মানসী

সম্পাদক-শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

Acc. No. 3012/8

বৈশাখ—১৩৬৩

জাতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদান!
বেঙ্গল ল্যাম্প

দি বেঙ্গল ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা

প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত

লিলি বার্লি

খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা - 8

বর্ষসূচী

বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৬৩

756.3
.012/8

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	অজ্ঞাত বাস—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার	৭৩৯
	অধিকার (গল্প)—প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী	৩০৬
	আধিক প্রসঙ্গ—শংকরপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৭১, ১৪৪-৫৬৬, ৬৪৭ ৮৩৬, ৮৯১, ৯৫১, ২০৩, ২৫৯, ৩২৪
	আশাবরী (কবিতা)—সুশান্ত ঘোষ	১৩২
	আমাদের পথ (প্রবন্ধ)—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ	৩৫৮
	আসান (গল্প)—অবধূত	
	আগমনী (কবিতা)—শ্রীসনত কুমার	
	আমার সে দিনগুলি (কবিতা) —গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	
	আশ্রয় (কবিতা)—অমলকান্তি ঘোষ	
	আমার দেশ (কবিতা)—করুণাময় বসু	
	আমার পরীক্ষা—ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ	
	আশ্চর্য যৌবন—শ্রীমতী শিপ্রা ঘোষ	
	একটী সাংচিলের চিন্তা (কবিতা) —শ্রীসজুনাথ চট্টোপাধ্যায়	
	একটী অপ্রাচীন কাহিনী (গল্প) —শ্রীউৎফুল্ল রায়	
	একটী না লেখা গল্প (গল্প) —শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
৫(ক)।	এরা দুরন্ত—বিমলকুমার ঘোষ	
৬।	একটী আধুনিক কবিতার ভূমিকা (প্রবন্ধ) —শ্রীপিযুষকান্তি চন্দ	৪৭
	এক বিহংগ (কবিতা)—শ্রীহিমাংশু চৌধুরী	৫৫৮
	এ পথে আমি যে (কবিতা) —শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৮৬
	কবি কহে (কবিতা)—শ্রীবিভূতিরঞ্জন গুহ	২১৭
	কবির গান (প্রবন্ধ)—শ্রীজয়দেব রায়	২০
	কবি বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার ধর্মতত্ত্ব —শ্রীমতী সন্ধ্যা দত্ত	

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২।	কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর (গল্প) —রণজিৎ কুমার সেন	
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— —নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত	
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— —হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	৬৬৩
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ ও স্নাতকোত্তর—শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ —শ্রী কে, কে, মুখার্জি	
২৬।	কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ —শ্রীমতী দেবী চক্রবর্তী	
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী —শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য	
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রণালয় —শ্রীশিবেন্দ্র কাঞ্জিলাল	
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা —অমর প্রসাদ দাশগুপ্ত	
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুব কল্যাণ কর্মধারা —অধ্যাপক প্রবোধ ঘোষ	৭২০
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গভাষা সাহিত্য —কালিদাস রায়	৭২১
	কালের যাত্রা (সম্পাদকীয়) ৭৪, ১৪৭, ২০৮, ২৬৪ ৮৯৪, ৯৫১, ৩৩৩, ৫৬৭, ৬৫২, ৮৪১,	
(৩২ ক)।	কাশ্মীর প্রসঙ্গ ও বৃটেন—শংকর	৮৮৮
৩৩।	কাশ্মীর (কবিতা)—শ্রীহিমাংশু চৌধুরী	
	কূপ মণ্ডুক (গল্প)—শ্রীকমলাকান্ত বরাট	
৩৫।	কোণারক (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত	
৩৬।	ক্যাসডর সুপারিশ ও করনীতি সংস্কার (প্রবন্ধ) —শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত	৩২৭

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৭।	গ্রন্থ জগতের দুএকটি কথা —শ্রীশচীভূষণ দাশগুপ্ত	৬২৭
৩৮।	শুদ্ধ—শ্রীবুদ্ধদেব ঘটক	৮০৫
৩৯।	গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৫০৬
৪০।	চলাচল (কবিতা) —শ্রীপার্থপ্রতিম চৌধুরী	৪৮৫
৪১।	চকমনিকের পিসিমা (গল্প) শ্রীপ্রভাত দেবসরকার	৪২৪
৪২।	জীবনানন্দ ও তার কবিতা —শ্রীমতী শিপ্রা ঘোষ	৬৩০
৪৩।	জীবন কবিতা (কবিতা) —শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৪৮৩
৪৪।	জীবন ছায়া (গল্প)—শ্রীসুভাষ সমাজদার	২৮৩
৪৫।	জীবন—শ্রীবাসুদেব দত্ত রায়	৯৪৪
(৪৫ ক)	জীবন ছবি (কবিতা) —শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৫৭
৪৬।	জীবন বীমা রাষ্ট্রীয় করণ (প্রবন্ধ) —শ্রীঅমলকুমার বসু	১৩৩
৪৭।	জীবে দয়া (প্রবন্ধ)—শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ	৩৫৬
৪৮।	জিজ্ঞাসা (কবিতা)—শ্রীবুদ্ধদেব ঘটক	২১৮
৪৯।	তর্জাগান (প্রবন্ধ)—শ্রীজয়দেব রায়	৯৪
৫০।	তোমার রাত্রিকে—রবিন্দ্রনাথ সেন	৮০৪
৫১।	তীর তরঙ্গ (কবিতা)— শ্রীমতী পারুল ঘোষ	৫৫৮
৫২।	তমসো পরস্তাৎ (গল্প)—সুভাষ সমাজদার	৪৯৯
৫৩।	তৃষ্ণা (কবিতা)—শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৩১৩
৫৪।	দামোদর (কবিতা) —শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী	২১৯
৫৫।	দিগন্তরে (কবিতা)—শ্রীবিবেক কুমার রায়	৩২
৫৬।	দিশা—শ্রীনদীর গুপ্ত	৮৮২
৫৭।	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নারীর ভূমিকা— —শ্রীসুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৩৬, ৩০৩, ৫৫১, ৫৮৪, ৫১৮
৫৮।	দীপ্তি দেবে মৃত্যু (কবিতা) —শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ	৩১৪
৫৯।	দুপুর পরিক্রমা (কবিতা) —শ্রীসিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	
৬০।	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি (প্রবন্ধ) —যাযাবর	৩৬৩
৬১।	নীল নীল বন (কবিতা)—শ্রীঅনিমেষ সেন	৩২
৬২।	নামের প্রেম (প্রবন্ধ) সরোজ কুমার দাস	৫১
৬৩।	নীতিশাস্ত্র বনাম মুনাফা শিকার (প্রবন্ধ) —শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দত্ত	৫১
৬৪।	নব পরিচ্ছদ—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়	৯৪৫
৬৫।	নতুন তারা (গল্প)—শ্রীসুশীল রায়	৪৬৭
৬৬।	নির্বাচন (কবিতা)—শ্রীসুসাহিত্য	৮০৬
৬৭।	নারী (কবিতা)—শ্রীদিপ্রা ঘোষ	৫৫৬
৬৮।	নোটিশ—শারিপুত্ত মোগ্‌গল্যায়ন	৫৯১
৬৯।	নতুন বনাম নবীন —শ্রীশ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায়	৬০০
৭০।	নতুন স্বর্ণমিক মুদ্রার বিনিময় হার	
৭১।	নারীর উক্তি—শ্রীবীরেন্দ্র কুমার রায়	৮৫৭
৭১ (ক)	পৃথিবীর কবি—রবীন্দ্র নাথ (প্রবন্ধ) —শ্রীঅমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩
৭২ (ক)	পশ্চিম এসিয়ার শক্তি কেন্দ্রে ঘাটতি—	৮২৯
৭৩।	পুস্তক পরিচয় ১৪২, ২৬২, ৮৩৯, ৯৫০, ৬৪৯, ৩০২	
৭৪।	প্রোটিন রহস্য (প্রবন্ধ) —শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—	২৬
৭৪(ক)	পৃথিবীর উপগ্রহ কয়টি ? (প্রবন্ধ) —শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	২৪৩
৭৫।	প্লাবন (কবিতা)—শ্রীনগেন দত্ত	৫১৮
৭৬।	প্রচার ও পরিকল্পনা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত	৮০২
৭৭।	প্রোটোটাইপ (গল্প)—শ্রীমতী বাণী রায়	৪৬৫
৭৮।	পরামর্শ (গল্প)—শ্রীমজেন্দ্রকুমার মিত্র	৩৯৭
৭৯।	পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ (প্রবন্ধ) —গোপাল ভট্টাচার্য	৩১৮
৮০।	পথ তরঙ্গ (কবিতা)—শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ	৬
৮১।	পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা—ডাঃ জে. সি. ঘোষ	৬৭৯
৮২।	পুরোনো স্মৃতি—শ্রীআশুতোষ বাগচি	৭০৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮২ (ক)।	ফ্যামিলি প্ল্যানিং (গল্প)—প্রা. না. বি	৩৫২
৮৩।	বহ্নি-বন্যা (উপন্যাস)—শ্রীগজেন্দ্র মিত্র ১৬০, ২২০, ৫৯, ১৩৭, ৮৮০, ৯০৫, ৩১৭ ৭১৮, ৫১৯	
	বর্মীমেয়ে মাসোয়ে (গল্প) শ্রীযামিনীকান্ত রায় চৌধুরী	
	বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	
	বিচিত্র দ্বীপ মিনিকয়	
	বসন্ত বাহার (কবিতা)— শ্রীঅনিল কুমার রায়	
	বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির ভাষণ—	
	বুদ্ধের জীবন ও বাণী— —ডাঃ এস্ রাধাকৃষ্ণনের ভাষণ	
	বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে—রচিত প্রবন্ধ	
	বুদাপেস্তের চিঠি	
	বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ— শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	৬৮৩
৯৩।	বৌদ্ধ মূল শাস্ত্র-গ্রন্থ ত্রিপিটক প্রচারের ইতিহাস —শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৬৯১
৯৪।	বাই লেনের কথা—অধ্যাপিকা ডাঃ উমা রায়	৬৮৫
৯৫।	বিড়ম্বনা (গল্প)—শ্রীমতী লীনা দত্তগুপ্তা	৩০৯
২৬।	বিলম্বিত শিক্ষা (প্রবন্ধ)—শ্রীকালিদাস রায়	৩৮৩
৯৭।	বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্য (প্রবন্ধ) —রণজিৎকুমার সেন	
৯৮।	বুদ্ধদেব লীলাসঙ্গিনী যশোধরা (প্রবন্ধ) —শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	
৯৯।	বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট (প্রবন্ধ) শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৪৭৬
	বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'দু'একটি কথা—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৫
১০১।	বৃন্দাসন—সুধীর গুপ্ত	৮০৪
৯০২।	বৈজ্ঞানিক কবি রবীন্দ্রনাথ—শ্রীশ্রুতি দেবী	৭৫০
	বিজ্ঞান সাধনা ও বিশ্ববিদ্যালয় —শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৭২৪
	বাংলার লোকসংগীত (প্রবন্ধ)—জয়দেব রায়	৫৫৯
	বেগবতী (কবিতা) শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০৩।	ভারতের শিক্ষা সমস্যা —ডাঃ কে, এল, শ্রীমালি	৫৩৬
	ভারতে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ —শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত	
	ভাটের গান—শ্রীজয়দেব রায়	
	ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কৃষি ঋণ (প্রবন্ধ). —প্রবোধচন্দ্র দত্ত	৪৮৮
	ভারত ও কমনওয়েলথ—শ্রীশঙ্কর	৯৪২
	ভারতের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র—শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত	৮১৪
	ভারতীয় শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ —শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত	
	ভারতে উচ্চশিক্ষার সমস্যা —শ্রীচিন্তামন দ্বারকানাথ দেশমুখ	
	শ্রীমতিলাল শীল—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	
	মহৎ পাপের ভূমিকা (গল্প) শ্রীসুভাষ সমাজদার	
	মানুষ (কবিতা)—শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ	
	মধ্যজ্ঞান (গল্প)—পবিত্র গোস্বামী	
	মুকুর (গল্প)—শ্রীমানবেন্দ্র পাল	
	মানভঞ্জন (একাঙ্কিকা)—শ্রীমন্মথ রায়	
	মনোদর্পন (প্রবন্ধ)—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী	
	মহেশ ভট্টাচার্য—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	
	মেয়েদের মন (গল্প) —শ্রীঅনিল কুমার চক্রবর্তী	
	মন (গল্প)—শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	
	মৃত্যুকে (কবিতা) —শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী	
	মিশর (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন দত্ত	
	যুগল আঁখি (কবিতা) —শ্রীকৃতান্ত নাথ বাগচী	
	যাত্রা বা গীতাভিনয় (প্রবন্ধ) —প্রভাংশু গুপ্ত	
	যমজের জন্ম রহস্য (প্রবন্ধ) —শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	১২৪
	রাতের কলকাতা—শ্রীশিবেন চট্টোপাধ্যায়	৯৪৪
	রাঙ্গা মামী (গল্প) —হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৪৮৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩১।	রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদন—শ্রীমতী সন্ধ্যা দত্ত	৭৬৮
১৩২।	ডাঃ রাধাকৃষ্ণানের বাণী—	৬৫৮
১৩৩।	রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (প্রবন্ধ) —শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত	২৩৩
	রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক প্রেমিকা —সুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	৫৯৭
১৩৫।	রূপছত্র (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রভাংশু দাশগুপ্ত	১০৮
১৩৬।	লোকমান্য তিলক স্মরণে—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ	২১৪
১৩৭।	শরতের দান (কবিতা)—শ্রীশান্তশীল দাস	৪৮৭
১৩৮।	শেষ কোথায় উপন্যাস —শ্রীসৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩৩, ৮৫১, ৬৩৭, ৯১৩, ৭২৭
	শুধু বাঁচার জন্য—সুভাষ সমাজদার	৮০৯
	শৈব মতবাদ ও শৈব সাহিত্য— শ্রীরণজিৎকুমার সেন	
	শরৎচন্দ্র—শ্রীরণজিৎকুমার সেন	
	শিল্পির মতামত (গল্প) —শ্রীমতী রেণুকা চক্রবর্তী	
	শান্তি ও মুক্তির প্রতীক জওহরলাল —শ্রীসচ্চিদানন্দ হোড়	
	শহর কোলকাতা ছাড়িয়ে (গল্প) —শ্রীবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত	
	শারদীয়া (প্রবন্ধ) —শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৩৪
	শিক্ষা বিস্তারে বাঙ্গালীর দান —শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	
	১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন ও ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার উপর ইহার প্রভাব —শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা	১৮১
	স্মৃতিকথা—শ্রীকালিদাস রায়	৯৭,১২, ১৭০, ২৪৭ ৮৪৩, ৮৯৭, ৫১১, ৫৭৫, ৭৬০, ২৭০
	সন্ন্যাসী উপগুপ্ত (প্রবন্ধ)—শ্রীজয়দেব রায়	২২৬
	স্ন্যাপ শট (গল্প)—শ্রীঅমিতা ঘোষাল	২৩৬
	সমাজ সেবার পরিপ্রেক্ষিতে (প্রবন্ধ) —শ্রীনগেন দত্ত	২৪০
১৪২।	সুবর্ণরেখা (কবিতা)—শ্রীবিভূতি ভট্টাচার্য	৬৩৫
১৪৩।	সোভিয়েট ও সোভিয়েট প্রভাব—"শ্রী"	৫৬২
১৪৪।	সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য—নগেন দত্ত	৬০৫
১৪৫।	সারদা দেবীর দর্শনের একটুখানি —শ্রীহারাধন রক্ষিত	

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৬।	সাতাইশে নভেম্বর—উৎপল রায়	৬১৮
১৪৭।	সুভাষচন্দ্র—সন্তোষ কুমার অধিকারী	৮০৪
১৪৮।	সন্ন ভঙ্গ (গল্প) —শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী	
	সাধক হরিদাস (গল্প) —শ্রীতারাপদ রাহা	
	সাহিত্যের ভিত্তিমূল (প্রবন্ধ) —শ্রীনগেন দত্ত	
	সমুদ্র সৈকতে (কবিতা) —শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী	
১৬২।	সাধারণ মানুষের ভূমিকা (গল্প) —নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৩৫৪
	স্বদেশ সেবায় যুব সমাজ (প্রবন্ধ) —সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	
	সাহিত্যের ভিত্তিভূমি (প্রবন্ধ) —শ্রীনগেন দত্ত	
১৬৫।	সমকালীন বৌদ্ধচিন্তা (প্রবন্ধ) —শ্রীরণজিৎ কুমার সেন	
	সূর্য স্নান (কবিতা) —শ্রীসিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	১৩১
১৬৭।	হয় তো (কবিতা)—সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৩১
১৬৮।	হে আমার দেশবাসী (কবিতা) —শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ	৬৩২
১৬৯।	হাজারীর হার-জিৎ—"শ্রী"	
১৭০।	হিত-মিত-প্রহণ —মহামোহপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী	৬৭৩
	হাতছানি (কবিতা)—তরুসখ বসু	৪৮৬
	হেগেল দর্শনে বাস্তবতা—অমলেন্দু চৌধুরী	৭৭৩
	(ক) ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় —ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৬৭
	ক্ষয়রোগীর আশেপাশে —নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য	
	ক্ষণ-গোধূলি (কবিতা) —শ্রীমতী শিপ্রা ঘোষ	
১৭৫।	ক্ষেত্র মোহন দে (প্রবন্ধ) —শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	
১৭৬।	খণ শোধ (গল্প)—প্রশান্তকুমার সিংহ	
১৭৭।	ডোবা (কবিতা)—শ্রীসুধীরঞ্জন মল্লিক	
১৭৮।	প্রাথমিক (কবিতা) —শ্রীসনত কুমার মিত্র	

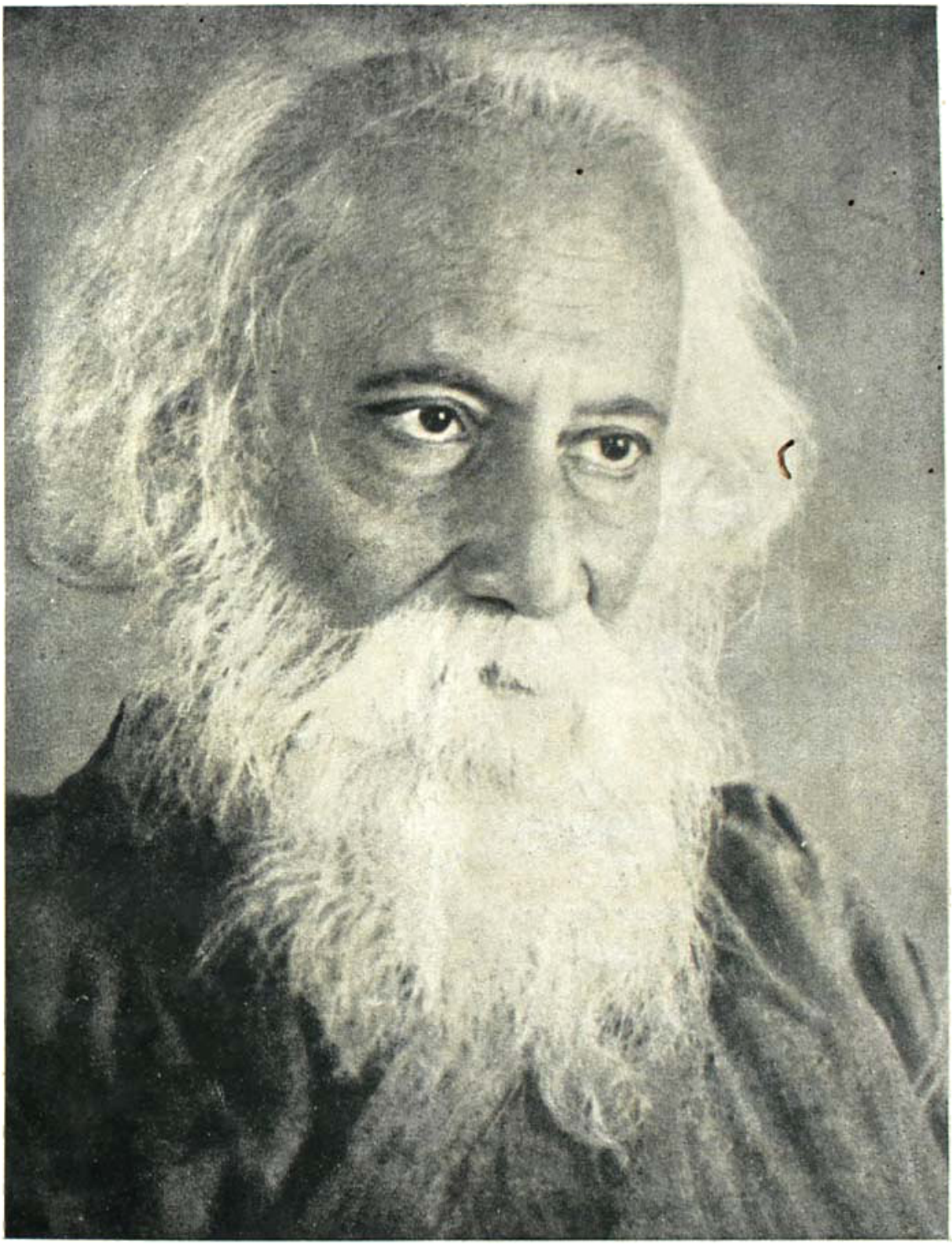

চির নতুনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ

মন্দিরা

উনবিংশ বর্ষ — বৈশাখ ১৩৬৩ — প্রথম সংখ্যা

UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY CALCUTTA

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

চট্টগ্রামের বন্দরে আকিয়াবগামী জাহাজ নোঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। জাহাজে মাল লওয়া হইয়াছে—উচ্চশ্রেণীর যাত্রীরাও জাহাজে উঠিয়াছেন। অবশিষ্ট কেবল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা অর্থাৎ যে-সকল যাত্রী অল্পভাড়া দিয়া জাহাজের প্লাটাতনে অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজীতে "ডেক" বলে তাহাতে—সর্ব্ববিধ অসুবিধা সহ্য করিয়া যাইবে তাহারা। তাহারা সংখ্যায় অল্প নহে—সুতরাং তাহাদিগের প্রদত্ত ভাড়ায় ষ্টীমার কোম্পানীর আয় যে অল্প হয় না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাহারা দরিদ্র এবং সেইজন্য তাহারা অবজ্ঞার পাত্র বলিয়া বিবেচিত। জাহাজে উঠিবার জন্য যে সিঁড়ি পাতিয়া দেওয়া হয়, তাহা ব্যবহার করিবার অধিকারে তাহারা বঞ্চিত—যেন তাহাদিগের চরণের ধূলায় ধনীদিগের ব্যবহার্য্য সিঁড়ি কলঙ্কিত হইবে। তাহারা ভীড় করিয়া অপেক্ষা করে এবং জাহাজ হইতে দড়ি ঝুলাইয়া দিলে তাহা ধরিয়া জাহাজে উঠিতে পায়। তাহাদিগের মধ্যে একটি দুর্ব্বলদেহ বাঙ্গালী বালক ছিল। সে দেখিল, একজন লোক দড়ি ধরিয়া উঠিবার সময় পড়িয়া মস্তকে আঘাত পাইল—সে ভাসিয়া যাইতেছিল, একজন "সাম্পান" নৌকাওয়ালা দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে তুলিয়া বাঁচাইল। সেই দৃশ্য দেখিয়া দুর্ব্বল বাঙ্গালী বালকের আতঙ্ক বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তাহাকে তখনই উঠিতে হইবে—অগত্যা সে সাহসে ভর করিয়া দড়ি ধরিয়া জাহাজে উঠিল। বালকটি ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মে যাইতেছিল। স্বদেশে বহু চেষ্টায় সে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাকণা লাভ করিতে পারে নাই। সে বিশেষ মেধাবী নহে—কুমিল্লা জিলা স্কুলে পাঠকালে সে ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ছিল—পেন্সিল কোন সহপাঠী লইলে সে ক্ষতি সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকায় তাহা একটি দীর্ঘ সুতায় জামার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিত—"যাহার প্রয়োজন হইত, লিখিতে পারিত কিন্তু ভুল করিয়া নিয়া যাইতে পারিত না"। উচ্চশিক্ষা লাভের আগ্রহও তাহার ছিল না—বাণিজ্যের আকাঙ্ক্ষা কাহাকে আকৃষ্ট করিত। দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সে কিরূপে দোকানী হইবে তাহা মনে করিত—এমনকি পত্র লিখিবার সময় প্রথমে দেবতার নাম না লিখিয়া—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" লিখিত। এক সময় সে জমিদারী সেরেস্তায় একটি চাকুরী পাইলে ও তাহা গ্রহণ করে নাই; ভাবিয়াছিল—ব্যবসা করিবে। কিন্তু শেষে অনন্যোপায় হইয়া অর্থোপার্জ্জনের আশায় ব্রহ্মযাত্রা করিতেছিল। এই বালক পরে বহু

বাল্য অতিক্রম করিয়া ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নানা প্রকারে অর্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন।

১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১১ই অগ্রহায়ণ ত্রিপুরা জিলার বিটঘর গ্রামে মাতামহের গৃহে মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শৈশবে পিতৃহীন ঈশ্বরদাস তর্কসিদ্ধান্ত বিটঘরের প্রাণকৃষ্ণ শিরোমণির প্রথমা কন্যা রাধুমণি দেবীকে বিবাহ করিয়া অপুত্রক শ্বশুরের পরিবারেই বাস করিতেন। ঈশ্বর দাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন—তাঁহার টোলে প্রায় ৪৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং তাহাদিগের মধ্যে ১৫ জন গুরুগৃহেই আশ্রয় ও অন্ন পাইত। পিতার সম্বন্ধে মহেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"পিতৃদেব মহাশয় অধ্যাপনা শেষ করিয়া দ্বিপ্রহরে অনেকদিন ঘরে গিয়া দেখিতেন যে, চাউল, ডাইল, কাঠ বা তরকারি নাই। তখন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে চাহিয়া বা ধার করিয়া এবং স্বয়ং কাঠ চিরিয়া বা খড় কাটিয়া দিনের কার্য্য সমাধা করিতেন। পরের দিনের জন্য চিন্তা করিতেন না বা চিন্তা করিবার সময় পাইতেন না।"

মাতার সম্বন্ধে মহেশ চন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"আমাদের চাকর বা চাকরাণী রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। মাতাঠাকুরাণীকে আমাদের ও টোলের ছাত্রদের রান্না করা, বৎসর তরকারী কুটা, বাটনা বাটা, সকড়ি নেওয়া প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। এই সকল কার্য্য তিনি ঘৃণার কার্য্য মনে করিতেন।..... মাতাঠাকুরাণী বিধবা হইয়া গায়ে তৈল মাখেন নাই, তৈল খান নাই ও গুড় খান নাই; কারণ, শাস্ত্রমতে বিধবার পক্ষে এই সকল নিষিদ্ধ। তিনি ঘৃত খাইতেন; কিন্তু ঘৃত পাইবেন কোথায়? বৎসরে অতিকষ্টে এক সের কি আধ সের পাইতেন। গ্রামে সর্ব্বদা সৈন্ধব লবণ পাওয়া যাইত না।.....সুতরাং তাঁহাকে বিনা লবণেও মধ্যে মধ্যে থাকিতে হইত। তিনি কাপড় ধোপায় দিতেন না বা নিজেও ক্ষার দিয়া ধুইতেন না, দিনে ২।৩ বার স্নান করিতেন, তাহাতে কাপড়ে এক প্রকার লাল রং ধরিত কিন্তু অপরিষ্কার বোধ হইত না। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন; রাত্রির জন্য তেঁতুল কাটা প্রভৃতি কতকগুলি কাজ ভাগ করিয়া রাখিতেন, রাত্রির পরিশ্রমকে 'কাও' বলিতেন। তাঁহাকে কখনও দিনে ঘুমাইতে দেখি নাই। তিনি বলিতেন, 'দিবানিদ্রা তমুক্ষয়'। উত্তর কালে আমার অর্থ হইলে পর তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রম করিতে হইত না; তখনও তিনি বলিতেন, 'আমি পূর্ব্বে যে কঠোর পরিশ্রম করিতাম, তাহা আমার বেশ ভাল লাগিত।"

মহেশচন্দ্রের এক ভ্রাতা ও দুই ভগিনী ছিলেন। অগ্রজ আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। এক পুত্র ডাক্তার হইয়া মেসোপোটেমিয়ায় (ইরাকে) গমন করিলে তিনি যখন বুঝিলেন, পুত্র ফিরিয়া আসিলে স্বজনগণ তাহার সহিত আহার করিবেন না, তখন "যবাকী" হইয়াছিলেন—ভ্রাতার বা পুত্রকন্যার গৃহেও কখনও অন্নেরও রন্ধন করা দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই।

মহেশচন্দ্রের বয়স যখন ৬ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তাহার চারি বৎসর পরে তাহার মাতামহের মৃত্যু হইলে পরিবার ঘোর দারিদ্র্য ভোগ করে। মহেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"আমাকে আমাদের গ্রামের পশ্চিমের মাঠ হইতে জ্বালাইবার জন্য খড় তুলিয়া মাথায় বোঝা বহিয়া আনিতে হইত। ইহা গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছেলেরাও করিত বটে, কিন্তু বাঁশপাতা দংগ্রহ কেবল আমিই করিতাম, মাঝে মাঝে মাতাঠাকুরাণীও করিতেন।" গ্রামে "আতপ চাউল" বিক্রয় হইত না—যাহাদিগের প্রয়োজন তাঁহারা ধান কিনিয়া "ভানিয়া" লইতেন। একবার মহেশচন্দ্রের বাটীতে অধিবাসে সঞ্চিত ধান্য পুড়িয়া গিয়াছিল; ধান কিনিবার সঙ্গতি ছিল না—তিনি "সিদ্ধ" চাউল লইয়া গ্রামের কালীবাড়ীতে প্রতিদিন বসিয়া থাকিতেন—পূজা শেষ হইলে পূজারী তাহার বিনিময়ে "আতপ" চাউল দিলে তাহা লইয়া আসিতেন—তবে তাঁহার মাতার অন্ন গ্রহণ করা হইত।

বাল্যকালে পিতৃহীন বালকের ৬ বৎসর বয়সে "হাতে খড়ি" হইলেও ৯।১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি লিখাপড়া করেন নাই বলিলেই হয়। ঐ সময়ে একদিন তাঁহার মনে হয়, তাঁহার সমবয়সী বালকরা লিখাপড়া করে—তাঁহারও তাহা করা উচিত। তখন দিন কয়েক সমবয়স্ক এক বালকের নিকট ও কিছুদিন গ্রামের

অবৈতনিক বিদ্যালয়ে কলার পাতায় লিখিতে অভ্যাস করেন। তাহার পরে গ্রামের বিদ্যালয়ে ২।৩ বৎসর পড়েন। রাত্রিকালে শিক্ষকের বাড়ীর বৈঠকখানায় পড়িতে হইবে;—"কারণ, বাড়ীতে প্রদীপের তৈল পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।" তখন মাটীর যে হাঁড়িতে ভূষের আগুন থাকিত, তাহাতে গন্ধক মাখান পাটকাটি জ্বালিয়া দিয়াশলাইয়ের কাজ হইত।

এই সময়েও কিন্তু বালক মহেশচন্দ্র যজমান বাড়ীতে যে ভোজন দক্ষিণা পাইতেন, তাহা সঞ্চয় করিয়া সহর হইতে কাগজ পেন্সিল আনাইয়া গ্রামে বিক্রয় করিতেন; মনে করিতেন, তাঁহার ব্যবসাবুদ্ধি আছে—তিনি ধনী হইতে পারিবেন। তখন তিনি লোকের নিকট হইতে পুরাতন খাতার কাগজ আনিয়া তাহাতে লিখিয়া হস্তাক্ষর ভাল করিবার চেষ্টা করিতেন।

তিনি যখন গ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন সমবয়সী জমীদার দুর্গাচরণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। দুর্গাচরণের ভগিনীপতি বসন্তকুমার ঘোষের একজোড়া পুরাতন জুতা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া ছিল। মহেশচন্দ্র লিখিয়াছেন —"আমি দুর্গাচরণ বাবুর নিকট হইতে চাহিয়া সেই জুতা জোড়া নিয়া নিজ বাড়ীতে রাখিয়া শ্যামগ্রামে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে আসিয়া শুনিলাম, বসন্তবাবু তাঁহার চাকর কুমারকে ঐ জুতা জোড়া দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। আমি জুতা আনিয়াছি জানিয়া কুমার আসিয়া জুতা নিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে আমার ও পরিবারস্থ লোকদের কত কষ্ট ও লজ্জা হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। শীতকালে প্রাতঃকালে খালি পায়ে হাঁটিতে বড়ই ঠাণ্ডা লাগিত বলিয়া জুতা চাহিয়া আনিয়াছিলাম, সখের জন্য নহে।"

গ্রামের বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে পড়ান না হওয়ায় মহেশচন্দ্র জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গৃহে যাইয়া তথায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে ৭।৮ মাস পাঠ করেন এবং আবার গ্রামে আসিয়া —গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠের সুবিধা না হওয়ায়—কুমিল্লা সহরে যাইবেন, স্থির করেন। কিন্তু মা হয়ত তাঁহার তথায় গমনে আপত্তি করিবেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে তাহা না বলিয়া কুমিল্লা যাত্রা করিলেন।

মহেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"তখন কুমিল্লায় রেল হয় নাই। গোমতী নদীতে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে নৌকা চলার মত জল থাকিত না। সুতরাং খুব অবস্থাপন্ন লোক ব্যতীত কেহই কুমিল্লায় পরিবার নিয়া থাকিতে পারিত না। তখন বেতনভোগী পাচক রাখিবার প্রথা ছিল না। ছাত্রদের কোন 'মেস' ছিল না। বাসার কর্ত্তা চাকর রাখিতেন; নিজের ও আত্মীয়ের ছেলেরা বাসায় থাকিয়া রান্না করিয়া খাইয়া পড়াশুনা করিত। কর্ত্তা নিজের ছেলেদের ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ছেলেদের ও চাকরের খোরাকি ও খরচের বেতন দিতেন। অন্য ছেলেরা শুধু তাহাদের নিজেদের খোরাকি দিত। কোন কোন বাসায় গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে কয়েকজনের রান্না করিয়া খোরাকি পাইয়া পড়িত। স্কুলের বেতনাদি অন্যান্য খরচ বাড়ী হইতে আনিতে হইত।"

পরিবারের শিক্ষার্থিদের একজনের চেষ্টায় এক সদ্বংশ ব্যক্তি মহেশচন্দ্রকে খোরাকি দিয়া বাসায় রাখিতে সম্মত হইলেও বিদ্যালয়ের বেতন ও পুস্তকাদির সংস্থান না হওয়ায় তাঁহাকে অন্য স্থানে ৫।৬ জন লোকের রন্ধন কার্য্যের বিনিময়ে আশ্রয়, খোরাকি, বিদ্যালয়ের বেতন ও পুস্তকাদির মূল্য পাইবার সর্ত্তে যাইতে হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে তথায় ২।৪ দিনের অধিক থাকা হয় নাই। তখন তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীতে ছাত্র হইয়াছেন—বেতন মাসিক এক টাকা। এই সময়ে তিনি একটি মাসিক ১৲ টাকা ছাত্র বৃত্তিও লাভ করেন। তাঁহাকে কয় বৎসর ভগিনীপতির বাসায় থাকিতে হইয়াছিল; কিন্তু তথায় আর ২ জন ছাত্রের সঙ্গে "যথাক্রমে ২ বেলা পর পরই পাক করিতে হইত"—এই কারণে পাঠের সময় অতি অল্প থাকিত। সেইজন্য সে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া প্রথমে যিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন, মহেশচন্দ্র আবার তাঁহার আশ্রয়ে গমন করেন—তিনি খোরাকি ব্যতীত ৬ মাসের বিদ্যালয়ের বেতন দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। —"এই বাসায় পাক করিবার অনেক লোক ছিল; বিশেষ স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই দিনে রান্না করিতেন"—সুতরাং মহেশচন্দ্রের "পাকের পালা অনেক বিলম্বে পড়িত।"

যে গৃহে তিনি এইরূপ আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই গৃহে তিনি গৃহস্বামীর, তাঁহার পত্নীর ও বালিকার যে স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। গৃহস্বামীর কথায় তিনি লিখিয়াছেন—"তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন। আমরা (অর্থাৎ তাঁহার আশ্রিতগণ) তাঁহার নিকট কত অপরাধ করিয়াছি কিন্তু তিনি স্বীয় উদারতাগুণে তৎসমুদায় ক্ষমা করিয়াছিলেন।" তাঁহার পত্নীর সম্বন্ধে মহেশচন্দ্রের মন্তব্য—"আমি তাঁহার স্ত্রীকে মা বলিয়া ডাকিতাম; তিনিও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।" গৃহস্বামীর বালিকা কন্যারূপিনী হিন্দু বিধবার প্রতীক ছিলেন—"আমরা তাঁহাকে মাসীমা বলিয়া ডাকিতাম। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হ'ন, সন্তানাদি কিছু ছিল না। তিনি আমাদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। কুগ্ন অবস্থায় আমরা বমি করিলে তিনি অক্লান্তরে ঐ সব পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেন। তিনি অতি ধার্ম্মিকা ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ঘুমের সময় ব্যতীত প্রায় সকল সময়েই ইষ্ট নাম জপ করিতেন।"

গৃহস্বামী ও তাঁহার গৃহিণীর উদার আদর্শ ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহীত হয় নাই। মহেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"তখন বাসায় সকলকে খেউরী করিবার জন্য বেতনভোগী নাপিত ছিল। কিন্তু সে আমার মত গরীব ছেলেদিগকে নিয়মমত খেউরী করিত না। এই কারণে দাড়ি রাখিয়াছিলাম এবং মাথার চুল ও পায়ের নখ ২।৩ মাস পরে পরে ফেলিতাম।"

দারিদ্র্যের সহিত এইরূপ সংগ্রামে মহেশচন্দ্র যেন অভ্যস্ত হইলেন। এই সময় কুমিল্লা জিলা স্কুলের শিক্ষক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী গুরুদয়াল সিংহের পরামর্শে তিনি ত্রিপুরা জিলার জজ মিষ্টার ষাউলের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিলে তিনি পত্রে লিখেন—দরিদ্রের পক্ষে লিখাপড়া শিখিবার চেষ্টা না করিয়া ব্যবসা করাই ভাল। এই পরামর্শ যে বালক মহেশচন্দ্রের স্বাভাবিক ব্যবসাপ্রীতি বর্দ্ধিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার কারমাইকেল ঐরূপ আবেদনে তাঁহাকে মাসিক ৫৲ টাকা সাহায্য দিতে থাকেন। মহেশচন্দ্র অর্থ সঞ্চিত করিতে থাকেন। তখন তিনি বৎসরে চারখানি বস্ত্রমাত্র ব্যবহার করিতেন—দুর্গাপূজার সময় গ্রামে যাইয়া পুরাতন ৪ খানি কাপড় মা'কে দিয়া যজমানদিগের প্রদত্ত ৪ খানি নূতন কাপড় ব্যবহারের জন্য কুমিল্লায় আনিতেন।

যখন তিনি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় একবার অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি মনে করিতে থাকেন, তাঁহার মেধা দুর্ব্বল—অর্থচিন্তাদি কারণে তাহা আরও ক্ষীণ হইতেছে—লিখাপড়া আর হইবে না। আবার তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষাও বাড়িতেছিল। তিনি কাহারও উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া অর্থোপার্জ্জনের দুরাশায় কলিকাতা যাত্রা করিলেন। অধিকাংশ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া গোয়ালন্দ হইতে রেলগাড়ীর চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রী হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া কয়দিন কোন কুটুম্বের বাড়ীতেও ত্রিপুরা জিলার ছাত্রদিগের 'মেসে' কয়দিন থাকিয়া অনাবশ্যে কলিকাতার ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহলাভের ব্যর্থ চেষ্টার পরে তিনি ঢাকায় যাইয়া তথা হইতে বরিশাল ও তথা হইতে পটুয়াখালী হইয়া কুমিল্লায় ও তথা হইতে বাসগ্রামে গমন করিলেন। এই সময় তাঁহার জমিদারী সেরেস্তায় একটি চাকুরীলাভের সম্ভাবনা ঘটিলে তিনি ব্যবসা করিবেন স্থির বলিয়া সে সম্ভাবনা ত্যাগ করেন।

তাহার পরে তিনি চট্টগ্রাম হইতে জাহাজে আকিয়াবে গমন করিলেন। তথায় দীননাথ বসু তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। দীননাথ "কেরাণী" নামে পরিচিত ছিলেন; তখন কেহ ইংরেজী জানিলে ব্রহ্মে তাহাকে কেরাণী বলা হইত। মহেশচন্দ্র কয় মাস ব্রহ্মে থাকিলেন—চাকরী জুটিল না, বিনা মূলধনে ব্যবসায়ের সুবিধা হইল না। তথায় তিনি মাসিক ১০৲ টাকা বেতনের ওজন-সরকারী চাকরীমাত্র পাইয়াছিলেন—"মিনিটে ১ বস্তা চাউল ওজন করিতে হয়; না পারিলে সাহেব গালি দেয়, কখনও বা মারে। এই কাজ করিতে সাহস হইল না।" শেষে মহেশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন স্থির করিলেন। দীননাথ বাবু তাঁহার জন্য দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে ৩টি টাকা দিয়া দিলেন।

যে জাহাজে মহেশচন্দ্র স্বদেশে ফিরিলেন, তাহা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছিবে সকলে বলিল। সন্ধ্যার

সময় কলিকাতায় যাইবেন শুনিয়া তিনি আকিয়াব হইতে যে মোটা চিড়া আনিয়াছিলেন, তাহা—আর প্রয়োজন হইবে না মনে করিয়া—জলে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু জাহাজ সেদিন তথায় রহিল—পরদিন যাত্রা করিয়া অপরাহ্নে কলিকাতায় আসিল। ফলে মহেশচন্দ্রকে সে পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিতে হইল।

কলিকাতায় কোন চাকরী জুটিল না। তখন মহেশ চন্দ্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া—সময় সময় দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া অবশেষে হতাশ অবস্থায় গৃহে ফিরিলেন। সকলেই তাঁহার অকৃতকার্য্যতায়, তাঁহার প্রতি বিরূপ—একজন আত্মীয়ের সহিত তিনি কথা বলিবার চেষ্টা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার পিছু পিছু ফির কেন?" কোন আত্মীয়ার অপ্রিয় মন্তব্যও তাঁহাকে বেদনা দিয়াছিল।

"অভাগা যদ্যপি যায়—সাগর শুকায়ে চায়—" লক্ষ্মীও লক্ষ্মীছাড়া হ'ন দেখিয়া মাতা প্রভৃতির উপদেশ মত মহেশচন্দ্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দে আবার কুমিল্লায় যাইয়া ত্রিপুরার মহারাজের বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্র হইলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ২২ বৎসর।

কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায়ও মহেশচন্দ্রের ব্যবসা করিয়া ধনী হইবার স্বপ্নের মোহ দূর হয় নাই। তাঁহার কুমিল্লা ত্যাগের পূর্ব্বেই একজন অবাঙ্গালী একখানি মনোহারী দ্রব্যের দোকান খুলিয়াছিলেন—দুই বৎসরে সে দোকানের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"স্কুলে যাবার সময় এই দোকান দেখিয়া যাইতাম এবং সেখানে গিয়াও এই দোকানই ভাবিতাম। স্কুল হইতে আসিবার সময় ঐ দোকান দেখিতাম এবং বাসায় আসিয়াও ঐ দোকানই ভাবিতাম। সুতরাং পড়িবার সময় কখন?" কাজেই ৬ মাস বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করিবার পরেই—প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়া মহেশচন্দ্র ছাত্রজীবন শেষ করিলেন।

যে সময় মহেশচন্দ্র ব্যবসা করিবার স্বপ্ন দেখিলেন —সে সময়ে সাধারণতঃ লোক পুরাতন সত্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।"

কয়মাস পরে মহেশচন্দ্র লোকের এই মনোভাবের পরিচয় বিশেষভাবে পাইয়াছিলেন। কয়মাস পরে ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে তিনি স্বগৃহে যাইলে তাহার মাতা, অগ্রজ, মাতুল প্রভৃতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—তিনি ব্যবসা করিলে কেহ তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না; সুতরাং তাঁহার নিকট যে টাকা আছে তাহা তিনি দি'ন তাহাতে একখানি ঘর প্রস্তুত করা হউক; তাহা হইলে তাঁহার বিবাহ দেওয়া সহজে হইবে—বিবাহের পরে তিনি যথেচ্ছা কাজ করিতে পারিবেন।

মহেশচন্দ্র কিন্তু ইহাতে সম্মত হইলেন না। তখন তিনি কুমিল্লা বঙ্গবিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র ইংরেজী শ্রেণীতে পড়িত তাহাদের শিক্ষকের কাজ করিয়া মাসে দেড় টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতেন। প্রত্যেক ছাত্রের মাসিক বেতন চার আনা ছিল। নানারূপে তিনি তখন ৫৫৲ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে ১০৲ টাকা গুরুদয়ালবাবু দুর্গাপূজার সময় বাড়ীতে যাইলে মহেশচন্দ্র তাঁহার দোকানের কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া যে ১০৲ পাইয়াছিলেন, তাহা ছিল। সেই টাকা লইয়া ১২৮৯ বঙ্গাব্দে তিনি তৃতীয়বার কলিকাতা যাত্রা করিলেন। দ্বিজদাস দত্ত কুমিল্লা জিলা স্কুলের হেডমাষ্টারের পদ হইতে বেথুন কলেজে অধ্যাপক হইয়া কলিকাতায় যাইতেছিলেন। মহেশচন্দ্র তাঁহার সঙ্গী হইলেন—কিন্তু ঢাকায় আসিয়া তিনি জ্বরে আক্রান্ত হইলে আর দ্বিজদাসবাবুর সহিত যাওয়া হইল না। সুস্থ হইয়া তিনি সম্বল ৫৫৲ টাকা লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন—পাথেয় দিয়া ৫১৲ টাকা অবশিষ্ট থাকিল।

কলিকাতায় আসিয়া মহেশচন্দ্র প্রথমে একমাসের অন্ন আহারের ব্যয়ের বিনিময়ে বড়বাজারে পশেয়াপট্টীতে এক কাপড়ের দোকানে কর্ম্মচারীদিগের কাজ লক্ষ্য করিবার চাকরী পাইলেন এবং তাহার পরে—১২৮৯ বঙ্গাব্দে মাসিক ৭৲ বেতনে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এক মুদীর দোকান খুলিলেন। ৫১৲ টাকা মূলধনে ২ মাসে ৫৮৲ লাভ হইল। কিন্তু কর্ম্মচারী আট আনা আত্মসাৎ করায় তাহার স্থানে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন সে অত্যন্ত অসাধু এবং তাহার কার্য্যফলে

২ মাসে ৫৬ টাকা ক্ষতি হওয়ায় ৩১৲ টাকা মূল্যে তাহাকেই তিনি দোকান বিক্রয় করিয়া কলিকাতা হগ সাহেবে একখানি মনোহারী দোকান খুলিলেন।

প্রথম দোকান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়—তখন ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে শ্রমের মর্য্যাদাবোধ উদ্ভূত হইতেছিল। কুমিল্লায় ত্রিপুরার মহারাজার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বঙ্কচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহেশচন্দ্রকে মুদীর দোকান করিতে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তখন কলেজের ছাত্র যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর ঐ দোকানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। এই দ্বারই পরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়—সমাজের সংস্কার। কাঁসার পাত্রের বদলে বহুদিন অন্তর মহেশচন্দ্র "চীনা মাটির" পাত্রে ভাত খাওয়ায় অন্য হিন্দু মুদীদিগের দ্বারা "একঘরে" হইয়াছিলেন।

অভিজ্ঞতার অভাবে মনোহারী দোকান বন্ধ করিতে হয়। তখন স্নানের জন্য মহেশচন্দ্রকে ময়দানে পুষ্করিণী হইতে "টিনের" ক্যানিষ্টারে জল আনিয়া কূলে বসিয়া স্নান করিতে হইত; পয়সার অভাবে ধোপার দ্বারা কাপড়-কাচানও সম্ভব হইত না।

ইহার পরে মহেশচন্দ্র ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে এক পুরাতন পুস্তকের দোকানে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে ২৮ দিন চাকরী করেন। তথায় দোকানের অধিকারীর জন্য তাঁহাকে তামাক সাজিতে হইত।

পরবর্ত্তী চাকরী এক কলের দোকানে। ২।১ দিন চাকরীর পর সে দোকানের আসুকাল শেষ হয়। মহেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, আমি ব্যবসায় বুঝি এবং ব্যবসায় করিয়া ধনী হইতে পারিব। কিন্তু নানা কষ্টে অকৃতকার্য্য হইয়া বুঝিলাম যে, আমি ব্যবসায় কিছুই বুঝি না। তখন আত্ম-হত্যা করার ইচ্ছা হইল। কিন্তু আত্ম-হত্যা করিলে মাতা ঠাকুরাণীর অত্যন্ত কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাহা করিলাম না।"

বেকার হইয়া মহেশচন্দ্র যখন বাউড়িয়া চটকলে শ্রমিকের কার্য্য করিতে যাইবেন স্থির করেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁহার চাকরী হইল। দোকানের অধিকারীরা কুণ্ডু—তৈলিক শ্রেণীর। ইঁহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ মহেশচন্দ্রকে ভৃত্যের কাজে ব্রতী করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দের শেষভাগে তিনি খোরাকী ও মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে এই চাকরী পাইলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"এই সময় ব্যবসায় বুঝি বলিয়া যে অহঙ্কার ছিল তাহা ভাঙ্গিল এবং ব্যবসায় শিখিবার উপায়ের সূত্রপাত হইল।" এই দোকানের সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মচারী হইয়া মহেশচন্দ্র নিষ্ঠা সহকারে কাজ করিতে থাকেন। তিনি লিখিয়াছেন—"দৈনিক ঘর ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি নিয়মিত কার্য্যগুলি আমি রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই করিয়া রাখিতাম এবং উপস্থিত কার্য্যগুলিও ইঙ্গিতমাত্রই করিয়া দিতাম।" এই সময়ের একটি ব্যাপার কৌতুকজনক—"কুণ্ডুদের স্বজাতীয় অনেক লোক 'দেশ' হইতে আসিত এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'এ ব্রাহ্মণটি কে?' এইজন্য দেশী লোক দেখিলেই পৈতা কোমরে জড়াইয়া ফেলিতাম।"

উত্তরকালে যে মহেশচন্দ্র তাঁহার বিবিধ বিরাট ব্যবসা-কেন্দ্রে, বিদ্যালয়ে, ছাত্রাবাসে, ধর্ম্মশালায় বহুলোকের আশ্রয় হইয়াছিলেন ও বহু সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিয়া সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগ্যে কিন্তু এই চাকরীও অধিক দিন স্থায়ী হইল না। দোকানে ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইল। তিনি ভাবিলেন—"যে ডাল ধরি,সেই ডালই ভাঙ্গিয়া পড়ে। ৫৲ টাকা বেতনের চাকরী, তাহা হইতেও আবার অবসর!!" কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকদিন চাকরী করিতে হইল না। ইহার পরে তিনি আর মাত্র ১০।১৫ দিন এক দোকানে চাকরী করিয়াছিলেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী, বোধ হয়, তাঁহার এই ভক্তকে তাঁহার দুর্লভ কৃপা অকাতরে প্রদানের পূর্ব্বে তাঁহাকে নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা সেই কৃপালাভের উপযুক্ত করিতেছিলেন—দারিদ্র্যের অগ্নিতে তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া তাঁহার খামিকা নষ্ট করিতেছিলেন—অভিজ্ঞতায় তাঁহাকে সমৃদ্ধ করিতেছিলেন।

কুণ্ডুদিগের দোকানে চাকরীর সময়েই তিনি কুমিল্লায় গুরুদয়াল সিংহের দোকানের জন্য দ্রব্যাদি কলিকাতা হইতে

সরবরাহ করিবার কাজ পাইয়াছিলেন—সেইজন্য টাকায় ২ পয়সা 'কমিশন' পাইতেন। চাকরী যাইবার পরে গুরুদয়ালবাবু তাঁহার মাসিক বেতন ৫৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিলেন—হোটেলে আহারের ব্যয়ও মাসিক ৫৲ টাকা ছিল।

পূর্ব্বে যে দিঘরাস দত্তের কথা বলা হইয়াছে; তিনি তখন কলিকাতায় অধ্যাপক। তিনি স্বদেশী পণ্যের অনুরাগী ছিলেন—পাতার ছাতা ব্যবহার করিতেন। তিনি নানা-ভাবে মহেশচন্দ্রকে সাহায্য করিতেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। কুমিল্লার গুরুদয়াল সিংহও ব্রাহ্ম ছিলেন এবং তথায় মহেশ-চন্দ্র তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তিনি বহু ব্রাহ্মের সহিত পরিচিত হ'ন এবং তাঁহাদিগের সাহায্য ও স্নেহ লাভ করেন। এক সময়ে তাঁহার উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা হয়; কিন্তু মাতা অসন্তুষ্টা হইবেন, এই আশঙ্কায় সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বহু ব্রাহ্ম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্ম বন্ধু-দিগের মধ্যে একজনের নাম—শ্যামলাল ঘোষ। ইঁহার পত্নী থাকমণি ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রথম ধাত্রীর কাজ করিতেন। শ্যামলালবাবু একখানি কাপড়ের দোকান করিয়া লাভ না হওয়ায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র বলিয়াছেন—"ইহাতেই তাঁহার ব্যবসাবুদ্ধি এমন হইয়াছিল যে, আমি বহুপ্রকারের ব্যবসায় করিয়াও তাঁহার মত ব্যবসায় বুঝি নাই।" তিনি হাপানীরোগে কষ্ট পাইতেন—স্ত্রীবিয়োগের পরে রোগযন্ত্রণায় অহিফেনসার 'ইনজেকসান' করিয়া আত্মহত্যা করেন। পরবর্ত্তীকালে সিমলা ষ্ট্রীটে তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী ছিল। তিনি মহেশচন্দ্রকে পোষ্টকার্ড লিখিয়া জানান, ঐ বাড়ী ১১,৫০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা স্থির হইয়াছে; কিন্তু মহেশচন্দ্র যদি তাহা ক্রয় করেন, তবে তাহা অন্যকে বিক্রয় করিবেন না; কারণ যে বাড়ীর জন্য তাঁহাকে অনেক চিন্তা করিতে ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, বন্ধু মহেশচন্দ্র তাহার ফলসম্ভোগ করিলে তিনি তৃপ্ত হইবেন। পত্নী হরসুন্দরীর ও পুত্র মন্মথনাথের ইচ্ছায় মহেশচন্দ্র ঐ গৃহ কিনিয়া তাহাতে বাস করিয়া গিয়াছেন।

ব্যবসায়ে মহেশচন্দ্রের মূলধনের স্বল্পতা তাঁহার সাধুতার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। তখন কলিকাতায় বাঙ্গালীর পাইকারী কাগজের দোকান অধিক ছিল না—যে কয়খানি ছিল সে সকলের মধ্যে "শ্রীশম্ভুচন্দ্র সিংহ" দোকান প্রধান। এই দোকানের অধিকারী ৫০ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়া বাকী কাগজ কলের "এজেন্ট" হইয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র এই দোকান হইতে কাগজ কিনিয়া গুরুদয়াল সিংহ প্রভৃতিকে সরবরাহ করিতেন। একবার মহেশচন্দ্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মনে করেন, যদি সহসা তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে শম্ভুচন্দ্র সিংহের মত যে সকল দোকানদারের তাঁহার নিকট টাকা পাওনা থাকিবে, তাহাদিগের পক্ষে প্রাপ্য টাকা আদায় করা দুষ্কর হইবে। তাহাতে তিনি—যাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইলে তিনি ঋণী থাকিয়া না মরেন এই আশঙ্কায়, পাওনাদারদিগের প্রাপ্য পরিশোধের জন্য ২ হাজার টাকার জন্য জীবন বীমা করেন। তখন বাঙ্গালীর কোন বীমা প্রতিষ্ঠান ছিল না—"ওরিয়েন্টাল" প্রধান বীমা কোম্পানী। পরে অর্থের অভাব ঘুচিলে ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র বীমা বন্ধ করিয়া নিয়মানুসারে ২০০ টাকার পরিবর্ত্তে ১০৮৲০ গ্রহণ করেন।

অল্প পরিমাণ কাগজ চীনাবাজার হইতে আনিতে হইলে মহেশচন্দ্র স্বয়ং তাহা বহন করিয়া আনিতেন। পূর্ব্বে "একসারসাইজ" বুক এ দেশে প্রস্তুত হইত না—তাহা ইংরাজের দোকানেই পাওয়া যাইত। মহেশচন্দ্র ও "কে সি দাঁ কোম্পানী" প্রথম এ দেশে উহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র কলেজ ষ্ট্রীটে (যে স্থানে এখন কলেজ ষ্ট্রীট বাজার হইয়াছে তথায়) একখানি ষ্টেশনারী ও পুস্তকের দোকান প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় মফঃস্বলে মাসে সরবরাহের কাজে তাঁহাকে প্রায় প্রতিদিন বেলা ১১ টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যাগ বহিয়া বাজারে ঘুরিতে হইত। টাকা, হিসাবের খাতা প্রভৃতি ঐ ব্যাগে থাকিত। সন্ধ্যার পরে বাড়ীতে ফিরিয়া তিনি হিসাব লিখিতেন এবং প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া মাল পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত করিতেন। আহারের অনিয়মে তিনি অম্লাধিক্যে পীড়িত হইয়া পড়েন—তদবধি তিনি দৈনিক একবেলা আহার করিতেন। ষ্টেশনারী দোকানে লাভ

না হওয়ায় তিনি তাহা বন্ধ করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিতে থাকেন—তাহাতে লাভ হয়।

এই সময় প্রায় ২৮।২৯ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন—পত্নীর বয়স বিবাহ কালে ১৩।১৪ বৎসর। পত্নী হরসুন্দরী বিশেষ পরিশ্রম করিয়া সংসার শ্রীসম্পন্ন রাখিতেন। কিন্তু ১৩০৬ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বোধ হয়, একমাত্র সন্তান পুত্রের মৃত্যুশোক তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের ও অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।

মহেশচন্দ্রের ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ১২৯৬ বঙ্গাব্দে মফঃস্বলে মাল সরবরাহ কাজের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক ষ্টোর নাম দিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান প্রতিষ্ঠিত করেন। এদেশে এলোপ্যাথীর পরে হোমিওপ্যাথীর প্রবর্ত্তন হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদিগের চেষ্টায় এবং মহেন্দ্রলাল সরকারের মত এলোপ্যাথের হোমিওপ্যাথ হওয়ায়—সর্ব্বোপরি এই দরিদ্র দেশে ঔষধের মূল্যস্বল্পতা হেতু অল্পদিনে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আদর হয়। কিন্তু প্রথমে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান অধিক ছিল না। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে, বোধ হয়, লালবিহারী মিত্র প্রথমে বড় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ও পুস্তকের দোকান করেন। মহেশচন্দ্রের ঔষধের দোকান যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ ঔষধ জার্ম্মানী হইতে, কতক আমেরিকা হইতে এবং অল্প পরিমাণ ইংলণ্ড হইতে আনিয়া "ডাইলিউশন" করিতেন। বিদেশী জার্ম্মাকোপিয়ার মূল্য অধিক থাকায় মহেশচন্দ্র অল্পমূল্যে বাঙ্গালায় ও ইংরেজীতে জার্ম্মাকোপিয়া ছাপাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি প্রথমে জার্ম্মান জার্ম্মাকোপিয়ার মূল তথ্যগুলি ছাপাইয়া গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগকে প্রদান করেন। তাহার একখানি ঘটনাক্রমে উমাচরণ মিত্র নামক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসানুরাগীর হস্তগত হওয়ায় তিনি উহাতে ভুল দেখিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া এক বন্ধুর দ্বারা মহেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন। মহেশচন্দ্র যেন অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঈপ্সিত সুযোগ পাইলেন। তিনি উমাচরণ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে উমাচরণ বাবু তাঁহার প্রস্তাবে করমর্দ্দন অক্লান্ত শ্রমে জার্ম্মাকোপিয়া লিখিয়া দিলেন—পারিশ্রমিক লইতে অস্বীকার করিলেন। তিনি মহেশচন্দ্রকে বলেন—"আমি আপনার উপকারের জন্য পুস্তক লিখি না; বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক ভাল পুস্তক নাই বলিয়া লিখিতেছি। আপনি ইহাতে সাহায্য করিতেছেন। সুতরাং আপনার নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইতে পারিনা।" অথচ উমাচরণ বাবু ধনী ছিলেন না।

এতদিন তাঁহার ব্যবসা করিয়া সাফল্যলাভের স্বপ্ন সত্য হইয়াছে—ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন বুঝিয়া মহেশচন্দ্র এলোপ্যাথিক ঔষধের দোকান "এলোপ্যাথিক ষ্টোর" প্রতিষ্ঠিত করেন। সেজন্য তাঁহাকে কিছু টাকা ঋণ করিতে হওয়ায় কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন—"এইবার মহেশবাবুর অগ্নিপরীক্ষা"—অর্থাৎ ভরাডুবি না হয়। শুনিয়া মহেশচন্দ্র স্থির করেন—ঐ ব্যবসায়ে লাভ হইলে লাভের এক চতুর্থাংশ দান করিবেন। পরে একটি ঘটনায় তিনি সঙ্কল্প করেন, লাভের অর্দ্ধাংশ দান করিবেন। তিনি কখনও সে সম্বন্ধে অনবহিত হয়েন নাই।

ইহার পরে অক্লান্তকর্মী মহেশচন্দ্র বিবিধ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সকলগুলিতেই যে তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। যে সকলে তিনি সাফল্য লাভ করেন, সে সকলের মধ্যে "ইকনমিক কার্ম্মেসী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "হোমিওপ্যাথিক ষ্টোরে" বাজারের অন্যত্র যেমন তেমনই চার আনা ড্রাম দরে ঔষধ বিক্রয় করা হইত। দরিদ্র দেশে অল্প মূল্যে বিশুদ্ধ ঔষধ দেওয়া যায় কি না তাহা চিন্তা করিয়া মহেশচন্দ্র দেখিলেন, নামমাত্র লাভে সন্তুষ্ট হইলে ৫ পয়সা ড্রাম দরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয় করা যায়। কিন্তু ঔষধ বিক্রীত হইলে—"তিল কুড়াইয়া তাল" হিসাবে মোট আয় অধিক হয়। কিন্তু অত অল্প মূল্যে বিশুদ্ধ ঔষধ বিক্রয় করা সম্ভব নহে—লোকের এই ধারণাহেতু প্রথম ৫।৬ মাস প্রতিদিন ৫ বা ৬ আনার অধিক মূল্যের ঔষধ বিক্রীত হইত না। দূরদর্শী মহেশচন্দ্র ইহাতে নিরুৎসাহ না হওয়ায় বিক্রয় বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তখন তিনি অধিক মূল্যে ঔষধ বিক্রয়ের দোকান বন্ধ করিয়া দেন।

যখন মহেশচন্দ্রের ব্যবসায়ে উন্নতির গতি দ্রুত তখন

কিন্তু মেঘলেশহীন আকাশ হইতে বজ্রাঘাতের মত দুর্ঘটনা ঘটিল—তাঁহার ১৯ বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র মন্মথনাথের মৃত্যু হইল। মহেশচন্দ্র দারুণ শোকে অভিভূত হইলেন—শোক সহ্য করিতে না পারিয়া এবং পরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লজ্জা বোধ হওয়ায় ও চীৎকার করিয়া রোদন করিলে প্রতিবেশীদিগকে পীড়া দেওয়া হইবে মনে করিয়া পুত্রের মৃত্যুর পরে ত্রয়োদশ দিবসে তিনি "নিজের মৃত্যু কামনা করিয়া" সস্ত্রীক বৈদ্যনাথ যাত্রা করেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ইহার পর আবার যে কুমিল্লায় ফিরিব অথবা কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসায় করিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। বৈদ্যনাথে অনেক জঙ্গল থাকায় চীৎকার করিয়া রোদন করিলে কাহারও বিরক্তির কারণ হইত না।"

কিন্তু বৈদ্যনাথেও তিনি কাজ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় কাঙ্গালীদিগকে খিচুড়ী খাইতে দিতেন ও এমেরিকান মিশনের অনাথাশ্রমের কাজে সাহায্য করিতেন। এক বৎসর পরে তিনি বারাণসীতে যাইয়া ২ বৎসর বাস করেন। কালের প্রলেপে শোকের ক্ষত প্রশমিত হইলে আবার তাঁহার কাজ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইতে থাকে। তিনি লিখিয়াছেন—"অবৈতনিক কাজ খুঁজিতে লাগিলাম। রামকৃষ্ণমিশনের নিকট কাজ করিতে চাহিলাম, বয়স বেশী বলিয়া কাজ পাইলাম না। ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রেসে ম্যানেজারী কার্য্য চাহিলাম; ছাপাখানার কাজ জানি না বলিয়া কাজ পাইলাম না।"

তিনি লিখিয়াছেন—"ভগবানে মন গেল না বলিয়া আবার ফিরিয়া গৃহে আসি।" তখনও তাঁহার কর্ম্মযোগের শেষ হয় নাই। তিনি বেলুড়মঠের দক্ষিণ দিকের এক বাড়ীতে প্রায় ২ বৎসর বাস করেন এবং মঠের কর্ম্মী সন্ন্যাসীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। প্রায় চারি বৎসর নয় মাস বৈদ্যনাথে, বারাণসীতে ও বেলুড়ে বাস করিয়া তিনি আবার কুমিল্লায় গমন করেন এবং এক জ্ঞাতি-পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন।

তখন ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁহার রোপিত বৃক্ষ বৃহদাকার ধারণ করিয়া ফল প্রসব করিতেছে। এক রবিবারে তাঁহার কলিকাতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীরা বেলুড়ে তাঁহাকে দেখিতে যাইলে—বহুলোক ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেছে দেখিয়া, তিনি বিশেষ আনন্দানুভব করেন। বোধ হয়, তাহাও তাঁহাকে আবার কর্ম্মজীবনে ফিরাইয়া আনিবার অন্যতম প্রধান কারণ।

ধনাগমের আরম্ভাবধি মহেশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, লাভের কতকাংশ লোকহিতকর কার্য্যে প্রযুক্ত করিবেন। পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সেই ইচ্ছা পুষ্ট ও প্রবল হয়। মহেশচন্দ্র অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। নানা কার্য্যে অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ বারাণসীতে তিনি দেহরক্ষা করেন।

মহেশচন্দ্র কুমিল্লায় যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর পাঠশালা—টোল ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর পাঠশালা এবং ইংরেজী বিদ্যালয়, রামমালা ছাত্রাবাস ও রামমালা পাঠাগার এবং দরিদ্র বালবিধবাদিগের চরিত্র গঠন করিয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস ও বিদ্যালয় যেমন উল্লেখযোগ্য, তাঁহার গৃহ "মহেশ প্রাঙ্গণ" তেমনই উল্লেখযোগ্য। ছাত্রদিগকে স্বাবলম্বী ও ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চাদর্শ গ্রহণকারী করিবার জন্য বুকার ওয়াশিংটনের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের আদর্শে রামমালা ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ ছাত্রাবাসের নিয়ম—"ছাত্রদিগকে তাহাদিগের প্রয়োজনীয় সকল কাজ নিজের হাতে করিয়া লইতে হইবে"—এমন কি ধোপার দ্বারা কাপড় কাচান ও নাপিতের দ্বারা চুল ছাটানও নিষিদ্ধ। ছাত্রদিগের দৈনিক কার্য্যতালিকায়—বাড়ী, উঠান, পথ ও নর্দ্দমা প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার কাজও আছে। তাঁহার "মহেশ প্রাঙ্গণে" বহু সভা সমিতি হইয়াছে এবং তথায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, সুভাষ চন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, লিয়াকেত হোসেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মোহান্ত সন্তদাস (তারা কিশোর

চৌধুরী), রামদাস বাবাজী, ভোলানন্দ গিরি, মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঢাকার "মা আনন্দময়ী", স্বামী প্রণবানন্দ প্রভৃতি আতিথ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে তিনি গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার পত্নীর ও শ্যালিকার স্নেহ লাভ হইয়াছিলেন—সেই জন্য গীতাকুণ্ড তীর্থে প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যে ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন—"গিরীশ ধর্মশালা"। তাঁহার আর এক কীর্তি বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা।

এই সকল ব্যতীত তিনি বিন্ধ্যাচলে রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন—নানা জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নানা সেবাকার্যে যে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিমাণ—লক্ষ লক্ষ টাকা। তিনি বিদেশী ধনী কার্ণেগীর মত মনে করিতেন—ধনী থাকিয়া মৃত্যু অপমানের কথা; অর্থাৎ ধনের সদ্ব্যবহার করাই মানুষের কর্তব্য। সেইজন্য দানের জন্য দান করিতেন, যশের জন্য নহে। তাঁহার অনেক দানের সর্ত থাকিত—তাঁহার নাম প্রকাশ করা হইবে না। একবার কোন জনহিতকর কার্যের জন্য তিনি কৃষ্ণকুমার মিত্রকে কিছু টাকা দেন। কৃষ্ণকুমার বাবু দাতার নাম প্রকাশ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে পত্র লিখেন—উভয়ে সকল বিষয়ে পূর্বের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে—কিন্তু তাহার মাধ্যমে আর কোন দান করা হইবে না।

তিনি গয়ায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গৃহ নির্মাণার্থ ভূমি কিনিতে ও উহার বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণের জন্য অনেক টাকা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"বাড়ী করিয়া দিলে নাম জাহির হয় বেশী; জমী দেওয়াল ইত্যাদি দরকারী হইলেও এ সকলের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে না, (দাতার) নামও জাহির হয় না। আমি সেই জন্যই বাড়ীর জন্য টাকা না দিয়া জমী ও দেওয়ালের জন্য টাকা দিয়াছি।"

ত্রিপুরা জিলার কোন স্থানে নদীর উপর মহেশচন্দ্র বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে একটি লৌহের সেতু করাইয়া দিয়াছিলেন। একদিন সে সম্বন্ধে এক ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার নাম লিখিত থাকিলে ভাল হইত। শুনিয়া মহেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "ইহার চেয়ে ভাল হয়, যদি আমার কপালে লিখিয়া দেন—'পুল নির্মাণকারী মহেশচন্দ্র'।"

সংবাদপত্রে দেশের জনগণের কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনা অধিক হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। সেই আদর্শ রক্ষার জন্য তিনি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে তাঁহার পত্রের জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

মহেশচন্দ্র সমাজে আবশ্যক সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। দরিদ্র হিন্দু বালবিধবাদিগের চরিত্রগঠন করিয়া স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লায় "নিবেদিতা ছাত্রী নিবাস" ও বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বহু বিধবার বিবাহে সাহায্য করেন। তিনি বলিতেন—"বিধবা সংরক্ষণের ব্যাপারে আমি মাসিক ৩ শত টাকা খরচ করি, আর বিধবা বিবাহ ব্যাপারে আমি খরচ করি মাসে মাত্র ৩০৲ টাকা। ইহা হইতেই বুঝিতে পার, বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে আমার মতিগতি কোন্ দিকে। যেখানে হিন্দু শাস্ত্র ও সমাজ অনুমোদিত বৈধব্যাচরণ প্রতিপালিত না হইয়া নানা প্রকার ব্যাভিচারের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা, সেখানেই আমি বিবাহ দিয়া বিধবাদের একটা পথ বাড়াইয়া দিতে চাই।" পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়—এই প্রথাহেতু হিন্দু সমাজে নমঃশূদ্র পাটনী প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্রদায়ের বিলোপ ঘটিতেছে—অথচ তাহারা তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত বিধবা-বিবাহ প্রথা "উচ্চ"বর্ণের অনুকরণে বর্জন করিয়াছে। সে সকল ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ পুনঃপ্রবর্তন প্রয়োজন বলিয়াই তিনি সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন।

মহেশচন্দ্র কঠোর পরিশ্রমী, নিয়মনিষ্ঠ ও দূরদর্শী ছিলেন। গ্রীষ্মকালে একদিন বেলা দুইটা কি আড়াইটার সময় মহেশচন্দ্র কুমিল্লার বাড়ীর নাটমন্দিরে টুলে বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া এক ব্যক্তি বলেন, চিকিৎসকের মত, বয়স্করা এদেশে মধ্যাহ্নে একটু ঘুমাইলে ভাল থাকেন; তিনি কেন একটু শয়ন করেন না?

তাহাতে মহেশচন্দ্র উত্তর দেন—তিনি নিয়ম করিয়াছেন ঐ বাড়ীতে কেহ দিবানিদ্রা সম্ভোগ করিবেন না—স্বয়ং আইন করিয়া তিনি আইন ভঙ্গ করিতে পারেন না।

মহেশচন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরে একখানি আয়না সম্মুখে রাখিতেন। তাহা রাখিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"যেন মুখ তুলিতেই কে ঘরে ঢুকিতেছে, তাহা দেখা যায়। আর একটা কারণ আছে—আমি ক্ষণক্রোধী—হঠাৎ রাগিয়া উঠি—রাগের সময় আপনার দিকে তাকাইয়া নিজের চেহারা দেখিলে রাগ করিয়া যায়।"

আপনার দৌর্ব্বল্য দূর করিবার এই চেষ্টা অসাধারণ।

মহেশচন্দ্র অনাড়ম্বর জীবনযাপন বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। একবার তাঁহার কোন বন্ধুর মাতা তাঁহাকে উত্তম বেশ পরিধান করিতে বলিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"এ শরীরে ভাল পোষাক মানাইবে না; অনর্থক পয়সা লোকসান।" বার্দ্ধক্যে তিনি নূতন জামা প্রভৃতি ক্রয় করা অর্থের অপব্যয় মনে করিতেন—পুত্রবধূকে পুরাতন জামা ও মোজা সেলাই করিয়া দিতে বলিতেন; কিন্তু সেলাই হইলে বলিতেন, তাহা কিনিতে তাঁহার অনেক টাকা লাগিত এবং পুত্রবধূকে ইচ্ছামত দরিদ্রকে দান করিবার জন্য টাকা দিতেন।

মহেশচন্দ্র তাঁহার কর্ম্মীদিগকে তাঁহার বন্ধু ও অংশীদার বলিয়া সেইরূপ ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদিগকে লাভের অংশ দিবার ব্যবস্থা করিতেন। ফলে কর্ম্মীরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং ব্যবসায়ে শৃঙ্খলা কখন ক্ষুণ্ণ হইত না।

যে বালক একদিন দারিদ্র্যহেতু অপরের গৃহে পাচকের কাজ করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিল—স্বদেশে অর্থার্জ্জনের উপায় করিতে না পারিয়া দুরাশায় ব্রহ্মে গিয়াছিল—দোকানে ভৃত্যের কাজ করিয়াছিল—কিন্তু কখনও শ্রম-বিমুখ ও নীতিভ্রষ্ট হয় নাই—তিনিই জীবনে লক্ষ লক্ষ টাকা সাধু উপায়ে ব্যবসায়ে অর্জ্জন করিয়া দানে অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। মহেশচন্দ্র জীবনে চেষ্টায় সাফল্যলাভ করিয়া যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা মনুষ্যত্বের আদর্শ—সে আদর্শ—বিরাটত্বে ও পবিত্রতায় বরণীয় ও স্মরণীয়।

জীবন-স্মৃতি

শ্রীকালিদাস রায়

ভবানীপুর লণ্ডন মিশন স্কুলের শাখা খাগড়া লণ্ডন মিশন স্কুলে এম ক্লাসে ভর্ত্তি হলাম। কেউ কেউ বলেছিলেন—মিশনারী স্কুলে পড়লে ছেলের মনে খৃষ্টানী ভাব জন্মাবে। বাবা সেকথায় একটু হেসেছিলেন। কাসিমবাজার হতে স্কুল দু'মাইলের পথ। কখনো হেঁটে কখনও শেয়ারের গাড়ীতে যেতাম। শেয়ারের গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার একটু ইতিহাস আছে। ঐ গাড়ীতে দুইটি ধনিসন্তানও স্কুলে যেত। তাদের সামনের সীটে আমি বসতাম, ঐ সীটে তারা পা তুলে দিত—তাদের পা আমার গায়ে লাগত। একদিন পা নামাতে বললাম—তারা পা নামালো না। তারপর দিন থেকে গাড়ী ছেড়ে দিলাম।

স্কুলের আবহাওয়া বেশ ভালোই লাগল। স্কুলে অনেক সঙ্গী সাথী পেলাম। পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলে প্রথম প্রথম সহপাঠীরা কৃপাদৃষ্টিতেই দেখত। তিনমাস পরে যে পরীক্ষা হ'ল—তার ফল দেখে তাদের কৃপা হিংসায় পরিণত হ'ল। যখন তারা দেখল প্রথম স্থান আমার কায়েম হয়ে গেল—তখন তারা আর হিংসা করত না।

কাসিমবাজারে আমার নিঃসঙ্গ জীবন। রাজবাড়ীর কুটুম্ব সন্তানরা ছাড়া কাসিমবাজারের একটি ছেলেও হাই স্কুলে পড়তে যেত না। অধিকাংশ লোকই ছিল নিঃসন্তান। ম্যালেরিয়ার কবল থেকে সন্তান বাঁচানো বড়ই কঠিন ছিল। প্রাতঃকালটা পড়াশুনাতেই কাটত, শীতকালে স্কুল হতে ফিরতেই সন্ধ্যা হয়ে যেত। অন্য ঋতুতে কিছু সময় থাকত, সেই সময়টা কি করে কাটাব ঠিক করতে পারতামনা। খাঁটি গঙ্গা কাসিমবাজারে কাটি গঙ্গায় পরিণত। গঙ্গার খুব বড় একটা বাঁকের উপর ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাসিমবাজার কুঠি। বাঁকের দুই মুখের নিকটতম ব্যবধানটাকে নবাব এবং কোম্পানী কেটে যোগ করে দিয়েছিলেন। গঙ্গা সেই পথে বইতে লাগল। কাসিমবাজার বন্ধ বাঁকের উপর থেকে গেল। খাঁটি গঙ্গা বড় একটা বিলে পরিণত হয়ে কাটিগঙ্গা নাম ধরল, তার ফলে কাসিমবাজার ম্যালেরিয়ার রঙ্গভূমি হ'ল। ইংরেজরা কুঠি সরিয়ে নিলে। ফরাসী ওলন্দাজ পোর্তুগীজ জার্মানী ও জৈনদের কুঠিও বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

ওলন্দাজদের আছে কবরখানা, ইংরাজদের আছে কবরখানা আর হাতার বাগানে Residency'র ঢিপি। তার পাশে আর গঙ্গা নেই। জার্মানীদের আছে একটা বড় গির্জা, ফরাসীদের স্মৃতি বহন করছে ফরাসডাঙ্গা আর জৈনদের উপাস্য তীর্থঙ্করের মন্দির (নেমিনাথের মন্দির) এখনো বর্ত্তমান।

ঐ কাটিগঙ্গার ধার ছিল আমার বেড়াবার প্রধান স্থান। প্রতিদিন চারিপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে দেখার কিছুই বাকি থাকল না, চারিদিকে কেবল ধ্বংসস্তূপ, বনে পরিণত বাগান। আবার সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাগানও আশে পাশে ছিল দুই রাজবাড়ীর।

বড় রাজবাড়ীর দিকে পূজাপার্বণ ছাড়া যেতাম না। বড় রাজবাড়ীতে উৎসব পার্বণ লেগেই থাকতো কাঙালী ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন, যাত্রা কীর্ত্তন, তরজা, তরাজ, কালোয়াতী গান, ধীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ ইত্যাদিতে সোর-গোল। আমাদের বাড়ীর কাছে ছিল ছোট রাজবাড়ী—রাজার নাম ছিল রাজা আশুতোষ নাথ। রাজা আশুতোষ একজন বড় শিকারী ছিলেন। তাঁর ঘোড়া ও কুকুরের খুব সখ ছিল। ঘোড়া ও কুকুরের যত্ন দেখে হিংসা হত। তাঁর দুই কন্যা তখন নিতান্ত বালিকা।—ছোট কন্যাটি পরে নদীয়ার মহারানী—হয়েছিলেন। ছোট রাজবাড়ীর ফটকের কাছে অশোকগাছ তলে খাঁচায় একটা বাঘ থাকত। মাঝে মাঝে সে গর্জ্জন করত। তখন আমি বলতাম—

একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে কাঁদেন বাঘের বাচ্চা।

২।৩ বৎসর নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোর পর একটি সঙ্গী মিলে গেল। এ সঙ্গীটি সাহিত্য জগতে অপরিচিত নয়। এঁর নাম সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। সৌরীন (ডাক নাম হরিদাস) মহারানী স্বর্ণময়ীর স্বর্গত সভাপণ্ডিতের পুত্র। দুজনের সখ্যবন্ধনের সূত্র হ'ল—রবীন্দ্রনাথের টালি আকারের সংস্করণের কবিতাবলী। সেই গ্রন্থখানি দুইজনে সুর করে পড়তাম—কবিতাগুলিকে গোগ্রাসে গিলতাম। এর অনিবার্য্য ফল যা তা ফলল। দুজনেই খুব পদ্য লিখতে সুরু করলাম। আজো দুজনেই পদ্য লিখি। আজ সে আমার চেয়েও জরাজীর্ণ হয়েছে। সে স্কুলে যেত না, ছবি আঁকত। সে আজো কাসিমবাজারের বাড়ী ছাড়েনি। এখন সে চাকুরিরায় আছে। এর সাহচর্য্য আমার কবিতারচনায় প্রবল প্রেরণা দিয়েছিল।

স্কুলের মারফতে ললিত মোহন রায় নামে একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। এদের প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল বড় রাজবাড়ীর পাশেই। একদিন সে আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। সে বাড়ীতে বাদুড়ের পক্ষসঞ্চালনে মুখরিত একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকা—বইভরা আলমারি আমার চোখে পড়ল। আলমারিতে চাবি দেওয়া ছিল না। আরশুলা তাড়িয়ে, তাদের মধ্যে আমি পেলাম ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত বাংলা বই। শুধু তাই নয়—বাঁধানো বঙ্গদর্শন। প্রচার, প্রবাহ, বান্ধব, সাধনা, নবজীবন, জন্মভূমি আরো অনেক মাসিক পত্র। নিঃসঙ্গতার গ্লানি আমার কেটে গেল। সেই সমস্ত বই আমি একে একে সব পড়তে লাগলাম। ললিত আমাকে কতকগুলি বাঁধা মাসিকপত্র একেবারে দানও করেছিল। তখন আমার বয়স চৌদ্দ পনেরো।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো, যোগীন বাবু, দামোদর, সঞ্জীবচন্দ্র ইত্যাদির বই পড়েছিলাম ঐখানে। বঙ্কিম, নবীন, হেম গুপ্তকবি, রমেশ চন্দ্র ইত্যাদির বই আমাদের বাড়ীতেই ছিল।

কাসিমবাজারের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমার গ্রামকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমার কৈশোর জীবন অবিমিশ্র আনন্দে কাটেনি। বৎসরে তিনবার পরীক্ষা দিতে হ'ত, তার জন্য উদ্বেগ ছিল বটে—তা সকল ছেলেরই থাকে। আমার উদ্বেগটা ছিল একটু বেশি মাত্রায়। প্রতিষ্ঠার উপযোগী মর্য্যাদা রক্ষা যে কত কঠিন—তা আমি বাল্য কৈশোর হতেই জানি। আমি সে উদ্বেগের উপর জোর দিচ্ছি না।

ম্যালেরিয়াই আমার জীবনীশক্তির অর্দ্ধেকের উপর শোষণ ক'রে নিয়েছিল। কেবল কি আমার নিজের রোগ জ্বালা। ভাই দুটি ও মা-ও প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগত। তাদের জন্য উদ্বেগ কম ছিলনা। নিজে সুস্থ থাকলেও বর্ষাকালটাতোর প্রত্যেকদিন প্রভাতে শিশি হাতে করে দূরবর্ত্তী ডিস্‌পেনসারিতে যেতে হ'ত। সেখানে কোন কোন দিন ৩ ঘণ্টাও প্রতীক্ষা করতে হ'ত রোগীদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসে।

দাম্পত্যিক অভাবের তাড়না কোনদিন অনুভব করতে হয়নি। কাসিমবাজারের যে খাদ্য-সুখ ছিল সে খাদ্য সুখ জীবনে আর ঘটেনি। বাবার আয় বেশি ছিল না তবু আমরা could pass rich with forty pounds a year গ্রামের বাড়ীর মত এখানে ব্যঞ্জনে তৈলাভাব ছিল না। সুতপক্ক খাদ্যই বৈকালে খেতে পেতাম। রাজবাড়ীর পূজারীদের বাসা ছিল আমাদের পাড়ায়। দুপয়সায় একখানা আধ হাত ব্যাসের লুচি ও একটা বড় সন্দেশ তাদের বাড়ীতে কিনতে পাওয়া যেত। তারা প্রচুর লুচি সন্দেশ প্রত্যহ গামছা বেঁধে নিয়ে আসত মহারাজের ঠাকুরবাড়ী হতে। দুধ ঘি তেল আটা ময়দা চিনি ইত্যাদি সস্তা থাকায় মা বহুবিধ সুখাদ্য তৈরি করতেন। দুধ ছিল টাকায় ১৬ সের। ২ পয়সায় ১২।১৪টা খয়রা মাছ পাওয়া যেত। তেমন সুস্বাদু খয়রা মাছ জীবনে আর খাই নি। এই খয়রা মাছকে লক্ষ্য করেই বোধ হয় ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছিলেন—

খয়রা তোমার পেটে ময়রার বাসা।

রুই মাছের সের ছিল ।০, ।/০। আর ফল? কাসিমবাজারময় ত উৎকৃষ্ট আমের বাগান। নারিকেল কলা প্রচুর। কাঁঠাল পেঁপে নোনা আতা বেল তাল ইত্যাদি আমরা স্পর্শও করতাম না। তরকারি পত্র

এত সস্তা যে একালের কলিনবাজারীরাও দামের কথা বললে বিশ্বাস করবে না। আজকাল অনেক দিন নিরামিষ নিরুপ্ত আহার করি এবং দালদায় ভাজা খাবার খাই, আর সেদিনের গল্প করি ছেলেদের কাছে। কিন্তু ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য্য থাকলেও ভোগের ভাগ্যত সবার থাকেনা—বছরে ৩।৪ মাস ধরে জ্বরে ভুগলে সুখাদ্য পেয়ে লাভ কি ?

কলিনবাজারের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে পরে একটি কবিতা লিখেছি সেটি এই—

মনে পড়ে সেই এক কিশোরের কথা
আজি মোর মনে জাগে ব্যথা।
সারাদিন বিদ্যালয়ে খেটে
বাড়ী ফেরে ক্রোশাধিক হেঁটে
দ্বারে এসে ধূলা পায়ে মা বলিয়া ডাকে,
ঘরে ঢুকে বইখাতা রাখে।
কিছু খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে
ক্লান্ত দেহে পড়ে না সে শুয়ে,
চলে যায় কাটিগঙ্গাপানে
যেন সেই সঙ্গীবের সাতেহার পাহাড়ের টানে।
নিঃসঙ্গ জীবন তার নাই কোন সাথী—
কি যেন কি বনে বনে খুঁজে পাঁতি পাঁতি,
পথে পথে কুড়ায় সে ফুল
ভালবাসে বৈকালের কাটিগঙ্গাকূল।
সন্ধ্যা যবে ঘনাইয়া আসে
ফিরে আসে আপনার নির্জ্জন আবাসে।
তখন নহবৎ বাজে রাজার ভবনে
শঙ্খ বাজে জননীর মুখের পবনে।
ভাঙ্গা বাড়ী ! একদিন ছিল বড় রেশমের কুঠী
আজ ব্যবহারে আসে মাত্র ঘর দুটী
বাকি সবি শূন্য পড়ে থাকে
চারিপাশ একুটীর ঘেঁটু আর ভাঁটিবনে ঢাকে।
রাতের আহার সারি বেড়ীর প্রদীপ আনি জ্বালে
শিশি হতে সেই দীপে কিছু তৈল ঢালে।
চেয়ার টেবিল নেই চৌকিতেই বসে—
ম্যাপ আঁকে, তারপর গোটাদশবারো অঙ্ক কষে
ভালো লাগেনাক তার একঘেয়ে ইস্কুলের পড়া,
অপাঠ্য পুস্তকে ভরে শেল্‌ফ কখানি ভরা।
গোটাদশ শ্লোক পড়ে খুলি ছোট গীতা,
তারপরে বুঝিবারে ইংরাজি কবিতা
প্রাণপণে চেষ্টা করে, বারবার খুলি অভিধান
বুঝিতে না পারি শেষে জন্মে অভিমান।
ইংরাজি প্রাইজ পাওয়া বইগুলি একে একে তুলি
দুই এক পাতা পড়ি ঝেড়ে মুছে ধূলি
রেখে দেয়, কিছু বোঝে কিছু সে না বোঝে
পুঁথির পাতায় নিত্য কি যেন কি খোঁজে।
তারপর টেনে নিয়ে কালীসিংহী শ্রীমহাভারত
কিংবা সেই রাজস্থানী কাহিনী বৃহৎ
কবিতার বস্তু খোঁজে। পড়ে যায় নয়টার ভোপ
মুখরিত করে ঝিঁঝিঁ জানালার পাশে বনঝোপ
টেনে নিয়ে গণিতের খাতা
কবিতা লিখিতে বসে ছিঁড়ে নিয়ে তার দুটা পাতা
লিখিতে লিখিতে মিল খুঁজে নাহি পেলে
গ্রন্থস্তূপে মাথা রাখি ভাবে সব ফেলে।
ঘুমাইয়া পড়ে শেষে কেতাবের ছিঁড়ে
মশারি খাটায়ে দেয় মা আসিয়া সন্তর্পণে ধীরে।
লক্ষ্যহারা এ কিশোরে তোমরা কি চেন !
মনে হয় চিনি চিনি যেন ?

আমাদের স্কুল ছিল সত্য সত্যই যাই ইংলিশ স্কুল। এখনকার মত যাই বেঙ্গলি স্কুল নয়। খৃষ্টান স্কুল বলে এর আবহাওয়া ছিল পুরাদস্তুর ইংলিশ। হেডমাষ্টার নেটিভ খৃষ্টান—রেভারেণ্ড কালীপ্রসন্ন মুখার্জী। ইনি ব্রজেন্দ্র শীলের সহপাঠী ছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজির এম-এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক ললিতবাবুও (রেভাঃ ললিত বিহারী চ্যাটার্জ্জী) ছিলেন নেটিভ খৃষ্টান ইনি পরে কলিকাতার কলিজিয়েট ইনস্টিটিউটের হেঃ মাঃ হ'ন। এই দুইজন ছাড়াও খৃষ্টান মাষ্টার ছিলেন আর ৩।৪ জন। এঁরা সকলেই ইংরাজি ভাষায় বিশেষরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাছাড়া Rev. James Henry Brown পরে Rev. Otto Stursburg এই দুইজন পাদরিসাহেব আমাদের

ইংরাজি পড়াতেন। সাহেব উপর ক্লাসে আমাদের নীলদর্পণ হতে অনুবাদ করাতেন।

এনট্রান্স পরীক্ষায় বাংলা ব'লে কোন বিষয় ছিল না—সংস্কৃতের দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে একটা বাংলা রচনা লিখতে দেওয়া হত। তার মার্কস্‌ছিল ২০। ইতিহাস ভূগোল প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রাথমিক ভূবিদ্যা, গণিত ইত্যাদি ইংরাজিতেই পড়ানো হত। সংস্কৃতের উত্তর ইংরাজি কিংবা সংস্কৃতে দিতে হ'ত। এর উপর ইংরাজিতে বাইবেল পড়তে হত।

প্রত্যেক বিষয়ের যতটা পড়া দেওয়া হ'ত সবটাই মুখস্থ করতে হ'ত। শিক্ষকরা প্রত্যহ মুখস্থ ধরতেন। পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ডেস্ক বেঞ্চি থাকত না, ক্লাসে ওঠা নামা ছিল—উত্তর দিতে না পারলে নেমে যেতে হ'ত। যে প্রথম স্থান পেত তার নম্বর হ'ত ১, তারপর ২।৩।৪ এইরূপ নম্বর সেদিনের মত। Attendance Register এ সেই নম্বর উঠত। বৎসরান্তে প্রাইজ দেওয়ার সময় সেই নম্বর হিসাবে ধরা হ'ত। বৎসরে তিনটা পরীক্ষা হ'ত। যদি কোন ছেলে বৎসরের প্রথম পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় পরীক্ষায় তৃতীয়, শেষ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করত এবং সারা বছরের দৈনিক নম্বর যোগ করে সব চেয়ে কম পেয়ে প্রথম হ'ত, তাহলে তার মোট নম্বর হ'তো ১+৩+২+১=৭। সেইরূপ হিসাবে যার সবচেয়ে কম নম্বর দাঁড়াত সেই ১ম প্রাইজ পেত। এখন যেমন বাৎসরিক পরীক্ষার ফল দেখে প্রাইজ দেওয়া হয়, সে ব্যবস্থা তখন ছিল না। প্রাইজে প্রচুর বই দেওয়া হ'ত। বাইবেলের জন্য পৃথক প্রাইজ দেওয়া হত। দ্বিতীয়শ্রেণী হতে প্রথমশ্রেণীতে ১ম স্থান দখল করে উঠলে ওয়েবষ্টার ডিকসনারি দেওয়া হ'ত। আমি তা নিই নি তার বদলে শেক্সপীয়ার কোলরিজ, গোল্ডস্মিথ, স্কট, কীটস্, টেনিসন, এমার্সন, কার্লাইল, মেকলে ইত্যাদির গ্রন্থাবলী নিয়েছিলাম। বাইরন ও শেলীর গ্রন্থাবলী সাহেব দেননি, তার বদলে কুপার ও মিল্টনের গ্রন্থাবলী দিয়েছিলেন। মিল্টন ও কুপার devout christian ব'লে বদলে তাঁদের গ্রন্থাবলী পেয়েছিলাম।

স্কুলে নিয়ম ছিল কোন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলে পরবর্ত্তী পরীক্ষা পর্য্যন্ত বেতন লাগত না। আমি স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে ১ম ক'রে তিনমাস বেতন দিয়েছিলাম। তারপর আর আমাকে বেতন দিতে হয়নি।

স্কুলে আমার সব চেয়ে বেশী কামাই হ'তো। কারণ, প্রতি বছরই ম্যালেরিয়ায় ভুগতাম—কত পাউণ্ড কুইনিন যে গিলেছিলাম তার ইয়ত্তা নেই। শরীর খুব শীর্ণ ছিল।

সেকালে আমরা ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির নোট পাইনি—সেজন্য গোটা বইই মুখস্থ করেছিলাম। ইংরাজী ও সংস্কৃতের নোট পেয়েছিলাম। গণিতেই আমার সব চেয়ে বেশি অধিকার ও অনুরাগ ছিল, তার কারণ গ্রামের স্কুলেই আমার গণিতের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। তা ছাড়া অঙ্ক কষতেই আমার খুব ভালো লাগত। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে গণিত কোন কাজে লাগেনি—কিন্তু নিজের ছেলেদের বাড়ীতে অঙ্ক কষাতে স্কুলে-পড়া গণিতের বিদ্যা খুব কাজে লেগেছে। তাছাড়া সাহিত্য রচনাতে গণিতের প্রভাব হতে বোধ হয় বঞ্চিত হইনি। সে প্রভাব কবিতায় হয়ত ক্ষতি করেছে, গদ্য প্রবন্ধে সতর্ক করেছে।

সেকালে এনট্রান্স, এফ-এ, বি এ পরীক্ষায় বাংলা ছিল না! কিন্তু যারা মাইনর পাশ ক'রে মন দিয়ে ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়ত, তারা সবলেই বিশুদ্ধ বাংলা লিখতে পারত। স্কুলে বাইবেলের পরীক্ষা অনেক ছেলে দিত না। সেজন্য বাইবেলের জন্য খুব ভালো প্রাইজ দেওয়া হ'ত। আমি বাইবেলের পরীক্ষা কখনো বাদ দিইনি। বাইবেল আগাগোড়া মুখস্থ ক'রে ছিলাম—কলেজ ক্লাসে তা খুব কাজে লেগেছিল।

আমাদের Rowes Hints এর Appropriate preposition এর Chapter ও Macmordies Idioms মুখস্থ করতে হতো। সেকালে ইংরাজির ৮০ মার্কের একটা paperই ছিল, গ্রামার ও অনুবাদের। অনুবাদে থাকত ২৬ মার্ক বাকি সবই গ্রামারের প্রশ্নের জন্য। কাজেই ইংরাজী গ্রামারে ফাঁকি দিলে চলত না।

আমাদের ছাত্রজীবনের একমাত্র উৎকণ্ঠার বিষয় ছিল ভালো ক'রে ইংরেজি শেখা। আমরা দেখতাম—যাঁরা ভালো ইংরাজি লিখতে বা বলতে পারেন—তাঁরাই বিদ্বান

ব'লে নমস্য হ'তেন এবং তাঁরাই কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভও করতেন।

স্কুলের কথা লিখতে গিয়ে আজ আমার শিক্ষকদের প্রসন্নগম্ভীর মুখগুলি মনে পড়ছে। তাঁরা সকলেই স্বর্গত। তাঁদের কথা স্মরণ ক'রে চোখ ফেটে জল পড়ছে। কত সাধুচরিত্রের কত শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাঁরা। কত সামান্য বেতনে তাঁরা হৃষ্ট ও তুষ্ট চিত্তে আমাদের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করতেন। তাঁদের স্নেহের শাসন ও, উৎসাহ-ভাষণ জীবনে পরম সম্পদ। অবশ্য তাঁরা যেপথে আমার ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালিত হবে মনে করেছিলেন—সে পথের যাত্রী আমি হইনি। তাঁরা ভেবেছিলেন—আমি শেষ পর্য্যন্ত 'রায়বাহাদুর' হ'ব, কিন্তু আমি শুধু রায়ই থেকে গেলাম। যাই হোক তাঁদের আশিষ, উপদেশ, অনুশাসন ও ভালবাসা আমার জীবনপথের পাথেয় হয়ে আছে। তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় যখন ছিলাম তখন তাঁদের মর্য্যাদা বুঝিনি—তারপর কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষতঃ শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করে নিত্যই চিত্ত ভরে তাঁদের স্মরণ করেছি।

কাসিমবাজার হ'তে দূরত্ব এড়াবার জন্য পাকা পথ ছেড়ে কাঁচা বনপথ দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতাম—কোন সঙ্গী ছিল না একাই যেতে আসতে হত। এতে আমি আমার কল্পনার সঙ্গে প্রতিদিন খেলা করবার অবসর পেতাম। এই পথটি বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই পথটির উপর পরবর্ত্তী জীবনে একটা কবিতা লিখেছি। সে কবিতা ইন্টারমিডিয়েট বাংলা সংকলনে আছে—ছেলেদের তা পাঠ্য। বনপথটির পরিচয় এই-

বাবলা ফুলের গন্ধে সেই পথখানি পড়ে মনে
যেই পথ ধরি চলিতাম কৈশোর জীবনে
বিদ্যালয় পানে নিত্য। রাঙচিতা বেড়া দিয়ে ঘেরা
মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটীর অঙ্গনে বালকেরা
করিতেছে ছুটাছুটি। মা তাদের ব্যস্ত নানা কাজে।
জীর্ণ দরজার তলে চক্ষু মুদি নিমগ্ন নামাজে
সারি সারি ভক্ত জন। বাজে শঙ্খ শিবের মন্দিরে
বিরাট মন্দির জীর্ণ উর্দ্ধে উঠে ঘটধ্বজা শিরে।
বিশ্বনাথ মুষ্টি ভিক্ষা লভে নিঃস্ব সেবকের হাতে।
ওলন্দাজী গোরস্তান উপবন পুষ্পের শোভাতে
বিদেশী কবিকুল এসেছিল হতে বসুপতি
বসুমতী অঙ্কে সেথা পড়িয়াছে সুপ্তির সদ্গতি।
বাঁ-পাশে বিলের জলে ফুটে আছে কুমুদ কমল
ডাহিনে বেণুর কুঞ্জ বায়ু ভরে করে টলমল।
ঝাপরে ফেলিছে শ্বাস কামারের ছোট্ট কারখানা।
বকুল তলায় ছিল করদিন বেদের আস্তানা
পড়ে আছে পোড়া কাঠ। বাজে ঘণ্টা আর্মানী গির্জ্জায়
স্থবির যাজক এসে ধীরে ধীরে তোরণে দাঁড়ায়
শুধায় কুশল প্রশ্ন। বাণিজ্যের ছলে পরবাসী
যাহারা হরিত বিত্ত করিত তাহারা হেথা আসি
দিনান্তের প্রায়শ্চিত্ত। গির্জ্জা আছে, ভক্ত আর নাই,
নির্ম্মল আর্মানীকুল পুরোহিত আজিকে একাই
শুনিছে কালের ঘণ্টা। ঘটে ঘটে ক্ষরিতেছে ক্ষীর
খর্জ্জুর তরুর কণ্ঠে। তালীবনে দুলায় সমীর
বাবুয়ের বাসাগুলি। খণ্ড খণ্ড এমনি কতই
চিত্র নিয়ে বনপথ মনে মোর জাগিছে সতই।

• • •

কৈশোরের কত মুগ্ধ আশা
ওপথের দুই পাশে গাছে গাছে বেঁধেছিল বাসা
ধূলায় লুটায় আজ। জানে জানে আই পথ খানি
জীবনের গূঢ়তথ্য। কৈশোরের অকথিত বাণী
ওপথের দুই পাশে পাখীদের কলকণ্ঠ ভরি
রাখিয়া এসেছি আমি। দুই ধারে তৃণের মঞ্জরী
সিক্ত মোর আঁখিজলে। মোর সুখ দুঃখ তার গায়
রেখেছে বিচিত্র করি আজো আলো আঁধারি মায়ায়
ধূলায় কাদার তূপে। মোর যত অতৃপ্ত বাসনা
আজো সেথা ঝিল্লী তানে নিশি দিন করিছে শোচনা
ধরণীর প্রতীক্ষায়। তারুণ্যের সোনার স্বপন
কণিকার শাখে শাখে হয়ে আছে পুষ্পিত কাঞ্চন।

সব চেয়ে ভালো লাগত—স্কুলের টিফিনের সময় দুই পয়সার চীনা বাদাম। মা প্রত্যহ দুটি করে পয়সা দিতেন টিফিনের জন্য। সে দুটি পয়সায় চীনা বাদাম কিনে খেতাম। মাঝে মাঝে পকেটে করে ভাইদের জন্য নিয়েও আসতাম।

আমার পিসতুতো দাদার নাম ছিল কবিরাজ রাধিকা চরণ বরাট। তাঁদের বাড়ী ছিল নিকটেই। তিনি ভাল কবি ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ছিলেন। আমি যে কবিতা লিখতাম তাঁর কাছে তা গোপন ছিল —কোন দিন আমার লেখা তাঁকে দেখাইনি। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমি এক প্রতিবেশীর কন্যার বিবাহে একটা কবিতা লিখে দিয়েছিলাম। সে কবিতা আমার নামেই ছাপা হয়েছিল। একটা ছাপা কপি দাদার হাতে পড়ে। দাদা আমাকে ডেকে বললেন—তুই কবিতা লিখিস?

আমি—লিখি মাঝে মাঝে।

দাদা—তা ছন্দ টন্দ ত ঠিকই রয়েছে দেখছি এই বিয়ের কবিতাটাতে। যাই হোক ওসব এখন লিখিস না —কলেজে গিয়ে লিখিস। এ সব লিখলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে। ওটা একটা নেশা।

আমি—না, আর লিখ্‌বনা।

কিন্তু সে অঙ্গীকার রাখা সম্ভব হয়নি।

দাদার এক বন্ধু ছিলেন—তাঁর নাম ছিল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। তিনি মহারাজার সত্যরত্ন প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি একজন সাহিত্যরসিক লোক ছিলেন। তিনি সেকালের ভারতী, দাসী, সাহিত্য ইত্যাদি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন এবং সেকালের সমস্ত গল্পপদ্যপুস্তক কিনে পড়তেন। তিনি আমাকে লেখা পড়ে উৎসাহিত করলেন। আমি পূজার সময় যখন বাড়ী যেতাম তখন শরৎবর্ণনা, আগমনী ইত্যাদি কবিতা লিখে তাঁকে শোনাতাম—তিনি বিনা মূল্যে সেই কবিতা তাঁর প্রেসে ছেপে দিতেন। আমি সেগুলি নিয়ে দেশে যেতাম এবং সেগুলি নির্বিচারে পাড়ার লোকদের কাছে বিলি ক'রে গ্রামে কবিখ্যাতি জাহির করবার চেষ্টা করতাম। বলা বাহুল্য, গ্রামের লোকেরা সে কবিতার এক বর্ণও বুঝত না।

দাদা এ সব জানতেন না।

দেবেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাঙ বাবু) ছিলেন মহারাজের সেক্রেটারি। তাঁর পুত্র পার্ব্বতী আমাকে খুব ভাল বাসতেন। তিনি একদিন তাঁর বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—

কালিদাস কবিতা লেখে, শুনবে বাবা?

ব্যাঙবাবু শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি তাঁকে রাজপুতকাহিনীর ২।৩টা কবিতা শুনিয়ে দিলাম। তিনি খুশি হয়ে আমাকে গিরিশচন্দ্রের তিনখানি নাটক উপহার দিলেন। দেবেনবাবু ছিলেন গিরিশ চন্দ্রের মাসতুতো কিংবা পিসতুতো ভাই।

এই ভাবে উৎসাহিত হয়ে কবিতায় মন দিলাম —সৌরীনও খুব লিখত। কিন্তু আমার পরীক্ষা ক্রমে আসন্ন হতে লাগল। কাজেই কবিতার খাতা বিছানার তলায় রেখে তিনমাস খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করলাম।

যথাসময়ে পরীক্ষা দিতে গেলাম ব্যারাকে। বহরমপুরে সৈন্যাবাস ছিল, যে সৈন্যাবাসে সিপাহি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। সেই সৈন্যাবাসের বিরাট ইমারতগুলি সরকারী আফিস আদালতের কাজে লাগত, সাহেবদের বাসভবনও ছিল সেগুলিতে। সেখানেই আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তারপর গ্রামে চলে গেলাম। তিনমাস পরে আমার এক আত্মীয় গুপ্ত প্রেসের ম্যানেজার একখানা পোঃ কাঃ লিখে জানালেন—কালিদাস প্রথম বিভাগে পাশ হয়েছে—এবার প্রথম বিভাগে খুব কম পাশ হয়েছে।

এইবার হলো কলেজে পড়ার সমস্যা। কাশিমবাজার থেকে কলেজ অনেক দূর হেঁটে যাতায়াত সম্ভব নয়। মহারাজ বললেন—শিবপুরে ওভারসীয়ারি পড়তে যাও সব খরচ আমার। এ প্রস্তাব আমার রুচিকর হ'ল না। আমার গাঁয়ের স্কুলের এক দরিদ্র সহপাঠী ওভারসিয়ারী পড়তে চলে গেল—সে এখন বহু লক্ষটাকার মালিক। কলেজেই ভর্ত্তি হলাম—মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র দয়া ক'রে রাজবাড়ীর ছেলেদের গাড়ীতে যাতায়াতের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

তিনমাস পরে খবর বেরুল সরকারী বৃত্তি পেয়েছি, তাছাড়া স্থানীয় বৃত্তিও একটা পেয়েছি। কলেজেও বেতন লাগতো না, স্কুলেও বেতন দিই নি। বিনা পয়সায় বিদ্যা আর কতই হবে? বৃত্তির একটি পয়সাও আমি নিজের জন্য ব্যয় করিনি—সবই মাকে দিয়েছিলাম।

সেই অর্থ তিনি তীর্থভ্রমণে ব্যয় করেছিলেন। এটা আমার জীবনে খুব বড় সান্ত্বনা। কারণ আমি উপার্জনক্ষম হওয়ার আগেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

কলেজে ভর্তি হয়েও দুবৎসর আমি কাশিমবাজারে ছিলাম—এই দুই বৎসর আমি কাশিমরাজারের আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে, পড়েছিলাম সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণ, কুমার-সম্ভব, উত্তরচরিত মেঘদূত ও কাদম্বরীর কতক অংশ। অলঙ্কার সম্বন্ধেও সামান্য জ্ঞান হয়েছিল।

এই সময়ের মধ্যে একটা দুঃসাহসের কাজও করে ছিলাম। ১৯০৭ সালের শীতকালে প্রথম কলকাতা দেখতে আসি। আমার আত্মীয় গুপ্তপ্রেসের ম্যানেজার বনওয়ারি দাদার কাছে ছিলাম।

তাঁকে বললাম—দাদা, আমার একখানা কবিতার বই ছেপে দিতে হবে। কত লাগবে?

তিনি বললেন—"লাগবে আবার কি? ছেপে দেব, কপি পাঠিয়ে দিস্।"

আমি বললাম—"কাগজের দাম? তিনি বললেন—"কাগজের দামও তোকে দিতে হবে না। তুই শুধু কপি পাঠিয়ে দিস, আমি ৫০০ খানা বই ছেপে রেল পার্শেলে পাঠিয়ে দেব।"

আমি ফিরে গিয়ে কপি পাঠালাম—একমাসের মধ্যে আমি গ্রন্থকার হ'য়ে গেলাম। বইয়ের নাম হ'ল কুঙ্কু। আস্পর্দ্ধা কম ছিল না, উৎসর্গ করলাম—রবীন্দ্রনাথের নামে। তিনি লিখেছিলেন—'এসব তোমার কাঁচা বয়সের লেখা। এগুলোর উপর বেশি নির্ভর করো না। কবিতা রচনায় যদি তোমার অন্তরের অনুরাগ থাকে তবে সাধনা করলে কালে সাফল্য লাভ করবে।' এই হলো তাঁর আশীর্বাদ। সেকালের সাহিত্যমহারথীদের সকলকে বই পাঠিয়ে আশীর্বাদ সংগ্রহ করেছিলাম। অক্ষয় সরকার, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি তখন বেঁচে ছিলেন, তাঁদের কাছ হতেও আশীর্বাদ পেয়ে ছিলাম। বলা বাহুল্য কুঙ্কুর কোন কবিতা পরবর্তী বইএ দিতে পারি নি। সে সব কবিতা নয়, পদ্য মাত্র।

মহারাজ উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় উপাসনাপত্র প্রকাশ করলেন—তাতে লিখবার জন্য চেষ্টা করলাম, সুবিধা হ'ল না। এই সময়ে কণিকা নামে সৈদাবাদ হতে একখানা মাসিক বেরুল—তাতে চরণদাদা লিখতেন। তাতেই লিখতে সুরু করলাম। তারপর উপাসনায় স্থান পেলাম। কিন্তু আমার স্কুলের লেখা একটা কবিতা সেকালের ভারতীতে বেরিয়েছিল। কবিতার নাম 'মেঘ ও মযুর।' এই কবিতাই আমার প্রথম মুদ্রিত কবিতা। উৎসাহিত হ'য়ে কলকাতার পত্রিকায় লেখা পাঠাতাম, কিন্তু ছাপা হ'ত না। এফ-এ পড়বার সময় কলকাতার কোন কোন পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছিল মনে পড়ে না। তবে লেখার বিরাম ছিল না—কত দিস্তা কাগজে যে মক্‌সো করেছি তার ইয়ত্তা নেই।

এফ-এ পাশ করে আমরা কাশিমবাজার ছেড়ে শহরের মধ্যে এসে বাস করতে লাগলাম। এতে জীবনের গতি-প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। কাশিমবাজার ছেড়ে আসতেও কম বেদনা পাইনি।

পরে এই কাশিমবাজারের উপর একটা কবিতা লিখেছিলাম—

কোম্পানীর ব্যবসায়ীদল
বঙ্গ ইতিহাসে তোমা অমরতা দেয়নি কেবল
বদান্য ভূস্বামী তব দানধারা ঢালি নিরন্তর
কত না সদানুষ্ঠানে বঙ্গে তোমা করেছে অমর।
আমি দীন কবি
সাহিত্যে তোমারে আমি করিব গৌরবী।
তব তরু তব লতা পশু পাখী তব,
ঋতুতে ঋতুতে তব রূপ নব নব,
তব কাটি গঙ্গাতীরে জীর্ণ দেবালয়,
পুষ্প কুঞ্জ পথঘাট ফলোদ্যান স্নিগ্ধ ছায়াময়
কুজনগুঞ্জণ হেথা গুঞ্জরণ মরালের স্বর,
কমল কুমুদগন্ধি তব সরোবর,
তোমার সমাধিক্ষেত্র অতীতের যত ভগ্নস্তূপ
সকলি লভিবে মোর কাব্যে রসরূপ।
কত জন কত ধন লভিয়াছে তোমার ভাণ্ডারে
বিলায়েছ তুমি নির্বিচারে।

দুদিনের পরিচয় দাতা গ্রন্থীতার
মিলাল বুধুদসম চিহ্ন নাহি তার।
যে ধন পেয়েছি আমি নাই তার তুলা
যায় কি তা ভুলা ?
তখন বুঝিনি আমি তোমার সে দান
জীবনে হইবে হেন উপচীয়মান।
নিখিলের মাধুর্য হরিয়া
আমাকে দিয়াছ তুমি অঞ্জলি ভরিয়া।
কেহ তাহা জানিত না দিলে তুমি নীরবে নিভৃতে
সবার হরিলে ক্ষুধা মোর চিত্ত ভরিলে অমৃতে।
দরিদ্র কিশোর আমি চাইনিক কিছু
চলেছিনু মাথা ক'রে নীচু।
জানিনা আমারে কেন বেসেছিলে ভালো—
অন্ধকার পথে মোর জেলেছিলে জোনাকি আলো।
ভুলিনি তোমার দান তোলা কি সম্ভব ?
জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, তাহা যে দুর্লভ।
ক'দিনের পরিচয় দান, তবু নহে পরিমেয়,
চির জীবনের পথে তাই মোর সম্বল পাথেয়।
তোমার সে দানে আমি দিব ছন্দোরূপ,
বাগ্‌দেবীর শ্রীমন্দিরে হবে গন্ধ-ধূপ।
আজো সেই কিশোর উদাসী
তুমি যা শিখায়েছিলে সেই সুরে বাজাতেছে বাঁশী।
ও-পারের বাঁশী তারে ডাকিয়াছে, দিন ত ফুরালো।
রাখিবে না মনে তারে যারে তুমি বেসেছিলে ভালো।
তোমারে পূজিতে আজি উপচার বৃথা কেন খুঁজি।
পূজিনু তোমারি দানে গঙ্গাজলে গঙ্গা যথা।

"শিল্পীর মতামত"

রেণুকা চক্রবর্তী

'আজ আমাকে একটু সিগ্‌গীর বেরুতে হ'বে'।

'দুপুর বেলা কোথায় যাবে ?'

' জয়ন্ত না দুপুরে যাবনা, এই খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করেই বেরুব'।

'সে তো রোজই যাও'।

জয়ন্ত জুতো পালিস করতে বসে যায়। লেবু দিয়ে, স্পিরিট দিয়ে, কালি দিয়ে, তবু যেন তার পছন্দমত পরিষ্কার হয় না। জুতো কিন্তু ঝক্‌ঝক্ করতে থাকে। তারপর স্নেত্। বহুক্ষণ আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বারবার কামায়। মুখে ঘসে ফিট্‌কিরী, পাউডার। মুখখানা সুন্দর মসৃন কোমল হয়ে ওঠে। গুন্ গুন্ করতে করতে চোকে বাথরুমে। সুগন্ধ সাবানের শুভ্র ফেনা বেরুতে থাকে মর্দনা দিয়ে, দীর্ঘ সময় স্নান করে বাইরে আসে। অণিমাকে হাঁক দেয়—'ভাত দিয়েছ' ?

অণিমা বলে,—'ভাত দিয়ে তুলে রেখেছি। চিরকাল বাবুর পাঁচ মিনিটে স্নান হয়, বাথরুমে ঢুকলেই ভাতদি, আজ সেই ৫ মিনিট পঞ্চাশকেও ছাড়াবে আমি কি করে জানব' ?

'বেশ করেছ গো, বেশ করেছ, এখন খেতে দাও'।

খেতে বসে জয়ন্ত এ কথা সে কথা বলে, হঠাৎ অণিমার মাছ রান্নাটার উচ্ছসিত প্রসংসা করে। দিল দরিয়া মেজাজে আর দুটি ভাত চেয়ে নেয়। অণিমার দিকে চেয়ে বলে, 'তোমার তো স্নান হয়ে গিয়েছে, একেবারে বসে পড়লে পারতে' ?

অণিমা বলে, 'আমাকেও নিয়ে বেরুবে নাকি ' ?

জয়ন্ত হেসে ফেলে, 'তোমায় নিয়ে কোথায় যাব বল ? আমি যাই রিপোর্ট সংগ্রহ করতে। সাংবাদিকের কাজ বড় কঠিন। যে যত আগে নূতন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবে তার তত সুনাম, কাজে উন্নতি'।

অণিমা বলে—'কাজে যা উন্নতি তা তো দেখ্‌ছিই'।

জয়ন্ত আর কথা বাড়ায়না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে। অণিমা রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে এসে দেখে, জয়ন্ত বাক্স খুলে ওঁর জামা কাপড় বের করছে।

অণিমা বলে—'এ কি, শোওনি' ?

'শুয়েছিলাম, ঘুম হ'লনা, আজ যাব টালায় অনীতা চাটার্জির বাসায় তার ব্যক্তিগত জীবনের সংবাদ নিয়ে আসব, এ মাসের বসুমতীতে তা ছাপতে হ'বে।'

'ও হরি ! এই কথা, সে জন্যই ঘুম হ'লনা।

খুসীর বান দেখ্‌ছি সকাল থেকেই উপ্‌ছে উঠ্‌ছে। তা শ্রীমতীর কাছে গিয়ে কি হবে ? আমিই তো সে সংবাদ দিতে পারি।'

'তোমার জীবনী নাকি ? কি যে বল ? অনীতা চাটার্জি একটি যে সে ষ্টার নয়, তার দৈনন্দিন খবর জানার জন্য কত মানুষ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে। শুধু একটু দেখার জন্য যে রাস্তায় ওরা চলে, সে রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোক দাঁড়িয়ে থাকে। আজ আমি তার কাছে গিয়ে সব খবর জেনে আসব।'

'ওগো ! আমিও তো সাংবাদিক গৃহিণী, কাজেই কেলনা নই। যে রিপোর্ট আনতে তোমার এত হৈ, চৈ, তা আমি ঘরে বসেই লিখে দিতে পারি। এমন নিখুঁত ভাবে লিখ্‌ব যে, তোমার অনীতা চাটার্জিও এতটুকু খুঁত ধরতে পারবেনা।'

জয়ন্ত বলে, 'সাধে কি আর লোকে বলে যে এগারো হাত কাপড়ে মেয়েদের কাছা হয় না। অনীতা চ্যাটার্জির জীবনী তুমি কি জান' ?

অণিমা জবাব দেয়, 'ওই সাম্বনা নিয়েই তোমরা থাক। কাছার উপর আমাদের এতটুকু আস্থা নেই বলেই ওটা আমরা নেইনা, হয়না-না বুঝলে মশাই। ওই কাছার

অন্যই তো তোমাদের যত বিব্রাট। পেছনে একজনকে কাছা আগলে চলতে হয় বরাবর'।

জয়ন্ত বলে, 'না আর সময় নষ্ট করবনা, যেতেও অনেকটা সময় লাগবে। আর যদি অকটু আগে পৌঁছি না হয় বাড়ির কাছে অপেক্ষা করব। দেরী হ'য়ে গেলে বড় লজ্জার কথা হ'বে, আর হয়ত কাজও হ'বে না। কত কাজ এদের, তবু যে আমার সঙ্গে এন্‌গেজমেন্ট করেছে এ কি সোজা কথা'!

জয়ন্ত সাজগোজ আরম্ভ করে। সুন্দর ব্রাউন রংয়ের সুট কর্ণা রংএ' চমৎকার মানায়। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাইটা বাঁধে। মুখে দেয় ক্রীম, পাউডার, হাতের আংটিটা একটু বড় হয় বলে জয়ন্ত খুলেই রাখে। আজ সেটি পরতেও ভুলেনা। নিখুঁত ভাবে সাজ সজ্জা করতে জয়ন্তের আরো ঘন্টা খানেক লাগে। অণিমা বলে, 'তুমি কি সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছ না বিয়ে করতে যাচ্ছ, সাজ যে আর হ'তেই চায় না গো'?

জয়ন্ত অণিমাকে একটু আদর করে বলে, 'বিয়ের কাজ তো অনেক দিনই চুকিয়েছি। আর অভিনয়, আমার মনিবানী পছন্দ করে না'। এই বলে কটাক্ষ করে বেরিয়ে যায়।

অণিমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। চেয়ে থাকে স্বামীর যাবার পথের দিকে। জয়ন্তকে সুশ্রীই বলা চলে। লম্বা চওড়ায় বেশ সুপুরুষ। অনেক দিন অণিমা জয়ন্তের চেহারার দিকে চেয়ে একটা গর্বই অনুভব করেছে। আজ যেন মনটা কি রকম ভেতরে মুচড়ে ওঠে। চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে।

হঠাৎ একটা কৌতুক অণিমার মুখে ঝিলিক মেরে ওঠে। একটা প্যাড্ আর পেন নিয়ে বসে যায় চেয়ারে। রাত্রি ৮টার সময় জয়ন্ত আসে। অণিমার মুখে চোখে চাপা কৌতুক।

বলে, 'কি গো! অণীতা চাটার্জির জীবনী এনেছ'?

জয়ন্ত জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, চমৎকার লোক। আমি যেতেই আমাকে বসাল। যা জানতে চেয়েছি-এতটুকু বিরক্ত না ক'রে-তাই আমাকে জানিয়েছে'।

'অণীতা চাটার্জির জীবনী তো আমি জানি'।

'তাই নাকি? তোমার সাথে আলাপ ছিল নাকি? তা থাকলেও তার আগের জীবনের খবর তুমি জানবে কোথা হতে'?

অণিমা বলে, 'আচ্ছা দাও রিপোর্টটা, দেখি কি জেনেছ'। অণিমা রিপোর্ট পড়তে পড়তে মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে বলে, 'চমৎকার! কি মজা!'

জয়ন্ত খুশী হয়, বলে,—'বলিনি তোমাকে সে চমৎকার; এখন বুঝলে?'

অণিমা কোন জবাব না দিয়ে একখানা কাগজ এনে জয়ন্তর কাছে ফেলে দেয়। জয়ন্ত পড়তে থাকে।

—'শিল্পীর মতামত'

বেলা ৪ টার সময় অণীতা চাটার্জির কাছে যাবার সময় ঠিক করা হয়। আমি কলিংবেল টিপতেই একটি চাকর আমাকে নিয়ে হ'লে বসায়, একটু পরেই অণীতা চাটার্জি হাসি মুখে ঘরে ঢোকেন, আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাই, তিনি প্রতিনমস্কার জানিয়ে একখানা চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন এবং আমাকে বসতে বলেন।'

আমি বলি, 'আপনাকে দুচারটে প্রশ্নকরে বিরক্ত করব।'

তিনি বল্লেন, 'বলুন আমায় কি বলবেন?'

আমি—'আপনার দৈনন্দিন রুটীন কি?'

অণীতা—'সাধারণ দৈনন্দিন রুটীন স্নান, খাওয়া, সংসারের কাজ করা, কুটনো কোটা, রান্নার তদারক করা। যে দিন সুটিং থাকে সে দিন অবশ্যি বাইরেই বেশী সময় কাটাতে হয়।'

আমি—'অভিনয় করতে হ'লে কিকি গুণের দরকার হয়'?

তিনি—'অভিনয় করতে হলে চেহারা, কণ্ঠ-সঙ্গীত, অভিনয় দক্ষতা, সবই দরকার হয়। তবে আমি বলব সব চেয়ে বেশী দরকার অভিনয় দক্ষতা, অভিনয়কে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে না পারলে বড় হওয়া যায় না।'

আমি—'আপনি কি মনে করেন ভদ্রঘরের মেয়েদের এ পথে আসা ভাল'?

তিনি—'নিশ্চয়ই, ভদ্রঘরের মেয়েরা এ লাইনে এলে অনেক উন্নতি করতে পারবে। আজকের দিনের সমস্ত

রকম না মেয়েরা এগিয়ে আসুন এটাই চাই।'

আমি—'আপনি এ লাইনে এসেছিলেন কেন?'

অতীতা চাটার্জি—'অধিক প্রয়োজন ছিলনা তা নয় তবে অভিনয়ের প্রতি ঝোঁকই প্রধান কারণ। ছোটবেলা থেকেই আমি অভিনয়কে মনে প্রাণে ভালবাসি'।

আমি—'আপনার বাড়ীর লোকের আপত্তি ছিলনা?'

তিনি—'প্রথমে একটু আপত্তি ছিল, ক্রমে তা দূর হয়'।

আমি—'কোন্ ছবিতে অভিনয় করে আপনি বেশী আনন্দ পেয়েছেন?'

তিনি—'সব ছবিতেই অভিনয় করতে আমার ভাল লাগে, তবে সবচেয়ে আমি বেশী খুসী হয়েছি বঁধুতে অভিনয় করে।'

আমি—'আপনার কি কোন 'হবি' আছে'?

তিনি—'হবি' বিশেষ একটা কিছুতে নেই, তবে পড়াশুনা আমার ভাল লাগে, মাসিক বসুমতী আমার প্রিয় গ্রন্থ। এটা আমি উল্টে পাল্টে পড়ি। সেলাইতে আমি আনন্দ পাই, গান আমার অন্তরের জিনিষ, রান্না করতে আমার খুব ভাল লাগে। পরিজনদের খাওয়া দেখতে আমি ভালবাসি—যদিও আমার ছেলে হয় নাই। আমার ছেলে হ'লে তাকে আমি নিজ হাতে খাওয়াব বলেই মনে করি। সংসার করতেই আমার সবচেয়ে ভাললাগে।'

আমি—'ভবিষ্যতে আপনার কি করার ইচ্ছা?'

তিনি—'ভবিষ্যতে আমি আরও ভাল করে অভিনয় করব, সংসার করব—এই-ই আমার কামনা। আর একটি কাজ আমার প্রিয়—যে ভাবেই হোক কিছু সময় করে নিয়ে স্বামীর কাছে থাকা। স্বামীর সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা।'

আমি বলি, 'কি রকম পোষাক পরিচ্ছদ আপনার পছন্দ'?

তিনি—'সাদা, সিম্পল্ পোষাকই আমি পছন্দ করি। আড়ম্বরহীন জীবন আমার ভাললাগে।

আমি বলি 'আর আপনার সময়নষ্ট করবনা।' বলে নমস্কার জানিয়ে উঠে আসি···

কাগজটা পড়া শেষ করে জয়ন্ত হেসে অণিমা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে হাসছে।

জয়ন্ত একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে বলে, 'এ উল্টো পাল্টা লেখাটা কোথা থেকে আন্‌লে?

অণিমা বলে, 'কেন তখন বলেছিলাম না অতীতা চাটার্জির জীবনী আমিই লিখে দিতে পারি'।

এবার জয়ন্ত চটে ওঠে, 'এটা কি হয়েছে? উল্টে পাল্টে কতগুলি কথা বসান হ'য়েছে।'

এবার অণিমা খিল্ খিল্ করে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

'যা! তুমি বুঝি এ প্রশ্ন আগে, সে প্রশ্ন পরে করতে পারনা? জবাবগুলিত নির্ভুল হয়েছে।'

জয়ন্ত কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়ে। এই অতীতা চাটার্জির রিপোর্ট আনার জন্য আজ কতদিন যাবত ঘোরাঘুরি চল্‌ছে, কত চিন্তা, কত সমস্যা, আর এ বলে কি? কিন্তু লেখাটা ত খুব ভুলও হয়নি? শুধু আগের প্রশ্ন পরে, পরের প্রশ্ন আগে করেছে।

জয়ন্ত বলে, 'লক্ষ্মীটি বলনা এ লেখা তুমি পেলে কোথায়? এ তোমাকে কে বলেছে?'

অনিমা এবার গলা ছেড়ে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

'ওগো বুদ্ধিমান, ওগো কাছাখেলেওলা আদমি, এ আবার কাউকে বলে দিতে হয় নাকি? তোমাদের মাসিক বসুমতীতে প্রতি মাসে যা বেরোয়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে সব তারকাদের জীবনী প্রায় একই, প্রত্যেকেরই সংসারের কাজ ভাল লাগে, স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি, সিম্পল্ পোষাকে আসক্তি এসব থাকবেই। আমি একটি স্কেচ্‌ও এঁকেছি, অতীতা চাটার্জি স্বামীকে প্রণাম করছেন। নীচে লিখে দিয়েছি, প্রতিদিন ভোরে তিনি যা করেন। এটাও সাথে ছাপিও। আরও সুখ্যাতি পাবে।' জয়ন্ত কেমন যেন বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। সব তারকাদের জীবনই এক রকম? দূর তা হতেই পারেনা। কেউ অভিনয়কে মনে প্রাণে ভালবাসে, কেউ এসেছে অর্থের তাগিদে, কেউ ভালবাসেন সঙ্গীত, কেউ ভালবাসেন শিল্প, এ কখনো এক হ'তে পারে? মেয়ে মানুষের বুদ্ধি আর কত হ'বে? সাধে লোকে বলে স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

কবির গান

শ্রীজয়দেব রায়

কবির গান আজ আর শোনা যায় না। এককালে পাঁচালী আর কবির গানে বাঙ্গলার চণ্ডীমণ্ডপ ও বারোয়ারী তলা মুখরিত হইয়া থাকিত। যে কোন উৎসবপার্বণে প্রধান অঙ্গ ছিল কবির গানের আসর। অনেক সময় মূল উৎসব অপেক্ষা প্রধান আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিত এই শ্রেণীর উৎসবাঙ্গ।

কবির গান, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি যে ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ আমরা প্রাচীন সংস্কৃতির উপর ক্রমেই শ্রদ্ধা হারাইতেছি। পাঁচালী ও কবি গানের আসর বহুদিন বিদায় লইয়াছে, যাত্রার আসরও বিস্মৃত প্রায়; কিন্তু একদিন এইগুলিই জনসাধারণের মনপ্রাণ মাতাইয়া রাখিয়াছিল।—নব নব গানের প্রভাবে ইহাদের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গ' কবিতার বরজলালের দশা।

বরজ করজোড়ে কহিল—

"প্রভু মোদের সভা হল ভঙ্গ।

এখন আসিয়াছে নূতন লোক; ধরায় নব নব রঙ্গ"।

কবির গানের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন—

"বোধহয় কালীদমন যাত্রার অনেক পরে কবি গানের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং ঐ যাত্রাই উহার নিদান ও উৎপত্তিস্থল।"

কবির গানের মূল উপজীব্য ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। তখনকার দিনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান ছাড়া আর কোন গান শ্রোতারা সহজে গ্রহণ করিতে পারিত না। কিন্তু তাই বলিয়া এ সমস্ত গান বৈষ্ণব গানের সমপর্যায়ের নয় কিংবা কবিরা সাধক বৈষ্ণব কবি নন। রাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের কাছে লৌকিক নায়ক নায়িকা মাত্র। অনেক কবির গানে বৈষ্ণব পদাবলীর কোন কোন অঙ্গের অনুকৃতি লক্ষিত হয়। পদাবলীর ন্যায় এইগুলিতে ভণিতাও দেওয়া হইত।

বৃন্দাবন লীলা ছাড়া শাক্তভক্তিধারা, উমার বাল্যলীলা, আগমনী-বিজয়া গান কবি-গানের অন্যতম উপজীব্য ছিল। রাধাকৃষ্ণের লীলাগান অপেক্ষা এগুলিতেই তাঁহাদের আন্তরিকতা অধিকতর পরিস্ফুট হইত।

হরগৌরীর লীলাগান ছাড়া শ্যামাসঙ্গীত কবিরা রচনা করিতেন। রামপ্রসাদের পর হইতে ভক্তিরসের গান বলিতে সাধারণতঃ শ্যামাসঙ্গীতকেই বুঝাইত।

ইহা ছাড়া নানাপ্রকার সামাজিক রীতিনীতি, সমসাময়িক ঘটনা প্রভৃতি লইয়া কবিরা গান বাঁধিতেন। প্রায় সমস্ত গানেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের মনোরঞ্জন।

রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসরবিনোদনের জন্য গান রচনা বর্তমান বাংলার কবিওয়ালারা প্রথম প্রবর্তন করেন।"

বাংলার সঙ্গীত জগতে সে সময়ে নব জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। পশ্চিম হইতে হিন্দুস্থানী সুরে বিশেষজ্ঞ হইয়া রামনিধি গুপ্ত মহাশয় নব সুরধারায় বাংলা গান রচনার সুরু করেন।

এই নূতন ওস্তাদি গানের নাম হইল "আখড়াই গান"। শোভাবাজারের রাজবাড়ীর সভাগায়ক কুলুইচন্দ্র সেন ছিলেন এ ধারার গানের প্রবর্তক। কাব্যবাণীবর্জিত এ শ্রেণীর উচ্চাঙ্গের সুরাশ্রয় গান বাঙ্গালী শ্রোতা বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না।

আখড়াই গানে সুরের ভাগ কমাইয়া সৃষ্টি হইল 'হাফ আখড়াই গান।' মোহনচাঁদ বসু ছিলেন এ ধারার প্রবর্তক। এ গানে শ্লীলতার গণ্ডী রাখার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। তাহাতেও উত্তর-প্রত্যুত্তরে বাদানুবাদ চলিত। কবির গান

এই হাফ আখড়াই গানকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পল্লীর জনসাধারণ কবিগানের রীতিমত সমাদর করিত; যে কোন পল্লীউৎসব তাহার অভাবে নিষ্প্রভ হইয়া যাইত। এক সময় একাধারে কাব্য ও সঙ্গীতের পিপাসা কবি-গানই মিটাইয়াছে। পল্লীর নিরক্ষর জনগণ ইহার মারফতেই সাহিত্যের সারোক্ত আস্বাদও পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ কবিগানকে বলিয়াছেন 'লোকসভার গান'। সাহিত্য তখন আর পৃষ্ঠপোষকের আশ্রয়ে ও তাঁহাদের উৎসাহে রচিত হইত না। লোক মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্যের রূপেরও পরিবর্তন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন তখন জনগণ—

"সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুইদণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না। কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙ্গিয়া সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁসি সহযোগে সবলে প্রবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।"

অবশ্য পল্লীর আসরের শ্রোতারা গানের কাব্যরস, সুর প্রভৃতির আনন্দ যতটা উপভোগ করিত, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ, উত্তেজনা অনুভব করিত প্রতিদ্বন্দ্বী কবিদলের বাগ্‌যুদ্ধে এবং রস-কলহের উত্তর-প্রত্যুত্তরের কলাকৌশলে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাহাদের মধ্যে লড়াই এবং হারজিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঝঙ্কার দিতে হইবে, আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্‌ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে।"

শ্রোতাদের এই আনন্দ বিতরণের জন্য কবিগণের কাব্যাংশকে তরল হাস্যরসে এবং সঙ্গীতাংশকে লঘু সুরের নিম্ন পর্যায়ে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সঙ্গীতের নামে অনেক সময়ে সঙ্গতের প্রচণ্ড কোলাহলই প্রাধান্য লাভ করিত। শ্রোতাদের রসসম্ভোগের ক্ষমতার উপরই কবিদের গান রচনা নির্ভর করিত, সেজন্য গানের রুচি সব সময়ে সুসঙ্গত হইত না। রবীন্দ্রনাথ এদিকটাকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"শ্রোতারাও বেশী কিছু প্রত্যাশা করে না, কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা এবং উপস্থিতমতো জবাবেই সভা জমিয়া উঠে এবং বাহবা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, তাহার উপরে আবার চারজোড়া ঢোল, চারখানা কাঁসি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চিৎকার—বিজন-বিলাসিনী সরস্বতী এমন সভায় অধিকক্ষণ টিঁকিতে পারেন না।"

কেবল সুরুচিই নয়, কবিগানে অলঙ্কার, ছন্দ প্রভৃতিরও পারিপাট্য ছিল না। কেমন যেন ঔদাস্যের সহিত সেগুলি রচিত হইত, অবশ্য সেজন্য সেগুলির সমাদরের বিন্দুমাত্র অভাব ঘটিত না। অনেক গান আসরে বসিয়া মুখে মুখেই রচিত। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"দেবতার কাছে অথবা বিদগ্ধরাজা ও রাজসভাসদ্‌গণের সম্মুখে যে রচনা পঠিত বা গীত হয়, তাহাতে লেখকের যত্ন, সতর্কতা, শালীনতার সঙ্কোচ থাকে; শ্রোতারাও অপরিচ্ছন্ন ভাষা, ছন্দ, বা রুচিতে তুষ্ট হয় না, পল্লীর জনসাধারণ অথবা ভোগবিলাসী জমিদারের সম্মুখে গাওয়ার জন্য রচনায় কোন সতর্কতা, শৃঙ্খলা বা সুরুচির বালাই থাকে না।"

কবির গানের মধ্যে আর একটি অংশ ধাঁধা-হেঁয়ালীর সমাবেশ। প্রশ্ন করিলে ধাঁধার সঠিক উত্তর গানের মধ্য দিয়া প্রতিযোগীকে দিতে হইত। এই শ্রেণীর গানের পুরাতন রূপ আর্যা ও তর্জা। প্রাচীন চর্যা গান হইতে গভীর ভাবের ব্যঞ্জনা দেওয়ার ধারা চলিয়া আসিতেছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে—'তর্জা প্রহেলী আচার্য কহে ঠারেঠোরে'। কবির গানেও এই শ্রেণীর প্রহেলিকাময়ী ভাষা ব্যবহার করা হইত। তরজায় ধাঁধার রহস্যোদ্ভেদ চাহিয়া একদল ছড়া গাহিত আর অন্যদল ছড়া কাটিয়া তাহার উত্তর দিত। কবিগানেও এই প্রকার হেঁয়ালীর সমাবেশ হইয়াছিল।

কবির লড়াই চলিত চাপান এবং উতোরের মধ্য দিয়া। একদল কোন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া 'চাপান' গাহিল—

অপর দল তাহার উত্তর দিবে 'উত্তোরে' গাহিয়া। তাহার পরে তাহারা আবার একটি ভিন্ন প্রশ্ন করিত। এইভাবে রস-কলহের মধ্য দিয়া কবির গান গাওয়া হইত। কৃষ্ণ-কীর্তনাদি প্রাচীন শ্যামালী গানের ভঙ্গিটী এইভাবেই রূপান্তরিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। শুকশারীর দ্বন্দ্বের মধ্যেও এই শ্রেণীর রস-কলহ দেখা যায়। গোবিন্দ অধিকারীর শুকশারীর গানেও তাহার নিদর্শন আছে।

সাধারণতঃ কবির গানের চারটি অংশ ছিল; প্রথমাংশ মালসী বা শ্যামাসঙ্গীত এবং বন্দনা গান। রামপ্রসাদের পরবর্তী শ্যামাসঙ্গীতগুলিকে মালসী নামে অভিহিত করা হইত। সম্ভবতঃ মালবশ্রী বা মালশ্রী রাগিনীর অপভ্রংশে মালসী হইয়াছে।

দ্বিতীয়াংশে সখীসংবাদ অর্থাৎ ব্রজলীলার গান। তৃতীয়াংশ বা প্রধান অঙ্গ খেউড়—গানের মধ্য দিয়া আক্রমণ—প্রত্যাক্রমণ এবং শেষাংশে প্রভাতী।

সুরেও উচ্চাঙ্গের গানের মতন চারটি তুক বা সুরাংশ ভাগ করা হইত—মহড়া, চিতেন, অন্তরা এবং পরচিতেন। হরুঠাকুরের একটি সুপরিচিত কবির গান উদ্ধৃত করিয়া এই তুকভাগ দেখানো হইল।

মহড়া—

"যদি শ্যাম না এলো বিপিনে,
তবে কি হবে সজনি।
লম্পট স্বভাব তার জানি॥
ওগো বৃন্দে, এই সন্ধ হয়।
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয়।
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী॥"

চিতেন—

ছিল যে সঙ্কেত হরি আসিবে নিশ্চয়।
বিলম্ব দেখে তায় হতেছে সংশয়॥

অন্তরা—

কৃষ্ণপ্রাণা আমি আমার অনঙ্গপতি।
বোলে কি জানাবো তোমায়; তুমি কি জান দূতী॥

পরচিতেন—

ক্রমেতে হতেছে গত নিশি অবশেষ।
শ্যাম বিনে ততই বাড়িতেছে ক্লেশ॥
আসার আশায় এতক্ষণ
রয়েছি করিয়ে পথ নিরীক্ষণ।
মাধব না এসে যদি; আসে দিনমণি॥

সখীসংবাদের সঙ্গে সমস্তাপূরণের ধাঁধা বা হেঁয়ালীর একটা প্রকরণ থাকিত—তাহাকে বলা হয় লহর। ক্রমে লহরও খেউড়ের মত রসদুষ্ট হইয়া পড়িলে তাহাকে পৃথক প্রকরণে পরিণত করা হয়। এ সকল গানে খেউড় ও লহরই ছিল প্রধান আকর্ষণের বস্তু। লহরে নানা শ্রেণীর শ্লেষাত্মক গান থাকিত আর খেউড়ে থাকিত নিছক গালাগালি। যাত্রার উপসংহারে সঙের জন্য দর্শকগণ যেমন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিত; কবির গানে শ্রোতাদের তাহার অপেক্ষাও বেশী আগ্রহ থাকিত এই খেউড় শ্রবণে। ভোলা ময়রার খেউড় ছিল একেবারে অশ্রাব্য।

খেউড় গানের সঙ্গে আজ আর সুরুচিসম্পন্ন ভদ্র বাঙ্গালীর পরিচয়ও নাই। অপেক্ষাকৃত মার্জিতরুচির একটি খেউড় আমাদের এই আলোচনায় উদ্ধৃত করা হইল। এই গানটি বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা মনোমোহন বসুর রচনা, তিনি আসল কবিওয়ালাদের ন্যায় ততটা সুরুচি লঙ্ঘন করিতে সাহস করেন নাই—

ওগো বোন তোমার।
দেবে নাকি বোনের বে আবার?
দ্বীপের মাঝে দিনের বেলা, পরাশর ঘটালে জ্বালা।
ছলে হোক্, বলে হোক্ পতি সেই;
তখন বদল করবে নাকি সে ভাতার?
ঋষিকে দেও শুভ সমাচার!
বিধবাকে বর, পরাশর, দিতে চায় বর,
দিতে চায় কন্যা সবে॥

বিধবা বিবাহের প্রতি বিদ্রূপই উপরের খেউড়টির উপজীব্য।

কবিয়ালরা পেশাদার গায়ক ছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের ভগবৎপ্রীতি এবং কবির তাঁহাদের কাছে আশা করাও যায় না। তবু অনেক গানের মধ্যে বেশ আন্তরিকতার স্পর্শও পাওয়া যায়। রাম বসুর দুই একটি গান ভাবে ভাষায় লৌকিক প্রেম কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। তাঁহার একটি গান—

মনে রইল সই মনের বেদনা! প্রবাসে যখন যাবেগো সে,
তারে বলি বলি বলা হলো না। সরমে মরমের কথা
কওয়া গেল না।

প্রাকৃত প্রেমের গান হইলেও ইহা আতির পরিচয় দেয়।

কবিত্বের দিক দিয়া রাম বসুই কবিয়ালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে 'বিরহ সঙ্গীতের রাজা' আখ্যা দিয়াছিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু না হইলে তিনি হয়ত অধিকতর কবিখ্যাতির অধিকারী হইতেন।

কবিয়ালদের মধ্যে গুরুস্থানীয় গায়ক ছিলেন হরুঠাকুর বা হরেকৃষ্ণ দীগাঙ্গী। পেশাদার কবির দল তিনিই একরকম প্রথম গঠন করেন। এছাড়া ভোলাময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিওয়ালারা প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন।

প্রোটিন-রহস্য

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শরীরের প্রত্যেকটি অংশে এমন একরকমের পদার্থ আছে, যাকে প্রোটিন বলা হয়। শরীরের কোন কোন অংশে এই পদার্থের পরিমাণ বেশী, আবার কোন কোন অংশে পরিমাণ কম। রক্ত এবং মাংসপেশীর ১/৫ অংশই প্রোটিন, মস্তিষ্কের ১/১২ অংশ এবং দাঁতের এনামেলের ১/১০০ ভাগের কিছু কম অংশ প্রোটিন। মোটের উপর কথাটা হচ্ছে—শরীরের কোন জীবন্ত অংশই সম্পূর্ণরূপে প্রোটিন-শূন্য নয়। এ কথা কেবল মানুষের পক্ষেই নয়, যাবতীয় জীবজন্তু, এমন কি উদ্ভিদাদির পক্ষেও সত্য। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রোটিন-শূন্য কোনও রকমের প্রাণবন্ত পদার্থের অস্তিত্ব নেই। অতি সরল গঠনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যেও প্রোটিনের অস্তিত্ব রয়েছে। এমন কি, ব্যাক্টিরিয়ার চেয়েও সূক্ষ্মতর একরকম জীবন্ত পদার্থ —যাকে আমরা ভাইরাস বলি—তার মধ্যেও প্রোটিন রয়েছে।

খালি চোখে দেখা তো দূরের কথা, অতি শক্তিশালী মাইক্রস্কোপ ছাড়া যেসব ব্যাক্টিরিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না—ভাইরাসের তুলনায় সেগুলিকেও এক একটা বিরাট দৈত্যের মত দেখায়। কতকগুলি ভাইরাস এতই সূক্ষ্ম যে, তাদের পাশাপাশি রেখে এক ইঞ্চি লম্বা লাইন করতে গেলে ১০ লক্ষ ভাইরাসের দরকার হবে।

অবশ্য জীবজগতের মধ্যে ভাইরাসের দেহের গঠন এতই সরল ও জটিলতাবর্জিত যে, একমাত্র বংশবৃদ্ধি ছাড়া এদের অন্য কোন রকম জীবনক্রিয়ার অভিব্যক্তি ঘটে নি, বললে অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীদের দেহকোষের মধ্যেই এরা কেবল বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রায়ই রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। মানুষের দেহকোষে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ঘটবার সময় সাধারণ সর্দি, হাম, শিশু-পক্ষাঘাত প্রভৃতি কতকগুলি রোগ আত্মপ্রকাশ করে থাকে। জীবনের পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটিমাত্র রাসায়নিক পদার্থের সমবায়েই সূক্ষ্মতম ভাইরাসের দেহ গঠিত বলে মনে হয়। জীবনের অভিব্যক্তি ঘটবার জন্যে যেসব জিনিষ না হলে চলে না, কেবলমাত্র সে কয়টি ছাড়া অন্য কোন অতিরিক্ত পদার্থ সমাবেশের স্থান ভাইরাসের দেহে নেই। কাজেই এসম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় হলো এই যে, নিউক্লিয়োপ্রোটিন নামে একরকমের জটিল ধরণের প্রোটিনই এসব ভাইরাসের দেহগঠনের প্রধান উপাদান। এথেকেই দেখা যায়, সব রকমের জটিলতা বাদ দিয়ে আমরা যে সহজ, সরল মৌলিক জীবনের সন্ধান পাই, সেটি হচ্ছে—এই প্রোটিন।

প্রায় ১২০ বছর পূর্বে সর্বপ্রথম যখন জীবন্ত দেহতন্তু থেকে প্রোটিন পৃথক করা সম্ভব হয়েছিল, বিজ্ঞানীরা এই পদার্থের গুরুত্ব সম্বন্ধে তখনই একটা ধারণা করতে পেরেছিলেন। ১৮৩৮ সালে মালডার নামে একজন ডাচ্ জৈব-রাসায়নিক এই পদার্থটির নাম দেন—প্রোটিন। এটি একটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ—প্রথম স্থানাধিকারী। জীবনের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের প্রোটিনের সম্বন্ধের বিষয় বিবেচনা করতে গেলে একথার সত্যতা যে অনস্বীকার্য, তা সহজেই বুঝা যায়।

কোন্ কোন্ পদার্থের সমবায়ে প্রোটিন তৈরী হয়? এ কথার উত্তরে বলা যায়—ইট, কাঠ, পাথর, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ যেমন পরমাণুর সমবায়ে উৎপন্ন, প্রোটিনও সেরূপ পরমাণুর সমবায়েই উৎপন্ন হয়ে থাকে। রাসায়নিকেরা বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। সেগুলিকে বলা হয় মৌলিক পদার্থ। আজ পর্যন্ত একশ' রকমের বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সোনা, রূপা, লোহা, তামা প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক পদার্থ আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত।

অপরগুলি এতই দুর্ঘট যে অনেকেই এদের নাম পর্যন্ত শোনেন নি।

পরমাণু কদাচিৎ এককভাবে থাকে। এরা যেন ছোট বড় বিভিন্ন রকমের দলবেঁধে থাকতেই ভালবাসে। এ রকমের দলবদ্ধ পরমাণুকে বলা হয়—অণু। এখন প্রোটিনের কথা আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতঃই মনে হয়—প্রোটিনগুলি তবে এরূপ অসাধারণ হয় কেমন করে? একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার বিষয়—প্রোটিনের অণুগুলি খুবই বড় হয়ে থাকে। এ কথার অর্থ—বুঝতে হলে বিভিন্ন রকমের পরমাণু ও অণুর ওজনের কথা মনে রাখতে হবে।

স্বভাবতঃ যাবতীয় পরমাণুই অদম্ভব রকমের হাল্কা। ক্ষুদ্রতম ধূলিকণার ওজনের সমান করতে হলেও কোটি কোটি অণু-পরমাণুর দরকার। মানুষ যে এরূপ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পরমাণুরও ওজন করতে সক্ষম হয়েছে—সেটা যে বিজ্ঞানের একটা বিস্ময়কর ঘটনা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

যত রকমের মৌলিক পদার্থ আছে তার মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুই সবচেয়ে হাল্কা। হিসাবের সুবিধার জন্যে এর ওজন ১ ধরা হয়, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা যায়—হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন হলো—১। কার্বনের পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে ১২ গুণ ভারী। সে হিসাবে কার্বনের পারমাণবিক ওজন হলো—১২। এভাবেই নাইট্রোজেনের পারমাণবিক ওজন—১৪, অক্সিজেনের ১৬, গন্ধকের ৩২ ইত্যাদি। এই তো গেল পারমাণবিক ওজনের কথা; কিন্তু আণবিক ওজন কেমন করে বুঝা যাবে? আণবিক ওজন বুঝতে কোন অসুবিধার ব্যাপার নেই। একটা অণুর মধ্যে যতগুলি পরমাণু থাকে তাদের ওজন একত্রে যোগ করলেই আণবিক ওজন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমবায়ে একটি হাইড্রোজেন অণু গঠিত। যেহেতু হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন—১, সেহেতু একটি হাইড্রোজেন অণুর ওজন হবে—২। এরূপ নাইট্রোজেন অণু, দুটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত এবং একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর ওজন—১৪; কাজেই নাইট্রোজেন অণুর ওজন হবে—২৮। সেরূপ অক্সিজেন অণুর মধ্যে দুটি অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে এবং এক একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন—১৬; কাজেই অক্সিজেনের আণবিক ওজন হলো—৩২।

যেখানে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর সমবায়ে অণু গঠিত হয়, সেখানেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। যেমন—জলের অণু। ১টি অক্সিজেন পরমাণু ও ২টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমবায়ে জলের একটি অণু গঠিত হয়ে থাকে। কাজেই জলের অণুর ওজন হবে—১৮; অর্থাৎ হাইড্রোজেন—১+হাইড্রোজেন—১+একটি অক্সিজেন পরমাণু—১৬।

জলের এক একটি অণু বরং খুবই ছোট; কারণ এর তুলনায় চিনির এক একটি অণুর মধ্যে আছে ১২টি কার্বন পরমাণু, ২২টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং ১১টি অক্সিজেন পরমাণু। ১২টি কার্বন পরমাণুর মোট ওজন হলো—১৪৪, ২২টি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমষ্টি হলো—২২ এবং ১১টি অক্সিজেন পরমাণুর সমষ্টিগত ওজন হলো—১৭৬। এগুলিকে একত্র যোগ করলে চিনির আণবিক ওজন দাঁড়ায়—৩৪২। জলের অণুর তুলনায় চিনির অণুর ওজন খুব বেশী হলেও, এই অণুই সবচেয়ে বড় নয়। কারণ কোন কোন চর্বি জাতীয় পদার্থের অণু ১১০টি পরমাণুর সমবায়ে গঠিত এবং তার আণবিক ওজন প্রায় ১০০।

এখন প্রোটিনের অণুর কথায় আসা যাক। আণবিক ওজনের দিক থেকে চর্বি অথবা চিনির অণুর সঙ্গে এর কি ভাবে তুলনা হতে পারে? অবশ্য বিভিন্ন রকমের প্রোটিন অণুর সংখ্যা অগণিত হলেও বোঝবার সুবিধার জন্যে দুধের প্রোটিন অণুর কথাই ধরা যাক। কারণ গবেষণার ফলে দুধের প্রোটিন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা গেছে। এই প্রোটিন অণুর মধ্যে ৯,৯৪১টি পরমাণু আছে। তার মধ্যে ১৮৬৪টা কার্বন, ৩০১২টা হাইড্রোজেন, ৪৭৬টা অক্সিজেন, ৪৬৮টা নাইট্রোজেন এবং ২১টা সালফারের পরমাণু আছে। এর আণবিক ওজনও খুব বেশী—চল্লিশ হাজারেরও উপর। এই অণু-

চর্বির অণুর চেয়ে ৪৫ গুণ এবং চিনির অণুর চেয়ে ১২০ গুণ ভারী।

কিন্তু এই প্রোটিনই একমাত্র আদর্শ প্রোটিন নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তত কতকগুলি প্রোটিন অণুর চেয়ে এগুলিকে বরং ছোটই মনে হবে। প্রোটিনের গড়পরতা আণবিক ওজন প্রায় ৩০,০০০ ধরা যেতে পারে। অবশ্য এর চেয়ে বেশী আণবিক ওজনের প্রোটিনও আছে। বিশেষ কোন রক্তের (Clam-blood) প্রোটিনের আণবিক ওজন ৪ মিলিয়নও হয়ে থাকে। কোন কোন ভাইরাসের মধ্যে যে প্রোটিন অণু থাকে তাদের আণবিক ওজন কোটি সংখ্যা তো বটেই, কোন কোন ক্ষেত্রে দশ কোটিরও বেশী হতে পারে।

একটা কথা মনে হতে পারে—অণুর ছোট বড় আকৃতির পার্থক্যে কি আসে যায়? অণুর ছোট বড় আকৃতিরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের শরীরের ভিতর যেসব প্রক্রিয়া চলে তার কতকগুলিতে প্রোটিনের বড় বড় অণুগুলি যতটা সুষ্ঠুভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে, ছোট ছোট প্রোটিন অণুগুলি সেরূপ পারে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়—কাঠের প্রধান উপাদান হচ্ছে সেলুলোজ। সেলুলোজের অণুগুলি খুব বড় হয়ে থাকে। এদের প্রধান কাজ হলো—উদ্ভিদের দেহ-কোষগুলিকে দৃঢ় করে তোলবার ব্যবস্থা করা। প্রাণীদের লিভারের মধ্যে গ্লাইকোজেন নামে শ্বেতসারের মত এক প্রকার পদার্থ দেখা যায়। এদের অণুগুলিও বৃহদাকৃতির হয়ে থাকে। শরীরের মধ্যে যেমন এরা কেবল ইন্ধনের মত ব্যবহৃত হয়, প্রোটিনেরও তেমনি শরীরের মধ্যে অসংখ্য রকমের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

কেন এমন হয়? গ্লাইকোজেন অথবা সেলুলোজকে যদি কোন কোন অ্যাসিডের সংস্পর্শে আনা হয় তবে সেসব অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে সেলুলোজ অথবা গ্লাইকোজেনের অণুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই এই ছোট ছোট অণুগুলি একই ধরণের হয়ে থাকে। দেখা যায়—এগুলি শর্করা জাতীয় পদার্থ গ্লুকোজের অণু—যা রক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলি সাধারণ চিনির চেয়ে একটু সরল গঠনের। গ্লুকোজের অণুগুলিকে মনে হয় যেন হাজার হাজার দানা একসঙ্গে মালার মত গাঁথা রয়েছে। গ্লাইকোজেনের অণুগুলিও এই গ্লুকোজ-অণুর সমবায়েই গঠিত, কিন্তু অন্য ধরণে একসঙ্গে গাঁথা থাকে। এ থেকেই মনে হয় যে, সেলুলোজ এবং গ্লাইকোজেন একই ধরণের ছোট ছোট অণুর সাহায্যে গঠিত হয়ে থাকে। অন্যান্য বৃহত্তর অণুর ক্ষেত্রেও (প্রোটিন ছাড়া) প্রায় সব সময়েই এক বা একাধিক সাব-ইউনিট দিয়ে গঠিত হয়। ব্যাপারটা কিরূপ ঘটে, সেটা বোঝবার জন্যে ধরা যাক—আমাকে একটা ভাষা গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু সে উদ্দেশ্যে আমাকে একটি মাত্র অক্ষর ব্যবহার করতে দেওয়া হলো। তার সাহায্যে এরূপ শব্দ তৈরী করতে পারি; যেমন—ক ক, ক ক ক ক ক ইত্যাদি। অর্থাৎ ক অক্ষরটাকে এক বা একাধিক বার ব্যবহার করে যতগুলি ইচ্ছা শব্দ তৈরী করতে পারি। কিন্তু এতে কোন সন্তোষজনক ভাষা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাকে যদি দুটা অক্ষর ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তবে আর একটু ভাল ফল হতে পারে। তিনটি অক্ষর ব্যবহার করতে দিলে আরও ভাল হবে। কিন্তু অনেক বেশী ভাল হবে যদি ২৬টি অক্ষর ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

প্রোটিনের ব্যাপারও ঠিক এরূপ। যখন প্রোটিনের সঙ্গে অ্যাসিড সংযোগ করা হয় তখন তাদের অণুগুলিও ক্ষুদ্রতর অণুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই ক্ষুদ্রতর অণুগুলিকে বলা হয় অ্যামিনো-অ্যাসিড; কিন্তু সেগুলি সবই এক রকমের নয়। ৯০ থেকে ২৪০ আণবিক ওজনের বিভিন্ন আকৃতির প্রায় ২০ রকমের অ্যামিনো-অ্যাসিড আছে। এই অ্যামিনো-অ্যাসিডগুলি বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন রকমের প্রোটিন তৈরী হয়।

একটি প্রোটিন অণুর মধ্যে কত রকমের বিভিন্ন সংযোজনা সম্ভব? মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে একটি প্রোটিন অণুর মধ্যে অন্ততঃ ৫০০ অ্যামিনো-অ্যাসিডের অণু থাকতে পারে। প্রথমে ছোট সংখ্যা ধরেই অগ্রসর হওয়া যাক। ধরা যাক, প্রথমে দুটি অ্যামিনো-অ্যাসিড নিয়ে সুরু করা গেল এবং সে দুটির নাম দেওয়া হলো ক ও খ। এগুলিকে দু-রকমভাবে সাজানো যেতে পারে; যথা—কখ

এবং খক। কিন্তু যদি তিনটি বিভিন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিড নিয়ে আরম্ভ করা যায়—যেমন ক, খ ও গ, তবে ৬ রকমের সংযোজনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ; যথা—কখগ, কগখ, খকগ, খগক, গকখ ও গখক। এভাবে ৪টি বিভিন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিডের সমবায়ে ২৪ রকমের সংযোজন করা সম্ভব।

প্রোটিনের ব্যাপারও এরূপ। কাজেই দেখা যায়—অ্যামিনো-অ্যাসিডের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন প্রোটিনের সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। এরূপে ১ টি অ্যামিনো-অ্যাসিডের সংযোজনে ৩,৫০০,০০০-এরও বেশী বিভিন্ন রকমের প্রোটিন পাওয়ার সম্ভাবনা। আবার ২০টি অ্যামিনো-অ্যাসিডের বিভিন্ন রকম সংযোজনে ২, ৫০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০টি রকমারি প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ব্যাপারটা সত্য। যদি কোন প্রোটিন অণুতে ৫০০ অ্যামিনো-অ্যাসিড থাকে (অবশ্য সবগুলিই পৃথক না হতে পারে) তবে তাদের বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত হওয়ার ফলে যে বিরাট সংখ্যা দাঁড়াতে পারে তা কেবল মাত্র ১-এর পিঠে ছয় ৭' শূন্য বসিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত পরমাণু আছে, এই সংখ্যা তার চেয়েও বহু-বহুগুণ বড়। ২৬টি অক্ষর বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে তা থেকে কতগুলি শব্দ তৈরী হতে পারে—সে কথা অনুধাবন করলেই ব্যাপারটা সহজে বুঝা যাবে। কারণ এই অ্যামিনো-অ্যাসিডের প্রত্যেকটির সজ্জার সামান্য একটু পার্থক্যের ফলেই পৃথক পৃথক এক একটি প্রোটিন অণুর উৎপত্তি হতে পারে। বিভিন্ন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার জন্যে আমাদের শরীর নতুন নতুন প্রোটিন উৎপাদনের ব্যবস্থা নিঃশেষ না করেও প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরী করতে পারে। কাজেই এরূপ একটা বিস্ময়কর অণু থেকে যে জীবন গড়ে উঠতে পারে তাতে বিস্ময়ের ব্যাপার থাকতে পারে, কিন্তু অসম্ভব মোটেই নয়।

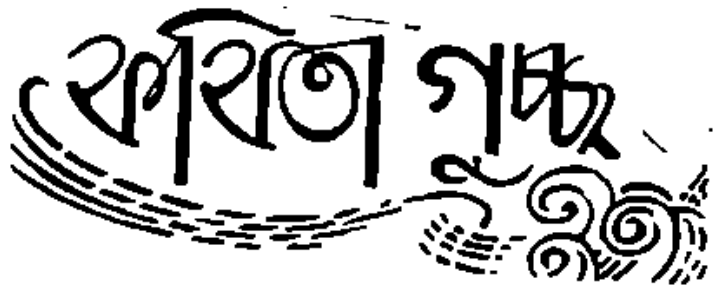

ক্ষণ-গোধূলি

সিপ্রা ঘোষ

মরণ-পারাবারের তীরে করলে আগমন
ওগো জীবন-সাথী,
পরপারের খেয়ায় বসে চমকে ওঠে মন
ঘুরিয়ে আসে রাতি।

অন্তবিহীন-অন্ধকারে কোন্ সে কিশোর-দিনে
তোমার খোঁজে বেরিয়েছিলাম একলাটি পথ চিনে
গহন-বনের অন্ধকারে নীরব-রজনীতে,
জ্বালিয়ে সাঁঝের-বাতি ;
আজকে যেন মরণ পারে ডাক দিয়েছ তবে
ওগো জীবন সাথী !

সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত সুরে গহন-বনের তলে
উজল-চোখের জলে,
মরণ-আলোর-রশ্মি মেখে জীবন-খেয়া-তরী
একলা ভেসে চলে।

সুর যে আমার হারিয়ে গেল অনেক দূরের-দেশে
অপূর্ণতায় কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত-পথের-শেষে,
অরুণ-আলোর-অস্ত-বেলায়-শব্দবিহীন সুরে,
লুকোচুরির ছলে ;
সে সুর আমার হারিয়ে গেছে পথের-প্রান্তে এসে
উছল-চোখের-জলে !

আজকে কেন নতুন করে গাঁথছ তবে মালা
শুকিয়ে যাওয়া ফুলে,
অন্ধকারে আমায় কেন ডাকছ তবে ওগো
ক্ষণিক-মোহের ভুলে ?

তোমায় আমায় বসবে সখা আবার প্রেমের-মেলা
আগের মত খেলব মোরা আবার নতুন-খেলা
নতুন করে বাজবে সখা আবার মিলন-বাঁশী,
উঠবে প্রীতি-দুলে ;
নতুন করে আবার তোমায় পরিয়ে দেব মালা
শুকিয়ে যাওয়া ফুলে।

বসন্তবাহার

শ্রীঅনিলকুমার রায়

"(Yet she comes not back to me !!)
Again the silver silence of the night blooms
With its untold passion ; in the bush
Nightingale sings a song of love and then
The lazy wind pipes the secret tune of the past,
That knocks at my heart and steals me far alone.
And time tolls the bell, she will come to me,
As the morning star kisses the ashamed sky,
She will come again ! she will come again !!"

এখনও সে বাসরে এলো না,
ঝ'রে যদি যায় যাক তারি নামে হৃদয়ের সোনা।

রাতের শিয়রে কেহ পুরানো সে-চাঁদ, চোখে তার
প্রেমের কাজল এঁকে, আঁচলে আযৌবন আলার
সমস্ত কামনা নিয়ে ফিরে এলো। এলোনা সে। গানে
প্রহরজাগানো পাখি প্রেম ডেকে আনে।
বাউল হাওয়ার তানে তানপুরা বেঁধে নিয়ে মন,
বারে বারে খুঁজে তাকে ফিরে গেল আহা অনুখন।
তারাগুলি দুষ্টুমী—লজ্জাবতীলতা অনুভূতি
চমকায় বারবার, ভালবাসা বোধের আকুতি
থরোথরো আর্তিতে ভ'রে তোলে সময়ের ভেলা
মুহূর্তের পারে ব'সে রঙ্ নিয়ে খেলা।

একদিন এই খেলা ফুরাবে এখানে,
শিশুর কাকলি দেবে অন্ত এক জীবনের মানে।
পুরানো চাঁদের দেহে কী বিলাস হ'য়েছে লুকানো,
সেই কথা জেনে জেনে দিন কাটে। জীবনের গানও
নদীর একূল ভেঙে ভালবাসা নদীর ওকূলে,
ভুল ক'রে পথ বাঁধে ভুলে।

এ-এক আশ্চর্য মেশা বাঁধা এই অরণ্যের চোখে,
আকাশে আকাশে স্মৃতিজাগানিয়া মেঘের অলকে।
হে হৃদয় মনে পড়ে যদি,
অদ্ভুত বসন্ত হাতে এলো কি সে আমার হৃদয়ী।
আসেনি সে, আসবে সে। হৃদয়ের সব লেনাদেনা,
একদিন জানি এই না আসার বেদনাও কেউ শুধাবেনা।

এই নদী কিংশুকে পাখিদের গানের আসরে,
রাঙাধূলো পথে পথে রঙীলা পাতার বাসরে,
হৃদয় কেবলি বলে, সে-আসবে জানি ভালবেসে,
যেদিন সমস্ত ব্যথা প্রেম হ'য়ে ফুটবে নিমেষে।

নীল নীল বন

অনিমেষ সেন

Under the greenwood tree :: Shakespeare.

ইসারায় ডাকে বুঝি নীল-নীল বন
আহা-নীল পাখী আর পাখালীর রঙ।
দেবদারু ঝাউ আম জারুলের শাখা
বিস্তীর্ণ পাহাড় দেশে যেন স্বপ্ন-মাখা।
পাটকিলে মাটি-মন সাঁওতাল ছেলে
অবাক বিস্ময়ে মেলা আঁখি দুটি মেলে
ভুল ভুল চেয়ে দেখে আকাশের তারা
—সোনাঝরা কল্পনার রঙে আত্মহারা।
এই মাটি, এই মন, এই চেয়ে থাকা
অশান্ত জীবনে সত্য হোক ছবি আঁকা।

দিনান্তরে

বিবেককুমার রায়

ঝড় এলো, বৃষ্টি এলো, এই বনটারে
শাল, তাল দোলা দিলো ; তমাল আকুল
হ'য়েছিলো মেঘছায়ে ; অশান্ত চিৎকারে
হ'য়েছে তো এলোমেলো বকুলের চুল।
কখনও শান্ত কোনো সূর্য আলো তার
আবৃত পাতায় ঢেলেছিলো, রাত্রির
আঁধারে জেগেছে ফুল ; তোমার আমার
সেদিন কি শেষ হ'ল ? নাগরিক ভীড়
ফের আজ দেখা দেবে ? দেয়ালেতে বাড়ী
আকাশেরে ঘের দেবে ? বহু যত্নে গড়া
পথে কি ফুরোবে নয় ফুলেদের সারি
আলোর চুম্বনে ঢাকা বল। পাখী ওড়া,
ছেলে মেয়েদের হাসি। উদাস ছেলের
চোখেতে কখনো স্বপ্ন মিলনে, মিছিলে
দোলন কি মুছে যাবে ! দীপ্ত প্রভাতের
কোটা ফুল গন্ধ ছড়াবে কি তিলে তিলে।

পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দেহ পঞ্চভৌতিক উপাদানের সৃষ্টি। মানুষসৃষ্টির আদিতে সৃষ্টির কারণ নির্ধারণ করতে গেলে একদিন এই দেহ পঞ্চভূতেই মিলিয়ে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মৃত্যুর পরও এই জড় দেহ পঞ্চভূতেই মিলিয়ে যায়। শুধু জীবদ্দশায় মানুষ একটা স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে অবস্থান করে মাত্র। রূপের স্বাতন্ত্র্য থাকলেও, উপাদান তাদের স্বতন্ত্র নয়।

রূপের মধ্যে অবস্থিতি কালে দেহের একটা বিশেষ ধর্ম পঞ্চভূত থেকে অথবা তাদেরই উপাদানে সৃষ্ট কোন বস্তু থেকে যতটা দেহগত সুখ ও আনন্দ আহরণ করা যায়, তা আহরণ করা ও নিঃশেষে উপভোগ করা। দেহধারী মানুষের এ-একটা সাধারণ প্রবৃত্তি। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের মত এ আপনি ঘটে। পঞ্চভৌতিক উপাদানসৃষ্ট দেহধারী রবীন্দ্রনাথও এই প্রবৃত্তিবিমুক্ত নন।

এই প্রবৃত্তিবশেই তিনি ভালবেসেছিলেন পৃথিবীকে। "ভূতের আঁকা খড়ির গণ্ডি"র ভেতর থেকে এই প্রবৃত্তির বশেই বেরিয়ে এসে কবি দেখলেন, "উদার পৃথিবীর উন্মুখ খেলাঘর।" বিরাট বস্তুজগতের মধ্যে উপভোগ্য জিনিষের অভাব নেই। তাই কবি বলেছেন, "সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম বড় মনোহর"—(জীবন স্মৃতি)।

কবির 'ছবি ও গান' পৃথিবীরই সৌন্দর্য-ছবি ও তাহারই উপভোগজনিত স্বতঃস্ফূর্ত গান। সংসারের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে রয়েছে কত সুন্দর, কত মধুর উপভোগ্য বস্তু, যার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর মানুষের অনন্তকালের আনন্দের উৎস, তাদের ছেড়ে মানুষের চলবে কেন? তাই কবি তাদের উপভোগ করার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন এবং এই 'সুন্দরভুবনে' বেঁচে থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন। তিনি চিরকাল বেঁচে থেকে এই ভুবনকে ভোগ করবেন—এই তাঁর একান্ত কামনা।

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

পৃথিবীর মধ্যে মানুষের প্রাণের খেলা, মিলন ও বিরহের, হাসি ও কান্নার, তাদের সুখ, তাদের দুঃখ অনুভব করে কবি পরম আনন্দ লাভ করেন; তাই তাদেরই বিষয়বস্তু করে কবি যদি গান রচনা করতে পারেন তাহলে নিজেকে সার্থক বলে মনে করবেন।

ধরার প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।

মানুষের জন্য এই সংগীত রচনা করা যদি সম্ভব না হয় তাহলেও তিনি মানুষের মধ্যে শুধু বেঁচে থাকবেন, তাতেও তিনি অসীম আনন্দ অনুভব করবেন।

তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদেরই মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই।

'কড়ি ও কোমলে' কবির ভোগবাসনা সৌন্দর্যচেতনা দ্বারা সংযত হয়ে বিশিষ্ট মাধুর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে।

স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রেম এক ধরণের বৃহত্তর আত্ম-প্রেম ও স্বার্থপরতা। নির্দ্বন্দ্ব জীবন যাপন করতে হলে স্বদেশ, স্বজাতি সৃষ্টি করতে হয়। স্বদেশপ্রেমিকরা নিঃসন্দেহে বাস্তবজীবনবাদী। তাই জীবনভোগী রবীন্দ্র-নাথও এই স্বদেশের গান গেয়েছেন 'কড়ি ও কোমল'-এর বিভিন্ন অংশে। 'বঙ্গবাসীর প্রতি' 'আহবান গীত' প্রভৃতি কবির ভোগভিত্তিক স্বদেশপ্রীতির পরিচয় বহন করে।

'কড়ি ও কোমল' এর মধ্যে মাঝে মাঝে রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ জৈব রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বচারী হয়েছেন, তাই 'কড়ি ও কোমল' এই ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তি দুই-ই

প্রকাশ পেয়েছে। এই অতৃপ্তি আরও প্রকাশ পেলো পরবর্তী কাব্য 'মানসী'তে। 'মানসী'তে তিনি রোমান্টিক হতে শুরু করেছেন। "সোনারতরী"তে উঠে তিনি প্রকৃত রোমান্টিক কবি হিসাবে পরিচিত হলেন। কিন্তু তবুও "সোনারতরী"তে রোমান্টিক কবির 'নিরুদ্দেশ যাত্রা"র সত্যকারের প্রাণের বাসনা যেন ছিল না। যেন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত আহ্বান কবিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু কোথায় তার শেষ কবি জানেন না। সারা পথ কবি চেয়েছিলেন পৃথিবীর দিকে। কবি শুনতেন পৃথিবী থেকে একটা করুণ আর্তনাদ ভেসে আসছে—"যেতে নাহি দিব।" অন্তর্দন দিয়ে অনুভব করছেন "কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।" তবুও কবি বলেছেন—কিন্তু এ চলায় যথার্থ শান্তি নেই। আবার পৃথিবী থেকে একটা মর্মান্তিক সুর এসে কবির মনে আঘাত করে "যেতে আমি দিব না তোমায়।"

মনশ্চক্ষে কবি দেখ্‌ছেন সন্তানবিরহজ্বালায় মাতা বসুমতী সন্তপ্তা। কাতর ক্রন্দনে তিনি বিদায়ী পুত্রকে উচ্ছ্বাস ভরে ডাকছেন।

ক্ষুণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব।"

সন্তানবিরহে বিবশা বসুমতীর হৃদয়স্পর্শী করুণ অবস্থা কবি লক্ষ্য করেছেন।

বসুমতী বসিয়া আছেন এলো চুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া.....
তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই ঘার প্রান্তে লীন স্তব্ধ মর্মাহত।

স্বর্গের অমৃতধারা পৃথিবীতে নেই, কিন্তু যে পৃথিবীর কোলে কবি স্থান পেয়েছেন, সেই পৃথিবীর সঙ্গে কবির এমন একটা আত্মিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে যে স্বর্গের অমৃতধারার চেয়ে পৃথিবী তাঁর কাছে অনেক আদরের। সন্তান-বিরহিনী-মাতার দুঃখ দুর্বশা হৃদয়বান সন্তানরা দেখ্‌তে পায়। কবি লক্ষ্য করেছেন যে, স্নেহ ও ভালবাসার প্রকাশের ক্ষমতাভাবের একটা গভীর নৈরাশ্য পৃথিবী উপলব্ধি করছে। এই নৈরাশ্যভাবই প্রকাশ পেয়েছে 'মায়াবাদ' 'খেলা' 'বন্ধন' 'গতি' 'অক্ষমা' 'দরিদ্রা' 'আত্ম-সমর্পণ' প্রভৃতি সনেটে।

উর্ধ্ব কল্পলোক থেকে কবি 'বসুন্ধরা'কে আবেদন করে বলেছেন—

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভেতরে
বিপুল অঞ্চল তলে।

'বসুন্ধরা'র সঙ্গে মেলার জন্য কবির মন আঁকু পাঁকু করছে—

"হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমাপানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাস ভরে, ইচ্ছা করিয়াছে,
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র-মেখলা-পরা তব কটিদেশ।"

যৌবনসুলভ আবেগ ও উচ্ছ্বাস কবির স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে পৃথিবীর উপর।

প্রথমেই যে বলা হয়েছে, প্রথম মানুষের বীজ একদিন পৃথিবীতেই মিশিয়েছিল। কবি সে সত্য নিজের মধ্যেই অনুভব করেছেন—

"একদিন যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠ্‌তো, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক লোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনী-শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকত, তাইযেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত, পুলকিত সূর্যদনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহে পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত

হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।"—(ছিন্নপত্র)

কবিচেতনার এই অনুভূতিই কবিতার কথা, সুর ও ছন্দে প্রকাশ করে কবি বলেছেন—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অগণ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ সব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোন দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্বমনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবন রসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ,.....

পৃথিবীর সঙ্গে অনাদিকালের যাঁর গভীর আত্মীয়তা, অংশাংশী যাঁর সম্বন্ধ, প্রগাঢ় যাঁর ভালবাসা ও প্রীতি, তাকে ছেড়ে তিনি কল্পলোকে শান্তিতে বিহার করবেন? কল্পলোকের বিহার কি সত্যকারের বিহার? এ বিষয়ে অনেক সমালোচক বলেছেন, "কবি কল্পনার নব নব রাজ্য দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু এখনও ইহা মানসভ্রমণ মাত্র। গৃহের তৃষ্ণা মিটিলে তবে বাহিরের প্রতি টান সত্য হইয়া দেখা দেয়। ইহাতে ঘরের ঘটনাটাই বাস্তব, বাহিরের জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বের বৈচিত্র্যের জন্য কেবলমাত্র আকুলতা এবং ঘরের প্রতি বালকোচিত অসহায় ও করুণ আসক্তির সম্মিলনে যে রসসঙ্গম হইয়াছে—ইহাতেই কবিতাটির বিশেষত্ব।"

কল্পলোকের বিহার যেন কবির সত্যকারের হয়নি। এই বিহার সত্য ও পূর্ণাংগ হবে যখন কবির মনে কল্পলোকের অনুভূতি ছাড়া আর কিছু থাকবে না। কিন্তু পৃথিবীপ্রেম মনকে তাঁর বার বার বিচলিত করেছে—কল্পলোক বিহার হয়েছে তাঁর বাধাগ্রস্ত। পৃথিবীর প্রতি আসক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে 'বসুন্ধরা'তে। কল্পলোকের প্রতি একটা কৌতূহল আছে মাত্র, মর্মের টান কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে।

পৃথিবীও তারই অংশ, কবির ধ্যানের বস্তু। তাই দিগন্ত বিস্তৃত কল্লোলনাদী সমুদ্রের মধ্যে কবি অনন্তকালের আত্মীয়তা আবিষ্কার করেছেন—কবির সংগে ঐ সমুদ্রের যেন গর্ভধারিণী মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক। ঐ "সমুদ্রের বিরাট জঠরে ভুবন-ভ্রূণ মাঝে" কবি যেন একদিন মিলিয়ে ছিলেন।

মনে হয় যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীনভাবে ছিনু ঐ বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে,.....

পৃথিবী, জগৎ, জীবনকে ছেড়ে শুধু অপার নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্যসাধনায় আর যেন কবির তৃপ্তি নেই। তাই 'সোনার তরী'র অস্পষ্ট ভাবসৌন্দর্যের সংগে জাগতিক সৌন্দর্যের একটা সামঞ্জস্য ঘটালেন কবি 'চিত্রা'য় যে সৌন্দর্য 'সোনারতরী'তে দেহহীন কল্পনাকে আশ্রয় করেছিল, সেই সৌন্দর্যই 'চিত্রা'য় "পৃথিবীর বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে রূপান্বিত হ'ল। কবি বস্তুমুখীন ও জীবনমুখীন হলেন। জীবনের উপর মমত্ব ও পৃথিবীর নানা বস্তুর বর্ণনার ভেতর দিয়ে কবিমনের অনুরক্তি 'চিত্রা'র নানা কবিতায় ছড়িয়ে পড়ল। জীবনই সত্য, কল্পনা বস্তুহীন কল্পনাই। সৌন্দর্যসৃষ্টি ত কল্পনাবিলাস। এই কল্পনাবিলাস নিয়ে জীবনধর্মী কবির চলবে কেন? কল্পনার সৌন্দর্যময় স্বর্গ, কবিকে বেঁধে রাখতে পারে না। তিনি আকুলভাবে সেই "স্বর্গ হইতে বিদায়" চান—"এবার ফিরাও মোরে", পৃথিবীর কবিত স্বর্গে "পরবাসী"।

থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে করো সুধা পান
দেবগণ স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান,
মোরা পরবাসী।

পৃথিবীর মধ্যেই কবির আত্মতৃপ্তির বীজ আছে। তাই স্বর্গের অমৃতধারায় কবির লোভ নেই; অবিমিশ্র সুখ পেলেও কবি স্বর্গকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুই তাঁর কাছে এক একটি স্বর্গখণ্ড।

স্বর্গে তব রহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চির স্নান করি
ভূতলের 'স্বর্গখণ্ডগুলি।'

বহুদিন কবি "পরবাসী" হয়ে স্বর্গে ছিলেন, বহুদিন অন্তরাত্মায় মর্ত্যের জন্য কবির প্রাণ আকুল।

অয়ি দীনহীনা
অশ্রু আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্যভূমি, আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।

কিন্তু কবি এখন ভোগলিপ্সু হয়ে নেই। এখন তিনি মানবতার কবি। এবার তাঁর জন্মভূমি "জননী মলিনা" "দীনহীনা" "দুঃখাতুরা" দুর্দশাগ্রস্তা। তাই কবি এসে দাঁড়ালেন "সংসারের তীরে" "জনতার মাঝখানে" "ধূলির প্রসর রাজপথে," কারণ, এখানে নূতন স্নান বুক মুখে দিতে হবে তাকে" "শ্রান্ত শুষ্ক জগবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।" তিনি সংকল্প করেছেন "সংসারে ক্ষুদ্র উৎপীড়ন" "প্রত্যহের কুশাঙ্কুর" "অবিশ্বাস" ও নির্মম "পরিহাস" দূর করবেন।

কবি এলেন বাস্তব জীবনের একান্ত সান্নিধ্যে। কল্পনা বিলাস ত্যাগ করে কবি বস্তুতান্ত্রিক মানুষ হলেন। জন-সাধারণের দুঃখ দারিদ্র্য, দৈনন্দিন ব্যবহারিক কুশ্রীতার ভয়াবহ রূপ তাঁর দৃষ্টিতে প্রকট হয়ে উঠল, তিনি বল্লেন—"এবার ফিরাও মোরে।" "আমাকে এখন অন্তভাবে অনু-প্রাণিত করো। এবার আমাকে এই বস্তুহীন কল্পরাজ্য হইতে বাস্তব জীবনের সমস্যার মধ্যে, জনজনের মধ্যে লইয়া যাও।" তাঁর স্পর্শকাতর ভাবপ্রবণ চিত্ত অস্থির হয়ে উঠলো বাস্তব সংসারের দুর্গত মানুষকে দেখে। তাই তিনি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোক থেকে যাত্রা করে বাস্তব জগতে "বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঘেরা, লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা সুন্দর ধরা তলে" নেমে এলেন।

মানবমুখী কবির পৃথিবীর উপর আকর্ষণ ও মানুষের উপর প্রীতির ভাব আত্মপ্রকাশ করলো 'চৈতালি'র বিভিন্ন কবিতায়। পৃথিবীর কোন বস্তুই কবির কাছে তুচ্ছ নয়। পৃথিবীর। বুকে সামান্য একটু স্থান কবি দুর্লভ বলে মনে করেন, জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও পৃথিবীর মাটিতে জন্মগ্রহণ করাতেও কবির কাছে গৌরব আছে।

"যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

পৃথিবীর অতি সামান্য বিষয় বস্তু এবং ঘটনা কবির দৃষ্টি এড়াতে পারেনি, সেই সব ঘটনা ও বস্তুর মধ্যে কবি গভীর অনুভূতিশীল মন নিয়ে প্রবেশ করেছেন; ও উপলব্ধি করেছেন। দরিদ্র "পশ্চিমি মজুর" কেমন করে দিন কাটায়, কেমন করে দিদি গ্রামে ঘট "ঘুরায়ে ঘুরায়ে" মাজে; তারপর ভাই-এর ক্রন্দন শুনে কেমনভাবে "এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ, দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ" কবির অন্তর্লোকে ছাপ পড়েছে, তিনি কবিতার মধ্যে চিত্রকরের মত তারই ছবি এঁকেছেন। প্রত্যেকটি ঘটনাই কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। কেমন করে "কাটা ঘুড়ি ধরিবারে ছুটে বাহু মেলে" "দোকানির খেলামুগ্ধ ছেলে" "ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে" "অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি" কবি তাও লক্ষ্য করেছেন। "একদা মাঠের ধারে শ্যাম তৃণাসনে একটি বেদের মেয়ে অপরাহ্ণ বেলা কবরী বাঁধিতে ছিল বসিয়া একেলা।" সেই মেয়েটির কবরী বাঁধার মাঝে ছোট পোষা কুকুরের সস্নেহ আদর সত্যই উপভোগ্য, রসজ্ঞ কবি তাও লক্ষ্য করেছেন। 'খেয়া' নৌকাটাও বাদ পড়েনি। এই-গুলিই কবির কাছে "ভূতলের স্বর্গখণ্ড"। 'চিত্রা'র "ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি" 'চৈতালি'র বস্তুপ্রাণ।

'চিত্রা' থেকেই কবি জীবনধর্মী হতে শুরু করেছেন। 'চৈতালি'র মধ্যে "স্বর্গখণ্ডগুলি'র উপলব্ধিতে রয়েছে তাঁর জীবনধর্মিতা ও জীবনোপভোগের একটা সুস্পষ্ট প্রয়াস।

দূরবিস্মৃত অতীতের সঙ্গে উজ্জ্বল বর্তমানের মিলন ঘটিয়ে, সেই মিলনের উপর জীবনকে স্থাপিত করে নূতন

জীবনোপলব্ধির বাসনা জাগল 'কল্পনা'য়। কবি আপন জন্মভূমির কথা স্মরণ করে বলেছেন—

অয়ি ভুবন মনোমোহিনী—
অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জ্বল ধরণী
জনক জননী জননীর।

যে জীবনকে নূতন অবস্থায় নূতনভাবে উপভোগ করার প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল 'কল্পনা'য়, সেই জীবনেরই নূতন তত্ত্বের সন্ধান করেছেন কবি 'ক্ষণিকা'য়। 'কল্পনা'র জীবনানুভূতির মধ্যে একটা নূতনত্ব ছিল। বস্তুতান্ত্রিক ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে একটা বৃহত্তর জীবনাদর্শের কল্পনা ছিল 'কল্পনা'য়। এই বৃহত্তর জীবনাদর্শের মূলে রয়েছে দার্শনিক উপলব্ধি। কিন্তু সেই বৃহত্তর জীবনাদর্শ কবির বস্তুতান্ত্রিক মনে শিকড় গাড়তে পারলোনা। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা ও বস্তুনিচয় আবার কবিমনকে দোলা দিল। কবি ক্ষণকালের জন্য ধনুকে দাঁড়িয়ে ওপর ওপর পৃথিবীকে উপভোগ করতে চাইলেন।

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গাবে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।

সংসারের কত চিত্র, সুখের দুঃখের, আশা ও নৈরাশ্যের, মিলন ও বিরহের, বিতৃষ্ণা ও আসক্তির, নিষ্ফলতা ও তৃপ্তির-সবই কবি ক্ষণিকের জন্য উপলব্ধি করেছেন।

ক্ষণিক উপলব্ধির মধ্যে কবি অনুভব করছেন বস্তু আপন রূপে এবং আপন অবস্থায় মনোরম। "যেমন আছ তেমনি এসো" বলে কবি আহ্বান জানিয়েছেন বস্তুনিচয়কে। "সত্যেরে লও সহজে" 'ক্ষণিকা'র মর্মবাণী। বস্তুর আসল রূপই সত্য, তার মধ্যে বঞ্চনা নেই। যা সত্য, কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে জটিল নয় বলেই তা সহজ। সত্যকে তাই গ্রহণ করাও সহজ। বস্তুকে তাই কবি সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে দেখতে চান।

যেমন আছ তেমনি এসো
আর করোনা সাজ।
এসো এসো সহজ বেশে
নাইবা হ'ল সাজ।

'চৈতালি'তে কবি সংসারের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও চিত্র দেখতেন তা দেখার আনন্দেই দেখ্‌তেন। গভীর অনুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে দেখলেও সে যেন ছিল শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখা ও আনন্দ করা। কিন্তু 'ক্ষণিকা'য় কবি সেই চিত্রগুলিকেই পরম সত্য ও সত্যিকারের জীবনপ্রাণ বলে স্বীকার করে নিলেন।

'কল্পনা'য় বৃহত্তর জীবনের উপলব্ধির পর থেকেই নিছক বস্তুতান্ত্রিক জীবনের উপর একটা নিরাসক্তি এবং আসক্তির ভাব এক সঙ্গেই কাজ করতো। 'কল্পনা'র অনুভূতি কবির মধ্যে এক অধ্যাত্ম অনুভূতির সৃষ্টি করলো 'নৈবেদ্য'তে। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ম কবি হয়ে উঠ্‌তে পারলেন না, অধ্যাত্ম রাজ্যের দ্বার থেকেই স্খলিত হলেন তিনি, কারণ সংসারের উপর আসক্তি তাঁর পুরোমাত্রায় ছিল। পৃথিবী ও সংসারের পরমসত্য সুখ ও দুঃখের ঘটনার আকর্ষণী শক্তিকে উপেক্ষা করে কবির যাওয়া হ'ল না অধ্যাত্মরাজ্যে। অধ্যাত্মরাজ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাঁর প্রকৃতিতে সইল না। তিনি বললেন—

বৈরাগ্যসাধন মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ.....
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধকরি যোগাসন, সে নহে আমার।

তিনি ত্যাগী নন, তিনি ভোগী। ত্যাগের দ্বারা মুক্তি তিনি চান না, ভোগের মধ্যে তিনি মুক্তি চান। "সীমার মাঝে অসীম" দ্রষ্টা কবি বলেন সংসারের মধ্যেই মুক্তি আছে। সংসারে থেকেও ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্ম প্রাপ্তির আনন্দ মানুষ সংসারের স্পর্শ, গন্ধ, গানেই পাবে।

যা কিছু আনন্দ আছে স্পর্শে, গন্ধে, গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

"মানব-সংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোট বড় সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক, কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা, সেই উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।" (৬৭)

আসল কথা দেহকে উপবাসী রেখে কোন বস্তুহীন নৈর্ব্যক্তিক ধর্মের উপাসনা করতে কবি প্রস্তুত নন। কবি পৃথিবীর কাছে স্বীকার করেছেন—

বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায়,
তরুনর-নারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে
বাসনার টানে।

কবি তাই "এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্রখানি"ই বারংবার ভরে ভাগবত অমৃতপান করবেন কামনা করেন।

বাস্তব পৃথিবীর ঊর্দ্ধে অধ্যাত্মলোকে বিচরণ ও পরদেশে প্রবাসীর বিচরণ। তাই 'উৎসর্গ' এর কয়েকটি কবিতায়—প্রবাসের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ কবির কাছে মর্মান্তিক। অধ্যাত্মজগতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হলে সংসারে ফেরা সম্ভব নয়, একথা জানলেই কবির মনে নিদারুণ যন্ত্রণা হয়। একদিকে সংসারের প্রতি গভীর অনুরাগ ও তজ্জন্য ব্যাকুলতা, তার স্মৃতির প্রতি মোহ, অপরদিকে অধ্যাত্মবোধের নির্মম অনুশাসন মেনে নেবার একটা সংস্কারগত বাসনা কবির মনে এক ট্রাজিডির সৃষ্টি করেছে। কবি দেখছেন—

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা,
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে,
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণেজলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে। (উৎসর্গ)

এ ভ্রমণ কবির অধ্যাত্ম লোকের। এই লোকে উপস্থিত হয়ে আর যেন কবি সংসারে ফিরতে পারছেন না, ফেরার যেন কোন উপায় নেই। কিন্তু বাস্তব জগতে পড়ে রয়েছে তাঁর চির জীবনের "ভবন।" সেই ভবন ত্যাগ করে অধ্যাত্মলোকে নতুন করে ঘর বাঁধলে সে ঘর কি বাস্তব সংসারের চির-আপন ভবনের মত মধুময় হবে? বাস্তব জগতের ভবনের কথা চিন্তা করে কবি বলেছেন—

এ সাত মহলা ভবনে আমার
চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি ধাজার বাঁধন
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে
তবু তায় ভুলে যাই বারে বারে।
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে?

কবি আপন দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন, তাই সকল দুর্বলতা কাটিয়ে—কবি আবার একবার সচেষ্ট হলেন বিবাগী হতে 'খেয়া'তে। 'খেয়া'র কবি সংসারবিমুখ, বৈরাগ্য-সাধক। কিন্তু এই বৈরাগ্যের মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হয়েছে। এ বৈরাগ্য সম্পূর্ণ বাহ্য, আপাত বৈরাগ্য। এ বৈরাগ্য কামনাগন্ধী—'খেয়া'র বৈরাগ্যসাধনা যেন পরিপূর্ণভাবে জীবনকে উপলব্ধি করার উপায় মাত্র, এ বৈরাগ্যের পিছনে কামনাই আত্মগোপন করে আছে।

বৈরাগ্যের নির্মোকমুক্ত হলেন কবি 'পলাতকা'য়। মাটির পৃথিবীর সুখ-দুঃখ হাসি কান্না কবিকে আবার ভুলিয়ে দিলে। এই ধরণীর ধূলিমাটি কবির কাছে আবার গর্বের সামগ্রী হয়ে উঠ্‌লো।

কত যে যুগ যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলামাটির মানুষ।

তিনি দেখলেন পৃথিবীর বুকেই স্বর্গ রয়েছে—

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটির মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দে কল্লোলে।

সত্যিকারের কবির আনন্দ এ সংসারের কান্না হাসির, মিলন বিরহের মধ্যেই আছে।

এইত' ভাল এ সংগমে কান্না-হাসির মিলন যমুনায়,
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

'পলাতকা'য় এই যে স্বীকার করে নিলেন মানুষের হাসি কান্না, সুখ ও দুঃখ, মিলন বিরহের মধ্যেই আছে জীবনের তৃপ্তি সেই স্বীকৃতিই শেষ জীবন পর্যন্ত রয়ে গেল। 'পলাতকা'র পর 'পূরবী' 'পত্রপুট' প্রভৃতি কাব্যে পৃথিবীর উপর কবিমনের টানেরই অন্তঃপ্রবাহ রয়েছে।

'পলাতকা' ও 'পূরবী'র কবি ষষ্ঠ বৎসর বয়স অতিক্রম

করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে কবি যৌবনসুলভ মন একবার শেষবারের মত ফিরে পেলেন, তাঁর জীবনে 'শেষ বসন্তের' আবির্ভাব হ'ল।

যে কবি রুদ্রের ভৈরবগান গেয়ে এলেন, যে কবি অধ্যাত্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অধ্যাত্ম জীবন অতিবাহিত করতে সচেষ্ট হয়ে ছিলেন; "এ বারারে—জীবন-উৎসব শেষে দুই পায়ে ঠেলে মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে" যাঁর বাণী আদর্শ ছিল, সেই কবিরই কাছে এই কালে "বিপুলা এই পৃথিবীর" "মহাএকতান" সত্য হয়ে উঠল। কবির অন্তিম বাসনা জাগল, "ধরণীর এককোণে" "এতটুকু বাসাতে" "কিছু ভালবাসা" দিয়ে যদি জীবনের "ক-দিনের কাঁদা আর হাসা" ভরে তুলতে পারেন তবে জীবনে তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করতে পারবেন।

'পূরবী'তে পৃথিবীর ডাক কবি মর্মে উপলব্ধি করলেন। কল্পনাগড়া স্বর্গ কবির কাছে বন্ধ কারাগার, কবির তাই আসল মুক্তিসুখ এই পৃথিবীরই বুকের উপরই আছে।

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে
যাই চলে যাই মুক্তি সুখে
• • •
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে।

মাটির পৃথিবীর উপর এই ভালবাসা, এ তো কবির নূতন নয়, বহুদিনের বহু পুরাতন। শুধু মাঝে ভুলবশতঃ নিয়েছিলেন অধ্যাত্মজীবন। এই ভুলের জন্য কবি নিজেকেই দোষারোপ করেছেন।

কোন ভুলে তুই হারিয়েছিলি চাবি?

কবির অধ্যাত্মজীবন পৃথিবীর মধুময় স্মৃতিগুলো দোলা দিত ও বাধার সৃষ্টি করতো। মাটির পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর মনে সইবে কেন? তাই তিনি অন্তর্যামীকে বলেছেন—

বাঁধন ছেঁড়া তোর সে নাড়ী—
সইবেনা এই ছাড়াছাড়ি
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।

অধ্যাত্মরাজ্যে নির্লিপ্তভাবে কবি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতেন, পরের বাড়ীতে অন্ন পেতেন, কিন্তু তাতে কবির তৃপ্তি হ'তনা মোটেই। 'পূরবী'তে পৃথিবীর অন্নপান করে কবি পরিতৃপ্ত হলেন।

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে—

কবি বুঝেছেন 'তপোভঙ্গ' হয়েছে তাঁর—অধ্যাত্ম তপস্যা তাঁর শেষ হয়েছে। সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে তাই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন—

আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে—

পৃথিবী এক অপূর্ব মোহিনী বেশে এসে কবিকে ভুলিয়ে দিলেন, অধ্যাত্ম তপস্যাভঙ্গ করলেন; কিন্তু আর ত রূপসী মোহিনী পৃথিবীকে ভোগ করার সময় নেই। তাঁর যে আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। একটা গভীর নৈরাশ্যবোধ, একটা নিদারুণ অন্তর্বেদনা কবির মনে প্রকাশ পেয়েছে।

কেন অবেলায় ডেকেছো খেলায়
সারা হয়ে এলো দিন

এই নৈরাশ্যবোধের 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থেও স্পষ্ট প্রকাশ আছে। পঁচিশে বৈশাখের উৎসবে তাঁর আনন্দ নেই—সেই উৎসবে কবির মনে পড়ে যায় মৃত্যুর দিকে কবি একটু একটু করে এগিয়ে চলছেন—

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুর দিকে।

এই নৈরাশ্যের সুর 'পত্রপুট'-এ আরও গভীর হয়ে উঠেছে।

কবি বৃদ্ধ, মৃত্যু আসন্ন। চিরকালের চির আপন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে কবিকে। "জীবনের খেয়াঘাটে" কবি এসে উপস্থিত, মৃত্যুনদী পার হয়ে চলে যাবেন এবার পৃথিবীকে ছেড়ে—

বসেছি অপরাহ্ণে পারের খেয়াঘাটে
শেষ ধাপের কাছটাতে।

জীবনের খেয়াঘাটের এই শেষ ধাপটাতে বসে অতীত জীবনের সংসারের মধুময় স্মৃতিগুলো একবার স্মরণ করছেন কবি। শৈশবে ও যৌবনে তিনি এই ধরণীকে যেমন করে

ভোগ করেছেন, ঠিক তেমনি করে ভোগ করতে আর হয়ত কবি পারবেন না। তাই পুরাতন স্মৃতিগুলিই কবির সান্ত্বনার শেষ সম্বল হয়ে রইল।

জীবনের নানা সুখ দুঃখের
এলো মেলো ভিড়ের মধ্যে
হঠাৎ কখন কাছে এসেছে
সুসম্পূর্ণ সময়ের ছোট একটু টুকরো।

এই রকম স্মৃতির টুকরো পড়ে রয়েছে 'পত্রপুট'এর নানা স্থানে। ছোট বড় সুখ দুঃখের নানা স্মৃতির মধ্যে স্রষ্টা মাঝে মাঝে আপন সৃষ্টির কথাও ভাবেন। এতদিনের সৃষ্টি ঐশ্বর্য কোথায় রেখে যাবেন? কেইবা করবে এর কদর, এর মধ্যেই যে কবির আপন সত্তা মিলিয়ে আছে।

আজ আমার এই পত্র পুঞ্জের
ঝরবার দিন এল জানি
• • • •
আমার এই পত্রগুলির সম্বাহিত দিন রাত্রির যে সকল
অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়
যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে।
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনখানে কোন কালে
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন গুণীর কোন রসজ্ঞের—
দৃষ্টির সম্মুখে,
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার ক'রে?

মৃত্যু কবির অনিবার্য—মৃত্যুকে মানুষ এড়াতে পারেনা—এর প্রকোপে সে পড়বেই। কিন্তু মৃত্যুর ঠিক পূর্বেও তিনি পৃথিবীর মোহ কাটাতে পারছেন না। মৃত্যুর বেদমন্ত্রের মধ্যেও কবি যেন কাকে বলতে শুনছেন "পৃথিবীর ধূলি মধুময়।" এ তো কবিরই অন্তরের কথা, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মত কবি বলে উঠলেন "সঙ্গীতময় ধরার ধূলি।" বেদমন্ত্রের ছন্দে আবার তিনি শুনতে পেলেন "মধুময় এই পার্থিব ধূলি।"

জীবনের সায়াহ্নে বিদায় বেলায় কবি পৃথিবীকে শেষ প্রণাম জানিয়ে রাখছেন—

আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে

'বসুন্ধরা'র পৃথিবী-প্রেমের মধ্যে ছিল যৌবন সুলভ আবেগ ও উচ্ছ্বাস। 'পত্রপুট'এর 'পৃথিবী'তে আছে বৃদ্ধ জ্ঞানী স্থবিরের অনুভূতি।

এখানে বৃদ্ধ জ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর প্রকৃতি এবং তার সৃষ্টিতত্ত্বও অনুশীলন করেছেন। বহুদিনের সংসারের অভিজ্ঞতা কবির হয়েছে।

পৃথিবীর প্রকৃতির মধ্যে কবি আবিষ্কার করলেন "ললিতে কঠোরে" দুই বিপরীতধর্মী গুণ। "মহাবীর্যবতী" "বীরভোগ্যা" পৃথিবীর সম্বন্ধে কবির এ ধারণা কেন? বাস্তবজগতের ঘটনানিচয় অনুধাবন করে কবি যা দেখলেন, তার মধ্যে কোন নির্ধারিত রীতি বা নিয়ম-তান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা গেল না, যেন সবটাই খামখেয়ালিতে ভরা। পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে কেউ হাসছে কেউ কাঁদছে, কেউ উপহার পেয়েছে সম্পদের আশীর্বাদ কেউ পেয়েছে সর্বনাশের অভিশাপ। কত তরুণের জীবন প্রাণরসকে নিঠুরের মত লেহন করে তাদের মৃত্যু ঘটাচ্ছে, আবার কোথাও নূতন জীবনের প্রাণ রস দিয়ে সঞ্জীবিত করছে, কোন নিয়ম নেই। কখনও বা মানুষের "জীবন দোলায়িত করছে—" "দুঃসহ দ্বন্দ্বে"। "মহৎ জীবনে যার অধিকার" তেমন বীরের জীবনকে কখনও বা করেছে "দুঃসাধ্য।" পৃথিবীর ধ্বংসশীল রুদ্রের ক্ষমতা দেখে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তার "প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশ্যে" প্রণাম জানিয়েছেন কবি। ধনীর কাছে এই পৃথিবী "সুন্দরী অন্নপূর্ণা", দরিদ্রের কাছে এই পৃথিবী "অন্নরিক্তা ভীষণা।" সেই পৃথিবীর মাটি দিয়ে তিনি আপন কপালে একটি মঙ্গলতিলক আঁকতে চান এবং তাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানান কবি—

তবে দিও তোমার মাটির কৌটার একটি তিলক
আমার কপালে।
• • •
নির্মম পদপ্রান্তে আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

'মাটির পৃথিবী' 'মাটির ঘর' 'মানব সংসার' তাঁর একান্ত প্রিয়। মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে মাটির মানুষের দিকে তাকিয়ে কবির তৃপ্তির শেষ নেই, বিস্ময়ের অবধি নেই। ধৈর্যশালী বীর্যবান কবি মৃত্যুকে ভয় না করে, তার রহস্য

(পরবর্তী অংশ ৬৮ পৃষ্ঠায়)

একটি না-লেখা গল্প

(গল্প)

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাসি-হাসি মুখে মালতী এসে ঘরে ঢুকলো, বললে এই ছাখো গো, কোথা থেকে তোমার আবার চিঠি এসেছে একটা। লক্ষণ-টা শুভই দেখ্‌ছি, ব'লে চিঠিখানা টেবিলের ওপরে রেখে দিয়ে সে হাসিমুখেই বেরিয়ে গেলো।

সতীনাথ কলম নিয়েই ব'সেছিলো, একটা নতুন গল্পে হাত দিয়েছে সবে। লেখাটা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে দিতে পারলে কিছুটা আর্থিক সুবিধা হয়। একটু আগেই মালতী টেবিলের উপরে চা দিয়ে গিয়েছিলো, তাড়াতাড়ি চিঠিটা নিতে গিয়ে খানিকটা চা চল্‌কে প'ড়ে গেলো কার্ডটার ওপরে—কিছুটা লেখা মুছে মুছে গেলো, তাড়াতাড়ি কার্ডটা তুলে নিয়ে তার মধ্যে থেকেই কোনরকমে পাঠোদ্ধার করলো সতীনাথ। যা ব'লেছে মালতী, শুভ লক্ষণই বটে! 'অরুণাচল' পত্রিকার সম্পাদক লেখা চেয়ে চিঠি লিখেছেন, নববর্ষ-সংখ্যা বের করছেন তিনি, এক সপ্তাহের মধ্যেই সতীনাথের একটা গল্প চাই তাঁর।

মনে মনে হাস্‌লো সতীনাথ, কে বলে তার প্রতিভা ছাই চাপা রয়েছে? এই তো তার ডাক প'ড়েছে 'অরুণাচল' পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যায়, তারো আগে ডাক এসেছে 'অভিযান' থেকে। সাহিত্য জগতে এ দুটি পত্রিকারই যথেষ্ট নাম আছে। আর সব থেকে বড়ো কথা, এই দুটি জায়গায় লিখ্‌তে পারলে অন্ততঃ গোটা ষাটেক্ টাকা তার আস্‌বেই। খানিকটা নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ততা। সাম্প্রতিক অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের সমুদ্রে এ-চিঠিখানাকে বেশ ছোট-খাটো একটা দ্বীপের মতো মনে হোল তার।

সেই সঙ্গে সকালের এই আলোটাকেও বড়ো প্রসন্ন মনে হোল সতীনাথের। একটা গান যেন গুন্ গুন্ ক'রে এলো এমন সময়ে বাইরের দরোজায় হঠাৎ সজোরে কড়া ন'ড়ে উঠ্‌লো।

সতীনাথ নিজে গিয়েই দরোজা খুলে দিলে। একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিলো। বছর ২৩।২৪ বয়েস হবে। নমস্কার ক'রে বললে, আমি এই পাড়াতেই থাকি; আমার নাম জয়ন্ত সেন, বিশেষ দরকারে আপনার কাছে একবার এসেছিলাম!

সতীনাথ বললে, বেশ তো, ভিতরে আসুন। ছেলেটি তার সংগে ভিতরে এসে ঢুকলো। ঘরের এক কোণে একটা হাতল ভাঙা চেয়ার বসানো ছিলো, সেটাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে এসে বেশ আরাম ক'রে বস্‌লো ছেলেটি। তারপরে সতীনাথের মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, আপনি প্রায় ছ'মাস হোল এ-পাড়ায় এসেছেন অথচ আজো আলাপ করতে পারিনি! কতো দিন ভেবেছি একদিন এসে আপনার সংগে কথাবার্তা ব'লে যাবো, পাড়ার মধ্যে আপনার মতো গুণী লোককে পাওয়া একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

একটু হেসে সতীনাথ বললে, আমি সামান্য লোক, ও সব কথা থাক্, আপনার কি দরকার বলুন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে সেই কথা বলবার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি জানেন না বোধ হয়, এই পাড়াতেই 'অরুণকণা পাঠাগার' ব'লে আমাদের একটা লাইব্রেরী আছে। আমরা ঠিক ক'রেছি সেই পাঠাগারের পক্ষ থেকে আগামী ২৫শে বৈশাখ উপলক্ষে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করবো। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার পাণ্ডিত্যের কথা আমরা জানি, তাই আপনার কাছ থেকে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করি।

সতীনাথ বললে, ও-সব কথা ব'লে আর লজ্জা দেবেন না—সাহিত্য ভালোবাসি সুতরাং সামান্য কিছু পড়াশুনা করতেই হয়, কি করতে হবে বলুন?

মানে আমরা ঐ দিন একটা গানের আসরের ব্যবস্থা করছি স্যার! মাঝে মাঝে গান থাকবে, আর তার মধ্যে মধ্যে কথা গেঁথে দিয়ে একটি চমৎকার ঘটনাটা গোছের অনুষ্ঠান করতে চাই, তা আপনি দয়া ক'রে সেটা আমাদের একটু লিখে দেবেন।

সতীনাথ প্রবন্ধে গুন্‌লো এবারে, বললে, আমাকে ক্ষমা করবেন, প্রথমতঃ ও সব লেখা আমার অভ্যাস নেই, দ্বিতীয়তঃ যা আপনাদের আইডিয়া, তা করতে বেশ সময় লাগ্‌বে! তৃতীয়তঃ আমার নিজের হাতে একেবারে সময় নেই—এইমাত্র একজন সম্পাদক গল্পের জন্যে চিঠি লিখেছেন, তাঁকে নতুন গল্প লিখে দিতেই হবে, এ ছাড়া আরো লেখার তরমাস তো আছেই!

জয়ন্ত সেন হাত জোড় ক'রে বললে, এটুকু আপনাকে দয়া করতেই হবে স্যার, আপনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই, কতোক্ষণ আর লাগ্‌বে আমি না হয় রোজ এসে আপনার সঙ্গে বস্‌বো, আপনি ডিক্টেট্ করবেন আমি লিখে নেবো। এক সপ্তাহের মধ্যেই হ'য়ে যাবে।

—মাপ করবেন, আমার সে সময় ত নেই!

—এটুকু আপনাকে করতেই হবে স্যার! আপনারা যদি আমাদের এই সংস্কৃতি-মূলক কাজে উৎসাহ না দেন, তাহ'লে আর কার কাছ থেকে পাবো বলুন?

এবারে সতীনাথও হাত জোড় করলে, বললে, আমাকে ক্ষমা করুন—আমার একেবারে সময় নেই!

—সে সব কথা শুন্‌ছি না স্যার! কাল আমরা সকালেই আস্‌ছি, বই-টই নিয়ে একেবারে রেডী হ'য়ে আস্‌বো; আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। আচ্ছা, আজ চল্‌লুম স্যার! ব'লে নমস্কার ক'রে জয়ন্ত সেন চলে গেলো।

মহা বিপদে পড়লো সতীনাথ। এদিকে তার হাতে একেবারে সময় নেই, অন্যদিকে যে দায়িত্ব তাকে জয়ন্ত সেন নিতে বল্‌ছে, তার গুরুত্ব সতীনাথের কাছে কম নয়। এ সব কাজ তো অবহেলা ক'রে, যা-তা ভাবে শেষ করা চলে না; রীতিমতো প্রাণ দিয়ে খেটে তবে গ'ড়ে তুলতে হবে, অথচ তা করতে গেলে, সামনে যে দুটো গল্প লিখবে ব'লে ঠিক ক'রেছিলো সে, তার একটাও লেখা হবে না। আর না লেখা মানে পুরো আট-দশ টাকার ক্ষতি। অন্য দিকে এই সব তরুণ উৎসাহীদের এই ধরণের কাজ ক'রে দিয়ে এক অনন্ত প্রসাদ ছাড়া আর কোনো লাভই নেই, আর্থিক ক্ষতিটার কথাই বড়ো বেশী ক'রে সতীনাথের মনে বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো।

তবু তার মধ্যে এক সময়ে মনে হোল, এই সব সংস্কৃতি মূলক কাজে তাদের মতো মানুষ যদি এগিয়ে না যায়, তাহ'লে যাবেই বা কে? এ-তো তাদেরই কাজ, না হ'লে কবিগুরুর প্রতি অবিচারই করা হবে। তাঁকে জনসাধারণ যাতে সহজে গ্রহণ করতে পারে, তার পথ তো তাদের মতো মানুষেরই কেটে দিতে হবে। তাছাড়া আজকাল ছেলেদের মধ্যে এই যে সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ প্রতিদিন প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে, এটা দেশের পক্ষে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ!

বিকেলের দিকে রাস্তার মোড়ে আবার সেই জয়ন্ত সেনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। সঙ্গে আরো দু'তিনটি ছেলে, অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে এগিয়ে এসে নমস্কার করলো, তারা। জয়ন্ত সেন বললে, কাল কিন্তু যাচ্ছি স্যার সকালে, দয়া করে আমাদের কথাটা ভুলবেন না।

সতীনাথ হাস্‌লো একটু, বললে, আস্‌বেন, তবে আমি দু তিন দিনের মধ্যেই শেষ ক'রে দিতে চাই, বুঝতেই তো পারছেন, আমার হাতে একেবারে সময় নেই!

—বেশ তো, তাই দেবেন, জয়ন্ত সেন হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো, আমরাও আপনার বেশী সময় নিতে চাই না স্যার, তবে ব্যাপার হচ্ছে, এ সব তো আর যা তা লোক দিয়ে হবে না, আপনাদের মতো গুণী এবং জ্ঞানী না হ'লে—

মাঝপথে সতীনাথ তাকে থামিয়ে দিয়ে হেসে নমস্কার ক'রে চ'লে এসেছে। ছেলেটি কথায় খুব পটু। যাক্ গিয়ে, যে পাড়ায় সে বাস করছে, তার প্রতি অতি অবশ্যই তার একটা কর্তব্য আছে, কিছু কাজ তার নিশ্চয়ই করা উচিত।

পরের দিন সকালেই জয়ন্ত সেন অনেকগুলি বই নিয়ে এসে হাজির হোল। সঙ্গে আর একটি ছেলেও এসেছে। সতীনাথ মোটামুটি নৃত্য-নাট্যটির একটা খস্‌ড়া করে ফেল্‌লে। তারপরে কোথায় কোন গান বস্‌বে, কোথায় কোন গানটি দিলে ভালো বানাবে এই সব ঠিক করতেই

পুরো তিন দিন কেটে গেলো। জয়ন্ত সেন বললে, আমাদের রিহার্সালটা আরম্ভ হলে আপনাকে কিন্তু মাঝে মাঝে একটু কষ্ট ক'রে যেতে হবে স্যার—একটু ডিরেক্‌সন দেবেন আপনি। কয়েকটি ভালো মেয়ে পেয়েছি, চমৎকার গান গায় তারা তাছাড়া এ বছরে আরো দুটি মেয়ে ও এসেছে আমাদের ক্লাবে, খুব সুন্দর নাচতে পারে—আর চেহারাও চমৎকার!

সতীনাথ হেসে বললে অতোটা আমার সময় হবে না—তবে নৃত্য-নাট্যের পাণ্ডুলিপি আমি মোটামুটি আপনাদের তৈরী ক'রে দেবো, তার থেকেই আপনারা বাকীটা ক'রে নেবেন।

—না না স্যার, সে আমরা কিছুতেই শুনবো না, জয়ন্ত সেনের সংগে এবারে যে ছেলেটি এসেছিলো সে হাত জোড় করলো, আপনাকে—মানে আপনাকে যেতেই হবে—'না' বললে কিছুতেই শুনবো না, আমরা এসে আপনাকে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবো।

সতীনাথ হেসে বললে, আচ্ছা সে দেখা যাবে, এখন বাকীটা লিখে নিন্‌তো! ব'লে সতীনাথ গীতবিতানের দ্বিতীয়খণ্ড খুলে উপযুক্ত একটি গান খুঁজতে লাগলো!

যেটা দু তিন দিনের মধ্যে সতীনাথ শেষ ক'রে দেবে ব'লে ভেবেছিলো, দেখা গেলো, সর্বাংগসুন্দরভাবে সেটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পুরো বারো দিন লাগলো। এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপিটা আবার ভালো ক'রে প'ড়ে দেখলো সে, এইবার ঠিক হ'য়েছে। মাঝে গানে সংলাপে ঘণ্টা দুয়েকের একটি চমৎকার নৃত্য-নাট্য বলা যায়। কবিগুরুর জীবনকে কেন্দ্র ক'রে অপূর্ব একটি রচনা! মনটা সৃষ্টির আনন্দে ভ'রে উঠ্‌লো, আর কিছু নাহোক সে একটা নতুন জিনিষ রচনা করলো—কেবল গল্প আর কবিতা নয়—নৃত্যনাট্যেও শেষ পর্য্যন্ত তার হাত আছে দেখা যাচ্ছে!

জয়ন্ত সেন এবং তার বন্ধুরা অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে চ'লে গেলো।

কিন্তু এদিকে যা সর্বনাশ হ'বার তাই হ'য়েছে। এখন সম্পাদকের লেখা তো হয় নি; 'অরুণাচল' পত্রিকার লেখা দেবারো সময় কবে শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সম্পাদক মশাই দুবার লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে দুবারই তাদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছিলো। আরো ২ দিন সময় চেয়ে নিয়েছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতেও পারে নি। চারদিকে কেমন যেন একটা অতল অন্ধকারের আভাস দেখতে পেলো সে! এই দুদিনে ৬০৲ টাকার মতো ক্ষতি হওয়া তার জীবনে যে কতোখানি মর্মান্তিক ঘটনা, তা সে শুধু নিজেই জানে। অথচ মজা এই যে, রবীন্দ্র জন্মোৎসবের এই দায়িত্ব নিয়ে সে যখন ব্যস্ত ছিলো, তখন এক মুহূর্তের জন্যেও একথা তার মনে হয়নি—একেবারে নিঃশেষে নিজেকে সে ওই কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পেরেছিল!

তারপরে দীর্ঘদিন কেটে গেছে। সুখে দুঃখে কোন রকমে দিন চ'লেছে সতীনাথের। রবীন্দ্র জন্মোৎসবের দিন ক্রমশঃ এগিয়েও আসছে, কিন্তু আশ্চর্য সেই যে জয়ন্ত সেনের দল তার কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে চ'লে গেলো তারপরে তো একদিনো এলো না! তারা ব'লেছিলে, রিহার্সালেও তাকে নিয়ে যাবে, কিছু কিছু ডিরেক্‌সনও দিতে হবে তাকে, সে অবশ্য মুখে আপত্তি জানিয়েছিলো, কিন্তু তাই বলে সতীনাথের একেবারে যে যাবার ইচ্ছে ছিলো না, তাও তো নয়। হাজার হোক্ নিজের লেখা নৃত্য-নাট্যের অভিনয় বা রিহার্সাল দেখতে কার না ইচ্ছে করে? তারা এসে জোর করলে কি আর সতীনাথের কোনো আপত্তি টিক্‌তো?

আশ্চর্য এই, পথে ঘাটেও আর দেখা হয় না জয়ন্ত সেনের সংগে। তবু ভাব্‌লে, হয়তো তারা খুব ব্যস্ত আছে, সময় পাচ্ছে না, তাকে খবর দিতে, যথা সময়ে ঠিকই আসবে তারা!

তারপরে নানা কাজের ভীড়ে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেছে, তা সতীনাথের মনেও নেই!

হঠাৎ একদিন সতীনাথ অফিস থেকে বাড়ী ফিরে দেখলে, তার নামে ডাকে একখানি কার্ড এসেছে। আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ 'অরুণকণা' পাঠাগারের রবীন্দ্র জন্মোৎসব হবে, তারই মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্র!

হাসি পেলো সতীনাথের! আগামী বছরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব সম্ভবতঃ আষাঢ় পর্যন্ত প্রসারিত হবে, তারপরে অদূরকালে ২২শে বৈশাখ আর ২২শে শ্রাবণ এক হ'য়ে যাবে।

নির্দিষ্টদিনে সতীনাথ হলের সামনে এসে উপস্থিত হোল। একটা বিশেষ কাজে আটকে যাওয়ায় আসতে দেরী হ'য়ে গিয়েছিলো, এসে দেখে, উৎসব আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

গেটের সামনে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাকে কার্ড দেখাতেই বললে, যান, ভিতরে লোক আছে বসিয়ে দেবে আপনাকে।

হলের ভিতরে এসে দেখে, সমস্ত হল ভরে গেছে, কোথাও তিলধারণের স্থান নেই, একটা স্বেচ্ছাসেবক এসে শেষের দিকে কোনরকমে একটা চেয়ারের ব্যবস্থা ক'রে দিলে। এদিক ওদিক চেয়ে কোথাও জয়ন্তসেন বা তাদের অন্য কোন সংগীকে দেখতে পেলোনা সতীনাথ। চুপচাপ এসে চেয়ারটায় বসলো সে।

কিন্তু একী ব্যাপার? সে যে নৃত্যনাট্য লিখে দিয়েছিলো তার সংগে এর তো কোনো মিল নেই! সম্পূর্ণ অন্য গান—অন্য সংলাপ! এ সব কি কাণ্ড?

খুব মন দিয়ে প্রায় আধঘণ্টা ব'সে দেখলো সতীনাথ, তারপরে সবই বুঝতে পারলো। তার লেখাটীকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হ'য়েছে!

আস্তে সকলের অগোচরে হল থেকে বেরিয়ে এলো সে, মঞ্চে তখন একটী অবিরাম লাস্য-নৃত্য চ'লেছে!

দরজার কাছে সেই কিশোর ছেলেটী তখনও দাঁড়িয়ে ছিলো, সতীনাথ তার কাছে এসে বললে, আপনাদের জয়ন্তবাবুর সংগে কি এখন একবার দেখা হ'তে পারে?

ছেলেটী একটু ইতঃস্ততঃ করলো; তারপরে বললে, এখন তো 'শো' চলছে কিনা, তিনি খুব ব্যস্ত র'য়েছেন, আপনার কি দরকার বলুন, আমি জানিয়ে দেবো।

—না জানাতে হবে না, আপনি গিয়ে দয়াক'রে সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে একবার ডাকুন, বলুন, সতীনাথ রায় ডাকছেন, বিশেষ দরকার।

ছেলেটী একটু অপ্রসন্নচিত্তেই ভিতরে চ'লে গেলো। একটু পরে ফিরে এসে বললে, আপনি দাঁড়ান উনি এখুনি আসছেন।

মিনিট পনেরো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর জয়ন্ত সেন এসে হাজির হোল, বললে, একি স্যার। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?

রাগে দুঃখে সতীনাথের গলা যেন বন্ধ হ'য়ে এলো, তবু কোনরকমে সামলে নিয়ে বললে, এভাবে আমাকে আপনারা অপমান করবেন, একথা কখনো ভাবতে পারিনি—যাক, যা হ'বার হ'য়েছে, আমার পাণ্ডুলিপিটা আমাকে এখনই ফেরৎ দিয়ে দিন!

একটু মুখটা কাঁচুমাচু করলো জয়ন্ত সেন, তারপরে বললে, অনেক কথা স্যার, আপনাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো কিন্তু সময়াভাবে সেটা আর হ'য়ে ওঠেনি, মানে আপনার লেখাটা আমাদের সেক্রেটারীর ঠিক পছন্দ হয় নি, তাই নিজেই তিনি এর্টা লিখে দিয়েছেন! অবশ্য আগেই আপনাকে—

কথাটা থামিয়ে দিয়ে সতীনাথ কোনরকমে বললে, বেশ ক'রেছেন, আমার পাণ্ডুলিপিটা দয়া ক'রে এখনই ফেরৎ দিন, গলাটা তার কেঁপে উঠ্‌লো যেন!

এতোক্ষণ সেই কিশোর ছেলেটি চুপচাপ তাদের কথা শুনছিলো, সে এবারে সামনের দিকে এগিয়ে এসে বললে, বাঃরে!—সে লেখা ফেরৎ পাবেন কি ক'রে? সেক্রেটারী মশাই তো সে লেখা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

পায়ের তলা থেকে মুহূর্তের মধ্যে যেন মাটি স'রে গেলো সতীনাথের। জয়ন্ত সেন তাকে এর পরেও কি যেন বলতে এলো, কিন্তু কিছুই তার কানে গেলোনা, তেমনি চুপচাপ নীরবেই গেট পার হ'য়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো সে; তারপরে কি ভাবে যে ট্রাম লাইন পার হ'য়ে আচ্ছন্নের মতো বাড়ী এসে পৌঁছেছিলো, তাও আজ আর মনে নেই!

প্রায় সমস্ত রাতটাই সে বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করলো। ঘুম এলোনা। এমন দুঃখ জীবনে সত্যিই সে কম পেয়েছে! এদের কী করা উচিত কি শাস্তি দিতে পারলে তবে এ সব মানুষের শিক্ষা হ'তে পারে? মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলতে লাগলো সতীনাথের।

সকালে উঠে মালতী বললে, একী তোমার শরীর খারাপ হ'য়েছে নাকি?

না, একটু শুধু ম্লান হাসলো সতীনাথ, তারপরে বললে, ভালোই আছি।

এরপরে আরো কিছুদিন কেটে গেছে, পথে ঘাটে অনেকবারই দেখা হ'য়েছে জয়ন্ত সেনের সংগে। নমস্কারের বদলে অত্যন্ত বিরক্তমনে প্রতি নমস্কার করেছে সতীনাথ—সময়ে সময়ে তাকে দেখতে না—পাওয়ার ভানও করেছে সে! ছেলেগুলির উপরে আর বিন্দুতম স্নেহ বা প্রীতি নেই তার!

অবশেষে একটা কঠিন সংকল্পে এসে সতীনাথ স্থির হ'য়ে বস্‌লো। এই সব অর্বাচীন লোকের মুখোস খুলে দেওয়া উচিত। খুব কড়া ক'রে এই জয়ন্ত সেনকে নিয়ে সে একটা গল্প লিখবে। শ্লেষে বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে সমস্ত গল্পটা ঝক্‌মক্ করবে। দেশের লোক জান্‌বে এই সব জঘন্য চরিত্রের মানুষও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কিভাবে মুখ লুকিয়ে চুপচাপ ব'সে আছে, আর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কিভাবে অন্যলোকের স্বার্থকে পদদলিত ক'রে হাসিমুখে তারা এগিয়ে চ'লেছে।

সংকল্পটা মনে আসতে আপাটা যেন অনেক কম্‌লো সতীনাথের। লিখতেই হবে তাকে এই গল্প। বরং না লিখলেই সমাজের প্রতি সেটা অন্যায় করা হবে।

কিন্তু এমনই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে আজকাল সময় কাট্‌ছে সতীনাথের যে লেখাটা নিয়ে আর কিছুতেই বসা হচ্ছেনা। পথে যখনই জয়ন্ত সেনের সংগে তার দেখা হয়, তখনই মনে মনে সংকল্প করে আজ সে বস্‌বেই লেখাটা নিয়ে। আবার নানারকম কর্মের আবর্তে প'ড়ে সে চিন্তা হারিয়ে যায়, আর বসা হয় না, এই ভাবে প্রায় দুটো মাস পার হ'য়ে গেলো।

সেদিন সকালের দিকে, অফিস যাবার পথে হাজরা রোডের মোড়ে একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়েছিলো সতীনাথ। দেখলে কয়েকটী ছেলে সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে তার দিকে এগিয়ে আসছে। দলের মধ্যে একটী ছেলেকে সে চিনতে পারলে। ওই ছেলেটীই সেবারে জয়ন্ত সেনের সংগে তার বাড়ী পর পর কয়েক দিন গিয়ে ছিলো এবং ওই ছেলেটীই তাকে মোটরে ক'রে নিয়ে গিয়ে রিহার্সাল শোনাবার প্রস্তাব ক'রেছিলো, আজ কিন্তু সতীনাথকে সে চিনতে পারলোনা। উচ্চ কলহাস্যে গল্প করতে করতে তারই সামনে দিয়ে ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে গেলো।

ছেলেটী আরেকজনকে বলছিলো, ছেড়ে দে তোর রঞ্জা সেনের কথা, যা একটা বাবিশ চেহারা! ওর থেকে ছন্দা লাহিড়ী 'মাইস্'! আজকাল সে যা নাচছে, দেখলে হাঁ হ'য়ে থাকবি, আমি বলি কি, যদি কিছু টাকাও খসে, খসুক, তাকে বাগিয়ে নিয়ে আর তারপরে দেখিস এখন মাটীর পুজোয় কী রকম একখানা 'শ্রীমতী' ক'রে বেরিয়ে যায় সে!

সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠলো সতীনাথের, আর শুনতে ইচ্ছে করলো না-এরাই আজকাল রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক!

সারাটা দিন অফিসে সতীনাথ ভালো ক'রে মন দিয়ে কাজই করতে পারলো না। সন্ধ্যার পর একটা সাহিত্য সভা ছিলো, কোনরকমে দায়সারাভাবে সেখান থেকে ঘুরে এসে রাত্রে কলম নিয়ে বসলো সতীনাথ। আজ লিখতেই হবে তাকে এ গল্প। নির্মম হাতে নিরাবরণ ক'রে দেবে সে তাদের জীবনের এই বর্বরতাকে, সম্ভব হ'লে এই সব অর্বাচীন দলের বিরুদ্ধে সে রীতিমতো ভাবে আন্দোলন চালাবে। ঝাঁটিয়ে দূর ক'রে দেবে সে সমাজ থেকে এই সব আবর্জনাকে। সেই রাত্রেই কলম নিয়ে বসলো সতীনাথ।

সতীনাথকে লিখতে দেখে মালতীর মুখে চমৎকার একটা প্রসন্নতা ফুটে উঠলো। বললে, যা হোক, কলম নিয়ে ব'সেছো তা'হলে, তোমার রকম সকম দেখে আমি তো ভেবে ছিলুম লেখার পাঠ বুঝি বন্ধই ক'রে দিলে।

একটু করুণ হাসলো সতীনাথ, বললে, কি যে বলো, লেখা কি এতো সহজে বন্ধ করা যায়?

কিন্তু নাঃ, একটা লাইনও আসছে না, কিছুই লিখতে পারছেনা সতীনাথ—সমস্ত মাথা যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। লিখবার 'মুড'ই নেই এখন! আস্তে কলমটা বন্ধ ক'রে রেখে সতীনাথ উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকার বারান্দার উপরে চুপচাপ পায়চারী করলো অনেক ক্ষণ-তারপরে ঠিক করলে কাল ছুটি আছে, ভোরে উঠেই সে এ গল্পটা ধরবে।

পরের দিন সকালে আবার কাগজ কলম নিয়ে বসলো

সতীনাথ। আজ সে লিখবেই এ গল্পটাকে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে জনসাধারণকে যে কতোগুলি অবাঞ্ছিত মানুষ সংস্কৃতির নামে কি ভাবে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি ক'রে চ'লেছে দিনের পর দিন! দিনের পর দিন।

আর আশ্চর্য, আজ বলতে না বলতেই তর্ তর্ ক'রে লেখাটা স্রোতের মতো এগিয়ে চল্‌লো। বড় ভালো লাগছে তার এ গল্পটা লিখতে। একটানা প্রায় ঘণ্টা-খানেক লিখে চল্‌লো সে। তারপর এক সময়ে বিশ্রাম নেবার জন্যে বারান্দার ওপরে এসে দাঁড়ালো, গল্পটাকে যাতে সরস ক'রে তোলা যায় তারই চিন্তায় সে খানিক এদিকে ওদিকে পায়চারী করতে লাগ্‌লো—এমন সময়ে স্ত্রী মালতী চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌লো, বললে, চা দিয়ে গেলাম তোমার। বড়ো খুশী হ'য়েছে সে মনে মনে। অনেক দিন পরে আবার লিখতে ব'সেছে সতীনাথ।

'যাচ্ছি, ব'লে আগের মতোই পায়চারী করতে লাগলো সতীনাথ। আরো ঘণ্টা দুই টানা লিখতে পারলে গল্পটা আজই শেষ হ'য়ে যাবে মনে হচ্ছে—শেষ না ক'রে আর কোন কাজই সে করবে না।

একটু পরেই আবার ঘরে এসে ঢুকলো সতীনাথ কিন্তু ঢুকেই একেবারে পাথরের মতো নিশ্চল হ'য়ে রইলো, দেখ্‌লে, তার তিন বছরের ছোট ছেলে অঞ্জন্ তার বন্ধ করা কলমটা রীতিমতো ভাবে বাগিয়ে নিয়ে পিতার মতো গম্ভীরভাবে ব'সে কাগজের ওপরে রেখা টানবার চেষ্টা করছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চমৎকার একটা ছবি যেন ভেসে উঠলো সতীনাথের চোখের সামনে। হঠাৎই মনে হোল থাক্—এ লেখা না-ই বা লেখা হোল তার! যদি সুদূর ভবিষ্যতে তার ছেলেও কোন দিন লেখক হয় (সাধারণতঃ তা হয় না—তবু সতীনাথের একথা ভাবতে বড়ো ভালো লাগ্‌লো।) তাহ'লে এ ভার সে-ই নেবে। কি হবে এখন কতোগুলি জ্বালাময়ী তিক্তরস পরিবেশন করে!—আর একথা তো ঠিকই, যাদের মধ্যে ফাঁকি আছে, শূন্যতা আছে তারা কি সেই মহাকালের দরবারে টিকে থাকতে পারবে কোন দিন? মাঝখান থেকে সে খানিকটা বিরক্তির সৃষ্টি ক'রে মানুষের মনের আনন্দকে কেন নষ্ট ক'রে দেবে? ঐ ছেলেগুলি আজ ভুল ক'রেছে বটে, কিন্তু বয়েস হ'লে বুদ্ধি হ'লে সবই বুঝতে পারবে তারা, তখন এই তরলতা থেকে মুক্তি হবে তাদের। থাক্—এ সংস্কারের কাজ আগামী যুগের ভাবী লেখকের জন্যেই তোলা থাক।

কিন্তু মালতী ততক্ষণে হাঁ হাঁ ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছে—বললে হ্যাঁরে খোকা আবার তুই জ্বালাতে এসেছিস্ এখানে?—একে লেখা হয় না, তবু যদি বা আজ ব'সেছিলেন, তাও তুই এসে ব'সেছিস্ তার মধ্যে? লেখাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্মী—ওঠ্ বল্‌ছি পাজী ছেলে! ব'লেই মালতী তার হাত থেকে কলমটা কেড়ে নিতে গেলো—

—আহা-হা! গাল দিও না! সতীনাথ হেসে উঠ্‌লো, বললে, ভুল করলে মালতী, লেখা লক্ষ্মী নয়—উনি সরস্বতী, আর জানোই তো, মা সরস্বতীর সংগে মা লক্ষ্মীর চিরকালের বিবাদ আছে! ও লেখা আমার আর হবে না। থাক্—কলমটা ওর হাতেই থাক্!

বিস্মিত বিমূঢ় মালতী শুধু স্বামীর দিকে বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইলো কোন কথা বলতে পারলো না।

একটী আধুনিক কবিতার ভূমিকা

শ্রীমুখ কান্তি চন্দ

মৈত্রী বৈরী সেন শহরতলীর কোনও এক কলেজের অধ্যাপক—ইংরাজী সাহিত্যের। তাঁর খ্যাতি অধ্যাপক হিসাবে যতটা না, বাংলার রবীন্দ্রোত্তর যুগের রোমান্টিক প্রগতিশীল কবি হিসাবে খ্যাতি অনেক বেশী। বোধ হয় সেই জন্য তাঁর ঐ অধ্যাপক পদটী, নচেৎ হয়ত কোন ইস্কুলের মাষ্টারী করেই জীবন কাটত। যাক্ সে কথা।

অভিনন্দন চট্টোপাধ্যায় সেই কলেজের বিজ্ঞানের চতুর্থ বার্ষিক ছাত্র। কবি হওয়ার বাসনা তার প্রবল। অন্ততঃ ছাত্রমহলে সে তাই বলে খ্যাত। কলেজ ম্যাগাজীনেও লেখা ওঠে। আবার সেই মফঃস্বল শহরটীতে প্রায় প্রত্যেকটী সাহিত্য-মহলে একটু ভাবগম্ভীর চালে চলে। পৃথিবীর মেঘলোকের মত, সে তার চারপাশে একটী আত্মসচেতনতার ধোঁয়াটে আবরণ টেনে দিয়েছে। চুড়িদার হাতার খদ্দরের বাদামী রঙের পাঞ্জাবী, সঙ্গে মিহি কাপড়ের ঢোলা পাজামা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটী। ক্রীম মাখাতে চুলে একটী তেলহীন মসৃণ ভাব। সে কুন্তলধাম সে রোজ প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে প্রসাধন করে। তারপরে অতি সুনিপুণ ভাবে কেশরাজীকে অবিন্যস্ত করে দেয়। মুখে মোটা একটী চুরট। হাতে একটী বড় ফ্লাট ফাইল।

সে কবিতা লিখছে।

সামনে চার পাঁচটী পুরাণো ইংরাজী কবিতার বই। পাশে এ. টি. ঘোষের একটী ইংরাজী-বাঙ্গলা অভিধান। একটী 'চলন্তিকা'। আর ছড়ানো আছে আধুনিক বাংলা কবিদের কটী বই, সমস্ত মন্থন করে একটী কবিতা দাঁড় করল। তার নকল আমরা নীচে দিলুম :—

ছন্দপতন

আধো আলোয় চাঁদ হাসছে
আর হাসছে একটা সদ্য ফোটা কনক চাঁপা।
বালি সমুদ্রের সৈকতে দাঁড়িয়ে
আর কাঁদছে ক্লিওপেট্রা।
আমার নৈর্ব্যক্তিক মন মহাজিজ্ঞাসায়
গুমরে ওঠে, ধূপ ছায়ার মাধুরী আর
নীল কণ্ঠের হলাহল উপছে পড়ে
আমার অবাঙ মানসে।
মোনালিসা হাসছে, হাসছে অন্তরালে
মুখে তার সকল বিদ্রূপেরা
মন তার উধাও হংস বলাকার পিছে
দূরে মহাশূন্যের শেষ প্রান্তরে।
হায় ক্লিওপেট্রা, হায় মোনালিসা,
তোমরা সে জান না কি বেদনা,
আমার এই জীবনের পাত্রর পাতুলিপিতে,
একি! রাস্তায় কেন কাঁদছে নটর-চাপা।
ছিঁড়ে ফেলা।

কবি অভিনন্দন সযত্নে প্যাড থেকে কবিতাটি ছিঁড়ল। তারপরে পকেটে পুরল। চুরুটটায় টান দিয়ে দেখল যে আর ধোঁয়া নেই। তখন সে ব্লেড দিয়ে কেটে পকেটে ফেলল। হাতঘড়িতে দেখল তখন সাড়ে বারটা। দুটো পিরিয়ড চলে গেছে। অভ্যাসমত চুল আঁচড়ালো। তারপরে সেগুলো আস্তেআস্তে এলোমেলো করতে লাগল।

অধ্যাপকদের কক্ষের নির্জন প্রান্তে একটা চেয়ারে বসে আছেন কবি মৈত্রীবৈরী সেন। বাঁহাতের বেঞ্জামোনাল চশমার কাচ দুটি ধূসর শেলাইয়ের টুকরো দিয়ে স্পর্শ করলেন (মানে পরিষ্কার করলেন)। আলতো ভাবে কানের ফাঁকে রেখে দিলেন। তারপরে ঠোঁটদুটী আধইঞ্চির মতো ফাঁক করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তুললেন। অংকের অধ্যাপক ভবতারণ মল্লিক পাশের চেয়ারে বসে কলকুলাসের বহু পুরাণ একটী খাতা খুলে দেখছিলেন।

এক পকেটের একটী কৌটা থেকে গোটা দুই পান মুখে পুরে অন্য একটী কৌটা থেকে খানিকটা দোক্তা মুখে ফেললেন। এমন সময়ে বেল বেজে উঠল। তিনি শশব্যস্ত হয়ে কখানা বই নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে গমনোদ্যত হলেন। তাঁর পায়ের সামনে মিহি কাপড়ের খোঁট পড়ল। কাপড়ের মালিক মৈত্রীবৈরী সেন তখন জানালা দিয়ে তন্ময় হয়ে পাশের বাড়ীর ছাদে অলস মধ্যাহ্নের কি যেন দেখছিলেন। ভবতারণ বাবু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লেন—ও মৈত্রী বাবু, আপনার কৌচাটা একটু সামলে নিন্ দেখুন তো আর্টুহলেই মাড়িয়ে ছিলাম আর কি!

তিনি ব্যস্ত পদে অদৃশ্য হলেন। কবি মৈত্রীবৈরী তখন ভ্রূজোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত করে তার গমন পথের দিকে চাইলেন মাত্র। কারণ কাপড় তিনি অমন করেই পরেন। পর মুহূর্তেই সেই জানালার দিকে নজর দিলেন। দৃষ্টিটা একটু প্রখর করলেন। চশমা খুলে হাতে নিয়ে পুনরায় তীক্ষ্ণ নজরে দেখলেন। বোধ হয় বস্ত্রবস্ত্র স্থানচ্যুত। তিনি বিরক্তি ভরে বললেন—যত সব ইডিয়ট। বসন্তের দাগে ক্ষতবিক্ষত মুখখানিতে হাত বুলাতে লাগলেন।

এমন সময় কবি অভিনন্দন উদিত হল। দেখলে মনে হয় অভিনন্দন অল্প একটু খোঁড়া। প্রকৃত তা নয়, ওটি তার বহু কষ্টলব্ধ অভ্যাস। সে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। মৈত্রীবৈরীকে হাত তুলে ছোট একটী নমস্কার জানাল। স্বনামধ্যাত কবির মুখটী একটু প্রসন্ন হল আর গ্রীবাটী ঘুরে উঠল একটু। চোখের ইঙ্গিতে অভিনন্দনকে বসতে বলে, বল্লেন—নোতুন?

—হুঁ' স্যর, অভিনন্দন চুলগুলোকে আরেকটু কাঁক করে দিল।

—ক্যামোন?

—এই যে স্যর, অভিনন্দনের কবিতাটী হস্তান্তরিত হল।

তিনি হাতের এজরা পাউণ্ডের বইখানা সরিয়ে পাণ্ডুলিপিটী খুলে ধরলেন। বেশ মন দিয়ে পড়ে, অভিনন্দনের আধকৌটা চোখের পরে তাঁর ছোট চোখদুটী স্থাপন করলেন।

সুরবিরালিষ্টিক, বক্রমুখের মৃদু কাকলি শুঞ্জিত হল;

তোমার এখনও সুরবিরালিজেমের দিকে মন উধাও করে দেওয়া ঠিক নয়। ক্যানোনা তোমাদের মত বয়সে চেতনা উল্কা বেগে ছুটে যাবে। সাবলীল কলম ছুটবে।

জীবনের ক্ষুব্ধ মরুভূমে
বিষাদের ছায়া নামে
কালো ঘন পীচ কালো
চেতনারে করবে আঁকালো

হাঁ, কি যেন বলছিলাম—তোমাদের চোখে থাকবে রোমান্টিসিজমের মায়াঞ্জন। আকাশে বাতাসে আর চেতনার মধ্যে থাকবে মেঘদূতের গতি, স্বপ্নে থাকবে ক্রিসানথিমম-এর রঙ। এই কবিতাটিতে যেমন হবে—

আমার নৈর্ব্যক্তিক মন মহাজিজ্ঞাসায়
গুমরে ওঠে—
না এটী হবে না, হবে—আমি ইথারের পরশে
হয়েছি মুখর
তবু কণ্ঠে আমার বাসুকির গান—

আর অন্যান্যগুলি ঠিক করতে গেলে কবিতাটায় তোমার কিছু থাকে না। তাই। হাঁ, 'মোনালিসা'র বদলে ভেনাস'টী আরো অর্থব্যঞ্জক। কবিতাটী ওভাবে লিখো, বুঝলে।

আচ্ছা, স্যর, অভিনন্দনের মাথাটী ঈষৎ হিল্লোলিত হয়।

অভিনন্দনের সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। কারণ অভিনন্দনের কবিমনটী বড় চঞ্চল। বিশেষ করে কবি মৈত্রীবৈরী সেনের সান্নিধ্যে এসে আরো চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপরে চৈষ্ট যখন এলো তখন পাঠ্যপুস্তকের দিকে তাকিয়ে দেখে সব ফাঁকা। কোন্ চাপটার পড়ানো হয়েছে আর কোন্‌টা হয় নি, সেটা বার করা মহামুস্কিল। এতে তার মন মৈত্রী বৈরী সেনের প্রতি বিমুখ হল। তার কিছুদিন বাদে তার স্বপ্ন মানসীকে (মানে অনৈক গল্প-রসিকা সহপাঠিনী) নির্জন পার্কের কোণে একটী মধুর বিকালে স্বরচিত কবিতা আবেগভরে আবৃত্তি করে শোনাল মানসী আকস্মিক নাসিকা কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করল, কবিতাটীর মানে কি?

অভিনন্দন চমকে গেল। সেতার হৃদয়ের তারে অজানাপুরের অচেনা রাগিণীর সুরের ঝংকার লাগে। সে

সাদা কাগজের বুকে মুক্তার হরপে লিপিবদ্ধ করে। মানে সে জানবে কি করে? বড়-বেরসিক! তবু অভিনন্দন প্রবোধ দেওয়ার জন্যে একটা মানে তৈরী করল। কিন্তু মানসী বুঝল কিনা বোঝা গেল না। সে শুধু বলল—মৈত্রী বৈরী সেনের কাছে জিজ্ঞাসা করো।

অভিনন্দন এতে চুপসে গেল। কদিন বাদে আবার সঙ্গীত হল। ক্রোধে অভিনন্দন আর মৈত্রী বৈরী সেনের কাছে গেল না। কবিতা লেখায় কেন জানি তার ভাঁটা পড়ে গেল। শুধু মনে না, তার পোষাক-পরিচ্ছদেও পরিবর্তন হল। সে এখন হাওয়াই সার্ট আর বুলপ্যান্ট পরে। মৈত্রীবৈরী সেন একটু মনক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু মুখে প্রকাশ করলেন না। একদিন অভিনন্দন চট্টোপাধ্যায় তার কাছে একটি কবিতা হাজির করল:

মেঘ মুক্তি

কোন মহাজন-তরঙ্গ মাঝে
লীন হয়ে আছ, হে মোর সর্বহী।
তোমার সমাধি পাশে আমার বোনা
রোদ্রোজ্জ্বল ঝরে পড়ে রক্তিম লাজে।
উইলো আর মাধবীলতা
তোমারে রেখেছে ঘিরে উষ্ণ আলিঙ্গনে।
ওগো মোর প্রেয়সী
আমার হৃদয়ের মন্থন আঙিনায়
তোমার ইজিপ্‌শিয়ান কার্পাসের মত
কেন গো গোপন অভিসার,
আর কেন এত শূন্য মোর হৃদয়
সাহারার বালুরাশির মত।
কেন গো আমার মন উধাও উক্রেনের শ্যাম সমারোহে।
কখনও গ্রীনল্যাণ্ডের তুষার-স্তব্ধ
ক্লান্তি আসে গো নামি।

ওগো মোর অজানা
খুঁজিনু তোমায় সেন্টপল গীর্জার চূড়ার শীর্ষে
আর আমাজনের অস্পর্শাস্পৃষ্টা অরণ্যে
ওয়েস্টমোলার চারণ ভূমি ছেড়ে
কিউবার ইক্ষুক্ষেতে
হাভানার কচি তামাকের বনে।
তবু হায়, আমার ঘর্মাক্ত ছায়া
শুকায়েছে বাইবেল নীলাম্বুতে
আর পপোকেটা প্যাটেলের
গগনস্পর্শী শীর্ষে।
আমি নীল নভে পক্ষ মেলি
গাঙ চীলের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখি
বিশ্বের কন্দরে কন্দরে।
আমার আর্তনাদে পীত সাগরের
ঢেউ স্তব্ধ হয়, শিশুরা ভুলে যায় ক্রন্দন।
উষ্ণ আলিঙ্গন হতে খসে যায়
প্রেয়সীর বাহুলতা।
আর তুমি মোরে ফেরাবে
ক্লান্ত করি ছিন্ন-পাল, ভগ্ন-হাল
তরীর মত টাইফুণ মহিতে
প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে।
ওগো লবঙ্গলতা, ফিরে চাও,
জনারণ্যের মায়া ছাড়ো
আমারে বাহু পাশে বাঁধো
তোমার সমাধি পাশে-
আর কতদূর, বলো আর কত দেরী।
মৃত্যুকীটেরা দংশিছে আমার
হৃদপিণ্ডের জঠরে কোটরে।
ফিরে তাকাও, আমারে দাও
তোমার শ্বেত-শুভ্র-মোহমুক্তি।

মৈত্রীবৈরী সেন পড়ে মুখ তুলে চাইলেন। চোখে তাঁর অগ্নি স্ফুলিংগ, যেন শিব মদন ভস্ম করবেন। মনে হল জানালার পাশ থেকে কতগুলো মুখ যেন সরে গেল। কবি মৈত্রীবৈরীর দৃষ্টি গেলেও মন তাঁর অভিনন্দনের দিকে। সাধনার বীণার একটি সরু তার যেন ঘা লেগে ছিঁড়ে গেল। তিনি অভিনন্দনকে পরুষকণ্ঠে বললেন, এটা কি লিখেছ, এর কোন মানে হয়? দাঁত-ভাঙ্গা শব্দ-চয়ন আর ভূগোলের পাতা থেকে টুকলেই কি তা কবিতা হয়? এর না আছে কোন ভাব, না আছে কোন ব্যঞ্জনা!

অ্যাব্সলিউটলি অবস্‌কিওর আর সেলফ-কন্‌ট্রাডিকটরি ওয়ার্ডসের কমপাইলেশন। তোমাকে এতদিন ধরে কি কনটেন্‌ট আর ফর্ম শেখালাম? তার নমুনা কি এই? তুমি আমার মান ইজ্জৎ, আশা-ভরসা সমস্ত জলাঞ্জলি দিলে। কি হবে তোমাকে দিয়ে বলতে পার? কি চুপ করে রইলে কানো?

অভিনন্দন তবুও নিরুত্তর।

—কবিতার প্রাণ হচ্ছে রিদ্‌ম—গোলা ছুঁড়ছেন যেন কবিবর, তোমার এই কবিতাতে কোথাও কি তার নাম গন্ধ আছে!

কেন গো, আমার মন উধাও উল্লেষের
শ্যাম সমারোহে।
কখনও কেন গ্রীন ল্যাণ্ডের তুষার শুভ্র
ক্লান্তি আনে গো নামি।

ওগো-ও-ও মোর অজানা-আ-আ—এখানে কোন্ রিদ্‌নটা প্রেজেন্ট? কমপ্লিটলি সেল্‌ফ-এন্ট্যাগনিস্টিক। বলো এর মানে কি হয়? জের চুপ করে রইলে, ইউ হোপলেস। বল এর মানে?

—তার মানে আমি জানি না স্যর।

—তুমি লিখলে, আর তার মানে কে জানবে?—আমি?

—হ্যাঁ স্যর—তার মানে আপনি জানেন।

—আমি জানি, ইডিয়ট। যাচ্ছে তাই বলে যাচ্ছ।

—না স্যর, আমি বলার কে। কারণ এর কবি আমি নই। এটি স্যর, আপনার 'মানবী ও পৃথিবীর' তৃতীয় সংস্করণের 'মোহ মুক্তি'র টু কপি।

—আমার কবিতার কথা আমার মনে নেই!

—রেফারেন্স আর ভূগোল কি আর মুখস্ত রাখা যায়?

—লাট আপ, নন্‌সেন্স, দেখি কোথায় আছে।

—এই যে স্যার, অভিনন্দন তার হাতের বইগুলি থেকে 'মানবী ও পৃথিবী'র নতুন কপি সামনে তুলে ধরল। আপনার ওই লাইনগুলো আমাদেরও স্ট্রাইক করেছে, আমরাও আণ্ডার লাইন করে রেখেছি। দেখুন স্যার।

ফণীর 'পরে মন্ত্রপূত ধূলা পড়ল। কবি মৈত্রীবৈরী সেন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। জানালার কাছ থেকে কতগুলি তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ ছুরির ফলার মতো মৈত্রীবৈরীর কানে প্রবেশ করল। অভিনন্দন চট্টোপাধ্যায় আর তার আধুনিক সঙ্গীরা বিদায় নিয়ে চলে এল। স্বনামধন্য কবি মৈত্রী বৈরী সেন লাইনকটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন। সেগুলো যেন মুখর বীণার তারের মত কাঁপছে।

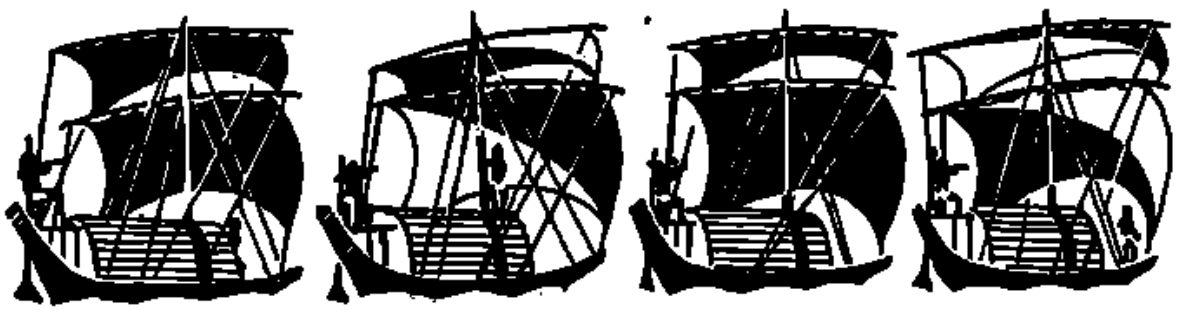

নামের প্রেম

শ্রীসরোজকুমার দাস

নরনারীর প্রেমের কথা সবাই শুনেছেন, পড়েছেন, এবং বোঝেন। সাহিত্যের পাতায় এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত। অনেক সাহিত্যিক তরল প্রেম নিয়ে কারবার করেন না (মানে করতে ভয় পান), নির্জলা ঘন (Concentrated) প্রেম না হ'লে তাঁদের ব্যবসা চলে না। বাজারে নাম খারাপ হবার ভয়!

আধুনিক গল্প-কবিতায় তাই আর যা' থাক্ বা না থাক্, প্রেম থাকবেই থাকবে! কবি-শিল্পী বলেন, প্রেম অবিনশ্বর,—মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ! বহু পাঠক ঐ অমূল্য বস্তুটি সাহিত্য থেকে সর্বাগ্রে সংগ্রহ করতে চান। যে গ্রন্থ তা দিতে অসমর্থ—সে যে একেবারে অবান্তর ও বাজেতম পুস্তক সে কথা ঠিক! প্রেমের ব্যাপার না থাকলে তাঁদের মতে উপন্যাসের অপমান! বর্তমানে প্রেমহীন নীরস রচনার রসিক অতি অল্পই দেখতে পাই।

নারী-পুরুষের প্রেমের ক্ষেত্রে পরস্পরের রূপ-সৌন্দর্যের অন্তরালে নামের প্রেম প্রচ্ছন্ন থাকে। কোন কিছুকে বিশেষিত করাই হচ্ছে নাম। নাম সৌন্দর্যের বাহক ও ধারক। নায়ক-নায়িকা যে কেবলমাত্র দয়িতা বা দয়িতের রূপলাবণ্য, গুণগরিমা নিয়ে স্বপ্নের মায়াজাল বোনে তা নয়, নামের বিচিত্র মোহও তাদের রক্তিম কামনার রাঙা গোলাপ ফোটাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। শয়নে,-স্বপনে, জাগরণে নাম মনের কোণে গানের কলির মত অবিরত গুণ গুণ করে ফেরে, অকবিকে কবিতার রসদ জোগায়। অপরিচিতা পথচারিণীর নাম জানতে ইচ্ছা জাগে, লোভ হয় কোন নাম দিয়ে তাকে স্বতন্ত্র করে' রাখতে। এমন কি নবপরিণীতাকে নতুন নাম করণে ভূষিত করতে কী আকাশ-পাতাল না ভাবতে হয়! কত আবেগ, কত প্রেম বন্যাধারার মত সব সংযম ভাসিয়ে দেয়! বাগদত্তা বধূটির নাম জানতে মনপ্রাণ কী করুণ আকুলতাই না প্রকাশ করে—এর জন্য কত ছলকলার যে প্রয়োজন হয়।

ক্ষণেক্ষণে শ্রীকান্তের কমললতাকে ছন্নছাড়া মনের মেয়ে ব'লে বোধ হয়। প্রথম দর্শনে প্রেমের কথা আদৌ অসাধারণ বা অসম্ভব নয়! কিন্তু এ যে দর্শনের পূর্বেই শুধুমাত্র নাম শুনেই প্রেম! ঠিক যেমন শ্রীমতী রাধার অবস্থা: অভিমানী রাধা যা' কৃষ্ণবর্ণ তা-ই ত্যাগ করলেন —ভীষণ প্রতিজ্ঞা তাঁর! কৃষ্ণরূপ এ জীবনে নয়নে আর হেরবেন না—মেঘ, যমুনার জল, কালো কেশ, শ্যাম বনানী—কিছু না! কৃষ্ণ নামও কানে শুনবেন না! এ সব কাব্য-কল্পনার কাহিনী ব'লে সহজে বিশ্বাস হতে না চাইলেও বাস্তব জীবনে ওই একই সত্যের উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না। বাংলার পত্নীরা স্বামীর নাম ধরে' ডাকেন না (গুটিকয়েক অতি আধুনিক শিক্ষিত মহিলাদের কথা ব্যতিক্রম মাত্র!)। এর পিছনে যে চিরাচরিত সংস্কার, লজ্জা আছে তা' ঠিক। কিন্তু কেবল কী এই? দেহধারী পতি-ব্যক্তিটির চেয়ে তাঁর নামটির প্রতি মোহ, ভক্তি ও প্রেম কোন অংশে কম নয়। স্বামীর নাম তাঁদের রক্ষা-কবচ, জপমালা। মনের গোপন মণিকোঠায় সে যেন এক দুর্লভ রত্ন—যা' প্রকাশ্য অনুভূতির অনবদ্য আনন্দের। —ভাষায় প্রকাশ করবার নয়, লোককে দেখাবার নয়।

সাধারণ ছোট্ট ঘটনায় মনোনিবেশ করা যাক্। ধরুন একটি মেয়ের বিয়ের সম্পর্কে সমস্ত কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। আয়োজন অনেকদূর এগিয়েছে—এমনসময় হঠাৎ বিয়ে ভেঙে গেল, অথচ হাত গুটাবারও কোন উপায় নেই। পাত্রীর মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এর মূলহেতু আশাভঙ্গ। যাকে নিয়ে কত কল্পনাময় অলস মুহূর্ত সে যাপন করেছে তারই বিরহ ব্যথাদায়ক হবে বৈ কি? কিন্তু নিদারুণ প্রচেষ্টা যদি সেই একই লগ্নে পুনরায় অন্য পাত্রের সঙ্গে এই মেয়েটির বিবাহের ব্যবস্থা চলতে থাকে,—দেখা যায় পাত্রীর বিষণ্ণভাব কিছুতে যেন কাটে না। পূর্বেকার একই দুর্ঘটনার ভীতি হয়ত তাকে বিশেষভাবে

আশঙ্কিত করে তোলে! তা' ছাড়া তার হৃদয়কমলে আর একজনের কল্পনামধুর মূর্তিকে যে সে প্রতিষ্ঠিত করে পূজা অর্ঘ্য নিবেদন করে ফেলেছে! অদর্শন তার কাছে কিছু মারাত্মক নয়,—তার নাম, সমূহ বর্ণনা তাকে একনিষ্ঠা পূজারিণীতে পরিণত করেছে। তাই নতুন কোন ব্যক্তিকে —যত দোষাই সে হোক—বরণ করে নিতে তার অনেক সঙ্কোচ, অনেক অন্তায় ও সর্বভঙ্গের পাপ এসে বিড়ম্বিত করে। সেযোক্ত পুরুষের প্রণয়োদ্রেক পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ উদ্দীপনা সঞ্চার করতে সক্ষম হয় না।

পটুয়ারা এককালে অনেক মূর্তি গড়ে রাখে। প্রায় দু'একটা প্রতিমা অবিক্রী থেকে যায়। তখন লক্ষ্মীর পেঁচা তুলে সেখানে একটা হাঁস বসিয়ে দিয়ে সরস্বতীতে পরিণত করে। এমনভাবে যৎসামান্ত পরিবর্তনের দ্বারা ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে মহেশ্বরে রূপান্তর ঘটে। আমরা কিন্তু অতশত বিচার করিনে। তা'বলে লক্ষ্মীর প্রতিমাকে সরস্বতীরূপে পূজা করা তো দূরের কথা—কল্পনা করতে শিউরে উঠি! অথচ মুহূর্তে পরিবর্তিত প্রতিমাকে সরস্বতী-ব'লে ভক্তিভরে গ্রহণ করি! এরই জন্ত ভিন্ন নৈবেদ্য, পৃথক উপকরণ, সাজসজ্জা, ব্রত, উপবাস ইত্যাদি! অর্থাৎ নামের বিশেষ কদর আছে।

সীতার সতীত্ব আজও নরনারীর আদর্শ। তাঁর দুঃখে অনেকের চোখ আজও অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ওঠে। মায়াবী রাবণের ছলাকলা তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের মূল কারণ। শক্তিশালী লঙ্কাধিপতির সকল অনুনয়, প্রলোভন, আস্ফালন তুচ্ছ হয়ে গেছে, সীতার একনিষ্ঠ পতিভক্তির কাছে। রাবণ তপস্বী সেজে অভিনয় করেছিল সীতা-হরণের প্রারম্ভে। যুদ্ধকালে রামচন্দ্রের কৃত্রিম মূর্তির শির ছিন্ন করে সীতাকে ভয় দেখিয়েছিল। ফলে সীতা কেঁদেছেন বই প্রতিজ্ঞা টলেনি। কিন্তু রাবণ যদি রামের বেশ ধরে স্বয়ং রামচন্দ্ররূপে পরিচয় দিয়ে সীতার সম্মুখে এসে দাঁড়াত —কি হ'ত জানিনে—তবে সম্ভবতঃ রামায়ণের কাহিনী অন্তভাবে লিখিত হত।

প্রেম কঠিন, তরল কি বায়বীয় সে সম্বন্ধে বিস্তর তর্কের অবকাশ আছে এবং সে তায় বিচারের জন্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু একথা বোধগম্য যে প্রণয়ের ব্যাপারে নামের (বৃহত্তর অর্থে) অখণ্ড প্রতাপ। ভারতের পুরাকাহিনী, ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করলেই বোঝা যাবে—এ উক্তির সত্যতা। সেকালের রাজনন্দিনীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দর্শনের পূর্বেই পরের মুখে কোন পুরুষের নাম শুনেই অপরিচিতের প্রতি গভীর প্রেম পোষণ করেছেন। পুষ্পিত বল্লরীর মত নাম—শোনা পরিচয়-না-জানা রাজকুমার বা রাজাটির প্রতি তাঁদের হৃদয় অবনমিত হয়ে গেছে। জাতি-কুল-শীল—প্রভৃতি তাঁদের কাছে তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে। আবার পাছে অন্ত কাউকে বিবাহ করতে হয়, তাই কঠোর ব্রত অবলম্বন করে বসেছেন—যাকে বলে বন্ধুর্জাঙ্গা পণ! শুধু অতীতে কেন, বর্তমানেও নামই প্রেমের প্রথম পথপ্রদর্শক।

নামের প্রতি স্পৃহা কারও কম নয়। সাধু-সন্ন্যাসী যাঁরা নশ্বরতার পরে কালকূটান গহনবনে ও আচ্ছাদন-হীন প্রান্তরে—যাঁরা বিষয়ে অনাসক্তির চর্চা করেন—তাঁরাও সংসারভুক্ত নরনারীর কাছে নিজেদের সুনাম বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। তাঁদের অন্তরেও নামের আসক্তির অন্ত নেই—একথা বললে বুঝি সত্যের অপলাপ হয় না। গৃহকর্মরত নরনারীদের বিন্দুমাত্র অবহেলাতে তাঁদের সর্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলে ওঠে, ভাবেন, মর্যাদা বুঝি নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে! সেই হৃত-মর্যাদা-লাভের জন্ত এই কোপবহ্নি। সন্ন্যাসীর যখন এমন অবস্থা, তখন সাধারণের কথা উহ্য রাখা ভাল।

প্রতিটি মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালবাসে নিজেকে। কিন্তু তারও চেয়ে বেশী ভালবাসে নামকে (মহিম-রহিম নয়—ব্রহ্ম, ভগবান)। নামকে ওল্টালে হয় মান। মানুষ যা' কিছু করে সমস্তই এই দুটির জন্তে—হয় মান রাখবার জন্ত কিংবা নাম বাড়াতে। কি শিক্ষিত, কি মূর্খ, কি সভ্য কি বর্বর—সবাই আপন আপন নাম বজায় রাখতে চেষ্টা করে। এই-ই তার সারা-জীবনের লক্ষ্য ও কর্ম।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। অবাধ স্বেচ্ছাচারের স্থান সেখানে স্বল্পই। মানুষের স্বাভাবিক শোভন সংযমের পিছনে প্রয়োজনবোধ ভিন্ন নামের মোহের অদৃশ্য শক্তি নিহিত আছে। নামের প্রতি সকলেই যদি নিতান্ত নির্বিকার হ'ত তাহ'লে সমাজের সংসক্তি এবং অকল্যাণ হ'ত সুদূর-

পরাহত। নাম মানুষকে দিয়েছে অশেষ প্রত্যাশা-প্রতিপত্তি আর অফুরন্ত উৎসাহ। দুর্বলকে করেছে সবল; অনড় অচলকে করেছে সচল; কৃপণকে করেছে দাতা।

একদিকে নাম যেমন জনগণের সকল উন্নতির অন্যতম কারণ, অন্যদিকে এনেছে তেমনই যথেষ্ট অকল্যাণ। নর-নারীর প্রেমের মত নামের প্রেমও অন্ধ। এই অন্ধতাই বহুক্ষেত্রে সুবিচার ব্যাহত করে। কোন বিখ্যাত লেখকের বই যদি অনামী লেখকের নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়—পাঠককুল সহজে তাকে সমাদর করবেন না,—(আসল নামটিতে যেমন হ'ত), বরং দুঃখিনী ফুটপাথ, অকৃপণ সহানুভূতি ও স্নেহে তাকে কোলে টেনে নেবেন। অথবা নাসিকাকুঞ্চন আর বিরক্তিকর বাঁকা চাহনি জুটবে শুধু তার বরাতে। বহু বাঞ্ছিত হাতের কোমলস্পর্শ থেকে হবে সে বঞ্চিত। পুনরায় স্বনামে প্রকাশ করুন দেখবেন, অনেকেই জিহ্বা মেলে বিনয়ের সঙ্গে ঘোনটা টেনে বলবেন, জানতুম না! মুহূর্তেই অতিরিক্ত আদর সুদে আসলে পুষিয়ে দেবে! নামের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তি অপরিচিত নতুনকে স্নেহই ঠাঁই দেয় না, বরং তাকে ধামা চাপা দেবার কুপ্রবৃত্তি এসে পড়ে। বস্তুর চেয়ে নামের মর্যাদা বেশী হ'য়ে যায়। তার ফলে কাঁচানবীনের সবুজ-জীবন অকালেই ঊষর-মরুর ধূসর হ'য়ে যায়! এক কথায়, নামের অযাচিত দাক্ষিণ্যে যেমন জীবন সুখময় হয়, তেমনি আবার এরই বিরহে জীবন দুঃসহ হ'য়ে ওঠে!

বিপরীত পক্ষে নিতান্ত কাঁচা লেখকের লেখা কোন নামকরা সাহিত্যিকের নাম দিয়ে প্রকাশ করুন, দেখবেন তার চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যাবে। পণ্ডিত সমালোচক-কুল তাতে গভীর জীবন-দর্শন, সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ, অনুসনীয় শিল্পনৈপুণ্যের সুস্পষ্ট আভাষ পাবেন! এবং সে গ্রন্থ যে জাতীয়সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ তেমন বলে দিতে কেউ কেউ হয়ত কুণ্ঠিত হবেন না।

সাহিত্যের ভিত্তিভূমি

নগেন্দ্র দত্ত

সমাজ যেখানে একদিন ছিল সেখান থেকে সে অনেকটা স্থানচ্যুত, সামাজিক মনও সেই সঙ্গে পরিবর্তিত, কাজেই শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে তার প্রভাব আপনা থেকেই পড়বে—এটা অবশ্যই জানা কথা। গল্প যেদিন গাছ-পাথরকে নিয়ে বলা হত সেদিন মানব সমাজ অবশ্যই কোন স্থিতি-শীল স্তরে ছিল, একথা স্বীকার করতেই হইবে। মানুষ তার সামাজিক আচার-ব্যবহার এমন কি মনোভাব গাছ-পাথরের সজীবতার মধ্য দিয়ে রূপ দেবার চেষ্টা করেছে।

অর্থাৎ সামাজিক চেতনা মানুষকে বাদ দিয়ে পশু-পক্ষী গাছ-পাথরের মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী সেদিন ছিল বহির্মুখী। এ খুব বেশী দিনের কথা নয় তখন লিখিত ইতিহাসের কাল। যে রসবোধ মানুষের অন্তরে জাগত, তার বস্তুসম্ভার ছিল—তার চিরদিনের পরিচিত জগতের বাহিরে। মনের এই বহির্মুখীনতা কেন এলো মানুষের মাঝে—এর কোন সদুত্তর নেই। কিন্তু তার আগে আর একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে মানুষ আপনাকে ভুলে কেন পশু-পাখীর মন নিয়ে এত রসালো আলোচনা করেছে?

কারণ, এই পশু-পক্ষীরা একদিন মানুষের অর্থনৈতিক জীবন যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল—এটাও ঐতিহাসিক সত্য। তখনকার মানুষের গোষ্ঠী-জীবন মানেই অর্থনৈতিক জীবন—তার মানে পশু, গোচারণ ভূমি, আর বৈষয়িক বিনিময়। মানে বাণিজ্যসূত্রে অপরিচিত মানুষের সন্ধান করা। এ সময় পাখী যে গৃহ-পালিত পাখী ছিল তা বেশ বোঝা যায়—কেননা, এরা সেদিন অপরিচিতের সঙ্গে বাক্য বা প্রতীক চিহ্নধারী গুটিকয়েক ভাব সমষ্টির লেন-দেনের কারবারে সহায়তা করত। কোন এককালে গরুই ছিল অর্থনৈতিক লেন দেনের প্রতীভূ। সেখানে অন্যান্য পশু-পাখী, বৃক্ষলতা যে অনুরূপ আদান-প্রদানের কাজে মানুষকে সাহায্য করেনি তা ঠিক জোর করে বলা চলে না।

...“according to primitive psychology, organic matter and, to some extent, inorganic also, is instinct with a Divne force or vital essence. The chief centres of this are sacred persons, objects, and places: latter, the gods and their temples, their representatives and apparatus, play this part.”

আদিম মানুষের জীবন যাত্রায়, মানস-চেতনায় যখনই ‘Divine force’ অথবা ‘vital essence’এর আবির্ভাব হয়েছে তখনই প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে রূপ নিয়ে, প্রাকৃতিক জীবের মধ্যে ফুটে উঠেছে। তার অর্থ মানুষের জীবন আর প্রাকৃতিক জীবের জীবন এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বাধা পড়েছে। এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের সূত্রেই এসেছে রসের সম্ভার। মনের রস-চেতনা যখন একান্তভাবে নিবিড় হয়ে উঠেছে—তখন বোবা প্রকৃতি পেয়েছে ভাষা, পশু-পাখীর আচার-ব্যবহার, বাক্য ও শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে রূপ নিয়েছে মানব মনের স্বপ্নভাব। এমনি করে একদিন বিকাশ লাভ করল মন। প্রকৃতি, প্রাকৃতিক জীব ও মানুষ যেন রসের পসরা খুলে বসল।

একথা আজ সবাই জানেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতের মূলসূত্র ‘সরগম’ বিশেষ পশু-পক্ষীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া একটা কথা স্বীকার করতে হয় যে, মানুষ প্রাকৃতিক জীবের আচার-ব্যবহার, ভাব, ভাষা সুর সবই একদিন পর্যবেক্ষণ করত। এবং তার নিজস্ব কল্পনানুভূতি সৃষ্টিতে সেই পর্যবেক্ষণের ফল সংযোজিত করত। তাই গীত বলার আদিযুগে ও চিত্রকলার আদিযুগে সঙ্গীত কলার—অন্তত ভারতীয় সঙ্গীতকলার আদিযুগে—প্রাকৃতিক জীবেরাই ছিল পরম আত্মীয়। কি তাদের অর্থনৈতিক জীবনে, কি তাদের রসচর্চায়—জীব জগতের প্রাণীরা প্রধান উপজীব্য

হয় দেখা দিল। যে প্রাণীরা সামাজিক জীবের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে মিশে গেল তারা তাদের ভাবের সঞ্চয় কোথায়ও কিছু রেখে গেল না—এ মনে করার কারণ নেই। এদেশে বৃষোৎসর্গ আছে—তার মূল উদ্দেশ্য প্রজনন। আর এক কথায় অর্থনৈতিক স্বার্থ। এখানে রসবোধ নেই বটে প্রয়োজন বোধ আছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন-কোন অঞ্চলে পৌষ পার্ব্বণের দিনে সুবিস্তীর্ণ মাঠে বাস্তুদেবীর পূজা হয়। এ দেবীর বাহন কুমীর। এবং গৃহস্থের নিজস্ব ভূমিতে এর উপাসনার বেদী রচিত হয়। একটি কুমীরের দেহ গঠিত হল, আর তার পিঠদাঁড়ার ওপর তিনখণ্ড কাঠ পুঁতে দেয়া হল। এই কাঠখণ্ডগুলি বিশেষ একটি বৃক্ষের হবে, তারও নির্দ্দেশ আছে। এর সামনে বসে আছেন মা লক্ষ্মী। তার বিপরীত দিকে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই পাশে দুই বাঘ। সমস্ত পূজার বস্তু ও উপরকণ একটা অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ বলে মনে হয়। কেননা, কুমীর, লক্ষ্মীদেবী, বাঘ—। হ্যাঁ, তবে এই তিন প্রতীকেরা তিনটি ভাব-অবস্থার যে প্রতিনিধি তা বেশ বুঝতে পারা যায়। কুমীর আর বাঘকে জল এবং জঙ্গলের প্রতীক হিসাবে ধরে নেয়া যেতে পারে। আর লক্ষ্মীদেবী আর্য্য সংস্কৃতির প্রভাবের অগ্রবর্ত্তিনী হিসেবে এসেছেন। এই তিনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, জল আর জঙ্গলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে মানুষ যে ভূমিটুকু রক্ষা করেছে, লক্ষ্মীদেবী সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে তাতে বরদান করছেন। এই সম্পদের বর পেয়ে মানুষের রসানুভূতি কতটা জেগেছে তার একটা নিদর্শন দেয়া যাক।

"আইলাম রে ভাই স্মরণে
লক্ষ্মীদেবী বরণে,
লক্ষ্মীদেবী দিলেন বর
টাকাকড়ি আদিধর।"

এর পরই আর এক দেবতার স্মরণ। তারও পূজা প্রসঙ্গত শুরু হল। তবে সে মন্ত্রে নয় গানের সুরে, কবিতার ছন্দে। যে বাঘের উল্লেখ এখানে করেছি সেই বাঘেরই বন্দনা। গাঁয়ের আটদশ জন মিলে গান শুরু করল:

"এক বাঘ রে এক বাঘ হৈ-চৈ
গোয়াল মারুইয়া রে
গোয়াল মারুইয়া নিল দৈ।
আর বাঘরে, আর বাঘ চৈতা
বাওন মারুইয়ারে,
বাওন মারুইয়া নিল পৈতা।"

সুসংস্কৃতিবান যেকোন পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে, এর মাঝে রসের আবেদন কোথায়? এখানে সব বস্তু সংযোগই অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু মানুষের রসবোধ এই অসঙ্গতিপূর্ণ ধারা থেকেই জন্ম নিয়েছে। সাহিত্যের আদি জননী—এই রূপ অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ রূপবিশিষ্ট সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঘর করেছেন। কিন্তু আসল রসসৃষ্টিতে অসঙ্গতি নেই। এখানে বিচার করে দেখতে হবে বাঘের ছড়া, আর লক্ষ্মীদেবীর বন্দনা এ দুয়ের মধ্যে সুরছন্দ ও ভাষার সামঞ্জস্য আছে কিনা।

সাহিত্যের আর একটা উন্নত স্তরে দেখতে পাচ্ছি 'অসঙ্গতি' পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে রসের এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করেছে। আমরা যে রসানুভূতিকে কাব্যের চরম ও পরম বলে জানি তা অবিশ্যি এতে নেই। কিন্তু ছন্দ, ভাব ও ভাষা অনেক পরিমাণে সুসংহত হয়েছে। এই সুসংহত মনের অবস্থায় প্রকৃতি কিভাবে দেখা দিয়েছে তা বিচার করে দেখা দরকার। যেমন ধরুন:

"ক্ষেতে বসি কৃষানে ঈষান বন্দে ভাল।
চারিদণ্ডে চৌদিক চৌরস করে চাল।
আড়ি তুলে ধারে ধারে বরাইল ধান।
হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥"

এই ছড়ায় 'ঈষান' অর্থে মহাদেব আর বাকিটা সব বর্ণনাই সমাজিক জীবের অর্থনৈতিক কর্ম্ম কাণ্ডের, কৃষি সভ্যতার যুগের চাষ আবাদের। ইতিপূর্ব্বে আর্য্য সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসাবে লক্ষ্মীর দেবীর যে স্থান কৃষি-সভ্যতার যুগে ছিল, এখানে ভোলা মহেশ্বর ঈষাণের ঠিক সেই স্থানই নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। কিন্তু মানুষের রসচেতনা সুশৃঙ্খলিত হয়ে রসের জগতে এক নবীন মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

তারপর এমন একটা দিন এলো কৃষি সভ্যতাকে ছাড়িয়ে, প্রাকৃতিক জীবকে ছাড়িয়ে মানুষ কর্ম্মে

স্বপ্রধান হয়ে উঠল। ব্যবহারিক কর্ম প্রধান হয়ে উঠল জীবন সত্তার মাঝে। এই ব্যবহারিক কর্মের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে লাগল কাব্যে, শিল্পে ও মানব প্রকৃতিতে। যে জীব জগৎকে আমরা একদিন অর্থনৈতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে জানতাম—সেই জীব জগৎ আজ আর মানুষের ব্যবহারিক কর্মের মধ্যে নেই। এখন মানুষের শ্রম খাটিয়ে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করা চলে। কেউ-কেউ তাঁর জগতের শ্রমকে মানব জগতের মধ্যে পরিপূর্ণ ভোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই অবস্থায় অবকাশটা সৌন্দর্য চেতনার রসে ভরপুর হয়ে থাকল। এই অবকাশ যেদিন সৃজনশীল ছিল সেদিন হয়ত মানুষ কোন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু যেদিন এই অবকাশ উদ্বৃত্ত জীবনের অজস্র উচ্ছ্বাসের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল সেদিন যেন জীবন-ছন্দে কোথায় বেসুর বাজতে লাগল। এরই ব্যাপক রূপ একদিন সমগ্র বিশ্বমানব সত্তায় ছড়িয়ে পড়ল। এতদিনকার শিল্পবোধ ও রসানুভূতি নতুন পথে কি যেন সন্ধান করে ফিরতে লাগল। মানবের অন্তর জগৎ ব্যাকুল হল একটা মানবত্ব বিধানের নিমিত্ত। এই ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, কোন কিছু পাবার নিবিড় আকাঙ্ক্ষা —একদিন প্রেমের জগতে একটা বড় স্থান অধিকার করেছিল। মন তার ছিল প্রেমিককে পাবার ভক্ত, চেতনায় ছিল সান্নিধ্যভোগী মিলনাকাঙ্ক্ষা। এগুলো মানবিক চরিত্রের পরিচয়, কাব্যে এর অজস্র নিদর্শন মেলে —কালিদাসের কাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত এই ইচ্ছার হেরফের হয়েছে, কিন্তু মূলগত কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়নি। কাব্যের ক্রমবিকাশে প্রাণী জগতের আবির্ভাব থেকে মানবিক ইচ্ছার বিচিত্র আবির্ভাব—সবই সূত্রাকার খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু গল্প, উপন্যাসে প্রাণী জগৎ থেকে রসধারার মানব জগতে প্রবেশ ? এরও ধারাবাহিকতা আছে—তবে সেটা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে। একক জীবন কোন সময় হয়ত অর্থনৈতিক জীবন থেকে খানিকটা মুক্তও হতে পারে তাই তার সূক্ষ্ম অনুভূতির ভাষা সংক্ষেপ, অতএব তা কাব্যে প্রকাশ করা চলে। কিন্তু বহু মানব মনের, বিবিধ সূক্ষ্ম চেতনা, মানবিক মান অভিমান, সূক্ষ্মানুভূতি ঠিক কাব্যে ধরা পড়ে না। কেননা, একক জীবন কোন সময় হয়ত সংহত ও সম্মিলিত অর্থনৈতিক জীবনধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে—অন্তত কিছুকালের জন্য—মুক্ত থাকতে পারে। এই আপাত স্বাধীন স্বচ্ছন্দ মনের ভাবগত মুক্ত অবস্থায় কোন একক জীবনকে ব্যক্তির দ্রষ্টা হিসাবে দেখবার সুযোগ থাকতে পারে। সেখানে কাব্য অন্তর্মুখী, ফল্গুর মত ধীর-প্রবাহিনী। এই অন্তর্মুখী কাব্যের ভাষা সংক্ষিপ্ত কোন-কোন অবস্থায় রহস্যানুগ, সাধারণের পক্ষে জটীল বটে। এই রহস্যানুভূতি কাব্যের জগতে চলতে পারে। কিন্তু মানব মন যেদিন থেকে সমাজ চিনল অর্থাৎ সমাজের আরশটা জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করল এবং তাদের সঙ্গে বিনিময়ের ভিত্তিতে চলতে শিখল সেই দিন থেকেই মানব মনে পরস্পরের ভাবে ছায়া ফেলতে লাগল। এবং চরিত্র বলতে আমরা যা বলে থাকি তা আর কিছু নয়—আমাদের পরস্পরের মনে কে কি ভাবের ছায়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে, এবং সেই ভাবরাশি আমাদের পরস্পরের মনে কতটা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে—তারই সমগ্র রূপ। একে একথায় ভাব-সাগরের উত্থান পতনের ঢেউ বলা যেতে পারে। অথবা ভাব প্রবাহিনী নদীর জোয়ার ভাটার খেলাও বলা যেতে পারে। কিন্তু সবটাই সমগ্ররূপে বিদ্যমান।

এ থেকে প্রমাণিত হবে মানব মন এক দৃষ্টিক নয় —তার শাখা প্রশাখার অন্ত নাই। বস্তুত পক্ষে আমরা বাইরের জগতে যে বহু বিচিত্র জীব দেখতে পাই—মনের জগতে তারই সন্ধান মেলে—তবে তা ভাবরূপে। মনে মনেরই ছায়া পড়ে অর্থাৎ বস্তুময় মানব দেহটা সেখানে নেই বটে কিন্তু তার ভাবের প্রতিকৃতি মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে। কিন্তু মানব মনের অন্তর 'প্রবাসী' সে ভাব তাকে আর একজনের রস চেতনার মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে কেমন করে ? এই প্রবেশ দ্বারের পথটি হল শিল্প-কৌশল। আর যে রস চেতনার মধ্যে অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে তা সম্ভব হবে বাস্তব জীবনের ভাবরূপ এঁকে। এই ভাবরূপের সংস্পর্শে এলে পাঠকের রস চেতনা আপনা থেকেই অনুভব করতে পারবে চরিত্র কি, এবং চরিত্রের মূল সূত্র কোথায়। একথা আজ সর্ববাদীসম্মত যে, কথা সাহিত্যে চরিত্রের আবির্ভাব কাব্যের অনেক পরে হয়েছে। এর কারণ জীবন একক বা গোষ্ঠীগত ভাবে যখন কাব্য রস উপভোগ করত তখন সে আর বহু বিচিত্র সংমিশ্রণ ধারার অনুসন্ধান করত না। সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক বিনিময়, ভাবগত স্পর্শযোগ তেমন ঘটতনা— কাজেই 'আমার' কথা 'তোমার' কথা ও ভাব শুনলে বা বুঝলেই চলত। এখন দেখা গেল 'আমি' তুমি' যেদিন ভাব বিনিময় করলাম সেদিন 'তাদের'ও আসবার পথ প্রশস্ত হয়ে থাকল। তার অর্থ সমাজ বৃদ্ধি পেল। সেই প্রশস্ত পথে 'তারা'ও এসে পড়ল। ভাবরাজ্যের প্রশস্ত পথে 'তারা' যেদিন বেরিয়ে পড়ল সেইদিন থেকে সাহিত্যের নূতন ভিত্তিভূমি রচিত হল।

নীতিশাস্ত্র বনাম মুনাফা শিকার

প্রবোধচন্দ্র বসু

অর্থ নৈতিক সমস্যা (Economic Problem) :— সামাজিক আয় বাড়ানো অর্থ নীতির মূল সমস্যা। কোন কোন এক বছরের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী জনসাধারণের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিলে দেখা যায় চাহিদার পুরোপুরি তৃপ্তি হয় না অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কম। একটা জিনিষ বাড়িয়ে পেতে হলে আরেকটার কম নিতে হয়। কারণ কোনো একটা বস্তু বেশী উৎপন্ন করতে হ'লে উৎপাদনের উপাদান (factors) অন্য বস্তুর উৎপাদনক্ষেত্র থেকে নিয়ে আসতে হয় যেহেতু এদেরও সরবরাহ অসীম নয়। সুতরাং উৎপাদন ব্যয় পড়ে বেশী আর দামও যায় বেড়ে। এভাবে দেখা যায় বস্তুস্বল্পতা ও সীমাহীন চাহিদার সমন্বয় সমস্যাই অর্থ নীতির মূল সমস্যা এবং এরই প্রকাশ হয় সর্বাধিক জাতীয় আয় উৎপাদনের প্রয়াসে।

এই প্রয়াস একমাত্র অর্থ নীতিকেই সার্থকরূপে রূপায়িত করতে পারে না—রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ও নীতিশাস্ত্রীয় সহায়তাও সামাজিক আয় বৃদ্ধি ও সুখ-বিধানে অপরিহার্য। নীতিশাস্ত্র আলোচনান্তে দেখা যায় অর্থ নীতির সঙ্গে এটা আঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িয়ে আছে। উদাহরণ দিয়ে এটা সহজে বোঝানো যায়—মজুরদের মজুরী তাদের উৎপাদন থেকে কম। এটা অর্থ নৈতিক দিক। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে, "এভাবে কম মজুরী দেওয়া কি সঙ্গত ?" এ প্রশ্ন তো আর আর্থিক দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ রইল না—নীতিশাস্ত্রবোধ থেকে এর উৎপত্তি। বাস্তব-জগতে নীতি ও অর্থ নীতি এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে আমরা এদের ভিন্ন ভিন্ন দেখতে পাবি না। কি করে উৎপাদন ভালভাবে করা যায় অর্থনীতিক বলতে পারে, কিন্তু তাতে সমাজের ভাল হবে কি না তা বলবে নীতি-শাস্ত্রবিদ্। তাই 'কি করা উচিত' ; 'কি করা ভাল' এর সঙ্গে অর্থ নীতির যোগ নেই বলা ভুল। কোন শাস্ত্র বা বিজ্ঞানই শুধু চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তব সমস্যার দিকে লক্ষ্য না থাকলে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ। তাই বাস্তব জগতের মুকুরেই অর্থনৈতিক বিচার সার্থক হয়। অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি একই মালায় দুটো ফুল এ ভাবেই বিচার্য।

নীতি বোধ আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে অর্থনৈতিক সমস্যা মুনাফাশিকারের (Profiteering) সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করব। দেখা যাক্ মুনাফার উৎপত্তি ও মুনাফাশিকারের সুযোগ কিভাবে হয়।

মুনাফা বলতে আমরা বুঝি কোন বস্তু উৎপাদন করতে বা পেতে (acquire) মোট ব্যয় (cost) ও তা বিক্রী করে প্রাপ্ত অর্থের (revenue) পার্থক্য। কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে মনে করি এক বছর—মূলধন খাটিয়ে সমস্ত দাবী মিটিয়ে পরিচালক (entrepreneur) যে পরিমাণ অর্থ নিজে পায় তা-ই মুনাফা। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে

(১) কেন মুনাফা হয় ?

(২) মুনাফা না পেলে পরিচালক উৎপাদন কাজে নামবে কিনা ?

(৩) পরিচালক উৎপাদন কাজে সহায়তা করে কিনা ?

বাস্তব জগৎ অনিশ্চয়তা ও আশার সমন্বয়ে গড়া। তাই দেখা যায় বিজ্ঞ সুপণ্ডিতও ভাগ্য বা luck বলে একটা কথা উচ্চারণ করে থাকেন। এ ভাগ্যবোধ অনিশ্চয়তা বা সংশয়সঞ্জাত। ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ফল মানুষ যথাযথ ভাবে জানেনা, বোঝেও না। অবশ্য অভিজ্ঞতা থেকে পরিণাম সম্বন্ধে একটা ধারণা হয় কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ নয় কারণ "future may not come" বা "অজাত'রে কে বলিতে পারে ?" মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য—এটা মানব জীবনের চিরন্তন ট্র্যাজেডি (tragedy)।

আর্থিক দুনিয়ায় এ অনিশ্চয়তার প্রভাব প্রচুর। বিশেষতঃ যান্ত্রিক যুগধর্ম এই যে যে-কোন সময় নতুন

উৎপাদন প্রথা আবিষ্কৃত হ'য়ে (innovations) পুরোনোকে হটিয়ে দিতে পারে—"Old order changeth yielding place to new।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংশয়-সংকোচ-ভয় অধিকজগতের চিরন্তন নাগরিক। পরিচালক (entrepreneur) ছুয়াড়ী মনোভাব নিয়ে কাজে নামে না—মুনাফাই তার উৎপাদনে নাম্‌বার কাজে একমাত্র আকাংক্ষা। এখানে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে শ্রমিকও অনিশ্চয়তার ভার বহন করে, তার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হ'তে পারে (accidents)। শ্রমিকের অনিশ্চয়তা সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে পেন্সন, ক্ষতিপূরণ, শ্রমিক কল্যাণ মূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা। কিন্তু পরিচালকের লোকসান রোধ করবার ব্যবস্থা কিছু নেই। সুতরাং মুনাফার আশা না থাকলে পরিচালক কাজে নাম্‌বে না খুবই স্বাভাবিক।

এখন দেখা যাক্ উৎপাদন কাজে পরিচালকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে কিনা! কোন বস্তু বা সামগ্রী নানা সমন্বয়ের ফল (joint effort of factors) ধরা যাক্ একটা উপাদান—শ্রমিক প্রচুর আছে, কিন্তু অন্যান্য উপাদান শ্রমের সঙ্গে না থাকলে কিছুই উৎপাদন করা শুধু শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিচালক অন্যান্য উপকরণ (factor) সমন্বয়ের কর্তা। সুতরাং তার সহায়তা ছাড়া উৎপাদন কাজ চল্‌তে পারে না। বাদ্যযন্ত্র থাকলেই বাজ্‌না শোনা যায় না, যন্ত্রীর প্রয়োজন; পরিচালক উৎপাদন যন্ত্রের যন্ত্রী।

অতএব পরিচালকের প্রয়োজনীয় মূল্যও (necessary remuneration) তার প্রাপ্য। সে মূল্য স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অর্থাৎ অনিশ্চিয়তার (risk and uncertainty) ঝুঁকি নেবার জন্যে স্বাভাবিক মুনাফা অপরিহার্য।

পরিচালক যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে কিছু বল্‌বার থাকে না। কিন্তু বাড়তি মুনাফা (surplus profit) শিকারের ঝোঁকই নিন্দনীয় এবং একেই আমরা মুনাফাশিকার (profiteering) বল্‌ব। কতকগুলো কারণ বাড়তি মুনাফার সুযোগ করে দেয়, যেমন (১) সংরক্ষণ ব্যবস্থা (protection) (২) অন্যান্য উপকরণের স্বল্প সচলতা (less mobility) (৩) একাধিপত্য ও প্রতিযোগীর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। এ সব কারণে যে বাড়তি মুনাফা শিকার হয় তা-ই চিন্তাশীল মানুষের ভাবনার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং নীতিগত দিক থেকে এর সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা সামাজিক কলঙ্ক (social evil)। শুধু দক্ষতাগুণেই একাধিপত্য বিস্তার করলেও অপরকে ঠকিয়ে বাড়তি মুনাফা শিকার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয় না। আর এতে সমাজ দক্ষ পরিচালক পেয়ে ধন্য হয় না বরং শোষিত (expolitation) হয় অর্থাৎ সুযোগ্য পরিচালক আশীর্বাদ না হয়ে সমাজের বুকে অভিশাপ হ'য়ে দাঁড়ায়। মার্কসবাদী অর্থনীতি—যা শ্রমকেই একমাত্র উৎপাদন-উপাদান (productive factor) মনে করে তা বাদ দিয়েও মুনাফাশিকারের পক্ষে কোন যুক্তিই নেই। বহু রকমপথে পরিচালক মুনাফাশিকারের প্রয়াস পায় যথা—

(১) অতিরিক্ত দাম আদায়, (high price)
(২) বস্তুর মান নামিয়ে দেওয়া, (inferior quality)
(৩) শ্রমিকের কম মজুরী,
(৪) শ্রমিককে বাড়তি কাজ করানো,
(৫) আইনপ্রণেতাদের পক্ষভুক্ত করা
(৬) শেয়ার বাজারে প্রভাব বিস্তার
(৭) ভূমির কর কমিয়ে দেওয়া।

এ সব রকমপথের সুযোগেই পুঁজিবাদী (এখানে entrepreneur) মুনাফাশিকার করছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথমেই আমরা বলেছি নীতিবোধ ও অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উপরোক্ত রকমপথগুলো আলোচনা করে দেখা যায় এর যাথার্থ্য কত সত্য। শোষিত জনসাধারণের কঙ্কালের উপর শোষক পরিচালকের প্রাসাদ গড়ে উঠুক এটা যুক্তি ও নীতির দিক থেকে কেউ চায় না। অর্থনীতির দিক থেকে বিচারেও দেখা যায় শোষণ শোষিতের দক্ষতা (efficiency) কমিয়ে দেয়। অপর পক্ষে পরিচালক ধনী তাই তার ভোগব্যয় (consumption expenditure) কম বলে অলস সঞ্চয় (idle savings) বিনিয়োগ কাজে (investment) প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়। এতে জাতীয় আয় কমে যায়, উৎপাদন কম হয় এবং পরিণামে অর্থনৈতিক বিপর্যয় (dislocation), ও বেকার সমস্যা দেখা দেয়। মোট কথা, মুনাফাশিকার স্পৃহাই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে নানারূপ সমস্যার সৃষ্টি করেছে এ সম্বন্ধে আজ আর দ্বিমত নেই বলেই বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও নানাভাবে মুনাফার সর্বোচ্চ মাত্রা (ceiling) বেঁধে দেবার চেষ্টা করছে।

এভাবে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র যে কোন দিকের কষ্টিপথেরই বিচার করা যাকনা কেন মুনাফাশিকার অনভিপ্রেত এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। পরিচালকের স্বাভাবিক উপার্জন (normal profit) নিয়ে আমাদের কিছু বিরুদ্ধতা করবার নেই। তবে বাড়তি মুনাফা কোন প্রকারেই সমর্থনীয় নয়। সত্যি কবির ভাষায়—"Where wealth accumulates—

Man perishes."

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৫

হীরালালের সেদিন সারারাত ঘুম হইল না। সমস্ত রাত বসিয়া বসিয়া শুধু এই কথাটাই সে ভাবিতে লাগিল যে আমবাগানে তন্দ্রার মধ্যে সে একটু আগে স্বপ্ন দেখিয়া আসিল—না কি এসব সত্যই ঘটিয়া গেল তাহার জীবনে? তাহার মত সামান্য প্রাণীকে কেন্দ্র করিয়া এতবড় একটা নাটক অভিনীত হইবে তাহা যে একেবারেই অবিশ্বাস্য! তাহার এই অল্প কয়দিনের জীবনে কোনপ্রকার বৈচিত্র্য বা নাটকীয়তার কোন ইতিহাসই কোথাও নাই—নিতান্তই অতি-সাধারণ জীবন। অখ্যাত, অবজ্ঞাত, নামমাত্র শিক্ষিত দরিদ্র বালক সে, কোনমতে দিন-গুজরানের একটা উপায় হইয়া গেলেই যথেষ্ট। ইহার অধিক কোন কামনাও তাহার নাই। কিন্তু ভগবান তাহারই জীবনে এ সব কী গোলমাল বাধাইয়া তুলিলেন?

যদি ইহা স্বপ্ন না হয়, যদি সত্যই এইমাত্র যা সে দেখিল ও শুনিল—তাহা সত্য সত্যই দেখিয়া বা শুনিয়া থাকে ত ইহা তাহার জীবনে একটা গুরুতর সমস্যা হইয়াই দেখা দিল বৈকি! একদিকে তাহার স্নেহ মমতাময়ী জীবনধাত্রীর অনুরোধ আর একদিকে কর্তব্যের ভ্রূকুটি। যদি চ সে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াই আসিয়াছে এবং কর্তব্যকেই শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তবু মন মানে কৈ? এক জোড়া ভুবনভুলানো চোখের মিনতি, সুন্দর এক-জোড়া অধরোষ্ঠের কোণে কঠিন বিদ্রূপ, বাঁশীর মত কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে অনুনয় ও ব্যঙ্গ—এ কী সহজে ভোলা যায়! বিশেষত হীরালালের এই নবীন বয়স, এই বয়সে ঐ রকম চোখের মিনতি নিষ্ঠুরের মতই দুর্লঙ্ঘ্য ঠেকে। এ সময় কাহারও জন্য কিছু করিতে না পারিলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়! কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ—আত্মত্যাগ এই বয়সেরই ধর্ম।

কিন্তু—

কিন্তুটাও যে অনেকখানি। বিধবা মায়ের সন্তান সে। তিনি সমস্তক্ষণ কাছে কাছে রাখিয়া নিজের আদর্শমত মানুষ করিয়াছেন! সে শিক্ষা, সে আদর্শ মজ্জাগত হইয়া গেছে। যাহা অন্যায় বলিয়া জানিতেছে তাহাকেই বা মানিয়া লয় কেমন করিয়া?……

সারারাত ভাবিয়াও এ সমস্যার কোন কূলকিনারা হইল না। লাভের মধ্যে রাত্রি জাগরণ ও অনিদ্রায় তাহার দুই চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, সুন্দর মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিল। সিপাহীরা তাহার এই ভাবান্তর এবং রূপান্তরকে ভীতি-জনিত দুশ্চিন্তা মনে করিয়া, কাপুরুষতার চরম নিদর্শন ভাবিয়া তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করিয়া তুলিল। এমন কি বাংগালী মাত্রেই যে ভে-সরম এবং ভীতু—একথাও বার বার শুনিতে হইল।

তাহার পরের দিন সকাল বেলাই তাহারা কানপুর পৌঁছিয়া গেল। কানপুরে পৌঁছিয়া সে যেন বাঁচিল। ভীড়ের মধ্যে, কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে আবার মানুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আগের দিনের দুঃস্বপ্ন এবং দুর্ভাবনার মধ্যে একপ্রকারের হতাশা ও আত্মধিক্কার যেন

তাহাকে একেবারে গ্রাস করিতে বসিয়াছিল, আজ কাজের মধ্যে আবার সে নিজেকে ফিরিয়া পাইল।

প্রত্যুষে স্নান সারিয়াই তাহারা যাত্রা করে। আজও করিয়াছিল। সুতরাং কানপুরে পৌঁছিয়াই তাহারা মেজর সাহেবের কাছে এত্তেলা পাঠাইল, তাহারা প্রস্তুত, তিনি দয়া করিয়া এখন মালপত্র বুঝ লইলে তাহারা অব্যাহতি পায়। মেজর অবশ্য বলিলেন যে তাহারা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করুক—তিনি বিকালেও উহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু না সিপাহীরা আর না সার্জেন্ট্—কেহই রাজী হইল না। কানপুর ভারী শহর—বহুতানাশার আয়োজন চারিদিকে। সকালে কাজটা সারিয়া ফেলিতে পারিলে বিকালটা হাতের মধ্যে পাওয়া যায়। অগত্যা মেজর সাহেব তখনই বাহির হইয়া আসিলেন।

মাল-পত্র বুঝিয়া লইতে বেশ খানিকটা বেলা হইয়া গেল। মেজর সাহেব একটু বিস্মিতও হইলেন। তাঁহার এতকালের অভিজ্ঞতায় তিনি এমন কখনও দেখেন নাই যে সরকারী মাল সব ঠিকঠিক আসিয়া পৌঁছায়। এতকাল ধরিয়া পথের বিবিধ ও বিচিত্র বিপদ এবং ক্ষয়ক্ষতির যে সব বিবরণ শুনিয়া আসিতেছেন—এই তরুণ-বয়স্ক বাবুকে তাহার একটাও না বলিতে দেখিয়া বেশ একটু সকৌতুকেই তাহার দিকে তাকাইলেন, তাহার পর বলিলেন, 'তুমি বুঝি একেবারে নতুন ঢুকেছ কমিসারিয়াটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' হীরালাল সবিনয়ে উত্তর দিল।

'বোঝা যাচ্ছে যে তোমাকে তৈরী করবার লোকও বিশেষ ছিল না বীরাটে। কী বলো? হাউ এভার, তোমার সততাকে পুরস্কৃত করবার সরকারী কোন ব্যবস্থা যখন নেই, তখন সে ত্রুটি আমিই ঢেকে নিচ্ছি।'

তিনি পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া, হীরালালের অনিচ্ছুক হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, 'সততার পুরস্কার বরাবরই কম। কিন্তু সততাই সততার পুরস্কার বাবু, এটা একদিন যেন বুঝতে পারো!.. উইশ ইউ গুডলাক্!'

সিপাহী এমন কি সার্জেন্টেরও অগ্নিদৃষ্টির মধ্য দিয়া মাথা হেঁট করিয়া সেখান হইতে সরিয়া আসিল হীরালাল। এই পাঁচটা টাকা উহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে যদি উহারা খুশী হয় ত এখনই দিতে রাজী আছে সে! কিন্তু তাহা হইবে কি? তাগে যে একটা করিয়া টাকাও হয় না। তাছাড়া সে-প্রস্তাব করিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না।...

আহারাদির পরও হীরালাল বিশ্রামের চেষ্টা করিল না। গতকল্যকার অনিদ্রার ফলে তাহার দুইচোখের পাতা ভারী হইয়া থাকিলেও শয়ন করিতে তাহার সাহস হইল না। মনে হইল নিরালায় বিশ্রাম করিতে গেলেই গতকালকার সমস্ত সমস্যা আবার তাহাকে তেমনি করিয়া ঘিরিয়া ধরিবে।

তাছাড়া—তাছাড়া তাহার মনের একান্তে আর একবার সেই জীবনদাত্রীকে দেখিবার অসম্ভব দুরাশা জাগিয়াছিল কিনা—তাহাই বা কে বলিবে?...সে আহারাদির পর সেই দুপুররোদেই কানপুরের পথে পথে ঘুরিতে বাহির হইয়া পড়িল।

সেকালের পশ্চিমে শহর, শহর বলিতে বাজারের দিকটাকেই বোঝাইত। সুতরাং হীরালালও ঘুরিতে ঘুরিতে বাজারের দিকেই আসিয়া পড়িল। সংকীর্ণ পথের দুইদিকে অসংখ্য বিপণি। পথের উপরও বহু লোক পসার সাজাইয়াছে। কিন্তু শুধু দোকানী বা ফেরিওয়ালা নয়, আরও নানা রকমের লোক এ বাজারে দু' পয়সা কামাইতেছে। বেদে আছে, তাহারা ঝুলির মধ্য হইতে এটা ওটা বাহির করিয়া জাদুর খেলা দেখাইতেছে। জুয়াওয়ালারা আছে তাহারা একটু আড়াল দেখিয়া ঘুঁটি ও ছক্ পাতিয়া বসিয়াছে। সারেঙ্গী-সহ পথের নাচ-ওয়ালীরা আছে—ইউরোপের 'ক্যাবারে-নটী'দের মত, যেখানে সেখানে ঘাঘরা উড়াইয়া একপাক্ নাচিয়া পয়সা কুড়াইতেছে। আর আছেন জ্যোতিষীরা। পথের পাশে পাশে খুঙ্গীপুঁথি লইয়া, কেহ বা ধূলার উপর ভাগ্যচক্রের ছক্ আঁকিয়া, কেহ বা খাঁচার মধ্যে কয়েকটি পাখী কিংবা দড়িতে একটা বাদর বাঁধিয়া লইয়া বসিয়াছে। এই ধারাটা শতাব্দী পার হইয়াও অব্যাহত আছে—কলিকাতার পথে যাঁহারা হাঁটেন, তাঁহাদের আর বলিয়া দিতে হইবে না।

হীরালাল অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ভীড়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল। ফলে শুধু যে শ্রান্তিতে তাহার পা-দুটা ভাঙ্গিয়া আসিল, তাহাই নহে—অসম্ভব পিপাসাবোধ হইতে লাগিল।

সে এদিক ওদিক দেখিয়া একটা দুধের দোকানে গিয়া এক পয়সা দিয়া একপোয়া গরম দুধ কিনিল এবং দুধের ভাঁড়টা হাতে লইয়া দোকানের সামনে পাতা চারপাইটাতেই ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। প্রথমটা অত সে খেয়াল করে নাই, নিজের পিপাসা-নিবারণেই ব্যস্ত ছিল কিন্তু অকস্মাৎ 'সিপাই' শব্দটা কানে যাইতেই সে সচেতন হইয়া উঠিল। আগে হইতেই দুধওয়ালার দোকানের ভিতর তিনচারটি লোক বসিয়া নিম্নস্বরে কী আলাপ করিতেছিল—হীরালাল সেদিকে চাহিয়াও দেখে নাই। এখন ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। অপেক্ষাকৃত ভদ্র চেহারা লোকগুলির—অর্থাৎ নিতান্ত পথের লোক নয়। উহারা এতক্ষণ আলাপটাকে নিম্নস্বরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে উত্তেজনায় সতর্কতার বাঁধ ভাঙিয়াছে। হীরালাল কানখাড়া করিয়া শুনিল—এবং যাহা শুনিল, তাহা একেবারে বিচিত্র খবর তাহার কাছে। ঝড়ের সঙ্কেত নাকি উঠিয়াছে—রুটি চলিতে শুরু করিয়াছে, ইংরাজের আর রক্ষা নাই। হিন্দুস্থানের তখ্‌তে অবশ্যই বাহাদুর শাহ বসিবেন কিন্তু মোটের উপর হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া—আর দেরী নাই।

এই রুটি-চলাটা যে কী বস্তু তাহা হীরালাল ঠিক বুঝিল না—তবে এটুকু বুঝিল যে সিপাহীরা গত সন্ধ্যায় যতটা গোপনীয়তার শপথই লউকনা কেন—কথাটা আর গোপন নাই। শুধু তাহাই নয়, সারাটা দেশেই একটা আলোড়ন জাগিয়াছে।···দুশ্চিন্তাটা একরকম ভুলিয়াই ছিল এতক্ষণ। এখন আবারও হীরালালের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে দুধের শূন্য ভাঁড়টা লইয়া স্থির নিষ্পলক নেত্রে সামনের নিমগাছটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

নিমগাছটার দিকে চাহিয়া রহিল বটে কিন্তু নিমগাছটা তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে চোখের মধ্য দিয়া দেখার খবরটা যখন মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছিল তখন সে প্রথম অনুভব করিল যে গাছতলাটাতে একটু অস্বাভাবিক রকমের ভীড়। আর একটু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল যে, ভীড়টা ঠিক সাধারণ বেকার পথিকের ভীড় নয়। দুচারখানা ডুলিও আশেপাশে দাঁড়াইয়া আছে। অর্থাৎ কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত লোক সেখানে ভীড় জমাইয়াছে। এবং সে ভীড় যে একটি কোন বিশেষ লোককে কেন্দ্র করিয়া, তাহাও বলিয়া দিতে হইল না।

হীরালাল দুধ-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে কি কোন বৈদ্য ওষুধ দিচ্ছে?'

'না, না'—সে একটু বিস্মিত হইয়াই তাকাইল, 'ওখানে সাধু বাবা হাত দেখছেন!'

'সাধু বাবা?'

'হাঁ—এক সাধুবাবা আছেন। খুব ভাল হাত দেখেন। তবে বড় খাঁই, বড়লোক ছাড়া কেউ ঘেঁষতে পারে না। পাঁচ আনা পয়সা ক'রে দিতে হয় পূজোর জন্যে—তবে উনি হাত দেখেন।'

'খুব ভাল গোনেন নাকি?'

'খুব ভাল। লোকে বলে উনি সর্বজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ। লোকের উপকারের জন্যে এসে বসেন ওখানে।'

হীরালাল ভাঁড়টা ফেলিয়া একটু জল চাহিয়া লইয়া হাত ধুইল। তাহার পর কৌতূহলী হইয়া সাধুবাবার চারিদিকের ভীড় ঠেলিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল। লাল কাপড় পরা একটি মধ্য-বয়সী লোক। দীর্ঘ চুল এবং দীর্ঘতর দাড়ি গোঁফ—গলায় রুদ্রাক্ষ ও শঙ্খের মালা। অর্থাৎ তান্ত্রিক। তাহার মামার বাড়ীর দেশে শ্মশানকালীর মন্দিরে এক তান্ত্রিক সাধক থাকেন, তাহাকে বহুবার দেখিয়াছে হীরালাল। তান্ত্রিক সে মোটামুটি চেনে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে তাঁহার গণনা দেখিল। নানা লোককে নানা কথা বলিলেন। কাহারও মুখে হাসি ফুটিল, কাহারও মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। পরিষ্কার এ-দেশোয়ালী বুলিই তিনি বলিতেছেন, তবু হীরালালের কেমন একটা সন্দেহ হইল যে সাধু-বাবাটি বাঙালী।

বেশ খানিকটা পরে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ভীড় অনেকটা পাৎলা হইল। এইসময় হঠাৎ একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়াই সাধুবাবা হীরালালকে দেখিতে পাইলেন। এবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তারপর আরও যে দুই-একজন অবশিষ্ট ছিল তাহাদের সোজা হাঁকাইয়া

দিলেন ; 'আজ তোমরা যাও। আজ আর আমি দেখবনা !' তার একটু আধটু মিনতি করিল কিন্তু বেশি কিছু করিতে সাহস করিল না। বোঝা গেল যে সকলেই 'বাবা'কে একটু ভয় করে। সকলে চলিয়া যাইতে তিনি ইঙ্গিতে হীরালালকে কাছে ডাকিলেন।

'তুমি বাঙ্গালী, না বাবা ? তোমার বাড়ী কোথায় ?'

'আমার বাড়ী কলকাতাতেই।'

'এখানে ? চাকরী উপলক্ষে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হিরাটে কাজ করি। অফিসের কাজে এখানে এসেছি !'

'খুব সাবধানে থেকো বাবা তিনচারটে মাস। খুব হুঁশিয়ার থেকো।'

হীরালালের মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে তাঁহার সামনে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে, তা'হলে কি—?'

'হ্যাঁ। লড়াই বাধবে। বিষম লড়াই। দেখি তোমার হাতটা—!'

হীরালাল সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া দিল।

তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার ডান হাতখানা দেখিলেন। সূর্য অস্তগামী হইলেও আলো একেবারে যায় নাই। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া হাতটা দেখিয়া একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে হীরালালের কপালের দিকে তাকাইলেন তাহার পর কহিলেন, 'না, তোমার ভয় নেই। বরং তোমার উন্নতিই হবে। তবে বিপদে পড়বে তুমি, অপরের জন্য। বোধ করি এক স্ত্রীলোকের জন্য !'

'আচ্ছা তার—তার কি হবে ?'

'কার ? সেই স্ত্রীলোকের ?'···আর একবার হীরালালের কপালের দিকে চাহিলেন, 'সে কী যবনী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তারও ঘোরতর সঙ্কট-যোগ আছে। এ-রকম যোগ থাকলে সাধারণত অপঘাত হয়।'

'এর অন্যথা হয় না ?'

'হয় বৈকি বাবা। পুরুষকার দৈবকেও লঙ্ঘন করে মধ্যে মধ্যে। তবে সে খুব কম-ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়।'

'আচ্ছা, এ লড়াইয়ের পরিণাম কি ?'

'ইংরেজ জিতবে। বরং তাদের রাজত্ব আরও দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হবে। আরও প্রায় শতবর্ষকাল তারা এদেশে রাজত্ব করবে।'

হীরালাল কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, 'কিন্তু আপনি এখানে কী ক'রে— মানে—, আপনার বাড়ী কোথায় ?'

'আমাদের পূর্বশরীরের কথা বলা নিষেধ বাবা। ঘটনা-চক্রে এখানে এসে পড়েছি। ইচ্ছা আছে এখানে আর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করব। কী হবে তা জানিনা, হুকুম হ'লে কালই হয়ত এখান ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবু চেষ্টা ক'রে দেখছি।···পয়সা চাই কিছু, সেই জন্যেই এই দোকান দেওয়া ! বসে বসে পয়সা কুড়োচ্ছি !'

হীরালাল আর কথা কহিল না। হুকুমটা কিসের তাহা সে বুঝিল না—প্রশ্নও করিল না। পিরানের একটা জেব্ ছিল, তাহারই মধ্য হইতে, সদ্য পাওয়া পাঁচটা টাকার একটি টাকা বাহির করিয়া তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল।

সাধু টাকাটা গ্রহণ করিলেন। বরং মনে হইল খুশীই হইলেন। হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'ব্রহ্মময়ী তোমার কল্যাণ করুন। তুমি শান্তি লাভ করো।···কিন্তু বাবা, ঐ যবনীটি থেকে দূরে থেকো। তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আর কী দরকারই বা—তোমার এই বয়সে, এখন থেকে—। তার ওপর ব্রাহ্মণ সন্তান !'

হীরালালের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে প্রতিবাদ করিয়া সাধুর ভুল ভাঙ্গিবারও চেষ্টা করিল না। সে নিজে যখন খাঁটি আছে তখন মিছামিছি এঁদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কথা নষ্ট করিয়া লাভ কি ?

১৬

সাধু-বাবার কাছ হইতে উঠিয়া হীরালাল একটু দ্রুত-পদেই ছাউনির রাস্তা ধরিল। সে রাতটা তাহার ছাউনিতেই কাটাইবার কথা। সেখানে আইন-কানুন বড় কড়া —সন্ধ্যার পরই দরজা বন্ধ হইয়া যায়। সেই সঙ্গে আহারের দফাও ইতি। অবশ্য সে বিদেশী, এখানে অতিথি—এখানকার নিয়ম তাহার উপর প্রযোজ্য না-ও হইতে পারে কিন্তু যদি হয় ? বিদেশবিভূঁই জায়গা—রাত কাটাইবে কোথায় ?

সে হন্ হন্ করিয়াই চলিয়াছে, অকস্মাৎ কাঁধের উপর কোথা হইতে একটা ভারী হাত আসিয়া পড়িল।

বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল—একটা দানো।

কাল রাত্রির অন্ধকারে দেখা হইলেও চিনিল, গত রাত্রের সেই দৈত্যটা, সর্দার খাঁ।

সর্দার খাঁ তাহার অভ্যাস-মত বিনা ভূমিকাতেই বলিল, 'মালেকান আর একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আর একটা কী কথা বলবেন।'

'কিন্তু—' ভয়ে হীরালালের তালু শুকাইয়া উঠিয়াছে। অহেতুক একটা ভয়। সে কোন-মতে শুষ্ককণ্ঠে কহিল, 'কিন্তু আমাকে যে ছাউনিতে ফিরতে হবে। এর পর ত আর ঢুকতে দেবেনা।'

'আচ্ছা, সে ভার আমার। আমি রাত দশটাতেও ঢুকিয়ে দিতে পারব। তুমি নির্ভয়ে এসো।'

'কোথায়?'

'এই কাছেই। উকীলপাড়ায়।'

কাল এই ব্যক্তির হাত হইতে মুণ্ডটা অল্প-একটুর জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে। সে কথা মালেকান স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। হয়ত বা সেই ভুলটুকু সংশোধনের জন্যই এই আয়োজন—নূতন একটা ফাঁদ। হীরালালের সমস্ত বুদ্ধি তাহাকে বার বার নিষেধ করিল এই ফাঁদে পা দিতে, অকারণে অজ্ঞাত বিপদের পথে পা বাড়াইতে। এটা শহরের প্রকাণ্ড রাজপথ, এখান হইতে কিছু জোর করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, এখনও সময় আছে বাঁচিবার। কিন্তু বুদ্ধিরও উপরে একটা বস্তু আছে, সেটার নাম আবেগ, তাহার বাসাটা হৃদয়ে। সেই বস্তুটিরই জয় হইল। আর একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমস্ত প্রাণটা উন্মুখ হইয়া উঠিল। সে মুহূর্ত-কয়েক ইতস্তত করিয়া কহিল, 'চলো, কোথায় যাবে। আমি যাচ্ছি।'

তাহার যে বয়স—সে বয়সে কেহ বিপদকে বিশ্বাস করে না ঠিক। আর এ বয়স হিসাব-নিকাশেরও ধার ধারে না।

কয়েকটা গলি খুঁজি ঘুরিয়া একেবারে নির্জন একটা পথে আসিয়া পড়িল দুইজনে। জনমানব-শূন্য জায়গাটা। দুদিকে বাড়ী থাকিলেও—মনে হয় যেন সব কয়টি বাড়ীরই পিছন দিক এটা, অথবা কোন বাড়ীতে কেহ বাস করে না। ইহারই মধ্যে একটা পোড়ো খাপরার চালের বাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া সর্দার খাঁ তিনটা টোকা মারিল।

হীরালালের এতক্ষণে দারুণ ভয় হইয়াছে। এই জনহীন পথ, এই পোড়ো বাড়ী—সবই ত তাহাকে বধ করিবার পক্ষে অনুকূল। হায়, হায়—তাহার বিধবা মা যে তাহার মুখ চাহিয়াই এতকাল এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়াছেন! তাঁহার সহিত বুঝি আর দেখাও হইল না।

সে বেশ একটু কম্পিতকণ্ঠেই কহিল, 'এ—এ আমরা কোথায় এলাম?' সর্দার খাঁ হাসিল। সেই ভয়ঙ্কর মুখের হাসিটাও বুঝি ভয়াবহ। আর ছায়া অন্ধকারে মনে হইল—ক্ষুধার্ত দানব একটা দন্ত-বিকাশ করিতেছে। সে হাসিয়া কহিল, 'ভয় নেই। তোমাকে মারবার দরকার হ'লে ঐ বড় সড়কেই মারতে পারতাম। আমাকে কেউ বাধা দিতে সাহস করতনা। কিন্তু মারবার জন্য মালেকান ডাকেন নি। তোমার কোন বিপদ আপদ না ঘটে—আমার ওপর এই হুকুমই আছে।'

বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, তবু হীরালাল কথাগুলা বিশ্বাসই করিল। মালেকান সম্বন্ধে এই ধরনের বিশ্বাস করিতেই যে ভাল লাগে। আশ্বস্তও হইল খানিকটা। তাই একটু পরেই যখন নিঃশব্দে কপাট জোড়াটা খুলিয়া গেল এবং একটা প্রদীপ হাতে এক বৃদ্ধা পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল, তখন সে বিনা দ্বিধায় তাহার পিছু-পিছু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীটা সত্যই পোড়ো বাড়ী—বোধকরি কাঁচের গুদাম টুদাম হইবে কারণ, উঠানময় ভাঙ্গা ও গুঁড়া কাঁচ ছড়ানো। তাহারই ভিতর দিয়া বুড়ীটা সাবধানে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সর্দার খাঁ সঙ্গে আসে নাই—খুব সম্ভব বাহিরে দাঁড়াইয়াই পাহারা দিবার হুকুম আছে তাহার উপর।

সঙ্কীর্ণ উঠানটা পার হইয়া একটা গলিপথ-মত অতিক্রম করিয়া একটা খাড়া পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এক সময়ে একটা পাকাবাড়ীর দ্বিতলে আসিয়া হাজির হইল হীরা-

লাল। এইবার বুড়ীটাও থামিল, আঙুল দিয়া পাশের একটি ঘর দেখাইয়া আলোটা সেইখানেই রাখিয়া বসিয়া পড়িল এবং নিমেষ-মধ্যে বুকের ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চোখ বুজিল। তাহার গতিক দেখিয়া বোধ হইল, সেই এক মুহূর্তের ভিতরই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সেদিকে চাহিয়া দেখিবার সময় নাই। বুড়ী যে দরজাটা দেখাইয়া দিয়াছে, ধীরে ধীরে তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। কপাট ভেজানো ছিল—ঠেলিয়া ঢোকা উচিত হইবে কিনা ভাবিতেছে—এমন সময় ভিতর হইতে পূর্ব-রাত্রিতে-শোনা সেই বিশেষ শব্দ-কয়টিই যেন এক দিন-রাত্রির ব্যবধান নিমেষে পার হইয়া কানে আসিয়া পৌঁছিল, 'ভেতরে এসো।'

সেই শব্দ-সমষ্টি এবং সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বর। সঙ্গীতের মত মিষ্ট না হউক—জাদু আছে সে কণ্ঠস্বরে। হীরালালের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, কয়েক পলকের মত যেন অবশ হইয়া আসিল সমস্ত শরীর।···কিন্তু দুর্বলতাকে সে বেশীক্ষণ প্রশ্রয় দিল না। মনে জোর আনিয়া দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

ফরাস-পাতা একটি সাধারণ ঘর। তাহারই মাঝখানে একটা কাঠের বাক্স এবং সেই বাক্সের উপর জ্বলিতেছে ডবল 'সেজ'-এর একটা আলো। বাক্সর পাশেই একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া হুসেন বেগম বসিয়া আছেন—ঘরে আর কেহ নাই। আলোটা পাশে পড়ায় তাহার মুখখানা পড়িয়াছে আলো-আঁধারিতে। ভাল করিয়া দেখা যায় না—আর সেলেও বোধকরি সেদিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে হীরালালের সাহসে কুলাইত না, সে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইল।

আমিনা তাহার সামনেটা দেখাইয়া বলিল, 'বসো। ভয় নেই—প্রতিজ্ঞা ভাঙবার জন্যে ডাকিনি। নির্ভয়ে ব'সো।'

তাহার পর—হীরালাল বসিতে না বসিতেই অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল, 'গণককে হাত দেখাচ্ছিলে বুঝি? কী বললে সে? শিগ্‌গিরই রাজা হবে, ভাল সাদী হবে—খুবসুরৎ বিবি হবে—এইত? তা কত দিতে হ'ল?'

হীরালাল স্তম্ভিত। তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। একি মায়াবিনী যাদুকরী? না সত্যই স্বর্গের দেবী!

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল আমিনা। কহিল, 'মাগো বাংগালী বাবু না? জীন কি ছরী কিচ্ছু নই আমি। তুমি যখন তখন হাত দেখাচ্ছিলে তখন আমি তোমার সামনের রাস্তা দিয়েই ডুলি করে এসেছি। তুমি টের পাওনি। তাছাড়া সর্দার খাঁ সারাটা দিনই তোমার পেছনে আছে—হাউনি থেকে বেরোন পর্যন্ত। এ শহর ভারি খারাপ জায়গা, নানারকমে বিপদ ঘটতে পারে। তাই ওকে একটু নজর রাখতে বলেছিলুম।'

হীরালাল এবার চোখ তুলিয়া চাহিল।

কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, অনুরাগ—দৃষ্টিতে যতটা নিবেদন করা যায় ততটাই বুঝি সে ঢালিয়া দিতে চাহিল এই যবনীর পায়ে—এই মাত্র যাহার সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিতে সন্ন্যাসী নিষেধ করিয়াছেন।

আমিনা পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু কী বললে গণৎকার তা ত বললে না!'

হীরালাল সব সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিল, কণ্ঠস্বরে বেশ একটু দৃঢ়তা আনিয়া বলিল, 'ঐ গণক একজন নাম-করা সাধু। খুব ভাল জ্যোতিষী। এখানে সকলেই তাই বলে।'

'তাই নাকি?' আমিনা সোজা হইয়া বসিল। আগ্রহের সুরে বলিল, 'কী বললে সাধু?'

'বললে যে ভারি লড়াই বাধবে। কিন্তু ইংরেজ হারবে না। বরং তার শক্তি আরও বাড়বে।'

ঈষৎ অবজ্ঞায় আমিনার ওষ্ঠকোণ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিল, 'এ আমিও বলতে পারতাম বাবুজী। এর জন্য সাধু কি জ্যোতিষীর দরকার ছিল না।'

'তবে? তবে কেন আপনি এর ভেতর যাচ্ছেন?' সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বেশ একটু আবেগের সঙ্গেই সে বলিল, 'আমি আপনার কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, আপনি এর ভেতর এলে বড় বিপদে পড়বেন!··· হয়ত, হয়ত—।'

'আমার মৃত্যুও হ'তে পারে—এইত?' আমিনা খুবই সহজ ভাবে বলে, 'তাতে আর আমার ভয় নেই।'

'কিন্তু কেন আপনি এই ঝুঁকি ঘাড়ে নিচ্ছেন—সব আয়োজন বৃথা যেনেও? আমি অনুনয় করছি আপনি এখনও ফিরুন। মিছিমিছি এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে

যাবেন না। এ আপনার কাজ নয়—যারা করে তারা করুক, আপনি এর ভেতর দাঁড়াবেন না।'

আমিনার আয়ত ও বিস্ফারিত দুটি চোখের দৃষ্টিতে বোধ করি কিছু বিস্ময়ই ফুটিল। সে খানিকটা অপলক নেত্রে হীরালালের মিনতি-ভরা চোখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'আমি মারা গেলে তুমি দুঃখিত হবে বাবুজী? তুমি—তুমি আমার জন্যে ভাবো?'

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কোমল হইয়া আসিল। তাহার দুই চোখে যেন স্নেহ উপচিয়া উঠিল। তারপর সে কতকটা ছেলে-মানুষের মতই বলিয়া উঠিল, 'তবে, তবে তুমি কেন আমাকে এটুকু সাহায্য করছ না?'

যেন কোন্ অদৃশ্য মন্ত্রবলে হীরালালের সব সঙ্কোচ, সব কুণ্ঠা দূর হইয়া গিয়াছে—সে নিজের অজ্ঞাতেই আর একটু কাছে সরিয়া আসিল। তেমনি আবেগের সঙ্গেই বলিল, 'আপনার জন্যে ভাবি বলেই আপনাকে সাহায্য করতে রাজী নই। ভাবি বলেই অনুনয় করছি—আপনি এ সবের বাইরে থাকুন। আপনি এর ভেতর যাবেন না। আপনি নিরাপদে থাকলেই আমি খুশী, আর কারুর জন্যে ভাবি না।'

খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল আমিনা। অন্যমনস্ক হইয়া, যেন সেই অল্প সময়টুকুর ভিতরেই কত কি ভাবিয়া লইল, অতীতের অনেকগুলি ছবিই তাহার চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া গেল—তারপর একটু ম্লান হাসিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, 'আমার আর ফেরবার কোন পথ নেই বাবুজী, নিরাপদে বেঁচে থাকতেও আমি চাই না। আমার কথা তুমি ঠিক বুঝবে না। এখন···আমাকে এই দিকে একটু সাহায্য করলেই আমার প্রকৃত উপকার করা হবে। আর তাতে তোমার কোন বিপদ নেই—তা থাকলে আমি তোমাকে কোন অনুরোধই করতাম না। তুমি এটুকু করতে পারবে না আমার জন্যে?'

সেই অবিশ্বাস্য রকমের মধু-ভরা কণ্ঠে ঐকান্তিক মিনতি।

ইহার কাছে বিবেক, সংস্কার, সত্য, ইহকাল-পরকাল সবই তুচ্ছ মনে হয়। আজও হীরালালের ললাটে স্বেদবিন্দু জমিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল ঘরে আর দুই-একটা দরজা থাকিলে ভাল হইত—বাতাস বড় কম। সে পিরাণটার গলার কাছে আঙুল দিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

আমিনা নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

তাহার চোখে কি শুধুই মিনতি, শুধুই মায়া?

আরও অনেক কিছু বোধ করি আছে সে চোখে। যাহার কোন সংজ্ঞা নাই। যাহাকে কোন বিশেষণে অভিহিত করা যায় না। বিচিত্র সে চাহনি। হীরালাল বুঝিবার চেষ্টা করিল সে চোখে চোখ রাখিতে—চোখে চোখ রাখিয়া দৃষ্টির মধ্য দিয়া অন্তরের দৃঢ়তা বুঝাইয়া দিতে—কিন্তু কিছুতেই পারিল না। একবার মাত্র সে চাহনি স্পর্শ করিয়াই তাহার চোখ দুইটা ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে কোণে-কোণে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

উত্তর দেওয়া একটা উচিত, আর দিতেই হইবে শেষ পর্যন্ত—তাহা সে বোঝে। কিন্তু উত্তরটা সে জোগায় না। শুধু অনর্থক আকুলতাতে কয়েক মুহূর্তকেই কয়েক যুগ বলিয়া বোধ হয়।

অবশেষে তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন বোধ হয় মা-কালীই!

খোলা দ্বারপথ দিয়া নিঃশব্দে কে একজন ঘরে প্রবেশ করিলেন। সম্ভ্রান্ত নাগরিকের পোষাক, বয়স পঞ্চাশের কিছু কমই হইবে হয়ত—প্রশস্ত ও প্রশস্ত ললাটে সকালের 'কুলি' বা সিন্দুর-বিন্দু এখনও লাগিয়া আছে। টুপির ভিতর দিয়া টিকির প্রান্ত প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ আগন্তুক হিন্দু।

তাঁহাকে দেখিয়া আমিনা অভ্যর্থনা জানাইল, 'আসুন বাবুজী।'

তারপর হীরালালের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'এরই বাড়ী। বাবু নানকচাঁদ।'

হীরালাল মাথা হেঁট করিয়া নমস্কার করিতে তিনিও প্রতি-নমস্কার করিলেন। তাহার পর বসিয়া বিনা ভূমিকাতে একেবারেই কাজের কথা পাড়িলেন, 'ছাখো বেগম সাহেব, এ বাংগালী ছোক্‌রাকে আমি চিনে নিয়েছি। মানুষ চরিয়ে খাই, আর যত রাজ্যের বদ্‌মানুষ—একে চিনতে আমার দেরী হয় নি। যতই যা করো, বেইমানী একে দিয়ে করাতে পারবে না। তার চেয়ে আমি যা বলি সেইটেই শোন।'

তাহার পর হীরালালের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'ভাখো বাবুজী—আমিও তোমারই দলের। আমি বিশ্বাস করি না যে ইংরেজ হারবে। সিপাহীরা অন্ততঃ যে জিতবে না এটা নিশ্চিত।...কিন্তু কী করব—প্রথমত এদের—মানে এই বেগমসাহেবাদের, আমি স্নেহ করি। একেবারে এদের কথা এড়াতে পারি না। তাছাড়া যদি চারিদিকে আগুন জ্বলে, সোজাসুজি এদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে বাঁচা মুস্কিল। সুতরাং আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করতেই হয়।...তুমিও এঁকে স্নেহ করো অথবা ভক্তি করো—তা দেখতেই পাচ্ছি। সুতরাং তোমার ইমান্ যা সত্য থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে যেটুকু উপকার করা সম্ভব—সেটুকু তুমি এদের জন্যে করবে তা আশা করতে পারি ত?'

পরম আগ্রহের সহিত হীরালাল বলিয়া উঠিল, 'নিশ্চয়। নিশ্চয় করব।'

'তবে শোন। তুমি ত দু' একদিনের মধ্যেই মীরাট রওনা হবে? তুমি যেদিন পৌঁছবে তার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নানা ধুন্ধুপন্থও মীরাট পৌঁছবেন। তাঁকে তোমার নাম-ঠিকানা দেওয়া আছে। তিনি হয়ত তোমার খোঁজ ক'রে তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করবেন। তিনি যাচ্ছেন খবর নিতে যে—সত্যিই সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহস করবে কিনা শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ সত্যিই তারা ক্ষেপেছে কিনা! এটা—তুমি যা শুনেছ এবং জেনেছ—সেটুকু বলতে পারবে ত? তুমি যদি জেনে থাকো যে সিপাইরা ক্ষেপেছে সেটা তাঁকে বলতে দোষ কি? এটা ত কারুর সঙ্গেই নিমকহারামী হ'ল না। ইংরেজদের সঙ্গেও না—সিপাইদের সঙ্গেও না—কারণ তুমি তাদের দলের লোককেই খবরটা দিচ্ছ। যদি তোমার ছাউনীর সম্বন্ধে কোন খবর জানতে চান ত তুমি সটান বলো যে তা বলতে পারবে না তুমি—অথবা তুমি নতুন এসেছ—কিছু জানো না। যা ভাল মনে করো তাই বলো। তোমাকে নিমকহারামী করতে আমি বলবনা।...শুধু তুমি ঐ খবরটিই তাঁকে দিও। কেমন, রাজী আছ ত?'

হীরালাল মন দিয়া কথাগুলি শুনিয়াছিল। শুনিতে শুনিতেই ঘাড় হেঁট করিয়াছিল। নানকচাঁদের কথা শেষ হইতেও অনেকক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া রহিল। তারপর সংক্ষেপে শুধু কহিল, 'রাজী।'

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নানকচাঁদের দিকে তাকাইয়া হীরালালকে কহিল, 'আর একটি কথা—বেইমানী ঠিক নয়—ছোট একটি মিছে কথা—যদি আমার জন্যে বলতে পারো ত তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব বাবুজী। খুব মিছেও নয়—এ কথা যদি পারো ত বিশ্বাস করো—এর মধ্যে অনেকটাই সত্য আছে। নানাসাহেবকে বলো যে "সিপাহীরা আপনার মুখ চেয়েই আছে। তারা আপনাকেই তাদের নেতা হ'লে মনে করে।"—পারবে বলতে?'

তেমনি ঘাড় হেঁট করিয়াই হীরালাল জবাব দিল, 'পারব।'

তারপর সে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'এবার তাহ'লে আসি। ছাউনিতে ফিরতে হবে আমাকে।'

'ভয় নেই বাবুজী। সর্দার খাঁ ঠিক পৌঁছে দেবে। না ফিরলেও তোমাকে কেউ কিছু বলত না। তোমার সঙ্গে যারা এসেছে তারা কেউই আজ রাত্রে ছাউনির ভেতর কাটাবে না—বাইরেই তাদের প্রলোভন বেশী।'

'আমি কিন্তু ফিরব—'তাড়াতাড়ি বলে হীরালাল।

আমিনা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ওষ্ঠের প্রান্তে সেই ভুবনভুলানো হাসি, চোখে সেই স্নেহ মিশানো বিদ্রূপ। সে হাসিয়া বলিল, 'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ বাবুজী। ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে বাইরে রাত কাটাতে বলছি না। আমি জানি সে প্রকৃতির লোক নও তুমি-চলো তোমাকে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

তাহার পর নিজের চম্পকাঙ্গুলি হইতে একটি বড় চারকোণা লাল পাথরের আংটি খুলিয়া হীরালালের হাতে দিয়া কহিল, 'এই আংটির জোড়া যে তোমাকে দেখাবে বুঝবে সে-ই নানাসাহেবের লোক। তিনিও তোমাকে চিনতে পারবেন এই আংটি দেখলে। বুঝেছ?'

হীরালাল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। কিন্তু পরক্ষণেই একটি কথা মনে পড়িয়া ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, 'কিন্তু

এ আংটি ফিরৎ দেব কেমন ক'রে আবার ? নানাসাহেবের হাতেই দেব কি ?'

'না, না। নানাসাহেবকে ত নয়ই।' তাহার পর আর একটু হাসিয়া আমিনা বাঁ-হাত খানা হীরালালের কাঁধে রাখিয়া ডান হাতে আজও নিজের রেশমী ওড়না দিয়া সযত্নে তাহার ললাট ও কণ্ঠের ঘাম মুছিয়া লইয়া কহিল, 'ফেরৎ নাই বা দিলে ? আমার আংটিটা কাছে রাখতে কি দেরা করবে তোমার ?'

হীরালালের মুখ আগুনবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না, শুধু আংটিটা একবার নিজের মাথায় ঠেকাইয়া সযত্নে পিরানের ভিতর রাখিয়া দিল।

আমিনা অল্পক্ষণ নিঃশব্দে তাহার আনত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর একটা ছোট্ট দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া সস্নেহকণ্ঠে কহিল, 'চলো বাবুজী, তোমাকে সর্দারের জিম্মা ক'রে দিই।'

হীরালাল দুইজনকেই নমস্কার জানাইয়া আমিনার পিছু পিছু বাহির হইয়া আসিল।

ক্রমশঃ

THE
UNION BANK OF INDIA LIMITED

Estd : 1919

Head Office : Apollo St., Fort, Bombay, 1.

Capital Paid-up ... ... Rs. 40,00,000
Reserve and other Funds ... Rs. 35,00,000

Chairman : Mr. M. S. Captain

Banking business of every description transacted including Foreign Exchange.

F. K. F. NARIMAN
General Manager.

পৃথিবীর কবি রবীন্দ্র (৪০ পৃষ্ঠার পর)

উদ্ঘাটন করতে প্রয়াস পান, তাঁর পক্ষেই মৃত্যুর পূর্বে বলা সম্ভব হয়েছিল 'আরোগ্যে'তে

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী—

জীবনের সব দিকেই কবির দেখা হয়েছে—বস্তুহীন কল্পলোকে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। বস্তুহীন দর্শন তিনি অনুশীলন করেছেন, অধ্যাত্মজীবনের রসও তিনি পেয়েছেন, কিন্তু সত্যকারের তৃপ্তি কোথাও তিনি পাননি, পেলেন এই "মধুময় পৃথিবীর ধূলিতে।" এই পৃথিবীর ধূলিতেই তাই তাঁর জীবনের পরম চরিতার্থতা। "মধুবৎ পার্থিব রজঃ" বৈদিক ঋষিদের এই বাণীই কবির অন্তরের উপলব্ধি।

সন্তরোত্তীর্ণ দেহে কবি খোলা বাতায়নে দাঁড়িয়ে দেখছেন পৃথিবীর সৌন্দর্য-মাধুর্য, স্মৃতিসরোবরে ফুটে উঠেছে এক একটা স্মৃতি-পদ্ম। মানুষ ও পৃথিবীর লীলা বৈচিত্রই তাঁর 'স্মৃতির পদ্ম' এইসব লীলাবৈচিত্র তুচ্ছ ঘটনা ও বস্তু আশ্রয় করা বটে, কিন্তু কবির কাছে তা সুন্দর স্বপ্নময়। এর পরে যদি তাঁর মৃত্যু আসে তাতে তিনি দুঃখিত হবেন না। কারণ পরিপূর্ণ তৃপ্তি তাঁর পাওয়া হয়ে গেছে।

কবির কাছে পৃথিবী পুণ্য ও পবিত্র। তার মাটির আঁকে আপন কপালে মঙ্গলতিলক দিতে দেখেছি 'পত্রপুট'এর 'পৃথিবী'তে। তিনি আবার যাবার সময় নূতন করে সেই পৃথিবীর ধূলির তিলক পরতে চান।

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে—।

পৃথিবীর ধূলিতেই তিনি জীবনসত্যের আনন্দরূপ দেখেছেন—

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি—

তাই তিনি ধূলিকেই প্রণতি জানাচ্ছেন—

এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

মানুষে মানুষে প্রীতি ও প্রেম এই পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করে—

.....মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্ঘ দেয় তারে।
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চির মানবের সিংহাসন।

যতই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কবি, ততই মনে আসছে অতীতের সুখ দুঃখের স্বপ্নময় স্মৃতিগুলো, ততই তিনি আরও আঁকড়ে ধরতে চাইছেন পৃথিবীকে। কবি নিজেকে পৃথিবীর কবি বলে সকলের কাছে আপন পরিচয় দিলেন—

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

পৃথিবীকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করলেও কবি মনে করেন তার বিরাটত্বের কথা চিন্তা করে, যেন তাঁর সব কিছু জানা হয়নি।

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
কিন্তু যতটুকু জেনেছেন তা একান্ত বাস্তব ; স্বপ্ন নয়।
রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম।
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

মৃত্যু শয্যাতেও কবি শেষবারের মত মনে করলেন, মধুময় এ পৃথিবী, মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি ও ধূলিমাখা মানুষ। এদের ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে কবি পৃথিবীর কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইলেন, পৃথিবীর আশীর্বাদ তাঁর কাছে চির শাশ্বত, চির শক্তিমান। তিনি কামনা করেছেন—

যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা'
তবে তারে সঙ্গে নিয়ে যাই।

যে মহাশক্তি বিশ্বজগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছে, যে 'ছলনাময়ী' মহাশক্তি "সৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ" করে রেখেছে, সেই মহাশক্তি কবির মৃত্যুদূত হয়ে এসেছে কবির দ্বারে। কবি তাকে ফেরাতে পারেন না।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে তিনি পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে বিদায় চাইলেন—

বিদায় দেহ ভাই
সকলে আমি প্রণাম করে যাই।

তারপর কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর জড়দেহ ভস্মীভূত হয়ে গিয়ে পৃথিবীর মাটিতেই মিশিয়ে গেল, আত্মা মিলিয়ে গেল পৃথিবীরই আকাশে বাতাসে। মৃত্যুর পরও কবি বেঁচে রইলেন পৃথিবীতেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।

রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন-বীমায় জাতির সমৃদ্ধি ও ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি

যাঁহারা বীমা করিবেন :

জনসাধারণের সকলকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কার্যকরীভাবে সুসংহত ও জাতীয় পরিকল্পনার সাফল্যে নিয়োজিত করিবার পক্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন-বীমা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বীমাপত্র গ্রহণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তাসাধনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই জীবন-বীমা দ্বারা যৌথভাবে সমগ্র জাতির অধিকতর শ্রী ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়।

এখনকার বীমাপত্র সম্পর্কে সরকারের পূর্ণ দায়িত্ব থাকায় ইহার আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন-বীমায় প্রিমিয়ামের হার ও বীমাপত্রের সর্তসমূহ সমান ও সুনির্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রিমিয়ামের হার আরও হ্রাস করার কোনও অভিপ্রায় সরকারের নাই।

যাঁহারা বীমা করিয়াছেন :

বীমা-তহবিল এখন সরকারের পরিচালনাধীন থাকিবে বলিয়া জীবনবীমা বহুবিধ সুবিধাসহ প্রিমিয়াম বাবদ প্রদত্ত অর্থের মূল্যে আরো নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সারবান হইয়াছে।

ন্যায্য দাবীর টাকা অবিলম্বে মিটাইয়া দিবার জন্য এবং বীমাপত্রের উপর ঋণ সহজ সুলভ করিবার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়াছেন।

এজেন্টগণ :

রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে সরকার বীমাকে জনসাধারণের কাছে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতে চাহেন। জীবন-বীমার এজেন্টগণ সংঘবদ্ধভাবে দেশের সুদূরপ্রান্তে জীবন-বীমার ঝুলি বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য এখন হইতে সচেষ্ট হইবেন। এইরূপে তাঁহারা নিত্য নূতন ক্ষেত্র জয় করিবার জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে থাকিবেন।

ফিল্ড অফিসারগণ :

এখন হইতে বীমা-সংগঠনের বিন্যাস ও বিস্তৃতি যেমন ব্যাপক তেমনি সুসংহত হইবে। ফিল্ড অফিসারগণ তাঁহাদের জ্ঞান ও গণ-সংযোগলব্ধ বিশেষ অভিজ্ঞতার গুণে এই সংগঠনের মেরুদণ্ডস্বরূপ বিবেচিত হইবেন। অতএব নিত্য নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া নূতন শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও সাহসের পরিচয় দেওয়া তাঁহাদের কর্তব্য।

রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন বীমায়

প্রিমিয়ামের হার একই রকম—কোনও তারতম্য নাই; বীমার সর্তগুলিও একইপ্রকার; বীমাপত্র বিশেষ লাভজনক; পরিচালন-ব্যয় পরিমিত; জনসেবার ক্ষেত্রে বীমা-কর্মিগণের সেবা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

অবিলম্বে বীমা করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলুন এবং দেশের অগ্রগতির সহায়ক হউন।

ভারতে জীবন-বীমা-ব্যবসায়ে নিযুক্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক প্রচারিত

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : 22-6853-58

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ভারত সরকারের নূতন শিল্পনীতি

গত ৩০শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকসভায় ভারতসরকারের নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখের সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিল্পনীতি পরিচালিত হচ্ছিল। সেই ঘোষণার পরে আট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এ সময়ে ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। ভারতের নূতন সংবিধান রচিত হয়েছে ও তাতে কতকগুলি মৌলিক অধিকারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য পরিচালনার মূল নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুসংহত ভাবে পরিকল্পনা এগিয়ে চলেছে এবং প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে লোকসভা সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য হিসাবে সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়ে তোলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাওয়ার দরুণ বিশেষ করে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতে, সরকারের শিল্পনীতির পুনরায় বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা, বিশেষতঃ গুরু শিল্প ও কল-কব্জা প্রভৃতের শিল্পের উন্নয়ন, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং বৃহৎ ও ক্রম বর্ধমান সমবায় প্রচেষ্টার সাফল্যের উপর দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ভর করছে। এসব কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা লাভজনক কর্ম-সংস্থানের প্রচুর সুযোগ হবে এবং জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নীত হবে। সঙ্গে সঙ্গে ধন ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য কমাতে চেষ্টা করতে হবে এবং স্বল্প-সংখ্যক লোকে যাতে সমস্ত অর্থনীতিকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখবার সুযোগ না পায় সে ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন হবে। কাজে কাজেই সরকারকে শিল্পক্ষেত্রে উত্তরোত্তর অধিক দায়িত্বের সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। নূতন শিল্পকেন্দ্র স্থাপন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বে-সরকারী মহলের দায়িত্ব তাই বলে একটুও কম নয়। বে-সরকারী মহলের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ আছে। যেখানেই সম্ভব সহযোগিতার নীতি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করতে হবে এবং বে-সরকারী মহলের কার্যবিধি অধিকতর সমবায় প্রথার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।

শিল্পোন্নয়নে সরকারের দায়িত্ব অনুসারে, শিল্পসমূহকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে যে সকল শিল্পকে রাখা হয়েছে, তাঁদের উন্নয়নের পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র সরকারের। এ রকম শিল্প আছে সতেরটি—অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী, পরমাণু-শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, লৌহ ও ইস্পাতের ভারী ঢালাই, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের ও খনি খননের ভারী যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূল শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি, কয়লা, খনিজ তৈল, আকাশপথের পরিবহন, বিমান নির্মাণ, রেলপথের পরিবহন জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, স্বর্ণ ও হীরা, সিসা, দস্তা, তামা ইত্যাদি ধাতুর খনন কার্য, বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও বণ্টন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সব শিল্পকে রাখা হয়েছে, তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী মহলদ্বয়ের উদ্যমের প্রয়োজন হবে। এ রকম শিল্পের সংখ্যা

১২টি—লাহ, রাসায়নিক সার, রাস্তার পরিবহন, সামুদ্রিক পরিবহন, কল-কব্জা, ইত্যাদি। এ ছাড়া বাকী সমস্ত শিল্প থাকবে বে-সরকারী মহলের আওতায় এবং তাদের উন্নয়ন নির্ভর করবে বে-সরকারী মহলের প্রচেষ্টার উপর। বে-সরকারী মহলকে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া হবে কিন্তু তাদের সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে অবশ্যই সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে।

শিল্পকে তিন ভাগে ভাগ করলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী মহল একে অন্যের গণ্ডীর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে। তা' ছাড়া যে কোন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার অধিকার সর্বদাই সরকারের কাছে উন্মুক্ত থাকবে।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় অর্থ-নীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ভূমিকারও উল্লেখ করেন এবং কর্ম সংস্থান ও জাতীয় আয় বণ্টনের উপায় হিসাবে এদের উন্নয়নের উপর জোর দেন।

সরকারের শিল্পনীতি পুনরায় বিশ্লেষণ করায় দেশের ব্যবসায়ী মহল ও অন্যান্য অনেক সম্প্রদায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই শিল্পনীতির প্রভাব অনুভব করা যাবে।

জাতীয় উন্নয়নে নেপা মিল

ভারতবর্ষে এতদিন পর্যন্ত সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা না থাকার দরুণ প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা এদেশ থেকে অন্যদেশে চলে যেত। ১৯৪৭ সালে নাগার প্রেস সিণ্ডিকেট লিমিটেড নামে একটি যৌথ কোম্পানী এদেশে সংবাদ পত্রের কাগজ উৎপাদনের চেষ্টা করে। কিন্তু নানা অসুবিধার দরুণ এরা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে মধ্য প্রদেশ সরকার ও ভারতসরকার এই মিলটির উন্নয়নের জন্য তৎপর হন। মিলটি এখনও যৌথ কোম্পানী হিসাবে থাকলেও, মূলতঃ এটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান।

ভারতের অর্থনীতিতে নেপা মিলের গুরুত্ব যথেষ্ট। যে কোন দেশেই সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদনের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কাগজ উৎপাদন করাই বড় কথা নয়, কাগজ স্বল্পমূল্যে পরিবেশন করাই বড় কথা। এজন্যে মিলে আধুনিক ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ও কারিগর ও শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা থাকা দরকার।

এই মিলে এখন প্রতিদিনে ৬০ টন কাগজ উৎপন্ন হচ্ছে এবং মিল যখন তার পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার করবে তখন প্রতিদিনে ১০০ টন কাগজ উৎপাদিত হবে। এর ফলে বছরে চারকোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। এই মিলে প্রয়োজন হলে সংবাদপত্রের কাগজ ভিন্ন অন্যান্য ধরনের কাগজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করাও সম্ভব।

নেপা মিলে একটি ভাল গবেষণাগার আছে। কাগজ উৎপাদনের জন্য শক্ত কাঠের মণ্ড ব্যবহারের জন্য এখানে সর্বদা গবেষণা কার্য চলছে। বর্তমানে সাবাই নামে একটি ঘাসে কাঠের মণ্ড থেকে শতকরা ৭০ ভাগ ও বাঁশের মণ্ড থেকে বাকী ৩০ ভাগ নিয়ে কাগজ উৎপাদন করা হচ্ছে।

এখানে শিক্ষানবীশ ও কারিগরদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। অপরাপর কাগজের মিলের থেকেও শিক্ষানবীশগণ এখানে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পাবেন।

নেপা মিলের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচবৎসর কালের জন্য শান্তি রক্ষার এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এখানে প্রত্যেক কর্মচারীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

নেপা মিলের চতুষ্পার্শ্বে একটি শহর গড়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে সেখানকার বসতি বেড়ে যাবে ও অন্যান্য শিল্প আশে পাশে গড়ে উঠে সমস্ত অঞ্চলটির রূপ বদলে দিয়ে জাতীয় উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে বলে আশা করা যায়।

ভারতে শক্তির (Energy) সরবরাহ

কোন দেশ শিল্পে কতটা অগ্রসর তা জানবার অন্যতম উপায় হচ্ছে সে দেশের শক্তির (Energy) কাটতির

পরিমাণে থেকে। এদিক থেকে বিচার ক'রলে ভারত প্রধান প্রধান শক্তি ব্যবহারকারী দেশগুলির তালিকায় কেবলমাত্র একটি নিম্ন স্থান লাভ করবে। সমস্ত পৃথিবীতেই শক্তির চাহিদা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে এবং ভারতেও এর লক্ষণ অনুভব করা যাচ্ছে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল থেকে ভারতে শক্তির চাহিদা যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে তা সহজেই অনুমেয়।

শক্তির উৎসকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা চলে—বাণিজ্যিক ও সাধারণ। আধুনিক শিল্পে বাণিজ্যিক শক্তি অপরিহার্য। বাণিজ্যিক শক্তি সাধারণতঃ উৎপন্ন হয় কয়লা, বিদ্যুৎ ও পেট্রোলিয়ম থেকে। এই তিনটি উৎসের মধ্যে তৃতীয়টি অর্থাৎ পেট্রোলিয়ম ব্যবহারের দিক থেকে অপর দুটি থেকে কিছু বিশেষ সুবিধাজনক। আয়তনের জন্যে কয়লার যেমন প্রচুর স্থানের প্রয়োজন তেমনই আবার তা নিয়ে কাজ করাও অসুবিধাজনক। কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কল-কব্জা অত্যন্ত ভারী হয় ও তাদের কর্ম ক্ষমতা খুব বেশী নয়। কয়লা ব্যবহারে ধূলীকৃত ছাইয়ের প্রশ্নটিও খুব সহজ নয়। বিদ্যুৎ শক্তির প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই যে একবার এই শক্তি উৎপন্ন হলে তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করে ফেলতে হবে, কারণ তা ধরে মজুত করে রাখা সম্ভব নয়। এর আর একটি অসুবিধা হচ্ছে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কল-কব্জাগুলির দাম অত্যন্ত বেশী। তৈলের কিন্তু এসব অসুবিধা নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে ব্যবহার, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর, পরিমাপণ ইত্যাদি ব্যাপারে তৈল খুব সুবিধাজনক। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলির শিল্পগুলিকে আরও সম্প্রসারণ এবং শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে লোক-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শক্তির কাটতির হারও ক্রমাগত বেড়ে চলবে মনে করা সঙ্গত।

ভারতের বর্তমান উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ ৩১৯ লক্ষ টন (coal equivalent)। তারমধ্যে ২৮০ লক্ষ টন কয়লা, ৪৫ লক্ষ টন বিদ্যুৎ (coal equivalent) এবং ৪১ লক্ষ টন তৈল (coal equivalent). ১৯৬০-৬১ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালের শেষ বৎসরে উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ প্রায় ৫৬৯ লক্ষ টন হবে বলে অনুমান করা যায়। বিভিন্ন উৎসের হিসাবে নিলেও ভারতের মাথাপিছু বাণিজ্যিক শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ০·১ টন। আর সেখানে আমেরিকায় ১০ টন, ইংলণ্ডে ৬টন, জার্মেনীতে ৩১ টন, রাশিয়াতে ৩টন, জাপানে ০·৮ টন। ভারতে বাণিজ্যিক শক্তির কাটতি শতকরা ৫·৬ ভাগ হারে বাড়ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এই হার হয়ত ১০ ভাগে গিয়ে পৌঁছোবে। জল বিদ্যুৎ শক্তির একটি অফুরন্ত উৎস হলেও এর উপর খুব বেশী নির্ভর করা উচিত নয় যেহেতু এর উৎপাদনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় প্রয়োজন। পরমাণুশক্তি একটি মূল্যবান উৎস হলেও, তা থেকে আপাততঃ বিশেষ সাহায্যের সম্ভাবনা নেই। কারণ খরচ ও কারিগরী জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা সেখানে আছে। সুতরাং শক্তির প্রধান উৎস হিসাবে তৈলের উপর আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। ভারত সরকার তৈলের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং আশা করা যায় যে অদূরভবিষ্যতে দেশের তৈলের উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে।

নববর্ষ :

এই বৈশাখে মক্ষিরা উনিশ বছরে পড়লো। একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা নিয়ে এই পত্রিকা আত্ম প্রকাশ করেছিলো। উদ্‌যোক্তারা মনে করেছিলেন, কেবল রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় চেতনা পরিব্যাপ্ত হওয়া উচিত। তা ছাড়া সেদিন সদ্য কারামুক্ত কর্মীদের একটা নূতন কর্মপথ উন্মোচনেরও প্রয়োজন ছিল। আজ পিছনের আকাশে স্মৃতির স্বপ্ন; সম্মুখের আকাশ নূতন আশার অরুণরাগে দীপ্ত। বিদেশীর শৃঙ্খল-মোচন নয়, নিজের হাতে দেশকে মনের মত ক'রে গড়ে তোলবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি আমরা। পরের উপর দোষারোপ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারিনা আজ। ভালো মন্দ সব কিছুর জন্য আমরাই দায়ী। যে জাতীয়তার গান, একদিন উচ্চকণ্ঠে গেয়েছি, সে গান ভুলে গাইতে হবে নব সৃষ্টির গান। যাঁরা পুরোনো দিনের নেশায় বিভোর, তাঁরা কারাগার-ভাণ্ডার অভ্যাস-বশে আজ বসন্ত-বরণও ভাঙতে চান। আমরা তাঁদের অনুরোধ করব নিরস্ত হ'তে, বসন্ত-বরণখানি মজবুত করে গড়ে তুলতে, সুন্দর করে সাজাতে। আমাদের পত্রিকাখানিকে যাঁরা স্নেহের চোখে দেখে এসেছেন, এবছরও তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষা ও সহানুভূতি পাবো—এই আশা রাখি।

জাতির আদর্শকে মলিন করবোনা, যা-কিছু মহৎ তাকে স্বীকার করবো এবং মানস-উৎকর্ষের সাধনা করে চলবো, এই আমাদের সংকল্প।

দেশে নতুন দিন এসেছে, পৃথিবীতেও নবযুগের উন্মেষ লক্ষ্য করছি। আমরা যেন মিথ্যা মোহে আচ্ছন্ন হয়ে না থাকি, যেন বরণ করে নিতে পারি নবীনকে।

"নব অরুণোদয় জয় হোক্।"

পঁচিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখ বারে বারে ফিরে আসে মৃত্যুহীন বাণী নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের এই জন্মদিনটি চিহ্নিত হয়ে আছে কালের ইতিহাসে—তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্মারক হয়ে। দেশ জুড়ে এইদিনে আমরা উৎসবের আয়োজন করি। কবিগুরুর কাব্য, গান ও বিচিত্র রচনার সমন্বয়ে আমরা স্মরণ করি তাঁকে।

বাইরের অনুষ্ঠান যতই সমারোহে সম্পন্ন হোক্, আমরা তৃপ্ত হতে পারি না তাতে। রবীন্দ্রস্মৃতিসভাকে বাহোয়ারি পূজার সামিল করে তুললে চলবেনা। রবীন্দ্রনাথের তপস্যা থেকে আমরা যেন চিনে নিই আমাদের সাধনার পথ; জীবন রচনার উপাদান যেন সংগ্রহ করি তাঁর ভাবের ভাণ্ডার থেকে। আরামের, আলস্যের, পরিণাম চিন্তাহীন রস-সম্ভোগের মন্ত্রদাতা তিনি ন'ন; তিনি দুর্গম পথের দিশারি, কঠোর ব্রত-পালনের পতাকাবাহী। আমরা যেন নামে গুরুর গৌরব দিয়ে লঘুচাপল্যে তাঁকে অসম্মান না করি। সুরুচি এবং প্রকৃষ্ট সৌন্দর্যবোধ নিয়ন্ত্রিত করুক আমাদের আচরণ ও কর্মকে।

বঙ্গবিহার

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বঙ্গবিহার-সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন। সংযুক্তি-বিরোধী জনমত বাংলাদেশে প্রবল ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ডাঃ রায় বলেছেন, গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে এই জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই তিনি তাঁর পূর্বপ্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন। আমরা কতকগুলি সর্তসাপেক্ষে সংযুক্তির সমর্থন করেছিলাম। এখন সংযুক্তি-প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হবার পর তা নিয়ে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আশা করি, রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ মেনে নিয়ে পুরুলিয়া বিষেণগঞ্জ অঞ্চল এখন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এ বিষয়ে বিহার থেকে যে সব আপত্তি উঠছে তা দুঃখ-জনক। স্বয়ং বিহারের মুখ্যমন্ত্রীও ঐ সুপারিশ মেনে নিতে নারাজ। বিহারের এই মনোভাবই যে বাংলাদেশে সংযুক্তি-বিরোধিতার প্রধান কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য প্রাপ্য বিনা বাধায় স্বীকার করে নিলে বিহারবাসী হয়তো বাঙালীদের ক্রমশঃ সংযুক্তি-পক্ষপাতীরূপে দেখতে পেতেন। বাইরের ঐক্য মনের ঐক্য থেকেই সার্থক ভাবে আসতে পারে। তা না হ'লে জোর ক'রে গ্রন্থি বেঁধে দিলেও তাতে সুফল পাওয়া যায় না।

১৯৫৬-৫৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ৫৬-৫৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক দুঃসাহসিক ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। আলোচ্যবছর দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমবছর এবং আলোচ্য বাজেট এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হ'য়েছে। বিস্তৃত আলোচনার আগে বাজেটের মোটামুটি হিসাবগুলো দেখ্‌তে হবে।

রাজস্ব বাজেটে চলতি কর অনুযায়ী এবছর রাজস্বের পরিমাণ ৪৯৩·৬ কোটি টাকা ও ব্যয়ের পরিমাণ ৫৪৫·৪৩ কোটি টাকা। মোট ঘাটতি প্রায় ৫২ কোটি টাকা। মূলধনী বাজেটে (capital budget) ব্যয় হবে ৭০৩ কোটি টাকা। এরূপ বিরাট ব্যয়প্রস্তাব জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। কারণ দেশের আর্থিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হ'লে এবং জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান করতে হ'লে এই পরিমাণে সরকারী বিনিয়োগ (Investment) অপরিহার্য। রাজস্ববাজেটে (Revenue budget) ঘাটতি রাখা বর্তমান নীতি ও আর্থিক দিক থেকে অনভিপ্রেত। তাই অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখ কতগুলো নতুন কর ধার্য করে রাজস্ব বাজেটের ঘাটতি মিটানোর চেষ্টা করেছেন।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ (direct & indirect) নতুন কর থেকে প্রায় ৩৪·১৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে. এবং এভাবে নীট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১১·৮৮ কোটি টাকা। প্রতি বছরই দেখা যায় বাজেটে নির্দিষ্ট ব্যয় পুরাপুরি হয় না এবং আয় কিছু বেশী হয়। তাই আশা করা যায়—প্রকৃতপক্ষে ১১ কোটি টাকা ঘাটতি হবে না। মূলধনী বাজেটে মোট ব্যয় ৭০৩ কোটি টাকা মধ্যে স্বল্পসঞ্চয়, বৈদেশিক সাহায্য, ঋণগ্রহণ প্রভৃতি থেকে পাওয়া যাবে ৩৬৫ কোটি টাকা। আর ঘাটতি থাকছে ৩৩৮ কোটি টাকা।

আলোচ্য বাজেটে নতুন কর ধার্য করার যৌক্তিকতা আছে প্রচুর। অপ্রত্যক্ষ করের বিরুদ্ধে কেহ কেহ যে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, তার জবাবে বলা যায় যে অপ্রত্যক্ষ করভার নাগরিকদের সকলের উপরেই কমবেশী পড়ে;—এতে তারা দেশের উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করছে—এ ধারণা তাদের হতে পারে। দেশের কাজে তারাও অংশীদার এ ভাব তাদের মনে জাগে। উন্নয়নমূলক বিনিয়োগের ফলে ছোট বড় সকলেই উপকৃত হবে। বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লোকদেরই উপকার হবে বেশী। দেশে কর্মসংস্থান হ'লে এই দুই শ্রেণীর লোকেরই আয়ের পথ বাড়বে। আমাদের দেশে প্রায় ৭ কোটি পরিবার। প্রতি ৭ পরিবার পিছু একজন করে নতুন কাজ পেলে বাৎসরিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এতে পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে এবং অপ্রত্যক্ষ কর হিসেবে যে অংশটা সরকারকে দিতে হয় সেটা দেবার পরেও প্রতি পরিবারের জীবন-ধারণের মান অনেকাংশে উন্নত হবে। নতুন কর্ম-সংস্থানের ফলে বহুলোকের অন্নসংস্থান হবে; এতে

সাধারণ লোকদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে। মোট কথা জনসাধারণ সরকারী বিনিয়োগের বাড়তি আয়ের সুযোগ পাবে। সুতরাং এ ভবিষ্যৎ সুখের জন্যে কিছু প্রতিদান (sacrifice) দিতে হয়। যারা প্রত্যক্ষ করের আওতায় পড়েনা, তাদেরও অপ্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে এরূপ প্রতিদান দেবার দায়িত্ব নিতে হবে।

এ ছাড়া আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করদাতার সংখ্যা নগণ্য, করের হারও পৃথিবীর বহুদেশের প্রত্যক্ষ করের হার থেকে বেশী। ছত্রিশ কোটি লোকের বাসভূমি ভারতে নূনাধিক ৫ লক্ষ লোক মাত্র প্রত্যক্ষ কর দেয়। নতুন বাজেটে এরূপ কর যথেষ্ট বাড়ানো হ'য়েছে এবং দেড়লক্ষ টাকা আয়ের উপর করভার হবে শতকরা ৯১৯ ভাগ। অর্থাৎ প্রতি ১০০৲ টাকায় ৯৸৯/১০ কর হিসাবে চলে যাবে। তবুও বোনাসশেয়ারের উপর কর ধার্য করে প্রত্যক্ষ করভার বাড়ানো হ'য়েছে। এই বছরের নতুন প্রত্যক্ষ করের মোট পরিমাণ হ'বে প্রায় ১০ কোটি টাকা। বলা চলে আমরা প্রত্যক্ষ করের শেষপ্রান্তে পৌঁচেছি। বেশী পরিমাণে সরকারী ব্যয়ের জন্যে সরকারী আয় বাড়ানো দরকার। সরকারের আয়ের পথ কর ধার্য করা। এ কর বেশী সংখ্যক লোকের নিকট থেকে আদায় করা অপরিহার্য। মুষ্টিমেয় লোকের কাছ থেকে কর নিয়ে বিশাল ভারতের আর্থিক উন্নতিসাধন করা যাবে না। অপ্রত্যক্ষ কর বহুসংখ্যক লোকের কাছ থেকে আদায় করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ধার্য করা হয়। ব্যাপক উন্নয়ন কার্যে এরূপ কর অপরিহার্য।

কারো কারো মতে এতে ক্রেতাস্বার্থ বা সাধারণ জনতার স্বার্থ রক্ষা পাচ্ছেনা। কিন্তু যে একদিকে ক্রেতা সে-ই অপরদিকে উৎপাদন যন্ত্রের কর্মচারী। কিনতে গিয়ে যেমন সে দিচ্ছে বেশী দাম, কুলীর দিক থেকে আবার পাচ্ছে বেশী। উন্নয়ন কাজে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, তাতে অনেক কর্মহীনের নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। এ কথা আমরা, পূর্বেই বলেছি এ ছাড়া দেশের আর্থিক উন্নতিতে ক্রেতা বা সাধারণ জনতা সহায়তা করবে না, এমন যুক্তির ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। এখানে অবশ্যি একথা বলে রাখা দরকার যে অপরিহার্য দ্রব্য ও দরিদ্র সাধারণের ভোগ্য দৈনন্দিন বস্তুর উপর কর ধার্য করলে এদের দুর্ভোগ হয়। তাই নির্বাচনী প্রণালীতে (Selective method) কর ধার্য করা উচিত এবং এই নীতি সরকার মোটের উপর অনুসরণ করছে। এজন্যেই মোটাবস্ত্রের মধ্যে ধুতি ও শাড়ীর উপর কর ধার্য করা হয় নি। অন্যান্য মোটা-কাপড়ের উপর যে কর ধার্য করা হ'য়েছে তা কিন্তু পুরোপুরি ভাবে সমর্থন যোগ্য নয়। কারণ এই কাপড়ের শ্রেণীতে বিলাসী পর্দা, শয্যাবরণ, ইত্যাদি বহু কাপড় আছে যার প্রতিগজ ৭।৮ টাকা পর্যন্ত বিক্রী হয়। এরূপ কাপড় ধনী বিলাসীদের ভোগ্য। কম দামী মোটা কাপড় যা দরিদ্রদের প্রয়োজনে আসে এবং যার দর গজ প্রতি ৮।১০ আনা পর্যন্ত হয় এবং বিলাসী মূল্যবান মোটাকাপড় এই উভয়ের উপর একই হারে কর ধার্য করা খুব সঙ্গত নয়। এই উভয় কাপড়ের উপরই কর ধরা হয়েছে প্রতি বর্গ গজে এক আনা সত্য। এটা আপত্তি জনক। মাঝারি কাপড়ের উপর গজপ্রতি দু'পয়সা করধার্য করার বিরুদ্ধে একশ্রেণীর সমালোচক আপত্তি করেছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে এই শ্রেণীর কাপড়ই বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। কাপড় হতে একটা মোটা পরিমাণ কর পেতে হ'লে মাঝারি কাপড়ের উপর করধার্য না করে উপায় নেই। কর হতে বছরের ১০।১১ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। এই কাপড় যারা ব্যবহার করে তারা দরিদ্রতম নয়—মধ্যবিত্ত ও আধা-ধনী সমাজেই এই কাপড় বেশী ব্যবহার করে। তাই মাঝারি কাপড়ের উপর প্রতি বর্গগজে ২ পয়সা নতুন কর খুব অন্যায় নয়। আপামর জনসাধারণের ভোগ্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু বলেই সরষে, নারকেল, তিসি, বাদাম প্রভৃতি তেলের উপর ধার্য মনপ্রতি আড়াই টাকা কর সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায় না। ডাকমাশুলের হার বাড়ানোর বেলায়ও এযুক্তিই প্রযোজ্য। সরকার এসমস্ত সামগ্রীর (commodity) উপর কোন কর ধার্য করলে, তার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীগণ ঐ হারের চেয়ে বহুগুণ বেশী দাম চড়িয়ে ক্রেতাস্বার্থে হানি ঘটায়। এভাবে ব্যবসায়ীরা একটা মোটা মুনাফা আদায়ের

চেষ্টা করে। ইতিমধ্যেই তেল কাপড় ইত্যাদির দাম বার্ষ-করের চেয়ে বেশী বেড়েছে। তবে একথাও সত্যি যে সরকার এদিকে যে একেবারে অচেতন তা নয়;—আশা করা যায়—এ মূল্য বৃদ্ধি সাময়িক। বাজার দর যাতে বেশী বেড়ে না যায় সেজন্যে সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে—এই আশা আমরা করি। গম ও চালের রপ্তানী বন্ধ হ'য়েছে, দরকার বোধে আমদানী করার সংকল্প-ও আছে এবং তুলার ফাটকা বাজার বন্ধ করা হ'য়েছে। এই ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রের দর নিয়ন্ত্রিত হবে আশা করি—আরো ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে সরকার প্রস্তুত। এসমস্ত ছাড়া একথাও বলা যায় যে গত পাঁচ বছরে লোকের আয় মোটের উপর বেড়ে গেছে প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ। কাজেই তাদের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়েছে।

উপযুক্ত আলোচনার পর বলা যায় নতুন কর প্রস্তাব সমাজের উপর গুরুভার হবেনা; বরং বিনিয়োগের গুরুত্ব বিবেচনায় এ প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ (Minimum)। কর-তদন্ত কমিশনের মতে (Taxation Enquiry Commission) গত দুই তিন দশকে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে তালরেখে করভার বাড়ে নি। দেশরক্ষা ও উন্নয়ন কাজের জন্য আগামী পাঁচবছরে প্রতিবছর প্রায় ৫০ কোটি টাকা নতুন কর আদায় করতে হবে। গত পাঁচবছরে ১৮% জাতীয় আয় বেড়েছে—একথা আমরা আগেই বলেছি। এর অর্থ প্রতি বছরে সমস্ত জাতির আয় ২০০ কোটি টাকার বেশী বেড়েছে। কর-তদন্ত কমিশনের সুপারিশ ও জাতীয় আয়বৃদ্ধি এ সমস্তের দিক থেকে বিচার করে দেখলে চলতি বাজেটে ৩৪·১৫ কোটি টাকার কর-প্রস্তাব আপাততভাবে কম সন্দেহ নাই। এখানে স্থিতিবান আয়ভোগীদের (fixed income group) সম্বন্ধে কথা উঠতে পারে। বাড়তি করধার্যের ফলে এদের অসুবিধে হবে। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে করবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের পরিবারের সদস্যগণ নতুন নতুন কর্মলাভ করে এদের আয়ও বাড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ এরা নিজেরা স্থিতিশীল আয়ভোগী হ'লেও অন্যান্য ব্যক্তির মাধ্যমে এদের সামগ্রিক আয় (group income) বেড়ে যাচ্ছে।

বর্তমান বাজেটে রাজস্ব ও মূলধনখাতে সর্বসাকুল্যে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৩৪৬ কোটি টাকা; অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ১ কোটি টাকা। এই টাকা জোগাড় করা হবে ঘাটতি বাজেট (deficit financing) করে অর্থাৎ নতুন নোট ছাপিয়ে। ঘাটতিব্যয়ের অসুবিধা সম্বন্ধে এবং স্বয়ং অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছেন—"We are, in fact, taking a measure of risk with the deficit financing proposed for 1956-57, and we shall have to watch its effects carefully." বর্তমান আর্থিক অবস্থায় উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে হ'লে এ ঘাটতি ব্যয় ছাড়া চলবে না। ঘাটতি ব্যয় হ'লে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে সত্য কিন্তু এ আশঙ্কা দূর করবার পথও আছে। বাজারে অর্থের প্রচলনের সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন বাড়ালে বা আমদানী করে সরবরাহ (Supply) বাড়ালে বাড়তি টাকার প্রভাবে টাকার মূল্য হ্রাস পায় না। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখি উৎপাদন আশাতীতরূপে বেড়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও উৎপাদন বাড়বে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও কাপড় চোপড়ের দর স্থির (Stable) রাখার জন্যে সরকারকে আরো সচেতন হতে হ'বে। প্রয়োজন বোধে এ সমস্ত জিনিষ আমদানী করা হবে। এ ছাড়া ঋণ গ্রহণ স্বল্প সঞ্চয়, কর আদায় ইত্যাদিতে মোট ১২০০ কোটী টাকা বাজার থেকে তুলে নেওয়া হবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ নতুন টাকা বাজারে চালু হবে প্রায় সেই পরিমাণ টাকা আবার তুলে নেওয়াও হবে। এভাবে দেখা যাচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির ভয়ে ঘাটতি ব্যয় সম্বন্ধে শংকিত হবার বিশেষ কারণ নেই।

ভারতবাসী এক নতুন জীবনের পথে চলেছে আশা আর আকাংক্ষা নিয়ে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আজ প্রতিটি নাগরিকের স্বপ্ন, প্রত্যেকে বুঝতে শিখেছে 'রাষ্ট্রের জন্যে নাগরিক নয়, নাগরিকের জন্যেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। গণতান্ত্রিক ভারত তাই প্রতিটি নাগরিকের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্রত গ্রহণ করেছে। এক নতুন প্রাণের সাড়া জেগেছে আজ দেশে। এ স্বপ্ন—আর্থিক উন্নতির স্বপ্ন। একে বাস্তবে

পরিণত করতে হ'লে চাই ত্যাগ স্বীকারের মহত্ত্ব। সাময়িক অসুবিধা যদি স্থায়ী উন্নতির পথ সুগম করে দেয় তাহ'লে সাময়িক অসুবিধা সম্বন্ধে ভীত হবার কিছু নেই। ভারতের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা সার্থক করবার জন্যে সকলে একযোগে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে আমরা এই আশা রাখি।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীযুক্ত কার্লিদাস রায়ের ধারাবাহিক নিবন্ধটির শিরোনাম 'স্মৃতি কথা' স্থলে এবার ভ্রমক্রমে 'জীবনস্মৃতি' ছাপা হয়েছে, সেজন্য আমরা দুঃখিত। —মঃ সঃ

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

মন্দিরা

উনবিংশ বর্ষ ৷ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ ৷ দ্বিতীয় সংখ্যা

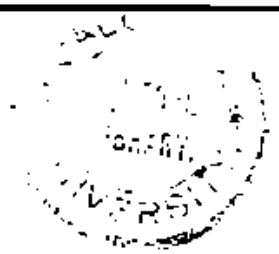

ক্ষেত্র মোহন দে

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

সাত বা আট বৎসর বয়স্ক একটি বালক প্রতিবেশীর গৃহ হইতে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতাকে বলিল, সে আর প্রতিবেশীর গৃহে তাঁত বুনা শিখিতে যাইবে না। পিতা তাঁত বুনিতেছিলেন; পুত্রের কথায় কাজ বন্ধ রাখিয়া তাহার অনুযোগ শুনিলেন—পুত্র ভুল করিয়াছে মনে করিয়া প্রতিবেশী তন্তুবায় তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছেন—সে আর সে বাড়ীতে যাইবে না। পিতা পুত্রকে তিরস্কার করিলেন না; সস্নেহে বলিলেন—তিনিও ভাবিতেছিলেন, অবস্থা যেরূপ তাহাতে আর তাঁত চালাইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা দুঃসাধ্য হইতেছে; তাই তিনি মনে করিতেছেন, পুত্রকে পৈতৃক ব্যবসা না শিখাইয়া লিখাপড়া শিখাইয়া অর্থার্জ্জনের উপায় করিয়া দিবেন। পুত্রের মনে হইল যেন তাহার মন হইতে দুশ্চিন্তার ভার সরিয়া গেল—সে অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাইল।

হুগলী জিলার বেগমপুর খরসরাই গ্রামে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র তন্তুবায় পরিবারে ক্ষেত্রমোহন দের জন্ম হয়। হুগলী জিলার যে অংশ তন্তুশিল্পের কেন্দ্র ছিল বেগমপুর খরসরাই গ্রাম তথায় অবস্থিত। বাঙ্গালার এক একটি স্থান এক একটি শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ এবং সেইরূপ এক একটি স্থানে একজাতীয় শিল্পীর বাস ছিল। কিন্তু এ দেশে উচ্চ শিল্প বিদেশী কলকারখানার প্রতিযোগিতায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। তন্তুশিল্পের এই অবস্থা অনেক দিনের। ইংরেজ এ দেশে শাসক হইয়া স্বার্থপরতাহেতু স্বদেশে তন্তুশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধিসাধন জন্য এ দেশের—অন্য অনেক শিল্পের মত—তন্তুশিল্পেরও অবনতি ঘটাইয়াছিল। ইংরেজ লেখক উইলশন বলিয়াছেন, রাজনীতিক ক্ষমতার অত্যাচারের দ্বারা ভারতের সমৃদ্ধ তন্তুশিল্পের সর্ব্বনাশসাধন না করিলে সে স্বদেশের কলেও তন্তুশিল্পে ভারতীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারিত না। সেই অত্যাচারের সুদীর্ঘ ইতিহাসের আলোচনার স্থান আমাদিগের নাই। বাঙ্গালায় ঠকঠকি তাঁতের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়াও বাঙ্গালী শিল্পী তন্তুশিল্পে পরিবার প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে না।

ক্ষেত্রমোহনের পিতা স্বয়ং তাহা অনুভব করিতেছিলেন। তাই তিনি ভাবিতেছিলেন, পুত্রকে লিখাপড়া শিখাইয়া উপার্জ্জনের অন্য পথের সন্ধান করিবার সুযোগ দিবেন। পুত্রের অনুযোগ তাঁহার সে বিষয়ে সঙ্কল্পে সাহায্য করিল—১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুত্রকে কলিকাতায় আনিয়া ভট্টাচার্য্যবাগান পল্লীতে মধুসূদন দের বাড়ীতে রাখিবার

ব্যবস্থা করিলেন। তখনও "পন্থা গন্তার সমন্ত"—সেই জন্ত বাঙ্গালী আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত ব্যক্তির পুত্রাদিকে অনাবশ্যক দুর্ব্বহ ভার বলিয়া বিবেচনা করিত না; পরন্তু সেরূপ বালকরা পরিবারের সন্তানদিগেরই মত স্নেহ, আশ্রয় ও আহার পাইত। সেইরূপ সাহায্য পাইয়া যে কত লোক "মানুষ" হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। গুরু ছাত্রদিগকে গৃহে রাখিয়া পুত্রবৎ ব্যবহার ও শিক্ষাদান করিতেন—লোক যথাসাধ্য স্বজন বা পরজন পালন করিত। তাহাই সামাজিক প্রথা ছিল।

বাঙ্গালীর এই উদার ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঙ্গালী নীলকমল মিত্র ব্যবসা ব্যপদেশে এলাহাবাদে কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভূত অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী এলাহাবাদে যাইলে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার অতিথি-সৎকার ও বহুজনপালনস্পৃহা বাঙ্গালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একদিন তিনি একটি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ বালককে এলাহাবাদের পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া কৌতূহল-বশে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারেন, বালক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ —বিদ্যালাভের কামনায় হৃষিকেশ হইতে এলাহাবাদে আসিয়াছে। তিনি বালককে নিজগৃহে লইয়া যাইয়া তাহার বাসের, আহারের ও শিক্ষালাভের সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তৃপ্তি অনুভব করেন। মেধাবী বালক সেই সুযোগ পাইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে বিদ্যালাভ করিয়া—উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া ব্যবহার জীবের ব্যবসা গ্রহণ করিলে মিত্র মহাশয়ই তাহার বেশাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী নীলকমল মিত্রের প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল—সে-ই ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য—বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। তথায় আশ্রিতবৎসল মধুসূদনের গৃহে আসিয়া ক্ষেত্রমোহন বিদ্যালাভে রত হইলেন। আত্মীয় মধুসূদন বালককে বিদ্যালয়ে ছাত্র করিয়া দিলেন এবং অবসর সময়ে তাহাকে বিদ্যালাভে সাহায্য করিবার জন্ত স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর গোপালচন্দ্রকে নির্দ্দেশ দিলেন। ক্ষেত্রমোহন ঈপ্সিত সুযোগ লাভ করিলেন।

ক্ষেত্রমোহন যে সুযোগ লাভ করিলেন, তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করিয়া বিদ্যালাভে অধিক অগ্রসর হওয়া কিন্তু তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কারণ, পিতার দারিদ্র্য ও পরিবারের অভাব দূর করিবার চিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহাকে পীড়িত করিত। সেই জন্ত সামান্ত বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিখিয়াই তিনি অর্থার্জ্জনের জন্ত চাকরীর সন্ধান করিতে বাধ্য হইলেন।

যে কাজে বুদ্ধি অপেক্ষা বিদ্যার প্রয়োজন অধিক তাহা করিবার যোগ্যতা ও অভিপ্রায় ক্ষেত্রমোহনের ছিল না। মধুসূদনের সুপারিশে তখন ক্ষেত্রমোহন কলিকাতা রাধা-বাজারে এক "কাটা কাপড়ের" দোকানে সামান্ত পারিশ্রমিকে চাকরী পাইলেন। তিনি সেই চাকরীই ভাগ্য লক্ষ্মীর দান মনে করিয়া নিষ্ঠা সহকারে নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে লাগিলেন এবং বুদ্ধিহেতু অল্পদিনেই ব্যবসাকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ব্যবসা ব্যপদেশে তাঁহাকে সময় সময় য়ুরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাজ আনিতে হইত। ক্ষেত্রমোহন যে ব্যবহারগুণে তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া কাজ আনিতে পারিতেন—তাহা লক্ষ্য করিয়া দোকানের অধিকারীরা সেরূপ কাজের জন্ত তাঁহাকে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতেন। সেই সূত্রে যে সকল য়ুরোপীয় কাজ দিবার অধিকারী তাঁহাদিগের অনেকের সহিত ক্ষেত্রমোহনের পরিচয় হইল। তাঁহারা কেহ কোন কারণে দোকানে আসিলে ক্ষেত্রমোহনকেই ডাকিয়া কাজের কথা বলিতেন।

দুই এক ক্ষেত্রে এমনও হইল যে, অতি অল্পসময়ের মধ্যে মাল সরবরাহ করিবার প্রয়োজনে কোন কোন য়ুরোপীয় ক্ষেত্রমোহনকে মাল দিতে বলিলে তিনি স্বয়ং তাহা সরবরাহ করিতেন। ইহাতে তাঁহার লাভ হইলেও দোকানের অধিকারীরা সে জন্ত তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। সেরূপ অবস্থায় চাকরী করা অসুবিধাজনক বুঝিয়া ক্ষেত্রমোহন চাকরী ত্যাগ করিলেন।

তিনি চাকরী ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা করিবার মূলধন কোথায়? সেজন্ত তিনি যখন চিন্তিত সেই সময় মধুসূদনের পরিবারবর্গ তাঁহার প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহাকে আবশ্যক অর্থ যোগাইতে লাগিলেন; তিনিও সেই অর্থে লোকের মাল সরবরাহ করিয়া ঋণ শোধ

করিতে লাগিলেন। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যেই ক্ষেত্রমোহনের মূলধন সঞ্চিত হইয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন তখন মধুসূদনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বেঙ্গল পুলিসের কর্তা ক্ষেত্রমোহনের কাজে সন্তুষ্ট হইয়া যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি বেঙ্গল পুলিসের সব পোশাক যোগাইতে পারিবেন? তখন ক্ষেত্রমোহন আপনার শক্তিতে প্রত্যয় হেতু বলিলেন, তিনি তাহা পারিবেন। তখন বেঙ্গল পুলিসে লোকসংখ্যা অল্প ছিল; সুতরাং কাজও খুব অধিক ছিল না। সুতরাং সে জন্য ক্ষেত্রমোহনের টাকার অভাব হইল না। তিনি কাজ পাইয়া কনষ্টেবলদিগের জন্য সেই নীল পোশাক সরবরাহ করিতে লাগিলেন।

যখন ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি সদয় হইলেন, তখন ক্ষেত্রমোহনের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি শোকার্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার অল্পদিন পরে তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় কুটুম্ব ক্ষেত্রমোহনের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন এবং তাহার পরেই আপনার কাজে আশানুরূপ অর্থার্জন না হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা দ্বারকানাথ গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া অগ্রজের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। ক্ষেত্রমোহন ভ্রাতাকে পাইয়া নবোদ্যমে কাজ বাড়াইয়া চলিলেন।

বেঙ্গল পুলিসের নীলবর্ণের ড্রিল কাপড়ের পোশাক নিয়মিত ভাবে সরবরাহ করায় য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ে ক্ষেত্রমোহনের কার্যকুশলতার আদর হইল এবং য়ুরোপীয়রা তাঁহাকে আপনাদের আবশ্যক পোশাক সরবরাহ করিতে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু আবশ্যক অর্থাভাবে ক্ষেত্রমোহন সে সকল কাজ লইতে অসম্মত হইলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার এক আত্মীয় ও হিতৈষী গ্রেহাম কোম্পানীর কাছে জামিন হইয়া ক্ষেত্রমোহনের আবশ্যক কাপড় লইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই আত্মীয় স্বয়ং ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন ও গ্রেহাম কোম্পানীর সহিত তাঁহার কারবার ছিল।

কাজের জন্য ক্ষেত্রমোহন কলিকাতা বাবাবাজারে দোকান খুলিয়াছিলেন। তাহার নাম দিয়াছিলেন—"ক্ষেত্রমোহন দে এণ্ড কোম্পানী"। তিনি দোকান দেবমন্দির বলিয়া মনে করিতেন—কাজই তাঁহার ধর্ম ছিল। তিনি ব্যবসায়ীর শুভ অভিজ্ঞতায় অর্জন করিয়াছিলেন—সেইজন্য কর্মচারী হইতে দফি পর্যন্ত কর্মীদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কখন কার্পণ্য করিতেন না। কর্মীরা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার কাজ করিতেন।

বেঙ্গল পুলিসের পোশাক সরবরাহ সম্পর্কে ক্ষেত্রমোহনকে সময় সময় কেল্লায় যাইতে হইত। তথায় তাঁহার সহিত জনার্দন দাঁহা নামক এক প্রসিদ্ধ মদ্য-ব্যবসায়ীর পরিচয় হয়। জনার্দন "কমিসারিয়েটে" মদ্য ব্যতীত জনো, টুপী প্রভৃতি সরবরাহ করিতেন। মদ্যের ব্যবসায়েই অধিক লাভ বিবেচনা করিয়া জনার্দন মদ্য সরবরাহের কাজ রাখিয়া অবশিষ্ট কাজ ক্ষেত্রমোহনকে দিলে ক্ষেত্রমোহনের ব্যবসা আরও বাড়িয়া গেল।

এই সময়ে অতর্কিতভাবে বিপন্ন হইয়া ক্ষেত্রমোহন নিজ বুদ্ধিবলে বিপমুক্ত হইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ও ব্যবসাবুদ্ধির পরিচায়ক। তখন কলিকাতার বাজারে নীলবর্ণের ড্রিল কাপড় আমদানী হইত না—শ্বেত ড্রিল কিনিয়া তাহা ছোবাইয়া লইতে হইত। ক্ষেত্রমোহন একবার শিখ সৈনিকদিগের জন্য নীলবর্ণের ড্রিলের অনেক পোষাক সরবরাহ করিবার ঠিকা পাইয়া নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই মাল সরবরাহ করিলেন। কিন্তু সকল পোশাকের কাপড়ের বর্ণ একইরূপ না হওয়ায় সব মাল ফেরৎ আসিল। সরকারী ঠিকার সর্ত—যদি যথাকালে নমুনা অনুযায়ী মাল সরবরাহ না হয়, তবে কেবল যে সরবরাহকারীর মাল বিনা কৈফিয়তে ফেরৎ দেওয়া যায় তাহাই নহে পরন্তু সরবরাহকারীকে সরকারের ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। মাল ফেরৎ হওয়ায় ক্ষেত্রমোহনের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন—বহুত ক্ষেত্রমোহনকে সর্বস্বান্ত—পথের ভিখারী হইতে হইবে। বিপদে অভিভূত ও কিং-কর্তব্য বিমূঢ় না হইয়া ক্ষেত্রমোহন কিন্তু বিপদ হইতে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং সব ফেরৎ পোশাক নূতন করিয়া নীলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া একইরূপ করিয়া দিলেন। মাল গৃহীত হইল—য়ুরোপীয়

রাজকর্ম্মচারীরা তুষ্ট হইলেন—ক্ষেত্রমোহন প্রভূত লাভ করিলেন।

দ্বারকানাথ তাঁহার ভ্রাতারই মত কার্য্যদক্ষ ছিলেন এবং অল্প দিনেই ক্ষেত্রমোহনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় ব্যবসার অপ্রত্যাশিত উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে দ্বারকানাথের অকাল মৃত্যু হইল। শোকার্ত্ত ক্ষেত্রমোহনের মনে প্রথমেই বিধবা ভ্রাতৃজায়ার ও তাঁহার শিশু সন্তান দিগের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের চিন্তা দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন, যদি অতর্কিত ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্রগণ খুল্লতাত-পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যে অবজ্ঞা করেন, তবে তাঁহার অর্থের অভাব ঘটিবে। দূরদর্শী ক্ষেত্রমোহন ভ্রাতৃপত্নীর ও ভ্রাতার সন্তানদিগের সম্বন্ধে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক অর্থ দিয়া সুব্যবস্থা করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন—ভাবিলেন, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন।

দ্বারকানাথ ব্যবসার একাংশের ভার লইয়াছিলেন; য়ুরোপীয়দিগের সহিত পত্রব্যবহারের ভার তাঁহার ছিল। তাঁহার অভাবে সে বিভাগে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে না দিতে ক্ষেত্রমোহনকে আবার সে বিভাগের ভারও লইতে হইল। তাঁহার চেষ্টায় আবার নূতন নূতন খরিদ্দার সংগৃহীত হইতে লাগিল। আর্ম্মি ক্লোদিং অর্থাৎ সেনাবলের বেশ সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্ণেল ওয়াটসন ক্ষেত্রমোহনকে ভারতে ইংরেজ সৈনিকদিগের জন্য টুপী সরবরাহের কাজ দিলেন। ক্ষেত্রমোহনও বৎসরে ৩০।৪০ হাজার টুপী প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ করিতে লাগিলেন।

কর্ণেল ওয়াটসনের কার্য্যকাল শেষ হইলে যখন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ম্যাকসী তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন ক্ষেত্রমোহন সরকারের প্রয়োজনে সাদা ক্লালেন কাপড় সরবরাহ করিবার একটা মোটা ঠিকা পাইলেন। কিন্তু তিনি যে ঐ ঠিকা না পাইতে পারেন, সে সংবাদ কোনরূপে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী জানিতে পারেন। ঐ ব্যবসায়ী সংবাদ জানিয়া বাজারে যত সাদা ক্লালেনের থান ছিল, সব কিনিয়া লইয়া ক্ষেত্রমোহনকে অতিরিক্ত ও আপনি লাভবান হইবার চেষ্টা করিলেন। ঠিকা পাইয়া ক্ষেত্রমোহন যখন ক্লালেনের জন্য বাজার ঘুরিয়া ঐ ব্যবসায়ীর নিকট গমন করিলেন, তখন ব্যবসায়ী সুযোগ বুঝিয়া ক্লালেনের দাম চতুর্গুণ চাহিলেন। ক্ষেত্রমোহন তাঁহাকে সঙ্গত লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে অনেক অনুরোধ করিয়া যখন তাঁহাকে কিছুতেই সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন সত্যই বিপন্ন গণিলেন। উপরোধ, অনুরোধ, অনুনয় সব ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষেত্রমোহন অনন্যোপায় হইয়া শঙ্কাতুর হৃদয়ে কর্ণেল ম্যাকসীর নিকট সমগ্র অবস্থা বিবৃত করিলেন। ম্যাকসী ব্যবসায়ে ক্ষেত্রমোহনের সাধুতা জানিতেন—বুঝিলেন, তিনি লাভের লোভে অযথা কথা বলিতেছেন না। অবস্থা বিবেচনা করিয়া ক্ষেত্রমোহনের প্রতি সদয় ম্যাকসী ঠিকার সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করিয়া সাদা ক্লালেনের পরিবর্ত্তে অন্য যে কোন প্রকার ক্লালেন ব্যবহার করিবার অনুমতি দিলেন। ক্ষেত্রমোহনের বিপদ কাটিয়া গেল—তিনি ডোরা ক্লালেন ব্যবহার করিয়া মাল সরবরাহ করিলেন। যে ব্যবসায়ীটি সাদা ক্লালেন একচেটিয়া করিয়াছিলেন, তিনি মাল লইয়া বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

যে ব্যবসায়ী এই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তিনি ক্ষেত্রমোহনের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অবসর সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবসর মিলিল। কর্ণেল ম্যাকসীর সময় পর্য্যন্ত দর যাচাই করিয়া (টেণ্ডার লইয়া) কাজ বিলি করার প্রথা সমর বিভাগে ছিল না। ম্যাকসীর স্থানে টোকার নামক কর্ম্মচারী আসিয়া যাচাই প্রথা করায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। ক্ষেত্রমোহনের লাভের পরিমাণ হ্রাস পাইল। এই সময় তাঁহার অনিষ্টসাধন জন্য আপনার নাসিকা ও কর্ণ কর্ত্তন করিয়া অপরের যাত্রা ভঙ্গ নীতি অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যবসায়ী অত্যন্ত অল্প মূল্যে টুপী সরবরাহের ঠিকা পাইলেন।

কিন্তু ঠিকা লইয়া ব্যবসায়ীটি অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপন্ন হইলেন। তিনি সানন্দে—নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই মাল সরবরাহ করিলেন। মাল অপছন্দ হইল। কারণ, টুপী যেরূপ হইবার কথা—সেরূপ হয় নাই। দারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া ব্যবসায়ী বুঝিলেন, ক্ষেত্রমোহনই তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিতে পারেন। তিনি বার বার ক্ষেত্রমোহনের

সহিত যে কুব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ক্ষেত্রমোহনের সাহায্য প্রার্থনা করিতে প্রথমে দ্বিধাবোধ করিলেন। শেষে তিনি উপায়ান্তরবিহীন হইয়া ক্ষেত্রমোহনের শরণাপন্ন হইলেন। ক্ষেত্রমোহন প্রতিদ্বন্দ্বীর পূর্ব্ব-ব্যবহার ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি অপছন্দ টুপী ও একটি নমুনা টুপী মিলাইয়া ত্রুটি কোথায় তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, নমুনা তাঁহার কারখানাতেই ছিল। অপছন্দ টুপী লইয়া তিনি বুঝিলেন, টুপীর উপরে যে পিতলের দণ্ডটি থাকে, তাহাই নমুনার মত হয় নাই। তিনি উহার পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ীটি তাহাতে সাহস না পাইয়া প্রস্তাব করিলেন, যাহা করিবার ক্ষেত্রমোহন বাবু করিবেন —ঠিকার লাভ সবই তিনি লইবেন। শুনিয়া ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তিনি লাভের জন্য কাজ করিতেছেন না; বিপন্নকে বিপন্মুক্ত করিতে পারিলে তাহাই পরম লাভ মনে করিবেন। তিনি ব্যবসায়ীটিকে সব অপছন্দ টুপী তাঁহার কারখানায় পাঠাইয়া দিতে বলিলেন এবং টুপী আসিলে ত্রুটি সংশোধিত করিয়া নমুনা লইয়া টোকারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহা দিলেন। এবার টুপী পছন্দ হইল। টোকার সব কথা শুনিয়া ক্ষেত্রমোহনের ব্যবহারে ও কর্ম্ম-দক্ষতায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ব্যবসায়ীটি ক্ষেত্রমোহনকে ঠিকার লাভের সমগ্র টাকা দিতে আসিলে তিনি টুপীর ত্রুটি সংশোধনের জন্য যে ব্যয় হইয়াছিল, কেবল তাহাই গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট টাকা ব্যবসায়ীটিকেই ফেরত দিলেন।

ইহা ক্ষেত্রমোহনের উদারতার পরিচায়ক।

এই সময় অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্ষেত্রমোহনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। মানুষের শক্তির সীমা আছে তিনি অনুভব করিয়া উপযুক্ত বাছিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কাজ বিভক্ত করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের অভাবে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে এই সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনায় তাহা যেমন প্রতিপন্ন হয়, তাঁহার ব্যবসার আদর্শ কিরূপ ছিল তাহাও তেমনই বুঝিতে পারা যায়। টোকারের কার্য্যকালে সরকারেরও সামরিক বস্ত্রির কারখানা ছিল। কারখানায় কতকগুলি খাস বস্ত্রী ব্যতীত যে সকল চুক্তিকরা বস্ত্রী কাজ করিত তাহারাও থাকিত। ইহারা কোনও মজুরীর হার বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট করায় টোকার বিব্রত হইয়া পড়েন। ক্ষেত্রমোহনের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম্মঘটকারীদিগের কাজে উৎসাহ দিতে থাকেন। তিনি ক্ষেত্রমোহনের কর্ম্মচারী—সেইজন্য টোকার তাঁহাকে ডাকিয়া বস্ত্রী সংগ্রহ করিয়া দিতে বলিলে কর্ম্মচারীটি তাহা করিতে অস্বীকার করেন। ক্ষেত্রমোহন তখন রোগশয্যায়। কর্ম্ম-চারীর অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে টোকার আপনাকে অপমানিত মনে করেন—এদিকে তাঁহার চাকরীও যায়-যায় হয়। তিনি নিরুপায় হইয়া এক জন নূতন ব্যবসায়ীকে ডাকিয়া আবশ্যক সংখ্যক বস্ত্রী সংগ্রহের ভার দেন। ব্যবসায়ী সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু ঐ কাজে অভিজ্ঞ বস্ত্রীর অভাব দেখিলেন। তিনি ধর্ম্মঘটকারীদিগের মধ্যে কতকগুলিকে "ভাঙ্গাইয়া" লইয়া তাহাদিগের সহিত কতকগুলি মজুরকে বস্ত্রী সাজাইয়া কারখানা বজায় রাখিলেন। কোনরূপে সম্ভ্রম ও চাকরী রক্ষার জন্য টোকার তাঁহাকে বিশেষ আদর ও অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন; এমন কি মাল নমুনার মত না হইলেও অথবা সময়ে মাল না দিলেও মাল মঞ্জুর করিতে লাগিলেন। ইহাতে বহু অর্থ লাভ করিয়া ব্যবসায়ীটি অধিক মজুরী কবুল করিয়া ক্ষেত্রমোহনের বস্ত্রী ভাঙ্গাইতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি যথাকালে নমুনার মত মাল সরবরাহ করিতে সমর্থ হইলেন না। টোকার মনে করিয়াছিলেন, ক্ষেত্রমোহনের ব্যবসায়ে আর কোনরূপ কাজ দিবেন না; কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না—কারণ, কাজ ভাল করিতে ও যথাসময়ে মাল সরবরাহ করিতে ক্ষেত্রমোহনের দোকানই অদ্বিতীয় ছিল।

অতিশ্রমজনিত স্বাস্থ্য-ভঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৫১ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

তাঁহার সময়ে ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং মৃত্যুকালে যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাণ, বোধ হয়, ২০ লক্ষ টাকা হইবে। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল তখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদক। তিনিও ক্ষেত্রমোহনের মত দারিদ্র্যের সহিত

সংগ্রাম করিয়া আর এক বিভাগে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ক্ষেত্রমোহনের জীবন কথা বাঙ্গালীর জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

নিঃসম্বল অবস্থা হইতে—মূলধন না পাইয়াও—নিষ্ঠা, শ্রমশীলতা, সাধুতা ও ব্যবসা-বুদ্ধির অনুশীলন ফলে ক্ষেত্রমোহন প্রভূত অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। ধনী হইয়াও তিনি কখন উদ্ধত বা গর্ব্বস্ফীত হয়েন নাই। তাঁহার দোকানে তিনি প্রায় দেড় শতাধিক লোক নিযুক্ত রাখিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত এক আসনে উপবিষ্ট হইয়া কাজ করিতে কুণ্ঠা বোধ না করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতেন। তিনি স্বয়ং মনুষ্যত্বের অধিকারী হইয়া মনে করিতেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য।"

ক্ষেত্রমোহন অকাতরে উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করিতেন। কিন্তু তিনি গোপন দানের পক্ষপাতী ছিলেন—কখন দানের বিষয় প্রকাশ করিতেন না।

সমসাময়িক প্রথানুসারে তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে একটি বৃহৎ "কুঞ্জ" প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে সাধু বৈষ্ণবদিগের সেবার ব্যবস্থা জীবদ্দশায় করিয়া গিয়াছিলেন।

ব্যবসাক্ষেত্রে ক্ষেত্রমোহনের অসাধারণ সাফল্য তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা, একাগ্রতা—সর্ব্বোপরি সাধুতার ফল। সেই সকল গুণ থাকিলে ও সেই সকলের অনুশীলন করিলে যে প্রতিকূল অবস্থা প্রহত করিয়া সাফল্য লাভ করা যায়—তিনি তাহার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত।

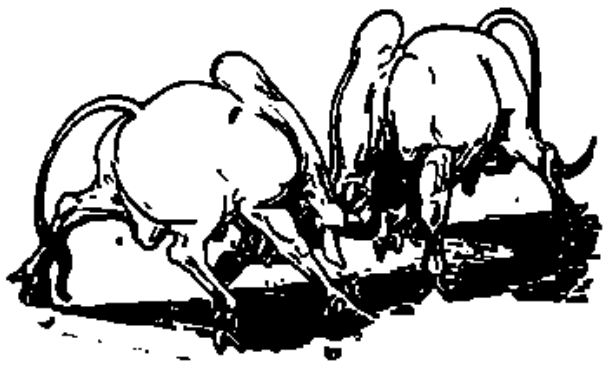

সমকালীন বৌদ্ধ চিন্তা

রণজিৎ কুমার সেন

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য যে শক্তি পাইয়াছে, সেই শক্তি চর্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—পশুযুদ্ধভূমিতে পশুদলের মতো ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলেনা। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূল ভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূল ভাবটি ভারতবর্ষের।

এই ভাবাদর্শের পরিপূরক হচ্ছেন বুদ্ধদেব। সমাজ-বিপ্লবের পথে নতুন সভ্যতার পথ রচনা ক'রে দিলেন তিনি পৃথিবীতে। বৌদ্ধ সমাজবাদ প্রসঙ্গে রাহুল সাংকৃত্যায়নের মন্তব্যটি এই সূত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: বৌদ্ধধর্ম কেবল কথার কথা নয়, কাজেও বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থেকে সুরু ক'রে চণ্ডাল পর্যন্ত সকল জাতির মানুষেরই সমান সমাদর ছিল। প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় উচ্চনীচের বিচার হ'তো মানুষের জন্মের দুর্ঘটনার মাপকাঠি দিয়ে। শাক্যরা—যে বংশে বুদ্ধদেব নিজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—নিজেদের বংশমর্যাদা সম্পর্কে গর্বিত ছিল। বুদ্ধের জ্ঞাতি অনুরুদ্ধ সদলবলে বুদ্ধের কাছে অভিষেকের জন্যে যাচ্ছিলেন, তাদের সঙ্গে ছিল তাদের পরিচারক উপালি। সে জাতে নাপিত। উপালি মনে মনে ভাবলো, এরা যখন সমস্ত

ধর্মং শরণং গচ্ছামি

দিল্লী ন্যাশনাল মিউজিয়মে রক্ষিত একটি বুদ্ধমূর্তি। ধনসম্পদ ও জীবনের ভোগসামগ্রী ত্যাগ ক'রে ভিক্ষু হ'তে

চ'লেছেন, আমিই বা তাঁদের পদানুসরণ করিনা কেন? অনুরুদ্ধ ও অপরাপর সকলে তার কথা জানতে পেরে বল্লেন, 'তা হ'লে তুমিই প্রথম ভিক্ষু হও। আমাদের রক্তে আমাদের বর্ণের অহঙ্কারের বীজ রয়েছে। আমরা যদি প্রথমে ভিক্ষুর দীক্ষা গ্রহণ করি, তা হ'লে প্রভুর আদেশ অনুযায়ী তুমি আমাদের প্রণাম ক'রবে। এতে আমাদের অহঙ্কারই অক্ষুণ্ণ রয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যদি প্রথমে দীক্ষা নাও, তা হ'লে তুমি হবে আমাদের প্রধান —আমরা তোমাকে প্রণিপাত ক'রবো। ফলে আমাদের অহঙ্কারে আঘাত প্রাপ্ত হবে।' আর কাজেও তাঁরা তাই করলেন। উপালি হ'লো প্রথম ভিক্ষু। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর যখন তাঁর বাণী একত্রীকরণের জন্য প্রথম অধিবেশন বস্‌লো, বিনয়-এর (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ব্যবহার বিধি) প্রধান আচার্যের সম্মান পেলেন উপালি। চীনা পর্য্যটকেরা লিখেছেন (এবং আজও বহু বৌদ্ধ প্রভাবিত দেশে দেখা যায়) যে, যখনই কোনো আগন্তুক ভিক্ষু বিহারে আসতেন, স্থানীয় ভিক্ষুরা তাঁকে প্রশ্ন করতেন, 'আয়ুষ্মান, আপনি কতদিন ভিক্ষুব্রত গ্রহণ ক'রেছেন?' যদি তাঁর জবাবে জানা যেতো যে তিনি জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু, তা হ'লে স্থানীয় ভিক্ষুরা তাঁকে প্রণাম করতেন। আগন্তুকের দেশ বা বর্ণ কোনো কিছু বিচার করা হ'তো না। অসাম্য মূলোচ্ছেদের লক্ষ্য কেবল ভিক্ষুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, সাধারণ মানুষদের মধ্যেও বুদ্ধ তার প্রচার করেছিলেন।

বহুক্ষেত্রে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকলেও সমাজবিপ্লবের বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে কি ভাবে একদা বৌদ্ধসমাজের ভিৎ রচিত হ'য়েছিল, তা উদ্ধার করা খুব বেশী কঠিন নয়। অনেকে বৌদ্ধ-কালকে বৌদ্ধবিপ্লব নামে আখ্যায়িত ক'রেছেন। 'অর্থ-নৈতিক পটভূমিকায় বৌদ্ধযুগ' (প্রভাতী, পাটনা) প্রবন্ধের অবতারণা ক'রতে গিয়ে শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ এই বৌদ্ধবিপ্লবের উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন : কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা আকস্মিকভাবে দেখা দেয় না। বৌদ্ধ বিপ্লবও একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। ইহা ইতিহাসের এক বৃহৎ অগ্রগতি। বুদ্ধের মতবাদ সমগ্র আর্যজাতির উৎকর্ষে সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের দর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি ব্যবহারিক কর্মধারা তুলে ধ'রেছিল।

সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যার ক্রমবিবর্তন। প্রতি-বিপ্লবী শক্তি যখন সেই শক্তিকে অগ্রসর হ'তে না দেয়, তখনই বিপ্লব আসে। এক সময় পুরাণো সমাজব্যবস্থা ভারতের উৎকর্ষতার গতিরোধ ক'রেছিল। ফলে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হ'য়েছিল। বৌদ্ধযুগ প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব। এত পুরোণোযুগে এতবড় বিপ্লব বিরল—যা সমগ্র আর্য জাতিকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা ক'রেছিল—যে সভ্যতা সহস্র বছরের চেষ্টার ফল।

একটা দেশের ইতিহাস ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পারে—যদি তার দেশীয় অবস্থা তার উপযোগী অথবা অনুকূল হয়। একটা জাতির উৎকর্ষ বর্দ্ধিত হয় তার সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সমাজব্যবস্থা উদ্বৃত্ত সম্পদ ও অবসর সময় (surplus wealth and leisure) দান ক'রতে পারে জাতিকে। কারণ জাতির প্রতিভা বিকাশের জন্য চাই সম্পদ এবং অবকাশ। আর্য সভ্যতা উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে একস্থানে এসে স্থির হ'য়ে গিয়েছিল—প্রতিকূল শক্তি ও 'বর্ণ-বিভাগ' (caste system) ব্যবস্থার জন্য বর্ণবিভাগ ব্যবস্থার পৃথকীভূত অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে প্রতিকূল পুরোহিত-সমাজ সকল উদ্বৃত্ত সম্পদ শোষণ করে নিয়েছিল। সম্পদের উৎপাদক কৃষকশ্রেণী তাদের উদ্বৃত্ত দেবতার পূজোর জন্য পুরোহিত শ্রেণীকে এবং দেশের শাসককে রাজস্বরূপে দিত। এইরূপে সভ্যতার উন্নতির জন্য যে সম্পদ আবশ্যক, তা এমন কতকগুলো শ্রেণীর হাতে এসেছিল—যারা নিজেদের বিলাসিতার জন্য সেগুলো ব্যয় ক'রতো। তার ফলে উৎপাদনেও উন্নতি দেখা দেয়নি। বণিকশ্রেণী ও বৈশ্যরা বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত সম্পদ পেতো না। সেই সময় বণিকশ্রেণী ও বৈশ্যরাই ছিল সামাজিক শক্তি—যারা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অনুভব ক'রেছিল—যার দ্বারা তাদের বাণিজ্যের সুবিধে ও উন্নতি হয়। কারণ সেই যুগে বাভা, মালয় ও চীন প্রমুখ ব্যবসাকেন্দ্র ভারতের বৈশ্যদের নিকট অবারিত ছিল। বৈশ্যরা সমগ্র দেশবাসীর নিকট ইচ্ছে প্রকাশ ক'রেছিল—তারা যেন নিজেদের শ্রম পর্যাপ্ত উৎপাদনের

জন্ম দান করে, কারণ তা না হ'লে বাণিজ্যের উন্নতি হ'তে পারে না। ফলে বর্ণবিভাগের মূলে কুঠারাঘাত করবার আবশ্যক হ'য়েছিল। 'বর্ণবিভাগে' উৎপাদকেরা তাদের স্ব স্ব ক্ষুদ্র গ্রামের জন্য সকল কিছু উৎপাদন করতো। পুনরায় এর দ্বারা তারা বর্ণ অনুযায়ী উৎপাদন ক'রতে বাধ্য হ'তো। তাই সমাজে অধিকতর আবশ্যকীয় বস্তু উৎপাদিত হ'তে পারতো না। অবশেষে দেখা যায়, বৈশ্যরাই বুদ্ধের মতবাদের পিছনে সমবেত হ'য়ে বৌদ্ধধর্মের ধ্বজা বহন ক'রে আসে।

বুদ্ধের মতবাদ বর্ণবিভাগের অবসান চেয়েছিল, চেষ্টা ক'রেছিল অনুর্বর সমাজব্যবস্থার হাত থেকে মানব জাতিকে স্বাধীন করবার।

এই হ'চ্ছে বৌদ্ধধর্মের দর্শনের ভিত্তি। অনুরূপ দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে চব্বিশজন মহাবীরের সাহায্যে জৈন-ধর্মেরও অভ্যুত্থান হয়—যা প্রথম দৃষ্টিতে সভ্যতা নাশক ব'লে মনে হ'লেও মূলতঃ সভ্যতার রক্ষক ও প্রাচীনযুগের একটি বৃহৎ 'রেনেসাঁ' আন্দোলন। এই আন্দোলনকেই আমরা পুরোপো সাম্যবাদী বিপ্লব ব'লে মনে করি—যা সুবৃহৎ চীন দেশকে সাহায্য ক'রেছিল—যখন চীন দেশের সভ্যতা পতনোন্মুখ।

বৌদ্ধযুগের পূর্বেকার ভারতীয় দর্শন মানবের ইচ্ছা ও শক্তিকে অবজ্ঞা করেছিল। তা সম্ভবতঃ সেই সভ্যতাকে কতকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই দর্শনের এমন পরিণতি হ'য়েছিল যে, তা মানুষকে কর্মপরাঙ্মুখ ও নিয়তির উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছিল। 'মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠজীব এবং সকলই তাঁর ইচ্ছা'—এই ছিল সেই দর্শনের মূলনীতি এবং এইটেই সকল সামাজিক শক্তির গতি রোধ ক'রেছিল। তাই অবশেষে সমগ্র আর্য-সভ্যতা নিবিড় তমসায় আচ্ছন্ন হ'লো। তখন ঐতিহাসিক আবশ্যকের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম মানবের ইচ্ছা ও শক্তি নিয়ে দেখা দেয় প্রতিবিপ্লবী শক্তির সামনে। তখন প্রতিবিপ্লবী ঈশ্বরও তাঁর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। অশোকের বাণী উদাত্তকণ্ঠে প্রচারিত হ'লো : '—চেষ্টা এবং শক্তির ফল : এ কেবলমাত্র মহানুভবতার দ্বারাই লাভ করা যায় না, কারণ অতি ক্ষুদ্র মানবও (মহানুভব নয়) যদি নিজের চেষ্টা এবং শক্তির ব্যবহার ক'রতে পারে, তাহ'লে সেও উচ্চে উঠ্‌তে পারে। তজ্জন্যই একথা বলা হ'য়েছিল—'মহৎ এবং ক্ষুদ্র' উভয়কেই জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য আপনাদের চেষ্টা এবং শক্তির ব্যবহার করতে দাও।'

মানুষের শক্তিবিকাশের মতো মহৎ বস্তু কিছু নেই, এবং বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি সেই নীতির উপর। মানুষের মধ্যে যখনই কোনো অমিত শক্তি ও প্রজ্ঞার স্ফুরণ হয়, তখন নিজের অজ্ঞাতেই মানুষ তার প্রচলিত পারিপার্শ্বিকতাকে জয় ক'রে এক মহাজীবনের অসীম ত্যাগের পথে যাত্রা করে। তার সেই ত্যাগসাধনার মধ্য দিয়ে বিশ্বসংসার নতুন আলোর স্পর্শ লাভ ক'রে ধন্য হয়। বুদ্ধদেবের জীবনে আমরা তারই স্বাক্ষর খুঁজে পাই। জীবন-মৃত্যুর রহস্যময় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে জীবনের পূর্ণ আনন্দের মধ্য দিয়ে কি ক'রে জগতকে মুক্তি দেওয়া যায়, জীবনের প্রথম প্রত্যূষেই এই চিন্তা তাঁকে পেয়ে ব'সলো, এবং এই চিন্তাকে ব্যবহারিক জীবনে রূপ দেবার জন্য একদিন তিনি গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রলেন। Sister Nivedita প্রকৃতই তাই তাঁর 'Siva and Buddha' গ্রন্থে ব'লেছেন :

"Life and Death together are an evil dream," he was saying to himself, "how are we to break it and awake ?"

So the Three Woes of men stung him even as the wise men had foretold at his birth, and he could neither eat nor rest. Towards mid-night, when all the household was asleep, he rose and paced about his room. He flung open a fretted window and looked out into the night. A wind swept down upon the tops of the trees as he did so, and the earth seemed to shiver. It was really the voices of the great souls of the universe, crying, "Awake ! Thou that art awakened ! Arise ! And help the world" ! And the soul of the prince heard doubtless, and understood without translating

into words. Then, as he stood looking out upon the stars seeking within himself some way to break the dream of life so that a man could pass out of reach of the play of Destiny —as he sought thus, he remembered suddenly the ancient wisdom of his race. "Why!" he cried, "this must be the quest that calls men to leave their homes and live in forests, covered with ashes! They must know something! That must be the way! I too will tread that road. But these never return to tell their wisdom. They keep it to themselves or share it only with the learned, I, when I know the secret, shall return and tell it to all mankind. The lowest of the low shall hear as much as the greatest. The way of salvation shall be open to all the world."

সমগ্র বিশ্বকে মুক্তিমন্ত্রে উদ্বোধিত ক'রে তুলতে মহাভিনিষ্ক্রমণ ক'রলেন তথাগত। পথে যে কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা তিনি ক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ ক'রলেন, তাঁর সেই কঠিন তপশ্চর্যা-ময় জীবন কাহিনী 'মজ্ঝিম নিকায়ে'র ভয়ভেরব, সচ্চক, মহাসিংহনাদ, বোধিরাজকুমার এবং মাগন্দিয় সুত্তে বর্ণিত হ'য়েছে। বৈশাখী পূর্ণিমারাত্রে তথাগত 'অনুত্তর সম্মাসম্বোধি'-পদ প্রাপ্ত হ'লেন।

এই সময়ে কাম জগতের অধিপতি 'মার' তাঁকে আক্রমণ করলো। মারের অনুচরেরা যুদ্ধ আরম্ভ ক'রলো। দেবলোক স্তম্ভিত, ভীত-সন্ত্রস্ত হ'য়ে তাঁরা পলায়ন ক'রলেন। একা প্রজ্ঞালোকবিহারী বুদ্ধ তাঁর ঐশীশক্তিদ্বারা মারের অনুচরদের আক্রমণ প্রতিহত ক'রতে লাগ্‌লেন। মার এসে হুঙ্কার ছেড়ে বল্‌লো, 'সিদ্ধার্থ, তুমি যে আসনে উপবিষ্ট, সেই আসন আমার; তুমি এই আসন অবিলম্বে পরিত্যাগ করো।'

বুদ্ধদেব ব'ল্‌লেন 'মার, তুমি দশ-পারমিতা পালন করনি, তুমি পঞ্চ মহাদান করোনি, তুমি জ্ঞানের জন্য, পৃথিবীর কল্যাণের জন্য অথবা দিব্যালোকের জন্যও বিন্দুমাত্র সাধনা করনি। সুতরাং এই আসন আমার, তোমার নয়।'

ক্রমে মারের অনুচরগণ পলায়ন ক'রলো, কাম পরাজিত হ'লো। বোধিদ্রুমতলে তখন দেবলোকের আনন্দ-উৎসব। বিজয়-গাথা উচ্চারণ ক'রে তখন বুদ্ধদেব বললেন—

'অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুনগেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খার গতং চিত্তং তহানং খয় মজ্ঝগা॥'

অর্থাৎ 'যিনি এই দুঃখপূর্ণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কারাগার নির্ম্মাণ করেছেন, তাঁর সন্ধানে আমাকে বহু জীবদেহ ধারণ ক'রতে হ'য়েছে। অবিরত আমি প্রবল সংগ্রাম ক'রেছি। কিন্তু এখন জীবদেহের নির্ম্মানকর্ত্তা, আমি তোমাকে জেনেছি। এই যন্ত্রণারূপ প্রাচীরগুলি আর তুমি নির্ম্মাণ করতে পারবে না। ছলনার মূলকাষ্ঠ আর তুমি উত্তোলিত ক'রতে কিম্বা মৃত্তিকার উপর নতুন বর্গা স্থাপন ক'রতে পারবে না। তোমার গৃহ ভগ্ন হ'য়েছে, সংযোগদণ্ড বিচূর্ণ হ'য়েছে। মার একে নির্ম্মাণ ক'রেছিল। আমি মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সেস্থান থেকে নিরাপদে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি।'

বোধিপদ লাভের পর প্রথমতঃ বুদ্ধদেব আপেক্ষিক কারণবাদের তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রলেন। এর অপর নাম দ্বাদশনিদান বা মূলকারণ। পারস্পরিক সংযুক্তির দ্বারা এই কারণগুলি মানুষকে তার স্বকীয় কর্ম্মের ফলস্বরূপ সৃষ্টি করে। এই মূল কারণ বা দ্বাদশনিদান হচ্ছে—

অবিজ্জা (অবিদ্যা)—চারি মহাসত্য, সৌরজগতের চতুর্ব্বিংশতি বিধান এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞান।

সঙ্খার (সংস্কার)—সৎ, অসৎ সম্বন্ধে ধারণা এবং বাক্য, কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রসূত কর্ম্মফল।

বিঞ্ঞাণ (বিজ্ঞান)—চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, জিহ্বা, শরীর ও মনের কর্য্যকরী সম্যক্ জ্ঞান।

নামরূপ—রূপ শরীর সম্বন্ধীয়, নাম ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সংজ্ঞা, সংস্কার সম্বন্ধীয়।

সলায়তন (ষড়ায়তন)—বিজ্ঞানের নিম্নে উল্লিখিত জ্ঞানের ছয়টি আধার।

ফস্‌সো (স্পর্শ)—প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, অন্তর্মুখীন স্মৃতির সংযোগ।

বেদনা—ষড়ায়তনের সঙ্গে মিলিত বিজ্ঞানসম্ভূত সুখ-কর, অসুখকর এবং নাতিসুখ দুঃখহীন এই ত্রিবিধ অনুভূতি।

তণ্‌হা (তৃষ্ণা)—কাম, ভব ও বিভব—এই তিনটি ইন্দ্রিয় সুখহেতু ত্রিবিধ বাসনা।

উপাদান—ইন্দ্রিয়সুখে আসক্তি, কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি আসক্তি, অন্ধবিশ্বাসের প্রতি আসক্তি, অহম্-এর প্রতি আসক্তি।

ভব—কাম, রূপ এবং অরূপ জগতের উর্ব্বরভূমি। কাম স্বর্গীয় ও মানবীয় ইন্দ্রিয়সুখের জগৎ। রূপ চারিধ্যানের দ্বারা লব্ধ দেবলোক। অরূপ নিরাকারের জগৎ—যেখানে অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ উপলব্ধি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

জাতি—মৃত অবস্থায় জন্ম—যাতে ব্যক্তিভাবাপন্ন চৈতন্য ক্রিয়াশীল হয়।

জরামরণ—বিনাশ এবং মৃত্যু, শোক-দুঃখ, পরিদেব-পরিতাপ, দুঃখ-যন্ত্রণা, গভীর সন্তাপ ও অশান্তি।

জৈবিক অস্তিত্বের এই জটিল সমস্যার সমাধান করে এবং মোক্ষলাভের পূর্ণানন্দ উপভোগ ক'রে বুদ্ধদেব ব'ল্‌লেন—

'যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা
আতাপিনো ঝায়তে ব্রাহ্মণস্স
বিধূপয়ং তিট্‌ঠতি মারসেনং,
সূরিয়ো ব ওভাসয়ং অন্তলিক্খে।'

অর্থাৎ—'যখন অপেক্ষিককারণবাদের তত্ত্ব অনুরাগী ধ্যাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণের নিকট সুপরিস্ফুট হয়, তখন তাঁর সমুদয় সংশয় অন্তর্হিত হয়, যেহেতু তখন তাঁর জগৎ প্রপঞ্চের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে। যখন সে কারণবাদের নিবৃত্তি উপলব্ধি করলো, তখন সে সমস্ত অপকৃত্য অপনোদন ক'রে গগনে প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় বিরাজমান হ'লো।'

অনেক ব্রাহ্মণ তাঁকে এসে জিজ্ঞেস করলেন: 'কি করলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায় এবং কোন্ বিশেষত্বলাভের দ্বারা ব্রাহ্মণ হ'তে পারা যায়?'

বুদ্ধদেব ব'ল্‌লেন: 'যিনি সমস্ত পাতক বর্জ্জন করেছেন, যিনি সমস্ত দ্বান্দ্বিকতা, অপবিত্রতা এবং আত্মনিগ্রহের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন, যিনি বেদের কৃতবিদ্য কর্ত্তা, যিনি শুচিতার কর্ত্তব্য সম্পাদক, যিনি সাংসারিক সর্ব্ববস্তুতে আসক্তিহীন, সেই লোকই প্রকৃত নিজেকে ব্রাহ্মণ ব'লে অভিহিত ক'রতে পারে।'

বোধদ্রুমমূল থেকে যাত্রা করে ক্রমে তিনি মুচলিন্দ তরুমূলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। নির্জ্জনতম পরিবেশের নির্ম্মল আনন্দে অভিভূত হ'য়ে আপন মনেই তিনি ব'লে উঠ্‌লেন—

'সুখো বিবেকো তুট্‌ঠস্স সুতধম্মস্স পস্সতো।
অব্যাপজ্জং সুখং লোকে পাণভূতেসু সংযমো
সুখাবিরাজতালোকে কামানং সমতিক্কমো
অস্মিন্ মানস্স যো বিনয়ো এতং বে পরমং সুখং।'

অর্থাৎ—'যে লোক সত্য শ্রবণ করেন এবং সত্য জ্ঞান লাভ করেন, তাঁর সুখকর এই বিজনতা কী আনন্দজনক! সর্ব্বজীবের প্রতি এই অনপকারিতা এবং আত্মসংযমের ভাব কী আনন্দের! প্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্তিলাভ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়জনিত সুখ বর্জ্জন করা অতীব সুখকর; তথাপি 'অহং'এর অভিমানকে পরিত্যাগ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আনন্দ।'

বেদে আর বুদ্ধে এখানে পার্থক্য নেই। তেম্‌নি ধর্ম্মগত পার্থক্য নেই এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃতই তাই বলেছেন—

"The relation between Hinduism (by Hinduism, I mean the religion of the Vedas) and what is called Buddhism at the present day, is nearly the same as between Judaism christianity. Jesus Christ was a jew, and Shakya Muni was a Hindu. The Jews rejected Jesus Christ, nay, crucified him, and the Hindus have accepted Shakya Muni as God

and worship him. But the real difference that we Hindus want to show between modern Buddhism and what we should understand as the teachings of Lord Buddha lies principally in this : Shakya Muni came to preach nothing new. He also, like Jesus, came to fullfil and not to destroy. Only in the case of Jesus, it was the old people, the Jews, who did not understand him, while in the case of Buddha, it was his own followers who did not understand the fullfilment of the old Testament, so the Buddhist did not understand the fullfilment of the truths of the Hindu religion. Again, I repeat, Shakya Mani came not to destroy, but he was the fullfilment, the logical conclusion, the logical development of the religion of the Hindus.'

কবি জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রেও এই ভাবটি বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি ব'লেছেন--

'নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে ॥'

সম্প্রতি শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য সংকলিত 'বেদ ও ভগবান বুদ্ধের চিন্তাধারা পর্য্যালোচনা' নিবন্ধটি (স্বস্তিকা, ৮ম বর্ষ, ১৯ সংখ্যা) এ সম্পর্কে বিশেষ আলোকসম্পাত ক'রেছে। তিনি বলেন : 'বৌদ্ধযুগ এক মহাপরিবর্ত্তনের যুগ। ইউরোপীয় মধ্যযুগের ন্যায় উহা বিস্তার ও উদ্বোধনের যুগও বটে। এই যুগের কৃতিত্ব এই যে, উহা সমগ্র এশিয়ার নানাস্থান হইতে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহপূর্বক বৈদিক আর্টের বিস্তার ও সমন্বয় আনিয়াছে। ভগবান বুদ্ধ সূক্ষ্ম বৈদিক চিন্তাগুলিকে বিশাল বিস্তৃতির দ্বারা মানুষের জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের বৈদিক আপন ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া নতুন সামাজিক আদর্শের সহিত ঐক্য স্থাপন করে। আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহা বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইয়া নবজীবন লাভ করে। বৌদ্ধযুগের বিভিন্ন চিন্তা, সভ্যতা ও আদর্শের সমাগমে ভারতসমাজে ধর্ম্মসঙ্কর (বর্ণসঙ্করের তো কথাই নাই) উপস্থিত হইয়াছিল। বুদ্ধ বৈদিক দর্শন ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে উহাতে প্রাচীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।'

ভিক্ষু আনন্দ মৈত্রেয়র মতে : বুদ্ধের সমসাময়িক এক পুরণো পালিগ্রন্থে এইরূপ একটা উপাখ্যান আছে যে, বুদ্ধ জনৈক নাস্তিকের কাছে মন ও শরীরাতীত আত্মার সত্তা যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করেছিলেন এবং মনে হয় ত্রিপিটকের বিস্তৃত ভাষ্যকার বুদ্ধ ঘোষের মতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠাংশ জানতে হ'লে ষড়দর্শন, গীতা, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিতে অন্বেষণ করতে হবে। যে নির্বাণ বা বিমুক্ত অবস্থায় স্বর্গ ও নরক উভয় থেকে মুক্তিলাভ করা যায়, তা শূন্য নয়। বুদ্ধদেব ব'লতেন, যে ভিক্ষু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মুক্তিলাভ করেছে, সে দেখতে পায় না, জানে না, শোনে না —এরূপ বলা অসঙ্গত। বৌদ্ধ নির্ব্বাণ এবং বৈদিক সমাধি উভয়েই এক। উভয়ই বাক্যমনাতীত অবস্থা। উপনিষদে উক্ত অবস্থার এইরূপ বর্ণনা আছে :

'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তংগচ্ছন্তি
নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং
পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥'

উপনিষদের ভূমা ও ত্রিপিটকের নির্ব্বাণ একই। নির্ব্বাণ অর্থে শরীর ও মনের বন্ধন থেকে চির মুক্তি। নির্ব্বাণ অর্থে স্বরাজ, যখন 'আত্মা বৈ মহিম্নি বিরাজতে।' সমাধি ও নির্ব্বাণ উভয়েই অখণ্ড আনন্দের অবস্থা। বৌদ্ধগণও নির্ব্বাণকে চরম শান্তির অবস্থারূপে বর্ণনা করেছেন। মহাযান শাখায় বুদ্ধের স্থান বেদের ব্রহ্মের মতো। 'নেতি, নেতি' রূপে বর্ণনা করা হ'য়েছে, তেম্‌নি পাশ্চাত্ত্য মিষ্টিক বা অতীন্দ্রিয়বাদিগণও বলেন যে, ঈশ্বরকে শূন্য ব'ললে মিথ্যে বলা হয় না।

ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামীর মতে সাংখ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল পার্থক্য এই যে, তা সাংখ্যের পুরুষকে অস্বীকার করে মাত্র—কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্তের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করে যে, সুখ-দুঃখ উভয়ই কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক। আনন্দ-উৎসবে অস্থিপঞ্জরে দর্শনের ন্যায় সুখের স্থায়ীত্ব অলীক।

অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব—এই দুঃখত্রয়াভিঘাত থেকে পরিত্রাণ লাভই সাংখ্যের উদ্দেশ্য। শুধু সাংখ্য নয়, যোগদর্শন দ্বারাও বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়। যোগদর্শনের ধ্যান প্রাচীন বৌদ্ধগণ 'ঝান' (Jhana) রূপে গ্রহণ করেছেন।

আসলে বেদে আর বুদ্ধে কোনো মৌলিক পার্থক্য বা বিরোধ নেই। বেদের পরিণতি হ'চ্ছেন বুদ্ধ। ঐতিহাসিক Dr. Waddel এর মতে: সভ্যতা অর্থে aryanisation. ভগবান বুদ্ধ সমগ্র এশিয়াকে বৃহত্তর ভারতে পরিণত করেছেন, সমগ্র এশিয়াকে সুসভ্য করেছেন। জন্মস্থানে বৌদ্ধ—সতেজ, সজীব ছিল ব'লে তা বেদান্তে পরিণত হয়েছে। কারণ ভারতের বেদান্ত বৌদ্ধধর্ম্মের Logical পরিণতি মাত্র। তাই চীন-জাপানে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ভারতীয় বেদান্তর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। মহাযান ও বেদান্ত উভয়কে এক ব'ল্‌লে অত্যুক্তি হয় না।

কতকগুলি সূত্র নিয়ে মহাযানের প্রাচীন সাহিত্য গঠিত। এই সূত্রগুলির প্রধান সূত্র হ'চ্ছে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র। এ সম্পর্কে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চীর মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে: প্রজ্ঞা হ'চ্ছে মৈত্রী করুণা প্রভৃতির মতই এক পারমিতা। বোধিসত্ত্বমার্গে উত্তীর্ণ হ'তে হ'লে প্রজ্ঞার চর্চা ছিল খুব প্রয়োজনীয়, কারণ, তা বাদ দিলে বোধিজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র লেখা হ'য়েছিল সংস্কৃতে, তারপর নানা ভাষায় তার অনুবাদও করা হ'য়েছিল। প্রজ্ঞাপারমিতা রচনার কাল এখনও সঠিক নির্দেশ করা যায়নি। তবে মনে হয় যে, কনিষ্কের সময় বা খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব্বেই এই সূত্র রচিত হ'য়েছিল। অবশ্য পরে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র অবলম্বন ক'রেই পারমিতাযান সৃষ্টি হ'লো ও খৃষ্টীয় প্রথম শতক কিম্বা তার কিছু পরে নাগার্জ্জুন তাঁর মাধ্যমিক এবং এর কিছু পরেই অসঙ্গ ও বসুবন্ধু যোগাচার-দর্শনের ভিত্তি স্থাপন ক'রলেন। এই সব আচার্য্যদের রচনা কিন্তু পিটকে স্থান পেল না। প্রজ্ঞাপারমিতাকে বুদ্ধের মুখ দিয়ে শোনানো হ'য়েছে, কিন্তু নাগার্জ্জুন প্রমুখ আচার্য্যদের রচনা শাস্ত্র; বুদ্ধের বাণী নয়। তাই তাঁদের লেখাগুলিকে 'শাস্ত্র' সংজ্ঞা দিয়ে পৃথক ক'রে রাখা হ'লো, যদিও সূত্রগ্রন্থের চেয়ে সে সব শাস্ত্র আদর কম পেলোনা। এই শাস্ত্রগুলিই হ'লো মহাযানের অভিধর্ম্ম। মহাযানের প্রথম সূত্রপাত হয় খুব সম্ভব অমরাবতীতে। নাগার্জ্জুন তাঁর শাস্ত্র অমরাবতী কিম্বা তার অদূরে ধান্যকটকের মহাবিহারে ব'সে লেখেন। কিন্তু কনিষ্কের সময় গন্ধারও মহাযানের একটা বড় কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। শোনা যায়, মহাযানের প্রধান কবি অশ্বঘোষ তাঁর অনেক বই গন্ধারে বসেই লিখেছিলেন। অসঙ্গ ও বসুবন্ধুও গন্ধারের লোক। নাগার্জ্জুনের সর্বপ্রধান গ্রন্থ হ'লো প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের টীকা। এই টীকার ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর নতুন দর্শনের প্রতিষ্ঠা ক'রে যান। আর যোগাচারের উপর অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সূত্রালঙ্কার এবং মহাযান বিংশতিকা ও ত্রিংশতিকা।

মৈত্রী হ'চ্ছে পারমিতার অন্যতম। এই মৈত্রী যেমন নিজের সম্পর্কে, তেমনি অপরের সম্পর্কেও সমভাবেই প্রযোজ্য। মহাভারতকার বলেছেন—

'জীবিতুং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোঽন্যং প্রঘাতয়েৎ
যদ্ যদাত্মনি চেচ্ছেৎ তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ।'

(শান্তি, ২১৮।২১)

অর্থাৎ 'যদি কেউ নিজে বাঁচতে ইচ্ছে করে, তবে সে কেমন ক'রে অপরকে হত্যা করে বা হত্যা করায়? নিজের জন্য যা ইচ্ছে করো, পরের জন্যও তা-ই ইচ্ছে করো।'

সুত্তনিপাতের মৈত্রীসূত্রে আছে: 'সমস্ত প্রাণী সুখী হউক, নির্ভীক হউক, সুখে জীবন যাপন করুক।'

তেম্‌নি প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে বুদ্ধবাণীতে শুনি—

'যথা মম পরেষং চ তুল্যমেব সুখং প্রিয়ম।
তথাত্মনঃ কো বিশেষো যেনাত্রৈব সুখোদ্যমঃ।'

(বোধিচর্য্যাবতার, ৮।৯৫)

অর্থাৎ—'আমার কাছে সুখ যেমন প্রিয়, অপরের সুখও তার কাছে তেম্‌নি প্রিয়; অতএব অন্য থেকে আমার প্রভেদ কোথায়—যাতে আমি কেবল আমার সুখের জন্যই চেষ্টা ক'রবো!'

বোধিসত্ত্বের মৈত্রী পারমীতে তাই বলা হ'লো—

'এবমাকাশ নিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোরনেকধা,
তবেয়মুপজীব্যোহং যাবৎ সর্গে ন নির্বৃতাঃ।'

অর্থাৎ—'অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে, সেই জীবলোকসমূহে যত জীব আছে, যতদিন সেই সব জীব মুক্তি লাভ না করে, ততদিন এইভাবে আমি তাদের সেবা ক'রবো।'

ডাঃ সতীন্দ্রবিমল চৌধুরী উল্লেখ ক'রেছেন: বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য যে সর্বোচ্চ দশটি গুণের অধিকারী হ'তে হয়, তন্মধ্যে মেত্তা বা মৈত্রী অন্যতম। মানুষে মানুষে সম্পর্কের উচ্চ আদর্শ মৈত্রীতে করে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ। বৌদ্ধধর্ম মৈত্রীর যে উচ্চ আদর্শ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন, তাই ভারতের অনুপম সম্পদরূপে পরিগণিত হ'তে পারে।

মৈত্রী সাধনায় সিদ্ধির প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব্ব, অচিন্তনীয়। বুদ্ধচরিত কাব্যে (১৩,১২) বর্ণিত আছে যে, শ্রেষ্ঠ ঋষিদের মৈত্রীর প্রভাবে বোধিবৃক্ষের পাদতলে নিক্ষীপ্ত অঙ্গারস্তূপ উক্ত পদ্মপত্রের আকারে বিন্যস্ত হ'তে লাগলো। অশ্ব ঘোষ সৌন্দরানন্দ কাব্যেও (১৮,১১) মানুষ বুদ্ধে মৈত্রীর অনুপম মাধুর্য্য সুপ্রকট করে তুলেছেন। অনুত্তরে (১,৪) লিখিত আছে যে, ব্যাপাদ বা অসদিচ্ছা ধ্বংসের কারণরূপে মৈত্রীর তুল্য আর কিছুই নাই। সৌন্দরানন্দ কাব্যে (১৬,৬৩) মহাকবি অশ্ব ঘোষ ব'লেছেন যে, মৈত্রী-সাধনায় মনের সর্ব্বপ্রকার অসদিচ্ছা দূরীভূত হয়।

মৈত্রী কেবল পরের অনিষ্ট চিন্তার অভাবই ঘোতনা করে না, পরন্তু মৈত্রী পরের সর্ব্বাঙ্গীন হিত চিন্তার ঘোতক। বিভঙ্গে (পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ৮৬) কথিত আছে যে, মৈত্রী অব্যাপাদধাতুমূলক কিন্তু ইহা হৃদয়ের উদগ্র স্নেহের পরিপোষক (নন্দতী'তি মেত্তা)।

বিশুদ্ধিমগ্গে (১১১ পৃঃ) কথিত আছে যে, চারটি ব্রহ্মবিহারের বা ভাগবত অবস্থার মধ্যে মৈত্রী অন্যতম। মনের বিমুক্ত অবস্থার উপজনন করে এই মৈত্রী (অনুত্তর, ১,৩৮)। খুদ্দকপাঠের (৮—৯ পৃঃ) মতে বিশ্বের সকলের প্রতি প্রেমভাব পোষণই পুনর্জন্ম পরিহারের শ্রেষ্ঠ উপায়। ইতিবুত্তকে (পি, টি, এস—১১ পৃঃ) মৈত্রীকে অতি উচ্চে স্থান দেওয়া হ'য়েছে। ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য যতকিছু উপাদান আছে, তা সমস্ত একত্রে মৈত্রীর ষোল ভাগের এক ভাগ মূল্যেরও নয়। মৈত্রী এই সকলের অতি ঊর্দ্ধে দিব্য আলোকে বিরাজ করে। অনুত্তরের (১.১৮৩ ; ৩.২২৫) মতে উপেক্ষা বা সর্ব্বাবস্থায় সমভাব পোষণ একটি উচ্চ ভাবের সর্ব্বোচ্চ ক্রম; এ সোপানের প্রথম ধাপই হ'চ্ছে মেত্তা বা সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি হিতভাব পোষণ; কালক্রমে এই ভাবই উত্তীর্ণ হয় করুণায়! করুণা থেকে উপজায়মান হয় মুদিতা বা নিঃস্বার্থ প্রেম। এই মুদিতা ভাব থেকেই ক্রমে উপেক্ষা-ভাবে উন্নীত হওয়া যায়। বিশুদ্ধিমগ্গে (পৃঃ ৩২৫) লিখিত আছে যে, হৃদয় যার মেত্তার অধীন, তিনি সর্ব্বদা দৃঢ়মনোভাবসম্পন্ন ও দানপ্রবণ হন, এবং কারো অনিষ্ট সাধন করেন না। সুত্তনিপাতেও (৯৬৭ পৃঃ) কথিত আছে যে, মেত্তাপরবশ ব্যক্তি মারপরবশ ব্যক্তির সংসর্গ পরিত্যাগ ক'রেই চলেন। বিশুদ্ধিমগ্গে (২৯৫ পৃঃ) লিখিত আছে যে, প্রথমেই (১) প্রেমহীন ব্যক্তি, (২) প্রিয় সুহৃৎ, (৩) উদাসীন, ও (৪) শত্রুর প্রতি মেত্তা পোষণের চেষ্টা অবিধেয়। এই গ্রন্থে এর যথাযথ কারণও বিশদরূপে বিবৃত হ'য়েছে। তবে মেত্তার উদারপথে যিনি অগ্রসর হন, তিনি কালক্রমে প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয়ও জয় করেন এবং শত্রুকেও তিনি মিত্রের মতই ভালোবাসতে সমর্থ হন। নিখিল বিশ্ব, এমন কি, দেবলোকও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে।

এই শান্তি, মৈত্রী ও সাম্যের শ্রেষ্ঠ কারক তথাগতের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

...'মহা শান্তি, মহা ক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহা প্রেম,
জ্ঞান সূর্য্য-উদয় ভাতি,
ধ্বংস করুক তিমির রাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন যাতি' অপগত কর' ভয়।
জয় হোক্ তব জয়।
মহা শান্তি, মহা ক্ষেম,
মহা পুণ্য, মহা প্রেম॥'

বৌদ্ধ পরবর্ত্তী বিশ্বে peace, uniformity বা Universal fraternity র উপর যত তত্ত্ব ও মত দর্শন গড়ে উঠেছে, তার মূল উৎস হ'চ্ছে বৌদ্ধ দর্শন। নির্লোভ ও নিরাসক্ত না হ'লে সকলের প্রতি সমদর্শিতা ও সংকুল

হওয়া যায় না। মনীষী Aldous Huxley এই নিরাসক্ত কর্মবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন—

'The ideal of non-attachment has been formulated and systematically preached again and again in the course of the last three thousand years. We find it (along with everything else) in Hinduism. It is at the vey heart of the teachings of the Buddha.....The non-attached man is one who, in Buddhist phraseology, puts an end to pain ; and he puts an end to pain, not only in himself, but also, by refraining from malicious and stupid activity, to such pain as he may inflict on others. He is the happy or 'blessed' man as well as the good man.'

বিশ্বের দরবারে চিরকাল ভারত এই দর্শনের ভূমিকা নিয়েই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা ক'রে ব'লেছে : 'অয়মহং ভোঃ,' 'আমাকে দর্শন করো।' পৃথিবী নেমে এসেছে 'ভারতের মহামানবের সাগরতলে' ভারত-আত্মার এই বাণী শুনতে। স্বাধীনভারতে আজ আবার বৌদ্ধদর্শনের নতুন রূপায়ণ সুরু হ'য়েছে। সংগ্রামী বিশ্বে শান্তির বাণী শুনিয়ে ভারত ব'লছে : 'সত্যমেব জয়তে'। জাতীয় পতাকায় তার অশোকচক্র লাঞ্ছিত, ভারতীয় মুদ্রায় আজ অশোকস্তম্ভ মুদ্রিত। তার মূলে র'য়েছেন সেই 'মহাশান্তি মহা ক্ষেম, মহা পুণ্য মহাপ্রেম'; সেই প্রজ্ঞালোকবিহারী মহাকারুণিক অমিতাভ বুদ্ধ, জাগ্রত র'য়েছে তাঁর অমৃতময় বাণী—যে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

'Buddhism has dominated increasingly the Indian mind. Buddha, in his action, is the most powerful personality that we know of as having lived and produced results upon earth. *

* লেখকের 'বৌদ্ধ দর্শন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তর্জা গান

শ্রীজয়দেব রায়

তর্জা গান, কুমুর গান এবং অন্যান্য নানা মেয়েলী গানের এক সময়ে বিশেষ চলন ছিল; কবির গানের মতো এ সকল গানের বিশিষ্ট দল ছিল এবং গ্রামে গ্রামে তাহাদের আসর বসিত। কবিগানের ন্যায় তাহাদেরও আদর ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতেছে। অনেকে অনুমান করেন, এজন্য লোকের রুচির পরিবর্তনই দায়ী। রুচিবাগীশ শ্রোতারা মনে করেন, এ শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল নিম্ন-স্তরের রঙ্গ-রসিকতা লইয়া রচিত। কিন্তু আসলে তাহা নয়। আমাদের দেশের লোকসঙ্গীত গায়কদের নৈতিক আদর্শ উচ্চ না হইলেও সমাজের আসরে গাহিবার সময় তাহারা যথাসাধ্য ভব্যতার গণ্ডী লঙ্ঘন না করিতেই চেষ্টা করিত। এ সকল গানের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ভক্তির আন্তরিকতা এবং কাব্যরসের নিদর্শনও প্রকাশিত হইয়াছে।

কবির গানের ন্যায় অতটা না হইলেও তর্জা গানের কবিরাও যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। কবিগান যেমন সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, তর্জা গানের সে ভাবে সংগ্রহ বা সংরক্ষণ হয় নাই। ভোলা ময়রা এবং এন্টনি ফিরিঙ্গির বসালাপের মতো তর্জা গানেও বহু বাদানুবাদ ও রসকলহ থাকিত।

তর্জা গান সাধারণতঃ কবিশক্তিবিশিষ্ট নিম্নশ্রেণীর লোকদের দ্বারাই পরিবেশিত হইত, তাহাদের জ্ঞান এবং রসজ্ঞতা অবশ্য সীমাবদ্ধই ছিল; সেই কারণে এ গানে কবিত্ব বা পাণ্ডিত্য বিশেষ নাই।

ক্রমে ক্রমে তর্জা, কুমুর প্রভৃতি গান মেয়েদের আসরেই একাধিপত্য বিস্তার করিল; এই গানে রসের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এবং কূট রঙ্গলীলা মেয়েরা বিশেষ ভাবে উপভোগ করিত। অনেক দল আবার স্ত্রীলোকেরাই পরিচালনা করিত।

কবির গানের দলও যজ্ঞেশ্বরী নামক একজন স্ত্রীলোক পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, এমন কি তিনি নিজেই তাঁহার দলের গানও রচনা করিতেন।

তর্জা গানের দলের মধ্যে সবচেয়ে নাম করিয়াছিল ভবরাণীর দল। মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল অঞ্চলের চেতুয়া দাসপুর গ্রামে ভবরাণীর জন্ম হয়। ভবরাণী ছিলেন একজন গ্রাম্য স্বর্ণকারের কন্যা, শৈশবে বিদ্যাচর্চার বিন্দুমাত্র সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকায় ভবরাণী কেবলমাত্র পাঁচালী আর কথকতা শুনিয়াই যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। প্রথম প্রথম তিনি তর্জা দলের পরিচালনা করিতেন, কিন্তু ক্রমশঃ তর্জার আদর কমিয়া গেলে তিনি কুমুর গানের দল গড়িলেন।

ভবরাণী অনেকটা সুরুচিসম্পন্না ছিলেন, অশ্লীলতা এবং দূষিত রসিকতা হইতে তিনি তাঁহার দলকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত নিম্নের গানটি শ্রোতাদের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিত—

ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠক্।
রাত দুপুরে বসে ঘরে, আঁৎকে ওঠে সখ।
ওরে ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠক্॥

সখের প্রাণ বাগ মানে না মানে,
বেরিয়ে পড়ে হেঁচ্‌কা টানে।
আনাচ কানাচ মানবে নাকো ধর্মে হবে বক;
রামা শ্যামা মিষ্টি বড়, ভাতার বড় টক্॥

ওই রামের পিসের শ্বশুর
টেকোর মামার শ্যালা।
মিস্তির গিন্নীর পিত্তি প'ড়ে
শুকিয়ে গেছে গলা॥

ছুটছে বেদো মেদো হাসুলে—
ইটিলি পদ্মপুকুর মানিকতলা।
যায় না রাখা সামলে॥

পেরিয়ে গেছে মেছোবাজার ধরমতলার চক্।
ওরে ঠক্ ঠক্। ঠক্ ঠক্।

গানটির মধ্যে এমন সব কথাবার্তা, ইঙ্গিত রহিয়াছে যে ইহা যে স্ত্রীলোকের রচনা তাহা ধরিতে বিলম্ব হয় না।

তর্জাগানের চঙটি বাঙলার একান্ত নিজস্ব। তর্জাগান অভিজাত সমাজে বন্ধ হইয়া গেলেও তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর, বাদ-প্রতিবাদের ভঙ্গীটি বাঙালী কবিগায়করা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। একসময়ে সাম্প্রদায়িক ধর্মসঙ্গীত রচনা করিবার একটা ধুয়া পড়িয়াছিল, প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা একপ্রকার উত্তোর গান গাহিয়া ধর্মের ক্ষেত্রে এই নূতন প্রচেষ্টাকে আক্রমণ করিতেন।

রামপ্রসাদ যখন শ্যামাসঙ্গীত রচনায় অগ্রণী হইলেন, আজু গোসাঁই নামক খালিশহরেরই এক বৈষ্ণব কবি তাহার পাল্টা গান রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। আজু গোসাঁই মোটেই ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া এ সকল গান রচনা করেন নাই, রামপ্রসাদকে আক্রমণ করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। রামপ্রসাদের গানের বিদ্রূপ রূপে তাঁহারই বিশিষ্ট সুরে তাঁহারই ভঙ্গীতে এই সকল গান গীত হইত।

রামপ্রসাদ গাহিলেন—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু তলে গিয়ে, চারি ফল
কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে
সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।

আজু গোসাঁই এই গানকে বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দিলেন—

কেন মন বেড়াতে যাবি?
কারো কথায় কোথাও যাস্‌নেরে তুই,
মাঠের মাঝে মারা যাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি;
ও তুই মদের ঝোঁকে কয়তে পারিস
মাঝগাঙেতে ভরাডুবি॥
বাঁশবনে গিয়ে ডোম কানা হয়, এ তত্ত্ব
কবে বুঝিবি?
সেথে কল্পতরু তলায় গিয়ে কি ফল
নিতে কি ফল নিবি॥

রামপ্রসাদের বিখ্যাত গান—

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥

তাহার উত্তরে গোস্বামী ঠাকুর গাহিলেন—

পেসাদ তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথা গিয়ে দেখবি রে তোর মেসো আর মাসী।
ঘরে যদি থাকিস্ বসি, ধরবে তোরে যমা কাশি।
ওরে এই বেলা নে তল্পী বেঁধে, পথের
সম্বল রাশি রাশি॥

গোঁড়া বৈষ্ণব গোসাঁই মহাশয়ের এ সকল গানের প্রেরণা দিয়াছে যে রীতিমত গায়ের জ্বালা তাহা বুঝিতে দেরি হয় না।

রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার প্রবর্তন করিলেন, তখন আবার গোঁড়া শাক্ত কবিরা আর এক শ্রেণীর গান লিখিয়া তাহার উত্তর দিলেন। দিগম্বর ভট্টাচার্য রাজার 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' এবং 'মন একি এত ভ্রান্তি তোমার' গানের পাল্টা গান রচনা করেন।

রামমোহনের গান ছিল—

মন একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জনে বল করো কার॥ (বেহাগ)

দিগম্বর ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন—

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার,
আবাহনে বিসর্জন ক্ষতি কিবা কার।
সর্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে সবে প্রাণ যায়,
বলি ধীরে আয়, আয়, জীবন সঞ্চার।

রামমোহনের গানে ছিল—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্তে কীর্তি কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র, কিবা জায়া,
তার মুখ স্মরি তত হইবে কাতর॥ (ইমন কল্যাণ)

দিগম্বর ভট্টাচার্য সেদিনের কথা ভাবিয়া উল্লসিত হইয়া গাহিলেন—

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর,
আখনীরে গঙ্গাতীরে পাতকী হীন নর।
কাটায়ে সংসার মায়া, আদ্যাদি পুত্র জায়া,
নির্মাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর॥

তাঁহাদের সমসাময়িক কৃষ্ণমোহন মজুমদারের একটি ব্রহ্মসংগীত ছিল—

তুমি কার কে তোমার কা'রে বলবে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবেশে দেখিছ স্বপন। (বিভাস)

দিগম্বর ভট্টাচার্য তাহারও উত্তর দিলেন—

মা আমার, আমি মা-র, মারে বলিবে আপন।
মহামায়া মায়ে আমি দেখিবে স্বপন॥
বলতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা, রজ্জু মিথ্যা বল কি তখন?

ধর্মসম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কপট বৈরাগ্যকে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিতেন।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গান'তরু বলরে, বল ও তরু বলরে' (রামকেলী) এককালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। ঐ সুরে বাঙলা দেশে বহু গান রচিত হইয়াছে। তাঁহার গানের একটি উত্তর দিয়াছিলেন চন্দ্রকান্ত ভায়রত্ন বাউলের সুরে—

পরমেশের দশার দেশে,
পেয়েছি পত্র পুষ্প ফলাদি তাঁর আদেশে।
বালিকে গিরির মত, ক্ষুদ্রকে হস্ত শত,
বিষময় দুগ্ধ যত, তাঁর কৃত প্রকাশে॥
আছি সদা মত্ত তাঁর উদ্দেশে,
গগন ছেদ ক'রে যাই ঊর্ধ্বদেশে,
পেলে সেই ঈশের দিশে,
প্রেমাশ্রুতে দেহ ভাসে। (খেমটা)

তর্জার প্রভাব ব্রহ্মসঙ্গীতের যুগেই সমাপ্ত নয়; রবীন্দ্রনাথের বহু গানের এই প্রকার বিদ্রূপাত্মক পাল্টা গান রচিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে আক্রমণ করিবার জন্য নয়, কেবলমাত্র রঙ্গরসের সৃষ্টি করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি কবিদের কতকগুলি বিখ্যাত গানের প্যারডি রচনা করিয়াছিলেন সতীশচন্দ্র ঘটক। রবীন্দ্রনাথের 'বাঙলার মাটি বাঙলার জলে'র প্যারডি রচনা করিলেন সতীশচন্দ্র—

বাঙলার ঢেঁকি বাঙলার কুলো
বাঙলার হাঁড়ি বাঙলার চুলো
পূজ্য হউক, পূজ্য হউক
পূজ্য হউক, হে ভগবান॥
বাঙলার টিকি বাঙলার কোঁচা
বাঙলার কচু বাঙলার মোচা
দীর্ঘ হউক, দীর্ঘ হউক
দীর্ঘ হউক, হে ভগবান॥

স্মৃতি-কথা

শ্রীকালিদাস রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

শহরের উপকণ্ঠ কাশিমবাজার থেকে শহরের মধ্যে এলাম। বহরমপুর শহরটি গঙ্গার ধারে ধারে লম্বা, এর প্রস্থ কোথাও আধমাইলের বেশি নয়। শহরটি অনেকগুলি অংশে বিভক্ত। গোরাবাজার, কাদাই, খাগড়া, ঘাটবন্দর, সৈদাবাদ, রাজাগঞ্জ, কুজঘাটা ইত্যাদি এক একটি অংশ। কাদাই ও সৈদাবাদে বহু ধনাঢ্যলোকের বসতি।

মুর্শিদাবাদ শহর বললে বহরমপুর থেকে লালবাগ, নিজামত, নসীপুর, বাদুচর, আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে ১২ মাইল দীর্ঘ শহর বুঝাত। মাঝে মাঝে অবশ্য ফাঁক ছিল।

সৈদাবাদ কাঠমাপাড়া গলির একটি বাড়ীতে আমরা বাসা পেলাম। এই বাড়ী কাশিমবাজারের মহারাজের এক আত্মীয় জমিদার ক্ষেত্রনাথ পালের বাড়ী। বাবা এই জমিদারটি উপদেষ্টা ছিলেন। সেই সুবাদে এই বাড়ী আমরা বাসের জন্য পেয়েছিলাম। বাড়ীর দোতালার ৫টি ঘরেই আমরা থাকতাম—নীচের তলার ঘরগুলি শুকুই পড়ে থাকত। তখন ত দেশে উদ্বাস্তু আসেনি।

সৈদাবাদে আমাদের কতকগুলি আত্মীয়-স্বজন ছিল। অতএব নির্বান্ধব কাশিমবাজার থেকে আমরা আত্মীয়-বান্ধবদের মধ্যেই এলাম। এখানে এসে ম্যালেরিয়ার কবল হতেও রক্ষা পেলাম।

বহরমপুর সেকালে বাংলার সংস্কৃতির একটা কেন্দ্রস্থল ছিল। কৃষ্ণনাথ কলেজের মতো ১ম শ্রেণীর কলেজ তখন খুব কম শহরেই ছিল। এই কলেজে এম-এ ও আইনও পড়ানো হ'ত। মহারাজ এ কলেজের অধিকাংশ ব্যয় ভার বহন করতেন। বহু টাকা ব্যয়ে উৎকৃষ্ট ল্যাবরেটারি তৈরি করে দিয়ে ছিলেন—কলেজের লাইব্রেরি ছিল বিরাট।

কলেজের অনেকগুলি হোস্টেল ছিল—এই সকল হোস্টেলের আংশিক ব্যয় মহারাজ বহন করতেন। এই সকল হোস্টেলে তখন বীরভূম, বর্দ্ধমান, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, বরিশালের বহু ছাত্র এসে পড়া শুনা করত। এত সস্তায় কলেজে পড়া আর কোথাও সম্ভব ছিল না। ১৮।২০ টাকা হলেই চলে যেত। কলেজের বেতন মাত্র ৩৲ টাকা। ১০৲ টাকার বেশী হোষ্টেলের মাসিক ব্যয় ছিল না। সীট ভাড়া লাগত না।

বহু ছাত্র শহরের গৃহস্থদের বাড়ীতে ছাত্র প্রতিপাল্য হিসাবে বিনা ব্যয়ে নয়ত ছোটছেলেদের পড়ানোর ভার নিয়ে বাসস্থান ও আহার্যাদি পেয়ে কলেজে পড়াশুনা করত। তাদের মধ্যে অনেকেই আজ বিবিধক্ষেত্রে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়েছেন। শহরের অভিভাবকস্থানীয় উকিল জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ সেনের বাড়ীতে ১৫।২০ জন ছাত্র আহার ও বাসস্থান লাভ করত। এঁর গৃহের পথে পুষ্ট শতাধিক ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে।

শহরে তখন দুইটি মাত্র হাইস্কুল ছিল। একটি কলেজের অধীন, আর একটি মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত। এই স্কুলটি খাগড়ায় অবস্থিত। আমি এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলাম। বালিকাদের জন্য একটি মহাকালী পাঠশালা ছিল। তাহাদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। অনেকগুলি চতুষ্পাঠি ছিল। তন্মধ্যে রাণী আর্মাকালীর চতুষ্পাঠী প্রধান।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ সুরগুরু রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহারাজের সভাগায়ক ছিলেন। তাঁর কাছে অনেকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করত। তাঁহার প্রধান শিষ্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী পরবর্ত্তী কালে দেশে বিদেশে অসামান্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব সমগ্র শহরে সঞ্চারিত হয়েছিল। পণ্ডিত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবগ্রন্থাদির সম্পাদনা ও প্রকাশের ভার পেয়েছিলেন। এঁর কাছে আমি কিছুদিন সংস্কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলাম। এঁর সম্পাদনায় একটি

বৈষ্ণব মাসিকপত্রও প্রকাশিত হত। মহারাজের অর্থসাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এর আগে বহরমপুরের ভট্টাচার্য্য পরিবার থেকেই বহু অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। তখনও সে সকল গ্রন্থ যেমন উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু কবিকর্ণপুরের অলঙ্কার কৌস্তুভ ইত্যাদি কিনিতে পাওয়া যেত।

উপাসনা পত্রিকার কথা পূর্বেই বলেছি। এই পত্রিকাকে মাঝে ক'রে একটা সাহিত্যগোষ্ঠিও গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যপরিষদের একটা শাখা ছিল—মাসে মাসে তার অধিবেশন হ'ত। আমি কলেজের ছাত্র হলেও একবার এক অধিবেশনে প্রবন্ধপাঠের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সেটা রবীন্দ্রনাথ কাব্যের উপরে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ—উপাসনার ৪ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হয়েছিল।

উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই শহরের অধিবাসী। যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (টডের রাজস্থানের অনুবাদক) মহারাজারই বৃত্তিভোগী ছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় প্রথমে উকিল ছিলেন —তার পর মহারাজের জমিদারির একটি দায়িত্বপূর্ণ ভার প্রাপ্ত হ'ন। সুলেখক দেবেন্দ্র নাথ বসু (ব্যাঙ বাবু) মহারাজের একজন সেক্রেটারি ছিলেন। কবি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় শহরের প্রধান কবি ছিলেন। আর একজন কবির নাম ছিল প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মোহিনীবাবু এখনও বাঁচিয়া আছেন। রাধাকমল তখন সবে মাত্র এম-এ পাশ করেছেন। নিরুপমা মুখোপাধ্যায় দেবীর নাম তখনও শোনা যায়নি। তবে আমাদের পুঁটুদা (বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমার দাদা) তখন গল্প লিখতেন। অতুলচন্দ্র দত্ত (কৃষ্ণনাথ স্কুলের শিক্ষক) প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর বাড়ীতে আমার আড্ডা ছিল। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বহরমপুরের উজ্জ্বলরত্ন তখন গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বহরমপুরের লোক ছিলেন—তখনই তিনি প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

আমার সহপাঠী হলেও শরবিন্দু রায় আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন রঙ্গরসের কবি। তাঁর পিতা প্রসন্নবাবু স্থানীয় ঘটনাদি নিয়ে রঙ্গরসের চমৎকার কবিতা লিখতেন। কবি রাধিকাচরণ বরাট ও সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কথা আগেই বলেছি।

কবিকা নামক একটা মাসিকপত্র রাজাগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়—তাতে আমরা তরুণেরদল সাহিত্য চর্চ্চা করতাম। ছুর্গেশ ভট্টাচার্য্য তার সম্পাদক ছিলেন।

প্রাতঃস্মরণীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন ছিলেন একজন বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মবীর। তাঁর প্রভাবে শহরে রাজনীতির চর্চ্চাও ছিল। তিনি প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মেলনকে বহরমপুরে আহ্বান করেছিলেন। সেই সম্মেলনে সেকালের সকল রাজনীতিক নেতাকে স্বচক্ষে দেখেছিলাম।

মহারাজ নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনকে প্রথম তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করেন। তার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে সেই প্রথম দেখলাম। আমার কুহু কবিতা গ্রন্থ তার আগেই প্রকাশিত হয়েছে—কিন্তু আমাকে এক জন স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ ছাড়া আর কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়নি। তবে আমি রবীন্দ্রনাথের ঘরে সেবার ভার চেয়ে নিয়েছিলাম। কোন সেবারই প্রয়োজন তাঁর ছিল না—স্বয়ং মহারাজই তাঁর সেবার তদারক করেছিলেন। আমি রবীন্দ্রনাথের পানে চেয়ে দুয়ারের পাশে বসে থাকতাম।

'আমিই কুহু লিখে আপনাকে উৎসর্গ করেছি' ব'লে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানো যে বাতুলতা, সে বুদ্ধি আমার ছিল। কাজেই নিজের পরিচয় দিতে পারলাম না। একটা কোন আদেশ পেলে ধন্য হয়ে যেতাম, কিন্তু কোন আদেশই ভাগ্যে জুটল না।

তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রেভাঃ ই-এম-হুইলার। তিনি ছাত্রদের খেলাধূলার খুবই পক্ষপাতী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। ফলে, শহরে ফুটবল খেলার খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল। যে সব ছেলে ভালো খেলোয়াড়, তারা সাহেবের খুবই প্রীতিভাজন ছিল। তরুণ অধ্যাপক নির্বাচনেও সাহেব ক্রীড়াদক্ষতায় গুরুত্ব আরোপ করতেন। কলেজের লাইব্রেরির পরিচালক হয়ে এলেন মাদ্রাজী খৃষ্টান জোসেফ এক্কলানানথম বড় খেলোয়াড় ছিলেন ব'লেই। তিনি পরে কলেজের স্কুলে হেডমাষ্টার হয়েছিলেন।

বহরমপুরের কায়স্থ জমিদার ডাঃ রামদাস সেন একজন পুরাতত্ত্বজ্ঞ ধনী পণ্ডিত ছিলেন। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি নিজের বাড়ীতে একটি বিরাট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ক'রে যান। শহরে যে লাইব্রেরিতে গবেষণার কাজ করবার লোক ছিল না। তাঁর জামাতা ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় সেই লাইব্রেরির সদ্ব্যবহার করেছিলেন। 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', মুর্শিদাবাদ কাহিনী ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার ফল।

রামদাস সেনের জ্ঞাতি বৈষ্ণবভক্ত বিষ্ণুচরণ সেনের বাড়ীতে বড় বড় কীর্ত্তনিয়াদের সমাগম হ'ত।

লালদীঘির ধারে একটি Recreation Club ছিল, এই ক্লাবের একটি ভাল লাইব্রেরী ছিল। লাইব্রেরিতে প্রধানতঃ ভালো ভালো ইংরাজি বই-ই ছিল।

বহরমপুর শহরের গায়েই বিষ্ণুপুরের বিরাট বিল। এই বিল শহরের মৎস্য ও ম্যালেরিয়া যোগাত। এই বিলের পরপারে বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ি। বিষ্ণুপুরই ছিল এ শহরের কালীঘাট।

শহরে তখনও রেশমের কুঠী ছিল। নিকটবর্ত্তী বাঞ্জেটিয়ার একসময় রেশমের কুঠী ছিল। এখন তার ইমারত কাশিমবাজার রাজের সম্পত্তি। মহারাজ সেখানে কৃষি শিল্পের প্রদর্শনী ও নৃত্য গীতের আয়োজন করতেন। সেখানে শহরের শখের থিয়েটারের অভিনয় হ'ত।

আমাদের সৈদাবাদে ছিল লালগোলার মহারাজের বিরাট কুঠিবাড়ী। এই কুঠিবাড়ী সারা বৎসরই খোলা পড়ে থাকত। এখানকার হলে শহরের সভা হ'ত। কুঠিবাড়ী বৈকুণ্ঠ বাবুর হেপাজাতে থাকত। এই কুঠিবাড়ীতেই আমরা বাৎসরিক সরস্বতী পূজা করতাম, সারস্বত সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতাম—। এই বাড়ীর প্রকাণ্ড হাতাই ছিল আমাদের পার্ক। গঙ্গার ধারের দিকে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ ছিল সৈদাবাদের ছেলেদের ক্রীড়াক্ষেত্র টেনিস কোর্ট। এই প্রকাণ্ড বাড়ীটি যেন ছিল সর্ব্বসাধারণের ভোগ্য। বৈকুণ্ঠ বাবুর বাড়ীর বড় বড় ভোজকাজ এই কুঠি বাড়ীতেই অনুষ্ঠিত হত। লালগোলার মহারাজ ক্বচিৎ কখনো আসতেন। যখন আসতেন তখন প্রধানতঃ বৈকুণ্ঠবাবুর আতিথ্যই গ্রহণ করতেন। লালগোলার মহারাজের মত এমন সদাশয় নিরভিমান ধর্ম্মনিষ্ঠ সদাশিব ধনী ব্যক্তি আর দেখিনি। সাহিত্যিক রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁর পৌত্র।

কাশিমবাজারের দুই রাজা ছাড়া শহরে অনেক ধনী লোক ছিলেন। শহরের সব লোক এঁদের দ্বারা প্রতিপালিত হ'ত। মুর্শিদাবাদ জেলা জমিদারের জেলা। শহরে সকল জমিদারেরই বাড়ী ছিল—সে সকল বাড়ীতে তাঁরা অনেক সময় থাকতেন এবং নানাবিধ পৌর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল। তবে সেকালের জমিদাররা বেশী লেখাপড়া শিখতেন না। মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র যখন বি-এ পাশ করলেন—তখন শহরে একটা অসম্ভব ব্যাপার যেন সম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। কয়েক দিন খুব উৎসব চল্‌ল। শহরে উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীরা তখন সাহেবই থাকতেন। তা'ছাড়া মিশনারী সাহেব, কুঠিয়াল সাহেব ইত্যাদি অন্যান্য সাহেব ছিল। কাজেই শহরে একটা সাহেবি আবহাওয়া ছিল। যাঁরা সাহেবি চালে চলতেন—তাঁরা সে চাল কলকাতা হতে শিখে আসতেন না—শহরেই তাঁদের তার অনুশীলন হ'ত। শহরে ইংরাজি ভাষার খুব চর্চ্চা ছিল এখনকার তুলনায়। জমিদাররা বি-এ পাশ না করলেও ইংরেজি ভাষায় খুব ভালো করেই লিখতে পড়তে পারতেন। যাঁরা বারবার এফ-এ দিয়ে এফ-এ পাশ করতে পারতেন না—তাঁরাও ইংরাজি ভাষা বেশ লিখতে পড়তে পারতেন। আর যাঁরা বি-এ দিয়ে যাঁরা পাশ করতে পারতেন না—তাঁরা এখনকার সাধারণ গ্র্যাজুয়েটদের চেয়ে ঢের বেশী ইংরাজি জানতেন। ইংরাজি ভাষায় শুদ্ধ করে লিখতে পড়তে পারাকেই বিদ্যার পরাকাষ্ঠা ব'লে মনে করা হ'ত। ফলে শহরের প্রত্যেক ছাত্র ইংরাজি ভাষা ভালো করে শিখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করত। যত বড় পণ্ডিতই হোক—কেউ একটা ইংরাজি শব্দের উচ্চারণ ভুল করলে অথবা ভুল ইংরাজি বল্‌লে বা লিখলে আর সুশিক্ষিত বলে গণ্য হ'ত না। এর থেকে কেউ যেন মনে করেন না ইংরাজি সাহিত্যেরও খুব চর্চ্চা ছিল। আমি সাহিত্যের ইংরাজির কথা বলছি না। কাজ চালানো, চিঠিপত্র লেখা, সাহেবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার ইংরাজির কথা বলছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের বক্তৃতাদি ইংরাজিতেই দিতে হ'ত। এই বক্তৃতা করতে পারতেন—

উকিল ও শিক্ষকরা। কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ইংরাজিতে ২।৪ কথা সভা সমিতিতে বলতে পারতেন।

শহরের ছেলেরা স্থানীয় কলেজেই পড়ত—তবে ধনী লোকের ছেলেরা প্রধানতঃ কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করত। শহরে ১ম শ্রেণীর কলেজ থাকলেও শহরের ছেলেদের মধ্যে ২।৩ জনই বি-এ পাশ করতে পারত। কলেজ থেকে যারা বি-এ পাশ করত তাদের অধিকাংশই অন্যান্য জেলার ছেলে—হয় হোষ্টেলে থেকে –নয়ত শহরের সঙ্গতিপন্ন লোকদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা ক'রে তারা পরীক্ষা দিত।

উচ্চতম শিক্ষার আদর্শ ছিলেন শহরের এক প্রান্তের অধিবাসী রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দুই ভাই। এরা বহরমপুর কলেজে পড়েন নি এবং শহরে খুব কম সময়ই ছিলেন। ফলে এদের আদর্শ শহরের ছাত্রেরা অনুকার্য্য বলে মনে করতে পারেনি। শহরের ছেলেদের উচ্চতম আদর্শ ছিল বি-এল পাশ করে ওকালতি করা। প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাওয়া, ভালো ক'রে এম-এ পাশ করা, বিলাতে শিক্ষালাভ করা, বড় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া, বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা ইত্যাদি শহরের ছাত্রদের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। এখন শহরের যে বাড়ীতে ৭।৮ জন ব্যারিষ্টার হয়েছে সে বাড়ীতে একজন মাত্র বি-এল পাশ করেছিল।

শহরে এম-বি ডাক্তার ৪।৫ জনের বেশি ছিল না। সে জন্য সরকারী এসিষ্টাণ্ট সার্জনই শহরে খুব বড় ডাক্তার ব'লে গণ্য হতেন।

জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত সস্তা ছিল—এত সস্তা সেকালেও অন্য জেলায় ছিল না। তার ফলে যে যা উপার্জ্জন করত তাতেই স্বচ্ছন্দে তার চলে যেত। যে উকিল ২৫০।৩০০৲ টাকা রোজগার করত সে রীতিমত বড়লোক ব'লে গণ্য হ'ত—সে নিজের ঘোড়ার গাড়ী রাখতে পারত।

লোকে অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করত না—আয় বাড়ানোর উপায়ও জানত না, পরিচ্ছন্ন বেশভূষা ও দুবেলা খাওয়া-দাওয়া হলেই যথেষ্ট মনে করত। ছেলেরা বারবার ফেল করতে সুরু করলেই একটা কোনো সামান্য কাজে ঢুকিয়ে দিত। ছাত্রাবস্থাতেই অনেক ছেলের বিয়ে হয়ে যেত—কলেজ থেকে বেরোবার আগেই অনেকেই পুত্রকন্যার পিতা হয়ে পড়ত। আমার স্কুলের সহপাঠিদের মধ্যেও দুএকজনের সন্তান হয়েছিল। 'জীব যে দিয়েছে আহারও সেই দেবে' এই ভরসাতে মাতাপিতা অল্পবয়সেই ছেলেদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ত। মেয়েদের ১০ থেকে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যেই বিয়ে হ'ত। এই বয়সের মধ্যে তারা চিঠিপত্র লেখার বিদ্যাটা আয়ত্ত করতে পারত।

ব্যবসা-বাণিজ্যটা শহরের খাপড়া অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বৈশ্যজাতীয় বা নবশায়ক শ্রেণীর লোকদেরই উপজীবিকা ছিল ব্যবসা ও দোকানদারি। শহরের অনেকের গ্রামে কিছু জমিজায়গা ছিল—তার উপস্বত্ব বৎসরান্তে গ্রামে গিয়ে আদায় ক'রে আনত।

তবু সেকালের বহরমপুর শহরকে দরিদ্র সহর বলা যায় না। তারা যা উপার্জ্জন করত জিনিসপত্র অসামান্য রকম সুলভ থাকায় তাতে তারা স্বচ্ছন্দেই কালযাপন করত।

শহরে আমোদ প্রমোদ লেগেই থাকত।

কথায় কথায় পার্টির ব্যবস্থা হ'ত।

রাজকর্ম্মচারীদের অভ্যর্থনা, বিদায় অভিনন্দন, ইত্যাদির পার্টি সব শহরেই হয়। এই শহরে কেউ রায় বাহাদুর বা রায়সাহেব হলে, কেউ বি-এ পাশ করলে, কেউ মিউনিসিপ্যাল সদস্য নির্ব্বাচিত হলে, কেউ বড় চাকরি পেলেও পার্টি দেওয়া হ'ত। অভিনন্দিতগণও অভিনন্দকদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করতেন। তা ছাড়া, বর্ষাকালে বোটপার্টি, শীতকালে পিকনিকের ধুম পড়ে যেত।

চাঁদা ক'রে টাকা তুলে এ সবের ব্যবস্থা হ'ত না। শহরের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই নিজ ব্যয়ে এর ব্যবস্থা করে আপন আপন সুহৃদ্ স্বজনকে নিমন্ত্রণ করতেন। ছাত্রাবস্থাতেই আমি অনেকগুলিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

একটা যে কোন উপলক্ষ আশ্রয় করে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ভোজের আয়োজন করতেন। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো শহরের সঙ্গতিপন্ন লোকের একটা প্রথাই ছিল। এইসব নিমন্ত্রণে

যে আয়োজন হ'ত—তা একালের কলকাতার বড় বড় ভোজকেও রাজসিকতায় অতিক্রম করত, একদিকে রাজা মহারাজা ও জমিদারদের ভোজনাদর্শ, অন্যদিকে বালুচর আজিমগঞ্জের মাড়োয়ারী বা ওসয়ালীদের ভোজ্যোপচারের বৈচিত্র্য শহরের ভোজনকলার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। নবাবী আদর্শের কথা আর বলবো না—কারণ তা নিঃশব্দ প্রভাব বিস্তার ক'রে লুপ্তপ্রায়। তবে নিরামিষ জৈনপ্রভাবটা সামিষ রাজকীয় প্রভাবের সঙ্গে অনুস্যূত হয়ে শহরে নতুন এপিকিউরিয়ান আদর্শের সৃষ্টি করেছিল। এখানকার বড় বড় ভোজে কলিকাতার কথাও বিস্মৃত হ'তনা। কলিকাতা হ'তে আসতো আম, ইলিশ মৎস্য, বরফ ও ভীম নাগের সন্দেশ যেত।

বহরমপুর আমার রাজকীয় খাদ্য ভোজনের সখ মিটিয়ে নিয়েছে—বরং অধ্যশনের সঙ্গে অতিতর্পণই লাভ হয়েছিল। আজ সুখাদ্য হতে বঞ্চিত হয়ে আর ক্ষোভ জন্মেনা—লোভও জন্মে না। তবে ছেলেদের যখন দালদায় ভাজা নিমকি পরোটা খাওয়াই, তখন একদা উপভুক্ত উৎকৃষ্ট ঘৃতে সুপক্ক সুবাসিত খাদ্যের কথা স্মরণ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলি—আর বলি, তোরা দেশে উদাস্ত ন'স বটে, তবে কালে উদাস্ত, তোদের ভাগ্যে এর বেশি জুটবে না।'

সেই ভোজনবিলাসী বহরমপুর এখন বহরমপুরবাসীর কাছেও স্বপ্নলোক।

আমি রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণে কচিৎ কখনো গিয়েছি—আমার ভোজনবিলাসের আশ্রয় ছিল—দেশপূজ্য বৈকুণ্ঠনাথ সেনের বৈকুণ্ঠে। ধারানগরীর রাজা ছিলেন সাহিত্যে প্রখ্যাত ভোজরাজ—আমার সাহিত্যে প্রখ্যাত ভোজরাজ তিনিই। এ বিষয়ে আমাকে সমর্থন করবেন—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মহারাজের গৃহে আমার ভোজনপর্বটা ছিল কাঙালীভোজনের পর্যায়ে। বৈকুণ্ঠনাথের গৃহে ছিল মান্য অতিথির মর্য্যাদা। সত্য গোপন করবনা—মহারাজের জামাতা ৺ধর্মদাস দে তাঁর কোটপাটি, পিকনিকে আমাকে মান্য অতিথির মর্য্যাদা দিয়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্র তখন বালক।

ভোজনবিলাসী বহরমপুরের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা দীর্ঘজীবী হ'ননি দুই একজন ছাড়া। জানিনা ভোজনবিলাসের সঙ্গে এর কোন গূঢ় সম্পর্ক আছে কিনা।

সেকালের বহরমপুরের নাগরিকদের গৃহের বহিরংশটা অনাচারী হতে সুরু করেছিল—আহার বিহারে পুরুষরা হিন্দুসমাজের বিধান অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করতনা—কিন্তু অন্তঃপুর লক্ষীরা অক্ষরে অক্ষরে সদাচার পালন করতেন—অন্তঃপুরের জানালার ফাঁক দিয়েও বিলাতী হাওয়া প্রবেশ করেনি। তাঁরা সকলেই পর্দ্দানশীন ছিলেন, পুণ্যস্নানের পর্ব্ব উপলক্ষেও তাঁরা কখন কি ক'রে স্নান করে যেতেন—তাও কেউ জানতে পারত না।

সেকালে বাস-মোটর হয়নি—সাইকেল রিক্সও হয়নি—কাজেই সাধারণের পক্ষে ছাকড়া গাড়ীই ছিল বাহন—মেয়েরা গাড়ীর খরখরে খড়খড়ি বন্ধ করে যাতায়াত করত। সঙ্গতিপন্ন লোকদের নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ী ছিল।—কারো টমটম, কারো ব্রুহাম, কারো ফিটন, কারো কম্পাস, কারো বা জুড়ী।

মহারাজের সব রকমেরই গাড়ী ছিল—তা ছাড়া ছিল অশ্বনিবাস। সেই অশ্বনিবাসের এক কোণে ব'সে কাসিম বাজার হতে গোরাবাজারে কলেজ যেতাম। মহারাজ অনেক গাড়ী রাখতেন কর্ম্মচারীদের জন্য। শহরের রাস্তা অতি সংকীর্ণ, সেই সংকীর্ণ পথ দিয়ে যখন বিশাল অশ্বদ্বয়-চালিত প্রকাণ্ড জুড়ী গাড়ী চলত, তখন অগ্রগামী সহিস হঠো হঠো করতে করতে পথ পরিষ্কার করে দিত। অশ্বদ্বয়ের ৮টি পায়ের দাপে পথ থর থর করে কাঁপতে থাকত। জুড়ী চলত বীর দর্পে রাজকীয় গৌরব বিস্তার করতে করতে। আর আজ মোটর চলে নিঃশব্দে চোরের মত।

মহারাজার কলিকাতার বাড়ী থেকে আমি বিয়ে করতে গিয়েছিলাম—মহারাজার কলকাতায় জুড়ী গাড়ীতে চড়ে রাজকীয় চালে। সে দিনত আমি মহামান্য ব্যক্তি—মহারাজের একজন আশ্রিত প্রতিপাল্য মাত্র নই।

শহরে প্রাসাদোপম অনেক হর্ম্ম্য ছিল। সংকীর্ণ নগরপথ হতে তাদের মহিমা উপলব্ধি করা যেতনা—গঙ্গাবক্ষ হতে মনে হ'তো—বহরমপুর a town of palaces ব'লে এরূপ নাগরিকদৃশ্য নদীবক্ষ হতে বাংলা দেশে আর কোথাও দেখিনি। সাধারণ লোকে বাস করত কাদা দিয়ে গাঁথা ছোট ছোট ইটের বাড়ীতে। প্লাষ্টারটা ঠিক রাখলেই আরো অর্দ্ধশতাব্দী টিকবে ব'লে মনে হ'ত। ইদানীং সে সব

বাড়ী ভেঙে চুণ সুরকী সিমেন্ট দিয়ে নতুন বাড়ী সব তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আর নতুন হর্ম্ম্য তৈরি হয়নি—কাজেই হর্ম্ম্যগুলিতে কাঠের কড়ি বড়গাই ছাদ রক্ষা করছে। পুরাতন শহরের আর উন্নতি হয়নি—রাস্তাগুলি এক ইঞ্চিও বাড়েনি। ভূসম্পদ্-চ্যুত জমিদারের প্রাসাদোপম ভবনগুলি মেরামতের অভাবে ক্রমে ভগ্নদশায় উপনীত হচ্ছে। অন্যদিকে দক্ষিণাংশে নতুন শহর গড়ে উঠছে।

কলেজের ইমারত রীতিমত রাজকীয়। মাতৃগর্ভের ভ্রূণে শিশু যেমন মাস মহিনা উপলব্ধি করে না—ছাত্রাবস্থায় ঐ ইমারতের মহিমা ও রাজশ্রী তেমনি উপলব্ধি করিনি। আজ তার স্মৃতিচিত্র মনে উদিত হলেই তার অপূর্বতা ও বিশালতার কথা ভেবে বিস্মিত হই। কলেজের ইমারতটি শুনেছি অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি ইমারতের অনুকরণে গঠিত। এর ক্লক টাওয়ারটি সম্পূর্ণ বিলাতী। এরূপ Clock Tower কোথাও দেখিনি।

কলেজের প্রিন্সিপালে ছিলেন ই-এম-হুইলার। তিনি কলেজের অন্তরঙ্গের অশেষ উন্নতি-সাধন করেছিলেন। ইনি আগে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপকদের বিশ্রাম কক্ষে এঁর যৌবনকালের একখানি ছবি আছে। যখন আমি ঐ কক্ষে যাই তখন অনিমেষদৃষ্টি হয়ে গুরুদেবের সেই সুপ্রসন্ন মুখচ্ছবির পানে চেয়ে থাকি।—যেমন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে গেলে বৈকুণ্ঠনাথের ছবির লম্বিতশ্মশ্রু মুখখানির পানে চেয়ে থাকি। সাহেব কলিকাতায় অবস্থান কালে মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের টিউটর ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ হ'ন। আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন সাহেব একদিন আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে ক্লাসে এসে বললেন —আজ তোমাদের ছুটি—মহিমচন্দ্র বি-এ পাশ করেছেন। সাহেব কলেজের প্রত্যেক ঘরে গিয়ে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। আর একদিনের চিত্র মনে পড়ে তখন বোধ হয় থার্ড ইয়ারে পড়ি। সাহেব ক্লাসে এসে চোখে রুমাল দিয়ে বালকের মত কাঁদতে লাগলেন। আমরা সকলেই শুনে-ছিলাম—মহিমচন্দ্র আর ইহলোকে নেই। এই সহৃদয় সচ্চরিত্র নিরভিমান কুমার ছিলেন সাহেবের নিজ হাতে গড়া মানুষ—নিজের সন্তানের মত। আমার ব্রজবেণু এই কুমার বাহাদুরের পুণ্য স্মৃতিতে উৎসৃষ্ট। কারণও আছে—বৃন্দাবন পর্যটনকালে কুমার রাধাকুণ্ডে—যেখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেহত্যাগ করেন—সেখানেই চিরনিদ্রিত হ'ন।

আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি যে হুইলার সাহেবের মত গুরু ও অন্যান্য আচার্য্যদের শিষ্যত্ব লাভ করেছিলাম। সকল অধ্যাপকই ছিলেন সাধুচরিত্র। ছাত্রবৎসল, কর্তব্য-নিষ্ঠ, স্বল্পে সন্তুষ্ট শিক্ষাব্রতী। একনিষ্ঠ সারস্বত ব্রত ছাড়া তাঁদের ব্রতান্তর ছিলনা। প্রত্যেকের নাম ধরে তাঁরা ডাকতেন। রোল নম্বরই ছাত্রদের পরিচয় ছিলনা। তাঁদের স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাই, আর বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি—তাঁদের আদর্শ এ যুগের অধ্যাপকদের জীবনকে আশ্রয় করুক।

আমার কলেজের উদ্দেশে আমি যে কবিতা রচনা করেছিলাম তাহা এখানে উদ্ধৃত করি।

অকূলের অন্তরালে দীপখানি বাঁচিয়ে যতনে
পল্লীর গৃহিণী যথা নিয়ে যায় অতিসন্তর্পণে
তুলসীবেদীর তলে, স্নানযাত্রী বর্ষীয়সী অয়ি
তেমনি জ্ঞানের শিখা জ্বালায়ে রেখেছ স্নেহময়ি
বঙ্গভূমে গঙ্গাকূলে। কত ঝড় ঝঞ্ঝা গেছে বয়ে
প্রাকৃতিক উপপ্লব; মহাধেরী সবই আছ সয়ে।
এক মহাব্রত ধরি শতশত তোমার সন্তানে
পালিয়াছ তুমি দেবি ওজোঘন পুণ্য শুভ দানে
দীক্ষা দিয়া শিক্ষা দিয়া পৌরুষের ব্রততার দিয়া
জীবন সংগ্রাম পথে অসি চর্ম্ম কবচে মণ্ডিয়া
পাঠায়েছ দেশে দেশে। বঙ্গবাণী তব জয় গায়
তব জয়ডঙ্কা বাজে সারস্বত চূড়াগ্রসীমায়।
সার্থক সাধনা তব। আত্মব্রত করিয়া সফল
পাঠায় ব্রহ্মার অর্ঘ্য আজিকে মা সন্তানের দল
তার সাথে মোর অর্ঘ্য ধরো দেবি।

রণদীক্ষা দিয়া
জীবনযাত্রার পথে যে সন্তানে দিলে পাঠাইয়া
তোমার দানের মূল্য সে সন্তান যায়নিক ভুলি।
তোমার রোপিত বীজ আজ দেবি ধরে শতগুণী
তাহার হৃদয়তরি ওতপ্রোত আজি অসংখ্যাত

কৃতজ্ঞ মাধুরীভরা বিগলিত হৃদয়ের তার
মমতা ধরেছে আজ ছন্দোরূপ। সন্তান তোমার
প্রেরিছে উদ্দেশে তব। জ্ঞানধাত্রী, তাই ভক্তিভরে
ঘর দেবি ঘর তাই দাও ঠাঁই চরণের পরে।

এই জ্ঞান ধাত্রীর আমিই বোধ হয় প্রথম জীবিত কবি সন্তান। আমার পরে শ্রীমান সাবিত্রী প্রসন্ন, শ্রীমান নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীমান হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি কবিগণ এই জ্ঞান ধাত্রীর স্তন্যপানে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে।

অধ্যক্ষ হইলার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। আমরা যখন ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হলাম তখন আমরা ত্রিশ জনের বেশী ছিলাম না। শহরে ১৪ জনের বেশী এনট্রান্স পাশ হয়নি কাজেই আমরা ছিলাম ১০।১২ জন। বাকি সব অন্যান্য স্থানের। তারা হোষ্টেলে থাকত।

আমাদের ইংরাজি Goldsmith-এর Deserted village ও Traveller, মিলটনের Paradise Lost এর কিছু অংশ Wordsworth's poems (Webb-এর সংকলন)। টেনিসনের Passing of Arthur Cowpers' Letters, Macaulay-এর দুটি Essay ইত্যাদি পড়ানো হত। সাহেব নিজে, ডাঃ হালদার, ভূষণ চন্দ্রদাস তিনজনে ইংরাজি পড়াতেন। ডাঃ হালদার ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। ইনি Cowper's Letters পড়াতেন। ব্রাহ্ম হালদার মশায়ের খুব বড় দাড়ি ছিল। ইনি যে ভাবে পড়াতেন তাতে মন দিয়ে শুনলে একবারে পড়া তৈরি হয়ে যেত। কুপারের লেখায় অনেক হাসির কথা থাকত—তিনি কিন্তু না হেসে হাসাতেন। ভয়ে আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারতাম না। তিনি হাসলেও মুচকি মুচকি হাসতেন—দাড়ির অরণ্যে তা মিলিয়ে যেত। ইনি সাহেবের ঠিক বিপরীত ছিলেন—সাহেব হেসে হাসিয়ে ক্লাসকে মাতিয়ে রাখতেন—আর এঁর ক্লাসে আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতাম।

ভূষণবাবু খুব অনর্গল ইংরাজি বলতে পারতেন না। তিনি ইংরাজি ও সংস্কৃতে ১ম শ্রেণীর এম-এ ছিলেন। ইনি অতি গরিব বিধবা বৈষ্ণবীর অসামান্য মেধাবী পুত্র ছিলেন। ইনি মহা পণ্ডিত ছিলেন—এঁর সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণব সুলভ তৃণাদপি সুনীচতা যেন ইংরাজি বিদ্যাকে বলগা টেনে অপ্রগল্‌ভ করে রেখেছিল। ইনি পাঠ্যাংশের প্রত্যেক লাইনের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতেন—কখনও লেকচার দিতেন না, বই বুঝিয়ে ২।৪ কথা বলতেন না। সাহেব বলতেন—ভূষণ বাবু পড়িয়ে গেলে আমি কয়েকটি লেকচার দিয়ে Supplement করে দেব। তিনি মাটি তৈরি করে দিলে তাতে আমি বীজ বপন করব। তাঁর পড়ানোই ছিল আসল পড়ানো।

আমাদের অঙ্ক কষাতেন ফিজিক্সের অধ্যাপক মোহিনী বাবু ও কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক শশীবাবু। তখনো অঙ্কের কোন পৃথক অধ্যাপক ছিল না। পরে বৈকুণ্ঠনাথ রায় অঙ্কের শিক্ষক হয়ে আসেন। এঁর কাছে বেশী দিন পড়া হয়নি কারণ বি-এ ক্লাসে আমি অঙ্ক ছেড়ে দিয়েছিলাম তাতে বৈকুণ্ঠবাবু বিস্মিত হয়েছিলেন—কারণ গণিতেই আমার সমধিক অধিকার ছিল।

অধ্যাপক মোহিনী মোহন রায় ফিজিক্সে খুবই কৃতবিদ্য ছিলেন। এঁর পড়ানোর অপূর্বতার চেয়ে মনে আছে এঁর শাসন। ইনি শুধু পড়াতেন না—ক্লাসে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করতেন, কাজেই এঁর তর্জ্জনা আমাদের নিত্য প্রাপ্য ছিল।

কেমিষ্ট্রি পড়াতেন—শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। অদ্ভুত এই অধ্যাপকটি। ইনি বি-এ পাশ ছিলেন—এম-এ ছিলেন না। তাঁর মত এত দ্রুত অনর্গল ইংরাজি কোন অধ্যাপকই বলতে পারতেন না। আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার—অধ্যাপকের অনুপস্থিতি ঘটলে ইনি লজিক ইতিহাস ইত্যাদিও পড়াতেন। অনর্গল ইংরাজি বলার শক্তি থাকায় সকল বিষয়ই ইনি পড়াতে পারতেন। ইনি বহরমপুর পৌর প্রতিষ্ঠানের সদ্যঃ সভাপতি ও পরে সভাপতি হয়েছিলেন। পরে কলেজের অধ্যক্ষও হয়েছিলেন।

আমাদের লজিক পড়াতেন ডাঃ হীরালাল হালদার। তখনও তিনি ডক্টর হননি। বহরমপুরে অধ্যাপক থাকতে থাকতেই তিনি Hegelianism সম্বন্ধে Thesis দিয়ে পি, এইচ, ডি হ'ন। তারপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন, তাঁর পুত্র সুধীন্দ্র হালদার আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি আই, সি, এস হয়ে ছিলেন।

আমাদের ইতিহাস পড়াতেন গিরিশচন্দ্র মিত্র। গিরিশ বাবু কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি এম-এর

ইতিহাসও পড়াতেন। তখন কলেজ হতেই এম-এ পরীক্ষা দেওয়া চলত। তাঁর পুত্র যতীশ চন্দ্র মিত্র আমাদের সময়ে টিউটর হয়ে কলেজে প্রবেশ করেন—পরে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

সংস্কৃত পড়াতেন গয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠ ও শশিভূষণ ভট্টাচার্য্যরত্ন স্মৃতিকণ্ঠ টোলে পড়া পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বড় সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন—ইনি ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু এবং পিতৃতুল্য। এঁর সব চেয়ে বড় গৌরব ছিল স্যার আশুতোষ এঁর ছাত্র। স্যার আশুতোষ এঁর কাছে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। স্যার আশুতোষ এঁকে পরীক্ষক করতে চেয়ে ছিলেন—ইনি পরীক্ষকতা গ্রহণ করেন নি। সহচারী নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ, স্বল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন। এঁর প্রপৌত্রীর সঙ্গে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান সনৎকুমারের (তারাশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্রের) বিবাহ হয়েছে। এঁর পরিবারের সঙ্গে নানা ভাবে আমি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ।

শশীবাবু যখন সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়ে আসেন তখন তিনি এম-এ পাশ করেন নি। পরে এম-এ পাশ করেন। ইনি সংস্কৃত নাট্য কাব্য ইংরাজিতেই পড়াতেন এবং অত্যন্ত দ্রুত বিশুদ্ধ ইংরাজি অনর্গল বলতে পারতেন। ইনি পরে রঙ্গপুর কলেজের অধ্যাপক হ'ন। আমি ছিলাম এঁর পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র।

আমি যখন বি এ পড়ি তখন যে অধ্যাপকরা আসেন তাঁদের কাছে আমি পড়িনি। ইতিহাসের অধ্যাপক নলিনী কান্ত নাগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি কুমার শ্রীশচন্দ্রের গার্জেন টিউটর ছিলেন। এর পাঠনার খুব সুখ্যাতি আছে। ইনি অনেক বৎসর বিলাতে শিক্ষা লাভ করেন। এঁর কাছে বিলাতের শিক্ষাদীক্ষার অনেক গল্প শুনতাম। এঁর কথারম্ভ হ'ত In England you see, the case is different এই বাক্যে। ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল কলেজ থেকে বেরিয়েই এখানে অধ্যাপক হ'ন। আর একজনের কথা বলতে বাকি আছে—পরবর্ত্তী জীবনে যাঁর সঙ্গে ও যাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে ছিল—তিনি সুধীর রায়। তিনি খুব নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন। সেই সুবাদেই তিনি কলেজে অধ্যাপক হয়ে আসেন। তিনি অল্পদিনই কলেজে ছিলেন। তিনি পরে ব্যারিষ্টার হ'ন এবং দেশবন্ধুর কন্যা অপর্ণা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর প্রত্যেকটি পুত্র আমার ছাত্র।

জোসেফ এক্লাপান খৎ কলেজের লাইব্রেরিয়ান এবং আমাদের টিউটর ছিলেন। ইনি পরে কলেজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। এঁর সঙ্গে বরাবর আমার সম্পর্ক ছিল। বৎসর বৎসর আমাকে এঁর স্কুলের টেষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ক'রে পাঠাতে হ'ত।

কলেজে অধ্যয়ন কালে অনেকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম করলে শিক্ষিত লোকে চিনতে পারবে কেবল তাদেরি নাম করব।

১। মহীতোষ কুমার রায় চৌধুরী—মহীতোষের সঙ্গে বন্ধুত্ব সমভাবেই বর্ত্তমান আছে। কলিকাতায় এম-এ পড়বার সময়ও দুইজনে মহারাজের বাগানবাড়ীতে ছিলাম। নানা তথ্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে গভীর আলোচনা হ'ত। আমার কবিতা রচনার প্রথম কয়েকজন উৎসাহদাতা ও রসবোদ্ধাদের মধ্যে মহীতোষ অন্যতম। মহীতোষ বঙ্গবাসী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিল—হিন্দুস্থান ষ্টানডার্ডের সহ সম্পাদকও ছিল। এখন এম-এল-সি ও 'শিক্ষক' পত্রিকার সম্পাদক। আমি শিক্ষকের নিয়মিত লেখক। মহীতোষ আমার নীচের ক্লাসে পড়ত। ছাত্রজীবনে চিন্তাশীল বন্ধু আর কেউ ছিল বলে মনে পড়ে না।

২। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া—বিশ্ববিদ্যালয়ের পালির প্রধান অধ্যাপক ছিল। বেণীমাধব আমার সঙ্গে কেবল ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে পড়েছিল। সে বৌদ্ধসাহিত্যে অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছিল। তার মৃত্যু হলে জগজ্যোতি পত্রিকায় একটি শোক কবিতা প্রকাশ করেছিলাম।

৩। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষাতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক। বসন্ত আমার উপরে পড়ত। বসন্ত শিক্ষাবিভাগে এবং বঙ্গসাহিত্যের গবেষণাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বসন্তর সঙ্গে বন্ধুত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ আছে। এর সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রধান সূত্র ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব।

৪। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়—দার্শনিক পণ্ডিত। বসন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে খুব বড় সরকারী কর্ম্মচারী হয়ে ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত।

বহরমপুরে এর সঙ্গে পরিচয় ছিল সামান্য। তারপর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিউটে বন্ধুত্ব গাঢ়তা লাভ করে। এর দুই পুত্র দেবীপ্রসাদ ও কামাক্ষী প্রসাদ তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বনামধন্য। এরা দুজনেই আমার ছাত্র।

৫। শরদিন্দু রায়। শরদিন্দুর অকালমৃত্যু হয়েছে। শরদিন্দু ছিল কবি, নাট্যকার, অভিনেতা ও শিল্পী। এর সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব ছিল গাঢ়তম। ছাত্র জীবনের বহু ঘণ্টাই এর সঙ্গে সাহিত্যালোচনায় কেটেছে। আমার কবিতা রচনায় এর সহায়তা সব চেয়ে বেশি। এর কাছে আমি চিরদিনই ঋণী। এর ঘরেই আমি 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটি লিখেছিলাম—সঙ্গে সঙ্গেই শরদিন্দু এতে সুর যোজনা করে গেয়ে শুনিয়েছিল। শরদিন্দু ইংরাজিতেও Verse লিখতে পারত। সে আমার তিন চারটি কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে সাহেবকে শুনিয়েছিল। সাহেব ঠাট্টা করে আমাকে Poet বলে আহ্বান করতেন। কিন্তু কবিতার অনুবাদ পড়ে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন এবং শরদিন্দুকে বলেছিলেন—Oh I see he is really a budding poet and you are already a full fledged poet. শরদিন্দুর অনেক হাসির গান আছে। সে গানগুলি নলিনীকান্ত সরকার গায়। কতবড় প্রতিভা যে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল তা যখন ভাবি তখন চোখ ফেটে জল পড়ে।

৬। চারুচন্দ্র রায়—শিল্পী। চারু আমার নীচে পড়ত। চিত্রশিল্পী হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। আমার চিত্রে সীতগোবিন্দ গ্রন্থের সব চিত্রগুলি তার আঁকা। তা ছাড়া সে সিনেমার একজন খ্যাত নামা ডিরেক্টার।

৭। ডাঃ উপেন্দ্র চন্দ্র নাগ—কাশীর একটি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। উপেন আমার উপরে পড়ত। তার মত সাহিত্যরসিক জীবনে খুব কমই মিলেছে। উপেনের কাছে আমি ঋণী। সে আমাকে (সেকালে uptodate বললে যা বুঝাত) তৎকালীন ইংরাজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় সাধন করেছিল তাতে আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ইংরাজি কবিতা পাঠে উৎসাহিত হই এবং কিছু কিছু অনুবাদও করি। তার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় জীবনের বহু প্রহরই কেটেছে। উপেন বিলাত গিয়ে সাহিত্যে ডক্টর হয়ে এসে প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধ্যক্ষ পর্যন্ত হয়ে অবসর গ্রহণ করেছে।

৮। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য ছাত্রজীবনের পরম বন্ধু। রাজনীতিক ক্ষেত্রে সে সুনাম অর্জন করেছে। কংগ্রেসের পক্ষ হতে সে এম-এল-এ হয়েছে।

৯। প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্কুল থেকে তার সঙ্গে পড়েছি। সাহিত্যে তার তেমন অনুরাগ নেই। যৌবন কাল হতে সে রাজনীতিক্ষেত্রে নেমেছিল—এখন সেও কংগ্রেস পক্ষের একজন এম-এল-এ।

কলেজের বন্ধুদের অনেকেই বড়বড় চাকুরিয়া হয়েছেন—কেউ কেউ উকিল ডাক্তার ইত্যাদিও হয়েছেন—কিন্তু তাঁদের নাম দেশের লোক শোনেনি। তাঁদের কথা ব'লে লাভ নেই। পরবর্তী জীবনে তাঁদের সঙ্গে আমার কোন ঘনিষ্ঠতাও আর ছিল না বা নেই। বরং শিক্ষা বিভাগে যাঁরা কাজ করেন—তাঁদের সঙ্গে কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল এবং আছে।

নির্বান্ধব কাসিমবাজার হতে শহরের ভিতরে এসে অনেক সঙ্গী সাথী পেয়ে গেলাম। তাদের সঙ্গ দুর্ভিক্ষ ক্ষুধিতের মুখে অন্নের মত উপাদেয় হয়ে উঠল। অধিকাংশ সময় তাদের সঙ্গেই গল্প গুজবে কাটত। গঙ্গারাম পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে শোভাবের গাড়ীতে কলেজে যেতাম—আসবার সময় হেঁটে আসতাম। কলেজের ছুটীর পর বাড়ী ফিরতে ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগত। পথে অনেকগুলি বন্ধুর বাটি ছিল—সেই সব বাটিতে অনেক সময় কেটে যেত। কলেজের পড়াশুনার ও ক্ষতি হত। কবিতা লেখাও প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। ভাবলাম কবিতা লেখার নেশাটা বোধ হয় কেটেই গেল। কিন্তু এ নেশা কাটবার নয় শরদিন্দুর উত্তেজনায় আবার ব্যাধি ফিরে এলো। এবার কবিতা লিখে প্রবাসী, ভারতী ইত্যাদি কলকাতার কাগজে পাঠাতে লাগলাম। আট দশটা পাঠালে ২।৩টা নিত এবং ছাপা হ'ত।

মফঃস্বল কলেজের একজন অখ্যাত অজ্ঞাত ছাত্র আমি, খাতার পাতা ছিঁড়ে নকল করে পাঠাতাম প্রবাসী ভারতী ইত্যাদি পত্রিকায়। আশ্চর্যের বিষয় সেকালের সম্পাদকীয় বিভাগের সাহিত্যিকরা সেগুলো পড়তেন এবং সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ছাপতেন। এ যুগে এটা বিস্ময়েরই বস্তু।

রাজসাহি সাহিত্য সম্মেলন হবে—কুঞ্জের পরিচয়ে রাজসাহী হতে নিমন্ত্রণ পেলাম। লালগোলা ঘাটে গিয়ে মহারাজার বোটে উঠে পড়লাম। রাজসাহীতে গিয়ে যথেষ্ট আদর পেলাম।

মেয়েদের মন

শ্রীঅনিল কুমার চক্রবর্তী

বেলা সাড়ে দশটা থেকে ছেলে ঠেঙিয়ে চারটের পর বাড়ি ফিরে এসে দেখি—গিন্নি আমার মুখখানি ভোলো হাঁড়ির তলা ক'রে বসে আছেন। ভয়ে ভয়ে শুধাই তাই,—আজ আবার কি হলো?

বাস্ আর যাবে কোথায়! গরম তেলে যেন জল পড়লো। গিন্নি অমনি ঝাঁক্ করে উঠলেন। ভাঙা কাঁসির মত গলায় ধ্বনিত হলো—যাও আর ন্যাকামো করতে হবে না!

আমি গাছ থেকে পড়ি। তবু ভয়ে শুধাই—ব্যাপার কি? খুলেই বলনা ছাই!

—বল্‌বো আবার কি! জান না যেন কিছু! ন্যাকা আর কাকে বলে?

গলা দিয়ে ত বটেই, চোখ্ দিয়েও যেন গিন্নির আগুন ছুটে বার হচ্ছে।

আমাকেও কৃত্রিম ক্রোধের ভাণ করতে হয়, বলি—রাগের কারণটা জান্‌তে না পারলে, মানটা ভাঙাই কি করে!

—মান তোমাকে ভাঙাতে হ'বে না। আমার মান আমি নিজেই ভাঙবো। এত কাল যার মান চুরি ক'রে ভাঙাচ্ছো, তারই মান ভাঙ্‌তে যাও! একনিঃশ্বাসে বলে গেলেন গিন্নি।

নীচু গলায় আমার বেরিয়ে আসে—সে কি!

মনে মনে আঁচ করি ব্যাপার গুরুতর। কিন্তু তবু সে ব্যাপার খানার হদিস্ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। চুপ করে কিছুকাল দাঁড়িয়ে থেকে, যখন বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়াবার মতলব করেছি, এমন কি এক পা তুলেছিও অমনি গিন্নির গলার আওয়াজ ভেসে এলো—দু'টো সংসার চালাতে হ'লে কি আর মাষ্টারীতে চলে!

—দুটো সংসার!—আশ্চর্য হ'য়ে গিন্নির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করি আমি।

গিন্নি বলেন ব্যঙ্গের সুরে—খাসা অভিনয় শিখেছ ত!

মনটা ওঠে চ'টে। সারাদিনের গরম মাথাটা আরও যেন গরম হ'য়ে ওঠে। তবু মুখে কিছু প্রকাশ না ক'রে চ'লে যাই বাইরের ঘরে। জামা কাপড় ছাড়ি সেখানে।

মুখহাত ধোয়ার পালাটি সবে শেষ করেছি, গিন্নি ঘরে প্রবেশ করলেন কালো মুখে। তাঁর হাতে একখানা ডিসে খানচারেক লুচি আর প্রকাণ্ড এক কাপ চা। আমি আসা যাওয়ার সময়টুকু একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকি। ফেরার পথে তিনি বলে যান—ও মুখ দেখাও পাপ,—অবশ্য অস্ফুটস্বরে।

—কেন? পুজোর শাড়ি খানার দাম বুঝি আশা'র বেশী যায় নি?

—বারো মণ ঘিও ফুটবে না; রাধাও নাচ্‌বে না। বলেই তিনি মরালীগমনে গাচাকা দিলেন।

সবে চিন্তাকুল মনে লুচি দু'খানির মণ্ডটুকু অন্তরাত্মার কাছাকাছি পাঠিয়েছি, এমন সময় তিনি ফিরলেন। তাঁর হাতে দেখি—একখানি খাম—রঙিন খাম। মনে কেমন সন্দেহ জাগলো।

লুচির মণ্ড বুকে পাছে আটকে যায়, তাই একচুমুক চা নিয়ে ওটাকে তরল করে নিলাম। তিনি চিঠিখানি টেবিলের ওপর ফেলে বলেন—দেখ্ ত' ওটা কার চিঠি, কোম্—।

চিঠি খানি নিয়ে খুলে ফেলি তাড়াতাড়ি। তাতে লেখা আছে—

প্রিয়,

তোমাকে অনেক দিন দেখিনি। পত্রও পাই নি। কেমন আছ জানাবে। তোমার পত্রের আশায় পথ চেয়ে রইলাম। ইতি—

তোমারই—রাধা।

মনে জাগে অনেক দিনের পুরাণো কথা। হাতের লেখাটাই তাকে আমার স্মৃতিপথে স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে

তোলে। মনটা একটু অন্যমনস্ক হয়। কিন্তু তাও ধরা পড়ে তাঁর চোখে।

তিনি বলেন— এবার জগৎটাও ভুলতে বসলে বুঝি!

আমার ঠোঁটের ফাঁকে একটু যেন হাসির ঝলক খেলে যায়। বলি না কিছুই। কারণ যে দাগ গিন্নির মনে পড়েছে, তা ত' আর বিনা প্রমাণে মুছবার নয়! তাই চুপ করে থাকি।

গোপনে রাধাকে পত্র দিই। লিখি—

রাধা, পত্রখানা টেলিগ্রাম মনে ক'রে, আমার বাসার— ঠিকানায় চলে এসো। ভীষণ বিপদাপন্ন আমি। ইতি

তোমার, বল্লভ।

দিন পাঁচেক কেটে যায়। সেদিন রবিবার। সোনালী রোদের সোনার রং ছড়িয়ে পড়েছে শরতের শিশির ভেজা ঘাসের মাথায় মাথায়। শিশির বিন্দুগুলো হাসছে মহানন্দে।

সদরের কড়া নড়ে ওঠে—খট্-খট্-খট্!

গিন্নি সান ছুটে; বলেন—কে?

দরজা খুলে দেখেন—এক অপরিচিত ব্যক্তিকে। আজ পাঁচদিন পরে আমার অর্দাংগিনী আমার প্রতি বাক্য বর্ষণ করেন; বলেন—কে যেন এসেছে।

—ওঃ, তা হলে রাধাই এসেছে। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলি।

গিন্নি তাকিয়ে থাকেন আমার মুখের দিকে। আমি তাঁর মুখমণ্ডলের পরিবর্তিত রূপটা দেখছিলাম, আড়চোখে। নেমে পড়ি আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানাতে।

রাধাকে নিয়ে আসি বাড়ির মধ্যে। গিন্নিকে বলি— এই আমার শুঁকো প্রেয়সী রাধা।

গিন্নি ততক্ষণে হ্যানিস্ট্। কানে তখন পাশের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে পেয়ালার টুন্‌টুন্ শব্দ।

প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

চতুর্থ পর্ব

—রঙ্গমঞ্চের দেবতাদের পূজা-পদ্ধতি—

ভরত বললেন—রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ হবার পর সপ্তাহভোর ব্রাহ্মণরা ঐ রঙ্গমঞ্চে পূত পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করবেন। নাট্যাচার্যকে তিন দিন উপবাস করতে হবে। শুধু তাই করলে হবে না। বাস-গৃহ থেকে দূরে গিয়ে ঈশ্বর-চিন্তায় তিন দিন অতিবাহিত করবার পর শুদ্ধ মনে মন্ত্রপূত পবিত্র গন্ধাজল নিজ অঙ্গে ও মস্তকে ছিটিয়ে নাট্যাচার্যকে রঙ্গালয় পবিত্রকরণের পূজা আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু তার আগে নাট্যাচার্যকে স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কার্তিকেয়, সরস্বতী, লক্ষ্মী, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের—তাঁদের কাছে রঙ্গালয়ের সাফল্যের জন্য করতে হবে প্রার্থনা। এইভাবে দেবতা এবং অন্যান্য দেবদিবের কাছে প্রার্থনা ক'রে পরিশেষে সকল দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলতে হবে করজোড়ে—হে দেবতারা, নিশা সমাগমে সর্ব বিপদ ও অকল্যাণ থেকে আমাদের রক্ষা ক'রো—তোমরা ও তোমাদের সহচররা নাট্যাভিনয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর আমাদের সাহায্য ক'রো।

এইভাবে দেবতাদের আরাধনা করবার পর নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষ ও সাফল্যের জন্য জরজর বা ইন্দ্রের ধ্বজকে নৈবেদ্য দিয়ে নাট্যাচার্যকে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বলতে হবে—"অসুর ও অকল্যাণ নিধনের ব্রহ্মাস্ত্র—তুমি ইন্দ্রের অস্ত্র। দেবতাদের দ্বারা তুমি সৃষ্ট। বাধা ও বিঘ্ন-নাশক তুমি। তুমি নৃপতির শত্রু নিধন ক'রে যুদ্ধের জয় গৌরব তাঁকে এনে দাও। সো ও ব্রাহ্মণের কল্যাণসাধন কর···উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চল নাট্যকলাকে।

এর পর নাট্যাচার্যকে রঙ্গালয়ে রাত্রিবাস ক'রে প্রতিদিন প্রভাতে পূজা আরম্ভ করতে হবে। রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত এই পূজা যে-সব নক্ষত্রের দিনে করতে হবে, তাহ'ল আর্দ্রা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, অশ্লেষা বা মূলা—এর যে-কোনো নক্ষত্রের অধিকার দিনে পূজা করা বিধেয়।

দীপাবলী দ্বারা রঙ্গমঞ্চ আলোকিত ক'রে পবিত্র দেহে ও মনে নাট্যাচার্যকে পূজা আরম্ভ ক'রতে হবে। ঐ দিন সন্ধ্যাগমের পূর্বেই আচমন ক্রিয়া সমাপ্ত করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে দেবতাদের। সেই সময় নিবেদন করতে হবে রক্ত চন্দন, লাল ফুল, লাল ফল, বার্লি, শ্বেত সরিষা, শুক্ল চাউল, নাগপুষ্প চূর্ণ ও লাল সুতা।

ভরত বললেন—এই শুভ কাজের পূর্বে রঙ্গালয়ের মধ্যে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ষোল হস্ত পরিমিত জায়গায় একটি মণ্ডল তৈরি করতে হবে। এর চারটি দিকেই চারটি দরজা থাকবে। এই জায়গার মধ্যস্থলে দুটি সমান্তরাল রেখা সমান্তরি চিহ্নিত করতে হবে—উপরের বিপরীত দিক দিয়ে আরো দুটি সমান্তরাল রেখা চিহ্নিত করতে হবে—এবং এই রেখার দ্বারা যে ছোট ছোট স্থান বর-স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করবে,—তারই ভেতর বিভিন্ন দেবতাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মণ্ডলের মধ্যস্থলে পদ্মাসনে স্থাপন করতে হবে ব্রহ্মাকে।

পূর্বদিকের প্রথমেই মহাদেব ও তাঁর সহচরদের, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কার্তিকেয়, সূর্য, চন্দ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা ও মেধার স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। দক্ষিণ-পূর্বে স্থাপন করতে হবে অগ্নি, গন্ধর্ব, রুদ্র, সাধ্য,—দক্ষিণে যম, মিত্র ও তদীয় সহচরগণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাক্ষসগণ ও ভূতগণ, পশ্চিমে সমুদ্র-দেবতা ও বরুণ, উত্তর-পশ্চিমে সপ্ত-বায়ু ও পর্বত ও অন্যান্য পক্ষীগণ, উত্তরে কুবের, যক্ষ্মা ও তাঁর অনুগামীগণ, উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মর্ষি।

এ-ছাড়াও পূর্বদিকের স্তম্ভে স্থাপন করতে হবে ব্রহ্মার পুত্র সনতকুমার, দক্ষিণদিকের স্তম্ভে অন্যতম সৃষ্টিকর্তা দক্ষ, উত্তরের স্তম্ভে পবনেতা প্রাণেশ ও পশ্চিম স্তম্ভে স্কন্দ স্থাপন করতে হবে। বিধি-নির্দেশ অনুযায়ী দেবতাদের প্রতিমূর্তি যথাযথ বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত ক'রে যথাযথ স্থানে স্থাপন করতে হবে। এইভাবে দেবতারা তাঁদের যোগ্য স্থান ও আসনে স্থাপিত হবার পর শাস্ত্রানুযায়ী তাঁদের পূজা করতে হবে। দিতে হবে উপযুক্ত নৈবেদ্য তাঁদের তুষ্টি-সাধনের জন্য।

ব্রহ্মাকে নিবেদন করতে হবে মধুপর্ক, সরস্বতীকে দিতে হবে সুপাচ্য পরমান্ন, শিব, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের মত দেবতাদের নিবেদন করতে হবে মিষ্টান্ন। অগ্নিকে দিতে হবে ঘৃতপক্ক অন্ন, চন্দ্র ও সূর্যকে দিতে হবে ইক্ষুরস সহ অন্ন, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব ও ব্রহ্মর্ষিদের দিতে হবে মধু ও পায়স, যম ও মিত্রকে দিতে হবে পিষ্টক ও মিষ্টান্ন, ভূতদের দিতে হবে মাংস ও অন্ন, বিবিধ মদ্য ও ঘন দুগ্ধসহ ছোলা। রাক্ষসদের মাংস ও অর্ধ-সিদ্ধ অন্ন, দানবদের মদ্য ও মাংস, জল-দেবতাকে মৎস্য ও পিষ্টক, বরুণকে ঘৃত ও পায়স, ঋষিদের বিভিন্ন ফলমূল, বায়ু দেবতা ও পক্ষীদের ভক্ষ্য ও ভোজ্য বস্তু, কুবেরকে ও তাঁর অনুগামীদের পিষ্টক। অন্যান্য দেবতা ও অর্ধ-দেবতাদের দিতে হবে অন্ন ও উৎকরিকা নামক মিষ্টান্ন।

ব্রহ্মাকে নিবেদন করতে হবে এই ব'লে—হে দেবাদিদেব, মহাপ্রভু, পদ্মাভরণ, জগতের পিতামহ, মন্ত্রাদি দ্বারা শুদ্ধ এই নৈবেদ্য গ্রহণ কর।

মহাদেবকে নিবেদন করতে হবে এই ব'লে—হে দেবাদিদেব-মহাদেবতা, ত্রিপুর ধ্বংসকারী, মন্ত্রাদি দ্বারা শুদ্ধ এই নৈবেদ্য গ্রহণ কর।

বিষ্ণুকে নিবেদন করতে হবে এই ব'লে—হে নারায়ণ, পদ্মনাভ, দেবতা—শ্রেষ্ঠ, মন্ত্রাদি দ্বারা শুদ্ধ এই নৈবেদ্য গ্রহণ কর।

অন্যান্য দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদের প্রীত করবার উদ্দেশ্যে যে সব মন্ত্রাদির বিধি-ব্যবস্থা আছে, তার উল্লেখ ক'রে ভরত বললেন—তারপর এক জলপূর্ণ, মৃত্তিকার মঙ্গল কলস,—অর্থাৎ যাকে আমরা বলি পূর্ণকুম্ভ এই রকম একটি কলস রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে রাখতে হবে। এই মঙ্গল কলসের সামনে থাকবে আম্রপত্র,—কলসের ভেতরে দিতে হবে এক খণ্ড স্বর্ণ।

নাট্যাভিনয়ের যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রাদি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন ক'রে সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্প, মাল্য, ধূপ-ধূনা ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য নিবেদন ক'রে ঐ বাদ্যযন্ত্রাদির পূজা করতে হবে।

এই ভাবে যথাযথ মন্ত্র ও বিধি-নির্দেশ অনুযায়ী দেব-তাদের ও জরজরের পূজা সম্পন্ন ক'রে নাট্যাভিনয়ের বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করতে হবে।

তারপর জরজরের সব চেয়ে ওপরদিকে বেঁধে দিতে হবে এক টুকরো শাদা কাপড়,—জরজরের রৌদ্র অংশে বেঁধে দিতে হবে এক টুকরো নীল কাপড়, জরজরের বিষ্ণু অংশে বেঁধে দিতে হবে এক টুকরো হলদে রংএর কাপড়, স্কন্দ অংশে বেঁধে দিতে হবে এক টুকরো লাল কাপড় এবং একেবারে নীচের দিকে বেঁধে দিতে হবে নানা বর্ণের এক টুকরো কাপড়।

এই-সব বিধি—নির্দেশ পালন ক'রে মাল্য, পুষ্প ও ধূপ-ধূনা ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে জরজরের উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। বলতে হবে মন্ত্রে—বাধা ও বিঘ্ন অপসরণ করবার জন্য ব্রহ্মা দেবতাদি তোমাকে করেছেন বজ্রসদৃশ শক্তি-শালী। ব্রহ্মা যেন রক্ষা করেন তোমার সর্ব উপরিভাগ, শিব রক্ষা করেন দ্বিতীয় অংশ, বিষ্ণু রক্ষা করেন তৃতীয় অংশ, কার্তিকেয় রক্ষা করেন চতুর্থ অংশ এবং মহানাগরা রক্ষা করেন পঞ্চম অংশ। যত দেবতা আছেন,—সকলেই তোমাকে যেন রক্ষা করেন—আশীর্বাদ করেন। তুমি অক্রনিধনকারী,—সর্বশ্রেষ্ঠ নক্ষত্র অভিজিৎ তোমার জন্মনক্ষত্র। হে জরজর! তুমি নৃপতির জয়সৌরব ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কর।

এইভাবে জরজরের পূজা সমাপ্ত হবার পর নাট্যাচার্যকে মন্ত্রাদি উচ্চারণ ক'রে হোমের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঐ হোমাগ্নির ভেতর পবিত্র ঘৃত নিক্ষেপ করতে হবে। হোম শেষ হবার পর নৃপতি ও নর্তকীদের রূপ লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য নাট্যাচার্যকে ঐ অগ্নিশিখা আরো প্রজ্বলিত করতে হবে এবং ঐ আলোকে উদ্ভাসিত নৃপতি, নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্রাদির ওপর পূত-পবিত্র মন্ত্রাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ বারি সিঞ্চন করতে হবে।

বলতে হবে মন্ত্র—আপনারা নানা গুণের অধিকারী ও অধিকারিনী হ'য়ে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। জন্মের অধিকারে আপনারা যে-সব গুণাবলী অর্জন করেছেন, —তা আপনাদের স্থায়ী ভূষণ হোক্, এই কামনা করি।

নৃপতিকে এই ভাবে তুষ্ট করবার পর নাট্যাভিনয়ের সাফল্যের জন্য নাট্যাচার্যকে প্রার্থনা করতে হবে। এই প্রার্থনায় বলতে হবে—মাতা সরস্বতী, ধৃতি, মেধা, হ্রী, শ্রী, লক্ষ্মী ও স্মৃতি যেন আপনাকে সর্ব বিপদ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করেন ও আপনার জীবন সাফল্য-মণ্ডিত করেন।

তারপর হোমাগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ ক'রে ও মন্ত্র উচ্চারণ করে নাট্যাচার্যকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন ক'রে ঐ মঙ্গল কলস ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

ভরত একটু থেমে আবার বললেন—কারণ ঐ মঙ্গল কলস যদি এক আঘাতে না ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে নৃপতির শত্রু কর্তৃক বিপদের আশঙ্কা থাকবে আর যদি কলস এক আঘাতে ভেঙ্গে যায়, তাহ'লে শত্রুর অনিবার্য্য ধ্বংস হবে।

কলস-ভঙ্গ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর নাট্যাচার্যকে রঙ্গালয়ের ভেতরে একটি দীপ জ্বালতে হবে এবং ঐ দীপ-বর্তিকা হাতে নিয়ে নানাবিধ শব্দ ক'রে সারা রঙ্গালয়ে তাঁকে দ্রুত প্রদক্ষিণ করতে হবে।

তারপর রঙ্গমঞ্চে এক কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করতে হবে—যুদ্ধের সময় বাজাতে হবে যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রাদি,—যেমন শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ও ঢাক। যদি এই যুদ্ধ-জনিত আঘাত সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত হয়, তাহ'লে মনে করতে হবে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ—অর্থাৎ তখন বুঝতে হবে নাট্যাভিনয়ের সাফল্য নিঃসন্দেহ ও অনিবার্য।

যদি রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয় এই সব বিধি-নির্দেশ অনুযায়ী শুদ্ধ করা হয়, তাহ'লে নাট্যাভিনয়ের ফলে দেশের নৃপতির সৌভাগ্য-বৃদ্ধি হবে—শুধু তাই নয়, যে নগরে হবে অভিনয়, সেই নগরের তথা সমগ্র দেশের অনন্যসাধারণের সৌভাগ্য-বৃদ্ধি হবে। কিন্তু যদি এই সব শাস্ত্র—নির্দিষ্ট পূজা আচরণ যথাযথ পালন না করা হয়, তাহ'লে ঐ নাট্যাভিনয় অর্ধপথে সমাপ্ত হবে অথবা ঐ নাট্যাভিনয় একেবারেই হবে না, —তাছাড়া নৃপতির হবে ভাগ্যহানি।

নাট্যাচার্য রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয় পবিত্রকরণের এই সব পূজা—পদ্ধতি স্ব-ইচ্ছায় অবহেলা ক'রে নাট্যাভিনয় করলে তার অর্থক্ষতি তো হবেই, তাছাড়া সে পরজন্মে জন্মগ্রহণ করবে পশুযোনিতে। এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই। প্রবল বায়ুর সাহায্যে অগ্নি দ্রুতগতিতে দ্রব্যাদি ভস্মীভূত করে—কিন্তু রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয় পবিত্রকরণের বিধি-নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলে, অগ্নির চেয়ে দ্রুতগতিতে ঐ অবহেলা ও অপকার্য নাট্যাচার্যকে ধ্বংস করবেই।

যে নাট্যাচার্যের শরীর ও মন পূজাদি দ্বারা পবিত্র ও নিয়ন্ত্রিত এবং যিনি নাট্যকলাজ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকারী ও নাট্যাভিনয়, প্রযোজনা ও পরিচালনায় নিপুণ, এই রকম নাট্যাচার্যের দ্বারাই রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয়ের দেবতাদের পূজাদি নিষ্পন্ন করা কর্তব্য।

ভরত বললেন—রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয়ের দেবতাদের পূজা-পদ্ধতির কথা প্রকাশ করলাম। নব-নির্মিত রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয়ের পূর্বে এই বিধি-নিয়মগুলি নাট্য-পরিচালকের পালন করা মানে হ'ল—নাট্যাভিনয়ের সাফল্য দেব ও নৃপতির সমৃদ্ধিবৃদ্ধি—তথা সমগ্র দেশের কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নয়।

[চতুর্থ পর্ব সমাপ্ত]

অল্-ইণ্ডিয়া রেডিওর উদ্যোগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা'—অভিনয়ের একটি দৃশ্য

বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ

আজ হইতে ২৪০০ বৎসর পূর্বে এই দিনে ভগবান বুদ্ধ, পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমি আজ স্বদেশবাসী ও বিদেশীদের অভিনন্দন জানাইতেছি। সমগ্র বিশ্বে ইহা একটি স্মরণীয় দিবস। কারণ এই দিনে আমরা এইরূপ একজন মহাপুরুষের স্মরণ করি, যিনি মানব ঐতিহ্যের অবিনশ্বর বাণী প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির সহিত ভগবান বুদ্ধের বাণীর কোনও সাদৃশ্য দেখা যায় না। তথাপি ঐ বাণীর সারবত্তা এখনও সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন।

ভগবান বুদ্ধের একান্ত অনুরাগী হিসাবে আমি সকলকে তাঁহার শিক্ষা, বিশেষতঃ তাঁহার অষ্টবিধ নৈতিক নিয়মাবলী গ্রহণের পরামর্শ দিতেছি। বর্তমানে বিশ্বে যেরূপ বিরোধ ও হানাহানি চলিয়াছে, সম্ভবতঃ অতীতে আর কখনও এইরূপ চলে নাই। এই কারণে বুদ্ধের প্রেম, সহনশীলতা ও শান্তি বাণীর প্রয়োজন বর্তমানেই সর্বাধিক।

বুদ্ধের বাণীতে কোনও বাগাড়ম্বর নাই। তাঁহার বাণী একান্তই ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী এবং সকল শ্রেণীর লোকেই উহা গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার চরমপন্থীদের পরিহার এবং সুলভ পন্থা গ্রহণ নীতি বিশ্ব-চিন্তাধারার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান। তাঁহার মধ্যম মার্গ বা মাঝের পথ শান্তিস্থাপন ও জটিল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই নির্ণীত হইয়াছে।

বর্তমানে আণবিক শক্তির বলে মানুষের ভাল বা ক্ষতি করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষণে বুদ্ধের জীবনাদর্শ ও অমর বাণীর গুরুত্বও বিশেষভাবে বাড়িয়াছে।

মানব জাতি বর্তমানে এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের স্থির করিতে হইবে যে, সমগ্র

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিসহ সহ-অবস্থিতি অথবা অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে অপরকে আক্রমণ—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা আমাদের অভিপ্রেত। দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণ করিলে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ অবশ্যই সুরু হইবে। ঐরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ আমাদের জীবিতাবস্থায়ই কয়েকটি ঘটিয়া গিয়াছে। ইহা হইতেছে ধ্বংসের পথ; ইহার ফলে মানব জাতিও অবলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ও পরবর্তী দুঃখকষ্টের একমাত্র বিকল্প পন্থা হইতেছে বুদ্ধ-প্রদর্শিত শান্তিময় সহ-অবস্থান। আশার কথা এই যে, এক্ষণে সর্বত্রই এই সত্য স্বীকৃত হইতেছে। বিশ্বের সকল দেশের চিন্তানায়কগণ এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, বুদ্ধের প্রেম ও শান্তির পথই অবশ্যম্ভাবী সর্বাত্মক ধ্বংস রোধ করিতে পারে। আমি আশা করি, ভগবান বুদ্ধের ২৫০০ তম পরিনির্বাণ দিবসে আমরা এই প্রেরণাই লাভ করিব।

রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম, অপরাপর মানব-শিশুর মত তাঁহার জীবনযাত্রা ও অবিরাম চেষ্টার ফলে নির্বাণ লাভ সম্ভবতঃ ভারতের, এমন কি সমগ্র বিশ্বের, ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একক ঘটনা। যদিও ভারতের বাহিরে তিনি কোথাও যান নাই, তথাপি অন্যান্য ধর্ম-গুরুর মত গৌতম বুদ্ধও হইতেছেন সমগ্র বিশ্বের এবং তাঁহার বাণী যথার্থই সার্বজনীন।

এই শুভ বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে বিদেশ হইতে যে সকল অতিথি ভারতে আসিয়াছেন আমি অতীব আনন্দের সহিত তাঁহাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাইতেছি। আমি আশা করি যে, ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কালে আমরা তাঁহার অমর বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইব এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতি তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ ভুলিয়া তাঁহার শাশ্বত বাণীর যথার্থ মূল্য অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে।

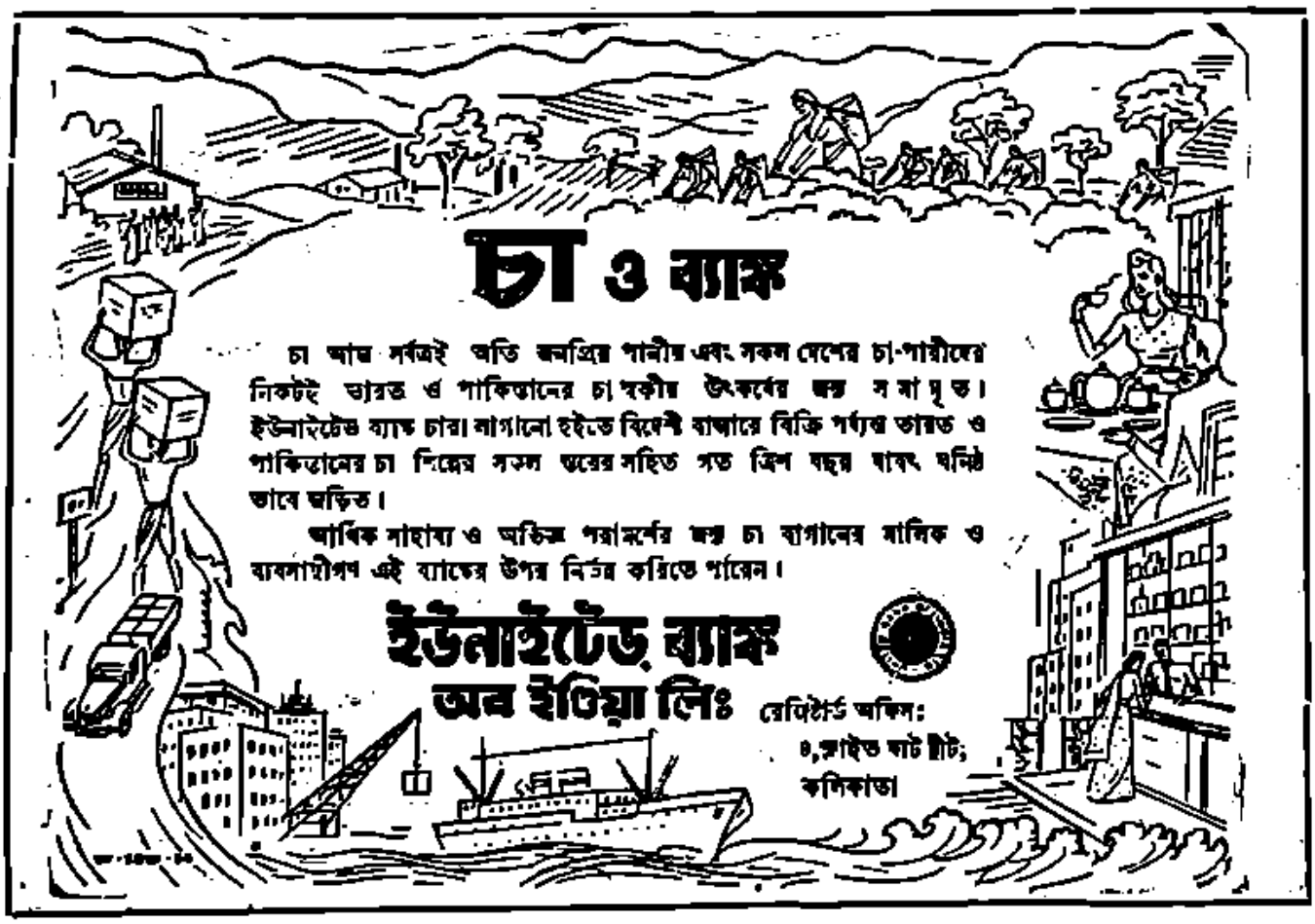

বুদ্ধের জীবন ও বাণী

ডাঃ এস রাধাকৃষ্ণণের বেতার ভাষণ

"বুদ্ধের শিক্ষা যেমন একদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র ভাবধারা অনুসারে পৃথক পৃথক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তেমনি ইহা বুদ্ধের জন্মভূমিতে সংস্কৃতির সহিত মিশিয়া উহার অচ্ছেদ্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে বুদ্ধ সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। ক্রমে ক্রমে দুইটি ভাবধারা এক সঙ্গে মিশিয়া যায়। এক কথায় বুদ্ধ অধুনাতন হিন্দু ধর্মের স্রষ্টা।

"বিশ্বের সম্পর্কে আমাদের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন যাহার ফলে শত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও মানবজীবনের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া যাইবে। আমাদের যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার আদর্শ নষ্ট হইয়াছে তাহা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে।

"খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বহুদেশে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জোর আন্দোলন চলিয়াছিল। সে সময় চীনে লো জু ও কনফুসিয়াস, গ্রীসে পারমেনিডেস ও এম্পোডোক্লস ইরাণে জরথুষ্ট্র, ভারতে মহাবীর ও বুদ্ধ ধর্মান্দোলন চালাইতেছিলেন। জন্ম, বুদ্ধত্ব ও পরিনির্বাণ—বুদ্ধের জীবনের এই তিনটি প্রধান ঘটনার সহিত বৈশাখী পূর্ণিমা জড়িত। বৌদ্ধ পঞ্জিকায় এই দিনটি বিশেষ পবিত্র। থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের মতে খৃষ্টপূর্ব ৪৪৪ অব্দে বুদ্ধের পরিনির্বাণ ঘটিয়াছিল। যাহাহউক অন্যান্য মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ ১৯৫৬ সালের মে মাসের দিনটিকে বুদ্ধের মহানির্বাণের ২৫ শততম বার্ষিকী দিবস বলিয়া গণ্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী

"বুদ্ধ কপিলাবস্তুর রাজার পুত্র। তিনি বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হন। তিনি যশোধরাকে বিবাহ করেন। তাঁহার রাহুল নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি একবার রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া একজন বৃদ্ধ লোককে দেখিতে পান এবং মনে করেন যে, তাঁহাকেও বার্দ্ধক্যের ক্লেশ ভুগিতে হইবে, আর একদিন তিনি এক রোগীকে দেখিতে পাইয়া মনে করেন যে, তাঁহাকেও রোগ ভোগ করিতে হইবে। আর একদিন তিনি এক শব দেখিতে পাইয়া মনে করেন যে, তাঁহাকেও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারে। অন্য আর এক দিন তিনি একজন সৌম্যমূর্তি সত্যসন্ধানী সাধুকে বলেন—আমি শ্রমণ, আমি জন্মমৃত্যুর ভয়ে মুক্তিলাভের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছি। বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্মজীবন যাপন করিতে মনস্থ করেন। তিনি গৃহ, পত্নী ও পুত্রকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশ ও ব্রত ধারণ করেন এবং মানুষের ক্লেশ, উহার কারণ এবং উহা দূরীকরণের উপায় চিন্তনের জন্য বনে চলিয়া যান

"বুদ্ধদেব ছয় বৎসর ধর্মের গূঢ় তত্ত্বগুলি অধ্যয়ন করেন। কঠোর ক্লেশ স্বীকার করিতে করিতে তিনি এক সময় মৃত্যুর সম্মুখীন হন। তথাপি তিনি বাঞ্ছিত জ্ঞানলাভ করেন নাই। তখন তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন।

বুদ্ধত্বলাভ

শারীরিক ক্ষমতা ও মানসিক শক্তিলাভের পর বুদ্ধ ধ্যান আরম্ভ করেন। একদিন রাত্রিতে বোধিবৃক্ষের তলায় ধ্যান করিতে বসেন। ভোরবেলায় তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তিনি এইবার জ্ঞান প্রচারে উৎসুক হন। তিনি বলেন—"আমি কাশী গিয়া এমন এক প্রদীপ জ্বালিব যাহা বিশ্বকে আলো বিতরণ করিবে। আমি এমন চক্রকা ধ্বনি করিব যাহা মানব জাতিকে জাগাইয়া তুলিবে। আমি নীতি শিক্ষা দিব। আমি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি। আমি ধর্ম প্রচার করিব।" তিনি তারপর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন এবং রাজা প্রজা ছোট বড় নির্বিশেষে হাজার হাজার লোকের সংস্পর্শে আসেন। সকলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হন। তিনি ৪৫ বৎসর কাল ধ্যান-মাহাত্ম্য, ত্যাগের আনন্দ এবং দারিদ্র্য ও সাম্যের প্রয়োজন শিক্ষা দেন।

অন্তিম বাণী

আশী বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব কুশীনগরে গিয়া পরিনির্বাণ লাভ করেন। বৈশালী নগর হইতে বিদায় লইয়া তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দসহ নিকটবর্তী এক পাহাড়ে চলিয়া যান এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে চাহিয়া আনন্দকে বলেন—চিত্রম্ ভবদ্বীপম্, মনোরমম্ জীবিতম্ মনুষ্যাণাম্ অর্থাৎ এই ভারতবর্ষ বিচিত্র—এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা মনোরম। হিরণ্যবতী নদীর তীরে এক শাল জঙ্গলে বুদ্ধদেব নিজের জন্য দুই বৃক্ষের মধ্যে এক শয্যা রচনা করেন। তিনি আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "আনন্দ, কাঁদিও না। হতাশ হইও না, মানুষ যাহা কিছু ভালবাসুক না কেন, তাহা তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবেই।" ইহাই তাঁহার জীবনের বাণী।

বুদ্ধের জীবনের দুই দিক

বুদ্ধের জীবনের দুই দিক—ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবন। বুদ্ধদেবের যে মূর্তি আমরা সচরাচর দেখিতে পাই তাহা তাঁহার ধ্যানমূর্তি। এখানে বুদ্ধ ভগবান নয়, মানব; ত্রাতা নয়, আচার্য।

বুদ্ধের জীবনের আর এক দিকে দেখা যায়—তিনি মানবের দুঃখে বেদনা বোধ করিতেছেন, তাহাদের ক্লেশ নিবারণ করিতেছেন এবং বহু ব্যক্তির কল্যাণের জন্য বাণী প্রচার করিতেছেন।

সর্ব ধর্মের লক্ষ্য

সকল ধর্মের লক্ষ্য হইল মানুষের স্বভাব পরিবর্তন। হিন্দু ও বৌদ্ধ, ধর্মের মূল শিক্ষা হইল দ্বিতীয় জন্ম; মানুষ শূন্যের মত। শূন্যের শূন্য হিসাবে অস্তিত্ব থাকে না, শূন্য হইতে চারা গাছের সৃষ্টি হয়।

বুদ্ধ, যে এক নূতন ধর্ম প্রচার করিতেছেন তাহা তিনি নিজে অনুভব করিতেন না। তিনি হিন্দু হইয়া জন্মিয়াছিলেন, হিন্দুভাবেই বড় হইয়াছিলেন এবং হিন্দু হইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ভারত-আর্য সভ্যতার প্রাচীন আদর্শকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ধর্মময় ভারতের লক্ষ্য হইতেছে অতুল শান্তি, নির্ভীকতা, অভয়, মোক্ষ, নির্বাণ। পার্থিব বিষয়ের উর্ধ্বে উঠিবার জন্য, পার্থিব বন্ধন হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য, বাহ্যিক অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোকের রাজ্যে উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

বুদ্ধ, নিজেকে ব্রহ্মভূত বলিতেন। ব্রহ্মভূত মানে সেই ব্যক্তি যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ভগবান যাহাদের করিবেন এই বিশ্বাসে অনেকে কার্য হইতে বিরত হয়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অন্তর হইতে আসে একথা তাহারা ভুলিয়া যায়। বুদ্ধ, অজ্ঞতা, সংস্কার ও ভীতির বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ করিয়াছিলেন।

বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ

হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, ও শিখ নির্বিশেষে সকল ভারতীয় ধর্মমতের নিকট বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ এক। সংসারে কোন জিনিষই চিরন্তন নহে, এমন কি দেবতাগণও নহে। মৃত্যুও চিরন্তন নয়, কোন ব্যক্তির এক জীবনের কার্যের দ্বারা চিরন্তন ভাগ্য নির্দিষ্ট হয় না। বুদ্ধ, অদৃষ্টবাদ সমর্থন করেন না। ভবিতব্যের উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নাই একথা তিনি বলেন না। তিনি বলেন—মানুষ তাহার ভবিষ্যৎ গঠন করিতে পারে—নির্বাণ লাভ করিতে পারে। সমস্ত ও সংসার জয় করা আমাদের লক্ষ্য।

বুদ্ধ, অপরিবর্তনীয় আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। কারণ সৎচিন্তা ও সৎকর্মের দ্বারা আত্মা গঠন করিতে হয়।

যখন বুদ্ধ, আমাদিগকে পরিশ্রমী হইতে, মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে বলেন, তখন তিনি আমাদের অন্তর্নিহিত সেই নীতির কথা বলেন যাহা ঘটনাপ্রবাহে ভাসিয়া যায় না, যাহা বাহিরের অবস্থার চাপে নিয়ন্ত্রিত হয় না, যাহা মানুষের মতানতের নিকটে নতি স্বীকার করে না। যে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছে সে স্বাধীন—সে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত। তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী যাঁহার অন্তঃকরণ নিজের ক্ষমতাধীন, যিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

বুদ্ধের শিক্ষা

বুদ্ধ, আমাদিগকে প্রজ্ঞা লাভ এবং করুণা অনুশীলন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ধর্মমত বা বাণী শুনিয়া কাহারও বিচার হয় না, ত্যাগ ও আত্মভাব দেখিয়া বিচার হয়।

একটা নূতন ও স্বতন্ত্র ধর্ম হিসাবে বুদ্ধধর্মের সৃষ্টি হয়

নাই। ইহা হিন্দুদের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের একটা শাখা। বুদ্ধ বৈদিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলিতেন—ধর্মের জন্য আমাদের পারিবারিক প্রথানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে পারি। কিন্তু আমি এ সকল সমর্থন করি না। কারণ অপরকে ক্লেশ দিয়া যে সুখ লাভ হয় আমি সে সুখের জন্য লালায়িত নই।

ধর্মাচার সমূহের সংস্কার করাই বুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা হিন্দুধর্মের অত্যাবশ্যক কাঠামোটি ধরিয়া থাকেন এবং আগ্রহ বিবেকের সহিত সঙ্গতি রাখিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই অবতার বলিয়া গণ্য হন। বুদ্ধকে নবম অবতার বলিয়া স্বীকার করা হয়।

বৌদ্ধধর্মের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

এদেশে বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় ভাবধারার অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি। তিনি ভারতের মৃত্তিকায় পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধ, এমন এক ধরণের মানবধর্ম সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন যাহার মধ্যে কোন প্রকার সংস্কার নাই। তাঁহার মানবধর্মে জাতিধর্মের বালাই ছিল না।

ইতিহাসের বাণী সর্বজনীন। তাহার বিষয়বস্তু শুধু ইউরোপ বা এশিয়া, কিম্বা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে—সর্বকালের এবং সর্বদেশের মানব সমাজের কথাই ইতিহাসের কথা রাজনৈতিক বিভাগ সত্ত্বেও এই পৃথিবী এক, আমরা তাহা চাই বা নাই চাই।

একের সৌভাগ্যের সহিত অপর সকলের সৌভাগ্য জড়িত। কিন্তু আজ আমাদের আধ্যাত্মিকতা ম্লান হইয়া আসিয়াছে। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অহংভাব বাড়িয়াছে। ইহারই ফলে এক বিশ্বসমাজ গঠনের আদর্শ-গ্রহণ করাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বিশ্বকে এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখাই আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। আমাদের এই দেশ বহু ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও এই আদর্শ ই চিরকাল অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। আবার একদিন হয়ত মানব জীবনের অচলায়তন ভাঙ্গিয়া সেই মহান আদর্শই জীবন্ত হইয়া উঠিবে। আধ্যাত্মিক মুক্তির সেই আদর্শকেই আমাদিগকে ফিরিয়া পাইতে হইবে।

আত্মলাভান্ ন পরম্ বিদ্যতে—একথা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই।

শান্তিই যদি আমাদের কাম্য হয় তবে আমাদিগকে আন্তরিক সংগতি বিধান করিতে হইবে। মুক্ত আত্মার প্রেমের সীমা পরিসীমা নাই। জীব মাত্রেরই মধ্যে সে দিব্য জীবনের সন্ধান লাভ করিয়া থাকে এবং মানবের কল্যাণে আত্মবলি দানেও সে পরাঙ্মুখ নয়। পাপ ছাড়া আর কিছুকেই সে ভয় করে না। কাল এবং মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া সে অনন্ত জীবন লাভ করে।

বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ

[কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রালয়ের প্রকাশনা বিভাগ 'বৌদ্ধ ধর্মের আড়াই হাজার বৎসর' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে অধ্যাপক বি, সি, বারুয়া লিখিত 'বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার' নামে একটি অধ্যায় রহিয়াছে। এ অধ্যায়টিকে ভিত্তি করিয়া এই প্রবন্ধটি রচিত।]

বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাতে কেহই এ ধর্মে তেমন সাড়া দেয় নাই; বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মকে এদেশের অন্যান্য ধর্ম হইতে পৃথক করা যাইত না। মৌর্য যুগে বৌদ্ধ ধর্ম একটি স্বতন্ত্র ধর্ম বলিয়া প্রতীত হয় এবং উহার সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা দেখা যায়।

মৌর্যগণ বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্ব ধর্মের পর্যায়ে উপনীত করেন। তারপর ইহা তিব্বত, ভুবন্স, চীন, কোরিয়া, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া ও মালয় পর্যন্ত প্রসারলাভ করে।

সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম বহু দূর দেশেও প্রসারিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ ধর্ম পরিষদের অনুষ্ঠান হয়। সম্রাটেরই প্রতিভাবলে বৌদ্ধ ধর্ম একটি বিশ্ব ধর্ম হইয়া উঠে। তাঁহার অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি সিরিয়া, মিশর, সাইরেনিকা ও ম্যাসিডোনিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক প্রেরণ করেন। চোল, কেরলপুত্র, সত্যপুত্র ও সিংহল পর্যন্তও প্রচারক পাঠান হইয়াছিল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, নেপাল, কাশ্মীর ও সুবর্ণভূমিতেও ধর্ম প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। এই ধর্ম প্রচারকগণ দেশে-বিদেশে ধর্ম প্রচারে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। যদি আজ বুদ্ধের নির্বাণ লাভের আড়াই হাজার বৎসর পরে সিংহল হইতে জাপান পর্যন্ত গৌতমের শান্তি-স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল মানুষের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতে নির্দেশ দিয়া থাকে, তবে তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে এক সময় এক সাধু ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মের শাখা

বৌদ্ধ ধর্ম দ্রুত প্রচারের ফলে, ইহার কয়েকটি শাখা সৃষ্টি হয়। এই শাখাসমূহের মধ্যে মতগতগত পার্থক্য তেমন ছিলনা যেমন ছিল ভৌগোলিক সীমাগত। পরে এই সব শাখার অস্তিত্বের অবসান ঘটে। শেষ পর্যন্ত দুইটি শাখার অস্তিত্ব বজায় থাকে। সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে হীনযান শাখা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই শাখার অন্তর্গত বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবকে ঈশ্বর মনে না করিয়া, গুরু হিসাবে পূজা করিতেন। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে একটা সংস্কার আছে। মানব মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য এবং কুশান, তাতার ও মঙ্গোলদের প্রয়োজন পূরণের জন্য মহাযান মতাবলম্বীরা বুদ্ধের দেবত্ব ঘোষণা করেন। চীন, জাপান, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া বৌদ্ধ ধর্মের এই মতবাদ গ্রহণ করে।

সুঙ্গদের সময়ে সরকার বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। পুষ্যমিত্র সুঙ্গ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে নির্যাতনও করিতেন। কিন্তু জনগণের সহায়তায় সুঙ্গ-কণ্ব যুগে বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রসারিত হয়। এই যুগে ভারুতস্তূপ, কারলা গুহা ও সাঁচি স্তূপ নির্মিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম ভিক্ষুদের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

এই যুগে গ্রীকগণ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা মেনান্দার এই ধর্মের একজন পোষক ছিলেন। মোগ্‌গলি-পুত্ত তিস্য একজন ধর্ম প্রচারককে অপরান্তক প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি বহু সহস্র ব্যক্তিকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। ভারতস্থিত গ্রীকগণ এক নূতন ধরণের বৌদ্ধ শিল্প প্রবর্তন করেন। এই শিল্প প্রধানতঃ পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে।

কনিষ্কের রাজত্বে বৌদ্ধ ধর্ম এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। কনিষ্ক কেবল বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, তিনি এ ধর্মের এক নব রূপদাতা ছিলেন। এই নূতন রূপের নাম মহাযান।

গুপ্ত যুগ

গুপ্ত বংশের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মে এক নব

প্রেরণার সঞ্চার হয়। গুপ্ত সম্রাটগণ ভাগবত ও ব্রাহ্মণ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁহাদের মমতা ছিল। এই যুগে যে সব চৈনিক যাত্রী ভারতে আগমন করেন তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্মের সমৃদ্ধির কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই যুগে বৌদ্ধ ধর্ম যে অগ্রগতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ মথুরা, সারনাথ, নালন্দা, অজন্তা, বাগ প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ শিল্প হইতে পাওয়া যায়।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে কতকগুলি দলিল হইতে বৌদ্ধ ধর্মের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধন তাঁহার পরিণত বয়সে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। পশ্চিমে বল্লভী নামক স্থানটি মৈত্রক-বংশের শাসন কর্তাদের অধীনে একটি বৌদ্ধ কেন্দ্র হইয়া উঠে।

হর্ষবর্ধনের পরবর্তী এক শতাব্দী দেশে অরাজকতা চলিয়াছিল। সে সময় বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। তবে তখন ইহা কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে লোপ পাইতে থাকিলেও পাল রাজাদের সহায়তায় উহা পূর্ব ভারতে বিস্তৃত হইতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম পর্যন্ত তিন শতাব্দীকাল নালন্দার প্রভাব ছিল। পাল রাজাদের সহায়তায় জগদ্দল ও বিক্রমপুরী, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরীতে যে সব নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলি ৯ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ সংস্কৃতির উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

রূপ মণ্ডূক

কমলাকান্ত বরাট

নব্য সমারোহে আমার নাটকের অভিনয় হয়ে গেল।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কাউন্সিলার শ্রীসত্যভূষণ মল্লিক, আর প্রধান অতিথি শ্রীনকুল চরণ শেঠ, বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনী। অভিনয়ের আগে আমাকে মঞ্চের ওপর নিয়ে গিয়ে সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং সমবেত দর্শকবৃন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। অভিনয়ের সময় আমাকে বসতে দেওয়া হল বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতবর্গের সঙ্গে। বিশ্রামের সময় অনেকের অনেক কথাই কানে চুকল···গ্র্যাণ্ড লিখেছে ভাই; কি ক্যারাক্টার, ওয়াণ্ডারফুল! আর ডায়লগ্ যা দিয়েছে না—আঃ কি বলব আর। সাকসেসফুল,—গ্র্যাণ্ড সাকসেস্! চতুর্দিক থেকে সপ্রশংস দৃষ্টি আমায় কিঞ্চিত কুণ্ঠিত করে তুললেও বিরাট আত্মপ্রসাদে মন ভরে গেল। আমি যেন রাতারাতি লেখক হয়ে গেলাম সকলের কাছে, হয়তো বা নিজের কাছেও।

পরের দিনের ঝামেলা আমার আরও বেশী। পাড়ার ছেলেরা ছেঁকে ধরল' চায়ের দোকানে। কাপকয়েক চা বেশী খাওয়া হয়ে গেল। শ্যামল বলল, "বিমলদা, এ্যান্টি-ষ্টোক্র্যাটিক সোসাইটিকে যা ঠুকেছ তোমার নাটকে মাইরী" —সন্তোষ বলল "তোমার নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে গ্রাম্য-জীবনের যে রূপটা তুমি তুলে ধরেছ, তা একেবারে নিখুঁত। কোনদিন যারা গ্রাম দেখেনি, তারাও তোমার নাটক দেখলে গ্রামের সহজ-সরল লোকদের বেশ বুঝতে পারবে।"

ক্লাবের পাণ্ডা সুরেশদা এলেন-দুজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এরা এদের ক্লাব সংস্কৃতি-মন্দিরে তোমার নাটকটা অভিনয় করবে ঠিক করেছে। আমাদের অভিনয় দেখে তোমার নাটকটা খুব ভাল লেগেছে এদের। কাল সন্ধ্যেবেলায় নাটকটা নিয়ে আমার সঙ্গে তোমায় এদের এখানে যেতে হবে।" ভদ্রলোকদের একজন বললেন "রোল সিলেক্সন্ ব্যাপারটা আমরা কালকেই সেরে ফেলব ঠিক করেছি, আর এটা যাতে আপনার সামনেই হয় তাই আমরা চাই। কাল সন্ধ্যে-বেলায় অতি অবশ্য সুরেশদার সঙ্গে আসবেন। সুরেশদা, ভদ্রলোককে বলে গেলাম, সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার ভার কিন্তু আপনার। আচ্ছা, চলি তাহলে, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

'সংস্কৃতি-মন্দিরের' নাম করে সুরেশদা আমায় যেখানে নিয়ে এলেন সেটা কারও বাড়ী নয়, ক্লাবও নয়, আসলে সেটা হচ্ছে একটা চায়ের দোকান। সাধারণতঃ চায়ের দোকান বলতে যা বোঝায়,এটা অবশ্য ঠিক সে ধরণের নয়। একটু উন্নত ধরণের দোকান, অর্থাৎ রেষ্টুরেন্ট্। তকতকে মেঝে, ঝকঝকে টেবিল চেয়ার, ইউনিফর্ম্ পরিহিত বয়-বেয়ারা আর সুবেশধারী সুদর্শন গ্রাহক। সুরেশদা কিন্তু বড় হলটার কোনখানেই বসলেন না। হলের পাশেই একটা ছোট আলাদা ঘর, একটা বড় লম্বা টেবিল, আর টেবিলের দু-পাশে ছোট ছোট অনেকগুলো চেয়ার। সাত আটজন যুবক বসে রয়েছেন; সকলের হাতে সিগারেট আর সকলের চোখেই চশমা। এঁদের পোষাকের বিশিষ্টতাও চোখে পড়বার মত। এঁরা কেউ ধুতি পরেন না। প্রত্যেকের পরনেই ফুল-প্যাণ্ট আর অতি আধুনিক ফ্যাসনে ওপর দিয়ে ঝোলানো ফুল সার্ট অথবা হাওয়াই সার্ট। কয়েকজনের সামনে চায়ের কাপ, কারও খাওয়া হয়ে গেছে, কারও বা হচ্ছে। বেশভূষায় আর চেহারায় স্পষ্ট বোঝা যায় এঁরা সকলেই বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। সুরেশদা পরিচয় করিয়ে করিয়ে দিয়ে বললেন "ইনিই আমাদের নাট্যকার পরিমল বোস, আর এঁরা হচ্ছেন 'সংস্কৃতি-মন্দির' ক্লাবের বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দ"

"নমস্কার।"

নমস্কার। বসুন, বসুন, আপনার নাটকটা এনেছেন তো?"

"হ্যাঁ"।

"বেশ, বেশ—সুরেশদা, আপনি বরং পড়তে সুরু করে দিন, উনি ততক্ষণ একটু চা-টা খেয়ে নিন।"

"টা না হয় আমার জুটবে না দিব্যেন্দু, কিন্তু চা খেতে খেতে বোধ হয় পড়াটা চলতে পারে ?"

"ও সিওর, এই বয়" !—

প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। এদের সঙ্গে বেশ মিশে গেছি এর মধ্যেই। আমার নাটকটা এদের ভালই লেগেছে। কিন্তু এই নাটকটার জন্যে একদিন একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে কি বিরূপ মন্তব্যই না শুনতে হয়েছিল আমায়। সে কথা এখনও আমার কানে লেগে রয়েছে··· "সাহিত্য বস্তুটা অত সহজ নয়। লিখতে গেলে প্রচুর পড়তে হয়, দেখতে হয়, ভাবতে হয়; তার ওপর থাকা চাই ভাষার দখল। আগে থেকে লেখক হওয়ার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ভাল করে পড়াশুনো কর, ভাষায় দখল আন, দেখবে, আপনা-আপনি লেখক হয়ে গেছে।" সেদিন আমার মনে বড় লেগেছিল। ঠিক এইরকম এক গোধূলিতে রাস্তার ধারের সেই দেবদারু গাছের মাথায় দিন শেষের ম্লান আলোটুকু বড় করুণ বলে মনে হয়েছিল যেন,—মনে হয়েছিল, ব্যর্থতা ছাড়া সংসারে আর কিছুই নেই। আর আজ! আজ বুঝেছি প্রচারটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিষ, আর এটুকু যে না পায় সে সবচেয়ে হতভাগ্য।

"কি ব্যাপার কবি, কি ভাবছেন অত তন্ময় হয়ে ?"

"কবি নই, লেখক।"

"ওই হল, একই ব্যাপার। তা নতুন কিছু ছাড়ছেন ?"

"অত নতুন ছাড়তে পারলে তো এতদিন একজন প্রতিভাবান হয়ে যেতাম"।

কেন, প্রতিভার কি চারটে হাত থাকে নাকি ? এমনি করে লিখতে লিখতেই তো একদিন একজন সাধারণ লেখক বিখ্যাত হয় এবং শেষে একদিন প্রতিভাবান বলে খ্যাতি লাভ করে। তবে প্রচার চাই; বিশেষ করে আজকের দিনে প্রচারটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিষ। আচ্ছা, সুরেশদার কাছে শুনলাম, আপনার নাটকটা এবার রাজ্য নাটক প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ও শুধুই পাঠানো। কত খ্যাতিমান শক্তিশালী নাট্যকার রয়েছেন দেশের, ওখানে কি আর পাত্তা পাওয়া যায় ?"

"দেখুন বিমলবাবু, কিছু মনে করবেন না। আপনি কিন্তু মনকে চোখ ঠারাচ্ছেন। নাটকটা যখন আপনি পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয় আপনি আশা রাখেন। কিন্তু এত দেরীতে খবরটা পেলাম যে এখন তার কিছু"—

"কেন বলুন তো, আগে খবরটা পেলে কিছু সুবিধে হত কি ?"

"হয়তো হতে পারত। কিন্তু—আচ্ছা, কবে আপনাদের প্রতিযোগিতার খবর বেরুবে বলুন তো ?"

"মতেরই মার্চ, আর দিন দশ-বারো আছে।"

ইট্ ইজ্ টু লেট্। তবু দেখি একটু খোঁজ খবর করে। কবে ওটা সাব্‌মিট করেছেন মনে আছে আপনার ?"

"হ্যাঁ, তা প্রায়"—

হ্যালো অসিত, কতক্ষণ ? নাট্যকারের সঙ্গে 'আজ শুধু কূজন গুঞ্জন তোমাতে আমাতে' হচ্ছিল বুঝি ? তারপর নাট্যকার কেমন কাটছে ?"

"নাটকীয় ভাবেই।"

"বাট হাউ ? নাটকের কুশীলব তো প্লাবে, আর নাট্যকার নাটক নিয়ে এখানে বসে থাকলে নাটকীয় ভাব হবে কি করে ? কি হে অসিত, চুপ করে রইলে কেন ?"

"কি আর করি বল ? সিগারেটটার জন্যেই তো যেতে পারছিনা। শোন দিব্যেন্দু, তোমার কবিতা এক বিশেষ জায়গায় বিশেষ ভাবে এ্যাপ্রিসিয়েশন্ পেয়েছে"।

"তাই নাকি ? কেবা সেই জন মোরে কহ তার নাম" ?

দিব্যেন্দুবাবুর মাথাটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে অসিতবাবুর কি যেন বললেন। অসিতের কথা শুনে দিব্যেন্দুবাবু উল্লসিত হয়ে গেয়ে উঠলেন—

"সে যেন আসবে আমার মন বলেছে

হাসির পরে তাই তো চোখের জল গলেছে"

সার্থক আমার ভাগ্য, ভাগ্যবান আমি। দিব্যেন্দু, এর পর রাজ্য কবিতা প্রতিযোগিতায় আমি যদি নো-পাত্তা'ও হই, তবু কোন আক্ষেপ থাকবেনা আমার"।

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "আপনিও কি প্রতিযোগিতায় কবিতা পাঠিয়েছেন দিব্যেন্দুবাবু"?

অসিতবাবু বললেন "আপনি কি ভাবেন আপনিই শুধু পাঠিয়েছেন? জানেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই লেখক? গোটা বাঙ্গালী জাতটাই লেখা পাঠিয়েছে। কিন্তু আর আমরা কতক্ষণ বসে থাকব সিতাংশুর জন্যে—কিরে দিব্যেন্দু"?

"ব্যাস্ সিতাংশু, চল আমরা বেরিয়ে পড়ি। এই বয় চা"—

রেষ্টুরেন্টটা সদর আর ক্লাব-ঘরটা অন্দর। আলোচনার যা কিছু, তা হয় রেষ্টুরেন্টে, আর রিহার্সাল হয় ক্লাবে। রেষ্টুরেন্টের মালিক যিনি, তিনি এঁদের ক্লাবের কর্তাদের একজন। ক্লাবের সভ্য ও সমর্থকদের প্রায় সকলেই কাছাকাছি বাস করেন। সকাল-সন্ধ্যে নিয়মিত ক্লাবে না এলে এঁদের পেটের ভাত হজম হয় না। জগতের এমন কিছুই নেই যা এঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। পৃথিবীতে সোস্যালিজম সচল কি অচল, এবার উইম্বলডনে কে জিতবে, অমুক খেলোয়াড় কেন ঘর ছাড়ছে, অমুক চিত্র-তারকা কেন এখন ষ্টুডিও যায় না, সাহিত্যে যে ভদ্রলোক এবার নোবেল্ প্রাইজ্ পেলেন তাঁর সত্যিকারের কতখানি যোগ্যতা ছিল, বর্তমানে বেলজিয়ামে কে একজন ছোট গল্প লিখছে না—একেবারে মারভেলাস্। নাচে দীপ্তি, ডলি, আর গানে আলপনা, অমল, আর চুন্নীর নাকি অতুলনীয় প্রতিভা। 'বিদেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেহের মিলন' গল্পে লেখকের স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। অমুক আবার লেখক নাকি, লেখা পড়ে মনে হয় যেন বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ পড়ছি।

এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেও এই রেষ্টুরেন্টে অনেকবার এসেছি এবং এঁদের আলোচনার কিছু কিছু শুনেছি। তখন এঁদের দেখে নিজেকে ছোট মনে হত। অর্থে শিক্ষায় রুচিতে এঁরা কত উন্নত, কত মার্জিত। আজ নেহাৎ ভাগ্যবলেই এদের সান্নিধ্য লাভ করেছি। লাভ হয়েছে প্রচুর, প্রেরণা পেয়েছি আরও প্রচুর, আর সবচেয়ে বেশী করে যা পেয়েছি, তা হচ্ছে প্রচার।

"পান খাওয়া হয়েছে আপনার"?

"হ্যাঁ, দাঁড়ান একটু"। বোঁটা-সংলগ্ন চুণে রাঙা জিবের ডগাটুকু ঠেকিয়ে কিছুটা চুণ মুখস্থ করে নমিতা দেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন; প্রম্পট্ সুরু হয়ে গেল।

সুরেশদা আমাদের ডিরেক্টার। জনৈক খ্যাতিমান প্রবীণ অভিনেতার অনুকরণে ইনি অভিনয় করেন এবং সেই মত অপরকেও দেখিয়ে দেন। নিজস্বতা বজায় রেখে সুরেশদার পরিচালনায় অভিনয় করা অসম্ভব। যাদের অনুকরণ করার ক্ষমতা আছে, তারা অনেক কষ্টে সুরেশদার অভিনয়ভঙ্গী রপ্ত করে। যারা নকলনবীশ নয়, তাদের অবস্থা হয় অত্যন্ত শোচনীয়—কয়েকটা লাইন ভুলতেই তাদের লেগে যায় কয়েকটা দিন। সুরেশদা কিন্তু নাছোড়বান্দা। যতক্ষণ প্রতিটি লোকের প্রতিটি কথা তাঁর মনের মত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কাউকে রেহাই দেন না। এর ফলে রিহার্সালের গতি হয় মন্থর এবং আবহাওয়াটাও লাগে একঘেয়ে। সুরেশদার বাড়াবাড়িতে সভ্যদের ভেতর চাপা অসন্তোষের ভাব যে মাঝে মাঝে দেখা না যায় তা নয়, কিন্তু তবু তারা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, কারণ, ক্লাবের প্রতিটি সভ্যের ওপরেই সুরেশদার প্রভাব অসামান্য।

প্রায় দশটার সময় রিহার্সাল শেষ হল। এতদিনে আমরা নাটকের প্রথম অঙ্কের রিহার্সাল শেষ করলাম। রিহার্সাল সাঙ্গ হতেই নমিতা দেবী উঠলেন। সঙ্গে গেলেন সিতাংশুবাবু আর নিখিলেশবাবু ওঁকে একটু এগিয়ে দিতে। এমন এঁরা প্রায়ই যান। এর পরের দিন রিহার্সালে আমরা দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ করব। সুতরাং রিহার্সালের আগে নাটকটা সকলের একটু ভাল করে দেখে নেওয়া দরকার। স্থির হ'ল শনিবার বিকেলবেলায় আমরা সকলে রেষ্টুরেন্টে উপস্থিত থাকব, আর সেইখানেই দ্বিতীয় অঙ্কটা পড়ে নেওয়া হবে।

শনিবারে যখন রেষ্টুরেন্টে পৌঁছুলাম তখন প্রায় সাতটা বাজে। দেরী হওয়ায় উপস্থিত সকলের কাছে কিছু তিরস্কার লাভ ক'রে যথারীতি কৈফিয়ৎ দিলাম বিলম্ব

ঘটার, তারপর এক কাপ চা সামনে রেখে পড়তে সুরু করে দিলাম।

বড় হলটায় সর্বদাই লোক। একদল যাচ্ছে আর একদল এসে সঙ্গে সঙ্গে তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করছে। আমাদের দলের দু-একজন ছাড়া সকলেই অন্য কাজে ব্যস্ত। কেউ কাগজের সিনেমা-পেজ দেখছেন, কেউ বা আবার রেসের ছোট্ট বইটা খুলে আসন্ন ঘোড়দৌড়ের সম্ভাব্য ফলাফল অনুষ্ঠান করতে ব্যস্ত। শ্রোতৃবর্গের এতাদৃশ অমনোযোগ যে কোন পাঠকের পক্ষেই বিরক্তিকর। আমিও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু বলবার কিছু নেই।

দু-একজন কৌতূহলী ভদ্রলোক আমাদের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন আর আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু বেতার-অনুষ্ঠান, আর পাঁচজনের কথাবার্তার গোলমালে ভাল করে কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। আরও খানিকটা এগিয়ে এলে হয়তো ওঁরা আমার নাটকের খানিকটা পরিচয় পেয়ে যেতেন। আমাদের নিকটতম লোকগুলি যে বিন্দুমাত্র রসিক নন, তা এঁদের গোগ্রাসে কোর্মা আর কাট্‌লেট্ গেলার ধরণ দেখেই বেশ বোঝা যায়। পড়তে পড়তে গলার আওয়াজটাকে ক্রমশঃ চড়া পর্দায় উঠিয়েও কোন কাজ হল না। ওঁরা যেমন খাচ্ছিলেন তেমনি খেয়ে যেতে লাগলেন এবং অবশেষে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন, নাটক শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

এঁদের উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোকের পোষাক-পরিচ্ছদে উদাসীনতার চিহ্ন সুস্পষ্ট, মাথার চুলগুলো আলুথালু। ঘরে ঢুকে বারকয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি যেন দেখে নিলেন তিনি, তারপর আমাদের দিকে এগিয়ে এসে সেই বেরসিক ভদ্রলোকদের পরিত্যক্ত চেয়ারগুলোর একটাতে বসে পড়লেন এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে।

ওঁর সার্টের একদিকের কলারটা চুকে রয়েছে, আর গলার চারটে বোতামের দুটো নেই। কপালের দু-একটা রেখা বেশ স্পষ্ট, আয়ত চোখ দুটি না-উজ্জ্বল, না-ম্লান। মুখের রঙটা তামাটে, কিন্তু হাতের রঙ উজ্জ্বল-গৌর। বেশ বোঝা যায়, ভদ্রলোকের জীবনে নানান বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

কিছুটা শুনেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন "মাপ করবেন, আপনিই কি এটা লিখেছেন?"

বিনীতভাবে বললাম "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করলে আপনাদের কি বিশেষ অসুবিধা হবে?"

না না, অসুবিধা আর কি, আমরা তো পাঁচরকম আলোচনা করতেই এখানে আসি। বলুন,আপনি কি চান?"

আমি জানতে চাই, এই নাটকে নাট্যকারের বক্তব্য কি? অর্থাৎ তিনি কি বলতে চান, কি দেখাতে চান।"

"আমি দেখাতে চাই দেশের এ্যারিস্টোক্র্যাটদের ব্যাভিচার-কলঙ্কিত জীবনের দিকটা আর ফুটিয়ে তুলতে চাই আমাদের পল্লীবাসীদের সহজ সুন্দর জীবন।"

"মাপ করবেন, আপনার ওই তথাকথিত এ্যারিস্টোক্র্যাটদের সংখ্যা অতি নগণ্য! আজকের লেখক ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?"

আমাকে কিছু বলতে দেবার আগেই অসিতবাবু বলে উঠলেন "মাপ করতে হল। ওদের নিয়ে সত্যিই কি কিছু লিখবার নেই তাহলে?"

"তা থাকবে না কেন? কিন্তু ঠিক আজকের দিনে ওদের বাদ দিয়েও দিব্যি লেখা যায়। তিরিশ বছর আগে ওদের সম্বন্ধে যে অহেতুক মোহ ছিল, আজকের লেখকের সে মোহ থাকা উচিত নয়, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই। আজকের লেখক তুলে ধরবে দুঃস্থ-দরিদ্র জনসাধারণের সমস্যা, ফুটিয়ে তুলবে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কারণ, তারাই তো দেশের সবখানি।"

"দাদাকে কোন বিশেষ ইজ্‌মের ভক্ত বলে মনে হচ্ছে?"

"কেন, জনসাধারণের কথা বললেই কোন বিশেষ ইজ্‌মকে আঁকড়ে ধরা হয় বুঝি? কিন্তু সাহিত্যে কোনরকম ইজ্‌মের স্থান না থাকাই ভাল,কারণ, ইজ্‌ম্ ঢুকলেই সাহিত্য হয় ধর্মচ্যুত। সে সাহিত্য আর তখন সাহিত্য থাকে না, সে হয় নিছক শ্লোগ্যান।"

সিতাংশুবাবু বললেন "আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। সাহিত্য সম্বন্ধে এখন আপনি যা বললেন তাতে অনায়াসে আপনাকে একজন প্রতিক্রিয়াশীল বলা যেতে পারে।"

সিতাংশু বাবুর কথা শুনে অসিতবাবু আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "আচ্ছা, আপনি আমার নাটকের যেটুকু শুনলেন এটুকুতে কোন অসঙ্গতি লক্ষ্য করলেন কি ?"

আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোকের ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির একটা ঝিলিক খেলে গেল। বললেন "এজায়গাটায় আপনি তো পাড়াগাঁয়ের লোকদের জীবন ফুটিয়ে তুলছেন ? কিন্তু তার আগে"—

ভদ্রলোকের বলায় বাধা পড়ল দিব্যেন্দুবাবুর আগমনে। দিব্যেন্দুবাবুকে দেখেই অসিতবাবু বলে উঠলেন "কিরে, মনে আছে তো আজ কোন তারিখ ? রেডিওর দিকে একটু নজর রাখিস। আজ হয়তো তোদের কম্পিটিশনের রেসাল্ট বলতে পারে। হ্যাঁ শোন্, আজ আমাদের একজন সমালোচকের সঙ্গে পরিচয় ঘটবার সৌভাগ্য হয়েছে। ইনি বিমলবাবুর নাটকটা একেবারে নস্যাৎ করে দিতে চান।"

"আপনাদের যদি আপত্তি থাকে তো আর করি না তাহলে।"

ঝাঁঝালো উত্তর শুনে দিব্যেন্দুবাবু ভদ্রলোকের মুখের পানে একবার কটমট করে তাকালেন। বুঝলাম লড়াই আসন্ন। ভদ্রলোকের পাশের একটা চেয়ারে বসে দিব্যেন্দু বাবু বললেন "না না, আপত্তি থাকবে কেন ? আপনার বক্তব্য আপনি বলতে পারেন, বক্তব্য শোনার অভ্যাস আমাদের আছে।"

"ভালো, খুব ভাল। এখন তাহলে আমার বক্তব্য আমি বলতে পারি ?"

বললাম "নিশ্চয়, বলুন না।"

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি, আপনার বাড়ী কোথায় ?"

প্রশ্নের অর্থটা আমার ঠিক বোধগম্য হল না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওঁর মুখের পানে তাকালাম।

"আপনার বাড়ী নিশ্চয় পল্লীগ্রামে নয় ?"

"না।"

"তাহলে কি করে আপনি পল্লীজীবন সম্বন্ধে লিখবেন বলুন ? দূর থেকে একটা ধারণা করে নিলে যা হয়, তাই হয়েছে—ওদের একটা চরিত্রও বাস্তব হয়ে ওঠেনি।"

আমার হয়ে দিব্যেন্দুবাবু উত্তর দিলেন "কিন্তু এমন অনেকে এর নাটকের প্রশংসা করেছেন যাদের পল্লীগ্রামেই বাস।"

"মাপ করবেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না।"

"আপনি কি তাহলে বলতে চান তাঁরা সকলেই"—

"তাঁদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে চাই না, আমি শুধু নিজের কথাটাই বলতে চাই। ঘোমটা-টানা, কলসী-কাঁখে কৃষক বধূ, আর বটের তলায় রাখাল ছেলের বাঁশী বাজানোর রূপ কল্পনা করে বড় জোর দু'ছত্র কবিতা লেখে যেতে পারে। নাটক বা উপন্যাস লিখতে গেলে আসল দিকটা আগে দেখতে হয়,—সে দিকটা দেখিয়েছেন শরৎ চাটুজ্জে তাঁর পল্লী-সমাজে।"

উত্তেজিত স্বরে অসিতবাবু বললেন "শরৎবাবুকে দেখিয়ে আপনি পল্লী গ্রামের চিরপরিচিত কৃষক বধূ আর রাখাল ছেলেকে অস্বীকার করবেন, এ কেউ মেনে নেবে না। আপনি জানেন না, এই নাটকের অভিনয়ের দিন কাউন্সিলর—"

সুরেশদা ঢুকলেন। বিতর্কের কারণটা শুনেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন "আপনার নামটা জানতে পারি কি ?"

"জনার্দন মুখোপাধ্যায়।"

ভদ্রলোককে শুনিয়েই অসিতবাবু বললেন "হ্যাঁ, গজানন মুখোপাধ্যায়ের ভাই।" বুঝলাম, দলপুষ্ট হলে বাঙ্গালী কি রকম বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

সুরেশদা আবার প্রশ্ন করলেন "কোথায় বাড়ী আপনার ?

"নদীয়া জেলার এক পল্লীগ্রামে ?"

"এখানে থাকেন কোথায় ?

"কুমোরটুলীতে।"

"কুমোরটুলীতে ? কতদিন আছেন সেখানে।"

"অনেকদিন, তা প্রায় পনের বছর।"

"কিন্তু ওখানকার কোন কাল্‌চারাল্ ফাংশানে আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না ?"

"আমার দুর্ভাগ্য। ওদের সঙ্গে আমার ঠিক মেলে না।"

অসিতবাবু উঠিয়েই ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন "কোনখানেই মিলিবে না"

অসিতবাবুর কথায় ভদ্রলোক লাল হয়ে উঠলেন। বললেন "ঠিক বলেছেন। আপনার বুদ্ধির তারিফ্ না করে পারছি না।"

অসিতবাবুর রাগের মাত্রা ক্রমশঃই চড়ছিল, বেশ উত্তেজিত ভাবেই তিনি বললেন "করবেন বৈকি, তবে মাত্রা ছাড়াবেন না যেন। মাত্রা ছাড়ালে আবার পাঁচজনের কাছে অপমান—"

ভদ্রলোকও এবারে বেশ উত্তেজিত ভাবেই বললেন "শুধু অপমান, না আরও কিছু ?"

"বলা যায় না, সঙ্গে ঘা-কতক—"

"নিশ্চয়, ইতিহাসে এর নজিরের কোন অভাব নেই। যিশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব, জোয়ান অফ আর্ক, এব্রাহাম লিঙ্কন, বিদ্যাসাগর—"

"হ্যাঁ, যিশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব, বিদ্যাসাগর, সেক্‌স্‌পিয়র, রবীন্দ্রনাথ, আর শ্রীজনার্দন মুখোপাধ্যায়। রামবাগ্ কোথাকার্! জানেন, আপনি কোথায় এসে পড়েছেন ? আপনি, কি জানেন, আমাদের ভেতর দুজন কবি আর একজন নাট্যকার রয়েছেন, যাঁদের লেখা এর মধ্যেই বেশ নাম করেছে ? আপনার কোন লেখা আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। আগে লিখুন, নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিন, তারপর সমালোচনা করতে আসবেন। আপনার সাহিত্য-সমালোচনা মানেই অনধিকারচর্চা, আর এই অনধিকার-চর্চার অনিবার্য পরিণাম—"

দিব্যেন্দুবাবু অসিতবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন "চুপ কর, রেডিওটা একটু শুনতে দে, এক্ষুণি স্যোক্যাল্ নিউস বলবে।"

ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে একটা সিগারেট ধরালেন। রাগে, দুঃখে, অপমানে উনি যে কতটা আহত হয়েছেন তা ওঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ওঁর অবস্থা দেখে দিব্যেন্দুবাবু আর সুরেশদা পরস্পরকে চোখে চোখে ইসারা করছিলেন আর হাসছিলেন। ভদ্রলোকের কথাবার্তায় যে একটা হামবড়া ভাব আছে তাতে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অসিতবাবু যে জঘন্য ভাষায় ভদ্রলোককে আক্রমণ করলেন তাও কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। মারধোরের কথা তুলতেও অসিতবাবুর আটকালোনা—

—আশ্চর্য !

বেতারে স্থানিক-সংবাদের ঘোষণা শুনেই সতর্ক হয়ে উঠলাম। মেলিক বললেন "মাননীয় রাজ্যপাল আজ অপরাহ্নে একটি মাতৃসদনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী এবং আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। খেলাধুলোর খবরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খবর হচ্ছে, বোম্বাই বনাম মাদ্রাজ প্রদেশের হকি খেলাটি দুই-দুই গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। রাজ্য সাহিত্য প্রতিযোগিতার বিচারকগণ গতকাল তাঁদের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারকে পেশ করেছেন। ছোট-গল্পে প্রথম হয়েছেন শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয়—শ্রীনটবর গুপ্ত, তৃতীয়—জনাব আবুল হোসেন। কবিতায় :—প্রথম—শ্রীসুহাস গোস্বামী, দ্বিতীয়—শ্রীমতী সুলেখা ব্যানার্জী, তৃতীয়—শ্রীঅরুণ সেন। নাটকে :—প্রথম—শ্রীজনার্দন মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয়—শ্রীগৌরেন রায়, তৃতীয়—শ্রীঅজিত কুমার সরকার।"

নিজের বিফলতার আঘাতটা মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিলাম। মুখ তুলে দেখি রাজ্য নাটক চ্যাম্পিয়ন জনার্দন মুখোপাধ্যায় মশলা মুখে ফেলে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আর আমার বন্ধুরা, বিশেষ করে' অসিতবাবু আর দিব্যেন্দুবাবু পরম বিস্ময় ও চরম লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন কাঠের মূর্তির মত।

যমজের জন্ম-রহস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রত্যেক গর্ভধারণে স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ একটি করে সন্তান প্রসব করে। কিন্তু একবার গর্ভধারণে দুই বা ততোধিক সন্তান প্রসবের ঘটনাও বিরল নয়। যমজ বা ততোধিক সন্তানের জন্ম-রহস্য বুঝতে হলে সন্তানোৎপত্তির প্রাথমিক ব্যাপারটা অবগত হওয়া দরকার। স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয়, অর্থাৎ ওভারী থেকে প্রতিমাসে একটি করে ডিম্বাণু নির্গত হয়। দুটি ডিম্বাশয় থেকে পরিবর্তীভাবে এই ডিম্বাণু-নিষ্ক্রমণ চলতে থাকে ; অর্থাৎ এক মাসে ডান দিকের ডিম্বাশয় থেকে এবং পরবর্তী মাসে বাঁ-দিকের ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নির্গত হয়। ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে নিষিক্ত হওয়ার পর ডিম্বাণু জরায়ু, অর্থাৎ গর্ভাশয়ে স্থিতিলাভ করে। এর পর থেকে গর্ভস্থ সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত ডিম্বাশয় থেকে আর ডিম্বাণু নির্গত হয় না। কাজেই এই ব্যবস্থায় একবার গর্ভাধানে একাধিক সন্তানের জন্মগ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে কেমন করে? উক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেই যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই ব্যতিক্রমের সঠিক কারণ নির্দেশ করতে না পারলেও কিরূপ ব্যতিক্রমের ফলে এক সঙ্গে দুই বা ততোধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে—সে কথা বলছি।

পূর্বেই বলেছি—ডিম্বাশয় থেকে মাসে একটির বেশী ডিম্বাণু নির্গত হয় না। কিন্তু বংশধারার বৈশিষ্ট্যের ফলে কোন কোন স্ত্রীলোকের দুটি ডিম্বাশয় থেকেই একই সময়ে দুই বা ততোধিক ডিম্বাণু নির্গত হয়ে থাকে এবং উভয় ডিম্বাণুই নিষিক্ত হয়ে জরায়ুতে স্থিতিলাভ করে। জরায়ু প্রয়োজনানুযায়ী সন্তানাধিক্য হতে পারে; কাজেই দুটি ভ্রূণই পাশাপাশি বর্ধিত হয়ে যথাসময়ে যমজ সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। যমজ উৎপত্তির এই হলো এক রকমের ব্যবস্থা; কিন্তু অন্য উপায়েও যমজের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন—কোন কোন স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয় থেকে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি মাত্র ডিম্বাণু নির্গত হয়ে নিষিক্ত হয় বটে, কিন্তু নিষিক্ত ডিম্বাণুটি প্রাথমিক অবস্থায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুটি ভ্রূণ সৃষ্টি করে। এরূপ দ্বিধা বিভাজনের ঘটনা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতবার ঘটে থাকে, সে কথা জানবার উপায় নেই। কারণ দ্বিধা-বিভক্ত ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন ভ্রূণ দুটি যে রীতি বর্ধিত হয়ে যমজরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই কেবল মাত্র এরূপ একটা ব্যাপার ঘটেছে বলে বুঝতে পারা যায়। এমনও হতে পারে যে, দ্বিধা-বিভক্ত ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন দুটি ভ্রূণের একটির নিষ্পেষণে অপরটি মোটেই পুষ্টিলাভে সক্ষম হয় না এবং পরিশেষে রক্তস্রোতে শোষিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে যমজ সন্তানের একটি অপুষ্ট ভ্রূণকে পাতলা কাগজের মমির মত ভূমিষ্ঠ হতে দেখা গেছে। এরূপ ভ্রূণকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Foetus papyraceus বলা হয়।

কোন কারণে ডিম্বাণু যদি সম্পূর্ণরূপে বিভাজিত না হয়, অর্থাৎ অনেকটা বিভাজিত হয়ে খানিকটা অংশে যদি পরস্পর সংলগ্ন থেকে যায় তবে বিখ্যাত শ্যামিজ টুইনের মত পরস্পর সংলগ্ন যমজ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। ১৮১১ সালে অসম্পূর্ণভাবে বিভাজিত ডিম্বাণু থেকে শ্যামদেশে পরস্পরের দেহসংলগ্ন এই অদ্ভুত যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। যদি ডিম্বাণুর সামান্য অংশ বিভাজিত হয়ে বেশীর ভাগই অবিভাজিত থেকে যায় তবে যে যমজ সন্তান উৎপন্ন হবে তাদের দেহ হবে এক, কিন্তু মাথা হবে দুটি ; অথবা একটি মাথা, একটি দেহ, কিন্তু হাত আর পা হবে চারটি করে। এই দু-রকমের কোন্‌টি হবে, সেটা নির্ভর করে ডিম্বাণুর বিভাজন প্রথমে কোন দিক থেকে সুরু হয়েছে—উপরের দিক থেকে, না নীচের দিক থেকে—তার উপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রকমের অদ্ভুত যমজ সন্তান মৃত অবস্থাতেই ভূমিষ্ঠ হয় অথবা জন্মের পরেই মারা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে দুই মাথা বা চার হাতওয়ালা অনেক

অদ্ভুত যমজ শিশু জন্মাবার নজির আছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ অদ্ভুত কয়েকটি যমজ শিশু অনেক দিন পর্যন্ত জীবিতও ছিল। তাছাড়া মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে দুই মাথাওয়ালা দীর্ঘজীবী সাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীদের অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

একটি ডিম্বাণু, না দুটি ডিম্বাণু থেকে যমজ উৎপন্ন হয়েছে, সেটা নির্ণয় করা সাধারণতঃ খুব শক্ত ব্যাপার নয়। দুটি পৃথক ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন যমজের পরস্পরের মধ্যে একমাত্র একই সময়ে, একই গর্ভে বর্দ্ধিত হওয়া ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ নেই। এরূপ যমজের দুটিই পুরুষ বা দুটিই স্ত্রী অথবা একটি পুরুষ ও আরেকটি স্ত্রী হতে পারে; এমন কি, তারা বিভিন্ন পিতার সন্তানও হতে পারে। তাছাড়া তাদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্যও খুব কম থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জন্ম সময়েরও বেশ কয়েক দিনের পার্থক্য ঘটে থাকে। কিন্তু একটি ডিম্বাণু বিভাজিত হয়ে যে যমজ উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে দুটি ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন যমজের মূলগত পার্থক্য আছে। এক ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন যমজের একটি অপরটির অনুরূপ হয়ে থাকে। মনে হবে একটি যেন আরেকটির হুবহু অনুকৃতি। নিষিক্ত ডিম্বাণু অথবা অতি প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় এবং পুনর্গঠিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিগ্রহ করে। এক ডিম্বাণু-জাত যমজের উভয়েই, হয় স্ত্রী, না হয় পুরুষ হয়ে থাকে—একটি স্ত্রী অপরটি পুরুষ—এরূপ হয় না। এরূপ যমজের উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এমনই নিখুঁৎ হয় যে, অতি পরিচিত ব্যক্তিরাও তাদের পৃথক করে চিনতে পারে না।

অভিন্ন আকৃতির এরূপ যমজ আমাদেরও নজরে পড়েছে, যাদের একজনকে অপর জনের ভুলের জন্যে ফলভোগী হতে হয়েছিল। অপর এক অভিন্ন আকৃতির যমজের ক্ষেত্রে পরিবারভুক্ত লোকেরাই ভুল করতো বলে একজনকে শ্মশ্রুগুম্ফ ধারণ এবং অপর জনকে তা বর্জন করে ভুল করবার পথ বন্ধ করতে হয়েছিল।

ইউনাইটেড ষ্টেটে নাকি প্রতি ৮৬ থেকে ৮৮টি প্রসবের মধ্যে একটি মাত্র যমজ ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। প্রতি ৪৪টি আমেরিকানের মধ্যে একটি যমজ। অবশ্য বিভিন্ন দেশে যমজের জন্মের হার বিভিন্ন। আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে যমজ জন্মের হার একটু বেশী, আরও উত্তরে আরও একটু বেশী এবং সবচেয়ে উত্তরে, অর্থাৎ উত্তর মেরু-অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী। মনে হয়, মেরুঅঞ্চলের প্রতিকূল পরিবেশে যেখানে বেঁচে থাকাই দুরূহতর সমস্যা, সেখানে জনসংখ্যা হ্রাসের প্রতিরোধকল্পে প্রকৃতি যেন এই উপায়ে সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে।

হেলিনের নিম্নানুপাতী দেখা যায়—সাধারণ একক সন্তান-সংখ্যার যে অনুপাতে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে, যমজের সঙ্গে ঠিক সেই অনুপাতেই একসঙ্গে তিন সন্তানও জন্মগ্রহণ করে থাকে। আবার যমজের সঙ্গে যে অনুপাতে একসঙ্গে তিন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তিন সন্তানের সঙ্গে ঠিক সেই অনুপাতেই একসঙ্গে চার সন্তান জন্মে থাকে।

যমজের মত একসঙ্গে তিন, চার বা ততোধিক সন্তান কেমন করে উৎপন্ন হয়—সে কথা বুঝতে হলে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, একটা ডিম্বাণু কেবল দু ভাগে বিভক্ত হতে পারে কিন্তু তিনভাগে বিভক্ত হতে পারে না। এই দ্বিধা-বিভক্ত ডিম্বাণু আবার চার ভাগে বিভক্ত হয়ে একসঙ্গে চারটি সন্তান উৎপাদন করতে পারে।

তিন রকম পন্থায় একসঙ্গে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে। যথা—

(১) ডিম্বাশয় থেকে নির্গত তিনটি ডিম্বাণু যদি একই সঙ্গে নিষিক্ত হয় তবে একসঙ্গে তিনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। তিনটি সন্তানের সবগুলিই বালক অথবা বালিকা অথবা বালক-বালিকা উভয়ই হতে পারে। এমন কি, একসঙ্গে এক গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেও এরা বিভিন্ন পিতার সন্তান হতে পারে।

(২) ডিম্বাশয় থেকে নির্গত দুটি ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার পর তাদের একটি যদি দ্বিধা-বিভক্ত হয় তাহলে সে দুটি সন্তান হবে অভিন্ন আকৃতির এবং অপরটি হবে ভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির।

(৩) একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর তার একাংশ আবার দুটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে। এক ডিম্বাণুজাত বলে এই তিনটি সন্তানই আকৃতি-প্রকৃতিতে অভিন্ন হবে।

এথেকে একসঙ্গে চারটি, পাঁচটি কিংবা ততোধিক সন্তান উৎপত্তির কারণ সহজেই বুঝতে পারা যায়। দুটি নিষিক্ত ডিম্বাণু চার ভাগে বিভক্ত হয়ে চারটি ভ্রূণ সৃষ্টি করতে পারে, অথবা দুই, তিন, চার বা ততোধিক ডিম্বাণু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে।

Dionne quintoplets-এর কথা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। একসঙ্গে এই পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এদের সবকটিই মেয়ে এবং প্রত্যেকের চেহারাও একরকমের। এমন কি, এদের নাক, মুখ, চোখ, হাত, পায়েও কোন পার্থক্য নেই। এ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়—একটি মাত্র ডিম্বাণু থেকেই এরা জন্মগ্রহণ করেছে। খুব সম্ভব ডিম্বাণুটি প্রথমে দু-ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। তারপরে সেই দুটি আবার বিভাজিত হয়ে চারটি হয় এবং সর্বশেষে চারটির একটি আবার দ্বিধা-বিভক্ত হয়। জন্মের সময় সবগুলি শিশুই অতি গুরুতর অবস্থায় ছিল; কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সবগুলিই রক্ষা পায়।

কুইন্টোপ্লেট-এর সব কয়টির বেঁচে থাকবার ঘটনা অতি বিরল। ১৯৩০ সালে আর্জেন্টিনায় এক ধনী পরিবারে এক গর্ভে পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এদের কয়েকটি বালক এবং কয়েকটি বালিকা; কাজেই বুঝা যায়—এরা এক ডিম্বাণুজাত নয়, বিভিন্ন ডিম্বাণু থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। পরিসংখ্যানগত সম্ভাবনার দিক থেকে ৫৪ মিলিয়ন (এক মিলিয়নে দশ লক্ষ) প্রসবের মধ্যে একটি মাত্র কুইন্টোপ্লেট জন্মাতে পারে। কিন্তু তাদের সব কয়টিরই বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা কম; তবে প্রতি দশ বছর পর এক সেট কুইন্টোপ্লেটের বাঁচবার সম্ভাবনা।

একসঙ্গে ছয়টি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ ক্বচিৎ কখনও শোনা গেলেও তার সত্যতায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পরিসংখ্যানের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়—৪,৫০০ মিলিয়ন প্রসবের মধ্যে একটি মাত্র সেক্সটুপ্লেট ভূমিষ্ঠ হতে পারে। কিন্তু একসঙ্গে ছয়টি সন্তান জন্ম-গ্রহণ করলেও তাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এমন সব ব্যবস্থা উদ্ভাবনের সম্ভাবনা আছে যার সাহায্যে গর্ভস্থ সন্তানের যাবতীয় অবস্থা জানা যাবে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ইনকিউবেটরে রেখে কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য সরবরাহ করে তাদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। বর্তমানে যেমন উদ্ভিদ এবং পরীক্ষাগারের প্রাণীদের প্রজননের উপর বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব দেখা যায়, অদূর ভবিষ্যতেই অনুরূপ প্রক্রিয়ায় গর্ভস্থ ডিম্বাণুকে এক, দুই, তিন বা আরও বেশী বার বিভাজিত করে ইচ্ছামত যতগুলি সম্ভব সন্তান উৎপাদন করে কৃত্রিম উপায়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য এ ব্যবস্থা কাম্য হতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থা কাম্যও নয় বা সঙ্গতও নয়।

মন

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

—রাঁধুনীর জুতো পরা! এত দুঃখেও হাসি পায় সীতার! বলতে কইতে কেউ তো আর বাকী রাখেনি কিছু! একে একে কথার বিষেই তো ছেড়েছে সব, বিলাসব্যসন নয়—নিতান্ত প্রয়োজন যা কিছুর—পরিষ্কার কাপড় পরা, আসন পেতে ছিমছাম ক'রে সুক্ষ্মসাক্ষা খাওয়া, গায়ে-মাখা সাবান মাখা, চুলটি নিত্য আঁচড়ানো, বিছানা মাদুর ঝকঝকে করা। আর কাপড় চোপড়ই কত, তার আবার পরিষ্কার! খেতে হয় তাই খাওয়া, কোঁৎ কোঁৎ ক'রে গেলা—পোড়া পেট বোঝেনা তাই—না হ'লে কি ঘেন্না ঘে করে।

"তুমিতো সব দেখ্‌ছ, সব তো দেখ্‌ছ গো ওপর থেকে, একটা দয়া করনা—যাতে আর না খেতে হয় তাই করে দাওনা, পায়ে পড়ি—" নিত্য কি বলেনা সীতা? বলেই তো! কিন্তু···বিধবা, মানুষের জীবন! সাবান মাখা! না মেখে পারেনা ব'লেই লুকিয়ে চুরিয়ে কাপড় কাচা সাবান খানাই গায়ে বুলিয়ে নিতে হয় সময় সময় আড়ালে আবডালে।—স্নানের পর, গা ধোবার পর সারা গায়ে পাউডার মাখা অভ্যেসের অভ্যাস—গাটা যেন চিড়্‌চিড়্, প্যাচ্‌ প্যাচ্‌ করে তার অভাবে, শত জল ঢেলে ধুলেও—"হয়েছে, মূলে মা রাঁধেনা পান্তা আবার কি সেই বলেনা ঘে তাই—" নিজের মনেই একটু হাসে সীতা।—আর চুল আঁচড়ানো? যাদের স্বামী আছে, চুলের শোভা দেখবার লোক আছে, তারাই করবে চুলের বাহার, বুড়ীই হোক্ আর ছুঁড়িই। হ'লেই বা সীতার বয়স বাইশ—বিধবার চুল আঁচড়ানোর ঘটা কেন বুঝ্‌লে? বোঝাবুঝিতে দাঁড়ি দেওয়াই ভাল, কি দরকার অত ভ্যাজালে! মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে ঘুলিয়ে নাও, ব্যস্, তারপর ভাল ক'রে জড়িয়ে রাখ মাথায়—নিশ্চিন্দি! বিছানা? "খাটে চৌকিতে শুতে নেই। স্বামী এসে তলায় বসে থাকে। জাননা বাছা? কলিকাল! আর তোষক বালিশ শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে যাদের হাতের নো আর মাতার সিঁদুর বজ্জর হ'য়ে আছে তাদের জন্যে—তুমিতো কপাল পুড়িয়ে বসে আছ এই দক্ষনেশে বয়েসে, ধর্মে মতি রেখে একন বুঝে সুঝে চলো বাছা," কত অমূল্য উপদেশে হিতৈষিণীদের শুভেচ্ছা নিয়ত ঘিরে রেখেছে সীতাকে—ভাগ্যিস্!

যাকগে, হ্যাঁ কি বলছিলাম, রাঁধুনীর জুতো পরা! সীতার তো বটেই যে দেখ্‌বে তারই হাসি পাবে। নিচের তলার সেই দেওয়ালের বালি খসা খাবলানো মেঝেওলা ঘরে, আরশোলা আর ইঁদুরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা জমিদারীতে তার ঘরটুকু—বাড়ীর দাসী হেমার অভিভাবকত্বে নিশি যাপন করে সীতা।—নিশি যাপন বলা এইজন্য যে ঐ কার্যটি করার সময় ব্যতীত এ ঘরে আর চোকার ফুরসুৎই নেই তার বলতে গেলে। এই ঘর, এই বিছানা, এই সঙ্গ, তবু রোজ বাড়ীর বাগান থেকে তুলে আনা ফুল নিয়ে শোবেই সীতা বিছানায়—পাঁচ ক্যাণ্ডল্ পাওয়ারের বিজলী বাতিতে দেখা না গেলেও কখনও চাপা কখনও উগ্র গন্ধে ভুর্‌ভুর্ করবে ঐ ঘরখানি—সব গ্লানিমা ঢেকে দিয়ে একটা অবাক্ত, বেদনমধুর ঐশ্বর্য দান করবে গোপনে গোপনে।

নিশীথের নির্জনে এ ঘরে ঢুকলেই তাই আবিষ্ট হ'য়ে যাবে সীতা—দারা দিনের বঞ্চনা, অবিচার ভুলে গিয়ে সে বিভোর হ'য়ে যাবে, কোন্ রহস্যলোকে করবে নিরিবিলির অভিসার! এ নিয়ে পা টেপাটেপি, হাসাহাসিতে খ্যাঁচড়া প'ড়ে গেছে—আর বেমা না বল্‌লে জান্‌বেই বা কে? এদিকে মাথা গলায় না কেউই পারতপক্ষে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের বাতাস মেদুর হ'য়ে ওঠে বেল, যুঁই, চাঁপা আর গন্ধরাজের অরূপণ সুরভিসম্ভারে প্রচণ্ড গরম—বদ্ধ গুমোট আর চাপা গুম্‌গুমি গন্ধভরা এই ঘর পদ্মবাচ্যই নয় কোটরের মধ্যে থেকেও অনির্বচনীয় রসে

টলোমল্ ক'রে উঠবে সীতার বুক। এ আনন্দ, এ অনুভূতি উদ্বেল ক'রে তুলবে তার মনটাকে—বর্তমান হবে অনুপস্থিত—আসবে নেমে কল্পনার স্বর্গ এক অনবদ্য!

বাগানে বেশী রকমের ফুল নেই—রজনীগন্ধা তানুরের সখের—তা তোলবার তো নেই। মাঝে মাঝে গোলাপ জোটে দু'একটা কিন্তু গোলাপ দেখতে ও শুকতেই ভালো—ক্ষমতা আছে কি ওর বর্তমানকে ভুলিয়ে দেবার? সে বরঞ্চ বলা যায় বকুলকে তবু—কিন্তু বেলের কাছে হার মানবে সবাই।

অন্ধকার আর অন্ধকার মনে হবেনা—ভেতরে বাইরে শুধু আলো—আর আলো—বিদ্বানার শ্রীহীনতা, কদর্যতা চাপা প'ড়ে ফুটে উঠবে প্রতি স্নিগ্ধ শুভ্র নিষ্কলংক শয্যা একখানি—আর, আর সীতা? মোংরা খান কাপড় পরা, মাকিণের সেমিজ পরা, পায়ের আঙুলে হাজা আর হাতে হলুদের ছোপ্ ধরা, আগুন তাতে তাতে পোড়া তামাটে রংএর সীতা নয়—সুলালের, সীতা—"তুমি না বলেছিলে, আমার সীতা অশোকবনের সীতা নয়, অযোধ্যার রাজরাণী সীতা? তেমনি রূপ, তেমনি মহিমা?" চোখের জল হেসে বলে মনে মনে সীতা? "কেন, এইতো আমি রয়েছি, রয়েছি তোমার পাশে, সীতা, রাণী," এইতো স্পষ্ট বলে সুলাল।

"কিন্তু, কিন্তু আমার কত কষ্ট তাকি তুমি দেখতে পাওনা?"

"কিসের কষ্ট? এইতো রয়েছি তোমার পাশে," ব'লে নিবিড় হ'য়ে আসে সুলাল—ওর নিঃশ্বাসের একটা মাদক গন্ধও তো পাগল ক'রে দেয় সীতাকে—আর ওর স্পর্শ? অমৃতের স্রোত বহায় তো আজও তনুতে তনুতে? সারা দিনের ক্লান্তি মেদুর চোখ কখন যে ঘুমে ঢুলে আসে! এমনি রোজ, প্রত্যেক দিন—পাঁচ বছর ধরে এমনি চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। তাই দিনটাকে কাটিয়ে দিতে পারে সীতা যেমন তেমন ক'রে—কোথা দিয়ে কেটে যায়—পরিশ্রম, লাঞ্ছনা, অবমাননা, তাচ্ছিল্য—পুরু হ'য়ে জমতে চাইলেও ধুলোর মতন উড়ে যায়। ক্ষণিকের মিলন, অভিমান জানাতে জানাতেই পূর্বচ্ছেদ—সারাদিন কাজের তাগিদে হাত দুটো সমানে চলে যখন সীতার, মন কি বসে থাকে ভেবেছ? না—মনতো সমানে রিহার্সাল দিয়ে চলে কত কথার—যা সে জিজ্ঞাসা করবেই সুলালকে? কিন্তু কি যাদু যে আছে সুলালের স্পর্শে সব ভুলিয়ে দেয়, সীতাকে—সান্নিধ্য সুখ বিভোর ক'রে দেয় তাকে।

"কেন তুমি চলে গেলে? তোমার বুকের আড়ালে এমনি ক'রে কেন সব ঝাপ্টা থেকে বাঁচিয়ে রাখ্লেনা আমাকে?" অনেকবার জিজ্ঞাসা করে সীতা।

"কিন্তু তুমিতো যেতে চাওনি, কি উদগ্র ছিল তোমার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা," বিড়বিড় ক'রে না ব'লে পারেনা ও।

স্বামীকে দোষী করতে পারেনা ও, মনেই আসেনা, না, কিছুতেই নয়। "পোড়া কপালী আমি, তাইতো রাখ্তে পারলামনা তোমাকে," নিঃশ্বেস ফেলে সীতা,—"সব দোষ আমার ওগো, সব দোষই আমার।" নিজেকে বড় অপরাধী, বড় সর্বনাশা মনে হয়।

মিলিটারীতে কাজ করে বিজন—সীতার ভাশুর। আপেলের দেশের আগুন নেভাতে ছিল ব্যস্ত তাই সীতাকে সেই বিয়ের কনেই যা দেখেছিল—আজ এতদিন পরে এসেছে ফিরে।

"ন বৌদি?" অবাক্ বিস্ময় লাগে বিজনের—দুচোখকে যে বিশ্বাস করানো যায় না? নতমুখী সীতা বঁটি ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়াল ঠাকুরপোর আগমনে। শুনছিল কদিন ও আসবে, আসবে। অস্বস্তি লজ্জাও বড় করছিল। আজ পাঁচ বছর তো বেরোয়নি কারও সাম্নে—প্রথম প্রথম সহানুভূতি আর কান্না দেখাবার জন্য অনেকের শুভাগমন হ'য়েছিল, অবশ্য এখন সে অবান্তর—আলাপ, আলোচনায়, অতিথি-সমাগমে। রান্নাঘর, ভাড়ার ঘরে কায়েমী আস্তানা।

"ন বৌদি?" চোখ্ ঠিক্রে বেরিয়ে আসবে বিজনের—নমস্কারটাও আর করা হলনা।

সেই নববধূ সীতা! রূপ লাবণ্যের সমারোহে রাজেন্দ্রাণীর মত ঘাটে বসেছিল সে—লাল বেনারসীর আভা পড়ে মুখখানাকে কি সৌন্দর্যই না দিয়েছিল—নিটোল বাহুতে বাজুবন্ধ, প্রকোষ্ঠে ঝক্ঝকে চুড়িবালার দ্যুতি যেন গায়ের রংএর কাছে হার মান্ছিল। বিজনের মন ভ'রে গিয়েছিল, ১৮।১৯ বছরের কিশোরই বলতে

পেলে। ওকে দেখে মুখ লুকিয়ে ছিল আজকের মতই সীতা। কৌতুকে উজ্জ্বল বিজন বলেছিল, "নবৌদি, আমি তোমার একটিই ভাশুর আর আমাকে দেখে লজ্জা! কথা বলবেনা বুঝি?" "বলিনিতো কথা বলবনা," সীতা মধুর হাসি হেসে বলেছিল। মৃদু স্বর, মিষ্টি, সংক্ষিপ্ত কথা, তবু আলাপ জমে উঠতে দেরী হয়নি। —সে সময়কার কথাগুলো কোনদিন কি ভুলতে পেরেছে বিজন? ঝিলম নদীর তীরে বসে বসে বর্তমানকে ভুলে গেছে কত সময় ও, এইসব মধুস্মৃতির রোমন্থনে।—

আজও তার সামনে সীতা—তেমনি নতমুখী—আজ কি কথা বলবে সে? সেদিন অচেনাকে চেনা ক'রে নিয়েছিল অনায়াসে। আজ চেনাকে অচেনার পর্যায়ে চলে যেতে দেখে সে সহজ হ'তে পারছেনা। প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে বাণী। সীতার অবস্থাও তথৈবচ। "এই মুহূর্তে কোন মায়াবলে যদি ঢেকে ফেলা যেত নিজেকে," এই ধ্বনিই উঠছে তার মনে মনে আর্তনাদে। বিজনই মুক্তি দিল তাকে—আর কিছু না ব'লে চলে গেল সে।

মনে মনে বড় আহত হ'ল সীতা—"সকলের কাছেই আজ আলাপের অযোগ্য হ'য়ে গেছি আমি," অতীতের কথাগুলো মনে পড়ল।'

"একজন না থাকলে এ জীবনের কিই বা মূল্য আছে, আজ বেশী ক'রে মনে হ'ল তার," স্নেহ-ভালবাসা, এমন কি একটু সৌজন্য ভদ্রতাও কেউ দেখাবেনা বিধবার জন্যে।" চোখ ভরল জলে।

...চায়ের হুকুম পাঠিয়ে দিলেন বড় যা, আর জল খাবারের। বেতো রুগী, নিচে নামতে পারেন না।—

ঝিকে বাজারে পাঠানো হ'ল কি কি যেন আনতে, ভাসুর ঝি, ভাসুর পো ওপরে গুলতান করছে।

তা তো হোল, কিন্তু দিয়ে আসবে কে?

ওর সামনে যেতে পারবেনা সীতা, কিছুতেই না। চাইছেনা অথচ জোর ক'রে যাচ্ছে—কি ছ্যাংলা ভাববে বলতো?

কিন্তু চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।

ওপর থেকে বড় ভাসুর ঝি হাঁকল, "নকাকী, চা হ'ল? বাবাঃ, এক কাপ চা করতেই কলি ভোর!"

হাসির একটা হররা উঠল, নিশ্চয় বিজনও যোগ দিয়েছে এ হাসিতে, ভেবে কান গরম হ'য়ে উঠল সীতার।

উপায়ান্তর না দেখে খানিক পরে সীতাকেই নিয়ে যেতে হ'ল চা ওপরে।

কথাবার্তা চ'লেছে।

"কেন ন'দা কি ছেলে মানুষ? তার বিয়ে করাই উচিত হয়নি, জেনেশুনে"—বলছে বিজন।

"তা ন ঠাকুরপো কি ক'রে জানবে, ২০।২১ বছরের সময় একবার হ'য়েছিল, আবার যে চাগান দেবে তা কি ক'রে জানবে?"

"কিন্তু ডাক্তারে তো বারণ করেছিল!"

"তখন খেপে উঠলো' বিয়ে করব, বিয়ে করব, কাজেই দেওয়া।"

"সে নবৌদির রূপ দেখে, কিন্তু সে রূপের কি হাল করেছ তোমরা!"

"কি, আমরা হাল করেছি?" গর্জন ক'রে ওঠেন বড়বৌদি।

"তা নয়ত কি, পাঁচবছরে মানুষের এরকম দশা হয়? আর চাকরাণীর অধম হ'য়ে আছে তাতো দেখতেই পাচ্ছি।"

"ওঃ তাই তুমি মুখে মাসসা নামিয়ে বসে আছ ওপরে উঠে, আমি ভাবি অনেকদিন বাদে একে বাদো বাদো ঠেকছে। তা এক কাজ কর না। অতই যদি দরদ, যাতে চাকরাণীর অধম না হ'য়ে থাকতে হয় তাই করো। একটা জন মনিষ্যিকে তো উঁকি দিতে দেখিনি।"

"সে উপায় থাকলে রাজরাণী ভিখারিণী হয়? সেই রাণীর মত চেহারা!"

"বিধবা কি রূপ নিয়ে ধুয়ে খাবে? বরঞ্চ ওসব জঞ্জাল যাওয়াই ভাল।"

"তাতো বটেই, রূপ নিয়ে থাকাটা তোমাদেরই এক-চেটে—ওপরে বসে থেকে থেকে তাই মৌরসী পাট্টা ভোগ করছ।"

"সে করছি আমার স্বামীর পয়সায়—কপাল পুড়িয়ে তো আর বসে থাকিনি? তা তুমিই এবার একটা ব্যবস্থা কর, দেখি আমরা পাঁচজনে। বাঁচি।"

"হ্যাঁ, কত যে বাঁচো তা জানি। ওই হাড়হাভাতে খাটুনি খাটবে কে? তুমি না তোমার মেয়েরা?"

"দেখ, আমার বাড়ীতে বসে তুমি এসব বলতে পার না। সোহাগ দেখাতে হয় আগে ব্যবস্থা ক'রে তারপর মুখ নেড়ো—কথায় চিঁড়ে ভেজেনা, বুঝলে?"

ইতিমধ্যে ঝগড়া! সীতা কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ ক'রে—এক ভাসুরঝি হঠাৎ এল' বেরিয়ে—তার হাতে চা জল খাবারটা কোনরকমে গছিয়ে দিয়ে নেমে গেল সীতা।

কোন কথা কানে যায়নি সীতার একটা কথা ছাড়া —"জেনে শুনে, জেনে শুনে, ডাক্তার বারণ ক'রেছিল।"

যন্ত্রের মত কাজ ক'রে গেল সে—রান্না বান্না সব—জেনাকে দিয়ে বলে পাঠাল' বড়খাকে, তার শরীর বড্ড খারাপ—খেতে দেতে সে দিতে পারবে না আজ, শুতে যাচ্ছে।

এধরনের কথা কেনা শোনেনি কোন দিন, বললে, "ছাওয়ালকে দেখে সোহাগ উথলোলো নাকি বৌদির?"

যেন শুনতেই পায়নি এমনি ক'রে চলে গেল সীতা নিজের ঘরে।

বিকেলেই তুলে রেখেছিল একমুঠো যুঁই, বেল, আর গন্ধরাজ, গোটাকতক চাঁপা। তারা অভ্যর্থনা জানাল' ভালবেসে তাকে রোজকার মত, গন্ধ-বিমূঢ় বাতাসের বিবশ সাহচর্যে। কিন্তু আজ আর তাদের আদরে ভুলল না সীতা, রোজকার মত স্পর্শসুখের লালসা আকুল হ'য়ে। কোন রকমে বিছিয়ে নিল মাদুরখানাকে। ধপাস ক'রে ফেলে আর পা দিয়ে টেনে দিয়ে—মশারির চারটে কোণ যন্ত্রচালিতের মত পেরেকে গলিয়ে গলিয়ে—তারপর টান্ মেরে যত জোরে পারে জানলার বাইরে ফেলে দিলো ফুল "আপদ্ যাক্, দূর হোক্" বিড়বিড় ক'রে বললও বুঝিবা—ঝড়ের বেগে বিছানায় এসে এবার দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে মাদুরের ওপর এতক্ষণকার নিরুদ্ধ কান্নার বাঁধ ভেঙে দিতে চাইলো—কিন্তু জল কোথায়? আগুন ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেরোতে লাগল' ওর চোখ দিয়ে—মনের আগুন—"জেনে শুনে, জেনে শুনে, ডাক্তার বারণ করেছিল।"

DENA BANK

The Saving Services offered by the Dena Bank will help you to save for the future.

General Banking Business Transacted.

A STRONG EDIFICE

DEVKARAN NANJEE BANKING CO., LTD.

HEAD OFFICE:

DEVKARAN NANJEE BLDGS., HORNIMAN CIRCLE, BOMBAY 1.

G. ROY & CO.,

PRIVATE LTD.

Govt. and Railway Contractors.

SUPPLIERS OF BRICKS, SAND, GRAVELS, ST. CHIPS AND ALL OTHER BUILDING MATERIALS.

3, DEHI SERAMPORE ROAD, ENTALLY.

Calcutta-14

(Bus Route No. 33, Gobra Stand)

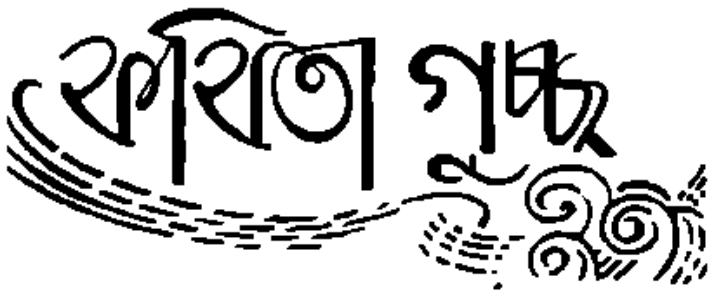

সূর্যস্নান

সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়

পালকের মতো ঝরে রোদ,
এই রোদে আকাশ উতলা।
বাতাসও মন্থর হোলো,
উজ্জ্বল আশার সূর্য ছড়িয়েছে অজস্র প্রণাম।
আবার জাগ্রত করি বীর্যবাহী চেতনা-পৌরুষ;
হৃদয়ের দোরে দোরে পৌঁছুতে হবে আজ রোদ্দুরের চিঠি
তির্যক তেজের গতি—ঝরে যাক্ প্রসন্ন সময়।
সোনালী ঢেউয়ের রাতি হলুদ আকাশ;
সূর্য আফরাণী—আলো-রাঙা,
আশা যেন আলতা-গোলা-লাল,
এসো তুমি এইবার,
রোদ্দুরের হ্রদে স্নান করি।

আশাবরী

সুশান্ত ঘোষ

তার সেই ব্যথা নিয়ে সুদূর আকাশদীপ হয়ে
জ্বলে কেউ, মেঘলীন একখানি অলীক বিস্ময়ে
স্বরলিপি এঁকে যায় ভাঙ্গানীলে, আর টানে ধ্বতি
অকস্মাৎ, ধূলোমাটি রোদ-ছাওয়া হৃদয়ের একটি প্রণতি
হয়তো কপোত হয়ে উড়ে যায় তারই মুগ্ধ পাশে।
তারপর অশ্রু ঝরে অন্ধকার রাত্রির আকাশে।
কার অশ্রু ? চিনেছি ; তারই তো পরভৃত মমতার জল
ঝরে পড়ে চোখ দিয়ে, সে এসেও কেঁদে গেছে
ম্লান রোদে পিঠ দিয়ে। শুধু সূর্যমুখী আছে
তার সাক্ষ্য এক, সেই জানে কান্নার কমল
ভোরের নির্জনে ফোটে। তবু সেই দুঃখের কোরক
দুহাতে বিচ্ছিন্ন করে নির্মম দস্যুর মতো
শুধু একজন আকস্মিক ঝড়ে মেশে, আর এক
অপার যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে আসে সেই তো নিয়ত
রাত্রি থেকে। মৃদু ভয় বুকে নিয়ে তখনো ব্যাকুল
ভাবে মনে,—আসবেনা, ঝরে গেছে শিশিরের জল
চুল থেকে কতদিন, শান্ত হাতে বেঁধে তার বেণী
ফিরে গেছে, আসবেনা সে যে কোনদিনই ॥

মৃত্যুকে

সন্তোষকুমার অধিকারী

মৃত্যুকে আবার দেখিলাম।
এক শুষ্ক দিনান্তের মেঘে
দেখিলাম রক্তসূর্যে মরে যেতে অসহায় ক্রোশে ;
জীবনের অন্তিম আকূতি তার
থেমে গেলো অবিচ্ছিন্ন রাত্রির অতলে
তোমার আমার প্রশ্ন হারালো আঁধারে।
জীবনকে মরে যেতে দেখিলাম
শূন্য প্রতিবাদে ;
মানুষের আশা কামনার রক্তাক্ত হৃদয়ে
শুষ্ক হ'লো সকল জিজ্ঞাসা
এক দীর্ঘ পাণ্ডুলেখা শুধু নীল
নক্ষত্র উচ্ছ্বাসে
পৃথিবীর আয়ু লিখে গেলো।
তারপর শুষ্ক কোন অতিক্রান্ত সময়ের কূলে
নিঃস্বত্ব কঠিন
মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করি নিষ্ঠুর কৌতুকে।

সুরদাসের প্রার্থনা

অনুবাদক—শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

(গান্ধিজীর Songs from Prison হইতে)

ওগো প্রভু, ওগো দয়াময়
রক্ষা করো, রক্ষা করো মোরে,
তুমি যে প্রীতির উৎস জীবের শরণ।

ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ অকূল পাথারে
হালভাঙা মোর তরীখানি,
ভেঙে যায়, ডুবে যায়, হায়!
মোরে ঘিরে নাচে অবিরাম
মিথ্যামায়া কামনার উত্তাল সাগর,
হিংসার তরঙ্গ তোলে মাথা
গ্রাসে মোরে প্রমত্ত বাসনা।
রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু!
ডুবে যাই, ডুবে যাই, পিতঃ!
আমার পাপের ভারে।
আঁধার নিশীথে, তরঙ্গের বিক্ষুব্ধ গর্জন
পিষ্ট করে দুর্বল আত্মারে।
ছিঁড়িয়াছে ঝড়াঝড়ি, ছিঁড়েছে নোঙর
নিরাশ্রয় আমি নাথ, শকতিবিহীন।
তাই আজ নিঃসহায়,
তোমারে যে ডাকি দীননাথ!
দীনের আশ্রয় তুমি, সর্বশক্তিমান,
চেয়ে দেখো বিপন্ন সন্তানে।
কূলহারা অশান্ত সাগরে
শ্রান্ত আমি, ওগো নিঃসহায়,
ডুবে যাই, ওগো ডুবে যাই।
বাহু দুটি করো প্রসারিত,
ক্লান্ত মোরে নাও তুলি তীরে
কোলে লও অধম সন্তানে।

—সুরদাস—

[১৯৩০ সালে এরোরা জেলে অবরুদ্ধ হয়ে থাকা কালে গান্ধিজী তাঁর ইংরেজ ভক্ত ও বন্ধুদের বিশেষ করে মীরাবেন মিস্ স্লেডের জন্য কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও ভক্তিমূলক ভজন সংগ্রহ করে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। পরবর্তী কালে সেগুলি একত্র করে এবং ইংরেজীর সংস্কার করে, গান্ধীভক্ত হয়ল্যণ্ড সাহেব গান্ধিজীর অনুমতিক্রমে 'Songs from Prison' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই কবিতাটি তারই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।]

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : 22-6853-58

জীবন বীমা রাষ্ট্রীয়করণ

অমল কুমার বসু

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—জীবনবীমা রাষ্ট্রীয়করণ তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ—দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে ইহার প্রতিক্রিয়া সুদূর-প্রসারী।

সঞ্চিত সম্পত্তির পরিচালনের জন্য ন্যাসরক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি জীবনবীমা শিল্পের আবির্ভাবের বহু পূর্বেও প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ ন্যাসরক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি থেকেই জীবনবীমা শিল্পের উৎপত্তি। ন্যাসরক্ষকের অধীনে সম্পত্তির পরিচালনের ব্যাপারে সম্পত্তির মালিকের স্বার্থই প্রধান লক্ষ্য থাকে। বীমা শিল্পের তহবিল পরিচালনের ব্যাপারেও ইহাই মূল নীতি হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতে জীবনবীমায়-ব্যবসায়িগণ এতদিন যে ভাবে বীমা-তহবিল পরিচালনা করেছেন তাতে বহু ক্ষেত্রেই এই সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে।

জীবনবীমা-শিল্পের চলতি মূলধনের অধিকাংশই আসে জনসাধারণ যে প্রিমিয়াম দেয়—সেই টাকা হতে। এই শিল্পে ব্যবসায়িগণের (Share holders) দায়িত্ব অন্যান্য শিল্পের ব্যবসায়ীদের দায়িত্বের তুলনায় অনেক কম। ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী মাত্র ১½ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। পরে ইহার অংশীদারগণের মধ্যে বোনাস শেয়ার (Bonus Share) বিলি করে এই মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ লক্ষ টাকায়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির বীমা তহবিলের পরিমাণ আজ প্রায় ১২ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানটির অংশীদারগণ ১½ লক্ষ টাকার দায়িত্ব নিয়ে আজ ১২ কোটি টাকার এক বিরাট তহবিলের মালিক। এইত হল এই শিল্পে ব্যবসায়িগণের দায়িত্বের দিক। কিন্তু জীবনবীমা ব্যবসায়ীগণ তাঁদের তহবিল এতদিন কি ভাবে ব্যবহার করেছেন তা পর্যালোচনা করলে যে চিত্র আমরা পাই তাও বিশেষ আশাপ্রদ নয়। জীবনবীমা ব্যবসায়িগণ যখন তহবিলের টাকা লগ্নী করতেন তখন Policy holder বা বীমাপত্র গ্রহীতাদের স্বার্থ প্রধান থাকত না—নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিই লক্ষ্য থাকত। বীমা তহবিলের টাকা নিয়ে শেয়ার বাজারে কাটকা খেলার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। রাষ্ট্রায়ত্তকরণ-দ্বারা জীবনবীমা শিল্পে জনসাধারণের টাকা নিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেলার পথ বন্ধ হল।

ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা পাবার জন্য সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ বীমা করে থাকেন। জীবনবীমা শিল্পের উন্নতি দ্বারা যাঁরা বীমাপত্র গ্রহণ করে থাকেন তাঁদের ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেওয়া ত সম্ভব হয়ই—উপরন্তু ইঁহাদের স্বল্প সঞ্চয় সমূহকে সুষ্ঠুরূপে কেন্দ্রীভূত করাও জীবনবীমা শিল্পের আর একটি বিশেষ দিক।

বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় ১,০৫৯ কোটি টাকার বীমা-পত্র আছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে এই সংখ্যাকে ৮,০০০ কোটি টাকায় বাড়ান মোটেই অসম্ভব নয় এবং ইহাদের মতে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকায়।

জীবনবীমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি এতদিন যাবৎ তাদের তহবিল বিনিয়োগ করবার সময় জাতির স্বার্থে সর্বাধিক এবং সর্বাগ্রে কোন্ শিল্পের প্রসার প্রয়োজন তা চিন্তা করেন নাই—কোন্ ব্যবসায়ে লগ্নী করে কত বেশী লাভবান হওয়া যায় এইটেই বিচার করে দেখতেন। এই যখন অবস্থা এবং বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য তখন জনসাধারণের সঞ্চিত এই বিরাট তহবিলকে ব্যক্তিগত মালিকানার মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। বিশেষ করে ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকলে এই তহবিল

যে দেশের প্রকৃত শিল্পায়নের জন্যই ব্যবহৃত হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ স্বার্থ জড়িত ব্যক্তিদের নিকট অবিবেচনাপ্রসূত মনে হতে পারে কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে ইহা খুবই সময়োচিত এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা।

তাছাড়া আজকে আমাদের শিল্পনীতির একটি মূল সমস্যা হলো অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা গোষ্ঠি দেশের অর্থনীতিকে নিজেদের হাতের মুঠোয় না রাখতে পারে সেদিকে নজর রাখা। কিন্তু ভারতে জীবনবীমা ব্যবসায়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই এই শিল্পের অধিকাংশ ব্যবসায় নিজেরা করে থাকেন। ভারতে মোট বীমা তহবিলের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ মাত্র ৭টি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের অধীনে। এই ভাবে সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জীবনবীমা ব্যবসায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের অনেকেই আবার অন্যান্য বড় বড় শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার আধিপত্য বিনষ্ট হল এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সরকারের পক্ষে আরো সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার পথ প্রশস্ত হল।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিভিন্ন জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্রেই ইহা যুক্তিসঙ্গত সীমা লঙ্ঘন করেছে। রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং জীবনবীমা কর্পোরেশন গঠনের ফলে জীবন বীমা ব্যবসায়ের মোট পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে। আর এতদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতির মধ্যে কোন সমতা ছিল না এখন আস্তে আস্তে সেই সমতা আনা সম্ভব হবে।

জীবনবীমা রাষ্ট্রায়করণের পর সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য কঠোর নজর রাখতে হবে। তার কারণ সরকারের বিরুদ্ধে গতানুগতিকতা একটি বড় অভিযোগ। একবার লাল ফিতের আওতায় পড়লে তা' থেকে রেহাই পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং এ বিষয়ে নজর রাখতে হবে।

এতদিন পর্যন্ত জীবনবীমা প্রায় সহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, গ্রামাঞ্চলে ইহার প্রসারের জন্য এখন সরকারকে জোর আন্দোলন করতে হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রচেষ্টাকে নানা ভাবে সাহায্য করবে—সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশ গঠনের কাজকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

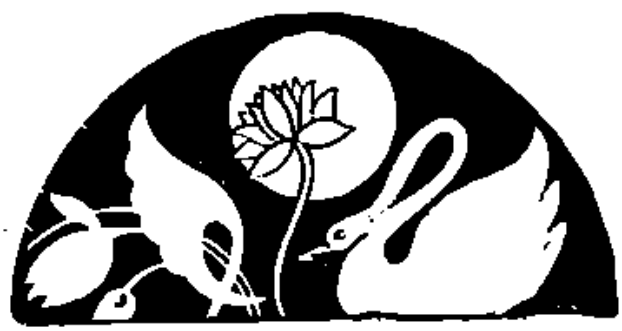

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৭

অবশেষে এক সান্ধ্য মজলিসে নানাসাহেব তাঁহার অন্তরঙ্গ দুই একজন 'বড় সাহেবে'র কাছে খবরটা ভাঙ্গিলেন —তিনি দিন-কতকের জন্য একটু বাহিরে ঘুরিতে যাইবেন, কালপী, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মিরাট। মাসখানেকের মধ্যেই অবশ্য ফিরিবেন। ততদিন ইঁহাদের একটু বিরহ-দশা ভোগ করিতে হইবে।

নানাসাহেব সাধারণত কানপুর ছাড়িয়া বড় একটা কোথাও নড়েন না। সুতরাং তাঁহার ভ্রমণের সংবাদে তাঁহার ইংরেজ বন্ধুরা বেশ একটু বিস্মিত হইলেন বৈকি!

কিন্তু নানাসাহেব সকলকেই এক কথা বলিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিলেন।—'এবার আদায়-আজাম বড়ই খারাপ হয়েছে। কোনমতে সরকারী খাজনাটাই উঠেছে মাত্র। কিন্তু তাতে ত আমার চলবে না—' তারপর একটু ম্লান হাসিয়া বলিয়াছেন, 'এখন ত আর বাঁধা সরকারী পেন্‌সন্ নেই, যা করে ঐ জমি-জমাগুলোর আয়। এখন একটু দেখাশুনো করতে হবে বৈকি! তাছাড়া কি জানেন, মাঝে মাঝে মালিক না গেলে গোমস্তা তহশীলদাররা পেয়ে বসে। মনের সাধে চুরি শুরু ক'রে দেয়। প্রজারা দিচ্ছে না, না কি ওরাই চুরি করছে, সেটাও দেখা দরকার ত!'

ইহার পর আর কথা বলা চলে না। এমন কি একথাও জিজ্ঞাসা করা চলে না যে, কোথায় কোথায় তোমার এত জমিদারী আছে, আর উত্তর ভারতেই বা এত জমিজমা কে কবে খরিদ করিল! আর একথাও সত্য যে এখন ত আর বাৎসরিক আট লাখ টাকা পেন্‌সন্ নাই—এমন রাজার হালে চলে কি করিয়া? নিশ্চয়ই বেশ কিছু জমি-জমা আছে।

তবু ম্যাজিষ্ট্রেট হিলার্সডন সাহেব একবার প্রশ্ন তুলিয়া ছিলেন, 'আপনার ত এত কর্মচারী রয়েছে, তারপর নেই মিঃ টোপীই রয়েছেন—তবু আপনাকে যেতে হবে?'

নিজের হাতে তাঁহার স্ফটিক-পাত্রে মূল্যবান বিলাতী সুরা ঢালিয়া দিতে দিতে নানা ধুন্ধুপন্থ জবাব দিয়াছিলেন, 'কৈ, ওদের দ্বারাও ত হচ্ছে না। যেখানে লাখ টাকার ওপর উশুল হবার কথা, সেখান থেকে এসেছে মাত্র ন' হাজার টাকা।'

তাহার পর মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'তাছাড়া এই ফাঁকে একটু ঘুরে আসাও হবে—এমনি ত বেড়ানো হয় না। কী বলেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। মাঝে মাঝে একটু বেড়ানো ভালো। খুব ভালো!' হিলার্সডন সাহেব মাথা নাড়িয়া বলেন।

কেবল এখানে নবাগত ফাইনান্স্ কমিশনার গাবিন্স্ সামান্য ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু আপনি যে সব স্থানগুলোর উল্লেখ করলেন, দিল্লী, মীরাট, লক্ষ্ণৌ—সবই ত শহর। আপনার জমিজমা সব নিশ্চয়ই শহরে নেই?'

'না না,'—তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন ধুন্ধুপন্থ, 'শহরের নাম করলুম—আপনারা সহজে চিনবেন ব'লে। দেহাতেও যাবো বৈ কি! তার আগে শহরে গিয়েই কর্মচারীদের ডাকব —তাদের কৈফিয়ৎ শুনব, তারপর সন্দেহ হ'লেই দেহাতে যাবো। যেতে হবে বৈ কি।'

গাবিন্স্ গুরুকণ্ঠে শুধু বলিলেন, 'ও!'

নানা একবার এক ঝাঁকে তাঁহার মুখের দিকে আড়ে তাকাইয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখের প্রশান্তি তাহাতে নষ্ট হইল না।

যথারীতি পান-ভোজন আদর-আপ্যায়নের পর সাহেবরা বিদায় লইলে নানাসাহেব ইঙ্গিতে আজিমুল্লাকে কাছে ডাকিলেন। তাঁহার মুখে বেশ একটু মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে ইতিমধ্যেই। আজিমুল্লা তাঁহার পাশে আসিয়া বসিলে চিন্তিত মুখেই বলিলেন, 'গাবিন্‌স্‌-এর কথা-গুলো শুনলে? ওর গলার আওয়াজ বা মুখের ভাব কোনটাই ভাল বোধ হ'ল না। ও কি কিছু সন্দেহ করেছে?'

আজিমুল্লা মুখে একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করিয়া উত্তর দিলেন, 'আপনি বড় সামান্য কথাতে বিচলিত হন পেশোয়াজী। গাবিন্‌স্‌ কীই বা সন্দেহ করবে? কতটুকু আপনি করেছেন? আপনি ত সত্যিই এখনও কোন কাজে হাত দেন নি—কোন ষড়যন্ত্রও করেন নি। গাছের পাতা নড়লেই যদি আপনি ঝড়ের আভাস পান তাহ'লে আমরা নাচার।'

নানা সাহেব ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, 'না তা নয়। ও লোকটা বড় ধূর্ত।'

'তা ঠিক।' আজিমুল্লাও সায় দেন সেই কথাতে, 'এই গাধাগুলোর মধ্যে ওরই বা একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। ওর কথা শুনে সতর্ক হবে—এমন বুদ্ধিও এদের নেই যে।'

নানা সাহেব চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত এবং বিপজ্জনক নানা চিত্রই বোধ করি এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতবেগে তাঁহার মানস চক্ষুর সম্মুখ দিয়া সরিয়া সরিয়া গেল। এইভাবে আরও কতকাল বসিয়া থাকিতেন কে জানে, অকস্মাৎ দূর হইতে তাত্যা টোপীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার চমক ভাঙিল। তিনি আজিমুল্লার দিকে ঈষৎ হেলিয়া চুপিচুপি বলিলেন, 'শোনো। একটা কথা। হুসেনীর সঙ্গে ত তোমার যোগা-যোগ আছে। ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার দেখাও হয়—তাই না?'

নানা সাহেব জানেন তাহারা একই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে —ইহা আজিমুল্লা আকারে ইঙ্গিতে টের পাইয়াছেন বহু বারই। কিন্তু ঠিক তাহাদের কতটা ঘনিষ্ঠতা তিনিও কোনদিন মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করেন নাই, আজিমুল্লারও জবাব দিবার প্রয়োজন হয় নাই। আজ অকস্মাৎ এই প্রশ্নে অজিমুল্লার অপরাধী মন একটু চমকিয়া উঠিল কি?

উঠিলেও—তাহা অন্তত তাঁহার শান্ত কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িল না। তিনি মুহূর্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'দেখা ত প্রকাশ্যেই হয়।'

'আড়ালে?'

'হাঁ—তাও একবার করতে হয়েছে। আপনারই প্রয়োজনে পেশোয়া।'

'না-না। আমি সে জন্যে কোন দোষ ধরছি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—তাকে তোমার কী মনে হয়?...আমার জন্যে তার এত কী মাথাব্যথা?

আজিমুল্লা উত্তর দিলেন, 'দেখুন মেয়েদের মনের খুঁটো খবর স্বয়ং খুদাতাল্লাও রাখেন কিনা সন্দেহ। তবে আমার যা মনে হয়েছে তা আমি বলতে পারি, কিন্তু সে আমারই বিশ্বাস, আপনাকে আমি জোর দিয়ে কিছু বলছি না। আপনি জানেন হুসেনী বেগম আপনার দাসী, উপপত্নী। কিন্তু সে শিক্ষিতা মেয়ে—সে আপনাকে স্বামী ব'লেই জানে। হিন্দুস্তানের কোন্ নারী না চায় স্বামীর অপমানের শোধ নিতে, কোন্ নারী না চায় স্বামীকে উচ্চাসনে বসাতে? আমার মনে হয় এটা হুসেনী বেগমের আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমেরই নিদর্শন।'

নানার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যোধ করি কথাটা তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত মিলিল। তিনি বলিলেন, 'তা বটে। কিন্তু—'

বক্তব্যটা শেষ হইল না। তাত্যা টোপী আসিয়া জোড়-হাতে নানাকে প্রণাম জানাইয়া নানারই ইঙ্গিতে তাঁহার সামনে বসিলেন।

নানা প্রশ্ন করিলেন, 'সব প্রস্তুত ত?'

'সব। কাল ভোর চারটেতে গাড়ী তৈরী হয়ে আপনার দোরে হাজির থাকবে। লোক বেশী দিলুম না। আপনার তিনজন চাকর আর পঁচিশ জন সওয়ার—এই হ'লেই চলবে আশা করি?'

'খুব, খুব।'

আরো দুই একটি খুচরা আলাপের পর নানা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'আজিমুল্লা তুমি আমাকে এদিকের খবর দিয়ে রোজ একখানা ক'রে খৎ পাঠাবে। টোপীজী আপনিও। আমাদের যা সঙ্কেত আছে, সেই মত লিখবেন—আমি বুঝে নেব। এখন উঠি, কাল চারটের আগে স্নান পূজা সেরে নিতে হবে। এ ঘরে ত বারোটা বাজে!'

তাত্যা প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি আদালা বেগমের ঘরে থাকবেন ত? কোথায় গিয়ে ডাকবে আপনাকে?'

'আদালা? ন্—না। আমি হুসেনী বেগমের ঘরেই থাকব।'

নানা চলিয়া গেলেন। তাত্যা হুসেনীর নাম শুনিয়া হয়ত কিছু বিস্মিত হইলেন—কিন্তু আজিমুল্লার ওষ্ঠের প্রান্তে একটু কৌতুকের হাসিই ফুটিয়া উঠিল।

তাত্যা টোপী খানিকটা নিষ্পলক নেত্রে আজিমুল্লার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যার জন্য এত করছি তাঁর যদি তোমার অর্ধেকও বুদ্ধি আর সাহস থাকত আজিমুল্লা!'

আজিমুল্লা ঈষৎ মাথা নত করিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন, 'মনে হয় খুদাও মাঝে মাঝে ভুল ক'রে বসেন। যে মনিব হ'তে পারত তাকে পাঠান কর্মচারী ক'রে—আর কর্মচারী হবার যার যোগ্যতা তাকে করেন মনিব। আমি ভাবি—যদি আপনার মত বুদ্ধি আর সাহস পেতাম টোপীজি!'

তাত্যা টোপী মুখ টিপিয়া হাসেন একটু।

নানাসাহেব বিদেশযাত্রার পূর্ব রাত্রিটা প্রিয়তমা আদালার ঘরে না কাটাইয়া হুসেনীর ঘরে কাটাইবেন—ইহা কেহই অনুমান করিতে পারে নাই, শুধু হুসেনী ছাড়া। হুসেনীর বসিয়া থাকিবার ভঙ্গীতে নানা সাহেবের মনে হইল সে যেন তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছিল।

'তুমি এখনও ঘুমোওনি হুসেনী?'

'না। আপনার প্রতীক্ষা করছিলাম।'

'তুমি আমাকে আশা করেছিলে?' নানাসাহেব সত্যই বিস্ময় বোধ করিলেন।

'করেছিলাম বৈ কি। পেশোয়াজী—আদালা বেগম আপনার সহচরী—কিন্তু কর্মসহচরী একমাত্র আপনার এই দাসী। আপনার মর্যাদা, আপনার প্রতিভা, আপনার শৌর্যের উপযুক্ত মূল্য বোঝবার মত শিক্ষা আদালার নেই। সে জানে না সে পুণ্যশ্লোক বিশ্বনাথ রাও, মহান্ বাজীরাও, কর্মবীর বালাজী রাও, দেশভক্ত মাধবরাওর রক্ত আপনার ধমনীতে বইছে। সে জানে না যে ঈশ্বর আপনাকে সিংহাসনে বসে কোটি কোটি মানুষকে শাসন করবার জন্যই পাঠিয়েছেন—সুন্দরী নারীর আলিঙ্গনে দিন কাটাবার জন্যে নয়। আপনার জীবনে ক্রীতদাসীর স্থান আছে—সে রণাঙ্গণের বিশ্রাম মুহূর্তে শুধু!'

খুশী হইলেন নানা সাহেব।

ঈষৎ হাসিয়া পাগড়ীটা খুলিয়া তাহার হাতে দিলেন। সেটা সদ্যোক্রীত একটি বিলাতী মেহগনি টেবিলের উপর রাখিয়া হুসেনী তাঁহার কোমরবন্ধ, আঙরাখা, ইত্যাদি খুলিয়া লইল।

তারপর নানাসাহেব আরাম করিয়া একটা দিওয়ানে বসিলে সে তাঁহার পা হইতে নাগরাটা খুলিয়া লইয়া একজোড়া তেলভেটের চটি পরাইয়া দিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'মুসম্মৎ—তামাকু!'

মুসম্মৎ নানাকে আসিতে দেখিয়াই কলিকাতে 'আগ চড়াইয়া'ছিল—কলিকাতে তামাকু টিকিয়া সাজানোই থাকে—এখন গুড়গুড়িটা রাখিয়া সসম্মানে ও সসঙ্কোচে ফরসীর মুখটা নানা সাহেবের হাতে ধরাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করিবার পর মুখ হইতে নলটা সরাইয়া নানাসাহেব কহিলেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ হুসেনী, আজ আর আদালাকে আমার প্রয়োজন নেই। আজ তোমাকেই আমার দরকার। তোমাকে আমার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আছে!'

হুসেনীর মুখভাবে মনে হইল সে-প্রশ্নটাও অনুমান করতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু সে মুখে শুধু বলিল 'এখন খাবেন কিছু? ঠাকুরকে কিছু আনতে বলব আপনার জন্যে? একটু দুধ?'

'না না। তুমি ব্যস্ত হয়োনা। আমার যা খাবার তা আমি সন্ধ্যাবেলাই খেয়ে নিয়েছি। হুসেনী—আজ একটা খবর পেলাম তাতে আমি বড় বিচলিত বোধ করছি।

তুমি নাকি মাঝে মাঝে মুন্সী নানকচাঁদের বাড়ী যাও? এ কি সত্যি? আমার ত বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না!'

হুসেনী একটু হাসিল। মধুর সে হাসি—কিন্তু তাহার অন্তরালে কিছু বিদ্রূপও বোধকরি ছিল। সে কহিল, 'খবরটা কার কাছ থেকে পেয়েছেন তাও আমি জানি। ডুলিওয়ালাদের ডেকে আমার গতিবিধি সম্বন্ধে জেরা করেছেন। পেশোয়াজী, যদি আমার একথা গোপন করবার প্রয়োজন হ'ত ত আমি ডুলিওয়ালাদের নিষেধ করতাম। আর তাহ'লে—কেটে দুখানা ক'রে ফেললেও আপনি ওদের কাছ থেকে এ খবর বার করতে পারতেন না। হাঁা, আমি নানকচাঁদের বাড়ী মধ্যে মধ্যে যাই। কিন্তু এতে এত বিচলিত হবার মত কী হ'ল পেশোয়াজী?'

শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা একটু তীক্ষ্ণই শোনাইল।

ধুন্ধুপন্থ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু তবু তিনি বেশ উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, 'বিচলিত হবো না? নানকচাঁদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তা তুমি জানো না। কিছুই ত পেলাম না—যা আছে সামান্য, পৈত্রিক খুলিগুড়ি তারই লোভে বর্ষত পেশোয়ার ভাগ্নেরা আমাকে তিক্তবিরক্ত ক'রে তুলেছে।...পঞ্চাশটা মকর্দমা চালাচ্ছে। নিচের আদালতে হারলে ওপরের আদালত—সেখানে হারলে আবার নতুন ক'রে নিচের আদালতে ফিরে আসছে। তাদের কী সাধ্য যে আমার সঙ্গে এই শত্রুতা করে—এতকাল ধরে! শুধু ঐ বেটা নানকচাঁদ আর চিন্না আপ্পা। আপ্পা টাকা জোগাচ্ছে আর নানকচাঁদটা তদ্বির ক'রে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী প্রেয়সীর যোগাযোগ—এটা খুব সুখবর কি?'

নানা ধুন্ধুপন্থ রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

হুসেনীর মুখের হাসি কিন্তু মিলায় নাই। সে হাসিয়াই জবাব দিল, 'মালিক, আপনি রাজপুত্র, রাজা—মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আপনার এর চেয়ে ঢের বেশী খবর রাখার কথা। ...নানকচাঁদ পাকা ব্যবসাদার, টাকা ছাড়া সে আর কিছুই চেনে না এ পৃথিবীতে। তবে তার একটি গুণ আছে—যার কাছে যেটুকু টাকা খায় তার সেটুকু কাজ বিশ্বস্ত ভাবেই করে। ঋণটার পুরো উশুল দেয়।...চিন্না আপ্পার টাকা খেয়ে সে আপনার বিরুদ্ধে যতটা তদ্বির করছে—আপনার টাকা খেলে ঠিক ততটাই তদ্বির করবে চিন্না আপ্পার বিরুদ্ধে। হয়ত দুজনের কাজ একসঙ্গেই করবে কিন্তু একের কথা অপরকে জানাবেনা।...নানকচাঁদের সঙ্গে আমার প্রয়োজনের সম্পর্ক। ষড়যন্ত্রের কাজে নানা মানুষকে প্রয়োজন হয় পেশোয়া—নানকচাঁদও সে প্রয়োজনের বাইরে নয়। তার যেটুকু কাজ সে ঠিকই করে—এবং সে কথা কোন দ্বিতীয় প্রাণী জানতে পারে না। কালই সে আমাদের এক মহা-উপকার ক'রে দিয়েছে। কিন্তু সে কথা থাক। সে বিশ্বাস করেনা যে আমরা জিতব ইংরেজরা হারবে, তবু আমাদের যেটুকু দরকার যেটুকু উপকার সে ঠিকই ক'রে দিচ্ছে। অবশ্য—টাকা খেয়েই।'

ধুন্ধুপন্থ নিঃশব্দে ধূমপান করিতেছিলেন, আরও কিছু ক্ষণ তেমনিই বসিয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন, 'কী করছ তোমরা—তা তোমরাই জানো। কী বিপদে শেষ অবধি পড়তে হবে তা কে জানে!'

হুসেনী তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, 'খুদা মেহেরবান—কিছুই আটকাবে না পেশোয়া। এটা ত জানেন, পলাশীর লড়াইয়ের পর ঠিক একশ বছর পুরো হয়েছে। এইটেই আংরেজদের পতনের বছর।...আর, এইটেই আপনার উত্থানেরও বছর!'

সে নানা সাহেবের চোখে চোখ রাখিয়া একটু আবেগের সুরেই শেষের কথাগুলি বলিল। নানা সাহেব তাহার গাল নাড়িয়া আদর করিয়া বলিলেন, 'আপনার বলছ কেন—বলো আমাদের উত্থান। আমি একা উঠবনা হুসেনী, তুমিও উঠবে। যদি গণপতি ভগবান্ দিন দেন—সুদিন আসে, তোমাকে ভুলবনা।'

হুসেনী নড়িয়া চড়িয়া বসিল। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া কহিল, 'রাত একটা বাজে। আর তিন ঘণ্টা বাদেই আপনার গাড়ী হাজির হবে। কাজের কথাগুলো এই বেলা সেরে নিই।...এই কাগজ-পত্রগুলো রাখুন। কোন্ কোন্ ছাউনীতে আমার কোন্ কোন্ লোক আছে কোথায় কাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন—তার পুরো বিবরণ, তাদের নামধাম সব লেখা রইল। কিন্তু খুব সাবধান—এ কাগজ আপনার কাছছাড়া করবেন না মোটে। করলে—

এ লোকগুলির ত জান যাবেই—আমাদেরও জান খুব নিরাপদ থাকবেনা।'

নানা সাহেব সবগুলি খেয়িয়া পড়িয়া তৃপ্তি করিয়া আওরাখার জেবে রাখিলেন। তাহার পর কহিলেন, 'আর সেই যে তুমি বলেছিলে কমিসারিয়েটের একজনকে হাত করবে—ওখানকার খবর—?'

হুসেনী উত্তর দিল, 'বড় মুস্কিল পেশোয়াজী। ওখানে সাহেব আর বাঙালী—এই-ই বেশী। বাঙালীরা বড় বেশী আংরেজের ভক্ত, বিশেষ ক'রে এই কেরানীরা। একটি ছেলেকে খানিকটা হাত করেছি তবে সে কতটা খবর আপনাকে দিতে পারবে তা জানি না। যাইহোক আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি নীরাটে পৌঁছলে আমার লোক তাকে আপনার কাছে হাজির ক'রে দেবে। তার নাম হীরালাল। খুবই কম বয়স—বালক বললেই হয়। সুশ্রী চেহারা, নম্র শান্ত ছেলে। তবে জোর ক'রে তার কাছ থেকে কিছু আদায় করার চেষ্টা করবেন না। সে ভাঙবে কিন্তু মচ্‌কাবে না!'

নানা সাহেব তাকিয়াতে এলাইয়া পড়িলেন।

তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, 'তোমার এগারের কী কী কাজ বাকী রইল, তা ত বললে না? আজিমুল্লা যে অনেক টাকা চাইছিল।'

'টাকাটার হুকুম দিয়ে রাখবেন খাজাকীকে। কাজের ফিরিস্তি আপাতত থাক। ঘুমে আপনার চোখ ঢুলে আসছে। আপনি ঘুমোন।'

হুসেনী লঘু কোমল হস্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

একটু পরেই নানা সাহেবের নিঃশ্বাস নিয়মিত হইয়া আসিল। গাঢ় ঘুমে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। হুসেনী এবার নিঃশব্দে তাঁহার পদতল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর পা টিপিয়া টিপিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, 'মুসদ্দৎ!'

'জী মালেকান!'

'সর্দার খাঁকে খবর দে, আমার জন্যে যেন একটা ঘোড়া তৈরী রাখে। ভালো ঘোড়া। পেশোয়া রওনা হবার এক-ঘড়ি বাদেই আমিও রওনা দেবো।'

'একা?'

'না। সর্দারও সঙ্গে যাবে।'

'আমি না গেলে তোমার অসুবিধা হবে মালেকান!'

'তুই ঘোড়ায় চড়তে পারবি?'

'পারব। অভ্যাস আছে। তবে মরদের পোশাকে।'

'আমিও মরদের পোশাকেই যাবো। বেশ, তাই ব'লে দে।'

'কী কী সঙ্গে নেব মালেকান?'

'একটা ক'রে আওরতের পোশাক—আর টাকা। আর কিছু দরকার নেই। আর শোন্—একটা খৎ আছে। আজিমুল্লা খাঁকে পাঠাতে হবে। এই নে—'

জামার ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিল হুসেনী।

[ক্রমশঃ]

পুস্তক পরিচয়

বাংলার সাহিত্য : নারায়ণ চৌধুরী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

আধুনিক বাংলার কৃতী সমালোচক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক অষ্টাদশ সন্তরটি প্রবন্ধ পরিবেশন করেছেন। যথা—বাংলা গদ্য, বাংলা সাহিত্যের ভাষাবিচার, সাধুভাষা ও চলতি ভাষা, যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যে যুগান্তর, বাংলা কথা সাহিত্যের সমস্যা, ভঙ্গি প্রধান সাহিত্য, সমালোচনার মানদণ্ড, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, কাব্যের ভূমিকা, আধুনিক উপন্যাসের স্বরূপ, বাংলা সাহিত্যে সমন্বয়ের আদর্শ, রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্য, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ, মনস্তত্ত্বের মাপকাঠিতে রবীন্দ্র-উপন্যাস এবং সাহিত্যে ঐতিহ্য চর্চা।—প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশের কালে পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোনো প্রবন্ধই চিরাচরিত ভাবধারায় রচিত নয়। লেখকের একটি স্বকীয় চিন্তার জগৎ আছে। তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সকলের চিন্তার মিল না ঘটলেও তাঁকে স্বীকার করে নিতে কারুর দ্বিধা নেই। আলোচ্য-গ্রন্থের আলোচনাগুলি সম্পর্কেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি রচনাই গভীর ও তথ্যপূর্ণ; তবে আলোচনার সূত্রে একাধিক স্থলে আলোচ্য বিষয়ের উদ্ধৃতির অংশ অধিকতর সম্প্রসারিত হ'লে, আমাদের মনে হয়, সাহিত্যের নতুন অভিযাত্রীদের পক্ষে মূল বিষয়টিকে তুলনামূলকভাবে বোঝা সহজতর হ'তো। তথাপি গ্রন্থটি তার স্বকীয় ক্ষেত্রে সার্থক। বক্তব্যের দিক থেকে লেখক যে ভাবে তাঁর আলোচনাকে দাঁড় করিয়েছেন তাতে বিষয়বস্তুর শ্রেণীপার্থক্য থাকলেও বাংলাসাহিত্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সাবলীল প্রকাশভঙ্গী তাঁর রচনাকে মনোজ্ঞ করে তুলেছে। সাহিত্যের ছাত্রদের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ উপকারে আসবে। আমরা পাঠকমাত্রকেই গ্রন্থখানি সাগ্রহ ক'রে পড়তে অনুরোধ জানাই।

ব্যান্ ভং ব্যান্ ভং : ছড়া ও ছবি। শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর, বসন্তিকা প্রকাশিকা, কলিকাতা-২৯। দাম—দশ আনা মাত্র।

ইতিপূর্বে লেখকের 'প্যাং টক্ প্যাং টক্' শীর্ষক বইটি হাতে পেয়ে আমরা প্রীতিলাভ করেছিলাম। শিশুদের উপযোগী লেখকের দ্বিতীয় ছড়া ও ছবির বই 'ব্যান্ ভং ব্যান্ ভং'। পূর্বেকার গ্রন্থটির মতো আলোচ্য গ্রন্থেও লেখক ছড়া রচনায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ছড়াগুলো শিশুমনকে শুধু আবিষ্টই করবে না, সন্দেশের মতো মিষ্টি লাগবে। যেমন—

সেতার সাথে পিড়িং পিড়িং
পিটার সমক প্যাঁও,
তবলা বাজে টক্ টকা টক্
গাইছে খেয়াল ম্যাও।

ছবি ছাপা চমৎকার। শিশুদের হাতে তুলে দেবার মতো বই।

———

সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম সোপান : নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত প্রভাকর। বসন্তিকা প্রকাশিকা, ৩৯বি, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। দাম—একটাকা মাত্র।

নীলরতন বাবু কৃতী সঙ্গীতজ্ঞ। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর দান অসামান্য। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি সঙ্গীতজগতের প্রাথমিক ছাত্রদের উপযোগী করে সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারাগুলি সম্পর্কে সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা করেছেন এবং স্বরগ্রামের মাধ্যমে উক্ত আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়েছেন। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন সঙ্গীতাধ্যক্ষ শ্রীরমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষার্থী মাত্রেরই গ্রন্থটি বিশেষ উপকারে আসবে।

———

বাংলা সাহিত্যের গল্প : অনিলেন্দু চক্রবর্তী ও ত্রৈলোক্য বিশ্বাস। প্রাপ্তিস্থান : মোহন লাইব্রেরী। ৩৪এ, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৸০।

পুরোনো সাহিত্যের ভিত্তির উপরেই নতুন সাহিত্যের নির্ভর। শুধু তাই নয় ; পুরোনো কালের সাহিত্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে জাতির মনের ইতিহাস। তার সঙ্গে দেশের ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া একটা বড় কাজ। অথচ, সে বিষয়ে চেষ্টা হয়েছে খুবই সামান্য। বর্তমান গ্রন্থে সে চেষ্টা বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। গ্রন্থকারদ্বয় কেবল পুরাতন সাহিত্যের কথাই বলেননি, নতুন সাহিত্যেরও কয়েকখানি স্থায়ী গ্রন্থের কথাবস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি সম্ভবতঃ বালকবালিকাদের মনে মূলগ্রন্থ পাঠের আকাঙ্ক্ষা জাগাবে ; তা'রা ক্রমশঃ দেশীয় সাহিত্যের ক্লাসিক বা সনাতন রচনাবলীর স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হবে। এ বইয়ে প্রাচীন যুগ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে মনসামঙ্গল, চৈতন্য চরিত, চণ্ডীমঙ্গল, ভাগবত ও পদাবলী, পূর্ববঙ্গ গীতিকা আর অন্নদামঙ্গল ; এবং আধুনিক যুগ থেকে নির্বাচিত হয়েছে—আলালের ঘরের দুলাল, নীলদর্পণ, মেঘনাদবধ, আনন্দমঠ, বিষাদসিন্ধু আর রাজর্ষি।

গ্রন্থবাণী : শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬২। সম্পাদনায় : সমীর ঘোষ, প্রিয়নাথ জানা। বাণী-নিকেতন, ২১৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ১৷০।

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি গ্রন্থানুরাগীর এবং গ্রন্থাগার কর্মীর পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। আমাদের দেশে পাঠকের এবং গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু তার সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রচেষ্টা বাড়ছে বলে মনে হয়না। অধিকাংশ পাঠক সময় কাটাবার উপায় মাত্র খোঁজেন আর অধিকাংশ গ্রন্থাগার সে উপায়ের সন্ধান দেয় মাত্র। এ অবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। পাঠক সমাজ আরও জ্ঞানানুরাগী হউন, এবং গ্রন্থাগার তাঁদের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করুক।

আলোচ্য পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের। তা ছাড়া লিখেছেন শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সরোজ আচার্য, মীনেন্দ্র নাথ বসু, নীহার রঞ্জন রায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিদেশের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত তথ্যও এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'গ্রন্থতালিকা', 'প্রবন্ধ সূচী', 'চলতি সাময়িক পত্র' প্রভৃতি অভিনিবেশযোগ্য তথ্যপূর্ণ।

রাওয়ালা : গোপালক মজুমদার। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩৸০।

আজকাল সামাজিক উপন্যাস লেখাই রীতি। ইদানীং দু'একজন অতীত কাল থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করলেও প্রায়ই সাধারণ সমাজ-জীবনের ছবি আঁকছেন। রাজারাজড়ার কাহিনী তাঁদের রাজত্বের মতই বিলুপ্তপ্রায়। এসময়ে গ্রন্থকার রাজপুত বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করে স্বাধীন রুচির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আখ্যানবিন্যাস ও বর্ণনাভঙ্গী ঐতিহ্যকর। রচনায় একখানি বিদেশী উপন্যাসের প্রভাব আছে, সেকথা তিনি গোড়াতেই স্বীকার করেছেন।

রাজনারায়ণ বসু : শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৬। মূল্য ১৲।

এখানি সাহিত্য সাধক চরিত্রমালার ৪৯-সংখ্যক গ্রন্থ। কিছুদিন পূর্বে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বোঝা যায়, পাঠক সমাজ গ্রন্থখানির সমাদর করেছেন।

উনিশ শতকে যে সকল বাঙালী মনীষী সাহিত্যে, সমাজে, ধর্মে, রাজনীতিতে নবযুগের সূচনা করে গেছেন, রাজনারায়ণ তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে এই স্বল্পিকয় পুরুষের চরিত্র-চিত্র এঁকেছেন।

জাতির নবজাগরণের প্রামাণ্য ইতিহাস-রচয়িতা যোগেশচন্দ্র এই মনস্বী পুরুষের সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যসমৃদ্ধ জীবন বৃত্তান্তখানি রচনা করে' বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। যে আদর্শবাদ বিগত শতকের শিক্ষিত সমাজকে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, মনে হয়, তার প্রভাব আমাদের মনে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, পূর্বগামী চিন্তানায়ক ও কর্মবীরদের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয়ও আমাদের অনেকেরই নেই। এই পরিচয়-সাধনের ভার নিয়েছেন গ্রন্থকার। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতই এগ্রন্থেও শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন পরিস্ফুট। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হোক্। সমাজের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের যেন আমরা চিনতে পারি এবং তাঁদের আদর্শনিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হই।

—বী

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চিনির উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

চিনির চলতি মরশুমে অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে চিনির উৎপাদন পূর্ববর্তী যে কোন বৎসরের উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশী হবে বলে আশা করা যায়। সর্বশেষ অনুমান অনুযায়ী এই সালের চিনির উৎপাদনের পরিমান হবে মোট ২৭ লক্ষ টন। ১৯৫৪-৫৫ সালে চিনির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৪·৯ লক্ষ টন, অর্থাৎ ঐ সালের উৎপাদনের তুলনায় চলতি মরশুমে শতকরা প্রায় ৭ ভাগ উৎপাদন বেড়েছে। চিনির কারখানায় যে সকল আখ সরবরাহ করা হয়েছে তা যদি আরও একটু উন্নত ধরনের হত তা হলে চিনির উৎপাদন আরও বেড়ে যেত। বস্তুতঃ পক্ষে আখের রকমে এসারে পরিষ্কার অবনতি ঘটে। আখ থেকে চিনি সংগ্রহের পরিমাণও এই মরশুমে ছিল পূর্বের বছর অপেক্ষা কম। সর্বভারতের হিসাবে এই সালে আখ থেকে চিনি সংগ্রহের পরিমাণ ছিল মাত্র শতকরা ৯·৪৭ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৯·৯৩ ভাগ। চলতি সালে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ কারখানায় আখের সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি। ১৯৫৪-৫৫ সালে কারখানায় ১৬০ লক্ষ টন আখ ব্যবহৃত হয়, আর বর্তমান সালে ব্যবহৃত হয় ১৭১ লক্ষ টন। আখের সরবরাহ বৃদ্ধির কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ এবছরের আখের উৎপাদন বেশী হয়েছে, মোট উৎপাদনের পরিমান ছিল ৫০৭ লক্ষ টন। দ্বিতীয়তঃ গুড়ের মূল্য গত বছরের মত নিম্ন স্তরে ছিল—গড়ে ১০—১১ টাকা মণ যেখানে ১৯৩৩-৩৪ সালে গুড়ের মূল্য গড়ে ২০·২২ টাকা ছিল। ফলে চাষীরা আখকে গুড়ে পরিণত করার চেয়ে মিলে আখ বিক্রী করাই লাভ জনক মনে করেছে।

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রধানতঃ বিহার, হায়দরাবাদ, মধ্যভারত ও বোম্বাই প্রদেশে। বিহারে গত বছরের উৎপাদনের পরিমাণ থেকে ৯১,০০০ টন চিনি বেশী উৎপাদিত হয়েছে। হায়দরাবাদ ও মধ্যভারতে ১৬০০০ টন করে এবং বোম্বাইয়ে ১৫০০০ টন চিনি বেশী উৎপাদিত হয়েছে। অবশ্য উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর ও পেপসুতে আবার চিনির উৎপাদন কিছু হ্রাসও পেয়েছে।

ভারতের মোট ১৯০টি চিনির কলের মধ্যে চলতি মরশুমে ১৩৭টি কল কাজ করেছে। গত বছরে চালু কলের পরিমাণ ছিল ১৬০টি। সমগ্র দেশের হিসাবে ১৯৫৫-৫৬ মরশুমে আখ পেষনের কালও গত মরশুম থেকে দীর্ঘ স্থায়ী হবে বলে আশা করা যায়। সর্বভারতীয় গড় এই মরশুমে ১৩০ দিন ধরা হয়েছে কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ মরশুমে গড় ছিল ১২৯ দিন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক বাণিজ্য

কিছুদিন পূর্বে আমদানী ও রপ্তানী উপদেষ্টা পরিষদ-দ্বয়ের বৈঠকে শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী ও শ্রী ডি, পি, কারমারকার যে ভাষণ দেন তা থেকে একটা জিনিষ খুব পরিষ্কার হয়েছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানী বৃদ্ধির ও আমদানী যথাসম্ভব হ্রাস করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। এর অন্যতম কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সামগ্রিক অর্থ বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি পেলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন

অতি মাত্রায় অনুভূত হবে। ভারতের বৈদেশিক লেন-দেনের অনুমিত ঘাটতির পরিমাণ সুবৃহৎ—চলতি খাতে ১১২০ কোটি টাকা এবং শ্রীকৃষ্ণমাচারীর মতে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। এই লেনদেনের ব্যাপারটি মুদ্রা-স্ফীতির সঙ্গে খুব জড়িত এবং টাকার মত ইচ্ছা করলেই কোন দেশ ডলার কিংবা ষ্টার্লিং উৎপাদন করতে পারে না। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের জন্য সর্ব-প্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন এ ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন কিন্তু ঘাটতি পূরণের কোন পরিষ্কার উপায়ের সন্ধান দিতে সক্ষম হন নি।

ভারতের যে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা নেই তা অনস্বীকার্য। অপর পক্ষে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করবার মত কোন কৃষিজ কিংবা শিল্পজাত পণ্যও নেই যা দিয়ে কল-কব্জা, খাদ্য ও অন্যান্য কাঁচামাল আনবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানীর জন্যও যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে সে প্রশ্নটিও খুব সহজ হবে না।

আমদানী নীতি খুব সুচিন্তিত হলে চলতি খাতের বাণিজ্যের ঘাটতি হয়ত কিছু হ্রাস করা সম্ভব হবে। আমদানী নীতির থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রপ্তানী বৃদ্ধির প্রশ্ন। পরিকল্পনায় সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সমাধানের কোন পরিষ্কার উপায় নির্ধারণ করা হয় নি বলে শ্রীকৃষ্ণমাচারী মন্তব্য করেছেন। তবে একটা ভাল কাজ পরিকল্পনা করেছে, তা হচ্ছে এই যে "আমাদের আশা-আকাঙ্খা, আমাদের প্রয়োজন এবং তা পূরণের জন্য কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে তার একটি পরিষ্কার ছবি এ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।" এই ছবি থেকেই ঘাটতির ব্যাপারটি পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়ে এবং তা পূরণের জন্য রপ্তানী বাণিজ্যের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থার উপরও অনেকটা নির্ভর করে। কেবল মাত্র রপ্তানী উপযোগী পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই রপ্তানী বাণিজ্যে উন্নতি হবে না, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে জিনিষ সরবরাহ করতে সক্ষম হওয়া চাই। দেশের আভ্যন্তরীন রাজস্বনীতির উপরও রপ্তানীবাণিজ্য যথেষ্ট নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রীর যুক্তিটি মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। তাঁর মতে দেশের রাজস্বনীতির দরুণ যদি দ্রব্যের আভ্যন্তরীন কাটতি কমে যায় তা হলে রপ্তানীবাণিজ্যে উন্নতি হবে। এ নীতিটি কোন বিচক্ষণ লোকই সমর্থন করবেন না। দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে, দেশের লোকের ক্রয় ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে, জন সাধারণকে আরও দুর্গতির মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে রপ্তানী বৃদ্ধির কি অর্থ হোতে পারে তা দুর্বোধ্য। তবে ভরসার কথা এই যে শ্রীকৃষ্ণমাচারী পরিশেষে মন্তব্য করেছেন যে কাজটি মোটেই সহজ নয় এবং এ বিষয়ে কোন উন্নতি সাধন করবার আগে আরও বহু কাজ করবার প্রয়োজন আছে এবং কোন পরিকল্পিত অর্থনীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বাদ দেওয়া চলে না।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যসংস্থা স্থাপন

দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গত ১৮ই মে ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন বা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়। এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। সম্প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধনের শেয়ার বিলীকৃত হয়েছে এবং তার সম্পূর্ণ ই কেন্দ্রীয় সরকার ক্রয় করেছেন।

দেশের বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কে এই সংস্থা যখন যেমন নীতি অবলম্বন করবে সেই অনুযায়ী রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্যকে পরিচালনা করা হবে। এর জন্য ভারতের অভ্যন্তর ও ভারতের বাইরে থেকে কর্পোরেশন বিবিধ পণ্য ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় কাজ করবে। এই সংস্থার কার্য পরিচালনা করবার ভার একটি বোর্ড অব্ ডিরেক্টর্সের উপর ন্যস্ত হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব শ্রী কে, বি, লাল্, আই, সি, এস ও শ্রীসতীশ চন্দ্র, আই, সি, এস, যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন।

আমদানী ও রপ্তানী উপদেষ্টা পরিষদ্-বর্ষের গত বৈঠকে

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যসংস্থা আলোচনার একটি বিশেষ বস্তু হয়েছিল। সংস্থার কার্যাবলীতে বে-সরকারী বাণিজ্য মহল কিরূপ অস্বস্তি বোধ করবে তার উল্লেখ করে কতিপয় সভ্য মতামত প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণমাচারী ও শ্রী কারনারকীর বাণিজ্য মহলের শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই বলে আশ্বাস দিয়েছেন। বাণিজ্য সংস্থার কার্যবিধির পরিধির কোন সংজ্ঞা নির্দেশ না করলেও শ্রীকৃষ্ণমাচারী বে-সরকারী মহলকে বাণিজ্যসংস্থা সম্পর্কে সহনশীলতার পরিচয় দিতে অনুরোধ জানান।

ভারতের জাতীয় আয়

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার তৃতীয়বার্ষিকী পত্রিকায় ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতের জাতীয় আয় ১৯৪৮-৪৯ সালের দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী ১০,১৭০ কোটি টাকা বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৫৩-৫৪, ১৯৫২-৫৩ এবং ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের জাতীয় আয় যথাক্রমে ১০,০৪০ কোটি টাকা, ৯,৪৬০ কোটি টাকা এবং ৯,১০০ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের জাতীয় আয় ১০,০০০ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা হয়েছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতের জাতীয় আয় ১০,১৭০ কোটি টাকা হওয়ায় পরিকল্পনার লক্ষ্য থেকে ১৭০ কোটি টাকা বেশী জাতীয় আয় হয়েছে, কিন্তু পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এ বছর জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমে গিয়েছে। এর একমাত্র প্রধান কারণ কৃষির উৎপাদনে অবনতি। মাথা পিছু জাতীয় আয় অবশ্য পূর্ববর্তী বৎসরের সমানই আছে অর্থাৎ ২৬৯ টাকা। কিন্তু বর্তমান বাজারের দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী বিচার করলে ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতের মাথা পিছু জাতীয় আয় মাত্র ২৬২·১ টাকা ছিল এবং এই হিসাবে ১৯৫৩-৫৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৮১ টাকা। তবে গত ৭ বছরের জাতীয় আয় এক সঙ্গে বিচার করলে ১৯৫৪-৫৫ সালে মাথা পিছু প্রকৃত আয় শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

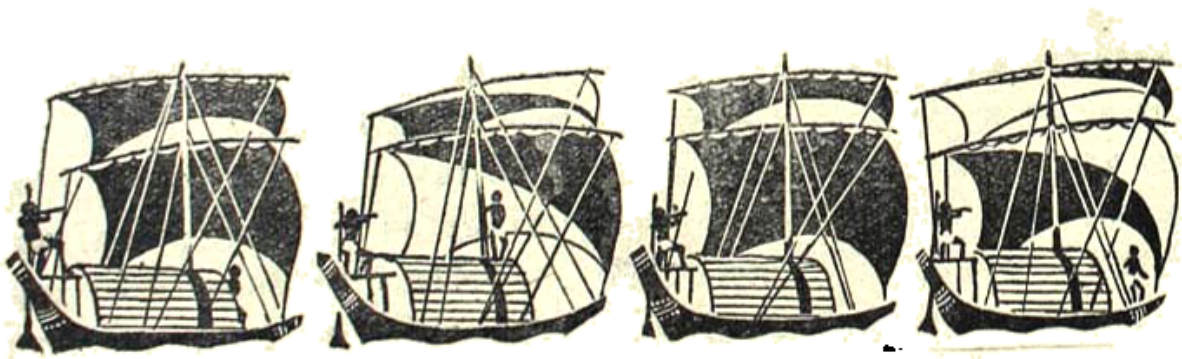

বুদ্ধজয়ন্তী

গত বৈশাখী পূর্ণিমায় ভারতের সর্বত্র বুদ্ধদেবের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে। তাঁর পরিনির্বাণেরও ঐ একই তিথি।

হিংসা-বিদ্বেষ জর্জরিত পৃথিবী আজ শান্তির পথ খুঁজছে। ভগবান্ বুদ্ধের করুণা ও মৈত্রীর আদর্শই শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষ পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছে সেই আদর্শকে। বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে এসেছিলেন দেশ-দেশান্তর থেকে ভক্ত-মণ্ডলী—চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি। ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক বুদ্ধদেবের মধ্য দিয়ে একদিন বিভিন্ন জাতির যে মহামিলনের সূচনা হয়েছিল, আড়াই হাজার বছর পরেও তার প্রভাব অনুভব করছে আজ সমগ্র মানব-সমাজ। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যে 'পঞ্চশীল' আজ মর্যাদা লাভ করেছে তাও বুদ্ধ-বাণীরই নবরূপ। তাঁর মহিমার পুণ্য আলোকে আলোকিত হোক্ সমগ্র মানবের অন্তর। লোভ, হিংসা, জড়তা অপসৃত হোক্ প্রভাত কিরণে অন্ধকারের মত।

বঙ্গবিহার :

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী বঙ্গবিহারের সীমানা নির্ধারণের আয়োজন হচ্ছে। এ নিয়ে বঙ্গে ও বিহারে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল; আপাততঃ সে উত্তেজনা প্রশমিত হোক, বাঙালী ও বিহারী সম্প্রীতি রক্ষা করে চলুক এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্যে রূপায়িত হোক; মাটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই কোনও উন্নতিশীল জাতির লক্ষণ নয়।

কলকাতার হাসপাতাল :

রোগী এবং তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা একান্ত বিশ্বাসে রোগীর জীবন-রক্ষার ভার সঁপে যেন চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীর উপর। রুগ্নকে সুস্থ করবার, মুমূর্ষুকে বাঁচাবার ব্রত নিয়েছেন তাঁরা, তাই শ্রদ্ধেয়, নির্ভর-যোগ্য তাঁরা।

কিন্তু কিছুকাল ধরে কলকাতার হাসপাতালগুলিতে জীবন নিয়ে যে ছিনিমিনি চলছে, তা অক্ষমতার ও হৃদয়হীনতার চূড়ান্ত নিদর্শন এবং জাতির কলঙ্কস্বরূপ।

অস্ত্রোপচারকালে অসতর্কতা, শয্যা থেকে রোগীর অন্তর্ধান ও আত্মহত্যা—এ সবের খবর অল্পদিন পূর্বে আমরা পেয়েছি। সম্প্রতি মেডিকাল কলেজের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে কর্তৃপক্ষের অবহেলায় জনৈক রোগীর মৃত্যুর যে সংবাদ করোনারের রায়ে প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা নেই। রোগী কি করে হাসপাতালে ভর্তি হ'লো তা নাকি কর্তৃপক্ষ জানেন না, কাজেই কি ক'রে মারা গেল, তা আর কি ক'রে জানবেন?

রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, হাসপাতালে স্থানাভাব, উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার ও নার্সের অভাব, কর্মচারীদের বেতনে অল্পতা ইত্যাদি নানা কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন না। তাঁরা জনসাধারণকে একথা জানিয়েছেন। কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক নয়, কিন্তু সহানুভূতি ও কর্তব্যবোধের অভাব যে বহু দুর্ব্যবহার ও দুর্ঘটনার মূলে আছে তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় চিকিৎসক-সমিতির প্রতিনিধিবর্গ তাঁদের তদন্তের পর যে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তাতে জনসাধারণের অভি-যোগকে অনেকাংশে সত্য বলে' মেনে নিয়েছেন।

শহরবাসী অনেককেই কখনও না কখনও হাসপাতালের শরণাপন্ন হতে হয়। রোগী ভর্তি করা কি কঠিন ব্যাপার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা জানেন। পরিবর্তে বেতনের অল্পতা সম্বন্ধে যিনি যাই বলুন, বেশী মাইনে পেলে সহসা তাঁর করুণার আবির্ভাব হবে, 'আর কম মাইনে পেলে তিনি পরের প্রাণকে প্রাণ বলে ভাববেন না, এ-জাতীয় উক্তির অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না।

শুধু রোগী ভর্তি করাই দুঃসাধ্য নয়, আউটডোরে রোগী দেখানোতেও হয়রানির অন্ত নেই। একটা তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার ভাব সর্বত্র প্রকট। এর প্রতিকার কি অসম্ভব ?

একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বড় বড় হাসপাতালগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধপত্র গুপ্তপথে চলে যাচ্ছে বাইরের দোকানে আর জাল-ওষুধ তৈরির গোপন কারখানায়। রোগীদের শয্যাসামগ্রীও নাকি বাইরে বিক্রী হচ্ছে। উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও শাসন থাকলে এ সব কি সম্ভব ? কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য অথবা প্রশ্রয় কি এর মূলে নেই ?

ইতঃপূর্বে আর একটি খবর কাগজে বেরিয়েছিল। হাসপাতালের ব্লাড্ ব্যাঙ্কের আশে পাশেই দুরভিসন্ধিপরায়ণ লোকেরা নিষ্ঠুরভাবে রক্ত নেওয়া-দেওয়ার ব্যবসা করে। জনসাধারণ এক্ষেত্রেও হাসপাতাল-কর্মচারীদের সঙ্গে এদের যোগসাজস অনুমান করবে।

মেডিকাল কলেজ কলকাতার প্রধান চিকিৎসা কেন্দ্র। একে গ্লানিমুক্ত করবার সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বনীয়। রোগী ও তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা সবাই যেন অনুভব করতে পারেন যে, এটা আশঙ্কার নয়, আশার স্থল, আশ্বাসের স্থল।

ভ্রম-সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখকের নাম অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

আগামী ২৩শে জুলাই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের জন্ম-শতবার্ষিকী ভারতের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হবে। "স্বরাজ আমাদের, জন্মগত অধিকার" তাঁর এই বাণী জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে। এই মহামানবের উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

CENTRAL LIBRARY

মন্দিরা

উনবিংশ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৬৩ | তৃতীয় সংখ্যা

মতিলাল শীল

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়ে এক সভার অধিবেশন হইয়াছে। সে সভায় কলিকাতার হিন্দু সমাজের গুণী ও ধনী ব্যক্তিরা সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দু সমাজের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য সে সভা আহ্বান করিয়াছেন। সভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন—রাজা রাধাকান্ত দেব। তাঁহার বিদ্যানুরাগের ও বিদ্যাবিস্তারের জন্য আগ্রহের খ্যাতি তখন সমগ্র সমাজে আদৃত। আলোচ্য বিষয়—কলিকাতায় হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। সে কার্য্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে মতভেদ নাই। হিন্দু কলেজের শিক্ষা বাঙ্গালার এক সময়ের তরুণদিগকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়াছিল—তাঁহারা হিন্দুর সংস্কার মাত্রই কুসংস্কার জ্ঞানে কেবল অবজ্ঞা নহে—ঘৃণাও করিতে থাকেন। তাহার পরে কলিকাতায় নানাস্থানে খৃষ্টধর্ম্মযাজকরা বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সে সকল বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহার ফলে হিন্দু ছাত্রদিগের স্বধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা শিথিলমূল হইতেছে—তাহারা "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" ভুলিয়া পরধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছে। এই অবস্থায় সমাজের যে অপকারের আশঙ্কা অনিবার্য্য হইতেছে তাহার প্রতীকার জন্য উপায় নির্দ্ধারিত হইবে। আলোচনায় স্থির হইল—হিন্দু বিদ্যার্থীদিগের জন্য কলিকাতায় কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় হিন্দুদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছাত্রদিগকে স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে উপস্থিত সকলে একমত হইলেন। তখন সেই সৎকার্য্যে কে কত টাকা চাঁদা দিবেন, তাহার প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময় আসিল। কে কত টাকা দিবেন, তাহা লিখিয়া স্বাক্ষর দিবার জন্য খাতা বাহির করা হইল। তখন কে প্রথমে স্বাক্ষর দিবেন, তাহার জন্য এক জন অন্যকে প্রথমে স্বাক্ষর দিতে বলিতে লাগিলেন। অর্থ দিতে কাহারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু যিনি প্রথমে স্বাক্ষর দিবেন, পরবর্ত্তীরা যদি তাঁহার প্রতিশ্রুত টাকার অপেক্ষা অধিক টাকা দেন—তবে ত তিনি অপমানিত হইবেন—এই আশঙ্কাই সকলের মনে প্রবল হইল। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া সভার আহ্বায়কদিগের মধ্যে এক জন বিরক্তি অনুভব করিলেন। তিনি ব্যবসায়ী—কাজে ইতস্ততঃ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; যাহা করণীয় তাহা করিতে বিলম্ব করা তাঁহার ধাতুসহ নহে। তিনি খাতাখানি চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"আপনারা ইতস্ততঃ করিতেছেন।

কে কি দিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। আমি সাধারণ ব্যবসায়ী—আমিই প্রথমে স্বাক্ষর দিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি খাতায় আপনার নামে লিখিয়া—অর্থের পরিমাণ লিখিবার সময় ১ লিখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং একের পশ্চাতে একে একে ৫টি শূন্য দিলেন—এক লক্ষ টাকা। সভাস্থ ধনীরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন—দাতার প্রশংসায় তাঁহাদিগের মন পূর্ণ হইল। স্বাক্ষরকারী—কলিকাতার অন্যতম প্রধান ধনী ব্যবসায়ী—মতিলাল শীল। সভা শেষ হইল। মতিলাল শীলের প্রদত্ত সেই অর্থে যে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল—তাহাই ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত "শীলস ফ্রী কলেজ" নামে পরিচিত অবৈতনিক স্কুল। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই বিরাট দান করিয়া মতিলাল কেবল যে উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করেন, তাহাই নহে—এ দেশের হিন্দুদিগের বিদ্যাদানের পুরাতন আদর্শ রক্ষা করেন—বিদ্যা বিক্রয় করা সঙ্গত নহে, তাহা দান করিতে হয়—শ্রদ্ধা সহকারে দান করিতে হয়। এইরূপ কার্য্যে আর এক জন বাঙ্গালী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল—বারাণসীতে ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী ও পারসী শিক্ষাদানের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উভয়ের প্রভেদ—জয়নারায়ণ ধনীর সন্তান, পৈত্রিক অর্থের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; মতিলাল দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া ধনী হইয়াছিলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মতিলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা চৈতন্যচরণ শীল অতি সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। কলিকাতা চীনাবাজারে তাঁহার একখানি ছোট কাপড়ের দোকান ছিল। ব্যবসার জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল না—তাঁহার খ্যাতির কারণ, তিনি চাতুর্য্য দেখাইয়া মোহন নামক ডাকাইতকে ধরিয়াছিলেন। মোহনের দৌরাত্ম্যে লোকের রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। চৈতন্যচরণ তাহাকে ধৃত করেন।

মতিলালের আভিজাত্যগৌরব করিবার কিছুই ছিল না। গল্প আছে, য়ুরোপের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ বিথোভেনকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার নামের "ভেন" কি তাঁহার বংশের আভিজাত্যদ্যোতক? তিনি তাহাতে স্বীয় বক্ষে ও মস্তকে আঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "না আমার আভিজাত্য এই দুই স্থানে।" মতিলালও তেমনই বলিতে পারিতেন, তাঁহার আভিজাত্য তাঁহার কার্য্যে—কার্য্যের অসাধারণ সাফল্যে।

মতিলাল পল্লীর পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া মার্টিন বৌল নামক একজন ফিরিঙ্গীর বিদ্যালয়ে সামান্য ইংরেজী শিক্ষা করেন। তখন কলিকাতার নানা অংশে ফিরিঙ্গীরা এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া অন্নার্জ্জন করিতেন। তাহার পরে তিনি নবস্থাপিত একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। তাঁহার হস্তাক্ষর (বাঙ্গালা ও ইংরেজী) সুন্দর ছিল এবং অঙ্ক তাঁহাকে আকৃষ্ট করিত। তখন সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উচ্চ ছিল না। বিদ্যালয়ে মতিলাল যে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা যৎসামান্য। পরে শিক্ষিত বাঙ্গালী ও ইংরাজদিগের সহিত মিশিয়া তিনি ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন।

বালক মতিলাল ভাল গান গাহিতে পারিতেন, কোন কোন বাদ্য যন্ত্র বাজাইতেও পারিতেন—লোকের অনুকরণ করিতে পারিতেন এবং সখের "কবি"র দলে যোগ দিতেন। বাল্যে তিনি উত্তরকালের ব্যবসাবুদ্ধির কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই—তাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ছিল।

এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অভিভাবকের অভাবে তাঁহার পক্ষে উপযুক্তভাবে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয় এবং তিনি অলস জীবন যাপন করায় অল্পদিনের মধ্যেই পিতা যে সামান্য অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা শেষ হইয়া আইসে; কারণ চালিতে চালিতে কলসের জল শেষ হইয়া যায়।

এদিকে তাঁহার সম্প্রদায়ের বীরচাঁদ শীল "প্রজায় মানে না তবু আপনি মণ্ডল" হইয়া তাঁহার অভিভাবকত্ব করিয়া মোহনচাঁদ নামক এক ব্যক্তির বালিকা কন্যার সহিত মতিলালের বিবাহ দেন। অল্পদিন পরে মোহনচাঁদ বাবু সপরিবারে তীর্থযাত্রা করেন এবং জামাতা মতিলালকে সঙ্গে লইয়া যায়েন। সতের বৎসর বয়সে মতিলালের বিবাহ হয়। তখনও এ দেশে রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তীর্থযাত্রীরা নৌকায় তিন মাসে বারাণসীতে উপনীত হইয়া, তথায় কয় দিন অবস্থানের পরে বৃন্দাবনে গমন করেন। এই পর্য্যটনে

মতিলালের নানা স্থান, ঐ সকল স্থানের অধিবাসী ও ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের যে সুবিধা হয়, পরে তিনি তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়াও মতিলাল কোন কাজে উৎসাহ দেখাইতে পারিলেন না। কিন্তু অর্থের অভাব অনুভূত হওয়ায় তাঁহাকে কাজের সন্ধান করিতে হইল। ঘটনাচক্রে কলিকাতায় দুর্গের কয় জন কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল এবং তিনি তাঁহাদিগের নির্দ্দেশানুসারে কিছু কিছু জিনিস সরবরাহ করিয়া সামান্য অর্থার্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হইল; মতিলাল বালীতে কুৎবরে দারোগার কাজ পাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিককাল সে চাকরী করিতে হইল না। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার ধনী পিতৃব্য গৌরমোহন শীলের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যা পিতার সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময় দুইটি নাবালক পুত্র লইয়া তিনি বিধবা হইলে মতিলালকে তাঁহার স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির পরিদর্শন ও পরিচালন ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মতিলাল সেই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবের দায়িত্ব বিবেচনা করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন; কেবল, এক বিষয়ে ভগিনীর অনুমতি গ্রহণ করিলেন—ভগিনীর অর্থের কিছু লইয়া তিনি ব্যবসা করিবেন—তাহার লাভ ও লোকসান তাঁহার হইবে। ভগিনী সে প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে মতিলাল নিজদায়িত্বে ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রথমে তাহাতে লাভ না হইয়া ক্ষতি হইল। ব্যবসায়ে মতিলালের আস্থা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইল না। ক্ষতি তাঁহার পক্ষে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভবিষ্যতে সতর্ক হইবার শিক্ষার কারণ হইল। তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তখন কলিকাতার বাজারে খালি বোতলের ও ছিপির চাহিদা অত্যন্ত অধিক। কেরী তাঁহার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কথায় (The Good Old Days of Honorable John Company) লিখিয়াছেন:—

"Bottles seem to have been rather scarce in Calcutta in 1807, for Messrs. Tulloh and Co. advertise that they will pay five sicca rupees per dozen for empty English bottles, and four for French ones."

কলিকাতায় য়ুরোপীয়রা তখন অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন; মদ্য পিপায় আসিত—এ দেশে তাহা বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করা হইত। এ দেশে তখনও কাচের কারখানা ছিল না বলিলেই হয় কাজেই বিদেশী শিশি বোতলই ব্যবহার করিতে হইত। মতিলাল কোন ব্যবসা "ছোট" বলিয়া ঘৃণা করিতেন না; তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল—

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই;
পেলেও পাইতে পার—অমূল্য রতন।"

বাস্তবিক এই শিশি বোতলের ব্যবসাই মতিলালের ভাগ্যোদয়ের প্রথম সোপান। ইহার লাভে তিনি ভগিনীর নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিয়া নূতন নূতন ব্যবসার জন্য আবশ্যক মূলধন সঞ্চয় করেন। গল্প আছে, একবার তিনি কোন মদ্যপান নিবারণী সভায় বক্তৃতা করিলে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একজন ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এ কি! খোদায় ধনী হইয়া শেষে বিরাগ!"

ব্যবসাবুদ্ধি মতিলালের ধাতুগত ছিল। তিনি তীর্থযাত্রায় নানা স্থানের লোকের উৎপন্ন পণ্যের ও প্রয়োজনের বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বাজারের অবস্থা, পণ্যের মূল্য ও চাহিদা এমন নৈপুণ্য সহকারে বিবেচনা করিতেন যে, ব্যবসায়ীদিগের নিকট তাঁহার মতের মূল্য অত্যন্ত অধিক হয়।

কলিকাতার কেল্লায় কিছু কিছু মাল সরবরাহের সময় তিনি বিদেশ হইতে মাল আমদানীকারী কোন কোন জাহাজের অধ্যক্ষের মাল বিক্রয়ে ও তাঁহাদিগের জন্য রপ্তানী মাল ক্রয়ে সাহায্য করিতেন। তখন য়ুরোপীয়রা এ দেশের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন। তাঁহারা সরাসরি মাল বিক্রয় করিতে—বিশেষ খুচরা বিক্রয় করিতে, সাহস করিতেন না। সেইজন্য "বেনিয়ান" অর্থাৎ মুৎসুদ্দি নিয়োগ আরম্ভ হয়—মাল ক্রয়-বিক্রয় মুৎসুদ্দির মাধ্যমে হইত—টাকা আদানের ও প্রদানের দায়িত্ব মুৎসুদ্দির থাকিত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে —কলিকাতায় "ষ্ট্র্যাণ্ড ষ্টীমওয়ার মিলের"—ময়দা কলের প্রতিষ্ঠাতা উদ্যমশীল ব্যবসায়ী স্কিনসন প্রথম মতিলালকে মুৎসুদ্দি মনোনীত করেন। ইহাতেই বুঝা যায়, তখন মতিলালের আবশ্যক মূলধন সঞ্চিত হইয়াছে এবং তিনি ব্যবসায়ীমহলে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই সময়েও

তিনি বিদেশ হইতে মাল আমদানীকারী তাহাদের ব্যবসায়ীদিগের জন্য মাল বিক্রয় ও মাল ক্রয় করিয়া লাভবান হইতেছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ও চীনে ব্যবসা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মতিলালের এই কাজ ছিল।

মতিলাল, ছোট ব্যবসা আরম্ভ করিয়া এবং লোকসান দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়া সাফল্য লাভ করেন। লোকসানে তিনি কখনও নিরাশ হয়েন নাই, সাহস ও আশা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, তিনি ব্যবসা করিয়া ধনী হইবেন এবং ধনী হইয়া বিলাসে অর্থ নষ্ট না করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেন। এমন কি পূজার্চনাতেও তিনি মনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার ব্যবসাবুদ্ধির জন্য বহু য়ুরোপীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে মুৎসুদ্দি অথবা পরামর্শদাতা করিয়াছিলেন—

পীচ, কেটেলওয়েল
লিণ্ডিংষ্টোন, ডিস্ব্রোয়্যান কোম্পানী
ম্যাকলিয়ড, কেগান কোম্পানী
চ্যাপম্যান কোম্পানী
টাল্লো কোম্পানী
বার্লী, মাস্তরোজানী
ওলওয়ার্ড, সীল কোম্পানী
কেলসন কোম্পানী

তিনি যখন কেলসন কোম্পানীর মুৎসুদ্দি তখন রামগোপাল ঘোষ তাহাতে চাকরী করেন। মতিলাল তাঁহার কাজ দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, রামগোপাল ব্যবসা জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন। ইহাতেই বুঝা যায় "নূতনে নূতন চিনে।"

তখন এ দেশে প্রচুর পরিমাণে নীল প্রস্তুত হইত এবং বিদেশে রপ্তানী হইত। নীলের ব্যবসা এ দেশে অন্যতম প্রধান ব্যবসা ছিল। মতিলাল মুর হিকী কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এ দেশে প্রথম নীলের হাট অর্থাৎ বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নীল, চিনি, চাউল ও সোরাসম্বন্ধে এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন যে, একবার কোন য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য "বাজি রাখেন"—মতিলালকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল স্পর্শ করিয়া নীলের স্বরূপ বলিতে হইবে। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপস্থাপিত নীল চটকাইয়া তাহা কোন শ্রেণীর ও তাহার মূল্য কত হওয়া উচিত তাহা বলিয়া দিয়া বাজি জিতিয়াছিলেন।

তাঁহার অভ্যাস ছিল, দিনের কাজ শেষ করিয়া তিনি পালঙ্কে শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতেন—ভৃত্য প্রভুর গাত্র মর্দ্দন করিত। সেই সময় সেদিনের "সওদা" চাউল, চিনি ও সোরার নমুনা সানকিতে লইয়া আসা হইত। তিনি সেই অবস্থায় কেবল স্পর্শ দ্বারা প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য কি হইলে লাভজনক হইবে তাহা বলিয়া দিতেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার অনুমান অভ্রান্ত হইত।

একবার কোন য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এ দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ চিনি কিনিয়া পাঠাইবার জন্য যে নির্দ্দেশ দেন তাহাতে সর্ত্ত ছিল—চিনি ক্রয় করা মতিলাল শীলের অনুমোদনসাপেক্ষ। যে কোম্পানীকে চিনি কিনিতে বলা হয়, মতিলালই সে কোম্পানীর মুৎসুদ্দি। কোম্পানীর মালিকরা চিনি কিনিয়া "কমিশনে" লাভ করিতে ব্যস্ত হইলেও মতিলাল কিন্তু—নানা দেশে মজুত চিনির পরিমাণ, তিন মাসে অন্যান্য স্থান হইতে ইংলণ্ডে কত চিনি রপ্তানী হওয়া সম্ভব—ইংলণ্ডে তখন দর কিরূপ হইতে পারে, এই সব বিবেচনা করিয়া চিনি কিনিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। কোম্পানীর মালিকরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেও কার্য্যকালে দেখা যায়—মতিলালের অনুমানই সত্য এবং তিনি চিনি কিনিতে না দেওয়ায়, য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী অনেক লোকসান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

ব্যবসা ব্যাপারে মতিলাল সর্ব্বতোভাবে সাধু ছিলেন—কোনরূপ অসৎ উপায় অবলম্বন করিতেন না। তিনি যখন টাল্লো কোম্পানীর মুৎসুদ্দি তখন একবার ঐ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়; কিন্তু কোন বন্ধু তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিলে মতিলাল উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ নহেন; কিন্তু নিয়মানুসারে সে সময়েও তাহাতে টাকা যোগান তাঁহার কর্ত্তব্য।

বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুৎসুদ্দি হইয়া মতিলাল মফঃস্বলে গঞ্জে অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্রে আড়ৎ প্রতিষ্ঠা করেন; কারণ, সর্ব্বনিম্ন মূল্যে মাল কিনিয়া যথাসম্ভব অধিক মূল্যে তাহা বিক্রয় করাই ব্যবসায়ে লাভের মূল-সূত্র। এইরূপে মফঃস্বলে আড়ৎ প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল। তিনি সোরা কিনিবার জন্য ছাপরায়, চিনি কিনিবার জন্য গাজীপুরে, রেশম কিনিবার জন্য রামপুর বোয়ালিয়ায় এবং অন্য নানা পণ্য কিনিবার জন্য নানা স্থানে আড়ৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মুৎসুদ্দিরূপে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া তিনি স্বয়ং বিদেশে মাল রপ্তানী ও বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নীল, রেশম, চিনি, সোরা ও চাউল রপ্তানী করিতেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে ভারতীয় চিনির উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস করা হয়, তখন তিনি একবার পাটনায় ও গাজীপুরে প্রায় ১২ লক্ষ টাকায় চিনি প্রায় ৯ টাকা মণ দরে কিনিয়া কলিকাতায় মণপ্রতি ২।৩ টাকা লাভে বিক্রয় করেন। তিনি বিদেশ হইতে প্রধানতঃ কাপড় ও লৌহ আমদানী করিতেন। এই আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। তিনি বিদেশের সহিত বাণিজ্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণমোহন মল্লিক ইংরেজীতে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ বাঙ্গালার বাণিজ্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যে ভারতের সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইতেছে। তিনি এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। মল্লিক মহাশয় মতিলালের কর্ম্মী হইবার পূর্ব্বে ভারত সরকারের দপ্তরে চাকরী করিয়াছিলেন; সুতরাং ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিবার যে সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল, তিনি সে সকল ব্যবহার করিয়া আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুলেখক ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া 'ওয়াচ্‌ম্যান ম্যাগাজিন' পত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

অর্থার্জ্জন যেমন অধিক হইতে লাগিল, মতিলালের সেই অর্থ লাভজনক কার্য্যে প্রযুক্ত করিবার আগ্রহ তেমনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। "কোম্পানীর কাগজ" প্রভৃতিতে অর্থ আবদ্ধ রাখিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি বাণিজ্যের জন্য জাহাজ কিনিবার বা প্রস্তুত করাইবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে ১২।১৩ খানি জাহাজের অধিকারী হইলেন। সে সকল ছোট বড় জাহাজ পণ্য লইয়া চীনে য়ুরোপে যাতায়াত করিতে থাকে। এই সকলের মধ্যে একখানি কলিকাতাতেই নির্ম্মিত হয়। তিনি তখন প্রথমা কন্যার নামে সেখানির নামকরণ করিয়াছিলেন—"রাজরাণী"। তিনিই প্রথমে কলিকাতায় মালবাহী নৌকা টানিয়া লইবার জন্য ষ্টীমার ব্যবহারকারীদিগের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার এইরূপ একখানি ষ্টীমারের নাম ছিল—"হেনিম্যান।" পরে সমুদ্রে তাঁহার কতকগুলি জাহাজ ডুবিয়া যায় বটে, কিন্তু সে সকলের জন্য তিনি ক্ষতি পূরণ বাবদে যে অর্থ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

মতিলাল বিদ্যালয়ে অধিক শিক্ষালাভ না করিয়াও কার্য্যক্ষেত্রে—অর্থাৎ ব্যবসার বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যক বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আবার প্রয়োজনে এঞ্জিনিয়ারের ও স্থপতির কাজেও দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার বহু গৃহের নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে কাজে তিনি বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। তাঁহার প্রতিভা নানা দিকে আত্মপ্রকাশ করিত।

মতিলাল ব্যবসা ব্যাপারেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই নিযুক্ত থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও সাধুতা ব্যবসায়ী মতিলালকে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ব্যবসায়ী থাকিবেন মনে করিলেও ঘটনাচক্র তাঁহাকে তৎকালীন অন্যতম প্রধান জমীদার করিয়াছিল। দায়ভাগ অনুসারে বাঙ্গালায় জ্যেষ্ঠাধিকার ছিল না—সম্পত্তি বহু অংশে বিভক্ত হইয়া "চটকন্ত নাসেৎ" হইত। সরকারের খাজনা আইনের কঠোরতাও অত্যন্ত অধিক ছিল। পূর্ব্বে খাজনা বাকি পড়িলে জমিদারকে কারারুদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল; পরে নিয়ম হয়, নির্দ্দিষ্ট দিন সূর্য্যাস্তের মধ্যে দেয় খাজনা দাখিল না করিলে সম্পত্তি নিলামে বিক্রীত হইত এবং মূল্যের টাকায় খাজনা পরিশোধ করিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা সরকার রাখিতেন। জমীদারেরা সরকারী

কর্মচারীদিগের দ্বারা নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়াও প্রতীকারোপায় করিতে পারিতেন না। সময় সময় বাত্যা বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে প্রজার নিকট হইতে যথাকালে খাজনা আদায় হইত না। আবার অনেক জমীদার বিষয়কার্য্যে অমনোযোগী ও বিলাসী হইয়া অমিত-ব্যয়িতার অনিবার্য্য ফলে ঋণগ্রস্ত হইতেন। এই সকল কারণে বাঙ্গালায় জমীদারী বিক্রয় হইত—খাজনার জন্যও বটে, ঋণের জন্যও বটে। সুবিধা পাইলে মতিলাল সেরূপ স্থলে জমীদারী ক্রয় করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি জমীদারদিগকে ঋণ দিবার পরে—ঋণী তাহা পরিশোধ করিতে না পারায়, সম্পত্তি আইনানুসারে মতিলালের হইত। এইরূপে তিনি বহু ভূমি সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি নবগ্রামে যেমন বহু জমীদারীর অধিকারী হইয়াছিলেন তেমনই কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে বহু সম্পত্তি কিনিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তখন সম্পত্তির মূল্য পরবর্ত্তীকালের মূল্যের তুলনায় অল্প ছিল। ভূমি-সম্পত্তি লইয়া তাঁহাকে সময় সময় মোকর্দ্দমায় জড়িত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি অকুতোভয় ছিলেন। ডব্লিউ অ্যাকশন নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি ধর্ম্মতলা বাজার কিনিয়াছিলেন। আনন্দনারায়ণ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি নূতন বাজার বসাইবার জন্য মতিলালের বাজার হইতে বেপারী "ভাঙ্গাইয়া" লইতে থাকায় দুই পক্ষে বিবাদ ঘটে। তখন পুলিস দুর্নীতিদুষ্ট—পুলিসের নিকট প্রার্থিত সাহায্য না পাইয়া মতিলাল লাঠিয়ালের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির ব্যবস্থা করিলে উভয়পক্ষে অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। শেষে বিবাদের মীমাংসা হইলে আনন্দনারায়ণ তাঁহার বাজার এক ব্যক্তিকে ইজারা দেন ও তিনি তাহাতে গুদাম নির্ম্মাণ করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সরকার গঙ্গার তীরে নূতন পথ প্রস্তুত করিবার জন্য ঐ স্থানের জমীদারদিগকে জমী দিতে বলেন। আর সকলে তাহাতে সম্মত হইলেও মতিলাল স্বীয় জমী ত্যাগ করিতে অসম্মত হয়েন। সরকার পক্ষের লোক ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে সম্মত করিতে অসমর্থ হয়। শেষে স্থির হয়—যতদিন তাঁহার দ্বারা নির্দ্ধারিত উন্নতিকর কাজ না হইবে এবং সরকার তাঁহার নক্সানুসারে তাঁহার ঘাটের পরিবর্ত্তে নূতন ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া না দিবেন, ততদিন নামমাত্র খাজনা দিয়া—তিনি জমীর অধিকারী থাকিবেন। মতিলালের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে সরকার মীমাংসার সর্ত্ত পালন না করিয়া মামলা করিয়া মতিলালের উত্তরাধিকারী-দিগকে জমী হইতে উচ্ছেদ করেন।

জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি মতিলালের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে—দীর্ঘকাল মামলা চলে। তখন মামলার ফল অনিশ্চিত বলিয়া মতিলালের বন্ধুরা তাঁহাকে মামলা মিটাইয়া লইতে বলিলে তিনি অসম্মত হইয়া বলেন—মামলা মীমাংসা করিয়া লইলে তাঁহার পক্ষে তাহা দণ্ডের মতই হইবে। মামলায় তাঁহার জয় হইয়াছিল। মামলার সময় প্রতিপক্ষের ব্যারিষ্টার তাঁহার বহু নিন্দা করিলেও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত বা ভীত হয়েন নাই।

জমীদাররূপে মতিলাল স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকিলেও প্রজাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন। তিনি মনে করিতেন, প্রকৃত পক্ষে প্রজার ও জমীদারের স্বার্থ অভিন্ন। তিনি প্রজাদিগকে স্নেহ করিতেন। একবার তিনি রঘুনাথপুর জমীদারী পরিদর্শনে গমন করিলে প্রজারা কতকগুলি কারণ দেখাইয়া খাজনা মকুব করিবার জন্য আবেদন করিলে তিনি প্রজাদিগের প্রদর্শিত কারণ সঙ্গত বুঝিয়া অনেক টাকা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগের আবেদন শুনিতেন এবং সঙ্গত বুঝিলে ও সম্ভব হইলে আপনার প্রাপ্য খাজনা হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিতেন।

মতিলাল প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ গৃহীর সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন:—

"বীরভোগ্যাবসুন্ধরা। বীর্য্যপ্রকাশ কর, সামর্থ্যানুযায়ী নীতি প্রকাশ কর; পৃথিবী ভোগ কর; তবে তুমি ধার্ম্মিক। ... অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ—গৃহস্থের পক্ষে। তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জ্জন করে স্ত্রী পরিবার স্বজনকে প্রতিপালন, যাতে হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করতে

হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও —আবার 'মোক্ষ'!!"

মতিলাল শীলের জীবন ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, এই আদর্শে মতিলাল ধার্ম্মিক, গৃহস্থ ও মানুষ ছিলেন।

ব্যবসায়ী মতিলাল কখন অর্থার্জ্জনের জন্য অসৎ পথ গ্রহণ করেন নাই—সৎ পথেই অগ্রসর হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে কথা বলিতেন, তাহা কখন কার্য্যে পরিণত করিতে দ্বিধানুভব করিতেন না। আবার তিনি দশ জনকে প্রতিপালন করিতে কখন পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। একবার সুপ্রিম কোর্টের এক জন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ কর্ম্মচারী অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া মতিলালের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি যে জামিন দিবেন, তাহা যথেষ্ট নহে বলিয়া মতিলালের বন্ধুরা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে নিষেধ করিলে মতিলাল তাঁহাদিগের নিষেধ পালন করেন নাই—ফল যাহাই কেন হউক না, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে হইবে। সত্যই ইহাতে তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেজন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েন নাই। তিনি এক জন অপরিচিত সাহায্যপ্রার্থী এটর্নীকে এবং কয়জন ভারতীয় ও য়ুরোপীয়কেও এইরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার কয় লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। তিনি তাহাতে বিচলিত হয়েন নাই।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মতিলাল ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারের অধীনে চাকরী গ্রহণ করা তিনি "জীবন ও আত্মা বিক্রয় করা" মনে করিতেন। সেইজন্য তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালালকে ব্যবসায়ী করিতে ওসওয়াল্ড শীল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছু দিন কাজ চলিবার পরে নানা কারণে এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র উহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন বলিয়া এবং পুত্র যাহাতে ব্যবসা ত্যাগ না করেন সেইজন্য মতিলাল উহার প্রায় চারি লক্ষ টাকা দেনা মিটাইয়া দিয়াছিলেন। তেমনই আবার তাঁহার তৃতীয় পুত্র পান্নালালের সহিত সম্পর্ক থাকায় তিনি লিণ্ডিংষ্টোন ডিয়ারম্যান কোম্পানীর লোকসান প্রায় চারি লক্ষ টাকা শোধ করেন। ব্যবসায়ে তাঁহার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা।

এই ক্ষতিতে যে শ্রেষ্ঠ ধনীদিগের মধ্যে তাঁহার আসন টলে নাই, তাহাতেই তাঁহার উপার্জ্জনের পরিমাণ অনুমান করা যায়।

মতিলাল কিরূপ হৃদয়বান ছিলেন, তাঁহার বহু প্রমাণ আছে। শুনা যায়, ঋণীর নিকট প্রাপ্য টাকার জন্য ডিক্রী জারি করিবার সময় তাঁহার কর্ম্মচারীরা লোকের প্রতি কুব্যবহার করে শুনিয়া তিনি এক বার ডিক্রী জারী করা দেখিতে গিয়াছিলেন। সেদিন কর্ম্মচারীরা সোৎসাহে অধমর্ণের পরিবারবর্গকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করে। তাহা দেখিয়া তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার সম্পত্তিতে কখন কোন ডিক্রী জারি করা হইবে না।

গল্প আছে, জগমোহন নামক তাঁহার কোন পরিচিত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বাড়ী বন্ধক রাখিয়া কয় সহস্র টাকা ঋণ লইয়াছিলেন। তিনি সে ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। অসুস্থ হইয়া তিনি তাঁহার স্বজনগণকে তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করাইতে—মতিলালের গৃহের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেন। ঐ গৃহের সম্মুখে আসিয়া তিনি গৃহস্বামীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে সে সংবাদ পাইয়া মতিলাল তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মতিলালকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—ঋণমুক্ত হইয়া মহাযাত্রা করিতে পারিলেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মতিলাল বন্ধকী দলিল আনাইয়া তাহা ব্রাহ্মণকে দিয়া ঋণমুক্ত করিলেন। এরূপ দান মতিলাল জীবনে অনেক করিয়াছিলেন।

মতিলাল হোলডওয়ার্থ নামক যে য়ুরোপীয়ের নিকট ব্যবসা করিয়া উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান জন্য সচেষ্ট ছিলেন, মহিলাটি স্বদেশে গমন করিলে তিনি যতদিন জীবিতা ছিলেন ততদিন মতিলাল তাঁহাকে নিয়মিত মাসহারা পাঠাইয়া দিতেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মতিলাল কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলঘরিয়ায় ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বহু লোক কলিকাতার উত্তরাঞ্চল হইতে দূরে

আসিবার সময় ঐ স্থানে আহার্য্য পাইত। তাঁহার জীবদ্দশায় কোন কোন দিন ৫ শত হইতে এক সহস্র অতিথির জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করা হইত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার পুত্র হীরালাল কোন কোন দিন ঐ স্থানে প্রায় তিন সহস্র লোককে আহার্য্য ও বস্ত্র দিয়াছিলেন। আজও তথায় "সদাব্রতের" ব্যবস্থা আছে। বেহালায়ও অনুরূপ একটি ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালা আছে।

সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের বিধবা ও অনাথদিগের জন্য মতিলাল বিশেষ দুঃখানুভব করিতেন—বহু পরিবারকে তিনি মাসিক অর্থ-সাহায্য দিতেন—তাঁহাদিগের অভাব দূর করিতে সচেষ্ট ছিলেন। দরিদ্র আত্মীয়স্বজনগণকে তিনি অবজ্ঞা না করিয়া সাহায্য করিয়া আনন্দ ও প্রীতিলাভ করিতেন। কোন ধনবান ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে দুঃস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া সান্ত্বনা, উৎসাহ ও অর্থ দিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময় ও তাহার পূর্ব্বে একবার তিনি কলিকাতায় কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের ঋণের টাকা দিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন।

গোপন ও ব্যক্তিগত দানের পক্ষপাতী হইলেও কল্যাণকর যে কোন কাজের জন্য তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। কলিকাতায় যখন মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তখন সে হাসপাতাল "ফিবার হস্‌পিট্যাল" নামে পরিচিত হয়। তাহার জন্য আবশ্যক ভূমির প্রয়োজন অনুভূত হইলে মতিলাল জমী প্রদান করেন। ঐ হাসপাতালে "মতিলাল শীলস ওয়ার্ড" সেই দানের স্মারক। শুনা যায়, ঐ জন্য প্রথমে যে জমী দিবার প্রস্তাব হয় তিনি তাহার তিনগুণ জমী স্বেচ্ছায় দান করিয়াছিলেন; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, কলিকাতা নগর যেমন বিস্তারলাভ করিবে ঐ হাসপাতালেরও তেমনই বিস্তারের প্রয়োজন হইবে।

শিক্ষা-বিস্তারে মতিলালের যেমন আগ্রহ ছিল সে বিষয়ে তাঁহার দানও তেমনই প্রশংসনীয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী কলিকাতায় যে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই পরে হিন্দু কলেজে পরিণতি লাভ করে। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের অনেকেই শিক্ষার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার অনুশীলন করেন। হিন্দু সমাজ তাহাতে আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। সেযে "হীরা বুলবুল" নাম্নী কোন রূপজীবার পুত্র তথায় প্রবেশ করিলে তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইলে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন হয়, তাহার ফলে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সে বিদ্যালয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এই সময়ে খৃষ্টান মিশনারীরাই তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ দিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ছাত্রদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। সেই কারণে হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে যে সভা হয়, তাহাতে মতিলালের লক্ষ টাকা দানের বিষয় প্রবন্ধের প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে। ঐ লক্ষ টাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া মতিলাল তাহার জন্য শিক্ষকনিয়োগের বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তাহা অবগত হইয়া সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান পাদরীরা কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় হিসাবে উহার ভার গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব পাইয়া মতিলাল পরদিনই কৃষ্ণমোহন মল্লিককে সঙ্গে লইয়া কলেজে গমন করেন এবং তথায় শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া স্বীয় বিদ্যালয় জেসুইট পাদ্রীদিগের পরিচালনাধীন করিতে সম্মত হয়েন। কৃষ্ণমোহন তাঁহাকে বিবেচনা করিয়া পরে ব্যবস্থা করিতে বলিলে তিনি সে কথায় কর্ণপাত করেন না; বলেন, দুই কারণে তিনি বিদ্যালয়টি পাদ্রীদিগের পরিচালনাধীন করিলেন—প্রথম উঁহাদিগের শিক্ষাদান প্রণালী উচ্চস্তরের—দ্বিতীয় তিনি ব্যবসায়ী, যদি কোন কারণে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে, তবে তাঁহার মনের চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। প্রথমে বিদ্যালয়ে ছাত্রের নিকট মাসিক এক টাকা বেতন লইয়া তাহাকে শিক্ষাদান করা ও তাহার আবশ্যক পুস্তক কাগজ প্রভৃতি দেওয়া হইত—পরে উহা অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। সাত জন পাদ্রী ও ৩ জন বাঙ্গালী শিক্ষক লইয়া বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মতভেদহেতু পাদ্রীদিগের সহিত বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় এবং ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস পামারের নেতৃত্বে আবশ্যক সাহায্যে ফিরিঙ্গী ও ভারতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ঐই বিদ্যালয়ে এখন প্রায় ৪ শত ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিতেছে। সুখের বিষয়, প্রথম ব্যবস্থানুসারে ৯৯ বৎসর বিদ্যালয় থাকিবে এই ব্যবস্থার আনুকূল্য শেষ হইলে মতিলালের উত্তরাধিকারীরা ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করিয়া উদারতার এ যথাযোগ্যতার পরিচয় দিয়া মতিলালের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

ধর্ম্মবিশ্বাসে মতিলাল হিন্দু ছিলেন। তাঁহার ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠায় এ মৃত্যুকালীন ব্যবস্থায় তাহার পূর্ণ পরিচয় প্রকট। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভগবদ্ভক্তি ও মানবে প্রেমই ধর্ম্মের সার সত্য। ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন—কিন্তু কখন ললাটে তিলক চিহ্ন ধারণ করা ত পরের কথা, কাহাকেও তাহা করিতে দেখিলে বিরক্তি বোধ করিতেন। ধর্ম্মের বাহ্যিক চিহ্ন তিনি ভণ্ডামী মনে করিতেন; কখন গুরু বা গোস্বামীর কাছে মস্তক নত করিতেন না। রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ইংরেজ সরকার যখন সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন, তখন এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের এক দল লোক—তাহার প্রতিবাদ করিয়া ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে বলিয়া আন্দোলন করেন এবং ঐ আইন প্রত্যাহার জন্য ইংলণ্ডে আবেদন করেন। ঐ সভায় কলিকাতার হিন্দু সমাজের বহু সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহারা "ধর্ম্ম সভা" নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদিগের বিশেষ অনুরোধেও মতিলাল সে সভায় যোগ দেন নাই। তিনি কেন ঐ সভায় যোগ দিবেন না তাহা সভার সম্পাদক পণ্ডিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করায় মতিলাল যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মতের দৃঢ়তার ও স্পষ্টবাদিতার পরিচায়ক। তিনি বলেন, ঐ সভা প্রকৃতপক্ষে "অধর্ম্ম সভা"—ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম, কার্য্যের সংরক্ষণ ও প্রসার সাধন না করিয়া উহার দ্বারা ধর্ম্মহানির ও ধর্ম্মনাশেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। কারণ, সভায় দানের কোন ব্যবস্থা নাই এবং অপরের ধর্ম্ম-মতকে আক্রমণ করা ও সর্ব্ববিধ উন্নতিদ্যোতক কার্য্যে বাধা দেওয়াই সভার উদ্দেশ্য। মতিলালের প্রস্তাবের আলোচনা করিবার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে সভার এক অতিরিক্ত অধিবেশন আহূত হইলে মতিলাল তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ তর্ক-নৈপুণ্য ও স্পষ্টবাদিতা সহকারে সভাকে সহরের দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলেন। সভায় বহু ধনী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মতিলাল বলেন, তিনি সভায় বহু ধনী ও ভূস্বামীকে দেখিতেছেন—তিনি তাঁহাদিগকে আরামের সব উপাদান বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন না, নিরন্ন ও আশ্রয়হীনের জন্য বিলাসের সামান্য অংশমাত্র ত্যাগ করিতে বলিতেছেন; যাঁহার ৪ খানি গাড়ী ও ১০টি ঘোড়া আছে, তিনি একখানি গাড়ী ও ২টি ঘোড়া বিক্রয় করিয়া বিক্রয় লব্ধ অর্থ দরিদ্রের সেবায় প্রযুক্ত করুন। মতিলালের করুণাস্নিগ্ধ দৃঢ় উক্তি অনেককেই মুগ্ধ করিয়াছিল এবং সভাপতি তাঁহার উক্তির যথার্থ্য স্বীকার করিলে সভা বিধবা ও অনাথদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ভাণ্ডার স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন এবং মতিলাল তাহাতে ৩০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

এইরূপে মতিলাল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সভাকে প্রকৃত ধর্ম্ম সভায় পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিক হিন্দু হইলেও সমাজে কালোপযোগী সংস্কারের এমনই পক্ষপাতি ছিলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হিন্দু বিধবার বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ করার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ ২৬শে জুলাই) বহু পূর্ব্বে (১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে) ঘোষণা করেন, হিন্দু সমাজে যিনি প্রথম বিধবা-বিবাহ করিবেন, তিনি তাঁহাকে ২০ হাজার টাকা দিবেন। তৎকালীন সংবাদপত্রে দেখা যায়, বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল এবং মতিলাল প্রতিশ্রুত অর্থও দিয়াছিলেন।

এই মতিলাল বহু হিন্দু বিধবাকে নিয়মিত মাসিক অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া অভাবের তাড়নায় পাপের প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তিনি যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাহা তাঁহার ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠায় যেমন কলিকাতায়

গঙ্গার একটি ঘাট প্রতিষ্ঠায় তেমনই সপ্রকাশ। বিশেষ তাঁহার মৃত্যুকালে তাহা প্রতিপন্ন হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর। রোগ প্রকাশের পরে ৪০ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। আরোগ্যলাভের আশা নাই বুঝিয়াই তিনি গঙ্গাতীরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঘাটে "তীরস্থ" হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তথায় গঙ্গা দর্শন করিয়া তিনি গঙ্গার উদ্দেশে বলেন—তিনি জীবনে কাহারও নিকট মস্তক নত করেন নাই, আজ গঙ্গাকে প্রণাম জানাইতেছেন। আর যখন তাঁহার কোন বন্ধু—ঐ কথা শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি মৃত্যুর জন্য ভীতি অনুভব করিতেছেন, তখন মতিলাল বলেন—"মতি ইহলোকে কিছুতে ভয় পায় নাই; বিশ্বাস করি ও প্রার্থনা করি, পরলোকেও যেন ভয় কাহাকে বলে তাহা না বুঝি।" জীবনে ইহাই তাঁহার শেষ উক্তি। শান্তিতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

জীবনে তিনি বহু বিস্ময়কর ও প্রশংসার্হ কার্য করিয়াছিলেন; কিন্তু যে ভাবে তিনি নির্ভয়ে, শান্তচিত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়—

"Nothing in his life
Became him like the leaving it."

রাজনীতিতে মতিলাল তাঁহার সমসাময়িক সংস্কারকামীদিগের সমর্থক ছিলেন। তখন এ দেশে শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ শাসনমুক্ত হইবার মনোভাব সৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু তখনই দেশের লোক (বিশেষ শিক্ষিত হিন্দুরা) শাসন-সংস্কারের ও অধিক রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন "ছাড়" প্রাপ্তির সময়—বিলাতের পার্লামেণ্টের সমিতিতে ভারত সরকারের কোন কর্ম্মচারী ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে যে সকল অসঙ্গত উক্তি করিয়াছিলেন সে সকলের প্রতিবাদে ও ভারতীয়দিগের অধিকার বৃদ্ধি দাবী করিবার জন্য কলিকাতা টাউন হলে এক সভা হয়। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন মতিলাল সে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই; কিন্তু রামগোপাল ঘোষকে লিখিত পত্রে সভার উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সভার নির্দ্ধারিত কার্যে সহযোগের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

সমাজে মতিলালের যে উচ্চ স্থান হইয়াছিল, তাহাতে প্রতিদিন বহু য়ুরোপীয় ও ভারতীয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন—তাঁহার গৃহ সমাগতে পূর্ণ থাকিত। তিনি সকলের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে উভয় সম্প্রদায়কে বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করিতেন।

কিন্তু মতিলাল স্বয়ং অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করিতেন—বিলাস ঘৃণা করিতেন—তোষামোদ সহ্য করিতে পারিতেন না—যেমন দয়ালু তেমনই সুরসিক ছিলেন। তিনি স্বয়ং রূপবান ছিলেন না। গল্প আছে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রূপের অত্যন্ত অভাব হেতু প্রতিবেশীদিগের—এমন কি স্ত্রীরও ব্যঙ্গের বিষয় হইয়াছিলেন। তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ধনীশ্রেষ্ঠ মতিলাল শীলকে দেখিয়া আসিতে বলেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণ মতিলালের প্রাসাদে আসিলে ভৃত্য যখন তাহার প্রভুকে সংবাদ দেয়—একজন ব্রাহ্মণ দর্শনপ্রার্থী, তখন মতিলাল বলেন—"দেবতাকে নিয়ে আয়।" ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া মতিলালকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মতিলাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি ত আগমনের উদ্দেশ্যও জানাইলেন না! তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিলে মতিলাল উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,"এখন দুঃখ ঘুচেছে ত?" সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মণকে ১০টি টাকা দিবার নির্দ্দেশ দিলেন।

তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী প্রভুকে "ধর্ম্মাবতার" বলিলে তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন,"মানুষ কি কখন ধর্ম্মের অবতার হইতে পারে?"

তিনি যখন বালীতে দারোগা ছিলেন, সেই সময় তথায় এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। মতিলালের ভাগ্যোদয় হইলে ব্রাহ্মণ একদিন কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মতিলাল তখন স্নান করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার গাত্রমার্জ্জন বস্ত্র পার্শ্বস্থ স্থান হইতে লইয়া তাঁহাকে দিতে উদ্যত হইলে মতিলাল বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়া-

ছিলেন—তিনি কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়া ভৃত্যের কাজ করিতেছেন ?

মতিলাল যাঁহার নিকট হইতে বিন্দুমাত্র উপকার পাইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতেন। তিনি অকৃতজ্ঞতা সহ্য করিতে পারিতেন না এবং লোকের অন্যায় কাজ সম্বন্ধে ক্ষমা বা উপেক্ষা করিতেন না—কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অন্যায় উপেক্ষা করিলে, তাহা দূর হয় না—বাড়িয়াই যায়। সেই কারণে তিনি সময় সময়, অপ্রিয়ভাষী ও কঠোর-হৃদয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু তিনি কখন স্বীয় বিশ্বাসানুযায়ী কাজ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না—অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা গোপন করিতেন না।

মতিলাল কেবল ধনীই ছিলেন না, পরন্তু বহুগুণে গুণীও ছিলেন। তিনি ধনী দরিদ্র, য়ুরোপীয় ভারতীয়, রাজা রায়ত, মৌলবী মুন্সী, ব্যবহারাজীব মুদী কাহাকেও যেমন ঘৃণা করিতেন না, তেমনই কাহাকেও অকারণ সম্মান দেখাইতেন না। তিনি উপযুক্ত পাত্রে ও দেশের লোকের কল্যাণকার্য্যে অর্থদানে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি দূরদর্শী ও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নানাদিকে দেশবাসীর জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

কর্ম্মই তিনি ধর্ম্মজ্ঞানে তাহাতে আত্মনিয়োগ করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। আত্মপ্রত্যয়, উদ্যম, পরিশ্রম ও সাধুতা তাঁহার মূলধন ছিল।

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৮

নানা ধুম্রপথ নানাস্থান ঘুরিয়া যখন লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলেন তখন সেখানকার হাওয়া রীতিমত গরম হইয়া উঠিয়াছে। পর পর কয়দিনে অনেকগুলি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

কিছুদিন পূর্বে আউটরাম বিদায় লইলে সরকার অযোধ্যায় চীপ্ কমিশনাররূপে পাঠাইয়াছিলেন কভার্লী জ্যাকসনকে। জ্যাকসন কড়া মেজাজের লোক, রূঢ়ব্যবহারের জন্যই বিখ্যাত। অযোধ্যা বিশেষ করিয়া লক্ষ্ণৌ, তখনও ওয়াজেদ আলী শাহ্‌কে নবাবী হইতে চ্যুত করার কথাটা ভুলিতে পারে নাই। ওয়াজেদ আলী শার যতই চারিত্রিক দোষ থাক, শাসন ব্যাপারে যতই তাঁর শৈথিল্য থাক, তিনিই অযোধ্যার সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। তাঁহার নবাবী কাড়িয়া লওয়াতে হিন্দু মুসলমান কোন ভূম্যধিকারীই সুখী হন নাই। তাঁহাদের নিজেদের ভয়ও বোধকরি ছিল কিছু কিছু—কে জানে আংরেজ সরকারের মতিগতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়া পৌঁছিবে? তাঁহাদের জমি জায়গাগুলা টিকিলে হয়।

ফলে অসন্তোষের আগুন শুধু সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে নয়—তাঁহাদের ছোঁয়াচে ও প্রভাবে তাহা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও সংক্রমিত হইয়াছিল। একে না মনদা তায় ধুনার গন্ধ। আসিলেন জ্যাকসন। তিনি ইংরেজী সুশাসনের বড়ি দেশবাসীকে একরকম জোর করিয়াই গিলাইতে শুরু করিলেন। তাঁহার সহিত আবার যোগ দিয়াছিলেন ফিনান্সিয়াল কমিশনার গাবিন্স্। উভয়ে, পরস্পরের সহিত রেষারেষির ফলে, সুশাসনের তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। বহু জমিদারের খাজনা বাড়িল। চাষীদের হয়ত কিছু সুবিধা হইল কিন্তু তাহা বুঝিবার মত অবস্থা তাহাদের নয়। নূতন সেট্‌ল্‌মেণ্টে কাগজ-পত্র না দেখাইতে পারায় বহু জমিদারের খাস-জমি বাজেয়াপ্তও হইল। নবাব পরিবারের অনেকের পেন্‌সন্ বন্ধ হইল। নবাব অপসারিত হইলে—তাঁহার বিরাট-সংখ্যক মোসাহেব ও পারিষদের দলও বেকার হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সিপাহীদের চাকুরী গিয়াছিল, তাঁহার অমিতব্যয়িতার প্রধান সহায় ছিল যেসব ব্যবসায়ীরা তাহাদেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে পথে-ঘাটে অসন্তোষের বীজ ছড়াইবার লোকের অভাব ছিল না। ইহাদেরই সহায়তায় মৌলবী অত সহজে এখানে গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। এছাড়া জ্যাকসন তাঁহার উদ্ধত নির্বুদ্ধিতায় আরও কতকগুলি হঠ্‌করিতা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হিন্দুমুসলমান উভয়েরই কতকগুলি দেবোত্তর সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন—পুরাতন প্রাসাদ কাড়িয়া লইয়া তাহাতে সরকারী দফ্‌তর বা দাওয়াখানা খুলিয়াছিলেন—শুধু সমাধি-মন্দির ধূলিসাৎ করিয়া বাগান বসাইয়াছিলেন।

ইহার ফলে অযোধ্যার অবস্থা যে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। অবশেষে ক্যানিং-এরও টনক নড়িল। তিনি জ্যাকসনের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া হেনরী লরেন্সকে আনিয়া বসাইলেন। কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশের অবস্থা তখন বোধকরি চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। লরেন্স আসিয়া যথাসাধ্য করিয়াছেন। অনেকের

পেন্‌সন্ আবার মঞ্জুর করিয়াছেন, অনেকের জমি ফিরাইয়া দিয়াছেন। প্রতিপত্তিশালী লোকদের সহিত দেখা করিয়া মিষ্টবাক্যে তাহাদের প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু তবু অসন্তোষ মেটে নাই। একদিন ত প্রকাশ্যেই, লক্ষ্ণৌ শহরের রাজপথে একটা লোক খোদ লরেন্সের মুখেই কাদা ছুঁড়িয়া মারিল। অপর কোন কমিশনার হইলে আগুন জ্বলিয়া যাইত কিন্তু লরেন্স অসীম ধৈর্যে সব সহ্য করিলেন। তিনি বৃহত্তর আগুনের পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন, সামান্য ব্যক্তিগত অপমানকে প্রাধান্য দিবার সময় সেটা নয়।

এ সব খবরই নানা সাহেব পাইয়াছেন।

আরও একটি জোর খবর পাইয়াছেন। মিলিটারী সার্জন ডাঃ ওয়েলস্ ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় একদিন হাসপাতালে ঢুকিয়া ঔষধের বোতল মুখে লাগাইয়া পান করিয়াছেন। এদেশের হালচাল তিনি জানেন না—এই সামান্য ব্যাপারের সুদূর-প্রসারী ফলাফল অনুমান করার মত অভিজ্ঞতা বা বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই। কিন্তু এই খবরটি যথাস্থানে প্রচার করিবার মত লোকের অভাব ছিল না। মৌলবী বন্দী হইয়াছেন কিন্তু আমিনা বেগম ও আজিমুল্লার বেতনভুক্ লোকের সংখ্যা খুব কমে নাই। দেখিতে দেখিতে সংবাদটা ব্যারাকে ব্যারাকে ছড়াইয়া পড়িল। বিধর্মী ম্লেচ্ছ রাজশক্তি নানা ফন্দীতে তাহাদের ক্রেস্তান করিতে চায়! ক্রেস্তানের উচ্ছিষ্ট ঔষধ খাওয়াইয়া ক্রেস্তান করিবার প্রয়াস তাহাদের পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনারই একটা কার্যক্রম মাত্র। সিপাহীরা আগুন হইয়া উঠিল। ওয়েলস্ শুধু গোরুখোর নন্—শুয়ারখোরও। সুতরাং তাঁহার উচ্ছিষ্ট হিন্দু মুসলমান সকলের কাছেই সমান অশুদ্ধ।

সিপাহীদের অসন্তোষের সংবাদ যথাসময়ে লরেন্সের কাছে পৌঁছিল। তিনি তখনই নিজে হাসপাতালে গিয়া ঔষধের বোতলটি কয়েকজন সিপাহীর সামনে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিলেন, ওয়েলস্‌কে সর্বজন-সমক্ষে তিরস্কার করিলেন, তাঁহাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিবারও ভয় দেখাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এটাকেও লোকে অভিনয়ের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইল। অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইয়াই রহিল। অবশেষে সে বহ্নির বহির্প্রকাশ হইল দিন-তিনেক পরে—সে আগুনে ডাঃ ওয়েলস্-এর বাংলো পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

সেই দিনই নানা সাহেব লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াছেন।

নিশীথরাত্রের সেই বহ্ন্যুৎসব তিনি নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করিলেন।

অন্ধকারে দূর প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়াইয়া নানা সাহেব এক দৃষ্টে সেই আগুনের দিকেই চাহিয়া ছিলেন। অতদূর হইতেও তাহার রক্তাভা তাঁহার ভ্রূকুটিবদ্ধ মুখকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি স্থির হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আগুন কোথায় আর কেন লাগিয়াছে সে সংবাদ আনিতে তিনি লোক পাঠাইয়াছিলেন—সে লোক ফিরিয়া আসিয়া খবর দিয়াছে। তারপর হইতে কোন উদ্বেগ বা কৌতূহল তাঁহার মুখে প্রকাশ পায় নাই—আশ্চর্য রকমের স্থির হইয়া গিয়াছেন।

আগুন অনেকক্ষণ ধরিয়াই জ্বলিল। সাহেবের বাংলো, কাঠকাঠরা আসবাব-পত্রের অভাব নাই। এবং যতক্ষণ তাহার রক্তাভা সেই তামসী রাত্রির অন্ধ আকাশের এক প্রান্ত আলোকিত করিয়া জ্বলিতে লাগিল ততক্ষণ নানা সাহেব কোথাও নড়িলেন না। বরং সেই অগ্নিকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করিয়া যে পৈশাচিক উল্লাস-কোলাহল উঠিয়াছিল, দূরোত্থিত সেই কোলাহলের দিকে যেন একাগ্রচিত্তে কান পাতিয়া ছিলেন। ক্রমে ক্রমে কোলাহল ও আলো দুই-ই মিলাইয়া আসিল। এইবার নানা সাহেব তাঁহার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই লক্ষ্য করিলেন—কখন দীর্ঘকায় একটি লোক নিঃশব্দে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটু চমকিয়াই উঠিলেন—কারণ রাজদরবারের সমস্ত আবহাওয়াই হইল সন্দেহ ও সংশয়ের—ষড়যন্ত্র, হত্যা এসব—নানা সাহেব যে পরিবারে ও যে-যুগে মানুষ হইয়াছেন, সে যুগে ও সে পরিবারের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার মতই সহজ ঘটনা। সুতরাং ভয়ও পাইলেন বৈকি—চকিতের মধ্যে হাতটা তাঁহার কোমরে চলিয়া গেল। সেখানে একটি পিস্তল গোঁজা।

অন্ধকার হইলেও তাঁহার কোন ভঙ্গী আগন্তুকের চোখ এড়ায় নাই। তিনি নিজের হাতদুটি স্থির রাখিয়া ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গীকে ঘাড় হেলাইয়া কহিলেন, 'বন্দিগী পেশোয়াজী। আমি আপনার বান্দা—মহম্মদ আলি খাঁ।'

'ও! খাঁ সাহেব। আসুন, আসুন। ঘরে চলুন।'

স্পষ্ট স্বস্তির আভাস তাঁহার কণ্ঠস্বরে।

মহম্মদ আলি খাঁ কহিলেন, 'এখানেই ভাল—ফাঁকা ও নির্জন। ঘরে কথা কইলেই আড়ি পাতবার ভয় থাকে। বসুন না এখানে, চৌকী ত আছেই—'

তিনি পেশোয়ার দিকে একটা চৌকী আগাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ধুন্ধুপন্থ নিজে বসিয়া মহম্মদ আলি খাঁকেও বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

'তারপর?' প্রশ্নটা প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই নানার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

'কেমন দেখছেন আর শুনছেন বলুন। আপনি নিজে যে সরেজমিনে খোঁজ করতে বেরিয়েছেন এ আমাদের কাছে বড় ভরসার কথা পেশোয়াজী। উপযুক্ত সেনাপতির যোগ্য কাজ। কিন্তু সে যাই হোক—আপনার মোটামুটি ধারণা কী হ'ল সেইটেই শোনবার জন্য কৌতূহল হচ্ছে।'

'ধারণা!' কথাটা উচ্চারণ করিয়া নানা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

'ধারণা ত ভালই। সবই ত লক্ষণ দেখছি আমাদের অনুকূলে। সত্যি কথা বলতে কি—কাজটা যে এতটা এগিয়েছে তা আমি এতদিন ভাবতে পারিনি। অবশ্য এর সবটাই যে আজিমুল্লা বা আপনাদের দ্বারা হয়েছে এ-ও আমি বিশ্বাস করিনা। কতকটা আপনিই হয়েছে। তাই মনে হচ্ছে খাঁ সাহেব, এ যেন ভগবানেরই নির্দেশ। আংরেজদের পাপ সহ্য করতে না পেরে স্বয়ং গনপতি ভগবানই যেন এই আগুন জ্বালিয়েছেন। না খাঁ সাহেব, এতদিন যেটুকু দ্বিধা আমার ছিল—আজ এই মাত্র তা চলে গিয়েছে। এবার থেকে আমি মনে-প্রাণে আপনাদেরই দিকে।'

মহম্মদ আলি খাঁ নিঃশব্দে হাসিলেন। অন্ধকারে তাঁহার ভ্রমর-কৃষ্ণ শ্মশ্রু ভেদ করিয়া সে হাসির ঝিলিক দেখা গেলনা। তাছাড়া মুখের হাসি কণ্ঠেও ধরা পড়িলনা। বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই কহিলেন, 'কিন্তু পেশোয়াজী—উল্লসিত হবার মত কিছু ঘটেনি। হঠাৎ আচমকা মারপিট ক'রে কখনও একটা শক্তিকে হারানো যায় না। মুষ্টিমেয় আংরেজ এতবড় দেশটা দখল করেছে, তাদের শক্তিকে ছোট ক'রে ভাবাও উচিত নয় কোনমতে।—আমি দু-দুবার ইউরোপ ঘুরে এসেছি পেশোয়াজী—এদের আমি চিনি। অবজ্ঞা বা অবহেলা করবার মত শত্রু এরা নয়।'

বোধ করি পেশোয়ার কথাটা ভাল লাগিল না। তিনি ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবেই বলিলেন, 'আপনি কী বলতে চান কি?'

মহম্মদ আলি খাঁ তাঁহার বিরক্তি লক্ষ্য করিলেন বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বরং আরও একটু গলায় জোর দিয়া বলিলেন, 'প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হ'তে হবে—এই ভেবেই কাজে নামবেন। আগে থাকতে ভেবেচিন্তে কাজের ছক কেটে নিতে হবে আমাদের। কোথায় কোথায় আমরা ঘাঁটি করব সেটা ভেবে নেওয়া দরকার। ওদের এক হ'তে দিলে চলবে না। যেমন ছড়ানো আছে তেমনি ভাবেই শেষ করতে হবে। সেটা অবশ্য সহজ। কিন্তু কাজ ত ঐখানেই মিটবেনা পেশোয়াজী। এতবড় সাম্রাজ্য ওরা এক কথায় ছেড়ে দেবে না। জবাব একদিন আসবেই। সেজন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। কোথায় কী ভাবে ঘাঁটি করবেন, কে কোন্ দিক আগলাবে, এসব আগে থাকতেই ঠিক হওয়া দরকার। তা না হ'লে এত আয়োজন—এত রক্তপাত—সব পণ্ড হবে।'

নানা সাহেবের বিরক্তি ঢাকা থাকেনা, তিনি বলেন, 'আপনি বড় বেশী দূর চিন্তা করেন খাঁ সাহেব। এত ভবিষ্যৎ ভাবলে কোন কাজই চলেনা। মুষ্টিমেয় আংরেজ এদেশ দখল করেছে ঠিকই—কিন্তু সে কাদের জোরে? ভেলেজী সিপাইরা না থাকলে ক্লাইভ কিছুই করতে পারত না। যা করেছে দেশী সিপাইরাই। আমরা উজবুগের মত হাতে ক'রে দেশটা ওদের হাতে তুলে দিয়েছি। আপোষে ঝগড়া ক'রে বাইরের শত্রু ডেকে এনেছি। যদি সত্যিই আমরা এক হয়ে নিজের ক্ষমতা বুঝে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি ত ওরা আর এদেশে নামতে

সাহস করবেনা। এই কটা আংরেজ ম'লেই যথেষ্ট শিক্ষা হবে ওদের। ওদের দেশ শুনেছি এতটুকু—একরত্তি।··· হিন্দুস্থানের সব লোক রুখে দাঁড়ালে তাদের নজরেই ওরা ভয়ে কুঁকড়ে যাবে। হাতী নিজের দেহটা সব দেখতে পায়না—এইত আফশোষ!'

মহম্মদ আলি খাঁ বেশ একটু বিদ্রূপের সুরেই জবাব দেন—'সে-ও যেমন আফসোস, কুয়ার ব্যাঙ তার কুয়াটাকেই জগৎ ভাবে, সেও তেমনি।'

নানা সাহেব এই রূঢ় বাক্যে যেন আঘাত খাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন—মহম্মদ তাহা লক্ষ্যও করিলেন না, তিনি বলিয়া চলিলেন, 'আংরেজদের দেশ এতটুকু তা ঠিকই—কিন্তু ঐটুকু দেশেরই ক-জন লোক শুধু হিন্দুস্তানে নয়, তামাম দুনিয়ার সব জায়গাতেই তাদের রাজত্ব ফেঁদে বসেছে। ওরা ভীরু নয়, ওরা বোকা নয়—এ দুটোই মস্ত বড় কথা পেশোয়াজী।···যদি আমরা এক হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি—তা'হলে অনেক কিছুই করতে পারব তা আমিও মানি। কিন্তু এ "যদি"টা অনেক-খানি "যদি" পেশোয়াজী। এ দেশের মানুষ এক হয়ে দাঁড়াবে এই আপনি আশা করেন? মানুষগুলো কি রাতা-রাতি পাল্টে যায়? সিন্ধিয়া হোলকার কি গায়কোয়াড় সহজে আপনার কর্তৃত্ব মানবে? আপনি মানবেন বাহাদুর শার বাদশাহী? সবাই চাইবে এই সুযোগে নিজের নিজের দিন কিনে নিতে।···নিজেকে বড় আর শত্রুকে ছোট দেখবেন না পেশোয়াজী—তাহলে নিজের সর্বনাশকে নিজে ডেকে আনা হবে।·· আপনি বলছেন সবাই যদি এক হয়ে দাঁড়ায়—কারা কারা এক হবে তা খবর নিয়েছেন? বাঙ্গালী, তেলেঙ্গী, রাজপুত, শিখ—এদের খবর রাখেন কি?'

বোধ করি মহম্মদ আলি খাঁর যুক্তিতে যত না হোক—তাঁহার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় খানিকটা নরম হইয়া আসিলেন ধুন্দুপন্থ। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'তা আপনি কি করতে বলেন?'

'আপনারা—যাঁরা এর নেতা—তাঁরা বসে এসব কথা আলোচনা করুন। যদি প্রতি-আক্রমণ আসে ত কোথা দিয়ে কেমন ক'রে আপনারা আত্মরক্ষা করবেন চিন্তা করুন। চারিদিক ছড়িয়ে সামলানো শক্ত হবে। দিল্লী থেকে শুরু ক'রে আরা, ওদারে ঝাঁসি পর্যন্ত এইত দেখছি আমাদের মূল ঘাঁটি। এর ভেতরই আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত করা উচিত। সাবধানে হিসাব ক'রে সমস্ত কার্যক্রম ছক্ কেটে ফেলুন। ইংরেজ খুব সহজ শত্রু নয়, আর একবার সে কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি পেশোয়া।'

নানা সাহেব আবারও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, 'আংরেজ সহজ নয় তা আমিও খানিকটা জানি বৈকি খাঁ সাহেব, তাই ত আমার এত সতর্কতা। আমি এখনও ওদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিনি, একটি আঙুলও তুলিনি। আসলে আমি এখনও সহকর্মীদের বুঝতে পারছিনা। বাজীটা খুব লোভনীয় বটে—মুক্তি, আর রাজ্যশ্রী—কিন্তু আর একদিকে সর্বনাশ তাও ভুললে চলবেনা, যথাসর্বস্বই পণ করতে হবে এই জুয়া খেলায়।'

মহম্মদ খাঁ হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি তামাম হিন্দুস্তানের তখ্‌ত্ চান পেশোয়া!'

নানা সাহেব অলক্ষ্যে শিহরিয়া উঠিলেন। অন্ধকারেই দূর আকাশের নির্বাপিত-প্রায় অগ্নিশিখার আভাসে মহম্মদ খাঁর মুখখানা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, 'না না। তেমন কোন লোভ আমার নেই। বাহাদুর শা বাদশা, তখ্‌ত্ তাঁর। তবে মহারাষ্ট্রের আমি ন্যায্য অধিকারী—নয় কি? আপনি কি বলেন?'

মহম্মদ আলি খাঁ হাসিলেন। এবার আর সে হাসি চাপা রহিল না। শুভ্র দন্ত-পংক্তি শুষ্ক-শ্মশ্রু ভেদ করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিল। তবে সে হাসিতে শব্দ ছিলনা, বিদ্রূপের হাসিও ঠিক নয়। তাহা যেন নানা সাহেবের ছেলেমানুষীর প্রতি এক চরম ধিক্কার।

তিনি কহিলেন, 'সকলেই একটা জিনিসের ওপর লোভ করবেন না পেশোয়া, ভাগ ক'রে নিতে শিখুন। অতি-লোভেই আমরা বার বার সব হারিয়েছি।' মহম্মদ আলি খাঁ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'আপনি চললেন কোথায়? কথাবার্তা ত কিছুই শেষ হ'লনা।'

একটু যেন ব্যস্ত হইয়াই ওঠেন নানা সাহেব।

'কথার ত কিছুই নেই। আমি নিজের ইমান ও

ইসলামের নামে শপথ ক'রে আপনাদের দিকে এসেছি। আংরেজ আমার দুষমন, কত বড় দুষমন তা আপনি জানেননা। তাদের আমি ঘৃণা করি। যেমন ক'রে হোক তাদের সর্বনাশই আমার লক্ষ্য। আমার কথার নড়চড় হবেনা। যখন আগুণ জলবে তখন বান্দাকে ঠিকই পাশে হাজির দেখবেন। রাজগীতে আমার লোভ নেই, কাজেই ওসব চিন্তা আপনারা করুন—পলাপরামর্শ যা করবার তাও আপনারাই করবেন। কাজের সময় আমি ঠিক থাকব—সেই সময়ই আমার দরকার। তবে যা বুঝেছি আপনাদের ভালর জন্যই তা খোলাখুলি বলেছি, যদি ধৃষ্টতা হয়ে থাকে ত মাপ করবেন।'

'বসুন, বসুন। আর একটু বসুন।' নানা সাহেব একরকম তাঁহার হাত ধরিয়াই টানিয়া বসান, 'আচ্ছা আপনার এই দুষমনির কারণ কি? অনেকদিনই জিজ্ঞাসা করব ভাবি—'

'দুষমন!' দূর আকাশের দিকে চাহিয়া কতকটা অন্যমনস্কভাবেই বলেন মহম্মদ আলি খাঁ, 'দুষমন! হ্যাঁ পেশোয়া—ইংরেজ আমার দুষমন। সেই জন্যেই আপনাদের দিকে এসেছি। নইলে আপনাদের ওপর শ্রদ্ধা আমার এতটুকু নেই। আমি জানি আপনাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, বুদ্ধি সংকীর্ণতর। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিতে আপনাদের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন। হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা, শান্তি, সমৃদ্ধি কোনটাই আপনাদের লক্ষ্য নয়। আপনারা যা চান সেটা আপনাদেরই সুবিধা। তবু, আমি আজ আপনাদের তাঁবেদারী করছি—শুধু ঐ এক কারণে। আংরেজ আমার দুষমন। যদি ওদের রাজশ্রী নষ্ট করতে না পারি, যদি ওদের জাতের সর্বনাশ করতে না পারি—অন্তত কয়েকজন আংরেজকেও ত যায়েল করতে পারব। তবু খানিকটা জ্বালা মিটবে। এই এক লক্ষ্য আমার।'

বলিতে বলিতেই মহম্মদ আলি খাঁর দৃষ্টি হিংস্র হইয়া ওঠে। সমস্ত মুখখানা কেমন একপ্রকার পৈশাচিক প্রতিহিংসায় বিকৃত দেখায়।

'কিন্তু'—নানা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'এ দুষমনীর কারণটা ত জানতে পারলাম না খাঁ সাহেব।'

কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত নানাসাহেবের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় যেন বাস্তবে নামিয়া আসেন মহম্মদ আলি খাঁ, 'কারণ! হ্যাঁ, কারণ আছে বৈ কি!...সব কথা হয়ত আজ বলতে পারবনা কিন্তু যা পারব তাও যথেষ্ট। আমি ইংরেজেরই হাতে গড়া জিনিস নানা সাহেব,—ছেলেবেলায় মিশনারীদের হাতে মানুষ হয়েছি, বেরিলী কলেজে সাহেবের কাছেই ইংরেজী পড়েছি। ওখানকার পড়া শেষ করে রুড়কিতে গিয়েছি ইঞ্জিনিয়ারীং পড়তে। প্রথম হয়ে বেরিয়েছি সেখান থেকে। বিদ্যা-বুদ্ধিতে কোন ইংরেজের চেয়েই আমি কম নই।...কিন্তু পাস ক'রে বেরিয়ে কোম্পানীর চাকরী নিয়ে কী দেখলুম? ...সেখানে আমি জমাদার মাত্র—এবং একেবারে মূর্খ এক ইংরেজ সার্জেন্ট আমার অফিসার।...সে তার দেশে বোধ হয় মজুরের কাজ করত, ইঞ্জিনিয়ারিং ত কিছু জানেই না—তার মাতৃভাষাতেও কিছু-মাত্র লেখাপড়া করেনি। অথচ ঐ মূর্খ লোকটা আমাদের সঙ্গে ঠিক কুকুর বেড়ালের মত ব্যবহার করত। যেহেতু সে ইংরেজ, রাজার জাত—আর আমরা কালা আদ্‌মী। আমার টাকার অভাব নেই তা আপনিও ত জানেন—আমি চাকরী করতে গিয়েছিলাম, টাকার লোভে নয়, কাজ শিখেছি ভাল ক'রে, ভাল কাজ দেখাব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেখলুম এক দল মজুর নিয়ে পথে পথে মাটি কাটা ছাড়া কোন কাজের ভারই আমার ওপর দেওয়া হ'ল না। লেখালেখি করলাম, কোন ফল হ'ল না। বরং ঐ লোকটা চটে গিয়ে আরও দুর্ব্যবহার করতে লাগল। বিনত সেবার পুরস্কার পেলাম অপমান আর লাঞ্ছনা।...অগত্যা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করলাম—যে বিদ্যা শিখেছি তা একদিন আংরেজদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে বুঝিয়ে দেব তার মূল্য। আমাকে অবহেলা করার দাম কড়া-ক্রান্তিতে বুঝে নেব।'

বলিতে বলিতেই আবার মহম্মদ আলি খাঁর মুখ-চোখের চেহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত হইয়া উঠিল। চোখের চাহনিতে তেমনি ঘৃণা উগ্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'মাপ করবেন পেশোয়া, এসব কথা এখন থাক্। এসব কথা ভাবলে আমার জ্ঞান থাকেনা। আমি এখন যাই—।'

'কোথায় যাবেন আপনি ?'

'আমার বিবি আছে, ছুটো বাচ্চাও আছে। তাদের আমিই এ দুনিয়াতে এনেছি। তাদের উপর আমার কর্তব্য আছে একটা। জানিনা কী আগুন জ্বলবে—কতদূর ছড়াবে তার শিখা। আমরা জিত্‌লেও হয়ত আমি পড়তে পারি ওদের হাতে, হয়ত মারা যেতেও পারি। সে ক্ষেত্রে আমার বাড়ী খুঁজে বার করা দুষমনদের পক্ষে কঠিন হবেনা।···তাই ওদের দূর দেহাতে কোথাও সরিয়ে রেখে আসতে যাচ্ছি, যেখানে আংরেজের গোয়েন্দা তাদের খুঁজে বার করতে পারবেনা, আর—আমি যদি কোনদিনই না ফিরি ত যেখানে তারা দুখানা রুটির অভাবে শুকিয়ে মরবে না।'

'আবার কবে আপনার দেখা পাব।'

'লড়াই যখন সত্যি-সত্যিই বেধে উঠবে তখন আমি নিজেই ছুটে আসব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন পেশোয়া। আল্লিমুল্লাকে আমি জবান দিয়েছি। এখন চলি—বন্দিগী।'

নানাসাহেব তাঁহার সহিত সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত আসিলেন। প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু আপনি কেন এসেছিলেন তা ত বললেন না।'

মহম্মদ আলি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে বিচিত্র এক হাসি। সে হাসি এক-দ' বাতির ঝাড়ের আলোতে নানাসাহেবের চোখে না পড়িবার কোন কারণ নাই। তিনি এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে নানাসাহেবের চোখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'এসেছিলুম দুটি কারণে। তার মধ্যে মুখ্য কারণ হ'ল আপনাদের কাছে ছুটি নেওয়া।'

'আর গৌণ কারণটা ?' হাসি-হাসি মুখেই নানাসাহেব প্রশ্ন করেন।

'গৌণ কারণটা হ'ল—'মহম্মদ আলি খাঁর মুখের হাসি ও চোখের দৃষ্টি বিচিত্রতর হইয়া ওঠে, 'আপনাদের চোখে-মুখেই আপনাদের ললাট-লিপিটা পড়তে চেয়েছিলাম।'

'কি পড়লেন ?' যেন সাগ্রহে প্রশ্ন করেন নানাসাহেব। তাঁহার মুখের হাসি তখন মিলাইয়া আসিয়াছে।

বাহিরের তামসী প্রকৃতির দিকে আঙুল দেখাইয়া মহম্মদ আলী খাঁ বলিলেন, 'অন্ধকার। ঐ অমনি-জমাট বাঁধা অন্ধকার।···আপনি এখন আগুনটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন না পেশোয়া ? ঐখানেই ভবিষ্যৎলিপি পাঠ ক'রে নিতে পারতেন। হঠাৎ আগুন জ্বলল—লাল হয়ে উঠল আকাশ। কিন্তু তারপর ? সে তিমির সেই তিমির। অনেক পাপ আমাদের সঞ্চিত আছে পেশোয়া—যুগ যুগ ধরে সেই পাপ জমছে। আপনারা দেশবাসীর বুকের রক্ত শোষণ ক'রে এনে মা ভবানীর চরণে পুজো দিয়েছেন। আমরাও কম যাইনি। বিধাতার শাস্তি আজ মাথা পেতে নিতে হবে বৈকি। কোথাও কোন আশা নেই—কোথাও কোন আশা নেই।'

তারপর স্তম্ভিত নানাসাহেবকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়াই মহম্মদ আলি দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিলেন।

১৯

মহম্মদ আলি খাঁ রাস্তায় বাহির হইয়া বেশ দ্রুত-পদেই হাঁটিতেছিলেন। তাঁহার গন্তব্য স্থানে যাইতে চকের মধ্য দিয়া পথটাই সোজা হয়। পাড়াটা ভাল নয়—'রেণ্ডিময়রা' বলিয়া মহম্মদ আলি খাঁর বরং ঘৃণাই ছিল কিন্তু আজ একটু তাড়াও আছে। তাই খানিকটা ইতস্তত করিয়া তিনি সেই পথই ধরিলেন।

শহরের সর্বত্রই আজ উত্তেজনা। সে উত্তেজনার ঢেউ এপাড়াও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দোকানপাট অন্যদিন এ সময় বন্ধ হইয়া যায়—আজ এত রাত্রেও সবগুলিই প্রায় খোলা আছে। বাজারের মাঝে-মাঝেই জটলা। সংকীর্ণ গলি পথের সবটুকু জুড়িয়াই সে জটলা চলিতেছে। ভীড় ঠেলিয়া যাওয়াই শক্ত। 'আংরেজ-রাজ' শেষ হইয়া আসিল, ফরাজদিল নবাব ওয়াজিদ আলি শা আবার ফিরিয়া আসিতেছেন—অধিকাংশ জটলারই আলোচ্য বিষয় এই। এ সব আলোচনায় মহম্মদ আলি খাঁর কান ছিল না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবেই পথ হাঁটিতেছিলেন। পথের ভীড়ে বার বার গতি ব্যাহত হওয়াতে একটু অসহিষ্ণু হইয়াও উঠিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে বেশ রূঢ় ভাবেই লোকজন সরাইয়া পথ করিতে হইতেছিল। গুজব-রাজদের ইহাতে চটিবার কথা, কেহ কেহ রোষ-কষায়িত নেত্রে তাকাইতেও ছিলেন কিন্তু চকচকে বাঁকা তলোয়ার, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, উগ্র ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টি এবং কটিবন্ধে তরবারীর

দিকে তাকাইয়া কেহই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিল না। তিনি কিছু বিলম্বে হইলেও নির্বিবাদেই পল্লীর শেষ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিলেন।

কিন্তু এই অবধি আসিয়াই সহসা বাধা পাইলেন তিনি।

চক বাজারের শেষ প্রান্ত হইতে যে রাস্তাটা বাহির হইয়া মন্দিভবনের অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তাতে মিশিয়াছে, সেই মোড়টায় পৌঁছিয়া মহম্মদ আলি খাঁ লক্ষ্য করিলেন দুইটি ঘোড়সওয়ার এক রকম পথ জোড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিছু দূরে আরও একজন। শেষ ব্যক্তিটির হাতে একটা ছোট মশাল, সেই আলোতে তাহার মুখখানা দেখা যাইতেছে। এমন বীভৎস ও কদাকার মুখ মহম্মদ আলি খাঁ আর আগে কখনও দেখেন নাই।

পথটা এখানে একেবারেই নির্জন। কাছাকাছি পল্লীও বিশেষ নাই। বেশীর ভাগই মাঠ ও সব্জী বাগান। যা দুই একটি বাড়ী এদিকে আছে, তাহার অধিবাসীরা নিশ্চয়ই সকলে শহরে গিয়াছে তামাসা দেখিতে ও উত্তেজনার অংশ গ্রহণ করিতে। এই জন-হীন পথে এমন ভয়াবহ দানবাকৃতি লোককে নিঃশব্দে স্থিরভাবে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া যেরূপ ধারণা হয়—মহম্মদ আলির সেইরূপই হইল। তিনি কোমরের তলোয়ারে হাত দিলেন।

অপেক্ষাকৃত সামনে যে দুজন ছিল তাহাদের মুখে পিছনের আলোর ছায়াই পড়িয়াছিল—সুতরাং এতক্ষণ সে মুখ-দুইটি একেবারেই দেখা যায় নাই। এইবার তাহাদের একজন কথা কহিল, 'ভয় নেই মহম্মদ আলি খাঁ, আমরা আপনার দুষমন নই। আপনি নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন। তলোয়ার খোলার দরকার হবে না।'

নারীকণ্ঠ। পরিচিত—হাঁ, পরিচিত বৈকি।

শুধু তাই নয়—এই বিশেষ বিদ্রূপের ভঙ্গীটি যেন বহু বৎসরের বিস্মৃতি পার হইয়া আসিয়া স্মৃতির দুয়ারে সহসা একটা আচম্বকা ঘা দিল। সে আঘাতে মহম্মদ আলি যেন চাবুক খাওয়ার মতই চম্‌কাইয়া উঠিলেন। নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—'আমিনা!'

ততক্ষণে অশ্বারোহিনীও ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িয়াছে। বিমূঢ় মহম্মদ আলি খাঁর সামনে আসিয়া ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নোয়াইয়া সে বলিল, 'আমি আপনারই অপেক্ষা করছিলাম খাঁ সাহেব।'

এবার আর বিদ্রূপের সুর নাই কণ্ঠে—বরং কেমন যেন একটা কুণ্ঠাই প্রকাশ পাইতেছে।

মহম্মদ আলি খাঁও ততক্ষণে আঘাতটা সাম্‌লাইয়া লইয়াছেন। বরং সামান্য একটা ভ্রূকুটির আভাসও তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি শান্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, 'আমাকে আপনার কি দরকার বেগম সাহেবা?'

আমিনা তখনই জবাব দিতে পারিল না। 'বেগম সাহেবা' শব্দটা তাহাকেও চাবুকের মত আঘাত করিয়াছে। সেটা পরিপাক করিতে সময় লাগিল। তাহার পর বিনম্র নতমুখে জবাব দিল, 'একটা সাহায্য চাইবার ইচ্ছা ছিল—তাই।'

'কি সাহায্য বলুন।' নিস্পৃহ নিরাসক্ত কণ্ঠে মহম্মদ আলি খাঁ উত্তর দেন।

'লক্ষ্ণৌয়ের হাওয়া যথেষ্ট গরম হয়ে উঠেছে। সামান্য চেষ্টা করলেই এখন মৌলভী সাহেবকে উদ্ধার করা যায়। এ সময় তাঁকে বড় দরকার। তিনি এখনকার কয়েদখানাতেই আছেন!'

কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া মহম্মদ আলি খাঁ উত্তর দিলেন, 'বেগম সাহেবা আমাদের লক্ষ্য এক, পথও হয়ত অনেকটা এক। কিন্তু আপনার প্রত্যক্ষ কোন কাজে আমি আসতে পারব না, মাফ্ করবেন।...প্রতিহিংসা পুরুষের কাজ, সে ভার আমিই স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলুম। তার জন্য আপনাদের এত নীচে, এত পাঁকে না নামলেও চলত। যা দেখলুম তা দেখবার জন্য বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল না। এ দেখতে হবে জানলে বহুদিন আগেই এ দুনিয়া ছেড়ে খুদার দরবারে গিয়ে দাঁড়াতুম।...না বেগম সাহেবা—আপনার পথ আর আমার পথ এক হ'লেও এক রকম নয়। মাফ্ করবেন। আমার ভরসায় আপনি এ পথে নামেন নি। আমিও আপনার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবার ভরসা রাখিনি।...যা পারেন আপনিই করুন।'

মশালের আলোটা তখনও পিছনে। সুতরাং হুসেনী বেগমের মুখখানা ছায়াতেই রহিল আগাগোড়া, মহম্মদ

আলি খাঁর কথাগুলো সেখানে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল তাহা বোঝা গেল না। শুধু পাষাণ-প্রতিমার মত খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেমন একপ্রকার স্খলিত স্বর-কণ্ঠে সে কহিল, 'আপনার মত ধৈর্য আমার নেই মহম্মদ আলি খাঁ, তাছাড়া আপনি কবে কি করবেন তার জন্য অপেক্ষা করবারও কোন উৎসাহ পাইনি। আপনি বিবাহ করলেন, আপনার সন্তান হ'ল—নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, সম্মানের জীবন আপনার। আমাদের আর কোন্ পথ খোলা ছিল তাও জানি না। যদি দিশেহারা হয়ে এই পথেই নেমে থাকি ত আমাদের দু বোন কারুরই লজ্জিত হবার কোন কারণ আছে ব'লে মনে করি না। জ্বালা আমাদেরই বেশী—নয় কি?···তাছাড়া আজ তিরস্কার করছেন কিন্তু আপনার মধুময় দাম্পত্য জীবনের কোনও এক অবসরে আমাদের খবর নেওয়ার কথা মনে এসেছিল কি আপনার?'

মহম্মদ আলি খাঁর মুখ এতক্ষণ উত্তেজনায় আরক্ত ছিল। এবার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ যেন কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলেন না। তাহার পর ঈষৎ মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলেন, 'হয়ত অপরাধ আমারই বেগম সাহেবা কিন্তু তবু আপনার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারব না। সারা জীবনই উৎসর্গ করেছি এই কাজে। বাঁচবার আশা বা ইচ্ছা কোনটাই রাখি না—কিন্তু দূরে থেকেই আপনার সেবা করব।··· মৌলভী সাহেবের মুক্তি আপনার পক্ষে ছেলেখেলা, তাও আমি জানি, আমাকে আপনার দরকার হবে না। আচ্ছা আদাব।'

এ পক্ষ হইতে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঘোড়াগুলিকে পাশ কাটাইয়া তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই অন্ধকার দূর পথে তাঁহার সাদা মূর্তিটা বিন্দুর মত দেখাইতে দেখাইতে এক সময় মিলাইয়া গেল।

আমিনা অনেকক্ষণ সেইখানেই পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার আসিয়া ঘোড়াতে উঠিল। মুহূর্তে কোন প্রশ্ন করিল না, কারণ সে ইহাদের কথোপকথন শুনিতে না পাইলেও এখন মশালের আলোতে মালেকানের বিবর্ণ মুখে ক্ষণে ক্ষণে রক্তোচ্ছ্বাস দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে এখনকার এই সাক্ষাৎকারটা মালেকানের পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই। তাই হুসেনীবেগম ঘোড়া ফিরাইলে বিনা-বাক্যে সে তাহার পিছু লইল। সর্দার খাঁও তেমনি ব্যবধান বজায় রাখিয়া পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল।

একটু পরেই দলটি চক বাজার ছাড়াইয়া আমিনাবাদের পথে আসিয়া পড়িল। পথে পথে জটলা ও আলোচনার শেষ নাই—পথ চলাই দায়। আমিনার অবশ্য সেদিকে লক্ষ্যও ছিল না, সে এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কতকটা অন্যমনস্কের মতই পথ চলিতেছিল; ভীড় সরাইয়া মানুষ বাঁচাইয়া চলিতে হইতেছিল বটে, সব কাজই করিতেছিল কতকটা যন্ত্রের মত, তাহাতে মন ছিল না। হয়ত বা সে নিজের বিচিত্র অদৃষ্টের কথাই চিন্তা করিতেছিল, অথবা কিছুক্ষণ আগেকার পরোক্ষ তিরস্কারের অপমানটাই সম্পূর্ণ পরিপাক করিতে পারে নাই।···মনটা একটা রুদ্ধ আক্রোশে দুর্ভাগ্যের দুয়ারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছিল, আর তাহারই ব্যর্থতা অসহায় চিত্তবিক্ষোভে মানসিক নিষ্ক্রিয়তা আনিয়া দিয়াছিল বলিয়া বাহিরের কোন কিছুতেই মন দিতে পারিতেছিল না।

কিন্তু সে যাই হোক—অকস্মাৎ তাহার মন অতীতের রোমন্থন ও চিত্তক্ষোভ হইতে একেবারে বাস্তবে চলিয়া আসিল। সামনেই যে জটলা তাহা ঠিক সাধারণ লোকের নয়—উত্তেজনাটাও যেন একটু অন্য ধরনের।

মনটাকে সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিকে লইয়া আসিতে কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব লাগিল। পুরাপুরি ভাবে সচেতন হইলে দেখিল কয়েকটি সিপাহী একটি নিতান্ত নিরীহ লোককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অত্যন্ত কটু ভাষায় গালিগালাজ করিতেছে।

'শালা বেসরম কাঁহিকা—মার শালাকো।'

'বাংগালী এইসাই বেইমান হায়। আংরেজ কা কুত্তা!'

চোখের পলকে আমিনা ভীড়ের মধ্যে ঘোড়া চালাইয়া দিল। সিপাহীর দল এই উপদ্রবে বিরক্ত ও রুষ্ট হইলেও পথ না ছাড়িয়া দিয়া উপায় রহিল না। আমিনা কাছে

আসিয়া দেখিল তাহার অনুমানই ঠিক—ইহাদের গালা-গালি ও ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্যটি আর কেহই নয়, হীরালাল। এতগুলি সশস্ত্র সিপাহীর মাঝখানে অতিশয় বিপন্ন মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

'কী ব্যাপার বাবুজী?' আমিনা বেশ একটু কর্তৃত্বের সুরেই প্রশ্ন করিল।

হীরালাল এতক্ষণ পুরুষবেশী আমিনাকে চিনিতে পারে নাই, পথের আলোও এমন প্রখর নয় যে দেখা যাইবে কারণ তখনকে দোকান পাট বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাছাড়া এইখানে এমন অবস্থায় সে তাহাকে দেখিতে পাইবে—ইহা সুদূর কল্পনারও অতীত। যাহা হউক কণ্ঠ-স্বরেই সে তাহার জীবনযাত্রীকে নিঃসংশয়ে চিনিতে পারিল, এবং ইনি যে তাহার শুভাকাঙ্খিনী কোন দেবীই মূর্তিমতী মাতৃ-আশীর্বাদের মত সর্বদা সঙ্গে রহিয়াছেন সে বিষয়েও আর সন্দেহ রহিল না। সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, সকৃতজ্ঞ আবেগে এক নিঃশ্বাসে সবটা বলিয়া গেল—মীরাটের জেনারেল সাহেবের কাছ হইতে এক গোপনীয় ও জরুরী 'খৎ' লইয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়াছিল। যথাস্থানে অর্থাৎ লরেন্স সাহেবের কাছে সে চিঠি পৌঁছাইয়া দিয়া একটু শহর দেখিতে বাহির হইয়াছিল। তাহার পর এখানের হট্ট গোল ও উত্তেজনা দেখিতে দেখিতে রাত হইয়া গেছে, বিশেষত অগ্নিকাণ্ডটা দেখিয়া সে একটু ভীত ও উদ্‌ভ্রান্তও হইয়া পড়িয়াছিল—এতটা যে দেরী হইয়াছে বুঝিতে পারে নাই। এখন পথ চিনিতে না পারিয়া সিপাহীগুলিকে দেখিয়া পথ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া এই বিপদে পড়িয়াছে। সিপাহীরা জানিতে চাহিতেছে সে খতের মধ্যে কী লেখা ছিল। তাহারা কেমন করিয়া যেন চিঠির খবর আগেই পাইয়াছে।

'অথচ' বিপন্ন ব্যাকুল কণ্ঠে হীরালাল কহিল, 'মা কালীর দিব্যি—আমি সত্যিই জানিনা সে খতে কী লেখা ছিল, বিশ্বাস করুন। কিন্তু এরা তা মানতে চাইছে না। মেরে ফেলবে ব'লে ভয় দেখাচ্ছে।'

'তোমার কোন ভয় নেই বাবুজী, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

হুসেনীর বিচিত্র ছদ্মবেশে (কারণ এখন তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া চিনিতে কাহারও অসুবিধা ছিল না) এবং মর্যাদা ব্যঞ্জক ভাব-ভঙ্গীতে অনেকেই বেশ ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। তবু উহারই মধ্যে একজন সাহসে ভর করিয়া কী কহিতে গেল, 'লেকিন—'

আমিনা সামান্য ভ্রূভঙ্গী করিয়া উহার দিকে তাকাইল। ততক্ষণে সে তাহার কোমর হইতে হাতীর দাঁতের কাজকরা পিস্তলটাও বাহির করিয়াছে। সর্দারও বাঁ-হাতে মশাল ও ডান হাতে অস্বাভাবিক লম্বা একটা খোলা তলোয়ার হাতে বড় বেশী কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। প্রশ্নকারীর মুখের প্রশ্ন মুখেই মিলাইয়া গেল।

আমিনা কহিল, 'যে এর গায়ে হাত দেবে সে যেন জানের মায়া না রেখে যেয়।...নানা সাহেবের নাম শুনেছ? পেশোয়া ধুন্দুপন্থ? তিনি লক্ষ্ণৌ এসেছেন তা জানো? আমি একে তাঁর কাছেই নিয়ে যাচ্ছি—যা জিজ্ঞাসা করবার তিনিই করবেন। এসো বাবুজী।'

আমিনা একটা হাত বাড়াইয়া দিল, তাহার পর রেকাবে আটকানো নিজের পা-টা দেখাইয়া বলিল, 'উঠে পড়ো শিগগির। তুমি নিশ্চয়ই এতদিনে ঘোড়ায় চড়তে শিখেছ।'

হীরালাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে আমিনার অনুমান ভুল নয়। কিন্তু তাই বলিয়া সে আমিনার পায়ের উপর পা দিতে পারিল না, এমনিই এক লাফে অবলীলাক্রমে আমিনার পিছন দিকে উঠিয়া বসিল। আমিনার পায়ের ঈষৎ চাপ পাইয়া শিক্ষিত ঘোড়া চোখের নিমেষে ভীড়ের মধ্য হইতে পিছু হটিয়া বাহির হইয়া আসিল...

তাহার পর এগলি সেগলি ঘুরিয়া আবার জনহীন পথ। আমিনার পিঠটা একেবারে বুকের সহিত লাগিয়া আছে। এ এক অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এ পথ আর পথচলা যদি জীবনে না ফুরায় তাহা হইলেও বোধ করি আপত্তি নাই।

'উঃ'। গিয়ানেরই এক প্রান্তে হীরালাল মুখের ঘাম মুছিয়া কহিল, 'আপনি এসে না পড়লে কী বিপদেই পড়তুম। আজ আর বোধ হয় জান নিয়ে ফিরতে হ'ত না। আবারও আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন, বার বার তিনবার।'

'এইসব গোলমালের সময়, হাতিয়ার নিয়ে বেরোও না কেন বাবুজী। এত বড় একটা কাজে আসছ, চারিদিকে এত গণ্ডগোল—একটা পিস্তল চেয়ে আনতে পারোনি?'

অপরাধীর মত মাথা চুলকাইয়া হীরালাল কহিল, 'সাহেব দিতে চেয়েছিলেন, আমিই ওসব হাঙ্গামা দেখে নিইনি।'

'কাজটা ভাল করোনি বাবুজী।'

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলার পর হীরালাল দেখিল তাহার এ এক বিশ্রী রকমের অনুভূতি হইতেছে। ঘাম যেন বাড়িয়া গিয়াছে, কণ্ঠ ও তালু শুকাইয়া উঠিয়াছে—বুকের মধ্যেও কেমন যেন করিতেছে।

সে জোর করিয়া কথা কহিল, 'কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন বলুন ত।

'নানা সাহেবের কাছেই। আমি যাবো না, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাও তাঁকে বলো না···আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তারপর—তোমাকে ছাউনীতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও আমি করব। ভয় নেই।'

'ভয়?' হীরালাল হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, 'আপনার যখন দেখা পেয়েছি তখন আর আমার কাউকেই, কিছুতেই ভয় নেই!'

'তাই নাকি' আমিনা হাসিল। অত্যন্ত বিদ্রূপের সুর তাহার কণ্ঠে।

অন্ধকারেই হীরালাল বেচারী লাল হইয়া উঠিল।

ক্রমশ

স্মৃতি-কথা

শ্রীকালিদাস রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শশধর রায়কে কুঞ্জ পাঠিয়েছিলাম—তিনি খুব আদর করলেন। তিনি, রজনীকান্ত সেন, ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ মিত্র, পণ্ডিত শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য্য (এখন আমার প্রতিবেশী), অধ্যাপক হেমচন্দ্র বাগচী ইত্যাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কবিবর রজনীকান্ত সভায় অনেকগুলি স্বরচিত গান গাইলেন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন এবং খুব আদর করলেন। কুঞ্জের মারফতে আগেই তাঁর সঙ্গে পত্র পরিচয় ছিল। রাজসাহি যাত্রার সবচেয়ে বড় লাভ হ'ল রজনীকান্তর স্নেহ লাভ।

ফিরবার পথে আমাদের বোটে কবি রমণীমোহন ঘোষ উঠলেন—সারা পথ তাঁর সঙ্গে কাব্য আলোচনা হ'ল। তিনি আমাকে ছন্দোবন্ধ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। তাঁর কবিতা আমার বেশ ভালো লাগত। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহলাভ করেছিলাম।

ফিরে এসে রজনীকান্তকে কবিতায় একটা চিঠি লিখলাম। সে চিঠিখানা এই—

তোমারে দেখিব বলি গিয়াছিনু কবি
সাহিত্য সভার এক অনুষ্ঠাত ধরি,
ধন্য হইয়াছি তব আলিঙ্গন লভি
আজো মোর অঙ্গ উঠে শিহরি শিহরি।
গঙ্গোত্রী হইতে যেন জাহ্নবীর ধারা
ঝরিল ও কণ্ঠ হতে সঙ্গীত লহরী।
অযাচিত এ গৌরবে আমি আত্মহারা
ফিরিলাম পদ্মাপারে গঙ্গা স্নান করি।
তোমার কল্যাণী বাণী শক্তির আধার
পাথেয় সম্বল হোক জীবনে আমার।

উত্তর পেলাম—

ভালবাসিয়াছি তোমা প্রথম দর্শনে
এদেহ পবিত্র হলো ও দেহ স্পর্শনে।
কুণ্ঠার শীতের কুজ্ঝে মেলিল যা চোখ
শরতের শতদলে পূর্ণ তাহা হোক।

রজনীকান্তের কবিতাই দিন কতক আমার পরম আলোচ্য বস্তু হয়ে পড়ল। অনুকূল আবহাওয়া পেলাম—আমার সহপাঠী বিষ্ণুপ্রসাদ সেনের (এখন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ) গৃহে। বিষ্ণুপ্রসাদের ভগিনীপতি গিরিজা ছিল রজনীকান্তের ভাইপো। সে তখন শ্বশুরবাড়ীতেই থাকত। রজনীকান্তের গান তখন সারা বাংলা দেশে গাওয়া হত।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যু হ'ল। আমাদের কলেজে সেজন্য একটা শোকসভা হ'ল। সভাপতি ছিলেন জেলার জজ কবি বরদা চরণ মিত্র।

আমি একটা মস্ত বড় শোকগাথা লিখে সভায় পড়েছিলাম। জজ সাহেবের খুব ভালো লেগেছিল। তিনি সভান্তে আমাকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন—"আশীর্বাদ করি তুমি হেমচন্দ্র হও।"

আমি হেমচন্দ্র হই না হই—শহরে আমার খ্যাতির অসামান্যরূপ বেড়ে গেল—বিশেষতঃ উকিল মোক্তারদের মহলে। স্বয়ং জজ সাহেব চেয়ার হতে নেমে আলিঙ্গন দিলেন, একি সোজা সম্মান!

শহরে ত খ্যাতি বেড়ে গেল, কিন্তু এদিকে সঙ্গতিপন্ন লোকদের বাড়ীর প্রত্যেক বিবাহে ও শ্রাদ্ধের জন্য কবিতা লিখে দিতে হ'ত। কবিতায় বহু অভিনন্দন লিখতে হ'ত। আর প্রত্যেক সভার জন্য গান লিখতে হ'ত। গিরিজা শঙ্কর (পরে দেশ বরেণ্য গায়ক) চক্রবর্তীকে সে সব গানে সুরসংযোগ করে সভায় সভায় গাইতে হ'ত। আমি গানের

রচয়িতা, গিরিজাশঙ্কর গায়ক—এ দুর্লভ যোগাযোগটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তবে তখন জানতাম না গিরিজাদা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী ব'লে ভবিষ্যতে গণ্য হবেন।

এখন হতে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গ আর ভালো লাগতনা —একটু বড় বড় লোকের সঙ্গের জন্য উৎসুক হতাম। বৈকুণ্ঠবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র রমণীবাবু আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর কাছে অনেক সময় কাটত। মাঝে মাঝে তাঁর বন্ধু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কলিকাতা থেকে যেতেন—তাঁর সঙ্গ লাভ করে সাহিত্য-জগতের অনেক খবর পেতাম। তখন হতে তাঁর স্নেহ লাভ করলাম। মাঝে মাঝে চাঁদা সংগ্রহের জন্য সারগাছি আশ্রম হ'তে অখণ্ডানন্দ স্বামী ঐবাড়ীতে আসতেন। তাঁর কাছে ধর্মজগতের খবর পেতাম।

আমার সহপাঠী ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (তাকে আমরা বক্তৃতার জন্য বার্ক বলে ডাকতাম) সঙ্গে তার মেসো মশায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের কাছে যেতাম। অধিকাংশ সময় তিনি অপ্রকৃতিস্থ থাকতেন। তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার সুযোগ হ'ত না। যে দিন প্রকৃতিস্থ থাকতেন সে দিন তিনি কোঁৎ, লক, হিউম, স্পেনসার, মিল, বার্কলি ইত্যাদির দার্শনিক তত্ত্বের কথা বলতেন। ফিলসফির ছাত্র ছিলাম—অনেক কথাই বুঝতাম।

চন্দ্রশেখর বাবু বঙ্কিম যুগের লোক, বঙ্গদর্শনে একসময় লিখতেন। ইনি ফরাসী ভাষা ভালো জানতেন। ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে অনেক কথা আদায় করা যেত।

নিখিল নাথ রায় ছিলেন মিতভাষী, তাঁর কাছে গিয়ে ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে অনেক কথা জানা যেত।

কবি যতীন্দ্রমোহন একবার বহরমপুরে এলেন। এখানে তাঁদের জমিদারি কাছারি ছিল এবং এক ভাই উকিল ছিলেন। তখন তার 'লেখা' কাব্যগ্রন্থখানি বেরিয়েছে। সহপাঠী নগেন চৌধুরী ওঁদের বাড়ীতে থাকত। তার সঙ্গে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করলাম। কবিতা শোনাতে যাইনি, কবিতা শুনতেই গিয়েছিলাম। কবি তাঁর লেখার কবিতাগুলি পড়ে শুনালেন। কবিতাগুলি এত ভালো লাগল যে নিজের লেখাগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছা হ'ল।

একটা বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এলেন। আমার এক আত্মীয়কন্যার সঙ্গেই বিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রপৌত্রের সঙ্গে। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সহজেই আলাপ হ'ল। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

গঙ্গার নিকটেই ছিল আমাদের বাসা। বাড়ীতে একেবারে মন বসত না। গ্রীষ্মের জ্যোৎস্না রাতে ঘরের মধ্যে আলো জেলে বই পড়া একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হত। বহু রাত পর্যন্ত গঙ্গার ধারে একাই কাটাতাম। মনটা ক্রমে উদাস উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। লিখবার শক্তিটা কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

এই সময়টাকে স্মরণ করে ৩৪ বৎসর পরে একটা কবিতা লিখেছিলাম।

মনে পড়ে চাঁদনী রাতের দুটন্ত যৌবন,
গঙ্গা তটের বাঁধাঘাটে উদাস জাগরণ।
দুরন্ত এক তৃষ্ণা নিয়ে উড়ন্ত পাখায়
কল্পনা মোর নীড় খুঁজিত দূর গগনের গায়।
গীতের ধ্বনি আসত ভেসে পল্লী কুটীর হতে
ওপার থেকে মাঝে মাঝে হালকা হাওয়ার স্রোতে।
উল্কামুখীর আলোকে মাঠে উল্কা আসা যেমনে
ঝলকে উঠে স্বপ্ন সম মিলিয়ে যেত ক্রমে।
রৌপ্যধবল বালুর পরে ছুটত কতই ছায়া
কায়া কোথায় ? মনে হতো পরী লোকের মায়া।
তেঁতুলগাছে ঝটপটানি বাদুড় জনতার,
মনে হতে ছটফটানি ক্ষুধিত আত্মার।
চাঁদের লোকে মেঘ ছুটিত আকুল হতো মন।
মেঘের দেশে কি লোভে মন ছুটত অকারণ ?
কাক ডাকিত শিমুল গাছে দিন ভাবিয়া বুঝি
একে একে ঘুরিয়ে যেত দীন জোনাকির পুঁজি,
নিশীথচর দস্যুপাখীর হঠাৎ উপদ্রবে
বটের নীরব কুলায়গুলি ভরত কলরবে।
নিভে যেত একে একে দুটি পারের আলো।
একেশ্বরী শর্বরীকে লাগত বড়ই ভালো।
আসত থেমে ক্রমে ক্রমে নরনারীর সাড়া
নীরব হত ঘুমের ঘোরে সেন বাবুদের পাড়া।

থানার ঘড়ির শব্দগুলো স্পষ্ট যেন গোণা,
আস্তাবলে ঘুরের অাওয়াজ আর যেত না শোনা।
বসে বসে এমনি করে দুপর যেত বাজি।
ঘুমিয়ে যেত ছইএর পরে খাগড়া ঘাটের মাঝি।
ঘুমিয়ে যেত শ্মশান শিয়াল দুপুর ডাকের পরে।
গিরগিটিরা ঘুমিয়ে যেত কোটরে কোটরে।
ফিরতে ঘরে মন ছিল না টান ছিল না তার
তার চেয়ে যে অনেক ভালো মা গঙ্গার ধার।
ছিল না ত জানা প্রিয়ে কোথায় তোমার ধাম,
তারায় তারায় জ্যোৎস্না ধারায় কোথায় খুঁজিতাম।
আজ মনে হয় এমনি কতই জ্যোৎস্নাময়ী রাতি
বৃথাই গেছে গঙ্গাতীরে ধূসর ঝাঁচল পাতি।
চৈতী হাওয়া বৈতে যদি আসতে মধুকরী,
নিষ্ফলতায় ঝরত না এই যৌবন মঞ্জরী।
সত্য কি এ ব্যর্থ প্রিয়ে ? চাঁদের আলোয় মন
করছিল না আলতা ধুয়ে বরণ আয়োজন ?
নাই কি কিছু সেই আলোতে পথ চাওয়াটির দাম ?
না খুঁজিতেই ধরা দিলে মর্ম বুঝিতাম ?
আকাশ কুসুম দিয়ে যদি ভরিতাম সাজী,
কিসে তোমার কবরী ধাম সাজিয়ে নিতাম আজি ?

• • •

সাহেব একদিন আমাকে ডেকে বল্লেন কালিদাস, তুমি কবিতা লেখ, এক কাজ করো—ইংরাজি কবিতা খুব পড়ো, শুধু পাঠ্য পুস্তকের কবিতার উপর নির্ভর কোরো না, কীটস, শেলি, মেথিউ, আর্নল্ড, টেনিসন, বার্নস, কোলরিজ ইত্যাদি কবিদের বাছাবাছা কবিতার অনুবাদ করো। তিনি টেনিসন ও বার্নসের কবিতাবলী উপহার দিলেন।

আমি বৈকুণ্ঠ বাবুর বাড়ীর লাইব্রেরিতে খুঁজতে লাগলাম—ঐ সব কবিদের কবিতাবলীর সটীক সংস্করণ। অনেকগুলি বই পেয়ে গেলাম—সেগুলি পড়তে লাগলাম। কতক বুঝতাম—কতক বুঝতাম না। এইসব কবিতার বোঝা-না-বোঝার আলো আঁধারি দিয়ে আমার মনে একটা রোমান্টিক স্বপ্নজগতের সৃষ্টি হ'ল। প্রকাশ করতে পারতাম না—সেই রহস্যময় স্বপ্ন জগতের কথা। লাভের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক থেকে মনটা যেন রেহাই পেল। তবে অনেক কবিতার গদ্যানুবাদ করে ফেললাম। সে সব খাতায় বন্দী হয়েই আছে। কতকগুলো প্রকাশ করেছি। সেগুলো মাসিক পত্রে পাঠালে সহজে ছাপা হ'ত। কিন্তু সেগুলো কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। দেখলাম অনূদিত কবিতা কেউ পড়ে না। কয়েক বৎসর পরে সত্যেন্দ্রনাথের তীর্থ সলিল, তীর্থরেণু পড়ে মনে হ'ল—সে গুলো মুক্তা, আর আমার অনুবাদগুলি শুক্তি। সেগুলোকে আর প্রকাশ করিনি। পর্ণপুটের প্রথম সংস্করণে ২।৪ টাকে ঠাঁই দিয়েছিলাম। তারপর আর কোন বইয়ে ঠাঁই দিই নি।

এই অনুবাদনের কাজ আমার হয়ত ব্যর্থ হয়নি—এতে হয়ত অনুশীলনের কাজ হয়েছে। এটাত আমার শিক্ষা-নবিশির সময়। সাহেব সম্ভবতঃ শিক্ষানবিশি করতেই বলেছিলেন। অনূদিত কবিতার সংখ্যা কম ছিল না—তিন খানা মোটা খাতা ভরতি। সেগুলো পুড়িয়ে ফেলিনি—মাঝে মাঝে সেগুলো পাতা উল্টে উল্টে দেখি। পরে একদিন পাতা উল্টাতে উল্টাতে একটা কবিতা লিখেছিলাম। সেই কবিতাটি এই—

পচা ছেঁড়া পাতা কবিতার খাতা ধুলো ঝেড়ে জড়ো করি
উল্টিয়ে যাই একে একে তাই আর মাঝে মাঝে পড়ি।
হাতে কাজ নাই সাথী আজ নাই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে মন
পুরানো খাতায় খুঁজিতেছি হায় জীবনের হারাধন।
পড়ে হাসি পায় কত জায়গায় নেহাৎ শিশুর মতো,
ঘরে খিল দিয়া খোঁড়া মিল দিয়া লিখিয়া দিয়াছি কত।
মাঝে মাঝে দেখি দুচার ছত্রে ছন্দ মন্দ নয়,
মৃদু মৃদু হাসি পেয়ে কিশোরের শক্তির পরিচয়।
যাহার লেখারে কিছুখন ধ'রে করিলাম পরিহাস
তার ম্লান মুখ স্মরিয়া পড়িল সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
কৈশোরে যেবা পাঠের কক্ষে গভীর রাত্রি জাগি
তপশ্চরণ করিল কঠোর কবির কাম্য মাগি,
নবযৌবনে প্রণয়াবেদনে মুগ্ধ হ'ল না যেবা,
হেলায় ত্যজিল প্রমোদ পিপাসা লীলা লক্ষ্মীর সেবা
হেলায় হারালো ছাত্র জীবনে কৃতিত্ব গৌরব,
হেলায় হারালো সম্ভাবনার গুহাহিত বৈভব,

অন্তরঙ্গ সুহৃৎ সঙ্গ দিনান্ত বিশ্রাম,
এই খাতা হাতে শ্রমরূপ পাতে খেটে গেল অবিরাম।
সারা বৎসরে কত উৎসব গেল দ্বারে গান গেয়ে,
খুলি বাতায়ন ভুলেও যেজন দেখিল না হায় চেয়ে,
তাহার বেদনা কেহ বুঝিবে না, কেবা বল চিনে তারে ?
বেদনায় তার আজিকে আমার বুক ভরে হাহাকারে।
কতদিন এরে আগুলি রাখিল দীন কৃপণের মত,
দ্বারে কর হানি' চলি গেল হায় জীবনের কত ব্রত।
মা'র দাড়া ভাত শুকায়ে গিয়েছে, সারারাত করি' চুরি
ভরেছে খাতার পাতাগুলি সে যে আঁখরে আঁখরে ভুড়ি।
অকালে ডুবিল এর লাগি কত কল্যাণশশিলেখা,
প্রাণভরা আশা কত ভালবাসা হয়ে গেল মরীচিকা।
তোমরা তাহারে চেননাক কেউ, লুপ্ত সে অনাদরে ;
আজি সে ব্যর্থ জীবনের ধূলি মুছাই করুণাভরে।
সেই অভাগার বেদনায় আঁখি আজিকে অশ্রু ঢালে—
তাহার শ্রমের ব্যর্থ শ্রমের পুঞ্জিত জঞ্জালে !
শ্রমজল এরে মুছেছে কতক, কাল মুছে দিল আধা,
মোর আঁখিজলে ধূলি ধুয়ে পুন পাতাগুলি হয় সাদা।

* * * *

একবার যখন লাইব্রেরীতে মন বসে গেল এবং বন্ধুসঙ্গ আর ভালো লাগলোনা, তখন পড়াশুনা কেবল কবিতাতেই সীমাবদ্ধ থাকল না। তখন দেখলাম বিনা টীকাতেই পড়া চলে এমন বই লাইব্রেরীতে অজস্র। আমাদের পাঠ্য ওয়াল্টার রলির শেকস্‌পীয়ার ছাড়া, ডাউডেন হাজলিট ইত্যাদির সমালোচনা গ্রন্থও পড়লাম। আরো কয়েকটি সমালোচনার বই পড়েছিলাম। মেকলে, রাসকিন, এমার্সন, ল্যাম্ব, এডিসন, গোল্ডস্মিথ, হাজলিট, সুইফ্‌ট, বেকন ইত্যাদির নিবন্ধাবলীও পড়লাম। নিবন্ধগুলি মোটামুটি বুঝ্‌তাম। দেখলাম সহজে বোঝা যায়—নভেল। সাইলাস মার্নার ও টেল অব দি টু সিটিজ আমাদের পাঠ্য ছিল। আমি ইলিয়ট্, থ্যাকারে, ডিকেন্‌স, মারি-করেলি, মিসেস উডের কতকগুলি নভেল পড়লাম। মোপাসাঁ, জোলা, বালজাকের গল্পও অনেকগুলি পড়েছিলাম।

আমার পড়াশুনা সামান্যই। আমাদের কলেজ লাই-ব্রেরি বিরাট—আলমারিগুলির পানে চেয়ে চেয়ে ভাবতাম সমুদ্র সৈকতে উপল কুড়িয়েই বা কি হবে ? অনেক বই শুধু নাড়াচাড়াই করেছি—পড়া আর হয়নি। মহানন্দ জলও অপরিমেয় একটি ঘটের পক্ষে ; তার আধার যতটুকু তার বেশি ত সে নিতে পারে না ; দুঃখ করে লাভ কি ? জগতের জ্ঞান সম্পদ বেড়েই চলবে—লক্ষ লক্ষ বই বেরুবে, কিন্তু আমার শক্তি সীমাবদ্ধই থাকবে, তার দুটো চোখ দুশত চোখ হবে না। সে চোখের শক্তিও বাড়বে না।

জ্ঞানসম্পদ যেমন বাড়ছে তেমনি বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধ হচ্ছে। যে জ্ঞান-শাখায় যার সাধনা সে সেই জ্ঞান শাখার বইএর সন্ধান করবে, গোটা লাইব্রেরির প্রয়োজন তার নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রটা খুবই বিস্তৃত। সাহিত্যিকের পক্ষে নির্বিচারে বই না পড়াই ভালো—কতকগুলি সুনির্বাচিত পুস্তকই তার পড়া উচিত। কারণ, তাকে সৃষ্টি করতে হয়, তার অল্প সময় চাই। এই সব কথা ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করা গেল।

কবিদের মধ্যে কীটস আমাকে মুগ্ধ করেছিল—তাঁর শোচনীয় পরিণাম ও অকালমৃত্যু আমাকে মর্মাহত করে রেখেছিল। কোন দূর দেশের এক যুবক কবির জন্য বাংলার এক কিশোর কবি নিভৃতে গোপনে অশ্রুপাত করেছে দিনের পর দিন। কীটসের উদ্দেশে একটি কবিতা লিখেছিলাম।

মাতা দিল বক্ষে তব কাল যক্ষ্মা বিষ
পিতা দিল দারিদ্র্য চরম
শেলী দিল পাশে ঠাঁই দিল শুভাশিস
হান্ট দিল বন্ধুত্ব পরম।
হৃদয় সঁপিল ফ্যানি তব জীর্ণ হাতে
চ্যাপম্যান হোমারের স্বাদ,
যোসেফ সেভার্ণ দিল সেবা দুঃখ রাতে
ল্যাম্ব তোমা দিল সাধুবাদ
স্বদেশ তোমারে দিল ব্যথা অনাদরে
লকহার্ট বিষশর হানি।
জ্ঞানের সম্পদ দিল গ্রীস অকাতরে
রোম দিল শেষ শয্যাখানি।

বিধাতা তোমারে দিল অতুল অম্লেয়
কবিশক্তি অসামান্যতম
সেই সঙ্গে দিল তব আয়ুর পাথেয়
শরৎত্রে ইন্দ্রধনুসম।
প্রকৃতি তোমারে দিল তৃতীয় নয়ান
সত্যশিব সুন্দরে হেরিতে
অসীম যাত্রার কাল দিল তোমা স্থান
সনাতন সোনার তরীতে।
আমি মূঢ় ছাত্র কবি হীন অতি হীন
তবু আমি সগোত্র তোমার
কৃতজ্ঞ বিনত শিরে স্মরি তব ঋণ
প্রণিপাত দিনু লক্ষবার।

আমার আর একটি কবি ছিলেন শেলী। তাঁর জীবনাবসানও আমার কিশোর চিত্ত বিচলিত করেছিল। তাঁর উদ্দেশেও ছাত্রদশায় একটি কবিতা লিখেছিলাম—

মহাসিন্ধু ছাড়া কেবা তোমার সে বিরাট আত্মারে
বহিতে সহিতে কিংবা ধরিতে বা পারে?
তাই তার মাঝে আত্মা হইল বিলীন
তাহার অসীমে তব ধ্বনিতেছে বাণী নিশিদিন।
মহাকাল তব সৃষ্টি বৈজয়ন্ত রথে
যুগে যুগে দেশে দেশে গেল বহি অনন্তের পথে
অমর হইয়া আছ সৃষ্টির মাঝারে।
ডুবিবে না, ভাসিবে তা চিরদিনকাল পারাবারে।
অস্থি মাংসে গড়া দেহ তরণী ঠেলিয়া দিল কূলে
পৃথ্বের আহার্য্য তা ত বাইরনও যায় নাই ভুলে।
খুঁজে নাই তাই শবাধার
করিল অনলযোগে তারে ভস্মসার।
সুন্দরের হে পূজারী অসুন্দর অসহ্য তোমার
পাছে ব্যাধি শোক জরা করে অধিকার
সে শঙ্কায় তনু তব যৌবন শোভন
অনন্ত যৌবন সিন্ধু উর্ম্মি করে করিলে অর্পণ।

Wordsworthএর Hart leap Well কবিতাটির উপর একটা কবিতা লিখেছিলাম, অনুবাদ নয়। এর নাম দিয়েছিলাম—

শোকের মাপদণ্ড যদি শোক।

কবিতাটা এই—

অন্বারোহণে ছুটেছে নৃপয়াবীর
বারবারই তার ব্যর্থ হয়েছে তীর
ছুটেছে হরিণ আগে আগে নাই তাহার অব্যাহতি
প্রাণভয় তারে দিয়াছে আজিকে বিদ্যুৎ সম গতি।
অনেক যোজন করেছে অতিক্রম
ক্লান্ত করেছে চারি চরণের দারুণ পরিশ্রম।
সম্মুখে এক পর্বত হেরি উঠিয়া তাহার শিরে
এড়াইল শিকারীরে।
কাঁপিতে কাঁপিতে চারিদিক পানে চায়
তৃষ্ণায় বুঝি প্রাণ তার বাহিরায়।
তৃষ্ণা তাহার জিনেছে প্রাণের ভয়।
এক মুহূর্ত্ত তর তার নাহি সয়।
সানুদেশে তার তৃষিত হরিণ উৎসের জল দেখে
তিনটি লম্ফে নামিয়া পড়িল
পর্বত চূড়া থেকে।
উৎসের জল জমেছে গর্ত্তে এসে,
নাসাগ্র তার তারি হিমধারায় ঘেঁষে
শেষ নিশ্বাস ত্যজিল, তাহার
নির্গত হ'লো প্রাণ।
হেরিল শিকারী গর্ত্তের জল তখনো কম্পমান
শেষ নিশ্বাসে তার
করিল শিকারী উল্লাসে হুঙ্কার।
ওয়াটারলুর বন
বিজয় করেছে এমনি তাহার মৃত্যু আস্ফালন।
বনের মৃগের এতই স্পর্দ্ধা তার মত বীরবরে
সারাটি দিবস ছুটায়েছে তায় বনগিরি প্রান্তরে।
যথাযথ পরিণাম
লভি এতক্ষনে দিল মোরে বিশ্রাম।
অট্টহাসে কহিল সে বারবার।
শুনিতে পেল না প্রকৃতিমাতার বেদনার হাহাকার
এই চিত্রটি স্মরি
কবির নয়নে গভীর শোকের অশ্রু পড়িল ঝরি
প্রতি বিন্দুটি তার

শ্লোকের মুকুতা হইয়া রয়েছে
বাণী কণ্ঠের হার।

কীটসের যন্ত্রারোগে অকালে শোচনীয় জীবনাবসান আমার মনে গভীর রেখাপাত করল। সেই সময় মিসেস উডের নভেল গুলি পড়ছিলাম—যে নভেল পড়ি তাতেই দেখি একটা ঘরে টি-বির রোগী। আমি শীতকালে সর্দি কাসিতে ভুগতাম—শরীরও শীর্ণ ছিল। আমার ধারণা হলো আমারও টিবি হয়েছে। ধারণার কারণ ছিল, আমার পিসতুতো দাদা রাধিকাচরণ বরাটের টি-বি হয়েছিল; সে রোগে তাঁর মৃত্যু হ'ল। তাঁর সঙ্গে খুব বেশি মেশামেশি ছিল। দেশের বাড়ীতে গিয়ে একঘরে শুতাম। আমার ছোট মামা টি-বিতে মারা গিয়েছিলেন। গ্রামেও অনেকের টি-বি হয়েছিল। অবশ্য জ্বর হ'ত না, জ্বরটাই বাকি ছিল। প্রত্যেকবার থুথু ফেলে দেখতাম রক্ত আছে কিনা—একদিন বহু প্রতীক্ষিত রক্তেরও দেখা মেলান। গলা ঝাড়লে শ্লেষ্মার সঙ্গে একটু আধটু রক্ত পড়ত। বাস! জীবনের সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে গেলাম। কোথায় গেল কবিতা লেখা কোথায় বা কলেজের পড়া। একলা একলা শুয়ে বসে শেষের সেদিন গুনতে লাগলাম। সবচেয়ে ব্যথা পেতাম মার মুখ পানে চেয়ে। মার চোখের জলের বিরাম ছিলনা। বাবা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বল্লেন—এটো পাত কি স্বর্গে যায়। ডাক্তার দেখানো হলো—ডাক্তার বল্লেন ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা। শেষে বাবা আমাকে সরকারী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে বল্লেন—কে বলেছে টি-বি হয়েছে? বাবা বল্লেন ছেলেই বলছে। তিনি বললেন "হতভাগা ছেলে, একটা চড় মারব। জ্যাঠা হয়েছ? টি-বি কাকে বলে জানো? যাও ওষুধ দিচ্ছি, তোমার Sore throat হয়েছে" এই ডাক্তারটির নাম ছিল অম্বিকাচরণ দত্তগুপ্ত। তখন পরীক্ষার আর মাত্র আড়াই মাস বাকি। টি-বি টি-বি ক'রে ৪।৫ মাস আমি ফাঁসির আসামীর জীবন যাপন করেছিলাম পড়াশুনা কিছুই করতে পারিনি। এখন অনার্স ছেড়ে দেওয়া ছাড়া অন্যউপায় ছিলনা।

পাস কোর্সেই পরীক্ষা দিতে হ'ল। পরীক্ষা দেওয়ার পর কিছু দিন মন দিয়ে সংস্কৃত কাব্য নাটক পড়েছিলাম। যথা সময়ে Distinction পেয়ে পাস হ'লাম। হেসোয় শ্রদ্ধায় বি-এটা পাশ করেছিলাম বলেই আজ কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করেছি—কবিতা আমার মুখে অন্ন যোগাতে পারেনি।

কাসিমবাজারে থাকতে লক্ষ্য করতাম উচ্চবর্ণের মর্য্যাদার চেয়ে ধনের মর্য্যাদা ঢের বেশি। দরিদ্রের সন্তান বলে সেখান কার যক্ষপুরীতে আমি বড়ই অবজ্ঞাত জীবন যাপন করেছিলাম—তখন ভাবলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হয়ে মাননীয় হতে হবে। শহরের মধ্যে এসে আমি অজ্ঞাত হয়ে ছিলাম না। কৃতীছাত্রত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ছিল না। তবে শহরের মধ্যে বহু ধনী আত্মীয়ের ও বহুগুণিজনের সংসর্গে এসেছিলাম। তখন মনে হ'ত লক্ষ্মীর কৃপা কপালে ত জুটবে না, সরস্বতীর কৃপালাভ করে গুণী হতে হবে। নইলে জনতার মধ্যে ডুবে যেতে হবে। এই মনোভাব থেকেই আমি কবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করি। আমাকে জোর করে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য বহু তরুণ সবল বাহুর চেষ্টার ত্রুটী নেই, কিন্তু আমি জানি এখনো ডুবে যাইনি।

বহরমপুর থেকে অনেকবার অনেক ব্যাপারে আহ্বান পেয়েছি। আমি বলেছিলাম যদি কোন দিন সগৌরবে যেতে পারি তবেই যাব। ৩২ বৎসর পরে জেলার শিক্ষক সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সভাপতি হয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম—আমার পরিচিত লোকদের অধিকাংশই মৃত। ২।৩ জন বেঁচে আছেন। এখনকার লোকে আমাকে চেনে না। তাদের কাছে আমি Stranger, একদিন স্কুলের যে হলে পঞ্চম শ্রেণীতে সতীর্থদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে—বেঞ্চিতে ওঠানামা করেছি—সেই হলে বক্তৃতা করে এলাম।

অধ্যাপকদের কথা আগেই বলেছি। কবি মোহিনী দাদা আমার কবিতা চর্চ্চায় একজন সহায় ছিলেন। তিনি এখন গৃহবাসী বৈরাগী। রাধাকমলের বড় ভাই রাধারমণ বাবু এবং প্রবীণ শিক্ষাব্রতী অতুল চন্দ্র দত্তের কাছে অনেক সদুপদেশ লাভ করেছি।

রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সমগ্র শহরে অভিভাবক। তাঁর উদ্দেশে আজ বলতে ইচ্ছা হয়।—"দাদু, তুমি ছিলে গুল্মবনে বনস্পতি—তোমার স্নেহচ্ছায়ায় আমার সন্তপ্ত

কৈশোরকাল কেটেছে। তোমার মহিমা তখন ভালো করে বুঝতে পারিনি। আজ মনে পড়ে ভোজন পংক্তিতে বসে তুমি একদিন আমার আসন তোমার ডানপাশে বেছেছিলে এবং বলেছিলে সবচেয়ে বড় মাছের মুড়োটা কবির পাতে দাও। সেদিন আমি মহারাণা প্রতাপের ডান পাশে অধিষ্ঠিত সালুম্বরা পতির মর্য্যাদা লাভ করেছিলাম, দাদু। কত বড়মানুষই দেখলাম—তোমার মত বন্ধুজন-প্রতিপালক খাঁটি গৃহস্থ দেখলাম না।"

বৈকুণ্ঠনাথের গৃহেই আমার দিনের অধিকাংশ কাটত—তাঁর বাড়ীর সকল উৎসব আমোদে আমি যোগ দিতাম। অনেকের তাহতে ধারণাই জন্মেছিল—আমি বুঝি তাঁরি গৃহে প্রতিপালিত।

অন্নবস্ত্র অর্থ সাহায্য ইত্যাদির দ্বারা উপকার লাভকেই লোকে ঋণ বলে মনে করে। সে দিক থেকে কোন অংশে আমি ঋণী নই। এসবের চেয়ে ঢের বড় ঋণ আমি তাঁর গৃহ থেকে পেয়েছি। তাঁর গৃহে একটি শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি সুপরিচ্ছন্ন ও মার্জিত রুচির লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন পরিবেষ ছিল, সেই পরিবেষের ঋণ আমার সাহিত্যিক জীবনের মস্ত বড় ঋণ। এই ঋণের জন্য আমি পরিবারের প্রত্যেককেই প্রিয়জন মনে করি।

আর একটি পরিবারের স্নেহ ভালবাসা আমি লাভ করেছিলাম। এই পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় (উকিল)—সেন বাবুদের বাড়ীর জামাতা। এই পরিবারের কাছে আমার ঋণ গভীরতর—সম্বন্ধও নিবিড়তর পরে সে কথা হবে।

মহৎ পাপের ভূমিকা

সুভাস সমাজদার

বাইশের তিন ভূপেন বোস এ্যাভিনিউর ছোট লালরঙ বাড়ীটার সকলের মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ নামল। কাস্তরাস পড় কমলা খনিতে মেডিকেল অফিসারের এমন সুন্দর স্থায়ী চাকরীটা কেন ছেড়ে দিল সুপ্রিয়া!

—চিরকাল একইরকম রয়ে গেল খুকী। অসমবয়সী ছেলে আর একগুঁয়ে। বিরক্তিতে মুখটা বেঁকিয়ে বললেন সুপ্রিয়ার বাবা—চাকরী ছেড়ে উনি অরক্যানেজ প্রতিষ্ঠা করছেন। আর বাপু, এই পোড়া দেশে জনহিতকর কাজের মূল্য দেয় কে?

—আমরা এতগুলো লোক ওরই মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছি। খুকী একবারও আমাদের কথা ভাবল না? থমথমে গলায় বললেন সুপ্রিয়ার মা।

সুরূপা, মা আমার,—পাশের বাড়ীতে সুপ্রিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরূপার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে করুণ মিনতি ভরা গলায় বললেন সুপ্রিয়ার মা—তুই খুকীকে চিঠি লিখে জেনে নে তো কেন ও চাকরী ছেড়ে দিল? সুরূপা চিঠি লিখল সুপ্রিয়াকে। দুই দিন পরেই উত্তর এল। দীর্ঘ চিঠিটা পড়েই বিস্বাদ বেদনায় ছেয়ে গেল সুরূপার মন। তীব্র নিরুদ্ধ একটা আবেগ কণা কণা জল হয়ে ঝরে পড়ল তার দু চোখ বেয়ে। বিক্ষুব্ধ, তীব্র বেদনায় আলোড়িত মন নিয়ে চিঠিটা আবার পড়ল সুরূপা।

—তোকে সব কথা বলবো বলেই চিঠি লিখতে বসেছি। সংসারে কেউ আমাকে না বুঝলেও, তুই নিশ্চয়ই আমাকে বুঝতে পারবি। কেননা, তুই আজীবন আমার প্রাণের বন্ধু।

মাঘের রাত্রে আকাশ কালো করে টিপি টিপি বৃষ্টি নেমেছে। দূরে শাল গাছের লম্বা পাতায় হাওয়ার আকুলি বিকুলি। বৃষ্টি-ভেজা এই শীতার্ত রাত্রে দুর্যোগ ভরা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমার মন স্মৃতির নদী বেয়ে ঝরা ফুলের পাঁপড়ির মত দূর অতীত জীবনের ঘাটে ঘাটে এসে লাগছে। জানিস তো ভাই, সু, বালিকা বয়সে আমি ছিলাম আদরে লালিত। হয়তো মেয়ে হয়ে জন্মেও চলনসই মত রূপও আমার ছিল না বলেই বাবা মা অত ভালবাসতেন। আমার কোটরগত দুটো কালিপড়া চোখে,অজস্র বহু রেখাঙ্কিত মুখে যৌবনের কোন মাদকতাই নেই, নেই এতটুকু স্নিগ্ধ কমনীয়তার আভাস। তাই সেই সুদূর শৈশবেই আশাছায়া কুয়াশাঘন ভবিষ্যতের দিকে আশঙ্কাভরা চোখে তাকাতাম। কেননা, আমাদের এই রক্ষণশীল দেশে কুমারী মেয়েদের জীবন অমিশ্র দুঃখের—তুই নিজেও তা জানিস। অবিবাহিত মেয়েদের নিজের বদলে পরের ছেলে মানুষ করতে করতে হাড় পাঁজরা সার হয়। দাদা বৌদি কি ছোট ভাইয়ের সংসারে অসহ্য কথার জ্বালার সঙ্গে চোখের জলে লোনা দুমুঠো অন্ন মুখে তুলে বন্ধ্যা যৌবনের রক্তে প্রাণের ধুকধুকি জাগিয়ে রাখতে হয়। যারা লেখাপড়া শিখেছে, তারা হয় মাষ্টারনী, না হয় কোন মহিলা সমিতির উৎসাহী সভ্যা হতে পারে। কেউ বা জীবন তৃষার মোহে রূপহীন যৌবনের ঝিলিক তুলে নিত্যি নতুন পুরুষকে প্রলুব্ধ করে। কারো কপালে কোন পুরুষ স্থায়ী হয়, যাদের হয় না তাদের পরাজিত, বিপর্যস্ত, ক্লান্ত যৌবন রাত্রির নিরালায় গুমরে গুমরে কাঁদে। দেশের মেয়েদের বিশাল এক অংশকে অল্প-বিধবার মত সীমাহীন দুঃখী-জীবনের বোঝা টেনে টেনে ধুঁকে ধুঁকে চলতে হয়। কেন যৌবন জীবন হবে না সফল? জীবন যৌবন আমার কাছে একটা হার্ড ফাক্ট! এই জীবন অর্থাৎ 'Being' এর সৃষ্টি হয় দুইটি নরনারীর পরিপূর্ণ আনন্দের ভেতর দিয়ে। সেই নবজাত জীবনও একটা স্বাভাবিক পরিণতির গোপন আশা সযত্নে লালন করেই বড় হয়। তাই দেহের রক্তে রক্তে প্রবহমান থাকে দুর্বার কামনা। সেই জীবনকে, আত্মাকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে শুধু মেয়ে বলেই,

এ দেশের মেয়েরা যেন কখনো তাদের ক্ষমা না করে। অনেক দুঃখে এই কথাগুলো বলছি। তুই তো জানিস্ সু, কলকাতা থেকে বহুদিন আগে একটি ছেলে আমাকে দেখতে এসেছিল। ভদ্রলোক এম. বি. বি. এস. পাশ করেছে। তার গোল মুখে ছোট চোখে চকচকে হাসিতে যেন কিছুটা গর্বের দীপ্তি মেশানো। ব্যাক ব্রাশ করা ঘন চুলে আদ্দির পাঞ্জাবীর ঝকঝকে বোতামে রাজাধিরাজের মহিমার মত দীপ্তি ছড়িয়ে তিনি অনুচরদের নিয়ে আমাকে দেখতে এসেছিলেন। একটা কুমারী মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার লোভে আর হয়তো চর্বচুষ্য আহারের লালসায় তাদের চোখগুলো লুব্ধক নক্ষত্রের মত জ্বলছিল। সেই জোড়া জোড়া তীব্র সন্ধানী চোখের সম্মুখে আমার এই কালো জীর্ণ শরীরটা নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। জানিস তো ভাই সু, আমাদের দেশের ছেলেরা ভাবে, বিয়ে করে যেন মস্ত একটা সামাজিক দায় উদ্ধার করছি। জলে ডুবে যাওয়া শিশুকে বাঁচানোর জন্য স্কুলে যেমন শুভ কণ্ডাক্টের প্রাইজ পায়, তেমনি কোন অসহায় কালো করুণ মেয়ের পাণিগ্রহণের মজুরীর জন্য আকাশের নক্ষত্রের মাপে (শত সহস্র) টাকা হাঁকে আর ভরি ভরি সোনার লালসায় তাদের চোখ জ্বলে। খসে পড়ে ইউনিভারসিটির মেকী শিক্ষার চকচকে পালিশ। সোনার বোতাম আঁটা সিল্কের জামার ভেতর থেকে আস্ত একটা লোভী পশু কন্যার পিতার সামনে সোফার বাঁধা তুলে ধরে। সেই এম. বি. বি. এস ভদ্রলোক বাবাকে বলেছিলেন, পনেরো হাজারের এক পয়সা কমে বিয়ে করতে পারবো না—

পনের হাজার! বাবার গলায় কাতর কান্নার স্বর বেজে উঠল। অনেক কষ্টে, চিবিয়ে চিবিয়ে শান্ত, দৃঢ় গলায় বলেছিলেন বাবা—আপনি আসতে পারেন। বিয়ে আমি দেব না—স্বদেশী যুগের বিপ্লবী ছিলেন আমার বাবা। শুধু জন্ম হরতুকী দিয়ে মাকে ঘরে এনেছিলেন। বাবার চোখে কোথায় কান্না? কান্নাটান্না কোথায় উড়ে গেছে। তাঁর দু চোখ থেকে ঘৃণার আগুন ঠিকরে পড়ছে। হন হন করে ভেতরে এসে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন—তোর বিয়ে দেব না। তুই নিজের পায়ে দাঁড়া। স্বাবলম্বী হয়ে যদি পারিস ইউনিভারসিটির অন্তঃসার শূন্য শিক্ষার গর্বে অন্ধ এই অমানুষগুলোকে শিক্ষা দিস—

সেই সুরু হয়েছিল আমার দুষ্কর সাধনা। ডাক্তার ভদ্রলোক দেখতে এসেছিলেন, শুধু সেটুকুই তুই জানিস। কিন্তু কী মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে যে দীর্ঘকাল পরে পড়াশুনা আরম্ভ করেছিলাম, তা আমাদের বাড়ীর বাইরের একজনও জানে না।

আই. এস. সি পাশ করলাম। যতদিন মেডিকেল কলেজে পড়েছি ততদিন কারো সঙ্গে হেসে কথা বলিনি। তোরাও বলতিস 'ফসিল'।

ফসিল! হ্যাঁ। আশা আকাঙ্ক্ষা, বাসনা কামনার স্বতোৎসারিত জোয়ার বাধা পেলে দুঃখ শোকের আঘাতে আঘাতে মানুষের মন স্পন্দনহীন নির্বিকার পাথরই হয়ে যায়··· এম. বি. বি এস পাশ করলাম। কাতরাসগড় কলিয়ারীতে চাকরী পেলাম। অনূঢ়া কালো মেয়েটির আদর আরও বাড়ল। ছোট ছোট দুটো ভাই পড়াশুনা করতে আরম্ভ করল। আর্থিক দৈন্যে বিষণ্ণ সংসারটার মুখে স্বচ্ছলতার হাসি ফুটল। যে আঘাতের যাতনায় পড়তে এসেছিলাম লক্ষ্যে পৌঁছবার পর অনেক বসন্ত আর অনেক বর্ষার বৃষ্টির জলধারায় কিন্তু সেই দুঃস্মৃতি মলিন হয়ে গিয়েছিল। হয়তো সবই ভুলে যেতাম।

কিন্তু নিশ্চিন্ত সুখী জীবনের সৌভাগ্য আমার নেই। সেদিন ছিল দোল পূর্ণিমা। পূর্ণ চাঁদের আলোয় কাতরাসগড়ের রুক্ষ লালমাটির উঁচু নীচু টিলা ছড়ানো প্রান্তর আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল। আমি পাওয়ার হাউসের পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলাম। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম, তরল জোৎস্নার আলো আধারি গায়ে মেখে দুটো মূর্তি ঘন হয়ে বসে আছে পার্কের বেঞ্চে। বড় স্নিগ্ধ, বড় সুন্দর মনে হলো ওদের যুগল মূর্তিকে। হাওয়ায় ভেসে এল ওদের অস্ফুট কথার কলগুঞ্জন। হয়তো দুটো প্রেমিক প্রেমিকা। সঙ্গসুখের আনন্দে ডুবে আছে আকণ্ঠ হয়তো—

তারা উঠে এল রাস্তায়। চাঁদের আলোয় পুরুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল আমার হৃদস্পন্দন। এও কি সম্ভব? দশ বছরের ব্যবধান পেরিয়ে রক্তের

ভেতরে সেই ঘুমন্ত গোক্ষুরটা আবার ফুঁসে উঠল। চোখে হিংসার আগুন চকচক করে উঠল। মাথা নীচু করে তাদের পাশদিয়ে ঝড়ের বেগে চলে যেতেই সেই এম, বি, বি, এস বললেন—এ কি ডক্টর মজুমদার যে!

হ্যাঁ! এদিকে একটু হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম—কুণ্ঠিত গলায় আমি বললাম।

বেশ! বেশ—শোন মজুমা—বলেই তিনি আমার সঙ্গে তার সুন্দরী স্ত্রীর পরিচয় করে দিয়ে বললেন—ইনি লেডী ডাক্তার—

লেডী ডাক্তার! ক্ষুব্ধ-এই দুটো কথাতেই যেন শেষ হয়ে গেল আমার অস্তিত্ব। তিনি জানেন না, আমারও একটা সম্মান আর আভিজাত্যে ভরা অতীত ছিল। তিনি চিনতে পারলেন না, আমিই সেই কুরূপা মেয়ে যে প্রথম যৌবনের স্বপ্ন নিয়ে তাঁকেই সারা জীবন নিবেদন করার জন্যে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। তারই বা দোষ কি? তিনি সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তর ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ মেয়ে দেখে বেড়িয়েছেন। আর টাকার ওজন করে করে বহু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মেরুদণ্ডের ভনটিব্রা কোলামগুলো নড়বড়ে করে দিয়েছেন। তাই দশ বছর আগে কবে কোথায় বেলা শেষের করুণ আলোয় একটা কালো মেয়ের হাড়-বের-করা মুখ দেখেছিলেন, তা মনে রাখা কঠিন। তাই লেডী ডাক্তার হয়েই থাকলাম তার কাছে।

সেই রাত্রে আর ঘুম এল না। মনে হল যেন বিছানায় অজস্র আগুনের ফুলকি ছড়ানো। মজুমার হাসি হাসি মুখখানা, সিন্দুরমাখা সিঁথিটা আমার রাত জাগা চোখের ওপরে বার বার ভেসে উঠল। স্বামীর আদরে ভালবাসায় গড়া তিলোমলো আনন্দের জীবন! হু হু করে এক ঝলক হাওয়া এল। হাওয়াটা যেন আমার রুক্ষ, রিক্ত, নিঃস্ব জীবনভূমির ওপর দিয়ে বয়ে এল। বহুদিন মজুমা ডেকেছে তাদের বাড়ীতে কিন্তু কোনদিন যাই নি। কিন্তু একদিন গভীর রাত্রে ডাক্তারের কোয়ার্টার থেকে আমার ডাক এল। এই ডাকে আমার না যেয়ে উপায় নেই।

আসন্নপ্রসবা মজুমার 'লেবারপেন' উঠেছে। কাতরাস-গড়ের ডাক্তার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন—এখুনি যেতে হবে—যে ডাক্তার আমাকে একদিন নির্মমভাবে প্রত্যাখান করেছিল, সে আজ বিপন্ন হয়ে ডাকছে! আমি ডাক্তার। 'প্রফেশানালি' আমার যাওয়াই উচিত। তবুও মনের ভেতরে বয়ে চলেছে উত্তেজনার উত্তপ্ত জোয়ার। কানের কাছে বার্তাসে যেন মন্ত্রোচ্চারিত হচ্ছে। বাবার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি—ইউনিভার্সিটির অন্তঃসারশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিত পশুগুলোকে শিক্ষা দিবি। কোনদিন এদের ক্ষমা করিস না—প্রসূতির ঘরে এসে দাঁড়ালাম। মজুমার ক্লান্ত করুণ চীৎকারে ঘরটা আড়ষ্ট ব্যথায় চমকে চমকে উঠছে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে তার মুখ! কি এক নিদারুণ মর্মান্তিক ব্যথার আক্ষেপে তার সমস্ত দেহটা মুচড়ে উঠছে। ডাক্তারকে বললাম—আপনি বাইরে যান। ছেলে হতে আর বেশী দেরী নেই—ডাক্তার বাইরে গেলেন। প্রসূতির আর্তচীৎকার তীব্র হয়ে উঠল। ফরসেপ-ফ্লাডস ইতস্তত ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। কিন্তু কেন জানি আমার চিকিৎসক মন কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না। আমার চেতনায় কেবল একটি কথাই পাক দিয়ে উঠছিল—এই সেই ডাক্তার, যে শুধু টাকার উগ্র লোভের তীব্র ছুঁড়ে কত অসংখ্য কুমারী মেয়ের চোখের অন্তহীন স্বপ্নের উল্লাসকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে মহাপাপ করবো?

—হ্যাঁ, পাপ হলেও মহৎ প্রয়োজনে এই পাপের দরকার আছে সুরূপা। মেয়েদের ওপরে একালের শিক্ষিত ছেলেদের বরপণের জুলুম মেয়েদের দাঁত নাক খুঁটিয়ে দেখা ও নানা অবাঞ্ছিত প্রশ্ন করার অত্যাচারের প্রতিবাদে এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংস পাপ করবো যে পৃথিবী চমকে উঠবে। মাথার ভেতরে আগুনের ঝড় বয়ে চলেছে। জানিস সুরূপা, একটা যুগপ্রচলিত ধারাকে পরিবর্তন করতে হলে বহু জীবনের বলি দরকার হয়। আকাশের তারার মত অসংখ্য অগণন সতী সহমরণের আগুনে পুড়ে মরেছিল। তাদের মৃত্যু-যন্ত্রণার চীৎকারই সমাজসংস্কারকদের সচেতন করে তুলেছিল। কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যার নিষ্ঠুর লীলার প্রয়োজন হয়েছিল অশোককে মহামতি অহিংস অশোকে রূপান্তরিত করার জন্যে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় সন্তানসহ প্রসূতি হত্যার কারণ ও আমার ফাঁসীর খবরে সারা দেশব্যাপী যে আলোড়ন হবে, তাতে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজসংস্কারকেরা

যদি বরপণের হীন ব্যবসা সম্বন্ধে একটু সচেতন হয়, শুধু সেই আশায় আমি—

……মঞ্জুলার মৃত্যু হয়েছে। 'এক্লিম্পটাল' পরীক্ষায় সন্তানসম্ভবা মঞ্জুলার দেহে কোন জটিল লক্ষণ ছিল না। অতএব তার ডাক্তার স্বামীর সন্দেহ হয়েছে—মঞ্জুলার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। পোষ্টমর্টেম পরীক্ষায় সরকারী ডাক্তার মঞ্জুলার তলপেটটা ফেঁড়ে ফেলেছেন। তিনি দেখেছেন পিণ্ডাকার মাংসল একটা নতুন জীবন শিরায় উপশিরায় জড়িয়ে বিবিয়ে নীল হয়ে আছে। অস্ফুট গলায় আর্তনাদ করে উঠেছেন সরকারী ডাক্তার মার্ডার! মঞ্জুলার ঘরে একটা বেলেডোনার শিশিও দেখেছেন তার ডাক্তার স্বামী…

— চিঁ চিঁ করে কেঁদে উঠল মঞ্জুলার সদ্যজাত ফুটফুটে শিশু। ভয়াল, বীভৎস ছবির মিছিল নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল আমার চোখের সামনে থেকে।…

চমকে উঠল আমার চেতনা। মাঘের শীতার্ত রাত্রে দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে আমার সারা শরীর বেয়ে। তীব্র যন্ত্রণা ভরা গলায় মঞ্জুলা বলল—আঃ মিস্ মজুমদার আপনি আমায় বাঁচালেন!

এ আমি কি করছিলাম? শিউরে উঠল আমার বিবেক। একজনের ওপরে প্রতিহিংসা নিতে যেয়ে নিরপরাধ একটি নারী ও শিশু হত্যার নিষ্ঠুর পরিকল্পনা গোক্ষুর সাপের মত মৃত্যুবিষ ঠোঁটে নিয়ে আমার মনের ভেতরে লুকিয়ে ছিল! মঞ্জুলার মত আমিও যে নারী! চাপ চাপ রক্ত আর নাড়ির বন্ধনে জড়িয়ে জন্মলোকের জঠরে ঐ ক্ষুদ্র শিশুকে আমরাই যে পরম মমতায় রচনা করি। আমি মেয়ে হয়ে কেমন করে……আমারই পরিকল্পিত নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা আমাকেই ভীত করে তুলল। ঠক্ ঠক্ করে পা কাঁপতে লাগল। হিমশীতল একটা জলস্রোত যেন হু হু করে বয়ে চলেছে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। ঝড়ের বেগে বাইরে চলে গেলাম। ডাক্তারের বাংলোর বাগানে রাশি রাশি যুঁই আর বেলী ফুল উঠেছে। শীতের কুয়াশা ঘেরা চাঁদের আলো শ্বেতশুভ্র ফুলগুলোর ওপর গলে গলে পড়ছে। জানিস সুরূপা মনে হয়েছিল —সৃষ্টি কী সুন্দর!

পরদিনই ঝাতরাসগড় ছাড়লাম। চাকরীও ছাড়লাম। সেই এম, বি, বি, এস ডাক্তারের সুখী জীবনের তার ভরা সংসারের পাশে নিঃসঙ্গ-রুক্ষ জীবনের বোঝা বয়ে চলতে চলতে আবার যদি কোন অশুভ মুহূর্তে মনের ভেতরের সেই ভয়াল গোক্ষুর সাপটা ফুঁসে ওঠে! আমি 'অরফ্যানেজ' খুলেছি। অনাথ শিশুদের সেবাযত্নের ভেতরে আমার সারা জীবনের অবিচ্ছিন্ন বেদনাকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলতে চাই! আশা করি তুই বুঝবি কেন আমি চাকরী ছেড়েছি আর কেনই বা শিশুদের সেবায় নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করেছি—

ইতি—

তোদের 'সুপ্রিয়া'

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন ও ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার উপর ইহার প্রভাব

শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

শিক্ষা আইন ১৯৪৪, ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার। এই আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের সরকার ১১ বৎসরের উপরে প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ভার লইলেন। ইতিপূর্বে জনসংখ্যার সামান্য অংশই মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৪ আইনে স্বীকার করা হইল যে দেশের প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার রহিয়াছে—Sceondary Education is to be the right of all and no longer the privilege of a few.

১৯৪৪ সালের পূর্বে Secondary School বলিতে বুঝাইত এমন কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে কেবল ধনীর সন্তান এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছাত্রদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। এ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র নেওয়া হইত কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা বাছাই করিয়া। অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনায় এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং উচ্চবেতন প্রাপ্ত শিক্ষক, মূল্যবান এবং সুদৃশ্য বিদ্যালয় গৃহ এবং শিক্ষা সরঞ্জাম এবং অল্পসংখ্যক ছাত্র নিয়া শ্রেণী গঠনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা এই ধরনের বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলির দ্বার সর্বসাধারণ ছাত্রের জন্য উন্মুক্ত হইল তাহা নহে। এই ধরনের বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলি পূর্বের ন্যায় ধনী ও তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের সেবার জন্য চলিতে থাকিবে। কিন্তু দেশের সমস্ত ছাত্র (১১ বৎসরের উপর) ছাত্রীকে তাহাদের যোগ্যতা অনুযায়ীবিভিন্ন ধরণের সরকারী এবং অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। ইহা সরকারী দায়িত্ব বলিয়া আইনতঃ স্বীকৃত হইল। পূর্বে সাধারণ বিদ্যালয়গুলির গৃহ বা সরঞ্জাম যে মানের ছিল সরকারী নূতন বিদ্যালয়গুলিতে তার চেয়ে অনেক উঁচু মানের গৃহ বা সরঞ্জামের ব্যবস্থা হইল। সমস্ত সরকারী বিদ্যালয়গুলির জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং উচ্চ বেতন প্রাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থাও হইল। এবং যদিও মাধ্যমিক শিক্ষার নানাপ্রকার বিদ্যালয় স্থাপন করা হইল সবগুলি বিদ্যালয়ের পিছনে সরকার সমান অর্থ ব্যয় করিয়া সবগুলিতেই একই ধরণের উঁচু মান প্রবর্তন করিলেন। সবগুলি বিদ্যালয়েই ছাত্র ছাত্রীদের শারীরিক মানসিক ও আত্মিক বিকাশ, শিক্ষা ও আনন্দ বিতরণের সমান ব্যবস্থা হইল। These (schools) will be State managed and will have the same kind of building and the same kind of amenities. They will enjoy the same holidays and enjoy the same games. In all these schools the studies will be related to the abilities and aptitudes of pupils. The maximum size of classes will be the same for all. এই বিদ্যালয়গুলির বিভিন্নতার সহিত সামাজিক মর্যাদার কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ "ছোট-লোকদের ছেলের জন্য হাতের কাজ শিখাইবার বিদ্যালয় আর "বড়লোক" এর ছেলেদের জন্য সাহিত্যপ্রধান বিদ্যালয় এমন নহে। সরকার সবগুলি বিদ্যালয়কেই সমান মর্যাদা দিলেন। ছাত্রদের মানসিক বা শারীরিক শক্তি অনুযায়ী ও রুচি অনুযায়ী এরকম বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই প্রকার যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত ইংল্যাণ্ডে এই আইন অনুযায়ী সর্বত্রই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে আরো বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। পুরাতন বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলিও এই আইন অনুযায়ী একটা ন্যূনতম উচ্চমান অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। প্রয়োজন হইলে মান অনুযায়ী তাহাদের

উন্নতির জন্য সরকার আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য করিবেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একমত হইয়া এই আইন প্রণয়ন করিয়াছেন—কাজেই একটা সুনির্দিষ্ট উন্নত Plan অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশঃই অগ্রসর হইবে—এবং অদূরভবিষ্যতেই ইহার সুফল জাতি ভোগ করিবে। জাতির শিক্ষাকে ইংলণ্ড কতটা মর্যাদা দান করে এবং ইহাকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এই Education Act 1944 তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা সরকার সমগ্র দেশকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার দায়িত্ব নিয়াছিলেন। ১৯৪৪ এর আইনে সমগ্র জাতির কিশোরদের শিক্ষা আর এক স্তর পর্যন্ত উন্নীত করিবার ভার সরকার গ্রহণ করিলেন।

১৯৪৪ এর পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা :—অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষাদান সরকারের একটা অবশ্য কর্তব্য এরকম ধারণা ইংল্যাণ্ডে (সমস্ত ইউরোপেই) ছিল না। বড়লোকদের ছেলেদের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল—কারণ তাহারাই ভবিষ্যতে দেশ শাসন করিবে। এই বড়লোকের ছেলেদের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় ধনীদের দানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিও বহুদিন পূর্ব হইতেই দেশে শিক্ষা বিস্তারের সামান্য ভার নিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকিলেও দেশে সর্বসাধারণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূতই হয় নাই তাই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ছাত্রের সংখ্যা সামান্যই ছিল। বরং দরিদ্র লোকদের মনে শিক্ষার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাবই ছিল। এবং দেশের চিন্তাশীল লোকদের মধ্যেও অনেকে মনে করিতেন—শিক্ষার সুযোগ পাইলে সাধারণ মানুষ ধর্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক হইয়া পড়িবে। "It would enable the labouring classes, to read seditious pamphlets, vicious books and publications against Christianity." [About Education—C. E. M. Joad.] কিন্তু ইংল্যাণ্ডে Industrial Revolution এর পর হইতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণেই শিশু ও কিশোরদের অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা [the three R's—Reading, 'Riting and' Rithmatic] দিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। ১৮০২ এর ফ্যাক্টরী আইনে বিধান দেখা যায় যে কাপড়ের কলের মালিকদের তাহাদের কলে ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৮৩৩, ১৮৬৭র Factory Act এবং ১৮৯০ সালের Mines Act-এও অনুরূপ বিধান আরো ব্যাপকভাবে রহিয়াছে। যাহাই হউক ধনীদের বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির বা Factoryর মালিকদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণ "স্বাধীন" ছিল, তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা প্রায় ছিল না। প্রথম শিক্ষা আইন পাশ হয় ১৮৭০ সালে এবং তখন হইতেই সরকার দেশের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই আইন অনুসারে সমস্ত দেশে জরীপ করিয়া শিক্ষার জন্য কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি অঞ্চল এক একটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আসে। এই বোর্ডের ক্ষমতা ছিল তাহাদের অঞ্চলের পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়সের সমস্ত ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠানো বাধ্যতামূলক করা এবং ১৩ বৎসর পর্যন্ত, প্রয়োজন হইলে, বিদ্যালয়ে তাহাদের আটকাইয়া রাখা—"It empowered School Boards for making attendance in school compulsory, between the ages of five and ten, with power to retain the children till thirteen."

১৯০২ এর শিক্ষা-আইন এবিষয়ে আরো একপদ অগ্রসর হইল। স্কুল বোর্ডগুলির স্থানে Local Education Authorities প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহাদের হাতে সর্বপ্রকার শিক্ষার ভার দেওয়া হইল এবং যে সমস্ত "Secondary Schools" ছিল (Public Schools গুলি বাদে। Public School ;—যেমন Eton. Harrow, Rugby ইত্যাদি ; এই বিদ্যালয়গুলি ধনীদের ছেলেদের জন্য ধনীদের অর্থে স্থাপিত 'স্বাধীন' বিদ্যালয়, Boarding Schools) তাহাদের Local Education Authorities দের আওতায় আনা হইল।

১৯৩৬ সালের শিক্ষা আইনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স ১৫ বৎসর করা হইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ লাগিয়া যাওয়ায়

এ সমস্ত সংস্কার সবই বন্ধ থাকে। যুদ্ধের সময়ে বহু বিদ্যালয় বিধ্বস্ত হইয়া যায় অথবা যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকারী কাজে লাগাইতে হয় এবং বড় বড় Industrial Town এর বিদ্যালয়গুলিকে বাধ্য হইয়া সুদূর গ্রাম দেশের অভ্যন্তরে সরাইয়া আনিতে হয়। সে বিশৃংখল অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোন প্রকারে টিকাইয়া রাখাই ইংল্যাণ্ডের প্রকাণ্ড সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল এবং নূতন সংস্কারের কথা তখন চিন্তাই করা যায় নাই। এটা ইংল্যাণ্ডের জাতীয় চরিত্রের পরম গৌরবের সাক্ষ্য যে এই বিষম বিপদের মধ্যে জাতি তাহার শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বপ্রযত্নে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক যুদ্ধের অবসান হইলেই দেশের রাজনৈতিক দলগুলি একত্র হইয়া নূতন করিয়া ইংল্যাণ্ডের শিক্ষার কাঠামো চালিয়া সাজিলেন। তাহারই নাম হইল ১৯৪৪ এর শিক্ষা আইন।

১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আগে যাকে "Secondary Schools" বলা হইয়াছে তাহার পাশাপাশি আরো কতগুলি বিদ্যালয়ও ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য যেমন Junior, Technical, Commercial এবং Art Schools. ১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায় বিদ্যালয়ের ১১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্র সংখ্যার মোট ৮ জনের মধ্যে একজনেরও কম পড়ে Secondary School গুলিতে মোট ২০০ জনের মধ্যে একজনেরও কম পড়ে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে—অর্থাৎ মোট ছাত্র সংখ্যার বৃহত্তম অংশই পড়ে Elementary School গুলিতে। অবশ্য ১৯০০ সালে elementary school গুলিতেও উচ্চতর শিক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল—এগুলিকে বলা হইত higher elementary schools. কিন্তু ১৯১৭ সাল পর্যন্ত দেখা যায় ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস মিলাইয়া এ রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০এরও কম। অবশ্য এই জাতীয় বিদ্যালয়, যাদের নাম ছিল Central School কোন কোন জায়গায় Local Education Authorityরা স্থাপন করিয়াছিলেন—যেমন লণ্ডনের Central School স্থাপিত হয় ১৯১১ সালে। ১৯১৮ সালের শিক্ষা আইনে একটু বয়স্ক এবং বেশী বুদ্ধিমান ছাত্রদের জন্য Elementary School গুলির মধ্যেই উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে উৎসাহ দেওয়া হইল। "The Education Act of 1918 encouraged the tendency to experiment in post-primary education by requiring authorities to provide "course of advanced instruction for the older or more intelligent children, in attendance at primary schools including children who stay at such schools beyond the age of 14." এই আইনের ফলে দেশের কোন কোন অঞ্চলে কতগুলি "Senior School" খোলা হইল। এই বিদ্যালয়গুলিতে আশে পাশের সমস্ত Elementary Schoolএর ছাত্ররা ১১ বৎসর পার হইলে গিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি হইত। Local Education Authority সমূহ এইসব স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহাতে দেশের উচ্চতর শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯২০ সালে দেখা যায় Elementary School গুলির ১১ বৎসরের উপর বয়সের ছাত্রদের মোট ১৮ জনের মধ্যে ১১ জন ছাত্রছাত্রীই এই প্রকারের। "Advanced courses" শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্পন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিত।

১৯২৬ সালে Hadow Report প্রকাশিত হয়। এর ফলে ১১ বৎসরের উপরের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য Elementary School গুলি হইতে পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকতর চেষ্টা দেখা যায়। Hadow Report যে সব মূল্যবান পরামর্শ (Recommendation) দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

(ক) ১১ বৎসরের উপরের ছাত্রদের শিক্ষা Secondary Education নামে অভিহিত হইবে।

(খ) বিভিন্ন প্রকারের ছাত্রদের বিভিন্ন মানসিক বিকাশ; রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের Secondary School স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) ১২ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে কোন ছাত্র এক জাতীয় Secondary School হইতে অন্য জাতীয়

Secondary School এ ভর্তি হইতে পারিবে। এসব ক্ষেত্রে কেবল ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এই প্রকার বিদ্যালয় পরিবর্তন (transfer) দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে অধিকতর উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(ঘ) এই Hadow Report এর ফলে এবং Board of Education এর উৎসাহে এবং সাহায্যে ১৯২৬ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত ১৩ বৎসর ইংল্যাণ্ডে এবং ওয়েলসএ মাধ্যমিক শিক্ষার বহু প্রসার ঘটিল এবং তাহার মানেরও উন্নতি ঘটিল। বহু Central এবং Senior School আলাদা বা Elementary School গুলির সহিত সংযুক্তভাবে স্থাপিত হইল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ সুরু হওয়াতে উন্নতির পথে জাতি বাধাপ্রাপ্ত হইল।

কিন্তু যুদ্ধ ছাড়াও, এ পর্যন্ত সমগ্র জাতির প্রয়োজনের ভিত্তিতে একই উচ্চমানের (the same high uniform standard) শিক্ষা সংস্থানের পথে কতগুলি বাধা ছিল।

প্রথমতঃ অর্থনৈতিক অসুবিধা—দেশের সব অঞ্চল সমান সমৃদ্ধ নয়। কাজেই কোন কোন অঞ্চলের Local Education Authority (সংক্ষেপে L.E.A)র আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য নতুন ধরনের উচ্চতর মানের বিদ্যালয় গৃহ বা উপকরণের ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হওয়াতে কোন কোন অঞ্চল শিক্ষায় অনগ্রসর রহিয়া গেল। তাহা ছাড়া ১৯৩৬ সালের বিশেষ আইন পাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সরকারী অর্থ বেসরকারী বিদ্যালয় (voluntary schools) এর গৃহ ইত্যাদি সংস্কার বা উন্নতির জন্য ব্যয় করা যাইত না। এবং voluntary school গুলির উপর সরকারের কর্তৃত্ব না থাকাতে এবং তাহাদেরও নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকাতে ছাত্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকাংশ বিদ্যালয়েরই সংস্কার হইত না।

আইনতঃ অন্য অসুবিধাও ছিল। আইনতঃ নূতন Senior School বা Central School গুলি Elementary School এর পর্যায় পড়ে—সুতরাং "Hadow Report" অনুযায়ী শিক্ষকদের সংখ্যা, বেতনের হার, প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা, লাইব্রেরী এবং অন্যান্য সরঞ্জামের যে আদর্শ নির্দিষ্ট হইয়াছিল—সে অনুযায়ী এই বিদ্যালয়গুলিকে বাধ্য করিবার উপায় ছিল না।

ছাত্রদের বিদ্যালয়ে থাকিবার বয়স (school leaving age) ১৪ বৎসর নির্দিষ্ট ছিল এবং অধিকাংশ ছাত্রই ১২ বৎসরের আগে elementary স্কুলের পড়া শেষ করিতে পারিত না। কাজেই এই Senior School গুলিতে ৪ বৎসর পড়ার যে পরামর্শ Hadow Report এ ছিল তাহা কার্যকরী হওয়ার উপায় ছিল না।

যাহা হউক এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচার এবং মান উন্নয়ন ক্রমবর্ধমান গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। সর্বসাধারণের শিক্ষার প্রয়োজন সে দেশে বিতর্কের বিষয় নহে এবং বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞ ইংরেজ জাতি সমস্ত জাতিকে শিক্ষায় উন্নীত করিতে বদ্ধপরিকর। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে সমগ্র জাতির কিশোরদের সরকারী ব্যয়ে শিক্ষার দাবী স্বীকার করিয়া সমগ্র জাতির কিশোরদের মাধ্যমিক শিক্ষার একটা সমান মান (uniform standard) অনুযায়ী বিদ্যা বিতরণের ব্যবস্থা করিল।

১৯৪৪-এর শিক্ষা আইনের কয়েকটি মূল বিধান—

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইল তাহা বলা যাইতেছে।

(১) ১১ বৎসরের উপর প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থার ভার সরকার গ্রহণ করিলেন। এই শিক্ষার জন্য বালক বালিকাদের অভিভাবকদের কোন ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। শিক্ষাই শুধু অবৈতনিক হইবে না, শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত সরঞ্জাম দুগ্ধ এবং টিফিনও বিনা ব্যয়ে ছাত্ররা পাইবে।

(২) ১৯৪৭ এর ১লা এপ্রিল হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত সমস্ত বালক বালিকার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক (compulsory) করা হইল এবং যখনই শিক্ষামন্ত্রী বুঝিবেন সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে তখনই এই বয়স বাড়াইয়া ১৬ বৎসর করা হইবে।

(৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে (Secondary Schools) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হইতে পৃথক করিতে হইবে।

(৪) যে সমস্ত বিদ্যালয়ের ব্যয় সম্পূর্ণভাবে বা

অংশতঃ সরকার বহন করেন (Local Education Authority-র প্রত্যক্ষ অধীন বিদ্যালয়গুলি) অথবা যে সমস্ত বিদ্যালয় 'স্বাধীন' এবং যাহার ব্যয় কোন ধর্ম বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বহন করেন (voluntary schools initially provided by a religious denomination or school foundation) তাহাদের সকলের জন্যই বিদ্যালয় গৃহ, সংগ্রাম, ব্যায়ামাগার, পুস্তকাগার, শ্রেণীর আয়তন, শিক্ষকদের মান (qualifications of teachers), শিক্ষকদের বেতন, শিক্ষার মান ইত্যাদি সম্পর্কে একই ধরনের লিখিত আইন শিক্ষামন্ত্রী প্রচার করিবেন এবং এই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে সমস্ত বিদ্যালয়ই বাধ্য।

(৫) এই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে কোন Voluntary School আর্থিক কারণে অসমর্থ হইলে সরকার প্রয়োজন বোধে সাহায্য করিবেন।

(৬) এখন হইতে Local Education Authorityরাই তাহাদের অঞ্চলে সমগ্র শিক্ষার (primary, secondary and further) জন্য দায়ী থাকিবেন। ইতিপূর্বে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এক Authority এবং মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য অন্য Authority ছিল।

কয়েকটি কারণে এই শিক্ষা আইনের বিধান বৈপ্লবিক বলা চলে। এই আইনের দ্বারা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে মূলতঃ বেসরকারী চেষ্টায়। Public Schoolগুলি ধনীদের দ্বারা, এবং দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের জন্য অধিকাংশ বিদ্যালয় Church Societyগুলি (যেমন Church of England, Roman Catholic Church) বা সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান (যেমন British and Eoreing School Socicty বা National Society) অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (যেমন Froebel Foundation) দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। এবং ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী মনোভাব ছিল নেতিবাচক। অর্থাৎ সরকার সেখানেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন যেখানে শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। কিন্তু ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে যে দেশের শিক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব সরকারের। রাষ্ট্র পরিচালনায় শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃতির একটি লক্ষণ এই যে President of the Board of Education এর পরিবর্তে একজন মন্ত্রী (Minister of Education) এখন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা পরিচালনার ভার নিয়াছেন।

ইংল্যাণ্ড অত্যন্ত রক্ষণশীল দেশ—প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাই প্রাচীন public school (tradition) বা voluntary school এর উপর হস্তক্ষেপ করিতে সরকার অনিচ্ছুক। কিন্তু এই আইনে public schoolগুলির উপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা না থাকিলেও secondary schoolগুলি প্রত্যেকটিই শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ মানিতে বাধ্য। যদিও ইংল্যাণ্ডে লিখিত আইন (Statutory Act) অপেক্ষা প্রাচীন রীতি convention এ অধিকতর বিশ্বাসী তথাপি ১৯৪৪ এর শিক্ষা আইনে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ সমূহ আইনতঃ লিপিবদ্ধ এবং তাহা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের উপর প্রযোজ্য।

ইতিপূর্বে সমগ্র দেশের জন্য একই ধরনের শিক্ষার মান প্রবর্তন তেমন কড়াকড়ি ভাবে হয় নাই। Local Education Authority-র Parliament এর আইনের দ্বারা সৃষ্ট হইলেও শিক্ষার ব্যাপারে তাহাদের অঞ্চলে তাহারা প্রায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরও যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া উচিত ইহাই ইংল্যাণ্ডের tradition। তথাপি এই আইনে শিক্ষা আগের তুলনায় অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত (centralised) এবং সরকারী কর্তৃত্ব আগের তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে। অবশ্য এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরিক পরিচালনা, পাঠ্যতালিকা নির্দেশ ইত্যাদি ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করেন না। পরিদর্শন (Inspection), অর্থ সাহায্য (grants) এবং অন্যান্য উপায়ে সরকারী কর্তৃত্ব পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিপূর্বে বেসরকারী বিদ্যালয়ই ছিল অধিকাংশ কিন্তু ক্রমশঃই সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং তাহাদের ছাত্র সংখ্যাও দ্রুত

বাড়িয়া যাইতেছে এবং voluntary schoolগুলি ক্রমেই সরকারী কর্তৃত্বের অধীন আসিতেছে।

এরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন করিতে হইলে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যবস্থা (long term planning) একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য Local Education Authority গুলিকে তাহাদের অঞ্চলের জন্য "Development Plan" তৈয়ারী করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। এই আঞ্চলিক Development Planগুলি একত্র করিয়া একটা সামগ্রিক দেশব্যাপী Plan গড়িবার দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রীর। ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এক বৎসরের মধ্যে এই সব Plan দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর Planগুলি বিবেচনা করিয়া, শিক্ষামন্ত্রী উপযুক্ত পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধন করিয়া Local Education Order দ্বারা নির্দেশ দেন—কখন, কোথায়, কি ভাবে নূতন বিদ্যালয় গড়িতে হইবে বা পুরাতন বিদ্যালয়ের সংস্কার করিতে হইবে।

His Majesty's Inspectors (সংক্ষেপে H. M. I'S.)—শিক্ষামন্ত্রী ও L. E. A.-র মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন H. M. I. মণ্ডলী। ইহাদের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা নাই, কিন্তু ইহারা মন্ত্রীকে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহারা একদিকে বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া তাহাদের অবস্থা শিক্ষামন্ত্রীকে গোচর করান এবং যাহাতে আইন অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলির উন্নতি ঘটে সে বিষয়ে তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে পরামর্শ দেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, যোগ্য এবং ধীরবুদ্ধি ব্যক্তিদিগকেই কেবলমাত্র H. M. I. নিযুক্ত করা হয়। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং L. E. A. রাও সর্বদা তাঁহাদের কাছে তাঁহার সমস্যা সম্পর্কে উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং আমাদের দেশের ইনস্পেক্টার সাহেবদের মত তাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে ভীতির ব্যাপার নয়। তাঁহারা অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়া শিক্ষকদের সঙ্গে মিশেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানের সমস্ত চেষ্টাকে উৎসাহিত করেন। Public School বা Voluntary Schoolগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্ব অতিশয় সামান্যই, তথাপি Public Schoolগুলিও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া H. M. I. দের উপদেশ চাহিয়া থাকেন। H. M. I. অবশ্য ১৯৪৪ আইনের দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হয় নাই। ১৯৪৪ এর শিক্ষা আইনের দ্বারা তাঁহাদের গুরুত্ব ও দায়িত্ব আগের তুলনায় অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী তাঁহাদের সাহায্যেই শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় আদর্শ L. E. A.-দের সামনে উপস্থিত করেন এবং সদা জাগ্রত প্রহরীর মত বিদ্যালয়গুলির উন্নতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তাঁহারা শিক্ষা সম্পর্কে নানা গবেষণার ফল প্রকাশ করেন, শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য বক্তৃতা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের পরে শিক্ষিত (trained) শিক্ষকের অভাব দূর করিবার জন্য যে Emergency Training Scheme হইয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ H. M. I. দের উদ্যোগ এবং উদ্যমেই হইয়াছে।

Local Education Authorities—পূর্বেই বলা হইয়াছে L. E. A. দের উপর তাহাদের অঞ্চলের শিক্ষার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে রহিয়াছে। ১৯০২ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা L. E. A. গুলি সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারা School Board এর স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৪ এর শিক্ষা আইন দ্বারা ক্ষমতা (সোজাসুজি শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে আসায়) কিছুটা খর্ব হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন হইতে County Councilই সেই County Boroughর L. E. A. হইবেন—"The local education authority for each county shall be the council of the county and local education authority for each county borough, shall be the county borough" ইতিপূর্বে Primary ও Secondary Education এর Authority অনেক স্থলে ভিন্ন ছিল। এই আইন অনুযায়ী তাঁহাদের একই Authorityর অধীনে আনা হইল।

Secondary Schoolগুলির শ্রেণী বিভাগ—

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন ইংল্যাণ্ডের সমস্ত স্তরের শিক্ষাকেই আমূলাদিক পরিমাণে পরিবর্তিত করিল। কিন্তু Secoudary Education এর ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন

সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে Hadow Report এবং Norwood Report এ বিভিন্ন প্রকার ছাত্রদের পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন ইহা আলোচিত হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালের আইনে ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইল এবং বিভিন্ন বয়স, বিভিন্ন মানসিক উৎকর্ষ এবং বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর সমমর্যাদাসম্পন্ন Secondary School স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। The 1944 Act requires Secondary Schools to be "sufficient in number, character, and equipment to afford for all pupils opportunities of education offering such variety of instruction and training, as may be desirable in view of their different ages, abilities and aptitudes".

ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ Public School এবং প্রাচীন বিদ্যালয়গুলি হইতেছে Grammar School. এই বিদ্যালয়গুলিতে পুঁথিগত বিদ্যা ও ভাষা ও সাহিত্যমূলক বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। Abstract বিষয়ে চিন্তা করিতে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা আনন্দ পায় তাহাদের জন্য এ বিদ্যালয়গুলি উপযোগী। University পর্যন্ত যাইতে যাহাদের আগ্রহ বা সামর্থ্য নাই অথচ উচ্চতর শিক্ষায় যাহাদের রুচি আছে এবং অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের চেয়ে দীর্ঘতর কালে যাহারা Secondary School এ থাকিয়া বিদ্যালাভে ইচ্ছুক সে সব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য "Sixth Form" এর ব্যবস্থা Grammar School গুলির বিশেষত্ব। আইনতঃ না হইলেও কার্যতঃ Grammar School এর শিক্ষার মর্যাদা অধিকতর।

কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র concrete বিষয় নিয়া শিক্ষা লাভ করিতে আনন্দ পায় এবং উপকৃত হয়। ভাষা বা সাহিত্যের সূক্ষ্ম রুচি অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীর কাছে আশা করা অন্যায়। কাজেই এই অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীর জন্য Public School Type এর পুঁথিগত শিক্ষা সময়ের ও শক্তির অপব্যবহার মাত্র। কাজেই সাংসারিক জীবনে কার্যকারী অনেকগুলি বিষয়ে মোটামুটি শিক্ষা এবং নানা রকম কাজে দক্ষতা এবং অনুরাগ জন্মাইবার জন্য এবং বর্তমান যুগের ও জীবনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য বহু সংখ্যক Modern Schools সরকারী ব্যয়ে স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। "The majority will do best in a school which provides a good all-round education in an atmosphere which enables them to develop freely along their own lines. Such a school will give them a chance sample—a variety of "subjects" and skills and to pursue those which attract them most. It is for this majority that the secondary modern school will cater".

আবার কতক ছাত্র বা তাহাদের অভিভাবক ভবিষ্যতে কোন শিল্প বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া জীবিকার্জন করিবে স্থির করিয়াছে এবং এ রকম কোন বিশেষ দিকে তাহাদের ঝোঁক রহিয়াছে, এ সব ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন Secondary Technical Schools এর ব্যবস্থা করা হইল। Commercial School ও Art School গুলি এই পর্যায়ে পড়ে।

আইনতঃ সমস্ত বিদ্যালয়গুলিই সমান মর্যাদাসম্পন্ন। সরকার সমস্তগুলিতেই একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া সবগুলিকেই সমান উন্নতমানসম্পন্ন শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয়-গৃহ, উপকরণ, শিক্ষিত শিক্ষক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সরকার সব শ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্যই সমান দায়িত্ব বহন করিয়া থাকেন এবং সব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা আনন্দ এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সমান সুযোগ ও সুবিধা দিয়া থাকেন।

Common Features of Secondary Schools.

প্রত্যেক Secondary School (তাহা যে শ্রেণীরই হোক না কেন) ইহা লিখিত আইন অনুযায়ী শিক্ষা, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষকের মর্যাদা, ন্যূনতম মান অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। "Every Secondary School must have an assembly hall, a gymnasium, a library, an art and crafts room for practical activities and a dining room. The gymnasium must be properly equipped, and

there must be rooms for changing dress and shower baths. There must be a large level play ground, and playing fields must be provided, either on the school site or in a reasonably accessible situation."…"There is a common maximum of 30 pupils in a class …the conditions governing approved by the minister as a "qualified" teacher are comprehensive.…A common scale of salaries, is binding on all employing bodies.

যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মেধাবী এবং "sixth form" work এর যোগ্য, তাহাদের পিতামাতা বা অভিভাবকের ১৫ বৎসরের (Compulsory School leaving age) পর তাহাদের পড়াইবার সামর্থ্য না থাকিলে সরকার হইতে সে সকল ছাত্রছাত্রীদের "Maintenance allowance" দিবার ব্যবস্থা আছে।

Libraries—সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত Library রাখিতে হইবে এবং যাহাতে Libraryতে নানা প্রকার বই পড়িতে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহিত হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

Instructional Equipment—শিক্ষার কাজের জন্য উৎকৃষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ উপকরণ রাখিতে হইবে। Magic-lantern, film-projectors, radio-set ইত্যাদির ব্যবস্থা সমস্ত বিদ্যালয়েই থাকিবে। বিভিন্ন বয়স ও রুচির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের radio programme প্রতিদিনই ব্যবস্থা থাকে।

The School Community—ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক একত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগরিত ও বিকশিত করিবার জন্য বহুবিধ আয়োজন আছে। School Council-elections, ইত্যাদি দ্বারা দায়িত্ব বোধ, পরিচালনা ও বাগ্মিতা শিক্ষার সাহায্য করা হয়। Picnics, Historical tours, Scientific expeditions, বিভিন্ন ধরনের ক্লাব ও organisation গঠনে উৎসাহ দেওয়া হয়। Boarding Schoolএ এ বিষয়ে সুযোগ সুবিধা Day School গুলির (যেখানে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ী হইতে আসিয়া, পড়াশুনার সময় কেবল একত্রিত হয়) চেয়ে বেশী। তথাপি Day School গুলি এসব ব্যাপারে কম উৎসাহী নয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে এ বিষয়ে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা বর্তমান।

Creative outlets—Arts, Crafts, Eurhythmics etc.

ছাত্রছাত্রীদের সৃজনী প্রতিভা যাহাতে স্ফুরিত হয় এবং যথাযথ প্রকাশের সুযোগ পায় সে জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ছবি আঁকা, হাতের কাজ, সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার দ্বারা জিনিষ নির্মাণ, সঙ্গীত শিক্ষা, নাটক ও আবৃত্তির নানাবিধ আয়োজন করা হয়। ইহা শিক্ষার একটা অবিচ্ছেদ্য এবং মূল্যবান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

Physical activities—Health and Hygiene.

ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে শরীর চর্চা দ্বারা সবল ও সুস্থ দেহ হয় সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সর্ব-প্রকারের সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত ভাবে ডাক্তারী পরীক্ষার ফল অনুসারে কোন না কোন প্রকারের ব্যায়াম করিতে হইবে। নানা প্রকার ব্যায়ামের; বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলা, Competitions-এর ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। দুধ এবং টিফিন বিনা ব্যয় বা নাম মাত্র ব্যয়ে দিবার ব্যবস্থা আছে।

Spiritual values—

ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধেও ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে উদাসীন না থাকে—যাহাতে মহৎ আদর্শের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধাশীল হয় সে জন্য ধর্ম ও নীতিমূলক আলোচনা এবং উপাসনা ইত্যাদির ব্যবস্থা সমস্ত বিদ্যালয়ে করা হয়।

Education through interest—

নূতন ধরনের শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে ছাত্রছাত্রীদের আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া। তাহাদের মনকে সজাগ কৌতূহলী, ও জিজ্ঞাসু করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষক বন্ধু হিসাবে তাহাদিগকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করিবেন—পথ দেখাইবেন। কাজেই ক্লাশে বক্তৃতার উপর আগের মত জোর দেওয়া হয় না। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীনভাবে নানা সমস্যার সমাধান করিবার সাহস ও

অভ্যাস জন্মাইবার জন্য শিক্ষক সর্বদাই চেষ্টা করেন। তিনি নিজেকে ছাত্রদের উপর চাপান না।

School & Home—

গৃহ ও বিদ্যালয় পরস্পরের পরিপূরক। গৃহের শিক্ষা বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিদ্যালয়-জীবন সাংসারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন জগৎ এই ধারণা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যাহাতে না জন্মে সে দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। বিদ্যালয় যাহাতে তাহাদের পক্ষে "কারাগার" না হইয়া আনন্দময় কর্মক্ষেত্র হয় সে বিষয়ে শিক্ষকগণ সজাগ থাকেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করেন।

Vocational guidance—ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকা অর্জন করিতে হইবে সুতরাং তাহাদের শিক্ষা যেন সেই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাহাদের প্রস্তুত করে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া চাই। প্রত্যেক ছাত্রের বিদ্যা ও রুচির record শিক্ষকেরা রাখেন এবং সে কোন কাজের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই অনুযায়ী তাহাকে জীবিকা নির্ধারণ ব্যাপারে সাহায্য করেন। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেন। জাতির সেবায় যে লোক যেখানে উপযোগী ইহা নির্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা হইলেই শক্তির অপচয় নিবারিত হইতে পারে। জীবিকার সুনির্বাচনের উপর ব্যক্তিত্বও ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ দুঃখ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে; সুতরাং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল এবং ব্যক্তির উপযুক্ত বিকাশের দ্বারা সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করে।

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : 22-6853-58

বর্ম্মী মেয়ে মাসোয়ে

শ্রীযামিনীকান্ত রায়চৌধুরী

রামবাবুর মুখে গল্প শুনছিলাম।

রামবাবুর সঙ্গে পরিচয় আমার দীর্ঘদিনের। একটা সহজ রসিক প্রাণ আছে তাঁর, আর আছে অনুকরণীয় কথন-কৌশল, যা দিয়ে অতি সহজে তিনি বয়ঃনির্বিশেষে সকলের মনের মধ্যে ঠাঁই করে নেন। দীর্ঘ জীবনে ব্রহ্মের বহু জায়গায় বিভিন্ন চাকরী উপলক্ষ্যে বহু কাল কাটিয়েছেন। শেষের দিকে থাটোনে সরকারী চাকুরী করতে করতেই পেন্সন গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে, ব্রহ্ম আর ভারত বলে ভিন্ন দুটো দেশ ছিল না, সমস্তটাই ছিল একটি শাসন-তন্ত্রের অধীন। আউটরাম ঘাট থেকে ১০৲ টাকার একটা টিকিট কেটে জাহাজে চেপে বসলেই হোল। না; বলবার কেউ ছিল না। রামবাবুও একদা এমনি ১০৲ টাকার টিকিট কেটে বসেছিলেন, তারপর একাদিক ক্রমে দীর্ঘ ৩০ বৎসর প্যাগোডার দেশে কাটিয়ে বেশ দু'পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন। রামবাবুর সঙ্গে পরিচয় আমার ব্রহ্মে। যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি তাদেরই দায় বহন করে সাময়িকভাবে ব্রহ্মে গিয়েছিলাম, সেই সূত্রেই আলাপ। বহুকাল অদর্শনেও সেই সূত্রটি আমি ছিন্ন হোতে দেইনি। আকর্ষণ সেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আকর্ষণটা কিসের জানিনা, যদি বলেন ব্যক্তিত্বের তাই মেনে নেবো। সেই আকর্ষণেই রামবাবু দেশে ফেরা অবধি দু'মাস ন' মাসে একদিন রামবাবুর গৃহে গিয়ে হাজির হই। আজ ১৫।১৬ বৎসর ধরেই এ পালা চালিয়ে এসেছি। এসেই নানা গল্প জমে ওঠে, কথনপটু রামবাবুর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনি।

"ভাখো জীবনে যত পাপ করেছি তার প্রায় সবগুলিরই ক্ষালনের একটা পথ রেখেছিলাম, কিন্তু একটা পাপ থেকে মুক্তির আর কোন পথ রইলো না।" জানি এটা ভূমিকা, চুপ করে রইলাম। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে নিজের দোলায়িত পায়ের দিকে তিনি কিছুকাল চেয়ে রইলেন। বুঝলাম স্মৃতি-মন্থন চলেছে। বল্লেন "আমাদের আমলে থাটনে আমরা একদল বাঙ্গালী ছিলাম। বাঙ্গালী মানে কেরাণী বাঙ্গালী। কেউ P. W. D তে, কেউ ট্রেজারিতে, কেউ পোষ্টাফিসে। এদের মধ্যে যদি বনেদী ঘরো তা হোলে ধরতে পারো আমাকে। আমি তখন D. C-র হেড ক্লার্ক। বিদেশে বাঙ্গালী বলেও বটে, আর স্বভাব গুণেও আমাদের এই ৭।৮ টি পরিবারের ভেতর, একটা সত্যিকারের সৌহার্দ্য ছিল। অবশ্য সকলেরই যে পরিবার ছিল এমন নয়। কেউ কেউ ঘর ভাড়া করে একা একাও থাকতেন। স্ত্রী হয় তো দেশে আছেন নানা কারণে আসতে পাচ্ছেন না। যেমন ছিল আমাদের অমিয়, মানে অমিয় সেন। ছেলেটি কাজ করতো ট্রেজারীতে, বয়স বছর ত্রিশেক। বিয়ে করেই চলে আসে, আজ আনি কাল আনি করেও আর বৌকে আনাতে পাচ্ছিল না। ছোট একটা বাড়ী ভাড়া করে ওর দিন গুজরান চলছিল। P. W. Dর কনট্রাকটার রমেন রায় আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী এরাও হাত পা ঝাড়া একা মানুষ মেস করে থাকতেন। আর ছিলেন আমাদের ললিত বাবু, অন্যান্য প্রমুখ কয়েকজন। ললিত বাবু সপরিবারেই ছিলেন। সে সব দিনগুলো আমাদের কেটেছে ভাল। প্রত্যেক রোববারই কোন এক বাড়ীতে আমাদের ফিষ্টের নেমন্তন্ন জুটতো। ফিষ্টের পালাটা সাধারণ নিয়মে Cyclic order এ চলা উচিত হোলেও,আমাদেরটা চলতো গৃহস্বামীর আগ্রহ আর আড্ডামুখীনতার ওপর নির্ভর করে। বেশীর ভাগ নেমন্তন্ন আর গল্প জমতো আমার আর ললিত বাবুর বাড়ীতে। রবিবারটা এক হিসেবে ছিলো আমাদের stock taking day, অর্থাৎ কে দেশ থেকে কি চিঠি পেয়েছেন, দেশে জমি বাড়ীর অবস্থা কেমন, এখন কার কাজকর্মে কি কি বিঘ্ন, কি করে উন্নতি হোতে পারে দেশের আর এখানকার সব সমস্যা মিলিয়ে, যে মুস্কিল তার আসান কি ভাবে হওয়া সম্ভব, গল্পের ছলে তারই প্রচেষ্টা চলতো। মুস্কিল অবশ্য সে সব দিনে,

তোমাদের আজ কালকার মতো আকাশ স্পর্শী ছিল না, তাই আসান ঘটাতে না পারলে অস্তিত্বের অবসান হবে এমন আশঙ্কা হয় নাই। আমাদের এই সহজ বাঙ্গালীয়ানার স্রোতে ললিত বাবু এক রোববার একটি ছোট ঢিল ছুঁড়ে মৃদু কম্পন তুললেন। সেদিন সকলের নেমন্তন্ন ছিল আমার বাড়ীতে। দুটো আড়াইটের আগে আহারের কোন সম্ভাবনা নেই। "ছোটে হাজারি" হিসেবে নারকেল কোরা মুড়ির সঙ্গে দু'এক কাপ করে চা চলছিল, ফাঁকে ফাঁকে গল্পও চলছিল। কিন্তু প্রধান আড্ডাধারী ললিত বাবুর অভাবে তেমন জমছিল না। ললিতবাবু হেলতে দুলতে এলেন অনেক বেলায়। গম্ভীর আনন। অভ্যাসবশে হাতের খড়কেটি তাম্বুল রঞ্জিত দাঁতের এফাঁকে ওফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফরাসের এক কোণ দখল করে নিঃশব্দে তিনি দাঁত খুঁচিয়ে চললেন। অবাক মানলাম, কারণ নিঃশব্দ ললিত বাবুর ধাতে লেখা নেই। বল্লাম—"কি ব্যাপার ললিতবাবু বাক্যহীন যে?" বল্লেন, 'বাক্যহীন করে দিয়েছে যে। অমিয় বোধহয় প্রেমে টেমে পড়লো···' এতক্ষণ মনে পড়েনি, হঠাৎ খেয়াল হোলো আজ এতো বেলা অবধি অমিয়ের একবারও সাক্ষাৎ পাই নি অথচ আমার গৃহে তার আগমন সাধারণতঃ ঘটে সকলের আগে। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "প্রেমে টেমে মানে?" প্রেমে মানে বমির প্রেমে—বাজারে একটা public scandal করে বসেছিল আজ অমিয়···Ranger এর যে মেয়েটা বাজারে কমলা লেবুর ব্যবসা চালায় তাকে নিয়ে এমন একটা···"। Scandal বর্ণনা আর বেশীদূর এগুলো না, দ্বারের কাছে অমিয়ের প্রফুল্ল মূর্তি দেখা গেল। লক্ষ্য করলাম অমিয়ের দিকে। নীরবে একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ললিতবাবু আবার দাঁত খোঁচাতে ব্যাপৃত হোলেন। বল্লাম, "এসো অমিয়, আজ এতো দেরী?" বল্লে, "ঘরে কিছু কাজ পড়েছিল, তাই সেরে উঠতে একটু দেরী হয়ে গেল। হাসলে। একা মানুষ আর পেরে উঠি না।" ললিতবাবু ঝনকে উঠলেন, "বৌমাকে নিয়ে এলেই পারেন দেশ থেকে···"। সহজ হাসি হেসে অমিয় জবাব দিলো, "তাই বা হচ্ছে কোথায়?" হঠাৎ বেয়াড়া ভাবে ললিতবাবু বলে বসলেন, "তা কমলা লেবু আর ফুল ছোড়াছুড়ি চলে সেটা হয়ই বা কেমন করে···" মুহূর্তের জন্য অমিয়ের মুখটা বোধ হয় রক্তিম হয়ে উঠেছিল বল্লে—"তার মানে···" "মানে আপনি ভাল করেই জানেন..." আমাদের প্রতি রোববারের একান্ত সরল হাস্যমুখর পরিবেশটা একটা আকস্মিক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আবির্ভাবে যে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে এ আমি কিছুতেই চাইছিলাম না। প্রসঙ্গান্তরে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু গল্প-গুজব সেদিন আর তেমন জমলো না। অমিয় প্রতিদিনের মতো তেমন প্রাণখোলা হাসি আর হাসলো না। প্রায় গুম হয়ে রইলো।

পরের রোববার ললিত বাবুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন। গিয়ে দেখি সকলেই আছেন, শুধু অমিয় নেই। জিজ্ঞেস করলাম "ললিত বাবু—অমিয় কোথায়?" বল্লেন, "সে কি আমি জানি, না আপনি জানেন! অমিয় তো এখন বাতাসে ভাসছে।" বুঝলাম ললিত বাবু ক্ষুব্ধ। প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করতে লাগলাম, এই সে এলো বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমিয় এলোই না। খাওয়া দাওয়া শেষ করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিকেলের দিকে ললিত বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে অমিয়ের বাড়ীর দিকে গেলাম। গিয়ে দেখি অর্গল বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করতে ছোকরা চাকরটা বেরিয়ে এসে জানালো, বাবু সকাল বেলাই কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন। ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ রাস্তার মাঝে অমিয়ের সঙ্গে দেখা। একা নয়, মা সোয়ে এবং আরো কয়েকটি সঙ্গিনী আছে। মা সোয়েকে আমি চিনতাম। তার বাবা উবা সেইন forest ranger এর কাজ করেন। অতি ভদ্র বিনয়ী। পূর্বে উবা সেইনের বৈঠকখানায় আমার সান্ধ্য বৈঠক জমতো। অন্য জায়গায় বদলী হবার পর আর অনেক কাল তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। ব্রহ্ম স্ত্রী স্বাধীনতার দেশ। স্বোপার্জনে চলা সেখানকার চলতি নীতি। তাই অনেক সময় নিতান্ত অভাবগ্রস্থ নয় এমন পরিবারের মেয়েদেরও স্বাধীন ব্যবসায়ে নামতে দেখা যায়। মা সোয়ের বাজারের দিকে একটা কমলালেবুর দোকান আছে। আমি নিজেও ক'দিন ওঁর দোকান থেকে ফলমূল কিনেছি। মেয়েটির সরল মুখশ্রীতে এমন একটা মধুরিমা আছে যে সহসা আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না।

অনতিদীর্ঘ, সুঠাম দেহবল্লরীতে লাবনি যেন ঝরে পড়ছে। আজ সে একটা গাঢ় সবুজ রংয়ের লুঙ্গি পরেছে, পায়ে দিয়েছে সবুজ রংয়ের "স্যানা।" পরেছে পাতলা ইঙ্গি। তার গৌরোজ্জ্বল বাহু দুটি যেন ফুটে বেরুচ্ছে ইঙ্গির আবরণ ভেদ করে। মুখে পরিপাটি করে মেখেছে তালাখ্যা। কৃষ্ণ কেশদাম দিয়ে রচেছে সুশ্রী কবরী, ফুল গুঁজেছে তাতে, কবরীতে বসিয়ে দিয়েছে ওদের বামা ভঙ্গীতে একটি বড় চিরুণী। বল্লাম, "কি মাসোয়ে কেমন আছ?" সে সলজ্জ হাসি হাসলো। বল্লে, 'ভালই আছি—আপনি তো আর আমাদের ওদিকে যান না'—বল্লাম, "যাই না সত্যি তোমার বাবাও তো সব সময় থাকেন না, তাই যাওয়া হয় না।.....তা অমিয়, ললিত বাবুর বাড়ীতে তো আজ তোমাকে দেখলাম না—।" গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিলাম অমিয় বিশেষ অস্বস্তি বোধ করছে, প্রশ্নটাতে, অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল, একটু ইতস্ততঃ করে বল্লে, "হ্যাঁ, তা···মানে যাওয়া আর কিছুতেই হয়ে উঠলো না···।" "আর কি জানেন ললিত বাবু আমাকে আজকে তাঁর ওখানে যেতে বলেনওনি···কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নাও হোতে পারে তাই তা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "গিয়েছিলে কোথায়?" পলকের জন্য মা সোয়ের দিকে চেয়ে অমিয় কি একটু ভাবলে, তারপর বল্লে, "খুব বেশী দূরে নয় আমাদের এক সহকর্মী থাকেন পাহাড়ের দিকে, ওর বাড়ীতে কাজু বাদামের গাছ আছে... আমি আবার একটু কাজু বাদাম প্রিয় কিনা তাই মাঝে মাঝে ওঁর বাড়ীতে আমার নেমন্তন্ন হয়। খাওয়া দাওয়া সব গুলবটাই মুখ্য কাজ বাদামটা গৌণ।" সে মৃদু হাসলো। কথা হচ্ছিল বাংলায়। অমিয় একটিও ভিন্ন দেশী শব্দ ব্যবহার করছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, "তা ওদের সঙ্গে কোথায় দেখা হোল?" "এইপথে আসতে আসতে···" মা সোয়ে স্মিতমুখে দাঁড়িয়েছিল। সে যে আমাদের কথোপকথনের কোন অর্থ উদ্ধার করতে পাচ্ছে তা মনে হোল না। বল্লাম, "কোথায় চলেছো" মা সোয়ে বল্লে, "বাড়ী···" সঙ্গের মেয়ে দু'টিকে দেখিয়ে বল্লে "এরা আমার মাসতুতো বোন···এদের বাড়ীই গিয়েছিলাম চড়ুই ভাতি খেতে···" বল্লাম, "বেশ···বেশ···তা তোমার মাসতুতো বোন দুটি তো তোমার থেকেও দেখতে ভাল—এক সঙ্গে চলাফেরা করলে লোকে তো তোমায় কুৎসিৎ বলবে···" সরল হাসির তরঙ্গে ওদের কণ্ঠ কল্লোলিত হয়ে উঠলো। অমিয়কে পরের রোববার আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে গৃহাভিমুখে পা বাড়ালাম।

অবনী এর মধ্যে এমন একটা খবর বহন করে নিয়ে এলো যে অমিয়র ওপর একটু বিরক্ত না হয়ে পারলাম না। অবনী অমিয়ের সহকর্মী। দু'জনেই ট্রেজারীতে কাজ করে। কথায় কথায় বল্লে—"অমিয় বাবুতো আজকাল মেয়েদের নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে কিষ্ট করে বেড়াচ্ছেন।" বিস্মিত হয়ে বল্লাম, "কোন বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে?" হেসে বল্লে, "ভয় পাবেন না, বাঙ্গালী বাড়ীর নয়। বর্মীদের নিয়ে। এই তো গত রোববারই গেছে বা সেইনের মেয়েটিকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে। বল্লাম, "তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছ। পাহাড়ের দিকে সে গিয়েছিলো ঠিকই, তবে গিয়েছিলো তোমাদের office এর কে একজন থাকিন তাঁর বাড়ীতে।" অবনী কৌতুকের হাসি হাসলে, "সে তাই বলেছে বুঝি! মিথ্যারও একটা সীমা থাকা দরকার···" বিস্মিত হোলাম, বিরক্তও হোলাম।

রোববার দিন অমিয়কে অন্তরালে নিয়ে পরোক্ষভাবে প্রকৃত সত্যটা জানবার চেষ্টা করলাম। সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো—তারপর একটু বিরক্ত মাখা কণ্ঠে বল্লে, দেখুন রায়বাবু, সকলে যদি আমার পেছনে গোয়েন্দা গিরিতে লাগেন তা হলে তো আমি নাচার। একেবারে ছেলেমানুষ নয়, ভাল-মন্দ বুঝবার একটা বয়সও হয়েছে—অবনী ললিতবাবুদের আমার সঙ্গটা যদি একান্তই দূষিত মনে হয় তা হলে বরং আমার মুক্তি দিন, কারুর শিরঃপীড়ার কারণ আমি হোতে চাই না।" বল্লাম, "এ তোমার রাগের কথা অমিয়। তোমায় মন্দ ভেবে এ কথাগুলো জিজ্ঞাসা করা হয় নি···" কথা আর বাড়ালাম না, ভাবলাম আমারই বা কি দরকার অন্য কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়ে গার্জিয়েনগিরি করতে যাবার। অবনীরা কিন্তু ছাড়লেনা। ওদের কোন গোপন প্রতিহিংসা জেগে উঠেছিল কিনা কে জানে। অবনী শ্লীলতার মাত্রা না রেখেই স্বরচিত-গান জুড়ে দিলো।

"মগের দেশে মগের বেশে যত কুলাঙ্গার—
দেখেশুনে হদ্দ হোলেম এদের ব্যবহার ;
এসেছে সব সাগর পারে গোটু হেল, তাই জাত-
বিচার,—
বমী নিয়ে আছেন সুখে ভুলে সবে ঘর দুয়ার !"

ললিতবাবুও কথার ফাঁকে বিদ্রূপ মাখা তীব্র মন্তব্য করতে ছাড়লেন না। অর্থাৎ আমাদের নিরুপদ্রব শান্ত রবিবাসরীয় বৈঠকগুলো ক্রমশঃই ক্ষেপ, হিংসায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠতে লাগলো। এভাবে চলে শেষ পর্যন্ত যে কি হোত কে জানে, হঠাৎ প্লেগ এসে সাময়িক ভাবে আমাদের সকলকে ছত্রভঙ্গ করে দিলো। এই প্লেগ জিনিষটা ব্রহ্মের এক বিভীষিকা, দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মহামারীর আকার ধারণ করে। ভয়ানক ছোঁয়াচে, কিছু করবার আর বোঝবার আগেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে ইহজগৎ ছাড়তে হয়। প্লেগ সম্বন্ধে লোকের আতঙ্ক তাই ভয়ানক। সেবার থাটন, মৌলমিন প্রভৃতি সহরে একসঙ্গে ভয়াবহ আকারে প্লেগ দেখা দিলো। সকলে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। Municipality-র লোক এসে হাতে পায়ে, কেরোসিন আর ফিনাইলে ভেজান ছালার মোড়া পরে পাড়ার এখান সেখান দিয়ে মরা নিয়ে যেতে লাগলো। সামান্য কোন কারণে গলা কি দুচ্‌কি কুললেই হোল, আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। ইষ্টনাম জপ করে দিন কাটাতে লাগলাম। এর ভেতর আর ললিতবাবুর সাক্ষাৎ পাই নাই। হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যে বেলা ঝড়ের মতো এসে হাজির। চোখ মুখ শুকনো, একটা দারুণ আতঙ্কের চিহ্ন মুখে। বল্লাম "কি ব্যাপার ললিতবাবু ?" ব্যাপার ! আপনি এখনও ব্যাপার জিজ্ঞেস কচ্ছেন ? কি কাণ্ডখানা হচ্ছে একবার ভেবে দেখেছেন। অমিয়ও নাকি attacked, আর ভরসা কি ! ছা পোষা লোক মশাই, অতো ধকল আমার সইবে না, সায়েবকে বলে কালই রেঙ্গুন লম্বা দিচ্ছি, তেমন দেখিতো চাকরীর কপালে ঝ্যাঁটা মেরে দেশেই চলে যাবো।" চিন্তিত হয়ে পড়লাম, বল্লাম, 'তা না হয় যাবেন, কিন্তু উপস্থিত অমিয়র একটা দেখাশুনার ব্যবস্থা তো আমাদেরই করতে হবে। বিদেশে বিভুঁয়ে একা বেচারীকে দেখবেই বা কে।' "রেখে দিন মশাই দেখা শুনা, ওসব বয়ে যাওয়া ছোকরার জন্যে আমার কর্তব্যবোধ অতো উথলে ওঠেনা। আর কি জানেন, আপনি বাঁচলে বাপের নাম···" পরের দিন বাপের নাম বাঁচাতে ললিতবাবু রেঙ্গুন পাড়ি দিলেন। পৈতৃক নাম রক্ষার আকাঙ্ক্ষায় আরো অনেকেই ইতিপূর্বে থাটোন ত্যাগ করেছিলেন। D.C.র কাছে দু' বেলা হেঁ হেঁ কচ্ছি ছুটির জন্যে। আজ হয় কাল হয় করে হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে চাকরী আঁকড়ে পড়ে আছি। ললিতবাবুতো চলে গেলেন। কিন্তু যে খবরটি দিয়ে গেলেন তাতে স্থির হয়ে ঘরে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। পরের দিন সাত পাঁচ ভেবে অমিয়র কুঠিতে গিয়ে হাজির হোলাম। একটু ইতস্ততঃ করে কড়া নাড়লাম। যে এসে দরজা খুললো তাকে দেখে চোখ আমার কপালে উঠলো। বল্লাম "মাসোয়ে তুমি এখানে ?" ম্লান মুখে সে দাঁড়িয়ে ছিল উত্তরে বল্লে "ওর যে প্লেগ হয়েছে বাবুজী কেউ নেই যে দেখবে, তাই এলাম।" সহসা মুখে কোন কথা জোগালো না, ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হোল ওর আতঙ্কগ্রস্থ নয়ন দুটি যেন আরো কিছু বলছে, যেন একটা পরম প্রাপ্তিতে নয়ন দুটো তৃপ্ত। বল্লাম, "চলো, ভেতরে যাই।" সে কিন্তু দোর গোড়া ছাড়লে না, বল্লে, "আপনি কেন ভেতরে যাবেন বাবুজী·····" ওর ভয়ের কারণটা বুঝলাম, বল্লাম, "তোমার যদি কিছু না হয়ে থাকে তা হলে ওর নেই আমারও কিছু হবে না।" মাসোয়ে আর বাধা দিলো না। ভেতরে গিয়ে দেখি অমিয় চোখ বুজে শুয়ে আছে। গলায় একটা কম্ফার্টার জড়ান। বুঝলাম গলা ফুলেছে। উত্তাপ পরীক্ষা করলাম, খুব বেশী বলে মনে হোল না। নিম্নকণ্ঠে মাসোয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তার দেখিয়েছ ?" বল্লে, "ডাক্তার তো দেখিয়েছি কিন্তু ঠিক কিছুই বলতে পাচ্ছেন না·····" কি সান্ত্বনা করা যায় কি পরামর্শ দেই কিছুই ভেবে পেলাম না। মামুলী উপদেশ দেয়া ছাড়া কিছুই করতে পারলাম না। সে দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিলো, বিদায় নেবার মুখে কিছু বলে যাবো বলে ঘুরেছি দেখি ওর চোখ দু'টো ছলছল্। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে, "বাবুজী, ওষুধ কি দেয়া হবে না ? ওকি ভাল হবে না ?" এ বিদেশিনীকে কি ভাষায় সান্ত্বনা দেই—ভেবে পেলাম না। স্বাভাবিক অবস্থায়

মনের একান্ত এ আকুলি সে নিশ্চয়ই আমার কাছে প্রকাশ করতো না। নিতান্ত একাকী দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নিশি-দিন যাপনের মাঝে অকস্মাৎ আমাকে পেয়ে অন্তরঙ্গ বোধে রুদ্ধ মনের উচ্ছ্বাস সহসা বাঁধ ভেঙ্গে আজ এমনি করে আত্মপ্রকাশ করে বসলো। বল্লাম, "ভাল হবে বৈকি..... ভগবান তথাগত কি আর এতো নিষ্ঠুর হবেন···তুমি কিছু ভেবো না, আমি যদি এখানে থাকি তা হ'লে মাঝে মাঝে আসবো···" সে প্রতিশ্রুতি আমি মাত্র দুদিন রক্ষা করতে পেরেছিলাম। D.Cর দরবারে বর্ম্মী মেয়ে শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হোল। কিছু কালের ছুটি মঞ্জুর হওয়ায় পাড়ি দিলাম উত্তর ব্রহ্মে শালক গৃহে। ফিরে এলাম প্রায় মাসখানেক পর। মহামারীর তাণ্ডব থেমে গেছে। অমিয়র জন্ত দুশ্চিন্তা ছিল, এসে শুনলাম সে ভাল আছে।

ললিতবাবুকেও দেশাভিমুখী রওনা হোতে হয়নি, রেঙ্গুন থেকেই আবার তিনি খাটোমে ফিরে এলেন। রমেনবাবু, গোবিন্দ গাঙ্গুলী প্রভৃতি যাঁরা এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছিলেন, তাঁরাও একে একে ফিরে আসতে লাগলেন। অনেক কাল পর—আবার সকলে একদিন বৈঠকে মিলিত হওয়া গেল। যে প্লেগের আশঙ্কায় একরা প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল তা নিয়েই হাসি তামাসা চল্লো। ললিত বাবু এলেন। একথা সে কথার পর বল্লেন, "যা বলেছিলুম, তাই হোল কিনা দেখুন। এ যে হবে তা আমি জানতুম..." বল্লাম, "কেন, কি হোল আবার?" "আপনি জানেন না? অমিয় যে দিব্যি সেই বর্মী নিয়ে ঘর সুরু করে দিয়েছে···" এ খবরটা আমার জানা ছিল না, চুপ করে রইলাম। অমিয়র অসুখের সংবাদ শুনে যেদিন প্রথম ওর বাড়ী যাই মাসোয়ের সেদিনকার ম্লান মুর্তিটি আমার মনে পড়ে গেল। মনে মনে কেমন একটা ভরসা ছিল, মনে হয়েছিল ওঁর এমন একান্ত প্রার্থনাটা ভগবান তথাগত কখনই অবহেলা করতে পারবেন না। তাই যখন শুনেছিলাম অমিয় সুস্থ হয়ে উঠেছে তখন খুব আশ্চর্য হইনি। সেবার এত বড় অধিকার নিয়ে যে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে তাকে আমার মন সহসা ছোট করে দেখতে চাইলো না। ললিতবাবু বল্লেন, "তবে এও বলি, এ সমস্ত বেলেল্লাপনা আমরা থাকতে এখানে হোতে দিচ্ছি না। মর্ ব্যাটা, দেশে একটা বিয়ে করে বৌ রেখে এসেছিস, আবার এখানে আরেকটাকে নিয়ে দিব্যি ঘর করতে লেগেছিস। আর তোকেও বলি বেটি তোরই বা এতো চলাচলিপনা কেন? এর একটা বিহিত করা দরকার, কি বলেন রামবাবু···" বল্লাম, "আমি বেশী কিছু বলিনা, তবে কি জানেন মেয়েটার ঘাড়ে যতবড় দোষের বোঝা চাপাতে চাইছেন তত বড় বোঝা বোধ হয় ওর ওপর চাপান ঠিক নয়। আমরা সকলে যখন প্লেগের ভয়ে পলালাম, তখন সেই তো এসে অমিয়র পাশে দাঁড়িয়েছিল।" ললিত বাবু শ্লেষের হাসি হেসে উঠলেন, "বাঃ! তবে আর কি রোগীকে নিয়ে দিব্যি ঘর করবার অধিকার সে পেয়ে গেল! রোগ না হাতী, প্লেগ হলে কেউ বাঁচে নাকি? ঐ রোগের ছুতো ধরেই বেটি এসে অমিয়র ঘর আগলে বসেছে।" বল্লাম, "ঘর কচ্ছে ঘর কচ্ছে বলছেন কিন্তু সত্য মিথ্যা তো আর যাচাই করা হয়নি। শুধু শুধু একটা উড়ো কথা ভরসা করে হৈ হল্লা করা কি ঠিক?" ললিতবাবু ডিবে থেকে একটা পান তুলে মুখে পুরে বল্লেন, "ঠিক আমিও সে কথাই বলি, হৈ হল্লা করাটা কিছু নয়। আমরা জানি না অমিয় বর্মী নিয়ে ঘর কচ্ছে কি কচ্ছে না; আমাদের জানবার দরকারও নেই। কিন্তু পাঁচ-জনে পাঁচ কথা বলছে। দেশে অমিয়র নব-পরিণীতা স্ত্রী আছেন। এ অবস্থায় অমিয়র পিতা এবং শ্বশুর মশায়কে হাওয়ায় ভাসা কথাগুলির আভাষ দিয়ে বৌমাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে লেখা কি আমাদের কর্তব্য নয়? বর্মী মেয়েটি খুব ভাল হোতে পারে, কিন্তু অমিয়র বাঙ্গালী বৌটি শুধু বাঙ্গালী বলেই যে মন্দ এমন কোন প্রমাণও তো আমরা পাইনি। কি বলেন রামবাবু?"

বক্রোক্তিটা নীরবে হজম করলাম। বল্লাম, "আপনারা যা ভাল বুঝবেন করবেন, আমার কিছু বলবার নেই....." অবনী প্রায় তেড়ে উঠলো, বল্লে, "আছে বৈকি। আপনি আমাদের অগ্রগণ্য; সব ব্যাপারে আপনার নেতৃত্ব আমরা মেনে চলি এ ব্যাপারে আপনি গা ঢিলে দিলে আমরা শুনবো কেন।" বল্লাম, "সকলের গার্জেনগিরি করে বেড়ানই কি আমার পেশা?" বল্লে, "তা না হোতে পারে। কিন্তু একটা নিরপরাধিনী মেয়ের চরম দুর্দশার ইঙ্গিত যখন পাচ্ছি তখনও আমাদের কোন দায়িত্ব থাকবে না এত বড়

মিথ্যা নীতি-বোধ নিয়েই বা বসে থাকি কি করে……" চিঠির দু'টো খসড়া ওদের তৈরী করাই ছিলো তাতে সকলে মিলে সই করে সে দু'টো পাঠিয়ে দেওয়া হোল। যেমন আশা করা গিয়েছিলো হোলোও তাই অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যেই একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে অমিয়র পত্নী খাটোনে এসে উপস্থিত হোল্ এবং উপস্থিত হোল আমারই গৃহে। অল্প বয়সী শ্যামবর্ণা মেয়েটি—বড় মিষ্টি চেহারা নাম বেলা। দেখলে স্বভাবতঃই স্নেহ হয়। মেয়েটি দু'দিন আমার গৃহে রইলো। যে দায়িত্ব নিয়ে মেয়েটিকে আনা হয়েছে তার গুরুত্ব চিন্তা করে আমি তো দিশেহারা হয়ে পড়লাম। ললিতবাবু কিন্তু ভরসা দিলেন, বল্লেন, "আপনি কিছু ভাববেন না…… আমরা সব ঠিক করে দেবো। আপনি শুধু দেখে যাবেন আমরা কি করি।" অগত্যা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলাম। সেদিন রোববার। অবনী আর ললিতবাবু সকাল বেলা এসে উপস্থিত। বেলা তখন একটু বেড়েছে। বল্লেন, "বেলাকে শিগ্‌গীর নিয়ে আসুন। আপনার চাকরটাকে ওর মালপত্তর নামিয়ে আনতে বলুন। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুণি যেতে হবে। আপনিও কাপড় পরে আসুন…… "কিছুই অনুধাবন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি, কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছি না।" "সবই বুঝতে পারবেন, আগে বেলাকে পাঠিয়ে দিন তারপর আপনি আসুন……" কথা না বাড়িয়ে অন্দরে গিয়ে বেলাকে পাঠিয়ে দিলাম ; ওর মালপত্রও চাকর দিয়ে নামিয়ে দিলাম। ওরা গাড়ী করে চলে যাবার পূর্বে বলে গেল অমিয়র বাড়ী যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আমিও বেরুলাম। মনে কৌতুহলের চেয়ে উদ্বেগই বেশী। ললিত বাবু যে কোন পথ ধরে এগিয়েছেন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিলাম না। অমিয়র বাড়ীর সামনে পৌঁছে দেখি দু' তিন খানা গাড়ী দাঁড়ান। আমাকে আসতে দেখে অবনী আর রমেশ-বাবু ছুটে এলেন। হাসতে হাসতে বল্লে, "আসুন আপনার জন্যেই তো সকলে বসে আছি।" বল্লাম, "কি ব্যাপার হে, অমিয় কোথায় ?" বল্লে, "চলুন…ঘরে চলুন ব্যাপার বুঝিয়ে দিচ্ছি……" বৈঠকখানার প্রবেশের পথে দেখি উঠোনের এক কোণে কিছু আসবাব পত্র, বাক্স, বিছানা স্তূপ করা। অমিয়র সেই ছোকরা চাকরটা ম্লান মুখে বসে আছে। সমস্ত ঘরগুলো দেখলাম জল দিয়ে ধুইয়ে দেওয়া হয়েছে। বৈঠকখানার একদিকে কলাপাতা কেটে রাখা হয়েছে। আমার আসার খবর পেয়ে ললিতবাবু হন্তদন্ত হয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। "এই যে এসেছেন… কেমন চালখানা দিয়েছি বুঝুন…" বল্লাম, "চালখানা কিন্তু এখনও বুঝতে পারিনি…" তাম্বূলরঞ্জিত দন্তরাশি বিকশিত করে ললিতবাবু হাসলেন, বল্লেন, "Pure and simple tactics……ওঁৎ পেতে ছিলাম কবে অমিয় পাহাড়ে ওর officer বন্ধুর বাড়ী যায় ; একবার ওখানে গেলে সমস্ত দিন ওর প্রায় সেখানেই কাটে। ছোকরা চাকরটাকে এক ধমক দিয়ে ঘর ধরল ও বেলাকে আনয়ন এবং পূর্ব পরি-কল্পনা মতো এখানে কিষ্টের আয়োজন—" নিজের কথন ভঙ্গীতে নিজেই হাসতে লাগলেন।

বল্লাম, "তা তো যেমন তেমন, কিন্তু আইন বলেও তো একটা বস্তু আছে, তার ধকল সামলাবে কে ?" একটু বিস্মিত হোলেন, "আইন ? আইন মানে ?" বল্লাম, "আইন মানে trespassing" মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেলেন, তারপর সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে আস্ফালন করতে লাগলেন, "আইন ! অমিয় দেখাবে আইন…দেখালেই হোল আর কি…আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি কিনা ! আর তেমন যদি হয়ই আপনি সামলাবেন…" এবার বিস্ময়ের পালা আমার, বল্লাম, "আমি সামলাবো ? ব্যাপারটা ঘটালেন আপনারা আর সামলাবার ভার আমার উপর ?" ললিত-বাবুর কণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তির আভাষ ফুটে উঠলো বল্লেন, "আমাদের কারও ব্যক্তিগত স্বার্থে তো আর আমরা ব্যাপারটা ঘটাইনি। কাজে কাজেই বেলার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের সকলের অগ্রণী হিসেবে আপনাকে ধকলটা সামলাতে হবে বৈকি। আপনি অমিয়র ব্যাপারগুলো D.C.র কাছে বল্লে, ওর সাহসই হবে না যে এ নিয়ে আবার সে কোর্ট ঘর করে—" ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক ঘটনা নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া অর্থহীন। বিশেষ সে তর্ক যদি তিক্ততার সৃষ্টি করে। চুপ করে গেলাম। চুপ করলাম বটে কিন্তু ললিতবাবুদের কিষ্টের উৎসাহ একটু যেন ঢিল পড়লো। বলা বাহুল্য, চিন্তিত হয়েছিলাম। একটা চেয়ার টেনে বৈঠকখানার দরজার কাছে

বসলাম। বেলা বাড়তে লাগলো। ঘণ্টা দুই পর মাসোয়ে ফিরে এলো। আমি দূর থেকেই ওঁকে আসতে দেখছিলাম, কি বলে সে প্রকৃত অবস্থা ওকে বুঝান যায় তাই ভাবছিলাম। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই ওর চোখে যে অবিশ্বাস্য বিস্ময় ফুটে উঠছিল তা আমি দরজা থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। উঠে গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। বিস্ময়ে ভাবনায় ওর কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে। ম্লান স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবুজী আপনি এখানে? ঘর দখল করে বসে আছে, এরা কারা? আর আমার বিছানা পত্তরগুলিই বা বাইরে কেন?" আশ্বাস দেবার সুরে বল্লাম, "ভাবনার কিছু নেই, ঘরে এসো, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে দিচ্ছি···" ইতিমধ্যে অবনী ললিতবাবুরা সামনের প্রাঙ্গণে এসে ভিড় করেছিলেন; মাসোয়েকে আনবার কথা শুনে তাঁরা ঘোর আপত্তি তুললেন। বন্দিনী বেটি ঘরে ঢুকলে আবার ঘর ধোয়া মোছার ঝামেলা পোহাবে কে? বল্লাম, "ঝামেলা যদি পোহাতেই হয়—আমি পোহাবো। কিন্তু ওকে দরজা থেকে বিদায় করবো এতো বড় ক্ষমতা অন্ততঃ আমার নেই।" ওকে এনে বসালাম, সহজ কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করলাম, "বেলা এসেছে, ক'দিন থেকেই আসবে আসবে করছিল, আজ এঁরা সকলে ওকে নিয়ে এসেছেন—" প্রশ্নাকুল দৃষ্টি নিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "বেলা কে?" নিজেও মনে মনে একটু বিস্মিত হোলাম, বল্লাম, "কেন তুমি জানোনা? বেলা অমিয়র বিবাহিতা স্ত্রী। দু' তিন বছর হয় মেয়েটাকে বিয়ে করে সে দেশে রেখে আসে; আজ আনি কাল আনি করে স্ত্রীকে সে কিছুতেই আনছিল না—তাই মেয়েটির বাবা ওকে কয়েকদিন হয় পাঠিয়ে দিয়েছেন·····" স্থির প্রস্তর মূর্তির মতো মাসোয়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলো। অমিয় যে পূর্বাপর নিজের সমস্ত কাহিনী মাসোয়ের কাছে গোপন করে গেছে তা বেশ বুঝতে পারলাম। এমনি অবস্তিকর অবস্থায় কি যে বলা যায়, ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ কাটলো, শেষে মাসোয়ে নিজেই ম্লান হাসি হাসলে, সে যে কি হাসি, তা ভাষায় বোঝান যায় না, বল্লে, "আমারই ভাগ্য মন্দ বাবুজী, নইলে এত বড় মিথ্যাচরণ সে আমার সঙ্গে করবে কেন!" দেখলাম উদ্গত অশ্রুতে নয়ন দুটি তার চক্ চক্ করছে। বল্লে, "বেলা কোথায় বাবুজী, আমি ওঁর সাথে একটু দেখা করতে পারবো কি?" বল্লাম, "পারবে না কেন, একশো বার পারবে—" মাসোয়েকে নিয়ে ভেতর ঘরে বেলার সঙ্গে দেখা করিয়ে চলে এলাম। দু'টি ভিন্ন ভাষা-ভাষী তরুণী আধঘণ্টা ধরে কি ভাষায় মনের কথা শুনে পরস্পরকে বলেছিল, তা মানুষের একান্ত বেদনার খবর যিনি রাখেন সেই অন্তর্যামীই বলতে পারেন। আমি শুধু এক মহৎ ত্যাগের সাক্ষী হয়ে রইলাম। আধঘণ্টা পর মাসোয়ে যখন বেরিয়ে এলো তখন, তার এক হাত অবগুণ্ঠিতা বেলার এক হাত ধরা, বল্লে, "বেলার মতো মেয়েকে দুঃখ দিয়ে আমি আমার দাবী প্রতিষ্ঠা করবো এমন দুর্গতি আমার নেই বাবুজী। আমার দিন যা হোক্ করে চলে যাবে, কিন্তু তোমাদের দেশের মেয়েদের তো আর নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। বিশেষ বেলার মতো মেয়েদের। ভেবে দেখলাম আমারই স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ান উচিত। আমি আর শুধু একদিন আসবো আর তা আপনাকে সঙ্গে করেই আসবো, অমিয়কে শুধু জিজ্ঞাসা করবো এত বড় মিথ্যার অভিনয়টা সে আমার সঙ্গে করেছে কেন·····"

মাসোয়ে চলে গিয়েছিল। সে আসবে বলেছিল কিন্তু আর আসে নি, কোন দাবীও জানায় নি। বাজারে তার দোকানটাও দেখলাম উঠে গেছে; লোক পরম্পরা শোনা গেল সে ফুজি চাউঙ্গে গিয়ে নাকি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে।

ললিতবাবু অবশ্য মন্তব্য করেছিলেন, "বেটি দাবী জানাবে কি? চাপে পড়ে শেষে পালাতে পথ পায় না।"

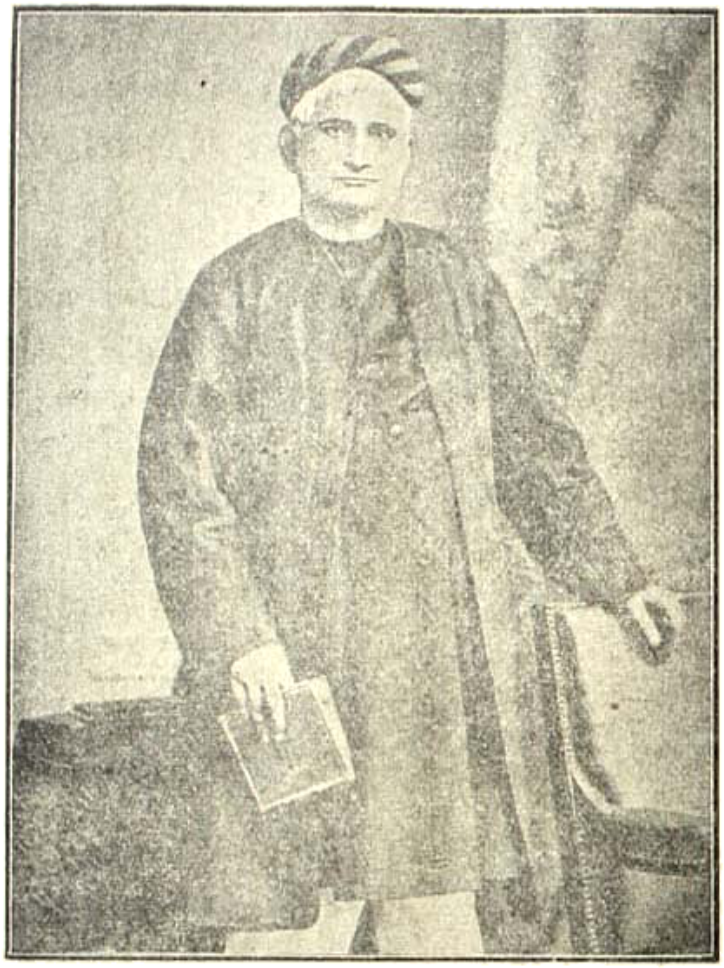

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সেদিন কাঁঠালপাড়ায় গিয়াছিলাম। ৮ই এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-দিবস। এই দিনটিতে নৈহাটী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শাখার উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান-উৎসব প্রতিপালিত হয়। কাঁঠালে পাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা-ভবনটি সংস্কার পূর্ব্বক পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং প্রধানত শ্রীযুত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের একান্ত চেষ্টাফলে সেখানে একটি বঙ্কিম মিউজিয়মও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৈকালে মিউজিয়ম-প্রাঙ্গণে সভা। এবারে আমার উপরে পৌরোহিত্য করিবার ভার পড়ে।

ছোটখাটো জনসভা। বক্তা অনেক। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন, ধর্ম, সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। দেখিতেছি বঙ্কিম এবং বঙ্কিমযুগ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে। কেহ বলিলেন বঙ্কিমের পূর্ব্বে জাতীয়তার নামগন্ধও ছিল না, তিনিই প্রথম বন্দেমাতরম্ এবং উপন্যাসের মাধ্যমে ইহা প্রচার করিলেন। কেহ বলিলেন, কি দুঃখের কথা, এখন আর বঙ্কিম-সাহিত্য পঠিত হয় না। বঙ্কিম-সাহিত্যের ভিতরে কি অমূল্য রত্ন ও শাশ্বত ভাব নিহিত আছে, তাহার পরিচয় ক'জনে রাখে? অধ্যক্ষ অক্ষয়কুমার ঘোষাল কিন্তু একটি ভাল কথা বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তথা বঙ্কিম-সাহিত্য সকলের, সমাজের

সর্বস্তরের ; কাজেই সাহিত্যিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিকের মত অর্থনীতিবিদেরও অনেককিছু শিখিবার আছে এই বঙ্কিম-সাহিত্য হইতে, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতেন। প্রধান অতিথি শ্রীযুত জ্যোতিঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কমলাকান্ত হইতে মার্জারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সমাজের বৈষম্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণাগুলি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিলেন। আরো কেহ কেহ বলিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, কিন্তু সময়াভাব বলিয়া ঐখানেই ইতি করিতে হইল।

সবশেষে সভাপতির ভাষণ। কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-তীর্থে আসিয়াছি। মন স্বতঃই আনন্দে উচ্ছল। বঙ্কিমচন্দ্র জাতির কি সম্পদ তাহা সহসা এবং সহজে বুঝানো যায় না। গত তিন-চারি বৎসরের মধ্যে বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। বুঝিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি কত দিকে প্রসারিত ছিল। বাংলা-সাহিত্যে তিনি যে প্রাণবন্যা আনিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায় তাহা বলিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানের এমন দিক নাই যাহা তিনি বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি নিজে করিয়াছেন, বন্ধুদের দ্বারা করাইয়াছেন। তাঁহারই উপদেশে আই-সি-এস্ রমেশ-চন্দ্র দত্ত বাংলা-সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ হন। নবীন প্রবীণ বহু সাহিত্যিক আসিয়া তাঁহার আসরে ভিড়িয়াছিলেন। জলপ্লাবনে যেমন প্রান্তর ভাসিয়া গিয়া আবর্জনা-মুক্ত হয় এবং পলি পড়িয়া উহা উর্বর হইয়া উঠে, তেমনি বঙ্কিম-মণ্ডলীর অকুণ্ঠ সাধনায় বাংলা সাহিত্য আবর্জনা-মুক্ত হইয়া গিয়াছে ; অনতিকাল মধ্যে বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় মুখর হইয়া উঠে। মানুষের জীবন লইয়াই যে সাহিত্য ; কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীমুখে জীবনের কোন বিভাগই বাদ পড়ে নাই ; অর্থনীতিই বা বাদ পড়িল কেন ?

কেহ কেহ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। বঙ্কিমচন্দ্র তথা বন্দেমাতরম মন্ত্রে যে জাতীয়তা-বোধের প্রকাশ তাহা একটি ঐতিহাসিক ধারার পরিণতি, অথবা ইহাকে বলা যায় একটি সুস্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ ধারা বা স্তর। ইংরেজের আমলে আধুনিক রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছি স্বীকার করিতেই হইবে।

ইউরেসিয়ান কবি ডিরোজিও নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার একটি ইংরেজী কবিতাকে প্রথম জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতার মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত কবিতাটির অনুবাদ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই কবিতাটির প্রথম চার পংক্তি এই :

"স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !"
ইত্যাদি।

এই ভাবধারাই ক্রমে নানা ভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের—

"ভাতৃভাব ভাবি' মনে　　দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া—
কতরূপ স্নেহ করি,　　দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

প্রভৃতি কবিতায় স্বদেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হইয়াছে। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' রাজপুত বীরদের মুখে স্বদেশপ্রেমের কথা ব্যক্ত করান নিম্নোক্ত কবিতাংশে :

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।"

স্বাধীনতা হীনতায় জীবন বৃথা, বাঁচিয়া থাকারও কোন সার্থকতা নাই। বাঙালী চিত্তের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা হিন্দু মেলার যুগে একটি ভারতীয় রূপ গ্রহণ করে। আমরা স্বদেশবাসীদের ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করিব। স্বাধীনতা ব্যতীত বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক। কিন্তু দেশমাতার স্ব-রূপ উপলব্ধি করিয়া নিজেদের আত্মস্থ হইবার প্রথম আহ্বান আসিল হিন্দু মেলার গীত সঙ্গীতাবলীর ভিতর দিয়া। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র ভারতের প্রথম সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিতীয় হিন্দু মেলার জন্য যে জাতীয় সঙ্গীতটি রচনা করিলেন তাহার প্রথম কলি এই :

"মিলে সবে ভারত-সন্তান,
একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ? ইত্যাদি

'ভারত-সঙ্গীতে' কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর নিদ্রামগ্ন ভারতবাসীকে জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন' এবং 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি জাতীয়তামূলক নাটকাবলী, গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে বল ভারত রে ! দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে,' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সাধারণভাবে, এবং 'কমলাকান্ত' বিশেষ ভাবে, আর এই সময়কার অন্যান্য সাহিত্য-গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র—ইহার মধ্যে 'অমৃত বাজার পত্রিকাও রহিয়াছে—জাতীয়তা-বোধের উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করে। জাতীয়তার যে ভাব-বন্যা বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ নব্যশিক্ষিত সমাজকে প্লাবিত করে তাহা একটি সুষ্ঠু পরিপূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের ভিতরে। সঙ্গীতটি ১৮৮২ সনে আনন্দমঠে সন্নিবেশিত হইলেও ইহার রচনাকাল যে ১৮৭৫-৭৬ সন তাহা নানা প্রমাণ প্রয়োগে আমরা জানিতে পারিয়াছি। 'বন্দেমাতরম্'-এ দেশমাতা সর্বজনপূজ্যা মহাদেবীর স্তরে উন্নীত হইয়াছেন। এই দেশভক্তি যে কথার কথা নয়, নিয়ত মনন ও অনুধ্যান করার বিষয়, বহুবৎসর পরে ধর্মতত্ত্বে তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। 'দেশভক্তি' আমাদের একমাত্র ধর্ম, আর আমরা কি করিয়া দেশচর্যার উপযুক্ত হইতে পারিব, এই কথাই নানা ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগের হৃদ্‌গত করাইয়াছেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন, সন্ন্যাসীর আবির্ভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁহার পিতৃদেবের গুরু ছিলেন সন্ন্যাসী। উপন্যাসে সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের মূলে হয়ত ইহা একটি কারণ। সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর স্বাভাবিকী অনুরক্তি থাকিতে পারে নিঃসন্দেহ ; কিন্তু আর একটি কারণ থাকা বিচিত্র বা অসম্ভব অথবা অযৌক্তিক নয়। সরকারী কর্মে লিপ্ত থাকিয়া বিভিন্ন সূত্রে তিনি শাসক জাতির সংস্রবে আসিয়াছেন ! শাসিতের প্রতি তাহাদের নিদারুণ মনোভাব, অত্যাচার-অনাচার তাঁহাকে দেশপ্রেমে যেমন উদ্বুদ্ধ করে তেমনি স্বজাতীয়দের মধ্যে সন্ন্যাসী শ্রেণীর মত এক দল সংযম, ত্যাগ ও প্রীতি অনুশীলন করিয়া দেশ সেবায় সম্যক্ উপযুক্ত হইবে এ চিন্তাও জন্মাইয়াছে। স্বদেশবাসীরা সন্ন্যাসী হইয়া বনে যাক্ ইহা তিনি চাহেন নাই, বা ইহার জন্য উপন্যাসে কাহিনীতে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটান নাই। কিন্তু স্বদেশসেবায় তাঁহাদের সংযম, নিষ্ঠা ও ত্যাগের আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হই, ইহাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কামনা-ভাবনা। 'আনন্দমঠের' সন্ন্যাসীদের মত নিষ্কাম সাধনায় দেশবাসী যথাযথ উদ্বুদ্ধ হউক। তাঁহাদের আদর্শ দেশ-কালোপযোগী নহে বলিয়া ভ্রান্তি-মূলক, কিন্তু তাঁহাদের নিষ্কাম দেশচর্যা-ব্রত তো আমাদের সর্বপ্রকারে অনুসরণ-যোগ্য। পরবর্তীকালে 'আনন্দমঠ' বিপ্লববাদের প্রচারে রসদ জোগাইয়াছিল ; সঙ্গে সঙ্গে 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীদের মত এক দল সর্বত্যাগী সেবকের উদ্ভবেও উহা সহায়তা করে ! তবে শুধু সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াই আমরা সবাই দেশসেবক হইব এ কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের নিশ্চয়ই ছিল না। আমরা সাধারণ মানুষ সমাজের মধ্যে থাকিয়াই নিষ্কাম স্বদেশচর্যা করিব ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। আর ইহার ফলে যখন দেশ পরাধীনতার খোলসমুক্ত হইবে, তখন তাহার সন্তানগণ পুরাপুরি কর্তব্য করিতে সক্ষম হইবে। উপন্যাসে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম্ সাধনার একটি সার্থক পন্থা।

মনীষীবৃন্দ নানা ভাবে বঙ্কিম-উপন্যাসের আলোচনা করিয়াছেন। এই সব আলোচনার একটি কথা আমাদের বড়ই মনে লাগে। আমরা এতদিন ইংরেজী উপন্যাস পড়িয়াছিলাম ; তাহাতে বিদেশের সাধারণ জীবনের খুঁটিনাটি ও সমস্যানিচয় পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের সমাজে, আমাদের গৃহমধ্যে ও গৃহ কোণে যে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় ও বিভিন্ন ধরণের মানুষ কত রহিয়াছে, তাহাদের

বৈচিত্র্য কত, সমস্যাই বা কত—এসকল কথা বাংলা ভাষার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রই সার্থক উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের শুনাইলেন। তৎকর্তৃক বাঙালী চিত্ত-জয়ের ইহাই হেতু। আমরা নিজেদের চিনিতে পারিলাম। আমাদের জীবনের সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, শোক তাপ, দৈন্য প্রাচুর্য, আশা নিরাশা দৈনন্দিন সমস্যা ও তাহার প্রতিকার—কত কি বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠে আমরা জানিয়া বুঝিয়া লইলাম। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক রচনাবলি যৌবনে তাঁহাদের তেমন উদ্বুদ্ধই করে নাই যেমন তাঁহাদের তৃপ্ত করিয়াছে তাঁহার উপন্যাস। পরবর্তী কালে তাঁহারা বঙ্কিম-সাহিত্যের ঐ দিকটাও সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বটে।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে মুখ্যতঃ অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং ঐ সমস্ত বিষয়ের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখনী জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনায়ও নিরস্ত হয় নাই। রামা কৈবর্ত এবং হাসিম সেখকে বঙ্কিমচন্দ্র অমর করিয়া রাখিয়াছেন। উভয়েই সেই যুগের দুঃখক্লিষ্ট নিপীড়িত সাধারণ মানবসমাজের প্রতীক। মার্জারকে কত উপদেশ দেওয়া হইল, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিলনা যে, সে দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পারে না, অথচ পাশেই ধনী দ্বিতলের উপরে ত্রিতল ইমারত তুলিতেছে, বিলাস-ব্যসনে মাতিয়া উঠিতেছে, ইহাকে কোন্ মুখে সে 'উন্নতি' বলিবে? কি গভীর অর্থনীতি ইহার মধ্যে রহিয়াছে। মার্জার উন্নতি চাহে; আবার দ্বিতলের উপর ত্রিতল ইমারত তুলুক, কিন্তু সে যেন দু' বেলা পেট পুরিয়া দু'মুঠো ভাত খাইতে পায়। এই উন্নতির কি, আজিকার পরিবেশেও, আমরা সাক্ষাৎলাভ করিব না? অধ্যক্ষ ঘোষাল সত্যই বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কাহারও কথাই বলিতে কসুর করেন নাই। কাজেই তাঁহার রচনায় অর্থনীতিবিদের যথেষ্ট চিন্তার খোরাক ও আলোচনার বিষয় মিলিবে।

কথা উঠিয়াছে, এখন আর বঙ্কিম-সাহিত্য লোকে তেমন আগ্রহ সহকারে পাঠ করে না। এ বিষয়টিও আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বঙ্কিম-সাহিত্য অপঠিত থাকিলে জীবনই বৃথা; যাঁহারা বঙ্কিম-সাহিত্য অন্ততঃ কিছু পড়িয়াছেন তাঁহারা এ কথায় নিশ্চয়ই সায় দিবেন। অধুনা শিক্ষিত সমাজে বঙ্কিম-সাহিত্যের আদর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে, নিজ অভিজ্ঞতা লইতে আমি একথা বলিতেছি। এই আর্থিক সঙ্কটের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং উপন্যাস ব্যতিরিক্ত রচনাসমূহ সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষিত সাধারণের নিকট কিভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় সে-ও এক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ আজ কোন কোন সাহিত্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন। 'আগে দৈন্যধারী পিছে গুণাধিকারী।' আজ একবার কল্পনা করুন, আজিকার দিনে 'বঙ্গদর্শন' পুরাতন পরিচ্ছদে বাহির হইলে ক'জনা পড়িত? অবশ্য দুচারিটা রত্ন খুঁজিয়া লইবে, যদিও সে শ্রেণী এ সংসারে মুষ্টিমেয়। যুগে যুগে লোকের রুচি বদলায়, যুগধর্মকে মানিয়া লইয়া পুস্তকাদি আমাদিগকে সুন্দর পরিচ্ছদে নয়নমনোহারী করিয়া বাহির করা দরকার। এদিকে কেহ কেহ দৃষ্টি দিতেছেন, ইহা আশার কথা বটে। বঙ্কিম-সাহিত্য নিয়মিত অধ্যয়ন অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। এ দায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান স্বীকার করিতে পারেন। কি ভাবে স্বীকার করিবেন তাহা বিবেচ্য। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিক উৎসব সমাগত। শুনিতেছি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণকল্পে কোটি টাকার নাকি এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে বঙ্কিম-সাহিত্য নিয়মিত আলোচনার জন্য কি একটা বরাদ্দ হইতে পারে না? কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম কমিটি এই বিষয়ে আলাপ করিয়া দেখিতে পারেন। সাহিত্য সম্বৎসর ধরিয়া আলোচনার বিষয়। একটি বৈঠকে বা সভায় ইহার কতটুকু আলোচনা করা যায়? অধ্যয়ন—অনুশীলনের ভিতর দিয়া বঙ্কিম-যুগকে আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব।

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়েছেন সন্দেহ নাই। এই পরিকল্পনা কতটা কার্যকরী হয় তা সকলের লক্ষ্য করবার বিষয়। যে কোন কাজের বিঘ্ন থাকে এবং পরিকল্পনা কার্যকরী করার পক্ষেও যে যথেষ্ট বাধা বিঘ্ন আছে তা বলাই বাহুল্য। তারমধ্যে উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারী সংগ্রহ করা একটি সুকঠিন কাজ। সমস্যা থাকলে তার সমাধানও থাকে। সে জন্যে গোড়া থেকেই খুব সুচিন্তিত কর্ম-পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

ভারতীয় করনীতি সম্পর্কে বৃটিশ অর্থনীতিবিদ

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বিদেশ থেকে সম্প্রতি যে সকল অর্থনীতিবিদ এদেশে এসেছিলেন, বৃটিশ অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কালডোর তাঁর মধ্যে অন্যতম। তিনি এদেশে করব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান সমাপ্ত করে তাঁর রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন বটে কিন্তু সরকারী ভাবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি এখনও প্রকাশ করা হয় নি। তবে যতটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে প্রফেসর কালডোর সম্পত্তির উপর বাৎসরিক করারোপ, ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর করারোপ করবার জন্য সুপারিশ করেছেন। মাত্র দু বছর বলবৎ রাখার পর ক্যাপিট্যাল আয়ের উপর থেকে কর ব্যবস্থা তুলে নেওয়াকে তিনি অযৌক্তিক বলে মনে করেছেন এবং যথাসত্বর এই কর পুনরায় আরোপ করবার জন্য সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে এ থেকে অনুমিত আয়ের পরিমাণ খুব বেশী ছিল না (মাত্র এক কোটি টাকা) বলে এই করটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং এই কর মূলধনের বাজারে লিকুইডিটির সাবলীল গতি বিধিকে খর্ব করে অর্থ বিনিয়োগে বাধার সৃষ্টি করবে এই আশঙ্কায় প্রফেসর কালডোর অবশ্য মনে করেন যে এর কোনটিই করটি তুলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়। প্রথমতঃ প্রথম কয়েক বছরে কর আদায় হয়েছিল ৬ কোটি টাকা। তাই তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি যে এক কোটি টাকার অনুমান তাঁরা কি করে করেছিলেন। কর আরোপ করবার ঠিক পরবর্তী বছর কয়েক আয় স্বাভাবিক পরিমাণ থেকে কিছু কম হওয়া স্বাভাবিক। এদিক থেকে বিচার করলে ক্যাপিট্যাল আয়-কর ক্রমাগত বৃদ্ধিই পেত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করেন না যে এই কর মূলধন নিয়োগে কোন বাধার সৃষ্টি করবে।

প্রফেসর কালডোর সম্পদের উপর সর্বনিম্ন স্তরের (১ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা) উপর শতকরা ০৩% টাকা এবং সর্বোচ্চ স্তরের (ধরা যাক ১৫ লক্ষ টাকার অধিক) উপর শতকরা ১০ টাকা হিসাবে করারোপের পরামর্শ দিয়েছেন। এই করারোপের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তির সম্পর্কে তিনি বলেন যে এই কর উৎপাদক মহলে কিছুটা নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সমপরিমাণ আয় কর থেকে এই সম্পদ কর অপেক্ষাকৃত কম নৈরাশ্যের কারণ হবে।

অর্থ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবার জন্য তিনি ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর করারোপের পরামর্শ দিয়েছেন। ব্যয়ের উপর ক্রম-বর্ধমান করারোপ করলে ধনী শ্রেণীর ব্যয় বাহুল্য অনেকটা কমে যাবে। মিঃ কালডোর আরও মনে করেন যে এই করারোপ করলে আয় কর পরিচালন ব্যবস্থাও সুদৃঢ় হবে। কারণ প্রত্যেক প্রদানকারীকে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসাবেও আয়-কর কর্তৃপক্ষের নিকট দিতে হবে। এর ফলে কর ফাঁকি দেওয়া সুকঠিন হবে।

দানের উপর করারোপের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেন যে এষ্টেট ডিউটির যদি যৌক্তিকতা থাকে তা হলে দানের উপর করারোপেরও যৌক্তিকতা আছে। তা ছাড়া জীবিতাবস্থায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি দান করে কর ফাঁকি দেবার সুযোগও এর দ্বারা বন্ধ হয়ে যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই সব প্রস্তাব সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেবেন জানা যায় নি। তবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পূর্বে দেশের বিভিন্ন স্বার্থের পক্ষ সমালোচনা আমন্ত্রণ করে সেই সমালোচনাগুলির যথাযথ বিচার করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

চা শিল্পের স্থিরতা

মূল্য অনবরত ওঠা নামা করা কি উৎপাদক কি ক্রেতা কারও পক্ষেই লাভজনক নয়। সুতরাং চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটা সমন্বয়-বিধান করা আবশ্যক। ভারতীয় চা সমিতির (লণ্ডন) সভাপতি—মিঃ এইচ্, সি, ব্যানারম্যান লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি ভোজসভায় চায়ের মূল্যে

স্থিরতা আনবার আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করেন। মিঃ ব্যানারম্যান চা শিল্পের বর্তমান অবস্থাকে ১৯৫২ সালের সঙ্কটের সমতুল্য মনে করেছেন। এবিষয়ে অবশ্য অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। প্রধান প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশের উৎপাদন যেমন বেড়ে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে চায়ের কাটতিও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। বিগত কতিপয় বছরে অনেকগুলি অর্ধোন্নত দেশের অর্থনীতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে; সুতরাং সে সকল জায়গায় চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বাজারে চায়ের সরবরাহ বেশী বটে, কিন্তু তাই বলে মিঃ ব্যানারম্যানের মন্তব্যকে মেনে নেওয়া চলে না। ১৯৫২ সালের সাধারণ চাহিদা হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু এখন হ্রাস পাবার থেকে চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

মূল্যে স্থিরতা আনবার জন্য মিঃ ব্যানারম্যান বলেন যে দুটি জিনিষ একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ একটি আন্তর্জাতিক চা চুক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ চায়ের কাটতি বাড়াবার জন্য নূতন করে প্রচেষ্টা চালানো।

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক চা সমিতি আন্তর্জাতিক চা চুক্তিকে এমন ভাবে পরিচালনা করেছিলেন যে কখনও বড় একটা সরবরাহের হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি হয় নাই। ১৯৫৫ সালের ৩১শে মার্চের পর থেকে ঐ চুক্তি আর বলবৎ নেই। ঐ চুক্তির সাফল্যের কারণ ছিল রাজনৈতিক। চুক্তির চারিটি সভ্য-দেশের মধ্যে তিনটি ছিল বৃটেনের অধীনে এবং অপরটি নেদারল্যাণ্ডের। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ঐ চারিটি সভ্য দেশই এখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং তাদের প্রত্যেকই স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে ও সম্প্রসারণে অত্যন্ত সচেষ্ট। ভারতবর্ষ অবশ্য সর্বদাই আন্তর্জাতিক চুক্তির পক্ষপাতী ছিল এবং ইন্দোনেশিয়া ও সিংহলও ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ দিতে একপ্রকার সম্মত ছিল, কিন্তু পাকিস্তান কিছুতেই রাজী নয়। পাকিস্তানের এইরূপ আচরণের কারণ প্রধানতঃ ভারতবর্ষের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং অদূরভবিষ্যতে এর কোনও সমাধান হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং চাহিদা ও সরবরাহের সমন্বয় বিধান করবার একমাত্র অন্য উপায় হচ্ছে কাটতির সম্প্রসারণ করা। মিঃ ব্যানার-ম্যান বলেন কতগুলি দেশে যুদ্ধোত্তর কালে চা কাটতির জন্য প্রচেষ্টা দৃঢ়ভাবে চালান হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডাতে যুদ্ধোত্তরকালে চা কাটতির প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। ভারতবর্ষে চায়ের কাটতি বাড়াবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ভারতীয় চা পরিষৎ দেশে চায়ের কাটতি বাড়াবার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা চালাতে স্থির করেছেন জেনে মিঃ ব্যানারম্যান সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এদিক দিয়ে ভারতীয় চা সমিতি কিছু কিছু কাজ ইতি-মধ্যেই আরম্ভ করে দিয়েছেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটি চা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই চা সমিতির প্রধান কাজ হচ্ছে দেশে ও বিদেশে চায়ের কাটতি বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্য চালানো। চা সমিতি একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে চা শিল্পের উন্নয়নের পক্ষে বৈদেশিক বাজার গুরুত্বপূর্ণ হলেও, শিল্পে প্রকৃত স্থিরতা আনতে হলে দেশের অভ্যন্তরে কাটতি বাড়ানো দরকার। ভারতে এখন মাথাপিছু চায়ের কাটতি মাত্র অর্ধ পাউণ্ড। ভারতের চায়ের মোট উৎপাদন ৬৪০ পাউণ্ড কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে কাটতি মাত্র ১৮০ পাউণ্ড। আর বিদেশে কাটতি হয় ৪৫০ পাউণ্ড। সুতরাং ৩৬ কোটি লোকের বাসস্থান ভারতবর্ষে চায়ের কাটতি বৃদ্ধি পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ভারতের বর্তমান উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার যথেষ্ট প্রয়োজন এবং সেদিক থেকে বিদেশে অধিকতর পরিমাণে চায়ের রপ্তানী করা প্রয়োজন। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে দেশের মাথাপিছু চায়ের কাটতি বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন, যাতে বিদেশের বাজারে সঙ্কট দেখা দিলে দেশের চা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বোম্বাইয়ে যে চা কেন্দ্র খোলা হয়েছে তা এসিয়াতে এই প্রথম। মাদ্রাজ, দিল্লী ও কলিকাতাতেও অনুরূপ চা কেন্দ্র খুলবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই চা কেন্দ্রগুলি প্রচার কার্যের প্রধান কর্মস্থল হবে। চায়ের প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কেও এরা জনসাধারণকে অবহিত করবেন। চা সমিতির কার্যবিধি কেবলমাত্র সহরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পল্লী অঞ্চলেও এদের কার্যবিধি সম্প্রসারিত করা হবে। ভারতের বাইরেও চা সমিতি চা পরিষৎ খুলে প্রচার কার্য চালাতে পারেন।

গিনিগোল্ড জুয়েলারি স্পেশালিস্ট

মৌলিকতায়
নির্ভরতায়
আধুনিকতায়

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

ফোন:- ৩৪- ১৭৬১ জুয়েলার্স গ্রাম-ডিলিয়ান্টস

১৬৭/সি১৬৭সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ১২

ব্রাঞ্চ- বালিগঞ্জ-২০০/১/বি রাসবিহারী এভিনিউ· কলিকাতা·২৯

শোরুমের পুরাতন ঠিকানা
১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

নতুন ব্রাঞ্চ শোরুম— জামসেদপুর· ফোন জামসেদপুর-৮৫৮

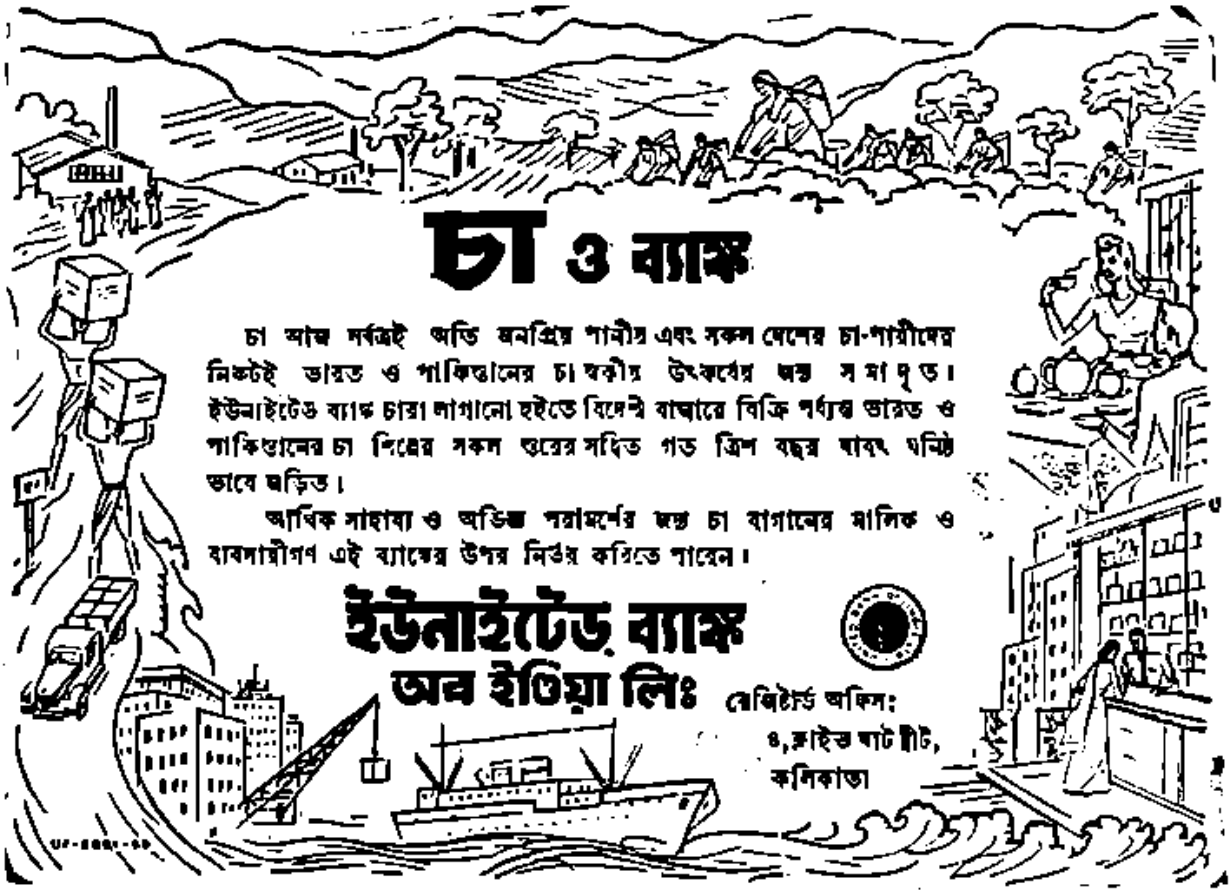

চা ও ব্যাঙ্ক

চা আজ সর্বত্রই অতি জনপ্রিয় পানীয় এবং সকল দেশের চা-পায়ীদের নিকটই ভারত ও পাকিস্তানের চা স্বকীয় উৎকর্ষের জন্য সমাদৃত। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক চারা লাগানো হইতে বিদেশী বাজারে বিক্রি পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের চা শিল্পের সকল স্তরের সহিত গত ত্রিশ বছর যাবৎ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

আর্থিক সাহায্য ও অভিজ্ঞ পরামর্শের জন্য চা বাগানের মালিক ও ব্যবসায়ীগণ এই ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিতে পারেন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস:
৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

নবরূপে ...

বহু পুরাতন কেশ তৈল

বহু পুরাতন এক প্রণালীর উপর ভিত্তি
করে প্রস্তুত ভেষজ এই কেশ তৈল চুল পড়া
ও অকাল পক্কতা বন্ধ করে আবার নূতন
চুল উৎপাদনে সাহায্য করে।

কেয়ো-কার্পিন

অপূর্ব ভেষজ কেশতৈল

প্রস্তুতকারক:
দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কেয়ো-কার্পিন বিভাগ: কলিকাতা-১২, ফোন, নিউ, মার্কেট

বাংলা-বিহার মিলন প্রস্তাবের প্রত্যাহার।

পূর্বের এক সংখ্যায় আমরা বাংলা-বিহার মিলন প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলাম, কিন্তু এ মিলন প্রস্তাবের সঙ্গে কয়েকটা সর্তের কথাও আমরা উল্লেখ করেছিলাম। তারপর হঠাৎ এ মিলন প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হ'য়েছে। যে অবস্থায় সৃষ্টি হ'য়েছিল তাতে ঘরত প্রস্তাব প্রত্যাহার করা ভিন্ন কোনো উপায়ও ছিল না। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমতকে ক্ষিপ্ত করে তোলা হ'য়েছিল, সুস্থভাবে বিচার করার কোনো চেষ্টা হয়নি বা তার কোনো অবকাশও ছিল না। প্রথম হ'তেই এমন কতগুলো ত্রুটি ও ভুল ভ্রান্তি এ প্রস্তাবটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল যার ফলে বিরোধীদলসমূহ জনমতকে এর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলবার সুযোগ পেয়েছিল। অপরদিকে সরকার বা কংগ্রেস পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবকে জনসাধারণের সামনে ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়াস করেনি।

এতবড়ো একটা প্রস্তাবকে দুই মুখ্যমন্ত্রীর এক সংক্ষিপ্ত সংযুক্তিবিবৃতির উপর ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। যখন বাংলার মন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন নিয়ে বেশ বিক্ষুব্ধ ছিল, ঠিক তখন এই দ্বিভাষিক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব যে বাংলার জনতা খুব সহজে গ্রহণ করবে না, এটা অনুমান করা উচিত ছিল। আরো অনুমান করা উচিত ছিল যে জনমনের এই বিক্ষোভের সুযোগ বিরোধী দলগুলি গ্রহণ করবে। একে প্রতিরোধ করার জন্য কোনো আয়োজন বা ব্যবস্থাই করা হয়নি। এমনকি এই মিলন প্রস্তাবের সত্যিকার রূপ পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়নি। বিহারের যে দু'টি অঞ্চল বাংলাকে দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত হ'য়েছিল সে দু'টি অঞ্চলের অবস্থা কি হবে তা পর্যন্ত সুস্পষ্ট করা হয়নি। বাঙ্গালীর মনে সাধারণতঃই আশংকা হ'ল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিহার এ মিলন প্রস্তাবে রাজী হ'য়েছে,—এ তার সংখ্যার প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে ঐ দু'টি অঞ্চল বাংলাকে না দেওয়ার জন্য : বিহারের মনে যে এমন একটা অভিসন্ধি ছিল না, একথাও বলা যায় না। মিলন প্রস্তাবের আলোচনার সময় সর্বপ্রথম এটা নির্ধারিত হওয়া উচিত ছিল যে বিহারের ঐ দু'টি অঞ্চল নিয়ে পুনর্গঠিত বাংলা ঐ দু'টি অঞ্চল বিবর্জিত বিহারের সাথে মিলিত হবে। এটা সুস্পষ্ট হ'লে মিলন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এমন তীব্র প্রতিবাদ হ'ত বলে আমরা মনে করিনা।

বাংলা ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ের যুক্তস্বাক্ষরিত বিবৃতি এই মিলন প্রস্তাবকে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করল যেন একটি চরম সিদ্ধান্ত হিসাবে আমাদের মনে হয় এখানেও গুরুতর ত্রুটি হ'য়েছে। যে কোনো অবস্থায়ই এ প্রস্তাবকে উপস্থিত করা উচিত ছিল জনসাধারণের আলোচনা ও সমর্থনের জন্য ;—উপরন্তু কর্তাদের সিদ্ধান্ত হিসাবে নয়। তখনকার বিক্ষুব্ধ জনমতের কথা স্মরণ ক'রে এটা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত জনসাধারণের আলোচনা ও মতামত প্রকাশের জন্য উপস্থিত করা উচিত ছিল। তারপর এ সম্বন্ধে কংগ্রেস ও সরকার পক্ষের নিষ্ক্রিয়তা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। কংগ্রেসের তরফ থেকে কালমাত্র বিলম্ব না ক'রে ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো উচিত ছিল, তা হয়নি বরং বিক্ষুব্ধ জনমত যখন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল তখন বিভিন্ন জেলার কংগ্রেস কর্মীগণ এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সন্দিহান ও ভীত হ'য়ে পড়লো। বাংলা দেশের পত্রিকাগুলি ইংরেজী প্রবচন অনুসরণ করে 'বেড়ার

উপর' বসে রইল (sitting on the fence). এমনকি এ প্রস্তাবটাকে ব্যাখ্যা করার কোনো চেষ্টাও তাঁরা করেননি বা কি কি শর্ত যুক্ত হ'লে এ প্রস্তাব গ্রহণ যোগ্য হ'তে পারে তার আলোচনাও তাঁরা করেননি। চিঠিপত্রের স্তম্ভে যথেচ্ছ মত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে তারা নিজেদের কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করল। কোন বিশেষ বিরোধী দলের বা সংঘের একই অফিস থেকে বিভিন্ন নাম ও ঠিকানা দিয়ে রোজ দশখানা চিঠি সংবাদপত্রে যে পাঠানো যেতে পারে সে বিষয়ে তাঁরা করেননি। পশ্চিমবাংলা সরকারও এ প্রস্তাবকে সুস্পষ্ট করার বা ব্যাখ্যা করার কোনো উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেনি। বোধ হয় ৩০শে জানুয়ারী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এক বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে সমস্যা আরো জটিল করেছিল, কারণ কিছুদিন পরেই বিহার থেকে খবর বেরুলো ঐ বিবৃতিতে উল্লিখিত শর্তসমূহ সম্বন্ধে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের কোন মতামত নেওয়া হয়নি। কাজেই ডাঃ রায়ের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা বা তাঁর উল্লিখিত শর্ত-সমূহের কোন মূল্যই জনসাধারণের নিকট রইল না। কলিকাতার একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের ইংরেজী ভাষায় লিখিত এক পুস্তিকা প্রচারিত হ'য়েছিল, তার সংবাদও বাংলার জনসাধারণ রাখেনি এবং তার মূল্যও তারা দেয়নি। জনমত যখন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে খুব প্রবল হ'য়ে উঠেছে তখন কয়েকজন প্রাচীন ও বয়োবৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতার সমর্থনমূলক বিবৃতি কাগজে বের হ'য়েছিল। তার মূল্যও জনসাধারণ দেয়নি;—প্রথমতঃ প্রতিবাদের প্লাবনে ঐ কয়েকখানা সমর্থন কোথায় ডুবে গিয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ বর্তমান জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

তারপর এল খেজুরী ও উত্তর পশ্চিম কলিকাতা উপ-নির্বাচন। এ দু'টি উপনির্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত। শেষ পর্যন্তও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আশা ছিল এ দু'টি উপনির্বাচনে তারা জিতবে। জনমত সম্বন্ধে তাদের এতটা ভুল ধারণা কেন হ'য়েছিল বা কি কারণে জনমত এমন ভাবে কংগ্রেসকে বর্জন করল, তা নিয়ে একটা অনুসন্ধান হওয়া উচিত। এই পরাজয়ের সমস্তটা দায়িত্ব মিলন প্রস্তাবের উপর দেওয়া সঙ্গত হবে কিনা তাও বিচার করা উচিত। কলিকাতার উপনির্বাচন ক্ষেত্রে শতকরা চল্লিশের উপর ছিল অবাঙালী ভোটদাতা;—মিলন প্রস্তাবের বিরোধিতা করবার তাদের কোনো সঙ্গত কারণ নেই, বরং সমর্থন করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এদের সব ভোটও যে কংগ্রেস পায়নি তাও নিশ্চিত; হয়তো অনেকে ভোট দিতেই আসেনি, এ ঔদাসীন্য কেন? এই উপনির্বাচনে যিনি নির্বাচিত হ'য়েছেন গত সাধারণ নির্বাচনেও তিনি প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন; কিন্তু অতি সামান্য সংখ্যক ভোট তিনি পেয়েছিলেন। এবার হঠাৎ তিনি এমন জনপ্রিয় হ'য়ে পড়লেন; একি সবই বাংলা-বিহার মিলন প্রস্তাবের জন্য?

যাক্, পূর্বে আমরা বলেছি যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'য়েছিল, তাতে বাংলা-বিহার মিলন প্রস্তাব প্রত্যাহার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না; কিন্তু আমরা আশা করি বাঙালী কোন একটা রাজনৈতিক অবস্থাকে সুস্থভাবে বিচার করে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করবে। এ মিলন প্রস্তাবকে ধীর স্থিরভাবে বিচার করা হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা ও বিহারের সীমা নির্দিষ্ট হবে; বিহার এতে প্রতিবাদ করছে ও করবে তা খুব সঙ্গত না হ'লেও অনেকটা স্বাভাবিক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে এক অঞ্চল গঠিত হচ্ছে। আমরা আশা করি এ ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ ভুলে এ চারটি প্রদেশ মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের পথে চলে এ অঞ্চলের জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করবে এবং ভারতীয় জাতীয়তার সংহতি ও শক্তিবৃদ্ধি করবে।

ভারত সরকারের নতুন ইণ্ডাষ্ট্রীয় নীতি।

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল স্বাধীন ভারত সরকার স্বাধীন ভারতের ইণ্ডাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করে। ভারতীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতির মূলকথা বলা হয় mixed economy বা মিশ্র অর্থনীতি; অর্থাৎ এই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ইণ্ডাষ্ট্রীয় এবং ব্যবসায়িক সংস্থাও যেমন থাকবে তেমনি ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারেও ঐসব সংস্থা থাকবে। প্রথম অংশকে বলা হয় সার্বজনিক হিস্যা (public sector) এবং দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় ব্যক্তিগত হিস্যা (private sector). ১৯৪৮ সালের নীতি ঘোষণায় তিনটা অংশ করা হ'য়েছিল;—কতক ছিল সম্পূর্ণভাবে সার্বজনিক বা সরকারের

আয়ত্তে, কতক ছিল ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের (private sector) জন্য সংরক্ষিত আর কতকছিল যেখানে কোন সংস্থা করতে হ'লে সার্বজনিক হিস্তার দাবী সর্বপ্রথম গণ্য হবে কিন্তু প্রচলিত ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের সংস্থাসমূহকে চলতে দেওয়া হবে।

এরপর ভারতীয় রাষ্ট্রের নতুন অর্থনৈতিক নীতির ঘোষণা হ'য়েছে; সমাজতান্ত্রিক ছঙ্এ ভারতীয় সমাজকে গঠন করবার নীতি কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় পার্লামেন্ট বা সংসদ গ্রহণ ক'রেছে। আমরা মনে করি কংগ্রেসের যে অর্থনীতি অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্র এতদিন পরিচালিত হচ্ছিল তা সমাজতান্ত্রিক আদর্শেরই অনুযায়ী; কাজেই সমাজতান্ত্রিক ছঙ্এ সমাজকে গঠন করবার নীতি নেওয়াতে এতদিনের অনুসৃত নীতির একটা নামকরণ ভিন্ন সত্যিকার কোন নতুন পন্থা নেওয়া হ'য়েছে বলে আমরা মনে করি না। তবুও এই ক'বছরের উন্নয়ন কাজের ফলে এবং অনুসৃত নীতিকে নামকরণ দিয়ে সুস্পষ্ট করার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রীয় নীতিরও পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল; তাই ৩০শে এপ্রিল পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রী নূতন ইণ্ডাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করেন। ১৯৪৮ সালে ঘোষিত ইণ্ডাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে এই নতুন বিবৃতির কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এখানেও ঘোষণা করা হ'য়েছে যে মিশ্র অর্থনীতিই (mixed economy) ভারতীয় রাষ্ট্রে অনুসৃত হবে; অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত সার্বজনিক হিস্তা এবং ব্যক্তিগত হিস্তা দুই-ই ভারতীয় রাষ্ট্রে চালু থাকবে। কিন্তু দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য এবং উৎপাদনশক্তির উপর ব্যক্তিগত প্রভাব কমিয়ে সার্বজনিক বা রাষ্ট্রাধিকার বাড়িয়ে অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলো মৌলিক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীর উপর রাষ্ট্রের একায়ত্ত অধিকার স্থাপন করা প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে। ব্যক্তিগত ইণ্ডাষ্ট্রীর সংস্থার মুনাফা ব্যক্তিবিশেষের পকেটেই প্রধানতঃ যায় এবং তার ফলে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য নানাপ্রকার কর দিয়ে এই বৈষম্যকে অনেকটা লাঘব করার চেষ্টা হ'তে পারে, কিন্তু তবুও একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে এর নিরসন করা সম্ভব হয় না। এজন্যও রাষ্ট্রায়ত্ত ইণ্ডাষ্ট্রীর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

এই নীতি অনুসারে আমাদের জাতীয় সরকার যে নতুন ইণ্ডাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করেছেন তাতেও ইণ্ডাষ্ট্রীসমূহকে তিনটী ভিন্ন তালিকায় বিভক্ত করা হ'য়েছে। ১৯৪৮ সালের ঘোষিত নীতিতেও এম্‌নি তিনটি তালিকাই ছিল; কিন্তু তালিকায় উল্লিখিত ইণ্ডাষ্ট্রীর সংখ্যার তারতম্য ঘটেছে। আণবিক শক্তি, প্রতিরক্ষামূলক (defence) সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রী, যানবাহন মূলক ইণ্ডাষ্ট্রী, বিদ্যুৎ, কয়লা, লৌহ ও ধাতব তেল সংক্রান্ত সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রী 'ক' তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। এতে কোন ব্যক্তিগত নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হবে না। এরপর 'খ' তালিকায় আছে বারোটি ইণ্ডাষ্ট্রী। জমির সার, এলুমিনিয়ম্ ও অন্যান্য নানা প্রকারের ধাতু, প্রতিষেধমূলক ঔষধ (antibiotics), রবার, মোটর (road transport) এবং সামুদ্রিক যানবাহন প্রভৃতি এই তালিকাভুক্ত। এইসব ইণ্ডাষ্ট্রিতে সরকারী প্রচেষ্টা ক্রমে প্রসার লাভ করবে যদিও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকেও সুযোগ দেওয়া হবে।

এভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রী 'গ' তালিকাভুক্ত। কাপড়, চিনি, পাট প্রভৃতি ইণ্ডাষ্ট্রী এই তালিকাভুক্ত। এইসব ইণ্ডাষ্ট্রী মূলতঃ ব্যক্তিগত মালিকানায়ই থাকবে তবে প্রয়োজনমত সরকারও এতে হাত দিতে পারবে।

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কারো কোন সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে সরকার নিতে পারে না। কাজেই 'খ' বা 'গ' তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগত সংস্থাগুলোকে লোপ ক'রে সরকারী আয়ত্তে আনতে হ'লে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ সার্বজনিক হিস্তার জন্য (public sector) ধরা হ'য়েছে। প্রয়োজনমত ইণ্ডাষ্ট্রী ও উৎপাদন বাড়াবার জন্য ব্যক্তিগত হিস্তায় আরো ২৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হ'য়েছে। ব্যক্তিগত হিস্তা উঠিয়ে দিয়ে সবটা সরকারী আয়ত্তে প্রয়োজনমত উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্য সাধন করতে হ'লে ৪৮০০ কোটি এবং ব্যক্তিগত হিস্তায় নতুন বিনিয়োগের (investment) জন্য ২৪০০ কোটি টাকা ছাড়াও ক্ষতিপূরণ বাবত হয়ত আরো কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হ'ত। ভারতীয় রাষ্ট্রের মূল নীতি মিশ্র অর্থনীতির কথা ছেড়ে দিলেও কেবল টাকার হিসাব দেখেও

পথটা সরকারী আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা বর্জন করতে হয়। তা ছাড়া সরকারী আয়ত্তে এনে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রী, উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যসাধনের উপযুক্ত লোকবলও সরকারের পক্ষে হঠাৎ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন বা প্রায় অসম্ভব। ভারত-রাষ্ট্রের যে মূল অর্থনীতির কথা পূর্বে বলা হ'য়েছে, অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতি, যাতে ব্যক্তিগত অধিকারে উৎপাদন কার্যের একটা অংশ নির্দিষ্ট আছে তার যে নিজস্ব কোন গুণ নেই এমন সিদ্ধান্ত করার কোন কারণও এখন পর্যন্ত আমরা দেখি না। তাই এ নতুন ঘোষিত ইণ্ডাষ্ট্রীয়নীতি আমরা সমর্থন করি।

ব্যক্তিগত হিস্তার অন্তর্গত ইণ্ডাষ্ট্রীর সংস্থাসমূহের অধিকারিদের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। উন্নয়ন কার্যের একটা বিরাট অংশ সরকার তাদের উপর ন্যস্ত করেছে। জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (consumers goods) মূলতঃ ব্যক্তিগত হিস্তা থেকেই সরবরাহ করার ব্যবস্থা হ'য়েছে। ইহা একটা অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব। আমরা আশাকরি যে ২৪০০ কোটি বিনিয়োগের বরাদ্দ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ধরা হ'য়েছে এবং বাস্তবিক উৎপাদনেরও (material production) যে মান (target) ধার্য করা হ'য়েছে তা ব্যক্তিগত মূলধনীগণ নিষ্ঠার সঙ্গে পূরণ করবে। কেবল ব্যক্তিগত মুনাফার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে দেশের ও জনসাধারণের সত্যিকার মঙ্গল সাধনের দিকেও যদি এরা দৃষ্টি না রাখে তা হ'লে এদের পক্ষে কর্তব্যের অপলাপ করা হবে এবং এদের নিজেদের মঙ্গলেরও তাতে ব্যাঘাত হবে। আশা করি নতুন ইণ্ডাষ্ট্রীয়নীতি অনুসারে তারা দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করবে।

কলকাতার হাঁসপাতাল—

কলকাতার হাঁসপাতাল নিয়ে আগের মাসেও আমরা আলোচনা করেছি। দিনের পর দিন হাঁসপাতালগুলির ভিতরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, তারা কি দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকবার যোগ্য? উপযুক্ত শাসন ও তত্ত্বাবধান থাকলে কি হাঁসপাতালে হাঁসপাতালে এই অবহেলা ও নিষ্ঠুরতা প্রশ্রয় পেতে পারে?

সম্প্রতি নীলরতন সরকার হাঁসপাতালে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দেড় মাসের প্লুরিসি রোগী ব্রজহরি পাল হাঁসপাতালের পুকুরে ডুবে মরেছেন। হাঁসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার খবরই রাখতেন না। রোগীর স্ত্রী এবং মেয়ে এসে শুনেছেন, রোগী নিখোঁজ। কোথায় গেল, জিজ্ঞাসা করতে ডাক্তার বলেছেন, পুকুরে খুঁজে দেখতে পারো। নার্স সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কেটেছেন, না হয় পথংকারকে গুণে বলতে বলো। মারাত্মক অবহেলার পর এই ধরণের হাসি-টিট্‌কারী যারা কাটতে পারে—জানিনা কত জন্মের পাপে তাদের হাতে জীবনের ভার সঁপে দিয়ে রোগীরা আসে।

কয়েকদিন পরে রোগীর মৃতদেহ ভেসে উঠলো। সৎকার করবার সামর্থ্যও ছিল না তাঁর স্ত্রীর। হিন্দু সৎকার সমিতির সাহায্যে কোনমতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'লো।

রোগীকে সুস্থ করবার ক্ষমতা হয়তো ছিল না ডাক্তার বা নার্সের। কিন্তু হাঁসপাতালের রোগী কি ক'রে পুকুরে ডুবে মরে, সে কথা বোঝা দুষ্কর। ওতে শুধু এই প্রমাণিত হয় যে রোগীকে দেখাশুনার সুব্যবস্থা সেখানে নেই। আর কথাবার্তায় যাদের রূঢ় নির্মমতা, তারা সেবাবৃত্তির মুখোস পরে ডাক্তার বা নার্স হয়ে আসে কেন?

মধ্যবিত্ত বাঙালীর দুর্দশা—

ব্রজহরি পালের এই ব্যাপার থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালীর দুর্দশা সমগ্রভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। যুবক ব্রজহরি অল্প বেতনের সরকারী কর্মচারী ছিলেন। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তাঁকে থাকতে হ'তো। কম টাকায় ভাড়া-বাড়িতে যাঁদের থাকতে হয় তাঁদের স্বাস্থ্যকর স্থান পাওয়া এ শহরে দুর্ঘট। বোধ হয় ঐ রকম জায়গায় থাকার ফলেই ক্ষয়রোগের বীজ তাঁর শরীরে ঢোকে। হাঁসপাতালে তাঁর বুকে যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। টাকা দিয়ে থাকতে পারেননি, তাই হাঁসপাতালেও ভাল জায়গা পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব

হয়নি ; সেবা-যত্ন ঠিকমত পাননি। তাঁর মৃত্যুর পর দাহ করবার খরচ জোগানো যাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, সেই অসহায় স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে কি করে আত্মরক্ষা করবেন জানিনা।

আজ আমোদ-প্রমোদেও উৎসাহ দেবার জন্যে আমরা সরকারীভাবে কত খরচ করছি। দুঃখদুর্গতি থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা কিছুই করতে পারবো না ?

THE

UNION BANK OF INDIA LIMITED

Estd : 1919

Head Office : Apollo St., Fort, Bombay. 1.

Capital Paid-up ... ... Rs. 40,00,000

Reserve and other Funds ... ... Rs. 85,00,000

Chairman : Mr. M. S. Captain

Banking business of every description transacted including Foreign Exchange.

F. K. F. NARIMAN

General Manager.

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅনর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

সরলচিত্ত মানুষ পরিচয়ের রাজাপদে তাঁর জীবনকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর এই অপূর্ব্ব
পরলোকে গমন করেছেন।

UNIVERSITY OF CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

ঊনবিংশতি বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৬৩ | চতুর্থ সংখ্যা

লোকমান্য তিলক স্মরণে

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মশতবার্ষিকী ভারতের সর্বত্র ২৩শে জুলাই পালিত হ'য়েছে। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত রত্নগিরির এক ক্ষুদ্র গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে ১০০ বছর পূর্বে তিলকের জন্ম হয়। কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে দেশ ও জাতির সেবাকেই তিনি নিজের কর্ম ও ধর্মরূপে গ্রহণ করেন। আজ স্বাধীন ভারতের যুবকগণ হয়ত হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌বে না উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজনীতিক্ষেত্রে তিলকের প্রভাব ও দান কতটা ছিল। তিলকের মতো বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করলে রাজনৈতিক সংগ্রামশক্তি ও প্রতিভা নিঃশেষে ক্ষয় না ক'রে জাতির শিক্ষা, সেবা ও সংস্কৃতিমূলক কাজে ব্যয় করতেন। তিনি জান্‌তেন দেশে শিক্ষাবিস্তার করার দরকার আছে;—তিনি জান্‌তেন দেশে রাজনৈতিক মত গ'ড়ে তোলার দরকার আছে;—আরো জান্‌তেন দেশের আর্থিক উন্নতি হতে পারে নূতন নূতন ইণ্ডাষ্ট্রি স্থাপন ক'রে। তাই তিনি দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সংস্থার (The Deccan Education Society) অন্যতম স্থাপয়িতা ও সেবক ছিলেন। এই সংস্থা দাক্ষিণাত্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ ক'রেছে। বড় বড় অধ্যাপক পর্যন্ত সকলেই মাসিক মাত্র ১০০৲ বেতনে এই সংস্থার কাজ কর্‌তেন। তিলক, গোখ্‌লে, পরঞ্জপে প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

কিন্তু যখনই তাঁর উগ্র রাজনীতির জন্য এই সংস্থার কোন হানি হবার সম্ভাবনা তিনি দেখ্‌লেন বা অন্যান্য স্থাপয়িতা ও কর্মীদের মনে সন্দেহের আভাস পেলেন, তখনি তিনি আস্তে আস্তে এর থেকে স'রে দাঁড়ালেন। তিলকের পরিচালিত 'কেশরী' ও 'মারহাট্টা' জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক কাগজের আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য হ'ত। নির্ভীকভাবে মত প্রকাশ করে রাজরোষ আকর্ষণ করা তখনকার দিনে বড় সুলভ ছিলনা। প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ড (Rand) সাহেবের হত্যার পর সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদ ক'রে তিলক যে সব প্রবন্ধ লেখেন তাতে ১৮৯৭ সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে

তাঁর দেড় বছর কারাদণ্ড হয়। ভারতের অধিক দৈন্য দূর করবার জন্যও লোকমান্য তিলক চেষ্টা করেছেন। এক এক পয়সা সংগ্রহ করে তিনি পয়সা ভাণ্ডার (paisa fund) দ্বারা একটি কাঁচের কারখানা স্থাপন করেন। পুনার কাছে আজো পয়সা ভাণ্ডার গ্লাস কারখানা (paisa fund glass factory) চলছে। এ কারখানা কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয়, একটা ট্রাষ্ট দ্বারা পরিচালিত হয়।

যখন কংগ্রেস ছিল ধনী অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রবেশ সেখানে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল, তখন তিনি তাঁর বিপ্লবের বার্তা প্রচার ক'রে কংগ্রেসের শান্ত আবহাওয়ার এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ১৯০৪ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্যে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন চিন্তা ও কর্মধারার প্রবর্তন হ'ল। গোখ্‌লে, নৌরজী, ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতি ধীর-পন্থী নেতারা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন। এই নূতন আন্দোলনের নেতা ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৫-৬ সালে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলার এ আন্দোলনকে কতকটা সমর্থন দেওয়া হয় এবং নৌরজী তাঁর অভিভাষণে 'স্বরাজ' শব্দ ব্যবহার করেন। সুরেন্দ্রনাথের সম্মোহনী বাগ্মিতা ও সংগঠন চেষ্টায় যে বিরাট ও শক্তিশালী আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল, তিনি নিজে তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন না। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনকে বাংলার যুবকগণ স্বরাজের পরীতে পরিণত করে। বাংলার অপর কয়েকজন নেতা বিশেষ করে বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ এগিয়ে এলেন এই বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মধারাকে পরিস্ফুট করবার জন্য। পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়, এবং মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক এই নূতন আন্দোলনকে সমর্থন ও আশীর্বাদ করলেন। ভারতের রাজনীতিতে বাল, লাল ও পাল এই ত্রয়ীর সমাবেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।

বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য যে আন্দোলন তা ব্যাপক রূপে দাবী করল দেশের স্বাধীনতা। বাংলার যুবকগণ গুপ্ত সমিতি গঠন করে বোমা ও পিস্তলের মারফতে দেশে বিদ্রোহ সংগঠনের আয়োজন করল। নরম ও গরমপন্থী অনেক নেতা গোপনে তাদের এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করতে সাহস পাননি—তা করেছিলেন একমাত্র বালগঙ্গাধর তিলক। কলকাতার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যার জন্য নিক্ষিপ্ত বোমা যখন মজঃফরপুরে দু'টি নিরীহ ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করল, তখন বাঙালী বিপ্লবপন্থী যুবকদের জন্য কেউ সহানুভূতি জানায়নি,—জানিয়েছিলেন একমাত্র বালগঙ্গাধর তিলক। 'The cult of bomb' বা 'বোমার তত্ত্বকথা' সম্বন্ধে তাঁর কাগজে তিনি প্রবন্ধ লেখেন; অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল গ্রেপ্তার, বিচার ও ছ' বছরের জন্য নির্বাসন। তিলকের এ কারাবরণে বাঙলার বিপ্লবী যুবকদের মনে যে কী উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল তা আজ কল্পনা করা কঠিন। যখন চারদিক থেকে তারা কেবল তিরস্কার ও অভিসম্পাত পাচ্ছিল, তখন তিলকের এই সহানুভূতি ও আশীর্বাদ তাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

১৯১৪ সালে তিলক মুক্তি পেয়ে এসে আবার কংগ্রেসে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে নরম ও উগ্রপন্থীদের সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেসের ঐ অধিবেশন অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়, তারপর ক'বছর উগ্রপন্থীরা আর কংগ্রেসে যোগদান করেন নি এবং কংগ্রেসে তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাও করেন নি। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'য়েছে; তিলক হোম্ রুল লীগ (Home Rule League) স্থাপন করলেন। শ্রীমতী বেসান্ত ও তিলকের মধ্যে এই সময় কতকটা রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅম্বিকা মজুমদারের চেষ্টায় একদিকে উগ্রপন্থী ও নরমপন্থী এবং অপরদিকে কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগের মধ্যে যে আপোষ হ'ল তাতে কংগ্রেসে আবার নূতন জীবনের সঞ্চার হয়। ১৯১৭ সাল থেকে নরমপন্থীরা আস্তে আস্তে কংগ্রেস থেকে সরে যেতে লাগ্‌ল। এই পরিবর্তন সাধনে তিলকের প্রভাব অনেকখানি ছিল। ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের ভিতর দিয়ে

বালগঙ্গাধর লোকমান্য তিলক

ভারতীয় রাজনীতির আরেকটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হ'ল। এর নেতা ছিলেন গান্ধীজী। গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রথম সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায় ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তনের জন্যই এই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হ'য়েছিল। এই আন্দোলনের প্রতি লোকমান্য তিলকের বিশেষ আস্থা ছিলনা। গান্ধীজীর বিরোধী নেতৃবর্গ তখন আশা করেছিলেন তিলক এ বন্যারোধের চেষ্টা করবেন। এমনি সময় লোকমান্য তিলকের মৃত্যু হ'ল। বেঁচে থাকলেও তিনি এ আন্দোলনের বিরোধীতা করতেন, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা দেখে তিনি পরে আন্দোলন সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করতেন—এটাই আশা করা যায়।

তিলক কেবল রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না; তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত ও বৈদিক সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তার উপর অঙ্ক এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রে (astronomy) তাঁর প্রভূত অধিকার ছিল। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর প্রথম পুস্তকের নাম 'Orion'—'কালপুরুষ'। এ পুস্তক প্রকাশিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। ১৮৯৭ সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে যখন তাঁর জেল হ'ল তখন বিশ্ববিখ্যাত প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্ (Orientalist) ম্যাক্সমুলার, ওয়েবার, হাউার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিচলিত হ'লেন এবং বিলাতে তাঁর মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করলেন এবং ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তাঁর মুক্তি হয়। 'Orion' পুস্তকে কালপুরুষ নক্ষত্রের বৈদিক উল্লেখের সঙ্গে এই নক্ষত্রের বর্তমান অবস্থানের তুলনা ক'রে তিনি ঋগ্বেদের রচনার কাল নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। এসবটাই জ্যোতিষী হিসাবের দ্বারা করা হ'য়েছিল। জেলবাসকালে 'Arctic Home in the Vedas' নামে তিনি অপর এক পুস্তক রচনা করেন। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে এমন কথা আছে যাতে মনে করা যায় যে ঋগ্বেদের রচয়িতাগণ একক্রমে বহুদিন সূর্যের মুখ দেখতে পাননি। এইসব উক্তি অবলম্বন করে জ্যোতিষী হিসাবে তিলক সিদ্ধান্ত করেন যে প্রথম বেদ-রচনার কালে আর্যগণ সুমেরু (North Pole) অঞ্চলে বাস করতেন।

১৯০৮ সালে ছ' বছর কারাদণ্ড দিয়ে সরকার তাঁকে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্ডালয় জেলে পাঠিয়ে দেয়। ঐখানে পুস্তকাদি পাওয়ার পক্ষে তাঁর অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। তা সত্ত্বেও 'গীতারহস্য' বা 'কর্মযোগ' নামে যে পুস্তক তিনি রচনা করেন, তা সুধীজনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বাংলা অনুবাদ করেন। আশা করি এ পুস্তকের পুনঃপ্রকাশ বাংলায় সম্ভব হবে।

লোকমান্য তিলকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি সম্পূর্ণ হবেনা, যদি ১৯০৮ সালের তাঁর বিচার সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করি।

বিচারের সময় তিনি যে দৃপ্ত জবানবন্দী দেন তাতে বিচারপতি পর্যন্ত বিচলিত হ'য়েছিলেন। তাঁর এ জবানবন্দী এবং বিচারপতির রায় 'তিলকের বিচার' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, অবশ্য সরকার থেকে এই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হয়। সখারাম গণেশ দেউস্কর এই পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করেন। বাজেয়াপ্ত অবস্থায়ও গোপনে গোপনে এই পুস্তক যুবকদের হাতে হাতে ঘুরেছে এবং তাদের মনে স্বাধীনতার প্রেরণা জাগিয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ প্রথম উচ্চশ্রেণীর হাত থেকে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনকে মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে বিরোধ সংঘর্ষ ভারতীয় রাজনীতিতে তিনিই প্রথম আমদানী করেন। সরকারের কোন এক শাসনকার্যের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম জন-আন্দোলন শুরু করেন। সেই হিসাবে ভারতের রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথের অবদান খুবই বড়, কিন্তু লোকমান্য তিলকই প্রথম সেই আন্দোলনকে বিপ্লবী রূপ দেন—এখানেই তাঁর বিশেষত্ব।

আমরা তাঁর অষ্টশতবার্ষিকী দিবস উপলক্ষ্যে এই বিপ্লবী নেতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করছি।

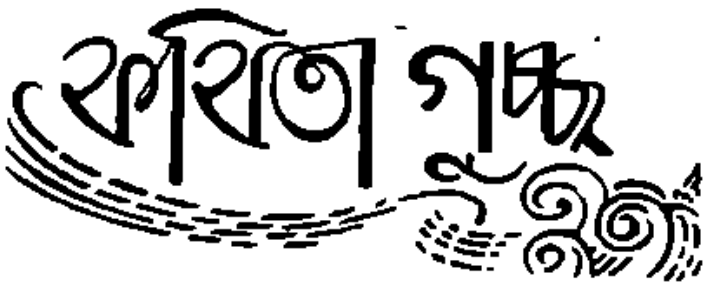

কবীর কহে

গান্ধীজির Songs from Prison হইতে

অনুবাদ—শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

এই সত্য জানিয়াছি প্রভুর কৃপায়,
আমি শুধু ভৃত্য তাঁর, তিনি এক প্রভু।
আমার সকল কর্ম, তাঁর সেবা লাগি
আমার সকল বাক্যে তাঁর যশ গাহে
আমার শ্রবণ দিয়া তাঁহারেই স্মরি,
যাহা ছুঁই, যাহা পিই তাঁরি সুধাধারা।
এক মোর আনন্দ বিলাস—
তাঁরি দিব্য বিভা
নয়নে ভাসিছে নিরবধি।
আমার হৃদয়মন ভরি, বিরাজে তাঁহারি শান্তি,
কিবা কাজ ব্রত উপবাসে?
অন্তরে আমার নাহি কোথা আঁধিয়ার
নাহি মিথ্যা কল্পনা-বিকার।
মোর চিন্তা লয় শুধু তাঁহে,
যাহা দেখি, যাহা ছুঁই
শুনি যাহা, করি আস্বাদন,
সব প্রিয় প্রভু প্রিয়তম।
আমার নিশ্বাস বায়ু, আমার জীবন
সেও শুধু তিনি, তাঁহাতেই করি বিচরণ।
এই একমাত্র সত্য,
আনন্দ, জীবন, সব শুধু তিনি
আমার কণ্ঠেতে বাজে
তাঁরি নাম গান।

একটি গাংচিলের চিন্তা

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

আবার সকাল শুরু দূর মাঠে—সুনির্জন গাঙে:
আলোর আভাস পেয়ে পৃথিবীর ক্লান্ত ঘুম ভাঙে!
উজ্জ্বল আকাশ।
খালিহাঁস—
উড়ে গিয়ে বসে দূর চরে।
সিজুলীর শাদা ডালে দুটি ঝিঁ-ঝিঁ আলোচনা করে!

সারসের ডানা তবু কেন জানি নিশ্চুপ নিশ্চুপ!

অপরূপ—
সকাল।
(তবু সে আসেনি কতকাল
যার ধ্যানে এ হৃদয় ভরে!)

রোদের পাঁচিল তুলে শরিকের পৃথিবীটা ঘেরা
হলেও—জলের নীচে খেলা করে চপল মাছেরা!
তীরে ঘাস!
অবকাশ।
মেঘ-ছেলে পশ্চিমে আকাশের হাতখানি ধরে!

অনেক জলের নীচে ঘুম ভেংগে ঢেউ ওঠে—গাঙে।

(এ সকালে একবার তার কাছে যায় নাকো ফেরা
যার কথা ভেবে মন রাঙে?)

ক্ষণ-গোধূলি

সিপ্রা ঘোষ

মরণ-পারাবারের তীরে করলে আমন্ত্রণ,
ওগো জীবন সাথী,
পরপারের খেয়ায় বসে চমকে ওঠে মন
ঘুরিয়ে আসে রাতি।
অন্তবিহীন-অন্ধকারে কোন সে কিশোর-দিনে
তোমার খোঁজে বেরিয়েছিলাম একলাটি পথ চিনে
গহন-বনের অন্ধকারে নীরব-রজনীতে,
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি,
আজকে কেন মরণ পারে ডাক দিয়েছ তবে
ওগো জীবন-সাথী।

সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত সুরে গহন-বনের তলে
উছল চোখের জলে,
মরণ আলোর-রশ্মি নেখে জীবন-খেয়া-তরী
একলা ভেসে চলে।
সুর যে আমার হারিয়ে গেল অনেক দূরের-দেশে
অপূর্ণতায় কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত-পাখা-শেষে,
অরুণ আলোর অন্ত বেলায় শব্দবিহীন সুরে,
লুকোচুরির ছলে ;
সে সুর আমার হারিয়ে গ্যাছে পথের-প্রান্তে এসে
উছল-চোখের-জলে।
আজকে কেন নতুন করে গাঁথছ তবে মালা
শুকিয়ে যাওয়া ফুলে,
অন্ধকারে আমায় কেন ডাকছ তবে ওগো
ক্ষণিক-মোহের ভুলে ?
তোমায় আমায় বসবে সখা আবার প্রেমের-মেলা
আগের মত খেলব মোরা আবার নতুন-খেলা
নতুন করে বাজবে সখা আবার মিলন-বাঁশী
উঠবে প্রীতি দুলে ;
নতুন করে আবার তোমায় পরিয়ে দেব মালা
শুকিয়ে যাওয়া ফুলে।

জিজ্ঞাসা

বুদ্ধদেব ঘটক

আমাকে সে স্বপ্ন দেবে, বলে সেই নারী
গেরুয়া ঝর্ণার পাশে একটি অশোক-গুচ্ছ নিয়ে
হাতে তুলে দিয়েছিল, তুমি হও আলোর দিশারী
পর্বত-চূড়ার মতো, জীবন চলেছে দেখো ইনিয়ে-বিনিয়ে
শুধবো বাঁচার ঋণ বলোতে কী দিয়ে
তোমার গর্বকে নিয়ে আমি যেন ফিরে যেতে পারি !

দুরন্ত ঝর্ণার মতো কলস্বনা সে এক নারীকে
স্বপ্নের মতোন কোন ক্ষণিক স্মরণে
ভুলে গেছি, সেই এক রৌদ্রবর্ণ পাহাড়কে মনে
নেই, শপথ প্রত্যয় তবে অভীপ্সায় ফিকে
হয়ে গেছে, আর সেই অগ্নিবর্ণা আলামুখী নারী
প্রথম প্রেমের অর্ঘ্য ফিরে নিয়ে কবে
আমার অক্ষম শক্তি, ব্যর্থতার ব্যথা অনুভবে
চলে গেছে, নেয়নি মাথায় তুলে বিলাপের স্নিগ্ধ
শান্তি-বারি !

অথচ আমিতো আজো মধুমক্ষিকার মতো বাঁচি
প্রগাঢ় তৃপ্তি নিয়ে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে থেকে
আলাপে-গুঞ্জনে ভদ্র, প্রেমে মুগ্ধ, সুখে তৃপ্ত আছি ;
জীবন ঘোষণা নয়,- অন্ধকারে তাই মুখ ঢেকে
কাজের জোয়াল টানি, বাঁচি আর মরি ;
কে দেবে আলোর স্বপ্ন, স্বর্ণচাঁপা জীবনের ভরে
প্রথম উষার ভোর, তামসিক আঁধার শর্বরী
মুছবে হৃদয়ে কবে অনাবিল আশার আশ্রয়ে !

তবু কোনো অর্ধরাতে বিরতি-মুহূর্তে বুঝি আজো
মনে হয় জেগে উঠি, গৌরবর্ণ সে পাহাড়ের কথা
মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই নারী প্রোজ্জ্বল দীপিকা
আমাকে সে চেয়েছিল, স্বপ্ন ভেঙে আজো অনাহিকা
রয়ে গেছে, কানে বাজে-ঝম্‌ঝম্ ঝর্ণার আওয়াজও
সত্তার প্রতীক সেও। কে তুমি অনন্ত ক্ষুধা স্তব্ধ নীরবতা
বুকে বও, আত্মার গভীরে আজো জাগো
জীবন পুরুষোত্তম ছড়াও আলোর সুধা হৃদয়ের ব্যাপ্ত
অনুরাগও !

দামোদর

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী।

বিন্ধ্যাচলের নিভৃত কন্দর থেকে
বেরিয়ে এল শুটিকয় ক্ষীণাঙ্গী ঝর্ণা
হাতে হাতে মিলিয়ে নেচে নেচে পার হয়ে চলে।
কত উপত্যকা, কত অধিত্যকা।

সমুদ্র কোথায়? কোন দিকে? কত দূরে?
ঘরছাড়া ঝরণার দল সে খবর রাখে না।
পথের মরুভূমি তাদের শুষে নিতে পারে,
প্রাণের পাথেয় ফুরিয়ে যেতে পারে অর্ধপথে
তবু তারা চলেছে, বল্লভের উদ্দেশ্যে
সাগর সঙ্গম অভিলাষিনী রঙ্গিণীগণ।

ছোটনাগপুরের গহন অরণ্যে
পথ হারিয়ে ফেলে তন্বঙ্গী যত অভিসারিকা
নিশ্চিত মৃত্যুর দিন গোণে নিরুপায় প্রান্তরে
বসে বসে
কঙ্করাকীর্ণ ধরণীতে রচিত হয় অকিঞ্চন সমাধি
তাদের অজ্ঞাত, অখ্যাত বঞ্চিত জীবনের।

সহসা মৌসুমী মেঘ নিয়ে আসে তার অজস্রবর্ষণ
দূর-দূরান্তরের পাহাড় ধোয়া ঘোলাজলের ধারা
কূলপ্লাবিনী করোলিনী রূপে ধেয়ে চলে
সাঁওতাল পরগণার দিকে
মুমূর্ষু বিন্ধ্যবাসিনী নির্ঝরিণী
আর পঙ্কিল বর্ষাধারা
একাকার হয়ে দুর্বার হয়ে ওঠে।

সন্ত্রস্ত জনপদবাসী এ দুরন্ত ধারাকে
দামোদর বলে সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা জানায়
ক্ষুদ্র ও নীচের এই মিলিত দম্ভ
প্রাণান্তক হয়ে ওঠে জনসাধারণের পক্ষে
কূলে কূলে কল্যাণ বিলিয়ে সে মহিমান্বিত নয়
বার বার সর্বনাশ ঘটিয়ে সে নিজেকে করে
তুলেছে বিশ্বত্রাস।

অসহায় মানুষ, নির্বোধ মানুষ, এতদিন
তাই মুখ বুজে মার খেয়েছে
এবার সে বিদ্রোহী!
এবার সে তোমাকে বন্দী করবে।
যে মানুষ বজ্রের বুক থেকে বিদ্যুৎ ছিনিয়ে
তাকে করেছে দাসী
সেই মানুষ আজ তার "মহাজ্ঞান" নিয়ে এসেছে
তোমাকে শাসন করবে বলে।
হে দামোদর, তুমি নতজানু হয়ে তার
কাছে আত্মনিবেদন কর।
হে প্রলয়ঙ্কর, তুমি কাল থেকে নিয়োজিত হবে
কল্যাণ ব্রতে
অন্ধকার অরণ্যপথে যে আজীবন বিচরণ করেছে
সে আজ দিক দিগন্ত উদ্ভাসিত করবে আলোক
মালায়
বার বার যে মানুষের সঞ্চিত সম্পদ লুণ্ঠন করেছে
আজ সে সাহায্য করবে সেই মানুষকে অমিত
সম্পদের অধিকারী হতে
তোমার অন্ধ, মূঢ়, ব্যর্থ শক্তি
আজ উজ্জ্বল, সার্থক বিদ্যুৎ শক্তিতে
রূপান্তরিত হবে
তোমার প্লাবিকা শক্তি পরিণত হবে উৎপাদিকা শক্তিতে
ত্বৈরিণী হবে কুললক্ষ্মী
সভয়ে যারা এতদিন তোমার দুই কূলের
সংস্রব এড়িয়ে চলত
তারাই এসে ভীড় করবে তোমার দুই তীরে
নীরব, নিথর, নগণ্য জনপদ
পরিণত হবে কর্মমুখর মহানগরীতে
অরণ্য হবে মানুষ
দুর্দান্ত দস্যু হবে চির নম্র, চির হিতৈষী
মানব সেবক।

পুনরাবৃত্তি

২০

হীরালাল শেষ পর্যন্ত যখন নানাসাহেবের প্রাসাদে পৌঁছিল তখন রাত্রি শেষ হওয়ার খুব বেশী দেরি নাই। কিন্তু নানাসাহেব সেদিন তখনও জাগিয়া আছেন—বরং বলা চলে বেশ সক্রিয়ই আছেন।

দোতালার কোণের একটি বড় ঘর—খুবই বড়, এত বড় ঘর সাধারণত এসব দিকে দেখা যায় না—তাহারই মাঝামাঝি একটা চৌকী, তাহার উপর দামী ফরাস বিছানো। সেই চৌকীর উপরই খুব কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া জনতিনেক লোক নিম্নস্বরে আলাপ করিতেছিলেন। তাহার একজন নানাসাহেব। বাকী দুইজনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ—হয়ত খুবই বৃদ্ধ বলা যাইত, যদি না তাঁহার তেজব্যঞ্জক দেহ এখনও সোজা হইয়া থাকিত। তাঁহার চুল দাড়ি ভুরু যদিও সব পাকা—ললাটে কুঞ্চনেরও যদিও অভাব নাই, তথাপি তাঁহার চোখের চাহনীতে, গ্রীবার ভঙ্গীতে এবং মেরুদণ্ডের ঋজুতায় কি একটা ছিল—যাহাতে বৃদ্ধ বা ঋষির বলিয়া বোধ হয় না। অবশিষ্ট জন অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিটি আমাদের পূর্ব পরিচিত—তাত্যা টোপী।

হীরালাল যখন হুসেনীর অনুচর এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত প্রাসাদদ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন এখানে ঘরের মধ্যে সেই প্রবীন ব্যক্তিটিই কথা কহিতেছিলেন. 'না—নানাসাহেব, আংরেজের শক্তিকে ছোট ক'রে দেখবার কোন কারণ নেই। কে মহম্মদ আলি খাঁ আমি চিনিনা—কিন্তু তিনি সত্যি কথাই বলেছেন।- আপনারা অনেকখানি লোভে এগোচ্ছেন, সেই সঙ্গে অনেকখানি বিপদের ঝুঁকিও ঘাড়ে নিচ্ছেন, এটা ভুলে যাবেন না।'

তাত্যা টোপী মুচ্‌কী হাসিয়া কহিলেন, 'আপনি কি লড়াই শুরু হবার আগেই ভয় পাচ্ছেন সিংজী ?'

প্রবীন ব্যক্তিটির তীক্ষ্ণ চোখ দুইটিতে যেন বারেক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কিন্তু তিনি রাগ করিলেন না, হাসিলেন মাত্র। বলিলেন—'কুঁয়ার সিংহের ভয়! এ কথাটা কোন রাজপুত বললে আর পার পেয়ে যেত না টোপীজী। এমন কি কোন শিখ বা কৌজীলোক বললেও তার রক্ষা থাকত না। কিন্তু মারাঠীরা সম্মুখ-যুদ্ধের ধার ধারে না—শৌর্যের চেয়ে কৌশলই তাদের বড় কথা। বীর বা সাহসীর মর্ম তারা বুঝবে এটা আমি আশা করি না। তাই আপনাকে ক্ষমা করলুম।'

কুঁয়ার সিং নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন, তাত্যা টোপীর দিকে একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাইয়া নানাসাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আংরেজ বেইমান কিন্তু ওরাও সাহসী, বীর। ওদের আমি সত্যিই শ্রদ্ধা করি। সত্যি বলতে কি আমার মত শত্রু

ওদের কেউ ছিল না। বিহারে ওদের এতদিন শান্তিতে রাজত্ব করতে হ'ত না—যদি না জগদীশপুরের কুঁয়ার সিং ওদের দিকে থাকত।...রেজিমেণ্ট বোর্ডের ঐ কুকুরগুলো আমার পিছনে অকারণে লাগল ব'লেই না:—। আর ঐ বেইমানের বাচ্চা বেইমান হ্যালিডে সাহেব, ওরা যদি আমাকে মিছিমিছি অপমান না করত ত কুঁয়ার সিং কিছুতেই আজ ওদের বিরুদ্ধে যেত না।...না, নানাসাহেব আমি আপনাদের দিকে আসব জবান দিয়েছি, তবু বলছি যে ওদের আমি আজও শ্রদ্ধা করি। আমার বন্ধু টেলার সাহেবের মত সাচ্চা লোক তামাম হিন্দুস্তানে একটাও নেই।'

তাত্যা টোপী অসহিষ্ণুভাবে কি বলিতে যাইতেছিলেন—নানাসাহেব ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। তিনি ধীর ভাবেই কুঁয়ার সিংকে প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি তাহ'লে কী সর্তে আমাদের দিকে যোগ দিচ্ছেন—আরার পুব থেকে সবটা আপনি চান, এই ত?'

কুঁয়ার সিংহের মুখে আবারও সেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি ঔদ্ধত্যের নয়—অবজ্ঞারও নয়—অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়ের। তিনি কহিলেন, 'ঐটুকু আমি নেব বলেছি—চাইনি কারুর কাছে। আংরেজকে যদি তাড়াতে পারি ত বাহুবলে ওটুকু আমি নিজের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারব নানা ঢুন্ডুপন্থ! তবে আপনাদের মত বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা আমার নয়, ওর বেশী আমি চাই না!

তাত্যা টোপী আগের অপমানের জ্বালা এখনও ভুলিতে পারেন নাই বোধকরি। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, 'এখন চাইছেন না ব'লে পরেও চাইবেন না—এমন কোন কথা নেই!'

'হয়ত মারাঠীর নেই তাত্যা টোপী, রাজপুতের আছে। রাজপুত—বিশেষ ক'রে যে হাতিয়ার ধরতে শিখেছে—তার কথার কখনও নড়চড় হয় না। তার জবান একটাই।' আমি বেশীর ভাগ রাজপুতের কথাই বলছি—দুএকটা বেইমান হয়ত আছে, তারা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।'

তাত্যা টোপী এবার একেবারেই জ্বলিয়া উঠিলেন, 'আপনি বার বার আমাদের জাত তুলে কথা কইছেন কুঁয়ার সিং—হুঁশিয়ার!'

'আবাস।' দাড়িতে মোচড় দিয়া কুঁয়ার সিং আবারও বলিলেন, 'সাবাস!...তবু এখনও এটুকু আত্ম-সম্মান জ্ঞান যে আছে এটা দেখে সত্যিই খুশি হলুম। তাত্যা টোপী, গত দুশ বছরের ইতিহাসে নিজের জাতের কথাটা যদি একটু পড়ে দেখেন ত দেখবেন—জবান ব'লে কোন জিনিস আপনাদের কোন কালে ছিল না. বার-বারই তা সুযোগ সুবিধা মত বদলেছেন। কিন্তু রাজপুতের দু' হাজার বছরের ইতিহাস পড়ে দেখবেন দু'একটার বেশী বেইমানীর কথা খুঁজে পাবেন না সেখানে। তাও আছে কিনা সন্দেহ।...শুনেছি ছত্রপতি শিবজী আমাদেরই জ্ঞাতি ছিলেন। সেটা সত্যি হলে আরও লজ্জার কথা!'*

তাত্যা টোপী বিষম উত্তেজিতভাবে আর একটা কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কুঁয়ার সিং কথাটা পাড়িতেই দিলেন না। ইঙ্গিতে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, 'আমাকে ভয় দেখাবেন না টোপীজী। আমাকে এটুকু আশা করি আপনিও চেনেন। এই যে লড়াইতে নামছি, এ কিছুর লোভে নয়—প্রতিহিংসার জন্যেই।... তাত্যা টোপী, নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখুন দিকি, পেশোয়া ঢুন্ডুপন্থের জন্যেই কি আপনার এত মাথা-ব্যথা? সিংহের উচ্ছিষ্ট শৃগাল কতটা পাবে—অথবা সিংহই বা বলছি কাকে, শৃগালকে ঠুকিয়ে মর্কট কতটা নিতে পারবে—এইটেই ত আপনাদের চিন্তা। আপনাদের আমি চিনি!'

অপমানে নানাসাহেবেরও মুখ কালো হইয়া উঠিল কিন্তু তিনি তাতিলেন না। বরং ভ্রূকুটি করিয়া তাত্যার দিকে চাহিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিলেন। কহিলেন,

* টডের মতে আলাউদ্দীনের আক্রমণ কালে মহারাণা লক্ষণ সিংহের এক পুত্র সুজন সিংহ দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। তাঁহারই কয়েক পুরুষ পরে এই বংশেই শিবজীর আবির্ভাব হয়।

উহুঁ-উহুঁ—এসব ঝগড়া আর নয়। এই হাত তুলে ঝগড়া আর পরস্পরকে গালাগালি—এইতেই আমরা গেছি।...আর আপনাকে কে না জানে কুঁয়ার সিং। যাক্...আপনার জবান পেয়ে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। টীকা সিং অবশ্য বলেছিল—তবু। কিন্তু আপনি লক্ষ্ণৌতে কেন এসেছিলেন তা ত জানা হ'ল না—?'

'নিতান্তই বিষয়-কার্যে গেছোয়া। টাকা চাই ত। এখানে আমার কিছু জায়গীর ছিল সেইগুলো বেচে দিয়ে গেলাম।'

এই সময় দরজায় মৃদু টোকা দিয়া একটি রক্ষী ঘরে প্রবেশ করিল। তিনজনেই আত্মসম্বরণ করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। রক্ষী ঈষৎ মাথা নত করিয়া নানাসাহেবের সামনে নিজের হাতটা মেলিয়া ধরিল। সে হাতে একটা আংটি। চার-কোণা লাল পাথরের আংটি।

নানাসাহেব আংটিটি দেখিয়াই চিনিলেন। একবার একটু ইতস্তত: করিয়া কহিলেন, 'আপনি একটু বসুন কুঁয়ার সিংজী। খুব জরুরী খবর আছে—আসছি আমি।'

তাহার পর তাড়াতাড়ি রক্ষীর সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিলেন।

দ্বিতলেরই একটি ঘরে বসিতে বলা হইয়াছিল হীরালালকে। সে একটা কাঠের টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। নানাসাহেব ঘরে প্রবেশ করিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

নানাসাহেব তাহাকে বসিতে বলিয়া নিজেও একটা চৌকীতে বসিলেন। তাহার পর অত্যন্ত মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'তারপর?'

হীরালাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। কহিল, 'আপনি?'

'আমিই নানাসাহেব। নির্ভয়ে বলো।'

'কিন্তু আমি ত আপনাকে চিনি না।'

বিরক্তিতে নানাসাহেবের ললাটে কুঞ্চন দেখা দিল। পরক্ষণেই তাঁহার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। তিনি বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলিটি মেলিয়া ধরিলেন। লাল চারকোণা পাথরের একটি আংটি—যেমন আংটি হীরালাল আনিয়াছিল ঠিক তাহারই জোড়া। একেবারে একরকম দেখিতে।

হীরালাল হাত তুলিয়া একটি নমস্কার করিয়া কহিল, 'মাপ করবেন—আমি আপনাকে সত্যিই চিনতাম না।'

'ঠিক আছে। এখন বলো—'

'আপনিই বলুন কী জানতে চান। তবে ইংরেজের ক্ষতি হয় এমন কথা কিছু বলতে পারব না।'

এবার নানাসাহেব আর বিরক্তি চাপিয়া রাখিতে পারেন না। একটু রূঢ়স্বরেই প্রশ্ন করেন, 'তাহ'লে মিছিমিছি এখানে এসেছ কেন, কী করতেই বা পাঠিয়েছে তোমাকে?...শুধু তোমার সুরৎ দেখতে আমি সময় নষ্ট করছি?'

তাঁহার কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক রূঢ়তায় হীরালাল একটু ভয় পাইলেও, সে বিনীত দৃঢ়তার সহিত বলিল, 'তিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তিনিও জানেন যে সিপাহীদের মতামত ছাড়া আমি কিছুই বলতে পারব না। আমি যাঁদের নিমক খাই—তাঁদের অনিষ্ট হয় এমন কাজ করব না।'

'সিপাহীদের মতামত জানালে অনিষ্ট হবে না?'

'সেটা তাঁরা আমায় জানাননি বিশ্বাস ক'রে।... তাছাড়া সেটুকু আমি না বললেও ক্ষতি যা হবার তা হবেই।'

নানাসাহেব একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'সিপাহীদের মত কি?'

'তারা কেউই আর ইংরেজ-রাজ চায় না। অন্তত বেশীর ভাগই। তারা ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত, শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষা করছে!'

'তারা আমাকে চায়, আমাকে রাজা বলে মানতে চাইবে?'

'কেউ কেউ চায় বৈ কি।...সকলে ঠিক হয়ত আপনার নাম জানেনা—তারা বাহাদুর শার কথা বলছে।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বোধকরি আর একটা নির্দেশ, হীরালালের কাছে অলঙ্ঘনীয় আদেশ—মনে পড়িয়া গেল; সে নিমেষে যেন আরও ঘামিয়া উঠিল, কথাটা চাকিয়া লইতে অগত্যা সে একটা মিথ্যারই আশ্রয় লইল। কহিল, 'কিন্তু আমি এটা বলছি প্রধানতঃ মীরাটের কথা। এরা অনেকটা আপনার মুখ চেয়েই আছে।'

নানাসাহেবের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন, 'কেমন ক'রে তুমি জানলে তা? তুমি ত এখানকার ছাউনির লোক নও।'

'আজ্ঞে, আমাকে প্রায়ই আসা যাওয়া করতে হয়। এই ত আজই সারা রাত প্রায় এখানের পথে পথে ঘুরছি, সিপাহীদের হল্লা শুনছি। ক'দিন আগেও কানপুর ছাউনিতে এসেছিলুম।'

'তুমি যা বলছ তা আমি বিশ্বাস করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। যাঁর নির্দেশে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে—তাঁর কাজে আমি মিছে কথা বলব না কিছুতেই। আর মিছে কথা বললে ত আমি আপনাকে অনেক মুটা খবরও দিতে পারতুম।'—

নানাসাহেব কিছুক্ষণ স্থির নিষ্পলক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন 'তোমাকে কে এখানে পাঠিয়ে দিলেন—হুশেনী বেগম?'

'তাঁ—তাঁরই লোক। তাঁর হুকুমেই আমি এসেছি।'

মিথ্যা কথা এখনও হীরালালের মুখে সত্যই আটকাইয়া যায়।

আরও কিছুক্ষণ স্থির হইয়া চাহিয়া রহিলেন নানাসাহেব। হীরালাল আগে হইতেই ঘামিতেছিল। এখন সে বিচিত্র দৃষ্টির সামনে বসিয়া আরও ঘামিতে লাগিল। তাহার পিরানটা গায়ের সহিত একেবারে লেপ্‌টাইয়া গিয়াছিল।

নানাসাহেব খুব মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি তাঁকে খুব ভালবাসো, না?'

হীরালালের মুখ আরক্ত ছিলই, এখন প্রায় অগ্নিবর্ণ ধারণ করিল। সে দুই হাত মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, 'কে না তাঁকে ভালবাসে—তিনি দেবী। আমি প্রত্যহ ঘুম ভেঙ্গে উঠে আগেই তাঁকে প্রণাম জানাই মনে মনে।

'কেন—হঠাৎ এত ভক্তি তোমার? তুমি ত হিন্দু, হয় ত ব্রাহ্মণ। তিনি ত মুসলমানী।'

'তিনি দেবী। তিনি বার বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। যখনই বিপদে পড়ি তখনই তিনি যেন মা দুর্গার মত আবির্ভূত হয়ে আমাকে রক্ষা করেন।'

'সে করেন—তিনিও তোমাকে ভালবাসেন ব'লে। তোমার এই কাঁচা বয়েস, খুবসুরৎ চেহারা। ভাল ত বাসতেই পারেন।'

ইঙ্গিতটা পুরা না বুঝিলেও কথাগুলা হীরালালের তত ভাল লাগিল না। সে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যেদিন হয় সেদিনই তিনি আমার জীবন দান করেন। তখনও তিনি আমাকে ভাল ক'রে দেখেন নি।'

'কী রকম? কী রকম?' নানাসাহেব সাগ্রহে প্রশ্ন করেন।

'আমি গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিলাম—উনি নৌকো থেকে দেখতে পেয়ে আমাকে টেনে তোলেন। নিজের প্রাণের মায়া না ক'রেই উনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলেছিলেন।'

বলিতে বলিতে হীরালাল মাতিয়া উঠিয়াছে, 'উনি মানবী নন—সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী! সকলেই ওঁর সন্তান। সকলের ওপরই ওঁর মায়া। বিশেষ কোন কারণে আমার ওপর দয়া করেছেন তা নয়। দয়া না ক'রে উনি থাকতে পারেন না।'

নানাসাহেব তখনও সেই বিচিত্র দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন, কহিলেন, 'হুঁ!···তা তোমাদের দেখা হয় কখন?···তুমি ত মীরাটে থাকো।'

'দেখা হয় মানে? আজ পর্যন্ত তিন চার দিনই মাত্র দেখা হয়েছে।'

'আজ ?' সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে নানাসাহেবের কৌতূহল. 'আজ কোথায় দেখা হ'ল ?'

হীরালাল পিয়ানের প্রান্তে ললাটের ঘর্ম মুছিয়া কহিল, 'আজ দেখা হয়েছে আমি এমন কথা ত বলিনি আপনাকে !···এখন আমি যাই। ভোর হয়েছে, ষ্টাউনিতে পৌঁছতে হবে এখন। এসব ব্যক্তিগত কথা-বলার জন্ত আমি আসিওনি।'

সে ঘাড় হেঁট করিয়া আবারও একটা নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হীরালাল চলিয়া যাওয়ার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত নানাসাহেব স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিরাট এক বিপর্যয় আসন্ন। তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে। একদিকে হয়ত সর্বনাশ, মৃত্যু। আর একদিকে মহারাষ্ট্রের—হয়ত বা সারা ভারতের সিংহাসন। অনেকখানি ঝুঁকি; অনেকখানি লোভ। কিন্তু এই মুহূর্তে কি তিনি ঠিক সে কথাই ভাবিতেছিলেন ? হয়ত তা নয়। কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে এসব জটিল এবং গুরুতর কথার বাহিরে তাঁহার মন চলিয়া গিয়াছে—নিতান্তই তুচ্ছ এক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে। সেখান হইতে মনটাকে ফিরাইয়া আনা যাইতেছে না। কে জানে কেন—এই বালককে দেখিয়া তিনি মনে মনে একটা ঈর্ষাই অনুভব করিতেছেন।···এমন কি ইহাকে দেখিবার আগেও, আজ সারা সন্ধ্যা ধরিয়াই কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে তাঁহার মনে নিজের ভবিষ্যৎ অপেক্ষাও যে প্রশ্নটা বড় হইয়া উঠিয়াছে—সেটা হইতেছে এই, হুসেনী কি সত্যই তাঁহাকে ভালবাসে, তাঁহার জন্তই এত কাণ্ড করিতেছে ? না কি অন্ত কোন গূঢ় উদ্দেশ্ত আছে—তাঁহাকে সে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করিতেছে মাত্র।

নানা মুদ্ধুপন্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই ঠকিবার ভয়টা বড় বেশী। কাহারও দ্বারা প্রবঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা আছে—একথা মনে হইলেই অস্বস্তিতে মন ভরিয়া ওঠে তাঁহার। আর তিনি নির্বোধ নন বলিয়াই হুসেনীর এই আপাত-প্রেম নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করিতে পারেন না। মনে হয় হুসেনী ত তাঁহার বহু রক্ষিতার মধ্যে একজন মাত্র। তাহার এত নিঃস্বার্থ ভালবাসার কারণ কি ? অথবা সত্য-সত্যই তাঁহাকে বাদশা করিয়া সেই বাদশার প্রিয়তমা বলিয়া গণ্য হইবার সম্ভাবনাতেই সে খুশী ?

নানাসাহেবের ললাটে আবারও ভ্রূকুটি ঘনাইয়া আসিল। তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে—ঘরের কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল আর একটি স্ত্রীলোক।

নানা চমকিয়া উঠিলেন।

'আদালা !'

'জী। আপনার বাঁদী।'

'তুমি এখানে ? তুমি এখানে কেন ? আমি লক্ষ্ণৌ আছি কে বললে তোমাকে ?'

'বলেছে আমার দুর্ভাগ্যই। আপনি চলে এলেন, আমাকে বলে এলেন না। আসবার আগের দিন একবার আমাকে দেখা পর্যন্ত দিলেন না।···ঐ সর্বনাশী আপনার সর্বনাশ করার জন্ত চারিদিকে জাল পাতছে আর আপনি বোকার মত, পতঙ্গের মত সেই জালে জড়িয়ে পড়ছেন।'

'বোকার মত' কথাটা ভাল লাগার কথা নয়। নানা সাহেবেরও লাগিল না। তিনি বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, 'কতবার বলব আদালা—তুমি এসবের মধ্যে নাক গলাতে এসোনা। তোমার স্থান আমার শয্যায়—তার বেশী নয়। হুসেনী আমার উপযুক্ত সহচরী, তার বিদ্যাবুদ্ধির কণামাত্রও তোমার নেই—তুমি চাও তাকে হিংসে করতে।···তোমাকে ভালবাসি আদালা তুমি বেশী সুন্দর বলে; কিন্তু দরকার আমার হুসেনীকে বেশী !'

'ঐ রাক্ষুসী আপনাকে জাদু করেছে দেখোয়া। তাই আপনি ওর কোন দোষ দেখতে পান না। আমাকে যতটা বোকা ভাবেন আমি ততটা নই। আমি সব জানি। আংরেজদের সঙ্গে লড়াই করা আপনাদের কাজ

নয়। সে কথা—হুশেনীও জানে। ওর নিশ্চয়ই কোন বদ্ মতলব আছে তাই জেনে শুনে আপনাকে এই সর্বনাশের মধ্যে টেনে আনছে।'

আরও বিরক্ত হইয়া নানা সাহেব কহিলেন, 'তুমি যা জাননা আদালা তা নিয়ে বোকার মত কথা কইতে এসোনা। তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি। কার হুকুমে তুমি বিঠুর ছেড়ে এখানে এসেছ?'

'হুশেনী কার হুকুমে এসেছে পেশোয়া?'

'হুশেনী?' নানা সাহেবের বিরক্তি ছাপাইয়া কৌতূহল প্রবল হইয়া ওঠে।

'হ্যাঁ। আপনার পেয়ারের হুশেনী।···আপনি বিঠুর ছাড়বার একঘণ্টার মধ্যেই সে বেরিয়ে পড়েছে তা জানেন কি?'

'সে ত মাঝে মাঝেই বাইরে যায়। সে কাজেই যায়।' নানা সাহেব কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিলেও তাঁহার সংশয় চাপা পড়েনা।

'হ্যাঁ। কিন্তু সে ছায়ার মত আপনার পিছু-পিছুই ঘুরছে। সে আর তার সেই পেয়ারের কসাই। দানোর মত দেখতে—হুশেনী বেগমের রুচি বেশ।'

নানা একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলেন, 'ও ওর বাপের আমলের চাকর। একা ঘোরাঘুরি করবার সময় পাছে কোন বিপদ হয় তাই ওকে সঙ্গে নেয়। আমার অনুমতি নিয়েই ওকে সঙ্গে নেয় সে।···আর পেয়ারের লোক হবার মত সুরৎ ওর নয়।'

'তা ত নয়'—আদালার কণ্ঠস্বর হইতে যেন মধু ঝরিয়া পড়ে, 'কিন্তু এই যে খুবসুরৎ ছোকরা একটু আগে বেরিয়ে গেল এ ঘর থেকে? তার চেহারা কেমন পেশোয়া?···যদি বলি যে মাত্র কয়েকদণ্ড আগেই আপনার প্রিয়তমা হুশেনীকে আর এই ছোকরাকে এক ঘোড়ার গায়ে-গায়ে লাগিয়ে বেড়াতে দেখেছি লক্ষ্ণৌয়ের রাস্তায়! যদি বলি যে এই ছোকরার বুকে আপনার প্রিয়তমা এলিয়ে পড়েছিলেন—তবে?'

'ঝুট্! আদালা তুমি বড় বেইমানী। তোমার ঐ জিভ কুকুর দিয়ে খাওয়াবো 'আমি তোমার সামনে।'

নানা সাহেবের কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর হইয়া ওঠে।

'খোদা কসম!' আদালাও স্বরতে জবাব দেয়, 'যে আমার জিভই আমিন রইল। আপনি নিজে খোঁজ করুন। যদি আমার কথা মিছে হয় ত—আমি নিজে হাতে এই জিভ কেটে দেব।'

নানা সাহেবের মুখের চেহারাটা যে পৈশাচিক রকমের ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বোধ হয় তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন। তাই প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত-কণ্ঠে ডাকিলেন, 'গণপৎ!'

কিছুক্ষণ আগে যে রক্ষীটি তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, সে-ই প্রণাম করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

'একটু আগে যে ছোকরা এসেছিল এখানে, তাকে তোমার মনে আছে?'

'আছে পেশোয়া।'

'তুমি আর একজন—এখনই দুটো ঘোড়া নিয়ে যাও। সে ছোকরা ছাউনির দিকে গেছে। পায়ে হেঁটেই যাবে সম্ভবত। এতক্ষণ বেশী দূর যেতে পারেনি। তাকে ধরে নিয়ে এস। ব'লো যে খুব জরুরী একটা কথা আছে। সহজে না হয়—জোর ক'রে এনো। দরকার হয় বেঁধে এনো।'

গণপৎ আবারও প্রণাম করিয়া নিরুত্তরেই বাহির হইয়া গেল।

নানাসাহেব নিজের মুখভাবকে আরও কিছুটা সহজ হইবার সময় দিয়া কহিলেন, 'আদালা তুমি এখানেই অপেক্ষা করো।'

তারপর ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় পড়িলেন। তাত্যাটোপী ও কুঁয়ার সিং বসিয়া আছেন। কিন্তু তা হউক, এখনই গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিবার মত ঠিক মানসিক অবস্থা নয়। তিনি ঊর্ধ্বে জ্যোতির্ময় আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

ততক্ষণে ভোর হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে পাখী-পাখালির ডাক শুরু হইয়াছে। বৈশাখের শেষ রাত্রি। বাতাস রীতিমত ঠাণ্ডা। কিন্তু সেই হু হু ঠাণ্ডা বাতাস এবং মধুর প্রাকৃতিক পরিবেশও নানা সাহেবের আতপ্ত ললাটকে কিছুমাত্র শীতল করিতে পারিল না।

ক্রমশঃ

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত

শ্রীজয়দেব রায়

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত ॥

কবি রবীন্দ্রনাথ যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন, তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বাসবদত্তার কাহিনীও ইতিহাসাশ্রিত, গল্পটি সকলেরই সুপরিচিত; 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' গ্রন্থ হইতে কবি তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন।

—মথুরাপুরীর নটী মদনিকা বাসবদত্তা অভিসারে যাইবার একদা শ্রাবণের অন্ধকার রজনীতে প্রাচীরতলে সুপ্ত উপগুপ্তের অঙ্গে অজানিতে পদের দ্বারা আঘাত করে। লজ্জিতা নটী তাঁহাকে সেখান হইতে তাহার গৃহে যাইতে আমন্ত্রণ জানায়। উপগুপ্ত জানাইলেন—"সেখানে যাবার সময় আমার এখনও হয় নি, সময় হ'লে আমি নিজেই তোমার গৃহে যাবো।"

চৈত্রমাসে বসন্তের মহামারীতে আক্রান্তা রূপ-যৌবনহীনা বাসবদত্তাকে তাহার অনুরাগীর দল নগরীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিল, সন্ন্যাসী তাহার শির অঙ্কে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"আজি রজনীতে হয়েছে সময়—এসেছি বাসবদত্তা।"

তাহার দেহে তখন রূপলাবণ্য, যৌবনতরঙ্গ ও ভূষালঙ্কার কিছুই নাই, আজ তাই তাহাকে মহামন্ত্রে দীক্ষা দানের সময় আসিয়াছে।

উপগুপ্ত ছিলেন চণ্ডাশোকের ধর্মগুরু। আবার ধর্মাশোকের প্রতিনিধি উপগুপ্ত সারা ভারতবর্ষময় বুদ্ধের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বারাণসীর এক গন্ধবণিকের সন্তান। তাঁহার পিতার নাম ছিল 'গুপ্ত'। উপগুপ্তকে গন্ধানদীর এক যৎস্য নারীর সন্তান কল্পনা করা হইয়াছে।

চণ্ডাশোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ের কাহিনীটি ইতিহাস সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে—

অশোক ছিলেন প্রথম জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। রাজা হইবার ১৩ বৎসর পরে তিনি কলিঙ্গ বিজয়ে যাত্রা করেন। কলিঙ্গবাসীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল, নৃশংস অশোক কঠোর হস্তে তাহাদের দমন করিলেন। ঐ একটি যুদ্ধেই একলক্ষ নিরীহ কলিঙ্গবাসী নিহত এবং দেড় লক্ষ কলিঙ্গবাসী অশোকের হাতে বন্দী হইল। সমস্ত দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

কলিঙ্গদেশের সর্বনাশ করিয়া অশোক পাটলিপুত্রে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার মনে তখন হইতে গভীর নির্বেদ জন্মিল, যেন একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইল। লক্ষ লক্ষ কলিঙ্গনারীর ব্যাকুল আর্তনাদ তাঁহার কর্ণে সর্বদাই ধ্বনিত হইতে লাগিল। ঠিক্ এই সময়ে ভগবান বুদ্ধের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী তাঁহাকে শোনাইলেন সন্ন্যাসী উপগুপ্ত।

চণ্ডাশোকের মৃত্যু হইল, জন্ম হইল ধর্মাশোকের—সুরু হইল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের গৌরবময় রাজত্ব।

"দিব্যাবদান" গ্রন্থে এই কাহিনীটি আছে। কুকুটারাম নামক সঙ্ঘারামে উপগুপ্তের সঙ্গে অশোকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পাটলিপুত্রের নিকটে একটি ক্ষুদ্র পর্বতের চূড়ায় উপগুপ্ত সে সময়ে আশ্রম রচনা করিয়া সাধন-ভজন করিতেছিলেন। ওয়াডেল সাহেব অনুমান করেন পাটনার দক্ষিণে ছোটপাহাড়ী নামক স্থানটিতে তাঁহার আশ্রম ছিল।

উপগুপ্ত কেবল চণ্ডাশোককে সৎপথে আনয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অনুপ্রাণিত করিলেন।

বোধিসত্ত্বের নির্বাণ লাভের শত বৎসর পরে সারা ভারতময় বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাহার একটি আপোষ মীমাংসার প্রয়োজন অনুভূত হয়। উপগুপ্ত সেই কঠিন কর্ম সম্পাদন করিলেন। তাঁহার সংস্কারের ফলে বৌদ্ধধর্ম সর্বজন আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

উপগুপ্ত অতি কিশোর বয়সে বৈশালী বিহারের সঙ্ঘপতি যশের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস লইবার অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। তারপর তিনি দেশবিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। জনগণের সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল।

স্থবির হইবার পর তিনি 'বিনয়পিটকে'র নীতিকথা দেশবিদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। ভাগলপুরের সন্নিকটে চম্পানগর নামে বৌদ্ধদের একটি বিখ্যাত সঙ্ঘারাম ছিল; উপগুপ্ত সেখানে যোগদান করিলেন। সেখানকার সঙ্ঘাধিপতি শাণরামিকের মৃত্যু হইলে উপগুপ্ত তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হইলেন। সঙ্ঘারামের নিয়মতান্ত্রিক জীবন তাঁহার বেশি দিন ভালো লাগিল না। একদিন সুযোগ পাইয়া তিনি সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে বিদেহ প্রদেশের বিম্বসার নামক এক গৃহস্থের অপ্রত্যাশিতভাবে পুনরায় তিনি তাহার স্থাপিত সঙ্ঘারামের প্রধান শ্রমণের পদ গ্রহণ করিলেন। উত্তর ভারতের সঙ্ঘারামগুলিতে সে সময়ে নানা অনাচার প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ভিক্ষু শ্রবণদের অনুরোধে তিনি বিভিন্ন সঙ্ঘারাম পরিভ্রমণ করিয়া সেগুলির সংস্কার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় উত্তর ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিতে থাকিল। সর্বত্রই জনগণের কাছ হইতে তিনি সাদর অভ্যর্থনা ও প্রচুর সম্মান লাভ করেন।

উপগুপ্তের 'মারবিজয়' কাহিনীটিও বিখ্যাত। অশ্বঘোষের 'মারবিজয়' গ্রন্থে এই কাহিনীটি আছে—উপগুপ্ত সমাধিমগ্ন হইয়া গিরি বা উরির পর্বতের চূড়ায় তপস্যা করিতেছিলেন। সে সময়ে মার বা বৌদ্ধ শাস্ত্রের অসুর তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল।

মানুষকে ছোট করিয়া তাহাকে যতটা হেয় করা যায়, তাহার অপেক্ষা বহুগুণ বেশি উঁচু করিয়া তাহাকে পতনের পথে লইয়া যাওয়া যায়। মার সেই চেষ্টাই করিল—তাঁহাকে তপস্যাভঙ্গ করিবার জন্য, তাঁহাকে ধর্মচ্যুত করিবার জন্য মার তাঁহাকে মায়ামুগ্ধ করিল। উপগুপ্ত ধ্যানের মধ্যে তাহা জানিতে পারিলেন।

তিনি তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহার কণ্ঠে একটি শবদেহ সংলগ্ন করাইয়া দিলেন। মার আর কিছুতেই সে শব মুক্ত করিতে পারিলেন না। সে উপগুপ্তের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

উপগুপ্ত ভগবান বুদ্ধদেবকে স্বচক্ষে দেখেন নাই। তাঁহার জীবনে এই আক্ষেপ ছিল। তিনি বলিলেন—"যদি তুমি আমাকে তথাগতকে দেখাতে পারো, তবে তোমাকে ক্ষমা করব।"

মার তখন নিজেই ভগবান বুদ্ধের দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন। অভিভূত উপগুপ্ত মারকে এবার ক্ষমা করিলেন।

উপগুপ্তের সম্বন্ধে এই প্রকার বহু গল্প প্রচলিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়েন সাঙ ও তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ উভয়ই তাঁহাদের বিবরণীতে উপগুপ্তের সম্বন্ধে অনেক গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন।

মথুরার পথে তিনি দুইধারের পুরজনদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিতে দিতে চলেন। কত পাপীকে যে তিনি ত্রাণ করেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। উপগুপ্ত তখন এক উপায় করিলেন—একটি শূন্য গুহায় প্রত্যেকটি পাপমুক্ত লোকের জন্য একটি করিয়া কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে অল্প দিনের মধ্যে সহস্র গুহাটি কাষ্ঠখণ্ডে পূর্ণ হইয়া গেল। কথিত আছে, তিনি একমাত্র মথুরা নগরে ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেন।

মথুরার কাজ সমাপ্ত হইলে তিনি পশ্চিম ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিন্ধুদেশে তখন রাজা ছিলেন মহেন্দ্র। যখন নানক এক স্থানের অধিবাসীরা তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া সেখানে একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়া দেয়। হিউয়েন সাঙ্ উপগুপ্তের সিন্ধু বিজয়ের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

সিন্ধু হইতে তিনি কাশ্মীর গমন করেন। কাশ্মীরে তিনি নানাপ্রকার অলৌকিক কার্যকলাপের পরিচয় দিয়াছিলেন।

অশোকের সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি রাজাকে সঙ্গে করিয়া বৌদ্ধ তীর্থগুলি পরিদর্শনে বাহির হন। উপগুপ্তের উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিখ্যাত স্থানগুলি রাজার সাহায্যে সংরক্ষিত করিয়া বৌদ্ধধর্মের উন্নয়ন করিবেন। তিনি রাজাকে বলিলেন—

"মহারাজ! তথাগত আমাকে ও আপনাকে ধর্মের ত্রাণরক্ষক রূপে নির্দেশ করেছেন। তাঁর নরজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি সযত্নে রক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদেরই।"

অশোক নতজানু হইয়া বলিলেন—"স্থবির, আমারও সেই অভিপ্রায়, চলুন সকল তীর্থস্থানগুলিতে একটি না একটি স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপন করি গিয়ে।"

সর্বপ্রথম তাঁহারা তথাগতের অবস্থান লুম্বিনীবনে গমন করিলেন। ১৮৯৬ সালে নেপালের তরাই অঞ্চলের অন্তর্গত রুম্মিনদেই ডাঃ Fuhrer যে শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

সেখান হইতে তাঁহারা বুদ্ধশিষ্য মহা মৌদ্গল্যায়ন, নন্দ ও উপনন্দ প্রভৃতির সমাধি পরিদর্শন করেন এবং সকল স্থানেই চৈত্য, স্তূপ, সঙ্ঘারাম ও বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা অশোকের বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মূলে আছে উপগুপ্তের অনুপ্রেরণা। তাঁহারই নির্দেশানুসারে দেশ-বিদেশে অশোকের শান্তিদূত মৈত্রী করুণার বাণী বহন করিয়া ফিরিয়াছেন।

উপগুপ্তের মৃত্যুর সম্বন্ধেও নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশে তাঁহার নির্বাণ লাভের বিষয়ে বহু মত রহিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে তাঁহাকে সমুদ্র দেবতা 'উপগু' বলা হয়। ব্রহ্মবাসী বৌদ্ধদের বিশ্বাস উপগুপ্ত অভিশপ্ত হইয়া জলমধ্যে বসবাস করিতেছেন।

একটি অপ্রাচীন কাহিনী

—শ্রীউৎফুল্ল রায়।

জীবনের কত কথা, কত অভিজ্ঞতা কখন কি ভাবে হারিয়ে যায় কেউ তার হিসাব রাখে না। আজ যা লিখতে বসেছি সেও এমনি একটি কাহিনী যা অনেক কাহিনীর মত তলিয়ে যেত বিস্মৃতির অতলতলে, যদি না বন্ধু ডাঃ ওয়েট চেপে ধরতেন লিখে রাখবার জন্যে।

বলা যখন শেষ হলো, বন্ধু বললেন—রাখই না লিখে; 'সাহিত্য যখন সত্যও নয়' আর 'পুলিশ রিপোর্ট নয়'—দেখই না যদি কোনদিন স্মৃতির খাতা থেকে সাহিত্যের পাতায় প্রমোশন পায়।

যাদের নিয়ে এ কাহিনী নাম তাদের নাই বা করলাম। ধরা যাক্, একজনের নাম "অনন্ত" আর একজন "অরূপ"।

কোলকাতায় এসে দীপালিদির সাথে দেখা। একে একে সবার কথাই হলো। অনন্তার কথা উঠতেই মুহূর্তে তার মুখের চেহারা বদ্‌লে গেল। গলার আওয়াজ ভিজে এলো—বললেন—অনন্তা! সে নেই। অজানা পথে পা বাড়িয়ে একান্তই নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছে। কোন নালিশ রেখে যায় নি।

অনন্তাকে আমরা স্নেহ করতাম। স্নেহ পাবারই মত ছিল সে। এ ছিল তার জন্মগত অধিকার; কিন্তু তাতে কি? যা জন্মগত অধিকার তা ক'জন ভোগ করতে পারে?

অনন্তা নেই! নিঃশব্দে হারিয়ে গেছে! এও কি সম্ভব? এও কি হতে পারে! নানা জিজ্ঞাসায় আমার মন ভরে উঠলো। দীপালিদিকে প্রশ্ন করলাম—কেন এমন হলো?

বললেন—এই পাশের বাড়ীতেই ওরা থাকত। গভীর রাতে ফিরত অরূপ। অভাব অভিযোগ লেগেই থাকত। অথচ একটু ত্রুটি ঘটলেই বিগড়ে যেত সে। সুরু হতো তার অত্যাচার। অনন্তা ছিল নির্বিকার। কত লাঞ্ছনা, কত অত্যাচারই না সে নীরবে সয়েছে! খোকন! ঐ তো ছ' বছরের কচিছেলে—ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এসেছে আমার কাছে। কোন কথা মুখ দিয়ে বেরোয় নি, হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছে। অনন্তার ছিল সবকিছু লুকিয়ে রাখবার সকল রকম চেষ্টা। যা কিছু এসেছে আমার কানে, কেড়ে নিতে চেয়েছে তার যুক্তির শক্তিতে। বলেছে—"সব মানুষ সমান হয় না।" দোষ ত্রুটি দেখাতে গেলেই বলেছে—'ও দোষ নয়, —খেয়াল; দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নয়—পেরে না ওঠা।' তেমনি বলেছে—'দোষত্রুটি সে ত' মানুষ মাত্রেরই ছিল; —আছে; থাকবেও।' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে দীপালিদি বললেন—না জানি কত বড় আঘাত ওকে এমনি দিশেহারা করে ঘরছাড়া করলো।

জের টেনে দীপালিদি বলে চললেন—সে বেশীদিনের কথা নয়। খোকন সবে জন্মেছে। হঠাৎ অরূপের পাত্তা নেই। শেষে চিঠি এলো পাটনা থেকে। কোলকাতা ফিরতে হলে তার টাকা চাই আর বেশ কিছু টাকা; কি দরকার ছিল ফিরিয়ে আনবার?

বিরক্তি আর ঘৃণা ঘিরে ধরলো দীপালিদিকে। বলে চললেন—আমি বললুম—না, কিছুতেই এ হ'তে পারে না। গয়না বিক্রি—এ' আমি কিছুতেই করতে দেব না। আমাকে একদম জড়িয়ে ধরে বললো—'দীপা, তুই ভাবিস নে, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই বাদ সাধিস্ নে, লক্ষীটি! ভেবে দেখ, সেই বা করতে পারে কি? লক্ষ্মী যেখানে বিমুখ, কর্তব্য যেখানে কাবুলিওয়ালা সেজে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে, সেখানে অতি সাবধানী মানুষেরও পা

কার। এ ছাড়া আমার কি উপায়ই আছে? অভিমান করে লাভ বা কি হবে? বলতে পারিস কতটুকু পথ আমাদের জন্ত খোলা আছে যে আমি অভিমান করব,—ফিরিয়ে আনব না? সমাজের দিকে একবার তাকিয়েছিস ভাই?"—হার হলো আমারই।

দীপালিদির চোখ জলে ভরে এলো। বাধা দিয়ে বললাম—থাক্ দুঃখের কাহিনী দীর্ঘ করে লাভ নেই।

বললেন—কিন্তু ওকে যে আমি দু'দণ্ডের জন্তও ভুলে থাকতে পারি না। একটানা বলে চললেন—অসুখে ভুগে ভুগে আমার চোখ দু'টো অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দিন রাত কেঁদে কেঁদে মরেছি। কোলের উপর সস্নেহে আমার মাথাটি টেনে নিয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়েছে, বলেছে—"দীপা, তুই কাঁদিস নে, চোখ তুই ফিরে পাবিই।"

চোখ দু'টো যে আজ ফিরে পেয়েছি এতো তারই যত্নে,—তারই সেবায়।

একটু থেমে আবার বললেন—চলে যাবার দিন তিনেক বাদে একটা চিঠি এলো। রেয়ারিং চিঠি। বুকে ল্যান্সডাউন রোড পোষ্ট-অফিসের ছাপ। লিখেছে—

"জানি সবাই ভুল বুঝবে। ডুবিয়ে দেবে নিন্দার তলায়। তা হোক্। তুই আমার ভুল বুঝবি না—এই আমার সান্ত্বনা।

—দুই—

সেটা ছিল ইষ্টারের ছুটি। হাতে কাজ ছিল অনেক; সময় ছিল অল্প। তাড়াহুড়া করেই আবার কাজ শেষ করতে হচ্ছে। বিকালের দিকে গড়পার থেকে বেরিয়ে সার্কুলার রোডে পড়ে' ট্রামের জন্ত ছুটছি—হঠাৎ বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। বিজ্ঞান কলেজের ফটক থেকে বেরিয়ে এসে আমার পথ রুখে দাঁড়ালো অরূপ! অধ্যাপক অরূপ।

অতীত এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। কতবার দেখেছি অনঙ্গ আর অরূপ এই ফটক দিয়ে বেরিয়েছে একই সঙ্গে। রঙিন দুনিয়ার রঙিন কাহিনী দিয়ে ওরে তুলেছে তাদের বিশ্ব সংসারটাকে। অজানার স্বপ্নে ছিল তখন তাদের জগৎ ভরপুর। তারপর? তারপর দেখেছি—সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে তাদের সুখ দুঃখকে একই সূত্রে গাঁথতে। হেলায় আর উপেক্ষায় পাশ-কাটিয়ে চলতে দেখেছি তাদের বাইরের জগৎটাকে। আবেগে আওড়াতে শুনেছি কবির কবিতা ক' লাইন—

"মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে বলিব
তুমি আছ, আমি আছি।"

মুহূর্তের মধ্যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। মনের মধ্যে উঠলো নিদারুণ ঝড়। চোখের সামনে ভেসে উঠলো দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাণ্ডব আর তার প্রলয়ঙ্করী মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠলো পরাভূত জীবনের এক করুণ কাহিনী।

অরূপ আমাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে চললো তার বাড়ীতে। আমি চললাম তার জোড়া লাগানো কাহিনী প্রত্যক্ষ করতে। এ তার পৈতৃক বাড়ী। এ বাড়ীতে অনেক এসেছি কিন্তু সবই নতুন ঠেকতে লাগলো।

অরূপ আমায় সোজা তার ঘরে নিয়ে গিয়ে লীলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বন্ধুপত্নীর সহজ সরল নমস্কারে আমি যন্ত্রচালিতের মত প্রতিনমস্কার জানালাম। আমাকে বসতে অনুরোধ করে তিনি চা আনতে গেলেন।

চা খেতে খেতে সামান্ত দু'চারটি কথা হ'লো। লক্ষ্য করলাম—মহিলার আচরণে আভিজাত্য আছে—কিন্তু অহংকার নেই।

চা খেয়ে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অরূপ ট্রাম লাইন পর্য্যন্ত আমায় পৌঁছে দিতে এলো। আশ্চর্য বন্ধুত্বভরা তার আচরণ। অর্থের অনটন ক'মেছে। মা-বাবা নন্ কোঅপারেশন বন্ধ করেছেন—এমনি আরও নানা কথাই হ'লো। আলাপের ফাঁকে প্রশ্ন করলাম—খোকন কই?

অরূপের মুখের চেহারার অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। বললো—অনন্তা চলে যাবার পর তাকে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওঁদের যত্নে খোকন অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে।

প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, শীলা জানে সব?

—না।

—খোকনকেও দেখেনি?

—না।

আমি অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করে বললাম—কেন এমন হলো।

যা বললো, নাই বা বললাম সে সব। কথা বাড়াবার ইচ্ছা কিংবা প্রবৃত্তি কোনটাই আর হলো না। ট্রাম এসে গেল। আমি চেপে বসলাম।

তিন

অর্থের অন্বেষণ—আমরা যাকে বলি কাজ—তারই তাগিদে কালাপানি পাড়ি দিয়ে আসতে হলো সুদূর বার্লিনে। শত্রুকবলমুক্ত জার্মানীতে নতুন করে কারবার সুরু করেছে "ছাভারো রেমিডিস্ কোম্পানী' তাদের নবভাগ্যবিধাতাদের অনুমতি নিয়ে। আমি এসেছি তাদের পূর্ব প্রাচ্যের প্রতিনিধি হবার তদ্বিরে।

সরকারী দূতাবাসের শরণ নিতে হলো। ট্রেড কমিশনারের দর্শনপ্রার্থী হয়ে আমি নামের কার্ড পাঠিয়ে অপেক্ষা করছি, এমন সময় বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। পরণে সাদা শাড়ী।

মেয়েদের মুখের দিকে তাকানো রীতি বিরুদ্ধ না হ'লেও রুচি বিরুদ্ধ; অন্তত আমাদের দেশে। তাই চট্ করে তার মুখের দিকে তাকাতে পারি নি।

তাঁর কামরায় আমাকে ডেকে নিয়ে, বিশুদ্ধ বাংলায় আমাকে বসতে বললেন। মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মৃদু হেসে আবার আমায় বসতে বলে নিজে আসন গ্রহণ করলেন।

আমার মন বলতে লাগলো:—স্বামী যাকে আগলে রাখতে পারে নি, আত্মীয় পরিজন যাকে অসহায় উপেক্ষায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে, সমাজের চাঁই যে তাঁরা যাকে তার অর্থের অন্বেষণ-অভিযানে পরম বিজ্ঞের ভাণ করে উপদেশ বিতরণ করেছেন—"তোমাদের ঘরেই মানায় ভাল"; দেশের সরকার যাকে দেশে এতটুকু কর্মের সংস্থান করে দিতে পারে নি, দারিদ্র্যের মিষ্টুর তাড়না একদিন যাকে জীবনের বন্ধুরতম পথে ঠেলে বের করে তাকে ঘরছাড়া করেছে—সেই অনন্তা আজ সুদূর বিদেশে বাড়িয়ে চলেছে দেশের মান—আগলে রাখছে দেশের স্বার্থ! অনন্তার রহস্য আর সত্তা পরিচয় ধরা পড়েছে—

"মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজদার
আছে দরদী,
আছে ইংরেজ ফার্সাণ ফরাসী।"

চার

অফিস থেকে ফিরবার পথে অনন্তা আমার হোটেলে এলো। এক রকম জোর করেই আমাকে তুলে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। নিজে হাতে চা করে, রান্না করে খাওয়ালো।

রাতে দু'জনে নানা কথাই হলো। আশ্চর্য তার সরলতা, অদ্ভুত তার মানসিক দৃঢ়তা—তেমনি সীমাহীন তার ধৈর্য আর ক্ষমা!

নিজের ছেলেকে নিজে হাতে মানুষ করতে পারেনি—তাই সে হাজারো ছেলের মা সেজে বসেছে। দিয়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষুধার অন্ন, শিক্ষার ব্যয়। সরকারের হাতে তুলে দেয় তার আয়ের মোটা অংশ, দেশের অসহায় ছেলে মেয়েদের জন্য ব্যয় করতে!

বন্ধুদের কথা উঠ্লো। প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব দিয়ে চললাম। জানতে চাইলো দীপার খবর রাখি কিনা। একটু থেমে কি একটা কিছু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো—অরূপ কোথায়? কেমন আছে?

বললাম—ভালই আছে। বিয়ে করেছে। মা-বাবার সঙ্গে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে থাকে।

জানালার কাঁচের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে একটা ফাঁকা চাহনিতে তাকিয়ে থেকে অত্যন্ত আনমনা হয়ে বললো—ভাঙ্গা কাঁচ জোড়া লাগানো হয়ত যায় কিন্তু তার দাগ মোছা যায় না।

হঠাৎ যেন কি একটা আতঙ্ক আর আশংকা তাকে ঘিরে ধরলো। একটা দারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো—খোকন বই ?

বললাম—তাকে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে দিয়ে দেওয়া হয়েছে; দেওঘরে।

আর কোন কথা হলো না। নিজেকে সতর্কে সামলে নিয়ে আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

পাঁচ

খবরের কাগজওয়ালা তখনও আসে নি; মিল্কভেণ্ডার তখনও কড়া নাড়ে নি। কিসের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল ? চেয়ে দেখি, অনন্তা দেয়ালের ফটোটিতে পরিয়ে দিচ্ছে একটি তাজা ফুলের মালা। সযত্নে রক্ষিত অরূপের একটি ফটো। চোখ বুজে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু আমার মন কেবলই প্রশ্ন করতে লাগলো—এসব কেন ?

সস্নেহ স্পর্শে চোখ মেলে দেখি চায়ের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে অনন্তা। মাতৃত্বেতরা নারীত্বের এক অপরূপ প্রকাশ। মনে পড়লো, অনন্তা একদিন বলেছিল—'যা ভাল, যা সুন্দর তাকে নিয়ে গর্ব সবাই করে। তার মধ্যে কি মহত্ত্ব, কি বাহাদুরী কোনটাই নেই। এর ব্যতিক্রমকে মেনে নিয়ে যারা ঠিক পথে চলতে পারে গর্ব করবার অধিকার তাদেরই।"

আমার মন একটা জবাব পেল। বুঝলাম—অনন্তা দৃঢ়তার সঙ্গে সকল সংঘাতকে এড়িয়ে চলেছে, তেমনি তার কাছে—

"রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"

আমার ফিরবার দিন ঘনিয়ে এলো। অনন্তাকে দেশে আসবার জন্ত আমন্ত্রণ জানালাম। হাসলো—রাজী হলো না।

আসবার দিনে আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল। ট্রেন ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে বললো—"আমাকে ভুলে যাবেন। আমার অনুরোধ। বলুন, পারবেন না ?

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে কোন মতে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল।

আমার মুখে কোন কথা সরছিল না।

ট্রেন চলতে সুরু করল।

দেশে ফিরে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে আমার কারবার সুরু হলো। আমি ডুবে গেলাম কাজের চাপে। অনন্তাকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

সেদিন অফিসে বসে কাজ করছি আকস্মিকভাবে খবর এলো। অভাবিত খবর, অনন্তা বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

পুরাণো চিঠির ফাইল খুঁজতে গিয়ে অনন্তার একখানা চিঠি বেরুল। লিখেছে—"খোকনকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করে কিন্তু খোকন জানে তার মা বেঁচে নেই।"

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দত্ত

গণতন্ত্রী সরকার জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল বিধানের প্রতি প্রথম প্রধান দৃষ্টি রেখে কাজে অগ্রসর হয়। গণতন্ত্রের মূলকথা, সর্বসাধারণের সুখবিধান, কারণ গণতন্ত্র সাধারণের ইচ্ছার (public opinion) উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সর্বপ্রকার স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ। তাই গণতন্ত্রী কোন রাষ্ট্রই জনগণকে শুধু ভোট দানের স্বাধীনতা দিয়েই ক্ষান্ত হ'য়ে যায়নি, লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকেও। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার গোড়ার কথা প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য সম্ভার (resources) সংগ্রহ করা এবং যথোপযুক্ত নিয়োগান্তে সর্বাধিক পরিমাণে জাতীয় সম্পত্তি সৃষ্টি করে সেই সম্পদ সমভাবে বিতরণ ক'রে দেওয়া (equitable distribution of national product)। সময় সময় একটা সাধারণ ভ্রান্তি দেখা যায়—উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে বণ্টনের প্রতি জোর দেওয়া। এখানে মনে রাখা দরকার যে উৎপাদন না বাড়িয়ে যা আছে তা বণ্টন করার অর্থ অভাব বণ্টন করা (distributing poverty)। বিশেষতঃ অনগ্রসর দেশে উৎপাদনের প্রতিই প্রধান লক্ষ্য রাখা উচিত।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান মধ্যে অর্থের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী, কারণ আর্থিক সংগতি থাকলে প্রয়োজনবোধে বিদেশ থেকেও বস্তু সামগ্রী (commodities) আমদানী করা যেতে পারে ; অবশ্য এরকম দ্রব্যাদি স্বদেশে পাওয়া গেলেই মঙ্গল। কিন্তু অর্থ সনাতন ভাবে বিদেশ থেকে আমদানী করা চলেনা (perpetual import of money is impossible), বিদেশ থেকে অর্থ পাবার দুটো দিক আছে—ধার হিসাবে এবং সাহায্য হিসাবে। ধার পেতে হলে পরিশোধ করার ক্ষমতাও থাকা প্রয়োজন আর সাহায্য কখনো সীমাহীন নয় ; ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এগুলি বোঝা শক্ত নয়। অপরপক্ষে, প্রয়োজনানুযায়ী (according to need) বিদেশী অর্থ পাওয়া যাবে এমন আশাও রাষ্ট্রীয় জীবনের আঘাত সংঘাতময় অভিজ্ঞতা থেকে করা যায়না। তাই স্বদেশের আর্থিক শক্তিবৃদ্ধি অর্থনীতির গোড়ার কথা (fundamental)। কোনো রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি দেশে উৎপাদন করেনা—এতে ক্ষমতার অপচয় এবং আর্থিক অসুবিধা হয় ; কারণ তুলনামূলক সুযোগ সুবিধা বলে (comparative benefits) কোন কোন বস্তু উৎপাদনে কোন কোন দেশের ক্ষমতা বেশী এবং এই (comparative benefits) তুলনামূলক সুযোগের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের (international trade) অনেকখানি পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা (economic autarchy) বর্তমান যুগে অচল। তাই বিদেশ থেকেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করতে হয় এবং তার জন্যেও চাই আর্থিক সংগতি।

ভারত সরকার প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার বহুলাংশে কৃতকার্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েছে। গত পাঁচ বছরে জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় (essential) কয়েকটি বস্তুর উৎপাদন ও ভোগ (production and consumption) যথেষ্ট বেড়েছে—খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ইত্যাদি এখানে উল্লেখ্য। অন্যান্য বহু বস্তুরও উৎপাদন বেড়েছে—তাই পরবর্তী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নে ভারত সরকার

আজ উৎসাহী। এখানেই প্রশ্ন উঠে আর্থিক সংগতির।

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় সরকারী অংশে (public sector) মোট ব্যয় ৪৮০০ কোটি টাকা মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা চলতি ব্যয় (current expenditure) বাদ দিয়ে ৩৮০০ কোটি টাকা উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ (developmental investment) হিসাবে ধরা হয়েছে। যান্ত্রিকযুগের বাসিন্দা হয়েও ভারত আশানুরূপ যান্ত্রিক উন্নতি লাভ করেনি। তাই কৃষি, শিল্প, সামরিক সংরক্ষণ প্রভৃতির উন্নয়ন বিধানে বিদেশ থেকে প্রচুর যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হবে। এক-শ্রেণীর সমালোচকের মতে যন্ত্রপাতির আমদানী এখনই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ; কিন্তু এমত আপাততঃ সমর্থন করা যায়না। স্বদেশের দারিদ্র্য ঘুচিয়ে রাখবো তবু আমদানী করবনা এ পরিণাম নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করবার মতই হাস্যাস্পদ। পরিকল্পনা কমিশন সুবিবেচনাসহ তাই যন্ত্রপাতি আমদানী করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। অবশ্য এব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ (self sufficient) হতে পারলে আর আমদানীর প্রশ্ন উঠবেনা। এ আমদানী বাবত আগামী পাঁচবছরে প্রচুর বিনিময় মুদ্রার (foreign exchange) প্রয়োজন হবে। সরকারী হিসাব মতে এর পরিমাণ হবে প্রায় একহাজার কোটি টাকা। এ অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রপ্তানী বাড়ানো আবশ্যক। এ উদ্দেশ্য নিয়েই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা (State Trading Corpn.) স্থাপনের উদ্যোগ চলেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় বিনিময় মুদ্রা যোগাড়ের তাগিদেই এ সংস্থা স্থাপিত হচ্ছে। এরই মধ্যে ১ লক্ষ টন সিমেন্ট ক্রয় এবং ১ লক্ষ্য টন কাঁচা লোহা বিক্রয়ের জন্য চুক্তি এবং বহু দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক (bilateral) বাণিজ্য চুক্তি হ'য়েছে। এতে লক্ষ্যাংশ সরকারী আয়ের অংশ বাড়াবে এবং বহুস্থলে মালের বদলে মাল দিয়ে বিনিময় মুদ্রার চাহিদা মেটানো হবে। ব্যক্তিগত মালিকানায় (private trade) অধীনে পরিচালিত বাণিজ্যে উঁচুলাভদায়ক (high profit yielding) দ্রব্যসামগ্রী আমদানীর দিকেই বাণিজ্যকারীদের ঝোঁক। এতে ভোগকারীদের (consumer) স্বার্থ রক্ষা পায়না। এ ছাড়া চাহিদা অনুযায়ী দরের উঠানামা ও সুবিধামত দর চড়িয়ে দেওয়া ব্যক্তিগত বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য। রপ্তানি ক্ষেত্রেও বিদেশে চলতি চাহিদা (existing demand) অনুসারেই এরা দ্রব্যাদি রপ্তানী ক'রে থাকে। এতে নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা হয়না অর্থাৎ চাহিদা-রেখার (demand curve) উন্নতি হয়না। কাজেই বিদেশে চাহিদা গতানুগতিক থেকে যায় এবং চাহিদার পরিমাণও উল্লেখ্য ভাবে বাড়েনা। অধিকন্তু দেশী ভোগকারীদের (indigenous consumers) স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েও লাভের আশায় বিদেশে মাল পাঠানোর নজিরের সংখ্যা কম নয়।

মোটকথা, বেসরকারী বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলি বিশেষভাবে সামগ্রিক স্বার্থের (community benefit) প্রতিবন্ধক :—

১। আমদানী—রপ্তানীর নীট লাভ ক্ষতির সামঞ্জস্য থাকেনা,

২। আমদানী বাণিজ্যে দেশের উন্নয়নমূলক দ্রব্যাদির প্রতি লক্ষ্য থাকেনা,

৩। রপ্তানীক্ষেত্রে নতুন বাজার সন্ধানের আগ্রহ কম,

৪। দেশী ক্রেতা-বিক্রেতার স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকেনা,

৫। বিদেশে নতুন দ্রব্যাদির প্রচলন ও চাহিদা সৃষ্টির চেষ্টা কম,

৬। স্বদেশের চাহিদা অনুসারে আমদানী করে দ্রব্যমূল্য স্থির (Stable) রাখার প্রতি নজর থাকেনা,

৭। আমদানী দ্রব্যের ন্যায়ানুগ বিতরণ (equitable distribution) হয়না,

৮। লক্ষ্যাংশ ব্যক্তি বিশেষের নিজ সম্পত্তি হ'য়ে পড়ে এবং এর দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগযোগ্যে

তহবিল (investible fund) পুষ্টিলাভ করেনা। সরকারী বিনিয়োগে লাগতে হ'লে চড়া সুদ ও প্রচার ব্যয় (high rate of interest and publicity outlay) দরকার হয়।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলি ব্যক্তি মালিকানায় অপরিচ্ছেদ্য ; কারণ ব্যক্তি-মালিকানায় (private ownership) মূলকথাই হ'ল ব্যক্তিলাভের (private gain) প্রতি ঝোঁক। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের (State trading) নীতিগত দিক (theoretical side) আলোচনাস্তে অল্প কথায় বলা চলে আমাদের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা (State Trading Corporation) এসমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করবে। এ সংস্থা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বলে এর মাধ্যমে যে লাভ-ক্ষতি হবে সমগ্র রাষ্ট্রই তার দায় বহন করবে। ইতিমধ্যেই রপ্তানী উন্নয়ন সংস্থা (Export Promotion Coudcil) বাইরে ভারতীয় দ্রব্যাদির চাহিদা প্রশংসনীয় ভাবে বাড়িয়েছে। সরকারী উদ্যমে বিদেশে প্রদর্শনী মারফত আমাদের মালপত্রের চাহিদা বাড়ানো হয়েছে এবং উত্তরোত্তর আরও সার্থক হবে এ প্রচেষ্টা এ আশা করা যায়।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা স্থাপন-পরিকল্পনার গোড়া থেকেই কিছু সংখ্যক সমালোচক এর ভাবী অমঙ্গল আশংকা করছে। তাদের মতে অব্যবসাদার সরকারী পরিচালকগণের হাতে বাণিজ্যে ক্ষতির মাত্রা বাড়বে, অর্থআত্মসাতের পথ সুগম হবে এবং বাণিজ্যে সরকারী একনায়কত্ব দেখা দিবে।

একটু পরীক্ষামূলক মনোভাব নিয়ে বিচার করে দেখলে বোঝা যায় এ সমালোচনা ভীতি সঞ্জাত (fear-created) সরকারী তত্ত্বাবধানে ব্যবসাদার মস্তিষ্ক (business-brain) পাওয়া শক্ত নয়, রীতিমত হিসাব (account) পরীক্ষা করে অর্থের অপচয় বন্ধ করা দুরূহ নয় আর সরকারী বাণিজ্য ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্র সংকুচিত করবেনা বরং নতুন নতুন ক্ষেত্র সন্ধান করে সহায়তা করবে ; অর্থাৎ সরকারী বাণিজ্য ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পরিপূরক (Complementary) হবে। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় মূলধাতি আমদানি করতে যে বৈদেশিক মুদ্রা দরকার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা তার উপার্জনে সহায়তা করবে।

স্ন্যাপ্‌ শট

শ্রীঅমিতা ঘোষাল

বেলা দু'পহর পেরিয়ে গেছে। রাজপথের ব্যস্তজন-কলধ্বনি হঠাৎ নীরব হয়ে আসে এই সময়টা। শুধু স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছাপাখানার আর লেস-ফিতে-ওয়ালাদের বিচিত্র সুরলহরী, নয়তো পেতলকাঁসার বাসনের টুন্‌ টুন্‌ আর ছ-ছ-আনা-ওয়ালার হাঁক। এইতো তাদের শুভলগ্ন; বাবুরা যাবেন অফিসে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে, বাড়ীর বৌঝি পাড়ার মাসীপিসি হেঁসেলের পাট সেরে কতদিন শুধু ঐ ভবঘুরে বিক্রেতাদের ডাকের প্রতীক্ষায় ব্যগ্র হয়ে জানলার গরাদে ধরে বসে থাকেন। ফেরী-ওয়ালারাও তাবে কোন না কোন ফ্ল্যাটের বারান্দার কিম্বা গলির ছায়ায় একটু বসতে পারলে হতো। হেঁটে হেঁটে পা দুখানা টাটাতে থাকে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে ওঠে, তবু না ডাক পড়লে তো যাওয়া যায় না।

বৈশাখ গিয়ে জষ্টি পেরিয়ে চলো। আকাশের চোখে যেন বার্নিকোর ছানি পড়ে আছে, রৌদ্রের তাপে আ'লে আ'লে ধূসর বিবর্ণ হয়ে আছে চারদিক। পা দুখানা টেনে টেনে ছত্রিশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরদিকে উঠছিল রত্নেশ্বর, ওরফে রতন। রতনকে কে না চেনে, রায়বাড়ীর বড়কর্তা বিষ্টুরায়ের নিকট সম্পর্কের আত্মীয়। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মাতুল বলেই ডাকতো কর্তাবাবুরা, ছেলেপুলেরা বলতো দাদুভাই। সে দুর্যোগের দিন কেটে গেছে রতনের। কারণ বড়ঘরের বড় বড় ব্যাপারে যে কোন সমস্যার সূচনা হলেই বিচক্ষণ কর্তাবাবুরা বেমালুম রতনকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিতো। বদনাম আর দোষের বোঝা মাথায় নিয়ে—রতন কত ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়েছে সেদিন, রায়বাড়ী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। কিন্তু তা হওয়ার নয়। সেদিন চলে গেছে অনেক বাদ। তখন রতন ছিল বাড়ীর সবার সময় অসময়ের সব সাথী হয়ে। এখন শুধু আশ্রিত।

চৌমাথার মোড়ে তাদের সৌধের মতো রায়বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে সোজা, কোনখানে এতটুকু প্রাণের স্পন্দন রেশ নেই যেন, ওপর নীচে কোন এতটুকু ছিদ্রপথও খোলা নেই, যাতে বাইরের প্রখর উত্তাপ গিয়ে কোন নিশ্রামকারিণীর দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। পা টেনে টেনে ওঠে আর ছেঁড়া গামছাটা দিয়ে কপাল মুছতে থাকে। কল্যাণী নাবছিলো ওপর থেকে নীচের দিকে, একবোঝা শুকনো কাপড়ের গোছা তার হাতে, তবু হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করলো রতনকে। খোকার ওষুধ, ফলের পুঁটলী, একটা ভ্যাস্ত বাণ্ডর মাছ। শ্রান্ত হাসি হেসে বল্লে রতন, এই নাও, দেখো ভোগে লাগে যেনো। কল্যাণী কৃত্রিম রাগের ভাব দেখিয়ে বলে, একশো বার তোমায় বারণ করলাম এবেলা যেওনা, বেলা দুপহর গড়িয়ে গেল সকাল থেকে দাঁতে কুটি পড়েনি, তুমি মরে যাবে নাকি আমার জন্যে? কোন উত্তর করে না রতন, একটু হাসে শুধু অদ্ভুত হাসি। সিঁড়ির অপর প্রান্তে দরজার আড়ালে একটা ছায়া নড়ে উঠতে দেখা গেল স্পষ্ট। তখন কল্যাণী আর রতন ব্যস্তভাবে এগিয়ে চলেছে দুজন, খোকাকে দেখে তবে রতন যাবে স্নানাহারে। সংসারসুখবঞ্চিত হতভাগার বুকখানা ভরে দিয়েছেন ভগবান স্নেহমমতায়। ভেবে কৃতজ্ঞতায় মন করুণ হয়ে ওঠে কল্যাণীর। রান্নাঘরে ভাতচাপা পড়ে আছে, লাইন বেঁধে চলেছে পিঁপড়ের রাশ, কল্যাণী ঝেড়ে বেছে গুছিয়ে রাখলো, ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে রতন। ভিজে গামছাটা

গায়ে জড়িয়ে—একপাশে বসে পড়ে ধুলো কাদাভরা মেঝের ওপর, বলে বেশতো ছিল, তুমি আবার ব্যস্ত হও শুধু শুধু, যাও খোকা একা আছে. আবার কান্নাকাটি করলে মুশকিলে পড়বে দিদি, যে বাঙ্গনাবরা ছেলে তোমার! কল্যাণী একটুকরো লেবু দিলে থালার ওপর। তারপর হেসে বলে, তা হবেনা কেন বলো, তোমার মতো এমন দাদ থাকলে আমরা না জানি কী করতুম। রতন বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে বলে; হাসি তামাসার কথা নয় দিদি, বড়কর্তাবাবুকে বলে করে দেখোনা, যদি ছেলেটার একটু ভাল চিকিৎসে হয়। কলকাতা শহরে এত ভাল ভাল ডাক্তার বদ্যি, আর এমনি করে বছরের পর বছর ছেলেটা ভুগে চলেছে। না দিদি তুমি কোন কর্মের নও. একটু চেষ্টা চরিত্তির করে না হয় ক'টা দিন ছেলেটাকে নিয়ে হাওয়া বদলে এসো যাও, আমি আছি দেখবো সংসার। কল্যাণীর মুখস্থ হয়ে গেছে রতনের এই একঘেয়ে পরামর্শ, এখন একটুতেই চটে যায় সে, মুখখানা রাগে অভিমানে থম থম করতে থাকে। —বড়কর্তা বাবু. বড়কর্তা বাবু. রতন যেন জেনেও জানেনা, কিসে বড় সে এ সংসারে? দীর্ঘদিন ধরে রতন কি দেখেনি কত ব্যাকুল মিনতি আর অকুল সমস্যার আকুল অনুরোধ কী ভাবে উপেক্ষা করেছে সে নির্মম আঘাতে, নিজের স্ত্রীপুত্রকে বঞ্চিত করে আত্মীয়বন্ধুর সুখ সুবিধের জন্যে দুহাতভরে দিয়েছে, পাড়াপড়শীর অনুরোধে বৈঠকখানার আড্ডায় রাত্রি কেটেছে সমাজ-সেবার প্ল্যান করে, যার জন্যে আজ দশবিশটা কেউকেটা দেশকর্মীর নামের পাশে তালিকাভুক্ত হয় বড়কর্তার নামটা বড় হরফে, চাঁদার খাতায় দশের যায়গায় অবলীলাক্রমে দুচারটে শূন্য বেড়ে যায়—সেই বড়কর্তার কাছে কল্যাণী যাবে মিনতি করতে ছিঃ ছিঃ।

নিরুত্তরে ধীরে ধীরে সরে আসে কল্যাণী, বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়ায় দুদণ্ড জানলার গরাদে ধরে,—প্রচণ্ড উত্তাপে জলে জলে বিবর্ণ হয়ে আছে চারদিকে দিবা সূর্য তারি তলদেশে অবগাহন করে আছেন। ছাদের ওপাশে হাউই ওঁচের মতো বিরাট চুড়ীটা দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

রতন তাড়াহুড়ো করে শুকনো জামাকাপড় নিয়ে চলেছে, সে জানে তার জন্যেই কল্যাণী দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন মেয়ে বাপু যে বলেও কথা শোনে না —।

নীচের তলা থেকে খোকার ডাক শোনা যায়। বিদ্রোহী মন শান্ত করে কল্যাণী নীচে নেমে যেতে। রতন নিশ্বেস ফেলে বাঁচলো। চৌমাথা আবার সরগরম হয়ে ওঠে। অফিস কাছারীর দশটা পাঁচটার বড় কর্তাদের বড় বড় মুইক, বাস, রিক্সা, ছুটছে, সবাই ছুটছে, সবাই ছুটছে, গনগনে আগুন ঢালাপথে শুয়ে গেছে কর্পোরেশনের জলের ছিটে, বেলা শেষের হুতাশ উঠেছে ধূলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে।

সিঁড়ির এক পাশে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছিল রতন ভিজে গামছাটা মাথায় দিয়ে। ছুটতে ছুটতে আসছে ছোটকর্তা বাবুর ছেলে রঞ্জন। পেছনে চাকরের হাতে বইএর র‍্যাক। রঞ্জন ইচ্ছে করে রতনের হাতটা মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল, চাকর রসিকতা করলো পেছন থেকে। নির্বিকারে সহ্য করে রতন উঠে বসে হাতে হাতটা ঘসতে থাকে আর খোলাটে চোখে ছুটো ভুলে দেখে—কল্যাণী টের পায়নি তো? ও মা মেয়ে বাপু রাগের মাথায় পরের ছেলের গালে বেরে হয়তো এক চড় কসিয়ে তারপর লাগবে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড, তাবি জুতোর চাপে শীর্ণ আঙুলগুলো টনটন করছে—বেশ হতো এখন যদি কল্যাণী দেখতো উঃ কী অসভ্য ডাকাবুকো ঐ ছোট কর্তার ছেলেটা। ওপর থেকে তখন উঁকি ঝুঁকি মারছে আর ডাকছে রঞ্জন এই—রতনা, রতন চাঁদ, কেমন মজা. বড় যে নাক ডাকাচ্ছিলি হি-হি-হি-হি।

কল্যাণীর কানে পৌঁছয়—কথাগুলো। এগিয়ে এসে বলে, ছি রঞ্জু এমন করে নাম ধরে ডাকতে না বারণ করেছি, বলো, দাদু। ঘাড় বেঁকিয়ে ঘমকে দাঁড়ায় রঞ্জন—ইস দাদু বলবে, দাঁড়াও মাকে বলছি, মা মা ওমা? চিৎকার করে ওঠে রঞ্জন। ছোট ঠাকুরুণ

বেরিয়ে আসে মন হতভম্ব হয়ে, কী হলোরে? রতন মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, কল্যাণী রতনাকে আবার দাদু বলতে শেখাচ্ছে।

রতনের কথা শুনে ছোট ঠাকরুণের মুখে চোখ দুটো সাপের মত চিকচিক করে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে আবার মাধুর্যটা যতটা সম্ভব দমন করে বল্লেন, ওকে যা তা শিক্ষা দেবেন না, যাকে তাকে দাদু দিদি বলা উচিত নয়, বংশের মান মর্যাদা যাদের আছে তারা অন্ততঃ পারে না। ছেলের হাত ধরে তড়তড় করে গিয়ে ঘরে ঢোকে ছোটঠাকরুণ। অতি দুঃখে হাসি পায় কল্যাণীর। তবু হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে মাঝ রাস্তায়। রতন কাছে এসে বলে খোকার পায়ের মাপটা দাও দেখিনি, বড্ডো কাজের কথা মনে পড়েছে ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি সেই লাল জুতোটা। দাও দাও, দেরী করলে হয়তো পাবো না। কল্যাণীর চোখে জল আসে এবারে, নিরুত্তরে চলে যায় ঘরের ভেতরে রতন দাঁড়িয়ে ভাবে এক্ষুণি বুঝি ছোট্ট একটা পায়ের মাপ নিয়ে ফিরে আসবে কল্যাণী, সব বুঝেও বুঝতে চায় না কিছু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা ধরে যায় কল্যাণীর দেখা নেই, পর্দা ঠেলে ঢুকতে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসে তখনি মনে পড়ে বড় কর্তাবাবুর সেদিনের কথাগুলো, বলে কী না,—"যখন তখন হুট করে ঢুকবে না রতন, লোকের কাছে মান থাকে না।" তাতো সত্যি কথা, বড় কর্তাবাবুর ত মান এখন কত, বড় বড় লোক আসে যায় তার কাছে। রতনের মতো লক্ষীছাড়া রূপ নিয়ে কী দাঁড়ানো যায় তাদের সামনে? তাই তো সেদিন রতনের সামনেই বেয়ারা বলে পরিচয় দিয়ে দিলে বড় কর্তাবাবু।

বার দুচার চাপা গলায় ডাকলো রতন ভেতর থেকে। সাড়া এলো না, আস্তে আস্তে সরে গেল রতন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। জনবহুল রাস্তায় হাত ধরাধরি করে চলেছে আলো বিহারিণীরা। উদাস বাউল ছাওয়ার ভোরাই এসেছে সারা শহরের বুকে বেলফুলের গন্ধে ভরা। দুপুরের নিষ্প্রাণ বাড়ীখানা হঠাৎ যেন প্রাণতরঙ্গে উচ্ছল হয়ে ওঠে এই সময়। বাটনটা ক্ল্যাটের সাড়ে ছিয়ানব্বুইটা জানলায় উড়ছে রঙবেরঙে পর্দা, তার ফাঁকে ফাঁকে সদ্য প্রসাধনে উজ্জ্বল কতোগুলো মুখ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সিঁড়িতে শব্দ হোল, জোড়া জোড়া জুতোর শব্দ। বড় কর্তা, ছোট কর্তা, ক্লার্কবাবু, ম্যানেজারবাবু, তার পেছনে আরো দু'চারজন ফার্মের লোক। বড্ড ব্যস্ত হয়ে থাকে রতন এই সময়টা এতগুলো লোকের খবরদারি করা, জলপানের ব্যবস্থার হাঁক ডাক, চাকর বাকর নয়তো এক একটা মোষ; নড়তেই দু' দণ্ড পেরিয়ে যায়। আজ আবার কে আসবে বিশেষ একটা আয়োজনের তাগিদ আছে রান্নাঘরে। ছোট ঠাকরুণের বাপের বাড়ীর কুটুম বাটুম হবে আরকী। হঠাৎ এক ফাঁকে ছোট কর্তাবাবু এসে বড়কর্তার খাবার টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসেন—কথা আছে দাদা। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন বড়কর্তা বলেন—কল্যাণী কেষ্টর খাবারটা এখানে দাও আজ। ছোট কর্তা বাধা দিতে দিতে বলেন—যত অশান্তি, দাদা তোমায় অনেকবার বলেচি একটা ব্যবস্থা করো—হয় রতনকে তাড়াও, নয় বলো আমরা চলে যাই। বৌদির বাড়াবাড়িতে এত বেড়ে গেছে যে আর মান থাকে না। আজ রঞ্জুকে না'কি যা তা বলে বকাবকি করেছে রতন।

কল্যাণী এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এবারে সে বাধা দিয়ে বল্লে,—'আমি সামনে ছিলুম ঠাকুরপো। রতনকে রঞ্জুই যা তা বলে—, বড়কর্তা বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলেন,—থামো কল্যাণী, রতনেরও দোষ আছে। আচ্ছা আমি দেখছি, তুই যা কেষ্ট, দেখি কী ব্যবস্থা করতে পারি।

বিনয়ের হাসি হেসে রতন এসে দাঁড়ায় হাতে একটিন ওভালটিন, বড়কর্তা দুধের সঙ্গে খান, ফুরিয়ে গেছিল, আনা মনে পড়েছে। ভুরু কুঁচকে তাকান বড়কর্তা—এই যে মূর্তিমান। রতন আমার বোতাম খুটতে থাকে একটা লাল, একটা নীল, সারি সারি

যোতাম. মুর্খ যোঝে না কিছু। কল্যাণী বলে তুমি যাও মামু টিনটা খুলে নিয়ে এসো। বড়কর্ত্তা বাধা দিয়ে বলেন, না, আর আসতে হবেনা। বিছানা পত্তর গুছিয়ে নাও চট্‌পট, দেশ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে একবার ঘুরে আসতে হবে তোমায়। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রতন আর বলে,—খোকাদাদুর অসুখ এখন আমি গেলে কে দেখবে। বড় কর্ত্তার মুখখানায় বিদ্রূপে বিকট হয়ে ওঠে, বলেন—ডাক্তার দেখবে ডাক্তার। তুমি থেকে কী করবে, যা করবার ডাক্তার করবে। নাও তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও। কল্যাণী এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। রুক্ষ গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে দুটো কথা—না, যাবে না রতন।

বড় কর্ত্তা বলেন—তার মানে? তোমার খুশি মত সংসার চলে না জেনো। কল্যাণী রতনের হাত ধরে সরিয়ে দেয় খোকার ঘরের দিকে।—যাও মামু খোকার জলপটীটা বদ্‌লে দাওগে আমি হাত খালি করে আসি। রাগে গরগর করতে করতে খাবার টেবিল থেকে উঠে গেলেন বড় কর্ত্তাবাবু। এরপর একটা ঝড় ঘনিয়ে আসতে দেরী নেই বুঝতে পারে রতন। কল্যাণীর এমন করা ঠিক হয়নি। না হয় চলেই যেতো রতন, কলকাতা সহরে কতো ভাল ভাল ডাক্তার, এবার যদি বড় কর্ত্তাবাবুর সুমতি হয়—একটা ভাল ডাক্তার দেখানোর। রতন দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ, খোকার মুখের দিকে চেয়ে। ঘরের ঘোরে অসাড় হয়ে আছে খোকা, রতন বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। কল্যাণী গ্লুকোজ তৈরী করছিলো মুখ তুলে তাকালো শুধু, রতন এদিক ওদিক দেখে হাত দুটো ধরে কল্যাণীর, দেখ দিদি আমি যাই, কর্ত্তাবাবু বলেছে ডাক্তার দেখাবে ভাল ডাক্তার। কথা বলতে বলতে রতনের চোখে জল গড়িয়ে পড়ে, গলা ধরে যায়।

কল্যাণী তেমনি রুক্ষ গলায় বলে। না-না-না তুমি আনোনা মামু ওরা তোমায় কোথায় পাঠাচ্ছে কেন পাঠাচ্ছে। রতন বলে, তুই একেবারে পাগ্‌লী দিদি। কটা দিন বৈ তো নয় দেখতে দেখতে কেটে যাবে, এ কটা দিন ছেলেটার কাছে কাছে থাকিস একটু। কী দরকার বাপু তোমাদের দুজনার অশান্তি আমায় নিয়ে। ওসব আমি আর সহ্যি করতে পারি নাদিদি।

খুব সত্যি কথা। রতনকে নিয়ে অশান্তি, কিন্তু রতন চলে গেলেই কী এ বাড়ীর অশান্তি মিটে যাবে? একটা বাড়ীর বুকের ভেতর এক একটা দেয়ালের পাঁজর লক্ষ যোজন ব্যবধান নিয়ে গড়ে উঠেছে এতকাল, হিংসা ঈর্ষা অহঙ্কার আর ব্যভিচারের জারক রসে যাদের রক্ত গেছে বিষাক্ত হয়ে। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায় যেন কল্যাণী। হঠাৎ খোকা উঠে আসে টলতে টলতে, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে রতন,—সর্বনাশ, এই শরীরে কী করে উঠলো খোকা কল্যাণী ভেবে পায়না, এই তো অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছিল। খোকা রতনের বুকে মাথা এলিয়ে দিয়ে জানায় সোতাম খোঁটে আর অভিমানে ফুলে ফুলে বলে—রোজ রোজ মিথ্যে কথা বোলে আমায় ভোলাতে পারবে না আজ আমার লাল সেই জুতোটা চাই চাই। রতন ব্যস্ত হয়ে ওঠে—তাইতো, আচ্ছা নাও শীগ্‌গির এই গ্লুকোজটুকু খেয়ে নাও তো সোনাদাদু, আমি এক্ষুণি তোমার জুতো এনে দিচ্ছি।

• • • •

ভোর রাত্তিরে জ্বরটা ছাড়ে, ছটফট্ করে একটু বেশী। এই সময় রতনকে খোঁজে খোকা। কল্যাণী চলো রতনকে ডাকতে যদিও রতন এই সময়টা উর্দ্ধশ্বাস হয়ে বসে ঠাকুরের নাম করে, আর ভাবে কখন ডাক পড়ে। দরজা খুলতেই ঠুক করে একটা ছোট্ট জুতোর বাক্সো ঠেকলো কল্যাণীর পায়ে। কল্যাণী তাড়াতাড়ি যায় বাইরে বারান্দার দিকে। রতন নেই,—কোথাও নেই।

সুখনিদ্রায় রায়বাড়ী নিস্পন্দ। কল্যাণী আর একবার প্রত্যক্ষ করলো সংসারের নির্মম আত্মপ্রসাদকে।

সমাজ সেবার পরিপ্রেক্ষিত

নগেন দত্ত

কথাটা যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, তবু সত্য যে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থাতেই দেশের শাসনব্যবস্থা বিদেশীর হাতে চলিয়া যায়। এজন্য ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলি সমষ্টিগতভাবে দায়ী। ইংরেজ বাংলায় শাসন-ব্যবস্থা প্রথম কায়েম করিয়াছিল। তখনকার বাঙালী সামাজিক জীবনে আজিকার মত কতটা পরস্পর নির্ভরশীল ছিল তাহা ভাবিয়া বলিতে হয়। ইংরেজ মিশনারীরা এদেশে অনেক অপ্রীতিকর কার্যের জন্য দায়ী বটে, কিন্তু তাঁহারাই প্রথম বহু-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, মেয়ে শিশু-সন্তান বিনাশ, সতীদাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, খৃষ্টধর্ম মত প্রচার উদ্দেশ্যেই এইসব কুসংস্কার বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। তবু কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক রীতি-নীতি যে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যতদূর জানা যায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দেই শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরা এই সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। এদিকে এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কুয়াশার মধ্যে একমাত্র রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম সমাজ সেবার নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করিলেন। তাঁর অপরিসীম প্রতিভা এই কার্যে কিভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল তাহা দেশবাসী জানেন। ইতিমধ্যে নব্য ইংরেজি শিক্ষা নূতন শ্রেণী গড়িল ও নব্য বিদেশী বাণিজ্য পদ্ধতি দেশের কুটির শিল্প ধ্বংস করিল। সর্বনাশা ধনসম্পদের আশায় সামাজিক মানুষ তাহার স্বাভাবিক আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া কর্মস্থল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফলে নগরের পরিধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; অর্থহীন, অসন্তুষ্ট একদল হতভাগ্যের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেন তাঁহারা দেশ ও দশের না হইয়া যেন সামাজিক গ্লানির অন্তর্ভিত্তির এক বিশেষ ভঙ্গিমায় পরিণত হইলেন। সামাজিক শক্তির স্রোত যখন এইভাবে ইতস্তত বহিতেছে তখন একটি কথা স্বতই মনে হইত—কি কর্মের ফলে মানবকল্যাণ সার্থক হইবে? কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে, তৃষ্ণার্ত মানুষ জল পাইবে, রোগী শুশ্রূষা পাইবে? এ প্রশ্ন আজিকার প্রশ্ন নহে, ইহা মানব মনের একটি চিরন্তন প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয়। এদেশে বৌদ্ধযুগে সেবা-ধর্ম নূতন একটা মর্যাদা পাইয়াছিল। জনকল্যাণের প্রতি মানুষের মন ইতিপূর্বে উৎসুক হইয়াছিল। কেননা আমাদের ধর্মচেতনার মধ্যে পাপ-পুণ্যের নিক্তি-ওজন বরাবরই চলিত। কর্মফলে বিশ্বাসী হিন্দু সমাজ—নিজেদের সব দুর্ভাগ্য কোন অদৃশ্য পূর্বার্জিত কর্মের ভার চাপাইয়া দিয়া পরম তৃপ্তি পাইত। তাই দুঃখমোচনের পন্থা হিসাবে পরহিতব্রতকে আগামী জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সোপান হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত ধর্ম যে নীতি-চেতনা দিয়া সমাজকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল তাহাও পুণ্যকামীর পুণ্য-কার্যে সহায়তা করিয়াছিল। কাজেই সমষ্টিগত সমাজ সেবার ইতিহাস একেবারে একালের হইলেও মনটা আমাদের সেকালেই রচিত হইয়াছিল। জীর্ণ আবাস সংস্কার করিয়া লইলেই যেমন বাসযোগ্য হয়, তেমনি মনের জীর্ণতা সংস্কার করিবার পন্থাও আছে। জাতির মনের রূপান্তর সাধনে, সংস্কৃতীকরণে রামমোহন প্রথম হাত দিয়াছিলেন। এসব পূর্বেও বলা হইয়াছে। কেহ-কেহ মনে করেন যে, রাষ্ট্রঅনুগ্রহলাভে উৎসাহী ব্যক্তিরাও সমাজসেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এদেশে ধনবান ব্যক্তিরা একদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহ পাইবার আশায় জনকল্যাণে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। শোনা যায় তৎকালীন ইংরেজ সরকারের দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও জন কল্যাণের প্রতি তেমন দৃষ্টি দেয় নাই, এদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় ইংরেজ শাসকেরা কর্তব্য পালন করেন নাই। সে কাজ ত দূরের কথা সাধারণ রাস্তাঘাটও এক সময় ইহাদের নজরে পড়ে নাই। এদেশের ধনীরাই খেতাব ও সহায়তা লাভের আশায় জনকল্যাণে অর্থদান করিয়াছেন। কলিকাতা টাউনহল স্মৃতির টাকায় নির্মিত হইয়াছে।'

কাজেই জনকল্যাণে পুণ্যলোভাতুরদের যথেষ্ট দান আছে স্বীকার করিতে হইবে। আর দান আছে রাষ্ট্র-অনুগ্রহভোগীদের, ইহা কল্যাণব্রতের রুক্ষ বাস্তব দিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু কালক্রমে রুক্ষ বাস্তবতা এক পরম সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে নিমজ্জিত হইল. সেবাব্রতের রূপ পরিবর্তিত হইয়া মানব-প্রেম নূতন মর্যাদালাভ করিল। তখনই, সর্বপ্রকার ত্যাগ হইল সেবাব্রতের, জনকল্যাণ ব্রতের এক অপরিহার্য বনিয়াদ! এই জাতীয় বনিয়াদ গড়িতে ব্যক্তির নিষ্ঠা, ত্যাগ, চরিত্রবল, নৈতিক নির্ভীকতা একান্ত প্রয়োজন। বাঙ্গালার স্বামী বিবেকানন্দ, ইহার তেজোদৃপ্ত দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হইয়াছে। সেবা যেমন ব্রত তেমন কর্তব্যও বটে একথা শিখিলাম।

এই সেবাব্রত ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিবার পথে কতগুলি অবশ্য শিক্ষণীয় কর্ম ছিল,—আত্মশুদ্ধি, বাক-সংযম, ব্রহ্মচর্য, অন্যান্য যাবতীয় কৃচ্ছ্রসাধন। এই দুরূহ শিক্ষার পথে একদিন বাঙলার যুবকেরা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আগাইয়া আসিত। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি বাঙ্গালার বিপ্লব আন্দোলন একদিন এইসব দুরূহ কৃচ্ছ্র সাধনের উপর আপনার বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বিপ্লবীরা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিবার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ-বিপ্লবের স্বপ্নও দেখিয়াছে। তাহারা সবাই সমাজসেবী ছিলেন। কাজেই এদেশের সমাজসেবা শুধু নিছক সমাজসেবা হিসাবেই আসে নাই রাজনৈতিক চেতনার অঙ্গ হিসাবেও দেখা দিয়াছিল। দেশবন্ধুর 'পল্লী সংস্কার সমিতি' ইহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এদেশে সমাজসেবার আন্দোলন মুখ্যত দুই পথে আপনার মুক্তি খুঁজিয়াছে। এক পথ ধর্মসংস্কার। আর এক পথ 'সমাজকর্ম'। অর্থাৎ কর্মের মধ্যে নিপীড়িত মানবের সেবা। মুখ্যত ইহা মানব প্রেম ও নৈতিক চেতনা হইতে উদ্ভূত। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া এই উভয়বিধ আন্দোলন ভারতব্যাপী চলিয়াছে। বাঙ্গালার দ্বারকনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র আরও অনেকে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট গঠনে সহায়তা করেন। কেহ-কেহ মনে করেন যে ইহাতে সমাজের অনেক গ্লানি-অভিযোগ মুক্তি পাইয়াছে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে পরমহংস সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ইহা জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহামতি রাণাডে বিধবা বিবাহ সমিতি স্থাপন করেন। বাঙ্গালায় এই সমস্যা সমাধানে মানবদরদী ঈশ্বরচন্দ্রের কথা আজ আর সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মহামতি রাণাডে সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় খৃষ্টান মিশনারী পণ্ডিতা রমাবাই 'আর্য মহিলা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। মহামতি রাণাডে ও ডাঃ ভাণ্ডারকর প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে মুসলমান সমাজেও সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এ সম্বন্ধে স্যার সৈয়দ আমেদ খান-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ভারতীয় মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিস্তারের বিশেষ সহায়ক হয়। স্যার সৈয়দ আমেদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী তৎকালীন যাহারা খুশী মনে গ্রহণ করেন নাই তাঁহারাও সমাজ সেবার আদর্শ ত্যাগ করেন নাই। লাহোরের 'অঞ্জুমান-ই-হিমায়েৎ-ই-ইসলাম ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে।

এই সমগ্র সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে ধর্ম মত ও সেবাই অনেকখানি স্থান জুড়িয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আর একটি আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের যারা অগ্রণী তাহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা অনেকেই শাস্ত্রের উপর তেমন জোর দিতেন না। কিন্তু বিশ্বাস-নিষ্ঠ আদর্শবাদের উপর নির্ভর করিয়া সমগ্র সামাজিক সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করিতেন। তাঁহারা প্রতি বছরে একবার একটি সামাজিক সম্মেলন করিতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহাদের কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের রচনাবলী অতি মহৎ ও উদার মনোভাবের সাক্ষ্য বহন করে। ইহাদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট ছিলেন তাদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভাণ্ডারকর, কোলহাটিকর চিন্তামণি, এম সুব্রাহ্মণিয়া আয়ার, বীরেশলিঙ্গম্ পন্তলু, নরেন্দ্রনাথ সেন, লালা বৈজনাথ, রামকালী চৌধুরী।

উনবিংশ শতাব্দীর এই মহামানবের মিছিল যেখানে আসিয়া সমাপ্ত হইল সেইখানে গান্ধীজীর আবির্ভাব। অস্পৃশ্য আন্দোলন, হরিজন আন্দোলন ইত্যাদি সেই মানবিক চেতনার বিকাশ মাত্র। ইহার রাজনৈতিক দিক যাহা প্রকটিত হইয়াছে তাহা সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ মাত্র।

গান্ধীজী প্রবর্তিত হরিজন আন্দোলন বিশ্বের নিপীড়িত মানবের এক নূতন চেতনা আনিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত আত্মনিয়ন্ত্রণ বৃত্তি, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নব্য অর্থনৈতিক কর্মধারা ভারতের প্রতিটি নিপীড়িত মানবের মনে আত্মবিশ্বাস আনিয়াছে। যে বিশ্বাসের ভিত্তি সামাজিক প্রথার পীড়নে শিথিল হইয়াছিল তাহা নিছক প্রেম বা করুণামিশ্রিত সেবাদ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিতে চাহিল না। বরং আত্মনিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক চেতনার নূতন পরিচ্ছেদ রচনা করিল। আমাদের পূর্ববর্তীদের সমাজসেবা ব্রতে কোথায়ও কোন ফাঁক ছিল না সত্য। সেখানে মানবপ্রেমই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। গান্ধীজী প্রবর্তিত সামাজিক আন্দোলনে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আজ এই প্রতিষ্ঠার দাবী মৌলিক দাবী রূপে দেখা দিয়াছিল তাই হিন্দুসমাজের কর্মফল ভোগের প্রশ্ন এখানে তেমন প্রবল আকারে দেখা দেয় নাই। মধ্যযুগের দাদু, নানক, কবীর যে মানবিকতার স্পর্শ ধর্ম আন্দোলনের মাঝে আনিয়াছিলেন গান্ধীজীও সেই মানবিকতার স্পর্শ আন্দোলনে আনিয়াছিলেন বটে, ইহা বাদেও আর একটি বিশেষ গুণ প্রকটিত হইয়া উঠিল স্বপ্রতিষ্ঠিত জীবন-যাত্রার প্রয়াস। ইহার আলোকে অপমানিত মানবেরা যেন নিজেদের নূতন করিয়া চিনিতে পারিল।

ইহার পর আজ আবার নূতন পরিস্থিতিতে সমাজ-সেবার আন্দোলন শুরু হইয়াছে। সম্ভবত ইহা কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। তার কারণ ভারত রাষ্ট্রের নব রূপ প্রাপ্তির ফলে যে দায়িত্ব দেখা দিয়াছে তাহা সমাজসেবারই অংশ বলিতে হইবে। রোগীর শুশ্রূষার দায়িত্ব আজ আর শুধু কোন ব্যক্তির শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কেননা ইহা মৌলিক অধিকারের রূপ লইয়া আসিয়াছে। কাজেই ব্যক্তির সদিচ্ছার উপর আর একটি সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে রাষ্ট্রই সব কর্মের হোতা হইবেন। একক রাষ্ট্রের যাহাই করিবার থাকুক না কেন, সমাজ-সংগঠন শক্তির প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে। এবং ইহা নিছক যৌথভাবে নহে সম্মিলিত-ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। আজকে যে সমাজসেবার প্রশ্ন আমাদের কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছে তা এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার তাগিদেই।

পৃথিবীর উপগ্রহ কয়টি ?

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য

পৃথিবীর বুকে আধিপত্য বিস্তার করেও মানুষ আজ আর সন্তুষ্ট নয়; সে চায় পৃথিবীর বাইরে চন্দ্র লোকে আধিপত্য বিস্তার করতে। এমন কি, তার চেয়ে আরও দূরে মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে গ্রহান্তরে অভিযানের পরিকল্পনাও সে করে ফেলেছে। কিন্তু পরিকল্পনা করা, আর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলা এক কথা নয়। পৃথিবীর ঊর্ধ্বস্তরের অবস্থা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যেসব তথ্যাদি জানা গেছে, কেবল তার উপরে ভরসা করেই মহাশূন্যে পাড়ি জমানো সম্ভব নয়। পৃথিবীর আওতার বাইরে মহাজাগতিক রশ্মি, আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি, ইতস্ততঃ ধাবমান বস্তুপিণ্ড এবং অন্যান্য অবস্থাদির সম্বন্ধে আনুমানিক বা পরোক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এরূপ যুগান্তকারী প্রচেষ্টায় সাফল্যের আশা করা যায় না; কাজেই এসব বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে এ বিষয়ে অবশ্য কিছু কাজও হয়েছে। তবে এই ব্যাপারে প্রথম সমস্যা হলো—কি রকম বাহনের সাহায্যে মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে গ্রহান্তরে যাওয়া সম্ভব হবে পরীক্ষামূলকভাবে তা নির্ধারণ করা; এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করতে পারে মাত্র দুটি জিনিষ—জেট আর রকেট। জেট বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে বিচরণ করতে পারে সত্য, কিন্তু মহাশূন্যে বিচরণ করবার ক্ষমতা তার নেই। কাজেই মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে হলে একমাত্র সম্বল—রকেট। গত মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত জার্মেনীর ভি-টু রকেটই বোধহয় মহাশূন্য অভিযানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রেরণা জুগিয়েছিল। ভি-টু পৃথিবী থেকে ৬০ মাইলেরও ঊর্ধ্বে বিচরণ করেছিল। বাইরে থেকে অক্সিজেন না নিয়ে ভিতরে সঞ্চিত প্রয়োজনীয় জ্বালানীর সাহায্যেই রকেট প্রচণ্ড বেগে ছুটে যেতে পারে। এ জন্যেই মহাশূন্য অভিযানে রকেট ছাড়া অন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কাজেই ভি-টু রকেটের যান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের পর কিছুকাল পূর্বে তিন-পর্যায়ী রকেট তৈরী করে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই তিন-পর্যায়ী রকেট ২৫০ মাইল উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। তিন-পর্যায়ী রকেটে তিনটি বিভিন্ন রকেট পর পর সংলগ্ন থাকে। প্রথম রকেটটি সম্মুখভাগে সজ্জিত অপর দুটি রকেটকে পৃথিবী ছেড়ে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবার পর জ্বালানী নিঃশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচে পড়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য দ্বিতীয় রকেটটির কাজ সুরু হয় এবং ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রাখে। আরও উঁচুতে উঠে তার জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে সে-ও তৃতীয়টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় রকেটটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। কাজেই এ ব্যবস্থায় মহাশূন্য অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে ঊর্ধ্বস্তরের বিভিন্ন অবস্থা অবগত হওয়ার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-সমন্বিত ছোট ছোট কয়েকটি গোলক, অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী করেছেন। তিন-পর্যায়ী রকেট তার সম্মুখভাগে যান্ত্রিক কৌশলে স্থাপিত এই ধরণের কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রায় ৩৫০ মাইল উপরে পৌঁছে দিবে।

এই ব্যবস্থায় ঊর্ধ্বে প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহগুলি কিছু-কাল পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ালেও সেই ভ্রমণ কক্ষে হয়তো স্থায়ীভাবে থাকতে পারবে না। কক্ষের দূরত্ব ক্রমশঃ কমতে কমতে অবশেষে সেগুলি আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসবে। এই পরীক্ষার ফলাফল থেকেই ভন ব্রন স্পেস ষ্টেশন স্থাপনের সম্ভাব্যতা নির্ধারিত হবে। চন্দ্রলোক অভিযানে রকেটের পৃথিবী থেকে একটানা অতখানি দূরত্ব অতিক্রম করা অন্ততঃ আপাততঃ সম্ভব নয়। কাজেই এই সমস্যা সমাধানের জন্যে ৬০০ থেকে ১০৭৫ মাইল

উর্ধ্বে একটা স্থায়ী প্ল্যাটফরম বা স্পেস ষ্টেসন স্থাপনের পরিকল্পনা হয়েছে। এই প্ল্যাটফরমটি হবে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি চাঁদের মতই স্থায়ীভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াবে। একেই বলা হবে ভন ব্রণ স্পেস ষ্টেশন। এই স্পেস ষ্টেসনটি কি রকম হবে তারও বিভিন্ন রকমের মডেল তৈরী করা হয়েছে।

যাহোক, এসব পরিকল্পনার কার্যকরী রূপায়ন সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে কতকটা নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যেই ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ ভ্যানগার্ড প্রোজেক্টের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারেরা পূর্বনির্মিত রকেটের সাহায্যে কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ ঊর্ধ্বস্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। আগামী বছরের শেষের দিকেই এই উপগ্রহগুলিকে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে বলে আশা করা যায়। এদের একটা কক্ষ হবে পৃথিবীর বিষুব রেখার ঠিক উপরে; অর্থাৎ ৩৫০ মাইল উর্ধ্বে বিষুব রেখার সমান্তরালে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। দ্বিতীয় কক্ষটি হবে বিষুব রেখার সমকোণে; অর্থাৎ এই কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবী থেকে ৩৫০ মাইল দূরের কক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। তৃতীয় কক্ষটিও হবে সমান দূরত্বে, তবে খুব সম্ভব বিষুব রেখার সঙ্গে ৩৫° থেকে ৪৫° ডিগ্রি কোণ করে থাকবে। ছবি থেকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হতে পারে।

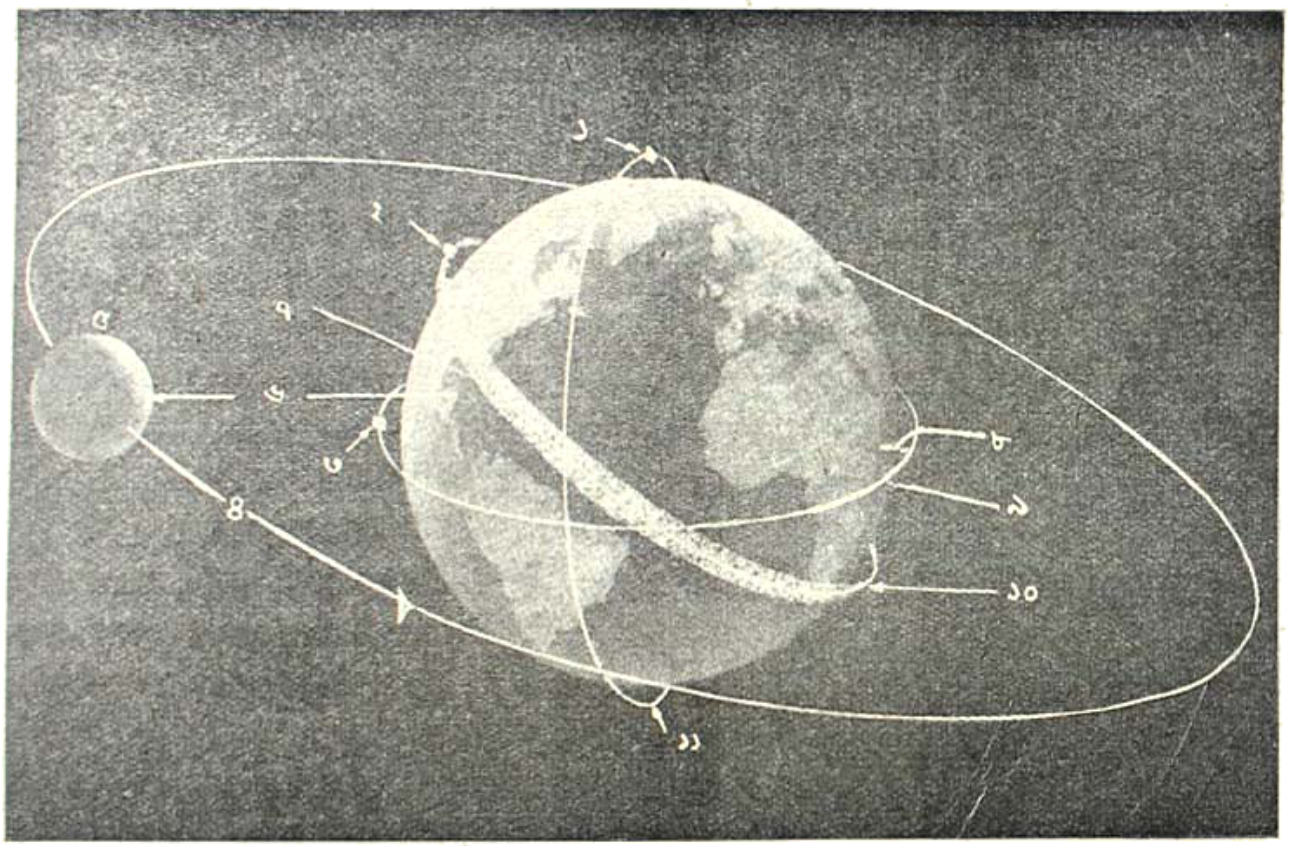

১—কৃত্রিম উপগ্রহ; ২—কৃত্রিম উপগ্রহ; ৩—কৃত্রিম উপগ্রহ; ৪—পৃথিবীর চতুর্দিকে চন্দ্রের ভ্রমণ-কক্ষ; তীর-চিহ্নিত দিকে ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। ৫—চন্দ্র; ৬—পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব ২৩৮, ৮০০ মাইল; ৭—১৯৫৩ সালে দৃষ্ট পৃথিবী থেকে ৩৪১ মাইল দূরে হোলপাক উপগ্রহ বলয়; ৮—পৃথিবী থেকে এই কক্ষের দূরত্ব ৩০০ থেকে ৩৫০ মাইল; ৯—৭০০ থেকে ৩৫০ মাইল দূরে বিষুব রেখার সমান্তরাল কক্ষ; ১০—বিষুব রেখার সঙ্গে ৩৫° ডিগ্রি থেকে ৪৫° ডিগ্রি কোণ করে অবস্থিত হেলানো কক্ষ। রকেটের সাহায্যে এই কক্ষেরই কাছাকাছি যে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হবে, অধিকাংশের পক্ষে সেটিই হবে পর্যবেক্ষণযোগ্য। ১১—উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বরাবর কৃত্রিম উপগ্রহের সম্ভাব্য কক্ষ।

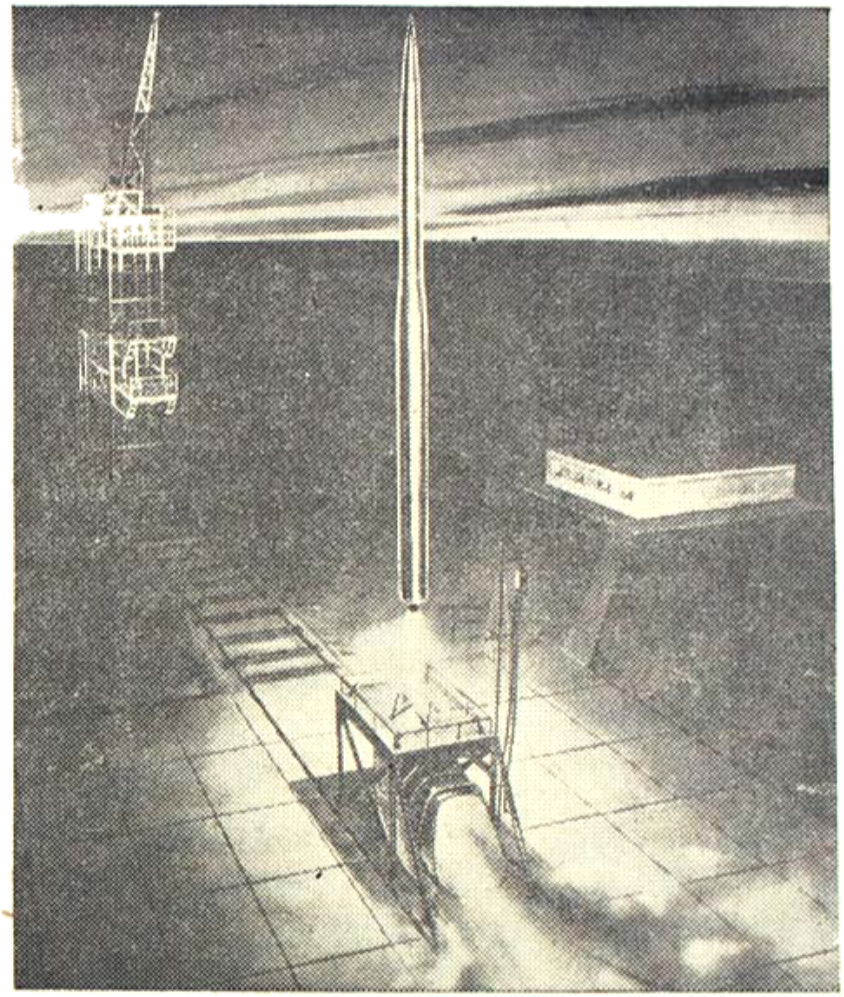

কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের জন্য তিন-পর্যায়ী রকেটের নমুনা

ঊর্ধ্বে প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কয়েকটি হয়তো এমন কতকগুলি স্বাভাবিক উপগ্রহের সঙ্গে মিলিত হবে, যেগুলি খুব সম্ভব শত শত বছর ধরে পৃথিবীর চতুর্দিকে দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর খুব কাছে হলেও যে কোন কারণেই হোক এতদিন কেউ এদের সন্ধান পায় নি। অবশ্য অনেক কাল আগে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোর কোন স্থান থেকে এই ধরণের কতকগুলি বস্তুপিণ্ড দেখা গিয়েছিল বলে এক অসম্পূর্ণ বিবরণীর কথা জানা গেছে। তাছাড়া এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখের কথাও জানা যায় নি।

সৌরজগতের কয়েকটি গ্রহেরই একাধিক উপগ্রহ আছে। এর মধ্যে বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। কিন্তু পৃথিবীর একমাত্র চন্দ্র ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপগ্রহের কথা কখনও শোনা যায় নি। তবে সম্প্রতি যতটা জানা গেছে তাতে মনে হয়—আমাদের পৃথিবীর চন্দ্রই একমাত্র উপগ্রহ নয়, আরও প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহ দলবদ্ধভাবে পৃথিবীর খুব নিকটবর্তী একটি মাত্র কক্ষে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। আবিষ্কারকের নামানুযায়ী এগুলিকে হোলপাক উপগ্রহ বলার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে সুধাংশুর পর হোলপাক নামে একজন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার নিজের

তৈরী একটি ৪½" রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপে চাঁদের ধারের দিকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন—অনুজ্জ্বল লাল রঙের এবড়ো-খেবড়ো কতকগুলি বস্তুপিণ্ড চাঁদের সামনে দিয়ে চলে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির কয়লার চাঁইয়ের মত প্রায় ৩০টিরও বেশী বস্তুপিণ্ডকে টেলিস্কোপের দৃশ্যপট অতিক্রম করে যেতে দেখা গেল। এই অদ্ভুত দৃশ্যের কারণ বুঝতে না পেরে জন ব্যাগ্‌বি নামে তাঁর এক সহকর্মীকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানান। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্বন্ধে ব্যাগ্‌বির কিছুটা ধারণা ছিল। তিনি বললেন—একমাত্র চন্দ্র ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন উপগ্রহ আছে বলে কোন নজিরের কথা কেউ জানে না। কাজেই মনে হয়, ওটা তুমি অতি উর্ধ্বে বিচরণকারী কোন পাখীর ঝাঁক দেখে থাকবে। নয়তো টেলিস্কোপের লেন্স ফোক্যাল পয়েন্ট ধূলাবালির কণা লেগে থাকবার ফলে ওরূপ দেখাও অসম্ভব নয়। কিন্তু পরের দিন আবার একই রকম কতক-বস্তুপিণ্ডকে পূর্বের ন্যায় দলবদ্ধভাবেই টেলিস্কোপের দৃশ্যপট অতিক্রম করে যেতে দেখা গেল। এবার হোলপাক আর একা নন, আরও অনেকে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। হিসাব করে দেখা গেল—এই বস্তু-পিণ্ডগুলি ঘণ্টায় প্রায় ১৭,০০০ মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছে। তবে কি এগুলি উল্কাপিণ্ড? কিন্তু উল্কাপিণ্ডগুলি সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪০,০০০ থেকে ১৪০,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে ছুটে আসে। এরূপ প্রচণ্ড বেগে চলবার ফলে বায়ুরাশির সঙ্গে সংঘর্ষের দরুণ তাদের অনেকেই জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। কোন কোনটা সম্পূর্ণ নিঃশেষ না হলে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। তবে কোনটা যদি এমন কোন বক্ষে এসে পৌঁছাতে পারে যেখানে স্থায়ীভাবে থাকা সম্ভব, তবে তারা উপগ্রহের মতই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াবে। হোলপাক কর্তৃক পরিদৃষ্ট বস্তুপিণ্ডগুলি উল্কাপিণ্ড হতে পারে কিন্তু সেগুলি নির্দিষ্ট বটে, বক্ষে বাঁধা পড়ে স্বতঃই এখন উপগ্রহের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে।

যাহোক ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দু-জায়গা থেকে আরও দুবার এরূপ কয়েকটি বস্তুপিণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে টেলিস্কোপের সাহায্যে আরও তিনবার এদের কয়েকটিকে দেখা গেছে। মোটের উপর হোলপাক পরিদৃষ্ট পদার্থ-গুলি যদি সত্য সত্যই পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে থাকে তবে মহাশূন্য অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিক তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে কৃত্রিম উপগ্রহের মত হোলপাক উপগ্রহের পর্যবেক্ষণ-লব্ধ বিবরণ যথেষ্ট সহায়ক হবে।

স্মৃতিকথা

শ্রীকালিদাস রায়

কাশিমবাজার বহরমপুরের কথা ফুরিয়ে এলো। কেবল কতকগুলি লোকের উদ্দেশে ঋণ স্বীকার বাকি আছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়—যদিও এঁর সঙ্গে সম্পর্ক তখনও ফুরায়নি, বরং সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়েছিল। মহারাজের গৃহে বিবিধ উৎসব উপলক্ষে গীতবাদ্য ও আমোদ আহ্লাদ উপভোগের সুযোগ পেয়েছিলাম। মহারাজ রাজবাড়ীর বালকদের সঙ্গে গাড়ীতে আমার কলেজ যাতায়াতের সুযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর জামাতা—ধর্মদাস (আমার গ্রামের পাশের গ্রামের ছেলে) আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ ক'রে আমার দীনতাজনিত কুণ্ঠা সংকোচ ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন—এজন্য তাঁকে নৈতিক সাহসেরও পরিচয় দিতে হয়েছিল। কারণ রাজপরিবারের কেউ একজন আমলার ছেলের সঙ্গে রাজজামাতার ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করত না। ললিতমোহন রায় আমাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল বাংলা বই পড়বার সুযোগ দিয়েছিল। কবি সৌরীন্দ্রনাথ আমার কবিতা রচনায় এবং স্বপ্নজাল বয়নে সহযোগী ছিল! পণ্ডিত পশুপতি নাথ শাস্ত্রী আমাকে তাঁর টোলে দুই বৎসর কাব্যনাট্য ও ব্যাকরণ পড়িয়েছিলেন। গোবিন্দ চক্রবর্তীর কথা আগেই বলেছি। আর রাধিকাচরণ দাদার কথা কি বলব? তিনি আমার কাব্যরচনায় দীক্ষাদাতা। তিনি ছিলেন সহোদরের চেয়েও বেশী। আর সেই বনপথ—যে পথ দিয়ে প্রত্যহ মিশনারী স্কুলে পড়তে যেতাম—তার কথা-ত কবিতাতেই বলেছি। এই পথের কাছে আমি খুবই ঋণী। উপকার শুধু মানুষেই করে না।

বহরমপুরে বৈকুণ্ঠ নাথের দুই পুত্র রমণীমোহন ও তারকমোহন আমাকে স্নেহ করতেন—সকল প্রকার আমোদ প্রমোদে ও নাগরিক অনুষ্ঠানে আমাকে তাঁরা সঙ্গে নিতেন। তাঁদের লাইব্রেরীতে আমার কাব্যানুশীলন। পূজার সময় বাড়ী না গিয়ে তাঁদের উৎসবময় গ্রাম্য ভবনে বাস করতাম। এঁরা পরে বৈবাহিক সূত্রে আমার আত্মীয় হ'ন। তাতে আত্মীয়তা এক ইঞ্চিও বাড়েনি। আমি আমার দ্বিশতম কবিতা গ্রন্থখানি তারকমোহনের নামে উৎসর্গ করেছি। তাঁর সম্বন্ধে ও তাঁর মহীয়সী পত্নী সম্বন্ধে দুটি কবিতা লিখেছি। দুটিই ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে।

দুঃখের বিষয় বহু বৎসর ধরে এঁরা দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। এঁদের কথা স্মরণ করলে আমার চোখ ফেটে জল পড়ে।

পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যকে আমি ভক্তিভরে স্মরণ করি। তিনি আমার সাহিত্যসেবায় একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। আর একজন উৎসাহদাতা নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, ইনি আমাকে সহোদরের মত ভালবাসতেন। এঁরা দুজনেই স্বর্গত।

শিক্ষকদের কথা আগেই বলেছি। প্রধান শিক্ষক আমাকে পুত্রের মতই স্নেহ করতেন। কিশোর-সুলভ প্রগল্‌ভতার বশবর্তী হয়ে তাঁর সঙ্গে হিন্দু সমাজ ও আচার নিয়ে কত তর্কই না করেছি—অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি আমাদের বক্তব্য সব শুনে যুক্তির দ্বারা সেগুলি খণ্ডন করতেন।

ইনি আমাদের ইংরাজি ছাড়া Crossbearer নামে একখানি বাইবেলের পুস্তকও পড়াতেন। ইনি বলতেন—"আমি খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে চাই না, আমি কেবল চাই তোমরা কুসংস্কার হতে মুক্ত হও।" ইনি হিন্দু সমাজের

কুসংস্কারগুলির উল্লেখ ক'রে সেগুলির অসারতা প্রমাণ করতে চাইতেন। এজন্য প্রায়ই এর সঙ্গে আমাদের বাদানুবাদ হ'ত। ইনি বলতেন—"বাঙালীরা সকলেই, যে জাতির লোকই হোক, মিশ্রিত জাতি, সকলের মধ্যেই অনার্যরক্ত আছে—অতএব জাত্যভিমান ভ্রান্ত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। সব জাতির শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান হওয়া উচিত। জাতিভেদ একটা কুসংস্কার, বিধবা বিবাহ চলা উচিত। বিদ্যাসাগর জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁর মতই অনুসরণ করা উচিত। প্রতিমা-পূজা ধর্ম হলেও অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধর্ম, শিক্ষিত লোকদের প্রতিমাপূজা করা উচিত নয়। দেবদেবী সব কবিকল্পনা মাত্র। যেমন রাহু চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে কবিকল্পনা। তোমরা স্কুলে শিখেছ কিসে 'গ্রহণ' হয়। তোমাদের উচিত নয় কবিকল্পনায় বিশ্বাস করা।

দিনক্ষণ দেখা কুসংস্কার। আমিও পাঁজি দেখি কোথাও যাবার আগে—বেছে বেছে মঘা অশ্লেষা ত্র্যহস্পর্শ দেখে যাত্রা করি। ট্রেণে ভিড় কম হয়, আরামে যাই। বহুবার কুদিনে যাত্রা করেও বাহাল তবিয়তে বেঁচে আছি।

হাতের রেখাগুলো হাত মুড়বার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, পায়েও ঐরূপ রেখা আছে, ঐসব রেখার সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের কোন সম্পর্ক নেই। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন ভালো, কিন্তু চালকলার পিণ্ড দেওয়া বা পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য জল দেওয়া এটা Primitive ageএর remnant. মিশরে মৃতদেহের সঙ্গে বহু বছরের রসদ সমার্পিত করা হত, এমন কি দাস-দাসীদের ও পোড়া হত। নইলে মৃত্যুর পর সেবা করবে কে? এ সব সভ্যতা বিকাশের আগেকার কথা।

ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে Climatic condition এর সম্পর্ক। শীত প্রধান দেশের আর্যেরা আগুন জেলে উপাসনা করত এবং মদ্যমাংস খেতে তাদের আপত্তি ছিল না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দেবতাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করা হয়। আচার অনুষ্ঠানগুলো ধর্মের খোসা। আসল ধর্ম জীবের সেবা, ভক্তি, ত্যাগ, সংযম, অহিংসা, প্রেম, চিত্তশুচিতা, মৈত্রী ইত্যাদি। নদীই ছিল প্রত্যেক দেশের প্রধান সম্বল। নদীকে সেজন্য ধাত্রী বা জননীর মর্যাদা দেওয়া হয়। এটা মনুষ্যত্বেরই লক্ষণ। কিন্তু কোন নদীতে স্নান করলে সব পাপ ধুয়ে যায়, বহু সহস্র বৎসর স্বর্গবাস হয়—এসব অজ্ঞ লোকদের কল্পনা।

স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক আচরণ ও অনুষ্ঠান খুব ভালো—এসব হাইজিনের কথা। ধর্মের মধ্যে এগুলোকে এনে সাধারণ লোককে প্রকৃত জ্ঞান হ'তে বঞ্চিত করা উচিত নয়। যেমন খাদ্যবিশেষ খেলে স্বাস্থ্যহানি হয় এটাই প্রচার করা উচিত, ধর্মভ্রষ্ট হতে হয় একথা বলা মিথ্যাচার। স্বপাকে যে খায়, বাইরের তৈরী করা খাদ্য যে খায়না, সে অনেকের চেয়ে সুস্থ থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐ লোককে মহাপুরুষ ব'লে মনে করবার কারণ নেই। কোন কোন সাধুবেশী লোক বুজরুগী দেখাতে পারে—কুহক জানে, কোন কোন রোগের চিকিৎসাও তার জানা আছে হয়ত, তাই বলে তাকে ভবনদীর কাণ্ডারী মনে করবার কোন কারণ নেই।"

যতই বাদানুবাদ করা যাক—তাঁর এইসব উপদেশের প্রভাব আমিও কাটিয়ে উঠতে পারি নি, অন্যের কথা বলতে পারি না। তিনি সব সময়ে বলতেন—"Be rational. Rationalityই মানবধর্ম। পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ Rationalityতে। ভগবান তোমাকে বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন—তাই দিয়ে সব পরীক্ষা ক'রে নেবে। তাঁর দেওয়া বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই তাঁকে মানা—তাঁকে ভক্তি করা। গতানুগতিক হয়ো না।"

আজকালকার হেডমাষ্টারদের চেয়ে তিনি ঢের বেশি ঘণ্টা পড়াতেন। এক একদিন চার পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাস নিতেন। সেকালে ৬টা Period থাকত, আজকালকার মত ৭টা নয়। এক এক সময় তিনি হাসি ঠাট্টা করতেন, তখন তাঁর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে তর্কও চালাতে পারা যেত। আবার এক এক সময়

এমন গম্ভীর হতেন, যে কাছে আসতেও সাহস হ'ত না। গম্ভীর হলে তিনি বাংলায় কথা বলতেন না। কি ভাষায় কথা বলছেন তাই শুনে তাঁর মেজাজ ধরা যেত।

প্রাইজের আগে কি কি বই Prize নেব, জিজ্ঞাসা করতেন। সেকালে বাংলা বই প্রাইজ দেওয়ার প্রথাই ছিল না। আমি Shelley বা Byron এর Works চাইলে বিরক্ত হয়ে বলতেন—"তুমি জানো এঁদের বই কিছুতেই ছেলেদের দেব না, এঁরা Heretic, তবু কেন প্রতিবার চাও? এটা তোমার দুষ্টামি। Cowper was a devout Christian, এবার তোমাকে Cowper ও Milton এর Works দেওয়া হবে। আর যা যা নেবে লিখে দাও Emerson, Carlyle, Ruskin, Smiles, Matthew Arnold ইত্যাদির বই নিতে পার। বাইবেলের প্রাইজ Biblical Literature ছাড়া দেওয়া হবে না।"

স্কুলের মাইনা কখনও লাগে নি। পরীক্ষার ফী ছিল ১০৲ টাকা। এই টাকাটা দিতে গেলে বলেছিলেন, "ও দশ টাকা আমি দিতে পারব বাবা, তোমাকে দিতে হবে না। মাসে মাসে দুবছর অন্ততঃ ১০৲ টাকা ক'রে সরকারের কাছে আদায় করতে পার কিনা তারি চেষ্টা দেখ। অঙ্কে পড়ে সব ভণ্ডুল কোরো না যেন।" আমি বললাম—"স্যার, আপনার আশীর্বাদ থাকলে তা হবে।" স্যার বললেন—"আশীর্বাদের কথা যদি বললে, তবে বলি এত তুচ্ছর জন্য আমার আশীর্বাদ নয়। আশীর্বাদ করি তুমি যেন আসল মানুষ হয়ে, দীর্ঘজীবী হয়ে দশজনের মধ্যে একজন হও।"

আমি খোঁড়া হিন্দু কবি বলে বিখ্যাত, কিন্তু আমি খৃষ্টান গুরুর প্রিয় ছাত্র—তাঁর হাতে গড়া। আমার লেখাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায় কেউ তা আজো দেখেনি। বৈষ্ণব কবিতা মাইকেল রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন।

আমার সহপাঠীদের মধ্যে ২।৪ জন মাত্র কলেজে সহপাঠী হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না—তাদের কে কে বেঁচে আছেন তাও জানি না। এই দুদিনের মেলামেশার অসারতার কথা ছাত্রধারা কবিতায় বলেছি।

আমি ছাত্রজীবনে যে সকল গণ্যমান্য লোকের সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁদের কথা বলতে হলে সকলের আগে পুণ্যশ্লোক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কথা বলতেহয়।

আমার পিতা মহারাজার জমিদারিবিভাগে মীর মুন্সী ছিলেন। সেই সূত্রে আমাদের কাশিমবাজারে বাস এবং সেই সূত্রে আমার ছাত্রজীবনেই মহারাজের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটেছিল।

মহারাজ যে অসামান্য দানশীল ব্যক্তি ছিলেন তা সকলেই জানেন। তাঁর এই দানশীলতার মূলে ছিল একটা বিষয়বৈরাগ্য। তিনি ভোগাসক্ত পুরুষ ছিলেন না। যেটুকু ভোগ করতেন তা অনাসক্ত ভাবেই করতেন। দান এই বিষয় বৈরাগ্যের একটা অঙ্গ ছিল এই যে বিপুল সম্পদ তিনি প্রৌঢ় বয়সে পেয়েছিলেন তা তাঁর কাছে ছিল অনেকটা অপ্রত্যাশিত। তিনি এই ঐশ্বর্য লাভের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে ছিলেন না। তিনি এর চিন্তা বাদ দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের মত জীবন ও চরিত্র গঠন করেছিলেন। এঁর এই মনোভাবের কথা আমার কবিবন্ধু—এঁর জমিদারির ইন্‌জিনিয়ার যতীন্দ্রনাথ একটি বাক্যে ব্যক্ত করেছিলেন—

দানস্রোতে যায় যাক ভেসে ভাগ্যস্রোতে ভেসে আসা গদি।

এই বিষয়বৈরাগ্যকে বাড়িয়ে দিয়েছিল বিধাতার আঘাতের উপর আঘাত। তিন পুত্রের মধ্যে দুটি সুযোগ্য পুত্র এবং দুইটি সুযোগ্য জামাতার অকালমৃত্যু তাঁকে বিষয় সম্ভোগে আরো উদাসী ক'রে তুলেছিল।

মহারাজ হিসেবী দাতা ছিলেন না—সুবিবেচনার দান ও করুণার দান তাঁর কম ছিল না। কিন্তু তার চেয়ে বেশি ছিল ঔদার্যের দান—সাময়িক উত্তেজনার দান। দেশের উপকার বা জাতির কল্যাণ হবে মনে করেও তিনি অনেক সময় দান করতেন।

সেজন্য অনেকেই তাঁকে প্রবঞ্চিত ক'রেছিল, তাঁর অনেক দান ব্যর্থ হয়েছিল। অনেক অপদার্থ শঠ প্রকৃতির লোক তাঁর দানশীলতার মর্য্যাদা রক্ষা করেনি। মহারাজ সরল বিশ্বাস ও উদার দৃষ্টি নিয়েই তুষাদি-জীবন আরম্ভ করেন—মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসীম। কিন্তু ক্রমে ঠকে ঠকে তিনি Pessimist না হলেও ক্রমে Cynic হয়ে পড়েছিলেন—তাই তিনি নবীনচন্দ্রের কবিতার দুইটি চরণ তিনি মটো ক'রে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন—

হৃদয়ের রক্ত দিয়া কর পরউপকার
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদানে তার।

তাই ব'লে তিনি শেষজীবন পর্য্যন্ত দানের মুক্ত হস্ত একেবারে গুটান নি। শেষ জীবনে তিনি প্রাণ ভ'রে দান করতে পারেন নি ব'লে তাঁর ক্ষোভের সীমা ছিল না। কুবেরের সম্পদেরও সীমা আছে—অবিরত ক্ষয় হ'তে থাকলে হিমালয়ও একদিন সমতলত্ব প্রাপ্ত হ'বে।

মহারাজ আত্মীয় বৎসল ছিলেন, যেখানে যত আত্মীয় কুটুম্ব ছিল সকলকেই তিনি কাশিমবাজারে আনিয়ে নানাভাবে প্রতিপালন করেছিলেন। তাঁদের ছেলেদের স্কুলকলেজে শিক্ষাদানের জন্য কতই না চেষ্টা করেছেন।

মহারাজ ছিলেন অসামান্য বন্ধুবৎসল। তাঁর বন্ধু-বৎসলতার আতিশয্য আমাদের শহরে একটা সমালোচনার বস্তু হয়েছিল। তাঁর নব্যবিত্ত জীবনে যাঁরা তাঁর সঙ্গে বান্ধবতা রক্ষা করেছিলেন—তিনি তাঁদের কত যে উপকার করেছিলেন—তাঁদের বংশধরগণও আজ তা মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন। এমন অনেক বন্ধুপরিবার আছে—যে সকল পরিবার তাঁর কৃপাতেই শোচনীয় পরিণতি ও দুর্নিবার দুঃস্থতা হ'তে রক্ষা পেয়েছে। জমিদারি গদী পেয়ে তিনি তাঁর বন্ধুদেরই উচ্চপদে নিয়োগ করেন। দুর্দিনের বন্ধুদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না।

বাঙ্গালী জাতি ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ ব'লে যে দুর্নাম ছিল, তা তাঁকে বড়ই পীড়া দিত। সেজন্য যে কেউ একটা ব্যবসায়ের বিচিত্র পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর কাছে এলেই তিনি তাকে অর্থ সাহায্য করতেন। বলা বাহুল্য, সে সব ব্যবসায়ের অধিকাংশই—অব্যাপারী বাঙ্গালী জাতির হাতে স্বাভাবিক পরিণতিই লাভ করেছে।

মহারাজ আশ্রিতবৎসলও ছিলেন। যার ত্রিকুলে কেউ নেই, যে জীবিকা অর্জ্জনে অক্ষম, এমন অনেক লোকও তাঁর বাড়ীতে প্রতিপালিত হ'ত। এসব আশ্রিতদের মধ্যে পাগল ও জড়বুদ্ধির মানুষও ছিল।

সমাজসংস্কারের দিকেও মহারাজের দৃষ্টি ছিল। এদিকে তিনি বাড়াবাড়ি কিছু করেন নি। নিজে দ্বিজ-বর্ণের লোক ছিলেন না ব'লে বোধহয় বেশি দূর আগাতেও সাহস করেননি। তাঁর স্বজাতির মধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব্বে কোন বৈবাহিক আদানপ্রদান হয়নি। মহারাজই সর্ব্বপ্রথম এই ব্যবধান দূর ক'রে দুই শ্রেণীকে মিলিয়ে দেন।

শিক্ষাবিষয়ে মহারাজের দান ছিল সবচেয়ে বেশি। দেশের বড় বড় বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে তাঁর দান যে ছিল—তার ফল তাঁর নামাঙ্কিত হয়ে রয়েছে। তিনি বলতেন মাতুল রাজা কৃষ্ণনাথ-ত সমস্ত বিষয় সম্পদই শিক্ষার জন্য উইল ক'রে গিয়েছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী (তাঁর মাতুলানী) যদি সে উইল নাকচ করতে না পারতেন—তাহলে তিনি কিছুই পেতেন না। অতএব তিনি যতদূর পারেন তাঁর অর্থবলকে শিক্ষার জন্যই ব্যয় করবেন। যেখানে যেখানে তিনি হাইস্কুল খুলেছিলেন—ঐ সব হাইস্কুলে ছাত্রদের খুব কম মাহিনা দিতে হত। কৃষ্ণনাথ কলেজটিকে তিনি প্রায় প্রেসিডেন্সী কলেজের সমকক্ষ ক'রে তুলে-ছিলেন। এ কলেজের জন্য তিনি বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। এই কলেজের বহু ছাত্র আজ দেশ বিদেশে কৃতিত্ব দেখাতে পারছে। এত অল্প ব্যয়ে সেকালে আর কোথাও উচ্চশিক্ষা লাভ হ'ত না। কলেজের মাহিনা ছিল মাত্র ৩৲—আর বোর্ডিংএর খরচের অনেকাংশ তিনিই বহন করেন। বহু ছাত্রের মাহিনা ও বোর্ডিং খরচ তিনিই বহন করতেন। এমন কি

পরীক্ষার ফীও তিনি দিতেন। অসামান্য পণ্ডিত রেভা: ই-এম-হুইলারকে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ ক'রে আনেন। হুইলার সাহেবের আমলই কৃষ্ণনাথ কলেজের Augustan Age. আমি সেই সময়ের ছাত্র ব'লে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করি।

এসব ছাড়া তিনি যে কত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করেছেন, তা আজ সব মনে করে লিখতে পারব না। সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের জন্যও তিনি মুক্ত হস্তে ব্যয় করেছেন। মহারাজ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তিনি কেবল স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন না, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি সাধনার পথে যে অনেক দূর এগিয়েছিলেন তা তাঁর শোকবিজয়ের অসামান্য শক্তি লক্ষ্য করেই বুঝা যেত। তিনি যে স্বজন বিয়োগের নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন সে আঘাতে অনেক পরম জ্ঞানী পুরুষও মুহ্যমান হ'য়ে পড়েন।

হরিনামসংকীর্তনে যোগ দিয়ে খালি পায়ে খালি মাথায় বৈশাখজ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে তিনি দশ মাইল ধ'রে নগরপরিক্রমা করেছেন তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। খড়দহ ওপানিহাটির উৎসবে তিনি সংকীর্তনের মধ্যে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়েছেন। তাও আমার স্বচক্ষে দেখা। তিনি বহুবার বৃন্দাবনপরিক্রমা করেছিলেন—প্রথম পরিক্রমাতেই ইনি এঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে হারিয়ে আসেন।

এঁর প্রসাদে ও প্রসাদেই আমি দেশের বড় বড় কীর্তনীয়াদের কীর্তনসঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আমার জীবনে সে শুভযোগ ব্যর্থ হয়নি।

কাসিমবাজারের রাজবংশের গুরু ছিলেন—শ্রীখণ্ডের বৈদ্য নরহরি-মুকুন্দ-রঘুনন্দন সরকার ঠাকুরেরবংশ। মহারাজের নিজের কুলগুরু ছিলেন—ব্রাহ্মণবংশীয়। যদিও তিনি শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবংশের কাছে মন্ত্র গ্রহণ করেন-নি—তবু তাঁদের গুরুমর্যাদা দানে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। অসাধারণ বৈষ্ণব ভক্তিভক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর তখন শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবংশে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে মহামান্য ব্যক্তি। মহারাজ তাঁকে গুরুর মতই ভক্তি করতেন এবং তাঁর কাছে ধর্মোপদেশ শুনতেন। মহারাজ বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থগুলির প্রকাশ, প্রচার ও বিনামূল্যে ভক্তদের বিতরণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। এজন্য তিনি রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ নামে এক জন বৈষ্ণব পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিতেন। মহারাজের ধর্মপ্রাণতায় সমগ্র সহরে একটা বৈষ্ণবপরিবেষ্টনীর সৃষ্টি হ'য়েছিল। আমি সেই পরিবেষ্টনীতেই প্রতি-পালিত। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বৈষ্ণব উৎসব-পার্বণ রাজবাড়ীতে মহাসমারোহেই অনুষ্ঠিত হ'ত।

মহারাজ সঙ্গীতেরও বিশেষরূপ অনুরাগী ছিলেন। বিষ্ণুপুরনিবাসী শ্রীনিবাস প্রভুর বংশোদ্ভূত আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে তিনি মাসিক বৃত্তিদানে প্রতিপালন করতেন। গোস্বামী প্রভুর জন্য সমগ্র শহরে উচ্চ সঙ্গীতের একটা রসাবেষ্টনীর সৃষ্টি হয়েছিল। তাহা ছাড়া, মহারাজের বাড়ীতে প্রত্যেক অনুষ্ঠানে কালোয়াতী সঙ্গীতের বৈঠক বসত। ভারতের নানা স্থানের বড় বড় কালোয়াতরা এসে সভা জমাত।

বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যও মহারাজ যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম সাহিত্য সম্মেলন তাঁর বাড়ীতেই হয়। তিনি তার সব ব্যয় একাই বহন করেন। তারপর প্রত্যেক সম্মেলনে তিনি উপস্থিত হ'তেন এবং অর্থ সাহায্য করতেন। সাহিত্যপরিষদমন্দিরের ভূমি তাঁরই দেওয়া এবং তাছাড়াও যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেছিলেন। অনেকগুলি সাহিত্যিককে তিনি প্রতিপালন করেছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাঙ বাবু) তাঁর সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি জমিদারি কাজকর্ম দেখার চেয়ে সাহিত্যচর্চাই করতেন বেশি সময়।

টডের রাজস্থানের অনুবাদক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি প্রথমে লাইব্রেরির ভার পরে কৃষ্ণনাথ কলেজে বাংলা পড়ানোর ভার দেন।

আচার্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়কে প্রতিপালনের জন্য তিনি উপাসনা নামক মাসিকপত্রের প্রবর্তন করেন। পরে

চন্দ্রশেখরবাবুকে শুধু বৃত্তি দিয়ে যজ্ঞেশ্বর বাবুর হাতে উপাসনার ভার দেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়কে তিনি ইথোরার কলিয়ারি এষ্টেটের ম্যানেজারের পদ দান করেন। বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারের জন্য তিনি যে হাসবিহারী সাংখ্যতীর্থকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে রেখেছিলেন, গৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকার প্রবর্ত্তন ক'রে তাঁর হাতে সে পত্রিকার ভার দেন। মহারাজের প্রকাশিত বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির তিনি সম্পাদকতা করতেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থমালা তাঁরি টীকায় গড়ে উঠে। এখন এই গ্রন্থমালা কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। কবি কুমুদরঞ্জনকে তিনি মাথরুণ স্কুলের হেডমাষ্টারি দেন। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন উপাসনা প্রেস ও উপাসনা পত্রিকার ভার পান। কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁর এষ্টেটের ইনজিনিয়ার হয়েছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ের কিছু পরে আরো এই দুইজন কবির সঙ্গে মহারাজের সম্পর্ক ঘটে।

কবি রজনীকান্ত শেষ জীবনে মহারাজের অর্থ সাহায্য লাভ ক'রে তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর ছেলেরা মহারাজের কৃপা হতে বঞ্চিত হয়নি; নিরুপমা দেবীর বড়ভাই কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ ভট্ট কৃষ্ণনাথ কলেজে বাংলার অধ্যাপক হন। সব আমার মনে পড়ছে না, এইরূপ অনেকে তাঁর সাহায্য পেয়েছেন। বহু সাহিত্যিক, পণ্ডিত, বৈষ্ণব ভক্ত ও গবেষক শ্রেণীর সুধী তাঁর কাছ হতে মাসিক বৃত্তি পেত।

আমি মহারাজের প্রথম স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করি আমাদেরই স্কুল হলে। মহারাজ প্রাইজ বিতরণ করতে গিয়েছিলেন—আমি সেবার অনেকগুলি প্রাইজ পেয়েছিলাম। বইএর ভার যখন দুর্বহ দেখলেন—তখন মহারাজ বললেন—"তুমিই ত টেবিল খালি ক'রে দিলে, মুটে ছাড়া কি ক'রে বই নিয়ে যাবে? তুমি না আমার মীর মুনসীর ছেলে?" আমি বললাম—"আজ্ঞে হাঁ" তার।

যখন ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি তখন তাঁর স্নেহের পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম একদিন। লুপ লাইনের একটি ষ্টেশনে একটি ছোকরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল—আমি ছিলাম ট্রেনে ব'সে। উদাসদৃষ্টিতে চেয়েছিল গাড়ীর দিকে। আমি তাকে আমার গাড়ীতে ডাকলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কোথা যাবেন?" তিনি বললেন—"আমি এনট্রান্স পাশ করেছি—বহরমপুর কলেজে পড়তে যেতে চাই।" কথায় কথায় বুঝলাম তার বোর্ডিং খরচ মাহিনা ইত্যাদি চালানোর ক্ষমতা নেই। শহরে কোন ধনী ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন। সে শুনেছে শহরের অনেক ব্যক্তি কলেজে পড়ার সাহায্য করে গরিব ছেলেদের। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে নিয়ে এলাম সঙ্গে ক'রে নিজের বাড়ীতে। পরদিন সকালে তাঁকে সঙ্গে ক'রে মহারাজের কাছে গিয়ে ছেলেটির জন্য অনুরোধ জানালাম, মহারাজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন অর্থাৎ আমার দৈবাৎ প্রাপ্ত বন্ধুর কলেজে পড়ার সুবিধে হয়ে গেল। মহারাজ আমার সাহস ও মুরুব্বিয়ানায় হেসে ফেলে বললেন—"এখন হতেই সুপারিশ সুরু করেছ? এরপর তুমি আমাকে অস্থির করে তুলবে।" মহারাজ অপাত্রে দয়া করেন নি। আমাকেও লজ্জা পেতে হয়নি। আমার সে বন্ধু পরে সরকারী কলেজে অধ্যাপক হয়ে এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। কেবল তাই নয়, তিনি ভাষাতত্ত্ব, বঙ্গভাষা, ও বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণাও করেছেন।

আমি এনট্রান্স পাশ করলে মহারাজ আমাকে ওভারসিয়ারি পড়ার জন্য শিবপুর পাঠাতে চেয়েছিলেন—তাতে আমি সম্মত হইনি। এজন্য তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন—তার ফলে বহরমপুরে কলেজে পড়বার সময় রাজবাড়ীর ছেলেদের কলেজ যাতায়াতের অমনিবাসে স্থান লাভ করবার জন্য কুমার বাহাদুর মহিমচন্দ্রের সাহায্য নিতে হয়েছিল। কাশিমবাজার হ'তে কৃষ্ণনাথ কলেজ অনেকটা দূর হেঁটে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল না।

বাবা খুবই কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একদিনও কামাই করতেন না বা দেরি করতেন না। বেলা ১০টা হতে বেলা ৪টা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। অথচ প্রায় ৩০ বছর ধ'রে একই অল্প মাহিনা পেতেন। অবশ্য তাতেও আমাদের কোন অভাব ছিল না। বাবাকে বলতাম—আপনি এত খাটেন কেন? আপনার অধীনে ২৩।২৭ জন লোক রয়েছে তাদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিলেই পারেন—তারা ত খাটে না।" বাবা বলতেন—"তারা খাটে না, কাজ ভালো ক'রে শেখেও না, কাজ করতে গেলে কাজ পণ্ড করে। কাজেই আমাকে খাটতে হয়। মনিবের কাজ ত ফেলে রাখতে পারা যায় না।" "আপনি—অযোগ্য লোকগুলোর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলেই পারেন।"

বাবা—"রিপোর্ট করে কেবল আমি অপ্রিয় হ'ব। মহারাজ-ত কারো চাকরি খাবেন না। তিনি কখনো কারো অন্ন মারেন না। মাঝ থেকে আমিই তিরস্কৃত হ'ব। মহারাজ বল্‌বেন আপনি উপরওয়ালা হ'য়ে তাঁবেদারদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারেন না।'

আমি—মহারাজ ত আপনার প্রতি সুবিচার করেন না—তবে আপনার এত কৃতজ্ঞতার ভাব কেন? কাজ করেন, কাজের উপযুক্ত মজুরি পান না। কিন্তু আপনি মহারাজকে এত শ্রদ্ধা করেন যেন আপনি কতই না তাঁর অনুগ্রহ পেয়েছেন।

বাবা যা উত্তর দিলেন—তা সেকালের লোকের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। একালে সে উত্তর মেলা কঠিন। বাবা বল্‌লেন—তুই ছেলেমানুষ কিছুই বুঝিস না। তিনি কাজ দিয়েছেন বলেই কৃতজ্ঞতা। বেতনের কথা এখানে ওঠেই না। বেতন ত আমিই স্বীকার করেই নিয়েছি—এতেই ত আমার বেশ চলেও যাচ্ছে, যদি না চলে অবশ্যই তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। তাঁর সব দিকেই দৃষ্টি আছে। না পোষালে কাজ ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু কে আমার জন্য কাজ নিয়ে ব'সে আছে? চেষ্টা ক'রে হয়ত কাজ যোগাড় করাও যায়। কিন্তু যে বিষয়ে পাকাপোক্ত হয়েছি—ঠিক সে বিষয়েরই কাজ অন্য জায়গায় মিলবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, মায়া ব'লে একটা জিনিস আছে। রাজসংসার, আমার কাছারি ও আমার সহকর্মীদের প্রতি একটা মায়াও জন্মেছে। যিনি প্রতিপালক, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণই ধর্ম। আর বেশি খাটার কথা। সেটাও ধর্মেরই অঙ্গীভূত। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাই না বলে ত কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া যায় না। তাছাড়া, ভবিষ্যৎ আছে—বর্তমানটাই সব নয়। ভবিষ্যতে তোরাও এই রাজসংসারে প্রতিপালিত হ'বি। কৃতজ্ঞতা সব সময়েই অতীতের জন্য নয়—ভবিষ্যতের আশাতেও কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ করতে হয়। শুধু বই-ই পড়িস সংসার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হয়নি।"

বাবা যা সেদিন বলেছিলেন—তা পরম সত্য। তাঁর কথার সার্থকতা পরে বুঝেছিলাম। ঠিক আজ আমার ছেলেদেরও ঐ একই উত্তর আমাকে দিতে হচ্ছে।

এফ-এ পাশ করার পর আর একবার মহারাজ আমাকে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়বার জন্য শিবপুরে পাঠাতে চেয়েছিলেন। মহারাজ আমার কল্যাণই চেয়েছিলেন—কিন্তু আমার মানসিক গতি ও মতিবুদ্ধির কথা তিনি জানতেন না। আমি যেতে পারিনি। আমি বি-এ পড়লাম। বি-এ পাশ করার পর মহারাজ আমাকে Law পড়তে বলেছিলেন, তাও আমার মনঃপূত হয়নি। আমি এম্-এ পড়বার সংকল্প করলাম। মহারাজের আদেশ আমি শুনিনি—তবু তিনি আমাকে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছিলেন এবং এম্-এর বইগুলো কিনে দিয়েছিলেন। আমিই মহারাজের স্নেহের মর্যাদা রাখতে পারিনি।

মহারাজের বাড়ীতে বহুবার নিমন্ত্রণ হ'তো। বাবা আমাকে নিমন্ত্রণে যেতে দিতেন না। একবার কি উপলক্ষে যেন মার পীড়াপীড়িতে বাবা নিমন্ত্রণে যেতে অনুমতি দিলেন। উপলক্ষ্যটা দোল, ঝুলন বা দুর্গোৎসবের মত নয়, বোধ হয় কোন কুমারের জন্মতিথির উৎসব। আমার বয়স তখন ১৩।১৪ বৎসর।

যেখানে পাত করা হয়েছে তার প্রবেশ মুখে—মহারাজ নিজে দাঁড়িয়ে। তখনও মহারাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে?" কাছে একজন দাঁড়িয়েছিল—সে বল্‌লে—"মীরমুন্সী মশায়ের ছেলে।" মহারাজ বল্লেন—"ও—, রায় মশায় নিজে বুঝি আসতে পারলেন না। তোমাকে প্রতিনিধি ক'রে পাঠিয়েছেন।" সেই লোকটি বলল—"অত বড় পাতখানা ছেলেমানুষ নষ্ট করবে? আচ্ছা যাও।" মহারাজ চুপ করে থাকলেন। মনে হল সেখান হ'তেই ফিরে আসি, ফিরে আসবারও সাহস হ'ল না। নিতান্ত অপরাধীর মত—গিয়ে দেখলাম—একটা পাতের চারিপাশে অন্ততঃ তিরিশটা বাটি। তখন মনে হ'ল—সত্যই এতবড় পাতটা আমি নষ্ট করতেই ত এসেছি!

তারপর লজ্জায় আর কোন দিন কোন উপলক্ষে রাজ-বাড়ীতে খেতে যাইনি। কিন্তু ভবিষ্যতে দেড় বছর ধরে দুবেলা যে তাঁরই কলকাতার বাড়ীতে পাত পাততে হবে তা আগে ভাবিই নি।

বাবা ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন। ঐ দেড় বছর পরে মহারাজের উলীপুর স্কুলে ৭ বছর ধরে শিক্ষকতা করতে হয়েছিল। এই সাত বছরও মহারাজ আমার কল্যাণ কামনাই করেছিলেন। তাই যখন আমাকে হেড-মাষ্টারীতে পাকা করবার জন্য Inspector of Schools ও District Magistrate সুপারিশ করেন, তখন মহারাজ বলে পাঠান—এম-এ পাশ না করলে পাকা করা হবে না। তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন এম-এ পাশ করে যোগ্যতর হই। তিনি জানতেন আমি একটু মন দিলেই এম-এ পাশ করতে পারি।

যখন আমি তাঁর স্কুল ছেড়ে চলে আসতে চাইলাম—তখন তিনি কিছুতেই রাজী হ'লেন না। তাঁর আদেশ স্কুলে হেডমাষ্টারী করতেও হবে প্রাইভেটে এম-এও পাশ করতে হবে। শেষে মহারাজকে প্রতারণা করতে হ'ল। এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার নামে এক বছরের ছুটি চাইলাম। তখন তিনি খুসী হয়ে আমায় ছেড়ে দিলেন। আমি আর উলীপুর ফিরে যাইনি। সেই কল্যাণকামী মহাপুরুষকে প্রতারণা করার ফল চিরজীবনই ভুগলাম। শুধু ঐ ডিগ্রীটা নেই ব'লে একাধিক মর্যাদাজনক পদ হ'তে আমি বঞ্চিত।

সাহিত্যানুরাগী মহারাজ আমাকে সাহিত্যিক ব'লে স্বীকার করেন নি। তিনি যে অনুগ্রহ করেছিলেন—তা অল্প বেতনের কর্মচারীর পুত্র ব'লে—সাহিত্যসেবী ব'লে নয়। বরং সাহিত্যচর্চার জন্যই আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হ'ল ব'লে তাঁর ক্ষোভই ছিল।

আমার ব্রজরেণু ছাপার খরচ তিনি পরে দিয়েছিলেন। তাও আমার সাহিত্যসেবার পুরস্কার বলে নয়—কুমার বাহাদুর মহিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিতে বইখানি উৎসর্গ ব'লে।

ছাত্রজীবনে কুন্দ ব'লে একখানা ছোট কবিতার বই ছাপিয়েছিলাম এবং শহরের নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে গান কবিতা ইত্যাদি লিখতাম। মহারাজের প্রশস্তি গান কবিতাও কোন কোন উপলক্ষে লিখেছিলাম। এতেই আমার নিজের একটা সাহিত্যিক অভিমান জন্মেছিল। এ অভিমান কূপমণ্ডূকের অভিমান।

মহারাজ আমার সাহিত্যিক শক্তিটা স্বীকার করেননি বলে একটা অভিমান হ'ত। কাশিমবাজার সাহিত্য-সম্মেলনে আমি ভলান্টিয়ার মাত্র ছিলাম।

তাঁর বাড়ীতেই আমি প্রথম রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই এবং তাঁর সেবা করবার সৌভাগ্যলাভ করি।

রাজসাহীর সাহিত্যসম্মেলনে মহারাজ বহু লোক সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমাকে সঙ্গে নেননি ব'লে আমার একটা অভিমান জন্মেছিল। আমি অভিমান ভরে একাই গিয়ে সে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ১৭।১৮ বৎসর মাত্র। সত্যই যে তখন পর্যন্ত এমন কিছুই করিনি যাতে সাহিত্যিক বলে গণ্য হতে পারি একথা তখন বুঝতাম না। এখন স্মরণ ক'রে লজ্জা বোধ হয়। সাহিত্য বাতিকের জন্য যে আমি ছাত্র জীবনের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছি,—মহারাজ এই কথাই সকলকে বলতেন। তিনি যে সত্যই মঙ্গল কামনাই করতেন সে কথা তখন বুঝবার মত বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না।

আমি তাঁর নামে যে অনেক প্রশস্তি রচনা করেছিলাম —সেগুলোর সবই কোন সংঘ, সমিতি, শ্রেণী বা সমাজ বিশেষের পক্ষ হতে। নিজের নাম দিয়ে কোনটাই নয়। সেগুলি সব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ২।১টির কাপি খুঁজে পেলাম।

২।১টা তুলে দিই এখানে—

(১)

স্বাগত মহারাজ আজিকে মঙ্গল সভামাঝে।
হেথা—মানস অরবিন্দ বৃন্দে আসন তব রাজে।
সত্যসন্ধ সন্তোজ্জ্বল বিত্তেশ সম স্বচ্ছ
চিত্তজগৎ দিগ্‌জয়ী প্রজাকল্যাণে চির সিক্ত।
সারথি তুমি ধর্মের পথে কর্মের পথে পার্থ,
আরতি তব মনোমন্দিরে ভারতী সেবা কাজে॥

* * *

ভবনাঙ্গনে শঙ্খ বাজিছে পথে পথে বাজে ডঙ্কা।
অশ্রু দূরিল চক্ষে চক্ষে বক্ষে বক্ষে শঙ্কা।
ধন্য করহে পুণ্য করহে চির প্রসন্ন হাস্তে
মর্মের বেণুসঙ্গীতে তব আজি আগমনী বাজে॥

(২)

এস রাজঋষি অনঘ মনীষী জয় হোক তব হে মহামতি
পুন দেহ ধরে এ মহী মাঝারে
এসেছ কি ফিরে বিদেহপতি॥
তব একাবলী বক্ষোমালায়
অক্ষের বীজ রাজি শোভা পায়,
হেরি তব সুধী রাজ বেশ ভেদি
জাগে নিরবধি গেরুয়া জ্যোতি॥
তেজপিঙ্গল তপোজটাজাল
মণিউষ্ণীষে গোপনে ঢাকা।
তব কাঞ্চন তনুটি উজলি
বিষয় বিরাগ-বিভূতি মাখা।
তোমার প্রাসাদে গৌরীর সাথে
যক্ষেরা বুঝি পুজে ভোলানাথে
জ্বালিয়া কমলা হেমদীপমালা
করে ভারতীর সন্ধ্যারতি।

(৩)

দেশে দেশে অভিনন্দিল তোমা বহু বন্দনা গান।
শুন দীনজন বন্ধুহে পুন পল্লীর বেণুতান॥
হেথা—তোমা লাগি আছে পুষ্পভূষণ
মরকত শ্যাম শষ্প আসন,
ঘর মৃন্ময় ভাজনে অর্ঘ্য প্রভৃতি সতীর দান॥
ঝরি—পিয়াল পরাগ ঝরিয়া নয়ানে
বিঘ্নিত হবে দৃষ্টি এখানে
গোষ্ঠের বেণু তব রাজতনু করিবে মলিন ম্লান॥
হেথা—কুশমূলে ক্ষত হবে ও চরণ,
কেতকীকাঁটায় বাধিবে বসন
কত না বেদনা পাবে, ক্ষমা করো দয়াবান ক্ষমাবান।

ব্রজবেণুর উৎসর্গ পত্রে যে কবিতাটি ছাপা হয় তাহা আমার ছাত্রজীবনে মহারাজ কুমার মহিমচন্দ্রের অকাল মৃত্যু উপলক্ষে লেখা হয়েছিল এবং কবিতাটা কণিকা নামক স্থানীয় মাসিক পত্রে ছাপাও হয়েছিল। কবিতাটার নাম দিয়েছিলাম গোবর্ধনে। রাজবাড়ীর একজন যেন আমাকে বলেছিল এমন একটা ছোট কবিতা লেখ যা গোবর্ধন কুমারের সমাধির গায়ে ক্ষুদে রাখা চলে। আমি জানি না —এটা সত্যিই কোন কাজে লেগেছিল কিনা। কবিতাটা এই—

যেদিন মাধবী নিশা সপ্তবিংশ ষোল
পৌর্ণ মাসীর স্বপন
মাধবের অঙ্গে অঙ্গে মিলাইল গোবর্দ্ধনে
ফাগের মতন।
মিতালি করিল হেথা রাধাপদ-রেণুসাথে
তার পুণ্য রজঃ
পদ্মার চরণ পদ্মে ছিল যাহা এতদিন,
ধন্য হ'ল ব্রজ।
হৃদয়সাগর মন্থে দেবাসুর-মহাদ্বন্দ্বে
জয়ী দেবগণ
মোহন মহিমচন্দ্রে অমৃত পানের লাগি
করি আহরণ
মুনীন্দ্র মণীন্দ্রকণ্ঠে রয়ে গেল চিরদিন
শেষ-হলাহল।
মাতা কাশীশ্বরী বুকে ইন্দুহারা শোকসিন্ধু
উথলে উজল।
অভিমন্যু চিত্তসম ধর্মক্ষেত্রে চন্দ্রজ্যোতিঃ
রহিয়াছে ফুটি।
ক্ষণতরে হও শান্ত ধীরে চল, ফেল পান্থ
অশ্রুকণা দুটি।

বিচিত্র দ্বীপ মিনিকয়

ভারতের মূল ভূখণ্ডের অদূরে আরব সাগরে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ সীমান্তের ক্ষুদ্র দ্বীপটির নাম মিনিকয়। দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূল হইতে উহার দূরত্ব প্রায় ২৩০ মাইল। কুমারিকা অন্তরীপের সহিত উহা একই অক্ষাংশে অবস্থিত। এই কারণে মিনিকয় দ্বীপকে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বলা হয়।

চন্দ্রকলার আকারবিশিষ্ট এই দ্বীপটির আয়তন মাত্র ৩ বর্গ মাইল। দ্বীপটির দৈর্ঘ্য ছয় মাইল; কিন্তু প্রস্থতম স্থানেও উহার প্রস্থ আধা মাইলের অধিক নয়। দ্বীপটির দক্ষিণ সীমান্তের আধা মাইলের মধ্যে একটি ১৪০ ফুট উচ্চ বাতিঘর আছে। ৮০ বৎসরের পুরাতন এই বাতিঘরটির পরিচালনা ভার ভারত সরকার গত এপ্রিল মাসে বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে লইয়াছেন।

মিনিকয় দ্বীপের প্রায় কেন্দ্রস্থলে একটি গ্রাম আছে। সম্প্রতি ঐ গ্রামে একটি পঞ্চায়েৎ গৃহ, একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি সরকারী হাসপাতাল ও একটি বেতার যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে।

দ্বীপটির জন সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। উহার মধ্যে গড়পড়তা প্রায় ১ হাজার বয়স্ক পুরুষ জাহাজীর কার্য-ব্যপদেশে সর্বদাই বিদেশে থাকে।

মিনিকয় দ্বীপের অধিবাসীদের নিকটে এখনও অর্থের মূল্য খুবই সামান্য। দৈনন্দিন জীবনের এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রয়োজন মিটিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। দ্বীপটির সর্বত্র, এমন কি বিদেশের সহিতও মিনিকয় দ্বীপের অধিবাসিগণ বিনিময়ের ভিত্তিতে বাণিজ্য করেন।

ভূ-সম্পত্তির উপর দ্বীপবাসীদের কোনরূপ মোহ নাই। সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেই তাহারা পছন্দ করেন। এই কারণে সমগ্র দ্বীপটিতে একটি পুলিশও দেখা যায় না, যদিও সেখানে এক দল পুলিশ মোতায়েন আছে।

মাতৃপ্রধান রীতিনীতি

দ্বীপবাসিগণ সকলেই মুসলমান। তথাপি স্ত্রীলোক-দের কোনপ্রকার আবরু মানিয়া চলিতে হয় না। পরন্তু সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেন। দ্বীপটিতে মাতৃ-প্রধান রীতি-নীতিই প্রচলিত আছে। নারী সেখানে গৃহের মালিক। গৃহের উপর পুরুষের কোনও দাবী নাই; তাহারা শুধু সেখানে বসবাস করিতে পারে। কিন্তু সেই অধিকারও বিবাহের পর আর তাহাদের থাকে না। বিবাহের পর পুরুষ তাহার স্ত্রীর গৃহে চলিয়া গিয়া সেই পরিবারের পদবী গ্রহণ করে।

বর নির্বাচন

মিনিকয় দ্বীপে সামাজিক কার্যাদিতে মেয়েরা কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। সেখানে শিশু বিবাহের প্রচলন আছে। মেয়েরা অবাধে নিজ নিজ বর নির্বাচন করিতে পারেন। সেখানে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় অধিক শিক্ষিত; সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে তাহারাই পরিবারভুক্ত শিশুদের লেখাপড়ার ভার গ্রহণ করিতেন। গত সাধারণ নির্বাচনে ঐ দ্বীপে পুরুষদের তুলনায় মেয়ে ভোটারদের সংখ্যা দ্বিগুণ ছিল।

মিনিকয় দ্বীপের নাগরিক জীবনেও মেয়েদের আধিপত্য অধিক। তাহাদের সুসংগঠিত দল ও মিলন কেন্দ্র আছে এবং ঐ সকল দল ও মিলন কেন্দ্রে পুরুষদের প্রবেশের অধিকার নাই। ঐ সকল দল ও মিলন কেন্দ্রে তাহারা যখন নানাবিধ আলাপ-আলোচনায়

ব্যাপৃত থাকেন তখন তাহাদের স্বামীরা গৃহে বসিয়া নারিকেলের দড়ি পাকান।

নারিকেল সম্পদ

মিনিকয় দ্বীপে পর্যাপ্ত সংখ্যক নারিকেল গাছ আছে। দ্বীপবাসীদের প্রধান উপজীবিকা মৎস্য শিকার ও নারিকেল শিল্প।

দ্বীপটিতে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য খুবই বেশী এবং ইঁদুরে নারিকেল ফলের অশেষ ক্ষতি সাধন করে। বর্তমানে ভারত সরকারের সহযোগিতায় দ্বীপবাসীরা ইঁদুর নিধন কার্য সুরু করিয়াছেন।

অপর দিকে, মৎস্য শিল্প দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে। এক দল জেলে একটি নৌকাযোগে দৈনিক গড়ে ৫০০ টাকার মাছ ধরে। কোন কোন দল এক দিনে অনধিক ৩০০০ টাকার মাছ ধরিতেও সক্ষম হয়। মাছগুলি নোনা জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। দেশীয় নৌকাযোগে ঐ শুটকী মাছ শুধু ভারতেই নয়, সিংহল, মালয় এবং অন্যান্য দেশেও নিয়মিতভাবে চালান দেওয়া হয়।

দ্বীপবাসীরা নৌকা নির্মাণে বিশেষ পটু। বস্তুতঃ তাহাদের নির্মিত "সর্প-তরী" গঠন, গতি প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নির্মিত নৌকাগুলি হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। নৌকা-দৌড় দ্বীপবাসীদের সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসব। মৃত্যাদিতেও তাহাদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে।

দ্বীপবাসীরা বিশেষ যত্ন সহকারে স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলেন। শিশুরা যাহাতে রাস্তাঘাট অপরিষ্কার না করে সেদিকেও তাহারা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যে জলাশয় হইতে তাহারা পানীয় জল সংগ্রহ করেন, স্নান বা কাপড় চোপড় পরিষ্কার কার্যে উহা ব্যবহৃত হয় না। পুরুষ ও নারীদের স্নানের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে।

ফাইলেরিয়াবাহী মশা দ্বীপবাসীদের সর্বাধিক মারাত্মক শত্রু। কলেরা ও বসন্ত রোগেও প্রতি বৎসর বহু লোক মারা যায়। সরকারী হাসপাতালের সহায়তায় সম্প্রতি মিনিকয় দ্বীপের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের মান বিশেষ উন্নীত হইয়াছে।

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square, East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : 22-6853—58

শ্রীশঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্য

হস্ত চালিত তাঁত শিল্পের জন্য ঋণ দান—

বিংশ শতকের যান্ত্রিক যুগেও ভারতে হস্ত চালিত তাঁত শিল্পের গুরুত্ব চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলির মত ভারতবর্ষও দ্রুত শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুটীর-শিল্পের গুরুত্ব পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার না করে পারেন নি। কুটীর-শিল্পকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সরকার সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। হস্তচালিত তাঁতশিল্প ভারতের কুটীর-শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম এবং সরকারের কাছ থেকে এই শিল্প নানা দিক থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি পাচ্ছে। কিন্তু কোন শিল্প বরাবর অপরের সাহায্য পেয়ে চললে কখনও উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না। কিছুদিন পূর্বে ব্যবহারিক শিল্পসমূহের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো বোম্বাইয়ে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ঋণ ব্যবস্থা সম্পর্কে এক বৈঠকে বক্তৃতাকালে এ বিষয়ের উল্লেখ করে বলেন যে, বছরের পর বছর সাহায্য দিয়ে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় এবং টিকে থাকবার মত জীবনীশক্তি এর মধ্যে থাকা দরকার। বস্তুতঃপক্ষে একথা কেবলমাত্র হস্তচালিত তাঁতশিল্প নয়, দেশের অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভারতের কুটীর শিল্পগুলির একটি মস্তবড় ত্রুটি হচ্ছে যে এর উৎপাদন পদ্ধতি অত্যন্ত সেকেলে। একথা বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং কিছুদিন পূর্বে কার্ভে কমিটিও মন্তব্য করেছেন। কুটীর শিল্পকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হলে এর উৎপাদনপদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হওয়া চাই। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের মন্তব্য খুবই যথার্থ ও সময়োপযোগী। হস্তচালিত তাঁতশিল্প তথা কুটীর শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে যাঁরা কিছুমাত্র সহানুভূতি সম্পন্ন, তাঁদের সকলের এই মূল সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ঋণ ব্যবস্থার সুবিধা সুযোগ সম্পর্কে তদন্ত ও সুপারিশ করবার জন্য গত ১৯৫৫ সালের ৩১শে জুলাই রাজ্যোন্নয়ন সচিবদের অধিবেশনকালে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন মিঃ ডি, নানযাপ্পা এবং এই কমিটি নানযাপ্পা কমিটি নামেই সমধিক পরিচিত। নানযাপ্পা কমিটির সুপারিশ সমূহ সম্পর্কে রাজ্য সরকার ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মন্তব্য জানবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বোম্বাইয়ে উপরোক্ত বৈঠকের আয়োজন করেন। বৈঠকে কমিটির সুপারিশসমূহ মোটামুটিভাবে সমর্থন করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিষয়টি এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তবে জানা গিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান সুপারিশগুলি সামান্য পরিবর্তন করে গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছেন। এর মধ্যে একটি সুপারিশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া সম্পর্কে। প্রাথমিক ও অপর কতকগুলি সমিতিকে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শতকরা ২ টাকা সুদে ঋণ দিতে স্বীকৃত হয়েছে। এই ঋণ দেওয়ার একটি প্রধান সর্ত থাকবে যে সুদ সহ ঋণ পরিশোধের জন্য রাজ্য-সরকার গুলিকে গ্যারান্টী দিতে হবে। এ সর্ত থাকা

খুবই স্বাভাবিক, কারণ কয়েক বছর আগে কতিপয় হস্তচালিত তাঁত সমবায় সমিতি যে ঋণ নিয়েছিল তা তারা পরিশোধ করে নাই। এখন যখন সরকার গ্যারান্টি দেবেন তখন আশা করা যায় যে সমবায় সমিতিগুলি এই ঋণের টাকা যাতে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যয় করে সে বিষয়ে সরকার বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। মানেজার কমিটি হস্তচালিত তাঁতশিল্পের মোট ঋণের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা অনুমান করেছেন।

তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি—

ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির বাৎসরিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এদেশে তুলার উৎপাদন উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় গত বছর (অর্থাৎ ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ থেকে ৩১শে আগষ্ট ১৯৫৪) ৩·৩৩ লক্ষ বেল তুলা বেশী উৎপন্ন হয়েছে। গত বছর মোট তুলার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪২·৯৮ লক্ষ বেল। তুলা চাষের জমিও ১৭২ লক্ষ একর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে গত বছর ১৮৩ লক্ষ একর হয়েছিল। এই বৃদ্ধি প্রধানতঃ হয়েছে বোম্বাই, পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র, পেপসু, রাজস্থান এবং মহীশূরে। ভাল বাজার দর ও অনুকূল আবহাওয়ার ফলে তুলার চাষ আরও বেড়ে চলেছে এবং বর্তমান বছরে তুলা চাষের জমির পরিমাণ ২০২ লক্ষ একরে পৌঁছোবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। কিন্তু মধ্য প্রদেশ, হায়দরাবাদ, পেপসু, অন্ধ্র, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর এবং কচ্ছে পরে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার ফলে তুলার উৎপাদন হয়ত কিছু কমে যাবে।

তুলার ব্যাপারে ভারতবর্ষ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। ভারত বিভক্ত হবার সময় অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর ছিল। প্রায় সমস্ত তুলা বস্ত্রের মিলগুলি পড়লো ভারতের এলাকায় কিন্তু তুলা চাষের শতকরা ২২ ভাগ জমি এবং তুলার মোট উৎপাদনের ৩৮ ভাগ চলে গেল পাকিস্তানের অংশে। ফলে ভারতীয় বস্ত্রের মিলগুলি অত্যন্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল এবং মিলগুলি চালাবার জন্য বিদেশ থেকে বহু পরিমাণে তুলা আমদানী করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর জন্য ভারত থেকে প্রতি বছর প্রায় ১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যেত। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষ নাতিদীর্ঘ আঁশের তুলায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছে। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার জন্য ৬ লক্ষ গাঁট তুলা যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান ও আফ্রিকা থেকে আমদানী করতে হয়। দেশীয় তুলার কাটতি যেমন বেড়ে চলেছে অপর দিকে বৈদেশিক তুলার কাটতি ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এ অবশ্য সন্তোষের কথা। কারণ এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অনেক সাশ্রয় হবে।

কিন্তু ভারতকে তুলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদন করতে হবে। আনন্দের বিষয় যে এই তুলা উৎপাদনের দিকে ইতিমধ্যেই দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। অপর একটি বিষয়েও কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। একর পিছু তুলার উৎপাদন ১৯৪৭-৪২ সালের ৯৩ পাউণ্ড থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালে ১১৬ পাউণ্ড হয়েছে। পাঞ্জাব, পেপসু, এবং মাদ্রাজের জল-সিঞ্চিত এলাকায় একর পিছু তুলার উৎপাদন ২০০ থেকে ২৫০ পাউণ্ড আর শুষ্ক এলাকায় একর পিছু উৎপাদন মাত্র ৬০ থেকে ১০০ পাউণ্ড। সেচ-পরিকল্পনাগুলি সমস্ত বাস্তবে রূপায়িত হলে একর পিছু উৎপাদন অবশ্য বৃদ্ধি পাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাল বীজ ও সার সরবরাহ এবং পতঙ্গ নিবারণ প্রভৃতি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় তুলা কমিটি একর পিছু উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত ধরণের তুলা উৎপাদনের জন্য গবেষণা চালাচ্ছেন। এই গবেষণার খরচ কমিটিই সাধারণতঃ বহন করেন তবে কোন কোন পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার সমূহ ও কমিটি যৌথভাবে খরচ বহন করেন। ভারত সরকারও গবেষণার জন্য মাঝে মাঝে মোটা টাকা সাহায্য করেন।

ভারতের ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার—

ভারত গ্রামকেন্দ্রিক দেশ। এদেশের উন্নতি নির্ভর করে প্রধানতঃ পল্লীর সমৃদ্ধির উপর। শিল্প দ্রুত প্রসার-

লাভ করলেও এখন পর্যন্ত কৃষিই এদেশের জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা। কৃষির উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে ভূমি ব্যবস্থার উপর। জমিদারী প্রথা এদেশের কৃষির প্রভূত ক্ষতি-সাধন করেছে। জমিদারী প্রথা বিলোপের পর ভূমির নূতন ব্যবস্থা ও সংস্কার নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে পড়েছে। এই প্রথা বিলোপ হওয়ায় প্রকৃত চাষী ও সরকারের সঙ্গে সোজা-সুজি সংযোগের ব্যবস্থা হল। চাষী এখন সরকার নিয়োজিত অফিসারদের পরামর্শ অনুযায়ী চাষ-প্রণালীর উন্নতি সাধন করবার সুযোগ পাবে।

জমিদারী প্রথা বিলোপের পর যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পারিবারিক বসবাসের জমি ও ব্যক্তিগত চাষাবাদের জন্য জমির মধ্যে বিভাগ কি উপায়ে নির্ধারিত হবে এবং প্রত্যেকে কত জমি নিজ অধিকারে রাখতে পারবে তার মাত্রা কি উপায়ে নির্ধারণ করা হবে। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে খাজনা স্থির করা। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম খাজনার পরিমাণ প্রচলিত আছে। বোম্বাইয়ে মোট উৎপন্ন ফসলের শতকরা ১৬½ ভাগ খাজনা দিতে হয়। আর সেখানে মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলায় দিতে হয় শতকরা ৬০ ভাগ। এই বৈষম্য দূর করতে না পারলে ভূমির উৎপাদন সুষ্ঠু গতিতে অগ্রসর হতে পারবে না। খাজনার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি কর, জল কর এবং অন্যান্য কর প্রভৃতি আরোপ করার একটি বিচক্ষণ ও একবিধ নীতি স্থির করতে হবে। এই সমস্যাগুলি খুব জটিল। কারণ অনেক রাজ্যসরকারের উপযুক্ত নথিপত্রও সংরক্ষিত নাই। তবে আশার কথা এই যে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পরিকল্পনা কমিশন একটি মূল নীতি রচনা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেছেন যে ব্যক্তিগত চাষাবাদ বলতে ভৃত্য ও ভাড়া করা শ্রমিক দিয়ে চাষ করাও বোঝাবে। কিন্তু তার মূল উপাদান হবে এই যে মালিককে নিজে পরিশ্রম করতে, সমস্ত রকম ঝুঁকি নিতে এবং ব্যক্তিগত তদারকের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

নিজ অধিকারে জমি রাখার মাত্রা নির্ধারণ করার জন্য খুব গভীর চিন্তার প্রয়োজন। জমির রকম, চাষাবাদের খরচ ও অন্যান্য স্থানীয় বিভিন্ন কারণ বিবেচনা করে এই মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ বিবেচনা করে জমি ভোগ করবার একটা মাত্রা বেঁধে দেওয়া একান্ত দরকার। এই মাত্রা বেঁধে দেওয়ার সময় কতকগুলি জমিকে অবশ্য রেহাই দিতে হবে। যে সকল জমি টুকরো করে দিলে উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না এবং চা-বাগান প্রভৃতি চাষের জমি যেগুলি বৃহৎ না থাকলে চলে না এ ধরণের জমিগুলিকে রেহাই দিতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন এ বিষয়ের উল্লেখ করতে ভুল করেন নি জেনে প্রত্যেকেই সুখী হবেন।

ভূমি সংস্কারের কথা বিবেচনা করবার সময় সমাজ তান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়ে তুলবার প্রশ্নটিকে সম্মুখে রাখতে হবে। পল্লী সংস্কারের মধ্য দিয়েই সত্যিকারের ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণ উপকৃত হবে। আর পল্লীকে সংস্কার করতে হলে ভূমি ব্যবস্থার বিলক্ষণ সংস্কার করতেই হবে। পরিকল্পনা কমিশন সমস্ত জমির মালিকদের মঙ্গলের জন্য চাষের সমবায় সমিতি গড়ে দিয়ে তার মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে জমির চাষাবাদ ও পরিচালন করে গ্রাম্য অর্থনীতিকে সুষ্ঠু ও সবল করে তুলতে চান। সমবায়ের ভিত্তিতে ভারতে যে সকল প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত হয়েছে তার কার্য-বিধি বিশেষ সন্তোষজনক হয় নি। পরিকল্পনা কমিশনের কর্মসূচী খুবই সময়োপযোগী এবং সকলের প্রশংসার্হ। এই কর্মসূচীকে কার্যকরী করতে হলে অক্লান্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। গ্রামে গ্রামে প্রচার কার্য চালিয়ে এবং সরকারী উদ্যোগে দু-একটি সমবায় সমিতি গড়ে তার মাধ্যমে চাষাবাদ করে পল্লীর অধিবাসীদের নূতন কর্মপদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।

পুস্তক পরিচয়

মন্দিরের চাবি—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। দি বুক কোং লিঃ। ৪।২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

দীর্ঘ সতেরো বছর বাজেয়াপ্ত থাকার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বইখানি রাহুমুক্ত হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নানা পর্যায়ের চিহ্ন আছে কবিতাগুলিতে। ঐ সংগ্রাম থেকেই কবি প্রেরণা পেয়েছেন। কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক মুক্তিরও তিনি আবাহন করেছেন। হরিজনদের মন্দির-প্রবেশে বাধা তাঁকে ব্যথিত করেছে। নির্যাতিত মানবের প্রতি সহানুভূতি তাঁর অধিকাংশ কবিতার প্রাণ। আদর্শ-গৌরব এবং রচনার পরিচ্ছন্নতা বিশেষরূপে তৃপ্তিকর। যে মহাপ্রাণ দেশ-সেবকেরা মানুষের মুক্তিকল্পে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন তাঁদের অনেকের পুণ্যস্মৃতি এ কাব্যে অক্ষয় হয়ে রইলো। বিশেষ ক'রে 'দীনেশ গুপ্তের শেষ পত্র' বড়ই মর্মস্পর্শী। ছাপা-বাঁধাইয়ের তুলনায় বইখানি দামে সস্তা।

রবীন্দ্রদর্শন—শ্রীচিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯। মূল্য ২৲। দ্বিতীয় সংস্করণ।

'দর্শন' শুনলেই গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা মনে করে অনেকে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু 'রবীন্দ্রদর্শন' শুষ্ক তত্ত্বকথা নয়। রবীন্দ্ররচনার মধ্য দিয়ে উপলব্ধির যে গভীরতা ও যে সত্যানুসন্ধানের পরিচয় পেয়েছেন লেখক, তাই সরল আলোচনার আকারে তিনি উপস্থিত করেছেন পাঠকদের কাছে। তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্র-সাহিত্যসাগরে ভেসেছি, ডুব দিয়েছি, কিনারা পাইনি। তাঁর ভাষাতেই বলি, কেবল মনে হয়েছে; 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, আমি অবাক্ হয়ে শুনি কেবল শুনি।' অবাক্ হয়ে শুনেছি, সেই গানের মূল সুরটির সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি।" সেই চেষ্টারই ফল এই গ্রন্থ। বস্তুপরিচয়, দর্শনের মার্গ, বিশ্বের রূপ, সত্যোপলব্ধি, মানুষের ধর্ম এবং সমালোচনা—এই ছ'টি অধ্যায়ে লেখক তাঁর বক্তব্য বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থারম্ভে একটি সূচিপত্র থাকলে ভালো হ'ত। পাঠক সমাজে বইখানির আদর হয়েছে, অল্প দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ তার প্রমাণ। সুদৃশ্য ও সুখপাঠ্য করতেও প্রকাশক যত্নের ত্রুটি করেননি।

নিউ দিল্লীর নেপথ্যে—অমিয়া সেন। প্রবর্তক পাবলিশার্স। ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১।০।

লেখিকা সুপরিচিতা ন'ন, কিন্তু তাঁর লেখা ঝোরালো। নয়া দিল্লীর হালচাল, কায়দা কানুন চমৎকার ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। হৃদয়হীন, নিষ্প্রাণ, কেতা-দুরস্ত এ শহর তাঁকে আনন্দের চেয়ে দুঃখই দিয়েছে বেশী। বড় চাকুরেদের উন্নাসিকতা, অর্থগত জাতিভেদ, আর অসুখারী পল্লীবিভাগ, সেবা-নগরের দরিদ্র কর্মচারীদের অন্ধকার গৃহ—আর যাই হোক, আমাদের জনপ্রীতির বা সাম্যভাবের পরিচয় দেয় না। অথচ, শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শ আমরা অহরহ মুখে প্রচার করি।

শিল্পে বা সাহিত্যে অনুশীলনের অনুকূল আবহাওয়া এখানে নেই। অবসর-বিনোদনের আড্ডা হয়তো অনেক আছে। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি এখানে নেই এমন নয়। "শ্রী নেহরুর রচনা যখন পড়ি, বিহ্বল হয়ে যাই।.. রাজনীতির অন্তর্গৃহে এই আবেগোজ্জ্বল হৃদয়, কাব্যধর্মী মনের বিহার ভূমি কই?"

কবে এ অভিশপ্ত পুরী প্রাণবন্ত হবে, মানবের সহজ মিলনে সরল ও সুন্দর হবে, লেখিকা তারই প্রতীক্ষায় উৎসুক।

—বী।

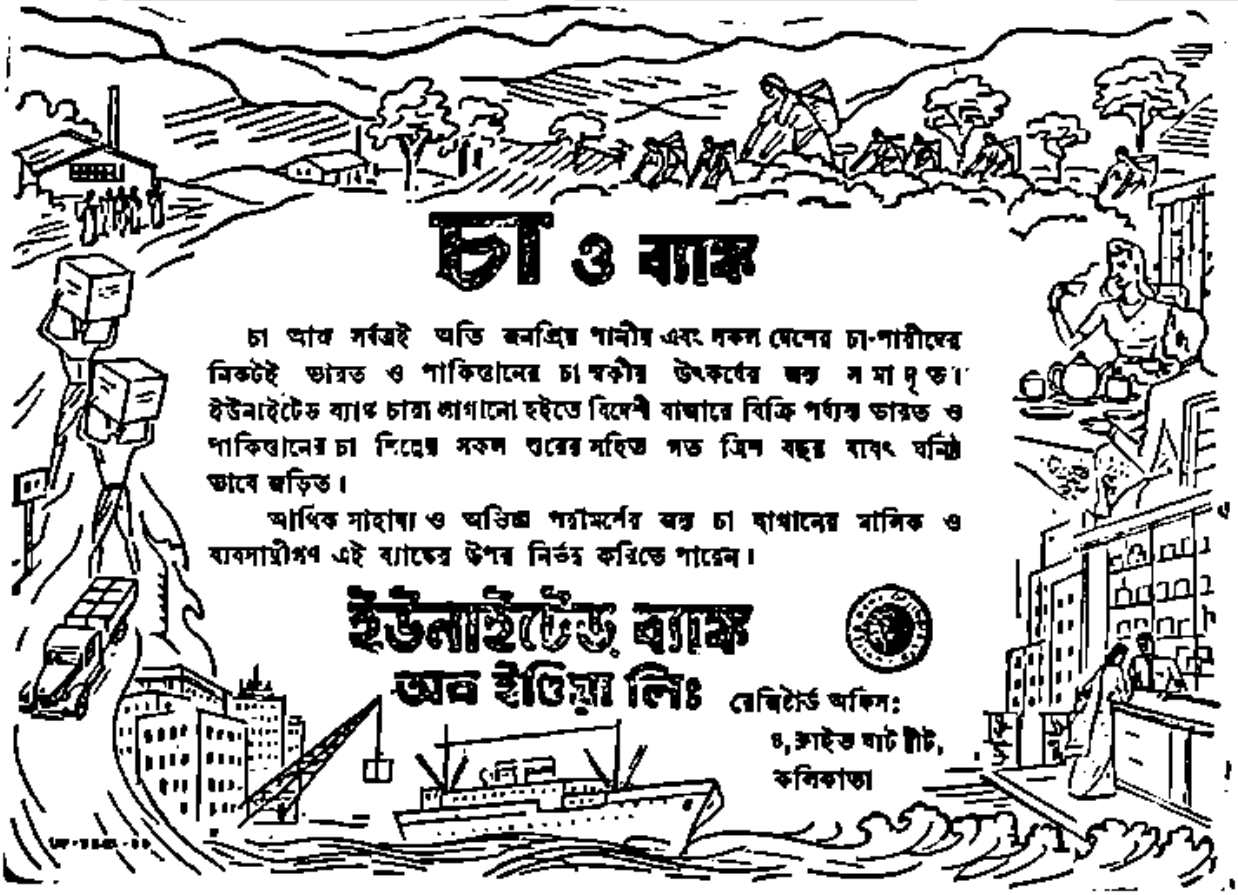

চা ও ব্যাঙ্ক

চা আজ সর্বত্রই অতি জনপ্রিয় পানীয় এবং সকল দেশের চা-শিল্পীদের নিকটই ভারত ও পাকিস্তানের চা শ্রমিক উৎকর্ষের জন্য সমাদৃত। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক চালু লাগানো হইতে বিদেশী বাজারে বিক্রি পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের চা শিল্পের সকল স্তরের সহিত গত ত্রিশ বছর যাবৎ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য পরামর্শের জন্য চা বাগানের মালিক ও ব্যবসায়ীগণ এই ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিতে পারেন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস:
৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

নবরূপে

বহু পুরাতন কেশ তৈল

বহু পুরাতন এক প্রণালীর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত জেবল এই কেশ তৈল চুল পড়া ও মাথার পরতা বন্ধ করে আর ঘন নূতন চুল উৎপাদনে সাহায্য করে।

কেয়ো-কার্পিন

অপূর্ব জেবজ কেশতৈল

প্রস্তুতকারক:
দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কেয়ো-কার্পিন বিভাগ: কলিকাতা-১২, বোম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ

L.P.B-E.K.-5-56

বাইশে শ্রাবণ—

বাইশে শ্রাবণ আগেও কতবার এসেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর থেকে ঐদিনটি তাঁর স্মৃতি-চিহ্নিত হয়ে আমাদের মনে স্থান নিয়েছে। মেঘচ্ছায়ায়, ধারা-বর্ষণে বেদনার সুর যেন দূর থেকে ভেসে আসে; প্রকৃতির বিচিত্র রূপকে যিনি আমাদের কাছে আরও মনোরম করে তুলেছিলেন, যাঁর হৃদয়ের স্পর্শে পৃথিবী এবং জীবন মধুময় হয়ে দেখা দিয়েছিল, তিনি আমাদের দৃষ্টি-সীমার বাইরে চলে গেছেন সে-কথা মনে পড়ে। কিন্তু এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে, দৃষ্টি-সীমার বাইরে গেলেও আমাদের অন্তর-লোক থেকে তিনি দূরে চলে যাননি। আমাদের উৎসবে-আনন্দে, দুঃখে-বেদনায় অন্তর-অন্তরে শুনি তাঁরই বাণী, সে বাণী মৃত্যুহীন, সে বাণী অবিনশ্বর।

পরলোকে হরেন্দ্রকুমার—

সর্বজনপ্রিয় রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত ৭ই অগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় সহসা চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন। ইদানীং কিছুদিন তিনি কিঞ্চিৎ শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করছিলেন, কিন্তু এত শীঘ্র মৃত্যু ঘটবে, একথা তিনিও মনে করেননি। ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথেরও মৃত্যুদিন। ঐদিন সকাল বেলায় নিমতলা ঘাটে রবীন্দ্র-নাথের স্মৃতিস্তম্ভের শিলা-ন্যাস করবার কথা ছিল তাঁর। শরীর ভালো না লাগায় তিনি সেখানে না গিয়ে লিখিত ভাষণ পাঠিয়ে দেন; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সে ভাষণ পাঠ করেন। বৈকালে নিজের ঘরে বসে তিনি কাজ করছিলেন। ৪টা ১৫ মিনিটে বুকে একটা ব্যথা টের পান এবং নার্সকে জানান। নার্স তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। এর মধ্যেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন এবং ৪টা ৫০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

৮ই আগষ্ট রাজভবন থেকে সকাল ৮টায় তাঁর শব-দেহ বা'র করা হয়। অগণিত নরনারী রাজভবন থেকে সমাধিস্থল পর্যন্ত শোক-যাত্রা দেখে। দীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনা করেছেন, বহু ছাত্রের তিনি শিক্ষাগুরু। শুধু বিদ্যা নয়, চারিত্রিক আদর্শেও তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। রাজ্যপাল হয়েও তিনি থাকতেন সাদাসিধা ভাবে; প্রাপ্য বেতন তিনি প্রত্যাখ্যান করে-ছিলেন। প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা তিনি জনকল্যাণে—প্রধানতঃ শিক্ষার জন্য—দান করে গেছেন। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যে সাধারণের একজন—একথা কখনও ভোলেননি। তাঁর অমায়িক আচরণে সকলে আকৃষ্ট হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে। 'বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে'—এ নীতিবাক্য যেন তাঁর জীবনে মূর্ত হয়েছিল।

তিলক-জন্মশতবার্ষিকী—

বালগঙ্গাধর তিলক কেবল মহারাষ্ট্রের নন, সমগ্র ভারতের নেতা। অসামান্য পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় সাহস এবং অটল চরিত্রবল তাঁকে ভারতবাসীর মনে ভক্তির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। 'কেশরী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা —তিনি নিজেও ছিলেন বীর-কেশরী। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনাকালে তাঁর নির্ভীক আচরণ এবং কর্ম-

কৌশল দেশসেবিগণকে অনুপ্রাণিত করেছে। বঙ্গে যখন সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছেন, তখন মহারাষ্ট্রেএই বীর নায়ক ঘরে ঘরে প্রচার করেছেন স্বাধীনতার বাণী। দেশপ্রেমের অপরাধে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড-বরণ তাঁকে দেশের কাছে আরও বরণীয় ক'রে তুলেছিল। বিদেশী শাসক শাস্তি দিতে গিয়ে তাঁর স্বরাজের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

এবারে তাঁর জন্ম-শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হ'লো। সমগ্র ভারত শ্রদ্ধাভরে তাঁর পুণ্যজীবন-কথা স্মরণ করলো। সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করে এবং তাঁর চিত্রযুক্ত ডাক-টিকিট প্রচার করে' গভর্ণমেণ্ট তাঁর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেছেন।

দেশের মুক্তিকল্পে যাঁরা দুঃখ-দারিদ্র্য নির্যাতন হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছিলেন, আজ স্বাধীনতা পেয়ে যদি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে যাই, তবে আমরা তাঁদের অযোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁদের নিষ্ঠার ও তপস্যার আদর্শ যেন অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে পারি, এই হোক্ আমাদের প্রার্থনা।

পুলিসের তৎপরতা—

খড়্গপুর রেলকারখানার ধর্মঘট-সম্পর্কে আলোচনা-কালে পশ্চিমবঙ্গের বিধান-সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিসের নিন্দা না ক'রে বরং উচ্চ প্রশংসা করা উচিত, কেননা, নানা অসুবিধার মধ্যেও তারা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। সরকারকে জব্দ করবার মতলবে যাঁরা অহরহ পুলিসের নিন্দা করেন, তাঁরা ভুল করেন সন্দেহ নেই। কিন্তু পুলিস যাতে সৎ এবং কর্মপটু হয়, সরকারেরও সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। ঐ প্রসঙ্গে সভার জনৈক সদস্য বলেন, খড়্গপুরে দুর্বৃত্তেরা যা খুশি করেছে, সেখানে পুলিস অথবা আইন-শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী কেউ ছিল ব'লে মনে হয়নি। বস্তুতঃ সাধারণের অভিযোগ ঐ জন্যেই। প্রায়ই দেখছি, চোর গুণ্ডা খুনী বদমাস্ অবলীলাক্রমে আপন আপন অভিপ্রায় সাধন করে চলেছে, দুষ্কৃতি দমনে পুলিস অপারগ। পরে হয়তো ভয় দেখাবার জন্যে পুলিস কিছু কাঁদুনে গ্যাস বা গোলাগুলি ছুঁড়লো অথবা জনকতক লোককে ধরে নিয়ে গেল, নির্যাতিত যারা হ'লো তারা অধিকাংশ নিরপরাধ। দেশকর্মী পূর্ণচন্দ্র দাসের হত্যার পরও দিনদুপুরে কত হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতি হ'য়ে গেল কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায়,—কটার কিনারা হয়েছে? কেউ কেউ বললেন সব শহরেই অমন হয়।—কিনারা করা সহজ নয়, জনসাধারণ কেন নিষ্ক্রিয় থাকে? এ প্রসঙ্গে ঐ জাতীয় উক্তি অর্থহীন। আমাদের মনে হয়, পুলিসের কার্য-কলাপের প্রতি কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি থাকেনা। দুর্বৃত্তেরা অনেক সময়ে পুলিসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা পায়, মধ্যে মধ্যে এমন সন্দেহেরও কারণ ঘটে। সুশিক্ষিত 'নিরীহ' ভদ্রলোক এবং নীতিজ্ঞানহীন অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোক—উভয়েই পুলিসের কাজের অনুপযুক্ত। আর, উপরের তত্ত্বাবধান না থাকলে শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা সহজেই দেখা দেয়। সাধারণ পুলিস বিভাগ তৎপরতা দেখালে জনসাধারণ অনেকটা নিরাপত্তা অনুভব করতে পারে।

এরা কারা?—

ক'দিন আগে কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রোগী ব্রজহরি পালের অন্তর্ধান প্রসঙ্গে হাসপাতালের একজন ডাক্তার ও নার্সের ব্যবহার নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হ'য়েছে। আলোচ্য ঘটনায় রোগীর স্ত্রী স্বামীর খোঁজ না পেয়ে ডাক্তার ও নার্সকে তাঁর সন্ধান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উত্তরে নাকি ডাক্তার বলেন পুকুরে খোঁজ করতে আর নার্স নাকি বলেন জ্যোতিষীর কাছে জিজ্ঞেস করতে। ঘটনাটি সত্য হলে বিবেকীজন মাত্রই এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন, কারণ এরূপ হৃদয়হীন ব্যবহার, মনুষ্যত্বহীন জবাব কোন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছ থেকে কেউ আশা করেনা। এ ছাড়া, ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এ জাতীয় বহু ঘটনারই একটা মাত্র।

সহানুভূতি ও মমতার অভাব আজ নানাভাবে

দেখা দিয়েছে—এমনকি ভিটামিনটিকাড়া ছিনমূল উদ্বাস্তুদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দৃষ্টান্ত আজ বাংলার দৈনন্দিন খবর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্বাস্তুদের ঋণের টাকা আত্মসাৎ করা, জমি দেবার নামে ভুয়া দলিল করা, তাদের প্রাপ্য সাহায্যের বখরা নেওয়া এবং এছাড়া আরও বহু জঘন্য কাজও আজ দেশের লোকেরই একটা অংশ নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছে। খবরের কাগজের পাতা খুললেই অমানুষিক বহু নির্যাতনের সংবাদ পাওয়া যায়।

আরেক শ্রেণীর ঘৃণ্য কাজ চলেছে সরলমতি তরুণ-তরুণীদের বিভ্রান্ত করে। সিনেমা ষ্টার করে দেওয়া ও লোভনীয় চাকুরী দেবার নামে বহু তরুণতরুণীকে বিপথে নিয়ে যাবার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায়। এই ত সেদিনের খবর, বারোজন তরুণতরুণী সিনেমায় নামবার মোহে বোম্বাই যাবার পথে হাওড়ায় পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়। ভুয়া ফিল্ম কোম্পানীর বিজ্ঞাপন দিয়ে বহু তরুণতরুণীকে কুপথে নেবার জন্যে ভারত-ব্যাপী একটা কুপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একশ্রেণীর লোক। চাকুরী যোগাড় করে দেবার ভুয়া প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে নিত্য নতুন গজিয়ে উঠ্‌ছে। চাকুরী দেবার নামে এরা চাকুরীপ্রার্থীদের কাছ থেকে একটা রেজিষ্ট্রেশন ফি আদায় করে নিয়ে ক'দিন পর পাত্তাড়ি গুটায়, এদের আর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। চাকুরী দেবার আরেক রকম তথাকথিত প্রতিষ্ঠান আছে যারা চাকুরীর লোভ দেখিয়ে তরুণতরুণীদের দিয়ে নিজেদের অর্থবাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে নানারকম ঘৃণ্য ব্যবসায় চালায়।

নিখিল ভারত সমাজকল্যাণ বোর্ডের (All India Social Welfare Board) সাম্প্রতিক রিপোর্টে অসহায় মানুষকে কিভাবে দুর্নীতির মুখে ঠেলে দিয়ে এক শ্রেণীর সমাজদ্রোহী ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছে তার ভয়াবহ রূপটা প্রকাশ ক'রে ধরা হ'য়েছে। কয়েকদিন আগেকার খবর, বিভিন্ন প্রদেশবাসী কয়েকটি ভিখারী ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জানতে পারে এরা একটি দলের অধীনে কাজ করে; ভিক্ষা করা ও সুযোগ বুঝে লোককে প্রতারিত করে অর্থোপার্জন করা এদের পেশা এবং এ অর্থের সমস্তটাই তাদের মালিকের পকেটে যায়, বিনিময়ে এরা জীবন ধারণের মত কিছু পায়।

গত বছর মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড্‌ব্যাঙ্ক নিয়ে যে কেলেঙ্কারীর রিপোর্ট আমরা দেখেছি এবং গত ক'দিন ধরে হাসপাতাল থেকে ওষুধপত্র আত্মসাৎ করবার যে খবর আমরা দেখ্‌ছি তাতে সমাজের একটা ভয়াবহ নৈতিক অবনতির দিক আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। অনেক সময়ই খবরের কাগজে দেখা যায় ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে বহু মুমূর্ষু রোগীর প্রতিও উদাসীনতা দেখানো হয়। এমন ঔদাসীন্যের ফলে বহু রোগীর মৃত্যু হ'য়েছে এরূপ ঘটনার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ভেজাল খাবার, ভেজাল ওষুধ বিক্রী, কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে লাভ সকর করা প্রভৃতি আজ আর কারো ধর্মবুদ্ধিতে লাগেনা।

জঘন্য কাজের তালিকা আর বাড়িয়ে লাভ নাই। উপরোক্ত তালিকা থেকেই দেখা যায় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, চাকুরে ব্যবসায়ী সবরকম লোকেরই একটা অংশ সমাজের বুকের উপর বসে সানন্দে সমাজবিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। যে সমাজের ভিত্তি নীতিজ্ঞানের উপর নয় তার অস্তিত্ব ও উন্নতির পথ বন্ধ। সমাজদ্রোহী কার্যকলাপের কারণ অনুসন্ধানে কেউ কেউ হয়তো বলবে সরকার কর্তৃক শাসনের অভাব—কিন্তু এর কারণ আরো গভীরে খুঁজতে হবে। শাসন করে মানুষের মনের পরিবর্তন করা যায় না। বারবার আসামী বহুবার শাস্তিভোগের পরও অপরাধের পথে পা বাড়ায় এটা আমাদের অজানা নয়। এ ছাড়া সরকার নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) নয়, সমাজের নানা স্তরের লোক নিয়েই সরকার। সরকার ভাল হ'তে হ'লে সরকারের মেরুদণ্ড ও প্রাণ

যে জনসাধারণ তাদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। যে সরষে দিয়ে ভূত তাড়াতে হবে তাতেই যখন ভূত আশ্রয় নেয় তখন যেমন ওঝার সব কেরামতি ব্যর্থ হয় ঠিক তেমনি সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ঢুকলে সরকারের পক্ষেও দুর্নীতি দমন চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সরকারী কর্মচারী অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে, এজন্য সরকারকে দায়ী করে লাভ নাই। কর্মচারী অসৎ হোক্ এটা কোন সরকারই চায়না। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, সমাজসেবক কর্মী; এরা উচ্চশিক্ষিত ও সাধারণের তুলনায় সচ্ছল। এদের কারো কারো কাছ থেকে যে নির্মম ও অকরুণ ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় সমাজের নীতিজ্ঞান শোচনীয়ভাবে কমেছে। যারা এসব অপকর্ম করছে তারা আমাদেরই ঘরের মানুষ। সরকারকে যখন আমরা দুর্নীতির জন্য উঁচু গলায় গাল দিই তখন ভুলে যাই এ দুর্নীতির শিক্ষা আমাদেরই ঘরে চলছে, এর লজ্জা আমাদের প্রতি ঘরের।

আমাদের মনে রাখতে দেশের মঙ্গলকামী জনসাধারণকে নৈতিক চরিত্রের উন্নতির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। সরকারের পক্ষেও কোন কর্তব্য নেই একথাও বলছি না। অপরাধ নিরূপণ ও শাস্তিবিধানে সরকারেরও মাঝে মাঝে ভুল ত্রুটি হয়। সরকার ও জনসাধারণের যুক্ত প্রচেষ্টা আজ একান্তভাবে দরকার। প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যারা সমাজের অপরের প্রতি সহানুভূতিহীন, তারা সামাজিক দায়িত্ব অবহেলা করছে, এদের প্রশ্রয় দিলে সমাজ ভেঙে পড়বে। অনেক সময় আমরা এরূপ দুর্নীতিমূলক কাজ দেখেও প্রতিবাদ করিনা, বাধা দেইনা। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে' কবির ভাষায় উভয়েই সমান অপরাধী। নিজের পরিবারে দেখতে হবে যাতে দুর্নীতির শিক্ষা কেউ না পায়, আর বাইরে দেখতে হবে অন্যায় বা দুর্নীতিকে যেন বাধা দেওয়া হয়। জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হ'য়ে দুর্নীতির বাধা না দিলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

গত কয়েক মাস ধ'রে নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে এবং এ নিয়ে নানা মহলে নানারূপ জল্পনা কল্পনাও চলেছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলেই এ মূল্য বৃদ্ধিতে শংকিত হ'য়ে পড়েছে। ভারত নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে চলেছে—তার দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা কার্যকরী করা ব্যাপারে। এমন সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আতঙ্কের কারণ, সন্দেহ নাই; কারণ আগামী পাঁচ বছরে বিদেশী বিনিময় মুদ্রা উপার্জন করতে হলে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন। বিদেশ থেকে ইণ্ডাষ্ট্রির উন্নতি সাধনের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানী না ক'রে আমাদের উপায় নেই। স্বাধীনতার আগে যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি দেশে উৎপন্ন হ'ত, তার চেয়ে বহু বেশী যন্ত্রপাতি বর্তমানে ভারতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু যে বিরাট ও দুঃসাহসিক উন্নয়ন কাজ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে স্বদেশী যন্ত্রপাতি ছাড়াও, বিদেশ থেকে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হবে। দ্রব্যমূল্য বাড়ার দরুণ আমাদের দেশে উৎপন্ন বস্তু কেনা ব্যাপারে বিদেশী টাকার দাম কমে যাবে অর্থাৎ বিদেশীদিগকে বেশী দাম দিয়ে আমাদের জিনিষপত্র কিনতে হবে—প্রতিযোগিতাময় দুনিয়ায় এটা হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বিদেশী ক্রেতাগণ আমাদের দেশ থেকে জিনিষপত্র কেনা কমিয়ে দেবে এবং এতে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য কমে যাবে। অপর পক্ষে, আমাদের দেশে জিনিষের দাম বেশী বলে মালের আমদানী বাড়বে, অর্থাৎ আমাদের টাকার একটা অংশ বিদেশে চলে যাবে। মোটকথা, বহির্বাণিজ্যে আমাদের নীট্ ঘাটতি ঘটবে।

এতো গেল বহির্বাণিজ্যের দিক। পাঁচশালা পরিকল্পনা সার্থক করতে হলে প্রচুর অর্থনিয়োগ (investment) প্রয়োজন। স্বল্প সঞ্চয় ও অন্যান্য প্রকার ঋণ খাতে সরকার দেশ থেকেই ১২০০ কোটি টাকা তুলবে বলে পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাবার

ফলে প্রয়োজনীয় ভোগব্যয়ের (consumption expenditure) পর জনসাধারণের হাতে উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় কিছু থাকবে না এবং এতে পরিকল্পিত ঋণ ও স্বল্প সঞ্চয় কমে যাবে। অন্যদিকে উন্নয়নমূলক কাজে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও শ্রমখাতে ব্যয় বেড়ে যাবে। লোকের জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে গেলে—তাদের সঞ্চয় কমবে। ফলে নতুন কর বসিয়ে ৪৫০ কোটি টাকা তোলার যে প্রস্তাব আছে তাতেও বাধা পড়বে, নতুন কর দেবার ক্ষমতাও তাদের থাকবেনা। ফলতঃ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব ও কার্যক্রম (estimate & achievement) সাংঘাতিক ভাবে বাধা পাবে।

কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হ'ল সাধারণের দুঃখ-কষ্টের প্রশ্ন। গত পাঁচ বছরে আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে ১৮% এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১১%; এই বাড়তি আয় প্রধানতঃ গিয়েছে উপরের দিকে ও নীচের দিকে—বড় বড় ধনপতিরা বেশী মুনাফা করেছে, আর কৃষক-শ্রমিকরা ও করেছে কিছু বেশী আয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় বিশেষ বাড়েনি, অতি কষ্টে তারা জীবন যাপন করে—এর উপর খরচ বাড়লে তাদের খুবই কষ্ট হবে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিপদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর দেখা দরকার কতটা পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। কারণ, সমাধান খুঁজতে হ'লে সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার। গত কয়েক মাসে নিত্যব্যবহার্য প্রায় প্রতিটি জিনিষের দরই বেড়েছে। পরিসংস্থান (statistics) অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৩৯ সালের পাইকারী দ্রব্যমানকে (whole sale price index) ১০০ ধ'রে ১৯৫৫ সালে ৩৬৮ ৪ ও ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ইহা দাঁড়ায় ৩৯৮·২। জুলাইয়ে শেষ দিয়ে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪১০·০। সকল দ্রব্যের দাম একই হারে বাড়েনি—খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রেই বেড়েছে সবচেয়ে বেশী। চাল, গম, যোয়ার, বজরা, ছোলা ও ডালের সূচকসংখ্যা (index) ১৯৫৫ সালে ৩৭১ এবং বর্তমান বছর মে মাসে ৪৪০ এ দাঁড়িয়েছে। ভোজ্য তেল, ঘি, চিনি প্রভৃতির দামও বেড়ে গেছে—সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানের হিসাব নিয়ে দেখা যায় ১৯৫৫ সালে ইহা ছিল সবচেয়ে কম এবং ১৯৪৯ সালের সঙ্গে তুলনায় এর সূচকসংখ্যা ছিল ৯৬ আর এ বছর এপ্রিলে দাঁড়িয়েছে ১০৩ এ। মোটের উপর গত বছরের তুলনায় এবছর পাইকারী মূল্যমান, খাদ্যদ্রব্যের দাম এবং সাধারণের জীবনযাত্রা ব্যয় বেড়েছে। সাধারণ লোক অন্নবস্ত্রের সঙ্গেই জড়িত এবং গত কয়েক মাসে এসব ভোগ্যবস্তুর (consumption goods) দর বেড়ে এদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই।

বর্তমান সমস্যা আলোচনা করতে হ'লে গত বছরের দ্রব্যমানের হিসাব নিয়েই তুষ্ট থাকলে চলবে না। বিগত কয়েক বছরের হিসাব দেখলে বোঝা যাবে আজকের সমস্যায় এখনই খুব বেশী ভীত বা সন্ত্রস্ত হবার মত কোন কারণ নেই।

১৯৫১ সালে সাধারণের জীবনযাত্রা ব্যয় ও খাদ্যশস্যের দামের সূচকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০৫ ও ৪১৮; ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৩ ও ৪৫০ এবং ১০৬ ও ৪৫১। ১৯৫৪ সালে খাদ্যদ্রব্যের দাম বিশেষ ভাবে কমে গেলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবী ওঠে দাম বাড়তে সাহায্য করে (price support) কৃষকের দুর্গতি দূর করার জন্য। সরকার খাদ্যশস্য ক্রয় করে দাম বাড়াতে সাহায্য করে অর্থাৎ চাহিদা (demand) বাড়িয়ে দাম বাড়াতে সাহায্য করে। ১৯৫৫ সালেও কৃষিজদ্রব্যের দাম কমের দিকেই ছিল—দরিদ্র কৃষকদের তাতে ক্ষতি ও কষ্ট হয়েছে। তাই ঐ দুই বছরের সঙ্গে খাদ্যবস্তুর দরের তুলনা করা সঙ্গত হবে না।

নানাকারণে গ্রামের লোকের হাতে এখন কিছু টাকার সঞ্চয় হ'য়েছে—উন্নয়ন কাজে বহুশত কোটি টাকা দেশে তথা গ্রামাঞ্চলে খরচ করা হয়েছে; কৃষিজ উৎপাদন পূর্বের চেয়ে প্রায় ১৫% বেড়েছে, আর গত পাঁচ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫·১ কোটি টন থেকে ৬·৫ কোটি টনে

ঊনবিংশতি বর্ষ ভাদ্র—১৩৬৩ পঞ্চম সংখ্যা

স্মৃতি-কথা

শ্রীকালিদাস রায়

আমার স্মৃতি কথায় বার বার বৈকুণ্ঠনাথ সেনের নাম করেছি। এই নিবাট পুরুষের পরিচয় বর্তমান কালের লোকদের কাছে দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

কাটোয়া হতে ৭ মাইল দক্ষিণে আলমপুর নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। গ্রামটি প্রধানত সদ্‌গোপ জাতির। এই গ্রামের মাঠে উৎপাদিত মিষ্ট ডাঁটাই কাটোয়ার ডাঁটা নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের বৈষ্ণবরাট বংশে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা হরিমোহন সেনের মধ্যমপুত্র ছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথের পিতা বহরমপুরে আদালতে কেরানীর কাজ করতেন। বাল্যকালে বৈকুণ্ঠনাথ গ্রাম থেকে পিতার কাছে এসে সৈদাবাদ হাডিঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'ন। কিছুকাল পরে তিনি বহরমপুরে উচ্চ ইংরাজি স্কুলে প্রবেশ করেন। ১৮৫৯ সালে সেই স্কুল হতে সরকারী বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। তারপর তিনি বহরমপুর কলেজ হতে ১৮৬১ সালে ২০৲ টাকা বৃত্তি পেয়ে সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষা পাশ করেন। বহরমপুর কলেজ তখন শহর থেকে ৪ মাইল দূরে সাজেটিয়ার কুঠিতে অবস্থিত ছিল। প্রত্যহ এই ৪ মাইল হেঁটে তিনি কলেজ যাতায়াত করতেন। বৃত্তি পাওয়ার ফলেই তিনি কলিকাতায় গিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হ'তে পারলেন। ১৮৬২ সালে তিনি এফ-এ পাশ ক'রে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এ পাশ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বি-এ পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গ্রাজুয়েট। বঙ্কিমচন্দ্রের ৫ বছর পরে বৈকুণ্ঠনাথ বি-এ পাশ করেন এবং পর বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করে বি-এল পাশ করেন।

তারপর তিনি বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ক্রমে তিনি বহরমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল হ'ন। তাঁর খ্যাতিপ্রতিপত্তি মুর্শিদাবাদের সীমা লঙ্ঘন ক'রে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রতিষ্ঠা এত বেশি বেড়ে যায় যে, স্যার চার্লস পল, ইভানস্, ডাব্লিউ, সি, ব্যানার্জী, জ্যাকসনের ন্যায় আইন জগতের দিগ্‌গজদের বিপক্ষেও প্রতিযোগী পক্ষ তাঁকে দাঁড় করাত এবং অনেকক্ষেত্রে মামলায় সে পক্ষ জয়লাভ

করত। বাংলার এডভোকেট জেনারেল স্যার চার্লস পল একবার প্রকাশ্য আদালতে বৈকুণ্ঠনাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন—I have been to almost every district of Bengal, but there never have come across such a formidable adversary. স্যার গুরুদাস বানার্জীর পর বৈকুণ্ঠনাথ কয়েক বৎসর বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপকের কাজ করেন। বৈকুণ্ঠনাথ ৫০ বৎসর সগৌরবে ওকালতি করার পর বহরমপুর বারের সদস্যগণ তাঁর জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠান করেন মহাসমারোহে। আমি সেই উপলক্ষে গান রচনা করেছিলাম, বন্ধুবর গিরিজাশঙ্কর সে গান গেয়েছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথের উকিল হিসাবে অসামান্য পশার প্রতিপত্তি ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার সকল জমিদার ও ধনী মহাজনদের তিনি বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শদাতা ছিলেন। আপন বৃত্তির কাজে খুবই ব্যস্ত থাকতেন—তবু তিনি জেলার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই উদ্যমে Murshidabad Association প্রতিষ্ঠিত হয়। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ পরিচালনার সমিতিতে তিনিই ছিলেন অগ্রগণ্য সদস্য। স্থানীয় আরোগ্যসত্র, জেল, পাগলা গারদ, বহরমপুর পৌরসভা ইত্যাদি বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। নয় বৎসর ধ'রে তিনি বহরমপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে বৈকুণ্ঠনাথের দান অকুণ্ঠ, অসামান্য! ১৮৯৯ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় আইন সভার প্রথম সদস্য হ'ন। তারপর ১৯০৯ সালে আবার মুর্শিদাবাদ জেলার পক্ষ থেকে তিনি সদস্য নির্বাচিত হ'ন। আইনসভার সদস্যহিসাবে তিনি ভাগীরথী নদীর সংস্কার সাধনের জন্য বারবার সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

১৯১৬ সালে বৈকুণ্ঠনাথ মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হ'ন। বাংলা দেশে প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান তিনি এবং যশোহরের যদুনাথ মজুমদার। লর্ড কারমাইকেল পরীক্ষামূলক ভাবে এই কর্মভার বৈকুণ্ঠনাথের হস্তে অর্পণ করেন। বলা বাহুল্য, বৈকুণ্ঠ নাথের কাজে প্রীত হয়ে সরকার সকল জেলাতেই ১৯২১ সালে বে-সরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯১৩ সালে Indian Public Service Commissionএর বৈঠকে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে তিনি ভারতবাসীদের বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙালীদের উচ্চপদে বাহাল করবার জন্য সুপারিশ ক'রে যে বক্তৃতা করেন তা বাংলার জাতীয় উন্নতির ইতিহাসের একটি মূল্যবান পৃষ্ঠা।

দেশসেবক ও কংগ্রেসকর্মী হিসাবে বৈকুণ্ঠনাথের দান অসামান্য। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হতেই তিনি কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁকে বলা হ'ত Nestor of moffusil delegates, ৩০ বৎসর ধরে তিনি অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে কংগ্রেসের সেবা করেছিলেন।

বাংলাদেশের মতো অন্যান্য প্রদেশে যাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রচলিত হয়, সেজন্য তিনি বারবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর রাজনীতিক সংগ্রাম বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের পর বাংলায় যে তুমুল আন্দোলন হয়। সে আন্দোলনে তিনি সুরেন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী ছিলেন। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ২০তম অধিবেশনে বৈকুণ্ঠনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কর্মভার লাভ করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৯৫ সালে বহরমপুরে তাঁরি আহ্বানে। তারপর আরো দুইবার ঐ সম্মেলনকে তিনি বহরমপুরে আহ্বান করেছিলেন। ১৯০৯ সালে হুগলী প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে তিনি যে ইংরাজিতে অভিভাষণ পাঠ করেন—তার উপসংহারটা কবিতায় লিখে দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ করেন। আমি একটি কবিতা রচনা ক'রে দিয়েছিলাম—তার

প্রতিলিপি থাকলে আমি এখানে উদ্ধৃত করতাম। কিন্তু কোন প্রতিলিপি রাখা হয়নি। মোটের উপর সভাপতির অভিভাষণ আমার রচনার দ্বারা উপসংহৃত হওয়ায় আমি ধন্য হয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ১৯ বৎসর।

বৈকুণ্ঠনাথ ছিলেন আত্মীয়বৎসল, আতিথ্যপরায়ণ ও পরোপকারী সজ্জন। তিনি ছিলেন আদর্শ একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের অধিকর্তা। তাঁর গৃহে বারো মাসে তের পার্বণে উৎসব হ'ত এবং বহুলোক ভূরিভোজনে আপ্যায়িত হ'ত।

বহরমপুর শহরে কোন গণ্যমান্য অভ্যাগত এলে তাঁর আমন্ত্রণে তাঁরি গৃহে আতিথ্য লাভ করতেন।

তিনি অন্ন ও বাসস্থান দিয়ে দরিদ্র সন্তানদের স্কুল কলেজের শিক্ষা লাভের সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন। শতাধিক ছাত্র তাঁর অনুগ্রহে বিদ্যালাভ করেছেন। ছাত্রদের জন্য পৃথক একটি বাড়ী ছিল—সেটাকে আমরা বাদাম-তলার বাড়ী বলতাম। এই সকল ছাত্রদের মধ্যে অনেকে রীতিমত কৃতবিদ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন।

বৈকুণ্ঠনাথের জন্মগ্রাম একটি নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লী। কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথের কাছে ছিল তা পরম তীর্থ। প্রত্যেক বৎসর পূজার আগে সপরিবারে গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা শেষ করে তিনি শহরে ফিরতেন। তিনি সৈদাবাদ থেকে কাটোয়া পর্যন্ত বোটে যেতেন—সঙ্গে বহু নৌকায় মালপত্র ও ঘি, ময়দা, চিনি ইত্যাদি যেত। মাসাধিককাল ধ'রে পল্লী-গৃহে উৎসব ও ভোজ চলত। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরাও নিমন্ত্রিত হ'ত। কাটোয়া থেকে সরকারী কর্মচারীরা যাতায়াত করত। বহরমপুর ও কলিকাতা থেকে অনেকে আমন্ত্রিত হয়ে যেতেন। বৃহৎ পরিবারের আত্মীয় পরিজনগণ সকলেই উৎসবে যোগ দিতেন। আমাদের গ্রাম ঐ গ্রামের নিকটেই। কিন্তু পূজার কয় দিন আমি বৈকুণ্ঠনাথের গৃহেই পূজার আনন্দ লাভ করতাম।

এরূপ দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ ব্যাপার আর কোথাও দেখিনি।

বৈকুণ্ঠনাথ জীবনে শোকতাপ কম পান নি। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও চতুর্থ পুত্র তাঁর জীবদ্দশায় দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বিবাহিত ছিলেন। কনিষ্ঠ জামাতার অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। শেষ বয়সে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। কর্মবীর বৈকুণ্ঠনাথের শোকবিজয় করবারও অসাধারণ শক্তি ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য মনীষীদের মত তাঁরও বিবিধ বিষয়ের গ্রন্থপাঠে অনুরাগ ছিল।

তিনি অজস্র অর্থ উপার্জন করেছিলেন। যেমন অর্জন করেছিলেন—তেমনি সদনুষ্ঠানে বর্জনও করেছিলেন। তিনি ভোগ করেছিলেন অর্জিত সম্পদ—তাঁর সে ভোগ ছিল দশজনের সঙ্গে ভাগ ক'রে।

সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর ও সি. আই. ই উপাধি দিয়েছিলেন। রায়বাহাদুর উপাধিটা তাঁর কাছে তুচ্ছ—তাঁর পুত্র জামাতা নাতি নাতজামাই অনেকেই রায় বাহাদুর। সরকারী পদবীর মূল্য তাঁর কাছে কিছুই নয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক রাজা, কিন্তু জেলার লোক তাঁকে অন্তরের রাজাধিরাজ মনে করত।

তাঁর তিন পুত্র রমণীমোহন, তারকমোহন, তারক নাথ জীবিত আছেন—ঠিক জীবিত নয়, জীবন্মৃত—পক্ষাঘাতে শয্যাগত।

অধ্যক্ষ রেভাঃ ই-এম-হুইলারের কথা আগে সংক্ষেপে বলেছি, এখানে বিস্তৃতভাবে বলি—

আচার্য রামজয় বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র আচার্য রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আর কৃষ্ণমোহনের দৌহিত্র রেভাঃ ই এম্ হুইলার। রামজয় বিদ্যাভূষণ ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রের আচার্য, কৃষ্ণমোহন হেদুয়ার খৃষ্টীয় তত্ত্বালোচনের আচার্য, আর—ই, এম, হুইলার ছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনের আচার্য; বাংলার বিদ্বৎসমাজে রামেন্দ্রসুন্দর, জানকীনাথ, হীরেন্দ্রনাথের সমপর্যায়ের দিগ্‌গজ পণ্ডিত ও সামসময়িক সহযোগী।

কৃষ্ণমোহন ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিক্ষেত্রের একজন বিরাট পুরুষ। তিনি হেয়ার, ডিরোজিও, রিচার্ডসন্ ইত্যাদি সেকালের পাশ্চাত্য শিক্ষাগুরুদের অগ্রগণ্য ছাত্র। তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বিদুষী কন্যা মনোমোহিনীর বিবাহ হয় হইলার সাহেবের পিতার সঙ্গে। আচার্য হইলার মনোমোহিনীর একমাত্র পুত্র।

মনোমোহিনী হইলার সরকারী শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জননীর শিক্ষাগুণে অতি অল্প বয়সেই হইলার সাহেবের অসামান্য জ্ঞানানুরাগ প্রবুদ্ধ হয়। হইলার কৃতিত্বের সঙ্গে ছাত্রব্রত উদ্‌যাপন করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজি ও লাটিনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স ও বিশপ্‌স কলেজ থেকে এম-এ (লাটিনে) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান লাভ করেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। শুনেছি এই টাকা তিনি এ-ডি এক্‌লানমথম্ নামে এক মাদ্রাজী খৃষ্টান সহপাঠীকে বিলাতে শিক্ষা লাভের সহায়তার জন্য দান করেন। তিনি অধ্যাপকরূপে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কাজ করার আগে কোথায় কোথায় অধ্যাপনা করেছিলেন তা আমি জানি না। তবে আমার শিক্ষক Joseph Arulanantham-এর কাছে শুনেছি তিনি প্রথমে হুগলী কলেজে Philosophy'র অধ্যাপক পদে কিছুদিন কাজ করেন।

মহারাজ কুমার মহিমচন্দ্র হইলারের তত্ত্বাবধানে থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠাভ্যাস করতেন। সেই সূত্রে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার একজন অসামান্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আগ্রহে ও অর্থসাহায্যে এই সময়ে বহরমপুর নগর বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হয়। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প ইত্যাদির অনুশীলনে তখন বাংলাদেশে কলিকাতার পরই ছিল বহরমপুরের স্থান। কৃষ্ণনাথ কলেজের অবদানে এই সংস্কৃতির অনুশীলন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিল। কৃষ্ণনাথ কলেজের অবদান বলতে হইলার সাহেবেরই সারস্বত অবদান বুঝায়; অবশ্য মহারাজের মুক্তহস্ততা হইলারের সাধনাকে সার্থক করতে পেরেছিল। হইলার সাহেবের প্রেরণায় ও উদ্দীপনায় মহারাজা, কৃষ্ণনাথ কলেজকে সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক'রে তুলতে আগ্রহী হলেন। হইলার সাহেবের আমলই কলেজের Augustan Age। কলেজের বিজ্ঞানবিভাগের উন্নতিসাধন হলো, বহুমূল্য যন্ত্রাদি গবেষণাগারে সংগৃহীত হল, গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি হল, কলেজভবন পরিবর্ধিত হল, ছাত্রদের কমনরুমের ও পাঠাগারের সুব্যবস্থা হল, কলেজসংলগ্ন ছাত্রাবাসের সংখ্যা বাড়ল, ছাত্রাবাসগুলির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধনে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রবর্তিত হ'ল এবং ছাত্রদের ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌতুকের আশাতীত সুব্যবস্থা হল। ১৯০৫-৬ সালের কথা আমি বলছি।

বাংলার নানা জেলা হতে এই সময়ে বহু ছাত্র হইলার সাহেবের আকর্ষণে বহরমপুরে পড়তে এল। তখনকার দিনে পরীক্ষায় খুব অল্প ছেলেই উত্তীর্ণ হ'ত। সেজন্য বহু শব্দটি সেকালের হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আমি ১৯০৬ সালে খাগড়া এল্ এম্ এস্ স্কুল হ'তে সে বছরের অতি কঠোর প্রবেশিকা পরীক্ষা Otto Sturoburg পাশ করে কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হলাম। স্কুলে Rev. James Henry Brown ও Rev, Otto Stursburg সাহেবের ছাত্র ছিলাম, এবার রেভা: ই. এম. হইলারের ছাত্র হলাম। আমার 'Reverence' এর ধারাও অক্ষুণ্ণ থাকল।

সাহেবের ক্লাসে পড়তে গিয়ে প্রথম দিনই ভয় ভেঙ্গে গেল। জন চল্লিশ ছাত্র আমরা ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে ছিলাম। প্রথম দিনই সাহেব আমাদের প্রত্যেকের নাম, ধাম, পরীক্ষার ফল, স্কুলের নাম

ইত্যাদি সবই জেনে নিলেন এবং প্রত্যেকের কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করলেন। সম্বদয় মিশনারি সাহেবদের কাছে আগেই পড়েছিলাম, কিন্তু সাহেবের ব্যবহার এত মধুর ও অমায়িক হতে পারে তাহা কল্পনাও করিনি।

সেদিন হতে সাহেব আমাদের নাম ধ'রে ডাকতেন। যাদের নাম ভুলে যেতেন অন্য ছাত্রের কাছে তাদের নাম জেনে নিতেন। বারেন্দায় বা করিডোরে যাবার সময় আমাদের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে বলতে, দুবারে দণ্ডায়মান ছাত্রদের দিকে হেসে আপ্যায়ন করতে করতে চলতেন।

আমাদের অসুখবিসুখে উদ্বেগ প্রকাশ করতেন, শোকে তাপে সান্ত্বনা দিতেন। তখন তাঁর সদাপ্রফুল্ল হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে যেত।

ছাত্রাবাসে যাহারা থাকত, সাহেবের সহৃদয় ও সস্নেহ আচরণ তাহারা আরো বেশি ক'রেই উপভোগ করত।

ছাত্রাবাসে কোন ছাত্র অসুস্থ হ'লে তিনি দুই বেলা তার শয্যাপার্শ্বে বসে তার ব্যাধির অবস্থা সম্বন্ধে সন্ধান নিতেন। ছাত্র যদি বলত তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে তা হলে নিজ হাতে তার মাথা টিপে দিতেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন এবং শুশ্রূষা করতেন।

এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা একটু বলি। এফ্-এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমার বুকে কিক্ ধরে একটা বেদনা হয়েছিল। আমাদের এফ্-এ পরীক্ষা কলেজে হয়নি, হয়েছিল মিলিটারি ব্যারাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সাহেবের মনোমালিন্য চলছিল; সেজন্য সাহেবের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার পরিচালনার ভার দেয়নি। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন পরীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর এক প্রতিনিধি পরীক্ষার হলের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। আমি এক হাতে বুক চেপে ধরে অন্য হাতে অতিকষ্টে লিখছিলাম। মুখে আমার ক্লেশের চিহ্ন। সাহেব হলে এসে ঘুরতে ঘুরতে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আমার অবস্থা দেখে ভারপ্রাপ্তকে ডেকে বললেন—One chair please, for this boy! ভারপ্রাপ্ত বললেন—Is he sick? সাহেব বলে উঠলেন—"No he is ill!"—তারপর দপ্তরীর হাত হ'তে নিজেই চেয়ার নিয়ে এসে আমাকে বসালেন এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে উৎসাহিত করলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি ট্যাবলেট এনে আমাকে খাওয়ালেন। সেদিন বারবার আমার কাছে এসে আমায় জিজ্ঞেসা করলেন—"How do you feel, my boy?" তার পর দিন দশটার সময় এসে আগে আমার খোঁজ নিলেন। আমি অনেকটা ভাল আছি জেনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলে গেলেন। এখানে ব'লে রাখি আমি একজন সাধারণ ছাত্র মাত্র।

সাহেব নিজে যেদিন সকালে উঠতে পারতেন সেদিন শয্যাত্যাগ করে একবার ছাত্রাবাসে গিয়ে ছাত্রেরা উঠে পড়তে বসেছে কিনা দেখতেন। রাত্রি দশটা বাজলে নিজে গিয়ে তাদের আলো নিভিয়ে দিতেন। বৈকালে গিয়ে ছাত্রাবাস হ'তে ছাত্রদের খেদিয়ে বাহির করতেন। তারা সকলে খেলুক না খেলুক খেলার মাঠের দিকে সকলকে নিয়ে যেতেন, ছুটির দিনে নিজের বাংলোতে ছেলেদের পড়াবার জন্য ডেকে নিতেন। সব সময় যে পড়ানো হত তা নয়, নানা বিষয়ের গল্প করতেন তাদের সঙ্গে। ছেলেদের নিয়ে শীতকালে তাঁহার বাগানে পিকনিক্ করতেন। তাদের সঙ্গে সেখানে তাস খেলতেন। ছোটনি ক্লাসের ছেলেদের তাঁর বাগানে অনেক সময় নিয়ে যেতেন এবং তাদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন ও টেনিস খেলতেন।

এসব ছাড়া প্রত্যহই তিনি ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতেন। বিশপ কলেজে পড়বার সময় সাহেব National Association Clubএ খেলতেন এবং Trades Cup বিজয়ীদের তিনি ছিলেন একজন। কৃষ্ণনাথ কলেজের সঙ্গে বাইরের ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ হ'লে কলেজের পক্ষ হতে তিনি কলেজ টিমে খেলতেন। যারা ভালো ফুটবল খেলতে পারত তারা তাঁর বিশেষ প্রীতিপাত্র ছিল।

সাহেবের চরিত্রের অধিকাংশই ছিল বাঙ্গালী ধাতুতে গড়া। বাঙ্গালীর মতই পরের দুঃখ কষ্ট দেখে তাঁর চোখ ছলছল করত। আমি দুবার সাহেবকে আকুল হয়ে কাঁদতে দেখেছি;—একবার প্রিয়ছাত্র কুমার মহিমচন্দ্রের মৃত্যুতে, আর একবার, তাঁর প্রতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আচরণের কথা বলতে বলতে। সাহেবের তেজস্বিতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য চলছিল। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদন করেছিল।

এই সময় দেশে বঙ্গ বিচ্ছেদ নিয়ে ঘোরতর আন্দোলন চলছিল। বলাবাহুল্য তার আঁচ কলেজের ছেলেদের গায়েও লেগেছিল। সাহেব এই সময় ছাত্রদেরকে পুলিশের অত্যাচার হতে সর্বপ্রযত্নে পক্ষপুটে রক্ষা করতেন।

সাহেব কলেজের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। আমাদের সময়ে কলেজের চারটি ক্লাস ছিল, কোন ক্লাসে সেক্‌সন ছিল না। সাহেব প্রায় প্রত্যহ চার ক্লাসই নিতেন। তাঁর রুটিনে সপ্তাহে ২৩টি পিরিয়ডের কাজ ছিল। ৪টার পর সাহেব অনার্স ক্লাস নিতেন। যেদিন অনার্স ক্লাস নিতেন না, সেদিন বোটানি ক্লাসে যেতেন। এই বিষয়েও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলেজেই টিফিন ক'রে তিনি প্রায়ই খেলার মাঠে যেতেন। কোন অধ্যাপক অনুপস্থিত থাকলে ক্লাস পড়ানো বাদ যেত না। সাহেব সেজন্য অনেক সময় Philosophy, Economics ইত্যাদিও পড়াতে আসতেন। তিনি কিছুকাল আমাদের ইংরাজী ও ফিলজফি দুইই পড়িয়ে-ছিলেন। পড়াতে তিনি নির্মল আনন্দলাভ করতেন।

তিনি নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন বলে অন্যান্য অধ্যাপকদেরও খাটতে হত বেশী। সাহেব খুব তাড়াতাড়ি বড় বড় বই পড়ে ফেলতেন। কি ক'রে তাহা সম্ভব হত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন,—"Sentence যদি বড় না হয় তা হলে তোমরা তাকাবামাত্র Sentenceএর বক্তব্য বুঝে নিতে পার। আগে তা পারতে না। অনুশীলনের দ্বারা তাহা সম্ভব হয়েছে। একটা Paragraphএর পানে তাকালেই আমি বক্তব্য ধরতে পারি। ইহাও অনুশীলনের ফল।

সাহেব খুব রসরসিকতা করে যতদূর সম্ভব সরস ও রোচনীয় করে পড়াতেন। তিনি চেয়ারে বসে পড়াতেন না, হয় দাঁড়িয়ে নয়ত, ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পড়াতেন।

পাঠ্য বিষয় সহজ নয়; অধ্যাপনা ইংরাজী ভাষায়। সাহেব খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে পড়াতেন না, তত্ত্ববিচার ও রস বিশ্লেষণের দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল বেশী—তা সত্ত্বেও সাহেবের পাঠনা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। কিন্তু তাহলেও তাঁর অধ্যাপনার যথার্থ মূল্য তখনও আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি। পরে কলিকাতায় এসে বহু অধ্যাপকের অধ্যাপনা শুনে বুঝলাম, সাহেবের অধ্যাপনার তুলনা হয় না। সাহেব আমাদের বলতেন, তোমরা বি.এ. পাশ ক'রে কলকাতার নামজাদা অধ্যাপকদের অধ্যাপনা মাঝে মাঝে শুনতে যেও। তিনি পার্সিভাল সাহেব, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতির অধ্যাপনার সুখ্যাতি করতেন।

সাহেব স্পষ্টই বলতেন—দেখ, আমার পাঠনায় তোমাদের পরীক্ষার ব্যাপারে খুব সুবিধা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের absurd questionsএর কি ক'রে উত্তর দিতে হয়, তা আমি শেখাতে জানি না। ভূষণবাবু আছেন, তিনি তোমাদের সে সব প্রশ্নের উত্তর কেমন করে দিতে হয় তাহা শেখাবেন। সাহিত্যের প্রশ্নে আর ইতিহাসের প্রশ্নে যদি তফাৎ না থাকে তাহলে তোমরা নোট-টোট সংগ্রহ কোরো। Literature proper নিয়েই আমার কারবার। কোন শব্দের অর্থ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন,—"Am I a dictionary? Do I look like a dictionary?"

সাহেব আমাদের এফ.এ, ক্লাসে Wordsworthএর Poems (Webb) ও Macaulay এর দুখানি

Essaysএর বই এবং বি.এ. ক্লাসে Holy Grail, Merchant of Venice, Richard Brukeএর American Taxation and Conciliation ও Walter Raleigh রচিত Shakespeare আমাদের পড়িয়েছিলেন।

Wordsworthএর কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি ফুলের উল্লেখ আছে। সাহেব এই সকল কবিতা শীতকালে পড়াবেন বলে মুলতুবি রেখেছিলেন। এর কারণ তখন বুঝতে পারিনি। শীতকালে একদিন দেখা গেল সাহেবের বাগান হতে মালী ফুলের কয়েকটা টব নিয়ে আসছে। সাহেব টেবিলের উপর টবগুলি সাজিয়ে বললেন—"আজ Wordsworthএর Flower Poems পড়াব।" তার পর তিনি ফুলগুলি চিনিয়ে দিলেন। শীতকাল ছাড়া ঐ ফুলগুলি এদেশে ফুটে না। Daisy, Primrose, Daffodil ইত্যাদি ফুলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে তিনি আমাদের ফুলের কবিতাগুলি পড়িয়েছিলেন।

Holy Grail পড়াবার সময় সাহেব টেনিসনের Coming of Arthur হতে Passing of Arthur পর্যন্ত বারোখানা Idyll আমাদের পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন। এরূপ পাঠ শুনে সমস্তটা বোধগম্য হয়নি সত্য, কিন্তু Arthurian Legend সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি জ্ঞান হয়েছিল। তিনি বলতেন সব Idyllগুলো মিলিয়ে একখানি মহাকাব্য (Epic)। সেই মহাকাব্যের মধ্য সন্ধি Holy Grail; অতএব সব Idyll গুলোর সঙ্গে পরিচয় না হলে এই পুস্তক পাঠের সার্থকতা থাকে না। এই মহাকাব্যের মূল সূত্র, "Sense at war with Soul"—এবং Soulএর পরিশেষে বিজয় লাভ। এই সত্যটাকে ভাল করে বুঝাবার জন্য তিনি এই কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।

Burke পড়াবার সময় তিনি আগে তিন জর্জের সময়কার সমস্ত ইতিহাস আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন। যে ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক পটভূমিকায় আমেরিকার মহানাট্যটি অভিনীত হয়েছিল, আগে সেই পটভূমিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার প্রয়োজন, ইহাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত।

ওয়ালটার রলির সেক্‌স্‌পীয়ার পড়াতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন,—'এরূপ পুস্তক তোমাদের পাঠ্য করা উচিত হয়নি। যারা সেকস্‌পীয়ারের নাটকগুলো পড়েনি, তাদের পক্ষে এই পুস্তক বিষ্ণু। অনায়াসে এই পুস্তক পাঠ্য করলে কতকটা সঙ্গত হত।" আমাদের পড়া ছিল Lamb's Tales from Shakespeare। সাহেব বললেন—'ওতে হবে না। এই বই পড়বার আগে সেকসপীয়ারের নাটকগুলো পড়তে হবে। ছমাস ধরে সাহেব সেকসপীয়ারের প্রধান প্রধান নাটকগুলো রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ভঙ্গীতে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক অঙ্কের আগে ভূমিকাস্বরূপ এবং মন্তব্যস্বরূপ লেকচার দিয়ে নাটকগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচায়িত করেন। তারপরে তিনি মূল সমালোচনা-পুস্তক পড়িয়েছিলেন। সুকণ্ঠে সুস্পষ্ট অভিনয়াত্মক ও ভাবানুগ আবৃত্তি বা পাঠ যে অর্থবোধের ও রস উপভোগের পক্ষে কতটা আনুকূল্য করে তা সাহেবের মুখে নাটকগুলোর আবৃত্তি শুনে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। সাহেব ভাষায় যাহা বুঝাতে পারতেন না, ভাবে ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় ও কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যের দ্বারা তাহা বুঝাতেন।

সাহেব ইংরাজি সাহিত্য পড়াবার সময় কোন্ টীকায় কি আছে তাহা দেখতেন না। তিনি নিজস্ব ব্যাখ্যাই দিতেন। একদিন কোন ছাত্র বলেছিল,—'এই ব্যাখ্যা ইংরাজ ভেরিটি, ডাইটন প্রভৃতি টীকাকারক ত দেন না, স্যার।' মনে পড়ে তাকে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—"তোমাদের Commentatorরা কি অর্থ দিয়েছেন জানি না। তবে তোমরা আমাকে তাদের চেয়ে ছোট ভাবছ কেন? আমিও একজন Commentator. আমি বিলাতে জন্মে মরে যাইনি এবং আমার কথাগুলো ছাপার অক্ষরে নেই ব'লে আমার দেওয়া অর্থটা তোমাদের যথাযথ মনে হচ্ছে না।'

আমরা ভাবতাম, পরীক্ষক তো সাহেবের লেকচার শুনল না,—তার যে পুঁজি ঐ তেরিটি, ডাইটন। Honours classএ তিনি Matthew Arnoldএর Poems, ও Essays দুইই পড়িয়েছিলেন। Honours classএ কবিতা পড়ানোর তাঁর একটা পদ্ধতি ছিল নতুন ধরণের। যে কবিতা পরদিন পড়াবেন, সেই কবিতার কোন্ কোন্ অংশ সাহিত্যাংশে চমৎকার, কোন্ কোন্ অংশ কোনও-না-কোনও কারণে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ, সেগুলো বাড়ী হতে নাগ দিয়ে আনতে বলতেন। এইভাবে তিনি আমাদের মনে স্বাধীন রসবোধের উদ্রেক করাতেন। আমার সহপাঠী কবি শরদিন্দু রায়ই এ বিষয়ে সাহেবের কাছে সুখ্যাতি অর্জন করতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

কোন পাঠ্যাংশে বাইবেলের allusion কিংবা reference থাকলে আমি সকলকে হারিয়ে দিয়ে সাহেবকে খুসী করতে পারতাম। তার কারণ, আমি ছিলাম মিশনারী স্কুলের ছাত্র, বাইবেল ছিল আমার অবশ্যপাঠ্য। বাইবেলের অনেক অংশ আমার মুখস্থ ছিল, আজও আছে। ভাল ভাল প্রাইজ বইএর লোভে আমি বাইবেল মুখস্থ করেছিলাম। তা যে পরে এত কাজে লাগবে তা ভাবতেই পারিনি। দেড় বছর অনার্স পড়ে আমি অনার্স ছেড়ে দিয়েছিলাম। সাহেবও বিলাতে চলে গেলেন। "বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর," এই মহাজন বাক্যের অনুসরণ করলাম।

সাহেব অবিরত প্রশ্ন ক'রে, তাঁর বক্তব্য আমরা বুঝেছি কি না, তার প্রমাণ চাইতেন। অনেক সময় তার পুনরাবৃত্তি করতে বলতেন। আমরা জানলে বুঝলেও ভাষার দৈন্যের জন্য নীরব থাকতাম। সাহেব বিরক্ত হয়ে Silly boys বলে তিরস্কার করতেন আর কোন তিরস্কারসূচক বিশেষণ তাঁর মুখে শুনিনি। একবার আমাকে কি জন্য যেন Cheeky boy ব'লে ভর্ৎসনা করেছিলেন। রাত্রে থিয়েটার শুনে একদিন সাহেবের ক্লাসে তন্দ্রাবিষ্ট হয়েছিলাম, সাহেব রাগ না করে শুধু বলেছিলেন, "Is my lecture a drug that has a soporific virtue ?"

Class Examinationএর ব্যাপারে সাহেবের বিধান ছিল অদ্ভুত। তিনি বলতেন,—"তোমরা আপন আপন বই নয়ে আসবে। বই Consult ক'রে তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তর লিখবে। তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় তাতেই পাব।"

আমি এক পরীক্ষায় বই নিয়ে যাইনি, তিনি লাইব্রেরী হতে বই আনিয়ে আমাকে দিয়েছিলেন। সেই বয়সেই সাহিত্য নেহাৎ কম বুঝতাম না। রস-বোধও নেহাৎ কম ছিল না, কিন্তু ভাষার দীনতার জন্য যা কিছু ভাবতাম বা বুঝতাম তা প্রকাশ করতে পারতাম না। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলাম। তা তাঁর অবিদিত ছিল না। এতে আমার বিপদই হয়েছিল। অনেক সময় সেজন্য আমি প্রশ্নাঘাত লাভ ক'রে মুসকিলেই পড়তাম।

বি.এ. পড়বার সময় আমার কবিবন্ধু শরদিন্দু সাহেবকে বলেছিল যে, আমি কবিতা লিখি, অনেক ইংরেজী কবিতার অনুবাদ করেছি এবং কুঞ্জ নামে একখানা কবিতার বইও প্রকাশ করেছি। সাহেব আমাকে Poet ব'লে (অবশ্য পরিহাসের ভঙ্গীতে) ডাকতেন এবং আমাকে একখানা Tennyson's Works উপহার দিয়েছিলেন। আজও সে পুস্তক আমার কাছে আছে। সেই বইখানাতে অনেক কবিতার পাশে সাহেবের হাতের লেখা নোটও আছে। পেন্সিলের লেখা এখন প্রায় মুছে গেছে। কবি পরিচয়ে নতুন বিপদ ঘটেছিল। কবিতা পাঠনার সময় প্রশ্ন করতেন,—But what does our poet say ? Poet মহাশয়ের মাথা নত ক'রে নীরব থাকা ছাড়া উপায়ান্তর থাকত না।

আজ আমি সত্যই একজন কবিসাহিত্যিক। বিনয়বশতঃ একথা গোপন করবার উপায়ও নেই। তা না হলে আজ আমি আমার ছাত্রজীবনের কথা লিখবার জন্য আমন্ত্রিত হতাম না।

আমি যে আমার আচার্যের কাছে আমার সাহিত্য-সাধনার জন্য কতটা ঋণী, আজ সে কথা বলবার অবসর পেয়েছি। সাহেবের ছাত্রত্বলাভের সৌভাগ্য না পেলে আমার রচনাশক্তিটুকু অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত; আমি আমার আর পাঁচজন সহপাঠীর মত কোন আদালত বা অফিসে জীবিকার্জনেই জীবন ব্রত সমাপ্ত করতাম, এবং তাদের জনতার মধ্যে ডুবে যেতাম। আচার্যের চরণতলে আসবার আগে আমি কবি ছিলাম না, আমি Versifier ছিলাম। Rhyming আমার অভ্যস্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাও পড়েছিলাম, কিন্তু গুরুকরণ হয়নি। সাহেবের পাঠনাতেই, Poetry কাকে বলে, আমি শিখলাম। সাধারণ পদ্যে ও আসল কবিতায় কতটা প্রভেদ, তাঁর শিক্ষাতেই আমার সে জ্ঞান হ'ল। তারপর সাহেবের উপদেশেই অজস্র ইংরেজি কবিতার অনুবাদ করতে করতে ২।৪টা কবিতা লিখতে হয়ত পেরেছি। সমালোচন-সাহিত্য লিখবার স্পর্ধাও আমার সাহেবের অপূর্ব পাঠনা হতেই সঞ্চারিত হয়েছে। চার বছর সাহেবের মুখে রসবিচারের লেকচার শুনে আমার Critical literatureএর বহু পুস্তক পাঠের কাজ হয়েছিল।

আমার শিক্ষাগুরুর পাঠনা ছিল সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যের অধ্যাপক বানাবার পাঠনা। যাঁরা সাহিত্যসেবী বা সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েছেন তাঁদের জীবনেই তাঁর পাঠনা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে। শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য, ওকালতি করবার জন্য অথবা সরকারী চাকরি করবার জন্য তাঁর রসাঢ্য অধ্যাপনার কোন প্রয়োজন ছিল না, যে কোনও অধ্যাপকই ঐ সকল কাজের দক্ষতা লাভে সহায়তা করতে পারতেন।

আমি চিরদিনই কলম হাতে করলেই আমার রস-গুরুকে স্মরণ করি,—কোনও একটা জুৎসই ইংরাজি Pharseএর জন্য নয়, তাঁর অপূর্ব সরস বাচনরীতির জন্য, কোনও একটা বিশিষ্ট টেকনিকের জন্য অথবা সাহিত্য-বিচারের কোনও একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য।

সতীর্থদের সঙ্গে দেখা হলে সাহেবের কথা ওঠে। তারাও সাহেবের পাঠনার সুখ্যাতি করে। আমি তাদের বলি,—"তাতো বুঝলাম ভাই, কিন্তু তাঁর রসাঢ্য পাঠনার ফল তো কিছু তোমাদের জীবনে ফলল না,—তোমাদের মধ্যে সাহিত্যে অনুরাগও জন্মালো না। আমি যে তোমাদের গুরুভাই, ৪০ বছর ধরে গুরুর শিক্ষা মাথায় নিয়ে সাহিত্যসেবা করছি, আমি যে এতকাল কি লিখ্‌লাম তাও তো কই পড়ে দেখলে না।"

কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর

রণজিৎ কুমার সেন

আনুমানিক ১৬৪২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরাকান রোসাঙ্গরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার রাজত্বকালে কোরেশী মাগন ঠাকুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রোসাঙ্গরাজ কবির পিতাকে ঠাকুর উপাধি দেন। তদবধি তাঁরা 'ঠাকুর' উপাধিই ব্যবহার করে এসেছেন। বাপ-মা ঈশ্বরের নিকট পুত্র কামনা ক'রেছিলেন। এই 'মাগিয়া পাওয়ার' ভিত্তিতে পুত্রের নাম রাখা হয় মাগন। তিনি কোরেশী শেখবংশজাত সিদ্দিকী গোত্রভুক্ত ছিলেন। তাঁর ন্যায় মনীষী তৎকালে রোসাঙ্গে খুব কমই ছিল। রাজ্যের মন্ত্রণাকার্যে নিযুক্ত থাকলেও আসলে তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। তাঁর সেই কাব্য-জীবনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর 'চন্দ্রাবতী' কাব্য। এতদ্ব্যতীত আরবী ফারসী, বর্মী ও সংস্কৃত ভাষায় মাগন ঠাকুরের ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। সঙ্গীত, নাটক, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভৈষজ্য, যাদুবিদ্যা ও নানা ব্যবহারিক বিদ্যায়ও তাঁর পারদর্শিতা ছিল অনন্যসাধারণ। মাগন যেমন দীন-দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিপন্ন ও দুঃস্থদের সহায়ক। এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ সত্ত্বেও, দুঃখের বিষয় যে, মাগন ঠাকুর কবি হিসেবে বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রতে পারেননি। জনপ্রিয়তা যদি ভাগ্য-সুপ্রসন্নতার লক্ষণ হয়, তবে সেদিক থেকে দেখতে গেলে কবির ভাগ্যবিপর্যয়ই ব'লতে হবে। কবি আলাওলকে তিনিই প্রধানতঃ রোসাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যে মাগন ঠাকুর সম্পর্কে প্রশস্তি রচনা করে বলেন—

"নামের 'ম'-কার আর ভাগ্যের 'গ'-কার।
শুভযোগে নক্ষত্রের আনিল 'ন'-কার॥
এ তিন অক্ষরে নাম 'মাগন' সম্ভবে।
রাখিলেক মহাজনে অতি মনোৎসবে॥
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল।
কাব্যশাস্ত্র-ছন্দ-মূল পুস্তক "পিঙ্গল"॥
"পিঙ্গলের" মধ্যে অষ্ট 'মহাগণ' মূল।
তাহাতে 'মগন' আছে শুন কবিকুল॥
নিধি স্থিত ফলপ্রাপ্তি 'মগন' ভিতর।
'মগণ' 'মাগণ' এক আকার অন্তর॥
আকার সংযোগে নাম হইল 'মাগন'।
অনেক মঙ্গল ফল পাএ তে-কারণ॥"

'চন্দ্রাবতী' কাব্যের বহুস্থলে মাগন ঠাকুর খাঁটি চট্টগ্রামী-কথ্যভাষার ব্যবহার করায় অনেকে অনুমান করেন, চট্টগ্রামেই কবির মূল বাসভূমি ছিল। কাব্যে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা সত্ত্বেও কবি তাঁর কাব্যের স্থানে স্থানে যে অনুপ্রাস ও আলঙ্কারিক ধ্বনি সৃষ্টি করেন, তা অনবদ্য। যেমন—

'বরিষার মেঘে যেন বরিষয়ে ধারা।
বসন তিতিল নিত্য নয়নের ঝারা॥
বসিয়া চাতক বৃক্ষে বলে পিউ পিউ।
বাণ হানে তার স্বরে দেহা প্রাণ জীউ॥'

এতদ্ব্যতীত দীপময় সামুদ্রিক বর্ণনায় মাগন ঠাকুরের কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম। 'চন্দ্রাবতী' কাব্যে তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় হ'চ্ছে পূর্ববঙ্গের একটি সাধারণ রূপকথা। সেই রূপকথাকে ভাবের ললিতগুণে সমৃদ্ধ ক'রে তিনি ছন্দের স্বচ্ছন্দ ঝঙ্কারে এমন কাব্য রচনা ক'রলেন—যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিদগ্ধ পাঠক সমাজকে চমৎকৃত ক'রলো। আলোচ্য কাব্যের নায়ক বীরভান নায়িকা চন্দ্রাবতীর রূপের খ্যাতি শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। চন্দ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভান। শৌর্যবীর্য ও সামরিক বিদ্যায় সে বিশেষ পারদর্শী। মন্ত্রীপুত্র 'সুত'-এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। দু'জন দু'জনকে

তিনি জানতো না। সরন্দীপের রাজা সুরপানের কন্যা চন্দ্রাবতীরও তেমনি সখী ছিল চিত্রাবতী। চন্দ্রাবতীর রূপ যেমন বীরভানকে আকর্ষণ করে, তেমনি বীরভানের অমিত শৌর্যও চন্দ্রাবতীকে আকৃষ্ট করে। তারা উভয়েই উভয়কে লাভ ক'রবার জন্য মনে মনে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। একদা বীরভান চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে সুত সহ সহস্র নৌকো নিয়ে সমুদ্রপথে সরন্দীপের দিকে যাত্রা করে। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন চারদিক আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, এমন সময় একটি দ্বীপে এসে নৌকো পৌঁছালো। ঠিক হ'লো, এই দ্বীপেই রাত্রি যাপন ক'রে ভোরে আবার তারা সৈন্যসামন্তসহ নৌকো ভাসাবে। কিন্তু এক নাগ-দলের ফোঁস ফোঁস শব্দে সকলকেই সচকিত হ'য়ে উঠ্‌তে হ'লো। তন্মধ্যে একটি বিরাটকায় অজগরের মুখে দু'টি প্রোজ্জ্বল মণি দেখা যাচ্ছিল। বীরভান ও সুত উভয়ে সৈন্যদের সাহায্যে শর বিদ্ধ ক'রে সেই অজগরকে নিহত ক'রে মণি দু'টি অক্ষয় কবচরূপে গলায় বেঁধে রাখলেন। ক্রমে প্রভাত হ'লো, নৌবহর সিংহল দ্বীপের দিকে যাত্রা ক'রলো, ক্রমে আর একটি দ্বীপে এসে নৌকো লাগলো; তখন ক্লান্ত দেহে সকলেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এমন সময় সমুদ্রে উঠ্‌লো প্রচণ্ড ঝড়। এবারে বুঝি প্রাণ যায়। সুত তখন সমস্ত নৌকো সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবার আদেশ দিল। কে কোথায় ডুবলো কি ভাসলো, জানা গেল না; কিন্তু অদৃষ্টক্রমে বীরভান ও সুত এই দুর্যোগেও রক্ষা পেয়ে গেল। নৌকো এসে এক অজানা কূলে ঠেকলো। সিংহল দ্বীপ। রাজা রত্নমণি, রাজকুমার ইন্দ্রমণি এবং রাজমন্ত্রী সুরদত্ত। ক্রমে বীরভান চন্দ্রাবতীর সঙ্গে ইন্দ্রমণির বিয়ের প্রস্তাবের কথা শুনে মনে মনে মুষড়ে পড়লো। সুত তাকে আশ্বাস দিয়ে ব'ল্‌লো:

'শুন পারি বুদ্ধি বলে মর্ত্যের মাঝার।
স্বর্গ হন্তে ইন্দ্র অপ্সরা আনিবার॥
পাতালেত অনন্ত নাগের শিরোমণি।
বুদ্ধিবলে আনিয়া দিতে পারি পুনি॥
যদিবা থাকএ মোর কণ্ঠেত জীবন।
চন্দ্রাবতী আনি দিমু তোমা বিদ্যমান॥"

আশ্বাস পেয়ে বীরভান কতকটা সান্ত্বনা পেলো। স্থির হ'লো—চন্দ্রাবতীর প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ ক'রতে না পারা পর্যন্ত এই নগরেরই কোথাও তারা ছদ্মবেশে বাসা বেঁধে থাকবে। কিন্তু বীরভানের রূপ ঢাকা থাকলো না, নারীরা এসে এসে সেই রূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যেতে লাগলো। চারদিকে তার সেই রূপ-ঐশ্বর্যের কথা ছড়িয়ে প'ড়লো, এমন কি রাজার কান অবধি গিয়ে পৌঁছাতেও দেরী হ'লো না। রাজা একদিন তাকে রাজপুরীতে নিমন্ত্রণ ক'রলেন। সুত তাহার বন্ধুকে নানা আভরণে ও রত্নসম্ভারে সজ্জিত করে রাজ-পুরীতে পাঠিয়ে দিল।

এদিকে চন্দ্রাবতীর মনেও তখন দারুণ ঔৎসুক্য আর উৎকণ্ঠা। চিত্রাবতীকে সে ব'ল্‌লো—

'কহ কহ প্রাণসখী কহ সত্য কথা।
কোন মতে বীরভান আসিবেন্ত এথা॥'

চিত্রাবতী স্থির ক'রলো যে, বীরভান যখন ঘুমাবে, তখন চন্দ্রাবতীর একটি সুন্দর চিত্র এঁকে বীরভানের বুকের উপর রেখে আসবে। জেগে উঠে বীরভান চিত্র দেখে অধীর আগ্রহে উতলা হ'য়ে নিজে থেকেই চন্দ্রাবতীকে উদ্ধার ক'রবার জন্য ছুটে আসবে। কার্যতঃ তাই করা হ'লো। এম্‌নি ক'রেই দিন তিনেক অতিবাহিত হ'য়ে গেল। এদিকে সুত সংবাদ নিয়ে জানালো যে, সিংহলরাজ কুমার ইন্দ্রমণির সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিয়ে একরকম স্থির হ'য়েই আছে। এই দুঃসংবাদ নিয়ে যখন সে বন্ধুর কাছে ফিরে এলো, দেখলো—সমুদ্রে ঝটিকাবিধ্বস্ত তাদের সকল সৈন্যই সমুদ্রের বিপদ কাটিয়ে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। চন্দ্রাবতীর আলেখ্য চিত্র দেখে অবধি বীরভান মূর্চ্ছা গিয়েছিল। অবস্থা দেখে সুত বিচলিত হ'য়ে বন্ধুকে ভদ্রাবতী নগরেই আবার নিয়ে গেল। রাজা চন্দ্রসেন পুত্রের আগমন সংবাদ পেয়ে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লেন। একসময়

বীরভানের যদিও বা মূর্ছার ঘোর কাটলো, কিন্তু চন্দ্রাবতীর প্রতি প্রেমের ঘোর কাটলো না। তখনও সে তেমনি সংসার-উদাসীন, প্রেমোন্মত্ত। পুত্রের অবস্থা দেখে এবারে রাজা ও রাণীও ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। তিনি পুনরায় আদেশ দিলেন চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে বীরভানকে সরণীপ যাত্রা ক'রতে। যাত্রাকালে এবারও সমুদ্রে ঝড় উঠ্‌লো। বীরভান ও সুত গিয়ে ছিট্‌কে প'ড়লো দু'দিকে। সুত গিয়ে উঠলো জলম নামক এক দেশে এবং জলমরাজ নিশাচরের সুন্দরী কন্যাকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে ক'রলো। আর বীরভান গিয়ে পৌঁছালো মণিপুর রাজ্যে। রাজকন্যা রূপবতীর সঙ্গে ছিল চন্দ্রাবতীর বন্ধুত্ব। রূপবতী এক রাক্ষস কর্তৃক অপহৃতা হয়। মণিপুররাজ মণিকন্যার অভাবে বিষণ্ণভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন। বীরভান তার নিজের অমিত বীর্য-বলে রূপবতীকে উদ্ধার করে এবং তার নিকট থেকে চন্দ্রাবতীর সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে। ইতিমধ্যে যাদুবিদ্যাবলে সুত শুকপাখীর রূপ ধারণ ক'রে বন্ধুর সঙ্গে এসে মিলিত হয়।

কিন্তু কাহিনীর পরিণতি কি দাঁড়ায়, গ্রন্থের শেষাংশের সন্ধান না পাওয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিকট তা অসমাপ্তই থেকে গেছে। চন্দ্রাবতীর গোড়ার দিকেরও কিছু অংশের সন্ধান নেই। ফলে কাহিনীর কোনো কোনো অংশে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কোনো কোনো অংশে কাহিনীর সামঞ্জস্য রক্ষা করার কাজে উত্তরকালের কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পীর লেখনী-সঞ্চালনও অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও একথা সর্ববাদীস্বীকৃত যে কবি যাগল ঠাকুরের ন্যায় সুপণ্ডিত ও রূপদক্ষ শিল্পী ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতি জগতে খুব বেশী ছিলেন না। আনুমানিক ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তিনি যেভাবে সাংস্কৃতিক যাদুস্পর্শে বাঙালী-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে গিয়েছেন, তা বাংলার সর্বকালের ইতিহাসেই অতুলনীয় হ'য়ে থাকবে।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্ ও আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের মতে: 'ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার কোনো কোনো গাথা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; এবং এই গীতিকাব্যগুলি আদর্শের দিক দিয়া 'চন্দ্রাবতী'র সহিত তুলিত হইতে পারে।'

আলোচ্য গাথা কাব্যখানিতে কাহিনীর যেমন সুবিস্তৃত পটভূমি লক্ষ্য ক'রবার বিষয়, তেম্‌নি লক্ষ্য ক'রবার বিষয় এর নাটকীয় সংঘাত। এর মধ্যে যেটুকু অবাস্তবতাদোষে দুষ্ট, তা কবিকৃত ত্রুটির জন্য যতখানি নয়, ততোধিক তদানীন্তনকালীন দেশাচার ও লৌকিক ধারণার জন্য। অতএব কবির শিল্পমর্যাদা তাতে ক্ষুণ্ণ হবার নয়।

জীবন-তৃষ্ণা

সুভাষ সমাজদার।

সমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা মাতলা হাতীর ঝাঁকের মত আছড়ে পড়ছে দীঘার বিস্তীর্ণ বেলাভূমির ওপরে। চাঁদের রূপালী আলোর চুমকি কাঁপছে ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। সমুদ্রের উদ্দাম বাতাসে ঝাউগাছের ঝিরি ঝিরি পাতাগুলো মাথা কুটছে। অজয় মুগ্ধ তন্ময় চোখে দেখছে বিপুল ব্যাপ্ত অশ্রান্ত সমুদ্রের মাতামাতি। ঝাউবনে হাওয়ার কান্না চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত গর্জিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তার চেতনা কেমন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে আসে। মনে হয় দিন রাত কুলীকামিন নিয়ে মাটি কাটা, ইঞ্জিনিয়ারদের হুকুম তামিল করা, কয়েকটা টাকার বিনিময়ে এই অবক্ষয়ী জীবনেরও ঊর্ধ্বে রয়েছে তার একটা সত্তা। কলেজ জীবনে বিভিন্ন বিতর্ক সভায় তার বক্তৃতার কথাগুলো কানের কাছে বাজতে লাগল: জীবিকার চেয়ে জীবন অনেক বড়···উপার্জনের উপায় যাই হোক না কেন, জীবনের লক্ষ্য থাকবে মহৎ আদর্শের দিকে, বলিষ্ঠ জীবন বোধের দিকে···কিন্তু আজ সে মাত্র একশো টাকা মাসিক মাইনেতে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ওভারসিয়ার হয়ে হাতুড়ি-ছেনী, ইট-কাঠ, রাজমিস্ত্রীদের উদয়াস্ত খবরদারীতে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আজ আর কেউ জানে না, কারো মনে নেই, বেঙ্গল বিহার-আসামের ইণ্টার ইউনিভার্সিটি 'ডিবেটে' সে প্রথম হয়েছিল। ছবি ছাপা হয়েছিল, দেশের নামকরা সব দৈনিকে।

—সমুদ্রের 'ভিউ' দেখা হলো? ওভারসিয়ারের এত কবিত্ব ভাল নয়—

চমকে উঠল অজয়। বালিয়াড়ির ওপরে গলাবন্ধ কোটটার বোতাম পর্যন্ত লাগিয়ে মুরারির হোটেলের বোর্ডার পূর্ণেন্দুপ্রকাশ দাঁড়িয়ে আছে। ঠেলেওঠা চোয়াল। রুক্ষ চুল, হাড়ের ফ্রেমে বাঁধানো জরাজীর্ণ কাঠামো। মিটি মিটি হেসে পূর্ণেন্দুপ্রকাশ আবার বলল —এত কাব্যি যে করছেন, মুরারির হোটেলের অন্নর মহল থেকে কোন প্রেরণা পেয়েছেন না কি?

—মানে? আপনি কি বলছেন পূর্ণেন্দু বাবু? হেঁয়ালী ছেড়ে দিয়ে খুলে বলুন—অধৈর্য হয়ে চীৎকার করে উঠল অজয়।

কোন কথা বলল না পূর্ণেন্দুপ্রকাশ। শুধু সমুদ্রের উদ্দাম ঝড়ো বাতাসে একটা ধূর্ত খুক খুক হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বালিয়াড়ির উঁচু ঢিপি থেকে নেমে গেল পূর্ণেন্দুপ্রকাশ। দূর থেকে হেঁকে আবার বলল—হোটেলে আসুন অজয় বাবু। খাওয়ার সময় হয়ে গেছে—পূর্ণেন্দুপ্রকাশের কথার সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটা যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে অজয়ের বুকের রক্তস্রোত। মনের ভেতরে তীব্র কৌতূহল নিয়ে সে চোখদুটো ছড়িয়ে দিল দূরে বিস্তীর্ণ বালুচরের দিকে, যেখানে একটার পর একটা সমুদ্রের ঢেউ তার পাশব মত্ততা নিয়ে আছড়ে পড়ছে।

অজয় বালিয়াড়ির ওপর থেকে নেমে এল। ঝাউ-বনের কাছে উঁচু নীচু প্রান্তরে অনেক তাঁবু খাটানো হয়েছে। দীঘায় নতুন টাউন তৈরী হচ্ছে। সার্ভেয়ার রাজমিস্ত্রী, আর সাব-ওভারসিয়ারদের তাঁবুর ভেতর থেকে হারিকেনের ম্লান আলো ছিটকে এসে পড়ছে বালু-চড়ানো মাঠের ওপরে। উড়িয়া আর রিফিউজি বাঙালী কুলীদের তাঁবু থেকে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। তারা ইট দিয়ে তোলা উনানে পাতা পুড়িয়ে রান্না করছে।

—জানি, জানি এসব তোমার কারসাজি—মুরারির হোটেলের পাশে একটা ছোট্ট ঘরের বন্ধ জানালার ভেতর থেকে একটা মর্মান্তিক আক্রোশের চীৎকারে আছড়ে পড়ল বাইরে।—তোমার সুন্দর মুখ দেখিয়ে টাকা কামিয়েছো। আর তাই দিয়ে আমাকে রাজভোগ খাওয়াচ্ছো। যাও তোমার পাপের টাকার অন্ন আমি

স্পর্শ করবো না——হোটেলের বাইরের বারান্দায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অজয়। একটা ঘুমজড়িত গলার স্বর শোনা গেল—এই রে, আবার আরম্ভ হলো? নাঃ ঘুমুতে দেবেনা দেখছি। পূর্ণেন্দুপ্রকাশের গলা মনে হচ্ছে। খট্—খট্—খট্—পূর্ণেন্দুর দরজায় সজোরে কড়া নাড়ল অজয়। দরজার কপাটের ফাঁকে চোখ লাগিয়ে সে দেখল, ঘরের মেঝেয় পায়চারি করছে পূর্ণেন্দুপ্রকাশ। মুখের শুকনো চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে নিবিড় পরিতৃপ্তির আভা।

—পূর্ণেন্দু বাবু দরজা খুলুন—চেঁচিয়ে ওঠে অজয়। বন্ধ দরজার ওপার থেকে উত্তর এল—আগে খেয়ে নিন ওস্তারসিয়ার সাহেব, পরে আমার ঘরে আসবেন—

হোটেলের লম্বা বারান্দার পশ্চিম দিকে টিনের ঘরটার জানালা খুলে গেল। আলোকিত জানালার খোপটা টানা একটা ঝুতি অস্ফুট গলায় বলল—রান্নাঘরে আপনার ভাত ঢাকা আছে। খেয়ে নিন। ঠাকুর চাকর চলে গেছে—জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে চিঁ চিঁ করে একটা শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল—মা, তোমরা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছো কেন? মেরে ফেল—আঃ—নিরুদ্ধ একটা যন্ত্রণার প্রলাপ কড়ো বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেল।—

—আবার দরজা বন্ধ করতে গেলে কেন? যাও না—যাও তুমি নিজেই শ্রীহস্তে পরিবেশন করে এস ঐ সুন্দর ফুটফুটে ছোকরাকে—

আঃ কী সব বলছো? ওগো এমনি করে বলো না। অযথা সন্দেহ করে তুমি নিজে কষ্ট পেও না—

পাতলা অন্ধকার ঘেরা নিঃসীম সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসছে রুদ্ধ বাতাসের গর্জন। স্থির দৃষ্টিতে রাউ-কলের দিকে তাকিয়ে রইল অজয়। মনের ভেতরে জলাদরা চিস্তার বুদ্বুদ ভেসে উঠল—তাকে জড়িয়েই মুরারি বাবু তার স্ত্রীকে এই কুৎসিত সন্দেহ করছে! আশ্চর্য আজ পর্যন্ত সে একবারও ঐ বৌটির মুখ দেখে নি!

রান্নাঘরে বসে ভাত খেতে বসল অজয়। কিন্তু কিছুই খেতে পারল না। হোটেলের মালিক মুরারির অযৌক্তিক সন্দেহটা বিষিয়ে দিয়েছে তার মন।

পূর্ণেন্দু বাবু কি ঘুমিয়ে পড়লেন? দরজার ওপার থেকে বলল অজয়।

না। আপনার খাওয়া হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে কথা আছে। ভেতরে আসতে পারি একটু?

কালিপড়া লণ্ঠনের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে পূর্ণেন্দুপ্রকাশ। মুখের একপাশে আলো পড়েছে, আরেক পাশে অন্ধকার।

কি ব্যাপার বলুন তো পূর্ণেন্দু বাবু? মনে হচ্ছে, আমাকে জড়িয়ে মুরারি বাবু তার স্ত্রীকে কিছু বলছে?

কোন কথা বলল না পূর্ণেন্দু প্রকাশ। কিন্তু তার ছোট ছোট ধারালো চোখের তারাদুটো ঝিকি ঝিকি জ্বলে উঠল।

হোটেলের মালিকের মাথায় একটু বিকার আছে। আর আছে রোগ—

রোগ?

হ্যাঁ। সন্দেহ রোগ। স্ত্রীর ওপরে হীন সন্দেহে তার মন সব সময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে—

—তা দেখুন, আমার সঙ্গে তো তাঁর স্ত্রীর আলাপ পর্যন্ত নেই—

আলাপ নেই, হতে কতক্ষণ? শুনেছি—না থাক, কিছু বলবো না—কোটের কলারটা খিমচে ধরে একটা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস চাপতে চাপতে আরও কি যেন বলতে যেয়ে থেমে গেল পূর্ণেন্দুপ্রকাশ।

খুলে বলুন পূর্ণেন্দু বাবু। এখানে থাকা কি ঠিক?

কেন নয়? হো হো করে হেসে উঠল পূর্ণেন্দু প্রকাশ। চারিদিকের ঘন অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে তার হাসির শব্দ বয়ে গেল লহরে লহরে। বিমূঢ় হয়ে বসে রইল অজয়।

সমুদ্র তীরের জনপদে রাত্রি নেমেছে গভীর হয়ে। সাঁওতালদের কুমার সাহেবের বিশাল প্রাসাদের দিক থেকে আটশো হর্স পাওয়ারের ডায়নামোর ভট্ ভট্ শব্দ ভেসে আসছে। সার্জেন্টার, রাজমিস্ত্রী, কুলীদের ছাউনিগুলো অন্ধকারে ডুবে গেছে।

দাঁড়াও এখানে। এই দেখ মাছিগুলোকে যেমন টিপে টিপে মারছি, তেমনি করে তোমাকে মারবো গলা টিপে—ক্রুদ্ধ বিদ্রূপ একটা তীব্র চীৎকারে কেঁপে উঠল চারিদিক। ঘর থেকে বেরিয়ে এল অজয়। হোটেলের মালিকের ঘরের আলোকিত জানালাটার দিকে তাকিয়ে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। একটা নীলাভ কাঁচের বয়মের ভেতরে একরাশ কালো কালো মাছি ঘুর ঘুর করছে। বয়মের ঢাকনা খুলে এক একটা মাছি বের করে কাঠের টেবিলে ঘষে ঘষে মারছে হোটেলের মালিক মুরারি মোহন চৌধুরী। চোয়াল দুটো মিলের মত এঁটে বসেছে তার গালে। রক্তবর্ণ চোখের তারাদুটো হত্যার উল্লাসে ছটফট করছে। দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে তার স্ত্রী একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। কান্নাভরা গলায় সে বলছে—ওগো, এমনি করে মাছির মত টিপে মের। অনেক হয়েছে। এইবার ঘুমোও লক্ষ্মীটি—

চুপ রও। তোমার ন্যাকামি আমি বিশ্বাস করিনা—রাগে উন্মত্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুরারি।

—আমার চালচলনে কখনো তুমি কোন ত্রুটি দেখেছো?

ফের কথা? এই বয়ম ছুঁড়ে মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব—নিশ্চিত একটা মৃত্যুর ষড়যন্ত্রের মত ঘরময় পায়চারী করতে লাগল তার ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ মূর্তিটা।

মা, আমার ঘুম আসছে না। চোখদুটো জ্বালা করছে পাশের ঘর থেকে করুণ কাতর গলায় চেঁচিয়ে উঠল মালিকের ভয়বহুরের বিকলাঙ্গ ছেলে। মুরারির স্ত্রী ধীর পায়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

দিন কাটে। দীঘায় নতুন সহর তৈরীর কাজ দ্রুত এগিয়ে যায়। রাজমিস্ত্রী, কুলী মেয়ে পুরুষের গানে হাউবন আর ঝোপঝাড়ে ভরা দীঘার বিজন সমুদ্রতীর মুখর হয়ে ওঠে। মাচা বাঁধার জন্য সারি সারি আকাশ-ছোঁয়া বাঁশগুলোর দিকে তাকিয়ে ছাতা ছাড়া গলায় অজয় বলল—আমার মনে হয়, মুরারি বাবুর কোন রোগ আছে—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন।

পূর্ণেন্দু প্রকাশ বালিয়াড়ির ওপরে বসে একটা ঘাসের শীষ দাঁতে কাটতে কাটতে আনমনা হয়ে আবার বলল—বেচারা ঐ গীতা বড় কষ্ট পায়। ভীষণ দুঃখের জীবন ওর—

—হ্যাঁ আমি কাল রাত্রে সব দেখেছি ওদের জানালা দিয়ে। অদ্ভুত একটা বাই মশায়! এক বয়ম বোঝাই মাছি নিয়ে টিপে টিপে মারে—

—দুপুরে খাওয়ার পর ঐ গীতাকেই মাছি ধরে ধরে বয়মে পুরে রাখতে হয় রাত্রে তার উন্মাদ স্বামীর পাগলামির খেলার জন্য—আশ্চর্য, দিনের পর দিন স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে গীতা।—ফিকে অন্ধকারে অজয় দেখতে পায় না, পূর্ণেন্দুর চোখে ধারালো হাসি ঝিকমিক করে। তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিতে মুখটা বেঁকিয়ে পূর্ণেন্দু বলে—শুধু সহ্য করে নয়। ওর পতিভক্তি দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। দুপুরে ঐ স্বামীর সরু সরু ঠ্যাঙদুটো কোলের ওপর টেনে নিয়ে সরষের তেল মালিশ করে। গুন গুন করে গীতা পড়ে—

বলেন কি? আশ্চর্য তো?

হ্যাঁ—হ্যাঁ, আশ্চর্যই মশায় আশ্চর্য! জানেন? মলে পূর্ণেন্দুপ্রকাশ—মেয়েরা সেই আশ্চর্য জীব। চতুর, সংযত, আত্মস্থ, যে কোন অবস্থায় অবিদ্রোহী, কখনো মাথা খোঁড়ে না অসম্ভবের পায়। আপনার বিরুদ্ধাচরণ না করেই আপনাকে হারিয়ে দেয়—উঠে দাঁড়াল পূর্ণেন্দুপ্রকাশ। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে ঢাকা সমুদ্রের উত্তাল জলরাশির দিকে চোখ দু'টা ছড়িয়ে দিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বলল।

—কিছু বলছেন পূর্ণেন্দুবাবু?

—আমি তিন বছর থেকে আছি এই হোটেলে

বুঝলেন? সবই আমি জানি—হঠাৎ চুপ করে গেল পূর্ণেন্দুপ্রকাশ। চোখে ব্যথার ছায়া পড়ল। রাত্রির অন্ধকার মাখা নিবিড় আউটরের দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় আবার বলল—মানুষের মনটাও হিংস্র ঐ অরণ্যের মতই অজয়বাবু! নাম না জানা গাছপালার মত কত কিছু শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে আছে মনের চারিদিকে—

তত্ত্ব কথা রেখে খোলাখুলি বলুন না পূর্ণেন্দুবাবু কি আপনি জানেন ওদের সম্বন্ধে?

—জীবনের প্রতিটি ঘটনার মূলেই একটা না একটা তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু অজয়বাবু—

—হ্যাঁ জানি, প্রতিটি 'একেক্টের' আড়ালে তার একটা 'কজ' থাকে। জীবনটা আকস্মিকতার মালা গাঁথা নয়—

—আমি রিপ্লীক—বলে করে দেশলাই জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে বলল পূর্ণেন্দুপ্রকাশ—'রায় এ্যাণ্ড সন্সে'র কাঠের ফার্মে কাজ করছি আজ প্রায় পাঁচ বছর। উড়িষ্যার মধুবনীর জঙ্গলে, ঝাড়গ্রামে আমার ছন্নছাড়া জীবনের বহু বছর কেটেছে। নানা ব্যবসায় টাকা রোজগার করেছি অনেক। কিন্তু খাওয়ার লোক নেই। স্নেহ মমতা দিয়ে ঘেরা একটা সংসারের মোহ আমার রক্তের ভেতরে কেঁদে ওঠে অজয়বাবু। তার কথাগুলো কাতর কান্নার মত শোনাল।

—বিয়ে করেন নি কেন?

—জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো কাজ। আদি বাড়ী বরিশালে, পাকিস্থানে। সহসা কোন মেয়ের বাপ রাজী হয় না। শুধু তাই নয়, আমার একনাত্র ছেলে কলকাতার বোর্ডিংএ থেকে পড়ে—চুরুটের এক একটা টানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আগুনের দীপ্তিতে দেখা গেল কঠিন হয়ে উঠেছে পূর্ণেন্দুর মুখের রেখাগুলো। হঠাৎ বলল—গীতাকে আপনার কি রকম মেয়ে মনে হয়?

কেন বেশ তো, পড়াশুনায়। শান্ত শিষ্ট একটা মেয়ে। এছাড়া আর কি মনে হবে?

—তাই মনে হয় বটে। কিন্তু আপনি জানেন না, কী ভয়ঙ্কর মেয়ে মশাই!

—কেন?

—আমার ধারণা ছিল, মেয়েরা মোটামুটি স্বাস্থ্যবান একটা স্বামী পেলে আর ঘরে কোন জিনিসের অকুলান না হলেই সুখী হয়, ধীরে ধীরে তারা মোটা হয়—

—না পূর্ণেন্দুবাবু—অজয়ের আদর্শবাদী মনটা উত্তপ্ত হয়ে উঠল—মেয়েদের আপনি এত মেটিরিয়েলিষ্ট ভাবছেন কেন? ওরা যে সে নয়—সে রকম মেয়ে হলে পুরুষের ভেতরে ওরা দেবত্ব জাগিয়ে দিতে পারে—

হুঁ, সংসারে আপনার অনেক দেখতে বাকী আছে অজয়বাবু। ধোঁয়াটে বড় বড় থিয়োরী বুঝি না। কাঠের ব্যবসা করি। জীবনটা আমার কাছে 'হার্ড ফ্যাক্ট'—একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আবার বলল—আমি এটা বুঝি না, একটা কুৎসিত রোগগ্রস্ত উন্মাদ স্বামীর সেবা করে দারুণ অভাবের সংসারে কি করে বেঁচে থাকতে পারে অমন ফুলের মত একটা মেয়ে? কিন্তু সবই পেতে পারতো। ও—আরও কি যেন বলতে গিয়ে বাদবাকী বক্তব্যটা তার গলার ভেতরে আটকে গেল। উঠে দাঁড়াল পূর্ণেন্দুপ্রকাশ। চোখের তারা দুটো দপ দপ করে জ্বলছে। নিদারুণ উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে তার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ রেখা।

আমি যাই অজয়বাবু, কাল ভোরের মোটরে কলকাতায় যেতে হবে। আমার 'সিজন' তো শেষ হয়ে এল। এখন উড়িষ্যায় যেতে হবে—বালিয়াড়ি থেকে দ্রুত পায়ে নেমে গেল পূর্ণেন্দুপ্রকাশ।

আবার আসবেন না দীঘায়?

না। আর আসবো না—পূর্ণেন্দুপ্রকাশের তীক্ষ্ণ গলার স্বর ঝড়ো বাতাসে ঘুরে মিলিয়ে গেল। পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল অজয়।

ঘুম এল না অজয়ের চোখে। দরজা খুলে বাইরে

এল। রাত্রি শেষ হতেও আর দেরী নেই। দূরে পশ্চিম দিগন্তের আকাশের ম্লান পাণ্ডুর চাঁদ সমুদ্রের ভেতরে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। দরজা খুলে বাইরে এল অজয়।

—না, কোন উপায় নেই, মাফ করুন। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি পূর্ণেন্দুবাবু—গীতার কাতর করুণ গলার স্বর কান্নায় ডুবে গেল। বিদ্যুদ্‌গতিতে একটা খড়ের গাদার পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল অজয়। কিন্তু দু' চোখে তীব্র কৌতূহল জালিয়ে তাকালো হোটেলের মালিকের অন্ধকার ঘরের পাশেই ছোট ঘরটার আলোকিত জানালার দিকে। জানালার গরাদের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণেন্দুপ্রকাশ। আর ভেতরে তক্তাপোষের ওপরে একটা নিষ্প্রাণ শিলামূর্তির মত বসে আছে গীতা। দুই চোখের দুই কোল বেয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। উন্মত্ত একটা আশায় পূর্ণেন্দুপ্রকাশের গলার স্বর কলকল করে উঠল—রোগ, অভাব, অনটন আর অত্যাচারের ভেতর থেকে চলে এসো না গীতা? তোমাকে আদরে ভালবাসায় ভরে দেব—

—না, না, কোন উপায় নেই, পূর্ণেন্দুবাবু—চাপা গলায় হিসিয়ে উঠল গীতা। বাঁ হাতে কপালটা টিপে ধরে নিরুদ্ধ একটা যন্ত্রণার আলায় ছটফট করে উঠল।

আশ্চর্য! বলেই খোঁচা খাওয়া একটা সাপের মত ঘুরে দাঁড়াল পূর্ণেন্দুপ্রকাশ। কীটব্যাগটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে হাতে সুটকেশ নিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে হেঁটে চলতে শুরু করল মোটর ষ্ট্যাণ্ডের দিকে। সমুদ্রের গর্জিত বাতাসে হোটেলের পাশে কলাগাছের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শুকনো কলাপাতার কালর একটানা ফর ফর শব্দ করে চলল।

—'বেশ ছিলাম সমুদ্রের ধারে ঝাউবনের জঙ্গলে নিরিবিলি—চাপা আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে বলে মুরারি—শালা এখানে শহর হচ্ছে, এখন কত উটকো লোক আসবে, পয়সা ছিটাবে। রূপের জৌলুস দেখিয়ে তুমি কিছু আরও করবে—

—সেই সন্দেহের বিষেই তো জলে পুড়ে মরলে। কিন্তু তুমি যা বলছো তার উল্টো হচ্ছে—শীতল গলায় বলল গীতা।

—কি রকম?

—সব হিসেব মিটিয়ে দিয়ে পূর্ণেন্দুবাবু চলে গেছেন এখান থেকে—ইজিচেয়ারে এলিয়ে দেওয়া মুরারির শিথিল দেহটা হঠাৎ তীরের মত সোজা হ'য়ে গেল। আগুন চকচকে চোখে গীতার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি নিশ্চয়ই তোমার হাস্যেলাস্যে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলে? পাশের ঘরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অজয়। বলো সত্যি করে—আবার গর্জে উঠল মুরারি—আমার মনে হয় তুমি পূর্ণেন্দুবাবুর ঘরে রাত্রেও যেতে। ভদ্রলোকের ছেলে তোমার ভয়ে ইজ্জৎ নিয়ে পালিয়েছে—

কি বললে? গীতার শান্ত চোখ দুটো দপ করে উঠল। কিন্তু কোন কথা বলল না। চাবির গোছা ঝনাৎ করে আঁচলে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বাধা এল। শোন দাঁড়াও—চলে যাচ্ছো যে! রাত-জাগা মুখ দেখাতে লজ্জা করছে? মুরারির লাল চোখের তারা দুটা থর থর করে কাঁপছে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—বলো, তুমি তার কাছে যাও নি?

—না। তোমার সন্দেহ ভুল—

আমার সন্দেহ ভুল? উন্মত্ত রাগে টিপয়ের ওপরে থেকে কাঁচের ফুলদানীটা তুলে লয়ে ছুঁড়ে মারলো গীতার দিকে।

উঃ বাবা গো! কেটে যাওয়া কপালটা চেপে ধরে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল গীতা। সাদা শাড়িতে রক্তের ছাপ লাগল।

এ আপনি কি করলেন?, ঝড়ের মত অজয় ঘরে ঢুকল। উত্তেজনায় রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল—আপনার স্ত্রী হলেও, মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলার কোন অধিকার নেই আপনার। ছিঃ ছিঃ—

—আপনি বাইরে যান—আদেশের সুরে মুরারি বলল—কেন আপনি এসেছেন আমাদের স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে, একেবারে অন্তরে?—

মুরারির কথা যেন শুনতেই পেল না অজয়। হোটেলের চাকর ভুতুকে বলল—আমার ঘর থেকে বেনজুইনের শিশিটা নিয়ে আয়—কাটা জায়গাটায় বেনজুইন লাগিয়ে দিয়ে ওরসা ব্যাণ্ডেজ করে দে—বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অজয়।।

সমুদ্রের একটানা তীব্র আর্তনাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল গীতা।

দুপুরে খেতে এল অজয়। ঘোমটা টেনে নিশব্দ পায়ে গীতা এই প্রথম তার সামনে এসে দাঁড়াল। নরম গলায় বলল—আমাদের এই নোংরা ব্যাপারে আপনি আর আসবেন না অজয়বাবু। কোনদিন আপনাকেও অপমান করবে—

আপনি এখন যে এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ করছেন মুরারিবাবু জানলে—

না, তাঁকে মফিয়া ইনজেকশান দেওয়া হয়েছে। উনি ঘুমুচ্ছেন—

আচ্ছা আপনি দিনের পর দিন এত অত্যাচার কি করে সহ্য করেন? কেন আপনি প্রতিবাদ করেন না? ঘোমটার ভেতরে গীতার বড় বড় চোখ দুটো হঠাৎ কেঁপে উঠল। বলল—মেয়েদের একটু সয়ে যেতেই হয় অজয়বাবু। কথার মোড় ঘুরিয়ে আবার বলল—হোটেলে আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

—ছয় মাসে যখন কোন অসুবিধা হয় নি, তখন আর নতুন কোন কষ্ট হবে না। কয়দিনই বা থাকবো—

আপনি চলে যাবেন? গীতার কথায় বেদনার আভাস ফুটে উঠল।

—আমরা নতুন ওভারসিয়ার। আমাদের তো বেশীদিন এক জায়গায় রাখে না—

মাসের পর মাস কেটে যায়। দীঘায় নিউ টাউন-শিপের স্বাক্ষর নিয়ে প্রথম তৈরী হয় 'ক্যাফেটারিয়া'। প্রায়ই কলকাতা থেকে মন্ত্রীরা আসেন। উৎসবে আর সমারোহে মুখর হয়ে ওঠে নিস্তব্ধ বিজন সমুদ্রতীর। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ দীঘার বিবরণ আর ছবি ছাপা হয় দেশের সব নাম করা দৈনিকে। সুদূর অতীতে একদা দীঘার সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস বলেছিলেন—ব্রাইটন অফ বেঙ্গল। অজয়ের মনে হয় হেষ্টিংসের সেই মুগ্ধ উচ্ছ্বাস এতকাল পরে কার্যকর হয়ে উঠছে এই দীঘায়। ব্রাইটনের মতই সুদৃশ্য সহর গড়ে উঠবে সমুদ্র তীরবর্তী এই জনপদে। কিন্তু মুরারির বুকের ভেতরে একটা রুদ্ধ আক্ষেপ আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলে। সে ঘরে পায়চারী করে আর বলে—যাবে,—সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ঝাউবন থাকবে না কেয়ার ঝোপ থাকবে না। শুধু ইট কাঠ পাথরের বাড়ীতে ছেয়ে যাবে দীঘা। রাস্তায় ঘাটে কৃমির কীটের মত মানুষগুলো কিলবিল করে বেড়াবে—মুরারির কথায় তরুণ ওভারসিয়ার অজয়ের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির রেখা ফোটে। পাগলের আবার ওদিকে আছে। 'ওল্ড প্রিমিটিভ বিউটি'র ওয়ারশিপার! নরম গালিচার মত সাদা ধবধবে বালুচরের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিতেই অজয়ের চেতনা কেমন যেন ঝিমিয়ে আসে। উঁচু উঁচু বালিয়াড়ির ওপরে ঘন কেয়ার ঝোপ সাদা জ্যোৎস্না গায়ে মেখে পরম আরামে ঘুমিয়ে আছে। তারপরেই ঘন নিবিড় ঝাউ গাছের অরণ্য। গর্জিত সমুদ্রের অশ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খলতার পাশেই এপারে যেন অগাধ শান্তির রাজ্য। যেন কোন সুদূর আবছায়া স্বপ্নের দেশ। মুহূর্তে তার মনের ভেতরে একটা নিষ্ঠুর সত্য আলোর মত ঝলসে উঠল; মুরারির পাশে যেমন গীতা, তেমনি অশান্ত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের পাশেই ঝিরি ঝিরি হাওয়ার সোহাগে মর্মরিত শান্ত, স্নিগ্ধ ঝাউবন। গীতা বেচারা! রাত্রির নিরালায় সকলের অলক্ষ্যে শিউলী ফোটার মত তাদের পরস্পরের ভেতরে নিবিড় প্রীতি ফুলের মত ফুটে উঠেছে। অজয়ের ভাল

লাগে শান্ত, নম্র, বড় দুঃখী গীতাকে! মনের ভেতরে ভেসে উঠল গীতার বিষণ্ণ মুখখানা। সে একদিন বলেছিল—তোমাকে যখন মুরারিবাবু যখন তখন অকারণে মারে, যা-তা বলে, আমার তখন বড় কষ্ট হয় গীতা—

কোন কথা বলে নি গীতা। শুধু আঙুলে শাড়ির আঁচলটা জড়াচ্ছিল ক্রমাগত। কপালে লজ্জার আভা ফুটে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত পর যেন স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করে বলেছিল—আপনি ভালবেসে ফেলেছেন বোধহয় খুবই আমাকে। আপনিও বড় কষ্ট পাবেন—

—কেন গীতা? প্রেম ভালবাসা আনন্দের নয়, দুঃখেরই, মানুষ তা জানে। তবুও ভালবাসে—গীতার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি নিবিড় হয়ে উঠেছিল। আর অজয়ের বুকের ভেতরে চকল হয়ে উঠেছিল একটা নিশ্বাসে। কিন্তু কি একটা কাজের অছিলায় ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল গীতা।

অষ্টপ্রহর নাকের পাটা ফুলিয়ে হুঙ্কে হয়ে বিষের গন্ধ শুঁকে বেড়ায় মুরারিমোহন চৌধুরী। রোগজর্জর দেহটা বাঁকিয়ে বলে—ঐ সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলনি তো?

গীতা পাথরের মত নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখখানায় কোন বিরক্তির চিহ্ন ফুটল না। মুরারির দিকে ফিরে বসে বিকলাঙ্গ ছেলেটিকে খাওয়াতে বসল। কিন্তু অজয়ের সঙ্গে হোটেলওয়ালার স্ত্রীর মাখামাখির কথা নিয়ে নতুন টাউনের কনষ্ট্রাক্শন ইঞ্জিনের ভেতরে খুক খুক চাপা হাসির সঙ্গে যে আলোচনা চলতো, সেই মুখরোচক আলোচনাই একেবারে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল একটা ঘটনায়।

সেদিন রাত্রিশেষের অন্ধকারে তখনও আকাশে তারাগুলো দপ দপ করছিল। অজয় আর গীতা গভর্ণমেণ্টের ইরিগেশন এ্যাণ্ড ওয়াটার ওয়ার্কসের বাংলোর পাশের রাস্তা ধরে চলেছিল সমুদ্রের দিকে। অজয়ের মনটা আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে। কতদিন পর তার একটা একান্ত বাসনা সফল হতে চলেছে। বহু অনুরোধ আর অভিমান করেও গীতাকে সে কোনদিন বাড়ীর বাইরে আনতে পারে নি। কেউ যদি দেখে ফেলে, এই ভয়ে সে কোনদিন রাজী হয় নি। বছরের পর বছর সমুদ্রের ধারে থেকেও গীতা কোনদিন সূর্যোদয় কি চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত সমুদ্রের রূপ দেখে নি! অনেককাল পরে অজয়ের সঙ্গে সেই রাত্রিশেষের চাঁদের আলোয় ভরা অবারিত আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল গীতা। উদ্দাম হাওয়ায় গীতার চুল উড়ছিল। শাড়ির আঁচল বাতাসে কেঁপে উঠছিল। বিপুল আনন্দে অজয় চেঁচিয়ে বলে উঠল—আঃ গীতা! তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে! মুগ্ধ অপলক দুটো চোখের দৃষ্টি ভাসিয়ে দিয়েছিল গীতা অদূর সমুদ্রের নীলিমার দিকে। অস্ফুটস্বরে বলেছিল—কতকাল পরে যে আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছি, সমুদ্র দেখছি। বালিয়াড়ির চড়াই উতরাই পেরিয়ে তারা বালুচরে এসে দাঁড়াল। দূরে পশ্চিমের আকাশ সমুদ্রের জলের ভেতরে যেন রক্তালী আগুন ধরে গেছে। ম্লান বিষণ্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে অতলান্ত সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে ডুবিয়ে তারা বালুচরের ধার ঘেঁসে হেঁটে চলেছিল বহুদূরে। কিশোরীর মত উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভেঙে ভেঙে পড়ছিল গীতা। বলেছিল—আমার মরতে ইচ্ছে করছে অজয়বাবু—

—হ্যাঁ, মৃত্যুই কিন্তু এই মুহূর্তটিকে চিরন্তন করে দিতে পারে—

—কি রকম?

এখুনি একটা বিশাল ঢেউ যদি আমাদের দুজনকে দূর সমুদ্রের ভেতরে টেনে নিয়ে যায়, তাহলে আমাদের বাঁচার কোন আশা নেই। আমরা মরে যাবো, কিন্তু সত্য হয়ে রইবে তোমার আমার এই অন্তহীন প্রীতিতে ভরা মুহূর্তটি—অজয় যেন কথার ভেতরে তোমের এই বিহ্বল মুহূর্তগুলিকে ফুলের মত ছড়িয়ে দিতে চায়। গীতার মনে হয়েছিল, শেষ রাত্রির একটা মিষ্টি স্বপ্নের

রাস্তার ভেতর দিয়ে তারা চলেছে। কথা বলতে বলতে তারা বাসচুর ছাড়িয়ে, বালিয়াড়ি ছাড়িয়ে সীধার নতুন শহরের ইট—কাঠ—পাথর ছড়ানো জায়গায় চলে আসে।

—দেখ গীতা; সাবধানে যেও, বলে উঠেছিল অজয়। সরু পায়েচলা পথের একদিকে উঁচু বালির ডিবি। আরেক দিকে নিউ টাউনের জল নিকাশের জন্য একটা বড় ড্রেন তৈরী হচ্ছে।

ও মা! এত বড় নর্দমাটা খুঁড়েছেন কেন?

—নর্দমা নয় গীতা। সীধার নতুন টাউনের সব বাড়ীতে ফিলটার ওয়াটার সাপ্লাই করা হবে। ঐ ড্রেনের ভেতরে মোটা পাইপ বসবে।

—সীধার নতুন শহরের বাসিন্দাদের জন্য আপনারা কত কিছু করছেন। তারা কি আপনাদের কথা মনে করবে? আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল গীতা। তার হাত দু'খানা নিজের হাতের ভেতরে নিয়ে অজয় বলেছিল—কেউ না করলেও, একজনের মনে হলেই আমি খুশী।

কে সে? কৌতূহলে চোখদুটো চক চক করে উঠেছিল গীতার।

—তার নাম গীতা!

—কি যে বলেন—মিষ্টি মিষ্টি নরম কথার গুপগুপানি মুহূর্তে তীব্র আর্তনাদে কেঁদিয়ে উঠল। চীৎকার করে অজয় বলল—এ কি গীতা, তুমি পড়ে গেলে? লাগে নি তো! দেখ তো, বললাম সাবধানে চলো—

—আমাকে তুলুন,—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমার পাদুটো কাদায় ডুবে যাচ্ছে—বর্ষার জল জমে থাকা নতুন কাটা ড্রেনের প্যাচপেচে কাদার পাঁকে দাঁড়িয়ে লজ্জায় আর ভয়ে ঘামতে লাগল গীতা। যে সরু রাস্তা ধরে অজয় আর গীতা হাঁটছিল, সেই রাস্তাটা একটু আগে গিয়ে পীচঢালা পাকা রাস্তা—কন্টাই রোডে পড়েছে। হেডলাইটের তীব্র আলোর কন্টাই রোড চমকে দিয়ে একটা ইট বোঝাই ট্রাক আসছিল। সমুদ্রের দিকের সরু রাস্তাটা আর কন্টাই রোডের সংযোগের কাছে এই ভোরে অজয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ড্রাইভার বলল—এ কী! ওভারসীয়ার বাবু, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন? আরে অজয় যে! ভুলিয়ার ইঞ্জিনিয়ার শিবদাসও অবাক হয়ে বলল—তুমি কি মর্ণিং ওয়াক করতে বেরিয়েছো?

আমাকে তুলুন, আমার দম আটকে আসছে—লজ্জা সংকোচ ভয় এড়িয়ে প্রাণের দায়ে চেঁচিয়ে উঠল গীতা।

এ কী! ড্রেনের ভেতরে মেয়েছেলের গলা! শিবদাস দু'পা ছিটকে সরে দাঁড়াল। বলল—এখানে মেয়েছেলে নিয়ে কি করছো অজয়? সকলে মিলে গীতাকে টেনে তুলল। কাদামাখা ভিজে শাড়িটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মুখ নীচু করে ঝড়ের বেগে বাড়ীর দিকে চলে গেল গীতা। নিঃপ্রাণ একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল অজয়। পরদিন সকালে এই ঘটনাই ডালপালা ছড়িয়ে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। অজয়ের উঁচু মাথা নীচু হয়ে গেল।

একেবারে বদলে গেল গীতা। অজয়ের ঘরে আর আসে না। তার সঙ্গে কথা বলে না। রোগগ্রস্ত স্বামীর প্রতি তার মনোযোগ বেড়ে যায়। পরম মমতায় মুরারিকে জড়িয়ে ধরে বলে...তোমাকে আমি ভাল করে তুলবোই—

নির্জন একক ঘরে বসে চিন্তার ঝড়ে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অজয়ের মন; তার কি দোষ? সে তো কোন অন্যায় করে নি। গীতা তার সঙ্গে এরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে কেন? আবার মনে হয়, রোগগ্রস্ত স্বামীর অত্যাচার, রোগা ছেলের ঘ্যানর ঘ্যানর কান্না আর অভাবের সংসারের শ্বাসরোধী অন্ধকার থেকে জীবনে যে একটি দিন সে আকাশভরা জ্যোৎস্নার মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিল, সেইদিনই কোথা কঠিন আঘাত পেয়েছে। গীতার জন্য সহানুভূতিতে তার মন ছেয়ে যায়। কিন্তু গীতা তার সঙ্গে কথা বলে না কেন?

গীতা কথা বলল শেষবারের মত। মফিয়া ইনজেকসনের প্রভাবে অঘোরে ঘুমুচ্ছে মুরারি। বাউবনে বড়ো বাতাসের অশান্ত গর্জনে বিক্ষুব্ধ রাত্রিটা যেন বুক চেপে গুমরে গুমরে কাঁদছে।

খট্-খট্-খট্—গীতার দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। দরজা খুলল গীতা। আবছায়া অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে সে বলল—কি বলবেন? আমার কাছে কিছু দরকার আছে কি?

আমি কাল চলে যাবো গীতা; আমার ট্রান্সফার অর্ডার এসেছে—তরল অন্ধকারে গীতার চোখদুটো ম্লান নক্ষত্রের মত দপ দপ করে উঠল। নিঃশব্দে বাইরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। অজয়ের বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল। অজয় বলল—সেই ঘটনার পর একমাস থাকলাম। তোমার কি যে হলো, তুমি একটা কথাও বললে না গীতা। আমি কি দোষ করেছি বল? ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত দুটো হাতে গীতাকে আরও কাছে টেনে নিল। গীতা জল টলমল দুটো চোখের দৃষ্টি তুলে ধরল অজয়ের মুখের দিকে। কান্নায় ভরা অস্ফুট গলায় বলল—আপনার কোন দোষ নেই। আমারই নিজের ওপরে বিশ্বাস কম বলেই আপনার কাছ থেকে সরে এসেছি।

—সরে আসতে হবে না গীতা—আকুল আগ্রহে প্রায় দেড়মাস আগে এইরকম একটা রাত্রিশেষের ভোরে পূর্ণেন্দু যেমন করে বলেছিল, তেমনি করে অজয়ও বলল—তোমাকে এই অত্যাচার আর কষ্টের ভেতরে রেখে চলে যেতে পারবো না গীতা। তুমি আমার সঙ্গে চল—গলার স্বরে আকুলিত আবেদন ঝরে পড়ল।

না, না, তা হয় না—গীতার নিঃশ্বাসে কান্নার ছাপরের মত একটানা শব্দ। থর থর করে কাঁপছে সারা দেহ। অজয়ের হাতদুটো ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে গীতা বলল—আমার স্বামীর কি রোগ যদি জানতেন তাহলে একথা বলতেন না। দেখছেন না, ছেলেটাও বিকলাঙ্গ হয়েছে।

তাতে কি? আমি তো সুস্থ সবল গীতা—গীতার কান্নাভেজা চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলল—আমার রক্তেও যে ঐ বীজ নেই, কে জানে বলুন? জেনে শুনে বিয়ে থাবেন আপনি? টলতে টলতে ঘরের ভেতরে গিয়ে সশব্দে খিল লাগিয়ে দিল গীতা। অজয়ের বুকের ভেতরে একটা দীর্ঘশ্বাস আঘাতের বেদনায় মুচড়ে উঠল। গীতার ঘরের আলোকিত জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল, সাদা ধবধবে বিছানার ওপর প্রপাতের ভঙ্গীতে উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে গীতা। কালিপড়া লণ্ঠনের আলোয় তার কালো চুলের অরণ্যে সিন্দুর মাখানো লাল টকটকে সিঁথিটা জ্বলজ্বল করছে। মুরারির পরমায়ুর নিশানা।

লগেজ নিয়ে মোটর ষ্ট্যাণ্ডের দিকে চলল অজয়। জোয়ার এসেছে সমুদ্রে। তালগাছের মত উঁচু উঁচু ঢেউ মত্ত আবেগে আছড়ে পড়ছে বালুচরের ওপরে, যেন আঘাতে আঘাতে নিজের অতল বুকের ভেতরে তাকে লোলুপ উল্লাসে গ্রাস করে নেবে। তার এই আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। অজয়ের মনে হলো, গীতার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে উচ্ছৃঙ্খল, অশান্ত এই সমুদ্রের। অতৃপ্ত, অসুখী জীবনের যন্ত্রণার জ্বালায় অস্থির হয়েই হয়তো সে ভালবেসেছিল পূর্ণেন্দুকে, তাকে, কিন্তু—

কিন্তু তারই মনের গোপন ভয়ঙ্কর একটা আশঙ্কা তাদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাকে। তবুও—

তবুও জীবনতৃষ্ণার সমুদ্র চিরকাল তার বুকের ভেতরে উত্তরোল হয়ে রইবে।

শহর কোলকাতা ছাড়িয়ে

বিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

শহর কোলকাতা ছাড়িয়ে আসবেন। কোলকাতা-যশোহর রোড ধরে এগিয়ে আসবেন বারাসাতগামী যে কোন বাসে। ক্রমে পেছনে পড়ে থাকবে কোলকাতা শহর, জনকলরব আর অজস্র গাড়ী ঘোড়ার বিচিত্র শব্দ-মুখরতা। আরও এগিয়ে যাবেন। দেখবেন, ক্রমে পেছনে পড়ে থাকবে ইংরেজ কুশাসনের প্রতীকচিহ্ন দমদম্ সেণ্ট্রাল জেল। তারপর আরও একটু এগিয়ে পর পর পাবেন দমদম্ এয়ার পোর্টের পোষ্টগুলি। তাকিয়ে দেখে নেবেন এ শতাব্দীর বিচিত্র কর্মচাঞ্চল্য আর গতিপ্রিয়তা। আপনি চোখ ফেরাতেই দেখবেন শহর শেষ হয়ে গেছে। আদিগন্ত মাঠ, মাঝে মাঝে সবুজ ঝোপ জঙ্গলের ইসারা আর তাল-খেজুর-নারকেল বীথির মর্মর গান আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। খুসী হয়ে দু-চোখ ভরে দেখতে দেখতেই, আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবেন আপনি। অনেক দূরের এ পথ—কালো মেঘের চোখের মত চকচকে যশোহর-রোড ধরে তখন আরও অনেক এগিয়ে গিয়েছেন, দুপাশে এবার দেখবেন ফসল হারা রিক্ত মাঠের আকাশমুখী তপস্যা—বন্ধ্যা নারীর মত। এবার দেখবেন বাসটা ঘুরে গেল। কণ্ডাকটার চেঁচিয়ে উঠবে, বারাসাত, বারাসাত। তখন আপনি নামবেন। শুনতে পাবেন একজন ফেরিওয়ালার কণ্ঠস্বর: চাই, বাবুদের চাই, দাঁতের মাজন, আশ্চর্য-মলম, সর্ব ঘায়ে, সর্ব বেদনায় মহাশংকর তেল। তারপরে শুনবেন একই কথা, এবার সে ইংরেজীতে বলছে: 'ইয়েস, ডু ইউ ওয়ান্ট ওয়াণ্ডারফুল ওয়েন্টমেণ্ট, টুথ পাউডার এ্যাণ্ড মহাশংকর অয়েল, 'ইট ইস ইউনিক এ্যাণ্ড আনপ্যারালেল্ড। তার পরেই শুনবেন সে হিন্দিতে বলছে একই কথা, যা বলেছে ইংরেজী আর বাংলায়। তারপর সে হাঁকবে মারাঠী, উর্দু, তামিল, তেলেগু, আসামী আর গুজরাটি ভাষায়। ভারতবর্ষের আটটি ভাষায় সে তার ফেরী করবে। এবার আপনার ঔৎসুক্য হবে। আপনি তাকিয়ে দেখবেন, পরণে খাঁকি হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে ছিটের সার্ট, বগলে আর্মষ্টিক, বাঁ পা এ্যাম্পুটেট করা। মাথায় কোঁকড়া চুল আর অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ। এই লোক, যদি নাম জিজ্ঞাসা করেন, সে হাসবে। বলবে এক মুহূর্তের পরিচয় স্যার, নাম দিয়ে কি করবেন স্যার! তারপরেই আপনার পাশ কাটিয়ে চলে যাবে সে। এরপর তাকে পাবেন বারাসাত ষ্টেশনে, দাঁড়িয়ে ফেরী করছে সে। ফিরবে বেলা একটা নাগাদ। যদি অপেক্ষা করেন দেখবেন বারাসাত বাস ষ্ট্যাণ্ডের পাশ কাটিয়ে, নোংরা মাছি ভন্ ভন্ রেস্তোরা আর মুদীর দোকানগুলো বাঁয়ে রেখে সে সোজা গিয়ে উঠবে একটা বাড়ীতে। টালীর ছাদ দেওয়া সে বাড়ী। জীর্ণ এই টালীর বাড়ীর ভেতরের উঠানে গোটা দুই বাঁকা নারকেল গাছ আর তার নীচে বাঁশের মাচা। ফেরীওয়ালা বাড়ীতে এসে প্রথমে সোজা ঘরে উঠবে, তারপর হাতের ব্যাগ ঘরে নামিয়ে, গায়ের জামা খুলে এসে বসবে ঐ মাচায়। আর্মষ্টিকটা রেখে দেবে নারকেল গাছের গোড়ায় ঠেকিয়ে, তারপর ঘাম মুছবে গামছায়। আপনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন আর না করুন, সে কিন্তু তার প্রাত্যহিক কাজগুলো করে যাবে ঠিক মত, চলতি কোন যন্ত্রের মত। এরপর বছর আঠারো বয়সের একটি শ্যামলা মেয়ে এসে দাঁড়াবে তার পাশে। ঘর্মাক্ত সার্ট আর প্যাণ্ট মেলে দেবে উঠানের তারে, আর্মষ্টিকটা ঘরে রেখে এসে সে পাখা চালাবে ফেরীওয়ালার পাশে বসে। পাখা চালাবে, যতক্ষণ না ফেরীওয়ালার ঘর্মাক্ত শরীরটা শুকিয়ে স্নিগ্ধ হয়ে আসে। ফেরীওয়ালা হয়ত বলবে, কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম মা, একটা টাকা রোজগার হলো না।

তখন তাকিয়ে দেখবেন মেয়েটির মুখে ম্লান এক-

টুকরো হাসি মিলিয়ে গেল। লোকটি এবার স্নান করে খেতে বসবে। পূর্বপুরুষ আর ইষ্ট দেবতার নামে খানিকটা ভাত তরকারী রেখে দেবে নামিয়ে। প্রণাম করে জল খেয়ে সে ভাতে হাত দেবে। দু'একটা মাছি হয়ত উড়বে, মেয়েটি তখন হাতপাখা চালাবে। খেতে খেতে লোকটি বলবে, ডালে নুন দাওনি মা, ঝোলটা বেশ ভাল হয়েছে। তবে একটু রসুনের গন্ধ করছে।

মেয়েটী তখন সলজ্জ একটু হাসবে। তারপর একটা পান মুখে গুঁজে ঠোঁট দুটো রাঙিয়ে সে নেমে যাবে বাড়ীর পাশে আর একটা খড়ের ঘরে। এ ঘরের ওপর বহু পুরানো কাঁঠাল গাছ। ঘরের দরজায় শেকলে তালা ঝুলানো। আর বাইরে ঐ কাঁঠাল গাছের মন ভুলানো ছায়ায় মাচার ওপর ভীড় করে বসা কতগুলি লোক। পরিচিত অপরিচিত সবই আছে সেখানে। খড়ের ঐ চালার বাইরে একটা সাইন বোর্ড : ভাল তাড়ির দোকান। প্রোঃ বিপ্রদাস পুরকায়স্থ। বিপ্রদাস পুরকায়স্থ ঘর খুলে তাড়ি ঢালবে মাটির গ্লাসে। তারপর এগিয়ে দেবে এক এক করে। এখানে তাড়ির এই আড্ডায় রোজ আসে ওষুধওয়ালা সুরেন মণ্ডল, বাস কণ্ডাকটার পিউতম সিং, ষ্টেশনের সিগন্যালার নটবর দাস আর চার নম্বর সোনাখালি ইউনিয়ন বোর্ডের এক চোখ কানা চৌকিদার হরিবোলা দাস। যারা মাঝে মধ্যে আসে তাদের নাম বিনোদ সরকার—রেস্তোরা মালিক, অবিনাশ কুণ্ডু—মটর মেকানিক, আর মামলাবাজ দেউলিয়া হরিপদ নাহা। এরা রোজ আসে না, শনিবার বিকালে আর রবিবার দুপুরে এরা আসে! সবাই তাড়ি খায়, সেই সঙ্গে নুন-পেঁয়াজী, আর গল্প করে, আড্ডা জমায়। আড্ডার মাঝে নটবর দাস হেসে হেসে বলে, কিন্তু মহাজন দা, আপনি ত' কোনদিন তাড়ি খেলেন নি।

হাসে মহাজন দা অর্থাৎ বিপ্রদাস পুরকায়স্থ। সে তাড়ির দোকানের মালিক ঠিকই, কিন্তু তাড়ির স্বাদ বলতে পারবেনা কখনও। বরং দোকানের আড্ডার যখন বার বার অনুরোধ করে সবাই, তখন জোড় হাত করে সবিনয়ে মাথা দুলিয়ে বলে, ছি ছি আমি সংসারী মানুষ, ঘরে বিয়ের মেয়ে, ওসব কি আমার পোষায়।

এক চোখ কানা চৌকীদার হরিবোলা দাস চোখ মিটি মিটি করে বলে, সেটা ঠিক কথা, কিন্তু তুমি একটু খাও মহাজন দা।

এমনি করে কথার ফাঁকে ফাঁকে, পশ্চিম দিগন্তের বাঁশ আর বোনাইচা বনের আড়ালে সূর্য ডোবে, নীড় সন্ধানী পাখীর ডানায় ভর করে সন্ধ্যা নামে ঘন হয়ে, আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে আলো জ্বলে।

তখন দোকান ঘরের তালাটা আবার খুলিয়ে দেয় বিপ্রদাস পুরকায়স্থ, ফিরে আসে বাড়ীতে। বারান্দার চৌকীতে শুয়ে থাকে, কোন কোনদিন বা কাগজ পড়ে। কোনদিন বিনোদ সরকার নিজে আসে, গল্প চলে। বিপ্রদাস নানা কথার মাঝে মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ তোলে, বলে, সুরমার বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আর শান্তি নেই। ওর বিয়ে দেব, সংসারের দায়িত্ব মুক্ত হব, তারপর তাকাবো নিজের দিকে।

—সে ত' ঠিকই, বয়স কালের মেয়ে। যোগ দেয় বিনোদ সরকার।

মেয়ের বয়স বাড়ছে, কিন্তু পাত্র কোথায়? ঘোর ঘোর সন্ধ্যায় বিনোদ সরকারের পাশে বসে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে বিপ্রদাস। কোথায় সে পাবে পাত্র। চোখের সামনে থাকে দেখে, সে হলো অধীর সামন্ত, পূর্ণ সামন্তের ছেলে। ট্র্যাকটার চালায়। দেশে একই গ্রামে ওরা থাকতো। বেচারী পূর্ণ সামন্ত মারা গেল এদেশে এসে, তখন এই ছেলে সংসারের দায়িত্ব নিলে। নিলে নিজের মায়ের আর বোনের দায়িত্ব।

ছেলেটী মন্দ নয়, মাঝে মাঝে আসে বিপ্রদাসের বাড়ী। তাকে কাকাবাবু ডাকে, গল্প করে ট্র্যাকটার চালকের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। একদিন ত' সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে বিপ্রদাস দেখলে রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরে

দাঁড়িয়ে অধীর সামন্ত। ঘরে কুপির আলোয় রান্না করছিল সুরমা। গল্প করছিল, হাসছিল আর কড়াইয়ের দিকে নজর রাখছিল।

আর একদিন দেখেছিল বিপ্রদাস—ঠিক এমনি এক ঘোর-ঘোর ধূপ-ছায়া সন্ধ্যায়। দেখেছিল বাড়ীর উঠানে গুটি চারেক ধান-দুবের কলি ফুটেছিল, সেই কলি সুরমার খোঁপায় পরিয়ে দিচ্ছিল অধীর—আর তখনই বাড়ীতে ঢুকছিল বিপ্রদাস।

সুরমাকে বলি বলি করেও পরে আর বলা হয়নি বিপ্রদাসের। কেমন এক সংকোচ এসে বার বার জড়িয়ে ধরছিল ওকে। আর তখনই মনে পড়ছিল বিপ্রদাসের, আজ যদি সুরমার মা বেঁচে থাকতো, তবে কত সহজ হতো সব কিছু। সংসারে মা' মেয়েকে যা বলতে পারে, বাপ তা পারে না।

সুরমার মা! তখনই ঝাপসা ভাবে মনে আসে বিপ্রদাসের। বছর আঠারো আগেকার সব ছোট ছোট স্মৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও সুরু হয় নি। বিপ্রদাস আর্মিতে যোগ দিল। সারা ভারতবর্ষের বহু প্রদেশেই সে ঘুরল। তারপর একদিন জাহাজ বোঝাই হয়ে চলল সিঙ্গাপুর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে তখন। জাপানী আক্রমণে সিঙ্গাপুর তখন থর থর করে কাঁপছে—আর সেই সিঙ্গাপুর থেকে আঠারো মাইল দূরে ইন নদীর তীরে তাদের ক্যাম্প। সারাক্ষণ হল্লা আর গান আর শত্রু-বিমানের সংকেত শুনলেই সব মুখ কালো হয়ে উঠত। আত্মরক্ষার সব পালাতো ট্রেঞ্চে, কি জঙ্গলে, কিম্বা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থানে। ভ্রুশ্চের গোলা-বারুদ আর যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ চোখের সামনে ভাসতে থাকে বিপ্রদাস পুরকায়স্থের। ভাসতে থাকে দু'একটা গলিত শব, বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর সৈনিকদের মৃত্যু-কাতরতা। এমনি এক বিমান আক্রমণে সে তার বাঁ পা হারালো। ছ' মাস ছিল হাসপাতালে। ভাল হলো তখন আনফিট্ ডিক্লেয়ার করেছে কর্তৃপক্ষ।

বিপ্রদাস দেশে ফিরে এল। এসে দেখলে স্ত্রী মারা গেছে কলেরায়, অথচ খবর পায়নি সে। আর সুরমা মানুষ হোচ্ছে গ্রামের এক পিসীমার কোলে। বাঁ পা হারিয়ে বিপ্রদাস গ্রামে ফিরে এসেছিল—তখন পূজার পর শরৎকালের প্রায় শেষ। তারপর সারা শীতকাল ধরে গ্রামের লোকের কাছে যুদ্ধের গল্প করেছে বিপ্রদাস। বলেছে, যাই হোক, সুরমার মা আমার এই জখম পা' দেখল না—এটা ভালই হোয়েছে। বেঁচে থাকলে মনে কষ্ট পেতো। এমনি করেই বছর ঘুরে গেল একদিন। হয়ত এমনি করেই বছরগুলো কেটে যেত' বিপ্রদাসের নিজের গ্রামে, ঘরে বসে। জমি-জমা আর হালগরু দেখে।

কিন্তু একদিন দেশ-ভাগ হয়ে স্বাধীনতা এল। ঘরে বসে স্বাধীনতার স্বাদ জানলো না বিপ্রদাস, মেয়ের হাত ধরে বেনাপোল আর বনগাঁর পথে সে এল এদেশে, এই ভারতবর্ষে। প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাস ফেললে বিপ্রদাস।

তারপর সুরমার ডাকে উঠে খেতে এল সে। কতক্ষণ আগে বলে কি না বলে উঠে গিয়েছে বিনোদ সরকার তা আর মনে করতে পারলো না বিপ্রদাস। সেদিন খেতে বসে একটু ইতস্তত: করে মাটির দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে ফেলল বিপ্রদাস, যদি তোর মত হয় তো অধীরের মা'কে বলি।

ভাত নামিয়ে ফিরে যেতে যেতে জবাব দিলে সুরমা, যা ভাল বোঝ, কর।

আর দেরী করেনি বিপ্রদাস, অধীরকে বলেছে, তার মায়ের মত নিয়েছে, দিন দেখে সুরমার বিয়ে দিয়েছে। সাধ্য মত খরচ করেছে বিপ্রদাস, আত্মীয় বান্ধবদের প্রীতিভোজে ডেকেছে—আর কি? আমার যা ক্ষমতা তা করেছি। বলে বিপ্রদাস। তারপর বলে, এবার আমি মুক্ত, আমার কর্তব্য আমি করেছি।

সত্যি তার কর্তব্য করেছে বিপ্রদাস। কথাটা লোকে বলে, পাড়া প্রতিবেশীরা বলে। এমন কি তাড়িখানার নিয়মিত অতিথি, ঐ সুরেন মণ্ডলের দলও স্বীকার করেছে, বলেছে, মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে খুসী করবার জন্য, কি পরিশ্রম-ই না করে মহাজনদা।

—তা মেয়ের বিয়ে ত' হলো, এবার নিজের দিকে তাকাও। বিনোদ সরকার বন্ধুর মত উপদেশ দেয় যেন।

—হ্যাঁ তাকাবো। এবার বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা। বেশি দিন সংসারে থাকলে মানুষ নীচ হয়ে যায়। সংসারের প্রয়োজনে যুদ্ধে গিয়ে পা' হারিয়েছি, আবার সংসারের প্রয়োজনেই ফেরী করছি, তাড়ি বিক্রি করছি, আর কেন? প্রয়োজন ফুরিয়েছে এবার আমি মুক্ত। কথার শেষে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে বিপ্রদাস, ভাবনা বিভোর কোন বৃদ্ধ মানুষের মত।

বিপ্রদাস পুরুষমানুষ জানে, আরও একটু কাজ বাকি আছে তার। এ কাজটা অবশ্য সংসারে মায়েদের। কিন্তু বিপত্নীক বিপ্রদাসকেই এখন তা করতে হবে। মেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে, স্বামীর ঘরে কি ভাবে ব্যবহার করবে তারই হাতে খড়ি। দিনের বেলায় স্বামীর সাথে কথা বলবে না, আর সংসারে কাউকে বুঝতে দেবে না যে এ সংসারে তার কাছে স্বামীই একমাত্র সব। আর কেউ কিছু নয়। লজ্জা হলেও লজ্জার মাথা খেয়ে সুরমাকে বুঝিয়েছে বিপ্রদাস, উপদেশ দিয়েছে। সংসারের অভিজ্ঞতা গল্পের ছলে বলেছে। আর কথাগুলো শুনেছে সুরমা, তবে স্থির হয়ে বসে নয়। হাতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, সজাগ কান মেলে রেখে, সব কথা শুনেছে সে।

আর একদিন সুরমা এল, চোখের জল ফেলে। কেঁদে কেঁদে বললে, ও বাড়ীতে আর যাব না আমি তুমি নগদ দাওনি, তাই নিয়ে ওরা আমার কথা শোনায়, খোটা-গঞ্জনা দেয়। আমি যাব না।

ঘুটো ঠোঁটের ফাঁকে অতিক্ত একটুকরো হেসে বিপ্রদাস বলে, নতুন নতুন ওসব হয়-ই। পুরান-হলে আর হবে না, বরং তখন ওরাই আদর যত্ন করবে, বলবে, আমাদের ঘরের বউ—মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পোকায়। তারপর একটু হেসে বলে, হ্যাঁ তুই সবাইকে সমান চোখে দেখবি, সবার সেবা যত্ন করবি, তা হলেই দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। আর তাছাড়া ওরা ত' নগদ চায়নি, বলেছেন, ছেলে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করছে, আবার নগদ কিসের?

অনেক বুঝিয়ে মেয়েকে পাঠিয়েছে বিপ্রদাস। তারপর হাঁফ ছেড়ে এসে বসেছে তাড়ির দোকানে। দোকানে বসে বসেছে, নাও ভাই, আজই আমার শেষ দোকান।

—সে কি?

—হ্যাঁ, দোকান ত' তুলে দিচ্ছি।

ফেরী করা সে আগেই বন্ধ করেছিল, এবার তাড়ির দোকানটিও তুলে দেবে বিপ্রদাস। এবার বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছা। দেশ-ভ্রমণে, তীর্থস্থানে, কাশীতে, প্রয়াগে আর কুম্ভমেলায়। সারা জীবন ত' সংসারে মেতে রইল, এবার সব ছেড়ে চলে যাবে সে। অন্ততঃ মনে মনে তাই ঠিক করেছে বিপ্রদাস। ফিরে এসে একটা মুদীর দোকান দিয়ে বসবে, সেই আয়ে একটা মুখ চলে যাবে তার।

সকাল বেলায় বিপ্রদাস দাঁতন করছিল। রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে তার বারান্দায়, উঠানে—শীতের সকালে এই কাজ ভোলানো রোদটুকু যেন বড় ভাল লাগছে বিপ্রদাসের। ভাল লাগছে, সকালের এই রোদ গায়ে মাথায় মেখে, এমনি করে বসে, ঐ রোদ কাঁপা উঠানে মুক্ত টলমল্ ঘাসগুলোকে দেখতে। অন্য কথাও ভাবছিল বিপ্রদাস। তাড়ির দোকান তুলে দেবে শুনে বিনোদ সরকার কেমন ক্ষেপে গেছে—সুরেন মণ্ডল কি নটবর দাস ত' মারমুখো।

হঠাৎ এক সময়ে উঠানের মাঝখানে দৃষ্টিটা যেন স্থির হয়ে গেল বিপ্রদাসের—বিপ্রদাস তাকিয়েই রইল।

একটা পুঁটুলী হাতে এসে দাঁড়িয়েছে সুরমা। রক্তবর্ণ দুই চোখ, আলুথালু মাথার চুল, সিঁথির সিঁদুর, ঘুটো ঠোঁট থর থর করে যেন কাঁপছে অভিমান ভরা আবেগে।

—হঠাৎ তুই এলি? বিপ্রদাস অবাক হয়ে উঠল।

আর বিপ্রদাসের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুরমা বললে, দেখ বাবা দেখ, ওখানে ওরা কি অত্যাচার করেছে, কি রকম মেরেছে। আমি আর যাব না, আর কখনো যাব না।

বিপ্রদাস দেখলে সুরমার সর্বশরীরে আঘাতের চিহ্ন। ফুলে উঠেছে, কালশিরে পড়েছে কোথাও কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আর বিপ্রদাসের পাশে বসে কেঁদে কেঁদে সুরমা তখন বলতে লাগলো, শ্বশুর বাড়ীতে তার প্রতি অত্যাচারের কথা। কেন বিয়েতে নগদ দেননি তাই তাদের রাগ। শুধু তাই নয়, বিপ্রদাসকেও অপমান করেছে ওরা। আজ সকালে সুরমা তার প্রতিবাদ করেছিল, তখন শাশুড়ী রুটি বেলার 'বেলুনা' ছুঁড়ে মেরেছিল প্রথম, তারপর তোমার জামাই। তিনিও লাথি দিয়ে মেরেছেন সারা শরীরে। বিপ্রদাসকে জড়িয়ে ধরে সুরমা বললে, দেখ' বাবা দেখ, এই যে লাথির দাগগুলো, এগুলো তোমার জামাই মেরেছেন। আর এই যে মাথা কেটে গেছে, এটা শাশুড়ি ঐ বেলুনা ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

বিপ্রদাস ওকে আদর করলে, বুকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, তুই আর যাস না। আমি যতদিন বেঁচে ততদিন তোর কোন ভাবনা নেই! বিপ্রদাসের চোখ জোড়া জলে ভিজে উঠল।

সেদিন বিপ্রদাস রাত্রে স্বপ্ন দেখলে, সে মারা গেছে। আর নিদারুণ দারিদ্র্য আর অভাবে দিন কাটছে সুরমার। কেউ নেই তাকে দেখবার—এমনকি দেহকে আশ্রয় করেছে সুরমা, বেঁচে আছে দেহ মুলধন করে। সে কি? চমকে ঘুম ভেঙে উঠল বিপ্রদাস। চোখ মুছে দেখলে, সুরমা তারই পাশে শুয়ে। সেইদিন সকালে বিপ্রদাস সুরমাকে বললে, যদি মরে যাই, আর যদি তোমার খুব অভাব হয়, আর কেউ যদি তোমাকে না দেখে তাহলে সুইসাইড্ করো—স্বর্গ থেকে আমি শান্তি পাব।

সুরমা অবাক হয়ে বললে, এ সব বলছ কেন বাবা?

—বলছি, কারণ অভাবের তাড়নায় মানুষ বড় নীচে নেমে যায়—শেষে তুমি কোনদিন নীচে নেমে যাও, সেই আমার ভয়।

সুরমা নিঃশব্দে ম্লান হাসলো।

বিপ্রদাস পুরকায়স্থ আবার ফেরী করতে সুরু করেছে। বাস-ষ্ট্যাণ্ডে, ষ্টেশনে আবার তাকে ফেরী করতে দেখা যায়। দেখা যায় অনেকদিন পর। আবার অনেকদিন পর তাড়ির দোকানটাও নতুন করে খুলেছে সে। পুরানো খরিদ্দারেরা, ঐ সুরেন মণ্ডলের দল আবার ভীড় করতে সুরু করেছে একে একে। বিনোদ সরকার হেসে বলে, কিন্তু দাদা, তোমার বেরিয়ে পড়ার কি হলো?

ম্লান হেসে বিপ্রদাস বলে, সংসার কি অত সহজেই ছাড়বে? যদি না ছেড়ে, বেরিয়ে পড়ো জোর করে।

—ঠিক বলেছ। বিপ্রদাসকে সমর্থন করে বিনোদ সরকার। সবই ঠিক আছে। সেই আগের মতই দিবারাত্রি পরিশ্রম আবার সুরু করেছে বিপ্রদাস পুরকায়স্থ। সুরু করেছে ফেরী করা আর তাড়ির দোকান করা, কিন্তু তবুও ঠিক আগের মতনটি যেন আর নেই তার সংসার। কেমন যেন বেসুরো হয়ে গেছে সুরমা। আগে যখন মাটিতে আর্থিকএর ছাপ আর পাশাপাশি ডান পায়ের ছাপ ফেলে দুপুরে বাড়ী ফিরত বিপ্রদাস, তখন কেমন যত্ন করত, পাখা করত, স্নানের জল তুলে দিত সুরমা। কিন্তু এখন যেন তেমন করে না। কেমন উদাসীন আর অন্যমনস্ক, একা একা আর নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছে সুরমা। মেজাজটা হয়ে পড়েছে খিটখিটে আর রুক্ষ। বরং এখন দুপুরে ফিরতে দেরী হলে কেমন বিরক্ত হয়ে ওঠে সে। একদিন ত' পরিষ্কার বলে বসল, আর পারি না বাপু, দিনরাত এ বেলনা বেলতে? সময় মত বাড়ী ফিরবে, নয় ত' আর পারিনা এত সব ঝামেলা সইতে।

মেয়ের কথায় মনে মনে আহত হয় বিপ্রদাস, কিন্তু কোন কথা বলে না। সহ্য করে যায় মুখ বুজে।

আর একদিন। বিপ্রদাস দুপুরে ফিরে ভাত খেতে বসে বললে, কৈ আমার সার্টটা ধোয়া হয়েছে সুরমা? আমি এখনই বের হব।

সুরমা অসভ্য জঙ্গলীর মত দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, কখন খোব ? সারাদিন ত' সংসারের হাজার ঝামেলা।

আজ পরিশ্রান্ত বিপ্রদাসও যেন অল্পতেই রুক্ষ হয়ে উঠল, না করলেই পারো—বলি, মেয়েদের এত তেজ ভাল না। তাই ত' স্বামীর সংসার—কথা শেষ করতে পারল না বিপ্রদাস।

সুরমা আরও চিৎকার করে উঠল, সাবধান হয়ে কথা বলো বাবা। স্বামীর ঘর করতে পারিনি, এজন্য যদি কেউ দায়ী হয় ত' সে তুমি।

—কি বললি তুই ? বিপ্রদাস থর থর করে কাঁপতে লাগলো। ভাতের গ্রাস হাতে তুলে চেয়ে রইল সুরমার দিকে। সুরমা বলতে লাগলো, কি আর বলব, তোমার জন্যই ত' আমার কপাল ভাঙলো।

—তোর জন্য আমি খেটে মরি আর তুই—কথা শেষ করলে না বিপ্রদাস। পাতের ভাত পাতেই রইল। হাত ধুয়ে উঠে পড়ল সে। আর সারা শরীরের রক্ত যেন ফুটতে লাগলো। এমন কি দুপুরের নিরিবিলিতে চোখ জোড়া একবার ঝাপসা হয়ে উঠেছিল বিপ্রদাসের। বিকালে বন্ধু বিনোদ সরকারকে দুঃখ করে বললে, আরে ভাই, মা মরা যে মেয়ের জন্য এত করি, সেই আমাকে মুখ করে, কথা শোনায়। সংসারে আর কি আছে বলো।

সংসারে অনেক দেখা, বিনোদ সরকার হেসে হেসে বললে, বলব কি দাদা, মেয়েমানুষ জাতটাই বিষে হলে স্বার্থপর হয়। স্বামীকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না। স্বামীকে চেনে, কেননা যা হতে চায়। এ তাদের আরেক রকম স্বার্থ।

যা হতে চায় ? বিনোদ সরকারের পাশে বসে চোখ দুটো যেন উজ্জ্বল আর বড় বড় হয়ে ওঠে বিপ্রদাসের। সুরমার মুখ মনে পড়ে, চোখ দুটো চোখে চোখে ভাসে। আর যেন স্পষ্ট দেখতে পায় বিপ্রদাস পুরকায়স্থ, সুরমার সিঁথিতে জলজল করছে রক্তের মত লাল সিন্দুর। সুরমা-ও কি তাই চায় ? আর না পাওয়ার জন্যই কি তার এই পরিবর্তন ? সংসারে এ অভিজ্ঞতা ত তার ছিল না।

গল্পের সুরুতে আমি বলেছিলাম, বারাসত বাসষ্ট্যাণ্ডে নেমে শুনতে পাবেন আট রকম ভারতীয় ভাষায় ফেরী করছে একটি লোক—যার বাঁ পা এমপুটেট করা আর বগলে আর্টিফিশিয়াল। যদি আরও অপেক্ষা করেন দেখবেন, মাছি ভন ভন রেস্তোরা আর ঘুঘুরীর দোকানগুলোকে বাঁয়ে রেখে সে ঢুকবে একটা জীর্ণ টালীর বাড়ীতে। তারপর এসে বসবে পাশের খড়ের ছাউনিওয়ালা ঘরে, কাঁঠাল গাছের ছায়ায়, তাড়ি বিক্রি করবে।

কিন্তু আমি ভুল বলেছিলাম। তাকে আর এখন দেখতে পাবেন না। কিছুদিন হলো সে বাড়ী বিক্রি করে দিয়েছে। পাঁচশো এক টাকা নগদ দিয়েছে সুরমার শাশুড়ীর হাতে। আর সুরমাকে রেখে এসেছে তার স্বামীর ঘরে। সে নিজে বেরিয়ে পড়েছে কাশি, প্রয়াগ আর কুম্ভমেলায়, দেশ ভ্রমণে, দেব-দর্শনে, ভারতবর্ষের নানা তীর্থস্থানে। আর তাড়ির দোকানের সাইনবোর্ডটা উল্টে রেখে গেছে যাওয়ার আগে।

শেষ কোথায়

[উপন্যাস]

শ্রীসৌরীন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

কলিকাতা হইতে একখানা টিকিট কাট। প্রথমেই যে বড় জংশন ষ্টেশনটী পাইবে, সেখানে নামিয়া পড়। জংশন ষ্টেশনটী বড় হইলেই উহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠা সহরটী ছোট। কিন্তু সহরটী ঝকঝকে, তকতকে, সুন্দর ছবির মত সাজান। রাস্তাগুলি পিচের নয়, কাঁকর বিছান, লাল। ওভারব্রিজটী পার হইয়া আসিয়া, ষ্টেশনের গা ঘেঁসিয়া যে রাস্তাটী সোজা পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইটী ধরিয়া আগাইয়া যাও। মালপত্র আছে সঙ্গে তো সাইকেল রিক্সা ভাড়া পাইবে। রাস্তার দুই পাশে ছোট ছোট বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী বা কোয়ার্টার, রাস্তার রংয়ের সহিত রং মিলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সামনে একটী করিয়া ফুলের বাগান। বেশ ভালই লাগিবে তোমার। আরও আগাইয়া সহর ছাড়িয়া দেখিবে, রাস্তাটী মাঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এখন আর অতটা জৌলুষ নাই। মাঝে মাঝে ছোট বড় নানা আকারের গর্ত। শীতের সময় ধূলা আর বর্ষায় কাদা জমে সেগুলিতে। রিক্সায় চাপিয়া গেলে কাঁকি লাগে খুব বেশী। সহরের শেষ প্রান্তে আসিয়া একটু দাঁড়াও, চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখ। রাস্তাটি ঈষৎ বাঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেন হারাইয়া গিয়াছে। পিছনে ছোট সহর, সামনে গ্রাম। দুইয়ের সংযোগ এই রাস্তাটী।

গ্রামে ঢুকিয়া দেখিতে পাইবে রাস্তার রূপ আরও বদলাইয়া গিয়াছে। কাঁকর প্রায় নাই বলিলেই চলে। কোনদিন হয়তো ছিল, সংস্কার অভাবে বহুদিন বর্ষার জল পাইয়া ধুইয়া গিয়াছে। ভালই লাগিবে গ্রামটী। নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন। অনেকগুলি বড় গাছ রাস্তার উপরেই ডাল পালা মেলিয়া দিয়াছে। এখানে ওখানে ছোট বড় দুই একটী মজিয়া আসা পুকুর। সমস্ত মিলিয়া গ্রামটীর প্রাচীনত্বেরই সাক্ষ্য দেয়। অপরিচিত লোক দেখিয়া পথের পাশের দুই একটী কুকুর হয়তো ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিবে, তাকাইবে দুই একটী কৌতূহলী চোখ। কেহ হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে,

'কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?'

ব্যাস্, জবাব পাইয়াই নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য আবার নিজের কাজে মগ্ন হইয়া যাইবে :

আগাইয়া যাও। গ্রামের প্রায় মাঝখানে রাস্তার বাঁদিকে দেখিতে পাইবে কাঠের একটী গেট। গেটটী সব সময়ই বন্ধ থাকে, গরু ছাগল যাহাতে ভেতরে ঢুকিতে না পায়। উল্টাদিকে, রাস্তার ওপারে একটী ছোট পুকুর, পাথরে বাঁধান ঘাট। গেটের পাশে একটী বড় নিমগাছ। ধীরে ধীরে গেটটী খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ কর। কাঁচা একটী সরু রাস্তা, ডানদিকে একটী লম্বা ঘর, আর বাঁদিকে কিছু পতিত জমি। প্রথমেই যে জিনিষটী তোমার মনে লাগিবে, তাহা পরিচ্ছন্নতা। কোথাও একগাছা কুটা পর্যন্ত পড়িয়া নাই। রাস্তা কাঁচা হইলেও ধূলা বা কাদা কিছুই নাই। ঘরগুলির বৈশিষ্ট্যও তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এতক্ষণ গ্রামের যে ঘরগুলি দেখিয়া আসিয়াছ সেগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মাটির দেওয়াল, বেশীর ভাগই খড়ের চাল। দুই একটীতে টিনও আছে। প্রত্যেকটী ঘরেই দরজা জানালা প্রচুর। আর আছে চারিপাশ ঘিরিয়া একটী করিয়া প্রশস্ত বারান্দা। দাওয়াগুলি উঠান হইতে বেশ উঁচু। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে, ছবিতে আঁকা আদর্শ বাসস্থানের নক্সা।

এইবার পরিচয় দেওয়া যাক জায়গাটীর। নামটী

কিন্তু বেশ গালভরা—'সীতারামপুর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।' স্থানীয় লোক এটাকে বলে কলেজ। যাহারা এখানে থাকে, তাহারা বলে আশ্রম। একই শিক্ষার দুই রকম ধারা চলে এখানে। একটা আছে অরফেনেজ, প্রায় পঞ্চাশটি অনাথ ছেলেমেয়ে লইয়া। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা পায় এরা—আবাসিক বিদ্যালয়। আর আছে 'শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র।' কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা পায় এখানে। নূতন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়, হয় নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত।

সেদিন সন্ধ্যার ঠিক পরেই একটি রিক্সা আসিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল আর সেখান হইতে নামিল অরুণ। পাশাপাশি দুইটি ঘরের বারান্দায় তখন রাত্রির আহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে আশ্রমের। রিক্সা হইতে নামিয়া অরুণ চারিদিকে তাকাইতেই নিঃশব্দে একটি লোক আসিয়া পাশে দাঁড়াইল।

'শিক্ষার্থী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

আর একবার চারিদিকে তাকাইয়া অরুণ লোকটির অনুসরণ করিল। ততক্ষণে বাহিরের অনেকের দৃষ্টিই তাহার উপর পড়িয়াছে। একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল, বোধ হয় তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই। নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু সঙ্কোচ বোধ করিল যেন অরুণ। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল:

'কত ভাড়া দিতে হবে রিক্সাওয়ালাকে?'

'দেড় টাকা দিন।'

টর্চের সাহায্যে পরদা তুলিয়া দিয়া অরুণ নিজের সুটকেশটির উপর বসিল। ক্লান্তিতে তাহার দুই চোখ জড়াইয়া আসিতে চায়। ক্ষুধাও পাইয়াছে বেশ। লোকটিকে কিছু বলিবার পূর্বেই অন্ধকারে ঠাহর করিয়া দেখে, কখন নিঃশব্দে সে ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে। একটু অস্বস্তি বোধ করিল অরুণ। টর্চ জ্বালাইয়া একবার ঘরের পরিবেশটি দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

ঝকঝকে করিয়া নিকান কাঁচা মেঝে। লম্বা হল ঘরটি। দুই পাশে প্রতি দুই হাত অন্তর মুখোমুখী বড় বড় জানালা ও দুইটি করিয়া চারিটি দরজা। এক-পাশে মাটির তৈরী কিছু উঁচু একটি বেদী। এখানে সেখানে দুই চারিটি মাদুর পাতা আছে লাইন করিয়া আর তাহারই উপর পরিপাটি করিয়া বিছানা বস্ত্র শয্যা। এক কোণে কতগুলি মাদুর গুটাইয়া ঠেস দেওয়া আছে দেয়ালে। পাশেই ভাঁজ করা কতগুলি বিছানা থাকে সাজান। অরুণ ভাবে, হয়তো এই ঘরেই তাহাকে শিক্ষার্থী জীবনের সুদীর্ঘ একটি বৎসর কাটাইতে হইবে। এই ভূমিশয্যায় শুইয়া, এই কঠোরতার নব্য দিয়া। দেহ ও মন দুইই প্রস্তুত ছিল অরুণের। হউক যতই কঠোরতা, সে ফিরিবে না। আসিবার সময় দুই একজন বন্ধু তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। প্রায় সব জানিয়া শুনিয়াই তো সে এখানে আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে দুই একটি করিয়া লোক কখন খাওয়া শেষ করিয়া আসিয়াছে তাহা অরুণ টের পায় নাই। তাহাদেরই মধ্যে একজন আলো জ্বালিয়া নিজের মাদুরটি পাতিতে পাতিতে জিজ্ঞাসা করিল,

'আপনার নামটি কি দাদা?'

'অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।'

'বামুন—এঁ্যা, একেবারে কুলীন ব্রাহ্মণ! আমি গয়লার ছেলে দাদা। বাড়ী আমার গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর। নামটি দাদা নেপাল—নেপাল ঘোষ। দিন, দিন দাদা, একটু পায়ের ধুলো দিন এই অধমকে।'

'পায়ের ধুলো!' অরুণ চমকাইয়া উঠিল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া। বয়সেও তো লোকটি তাহার অনেক বড় বলিয়াই মনে হয়।

'হ্যাঁ দাদা, পায়ের ধুলো। যা ভাবনা থেকে বাঁচিয়েছেন আপনি! কি হে অতুল, আমি বলেছিলাম না যে হিন্দু না হয়ে যায় না। তা', অতুলেরও দোষ নেই দাদা। আপনার এই পোষাক আর খোঁচা খোঁচা

দাড়ি দেখে ওরকম ভুল একটু হবারই কথা। অতুল তো আমার সঙ্গে বাজীই রাখলো!'

এতক্ষণে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হইল অরুণের। একটু অপ্রস্তুত হইয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই একবার খোঁচা খোঁচা দাড়ির উপর হাত বুলাইল। তাইতো, দাড়িটাও কামান হয় নাই কয়দিন! একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল:—'মুসলমান কারুর আসবার কথা আছে নাকি এখানে?'

'ঠিক ধরেছেন দাদা। শুনে অবধি তেবে আর বাঁচিনে। কিন্তু ওহে অতুল, কাঁড়া তো এখনও কাটল না।

অতুল ইতিমধ্যে কোণের দিকে নিজের বিছানা পাতিয়া লইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া শুইয়াই জবাব দিল, 'এত ব্যস্ত কেন হে? ভাত গয়লার ভাত কি আর অমনি যায়।'

নেপাল কিছু উত্তর দিতে যাইতেছিল। হঠাৎ দুয়ারের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ছুটিয়া উপুড় হইয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইল। মুখে অদ্ভুত এক আওয়াজ তুলিয়া, টানিয়া টানিয়া গদগদ স্বরে বলিতে লাগিল,

'ঠা—কু—র! ঠাকু—র্ র্ র্!'

বয়োবৃদ্ধ একটী লোক ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলেন। তুমুল একটা হাসির রোল উঠিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুচকী হাসিয়া লোকটি বলিলেন, 'সর, সর হে নেপাল! আরে, ঢুকতেও দিবা না নাকি?

একটা ছোটখাট হট্টগোল আরম্ভ হইল। কতক্ষণ এইরূপ চলিত বলা যায় না। হঠাৎ টুংটুং করিয়া একটা ঘণ্টার শব্দ হইতেই অরুণের পাশের ছেলেটী মৃদু কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'যান্, খেয়ে আসুন। সেকেণ্ড ব্যাচে খাবার ঘণ্টা পড়েছে।' কণ্ঠস্বরে শুভ্রতা মিশান।

'কিন্তু নেপালবাবুর কথা শুনতে গিয়ে আমার যে হাতমুখই ধোওয়া হয় নি এখনও।'

ছেলেটী অল্প হাসিয়া নিজের লণ্ঠনটি হাতে তুলিয়া লইল।

'চলুন, পুকুরঘাট দেখিয়ে দি।'

রাত্রিতে শুইবার পূর্বে অরুণ ডায়েরীতে লিখিল:

'হে যাত্রাপথের অগ্রদূত, আমার এই নবজীবনের প্রারম্ভে তোমায় প্রণাম জানাই। ওঁ শান্তি!

(২)

'স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মনে বারবার এই প্রশ্নই জাগিতে লাগিল যে বুদ্ধিমানের পাওয়া এই স্বাধীনতা দেশের কতটুকু মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে। সবরমতী হইতে সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, যতদিন দেশের প্রতিটি নরনারী স্বাধীনতার মূল মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন ইহাকে স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। দুইশত বৎসরের পরাধীনতা দেশকে যে শুধু রিক্ত, নিঃস্ব করিয়া দিয়াছে, তাহাই নহে, দেশবাসীর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাটুকুও তাহারা নিঃশেষে হরণ করিয়া লইয়াছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার 'শিক্ষা'। রূপকথার ঘুমন্ত পুরীর মত এই বিরাট দেশকে জাগাইতে পারা যায় একমাত্র শিক্ষার যাদুদণ্ড বুলাইয়া। শাসকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা নহে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হইবার উপযুক্ত শিক্ষা। যে শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের বাস্তব অবস্থার আছে নিবিড় সম্পর্ক, যে শিক্ষা আমাদের 'মানুষ' করিয়া তুলিবে। তাই তো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহামানব বহুপূর্ব হইতেই এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়াছেন আর তাঁরই চিন্তাপ্রসূত ফলস্বরূপ আমরা পাইয়াছি বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি।'

উদাত্তকণ্ঠে ছোট প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। তখনও ভোর হয় নাই। সবেমাত্র আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। মাটীর বেদীর উপর অধ্যক্ষের স্থির প্রশান্ত মূর্তি। নামের সঙ্গে আকৃতি, যেন প্রকৃতিরও যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। এক পাশে প্রার্থনার ধূপদানী হইতে তখনও মৃদু গন্ধ বাহির হইতেছে। অরুণের স্বপ্নাতুর মনে জাগিল পুরাকালের কোনও আশ্রমের দৃশ্য। শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে ঋষি

বালক বালিকাগণ বেদের পাঠ লইতেছে। বাহিরে তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। দুই একটা পাখীর কলরব শোনা যায়। অধ্যক্ষ হাত বাড়াইয়া লণ্ঠনটা কমাইয়া দিলেন।

'সহশিক্ষা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছিল। নইতালিম (নূতন শিক্ষা) এ সহশিক্ষার স্থান। তোমাদের আমি বলেছিলাম এ সম্বন্ধে ভেবে আসতে। তোমাদের মতামত বল।'

অরুণ একটু ইতঃস্তত করিতে লাগিল। আজ দুইদিন ধরিয়া সে আলোচনা শুনিয়াছে। যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছে সে এই লইয়া। কিন্তু নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে সে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। সমস্ত ঘরটা নিঃস্তব্ধ।

অধ্যক্ষের দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। অরুণ সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আচ্ছা, এ' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আছে কি? অবশ্য আমার মতের সঙ্গে আমি যুক্তি দেব।'

'তুমি নতুন এসেছ, তাই জান না। আমিও শিক্ষার্থী। আমি নতুন কিছু তোমাদের শেখাবার গর্ব নিয়ে এখানে বসিনি। পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে আমরা সকলেই এখানে উপকৃত হব। তোমার কাছেও আমরা সবলেই নতুন কিছু শুনতে চাই।'

'আমি যা বলব, তা' নতুন নয়। হয়তো অনেকেই এসব কথা ভেবেছেন। আমি বলতে চাই যে জগতের প্রতি দেশে প্রতিটী প্রয়োজনীয় বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, নারী পুরুষেরই সঙ্গে সমান তালে কাজ করে এগিয়ে গিয়েছে—উপযুক্ত শিক্ষা পেলে। বিশেষ করে গত মহাযুদ্ধে এই সত্য আমাদের চোখে বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সুতরাং নারীকে শুধুমাত্র নারী বলেই কোনও বিশিষ্ট শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা অপরাধ। এতে দেশ ও জাতি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য জৈব-তাত্ত্বিক দিক থেকে তাদের শরীর গঠন আলাদা। তাদের সন্তান ধারণ ও পালন করতে হয়। সেই বিশেষ শিক্ষাই শুধু তারা আলাদা ভাবে পেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত শিক্ষাই একযোগে হওয়া উচিৎ।'

'কিন্তু নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কি সমাজে কুফল ফলবে না?'

অরুণ তাকাইল। একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। সমস্ত ঘরশুদ্ধ লোকের দৃষ্টিও তাহার উপর। অরুণ একটু ভাবিয়া বলিল:

'দেখুন, এ'সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা শক্ত। তবে প্রথম কথা হচ্ছে, কুফলের সংজ্ঞা কি! একসঙ্গে কাজ করতে গেলে অবাধ মেলামেশার ফলে পরস্পরের মধ্যে যদি স্নেহ, প্রীতি বা শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা'কে কি আপনি কুফল বলবেন?'

মেয়েটির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ কোনও উত্তর যোগাইল না। তাহার এই বিব্রত অবস্থা দেখিয়া পাশেরই আর একটি মেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিলে পাঞ্জাবী মেয়ে বলিয়া ভুল হয়। সুন্দর, সুঠাম চেহারা, বলিষ্ঠ শরীর। মেয়েটি অধ্যক্ষের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল:

'ছাত্রার হয়ে এ'প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি। স্নেহ প্রীতি বা শ্রদ্ধায় কুফল ফলবে না কিন্তু নীতিধর্মের আবরণ যদি ছিঁড়ে যায়?'

বোঝা গেল মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। অরুণ একটু সাবধান হইল।

'নীতিধর্মের সংজ্ঞাও দেশ কাল ভেদে বদলে যায়। আজ যা ধর্ম, কাল হয়তো সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে অধর্ম হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে যেটা নীতি, অন্য দেশে সেটা হয়তো তা' নয়। তবুও আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। নীতিধর্মের আবরণ ছিঁড়ে যাওয়া না যাওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করবে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ওপর। সেই আবহাওয়া যত সুস্থ, সবল হবে, আপনার তথাকথিত নীতিধর্মও ততই অটুট থাকবে। অসুস্থ

পরিবেশে শত বাঁধন সত্ত্বেও আপনার ঐ নীতিধর্ম বজায় থাকবে না। আমার বিশ্বাস, পারিপার্শ্বিকতাকে সুস্থ ও সবল রেখে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় সুফলই ফলবে।'

সমস্ত ঘর বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাদের এই আলোচনা শুনিতেছিল। নেপাল অরুণের পাশেই বসিয়াছিল। অরুণ বসিয়া পড়িতেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

'বাঃ, বেড়ে বলেছেন দাদা! ঠিক জবাব হয়েছে। আরে মশাই, মেয়েগুলো দেমাকে আমাদের সঙ্গে কথাই কয় না। আমাকে তো হুকুমই করে।'

'হুকুম করে?'

'হ্যাঁ মশাই, হুকুম করে। এই সেদিন, ঐ যে অর্চনা বলে মেয়েটি—দেখুন, দেখুন, আমাদের কথা শুনতে পেয়ে হাসছে।'

অরুণও হাসিল। স্বচ্ছ সপ্রতিভ হাসি। ঘণ্টা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অধ্যক্ষ উপসংহারে বলিলেন:

'কোন কোন বিষয়ে অরুণের সঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনা না হলে এ'বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা শক্ত। তোমরা এ'বিষয়ে আরও গভীর ভাবে চিন্তা করবে। নতুন কোনও প্রশ্ন কারও মনে এলে বলবে, আমরা এ'নিয়ে আবার আলোচনা করব। এখন, কাল থেকে আমরা অন্য বিষয়ে চলে যাব। তবে, এ'প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আমি তোমাদের বলতে চাই। তোমরা দেখেছ, আশ্রমের ভেতরে এখানকার ভাই-বোনদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ আমরা দিয়েছি। তোমরা সকলেই শিক্ষিত ও পরিণত বয়স্ক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এক বছর বাদে যখন তোমরা এখান থেকে বেরুবে, তখন আজকের মতই সহজ ও স্বচ্ছন্দ মন নিয়ে বেরুতে পারবে। কোথাও কোন দাগ তোমাদের মনে পড়বে না।'

'অরুণ ভাই!'

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আশ্রমের একটা রীতি আছে, নতুন কেউ এখানে এলে তার নিজের পরিচয় নিজেকেই দিতে হয়। এখানে সকলেই তা দিয়েছে। যোগ্যতা, বাড়ীর ঠিকানা, এই সব। এতে লজ্জার কিছু নেই। আজ দু'তিনদিন তুমি এসেছ, তোমার পরিচয় এখনও আমরা কিছু পাইনি।'

'এটা একটু formality হয়ে যাচ্ছে না স্যার?'

'স্যার নয়, দাদা বা ভাই। এখানে আমরা সকলেই এক পরিবারভুক্ত। Community life lead করছি এখানে। আমরা সকলে ভাই বোন।'

'বেশ।' সপ্রতিভ ভাবেই অরুণ উত্তর দেয়; 'আমার নাম শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। বাড়ীঢাকা জেলায়। ম্যাট্রিক পাশ করেছি সেখান থেকেই, তারপর কলকাতা। বিজ্ঞানের ছাত্র আমি। দু'বছর আগে Masters degree পেয়েছি। বছরখানেক গ্রামের স্কুলেই মাষ্টারী করেছি। তারপর একটা কাপড়ের ছাপাখানার কাজ নিয়েছিলাম। মালিকের সঙ্গে মতান্তরের কথাটাও বলতে হয়। নতুবা হয়তো এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতির দিকে দৃষ্টি পড়তো না। মাত্র দু'তিন দিন হয় এখানে এসেছি। মনে হচ্ছে, আসা আমার সফল হবে। নতুন সমাজ গঠনের ইঙ্গিত পাচ্ছি। বয়স আমার চব্বিশ বছর।'

অরুণ থামিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিল। অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কোনও পরিচয়ে কাহারও প্রয়োজন আছে কি না। হঠাৎ নেপাল উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল:

'বিবাহিত কি অবিবাহিত?'

একটা হাসির ধুম লাগিয়া গেল। অরুণ কিন্তু গম্ভীর হইয়া বলিল:

'জিনিষটা ব্যক্তিগত। এর জবাব আমি দোব না।'

সে'দিন দুপুরে বিশ্রামের সময় অরুণ চিঠি লিখিল রাণীকে। এখানে আসিবার মাত্র কিছুদিন পূর্বে পরিচয় হইয়াছিল রাণীর সঙ্গে।

কিন্তু সময়ের স্বল্পতা অন্তরঙ্গতার স্বচ্ছ নীতিকে কোথাও বাধা দেয় নাই। আসিবার সময় রাণী বলিয়া দিয়াছিল, নূতন স্থান ও নূতন পরিবেশ কেমন লাগে জানাইতে। অরুণ, লিখিল,

'এখানে এসে জীবনের একটা সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছি। Work is delight here, not a drudgery. সম্ভব হয় তো একবার এখানে এসে ঘুরে যেয়ো।

ক্রমশঃ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নারীর ভূমিকা

শ্রীসুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[১]

হিটলারের অনুশাসন

"নারীর সংস্পর্শে আসিলে বেশীর ভাগ পুরুষই বোকা বনিয়া যায়। যাহারা যায় না তাহারা সরল ও দুর্বল। অবশ্য কিছু সংখ্যক সবল ও দৃঢ়চিত্ত লোকও আছে, কিন্তু সংখ্যায় তাহারা নিতান্তই লঘু, এবং জাতিগত কোন ব্যাপারে তাহাদের বিশেষ কোন মূল্য নাই। জার্মানীর পুনর্গঠনের ব্যাপারে আমাদের ইতিহাসের কথা স্মরণ রাখা উচিত। অতীতের যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি আমাদের নিকট এখন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতে আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত।"

"নারী যে কতখানি ক্ষমতা রাখিতে পারে ক্লিওপেট্রা আমাদের কাছে তাহার একটি উদাহরণ। এই শক্তি জাতির উপকারে ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেক শ্রেণীর নারীই আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়। সুগঠিত জাতির জন্ম দেওয়াই নারীর চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলের পক্ষে ইহাই চরম উদ্দেশ্য নহে, যাহারা কখনও সন্তানের জন্ম দিবেনা এরূপ নারীও আছে। তাহাদের যদি ঠিকভাবে চালিত করা যায় তবে তাহারা বিরাট প্রয়োজনে আসিতে পারে।"

"১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব যুগে পুরাতন জার্মানী অন্যান্য জাতির সামরিক ক্ষমতা ও গুপ্ত তথ্য নিরূপণ করার জন্য এবং সংবাদ ক্রয়ের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিল। ঐ সমস্ত সংবাদের বেশীর ভাগই ছিল ভুল। শক্তিশালী এবং ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী জার্মানীর বিরুদ্ধে পৃথিবীর জাতিসমূহ নিজেদের সশস্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত পৃথিবীর সন্ধি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে জার্মানী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সে জার্মানী যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, কিন্তু সে যুদ্ধের ফলাফল আমরা সকলেই জানি। এবারে যেন অবশ্যই তাহা না ঘটে। এবারে যখন জার্মানী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, পৃথিবীর জাতিসমূহ তখন অবশ্যই নিরস্ত্র থাকিবে। জার্মানীর যাত্রাপথকে অবশ্যই সুগম রাখিতে হইবে। কি ভাবে ইহা সম্ভব?"

"ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে, অন্যের অলক্ষ্যে, কেহ যেন সন্দেহ না করে। স্ত্রীলোকের পক্ষে এসব সম্ভব! অতীতে অন্যের গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করার জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এবারে তাহা দ্বারা জাতি-গঠনের কাজ হইতে পারে—ট্যাঙ্ক, বিমান, বন্দুক প্রস্তুত হইতে পারে, উহা দ্বারাই জার্মানীর বিরুদ্ধে সমস্ত বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। অন্যে কি করিতেছে তাহা জানিবার অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য ঐ অর্থ নষ্ট না করিয়া ঐ অর্থ জার্মানদের দ্বারা জার্মানদের জন্য জার্মানীতেই ব্যয় করা হইবে।"

"নারীরা অন্যান্য জাতিগুলিকে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জায় বাধা দিতে পারে। রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীকে কখনও জবাবদিহির সম্মুখীন হইতে হইবে না।"

"কোন সন্দেহ দেখা দিলে নারী তাহার নিরসন করিবে, অতীতের মত ভবিষ্যতেও তাহারা রাজা ও রাজত্ব ধ্বংস করিতে পারিবে। ঠিকভাবে চালিত করিতে পারিলে, জাতির প্রয়োজনে নারী যে কতখানি শক্তি নিয়োগ করিতে পারে, অন্যান্য অত্যাবশ্যক ব্যাপারের সহিত ইহাও জার্মানীকে বুঝিতে হইবে। নূতন জাতিকে নূতন পথে চলিতে হইবে। যে পথের কথা আমি বলিতেছি অনেকের পক্ষে নূতন হইলেও তাহা নূতন নহে। ইহা ইতিহাসের পুরাতন কথা। জগতের প্রথম নারী ইভ কি তাহার ক্ষমতা

প্রয়োগ করে নাই? ইহার জন্য একটি পৌরাণিক কাহিনী হইতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের প্রয়োজনে আসিবে। আকাশের উপর তাহার সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল। ঐ আধিপত্যের ফলে পৃথিবীর সমস্ত জীবনযাত্রার পরিবর্তন হইয়া গেল। প্রত্যেক দেশে আজ এইরূপ অনেক ইহুদ আছে। তাহারা জার্মানীর কাজে লাগিতে পারে, ও লাগিবে, এবং তাহাদের অবশ্যই কাজে লাগাইতে হইবে। তাহাদের মধ্যে অনেকে দার্শনিক, লোভী এবং বোধশক্তিবিনিষ্ট, বাকী সব খোসামোদ প্রিয় ও সর্বদা পরশ্ব ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ব্যস্ত। ঐ সমস্ত সাধারণ দুর্বলতাগুলিই আমাদের শক্তি যোগাইতে পারে। আমাদের বিরোধী জাতিগুলির সরকারী শাসনযন্ত্রের পরিচালকদের ইচ্ছা এবং মনের উপর আমাদের নিয়োজিত নারীরা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অথচ ঐ সমস্ত নারীরা হয়ত জানিতেই পারিবেনা যে তাহারা জার্মানীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। তাহারা জানিতেই বা পারিবে কেন? জার্মানীর পক্ষে তাহা বিপজ্জনক হইবে। কেহ অর্থ চাহে, কেহ সামাজিক মর্যাদা চাহে। আমি যে শ্রেণীর নারীদের কথা বলিতেছি তাহাদের নিকট ঐগুলি আকর্ষণীয় বস্তু। তাহাদের ঐ বৃত্তিগুলিতে ইন্ধন যোগাও। তাহাদের বুঝিতে দাও যে তাহারাই সরকারের শক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে, তাহা হইলেই জার্মানী যখন চাহিবে তখনই ঐ সমস্ত সরকারের পতন ঘটিবে।"

"ফ্রান্স এখনও প্রস্তুত হইতেছে এবং অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে। কি উদ্দেশ্যে? জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবার জন্য। ফ্রান্সকে অকর্মণ্য করিয়া দিতে হইবে। তাহার দুর্বলতাকে বাড়াইয়া তাহাকে কাজে লাগাইতে হইবে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বদ্বারা ক্ষত বিক্ষত কোন জাতি অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হইয়া শক্তিশালী হইতে পারে না। কেবল মাত্র একতাবদ্ধ জাতিই বাঁচিয়া থাকিয়া উন্নতি করিতে পারে। ফ্রান্স আজ দুর্বল তাহাকে আরও দুর্বল করিতে হইবে। কিন্তু ইহার ভিতর জার্মানীর হাত গোপন রাখিতে হইবে। ফ্রান্সের হাত দিয়াই ফ্রান্সকে দুর্বল করিতে হইবে। নারীর হাত দিয়াই তাহা করাইতে হইবে। ফ্রান্স দুর্বলতার জন্য কুখ্যাত; সর্বত্রই রাজনৈতিক আবহাওয়া, অসাধুতা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। রাজনীতিক এবং সরকার পরিচালকরা কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। ঠিক সময়ে ফ্রান্স ভাঙিয়া পড়িবে। ইহার দুই খণ্ডকে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। নারী দ্বারা ইহা হাজার গুণ বাড়ান যাইতে পারে। বিদ্বেষকে বাতাস দিয়া বাড়াইতে হইবে, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে উৎসাহ দিতে হইবে এবং উহা দ্বারাই শাসনযন্ত্রকে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে ঠিকভাবে চালিত করিয়া নির্দেশ দিয়া তাহাদের দ্বারা ইহা করান যাইতে পারে। ইহা অসম্ভব নহে। শাসনযন্ত্র যখন ভাঙিয়া পড়ে, রাজনীতিকরা যখন ঝগড়া বিবাদ নিয়া মত্ত থাকে, জাতি তখন উহা নিয়াই ব্যস্ত থাকে। দেশের সীমানার দিকে দৃষ্টি দিবার তখন সময় থাকেনা। অন্যান্য বিষয়েই মনোযোগ আকৃষ্ট থাকে।"

"ফ্রান্সকেই পরীক্ষাক্ষেত্র করিতে হইবে। আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ফ্রান্সে নারী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে, খোসামোদ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ভয় দেখাইতে হইবে। যাহারা পারিবে না তাহাদের ক্ষমা নাই।"

বৃদ্ধ হিণ্ডেনবার্গকে দিয়া নিজেকে চ্যান্সেলার ঘোষণা করার এক বৎসর পূর্বে নুরেমবার্গে নাজী নেতাদের একটি গুপ্ত আলোচনা সভায় এডল্‌ফ হিটলার এই অনুশাসন পেশ করে।

এই অনুশাসনই অধুনা স্বীকৃত পৃথিবীর সর্বত্র অবস্থিত জার্মান পঞ্চম বাহিনীর ভিত্তি।

হিটলারের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ফ্রান্সের পতন হইয়াছে। বেলজিয়াম, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও যুগোস্লাভিয়া পরবর্তী শিকার হইয়াছে।

নাজীবাদকে বাধা দিতে ও পরাস্ত করিতে শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডই বাঁচিয়া আছে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে জয় সুনিশ্চিত। আমেরিকার উদার সাহায্য সেই জয়কে আরও সমর্থন ও সুনিশ্চিত করিয়াছে।

কিন্তু হিটলার ও তাঁহার নাজী অনুচরগণ ইংল্যাণ্ডকেও ফ্রান্সের পথে চালিত করার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, ঠিক সময়ে জাগিয়া না উঠিলে হয়ত ইংল্যাণ্ডেরও পতন হইত। জার্মানীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে এইরূপ শত শত নারী পুরুষকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে পোষণ করিতেছে এই সন্দেহে ডিফেন্স রেগুলেশনের ১৮বি ধারায় স্বরাষ্ট্র সচিবকে প্রদত্ত অসীম ক্ষমতা অনুযায়ী আটক রাখা হইয়াছে।

আটক বন্দীদের অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক অনেকে বোধ হয় এখনও মুক্ত আছে। তাহারা মোটেই অনুতপ্ত হয় নাই। কিন্তু জাতির ক্রোধের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তাহাদের নাই। আমি একথা কোন সময়েই বলিবনা যে যাহারা পূর্বে জার্মানীকে সাহায্য করিয়াছে এবং বর্তমান ইংল্যাণ্ডের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে তাহারা নাজীদের বেতনভুক্ত ছিল। জার্মানীকে সাহায্য করার পরিবর্তে তাহারা একটি পয়সাও পাইয়াছিল একথা আমি বিশ্বাস করি না। ইহারা জীবনের প্রতি বিকৃত মন ও আদর্শ-বিশিষ্ট আদর্শবাদী। একশ্রেণীর লোক আছে তাহারা নিজেদের দেশের কিছুই ভাল দেখেনা। অন্য দেশের নীতি ও কার্যপদ্ধতি নিজের দেশের অপেক্ষা ভাল বোধ করে। এই সব সাধারণ সরল লোক কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করিয়াও তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার ফলে জাতির অশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ঐ শ্রেণীর লোক এদেশে অনেক ছিল। তাহারা নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া বেতনভুকের মতই নাজীদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে।

[২]

রহস্যময়ী নারীর প্রভাবে হিটলার—

জার্মানীর একনায়ক, শত্রুলোক, এডলফ্ হিটলার বলেন যে তিনি নারীদ্বারা বিচলিত হইবার লোক নহে, এবং স্ত্রীলোকের ছল, চাতুরী বা মিষ্ট কথা তাহার নিকট ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। হিটলার তাঁহার জীবনের প্রথম হইতেই নারী দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি নিজেকে নারীবিদ্বেষী বলিতেন বটে কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা ছিলেন না। সুন্দরী স্ত্রীলোকদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের চাটুবাদ শুনিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অবশ্য আর্য রমণীর ন্যায় গড়নবিশিষ্ট নারীই তাঁহার বিশেষ পছন্দ ছিল। স্ত্রীলোকদের নিকট বিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল। তাহাদের নিকট তিনি অতিরিক্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ভদ্রতা দেখাইতেন। প্রাচীন অষ্ট্রীয়ানদের ন্যায় গাম্ভীর্য সহকারে সে তাহাদের হস্ত চুম্বন করিতেন এবং ইহাতে নিজের আনন্দ গোপন করার চেষ্টা করিতেন না।

ইহার ভিতর কোন কৃত্রিমতা ছিলনা। তিনি স্ত্রীলোক পছন্দ করিতেন এবং তাহাদের ছল চাতুরী উপভোগ করিতেন।

হিটলার তাঁহার মাতার দ্বারা লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং বাল্যকালে কখনও সংযত পুরুষের প্রভাবে আসেন নাই। কয়েক বৎসর তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহার বালকোচিত খেয়াল খুসী সংযত করিতে পারেন নাই।

রংএর মিস্ত্রী হিটলার যখন ভাবী ওস্তাদিয়ার হিসাবে বালকত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া পরিণত বয়স লাভ করিলেন তখন তাঁহার মাতাই মিউনিকে তাঁহার গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। পরে হিটলারের দূর সম্পর্কিত এক ভগ্নী এঞ্জেলা তাঁহার স্থান পূরণ করে। সেই পুরাতন শহরের দীন কুটিরে এঞ্জেলা তাহার কন্যা গ্রেটা রুবলের সহিত বাস করিত।

গ্রেটা তখন কেবল মাত্র শিশু। হিটলার তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মামা হিটলার তাহার কাছে আদর্শ ছিল। প্রতি সপ্তাহে যা সামান্য বেতন সে পাইত তাহা হইতেই সে ভাগ্নের জন্য কিছু কিনিয়া আনিত।

বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবন যাপন করিলে হয়ত হিটলার আজ সম্পূর্ণ অন্য রকমের মানুষ হইতেন। তাঁহার দোষ ত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন গভীর কলঙ্কময় চরিত্রের তলদেশে বালক বালিকার প্রতি তাহার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। ইহার ভিতর কোন কৃত্রিমতা ছিল না। শিশুদের দাবী যে অত্যন্ত গুরুতর ইহা কখনও অস্বীকার করেন নাই। এমন কি গুরুতর রাজকার্য ফেলিয়া গোয়েরিং গোয়েবেলস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সহযোগীদের পুত্র কন্যাদের সহিত খেলিতে বসিতেন। সংসারী মানুষ হিসাবে হিটলার অত্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারিতেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিল তাহারা বলিয়াছে যে শিশুদের দলে তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন, তাহাদের পিঠে চড়াইয়া তিনি ভল্লুক ভল্লুক খেলা করিতেন।

হিটলার তাঁহার জীবনে গভীরতম দুঃখ পাইয়াছিলেন ১৯৩০ সালে যখন তাহার ভাগ্নী গ্রেটা কবল আত্মহত্যা করে। পাশে একটি রিভলবারসহ কপালে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাহাকে পাওয়া যায়। প্রণয়ঘটিত ব্যাপারই এই শোচনীয় ঘটনার মূল। গ্রেটা কবলকে যে ব্যক্তি প্রতারণা করিয়াছিল হিটলার তাহাকে কখনও ক্ষমা করে নাই। তাহার প্রতিশোধ ছিল ক্রুত এবং সুনির্দিষ্ট। সে যুবক তাহাকে প্রতারণা করিয়া পরকালের পথে পাঠাইয়াছিল, খুব অল্পদিনের মধ্যেই ঐ পথেই তাহাকে আবার তাহার অনুসরণ করিতে হইল। কি ভাবে কাহার হাতে তাহার মৃত্যু হইল তাহা এখনও রহস্যাবৃত।

কিন্তু ১৯৩০ সালের পূর্বেই হিটলার নিজেই ব্যর্থ প্রণয়ের আঘাত পাইয়াছিলেন। তখন তিনি সাধারণ শ্রমিক হিসাবে মিউনিকে বাস করিতেন—রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বপ্ন তখন দেখিতেন না। একটি কারখানার জার্মান শ্রমিকবালিকাকে সে ভালবাসিতেন। সাধারণ দৈনন্দিন প্রেমের ব্যাপার। বৈকালে অন্যান্যের ন্যায় তাহারাও উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সহজ আনন্দে মিলিত হইত। নষ্ট করিবার মত অর্থ উভয়ের কাহারও ছিল না। হিটলার তখন ভবিষ্যতের নীড় বাঁধিবার জন্য প্রতিটি পয়সা সঞ্চয় করিতেছিলেন।

তারপর আসিল আঘাত। সুন্দরী আর্যকন্যাটি আর একটি লোকের সাক্ষাৎ পাইল। সে ছিল ধনী। গয়না, পোষাক, গাড়ী, বাড়ী এবং দাস, দাসী, যা সে কখনও কল্পনাও করিতে পারিত না এ সবই সে দিতে পারে।

সুযোগ সে নষ্ট করিল না। এডল্‌ফ আর কখনও তাহাকে দেখেন নাই। লোকটি তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গিয়া প্রচুর বিলাসিতার মধ্যে ডুবাইয়া দিল কিন্তু বিবাহের মালা বদল হইল না। লোকটি শ্রমিক রমণীর উপর বিতৃষ্ণ হইয়া অন্যত্র মধুর সন্ধান করিতে লাগিল। দুইটি শিশুসন্তানসহ সে পরিত্যক্তা হইল। স্বাভাবিক পথেই বালিকাটি নীচে নামিতে লাগিল। শিশু দুইটি সরকারী সম্পত্তি হিসাবে কোন আশ্রমে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। শিশু দুইটির পিতা তাহাদের সম্বন্ধে বা যে বালিকাটিকে সে ধ্বংসের মুখে আনিয়া দিল তাহার সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিল না। এই ঘটনায় হিটলারের জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। যে ব্যক্তি তাহার প্রণয়িনীকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল সে ছিল একজন জু।

ঐ সময় হইতেই হিটলার জুদের ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সমগ্র ইস্রাইল জাতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

সেই একটিমাত্র জু তাহার জাতির শত সহস্রের ভাগ্যে বিপর্যয় আনিয়া দিল। একটি মাত্র জু বাকী থাকিতে হিটলারের প্রতিশোধ স্পৃহা কখনও মিটিবে না।

প্রণয়িনী দ্বারা পরিত্যক্ত হইবার পর হইতেই হিটলার জুদের পিছনে লাগিতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধু বান্ধবদের একত্রিত করিয়া তাহাদের মধ্যেও জুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

রাত্রির পর রাত্রি শিক্ষানবীরা লাঠি ও সীসাভর্তি

রবারের নল হাতে লইয়া জু শিকারে বাহির হইত। সহরের নির্জন অংশে বহু লোককে পিটাইয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া রাখা হইত। মিউনিকের পুলিশ বৃথাই দুর্বৃত্তদের খুঁজিতে লাগিল। নেতা হিসাবে হিটলার তখন হইতেই নিষ্ঠুর ধূর্ত ও নিপুণ ছিলেন।

কয়েক বৎসর পর নাজী ব্রাউন সার্ট দল গঠনের সময় হিটলার কি বলিয়াছিলেন তাহা এবার শুনুন। পুনরায় মিউনিকেও এক গুপ্ত সভায় বলিয়াছিলেন :

তখন তিনি নাজীদের বিরুদ্ধে তাঁহার বিখ্যাত অভিযানের উদ্যোগ করিতেছিলেন।

তাহার ভাষা হুবহু এইরূপ :—

"জু'রা জাতির দূষিত পরগাছা, তাহারা সুনির্দিষ্ট ভাবে অনভিজ্ঞ আর্য কন্যাদের উপর অত্যাচার করিতেছে এবং এমন একটা জিনিষ নষ্ট করিয়া চলিয়াছে যাহা পৃথিবী কখনও পূরণ করিতে পারিবে না। পৃথিবীর বিশুদ্ধতা এবং উন্নতির জন্য সমগ্র জু জাতিকেই নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজন।"

একটি নারীই তাহার কৃতকর্মের দ্বারা আজ হিটলারকে পশুতে পরিণত করিয়াছে। যে আঘাত সে পাইয়াছিল তাহা কোন দিনই সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। যে রাত্রে সে তাহার প্রণয়িনীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনিয়াছিল সেই রাত্রিতেই সে প্রতিশোধ গ্রহণ করার শপথ গ্রহণ করিয়াছিল। চরম দুঃখের দিনে যে শপথ সে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কোন ক্রমেই হাল্কা ছিলনা। ইহা এমন একটি প্রতিজ্ঞা যাহার ফলে একটি লোকের সমস্ত ভবিষ্যৎ নিরূপিত হইয়া একটি বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করিল এবং সমস্ত জগৎ তাহার সাক্ষী হইয়া রহিল।

তথাপি তথাকথিত স্ত্রীবিদ্বেষী এডল্‌ফ হিটলার—তিনি কখনও স্ত্রীলোকের বশীভূত হইবার কথা শুনিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন—আজ সম্পূর্ণভাবে একটি নারীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আছেন।

কিন্তু ইহা কোন অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপার নহে। কোন গুপ্ত প্রেমও ইহার পিছনে নাই। যে স্ত্রীলোকটির কথা বলিতেছি তাহার মধ্যে কোন উৎকট সৌন্দর্যের মোহন আকর্ষণ ছিলনা। সে ছিল অষ্ট্রিয়ার একজন কুৎসিত বৃদ্ধা।

তাহাকে সকলেই ফ্রাও এলসা বলিয়া জানে এবং সেই ছিল একমাত্র ব্যক্তি যাহার দিনে বা রাত্রে যে কোন সময়ে ফুরারের নিকট যাওয়ার ক্ষমতা ছিল। হিটলার জার্মান জাতির আরও অনেকের মত না যাহারা ছোট হইতে বড় হইয়াছে তাহাদের মত অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী ছিল। প্রাচীন যাদু বিদ্যা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সে মন্ত্র, ভাগ্য এবং অনুকূল প্রভাবের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। অন্যান্য অনেক ব্যাপারে সে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি হইলেও সর্বদাই সে অযৌক্তিক সংস্কারের দ্বারা চালিত হইত।

ফ্রাউ এল্‌সা নিজেকে একজন যাদু-বিদ্যার পুরোহিত এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা গণৎকারিণী বলিয়া দাবী করিত। ফুরারের উপর তাহার সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল। তাহার সামরিক উপদেষ্টাদের যথেষ্ট বিরক্তির কারণ থাকা সত্ত্বেও ঐ আধিপত্য অটুট আছে। সুতরাং তাহার সহিত যথা-সম্ভব সংঘর্ষ এড়াইয়া চলাটাই লোকে ভাল মনে করিত। ফ্রাউ এলসা একজন কলহপরায়ণ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। যে ফুরারকে সে অর্থহীন উপদেশ দিত সেই ফুরারকে প্রকৃত পক্ষে সে পূজাই করিত। ফুরারের রাজনৈতিক এবং সামরিক উপদেষ্টারা শীঘ্রই তাহাকে আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল।

হয়ত কোন বিশেষ পরিকল্পনা ফুরার তাহার স্বাভাবিক সামরিক উত্তেজনাবশে সেই মুহূর্তেই কার্যে পরিণত করিতে চাহিতেছে। তাহার সামরিক বিশেষজ্ঞরা ঐ পরিকল্পনার অকৃতকার্যতা উপলব্ধি করিয়াও তাহার বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করিত না। তাহাদের চাকুরী বজায় রাখিতে গেলে তাহাদের সর্বদাই "যো হুকুম" বলিতে হইবে। ফ্রাউ এলসাই তাহাদের

উপায় বাহির করিয়া দিত। তাহারও নিজস্ব উপদেষ্টা ছিল। চতুর বৃদ্ধা বুঝিয়াছিল যে হিটলারের অলৌকিক কিছু ঘটাইবার ক্ষমতা নাই। যে হুকুমের দল তাহার নিকট আসিলে সে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিত যে, এখন সময় অনুকূল নহে, যে হুকুমের দলও সন্তুষ্ট হইত এবং হিটলারও তাহার ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ডাকিনীর উপদেশে তাহার পরিকল্পনা স্থগিত রাখিত।

প্রতিদিন ফ্রাউ এলসা হিটলার ও তাহার অনুগামীদের একটি দৈনন্দিন কোষ্ঠী উপস্থিত করিত। সমস্ত জার্মানীতে হিটলারের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত যদি কেহ থাকে তবে সে ছিল ফ্রাউ এলসা। ঐ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সে তাহার অংশ অভিনয় করিয়া যাইত।

হিটলারের মত এইরূপ একজন বিখ্যাত প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে আজিকার দিনে কুসংস্কার দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকিবে ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে প্রতিভাশালী হইলেও হিটলারের জন্ম চাষী শ্রেণী হইতে এবং যে দেশ হইতে সে আসিয়াছে ঐ দেশেই যাদুবিদ্যার জন্ম হইয়াছে। ফ্রাউ এলসার ভবিষ্যদ্বাণী হিটলার বেদবাক্যের ন্যায় মনে করিত। অদ্ভুত হইলেও একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির অনেক ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হইয়াছে।

বার্লিনের সকলেই জানে যে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড আক্রমণের অনুকূল সময় কখন তাহা এলসাই বলিয়া দিয়াছিল। এবং কোন তারিখে ফ্রান্স সন্ধি প্রার্থনা করিবে তাহাও এলসা বলিয়া দিয়াছিল।

শোনা যায় হিটলার যখন ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করা স্থির করে তখন এলসাই তাহাকে নিবৃত্ত করে এবং বলে যে সেপ্টেম্বর মাসে ঐ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে গেলে পরাজয় ও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। বরং বিজয় লাভের পথ পূর্বাকাল হইতেই প্রশস্ত। ডাকিনীর এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য যে হুকুমের দল কতখানি দায়ী তাহা একমাত্র উহারাই জানে।

মূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত ফ্রাউ এলসার ভবন বার্লিনের ব্রাণ্ডেনবার্গ গেটের একান্তে অবস্থিত ছিল। ঐখানে বসিয়াই সে তাহার মানচিত্র এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করিত। সে ইচ্ছামত রাষ্ট্রভবনে প্রবেশ করিতে পারিত। তাহার বিশেষ প্রবেশপত্রখানি প্রহরীদের পক্ষে অবহেলা করা সম্ভব ছিল না।

বার্লিন সমাজে এলসা কখনও মিশিত না। স্বতন্ত্র ভাবে সারাজীবন সে তথাকথিত বিজ্ঞানের চর্চাতেই অতিবাহিত করিয়াছে।

আজকাল বার্লিনে এইরূপ শত শত ঐন্দ্রজালিক আছে। কোষ্ঠী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা তাহারা জন-সাধারণের নিকট হইতে বেশ দু'পয়সা কামাইতেছে। কিন্তু ফ্রাউ এলসার কথা স্বতন্ত্র। সে ছিল হিটলারের একান্ত নিজস্ব ঐন্দ্রজালিক, কাজেই সে স্বতন্ত্রভাবে জাঁক-জমকের সহিত বাস করিত।

এই বৃদ্ধাটি ইংল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের সমস্ত কিছুর উপরই তীব্র ঘৃণা পোষণ করিত। শোনা যায়, গত যুদ্ধে সে স্বামী এবং তিন পুত্র হারাইয়াছে। তার মধ্যে একটি মাত্র পনর বৎসরের বালক ছিল। এই ক্ষতির জন্য সে ইংল্যাণ্ডকেই দায়ী মনে করিত। হিটলার তাহার নিকট দেবতা ছিল। সে-ই তাহাকে অষ্ট্রিয়ার এক কদর্য বস্তী হইতে উদ্ধার করিয়াছে সুতরাং সে হিটলারের কুসংস্কারের এবং দাম্ভিকতার ইন্ধন যোগাইয়া একদিকে সে হিটলার এবং নাজীনেতাদের সেবা করিত এবং অন্য-দিকে তাহার নিজের পথে তাহার চির শত্রু ইংরাজদের ক্ষতি সাধন করিত।

বার্লিন প্রত্যাগত একজন আমেরিকান বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে সেখানে ফ্রাউ এলসা সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আলোচনা করা নিষিদ্ধ। সংবাদ পত্রেও তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা বা উল্লেখ করা নিষিদ্ধ ছিল। জার্মানীর জনসাধারণকে একথা জানিতে দেওয়া চলেনা যে তাহাদের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ফুরারের পায়েও কাদা লাগে।

[ক্রমশঃ

* রিচার্ড ড্যাকসটন লিখিত "গিলটি উওম্যেন" পুস্তকের অনুবাদ।

বিড়ম্বনা

শ্রীলীলা দত্তগুপ্তা

পকেট থেকে গোলাপী খামখানা বের করতেই হিমানী এগিয়ে আসে,—কার বিয়ের চিঠি? বলে তুলে নেয় চিঠিখানা।

সরকার সাহেবের মেয়ের বিয়ে, তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন বিশেষ করে। গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে বলল অজয়।

—"ও বাবা সে তো শুনেছি একেবারে সাহেব!"

সাহেবরা বুঝি মেয়ের বিয়ে দেয় না?

তা দেবে না কেন? আমি বলছি ওরা অত বড়লোক, অত টাইলিষ্ট। ওদের ওখানে কি আমাদের মত লোকদের মানায়?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে গিয়েও চাপতে পারল না হিমানী। অজয় চমকে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। কি যেন মনে পড়ল,—একটু সময় চুপ করে থেকে বলল,—নাঃ এরা খুব ভাল লোক। না গেলে দুঃখিত হবেন।

ধনীর সমারোহপূর্ণ উৎসবে তাদের মত গরীব না গেলে কেউ দুঃখিত হবে এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখন শুনেছে না কি! হিমানীর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে যায়।

অজয়ের সারাদিনের কর্মক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে হিমানী তাড়াতাড়ি বলল,—থাকগে এখন ও কথা,—তুমি কাপড় জামা বদলে হাত মুখ ধুয়ে এস। আমি খাবার নিয়ে আসছি।

অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় হিমানীর। বছর সাতেক আগের কথা। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের ছেলের বিয়ে। তার 'বৌভাতে'র নিমন্ত্রণ করতে এল সে বাড়ীর একটি ছেলে। বড় লোকের ছেলে, বাড়ীর মোটর হাঁকিয়ে এসেছে। অজয় বাড়ী নেই। হিমানী ভেবে পায় না কেমন করে তার আদর যত্ন করবে।

ছেঁড়া বিছানা আর ভাঙ্গা বাক্স পেটরা—তাড়াতাড়ি কোন মতে একটু আড়াল করে ঢেকে ঢুকে বিছিয়ে দিয়েছিল দশ বছর আগের রং ওঠা ছেঁড়া বেড্ কভারখানা বসবার জন্য। তারপর অন্য ভাড়াটেদের ছেলেকে দিয়ে খাবার আনিয়ে চা' করে সযত্নে প্লেট সাজিয়ে এনে দিয়েছিল ছেলেটীর সামনে। কিন্তু ছেলেটি কিছু স্পর্শও করল না। তার নাকি বাইরে খাবার অভ্যেস নেই।

অজয় বাড়ী এলে হিমানী বলল নিমন্ত্রণের কথা। অজয় মাথা নেড়ে বলল—যাব না।

—ও মা যাবে না কেন? নিকট আত্মীয়। না গেলে কি মনে করবেন বল তো?

—কিছুই মনে করবেন না হিমানী। আমরা কখনও ওদের বাড়ী গেলে ওরা কথাই বলে না ভাল ক'রে। যদি বলেও, মনে করে মহা অনুগ্রহ করে আমাদের একেবারে ধন্য করে দিলেন। তা ছাড়া গেলেই তো নতুন বৌকে দিতে হবে কিছু। নেহাৎ খেলো জিনিষও দেওয়া চলবে না। নিজেরাই ভাল করে খেতে পাইনা ও সব সখ বাদ দাও।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সামাজিকতা. স্বজন দুষ্টি ইত্যাদীর দোহাই দিয়ে হিমানী অজয়কে রাজী করিয়েছিল। তারপরের ঘটনা মনে হলে এখনও হিমানী লজ্জায় মেয়ে ওঠে।

তখন শীতকাল। অজয় বা হিমানীর ভালো শীতের জামা ছিল না যা' পরে বিয়ের নিমন্ত্রণে যাওয়া যায়। তবু যা ছিল হিমানী তাই ধুয়ে রিপু করে এক রকম সাঁড করাল। কিন্তু মুস্কিল হ'ল শাল নিয়ে।

অজয় বলল,—আমার শালখানা তো অকেজো হয়ে

গেছে। অফিসের বন্ধুদের কাছ থেকে একখানা শাল চেয়ে আনব নাকি ?

হিমানী বলল,—'দরকার নেই তোমার এই অকেজো শালই কি করে কাজের করে দি দেখো।

বাস্তবিকই হিমানী শালখানাকে পরিপাটি করে ভাঁজ করে ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে সেলাই করে এমন ভাবে আটকে দিল যে বাইরে এতটুকুও কিছু বোঝা যায় না।

নিমন্ত্রণের দিন ও সময় এসে গেল। নতুন বৌকে দেবার জন্য অজয় ধার করা টাকায় একখানা শাড়ী কিনে এনেছিল। তিন যায়গায় সেলাই আর চার যায়গায় রিপু করা গরম পাঞ্জাবীর ওপর ভাঁজে ভাঁজে সেলাই করা লাল কাঁধে ফেলে হিমানীকে নিয়ে চলল অজয়—আত্মীয়ের বাড়ী সামাজিকতা রক্ষা করতে।

হিমানীর সাজ সজ্জাও ভালই হয়েছিল সেদিন। বিয়ের সময়কার গোলাপী বেনারসীখানাই ঘুরিয়ে পরে নিয়েছিল আধুনিক ষ্টাইলে। আর গরম ব্লাউজটা পুরনো হলেও ছেঁড়া ছিল না—তা ছাড়া শাড়ীখানা বেশ চকচকেই ছিল।

বিরে বাড়ী। প্রাসাদোপম অট্টালিকা। আলোয় ঝলমল করছে। বাইরে অগণিত মোটর, ভেতরে অসংখ্য মানুষ। হিমানী অজয়ের পিছু পিছু ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকল। দু'তিনটি ভদ্র মহিলা ওপরে উঠে যাচ্ছেন দেখে অজয় হিমানীকে ওপরে যেতে বলল।

ওপরে যে হলঘরে ঢালা ফরাসের ওপর নিমন্ত্রিত ভদ্র মহিলারা নতুন বৌকে ঘিরে বসেছিলেন সেই ঘরের জানালার পাশে এসে হিমানী দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘরের ভেতর রূপ, রং ও গন্ধের কী সমারোহ। দামী শাড়ী গহনার যেন প্রতিযোগিতা লেগে গেছে এখানে। হিমানী তার শাখার সামনের সরু বালা জোড়া ও কানের 'টাব' দুটোতে আলগোছে একবার হাত বুলিয়ে নিল।

হঠাৎ পেছনে কথা শুনে চেয়ে দেখল কয়েকটি সুসজ্জিতা মহিলা আসছেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করতে এ বাড়ীরই একটি মেয়ে ও একটি বউ এগিয়ে এল এবং তাঁদের নিয়ে হলঘরে বসাল। হিমানীকে তারা দেখেও একটি কথা পর্যন্ত বলল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে ভেতরে ফরাসের এক ধারে গিয়ে বসল।

ওদিকে পুরুষদের খাওয়া শুরু হয়েছিল। একদল খেয়ে বেরিয়ে গেল, আরেক দলের ডাক পড়ল। অজয়ও তাদের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল। শচী নামে বাড়ীরই একটি ছেলে এসে বলল—"আরে এই যে অজয়দা—কখন এলে ?" অজয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করেই অজয়ের কাঁধের ওপর থেকে শালখানা টান দিয়ে তুলে নিয়ে বলল —একটু দোকান যেতে হচ্ছে, আসছি এখখুনি।

অজয় বাধা দেবার সময় পেল না।

শালখানা খুলতে গিয়ে বাধা পেয়ে ছেঁড়া অংশ ও সেলাই নজরে পড়তে হো হো করে হেসে উঠল—আরে এর মধ্যে যে অনেক কারুকার্য দেখছি বলে খুলে ধরল শালখানা। বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এভাবে অপদস্থ হয়ে অজয়ের মুখ কালো হয়ে উঠল।

শচীর হাত থেকে শালখানা টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল হিমানীর খোঁজে।

হিমানী তখন নতুন বৌকে আশীর্বাদ করে শাড়ীখানা তার হাতে দিয়ে ফিরে আসছিল—দরজার দিকে তাকাতেই দেখল অজয় দাঁড়িয়ে আছে—তাকে ইসারায় কাছে ডেকে বলল—"শীগগীর চল।"

হিমানী আশ্চর্য হয়ে বলল—"সে কি—এখনও খাওয়া হয়নি যে।"

—"থাক আর খেতে হবে না"। বলে অজয় ওকে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল।

নিমন্ত্রিত হয়েও ধনীর গৃহ হতে অজয়রা সেদিন অভুক্ত ফিরে এল। আচরণ এবং আভরণের ঔজ্জ্বল্য কম বলেই হয়তো তাদের কেউ একবার জিজ্ঞেসও করল না খাওয়া হয়েছে কি না।

পরিবর্তনশীল জগৎ। অজয়ের সংসারের পরিবর্তন এসেছে। আশী টাকার কেরাণী বর্তমানে দেড়শ' টাকায় উন্নীত হয়েছে। অগ্নিমূল্যের বাজারে এতে কুলিয়ে ওঠা দায়। তবু মেঝের ছেঁড়া বিছানা তক্তপোষে উঠেছে। অতিথিদের বসতে দেবার জন্ত রং-ওঠা বেড্‌কভারের বদলে শতরঞ্চি মাদুরও হয়েছে। কিন্তু এই সামান্ত আয়ে কত দিকে সামলাবে,—এদিক টানতে ওদিক কুলোয় না। তবু সময় কারো মুখ চেয়ে বসে থাকে না। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সময়ের চাকা গড়িয়ে চলে।

অজয়ের অনুরোধে হিমানীকে রাজী হতে হ'ল। কোথায়ই বা যায় হিমানী। দিন রাত ঘরের কোণে মুখ গুঁজে থাকা। কিন্তু এ হ'ল রীতিমত সাহেব বাড়ী। সেই রকম টাইলেই যেতে হবে। পেঁয়ো ভূতের মত সং সেজে যাওয়া যায় না।

অজয় বলল—আমার তো নতুন তাল স্যুট রয়েছে। তোমারও আছে শাড়ী জুতো। কিন্তু একটা সুন্দর লেডিজ ব্যাগ হ'লে বেশ হত তোমার 'ড্রেস্'টা—।

হিমানী হেসে ফেলল অজয়ের কথার ধরণে। বলল, —রয়েছেই তো আমার কাঁচের কাজ করা বটুয়া।

—না না—বটুয়াটা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। উপহার দেবার জন্ত ফুল জোড়া কিনতেই অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। না হলে তোমার জন্ত একটা ভ্যানিটী ব্যাগ কিনেই আনতুম। তা একটা আমি জোগাড় করব'খন।

হিমানী বলল—থাক্ হয়েছে। ধার কর্জ করে চেয়ে চিন্তে নিমন্ত্রণ খেতে গেতে হবে না। কোন প্রয়োজন নেই ভ্যানিটী ব্যাগের। আজকাল বিশেষ কেউ নেয়ও না।

অজয় কিন্তু হিমানীর কথা শুনল না। সে তার মাসতুত বোনের কাছে থেকে এক রাত্রের জন্ত তার ভ্যানিটী ব্যাগটা চেয়ে আনল।

যথা সময় স্বামী স্ত্রী শোভন সুন্দর বেশে বিয়ে বাড়ী গেল,—এবং প্রচুর আদর আপ্যায়নের মধ্যে বিয়ে দেখা এবং খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ী ফিরবার জন্ত প্রস্তুত হ'ল।

ইতিমধ্যে একটি নিমন্ত্রিতার বাচ্চা ছেলেকে আদর করবার সময় হাতের ব্যাগটা হিমানী টেবিলের ওপর রেখেছিল। অনভ্যাসের দোষে যাবার সময় ব্যাগটা তুলে নিতে সে ভুলেই গেল।

বাইরে যেতেই অজয় মৃদুস্বরে বলল কই তোমার ব্যাগ?

হিমানীর মুখ শুকিয়ে গেল। এঁ্যা,—তাই তো— হল-ঘরের টেবিলের ওপরে ফেলে এসেছে যে। পরের জিনিষ। ফেলেই বা যায় কি করে?

অজয় একটি ছেলেকে বললে। সে ছুটে গেল ওপরে ভ্যানিটী ব্যাগের খোঁজে। একটু পরে সেই ব্যাগটি হাতে নিয়ে ছেলেটি এসে বলল,—কই মিসেস রায়ের ব্যাগটা পেলাম না। হাতের ব্যাগটা দেখিয়ে বলল, এইটে পাওয়া গেছে, কিন্তু এটা মিসেস্ ব্যানার্জির। এক কোণে নাম লেখা রয়েছে।

অজয় হিমানীর দিকে চেয়ে একটু হেসে ছেলেটিকে বলল—থাক্‌গে—ঠিক আছে।

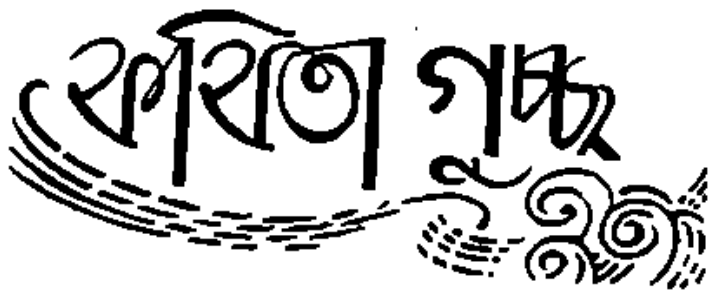

শাশ্বত প্রেম

আনোয়ার হোসেন

এই যে সুন্দর পৃথ্বী গন্ধে গানে অপূর্ব অতুল
যার প্রতি তরুলতা নদী গিরি তারকার ফুল
সুখ স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে রূপে রাগে নাচায় হৃদয়
তার সাথে জন্ম হ'তে অঙ্গে অঙ্গে জেগেছে প্রণয় ;
হৃদয়ের তারে তারে বাজে সুর বিচিত্র মধুর,
কাচের মতন তাই প্রেম মোর নহেকো ভঙ্গুর।

সুখে দুঃখে হাসি কাঁদি কভু গাই বেদনার গান,
দুঃখ-পাত্র নিঙারিয়া নিতি কত মধু করি পান ;
শত ব্যথা ভুলে যাই ধরিত্রীর শ্যামল শোভায়
দূরে যায় অন্ধকার কুসুমের হাস্যের প্রভায়।
দুঃখময় এ-জীবন, তবু হৃদে বাঁধে প্রেম-ডোর,
ধরার মাধুরী পিয়ে দিবানিশি রহিগো বিভোর ;

সুধা ঢালে গানে গানে চিত্তে মোর কোকিল পাপিয়া,
তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গে ছন্দে ছন্দে জেগে ওঠে হিয়া।
কৈশোরের খেলাঘর আজি মোর মিলন-বাসর,
আনন্দগীতিকা গাহি' নিত্য নব জাগাই আসর।
প্রাচীন এ-পৃথ্বী তবু রাজে চির নবীনের হাসি,
নব নব ছন্দে সুরে প্রাণে তাই বেজে ওঠে বাঁশি।

পৃথ্বীর সম্পদে মন ভরে যবে বিতৃষ্ণায় মোর
শাশ্বত প্রকৃতি রূপে ভুলে যাই দুঃখ ব্যথা ঘোর ;
ভালোবাসি তাই আমি বনে বনে জ্যোছনার হাসি,
চঞ্চলা ঝর্ণারে আর নদীকূলে কাশ ফুল রাশি।
অটল এ-প্রেম মোর কভু এর নাহি পরাজয়,
গানে গানে প্রেম মোর রবে জাগি শাশ্বত অক্ষয়।

বর্ণদীপ্র

সনতকুমার মিত্র

বর্ণ সমারোহে তুমি আমার সম্মুখে এলে পর
তোমাকে চিনতে আমি ভুল করি। মন সরোবর
তোমার ছবিকে বুকে তুলে নিতে হয় না সক্ষম,
কেন যেন মনে হয় তুমি এক দূর বিহঙ্গম
চকিতে এসেছো নেমে,-ক্ষণিকের খেয়ালের ডানা
কুড়িয়ে স্মৃতির ঝুড়ি তুচ্ছ করে আর সব মানা
আবার ফিরবে নীড়ে ; আর আমি স্মৃতির আগুনে
দগ্ধ হবো পথ চেয়ে প্রতীক্ষার প্রতিপল গুনে।

বর্ণ-গন্ধ মুক্ত হ'য়ে গোধূলির স্নিগ্ধছায়া মেলে
চোখের তারায় তীব্র প্রেমের প্রদীপ শুধু জেলে
অস্ফুট নূপুর-ধ্বনি পথ চিনে হৃদয়ে বাজিয়ে
তুমি এলে, কল্পনায়-সাত-রঙে তোমাকে সাজিয়ে
তুলে নেব ; চিনে নিতে ভুল আমি করব না আর
বর্ণ-গন্ধ মুক্ত হয়ে যদি এস হৃদয়ে আমার।

সমুদ্রসৈকতে

সন্তোষকুমার অধিকারী

একটি অনন্ত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের নিশ্চিন্ত বিস্তার
চোখে নিয়ে দাঁড়ালাম,
শুভ্র বালুতটে লগ্ন কণিকার বিন্দু বিন্দু জলে
ছেড়ে দিয়ে বালুকার মত এ' শরীর
দাঁড়ালাম অপার জলধিকূলে।
নিমীলিত করিলাম বিস্ময়ে আপ্লুত দুই চোখ,—
ঐ সমুদ্র মুছে দিক জীবনের বারিবিন্দু যত
কল্পনার সুনীল আকাশে।

অনন্তে ত' পাইনি আশ্রয়।
সঙ্কীর্ণ জীবন বদ্ধ, ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর আশা ;
পারেনি এ' শীর্ণ মন দিগন্তের উধাও মেঘের
সঙ্গী হ'তে দীর্ঘকাল ;
এ' বেদনা পলে পলে হৃদয়ে জ্বেলেছে দাহ,
করেছে মলিন,
চূর্ণ হোক সঙ্কুচিত জীবনের বাধাবদ্ধ যত,
অপূর্ণতা মেলে দিক পাখা তার দিগন্তের নীলে ;
খুঁজে পাক্ হৃদয় আমার
আরবার অনন্ত সমুদ্রে মগ্ন লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের শরীর।

চূর্ণ হোক সঙ্কীর্ণ পৃথিবী ;
চোখে নিয়ে দাঁড়ালাম অন্তহীন উদার সুনীল ;
প্রত্যহের তীর হ'তে আকাঙ্ক্ষার সংখ্যাহীন ঢেউ
লগ্ন শেষ প্রশান্ত গভীরে ;
হৃদয়ের অশান্ত উচ্ছ্বাস আশা
মিলাইলো ধীরে
এ' সমুদ্র ছেয়ে গেলো পৃথিবী আকাশ মন
বিক্ষুব্ধ জীবন।

চোখে নিয়ে দাঁড়ালাম ;
যেথা নেই দিগ্‌বন্ধ রাত্রির নিষেধ ;
ক্ষুদ্র বেদনার নীড়ে কেঁপে ওঠা বিপুল অনন্ত
বিশাল...ব্যাকুল।
যেথা মোর লুপ্ত হ'লো চেতনার সমস্ত আলোক
অকূল অতলে॥

কোণারক

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সূর্যের সপ্তাশ্ব-রথ মূর্ত মন্দিরেতে,—
নির্জন নীলাম্বু-চুম্বী সমুদ্র-সৈকতে
শোভা পায়। ধাবমান জীবনের পথে
কোণারক-শিল্প-সার পাথরেতে গেঁথে
তুলেছে ভাস্কর যা'রা শিল্প-রসে মেতে
মৃত্যু-ভীতিরেও ভুলে, তা'রা নানা মতে
মুক্তি পেলো মরণেরও বিস্মরণ হ'তে।

শিল্পায়নে মোহ আনে আজও নয়নেতে।
সৈকতে ভাঙিছে ঊর্মি, অম্বুধি মাতাল।
রহস্য-রঞ্জিত-কান্তি শান্ত কোণারক,—
মহিমার মহামূর্তি, অভ্র-দীপ্ত ভাল,
শোভমান সুমহান শিল্পের পাবক।
নীলাপদ্ম হেরি' শুদ্ধ কাপালিক কাল
কোণারকে সুপুষ্পিত শিল্পের কোরক।

তৃষ্ণা

প্রভাকর মাঝি

জীবন যদি হয় বেদনা-দুর্ধর
মনের কোণেরেরা সহসা ঝরে যায়—
আঁধার পথে যেতে নিবলো উৎসাহ,
কি হবে অপরাধ? কি হবে ক্ষতি তা'য়?

ঘাসের, শিশিরের, ফুলের সৌরভ
যদি না করে আর মনকে উন্মন।
পাখীর কল-গানে যদি না জাগে প্রাণ,
চৈত্রে যদি বয় শীতের সমীরণ!

সকাল থেকে সুরু দিনের সংগ্রাম
সকল দেহ জুড়ে করুণ ক্লান্ত তার।
শ্রান্ত পদাতিক কাঁপছে থরো-থর,
সময় নেই নেই, ভাল যে বাসবার।

জীবন ঝরো-ঝরো; সকলি চলে যাক—
তৃষ্ণা জেগে থাক, তৃষ্ণা জেগে থাক।

দীপ্তি দেবে মৃত্যু

অমলকান্তি ঘোষ

আজ তুমি স্বপ্ন নও, সারাদিন ধরে
তোমাকে পড়ে না মনে! স্বপ্নের প্রহরে
মূর্তিমান বিঘ্ন হয়ে শুধু উঁকি দাও।
দিন-বর্ষ লুপ্ত হ'ল। একুল সন্তাস
ভুলে গেছে অতীতের শ্যামল অঙ্গনে।
যদিও ক্ষণিক বৃষ্টি চিত্রের অঙ্গনে
শৈশবের দিন আনে, স্পষ্ট শ্যামলিমা।
আবার প্রমূর্ত হয় রৌদ্রের মহিমা।

আয়ার দৃষ্টিরপটে শুধু অগামীর,
সুবর্ণ প্রলেপ। তবু কিছু চিহ্ন রয়ে।
একদা সঙ্গীত সত্তা, আজ শুধু নাম;
তারেই লুণ্ঠন করে প্রাণের প্রণাম।

তুমি বর্তমান তাই অবজ্ঞার পাকে।
চির দীপ্তি দেবে মৃত্যু নিশ্চিহ্ন তোমাকে।

প্রাথমিক

সলিলকুমার মিত্র

আলোর অম্লান পাখী উড়ে এলো স্বর্গতীর্থ থেকে
সৃষ্টির উত্তাপ নিয়ে, পালনের স্বপ্ন চোখে মেখে,
মাটির গুদুরে,—হৃদয়ের চেতনায়; তার ছায়া পড়ে
আমার সহনে আর-ধরার-অধরে।

আলোর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাতের কান্নার যুক চেরা
চোখের জলের মত : ঘাসের নীচের শিশিরেরা
প্রথম আলোর স্পর্শে মিলনের তৃপ্তি-কাঁপা দৃষ্টি দীপ জেলে,
সলজ্জ হাসির মত রামধনু ছবি দেয় মেলে;

তারপর সীমা ছেড়ে অসীমের আহ্বানে সেও দেয় সাড়া—
আলোর সমুদ্রে হয় হারা।

চেতনার মর্মমূলে তীব্র তীব্রাঘাতে—
ঘর্ষনিকা নামে মুক্ত হৃদয়ের রাতে,
মুখর হৃদয় তাই কলকণ্ঠে গেয়ে ওঠে গান;
তারপর লীন হয় প্রাথমিক সঙ্গীতের এ উচ্ছল প্রাণ
তন্ময় ধ্যানের এক অতল সমুদ্রে, আর সমুদ্রের সুরে
ভেসে যায় সব ছবি সীমার সুদূরে।

কাশ্মীর

হিমাংশু চৌধুরী

দিল্লী, পাঠানকোট,—আরো দূরে হিম উত্তর
আঁকাবাঁকা হাওয়া দেওয়া অ্যাস্ফাল্ট পথ
দুধারে ভুট্টার ক্ষেত, ধানের—গমের—আর
দেবদারু, পাইনের ইতস্তত অপরূপ মিল
গানের সুরের মতো,—পাতরতা ছবির মিছিল
সটান কিছুটা সোজা তারপরে হামাগুড়ি—
ঘুরে ঘুরে ঘরে উত্তর—
জম্মু—অনন্তনাগ—নৌশেরা—দূর শ্রীনগর
গিলগিট—ডারকোট—উত্তর আরো উত্তর।

এ এক বরফদেশ,—নির্জন মেয়ের মতন
একান্ত আপনমনে কাঁচালোনা টিপ পরে
হাসে খেলে যখন তখন;
কখনো সে বেগবতী ছুঁয়ে ছেনে তীর থেকে তীর
বৈ ফোটে তার মুখে—কখনো সে নির্জন গভীর।
জাফরানী সালোয়ারে সে মেয়ে আঙুর ক্ষেতে,
আপেলের গাছের ছায়ায়,
কখনো সে ডাল দুলে সাম্পান বেয়ে চলে
কখনো সে উড়ে উড়ে যায়
হালকা হালকা চালে ফিনফিনে নরম শরীর
সে এক পাহাড়ী মেয়ে,—উত্তরা, নাম কাশ্মীর।

মানমুক্ত

অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ

তুমি স্রষ্টা, বিশ্বপ্রভু, সর্বশক্তিমান্
তোমার কীর্তির চেয়ে, আমি যে মহান্।
অনড়, অচল তুমি, উন্নতির নাহি অবসর,
আমি নিত্য ঊর্ধ্ব-গতি—সদা অগ্রসর।
* * *
আলো হ'তে আরো আলো পানে, মোর অভিযান,
যদিও রচিলে মোরে তুচ্ছ অতি,—ধূলির সমান।

সেদিন কি ভেবেছিলে, স্রষ্টা তুমি, ওগো মহেশ্বর!
স্বর্গের আসন পানে নিজ বলে হবো অগ্রসর?
হুল্‌জ্যা পর্বত আর সীমাহীন কালের সাগর
ধূলিবাধা এই পায়ে দলি যাব স্বয়ং নির্ভর?

Watsonএর The Dream of Man কবিতার মর্মানুবাদ

পুনরাবৃত্তি

২১

যে রক্ষীটি পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল সে-ই আবার হীরালালকে প্রাসাদদ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। বোধ করি অজ্ঞাত কোন নির্দেশেই সে এতখানি তৎপরতা করিয়া থাকিবে। কিন্তু যেখানে হুশেনী বেগম আছেন সেখানে ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হইবে না—এটা কেমন করিয়া যেন হীরালালের বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কাজেই সে রাজবাড়ীর প্রহরী বা রক্ষীর এতটা তৎপরতাতেও বিস্মিত হইল না। তবে প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া সে একটু বিব্রতবোধ করিল। রক্ষীটি ততক্ষণে কাটা ফটক বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। বাহিরের গলিপথটা তখনও যেন অন্ধকার—এবং জন-মানব-শূন্য। কাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিবে বুঝিতে না পারিয়া সে বোকার মত এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। হয়ত বা কথঞ্চিৎ নিরাশও হইল।

কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তমাত্র। দেখা গেল হুশেনীর উপর হইতে তাহার বিশ্বাস টলিবার মত কোন কারণ ঘটে নাই। কোথা হইতে পাশাপাশি অট্টালিকাগুলির জমাট বাঁধা ছায়ান্ধকার ভেদ করিয়া নিশীথচারী দৈত্যের মত বাহির হইয়া আসিল সর্দার খাঁ।

তবে আজ আর তাহাকে দেখিয়া হীরালাল ভয় পাইল না। বরং সাগ্রহে আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, 'বেগমসাহেবা আপনাকে পাঠিয়েছেন বুঝি? তিনি কোথায়? বাড়ী গেছেন?'

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করিল না সর্দার খাঁ, সে সংক্ষেপে শুধু কহিল, 'আমার সঙ্গে চলুন' এবং হীরালাল আসিতেছে কিনা দেখিয়াই লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সে নিজে চলিতে শুরু করিয়া দিল!

তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলা কষ্টকর। তবু হীরালাল অনেক চেষ্টায় কতকটা তাহার পাশাপাশিই চলিতে লাগিল। কিন্তু দেখা গেল সর্দার খাঁ নির্বিকার সে সোজা সামনের দিকে তাকাইয়া হাঁটিতেছে, হীরালালের দিকে চাহিয়াও দেখিতেছে না।

খানিক পরে হীরালালই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, ডাকিল, 'খাঁ সাহেব।'

উত্তর নাই।

'খাঁ সাহেব, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে!'

এবার সর্দার খাঁ তাকাইল। উদ্ধত, বিরক্ত দৃষ্টি। তাহারও এই রূপবান তরুণ সম্বন্ধে ঈর্ষিত হইবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কিনা কে জানে!

সে কহিল, 'কথার কোন দরকার নেই। পথ চলো।'

হীরালাল হঠাৎ মরীয়া হইয়া উঠিল, সে একটু চেষ্টা করিয়া ঘুরিয়া সর্দারের সামনের দিকে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, 'আমার কথাটা তোমাকে শুনতেই হবে খাঁ সাহেব। বহুত জরুরী কথা। বেগম সাহেবার কথা।'

সর্দার খাঁর লোহিতাভ দৃষ্টি রক্তবর্ণ ধারণ করিল, সে রূঢ়ভাবে তাহাকে এক ধাক্কায় সরাইয়া দিয়া কহিল, 'ব্যস! কোন কথা নয়। পথ চলো।'

হীরালাল কিন্তু ভয় পাইল না। সে প্রাণপণ শক্তিতে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'কিন্তু আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে খাঁ সাহেব। আমি জানি তুমিও বেগম সাহেবাকে ভক্তি করো, ভালবাসো! বেগম সাহেবের বড় বিপদ। তুমি একথা না শুনলে আর কাকে বলব?'

নিমেষে দানব যেন বালকে পরিণত হইল। সেই বীভৎস ভয়াবহ মুখে একই সঙ্গে উদ্বেগ আশঙ্কা এবং আকুলতা ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে আশ্চর্য রকম কোমল করিয়া তুলিল। 'সে শুধু কহিল', বিপদ! বেগম সাহেবার বিপদ?'

'হ্যাঁ, বিপদ। খুব বিপদ!···আমি জানি খাঁ সাহেব, তোমার চেয়ে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই। তাই তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করতে চাই।'

'কী বিপদ বাবুজী?' যেন নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে বলে সর্দার খাঁ।

'তুমি জানো নিশ্চয় যে একদল লোক সিপাইদের ক্ষেপিয়ে তুলছে; তারা চায় ওদের সঙ্গে আংরেজদের লড়াই বাধুক। আর হয়ত তা বাধবেও শিগ্‌গির। কিন্তু আংরেজদের হারাতে এরা পারবে না।...আমি জানি পারবেনা, এদের ভেতর বড় দলাদলি, সবাই চায় নিজেদের সুবিধা ক'রে নিতে, তাতে কখনও কোন বড় কাজ হয় না। তাছাড়া আমি গণককেও জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন ইংরেজ আরও প্রায় একশ' বছর এদেশে রাজত্ব করবে।···সে যাকগে, কিন্তু বেগম সাহেবা এইতে জড়িয়ে পড়ছেন। সবাই তাঁকে বুঝবে না, আর এরা বড় স্বার্থপর খাঁ সাহেব—এদের সঙ্গে বেগম সাহেবার মত দেবী কখনও পেরে উঠবেন না। ওঁকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তারা অনায়াসে নিজেদের বাঁচিয়ে নেবে।...আমি সেদিন খুব বড় এক গণৎকারের কাছে গিয়েছিলুম, তিনি আমাকে চেনেন না কিন্তু হাত দেখে সব বলে দিলেন। তিনি বেগম সাহেবার কথাও বললেন—'

'কী বললেন?' তোরাই ঠাণ্ডা হাওয়াতেও সর্দারের কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে। মুখে তাহার শিশুর মতই উৎকণ্ঠা প্রকট।

হীরালাল গলা নামাইয়া বলিল, 'বললেন বেগম-সাহেবা এই লড়াইতে খুব বিপদে পড়বেন।···হয়ত ওঁর প্রাণসংশয় ঘটবে।...হয়ত ওঁর অপঘাত মৃত্যু ঘটবে—'

আতঙ্কে উদ্বেগে হীরালালের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে।

সর্দার খাঁ অনেকক্ষণ পাথরের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার অত বড় দেহখানা হইতে সমস্ত শক্তি কে যেন নিঃশেষে হরণ করিয়া লইয়াছে।

বহুক্ষণ পরে সে কেমন এক রকম অসহায়, ভগ্ন স্খলিত কণ্ঠে কহিল, 'কিন্তু আমি কি করতে পারি বাবুজী, উনি কি আমার কথা শুনবেন? আংরেজকে উনি বড় ঘেন্না করেন, ওদের সর্বনাশের জন্যেই জীবন পণ করেছেন। এ লড়াই থেকে ওঁকে ফেরানো যাবেনা!···'

হীরালাল আবারও সর্দারের হাতটা চাপিয়া ধরিল, 'সে আমি জানি খাঁ সাহেব। এটুকু ওঁকে আমি চিনেছি। সেই জন্যেই তোমাকে বলা। আমি ত কাছে থাকতে পারবো না। তুমি ওঁর কাছে থাকবার সুযোগ পাও। তুমি ওঁকে একটু দেখো। যদি সত্যিই লড়াই বাধে, ওঁকে তুমি নজর-ছাড়া করোনা।···আমি জানি তুমি কাছে থাকতে আর তোমার জান থাকতে ওঁর কোন ভয় নেই!'

সর্দার খাঁ হাসিল। সে হাসিতে তাহার ঐ ভয়াবহ মুখও কেমন একপ্রকার স্বর্গীয় দ্যুতিতে যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, 'এটুকু আমি তোমাকে অনায়াসে ভরসা দিতে পারব বাবুজী। আমার সামনে আমার জান থাকতে ওঁকে কেউ বিপদে ফেলতে পারবে না। আর আমি এবার থেকে নজরও রাখব।'

'ব্যস্। আমি এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত।' সত্যই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হীরালাল।

সর্দার খাঁ সস্নেহে হীরালালের কাঁধে একটা হাত রাখিল। কোমল কণ্ঠে কহিল, 'তুমি বড় আচ্ছা আদমি বাবুজী, বড় সাচ্চা আদমী!'

সর্দারের কথা তখনও শেষ হয় নাই, দূর নির্জন পথে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ উঠিল। সর্দার ভ্রূকুটি করিয়া চাহিয়া দেখিল, হীরালালও একটু বিস্মিত হইয়া তাকাইল। ঘোড়াই বটে। দুজন ঘোড়সওয়ার বেশ জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া এদিকে আসিতেছে।

কিন্তু ঘোড়সওয়ার এসব পথে এমন কোন আজব 'চীজ' নয়। সুতরাং সর্দার ও হীরালাল সেদিকে মন না দিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। কিন্তু খানিক পরে, ঘোড়-সওয়ার দুজন আর একটু কাছে আসিয়া হাঁকিল; 'এই! রোক যাও।...একদম ঠাহ্রো যাও।'

হীরালাল একটু ভয় পাইল। সে রক্ষী দুজনকেই চিনিয়াছে এতক্ষণে। একজন গজপৎ আর একজন তেওয়ারী—এই তেওয়ারীই মাত্র দুইদণ্ড আগে তাহাকে প্রাসাদের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেছে। সে সর্দার খাঁর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'খানাসাহেবের থাইক—।'

সর্দার খাঁর কোমরে তলোয়ার ঝোলা ছিল কিন্তু সে তাহাতে হাত দিল না। ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

একটু পরেই ঘোড়সওয়াররা কাছে আসিয়া পড়িল। তেওয়ারী ঘোড়া হইতে নামিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'ফিরে চলো জনাব—পেশোয়ার হুকুম!'

হীরালাল আগেই একটু ভয় পাইয়াছিল এখন তেওয়ারীর রুক্ষ ভঙ্গীতে রীতিমত ঘাবড়াইয়া গেল। চোক গিলিয়া কহিল, 'কিন্তু আমার যে এখন ছাউনিতে ফিরতে হবে ভাই সিপাইজী। ছটায় হাজিরে নেওয়া হয়, তখন ছাউনীতে না থাকলে চলবে না—'

হীরালালের একটা হাত ধরিল। বেশ একটু রূঢ় কণ্ঠেই কহিল, 'সে সব আমি বুঝি না। পেশোয়ার হুকুম, এখনি না গেলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে—'

ততক্ষণে গণপৎ নামিয়া পড়িয়াছে। সে এখন হঠাৎ আসিয়া এইবার সর্দার কথা কহিল, বেশ সহজ শান্ত-কণ্ঠেই কহিল, 'কিন্তু এ বাবু তোমার পেশোয়ার নোকর নয় গণপৎ, কোম্পানীর নোকর। এর ওপর হুকুম চালানোর এক্তিয়ার পেশোয়ার নেই।'

'কিন্তু আমাদের ওপর ত আছে! আমাদের ওপর হুকুম—যেমন ক'রে হোক ওকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। এই, চলো—'

সে বেশ জোরেই হীরালালের ডান কনুইয়ের কাছটা ধরিয়া একটা হ্যাঁচ্‌কা টান মারিল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই হাতীর থাবার মত সর্দারের প্রকাণ্ড হাতখানা আসিয়া পড়িল তাহার ঘাড়ে। নিমেষের মধ্যে হীরালালের হাতের উপর হইতে গণপতের মুঠিটা শিথিল হইয়া গেল। তাহার পর বিড়ালে যেমন করিয়া ইঁদুরের টুঁটি ধরিয়া দূরে আছাড় মারে, তেমনি করিয়াই গণপৎকে ধরিয়া সে অবলীলাক্রমে বহুদূরে ছুড়িয়া ফেলিল। তেওয়ারী এই দৃশ্যে বোধকরি মুহূর্তকালের জন্য হতভম্ব হইয়াছিল—এখন ইহারা আবার রওনা হইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া আগাইয়া আসিল। কিন্তু সে নির্বোধ নয়—সে তাহার তরবারি বাহির করিয়াই অগ্রসর হইল।

'এই বাংগালী বদ্‌মাশ, ঠাহ্‌রো!'

এবার সর্দার প্রায় তেল্‌কী দেখাইল। সে চক্ষিতের মধ্যে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া এক আশ্চর্য কৌশলে

তেওয়ারীর তলোয়ারের ডগাটা দু-আঙুলে চাপিয়া ধরিয়া এমন একটা ঝাঁকানি দিল যে শিশুর হাতের খেলনার মতই তেওয়ারীর হাত হইতে তাহা খসিয়া আসিল। তাহার পর সেটা শূন্যে ছুড়িয়া দিয়া চোখের পলকে তাহার বাঁটটা লুফিয়া লইয়া একেবারে তেওয়ারীর গলার ডগাটা ঠেকাইয়া কহিল,—'যাও, ভাগো, নেহি ত—!'

'নেহি ত' কী হইবে—তাহা আর তেওয়ারীকে বিশদ বুঝাইতে হইল না। দুরে তখনও গণপৎ কাঠ হইয়া পড়িয়া আছে, হয়ত বা মরিয়াই গিয়াছে—এ দৈত্যটার পক্ষে সবই সম্ভব—মিছামিছি নানাসাহেবের একটা খেয়ালের জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করার মত নির্বোধ সে নয়। সে শুষ্ক মুখে দুই পা পিছাইয়া গিয়া নিজের ঘোড়াটা ধরিল, তাহার পর যত দ্রুত সম্ভব সওয়ারে চড়িয়া প্রাসাদের দিকে ফিরিল।

তোরাই ঠাণ্ডা বাতাসেও হীরালাল ঘামিয়া উঠিয়াছিল। সে পিরানের প্রান্তে মুখ মুছিয়া কতকটা ভয়ে ভয়ে কহিল, 'কাজটা হয়ত ভাল হ'ল না খাঁ সাহেব, পেশোয়ার হুকুম—'

ততক্ষণে সর্দার খাঁ আবার চলিতে শুরু করিয়াছে। বেশ সহজ, নিরুদ্বিগ্ন গতি। সে চলিতে চলিতেই শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'তা জানি না বাবুজী, আমার কাছে যার হুকুম হাজার পেশোয়ার হুকুমের চেয়েও বড়—তিনি হুকুম দিয়েছেন তোমাকে ভোর বেলা যেমন ক'রেই হোক ছাউনীতে পৌঁছে দিতে হবে। আমার যতক্ষণ জান থাকবে সে হুকুম আমি তামিল করব।'

হাজার পেশোয়ার চেয়েও বড় এ ব্যক্তিটি কে—অনাবশ্যক বোধে হীরালাল সে প্রশ্ন করিল না।

• • • •

তেওয়ারী যখন ভূতের মত আসিয়া সংবাদটি দিল তখনও নানাসাহেব অস্থির ভাবে ঘরে পায়চারী করিতেছেন, আর আধালা মুখে ঈষৎ বিদ্রূপের ভঙ্গী করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া আছে!

'দেখলে ত পেশোয়া! আপনার পেয়ারের হুসেনীর বেগমের পেয়ারের লোক সর্দার খাঁর কতদূর আস্পর্দা। ...আর বেগম সাহেবা যে লক্ষ্ণৌতে আছেন—সে প্রমাণও ত পেলে না! খোঁজা দেখলেই আগুনের খবর মেলে!...'

তারপর ঈষৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে একটা সেলাম করিয়া কহিল, 'আমার জিভ কিন্তু এখনও আপনার খিদমতে হাজির আছে পেশোয়াজী!'

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নানাসাহেব ভীষণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, 'তোরা দু-দুজন লোক হাতিয়ার হাতে—একটা বাচ্চাকে ধরে আনতে পারলি না! বেইমান কুকুরের দল। কুকুরই বা বলছি কেন, যার খায় কুকুর প্রাণপণে তার হুকুম তামিল করে!... তোদের পয়সা দিয়ে পোষা আমার একেবারেই পয়সা নষ্ট করা।'

তেওয়ারীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ততক্ষণে। নানাসাহেবের এই রুদ্র চেহারার সহিত তাহার পরিচয় নাই। সে কোনমতে ঢোঁক গিলিয়া কহিল, 'গণপৎ তো বোধ হয় মরেই গেছে। আমি একা—ওরা দুজন—সর্দার খাঁর হাতেও তলোয়ার ছিল—'

'চুপ!' প্রচণ্ড ধমক দিয়া উঠিলেন নানাসাহেব। তারপর হাঁকিলেন, 'কোন হ্যায় দরওয়াজা মে?'

সঙ্গে সঙ্গে একজন রক্ষী আসিয়া দাঁড়াইল।

'মংগরকর? শোন, এই বেইমানকে বিঠুর পাঠিয়ে দেবে আজই, পায়ে বেড়ি দিয়ে। সেখানে ঠাণ্ডি গারদে থাকবে একমাস।...আর শোন, দশজন সওয়ার পাঠাও ছাউনির পথে। সর্দার খাঁ ঐ দিকে গেছে, পথেই খুঁজে পাবে। তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে আসবে। যদি সে পালিয়ে যায় কি ধরে আনতে না পারে ত এই দশজন লোককে আমি কোতল করাব—বলে দিও।...যত সব অপদার্থ ভেড়ির বাচ্চাকে আমি পুষছি রুটি খাইয়ে। এই আমার কপাল!'

নানাসাহেব যতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন ততক্ষণে আর

একজন যে কে ঘরে আসিয়া মঙ্গরকরের পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল তাহা কেহ টের পায় নাই, এমন কি আদালাও না। সে এবার কথা কহিল, অত্যন্ত নম্র এবং ঈষৎ বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, 'অত কাণ্ড করতে হবে না পেশোয়া, সর্দার খাঁ না হোক তার মনিব এখানে হাজির আছে। তাকেই ত আপনার বেশী দরকার!'

তাহার পর আর একটু সামনে আসিয়া রক্ষীদের দিকে ফিরিয়া কহিল, 'মংগরকর তুমি দরওয়াজায় ফিরে যাও, তেওয়ারী তোমাকে পেশোয়া এবারকার মত মাফ করছেন, তুমিও কাজে যাও। আর কখনও এমন গাফিলতী করো না।'

তাহারা বাহির হইয়া গেলে হতভম্ব স্তম্ভিত দুঃশাসনের সামনে আভূমিনত একটা সেলাম করিয়া হুশেনী কহিল, 'তারপর, মহারাজ পেশোয়া, বাঁদীর ওপর কী হুকুম হয়? কুকুর দিয়ে খাওয়ানো—না ঠাণ্ডা গারদ?'

এতক্ষণের প্রচণ্ড দিক্‌দাহকারী রোষ এখনও রুদ্ধ আক্রোশে মনের মধ্যে মাথা খুঁড়িতেছে সত্য কথা—তবু অপরাহ্নিনীর এই আকস্মিক আবির্ভাবে এবং সহজ ও সপ্রতিভ প্রগল্‌ভতায় নানাসাহেব এতই অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন যে তাহার আচরণে বাধা দিবার চেষ্টা ত দূরে থাক, যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করিতেও পারিলেন না। কিছুক্ষণ তাঁহার মুখে কথাই সরিল না, পাথরের মত স্থাণু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর যখন কথা ফুটিল তখনও কণ্ঠস্বরটা ঠিক বাঁদীর প্রতি শাসক মনিবের ন্যায় শোনাইল না। কঠিন হইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ প্রশ্নটা বাহির হইয়া গেল, 'তুমি—তুমি এখানে কেন?'

'কেন? এখানে আসতে বাধা কি?'

প্রশ্নের উত্তরে এই সহজ প্রশ্নটার জন্য নানাসাহেব একটুকু প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আরও থতমত খাইয়া কহিলেন, 'তুমি আমাকে—কই—আমাকে বলোনি ত?'

'সব সময়ে কি আপনাকে বলে আসি যাই? আমাকে ত আপনি সে স্বাধীনতা দিয়েই রেখেছেন—'

'কিন্তু তাই ব লে—তুমি নাকি সেইদিনই বেরিয়েছ? আমার সঙ্গেই?'

'হ্যাঁ পেশোয়া।' সহজ শান্ত সুর হুশেনীর কণ্ঠে।

'তাহ'লে আমাকে জানাওনি কেন? হুকুম একটা নিতে পারতে।'

'আমার যা কাজ পেশোয়া—সেটা ঠিক আদালা বেগমের পুতুলের বিয়ে দেওয়ার মত জরুরী কাজ নয় যে আগে থাকতে ভেবে হুকুম নিয়ে করতে হবে!... আমি এই এক মাস প্রায় আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতই ঘুরছি!...আপনি জানেন না পেশোয়া—আপনার কত শত্রু আপনার চারদিকে। আপনার নিজস্ব অনুচরদের মধ্যেও আপনার জীবন সব সময়ে নিরাপদ নয়। আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যেই আমার এত কষ্ট করা। আর.....জানেন ত পেশোয়া, আমার সব গতিবিধি লোককে সব সময়ে জানানো সম্ভব নয়।... তাছাড়া, ঘরে পাহারা দিয়ে রাখবার মত এ দেহটার এত মূল্য এখনও আছে তা জানতুম না পেশোয়া—আমি ভেবেছিলুম যে রূপ-যৌবন আপনার পিয়ারী আদালারই একচেটে!'

আদালা বোধ করি ইহার সাহসে ও স্পর্ধায় একেবারেই বাক্যহারা হইয়া গিয়াছিল। তাই সে এতবড় খোঁচাটারও তখনই কোন জবাব দিতে পারিল না নির্বাক বিস্ময়ে কতকটা ভয়ে-ভয়েই চাহিয়া রহিল।

নানাসাহেব ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কোমল হইয়া আসিয়াছেন, তবু আসল জ্বালাটি একেবারে ভোলেন নাই। কহিলেন, 'কিন্তু ঐ বাংগালী ছোঁড়াটার সঙ্গে এক ঘোড়ায় চেপে সারারাত বিহার করা, সেটাও কি তোমার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য ছিল হুশেনী?'

'ছিঃ পেশোয়া, ছিঃ!...সে আমাকে দেবীর মত দেখে! সন্তানের বরণী সে!'

তাহার পর গম্ভীর এবং ঈষৎ কঠোর কণ্ঠেই সে কহিল, 'যে খবরটা আপনাকে দিয়েছে সে এ খবরটা

দিতে পারেনি যে একদল সিপাহীর হাতে যখন তার প্রাণটা যেতে বসেছিল তখনই না তাকে আমি উদ্ধার ক'রে সোজা এই প্রাসাদের দোরেই পৌঁছে দিয়েছি।'

'তবে সে আমাকে মিছে কথা বলল কেন?'

'আমিই তাকে নিষেধ করেছিলুম আমার কথা জানাতে।...কিন্তু পেশোয়া এই সব ব্যক্তিগত একান্ত বাজে আলোচনার সময় আর নেই। আমি ত বৈরিণী, আমার মত দাসী আপনার কত আছে, কত সহস্র জুটবে আরও। আমার চিন্তাতে আপনি কাজ ভুলে বসে আছেন? ধিক্!...আমারই যে লজ্জা করছে আমার জন্যে।...যান্, ওঁরা এখনও আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। আপনি দেখা করুন গে। আজই বিঠুর রওনা হ'তে হবে। আপনার হুকুম না নিয়েই আমি বলে দিয়েছি সবাইকে। স্নান পূজা সেরেই রওনা হবেন আপনি!'

'কেন, কেন হুশেনী—এত জরুরী?'

'আগুন জ্বলেছে পেশোয়া, আগুন জ্বলেছে। এবার কাজের সময়। আর বৃথা সময় নষ্ট করলে চলবে না! আপনি ফিরে যান বিঠুরে!'

কথাটা আদেশের মতই শোনাইল। কিন্তু নানাসাহেব এ ধৃষ্টতা গায়ে মাখিলেন না। শুধু কহিলেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ত হুশেনী?'

'না। আমি যেমন এসেছি তেমনি ফিরব! দুদিন পরে, আমার কাজ আছে। মৌলবীকে জেলখানা থেকে বার করতে হবে আগে।'

তাহার পর স্তম্ভিত, অপমানিত আদালার দিকে ফিরিয়া একটা সেলামের ভঙ্গী করিয়া হুশেনী কহিল, 'জিত্‌টা তাহ'লে আপাতত মুখেই রয়ে গেল আমাদের—কী বলুন বেগম সাহেবা, দুঃখ হচ্ছে, না?'

ক্রমশঃ

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
অনুবাদ, স্কুলে ভের্ণের অ্যাড্‌ভেঞ্চার

১। সাগরের অতল তলে— ১৲
(20,0000 Leagues Under the Sea)

২। চাঁদের দেশে—১৲
(From the Earth to the Moon)

৩। আশি দিনে পৃথিবী—১৲
(Aronnd the World in 80 days)

৪। বেলুনে পাঁচ হপ্তা—১৲
(Five Weeks in a Balloon)

ছোটদের রামায়ণ—২৲
ছোটদের মহাভারত—১৷৷০

আরব্য উপন্যাসের গল্প—৩৲
এ্যাডভেঞ্চার (২য় সংস্করণ)—১৲
বাব্‌লা (কিশোর সং)—১৷৷০
চার্লস ডিকেন্সের গল্প—১৷৷০
" পিকউইক্ পেপার্স—১৷৷০
" এ টেল অব টু সিটিজ—১৲
" গ্রেট এক্সপেক্টেশন্স—১৷৷০
" বার্ণাবি রজ্—১৲
১। রবার্ট লুই ষ্টিভেন্সনের
কিডন্যাপড—১৷৷০
২। আলেকজাণ্ডার ডুমার
কলিকাস্ ব্রাদার্স—১৷৷০
অস্কারওয়াইল্ডের শ্রেষ্ঠ গল্প—১৲

এলিস্ ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড—১৷৷০
স্বপন বুড়োর :—
হাসির গল্প (২য় সং)— ১৷৷০
" উড়ন্ত চাকি— ১৷৷০
ছোটদের স্ব-নির্বাচিত গল্প, প্রতিখানি ১৷৷০
১। সৌরীন্দ্রমোহন, ২। স্বপন বুড়ো, ৩। গৌরগোপাল, ৪। অমরেন্দ্র ঘোষ ৫। রবিদাস সাহারায় ৬। অশোক গুহ ৭। কাত্তিক দাশগুপ্ত ৮। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ৯। জয়ন্ত ভাদুড়ী।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের
॥ প্রভাস ॥ ৩৷৷০

এম, এল, দে এণ্ড কোং ১৩।১, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-২

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square, East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : 22-6853—58

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে

বিজয়-বৈজয়ন্তীবাহী

মোহিনী মিল্‌স্ লিমিটেড

(স্থাপিত :৯০৮)

১ নং মিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)

২ নং মিল

বেলঘড়িয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেন্টস

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

১২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত বরেণ্য জ্যোতির্বিদ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রিষ্টি বিচারক এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের করকোষ্ঠী বিচারক।

অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীমোহিনীমোহন শাস্ত্রী

মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র

কাশী প্রত্যাগত প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ

—জ্যোতিষ-ভারতী—

পণ্ডিত শ্রীকুমার শঙ্কর শাস্ত্রী, সাম্যুদ্রিকরত্ন।

হস্তরেখা এবং কোষ্ঠি বিচারে ও প্রশ্নত বিশারদ : বিশেষ যত্ন ও সাফল্য সহকারে সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। কুগ্রহের অশুভ প্রভাব প্রতিকারে সিদ্ধহস্ত। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমুদ্রমন্থনজাত অমৃতের পূর্ণ অধিকারী, বিচারের দক্ষতা, প্রাঞ্জলতা ও প্রাঞ্জলতায় জনসাধারণ বিমুগ্ধ ও চমৎকৃত।

বিশ্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্দির

৬৪ ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ, কলিকাতা-৪

ফোন—বি, বি, ৫০১৪

সাক্ষাৎ সময় সকাল ৭টা হইতে ১০টা

এবং বেলা ২টা হইতে ৬টা।

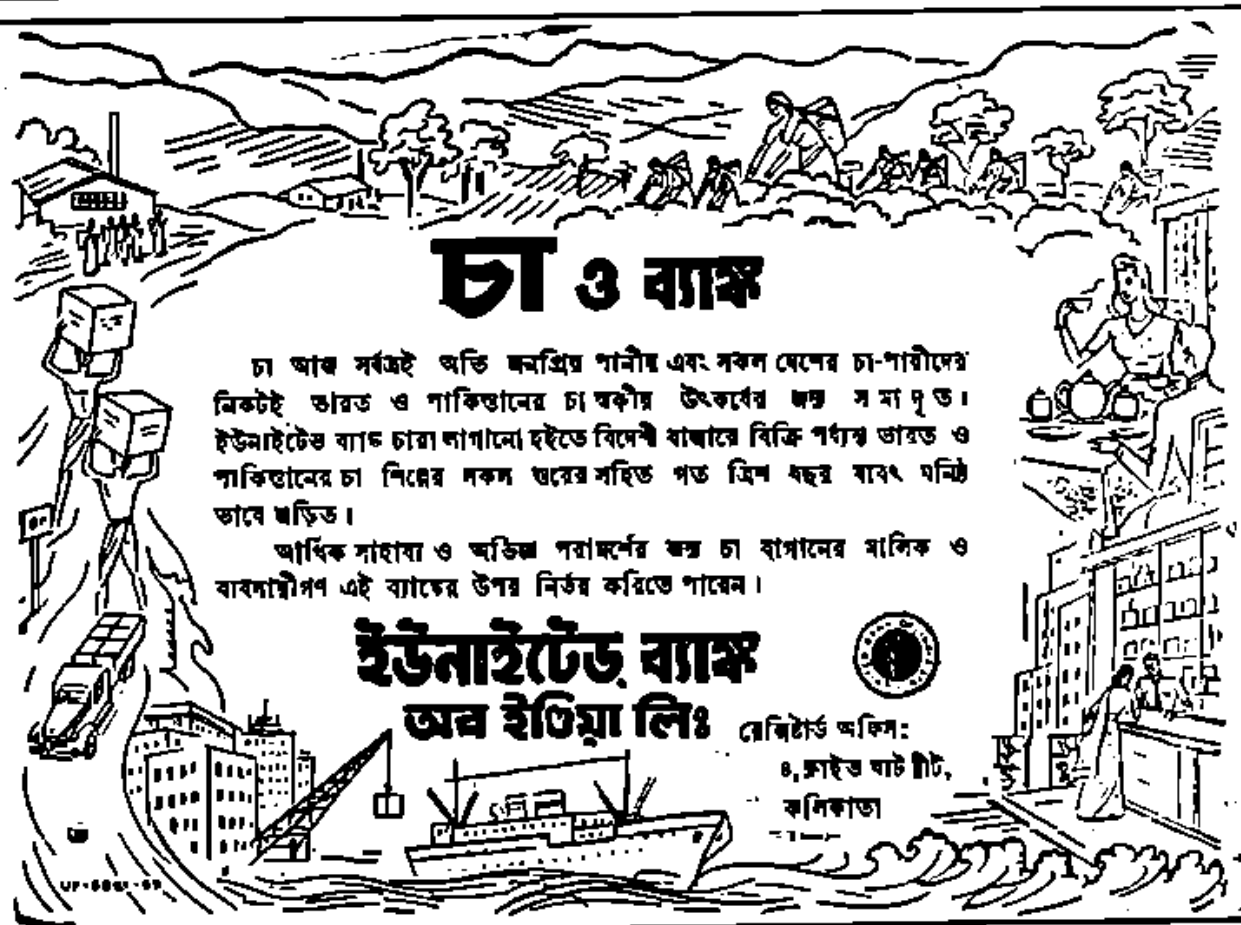

শ্রীশঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি—

কিছুদিন থেকে দ্রব্যের মূল্য যেরকম অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলেছে তাতে সকলেরই অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়েছে। বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় জনসাধারণ ইতিমধ্যেই জীবন-যাত্রার মান বজায় রাখা অসম্ভব বলে মনে কোরছেন। খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে অন্যান্য জিনিসপত্রের মূল্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সমস্ত অর্থনীতিতে একটা ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করবার জন্য সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও মূল্য হ্রাসের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুদিন পূর্বে রাজ্য-সভায় কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী শ্রী এ. পি. জৈন খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা কালে মূল্য বৃদ্ধির জন্য পাঁচটি কারণের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, খারিফ শস্যের স্বল্প উৎপাদন, ফাটকা-বাজী, গুপ্ত ভাবে শস্য মজুত করা, পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্যাভাবের দরুন পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি অর্থাৎ আসাম, বাঙ্গলা ও ত্রিপুরার উপর চাপ এবং ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং করার ফলে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ এই পাঁচটি কারণ সাম্প্রতিক খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

সরকারী সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়ে চলেছে অথচ ঠিক এই সময়ে কয়েকটি কারণে কৃষির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। খরিফ শস্যের উৎপাদন হ্রাসের দরুণ খাদ্যের উৎপাদন প্রধানতঃ হ্রাস পেয়েছে, তার উপর প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এ বছরের গোড়ার দিকে রবিশস্যেরও ক্ষতি হয়েছে। বাজারে খাদ্য-দ্রব্যের সরবরাহ ঠিক রাখবার জন্য সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বটে কিন্তু সেগুলি থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। দেশ থেকে খাদ্যশস্যের রপ্তানী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেশের বাজার থেকে সরকার খাদ্য-শস্য ক্রয় করা বন্ধ করেছেন। রাজ্য সরকার সমূহের দ্বারা স্থাপিত ন্যায্য-মূল্যের দোকানগুলির মধ্য দিয়ে চাল এবং গম সাধারণের নিকট বিক্রয় করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে বড় বড় বাজারে খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করছেন, এ ছাড়া মজুত ধান-চালের জামিনে ব্যাংকের ঋণ-দান ও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে না পারলে দেশের অর্থনীতিতে তার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে শিল্প-সম্প্রসারণের বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্যে ভারতকে বিদেশ থেকে বহু শিল্পীয় দ্রব্য আমদানী করতে হবে এবং এজন্য ভারতের বহু বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে। এ সময়ে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হলে, শিল্পীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যেই বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করবার জন্য লোকসভা অতিরিক্ত ৮০·৪৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছে। খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যের সঙ্গে শিল্পীয় উৎপাদনের খরচ বিশেষ ভাবে জড়িত। খাদ্য-দ্রব্যের

মূল্য বৃদ্ধির ফলে শিল্পীয় উৎপাদন খরচও বেড়ে চলেছে। শ্রমিকদের মজুরী একবার বৃদ্ধি করলে, তা আবার কমানো কঠিন সমস্যা হয়ে পড়ে। কাজেই অবিলম্বে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে স্বাভাবিক অবস্থায় আনবার জন্য আরও সুচিন্তিত কর্ম-পন্থা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য যদি ঋণ হিসাবে আমদানী করা যায় তা হলে উপস্থিত বৈদেশিক মুদ্রা বাজের থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঋণে খাদ্যশস্য আমদানী করার বিষয়টি মোটেই সহজ নয়। কিছুদিন থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের চাল, গম, ময়দা ও তুলা ঋণে আমদানীর আলোচনা চলছে। এই আলোচনা কতদূর ফলপ্রসূ হবে তা বলা যায় না।

দ্রব্যাদির মূল্যে স্থিরতা বজায় রাখা বর্তমানে, অর্থাৎ দেশ যখন সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে তখন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে বিলম্ব করলে দেশের নিদারুণ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন—

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভারত বিরাট বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হলে দেশে খুব সু-পরিকল্পিত ও উন্নত ধরনের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কৃষি এবং শিল্পের দ্রুত প্রসারলাভের জন্য যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৩৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৪৬ কোটি টাকা রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিল থেকে আরও ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে নাগপুর পরিকল্পনায় দেশের রাস্তাঘাট উন্নয়নের একটি বৃহৎ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় ২০ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে দেশের রাস্তা-ঘাট এমন ভাবে উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয় যাতে কৃষিতে উন্নত যে কোন গ্রাম থেকে প্রধান রাস্তা পাঁচ মাইল থেকে দূরে না থাকে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে দেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে যে সব অঞ্চল অবিভক্ত ভারতের অংশ ছিল তা ভারতের বহির্ভূত হয়ে গিয়েছে। আবার যে সব অঞ্চল দেশীয় রাজ্য বলে পরিগণিত ছিল তা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এসব কারণে পূর্বের পরিকল্পনাকে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়ার দিকে ভারতে মোট ৯৭০০০ মাইল পাকা রাস্তা এবং প্রায় ১,৪৭,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা ছিল। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকালে নতুন প্রায় ১০,০০০ মাইল পাকা রাস্তা ও ২০,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা তৈরী করা হয় এবং প্রায় ১০,০০০ মাইল পূর্বেকার রাস্তার সংস্কার করা হয়। গত পাঁচ বৎসরে কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিলের বরাদ্দ নিয়ে ১৫৪ কোটি টাকা রাস্তা-ঘাট উন্নয়নের জন্য খরচ করা হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। আশা করা যায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারলে নাগপুর পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্যে রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য ৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছে ১৬৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ১৮,০০০ মাইল পাকা রাস্তা নির্মাণ করবার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় যে সব অনগ্রসর অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নি, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রথম পরিকল্পনায় যে সব কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে তার উন্নয়ন সাধন করার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানাভাব এস্টেব্লিশমেন্ট

সার্ভিস ও অন্যান্য সংস্থার মধ্য দিয়ে পল্লীগ্রামের হাসপাতালের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে বলে পরিকল্পনা কমিশন আশা করছেন।

পারিবারিক পরিকল্পনা—

জাতীয় কল্যাণ ও জাতীয় পরিকল্পনায় ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ, জন্ম-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণকে দ্রুত শিক্ষিত করে তুলবার উপায় ও হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলির অন্যতম কাজ হিসাবে পারিবারিক পরিকল্পনা ও পরামর্শ দেওয়া এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

এই পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার প্রতি জনমত সংগ্রহ ও বর্তমান জ্ঞানের ভিত্তিতে পারিবারিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবার সম্প্রসারণ করার কার্যসূচী নেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীতত্ত্ব ও চিকিৎসামূলক গবেষণার কাজও হাতে নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য বিভিন্ন রাজ্য, পৌরপ্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক সংস্থা, ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই পরিকল্পনাকে আরও জোরদার করবার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

পারিবারিক পরিকল্পনায় এখন আরও বড় কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীতে প্রণালীবদ্ধ ভাবে এর আরও উন্নয়ন এবং ধারাবাহিকভাবে জনসংখ্যা সমস্যার ও পরিবার পরিকল্পনার গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বোর্ড হবে একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হবে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া ও কাজ করা এবং এজন্য যৌন শিক্ষা, বিবাহ সম্পর্কে পরামর্শ, শিশুর লালন-পালন প্রভৃতি বিষয়ে পারিবারিক জীবন-যাপন সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য একটি বড় রকমের কার্যক্রম গ্রহণ করা। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এই সংক্রান্ত কাজ কর্ম পরিদর্শন করাও হবে এই বোর্ডের একটি কাজ।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি ৫০,০০০ জন লোকের জন্য সমস্ত বড় সহর ও নগরে একটি করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানাগার স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই চিকিৎসাগারগুলি জনসাধারণের মধ্যে এই সমস্যা সম্পর্কে একটা সাধারণ চেতনা এনে দেবে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে ও সেবা করে যাবে। বাঙ্গালোরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নামে একটি এবং পল্লী সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয় সরকারী বিবেচনাধীন আছে। বোম্বাইয়ে গর্ভনিরোধক বিষয়ে পরীক্ষা ও কার্যকারীতা সম্পর্কে বিচার করবার জন্য একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। সমস্ত হাসপাতাল এবং অধিক সংখ্যায় ডাক্তারখানাগুলিকে পারিবারিক পরিকল্পনার কাজ হাতে নিতে হবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র এবং রোগীর পরিচর্যাকারিণীদেরও এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক পরিকল্পনার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ক্যালডর সুপারিশ ও করনীতি সংস্কার

শ্রীপ্রবোধেচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

ভারতীয় করব্যবস্থায় গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের প্রাক্কালেও আমাদের করব্যবস্থা রীতিমত regressive ছিল—মোট রাজস্বের একটা নামমাত্র অংশ প্রত্যক্ষ কর মারফৎ আসতো, আর বাকীটা আসতো নানারূপ অপ্রত্যক্ষ কর থেকে। মহাযুদ্ধের সময় থেকে এ গতির কিছুটা পরিবর্তন শুরু হয়—আয়কর (income tax), ব্যবসায় কর (business profit tax), বাড়্তি মুনাফা কর (excess profit tax), কর্পোরেশন ট্যাক্স, সুপার ট্যাক্স ও সারচার্জ ইত্যাদি পথে প্রত্যক্ষ কর রাজস্বের (direct tax-revenue) পরিমাণ সমগ্র রাজস্বের অনুপাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতে শুরু করে। বর্তমানে আমাদের করব্যবস্থা বহুলাংশে progressive. মোট রাজস্বের একটা মোটা অংশ এখন প্রত্যক্ষ কর-খাতে পাওয়া যায়। এরূপ করের হারও আবার আয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বাড়ে, অর্থাৎ ধনী ও আর্থিক ক্ষমতাবানের উপরই করভার বেশী—সর্বোচ্চ আয়ের অংশ থেকে সরকার এখন প্রায় শতকরা ৯২৲ টাকা পায়; অর্থাৎ আয়কারীর হাতে মাত্র ৮৲ টাকা অবশিষ্ট থাকে। এই ত গেল বর্তমান ভারতে করনীতির একটা দিক।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রগঠনের অভিপ্রায় নিয়ে ভারত সরকার সাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা করেছে। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা সার্থকতার সঙ্গে শেষ হয়েছে। এতে সরকারী হিসাবে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রথম পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করেছে। সুখের কথা এই যে এ বিরাট ব্যয়ভার চালানোর জন্যে সরকার সাধারণের উপর অনভিপ্রেত কর ধার্য করেনি।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে, এর সরকারী হিসাবে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪,৮০০ কোটি টাকা। এ টাকা যোগাড় করতে হলে ৪৪০ কোটি টাকার মত জোগাড় করতে হবে নতুন ট্যাক্স বসিয়ে। নতুন ট্যাক্সের প্রস্তাবসহ অন্যান্য সমস্ত সম্ভাব্য উৎস (source) থেকেও প্রয়োজনীয় টাকার সংস্থান হয় না বলে ১২০০ কোটি টাকা ঘাট্তি ব্যয় করতে হবে। তবু ৪০০ কোটি টাকা সংস্থানের কোন পথের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ ৪০০ কোটি টাকাও ঘাট্তি ব্যয় মারফৎ জোগাড় করতে হবে, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাহ'লে মোট ঘাট্তি ব্যয় দাঁড়ায় ১৬০০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ-সংস্থান করবার জন্যে আমাদের করব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখ্বার সময় এসেছে। এই উদ্দেশ্যেই ভারত সরকার বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ নিকোলাস ক্যালডরকে আমন্ত্রণ করে। তাঁকে আমাদের করনীতি ও জাতীয় আয় বণ্টন (distribution of national income) সম্বন্ধে সুপারিশ করবার জন্যে অনুরোধ করা হয় এবং তিনি কিছুদিন পূর্বে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট দিয়েছেন।

অধ্যাপক ক্যালডর মনে করেন ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় এত টাকা ঘাট্তি ব্যয় অভিপ্রেত নয়। তাই মুখ্যতঃ তিনি করধার্য করে আর্থিক সংস্থানের সুপারিশ করেছেন। তাঁর মতে আমাদের দেশে যে করভার বহন ক্ষমতা (taxable capacity) তাতে বছরে আরও ২।৩ শো কোটি টাকা কর ধার্য করা যেতে পারে। তিনি মনে করেন বর্তমানে প্রতি বছর ৭০।৭৫ কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়া হয়। তাঁর মতে যে পরিমাণ আয়ের উপর (assessed income) করধার্য আছে, প্রকৃত আয় (assesable

income) তার প্রায় দ্বিগুণ। অধ্যাপক ক্যালডর নতুন কর বাড়িয়ে আগামী পাঁচ বছরে ১২৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে এমন মত ব্যক্ত করেছেন।

তিনি পরোক্ষ কর অপেক্ষা প্রত্যক্ষ করের পক্ষপাতী। তাঁর মতে আয়করের হার কমানো, সম্পদকর (property tax), দান কর (gift tax) এবং ব্যয় কর (expenditure tax) বসানো একান্ত প্রয়োজন। তাঁর মতে এরূপ কর ধার্য হলে বণ্টনব্যবস্থার (distribution) উন্নতি ও সমতারক্ষা, সরকারী আয়বৃদ্ধি (enhanced revenue) ও কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ হবে। দেশের ধনবানদের নিকট থেকেই প্রধানতঃ পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে হবে—এই তাঁর সুপারিশ। বর্তমানে প্রচলিত মৃত্যুকরও বলবৎ থাকবে। এটাও তাঁর মত।

আয়করের হার কমানোর সপক্ষে তিনি বলেন যে সারচার্জ প্রভৃতি মিলে আয়ের একটা বিরাট অংশ এমনিতেই ট্যাক্সের আওতায় পড়ে। এ ছাড়া, তাঁর মতে আয়করের হার কমিয়ে সুষ্ঠুভাবে ট্যাক্স ধার্য (tax administration) পরিচালনার জন্যে আয়করদাতাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে এবং তাতে ফাঁকি দেবার ঝোঁক কমে যাবে। সম্পত্তি করের হারও progressively সম্পত্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে, তবে সাধারণভাবে সম্পত্তিকরের হার খুবই কম হবে। মৃত্যুকর, সম্পত্তিকর ইত্যাদি ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভুয়া দানপত্র করার সম্ভাবনা থাকায় তিনি মনে করেন, দানের বস্তুর বাজার দর অনুযায়ী দানকরও ধার্য করা উচিত এবং দানের বস্তু যত বেশী দামী হবে, এই করের হারও ততই বেশী হবে।

অধ্যাপক ক্যালডরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ব্যয়কর (expenditure tax) ধার্য করা। ১০,০০০ টাকার বেশী বাৎসরিক ব্যয় হ'লে একটা আনুপাতিক হারে (proportionately) কর দিতে হবে। বছরে কার কত টাকা ব্যয় হ'ল তার জন্য একটি রিটার্ণ দিতে হবে। তিনি মনে করেন ব্যয়করদাতার সামর্থ্যানুযায়ী হবে, কারণ যার ব্যয় যত বেশী হবে তারই উপর করের হারও তত বেশী হবে। এতে ধনীদের উপরই বেশী চাপ দেওয়া হবে এবং ১০,০০০ টাকার বেশী ব্যয়ের উপর কর ধার্য হ'লে এর কম আয়বিশিষ্ট কারো উপরই এর বোঝা পড়বে না। আয়কর নির্ধারণের সময় আয়ের মধ্যে কাটকা লাভ (accidental income), দান (gift), ইত্যাদি ধরা হয় না, কিন্তু এ সব ক্ষেত্র থেকে যে আয় হয় তাও ব্যয় করবার সময় ধরা সহজ। অর্থাৎ বাস্তব আয়ের পরিমাণ (যা আয়কর ক্ষেত্রে ধরা হয়) ও বাড়তি প্রাপ্তি (additional receipts) সব মিলেই ক্রয়ক্ষমতা বা purchasing powerএর নির্ধারণ করা ব্যয়করের মাধ্যমে (through a tax on expenditure) সহজ। আর এভাবে ভোগব্যয়ই (consumption expenditure) করবহন ক্ষমতার (taxable capacity) সূচক (index) হবে।

আমাদের ট্যাক্স বিভাগের কর্মীগণ এই নূতন প্রথায় প্রথম প্রথম খুব কৃতিত্ব দেখাতে পারবে না ধরে নিয়েই ক্যালডর মনে করেন, ব্যয়কর ধার্য করলে বছরে আপাততঃ কমপক্ষে ১২৫ কোটি টাকা রাজস্ব বাড়বে এবং বাকী একটা মোটা অংশ ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

উপরে আমরা মোটামুটিভাবে ক্যালডর প্রস্তাবের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি আলোচনা করেছি। বার্ষিক কর ফাঁকি দেওয়ার পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে অনেকের মতভেদ আছে। অর্থমন্ত্রণালয়ের (Finance Ministry) মতে এর পরিমাণ ৩০।৪০ কোটি টাকার বেশী নয়—কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও অসামরিক ব্যয়মন্ত্রী পার্লামেন্টে এরূপ একটা হিসাব দেন। কয়েক বছর পূর্বে আয়কর তদন্ত কমিশন (Income Tax Investigation Commission) রিপোর্টে দেখা যাবে ভারতে মোট আয়কর ফাঁকির পরিমাণ প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা। কর ফাঁকির পরিমাণ নিয়ে মতভেদ থাকলেও একটা বিরাট পরিমাণ রাজস্ব থেকে সরকার প্রতি বছর বঞ্চিত হচ্ছে এ বিষয়ে সকলেই একমত। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এ ফাঁকি বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অর্থবিনিয়োগ সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। এতে ভোগ্যবস্তুর চাহিদা

(demand for consumers' goods) বেড়েছে এবং ঐ সমস্ত বস্তুর ব্যবসায়ীগণ একটা মোটা টাকা লাভ করেছে। কর ফাঁকি দেবার ঝোঁক আমাদের দেশে এতই বেশী যে বাড়তি মুনাফা ভোগকারীগণের একটা বিরাট অংশ যে সরকার তাদের ব্যবসায়ের সম্প্রসারণে সাহায্য করল তাকেই বছরে বহুকোটি টাকা ফাঁকি দিচ্ছে। এতে সাধারণ উন্নয়ন কাজ বাধা পাবে এবং পরিণামে তারাও বাজার পাবেনা—এ দিকে তাদের লক্ষ নেই। এ ছাড়া যে বিরাট পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছে তাকে সার্থকভাবে রূপ দিতে হলেও আর্থিক সংগতির প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের ট্যাক্স-ব্যবস্থা নতুন করে পর্যালোচনা করা একান্ত দরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক ক্যালডরের সুপারিশগুলি বিচার করে দেখাও দরকার। ক্যাপিট্যাল গেন্‌স (capital gains) বা আকস্মিক লাভ, দান, সম্পত্তি ইত্যাদি অনুপার্জিত আয় (unearned income) সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের উপকরণ হোক্ এ ধারণা বর্তমান সমাজব্যবস্থার অচল। এর উপর কর ধার্য করতে হবে।

ব্যয়কর প্রসঙ্গে বলা যায় অধ্যাপক ক্যালডর যেরূপ ব্যাপকভাবে এর প্রবর্তন সুপারিশ করেছেন, ট্যাক্স-বিভাগীয় কর্মীদের যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাবে বর্তমানে ততটা ব্যাপকভাবে এর প্রবর্তন করা শক্ত; কিন্তু একটা সীমার (limit) উপর ব্যয়কর ধার্য করা ও আদায় করা খুব অসম্ভব মনে হয় না। এতে ভোগবিলাসে ব্যয় কমবে, ফলতঃ সঞ্চয় বাড়বে। আমাদের দেশে সঞ্চয়ের হার উন্নত দেশগুলি থেকে অনেক কম। এ কারণে বিনিয়োগের হারও খুব কম। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয়ের অনুপাতে এর হার ছিল জাপানে ৩০%, ব্রহ্মদেশে ২০% আর ভারতে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার 'ক' বছরে ৭·৩%, আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি উন্নত দেশেও এর হার বেশী ছিল (১৫%।১৬%)। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে বিনিয়োগ (investment) বাড়াতে হবে এবং সঞ্চয় না বাড়লে ইহা বাড়তে পারেনা। ব্যয়কর ধার্য করলে সঞ্চয় বাড়বে, এ সঞ্চয় থেকে স্বল্পসঞ্চয় খাতে জমা, সরকারী ঋণপত্রে জমা ইত্যাদি বাড়বে এবং এ টাকা দেশের উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করা যাবে। সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এ অর্থ জাতীয় উন্নতির সহায়তা করবে। সরকারী বিনিয়োগ যতটা সম্ভব ট্যাক্স ও ঋণ (taxes & loans) থেকে করা গেলে মুদ্রাস্ফীতির ভয় থাকে না। আমাদের ঘাটতি ব্যয় কমাতে ব্যয়কর সহায়তা করবে এবং অধ্যাপক ক্যাল-ডরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ব্যয়কর—রাজস্ব (expenditure revenue) ৬২৫ কোটি টাকা ধরলেও ঘাটতির পরিমাণ অর্ধেক হয়ে যায়। এতে মুদ্রাস্ফীতি হবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে আশা করা যায়; আর ভোগব্যয়ীর হাত থেকে পাওয়া অর্থ উন্নয়নকাজে বিনিয়োগের ফলে নতুন কর্মসংস্থানেরও পথ হবে এবং পরিণামে সাধারণের ভোগস্পৃহা (Propensity to consume) বেড়ে যাবে ও দেশের ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি উৎপাদনকার্যে আরও বেশী উৎসাহ পাবে। মোট কথা, সঞ্চয়—বিনিয়োগ—ও জাতীয় আয় (Savings, investment & national income) বৃদ্ধির দিকে চলবে আর মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে জাতীয় আয় (national income) বণ্টনের সমতারক্ষা করবে।

এতে যাদের স্বার্থহানি হবে তাদের তরফ থেকে নানাবিধ আপত্তি উঠবে এবং ইতোমধ্যেই উঠছেও। মুষ্টিমেয় কয়েকলক্ষ লোকের স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করুক, এটা সরকার মেনে নিতে পারে না। স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে বলা হচ্ছে আমাদের করহার খুব বেশী। উন্নত দেশের হার ছেড়ে দিয়েও বিভিন্ন অনুন্নতদেশের তুলনামূলক হিসাবে এর যুক্তিহীনতা বোঝা যাবে। ১৯৪৯ সালে জাতীয় আয়ের অনুপাতে করের হার (ratio of tax revenue to national income) ছিল সিংহলে ২১·৪%, ব্র্যাজিলে ১২·৪%, মিশরে ১৬%, কিউবায় ১৪·৫% আর ভারতে ৭%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে করহার বাড়ানোর পথে আমাদের যথেষ্ট উপায় (scope) রয়েছে। অধ্যাপক ক্যালডরের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি কার্যকরী করার সময় সমাগত এবং দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এরূপ কর প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

মিশর

নগেন্দ্র দত্ত

ইতিপূর্বে সুয়েজকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্যা দেখা দিয়াছিল তাহা মুখ্যত ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুয়েজের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব যতদিন সম্ভব হইয়াছে, ততদিনই ব্রিটিশরা তাহা ভোগ করিয়াছে। মিশরের রাজকীয় প্রভুত্বের পতনের পর যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখা দিল তাহা মিশরবাসীর সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য আন্দোলন করিল। 'আন্দোলন' কথাটি এখানে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেননা, মিশরের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যাহা-কিছু-ছিল তাহা রাজার মারফৎ ছিল বটে, কিন্তু জাতির অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিয়া কিছু ছিল না। ফলে বিদেশী মূলধন আর দেশী শ্রম জাতির ভাগ্যের কারণ না হইয়া বরং দুঃখের কারণ হইয়াছিল। ইহা আজ সবাই জানেন যে মিশরকে আমরা সুয়েজ খালের প্রভু বলিয়া দেখি না অথচ এই সুয়েজ খাল পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশের বাণিজ্যের সংযোগ-সূত্র হিসাবে কাজ করিতেছে। কিন্তু যাহার রাজ্যের মধ্য দিয়া সংযোগসূত্র সাধিত হইল তাহার কোন প্রভুত্ব নাই। যাঁহারা সুয়েজের খাল কাটিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন তাঁহারাই ইহার প্রভুত্ব ভাগাভাগি করিয়া কায়েম করিয়াছেন। ইহা পুরোনো ইতিহাস বটে, এবং ইহাতে সাধারণ মানুষের কোন ঔৎসুক্যও নাই। কিন্তু ইহা একটি বিষয়ের নির্দেশ করে যে, মিশরের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন মানেই জাতীয় অর্থনীতির মুক্তি। মিশরের শাসক শ্রেণীর অমিতব্যয়িতার ফলে গোটা জাতিকে অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খল পরিতে হইয়াছে। মিশরের রাজা বিদেশী ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গটা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আজকাল বিদেশী ঋণ গ্রহণের বেশ একটা হিড়িক এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। ইহা সাম্রাজ্যবাদী উদ্বৃত্ত অর্থনীতির একটি নূতন রূপ। ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করিলে মিশরের মত স্বাধিকারবঞ্চিত হইতে হইবে। ফরাসী-ব্রিটিশ মিলিয়া মিশরের যাহা করিয়াছে অমুক-অমুক মিলিয়া তাহা করিতে পারিবে। এ-বিষয় এশিয়ার জাতিগুলির সতর্ক হইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। সুখের বিষয় বান্দুং সম্মেলনএর মত একটি সংস্থা এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনৈতিক স্বার্থের প্রহরীর মত কাজ করিতেছে। অন্যত্র আরব-এশিয়ান গোষ্ঠী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে রহিয়াছে। এই সব সংস্থাগুলির কোন গোলা-বারুদ সম্বল নাই বটে, কিন্তু জনমত গঠন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। ইতিপূর্বের রাজনীতিতে জনমতের তেমন কদর ছিল না, শুধু গোলাবারুদ অস্ত্র-শস্ত্র দেখাইয়া অনেক কাজ হইত। এই মিশরেই ফরাসীরা টাকা আদায়ের জন্য যুদ্ধ জাহাজ একদিন পাঠাইয়াছিল। তাহাতে মোটামুটি ফলও হইয়াছে। বর্তমান মানুষ অস্ত্রকে ভয় করে সত্য, এবং অস্ত্রধারীকেও ভয় করে, তবে তার চাইতে অধিকতর বলশালী কিন্তু জনমত—অনেকক্ষেত্রে অস্ত্রের মতই কাজ করিয়া থাকে। কাজেই এক পক্ষে বান্দুং সম্মেলন আর এক পক্ষে আরব জগৎ, আরব-এশিয়ার গোষ্ঠী, মধ্যে মিশরকে রাখিয়া বর্তমান মিশর সমস্যা বিচার করিতে হইবে। ইহা বাদে মিশরের সবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনা, সুদানের নয়া বন্ধুত্ব ইত্যাদি রহিয়াছে।

বর্তমান মিশর সমস্যায় সুদানের একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। কেননা, আসোয়ান বাঁধ বাঁধিতে হইলে সুদানের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। যেমন ঘানোদর বাঁধ বাঁধিতে বিহার-পশ্চিম বাঙ্গালার প্রয়োজন। সে যাহা হউক, পশ্চিমী শক্তিবর্গ তাবিয়াহিক সুদানকে দিয়া মিশরকে একটা অর্থনৈতিক চাপ দেয়া সম্ভব

হইবে, কিন্তু তাহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই। সুদান মিশরের বিরোধিতা করিবে না। বরং সহযোগিতার প্রশ্ন তাহার মনে আসিয়াছে। কাজেই ধরত্তেদী বিভীষণ সৃষ্টি এখানে সম্ভব হইল না।

মিশরকে অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদেই সুয়েজের শুল্কের উপর হাত দিতে হইল। কেননা, এই মাত্র সেদিন মিশর সুয়েজ হইতে ব্রিটিশ সেনা বিদায় করিয়া দিয়াছে। ক্ষমতার মধ্যে যেটা ফাঁক পড়িয়াছিল সেটা ভরাট হইয়াছে কিন্তু ফেলাহিনদের সম্পত্তি বিতরণ করিতে হইলে তাদের চাষেরও সুবন্দোবস্ত প্রয়োজন। সমস্যা কিন্তু একটার সঙ্গে আর একটা গাঁটছড়া বাঁধা। আর তাছাড়া যদি দরিদ্র ফেলাহিন চাষবাসের সুযোগ না-ই পাইল তবে রাষ্ট্র ব্যবস্থারও পরিবর্তন কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজা কায়েম থাকিলেই চলিত। আর যেমন-যেমন সব ঘুষখোর মন্ত্রী ছিল তাহারা থাকিলেই চলিত। বস্তুত বর্তমান মিশরী বিপ্লব চীনের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। নিজের দেশের রাজা ও শাসক সম্প্রদায় থাকিলেই হয় না, যদি আমলাতন্ত্র ব্যভিচারী হয়, উচ্ছৃঙ্খল হয় তবে সাধারণের দুঃখের অবধি নাই। এই দুঃখের অবসানকল্পে বিপ্লব বা রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তন। মিশরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বিশ্ব-ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন কিছু নহে। কাজেই সুয়েজের শুল্কের উপর হাত দেওয়া ওটা অনেকটা পেটের দায় মত। কিন্তু সে কথা ব্রিটিশ শুনিবে কেন? তাহার ত পেটের দায় আছে। এবং অন্যের পেট না মারিলে তাহার চলে না—একথা সে নিজেও জানে। জানিয়াও লাভ নাই—সে অবিশ্রান্ত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের কন্‌স্তান্তিনোপল চুক্তির দোহাই পাড়িতেছে। কিন্তু এই চুক্তি যে-মিশরের আমলে সংঘটিত হইয়াছে সে-মিশর যে আজ আর নাই একথা মনে রাখা ব্রিটিশের উচিত ছিল। অপর পক্ষে সে-ব্রিটিশও নাই। তাহার সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিয়াছে, ক্ষমতায় ঘুন ধরিয়াছে—নচেৎ মিশরকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হইত (?) বস্তুত মিশর সমস্যার সত্য-স্বরূপটা এইখানেই নিহিত রহিয়াছে। সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই। কাজেই মিশর ও ব্রিটিশের উভয়ের স্বার্থে আপোষ মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। নূতন-পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া কাজ করাই কূটনীতির ধর্ম। ঠিক সুয়েজের কারণে আজ যুদ্ধ-করা সম্ভব কিনা তাহা ব্রিটিশ নিজেই ভাল বোঝে, কিন্তু এই কারণে ব্রিটেন যদি অর্থনৈতিক অবরোধ শুরু করে তবে মিশরের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে। এতাবৎ যাহা ঘটিয়াছে তাহাতেই মিশরের অর্থনীতির উপর চাপ পড়িতেছে। সমগ্র জাতিকে সমরশিক্ষা দিয়া গড়িয়া তোলাতে যে অর্থ প্রয়োজন তাহা মিশরের রাজকোষ বহন করিতে সমর্থ কিনা, কে জানে? মিশর কৃষি-প্রধান দেশ কৃষিজাত পণ্যের উপর তাহার বেশী নির্ভর করিতে হয়। কৃষিপণ্য নির্ভরশীল দেশ বর্তমান শিল্প সমুন্নত দেশ চাইতে একটু পশ্চাদপদ না হইয়া উপায় নাই।

কিন্তু জাতির যখন সার্বভৌম ক্ষমতার হাত পড়ে এবং উহা রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় তখন সব রকম দুঃখবরণই সহ্য হয়। এবং জাতির সহনশীলতার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত দিবার জন্যই শক্তিশালী রাষ্ট্রেরা চেষ্টা করে। ফলে গৃহ-যুদ্ধ বাধে, নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র সম্ভব হয়। মিশরের নেতা নাসের এ সম্ভাবনা যে বিচার করিয়া দেখেন নাই এমন নহে। তিনি অস্ত্র কষিয়াই কাজে হাত দিয়াছেন। সম্ভবত প্রেসিডেন্ট নাসের এই সব সম্ভাবনার বিষয় চিন্তা করিয়া কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। এই ভরসা পাইয়া বোধহয় লণ্ডন সম্মেলন ডাকা হইয়াছে। নচেৎ ব্রিটেন আর একবার বজ্রমুষ্টি প্রদর্শন করিত।

লণ্ডন সম্মেলন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে তাহা এশিয়া-আফ্রিকার জাতিগুলি মানিয়া লয় নাই। ফলে বিরোধ না হোক অন্তত মতান্তর হইয়াছে। এটা সহজেই অনুমেয় যে, মিশর তাহার সার্বভৌম ক্ষমতা হারাইয়া কিছু স্বীকার করিবে না। তাছাড়া এশিয়ার জাতিগুলি একবার যদি এইরূপ গুরুতর ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা হরণের প্রশ্রয় দেয় তবে এশিয়ার ভবিষ্যত ত্রাসও আবার নূতন রূপে দেখা দিবে। কাজেই এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলির সতর্ক হইবার কারণ আছে। সেই দিক হইতে বিচার করিতে গেলে যেমন-পরিকল্পনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মিঃ ডালেস যাহা পরিকল্পনা রূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জাতির কথা। কিন্তু এই দুইটি পরিকল্পনা প্রকাশের পর বিশ্ব রাজনীতিতে একটি প্রশ্ন সব নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকগণের মনেই জাগিবে। তবে কি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রাজনীতি এতদিনে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল?

পুস্তক পরিচয়

মন্দার ও মালঞ্চ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। ৪৪।২ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ২৲।

আদর্শমূলক নাটক। মহারাজ অবন্তীবর্মা সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। এ গ্রন্থে তাঁর শিল্প ও সঙ্গীত-প্রীতির নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। রচনা কবিত্বময়। ভাবাত্মক নাটক ব'লে সে কবিত্ব অশোভন মনে হয়না।

কৃষ্ণকলি—শ্রীতারাপদ রাহা। বেঙ্গল পাব্লিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ২৲।

দৃষ্টি থাকলে প্রতিদিনকার সাধারণ জীবনেই কত আশ্চর্য মুহূর্তের সন্ধান মিলে যায়, কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয়না। তারাপদবাবুর গল্পগুলি পড়তে পড়তে তাই মনে হ'লো। প্রায় সবগুলিই আমাদের পরিচিত সংসারের ছবি। পাশের বাড়ীর কৃষ্ণার প্রগল্‌ভ অভিমান, বাস্তুভিটে ছাড়তে কমলা ঠাকরুণের মর্মান্তিক বেদনা, প্রতিবেশিনী সেবা-ব্রতা বৌটির প্রতি স্বামীর রূঢ় আচরণ, ভবেশবাবুর ভরা সংসারে তাঁর করুণ নিঃসঙ্গতা, বিধবা ছোড়দির অসহায় মৃত্যু—এসব আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। শুধু লেখকের সহানুভূতি স্পর্শে সজীব হয়ে বিশেষ ঘটনা-সংস্থানে দেখা দিয়েছে, এইমাত্র। এমন কি, ছলনা-নিপুণ শিবশঙ্কর এবং বাঁশীওয়ালা ভৈরবও বোধহয় আমাদের অপরিচিত নয়; তাদের সম্বন্ধে নূতন কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছেন লেখকার। তাঁর উদার সমবেদনা থেকে বঞ্চিত হয়নি এরা কেউ। আমরাও তাঁর সঙ্গে অনুভব করি, সুদূর দিয়ে দেখলে অনেকেরই উপর রাগ করতে পারিনা, বুঝতে পারি তাদের ভুল ভ্রান্তির কারণ। গল্পকে যাঁরা শুধু গল্প মনে করেন না, জীবন-দর্শনের অন্যতম অভিব্যক্তি ব'লে জানেন, তাঁরা 'কৃষ্ণকলি' প'ড়ে খুশী হবেন।

কৃত্তিবাস—সপ্তম সংকলন। বৈশাখ ১৩৬৩। সম্পাদক—শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ২বি, বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা ৩। দাম ॥০।

'রিল্‌কের বই থেকে অনুবাদ 'তরুণ কবিকে চিঠি' দিয়ে এই সংখ্যার আরম্ভ। তারপর আছে আলোক সরকারের কবিতার আলোচনা। সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বুড়িমার গল্প' এবং বটকৃষ্ণ দের 'চিঠি' বিশেষ ক'রে ভালো লাগলো। উদীয়মান কবিদের শক্তির ও সম্ভাবনার পরিচয় পেতে হ'লে এ জাতীয় সংকলন অপরিহার্য। তৎপক্ষে উপযোগী করবার জন্যে তথা পত্রিকাখানিতে সুদৃশ্য করবার জন্যে উদ্‌যোক্তারা যত্ন নিয়েছেন।

স্বর্ণ গোধূলি—আশা গঙ্গোপাধ্যায়। পরিবেশক—টি. কে. ব্যানার্জি এণ্ড্ সন্স্। ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম ৫৲।

লেখিকার কোন কোন গল্প সাময়িক পত্রে বেরিয়েছে, কিন্তু এই তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। এতে আছে সাতটি গল্প। শেষ গল্পের নামে বইয়ের নাম। মনোরহস্যের প্রতি লেখিকার বিশেষ আকর্ষণ। প্রথম গল্প 'বৃষ্টি'র ঘটনা একটু অসাধারণ কিন্তু বর্ণনাকৌশলে চিত্তাকর্ষক হয়েছে। 'একক' গল্পে ইন্দুপ্রকাশের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিপুণ হাতে আঁকা হয়েছে। 'কাঁচা পথে' সমাজ-সমস্যার একটি দিক্ স্পষ্ট করে' দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটু আধটু অনবধানতার চিহ্ন এখানে ওখানে থাকলেও গল্পগুলিতে লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি, অনুকম্পা এবং স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় পাই।

—বী।

THE
UNION BANK OF INDIA LIMITED
Estd : 1919
Head Office : Apollo St., Fort, Bombay. 1
Capital Paid-up ... ... Rs. 40,00,000
Reserve and other Funds ... ... Rs. 85,00,000
Chairman : Mr. M. S. Captain
Banking business of every description transacted including Foreign Exchange.
F. K. F. NARIMAN
General Manager.

সুয়েজ খাল—মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের সুয়েজ খাল কোম্পানিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল; কারণ, ঐ কোম্পানিতে তাদের মূলধন খাটছে, তার মুনাফা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। মিশর অবশ্য ক্ষতি-পূরণ দেবে জানিয়েছে, বিভিন্ন জাতির জাহাজ-চলাচলেও অকারণে বাধা দেবেনা ঘোষণা করেছে, তবু তারা সন্তুষ্ট নয়। কেননা, সুয়েজ খাল কেবল তাদের ব্যবসায়ের দিক্ থেকেই মূল্যবান্ নয়, কূটনৈতিক দিক্ থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের অসন্তোষ প্রবলতম ভাষায় ব্যক্ত হয়েছিল। ফ্রান্সও সুয়েজ অভিমুখে রণতরী পাঠানোর হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্র যুদ্ধ-মনোভাবকে সমর্থন করেনি। ভারত বিশেষ ক'রে শান্তিরক্ষায় উদ্‌যোগী। ইংলণ্ড-ফ্রান্স-আমেরিকার সুরও এখন ক্রমশঃ নরম হয়ে আসছে। তারাও বুঝতে পারছে উত্তেজনাবশে হঠাৎ কিছু ক'রে বসা সঙ্গত হবেনা। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেজিসের নেতৃত্বে যে প্রতিনিধিদল আলোচনার জন্য মিশরে গিয়েছিলেন, তাঁরা নাসেরের অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করেছেন, তবু আপোষ সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেন নি। ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন শক্তি যে আঠারোটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে নাসেরের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব করেছেন, তা মিশরের মনঃপূত হয়নি, কেননা, অভিপ্রেত কোন কোন রাষ্ট্রের নাম তাতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

যাহোক্, বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করে মনে হয়, বিনা যুদ্ধে মীমাংসা অসম্ভব হবে না।

ধর্মগুরু—আমেরিকান লেখক প্রণীত, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পৃথিবীর ধর্মগুরুদের কথা নিয়ে লেখা একখানি গ্রন্থের একটি সুলভ সংস্করণ বোম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে হজরত্ মোহাম্মদ সম্পর্কে অসম্মানজনক উক্তি আছে এই অজুহাতে নানাস্থানে এক শ্রেণীর লোক বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। শ্রীযুক্ত কে. এম্. মুন্সি ভারতীয় বিদ্যাভবনের পরিচালকগণের অন্যতম, এজন্য তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা হয়েছে। আলিগড়, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানে আন্দোলন কদর্যরূপ ধারণ করেছে। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিও আন্দোলনকারীদের মুখ থেকে বেরিয়েছে। দেখে মনে হয়, এটা ঠিক ধর্মপ্রাণতাপ্রসূত আপত্তি নয়, হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে একদল লোকের আক্রোশ-প্রকাশ। বইখানি সম্পর্কে অভিযোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত মুন্সি ও শ্রীযুক্ত নেহেরু দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বইখানির প্রচার বন্ধ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিহারে বইখানি বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি সমস্ত ভারতেই ওর প্রচার বন্ধ হয়েছে। তবু এ আন্দোলনের অর্থ কি? কলকাতায়ও একদল ছাত্র সভা ও শোভাযাত্রা করেছে। দু'এক জায়গায় পুলিস কর্মচারী আক্রান্ত হয়েছে এবং গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। এ অবস্থা শোচনীয়। ভারত অসাম্প্রদায়িক। কোন ধর্মের উপরই আক্রমণ সমর্থনযোগ্য নয়। তবে গণতান্ত্রিক দেশে আপত্তি জানাবার ভদ্রতর পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিই অবলম্বনীয়। যদি ধর্মান্দোলন উপলক্ষ্য করে কেউ রাষ্ট্রদ্রোহিতার পরিচয় দেয় তবে তাকে কঠোর

হস্তে দমন করা কর্তব্য। যে-বই দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর বাজারে বিক্রীতে হয়ে আসছে, সে বই উপলক্ষ্য করে' আজ ভারতবর্ষে অশান্তির সৃষ্টি হ'লো কেন, সে কথা ভেবে দেখা দরকার।

একটি ঘটনা—অল্প দিন আগে একটি ঘটনার কথা কাগজে বেরিয়েছে। সিঁদিরপুরে ট্রামের ধাক্কা লেগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আহত হ'ন। ট্রাম কর্মচারী এবং সাধারণ লোকেরা অনেকক্ষণ ধরে' তাঁকে ঘিরে জটলা করেছে, কেউ তাঁকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেনি। এক মেমসাহেব ভিড় ঠেলে ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং ভদ্রলোককে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে ট্রাম কর্মচারীদের অনুরোধ করেন। তাতে কোন ফল হয়না। এমন সময়ে ট্রাম কোম্পানির একখানা গাড়ি ওখানে উপস্থিত হয়। ঐ গাড়িতে আহত ভদ্রলোককে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করে' তিনি প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হ'ন, পরে অনেক চেষ্টায় গাড়ির চালককে রাজি করান। তাঁর উদ্যোগে লোকটিকে হাসপাতালে নেওয়া হয় কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটির মৃত্যু ঘটে।

ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে সামান্য মনে হলেও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সামাজিক দায়িত্ববোধহীনতার পরিচয় এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। প্রায়ই দেখি, পথে দুর্ঘটনা ঘটে, তা নিয়ে জটলাও হয় কিন্তু তাড়াতাড়ি করে কর্তব্য পালনে আমরা কম লোকই অগ্রসর হই। সমাজতন্ত্রের কথা আমাদের মুখে। কিন্তু সামাজিকতা-বোধের নিদর্শন আমাদের আচরণে বিরল।

কার্য্যকারিতায়, স্থায়িত্বে ও গুণে

বেঙ্গল বেল্টিং

ও

বেঙ্গল হোস

অতুলনীয়

২নং ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট

কলিকাতা - ১

ফোন : সিটি ১২৫১, ১৯৫২

আনন্দে এবং নিশ্চিন্তে

ব্যবহার করুন

ইণ্ডিয়া সাইকেল

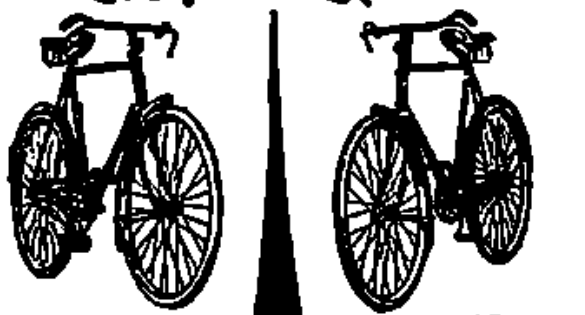

সুপার ডি-লুক্স

সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে নিখুঁত ভাবে প্রস্তুত

রোডস্টার

সর্বজনপ্রশংসনী ও সর্বত্রলভ্য সুলভমূল্যে আদর্শ সাইকেল

ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ কলিকাতা-১

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

মাতার কণ্ঠে শেফালী মালা
গন্ধে ভরিছে অবনী

শিল্পী : শ্রীইন্দু গুপ্ত

মন্দিরা

উনবিংশ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৬৩ | ষষ্ঠ সংখ্যা

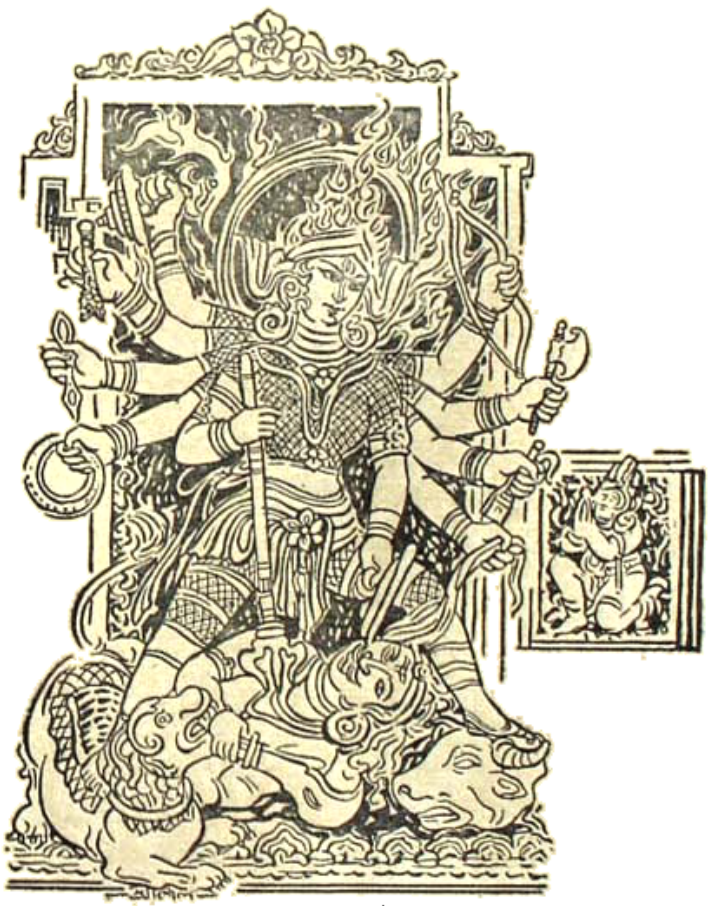

মহিষমর্দিনী

শারদীয়া

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দুর্গাপূজার ইতিহাস আজও আমরা জানি না। মার্কণ্ডের চণ্ডীতে সুরথরাজার পূজার কাহিনী পড়েছি। রামায়ণের অকাল-বোধনের কথা শুনেছি। ভারতে এবং ভারতের বাইরেও মিলেছে চণ্ডী বা দুর্গামূর্তির সন্ধান। দুর্গা হিমালয়-কন্যা। হিমালয়ের সন্নিহিত অঞ্চলে—বঙ্গের উত্তর সীমায়, আসামে, নেপালে, তিব্বতে—তন্ত্র-সাধনার বহুল প্রচলন। হয়তো এসবের মধ্যে নানা তথ্য লুকোনো আছে। সে-সব সাজিয়ে ইতিহাস-রচনা আজও হয়নি।

বাংলা দেশে অনেক দিন ধরে এ পূজা চলে আসছে এবং বাঙালীর মন অধিকার করে নিয়েছে। বর্ষার মেঘাবরণ সরে গেলেই শরৎ তার সোনার আভা নিয়ে দেখা দেয়; চাপা-বরণ আলোর আঁচল লুটিয়ে পড়ে পৃথিবীর উপর। কূলে কূলে ভরা নদীর বুকে পাল তুলে ভেসে চলে নৌকার দল; আকাশে ওড়ে শাদা মেঘের পাল। দীঘিতে বিলে পদ্ম কুমুদ; বাগানে ঝরা শেফালির পুষ্প; স্নিগ্ধ গন্ধে বাতাস ভরপুর। শস্য ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ শ্যামশ্রী। মাটির বুকে প্রাণের জোয়ার। পূজার বাঁশী যেন আপনা-থেকেই বেজে ওঠে অসংখ্য হৃদয়ে। শাস্ত্র-পুরাণের অপেক্ষা রাখেনা এমন দিনে আমাদের মন। নির্মল রৌদ্রে যেন কোন্ জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি ফুটে ওঠে; শীতল বাতাসে পাই তাঁর স্নেহস্পর্শ। ধরণী নিবেদন করে পুষ্পার্ঘ্য, চরণ প্রক্ষালন করে নদী। এই মনোহর রূপ জাগায় পূজার প্রেরণা—সেই প্রেরণা বশেই বোধহয় বাঙালী শারদীয় উৎসবের প্রবর্তন করেছিল। শাস্ত্রের সঙ্গে তার যোগ আনুষঙ্গিক।

অখণ্ড বাংলার উৎসব আজ অংশতঃ আনন্দ হারিয়েছে। পূর্ববঙ্গের গ্রামের কূলে কূলে প্রবাসীদের নিয়ে যে অসংখ্য তরী এসে ভিড়ত, আজ তা ভেড়েনা। সে উদ্যোগ আয়োজন, সাড়ম্বরে প্রতিমা ভাসান, নৌকা-বা'চ, কৌতূহলী দর্শকের মেলা, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ, বিজয়াদশমীর আলিঙ্গন—অতীতের স্বপ্নমাত্র। ক'লকাতার সার্বজনীন পূজা তেমন ক'রে হৃদয় স্পর্শ করে না। এতে পল্লীর পূজার মত প্রাণের স্ফূর্তি নেই। সামাজিকতার চেয়ে অসামাজিকতার, ধর্মভাবের চেয়ে রুচিবিকারের পরিচয় অনেক সময়ে বেশী প্রকাশ পায়। জাতি আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, দেখে দুঃখ হয়।

সামাজিকতার রূপটিই ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুর্গাপূজা বৈরাগ্যবাদীর পূজা নয়, আদর্শ সংসারীর পূজা। ধনধান্য পূর্ণ গৃহ, সৌন্দর্য ও খ্যাতি, উপযুক্ত জায়া ও পুত্র—কামনা ক'রেই গৃহস্থ মায়ের স্তবমন্ত্র উচ্চারণ করেন।

এ কামনা ক্ষুদ্র স্বার্থকামনা মাত্র নয়; সকলের সঙ্গে এক হয়ে সুখ সম্পদ্ কামনাই তাঁর লক্ষ্য। দারিদ্র্য চাইনা, চাই সচ্ছলতা, চাই শক্তি; উপকরণের প্রাচুর্য আর অন্তরের প্রসার; সৃষ্টির শক্তি আর দানের শক্তি; দেহের বল আর আত্মার বল।

কর্মকুণ্ঠ, নিশ্চেষ্ট জাতি আজ সজ্ঞান নিষ্ঠা নিয়ে শক্তি-দেবীর আরাধনায়, ঐশ্বর্য-সম্ভার-আহরণে, দেশকে সম্পদে পরিপূর্ণ করে' তোলবার সাধনায় এবং তারই সঙ্গে শরতের পূর্ণতার মধ্যে যাঁর অধিষ্ঠান ভক্তিবিনম্র চিত্তে তাঁর আরাধনায় আবার কি প্রবৃত্ত হবে না?

শিক্ষাবিস্তারে বাঙ্গালীর দান

শ্রীরেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

ভারতবর্ষে শিক্ষার আদর বহুকাল হইতে লক্ষিত হয়। কুশাগ্রবুদ্ধি চাণক্য বলিয়াছেন, রাজা কখন বিদ্বানের সমকক্ষ হইতে পারেন না; কারণ, রাজা কেবল স্বদেশেই পূজিত, বিদ্বানের পূজা সর্ব্বত্র। সেকালেও বাঙ্গালী পণ্ডিতরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদেশে গিয়াছেন—তিব্বতে বাঙ্গালী পণ্ডিতের আদর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সেকালের কথা ছাড়িয়া দিলে একালে আমরা দেখিতে পাই নবভারতে শিক্ষাবিস্তারে বাঙ্গালীর দান অসাধারণ।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শিক্ষাবিস্তারে বাঙ্গালীর দানের বিষয় বিশেষ ভাবে লোকের আলোচনার বিষয় হইতেছে। কারণ, শিক্ষাব্রতী হরেন্দ্রকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজ্যপাল হইয়া যে সকল জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সে সকলের জন্য অর্থ সংগ্রহে লব্ধ অভিজ্ঞতাবলে তিনি মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী সমাজে দানের প্রবৃত্তি তখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; কিন্তু অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকায় দানের উৎস সর্ব্বদা উৎসারিত হয় না—সে উৎসের সন্ধান করিতে হয়। তিনি যে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র দাতাদিগের দান। তিনি স্বয়ং দরিদ্র-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া মিতব্যয়িতার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া শিক্ষাব্রতীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাবিস্তারকল্পে ১৪ লক্ষ টাকা—ক্রমে ক্রমে—দিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ দানে তাঁহার সমকক্ষ না হইলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনিও শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং জীবনের উপার্জ্জন শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

শিক্ষার মর্য্যাদা ভারতবর্ষ যখন অনুভব করিয়াছিল তখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই তাহা করে নাই। প্রাচীতে জাপানের—প্রয়োজনে—শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। তখন জাপানের সম্রাট—মিকাডো—দেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সে সম্বন্ধে যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

সাধারণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান হইতে সর্ব্ববিধ জ্ঞান শিক্ষাসাপেক্ষ—"Is is intended that henceforth education shall be so diffused that there may not be a village with an ignorant family, nor a family with an ignorant member." অর্থাৎ কোন গ্রামে একটিও অজ্ঞ পরিবার এবং কোন পরিবারে একজনও অজ্ঞ ব্যক্তি থাকিবে না।

এই ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা দুঃসাধ্য হইলেও তাহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের পতন দশায় যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় লোকের ধন প্রাণ মান বিপন্ন হইয়াছিল, ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সেই অবস্থার অবসান ঘটায়—তখনই বাঙ্গালায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য আগ্রহ লক্ষিত হয়। তদবধি ধনী যেমন তাঁহার ধন—জ্ঞানী তেমনই তাঁহার জ্ঞান শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়। সেই সময় হইতে ছলে বলে কৌশলে ইংরেজ বণিকের শাসন-ক্ষমতার বৃদ্ধি। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে সে ক্ষমতা ইংরেজের হস্তগত হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে কলিকাতায় এক সভায় একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই পরে হিন্দুকলেজে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ ১০ হাজার টাকা ও কলিকাতার গোপীমোহন

ঠাকুর ১০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কালেজের জন্ত উদ্দিষ্ট গৃহের ভিত্তিস্থাপনোৎসব হয়—

"Amidst the acclamations of all ranks of the native population of this city".

কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে বাঙ্গালী মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বারাণসীবাসী হইয়া তথায় শিক্ষার্থীদিগকে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী ও পারসী ভাষা শিক্ষাদানের জন্ত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মুসলমান সৈয়দ মামুদ সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Nor was Calcutta the only place where the Hindus evinced their desire to advance English education among their countrymen. When the Governor-General visited the Upper Provinces in 1814, Joynarayan Ghosal, an inhabitant of Benares, presented a petition to his Lordship, with proposal for establishing a school in the neighbourhood of that city, and requesting that Government would receive in deposit the sum of Rs 20,000 the legal interest of which, together with the revenue arising from certain lands he wished to be appropriated to the expense of the Institution."

প্রস্তাব গৃহীত হইলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা জয়নারায়ণের পুত্র পরে পিতার কার্য্যের জন্ত আরও ২০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, জয়নারায়ণ কলিকাতার উপকণ্ঠে ভূকৈলাস প্রতিষ্ঠিত করিয়া বারাণসীবাসী হইয়াও দেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন উপেক্ষা করেন নাই এবং নিষ্ঠাবান হিন্দুর প্রথানুসারে "তীরস্থ" হইয়া দেহত্যাগ করিলেও যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া বিদ্যালয়ের পরিচালনভার খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগকে দিয়াছিলেন। বিদ্যালয় আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় তৎকালীন গবর্ণর-জেনারলকে এক পত্র লিখিয়া প্রতীচ্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে বলেন :—

"As the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a College furnished with necessary books, instruments, and other apparatus."

ইংরেজ এ দেশে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন—কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যে শিক্ষা দিলে তাঁহারা স্বল্প ব্যয়ে, কিন্তু সুষ্ঠুভাবে শাসন ও শোষণ করিতে পারিবেন, সেই শিক্ষা প্রদানই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল। আর সেই জন্ত তাঁহারা প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি হইতে তিনটি প্রয়োজনীয় উপকরণ বর্জ্জন করিয়াছিলেন—শৃঙ্খলা, সন্তোষ, ধর্ম্ম। তাঁহারা দেশের জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখিয়া পঙ্গু করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কারণ, যে স্থানে অজ্ঞতাই ব্যাপ্ত সে স্থানে স্বৈরশাসনশীল শাসকরা নির্ভয়ে লোকের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন নাই, যে স্থানে জনগণ সমৃদ্ধ তথায় জ্ঞানবিস্তার অনায়াসে করা যায়—আর যে স্থানে শিক্ষার সহিত অন্নাভাবের সম্মিলন হয় সেই স্থানে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। সে শিক্ষা নগরে বদ্ধ থাকিলেও কার্য্যকরী হয়। শাসন-সংস্কারের সময় ইংলণ্ডে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এবং খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে আয়র্লণ্ডে ও মিশরে ইহাই দেখা গিয়াছে। "All social convulsions have been preceded by a period of growing misery for the agricultural poor, combined with the growing intelligence of the urban populations."

এ দেশে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এ দেশে—বিশেষ বাঙ্গালায়—শিক্ষাবিস্তারের জন্য আগ্রহ সর্ব্বত্র স্বপ্রকাশ।

এ দেশের ইংরেজ শাসকরা জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে উদ্যোগী হইলেন না—উচ্চ শিক্ষা মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর অধিগম্য করিবার আয়োজন করিলেন। কারণ, তাঁহারা জানিতেন, সভ্যতা সমাজের উচ্চস্তরে প্রস্ফুটিত হয়—সমাজের শক্তি নিম্নস্তর হইতে উদ্গত হয়। ভয়—নিম্নস্তরে। বিশেষ তাঁহারা লক্ষ্য করিতেছিলেন—তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার ফলে এ দেশের লোক—আপনাদিগের সংস্কৃতিভ্রষ্ট হইয়া প্রাচ্য সভ্যতার অনুকরণ-পটু হইয়া উঠিতেছিল। সে দলকে ভয় নাই। অবশ্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই—জাতি যখন তাহার জন্মগত অধিকার লাভ করিবার জন্য আগ্রহানুভব করে, তখন কেহ সে আগ্রহের গতিরোধ করিতে পারে না। কারণ, ইতিহাসের শিক্ষা—"Fleshly arms, and the instruments of war, are but a fragile tenure, and 'soon to nothing brought' when opposed to the interests and the will of an enlightened people."

তাহাই হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিলম্বে। ইংরেজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি সেই বিলম্বের কারণ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—সিপাহীবিপ্লব আর কলিকাতায়, বোম্বাইএ ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—উচ্চশিক্ষাবিস্তারের জন্য—প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নহে।

কিন্তু সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার এক তরুণ ধনী বাঙ্গালায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি—ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান ও প্রিয়পাত্র (এক কালে জীবন রক্ষক)—কৃষ্ণকান্ত নন্দীর বংশধর—কৃষ্ণনাথ রায়। তিনি তাঁহার বিধবার জন্য সামান্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া সমগ্র সম্পত্তি একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযুক্ত করিবার নির্দ্দেশ তাঁহার উইলে দিয়াছিলেন। তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার উইল নাকচ হয়। তাঁহার প্রমোদকানন বাজেটিয়ায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কৃষ্ণনাথের আদর্শ কিন্তু নষ্ট হয় নাই। বহুদিন পরে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার ভাগিনেয় মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনাথের পরিকল্পনা ব্যাপক ছিল এবং তখন শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ শিক্ষিত সমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকরা এ দেশে লোককে শিক্ষা দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাও করিতেন। বিশেষ সে ধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মের প্রচারকরা রাজার জাতি—অনুগ্রহদানের অধিকারী। লোক তাঁহাদিগের মতে আকৃষ্ট হইত। তাহার প্রতীকারকল্পে হিন্দুদিগের দ্বারা অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য কলিকাতায় এক সভা হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। সে সভায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কে কত টাকা দিবেন, সে বিষয়ে অনেকে ইতস্ততঃ করিলে কলিকাতার ব্যবসায়ী ধনী মতিলাল শীল লক্ষ টাকা দিলেন। সেই টাকায় যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা আজও বিদ্যমান। তাহাই "শীলস ফ্রি কলেজ" নামে পরিচিত।

শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ কিন্তু রাজধানী কলিকাতাতেই আবদ্ধ রহিল না। সরকার কলিকাতায়, কৃষ্ণনগরে, হুগলীতে ও ঢাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন বটে, কিন্তু সে সকলে ছাত্র যোগাইল নানা স্কুল—সে সকলই সরকারী নহে। সে সকলের অধিকাংশেই শিক্ষিত বণিকদিগের আগ্রহে ও ধনী (বিশেষ জমীদার) সম্প্রদায়ের অর্থের শুভ সন্নিবেশে নানা কেন্দ্রে—সহরে ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশে শিক্ষাবিস্তারে সহায় হইল।

এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালার ধনীরা কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার হিসাব পাওয়া অসম্ভব। একবার বাঙ্গালার জমীদারদিগের এইরূপ কার্য্যে ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার ফল—'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত দুইটি প্রবন্ধ। কিন্তু সে তালিকা অসম্পূর্ণ। যে বহু জমীদার শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী হইয়াছিলেন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম।—মেঘচন্দ্র তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন।

"মাল আইনে তোড়বল, রোখে ছায়দার আলী,
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলি।"

কথিত আছে, তাঁহার পুত্র (রাজা) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিস্তারে পিতার অর্থব্যয়ের সমর্থন করেন না বুঝিয়া পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নিরস্ত্রের বঙ্গে যুদ্ধ করা কাপুরুষের কাজ। প্রজাকে শিক্ষা দাও —সে তাহার অধিকার বুঝিয়া লউক; তাহার পরে তুমি তোমার অধিকারে তাহার প্রভু—জমীদার।" তিনি আপনার জমীদারীতে নানা স্থানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং উত্তরপাড়া লাইব্রেরী তাঁহার কীর্ত্তি। এই লাইব্রেরী ভবনে মধুসূদন কিছুদিন বাস করিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ বিষয়ে জয়কৃষ্ণ একক নহেন। পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে বহু জমীদার ছাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিচালিত করিয়াছেন। ধনী ব্যবসায়ীরাও সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছেন।

এই সকল বাঙ্গালীর বদান্যতায় সমগ্র বাঙ্গালায় বিদ্যালয়ের অভাব দূর হইয়াছিল। সরকারের একটি বিদ্যালয়ের স্থানে বেসরকারী দশটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ে বেতনের হার যেমন অল্প ছিল—তেমনই বহু ছাত্র বিনা বেতনেও পাঠ করিতে পারিত।

বেসরকারী বিদ্যালয় কেবল বালকদিগের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—বালিকাদিগের জন্যও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় লোকের আগ্রহের পরিচয় পাইতে বিলম্ব হয় নাই এবং সে বিষয়ে কলিকাতা অপেক্ষাও মফস্বলে অধিক উল্লেখযোগ্য কাজ হইয়াছিল।

শিক্ষাবিস্তারে বাঙ্গালীর দান এইরূপে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে দানের সুযোগ বাঙ্গালী সর্ব্বত্র গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাতে সমাজে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

প্রথমে কলিকাতায় সরকারী কলেজ ছিল একটি—প্রেসিডেন্সী কলেজ; আর বেসরকারী কলেজ সবই খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারকদিগের—

(১) নিমতলা ষ্ট্রীটে—ফ্রিচার্চ্চ ইনষ্টিটিউশন (ডাফ কলেজ)

(২) হেদুয়ার ধারে—জেনারল এসেম্‌ব্লীজ ইনষ্টিটিউশন

(৩) মীরজাপুর ষ্ট্রীটে—কেথিড্রাল মিশন কলেজ

(৪) পার্ক ষ্ট্রীটে—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ

(৫) ভবানীপুরে—লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর কলেজ

এই সকল কলেজেই বাইবেল পাঠ করিতে হইত—বাইবেল ক্লাস ছিল।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রথম বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জমী কিনিয়া তিনি বন্ধু এঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্রের মধ্যস্থতায় তাগ্যকুলের মহাজন শ্রীনাথ, জানকীনাথ ও সাঁতানাথ রায়ের নিকট টাকা ধার করিয়া মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহা কেবল হিন্দুদিগের জন্য। মুসলমান ছাত্রদিগের কথা তখন উঠেও নাই। কারণ, মুসলমানরা বহু দিন ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই—বরং রাজনীতিক কারণে বিজেতা ইংরেজদিগের শিক্ষা গ্রহণ করিতে অসম্মত ছিলেন।

পরে মাদ্রাসার (মুসলমান ছাত্ররা) প্রেসিডেন্সী কলেজে কয়টি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিত। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজই প্রথম প্রতিপন্ন করে, বাঙ্গালায় বেসরকারী কলেজ পরিচালন অসম্ভব নহে। সিভিল সার্ভিস ত্যাগে বাধ্য হইবার পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে অধ্যাপনার কাজে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নূতন জীবন আরম্ভ করেন। তিনি পরে স্বয়ং রিপন কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

রাজনীতিক কার্য্যে সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী আনন্দমোহন বসু ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রথম, "র‍্যাঙ্গলার"। তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সহযোগিতায় সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ইহার পরে শিবনাথচন্দ্র বসু সরকারী বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

মফঃস্বলে বর্দ্ধমানের মহারাজা বর্দ্ধমানে যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার বৈশিষ্ট্য ছিল—তাহাতে ছাত্ররা বিনাবেতনে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিত। বহুদিন পরে বাঙ্গালার ছোট লাট সার এডওর্ড ফ্রেজারের পরামর্শে তৎকালীন মাহারাজা সে কলেজে বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রাজসাহীতে যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথের দানই প্রধান।

অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালকে বিরাট শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করেন। তাঁহার কলেজে ছাত্রগণ যে চারিত্রিক শিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষাও—সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে লাভ করিত—তাহাই তাহার বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ ছিল। তাঁহার ব্রজমোহন কলেজ এক হিসাবে বাঙ্গালায় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তাঁহার ব্যক্তিগত মনোযোগ ও আদর্শ বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

এই কলেজের আদর্শ গ্রহণ করিয়া খুলনা দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার প্রতিষ্ঠাতা—হাই-কোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী। ব্রজবাবুর সতীর্থ—নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র, ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, চারুচন্দ্র ঘোষ, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, চারুচন্দ্র দত্ত, ফজলুল হক, মনীন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রকুমার সরকার, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শরৎচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। এই ছাত্রদলে সর্ব্বপ্রধান—জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে খণ্ডিত হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালার প্রায় সকল সহরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—প্রায় সবই বেসরকারী।

কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন বাঙ্গালী অনুভব করিয়াছিল—অনেক দিন পূর্ব্বে। যখন ইংলণ্ডের যুবরাজ এলবার্ট এডওয়ার্ড ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন তখন সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ দুই জন ধনীর নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকা হিসাবে—অর্থ সংগ্রহ করিয়া সরকারী সাহায্যে "এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স" প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পূর্ব্বে এবং পরেও কারিগরী বিদ্যা প্রসঙ্গে সরকারী নীতি—হার্কোর্ট বাটলারের কথায়—"A record of inconstant purpose with breaks of unconcern,"

ভূপেন্দ্রনাথ বসুর প্রয়োচনায় "পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির"—অবৈতনিক কারিগরী বিদ্যালয়ের জন্য মাণিকলাল শীল ৫ লক্ষ টাকা দান করেন।

সরকারের এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা হয়—১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। তখন বাঙ্গালা সরকার শিবপুরে বিশপস কলেজের বাড়ী কিনিয়া প্রথম কারিগরী কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। সে সম্বন্ধে 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' মন্তব্য :—

"The great redeeming feature of our rule, in the midst of the misery it has brought upon the people, is the 'education' we are giving them. The introduction of Technical Schools is full of bright promise. We are accustomed to speak of India as a purely agricultural country, and so it is, but there is no reason why we should suppose it must ever remain so. The people show great mechanical skill, and delicate and skilful manipulation; and thirty years hence those of us who may be alive then will probably see Calcutta the mother of many of the manufactures for which we now depend on Europe."

এই সরকারী কলেজ অপেক্ষাও যে বেসরকারী কলেজের গৌরব অধিক, তাহা "স্বদেশী আন্দোলনের" সময়ের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ—এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত।

তাহার জন্য প্রথম দান—এক লক্ষ টাকা। দাতা—সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক। ইহার দ্বিতীয় দাতা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও তৃতীয় দাতা (মহারাজা) সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী—দানের পরিমাণ যথাক্রমে ৫ লক্ষ টাকা ও আড়াই লক্ষ টাকা। রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিত এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিরাট দান—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায়—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ ছিল না। আশুতোষের চেষ্টায় তাহা হয়।

কিন্তু কলেজগুলির মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজ ব্যতীত অন্যত্র বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা না থাকায়, সেই অভাব দূর করিবার জন্য মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতায় বিজ্ঞান সভা (ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স) প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার প্রতিষ্ঠানপত্র রচনা করিয়াছিলেন—কেশবচন্দ্র সেন। কলেজগুলিতে—বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার পরে সেই প্রতিষ্ঠান গবেষণাগারে পরিণত হয়। এই গবেষণাগারেই চন্দ্রশেখর রমণ তাঁহার গবেষণা আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি পরে, সরকারের প্রচেষ্টায়—যাদবপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে; তাহার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। দেবনাদ সাহা ইহার পরিচালক ছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠান বহু বৈজ্ঞানিককে গবেষণার সুযোগ দিয়াছে এবং বহু ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়া বিজ্ঞানচর্চায় আকৃষ্ট হইয়াছে। মহেন্দ্রলাল সরকারের এই কীর্তি অক্ষয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন এবং উপার্জিত অর্থ শিক্ষাবিস্তার কার্যে প্রযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গবেষণাফল জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। তাঁহার গবেষণা—বহু ছাত্রকে প্রেরণা দিয়াছে এবং সেই গবেষণায় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাস্যুটিক্যাল ওয়ার্কস নানাভাবে উপকৃত হইয়াছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা অন্য পথে গিয়াছিল এবং "বসু বিজ্ঞান মন্দির" তাঁহার কীর্তি। তিনি যে বিভাগে যেরূপে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, গবেষণাগারে সেই বিভাগে গবেষণা পরিচালিত হইতেছে। তিনি তাঁহার আবিষ্কারের দ্বারা কিরূপে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি প্রথমে যে আবিষ্কার করেন, তাহা যদি অর্থকরী ব্যাপারে প্রযুক্ত করিতেন তবে প্রভূত ধনার্জন করিতে পারিতেন; কিন্তু জ্ঞান বিক্রয় না করিয়া তিনি তাহা প্রচার করিয়াছিলেন।

অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষা প্রদান জন্য মেডিকেল কলেজ প্রথমে কলিকাতায় (সরকার কর্তৃক) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শল্যচিকিৎসা বহুদিন এ দেশে অজ্ঞাত থাকায়, কোন ছাত্র শব ব্যবচ্ছেদে সম্মত হইবে কি না, সে বিষয়ে ইংরেজ সরকারের সন্দেহ ছিল। সেই জন্য যখন মধুসূদন গুপ্ত তাহা করেন তখন কলিকাতায় দুর্গে তোপধ্বনি করা হইয়াছিল।

বহু বাঙ্গালী চিকিৎসা বিদ্যা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ডক্টর শুভির চক্রবর্তী ভারতীয় ছাত্রের মাতৃভাষায় তাহার চিকিৎসাবিদ্যা অর্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি বলেন :—

"The vernacular languages are your mother tongue. They cost you little trouble and expense, cheapness and facility of comprehension are hence two recommendations in their favour. The most important defect at present is the want of sufficient medical books".

পাঠ্যপুস্তকের অভাব দ্রুত দূর হইতেছিল। দুর্গাদাস করের "মেটিরিয়া মেডিকা", অবিরুদ্দীন আহমেদের "সার্জারী", লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের "চক্ষুচিকিৎসা" প্রকাশিত হয়। পরে—অনাবশ্যকভাবে—বাঙ্গালা সরকার ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে বাঙ্গালায় চিকিৎসাবিদ্যা পঠন-পাঠন বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ঐ কার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছিল।

সে জন্য দায়ী—ইংরেজ সরকার।

প্রথমে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে দুইটি বিভাগ ছিল—ইংরেজী ও বাঙ্গালা। উভয় বিভাগে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিতে বাঙ্গালা বিভাগ স্থানান্তরিত করা হয়। তখন ইহার নাম হয়— ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল। পোর্ট ক্যানিং কোম্পানী বাজার বসাইবার জন্য যে গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় নানা মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সকলের একটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক—ডক্টর রাধাগোবিন্দ কর (দুর্গাদাস করের পুত্র) বেলেরকারী

মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতে থাকেন এবং তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় সেই স্বপ্ন সফল হয়। তাহার ফল—কার্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল। ইহাই পরে—আর, জি, কর হাসপাতাল নামে অভিহিত হইয়াছে।

আর একটি মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন—ডক্টর শরৎকুমার মল্লিক। চিত্তরঞ্জন দাশের সহায়তায় ডক্টর সুন্দরী মোহন দাশ প্রতিষ্ঠিত স্কুল—ইহার সহিত সম্মিলিত হওয়ায় আর একটি মেডিক্যাল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রথম বেসরকারী কলেজ বাঙ্গালীর কাজ।

ডাক্তারীর মত কবিরাজী শিক্ষার জন্যও বাঙ্গালীর দ্বারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় প্রতিষ্ঠিত (কবিরাজ গণনাথ সেনের সহযোগে) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রী—কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তখন ছাত্রীরা উপাধি পাইতেন না। সেই জন্য তাঁহাকে উপাধি দেওয়া হয়—গ্র্যাজুয়েট, মেডিক্যাল কলেজ।

আজ কলিকাতায় মফঃস্বলে বাঙ্গালীর দ্বারা বহু নারী-শিক্ষালয়—কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে বিষয়ে বেথুন কলেজ পথপ্রদর্শক।

বাঙ্গালী সোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্জাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার দৌহিত্রী (রাজা হরনাথ সিংহের কন্যা) রাজকুমারী অমৃত কাউর ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী।

বাঙ্গালার বাহিরে নানা প্রদেশে শিক্ষাবিস্তারে বাঙ্গালীর দানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত।

শিক্ষাবিস্তারে বাঙ্গালীর দানের পরিচয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিবরণ দেখিলে পাওয়া যায়। প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বাঙ্গালী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রণী—শিক্ষক ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য সর্ব্বস্ব দিয়া গিয়াছেন—আপনাকে বঞ্চিত করিয়া যে জন্য অর্থ সঙ্কুল করিয়াছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারে বাঙ্গালীর দানের কথার আলোচনা করিবার সময়—রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী"র উল্লেখ করিয়া শেষ করিব। "বিশ্বভারতী" আজ বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা এই অসাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে ভারতের গুরুগৃহের আদর্শের সহিত প্রাচীর বিদ্যাদান-পদ্ধতির শুভ সম্মিলন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং

প্র, না, বি

অভয় ও শর্মিতা বিবাহের পরেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ (Family Planning) বসিয়া গেল।

এ সব বিষয়ে নব বিবাহিতদের মধ্যে যে রহস্যময় মাধুর্য থাকে তাহার বাষ্পটুকুও তাহাদের মনে ছিল না, কারণ প্রথমতঃ তাহারা অর্থনীতি ও রাজনীতির ডবল এম-এ, তার পরে আবার Sociology বা সমাজতত্ত্ব শাস্ত্রটাও পড়িয়া ফেলিয়াছে। তা ছাড়া বিশ্বে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর যে বিপুল আয়োজন চলিতেছে তাহারও সন্ধান লইয়া আসিয়াছে। প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত রোমান্স বিনোদের পক্ষে এগুলিই যথেষ্ট, কিন্তু না আরো আছে। বিবাহে পরিণয়ের বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহারা কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছে কাজেই চরাচর তাহাদের কাছে পরিচিত খাতার মতো সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত ছকে ছাঁটাই, কোথাও কিছু বাহুল্য বা বেহিসাবী থাকিবার উপায় কি? আধুনিক প্রগতির তাড়নায় অগ্রসর হইতে হইতে তাহারা প্রায় মনুসংহিতার আমল পর্যন্ত পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহারা বিশ্বাস করে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা', বিবাহ প্রজাবৃদ্ধির বিধিসঙ্গত উপায়, প্রেম, রোমান্স, হাহুতাশ, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি সমস্তই অলীক। তাই তাহারা বিবাহের ঠিক পরেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ বসিতে সক্ষম হইয়াছে। অভয় বলে লজ্জা ঘৃণা ভয় জ্ঞানের অন্তরায়, শর্মিতা বলে সেই সঙ্গে রোমান্সটাও।

তাহারা পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষের পুত্রকন্যার সংখ্যা উদ্ধার করিয়া, সাধারণের অজ্ঞাত কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের সুপরিজ্ঞাত নিয়মে তাহাকে যোগ বিয়োগ ভাগ গুণ প্রভৃতি করিয়া তাহাদের সম্ভাবিত পুত্রকন্যার সংখ্যা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। দশ!

বিজ্ঞান আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেই ওর মধ্যে পুত্র ও কন্যার স্বতন্ত্র সংখ্যাটাও জানা সম্ভব হইবে। কিন্তু সম্প্রতি যাহা জানা গিয়াছে তাহাতেই দু'জনে হতবুদ্ধি হইয়াছে।

দশ জন?

সর্বনাশ!

শর্মিতা বলিল—সেকালের কর্তাদের এ ছাড়া তো কাজ ছিল না।

অভয় বলিল—খাদ্য ও অবকাশ প্রচুর। কিন্তু বিষয়টা অন্য দৃষ্টিতে দেখো না কেন। সংখ্যাটা দশ না হ'য়ে তিন চার হ'লে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি খাটাবার স্থান থাকতো কোথায়? দশ বলেই তো প্রচুর সুযোগ। ওকে তিনে নামিয়ে আনতে হবে।

তাহাদের দেহমন, আর্থিক অবস্থা, ও দেশের ক্রম-বর্ধমান জন সংখ্যার চাপ যে তিনটির অধিক পুত্রকন্যার ভার বহনে অক্ষম এই অতিসহজ বৈজ্ঞানিক সত্যটা বিবাহের পূর্বেই তাহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

তিন।

একজন পিতার স্থান লইবে, একজন মাতার স্থান আর একজন বিসর্জন, অঙ্গহানি, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি তো আছে।

সিদ্ধান্ত শুনিয়া এক বন্ধু শুধাইয়াছিল, ধরো, তিনটিই যদি কন্যা বা পুত্র হয়, তবে পিতা মাতার স্থান অধিকার কিরূপে সম্ভব!

প্রশ্ন শুনিয়া অভয় একবার মাস্টারী ধরণে হাসিল, তার পরে বলিল, আজকাল স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ কোথায়? লিঙ্গভেদ একটা বুর্জোয়া সংস্কার।

বন্ধুটি মনে মনে বলিল তোমাদের দেখিয়া তাই মনে হয় বটে!

অতএব দশ তিনে নামিবে। কিন্তু ফ্যামিলি প্ল্যানিং বলিতে কেবল তো নিজের পুত্রকন্যার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বোঝায় না, সংসারে অপরের যে সব পুত্রকন্যা পিসিমাসি

ভাই ভাইপো গ্রামসম্পর্করূপে বিরাজ করে তাহাদেরও নিমন্ত্রণ আবশ্যক।

কিন্তু কাজটা তত সহজ নয়। নিজের অজাত পুত্রকন্যা শাসন অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু অন্যের একে তো অপরের সন্তান তাহাতে বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান জীব। অপরের সংসারে থাকিতে থাকিতে শাসন এড়াইবার বিদ্যায় তাহারা পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। তবু চেষ্টা করিতে হইবে, বিজ্ঞানের পথ তো সুগম নয়।

অভয়ের সংসারে এমন কয়েকটি অবান্তর জীব ছিল, একা সে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই, এবারে দু'জনের সম্মিলিত চেষ্টায় সাফল্য লাভ হইবে আশায় তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাছাড়া ইহার একটা ব্যবহারিক সার্থকতাও আছে, ঝিকে মারিয়া বউকে শাসন করা হইবে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর সূত্রপাত ফ্যামিলির অবান্তর ভার অপসারণে। যে শাস্ত্র পাঠে এই অত্যাবশ্যক জ্ঞানোদয় হয় সেই শাস্ত্রের জয় জয়কার হোক।

২

বিবাহের পরে অভয়ের চোখ অনেক কিছুঅভাব লক্ষ্য করিল। টেলিফোন নাই, মোটর গাড়ী নাই, রেফ্রিজারেটার নাই, পুরাতন 'সেট' এযুগে অচল, একটি মেহগিনির আলমারী অত্যাবশ্যক ইত্যাদি। এ সব বস্তুর অভাব আগেও ছিল কিন্তু যেহেতু পুরুষে এ সব অভাব স্ত্রীর চোখে আবিষ্কার করিয়া থাকে তাই আগে লক্ষ্য হয় নাই।

রেফ্রিজারেটারের অভাব, একটা কিনিলেই চলে, এ তো সোজা হিসাব। কিন্তু ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ অভ্যস্ত ব্যক্তির হিসাব অন্যরূপ। তাহারা আমদানী ও রপ্তানিতে তাল মিলাইয়া চলে। অতএব অভয়ের সংসারে তাহার যে পিসি আজ কুড়ি বছর আছেন তিনি গ্রামে যাইবার নোটিশ পাইলেন। অভয় তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইল যে সহরের চেয়ে গ্রামের স্বাস্থ্য ভালো, কাজেই তাঁহার গাঁয়ের বাড়ীতে যাওয়া শ্রেয়। বিস্মিত পিসি বলিলেন, সে কি, তোদের অস্বাস্থ্যকর সহরে রেখে আমি স্বাস্থ্যকর গাঁয়ে গিয়ে কোন্ সুখে বেঁচে থাকবো?

কিন্তু পিসির অনুরাগ ও আশংকা আশানুরূপ ফল ফলাইল না। পিসি গ্রামে গেলেন, রেফ্রিজারেটার বাড়ীতে আসিল।

ক্রমে তাহার অবিবাহিতা বোন কমুনিটি প্রোজেক্টে কাজ করিতে গেল, আসিল টেলিফোন।

'সেলফ্ হেলপ' মনুষ্যত্বের চরম প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে অভয়ের ছোট ভাই চাকুরির সন্ধানে উত্তর প্রদেশে প্রেরিত হইল, আসিল মোটর গাড়ী।

পুরাতন চাকর অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে বিধায় বরখাস্ত হইয়া মেহগিনি আলমারির স্থান করিয়া দিল। এইভাবে শনৈঃ শনৈঃ অভয় শমিতার সংসার প্রায়মাফিক গড়িয়া উঠিতে থাকিল।

বছর পাঁচেকের মধ্যেই তাহাদের প্রার্থিত সন্তান সন্ততি সংখ্যা তিনে পৌঁছিল। আর বিস্ময়ের কথা এই যে (তাহারা বিস্মিত হয় নাই) তিনটির মধ্যে সত্য সত্য দুইটি পুত্র, একটি কন্যা। ফ্যামিলি প্ল্যানিং পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছে—তাহারা যখন রিপোর্ট লিখিবে ভাবিতেছে এমন সময়ে এক অভাবিত কাণ্ড (তাহাদের মতে) ঘটিল। শমিতার চতুর্থ সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিল।

তার পরে যাবতীয় প্ল্যানিং বানচাল করিয়া পরবর্তী পনেরো বছরের মধ্যে আরো ছয়টি সন্তান জন্মিয়া তাহাদের সাকুল্য সন্তান সংখ্যা দশে পৌঁছিল। তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণ কর্তৃক লব্ধ সেই দশ।

অভয় ও শমিতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, ভাবিল, তবে কি গণিতে কোথাও ভুল হইয়া গিয়াছে!

কিন্তু সত্যই ভুল হয় নাই। হিসাবের অতিরিক্ত এক একটি সন্তান আসিয়াছে আর এক একটি সাহেব আসবাব-পত্র বাড়ী হইতে বিদায় লইয়াছে। রেফ্রিজেরেটার, টেলিফোন, মোটর গাড়ী, মেহগিনির আলমারি, বৈদ্যুতিক চুল্লি, ঘর ঠাণ্ডা রাখিবার যন্ত্র কত নাম করিব।

পিসি ভাইবোন পুরাতন চাকর প্রভৃতির শূন্যতা যে সব বস্তুতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, হিসাবের অতিরিক্ত এক একটি সন্তান তাহাদের পুনরায় বাড়ীর বাহিরে ঠেলিয়া দিল। হরণে পূরণে সংখ্যা সমান রহিয়া গেল। অভয় ও শমিতা যাহাই মনে করুক, খুচরা হিসাব একটু এদিক ওদিক হইলেও গ্র্যাণ্ড টোটাল ঠিক থাকিয়া গিয়া ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর নির্ভুলতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

সাধারণ মানুষের ভূমিকা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অল্প দিন হল একটি সাধারণ লোকের মৃত্যু হয়েছে। এমন ত কত মানুষই রোজ দেনা পাওনা শেষ করে বিদায় নিচ্ছেন। কে আর কার খবর রাখে? কিন্তু এই ভদ্র লোকটি সাধারণ হয়েও অসাধারণ, তাই তাঁকে নিয়ে সংবাদ-পত্রে অল্প একটু হৈচৈ হয়েছে। সকলের অজ্ঞাত অথচ সর্বত্র পরিচিত এমন মানুষ এযুগে আর কেউ ছিলেন না।

প্লেয়ার্স প্লীজ সিগারেটের বাক্সে নাবিকের পোষাক ও টুপি পরা, অল্প গোঁপদাড়িওয়ালা একটি লোকের ছবি আমাকরি সবাই দেখেছেন। এই লোকটির কথাই বলছি। এখন থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে সিগারেট কোম্পানী বিজ্ঞাপন দেন—কোন সুদর্শন চেহারার ছবি যদি তাঁদের ছবির মডেল হতে রাজী হন, তাহলে তাঁকে তাঁরা কুড়ি পাউণ্ড দক্ষিণা দেবেন। নাবিকের কাজে জীবিকার্জন নিরত যে যুবকটি এই ব্যাপারে প্রার্থী হয়ে আসেন, আর বিচারকদের মতে যোগ্যতম বলে বিবেচিত হন, চুয়াত্তর বছর বয়সে সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অর্ধশতাব্দী কাল পৃথিবীর সমস্ত দেশেই জনপ্রিয় সিগারেটের বাক্স মাধ্যমে তিনি মানুষের পকেটে পকেটে ঘুরেছেন। দুনিয়ার বিখ্যাত যোদ্ধা, জন নেতা ও পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশী পরিচিত তাঁর চেহারা। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, কে না দেখেছেন তাঁর উজ্জ্বল সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানি? কিন্তু তিনি যে সত্যিকার মানুষ এবং এত দিন আর পাঁচজনের মতোই তিনিও যে বেঁচেছিলেন, এ কে কবে জেনেছেন বা ভেবেছেন? নিরুপাধিক একটি ভাব-মূর্তি হিসাবে তিনি অপরিচয়ের মধ্যেই চির পরিচয়ের আসন লাভ করেছেন।

ভাবতে সত্যি অবাক লাগে। কিন্তু শিল্পের জগতে ত এই রকমই হয়। লিওনার্দো চিরস্মরণীয় করে গেছেন মোনালিসাকে। ব্রাঙ্কে অমর মহিমায় অভিষিক্ত করেছেন বালিকা বেয়াত্রিচেকে। সেক্সপীয়ার তাঁর সনেটে জয়গান করেছেন কোন ডার্ক লেডীর। গ্রেটখেন গৌরবের বরমালা পেয়েছেন গ্যয়টের ফাউষ্টে। বিশ্বের জ্ঞানী গুণী ও শিল্প-রসিকরা কে না চেনেন তাঁদের? কিন্তু তাঁরা কারা, কি তাঁদের আসল পরিচয়, তা জানেন কজন লোক? প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের আত্মগবেষণায় উদ্ঘাটিত হয়েছে অবশ্য তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের ইতিবৃত্ত। কিন্তু সে পরিচয়কে অতিক্রম করে তাঁদের ভাবরূপই মানুষের মনে চিরকালের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

জয়দেবের পদ্মাবতী, বিদ্যাপতির লছিমা এবং চণ্ডীদাসের রামীর নাগালই পায়নি ইতিহাসকারের সন্ধানী আলো। তাই কল্পকথার গালগল্পেই গরীয়সী হয়ে রয়েছেন তাঁরা পাঠকের কল্পনায়। ঠিক এই ভাবেই রয়েছেন ওয়ার্ডস ওয়ার্থের লুসী এবং কীটসের ফ্যানী—রয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি। এঁরা যে বাস্তবের মানুষ ছিলেন, সুখে দুঃখে আর সকলের মতো জীবনের বোঝা বয়ে গেছেন, তা জানা আছে কজনের? আর না জানলেই বা যায় আসে কতটুকু? শিল্পরসের আস্বাদনে তা কি কোনদিন বিন্দুমাত্র অসুবিধা সৃষ্টি করতে পেরেছে বা পারে? অর্থাৎ শিল্প জন্মায় বাস্তবের মাটি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেই। কিন্তু সৃষ্টি হয়ে যাবার পর তা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ রসবস্তু। তখন তার বিচার তার নিজস্ব পুঁজি ধরে। যে সব কাঠ খড় ও মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি হয়, তৈরি হয়ে গেলে তারা যায় সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে—তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও থাকে না, তাই থাকেনা তাদের ইতিহাসও। ইতিহাসের যেখানে সমাপ্তি, রসের সুরু সেখান থেকে। মানুষের নির্জ্ঞান মন এটা জানে, তাই তার কিছুমাত্র মাথা ব্যথা নেই বস্তু পরিচয় নিয়ে!

কিন্তু সব মানুষইত রসের ব্যাপারী নন পৃথিবীতে। বস্তুসন্ধানী মানুষও আছেন অনেক। তাঁরাই খুঁজে বের

করতে বেরিয়ে পড়েন, মাইকেলের প্রমীলা আদলে অশ্বারূঢ়া ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের কাব্যরূপ কিনা? কুন্দনন্দিনী ষোল আনাই কল্পনা, না তার পিছনে ছায়াপাত করেছেন কোন বাস্তবী নারী? নষ্টনীড়ের পিছনে কোন সত্যের কাঠামো আছে কিনা? গোবিন্দ গাঙ্গুলীর গলা দিয়ে কোন সত্যকার মানুষই কথা কইছেন কিনা? অনেক অসাধ্য সাধন করেন এই সব প্রত্নবিদ্যাপরায়ণরা—পাদটীকা ও উদ্ধৃতিকণ্টকিত মোটা মোটা বই লেখেন, অনেক পুরানো প্রত্যয়ের ইমারত ধ্বসিয়ে দেন, অনেক নূতন তথ্য গবেষণার শাণিত ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে বের করে আনেন!

তারিপ করি আমি এঁদের অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসাকে। কিন্তু একথা না ভেবে পারি না যে তুতেন খামন বা তোতমেসের নাম না জানলেও, কিছু ক্ষতি হত না পিরামিডের। মমতাজ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাতা হলেও, তাজমহল ওস্তাদ ঈশার শিল্পকৃতিত্বের স্বাক্ষর চিরদিন এই ভাবেই বহন করত। অজন্তার ঐ সব আয়তনয়না রূপসীরা, অনবদ্যাঙ্গ পুরুষরা ত বাস্তবেরই প্রতিরূপ—কিন্তু কে জানি আমরা তাদের পরিচয়? সাধারণ মানুষ, অখ্যাত মানুষ, দূরের অচেনা মানুষ, দুর্গম দুরাশার মানুষ অলক্ষ্যে থেকে জোগায় শিল্পের প্রেরণা—নিজের অস্তিত্ব নিঃশেষে লোপ করে দিয়ে ফুটে ওঠে ফুলের মতো। রসের রাজ্যে এই তার বরাবরের ভূমিকা। হঠাৎ কখনো মিলে যেতে পারে তার আসল পরিচয়ের আদিসূত্রটি, যেমন গেল প্লেয়ার্স প্লীজের এই নাবিক মডেলের। কিন্তু সেটা নিতান্তই উপরি পাওনা!

জীবে দয়া

শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবশাস্ত্র গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

"জীবে দয়া, নামে রুচি, ভক্তি ভগবানে—"

এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "জীবে দয়া! ছিঃ ছিঃ দয়া নয়, সেবা, সেবা।" ঠাকুরের এই কথা জ্যোতিস্মুলিঙ্গের মত স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল, নূতন ভারতে এক নূতন কর্মবাদের সূচনা হইল, বিবেকানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ সংঘ নরনারায়ণসেবারূপ ধর্মসাধনায় ব্রত হইল।

দয়া করি তাহাকে, যাহাকে আমার চেয়ে ছোট বলিয়া জানি, তাই সাধারণতঃ দয়া করার মধ্যে অহংকার বর্তমান থাকে। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন দয়া নয়, সেবা। যাহাকে বড় বলিয়া জানি, দেবতা বলিয়া মানি তাহাকে সেবা করি, তাই সেবার মনোবৃত্তি হইতেছে বিনীত হইয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পরোপকারে ব্রত হওয়া। অবশ্য যেখানে "জীবে দয়ার' কথা বলা হইয়াছে সেখানেও বাস্তবিকপক্ষে দয়া অর্থে করুণা, অহংকার ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অপরকে ভালবাসা। তবে সাধারণতঃ দয়ার মধ্যে অহংকার মিশ্রিত থাকে—ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই বিপদের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রবাক্য অস্বীকার করেন নাই।

সকলেই আমরা সুখ চাই ও দুঃখকে এড়াই, তবুও বহু জীবনে দুঃখ, ক্লেশ, রোগ ও দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পরের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার অপরের সেবা করিবার দায় আমাদের কেন? ভোগবাদী বেন্থাম্ বলেন আমাদের স্বার্থবুদ্ধিই আমাদের অন্যের দুঃখ দূর করিতে প্রবৃত্ত করে। ধর্ম,রাষ্ট্র, সমাজ সকলই আমাদিগকে বাধ্য করে অন্যের সুখও অন্বেষণ করিতে, অন্যের সেবা করিতে কাজেই বাহিরের শাসন তাড়নের ভয়ে আমরা পরোপকারে প্রবৃত্ত হই। পরোপকারের এই বাহ্য তাড়নাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বলিয়াছেন External sanctions of morality. মিলও ভোগবাদী, তবে আদর্শবাদের প্রতিও তাঁহার প্রবণতা আছে। তিনি বলিলেন বাহ্য তাড়ন শাসন ছাড়াও আমাদের অন্তরের তাড়নাও আছে। নিজে যখন সুখভোগে রত আছি, তখন আশে পাশে অন্যের দুঃখ শোক আমাদের সুখ ও আরামকে রূঢ়ভাবে আঘাত করে, তাই নিজের সুখের জন্য অপরের দুঃখ দূর করিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি। এই অন্তরের তাড়নাকে তাই তিনি বলিলেন Interual sanction of morality. বাহ্য ও অন্তর এই দুই প্রকার তাড়নাই মূলতঃ স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত। ইহা ভোগবাদীরা অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন স্বার্থবুদ্ধিশূন্য কর্মপ্রেরণা অসম্ভব, কিন্তু সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি নিজ উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে এবং সমাজের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না দিলে ব্যক্তির স্বার্থও বাস্তবপক্ষে শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় না। তাই বুদ্ধি-মার্জিত স্বার্থবুদ্ধি Enlightened self-interest-ই পরোপকারের মূল উৎস।

মিল বেন্থামের দেশ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলিবে, সাম্রাজ্য বিস্তারে ও শিল্প বিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় ও ধনিকসম্প্রদায় অভূতপূর্ব বিত্ত ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলেন। কিন্তু নিঃবিত্ত ও দরিদ্র শ্রমিক সম্প্রদায় অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, কুসংস্কার, ও কুশ্রীতায় নিমজ্জিত হইয়া সমাজের পক্ষে বিষম বোঝা ও বিপদস্বরূপ হইয়া রহিল, দেশে নূতন শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু কলকারখানা স্থাপিত হইল। কিন্তু দেখা গেল দরিদ্রের রুগ্ন ও বুদ্ধিহীন সন্তানেরা শ্রমিক হিসাবে নিতান্তই নিকৃষ্ট। তাই উৎকৃষ্ট শ্রমিকের প্রয়োজন, নিতান্তই নিজ স্বার্থে, ধনিকসম্প্রদায়

শ্রমিকদের বাসস্থানের উন্নতির দিকে মন দিলেন, বিভিন্ন ফ্যাক্টরী আইন প্রণয়ন করিলেন, দরিদ্রের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, তাহাদের চিকিৎসারও ব্যবস্থা করিলেন। একদিনে ইহা হয় নাই, কিন্তু যখনই দরিদ্রের অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা হইয়াছে তখনই অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, তাহার পিছনে স্বার্থের তাগিদ ছিল, যেমন ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। বুয়র যুদ্ধে যখন ইংলণ্ডে বহু সৈন্যের প্রয়োজন হইয়াছিল তখন দেখা গেল যাহারা সৈন্য হইতে আসিয়াছে, বাল্যকালে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং অস্বাস্থ্যকর গৃহে লালিত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে অনেকেই সৈনিক হইবার অনুপযুক্ত, অধিকাংশের বুদ্ধিবৃদ্ধি নিতান্ত অপরিণত। নির্বোধ সৈনিক বর্তমান যুগের যান্ত্রিক যুদ্ধের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। তাই ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায় বিদ্যালয়ে শিশুকাল হইতে যাহাতে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হয়, তাহারা পুষ্টিকর খাদ্য পায়, যাহাতে তাহাদের বুদ্ধি বিকশিত হয় ক্রমে ক্রমে সে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ও করিতেছেন। তাঁহারা নিশ্চিত জানিয়াছেন :

"তুমি যারে নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

বর্তমানে সমস্ত কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Welfare State)-এর পশ্চাতে এই অজিত স্বার্থবুদ্ধি কাজ করিতেছে।

কিন্তু ইহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়, সেবাধর্মের সজীব প্রেরণার উৎসও ইহা নয়, সর্বদেশে সর্বকালে এমন সব মানব প্রেমিক মানুষ জন্মিয়াছেন যাঁহারা স্বার্থবুদ্ধিমুক্ত হইয়াই মানুষের সেবায় রত হইয়াছেন, তাঁহারা একথা বলেন নাই, মানুষের ইহকালে সুখ লাভের হইবে, পরকালে স্বর্গলাভ হইবে তাই মানুষের সেবা করিতে হইবে। তাঁহারা জানিয়াছেন সমস্ত মানুষ ভগবানের সন্তান, সমস্ত মানুষ ভাই, পরমাত্মীয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। তাই অন্তরের ভালবাসা হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে তাঁহারা মানুষের সেবা করিয়া গিয়াছেন, দুর্গতের ক্লেশের, দুঃখীর বেদনার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান (Mission) বা সাধুব্যক্তিরা এমনই মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিভিন্ন দেশে সেবার ভার স্বেচ্ছায় নিয়াছেন।

ভারতবর্ষ ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর আদর্শ কল্পনা করিয়াছে। ভারতবর্ষ বলিয়াছে, সমস্ত মানুষই শুধু ভাই নয়,—সমস্ত জীবও তোমার পরমাত্মীয়, তাই গো-সেবা, বৃক্ষ সেবাও ভারতের ধর্মের অঙ্গ। নির্বোধ বিদেশীরেরা এজন্য আমাদের বহু উপহাস করে, বলে, "হিন্দুরা পাথর পূজা করে, গাছ পূজা করে, সাপ পূজা করে, তাহারা নিতান্তই অসভ্য!" কিন্তু এই পূজার মর্মকথাটি যদি তাহারা অনুধাবন করিতে পারিত, যদি জানিত হিন্দু গাছ পাথরকে পূজে না, সে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের সত্তা অনুভব করিতে চায়; সমস্ত জীব ও জগতের মধ্যে পরমাত্মাকে আবিষ্কার করিয়া নিজেকে জানিতে ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সৎ চিৎ আনন্দময়ের সত্তায় বিলীন করিয়াই আত্মোপলব্ধির শ্রেষ্ঠ আদর্শে পৌঁছিতে চায়, তাহা হইলে হয়তো তাহাদের উপহাস শ্রদ্ধা ও বিনয়ে পরিবর্তিত হইত।

কিন্তু আমাদের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া আত্মসন্তুষ্টি বৃথা, আমাদের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শ ও আমাদের নিকৃষ্ট অলস স্বার্থান্ধ ও সংকীর্ণ জীবনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান, তাই স্বামী বিবেকানন্দ একটি সহজবোধগম্য আশু কার্যকরী অথচ সজীব সমাজসংস্কারের আদর্শ হিসাবে নরনারায়ণের সেবার প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং নিজ ও অনুগামীদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন।

ভোগবাদী ও বস্তুবাদী বলিয়া পাশ্চাত্য দেশগুলিকে আমরা গালি দিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু দেশ হইতে বহুদূরে আত্মীয় বান্ধব হইতে বিচ্যুত হইয়া সভ্য সমাজের অত্যন্ত সমস্ত আরাম ও সুখ ত্যাগ করিয়া, কুষ্ঠী পূতিগন্ধ ভয়ঙ্কর গলিত কুষ্ঠের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার উদাহরণ সেই পশ্চিম দেশেই মিলিবে। সেই সমস্ত উদাহরণ আমরা যদি অনুধাবন করিতে পারি, তবেই আমাদের—আধ্যাত্মিকতার প্রমাণ আমরা দিতে পারিব। তাহা ছাড়া পশ্চিমের কাছেই আমাদের এ শিক্ষার প্রয়োজন আছে, যে সেবা কর্মের জন্য ও শিক্ষা ও সুশৃংখলার (Training and Organisation) প্রয়োজন আছে। শুধু ভাবালুতা ও অস্পষ্ট আদর্শবাদই যথেষ্ট নয়।

আমাদের পথ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা থেকে আগামী পাঁচ বছরে ভারতের উন্নয়নমূলক কাজ ও ব্যয়ভার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হবার বহু আগেই ব্যয়ভার সংক্রান্ত আনুমানিক হিসাব জনসাধারণের অনেকটা জানা ছিল। সরকারী হিস্তায় (Public Sector) ৪৮০০ কোটি টাকা আগামী পাঁচবছরে ব্যয় হবে, এ ছাড়া ব্যক্তিগত হিস্তায় (Private Sector) আনুমানিক ব্যয় ধরা হ'য়েছে ২৪০০ কোটি টাকা। সমগ্রভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ এভাবে দাঁড়াচ্ছে ৭২০০ কোটি টাকা। এ হিসাবে প্রতিরক্ষা ব্যয় ধরা হয়নি—কারণ প্রতিরক্ষা-ব্যয় উন্নয়নব্যয় নয়, কিন্তু দেশের নিরাপত্তার জন্যে প্রতিরক্ষা-ব্যয় এবং প্রতিরক্ষাখাতে বিনিয়োগ (investment) করতেই হবে।

বেসরকারী হিস্তার ব্যয়ভারের হিসাব ছেড়ে দিয়ে সরকারী হিস্তায় ব্যয়ভারের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় নিম্নোক্তভাবে এর অর্থসংকুলানের চেষ্টা করা হবে :—

(কোটিটাকার হিসাব)

(১) বার্ষিক রাজস্বের উদ্বৃত্ত—	৮০০
(ক) চলতি (৫৫—৫৬) করহারে—৩৫০	
(খ) বাড়তি কর— ৪৫০	
(২) জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ ইত্যাদি—	১২০০
(ক) ঋণ— ৭০০	
(খ) স্বল্প সঞ্চয়— ৫০০	
(৩) বাজেটের অন্যান্য উৎস—	৪০০
(ক) রেলওয়ে খাতে— ১৫০	
(খ) প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি— ২৫০	
(৪) বিদেশী সাহায্য—	৮০০
(৫) ঘাটতি ব্যয়—	১২০০
(৬) ঘাটতি (দেশের অভ্যন্তর থেকে তুলতে হবে)—	৩০০
মোট—	৪৮০০

উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে একমাত্র চলতি রাজস্বখাতে ৩৫০ কোটি টাকা ছাড়া বাকী সমস্ত টাকাই নূতন করে আদায় করতে হবে। বৈদেশিক সাহায্য সম্বন্ধে কোন সরকারই নিশ্চিতরূপে ধরে নিতে পারেনা যে এটাকা পাওয়া যাবেই—আমাদের হিসাবে এর পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকা। ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ও অসুবিধাজনক। জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ ও স্বল্প সঞ্চয় রূপে ১২০০ কোটি টাকা তোলা, ৪৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আদায় করা—এর কোনটিই খুব সোজা কাজ নয়। এ সমস্তের পরও ৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহের পথের নির্দেশ এখন পর্যন্ত দেওয়া যায়নি।

এই তো গেল অর্থসংগ্রহের দিক—এছাড়া রয়েছে উন্নয়ন কাজে ব্যয়, বিশেষ করে ঘাটতি-ব্যয় সংক্রান্ত সতর্কতার দিক। মুদ্রাস্ফীতিরোধের জন্যে এ সতর্কতা প্রয়োজন, কারণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিষপত্র ও শ্রমের মূল্য বেড়ে যায় এবং উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ও বেড়ে যাবে। ফলতঃ সমগ্র উন্নয়নকাজই বাধা পাবে। বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের দিক থেকেও মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম ভয়াবহ—কারণ যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্যে বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজন আর এ মুদ্রা সংগ্রহের জন্যে চাই বেশী পরিমাণে রপ্তানী ও যতটা সম্ভব কম আমদানী। অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে এদেশে জিনিষের দর বেড়ে গেলে রপ্তানী কমবে ও আমদানী বাড়বে। পরিকল্পনা কমিশনও এসব অসুবিধার কথা ভেবেছে এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করবার জন্যে কতগুলি উপায় নির্দেশ করেছে। এ সমস্ত আলোচনা করে বলা যায় পরিকল্পনার সার্থকতার জন্য চাই সমগ্র জাতির সহযোগিতা ও সমবেত প্রচেষ্টা ; শুধু পরিকল্পনা কমিশন বা সরকারের উপর এ দায়িত্ব দিলে চলবেনা।

কেহ কেহ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে উচ্চাশাব্যাঞ্জক বলেছে

হে মহামানব, জন্মদিনে লহ প্রণতি

এবং তাদের মতে পরিকল্পনা ব্যয় আরও কমানো উচিত। বিশ্বব্যাংকের প্রারম্ভিক রিপোর্টের উপর নির্ভর করে তাদের এই মতে তারা আরো জোর দিচ্ছে। কিন্তু সমস্ত রাজ্যসরকার ও মন্ত্রণাবিভাগের দাবীর তুলনায় ৪৮০০ কোটি টাকা খুবই কম। বিভিন্ন রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জনতার প্রয়োজন হিসাব করেই টাকার দাবী করেছিল। এরা নিজেদের প্রয়োজনের হিসাব দিয়ে যে পরিমাণ অর্থ দাবী করেছে তা একত্র করলে হয়ত মোট টাকার পরিমাণ এর দ্বিগুণ হত। কমিশনের পক্ষে সে সব দাবী মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি; সে জন্য কমিশন উন্নয়ন কাজের প্রাধান্য (Priority) অনুযায়ী সাধ্যমত অর্থবরাদ্দ করেছে। এর থেকে বোঝা যায় প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের পরিকল্পনা অনেক খাটো, অপরপক্ষে সামর্থ্যের তুলনায় অনেক উঁচু। প্রত্যেকটি অনুন্নত দেশকেই এরূপ অবস্থার মধ্য দিয়ে উন্নয়নকাজ চালিয়ে নিতে হয়। পরিকল্পনার অর্থই হ'ল স্বাভাবিক গতিতে যতটা উন্নয়ন হতে পারত তার চেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে উন্নয়নের ব্যবস্থা ও সংকল্প গ্রহণ করা। সেই জন্যই স্বাভাবিক আর্থিক ও অন্যান্য সঙ্গতিকে বাড়িয়ে নিতে হয়—জাতির সংগতি অনুযায়ী উন্নয়ন কাজের ব্যবস্থা করলে পরিকল্পনামূলক উন্নয়ন কাজ হ'তে পারেনা।

সমাজজীবনের উন্নয়ন প্রয়াসী এরূপ পরিকল্পনার সার্থকতার জন্যে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমবেত কষ্ট স্বীকার প্রয়োজন। দেশে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের (resources) অভাব, এর মধ্যেই জাতির উন্নয়ন কাজে অগ্রসর হ'তে হবে। এর জন্যে জাতীয় ত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠা প্রয়োজন। পরিকল্পনার অপরিহার্য আর্থিক জোগানের জন্যে বাড়তি কর ও সঞ্চয় প্রয়োজন এবং এর জোগান দেবার জন্যে জনসাধারণকে কিছুটা দারিদ্র গ্রহণ করতে হবে। জনগণ সঞ্চয়ী না হলে মূলধন বৃদ্ধি (Capital formation) হতে পারেনা। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় ২৫% বাড়বে ধরা হ'য়েছে, প্রথম পরিকল্পনাকালে ইহা ৯১১০ কোটি টাকা হ'য়েছে। এর উপর ২৫% বাড়লে আশা করা যায় ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হবে ১৩৪৮০ কোটি টাকা। এ বাড়তি আয়ের সবটাই ভোগব্যয় বাবত খরচ করা হবেনা ধরে নিয়ে কমিশন মনে করে আগামী পাঁচবছরে জাতীয় আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা হবে এবং একটা নির্দিষ্ট সীমার উপর ভোগব্যয় হবে না। কিন্তু ক্রয়ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যয় বেড়ে যেতে পারে—বাড়তি আয়ের সবটুকু ভোগব্যয় হ'লে মূলধন গঠনের সহায়তা হবেনা। তাই কিছুটা বাড়তি আয় সঞ্চয় করতেই হবে—কোন অবস্থাতেই বাড়তি আয় আর ভোগব্যয় সমান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ৩৫% আয়বৃদ্ধির সঙ্গে অন্ততঃ ৪।৫% সঞ্চিত হওয়া একান্ত দরকার। ১৯৫০—৫১ সালে জাতীয় আয়ের মাত্র ৫% সঞ্চিত হয়; প্রথম পরিকল্পনার পর ইহা দাঁড়িয়েছে ৭·৩% আর দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এর পরিমাণ ধরা হ'য়েছে ১০%। এর চেয়েও কিছু বেশী সঞ্চয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুন্নত দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্যে সঞ্চয় হার বৃদ্ধি খুবই দরকার; কারণ এরূপ হার বেশী হলে বাড়তি সঞ্চয় বিনিয়োগ করা সহজ হয়। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় ভারতে সঞ্চয়হার অত্যন্ত কম। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে এর হার ১০% থেকে ২০% আর আমেরিকা ক্যানাডা প্রভৃতি উন্নত দেশেও ১৫% থেকে ১৮%। ভারতে সঞ্চয়হার বাড়াতে না পারলে উন্নয়নমূলক উৎপাদনকার্য তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা যাবেনা। তাই জাতীয় আয়ের একটা বিশেষ অংশ প্রতি বছরই সঞ্চিত রাখতে হবে।

এখানে স্বল্পসঞ্চয় পরিকল্পনার কথা বলা যেতে পারে। আগামী পাঁচ বছরে এর পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রতিবছর ১০০ কোটি টাকা। এ পরিকল্পনায় স্বল্পবিত্ত জনতাও অর্থসঞ্চয় করতে পারবে এবং এর উদ্দেশ্যই তাই। এতে দেয় সুদের হারও সঞ্চয়কারীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। মূলধন গঠনের জন্যে সরকার কর্তৃক ভোগব্যয়ের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করবার প্রয়োজন কোন কোন দেশে আছে; এতে ভোগব্যয় কমানোর জন্যে সাধারণকে বাধ্য করা হয়। রুষিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে পরিকল্পনার প্রথমদিকে বাধ্যতামূলক ভাবে ভোগব্যয় কমানো হ'য়েছে। রুষিয়ায় তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার সময় পর্যন্ত জনসাধারণের ভোগব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে কম

রাখা হ'য়েছে—এমনকি এখন পর্যন্ত ভোগ্যবস্তুর (Consumption goods) চেয়ে মহাপাতি (heavy industries) উৎপাদনের প্রতি বেশী নজর দেওয়া হয়। দেশের আয় যথেষ্ট বেড়েছে কিন্তু ভোগব্যয় বেড়েছে তার চেয়ে যথেষ্ট কম। কাজেই বিনিয়োগ যোগ্য (investible) মূলধন গঠনের সহায়তা হয়েছে প্রচুর। এমন কি ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য থেকে বিদেশীমুদ্রা উপার্জনের উদ্দেশ্যে দেশের জনসাধারণের ভোগের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে—জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার কিছু করতে চায় না। তাই এপথে সঞ্চয় বাড়ানো চলেনা।

পরিকল্পনা ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে বাধাতামূলকভাবে ব্যয় হ্রাসের পক্ষে এদেশীয় বহুলোক যুক্তি দেখিয়েছে; কিন্তু গণতন্ত্রী সরকার তেমন পথ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। সঞ্চয় বাড়ানোর জন্যে জনসাধারণের সহযোগিতাই একমাত্র পথ হিসাবে ধরা হয়েছে, গত ক'বছরে ভোগব্যয় বেড়েছে কিন্তু সরকার থেকে কোনরূপ বাধা দেওয়া হয়নি। দেশের জনগণই যথাসাধ্য সঞ্চয় করে এবং নিতান্ত অপরিহার্য নয় এমন ব্যয় কমিয়ে ভবিষ্যৎ সুখের জন্য সঞ্চয় পরিকল্পনায় অর্থবিনিয়োগ করবে আশা করা যায়।

করক্ষেত্রেও দেখা যায় জাতীয় আয়ের তুলনায় এর হার ভারতে ৮%, সিংহল, ব্রাজিল, মিশর প্রভৃতি অনুন্নত দেশেও এর হার অনেক বেশী। ১৯৪৯ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় সিংহলে জাতীয় আয়ের ২১%, মিশরে ১৬% সরকারী রাজস্বরূপে পাওয়া যায় আর ভারতে এর পরিমাণ ছিল ৭%। করতদন্তকমিশনের মতেও ভারতে কর ধার্যের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং কমিশন বিভিন্ন কর ধার্যের সুপারিশ করেছে। বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ক্যালডর মনে করেন বছরে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা নূতন কর ধার্য করে পাবার মত সুযোগ ভারতে রয়েছে। এসমস্ত রিপোর্ট সত্ত্বেও সরকার জনসাধারণের সুবিধার কথা ভেবে করভার বেশী বাড়ায়নি, বরং বিক্রয়কর ধার্যব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির উপর যথাসম্ভব কম কর ধার্য করবার জন্যে রাজ্যসরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়াছে।

এ অবস্থায় আমাদের দু'টি পথ আছে—হয় চির দারিদ্র্য বরণ করে নেওয়া, নয় সাময়িক কষ্ট সহ্য করেও পরিকল্পনা সার্থক করবার সবরকম চেষ্টা করে জাতীয় উন্নয়ন করা। আপাত সুখের চেয়ে স্থায়ী সুখই মানুষের বেশী কাম্য। দেশের অগ্রগতি দ্রুত ও অধিকতর হারে করতে হলে এবং জনতার স্থায়ী মঙ্গলসাধন করতে হলে আপাততঃ কিছু ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া বর্তমান অবস্থায় আর কোন পথ নাই। আমাদের করব্যবস্থায় (taxation policy) দিন দিনই ধনীর উপর বেশী করভার পড়ছে; কিন্তু শতকরা নব্বইজনই যে দেশে গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেখানে মাত্র দশজনের উপর কর ধার্য করে কোন বিরাট আর্থিক নিয়োগ (financial investment) সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সাধারণের কাছ থেকেও তাদের সাধ্যমত কর আদায় করতেই হবে। প্রত্যক্ষ করহার ভারতে অত্যন্ত বেশী। সর্বোচ্চ আয়ের উপর আয়কর, অতিরিক্ত কর (surcharge) ইত্যাদির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ অর্থাৎ প্রতি ১০০৲ টাকা আয়ের উপর ৯২৲ টাকা কর। মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪ লক্ষ লোক আয়কর দেয়। আয়কর-দেয় নিম্নতম পরিমাণ না কমিয়ে আয়করদাতার সংখ্যা শীঘ্র বাড়াবার পথও নাই। কাজেই নূতন কর ধার্য করতে হলে অপ্রত্যক্ষ কর ধার্য না করে উপায় নাই। এরূপ কর ধনী-দরিদ্র সকলের উপরই পড়বে। বিলাসদ্রব্যের উপর করহার বেশী করে ধনীদের দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। জনসাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর করহার যাতে কম হয় সেদিকেও সরকারের দৃষ্টি আছে। সংকুলানের দিক ছাড়া অন্যান্যদিক থেকেও অপ্রত্যক্ষ করের যৌক্তিকতা আছে। দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমদানী কমবে এবং এর জন্য বহিঃশুল্ক (customs duty) কমে যাবে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে উৎসাহ দেবার জন্য এদের অর্থ সাহায্য (subsidy) দেওয়া হয়; মিলজাত দ্রব্যাদির উপর কর ধার্য করে এ অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এতে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের উন্নতি ও আয় বাড়বে।

প্রত্যেক কাজেই সরকারকে বাধা দেবার ঝোঁক কোথাও

কোথাও দেখা যায়—শিক্ষিতদের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন স্বাধীনতার পর সরকার কর বাড়িয়েই চলেছে। এ শ্রেণীর বক্তাগণ একটা দিক ভেবে দেখেননা যে স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রের আকৃতি ও প্রকৃতিতে কতটা পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর ভারতবর্ষ পুলিশ রাষ্ট্র নয়, ভারত এখন জনকল্যাণধর্মী সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র—প্রতিটি মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে রাষ্ট্র আজ ব্রতী। গত ক'বছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাস্তাঘাট ইত্যাদির যে আশাপ্রদ উন্নতি হয়েছে তাতে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে উৎসাহিত হয়ে গ্রামবাসিগণ স্বেচ্ছায় উন্নয়নকাজে সাহায্য করছেন। এরূপ সহায়তা পরিকল্পনা সার্থকতার পক্ষে অপরিহার্য।

গত পাঁচবছর ও বর্তমান বছরের বিনিয়োগের ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে গেছে; ফলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ও দাম কিছুটা বেড়েছে—খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে দাম বেড়েছে সবচেয়ে বেশী। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান খুব নীচু বলে বাড়তি আয়ের সবটুকুই হয়ত এরা ভোগ্য বস্তুতে ব্যয় করছে। গত ক বছরে চিনি, চাউল, গম, ডাল, কাপড় ইত্যাদির মাথাপিছু ভোগ খুবই বেড়েছে। অপরপক্ষে খাদ্যবস্তুর উৎপাদন ১৯৫৬।৫৭ সালের পর কিছু কমেছে—প্রতিবছর ৫০ লক্ষ লোক আমাদের জনসংখ্যার সঙ্গে যোগ হচ্ছে। আরেকটা দিকও ভেবে দেখতে হবে—দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেশে ভারী উদ্যোগের (heavy industries) দিকে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করে দেশের আর্থিক বুনিয়াদ শক্ত করা যায় না। প্রয়োজনীয় ভারী-উদ্যোগ সত্বর যাতে দেশেই স্থাপন করা সম্ভব হয় এটা অনুন্নত দেশের পরিকল্পনায় মুখ্য উদ্দেশ্য। পরের মুখের দিকে চিরদিন চেয়ে থাকা অর্থনৈতিক উন্নতির বিরোধী। যন্ত্রপাতি উৎপাদনের প্রতি বেশী জোর দেওয়ায় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন উন্নয়নব্যয়ের সঙ্গে তাল রেখে আপাততঃ বাড়ছেনা; এখন যে কোটি কোটি টাকা উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হচ্ছে—তার ফলে দ্রব্য উৎপন্ন হতে দু'চার বছর দেরী হচ্ছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় গত পাঁচ সাত বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে; কিন্তু সেচের সুবিধা হয়ত সবেমাত্র কিছুটা পেতে শুরু করছে। অধিক শস্য উৎপাদন ঐ টাকার ফলে এখনও বিশেষ হয়নি। অথচ ঐ টাকার বেশ একটা অংশ সাধারণ শ্রমশীল জনতার হাতে গিয়েছে। এদের হাতে এই যে টাকা যাচ্ছে বা গিয়েছে তা প্রায় সবটাই এরা খাদ্য ও বস্ত্রে খরচ করছে। যেখানে যত উন্নয়ন কাজে টাকা খরচ হচ্ছে তার ফলে সর্বত্রই ভোগ্যবস্তুর অর্থাৎ প্রধানতঃ খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু উৎপাদন সে অনুপাতে এখন পর্যন্ত বাড়েনি; তাতে আরো কিছু সময় লাগবে। এতে এসমস্ত জিনিষের দাম একটু বাড়বেই। অনুন্নত দেশের উন্নয়ন কাজ করতে হলে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। পরিকল্পনা সার্থক হবার পর ভোগ্য বস্তুর উৎপাদনও বাড়বে এবং দেশে প্রস্তুত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এরূপ উৎপাদন দ্রুত হবে। তাই ভবিষ্যৎ সম্পদের আশায় কিছুটা অসুবিধা বরণ করে নিতেই হবে। তা নইলে কোন দিনই দারিদ্র্যের শেষ হবে না। মূল্য বৃদ্ধি রোধ ও মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দূর করবার জন্যে ইতোমধ্যেই খাদ্যবস্তুর রপ্তানী বন্ধ, সরকার কর্তৃক দেশে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় বন্ধ ও বিদেশ থেকে আমদানী বৃদ্ধি করা হয়েছে। কদিন আগেও আমেরিকার সঙ্গে এক চুক্তি হয়েছে—এতে আমেরিকা ভারতকে গম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সাহায্য করবে। এছাড়া দেশময় ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হয়েছে। আশা করা যায় এসব ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বাধা পাবে। সামনের ফসল ভাল হলে হয়ত দাম কিছু কমতেও পারে। সাময়িক কিছুদিন একটু দর বেশী থাকতে পারে। কিন্তু এ সাময়িক অসুবিধার ভয়ে ভীত হলে বিকল্প ব্যবস্থা হ'ল উন্নয়নমূলক ব্যয় কমিয়ে দেওয়া। এমন কি অধ্যাপক শিনয়ের (Prof Shenoy) মত অর্থনীতিবিদও উন্নয়নমূলকব্যয় কমিয়ে দেবার সুপারিশ করছেন। কিন্তু এর ফলে দারিদ্র্য বজায় থাকবে এবং উন্নয়ন কাজ পিছিয়ে পড়বে। দেশের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে এ যুক্তি ও সুপারিশ মেনে নেওয়া যায় না। জাতীয় কল্যাণের জন্য চাই সাময়িক দুঃখবরণের জন্য জাতীয় প্রবৃত্তি। উন্নয়ন ব্যয় কমিয়ে চির দৈন্য বরণ করবার পথ আমাদের নয়; আমাদের পথ স্বার্থত্যাগ করে, সাময়িক কষ্টভোগ করেও পরিকল্পনা সার্থক করা; আমাদের পথ

ভবিষ্যৎ সুখের পথ। আজকের স্বার্থত্যাগের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের আগামী দিনের সুখ ও সমৃদ্ধি।

রুষিয়া ও চীনকেও এ সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। রুষিয়ায় এখনো ভোগ্যবস্তুর অভাব ও দুর্মূল্যতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। একজোড়া জুতো বা একটা জামা কিনতেই শ্রমিকদের মাসিক আয়ের একটা প্রধান অংশ চলে যায়। জামাজুতো রুষিয়ার মত শীতপ্রধানদেশে সখের জিনিষ নয়—অপরিহার্য ব্যবহারের দ্রব্য।

আজ আমাদের সামনে প্রশ্ন হল কোন পথে চলব। এখনকার সাময়িক মূল্যবৃদ্ধিজনিত কষ্টস্বীকার করে উন্নয়ন কাজকে দ্রুত ও ক্ষিপ্র ভাবে চালাব অথবা বর্তমানের এ কষ্টকে এড়াবার জন্যে উন্নয়ন-কাজ বন্ধ করে বা বিশেষ কমিয়ে দারিদ্র্যকেই কায়েম করে রাখব। বিভিন্ন রাজনৈতিকদল বর্তমান অসুবিধার সুযোগ নেবার জন্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ক্ষিপ্ত করে তুলছে। এটা হ'ল রাজনীতির অপকৌশল ও অপপ্রয়োগ। দেশের সাধারণ জনতা যে উন্নয়ন কাজে কতটা আগ্রহশীল তার পরিচয় পাওয়া যায় গ্রামীণ উন্নয়নকাজে তাদের সহযোগিতার পরিমাণ হতে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি

[যাযাবর]

ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের অর্ধেক কৃষিতে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ আসে পাট, তিল, তিসি, বাদাম প্রভৃতি কৃষিপণ্য থেকে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ও চিনির কলগুলি নির্ভর করে তুলা আর আখের উপরে। কৃষিকে যে ভারতে মূল শিল্প—বলা হয় সেটা অহেতুক নয়।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল কৃষিকে। তার যথোচিত কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশের শাসন ভার যখন দেশনেতাদের হাতে এল, দেশের খাদ্য পরিস্থিতি তখন উদ্বেগজনক। যুদ্ধকালীন খাদ্যাভাব—বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যার মারাত্মক পরিণতি—যুদ্ধোত্তরকালেও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ছিল দুশ্চিন্তার কারণ। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর শুল্কব্যয়ভার বহনেই সরকারী অর্থভাণ্ডার বহুলাংশে নিঃশেষিত, উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির এক বৃহদাংশ খরচ হচ্ছিল রেশনব্যবস্থায়। দেশকে খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দিকে মনোযোগ দেওয়াই ছিল তখন আশু কর্তব্য। তা ছাড়া দেশ বিভাগের ফলে পাট, তুলা ইত্যাদি অর্থকারী শস্যের উৎপাদক এলাকাগুলি বেশীর ভাগ পড়েছে পাকিস্থানের ভাগে, ভারতীয় কলকারখানার কাঁচা মালে দেখা দিয়েছে ঘাটতি। সুতরাং পরিকল্পনাকারীদের প্রথম লক্ষ্য হলো দেশের কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

প্রথম পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগ ২৩৬৩ কোটি টাকার মধ্যে ৩৭২ কোটি নির্দিষ্ট ছিল কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায়। সেচ ও বন্যানিরোধক কার্যে নির্দিষ্ট ৩৯৫ টাকা দিয়ে কৃষি খাতে পুরোপুরি বরাদ্দ দাঁড়িয়েছিল ৭৬৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের প্রায় এক তৃতীয়াংশই নির্দিষ্ট ছিল কৃষি-উন্নয়নের জন্য।

উৎপাদন-লক্ষ্য—ইংরেজীতে যাকে বলে টারগেট—হিসাবে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের যে পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট ছিল, তা খুব সামান্য নয়। ১৯৪৯-৫০ সালে দেশে চাউল, গম, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি তণ্ডুলজাতীয় শস্যের উৎপাদন ছিল ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন, ডাল জাতীয় শস্যের পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ টন। একুনে এই পাঁচ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের পরিমাণকে বাড়িয়ে প্রায় ৬ কোটি ১১ লক্ষ টন করার দায়িত্ব ছিল পরিকল্পনায়, অন্যান্য কৃষিপণ্যের বেলায়ও উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ কম ছিলনা।

সুখের বিষয়, পরিকল্পনার এই উচ্চ নির্দিষ্ট পরিমাণ বহুলাংশেই সফল হয়েছে। নীচের তালিকায় বিভিন্ন কৃষিপণ্য সম্পর্কে পরিকল্পনার সাফল্য বা অসম্পূর্ণতার তথ্য পাওয়া যাবে :—

	পরিকল্পনার গোড়ার উৎপাদন ১৯৫০-৫১	পরিকল্পনার লক্ষ্য ১৯৫৫-৫৬	পরিকল্পনার সাফল্য বা অসম্পূর্ণতা ১৯৫৫-৫৬	বৃদ্ধি বা হ্রাস
খাদ্য শস্য	৪ কোটি ৪০ লক্ষ	৬ কোটি ১০ লক্ষ	৬ কোটি ৫০ লক্ষ	+
তুলা	২৯ লক্ষ গাঁট	৪১ লক্ষ গাঁট	৪৩ লক্ষ গাঁট	+
পাট	৩৩ লক্ষ গাঁট	৫৩ লক্ষ গাঁট	৩১ লক্ষ গাঁট	−
আক বা (ইক্ষু)	৫৬ লক্ষ টন (গুড়)	৬৩ লক্ষ টন (গুড়)	৫৪ লক্ষ টন	−
তৈল বীজ	৫১ লক্ষ টন	৫১ লক্ষ টন	৫৮ লক্ষ টন	+

একমাত্র পাট আর আক ছাড়া আর সকল শস্যের উৎপাদনই পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। ইক্ষু উৎপাদনের সর্বশেষ তথ্য থেকে প্রকাশ যে বর্তমান বৎসরে তার পরিমাণও আশাতীতরূপে অধিক। চিনির উৎপাদন এ বছরে প্রায় ১৩ লক্ষ টনের কাছাকাছি। এত চিনি এর আগে ভারতবর্ষে আর কখনও হয়নি।

কৃষিপণ্যের এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিদেশ থেকে খাদ্য আনয়নের প্রয়োজন ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে, বৈদেশিক

মুদ্রার অপচয় নিবারিত হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রায় ৪৭ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী হয় ভারতবর্ষে। ১৯৫৪ সালে আমদানীর পরিমাণ কমে এসে দাঁড়ায় মাত্র ৮ লক্ষ টনে।

প্রথম পরিকল্পনার এই সাফল্য স্বভাবতঃই কর্তৃপক্ষকে উচ্চতর লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনায় তাই তাঁরা বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজন ও পরিমাণ বিচারে সমর্থ হয়েছেন।

প্রথম পরিকল্পনার প্রকালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফিতি, খাদ্যাভাব, দেশবিভাগজনিত বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি একাধিক কারণে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। তাকে সুস্থ ও সবল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য। সে উদ্দেশ্য বহুলাংশ সফল হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে লক্ষ্য তাই অধিকতর ব্যাপক। তার উদ্দেশ্য দেশের ভাবী ও ক্রমিক উন্নয়নের উপযোগী উদ্যোগ। এই পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্য শুধু কোনো বিশেষ শস্যের অধিক উৎপাদ বা ঘাটতি পূরণ নয়। তার লক্ষ্য দেশের জনবল, প্রাকৃতিক সম্পদ ও আর্থিক-সম্বলের এমন একটি সুসংবদ্ধ ব্যবহার যার ফলে কৃষি ও শ্রমশিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা দেশের আধিকশক্তি সুদৃঢ় হয়। অর্থাৎ দেশের কর্ষণযোগ্য জমি ও শ্রমিকের সার্বোত্তম বিনিয়োগেই হচ্ছে দ্বিতীয় প্ল্যানের কৃষি-অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

অবশ্য প্রত্যেক পরিকল্পনারই মূল উদ্দেশ্য জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। একথা সুবিদিত যে বর্তমানে ভারতবর্ষে সর্বসাধারণের পক্ষে জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন—অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সংস্থানও অপ্রচুর। সংখ্যা-তত্ত্ববিদেরা বলেন, ভারতবর্ষে জনপ্রতি খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ প্রতিদিন মাত্র ·৮০০ ক্যালরি যদিও সুস্থ সবল জীবনযাপনের জন্য জনপ্রতি ৩০০০ ক্যালরি আবশ্যক। আমাদের জনপ্রতি বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে প্রায় হ্যানতম এবং দেশে অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই বাসস্থানের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের পরিমাণ ও পন্থা নির্দ্ধারণে কর্তৃপক্ষ এই মূল তথ্যগুলির প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন,—কৃষিপণ্যের উৎপাদন এতখানি বাড়ানো প্রয়োজন যাতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে জনপ্রতি খাদ্যের পরিমাণ অন্ততঃ ২৬০০ ক্যালরিতে দাঁড়ায়। তাছাড়া বর্তমান ভারতীয় খাদ্যে আমিষজাতীয় বস্তু যথা মাছ, দুধ, ঘি, মাখন—যাদের ইংরেজীতে বলে প্রোটীন—ইত্যাদির যে অভাব তারও প্রতিকার আবশ্যক। এই কারণে পরিকল্পনাকারীগণ দ্বিতীয় প্ল্যানে কৃষির সামগ্রিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন বেশী। তাদের পরিকল্পনায় বিস্তার এবং বৈচিত্র্য—এক্সটেনসান ও ডাইভারসিফিকেশন—দুইই যথোচিত প্রাধান্য লাভ করেছে। কৃষিবৃত্তির জন্য চাই খাদ্য শস্য, দেহগঠনের জন্য চাই ডিম, মাছ, দুধ ইত্যাদি প্রোটীন, দেহাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজন তুলা, এবং বাসগৃহের জন্য আবশ্যক কাঠ, বাঁশ ও অন্যান্য বনজসম্পদ। কৃষি দপ্তরের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই বিভিন্ন বিষয়ের লক্ষ্য স্থির হয়েছে :—

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
খাদ্য শস্য	৬৫০ লক্ষ টন	৭৫০ লক্ষ টন
আক (গুড়)	৫৫ " "	৭৩ " "
চিনি	১৮ " "	২৫ " "
তৈলবীজ	৫৮ " "	৭০ " "
তুলা	৪১ লক্ষ গাঁট	৫৫ লক্ষ গাঁট
পাট	৩১ " "	৫০ " "

অর্থাৎ কৃষি উৎপাদনের যে নির্দেশ সংখ্যা—ইনডেক্স—১৯৫৫-৫৬ সালে ১১৫ ছিল তাকে ১৩৫ অবধি বাড়িয়ে তোলাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য।

অপ্রধান কৃষিপণ্য যথা,—নারিকেল, সুপারি, লাক্ষা, কাজু বাদাম প্রভৃতিও যাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য পরিকল্পনায় নির্দেশ আছে। গোল মরিচ ও কাজু বাদাম আমেরিকার বাজারে চালানী শস্যের তালিকায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এবং ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা—বিশেষতঃ ডলার উপার্জনের সহায়ক।

কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে প্রধানতঃ সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা, উন্নত বীজ বপন ও যথেষ্ট সার ব্যবহারের উপর। ১৯৫৫-৫৬ সালে সেচ জমির পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৭০ লক্ষ একর। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে অনুরূপ জমির

পরিমাণ হবে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ একর। বর্ষিত এলাকার এক কোটি ২০ লক্ষ এলাকায় সেচ ব্যবস্থা হবে বৃহৎ নদী উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। বাকীটা ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থায়—যেমন সাধারণ পুকুর, কুয়া, ইত্যাদির দ্বারা। প্রায় ৪০০০ নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা আছে পরিকল্পনায়।

উন্নত বীজ সরবরাহের জন্য প্রত্যেক ব্লকস্তরে এক্সটেনশান সার্ভিস কেন্দ্রে একটি বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের পরিকল্পনা আছে দ্বিতীয় প্ল্যানে। আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৪০০০ অনুরূপ বীজ উৎপাদন কেন্দ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হবে আশা করা যায়। রাসায়নিক সার উৎপাদন—বিশেষতঃ নাইট্রোজেন যুক্ত সার উৎপাদনের নতুন কারখানা স্থাপন পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ। সার প্রয়োগের দ্বারা জমির উর্বরা বৃদ্ধি একর প্রতি অধিকতর উৎপাদনের সহায়ক।

কিন্তু কৃষকের পক্ষে অধিক শস্য উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ প্রেরণা হলো উৎপন্ন শস্যের লাভজনক দাম। অধিক সার প্রয়োগ, অধিক সেচব্যবস্থা ও অধিক উন্নত বীজ ব্যবহার যদি অনুরূপ অধিক মূল্য প্রাপ্তির সহায়ক না হয়, তবে শুধু দেশপ্রেমের নামে কৃষককে অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহিত করা অসম্ভব। সুতরাং কৃষক যাতে তার শস্য বিক্রয়ে সুযোগ-সুবিধা পায় সেজন্য গুদাম ও সুনিয়ন্ত্রিত বাজারের ব্যবস্থা করাও কৃষি পরিকল্পনার লক্ষ্য। বিভিন্ন মরশুমে কৃষিপণ্যের দর যাতে মারাত্মক ভাবে পরিবর্তিত না হয় সে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে ভারতবর্ষে। তাই সমবায় পদ্ধতিতে ওয়ার হাউস গঠনের সুপারিশ আছে দ্বিতীয় প্ল্যানে।

কৃষির বৈচিত্র্য বিধানের ক্ষেত্রে নতুন প্ল্যানের নির্দেশগুলিও বহুপ্রসারী। দৃষ্টান্তরূপে দুধের কথাই ধরা যাক। এদেশে মাথা পিছু দুধ পাওয়া যায় পাঁচ আউন্স। নিউট্রিশন এ্যাডভাইসরী কমিটির মতে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দুধের প্রয়োজন অন্যূন দশ আউন্স। আমেরিকা হল্যান্ড, ডেনমার্ক, অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনে জনপ্রতি দুধের উৎপাদন এর চাইতে অনেক উপরে। যদিও ভারতবর্ষে গো মহিষের সংখ্যা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের চাইতে বেশী, এদেশে দুধের উৎপাদন শোচনীয়রূপে পরিমিত। দুধের পরিমাণ বাড়াতে প্রথমে প্রয়োজন উন্নতশ্রেণীর গো, মহিষ, পশু মড়ক ও ব্যাধি নিবারণ, প্রয়োজনানুযায়ী পশুখাদ্য উৎপাদন। সহরাঞ্চলে যথেষ্ট দুগ্ধ সরবরাহের জন্য চাই সুনিয়ন্ত্রিত গোশালা ও দুগ্ধ বণ্টনের ব্যবস্থা। দ্বিতীয় প্ল্যানে দুধের উৎপাদন ও পশুপালন খাতে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ৬১ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনায় এই অঙ্কটা ছিল মাত্র ২২ কোটি।

ফল-উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অত্যন্ত পশ্চাতে। অথচ প্রকৃতিদেবী তাঁর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে এদেশকে বহুবিধ ফলের অধিকারী করেছেন। গ্রীষ্ম প্রধান ও শীতপ্রধান—দুই দেশেরই ফলসম্ভারের একত্র সমাবেশ আছে ভারতবর্ষে। ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার নানাবিধ সংরক্ষণ ও ব্যবহার শুধু যে দেশের আর্থিক উন্নতির অনুকূল তাই নয়, দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসাধনের দিক দিয়েও উপকারী। প্রথম পরিকল্পনায় এদিকে অর্থ বিনিয়োগের অভাব ছিল। দ্বিতীয় প্ল্যানে ফল চাষের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৯ কোটি।

কৃষির বিভিন্ন দিকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তার একটা তুলনামূলক আভাস পাওয়া যাবে নীচের তথ্যগুলিতে :—

	প্রথম প্ল্যানের বরাদ্দ	দ্বিতীয় প্ল্যানের বরাদ্দ
ফলের চাষ ও সংরক্ষণ	১ কোটি টাকা	৯ কোটি টাকা
দুধ ও পশুপালন	২২ কোটি টাকা	৬১ কোটি টাকা
বন ও ভূমি সংরক্ষণ	১২ কোটি টাকা	৪৮ কোটি টাকা
সমবায়ে	৭ কোটি টাকা	৪৭ কোটি টাকা
মৎস্য চাষ	৫ „ „	১১ „ „

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিখাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। তা ছাড়া সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও গ্রামসেবক এক্সটেনশান সার্ভিসের জন্য নির্ধারিত হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। বৃহৎ ও মাঝারী সেচ পরিকল্পনা গুলিতে ব্যয় হবে ৩৫৮ কোটি টাকা। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির জন্য নানা দিক দিয়ে ব্যয় হবে ৯০০ কোটি টাকার উপরে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি বিভাগের উদ্যোগ আয়োজনের

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয় ভারতীয় পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনে। কিন্তু তার অব্যবহিত পূর্বে জাতীয় উন্নয়ন সংসদের—ন্যাশনাল ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিলের অধিবেশনে—প্ল্যানিং কমিশনের সহকারী সভাপতি শ্রী ভি টি. কৃষ্ণমাচারী দ্বিতীয় প্ল্যানে কৃষির উৎপাদন অধিকতর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে আমাদের কৃষিপণ্য আগামী পাঁচ বৎসরে শতকরা আরও চল্লিশ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্ল্যানে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ।

কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে বিশেষ ভাবে উপলব্ধির একটি গুরুতর কারণ আছে। কিছুকাল যাবৎ—১৯৫৫ সালের শেষ ভাগ থেকে—দেশে খাদ্যশস্যের মূল্য ঊর্ধ্বগামী। গমের দাম ১৯৫৪ সালের মে মাসে ছিল দশটাকার মতো। সে দাম এবছরের জুলাই আগষ্ট মাসে ১৬ টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকার ১৪ টাকা দামে বাজারে গম সরবরাহ শুরু করেছেন, মূল্যের ঊর্ধ্বগতি এখনও সম্পূর্ণ নিরোধ হয়নি। চালের দামও অনুরূপ বৃদ্ধির দিকে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে যে অর্থ বিনিয়োগ হবে এবং হচ্ছে, তার ফলে অধিকতর লোকের কর্মসংস্থান অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ উন্নয়নব্যয়ের মারফতে জনগণের হাতে অর্থাগমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং খাদ্য শস্যের চাহিদা আগামী বৎসরগুলিতে বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। প্রতিবৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত খাদ্যশস্যের প্রয়োজনও অনুধাবনযোগ্য। প্ল্যানিং কমিশনের অভিমত এই যে এই বর্ধিত চাহিদার উপযোগী খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রয়াস কৃষি দপ্তরের অবশ্য কর্তব্য। নতুবা খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশে মজুরী বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিবে এবং পরিকল্পনার বর্তমান ব্যয় বর্তমান অনুমিত অঙ্ককে ছাড়িয়ে যাবে।

কৃষি খাতে বর্তমান নির্দিষ্ট অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি ব্যতীত এই অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব কি না, সে-সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে মতদ্বৈধের আভাস পাওয়া গেছে। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী পার্লামেন্টে এ সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে আশা হয়, সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনা ও ন্যাশন্যাল এক্সটেনশান সার্ভিসের মাধ্যমে ও কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কৃষিবিভাগের সহযোগিতায় অধিকতর ব্যাপক প্রযত্ন ও প্রয়াসের দ্বারা ভারতের বর্তমান উৎপাদন আরও বাড়িয়ে তোলা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন, জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ; ভারতবর্ষকে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতীয়ের। সে দায়িত্ব পালনের উদার আহ্বান আছে ভারতের জন-গণ-মন-অধিনায়কের কণ্ঠে। সে আহ্বান ব্যর্থ হবেনা।

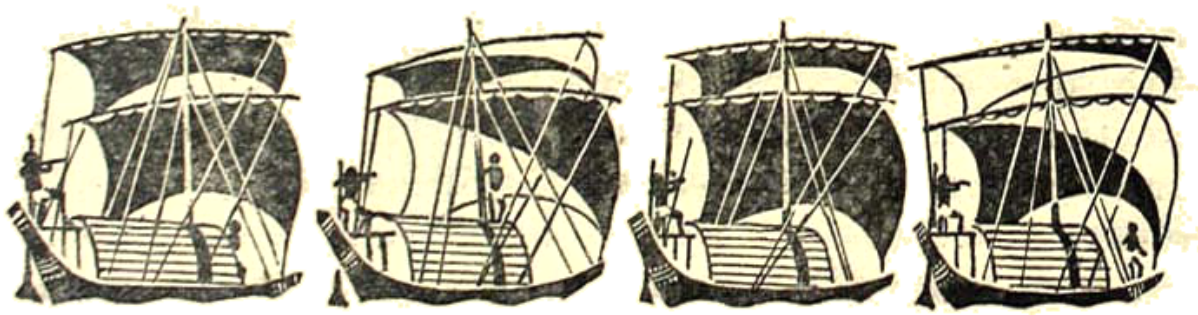

ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়

[আমি যতোটুকু দেখেছি]

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর নাম শুনছি। তখন তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক। আমার এক দাদা তাঁর কাছে পড়তেন, তাঁর মুখে তাঁর অধ্যাপনার সুখ্যাতি শুনেছি। আরও অনেকের মুখে। এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের কথা। তারপর জেলে চলে গেছি। মাঝে মাঝে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পুনঃ পুনঃ বিপুল অর্থ দানের কথা কাগজে পড়েছি। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপনের কথা লোকমুখে শুনেছি। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়েছে। চাক্ষুষ দেখেছি আরও অনেক পরে। সেই কথাই বলতে বসেছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগেছে। ১৯৪০ সাল। বাংলার রাজনীতিতে ঘুণাপাক ধরেছে। মহাত্মা গান্ধী তখন ভারতের বহু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে, তথা আমাদের সঙ্গেও, কি করা উচিত তা-ই নিয়ে আলোচনা করছেন। মৌলানা আজাদ, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি অন্যান্য কংগ্রেস নেতারাও পরামর্শ করেন, পরামর্শ চান—কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন না। অকস্মাৎ মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের কথা বললেন। আইডিয়াটা আমাদের মনঃপুত হল। যুদ্ধ লাগবার কয়েক দিনের মধ্যেই ওয়ার্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হয়। তার আগে রাজেন বাবু রাঁচিতে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জির সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁকে ওয়ার্ধায় যেতে বলেন। যাদুদা নিজে যান নাই, আমাদের খবর পাঠান। সেই অনুযায়ী আমরা চারজন যাই—হরি কুমার চক্রবর্তী, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং আমি। আমি রাঁচিতে যাদুদার সঙ্গে দেখা করে যাই।

আমরাও গান্ধীজিকে 'ইতি'র দিকে কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু 'নেতি'র দিকে বলেছিলাম : তথাকথিত বামপন্থীরা আয়র্ল্যাণ্ডের জোগান অনুযায়ী বলছেন, 'ইংল্যাণ্ডের বিপদে আমাদের সুযোগ'—এখনই আন্দোলন আরম্ভ করুন—এমতের আমরা সমর্থক নই। যুদ্ধের গোড়াতে গণ-আন্দোলনের সময় নয়, যুদ্ধ কিছুকাল চলার পর সমাজের অর্থনৈতিক ভিৎ ভাঙবে, দারিদ্র্য, নিরন্নতা শুরু হবে, সর্বব্যাপী অসন্তোষ দেখা দেবে। গণ-আন্দোলনের সুযোগ সেই মুখে। কিন্তু ক্ষেত্র এখন থেকে প্রস্তুত করতে হবে। নেতৃত্ব ভেঙে পড়েছে, তাকে গড়ে তুলতে হবে। আর মহাত্মাজীকে ব্যক্তিগত ভাবে বলেছিলাম, দায়িত্ব নিন, নেতৃত্ব নিন, নয়তো অন্যদের পথ ছেড়ে দিন। নানা কথার পর তিনি বলেছিলেন, "আমি আশা ছাড়িনি, দেখি কি করতে পারি।"

এরপর যখন গান্ধীজি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রোগ্রাম দিলেন, তখন আমরা আইডিয়াটাকে লুফে নিলাম। নিরস্ত্র জনগণ যদি ক্ষমতা হস্তগত করতে চায়, সর্বত্র স্বানীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের যে প্রোগ্রাম, তার ফলে তাই গড়ে উঠবে। বাংলার তথাকথিত বামপন্থীদের কিন্তু ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রোগ্রাম পছন্দ হয় নাই। তাঁরা একে তীব্র আঘাত দিতে সুরু করলেন। আমি তখন 'ফরোয়ার্ড' কাগজের সম্পাদনা করি। প্রতি সপ্তাহে আন্দোলনের ব্যাখ্যা সুরু করলাম। লেখাগুলি অনেকের ভাল লেগেছিল। তাঁদের ভিতর ছিলেন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এবং আরও অনেকে। মহাত্মা গান্ধীও পরে আমরা জেলে চলে গেলে একখানা ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন, 'Your interpretation of the movement was accurate'.

ফরোয়ার্ড বের হয় তখন ৩২, আপার সার্কুলার রোড থেকে। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসও তখন সেই বাড়ীতে। নীচে শ্রীসরস্বতী প্রেস। উপরের কোণের

একটা ঘরে থাকি আমি এবং শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ। অরুণদা তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারী। মাঝখানের হল ঘরটায় কংগ্রেস অফিস। পশ্চিম দিকের ঘর দুটোয় ফরোয়ার্ড ও মন্দিরা অফিস। অকস্মাৎ এক বিকেলে সেখানে দেখা দিলেন ডাঃ হরেন্দ্র কুমার। সঙ্গে বেলজিয়ান মিশনারী ফাদার দঁতেইন। কংগ্রেস অফিসে তখন বসে ছিলেন শ্রদ্ধেয় বিনয় পালিত, শৈলজানন্দ সেন এবং আরও কে কে। শৈলজা বাবু আমাদের ঘরে এসে খবর দিলেন, ডাঃ মুখার্জি এসেছেন আপনার কাছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস অফিসে ঢুকবার আগেই ডাঃ মুখার্জি দরজায় এসে বল্লেন, আমি এসেছি ফরোয়ার্ড সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ করতে।

আমি ও অরুণদা ওঁদের ডেকে নিয়ে বসালাম। জিজ্ঞেস করলাম—'হঠাৎ' ?

উনি হাসি মুখেই বলে চল্লেন, মশাই, অমন কাটাকাটা যুক্তি, আর, এখনকার দিনে অমন সুন্দর ইংরেজি—আপনার সঙ্গে আলাপ করার লোভটা সম্বরণ করতে পারলাম না।

কয়েকদিন আগে ঠিক এই রকম উপলক্ষ্যেই আলাপ করতে এসেছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। নীচে বসে সরস্বতী প্রেসের বন্ধুদের বলেছিলেন, আমি দেশ বিদেশের অনেক কাগজ পড়ি, এরকম লেখা কমই পড়তে পাই। সেই সপ্তাহেই বেরিয়েছিল 'Why Non-Violence' ব'লে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। তা নিয়ে কিছু আলোচনা ক'রে যেন বেশ তৃপ্ত হয়েই গেলেন।

আজ ডাঃ মুখার্জির কথাতে আত্মবিশ্বাস আরও অনেক খানি বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে বিনয়বাবু প্রভৃতি বন্ধুরাও এসে জুট্‌লেন। তাঁরা আমাদের পরিচয় দিলেন। ডাঃ মুখার্জিও ফাদার দঁতেইনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফাদার দঁতেইন্ বাংলায় ছাড়া কথা বলতেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওঘরে যতো লোক দেখলাম, সবই কি এমনি পনের বিশ বছর জেল ফেরতা ? তা নিয়ে খানিকটা হাসাহাসি হ'ল। তারপর ডাঃ মুখার্জি বল্লেন, চলুন আমার সঙ্গে

কোথায় ?

চলুনতো !

সুরু হ'ল এম্‌নি চলার পালা ওঁর সঙ্গে—কত জায়গায় যে নিয়ে গেলেন, আর কত জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ! রেভারেণ্ড ফাদার ওয়েষ্টকট, ফাদার লাদুমঁ, শ্রদ্ধেয় সজনী দাস, মাখন সেন, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল ব্যানার্জি, প্রিয়রঞ্জন সেন, নির্মল বসু, হেম রায় চৌধুরী (ছোট), নীহার রঞ্জন রায়, প্রবোধেন্দু ঠাকুর, সাংবাদিক নারায়নন্। তখনকার দিনে Oxford Group ব'লে একটা দল গড়ে উঠেছিল—এঁরা কেউ কেউ তার সভ্য, কেউ কেউ তার আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল। এক একদিন এক এক জনের বাড়ীতে চায়ের আড্ডা বস্‌তো। সেখানে নানা আলোচনা চলতো।

একদিন আমার রাজনীতি নিয়ে আক্রমণ করলেন মাখনবাবু। তাঁর সমর্থক সজনীবাবু। আমি তখন লিখ্‌ছি, এই যে স্বীণাকার আন্দোলন গান্ধীজি সুরু করেছেন, এই একদিন প্রচণ্ড আকারে দেশময় ঝড় তুলবে। মাখনবাবু প্রশ্ন করলেন, "এই যা তুমি লিখ্‌ছ, এতে বিশ্বাস কর ?"

ভয় পেয়ে গেলাম। তার্কিক মাখনবাবুকে আমি চিনতাম ১৯১১-১২ সাল থেকে। তার উপর সমর্থক সজনীবাবু !

তবু জবাব দিলাম, "বিশ্বাস না করলে লিখতাম না।" বুঝলাম, আমার সমর্থক প্রিয়রঞ্জন সেন, নির্মল বোস এবং ডাঃ মুখার্জিও। কিন্তু তাঁদের কণ্ঠ ক্ষীণ। তাই একটু উগ্র ভাবেই আমার কথা চালাতে হ'ল। তর্ককে এরপর অন্যপথে নিয়ে গেলেন ডাঃ নীহার রঞ্জন ও ডাঃ হেম রায় চৌধুরী। ডাঃ মুখার্জি ইতিমধ্যে পাশে এসে বসে শান্তস্বরে গভীর প্রাণের সমর্থন জানালেন।

আড্ডা জমতো কোনো কোনো দিন আমাদের বাসার কিরণদার ঘরে—স্বর্গীয় কিরণ চন্দ্র মুখার্জি। দুই জনাই সমান আপন ভোলা সেবাব্রতী। আলাপে, হাসি পরিহাসে কোথাও কোনো কুণ্ঠা নেই, সংকোচ নেই, ব্যবধান নেই। অন্যলোক আস্‌ছে, বস্‌ছে, চলে যাচ্ছে—ওঁদের কথা চলছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বাড়ীতে আরও লোক ছিলেন, বা এসে জমতেন, যাঁদের আনৈশব জীবন

ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়

কেটেছে নিঃস্বার্থ জনসেবায়, দেশ সেবায়—রসিক দাস, রবি বোস, সুধীর রায়, উপেন সাহা, ডাঃ নীরেন দত্ত, কমলা দাস গুপ্ত, বীণা দাস (ভৌমিক), শান্তি দাস, মায়া ঘোষ। এক একজনের পরিচয় শুনতেন, ডাঃ মুখার্জির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। সরস্বতী প্রেসের শৈলেন গুহ রায়, মহেন্দ্র দত্তের সঙ্গেও আত্মীয়তা গ'ড়ে উঠলো।

কোনো কোনো দিন খাওয়ার আসর জমতো ডাঃ মুখার্জির নিজের বাড়ীতে। অত্যন্ত নিরাড়ম্বর ব্যবস্থা, কিন্তু ডাঃ ও শ্রীযুক্তা মুখার্জির হৃদ্যতায় ভরা। সারা বাড়ীতেই অতি দীন ভাবে দিন কাটাবার ব্যবস্থা। বহু বছর আগে যেদিন ডাঃ মুখার্জি তাঁর এক মাত্র পুত্রকে হারিয়েছেন, সেই দিন থেকেই মনে হয়, বাড়ীখানা তাঁর মনের উদাসীনতায় ছায়াচ্ছন্ন। সমস্ত বাড়ীটায় আর ওঁদের দুজনের জীবনে একমাত্র বিলাসবস্তু একটি অ্যালসেশিয়ান।

একদিন সন্ধ্যায় নিয়ে গেছেন ওঁদের বাড়ীতে। রাত্রে একাই ওখানে খেয়ে ফিরব। হঠাৎ উপস্থিত হলেন আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ আবু হোসেন সরকার। তিনি শ্রীযুক্তা বঙ্গ বালাকে 'বউদি' ব'লে ডাকেন এবং খাওয়া দাওয়া নিয়ে নানা রকম আবদার উৎপাত করেন। ডাঃ মুখার্জি ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ক'রিয়ে দিলেন। এক সময়ে বললেন, লোকটি সৎ। সেকথা আগেও শুনেছিলাম অনুজা সেনের মুখে। অনুজা ১৯৩০ সালে ডালহাউসি স্কোয়ারে সার চার্লস্ টেগার্টকে মারতে গিয়ে নিজের জীবন দেন। তার আগে কয়েক বছর তিনি রাজনীতিক কাজে গাইবান্ধায় ছিলেন, তখন আবু হোসেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

ঐ সন্ধ্যাতেই আবু হোসেন বিদায় নেবার পর আর একজন এলেন—তিনি লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির মিঃ উইলসন। বয়স বেশী নয়। সেই দিনই খবর পেয়েছেন লণ্ডনে বোমা প'ড়ে তাঁর একমাত্র পুত্র মারা গেছেন, দু'একদিনের ভিতরই বিলেত চলে যাবেন। ডাঃ মুখার্জির কাছে বিদায় নিতে এসেছেন। দেখলাম, কী প্রগাঢ় ভক্তি ডাঃ মুখার্জির প্রতি! আর ছেলের মৃত্যুতেও কী শান্ত ভাব! অথচ আমায় বললেন, "Eighteen years in prison and yet no bitterness in heart!"

ছাদে অন্ধকার আকাশের নীচে তিনজন অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

এরপর এল ১লা মে, ১৯৪১ সাল। চতুর্থবার বন্দী। পাঁচ বছরের জন্যে।

• • •

জেল থেকে বেরিয়ে এলাম ১৯৪৬ সালের মে মাসে। এর কিছু দিন বাদেই সব আমরা দিল্লিতে। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ৩রা জুন প্ল্যানের আলোচনা চলছে। গণপরিষদের নির্বাচন স্থির হয়েছে। আমাদের আড্ডা শ্রদ্ধেয় কিরণশঙ্কর রায়ের বাসায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও রাজনৈতিক গ্রুপের সদস্য মনোনয়নের খসড়া তৈরী হচ্ছে। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কথা উঠতে আমি ডাঃ মুখার্জির নাম উল্লেখ করলাম। কিরণবাবু তাঁর সকৌতুক আপত্তি জানালেন। অবিভক্ত বাংলা অ্যাসেমব্লির স্বরাজ্য দলের নেতার সঙ্গে ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট ডাঃ মুখার্জির মত বিরোধ তো কিছু ছিলই। বললাম, বাংলা থেকে খৃষ্টান তো একজন নিতে হবেই, ওঁর চেয়ে ভাল লোক কাকে পাবেন? কথাটা পাকা কিছু হ'ল না।

কলকাতায় ফিরে ডাঃ মুখার্জির ইচ্ছা কি জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, না, আর ওসব ঝামেলা ভাল লাগে না। একটু পীড়াপীড়ি করলাম, উনি মত বদলালেন না। এর পর বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটির সভা। সেই দিনই আমরা যাত্রার আয়োজন করেছি। বেরিয়ে পড়ব, এমন সময় ডাঃ মুখার্জি এলেন, বললেন, ভূপেনবাবু, আপনি আমায় গণপরিষদে যাবার কথা বলেছিলেন, তখন 'না' বলেছিলাম। এখন আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমায় ধরেছেন, বলছেন, আপনি না গেলে যাঁরা প্রার্থী হবেন, তাঁরা পৃথক নির্বাচনের পক্ষপাতী হবেন, সেটা সম্প্রদায়ের পক্ষে হবে একটা disgrace. কাজেই আপনাকেই যাওয়া চাই।

বললাম, একেবারে শেষকালে কথাটা বললেন!

উনি বললেন, দেখুন চেষ্টা ক'রে। না হয় না হবে।

তখন বাংলার পক্ষ থেকে কংগ্রেসের-গণপরিষদে মনোনয়নের ভার পড়েছে পাঁচজনের উপর: মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ,

(পরবর্তী অংশ ৪৭৯ পৃষ্ঠায়)

স্বদেশ-সেবায় যুব-সমাজ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিশাল ভারতবর্ষ আজ গড়িয়া উঠিতেছে—তাহার বিস্ময়কর ইতিহাস ও বিচিত্র ঐতিহ্যের স্থিতি ভূমিতে। একদিকে গৌতম বুদ্ধ হইতে রাজা অশোক,—চৈতন্যদেব হইতে মহাত্মা গান্ধী,—অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ—সকলেই এই নবভারতের স্বপ্ন ও সাধনায় মগ্ন ছিলেন। আমাদের এই উত্তর সাধকদের সে স্বপ্ন ও সাধনা আজ সম্পূর্ণ সফল ও সার্থক হইয়াছে একথা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহাদের সেই মিলন ও সমন্বয়ের বাণী—তাহার সার্থকতা হারায় নাই। তাঁহারা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বিশাল ভারতবর্ষের, সাধনা করিয়াছিলেন—এক অখণ্ড অবিভক্ত ভারতের কিন্তু রাজনীতিক অবস্থা বৈগুণ্যে তাহা সম্ভব হয় নাই। ১৮৮৫ সাল হইতে আমরা অখণ্ড ভারতের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম খণ্ডিত ভারতবর্ষে আমাদের সে স্বপ্ন সফল হইল না, আমরা ভারাক্রান্ত মনে ভারতের বর্তমান স্বাধীনতাকেই মানিয়া লইলাম। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট তারিখে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের ভাষণে আমাদের সেই মনোভাবের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—:

"Seven years ago, we accepted freedom from foreign domination at the cost of partitioning our motherland. This meant giving up the ideals and dreams we had cherished since 1885 and revived again in 1920 of having a free and United India. We agreed to pay this heavy price as we wanted freedom for the nation, to develop our resources, our economy, to increase our production and secure the national well-being of the people and to regain for our great country her proper place in the Comity of nations. The wisdom of our decision taken with a heavy heart and after careful thought, will be Judged by the future historian."

অর্থাৎ সাত বৎসর পূর্বে আমাদের মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করিবার সর্তে বৈদেশিক প্রভুত্বের নিকট হইতে স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। যে অখণ্ড-ভারতের আদর্শ ও স্বপ্ন আমরা ১৮৮৫ সাল হইতে অন্তরে পোষণ করিয়া আসিয়াছি এবং ১৯২০ সালে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছি—এই স্বাধীনতা লাভের অর্থ সে স্বপ্ন ও আদর্শকে পরিত্যাগ করা। আমরা এই দুর্মূল্য দিতে স্বীকার করিলাম দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য, আমাদের শিল্প সম্পদের উৎকর্ষ-সাধন ও অধিক উন্নতি বিধান করে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং জাতির কল্যাণ সুরক্ষিত করিয়া এই মহান দেশকে জাতি সংঘের মধ্যে তাহার যোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা বিশেষ চিন্তা করিয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম—তাহার বুদ্ধিমত্তার বিচার করিবেন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণ।

খণ্ডিত ভারতের সমস্যা তাই প্রবল হইয়া দেখা দিল স্বাধীনতা লাভের ঠিক অব্যবহিত পরেই। সে ইতিহাসের মর্মন্তুদ বেদনা আমরা অনুভব করি, প্রাণপণে চেষ্টা করি সে সমস্যার সমাধানে; কিন্তু বাধা পাই,—যে বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব, স্বার্থলেশহীন চরিত্র এই প্রকার বিপর্যয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করে—আজ তাহার একান্ত অভাব ঘটিয়াছে।

উদ্বাস্তু সমস্যা, কর্মবিহীনের কর্মসংস্থানের সমস্যা, জাতির সঙ্গতি ও সম্বল বৃদ্ধি করিবার সমস্যা, নগণ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি বিধানের সমস্যা, দেশবাসীর কল্যাণের পথকে নিবিঘ্ন ও নিরাপদ করিবার সমস্যা, জাতিপুঞ্জের মধ্যে এই মহান দেশের যোগ্য স্থান অধিকার করিবার সমস্যা—একে একে আমাদের সম্মিলিত শক্তি ও সমবেত চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ১৯৪৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ভারাক্রান্ত মন লইয়া স্বাধীন অখণ্ড ভারতবর্ষে—দেশবাসীকে মহান আদর্শের ক্ষেত্রে সুগভীর চিন্তা ও নিরলস কর্মের ক্ষেত্রে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্বেগ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের মনেও একদিন সে উদ্বেগ প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার একটি কথায়: "সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মত ব্যাপ্ত, বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই"

এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য:

"সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা—। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বাধীনতার কোনো মূল্যই থাকিবে না। যথার্থ স্বাধীনতার মূল্য বুঝিলে মত-বৈচিত্র্য দলিত হয় না; নিয়মের শাসনকে মান্য করিয়া, নিয়মকে লঙ্ঘন না করিয়া প্রার্থীত ফললাভের চেষ্টাই মনুষ্যোচিত। মানুষ নিয়মকে পালন করিয়াই জয়লাভ করিবার ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারে বলিয়াই সংযমই তাহার বলের পরিচয়-দেয়; কত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ-মতি-গতির লোককে একত্রে লইয়া শুধু তর্ক আলোচনা নহে, এই সংযমের বলেই বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য চালনার কার্য সম্ভবপর হইয়াছে। অতএব আজ এই খণ্ডিত ভারতেও আমরা এক মহান জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারিব না কেন?

যখন পরাধীন ছিলাম তখন যে আত্মবিস্মৃতির ফলে আমরা একদিন আমাদের সব কিছুই হারাইতে বসিয়াছিলাম। যে লুপ্ত ধন ফিরাইয়া পাইবার জন্য আমরা বহুজীবনকে বলিদান দিয়াছি, বহুজনের পীড়ন নির্যাতন ও অসম্মানকে আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি—যাহার জন্য আমাদিগকে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অভাবনীয় ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ যেজন্য এতাবৎ-কাল বিপদসঙ্কুল হইয়া আমাদিগকে পদে পদে বাধা দিয়াছে—আজ সেই আত্মবিস্মৃতিই কি আমাদিগকে আবার পাইয়া বসিবে? আমরা কি এখনো ভুলের পর ভুল করিয়া চলিব? পতন হইতে অভ্যুদয় ঘটিয়াছে—; এই অভ্যুদয়ের জন্যই আজ আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ দেখা যাইতেছে। এই দুশ্চিন্তার মধ্যে আজ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের কথাগুলি বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। বহুকাল পূর্বের কথায় তাঁহার গভীর চিন্তা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—

"অধঃপতনের কাল প্রকৃত সঙ্কটকাল নয়, কিন্তু অভ্যুদয়ের কালই প্রকৃত সঙ্কটকাল। আমরা একদিন অবশ্যই উঠিব—জগতের জনসমাজের মধ্যে দশ জনের একজন হইয়া উঠিব। কিন্তু কেমন করিয়া উঠিব? —আমরা কি দৈত্যদানবের মত ক্ষমাশূন্য সীমাশূন্য বাহুবল লইয়া বসুন্ধরা হইতে সকল সভ্যতা, সকল শৃঙ্খলা, সকল উন্নতি চিরপদদলিত করিতে করিতে প্রচণ্ড তাণ্ডবে জলস্থল কম্পান্বিত করিয়া উঠিব? অথবা জগতের সম্মুখে মানবতার মহান আদর্শ সুসংস্থাপিত করিবার জন্য ধর্মের নামে, সত্যের নামে, প্রীতির নামে, পবিত্রতার নামে, মনুষ্যত্বের নামে, দেবত্বের নামে—প্রসন্ননয়নে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিব?—আমরা কোন আদর্শের অনুগামী হইব তাহারই উপর তাহা সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করিবে। ভাঙা নহে গড়া, শুধু গড়া নহে সংশোধন, শুধু সংশোধন নহে সংস্কার, শুধু সংস্কারও নহে চিরাগতকে নবাগতের সঙ্গে সুসঙ্গত-ভাবে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া—ইহাই যে যুক্তিযুক্ত কার্য বিচার বুদ্ধি তাহারই সমর্থন করিবে। তাহাই প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া সকলের নিকট প্রতিভাত হইবে।"

চিন্তাশীলের এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার মত ধৈর্য্য আমাদের আছে কি? ভাব-প্রবণতায় অধীর হইয়া আমরা লঘু গুরু জ্ঞান হারাই,—স্থির বুদ্ধি ও ধীর কার্য্যের সমর্থক—কয়জনকেই বা আমরা শ্রদ্ধা করি। হঠাৎ তাতিয়া উঠিতে এবং পরমুহূর্তেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে আমাদের কোনও দ্বিধাই মনে জাগে না। যে কোনও বিরোধকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমরা ভাবি আমরা সাধারণ হইতে পৃথক—আমাদের সাহস আছে তাই প্রতিবাদ করিতে পারি,—শক্তি আছে তাই বিরোধ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না।

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সাবধান বাণী আজিকার দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয়—তিনি বলিয়াছেন:

"বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিও না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে, তাহা সংযমীর দ্বারা যোগীর দ্বারাই সাধ্য।"

আমাদের দেশে ভেদ বুদ্ধি প্রকট হইয়াছিল বিদেশী শাসকের আমলে। তাঁহারা দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন—সেজন্য—"কালক্রমে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়াই চলিয়াছিল।" আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই দ্বন্দ্ব সেই ঈর্ষাবিদ্বেষ কি আমাদের দেশে তীব্র করিয়া তুলিব—?

তথাকথিত স্বার্থের দোহাই দিয়া, দেশের কল্যাণের অজুহাত দেখাইয়া আমরা কি আজ আসল সত্য কথাটি ভুলিয়া যাইব যে আমরা—এক এবং অবিচ্ছিন্ন দেশের মানুষ?

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে—তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মার ধর গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; যখন আমরা পরম ধৈর্য্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে, হৃদয়কে, মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব তখন আমরা মানুষকে চাহিব—।

মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়। নিজেকে নম্র করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনোমতে আমার মতে ভিড়াইবার আমার দলে টানিবার জন্য টানাটানি মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পন করিতে হইবে। তখনই সে বুঝিবে যে বন্দেমাতরম মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি, দেশের ছোটোবড়ো সকলেই যাহার সন্তান। এই সকল জ্ঞানগর্ভ আসল কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনেক আগেই শুনাইয়া গিয়াছেন—তিনি আরও বলিয়াছেন যে আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন।

আমরা কি আমাদের পৃথক সত্তাকে অতিমাত্রায় ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া সাধারণ মানুষের মনে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করি নাই—? আমরা স্ফীতগর্বে কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্বের মুখোস পরিয়া মানুষের যথাযোগ্য মর্যাদা যথাযোগ্য স্থানে দিতে কি কার্পণ্য করি নাই?—মানবধর্ম্মের যে বাণী রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায় অন্তিমশয্যায় শয়ন করিয়াও আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন—আমরা কি তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে ত্রুটি করি নাই? বৃহৎ ভারতবর্ষের আদর্শ ও সংস্কৃতির গুণগানে পঞ্চমুখ আমরা, আমরা কি সেই পঞ্চমুখেই প্রতিবেশীদের নিন্দাবাদ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি নাই?

আজ যে কোনো অবস্থাসঙ্কটকে ঘিরিয়া প্রতিনিয়ত যে ভেদবুদ্ধি ও সংশয় সন্দেহের ধূম্রজাল বিস্তৃত করা হইতে দেখিতেছি—আমাদের ছাত্র ও যুবসমাজের নির্মল দৃষ্টি ও নিষ্কলুষ মন মাঝে মাঝে তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে—সেই কারণেই এই বক্তব্যের সূচনা। পরমত অসহিষ্ণুতা দেশের অগ্রগতির পথে অনন্ত বাধার সৃষ্টি করিতেছে—দেশের কল্যাণের নামে দেশের স্বাধীনতাকে এমনভাবে নিগৃহীত হইতে আর কোথাও দেখা যায় না। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:—

আমাদের দুর্ভাগ্য এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিনা। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই—আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে জড়বেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষ নরকস্থ করিবার ভয়, ধোপানাপিত বন্ধ করিবার শাসন,

ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্ত ত্রাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপর কাজ ফাঁকি দিবার জন্য, পথ বাঁচাইবার জন্য যখন আমরা এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ হয় বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়, অতএব সকলে যদি এ সত্যকে বুঝিয়া সে-পথে চলে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে—অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় জবরদস্তি।" কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে।" সেই জন্যই স্বাধীনতা লাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনতা ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি—দেশে মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে বল উত্তোলন করিয়া বলপূর্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ দুর্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতে হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতে হইবে, এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ বৈচিত্র্যের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা পরম লাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতি কুৎসিতভাবে গালি দিতেছি, এমন কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি।"

তিনি আরো বলিয়াছেন—

দুঃখের বিষয় এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না—তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, দেশের হিতসাধনের উপলক্ষে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে। ইহাদের কাছে ন্যায়ধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা—ইহারা বলেন—"মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যায় তাহা অধর্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনোই হইবে না—সে-কথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বার বার বলিতে হইবে"

নিছক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া আমরা বার বার আমাদের শুভকর্মের পথে অনন্ত বাধার সৃষ্টি করিতেছি। যুবকগণের ভাবপ্রবণতাকে তাতাইয়া, জ্বালাইয়া দিয়া বলিতেছি এই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের দ্বারা আমরা অন্যায়কে অনর্থকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিব এবং ঘরে ঘরে আজ বিড়ম্বিত জীবনের তিমিত দীপগুলি আমরা এক সঙ্গে জ্বালাইয়া দিয়া আনন্দের দীপালী উৎসব করিব। এই ভ্রান্তবুদ্ধিকে তিরস্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :

"স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। তাহার আয়োজন স্বল্প—তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্য। প্রদীপের আয়োজন অনেক,—তাহার আধার গড়িতে হয়। শলিতা পাকাইতে হয়, তাহার তেল জোগাইতে হয়। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন হইলে স্ফুলিঙ্গ আপনাকে স্থায়ী শিখায় পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। যখন উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা সেই প্রদীপ রচনার আয়োজন করিবার উদ্যম জাগিতেছেনা, শুদ্ধমাত্র ঘন ঘন চকমকি ঠোকার চাঞ্চল্য মাত্রেই সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি তখন সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে—এমন করিয়া কখনই ঘরে আলো জ্বালিবে না কিন্তু ঘরে আগুন লাগা অসম্ভব নহে।"

এমনি অশান্ত অবস্থার মধ্যে ছাত্র ও যুব সমাজের মনে শুভ বুদ্ধি জাগ্রত হউক—তাঁহারা আজ সাবধানে অভিনিবেশ সহকারে স্বীয় বিচারবুদ্ধির দ্বারা দেশের কল্যাণ অকল্যাণের পথ বাছিয়া লউন। তাহার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য স্বীকারের প্রয়োজন আছে, আমরা জানি তাঁহাদের জীবনে নৈরাশ্য আসিয়াছে নানা অনিবার্য কারণে। পারিবারিক জীবনে অভাব অনটন, বেকার জীবনের বিড়ম্বনা ও গ্লানির প্রতিক্রিয়াও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাঁহাদের আচরণে

(পরবর্তী অংশ ৪৮১ পৃষ্ঠায়)

মহাজ্ঞান

পরিমল গোস্বামী

আসীন ভাব নামক কোনো কথা সংসারে আছে কিনা জানি না, আর থাকলেও তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত জানি যে ছোটবেলা থেকেই সব বিষয়ে আমার কেমন যেন একটা উদাসীন ভাব।

ক্ষতিও এ জন্য বিস্তর সয়েছি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউ আমার উদাসীনতার সুযোগ নিতে ছাড়েনি। আত্মীয়েরাই বেশি নিয়েছে।

পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর সকল বিষয় সম্পত্তির আমিই একমাত্র মালিক ছিলাম; এবং সম্পত্তি বিষয়ে একটুখানি সচেতনতা থাকলে আমার অন্ন আজ খায় কে। কিন্তু সে সময় আমি কবিতা লেখায় মত্ত ছিলাম। ফলে আমার শরীকেরা তার প্রায় সবখানিই কৌশলে বেদখল ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ নির্বিঘ্নতর ক'রে নিল। আমি তখন ভূমি ছেড়ে ভূমার দিকে মুখ তুলে বসে আছি।

কানে এসেছিল সব কথা, কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম মাটির পথ আমার নয়, আমার পথ আকাশে বিস্তীর্ণ।

উদাসীনতারই লক্ষণ। এবং সব দিকেই। খাওয়া-খাওয়ারও আমার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল না। সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধি খুলতো ভাল, তারই উপর ছিল আমার নির্ভরতা, তাই শেষ মুহূর্ত সমাগত হলে বুদ্ধি ঘনীভূত ক'রে যে কোনো দিকে প্রয়োগ করলেই কাজ চলা গোছের একটা সাফল্য লাভ করতাম। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষারূপ সপ্তসাগর পাড়ি দিয়ে আসা আমার পক্ষে খুব দুঃসাধ্য হয়নি।

প্রকৃত অসহায় হয়েছিলাম পরীক্ষা পাস ক'রে। এর পর কি? সমুদ্র সীমাহীন মনে হয়েছিল, এখন দেখি ভূভাগ সীমাহীন, সেই কঠিন স্থানে এই আমার প্রথম পদপাত।

দূর পল্লীর মানুষ, কলকাতা এসে ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে লাগলাম। পিতার নগদ টাকাটা তখনও হস্তান্তর হয়নি।

আছি এক বন্ধুর রুমমেট হয়ে, বন্ধু ডাক্তারি পড়ে।

আমার কোনো কাজ ছিল না, ছিল প্রচুর অবসর, যথেষ্ট চিন্তা, এবং টাকা। যথেষ্ট চিন্তা মানে ভবিষ্যতের চিন্তা। শুধু শুয়ে বসে থাকায় মন আর রাজি নয়। কিন্তু চিন্তা করাতেও বিপদ, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়তাম। প্রথমে মিনিট দশেকের মধ্যে, তারপর দশ সেকেণ্ডে! ক্রমে ঘুম এমন অভিগত হয়ে গেলে যে এর পর ভবিষ্যৎ চিন্তা করতেই ভয় হত—যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে না পড়ি।

কলকাতায় থাকার একটা সুবিধে এই যে এখানে বিবেককে সহজে খুশি রাখা যায়। যে কোনো পথে শুধু ঘুরে এলেও মনে হয় কাজের চেষ্টা ক'রে এলাম। সম্ভাব্য কার্যস্থল রাজপথের দুপাশে শত শত রয়েছে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। যে কোনো একটায় প্রবেশ করলেই নিশ্চিত কাজ, তাই কোনো দরজায় প্রবেশ না করলেও মনে এই সান্ত্বনা থাকে যে, ও একদিন করলেই হল।

অতএব অফুরন্ত সময় কাটানোর জন্য উপায় ভাবতে হল, অফুরন্ত নিদ্রা লজ্জাকর। শেষ পর্যন্ত বন্ধুর সাহায্য নিতে হল। তাকে বললাম, "ভাই জেগে থাকার ওষুধ দিতে পার?" প্রশ্নটি হয় তো ডাক্তারদের কাছেই হঠাৎ অসম্ভব মনে হতে পারে, ডাক্তারি ছাত্রের কাছে তো হবেই। সে বলল "ঘুমোনোর ওষুধ দেওয়াই তো জানি, জেগে থাকার ওষুধ তো কেউ চায় না। তার মানে, জেগে-থাকতে ওষুধই লাগে না; তুমি এক কাজ কর। আমাদের শাস্ত্র কিছু পড়াশোনা কর, আমি সাহায্য করব, তাতে জেগে থাকতে পারবে।"

বন্ধু তার নিজের পড়ার সুবিধের জন্যই আমাকে তার সহকারী পড়ুয়া ক'রে নিতে চায়।

সেদিন আমার বালিশগুলো বোদে দেওয়াতে বন্ধুর বাহাত্তর টাকা দামের প্রো'স অ্যানাটমিখানাকে বালিশ বানিয়ে শুয়েছিলাম, আর ঠিক সেই দিনই ঐ অ্যানাটমির পথেই ডাক্তারি শাস্ত্রে হল আমার প্রথম দীক্ষা। আমার ঘরের মধ্যেই মানুষের যে কঙ্কালগুলো পড়ে ছিল দিনের পর দিন, সে বিষয়ে এতদিন ছিল আমার ঘোর ঔদাসীন্য, কিন্তু আজ ঐ কঙ্কালগুলো ঘিরে আমার কল্পনা কিকিৎ খেলায় মত্ত হল।

সময় বেশ কাটতে লাগল। অ্যানাটমিতে পণ্ডিত হচ্ছি এমন সন্দেহ আমার কখনো হয়নি, কারণ ও-বইকে মাথার ভিতরের চেয়ে মাথার বাইরে রাখাই বেশি সহজ। ভিতরে পুরতে হলে পরীক্ষারূপ বিভীষিকা সর্বদা মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখতে হয়। আমার সে দায় ছিল না।

মোটামুটি কতকগুলো হাড়ের নাম শিখে ফেললাম। ম্যাক্সিলা, ম্যানডিবল্, অক্সিপিটাল, ক্লাভিক্ল, স্ক্যাপুলা, স্টারনাম, ইত্যাদি ইত্যাদি।—আপাতনস্তক সব।

প্রতিদিন নেড়ে নেড়ে কঙ্কালের সঙ্গে বেশ একটু পরিচয় হতেই তারপর পেশী স্নায়ু শিরা উপ-শিরার দিকে কৌতূহল জাগল। বন্ধুকে বললাম, "এখন তো আর ঘরে বসে হবে না, তোমাদের শবব্যবচ্ছেদ ঘরে দু চারদিন নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। নিজ চোখে না দেখলে ভাল লাগছে না।"

ব্যবস্থা হল। বন্ধুর খুব উৎসাহ ছিল না, কিন্তু আমার উৎসাহের জন্যই তাকে অনেক কষ্ট ক'রে ব্যবস্থা করতে হল।

কিন্তু এইখানে গিয়ে খেলাম এক প্রচণ্ড ধাক্কা। শরীর তত্ত্বে এতদিন আমার যত কৌতূহলই থাক, সেটি ছিল নিতান্তই সৌখিন, কিন্তু ডিসেকশন ঘর, কোনো সৌখিন শিক্ষার্থীর জন্য নয়। এখানে একটি অখণ্ড মানুষ বহু খণ্ডে বিচ্ছিন্ন। আমরা মানুষকে যে ভাবে জানি, সে মানুষকে এখানে বহু ভাগে বিভক্ত অবস্থায় ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির উপাদানরূপে দেখা, অনভ্যস্ত কারো পক্ষেই সহজ নয়।

আমার সমস্ত দেহ মন যেন এক সঙ্গে মোচড় দিয়ে উঠল। প্রায় শুকনো, মাসখানেকের মৃত, একটি মানব-দেহের একটি পচা দুর্গন্ধ অংশ দেখামাত্র সে ঘরের দমবন্ধ করা হাওয়ায় মন যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ল, আমি টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম।

ছিলাম মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। বন্ধু হেসে বলল "জানতাম, সহ্য হবে না।"

কিন্তু আমার এ কি হল। অনেক মৃত্যু দেখেছি, কিন্তু মৃত্যুকে এমন স্থূলভাবে তো কখনো দেখিনি।

মানুষের এই পরিণাম ?

সিদ্ধার্থের কথা মনে জাগল। উপলব্ধি করলাম, তিনিও নিশ্চয় হঠাৎ কোনো উপলক্ষে এমনই পীড়িত হয়ে মানুষের পরিণাম চিন্তা করেছিলেন।

আমি কয়েকদিন স্তম্ভিতবৎ পড়ে রইলাম, কোনো কাজেই কোনো উৎসাহ পাই না, খাওয়াতে সবচেয়ে কম। সুস্থ হতে বেশ কিছু সময় লাগল। শক্ পেয়েছিলাম খুবই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, এতে আমার মনের এমন একটা পরিবর্তন ঘটেছে যাতে শরীর তত্ত্বে আর রুচি নেই। জীবন কি, মৃত্যু কি, এই সব দুরূহতর জিজ্ঞাসায় মন ব্যাকুল।

বন্ধু খুব সহানুভূতির সঙ্গে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল। বলল, "ও নিয়ে ভেবো না কিছু, ভেবে কূল-কিনারা পাবে না।" তবু কি ক'রে পৃথক এক একটি জীবন্ত কোষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটি মানুষ গড়ে তোলে তার পরমাশ্চর্য রহস্য সে আমাকে বোঝাতে লাগল। কি ক'রে কোষবিভক্তি এবং কোষবিভেদ হয়, কি ক'রে সম্পূর্ণ মানুষের দেহটি রূপায়িত হয়ে ওঠে, তার অদ্ভুত সব তথ্য আমাকে বোঝাতে লাগল।

কিন্তু মন তোলে না ওতে। জরা মরণ কি ঠেকানো যায় না কোনো উপায়ে ?

বন্ধু দেখলাম, এ বিষয়ে নির্বিকার। তার ধারণা, ব্যক্তিগত মানুষের মৃত্যু হলেও মানবতা অমর। এই মানবজাতি পৃথিবীতে যখন এসেছিল, আজ সেই মানব-জাতিই বেঁচে আছে, শুধু তারা তাদের উত্তর পুরুষের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত নিজেদের অস্তিত্বকে বদল ক'রে ক'রে চলেছে। এমনি আরও কত যুক্তিপূর্ণ কথা। প্রথম প্রথম ভালই লাগল, কিন্তু বেশি দিন ভাল লাগল না। ব্যাখ্যাটা ভাল, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা কোথায় ? আমি ব্যক্তিটি এ

পৃথিবীতে আর থাকব না, ক্রমে জরাগ্রস্ত হয়ে শুকে মিলিয়ে যাব, এ জেনে নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। এতকালও এ কথা অজানা ছিল না, কিন্তু এমন ক'রে ভাবিনি কখনো। জরা এবং মৃত্যুই যদি মানুষের শেষ কথা, তবে আমি চুপ ক'রে বসে আছি কেন? নিজেকে এর জন্য কতটুকু প্রস্তুত করছি? এমন কি কিছুই করতে পারব না যাতে আমার এই আত্মবিস্মৃত অবস্থা কাটিয়ে উঠে মহাজ্ঞান লাভ করতে পারি? মুক্তির কোনো একটা সন্ধান পেতে পারি?

ঘুরে ফিরে মনে ঐ একই প্রশ্ন। যে মৃত্যু অনিবার্য, তার জন্য আমি নিজেকে কতটুকু প্রস্তুত করেছি? সিদ্ধার্থ ঐ একই সমস্যার সমাধানে চিন্তা করেছিলেন বটগাছের নিচে বসে। আমি করছি এক বোর্ডিং হাউসের ছাতের তলায় তক্তাপোষে বসে।

দিন কাটাচ্ছি প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। বন্ধু বলল "এবারে ঘুমের ওষুধ দিই?" আমি বললাম, "না, আমি ঘুমোতে চাই না।"

বন্ধু আমার সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়াশোনায় মন দিল, আমিও আত্মগত হবার নিরুপদ্রব সুযোগ পেলাম।

প্রায় এক মাস কেটে গেল নিজেকে প্রস্তুত করতে। পরিণাম চিন্তা আগেও করেছি, কিন্তু সে যেন নিতান্তই খেলা। এবারে আর খেলা নয়। চিন্তা করতে করতে অবশেষে একদিন মহাজ্ঞান লাভ হল এবং সেই দিনই দেখে চলে গেলাম।

এবং ফিরেই শরীরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ করলাম। শরীর ছেড়ে গেল, বেআইনীভাবে দখল করা আমার সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করলাম।

তারপর বিয়ে করলাম। তারপর সুখে আছি। জরা মরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছি এখন, দুশ্চিন্তা আর নেই।

পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আগামী ১৯৫৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষের তৈরী অন্ততঃ ১০টি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর বাইরে পাঠানো হবে। সূর্যোদয়ের পূর্বে অথবা সূর্যাস্তের পরে, যখন বেশ অন্ধকার থাকে তখন নক্ষত্র-খোচিত আকাশে দিকচক্রবালের দিকে তাকালেই একটা স্তিমিত আলোক-বিন্দুকে একদিক থেকে আর একদিকে দ্রুতগতিতে ছুটে যেতে দেখা যাবে। সেটিই হবে মহাশূন্যে প্রেরিত মনুষ্য-নির্মিত কৃত্রিম উপগ্রহ বা চন্দ্র। পৃথিবী থেকে উৎপন্ন এই শিশু চন্দ্র প্রতিফলিত সূর্যালোকে আলোকিত হবে।

অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ যেমন ভয়াবহ, বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা করে, এই কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যাপারটা অবশ্য সে রকমের কিছু দর্শনীয় বস্তু হবে না বটে, কিন্তু মানুষের ইতিহাসে এটা যে একটা বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বরূপে পরিগণিত হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তাছাড়া বহির্বিশ্ব সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান সঞ্চয়ের শান্তি-মূলক উদ্দেশ্যে এরূপ ছোট একটু আলোক-বিন্দুকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করবার জন্যে পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিশালী রকেট ছুড়তে হয়েছে—এটাও কম বিস্ময় বা কৌতূহলের কথা নয়। এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১০,০০০,০০০ ডলার খরচ হওয়ার সম্ভাবনা। আগামী আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বছরে ৪০টি বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার পরিকল্পনা করেছেন তাতে এটিই হবে যুক্তরাষ্ট্রের আংশিক অবদান।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পৃথিবীর বাইরে নির্দিষ্ট কক্ষে যাতে ঘণ্টায় প্রায় ১৮,০০০ মাইল বেগে ভ্রমণ করতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সংস্থা সে বিষয়ে চেষ্টা করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিন-পর্যায়ী রকেট ব্যবহৃত হবে। প্রত্যেকটি রকেটের প্রথম অংশ, অর্থাৎ যে অংশ রকেটকে গতিশীল

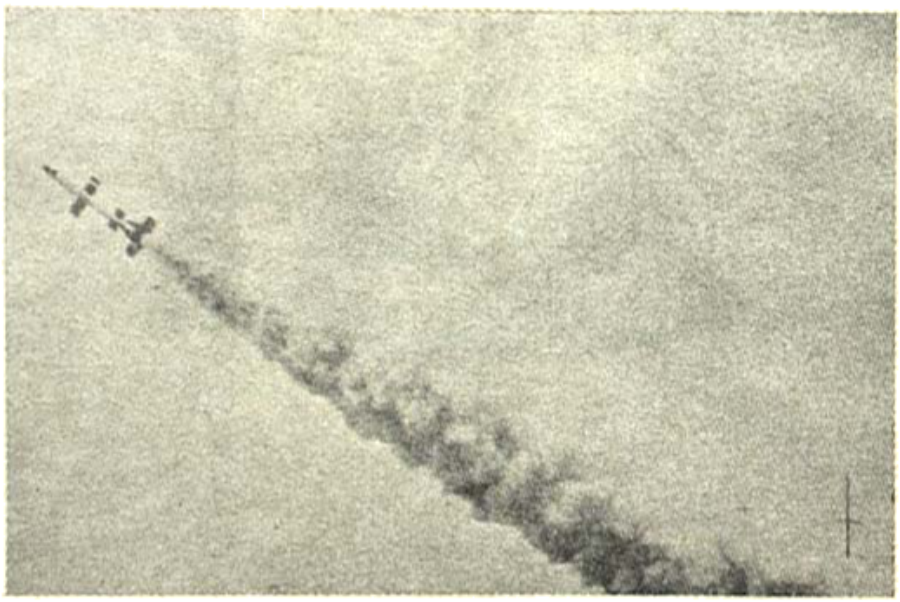

গ্রহান্তরে অভিযানের প্রথম প্রস্তুতি হিসেবে প্রথম যে দু-ষ্টেজ বা তিন ষ্টেজ রকেটের পরিকল্পনা হয়েছে তা চলবার সময় এই রকেট চালিত যন্ত্রের মত দেখা যাবে।

করে তুলবে, সেগুলি হবে নতুন রকমের অধিকতর শক্তিশালী ইঞ্জিন সমন্বিত বিশেষ ধরণের মার্টিন ভাইকিং। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী এই ধরণের ইঞ্জিন তৈরী করছেন। খুব সম্ভব নতুন কোন হাল্কা অথচ খুব শক্ত সঙ্কর ধাতু দিয়ে ইঞ্জিনগুলি তৈরী হবে এবং তার কমাবার জন্যে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন নতুন কোন মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহৃত হবে। যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে ঊর্ধ্বাকাশে পাঠানো হবে, সেগুলি হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগীয় লেবরেটরীতে তৈরী হবে।

এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি দেখতে কি রকম হবে, এদের ভিতরেই বা কি থাকবে এবং ঊর্ধ্বাকাশে থেকে সেগুলি কি করবে?—এসব কথা জানবার জন্যে প্রত্যেকেরই কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কথা হচ্ছে—যেহেতু এখন পর্যন্ত কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী হয়নি এবং এ সম্বন্ধে কারো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই, সে হেতু বিশেষজ্ঞেরাও এ সম্বন্ধে সঠিক জবাব দিতে পারেন না। কিন্তু ঊর্ধ্বতরে বিচরণকারী রকেট, যেমন—ভাইকিং, এগ্রোবি, দ্বি-পর্যায়ী বাম্পার এবং বেলুনবাহিত ডেকন প্রভৃতি ইলেকট্রিক যন্ত্রাদি সহ, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে হলেও ২৪২ মাইল অবধি উঠে সেখানকার অবস্থাদি সম্পর্কে অতি সুষ্ঠুভাবে পৃথিবীতে রেডিও সঙ্কেত প্রেরণ করেছিল। এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির মধ্যেও সেরূপ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সন্নিবেশিত হবে যাতে ঊর্ধ্বতরের অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রেডিও সঙ্কেতরূপে পৃথিবীতে প্রেরিত হবে। এই কৃত্রিম উপগ্রহ অর্থাৎ অধুনা পরিচিত 'মাউস'-এর (পৃথিবী থেকে খুব কম দূরত্বের কক্ষপথে বিচরণকারী আরোহীশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহকে 'মাউস' বলা হয়) নক্সা প্রভৃতির জন্যে কাগজ-পত্রে অনেক কিছুই করা হয়েছে। তাছাড়া কোন কৃত্রিম উপগ্রহকে কোন নির্দিষ্ট কক্ষে যে কোন সময়ের জন্যে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রাম্যমান রাখবার জন্যে ভৌতিক সীমা-

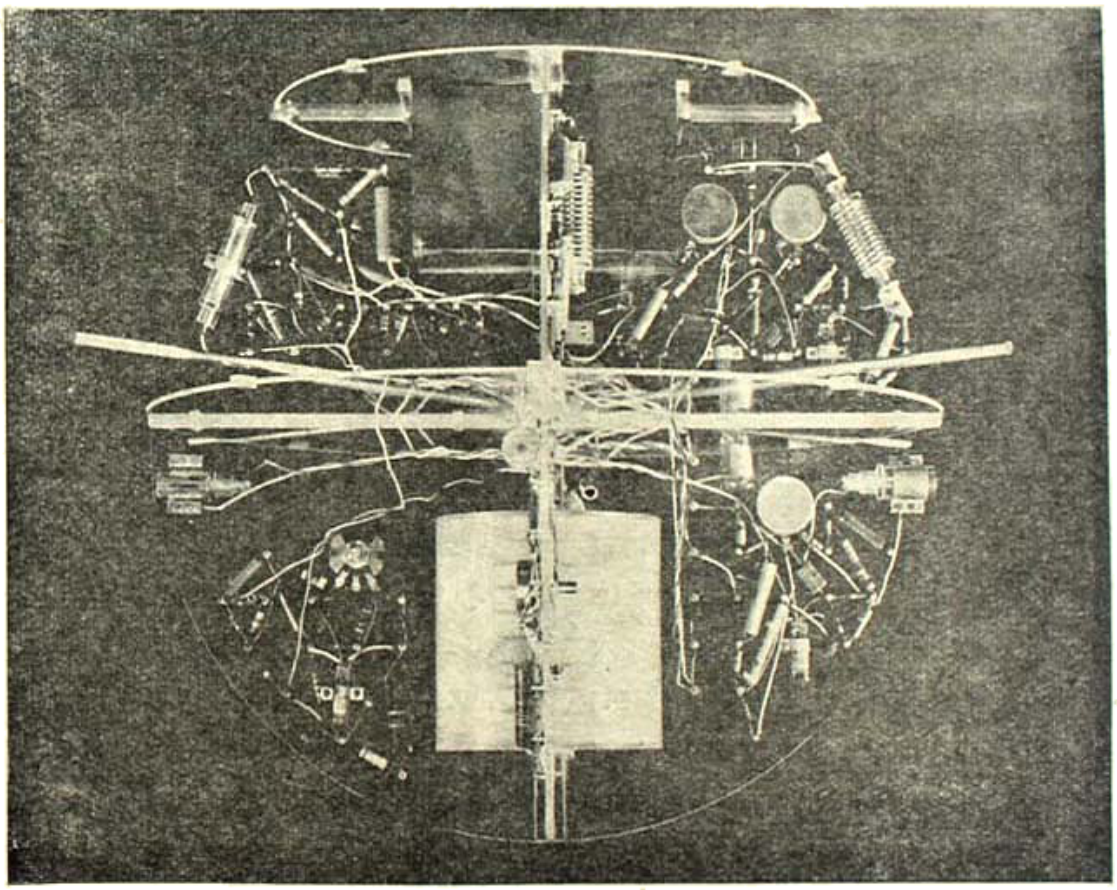

প্লাষ্টিক নির্মিত কৃত্রিম উপগ্রহের ভিতরকার যন্ত্রপাতি মোটামুটি ভাবে দেখানো হয়েছে।

বক্তৃতা এবং প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাদির কথাও জানা আছে। আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংস্থার সদস্যবৃন্দ এবং জানা তথ্যাদি সম্বন্ধে যেসব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তা থেকে এই কৃত্রিম উপগ্রহের আকৃতি, আয়তন, ওজন এবং ভিতরকার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। তিন-পর্যায়ী রকেটের তৃতীয়টি কৃত্রিম উপগ্রহটাকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া মাত্র যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে তাকে কক্ষপথে ঘোরবার জন্যে প্রয়োজনীয় গতিবেগ দিয়ে দিবে। কাজেই কৃত্রিম উপগ্রহের আয়তন কিরূপ হবে, সেটা নির্ভর করবে সেই তৃতীয় রকেটের সর্বশেষ অগ্রভাগের ব্যাসের উপর। রকেটের অগ্রভাগের ব্যাস সম্ভবতঃ ১৫´ থেকে ২০´ হবে। কৃত্রিম উপগ্রহগুলি খুব ছোট হলে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির স্থান সঙ্কুলান হবে না—তাছাড়া পৃথিবী থেকে তাদের দেখাও সম্ভব হবে না। প্রয়োজন বোধে যদি কোন একটি উপগ্রহকে রকেটের অগ্রবর্তী অংশের ব্যাসের চেয়ে বড় করা হয় তবে তাকে রকেটের ভিতরে রাখা যাবে না। তবে গোলকের অর্ধেকটা রকেটের অগ্রভাগের গর্ভে বসিয়ে দিয়ে বিস্ফোরক বোল্টের দ্বারা এঁটে দেওয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে যখন রকেটের জ্বালানী নিঃশেষিত হয়ে যাবে তখনই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় বোল্টটি বিস্ফোরিত হয়ে একটি স্প্রিং-কে মুক্ত করে দিবে। হঠাৎ-মুক্ত এই স্প্রিং-এর প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে কক্ষপথে চলতে থাকবে। উপগ্রহটিকে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখবার জন্যে অবশ্য বিশেষ ধরনের আবরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক হিসাব মতে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি গোলাকার হওয়াই সুবিধাজনক। কারণ লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হওয়ার সময় যে কোন দিকের পৃষ্ঠতল একই রকম দেখাবে। বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে এটা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ তাঁরা উপগ্রহটির উপর বায়ুর টান পরিমাপ করে ঊর্ধ্বস্তরের বায়ুর ঘনত্ব সঠিকভাবে নির্ধারণের চেষ্টা করবেন। এসব তথ্যাদি থেকে ভবিষ্যতের আরও অধিক দূর পাল্লার আকাশ-যান এবং আরোহীশূন্য মহাশূন্য-যানের আকৃতি ও গঠনকৌশল নির্ধারিত হবে।

যে কোন আকারের কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী করা যেতে পারে; কিন্তু আকারে গোল হলেই অনেক বেশী সুবিধা। ধরা যাক, গোল না করে যদি চোঙাকৃতি করা যায় তবে অতি বেগে চলবার মুখে হোচট খাওয়ার মত একটা অবস্থা ঘটতে পারে। সেরূপ অবস্থা ঘটলে রেডিও সঙ্কেত প্রেরক যন্ত্রের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া কৃত্রিম উপগ্রহ বহনকারী রকেটের অগ্রভাগের সঙ্কীর্ণতার কথা বিবেচনা করেই উপগ্রহের আকৃতির বিষয় নির্ধারিত হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের বহিরাবরণ বেশ অথচ শক্ত হওয়া দরকার। কাজেই স্বভাবতঃ অ্যালুমিনিয়ামের কথাই মনে হয় কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যেসব বিষয়ে তথ্যাদি সংগৃহীত হবে তার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় একটি হচ্ছে, আয়নোস্ফিয়ার এবং তার বাইরে যে অজ্ঞাত তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে তার সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা। ম্যাগ্নেটোমিটারের সাহায্যে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু ম্যাগ্নেটোমিটার থেকে যথাযথ কাজ পেতে হলে উপগ্রহের আবরণটি সম্পূর্ণরূপে তড়িৎ-অপরিচালক এবং চৌম্বকত্ব বর্জিত হওয়া দরকার। কাজেই অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য কোন সঙ্কর ধাতুর সাহায্যে উপগ্রহের বহিরাবরণ নির্মাণের প্রশ্নই ওঠে না। প্লাষ্টিকই এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী; কাজেই অন্ততঃ একটি উপগ্রহও প্লাষ্টিক দিয়েই তৈরী হবে। প্লাষ্টিক আবরণীর দুধের মত সাদা পৃষ্ঠদেশ খুব বেশী পরিমাণে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করবার ফলে পৃথিবী থেকে উপগ্রহটিকে বেশ ভালভাবেই দেখা যাবে বলে মনে হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহের ওজন সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে, উপগ্রহটি যদি তৃতীয় পর্যায়ের রকেটে ৩০০ মাইল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং কক্ষপথে গতি হয় তার ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল তবে তার সর্বোচ্চ ওজন কত হতে পারে তার একটা হিসাব আছে। সে হিসাবে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট ও তার জ্বালানী পদার্থের ওজন বাদ দিলেই উপগ্রহটির ওজন কত হওয়া উচিত তা জানা যেতে পারে। এর উপর এক পাউণ্ড ওজন বৃদ্ধি করলে তার জন্যে ৩০০ পাউণ্ড অতিরিক্ত জ্বালানীর প্রয়োজন হবে, বর্তমানে যেসব রকেট আছে

তাদের পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব করলে দেখা যায়—এরূপ এক একটা কৃত্রিম উপগ্রহের ওজন ৩০ পাউণ্ডের মত হতে পারে।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির ভিতরে থাকবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রাহক যন্ত্রপাতি। ঊর্ধ্বস্তরে প্রেরিত এসব উপগ্রহ বা যন্ত্রপাতির পুনরুদ্ধারের কোনই সম্ভাবনা নেই, কারণ এগুলি ঊর্ধ্বস্তর থেকে নিম্ন স্তরের ঘন বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অবতরণ করবার সময় ধ্বংস হয়ে যাবে অথবা উল্কার মত পুড়ে নিঃশেষিত হবে। কাজেই ওইসব প্রত্যেকটি যন্ত্রের সাহায্যেই ঊর্ধ্বস্তরের জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সঙ্গে সঙ্গে রেডিও-সঙ্কেতরূপে পৃথিবী-পৃষ্ঠের ষ্টেশনসমূহে প্রেরিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এসব প্রেরক যন্ত্র এবং ইলেকট্রনিক রিসার্চের যন্ত্রপাতি চালু রাখবার জন্যে শক্তির যোগান দেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে মার্কারী ব্যাটারী ব্যবহারের প্রস্তাব হয়েছে। এই ব্যাটারী খুবই নির্ভরযোগ্য এবং চালু না থাকলে খুব কম শক্তিই নষ্ট হয়। সৌরশক্তি চালিত ব্যাটারীর কথা অবশ্য বিবেচনা করা হয়নি—কারণ এগুলি সবে মাত্র নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে; তাছাড়া সব সময়ে ঠিক ভাবে কাজ করবে কিনা, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই। তবে যে কোন ব্যাটারীই শক্তির উৎসরূপে ব্যবহৃত হোক না কেন, সারাক্ষণ চালু থাকলে পুরা একদিনেরও শক্তি যোগানে দিতে পারবে না। কাজেই পৃথিবীর ষ্টেসন থেকে রেডিও তরঙ্গ যোগে প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে, অর্থাৎ উপগ্রহটি যখন কক্ষের সুবিধাজনক স্থানে আসবে তখন সঙ্কেত গ্রহণ ও প্রেরণের উদ্দেশ্যে—কিছুক্ষণের জন্যে চালু অথবা বন্ধ করে দেওয়া যাবে। পৃথিবী থেকে প্রেরিত এই বেতার তরঙ্গ ধরবার জন্যে উপগ্রহের মধ্যে একটি গ্রাহক যন্ত্রও থাকবে। এতে প্রায় ১/৪ ওয়াটের মত শক্তি ব্যয় হবে। পৃথিবী থেকে প্রেরিত রেডিও-সঙ্কেত ধরবার জন্যে এই প্রেরক যন্ত্রটি সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে এবং পৃথিবী থেকে আগত রেডিও-সঙ্কেত অনুযায়ী কখনও ফিলামেণ্ট বা টিউবকে প্রজ্বলিত করবে, কখনও বা বন্ধ করে দিবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের একবার কক্ষ পরিক্রমায় সময় লাগবে ৯০ মিনিট এবং একদিনে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় ১৬ বার পৃথিবী

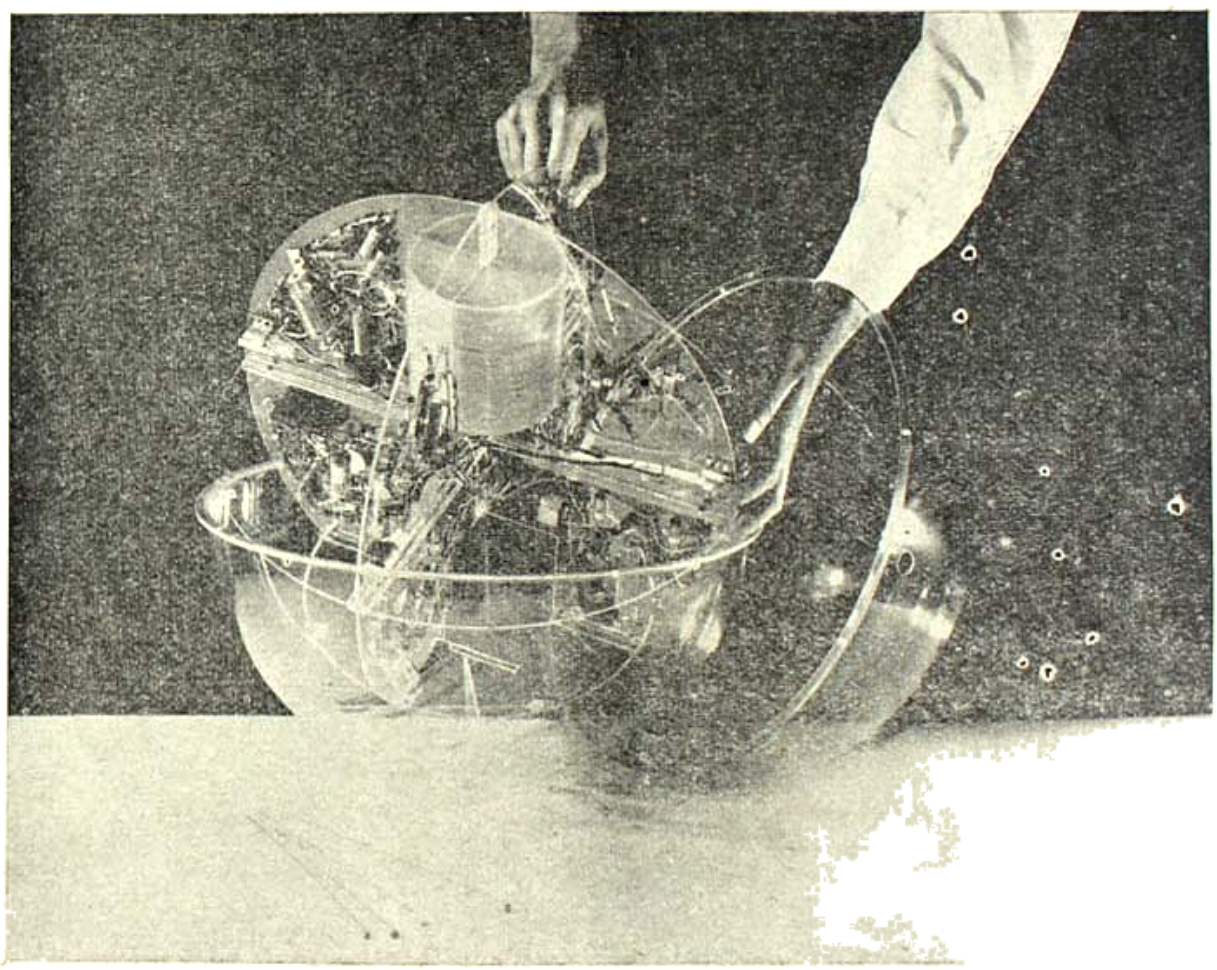

কৃত্রিম উপগ্রহের প্লাষ্টিকের ঢাকনাটি খুলে ভিতরকার যন্ত্রপাতিগুলিকে কাঠামোসমেত বের করা হচ্ছে।

প্রদক্ষিণ করবে। ৩০ পাউণ্ডের একটা উপগ্রহের মধ্যে যে ব্যাটারী থাকবে তার তড়িৎস্রোত প্রবাহের পথ যদি প্রত্যেকবার পরিভ্রমণের সময় মাত্র ৫ মিনিটের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া যায় তবে সঙ্কেত প্রেরক ও অন্যান্য যন্ত্রগুলিকে ১৫ দিনেরও বেশী সময় চালু রাখা যাবে। ২০০ মাইল দূরে থেকে কোন উপগ্রহকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হলে তার পক্ষে সেই কক্ষে অবস্থান করবার এই হলো সম্ভাব্য সময়। কিন্তু প্রস্তাবিত কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে হয়তো ৩০০ মাইল দূরে থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে। ৩০০ মাইল দূরের কক্ষপথে এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি খুব সম্ভব এক বছর অবধি অবস্থান করতে পারবে। অবশ্য যদিও এরা ১৫ দিনের বেশী পৃথিবীর কোন রেডিও সঙ্কেত গ্রহণ বা সেখানকার কোন রেডিও সঙ্কেত প্রেরণ করতে পারবে না; তথাপি ঊর্ধ্বাকাশে এগুলি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবেই পরিগণিত হবে। কারণ পর্যবেক্ষকেরা রেডিও অথবা আলোক রশ্মির সাহায্যে এর উপর বারুদ টান লক্ষ্য করে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তর সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ চালাতে পারবেন। তাছাড়া পৃথিবীর আকার, আয়তন সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্যে জিওডেটিক গবেষণার পক্ষে সুবিধা হবে।

যতগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ ঊর্ধ্বাকাশে পাঠানো হবে তাদের প্রত্যেকটির সাহায্যেই বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা। তাছাড়া প্রত্যেকটি উপগ্রহেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকবে। কারণ এসব উপগ্রহের সাহায্যে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে; যেমন—সূর্যের আলট্রাভায়োলেট ও এক্সরশ্মি, তড়িৎপ্রবাহ এবং চৌম্বক প্রভাব, কসমিক রশ্মি, ক্ষুদ্রাকৃতির উল্কা, হাইড্রোজেন এবং আয়নের ঘনত্ব ইত্যাদি। কাজেই এর প্রত্যেকটি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি একটি উপগ্রহের মধ্যে সন্নিবেশিত করা সম্ভব নয়। কাজেই সম্ভবতঃ বিভিন্ন উপগ্রহে বিভিন্ন রকমের গবেষণা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে। যেমন—জলবায়ু, আবহাওয়া সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্যে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এই সর্বপ্রথম ফটোন কাউণ্টার বসানো হবে। আয়নোস্ফিয়ারের ভিতরে ও বাইরে যে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হয়, দূর পাল্লার সঙ্কেতাদি আদান-প্রদানের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা। এজন্যে খুব সম্ভব প্রোটন প্রিসিসন ম্যাগনেটোমিটার নামে এক বিশেষ রকমের যন্ত্র স্থাপিত হবে। এই যন্ত্রটিকে নিউক্লিয়ার রেজোনেন্স ম্যাগনেটোমিটারও বলা হয়। উপগ্রহের মধ্যে এর ব্যবস্থা হবে এরূপ—

একটি ছোট্ট প্লাষ্টিকের চৌবাচ্চা সাধারণ জলে পূর্ণ থাকবে। তার মধ্যে ডুবানো থাকবে একটা তামার তারকুণ্ডলী। এই তারকুণ্ডলীর সঙ্গে একটা প্রোগ্রামার সংযুক্ত। পৃথিবী থেকে বেতার সঙ্কেত গিয়ে তাকে সক্রিয় করে তোলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার কুণ্ডলীটাকে প্রতি সেকেণ্ডে পরিবর্তীভাবে একবার সক্রিয় আবার নিষ্ক্রিয় করে তুলবে। যেই মাত্র কুণ্ডলী সক্রিয় হবে তৎক্ষণাৎ জলের হাইড্রোজেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি চুম্বকের মত সারবন্দি হয়ে পড়বে। কিন্তু পরমুহূর্তেই কুণ্ডলীটা নিষ্ক্রিয় হওয়া মাত্র এই সারবন্দি নিউক্লিয়াসগুলি স্থান পরিবর্তন করে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে ঘুরে যাবে। নিউক্লিয়াস-গুলির এরূপ নড়াচড়ার ফলে তারকুণ্ডলীর মধ্যে অতি ক্ষীণ বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়, সেই ক্ষীণ প্রবাহই অ্যাম্-প্লিফায়ারের সহযোগে পরিবর্ধিত হয়ে নির্দিষ্ট সঙ্কেতে পরিণত হবে এবং রেডিও-সঙ্কেত রূপে পৃথিবীর পৃষ্ঠে এসে পৌঁছবে।

এই হলো কৃত্রিম উপগ্রহের নির্মাণ-পরিকল্পনার মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আপাত দৃষ্টিতে এটাকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে নাও মনে হতে পারে; কিন্তু পৃথিবী ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে মানুষের বাস্তব জ্ঞানের প্রসারতার জন্যে এই ব্যাপারে বিজ্ঞান যে অভাবনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিবে, সেকথা মানুষ চিরকাল বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করবে।

[পপুলার সায়েন্স মান্থলি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হার্বার্ট ও জোহানসের প্রবন্ধ অবলম্বনে। ছবিগুলিও উক্ত ম্যাগাজিনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

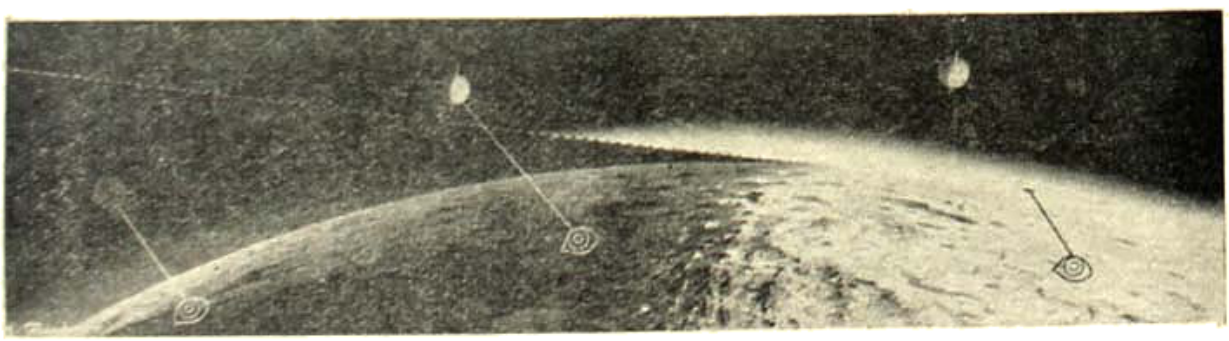

সন্ধ্যা অথবা উষার অন্ধকারে পৃথিবী থেকে কৃত্রিম উপগ্রহকে যেরূপ দেখাবে।

বিলম্বিত শিক্ষা

শ্রীকালিদাস রায়

সুধীর আমাদের সঙ্গে পড়িত, সে ছিল পয়লা নম্বরের ফাঁকিদার। যাহাই হউক, আমাদের সঙ্গেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়া—কলেজেও সে বছর খানেক পড়িয়াছিল—তারপর পড়া ছাড়িয়া দিল। দীর্ঘকাল কেরাণীগিরি করিয়া এখন রিটায়ার করিয়াছে।

সেই সুধীরের সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে দেখা। কার্য্যগতিকে একদিনের জন্য তাহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম। তাহার সঙ্গে নানাবিধ কথাবার্ত্তায় সারাদিন কাটিল। অবাক হইলাম তাহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া। সকল বিষয়েই তাহার জ্ঞান সাধারণ এম-এ-দের চেয়ে ঢের বেশি। সুধীরের ছেলেরা কৃতবিদ্য হইয়া বড় বড় কাজকর্ম্ম করিতেছে—একজন অধ্যাপক। একটি মেয়ে এক স্কুলের হেড মিসট্রেস। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

তুমি সেই সুধীর, পণ্ডিতের ঘণ্টায় ক্লাস থেকে পালাতে। পরীক্ষার হলে একাধিক বার তোমার unfair means ধরা পড়েছিল, কখনও সব subjectএ পাশ করনি। তুমি এত বিদ্যে কোথা হ'তে পেলে, বল দেখি!

সুধীর—দেখ, তোমরা জানো, বাপের কাছে ছেলে মেয়েরা শেখে, ছেলেমেয়েদের কাছে যে বাপ শিখতে পারে কত, তার খবর রাখ? দেখ ছোট দুটি ঘরে থাকতাম। আমার শোবার ঘরেই ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে বাধ্য হ'ত। ছেলেমেয়েরা স্কুলকলেজে পড়বার সময় গলা ছেড়ে পড়ত, আমি শুনতাম, তা হতে অনেক শিখেছি।

আমি—তাতে আর কতটুকু শেখা যায়?

সুধীর—শোন, ছেলেমেয়েরা বিবিধ বিষয় পড়েছে—আমি প্রত্যেক বিষয়ে তাদের সতীর্থ। স্কুলে তারা যখন পড়ত, তখন আমি তাদের পড়াশুনায় সাহায্য করতাম, তাতে ক'রে স্কুলের বিষয়গুলো আমার বেশ অধিগত হ'লো। তারপর কলেজে গেলেও তারা অভ্যাসবশে আমাকে এটা ওটা জিজ্ঞাসা করত। আমি দেখলাম বুক্‌লিস্ট—তাদের বইগুলো পড়ে নিয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতাম, পরে মেজো সেজো ছেলে ও দুই মেয়েকে কলেজের পড়ায় বেশ সাহায্য করতে পারতাম। বড় ছেলে যখন বি-এ পড়ে তখন আমার Economics ও history বেশ ভালো করেই পড়া হ'ল। মেজো ছেলে যখন I.Sc., B.Sc. পড়ত তখন বিজ্ঞানে আমার বেশ দখল হ'ল—Mathematics-টার দিকে আমি বিশেষ আগাইনি। দুই মেয়েকে বি-এ পর্য্যন্ত আমি বেশ পড়িয়েছি, তাদের সঙ্গে পড়ে নিয়েই।

আমি—কোন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শুনেছি আই-এ ফেল ছিল, বি-এ পর্য্যন্ত সে এমন পড়াত যে ছেলেরা ধরতেই পারেনি—তার তথাকথিত বিদ্যা আই এ পাশের বেশি নয়। বুদ্ধিমান লোক ইচ্ছা করলে বাড়ী ব'সে পড়াশুনো ক'রে যে বিদ্বান্ হতে পারে—সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুধীর—আমার তৃতীয় পুত্রটি অধ্যাপক, জানো বোধ হয়—সে খুবই বুদ্ধিমান। এ ছেলেটি বি-এ Honours এ Ist. Class 2nd এবং এম-এ পরিক্ষায় Ist. Class 3rd হয়েছিল। সে যখন বি-এ, এম-এ পড়ত তখন আমি অনেকটা advanced. তার সঙ্গেই আমি বি-এ, এম-এর Course সবই পড়েছি। যখন যা বুঝতাম না—তার কাছে বুঝে নিতাম, তার সঙ্গে তার অধ্যেতব্য বিষয় নিয়ে discussion করতাম, তর্ক করতাম, অনেক

কিছু শিখে নিতাম। সেই আমার প্রধান শিক্ষক। সে আমার friend, philosopher, guide.

আমি—ও হে তুমি অধ্যেতব্য কথাটা ব্যবহার করলে—অনেক সাহিত্যিক বা বাংলার এম এ বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকেরাও যে ও কথাটা জানে না—তারা বলে অধীতব্য। সংস্কৃতও জানো দেখছি।

সুধীর—বড় মেয়ে সংস্কৃতে সুশিক্ষিতা, সে কাব্য ব্যাকরণ-তীর্থও বটে। সেই একদিন বললে 'বাবা ওটা অধ্যেতব্য হবে। অধীতব্য নয়। আমি সেই সুধীর, যে পণ্ডিতের ক্লাস হতে পালিয়ে বেড়াত। আজ আমার ব্যাকরণ কৌমুদী চারভাগ কণ্ঠস্থ। মেয়েটা সংস্কৃত Honours ও এম-এ পড়েছিল ব'লে আমি সংস্কৃত সাহিত্যও পড়েছি। সিদ্ধান্ত কৌমুদীও পড়েছি। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক শ্লোক মুখস্থ। তুমি আমার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা ক'রে দেখ।

দেখ যারা দোতালায় বাস করে সারা দিন, আর ছেলে মেয়েরা পড়ে Private Tutorএর কাছে নীচের তলার একটা ঘরে, সে ঘরের দিকে কখনও তাকায় না, সে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খবর পায় বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলের রিপোর্ট কিংবা মেজেন্ট দেখে, তারা নতুন কিছুই শেখেনা, যা শিখেছিল তাও ভুলে যায়, ক্রমে তারা rusticated হয়ে যায়, মূর্খের স্তরে নেমে আসে!

আর যাদের ছেলেপুলে তাদেই ঘরে বসে লেখাপড়া করে তার, বিদ্যা থাকলে সেটা তাদের থাকে কিংবা যাড়ে, আর না থাকলে সে বিদ্যা আয়ত্ত করে। আমি ছেলেমেয়েদের কাছে শিখতে লজ্জা বোধ করিনি। দারিদ্র্যের জন্য তাদের পৃথক ঘর দিতে পারিনি। বুড়ো বয়সেও পড়াশুনা করতে দ্বিধাবোধ করিনি, যাদের কাছে তাদের সব বইগুলো পেয়েছি। ইংরাজি সাহিত্যের বইগুলোর annotated edition পেয়েছি, তাদের খাতার লেখা notes পেয়েছি, তাদের অধ্যাপকরা কি শিখিয়েছে, জিজ্ঞাসা ক'রে তা জেনে নিয়েছি—এইগুলোই আবার প্রয়োজন হ'লে ছেলেদের বুঝিয়ে দিয়েছি। আমি মূর্খ, তবু আমার সংসর্গ পেয়ে ছেলে মেয়েরা এত বেশি লেখা পড়া শিখতে পেরেছে—ওদের লেখাপড়ার অনুরাগ দেখে বিদ্যার মর্ম্ম আমি বুঝেছি, তাই। ছাত্রজীবনে এ অনুরাগ লাভের কোন Source ছিল না আমার। পুত্র যে অধ্যাপক সে ছাড়া আমি এখন অন্য ছেলে মেয়ের লেখা ইংরাজি বাংলা revise বা improve ক'রে দিতে পারি। বিদ্বান পুত্রের মূর্খ বাপ মর্য্যাদা পায় না। আমাকে তাই অনেক খেটে বাপের মর্য্যাদা রাখতে হয়েছে। কোন ছেলে মেয়ে আমাকে আজ old fool ব'লে উপেক্ষা করতে পারবে না। এ ছাড়া লেখাপড়া শেখার আমার অন্য উদ্দেশ্য নেই। আমি এ বয়সে পরীক্ষা দিতেও যাব না, আর নতুন চাকরি করার বয়সও নেই। বিদ্বানের মান খাতিরও চাই না। পাশটাশ না করার জন্য আমার আর লজ্জাবোধও হয়না।

আমি—বুঝলাম। পুত্রের কাছে মিত্রের কাছে যেমন শিখতে পারা যায়, ছাত্রের কাছেও শিক্ষকেরাও তেমনি অনেক শেখে। ছাত্র পড়াতে গিয়ে আমাদের অনেক কিছু নতুন শিখে নিতে হয়েছে, তা ছাত্রদেরই দান। তারা এমন প্রশ্ন করেছে যার উত্তর দিতে বেশ কিছু পড়ে শুনে নিতে হয়েছে। আনকোরা এম-এ, বি-টি আর বিশ বছর মাষ্টারি করা বি-এ-র মধ্যে বিদ্যার অনেক তফাৎ—এমন কি Experienced Under Graduate এর সঙ্গেও বেশ তফাৎ দেখা যায়। কারণ, এরা বহুদিন ধরে পড়াতে পড়াতে প্রত্যহ নিত্য নতুন তথ্য শিখেছে। প্রাইভেট টিউটররা ছাত্রদের নানা বিষয় পড়াতে গিয়ে অনেক কিছু শেখে। ছাত্রদের প্রত্যক্ষ দানও আছে—তাদের খাতার উত্তর পড়েও শিক্ষক ও পরীক্ষকরা শিখতে পারে। ছাত্র খুব বুদ্ধিমান্ হ'লে তার কাছেও শেখা যায়।

সুধীর—প্রাচীনকালের মত বস্তুত এখনও বিদ্যার বিনিময় আছে। "অথবা বিজ্ঞতা বিদ্যা পুত্রেণেন ধনেন বা।" সব বিদ্যা সবার জানা থাকে না। রামের যে বিদ্যা জানা আছে শ্যামের তা জানা নেই। রাম শ্যামকে তার বিদ্যা

শেখালেন—গ্রাম রামকে তার বিদ্যা শেখালেন। এও-ত ছাত্রের কাছে গুরুর শিক্ষা।

আমি—পুরাকালে কত গুরু ধীমান্ ছাত্রের কাছে অনেক কিছু শিখে নিতেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীর শ্রীমন্তের গুরু জনার্দন পণ্ডিতের মত গুরু-অভিমান না থাকলে অথবা পঙ্কবর নিম্নের মত গুরু অভিমান না থাকলে অনেক গুরুই শিষ্যের কাছেও অনেক কিছু শিখে নিতে পারেন বৈ কি।

সুধীর—তোমার নাথসাহিত্যে গোরক্ষনাথের গুরু ছিলেন মীননাথ। মীননাথকে যখন গোরক্ষনাথ উদ্ধার ক'রে তার মাঝে মহাজ্ঞানকে আবার জাগিয়ে তুললেন—তখন গোরক্ষনাথই ত মীননাথের গুরু হ'লেন।

আমি—দেখ আমরা নিম্নশ্রেণীর মূর্খ লোকদের কাছেও কত শিখতে পারি।

সুধীর—পারিইত! তাই সেই সতী বৈষ্ণবকন্যা এক উগ্র তপস্বীকে ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ধর্ম্মব্যাধের কাছে—একটা কশাইএর কাছে পাঠিয়েছিলেন। মহাভারতে ১টা গল্প আছে নয়? তোমারি একটা কবিতায় পড়েছিলাম,—মহাদাতা নামে খ্যাত জাফর একটা ক্রীতদাসের কাছে শিখ্‌ল—কাকে আসল বদান্যতা বলে।

আমি—আমরা যদি শিখতে চাই, যদি অবজ্ঞা না করি—তাহলে একজন চাষী, মালী, জেলে বা গোয়ালার কাছেও অনেক কিছু শিখতে পারি। কেবল নতুন নতুন জ্ঞানলাভের আগ্রহ থাকলেই হ'ল।

সুধীর—আরে অধিক কথা কি—এদেশে সাহেবরা এমন কি আই-সি এস সাহেবরা খানসামাদের মুখের কথা শুনে শুনে হিন্দী শিখ্‌ত। বুদ্ধিমান পণ্ডিত লোক তারা, সহজেই শিখে নিয়ে বেশ হিন্দী বলতে পারত।

দেখ বাংলার বৌদ্ধযুগে ভদ্রজাতির জ্ঞানী লোকেরাও হাড়িডোমের কাছেও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করেছে।

আমি—নিম্ন শ্রেণীর বড় গায়কের কাছে অভিজাত বংশের লোকে গান শিখেছে এরূপ দৃষ্টান্ত আমি জানি।

আগেকার কবিরাজরা মালের কাছে বিষ চিকিৎসা শিখত, একথা আমাদের বৈদ্যসমাজে প্রচলিত আছে।

সুধীর—মোটকথা হচ্ছে—চাই শিখবার আত্যন্তিক আগ্রহ। শিক্ষক কে নয়? চরাচর গ্রাবর জঙ্গম সবাইত গুরু। বাউলের গানে শোননি?

গুরু ব'লে কারে প্রণাম করবি ওরে মন।
ও তোর—অতিথ গুরু পথিক গুরু
ও তোর গুরু অগণন।

মানুষের ত কথাই নেই পশুপক্ষীরাও আমাদের নিত্যই শিক্ষা দিচ্ছে। প্রকৃতিই কি আমাদের কম বড় গুরু? অভিমান ত্যাগ ক'রে শিষ্যের মনোভাব নিয়ে তাকাও দেখবে চারদিকেই শিখবার বিষয়—চারদিকেই শিক্ষক।

Wordsworth এর সেই lineগুলো মনে আছে?

One impulse from a verual wood
May teach you more of man.
Of moral evil and of good
Than all the sages can.
Enough of Science and of art
Close up those barren leaves,
Come forth and bring with you a heart
That watches and receives,

অভাব হচ্ছে সেই heart-এর যা watches and receives. ভাই, বুদ্ধি সবার অল্প বয়সে খোলে না—কারো কারো দেরিতে খোলে। আমার একটু দেরি হয়েছে। অনুকূল যোগাযোগ না হলে ত সুপ্ত শক্তিরও জাগরণ হয় না।

আমি নিজে স্কুল পলানো সুধীরের কাছে অনেক কিছু শিখিলাম। প্রধান শিক্ষা—প্রত্যেক পিতারই নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নতুন করিয়া শিক্ষালাভ করা উচিত। তাহা হইলে নিজের বিদ্যা বুদ্ধি বেশ তাজা থাকে, অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। আর, কোন ছেলেমেয়ে শিক্ষাবিমুখ বা বিদ্যায় অনুন্নত থাকে না, পরীক্ষাতেও অকৃতকার্য্য হয় না।

অধিকার

[গল্প]

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পত্রখানা হাতে নিয়ে স্বামীর অফিস কামরায় প্রবেশ করলেন কণিকা—

মুখ তুলে একবার চাইলেন মিঃ উদয়ন চৌধুরী তারপর আবার ফাইল দেখতে মন দিলেন, স্ত্রীর দিকে মনঃসংযোগ করবার সময় তাঁর এখন নাই।

কণিকা তা বোঝেন,—

হয়তো স্বামীর কাজের গুরুত্ব বুঝে চলেই আসতেন তিনি, কিন্তু নিজের অফিসটা মনে করে ঠিক সামনাসামনি টেবলের ওদিকে চেয়ারটা সশব্দে টেনে নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধে ঘোষণা করে বসলেন।

বিরক্ত মিঃ চৌধুরী চোখ তুলতেই তিনি হাতের খোলা পত্রখানা তাঁর সামনে রাখলেন। পত্রের দিকে চোখ রাখতেই বিবর্ণ হয়ে উঠলো মিঃ চৌধুরীর মুখখানা।

পিতা তাঁর কাছে আসছেন শেষ বয়সে পুত্র পুত্রবধূর কাছে তিনি থাকতে চান।

হাতের ফাইল সরিয়ে ফেলে মিঃ চৌধুরী গর্জন করে ওঠেন, "না না ওসব চলবে না কণি, তাঁর এখানে আসা বা থাকা হবে না। তুমি এখনই একখানা টেলি পাঠাও—এখানে আসা চলবেনা।"

মিসেস চৌধুরী শান্তকণ্ঠে বললেন, "কিন্তু কেন আসা চলবে না শুনি? নিজে তিনি আসতে চাচ্ছেন—তোমার বাবা—ছেলের কাছে শেষ বয়সে থাকতে চান, তোমার তাতে অমত কেন?"

"অমত কেন—

মিঃ চৌধুরী রুখে ওঠেন, "কেন অমত? তিনি কখনও আমায় দেখলেন না, চিরদিন আজ বৃন্দাবন কাল মথুরা পরশু পুরী এমনই করে কাটালেন, আমার সঙ্গে মা মারা যাওয়ার পর সম্পর্ক রাখেন নি। আমি মামার বাড়ী মানুষ হয়েছি—অবশ্য বাবা যথেষ্ট টাকা রেখে গিয়েছিলেন। তোমার বিয়ের পর একদিন মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্যে তিনি তোমায় আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন সেই চেহারাটা একবার মনে কর কণি—"

কণিকার মনে সেই শান্ত সৌম্য বৃদ্ধের মূর্তিটাই জেগে উঠেছে। স্থূল দেহ, কণ্ঠে বাহুতে তুলসী মালা, মুখে বুকে হরিনামের ছাপ। একখানি মোটা ধুতি পরণে, গায়ে নামাবলী, পায়ে খড়ম, স্কন্ধে হরিনামের ঝুলি।

পত্নীর মৃত্যুর পরে চার বছরের ছেলেটীকে শ্বশুরবাড়ী দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি বালিগঞ্জের বাড়ী সব তার নামে লেখাপড়া করে তিনি সংসার ত্যাগ করে গেছেন। পুত্র বড় হল, মানুষ হল, পিতা আর ফিরলেন না। পুত্র উচ্চ শিক্ষার্থে ইউরোপে গেলেন, দেশে ফিরে বিবাহ করলেন নিজের মনোনীত পাত্রী কণিকাকে, মামাদের মত নেওয়ার আবশ্যকতা পর্যন্ত বোধ করেন নি। মনে যথেষ্ট আঘাত পেলেও দুই মামা নিজেদের কর্তব্য পালন করে সরে গেছেন, আশীর্বাদ করে গেছেন যেন তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখ ও শান্তিতে কাটে।

মামারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ,—চাকরী তাঁদের সম্বল, ভাড়া বাড়ীতে কোন রকমে বাস করেন। মামার বাড়ীর মেয়েরা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করলেও মত তাঁদের একেবারে প্রাচীন কালের, পূজার্চনা সন্ধ্যাহ্নিক সে বাড়ীতে রীতিমত চলে।

বালো তাঁদেরই কাছে প্রতিপালিত হলেও কৈশোরে উদয়ন চৌধুরী জিদ করে বোর্ডিংয়ে ছিলেন তখন হতেই তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায় তার পর নিজের জিদেই তিনি ইউরোপে যান—সেখানেই কণিকা ও তাঁর পিতার সঙ্গে পরিচয় হয়।

ফেরে ফিরে উদয়ন চৌধুরী মামাদের নিকট হতে নিজের জিনিস টাকাকড়ি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিলেন। ছোটমামা কিঞ্চিৎ রুখে উঠেছিলেন কিন্তু ধর্মভীরু বড়মামা ভাগ্নিনেয়ের সমস্ত জমা সম্পদ হিসাব সহ মিটিয়ে দিয়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

বিবাহের সংবাদ পেয়ে দুই মামা, দুই মামী এবং তাঁদের ছেলে মেয়েরা বালিগঞ্জের বাড়ীতে এসেছিলেন, আশীর্বাদ করে গেছেন, তারপর আর কেউ আসেন নি।

এসেছিলেন পিতা শুভময় চৌধুরী—

মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য।

উদয়ন চৌধুরী পিতাকে প্রণাম করেন নি, জড় দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মচারী মূর্তির পানে তাকিয়ে ছিলেন। মনে দারুণ অস্বস্তি জেগেছিল। অতি আপটুডেট এবং গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি, তাঁর বাড়ীতে আজ আসছে তাঁর কত বন্ধু বান্ধব, এর মধ্যে এই মুণ্ডিত মস্তক তুলসীমালা ও গেরুয়াধারী সর্বাঙ্গ হরি নাম সংবলিত লোকটির কি পরিচয় তিনি দেবেন ?

কিন্তু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পায়ের ধূলা মাথায় নিয়েছিলেন কণিকা, অত্যাধুনিকা এবং বিলেতে ডিগ্রি ধারিণী কণিকা চৌধুরী। পুত্রবধূকে দেখে ভারি খুসি হয়েছিলেন ব্রহ্মচারী শুভময় তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন "তোমার দেশের সতী কীর্তিকে তুমি অক্ষয় রেখো মা, তাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো তোমার কাজের মধ্যে।"

সামান্য উপহার এনেছেন তিনি,—দুগাছি শাঁখা এক কৌটা সিন্দুর; পুত্রবধূর হাতে উপহার দিয়ে পুত্রের ভ্রূকুটিপূর্ণ মুখের পানে তাকিয়ে একটু হেসে বিদায় নিয়েছেন তিনি, তার পর এই তিনবৎসর তাঁর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নি।

(২)

দৃঢ়কণ্ঠে কণিকা জানিয়েছেন—শুভময় নিশ্চয়ই তাঁর নিজের বাড়ীতে আসবেন পুত্র পুত্রবধূর কাছে, এতে উদয়ন চৌধুরীর কোন কথা বলবার অধিকার মাত্র নাই।

থতমত খেয়ে যান উদয়ন, স্ত্রীর কঠোর মুখের পানে তাকাবার সাহস তাঁর থাকে না।

তবু শুধু হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে বলেন, "চমৎকার, পুত্র এবং পুত্রবধূ; কিন্তু জানো কণিকা, চারবছর বয়সে তিনি আমায় ওই অশিক্ষিত গ্রাম্যপ্রকৃতি মামা মামীর কাছে ফেলে রেখে চলে গেছেন। আমি নেহাৎ নিজের শক্তিতে এত বড় হয়েছি, নচেৎ কি হতাম তা কে জানে। যে ছেলে তার বাপের পরিচয় মাত্র জানে না, আজ সেই ছেলের কাছে বাস করতে আসতে তাঁর এতটুকু বাধছে না—এই না আশ্চর্য।"

অসহিষ্ণু কণিকা উত্তেজিত হয়ে বলেন, "থামো, যথেষ্ট শিক্ষার পরিচয় দিয়েছো। তুমি এমন ছেলে তাই যে মহাপুরুষ পিতা তাঁর যথাসর্বস্ব তোমায় দান করে বড় করে নিজে ভিখারীব্রত নিয়ে চলে গেছেন তাঁকে এমনই কথা বল। তোমারই বরং লজ্জা পাওয়া উচিত।"

আরক্ত হয়ে ওঠেন মিঃ চৌধুরী, অত্যন্ত রাগের সঙ্গেই সজোরে পদক্ষেপ করে ঘর হতে বার হয়ে যান তিনি।

গুম হয়ে বসে থাকেন কণিকা।

কিন্তু তাতেই কি বাধা দেওয়া যায়—

একদিন সকালে বৃন্দাবন হতে ফিরলেন ব্রহ্মচারী শুভময়।

সেই মুণ্ডিত মস্তক, পায়ে খড়ম, পরণে গেরুয়া, হাতে হরিনামের ঝোলা; সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, মুখে সেই স্নিগ্ধ শান্ত হাসি—।

"হরি বোল, হরি বোল, ফিরে এলাম বৌমা, তোমার কাছেই আবার এলাম। হাঁ, এবার ওদিককার কাজকর্ম একেবারে মিটিয়ে দিয়ে তোমার কাছে থাকব বলে এলাম মাগো,—আমায় এখানে থাকতে দেবে তো ?"

শ্বশুরের পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে স্মিত হাস্যে কণিকা বললেন, "সে কি বাবা, আপনার বাড়ীতে আপনার ঘরে আপনি থাকতে পাবেন না—এ ও কি একটা কথা ?"

শুভময় মাথা নাড়েন, "তা বললে কি হয় মা, এ সব এখন তোমাদের, তোমরা আমায় থাকতে দিলেই থাকতে পারি, সেই কথাটাই জানতে চাচ্ছি মা—"

কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, ছেলেটি তো খাঁটি সাহেব দেখলাম মা, ওর মোটে ইচ্ছে নয় যে আমি এখানে থাকি। কিন্তু তোমার মধ্যে দেখতে পেলাম

আমার বাবার লক্ষ্মীকে—এই তিনটি ছেলে তোমার ডাক আমি শুনেছি বউ মা, তাই আমি আমার ব্রত ভাসিয়ে দিয়ে তোমার কাছে থাকতে এসেছি। তুমি আমায় এখানে থাকতে দেবে তো—আমায় চলে যেতে বলবে না তো?"

তাঁর মুণ্ডিত মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কণিকা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "না বাবা, আপনি নিজে যদি যেতে চান আমি আপনাকে আটকাতে পারব না, নিজে আমি কখনও আপনাকে যেতে বলব না বাবা, আমার যতখানি ক্ষমতা আমি আপনার পরিচর্যা করব।"

বৃদ্ধ খুব খুসি হন শুভময়—

কাঁধের ঝুলি নামিয়ে একখানা আসন বার করে তিনি বসেন, বলেন, "এবার তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি মা—আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতা। বিলেতে বহুকাল ছিলে জানি—দেশের জিনিস উপেক্ষা করে বিদেশের অনেক কিছু নিয়েছো, অনেক কাহিনী পড়েছো। এবার এখানা পড়ো মা আর একটু ভক্তি করে পড়ো।

কণিকা পরম শ্রদ্ধায় গীতাখানি মাথায় রাখলেন, তার পর বললেন, "এ আমার অমূল্য সম্পদ বাবা, আমি যত্ন করেই রাখব, আপনি দেখবেন।"

বৃদ্ধ খুব খুসি হন—তাঁর মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

(৩)

পিতার সঙ্গে পুত্রের দেখা হয় খুবই কম, কিন্তু কণিকাকেই তো পাওয়া যায় না—মহা মুস্কিল। মিঃ চৌধুরী ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হন বড় কম নয়। কণিকা নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যান, গম্ভীরপ্রকৃতি স্ত্রীকে তিনি আজ কাল যেন ভয় করতে শিখেছেন।

এর মধ্যে একদিন নিঃশব্দে তিনতালার ছোট কুঠরীটি তিনি খুলে ফেললেন।

শোনা যায় তাঁর স্বর্গতা মা যখন বেঁচে ছিলেন এটি ছিল তাঁর পূজার ঘর। মিঃ চৌধুরী যখন এ বাড়ীর ভাড়াটিয়া তুলে দিয়ে নিজে এ বাড়ীতে বাস করতে আসেন তখন হতে এ ঘরটি অব্যবহার্য জিনিস পত্র রাখবার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখেন মিঃ চৌধুরী তাঁর পিতার এটি পূজার ঘর হয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, জপের মালা, নামের ঝুলি স্থান পেয়েছে, মেঝের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কে জানে।

আস্তে আস্তে নেমে আসবার সময় সিঁড়িতেই দেখা হয় শুভময়ের সঙ্গে; গুণ গুণ করে কি একটা সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে তিনি পূজার ঘরে চলেছেন।

আত্মসম্বরণ করতে পারেন না মিঃ চৌধুরী, রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

সিঁড়িতেই থমকে দাঁড়ান শুভময়, কথা বলেন না, জিজ্ঞাসু চোখে পুত্রের পানে তাকান।

পুত্র গর্জন করেন, "আপনি মনে ভেবেছেন কি তাই জিজ্ঞাসা করছি। স্পষ্ট কথা আপনাকে বলে দিচ্ছি—এ সব ব্যাপার আমার এখানে চলবে না, আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আমি বুঝেছি আপনার এখন অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়েছে সেই জন্যেই যাকে এতটুকু বেলায় কোলে রেখে গিয়েছিলেন, কোনদিন যার একটা খোঁজ পর্যন্ত নেন নি,—শেষে তার কাছেই এসেছেন। আপনি জানেন—আপনার এখন এ বাড়ীতে কোন অধিকার নেই আমার সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই। তবু নেহাৎ আমি আপনার ছেলে—সেই সুবাদেই আপনি যেখানে থাকবেন আমি মাসে মাসে আপনাকে অর্থ সাহায্য করব এ কথা দিচ্ছি।"

শুভময় স্থির ভাবে শুনলেন, একটু হেসে বললেন, ঠিক কথা বলেছো উদয়, আমার এখানে আসাটাই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি চলেই যাব, তবে আমার জন্যে তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, তোমার অর্থ সাহায্য করবার দরকার হবে না। বৈষ্ণবের লাজলজ্জা নেই, যেখানে খুসি ভিক্ষের ঝুলি পাতব, দিনের খাওয়া আমার চলে যাবে। আচ্ছা, কথা দিচ্ছি, আমি দু একদিনের মধ্যেই চলে যাব।"

বিস্মিত চোখে তাকিয়ে দেখলেন উদয়ন চৌধুরী—হাসি মুখে তিনি উপরে যাচ্ছেন, তাঁর মুখে স্তোত্র শোনা যাচ্ছে।

হরে মুরারে মধু কৈটভ হারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে—

আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে তিনি নেমে আসেন নিজের ঘরে—

আলমারি খুলে ব্রাণ্ডী বার করেন—

মনটা যেন কি রকম দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, ব্রাণ্ডি পান করে তিনি সবল হাত চান।

কি মানুষ শুভময় চৌধুরী—

দ্রুত কাহিনী মনে হয়,—

পুলিসের পরাক্রান্ত অফিসার, এককালে তাঁর নামে নাকি বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে। যেখানে বিপ্লব, বিদ্রোহ, অশান্তি,—গভর্ণমেণ্ট শুভময় চৌধুরীকে সেখানে পাঠিয়েছেন,—শুভময় গেছেন একহাতে লাঠি একহাতে রিভলভার নিয়ে; তিনি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

আজ পুত্র শুনতে পান অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল পিতার কাহিনী। কি না করেছেন তিনি। কত লোকের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন, কত লোককে ধরে এনে কেবল গারদে রেখেই শান্ত হয়নি, অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছেন বন্দীদের উপর।

মায়ের কথা শোনা যায় না বিশেষ; সামান্য দু একটা কথা যা শোনা যায় তাতে জানা যায় তাঁর মা ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও ধর্মপরায়না নারী, হয় তো দুর্দান্ত স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য অনেক অশ্রুজল ফেলেছেন, অনেক লাঞ্ছনাও সয়েছেন, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে জুড়িয়েছেন।

মায়ের কথা মনে করবার অনেক চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না। এ বাড়ীতে এসে মায়ের একখানি ফটোও তিনি পান নি।

দুই হাতের মধ্যে মাথাটা চিপে ধরেন তিনি, এক একবার মনে হয়—পিতাকে কটু কথা গুলা না বললেই ভালো হতো। এই যে মাসখানেক তিনি এসেছেন, পুত্রকে ব্যস্ত তো করেন নি।

কিন্তু গত কাল—

এসেছিলেন সস্ত্রীক ব্যারিষ্টার মিঃ বাসু, কণিকা ও তিনি তাঁদের যথাযোগ্য সম্বর্ধনা করেছিলেন। চা পান সেরে যখন বিদায় নিয়ে তাঁরা নিচে নামছিলেন তখন দেখা যায় শুভময়কে—

বিস্মিত মিসেস বাসু বলেছিলেন—"আপনার বাড়ীতে বৈরাগী বাবাজী দেখছি যে—তলে তলে এ সবও চলছে নাকি?"

"না না, বাবাজী ভিক্ষে চাইতে এসেছে, আমার কাছ হতে মাসোহারা পায় কিনা—"

বলতে বলতে মিঃ চৌধুরী নিজের অজ্ঞাতে একবার তাকিয়েছিলেন শুভময়ের মুখের দিকে—।

অদ্ভুত—

তাঁর মুখে সেই শান্ত স্নিগ্ধ মধুর হাসি ফুটেছে,

দ্রুত তিনি অতিথিদের নিয়ে নেমে যাওয়ার সময় মিসেস বাসু তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা দামী আংটি তুলে বৈরাগীর প্রসারিত হাতের উপর আলগোছে ফেলে দিয়েছিলেন।

কত বড় সে অসম্মান—

ভাগ্যে কণিকা সঙ্গে ছিলেন না,—থাকলে তিনি নিশ্চয়ই চীৎকার করে জানাতেন—এ ভিক্ষা বৈরাগী শুভময়কে দেওয়া নয়—এ ভিক্ষা দেওয়া হল উদ্ধত উদ্ধত চৌধুরীকে।

নাঃ, তাঁকে এখান হতে বিদায় দিতেই হবে, নিজের পক্ষিমান নষ্ট করতে পারবেন না মিঃ চৌধুরী।

(৪)

তিন তালার পূজার ঘরে গান শোনা যায় রীতিমত কীর্তন গান—গাইছেন কণিকা—

উৎকর্ণ হয়ে শোনেন মিঃ চৌধুরী।

তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম
　　সুতমিত রমণী সমাজে—
তোঁহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
　　অব মঝু হব কোন কাজে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন মিঃ চৌধুরী—

বিশ্বাস করতে পারেন না—কণিকা কীর্তন গান করছেন—

আস্তে আস্তে তিনি উপরে উঠেন।

কণিকা গাইছেন—

মাধব হাক পরিণাম নিরাশা,
তুঁহু জগতারণ, দীন-দয়াময়
অতএ তোহরি বিশোয়াসা।—

জানালার কাছে পা টিপে এসে দাঁড়ান মিঃ চৌধুরী।

শূন্য ঘর,—পিতা কাল বিদায় নিয়েছেন। তাঁর যা কিছু ঘরে ছিল সব তিনি নিয়ে গেছেন, নেননি শুধু রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিটী,—সিংহাসনে সেটি স্থাপিত রয়েছে।

সামনে নতজানু অবস্থায় বসে রয়েছেন কণিকা, স্নান করেছেন তিনি, এককালের রুক্ষ করা চুল গুলি পৃষ্ঠে মস্ত মুখখানি ঘিরে রয়েছে। পরণে তাঁর লাল পাড় একখানি গরদের শাড়ি ;—সম্ভবত পিতাকে দিয়ে তিনি এখানি কেবল পূজার উদ্দেশ্যে কিনিয়ে এনেছেন। মুদিত চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, দুটি হাত বুকের উপর যেড় করে রেখেছেন তারই উপর—।

এ মূর্তি তো মিঃ চৌধুরী কোনদিন দেখেন নাই—বিলাসিনী কণিকাকে তিনি দেখেছেন—সে ক্লাবে যায়, টেনিস খেলে, সুইমিং ক্লাবে সাঁতার দেয়, নৌকা চালায় ; সে কণিকা মোটর চালনা করে, অশ্বারোহণে সে দক্ষ—ইউরোপীয়ান ক্লাবে সে ডান্সিংএ যোগ দেয়, তার প্রশংসায় সবাই মুখর।

কিন্তু এ কোন্ কণিকা,—এ কণিকা কোথায় ছিল, এক এই বিলাসিতা উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কে লুটিয়ে তুললো—কার হাতের মায়াদণ্ড স্পর্শে হল এই অদম্ভব পরিবর্তন ?

কণিকা গাইছেন—

আর জনম হাম নিঙ্গে গোঁয়ায়নু
জরা শিশু কতদিন ভেলা,—
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতনু
তোঁহে ভজব কোন বেলা—।

না ; এখানে প্রবেশের অধিকার উদয়ন চৌধুরীর নাই ও মন্দিরের মধ্যে তিনি পদার্পণ করতে পারেন না।

নিঃশব্দে তিনি নেমে আসেন, নিজের ঘরে প্রবেশ করে চেয়ারে বসে পড়েন।

আর্দালী সেলাম করে আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়ায়, মিঃ চৌধুরী তাকে চলে যাওয়ার আদেশ করেন, আস্তে সে সরে যায়।

পিতা এ কি সর্বনাশ করে গেলেন, পুত্রের সাজানো সংসারে তিনি আগুন লাগিয়ে দিয়ে সরে গেছেন।

অফিসে তিনি সেদিন গেলেন না।

অনেকক্ষণ পরে কণিকার সাড়া পান—তিনি আর্দালিকে ধমক দিচ্ছিন, আর্দালী কি জবাব দিলে বুঝা গেল না। একটু পরেই চটির শব্দে সচকিত হয়ে তিনি মুখ তুললেন, কণিকা এসে দাঁড়িয়েছেন টেবলের ধারে।

জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ অফিসে গেলে না, শরীর ভালো আছে তো ?"

তাঁর কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্নভাব ফুটেছিল।

বুঝা গেল—স্বামী অফিসে যান নি—সে খবর তাঁকে না জানানোর জন্যই আর্দালী তিরস্কৃত হয়েছে।

বিবর্ণ হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে মিঃ চৌধুরী বললেন, "আমার জন্যে তোমার উদ্বিগ্ন হতে হবে না কণি, তোমার জন্যেই আমি ভাবছি। আমি দেখছি কিছুদিন যাবত তুমি যেন অন্য রকম হয়ে গেছ। তোমায় আমি আমার কাছে আর খুঁজে পাচ্ছি নে। সে জন্যে ভাবছি কি জানো— ?

কণিকা শুধু কণ্ঠে বললেন, "কি ?"

মিঃ চৌধুরী বললেন, "আমায় দু এক দিনের মধ্যে একবার দিল্লী যেতে হবে কাজের জন্যে, আমি তোমাকেও নিয়ে যেতে চাই। মাসখানেক দিল্লী থেকে, আর এক মাস ছুটি নিয়ে—"

বাধা দেন কণিকা,—বললেন, "কিন্তু আমার তো এই দু তিন মাস গিয়ে কোথাও থাকবার সময় হবে না।"

"কেন— ?"

মিঃ চৌধুরীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো, তিনি স্ত্রীর পানে তাকালেন।

কণিকা শান্ত কণ্ঠে বললেন "আমার এখানে কাজ আছে"—

"কি—ঠাকুর পুজোর কাজ, কীর্তন গেয়ে ঠাকুরের মনোরঞ্জন করা"—

বিদ্রূপের সুরে কথাটা বলে উঠে দাঁড়ান মিঃ উদয়ন চৌধুরী, বললেন, "শেষটায় যে তোমার এই শোচনীয় পরিণাম হবে, আমি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি কণিকা, চিরদিন যে পূজাপদ্ধতিকে বিদ্রূপ করে এসেছো, আজ তুমি সেই পূজা করছো—সব ছেড়ে দিয়ে

ঠাকুরের কীর্তন গাইছো—এ আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না কণি। ছি ছি, আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে ?"

হতাশায় তিনি আবার বসে পড়েন।—

স্বামীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেন কণিকা, "না না, তুমি ভুল বুঝো না ;— বাবাকে তুমি অপরাধী করো না। একদিন তুমি সব জানতে পারবে, সব বুঝতে পারবে, সে দিন তুমি আমাকেও দোষী ভাবতে পারবে না।"

ক্রোধের আতিশয্যে কণিকার হাত খানা ছুড়ে দিয়ে মিঃ চৌধুরী উঠে বার হয়ে যান।

(৫)

সেদিন নিজেই মোটর চালিয়ে দক্ষিণেশ্বরে মামার বাড়ীতে আসেন মিঃ চৌধুরী।

পিতার সন্ধান নিতে হবে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হবে —তিনি কোন যাদুমন্ত্রে কণিকাকে অভিভূত করেছেন ? আজ বাদে কাল সে তাঁর সন্তানের জননী হবে, তার এ সর্বনাশ করলেন কেন ?

মামার বাড়ীর সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন, বড় মামা ভাপিনেয়ের অফিসে কাজ করেন, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন বড় বেশী রকম তিনিই।

চেয়ার দেওয়া সত্ত্বেও বসলেন না, মিঃ চৌধুরী গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "উনি এখানে এসেছেন—মানে—উনি—"

পিতা কথাটা মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন না। যে একমাস তাঁর বাড়ীতে শুভময় ছিলেন, পিতা নামে কোনদিনই তিনি পুত্রের কাছ হতে সম্বোধন পান নি। কণিকা অসঙ্কোচে তাঁকে পিতৃসম্বোধন করেছেন, পুত্র পারেন নি।

ছোট মামা বিশ্বজিৎ উনি সম্বোধন শুনে খুসি হন নি, ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, "উনি মানে, বাবা বলতে কি লজ্জা হয় উদয়ন ?"

আরক্ত মুখে উদয়ন চৌধুরী উত্তর দিলেন, "লজ্জা না হোক, ঘৃণা হয়।"

"ঘৃণা—?"

ধর্মভীরু বড় মামা যেন চমকে উঠলেন।

দৃঢ়কণ্ঠে উদয়ন উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই। আমার চেয়ে আপনারাই তাঁকে ভালো চেনেন, যে সন্তানের সঙ্গে তিনি কোন যোগসূত্র রাখেন নি, আজ দীর্ঘকাল পরে যদি সেই যোগসূত্র স্থাপন করতে তিনি এগিয়ে আসেন, সন্তানই বা তা স্বীকার করবে কেন ? আমার সন্দেহ হয়—হ্যাঁ, সত্যই আমার সন্দেহ হয় নিজেকে—"

তিনি চেয়ারে বসে পড়েন, দুই হাতে মাথার চুলগুলা ধরে টানেন—তিনি যে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছেন তা বেশ বুঝা যায়।

বড় মামা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করেন, "কি সন্দেহ হয় তোমার উদয়ন ?"

উত্তর দেন না উদয়ন, নিঃশব্দে চুল টানেন।

মামার মেয়ে শুভ্রজা এসে হাত ধরে, "ও কি ছেলেমানুষি করছো দাদা—ওঠো, ভেতরে এসো, চা খাবে, মা তোমায় ডাকছেন।"

তার হাত হতে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নেন মিঃ চৌধুরী, বললেন, "চা এখন থাক শু, আমি মামার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তারপর চা খাব।"

শুভ্রজা সরে যায়।

ছোট মামা বললেন, "কিন্তু দাদা অসুস্থ উদয়ন, জানোই তো—একমাস অফিসে যান নি, ব্লাডপ্রেসার ভীষণ রকম বেড়ে গেছে। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে আমার সঙ্গে কথা বল, দাদা একটু ভালো হলে ওঁর কাছে যা জানাবার তা জেনো।"

মিঃ চৌধুরী উত্তর দেন, "আমি প্রথমেই জানতে চাচ্ছি —তিনি কোথায় ? তাঁর কাছে আমার জিজ্ঞাস্য—কেন তিনি আমার সংসারে এসে এ সর্বনাশ করলেন, আমার সোনার সংসার জ্বালিয়ে দিলেন।"

বড় মামা কি বলতে যান, বাধা দেন বিশ্বজিৎ, বললেন, "তিনি এখানে এসেছিলেন আবার চলে গেছেন। হয় তো আবার ফিরে আসবেন, এলে তোমার যা জিজ্ঞাস্য আছে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো।"

মিঃ চৌধুরী উঠে দাঁড়ান।

শুভ্রজা চা নিয়ে এসে দাঁড়াল—"চা খেয়ে নিয়ে যাও দাদা—"

মিঃ চৌধুরী বিষণ্ণ হাসি হাসলেন, বললেন, "কিন্তু দিদিমণি, আমার আজ কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, তবু তুমি হাতে করে দিচ্ছো বলেই খেতে হচ্ছে—দাও।"

দাঁড়িয়েই তিনি চা পান করেন।

শুভ্রজা আস্তে আস্তে বললে, "একটা খবর দেই দাদা, ঠাকুরমা বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন, তিনি পিসেমশাইয়ের সঙ্গেই ফিরে এখানে এসেছেন, পিসেমশাই তোমার ওখানে গিয়েছিলেন।"

শুভ্রজার ঠাকুর মা—অর্থে মিঃ চৌধুরীর দিদিমা।

একদিনকার কথা মনে পড়ে, মিঃ চৌধুরী তখন কিশোর, আই-এ ক্লাসে কেবল মাত্র ভর্তি হয়েছেন। পূর্বেই শুনে এসেছেন তাঁর দিদিমা আছেন, কন্যার মৃত্যুর পর তিনি বৃন্দাবনবাসিনী হয়েছেন, দীর্ঘকাল দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি।

এমনই সময় একদিন কলেজ হতে ফিরে তিনি বাড়ীতে দেখতে পেয়েছিলেন সুগৌরবর্ণা শীর্ণা ও খর্বাকৃতি বিধবা দিদিমাকে, শুভ্রজার মুখে পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন, বিধবা তাঁর প্রণাম গ্রহণ করেন নি। দিদিমাতের বিবাহ উপলক্ষে মাত্র সাতদিনের জন্য তিনি এসেছিলেন, এই সাতদিনের মধ্যে দৌহিত্রের সঙ্গে তিনি একটি কথা বলেন নি, বরং মনে হয়েছে দারুণ ঘৃণায় তার কাছ হতে সরে গিয়েছেন।

আশ্চর্য—যে কয়দিন দিদিমা ছিলেন বাড়ীর সকলেই যেন সসঙ্কোচে তাকে এড়িয়ে গেছে ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তার কাছে আসে নি—তাকে সকলের সঙ্গে খেতে দেওয়া হয় নি।

আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছিল বলেই সেদিনকার কিশোর উদয়ন চৌধুরী মামার বাড়ীর আশ্রয় ত্যাগ করে হোষ্টেলে স্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং আর কোনদিন মামার বাড়ী যান নাই।

আজ সেদিনকার কথাই মনে পড়ে।

চায়ের কাপের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন শুভ্রজা, মিঃ চৌধুরী শূন্য কাপ মাটিতে নামিয়ে রাখলেন,—তারপর শুভ্রজার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ো শু—"

তিনি দ্রুত পদে বার হয়ে গেলেন।

(৬)

সমস্ত দিন অফিসে কাজ করে সন্ধ্যার পরে বাড়ীতে ফিরলেন মিঃ চৌধুরী।

আর্দালী ছুটে আসে, হাত হতে মোটর বাইকটা গ্রহণ করে।

দ্বিতলে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যান মিঃ চৌধুরী।

কীর্তনের সুর কানে আসে, শুভময়ের কণ্ঠস্বর,

পতিত পাবন নামটি শুনে
বড় ভরসা হয়েছে মনে।
আমি হইনা কেন যেমন তেমন
স্থান পাব রাঙা চরণে।

শুভময় ফিরেছেন,—

পা দুখানা গতিশক্তিবিহীন হয়ে যায়। মিঃ চৌধুরী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শোনেন—

তোমার নাম ভরসা,
দীনের পুরাও আশা,
তুমি না তরালে পতিত পাবন
কে তরাবে জগৎজনে।

আস্তে আস্তে নেমে আসেন মিঃ চৌধুরী, নীচের বৈঠকখানায় প্রবেশ করে অন্ধকারেই একখানা চেয়ারে বসে পড়েন, টেবলের উপর মাথা রেখে তিনি কত কি ভাবেন।

আর্দালী আলো জ্বালাতে এসেছিল, নিষেধ করেছেন তিনি,—অন্ধকারে তিনি ভালো থাকবেন।

হয় তো একটু তন্দ্রা এসেছিল, মনে হল কে যেন মাথায় হাত বুলাচ্ছে—অতি কোমল স্নেহপূর্ণ হাতখানা।

"কে, কে—"

ধড়ফড় করে উঠতে যান মিঃ চৌধুরী।

কণিকার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"আমি, আর কেউ নয়। কিন্তু তুমি এখানে এমন ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছো কেন —কেন উপরে গেলে না, একবার আমায় জানতে দিলে না

তুমি এসেছো ? এত রাত পর্যন্ত তোমার সাড়া না পেয়ে নীচে এসে খোঁজ করে জেনেছি তুমি এসেছো। এই অন্ধকারে এমনি করে ঘুমিয়েছো কেন—শরীর খারাপ নিশ্চয়ই—"

বলতে বলতে তিনি নীল বাল্বের আলোটা জেলে দিলেন।

হাসতে যান মিঃ চৌধুরী—"না না, অসুখ করবে কেন, তুমি কর্মব্যস্ত, সেই জন্যে আমি তোমায় ত্যক্ত করি নি।"

ক্লিষ্ট কণ্ঠে কণিকা বললেন, "খুব অন্যায় করেছো। আমি কি করছিলাম তা না জেনেই যা তা বলছো। কিছু খাওনি,—সমস্ত দিনের খাটনি, এ রকম করলে—"

তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়, সম্ভব—অশ্রু জল গোপন করতেই তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরান।

অধৈর্য হয়ে ওঠেন মিঃ চৌধুরী—"আঃ ওকি হচ্ছে কণিকা, শুধু শুধু চোখের জল ফেলছো কেন ? আমি অফিস হতে খেয়ে এসেছি—সে জন্যে তোমার উদ্বিগ্ন হতে হবে না। এসো, আমার সামনে এসো—"

কণিকার হাত ধরে তিনি সামনে নিয়ে আসেন, তাঁর চোখ মুছিয়ে দেন।

আত্মসম্বরণে অসমর্থা কণিকা তাঁর কোলের উপর মুখখানা লুকিয়ে ফেলেন, আর্দ্রকণ্ঠে বললেন, "জানি তুমি আমায় অপরাধিনী করেছো, কিন্তু তুমি জানো না—আমি কি বিষ খেয়েছি, সে বিষ আমার পলাধঃ করবার নয়, উগরিয়ে ফেলব তারও যো নেই। আমি সেই বিষে জ্বলে মরলাম, আমি বাঁচতে আর চাচ্ছি নে।"

ক্ষুব্ধ বালিকার মত উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদেন কণিকা।

কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারেন না মিঃ চৌধুরী, বিস্ময় বিমূঢ় বলেও তিনি এ সময়ে কোন প্রশ্নই করলেন না, নীরবে কেবল কণিকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

(৭)

পূজার ঘরের দরজায় দাঁড়ান মিঃ চৌধুরী, শুভময় যোগাসনে চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যান করছেন, তাঁর সামনে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ।

কাল হতে অসুস্থ হয়েছেন কণিকা ; ডাক্তার তাঁকে শয্যাত্যাগ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি গোপনে একবার উঠবার চেষ্টা করেছিলেন, মিঃ চৌধুরীর সদাসতর্ক দৃষ্টিকে তিনি এড়াতে পারেন নি।

পূর্ণগর্ভা কণিকা, আজ কালই তাঁর সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা। কাল হতে এসেছে নার্স, লেডী ডাক্তার কাল সারারাত্রি ছিলেন, আজ সকালে দুই ঘণ্টার জন্য তিনি নিজের ডিউটিতে গেছেন, ফিরে আবার এখানেই আসবেন।

শয্যাগতা কণিকা,—উঠতে পারবেন না তিনি, জেনেই মিঃ চৌধুরী শুভময়ের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। কিন্তু ধ্যানস্থ শুভময়কে ডাকবার সাহস তাঁর নাই, নিঃশব্দে তিনি অপেক্ষা করেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে শুভময় তাকান, দীর্ঘদ্বারী একটি প্রণাম করে একটি তাম্রপাত্রে ফুলসহ চরণামৃত নিয়ে উঠে দাঁড়ান।

"এই যে, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছ উদয়—ভালোই হল, আমাকে আর বউমার ঘরে যেতে হল না। জুতোটা খোল, এই চরণামৃত বউমাকে নিয়ে গিয়ে দাও,—দেরী করো না, বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছে।"

চমৎকৃত হয়ে যান মিঃ চৌধুরী, কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়েই থাকেন।

চরণামৃত নিয়ে অগ্রসর হয়ে আসেন শান্ত সৌম্য বৃদ্ধ, ধমকের সুরে বলেন, "আঃ, তবুও তুমি দাঁড়িয়ে রইলে উদয়, তোমার একটুকু কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই ? বেচারা মেয়েটা কি কষ্টই না পাচ্ছে ; তার জন্যে সারারাত এইখানে বসে ঠাকুরকে ডেকেছি। নাও নাও, চট করে জুতোটা খোল বাপু, না হয় একটু বাসি পায়েই হাঁট তাতে তোমার পায়ে ফোস্কা পড়বে না।"

থতমত মিঃ চৌধুরী সত্যই জুতা খুলে ফেলেন।

খুসি মুখে শুভময় তাঁর মাথায় একটু চরণামৃত ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এ সময়টায় বউমার ঘরে আমার যাওয়া উচিত নয় তাই তোমার হাতে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে বউমার মুখে দাও গিয়ে। হ্যাঁ,—দক্ষিণেশ্বর হতে মায়ের আসার কথা আমি বসে পাঠিয়েছি, হয় তো এখনই এসে পড়বেন। আমায় একটা খবর দিয়ো তিনি এলে, ভুলো না। আর তুমি যেন আজ অফিসে যেয়ো না,

কখন কি দরকার হবে কে জানে—মা গঙ্গা আর যেন কষ্ট না পান—ঠাকুরকে তাই বলেছি।"

"দিদিমা—দিদিমা এ বাড়ীতে আসবেন?"

বিস্ময় দমন করতে পারেন না মিঃ চৌধুরী। যে দিদিমা তাঁকে দেখে মুখ বন্ধ করে চলে গেছেন, তাঁর প্রণাম পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি, সেই দিদিমা তাঁর বাড়ীতে আসবেন এ কি সত্য?

পূজায় আবার বসেছেন শুভময়—তাঁকে আর কোন কথা বলার সাহস হল না মিঃ চৌধুরীর, সঙ্কুচিত পদে চরণামৃতের পাত্র হাতে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে নেমে আসবার মুখে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে যান।

সামনেই দাঁড়িয়ে মিসেস বাসু ও মিস তরফদার, কণিকাকে দেখতে এসেছেন লেডী ডাক্তার মিস তরফদার, মিসেস বাসুর এ সময় আসা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

"ও মাই গড,—মিঃ চৌধুরীর পা ধরলি কেন, হাতেই বা ও কি?"

পরম কৌতূহলে মিসেস বাসু উঁকি দিয়ে দেখে চপল হাসিতে ভেঙ্গে পড়েন। মিস তরফদার গম্ভীর মুখে বললেন, "একে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন তার ওপর স্ত্রীই যদি তা করে। মিসেস চৌধুরীকে হত্যা করবেন না মিঃ চৌধুরী। অত্যন্ত দুঃখের কথা—আপনি ওর মাথা পাগলা সাধুর কথা বিশ্বাস করে এই সব শুভময়ে বিশ্বাস করছেন—ছিঃ—"

বিবর্ণ হয়ে যায় মিঃ চৌধুরীর মুখখানা, সে মুখ তিনি তুলতে পারেন না।

মিসেস বাসু বললেন, "ফেলে দিন ফেলে দিন মিঃ চৌধুরী, সেকালের লোকেরা যা বিশ্বাস করেছেন, আজ এই বিজ্ঞানের যুগে আপনি এতবড় একজন এডুকেটেড মানুষ হয়ে বিশ্বাস করবেন? ফেলে দিন বলছি—"

"না, ফেলবে না। ফেলো না উষা, তুমি নিজে না দিতে পারো আমার হাতে দাও—"

ঘরের দরজার উপর পর্দা তুলে যিনি দাঁড়ালেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে মিঃ চৌধুরীর মুখ লাল হয়ে যায়,

দিদিমা এসেছেন—

শুভ্র তাঁর গাত্রবর্ণ, শুভ্র তাঁর পরিধেয়, আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও দৈর্ঘ্যে তিনি অনেক—অনেক বড়।

চরণামৃতের পাত্র নিজের হাতে নিয়ে তিনি আদেশ করেন, "তোমার বন্ধুদের নিচে বৈঠকখানায় বসাও গিয়ে উষা। ওঁদের জানিয়ে দাও—এখন এ ঘরে ওঁদের কোন দরকার নেই, খোকা হোক—তারপরে দেখে আনন্দ করে তাকে আর আমার নাত বউকে আশীর্বাদ করে যাবেন।"

দরজার পরদাটা টেনে দিয়ে ভিতরে সরে যান তিনি।

(৮)

"খোকা—খোকা এসেছে, চনৎকার একটি খোকা, সুন্দর স্বাস্থ্যবান একটি খোকা—"

খবরটা তখনিই গিয়ে পৌঁছালো শুভময়ের কাছে—

"ঠাকুর ঠাকুর,—তুমি বাঁচিয়েছ, তুমি রক্ষা করেছো—"

উপুড় হয়ে পড়েন শুভময়—সময় কেটে যায়।

"শুভ, নাতির মুখ দেখবে এসো বাবা, তোমার জীবনে আনন্দের দিন এসেছে, এসো, আজ ওকে—ওই হতভাগাকে আন্তরিক আশীর্বাদ করবে এসো"।

শুভময় মুখ তোলেন, অশ্রুধারায় তাঁর মুখ প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। আর্দ্রকণ্ঠে বললেন, "আমি কি আশীর্বাদ করতে পারব মা, আমার সে অধিকার আছে কি?"

রুদ্ধকণ্ঠে মা বললেন, "আছে বই কি বাবা, আমার যদি অধিকার থাকে, তোমার থাকবে না কেন? আজ যার জন্যে তুমি সর্বত্যাগী, আমিও কি তার মা নই,—আমি ও কি শুধু তার জন্যেই সব ছেড়ে কুমারখন-বাসিনী হই নি শুভ?"

মনে শক্তি পান শুভময়, উঠে দাঁড়ান—

"কিন্তু আমি কি দিয়ে আশীর্বাদ করব মা, আমার যে কিছু নেই, আমি যে পথের ভিখারী।"

মা হাসেন, বললেন, "ঠাকুরের নির্মাল্য আছে—পূজার যা কিছু আছে, তুমি তাই দিয়ে আশীর্বাদ কর।" জামাতাকে নিয়ে তিনি নেমে আসেন।

অনেকটা সুস্থ হয়েছেন কণিকা,—কোলের কাছে শিশু পুত্র চোখ বুজে ঘুমাচ্ছে।

নিঃশব্দে কাছে গিয়ে দাঁড়ান শুভময়,—কণিকা তাঁর পানে তাকায়, তার দু চোখ সজল হয়ে ওঠে।

"চোখে জল কেন পাগলী মা, কোলে চাঁদের মত গোপাল পেয়েছিস, ওর দিকে তাকালে সব দুখ বাধা ভুলে যাই।"

বলতে বলতে শুভময় মুখ ফিরান, নিজেকে সামলে নেন তিনি।

কণিকা আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, "আজ একটা কথা বাবা, এই খোকার পানে তাকিয়ে আপনি আগেকার সব কথা ভুলে যান, আমাদের সকলকে নিজের মনে করুন, কারও অপরাধ মনে রাখবেন না,—বলুন বাবা—

হেসে উঠলেন শুভময়, বললেন, "পাগলী, যদি ক্ষমা না করতাম বৃন্দাবন ছেড়ে আমি আসতাম না। বৃন্দাবনে বসে আমি শুনলাম আমার গোপাল আসছে, আমি গোপালকে বরণ করতেই তো ছুটে এসেছি। আমি জানি—উষর আমায় সহ্য করতে পারে নি। আমার জন্মে তোকেও না কত দুঃখ সইতে হয়েছে মা, তবু তোমার জন্মের গ্লানি মুহূর্তে তুই যে কি করে নিজেকে বদলে নিলি, তাই ভাবতেই যে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই মা। মা, আমি গোপালকে পেয়েছি, আমার সত্যিকার মালিক এসেছে, ওর দিকে তাকিয়ে আমি সব ভুলে গেছি মা—আর কিছু মনে নেই।"

কণিকার দু চোখ ছাপিয়ে অশ্রুধারা ঝরে, শুভময়ের ডান হাতখানা ললাটে চেপে ধরে মহাআনন্দে আজ কণিকা কাঁদেন।—

(৯)

দিদিমার যাওয়ার সময় হয়েছে—

দৌহিত্রকে তিনি কাছে ডাকেন—

"শোন উষর, আজ আমি প্রথম তোমার সঙ্গে কথা বলছি। তোমার আত্মপরিচয় তোমায় দিচ্ছি যদিও সে কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু তোমায় না বললে তুমি বুঝবে না।"

মিঃ চৌধুরী চোখ তুলে কণিকার পানে তাকান, দোলায় শোওয়ানো শিশুর দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট ভাবে বসে আছেন কণিকা,—ও পাশে মেঝের একখানা আসনে বসে আছেন শুভময়, নির্নিমেষ মনে চৈতন্যচরিতামৃতের অমৃত পান করছেন।

সে এক কাহিনী।

পুলিস অফিসার শুভময় চৌধুরীর গত জীবনের কাহিনী উষরন শুনেছেন—অত্যাচারী পিতার জীবনের সে কাহিনী মনে করতে গিয়ে আজও তিনি শিউরে ওঠেন।

সন্তান একটি হয়েছিল বই কি, কিন্তু সে কার সন্তান?

চরিত্রহীন শুভময় একদা রাত্রে বাড়ী এসে নিজের শয়ন ঘরে কাকে দেখতে পেয়েছিলেন?

সেই মুহূর্তে বিবেকহারা হয়ে তিনি গুলি ছুড়েছিলেন, সে গুলি তাঁর পরম বন্ধু মিঃ রায়ের গায়ে লাগে নি; কিন্তু হস্তের গুলি দেওয়ালে বিদ্ধ হয়েছিল এবং মিঃ রায় তাঁরই পাশ দিয়ে বেত্রাহত কুকুরের মত পলায়ন করেছিলেন।

নিদ্রিতা স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তিনি বুঝলেন ভাগ্যচক্রে তিনি অপরাধিনী প্রতিপন্ন হয়েছেন। স্বামীর বন্ধু মিঃ রায় এখানে আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন, এককালে তিনি ছিলেন সুরমার ভাবী স্বামী—শুভময় তা জানেন বলেই বন্ধু ও স্ত্রীকে অবিশ্বাস করেন নি। মুহূর্তের ভুলে স্ত্রীর অধঃপতন তিনি সহ্য করতে পারেননি, জারজ পুত্র বলে সেই শিশুকে তিনি সেই মুহূর্তে হত্যা করেছিলেন।

"তবে আমি—আমি তাঁর ছেলে নই—?"

উষরন হাঁকিয়ে উঠলেন, সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

দিদিমা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "না, তুমি আর এক নারীর ছেলে। শুভময় এরপর তার স্ত্রী, আমার মেয়েকে হত্যা করতে যায়, কিন্তু স্ত্রীকে নয়—সদ্যো সন্তানহারা মায়ের আত্ম বোধনে তাকে গুলি করে নি। সেই মুহূর্তে সে গৃহত্যাগ করে।

তার পরের শুভময়ের কথা নাই বা বললাম, উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে সে গা ভাসিয়েছিল—অধঃপাতের পথে শুভময় নেমে গেল।

সুরমা পিত্রালয়ে যাননি, স্বামীর অন্যায়ের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন নিজের পাপ কর্মের। মা, দুই ভাই সকলে একদিন শুনতে পেয়েছেন সুরমা মারা গেছেন।

দুঃখ পুষিয়া রাখিতে একথার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে কেউ যায় নি।

মা এরপর বৃন্দাবনে চলে যান,—বড় আঘাত পেয়ে ছিলেন কন্যার অধঃপতনে, তিনি আর ফিরলেন না। কিছু দিন যাবে খবর পেলেন শুভময় চার বছরের একটি শিশুকে ছেলেদের কাছে রেখে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাড়ী সেই ছেলে উদয়ন চৌধুরীর নামে লেখাপড়া করে আমার ছেলে-দের অভিভাবক করে দিয়ে সন্ন্যাস ব্রত নিয়ে চলে এসেছেন।

এই শিশুর মাকে পতিতালয় হতে উদ্ধার করেছিলেন শুভময়, এই পুত্র শুভময়ের—এই ছিল তার পরিচয়। আজও এই তার পরিচয়—সে শুভময় চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। দুই মামা এবং দিদিমা তার পরিচয় জানেন, আর কেউ জানে না।

কণিকার বিবাহের পর শুভময় সামান্যক্ষণের জন্য আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন। তাঁর বিশ্বাসঘাতক বন্ধু মিঃ রায়ের কন্যা কণিকা রায়, সেই পরম রূপবতী অসীম জ্ঞানময়ী শিক্ষিতা মেয়ে ভাগ্যবশে হলেন উদয়নের ধর্মপত্নী। স্ত্রী শিশু সন্তান রেখে মারা যান, মিঃ রায় কন্যা সহ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিলাতে চলে যান। জীবন্তে তিনি ভারতে আর ফিরেন নি, কন্যার বিবাহের সময় আশীর্বাদ করতে পারেন নি।

আশীর্বাদ করে গেলেন শুভময়—

এই মেয়েটিই আবার টেনে নিয়ে এলেন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীকে,—বৃন্দাবনে আর টিকতে পারলেন না শুভময় —যখন শুনলেন কণিকা মা হতে চলেছে।

নিজের গোপালকে হারিয়েছেন শুভময়, নিজে তাকে ছুড়ে ফেলে হত্যা করেছেন। আজকে গোপালকে তিনি পেয়েছেন, এর সেবা করে—পরিচর্যা করে সে পাপ হতে মুক্তি চান তিনি।

"বাবা—"

উদয়ন চৌধুরীর মুখে—এই প্রথম পিতৃ সম্বোধন—।

উদয়ন শুভময়ের পায়ের কাছে নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভময় তাঁকে বুকের মধ্যে টেনে নেন—

"আমায় ক্ষমা করুন বাবা। আমায় ছুটি দিন, মুক্তি দিন—আমি—"

বলতে বলতে উদয়নের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

বেদনার হাসি হাসেন শুভময়— 'পাগল ছেলে, তোমার আর মুক্তি পাওয়ার যো আছে কি? আমার এই সতী সাধ্বী বৌমা—মা আমার সব জানে, নীলকণ্ঠের মত এই হলাহল কণ্ঠে রেখেছে, কাউকে কিছু বলতে পারেনি, জ্বালায় পাগল হয়ে গেছে। আজ সে হলাহল আমি তুলে নিলাম মা, তুমি আমার গোপালের রক্ষণাবেক্ষণ করো তোমার স্বামীকে মানুষ করে গড়ে তোল।"

শঙ্কিতা কণিকা বললেন, "কিন্তু আপনি—আপনি কি চলে যাবেন বাবা—?"

হাসলেন শুভময়, "মায়ের সঙ্গে যাচ্ছি, আবার যদি বেঁচে থাকি গোপালের অন্নপ্রাশনের সময় আসব।"

মিঃ চৌধুরী নিঃশব্দে থাকেন, তাঁর যেন কোন বলবার অধিকার মাত্র নাই।

পরামর্শ

[গল্প]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

অঞ্জনাকে সবাই বেশ লক্ষ্মী মেয়ে বলেই জানত কিন্তু বিয়ের কথা ওঠ্‌বার পর দেখা গেল জেদ আর অভিমান ওর কারুর চেয়ে কম নয়।

অবশ্য কথাটা একটু সে দেরিতেই উঠেছে সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যেটাকে আমরা অন্তত গেরস্ত-ঘরে বিয়ের বয়স বলে মনে করি সেটা ওর এসেছে অনেক আগেই। এমন কি পেরিয়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয়না।

কিন্তু তার জন্য ওর দাদাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি?

অসিত বেচারী নিজের উপার্জনে পর পর চারটি বোনের বিয়ে দিয়েছে। আর এ-ও ঠিক—তারা যত পিঠোপিঠি এ পৃথিবীতে এসেছে ঠিক তত পিঠোপিঠি তাদের পার করা যায়নি। বরং প্রথম থেকে দ্বিতীয়কে যতটা পরে বিয়ে দেওয়া গেছে, তার চের বেশী পরে তৃতীয়াকে পার করতে হয়েছে। কারণ বিবাহ ত শুধু বিবাহ নয়, সারা বছর ধরে তত্ত্ব আছে, বোনেদের বাড়ী আনা আছে, তারপরই আছে ভাগ্নী-ভাগ্নেদের অন্নপ্রাশন। এর কোনটায় ত্রুটি হবার যো নেই—তাহ'লে শ্বশুর বাড়ী তাদের মুখ দেখাবার উপায় থাকেনা যে।

সুতরাং চার নম্বরের বেলা শেষ হ'তে হ'তে পঞ্চমীর বয়স যে একটু বেশীই বেড়ে যাবে এটা খুবই স্বাভাবিক। পয়সাটা নিজ হাতে উপার্জন না করুক, দীর্ঘদিন ধরে নিজ হাতেই খরচ করেছে অঞ্জনা, সুতরাং সেও হয়ত স্বীকার করবে যে এটা অস্বাভাবিক নয়।

তাই বলে সত্যিই ত আর বাড়ীতে কেউ অঞ্জনাকে অবহেলা করেনা। দাদা অসিত ত রীতিমত ভালই বাসে। ওর পয়সা-কড়ি, সংসারের হিসাব সবই এই বোনটির হাতে। যখন তখন ধমক দেয় অঞ্জনা দাদাকে—সকলের সামনেই —তাও সে নির্বিবাদে হজম করে। ফলে অঞ্জনার কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গেছে যে সকলকার ওপরই ধমক দেবার একটা স্বাভাবিক অধিকার ওর আছে। সে ভয় করেনা প্রায় কাউকেই, কথা বলে সর্বদা চেঁচিয়ে, খরখর ক'রে ওঠে সকলকার ওপর—এবং কেউ তার কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করতে গেলেই 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে কোমর বাঁধে।

তবু মোটের ওপর হাসী-খুশী মেয়েই ছিল অঞ্জনা। অসিত ত বটেই—পাড়া প্রতিবেশী, অসিতের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনরা সকলেই ওকে স্নেহের চোখে দেখত। কিন্তু ওর প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কী ছিল যাতে তরুণরাও ওকে স্নেহই করত—সে স্নেহ ভালবাসার স্তরে উঠতে পারত না। দায়ে অদায়ে অনেকের বাড়ী গিয়ে অনেক কন্নাই তাকে করতে হয়েছে কিন্তু কোথাও কোন যোগাযোগ ঘটেনি। বোনেদের বাড়ীও তাদের মা বোন্‌পো-বোন্‌ঝিদের অসুখ উপলক্ষে অনেকবার গিয়ে থেকেছে কিন্তু এমনই ওর ভাগ্য—সে রকম উপযুক্ত দেওর ওর দিদিদের কারুরই নেই। অর্থাৎ আজ পর্যন্ত সহজে বিয়ে হয়ে যাবার কোন সুযোগ-সুবিধাই ওর আসেনি।

অবশ্য ওর ভাব ভঙ্গীতেও এতকাল এমন কোন অধীরতা প্রকাশ পায়নি যাতে ওর দাদা ওর বিবাহ সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারে। তবু,একদিন ত সচেতন হ'তেই হয়। চারটি বিবাহের ক্লান্তি দূর ক'রে আবারও সেইসব পুরাতন পদ্ধতিতে পাত্রের খোঁজ করা—ঘটক ঘটকী নিয়োগ, বিবাহ কোম্পানিতে নাম লেখানো প্রভৃতি শুরু করতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন মেয়ে দেখাবার কথা ওঠে তখন দেখা যায় যে, অঞ্জনার বাইরেটা যতই নিস্পৃহ নিরাসক্ত হোক্, অন্তরে অন্তরে দাদার এই অমনোযোগকে সে অবহেলা বলেই ধরে নিয়েছে, আর তার জন্য অভিমানও বড় কম জমেনি তার অন্তরে!

সে কথাটা ওঠ্‌লো মাত্র বলে উঠল, 'তোমরা কি পাগল মা? এই বুড়োবয়সে গিয়ে কনে-দেখা দিতে বসব? গলায় দড়ি!'

মা ত অবাক। তাঁর আমলে এসব কথা কারুর মাথাতেই যেতনা। (অবশ্য তিনি মনে মনে একথাও মানেন যে তাঁর আমলে এতদিন আইবুড়ো থাকাও সম্ভব হ'তনা।) তিনি গালে হাত দিয়ে বলেন, 'এ কী রে! মেয়ে না দেখলে তারা পছন্দ করবে কি ক'রে?'

'দরকার কী। তাদের ত আর সাধতে যাচ্ছিনা পছন্দ করবার জন্যে!'

মা এবার রেগে ওঠেন, 'নে নে। ন্যাকামো করতে হবেনা। আমাদের দেশে মেয়ে হয়ে জন্মেছিস যখন তখন কনে-দেখা দিতেই হবে। নইলে বিয়ে হবে কেমন ক'রে? বয়সের ত ওধারে গাছ-পাথর নেই!'

'বয়সের গাছ পাথর নেই ব'লেই ত বলছি! এই বয়সে গিয়ে কনে-দেখা দিতে পারবনা। বিয়ে দেবার সত্যিকারের ইচ্ছে থাকলে অনেকদিন আগেই বয়সের হিসেবটা করতে!'

মা নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন। ইচ্ছে ক'রে ত আর তাঁরা চুপ ক'রে ছিলেন না। চার-চারটে মেয়ে পার করেছেন। রোজগার বলতে ত অসিতের একার! সে যা করলে একার রোজগারে তা আর কোথাও কেউ পেরেছে? এর ওপরও যদি অঞ্জনা অবুঝ হয় ত—

কিন্তু মার এসব যুক্তিতে কোন ফল হয়না। আরও বাঁকা কথা বলে অঞ্জনা, 'কেন মা সংসারে ঝিয়ের মত খেটে ত দুটো খাচ্ছি, তাতেও কি তোমাদের লোকসান যাচ্ছে? ভাবনা ত দাদার বিয়ের জন্যে, দাদার বিয়ে তোমরা দাওনা। আমি কথা দিচ্ছি কোনদিন ঝগড়া করব না বৌয়ের সঙ্গে—যদি কোনদিন না বনে ত নিজেই নিজের পথ দেখতে পারব।' ইত্যাদি—

অবশেষে অসিতকেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। অসিত আর তার বন্ধু—পাশের বাড়ীর অপূর্ব কাকার ছেলে শিবু, সে-ও এ বাড়ীর ছেলের মতই, দীর্ঘকাল ধরে এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া, অঞ্জনাকে এতটুকু থেকে দেখছে। দুজনে মিলে অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করে ওকে। শেষ অবধি অঞ্জনার মুখে আবার হাসি ফোটে, দুএকটা তামাসার জবাবও দেয় এবং বরপক্ষ এলে লজ্জিত নতমুখে গিয়ে কনেদেখা দিতেও বসে।

মুস্কিল হচ্ছে এই যে—একবারে কাজ মেটে না। দুবার তিনবারেও না। কারণ বাধা অনেক। অঞ্জনার চেহারা চলনসই-এর ওপরে না। কচি বয়সের কমনীয়তা নেই। সে পাস পেয়ে তথাকথিত কম্পিটিশন থেকে 'কাপ' আনেনি ঘরে, লেখাপড়ায়ও ডিগ্রি নেই। তার ওপর ওর দাদাও এমন কেউ তালেবর নয় যাতে এই এতগুলো 'নেই'-এর অভাব কারেন্সী নোট দিয়ে পূর্ণ করতে পারে।

অথচ বার বার দেখা দিতে বিদ্রোহ করে অঞ্জনা। দাদার মুখের ওপরই বলে, 'মিছিমিছি কেন এ সব চেষ্টা করছ দাদা, হাতের শিরা বেরিয়ে গেছে, মাথার চুল উঠে টাক্ পড়তে বসল, এখন কি আর কনে-দেখা দেওয়া সাজে? শুধু শুধু কতকগুলো অপরিচিত লোকের সামনে বারবার অপমানিত হওয়া! কী দরকার, ঝিয়ের মত এসেছি, ঝিয়ের মতই খেটে যাই। তোমার একটা ঝি রাখতে হ'লেও ত আমার চেয়ে বেশী খরচ লাগত।'...

শিবু বোঝাতে এলেও উত্তর পায়, 'শিবুদা, তোমাদের যদি এমনি বার বার দেখতে আসত আর তোমাদের পড়ে থাকতে হ'ত মরা ইলিশের মত? নেহাৎ হাত দিয়ে টিপে দেখতে পারেনা কতটা টাট্‌কা তাই—তা সে কাজটা চোখ দিয়েই সারে। ঐ চাউনিগুলো গায়ে বেঁধে শিবুদা। যে বয়সে বিয়ের আনন্দে এ অপমান গায়ে-লাগেনা সে বয়স কি আর আছে? যদি এতই বিদায় করার ইচ্ছে ত দোজবরে কিংবা তেজবরে ভাখো—'

তবু শেষ পর্যন্ত রাজী হ'তেই হয়। আবারও একদল এসে দেখে, আবারও খবর দেবো বলে যায়। যদি বা কেউ খবর দেয়, তারা হাঁকে কেউ আট, কেউ দশ হাজার। পিছিয়ে আসতে হয় অসিতকে।

মাঝখান থেকে অমন হাসিখুশী মেয়েটা কেমন হয়ে যায়। যার গলা রাস্তা থেকে শোনা যেত—তার গলা

শ্রী ডি, পি, রায়চৌধুরী কর্তৃক পরিকল্পিত ও নির্মিত এই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ।
এই স্মৃতিস্তম্ভটি পাটনার বিহার সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে।

এক বাড়ীতে থেকেও পাওয়া যায়না। সাতটা কথা কইলে একটা উত্তর দেয়। বাড়ীর কারুর সঙ্গেই বাক্যালাপ নেই। কথা কয় শিবুদার সঙ্গেই দু-একটা, কিন্তু সে বিচিত্র কথা সব। কোন দিন বলে, 'আচ্ছা শিবুদা, কতটা আপিং খেলে মানুষ মরে?' কোন দিন বা প্রশ্ন হয়—'শিবুদা, আজকাল আপিং-এর রেশন কার্ড হয়েছে না? খুচ্‌রো মোটে পাওয়া যায়না?' কিংবা 'মা, কী দিয়ে যেন আপিং গুলে খেলে আর পাম্প করতে পারেনা?'

মা ধমক্ দেন, শিবুদা ধমক দেয়—উপন্যাসের নায়িকার মত ম্লান হাসে অঞ্জনা।

একদিন মীরাট থেকে ওর বড় ভগ্নিপতি এসে হাজির হলেন। কী একটা অফিসের কাজে এসেছিলেন, দিন-দুই মাত্র থাকবেন। ভদ্রলোকের মাথাধরার ব্যামো—তিনি সর্বদা কোন না কোন য়্যাস্পিরিনের বড়ি গোটা-কতক ক'রে পকেটে রাখেন। জামা বদলে দিতে গিয়ে সেগুলোয় হাত পড়তে হাসি-হাসি মুখ ক'রে প্রশ্ন করলে অঞ্জনা, 'আচ্ছা বড় জামাইবাবু, এই বড়ি কতগুলো খেলে মানুষের হার্ট ফেল করে বলুন ত? এমনি চাইলে দেয় ডাক্তার খানায়?'

তার ফলে ওর ভগ্নিপতি ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বড়িগুলো নিয়ে নর্দমায় ফেলে দিয়ে সারা সন্ধ্যাটা মাথাধর যন্ত্রণায় ছটফট করলেন। শিবু এবং অসিত আসতে বললেন, 'এসব কী কাণ্ড ভাই? তোমরা কি করছ?'

অসিত একটু বিরক্ত হয়। বলে, 'করতে ত আপনারাও পারেন! আপনাদের কি কোন দায়িত্ব নেই? সবটা আমার ওপর চাপিয়ে দেন কেন?'

শিবু একটু হেসে চুপিচুপি বলে, ভয় পাবেন না জামাইবাবু, যতটা গর্জায় ততটা বর্ষায় না। যে বিষ খায় সে ব'লে কয়ে বিজ্ঞাপন ক'রে খায়না। ওটা একরকমের তাগাদা!'

কিন্তু বিষ খেতে না পারু ইদানীং খাওয়াদাওয়াও একরকম ছেড়ে দিয়েছে যে। অন্ন দুটি ভাত ছাড়া কিছুই খেতে চায়না। মাছ নয়, দুধ নয় মাখন নয়। বলে, 'কী হবে, দেহ ধারণের জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু ঠিক খাচ্ছি আমি। তার বেশী খেয়ে লাভ কি? এ দেহকে সখ করার কোন প্রয়োজন আছে?'

ফলে চেহারা আরও খারাপ হয়ে যায়। লোকের পছন্দ করার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়। অসিত ভয় পেয়ে টনিক আনে। সে টনিক অঞ্জনা নাকে, দেখিয়ে দেখিয়েই নর্দমায় ফেলে দেয়। বলে, 'আত্মহত্যা পাপ তাই সেটা করবনা। তাব'লে বেশী ক'রে বেঁচে থেকে বেঁচে থাকার লজ্জাটা আরও বেশী দিন ভোগ করতে হবে—এমন কোন আইন আছে কি?'

এই যখন অবস্থা—বাড়ীসুদ্ধ লোক বিচলিত, উদ্বিগ্ন তখন হঠাৎ একটু আশার আলো দেখা দেয়। শিবুরই এক দূর সম্পর্কের মামা দেখতে এলেন তাঁর ছেলের জন্য। লেখাপড়া জানা মেয়ের ওপর তিনি হাড়ে-চটা। তিনি চান গেরস্ত ঘরের কাজকর্ম-জানা মেয়ে। অঞ্জনার হাতখানা নিজের হাতে নেড়েচেড়ে বললেন,'না—তুমি কাজকর্ম করো বলেই মনে হচ্ছে। কলকাতা ভবানীপুরে যে মেয়েই দেখতে যাই বলে, হ্যাঁ সংসারে কাজকর্ম রান্নাবাড়া সব ও-ই ত···করে! বাবা, আমি হলুম গে সাত হাটের কানাকড়ি, আমার সঙ্গে চালাকি! হাতখানা দেখলেই বুঝতে পারি, তুলতুল করছে হাত—কাজের হাত কখনও অমনি হয়! না অসিতবাবু মোটের ওপর আমার খুব অপছন্দ নয়।··· রূপ নিয়ে কী আর ধুয়ে খাবো? আর এই যে দেখছেন আজ-কালকার মেয়ে—রূপ এদের কদিনই বা থাকে। কাজ কর্ম করলেও তবু দু একদিন শরীর থাকৃত। পড়ে পড়ে চোখ কানা, এই পুরু পুরু পরকলা—আর দেহগুলি মা লক্ষ্মীদের এক একটি রোগের ডিপো। আমি মশাই এমনি গেরস্ত-ঘরের মেয়েই পছন্দ করি!'

এঁরা উল্লসিত হলেন। আর হবারই কথা।

কিন্তু দেখা গেল, ইংরেজীতে যাকে বলে মাসিককে বাদ দিয়ে শুয়োর পোনা—এঁরা তাই ক'রে বসে আছেন। মামা গেরস্ত ঘরের মেয়ে ত পছন্দ করেনই—সেই সঙ্গে আরেও একটি জিনিস পছন্দ করেন—সেটি হচ্ছে কিঞ্চিৎ টাকা!

না। সোজা কথা দেখছেন ত আমার জন্য এঁরা কী রকম বিপদে পড়েছেন—'

'কিন্তু কোথাও যদি একটা ঠিক ক'রে দিই? তা'হলে ছাড়বি ত মা?' অপূর্ববাবু সাগ্রহে উঠে দাঁড়ান, 'আমি এখনি যাচ্ছি সে সরস্বতীর কাছে। শুনবে না মানে। আমার কথা না শুনে সে যাবে কোথায়। তার ঘাড় শুনবে। টিকি পর্যন্ত বাঁধা না আমার কাছে!···এক ঘারে দিন ঠিক ক'রে ফিরব বাবা অসিত। কিন্তু তা'হলে, তা'হলে—ছেলেকে কি রাজী করাতে পারব?' আবার যেন একটু হতাশা তাঁর কণ্ঠে।

অসিতের অপেক্ষা না ক'রেই অঞ্জনা উত্তর দিলে, 'সে রকম কোন ভরসা পেলে আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি—'

অপূর্ববাবু আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে ঝড়ের বেগেই বেরিয়ে গেলেন। এমন কি চা খাবার কথাও তাঁর মনে পড়ল না।

"রাঙা মামী"

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দেখা হ'লেই রাঙামামী অনুযোগ করতেন, কই রে কি হ'ল ?

বলতাম, এই যে রাঙা মামী দুটো বই আরম্ভ করেছি, এগুলো শেষ হ'লেই তোমারটা ধরব।

—আর তুই আমারটা ধরেছিস। কবে মরে যাব। রাঙামামী আফসোস করতেন।

—হ্যা মরে যাবে বই কি। কিই বা তোমার বয়স !

—মরে যাবার আবার বয়স আছে নাকি, হ্যারে পাগলা ? রাঙামামী হেসে ফেলতেন, তারপর গম্ভীর হ'য়ে বলতেন, বয়স আমার কমই বা কি হল ? গেল বোশেখে আটচল্লিশ পেরিয়েছি।

বয়সের কথায় রাঙামামীর দিকে চাইতে হ'ত। আঁটসাট গড়ন, টুকটুকে রং, এখনও একমাথা কালো চুলের রাশ। কানের পাশে দু একটা রুপোলী ঝিলিক। তাও চট করে নজরে পড়ে না। অনেক খুঁজতে হয়।

—হ্যাঁ তোমার বয়স আটচল্লিশ না ছাই। আমি ঘাড় নাড়তাম।

—তবে কত বল না ? একুশ না বাইশ ? কিরে পাজাজিস যে ?

রাঙামামীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক কিছু নেই, কেবল গাঁ সুবাদে মামী। বহু বছর আমরা পাশাপাশি ছিলাম। দু বাড়ীর মাঝখানে পাতলা কঞ্চির বেড়া, সে বেড়া কাউকে আটকাতে পারে নি, এ বাড়ীর লোককেও নয়, ও বাড়ীর লোককেও না। আমার বেশীর ভাগ সময় কাটত রাঙামামীর কাছে। আকর্ষণ শুধু রাঙামামীই নয়, সেই সঙ্গে ছিল পাকা চালতা কুলের আচার আর বেলের মোরব্বার ওপর লোভ।

গায়ের বর্ণ অবশ্য রাঙা, কিন্তু কি সুবাদে মামী হ'লেন তা আজও বুঝে উঠতে পারি নি। মামাকে বড় জোর দেখেছি বার দশেক, কোন সময়েই সহজ অবস্থায় নয়। চুল এলোমেলো, দু চোখ জবাফুলের চেয়েও লাল, পা দুটো সর্বদাই টলছে। বাইরে চাকরী করতেন, শনিবার শনিবার বাড়ী ফিরতেন। তাও সব শনিবার নয়, বেশ কয়েক শনিবার এ মুখোই হতেন না।

শনিবার হ'লেই রাঙামামীর চেহারা বদলে যেত। অকদিন পরণে আধ ময়লা শাড়ী, এলো চুলের গোছা লুটিয়ে পড়ছে ঘাড়ের ওপর। সেমিজের বালাই নেই। ঘরদোরের শ্রীও তথৈবচ। তরকারির ডালাটা টেবিলের ওপর, বোধ হয় বিছানার ওপর চুল বাঁধতে বসার চেষ্টা করেছিলেন, সরঞ্জাম সেখানেই ছড়ানো। ঘরের কোণে কোণে মাকড়সার জাল। ধুলোর স্তিটে এখানে ওখানে। শনিবার হ'লেই কিন্তু অন্য ব্যাপার। ঝকঝকে তকতকে ঘরের মেঝে, ফুটো পড়লে তুলে নেওয়া যায়। ফর্সা চাদর বিছানার ওপর। বাড়তি বালিশ। সেই বালিশের ওয়াড়ে প্রজাপতি আঁকা। রাঙামামীর হাতের কাজ।

শুধু ঘরের চেহারাই নয়, নিজের চেহারাও বেমালুম পাল্টে ফেলতেন। বোধ থাকতে পালেদের পুকুরে নামতেন গা ধুতে। হাতে সাবানের বাক্স। এক ঘণ্টা ঘষে গা রগড়ান। তারপর মার কাছে এসে দাঁড়াতেন চুল বাঁধবার জন্য। হাতে একরাশ চুলের কাঁটা আর ফিতা।

চুল বাঁধা শেষ করে ফর্সা শাড়ী পরে রাঙামামী যখন দাওয়ায় ঘোরা ফেরা করতেন, তখন দেখাতো ঠিক দেবী প্রতিমার মতন। আয়ত দুটি চোখ, টিকোলো নাক, পাতলা লালচে ঠোঁট, নিটোল গড়ন হাত পায়ের। জানলা দিয়ে বসে বসে দেখতাম। শনিবার রাঙামামীর বাড়ী যেতাম না। যাওয়া অবশ্য বারণ ছিল না, কিন্তু সেদিন গেলে বিশেষ সুবিধা হ'ত না। রাঙামামী কেমন আনমনা, দশটা কথা জিজ্ঞাসা করলে তবে একটা উত্তর,

নিজে থেকে একটি কথাও নয়। তা ছাড়া, চালতা, কুল বেদের মোরব্বা উধাও।

মাঝে মাঝে শনিবারেও ডাক পড়ত। সন্ধ্যা উতরে গেলে রাঙামামী দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আমাদের বাড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকতেন, টুলু আছিস অ টুলু।

আমি এই ডাকের প্রতীক্ষায় জানলার ধারে বসে থাকতাম। সামনে বইয়ের পাতা খোলা থাকত কিন্তু মন কব্জির বেড়া পার হ'য়ে রাঙামামীর কাছাকাছি।

এক ডাকেই কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম।

—কটা বেজেছে বলতে পারিস টুলু?

আসবার আগে বেয়ালে টাঙানো বাবার হাত ঘড়িটার ওপর নজর বুলিয়ে এসেছিলাম, বললাম সাতটা প্রায় বাজে।

সাতটা! রাঙামামীর মুখে অবসাদের আভাস, গলার স্বরে হতাশার রেশ, আস্তে আস্তে বলতেন, সাতটা! তার মানে ছটা বাইশের গাড়ী এসে গেছে।

—কখন। ভাল হ'য়ে বসি রাঙামামীর পাশে।

অনেকক্ষণ পরে রাঙামামীর গলা, এর পরের গাড়ী কটায় রে টুলু?

—আটটা বারো।

—আটটা বারো। তার মানে আপদটা আজ আর এল না। কথার শেষে দীর্ঘশ্বাস।

প্রথম প্রথম বুঝতে অসুবিধা হ'ত। আপদ! আপদ আবার কে? পরে বুঝতে পেরেছিলাম। আপদ মামা। কোন দিন রাঙামামীর মুখে আর কোন ডাক শুনি নি।

রাঙামামী উঠে পড়তেন। একটা একটা ক'রে মাথার কাঁটা খুলে ফেলতেন। ভেঙে ফেলতেন খোঁপা। ফর্সা কাপড় ছেড়ে আবার আধময়লা শাড়ী জড়াতেন। দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকতেন চুপচাপ। কোলের ওপর দুটো হাত জড়ো করে।

আমিও বসে থাকতাম। কথা নয় বার্তা নয়, একদৃষ্টে চেয়ে থাকতাম রাঙামামীর মুখের দিকে। নারকোল গাছের ছায়ার কিছুটা রাঙামামীর মুখে। স্পষ্ট কিছু দেখা যেত না কিন্তু আভাসে বুঝতাম দু গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। আঁচল দিয়ে চোখ মোছার কোন চেষ্টা নয়, কান্না থামাবার কোন প্রয়াস নয়। মাঝে মাঝে ঠোঁটদুটো শুধু কেঁপে কেঁপে উঠত।

অনেকক্ষণ রাঙামামী বসে থাকতেন। আমি খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগেও জানলা দিয়ে চেয়ে দেখতাম রাঙামামী একভাবে বসে। খাওয়া খাওয়া নয়, নড়াচড়া নয়।

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতাম, রাঙামামী অমন করে বসে কেন মা?

মা নিচু হ'য়ে জানলা দিয়ে দেখতেন। বুক কাঁপিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলতেন, আহা বেচারী।

—কি হয়েছে মা?

মা আর কোন কথা বলতেন না। রান্নাঘরে খেতে বসে ফিসফাস ক'রে বাবাকে কি সব বলতেন। মাঝে মাঝে রাঙামামীর নামটা কানে আসত।

যে শনিবার মামা বাড়ী ফিরতেন, সেদিন রাঙামামী আনন্দে ডগমগ। আমার কথা আর মনেই থাকত না। মামাকে গাড়ু গামছা এগিয়ে দেওয়া, মাঝে মাঝে নিজের হাতে পা মুছিয়ে দেওয়া, পরিপাটি করে আসন পেতে মামাকে কাছে বসে খাওয়ানো। মামার গলার আওয়াজ বেশী পাওয়া যেতনা, দু একবার জড়ানো গলায় চীৎকার কিংবা বমির শব্দ। ব্যস্।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপারও হ'ত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসতাম বিছানায়। গুণ গুণ করে গানের শব্দ। সে বয়সে তাল মান সুর বোঝবার কথা নয়, কিন্তু মিষ্টি একটা সুরের প্রবাহ আচ্ছন্ন করে ফেলত আমায়। মনে হ'ত এমন গান আমি কোনদিন শুনি নি। রাঙামামীর ওপর রাগ হ'ত। এমন চমৎকার গলা অথচ কোন দিন একটা গানের কলিও কি শোনাতে নেই আমাকে! এ গান কি এমনি ক'রে দরজা জানলা বন্ধ করে গাইতে হয়। কেবল যাতে মামা শুনতে পায়, আর কেউ নয়।

সোমবার সকালে মামা চলে যেতে আমি রাঙামামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। অভিমান ভরা গলায় বলতাম, যাও আর কোনদিন যদি কথা বলি তোমার সঙ্গে?

তরকারি কুটতে কুটতে থেমে বঁটিটা কাত করে

রেখে রাঙামামী হাসতে হাসতে বললেন, কেন গো টুনুবাবু, কি অপরাধ করলাম আমি।

—হুঁ, কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে মামাকে গান শোনাবে দরজা জানলা বন্ধ করে। আমরা যেন আর গান শুনতে পারি না, না ?

হাসতে গিয়েও মামী গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। সারা মুখে বেদনার মেঘের সঞ্চার। দুটি চোখে অশ্রুম্লান। খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলতেন,—আমি গান গেয়েছি কে তোকে বললে ?

প্রতিবাদের ধরণ দেখে চটে উঠতাম, আমি নিজের কানে শুনেছি মশাই। বিছানার ওপর বসে অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি।

—দূর ভুল শুনেছিস। কোন পেত্নীর গলা। নিজের মানুষকে ধরে রাখবার জন্য বোধ হয় ইনিয়ে বিনিয়ে সুর তুলছিল।

খুব চটে গরম কিছু বলতে গিয়েই থেমে যেতাম। রাঙামামীর দুটি চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। গাল ভিজিয়ে, বুকের আঁচল ভিজিয়ে।

একটি কথাও বলতে পারতাম না। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে বাড়ীতে পালিয়ে আসতাম।

আসল ব্যাপার বুঝলাম অনেক পরে। স্কুলে উঁচু ক্লাশে পড়ছি তখন। মামার আসাযাওয়ার পালা তেমনি চলছে, রাঙামামীর প্রতীক্ষা করার ধরণও এক।

মাঝরাতে রাঙামামীর গান নয়, আচমকা চীৎকার।

দরজা খুলে ছুটে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। পিছন পিছন মাও এসেছিলেন কিন্তু তিনি কি ভেবে বেড়ার এপারেই রয়ে গেলেন। রাঙামামী দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কপাল চেপে। হাতের ফাঁক দিয়ে তাজা রক্তের স্রোত।

আর একটু এগোতেই রাঙামামী দেখতে পেলেন। হাত নেড়ে বারণ করলেন। আমি পায়ে পায়ে পিছিয়ে এলাম। দাওয়া থেকে নেমে পথের ওপর, সেখান থেকে সরে সরে আমাদের বাড়ীর উঠানে।

চলে আসতে আসতেই মামার কর্কশ কণ্ঠ কানে গেল, বেশ করব খাব। আলবৎ খাব। কারুর বাপের পয়সায় খাচ্ছি ? আমাকে বাধা দিতে এলে খুন করে ফেলব। হুঁ।

মামা প্রকৃতিস্থ নন, এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম আর রাঙামামীর কপাল থেকে ঝরে পড়া রক্ত বিন্দুর ইতিহাসও অজানা ছিল না।

আরো বছর তিনেক। ম্যাট্রিক পাশ করে শহরে চলে এলাম। তার আগেই লক্ষ্য করেছি মামার আসাও খুব কমে গিয়েছে। মাসে একবারও আসেন কিনা সন্দেহ। এলেও রাঙামামীর গান আর নয়, সারা রাত ধরে খিটিমিটি, বচসা। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ছিটকে ছিটকে বাইরে আসত।

সপ্তাহান্তে বাড়ী আসতাম। একদিন সবে দাওয়ায় পা দিয়েছি, দেখলাম রাঙামামী মাথায় ঘোমটা টেনে আমাদের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ আমাকে দেখতে পান নি।

মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ মা, রাঙামামী না ? মা বললেন, হ্যাঁরে। আহা বেচারীর যা অবস্থা। লোকের বাড়ীতে চালডাল ধার করে বেড়াচ্ছে।

—কেন, মামা ?

—হুঁ, মা তালুতে জিভ ঠেকিয়ে হতাশাব্যঞ্জক শব্দ করলেন, এ তল্লাটে আর আসে না। আজ মাসখানেক তার পাত্তা নেই। গোটা চারেক চিঠি লিখেছে কোন উত্তর আসে নি।

আর কথা বাড়ালাম না। বড় হয়েছি, যখন রাঙামামীর বাড়ী গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করে। তা ছাড়া সময়ও পাই না। শনি রবি দুটো দিন এদিক ওদিক করেই কেটে যায়। এ ছাড়াও বুঝতে পেরেছি ভাগ্য বিড়ম্বিতা রাঙামামীর অন্তরের কাহিনী। নপুংস স্বামীকে নিয়ে জীবন-নির্বাহ করার জ্বালা।

সেদিন বাইরে বেরোবার মুখেই বাধা পেলাম। রাঙামামী উঠান থেকে নাম ধরে ডাকলেন, টুনুবাবুর যে দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল।

থেমে মুচকি হাসলাম।

রাঙামামী কয়েক পা এগিয়ে এলেন, শোন একটা কথা আছে।

পাড়ার লাইব্রেরীতে যাবার একটু দরকার ছিল, কিন্তু রাঙামামীর ডাক উপেক্ষা করা যায় না।

দাওয়ার কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে বললাম, কেমন আছেন? রাঙামামী হাসলেন, ভাল, আজকাল তো তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। কখন আস, কখন যাও কিছুই টের পাই না।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাঙামামী চালের বাতা থেকে একটা আসন টেনে নিয়ে দাওয়ার ওপর পেতে দিলেন।

—এ আবার কি?

—বাবা, তুমি আজকাল কলেজে পড়ছো, আসন না পেতে তোমায় বসতে বলতে পারি? আর তো ছোটটি নেই যে আচার আর মোরব্বার লোভে তোমায় আটকাব।

সহজ সুরে রাঙামামী কথাগুলো বলার চেষ্টা করলেও গলার আওয়াজ যেন ভেজা ভেজা। চোখের কোনেও অশ্রুর ইসারা।

—কিছু বলবেন রাঙামামী?

রাঙামামী কোন উত্তর দিলেন না। কাছে বসে পড়লেন। গলাটা এগিয়ে নিয়ে এসে প্রায় কানে কানে বলার মতন বললেন, আমার একটা কাজ করে দিবি টুনু?

চোখ তুলে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলাম। উদ্বেগ আর অনুনয়ের নিষ্পেষ দু চোখের দৃষ্টিতে।

খুব আস্তে বললাম, বলুন?

রাঙামামী আরো কাছে সরে এলেন। প্রায় গা ঘেঁষে, বললেন, হ্যাঁরে তোর তো কলকাতায় অনেকদিন হ'য়ে গেল। রাস্তাঘাট সব চিনিস?

সমস্ত রাস্তা ঘাট চেনা আজ সম্ভব নয়, কলকাতায় বহু বছর বাস করলেও। কিন্তু এমন কথা কারুর কাছে স্বীকার করা যায় না, অন্ততঃ রাঙামামীর কাছে তো নয়ই।

বললাম, তা চিনি বই কি। প্রায় সবই চিনি।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। স্কুলে থাকতেই লুকিয়ে চুরিয়ে কবিতা লেখার বাতিক ছিল। কলেজে যাবার মতন প্রায় অন্তঃসলিলা। কিন্তু কলেজে উঠে সে ধারা তটপ্লাবিনী হ'য়ে উঠল, কূলপ্লাবিনীও। ফলে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সম্পাদকের দরজায় দরজায় ঘোরা। পলি খুঁজিতে নতুন পত্রিকার আঁতুড়-ঘরে হানা। কাজেই পথ ঘাট কিছুটা জানা হয়েছিল বৈ কি।

—তুই তারকদত্ত লেন চিনিস? সত্যেরোর বি?

তারকদত্ত লেনই চিনি না, তার আবার সত্যেরোর বি। কিন্তু সবেগে ঘাড় নাড়লাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব চিনি। নেহাৎ ছোট গলি তো নয়, বেশ বড় রাস্তা।

বড় রাস্তা বুঝি? রাঙামামীর গলায় উৎসাহের আমেজ।

—হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে কার কাছে যেতে হবে?

—মানে, ইয়ে, ওই যে, রাঙামামী আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়ালেন, আবার খুললেন তারপর যেন দ্বিধা সঙ্কোচ জোর করে কাটিয়ে উঠেছেন এই ভাবে বললেন, তোর মামার কাছে একবার যেতে হবে?

—মামার কাছে? মামা ওই ঠিকানায় থাকেন বুঝি?

—ওটা তো মেসবাড়ী। সেখানেই আছে অনেক দিন থেকে।

—মামাকে কি বলব?

রাঙামামী আবার বিব্রত হয়ে পড়লেন। আঙুল দিয়ে দাওয়ার ওপর আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বললেন, অনেকদিন মানুষটা আসে নি। অসুখ বিসুখেই পড়ল কিনা কে জানে। একবার গিয়ে খোঁজটা নিয়ে আসবি।

কথাটা আমার হঠাৎই মনে পড়ে গেল। লোকটার যে খোঁজ নেব, তাঁর নামই তো জানি না।

—মামার নামটা বলে দাও রাঙামামী, নইলে খোঁজ করব কি করে?

—দূর বোকা, রাঙামামীর সিঁথির সিঁদুর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। লজ্জাজড়ানো গলায় বললেন, স্বামীর নাম মেয়েছেলেকে করতে আছে। দাঁড়া কোন বই টইয়ে যদি নাম লেখা থাকে, দেখছি।

রাঙামামী উঠে পড়লেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন টেবিলের ওপর, ড্রয়ারের মধ্যে, বালিশের তলায় তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে একটা কাগজে নামটা লিখে কাগজটা আমার হাতে দিলেন।

মোটা মোটা অক্ষর। লেখার কোন ছিরি ছাঁদ নেই। কিন্তু নামটা স্পষ্ট পড়া গেল। শ্রীহেমচন্দ্র রায়।

কাগজের টুকরোটা পকেটে ফেলে উঠে পড়লাম।

মুখে বললাম, ঠিক আছে, আমি কালে বিকেলেই দেখা করব। সামনের শনিবার খবর নিয়ে আসব রাঙামামী।

রাঙামামীও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, যদি অসুখ বিসুখ দেখিস টুনু তো মাকে একটা চিঠি লিখে জানাস, তাহলেই আমি খবর পাব।

সোমবার ভোরে কলকাতা রওনা হওয়ার মুখে আবার রাঙামামীর সঙ্গে দেখা। চৌরাস্তার মোড়ে বটগাছতলায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন। শোন টুনু, যদি দেখিস অসুখ বিসুখ কিছু নয় তো একটা কথা বলে আসতে পারবি?

—কি?

—বলবি, এ শনিবার যেন নিশ্চয় আসে, খুব দরকার। আমার মাথার দিব্যি দিয়ে আসতে বলবি, বুঝেছিস?

ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি পা না চালালে সাতটা দশের গাড়ী ধরতে পারব না।

সত্যি সত্যিই পৌঁছেই বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম তারকদত্ত লেনের সন্ধানে। সহপাঠীদের কাছে অবস্থান সম্বন্ধে খোঁজ পেয়েছিলাম, কিন্তু ঘুরে ঘুরে হায়রান। ও নামের গলি মিলল না। ফিরে আসব ভাবছি এমন সময়ে এক পানওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতে সে নির্দেশ দিল। ভুবন হালদার লেন থেকে বেরিয়েছে। সরু সড়ক। তিন ফুট চওড়া। গলি নয় উপগলি। পাশাপাশি দু জন যাওয়া দুষ্কর। দু ধারে ইঁটের পাঁজর প্রকট দেয়াল, বসন্তের গুটির মতন ঘুঁটের দাগ সর্বাঙ্গে। কানায় কানায় টইটম্বুর ডাষ্টবিন। উপচে কিছু রাস্তাতেও পড়ছে। একটু এগোতে সন্ধান মিলল। খড়ি দিয়ে বাড়ীর দরজায় লেখা সতেরোর বি।

কড়ায় হাত ছোঁয়াবার আগেই দরজা খুলে গেল। বিরলকেশ ভদ্রলোক। একেবারে পিছনের দিকে মাথার মতন দু একগাছা চুলের ইসারা। পানের ছোপে শুধু ঠোঁটেই নয়, দাঁতগুলোও রাঙা টুকটুকে।

বললেন, কাকে চাই?

মামার নাম বললাম, শুনে ভদ্রলোক মাথায় হাত চাপড়ালেন। চোখ দুটো ছোট করে আমাকে আর একবার জরিপ করে বললেন, আপন মামা, মানে সাক্ষাৎ মামা।

—একরকম তাই। ঠিক কি রকম মামা তা বোঝাতে গেলে সময় নেবে, তাই ওপথে গেলাম না।

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, মামার খোঁজ আমরা আর আপনাকে কি দেবো বলুন। খোঁজ করুন গিয়ে পিয়ারী সরকার লেনে মালতীর বাড়ী, দিনরাত তো সেখানেই পড়ে আছেন। মাঝে মাঝে মদ গিলে ফিরে আসেন মেসে, হৈ হল্লা করে আবার হাওয়া। তবে কিছু বলতে পারি না মশাই, মাসের প্রথম তারিখে ঠিক মত হিসেব মিটিয়ে দেন। একটু এদিক ওদিক নয়। আমার পাওনা মিটিয়ে দিলেই হ'ল কে কোথায় কার বাড়ী পড়ে আছে, তাতে আমার কি দরকার, কি বলুন?

কোন উত্তর দিলাম না। পায়ে পায়ে সরে এসে গলির ওপর দাঁড়ালাম। শুধু মুরা নয়। সাকীও আছে মামার। সেইজন্যই বোধ হয় রাঙামামীর কাছে আসবার অবকাশ মেলে না। শনিবার, শনিবার তো নয়ই, মাসে একবারও নয়।

ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করতে যাবার মুখেই কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম, একটা কথা বলতে পারবেন মামাকে?

—তা কেন পারব না। তবে সর্বদাই ঘোড়ায় চড়ে থাকেন কিনা, আমাদের ছোট কথা কানে তুললে হয়।

—বলবেন রাঙামামীর খুব অসুখ। একবার যেন দেখা করেন।

—রাঙামামী? বিস্ময়ে আর কৌতূহলে ভদ্রলোকের দুটো চোখ চিক চিক করে উঠল।

—মানে, ওই মামার স্ত্রী।

—তা বুঝেছি। আচ্ছা বলবো'খন। অফিস থেকে সোজা যদি এখানে ফেরেন তো নিশ্চয় বলব।

পরের শনিবার বাড়ী গেলাম বটে কিন্তু রাঙামামীকে এড়িয়ে গেলাম। ব্যাপারটা কিছু কিছু মাকে বললাম। সব কথা সোজাসুজি রাঙামামীকে বলতে সঙ্কোচে বাধল।

তারপর অনেকদিন আর রাঙামামীর সঙ্গে দেখা হয় নি। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মাকে নিয়ে শহরে বাসা

বাঁধলাম। দি, এ পরীক্ষায় যার দুয়েক মুখ থুবড়ে এক বেসরকারী অফিসের ফাইল ক্লার্কের চেয়ারে বসলাম। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে। ইতিমধ্যে কবিতা ছেড়ে গল্প ধরেছি। দু একটা বইও বাজারে বেরিয়েছে। যত খেটে লিখেছি, সে অনুপাতে নাম অবশ্য হয় নি। পকেটও ভরে নি। মাগ্‌গীভাতা নিয়ে সাতানব্বই টাকা মাইনে তার মধ্যে পঁচিশ টাকা বাড়ী ভাড়া দিয়ে বাকি যা থাকে তাতে দু জনের গ্রাস বা আচ্ছাদন কোনটাই পুরোপুরিভাবে চলে না।

বাড়তি রোজগার হিসাবে বইয়ের ক্যানভাসারের পোষাক অঙ্গে জড়ালাম। ঝামেলার কাজ। বইয়ের বস্তা হাতে নিয়ে মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘোরা। সেক্রেটারী আর হেডমাষ্টারদের দরজায় ধর্না। নানা জিনিসপত্র ঘুষ। ছানাবড়ার হাঁড়ি থেকে অসময়ের কপি। পরিবর্তে শুধু দু একখানা বই তাঁরা চালু করবেন। নব স্বাস্থ্য কথা কিংবা ভূগোল প্রকাশ। একটু দূরে কোথাও যেতে হ'লে মাঝে মাঝে অফিস থেকে ছুটি। মার অসুখ কিংবা নিজের জ্বর। শুধু বাঁচবার জন্যই এই মিথ্যাচারের আশ্রয়টুকু নিতে হত। প্রাণধারণের গ্লানি।

সেদিন মলয়পুরের স্কুলবাড়ী থেকে ফেরবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল। এই তো কাছেই রাঙামামীর বাড়ী। বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। একবার দেখা করে গেলে হয়।

রাঙামামী দাওয়ায় খোলা উনানে মুড়ি ভাজছিলেন, গিয়ে দাঁড়াতেই লাফিয়ে উঠলেন, কে টুনু না? আয়, আয়। খুব ছেলে যা হোক, আর এ পথ মাড়াতে নেই! রাঙামামী বাঁচল না মরল সে খোঁজই নয়।

শুধু শাড়ীর পাড় থেকেই রাঙামামী রঙ মুছে ফেলেছিলেন, দেহের আর কোথাও রঙের অভাব হয় নি। শক্ত সমর্থ শরীর, সুগৌরবর্ণ, এক মাথা ভ্রমরকৃষ্ণ চুল। বয়সের কোন ছাপ নেই সারা শরীরে।

খুব আস্তে বললাম, এ সর্বনাশ কবে হল রাঙামামী?

—সর্বনাশ! ওঃ, রাঙামামী নিজেকে সামলে নিলেন, তোরা চলে যাবার বছর খানেক পরেই। কিছুই জানি না রে টুনু। হঠাৎ একদিন দুজন ভদ্রলোক ওর বিছানাপত্র আর সুটকেসটা দিয়ে গেল। তারাই বলল, হাসপাতালে সব শেষ হ'য়ে গেছে। লিভারের কি একটা অসুখ বলল।

রাঙামামী একটু থামলেন। গলা ধরা ধরা লাগল। মাথা নিচু করে কি ভাবলেন কিছুক্ষণ তারপর থেমে থেমে বললেন, দিন সাতেক পরে অফিস থেকেও একটা চিঠি এসেছিল। ওটাচার্যদের সাতুকে নিয়ে কলকাতায় যেতে হয়েছিল। সই সাবুত। অনেক ঝামেলার পর ওর অফিসের জমানো টাকা হাতে এসেছিল। সেই পোষ্টাফিসে জমা রেখেছি। সুদ কিছু পাই আর এই মুড়ি ভাজার কাজ। আমায় বেরোতে হয় না, যার দরকার তারাই বাড়ী থেকে নিয়ে যায়।

এবার আর রাঙামামীকে চিনতে অসুবিধা হয় না। নিজের মধ্যে দিয়েই যেন চিনতে পারি। বাড়ীতে রোজগারের জন্য আমার যেমন বইয়ের দালালি, রাঙামামীর তেমনি মুড়ি ভাজা। তবে আমার চেয়ে রাঙামামীর সুবিধা এই যে আমায় যেমন স্কুলের দরজায় দরজায় ফেরি করে বেড়াতে হয়, রাঙামামীর তা নয়। খদ্দের এসে তাঁর দরজায় দাঁড়ায়।

রাঙামামীর কথায় চমক ভাঙল, তুই তো আজকাল মস্ত বড় লেখক?

—লেখক, কে বললে?

—বলবে আবার কে। বক্সীতলা লাইব্রেরী থেকে তোর বই আনিয়ে যে পড়ি। সুরের বাঁধন, এই সেদিন কি যে একটা পড়লাম, শ্বেতপদ্ম।

—আসল ব্যাপারটা আর রাঙামামীর কাছে ভাঙলাম না। বই বেরোলেই নিজের খরচে বক্সীতলা লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিই। মলয়পুরে ছেলেবেলা থেকে মানুষ। আমি যে লেখক হয়েছি এ খবরটা এখানে না দিতে পারলে শান্তি নেই। পাড়ার সঙ্গীরা, যারা অনেক খোসামোদের পরেও কবিতার একটি লাইন শুনতে চায় নি, তারা জানুক কি ভাবে একজন প্রতিভাবান লেখক অবহেলায় অবজ্ঞায় এখানে তার শৈশব আর কৈশোর কাটিয়ে গেছে।

তারপরই রাঙামামী আসল কথাটা পাড়লেন, টুনু, এত তো বই লিখছিস, আমাকে নিয়ে একটা বই লেখনা!

—আপনাকে নিয়ে।

—হ্যা, কেন, লেখা যায় না আমাকে নিয়ে। তোর মামাকে নিয়ে কি ভাবে জ্বলে পুড়ে মলাম সারাটা জীবন,

নিজের জিনিস পরের হাতে তাও হেসেছি, ঘোরাফেরা করেছি মনের আনন্দে। এই সব নিয়ে গল্প হয় না।

—কেন হবে না ?

—তবে লেখনা টুনু। বানিয়ে বানিয়ে কিছু লিখতে হবে না তোকে। যা সত্যি তাই লেখ। লিখবি।

কথা দিয়েছিলাম লিখব। মাঝে মাঝে ভেবেওছি মনে মনে। শনিবার রাতে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকা, মাঝরাতে গানের টুকরো, হাতের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের ধারা তারপর পিয়ারী সরকার লেনের কে এক মালতী। রাঙামামীর জীবন যে বিষাক্ত করে তুলল। লেখা যায় বই কি, বেশ লেখা যায়। কিন্তু খাতা-কলম নিয়ে বসতেই লেখা এক লাইন এগোয় নি। এত জলন্ত সত্য কথা নিয়ে বুঝি উপন্যাস ফাঁদা যায় না। কোথাও ফাঁক নেই, ফাঁকি নয়। নিটোল বাস্তব।

এরপর যতবার মলয়পুর এসেছি দেখা করেছি, রাঙামামীর সঙ্গে। ঐ এক কথা, এক অনুযোগ।

—কইরে টুনু, কবে আরম্ভ করবি। লিখেছিস কিছু।

—কিছু কিছু হয়েছে রাঙামামী।

—হয়েছে ? রাঙামামী উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠতেন, এরপরে যেদিন আসবি, খাতা নিয়ে এসে শুনিয়ে যাবি কেমন ?

উত্তরে ঘাড় নেড়েছি।

আবার অনেকদিন দেখা হয়নি রাঙামামীর সঙ্গে। মলয়পুরে যাবার সুযোগই হয়নি। এর মধ্যে আর একটা বই লিখেছি। কিন্তু রাঙামামীকে নিয়ে নয়।

সুযোগ জুটে গেল। এক গাদা বই নিয়ে মলয়পুর নিস্তারিণী বিদ্যালয়ের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। আরো অনেক ক্যানভাসার বেরিয়েছে অন্য প্রতিষ্ঠানের বই নিয়ে। কাজেই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন যে আগে বুড়ি ছুঁতে পারবে, তারই লাভ। বরাত। সেক্রেটারী গিয়েছেন মেয়ের বাড়ী। পরের দিন সকালে ফিরবেন। দেখা করতে হ'লে মলয়পুরে রাতটা কাটাতে হয়। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি।

রাঙামামীর কথা মনে পড়ল। রাত কাটাবার আস্তানা। বইয়ের থলি হাতে উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম। গলার আওয়াজে রাঙামামী ভেতর থেকে বাইরে এলেন।

—কে রে, টুনু ?

—হ্যাঁ রাঙামামী।

—হাতে কিরে ?

—বই। কথার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের ঝোলাটা দাওয়ায় নামিয়ে রাখলাম।

—বই। রাঙামামী এগিয়ে এলেন, তোর নতুন বই বেরল বুঝি। হাসি এল। হায়রে, সে ভাগ্যই করেছি কিনা। বুঝিয়ে শুনিয়ে পরকে পছাচ্ছি নিজের নয় পরেরই বই।

—না রাঙামামী, ওসব স্কুলের বই। অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থ্য। নতুন বই লিখছি তোমাকে নিয়ে, মাস দুয়েকের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে।

রাঙামামী ঝোলার দিকে নিচু হয়েছিলেন, আমার কথা শুনে টান হয়ে দাঁড়ালেন। মুখে একগাল হাসি। বললেন, বলসি বেরবার আগে দেখিয়ে যাবি আমাকে ? যাতা ছাই পাশ দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছিস না তো ? একটু মিথ্যে কথা কোথাও লিখতে পারবি না কিন্তু। তোর মামার কোন দোষ ঢাকতে পারবি না।

আর কথা বাড়ালাম না। আসার উদ্দেশ্য বললাম। দোকান থেকে চা আর রুটি খেয়ে এসেছি। রাতটা তাতেই কেটে যাবে। শুধু একটু শোবার ব্যবস্থা।

কোন অসুবিধা নেই। আমার বিছানা হল তক্তপোষের ওপর, রাঙামামী দাওয়ায়।

শরীর এমনিতেই ক্লান্ত ছিল। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। খুটখাট শব্দ। বিড় বিড় করে কার যেন কথা বলার আওয়াজ। আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। দরজা ভেজানো ছিল। খুলে দেখলাম, রাঙামামী দাওয়ায় নেই।

দাওয়ায় নেমে কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। এদিকের ছোট একটা ঘর। ভাঙা তোরঙ্গ, ছেঁড়া কাপড় থেকে শুরু করে কাঠ, ঘুঁটে, নারকেল পাতা বোঝাই।

মাটির প্রদীপ জ্বলছে। কাঠের বাক্সর গায়ে ফটোটা

হেলান দেওয়া। শুকনো ফুলের মালা জড়ানো। ফটোর সামনে মাথা রেখে রাঙামামী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

ফটোটা কার এ বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। একবার ভাবলাম পা টিপে টিপে ফিরে যাই বিছানায়, কিন্তু নিছক কৌতূহলের বশে এগিয়ে গেলাম।

মামার ফটো কিন্তু শুধু মামারই নয়, পাশে আর একটি মেয়ে। চুল বাঁধার ধরণে, চোখমুখের চংয়ে মেয়েটি যে কোন শ্রেণীর তা আর বুঝতে অসুবিধা হল না।

বোধ হয় মুখ থেকে বিস্ময়-সূচক কোন অব্যয় বেরিয়ে গিয়ে থাকবে, কিংবা পায়ের শব্দ একটু জোর, রাঙামামী পিছন ফিরলেন। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ফটোটা লুকিয়ে ফেললেন আঁচলের তলায়। হেসে ফেললাম, বললাম, ওটা লুকিয়ে লাভ নেই রাঙামামী, আমি দেখে ফেলেছি।

রাঙামামী একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। দু গাল বেয়ে জলের ধারা। নাকের পাটা দুটো ফুলে ফুলে উঠছে। কি ভেবে ফটোটা বের করলেন কাপড়ের তলা থেকে, একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, ট্রাঙ্ক থেকে পেয়েছি। কতদিন ভেবেছি ওর ফটোটা আলাদা করে নেব, ছিঁড়ে ফেলব বাকিটা, কিন্তু ছিঁড়তে গিয়েও পারি নি। বারবার মনে হয়েছে, ও তো একেই সত্যি ভালবাসত, বেশীর ভাগ সময় এর কাছেই কাটত, একে পেয়েই আমাকে ভুলে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম পরকাল বলে যদি কিছু থাকে, মানুষের আত্মা থাকে, তাহলে এ ফটো আলাদা করলে সেখানে ও কষ্ট পাবে। তাই ওটা আর ছিঁড়ি নি টুনু। ও যাতে সুখী হয়, যাতে আনন্দে থাকে, তাই তো আমার করা কর্তব্য, কি বল?

কি বলব! এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। স্বল্প আলোয় রাঙামামীকে আর একবার ভাল করে দেখলাম। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলেছেন, কোথাও একটু দাগও নেই, সামান্য দুর্বলতাও নয়।

মনে হল রাঙামামীকে নিয়ে উপন্যাস রচনা চলে কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠতর কোন লেখনীর, স্থিতপ্রজ্ঞ কোন সাহিত্যিকের।

মুকুর

[গল্প]

মানবেন্দ্র পাল

শুভ্রজ্যোতির অনুরোধে আজ পর্যন্ত দু'বার সর্বান্তঃকরণে 'না' বলেছে তপতী।

একবার, যেদিন হঠাৎ অফিসে গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শুভ্রজ্যোতি বললে—আমার নতুন প্রেসটার নাম তোমার নামেই করে দিই।

এই পর্যন্ত বলেই শুভ্রজ্যোতি নিজেই হেসে উঠেছিল। বলেছিল,—ভয় নেই, কেবলমাত্র তোমার নামটাই নেব না তোমার নামে প্রেসটা লিখেও দেব।

খুব সহজ ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা শুভ্রজ্যোতি বলে ফেলেছিল কিন্তু তপতী অত সহজে তার উত্তর সে মুহূর্তে দেয়নি।

ঘরের ভেতর তখন আর কেউ ছিল না। বাইরে শ্রাবণের বাদলা। সিলিং ফ্যানটা ঘুরছিল মৃদু গতিতে।

—কী হ'ল অমন গম্ভীর হ'য়ে গেলে যে! অন্ধকারটা ভালো লাগল না বুঝি?

তপতী এবারও চুপ করেছিল। একটু পরে বললে—ওসব কথা দয়া করে আমায় বলবেন না। আমি লোভী নই।

শুভ্রজ্যোতিও গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিল। একটা সিগারেট নিয়ে নখের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বললে—লোভ আমি দেখাচ্ছি না। তবে নিজের ভবিষ্যতটা তো ভাবা দরকার। চিরদিন কি এমনি ভাবে আমার হাসব ক'রে চলবে? আজ যদি আমি চোখ বুজি?

তপতী বললে—তাহলে সুপ্রিয়াদি, বাচ্চু, পিন্টু আর রেখার যে দশা হবে, আমারও না হয় তাই হবে। ওদের জন্যে কি ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন? ওদের কাছে তো আপনি অন্তত ন্যায়ের দিক থেকে বাধা। আমার কথা বাদ দিন।

শুভ্রজ্যোতি সূক্ষ্ম হাসল। বললে—তোমার ভবিষ্যৎ কি ঠিক ক'রে রেখেছ নাকি? তা তোমার মতো এ রকম ধর্মপ্রাণ মেয়ে পেলে সময় সময় আমার মতো পাপিষ্ঠেরও বিয়ে করতে ইচ্ছে করে।

তপতীও একটু হাসল।—কিন্তু তার তো আর উপায় নেই। যুগটা তো ত্রেতা বা সত্য নয়। বৈরকলি। তা ছাড়া বাজারে এখন আপনার সুনামও যথেষ্ট।

তপতী একটু থামল। টেবিলের ওপর পেয়ালা স্তূতি চা জুড়োচ্ছিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তপতী আবার বললে,—আমার ভবিষ্যতের কথা বলছিলেন? সেটা অবশ্য ঠিক বলতে পারব না; তবে আর যাই হোক এতদিন পর হঠাৎ আবার সাড়ম্বরে আর একজনের গলায় মালা পরিয়ে বসতে পারব না, একমাত্র তোমার পায়েই আমার এই অনাঘ্রাত ফুলের মতো পবিত্র জীবনটি সমর্পণ করলাম।

শুভ্রজ্যোতি হেসে উঠল। বললে—পারবে না কেন? এখানের মেয়েরা তো এতে খুব চালু। তারা শুধু দেখে নেয়, বিয়ের আগের কোনো ছাপ দেহে লেগে নাই তো? ধরা না পড়লেই হল। মনের বালাই তো মরেই যায় পনেরো বছর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে।

তপতী বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললে—মেয়েদের ওপর খুব রাগ দেখছি। ঘা খেয়েছেন কত জায়গায়?

শুভ্রজ্যোতি বললে—নিশ্চই খেতাম, যদি বোকার মতো সিন্‌সিয়ারলি কাউকে ভালোবাসতাম। আমার জীবনে সিন্‌সিয়ারিটির বালাই নেই। আজ এই মুহূর্তে একবার উঁকি দিয়েছিলো, তা তুমিই বুদ্ধিমতীর মতো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ।

এটা কিন্তু গল্প নয়, ভূমিকা। এটা হল তপতীর প্রথম 'না'। এরও আগে তপতী এই শুভ্রজ্যোতির কাছে

আরও কয়েকবার মৃদু আপত্তি জানিয়ে মাথা নেড়েছিল, কিন্তু সেগুলো ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ওরকম আপত্তি সব মেয়েই বোধ হয় জীবনে অন্তত এক আধবার ক'রে থাকে। তারপর যখন ধাতস্থ হয়ে যায় তখন আর প্রথম দিনের আপত্তির কথা মনে থাকে না।

কিন্তু দ্বিতীয়বার যে 'না' করেছিল সেইটেই হল গল্প। সেই 'না'র সঙ্গে সঙ্গে তপতীর জীবনের ইতিহাসে যে ছেদ পড়ে গিয়েছিল তা নয়, এমন কি একটি অধ্যায়েরও এক চুল নড়চড় হয়নি—তপতী যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলতে লাগল; কিন্তু আমার গল্পের শেষ ঐখানেই।

'শুভ্র-প্রকাশনীর' নাম এই ছ'সাত বছর আগেও কিছুই ছিল না। আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের একটা সরু গলির মধ্যে একটা ছোট্ট ঘর। একটা ছোট্ট টেবিল। খান দুই তিন চেয়ার। আর একটা আলমারী। আলমারী ভর্তি নানা রকমের বই। সিলিং ফ্যান কেনার সামর্থ্য তখনো ছিল না। একটা টেবিল ফ্যান ভাড়া করে চালিয়ে নেওয়া হত এপ্রিল থেকে আগষ্ট পর্যন্ত।

টাকার তখন টানাটানি বড্ড বেশি শুভ্রজ্যোতির। পৈতৃক সম্পত্তি যা ছিল ব্যবসা নামে বহুবার উড়িয়ে দিয়েছে। তখন বন্ধুরা যে যা মাথায় বুদ্ধি জুগিয়েছে শুভ্রজ্যোতি সেই মতোই করতে গিয়েছে। আর অজানা অচেনা পথে চলতে গিয়ে বারে বারেই হোঁচট খেয়েছে। সেই হোঁচটের খেসারত দিতে দিতে আজ শুভ্রজ্যোতি সর্বস্বান্ত।

শেষ পর্যন্ত বন্ধু অনুকূলের পরামর্শে খুলল ছোট্ট এই বইয়ের দোকান। তেমন কিছু টাকা ফেলতে হয়নি। তবু যা লেগেছিল তা দেবার ক্ষমতা শুভ্রজ্যোতির তখন ছিল না। তখন অনুকূলই এগিয়ে এল। বললে—আচ্ছা, অর্ধেক আমিই দিচ্ছি।

বাকি অর্ধেক ?

এমনি সময়ে পর্দা সরিয়ে শুভ্রজ্যোতির সাত বছরের ছেলে পিন্টু বেরিয়ে এল। হাতে তার কয়েক গাছা চুড়ি। বললে—বাবা, মা এগুলো তোমায় দিতে বললে।

অনুকূল আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বললে—বাঃ! এই নইলে স্ত্রী! আর দেরী নয়, দোকান খুলে দাও। আর একটি কথা—তোমার পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে সাবধান। যেন তারা তোমার দোকানের ত্রিসীমানা না মাড়ায়।

দোকান খোলা হল।

প্রথম প্রথম পাঁচজনের বই কিনে এনে বিক্রি চলত। তারপর ক্রমশ শুভ্রজ্যোতি নিজে প্রকাশক হল। তখন সবে একটি কি দুটি বই বেরিয়েছে, এমনি সময়ে একদিন এল তপতী রায়।

এল অবশ্য দূরের একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরে। ফরিদপুরে বাড়ি। রায়টে সর্বস্বান্ত হয়ে বিধবা মায়ের হাত ধরে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুভ্র প্রথমে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল। বুঝতে পারছিল না, কী ভাবে তার এই দূর সম্পর্কের আত্মীয়াটিকে সাহায্য করবে।

তপতী বোধহয় শুভ্রর মনের ভাব বুঝতে পারল। বললে স্নিগ্ধ কণ্ঠে—আমি আপনার গলগ্রহ হ'য়ে থাকবার জন্যে আসিনি। লেখাপড়া জানি, ম্যাট্রিক পাশ করেছি, টাইপও জানি কিছু কিছু। আমায় কোনো ভদ্র জায়গায় একটা চাকরী করে দিন। তাহলে আমরা উপকৃত হব।

শুভ্র কী ভেবে বললে—আপনারা এখানে আছেন কোথায় ?

তপতী বললে—টালায়। এখানে এসে একটা ছোটো স্কুলে সাময়িকভাবে কাজ পেয়েছিলাম, সেটিও গেছে কয়েক দিন হল। এখন—

শুভ্র বললে—আপনি তাহলে ছটার পর আসবেন। দোকান বন্ধ করে আপনাকে নিয়ে আমার বাসায় যাব। সুপ্রিয়া কী বলে দেখি।

সুপ্রিয়া খুশিই হল। ওই বললে—যাচ্ছু, পিন্টুর পড়ানোর জন্যে যদি পাওয়া যায় তা'হলে তো ভালোই হয়।

তাই স্থির হল। তপতী দু'বেলা খাবে আর অল্প কিছু করে পাবে। তারপর যদি শুভ্রর বিজনেস ভালো চলে তাহলে তার দোকানের জন্যেই ওকে টাইপিষ্ট রাখতে পারে। আজকালকার দিনে বিজনেস করতে গেলে অন্ততঃ বসবার ঘরটা—চিঠির প্যাডটা—লেডি-

টাইপিষ্টের সরু সরু আঙুলের নিভুল অক্ষরবিন্যাস এগুলোর প্রয়োজন যে অনিবার্য।

এই বলে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে শুভ্রজ্যোতি বেরিয়ে পড়েছিল।

সেই শুভ্রজ্যোতি উন্নতি করলে যথেষ্ট। তা সে নিজের ভাগ্যেই হোক কিম্বা তপতীর পরে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের অন্ধ গলি থেকে দোকানে উঠে এল কলেজ ষ্ট্রীটের ওপর। বড়ো বড়ো অক্ষরে সাইন বোর্ড ঝুলল 'শুভ্র প্রকাশনী'। টেবিল ফ্যান উঠে গেল, এল বড়ো বড়ো সিলিং ফ্যান। টেলিফোন বসল, বেয়ারা নিযুক্ত হল অনেকগুলি। নীচে দোকান। খদ্দেরের ভিড় লেগেই রয়েছে। এখন তো আর দু'একটা বইয়ের প্রকাশক নয়, রীতিমতো কলকাতার বাজারে বিখ্যাত প্রকাশক হিসেবে কম্পিট করতে চলেছে।

তপতী রায়ও উন্নতি করেছে। এখন আর টাইপ মেশিনটা সামনে নিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে মাঝে মধ্যে দু'একটা চিঠি টাইপ করা তার কাজ নয়, তার জন্যে নতুন টাইপিষ্ট এসেছে। এখন তার চেয়ার শুভ্রজ্যোতির ঘরে—পাশেও বলা যেতে পারে।

এখন তপতীর চেহারাই বদলে গেছে। যে মেয়ে ছিল নিতান্ত সাধারণ এখন তারই চালেচলনে কোথা থেকে এসেছে একটা স্বকীয়তা। মুখের ওপরে ফুটে উঠেছে আভিজাত্য। শাড়ি আজও সহজভাবেই পরে; কিন্তু সহজে কেউ বুঝতে পারে না তার দাম। গায়ে গহনা নেই—কিন্তু সরু কব্জির ওপর আছে একটা দুর্মূল্য ঘড়ি। তপতী রায় ঠিক সাড়ে দশটায় অফিস আসে। বাইরে থেকে খুট্ খুট্ শব্দ শুনেই স্টাফেরা সোজা হয়ে বসে, জ্বলন্ত সিগারেট লুকোয় পেছোনে, চোখ নামিয়ে নেয়। তপতী রায় গম্ভীর ভাবে ভেতরে চলে যায়। কী তেল মাখে কে জানে চলে যাবার পরও সমস্ত ঘরখানা গন্ধে ভরে থাকে।

তপতী রায় চলে যায়। চলে যায় মানে, ওপরে উঠে আসে। কিন্তু নীচের ঘরে যতক্ষণ সেই চুলের গন্ধটুকু থাকে ততক্ষণ স্টাফেরা ভুলতে পারে না তপতীকে। তারা ঈর্ষা করে; এক নিরপরাধ ভদ্রমহিলা দুতিনটি সন্তানের জননীর সর্বনাশের মূল কারণের জন্যে ঘৃণা করে; আবার শুভ্রজ্যোতির অতবড়ো অবার প্রত্যাখ্যান করায় মনে মনে প্রশংসাও করে।

সেদিন নিরিবিলি ঘরে দুজনে যে-আলোচনা হয়েছিল সে খবরও কেমন করে জানি ছড়িয়ে পড়েছে এদের মধ্যে।

আলোচনা জোর হয়ে ওঠে। বিড়ি আর সিগারেটের ধোঁওয়ায় ঘর ভরে যায়, এমনি সময়ে বাইরে ভারী জুতোর শব্দ হয়। শুভ্রজ্যোতি আসছে।

মিস রায়ই আসেন আগে। শুভ্রজ্যোতি পরে। আবার কোনো কোনোদিন আসেন দুজনেই একসঙ্গে। সেদিন আসেন 'ওরা ট্যাক্সীতে।

সব জিনিস আন্দাজে ঠিক ধরা যায় না, তবু এটুকু নিঃসন্দেহ যে, যেদিন ওদের একসঙ্গে আসতে দেখা যায় সেদিন কর্মচারীরা অলক্ষ্যে মুখটিপে একটু হাসে। তারা জানে গত রাত্রে মালিক আর বাড়ি ফেরেন নি। বোধহয় নেমন্তন্ন ছিল মিস রায়ের বাড়ি।

ওরা দুজনে যেদিন একসঙ্গে আসেন সেদিন আর মিস রায় গম্ভীর নন। হাসিতে মুখ ঝলমল্। শুভ্রজ্যোতির বুকের কাছ ঘেঁষে গল্প করতে করতে দোকান ঘর পার হয়ে ওপরে উঠে চলে যান।

কাজ চলে। সারা দুপুর ঘন্টি বাজে টং টাং। বেয়ারা ছুটে আসে। সেলাম দেয়।

টেলিফোন বাজে ঝন্‌ঝনিয়ে। টেলিফোন ধরেন মিস রায়। —হ্যালো! বড়ো মিষ্টি কণ্ঠস্বরটি।

—হ্যাঁ বলুন, 'শুভ্রপ্রকাশনী'।

মিনিট খানেক চুপচাপ কথা শোনে। তারপর বলেন হয় তো—আচ্ছা ধরুন একটু। এই বলে টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে শুভ্রকে বলে—এই শোনো।

শুভ্র হয়তো চিঠি লিখছিল সেই সময়ে। মুখ তুলে তাকায়। মিস রায় বলেন—কাগজের বিল। শুভ্র বলে—আগামী সপ্তাহে নিয়ে যেতে বলো। তপতীর কণ্ঠস্বর আবার ভেসে যায় দূরে—হ্যালো!

একদিন অমনি টেলিফোন এসেছে।

মিস রায় উঠে টেলিফোন ধরলে—হ্যালো! 'শুভ্র-প্রকাশনী'। কিছুক্ষণ কথা শুনল কান পেতে। তারপর

বললে—আচ্ছা, ধরুন দেখছি। এই বলে শুভ্রর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে—অনুকূল বাবু।

—অনুকূল! এস এস। শুভ্র চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠছিল।

তপতী একটু ক্ষুব্ধ অভিমানের সুরে বলে—দেব কি? আমি যে বলেছি, 'ধরুন দেখছি' এখুনি তোমায় পেলেই বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বসবে।

শুভ্র বললে—বেশ তো।

তপতী অভিমানের সুরে বললে—বেশতো! আজ কি বার মনে নেই? ওদিকে না—

এই পর্যন্ত বলে তপতী হঠাৎ টেলিফোনটা শুভ্রর হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে নিজে বাইরে এসে দাঁড়ালো। মুখটা তখন ওর থর্ থর্ করছে—লাল হয়ে গেছে কানের দুপাশ।

শুভ্র মুহূর্তখানেক কী ভাবল। তারপর টেলিফোনে মিনিট কয়েক কথা বলে রেখে দিল।

—তপতী!

তপতী তখন ঘরে ছিল না। দাঁড়িয়েছিল বাইরের বারান্দায়। শুভ্র হাসতে হাসতে বললে—মিস রায় শুনুন। অপরাধ নেবেন না। আমি ওঁকে নিষেধ করে দিয়েছি, যেন অতঃপর আর মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবার নেমন্তন্ন না করেন।

নেমন্তন্ন করতে না এলেও হঠাৎই একদিন এক বৃহস্পতিবারেই অনুকূল স্বয়ং এসে হাজির। নিজে যে শুভ্রর অফিসে আসে না তা নয়। তবে কম। নিজেও কাজে ব্যস্ত। তাছাড়া শুভ্র তো এখন দাঁড়িয়ে গেছে। এর জন্যে অনুকূল মনে মনে শুভ্রকে তারিফ করে। কর্মী পুরুষ।

আজ কিন্তু অনুকূল একা আসে নি। সঙ্গে আছে একটি মেয়ে। বয়েস বেশি হয়নি, বোধহয় সবে ষোলো পেরিয়েছে।

অনুকূলকে আসতে দেখেই তপতীর মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, নিশ্চয়ই আজ শুভ্রকে ওরা কেড়ে নিয়ে যাবে। সপ্তাহে মাত্র তিনটি দিন নিজের জন্যে রেখেছে। স্বল্প মেয়াদী এই কটা দিনের ওপর কেউ ভাগ বসায় তপতী যেন তা চায় না।

শুভ্র চেয়ার থেকে উঠে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, —আরে এসো, এসো, এসো।

দেখাদেখি তপতীও অভ্যর্থনা করলে ছোট্ট নমস্কার করে আর দুটো চেয়ার এগিয়ে দিয়ে।

অনুকূল হাসতে হাসতে বললে—আজ আর নিজের তাগিদে অর্থাৎ বন্ধুত্বের খাতিরে আসিনি, এসেছি আমার এই মহামান্যা স্যালিকার তাড়নায়। ওর বন্ধুর জন্মদিন—

এই পর্যন্ত বলে তপতীর দিকে তাকিয়ে বললে—মিস রায়, একে যদি দু'একটা ভালো বই দেখান—

তপতী একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল মেয়েটির মুখের পানে। আশ্চর্য সরল মিষ্টি মুখ। চোখ দুটি যে তুলি দিয়ে টানা তা নয়, নাকটি যে বাঁশির মতো সুন্দর তাও নয় তবু সব মিলিয়ে ফর্সা নিটোল মুখখানির ওপর একটি সহজাত শ্রী নিখুত কৌমার্যের গর্বে যেন টলমল্ করছে। এ মেয়ের চোখের দিকে তাকালে আর সংশয় থাকে না। নিষ্পাপ নিষ্কলংক শিশিরকণাটির মতো একটি সলাজ বিনম্র শুচিতা একে যেন ঘিরে রয়েছে। ঠিক এমন আর-একটি মেয়ে তপতী বোধ হয় এর আগে দেখেনি। আজ অকস্মাৎ সেই অফিস ঘরের একদিকে মাদকতা ভরা হাসি-উল্লাসের পটভূমিতে বসে তপতী এই অতি সাধারণ মেয়েটির ভেতর কী যেন আবিষ্কার করল।

অনুকূল ততক্ষণে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ শুরু করেছে। নানা কথার পর জিজ্ঞেস করলে—বৌদি কেমন আছে? অনেকদিন তোমাদের বাড়ি যেতে পারিনি।

কথাটা তপতীর কানেও গিয়ে পৌঁছল। চুপ করে রইল, যেন শুভ্রর উত্তরটা শুনতে চায়।

শুভ্র এতক্ষণ স্বচ্ছন্দে কথা বলছিল। এবার অকস্মাৎ থেমে গেল।

অনুকূল বুঝতে পারলনা। আবার একবার জিজ্ঞেস করল, বৌদি ভাল আছেন তো? পিন্টু, রেখা?

শুভ্র একটু চোক গিলে বলল—হ্যাঁ, মোটামুটি এক-

রকম। এই পর্যন্ত বলেই একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল অনুকূলের দিকে—তোমার বাড়ির খবর কি বলো।

তপতী তার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটির হাত ধরে বললে—এসো ভাই, আমরা ওঘরে যাই।

ঘড়িতে যখন তিনটে বাজল তখন অনুকূল উঠল।

—পুতুল—? ও আবার গেল কোথা হে?

বলতে বলতেই তপতী আর পুতুল বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পুতুলের হাতে চারখানি বই।

অনুকূল হেসে বললে—তোমার কি চারখানাই পছন্দ হল? এই বলে হাসতে হাসতে ব্যাগ থেকে টাকা বের করে চারখানা বইয়ের দাম তপতীর হাতে দিয়ে দিলে।

তপতী একটু হেসে দুখানি বইয়ের দাম ফিরিয়ে দিলে। বললে—এদুখানি আমি পুতুলকে দিয়েছি। ওটা ওর দিদির প্রথম আলাপের স্মৃতি। এই বলে নিজের হাতের লেখাটুকু দেখিয়ে দিলে। এক সঙ্গে অনুকূল আর শুভ্র দুজনেই হেসে উঠল।

শুভ্র বললে—মিস রায়ের এই একটি মহৎ গুণ। কেউ নেকনজরে পড়লে নিরাকার স্নেহভালোবাসা দিয়েই ফিরিয়ে দেন না।

হাসতে হাসতে অনুকূল তপতীকে নমস্কার করলে। পুতুলও দুই বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে নমস্কার করতে যাচ্ছিল, তপতী এগিয়ে গিয়ে ওর হাত দুটো নিজের মুঠোয় নিয়ে বুকে চেপে ধরলে।

ওরা নীচে নেমে গেল। শুভ্রও গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তপতী আর নামল না। ও তাড়াতাড়ি চলে এল ওপরের বারান্দায়। এখান থেকে অনেকটা দেখা যাবে পুতুলকে। ঐ যে—যাচ্ছে। ফিরে তাকাচ্ছে। কিন্তু তপতীকে দেখতে পাচ্ছে না। তা না পাক, সে নিজে তো দেখতে পাচ্ছে। আশ্চর্য সুন্দর মুখ! কিন্তু—

কিন্তু এমনি একটি সরল সুশ্রী নিষ্পাপ বোড়শী মেয়েকে যেন কোথায় দেখেছে!

মনে পড়ল।

সেটা একটা ফোটো। বাঁধানো ছিল। এখন ফ্রেমটা খুলে গেছে। পোকাতেও কাটছে বোধ হয়।

মনে মনে ভাবল, কালই মায়ের কাছ থেকে ট্রাঙ্ক থেকে ফোটোটাকে উদ্ধার করতে হবে। এ জীবনে সে হয় তো আরও অনেক কিছু পাবে—রূপ, যৌবন, ধন, ঐশ্বর্য—। কিন্তু ষোলো বছর বয়েসের সেই কৌমার্যের গৌরব,—এ জীবনে যে আর ফিরে পাবার নয়।

অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে এই বৃহস্পতিবারে পূর্বের মতো আজও শুভ্র সঙ্গে ছিল, কিন্তু তপতী যেন তেমন ভাবে কথা বলে নি।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর অন্যবারের মতো এবারও তপতীর মা শুভ্রকে রাত্তিরটা থেকে যাবার অনুরোধ করলেন। এবং প্রত্যেকবারের মতোই একটি কথাতেই রাজি হয়ে শুভ্র ওপাশের ছোটো ঘরটিতে পাতা বিছানায় গিয়ে সুবোধ ছেলেটির মতো আশ্রয় নিল।

তপতীর মা তখন যথারীতি মেয়ের হাতে একটা পান দিয়ে বললেন—যা, ওকে দিয়ে আয়।

তপতী পান নিয়ে পায়ে পায়ে ছোটো ঘরে ঢুকল। অন্যবার হাতে করে দিত; আজ দিল ছোট্ট একটা কাচের ডিসে।

ডিসটা সামনের টিপাইয়ের ওপর রেখে দিয়ে নির্বাক গাম্ভীর্যে তপতী চলে আসছিল, বিস্মিত শুভ্র তখন হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসে একটু তীক্ষ্ণস্বরে ডাকলে—তপতী।

তপতী যেন একটু উদাসভরা চোখে ফিরে তাকালো।

—এখুনি চলে যাচ্ছ যে! বসবে না?

একটু ম্লান হাসল তপতী। বললে—না। শরীরটা আজ ভালো নেই।

বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্য

রণজিৎ কুমার সেন

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে কেন্দ্র করে মূলতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্যের উৎপত্তি। আদি বৈষ্ণব কবি জয়দেব এর প্রথম উদ্গাতা। সংস্কৃত ভাষায় তিনি তাঁর কাব্য রচনা করলেও তা' মূলতঃ বাঙালী সংস্কৃতিরই অবদান। বাংলার পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে প্রধানতঃ এই বিশাল বৈষ্ণবসাহিত্য গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টি একেবারেই আকস্মিক নয়। ঈশ্বর-বিমুখ বৌদ্ধ অনাত্মবাদ ও শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ ব্রহ্মবাদ, অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদে যখন ভারতভূমি পরিপ্লাবিত, তখনও দেখা গেল—মানুষ এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বাইরে সহজতর নতুন ধর্ম্মের আশ্রয়ে উৎসাহী। সেই আশ্রয় হচ্ছে শৈবধর্ম্ম। শিবের সঙ্গে শক্তি। এলেন চণ্ডী। তন্ত্র সাধনায় নতুন ক'রে জেগে উঠলো মানুষ। বুদ্ধ হ'লেন শিব। শিবকে নিয়ে লৌকিক ব্রতে মুখর হ'য়ে উঠলো মানুষ; সেই সঙ্গে ভারতের তান্ত্রিক মন মহাশক্তির পূজার্চ্চা সাজাতেও কম ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো না। শক্তিতে ভয়, শিবে ভালোবাসা। এই ভয় ও ভালোবাসার মধ্যে ভারত-আত্মা যখন হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন তার মনে জেগে উঠলো সর্ব্বভয়কে জয় ক'রে নিরঙ্কুশ ভালোবাসার মধ্যে আশ্রয় পেতে। সেই ভালবাসার আশ্রয়টি হচ্ছে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম্ম বা বৈষ্ণববাদ। এই বৈষ্ণববাদের যেটুকু দেবদুর্লভতা, সেটুকু ছাঁটাই ক'রে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-পুরুষ ক'রে তাঁকে নিয়ে আনন্দ-সঙ্কীর্ত্তন রচনা করতে চাইল মানুষ। তিনি যে সর্ব্বশক্তির মূলাধার হ'য়েও আনন্দস্বরূপ; নওল কিশোর চির প্রেমিক তিনি। সেই প্রেমের দ্বারাই তিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিগুণাত্মক শক্তির আধার তিনি। তিনি শুধু শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারীই নন্, তিনি যে তমাল-বিহারী গোপীজনবল্লভ নয়নাভিরাম। তিনি আনন্দ ও রসস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই রসপ্রমাতাকে দু'ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যথা—'রসম্ভতে ইতি রসঃ,' ও 'রসয়তি ইতি রসঃ'। তিনি যেমন সকলকে আস্বাদন করেন, তেমনি সকলের দ্বারা তিনি আস্বাদিত হন। একেই শ্রুতি বলেছেন—'এক এব বহু স্যামঃ'—অর্থাৎ 'এক বহু হবো।' তিনি বহু হ'লেন। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে দর্শন ক'রতে তিনি সৃষ্টি ক'রলেন হ্লাদিনী শ্রীরাধিকাকে। তাঁর এই লীলাসৃষ্টি প্রকৃতিস্বরূপা শ্রীরাধাকে নিয়েই তাঁর সহস্র লীলা। এই লীলাকে লক্ষ্য ক'রেই বাংলার আদি কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দে ব'ললেন: 'রাধাস্তনবিনির্ভর্ত্তসনে বসতি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ'। এখানে উঁচু-নীচুর প্রভেদ নেই, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ভেদ নেই, দাতা-গ্রহীতার তারতম্য নেই, দেবতায়-মানুষে পার্থক্য নেই বা শাসক-শাসিতের অনাবশ্যক বৈষম্য নেই। এখানে এক প্রাণ, এক দেহ, দু'য়ে মিলে এক। এই বৈষ্ণববাদী ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে ভারত-আত্মা এক নতুন জীবন-বোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো। যুগ যুগ ধ'রে এই আত্মিক ধর্ম্মকেই খুঁজে বেরাচ্ছিল মানুষ। এক এক যুগে এক এক জন যুগ-পুরুষ এসেছেন, তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাচারের মধ্যে ডুবে গিয়ে আবার নতুন কিছু চেয়েছে ভারত। ক্রমে বৈষ্ণব-বাদের মধ্যে প্রবেশ ক'রে ভারত-আত্মা শান্ত হ'লো। এখানে দেবতা ও মানুষে লৌকিক সম্পর্ক। দেবতাকে এখানে মানুষ ভাইয়ের মতো, সখার মতো, দয়িতের মতো পেতে চেয়েছে। প্রতিদিন যে তাঁকে নিয়েই তার সহস্র প্রেম। বৈষ্ণবেরা বলেন: "এই প্রেমই যদি হ'লো, তবে আর 'এক উচ্চ, আর তুচ্ছ' থাকবে কেন? তিনি যদি আমাকে প্রেম করেন, তবে তাঁকেও আমার প্রেম-লীলায় সমান হ'তে হবে। নইলে উচ্চ স্থানে ব'সে যে দাবী, তাতে তো প্রেম হয় না। তা হ'লো শক্তি ও বৈভবের জুলুম মাত্র। রাজাও যদি দাসীকে প্রেম করে, সেই মুহূর্ত্তে দাসীর দাস্য মোচন হ'য়ে সে স্বাধীন হ'য়ে যায়। কাজেই প্রেমলীলাময় প্রেমের সাধনায় তাঁর বৈকুণ্ঠ এমন কি

মথুরার রাজসিংহাসন ছেড়ে ব্রজে এসে গোপ-তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে সমান হ'য়ে যান। যতক্ষণ তিনি মানবীয় ভাবে ধরা না দিলেন, ততক্ষণ তিনি আমাদের কে ?"

আসলে ভারতীয় লৌকিক সাধনায় ধরা দিয়েই যে তিনি ভারত-আত্মার সর্ব্বস্ব হ'লেন। বাংলার কবিরা তাই তাঁদের চির সাধনার চির আদরের দুর্ব্বাদলশ্যাম কান্তমণি শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের ললিত লাবণ্য দিয়ে নিজেদের ঘরের পরমাত্মীয় ক'রে নানা ভাবে রূপ দিলেন। সেই রূপের মধ্যে অপরূপ হ'য়ে উঠ্‌লেন প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন-কথা বিশ্বমানব-জীবনেরই বিরহ-মিলনের ইতিহাস। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবৎ ও ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের মধ্য দিয়ে এই ঐতিহাসিক ধারা এসে ক্রমে আধুনিক যুগে ছড়িয়ে পড়েছে। বৈষ্ণবেরা বলেন—পঞ্চ-ভাবে কৃষ্ণ-ভক্তি হ'তে পারে, যথা—'সনকাদির ন্যায় শান্ত ভাবে, সাধারণ উপাসকের ন্যায় দাস্য ভাবে, সুবল প্রভৃতির ন্যায় সখ্য ভাবে, যশোদার ন্যায় বাৎসল্য ভাবে এবং ব্রজ-গোপীদের ন্যায় মাধুর্য্য ভাবে। এই পঞ্চ ভাবের মধ্যে মাধুর্য্যভাবই সর্ব্বোত্তম। নায়িকা হ'য়ে নায়কের উপাসনা হচ্ছে এই ভাবের লক্ষণাক্রান্ত। এখানে দেহ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেহের ঊর্দ্ধেও মন। কামগন্ধময় দেহবাদী প্রেম এখানে তুচ্ছ, কামগন্ধহীন প্রীতিময়তাই এখানে প্রধান উপজীব্য। প্রেম ও কামের স্বরূপ বর্ণনা ক'রে চৈতন্য-চরিতামৃতকার তাই বল্‌লেন—

'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা তার প্রেম নাম।'

আত্মেন্দ্রিয়ের উপলখণ্ড থেকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের শিখর চূড়ায় যিনি উত্তীর্ণ হ'তে পারলেন, তিনিই সত্যিকারের বৈষ্ণব।

কবি জয়দেব অবশ্য তাঁর গীতগোবিন্দে এ তত্ত্বকে পুরোপুরি মেনে চলেন নি। তাঁর গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্ত কামনা ক'রলেন : 'রময় ময়া সহ কেশামধনমুদারম্।' শ্রীকৃষ্ণ সে-কামনা পূর্ণ ক'রলেন—

'শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাং।
পশ্যতি সস্মিত চারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাং।'

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও বা আলিঙ্গন ক'রছেন, কাহাকেও বা চুম্বন ক'রছেন, কাহাকেও বা সস্মিতবদনে অবলোকন ক'রছেন, আবার কখনও কোনো রামাকে আনন্দ দিচ্ছেন এবং অনুরাগে অপর কোনো রামার অনুগমন ক'রছেন।

—তাঁর আদর্শ ভক্ত রাসরসময়ী রাধা। রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা নিয়েই প্রধানতঃ কবি জয়দেব তাঁর 'গীত-গোবিন্দ' রচনা করেছেন। মন সেখানে দেহোত্তীর্ণ না হ'য়েও এমন এক ভক্তিমার্গের উঁচু পর্দ্দায় মূল কাব্যখানির সুর বাঁধা যে, দেহবাদ সেখানে তুচ্ছ হ'য়ে অধ্যাত্ম-মানসিকতাই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশে এই মানসিকতার বিশেষভাবে সম্প্রসারণ ঘটে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার হিসেবে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে খ্যাত হ'লেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুধু বাংলা দেশেই নয়, আসাম, উড়িষ্যা ও শ্রীখণ্ডের মানুষদেরও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ক'রলো। এতকাল উক্ত প্রদেশগুলিতে যে তান্ত্রিক সাধনা প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিল, চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম-প্রচারের ফলে সেই সাধনা ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেল। চৈতন্যদেব এমন শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হ'লেন—যে শক্তির প্রভাবে সামাজিক বৈষম্য ও মানসিক ভেদাভেদ দূরীভূত হ'য়ে মানুষের সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ ঘটলো, মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্রের সূচনা দেখা দিল, এবং নৃত্য-গীত ও সাহিত্যের নবতন চর্চ্চার মধ্য দিয়ে এক নতুন সাংস্কৃতিক আলোক চারদিকে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়লো। হিন্দু সমাজের বহু সংখ্যক মূর্ত্তিপূজার তিনি যে বিরোধী ছিলেন তা নয়, তিনি সেই বহুকে এক ক'রতে চাইলেন; a new synthesis. এই Synthetic Religionই তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল প্রাণবস্তু। সংসার-বন্ধনের মধ্য দিয়ে কিভাবে মোক্ষলাভ করা যায়, তার উপায় নির্দ্ধারণ ক'রে চৈতন্যদেব ব'ল্‌লেন, "সংসারে থাকা-কালেও যেমন কোনো অপবিত্র নারী সর্ব্বদা তার অবৈধ প্রেমাস্পদের কথা চিন্তা করে, তেম্‌নি তুমি যখন তোমার প্রাত্যহিক কাজে রত থাকবে, তার মধ্যেও অবিরাম তুমি অবিচলিত ভাবে শ্রীহরির চিন্তায় তন্ময় হ'য়ে থাকতে পারো।" সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষে যার মন সমর্পিত,

সেই তো প্রকৃত মোক্ষলাভের অধিকারী। 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' ব'লে মানুষকে তাই তিনি নাম-কীর্তনের মধুর মন্ত্র শোনালেন। সেই মন্ত্র—'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ।' ঘর ছেড়ে দলে দলে মানুষ বেরিয়ে এলো তাঁর সঙ্গে নাম-কীর্তনে যোগ দিতে—যেমন ক'রে শ্যামের বাঁশী শুনে একদা রাধা বেরিয়ে এসেছিলেন যমুনা-পুলিনে। সেদিন বুঝি সবাই পরমা-প্রকৃতি রাধা হ'য়ে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ ক'রে ধন্য হ'য়েছিল।

শ্রীচৈতন্য-কাল বাঙালীর এক মহা সঙ্কটকাল। এর অব্যবহিত পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে গৌড়বঙ্গে হিন্দু রাজশক্তি ও সামাজিক ব্যবস্থার চাপে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন প্রবল শক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়ায় শৈব ও শাক্তধর্ম্ম। এ সময়ে নিরুপায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ শৈবধর্ম্মের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে বাইরে শৈবধর্ম্মানুযায়ী দেখালেও গোপনে বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার বজায় রেখে চলার প্রয়াস পেতো এবং লাঞ্ছিত হ'তো। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার এই লাঞ্ছনার ইতিহাস-বঙ্গে চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত 'নব প্রচলিত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রম বিচার ছিলনা। পূর্ব্বে সমাজভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘে আশ্রয়লাভ করিত। বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলে এই সকল নরনারী নিরুপায় হইয়াছিল। ইহারা খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালাদেশে নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত ছিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এই সকল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।'

চৈতন্য জন্মকাল বাংলায় হুসেন-শাসনের কাল। দেশ জুড়ে সর্ব্বত্র মুসলীম আধিক্য, গৌড়, সপ্তগ্রাম, কর্ণ-সুবর্ণ সর্ব্বত্র মুসলমানের ছড়াছড়ি। দাসমনোবৃত্তির বশে হিন্দুরা তখন মনে মনে প্রায় অর্ধমুসলমান হ'য়ে উঠেছে। এই সময় স্বাধীনতার মন্ত্রে কোমর বেঁধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন রাজা গণেশ। তিনি নিজনামে মুদ্রা প্রচলন ক'রে, আইন-কানুন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংশোধন ক'রে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন; রাজসভায় বাংলা ভাষার প্রচলন ক'রলেন, বাঙ্গালী কবিরা নতুন আসন পেলেন রাজসভায়। কিন্তু রাজনীতির কঠোর চাপে বাঙ্গালীর সমস্ত আশা ধূলাবলুণ্ঠিত হ'লো; রাজপুত্র যদুমহেন্দ্রদেব মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লেন; রাজা গণেশের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন উল্লেখ করেছেন : বাংলার এই দুর্গতির দিনেও 'সমাজপতিগণ বসিয়া ছিলেন না। চিন্তাশীল শক্তিশালী কর্ম্মী দেবীবর ঘটক সমাজ সংস্কারে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। যুবক পণ্ডিত রঘুনন্দন স্মৃতির নূতন বিধি রচনাপূর্ব্বক সমাজের সংহতি বিধানে মনঃসংযোগ করিলেন। মিথিলার পক্ষধরের পক্ষপাতনকারী অল্প এক যুবক রঘুনাথ শাস্ত্রের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য্য নব্য ন্যায় গড়িয়া তুলিলেন। —এমনই দিনে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে দীক্ষা দিলেন। কুমার হট্টের এক বাঙ্গালীকে সন্ন্যাস দিয়া ঈশ্বরপুরী নামকরণ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির সহযোগিতায় বাঙ্গালীর এই কয়েকজনে অতি ক্ষুদ্রাকারে নবদ্বীপে একটি গোষ্ঠি গড়িয়া গণআন্দোলনে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। পুরোভাগে দাঁড়াইলেন আচার্য্য অদ্বৈত। আচার্য্য অদ্বৈতের কঠোর সাধনায় বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্খা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। 'বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরিল কায়া'—বাঙ্গালার নিমাইচাঁদ উদিত হইলেন।'

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলার সামাজিক সমস্যার পথ নূতনরূপে নির্দ্দিষ্ট হ'লো। চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের একটি প্রধান বিশেষত্ব হ'লো—সার্ব্বজনীনতা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ও তার বর্ণবিচারের মূঢ়তার মূলে পদাঘাত ক'রে আচণ্ডাল সকলকে প্রেমপাশে আবদ্ধ ক'রলেন চৈতন্যদেব। ব'লুলেন—

'মুচি যদি ভক্তি সহ ডাকে কৃষ্ণধনে।
কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে।'

(গোবিন্দ দাসের করচা)

বললেন—

'জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে
প্রেমধন আর্তি বিনা না মিলে কৃষ্ণেরে।'

(চৈতন্য ভাগবত)

প্রচারকের মতো সেই কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারে আত্ম-নিবেদন করলেন চৈতন্যদেব। যিনি এই বিশ্বের মূল কারক, যিনি বিশ্বরূপ—মহাবিষ্ণু, মহাভারতের যিনি মূল নায়ক—তাপ-দুঃখ-সন্তাহারী শ্রীকৃষ্ণ, পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনী শ্রীরাধা যাঁর লীলাসৃষ্টি—সেই পরম পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন শ্রীচৈতন্য। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঞি।
রস আস্বাদিতে দুঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥'

ভাগবত-ধর্ম্মের নব উদ্গাতা শ্রীচৈতন্য, শুধু বাংলা-দেশকে নয়, সমগ্র ভারতকে তিনি মনুষ্যত্বের উত্তুঙ্গশিখরে তুলে ধরলেন। এদিক থেকে তিনি ছিলেন New interpreter of Indian Philosophy and Indian culture.—বা ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় সংস্কৃতির নব ব্যাখ্যাকার। সেই দর্শন সামনে এগিয়ে চলবার নতুন পথ পেলো শ্রীচৈতন্যের সাধনায়।

তাঁর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-সাধনার বিকাশ যে রুদ্ধ ছিল, তা নয়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পুরাণ বর্ণিত প্রহ্লাদ, বিল্বমঙ্গল, মীরা প্রভৃতি। সেই সাধনার পথে পূর্বপ্রাণের গীতি-অর্ঘ্য নিয়ে এলেন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। নামের দিক থেকে একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটায় বিদগ্ধ সমাজে চণ্ডীদাসকে নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত এক সমস্যার উদ্রেক হয়। দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস প্রভৃতি নানা চণ্ডীদাসের পরিচয় জানা যায়। তন্মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনাই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে খ্যাত। কারও কারও মতে দীন চণ্ডীদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রকাশের ফলে চণ্ডীদাসের নাম ও তৎকৃত পদ-সমস্যার উদ্ভব হয়। পরে বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লে সমস্যা আরও জটিল হ'য়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা বাংলার প্রাচীনতম ভাষা। সে ভাষার পরিচয় র'য়েছে এই কীর্ত্তনাঙ্গ গীতিকাব্যে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কাছে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—এই তিনজনই বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন। ভক্ত রামানন্দের সঙ্গে মিলে চৈতন্যদেব এই তিনজন কবিরই গীতাবলী সঙ্কীর্ত্তন ক'রে আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে যেতেন। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ'॥

তবে আধুনিককালে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত গীতা-বলী আদৌ এই বড়ু চণ্ডীদাস কর্ত্তৃক বিরচিত কিনা, তাতে সন্দেহ আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, বড়ু চণ্ডীদাসের মূল কাব্যকে পরবর্ত্তী বিভিন্নকালের খ্যাত ও অখ্যাত কবিবৃন্দ যুগোপযোগি রূপ দিতে দিতে তা আধুনিক কাঠা-মোয় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল গীতিগুলির সঙ্গে আধুনিক পদাবলী-গীতিগুলির মিল অত্যন্ত সামান্য। যেটুকু মিল—তা ভাবগত, শব্দগত নয়।

চণ্ডীদাস ছিলেন দেবী বাসলীর পূজারী। বাসলী হ'চ্ছেন বিশালাক্ষী বাগেশ্বরী দেবী সরস্বতী। প্রবাদ আছে যে, দেবীর আদেশেই কবি এই কীর্ত্তন রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যে ভাষা, তা প্রাক্‌চৈতন্য ভাষা; এতে অসমীয়া, উড়িয়া, বাংলা ও মৈথিলী শব্দের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করবার মতো। চণ্ডীদাস কবি বিদ্যাপতিরই সমধর্ম্মী ছিলেন এবং তাঁর আনুমানিক প্রায় দুশো বছর পূর্ব্বের কবি জয়দেবের কাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাবের বহুতর মিল আছে। কোনো কোনো পদে জয়দেবের নিখুঁত তর্জ্জমাও লক্ষিত হয়। প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও দূতী বড়াইর মারফৎ এই গ্রন্থের গীতিপদগুলি বর্ণিত হ'য়েছে। গ্রন্থখানি মোট তের খণ্ডে বিভক্ত, যথা—জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালীয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহখণ্ড। এই বিভিন্ন খণ্ডের বর্ণাত্মক

বিষয়ের পরিচয়সূত্রে গ্রন্থখানির আবিষ্কারক ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বিশেষ গুণকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। পুঁথির হরফ দেখে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী গ্রন্থের রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর ব'লে অনুমান করেন। এই অনুমানই প্রামাণ্য ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছে। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত ভাষার পরিচয় এ-কাব্য থেকে পাওয়া যাবে। যেমন বংশীখণ্ডে বড়ায়িকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীরাধা ব'লছেন—

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রন্ধন ॥১॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিবিবোঁ আপনা। ধ্রু॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলোঁ পরাণী ॥২॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুন্দর বাঁশী নান্দের নন্দন।
শাশুী নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাঁও।
বেদনী বিহার বেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥৩॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ কুম্ভারের পনী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন আভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥৪॥

চণ্ডীদাসের রাধা কৈশোর উত্তীর্ণা, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে তিনি মাতোয়ারা। বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণ-বিমোহিতা এই রাধা হ'চ্ছেন—

'হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥'

বিদ্যাপতির রাধা কিন্তু রসময়ী যুবতী নারী নয়, সামান্যা অল্পবয়সী বালা। প্রেমের পাঠশালায় গতি তাঁর মন্থর, তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে তবে কৃষ্ণ-অনুগামিনী ক'রে তুলতে হয়। বিদ্যাপতি তাই ব'লছেন—

'শুন শুন মুগুধিনি বচন উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ ॥
পহিলহি অলকা তিলকা করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ ॥
ঘাওবি বদনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ ॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি ॥
ঝাঁপবি কুচ হরষায়বি বন্ধ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহিক বন্ধ ॥
মান করবি কহু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব ॥'

তারপর প্রেমের পাঠ শেষ ক'রে প্রিয়-মিলনের পূর্ণ আনন্দে প্রাণ যখন নৃত্যচঞ্চল, তখন দয়িতের কথা জিজ্ঞেস করায় রাধা বলছেন—

'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নোতুন হোয় ॥
জনম অবধি হম্ রূপ নেহারণু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইনু না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত কত রসিকজন রসে অনুগমন অনুভাব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক ॥'

বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিলী ভাষা। মিথিলা ও বাংলার ভাষাসম্পর্ক; এদিক থেকে মৈথিলীও বাংলাভাষারই অঙ্গ।

অন্যদিকে একে ব্রজবুলি ভাষা বলা হয়। 'বুলি' নামক মিথিলার ক্ষত্রিয় বংশের ভাষা থেকে এই ভাষার উৎপত্তি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ডাঃ গ্রীয়ার্সন প্রমুখ মনীষিবৃন্দ-সংগৃহীত বিদ্যাপতির মূল পদাবলী ক্রমে বিভিন্ন কালের কবির হাতে প'ড়ে বর্ত্তমানে প্রায় পূর্ণাঙ্গ বাংলায় রূপায়িত হ'য়েছে। তার সঙ্গে মূল বিদ্যাপতির আসল ভাষার তারতম্য অনেক। 'ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন উল্লেখ করেছেন: 'বিদ্যাপতি বিলাস-কলা-কুতুহলী বিদগ্ধ কবি,—বিশ্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী হইলেও তিনি প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী মহাজনরূপেই ভক্ত ও রসিক সমাজে গৌরব-লাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'কীর্ত্তিলতা' ও 'কীর্ত্তিপতাকা' অবহট্‌ঠ ভাষায়, 'পুরুষ পরীক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদাবলী মৈথিলী ভাষায় রচিত হইয়াছে। তিনি শৈব হউন আর শাক্তোপাসক হউন, তাহা পণ্ডিতের আলোচ্য বিষয়; কিন্তু শব্দৈশ্বর্য্য ও অর্থগৌরবে ভূয়িষ্ঠ, শ্রবণবিলাস ও রুচির পদ রচনায় তিনি যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা অনন্যদুর্লভ।' চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি বোধ করি সব চাইতে সার্থক! তিনি বলেছেন: 'চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।' এ উক্তির তাৎপর্য্য চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনার মধ্যেই পরিস্ফুট; তা নিয়ে পাঠকের তর্কের অবকাশ থাকে না।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য কিন্তু এঁদের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুসরণে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কিত লৌকিক কাহিনীগুলিও রচনাকার্য্যে কবিকে সাহায্য ক'রেছে। রচনাকার্য্যে তাঁর সংযম ছিল অসাধারণ, তেমনি ছিল তাঁর সমাজচেতনা বোধ। বস্তুতঃ সমাজ-কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হ'য়েই মালাধর বসু তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেন। পুরাণাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও রাসলীলা পাছে সমাজ-জীবনে ব্যভিচার সৃষ্টি করে, ভাগবতের স্কন্ধগুলিকে তিনি তাই সযত্নে বেছে নিজের অভীষ্ট বিষয়টিকে তা থেকে নির্ব্বাচন ক'রে নিয়েছিলেন। তাই ব'লে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাবিষয়ক বর্ণনায় তিনি যে ব্যর্থ হ'য়েছেন, তা নয়, বরং সংযমের সঙ্গে তিনি তাঁর শিল্প-শক্তির উদার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর ভাবধারার যোগসূত্র। তাঁর রচনা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের ন্যায় বহুভাষা সম্পৃক্ত নয়, বরং তাঁদের প্রভাবমুক্ত সরল বাংলাভাষা। যেমন—

'বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পূরে।
অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে॥
বৎসগণ সঙ্গে আনে বেণু বাজাইয়া।
গোকুলের রমণীর চিত্ত সে হরিয়া॥
যমুনার কূলে যবে বংশীতে দেই তান।
ফিরিয়া যমুনানদী বহই উজান॥
কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল।
তা শুনি ময়ূরপক্ষ নাচিতে লাগিল॥
শুখান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংশীর নাদে ফুল-ফল ধরে তরুগণে॥'

মালাধর বসু মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ ক'রেছেন, তেমনি তাঁর রচনা দ্বারা পরবর্ত্তী ষোড়শ শতাব্দীর বহু বাঙালী কবি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত হ'য়েছেন। তাঁদের মধ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য অন্যতম। এতদ্ব্যতীত মাধব আচার্য্য রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' বা 'ভাগবতসার', বৈদ্যকবি নন্দন সিংহ বা কবিশেখর রচনা করেন 'গোপালবিজয়'। দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' এই প্রসঙ্গে আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পদাবলী গীত ব্যতীত এইযুগে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক অন্যান্য কাব্যও পাওয়া যায়। অনুরূপ একখানি কাব্য 'রাধিকার মান ভঙ্গ', রচনা করেন 'গরাণহাটি' ও 'রেণেটি' কীর্ত্তনের জন্মদাতা নরোত্তম ঠাকুর। লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' আর-একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে বারমাস্যার সুরটি বড় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণবকাব্যসাহিত্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছে। অনুরূপ বারমাস্যার চতুর্মাসির পরিচয় আছে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'রাধাবিরহে', যেমন—

'আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥

পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথা।
মোর প্রাণনাথ কহ্নাঞি বসে যথা ॥ ১ ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বাহ্নে চারি মাস।
এ ভরা যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ॥ ধ্রু।
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সে জাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজ্বালা।
হেনকালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ॥ ২ ॥
ভাদর মাঁসে অহোনিশি আন্ধকারে।
সিখি ডেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি জাইবে বুক ॥ ৩ ॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ রহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।
তবে কাহ্ন বিনা হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥'

চণ্ডীদাসের এই চতুর্মাসি বারমাস্যার আংশিক পরিচয় মাত্র হ'লেও বৈষ্ণবসাহিত্যে অনুরূপ বিরহের অভাব নেই। শ্রীরাধার বিরহ আর বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ ভাবগত বিচারে প্রায় একাত্মক হ'য়ে উঠেছে।

বৈষ্ণবসাহিত্যের পরিধি বিশাল। বাংলাভাষার ন্যায় উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষায়ও বৈষ্ণবসাহিত্য নানা আকারে গ'ড়ে ওঠে। তার মূল উৎস বাংলার বৈষ্ণব কবিবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও মালাধর বসুর ন্যায় গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, বৃন্দাবন দাস, বংশীদাস, পরমানন্দ সেন বা কবি কর্ণপুর, প্রেমদাস, যাদবেন্দ্র দাস, জগদানন্দ, অনন্তদাস, বাসুদেব ঘোষ, জয়কৃষ্ণদাস, নরোত্তম ঠাকুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নসির মামুদ, আলাওল, ফকির হাবিব, সৈয়দ মর্তুজা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাব্য ও চরিত-সাহিত্য—উভয়ক্ষেত্রেই তাঁদের দান অসামান্য। মুরারি গুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় যে চরিতগ্রন্থ রচনা করেন, তা 'মুরারী গুপ্তের কড়চা' নামে খ্যাত। তিনি শ্রীচৈতন্যের লীলা প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁর কৃপালাভের অধিকারী হন। কবি কর্ণপুর ছিলেন একাধারে নাট্যকার ও কবি। তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য কবির এই উত্তরমুখী প্রতিভার পরিচয় দেয়। নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন কবি বৃন্দাবন দাস। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে তিনি 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' নামে আখ্যায়িত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি রচনা করেন 'চৈতন্য ভাগবত'। ঐতিহ্যের দিক থেকে গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য' সম্পর্কে লিখেছেন : 'বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচনায় ক্রমভঙ্গ, অতিশয়োক্তি ও অলৌকিক ঘটনা-সংযোজনার প্রবৃত্তি থাকলেও সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে তাঁহার গ্রন্থ ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ মূল্যবান। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত বৈষ্ণবদের মধ্যে মতভেদ, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবিধ কার্যকলাপ ও গৌড়দেশে প্রেমধর্ম প্রচার সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থই আমাদের একমাত্র উপজীব্য।...বৃন্দাবনদাসের কবিত্বশক্তি অতুলনীয়। কবির অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রেমের যে আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা রসিক জনের পরম আদরের ধন। ঐতিহাসিকের বহির্মুখী দৃষ্টির নিকট খুঁটিনাটি ঘটনায় বৃন্দাবন দাসের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়িলেও, ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত ঐতিহাসিক তত্ত্বের আকরস্বরূপ।'

অভিসার ও বিরহ-বর্ণনায় কবি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের জুড়ি নেই। গোবিন্দদাসের একটি মাথুর এইরূপ—

'তোহে বহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল দুকুল কলরব কানু কানু করি ঝুর ॥
যশোমতী নন্দ অনুদিন বৈঠই সাহসে চলই না পার।
সখাগণ বেণু ধেনু সব বিসরণ রোই ফিরে নগর বাজার ॥
কুসুম তেজি অলি ভূমিতলে লুঠত তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক মযূরী না নাচত কোকিল না করহি গান।
বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব দশ দিক বিরহ হুতাশ।
সোই যমুনাজল অবহুঁ অধিক ভেল কহতহি গোবিন্দদাস ॥'

অনুরূপ জ্ঞানদাসের একটি বিরহ—

'সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সায়রে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥

সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু রবির কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র বাঢ়ল মানিক হারানু হেলে॥
পিরাস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল॥
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি মরণ অধিক শেল।'

ষোড়শ শতকের অন্যতম রসগ্রাহী কবি বলরাম দাস। বাৎসল্যরস ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাবর্ণনায় তাঁর জুড়ি নেই। চণ্ডীদাসের ন্যায় বলরামদাসও একাধিক ব্যক্তি ছিলেন ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায়। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে বলরামদাস গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন। অনেকের মতে বাঙালী পদকর্তাদের মধ্যে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পরেই বলরাম দাসের স্থান। পদকল্পতরুতে তাঁর ১৩৬টি পদের উল্লেখ আছে; পরে বলরামদাস-ভণিতাযুক্ত মোট ২৪০টি পদ আবিষ্কৃত হ'য়েছে। সহজ সরল ভাষায় তিনি তাঁর কাব্য রচনা ক'রলেও ভাষাকে আলঙ্কারিক ক'রে বক্তব্যকে অধিকতর রসগ্রাহী ক'রে তুলতে তিনি কম নৈপুণ্যের পরিচয় দেন নি। তাঁর ন্যায় কবি বাসুদেব ঘোষও বাৎসল্যরসের চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু রচনার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের গভীরতার দিক দিয়ে বলরাম দাসের কাছে তাঁর স্থান অনেক নিচে ছিল।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনায় বলরাম দাসের একটি প্রসিদ্ধ পদ এইরূপ—

'চাঁদ মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইয়া গোকুলের মুখে॥
শ্বেত কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নব ঘন-শ্যাম।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোকুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরামদাস চলু সঙ্গে॥'

মুসলমান কবি নসির মামুদের একটি পদও বড় মধুর। যেমন—

'চলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি কাচরি রে।
বেণী মুরলী খুরলি গানরি রে।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি অরুণ তনয়া তীরে কেলি
ধবলি সাওলি আওরি আওরি সুরভি চলতি কাঁণরি রে।
বয়সে কিশোর মোহন ভাঁতি বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারুচন্দ্র গুঞ্জাহার বদনে মদন ভানরি রে।
আগম নিগম বেদ সার লীলায় করত গোঠবিহার,
নসির মামুদ করত আশ চরণে শরণ দানরি রে॥'

এতদ্ব্যতীত কবি আলাওল, ফকির হাবির প্রমুখ অন্যান্য মুসলমান কবিবৃন্দও রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যবিষয়ক পদ রচনা ক'রে বৈষ্ণবসাহিত্যের বেগবান্ স্রোতকে প্রখর ক'রে গিয়েছেন।

সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হ'চ্ছে 'চৈতন্য-চরিতামৃত'। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষোড়শ শতকের শেষভাগে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর মতে—

'পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে তত দূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই।
যার যত শক্তি সবে তত তত গাই॥'

প্রাক্-চৈতন্যযুগে যেমন বিশেষ ক'রে পদাবলীসাহিত্যের প্রসার ঘ'টেছিল এবং সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলা ও দাম্পত্যজীবন, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িককালে বা পরবর্তীযুগের সাহিত্যে তেম্‌নি দেখা যায় যে, পদাবলী-রচয়িতাগণ কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে অবলম্বন ক'রেই পদাবলীর সৃষ্টি করেননি, সেই সঙ্গে মহাপ্রভুর অমূল্য জীবনও তাঁদের প্রচুর প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। সেই প্রেরণায় বলবর্তী হ'য়ে যে পদাবলীর সৃষ্টি হ'লো, তা একাধারে রাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মিলিত রূপ। এ রূপের মধ্যে কোথাও খাদ নেই। নিখাদ এই রূপটিই প্রকৃত বৈষ্ণব-দর্শনের অন্তরঙ্গ রূপ।

চক্‌মণিকের পিসিমা

[গল্প]

প্রভাত দেবসরকার

খেয়ে-দেয়ে উঠে একটু গড়াবার মতলব করছি। আজ ছুটি।

পানটা মুখে দিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছি ছোট ছেলে এসে বললে, বাবা, বাইরে তোমাকে কে ডাকছে!

স্পষ্টই দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটলো। চটে বল্‌লুম, কে ডাকছে?

ছোট ছেলে, অত খবর জানে না। খবর দিয়েই খালাস, আর তার টিকির ঠিকানা নেই। কে ডাকছে তো কে ডাকছে!

খবরটা শুভ নয়, অশুভ। চক্‌মণিক থেকে লোক এসেছে, গতকাল রাত্রে আমার পিসিমা হঠাৎ মারা গেছেন। আজ তাঁর শব কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে বয়ে আনা হয়েছে। ইচ্ছে হ'লে আমি শেষ দেখা করে আসতে পারি।

লোকটিকে আমি চিনি না, কিন্তু সে দেখলুম আমাকে খুবই চেনে। শোকাহত আত্মীয়ের মতই কথা বলছে। কথার সুরে সান্ত্বনাও দিচ্ছে।

লোকটি বললে, রাঙাখুড়ি ভালই গেছেন! নিজের বলতে তো কেউ ছিল না, সে কবে ঘুচে গেছে! মেয়ের ছেলেরা, তা-দেওর যা দেখা শোনা করছিস। ইদানিং চোখেও দেখতে পেতেন না ভাল। কেবল মরার কথা বলতেন—

পিসিমার মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে এতগুলো সংবাদ শোনাবার অর্থ প্রকারান্তরে আমাকে দোষারোপ কিনা বলতে পারি না। চুপ করে রইলুম।

লোকটি বললে, মরার সময় কেউ কি তাই দেখেছে! সকাল বেলা সবাই দেখলে, রোয়াকের নীচে মরে পড়ে আছেন। রাতে বাইরে বেরিয়ে রাস্তা ঠিক করতে পারেন নি বোধ হয়!

অপঘাত! বুকটা কেঁপে উঠলো। পিসিমার মুখটা চোখের ওপর ভেসে উঠলো। শোকাতপ্তা, জরা-জীর্ণা আমার পিসিমা!

হঠাৎ ধরা গলায় লোকটি বললে, মরবার সময় মুখে এক কোঁটা জল পেলেন না।

মৃত্যুটা যেখানে একটা বড় আক্ষেপ সেখানে এক কোঁটা জল পেলে কি আর না-কি! স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। লোকটি চলে গেল চোখ মুছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কথা মনে হ'লো। সাত ভায়ের এক বোন এই পিসিমা! একটি ছেলে আর একটি মেয়ে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। সে ছেলেও উপযুক্ত হ'য়ে কবে মারা গেছে, মেয়েটিও ঘর-সংসার পেতে তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেছে! পিসিমার শোকের অন্ত ছিল না।

তবু কত সহনশীলা ছিলেন পিসিমা! বৈধব্য, পুত্রশোক বুক পেতে নিয়েছিলেন। পিসেমশায়ের বিষয় সম্পত্তির তদ্বির তাগাদা নিজেই করতেন। কখনো ভায়েদের গলগ্রহ হননি।

পিসিমাকে আমি শেষ দেখেছি, আমার খুড়তুতো ভায়ের মেজ ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন করতে গিয়ে। অমন সহনশীলা কেমন যেন হ'য়ে গেছেন, থপ্‌থপে।

কারণও আছে, ছেলের পর মেয়েটি এক ঘর ছেলে-মেয়ে রেখে বছর দুই হ'লো হঠাৎ মারা গেছে। তাদের দেখবার শোনবার কেউ নেই, ঐ পিসিমাই ভরসা।

ছেলেটিকে আমি চিনতে পারিনি। পিসিমা বললেন, নন্তু তোর দাদাকে গড় কর।

থাক, থাক! বীণাদির ছেলে বুঝি! হাত ধরে তুলে দেখলুম বার তের বছরের দুর্বল স্বাস্থ্য, একটি লাজুক ছেলে। জড়সড়।

পিসিমা বললেন, দেখনা বুড়ো বয়েসে কি শাস্তি করে গেল। পাঁচ পাঁচটি অপোগণ্ড, কে দেখে বলতো।

বলবার কিছু নেই। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ওদের বাবা তো আছেন!

পিসিমা কপালে হাত চাপড়ালেন; আর বলিস কেন, ভূপেনের মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে—বিয়ে করবেন বলে উঠে পড়ে লেগেছেন।

বাপের মতিভ্রমের কথায় দেখলুম নন্তু লজ্জা পেয়েছে। হেঁটমাথা আরো হেঁট হ'য়ে গেছে।

ভাবলুম, মেয়ের শোকে পিসিমা বুঝি ঠিক বলছেন না। অন্যায় দোষারোপ করছেন জামাইকে। ভূপেনবাবু হয়তো ছেলেমেয়ের কথা ভেবেই দ্বিতীয়বার পরিগ্রহ করতে চাইছেন। সত্যি, এতগুলো অপোগণ্ড কার ঘাড়ে চিরকাল ফেলে রাখবেন! বুড়ি শাশুড়ি আর কতদিন করবেন।

বললুম, তিনি হয়তো সুবিধের কথা ভাববেন। এদের কে দেখাশোনা করে?

অনেক শোক মাথার ওপর দিয়ে গেলেও পিসিমাকে কখনো বিচলিত হ'তে দেখিনি। পিসিমা বললেন, সুবিধে না ছাই!···এদের অবস্থার একশেষ হ'বে! কুকুর বেড়ালেরও অধম হ'বে বাছারা!

নিছক শোক-সন্তপ্তা জ্বরের প্রলাপ নয় কথাটা। সংসার স্নেহ সব সময় সমদর্শী নয়।

বললুম, তা হ'লে তোমাকেই দেখতে হ'বে দুখু করে লাভ কি?

পিসিমা বললেন, দেখবো। কিন্তু তোরা একবার ভূপেনকে বুঝিয়ে বল না। দেখ দেখি ভগবান আমার কি জ্বালা দিলেন! এই বাচ্ছাকাচ্ছা—

চুপ ক'রে রইলুম। কাকে বুঝাব? ভূপেনবাবু আমার কথা শুনবেন কেন? পিসতুতো বোনই যখন নেই, তখন তিনি আমার কথা শুনবেন কেন! তাছাড়া ভদ্রলোককে ভাল করে চিনিও না, আমাদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশাও নেই তেমন। সেই বীণাদির বিয়ের পর যেন কবার দেখেছিলুম, মনেই নেই।

তারপর অনেকদিন পিসিমার কোন খবর পাইনি। তবে শুনেছিলুম, ভূপেনবাবু শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেননি। হঠাৎ ভদ্রলোক হার্টফেল করে মারা গেছেন।···পিসিমা আমার বিয়েতে আসেননি। লোক দিয়ে আমার বৌকে একখানা লাল পাড় শাড়ি আর এক কৌটা সিঁদুর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আশীর্বাদ হিসেবে। এক থালা ঘরে-তৈরী চন্দ্রপুলীও পাঠিয়েছিলেন। বিয়ে বাড়িতে পিসিমার কথা উঠেছিল, তাঁর দুর্ভাগ্যের কথাও আলোচনা হ'য়েছিল। আমার মনে হ'য়েছিল, আমি নিজে গেলে পিসিমা নিশ্চয়ই আসতেন। আমার যাওয়া উচিত ছিল। ইচ্ছে ছিল বিয়ের পর এক দিন বৌ নিয়ে তাঁর কাছে যাব। তা আর হ'য়ে ওঠেনি।

অথচ এই পিসিমাই বুঝি আমাকে তাঁর আর সব ভাইপোদের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তখন আমি স্কুল কলেজে পড়ি, পিসতুতো ভাই বেঁচে ছিলেন—নড়তে চড়তে পিসিমার বাড়ি গিয়ে উঠতুম। পিসিমার আদর যত্নের শেষ ছিল না—কোথায় আমরে, জামরে, কাঁঠালরে, দুধরে, ক্ষীররে! চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের উদর পূরণ করে একঘেয়ে খোড়-বড়ি-খাড়ার মধ্যে ফিরে আসতুম। ছুটি-গুলো বেশ আরামে কাটতো!

পিসিমা ঘন দুধের বাটিতে খাজা কাঁঠাল নিঙড়ে দিয়ে বলতেন, তুই তবু পিসি বলে খোঁজ করিস, আর কেউ দু পয়সার পোষ্টকার্ড দিয়ে খবর নেয় না। তোদের সবাইকে কত দেখতে ইচ্ছে করে!

যেন কেউ এমন করে না, এসে পিসিমাকে কৃতার্থ করছি! চেটে-পুটে ঘন দুধের বাটি শেষ করি। প্রত্যেক বারে আসবার সময় রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে পিসিমা বলতেন, আবার আসবি তো? পিসিকে ভুলে যাবি না!

পিসিকে ভুললেও ঘন দুধের বাটি ভোলবার মত নির্বোধ আমি নই। কোন ছুটি-ই ফাঁক দিতুম না। পিসিমাও আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতেন। স্কুল-কলেজের ছুটির হিসেব তাঁর মুখস্থ ছিল।

অনেক সময় আমার তাই মনে হ'তো, নিজের ছেলের চেয়েও বুঝি পিসিমা আমাকে বেশি ভালবাসতেন। কালীদা হাসতে হাসতে কতদিন পিসিমার সামনে সে-কথা বলেছেন; আর জন্মে আমি মুকু হ'বো।

পাঁচটার ঘরে মানুষ, হেলায়-ফেলায় মুখ-চেয়ে মানুষ—পিসিমার মত অমন যত্ন-আত্তি কে করবে? যেন বড়ে

পাইনি। চিঠি লিখেও সান্ত্বনা জানাইনি। মনের কেমন যেন জড়ত্ব বোধ করেছি। পিসিমার ভাগ্যটাই খারাপ! আমি গিয়ে আর কি করবো!

আমার বিয়ের সময় যে লোককে নেমন্তন্ন ক'রতে চক-মণিকে পাঠান হ'য়েছিল সে নাকি ফিরে এসে বলেছিল, এবার দিদিমণি খুব কান্নাকাটি করেছেন—বলেছেন এত-গুলো ভাই ভাইপো, কেউ ভুলেও খোঁজ করে না···এত কাছে একবার উঁকিও মারে না!

অভিমান! কিন্তু আমরা কেউ-ই তার মর্যাদা দিইনি। শুনে সবাই বলেছিলুম, যাওয়া উচিত, দেখা উচিত। হাজার হোক, বোন, পিসি—রক্তের সম্বন্ধ! তারপর সব ভুলে গিয়েছিলাম বেমালুম!···

শুনেছিলুম, এক মেয়ে বলে বাপ-মার খুব আদরের ছিলেন পিসিমা। বিশেষ করে' ঠাকুরদা মেয়ে-মেয়ে করে' অস্থির হতেন। বুড়োর নাকি ঘর-জামাই করবার ইচ্ছে ছিল। ঠাকুমা হ'তে দেননি। কিন্তু যতদিন তাঁরা বেঁচে-ছিলেন, মেয়েকে তারা বিয়ের পর নজর ছাড়া করেননি। পিসিমার যে-কি দাপট ছিল বাপের সংসারে! ছোট দিদিমণিকে কারো কিছু বলবার হুকুম ছিল না। জেঠাকাকারাও নাকি বোনকে সমীহ করতেন। শ্বশুর-বাড়িতে পিসেমশায়েরও খুব খাতির ছিল।

আমার জ্ঞান হয়ে অবশ্য পিসিমাকে আমাদের বাড়িতে কখনো দেখিনি, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। প্রথম থেকেই ভালবেসেছিলুম। বিধবাবেশই পিসিমার আমি দেখেছি, ভারি স্নিগ্ধ, শান্ত, সুশ্রী ছিলেন পিসিমা। অত অল্প বয়েসেই মাথার চুলগুলো ছোট-ছোট করে' ছাঁটা, সিঁথির দাগটা স্পষ্ট মিলিয়ে গেছে অব্যবহার্য, পায়ে-হাঁটা পথের মত। খুব ভোরে অস্পষ্ট কুয়াশায় আগুরপের মত পিসিমার নক্সাপাড় ধুতি পরতেন। সরুসুতোর মত গলায় এক ছড়া সোনার হার ছিল। কালীদা নাকি ওটা কিছুতে খুলতে দেননি।

দেখে আমার কখনো মনে হয়নি, বাপ-মার অত্যধিক স্নেহে পিসিমা ব্যথাগর্বিতা, অহঙ্কারী, অভিমানী ছিলেন! আমাদের বাড়িতে অনেকে বলতেন, অল্পবয়েসে বিধবা হয়ে পিসিমা নাকি বদলে গেছেন। গর্ব করবার আছে কি?

পিসিমা খুব রূপসী ছিলেন। বৈধব্যেও তাঁর রূপ ম্লান হয়নি। কালীদা, বীণাদিও দেখতে খুব সুন্দর ছিল। সে তুলনায় আমি কুৎসিত ছিলুম। বীণাদির সঙ্গে আমার সুন্দর কুৎসিতের তর্ক বেধে যেত। পিসিমা এসে বলতেন, সোনার বাছা আবার বেঁকা! তুই শুনিসনি ওর কথা!

পিসিমা বুঝি নিজেকে দিয়ে বুঝতেন, রূপের গরব থাকে না মেয়েমানুষের। বীণাদিকে আরো অনেক বকতেন আমার সামনে। আমিই শেষ পর্যন্ত লজ্জা পেতুম। নিজেকে সত্যি কুৎসিত মনে হ'তো।

একটা জিনিষ আজ আমার মনে হ'চ্ছে, সংসারে এক একজনের জীবনে দুঃখের যেন শেষ নেই। একটার পর একটা লেগেই থাকে। তারা যত সুন্দর, যত ভালোই হোক। ভগবান যেন তাদের জীবন নিয়ে পরীক্ষা করেন। পিসিমা আমার সেই রকম পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন মৃত্যু পর্যন্ত। একাই তিনি সে-দুঃখ সহ্য করেছেন, কাউকে ডাকেননি।

আর আমার করবার কিছু নেই। পিসিমার জলন্ত চিতায় একটু জল দিয়ে তাঁকে আর কি শান্তি দিতে পারি। বড় স্বার্থপরের মত ব্যবহার করে' এসেছি। অপঘাত মৃত্যুটা প্রমাণ করলো, তাঁর কেউ ছিল না বুড়ো বয়েসে দেখবার। আত্মীয়-স্বজনহীন একটা বুড়ি কোথাকার!

বাড়ির সবাই শুনলে খবরটা। দুঃখ সবাই করলে। পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই। আত্মীয় বিয়োগ হাজার হোক!

আমার স্ত্রী কখনও পিসিমাকে দেখেনি। তবু দেখলুম তার শোকটা যেন সবার চেয়ে বেশি হ'য়েছে। কতবার আমার কাছে এসে আহা-উহু ক'রলে। বার বার আমাকে শ্মশানে যাবার জন্যে বললে।

এক সময় নিজেকে স্নেহ করে' বললুম, আর শ্মশানে গিয়ে কি হ'বে! বেঁচে থেকে খুব করলুম, এখন চিতায় ফুল ছড়াতে যাই!

তবু স্ত্রী বললে, না না, এ সময় যাওয়া উচিত। যাও।

উচিত-অনুচিতের কথায় চটে উঠলুম, আমাকে কর্তব্য শেখাতে এসেছেন। যাব না, কার কি বলবার আছে!

কে আর কি বলবে, আমিই কর্তা আমিই সব এখন! মুখ নীচু করে' স্ত্রী বলে গেলেন। কে জানে এ আমার হৃদয়হীনতা না আর কিছুর পরিচয়। এক সময় তাঁর নিঃস্বার্থ স্নেহে নিজেকে ধন্য মনে করেছি, জীবন দিয়ে যাঁর সেবা করবার প্রতিজ্ঞা করেছি মনে মনে, আর তাঁর মৃত্যুতে একবার শেষ দেখবার ইচ্ছেও করছে না। অথচ তাঁর ভালবাসার সঙ্গে কোনই বিরোধ কোনদিন আমার হয়নি। কে জানে চোখের আড়াল নিকট আত্মীয়কে এমন পর করে দেয় কি না। নাকি সংসারের চাপে পড়েই মনটা আমার এমন হ'য়ে গেছে। কোন সাড় নেই। তাছাড়া দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কি?

নিশ্চেষ্টের মত বসে আছি, কি করবো ভাবতে পারছি না। কেমন একটা জড়তা বোধ করছি, এই শোক, এই দুঃখ, এই ভালবাসা-স্নেহ পরস্পরের। মন শূন্য হ'য়ে গেছে, কত যদি'র চিন্তা বুদ্‌বুদেরর মত মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার সেই তরুণ বয়েসের বেদনা আজকের সঙ্গে কিছুতে মিলতে পাচ্ছে না। চকমণিকের পিসিমা যেন আমার কোনকালেই আপনার ছিল না। কে জানে কেন।

হঠাৎ পাশের ঘরে একটা গোলমাল-চিৎকার উঠল। তুমুল কাণ্ড, ভাই-বোনে ঝগড়া বেধেছে। স্ত্রীর গলা পেলুম।

মেয়েকে বলছে, বোকা মেয়ে কোথাকার, ওতে কাঁদবার কি আছে? নাই বা গেল দাদা তোর শ্বশুর বাড়ি, তোরই তো মজা।

মেয়ের কান্না থামলো না। বিনিয়ে বিনিয়ে অদ্ভুত করুণ সুরে ছোট মেয়ে কাঁদতে লাগল। অস্বস্তিকর সে কান্নার সুর।

শেষটা বুঝি চড়চার ঘা প্রহারের শব্দ পেলুম। স্ত্রী বলছেন, কোথায় শ্বশুরবাড়ি তার ঠিক নেই, এখন থেকে মেয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছেন! বেশ করেচে, কেন যাস ওর সঙ্গে লাগতে?

খানিক আর কোন সাড়া পাই না। ভাবলুম, মিটে গেছে মেয়ের অভিমান। মিথ্যে কান্না আর কতক্ষণ চলবে! শাসনে শুদ্ধ হ'য়ে গেছে।

চুপিসাড়ে উঠে এলুম। দেখি দরজার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে মেয়ে আমার এখনো চোখ মুছছে। চোখের জলে বুক ভেসে গেছে।

বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠলো। অকারণে একি শোকের ছায়া আমার সংসারে।

ছুটে এসে মেয়ের হাত ধরলুম। নিজের চোখ দিয়েও জল বেরিয়ে এল। কি বলে প্রবোধ দেব ভেবে পেলুম না।

মেয়ে আর চোখ মুছলে না। আরও চোখ দুটো আমার মুখের ওপর তুলে ধরে বললে, বাবা, দাদা মিছে কথা বলে, না?

সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, হাঁ মা, দাদাটা তোমার অমনি!

মেয়ের মুখে হাসি ফুটলো। আমি কিন্তু হাসতে পারলুম না।

এতক্ষণে হয়তো পিসিমার দেহ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে চিতার আগুন বুঝি দেখতে পাচ্ছি। আকাশ লালে লাল হ'য়ে উঠেছে।

শত ভাইয়ের একমাত্র বোন, আমার চির-দুঃখিনী পিসিমার মনে আমার মেয়ের মত অভিমান ছিল কিনা কে জানে?

হয়তো ছিল, তাই ভাইয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে ভাইপোর মুখ চেয়েছিলেন।

কিন্তু আমি সে-মুখ রাখতে পারিনি।

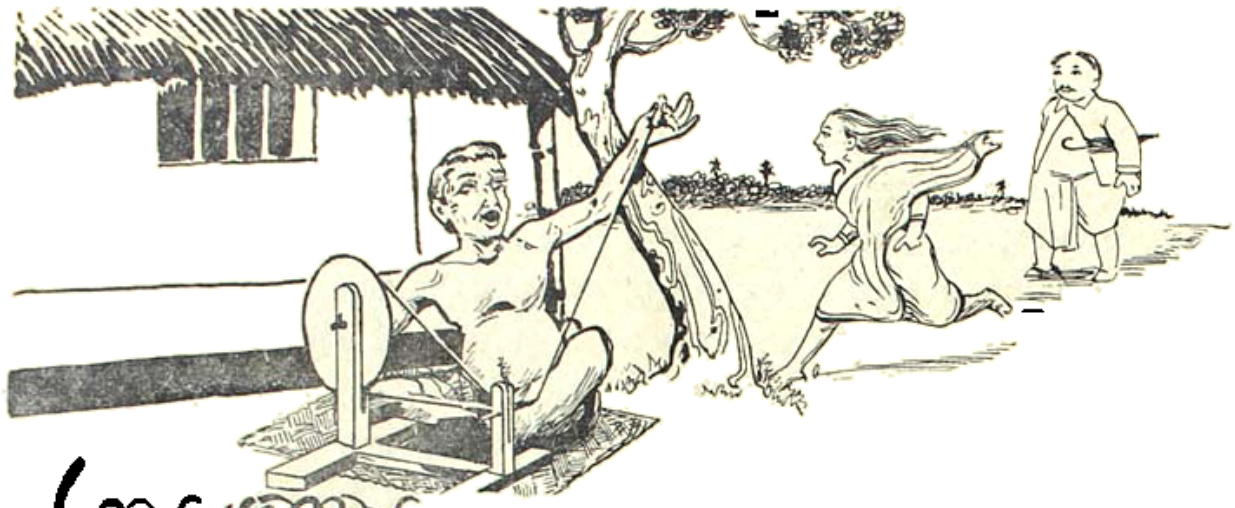

মোল ভজন

- একাঙ্কিকা -

শ্রীসত্য রায়

শাসন নামক একটি পল্লীগ্রাম। বৃদ্ধ চাষী বলরাম মণ্ডলের গৃহের একটি বারান্দার সম্মুখস্থ বহিঃপ্রাঙ্গণ। অপরাহ্ণ। আধুনিক কাল। বলরাম মণ্ডল বসিয়া চরকা কাটিতেছে এবং গাহিতেছে।

শেষের দিনে কেহ কিনে
পর কি আপনার হয় রে।
মাগো আপন ঘরে শুয়ে থাকি
দিছে বালিশ তোষক রে।
সেই দেহ তোমার শৃগাল কুকুরে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে রে,
মা কাঁদে ধন বাছা বাছা
ভগিনী কাঁদে ভাইরে।
পরের ছেলে বাহিরে কাঁদে
আর আমার কেউ নাই রে।

[রাস্তা থেকে ছুটে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধের দ্বাদশ বর্ষীয়া ভাগিনেয়ী চেঁকী।]

চেঁকী। মামা রে!

বলরাম। কিরে চেঁকী—কিরে?

চেঁকী। কি জানি মামা—কে এল রে!

বলরাম। কুথায় রে?

চেঁকী। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়ে) ঐ যেরে—ওরে বাবা রে!

[বৃদ্ধের জামাতা বাবু মণ্ডলের প্রবেশ। বয়স বছর ত্রিশ। মোটা সোটা অলস একটি লোক]

বাবু। এ আমি কুথায় আলাম রে! (চেঁকীর প্রতি) অরে ও ছুঁড়ি! দেখিয়ে দে বাবা বলরাম মণ্ডলের বাড়িটা।

চেঁকী। বলছুতো, এই বাড়ী।

বাবু। এই বাড়ী! বলরাম মণ্ডলের এই বাড়ী! মস্করা হচ্ছে?

বলরাম। হ্যাঁ, এই বাড়ী! তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি আমায় চিনতি পারতিছনা বাপধন! চেনাচ্ছি।

(চেঁকী কে) চেঁকী—একডা লাঠি—

[চেঁকী ছুটে ভেতরে চ'লে গেল]

বাবু। লাঠি!

বলরাম। লাঠি!

বাবু। তুমি বলরাম মণ্ডল?

বলরাম। বলরাম মণ্ডল কিনা সেটা দেখাচ্ছি।

বাবু। উরে বাবা! দেখাবে কি বাবা! তিনি তো মশাই আমার এই বাবু মণ্ডলের শ্বশুর। তিনি তো তুমি নন! তোমার দাড়ি কৈ?—ইয়া এতবড় দাড়ি, একিবারে রাম ছাগলের দাড়ি!

নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা

বলরাম। গ্যাছে গ্যাছে, সে যেখানে গ্যাছে—তোমার ঐ বাবড়ি চুলও সেখানে যাতিছে।

[ভাঙ্গে লাঙ্গলের প্রবেশ। হাতে লাঠি—। পশ্চাতে ঢেঁকী।]

বলরাম। এই লাঙল—বেটাকে ধর—মাথাটা ন্যাড়া করি দে। ন্যাড়া করি মাথায় ঘোল ঢালি দে—ঘোল ঢালি দিয়ে মার লাথি—মার লাঠি—দূর করি তাড়িয়ে দে গাঁ থিকে।

[কথাবার্তা শুনে বাবু হতাশ হ'য়ে ব'সে পড়ল।]

বাবু। এ্যাঁ।

লাঙল। ঢেঁকী!

ঢেঁকী। দাদা।

লাঙল। কাঁচি।

ঢেঁকী। আর ঘোল?

লাঙল। হ্যাঁ, আর ঘোল।

বাবু। উরে বাবা—ইকি হলোরে বাবা—কুথায় আলাম রে বাবা—ইরা কারারে বাবা।

[বাবু শুয়ে প'ড়ে কাটা পাঁঠার মতন ছট্‌ফট্ করতে লাগল।]

ঢেঁকী। (না দিয়ে, বাবুর অবস্থা দেখে খিল খিল ক'রে হেসে উঠে) কাটা পাঁঠা দেখিছ? ঐ ভাখো।

বাবু। (ঢেঁকীকে) জল—একটু জল দে বাবা।

ঢেঁকী। (বলরামকে) গেল যে!—জল চায়। দেবো?

বলরাম। এই মরিছে!—দে দে—জল এনে দে। [ঢেঁকী ছুটে ভিতরে চলে গেল]

লাঙল। (বলরাম কে) ও মামা! লোকটা কে?

বলরাম। শালা আমার জামাই—তোর বোনাই ঐ মাটির বরবে। মাটির যখন বিয়ে হয়, তখন তো তোরা আসিসো নি—দেখিসো নি।

লাঙল। সেই শালা বাবুরাম মণ্ডল! আমি সব শুনেছি। তুমি শালা ঐ বুড়োর মেয়ে মাটিকে বিয়ে করি নিয়ে গিয়ে রাতদিন পা টিপাতে—দিনের বেলা একদিন পা টেপেনি বলি লাথি মেরে তাকে দিয়েছিলে তাড়িয়ে—পাঁচ বছর পর সেই মাটির বাড়ীতে আজ গেঁথিয়েছ তুমি। (হুঙ্কার দিয়ে) ঢেঁকী—আন আমার ঐ পাঁঠা কাটার খাড়া, সেই পা-ই আমি কাটব।

বাবু। (উঠে গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে) তবে কি আর আমি বাঁচব—দোহাই বাবা—আর যা কর তোমাদের মাটিকে বিধবা ক'রো না! মাটিকে মাটি ক'রো না বাবা! পথ ছাড় বাবা—আমি চলি যাতিছি—জল না খেয়েই চলি যাতিছি।

[বাবু চ'লে যেতে উদ্যত হ'ল]

বলরাম। এই দাঁড়া! কুথায় যাচ্ছিস্!

বাবু। যাচ্ছিনু তো শ্বশুর বাড়ী—তা দেখছি, এনু যমের বাড়ী। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছি বাবা।

[মাটি জলের ঘটি এবং গেলাস নিয়ে এল। পশ্চাতে ঢেঁকী। মাটি বাবুকে দেখেই ঘোমটা টেনে দিয়ে ঢেঁকীর হাতে ঘটি গেলাস বাড়িয়ে দিল]

বলরাম। এই বেটা জল খেয়ে যা!

বাবু। (মাটি কে দেখে) মাটি না! হুঁ,—তাই যে গো—এই পাঁচ বছরে কেমন ডাগরটি হ'য়েছে গো—তা' হ'য়েছো বেশ ক'রেছো সো—জল আমি খাব না। এমন নাকানি চুবানি খায়ি এখানে জল খাব না! চোখের দেখাতেই তেষ্টা আমার গেল। আমি চলনু গো।

বলরাম। আরে বাবা চটছো কেন—যা হবার হ'য়ে গেছে—! এখন জল টল খায়ি মাথা ঠাণ্ডা করো—বোসো বাবাজি বসো। হাজার হ'লেও জামাই তো!

বাবু। গরু মারি জুতো দান করতিছেন শ্বশুর মশাই—করুন করুন। (কাছে গিয়ে) দাড়িটা কামিয়ে ফেলিছেন কিনা চিনতি পারিনি। (পায়ের ধূলো নিয়ে উঠে' দাঁড়িয়ে)—আর তা' ছাড়া পাঁচ বছর আগে সেই বিয়ে করতি এ বাড়ী আসিছিনু—আর তো আসিনি। আজ আসি

দেখনু সব অবাক কাণ্ড—বাড়ীটা ছিল আস্তাকুঁড়—আজ দেখনু নন্দন কানন। (লাঙলকে) জানি তো মশাই ই বাড়ীতে আগে দুবেলা হাঁড়ি চড়ত না—এখন দেখছ তিন তিনটে ধানের গোলা। ভাবনু—ইকি ভেল্কি রে বাবা—ই আমি কুথা এনু রে বাবা—শ্বশুর বাড়ির খুঁজে যত বাড়ি গেনু—সবই দেখনু—ঝক্ ঝক্ তক্ তক্! গাঁয়ের নাম শাসন—লোকে বলতো শ্মশান—আজ দেখছ একেবারে সগগ! তা লাঠির গুঁতো খায়ি এ সগগে কদিন টিকবো বাবা! আমি চলি গো—

বলরাম। না—না সে কি! যাবে বললেই হ'ল। শুধু মুখে ফিরি যাবে জামাই! তা সে যতো পাষণ্ডই হোক! ওরে ব্যাটা লাঙল, পুকুরে চল্—জাল ফেলতি হবি—মাছ তুলতি হবি। চল্ চল্।

[বলরাম ভেতরে চলে গেল]

লাঙল। যাচ্ছি মামা যাচ্ছি। (বাবুকে) গাঁয়ের নাম শাসন এখন পাঁচসালার শাসন চলছে এ গাঁয়ে—তুমি শালা যে শালাই হও পাঁচসালার শাসন মানলি তবে মাছ ভাত। নইলি খাবে গলা ধাক্কা—বলি রাখনু এ-ও—(ঢেঁকীকে) এই ঢেঁকী! হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস?

ঢেঁকী। মজা দেখছি দাদা।

লাঙল। মজা দেখছি—ই আর কি মজা—আজকে কার পা টিপি দেয় সেই মজা দেখবি—এখন ভাগ্। গরুগুলো গোয়ালে তোল্, রান্নার জুগার ছাখ—বেলা গড়িয়ে গেলেই গ্রাম সেবার আসর বসবে মনে নেই?

[লাঙল ভেতরে চলে গেল।]

ঢেঁকী। যাচ্ছি দাদা যাচ্ছি। (বাবুকে) জামাইবাবু, দিদির কাছে শুনেছি তুমি নাচতি জান গাইতি জানো।

বাবু। জানি, জানি। তুমি পা টিপতি জানো তো?

ঢেঁকী। না। (নিজের পা বাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে) শিখিয়ে দাও না!

বাবু। উড়ে বাবা!

মাটি। ঢেঁকী! গেলি!

ঢেঁকী। ওরে বাবা! [ছুটে ভেতরে গেলো।]

বাবু। বাঁচা গেলো—(চারদিকে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখে)—নাঃ কেউ নাই। (গলা নামিয়ে) ওগো! (কোনো সাড়া না পেয়ে) বলি শুনছ—(তথাপি কোনো সাড়া না পেয়ে) আচ্ছা! আচ্ছা! (চারদিকে আবার উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখে দুহাতে কান মলে) আর কখখনো বাড়ি মারবুনি—এই নাকে খৎ দেইছি (নাকে খৎ দিয়ে উঠে দাঁড়াল) নাও এইবার হ'লো তো! (তথাপি কোনো সাড়া না পেয়ে) আচ্ছা! আচ্ছা! পা টিপতেও আর বলবুনি। (মাটির মুখে হাসি ফুটল তা দেখে) এ-ই……এ-ই……এ-ই……মেঘ কাটল চাঁদ উঠল—। তা এইবার চাঁদ বদনে দু'টো কথা বলো গো!

মাটি। গরীবের বাড়ি হাতির পা ক্যানে গো!

বাবু। আর হাতি! হাতি এখন মশা! কিছু নাই গো—কিছু নাই—ডাকাতে সব লুটে নিছে—টাকা-পয়সা, ধান-পান সব গেছে—এক বেতেই শালারা সব লুটি নিছে গো—

মাটি। বীর পুরুষ তুমি—রুখলে না!

বাবু। এ···ই তো···এ-ই···তো সাধে কি মানুষে কয় দশহাতে কাপড়ে মেয়ে মানুষের কাছা না হয়—আমি যদি রুকতাম—তা হ'লে তারা ছাড়তো! ছাড়তো—তোমায় বিধবা ক'রে ছাড়তো!

মাটি। আ—হা—হা! তাই পালালে বুঝি!

বাবু। তা ছাড়া কি!

মাটি। আস্তাকুঁড়ের কচুবনে।

বাবু। হ্যাঁ—একেবারে ছাইয়ের গাদায় তলে—বেটারা আমাকে দেখতি পেলে না—সে কি কম!

মাটি। (মুখের হাসি চাপিয়া) তারপর ?

বাবু। মনটা কেন যেন হু হু করে কাঁদি উঠলো। চলি আলাম শ্বশুর বাড়ী—মধুরা পুরী গো।

মাটি। কেনে ?

বাবু। খাব কি ?

মাটি। টাকা পয়সা না হয় লুট হলো—যোত জমি তো আর লুট হ'লো না—খাবার ভাবনা কি ! চাষ বাস করো—খাও !

বাবু। ছিনু বাপের এক ছেলে—খাই দাই কাঁসি বাজাই ব্যস্ ! বাপ-মা বুঝেই না নাম রাখিছিল বাবু মণ্ডল ! আরে একডা মাদ তো ঘর করিছিলে—দেখি আসিছিলে তো লোকে কইতো বাবু তো বাবু, বাবু মণ্ডল। তা সেই বাবু মণ্ডল আমি—এই আট কোশ মাটি পায়ে হেঁটে চলি আলাম—তুমি আছ ব'লেই না আলাম—তা না হলে খুন শালা আসতি যেতো—পা দুটো কি আর আছে—গেছে—ঐ ঢেঁকী ছুঁড়িটাকে একটু বলো না গো—পা দুটো···একটু···

মাটি। (খুব চেঁচিয়ে) ঢেঁকী আয় তো—একবার এখানে আয় তো।

বাবু। উরে বাবা। [ঢেঁকী ছুটে এল।]

বাবু। (তাকে দেখে)—একটু জল চাইছিনু মণি ; তা' তা'ও আর লাগবেনি। কি জানো—এই তুমাদের দেখলেই তেষ্টা তো—তেষ্টা—একেবারে বরফ বনি যাই।—যাও মণি—যাও—ক্ষীর পায়েস রাঁধ্‌তিছিলে বুঝি ?

মাটি। হুঁ—গোবরের। খাবে এখন।

[ঢেঁকী ছুটে চ'লে গেল। বাইরে থেকে গ্রাম সেবক মঙ্গল চৌধুরী এল। বয়স পঁচিশ। শিক্ষিত যুবক। হাতে খাতা পত্র।]

মঙ্গল। এই যে জামাইবাবু—নমস্কার।

বাবু। আপনি কে বটো আছো হে ? (বাবু মাটির মাথার ঘোমটাটা নিজের হাতেই টেনে দিলে)।

মাটি। (ঘোমটাটা সরিয়ে) বাঃ—উনি যে আমাদের মঙ্গলদা।

বাবু। ই তবে আর এক শালা ! ই শালাকে তো আগে দেখিনি।

মাটি। কি অসভ্য ! মঙ্গল চৌধুরী—বি-এ পাস—গ্রাম সেবক, ওনার জন্তে গাঁয়ের এতো উন্নতি।

মঙ্গল। না, না—তা কেন ? গাঁয়ের উন্নতি গাঁয়ের লোকেরাই ক'রেছে—আমি তো শুধু উপদেশ দিয়েই খালাস্। তা জামাইবাবু—পরিচয় আমি সবই পেলাম আপনার শ্বশুরের কাছে—শালার কাছে—আপনাদের গ্রামেও কাজ হ'চ্ছে তো ; পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়নের—?

বাবু। পাঁচসালা আমার গাঁয়ে কেনে মশাই—আমার যতো শালা সব ই গাঁয়ে—যে-গাঁয়ে বিয়ে করনু সেই গাঁয়ে !

মাটি। মঙ্গলদা ! শাসন গাঁয়ের পাঁচসালার শাসনটা তোমাদের জামাইবাবুকে একটু শুনিয়ে দাও—আমি রান্না বান্নাটা একটু দেখে আসি।

বাবু। পাঁচসালার শাসন—সে আবার কি রে বাবা ?

মঙ্গল। গাঁয়ের নামই শাসন কিনা, খুব কড়া শাসন—এই যেমন এ-গাঁয়ে কেউ মাথার ঘাম পায়ে না ফেলে ভাত খাবে না।

বাবু। উরে বাবা ! শাসন গাঁয়ের এমনি শাসন !

মঙ্গল। শাসন গাঁয়ের এমনি শাসন—সবাইকে খেটে খেতে হয় এই গাঁয়ে।

বাবু। খাটি সবাই খায়—সব গাঁ—ই খায়—আমি খাটতি পারি না—খাটি না।

মঙ্গল। না খাটলে—এ গাঁয়ের বউ-ঝি ভাত দেবে না খেতে !

বাবু। জামাইকেও না ?

মঙ্গল। না দেবারই কথা !

বাবু। হে—হে—হে·····পুকুরে জাল পড়িছে, মাছ তুলা হতিছে। কার জন্তি কও ?—হে—হে

হে—একটা গান মনে প'ড়ল—শোন বাবু শোন !

দহের মাছ না পড়ে জালে
গাঁতার দিছ ভব জলে।
যদি হবে রুই কাতলা
ঘুচাও হে মনের মাতলা
কি করিতে পারে মোটা জালে ॥
যদি হবে গড়ুই শোল
তবে বড় গণ্ডগোল
ঘুরাই ফিরাই মারবে গুণ জালে ॥
যদি হবে নিতুর-তুর
তুড়ুর মত বুদ্ধি ছুড়,
পাঁক কেটে চলে যাব ভিতরে ॥
ওরে আমার মন মীন,
দিন দিন তনু ক্ষীণ,
পরেশ বলে ধর মাছ
রাখ ছলের তলে

[এই গান শুনে একে একে বাড়ীর সকলেই এখানে সমবেত হ'ল ; এবং মুগ্ধ বিস্ময়ে গান শুনতে লাগল।]

মঙ্গল। সাবাস্ ! সাবাস্ ! গুণী লোক ! এমন রত্ন হাত ছাড়া করবেন না মণ্ডল মশাই !

বাবু। বাঁচি থাকো দাদা—বাঁচি থাকো। এ-চুলো ছেড়ে কুন চুলোয় যাব—বাড়ীতে ডাকাতি হ'য়েছে আমার—চাল চুলো সব গেছে—(শ্বশুরের প্রতি) মারো আর ধরো ইখান থিকে আমি নড়ছি না বাবা !

বলরাম। সে কি বাবাজী !

বাবু। হ্যাঁ বাবা ! তোমার তো বাবা সবেধন নীলমণি ঐ মাটি—সেই মাটির সবেধন নীলমণি আমি ! ছেলে নাই বলি তুমার কতো দুঃখু বাবা। আর দুঃখু কোরো না !

লাঙল। শালার ঘরজামাই হবার মতলব !

মঙ্গল। তা বেশ তো।

মাটি। সে কী ক'রে হবে মঙ্গল দা ! ঐ যে লোকটি দেখছ কুঁড়ের বাদশা—এক গেলাস জল গড়িয়ে খায় না হাতে—এক পা হাঁটবে—তো তুপা টিপিয়ে নেবে।…যে গাঁয়ে পাঁচসালার কাজ চলছে সে গাঁয়ে এমন লোকের—কী ক'রে ঠাঁই হবে ?

মঙ্গল। আপনি কি বলেন মণ্ডল মশাই ?

লাঙল। মামা আবার কি বলবে ? ই বাবা শাসন গাঁয়ের শাসন মানতি হবেই—গা গতর খাটিয়ে ভাতের গিরাস মুখে তুলতি হবে—এই তো মাছ তুলিছি পাঁচ সেরি কাতলা—ইগ্না বড়ো মুড়ো—(বাবুকে) গায়ের ঘাম ঝরবে তবে পি ড়ি পাতি বস্‌বে—ভাতের থালা আসবে—সে শালা তুমি জামাই-ই হও আর বাবা-ই হও।

বাবু। (চটে গিয়ে) সে তুমাকি ভাবতি হবে না—পাঁচসালার এক শালা ! আমার খাটতি হয়না—বসি বসি আমার ঘাম ঝরে। (কপাল থেকে হাতে ঘাম নিয়ে দেখিয়ে) এ…ই দে…খো ঝরতিছে।

মঙ্গল। জামাই বাবু জিতি গ্যাছে।

বাবু। হ্যাঁ দাও ! পেটে আগুন জ্বলতিছে। সেই কখন বাড়ী থিকে বেরিয়েছি—হাঁটি হাঁটি আমার আবার খিদে হু হু ক'রে বাড়ি গেছে।

মাটি। আচ্ছা খেতে না হয় দিচ্ছি, কিন্তু ভাত মেখে দিতে আমি পারব না। মাছের কাঁটা বেচে দিতে পারব না। খাবে তো নিজের হাতে খাবে।

বাবু। বটেক্ !

মাটি। হ্যাঁ।

বাবু। তুমি আমাকে খাইয়ে দেবে না ?

মাটি। মরণ আর কি !

বাবু। (কাঁদো কাঁদো ভাবে) নিজের হাতে ভাত মাখি খাতি হবি ?

মাটি। হ্যাঁ।

বাবু। মাছের কাঁটা বাচতি হবে !

মাটি ॥ হ্যাঁ।

বাবু ॥ আমি খাবনা। আমি চ'লনু।

মাটি ॥ যেতে তোমাকে হবেই। (মঙ্গলদার দিকে তাকিয়ে) বুঝলে মঙ্গলদা, তোমাদের জামাইবাবু কথায় পঞ্চমুখ কিন্তু 'ক' অক্ষর গোমাংস—শাসন গাঁয়ে পাঁচসালার শাসনে নিরক্ষর থাকতে পারবে না কেউ—না ছেলে না বুড়ো। ওকে নাম লিখতে দাও পারবে না, 'ক'-'খ' তাও জানে না!

মঙ্গল ॥ জামাইবাবু তুমার এত বিদ্যে!

বাবু ॥ (মুখ ভেঙচিয়ে) এতো বিদ্যে! (গর্বভাবে) হ্যাঁ, এতো বিদ্যে! বল শালা এতো বিদ্যে তুদের ই-গাঁয়ে কজনের আছে!

মঙ্গল ॥ তা···নেই। এ গাঁয়ে আর একটিও নেই।

বলরাম ॥ কাজেই, তুমি থাকি যাও বাবাজি আমার ঘরে—

বাবু ॥ থাকতি তো আমি চাই বাবা—তা ইরা থাকতি দিতিছে কই?

বলরাম ॥ দিবে—দিবে! তবে কি জানো বাবাজি—থাকতি হ'লে ইদের মতন থাকতি হবে—! গাঁয়ে ঢুকি দেখিছ তো পাঁচ বছরে কি কাণ্ডটা না হয়েছে! ই-গাঁয়ে কুনো লোকের বসি বসি খাওয়া চলে না। উদয়—অস্ত কাম করতি হবে!

বাবু ॥ কি কাম?

বলরাম ॥ বলনা মাটি।···না···না···মাটি তুই খাবার জুগাড় কর ঢেঁকী—আমার হুঁকাটা আর সেই বেতের ঝুড়িটা নিয়ে আয়! যা।

[মাটি ও ঢেঁকী চলে গেল। ঢেঁকী পরক্ষণেই ঝুড়ি দিয়ে গেল।]

আপনি বলো না গেরাম সেবক বাবু—কি কাম? আমি বেতের ঝুড়িটা বেষ ঝরি।

মঙ্গল ॥ প্রথমেই চাষ বাস···

বাবু ॥ (মুখের কথা কেড়ে) সে তো সবাই করে। সে আবার নতুন কি কাম।

মঙ্গল ॥ না, না আগের মতন চাষ বাস এখন আর নেই—আগে চাষা চাষের জলের জন্যে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো—সে দিন আর নেই—আমরা এখন গাঁয়ে সেচের জল আনি নদী নালা থেকে খাল কেটে—না হয় মাটিতে টিউব ওয়েল বসিয়ে—একলা নয়—গাঁয়ের সব চাষা মিলে মিশে একযোগে—পারবেন জামাইবাবু?

বাবু ॥ আপনি মশাই সব বলো—পারব কি পারব না সে আমি পরে বলবখন।

[এমন সময় ঢেঁকী হুঁকো এনে বলরামকে দিলে।]

বাবু ॥ (ঢেঁকীকে ডেকে বলল) এই ঢেঁকী একটা পাখা (বলেই বাবু নিজে হাতেই নিজেকে হাওয়া করতে লাগল)···হ্যাঁ তারপর, বলো বাবু বলো!

[ঢেঁকী সকলের অলক্ষ্যে তাকে বক দেখিয়ে চলে গেলো।]

মঙ্গল ॥ সেচের জল—তারপর ভালো বীজ আর ভালো সার—এ-ও আমরা সকলে জোগাড় করছি সরকারী কৃষি ভাণ্ডার থেকে—আর এতে ক'রেই সোনার ফসল ফ'লছে—অনেকে আবার জাপানী প্রথায় ধান চাষ ক'রছে—এই যেমন আপনার শ্বশুর মশাই।

বাবু ॥ কি প্রথায়?

মঙ্গল ॥ জাপানী প্রথায়—প্রথাটা এমন কিছু কঠিনও নয়—একটা বীজতলা তৈরী করা আর রাসায়নিক সার—এই হ'ল আসল কথা—

[ঢেঁকী পাখা নিয়ে ঢুকল। বাবু হাত বাড়িয়ে পাখাটা নিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে লাগল।]

না, না অত ঘামবার মত বিষয় নয়—আচ্ছা সে আপনাকে আপনার শ্বশুর-মশাই হাতে ক'লমে শিখিয়ে দেবে।

বাবু ॥ ততদিন বাঁচলি হয়। যা গরম! (খুব জোরে জোরে পাখা নেড়ে হাওয়া খেতে লাগল) হ্যাঁ, আপনি বলো!

মঙ্গল। তারপর হ'লো গিয়ে কুটীর শিল্প।

বাবু। সে আবার কি ?

মঙ্গল। এই যেমন ধরুন চরকা চালানো—তাঁত চালানো, কাপড়-গামছা তৈরী করা, বেতের কি বাঁশের ঝুড়ি বানানো। কাঠের জিনিষপত্তর তৈরী করা, খেলনা তৈরী করা এই সব।

বাবু। ভাল—ভাল-ই সব বাবা খুব করো। পাঁচশালা কেন সব শালা মিলি করো। তা' আখো বাবা আমায় একডা বাঁশের বাঁশি তৈরী করি দিবে।

ঢেঁকী। ছেপুঁ বাজাবে জামাইবাবু—আমি দোব।

বাবু। বেশ বেশ দিয়ো। হাঁ, বলতি থাকো শালা বাবু।

মঙ্গল। গাঁয়ের সকলেই চাষ বাস করে না—আর তা ছাড়া চাষ বাসের কাজ বারোমাসও হয় না—এ ছাড়া দিনে রাতে অবসর সময়ও তো একটা আছে—এদের জন্যই এই সব কুটীর শিল্প—ঘরে বসে কাজ—দু'পয়সা বেশ ভালো রোজগার হয়। এ গাঁয়ের লোক দু-বেলা দু-মুঠো খেতে যে পাচ্ছে সে শুধু শুয়ে ব'সে নেই ব'লে—মাঠেও কাজ করছে···ঘরেও কাজ ক'রছে। আপনাকেও ক'রতে হবে।

বাবু। উরে বাবা—আমি কি করি করব—আমার যে অসুখ গো!

মঙ্গল। অসুখ—কি অসুখ!

বলরাম। কি অসুখ বাবা ?

বাবু। ভীষণ অসুখ!

মঙ্গল। অসুখ তাতে ভাবনা কি! পাঁচশালায় গাঁয়ে আমরা ডাক্তারখানা করেছি। যে অসুখই হোক ভাবনা নাই। চলুন না ডাক্তার দেখিয়ে আনি।

বাবু। আমার অসুখ বুঝতি পারবে কুন শালা ?

[বলরাম উঠে এসে কাছে দাঁড়াল]

বলরাম। কি এমন অসুখ বাবা যে ডাক্তারে বুঝতি পারবে না।

বাবু। বুক ধড়্‌পড়—হাড় মড়্‌ মড়্‌, কান ভন্‌ ভন্‌, দাঁত কন্‌ কন্‌, মাথা ঝন ঝন, পা টন্‌ টন্‌···!

সকলে। উরে বাবা···উরে বাবা!

মঙ্গল। আপনি ভাববেন না মণ্ডল মশাই ওষুধে যদি না সারে ডাক্তারখানায় অপারেশনেরও ব্যবস্থা আছে।

লাঙল। মাথা থেকি পা অব্দি সব—কাটি ফেলি দেওয়া হবে!

(হাত দিয়ে অপারেশানের ইঙ্গিত করল)

বাবু। উরে বাবা—কচু কাটা করবে!

লাঙল। হ্যাঁ, দরকার হ'লে কচু কাটা ক'রবে বৈকী। ব্যারামটা তো সারাতি হবে!

বাবু। দরকার নেই বাবা ব্যারামে, আমি বেশ আছি। বেশ আরামে আছি।

মঙ্গল। বেশ থাকবেন বৈ কি এ গাঁয়ে—এ গাঁয়ে কোনো ব্যারাম নেই—পানীয় জল আমরা ফুটিয়ে খাই। টিকা নিয়ে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড শাসন ক'রে এই শাসন গাঁয়ের লোকেরা।

বাবু। শাসন! শাসন! গাঁয়ের নাম শাসন! সবাই ইখানে শাসন ? এ গাঁয়ে বিয়ে ক'রেই এক বকমারি করি ফেলিছি। তা এখন রেহাই দাও বাবা। (বলরামকে) বলি ও শ্বশুর মশাই!—খিদের জ্বালায় জামাই বাবাজি তোমার চোখের সামনে কি অজ্ঞা পাবে ?

বলরাম। এই লাঙল আখ না!

লাঙল। তুমি থামো মামা—খাটি খেতে হবে না—তা জামাই-হ'ক আর নাট গায়েরই হ'ক—খাটবে তবে খ্যাট! বুঝলে জামাইবাবু—এ শাসন গাঁয়ের শাসনই এই। ঐ তো ব'য়েছে গেরাম সেবক, শুধাও না।

মঙ্গল। মিথ্যা বলেনি জামাইবাবু—এ গাঁয়ের লোকেরা মিটিং ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছে সারাদিনে কিছু না কিছু এমন কাজ করবে যাতে রোজগার হয়—সে আজই হ'ক বা দুদিন বাদেই হোক—এ করবে তবে এখানকার লোক খাবে।

লাঙল। শোনো বাবু শোনো—না-না ঐ বুড়োর দিকে

তাকালি হবে না। তাকাতি হবে এখন মাটির দিকে। ঐ যে আসি গেছে বই শ্লেট হাতে আসি গেছে।

[বই শ্লেট পেনসিল হাতে করে মাটির ও ঢেঁকীর প্রবেশ।]

বলরাম। (মাটিকে) কি রে—মাটি, জামাইয়ের নাতি খেয়ে তোর পেট টা তো একদিন ভ'রল—এখন ওর পেটটা কে ভরে!

বাবু। উরে বাবা! আমার পেট ভরি গেছে বাবা!

বলরাম। পেট ভরি গেছে—কি-খাই ভরি গেছে?

বাবু। তোমার মেয়েকে সুধোও না—কানমলার পোলাও আর নাক মলার পায়েস!

[বাবু উদ্‌গার তুলল।]

বলরাম। না, না, সেকি? (মাটিকে) মাটি, খ্যাটের আর দেরী কি?

মাটি। লেখাপড়ার ক্লাশটা হ'য়ে গেলেই খাওয়া দাওয়ার পালা। এই ঢেঁকী তোর পুরোনো পড়াগুলো ঝালিয়ে নে।

ঢেঁকী। (সুরে) অ—অজগর আসছে তেড়ে।
আ আমটি আমি খাব পেড়ে।
ই ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে।
ঈ ঈগল পাখী পাছে ধরে।

[বাবু ছাড়া সকলে ঢেঁকীর সুরে সুর মিলিয়ে পড়তে লাগল। বাবু এই সুরেল আবৃত্তি বেশ উপভোগ করতে লাগল।]

বাবু। এ-আবার পড়া নাকি—এতো গান! এ আমি পারি—তোমাদের চেয়ে ঢের ভালো পারি।

[বাবু নেচে কুঁদে গাইতে লাগল।]

ঢেঁকী। (সুরে) অ—অজগর আসছে তেড়ে
আ—আমটি আমি খাব পেড়ে,
ই—ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে
ঈ—ঈগল পাখী পাছে ধরে।
উ উট চলেছে মুখটি তুলে।
ঊ—ঊটি আছে ঝুলে।
ঋ—ঋষি মশাই ব'সে পূজায়।
ঌ—ঌকার যেন ডিগবাজি খায়।

[বাবু নর্তন কুর্দনে ছড়াটি আরো প্রাণবন্ত ক'রে তুলল।]

কানমলার পোলাও আর নাক মলার পায়েস

ঢেঁকী। (সুরে) এ—একা গাড়ি খুব ছুটেছে,
ঐ—ঐ ভাখো ভাই চাঁদ উঠেছে।
ও—ওল খেয়োনা ধরবে গলা
ঔ—ঔষধ খেতে মিছে বলা।

[বাবু নেচে গেয়ে আরো উন্মত্ত হ'য়ে উঠল। সকলে হাত তালি দিল। যবনিকা নামল।]

[বিরাম]

যবনিকা উঠল।

পূর্বোক্ত দৃশ্য।

গভীর রাত্রি। বারোন্দায় ব'সে বৃদ্ধ বলরাম হুকো টানছে। একটা লণ্ঠন সামনে রেখে মাটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সুর ক'রে পড়ছে। একটি ব্যালার্মিং ঘড়ি ও চিক্ টিক্ ক'রে বেজে চলেছে।

মাটি। (সুরে সুরে রামায়ণ পড়ছে)

[রামায়ণ পাঠের পর রাত এগারো-টায় য়্যালার্মিং ঘড়ি বেজে উঠল। মাটি য়্যালার্ম বন্ধ ক'রল।]

মাটি। রাত এগারোটা বাজল, তোমার শোবার সময় হ'ল বাবা।

বলরাম। তা আমাদের বাবু তো এখনও ফিরল না।

মাটি। যাত্রা গান শেষ হবে তবে তো ফিরবে। লোকটার আর আছে কি? গানবাজনাই ওর সব।

বলরাম। যাত্রার পালাটা কি?

মাটি। গান শুনেই তুমি মোহিত হ'চ্ছ বাবা। কিন্তু লোকটা যে কি সাংঘাতিক তা' আমি বুঝিছি হাড়ে হাড়ে। যেমন কুঁড়ের বাদশা তেমনি মেজাজ্! বিয়ে হ'য়ে ঘর করতে গেলাম, বলে কি না পা টেপার দাসী এল। আজ ঠেলায় পড়ে শ্বশুর বাড়ী এসে কানমলা খেয়ে আর নাকে খৎ দিয়ে ভালমানুষটি সেজেছে বলেই ওর আগেকার লাথি আমি হজম করতে পারব না বাবা।

বলরাম। তখন টাকার গরম ছিল—লোকটা ছিল

মাটি সুরে সুরে রামায়ণ পড়ছে

মাটি। লক্ষ্মণের শক্তিশেল। চাই কি—যে হনুমান সাজছে—তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে নিজেই হনুমান সেজে গন্ধমাদন পাহাড় মাথায় নিয়ে লাফালাফি দাপাদাপি ক'রছে। কি আর পারে! পারে তো ঐ সব।

বলরাম। না, না—গলাটা ভাল! অ আ, ক খ—তাই কেমন গান গায়ি একেবারে মাত করি দিল।

আলাদা—সে সব তুই ভুলি যা মাটি। শাস্ত্রে কয় পতি কি না দেবতা—পতির দোষ ধ'রতে নাই। উল্টো তোকে লাথি মেরেছে—আমি তোর মাকে ছেঁকা দিতাম। একটু ফুপিয়ে কাঁদত—তারপরেই আবার হুঁকোটি নিয়ে পাশে আসি দাঁড়িয়ে যে হাসি—সেই-হাসি। তা' কিনা এমন লক্ষ্মী পিত্তিমে বউ তোকে

জন্ম দিয়েই—ই পোড়া কপালে আর টিকল না।

মাটি। সে তুমি যাই বলো বাবা—ও লোকের সঙ্গে আর আমার ঘর করা চলবে না। ওকে দেখলেই আমার কেবলি মনে পড়ে, ও আমাকে লাথি মেরেছে' আমি ভুঁয়ে প'ড়ে আছি—ওকে আমি সইতে পারব না—পারব না বাবা।

বলরাম। (রেগে গিয়ে) দুপাতা লেখা পড়া শিখি তোর এতো আস্পদ্ধা মাটি, স্বামী নিয়ে তুই ঘর করবি না!

মাটি। ও আমাকে নিয়ে ঘর করতে আসেনি।

বলরাম। এলো আর তুই বলছিস আসেনি!

মাটি। ঘর করতে নয়—এসেছে লুট করতে—তোমার টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি। আমার জন্ত ওর এতটুকু মায়া নেই মমতা নেই—ও আমাকে চায় না, ও চায় তোমার টাকা। খাটবার ক্ষমতা নেই তাই এসেছে শ্বশুর বাড়ী,—ঘর-জামাই হ'য়ে পায়ের ওপর পা রেখে আমাদের ভাত মারবে।

বলরাম। মারুক। কে খাবে আমার ভাত? আমার একডা ছেলে নাই—ঘরজামাই হ'য়ে ও যদি থাকে, উ হবে আমার ছেলে। মুখে ওর হাতের আগুন পেয়েই ড্যাং ড্যাং করি আমি চলি-যাব সগ্‌গে!

মাটি। বেশ, ছেলে হ'য়ে ওই লোকটাই থাক্। মেয়ে তুমি হারালে।

বলরাম। কি বিপদ! আগে মেয়ে, তবে না জামাই! আমার কুথাটা কি মা, এই শাদন গাঁটা শ্মশান ছিল, পাঁচসালার কাজ করি এই শ্মশানে তোরা ফুল ফুটালি, ঐ একটা লোককে তোরা মানুষ করি তুলতি পারবি না? হার মানবি? ওরে আমার যে বড় সাধ আমার এই সোনার সংসারে তুরা দুজনে হর গৌরী হয়ে বাস করবি। নয়ন ভরি তাই দেখতি দেখতি আমি চোখ বুজবো! আমার এ সাধে তুই বাদ সাধিস না মা!

[লাঙ্গলের প্রবেশ]

লাঙ্গল। নাও হ'লো তো?

বলরাম। কি হ'লো?

লাঙ্গল। যাত্রা দেখতি গিয়ে পাগলটা ক্ষেপি গেছে। যাত্রার উকিল সাজি গান ধরেছে। তা' ব'লব মামা, কি গানই গাইছে—লোকে ধন্যি ধন্যি করতিছে।

বলরাম। তা' তুই চলি আলি যে!

লাঙ্গল। বারে! তুমি জানো না নাকি মামা!

বলরাম। কি?

লাঙ্গল। আমাদের শ্মশানের সড়ক গো—বানের জলে তাতে ফাটল ধরিছে, আজ শেষ রাতে পাহাড়া দেবার পালা পড়িছে আমার, তাই এখন একটু ঘুমিয়ে নিতি আলাম। (মাটিকে) মাটি! রাত দু-টোয় উঠতি হবে, ঘড়িতে সময়টা বাঁধি দে।

মাটি। দিয়ে লাভ! ঘুমোলে তো তুমি কুম্ভকর্ণ! বাজ পড়লেও তোমার ঘুম ভাঙবে না।

লাঙ্গল। তবে আমি না ঘুমাবো। জাগি থাকবো। গাঁয়ের সব লোক মিলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলি একটি পয়সা মজুরি না নিয়ে ঐ সড়কটা আমরা বাঁধিছি—গাঁ থেকে বর্গাকালে বেরুবার পথ ছিল না আমাদের এতোকাল পর সেই পথ হ'লো—দেশ বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ হ'লো—ধানের গাড়ী নিয়ে ঐ পথে যখন সহরে যাই, বুকের ছাতি ফুলি ওঠে। সেই পথ বানের জলে ভাসি যাবে, আর আমি থাকবো ঘুমিয়ে—ঘুমাবো না—আমি ঘুমাবো না, আবার চলনু যাত্রায়।

বলরাম। শোন! শোন! তুই ঘুমো, আমি তোকে ঠিক সময়ে তুলি দোবো বাবা।

লাঙ্গল। না মামা, আমি যাই, পাগলাটাকে যাত্রা থিকে নিয়ে আসি।

মাটি। না দাদা তুমি ঘুমোও! ঢেঁকী গেছে, ঢেঁকীই তাকে নিয়ে আসবে। সারারাত জাগলে তোমার অসুখ হবে।

লাঙ্গল। বাপ-মা নাম রাখিছিল লাঙ্গল—আমার আবার —অসুখ কি? রোদেই পুড়ি, আর জলেই ভিজি—রাত জাগি আর না জাগি—আমি যে-লাঙ্গল সেই লাঙ্গল!

বলরাম। কথাটা তুই মিথ্যে বলিস নি রে লাঙ্গল। সাবাস্ বেটা সাবাস্! এই মেয়েটারও নাম আমি রাখিয়াছিলাম মাটি। ভাবিছিলাম মাটি। ভাবিছিলাম মাটির মতই হবে ওর দয়া মায়া। মাটির মতই ফলে ফুলে ভরি উঠবে একদিন—কিছু হ'ল না সব মাটি হ'ল!

[হুঁকো নিয়ে ভেতরে চলে গেলো]

লাঙ্গল। ব্যাপার কি রে মাটি? বুড়োর হঠাৎ এতো আপশোষ!

মাটি। ঐ অমানুষটাকে বাবা রাখবেন ঘর জামাই ক'রে, আর ওরই পা টেপার দাসী হ'য়ে জীবনটা আমার কাটাতে হবে এই বাড়ীতে, বাবার এই ইচ্ছে।

লাঙ্গল। কিন্তু লোকটাকে যতই দেখছি ততই মজি যাতিছি রে মাটি। লোকটাকে গড়ি পিটি নিলে একটা কাজের কাজ হ'বে। তা তুই পরশ পাথর হ'য়ে বসি থাক তোর ছোঁওয়া পালি সোনা হতে কদ্দিন! চলি, লোকটাকে নিয়ে আসি। ওর আবার বড় ভূতের ভয়। সে-ও এক মজা! ঢেঁকী, আমি আর ও তিনজনে যাত্রা শুনতি যাচ্ছি, তবু—ঝোপঝাড়ে—তাকাচ্ছে আর চমকি চমকি উঠছে! আমরা তো হাসি মরি। এ গাঁয়ে যা ভূতের ভয়—মানুষটা না পালায়—এই আমার ভাবনা।

মাটি। পালালে তো বাঁচি।

লাঙ্গল। তবে ই ও জানি রাখ—উ পালাবে না। মরি বাঁচি করি থাকি যাবে। তোকে ছাড়ি ও আর যাবে না কইল্ তা আমায়, লক্ষ্মীছাড়া আর হবে নি।

মাটি। তুমি জানো না, তুমি জানো না লাঙ্গলদা! ও এখানে আমার জন্যে আসেনি, ও এসেছে বাবার টাকা কড়ির লোভে। বাবার সিন্দুকটা আর চাবিটা পেলে ও গুড় গুড় ক'রে চলে যাবে নিজের গাঁয়ে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শাসন গাঁয়ের শাসন মেনে—এ গাঁয়ে থাকবার লোক ও নয় লাঙ্গলদা।

লাঙ্গল। না উ থাকবে। তোর অস্তি থাকবে। যদি যাবে তো তোকে ধরি নিয়ে যাবে।

মাটি। আমি যাব আবার ঐ বাড়ীতে, যে-বাড়ীতে লাথি খেয়েছি!

লাঙ্গল। তবে উ ইখানেই থাকবে।

মাটি। না, না, না লাঙ্গলদা!

লাঙ্গল। বাজি রাখ।

[নেপথ্যে ঢেঁকী আর বাবুর গান শোনা গেল।]

মাটি। বেশ বাজি রাখছি—ঐ আসছে। শুনে যাও—শুনে যাও লাঙ্গলদা—

[মাটি লাঙ্গলকে কাছে টেনে নিয়ে তার কানে কানে কি সব বলল।]

লাঙ্গল। বটেক!

মাটি। হ্যাঁ।

লাঙ্গল। আচ্ছা বেশ।

[বাবু এবং ঢেঁকী গান গাইতে গাইতে আসছে শোনা গেল।]

লাঙ্গল। ঐ আসি গেল। ভাল কথা মাটি, উ আমাকে জিগ্‌গেস করতিছিল—পাঁচসালায় বিছানা বালিশে শুতি দেবেতো!

মাটি। শোয়াচ্ছি!

[বাবু আর ঢেঁকী গান গাইতে গাইতে এসে দাঁড়াল। মাটিকে দেখেই বাবু চট করে গান থামিয়ে দিল।]

বাবু। এই...যা! আমার জন্যে এতো রাত জাগি বসি আছো?

ঢেঁকী ॥ দিদি! জামাইবাবু বলেছে, আজ তোমাকে আর পা টিপতি হবে না, জামাইবাবুই তোমার পা টিপি দেবে।

মাটি ॥ (রেগে) ঢেঁকী।

ঢেঁকী ॥ বারে! বললে যে!

বাবু ॥ আর কি বলিছি ঢেঁকী।

ঢেঁকী ॥ মানভঞ্জন হবে সারারাত।—মানভঞ্জন কি দিদি?

মাটি ॥ ঢেঁকী গেলি?

বাবু ॥ (ঢেঁকীকে) হাঁ॥ তুমি দিদি এখন যাও, গিয়ে ধান ভানো?

[ঢেঁকী বাবুকে মুখ ভেঙিয়ে চলে গেল।]

বাবু ॥ (লাঙলকে) ওগো পাঁচশালার একশালা! তুমি না বলি এলে কুথায় পাহারা দিতে যাবে?

লাঙল ॥ যাচ্ছি, যাচ্ছি।

বাবু ॥ হ্যাঁ যাও। আর দেরী নয় ভাই, ওখানকার পাহারা তুমি দাও, এখানকার পাহারা দিচ্ছি আমি।

লাঙল ॥ যা বলিছ, চলনু।

[লাঙল চ'লে গেলো, মাটিও চলে যাচ্ছিল।]

বাবু ॥ ওগো চলি যাতছি যে। শুতি যাচ্ছ তো? বড় ঘুম পাতিছে বুঝি?—আমারও!

মাটি ॥ আমাদের সড়কে বানের জলে ফাটল ধ'রেছে—কখন কি হয় বলা যায় না—গাঁয়ের লোক আজকে ঘুমোবে না।

বাবু ॥ বেশ তো! বেশ তো! কি ফুটফুটে জোছনা, এসো না—এখানে বসি—দুজনে গল্প করি রাতটা কাটিয়ে দিই,

মাটি ॥ না, এতো রাতে বাইরে থাকতে নেই—এখানে ভয় আছে।

বাবু ॥ ভয়? কিসের ভয়? চোর ডাকাত? আবার কি তবে কচু বনে লুকতি হবে! উরি বাবা!

[বাবু হঠাৎ কি যেন দেখে।]

বাবু ॥ ও কি।

[দেখা গেল ছোট খাটো একটি তাল-গাছের মতো উঁচু শ্বেত বসনা একটি নারীমূর্তি তাদের দিকে ধীরে ধীরে লম্বা লম্বা পা ফেলে অগ্রসর হ'চ্ছে। মূর্তির মাথাটি নেমে একবার পেটের কাছে আসছে—আবার সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে।]

বাবু ॥ উরে বাবা!

[বাবু ভয়ে কাঁপতে লাগল।]

মাটি ॥ উরে বাবা!

[মাটি ভ'য়ে কাঁপতে লাগল। বাবু গোঁঙাতে গোঁঙাতে পালিয়ে যাচ্ছিল মাটির হাত ছেড়েই। এমন সময় মাটি একটা আর্তনাদ ক'রে উঠে মাটিতে প'ড়ে গেল। তা শুনে বাবু দাঁড়াল। মূর্তিটি মাটির দিকে আগে এগিয়ে আসছে দেখে বাবু সাহস ক'রে মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে মাটিকে আগলে দাঁড়াল। মাটির এরকম অবস্থা দেখে বাবু যেন ভয় কে জয় করল! মূর্তিটি তবু আরো এগিয়ে আসছে দেখে বাবু যেন মত্ত হস্তীর বল ও সাহস নিয়ে ঘুষি বাগিয়ে মূর্তিটির সঙ্গে লড়াই ক'রতে প্রস্তুত হ'লো, নাগালে আসতেই বাবু মূর্তিটিকে মারল প্রচণ্ড এক ঘুষি। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটি আর্তনাদ করে উঠল। মাটিও মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল।

মূর্তিটি ॥ উরে বাবা! গেছি—গেছি, গেছি।

[মূর্তিটির রহস্য তখন প্রকাশ পেল। দেখা গেল, মূর্তিটি আর কেউ নয়—স্বয়ং লাঙল। ইতিমধ্যে—দীর্ঘবস্ত্র খণ্ডটি সরে গেছে—লাঙলের হাত দুখানি একটি মাটির কলসীর মুখে

নিবদ্ধ ছিল। ঊর্ধ্ববাহু হ'য়ে সেই কলসিটিকেই লাঙ্গল করেছিল মূর্তিটির মাথা। সেই মাথা ঢাকা ছিল সুদীর্ঘ বস্ত্র খণ্ডের ঘোমটা-তেই। লাঙ্গল কলসিটি মাটিতে ঠুকে ভেঙ্গে ফেলে তার হাতদুখানি মুক্ত ক'রে নিল।]

বাবু। ওরে শালা! তুই?

[মাটি মৃদু হেসে গলবস্ত্র হয়ে বাবুকে প্রণাম করল।]

বাবু। আহা! করো কি? করো কি! আর পা ছুঁতি হবে না। আর পা টিপি দিতি হবে না। পাঁচশালায় তোমাকে যা শিখিয়েছে আমাকে সেই সব শিখিয়ে তোমার মনের মানুষ করি নাও—মানুষ করো!

লাঙ্গল। পরশ পাথর যখন তুমি ছুঁয়েছো—ওঁ তুমি

বাবু মত হস্তীর বল ও সাহস নিয়ে ঘুষি বাগিয়ে মূর্তিটির সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হলো।

লাঙ্গল। হ্যাঁ জামাইবাবু আমি। ঘুষি খেয়েছি দু:খু নেই; কিন্তু মাটির সঙ্গে বাজিটা জিতেছি। ভাগ্‌গিস তুমি ভূতের মুখে বউ ফেলি কচু বনে গিয়ে ঢোকোনি।

বাবু। হ্যাঁরে শালা! তুই ভাবছিস কি? নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার? একবার লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিছি, আর ঠেলি? ওগো এ-শালা ভূত নয়, দেবতা—দেবতা! পরীক্ষা করি বাজিয়ে নিলে, আমি লক্ষ্মীছাড়া, কি না? না—না আর আমি লক্ষ্মী ছাড়া নই—(মাটিকে বুকে টেনে নিয়ে) এই আমার লক্ষ্মী।

মানুষ হ'য়ে গেছো! এবার চলো দেখি বানের জল কুথতি সড়কে যাই—মাটি, তুই-ও চল্ -- ধরো দেখি ভাই তোমার সেই গানটা হেঁইয়ো হেঁইয়ো!

[বাবু সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল। এক লাইন সে গায়। পুনরাবৃত্তি করে লাঙ্গল আর মাটি। গাইতে গাইতে পরমানন্দে তারা এগিয়ে চলল তাদের জয়-যাত্রার পথে।

যবনিকা পড়ল।

স্বপ্ন ভঙ্গ

সন্তোষকুমার অধিকারী

কলকাতা থেকে একশ' মাইল দূরে। তাও ষ্টেশনের কাছে নয়, ষ্টেশনে নেমে উঠ্‌তে হয় গরুর গাড়ীতে। নতুন শড়ক ধ'রে মাইল চার চ'লে তারপর নামো বাঁদিকের মেঠোপথে। এবারে একটু এগোলেই আমবনের আড়ালে পড়ে গ্রাম।

আশ্চর্য এমন একটা গ্রামেও রয়েছে মেয়েদের ইস্কুল। শুধু মাইনর ক্লাস নয় পুরো স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত পড়ানো হয়। কিন্তু আরও বেশী আশ্চর্য এই ইস্কুলের তরুণী শিক্ষিকা প্রতিভা ঘোষ।

শুধু প্রতিভা ছাড়া কেউই ভেবে পায়না কেন এখানে সে এলো। প্রতিভা-ই স্কুলের একমাত্র এম. এ. পাশ করা মেয়ে। বয়সে সে সবার ছোট। বড়জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ হ'তে পারে। তাকে শুধু সুশ্রী বললে ভুল করা হ'বে; প্রতিভার রূপ চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বড় বিষণ্ণ তার চোখ। মনে হয় একটা করুণ কান্নার ছবি লুকিয়ে আছে তার চোখের দুটি তারায়।

কিন্তু আশ্চর্য তার রূপ নয়, তার নিঃশব্দতা। প্রতিভা কথা বলে কতটুকু তা গুণে বলা যায়। স্কুলের বর্ষীয়সী শিক্ষয়িত্রীরা লজ্জা পান তার নিরাভরণ চেহারা দেখে। মনে হয় একটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত রুক্ষতার সাধনা তার সর্বাঙ্গে। একটি রূপসী তরুণীর পক্ষে এটা আশ্চর্য বইকি।

স্কুলের বোর্ডিংয়ে তার ঘরের জান্‌লা থেকে দূরের সড়কটা চোখে পড়ে। অনেক মাঠ, আম আর পলাশের বন ডিঙিয়ে তবে সে রাস্তা। মাঝে মাঝে আমবাগানের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে দু' একটা সাঁওতালী মেয়ে। কোমর ঘুরিয়ে তাদের কাপড় পরা; মাথায় গোঁজা ফুল। তারা আসে বিচিত্রসুরে গান করতে করতে। জান্‌লায় বসে বসে সারাক্ষণ প্রতিভা শুধু ওইদিকেই তাকিয়ে থাকে। ওই মাঠ বন আর পথের দিকে। চেয়ে চেয়ে বোধ হয় শ্রান্ত হয়না ও'র চোখ।

প্রতিভা কি ভাবে? বোধহয় চেয়ে দেখে সে এই জীবনটাও অমনি নির্জন নিঃসঙ্গ পথ। মাঝে মাঝে চাঞ্চল্য আসে। আনন্দের মুক্ত ঝর্ণার ধারার গান গেয়ে ওঠে আকাশ বাতাস। কিন্তু তারপরে নামে রাত্রি। বিজন নিঃশব্দ সেই রাত্রির বুকে দূর প্রান্তর ব'য়ে হেঁটে যাওয়া পথের দুঃখকে অনুভব করা যায়।

পাশের ঘরে থাকে ইলা—ইলা মিত্র। স্কুল বেমানান চেহারা। বয়েস তার ত্রিশ এর বেশ কিছু ওপরে কিন্তু সাজগোজ করে থাকে বলে, তাকে হঠাৎ দেখলে প্রতিভার সমবয়সী বলে মনে হয়। দিনরাত পানের রসে লাল হ'য়ে থাকে তার ঠোঁট। অনর্গল কথা তার মুখে। সেই ইলা মাঝে মাঝে এসে চেপে ধরে।

—কি তোর গোপন কথা, আমায় বলবিনা?

গোপন কথা? চকিতে একটি দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে প্রতিভার বুক থেকে,—না ইলাদি, গোপন কথা ত' কিছু নেই।

—তবে এমন ছলোছলো চোখ নিয়ে বসে থাকিস কেন? তোর মত রূপ পেলে আমি কি এই চাকরী করতাম? কত গণ্ডা স্বামী জোগাড় করতাম তা জানিস? আচ্ছা সত্যি বলতো, তুই কি প্রেমে পড়িস নি প্রতিভা?

কি জবাব দেবে সে? একা কত নির্জন রাতে বিনিদ্র চোখে চেয়ে বসে থাকে প্রতিভা। নিদ্রিত গ্রামের বুকে রাত্রির প্রহরগুলোকে বড় দীর্ঘ ব'লে মনে হয়। অষ্টমীর ক্ষীণ ফ্যাকাশে চাঁদ যখন রাত্রি প্রায় শেষ করে আকাশে আসে, তখনও বসে বসে দেখে প্রতিভা। মনে হয় অমনি-ভাবেই ক'য়ে ক'য়ে অন্ধকার হ'য়ে গেল তার পৃথিবী।

সে কি অনেক দিনের কথা? না, এইত সেদিন।

নিজের হাতে দীপ নিভিয়েছে সে নিজের জীবনের। মনোজ বাধা ঠুকে ঠুকে ফিরেছে। ঠুকে ঠুকে রক্ত ঝরিয়েছে কপালে। তবুও সাড়া দিয়েছে একদিন। সে খবরও পেয়েছে প্রতিভা। মনোজ ফিরে গিয়েছে তার বাড়িতে—তার বাপ-মায়ের কাছে। হয়ত এরপরে আবার বিয়ে করবে সে; সুখী হ'বে।

আর প্রতিভা? প্রতিভা লুটিয়ে পড়লো জানলার গরাদে ধরে। ওরা জানে প্রতিভা মিস্ প্রতিভা ঘোষ—কুমারী। ওদের সে জানা কতটুকু সত্য??

একই সঙ্গে এম. এ. পড়তো—মনোজ আর প্রতিভা। দু'জনেই পড়ছিলো অর্থনীতি। মনোজ একটু লাজুক প্রকৃতির। মেয়েদের দিকে দেখতো না। কিন্তু ভালো বলতে পারতো মনোজ। ডিবেট হলে তার কথা শুনতে ভালোবাসতো প্রতিভা। লেকচারহলে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকতো ওরদিকে। অন্য মেয়েরা ঠাট্টা করতো কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করতো না ও'। একদিন আলাপ হ'য়ে গেলো লাইব্রেরীতে।

প্রথম আলাপে মনোজের কোন ভাবান্তর হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রতিভা এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। যাকে প্রতিদিন আগ্রহের চোখে দেখেছে তাকে পরিচয়ের জন্যে পেয়ে একটা নতুন জগৎ পেল সে। আর আশ্চর্য যে মনোজ এমনি কোনদিন মুখ তুলে তাকায়নি তার দিকে—একবার পরিচয়ের পর তার ব্যবহার হ'য়ে উঠ্‌লো অকুণ্ঠ, ঘনিষ্ঠ।

তারপর একটি বছরের ইতিহাস। সে ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা তার মুখস্থ। একা শুধু রাত্রির জানলায় ব'সে সেই স্মৃতিকেই উজ্জ্বল ক'রে রাখবার চেষ্টা করে প্রতিভা……

একদিন মনোজ আশ্চর্য হ'য়ে আবিষ্কার করলো যে তার চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে প্রতিভার। দুজনের মনেই যেন একই আদর্শের দীপশিখা। কিন্তু প্রতিভা তখন ভাবতে সুরু করেছে কত অমিল তাদের পরিবেশে। মনোজের বাবা হাইকোর্টের নামকরা এ্যাডভোকেট্। ভবানীপুরে তাঁর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বাড়ীতে ও'র মা' ও বাবা রয়েছেন, আর রয়েছে এক উজ্জ্বল গৌরবময় ভবিষ্যৎ। আর প্রতিভা…… দৈনন্দিন দীনতার, দুঃস্থতার গ্লানি যে কত, তা' তার চেয়ে বেশী কে বুঝবে!

প্রতিভা মনে মনে আবৃত্তি করে—'ছুটো না মরিচীকার দিকে—মনোজ তোমার স্বপ্ন হ'য়েই থাক। চাঁদকে চেয়োনা হাতের মধ্যে পেতে।'

কিন্তু মনোজের সান্নিধ্যে এলেই সমস্ত গোলমাল হ'য়ে যায়। তার নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে ফেলে প্রতিভা।

একদিন কলেজ ফেরত ওরা গেলো মিউজিয়মে—আর্ট-এগ্‌জিবিসন দেখতে। তারপর সন্ধ্যের চৌরঙ্গীর পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে মনোজ বললো—চলো না, একটু বসি।

সায়াহ্নের ভীরু নির্জন বাতাস তখন মন ছুঁয়ে চলেছে মৃত্তিকার। মাঠের এদিক ওদিকে যারা ঘুরছে তারা নিছক ভবঘুরে। পার্কের সবুজ চোখে লেড্‌ল'র উঁচু টাওয়ারটা এসে পড়েছে।

মনোজ প্রতিভার কোমল হাতছুটি নিয়ে যেন খেলা করছে। আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলো সে। সে কথা তার আদর্শের, তার জীবনের। মনোজ বললো—তার বাবা চান সেও তাঁর মত বড় উকীল হোক। কোন একটি বড়লোক রায়বাহাদুরের আদুরে মেয়েকেও তিনি পছন্দ ক'রে রেখেছেন। কিন্তু মনোজ দেশের কাজে পার্টির কাজে জীবন উৎসর্গ করবে।

প্রতিভা আস্তে আস্তে বললো—তোমার জীবন তোমার হাতে। অন্যের হাতে সে জীবনকে যদি গড়তে দাও মনোজ, তবে তা' হ'বে মাটির পুতুল। তুমিও যদি পাঁচজনের মত উকীল হ'তে চাও আর নিরীহ ভদ্রজীবন যাপন ক'রে সময় কাটাও—তাহ'লে আমরা আর নতুন কি আশা করতে পারি?

মনোজ তখনও দ্বিধান্বিত। বললো—কিন্তু আমার বাড়ীর ঐতিহ্যকে কি একেবারে ত্যাগ করবো? আমার বাপ মা'র সমস্ত এ্যামবিসন আমাকে ঘিরে জেগে উঠ্‌ছে—তাকি একেবারেই ভেঙ্গে দেবো?

প্রতিভার মুখে এবার মৃদু হাসির স্ফুরণ দেখা দিল। সে বললো—তুমি কি তোমার পরিবেশের রেজালট্যান্ট্

মাত্র ? না, তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার নিজের। পৃথিবীতে কোন মহৎ আদর্শ কি পরিবেশকে অস্বীকার না ক'রে জেগেছে কোন দিন ?

প্রতিভার কথার ব্যক্তিত্ব যেন অভিভূত করলো মনোজকে। হঠাৎ সে প্রতিভার হাত চেপে ধরলো তার দুহাত দিয়ে। বললো - তুমি সাহস দাও আমায়। কথা দাও, আমার পাশে থাকবে ?

এবারে বাক্‌রুদ্ধ হ'য়ে গেল মুখরা মেয়ে প্রতিভার। রক্ত স্তব্ধ হ'য়ে গেল তার দেহে। কি বলতে চেয়েছে মনোজ, প্রতিভা যেন আভাস পাচ্ছে তার। কিন্তু সেই মুহূর্তেই হঠাৎ একটা মেঘ দেখা দিল আকাশে। এক ঝলক এলোমেলো বাতাস ছুটে এলো মাঠের মধ্যে। প্রতিভা বললো—ঝড় আসছে মনোজ, চলো উঠি।

মনোজের মাকে মাসীমা বলে ডেকে লুটিয়ে প্রণাম করলো প্রতিভা। তিনি ত' ভারী খুসী। বুকে জড়িয়ে ধরে বার বার আদর করে বললেন—তুমি রোজ আসবে মা। এ' রাস্তা দিয়েই যখন যাও একবার করে নেমে চা খেয়ে যাবে আমার কাছে।

রোজ না হ'লেও প্রায়ই আসতে হ'চ্ছে প্রতিভাকে। পরীক্ষা এসে গেছে। মনোজের কাছে ও নোট নেয়; আলোচনা করে ও'র সঙ্গে। তারপর মাসীমার কাছে বসে তাঁর হাতের চা খাবার খেয়ে বাড়ী ফেরে।

একদিন যেন অনুভব করলো ওরা, আর কিছুই নেই যা জানানো হয়নি দুজনেকে। যেন অনেক কিছু—হয়ত সবকিছুই বলা হয়েছে, তবু কি একটা বলতে বলতে বলা হ'চ্ছেনা। যেটা দুজনেই জানে সেইটাকেই একবার মুখের ভাষার দিয়ে বলা।

সেই সুযোগ এলো অকস্মাৎ। সেদিন মনোজের বাবা আর মা দুজনেই গিয়েছিলেন কোন বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখতে। বাড়ীতে ঠাকুর চাকর ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিলনা। প্রতিদিনের মত পড়ার ঘরের মধ্যে না ঢুকে তেতলার ঘেরা ছাতের ওপর এসে বসলো দুজনে।

যে কথাটা মনোজ বলতে চায়, যে কথাটা প্রতিভা শুনতে চায়, সেই কথাটাই অনেকক্ষণ ধরে যেন নিঃশব্দে আলাপ করলো ওরা। তারপর এক সময়ে বললো প্রতিভাই—এরপর ? পরীক্ষা হ'লে তুমি যাবে একদিকে আর আমি একদিকে। ভাবছি এই দিনগুলোর কথা শুধু।

মনোজ বললো—ভেবে লাভ নেই। যা হ'বে তা' আমি ঠিক করে রেখেছি।

—কি হবে মনোজ ?

—বাবা মা দুজনেরই ইচ্ছে আমি পরীক্ষার পরই রায়বাহাদুর মনসা চ্যাটার্জির মেয়ে আশাকে বিয়ে করি।

আচম্বিতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নেমে এলো প্রতিভার বুক থেকে। রুদ্ধকণ্ঠে সে বললো—তাই করো মনোজ।

—তাই করো ?

মনোজ যেন বিস্মিত হয়ে চাইলো। এতদূর এগিয়ে এসে আমি বিয়ে করতে যাবো ওই রায় বাহাদুরের মেয়েকে। তুমি কি আমায় পুতুল ভাবছো নাকি ?

—কি করবে তবে ?

মনোজ আস্তে আস্তে হাত রাখলো প্রতিভার কোলে। বললো—কেন তুমিও কি আমায় ফাঁকি দেবে নাকি ?

—আমি ?

যা জানা কথা তা শুনতে এত কাঁপন লাগে কেন মনে! ভীরু গলায় বললো প্রতিভা—একটু স্পষ্ট করে বলো মনোজ।

—কতবার বলবো ? তুমি আমায় কি ভেবেছো বলত ? না প্রীতি, তোমায় আমি ছাড়তে পারবো না।

অনেকক্ষণ ধরে তারা ভাবতে লাগলো। মনোজের ব্যাকুল চোখে চোখে নীরবে চেয়ে রইলো প্রতিভা। তারপর বললো—তুমি ভুল করছো। আমাকে ত' কেউ স্বীকার করবে না। তুমি ত' জানো তোমার স্বজন তোমার সমাজকে। অসবর্ণ বিয়ে এখনও ত' চালু হয়নি এদেশে। আমি যে তোমাদের কাছে সবদিক থেকে অপাংক্তেয় মনোজ!

অপরিসীম কারুণ্য প্রতিভার কণ্ঠস্বরে। কিন্তু মনোজের গলা অকম্প্র। সে বললো—কেউ স্বীকার করবে কিনা সে দেখবার কথা ত' আমার নয়।

—কিন্তু তোমার বাবা মা ?

—ঘরে মাও তাঁরা করবেন না।

প্রতিভা যেন শিউরে উঠলো। বললো—তার মানে, আমার জন্যে তুমি ছেড়ে আসবে তোমার বাবা মাকে? তোমার বাড়ী ঘর? তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ? না মনোজ, এত স্বার্থপর আমি হ'বোনা।

মনোজ ভ্রূকুঞ্চিত করলো,—তুমি কি বলতে চাচ্ছো জানি না। কিন্তু তোমায় আমি চাই। এই আমার শেষ কথা। আমার ভবিষ্যৎ তোমায় বাদ দিয়ে নয় প্রতিভা।

এর উত্তরে কি বলবে প্রতিভা? তার চোখের পাতায় নেমেছে কাঁপন। তার বুকের রক্তে জেগেছে দোলা। অনেক আনন্দ অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন.....মনোজের হাতে মুখ রেখে অস্ফুটস্বরে সে ডাকলো—মনোজ।

এর পরের ঘটনা বেশ কিছুদিন পরে। তখন এম, এ, পরীক্ষা দেওয়া শেষ হ'য়েছে। একদিন মনোজ ওকে নিয়ে গেল দক্ষিণেশ্বরে। বাঁশি ব্রীজের ওপরে তখন অস্তসূর্যের রক্তাভা। নীচের জলে পড়েছে তার ছোঁওয়া। সে রক্তাভা মুখে মেখে নিয়ে বললো মনোজ—সব ঠিক করে ফেলেছি প্রীতি।

প্রতিভা বললো—তোমার বাবা মা? তাঁদের কি বলবে?

—আগে কিছুই বলবো না। বললে কি মত পাওয়া যায়? সর্বনাশ.....!

—তবে? আমি তোমায় কেড়ে নেবো?

মনোজ হাসলো—ভয় নেই। আমার বাবা এখন পর্যন্ত আমায় না নিয়ে শোন না। একদিন না দেখলে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। তুমি কি ভেবেছো সত্যিই তিনি আমাদের ত্যাগ করতে পারবেন? আর মাকে ত' তুমি জেনেইছো যে কত নরম শান্ত আমার মা।

প্রতিভা ক্ষীণ গলায় বললো—বড় ভয় করছে যে আমার!

—তুমি বড্ড ভীতু! শোনো, কাল আমরা রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করবো। সাক্ষী থাকবে শ্যামল আর কানাক্ষী। একমাসের জন্যে একটা ফ্ল্যাটও ভাড়া করেছি। কাল সেখানেই উঠবো আমরা। কানাক্ষী বাবাকে খবর দেবে। বলবে যে আপনি যদি ওদের ক্ষমা করেন, তাহ'লে ওরা ফিরে আসবে। দেখবে—বাবা কি ক্ষমা না করে পারেন?

তবে তাই হোক। বাবা মা ক্ষমা করবেনই একদিন। জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলবে দুজনে।

বিয়ের পরের দিনগুলি। জীবনে যে এত মাধুর্য, তা কি ভেবেছে প্রতিভা? দুজনের নিভৃত কুজন শুধু। সঙ্গীতের মুগ্ধ ব্যঞ্জনা। একটি পরিপূর্ণ সুরের মত নিটোল দিন।

কিন্তু তবুও একদিন ম্লান দেখালো মনোজের মুখ। প্রতিভা কাতর হ'য়ে বললো—কি হলো তোমার মনোজ?

মনোজ হেসে উড়িয়ে দিল—কিছু না ত?

কিন্তু সন্ধানী প্রতিভা ছাড়লো না। শেষ পর্যন্ত জানলো সেও। কানাক্ষীকে অপমান করেছেন মনোজের বাবা। বলেছেন—তাঁর পুত্র কেউ নেই। মনোজের কোন বন্ধু বান্ধব যেন কোনদিন তাঁর গৃহে প্রবেশ না করে।

—এত কঠোর হবেন বাবা? কোনদিনই ভাবিনি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো মনোজ। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই হেসে বললো—চলো দেখি, আজ একটা সিনেমা দেখে আসি।

মানুষ কতদিন নিজেকে চেপে রাখতে পারে? ক্রমান্বয়ে শরীর খারাপ হতে লাগল মনোজের। তারপর দেখা দিল অর্থকৃচ্ছ্রতা। শুধু ঋণের ওপরে এতদিন চলছিলো। কিন্তু বাবা তাকে ত্যাগ করেছেন—এ কথা প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে, বন্ধুরা হাত গুটোলো। নিজের সামান্য দু'গাছা চুরী ও হার বিক্রী করে দিলো প্রতিভা। মনোজ বিক্রী করলো তার ঘড়ি ও আংটি। কিন্তু তারপরে একদিন প্রায় অনশনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো দুজনে।

প্রতিভা বললো—আমার যা হয় হবে মনোজ তুমি ফিরে যাও।

মনোজ হাসলো—আমার স্নেহশীল বাবা দেখুন তাঁর ছেলে বউ না খেতে পেয়ে মরে গেল! ফিরে আমি যাবো না প্রীতি।

শ্যামল খবর আনলো মনোজের বাবা তাঁর প্রাসাদের মত বাড়ীতে এক গেরুয়া সন্ন্যাসীকে বসিয়েছেন। সে তার একদল সঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দিনরাত হরিকীর্তন সুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে বাড়ীটা নাকি ওদেরকেই দান করবেন মনোজের বাবা বিপ্রচরণ মুখার্জি।

প্রতিভা কেঁদে ফেললো—ফিরে যাও মনোজ।

মনোজ দাঁতে দাঁত দিয়ে বললো—না।

ল' কলেজে তখনও এক বছর বাকী মনোজের। প্রতিদিন সেজেগুজে নির্দিষ্ট সময়েই সে বেরোত কলেজে। একদিন তাকে অনুসরণ করলো প্রতিভা। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বাসে উঠলো না মনোজ। রাস্তা ধরে হেঁটে চললো। এদিক ওদিক এলোমেলো হেঁটে একটা পার্কে ঢুকলো সে।

এবারে প্রতিভা এগিয়ে এলো। অন্যমনস্ক মনোজের পেছনে এসে হাতে হাত দিলো তার। ডাকলো—মনোজ!

হঠাৎ চমকে উঠলো মনোজ। প্রথমটা কেমন বিহ্বল চোখে চেয়ে রইলো সে। তারপরে বললো—তুমি পেছন পেছন এসেছো?

শান্ত ধরা গলায় বললো প্রতিভা—কলেজে গেলেনা তুমি?

—কলেজ ছেড়ে দিয়েছি প্রীতি। ল' পাশ করে আমার কিছু হ'বেনা, তাই—

হাসবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু বড় করুণ বড় বেদনাময় দেখালো তার মুখ।

সমস্ত আশা, সমস্ত সুখ স্বপ্ন যেন প্রদীপের জলে ভেজা সলতের মত মিথো হয়ে গেছে। প্রতিভা মনোজের মাথা বুকে চেপে ধরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো—তোমার বাপ মার কাছে তোমায় ফিরিয়ে দেবোই মনোজ।

খবরটা আনলো অপরেশ নামে একটি ছেলে। মনোজদের পাশের বাড়ীতে থাকে সে। বললো—কদিন থেকে প্রবল জ্বর বিপ্রচরণ বাবুর। রোজ দু'বেলা ডাক্তার আসছেন। কিন্তু বলতে পারছেন না। বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছেন মনোজের বাবা। বাড়ীতে তৃতীয় লোক নেই।

মনোজের ক্রন্দনোজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে প্রতিভা বললো—তুমি যাবে না?

কান্নারোধ করে বললো মনোজ—না।

প্রতিভার শুকনো চোখ হঠাৎ আগুনের মত জ্বলে উঠলো। কঠিন কণ্ঠে সে বললো—তোমার বাবা যদি মরে যান?

মনোজ শিউরে উঠলো। প্রতিভা ব'লে চলে—একা বাড়ীতে তোমার মায়ের অবস্থা ভেবে দেখেছো? তুমি গেলে হয়ত বাঁচতে পারেন তোমার বাবা।

মনোজ ব্যাকুলকণ্ঠে বললো—তোমায় ছেড়ে আমি কেমন করে যাই?

—তুমি যাও, তোমার পায়ে পড়ি—যাও।

—প্রতিভা……!

প্রতিভা তার অশ্রুভরা চোখ ওর চোখে রাখলো। বললো—ভয় নেই। আমি তোমারই থাকবো। তুমি যাও মনোজ; নইলে মাথা খুঁড়ে মরবো আমি। যাও, তুমি যাও মনোজ।

পাগলের মত তাকে ঠেলে ঠেলে পাঠালো প্রতিভা। তারপর যতক্ষণ তাকে দেখা গেল রুদ্ধ জানলার ছিদ্রে চোখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে।

ক্লাসে ওদের সঙ্গে একটি মুসলমান ছেলে ছিল। নাম আহসান হবীব। ছেলেটি সরল ও নিরীহ। কিন্তু প্রতিভার পেছনে পেছনে ঘোরা তার এক বাতিক ছিল। ওকে খুসী করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতো। আজ তার কথাই মনে পড়লো প্রতিভার। রাস্তার মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে সে টেলিফোন করলো আহসানকে।

টেলিফোন পেয়ে ছুটে এলো আহসান। বললো—কি খবর দেবী?

ততক্ষণে স্বাভাবিক হ'য়ে গেছে প্রতিভা। ভালো একটি শাড়ী প'রে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে এসেছে। আহসানের মুখের ওপর একটু মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললো—বড্ড ভুল করেছি আহসান। মনোজের মত লোককে নিয়ে প্রেম করা যায় কিন্তু ঘর-করা যায় না। আজ দুদিন থেকে পাত্তা নেই। বোধ হয় বাড়ী ফিরে গেছেন বাবু। তুমি আমায় বাঁচাও এবার।

—বলো কি হুকুম তোমার?

—আজই এখান থেকে নিয়ে চলো আমায়। না, তোমার কলকাতার বাড়ী নয়। একজনের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছো। সে কি ছাড়বে সহজে? তার চেয়ে চলো মাস তিনেক অন্ততঃ বাইরে কোথাও কাটিয়ে আসি।

সেইদিন সন্ধ্যেতেই আহসানের সঙ্গে ষ্টেশনে এলো

প্রতিভা। শ্যামল ও কামাক্ষীকেও সে ইতিমধ্যে খবর দিয়েছিল ষ্টেশনে আসবার জন্যে। তাদের সামনে আহসানের হাত ধরে গাড়ীতে উঠে বসলো সে। শ্যামলকে ডেকে মৃদুস্বরে বললো—বড় ভুল করেছিলাম, মনোজকে আমার পোষালো না। আহসানের আর যাই হোক টাকার অভাব নেই।

কামাক্ষীকে আড়ালে ডেকে বললো—চললাম। ওকে জানিয়ে দেবেন। বলবেন, যে মুসলমান নিয়ে গৃহত্যাগ করে তার পেছনে ছুটে লাভ নেই। আর···আর ওর জীবনটা যেন নষ্ট না হয়। ল' পরীক্ষাটা যেন দেয়।

তার গলাটা শেষের দিকে কি কেঁপে গেল ?

কিন্তু অনেক বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো আহসানের জন্যে। বর্দ্ধমানে এসে নেমে পড়লো দুজনে। ষ্টেশনের বাইরে এসে হঠাৎ তার দুই হাত চেপে ধরলো প্রতিভা,—আহসান, ভাই আমার, মাপ করো আমাকে তুমি—

আহসান হতবাক হ'য়ে চাইলো ও'র দিকে।

—ভাই, অনেক দুঃখ অনেক লজ্জা দিলাম তোমায়। কলকাতার লোক জেনেছে এতক্ষণে আহসান প্রতিভাকে নিয়ে পালিয়েছে। আমার জন্যে এই কলঙ্ক তুমি নাও।

আহসান তখনও বিমূঢ়। কিন্তু প্রতিভা বলে চললো—

—সংসারের জীবন আমার নয় আহসান। আমি মনোজকে মুক্তি দিতে চাই। সে আমায় ছাড়তো না তাই এ' কৌশল। আমায় ক্ষমা করো আহসান, লক্ষ্মী ভাই আমার।

আস্তে আস্তে যেন জ্ঞান ফিরে এলো আহসানের। সে বললো—কিন্তু কোথায় তুমি যাবে প্রতিভা ?

—এখানে আমার এক দিদি থাকেন। তাঁর কাছেই আজ উঠ্‌বো। তারপর ? নিজের ব্যবস্থা ঠিক করে নেবো।

আহসান মৃদুস্বরে বললো—দরকার পড়লে খবর দিও। তারপর পকেট থেকে একমুঠো নোট বার করে ও'র হাতে গুঁজে দিয়ে বললো—পরে ফেরত দিয়ো। ঠিকানাত জানোই।

প্লাটফরমে ওকে ছেড়ে দিয়ে সোজা ওভারব্রীজে গিয়ে উঠ্‌লো আহসান। পেছন ফিরে সে চাইলোনা একবারও। হয়ত ভয় ছিলো যদি ধরা পড়ে যায় তার সাময়িক দুর্বলতা।

···জীবন বড় বিচিত্র কিন্তু বড় করুণ। শেষরাত্রের পাণ্ডুর আকাশের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো রায়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মিস প্রতিভা ঘোষ।

• • •

বর্দ্ধমানে প্রতিভার পিসতুতো বোন সুমিত্রা থাকেন। বয়সে তিনি প্রবীণা। কিন্তু প্রতিভাকে স্নেহের চোখে দেখেন। এবারে পূজোর পর ছুটির নিঃসঙ্গ দিনগুলি বোর্ডিংয়ে কাটানো অসম্ভব মনে হ'লো প্রতিভার। সে চ'লে এলো বর্দ্ধমানে।

কিছুদিন থাকার পর বর্দ্ধমানকে হঠাৎ যেন ভালো লেগে গেল। সুমিত্রার স্বামী বেশ মিশুক লোক। তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে আসেন অনেকেই। কলকাতা না হ'লেও কলকাতার কাছাকাছি আবহাওয়া। প্রতিভা তার তিন বছরের গ্রামজীবনের পর নতুন করে পেলো নিজেকে।

সুমিত্রাই একদিন বললেন—তুই এখানেই থেকে যা' প্রীতি। চাকরীর অভাব কি ? ভালো চাকরী এখানেই জুটে যাবে। তুই থাকলে আমাদেরও ভালো লাগে।

প্রতিভা যেন ভাবতে লাগলো কথাটা। এক একবার ভয় হচ্ছিলো তার। কলকাতার এত কাছে থাকা ; যদি কোনদিন···কিন্তু তারপরেই সে হেসে উঠ্‌লো আপন মনে। সে কি অপেক্ষা করছে এক কলঙ্কিনী মেয়ের পথ চেয়ে ? অসম্ভব।

প্রতিভা প্রায় রাজী হ'য়ে গেল। প্রথমে একমাসের ও তারপরে আরও একমাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলো সে। এখানে একটা চাকরী হাতে নিয়ে তবে পদত্যাগ পত্র দেবে সে।

সুমিত্রা আস্তে আস্তে বাইরে টান্‌তে লাগলেন ওকে। একদিন মেয়েদের একটা সভায় বক্তৃতা দিয়ে ও প্রশংসা পেলো সকলের। কিন্তু মন জয় করলো গান গেয়ে। এতদিন পরে আবার সুরু করলো গান গাওয়া। মনের অবচেতনার কোণ থেকে হারিয়ে যাওয়া সুরকে খুঁজে নিয়ে এলো। কণ্ঠ ওর চিরদিনই সুরেলা। কিন্তু সুর যে স্মৃতিকেও জয় করতে পারে তা এতদিনে বুঝলো প্রতিভা।

শেষপর্যন্ত চাকরীও পাওয়া গেল একটা। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সহপ্রধানা শিক্ষিকা। স্কুল কমিটির সম্পাদক গোপনে জানালেন সুমিত্রার স্বামীকে যে, প্রধানা শিক্ষিকা বয়সে প্রাচীনা। আর বছর খানেকের মধ্যেই তিনি অবসর নেবেন। তখন তাঁর জায়গাতেই বসবে প্রতিভা।

রায়পুরের পদত্যাগপত্রটা লিখে রেখেছে প্রতিভা। ছুটিটা ফুরোলে তবে পাঠাবে। রায়পুরের দুঃখের নির্জনতার দিন নয়। নিজেকে নতুন করে খুলতে আরম্ভ করলো সে।

সেদিন একটি বিয়ের বাসরে গান গাইবার ডাক পেলো। প্রতিভা আজকাল খুসী হ'য়েই গান করে। কিন্তু সদ্য বধূ হওয়া শান্তি আর তার পাশে তার তরুণ স্বামী প্রদ্যোৎকে দেখে পুরোনো একটা জ্বালা যেন জেগে উঠ্‌লো একবার। ফলে গানের সুর হয়ে উঠ্‌লো করুণ। কিন্তু তবু অপূর্ব তার কণ্ঠ। শুধু বাসর ঘর নয়, গোটা বাড়ীর লোকই বোধ হয় জমে গিয়েছিলো দরজার মুখে।

গান শেষ করে বেশ খুসী হ'য়ে উঠ্‌লো প্রতিভা। সকলের দৃষ্টি যখন প্রশংসায় মুখর তখন চাইতে গিয়ে হঠাৎ জান্‌লা দিয়ে দরজার বাইরে একজোড়া ব্যাকুল চোখের ওপরে তার চোখ পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর যেন হিম হ'য়ে গেল তার। মনে হ'লো এক আকাশ জোড়া অন্ধকার নেমে এসেছে ওই দুটি চোখের পথ বেয়ে।

কখন যে সেই ঘরের মধ্যে থেকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে প্রতিভা, আর সকলকে কাটিয়ে কেমন করে রাস্তায় এসে পড়লো তা' নিজেই বুঝে উঠতে পারলোনা সে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে একটা রিক্সায় উঠে বললো—জলদি চলো, স্যানন্যায়র। তারপর দুইকানে আঙ্গুল গুঁজে কুঁজো হ'য়ে বসে পড়লো সে। কিছুতেই শুনবেনা সে, পেছন থেকে কেউ করুণ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকছে কিনা,—প্রতিভা, প্রতিভা……

বড় রাস্তাতে রিক্সা ছেড়ে ছুটে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো সে। হোঁচট্ খেয়ে একবার রাস্তায় উপুড় হ'য়ে পড়ে গেল। পায়ের আঙ্গুল কেটে রক্ত ঝরলো। প্রতিভা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে এসে ঘরে ঢুকলো। ঘরের ভেতরে। দরজা রুদ্ধ করে দিয়ে লুটিয়ে পড়লো বিছানাতে। তারপর দুইহাতে বুক চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠ্‌লো—মনোজ।

পরের দিন প্রত্যুষের প্রথম যে ট্রেন বর্দ্ধমান ছেড়ে এলো বোলপুর, সেই ট্রেনেই এসে নামলো রায়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মিস প্রতিভা ঘোষ। তারপর আবার এলো সেই দিগন্ত—প্রসারিত মাঠ আর বন; সেই বিজন নিরুদ্দেশ কালো পথ আর নির্জন কায়ায় ভরা বোর্ডিংয়ের ক্ষুদ্র কক্ষ। সেই শান্ত দীর্ঘায়ত দিনান্ত আর বিনিদ্র বেদনাময় রাত্রি। জান্‌লার পরাদে মুখ রেখে চুপিয়ে চুপিয়ে কাঁদতে লাগলো এক যৌবনবতী তরুণীর হৃদয়। ওই মাঠ বন নদী পার হ'য়ে চলেছে যে নীল সড়ক একদিন না একদিন সে পৌঁছোবেই কোন শহরে, কোন জনপদে। কিন্তু এই রিক্ত হৃদয়ের পথ কি চিরদিন শূন্যেই ভেসে রইবে—নিরুদ্দেশ নিরবলম্ব হয়ে??

আসান

[গল্প]

অবধূত

বেধে গেল হুলস্থুল কাণ্ড।

অর্ধেক রাতে বাড়ী শুদ্ধ মানুষ বিছানা ছেড়ে উঠে চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে। জ্বালাও আলো, লে আও টর্চ, আন্ শিগ্‌গীর লাঠি ছড়ি-ছাতা জুতো যা পাস্ হাতের কাছে। তেতলার চিলে কোঠা যেখানে পিসীমার নাড়ু গোপাল শুয়ে ঘুমচ্ছেন এতটুকু একটু মশারির মধ্যে, সেখান থেকে শুরু করে একতলার সিঁড়ির তলার-ঘুপসিকোণটুকু পর্য্যন্ত খোঁজা আরম্ভ হোল! নিশ্চয়ই আছে কোথাও, না থেকে যাবে কোথায় বেটা। স্পষ্ট শোনা গেছে—কেঁউ কেঁউ কুঁই কুঁই কাঁই কাঁই—কান্না। একবার নয়, দু'বার নয়, অনেকবার শোনা গেছে। একজায়গায় নয়, বাড়ীময় শোনা গেছে। ছুতুড়ে কুকুর বাচ্ছা, কেউ দেখতে পাচ্ছে না, অথচ ঠিক কেঁদে চলেছে। বাড়ী শুদ্ধ মানুষকে নাকানিচোবানি খাইয়ে ছাড়লে একেবারে।

সর্বপ্রথম শুনতে পান মা তাঁর শোবার ঘরের মধ্যে। সে ঘরের খাটে তিনি শোন ছোট ছেলে নিমু আর তার বড় বোন শান্তাকে নিয়ে। বাড়ীর কর্তা শোন একলা আলাদা ঘরে। কারণ অনেক রাত পর্য্যন্ত তিনি পড়াশোনা করেন। বড় ছেলে সুব্রত শোয় নিচে বাইরের ঘরে। আর পিসীমা শোন দুই মেয়ে আরতি আর আরাধনাকে নিয়ে। কুঁই কুঁই কান্না শুনে মার ঘুম ভেঙে যায়। তাঁর মনে হয় যে ঘরের ভেতরেই হচ্ছে আওয়াজটা। বিছানা থেকে উঠে তিনি আলো জ্বালেন। কিন্তু ইলেকট্রিকের আলোয় খাট আলমারির তলায় কিছুই দেখবার উপায় নেই। অগত্যা দরজা খুলে তাঁকে নিচে যেতে হয়। টর্চটা থাকে সুব্রতর কাছে। সে বেচারা সারা দিন খেটেখুটে এসে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল। মা'র ডাক শুনে উঠে সেও টর্চ নিয়ে লেগে যায় মার সঙ্গে কুকুরবাচ্ছা খুঁজতে। কিন্তু তখন আরম্ভ হয় তাজ্জব কাণ্ড, একবার শোনা গেল বাচ্চাটা ডাকছে নিচের তলায়, তারপরই শোনা গেল দোতলার বারন্দায়, তারপর—তারপর তেতলার ছাতে। মা ছেলে দু'জনে নিঃশব্দে কারও ঘুম না ভাঙিয়ে একতলা দোতলা তেতলা ঘুরতে থাকেন। শেষে লাগল এক বিষম ধাঁধা, সুব্রতর মনে হোল কিঁউ কিঁউ শব্দটা আসছে যেন পিসীমার ঘরের ভেতর থেকে। দরজার গায়ে কান পেতে সুব্রত শুনল—হাঁ ঠিকই—ঐ ত কিঁউ কিঁউ-কাঁই কাঁই-কুঁই কুঁই। আর দেরী না করে সুব্রত ধাক্কা দিতে লাগল পিসীমার দরজায়।

"দরজা খোল পিসীমা, শিগ্‌গীর খোল দরজা, তোমার ঘরে কুকুর বাচ্চা ঢুকেছে"।

ঘরের ভেতর থেকে পিসীমার ঘুমে জড়ানো গলা শোনা গেল—"এ্যাঃ কি বললি?" দরজায় আরও দু'টো ধাক্কা দিয়ে সুব্রত বললে—"কুকুর—কুকুর ঢুকেছে তোমার ঘরে।"

"এ্যা! কি বললি? বললি কি রে?"

আঁতকে উঠলেন পিসীমা। ঝড়াস করে ঘরের ভেতর খিলটা আছড়ে পড়ল। টর্চ হাতে ঘরে ঢুকল সুব্রত, পেছনে মা, হাতে এক গাছা ছড়ি। ওরা দু'বোন আরতি আর আরাধনা মশারি থেকে বেরিয়ে বিছানার কিনারায় বসে রইল। নিচে পা দিতে সাহস হোল না ওদের। পিসীমার গলা চড়ল গিয়ে একেবারে সপ্তমে।

"কুকুর বাচ্চা, হ্যাঁরে কুকুর বাচ্চা কি রে? শোবার ঘরে কুকুর বাচ্চা? আমার সর্বনাশ হ'য়ে যাবে যে রে। বড়ির টিন কটা আচারের হাঁড়ি সব যে ছাই মেঝের নামানো রয়েছে আজ। সন্ধ্যের সময় ছাত থেকে নামিয়ে এনে আর তোলবার সময় পাইনি। কে এমন সর্বনাশ করলে রে আমার ঘরে কুকুর বাচ্চা ঢুকিয়ে দিয়ে।"

পিসীমার হায় হায়ের চোটে বাবার ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মোটা বেতের লাঠিটা হাতে নিয়ে। এ দরজার বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন—

"কি ওখানে? কি খুঁজছ তোমরা? চোর না সাপ।

পিসীমাই আগে জবাব দিলেন—"চোর সাপ হলে ত বাঁচাই যেত রে ভাই, আমার মাথা খেতে ঘরে ঢুকেছে একটা কুকুর।"

যামিনীবাবু চশমা খুলে রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। চশমা ছাড়াই উঠে এসেছেন। কাজেই তাঁর পক্ষে চার হাত তফাতেও কিছু দেখা সম্ভব নয়। দরজার বাইরে থেকেই তিনি তাঁর লাঠিগাছটা বাড়িয়ে দিলেন। দিয়ে ধমক দিলেন মেয়েদের।

"এই আরতি, কোথা গেলি তোরা, ধরনা লাঠিখানা। খুব সাবধান, কামড়ায় না যেন তোদের।"

ঠিক সেই সময় আবার ডাকটা শোনা গেল বারান্দার ওধারে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন যামিনীবাবু।

"এই আরাধনা, কোথা গেলি তুই। নিয়ে আয় শিগ্‌গীর আমার চশমাটা। আমিই বার করছি কুকুরটাকে। নিশ্চয়ই নেহাত বাচ্চা একটা, ওটা কখনও কামড়াতে পারবে না। কোন ভয় নেই, আগে নিয়ে আয় আমার চশমাটা।"

কিন্তু চশমা আর আনতে হোল না। সুব্রতই দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। স্নানের ঘরের ওপাশের বারান্দার কোণে একখানা ছেঁড়া ছোবড়ার গদি জড় করা ছিল। তার নিচে থেকে বার হোল বাচ্চাটা। কালো কুচকুচে এতটুকু একটা কুকুর ছানা। কাঁই কাঁই কুঁই কুঁই করে বাড়ী মাথায় করে তুললে। একটা কানে ধরে সেটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে সুব্রত নিচে নেমে গেল।

পিসীমা চেঁচাতে লাগলেন—"ফেলে দিয়ে আয়, দূর করে দিয়ে আয়, এত রাতে কোথা থেকে জ্বালাতে এল আপদ।"

সদর দরজা খুলে ছুঁড়ে সেটাকে ফেলে দিলে সুব্রত রাস্তায়। করুণ একটা চীৎকার করে উঠল বাচ্চাটা। সদর দরজায় খিল এঁটে সুব্রত চলে গেল কল ঘরে হাত ধুতে।

আরও কিছুক্ষণ হৈ হৈ চলল। কি ক'রে ওটা ঢুকল বাড়ীতে? নিশ্চয়ই নরদমা দিয়ে ঢুকে পড়েছে, আরতি আর আরাধনার ধারণা, ওটা নেমে এসেছে ছাতের ওপর থেকে। অতটুকু বাচ্চা নিশ্চয়ই বাজে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তার থাবা ফসকে পড়েছে ছাতের ওপর, তারপর কখন নেমে এসেছে সিঁড়ি দিয়ে! পিসীমা বললেন—"পই পই করে বলি সন্ধ্যের পর সদরটা বন্ধ রাখতে। তা' নয়, রাত দশটা পর্য্যন্ত দরজা হাঁ হাঁ করছে। একজন না একজন আসছে আর যাচ্ছেই। ও ঢুকেছে সদর দোর দিয়েই যেখান দিয়ে সবাই ঢোকে। এখন ছোল ত', রান্না ভাঁড়ার সব যজিয়ে গেল নরদমার কুকুরে। কর কি করবে এর বাছ বিচার।"

মা বললেন—"কাল সকালে টাটকা গঙ্গাজল আনিয়ে সব ছিটিয়ে দিলেই হবে।"

বড় মেয়ে আরতি ক্লাস নাইতে উঠেছে। মুখ বেঁকিয়ে বললে—"তার সঙ্গে একটু টাটকা গোবর জলও।"

ভাগ্যে কথাটা পিসীমার কানে গেল না। যামিনীবাবু ধমক দিলেন সবাইকে—

"যা, যা, শুয়ে পড় গিয়ে আবার সবাই, আড়াইটে বাজল প্রায়।"

তখন আবার বাড়ী নিস্তব্ধ হ'য়ে এল। একে একে সব ঘরের আলো নিভল। পিসীমার ঘরের ভেতর থেকে ঠং ঠং ঠকাস আওয়াজ আসতে লাগল। পেতলের হামানদিস্তেয় তিনি পান ছেঁচতে বসলেন। ঘুম ভাঙলেই তাঁকে আবার নতুন করে পান মুখে দিতে হয়।

এ ঘরে এসে মা দরজা বন্ধ করলেন। খাটের ওপর ওরা দুই ভাই বোন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এত বড় ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও ওরা জানতে পারল না। জানলে আর রক্ষে ছিল নাকি! এতক্ষণে বাড়ী মাথায় করত চেঁচিয়ে। যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে। ওদের সামনে থেকে কুকুর ছানাটাকে বাড়ী ছাড়া করতে হ'লে খুনোখুনি লেগে যেত। আলো নিভিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে অন্ধকারেই মা ওদের দু'জনের মাথার বালিশ ঠিক করে দিলেন। দিয়ে শুয়ে প'ড়ে মনে মনে হাসলেন। কাল সকালে উঠে যখন ভাই বোনে শুনবে যে বাড়ীতে কুকুরছানা ঢুকেছিল অথচ ওদের জাগানো হয় নি তখন বাধবে অনর্থ কাণ্ড। কুকুর, বেড়াল, ছাগল, যার ছানাই হোক না কেন, ওদের হাত ছাড়িয়ে বাড়ীর বার করে দেওয়া সহজ কথা নয়।

আর একবার সস্নেহে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে

দিয়ে মা এপাশ ফিরে চোখ বুজলেন। আর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার, সকাল হ'লেই রাজ্যের কাজ তাঁর। খাস নেবারও ফুরসত পাবেন না সেই বারটা একটা পর্য্যন্ত।

কিছুক্ষণ পরেই আবার তিনি চমকে উঠলেন। আবার সেই কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই। স্থির হ'য়ে শুয়ে কান পেতে রইলেন মা। কোথা থেকে আসছে ঐ চাপা আওয়াজটা!

বেশ অনেকটা সময় পার হ'য়ে গেল। নিমু ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় ক'রে কি খানিকটা ব'কে বোধ হয় পাশ ফিরলে। সঙ্গে সঙ্গে আবার কুঁই কুঁই কুঁই। এবার আর ভুল হোল না। আওয়াজটা আসছে বিছানার ভেতর থেকেই সন্তর্পণে বিছানা থেকে নেমে মা আলো জ্বাললেন। সাবধানে মশারিটা তুলে ফেলে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন বিছানার দিকে। একটু পরে শান্তা পাশ ফিরল। আর সেই সঙ্গে আবার শোনা গেল কুকুর বাচ্চার কান্না। সঙ্গে সঙ্গে মা একটানে ছোট সেপখানা তুলে নিলেন ওদের গায়ের ওপর থেকে।

বেরিয়ে পড়ল কুঁই কুঁই-এর উৎপত্তি স্থান। দুই ভাই বোনের মাঝখানে বুকের কাছে রয়েছে কুকুর বাচ্চাটা। বেশ আরামেই আছে ওদের দু'জনের শরীরের চাপের মধ্যে। কিন্তু ওরা কেউ ন'ড়ে উঠলেই সেই কুঁই কুঁই আওয়াজ করে উঠছে।

খাটের ওপর ঝুঁকে মা ভাল করে দেখলেন সব। ভাই বোনের জামা কালো পাঁকে মাখামাখি। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধও তিনি পেলেন। নরদমার পাঁক থেকে যে জীবটিকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে, এটুকু বুঝতে তাঁর একটুও কষ্ট হোল না। তখন দু'হাতে দু'জনের নড়া ধরে টেনে তুলে বসাতে গেলেন। বসবে কে, ওরা চোখও চাইলে না, সাঁই গুঁই ক'রে আবার শুয়ে পড়তে গেল।

মা আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। মেয়ের চুলের মুঠি ধরে দিলেন দুই ঝাঁকুনি। ছেলের গালে বসিয়ে দিলেন ঠাস ক'রে একটি ছোট্ট চড়। তাতেও ওরা কেউ চোখ চাইলে না। ছেলে শুরু করলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে। মেয়ে দু'হাতে দু'চোখ রগড়াতে আর ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

আর তার সঙ্গে তাল রাখবার জন্যেই বোধ হয় বাচ্চাটা জুড়ে দিলে কান্না।

একটা চাপা ধমক দিলেন মা—"শিগ্‌গীর বল, কুকুর ছানা এল কোথা থেকে?"

হঠাৎ ঝপ করে দু'জনের গলা বন্ধ হোল। দু'জনেই ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল বাচ্চাটার দিকে।

দুই চাটি পড়ল দু'জনের মাথায়।

"বল শিগ্‌গীর, কোথা থেকে আনলি ওটাকে?"

উত্তর নেই কারও মুখে। বোনটি সভয়ে একবার বাচ্চাটার দিকে একবার মার মুখের দিকে চাইতে লাগল। ভাইটি কি ভেবে ঝপ করে বাচ্চাটাকে ধ'রে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ছোট সার্ট দিয়ে চাপা দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

আবার গর্জন ক'রে উঠলেন মা—"কখন আনলি ওটাকে?" ব'লে মেয়ের মুখের কাছে চড় তুললেন।

খুব গম্ভীর ভাবে মাথা দুলিয়ে ভাই বললে—"ওল নেই, এতা আমাল, আমি আনি।"

সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সুরে চেঁচে উঠল বোন—"আ-হা-হা আল্লাদে ছেলে, ওটা আমার, আমি এনেছি। ঐ দেখ লেজটা সাদা। তোরটার কালো লেজ, সেটা পালিয়েছে।"

চট করে নিজের জামাটা তুলে নিমু একবার দেখে নিলে বাচ্চাটাকে। দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সত্যিই লেজটা সাদা। কিন্তু তা বলে হাতেরটা ত আর হাতছাড়া করা যায় না। আরও জোরে বাচ্চাটাকে চেপে ধরলে নিজের পেটের সঙ্গে।

আবার একটা ধমক দিলেন মা—"বল শিগ্‌গীর, কখন আনলি ও দুটোকে?" জবাব দেবার জন্যে মেয়ে একবার হাঁ করলে। হাঁ করেই আবার টপ্ করে মুখ বুজে ফেললে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

ছেলে বেপরোয়া। গম্ভীর ভাবে বললে—মাল্ল।"

চোখ কুঁচকে মা বললেন—"মাল্ল, নিকুচি করেছে তোর মাল্লর। নরদমা থেকে কুকুর এনে বিছানায় তুলে এখন মাল্ল করা হচ্ছে। দাঁড়া আজ তোদেরই একদিন না আমারই একদিন।"

বলে তিনি আবার দরজার খিল খুলে বেরিয়ে বারন্দায় দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন "সুবো, এই সুবো।"

সুব্রত উঠে এল ওপরে, আরতি আর আরাধনা বেরিয়ে এল পিসীমার ঘর থেকে। ছেঁচা পানটুকু মুখে দিয়ে পিসীমাও এলেন। যামিনী বাবু এবার চশমা চোখে দিয়েই এলেন। সবাই এসে দাঁড়ালেন খাটের সামনে। শান্তা আর কিছুতে মাথা তুলতে পারে না। নিমু তখন প্রাণপনে চেপে ধরে আছে বাচ্চাটাকে নিজের কোলে আর বড় বড় চোখের কাতর দৃষ্টি সকলের মুখের ওপর ফেলে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে কুকুর বাচ্চা টাচ্চা নয় শুধু মাত্র। তার মত মানু, তাকে ও সকলে কোলে নিয়ে আদর করে মানু বলে, এও ঠিক—তাই। ভয় পাবার মত বা বাড়ী শুদ্ধ সকলের বিছানার ধারে এসে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে চেয়ে থাকবার মত কোনও ব্যাপার হয় নি।

মানু কিন্তু কাঁই কুঁই করে প্রবল প্রতিবাদ করেই চলেছে। অর্থাৎ সে বোঝাতে চায় যে সে মানু কানু কিছুই নয়, একটা নেড়ী কুত্তার বাচ্চা মাত্র। নরদামার পাঁকেই বেশ ছিল, এখানে খাট গদির ওপর নিমুর কোলে উঠে আদর খাওয়া তার ঠিক পোষাচ্ছে না।

অবশেষে মানুর মতেই সকলে মত দিলে। সুব্রত তার একটা কান ধরে এক হেঁচকায় ছিনিয়ে নিলে নিমুর কোল থেকে। নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দোতলার বারন্দায় দাঁড়িয়েই সজোরে ছুঁড়লে সেটাকে। পাঁচিল টপকে ওপাশের মাঠে গিয়ে পড়ল বাচ্চাটা। একবার মাত্র বড় করুণ একটা আওয়াজ হোল। তারপর নিস্তব্ধ।

হায় হায় করে উঠলেন মা—আহা, হা, মেরে ফেললি রে, মেরে ফেললি বাচ্চাটাকে।"

বাইরে থেকেই একটা ধমক দিলে সুব্রত—"গোল্লায় যাক্, আদ্ধেক রাতে বার বার ঘুম থেকে তোল কেন আমায়।" বলতে বলতে দুম দাম ক'রে পা ফেলে নিচে নেমে গেল।

পিসীমা বললেন—মরতে ব'য়ে গেছে ওর। কুকুর ছানা আবার মরে সহজে, তোমারও যত আদিখ্যেতা বউ। নাও এখন কি করবে কর। বিছানা মাদুর সব পাঁক মাখামাখি। ছেলে মেয়ের দিকে ত চাওয়াই যায় না, যেন সদ্য উঠে এল নরদমা থেকে।"

যামিনী বাবু হুকুম দিলেন—"এই আরতি, তোরা দু'বোনে গিয়ে জল গরম ক'রে আন। আগে ওদের দু'জনকে নাওয়ান হোক। কি জানি, কত রকমের ব্যাসিলারী আছে ঐ পাঁকে।"

আরতি বললে—"নাওয়াবার আগে লাগাতে হয় দু'জনকে বেত। পাজী চোর কোথাকার। চোরের মত লুকিয়ে আনছে নরদমার কুকুর বিছানায়।"

আরাধনা অতি সংক্ষোপ বললে—"ওদের দু'টোকেও দাদা অমনি নড়া ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেত ত আপদ যেত।"

বলে ওরা দু'বোন নিচে জল গরম করতে গেল। পিসীমা গেলেন নিজের ঘরে। যামিনী বাবু তখন এগিয়ে গেলেন বিছানার দিকে।

মা বললেন—"আহা হা, তুমি আবার ছুঁও না ওদের। দাঁড়াও আগে স্নান করিয়ে দি।"

কথাটা তিনি কানেও তুললেন না। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন—"কই, উঠে আয় তোরা। জামা খুলে দি। ও রকম ক'রে বসে আছিস কেন?"

এতক্ষণ পরে একজনের কাছ থেকে স্নেহের আহ্বান শুনে শান্তা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নিমু এবার মুখ খোলবার ফুরসত পেলে। ছোট ছোট দু'খানি হাত উলটে বললে—"বাবা, মানু, ছুঁয়ে দিলে—দাদা" বলে বাইরের বারন্দার দিকে হাত দু'খানা ছুঁড়ে দেখিয়ে দিলে। হঠাৎ কি হোল কে জানে, ছেলের বলবার ঢঙ্ দেখে বা তার অদ্ভুত গলার আওয়াজ শুনে মা আর থাকতে পারলেন না। টপ্ করে দু'হাতে সেই পাঁক মাখা ছেলেকেই বুকে তুলে নিয়ে বললেন—"না বাবা, ও কুকুর নিতে নেই। সকাল হোক, তোমায় একটা ভাল কুকুর এনে দোব।"

মার মুখের দিকে চেয়ে নিমু বললে—"নেই, মরে গেল, কানছে।" ছেলের অস্বাভাবিক চাউনির দিকে চেয়ে মার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল। ততক্ষণ শান্তাকে যামিনী বাবু বোঝাচ্ছেন যে তাঁর আফিসের বড় সাহেবের কুকুর ছ'টা বাচ্চা দিয়েছে, তার দু'টো তিনি কালই এনে

দেবেন দুই ভাই বোনকে। এই এত কুটু টুকু সাল লাল বাচ্চা, গায়ে খোবা খোবা পোম।

তারপর গরম জল এলো, সাবান এলো। বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় মশারি সব খুলে ফেলা হোল। ওদের ভাই বোনকে স্নান করান হোল। রাত প্রায় শেষ হ'য়েই গেল। শান্তা বা নিমু মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করলে। শুধু মনে হোল বোনটি যেন কান পেতে কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। ভাইটি মাঝে মাঝে ঐ এক কথাই বলছে—"মাস্ত, নেই, মরে গেল, কানছে।"

পর দিন দশটার মধ্যে বাড়ী খালি হ'য়ে গেল। যামিনীবাবু সুব্রত চলে গেলেন আফিসে, আরতি আরাধনা গেল স্কুলে। ওদের দুই ভাইবোনকে নাইয়ে খাইয়ে দিয়ে মা গেলেন কাল রাতের বিছানা মশারি কাছতে। পিসীমা তখনও তেতলার ঠাকুর ঘরে তাঁর নাড়ুগোপালের সেবায় ব্যস্ত। নিমু আর শান্তা দোতলার বারান্দায় বসে নিজেদের ছোট্ট ঘর করা নিয়ে মসগুল। তিনটে বিস্কুটের টিন বোঝাই ওদের সংসার। কি না পাওয়া যাবে তার মধ্যে। শান্তার ছেলে মেয়েদের বিছানা মাদুর মশারি—হাঁড়ি কুড়ি পুঁথির মালা জামা কাপড় আর নিমুর এক পাল জন্তু জানোয়ার। কারও হাত নেই, কারও নেই মাথাটাই, কারও বা ধড়টাই আলাদা হয়ে গেছে। তা থাক, তবু তাদের যত্ন আছে, তাদের নাওয়ানো খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো সবই যথাযথ ঠিক চলছে। হঠাৎ প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল চাল্লি টাটকা ঘাসের। কারণ এবার বুধের মেলা থেকে পিসীমা যে গরুটা এনে দিয়েছেন শান্তাকে, যার নিচে একটা ছোট্ট বাচ্চা পর্য্যন্ত ছিল, এখন অবশ্য নেই, নিমু উপড়ে নিতে গিয়ে টুকুরো টুকুরো ক'রে ফেলছে, সেই গরুটাকে টাটকা ঘাস জল দেওয়ার জরুরী প্রয়োজন বোধ ক'রে বড় বোন শান্তা ছোট ভাই নিমুকে খোশামুদি করতে লাগল—"যা না ভাই। লক্ষিটী, একবার নিচে গিয়ে কলতলার পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এক মুঠো দুব্বো নিয়ে আয়—। পিসীমার ঠাকুরের দুব্বো আনে যেখেন থেকে। ঐ যে দরজার ওধারেই রয়েছে ভালো দুব্বো। যাবি আর আসবি। ছুটে যা। আমি ততক্ষণ কুটনোটা কুটে নি।"

বলে দু'পয়লা দামের বঁটি পায়ে করে টিপে বসে রান্না ঘর থেকে সংগ্রহ করা কপির পাতা কুচোতে লাগল।

টলতে টলতে সিঁড়ির মাথা পর্য্যন্ত গিয়ে নিমু দু'হাত দু'ধারে প্রসারিত ক'রে সেই ঘরের মত ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলে—"খোল দি—এই এত ?"

শান্তা তখন ভয়ানক ব্যস্ত। ওধারে না চেয়েই বললে—"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ যে বললুম, চাল্লিখানি নিয়ে আসবি।"

তখন সিঁড়ির রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নামতে লাগল নিমু।

কুটনো কোটা হ'য়ে গেল, বাটনা বাটা হ'য়ে গেল। একটা বিস্কুটের টিন খালি ক'রে সব কটা মাটির আর কাঠের ছেলে মেয়েদের জামা কাপড় ছাড়ানো হোল তখনও না ঘাস না ঘেসেড়া। শেষে বাধ্য হ'য়ে উঠতে হোল শান্তাকে। চুপি চুপি পা টিপে টিপে নেমে গেল নিচে। কলঘর থেকে কাপড় আছড়ানোর শব্দ আসছে। উঠোন পার হ'য়ে কলতলার পাশের ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল শান্তা। কই! কোথায় নিমু? সামনের পোড়ো জায়গাটায়—শুধু দু'টো ছাগল চরছে। ও পাশের বড় বাড়ীর বারান্দায় ঠিক রোজ যেমন ঝোলে তেমনি কাপড় ঝুলছে। ডান দিকে বাড়ীর সামনের রাস্তা। তাড়াতাড়ী সেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো শান্তা। না, কোনও দিকে কেউ নেই ত। ঠিক এই সময়টা রাস্তায় থাকেও না কেউ। এধারে চেঁচিয়ে যে ডাকবে তারও উপায় নেই। মা পিসীমা জানতে পারবে যে ওরা বাড়ী থেকে বেরিয়েছে। তা হলেই চিত্তির। মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চুলগুলোকে ঘাড়ের ওপর ফেলে শান্তা এগোলো। কোথায় গেল দুষ্টু ছেলে। একবার ধরতে পারলে এমন টান টানবে চুল ধরে শান্তা যে চোখ দিয়ে জল বার করে ছাড়বে।

কয়েকটা বাড়ী পার হতেই ওদের বাড়ীর সামনের রাস্তাটুকু গেল ফুরিয়ে। এবার বড় রাস্তা, পিসীমা বলেন ঐ রাস্তা ধরে—এ ধারে ও ধারে যেধারে যাও—সেই দিল্লী বোম্বাই পৌঁছে যাবে। ও রাস্তায় পা দিলে আর রক্ষা নেই। দিদিরা অবশ্য শুধু স্কুলেই যায় ওই রাস্তা দিয়ে। আবার ফিরেও আসে। শান্তা আর একটু বড় হলে কিন্তু ফিরবে না, শুধু চলবে চলবে আর চলবে। যতক্ষণ না

পৌঁছবে গিয়ে সেই দিল্লী—দিল্লী বোম্বাই। কিন্তু সে ত হবে যখন বড় হবে, এখন গেল কোথায় ঘাস কাটতে দুষ্টুটা!

হঠাৎ পেছনে ডাক শুনতে পেলে শান্তা—"খোল দি, খোল দি।"

ঝট ক'রে পেছন ফিরে দেখতে পেলে, ঐ যে হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

ভাইকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল শান্তার। তাড়াতাড়ী এগিয়ে গেল চুলের মুঠিটা ধরবার জন্যে। ভাইও থপ থপ করে এগিয়ে আসছে। কাছা কাছি হ'তেই ভাই বলে উঠল—"খোলদি, মাত্ত, পা" বলে ঘাড় উলটে মুখ বেঁকিয়ে দেখিয়ে দিলে উলটে উলটে পড়ে যাচ্ছে মাত্ত।

বোন বুঝে ফেললে তৎক্ষণাৎ। বললে—"কোথায় রে? কই মাত্ত? পা ভেঙেছে বুঝি?"

বোনের হাত একখানি দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ভাই টানাটানি জুড়ে দিলে। ফিস ফিস ক'রে বলতে লাগল—"মাত্ত, মাত্ত, কানে।" বলে ঠোঁঠ ফুলিয়ে কাঁন্না দেখালে। নিজের একখানা পায়ে হাত দিয়ে বললে—"কত্তো, হাঁত্তে পারে না।" চোখ বড় বড় ক'রে শান্তা বললে—"পা ভেঙেছে বুঝি, তাই হাঁটতে পারে না।"

ভাই বোনের চোখের দিকে চেয়ে বললে "মাত্ত, কানে।"

বোন শুধু বললে—"চল শিগগীর, কোথায় মাত্ত, নিশ্চয়ই পা ভেঙেছে।"

বড় রাস্তার ওপরেই খানচারেক বাড়ীর পরে এসে দাঁড়ালো ভাই বোন। নিমু বললে—"ঐ, মাত্ত, এত।" ব'লে দিদির হাতে টান দিলে।

দিদি একবার দেখে নিলে এধার ওধার। না কেউ নেই, কেউ দেখছেও না। দরজাটা সামান্য খোলা রয়েছে। টুপ করে একবার দেখে এলে কি হয়! আহা, কুকুর বাচ্চাটা যদি মরে যায়। আর বেশী না ভেবে ভায়ের হাত ধরে টুপ করে ঢুকে গেল সেই আধ ভেজানো দরজার ভেতর।

ঘরটার ভেতর কেমন যেন মোটর গাড়ী মোটর গাড়ী গন্ধ। পায়ের তলায় কি যেন চটচট করে উঠল। শান্তা ভাবল, থাক গে, তার চেয়ে ভাইটাকে নিয়ে পালাই এখান থেকে। ঘরের ভেতর অন্ধকার, ভাল করে কিছু দেখাও যায় না। সে চুপিচুপি বললে—"কই রে, কই তোর মাত্ত?"

ভাই বললে—"এত" বলে হাত ধরে টানতে লাগল। শেষে ওরা গিয়ে পৌঁছল ঘরের কোণে। ততক্ষণ বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সব কিছু শান্তা। হাঁ, ঐ ত রয়েছে, মরার মত পড়ে রয়েছে বাচ্চাটা। মোটা কতক টিনের পাশে—এধারে একখানা মোটরের চাকাও দাঁড় করানো রয়েছে।

শান্তা তাড়াতাড়ি গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলে।

ঘড় ঘড় ঘটাং।

বিকট শব্দ শুনে দুই ভাই বোনই চমকে উঠে পিছন ফিরল। ফিরে দেখলে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরটা হয়ে গেল আরও অন্ধকার, শুধু দরজার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো আসছে।

নিমু চাপা গলায় ডুকরে কেঁদে দিদিকে জড়িয়ে ধরলে। দিদি ভায়ের মাথাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বললে—"চুপ, চুপ কর।" বলে সভয়ে চেয়ে রইল বন্ধ দরজাটার দিকে।

এক রাশ ভিজে বিছানার চাদর মশারি কাঁধে নিয়ে মা তেতলার ছাতে যেতে যেতে দেখলেন দোতালার বারান্দায় জিনিষপত্র ছড়ানো। ছেলে মেয়ে নেই। ভাবলেন ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয় ঘরের মধ্যে। নয়ত করছে চুপি চুপি একটা 'অনাছিষ্টি' কাণ্ড। ভিজে কাপড়গুলো ছাতে মেলে দিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখবেন ঘরের মধ্যে, এই ভেবে তিনি ওপরে চলে গেলেন।

ঠাকুর ঘর থেকে পিসীমা বললেন—"অনেকক্ষণ থেকে ওদের আওয়াজ পাচ্ছি নি যে বউ, গেল কোথায় সব?"

মা বললেন—"করছে নিশ্চয়ই একটা সর্বনাশ দু'জনে নিশ্চিন্তি হ'য়ে। যাই দেখি গিয়ে।"

নেমে এলেন দু'জনেই নিচে। ঘরে ঘরে খুঁজলেন। একতলা দোতলা তেতলা রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর কোথাও দেখতে আর বাকি রইল না।

তখন চেঁচামেচি চিৎকার। পাড়ার লোক ছুটে এল। আধ ঘণ্টার মধ্যে যামিনীবাবু এলেন। সুব্রত এল তার মিনিট পনেরো পরে। তারপর আরম্ভ হোল তুমুল ব্যাপার।

থানা থেকে রেডিও লাগানো গাড়ী ছুটল। বড় রাস্তার

ওপরে চারখানা বাড়ী পরেই থাকেন পুরন্দর বোস। পুলিশের মস্ত বড় অফিসার। পাড়ার লোক তাঁকে ফোন ক'রে দিলে আফিসে।

দু'জন অফিসার সঙ্গে নিয়ে নিজেই তিনি তাঁর গাড়ী চালিয়ে এসে পড়লেন। নানা রকম কাণ্ড করতে লাগলেন তাঁরা। মেঝের ওপর পায়ের ছাপ নিলেন। ফোটো তুললেন। পাড়া শুদ্ধ মানুষকে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। পুরন্দর বাবুর স্ত্রী পুত্র কন্যাও এসে গেলেন বাড়ী থেকে। তাঁরা শান্তা নিমুর মা পিসীমাকে শান্ত করতে লাগলেন।

কিছুতেই কিছু হোল না।

শেষে এল একটা বৃহদাকার কুকুর। পুলিশের গাড়ী চেপে এল কুকুরটা।

ওপরের বারান্দায় সেই খেলনার বাক্সর সামনে নিয়ে কুকুর ছেড়ে দিলে। সেই কুকুরটাও আবার সব কটা ঘর ঘুরলে। সব শুঁকলে, এমন কি বিছানার ওপর পর্য্যন্ত উঠে ওদের মাথার বালিশ শুঁকে এল। পিসীমার ঘরের ও আর কিছুই বাকী রাখলে না শুঁকতে। মুখ বুজে সবই সহ্য করলেন পিসীমা। তখনও ক্ষীণ আশা যদি কুকুরটা খুঁজে বার করতে পারে ছেলে মেয়ে দু'টোকে।

সারা বাড়ী ঘুরিয়ে কুকুর বেরোলো কলতলার পাশের ছোট দরজা দিয়ে। পুরন্দর বাবু যামিনী বাবু সুব্রত পিসীমা সবাই চললেন তার পিছু পিছু। শুধু মা ওপরের ঘরে মড়ার মত মেঝেয় পড়ে রইলেন উপুড় হ'য়ে।

বাড়ীর পাশের পোড়ো জমিটার গোটা কতক চক্কর দিয়ে কুকুর চলল রাস্তা ধরে। বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছে বার কতক ঘুরলে মুখ নিচু করে। তারপর চলল ডান দিকে। ততক্ষণে প্রায় শ'খানেক মানুষ চলছে কুকুরের পেছনে।

হঠাৎ থামল কুকুরটা। তারপর আরম্ভ ক'রে দিলে লম্ফ ঝম্ফ।

পুরন্দরবাবু বললেন—"আমার বাড়ীর সামনে ওরকম করছে কেন কুকুরটা।"

তাড়াতাড়ী সকলে গিয়ে পৌঁছলেন সেখেনে।

পুরন্দরবাবুর গ্যারেজের বন্ধ দরজার ওপর কুকুর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল।

পুরন্দরবাবু চিৎকার করে উঠলেন—"খোল, খোল জলদি দরজা।"

চাবি নিয়ে ছুটে এল তাঁর দরোয়ান।

চাবি খুলে দু'হাতে দু'টো কপাট সজোরে ঠেলে দিলে।

বাইরের আলো আর—দু'শো জোড়া চক্ষুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গ্যারেজের মধ্যে।

একটা হুংকার দিয়ে কুকুরটা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে।

প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল শান্তা।

অত-জোড়া চক্ষু এক সঙ্গে দেখতে পেলে একেবারে কোণে গোটাকতক পেট্রলের টিনের পাশে ভাইটিকে কোলে নিয়ে বসে আছে শান্তা। তার চোখ মুখ ফুলে উঠেছে কাঁদতে কাঁদতে। ভাইটি বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমচ্ছিল, জেগে উঠে ভ্যাবাচাখা খেয়ে চেয়ে রইল মস্ত বড় কুকুরটার দিকে।

শান্তা দু'হাতে ভাইকে আঁকড়ে ধরে আর্ত্তনাদ করছে।

পুরন্দরবাবু চিৎকার করে উঠলেন—"ধর, ধর শিগগীর কুকুরটা।"

একজন অফিসার ছুটে গিয়ে ধরলে তাকে। কিন্তু টেনে আনে কার সাধ্য। কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ওদের ভাই বোনের ওপর।

যামিনীবাবুও ভয়ে এগোতে পারেন না সামনে। পুরন্দরবাবু বললেন—"কি আশ্চর্য্য! ও রকম করছে কেন কুকুরটা? দেখ ত হে কি আছে ওদের কাছে।"

একজন অফিসার এগিয়ে গিয়ে শান্তা নিমুকে টেনে তুললেন।

তখনও বিকট হুংকার দিয়ে ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় পুলিশের কুকুরটা। দু' জন লোকে তাকে টেনে রাখতে পারছে না।

পিসীমা ছুটে গিয়ে নিমুকে ঝাপটে ধরলেন। ধরেই তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দিলেন। তখন বার হোল একটা কুকুর ছানা—নিমুর ছোট শার্টটার ভেতর থেকে।

সামান্য শব্দ হোল, বাচ্চাটা পড়ল নিমুর পায়ের কাছে।

পুরন্দরবাবু বললেন—"ঐ কুকুর বাচ্চাটার জন্যেই এই কুকুরটা অমন ক্ষেপেছে।" দু' জনের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল পুলিশের কুকুরটা। গিয়ে সেই বাচ্চাটাকে শুঁকতে লাগল।

পাশেই দাঁড়িয়ে নিমু। তখনও সে বলছে—"মাস্ত মাস্ত।"

মাস্ত কিন্তু আর নড়ল না। অনেকক্ষণ মরে গেছে সে। মরে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

মনোদর্শন

নারায়ণ চৌধুরী

'টেলীপ্যাথি' কথাটার সঙ্গে সকলেরই বোধ হয় পরিচয় আছে। এটি এমন এক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা মনের সঙ্গে মনের সহযোগ স্থাপিত হয়, অথচ তার জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপায়ের দ্বারস্থ হওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। টেলীপ্যাথির দৃষ্টান্ত হিসাবে সাধারণতঃ দূরবর্তী মানুষের মধ্যে অদৃশ্য যোগাযোগের ঘটনার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এটি বাস্তবিক এক বিস্ময়কর সংঘটন। বিজ্ঞানের প্রচলিত সূত্রগুলির মধ্যে এই সংঘটনের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানে তাকেই জ্ঞান (Knowledge) বলে স্বীকার করা হয়, যার অনুকূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ (Positive proof) উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু এটি সে জাতীয় ব্যাপার নয়। এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুপস্থিত, কিংবা তা আদপেই নেই। প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) এবং অভিজ্ঞতাবাদীরা (Empiricist) বলবেন, প্রমাণ আদপেই নেই এমন কথা মেনে নেওয়া যায় না। প্রমাণ আছে, তবে তা এখনও আমাদের চক্ষুগোচর হয় নি এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে জ্ঞানের পরিধির সম্প্রসারণের সঙ্গে এই প্রমাণ একদিন আমাদের দৃষ্টিসীমার অন্তর্গত হবেই, আর তা যখন হবে তখন টেলীপ্যাথি আর বিস্ময়কর সংঘটনরূপে পরিগণিত হবে না, আর দশটা সাধারণ বিজ্ঞানের তথ্যের মত এটিও মামুলী একটি তথ্যে পরিণত হবে। বস্তুজগতে অভিপ্রাকৃত বা অলৌকিক বলে কিছু নেই।

প্রত্যক্ষবাদীদের যুক্তিতর্কের প্রসঙ্গ থাক্। সে-সকল যুক্তিতর্কের সত্যাসত্য ও জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারি যে, টেলীপ্যাথির অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হয় নি। ধরুন আমার বন্ধু জিতেশ ডিব্রুগড়ে বাস করে। আমি কলকাতায় আছি। জিতেশের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই বললেই চলে। সাক্ষাৎ সন্দর্শন তো পরের কথা, চিঠিপত্রের যোগাযোগও নিতান্ত ক্ষীণ। একসময়ে জিতেশ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিল, কিন্তু নৈকট্য এবং যোগাযোগের অভাবহেতু, উপরন্তু আমাদের জীবিকার ঘোরতর বৈপরীত্যবশতঃ অধুনা সে ঘনিষ্ঠতা অতিশয় ম্লান হয়ে এসেছে। এমন যে এককালীন বন্ধু জিতেশ, সেই জিতেশের কথা কেন জানি না কাল বারে বারেই মনে পড়ছিল। থেকে থেকে জিতেশের সঙ্গে আমার পুরনো দিনের মেলামেশার মধুময় সব স্মৃতি মনের ভিতর জেগে উঠছিল। জিতেশের কথা হঠাৎ মনে হওয়ার কোনই কারণ ছিল না, তবু মনে হচ্ছিল। আর অবাক্ কাণ্ড, আজই কিনা সকালে জিতেশের টেলিগ্রাম পেলাম সে কলকাতা আসছে আর কলকাতা এসে আমার এখানেই উঠছে। তার মানে আমি যখন কাল সারাক্ষণ জিতেশের কথা ভাবছিলাম তখন সেও আমার কথা, আমার এখানে এসে ওঠার কথা, আমাকে 'তার' করবার কথা ভাবছিল। সে যখন সত্যি সত্যি তারের মুসাবিদা করছিল, আমি হয়তো তখন বাল্যবয়সে তার সঙ্গে আমার একই সঙ্গে স্কুলে যাওয়া-আসার প্রসন্ন স্মৃতি মনের ভিতর নেড়ে-চেড়ে দেখছিলাম। এ জিনিস কেন হয়, কেমন করে হয়, সে ব্যাখ্যা সত্যই আমাদের অজ্ঞাত।

কিংবা ধরুন আর একটি দৃষ্টান্ত। আজ সকালে ট্যালিগঞ্জের অতীনের কথা ঘন ঘন আমার মনে হয়েছিল। এত বন্ধু বান্ধব থাকতে অতীনের কথাই কেন বার বার মনে জাগছিল তার কোন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ নেই, তবু মনে জাগছিল। আমি থাকি শহরের আর-এক প্রান্তে—পাইকপাড়ায়। অতীনের সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়। কিন্তু এমনি আশ্চর্য ব্যাপার, আজ যখন আফিসে যাবার মুখে পাইকপাড়া স্ট্যাণ্ড থেকে দোতলা বাসে উঠতে যাচ্ছি পিঠের

উপর বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি চাপড় এসে পড়ল। পিছন ফিরে তাকাতে দেখি—অতীন। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। এই প্রাত-সকালে সে যে কোন্ গুরুতর রাজকার্যে টালিগঞ্জ থেকে টালায় এসেছে তা সে এবং তার অন্তর্যামীই শুধু বলতে পারেন। আমি শুধু মনে মনে ভাবছিলাম, এমন অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হয় কী করে। আজ এই মুহূর্তে অতীনের সঙ্গে আকস্মিক দেখা হয়ে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে, যখন আজই তার কথা বিশেষ করে ভাবছিলাম? আমার চিন্তার আকর্ষণেই কি তাকে এতদূর টেনে এনেছে, না কি আমাদের মধ্যে দেখা হয়ে যাওয়াটা নিতান্তই আকস্মিক সংঘটন? এ কি শুধুই কাকতালীয় যোগাযোগ, না কি এর পশ্চাতে গূঢ় কোন অভিপ্রায় কাজ করছে? কে বলতে পারে!

শুধু এ-জাতীয় দৃষ্টান্তই যে টেলীপ্যাথির অস্তিত্ব প্রমাণ করে তা-ই নয়, আমার মনে হয় খতিয়ে দেখতে গেলে, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক মাত্রই টেলীপ্যাথির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আওতার মধ্যে পড়ে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আচরণে পরস্পরের প্রতি মনোভাবে আমরা প্রতিনিয়ত এই প্রক্রিয়ার শরণ নিচ্ছি—কখনও জ্ঞাতে কখনও অজ্ঞাতে। কোন কোন মানুষকে দেখামাত্রই ভাল লেগে যায়, তার সান্নিধ্যে মন প্রসন্ন হয়, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সুখ পাওয়া যায়। কোনরূপ অস্বস্তি বা ব্যবধানচেতনা এক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ককে মলিন করতে পারে না। কেন এমন হয়? এও কি টেলীপ্যাথিরই একটি দৃষ্টান্ত নয়? তফাতের মধ্যে শুধু এই যে, পরিজ্ঞাত উদাহরণগুলিতে মানসিক যোগাযোগের ক্রিয়া চলে দূর ব্যবধানের দ্বারা বিভক্ত একজোড়া মানুষের মধ্যে; আর এখানে সংযোগ স্থাপিত হয় নিকটবর্তী দুই মানুষে। বরং শেষোক্ত ক্ষেত্রে নৈকট্য যোগাযোগ সংসাধনে বিশেষ সহায়তা করে বলে টেলীপ্যাথির ক্রিয়া এখানে আরও বেশী প্রত্যক্ষগোচর বলে মনে হয়।

টেলীপ্যাথি বলছি এ কারণে যে, প্রক্রিয়াটি আদৌ একতরফা নয়। উভয় পক্ষের উপর তার সমান প্রভাব। আমার যদি কাউকে সহসা ভাল লেগে যায়, এক দুর্নিরীক্ষ্য কারণ হেতু অবধারিত আমাকে তাঁরও ভাল লেগে যাবে। সেই বিশেষ ব্যক্তির সান্নিধ্য আমার পক্ষে যদি আনন্দের কারণ হয় তা হলে দিনের পর রাত্রির অনুগমনের মত এ কথা ধ্রুব জানবেন যে, আমার সান্নিধ্যও তাঁর পক্ষে আনন্দের হেতু হবে। আমার সঙ্গে কথা বলে তাঁর সোয়াস্তি হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমারও সমান-সোয়াস্তি।

কেন এমন হয়, কেন এমন হবে—সত্যই কি তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি? পারি না। আবার এর উল্টো উদাহরণটিও সমান সত্য। কোন কোন মানুষ আছে, যার সান্নিধ্যে এলেই মন বিরূপ হয়ে ওঠে। অবশ্য বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝি যে, কোন মানুষ সম্পর্কেই মন বিরূপ হওয়া উচিত নয়, সকল মানুষকেই সমদৃষ্টিতে দেখা কর্তব্য। জ্ঞানীরা এই সমদৃষ্টিরই অনুশীলন করে থাকেন। স্থিত-প্রজ্ঞের অন্যতম লক্ষণ সমদর্শিতা ও সম্যক্‌দর্শিতা। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বোঝা এক আর তাকে আচরণে ফুটিয়ে তোলা ভিন্ন জিনিস। বুদ্ধি দিয়ে আমরা সমদর্শিতা ও সম্যক্‌-দর্শিতার যতই মহিমা কীর্তন করি না কেন, এ কথা কোন-ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না যে, কোন কোন মানুষ কাছে এলে কোনরূপ কারণ ব্যতিরেকেই আমাদের মুখ ভার হয়, তার সঙ্গে কথা বলতে মন চায় না, কথা বলতে গেলে ব্যবহারে আড়ষ্টতা আসে, চোখে মুখে অপ্রসন্নতা ফুটে ওঠে ইত্যাদি। এটা যদি একতরফা ব্যাপার হত অর্থাৎ একের মধ্যেই যদি এই অপ্রসন্নতা সীমাবদ্ধ থাকত তা হলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু তা নয়। এই অপ্রসন্নতা অপর পক্ষকেও সমান প্রভাবিত করে। কী এক দুর্জ্ঞেয় কারণে একের প্রতিকূলতা অন্যের মধ্যে গিয়েও সঞ্চারিত হয় এবং এ ভাবে উভয়েই উভয়ের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে। এই বিমুখতা শুধু মুখচোখের ভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে না, কথায় বার্তায় আচারে আচরণেও যথেষ্ট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে যাকে পছন্দ করে না সে তাকে সূক্ষ্ম স্থূল যে-ভাবেই হোক আঘাত করতে চেষ্টা করে এবং ওই আঘাত আবার অপর পক্ষ থেকে প্রত্যাহতও হয়। এই ভাবে আঘাত-প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমেই পরস্পরের সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠতে থাকে এবং তার ফলে সমাজজীবনেও নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়। সংসারে সব চেয়ে দুরূহ

সমস্যা যদি কিছু থাকে তো তা এই মানবীয় সম্পর্কের জটিলতা। যুদ্ধ নয়, দারিদ্র্য নয়, রোগ নয়, শোক নয়, সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার হল এই মানুষে মানুষে সম্পর্কের অস্থিরতা ও কুটিলতা। বস্তুতঃ এই অস্থিরতা আর কুটিলতা থেকেই যুদ্ধ বিগ্রহ পররাজ্য আক্রমণ হানাহানি মারামারি দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রাদেশিকতা আঞ্চলিকতা প্রভৃতি নানাবিধ অবাঞ্ছিত ঘটনা কিংবা মনোবৃত্তির উদ্ভব। এক পক্ষের মনের ক্রিয়া অপর পক্ষকে দিয়ে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে বলেই সংসারে এত গণ্ডগোল।

কেন একের মনের ক্রিয়া অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা এখন পর্যন্ত রহস্যই রয়ে গেছে। আমরা গোড়াতেই বলেছি যে, আজ পর্যন্ত এই রহস্যের মর্মোদ্ধার সম্ভব হয় নি। তবে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই পণ্ডিতেরা কিছু কিছু দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। একটি মত হল এই যে, আমরা সবাই একই চিন্ময় শক্তির প্রকাশ এবং তার অংশ ও অধীন। আমাদের সকলের মধ্যে যে জীবাত্মার অধিষ্ঠান, সেই জীবাত্মা এক অখণ্ড পরমাত্মায় বিধৃত। দেহীরূপধারী আমাদের প্রত্যেকের প্রাণ এক বিশ্বব্যাপী অদৃশ্য প্রাণলীলার ছন্দে নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে। সুতরাং একের মনের ভিতর যে স্পন্দন জাগে, অবধারিত ভাবেই অপরের মনের ভিতর তার প্রতিধ্বনি গিয়ে বাজে। বিশেষ, দুটি প্রাণ যদি সমমর্মিতার সূত্রে কিংবা পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে গাঁথা থাকে তা হলে এই অদৃশ্য যোগাযোগ আরও পাকা হয়। আমাদের সকলের মধ্যে যখন একই চিন্ময় শক্তির খেলা চলছে তখন একটি মন অন্য আর একটি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে তাতে আশ্চর্য কী।

এই গেল দার্শনিক ব্যাখ্যা। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। বায়ুমণ্ডলের ভিতর অদৃশ্য ইথার-তরঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে। শব্দের মত চিন্তাও এই ঢেউ আশ্রয় করে এক আধার থেকে অন্য আধারে বাহিত হতে পারে, হয়ে থাকে। শব্দ যেমন একটা এনার্জি, চিন্তাও তেমনি এক এনার্জি। এনার্জি সর্বদাই অস্থির। সুতরাং এক মন থেকে অন্য মনে চিন্তারূপ এনার্জির সঞ্চরণ বিশেষ কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

কিন্তু দার্শনিক ব্যাখ্যাই হোক আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই হোক, এ সকল তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণ টেলীপ্যাথিকে বোঝবার পক্ষে আদৌ পর্যাপ্ত নয়। বিশেষ, নরনারীর মন-দেওয়া-নেওয়ার রহস্য ভেদ করতে গিয়ে এ জাতীয় ব্যাখ্যা একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রেম হচ্ছে টেলীপ্যাথির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। কেন যে একটি নারী বা পুরুষ পৃথিবীতে এত এত মানুষের জটলার মধ্যে বিশেষ আর একটি নারী বা পুরুষের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হয় এর কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। এই গভীর অদৃশ্য মানসিক সংযোগের দৃষ্টান্ত যদি টেলীপ্যাথি না হয় তা হলে তা যে কী তাও বোঝা যায় না।

অনেকে প্রেমকে টেলীপ্যাথির দৃষ্টান্ত বলায় আপত্তি করতে পারেন এই যুক্তিতে যে, টেলীপ্যাথিতে ইন্দ্রিয়ের সোষকতা অনুপস্থিত। আভিধানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী টেলীপ্যাথি হল সেই শ্রেণীর মানসিক সংযোগ, যা ইন্দ্রিয়ের স্বীকৃত মাধ্যমগুলির সহায়তা ব্যতিরেকে সংসাধিত হয়। পক্ষান্তরে নরনারীর ভালবাসার মধ্যে ইন্দ্রিয়গত আকর্ষণের একটা বিশেষ অংশ আছে। কোনও এক আধুনিক কবি বলেছেন, "কী দিয়ে বোঝাব প্রেম যদি দেহ রহে নিরুত্তর?" কিন্তু কবির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, এটা প্রেমের নিতান্তই আংশিক, খণ্ডিত বর্ণনা। দেহের বাইরে প্রেমের বিশাল জগৎ পড়ে রয়েছে, এবং সত্যি বলতে দেহজ আকর্ষণের যেখানে শেষ সেখান থেকেই যথার্থ প্রেমের আরম্ভ। নরনারীর ভালবাসার মধ্যে রূপজ মোহের প্রভাব প্রথমে খুব প্রবল থাকলেও ধীরে ধীরে তার বিলয় হতে থাকে এবং সত্যকার ভালবাসার ওই পথেই স্ফুরণ হয়। প্রেমের ভিতর দেহের লীলা ছ' আনা, মনের লীলা চোদ্দ আনা। প্রেম বস্তুটি স্বভাবতঃ ও মূলতঃ একটি সূক্ষ্ম, পরোক্ষ, অন্তঃসঞ্চারী প্রক্রিয়া। এর লীলা চলে দৃষ্টির অগোচরে, মনের গভীর নেপথ্যে। দুটি প্রাণ এক হয় দেহকে আশ্রয় করে যতটা তার চাইতে অনেক—অনেক গুণ বেশী অদৃশ্য মনোলীলাকে অবলম্বন করে। প্রেমের মাধ্যমে দুটি প্রাণের নিত্য পারস্পরিক মনোদর্পণ ঘটে। ইন্দ্রিয়ের দর্পণ ছাড়াও দুটি প্রেমাভিভূত চিত্ত একে অপরের মনকে স্পষ্ট দেখতে পায়।

এই যদি প্রেমের স্বরূপ হয় তো তাকে টেলীপ্যাথি বলায় বোধ হয় কারও আপত্তি থাকতে পারে না।

সাধক হরিদাস

[গল্প]

ভাস্করপদ রাহা

সাধক হরিদাস অনশনে নাম জপ করছেন। আজ তিন দিন। শুধু আহার নয়, নিদ্রাও ত্যাগ করেছেন তিনি। তা ছাড়া আজ তিনদিন তিনি মৌনী। আশ্রমের অন্যান্য সাধুরা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তাঁর কথা ভেবে। যে আশ্রমের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের সুষ্ঠু পরিচালনার দিকে ছিল তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না তিনি আজ। সুযোগ পেলেই ঠাকুর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করছেন তিনি,—একমাত্র ভোগ আরতির সময় ছাড়া সে দরজা আর খুলছেন না। বিগ্রহের পূজা অর্চনারসময় যখন তাঁর ঠাকুর ঘর থেকে বেরুতে হয়, তখন গিয়ে তিনি শয়নকক্ষে কপাট দেন। আশ্রমের সাধু এবং হরিপ্রেমিক অন্যান্য ভক্তদের মাঝে—মাঝে মাঝে আলোচনা বৈঠক বসছে,—এবং তাদের অধিকাংশেরই মত—হরিদাস এবার সিদ্ধিলাভ করবেন। বড় বাবাজী মশায় উপযুক্ত শিষ্যের হাতেই আশ্রমের ভার দিয়ে গিয়েছেন।

হরিদাসের গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম ছিল নিরঞ্জন। মায়ের একমাত্র ছেলে, বাল্যেই পিতৃহীন। বাড়ীর অবস্থা ভাল, চেহারাও ভাল, সাড়ে পাঁচ ফুটের কিছু উপর লম্বা, ফরসা গায়ের রঙ, টানা ভ্রু, সুন্দর মুখশ্রী, ঠোঁটে যেন হাসি লেগেই আছে।

নিরঞ্জনকে ভালবাসত গ্রামেরই একটি মেয়ে, নাম মাধবী। তাদের ভালবাসার কথা কেউ জানত না, জানত কেবল মাঝে মাঝে কৃষ্ণপক্ষের আকাশের চাঁদ আর রাতের ফুল কুন্দ যুথিকা শেফালি। আর ঐ চাঁদেরই জোছনার মত ছিল মেয়েটির গায়ের রঙ, আর ঐ ফুলেরই মত মন।

জোছনা রাতে চিত্রার বাঁধা ঘাটে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দু'জনা ফুলেরই মত স্বপ্ন দেখত।

কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হয় নি। জীবনে ক'জনের স্বপ্নই বা সফল হয়? একদিন অন্ধকার রাত্রে বিনা আলোয় বাইরে এসে সর্পাঘাতে নিরঞ্জনের মা প্রাণ হারালেন, নিরঞ্জন যেন শোকে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর এক দিন গ্রামে এলেন সদলবলে তুলসীদাস বাবাজী,—যাঁর নাম কীর্তনে পাষাণ গলে, জড় চেতন হয়,—চেতন চৈতন্য হারায়। নিরঞ্জনও কি যেন হারিয়ে ফেললে।

নিরঞ্জন কিছুদিন বাবাজী মশায়ের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ালে, তারপর একদিন সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে সে বাবাজী মশায়ের পায়ের শরণ নিলে। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হ'ল তার হরিদাস।

বাবাজী মশায় তাকে বেশ যাচাই করেই নিয়েছিলেন, অন্যান্য শিষ্য ভক্তদের কাছে প্রায়ই বলতেন, আমাদের নিরঞ্জন সত্যিই নিরঞ্জন,—আমাদের নিতাইচাঁদে খুঁৎ আছে ত নিরঞ্জনের খুঁৎ নেই।

দেহত্যাগের সময় বাবাজী মশায় তাই হরিদাসের উপরই আশ্রমের ভার দিয়ে গেছেন। হরিদাস তা বহনও করছেন প্রাণপণে এবং পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কর্তব্য করছেন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন।

আশ্রমবাসী গুরুভাইদের উপর যেমন ছিল তাঁর স্নেহ-যত্ন ভালবাসা, তেমনি ছিল কঠোর শাসন, খাঁটি বৈষ্ণব আদর্শে। আশ্রমের এক তরুণ গুরুভাই কিছুদিন যাবৎ বাবাজী মশায়ের এক গৃহস্থ শিষ্যার উপর যেন একটু বেশি রকমের মনোযোগ দিচ্ছিল। হরিদাসের চোখে তা এড়ায় নি, হরিদাস তাকে কিছুদিনের মত আশ্রম থেকে বের করে দিয়েছেন: পদব্রজে শত তীর্থ পরিক্রম করে তবে সে আশ্রমে ফিরে আসতে পারবে।

এ হেন হরিদাসের জীবনে হঠাৎ একদিন এক বিপর্যয় ঘটে গেল। রাত্রে সবাই ঘুমুলে হঠাৎ একদিন বাইরে এসে তিনি দেখলেন, আকাশে চাঁদ উঠেছে, আশ্রমের

বাগানে ফুটেছে বেলি, মল্লিকা, কুন্দ, রজনীগন্ধা,—পঞ্চবটের আড়ালে যেন এক আবছা নারী-মূর্তি।

কে ?

কোন উত্তর এল না।

হরিদাসের বুকটা কেঁপে উঠল। কতদিন পরে, কত বৎসর পরে আজ হঠাৎ মাধবীর কথা তাঁর এমনি করে মনে পড়ে গেল। হরিদাস আবার তাকিয়ে দেখলেন পঞ্চবটীর দিকে, কই, কেউ নেই!—কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে তখন মাধবীর মুখখানা আবছা নয় স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। ঠিক অমন করে জোছনা রাতে বাঁধা ঘাটে বকুল গাছের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে থাকত,—নিরঞ্জন জানত সে কে, তবু নিশ্চিত হবার জন্তে ঠিক একটি করে সে জিজ্ঞাসা করত,—কে ?

মাধবী কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে আসত। মুখে এই কুন্দ ফুলের মতই হাসি,—দুটি কচি ঠোঁটের মাঝ দিয়ে ঈষৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ত এই কুন্দেরই মত দশন শ্রেণী।

তাকে ত্যাগ করে এসেছেন হরিদাস। বিদায়ের দিন বড় কেঁদেছিল মাধবী, বলেছিল, তুমি যেও না, আমি তোমার সাধনায় বিঘ্ন করব না। কিন্তু হরিদাস তা শোনেন নি, তিনি এখন সন্ন্যাস নিতে বদ্ধপরিকর। হরিদাসের মনে পড়তে লাগল বৃষ্টির জলে ভেজা পদ্মের পাপড়ির মত মাধবীর অশ্রু ভারাক্রান্ত দুটি চোখ, সংযত বাসান্তরালে বেদনার্ত বক্ষের করুণ বিক্ষোভ।

মনে পড়তে লাগল—জোছনা—আরও ঘন জোছনার মত মাধবীর গায়ের রঙ, চাঁপার কর্ণের মত হাতের ক'টি আঙুল, স্থলপদ্মের পাপড়ির মত পায়ের পাতা। হরিদাস স্বপ্নাবিষ্টের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন আশ্রমের উদ্যান বাটিকার মাঝে। তারপর হঠাৎ বুকটা তাঁর কেঁপে উঠল : এ কি করছি আমি,—বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ? —প্রত্যক্ষ না হলেও মনে মনে ত ?—মাধবীর সঙ্গ কামনা করছি আমি ?—দর্শন ?

বুকের মাঝে সভয় একটা আন্দোলন সুরু হয়ে গেল তাঁর : আমি পাপ আচরণ করছি,—মানসিক পাপ। এই পাপের জন্ত আশ্রমের—এক ব্রহ্মচারীকে আমি সাময়িক নির্বাসন দিয়েছি। এই পাপের জন্ত মহাপ্রভু নিজের অতি প্রিয় গন্ধর্বকণ্ঠ ছোট হরিদাসকে বর্জন করেছিলেন! ছোট হরিদাস তবু 'রাধাগণের আধখানা'—শিখি মাইতির বোন পরম ভক্ত মাধবীর কাছ থেকে সালি ধানের চাল ভিক্ষা করে এনেছিলেন মহাপ্রভুরই সেবার জন্ত। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও—ভিক্ষাদাত্রী ভক্ত এবং প্রাচীনা হলেও—মহাপ্রভু তাকে ক্ষমা করেন নি। এক বৎসর অপেক্ষা করবার পর ছোট হরিদাস শেষে প্রয়াগে ত্রিবেণীতে বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। আর তাঁর মাধবী—প্রাচীনা নয়, কিশোরী নয়,—যুবতী,—বিকসিত কুসুমের মত পূর্ণাঙ্গী, তাঁর যৌবনের প্রণয় পাত্রী।

মহা অপরাধ করেছেন তিনি, মহা অপরাধ।

কম্পিত বক্ষে—নিজের মন থেকে মাধবীর চিন্তা অপসারিত করে রাধাগোবিন্দের দিব্য সুন্দর মূর্তিতে মনোনিবেশ করতে—চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু পারলেন না, ধীরে ধীরে মাধবীর বিদায়কাতর মুখখানাই ভেসে আসতে লাগল—চোখের সামনে। মিনতি ভরা অশ্রুসিক্ত দুটি চোখ, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর : তুমি যেও না, আমি তোমার সাধনায় বিঘ্ন কোনদিন—করব না।

পুষ্পগন্ধী জোছনার এলোকা থেকে অন্ধকার ঘরে এসে মাধবীর চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাবেন মনে করে হরিদাস তাঁর ঘরে এলেন। জানলা দিয়ে জোছনা আসছিল বলে জানলা বন্ধ করে দিলেন, তারপর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ধ্যান করতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তবুও মাধবীর কাতর মুখখানা—তাঁকে পুরোপুরি রেহাই দিল না।

এর পরের রাত্রিটুকু—ভাল ঘুম হ'ল না হরিদাসের। চোখে মুখে ক্লান্তি, আর অন্তরে গ্লানি। মাধবীর চিন্তা মন থেকে সমূলে উৎপাটন, এবং সম্পূর্ণ আত্ম-শুদ্ধির জন্ত হরিদাস সঙ্কল্প করলেন, অনাহারে তিনি নাম জপ করে যাবেন, শুধু দু'চার লক্ষ নয়, বহু বহু লক্ষ—যে পর্যন্ত না মনের-পূর্ব-শান্তি ফিরে আসে।

অতি প্রত্যূষে স্নান করে এসে তিনি মন্দিরে গিয়ে জপে বসলেন। আশ্রমের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ফিরে গেলেন, আহারের আহ্বানে

তিনি সাড়া দিলেন না, একবার ফিরে তাকালেন না পর্যন্ত।

সেই থেকে অনাহারে অনিদ্রায় নাম জপ চলেছে হরিদাসের আজ তিনদিন। দীর্ঘকাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করায় মনের চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়ে সেখানে এক আশ্চর্য স্বপ্নাতুর ভাব দেখা দিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এইবার তিনি বুঝি মূর্ছিত হয়ে পড়বেন। তা পড়ুন, তাঁর অপরাধের ক্ষমার জন্য দৈববাণীর মত কোন কিছু না শোনা পর্যন্ত, মনের গ্লানি সম্পূর্ণ দূর না হওয়া পর্যন্ত তিনি নাম চালিয়ে যাবেন। তাতে মৃত্যু আসে ত সে-ও স্বীকার। গুরুদেব তাঁকে উপযুক্ত আধার মনে করে যে বিশ্বাস করে দিয়েছেন তার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করবেন তিনি—এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

তৃতীয় দিনের দিবাভাগ কেটে গেল, সন্ধ্যা এল। সন্ধ্যা পূজা আরতির সুযোগ দিতে তিনি মন্দির ত্যাগ করে নিজের ঘরে এসে কপাট দিলেন,—তারপর সন্ধ্যারাত্রির পর আবার মন্দিরে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করলেন। ঠাকুরের কাছ থেকে একটা উত্তর তাঁকে পেতেই হবে, এমনি করে অনশনে নাম করতে করতে তিনি দেহত্যাগ করবেন।

হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে আকুল প্রার্থনা জাগছিল একটা,—কিন্তু সে প্রার্থনা ভাষা দিয়ে স্পষ্ট করে ঠাকুরের কাছে জানাবার মত শক্তি নেই আর। না থাক—দরকার নেই, ঠাকুর ত অন্তর্যামী,—ভাবলেন হরিদাস। চালাতে থাকলেন তিনি নাম জপ—একদৃষ্টে ঘৃতদীপ-উদ্ভাসিত রাধা গোবিন্দজীর মূর্তির দিকে চেয়ে।

ঐ কঠিন পাথরে গড়া নিশ্চল মূর্তি কখন জীবন্ত হয়ে কোমল হয়ে ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে তাঁর দিকে চাইবে,—হয়ত বা শুনতে পাবেন হরিদাস বংশীরবের চেয়েও মধুর তাঁর শ্রীমুখের বাণী, রাধারাণী মৃদু হেসে—তা অনুমোদন করবেন, তারই প্রত্যাশায় হরিদাস দেহ মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে আরও দ্রুত গতিতে নিরবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ নামের প্রবাহ ছুটালেন।

আশ্রমের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা রাত্রির জলযোগের পর যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, শৃগালকুল রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণা করে আবার নীরব হয়ে গেছে। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। ঘৃতদীপের স্তিমিত আলোকে রাধা গোবিন্দজীর দিকে দৃষ্টি রেখে হরিদাস গুরুদত্ত নাম জপ করেই চলেছেন।

হঠাৎ মনে হ'ল গোবিন্দজীর মূর্তি একটু নড়ল, ঘৃতদীপ একটু কাঁপল। নাসারন্ধ্রে একটা দিব্য মধুর গন্ধ ভেসে আসছে। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল হরিদাসের সমস্ত দেহ: এ কি গোবিন্দজীর অঙ্গসুরভি? গোবিন্দজী কি এতদিনে কৃপা করলেন, কৃপা করলেন রাধারাণী?—আজ কি পাষাণে আবির্ভূত হলেন—তাঁর ইষ্ট দেবতা?

গোবিন্দজীর পদমূল থেকে কি যেন সব উড়ছে। নিবেদিত পুষ্পের দল? কিন্তু এত একটি দুটি নয়, অসংখ্য। উড়ছে, কেবলি উড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। সমস্ত ঘর যে ফুলের পাঁপড়িতে ছেয়ে গেল। ভরে গেল স্বর্গীয় সুবাসে!···অতি—অতি দূর থেকে যেন একটু মধুর দিব্য সঙ্গীত ভেসে আসছে। এই কি কৃষ্ণের বংশীরব? বাঁশীর সুর ক্রমেই যেন নিকটে আসছে, হৃদয়ের সকল গ্রন্থি শিথিল করা সুর, চুম্বকের মত টেনে নেওয়ার সুর।

অগণিত পুষ্পদল বাষ্প হয়ে গিয়ে যেন একটা মেঘের সৃষ্টি করল, ঘন মেঘ, শরৎকালের—পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ। একটা স্নিগ্ধ মৃদু হাওয়ায় সে মেঘও ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল। হরিদাস বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন—সম্মুখে অসংখ্য কুঞ্জবন, আশে পাশে কত পুষ্প শোভিত তরুবল্লরী। গাছের ডালে ময়ূর। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মধ্যে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। কুয়াশা আরও একটু কেটে যেতে দেখা গেল—সেই প্রান্তরে অসংখ্য নারী-মূর্তি হাত ধরাধরি করে নাচছে। সবাই সুন্দরী, যুবতী, নৃত্যকুশলা, যৌবন মদে মত্তা কুরঙ্গীর মত চপলনয়না। সেই চপল নয়নে কটাক্ষ হেনে নৃত্যের মাঝেই তারা—সেই নৃত্যবৃত্তের মধ্যমণি এক অপরূপ সুন্দর তরুণের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করছে। তরুণের মুখে একই সঙ্গে হাসি ও বাঁশী। চরণ দুটি নৃত্য চঞ্চল, নয়নে প্রেমময়ির চাহনি। হরিদাস বুঝলেন—ইনিই হচ্ছেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। মনে পড়ল—

তত্রাতি শুশুভে তাভি
গর্ভধান দেবকী সুতঃ
মধ্যে মণীনাং হেমানাং
মহা মারকতো যথা।

কুয়াশা এবার সম্পূর্ণ কেটে গেল, উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশের চাঁদ, স্বর্গ থেকে যেন স্নিগ্ধ আলোকের সুধা বর্ষিত হতে থাকল, বেড়ে উঠতে লাগল তেমনি নৃত্যের বেগ। নয়নানন্দকে সামনে পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠল যেন গোপীদের তনু মন প্রাণ।

হঠাৎ অসামান্য রূপসী এক তরুণী বৃত্ত ছেড়ে বিদ্যুৎ গতিতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন, হরিদাস সবিস্ময়ে দেখলেন কৃষ্ণ তখনও নেচে চলেছেন—সেই বৃত্তের মধ্যমণি হয়ে। গোপীদের মাঝে তখনও নৃত্যের উন্মাদনা।

হঠাৎ আর এক সুনয়না ঝড়ের বেগে গিয়ে কৃষ্ণের হাত ধরে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। নৃত্য তবুও চলতে লাগল,—মধ্যে নটবর শ্রীকৃষ্ণ।

উপর থেকে তীব্র সুরার মত সুধা বর্ষিত হচ্ছে,—আর তাই পান করে গোপিকাগণ যেন মত্ত হয়ে নৃত্য করে চলেছেন আর একে একে কৃষ্ণকে নিয়ে কোথায় আত্মগোপন করছেন,—কৃষ্ণ তবুও নৃত্যবৃত্তের মধ্যমণি হয়ে নৃত্য করে চলেছেন।

সর্বশেষ গোপী কৃষ্ণকে নিয়ে চলে আসার পর হরিদাসের দৃষ্টি পড়ল অগণিত কুঞ্জবনের মাঝে। প্রতি কুঞ্জে সদ্য রচিত পুষ্প শয্যা, পেঁজা তুলোর মত শুভ্র পুষ্পদল দিয়ে তৈরী পুরু বিছানা,—ঐ শ্বেত পুষ্পেরই উপাধান। সেই উপাধানে মাথা রেখে শায়িতা সব এক এক গোপিকা, বক্ষে তাদের মদন মোহন শ্রীকৃষ্ণ। প্রত্যেক গোপিকা—প্রেম মদির দৃষ্টিতে চেয়ে কৃষ্ণকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলেছে, তাদের নবনীত কোমল দেহের মাঝে কৃষ্ণের দেহ যেন ডুবে হারিয়ে আছে। প্রত্যেক গোপীর চোখে অশ্রু-বিন্দু, গাত্রে স্বেদ, বিবর্ণ দেহবর্ণ, সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ, ভাবাবেগে থর থর করে কাঁপছে সবাই। মনে হচ্ছে আনন্দের আতিশয্যে এখনই বুঝি মূর্ছিত হয়ে পড়বে ওরা।

হরিদাসের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠেছে,—চোখে জল। বাবাজী মহাশয়ের কীর্তন শুনে মাঝে মাঝে তাঁর দেহের মাঝে যে এক দিব্য অনাস্বাদিতপূর্ব সাত্ত্বিক আনন্দানুভূতি জাগত তাই যেন বহুগুণে বর্ধিত হয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ অবশ করে দিচ্ছে। আনন্দটা মনের সঙ্গে দৈহিক বলেও এর স্বরূপ কামধর্মের বিপরীত। মনে পড়ল কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি—

সহজে গোপীর প্রেম নহে ত প্রাকৃত কাম,
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম।

সহসা মৃদু বীণাঝঙ্কার কানে এল যেন হরিদাসের। হালকা মেঘের অন্তরালে এক দিব্য সুন্দর ঋষি মূর্তি। পিঙ্গল তার মাথার জটা, বালসূর্যের মত দীপ্ত অথচ স্নিগ্ধ তার দেহজ্যোতি, নয়নে অপূর্ব দীপ্তি; ঋষি বীণা বাজিয়ে কুঞ্জের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে কি গান গেয়ে চলেছেন। এমন অপূর্ব সঙ্গীতও হরিদাস জীবনে শোনেন নি। ভাবের আবেগে ঋষির মাথার জটা মাঝে মাঝে খাড়া হয়ে উঠছে,—দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন আনন্দের প্রস্রবণ।

হরিদাসের মনে পড়ল—ভাগবত পুরাণে বর্ণিত নারদের রূপের সঙ্গে ঋষির চেহারা অবিকল মিলে যাচ্ছে। তা হলে ইনিও কৃষ্ণলীলা দেখতে এসেছেন!

এদিকে হরিদাসের—সারা পিঠটা কে যেন অতি সুকোমল দেহ দিয়ে গভীর অনুরাগে জড়িয়ে ধরেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখেই চমকে উঠলো হরিদাস: এ কি তুমি?—মাধবী?

মাধবীর চোখে জল,—সর্বাঙ্গে পূর্ণতা চিহ্ন। মাধবী হরিদাসকে—আর কোন কথা বলতে সুযোগ না দিয়ে বহু মিনতি করে বললেন, আর তুমি আমায় সরিয়ে দিও না। দেখছ ত—যেমনি করে গোপবালারা—কৃষ্ণকে পেয়েছেন অমনি করে তুমি আমায় পেতে দাও, তোমার সাধনার বিঘ্ন আমি কোনদিন—করব না। যাকে তোমরা দহন করতে চাও,—দগ্ধ হয়েও আবার সে প্রাণ পেয়ে সজীব হয়ে ওঠে, তোমাদের এ পথ নয়—তোমাদের ঠাকুর মদনমোহন, প্রেম মদনমোহন। তুমি আমার প্রেমবুভুক্ষু হৃদয়ে তোমাদের ঠাকুরের মত ডুবে যাও, অমৃতের সাগরে স্নান করাব তোমায় আমি, তুমি এস—

এই বলে সম্মুখে এসে দুই বাহু প্রসারিত করে মাধবী—আলিঙ্গন করতে গেল—হরিদাসকে, হরিদাস দুই চোখ মুদ্রিত করলেন। পর মুহূর্তে অমৃতসাগরে ডুবে গেল হরিদাসের দেহ,—জীবনের যত আলা যেন এক নিমিষে

ধুয়ে মুছে গেল। কতকাল পরে আজ মাধবীর দেখা পেয়েছেন তিনি, তাকে একবার ভাল করে দেখবার—জন্ত চোখ মেললেন হরিদাস। মাধবী কাঁদছে, হরিদাসেরও চোখে জল এসে গেল। 'হুঁহু কোরে হুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

কতক্ষণ এ ভাবে কেটেছে হরিদাসের হুঁস নেই। হঠাৎ খোল করতালের সঙ্গে নাম সংকীর্তনের শব্দ কানে যেতে তাকালেন তিনি সেই দিকে। বুকটা কেঁপে উঠল একটু। দেখতে পেলেন না কাউকে,—কিন্তু শুনতে পেলেন। শুনতে পেলেন—। বিলীয়মান সঙ্গীত ধ্বনির মাঝে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে সদ্গুণ তিরস্কার করে তাঁরই উদ্দেশ্যে বলছেন—

বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ;
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।

এ গুরুদেব, না মহাপ্রভুর কণ্ঠস্বর ঠিক বুঝে উঠলেন না হরিদাস, বুঝবার অবসরও পেলেন না, নিজের বর্তমান অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি জানিয়ে প্রতিবাদ করবারও নয়।

কণ্ঠলগ্না মাধবীও আর নেই, কুঞ্জে কুঞ্জে সহগোপী গোপীগণও আর নেই। কানে আসছে শুধু বজ্রাঘাতের মত কার সদ্গুণ তিরস্কার—

বৈরাগী হইয়া করে···

হরিদাসের সর্বাঙ্গে কে যেন তুষের আগুন জ্বালিয়ে দিল, —বুকের মাঝে কেমন করে উঠল,—সঙ্গে সঙ্গে, মাথাটা একটু নড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে আশ্রমের সন্ন্যাসীরা মন্দিরদ্বারে বার বার করাঘাত করেও সাড়া না পেয়ে অবশেষে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলেন।

হরিদাসের দেহটা বড় বাবাজী মহাশয়ের সমাধির পাশেই সমাহিত করা হ'ল। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য; কিন্তু পাশে থেকে গুরুদেব তাকে অবিরত তিরস্কার করছেন, না আশীর্বাদ, বিদেহ হরিদাস—এখনও হয়ত তা ঠিক বুঝে উঠছেন না।

প্রোটোটাইপ

[গল্প]

শ্রীমতী বাণী রায়।

প্রখ্যাত সুন্দরী তমাল। রূপের গর্বে আজও অনূঢ়া রয়ে গেছে। যৌবনের সূর্য পশ্চিমে অস্তগামী হ'লেও ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

মাতৃহীনা তমাল ঠাকুরমায়ের আদরে বর্ধিত হয়েছিল।

ঠাকুরমায়ের অনুনয়—মিনতি আজ তাকে স্পর্শ করে না।

ঠাকুরমা ভাতের থালার সামনে বসেন, "আর দেরী করিসনে, দিদি। চিরকাল কি আমি বেঁচে থাকব? তোকে দেখবে কে? মৈত্র-ছেলেটির এখনও বিয়ে হয়নি। খবর পাঠাই?"

"রেখে দাও।" তমাল মাছের কাঁটা বাছতে মন দিল। একটু চুপ করে থেকে ঠাকুরমা বল্লেন, "না হয় নিজে দেখে বিয়ে কর্ ভাই। আমরা কেবল দেখেই সুখী, আর নয়।"

"আমি বিয়ে করব না।" তমাল উঠে দাঁড়াল। কলেজে সে পড়ায়। প্রথম ঘণ্টায় ক্লাস আছে।

"দিদি, মেঘে-মেঘে বেলা হয়ে গেছে যে। এর পরে পস্তাবি।"

ঠাকুরমায়ের মুখে হাসির তীর ছুঁড়ে অদৃশ্য হল তমাল।

চমৎকার দিন কাটে তমালের। পড়াশোনার আবহাওয়া চিরকাল ভাল লাগত। পড়তে এবং পড়াতে সময় ফুরিয়ে যায়। নিত্য কলেজ, ছুটীর দিনে খাতা দেখা, ছোট খাটো সভা-সমিতি, দুই-একটা পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা, রেডিও-বক্তৃতা; যেমন করে অধ্যাপকদের দিন কাটে, তেমনি নির্বিবাদে দিন কেটে যেত তার। অবকাশ ভরিয়ে রাখত বন্ধুরা, ছাত্রীরা। আত্মীয়দের তাগিদাও মেটাতে হ'ত। বাবা-দাদা রোজগেরে। তমালের চিন্তা ছিল না।

আর একটু সময় কাটত প্রসাধনে। সুন্দরী সে। রূপকে রক্ষা করা, বৃদ্ধি করা ঈপ্সিত ছিল তমালের। শোবার পূর্বে চুলে ব্রাশ, মুখে ক্রীম যথাযথ পরত। একটিও ব্রণ দেখা দিলে ঔষধ আসত। শতকাজের মধ্যেও শীতকালে গোলাপজল-সংযুক্ত গ্লিসিরিণ্ মর্দনের সময় সে হাতে রাখত। সুন্দর মুখখানি বাঁচাবার জন্য রোদে বেরুনী ছাতা সে ভুলত না।

নিজেকে নিয়ে, কাজ নিয়ে ব্যস্ত তমালের আত্মদর্শনের সময় ছিল না। একদা ঠাকুরমা গত হ'লেন। কিছুদিন হা-হুতাশ করে তমাল শান্ত হ'ল। বৌদি বাড়ীর কর্ত্রী। মেনে নিল তমাল। আবার দিনগুলো কেটে যেতে লাগল, আরও নিরুপদ্রব। কারণ ঠাকুরমা রইলেন না অনুনয়ের জন্য। চিরকুমারী নাম ডেকে বা'র হ'ল তার। তমাল হাসত। আয়নায় নিজের রূপ দেখত। এই রূপের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য পুরুষ কোথায়? যোগ্য না পাওয়া গেলে অযোগ্যকে মাল্যদান করবে না তমাল। যুঁইফুলের গোড়ে, বেলীর পাঁচনহর, রজনীগন্ধার একহারা হার বাজারে উঠুক, ঝরুক, শুকিয়ে যাক। তমাল দিন কাটাতে জানে।

সেদিন সন্ধ্যা। কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় থেকে বইএর প্যাকেট হাতে উঠছে তমাল। বই কেনা শেষ করে ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছে। তা হোক, আর তো ঠাকুরমা নেই যে দেরী দেখে ব্যস্ত হ'বেন। বাবা রেডিও-জগতে। দাদা কাগজপাঠে তন্ময়। বৌদি গ্রাহ্য করে না ননদ ফিরল কি না।

ঠাকুরমায়ের উদ্দেশে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। মনোগত বিষাদ দমন করে চলন্ত বাস থামিয়ে উঠে পড়ল তমাল। জায়গার অত্যন্ত অভাব। কোনমতে লম্বা লেডিস্-সিটের একপাশে বইএর প্যাকেট সামলে বসে পড়ল তমাল। পাশে বসেছে বাচ্চা খুকু একটি, অতি গম্ভীর-ভাবে। তার অভিভাবক এক যুবক শিক ধরে ঝুলছে।

মেয়েটির দিকে কিছুক্ষণ চাইবার পরে তমালের মনে

হ'ল মুখখানা বড় চেনা-চেনা। এমন মুখ সে বহুবার দেখেছে। আত্ম সংহত লেডির মত পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েটি বসে আছে। কৌতুকজনক দৃশ্য।

তমাল সহযাত্রিনীকে ভদ্রতা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

"বাড়ী।" খুকু উত্তর দিল তৎক্ষণাৎ। পরক্ষণেই প্রশ্ন করল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

"আমিও তোমার মত বাড়ী যাচ্ছি।" তমাল হাসিমুখে খুকুর দিকে চেয়ে রইল। গোলাপী সিল্কের ফ্রক, নীলের পাইপিন, এম্ব্রিং দেওয়া। কি আশ্চর্য! গোলাপী সিল্ক তো তমালও পরেছে আজ, গায়ে তমাল নীল জামা দিয়েছে।

বিস্মিত তমালের সম্মুখে নড়ে-চড়ে বসল খুকু, একটি পা দেখা গেল। লাল টুক্‌টুকে বাটার স্যাণ্ডাল-শু। হুবহু তমালের পায়ের জুতো। তাজ্জব বনে' গেল তমাল। জীবনে এমন ম্যাচ-মেলানো দেখেনি সে।

খুকু আবার প্রশ্ন করল, "কার সঙ্গে যাচ্ছ ?"

তমাল উত্তর দিল, "একা যাচ্ছি। আমি যে বড়।"

খুকু নিশ্চিন্ত হ'লনা। ধীর-গম্ভীর দৃষ্টি মেলে ভাল করে তমালের আপাদমস্তক দেখে শুনে আবার জিজ্ঞাসা করল, "ভয় করে না ?"

"কিসের ভয় ?"

"ভূত ধরে নেবে না ?"

কৌতুক বোধ করল তমাল। কিন্তু অধ্যাপকমন তার বলে উঠল, বাচ্চার মনে ভূতের ভয় থাকা উচিত নয়। অল্প সময় হোক, যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাক। অতএব সতর্কভাবে তমাল শিক্ষা দেবার চেষ্টা করল, "ভূত নেই।"

খুকু মাথা দুলিয়ে জোর নিয়ে বলল, "হুঁ, আছে।"

"না, নেই।"

খুকু স্থিরভাবে বলল, "আছে। তুমি জান না।"

প্রায় তমালের মত আত্মপ্রত্যয়। নিজের ধারণা অকাট্য। স্বভাবেও উভয়ের মিল দেখা যাচ্ছে, শুধু বেশভূষায় নয়। হয়তো তমালের কোন বান্ধবীর কন্যা, কে জানে ? তাই পছন্দ তমালের মুখের, তাই চেহারা চেনা লাগছে। পারিবারিক খবর নিতে উৎসুক হ'ল তমাল।

"তোমার নাম কি"

সহাস্যে উত্তর দিল খুকু, "খুকু।"

"চমৎকার। তুমি থাক কোথায় ?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে খুকু পাল্টা প্রশ্ন পাঠাল, "তুমি থাক কোথায় ?"

তমাল উৎসাহ ভরে বলল, "এখান থেকে অনেক দূরে। লেকের ধারে। লেক মানে জান খুকু ? হ্রদ।" খুকুর মুখভাবে বিপন্ন অজ্ঞতা দেখে তমাল বুঝল ও গম্ভীর লেডি হ'লেও বয়সে অতি শিশু। তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দিল তমাল, "নদী মত, আর কি।"

এবারে খুকু প্রশ্ন করল, "কুমীর আছে ?"

বোঝা গেল খুকুর মন আদিম ভীতিজনক বস্তুতে পরিপূর্ণ। অবচেতনের গহনে বাস করছে হয়তো অসতর্ক ক্ষণের ভয় দেখানোর উপাদান।

"কুমীর নেই"—তমাল সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখল রুচি-মুখটি। কত চেনা লাগছে খুকুকে। চাপা সেরি কপাল, তিনকোণা মুখে চিবুকে টোল, কোঁকড়া চুল, টানা চোখ, একটু ছোট নাক—কতবার দেখেছে তমাল। কোথায় ?

মনে পড়ে গেল—দেখেছে অনেকবার, আয়নায়। নিজের মুখ আয়নায় বহুবার দেখেছে। নিজের মুখই বসানো দেখছে তমাল ছোট মেয়েটির মুখে ছোট করে। তমাল নিজেকেই দেখছে, দেখছে নিজের একটা ছোট সংস্করণ।

খুকুর সঙ্গী ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। অণ্ডবাবুর বাজারের কাছে খুকু নামবে।

একটি কথা, শেষ কথা বলবার চেষ্টায় প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে তমাল জিজ্ঞাসা করল, "খুকু তোমার মায়ের নাম কি ?"

"আমার মায়ের নাম—তমাল-লতা।" খুকু নেমে গেল।

অতটুকু মেয়ে তো পরিহাস জানে না। এ পরিহাস স্বয়ং বিধাতার।—

যে রত্ন গলায় ধারণ করে কৃতার্থ হ'তে পারত তমাল, বিগত বৎসরগুলো তাকেই পথের ধূলায় ফেলে এসেছে। এই পথচলায় লাভ কি, যে পথে শুধু ধূলো ?

রূপগর্বিতা হার মানল শিশুর কাছে। সে বলে গেল, তোমার তো সবদিকেই হার হয়েছে। যে রূপ আপনাকে আবার সৃষ্টি করতে পারে না, সে রূপ ব্যর্থ। আমার দিকে চেয়ে দেখ তোমার সৃষ্টির রূপ কেমন হ'তে পারত।

যে মানস-কন্যাকে পৃথিবীতে রূপ দেয়নি তমাল, তারই উদ্দেশে সঞ্চিত জীবনের অশ্রু আপনি ঝরে পড়ল।

নতুন তারা

[গল্প]

সুশীল রায়

অলকাপুরী ষ্টুডিয়োর আজ বুঝি মহোৎসব। নানা-রঙের কাগজের শিকল দিয়ে সাজানো হয়েছে গেট। নানারঙের আলোর মালা পরানো হয়েছে ষ্টুডিয়ো ঘরের দরজায়। ষ্টীমারের সার্চলাইটের মত তীব্র তেজের দুটি প্রকাণ্ড আলো বসানো হয়েছে ফটকের দুই স্তম্ভের মাথায়। বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে শুভ্র আলোর বন্যা।

নূতন দেশে এসে পৌঁছেছে নয়নতারা।

ডিরেক্টর হেরম্ব পুরকায়স্থের ব্যস্ততার শেষ নেই। পায়ে ভারী ক্রেপসোলের জুতো, পরনে সবুজ সার্জের ট্রাউজার, গায়ে সিল্কের হাফশার্ট, চোখে কালো চশমা—হেরম্ব পুরকায়স্থ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে একবার ষ্টুডিয়োর মধ্যে ছুটোছুটি করছে, একবার বেরিয়ে আসছে বাইরে।

সকলের মুখেই এক নাম।—হেরম্ব, হেরম্ববাবু, মিষ্টার ডিরেক্টর।

নয়নতারা বসে বসে দেখছে চারিদিক, আর শুনছে চারিদিকের শব্দ। মন্দ লাগছে না নেহাত, কিন্তু সামান্য একটু চাপা জড়তা সে বোধ করছে ভিতরে ভিতরে। কেবল নতুন দেশই নয় এটা, একেবারে নতুন পরিবেশ।

পিচবোর্ড রং করে ঘরের দেয়াল তৈরি করা, সেই দেয়ালের জানালার ওপারে সিন টাঙানো। এখন দেখে অবশ্য মেকি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ছবিতে নিশ্চয় আসল পাকা দেয়াল বলেই বোধ হবে এবং ওই সিনে আঁকা ঘরবাড়িগুলি বহু দূরের একটা লোকালয় বলেই মনে করবে দর্শকেরা।

নিজের কথাও ভাবছিল নয়নতারা। তার চেহারাতে কিংবা তার অভিনয়ে যদি এমনি ফাঁকি আর মেকি কিছু থেকে থাকে তাহলে চার চাকায় চলন্ত ওই তেজি ক্যামেরা আর দু পায়ে চলন্ত ওই উৎসাহী ডিরেক্টর নিশ্চয়ই তা সেরে নেবে।

ষ্টুডিয়োর মধ্যে আজ অনেক মানুষ আর অনেক মেয়ে। মেয়েরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে বসে আছে। কোনো ভাগ অন্য ভাগের সঙ্গে কথা বলছে না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে টুকিটাকি দু চারটে কথা সেরে নিচ্ছে। নয়ন-তারাদের ভাগে বসেছে ভদ্রঘরের মেয়েরা, আর, ও পাশের ভাগে অন্য মেয়েরা। দল ভারী অবশ্য ওপাশেরই।

ভদ্রঘরের মেয়েই শুধু না, নয়নতারা ভদ্রঘরের বউও। তার নিজের কাছে কদর তাই একটু আলাদা। ষ্টুডিয়োর কাজে উৎসাহ তার খুবই আছে, কিন্তু ও-পাশে তাকালেই মনটা কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে ওঠে। এখন না হয় ভাগ ভাগ হয়ে বসে আছে, কিন্তু অভিনয়ের সময় এরকম ভাগাভাগি তো আর চলবে না, তখন সব মাখামাখি হয়ে যাবে।

ও পাশের ভাগের মধ্যমণি হচ্ছে মনকা—এর ছবি অনেক দেখেছে নয়নতারা। উঠে গিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ওভাবে নিজেকে খেলো করতে সে চায় না। তাই নিজের জায়গায় বসে রইল চুপচাপ। এ পাশের ভাগের মধ্যমণি হচ্ছে ত্রিনয়নী, কিন্তু এখনো সে এসে পৌঁছয়নি বলে সেই জায়গা দখল করে বসে আছে নয়নতারা।

ষ্টুডিয়োরও সকলের বিশ্বাস, হেরম্ব পুরকায়স্থেরও, ত্রিনয়নীর জায়গা দখল করবে ওই বইটাই—ওই নয়নতারা।—ওই নতুন তারা।

অলকাপুরীর আকাশে আজ যেন দেখা দিয়েছে সত্যিই একটি নতুন তারা। ষ্টুডিয়ো মহলে তাই আজ এত উৎসাহ এবং এত উদ্দীপনা।

কিন্তু কাগজের মালা আর রঙিন আলোর মেখলা

রেখেছিল সে তার দিদি সম্বন্ধে। চাঁদা সোনা অহরতে বুঝি আগাগোড়া মোড়া তার, শাড়ির আর সাজের ঘটা নিয়েই বুঝি চলাফেরা করে তার দিদি, কিন্তু এ কী! তার দিদি এলো সাধারণ একটা তাঁতের শাড়ি প'রে অতি সামান্য বেশে।

ছোট বোনকে অনেকদিন পরে দেখে চমকে উঠল ত্রিনয়নী, বলল, "তুই বদলে গেছিস। বড় বাবু হয়ে গেছিস, নয়ন। তোর বর কই?"

ঠিক পিছনে এসেই দাঁড়িয়েছিল বৈদ্যনাথ। নয়নতারা ত্রিনয়নীর ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বলল "ওই—যে।"

ঘুরে দাঁড়াল ত্রিনয়নী, হাত তুলে নমস্কার করতে করতে বলল, "নাম শুনেছি আপনার, আজ প্রথম দেখা হল।"

বৈদ্যনাথ প্রতিনমস্কার করল। বলতে পারল না যে, সেও নাম শুনেছে তাঁর, কিন্তু দেখা হল আজ প্রথম। বলতে পারল না, তার কারণ সে হতভম্ব হয়ে গেছে। নায়িকা পার্বতী আসছেন মানেই ধাঁকে জমকে যেন একজন সম্রাজ্ঞী আসছেন, এই রকম আন্দাজ ক'রে রেখেছিল বৈদ্যনাথও। অথচ তাদের সে ধারণা একেবারে ওলট-পালট করে দিল এই নায়িকা।

ত্রিনয়নী ডাকল, "এস ভাই মানকা। আলাপ করিয়ে দিই।"

মনকা উঠে এসে দাঁড়াল কাছে। ত্রিনয়নী নয়নতারাকে বলল, "ইনি শ্রীমতী ত্রাক্ষা দেবী। আমাদের ষ্টুডিয়োর প্রাণ। আর মনকা, এ আমার বোন নয়নতারা, আর, ইনি আমার ভরিপতি শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—খুব জ্ঞানী আর পণ্ডিত লোক।"

মনকা নমস্কার করল।

একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল ত্রিনয়নী। নায়ক দেবকুমার, ডিরেক্টর পুরকায়স্থ, শব্দযন্ত্রী অমর ব্যানার্জি, ক্যামেরাম্যান প্রদ্যুম্ন—একে একে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল ওদের।

এ পাশে আর ওপাশে দু ভাগে ভাগ হয়ে বসেছিল ছবি হল, এবার সে ভাগ গেল ভেঙে। সব কেমন একাকার হয়ে গেল। ষ্টুডিয়োতে জমে উঠল যেন একটা জনতা। একটা চাপা কলরবও যেন আরম্ভ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ হরলাল জোয়ারদার বুঝি এ-সব মাতে-পাঁচে নেই, সে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মহরৎ-অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজন দেখছে। আর, দেখছে এই নতুন হিরোইনটিকে—নয়নতারাকে। কেমন বিরক্ত লাগছে তার। ষ্টুডিয়োয় এসেছে ছবি তুলতে—মেকআপ নেবে, ক্যামেরার চোখের সামনে দাঁড়াবে, মুখস্থ করা বুলি কপচাবে, ডিরেক্টরের নির্দেশ মত একটু ভাবভঙ্গি দেখাবে—ফুরিয়ে গেল কাজ। এত সাজ কেন? এত জাঁক কেন? জোয়ারদার খুঁজে পেতে নিয়ে এসেছে দুটি রত্ন, কুমারী পার্বতী আর শ্রীমতী ত্রাক্ষা। বাংলা দেশের সিনেমা আকাশে এরা দুটি তারা না, যেন দুটি চাঁদ। জোয়ারদারের পছন্দ কখনো মিথ্যে হয় না—এ গর্ব জোয়ারদার সত্যি করতে পারে।

মহরতের আয়োজন চলছে, ক্যামেরা এক খণ্ড সেটের উপর ফোকাস ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। পাওয়ারফুল আলোগুলো জলে উঠছে, আবার পুরকায়স্থের আঙুলের নির্দেশে নিভে যাচ্ছে।

জোয়ারদার ত্রিনয়নীর পাশে এসে দাঁড়াল, বলল, "বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন। আশা করি, আমাদের এই ছবি হিট-পিকচার হবে।"

ত্রিনয়নী হাসল, বলল, "আশা করি সে আশা দুরাশা নয়।"

"কথা বলতে শিখেছ দেখছি।"

সংক্ষেপে ত্রিনয়নী বলল, "শিখেছি।"

জোয়ারদার বলল, "একটা সত্য কথা বলি?"

"কি?"

"অপ্রিয় সত্য কিন্তু।"

"হোক।"

"উনি তো তোমার বোন?"

ত্রিনয়নী বলে উঠল, "ও, বুঝেছি। সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি, আপনার সঙ্গে আলাপ করানো হয়নি বলে বুঝি চটেছেন।"

"না না না। সে কথা নয়। বলছিলাম, তুমি এমন

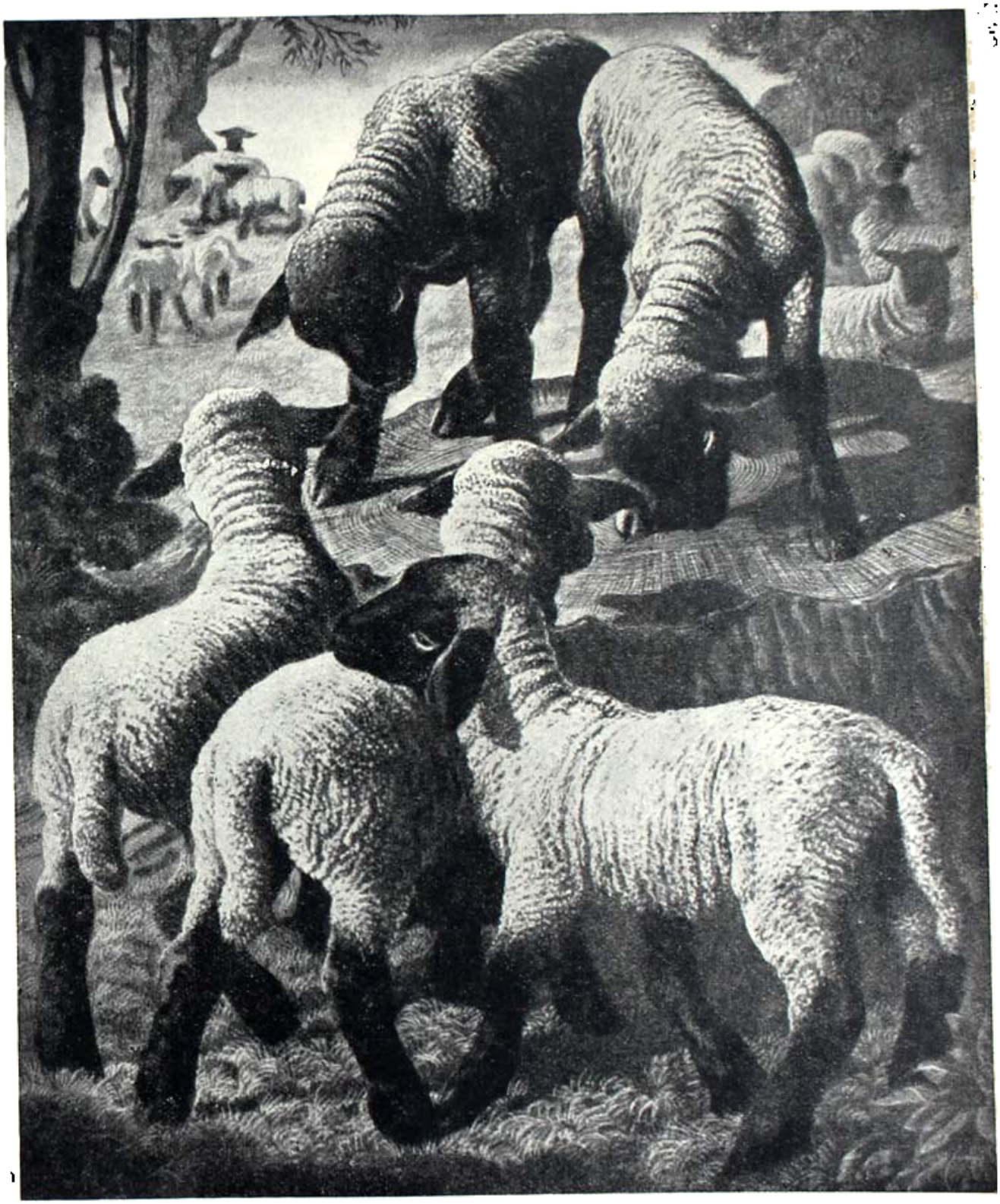

বিশ্রাম

সহজ সাধারণ স্বাভাবিক, আর তোমার বোন হয়ে উনি অমন বিলাসিনী আর ইয়ে কেন ?"

ত্রিনয়নী একটু হাসল, বলল, "ওটা হয়তো একটা পারিবারিক দুর্ঘটনা।"

হেসে উঠল জোয়াদ্দার, বলল, "কথা বলতে শিখেছ দেখছি।"

সংক্ষেপে ত্রিনয়নী বলল, "শিখেছি। কিন্তু বিলাসিনী আর ইয়ে বললেন, ইয়েটা কী ?"

"ওঁর ভবিষ্যৎ বড় ডার্ক—বড় অন্ধকার।

"কেন ? পারবে না অভিনয় করতে ? আমিই ওকে ডেকে এনেছি।"

জোয়াদ্দার বলল, "তা পারবে। কিন্তু সেই সঙ্গে হয়তো আরো অনেক কিছু পেরে যাবে, এই ভয়।"

দিলুকের রুমাল দিয়ে চোখের কোণ পরিষ্কার করতে করতে নয়নতারা এদের দিকে চাইল।

জোয়াদ্দার লক্ষ্য করল ওই চাউনি, বলল, কুলবধূ না উনি ? এ কূল ও কূল দু কূল রক্ষা হলেই বাঁচি।"

এ-কথার মানে বুঝল না ত্রিনয়নী। কিন্তু আর স্পষ্ট করতে রাজি না জোয়াদ্দার।

বুদ্ধদেব-লীলাসঙ্গিনী যশোধরা

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ছন্দক ও কণ্টক রাজপুত্রকে যেই পথে নিয়ে গিয়েছিল একরাতে, সেই পথ ফিরে আস্‌তে তাদের আট দিন লেগে গেল। কণ্টক সর্ব বিভূষণ সত্ত্বেও আন্তরিক বৈরুবাহেতু মৃতকল্প দেখাচ্ছিল। সে রাজপুত্রের অবরোহণ স্থল তপোবনের দিকে বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে উচ্চ করুণ ক্রেষারব করতে লাগ্‌লো; ক্ষুন্নিপীড়িত হয়েও সুদীর্ঘকালের শষ্পখণ্ড বা জলবিন্দুটুকু সে গ্রহণ করলো না—

নিত্যং চৈবাভিমুখস্তপোবনং দৃশ্যং নিরীক্ষ্যে করুণং মুহুর্মুহুঃ।
ক্ষুন্নিপীড়োঽপ্যনিলঃ শষ্পমপু বা যথা পুরা নাভিনন্দ নাদদে॥

ছন্দকের মুখে রাজপুত্রের প্রব্রজ্যাগ্রহণের সংবাদ পেয়ে কপিলবাস্তু নগরের সকলেই রাজপুত্রকে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য কৃতসঙ্কল্প হলেন। রাজার মনে পুত্রবিষয়ে আশঙ্কার উদয় হওয়ায় তিনি কুমারের মঙ্গলার্থে মন্দিরে দেবতার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করছিলেন এবং সময়োপযোগী ব্রতসম্পাদন করছিলেন। এমন সময় অশ্বশালায় প্রবেশ করে অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টিতে চতুর্দিকে একবার নিরীক্ষণ করে কণ্টক সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে নিজের দুঃখ নিবেদনের জন্য এক গগনভেদী শব্দ করল। অনেক নারী বিষয় বুঝতে পেরে সংজ্ঞাবিহীন অবস্থায় চিত্রার্পিতবৎ রইলেন—ক্রন্দনও করলেন না, অশ্রুবিসর্জন করলেন না—এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন নিরুদ্ধ হয়ে গেল। অন্যান্য অনেক নারী বক্ষে করাঘাত করে ক্রন্দন সুরু করলেন।

গোপা ছন্দক ও কণ্টককে দেখেই মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। অন্তঃপুরচারিণী নারীরা সকলে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে জল আহরণ করে শাক্যকন্যা গোপার পরিচর্যা করলেন এবং সযত্নে তাঁকে স্নান করিয়ে দিলেন। তাঁরা তাঁকে অনেক প্রবোধ দিলেন; বল্‌লেন—হে শোকাপন্নে! ধৈর্য অবলম্বন কর; বিপদ্ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে তুমি; প্রেমাস্পদ দু'জনের বিচ্ছেদ গুরুতরই হয়ে থাকে।

দুঃখকাতরা শাক্যকন্যা গোপা শক্তি সংগ্রহপূর্বক কণ্টকের কণ্ঠ অবলম্বন পূর্বক পতিপ্রণয়ের কত পূর্বকথা স্মরণ করে করে করুণ বিলাপ করতে লাগ্‌লেন।

হে আমার পরম প্রীতিনিধান, হে আমার পুরুষ প্রধান, চারুচন্দ্রমুখ, হে আমার মোহনরূপ, হে আমার সর্বোত্তমচিহ্নধর, বিমল, জ্যোতির্ময়, হে আমার অনিন্দিতাঙ্গ, সৌম্যদর্শন, হে আমার গুণমণি, দেবনরগণের পূজ্য করুণাকর, হে আমার শক্তিনিধান, নারায়ণ শক্তিধর, শত্রুহন্তা, হে আমার মধুরভাষিন্, করবিজবিহঙ্গ কলনিনাদিন্, সুমধুর ব্রজবাণীধর, হে আমার অনন্তকীর্তি, আমার শত-পুণ্যের ফল, বিমলপুণ্যদায়িন্, হে আমার অনন্তরূপাধার, গুণরাজিমণ্ডিত, ঋষিগণের প্রীতিকর, হে আমার সুন্দরোত্তম, ভ্রমরকঙ্কণমুখরিত লুম্বিনীকাননের মধ্যমণি, হে আমার বাণীমনোহর, স্বর্গে মর্ত্যে সংপূজিত নির্মল জ্ঞানক্রম, হে আমার সর্বরসাধার, বিম্বোষ্ঠ, কমললোচন, হেমকান্তি, হে আমার শুচিদন্ত, দুগ্ধতুষারতুল্য শুভ্রসংবদ্ধ দন্ত, হে আমার সৌম্য নাসিক, ভ্রূমধ্যবর্তুলশোভারি, জ্যোতির্ময়, হে আমার বৃত্তস্কন্ধ, চাপতুল্যোদারধারিন্, মৃগজঙ্ঘাকৃতি বৃত্তকটিধর, হে আমার গজবস্তাকৃতি করচরণধারিন্; তত্তুল্য ক্রমাবনত শোভাময় উরুধর, হে তাম্রনখ, এরূপে রাজকুমারের নানা দিবসীয় পুণ্যকর্মাবলী ও ব্যবহৃত আভরণাদি লক্ষ্য করেও বিলাপ করলেন। হায় আমার গীতবাদ্যজাত আনন্দ, আর পুষ্পপ্রসাধন, হায় ঋতুরাজ বসন্তসমাগম, কি আর আমার পুষ্পগন্ধানুলেপন আর অন্তঃপুরের গীতযন্ত্রের হর্ষবিলাস!

হায় সৌম্য কণ্টক স্বামিসুহৃৎ, আমার প্রিয়তমকে কোথায় তুমি নিয়ে গেলে? হায় ছন্দক, তুমি অকরুণ, সেই গমনোদ্যত নরোত্তমকে তুমি নিবারণ করলে না! কেন তুমি তখন বল নাই যে, এই কল্যাণদ একা চলে যাচ্ছেন—। এই পুরী থেকে মানুষের সর্বগর্বলয়কারী সেই কারুণিক নির্গত হচ্ছেন। কি উপায়েই বা সেই

প্রিয়কর গেলেন, কি করেই বা এই রাজকুল অতিক্রম করে নিষ্ক্রান্ত হলেন, কোন্ দিক্ অভিমুখেই বা প্রস্থান করলেন—বন্ধু সেই বন, গুল্মলতা দেবতা প্রভৃতি—যারা পড়েছে তাঁর সম্মুখে। ছন্দক, আমার বড় দুঃখ, আমাকে সেই বন্ধু সেই গুণনিধিকে দেখাও। আমার নয়ন উৎপাটিত হয়ে গেছে, আমায় চক্ষুদান কর। হায় ছন্দক, মিত্র বন্ধু সকলের অকৃত্রিম প্রীতি, পরমারাধ্য মাতাপিতার চির-স্নেহামৃত সব কিছুকেই বিসর্জন দিয়ে তিনি চলে গেছেন—আর নশ্বর ভোগসুখ বা আমার মত সামান্য স্ত্রী কি তাঁকে ধরে রাখতে পারে, [অর্থাৎ তোমাকে বৃথাই অভিযোগ করছি—কিছু অন্যথা মনে করো না।] অথবা আমাকে ধিক্, প্রিয়বিচ্ছেদ নটরসিকদের চরিত্রচিত্রণায়ণের ন্যায় বা একই ব্যক্তির বিভিন্ন চরিতে অভিনয়ের মত অনিত্য ক্ষণস্থায়ী। এই সমুদয় নামরূপ প্রপঞ্চ—বাল-সুলভ দৃষ্টিবিভ্রমমাত্র, জন্ম-মৃত্যু কোনটিই বস্তুত নাই। একথা পূর্বেই তিনি বলেছিলেন যে, প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট জরামরণ বলে কোন সত্যবস্তু নাই। হে সখে, তাঁর আশা পূর্ণ হোক্, পূর্ণজ্ঞানের স্পর্শ তিনি লাভ করুন। নির্মল জ্ঞানজ্যোতি অধিকার করে আবার তিনি যেন ফিরে আসেন।

এই মনোরম পুরী মধ্যে নিতান্ত শোকাকুল ছন্দক গোপিকার বচন শুনে অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বললেন—বন্ধু তুমি গোপিনি! এবার আমি সব বলছি।—রাত্রির নিগুঢ় মধ্যযামে যখন অন্তঃপুরের রমণীগণ সুপ্তিতে অচেতন, তখন সেই শতপুণ্যাধার নির্গত হলেন। আমাকে বললেন—কণ্টককে দাও। তাঁর সেই কথা শুনেই তাকিয়ে দেখলাম—তুমি সুপ্তি ঘোরে নিমগ্ন—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠলাম। তোমাকে ডেকে বললাম—"হে গোপি উঠ। এই যে যায়, তোমার প্রিয় চলে যায়।—কিন্তু কোন অদৃশ্য দেবতা আমার সে বাক্য রুদ্ধ করে দিল। একা স্ত্রী সেও নিদ্রাভিভূতা, এমন জাগ্রত কেউ ছিল না, যাকে কিছু বলব। সজ্জিত তেজোবিক্রমী বলীয়ান্ সেই অশ্বরাজ কণ্টককে দিলাম। যার পদশব্দ একক্রোশ স্থানাবধি শুনতে পাওয়া যায়, সেই শব্দ এই পুরীর কেহই শুনতে পেল না। এই স্বর্ণ রৌপ্য-মণিময়ী পৃথিবী সেদিন দেবতার মায়ায় স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিল। অশ্বরাজ কণ্টকের চরণাঘাতে সকলকে পরাভূত করে সেই বাণীনদীর চরে গেছেন। কোন মানুষই তা শুনতে পায় নাই। সেইদিন পুষ্যানক্ষত্র উদিত হয়েছিল, বিমল চন্দ্র কিরণে আকাশ-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। দেবতাগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে মস্তক অবনমন পূর্বক অভিবাদন জানিয়ে প্রণাম জ্ঞাপন করলেন সিদ্ধার্থের কাছে। যক্ষ, রাক্ষস এবং লোকপালগণ সকলে এসে অশ্বরাজ কণ্টকের চরণসমূহে পদ্মকেশর বিকিরণ করে দিয়েছিল। সুপবিত্র তেজোগর্ভ সেই পুরুষ সুচিত্রিত শীতরশ্মিচন্দ্রসমতুল্য নয়নমনোহর অশ্বরাজ কণ্টকে আরোহণ করলেন। বুদ্ধের গমনক্ষেত্রসমূহ অদ্ভুপম শোভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ধরণী বড়্‌বিধ প্রকাশ করে কম্পিত হলো। শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং দ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। অগণিত দেবতাবৃন্দকে সম্মুখে রেখে দেবনাগ-পূজিত চলে গেলেন। সঙ্কেত মাত্রে কণ্টক সেই লোক-নায়ক বুদ্ধকে [নিয়ে] নভোমণ্ডল ভেদ করে অগ্রসর হলো। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ এবং ধারণগণই গমনশীল সুগতকে বহন করে নিল। গীতবাদ্যকুশল অপ্সরাবৃন্দ বোধিসত্ত্বের গুণাবলী কীর্তন-পূর্বক কণ্টকের বলসঞ্চার করতে করতে সুমধুর বাক্য বলল—কণ্টক, লোকনাথকে তুমি দ্রুত বহন করে চল, মনঃক্ষোভ পোষণ করো না, তোমার কোন ভয় নাই, লোকনাথকে বহন করে চলেছ; সুতরাং তাঁর সান্নিধ্যে কোনরূপ দুর্গতির আশঙ্কাই নেই। দেবতাদের এক একজন এসে কণ্টককে অভিনন্দন জানিয়ে বলতে লাগলেন—'আমি লোকনাথের বাহন হবো। অর্থাৎ বাহন হয়ে লোকনাথের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হবো। এখানে দেবতাদের মধ্যে আকর্ষণীয় কিছুই নাই। দেখ কণ্টক, নভোভাগে এই যে পথ রয়েছে, কি সুন্দর বিচিত্র। এই বিচিত্র পথে তুমি এসো, তোমার শুভকর্ম ফলে বিবিধ বিচিত্র রত্নমণ্ডিত, দিব্য বস্ত্র-নির্যাস-সুগন্ধি পরিপূরিত যে ৩৩ কোটি সুশোভন ভবন রয়েছে, তাতে অবস্থান কর। অপ্সরাপরিবৃত হয়ে দিব্য আনন্দ উপভোগ করতে পারবে তুমি চলে এসো আমি বাহন হবো·····[সুতরাং এই সব কিছুর অলৌকিক তাৎপর্য বুঝে] হে গোপি, তুমি আর রোদন করো না। সন্তোষ লাভ কর, আনন্দ প্রকাশ

কর—শীঘ্রই তুমি অপ্সরাসমূহ যাঁর অগ্রে চলেছে সেই নরোত্তমকে সম্যক্ বোধিপ্রাপ্ত বা সম্বুদ্ধরূপে দেখতে পাবে। যে লোক সুকৃতকারী—সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে, হে সোপি, শোক করতে নেই। তিনি মহাপুণ্যগর্ভ পুরুষ, তাঁর উদ্দেশ্যে আনন্দ বর্ষণ কর। রোদন করো না। আর সাত রাত্রি ধরে চীৎকার করে কাঁদলেও সেই বীর্যবান্ পুরুষকে এ ক্রন্দন জানাতে পারবে না,—সেই শক্তিধর দেবনরপূজিত পুরুষ ত চলেই গেছেন।

আমার বাক্য অবধারণ কর—, যা ঘটেছে তা জগতের হিতকর। তুমি অচিরেই পরম শান্তি লাভ করবে এবং আমার এই জ্ঞান আছে যে তুমিও নিজে নরোত্তম তুল্য হবে।

উপরের অতি করুণ বিবরণ ললিত-বিস্তরে পাই। কিন্তু তদন্ত অশ্বঘোষাচার্য—যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অতি প্রাচীন মুকুটমণি, যাঁর সৌন্দরানন্দ-কাব্য, সারিপুত্র প্রকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্ত অক্ষয় সম্পদ্, তিনি জননী যশোধরার বিলাপ আরো একটু করুণ-কঠোর করেছেন। জননী সীতা একদিন শ্রীরাম-চন্দ্রের সন্তাব্যমান বিপদ্ বুঝে ভ্রাতৃকুলশিরোমণি লক্ষ্মণকে গুরুতর কটু কথা বলেছিলেন। আজ জননী যশোধরাও যেন প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে ভায়ের মতই অনুপম সারথি ছন্দককে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন—

"হে কঠোর-হৃদয়, নিতান্ত মর্যাদাহীন, অকরুণ, অমিত্রোচিত কার্য করে এখন তুমি অশ্রু বিসর্জন করছ কেন? অশ্রুবেগ রুদ্ধ কর, এবং হৃদয়ে হৃদয়ে সন্তুষ্ট হও, তোমার এই কঠোর কাজের পর অশ্রু তোমাতে শোভা পায় না।

যদিও তুমি প্রিয় বংশবদ বিশ্বাসী ভক্ত সাথী এবং নিরন্তর ন্যায্য কার্যেরই অনুষ্ঠান করেছ—তা হ'লেও তোমাকে আশ্রয় করেই আমার আর্যপুত্র প্রব্রজ্যায় নির্গত হয়েছেন! তুমি আনন্দ কর; তোমার সমস্ত কষ্টই আজ সার্থক হয়েছে।

যে নির্বোধ বন্ধু বিপর্যয়কালে অনুকূল উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ না হয়, তার থেকে প্রাজ্ঞ শত্রুও শ্রেয়। তুমি নিজেকে বন্ধু বলে অভিহিত কর—অথচ তোমার জন্য এই পরিবারের এমন বিষম বিপৎ সংঘটিত হলো।

অশ্বঘোষের চিত্রণে আরো দেখি—তারপর তিনি স্বীয় ভাগ্যকে দিলেন ধিক্কার এবং যে সকল নারীরা পতিসহ বিরাজমানা, তারাও আজ যেন পৃথিবীপতি কুমার ব্যতীত অনাথা—সেই প্রকার প্রতীয়মানা হয়েছেন। আজ প্রাসাদরাজিও সুদীর্ঘ পারাবতাস্রর বিচিত্রবাহু সংপ্রসারণ পূর্বক পারাবতের অবিরল দীর্ঘ স্বরের মাধ্যমে রোরুদ্যমান—

গভীর ক্ষোভে তিনি আবার কণ্টককে তিরস্কার করতে লাগলেন। বললেন তিনি—

এটা নিঃসন্দেহ যে এই কণ্টকও আমার অনর্থকামী; নিশীথে লোকের নিদ্রাকালে চোর যেমন রত্ন চুরি করে, তেমনি এও আমার সর্বস্বকে এখান থেকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

যখন এই অশ্ব কশাপাতের কথা দূরে থাকুক, তীব্রের প্রহার পর্যন্ত সহ্য করতে সমর্থ; তখন কশাপাতের ভয়ে কেন এ আমার হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার সৌভাগ্য লক্ষ্মীকেও গ্রহণ করে চলে গেল?

এখন এ নীচাশয় অশ্ব রাজপ্রাসাদ পরিপূরণ করে উচ্চনাদ করছে; কিন্তু আমার প্রিয়কে যখন নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে মূক হয়েই ছিল।

যদি অশ্ব হ্রেষারব করতো যার ফলে লোক জেগে উঠতো, অথবা পায়ের খুর দিয়ে ভূমিতে আঘাত করতো বা হনু দ্বারা যথাসম্ভব উচ্চে শব্দ করতো, তাহলে আমার এত মহান শোকের কারণ ঘটতো না।

দেবীর এই শোকবিহ্বল বাষ্পরুদ্ধ বাক্য শুনে ছন্দক অধোবদনে সাশ্রুনেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরে ধীরে যে উত্তর দিলেন, তা' কিয়দংশে ললিতবিস্তারের তুল্য। অশ্বঘোষ এ প্রসঙ্গে দেবতাদের সাহায্যের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে স্বীয় বাগবিহীন আজ্ঞাধীনতা, কণ্টকের ভূমিস্পর্শ ব্যতীত হ্রেষাহীন ত্বরিত গমনাদির সঙ্গে সঙ্গে এও বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন ছন্দকের মুখে "দেবতাদের চক্রান্তই যদি সব কিছুর মূলে না থাকবে, তা হ'লে ঐ কঠোর প্রাসাদ দ্বার আপনা থেকেই খুলে যাবে কেন; সূর্যালোকের উজ্জ্বল দীপ্তিতেই গাঢ় তমিস্রা দূরীভূত হয়ে যাবে কেন?

রাজাদেশে তো সহস্র সহস্র দক্ষ রাজানুচর প্রাসাদে পাহারা দিচ্ছিল, তারাই বা ঘুমিয়ে পড়বে কেন? কাজেই হে দেবি! আপনি এ বিষয় সম্পূর্ণ দৈবেচ্ছিত বলেই মনে করুন।

কুমারের পরিধেয় বাসের পরিবর্তে বনবাসোপযোগী বস্ত্র তো দেবতারাই দিলেন; তাঁর শিরে পরিহিত মুকুট যখন উৎক্ষিপ্ত হলো, তখন কে তাকে গ্রহণ করলো—সে তো ভূতলে পতিত হলো না। এক দৈববিধান ছাড়া আর কি বলা যায়?

কাজেই হে দেবি!—আপনার এটা মনে করা সমীচীন হবে না যে এ'তে আমার বা কণ্টকের কোনও দোষ আছে; আমাদের উভয়ের মধ্যে কেউ ইচ্ছাপূর্বক কিছুই করিনি, দেবতাগণকে পরিকর করে তিনি এখান থেকে নির্গত হয়ে গেছেন।"

এই করুণ বিলাপের পর যশোধরা দৃঢ় সংকল্প করলেন যে সিদ্ধার্থ যেমন সাধনা করবেন বনে বনে, তিনিও ঠিক তেমনি রাজপ্রাসাদের গহন গোপনে—স্বকক্ষে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করবেন বুদ্ধদেবের মত, ঠিক একই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য। রাজা শুদ্ধোদন সাক্ষী রেখে গেছেন এবং বুদ্ধদেবও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে যশোধরা তাঁর অপূর্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং ভারতীয় নারী সমাজের সমুদ্ধারের পথ সম্পূর্ণ অবারিত করে দিয়েছিলেন।

প্রকাশের পথে

বাংলার কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা

রঞ্জিৎ কুমার সেনের অনবদ্য

সাহিত্য সৃষ্টি

নানা ফুলের সাজি

এতে আছে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, অজস্র ছড়া ও কবিতা, মজার মজার গল্প, বহু মনীষীর জীবনী, শিশু সাহিত্য ও গ্রন্থ বিষয়ক ঐতিহাসিক—প্রবন্ধ প্রভৃতি।

নানা রঙের চিত্র, নানা রঙের প্রচ্ছদপট।

প্রত্যেক শিশুর হাতের তুলে দেবার মতো বই, প্রত্যেক গ্রন্থাকারকে সমৃদ্ধ ক'রবার মতো বই।

এক কথায় শিশু-সাহিত্যের সেরা বই।

সরস্বতী লাইব্রেরী

৬, বঙ্কিম চ্যাটুজ্জে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সকলেরই প্রিয়—

'SANKHA' (শঙ্খ)

মার্কা চিরুণী, সোপ কেস, পাউডার কেস, অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী ও 'পূর্ণিমা' টুথব্রাস

সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

CALCUTTA-9

বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য রত্ন

বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট! কথাটা যেন কেমন। আজিকার দিনে এই বিজ্ঞানের যুগে আবার এ সব পুরানো কাসুন্দী কেন! পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করাটাই তো উঠিয়া গেল, তার আবার উচ্ছিষ্ট ভোজন। কে জানে কার কোন্ ব্যারাম আছে, আর এত হীনতা স্বীকারই বা কেন! একজনের পালাক্লিষ্ট ভোজ্যের শেষ অপরে গ্রহণ করিবে কোন্ দুঃখে? আমি এসব প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য কোন্ গুরু গম্ভীর প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি না। একটা পুরানো গল্প বলিব মাত্র। তারও পূর্ব্বে এক দিনের একটা কথা বলি। বোধ হয় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বীরভূম বিবরণ ছাপাইবার জন্য আমি তখন বিশ্বকোষ ছাপাখানার উপর তলায় থাকি। বিদ্যানিধি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই উপর তলা বৈঠকখানা রূপে ব্যবহার করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, এখানেই বসু মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইতেন। দিনাজপুরের মহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ, আবার বৈবাহিক অদ্ভুত বাজারের মৃণালকান্তি হইতে বাঁকুড়ার পুরানো পুঁথি বিক্রেতা রাম কুমার ধনী জ্ঞানী গুণী অর্থী প্রার্থী বহুজনকেই আমি সেখানে দেখিয়াছি। স্বনামধন্য মনীষী ভূদেবচন্দ্রের কৃতী পুত্র মুকুন্দ দেবকে আমি এই সময় প্রায়ই বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে দেখিতাম। একটু দূরে বাড়ী, হাঁটিয়া আসিতেন। কান্যকুব্জে একটি সংস্কৃত বিদ্যা মন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত ছিল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সঙ্গে প্রায়ই এই প্রসঙ্গটার আলোচনা করিতেন। আমি পরিচিত হইয়াছিলাম, সময় সময় আমার সঙ্গেও নানা-বিষয়ের আলাপ হইত। সামাজিক আচার নিয়মের ব্যতিক্রম তখনই তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। একদিন কথায় কথায় বলিলেন "দেখুন, উচ্ছিষ্ট খাওয়া আজকাল প্রায় উঠেই যাচ্ছে, স্বামীর পাত্রে স্ত্রীরা পর্য্যন্ত ইদানীং খেতে চায় না। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে নিয়মটা এখনো আছে। আমার এক ভাইপো পাটের দালালী করে। বছরেই বিয়ে হয়েছে, বৌমাটির বয়স অল্প। ভাইপোর রোজই বাড়ী ফিরতে দেরী হয়। আমি একদিন বৌমাকে বললাম তুমি সকাল সকাল খেয়ে নাও না কেন, তোমার কষ্ট হয়। বৌমাটি হাসি মুখে মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বললে, আমার তো কষ্ট হয় না। তাছাড়া আপনার ছেলে ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ী ফেরেন কোথায় আমি তাঁকে হাত মুখ ধোবার জল দোব, বাতাস করবো, তা না আগে ভাগে খেয়ে আরাম নেওয়া আমার ভারি বিশ্রী লাগে। আর একটা কথা বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে এখন দু পয়সা হাতে আসবে। এ সময় অনাচার করলে মা লক্ষ্মী রাগ করবেন।" এই নববধূ স্বামীর খাওয়ার পর আনন্দের সঙ্গেই তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাত্রে আহারে বসিতেন। এখন তো অনেক বাড়ীতেই দেখি স্বামী স্ত্রী এক পাত্রে অবশ্য নয়, এক সঙ্গে আহারে বসিয়াছেন। কন্যা, জামাতা, পুত্র, পুত্রবধূ স্বামী স্ত্রী এক পংক্তিতে বসিয়া খাইতেছেন, এ দৃশ্য এখন যত্র তত্র। অনেক হিন্দু বাড়ীতেই আসনের স্থলে টেবিল আসিয়াছে। পুত্র কন্যা লইয়া স্বামী স্ত্রী টেবিলেই ভোজন পর্ব্ব সমাধা করেন। আমি এ প্রথার নিন্দা করিতেছি না। যাহা দেখিয়াছি বলিতেছি। এইবার আসল গল্পটা আরম্ভ করি।

নদীয়ার নিমাই, বাঙ্গালার শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; নাম হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। ভক্তগণ নাম দিয়াছেন মহাপ্রভু। নিমাই দরিদ্রের ঘরেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দারিদ্রের মধ্যে দারিদ্রের সঙ্গেই জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান যে দিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, নদীয়া জুড়িয়া হাহাকার উঠিল, সারা বাঙ্গালা কাঁদিয়া আকুল হইল। আর একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল বাঙ্গালীর আশ্চর্য্যজনক রূপান্তর। একদিকে

যেমন সমাজে অবহেলিত অদৃশ্য বঞ্চিত তথাকথিত নীচ সম্প্রদায়ের নরনারী কাতারে কাতারে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ গ্রহণ করিল, অন্য দিকে তেমনই মহামহা ধনী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিদ্বান, বড় রাজ কর্ম্মচারী দলে দলে তাঁহার পদ প্রান্তে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে কোল দিতেছে। ধনী দরিদ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে, পণ্ডিত মূর্খের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিতেছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের নিকট দীক্ষিত হইতেছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। যেন ইন্দ্রজাল।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন বাঙ্গালার সুলতান হুসেন শাহের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রঘুনাথ দাস কায়স্থ সন্তান। তাঁহার পিতা সপ্তগ্রাম মুলুক হইতে বৎসরে কুড়ি লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করিতেন। গৌড়ের দরবারে তাঁহাকে বার লক্ষ টাকা পাঠাইতে হইত। সেকালে আট লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়ের অধিকারী গোবর্দ্ধন দাসের এক মাত্র পুত্র যুবক রঘুনাথ পিতামাতার স্নেহ ডোর এবং অপরূপ সুন্দরী পত্নীর প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া মহাপ্রভুর চরণে শরণ লইয়াছিলেন। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র, তাঁহার গুরু কাশী মিশ্র, সভাপণ্ডিত সুবুদ্ধি কল্প বিদ্বান বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পদ প্রান্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। এমন কত নাম করিব। আবার জগাই মাধাই-এর মত দুরাচারও মহাপ্রভুর করুণায় সম্যক ব্যবসিত সাধুর পদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্ত সংখ্যার ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহাদের উন্নত জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ বৈচিত্রের ও যেমন পরিমাপ হয় না, চরিত্র মাধুর্য্যের ও তেমনই সীমা পাওয়া যায় না।

চব্বিশ বৎসরে মহাপ্রভু সংসার ত্যাগ করেন। ছয় বৎসর কাল তিনি ভারতের নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট অষ্টাদশ বর্ষ তাঁহার পুরী ধামে অতিবাহিত হইয়াছিল। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার পূর্ব্বেই বাঙ্গালার ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে সমবেত হইতেন। মহাপ্রভুর সাধচর্য্যে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিয়া পুনরায় তাঁহারা বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের জন সংখ্যাও বড় কম ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজন ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিচিত্র। এক একজন এক একটি অধিষ্ঠান ভূমি হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। অনুভব মাধুর্য্যে এই দর্শন বৈচিত্র আজিও স্মরণীয় হইয়া আছে। মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছিলেন "জীবে দয়া নামেরুচি বৈষ্ণব সেবন" প্রতি নরনারীর অবশ্য পালনীয় ধর্ম। কুলীন গ্রামের মালাধর বসুর পুত্র এবং পৌত্র প্রতি বৎসর পুরী যাইতেন। এক বৎসর বিদায়ের দিনে মহাপ্রভুকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন কি আমাদের কর্ত্তব্য আপন শ্রীমুখে উপদেশ দাও, শুনিয়া যাই। মহাপ্রভু বলিলেন নাম গ্রহণ এবং বৈষ্ণব সেবা করিও। প্রশ্ন হইল কে বৈষ্ণব, কেমন করিয়া চিনিব। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন একবার মাত্র যাঁহার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিবে, সেই বৈষ্ণব তাহারই সেবা করিও। দ্বিতীয় বৎসর আবার তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাকে ছাড়িয়া তোমার পদপ্রান্ত হইতে দূরে সরিয়া আমাদের দিন কাটিবে কিরূপে, কি আমাদের কর্ত্তব্য? মহাপ্রভু বলিলেন নাম গ্রহণ এবং বৈষ্ণব সেবা এই দুই তোমাদের কর্ত্তব্য তো বলিয়াই দিয়াছি। মালাধর পুত্র সত্যরাজ দাস জিজ্ঞাসা করিলেন বৈষ্ণব চিনিব কেমন করিয়া। মহাপ্রভু বলিলেন নিরন্তর যাহার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিবে, সেই বৈষ্ণব। তৃতীয় বৎসরে অনুরূপ প্রশ্নে মহাপ্রভু বৈষ্ণবের চিহ্ন স্থির করিয়া দিলেন—

যাহারে দেখিলে মুখে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম।
তাহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

কংগ্রেস সরকার আইন করিয়া অস্পৃশ্যতা দূর করিতেছেন। মহাপ্রভুর এই বৈষ্ণবের সংজ্ঞা "একবার কৃষ্ণনাম যাহার বদনে" কত ব্যাপক তাঁহারা বোধ হয় ভাবিতে পারেন না। দেশে রাজা মুসলমান, রাজকর্ম্মচারী অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের অত্যাচারে উৎপীড়নে ছলে বলে প্রলোভনে দলে দলে লোক মুসলমান হইয়া যায়। সমাজের প্রতিরোধের শক্তি নাই। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে ধীরে এই ব্যাধি অন্তর্হিত হইয়া গেল। আইন না করিয়াই রাজ সাহায্য না লইয়াই এক কৌপীন সম্বল সন্ন্যাসী দেশ হইতে অস্পৃশ্যতার শিকড় তুলিয়া ফেলিলেন। যবন হরিদাস মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গগণ মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

রথযাত্রার সময়ে শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা রথে চড়িয়া ঘুরিয়া বাড়ীতে উপস্থিত

হন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে বলিলেন চল গুণ্ডিচা গৃহ মার্জ্জন করি। মহাপ্রভুর অভিপ্রায় জানিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র হাজার খানেক নূতন বৃহৎ কলস পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভু প্রথমে একটি একটি করিয়া গুণ্ডিচা মন্দিরের সমস্ত খড় কুটা চাঁচিয়া ফেলিলেন। তাহার পর কলসী কলসী জল ঢালিয়া শ্রীমন্দির ধৌত করিতে লাগিলেন। এক দল ভক্ত কলসী ভরিয়া জল বহিয়া আনেন, অন্যদল সেই জল বেদীর চত্বরে অঙ্গনে ঢালিয়া দেন। জল প্রণালী বাহিয়া বাহিরে গিয়া পড়ে। মহাপ্রভু ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের কাজ দেখিতে ছিলেন। অঙ্গন ভরা জল, মহাপ্রভু জলের মধ্যেই যাতায়াত করিতেছিলেন। একজন গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর পাদস্পৃষ্ট জল অঞ্জলি তুলিয়া পান করিয়াছিলেন। দেখিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রিয় ভক্ত স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। দামোদর তাঁহাকে জোর করিয়া গলায় ধরিয়া গুণ্ডিচা মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের অপরাধ মহাপ্রভুর পাদস্পৃষ্ট জল পান, সাক্ষাৎ পাদোদক পান করিলে না জানি তাহার কি দুর্ব্বশাই হইত।

দাস রঘুনাথের পিতৃব্যের নাম কালিদাস। কালিদাস বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট ভোজন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সম্প্রদায় ভুক্ত ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণের গৃহে গিয়া তিনি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। অন্যজাতির গৃহে ভোজ্যোপকরণ পাঠাইয়া কৌশলে প্রসাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। কাহাকেও বা নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ লইতেন। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত ঝরুঠাকুর জাতিতে ভুঁই মালী। তিনি কাহাকেও প্রসাদ দিতেন না। কালিদাস কহিতেও পারিতেন না। একদিন তিনি একটা উপায় অবলম্বন করিলেন। সময়টা অবোধ সময়। কালিদাস বাজার হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট আম কিনিয়া ঝরুঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ঝরুঠাকুর বসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। কালিদাসের নিকট হইতে আমগুলি পাইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সপরিবারে সেবন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে খাইতে লাগিলেন। খাইতেছেন আর আঁঠি ছালগুলি স্ত্রীর হাতে তুলিয়া দিতেছেন। খাওয়া শেষ হইলে ঠাকুরের স্ত্রী সেই আঁঠি ছালগুলি লইয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিলেন। কালিদাস নিকটেই কোথাও দাঁড়াইয়াছিলেন। অবজ্ঞনা স্তূপ হইতে ঝরুঠাকুরের উচ্ছিষ্ট আমের ছাল তুলিয়া একটুকরা মুখে দিয়া বাড়ী আসিলেন। তাঁহার বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট ভোজন ব্রত সম্পূর্ণ হইল।

পুরীধামে মহাপ্রভু নিত্য জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতেন।

অপরাণ যান প্রভু মন্দির গহনে।
লোক ঠেলে পথ করে কাশী বলধানে॥

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী মহাপ্রভুর আগে আগে লোক ঠেলিয়া অন্যের স্পর্শ বাঁচাইয়া পথ করিয়া দিতেন। মহাপ্রভুর পশ্চাতে থাকিতেন জলপূর্ণ ঝারি হস্তে প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দ। সিংহদ্বার পার হইয়া মন্দিরের উত্তর প্রান্তে একটা গর্ত্তের নিকটে মহাপ্রভু গিয়া দাঁড়াইতেন। গোবিন্দ তাঁহার শ্রীচরণ দুটি ধৌত করিয়া দিতেন। সেইজল কাহারো স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না, জল গর্ত্তের মধ্যেই অন্তর্হিত হইত। একদিন মহাপ্রভু গর্ত্তের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়াছেন, গোবিন্দ প্রতিদিনের মত পাদপদ্মে জল ঢালিয়া দিতেছেন। কালিদাস গিয়া অঞ্জলি পাতিয়া বসিলেন। গোবিন্দ একবার মহাপ্রভুর মুখের পানে চাহিলেন মাত্র। কিন্তু কি প্রভু কি ভৃত্য কাহারো কিছু বলিবার সাহস হইল না। কালিদাস মনের সাধ মিটাইয়া মহাপ্রভুর পাদোদক এক দুই তিন অঞ্জলি পান করিলেন। এতক্ষণে মহাপ্রভু বলিলেন—

"এতাবত বাঞ্ছাপূর্ণ করিল তোমার" আর নয় এবার যাও।

(৩৭০ পৃষ্ঠার পর)

শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণ শঙ্কর রায়। প্রথম তিনজন তো বোম্বাইতেই থাকবেন। প্রধানতঃ শরৎবাবু ও কিরণবাবুই মনোনয়ন স্থির করবেন। আমি কিরণবাবুকে কোন করলাম। তিনি বললেন, আপনি বলছেন, দিয়ে দেব।

গণপরিষদে ডাঃ মুখার্জি ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লেন। রাজেনবাবু প্রেসিডেন্ট, তিনি অনেক সময় অসুস্থ থাকেন। ডাঃ মুখার্জির কাজের ধারায় বাংলার মুখ উজ্জ্বল হয়, গৌরবে আমাদের বুক ফুলে ওঠে।

দিল্লিতে কনষ্টিট্যুশন হাউসে অরুণদা থাকেন, আমি মাঝে মাঝে যাই। অনেক বন্ধুবান্ধবই তো সেখানে। খুব আড্ডা জমে। ইতিমধ্যে আমি পাকিস্তান গণপরিষদে সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। করাচি যেতে আসতে মাঝে মাঝে দিল্লীতে দু'চার দিনের জন্য ছুটি—মাঝে মাঝে আড্ডা বসে ডাঃ মুখার্জির ঘরে। হাসি ঠাট্টার আর অন্ত নেই—বিশেষ ক'রে তাঁর দৈনন্দিন মিতব্যয়ী জীবন নিয়ে আর হুকা টানা নিয়ে। প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই ডাঃ মুখার্জি 'ফরোয়ার্ডে'র প্রায় নিয়মিত লেখক। তাঁর অভিযান মদ গাঁজা আফিং এর বিরুদ্ধেই বোশ। তিনি গাঁজা আফিং নিয়েই থাকেন—বন্ধুদের আক্রমণের এ একটা দিক। কী প্রাণ খোলা হাসি দিয়েই—তিনি সমস্ত আলোচনাকে সরস ক'রে রাখতেন। আর ছিল তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতার টুকরোটাকরা অজস্র গল্প। দিনের পর দিন হ'লে গেলেও তাঁকে যেন কখনও পুরোনো গল্প বলতে হ'ত না।

অরুণদার সঙ্গে ইতিমধ্যে রীতিমত জমে গেছে। ছোট বড় প্রায় কোনো ব্যাপারেই তাঁর পরামর্শ না নিয়ে চলেন না। শিশুর মতো সরলতায় নিজের ভুলভ্রান্তির কথা এসে অরুণদাকে বলেন, ধমক খান, আর হাসেন। ও সময়টায় একান্তভাবেই অরুণদা ওঁর guide, friend and philosopher.

অরুণদা কোয়ার্টার্স পাবার পরে আমার বোন ছেলে-মেয়ে নিয়ে ছুটলো সেখানে স্বাস্থ্যোন্নতির আশায়। ডাঃ ও মিসেস্ মুখার্জি দু'জনারই খুব স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠ্‌লো। বাজারে কেনাকাটির প্রয়োজন হ'লেই ওর কাছে আসতেন—যদিও তিনজনাই সে কাজে সমান আনাড়ী।

এর পর ঘটলো একটি অপ্রিয় ঘটনা। কি খেয়ালে জানিনা, বন্ধুরাই ডাঃ মুখার্জিকে করলেন কংগ্রেসের নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার, ২৪-পরগণা জেলার। অখ্যাতি শুনলাম নানা রকম—যাতে একটা খুব আঘাত পেলাম—নিজের হাতে গড়া একখানা মূর্তি যেন ভেঙে গেল। একটা উদাহরণ দিই। শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী পেয়েছেন ৫০ ভোট, আর তাঁর বিরোধী প্রার্থী পেয়েছেন ১ ভোট। চারুবাবুর নামে লেখা হয়েছে এক ভোট, আর বিরোধীর নামে ৫০ ভোট।

সোজা গেলাম ডাঃ মুখার্জির বাড়ীতে। সঙ্গে শ্রীমান অমলেন্দু চক্রবর্তী—উলুবেড়ে কলেজের ডেমনষ্ট্রেটর। কিন্তু বয়সে একান্তই ছোট। গিয়ে এক মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝলাম। তবু অমলের সামনেই ডাঃ মুখার্জিকে খানিকটা গাল পাড়লাম। বললাম, কি প্রয়োজন ছিল এসব কাজে আপনার আসবার? অস্বীকার করতে পারেন নি?

সামনেই যে লোকটি বসে ছিলেন—ডাঃ মুখার্জির ঘরে এই সব গমাগমনরত করছিলেন তাঁর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললাম, এ সবতো আপনার কাজ নয়, এখানে আপনাকে নির্ভর করতে হচ্ছে এই লোকটির উপর। এঁর কীর্তি জানেন আপনি কিছু? ফাঁসির আসামী এঁর এক ভাইকে ধরিয়ে দেবার জন্যে ইনি পুলিশকে সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন। এখন আপনাকে নিষ্কণ্টক বানিয়ে যতো নোংরা কাজ ক'রে নিচ্ছেন।

ডাঃ মুখার্জি যেমন স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন, তেমনি বুঝলেন, তাঁর সুনামে কলঙ্ক লাগছে বলেই আমি আঘাত পেয়েছি এবং আঘাত পাওয়ায় তারই প্রকাশ হচ্ছে আমার গালাগালির ভাষায়। তবু খৃষ্টানের জীবনাদর্শের সাধনা একান্ত করে না নিলে অমন গালাগালির তোড়ের সামনে অমন শান্ত হাসি হাসতে পারতেন না। সে হাসির ভিতর লজ্জা ছিল, অনুযোগ ছিলনা। সব চেয়ে বড়ো ক'রে ছিল অনুতাপ—খৃষ্টীয় আদর্শের এক প্রধান অঙ্গ।

অপর লোকটি যে অমন ক'রে ধরা প'ড়ে যাবে, তা কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারে নাই। তাই মুখ কাচু মাচু ক'রে নীরবে বসে থাকা ছাড়া তার আর গত্যন্তর ছিল না। আমি গালাগালির পালা শেষ ক'রেই উঠে পড়লাম, পেছনে

অমল। ডাঃ মুখার্জি একবার ডেকে বসাতে বলারও সুযোগ পেলেননা।

এর পর তো পশ্চিম বাংলার গভর্ণর। সমস্ত বাংলা খুসি হয়েছিল নিশ্চয়ই। অতখানি অকুণ্ঠ আনন্দ বোধ হয় আর কোনো লোকই গভর্ণর হ'লে আমরা পেতামনা। খেতে ভালবাসতেন। অরুণদা আর আমি কিছু খাবার নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, খাবার, ফুলের মালা আর তোড়া তার ভিতরেই অনেক পৌঁছে গেছে—যাঁদের কাছ থেকে আশা করেননি এমন অনেক লোকের নাম ছাপানো কার্ডসহ সেগুলো সকৌতুকে দেখালেন।

যেমন আমরা আনন্দ পেয়েছিলাম ডাঃ মুখার্জি গভর্ণর হওয়াতে তেমনি গভীর তৃপ্তি বোধ করেছিলেন ডাঃ মুখার্জি অরুণদাকে মন্ত্রী হওয়াতে। এর কোনো ক্ষেত্রেই অনুরোধ উপরোধ করা বা করানো ছিলনা। একজন গভর্ণর, অপরজন মন্ত্রী হয়েছিলেন যোগ্যতা, চরিত্র ও সুদীর্ঘ কালের স্বার্থলেশশূন্য সেবার জীবনের ফলে।

ডাঃ মুখার্জির একমাত্র আক্ষেপ ছিল অরুণদাকে প্রথমতঃ মাত্র ডেপুটি মন্ত্রীর পদে নেওয়া হয়েছিল ব'লে।

পনের বছর আগেও যেমন দেখেছি, তেমনি কনষ্টিট্যুশন হাউসে, তেমনি রাজভবনে লেখাপড়া নিয়ে থাকতেই ডাঃ মুখার্জি ভালবাসতেন। শেষ বয়সেও লেখাপড়ার বা চিন্তার ধারাবাহিকতা কখনও হারান নাই। যা তিনি নিজে জানতেন না, বা যা নিয়ে নিজে ভাবেন নাই বা পড়াশুনো করেন নাই, তা নিয়ে পাণ্ডিত্যপ্রাহিতা দেখানোর আগ্রহ তাঁর ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে অনেকের আলাপ আলোচনায় একটা আবোল তাবোল ভাব দেখা দেয়। সরস কথাবার্তা ডাঃ মুখার্জি অনর্গল চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু যেমন কথাবার্তায়, তেমনি আচরণে কেউ বোধ হয় কখনও তাঁর ভিতর কোনো রকম অসংযত ভাব লক্ষ্য করেন নাই। আগে বলেছি, ডাঃ মুখার্জি খেতে ভালবাসতেন। কিন্তু আহার তাঁর বরাবরই ছিল পরিমিত। বরং অন্যকে খাইয়ে বেশি তৃপ্তি পেতেন।

ইদানিং তো কলকাতায় যাওয়া আসাই কম হয়। কিন্তু যখনই গেছি খবর পেয়েছেন বা দিয়েছি অমনি ডাঃ মুখার্জি টেলিফোন ক'রে—হয়তো বললেন ভাল কই মাছ পাওয়া গেছে, উনি নিজে রান্না করবেন, অরুণবাবু আর আপনি এখানেই খাবেন। যেমন সেই ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীতে তেম্‌নি রাজভবনে—সেই মন্ত্রদেহ, লুঙ্গিপরা, হাতে হুঁকা কখনও বা অপরের দেওয়া গড়গড়ার নল। বিদেশীরা এসে দেখে কি ভাবে? এ প্রশ্ন আমাদেরও অনেকে করেছেন। হরেন্দ্রকুমারকে এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামাতে দেখিনি। পশ্চিম বাংলার রাজভবনে যতো চাকুরে বিদেশী আসেন, মহাত্মা গান্ধীর কাছে তার চেয়ে নানা শ্রেণীর কম বিদেশী আসতেন না। মহাত্মা গান্ধী বিলাতে রাজ সন্দর্শনে যেতেও আমাদের দেশের অগণিত মানুষের পোষাক পরিচ্ছদের যতোটা কাছাকাছি সম্ভব থাকতে চেষ্টা করেছিলেন—পোষাক পরিচ্ছদ দিয়ে এই ফাঁকাটাকে ঢাকতে চেষ্টা করেন নাই।

দেশের অগণিত মানুষের দুঃখ দৈন্য হরেন্দ্রকুমার দেখে বেড়িয়েছেন সারাজীবন—বনে জঙ্গলে পাহাড় পর্বতে—পার্বত্য ও উপজাতীয়দের ভিতর। সাধারণ মানুষের দুঃখ তিনি গভর্ণরের আসনে ব'সেও ভোলেন নাই। আমাদের দেশের চির-অর্ধভুক্ত নরনারী শিশুর জীবনে যক্ষ্মারোগ যে কত বড় অভিশাপ, তার পরিচয় দেবার আজকের সমাজে প্রয়োজন নেই। গভর্ণরের আরামকুর্শিতে তাই তিনি আরাম পান নাই, ধনীর দুয়ারে দুয়ারে, উৎসবে অনুষ্ঠানে তাই গভর্ণর ডাঃ মুখার্জি ঘুরেছেন ভিক্ষাপাত্র হাতে—তাঁর সৃষ্ট দুটি যক্ষ্মা রোগীর প্রতিষ্ঠানের জন্য। কিন্তু সব চেয়ে আনন্দ পেয়েছেন তিনি ছাত্রদের টিফিনের পয়সা থেকে দু'একটি ক'রে বাঁচানো পয়সায়। এক এক স্কুলের ছাত্রদের পয়সা আনী দুয়ানী বাঁধা ন্যাকড়ার পুটুলিতে বিশ-পঁচিশ টাকা কয়েক আনা কয়েক পয়সা দেখিয়ে তিনি কত আনন্দ করেছেন, কত গৌরব বোধ করেছেন।

এর পর, পরিপূর্ণ বয়সে, সেবার পরিপূর্ণ সার্থকতায়, গৌরবে, পরিণতিতে, সুপরিপক্ক ফলটির মতো অকস্মাৎ একদিন যে-মাটির কাছাকাছি তিনি তাঁর সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন সেই মাটিতেই নিজের চির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। জীবনে যাদের যা হতাশ নিজের নিঃশ্বাস টেনে নিয়েছেন, মৃত্যুর আগে তাদের দীর্ঘশ্বাসের অবকাশ দিলেন না। নিত্য তাদের দুঃখের জীবনে স্মৃতির সহচর হয়ে অমর হয়ে রইলেন। আমাদের জীবনে যে-স্থান শূন্য হ'ল, তা চিরদিনের মতো শূন্যই রয়ে যাবে।

(৩৭৪ পৃষ্ঠার পর)

ঘরে ও বাহিরে। তাই বলিয়া একথা আমরা বিশ্বাস করিনা—বাঙালী ছাত্র ও যুব সমাজের আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস আসিয়াছে,—আসিয়াছে ভ্রান্তি ও সংশয়—, পথনির্দেশের গুরু দায়িত্ব আজ দেশের নেতৃস্থানীয়দের। ছাত্র ছাত্রই আছে—বাংলার যুব সমাজও তাহার পবিত্র ঐতিহ্য হারায় নাই—শুধু রাজনৈতিক অবস্থান্তরে তাহাদের সুকোমল বৃত্তি ও মননশীলতায় নানা দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি—এ সাময়িক অবস্থার সত্বরই অবসান ঘটিবে। আমরা জানি—জগতিত যুবক ও ছাত্রের মধ্যে শুভবুদ্ধির অভাব নাই—যাঁহারা আজ চৌমাথায় আসিয়া অস্থিরতা ও উদ্বেগ লইয়া দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদের কাছেই পথ নির্দেশের প্রয়োজন আছে—তাঁহাদের জন্যই আজ শুভবুদ্ধির আহ্বান। আমরা ইহাও জানি কেহ কেহ আজ গতিবেগে চঞ্চল, উৎসাহে অধীর, মনের পর্দায় বাঁধা আছে রবীন্দ্র বাণীর বিচিত্র সুর। তাঁহাদের সেই পর্দায় আমরা ঝঙ্কার দিয়া শুনাইতে চাই আশার বাণী, সৃষ্টি-যজ্ঞের আনন্দ-ঘন উদাত্ত মন্ত্র—সে মন্ত্র গভীর হইয়া বাজুক তাঁহাদের কানে—নিবিড় হইয়া দোলা দিক তাঁহাদের মর্মস্থলে। আমরা দেখিতে চাই—ছাত্র ও যুব জীবনের অনলস সাধনা ও প্রাণ-চঞ্চল অধ্যবসায়—একক ও অনন্যসাধারণ শুভবুদ্ধির উজ্জ্বলতা। সেই-ত স্বাধীন ভারতের পরম সম্পদ—জয়যাত্রা পথের মহামূল্য পাথেয়।

আমরা বিশ্বাস করি—তাঁহাদের মননশীলতায় স্থৈর্য, আচরণে শিষ্টতা, আদর্শে আন্তরিক নিষ্ঠা আসিবেই আসিবে—চাই স্থির বুদ্ধি, ধৈর্য ও নৈতিক শক্তি—উত্তেজনা নয়,—চাই উন্মাদনা—।

চিত্তের এই অস্থিরতা মনের এই উত্তেজনা আসন্ন বিপদ হইতে তাহাদিগকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবেনা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেশের যুবকদের সম্পর্কে বলিয়াছেন—

> "Yet mere restiveness will not save them. They have to undergo the tedium of careful study. It may be we have to weild a Scythe. With every sweep the weeds and tares vanish. So does the harvest. The apropriate tool for getting the harvest to the back-breaking hoe. Great men do not fall from heaven but reach upto heaven from earth. It is always simple to fall, there are infinity of angles at which one falls, only one at which one stands. It is youth that has to work and build. Let not our to-morrow be flaiser than the former day"—

অর্থাৎ—

তথাপি শুধু চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা তাহাদের রক্ষা করিতে পারিবে না। কষ্ট স্বীকার করিয়া সকল বিষয় বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রণিধান করিতে হইবে। অনুসন্ধানের দ্বারা কার্যকারণ নির্ণয় করিতে হইবে। এমনও হইতে পারে যে আমাদের নিজেদেরই কোদাল ধরিতে হইবে। এক এক কোপে আগাছা নির্মূল হইবে সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু শস্যও বিনষ্ট হইবে। শস্য পাইতে হইলে আগে তাহার আসল অস্ত্র নিড়ানি চালাইতে হয়। এ কাজ বিশেষ শ্রমসাধ্য। মহাপুরুষেরা স্বর্গ হইতে নূপ করিয়া মাটিতে পড়েন না, মাটি হইতেই তাঁহারা স্বর্গের দিকে উঠিয়া যান। পড়িয়া যাওয়া সব সময়েই খুব সহজ এবং তার অসংখ্য পথও আছে কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকার পথ মাত্র একটি। আজ দেশের যুব শক্তিকেই কাজে নামিতে হইবে—দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। গত কল্যের অপেক্ষা আগামী কল্য যেন তাহাদের কাছে অধিকতর মিথ্যা হইয়া না দাঁড়ায়।

তাই বলিতেছিলাম—আজিকার দিনে ছাত্র ও যুব সমাজের দায়িত্বকে বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগকে আমরা যেন রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্রীড়নক রূপে ব্যবহার না করি। তাঁহারা যদি চিন্তা করিবার, বিচার করিবার সুযোগ পান তাহা হইলে তাঁহারা একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিবেন যে স্বাধীন রাষ্ট্রে আমরা এক ও অবিচ্ছিন্ন জাতি; একই আদর্শে, একই লক্ষ্যে, একই স্বার্থে আমাদের সমগ্রের দেশ সেবাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব জ্ঞান তাঁহাদের আপনা হইতেই আসিবে।

আমাদের একান্ত আবেদন আজ ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে—তাঁহারা যেন সাময়িক উত্তেজনা বা আশু ফল লাভের দুর্দমনীয় আশায় জাতির ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া না যান, আমাদের ঐতিহাসিক মহিমা—যেন তথাকথিত বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে কলঙ্কিত না হয়, আগামীকালের যাত্রাপথ যেন আমাদের ঐতিহাসিক অভ্যুদয়ের নির্মল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

আজ "বিপ্লব" কথাটির অপপ্রয়োগ বক্তৃতামঞ্চে রাজপথে ও কার্যক্ষেত্রে ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। যাহার স্বাধীন চিন্তাধারা আছে, স্বকীয় মতবাদ আছে, অনন্য নির্ভর স্বাজাত্যবোধ আছে—আত্মনিষ্ঠ দেশসেবার প্রেরণা আছে—সবার উপর যাহার চিত্তে অনল-শুদ্ধ পবিত্রতা আছে—মহান কার্য সাধনে আত্মদান করিবার আত্মশক্তি আছে—তিনিই বিপ্লবের বাণী শুনাইবার অধিকারী—তিনি বিপ্লবের দ্বারা কল্যাণের পথ প্রশস্ত করেন—বিপ্লবের নামে অনাচার ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন না। আজ দেশের কল্যাণে জীবন-দানের আদর্শই বড় আদর্শ—আমাদিগকে ব্যক্তি দল ও মত নির্বিশেষে সেই জীবন-দানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা সকলে যেন দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে বলিতে পারি—

"To the last breath of our lives, to the last child of our mothers, to the last stone of our dwellings—all is there my Country. Accept the gift I make thee of my strength, my hopes, my joys and my sorrows, of all my being filled with the passion of thee. Pardon thy children of their errors of past days. Cover them with thy glory—put them to sleep on thy flag. Rise victorious and renewed upon their graves. Let our holocaust save thee"—(Captain Robert Duberley's Dairy—France)

হে আমার দেশজননী, আমাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত, আমাদের গৃহের শেষ ইষ্টক খণ্ড পর্যন্ত সবই তোমার। আমরা আজ আমাদের শক্তির, আমাদের আশার ও আনন্দের, দুঃখ ও শোকের দ্বারা তোমার প্রতি প্রেমপূর্ণ স্বত্বার অর্ঘ রচনা করিয়া তোমাকে নিবেদন করি। তুমি গ্রহণ কর। তোমার সন্তানদিগের অতীত অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। তাহাদিগকে তোমার গৌরবে তুমি গৌরবমণ্ডিত কর—তোমার পতাকাতলে তাহাদিগকে শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হইতে দাও, তাহাদিগের আহুতির পবিত্র অঙ্গের উপর তুমি গৌরবান্বিতা ও বিজয়িনী হইয়া—সমুত্থিত হও।

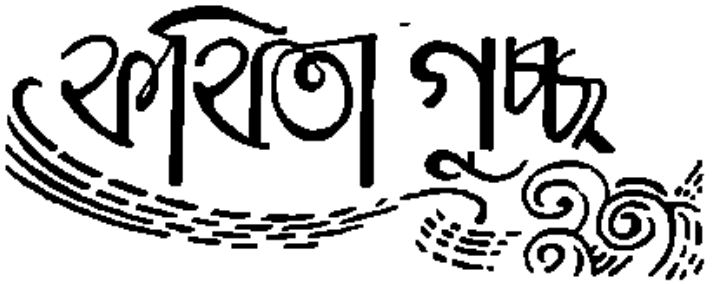

জীবন ঃ কবিতা

প্রভাকর মাঝি

জীবনই তো বিরাট কবিতা
মুহূর্তের মূল্যায়নে লেখা হয় নব সঞ্চয়িতা
অন্তরের গহন-গভীরে
ভোরের শিশিরে, কিংবা বৈকালের ক্লান্ত নদী-নীরে
তরুণী-প্রিয়ার গণ্ডে, রাঙ-ধনু পাখা-আঁকা কবিসুর রোদে
বিষাদে আমোদে
জাগে সে বিস্ময়
যে উষ্ণ আবেগ আর যে যন্ত্রণা সমুচিত হয়,
মনকে তারাই করে সতত উন্মন,
কাব্য হয় তখনি জীবন।
প্রতিদিনকার দুঃখে স্বেদে আর ক্লেদে
মানুষিক সত্যতা পুষ্ট এই নরমেধে
কখনো অমৃত পাই, কখনো গরল,
প্রাণ-পুষ্প তবু তো প্রোজ্জ্বল!
ক্লান্তিতে কি পরাজয়ে
মৈনাক-মানস যেতে পারে নি কো ক্ষয়ে।
যন্ত্রণার গাঢ় সোমরস
শিথিল শিরায় মাঝে জাগাইয়া দেয় দুঃসাহস।
বন্ধ-বিশ্ব ভাসুক সাধনা,
যত নেশ জমে উঠে, তত চলে সূর্যের সাধনা।
চারি দেওয়ালের বন্দী অকস্মাৎ অনন্তে উধাও,
যে জীবনে ঝড় নেই, সে জীবনে নেই কবিতাও।
সহস্র বর্ষের আয়ু পেলে তার পর,
এ জীবনে বোঝা যেত কেমন সুন্দর!
কোন্ সে বিশেষ অর্থ নিয়ে
ফুল ফুটে, প্রজাপতি উড়ে ফিরে ডানা ঝাপটিয়ে।
আকাশের, নক্ষত্রের, পৃথিবীর ভাষা,
চেতনার অন্তস্তরে কিছু বোঝা যেত ভালবাসা
কার নাম।
পরিমিত পরিধিতে কতটুকু বুঝি তার দাম?
চেখে চেখে দেখে এই জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান,
কবিতার রস করি পান।

আগমনী

সনতকুমার মিত্র

ধূলোর ঝড় নিলীন হোলো দূরে,
বৃষ্টি-সুরও নূপুর-নিক্কণে
অতিক্রম করেছে পথ ; মনে
সে আসে তাই শিউলি ঝরা সুরে।
কাশের শীষ পথের দুই ধারে
ব্যজনে তার ক্লান্তি করে দূর ;
শিশির-টিপ চয়ন-সুমধুর
প্রতিটি ভোর—নিকট করে তারে।

সব আসে শিউলি ঝরা ঘাসে :
ধমনী রক্তে নূপুর-ধ্বনি শুনে,
আকাঙ্ক্ষিত আলোর বীজ বুনে,
প্রাণের প্রেম প্রতিমা ঘরে হাসে।

আমার সে দিনগুলি

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আমার সে দিনগুলি—বিচিত্র, রঙিন ভাবনার
রামধনু পাখা নিয়ে গেয়েছিলো গান; ভাবিনিতো
উবে যাবে দুদিনেই! সে-বিচিত্র মনের আকাশ
এখন ধূমল চিতা। পিছনের দীর্ঘ ইতিহাস
অবিশ্রান্ত মনে হয়। তুমি নেই। তুমি নেই যার—
সে-প্রান্তর মরু হয়, সে-আকাশ হয় রুক্ষ, মৃত।
ফাল্গুনের শেষে চৈত্ররাতে তার আকাশ-বাসর
নিভন্ত তারারা রচে, ব্যর্থ হয় দিনের আসর।

আমার সে দিনগুলি—ধুলো-ঝড়া চৈতের বাতাসে
বিবর্ণ পাতার মত উড়ে গিয়ে কোথা হলো জড়ো!
রুক্ষচূড়া ঝরে গেছে, কী-রঙে হৃদয় তবে ভরো!
নিশানা তাহার আলো খুঁজে-ফিরি দেহ-মনে, ঘাসে!
কতো রাতে কান পাতি শ্রাবণের রিমঝিম বর্ষণে,
তোমার বুকের তাপ গান হয়ে নামে যদি মনে।
আমার সে-দিনগুলি—বিচিত্র, রঙিন ভাবনার
রামধনু পাখা নিয়ে ফিরবে না আকাশে আমার।

আশ্রয়

অমলকান্তি ঘোষ

১

দারুণ শ্রমের আল্পনা আঁকা
অঙ্গে আননে।.....ক্রতগতি তার দিনের বলাকা
সোনালী সকালে উড়ে গিয়ে এলো এই অঙ্গনে।
ক্লান্তির লতা ঢাকা উপবনে।

সারাদিনে তার
নিঃশেষ হল অনেক পানীয়, অনেক আধার।

পত্র দিয়েছে উত্তমর্ণ
সম্ভব হ'লে সেই ঋণটাকে—।
অফিস দিয়েছে মৃদু গঞ্জনা,
মৃদু গঞ্জনা সমুদ্র ডাকে।
বন্ধুরা তাঁকে অবহেলা দিয়ে
শান্ত আগুন জেলেছে বক্ষে।
পৃথিবী দিয়েছে ঔদাসীন্য।...
এত অযত্ন সেই অলককে ;
তবুও ত কালো।...অন্তরে তাঁর তৃপ্ত বেদনা।
হৃদয় বলেছে, "তুমি সান্ত্বনা"।

২

দারুণ শ্রমের আল্পনা আঁকা অঙ্গে আননে।
বুঝি তারো বেশী আঁকা মনে মনে।—

সকাল হতেই উনোন জ্বালায়, ধোঁয়ায় নাময় কান্না প্রপাত ;
আগে চা বানায়, সাড়ে নয়টায় বেড়ে দেয় ভাত।

ভৃত্য সে নয় আজ্ঞা-পালক।
পুত্রটি তার অতি দুরন্ত।
কয়লা ঘাটতি.....কলে জল নেই।
প্রতিবেশী যেন কলহযন্ত্র।...
চারটি দেয়ালে বন্দিনী হয়ে
সারাটি দুপুর নির্জন বাস।
আবার বিকেল—সন্ধ্যা-রাত্রি—
এক মুহূর্ত নেই অবকাশ।
তবু ও হৃদয় পেল স্রোতময় ফল্গু-প্রেরণা।
হৃদয় বলেছে, তুমি সান্ত্বনা।

চলাচল

শ্রীপার্থপ্রতিম চৌধুরী

পৃথিবী চলেছে। মানুষ চলেছে। কারখানা চলে ওই :
অমৃতের পথে পৃথিবীর চলা সত্য
এ চলার পথে স্থবির জাতক আমি শুধু চেয়ে রই
অবাক দু'চোখ খুঁজে ফেরে দেখি নানা সন্ধানী তথ্য।

অর্থ চলেছে। বচসা চলেছে। রকমারী ঝঞ্ঝাটে :
মানুষ চলেছে ভুবনের হাটে-হাটে।
চলার পথের ঠিকানা রয়েছে তারি নানা ইংগিতে
সকলি চলেছে কি এক নেশায় এই ঘোর পৃথিবীতে।

অনেক চলারে শেষ করে আজ অলস বিকেল বেলা :
ছেড়েছি এবার বহু পুরাতন সেই সে চলার খেলা।
এখন দু'চোখে ভীরুভয়ে দেখি আশ্বিন চলে আসে :
আমারি হৃদয়ে আজিও তাহার নানান্ স্মৃতি'রা ভাসে।

এই অবসরে, অগোচরে, শুধু চুরি করে আমি তাই :
অমৃতের পথে পৃথিবীর এই চলাটুকু দেখে যাই।

ডোবা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

বাড়ীর কাছেই ডোবা ছিল, বাড়ীর কাছে ছিল ডোবা।
নয় কো মোটেই মনোলোভা।
ছেলের দলে ছিপ ফেলিত,
ট্যাংরা পুঁটি মাছ মিলিত,
তেঁতুল শাখায় বক বসিত,
তাহাই তাহার ছিল শোভা।

২

সবাই সেবা মাত্র তো বাসন, সখ করে ডুব দিত আসি,
জল থাকিত বারোমাসই।
পচা ডোবা বৃথায় খোঁজো ?
ভেবেছিলাম বুঝিয়ে দেবো,
বলতো মশায় আজ্ঞা ওটা
শিক্ষিত সব পল্লীবাসী।

৩

উপেক্ষা ও অনাদরে অবজ্ঞাতই ছিল ওটা
অবাক দেখে পদ্ম ফোটা!
পদ্ম ফুলের সে কি বাহার
পচা ডোবা নাইকো তো আর,
একেবারে ধন্য নূতন—
মা কমলার মণিকোঠা।

৪

বাঃ রে ডোবা বাঃ রে ডোবা, বারবারই বলছি আমি,
আজ আমি তোর প্রসাদ কামী।
কি তপস্যা করলি চুপে ?
উঠ্‌লি ভরে রসে রূপে,
গৌরবে তুই বড়িয়ে দিলি
অগৌরবের সে দিন যামি।

হাতছানি

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

হায় রে এ হাতছানি !
গন্তব্য জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে কিসের প্রত্যাশা ?
কখনো বুঝেও বটে বুঝিতে পারিনা ভাসা ভাসা
অর্থ এর, কখনো বা না জেনেও জানি !

বাইরে শ্যামল রঙ, কাঁচা ঘাস
প্রকৃতি সবুজ, মেটে নদী, চঞ্চল বাতাস
সুরের লহরী তোলা : চিকণ পাতায় পড়া রোদের আলোয়
মনে হয় সবুজাভ ছোট ছোট আলোর ছায়ার
সংকেতের হাতছানি সে-কোন্ মায়ার ?
পরম আদরে ডাকা ছোট হাতে এ কার ইসারা ?
উদয়াস্ত জোয়ালের ঘায়ে ঘায়ে কাঁদিল চোয়াল—
তখন হঠাৎ এই কিসের বা হাতছানি ?
জানিনা—তবুও কিন্তু মনে হয়, জানি, জানি !

শরতের গান

শান্তশীল দাস

জানি তুমি আসবে নাকো, আছো অনেক দূরে যে,
ব্যস্ত আছো অনেক কাজে, নেই কো মোটেই অবসর ;
শিউলী-ঝরা আজ সকালে কাজ-ভোলানো সুরে যে
বাজছে বাঁশী—সে সুরখানি পৌঁছোবে না তোমার ঘর।

কাজ-ভোলা এই আমার ঘরে একা বসে জানলাতে,
তাকিয়ে আছি আকাশ পানে, আলোক-ঝরা নীল আকাশ ;
শিউলী ফুলে গাঁথছে মালা কিশোরীদল একসাথে—
তাদের কল-কাকলীতে ভরছে আমার অবকাশ।

ওই আকাশের পানে চেয়ে এলোমেলো কল্পনায়
আপন মনে বুনছি কত খেয়াল-খুশির রঙিন জাল ;
লাগছে ভারি মিষ্টি মধুর কাজ-ভোলান ভোর বেলায় ;
এমনি করে কাটতো যদি এই জীবনের সব সকাল।

হঠাৎ কেন পড়ল মনে তোমার কথা কে জানে !
বিস্মরণের অন্তরালে ছিল যে সব অতীতের ;
তোমার হাসি মুখখানা কে মিষ্টি তুলির এক টানে
আঁকলো যে ওই আকাশ পটে একটুও তো পাইকি টের।

বেশ ভাল হয় হঠাৎ যদি সেই আগেকার নাম ধরে
লাফিয়ে আস দুয়ার ঠেলে তেমনি নাচের ভংগীতে ;
যেমন করে আসতে তুমি নিত্য আমার এই ঘরে :
ভাবতে ভারি লাগছে ভালো এই শরতের সংগীতে।

আমার দেশ

শ্রীকরুণাময় বসু

আবার যেতেছি ফিরে গ্রামান্তের সরু পথ ধরে
বিদেশ বিভুঁই দেশে, যেথা রুক্ষ মত্ত রৌদ্র জলে,
যেখানে শ্যামল বনে মায়াময় ঘনছায়া নেই,
পাতি হাঁস চোখ বুজে খোঁজেনা ত সবুজ শ্যাওলা।

চলে যাই, ফিরে চাই, বকুলের ঘন ছায়াবন
হেলায়ে ফুলের শাখা ছায়া মাখা ডাক দিয়ে যায় ;
দুধরে বিকেল নামে, পক্ষীরা ঘুমানো বিকেল,
বুঁই ফুল উড়ে যায় এক কৌটা সরু পাখা মেলি।

কোথায় আমার দেশ ? কালো জলে কাজলপ্রহর,
কলা বনে কুঁড়ে ঘর, চাঁপা গন্ধে সুরভিত রাত ;
নিঝুম স্বপ্নের মতো রেখে যায় পল্লীর নিশ্বাস,
তারপর ভোর বেলা ফুটে ওঠে পদ্মকুঁড়ি দিন।

আকাশে হাঁসের সারি, ঘন বনে ফুলের পসরা,
সোনালি রৌদ্রের রঙ, গোধূলিতে ঘুমের কাজল ;—
সেই তো আমার দেশ চেয়ে আছে কতো, কতোদূরে,
নির্জন মুঠোয় ভরি দিয়ে গেল মায়ের সান্ত্বনা।

দুপুর-পরিক্রমা

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

অনেক দুপুরে চড়ুয়ের ঠোঁটে পেয়েছি গোপন চিঠি
কার্নিশে এসে পাক খেয়ে গেছে প্রীতমের ধূ-ধূ রোদ,
কাগজের কোলে কলমের মুখ, চমকে উঠেছে মন,
পায়রেতনাড়ে ঘুলঘুলি সুর বুঝিয়ে দেয়নি কেউ।

কতো ডালিয়ার পাপড়ি ঝরেছে দুপুরে রোদের ভীড়ে,
আগামী কালের কত রঙ ছবি দ্বিপ্রাহরিক খামে
মুড়ে তুলে রেখে সন্ধ্যালোকের কোরেছে সে বন্দনা।
যত ছেঁড়া সুর গানের বাঁধায়, যতো ছায়া-ঘেরা আলো।

তেতালা বাড়ীর টিলের কোঠায় নিষন্ন অবসাদ
শুকনুখর আকাশের স্বরে টলেছে মনের বেদী,
রোদ্দুর ঘন, নির্জন সুর ততো গ্রাম থেকে গ্রামে,
বিচ্ছিন্ন বাঁচার ঘুনসিঁড়ি নদী হৃদয়-কম্প তীরে।

এমনি করেই কেটে যেত দিন, সরে যেত ধূধূ আলো,
মধুপুরে আজ নিবিড় দুপুরে মেঘহীন আশ্বিনে,
ভুলে যেতে যেতে মনে পড়ে যায় দিন পঞ্জুতীর কথা,
ডায়েরী তো শেষ, কল্পনাতেই স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি॥

এ পথে আমি যে

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি চলে যাবে এই পথ দিয়ে দূরে।
এই ধুলো-ঘাসে ছায়াসুর্যের গান
যেন লজ্জায় রাঙা হলো কার সুরে—
শিশুর স্বপ্ন মুঠো-মুঠো অভিমান!

পথের দুপাশে বকুল-পারুল ঝরে।
আমি বলি ডেকে : 'সে যদি কখনো আসে
ব'লো তাকে তার প্রতীক্ষা ক'রে-ক'রে—
সন্ধ্যাদকাল দিবসরজনী ধ'রে—
একটি হৃদয় বেদনার প্রতিভাসে
ফিরে চলে গেছে অবশেষে তার ঘরে।

ব'লো তাকে এই পথের ধুলোয় ঘাসে
একটি প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা-আশা
দুঃখ-বেদনা বিজড়িত ভালবাসা
মিশে আছে তবু শিশির রেণুর সুরে,
সে আসবে—এই পুরাতন আশ্বাসে।'

তুমি চলে যেয়ো এই পথ দিয়ে দূরে॥

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক ও কৃষিঋণ

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দত্ত।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে মূল ব্যাংকের (Central Bank) উদ্দেশ্যের কোন সংজ্ঞা ছিলনা—কতগুলো ধরাবাঁধা কাজ করা ছাড়া এদের আর কিছু করবার ক্ষমতা ছিলনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরও এ অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। ১৯৩০ এর মন্দা (depression) জাতীয় অর্থনীতির উপর মূল ব্যাংকের তথা আর্থিক নীতির (monetary policy) ক্ষমতা সম্বন্ধে ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দা পর্যন্ত সোনা সংরক্ষণের (gold reserve) দিকে লক্ষ্য রেখেই আর্থিক নীতি নির্ধারিত হত—মন্দার পর এ দিকে পরিবর্তন দেখা দেয়। ঐ সময় থেকেই কেন্দ্রীয় বা মূল ব্যাংকিং নীতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করা। এরূপ সহায়তা করার পথ হিসাবে ধরা হয়;—দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থব্যবস্থা, আর্থিক কাঠামোর স্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা দূরীকরণ, ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষির প্রয়োজনে ঋণ সংস্থান, সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য, বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার (Financial institutions) মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা (coordination); বিদেশী মুদ্রা উপার্জন, বিদেশের বাজারে মুদ্রার মান বজায় রাখা, এবং বিভিন্ন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে সমভাবে ঋণ বণ্টন (equitable distribution of credit)—অর্থাৎ, দেশের আর্থিক কাঠামোর উপর সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য বিস্তার করা মূল ব্যাংকিং এর প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক প্রস্তাবনায় (preamble) আর্থিক স্থিতিশীলতাই (monetary stability) এর উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্যে trade cycle এর ক্ষতিকারক ক্ষমতা নষ্ট করা একান্ত দরকার এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এদিকেও বিশেষ নজর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মুদ্রা বিনিময় স্থিতিশীলতাও (exchange stability) মূল ব্যাংক-নীতির আর একটা লক্ষ্য। কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে trade cycle এর ক্ষতি করবার ক্ষমতা বেশী, কারণ এদের বহির্বাণিজ্যের (Foreign trade) গতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এরা কাঁচামাল রপ্তানী করে এবং যন্ত্রপাতি ও বিলাসদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করে। কাঁচামালের উৎপাদন প্রধানতঃ নির্ভর করে প্রকৃতির খেয়ালের উপর, কারণ এ সমস্ত দেশে যান্ত্রিক কৃষি (mechanised agriculture) উন্নতি লাভ করেনি। কাজেই বিদেশে কাঁচামালের চাহিদা ও বিদেশীর অন্যান্য মাল সরবরাহের ক্ষমতা এবং দরের সঙ্গে এদের আর্থিক অবস্থা জড়িত। তাই বিদেশে trade cycle হলে তার ঢেউ এসব দেশের আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে দিতে পারে। এর জন্য মূল ব্যাংকের প্রধান কর্তব্য কৃষি উন্নয়নের সহায়তা করে শুধু দেশের চাহিদা ও বিদেশে রপ্তানী বাড়ানোই নয়, রপ্তানীর একটা অনুপাত বজায় রাখার সহায়তা করা। এছাড়া প্রকৃতির খেয়ালের উপর আর্থিক কাঠামোর নির্ভর দূর করা একান্ত দরকার বলে কৃষি উন্নয়নের দিকে কেন্দ্রীয় বা মূল ব্যাংকের যথেষ্ট নজর দেওয়া উচিত।

প্রায় সমস্ত দেশেই উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি ব্যাংকিং নীতির প্রধান লক্ষ্য হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় রয়েল কমিশন ১৯৩৭ সালে এদিকটা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। ক্যানাডা, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের দিকে তাকালেও এ সত্য চোখে পড়ে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকও এ বিষয়ে একমত। অনুন্নত দেশের আর্থিক উন্নয়নের মূল ব্যাংকিং এর প্রথম ও প্রধান কাজ কৃষির উন্নয়ন, কৃষিজ দ্রব্যের সরবরাহের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ঠিক রাখায় সহায়তা এবং কৃষকের আয়বৃদ্ধির সহায়তা করা। কারণ এ সমস্ত দেশে কৃষকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ এবং এ সব দেশের উৎপাদন

কাজ বলতে প্রধানতঃ কৃষি উৎপাদন বুঝায়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছে।

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ—কৃষি কর্মের গুরুত্ব এখানে অত্যন্ত বেশী, কৃষক ভারতের মেরুদণ্ড এবং তার সুখেই ভারতের প্রকৃত সুখ ও উন্নতি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৭৯% ভারতীয় কৃষি থেকে জীবিকাসংগ্রহ করে এবং এভাবে ৩৬ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ২৮ কোটিই কৃষিকার্যের উপরে নির্ভর করে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষিকার্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যেকেই স্বীকার করে এবং প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা এর উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্পের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়া হলেও কৃষিকেও উপেক্ষা করা হয় নি। ভারতে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ছিল ১৯৫০-৫১ সালে ৫৪ মিলিয়ন টন আর ১৯৫৫-৫৬ সালে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৫ মিলিয়ন টনে। ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট পাট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪১.৪ লক্ষ বেল; তার আগের বছর এর পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ বেল। ১৯৫৪-৫৫ সালে তুলা উৎপাদন হয় ৪২.২৭ লক্ষ বেল; ১৯৫৩-৫৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৯.৪৪ লক্ষ বেল। ১৯৫৩-১৪ সালের ৪.৪ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ১৯৫৪-৫৫ সালে আখের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.৫ মিলিয়ন টন। এভাবে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকটি কৃষিদ্রব্যের উৎপাদনই বেড়েছে। কিন্তু এ বৃদ্ধি দেখে আত্মতুষ্টির কোন কারণ নেই; কারণ আমাদের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা ও ইণ্ডাষ্ট্রিগুলোর কাঁচামালের প্রয়োজনে কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা জনসাধারণের বিবেচনা শেষ হবার আগেই কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরও বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যদপ্তর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকে আরও বেশী ঝোঁক দেবার যৌক্তিকতা একবাক্যে স্বীকার করেছে এবং আগামী পাঁচ বছরে উৎপাদন প্রায় ৪০% বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে। ইতোমধ্যেই খাদ্যদ্রব্যের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত জনগণের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে খাদ্যমূল্য তাল রেখায় রাখেনি, এতে সরকারপক্ষের চিন্তা ও দুর্ভাবনার অন্ত নেই। বিদেশ থেকে আমদানী, দেশের রপ্তানী বন্ধ ইত্যাদি বহু উপায়ে সরকার এ মূল্যবৃদ্ধি রোধের চেষ্টা করছে। দরবৃদ্ধিতে যেমন জনগণের অসুবিধা, তেমনি পরিকল্পনা সার্থক করবার পথেও বাধা; কারণ বিদেশ থেকে আমদানী করে যে টাকা বিদেশে যায় তা পরিকল্পনার কাজে ব্যয় করা যায় আর দেশেও পরিকল্পনা ব্যয় বেড়ে যাবে, কারণ শ্রমের মজুরী ও জিনিষপত্রের দর বেড়ে যাবে আর অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ের পর জনসাধারণের হাতে এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকবেনা যা দিয়ে স্বল্পসঞ্চয় পরিকল্পনার ৫০০ কোটি টাকা ও সরকারী ঋণের ৭০০ কোটি টাকা তোলার সহায়তা হয়। তাই কৃষির উন্নয়ন সবচেয়ে আগে দরকার।

একথা ভুললে চলবেনা যে কৃষকদের কৃষিকার্যে ব্যয় করবার মত অধিক সঙ্গতির ব্যবস্থা না থাকলে কখনই কৃষিউৎপাদন আশানুরূপ বাড়তে পারে না। কৃষির উন্নতির জন্যে শুধু উন্নত ধরণের সার, সেচ প্রণালী ও সমবায় শিক্ষা বিস্তারই যথেষ্ট নয়, কৃষকের আর্থিক উন্নতি প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন। ভারতীয় মূলব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক এ দিকে কতটা সহায়তা করেছে এবং কি পরিমাণ সার্থক হয়েছে তা বিচার করে দেখা দরকার। কৃষির প্রয়োজনে অর্থ সরবরাহ করা রিজার্ভ ব্যাংকের একটা প্রধান কর্তব্য এ সম্বন্ধে আর কারো দ্বিমত নেই। ১৯৩৭ সালে ডালিং রিপোর্টে রিজার্ভ ব্যাংককে কৃষিঋণের ব্যাপারে ওয়াকেবহাল করে দেওয়া হয়। শুরু থেকেই রিজার্ভ ব্যাংক এর কৃষিঋণ বিভাগের (Agricultural Credit Department) মাধ্যমে কৃষিঋণ যোগানোর ভার নিয়েছে। এই বিভাগ কৃষিঋণের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে সুসমাধানের চেষ্টা করে; এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোকে কৃষিঋণ সম্বন্ধে পরামর্শ দেয়।

গ্রাম্য মহাজন (village moneylender) ও দেশীয় ব্যাংক (indigenous bank) গুলো কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের প্রায় ৮৯% সরবরাহ করে; নানামহল থেকে এদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে এরা ভারতী কৃষির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে। কৃষক তার প্রয়োজনে সময়ে অসময়ে এদের কাছ থেকে অর্থ পায় এবং এদেরও কৃষকের

প্রয়োজন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। কৃষকের উপর এদের এত বেশী ক্ষমতা থাকায় এদের আইনের গণ্ডীর বাইরে রেখে কোনও ব্যাংকিং ব্যবস্থাই সার্থকভাবে কৃষিঋণের সমস্যা সমাধান করতে পারেনা। এ কথা বলা হয়েছে যে, "until the vast portion of India's banking and credit which is represented by the indigenous banker is put into gear with the Reserve Bank, credit functions in India cannot be successfully operated". এদের মাধ্যমে কৃষকের সাহায্যের সুবিধা করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাংক কতকগুলো শর্তাধীনে সিডিউল্ড ব্যাংকের মত এদেরও রি-ডিস্কাউন্টিং (re-discounting) সুবিধা দেয়, কিন্তু এদের সাড়া আশানুরূপ হয় নি।

ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাই কৃষিঋণের জন্যে রিজার্ভ ব্যাংক এদের কি কি সুবিধা দেয় তা আলোচনা করা দরকার। এ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংক প্রধানতঃ এদের মাধ্যমেই কৃষিঋণ সরবরাহ করেছে। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক (Provincial Co-operation Bank) জমি বন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Bank) গুলো রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংকগুলো দুইভাবে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে সুবিধা আদায় করছে—এরা ঋণ পায়, আবার বাট্টার (discounting) সুবিধাও পায়। এর জন্যে সুদের হারও কম। রিজার্ভ ব্যাংকের হারের ১½% কমে এরা ঋণ পায়। এছাড়া রিজার্ভ ব্যাংক গোলাঘর রসিদ (ware house receipt) সরকারী সিকিউরিটি ইত্যাদির বিনিময়ে ধার দেয়। বাট্টাক্ষেত্রে ১৫ মাস পর্যন্ত সময় দেয়। এগুলো সবই স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের কথা বলতে গেলে রিজার্ভ ব্যাংক এখনও পর্যন্ত এদিকে খুব বেশী কিছু করেনি। জমি বন্ধকী ব্যাংকগুলোর ডিবেঞ্চার কিনে রিজার্ভ ব্যাংক এ সমস্ত ব্যাংকগুলোর আর্থিক ক্ষমতা বাড়ায় এবং এরা জমি বন্ধক রেখে কৃষককে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়। রিজার্ভ ব্যাংক এদের ২০% ডিবেঞ্চার কেনে এবং অপ্রত্যক্ষভাবে (indirectly) কৃষকদের কিছুটা সাহায্য করে।

রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয়করণের আগে ঋণদান ব্যাপারে আইনকানুন অত্যন্ত শক্ত ছিল বলে এর সাহায্য খুব কার্যকরী করা যায়নি। জাতীয়করণের পরে নিয়মকানুন অনেকটা সহজ করা হয়েছে এবং ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংকের কাজ বেড়ে গেছে। ১৯৪৬, ১৯৫১, ও ১৯৫৪ সালের হিসাবে দেখা যায় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংকগুলো রিজার্ভ ব্যাংক থেকে যথাক্রমে ১.৪ লক্ষ ১২৫১.৩৩ লক্ষ ও ২২০৯.০০ লক্ষ টাকা ধার ও দাদন নেয়। এতে জাতীয়করণের পর রিজার্ভ ব্যাংক যে বেশী পরিমাণে ধার ও দাদন দিচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রিজার্ভ ব্যাংক থেকে দাদন নিয়ে সিডিউল্ড ব্যাংকগুলো ১৯৫৪ সালে কৃষিক্ষেত্রে প্রায় ১১.৩ কোটি টাকা ধার দিয়েছে।

কৃষিঋণ সরবরাহের সুবিধার জন্যে বহুবার রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়মকানুন (statute) বদলাতে হয়েছে, কৃষিঋণ সমস্যা ও সমাধানের পথ সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবার জন্যে All India Rural Credit Survey Committee স্থাপন করা হয়। কমিটি কৃষিঋণ ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে সমাধানের পথ সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। কমিটির মতে রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্যসরকার গুলোকে সাহায্য করবে, রাজ্যসরকারগুলো আবার প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক ও বড় বড় প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোকে আর্থিক সাহায্য করবে। জমি বন্ধকী ব্যাংকগুলোকে সরাসরি রিজার্ভ ব্যাংক অর্থ সাহায্য করুক—কমিটি এ মতও প্রকাশ করেছে।

কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করবার জন্যে ১৯৫৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন করা হয়েছে এবং National Agricultural Credit (long term) Operations Fund ও National Agricultural Credit (stabilisation) Fund খোলা হয়েছে, এ দুটি সংস্থার সাহায্যে দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ ও সারা দেশ জুড়ে একটা বিস্তৃত কৃষিঋণ পরিকল্পনা সার্থক করবার জন্যে স্থায়ী ব্যবস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই ইম্পিরিয়াল ব্যাংক রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে।

কৃষিঋণ ব্যাপারে এর দায়িত্ব প্রচুর। আগামী পাঁচ বছরে ছোট ছোট সহরে এর ৪০০ শাখা খোলা হবে। এরই মধ্যে প্রায় ৩৫টি শাখা খোলা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক সব সময় এর কাজকর্ম দেখা শুনা করবে। এই নতুন ব্যাংকের একটা প্রধান কাজ সমবায় ব্যাংকগুলোকে অর্থ দাদন ও কৃষি-দ্রব্যের বিনিময়ে অগ্রিম দেওয়া।

কিছুদিন আগেও দেশীয় রাজ্যগুলোতে (বর্তমানে 'খ', 'গ' শ্রেণীর রাজ্য) সমবায় আন্দোলন প্রসার লাভ করেনি। রিজার্ভ ব্যাংকের উদ্যোগে এখন প্রায় প্রতিটি খ ও গ শ্রেণীর রাজ্যে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে। কিছুদিন ধরে রিজার্ভ ব্যাংক কৃষিঋণ বিষয়ে বহু সুযোগ সুবিধে দিচ্ছে। ১৯১১ সালে সাধারণ সুদের হার (Bank Rate) ৩% থেকে বাড়িয়ে ৩½% করা হয়; কিন্তু কৃষিঋণের বেলায় এ হার বাড়ে নি; ১৯৩৩ সালে ব্যাংকের আইন সংশোধন করে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে রিজার্ভ ব্যাংক ৫ বছর মেয়াদে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ধার দিতে পারে। জমির উন্নয়ন, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী, কৃষিযন্ত্র ক্রয় প্রভৃতির জন্যে মধ্যমেয়াদী (medium term) ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে এরূপ ঋণের পরিমাণ ছিল ১২২ কোটি টাকা।

এ ছাড়া রিজার্ভ ব্যাংকের ব্যাংকিং উন্নয়ন বিভাগ (Banking Development Department) সমবায় ব্যাংকের প্রয়োজনবোধে যথাযথ সহায়তা করছে; পরিদর্শন বিভাগ (Inspection Department) সমবায় ব্যাংক এর হিসাব পত্র পরীক্ষা করে ত্রুটি সংশোধন ও উন্নয়নমূলক পরামর্শ দিচ্ছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক ৩৫টি সমবায় ব্যাংকের হিসাব পরীক্ষা করেছে আর ১৯৫২ সালে এর সংখ্যা ছিল মাত্র ২টি। সমবায় শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাংক বিদ্যালয় খুলেছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করা হয়েছে আগামী পাঁচ বছরে ১০,৪০০ কৃষিঋণ বিষয়ক সমবায় সমিতি স্থাপন করা হবে এবং ২২৫ কোটি টাকা ধার দেওয়া হবে। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশমত সরকার থেকে ৪৭ কোটি টাকা নিয়ে ও রিজার্ভ ব্যাংক বাকী টাকা দিয়ে ৩১০টি গোলাঘর ও ৫৫০০ গুদাম তৈরী করবে।

রিজার্ভ ব্যাংক শুরু থেকেই কৃষিঋণ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী এবং কিছু কাল যাবত এর কার্যক্রম বেড়ে চলেছে—উপরোক্ত আলোচনায় তা স্পষ্ট বোঝা যায়, কৃষিঋণ ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক দায়িত্ব সম্বন্ধে এত বেশী ওয়াকেবহাল যে অনেক উন্নত দেশের মূল ব্যাংকের চেয়েও বেশী সুবিধা দিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক সচেষ্ট। অষ্ট্রেলিয়ার মূল ব্যাংক কৃষি বিলের (Agricultural bill) বদলে ৯ মাসের জন্যে দাদন দেয়, রিজার্ভ ব্যাংক দেয় ১৫ মাসের জন্যে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে রিজার্ভ ব্যাংক সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ সার্থক হতে পারে নি। এর কারণ আমাদের দেশে গোলাবাড়ী, (warehouse) কৃষিবিল ও সরকারী সিকিউরিটির সুবিধা খুব কম। আর এসব সুবিধা না থাকলে যে নীতির উপর ভিত্তি করে রিজার্ভ ব্যাংক দাদন ও ঋণ দেবে তারই অভাব ঘটে। এ কারণে শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাংক দাদনের সমতা রক্ষাও হয় না—এখনও ব্যবসায় বাণিজ্যই (trade & commerce) প্রধান ঋণগ্রাহক (borrower), ১৯৫২ সালের হিসাবে দেখা যায় সিডিউল্ড ব্যাংকগুলোর মোট দাদনের মাত্র ৪·১% কৃষিদাদন আর ৪৭% ব্যবসায় বাণিজ্যদাদন ছিল। ১৯৫১ সালে আমেরিকায় কৃষিদাদনের হার ছিল ৬% ও ব্রাজিলে এর পরিমাণ ছিল ৮·৯১ মিলিয়ন ক্রুজেরস্ (ব্রাজিলের মুদ্রা) আর শিল্প-বাণিজ্যে মাত্র ৭৪৯০ মিলিয়ন ক্রুজেরস্। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংকগুলোর হাতে সরকারী সিকিউরিটির পরিমাণ খুব বেশী নয় বলে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ঋণ নেবার ক্ষমতা কম। রিজার্ভ ব্যাংক কৃষি দ্রব্যের বিনিময়ে ঋণ দেয়, কিন্তু এ ঋণ খুব জনপ্রিয় নয়, কারণ ভারতীয় কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের জন্যই ঋণের প্রধান প্রয়োজন, পণ্য উৎপাদনের পর ঋণ নেবার ঝোঁক তার বেশী থাকেনা, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী করাই সাধারণ নিয়ম। এ ছাড়া বিরাট কৃষক সাধারণ ও রিজার্ভ ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্কও খুব কম। রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দেয়, আর এরূপ সমবায় সংস্থা ভারতের কৃষক সাধারণের মাত্র ১৩% নিয়ে গঠিত। ১৯৫১-৫২ সালে প্রাথমিক সমবায় সমিতি মোট ২৪·২১ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ১০৫.৬ কোটি টাকা আর

প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক ৫৫ কোটি টাকা ঋণ ও দাদন দেয়।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ বেড়ে চলেছে; কিন্তু বিরাট কৃষক সংখ্যা ও প্রয়োজনের দিক থেকে মোট ঋণের পরিমাণ খুবই কম। উন্নত দেশের মূল ব্যাংক কৃষি উন্নয়নের জন্যে যা করেছে, তার সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক এখনও বহু পেছনে পড়ে আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এ অবস্থার জন্যে রিজার্ভ ব্যাংককেই সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—অষ্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ্ ব্যাংক (মূল ব্যাংক) বড় বড় কৃষি সংস্থা ও সমবায় ক্রয় বিক্রয় সমিতির (co-operative marketing societies) মাধ্যমে কৃষিঋণ দেয়। লেনদেনের ব্যাপারে এতে সুবিধা প্রচুর। আমাদের দেশে এরূপ বড় বড় কৃষি সংস্থা বা সুসংহত ক্রয় বিক্রয় সমিতির সংখ্যা নগণ্য। তাই রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে অসুবিধা প্রচুর। সমবায় সমিতি যেখানে উন্নত ধরনের সেখানে রিজার্ভ ব্যাংক আশাতীত সাহায্য করেছে—বোম্বাই ও মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত এর প্রমাণ দেয়।

রিজার্ভ ব্যাংক কৃষিঋণের প্রধান সহায়ক হতে উদ্যোগী সন্দেহ নেই। এদিকে কৃতকার্য হতে হলে সমবায় ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন প্রয়োজন—বিশেষ করে সমবায় ঋণদান সমিতি, সমবায় ক্রয় বিক্রয় সমিতি ও গোলাবাড়ী অপরিহার্য। গোলাবাড়ী স্থাপন করা কৃষকদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে সম্ভব নয়। কারণ এদের আর্থিক অবস্থা মোটেই এরূপ বিরাট কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই রিজার্ভ ব্যাংকের নিজ ব্যয়ে এসব তৈরী করা উচিত। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এদিকে লক্ষ্য রাখা হবে—এরূপ স্থির হয়েছে।

আরেকটি প্রধান কাজ দেশীয় ব্যাংক ও গ্রাম্য মহাজনদের সুসংহত করা। কারণ এদের অসংবদ্ধ রেখে টাকার বাজারের (money market) উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে না। সমবায় ব্যাংকে সরকারী সিকিউরিটির অভাব—একথা অত্যন্ত সত্য—তাই রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ঋণ পাবার জন্যে সরকারী সিকিউরিটি বন্ধক রাখার নিয়মের কড়াকড়ি শিথিল করা উচিত।

সুখের ও আশার কথা এই যে রিজার্ভ ব্যাংক এসব দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে গ্রাম ও কৃষিপ্রধান ভারতের প্রতিটি কৃষককে এ ব্যাংকের সহায়তায় আর্থিক-সংগতিপন্ন করে তোলার প্রচেষ্টা চলেছে।

মূল ব্যাংক (Central Bank) জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণধারা, এর সক্রিয় সহায়তা ছাড়া ভারতের কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়—এ সত্য রিজার্ভ ব্যাংক মেনে নিয়ে যথাযথ উন্নয়ন কাজে হাত দিয়েছে।

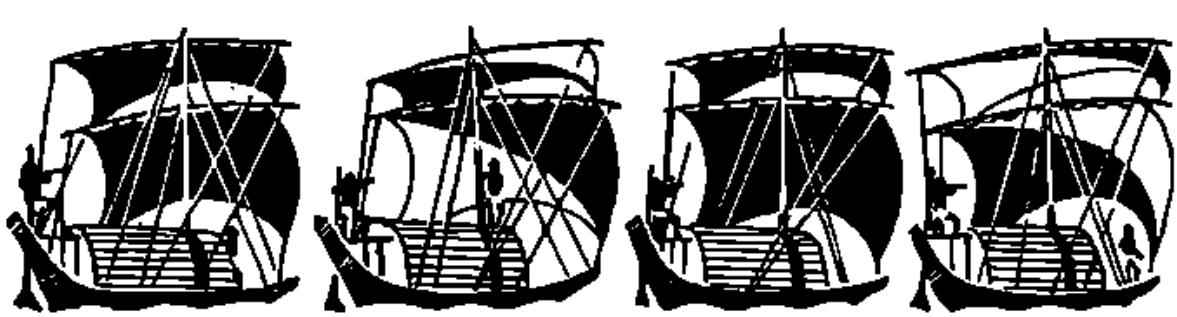

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : 22-6853-58

সাহিত্যের ভিত্তিমূল

[*ধর্ম সাধনা*]

মণেন দত্ত

আমাদের মনে একটি সুসংস্কৃত অভিমান আছে যে একালের বাঙ্গালা সাহিত্যকে আমরাই গড়িয়া তুলিয়াছি। অতীতের সব ভাবসাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহা যেন স্বতন্ত্র-কিছু হইয়াছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরাই এই সাহিত্যকে বিশ্বের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন—এমন দাবীও কেহ-কেহ করিয়া থাকেন। বিশ্ব বলিতে এখানে অনেকেই ইয়োরোপীয় বিশ্ব বুঝিয়া থাকেন। প্রাচ্যে যে অন্যান্য সব দেশ রহিয়াছে তাহাদের কথা আমাদের মনে বড় একটা আসেনা। ইয়োরোপীয় সাহিত্যজগত হইতে হাততালি পাইলে আমরা বুঝিলাম যে, একটা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছি। এদেশে কেহ বা বাঙ্গালার বায়রণ হইয়াছেন। কেহবা বিপুল সমাজ জীবনের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কলঙ্কের কাহিনী লিখিয়া যুগের সমাজ মানসকে (ভ্রষ্ট মানস নহে কি !) তুলিয়া ধরিয়াছেন। এইরূপ সাহিত্য প্রচারধর্মী মন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা সত্যের অনুভূতি হইতে উদ্ভূত নহে, সমগ্র মানবসমাজকে বিশ্বসৃষ্টির একটি অপূর্ব বিকাশ বলিয়া স্বীকার না করিয়া, ইহাকে বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে পরিণত করিয়াছে। ফলে বিশ্বসৃষ্টির প্রতি যে প্রেমানুভূতি, গভীর হৃদয়াবেগ সাধকের অন্তরে জাগ্রত হয় তাহা ব্যাহত হইয়াছে। সাহিত্য সাধনার বস্তু না হইয়া নিছক মস্তিষ্ক-প্রসূত চিন্তার দান হইয়াছে। এই সাহিত্য তথাকথিত বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রণালীর মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদের মনের দুয়ারে আঘাত করিতে থাকে। যেখানে দৃষ্টির স্বচ্ছতা বা গভীরতা নাই সেখানেই ইহারা পাঠকের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কি হইয়াছে জানিনা কিন্তু বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইয়োরোপীয় সমাজ-চেতনার প্রভাবিত ছায়া পড়িয়াছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে অনভিজ্ঞ পাঠক সহসা ঐরূপ মনের পরিচয় পাইয়া অনেকটা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্প স্বল্পকাল আগে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সমাজমনের যে পরিচয় পাইতেছি তাহা আমাদের ঐতিহ্যকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছে। এই নূতনত্ব জাতির মানসিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিয়াছে কি একেবারে বিসর্জন দিয়াছে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। উপন্যাস, গল্প সাধারণত ব্যবহারিক জীবনের সত্যকে লইয়া মগ্ন থাকে বলিয়া জাতির অন্তর সত্তার খবর সব সময় সঠিক পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের কাব্যে দুই চারি শতাব্দী পূর্ব পর্যন্ত জাতির অন্তরসাধনার পরিচয় মিলিত। ইস্‌লাম রাষ্ট্রপ্রভু হইয়াও জাতির নৈতিক ও ধর্মসাধনার আন্দোলন ধ্বংস করিতে পারে নাই। সাময়িক ভাবে কোথায় কোন পরাভব আসিয়া থাকিলেও জাতির অন্তর সত্তার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। ব্যবহারিক জগতে যতই বন্ধন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে ততই চিন্তাশক্তি, ভাব প্রেরণা, নিগূঢ় সাধনার ধনকে পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা বাড়িয়াছে। এদেশে শাসকের হাতে রাজদণ্ড থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানসাধনার নেতৃত্ব কোনদিন শাসকের হাতে যায় নাই। ইহা শুধু ইংরেজ শাসন ও সাহিত্যের আমলেই সম্ভব হইল। কেন, এবং কি কারণে সম্ভব হইল সে প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে অবান্তর। জাতির ধর্মসাধনার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস খুঁজিলেই দেখা যাইবে যে এদেশে জ্ঞান, সাধনা, ধর্মচেতনা গোটা মানুষকে গড়িয়া তুলিয়াছে। কোথায় যে ইহার পরস্পর সংযোগ রহিয়াছে সহসা বুঝাইয়া বলা যায় না বটে, কিন্তু এমন একটা নৈতিক বনিয়াদ আপনার আভ্যন্তরীণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাহার সর্বব্যাপক

প্রভাবে জাতির অন্তরে প্রভাবের ভার বিরাজ করিত। জীবনটা সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহারিক ছিল না, জাগতিক দুঃখকে তাচ্ছিল্যভরে দেখিবার মহতী শিক্ষা সামাজিক মানুষের মানসিক অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। এ 'অভ্যাস' সামাজিক মানুষ সাহিত্যের মধ্যে পাইয়াছিল, কেননা, সাহিত্য ছিল সাধনার অপরিহার্য বিকাশ। ইহার প্রভাব ছোট-বড় কেহই এড়াইতে পারে নাই।

পাশ্চাত্য শিল্প-বিপ্লবের ফলে এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়াছে। মানবের অর্থ নৈতিক মুক্তি চেতনা রাজ্যে রাজ্যে দেশে দেশে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া আজ যে শিল্প বিপ্লবের জন্য ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাইতেছে ইহার শুভাশুভ ফল জাতির সাহিত্যের মধ্যে দেখা দিবেই। অতিরিক্ত বিষয়াসক্ত মন সৃষ্টি হইবে মাত্র। ফলে সমাজের শান্তি, শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির ভাব লুপ্ত হইবে। বস্তুত পক্ষে ইহা এখনই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। মানব মনে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সাহিত্যে খামখেয়ালী চরিত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। ব্যক্তি যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া তৃণের মত কাল প্রবাহে ভাসিতেছে। কিন্তু ভারতীয় সাধনমার্গে ব্যক্তি অর্থ পূর্ণ সত্তা। ইহা বাদে সব মানুষকেই পরমসত্তার অংশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেকটি জীবের এই খণ্ড অংশ হইতে অখণ্ড পূর্ণ অংশে মিলিত হইবার প্রয়াসই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত। এই পরম উদ্দেশ্যের সামাজিক সহযোগী হিসাবে বস্তুকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া উচিত ঠিক ততটা প্রাধান্যই বস্তু পাইয়াছে তথাপি বস্তুজগতের মধ্যে যে সামাজিক চেতনার আনাগোনা চলিতেছে তাহাও সর্বব্যাপক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানবের আত্মোপলব্ধির বিরুদ্ধাচারণ করিবার ইহার সামর্থ্য থাকিলেও অন্তিম ফলে মানবাত্মাই জয়ী হইয়াছে মানব জীবনের এই অনিবার্য পরিণতি এক অনির্বচনীয় সত্যের দিকে মনকে প্রসারিত করিয়াছে। মানুষ এই সত্যানুভূতির অন্তরে প্রবেশ করিয়া সাহিত্যে রূপ রস সৃষ্টি করিয়াছে। রূপ হইতে রসানুভূতি আসিয়াছে, রসানুভূতি সত্যের স্বরূপ লইয়া অতি ধীরে বিকশিত হইয়াছে, আবার সে বিশেষ রূপে পরিণত হইয়া স্থির অচঞ্চল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই রূপ রসের খেলাই আমাদের প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের সাহিত্য।

বর্তমান যুগের সাহিত্য হয়ত ধর্মসাধনার প্রতি তেমন আস্থা রাখে না। কেননা, ধর্মকে সে একটা সংস্কার রূপে দেখিয়াছে, সাধনাকে দেখিয়াছে একটা বিশেষ প্রক্রিয়া রূপে। ইহার মুখ্য কারণ কালের কুটীল গতি। ধর্ম যখন সংস্কারে পরিণত হয় তখন নিয়মপদ্ধতি প্রবল হইয়া উঠে। সমাজের সাধারণ মানুষ প্রভাবশালী নিয়ম পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া থাকে। একথা স্বীকার করিয়া লওয়াই উচিত, বহুর যে সমাজ তাহাকে নিয়ম পদ্ধতি মানিয়া চলিতে হইবে। তাহা না হইলে শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। কিন্তু যাহা একদিন প্রয়োজনবোধে স্বীকার করিয়া লইয়াছি তাহাই আর একদিন শৃঙ্খল স্বরূপ পায় বাজিতে থাকে। এই কালের ও স্বরূপের ব্যবধান মানব চেতনার প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া-শীলতার ব্যবধান বলা যাইতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যদি সমাজের ক্রমবিকাশের সন্ধান করি তবে দেখিতে পাইব শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদেই নিয়মপদ্ধতি সৃষ্টি হইয়াছিল।

কিন্তু সেই শৃঙ্খলা বোধ এইরূপ সংস্কারে পরিণত হইল এবং মোটা সমাজকে এমনভাবে শৃঙ্খলে বাঁধিল যে, ইহা হইতে মানবাত্মা একদিন মুক্তি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই ব্যাকুলতা, অন্তরের আকুতি, গভীর উপলব্ধিবোধ—যে কোন সাধনার, সে ধর্ম সাধনাই হোক, আর নিছক সাহিত্য সাধনাই হোক—মহতের পথে প্রাথমিক সোপান বলিয়া গণ্য হইবে। এই আদর্শের পথে বিভিন্ন সাধক, বিভিন্ন পন্থায় বিচরণ করিয়াছেন। কেহ-কেহ আত্মবিগ্রহের পথে, নির্মম কৃচ্ছ্রসাধনকে আত্মানুসন্ধানের মুখ্য সোপান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কেহ-বা এই শুষ্ক নিয়মের কঠোর শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিপুল প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং একটি মধ্য পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। মানব মনের চিরন্তন সন্ধানকে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে দেখিবার, বুঝিবার ও অনুভব করিবার নিমিত্তই 'সাধনা' বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার গভীর রহস্যময় ইঙ্গিত একমাত্র অন্তর জগৎ ভিন্ন বাহিরের ব্যবহারিক সত্তায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। ইহাকে বিশেষ রূপে পরিচিত করাইবার জন্য কতগুলি পথ

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। এবং এই নির্দ্দিষ্ট পথযাত্রীকেই বিশেষ একধরনের সাধক বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়। ইহারা দ্বি-সত্তায় বিরাজ করিয়া থাকেন, ইহাদের মুখ্য সত্তা সাধক, গৌণসত্তা সামাজিক জীব। এই উভয় অংশে বিরাজিত সত্তাই যে একদিন মুক্তির জন্য পাগল হইয়া উঠে—ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের সাধনার ধারার মাঝে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। সাধকের সামাজিক জীবন ও দিব্যভাবের জীবন একই সঙ্গে বাঙ্গালার বাউল, দরবেশ সম্প্রদায়-এর মাঝেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। এই সাধনার ধারা কেবলমাত্র সাধারণের সমাজকে প্রেমের ও প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করে নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। বাঙ্গালার বাউল, দরবেশ সম্প্রদায় শুধু সাধকই ছিলেন না, তাহারা কবি ও দার্শনিক ছিলেন, এবং এই কাব্য ও দর্শনজগৎ মূলত সচেতন সাধনক্ষেত্র হইতেই জন্ম লইয়াছে। ইহাই আমাদের সাহিত্যে মানবতাবাদ।

ইয়োরোপীয় মানবতাবাদ—যাহার জন্ম ইতালীতে এবং যাহা একদিন সমগ্র ইয়োরোপীয় বিশ্বে ভাব প্রবাহের বন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—তাহার ভিত্তিমূল কোন সাধনচিন্তা হইতে সৃষ্টি হয় নাই। সমগ্র মানবতার আন্দোলনের মধ্যে ধর্ম সংস্কারের প্রবৃত্তিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সাধনক্ষেত্রের বিশেষ মুক্তির আশ্বাস তাহাতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই; জীবনচেতনার মধ্যে পরম সত্যের বিচিত্র অনুভূতি একাগ্রস্রোতমুখী নদীর মত দেখা দেয় নাই। ফলে মানবতার আন্দোলনটি শিল্প, সাহিত্যের বহিরঙ্গের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। মানবতার ভিত্তিতে সাহিত্য রচিত হইয়াছে সত্য কিন্তু সে মানব নৈতিক মানব নহে, সামাজিক মানব মাত্র। আমরা এমন কথা বলিনা যে, সামাজিক মানবের কোন মূল্য নাই, মহত্ত্ব নাই, বরং ইহার মূল্য ও মহত্ত্ব প্রভূত রহিয়াছে। কিন্তু মনে সন্দেহ জাগে ইহার স্থায়িত্ব লইয়া।

সমাজের রূপান্তর যখন বিভিন্ন কারণে হইয়া থাকে, সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক জগতের রূপান্তর তেমনই হইয়া থাকে বিভিন্ন ভাবাদর্শের প্রভাবে। ধর্মের আন্দোলনও অনেক সময় সমাজের দাবীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায় এবং স্বকীয় অনুশাসনের দ্বারা সেই দাবীকে পরিশুদ্ধ করিয়া লয়। পাশ্চাত্ত্য জগতেও এইরূপ আন্দোলনের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় সমাজ-জীবনে ধর্ম আন্দোলন ও নিগূঢ় সাধনার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে এবং এই প্রভেদ রহিয়াছে বলিয়াই ব্যবহারিক ধর্ম ও সাধনক্ষেত্র ভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে। ধর্ম সংস্কারকের ক্ষেত্র এবং সাধকের ক্ষেত্র এক নহে। ধর্ম সংস্কারক অনেক সময় সুচিন্তিত অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। তাহা অনেক ক্ষেত্রেই বিধি ও নিষেধ দ্বারা শৃঙ্খলিত বাক্যদুর্গ বলিয়া অনুমিত হয়। তাহার ঐতিহাসিক মূল্য থাকিতে পারে সাহিত্যিক মূল্য নাই। কিন্তু সাধক অন্তর জগতের বাণীর প্রতীক। তার বাণী রূপ, রস, গন্ধ ও অনুভূতির অপূর্ব সমন্বয়। তিনি সত্যকে বাক্যের বলয় পরাইয়া যে রূপে সমাজের কাছে উপহার দেন তাহার ভাবে সমাজ মুগ্ধ। এই সব ভাব রূপের সন্ধান পাইয়া মানব মনে এক অপূর্ব অনুভূতি জাগে। মানবের সব কর্মসাধনা যেন এই অনুভূতির আলোকে আলোকিত হয়।

ইতিপূর্বে সাধকের অন্তরজগতের যে বাণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ভাষা ও ছন্দের বিচিত্র অবয়ব ধারণ করিয়া এক ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করে। এই ভাবমূর্তি ইতিহাসের উপলক্ষ্য না হইয়া, বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে কি ভাবে আশ্রয় লইল তাহা একটু পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। একজন সাধক কবি তার অন্তরের বাণী ভাষায় বিবৃত করিতেছেন—

"আগে নদী শুকনা ছিল,
আজগুপি এক বন্যা এল,
এ যে বন্যা হল-পারাপার।
বাঁকা নদীর গতিক বুঝা ভার।
নদীতে নেমব না ভাই খবরদার,
বাঁকা নদীর গতিক বুঝা ভার।"

এখানে সাধনমার্গের অনুভূত সত্য সাহিত্যের রূপ লইয়া ভাষার মাধ্যমে ধরা দিয়াছে। শুধু ধরা দিয়াছে বলিলে সবটা বলা হইলনা, আমাদের অন্তরে এক মহা সত্যের অনুভূতি জাগ্রত করিয়াছে। সেই সত্যটি কি? এই জীবন নদীর সর্পিল গতি সত্য-সত্যই বোঝা ভার। অজস্র তরঙ্গ

আসিয়া আঘাত করিতেছে। এই তরঙ্গসঙ্কুল এ-পার ও-পার ছড়াইয়াই পড়িতেছে, কাজেই জীবন-নদীর কিছুই ঠাহর করিতে পারিতেছিনা। যখন সাধকের চেতনা এই রূপ নিজের সীমাবদ্ধ শক্তির জ্ঞান অর্জন করে তখনই সে নিজের অন্তরে নির্দেশ খোঁজে। এই সন্ধানকার্য আর একবার সাধকের সমগ্র ভাবচেতনাকে অন্তস্তরে উন্নীত করে। তখন ভাষা, ভাবও রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরিত ভাবের ও ভাষার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

"দিল হরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা।
দেহের মাঝে বাড়ী আছে,
সেই বাড়ীতে চোর লেগেছে,
ছয়জনাতে সিঁদ কাটিছে
চুরি করে একজনা।
দেহের মাঝে বাগান আছে,
নানা জাতির ফুল ফুটেছে,
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে,
কেবল লালনের প্রাণ মাতলনা।"

ইহা সাধকের আর একটি সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ, ইহাকে সাহিত্য রসের সর্বোত্তম সুষ্ঠু প্রকাশ বলা যাইতে পারে। বস্তুত এই সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের মধ্যে যে মানসিক উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যায় তাহার লক্ষ্যস্থল সামাজিক জীবন নহে। মনকে বিশেষ ভাবে গঠিত করিতে না পারিলে এই আবেগ উন্মুখ হইয়া উঠেনা; ভাষা ও ছন্দ খরস্রোতা নদীর মত উদ্বেলিত না হইয়া কেবলমাত্র অবিরাম গতিতে বহিতে থাকে। এই বিরামহীন গতির সাধনাও বাঙ্গালার বাউল সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। জীবনকে দেখা হইয়াছে নদী স্বরূপে, ইহার তরঙ্গের আঘাতকে উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের প্রতীক বলিয়া মনে হইয়াছে। জীবনের সুখ-দুঃখ কিছুই বাদ যায় নাই। সকলেই স্ব স্ব অধিকারে সাধকের চেতনারাজ্যে আসিয়া ঠাঁই লইয়াছে কিন্তু ইহারা কেহই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। কেননা, পরম সত্যের জ্যোতির আকর্ষণ সাধককে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেয় না, বরং ঐকান্তিকতাকে বৃদ্ধি করে। সাধকের এই ঐকান্তিক ভাবপুষ্ট অবস্থাই যাহা বাণীস্বরূপ প্রকাশ পায় তাহাই সাহিত্যের নির্বিশেষ রূপ। এবং রসের সেই স্তরে উন্নীত হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য আর সব গৌণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে। মানব মন যতদিন সামাজিক স্তর হইতে মুক্ত হইয়া সত্যানুভূতির স্তরে বিরাজ করিত ততদিন সাহিত্যে রসের বিকারগ্রস্ত ভাব দেখা দেয় নাই। ইহার কারণই হইল আমরা সত্যকে কাব্যে প্রতিফলিত করিবার পূর্বে সত্যের সাধক হই নাই। চণ্ডীদাস সাধননার্গের একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছাইলে ঐ কাব্য তাহাদ্বারা সম্ভব হইত না। এমন কি রবীন্দ্র কাব্য বিকাশের পূর্বে বাঙ্গালীর নৈতিক চেতনার, ধর্মের ব্যাপক আন্দোলন না হইলে হয়ত রবীন্দ্রমানস এত মহৎবৃত্তিতে ফুটিয়া উঠিত না। কাজেই আজ সমাজে যত গ্লানি আসুক না কেন, আর সেই গ্লানিকে কেন্দ্র করিয়া অতৃপ্তিকর সাহিত্য রচিত হোক না কেন—তাহা জাতির মহৎ মনের প্রতিবিম্ব নহে। সাহিত্যের স্বাস্থ্য উদ্ধার বলিয়া কিছু আছে কিনা জানিনা, কিন্তু জাতির সাধনজগতের আপাত বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইয়া নৈতিক চেতনা উদ্ধারের প্রয়োজন রহিয়াছে। আমরা যদি কোন মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য নৈতিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারি, সাহিত্য—অন্তত বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্য নির্মল আবহাওয়ায় আপনার সত্তা ফিরিয়া পাইবে। নচেৎ শব্দের সড়ক তৈরী করিয়া অন্তরের সাধনার পথকে পিচ্ছিল করিয়া তুলিবে মাত্র।

তমসো পরস্তাৎ

সুভাষ সমাজদার

নিশি রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে রামকৃষ্ণপুরের আদিগন্ত প্রান্তরে। দূরে দূরে গাঢ় অন্ধকারের সমুদ্রে দপ করে জ্বলে উঠছে আলেয়ার আলো। আকাশ তারার রোশনাই জ্বলছে না। শেষ রাতে হয় তো বৃষ্টি বাদল হবে। হঠাৎ শিবপুকুরের কাছে পাঁকুড়গাছের নীচে ঘন থকথকে অন্ধকারে খস করে কে যেন দিয়াশলাই জ্বাললো। দিয়াশলাইয়ের স্বল্পায়ু ম্লান আলোয় দেখা গেল, বিশাল একটা মাংসল মুখে কালো কুচকুচে গোঁফ। বিড়িতে আগুন ধরিয়ে সে বলল—জমাদার সাহাব, এই মাগীর লাশটা সদরে এখুন লিয়ে যাবেন কেমুন করিয়ে?—সদর থানার জমাদার নিবারণ চিন্তিত হয়ে বলল—একটা গোরুর গাড়ি টাড়ি এখানে কারও পাওয়া যাবে না?

লাশটা আপনি যদি পাহারা দেন, তাহলে আমি আশপাশের গাঁওতে একটু খুঁজিয়ে দেখে আসতে পারি গোরুর গাড়ী—না। তুমি থাকো। আমি যাই। তোমার আবার ভয় টয় লাগবে না তো শিউচরণ? রাম, রাম, রাম! বুকের ওপর হাত ঠেকিয়ে বিড় বিড় করে বলল শিউচরণ—রাত্রে ওসব বলবেন না জমাদার সাহেব। এগারো বরষ নোকরী করতেছি—কত লাশ পাহারা দিলাম। ডর কোন দিন লাগে না বাবু—

রাত্রির অতলান্ত অন্ধকারে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল নিবারণ। পাঁকুড়গাছের নীচে ঘন অন্ধকারে একটা সাদা কাপড়ে আপাদ-মস্তক ঢাকা সেই মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে রইল শিউচরণ।

এই জেলার পুলিশ রেকর্ডে এমন নৃশংস হত্যার ইতিহাস আর নেই। নিদারুণ ভয়াবহ এই খুনের সংবাদে থমকে দাঁড়িয়েছিল সকলের হৃদস্পন্দন। চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়ে বলেছিল—ইস্ কী অপরাধ করেছিল এমন সুন্দর মেয়েটা! পতিরামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে আত্রাই নদী। পতিরাম ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে মণীপুরের কাছে নির্জন বালুচরে সাঁওতাল পাড়ার ডগরু মাঝির মেয়ে সোনার মৃতদেহটা একটা লাটাই ঝোপের ভেতরে পড়েছিল। তিনদিন পরে বাতাসে ভেসে উঠেছিল দুর্গন্ধ। মণীপুরের একটা রাখাল ছেলে উৎসুক হয়ে ঝোপে উঁকি দিয়েই আর্তনাদ করে উঠেছিল। সাব ইনসপেক্টার এসেছিল সেইদিন দুপুরে। তার রিপোর্টে সে লিখল, যার সঙ্গে সোনা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতো, তাকে তিনদিন থেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডেড বডিটা পোস্টমর্টেমে যাবে। সাব ইনসপেক্টার বলল—বিকেলে সদর থেকে পুলিশ ভ্যান আসবে, তোমরা তখন 'ডেড বডিটা' নিয়ে চলে যেও—

সাব ইনসপেক্টার সদরে চলে গেল। কিন্তু বিকেলে সদর থেকে সংবাদ এল—গাড়ী ডি. এস. পি. সাহেব নিয়ে গেছেন। এখানকার কারো গরুর গাড়ীতে করে ডেড বডিটা সদরে নিয়ে যেতে হবে।

ঘন অন্ধকারে একটা প্রেতের মত গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে এ. এস. আই. নিবারণ দাস। সবাই কাঁচা ঘুম থেকে উঠেই কাতর গলায় বলল—না সাহেব, লাশ নিয়ে আমার গাড়ী সদরে গেলে পকালে মাঠের কাজের ক্ষতি হবে—অসহ্য বিরক্তিতে জ্বলে উঠল নিবারণের মাথার ভেতরটা। কি চাকরীই যে করছে! হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ছোট ছোট ভাই বোনের জীর্ণ মুখের মিছিল, বিধবা মায়ের কাতর দুটো চোখ। মাস ফুরুলে কয়েকটা টাকার জন্যে এই অবক্ষয়ী জীবনের সঙ্গে লড়াই তাকে করতে হবে। রামকৃষ্ণপুর, পতিরাম, মণীপুর, কোথাও গোরুর গাড়ী পাওয়া গেল না।

মণীপুর ছাড়িয়ে আশায় নিরাশায় ক্ষত বিক্ষত মন নিয়ে সে পরানপুরের দিকে চলতে সুরু করল। মইনুদ্দিন মোল্লার কাঁঠাল গাছের নীচে একটা গোরুর গাড়ী আছে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল নিবারণ। অন্ধকারে এক জোড়া

গোরুর পিঙ্গল চোখ জ্বলছে। তার বুকের রক্তে আনন্দের কলধ্বনি বাজতে লাগল। আহা! সবই তো পেয়েছিলাম, একটা গাড়োয়ান পেলেই তো হতো- কি করা যায়! কি করা যায়—তীব্র অস্থিরতায় তার হাত দুটো নিসপিস করে উঠল।

কে?—কে ওখানে? হঠাৎ ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল নিবারণ। একটা আতাগাছের ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কালপুরুষের মত পেশীবহুল বিশাল এক মূর্তি। বাতাসে ভেসে উঠল তাড়ির উগ্র গন্ধ। তার নেশারক্ত চোখদুটো চারিদিকের তরল অন্ধকারে হিংস্র বাঘের মত ধক ধক করে জ্বলছিল।

—কি করছিস, তুই এখানে?

—তাড়ি খাচ্ছিলাম।

—তাড়ি! চুরি করেছিস না কি? না দোকান থেকে কিনে খাচ্ছিস?

—কি বললেন বাবু, চুরি করতে যাবো কেন? আমার একটা 'পেরসটিজ' নাই?

—আচ্ছা তোকে ভাল মদ—বিলেতী মদ খাওয়াবো, তুই একটা গোরুর গাড়ী চালিয়ে সদরে নিয়ে যেতে পারবি?

—বিলেতী মদ! বিলেতী মদ দিবেন? আঃ কি মিষ্টি গন্ধ বাবু। তুমি সেই মদ খাওয়াবেন? লোভের আশায় দগদগে ঘায়ের মত জ্বলে উঠল আর চোখদুটো। উল্লসিত হয়ে বলল—বিলেতী মদ পেলে আমি সব করতে পারি। চলেন যাবো—

নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে একটা মেটে সাপের মত রামকৃষ্ণপুর পশ্চিমপাড়ার চওড়া লাল মাটির রাস্তাটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রাস্তার দুই পাশে দিগ্‌বিস্তীর্ণ বনের মাঠে ঝিঁঝিঁদের বাজনা চলেছে। নিশী রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে চাকার চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর আর্তনাদ তুলে চলেছে গোরুর গাড়ী। থেকে থেকে তাড়ির রসে ভেজা গলায় চেঁচিয়ে উঠছে মাতাল গাড়োয়ান—এই চল—হেট, হেট, ডান-ডান-বাঁ। কোলের কাছে রাখা দইয়ের ভাঁড় থেকে দু' এক ঢোক তাড়ি ঢেলে দিচ্ছে গলায়।

—তুই এত তাড়ি খেতে শিখলি কোথা থেকে রে? নিবারণ প্রশ্ন করে।

—একটু নেশাটেশা না করলে মেজাজ আসে না বাবু। তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে জ্বলে উঠল নিবারণের মাথার ভেতরটা। ক্রোধতপ্ত গলায় বলল—জানিস শিউচরণ, এই আদিবাসীরা সভ্য হতে গিয়ে অনেক কদাচারের বিষ ঢুকেছে ওদের চরিত্রে—

—হাঁ, জমাদার বাবু, সাঁওতালকে এত তাড়ি খেতে কোনদিন দেখিনি। কালেভদ্রে পালপার্বণের দিনে ওরা পচানি খায়—

—না, না জানিস না তুই শিউচরণ—সচ কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা জমাদার নিবারণ দাস উদ্দীপ্ত হয়ে বলল—নদীর স্রোতে মাঝে মাঝে পাক থাকে তো, দেখেছিস কোন দিন?

—হাঁ বহুত দেখেছি। হামাদের কোশী নদীতে বহুত পাক হায়—

ঠিক সেই রকম বুঝলি, আমাদের দেশের সাঁওতাল, উরাও, রাজবংশী ইত্যাদি আদিবাসীদের সরল, সহজ আনন্দ ভরা জীবনের স্রোতে তথাকথিত মেকী সভ্যতার ধারা জটিল আবর্তের সৃষ্টি করেছে। ওরা আজকাল খালি গায়ে থাকাকে অসভ্যতা মনে করে। অতিথি গেলে চিড়ে না দিয়ে সন্দেশ দেয় বার ক'রে।

—সাচ বাত বাবু—হৈনি ভরা ঘরঘরে গলায় বলল শিউচরণ—ওদের চিদোক মানুষগুলোর কি চুল বাঁধার কায়দা বাবু। মিষ্টি গন্ধ তেল মাখে। এই সব ইসব বিলাসীতার জিনিস সংগ্রহ করতে অনেক সময় মেয়েগুলো নষ্ট হয়ে যায় বাবু—

—তা হয়ই তো পথে ঘাটে দেখতে পাচ্ছি। মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলিষ্ঠ গলায় নিবারণ বলল—না, শিউচরণ, সাঁওতাল উরাওরা আদিবাসী হয়েই সুখে ছিল। ওরা সভ্য হয়ে ওদের অভাব বেড়েছে, আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। তাই পাপও বেড়েছে—

ঠিক! গাড়োয়ানের তাড়ির নেশায় ঝিমিয়ে পড়া ক্লান্ত অবসন্ন চেতনাকে নিবারণের ঝাঁঝালো কথাগুলো যেন ছুরগুন দিয়ে কালা কালা করে দিয়ে গেল। চার্চের বড় কাদার বলতেন—'ডিজায়ার' মানুষকে কিয়ার্স করে তোলে। হ্যাঁ ঠিক। তার মনের ভেতরে খলখল করে উঠল

স্বাধানিয়াল জন হাকমার মেয়ে ডলি মুরমুর মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার কমনীয়তা ভরা হাসি হাসি মুখখানা। ডলি মুরমু। তার সুঠাম তন্বী দেহে প্রখর হয়ে জেগেছিল স্বাস্থ্য ও যৌবনের দীপ্তি। নিকষকৃষ্ণ গায়ের রঙ। তার কাজলাদীঘির মত কালো আর অতল দুটো চোখে কি যেন একটা নেশা মাখানো থাকতো। তার খিল খিল হাসিতে উদ্দাম জীবনের আবর্ত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তো। ডলির মতই সেও সাঁওতালের ছেলে। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে সে গঙ্গারামপুরে সেন্ট বার্থ লোমিউ ক্যাথেড্রাল চার্চে এসেছিল। বড় ফাদারের মুখে বাইবেলের সারমন অন দি মাউন্টের ব্যাখা শুনে আর পবিত্রাতা যীশুর শান্ত, সৌম্য প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে করুণ গলায় সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীত করে তার জীবনের চারিদিকে আশ্চর্য একটা শুচিতার দীপ্তি জ্বালিয়ে নিয়ে আদর্শ খৃষ্টান হয়ে উঠেছিল মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যে। বড় ফাদার তাকে আদর করে বলেছিল—জন তোকে আমি 'হোমে' নিয়ে যাবো—

হোম! বিলেত? জনের বুকের রক্তে রক্তে ঝড়ের তাণ্ডব সুরু হয়েছিল। ইংলিশ চ্যানেলের নীল জলের ছায়া পড়েছিল তার দুটো রক্তাভ চোখে। প্রায়ই সে চার্চের বাগানের বিশাল দীর্ঘ ইউক্যালিপট্যাস গাছটার দিকে তাকিয়ে ভাবতো, লণ্ডনের ওল্ডেষ্ট চার্চের চূড়ো কি ঐ গাছটার চেয়েও উঁচু? লণ্ডন! লণ্ডন! তার চোখদুটো অন্তহীন স্বপ্নের উল্লাসে ছটফট করতো। দুস্তর সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ কেটে কেটে শ্বেতকায় দেশে যাওয়ার আশায় সে বড় ফাদার রবার্টের পায়ের কাছে প্রভুভক্ত একটা কুকুরের মত বসে থাকতো। হয়তো তার বহু বিনিদ্র রাত্রির সেই অস্থির উন্মন স্বপ্ন সত্যে রূপায়িত হয়ে উঠতো, কিন্তু—

কিন্তু ডলি মুরমুর গম্ভীর কালো ডাগর চোখের মাদক ছায়ায়, ওর সারেঙ্গীর সুরের মত মিষ্টি হাসিতে অলক্ষ্যে তারই মৃত্যুবান লুকিয়ে ছিল, তা কি সে জানতো? গঙ্গারাম-পুরের চার্চে আদিবাসী তরুণের ভেতরে সে যেমন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান ছিল। তেমনি মেয়েদের ভেতরে ছিল ডলি মুরমু। বড় ফাদারের ব্যবহৃত ছেঁড়া ঢুল প্যান্ট আর বাফশার্ট পরতো সে। আর ডলির পরণে থাকতো স্কার্ট। তার কালো কুচকুচে নিটোল পা দুখানা দুটো খুঁটির মত বেরিয়ে থাকতো। ওর উচ্ছ্বসিত হাসির সমকে কেঁপে কেঁপে উঠতো রঙীন স্কার্টের আড়ালে তার সুডৌল, উত্তুঙ্গ দুটো বক্ষকুম্ভ। তার চেতনাটা মিষ্টি একটা নেশায় ঝিম ঝিম করতো। বড় ফাদারের সঙ্গে তারা তপন, খালপুর বেল্লা, পতিরাম, মদনগঞ্জের হাটে হাটে শত শত জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে যীশুর বাণী শোনাতো। সাঁওতাল উরাওদের দিকে তাকিয়ে সে আর ডলি উগ্র ঘৃণায় নাক কুঁচকে বলতো—কী স্যাটিক থাকে সব। ডেভিলস্! ইম্পস্! আহা ওরা প্রেমময় পিতার সন্তান। ওদের ঘৃণা করিও না। করুণা করিও—বলতেন বড় ফাদার।

গঙ্গারামপুরের সেন্ট বার্থোলোমিউ ক্যাথেড্রাল চার্চের নরম সবুজ ঘাসে ঢাকা লনে, ইউক্যালিপট্যাস আর পাম গাছের ছায়ায় ছায়ায় শুরু নির্জন দুপুরে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল মাঝরাতে দুটো আদিবাসী হৃদয়ের আকুতি তাদের অপলক চোখে কি এক অর্থময় ইঙ্গিত নিয়ে ফুটে উঠতো। তার মন, তার চেতনা, তার দৃষ্টি একটা পঞ্চমাতাল মৌমাছির মত গুনগুন করতো ডলি মুরমুর উদ্দাম যৌবনের চারিদিকে। তার স্মৃতি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছিল দূরে কালকাপুরের বকুলগাছের মিষ্টি ছায়ার নীচে ছোট একটা কুঁড়ে ঘরের একটি কিশোরীর কোটা ফুলের মত মুখচ্ছবি। সে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু সেই কিশোরী হৃদয় তাকে ঘিরেই রামধনুর ঝিলিমিলি এঁকেছিল। ডলির ভালবাসায় টলোমলো মন তার সেই সুদূর বাল্যকালের স্বপ্ন রঙ্গিনীকে একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছিল···

—কি রে ঘুমে ঢুলছিস না কি? যত তাড়ি খেয়েছিস! বলল নিবারণ।

—আর কতদূরে যেতে হবে বাবু?

—আরো আটমাইল।

—আট মাইল! এই মেয়ে লোকটা কি আত্মহত্যা করেছিল বাবু?

—সে খোঁজে তোর কি দরকার?

আরো আটমাইল! আবার চক চক করে তাড়ি ঢেলে দিল গলায়। তীব্র তীক্ষ্ণ একটা অস্বস্তিতে ছিঁড়ে যাচ্ছে তার বুকের ভেতরটা। তার রক্তে যেন একটা বিষের দুর্বিসহ জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে। রক্তমাখা, ক্রুসবিদ্ধ যীশুর

কাতর মুখ, ডলির মুখ সব মিলিয়ে যেন একটা অতিকায় দানবের মুখ চারিদিকের নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে রক্তাক্ত চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইল। না, নেশাটা বেশী হয়েছে। অসহ্য ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে তার শরীর।

—এই সিউচরণ, ঘুমিয়ে পড়লি না কি?

—না মালা, গোরুর গাড়ীর ঝাঁকিতে ঘুমটা ভাঙিয়ে যাইতেছে—

—জানিস সিউচরণ, চাপা গলায় বলল জমাদার নিবারণ —দারোগাবাবু বলছিল, এই মাগীটার পেটে না কি ছেলে আছে—

রাম, রাম—কানে আঙুল দিয়ে অস্ফুট গলায় আর্তনাদ করে উঠল সিউচরণ—আপনাদের বাংলাদেশে ইসব ব্রেচ্ছ কাণ্ড হরবখৎ হোইতেছে—

কালো পাথরের মত বিশাল দেহ নেশাচ্ছন্ন গাড়োয়ানের চোখে টিপ টিপ বৃষ্টিঝরা সেই রাত্রির স্মৃতি ছবির মত ফুটে উঠল। প্রেতিনীর কান্নার মত সোঁ সোঁ বাতাস আর্তনাদ করছিল চার্চের চারিদিকে। ইউক্যালিপট্যাসের লম্বা লম্বা পাতা মাথা কুটছিল। তার বুকে মাথা রেখে গানের মত নরম মিষ্টি গলায় বলেছিল ডলি—জন, আমরা যদি এখুনি মরে যেতাম, আমার কিন্তু এইভাবে মরতে বড় ইচ্ছে করে—

—তুমি আর আমি এইভাবে মরে গেলে 'ট্রুথ' হয়ে থাকবে শুধু তোমার আমার এই ডিভাইন লাভ—

পাদ্রী সাহেব আছে—পাদ্রী সাহেব—মেঘলা রাত্রির ঝড়ো বাতাসে তীক্ষ্ণ উত্তেজিত একটা চীৎকার আছড়ে পড়লো চার্চের গায়ে। বড় কাদার ছিলেন না। সদরে গিয়েছিলেন। কালো রাত্রির সঙ্গে একাকার হয়ে একটা কালো আদিবাসী মেয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে এসেছিল একেবারে চার্চের ভেতরে। হৈ হৈ করে ছুটে এল চার্চের অধিবাসীরা। তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্ত গলায় সে বলেছিল—তোমাদের জন আমাকে ঠকিয়েছে। শুনেছি এখানে একটা মেটো আমাপরা খেরস্তানী মাগীকে বিয়া করবে। আমার পেটে ওর—একটা বন্য হিংস্রতায় ধপধপ করে জ্বলছিল তার চোখদুটো। হিম হয়ে গেল তার বুকের রক্ত। ডলির চোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল। বুনো বাঘের মত আক্রোশ নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মেয়েটির ওপরে। তার মোংরা আদিবাসী জীবনের অন্ধকার কবর থেকে যেন একটা অভিশপ্ত প্রেতিনীর মত উঠে এসেছে মেয়েটা। বড় কাদার এসে পড়লেন। কান্না ধরো ধরো দেহটা নিয়ে বড় কাদারের পায়ের কাছে গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদে সে বলেছিল —এই জন, খেরস্তান হওয়ার আগে পর্যন্ত, ছোটকাল থেকে আমাকে ভালবেসেছে। আমি ওকে সব দিয়েছি। আমার পেটে ওর—

হোয়াট! সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মত বেঁকে গেল বড় কাদারের সাদা ভ্রূদুটো। শুধু তর্জনী সঙ্কেতে তাকে চার্চের 'গেট' দেখিয়ে দিলেন। শেষ বিকারের আগে চার্চের একটা অন্ধকার কোণে গিয়ে ডলির সঙ্গে দেখা করেছিল। হিংস্র সাপিনীর মত ফুলে ফুলে উঠছিল ডলি। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে সে বলেছিল—ঐ ডেভিল মেয়েটা—ঐ জাস্টিক শয়তানীটা বেঁচে থাকতে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলারও চেষ্টা করো না কোনদিন—চার্চের এরিয়ায় পা দিও না—বজ্রগম্ভীর গলায় বলেছিলেন বড় কাদার তোমার আত্মার পিউরিফিকেশন হয়নি—

গঙ্গারামপুর চার্চের খ্রীষ্টানী আভিজাত্যের দীপ্তিতে ঝলোমলো, ডলি মুহূর্তের নিবিড় কবোষ্ণ প্রেমে ভরা মধুর একটা অধ্যায় তার জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। অশ্রান্ত বর্ষণমুখর আর ঝড়ো বাতাসের দুর্যোগভরা সেই রাত্রে তার সঙ্গেই মেয়েটি চলেছিল গ্রামের দিকে। মেয়েটিকে সে ছোট কাল থেকে আদর করে ডাকতো পরী বলে। পরী বলেছিল—তুই কথা বলছিস না কেন রে? নিবিড় আদরে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিল সে। তার পাহাড়ের মত বিশাল দেহটা উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছিল। টিপ টিপ নরম বৃষ্টির মত গলায় বলেছিল আবার পরী— তুই রাগ করেছিস না রে টোঙা? কি করবো বল। আর কয়দিন পরেই যে লোক সব জানতে পারবে। গাঁয়ের পঞ্চায়েতও বলেছে তোর সঙ্গে বিয়ে বসতে—কোন কথা বলে নি সে। তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে আগুনের জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছিল। ঝাঁ ঝাঁ করছিল কানদুটো। পরী বলেছিল— তোকে কতদিন দেখিনি বল তো! সেই ডোভাপূজার দিনে সন্ধ্যায় তুই ডাহুক শিকার করলি। তারপর আমরা

নদীর ধারে বালুচরে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকলাম। তুই আমাকে কত আদর করেছিলি। টোঙা, তুই খেরস্তান ঘরে মোটা বিড়ালীর মত ঐ মেয়েটার পাল্লায় পড়ে সব ভুলে গেলি—আকুলিত একটা আবেদন ঝরে পড়েছিল পরীর গলায়। তার বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আবার বলেছিল পরী—তাকা আমার দিকে টোঙা। আমি কি তোর ঐ খেরস্তান মেয়েটার চেয়ে দেখতে খারাপ? ম্লান নক্ষত্রের মত ঢল ঢল করে জলছিল তার চোখদুটো। খেরস্তান মেয়ে! ডলি মুরমুর চোখের কোণায় কোণায় মোহমায়া সেই মধুর দৃষ্টিসভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তার বুকের ভেতরে। সেই ক্ষত মুখ থেকে গল গল করে রক্ত ঝরছে। ভয়ানক হিংস্র একটা সঙ্কল্পে কঠিন হয়ে উঠেছিল তার চোখের দৃষ্টি। নীরস গলায় সে বলেছিল—পরী নদীর পারে যাবি?

—কেন, গ্রামে যাবি না?

—না! কি হবে বাড়ীতে গিয়ে। তোরা তো সবাই আমাকে মহুয়ের পাখা লাগানো দাঁড় কাক বলিস—

না, না, আমি কোনদিন তা বলিনি—ভাটিয়ালী গানের সুরের মত দীর্ঘ অপরূপ তন্বী দেহটা হাসির দমকে কাঁপিয়ে উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে পরী বলেছিল—তুই আমাকে নিয়ে পালাবি ভিন গাঁয়ে? ঘর বাঁধবি টোঙা? তার দুচোখে স্বপ্ন নেমে এসেছিল। নিবিড় প্রেমে বিভোর হয়ে তার বিশাল ধরজার চওড়া কপাটের মত বুকে মাথা এলিয়ে দিয়েছিল। তারপর?

তারপর। হ্যাঁ, সেই নিদারুণ ভয়াবহ স্মৃতি একটা তীক্ষ্ণ বর্শা ফলকের মত বিঁধে আছে তার বুকের ভেতর। সেই রাত্রেও সে মদ খেয়েছিল। পরী আর সে মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন আত্রাই নদীর বালুচরে এসেছিল। মধুর গানের মত গলায় পরী বলেছিল—চল টোঙা আমরা সরণ গ্রামে চলে যাবো। মাখনের মত নরম জমি আদি নেব। চাষ করবো। দু হাতে খাটবো—

কোন কথা বলছিল না সে। শুধু ধারালো ছুরি দিয়ে কাঠের ক্রুশটার দুটো দিক চেঁছে চেঁছে সুচলো করছিল। কিছুক্ষণ পরে অকম্পিত গলায় সে বলেছিল—চল পরী নদীর ঐ বাঁকটার কাছে—

—কেন রে, ওদিকে যাচ্ছিস কেন?

আয় না, তোকে আদর করবো—নদীর বাঁকের কাছে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা জগডুমুর, শিমুল আর বাঁশ ঝাড়ের নীচে গা ছম ছম করা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল। তার রক্তে রক্তে আদিম হিংস্রতা উগ্র সুধায় জ্বলে উঠেছিল।

উঃ এ কী করছিস টোঙা? কি দোষ করেছি আমি—পরীর যে চোখদুটো ঘর সংসার ভালবাসার স্বপ্নে অপার হয়ে উঠেছিল, মত্ত হস্তীর আক্রোশ নিয়ে ক্রুশের তীক্ষ্ণ দুটো কাঠি দিয়ে সেই চোখ দুটোই গেলে দিয়েছিল।

—আমাকে কানা করে দিচ্ছিস? পরীর বুকফাটা তীব্র আর্তনাদে আকাশের কোটি কোটি অসংখ্য অপলক তারাও আতঙ্কে ব্যথায় শিউরে উঠেছিল। পরীর চোখ বেয়ে রক্ত ঝরছিল ঝিনঝিন দিয়ে। অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে সে বলেছিল—আমাকে প্রাণে মারিস না রে টোঙা। তোকে বিয়ে করতে হবে না—তার নোংরা আদিবাসী জীবনের বন্য ভালবাসার এই প্রেতিনীটা কেড়ে নিয়েছে তার ডলিকে, মুছে দিয়েছে তার চোখ থেকে নীল সাগর পাড়ি দিয়ে 'হোমে' যাওয়ার স্বপ্ন। একে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে সে। রাত্রিচর ক্রুদ্ধ একটা দৈত্যের মত সে তার গলা টিপে ধরেছিল। কোঁৎ করে একটা শব্দ করেই অসাড় হয়ে গিয়েছিল পরীর দেহ। কিন্তু পরীর সেই স্বপ্নেভরা গানে মাখা চোখ দু'টো রক্ত লোলুপ আহত নেকড়ের মত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দুদিন সে খায় নি। ঘনঘাদাড়ে বন্য জন্তুর মত আত্মগোপন করে বেড়িয়েছে। তার কানের কাছে বাতাসে ভাসে পরীর আর্তস্বর—আমাকে প্রাণে মারিস না রে—রাত্রে গাছের পাতায় পাতায় জোনাকির আলোয় পরীর কাতর কান্না ভরা চোখ দুটো দেখতে পায়। পরীর সেই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় কুঞ্চিত, বিকৃত মুখখানা তার চেতনাকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে। না, না, কি লাভ এই ভাবে বেঁচে থেকে? কি হবে—ডলি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে একট কথা—শাস্তি! শাস্তি—কঠিন শাস্তির প্রায়শ্চিত্তে তার এই পাপের ক্ষয় হবে না—ঢক ঢক আবার কিছু তাড়ি গলায় ঢেলে দিল। হাতের চেটোয় মুখ মুছে

আকাশ কাঁপিয়ে চীৎকার করে বলল—জনাদার সাহেব—আমি—আমি খুন করেছি পরীকে।

চমকে উঠল শিউচরণ আর নিবারণ। শিউচরণ বলল শালার নেশা ধরেছে বেশী—কাকে তুই খুন করেছিস?

—পরী—পরীকে আমাকে ধর তোমরা—আমাকে কালাপানিতে পাঠাও—তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে এ-এস আই নিবারণ বলল—যে মেয়েটাকে খুন করেছিস, তার বাপের নাম কি?

ডমরু মাঝি।

—ডমরু মাঝি! তার মেয়ে তো সোনা। ঐ তো ওর লাস। তোর পরী কে?

সোনার লাস! জনের জাগর ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখের তারা দুটো শিউরে উঠল। ঝড়ের মত গিয়ে দু'টো কাঁপা হাতে সোনার মুখের কাপড় সরিয়েই চীৎকার করে কেঁদে আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহের ওপরে—পরী! পরী! দুহাত বুক চেপে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল জন। গাড়ীর প্যাটাতনে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্ত ঝরিয়ে ফেলল কপালে। পাগলের মত অজস্র কিল চড় মারতে লাগল গাড়ীটার গায়ে। তার পাপপঙ্কিল জীবনের অনুতাপের অনুভূতিগুলোকে যেন সে মাটিতে আছড়ে আছড়ে বুকের ব্যথাকে লাঘব করতে চায়। আকাশে জেগেছে ভোরের রেখা। অদূরে সদর থানার লাল বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে। তীব্র ভাঙ্গা কান্নায় ঝাপসা জনের চোখদুটো দেখতে পেল, সদর থানার আর্ম পুলিশের দল তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আবছায়া অন্ধকারে তাদের রাইফেলের সঙীনের ফলাগুলো চকচক করছে।

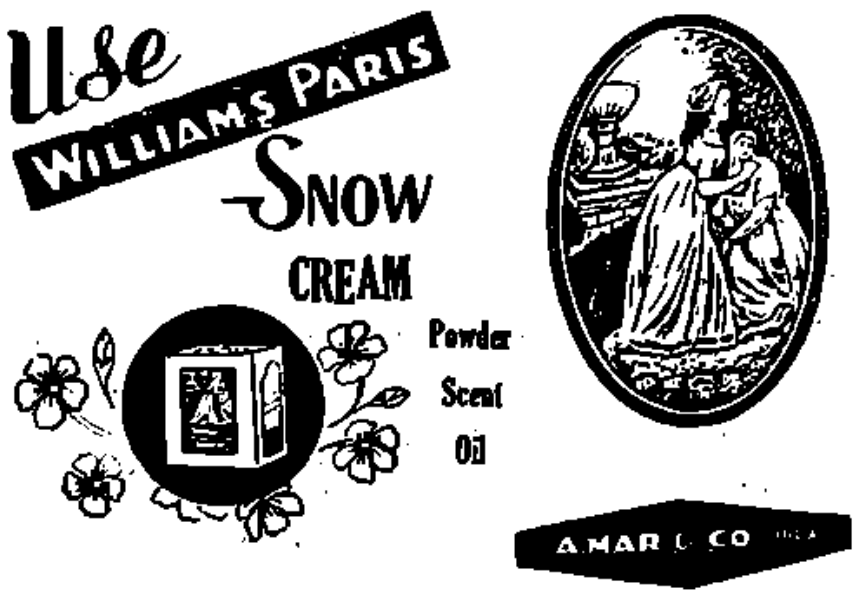

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে
বিজয়-বৈজয়ন্তীবাহী

মোহিনী মিল্‌স্‌ লিমিটেড

(স্থাপিত ১৯০৮)

১ নং মিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)

২নং মিল

বেলঘড়িয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

DENA BANK

The Saving Services offered by the Dena Bank will help you to save for the future.

General Banking
Business Transacted

A STRONG EDIFICE

DEVKARAN NANJEE BANKING CO., LTD.

HEAD OFFICE:
DEVKARAN NANJEE BLDGS., HORNIMAN CIRCLE, BOMBAY 1.

চুপ! ছেলেটি ঘুমুচ্ছে!

কালকে ছেলেটি অনবরত কাশছিল। আজ ঘুমোচ্ছে কারণ গ্লাইকোডিন টার্প বাসক খেয়ে তার কাশি একদম সেরে গেছে।

Alembic

গ্লাইকোডিন টার্প বাসক

এ্যালেম্বিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস কোং, লিঃ. বরোদা-৩।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গত বৎসর গ্রন্থাগার ও গবেষণা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। তাহাতে অনেক কথা অ-বলা রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমশঃ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে। সরকারী সমাজ-শিক্ষা বিভাগের প্রচেষ্টার কথা অনেকে অবগত আছেন। প্রতি বৎসর নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া থাকে। এবারে ইহার একাদশ অধিবেশন হইয়াছে কলিকাতায়। বাংলা দেশেও প্রতি বৎসর এইরূপ প্রাদেশিক সম্মেলন হয়; অন্যান্য প্রদেশেও হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূলে ছিলেন ডক্টর এস্. আর. রঙ্গনাথন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ এই আন্দোলন পরিচালনা করিয়া দেশবাসীদের গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন।

এ প্রদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের পুরনো। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন বাংলা দেশের দূরতম অঞ্চলে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। পুরাতন গ্রন্থাগারগুলি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, নূতন গ্রন্থাগারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাঠক-পাঠিকার অধ্যয়ন-স্পৃহা বর্দ্ধনে প্রয়াসী হইতেছে। সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, স্কুল-কলেজ গ্রন্থাগার সকলই যে এই বিষয়ে অগ্রণী সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু কোথাও এমন কোন ত্রুটি রহিয়াছে যাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব। ঘটনাটি অতি সত্য, আমার প্রত্যক্ষীভূত।

বার-তের বৎসর পূর্বে কলিকাতা হইতে মাত্র এগার মাইল দূরে একবার চাংড়িপোতার বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতে তথ্যানুসন্ধানে গিয়াছিলাম। সমস্ত সকাল কাজ করিয়া পূর্ব ব্যবস্থা মত এক ভদ্রমহোদয়ের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করি। বৈকাল ২টা নাগাদ ট্রেন ধরিতে হইবে; কাজেই তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন ধারাসারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। ষ্টেশন প্রায় জনমানবশূন্য। একটি তরুণ বেঞ্চিতে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল। এই ছেলেটির সঙ্গেই আলাপ জমাইলাম। জানিলাম, সে তখন হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়িতেছে। পুস্তকখানি কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "...সিরিজের তেতাল্লিশ নম্বর বই।" শুনিয়া ঐ বই সম্বন্ধে তাহার, অর্থাৎ পাঠকের মতামত জানিতে কৌতূহলী হইয়া সুধাইলাম—"কেমন বই?" তৎক্ষণাৎ সে বলিল—"স্রেফ গাঁজা!" ছেলেটির কথা এখানে হুবহু বলিতেছি। ইহার পরেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে এ বই তুমি পড় কেন?" ছেলেটি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল—"সময় কাটাবার জন্য।" এই তরুণটি কোন লাইব্রেরী হইতে এই বই লইয়াছে। স্কুল-লাইব্রেরী কি অন্য কোন প্রাইভেট লাইব্রেরী, ঠিক মনে পড়িতেছে না। ছেলেটির কথা শুনিয়া তখনও ভাবিয়াছি, বার-তের বৎসর পরে আজও ভাবিতেছি। আর নিজেকে প্রশ্ন করি, দেশ স্বাধীন হইয়াছে, পরিবেশ পাল্টাইয়াছে, শিক্ষা-দীক্ষার রকমফের হইতেছে; গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও তো বিস্তার দেখিতেছি। কিন্তু ভোল কি ফিরিয়াছে? কিশোর ও যুবকদের পঠন-স্পৃহা কি বর্দ্ধিত ও নিয়মিত হইতেছে? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিতেছি না। কেন—বলিতেছি।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া কোন সাধারণ মন্তব্য করা বা একটা ধারণা করিয়া লওয়া ঠিক নয়। আমি এমন এক বাড়ীতে বাস করি যেখানে অন্ততঃ এক শত কি দেড় শত কিশোর ও যুবক আছে এবং তাহাদের অধিকাংশই স্কুল-কলেজে পড়ে। অল্পবয়স্ক কিশোরদের বাদ দিলাম। স্কুলের উচ্চতম চারি শ্রেণীতে এবং কলেজে বালক-বালিকা অন্ততঃ ত্রিশ-চল্লিশ জন পড়ে ধরিয়া লইতেছি। এই সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ক'জনা পাঠ্যাতিরিক্ত বই পড়ে, বা পাঠ্য-বই পরীক্ষার সময় ছাড়াই বা ক'জনা অধ্যয়ন

করিয়া থাকে? বিশেষ করিয়া একটি ছাত্রের কথা বলিতেছি। কলিকাতায় এক নামজাদা দীর্ঘকালস্থায়ী বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আজ সাত বৎসর পড়িতেছে। এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে বর্তমান লেখকের কিঞ্চিৎ যোগ রহিয়াছে। বিদ্যালয়টিতে উল্লেখ-যোগ্য লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলে আমি সুখী হইতাম। দু'তিনটি আলমারীর দু'চারটি তাকে দামাস্ক কয়েকখানি বই ছাড়া বিশেষ কিছু দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। উক্ত ছেলেটিও এই সাত বৎসরের মধ্যে দু' তিনখানির বেশী বই লাইব্রেরী হইতে আনিয়াছে কি-না সন্দেহ। অথচ বালকটি যে পড়াশুনায় নিতান্ত অমনোযোগী এ কথাও বলা যায় না। কলিকাতার একটি প্রধান উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের যখন এই অবস্থা, তখন অন্যান্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে কি বলা যাইবে? যে বাড়ীতে এতগুলি কিশোর ও যুবক বাস করে, তাহাদের মধ্যে ভাল এবং মাঝারি রকমের ছেলেও আছে; তাহাদের ভিতরে পঠন-স্পৃহা জাগ্রত হয় নাই কেন এ কথা ভাবিয়া আজ আর বিস্ময় মানি না। স্কুল-কর্তৃপক্ষ কি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এখনও লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন বা অনুভব করেন বলিয়া তো মনে হয় না।

মফস্বলের বিদ্যালয়গুলিরও কি এই অবস্থা? অন্যূন চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। আমি পল্লীগ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে একক্রমে আট বৎসর পড়িয়াছিলাম। এই স্কুলটি একটি অনগ্রসর শ্রেণী-অধ্যুষিত গ্রামে তাহাদেরই নেতাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তবে এখান যোগ্য শিক্ষক, সাজসরঞ্জাম কিছুরই ত্রুটি ছিল না। বলা বাহুল্য, স্কুলের সঙ্গে একটি লাইব্রেরী ছিল। এখানে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সবুজপত্র, স্বাস্থ্য সমাচার, Health and Happiness, মুকুল—এই কয়খানি মাসিক পত্রিকা এবং 'The Bengalee' ইংরেজী দৈনিক রাখা হইত। আমরা অন্য সূত্রে সাপ্তাহিক অমৃত বাজার পত্রিকা, বসুমতী, হিতবাদী, বঙ্গবাসীও মাঝে মাঝে পড়িতে পাইতাম। পল্লীগ্রামের স্কুল-লাইব্রেরী, তাহাতে খুব বেশী বই আশা করা যায় না। তথাপি ছোট বড় মাঝারি কিশোর পাঠ্য এবং বয়স্কদের পাঠ্য অনেক বই সেখানে পড়িতে পাইয়াছি। আমরা যখন নবম শ্রেণীতে পড়ি তখন নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া, এবং কতকটা স্কুলের সাহায্যে মাদ্রাজের "The Indian Reviw" আনরা বৎসরখানেকের জন্য আনাই। এইরূপে পল্লীগ্রামে বসিয়া যতদূর সম্ভব আমাদের পাঠ স্পৃহা মিটাইতাম। স্কুল-লাইব্রেরীর অভাব কি আজ মফস্বলেও দেখা যাইতেছে?

একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সাম্প্রতিক কালেও মফস্বলের ছেলেরা যে অধিকতর মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করে তাহার প্রমাণ পাই প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া। জনৈক অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে উহার সেক্রেটারী রূপে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার স্কুল যে অঞ্চলে অবস্থিত সে অঞ্চলের স্কুলগুলির পরীক্ষার ফল দেখিয়া বুঝা গিয়াছে, কলিকাতার স্কুলসমূহ হইতে ঐ অঞ্চলের ফল উৎকৃষ্টতর। কলিকাতায় নানা কারণে কিশোর ও যুব ছাত্রদের যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, মফস্বলে তাহার প্রায়ই অভাব। এই দেখুন আজ ৩১শে ভাদ্র, বিশ্বকর্মা পূজা—সমস্ত দিন ধরিয়া ছেলেদের কথা ঘুড়ি উড়ানোর! কি বিলাস, কি হুল্লোড়! ছেলেদের কথা কি, বড়োরাও ইহাতে যেন একেবারে মাতিয়া গিয়াছে! আগামী কাল স্কুল খোলা, সমস্ত দিন হৈ-হুল্লোড় করিয়া রাত্রিতে ছেলেদের পাঠে মন বসিবে, না পাঠে মন বসা সম্ভব? এরকম উৎসব-চাঞ্চল্যের একান্ত অভাব পল্লীগ্রামে। কাজেই আজকালকার সহরে ছেলেদের অপেক্ষা পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের মনঃস্থিরতা অধিক নিঃসন্দেহ।

কিন্তু স্কুলের সঙ্গে একটি কিশোর, পাঠ্য-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সহরে স্বীকৃত হইতেছে না, হয়ত অর্থাভাবে মফস্বলেও পুস্তক সংগ্রহে শৈথিল্য দেখা যাইতেছে। ইহার ফল ভীষণ এবং বিষময়। লোকের মনে জ্ঞানলাভস্পৃহা জাগানো গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য। ইহার মূলে রহিয়াছে নিয়মিত অধ্যয়ন। কৈশোরে যদি অধ্যয়ন-স্পৃহা জাগ্রত না হইল, তাহা হইলে পরে কি উহা সম্ভব? এই অভ্যাস স্কুল হইতেই ছেলেদের করাইতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কি স্কুল কর্তৃপক্ষ কি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকেই সমান উদাসীন। ভারতবর্ষে,

তথা প্রদেশসমূহে গ্রন্থাগার-আন্দোলন যে তেমন কার্যকরী হইতেছে না তাহার মূলে রহিয়াছে উহাদের এই বিমন ঔদাসীন্য। কলিকাতার গত অধিবেশনে নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ গ্রন্থাগারিক নিজ ভাষণে এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন :

"The employing authorities are not conscious of the role of librarians in the life of the community, and that, not uncommonly, the librarian is still regarded as a petty clerk who can attend to library work in addition to his other responsibilities. The managing bodies of our schools are guilty in the highest degree in this regard. More often, it is the attendance clerk who is assigned the additional duty of looking after the school library, or, it is a teacher who is expected to keep guard over an indifferent collection of out-of date shabby books securely packed up in an assortment of cupboards of a variety of shape and size. This is most deplorable, as it is at the school age that the child can be made book-conscious. If today students at the University stage show indifference towards reading, the fault can easily be traced to the schools where libraries do not receive the attention they deserve. Absence of reading habits among the adults is to a great extent due to the fact that at the early stages of their education they seldom had a chance of using 'real' books as different from books prescribed."

এই উক্তিতে বিস্তর চিন্তার খোরাক আছে। সভাপতি মহাশয় এই অংশে দুইটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি কারণ এবং অপরটি কার্য, অর্থাৎ তাহার ফল। বিদ্যালয়সমূহে কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যাতিরিক্ত ভাল ভাল পুস্তক পাঠের জন্য গ্রন্থাগারের একান্ত অভাব ; যদি-বা কোথাও কিছু থাকে তবে সেখানে গ্রন্থাগার সুপরিচালনে দৃষ্টি আদৌ দেওয়া না। কোথাও কেরাণীর উপর অন্য দশ কাজের মধ্যে পুস্তক আদান-প্রদানের কাজটিও জুড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। আবার কোথাও-বা কোন শিক্ষক নিজ কার্যের অবসরে এই অত্যাবশ্যক অথচ বিশেষভাবে অবহেলিত কাজটি করিয়া থাকেন। আমি কলিকাতার একটি স্কুলের দৃষ্টান্ত উপরে দিলাম। কোন কোন বিদ্যালয়ে হয়ত উহা অপেক্ষা বেশী আলমারী ও বই আছে, কিন্তু ছাত্রদের পুস্তক-পরিবেশনের ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই ঐ একই রূপ। সভাপতি মহাশয় উক্ত ভাষণে এইরূপ ব্যবস্থা বা অ-ব্যবস্থার নিমিত্ত বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে অতি কঠোর ভাষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা।

পাঠ্যাতিরিক্ত অথচ পাঠের সহায়ক পুস্তকাদি অধ্যয়নে আগ্রহ আজ যে শিক্ষিত সাবালকদের মধ্যে এত কম দেখা যাইতেছে তাহার কারণ বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের উক্ত প্রকার অ-ব্যবস্থা বা দুরবস্থা। ইহার ফল যে বিষময় হইতেছে তাহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। গ্রন্থাগার-আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে কিরূপে ? গোড়ায়ই যে গলদ। স্কুলে ছাত্রদের পাঠের উপযোগী পুস্তক-সংগ্রহ নাই। তাহাদের সাধারণ জ্ঞান বাড়িবে কেমন করিয়া ? তাহাদের অধ্যয়ন-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার উপায় কৈ ? আবার কি কি বিষয় অধ্যয়ন করিলে তাহাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত এবং চিত্ত সংযত হইবে তাহাই বা কে বলিয়া দিবে ? প্রায়ই গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষের মুখে একটি অনুযোগ শুনিয়া থাকি—চুটকি গল্প উপন্যাস না হইলে লাইব্রেরী চালানো ভার। ইহার মূলে রহিয়াছে গোড়াকার ঐ অ-ব্যবস্থা-ও দুরবস্থা। সুতরাং গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে এই গোড়ার গলদ বিদূরণে প্রয়াসী হইতে হইবে।

এই গোড়ার গলদ দূর করিয়া একটি উৎকৃষ্ট উপায়ের

ইঙ্গিতও রহিয়াছে উক্ত ভাষণে। কিন্তু ইহার পক্ষেও সমবেত চেষ্টা বা সহযোগিতা আবশ্যক। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষালব্ধ যুবকগণকে বিদ্যালয়সমূহে গ্রন্থাগারিক বা লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য প্রারম্ভিক একটি কার্য্য দরকার—গ্রন্থাগারে জ্ঞান-গর্ভ কিশোর পাঠ্য ও বয়স্ক পাঠ্য গ্রন্থ সংগ্রহ। এই সংগ্রহে অবশ্য গল্পের বই—যাহা বিভিন্ন নামের 'সিরিজে' প্রকাশিত হইতেছে, সমুদয় নির্ম্মমভাবে বাদ দেওয়া দরকার। গল্প, উপন্যাস বাছাই করিয়া এখানে নিশ্চয়ই রাখা হইবে। কিন্তু সাধারণ ভাবে তাহাদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে অন্য ধরনের বইয়ের প্রতিই আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। কাব্য, জীবনী, স্মৃতিকথা, ইতিহাস, ভূ-পরিচয়, দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা,প্রাচীন ও আধুনিক বিস্ময়কর অভিযান ও আবিষ্ক্রিয়া, পুরাতত্ত্ব, জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বই রাখা যাইতে পারে। তবে মনে রাখিতে হইবে—এখানে রক্ষিত অধিকাংশ বই-ই সরল এবং কিশোর-মনের উপযোগী করিয়া লেখা হওয়া চাই। কিশোর-মন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর, কঠিন হইতে কঠিনতর বিষয়ের ভাব গ্রহণে সমর্থ হইবে। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রাহক এবং গ্রন্থাগারিকদের এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অবহিত হইলে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। কেন বেগ পাইতে হইবে না—একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছি। আমাদের কৈশোরে নর্ম্মাল পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষক মহাশয় আমাদিগকে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতেন। চিত্রাঙ্কন যে একটি অত্যাবশ্যক শিক্ষণীয় বিষয় এ ধারণা তখন আমাদের মনে জন্মে নাই; হয়ত তখনকার 'দায়সারাগোছ' ব্যবস্থায় তেমনটি হওয়া সম্ভবপরও ছিল না। ললিতকলা চর্চ্চার মূলে অঙ্কন-শিক্ষা, এতো স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু উচ্চতন বিজ্ঞান শিক্ষায়ও যে ইহা কত প্রয়োজন বিজ্ঞানীরা তাহা অবশ্যই বলিতে পারিবেন। এই চিত্রাঙ্কন শিক্ষার প্রতি এক কালে কর্তৃপক্ষের নজর একরকম ছিলই না। কিন্তু পরে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সরকারী এবং সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়েচিত্রাঙ্কন শিক্ষার জন্য 'গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে' বা অন্যত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী-শিক্ষক নিয়োগ আবশ্যিক করা হইয়াছে। মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি আছে; তাহার মধ্যে চিত্রবিদ্যার প্রতি আকর্ষণও একটি। কিশোর ছাত্রদের মধ্যে এই বৃত্তির অস্তিত্ব দেখিতেছি। একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-জন্মতিথি-উৎসবে গিয়াছিলাম। সভার প্রারম্ভে একটি প্রকোষ্ঠে আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের ছবি, বৃক্ষচিত্র, অন্যান্য মনীষীর ছবি প্রভৃতি দেখিলাম, দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। প্রত্যেকটি চিত্র ছেলেদের আঁকা। প্রথম দিক্‌কার প্রয়াস বলিয়া ইহাদের মধ্যে দোষত্রুটি রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এই প্রয়াসই যে বিশেষ প্রশংসার্হ।

চিত্রাঙ্কন-শিক্ষক নিয়োগের মত প্রতিটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থ-সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মী নিয়োগ আবশ্যিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পূর্বেই বলিয়াছি, এ বিষয়ে সকলেরই সহযোগিতা আবশ্যক, কেননা ইহা কথঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ। সরকারী শিক্ষা-বিভাগ, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবক প্রত্যেকেই এই অত্যাবশ্যক বিষয়টির প্রতি অবহিত হইবেন কি? একটি কথা আমরা বড় ভুলিয়া যাই। সদ্য-পরলোকগত পণ্ডিতপ্রবর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কত আগে ইহা আমাদের বলিয়াছেন। কৈশোর হইতে ত্রিবিধ জ্ঞান আহরণের দিকে আমাদের মন নিবিষ্ট হওয়া দরকার—১ লোকজ্ঞান, ২ কালজ্ঞান, ৩ দেশজ্ঞান। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, লোকজ্ঞান মানে—যে সমাজে আমরা বাস করি তাহার জ্ঞান; কালজ্ঞান মানে—আমাদের পূর্ব্বেকার ইতিহাস এবং দেশজ্ঞান মানে যে দেশে আমরা বাস করি সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে পরিচয় লাভ। বর্ত্তমানে, স্বাধীনতার পরিবেশে, এই ত্রিবিধ জ্ঞান আহরণ যে কত আবশ্যক তাহা কি এখনও বলিয়া বুঝাইতে হইবে?

ইংরেজীতে একটা কথার বড় চল—"Educate your leaders"—নেতাদের শিক্ষা দান কর। আজ আমাদের ভিতরও সেই দিন আসিয়াছে। নেতারা—সমাজ এবং রাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দ যাহাতে জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে তৎপর হন, অহরহ আমাদের এই প্রয়াস পাইতে হইবে।

কৈশোর হইতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের মধ্যে এই বিবিধ জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, আর গ্রন্থাগারই ইহার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। কিন্তু মূল হইতে সুরু করিতে হইবে। স্কুলের গ্রন্থাগারে কিশোরগণকে একদিকে যেমন পাঠ্যাতিরিক্ত পুস্তক পাঠে আগ্রহশীল করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি উক্ত বিবিধ জ্ঞান আহরণের পথ তাহাদিগকে বাৎলাইয়া দিতে হইবে। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার (প্রথম চৌধুরী কৃত) প্রথম পুস্তকখানির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, চটুল গল্প উপন্যাস পাঠ করার দরুন আমাদের মন জড়ত্বপ্রাপ্ত হইতেছে, গুরুতর বিষয় চিন্তা বা ভাবনা অথবা অধ্যয়ন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি যেন আমাদের ভিতর হইতে চলিয়া যাইতেছে। গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ বলেন, প্রকাশকগণও বলিয়া থাকেন, মননসাহিত্যের পুস্তকের চাহিদা নাই, চাহিদা হাল্কা গল্প-উপন্যাসের। এসব না থাকিলে গ্রন্থাগার অচল, পুস্তক ব্যবসা চালানোও দুঃসাধ্য। খুবই চিন্তার কথা বটে। মনোরাজ্যে বাঙালীর যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, যাহার ফলে আমরা ক্রমশঃ জীবন-যুদ্ধে—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হটিয়া যাইতেছি তাহার আশু প্রতিকার আবশ্যক; এবং গোড়া হইতেই তাহার আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিষয়টির উপরে এখানে কেন বেশী জোর দিতেছি তাহা সহজেই অনুমেয়। নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি এস্, নাসিরুদ্দিন মহোদয়ও ঐ একই কারণে এবিষয়টি সম্বন্ধে অত দৃঢ় অথচ কঠোর মন্তব্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার-সংঘেরও বিশেষ কর্তব্য আছে। আমি এখানে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার-সংঘের উদ্দেশেই দুই-একটি কথা নিবেদন করিব। সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁহারা তো অবহিত আছেনই। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে এই সংঘের সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করি। প্রথমেই প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাদে বাংলা দেশের দুই হাজারের উপর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলেজের গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে একটি পরিসংখ্যান তৈরী করা। কলেজ-লাইব্রেরীর কথা এখানে তেমন বলিতেছি না যত বলিতেছি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-গুলির গ্রন্থাগার সম্বন্ধে। কেননা কিশোর-মনকে প্রথম হইতেই গ্রন্থ-মুখী করাইতে হইবে। নিতান্ত সহানুভূতির সঙ্গেই পরিসংখ্যান গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, এবিষয়ে সকলেরই সহযোগিতা আবশ্যক। কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নাই, বা নামেমাত্র আছে তাহা দেখিতে হইবে: দ্বিতীয়তঃ, যে সব বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার আছে তাহার গ্রন্থ-সংখ্যা, বিষয়ানুগ পুস্তক-বিভাগ, পুস্তক-পরিবেশন ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্ধান লইতে হইবে। প্রাথমিক পরিসংখ্যান গ্রহণান্তর স্কুল-কর্তৃপক্ষ, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সরকার, অভিভাবক সকলকে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা জ্ঞাপন করিতে হইবে এবং কি কি উপায়ে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন, উৎকৃষ্ট পুস্তক সংগ্রহ করা ও গ্রন্থ পরিবেশন সম্ভব তাহারও উপায় সম্বলিত একটি পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। এই প্রাথমিক কার্যটিতে গ্রন্থাগার-সংঘ অগ্রসর হউন। এইরূপে সুনিয়মে কার্য আরম্ভ হইলে ফল ভাল না হইয়াই পারিবে না।

গ্রন্থাগার-আন্দোলন, সরকারী সমাজ-শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক গ্রন্থাগার-স্থাপন ও গ্রন্থাগার-নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থ-পরিবেশন ব্যবস্থা, গ্রন্থ-ক্রয়, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তক আদান-প্রদান, পুঁথি-সংগ্রহ, গ্রন্থাগারের অঙ্গরূপে পুরাদ্রব্য-সংগ্রহশালা স্থাপন, গ্রন্থাগার কর্তৃক লোকশিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা বর্তমানে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একটি নিবন্ধে এতগুলি বিষয়ের অবতারণা সম্ভব নয়। বারান্তরে এসব সম্বন্ধে আলোচনার বাসনা রহিল।

তবে একটি কথা এখনই বলি। পুস্তক-ক্রয়, নূতন ও পুরাতন পুস্তকের তালিকা তৈরী, দেশবাসীর মধ্যে সাধারণ জ্ঞান বিস্তারের পক্ষে আলোকচিত্র-সহযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা—এই কয়টি বিষয়ে অন্ততঃ সরকারী সমাজ-শিক্ষা বিভাগ এবং গ্রন্থাগার-সংঘ এখনই বিভিন্ন গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করিতে ও সুপরামর্শ দিতে পারেন।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

মন্দিরা

উনবিংশ বর্ষ | কার্তিক, ১৩৬৩ | সপ্তম [illegible] সংখ্যা

স্মৃতি কথা

শ্রীকালিদাস রায়

আমার Versification এর stage-এ কবিবন্ধু সৌরীন্দ্রনাথ ছিল প্রধান সাথী আর আমার কবিতারচনার সূত্রপাতের Stage-এ আমার সহচর ছিল শরদিন্দু। শরদিন্দু ছিল প্রতিভাবান—তার প্রতিভার স্ফুরণ হলো না—সংযমের অভাবে। তারপর হলো অকালমৃত্যু। এরূপ শিল্পসাধককে সকলে ভুলে যায়—কিন্তু যতদিন তার বন্ধুরা বেঁচে থাকে তত দিন তাকে ভুলতে দেয় না। আজ আমার স্মৃতি কথায় তার পরিচয় রেখে গেলাম।

শরদিন্দু বহরমপুরের উকিল প্রসন্ননাথ রায়ের পুত্র। প্রসন্নবাবু হাস্যরসিক কবি ছিলেন। স্থানীয় ঘটনা নিয়ে রঙ্গরসের কবিতা লিখতেন। সাধারণতঃ পৌর-প্রতিষ্ঠানের ভোটের সময় তাঁর লেখনীতে কবিতার খই ফুটতো।

শরদিন্দু যতবার পাশ করেছিল তার চেয়ে বেশী বার ফেল করেছিল। তার মত অসাধারণ ধীশক্তিশালী ছাত্র কি ক'রে কি কৌশলে বারবার ফেল করত, তা ভেবে পেতাম না। এনট্রান্স পাশ করার পরে দু' একবার এফ-এ ফেল করে এফ-এ পাশ করার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে যায়। সেখানে দুবছর পড়ে পালিয়ে আসে। তারপর তার সঙ্গে বি-এ পড়েছিলাম। দুজনে ইংলিশ অনার্স পড়তাম। প্রিন্সিপ্যাল হুইলার বলতেন 'শরদিন্দুর ইংরাজি সাহিত্যে এত বেশী জ্ঞান যে সে যদি 1st. Class 1st. হয় তা হ'লে বিস্মিত হব না।' সেই শরদিন্দু বি-এ ফেল করল। অবশ্য ইংরাজীতে নয়। তারপর সে গেল Ripon College এ পড়তে। সেখানে সে কোন Chance এ পাশ করেছিল মনে নেই। সে যখন রিপন কলেজে পড়ত তখন আমার বিয়ে হয়। সে আমার বিয়েতে দুটো কবিতা লিখেছিল—একটা কবিতার দু' লাইন মনে আছে—

কড়ুই গাঁয়ে বড়ুই গাছে চড়ুই করে বাস।
সেথায় কিনা জন্ম নিল কোকিল কালিদাস।

বি-এ পাশ করে সে বি-এল পড়তে সুরু করলে বার বার আইনের পরীক্ষা দিয়ে সে পাশ করতে পারল না।

এরূপ বিপর্যয়ের কারণ—কবিতা রচনা, গান, নাট্যাভিনয়, নাট্যরচনা, মজলিসী গল্পগুজব, আবৃত্তি ইত্যাদিতে বিক্ষিপ্তচিত্ততা। শরদিন্দু নিজে পড়ত না, কিন্তু পড়াতে পেলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। বহরমপুরে যখন থাকত তখন একটা কাজ ছিল স্কুলকলেজের ছাত্রদের ধরে ধরে পড়ানো। নিজের কাজ ছাড়া অন্য কাজে তার ঔদাস্য ছিলনা। নিজের ইষ্ট চিন্তা তার কোষ্ঠীতে লেখা

ছিলনা। যাতে অর্থাগম হয়—তার প্রতিই ছিল তার বিরাগ। বিন্দু স্কুলে কিছুদিন মাষ্টারি করেছিল কিন্তু রুটিন-বদ্ধ কাজ তার ভাল লাগেনা—সে ছেড়ে দিয়ে বহরমপুর পালালো। শরদিন্দুর প্রধান কাজ ছিল বহরমপুর শহরের যুবসমাজকে মাতিয়ে রাখা। পিকনিক, বোট পার্টি, নাট্যাভিনয় ইত্যাদিতে সর্দারি করে সে আনন্দ পেত। শহরে যত বিয়ে হতো তাতে শরদিন্দু হাসির কবিতা লিখত। বিয়ের কবিতা যে কত চমৎকার সাহিত্য হতে পারে—তা শরদিন্দু দেখিয়ে গিয়েছে। তার বিয়ের কবিতার নমুনা কিছু কিছু আমার কাছে আছে। একটা কবিতায় সে লিখেছিল—বর না হলে চলতে পারে বিয়ের পদ্য চাই। আর একটায় শুরু হয়েছিল—

ঢাকী সব করি রব ঢোল বাজাইল।
আনন্দে হাবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

শরদিন্দু প্যারডি রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিল—কত রঙ্গরসের গানই সে যে লিখেছিল তার ইয়ত্তা নেই। এখনো সেগুলির কয়েকটি কবি নলিনীকান্ত সরকার সভা মজলিসে গায়। মাসিক পত্রে ছাপাবার জন্ত সে কখনো কবিতা পাঠাতনা—নিজে সেগুলো গাইত কিংবা আবৃত্তি করত—মজলিসে মজলিসে। কেবল অর্থার্জনে নয়, সাংসারিক বিষয়েও তার ছিল দারুণ ঔদাসীন্য—নিজের স্বাস্থ্য বিষয়েও ছিল ঔদাসীন্য। অকাল মৃত্যুর এও একটা কারণ। শরদিন্দুর হাঁপানি রোগ ছিল। কিন্তু তার রুসরুসের বিশ্রাম ছিলনা। তা ছাড়া রাত জেগে নাট্যাভিনয়ে যোগ দিত, গানের আসরে চেঁচামেচি করত, ঠাণ্ডা লাগাত আর কেবলি ভুগত।

এক একদিন কলেজের ফেরতা পথে আমাকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে যেত, রাতে আর বাড়ী আসতে দিত না—তাই অরবিন্দকে পাঠিয়ে দিত আমার বাড়ীতে সংবাদ দেওয়ার জন্ত। সারারাত কবিতার আবৃত্তি করত—এক ঘণ্টাও ঘুমুতে দিত না। শরদিন্দুর নিজের লেখা সমস্তই তার মুখস্থ থাকত। মোহিতলালের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তার মিল ছিল। দুজনেই সাহিত্য সাহিত্য করে পাগল। রুস-সরোবরে দুজনেই সন্তরণ করত, মোহিতলাল ছিল রোহিত গম্ভীর জলসঞ্চারী, মাঝে মাঝে আকুল মেরে সরোবরকে প্রকম্পিত করত। আর শরদিন্দুর ছিল শফরী-লীলা, তাই বলে শরদিন্দু বিদ্যায় লঘীয়ান্ ছিল না। তার ইংরাজি ভাষণ ও সাহিত্যের জ্ঞান মহাপ্রাজ্ঞ হইলারই স্বীকার করে গিয়েছেন। বাংলাসাহিত্যেও তার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, রবীন্দ্রসাহিত্যের রস সে নিঃশেষে পান করেছিল—তা ছাড়া সমাজতত্ত্ব, ইউরোপীয় দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদিতেও তার জ্ঞান ছিল—সাধারণ গ্র্যাজুয়েটদের চেয়ে ঢের বেশী। কিন্তু শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা ও সংযমের অভাবে এ সমস্ত কোন কাজেই লাগেনি। এরূপ চরিত্রকে কাছে পেলে মোহিতলাল নিশ্চয়ই খুব ভালবাসত। কিন্তু দুজনের পরিচয়ই হয়নি।

আমার অন্যতম বন্ধু সতীশ ঘটকের সঙ্গে শরদিন্দুর চরিত্রসাম্য ছিল। দুজনেই রঙ্গরসের কবি, দুজনেই সবই হেসে উড়িয়ে দিত। দুজনেই বিদ্বান ছিল। দুজনেরই অসামান্য প্রতিভা সংযম শৃঙ্খলা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাবে—অসামান্য সৃষ্টিতে রূপ ধরেনি। তবু সতীশদা ভবানীপুরে ছিলেন ব'লে এবং বড় বড় সাহিত্যিকদের সংসর্গে এসে-ছিলেন ব'লে এবং যৌবন অতিক্রম ক'রে মারা গিয়েছিলেন বলে গ্রন্থকারে কিছু রেখে গিয়েছেন। শরদিন্দুর গ্রন্থকার হবার কোনো উৎকাঙ্ক্ষাও ছিল না।

আমাদের কলেজটা খাগড়া থেকে অনেক দূরে অবস্থিত—শরদিন্দুর বাড়ি ছিল খাগড়ায়। সৈদাবাদ থেকে কলেজ আরো দূর। কিন্তু আমি যেতাম ঘোড়ার গাড়ীর সোয়ারে, আসবার সময় আসতাম হেঁটে। আসবার সময় সঙ্গী হতো শরদিন্দু, কাজেই কোনদিন আমার পথক্লেশ অনুভব করতে হয়নি। তার রসনার অবিশ্রাম নরীনৃত্য আমার সুধার সঙ্গে পথক্লান্তিও ভুলিয়ে দিত—বাড়ীর কাছাকাছি এসে সে বলত "ওরা, এর মধ্যে আমরা এসে পড়লাম—কলেজটা খুবই কাছে দেখছি, চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

আমাদের গলির মোড়ে এসেও তাকে বিদায় করতে পারতাম না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্ততঃ একঘণ্টা চেঁচামেচি করত। মনে পড়ে ঠনঠনে কালীবাড়ীর সামনে গ্যাস-পোষ্টের ধারে মোহিতলালের বাক্যচ্ছটা ৪টা হতে রাত্রি ১০॥ পর্যন্ত। দুজনেরই কথা আর ফুরত না।

শরদিন্দুর প্রতিভার স্ফুরণ হ'তে শুরু হয়েছিল—নাটক

রচনায় ও নাটকের অভিনয়ে। অন্য সকল বিদ্যার কথা ছেড়ে দিলে শরদিন্দু অভিনয়বিদ্যায় অনন্যসাধারণতা লাভ করতে পারত। তার এ বিদ্যার প্রসারের ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। আমার অন্যতম বন্ধু শিশির ভাদুড়ী যখন ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিউটে অভিনয় করছিল—তখন শরদিন্দু বিপন কলেজের ছেলেদের থিয়েটারে চাণক্য ও বাদবচন্দ্রের ভূমিকা অভিনয় করছিল।

শরদিন্দু সখের থিয়েটারের যেসব নাটক লিখে নিজে অভিনয় করেছিল সে সব নাটকের মধ্যে 'সমানে সমান' শুধু প্রকাশিত হয়েছিল। তার রঙ্গরসের গানগুলো বোধ হয় প্রকাশিত হয়নি। সে সব গান আমার পণ্ডিচেরির বন্ধু নলিনীকান্ত জানে—অন্যান্য লেখা আমার আত্মীয় হেমাঙ্গ ভায়ার (হেমাঙ্গপদ বরাট, কবির ভক্ত প্রতিবেশী) কাছে থাকতে পারে।

আমি ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত রঙ্গপুর জেলায় ছিলাম—এই সময়টায় তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এই সাত বৎসর তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার সুযোগ আমি পাইনি। মনে হয় আমি দেশে থাকলে তাকে কলকাতার সাহিত্য সমাজের সঙ্গে পরিচায়িত করে দিতে পারতাম। জানি না তাতে কিছু ফল হ'ত কিনা। একটা ফল এই হ'তো—সে যাদের কাছে বাহবা পেয়েছে তাদের সাধুবাদে সে আত্ম-সচেতন হয়ে উঠতে পারেনি। কলকাতায় সাহিত্যিক ও সম্পাদকদের কাছে তার যথাযোগ্য আদর হ'লে সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠতে পারত। তাতে-তার মনে একটা উদ্যম ও উৎকাঙ্ক্ষা জাগতে পারত।

আমার সাহিত্যিক জীবনে তার প্রভাব নিঃসন্দেহে সক্রিয় ছিল তা আমি বেশ উপলব্ধি করতাম। আমি তার জীবনীশক্তির কাছে মুহ্যমান হয়ে থাকতাম—তাই আমি তার জীবনে বা চরিত্রে কোন প্রভাবই সঞ্চার করতে পারিনি।

অনেক সংকল্পই তার মনে ছিল, সে সব সংকল্প সৃষ্টিতে রূপলাভ করেনি, অনেক কাজই অসমাপ্ত রেখে সে অকালে চলে গেছে।

ভূবেরের ভাণ্ডারও অবিশ্রান্ত ব্যয়ে শূন্য হয়, তার অফুরন্ত জীবনী শক্তির ভাণ্ডারও অবিরত ব্যয়ে ও অপচয়ে অকালেই শেষ হয়ে গেল।

দশগ্র হিম-শৈলের (Ice-berg) একভাগ জলের উপরে থাকে—দশভাগথাকে জলের নীচে। আমরা শরদিন্দুর একভাগের পরিচয় পেয়েছিলাম। সেই দশভাগকে কল্পনায় অনুমান করেই বলি—

প্রেমক অফুর ভাত অংতভেল না ভেল যুগল পলাশা।

বন্ধুবর গিরিজাশঙ্কর বহরমপুর ত্যাগ ক'রে কলকাতায় সঙ্গীতরসিক মাড়োয়ারী রসিক সম্প্রদায়ের সংসর্গে আসেন —তারপর তাঁর খ্যাতি আর্যাবর্তে বিস্তৃত হয়েছিল। গিরিজাশঙ্কর যখন সুরশিল্পীর খ্যাতির উচ্চ চূড়ায় আরূঢ়, তখন তার উদ্দেশে একটি কবিতা লিখে দীপালি পত্রিকায় ছেপেছিলাম। জানি না সে কবিতা তার হাতে পৌঁছেছিল কিনা। কবিতাটা এই—

বন্ধু আজিকে বঙ্গের সীমা
লঙ্ঘিয়া গেছে তোমার যশ—
দেশে দেশে আজ কত না রসিক
পিইতেছে তব গীতির রস।
একদা ছিলাম তব কণ্ঠের কল
কুজনের মোরাই শ্রোতা,
তব জীবনের সে উষার স্মৃতি
সে মধুর প্রীতি আজিকে কোথা ?
একদিন ছিল, স্ফুটনোন্মুখ
তব সাধনার কমল দলে
অলি হয়ে মোরা পিয়েছি মাধুরী
তোমায় ঘিরিয়া কৌতূহলে।
মংগল ঘটে চুতশাখা সম
তব কণ্ঠের সুরবিতান,
সব উৎসবে মংগলাচারে
করিত যে শুচি-মহিমা দান।
একদিন আমি রচিয়াছি গান
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছ তায়,
তোমার কণ্ঠে আমার বাণীর
সুর পরিণয় ভোলা কি যায় ?

ভাগীরথীবুকে নৌকা বাহিনু
কত উষ্ণান দরিগণ,
মনে পড়ে সখা তোমার গীতিতে
সুরভি মধুর বনভোজন।
সেদিনের স্মৃতি জাগাই বন্ধু
আজিকে তোমার জন্মদিনে
এ স্মৃতি জাগাবে সে প্রীতি-মাধুরী
সে প্রীতিতে তুমি রেখেছ কিনে।
তোমার সুরের সুরধুনীধারা
উত্তরাপথ প্লাবিয়া বয়।
করিয়াছে তাহা ক্রূর মরুভূর
রুদ্ধ-পাষাণেরো হৃদয় জয়।
হিংস্র-দর্প শার্দ্দ লও আজি
মুগ্ধ-মুগ্ধ তোমার গীতে।
কবির-কুঞ্জে আনে বসন্ত
তব মূর্চ্ছনা গভীর শীতে।
সরস করিলে মোর যৌবনে
সুলভ করিলে আনন্দ-কে
মোর মত হবে তব গৌরবে
গৌরবী কেবা শুধাই সখে।
চারিদিকে তব বন্দনাগান
দেশে দেশে তব জয়ধ্বনি,
তার মাঝে শোন পুরানো মিতার
ফুরানো স্মৃতির আমন্ত্রণী।

কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বহরমপুর থাকা কালে। বসন্ত কাটোয়ার লোক—কাজেই আমার 'দেশের' কবি। তার সঙ্গে পত্রযোগে আলাপ হয়। তারপর সে আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসে বহরমপুরে। আমি তার জীবনী শক্তির আতিশয্য ও উচ্ছলিত ভাবাবেগের অভিব্যক্তি দেখে বিস্মিত হলাম। তারপর থেকে তার সঙ্গে পত্র ব্যবহার চলত। সে ডাক বিভাগে কাজ করত। তার সঙ্গে বহুত্ব অক্ষুণ্ণই আছে।

বসন্ত গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, জীবন-চরিত, প্রবন্ধ—সবই লিখতে পারত। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে সে মস্তবড় বই লিখেছে—সে বই এখনো অপ্রকাশিত। আমার মনে হয়—সে তার বহুমুখী শক্তিকে এক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করলে ভালো করত।

ডাঃ সুরেন্দ্র দাসগুপ্তের কথা পরে লিখব। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কাহিনী খুবই দীর্ঘ ও বিচিত্র। ছাত্র-জীবনেই তাঁর সঙ্গে বহরমপুরে থাকতে পরিচয় হয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাবই ছাত্রজীবনের শোচনীয় পরিণতির প্রধান কারণ। আমি যাদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলাম—বাল্য থেকে যাদের সঙ্গ লাভ করেছিলাম—তাদের কারো মনে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না।

আমার মনে হয়, শহরের উত্তরপ্রান্তে না থেকে দক্ষিণ প্রান্তে বাস করলে আমার জীবনের গতি হ'তো অন্যপথে।

দ্বিতীয় কারণ, পরীক্ষার পড়াশুনার প্রতি ঔদাসীন্য। পরীক্ষা পাঠ্যের অতিরিক্ত বহু জিনিস পড়তে হবে এবং তার দ্বারা সতীর্থগণ হ'তে স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে হবে—এটাই ছিল তখনকার অভিমান ও অভিসন্ধি।

তৃতীয় কারণ স্বাস্থ্য। মামা যক্ষ্মায় মারা যান। পিসতুতো দাদা রাধিকাচরণ বরাট চোখের সামনে যক্ষ্মায় ধীরে ধীরে মারা গেলেন। আমি বাল্য-কৈশোরে অবিরত ম্যালেরিয়ার ভুগে শীর্ণদেহ হয়ে পড়েছিলাম। কলেজে পড়বার সময় প্রায়ই সর্দ্দিকাসি হত—নাক ঝাড়লে রক্ত পড়ত, সেই রক্ত অজ্ঞাতসারে টানলে মুখ দিয়েও পড়ত। আমার ধারণা জন্মে গিয়েছিল আমারও টি. বি. হয়েছে। এরূপ অবস্থায় মন দিয়ে পড়াশুনা করা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা অসম্ভব। এই ছাত্রদশায় Keatsএর বহু কবিতা ও জীবন-চরিত পড়েছিলাম এবং Mrs Wood এর অধিকাংশ নভেলে যক্ষ্মারোগীর শোচনীয় চিত্রবিবৃতি পড়েছিলাম। ফলে, প্রায়ই যক্ষ্মা রোগেরই স্বপ্ন দেখতাম। এসব কথা আগেই বলেছি।

চতুর্থ কারণ—কবিতা রচনার নেশা। কবিতা রচনা করতে এখন বেশি সময় লাগে না। কিন্তু ছাত্রজীবনে অনেক সময়ই ব্যয়িত হত। কবি ব'লে শহরের লোক স্বীকার করলে নিজের মনে হল এইত আমার পথ পেয়েছি—এর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তুচ্ছ। বিশেষতঃ স্বয়ং কবিগুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেননি। যারা

প্রাণপাত করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'ত তাদের কৃপার পাত্র মনে হত।

এই সকল কারণ সত্ত্বেও Distinction-এ বি. এ. পাশটা আটকায়নি শহরে। খুব কম ছেলেই বি-এ পাশ করত। পাশ ক'রে মনে হ'ল দরিদ্র সন্তানের পক্ষে এ-ই যথেষ্ট। এখন সেই মনোভাবের কথা স্মরণ করে হাসি পায়।

যে সকল কারণের কথা উল্লেখ করা হল, পরে ঐ সকল কারণ আরো জোরালো হয়েছিল, তার ফলেই আমার জীবনের শোচনীয় পরিণতি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কোনো বৃত্তি গ্রহণের বা সংগ্রহের জন্য আমাকে উৎসাহিত করেনি।

এফ. এ. পাশ করার পর ইনভিনিয়ারিং কলেজের কথা আর একবার উঠেছিল, কিন্তু তখন আমি মহারাজের শাসনের বাইরে। কাসিমবাজার হ'তে তখন আমরা সৈদাবাদে উঠে এসেছি। বি. এ. পড়ার সময় আমি সৈদাবাদেই থাকতাম। এখানে আসার পর হতে আমি বন্ধু-সংসর্গে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। কাসিমবাজারে ছিলাম একেবারে নিঃসঙ্গ। প্রকৃতিই ছিল আমার একমাত্র Friend, philosopher and guide সৈদাবাদে এসে বহু কলেজে-পড়া বন্ধু পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এখানকার বন্ধু-মোল্লাদের দৌড় ছিল বি. এ. পাশের মসজিদ পর্যন্ত। বন্ধুদের সংসর্গে যোগভীতি হ'তে কতকটা অব্যাহতি পেতাম—অন্য কিছু লাভ হয়নি।

আমি যখন বি. এ. পড়তাম তখন স্যার আশুতোষ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব লাভ করেছেন—পরীক্ষার ব্যাপারে নব-বিধানের সূত্রপাত হয়েছে। কাজেই আমি এক পেপার বাংলা বাধ্যতামূলক হিসেবে পাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। নববিধানের সবচেয়ে বড় দান—ছাত্রদের বিষয়-নির্বাচনের সুবিধা ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বৈকল্পিক প্রশ্ন-নির্বাচনের স্বাধীনতা।

এই দুইটি যে কত বড় দান, তা আমাদের সময়ে ছাত্রেরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বাদ দিতে না পারায় কত কৃতী ছাত্র যে এফ. এ. ফেল হয়ে থাকত তার ইয়ত্তা নেই। সেকালের অনেক বড় বড় বিদ্বান লোক, বড় বড় সংবাদপত্র-সম্পাদক এফ-এ ফেল ছিলেন। তাঁরা ইংরেজীর জন্য বারবার এফ-এ ফেল হতেন না, কারণ তাঁদের অনেকেই ইংরাজি ভাষার রচনাতেই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকে দেশবিখ্যাত Journalist হয়েছিলেন।

বি. এ. পরীক্ষাতেও বিষয়ের সংখ্যা বেড়েছিল এবং নির্বাচনের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। ইকনমিকস্ নামে নতুন বিষয়ের আবির্ভাবে বহু ছাত্র দর্শন ছেড়ে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস ও সংস্কৃত একসঙ্গে নেবার সুযোগ আগে ছিল না। ইতিহাস ও সংস্কৃত নিয়ে অনেক ছাত্রেরা তরিয়া যেতে লাগল। বি-কোর্স বি-এ তে গণিত ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সকল ছাত্রকে ইংরাজিরও পরীক্ষা দিতে হত। বি-কোর্সের ছাত্রদের অনেকে ইংরাজিতে ফেল হয়ে যেতে। অধ্যবসায়ী ছাত্রেরা বহুবার এফ-এ, বহুবার বি-এ পরীক্ষা দিয়ে, হয়ত ত্রিশ বছর বয়সে বি-এ পাশ ক'রে পারিবারিক সম্বল নিঃশেষ করে কোন স্কুলে মাষ্টারি নিত। মাষ্টারি করতে করতে আইন পাশ করে উকিল হ'ত। এইরূপ উকিলের সংখ্যা ছিল সেকালে খুব বেশি। পরে এদের অনেকেই ওকালতিতে অসাধারণ পসারও করত।

পরীক্ষার ব্যাপারে সেকালে কত বড় অবিচার ছিল—তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার একজন গণ্য মান্য আত্মীয় ৪ বার বি-এ ফেল হ'ন! দু'বার শুধু ইতিহাসে, দু'বার শুধু দর্শনে। কিন্তু ২ বার ইতিহাসে ২ বার দর্শনে পাশ করেও এবং প্রত্যেকবার ইংরাজিতে পাশ হয়েও তিনি পাশ করা বলে গণ্য হলেন না। অথচ পৌর জীবনের নানা দায়িত্ব-পূর্ণ কাজে পরে এর চেয়ে কৃতিত্ব কোন এম-এ বি-এল দেখাতে পারেন নি। ধনীর সন্তান না হলে তাঁকে স্কুলে ৪০৲ টাকা মাহিনায় মাষ্টারি করতে হত। সেকালে Compartmental পরীক্ষার সুযোগ ছিল না। ইংরাজি বাদ দিতে পেরে বহু ছাত্র বি-এস-সি পরীক্ষা দিয়ে কৃতবিদ্য হতে লাগল। তারপর alternative প্রশ্ন থাকার প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় বহু ছাত্র যে সুবিধা পেল—তার মূল্য এখনকার ছাত্রেরা উপলব্ধি করবে না, কারণ তাদের প্রথান্তরের কথা জানা নাই। আমরা এনট্রান্স ও এফ-এ পড়েছিলাম—আমরা

সে সুযোগ পাইনি। আমরা এর মূল্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করলাম। এতে পাশের সংখ্যা বেড়ে গেল। আমরা জানলাম, স্যার আশুতোষের চেষ্টাতেই ছাত্রগণ এই সুবিধা পেয়েছিল। নববিধানের গ্রাজুয়েটদের প্রতিদিন প্রভাতে সেই মহাপুরুষের দানের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। তাছাড়া পরীক্ষার সরকারী কঠোরতা বহুভাবে শিথিল হওয়ায় এবং আজ পর্যন্ত সেই ধারা অনেকটা বর্ত্তমান থাকায় দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা এত বেড়েছে। নতুবা কত ছাত্র, যারা ভবিষ্যৎ জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তারা এনট্রান্স, এফ-এ কিংবা বি. এ. ফেল করে ব্যর্থজীবন হয়ে থেকে যেত।

পাসকোর্সে Distinction দেওয়ার প্রথাও নব-প্রবর্ত্তিত। মন দিয়ে পড়াশুনা করিনি—নিজের বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। সেজন্য নববিধানের ও নববিধাতার প্রতি আমার অকপট কৃতজ্ঞতা জানাই। চারিদিকে দেখতাম আমার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রমী ও মেধাবান ব্যক্তিরা এফ-এ কিংবা বি-এ ফেল ক'রে দরিদ্র জীবন যাপন করছে—তখন নিজকে ভাগ্যবানই মনে হ'ত।

বি-এ পাশের পর আমার উচিত ছিল চাকরির চেষ্টা করা। বাড়ীর বড় ছেলে আমি। বাবার বয়স তখন ৫৪ বৎসর। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তখনও বাবা অবসর গ্রহণ করেন নি। তিনি আমাকে চাকরির জন্য উৎসাহিত করেন নি। আমিও দেখলাম—সহায় নেই, সম্বল নেই, কোথায় কি চাকরি পাওয়া যায় তাহাও জানি না। কলিকাতায় কিছুকাল না থাকলে চাকরির হদিশও পাওয়া যাবে না। কাজেই এম-এ পড়ার জন্য কলিকাতায় আসাই স্থির হল। কলিকাতায় এসে পড়াশুনা করার অসুবিধাও ছিল না।

কাসিমবাজারের মহারাজের বাগানবাড়ীতে বহু ছাত্র আহার ও বাসস্থান লাভ করে পড়াশুনা করত, আমার ত রীতিমত দাবিই ছিল। বলবামাত্র মহারাজ সম্মতি দিলেন। আমি মহারাজের বাড়ীর ছাত্রাবাসে থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনের এম-এ ক্লাসে যোগ দিলাম। বিষয় নির্বাচনের জন্য দায়ী ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। মার্কশীট তাঁকে দেখালে তিনি বল্লেন—'Philosophyতেই সবচেয়ে বেশি মার্ক পেয়েছেন, বিষয়ও কবির পক্ষে উপযোগী, এই বিষয়ই পড়ুন। আমি যতদূর সম্ভব সাহায্য করব।' কিন্তু আমি আমার এম-এ পড়ার সময় তাঁর দেখা আর পাইনি। তিনি সম্ভবতঃ তখন চট্টগ্রামে অধ্যাপক।

কলিকাতার কলেজে যাঁদের সঙ্গে পড়েছিলাম—তাঁদের অনেকে কৃতী পুরুষ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের কর্ত্তা ডাঃ মৈত্রেয় একজন। তাছাড়া, অনিলবরণ রায় ও অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যকে শিক্ষিত লোকেরা সকলেই চেনেন। অনিল বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক ছিল—পর জীবনে তার সঙ্গে অনেকদিন তাস খেলেছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে কোন সারস্বত আলোচনা হয়নি। সে অসহযোগিতার আহ্বানে স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগ দিল—তারপরে সে অরবিন্দ আশ্রমের একজন কর্মী হ'ল। তার গীতার উপর প্রবন্ধগুলি তার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও আধ্যাত্মিক সাধনার ফল। হরিদাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনবিভাগের কর্ত্তা ছিল—তার সঙ্গে আমার বরাবর সম্বন্ধ ছিল। সে ছিল অসাধারণ পণ্ডিত। জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে এমন অসাধারণ বাগ্মিতা আর কারো লক্ষ্য করিনি। ভারতবর্ষের বহু দার্শনিক সম্মেলনে বাংলার পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে গিয়ে সে বাংলার মুখ রক্ষা করেছিল। ডাঃ দাশগুপ্ত কোন দার্শনিক পণ্ডিতকে আমল দিতেন না—কিন্তু হরিদাসকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর মুখে হরিদাসের প্রশংসা ধরত না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে অধ্যাপক ক'রে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন—হরিদাস তাঁদের মধ্যে একজন।

স্টিফেন সাহেবের উচ্চারণ ভালো বুঝতাম না, ক্লাসে অন্যমনস্ক হয়েই থাকতাম। মিঃ আর্কহার্টের উচ্চারণ ছিল খুব স্পষ্ট, তাঁর লেকচার মন দিয়ে শুনতাম। স্টিফেন সাহেব ছেলেদের অসুবিধা বুঝে বোর্ডে তাঁর বক্তব্য লিখে দিতেন, আমরা টুকে নিতাম। অনেক সময় মনে হত—এই কথাগুলো খুব মনে থাকবে, এ আর টুকে কি হবে? ততক্ষণ একটা কবিতা লেখা যাক। আমার পাশে ব'সে আমার ভবিষ্যৎ প্রোলকটি (নির্মল) তাতে বিদ্রূপ প্রকাশ করতেন।

যা হোক আমার কলেজে পড়াটা একটা গৌণ উপলক্ষ মাত্র—এতে কলকাতাবাসের সুযোগ ঘটেছিল মাত্র। মুখ্য অবলম্বন হয়ে উঠল—কবিতা রচনা, কবিতা প্রকাশ, কবিতাপ্রচার ও সাহিত্যিক সমাজে মেশা-মেশা করা। তখনকার প্রধান সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রবাসী-ভারতীর দল। সেখানে ঘাতায়াত ক'রে দেখলাম—ঐ দলের সাহিত্যিকরা আমাকে পাত্তা দিল না। গোষ্ঠীতে স্থান দিতে তারা যেন কুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়কে অবলম্বন করে তাঁরা একটি aristocratic সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়েছিলেন। তাতে আমার ন্যায় দরিদ্র ছাত্রের স্থান ছিল না। বিশেষতঃ তখনও আমার কোন উল্লেখযোগ্য বইও বাহির হয়নি। প্রবাসী ও ভারতীতে তখন আমার কবিতা প্রকাশিত হ'ত, সেই ভরসায় আমি মিশতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় "পদ্মরাজের পরিবেশমণ্ডলে" প্রবেশ লাভের যোগ্যতা তখনও আমার হয়নি।

তখন আমি ছাত্রদের গোষ্ঠীতেই স্থান খুঁজলাম। কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট-তখন ছাত্রদের প্রধান মিলনসংসদ। এখানে সদস্য হয়ে সাদরে অভিনন্দিত হলাম। কারণ, ছাত্রদের মধ্যে কবি কেউ ছিল না। এই সকল ছাত্র সংস্কৃতির বিবিধ অঙ্গের অনুশীলন করতেন। সাহিত্য এই সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট শাখা। কাজেই আমি এখানে সহজেই সমাদর লাভ করলাম। আমার যে সময়টা বাসায় পড়াশুনা করবার কথা সে সময়টা ইনস্টিটিউটের বন্ধুগণের সাহচর্যেই কাটতে লাগল। এখানকার অধিকাংশ সদস্যই ছিল উৎকাঙ্ক্ষী—এদের লক্ষ্য ছিল অর্থকরী কোন জীবিকা অবলম্বন ক'রে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও কার্যক্ষেত্রে কৃতিত্বলাভ। আশ্চর্যের বিষয়, এদের সাহচর্যে আমার মনে সেদিক দিয়ে কিছুমাত্র উৎকাঙ্ক্ষা জাগল না। আমার উৎকাঙ্ক্ষা ছিল, ঐ প্রবাসী-ভারতীর দলের উৎকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অভিন্ন।

এখানে যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল তাঁদের অনেকে আজ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি। বন্ধুত্ব কথাটা বলা ঠিক হল না। কারণ, আমি বন্ধু তাকেই বলতে পারি যে আমাকে বন্ধু ব'লে স্বীকার করে—আর যার সঙ্গে কেবল সামাজিক সম্বন্ধ নয়, গার্হস্থ্য জীবনেরও সম্পর্ক ঘটে। যা হোক যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়—তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কৃতী ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের দেশের লোক, বিশেষতঃ শিক্ষিত লোকেরা জানেন।

১। অমল হোম। ২। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৩। শিশির কুমার ভাদুড়ী। ৪। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ৫। গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী। ৬। নরেশ চন্দ্র মিত্র। ৭। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। (দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ) ৮। ডাঃ সুশীলকুমার দে। ৯। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

অমল আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু অমলের সঙ্গেই রীতিমত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বই হয়েছিল। ছাত্রগোষ্ঠী ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে সেই ছিল আমার যোগসূত্র। "পদ্মরাজের পরিবেশ মণ্ডল" আমাকে সাদরে গ্রহণ করেনি বলে সে বড়ই ব্যথিত হয়েছিল। আমি তখন যাহা কিছু লিখতাম সমস্তই অমলকে শুনাতাম এবং তার মতামতের উপর নির্ভর করতাম। সে আমার রচনার প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। আমার যখন তিনখানা বই ছাপা হয়েছিল তখন সে সেগুলি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ আনিয়ে দিয়েছিল। কবিজীবনে তা-ই আমার পাথেয় সম্বল। অমলের সঙ্গে আমি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম। বহরমপুরের বন্ধু ডাঃ ললিত মোহন সেন (মানু) নববিধান সমাজের বিবিধ অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে যেত। অল্পদিন হ'ল মানুর মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তী জীবনে তার সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ ছিল না।

ডাক্তার সুনীতিকুমারকে আমার সবচেয়ে ভাল লাগিত, তাঁর রসভূয়িষ্ঠ আলাপ, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, অকপট বন্ধু বাৎসল্য, অমায়িক আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তার সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম। তার বন্ধুগণও আমার বন্ধুরূপে গণ্য হয়েছিল।

প্লাবন

নগেন দত্ত

অচেনা ঝড়ের মুখে হিমশ্বাস বয়,
আয় মৃত্যু আয়।
জলে-জল থৈ থৈ বেয়ালের গায়।
আয়-মৃত্যু ঘরে-সরে শীতের শিরায়।

বাজারে চালের দাম
চব্বিশ তেরো।
দশ আনা আলুর দাম
ঝিঙা-সের বারো।
রেলপথ ডাব্-ডুব্,
বেপারীর শব্জী ভাসে
ভাগীরথী জলে।
বাজার আক্রা—
আড়ৎদার মিষ্টি হেসে পূর্ণ করে থলে।
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ হিমগেহ,
পচা মাছে আকীর্ণ জঞ্জাল।
বরফের ফেশে বাস
রুই, পোনা-পাল।

রোগের-কুঠুরী থেকে নেবে আসে
কলেরার বীজ।
একপোয়া কাঁচামদ,
গোটা মাছ,
বাহাদুর পার হয়
বেলেঘাটা ব্রীজ।
নেশা নেই, তবু যেন মনের চুলুনি নাই থামে।
তাল কেটে পাণ্ডলো নর্দ্দমায় নামে।

বস্তীর বনবালা হেসে কুট-পাট,
'মিন্‌সের কী হাল হলো স্থাখো!
আরে! রাখো, রাখো।'
তিমির রাত্রির মুখে ছাই দিয়ে
বেড়ে ওঠে বিদ্যুতের কণা।
গরুড়ের পক্ষ পুটে চঞ্চল পবন,
বরুণের চোখে করে বৃষ্টির ঝণা।

শিয়রে বালিশ নেই,
ঘর ভাসে প্লাবনের জলে।
বাহাদুর-বেহুঁস ভাসে অনন্তের কোলে।
বটপত্রে ভাটে যেন নবীনারায়ণ,
অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু কোথা চলে যান?

এখানে বাজার সস্তা মূল্য নেই,
জীবনের হাটে।
ফাঁপুড়ে ফড়ে'র দল সুদ বাট্টা বাঁটে।
বাহাদুর বস্তাপচা বেওয়ারিশ মাল
সস্ত পারো চাল্
পৃথিবীর ওপারেতে অন্ধগাধা অচেনা গুদামে।
জীবনের প্যাসেঞ্জার-গাড়ি সাইডিংএ থামে।
সিগন্যাল ডাউন;
গাড়ির অনন্ত গতি,
হুইস্‌ল বাজে।
দেখে-শুনে মন দেও ইস্তফা কাজে।

এ পারের খেয়া কড়ি
এ পারেতে থাক।
লিখে রাখ জীবনের
নেই তাল ফাঁক।
দিনের নিশ্বাস নাই,
রাত্রি চেয়ে রয়।
পুরাতন পৃথিবীটা পাখা তুলে
শূন্য মার্গে বয়;
অনন্ত-কালের স্রোতে জীবনের গীতা।
উড়ে যায় ছেঁড়া-ফাড়া তামাকের পাতা।

ফুটে উঠে জীবন বিভূতি
শূন্যের-সীমানা শেষে শূন্যময় শুদ্ধ অনুভূতি।
এ কেমন কথা?
ধরে নাও এই সেই
জীবন বারতা।

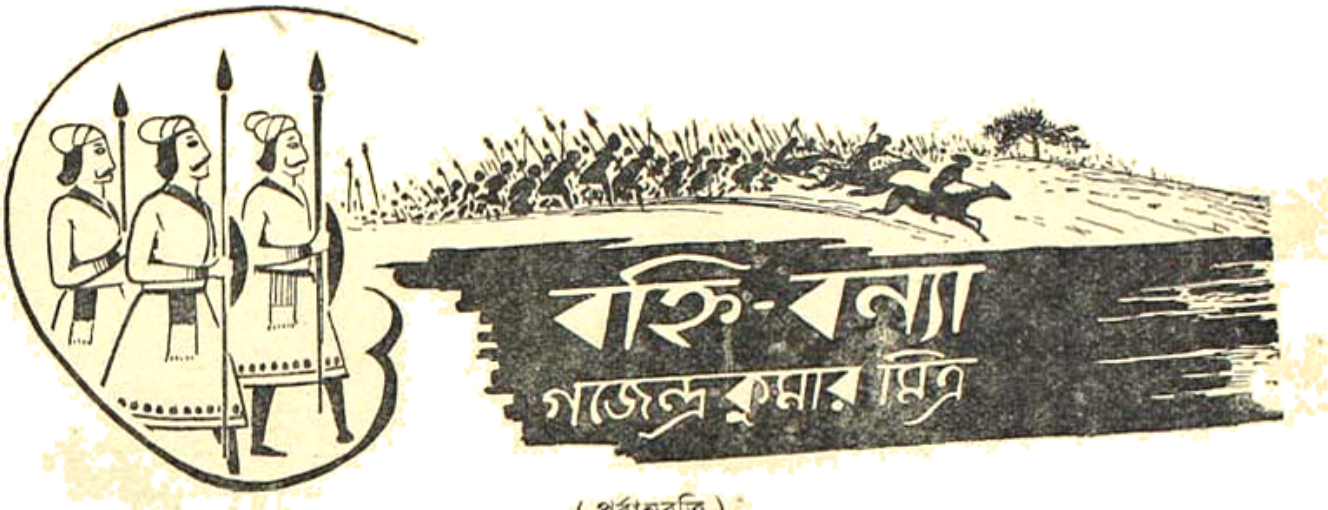

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের পশ্চিম বিভাগে—বারাকপুরের মাটিতেই কী করিয়া দাবানলের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহাকে দাবানল বলিয়া চেনা যায় নাই। মনে হইয়াছিল একটা গাছেই বুঝি আগুন ধরিয়াছে। সেনাপতি প্যাজেট সে গাছের ছেদন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তিনি এবং আর সকলেই মনে করিয়াছিলেন—ঐখানেই বুঝি ঐ বহ্নিলীলার পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে মহীরুহের শাখাপ্রশাখাগুলিই কাটা হইয়াছে, মূল কাণ্ডে বহ্নির অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। একেবারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক চাটগেঁয়ে লস্কর আসিয়া ভস্মস্তূপে খুঁচিতেই ধূমায়মান আগুনের খবর পাওয়া গেল। ২৯শে মার্চ মঙ্গলপাণ্ডে সে আগুন নিজের মস্তিষ্কের ঘৃতে বেশ জমকাইয়া তুলিল।

দেখিতে দেখিতে তাহা ছড়াইয়া পড়িল বহুদূর। দাবানল জ্বলিলে যেমন সে আগুন শনৈঃ শনৈঃ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, বন হইতে বনান্তরে ছড়াইয়া যায় তেমনিই এই বহ্নিবন্যা ভারতের পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল। মঙ্গলপাণ্ডের আত্মাহুতিরই যেন অপেক্ষায় ছিল সকলে। কাহারা ইহার ইন্ধন জোগাইয়াছে, কাহারা সংগ্রহ করিয়াছে সমিধ্—আজও পরিষ্কার কেহ জানে না। কোথা হইতে কাহারা চাপাটি বা রুটি বিলি করিতে শুরু করিল, কাহারা শুরু করিল পদ্মচিহ্ন প্রচার করিতে কেহই সেদিন খবর লয় নাই। একই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না সকলের—একই স্বার্থসিদ্ধির জন্য এত বড় আগুন জ্বলে নাই। ইংরাজের প্রতি সেদিন বুঝি বিধি ছিলেন প্রতিকূল তাই বিভিন্ন স্বার্থে সংঘাত বাধে নাই, স্বার্থের উপনদীগুলি মিলিয়া মহানদীতে পরিণত হইয়াছে মাত্র। বহু শিবা ও গৃধ্র শুধু গলিত শবের লোভেও আসিয়া জুটিয়াছিল বৈকি!

ইংরাজ সেদিন ছিল এক আশ্চর্য সুপ্তিমগ্ন। নিজের ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হইয়া ছিল। ভুলিয়া গিয়াছিল সিপাহীদের হাতে তাহারাই অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে, যুদ্ধ-বিদ্যায় নিজেরাই শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে! একথাটাও মনে পড়ে নাই যে বাড়তি খরচের অজুহাতে ইউরোপীয় সেনাদের এদেশে আনানো বহুকাল কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে—এখানে এখন তাঁহারা আছেন কতকটা এই দেশী সিপাহীদেরই ভরসায়। * সিপাহীদের অসন্তোষের কারণগুলি যেমন তাঁহাদের অনুসন্ধান করা উচিত ছিল—তেমনি উচিত ছিল তাহাদের স্পর্ধা বাড়িতে না দেওয়া। কিন্তু সে সব কিছুই করা হয় নাই। এমন কি ঘুমন্ত মানুষ যেমন মশারীতে আগুন ধরিবার আগে ঘর পুড়িবার খবর পায় না—সেদিনকার ইংরেজ অফিসাররাও নিজের নিজের ছাউনীতে বিদ্রোহ শুরু হইবার আগে একান্ত কাছে যে সব সিপাহীরা ছিল তাহাদের মনোভাবের কোন খবরই পান

* ভার হাউসীয় অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে যে হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়—তখন কোম্পানীর তাঁবে ২ লক্ষ ৩০ হাজার বিদেশী সিপাহী এবং ৪৫ হাজার ৩২২ জন ইংরাজ (প্রাইভেট ও অফিসার মিলাইয়া) কাজ করিত।

নাই—এমনও হইয়াছে। অথচ এতবড় একটা বিপ্লব—তাহার আগে নিশ্চয়ই দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল। ইন্ধন অবশ্যই বহুদিন হইতে জমা হইয়াছে!

প্রথম প্রকাশ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল লক্ষ্ণৌতে। স্ফুলিঙ্গই বা বলি কেন—রীতিমত আগুনই সেদিন জ্বলিয়া উঠিল।

সেটা ১৮৫৭ সালের ১লা মে।

'সাতনম্বর আউধ ইরেগুলার ইন্‌ফ্যান্ট্রি'র রংরুটরা বাঁকিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ঐ চর্বি দেওয়া কার্তুজ লইবে না। উহাতে তাহারা হাতও দিবে না। তাহারা শুনিয়াছে, বেশ ভাল লোকের মুখ হইতেই শুনিয়াছে যে গরু ও শুয়োরের চর্বি আছে ঐ কার্তুজে! অফিসাররা প্রাণপণে বোঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে এটা যে নতুন কার্তুজ নয়—উহারা আগে যাহা ব্যবহার করিতেছিল এ সেই পুরাতন ও পরিচিত কার্তুজ—কিন্তু তাহার ফল হইল এই যে শুধু রংরুটরা নয়, পরের দিন গোটা রেজিমেণ্টের সিপাহীরাই বাঁকিয়া দাঁড়াইল।

স্যর হেনরী লরেন্স—অযোধ্যা প্রদেশের নূতন শাসন-কর্তা প্রমাদ গণিলেন কিন্তু বিচলিত হইলেন না। ব্রিগেডিয়ারকে আদেশ করিলেন প্যারেডের ব্যবস্থা করিতে। প্যারেডের মাঠে ব্রিগেডিয়ার একটি মিষ্ট বক্তৃতাও করিলেন—ফল সেই একই। দু একজন পাণ্ডা গোছের সিপাহী বাকী সকলের মনোভাব জানাইয়া দিল—'তামাম হিন্দুস্থানে কোন সিপাহী আজ আর তোমাদের ও কার্তুজ নিতে প্রস্তুত নয় সাহেব—আমরা কি করব?'

এই হইল সূত্রপাত। লক্ষ্ণৌয়ের পর মীরাট।

মীরাটেও বহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল বহুকাল হইতেই। রীতিমত রক্তাক্ত হইয়া উঠিল এপ্রিলের শেষের দিকে। একেবারে শিখা দেখা দিল ১০ই মে, রবিবার। ইংরাজ অফিসার ও তাঁহাদের পরিবারের সকলে যখন সান্ধ্য উপাসনার জন্য গীর্জায় জড়ো হইয়াছেন তখনই দূর সিপাহী ব্যারাকে প্রথম গুলির শব্দ পাওয়া গেল। গীর্জা হইতেই দেখা গেল কোন কোন বাংলোয় আগুন ধরিয়াছে, তাহার শিখা শেষ বৈশাখের সান্ধ্য আকাশকে রক্তিমতর করিয়া তুলিয়াছে।

মীরাটের ব্যাপারটা প্রথমদিনই গুরুতর আকার ধারণ করিল। সিপাহীরা আগেই জেলখানা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদের দলে টানিয়া লইল। দেশী পুলিশ নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া রহিল মাত্র—বাধা দিবার কোন চেষ্টাই করিল না। শুরু হইল উন্মত্তের মত লুটপাট ও হত্যা। অন্য সমস্ত ছাউনী অপেক্ষা মীরাটেই বেশী সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য ও অফিসার ছিল কিন্তু 'আপৎকালে বিপরীত বুদ্ধি'—একটির পর একটি ভুলের জন্য তাহারা না পারিল স্থানীয় অসহায় সাহেবদের রক্ষা করিতে, না পারিল বিদ্রোহীদের দমন করিতে আর না পারিল দিল্লীকে বাঁচাইতে। মাটির পুতুলের মতই হাতিয়ার হাতে বসিয়া রহিল শুধু।

মীরাটের পরই দিল্লী। ১১ই মে শুরু হইয়া গেল দিল্লীতে।

সকালবেলা অফিসাররা 'ব্রেকফাষ্টে' বসিয়াছেন—খবর আসিল মীরাটের দিক হইতে একদল সওয়ার এদিকে আসিতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই ব্রিগেডিয়ারকে খবর দিলেন। খবর গেল লেফ্‌টেনাণ্ট্ উইলোবীর কাছে। তাঁহার জিম্মায় ম্যাগাজিন—শত শত মণ বারুদ সেখানে ঠাসা। গোলাগুলিরও অভাব নাই। ম্যাগাজিন শত্রুর হাতে পড়া মানেই মৃত্যুবান পড়া।...ইতিমধ্যে সওয়াররা দিল্লীর নগরপ্রাচীর পার হইয়াছে। জেলখানা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদের বাহির করা প্রথম কাজ, তাহার পর তাহারা সোজা আসিয়া হাজির হইল লালকিল্লার ফটকে। তখনও ইংরেজদের হাতে ফটকের চাবি। কিন্তু গোলমাল বাড়িয়া যাইতে লাগিল। "গোরাসিপাহী"দের ভ্রূকুটি আর কেহ গ্রাহ্য করে না। তাহারা প্রকাশ্যেই চেঁচাইতে লাগিল, 'মীরাটে একটিও সাহেব রেখে আসিনি, তোমাদেরও শেষ করতে দেরী হবে না।'

তবু হয়ত কেল্লায় ঢোকা তখনই সম্ভব হইত না যদি না শেষ পর্যন্ত ভিতরের কয়েকজন মুসলমান গিয়া চুপিচুপি যমুনার দিকের একটা দরজা খুলিয়া দিত। সিপাহীর দল ও উন্মত্ত জনতা হৈ হৈ করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। তাহার

পর কোথায় কী হইল, কোন্ কোন্ ইংরেজের বাসা লুঠ হইল কে কাহার হাতে মরিল তাহা বলা কঠিন। সে প্রচণ্ড অগ্রগতির প্রতিরোধ করা অল্প কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের কাজ নয়। তাঁহারা পিছু হটিতে লাগিলেন। একজন পরিখায় পড়িয়া জখম হইলেন। আর একজনও সেই পথে গিয়া কোন মতে জনতাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর তাহাদের কর্ণে পৌঁছিবার পূর্বেই তাহাদের হাত তাঁহার কণ্ঠে পৌঁছিল এবং তাহা চিরতরেই নীরব হইল। তাহার পর অল্প কয়েকজন ইংরেজ নরনারীকে খতম করিতে আর কতক্ষণ?

ইহার ভিতর মীরাট হইতে আরও কয়েকজন আসিয়া পৌঁছিয়াছে বৈ কি! তাহারা শহরের অপর জায়গায় সাহেব পাড়ায় তাণ্ডব জুড়িয়া দিল। এমনকি দরিয়াগঞ্জের দেশী খ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গি-পাড়াও বাদ গেল না। অপরাহ্ণের দিকে তোপখানা বা ম্যাগাজিন রক্ষা অসম্ভব দেখিয়া উইলোবী বারুদের স্তূপে আগুন লাগাইতে হুকুম দিলেন। স্কালী নামে এক অফিসার যিনি আগুন লাগাইয়াছিলেন তিনি সেখানেই পুড়িয়া মরিলেন—বাকী রক্ষকদের কয়েকজন কোন মতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। উইলোবী সে অগ্নিক্ষেত্র হইতে উদ্ধার পাইলেও পথে আততায়ীর হাতে নিহত হইলেন।

কেল্লার একাংশ ব্রিগেডিয়ার অনেকক্ষণ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। অগত্যা তিনি 'পিছু হটিবার' হুকুম দিলেন। তখনও অবধি ছাউনির সিপাহীরা কতক কতক শান্ত ছিল, তাহারা এবার স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, সাহেবদের জানের জন্য আর তাহারা দায়ী থাকিতে রাজী নয়। তাঁহাদের এখন পথ দেখাই ভাল।

অগত্যা! অবশিষ্ট অফিসার তাঁহাদের স্ত্রীপুত্ররা পথই দেখিলেন। পলায়নের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর চেয়েও কষ্টকর হইয়া উঠিল। অনেকেই পথে প্রাণ হারাইল। কেহ বা আততায়ীদের হাতে প্রাণ দিল—বাকী যাহারা শেষ অবধি নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইতে পারিল, তাহাদের বহুদিন সময় লাগিল সারিয়া উঠিতে। 'লু' লাগিয়া তাহাদের গায়ে ফোস্কা পড়িয়াছিল—সে ফোস্কা ক্ষতে পরিণত হইয়াছে, বস্ত্র ছিন্নভিন্ন, কোনমতে তাহাতে লজ্জা নিবারণ হওয়াই কঠিন। গায়ের রং জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে পুড়িয়া নদীবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাও সিপাহীদের হাতে না পড়িয়া যাহারা কোনমতে সাধারণ হিন্দু গ্রামবাসীর আশ্রয়ে আসিয়া পড়িতে পারিয়াছে, তাহারাই বাঁচিয়াছে। যাহারা মরিয়াছে তাহাদের মৃত্যুর কারণ ও মরণ এক নয়, সুতরাং সে আলোচনা হইতে বিরত থাকাই ভাল।

সুতরাং বহ্নিস্রোত প্রবাহিত হইবার বিশেষ আর কোন বাধা রহিল না। সমগ্র আগ্রা প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে তাহা ছাড়াইয়া পড়িল। বুলন্দসর, এটোয়া, মৈনপুরী, বুন্দেলখণ্ড, শাহারানপুর, বেরিলী, আগ্রা, ফরক্কাবাদ—আর কতকগুলি নাম শুনিয়া কি হইবে, মোট কথা মে মাসের শেষে কানপুরের উত্তর-পশ্চিমের কোন শহরেই আগুন লাগিতে বাকী রহিল না।

২৩

আগুন না পৌঁছাক—এই বিপুল বহ্নিবার্তা কি কানপুরের নিস্তরঙ্গ বায়ুসমুদ্রে কোন কম্পন জাগায় নাই?

হয়ত জাগাইয়াছিল কিন্তু ঈষৎ বধির অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি হার হিউ হুইলার সে কম্পন অনুভব করেন নাই।

দূর দিকচক্রবালে ঝড়ের বেগে যে বনস্পতি আন্দোলিত হইতেছিল তাহাও তিনি দেখিতে পান নাই। তাঁহার সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা—তিনি নানা সাহেবের উপর ভরসা করিয়া ছিলেন। হিউয়ের অনেক বয়স হইয়াছিল, অর্ধশতাব্দীরও বেশী তিনি এই দেশে চাকরী করিতেছেন, দেশী সিপাহীদের বিশ্বাস করিতে ও ভালবাসিতেই তিনি অভ্যস্ত। তাঁহার অধীনে যে সব সিপাহীরা আছে তাহারা কোনদিন বিদ্রোহ করিবে—একথা তিনি ভাবিতেই পারেন নাই। তিনি ১৮ই মে-ও বড়লাট লর্ড ক্যানিংকে চিঠি লিখিয়াছেন, "কানপুরের সব কুশল। কিছু কিছু উত্তেজনা থাকিলেও অবস্থা মোটের উপর শান্ত। আমরা শীঘ্রই দিল্লীর দিকে রওনা হইতে পারিব। বিদ্রোহীদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশী হইবে না।...উহারের

একজনকেও পলাইতে দেওয়া ঠিক হইবে না।...থাক ব্যাধির বিস্তৃতি বন্ধ হইয়াছে এই রক্ষা।"

যত সহজে সার হিউটের চোখে ধূলা দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল তত সহজে অপরকে দেওয়া যায় নাই। কমিশনার গ্যাবিনস্ এবং হেন্‌রী লরেন্স নানা সাহেব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন অনেক দিনই—এবার অমন আকস্মিক-ভাবে লক্ষ্ণৌ হইতে চলিয়া আসায় তাঁহাদের সে সন্দেহ আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহারা হুইলারকে কর্তব্য বোধে সচেতনও করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু হুইলারের চেতনা হইল না। বহুদিনের পরিশ্রমে স্নায়ুগুলিও বুঝি তাঁহার বধির হইয়া পড়িয়াছিল, কোন বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছানো আর তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না।... তিনি সার হেনরীকে বরং ঈষৎ একটু বিদ্রূপ করিয়াই লিখিলেন, "বিঠুরের মহারাজা আজই আমাদের নিরাপত্তার জন্য তিনশ সিপাহী এবং দুটি ভাল কামান পাঠাইয়াছেন!"

চিঠির তারিখ—২২শে মে!

নির্বুদ্ধিতার এইখানেই শেষ নয়। নানাসাহেব হুই-লারকে নানারূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। ভরসা দিয়াছিলেন যে প্রয়োজন হইলে জান দিয়াও তিনি ইংরাজদের রক্ষা করিবেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বিঠুরের রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া নবাবগঞ্জের কাছে সিভিলিয়ান পাড়ায় আসিয়া বাসা বাঁধিলেন। হুইলারকে বুঝাইয়া দিলেন, 'আমি যতক্ষণ এখানে থাকব ততক্ষণ ত কেউ চড়াও হ'তে সাহস করবে না! তাছাড়া আমার মনে কোন পাপ থাকলে আমি চারিদিকে ইংরেজের মধ্যে এসে থাকতে পারতুম কি? আমি ত আপনাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই রইলুম।'

হুইলারের মনে বিশেষ কোন সংশয় কোন কালেই ছিল না, যেটুকু আভাস মাত্র থাকিতে পারিত তাহাও কাটিয়া গেল। তিনি নিশ্চিন্ত মনে ট্রেজারীর ভারও তুলিয়া দিলেন নানাসাহেবের হাতে। নানাও 'জান-কবুল' দিয়া কোম্পানীর পনেরো লক্ষ টাকা পাহারা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।...হুইলারের এতখানি বিশ্বাসের বদলে তিনি আরও একটি প্রস্তাব করিলেন—এখনও যদি সাহেবদের কোন ভয় থাকে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রকে বিঠুর প্রাসাদে রাখিয়া আসিতে পারেন। সেখানে তাহারা নিরাপদেই থাকিবে। তাঁহার নিজস্ব সিপাহী-শান্ত্রী ত আছেই। তাহারা কিছু কোম্পানীর নৌকর নয়, বিদ্রোহীদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

হুইলারের উপর সমস্যাটা নির্ভর করিলে তিনি হয়ত তখনই এই ব্যবস্থায় সম্মত হইতেন। কিন্তু দেখা গেল যে বাকী সকলে সার হিউটের মত অতটা নির্ভরশীল নন। তাঁহারা বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। যে লোকটির ইংরাজদের উপর খুশী থাকিবার কোন কারণ নাই, তাহার কবলে নিজেদের মান-ইজ্জৎ সঁপিয়া দিতে তাঁহারা রাজী নন। শুধু তাহাই নয়, আপৎকালীন একটা ব্যবস্থা করার জন্য তাঁহারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদেরই পীড়াপীড়িতে অবশেষে একটা 'আশ্রয়' ঠিক করিবার হুকুম দেওয়া হইল। কোষাগার এবং অস্ত্রাগার হইতে বহুদূরে, সম্ভাব্য পলায়নের সকল সম্ভাবনা হইতে বিচ্ছিন্ন, একটি পুরাতন ছোট হাসপাতাল বাড়ীকে ঘিরিয়া একটি হাত আড়াই উঁচু কাদার পাঁচিল দেওয়া হইল। হুইলার জানিতেন এসব অনাবশ্যক, তিনি এদিকে কোন নজরই দিলেন না, হিন্দুস্থানী ঠিকাদার যতটা সম্ভব ফাঁকি দিল। আরও একজনকে পঁচিশ দিনের মত খাদ্য-খাবার জমা করিবার ঠিকা দেওয়া হইয়াছিল—সে ব্যক্তি কিছু ময়দা ও মটর-কড়াই মাত্র মজুত করিয়াই মোটা টাকার 'বিল্' লইয়া চলিয়া গেল। সাহেব সুবারা কেহ কেহ দু'চার বোতল মদ পাঠাইয়া দিলেন—কতটা নিজেদের গরজেই। আর কোন ব্যবস্থা হইল না। কুয়াটা পড়িল খোলা জায়গায়—সে কথাটাও কেহ ভাবিল না। ওধারে যখন হিন্দুস্তানের সমস্ত উত্তর পশ্চিম প্রান্ত জুড়িয়া প্রলয়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে—মুহুর্মুহু চলিয়াছে বিদ্যুৎস্ফুরণ—অসংখ্য ইংরেজ নর-নারীর জান-মান লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইতেছে—এদেশে তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই একটা বিরাট রকমের সংশয় দেখা দিয়াছে—এখানে তখন এই ভাবে পনেরোটা বহুমূল্য দিন এক্‌প্রকার হাস্যকর ছেলেমানুষীতে কাটিয়া গেল। নিয়তি আর কাহাকে বলে।

২৪

পুরাতন কানপুর বা সাহেবদের ভাষায় 'নেটিভ' পাড়ার একটি কুখ্যাত পল্লীতে আজিজন বিবির বাস। সংকীর্ণ গলির দুইপাশে পাথরের নিচু রেলিং দেওয়া বারান্দায় চিক-ঝোলান বাড়ী—একই রকমের প্রায় সবগুলি। কেবল আজিজনের বাড়ীটিই তাহার ব্যতিক্রম। এই বাড়ীটির বাহিরের চেহারা অপর বাড়ীর মত হইলেও সাজ সজ্জায় কিছু তফাৎ ছিল। তাহার বারান্দায় বহুমূল্য বিলাতী লেসের পরদা, দরজায় সিঁড়ির মুখে বিপুলকায় দারোয়ান। তাহার ঘরে ঝাড়ের আলো, দরজায় ভেলভেট—বাহিরের বারান্দায় হরেক রকম পাখার খাঁচা ও দাঁড়। এক কথায় ঐশ্বর্য ও বিলাসের চিহ্ন বাহির হইতেই একরকম সুস্পষ্ট।

পাড়াটার কু-খ্যাতির জন্যই হুসেনী বেগম কোনদিনই এখানে আসিতে সাহস করে না—প্রয়োজন থাকিলে খবর দিয়া আজিজনকে ডাকিয়া পাঠায়। আজ কে জানে কেন—সর্দার খাঁকে দিয়া পূর্বাহ্ণেই খবর পাঠাইয়াছে। সন্ধ্যার সময় সে আসিবে, আজিজন যেন আজ বাড়ী হইতে সব 'ওঞ্জাল' সাফ্ করিয়া রাখে।

খৎ-খানা পাইয়া অবধি আজিজনের বিস্ময়ের সীমা নাই। আমিনা এখানে আসিবে? কেন? এমন কি জরুরী দরকার পড়িল?

যাহা হউক—ব্যবস্থার ত্রুটি হইল না। দারোয়ানকে ডাকিয়া সে বলিয়া দিল, যে-কোন রকম সাজা অতিথিই আসুক, আজ আর কাহাকেও যেন ঢুকিতে দেওয়া না হয়। 'বিবি'র ভীষণ রকম মাথা-ধরিয়াছে, এই কথা বলিয়াই বিদায় দিতে হইবে।

তাহার পর হইতে সে একটা রেশমী ওড়না জড়াইয়া সারাক্ষণই বলিতে গেলে বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল। কৌতূহল তাহাকে স্থির থাকিতে দিল না।

আমিনা আসিল একেবারে সন্ধ্যার মুখে। ভেলভেটের ঘেরাটোপ দেওয়া ডুলি। নামিলও কালো বুরখায় সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া—কিন্তু আজিজনের চিনিতে ভুল হইল না। দ্রুত নামিয়া গিয়া একেবারে আমিনার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল ছাদে। ছাদে তখনই জল ছিটাইয়া খাটিয়া পাতা হইয়াছে। বড় চওড়া খাটিয়া—তাহাতে রাত্রে আজিজনের বিছানা পড়িবে। খাটিয়ার পাশে একটা উঁচু চৌকিতে মাটির ঝাঁঝোরায় জল এবং একটি থালায় চামেলি ফুল।

আজিজনের ইঙ্গিতে একজন বাঁদী নিঃশব্দে আসিয়া খাটিয়ার উপর একটা নরম গালিচা বিছাইয়া দিয়া গেল। আজিজন এতক্ষণে কথা কহিল; 'বোস। ছাদেই সুবিধে, আড়ি পাতবার ভয় থাকে না।···তারপর—কী ব্যাপার, এমন হঠাৎ?'

আমিনা খাটিয়াতে বসিয়া মুখের উপর হইতে বুরখাটা সরাইল, কিন্তু তখনই কোন কথা কহিল না। আজিজন লক্ষ্য করিল তাহার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, চোখের কোলে কালি—অর্থাৎ অনিদ্রার চিহ্ন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবেই আজিজন পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, 'খবর কি?'

আমিনা ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, 'খবরটাই যে কি তাই ত বুঝতে পারছিনা।'

'এখানে এলে যে!'

'কী করি। নবাবগঞ্জের এ বাড়ীটায় জায়গা কম। সকলেই সকলের চোখের ওপর আছি। ডেকে নিয়ে গিয়ে আড়ালে দুটো কথা কইব—সে জায়গা কৈ? এক গঙ্গার ঘাটটায়—কিন্তু এখন চারিদিকেই লোক আর সকলেই সন্দিগ্ধ।'

'নানা সাহেবও?'

'নানা সাহেবকেই ত ঠিক বুঝতে পারছি না। সন্দিগ্ধ ত বটেই। যতই যা করি, আঁধালা মাথাটি খেয়ে দিয়েছে। একটু সন্দেহ কিছুতেই যাচ্ছে না। এ আবার এক নতুন বিপদ হয়েছে আজিজন,—এখন শুধু আমি কি করছি তা নিয়েই মাথাব্যথা নয়, আমি কি ভাবছি তা নিয়েও।··· এখন যেন মনে হয় আমাকে ভালবাসতেও চায় সে!'

'সেটা কি খুবই আশ্চর্য একটা কিছু?—'আজিজন আমিনার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া একটু কৌতুকের হাসি হাসিল।

লাল হইয়া ওঠে আমিনা নিমেষে। সেটা কতটা লজ্জায় আর কতটা অপমানে—বলা কঠিন।

'ভালবাসার সাধ নেই আজিজন। সে সম্ভাবনা আছে জানলে নানার কাছে আসব কেন? বেচাকেনার সম্পর্ক জেনেই ত লম্পটের উপপত্নী হ'তে এসেছি!'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে।

শেষে আজিজন বলে, 'এখানে কতদূর?'

'সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। নানাকে নিয়েই হয়েছে বড় মুস্কিল। ও ইংরেজদেরও স্তোক দিচ্ছে, আমাদেরও। আসলে নিজে এখনও মন স্থির করতে পারেনি। আমাদের বোঝাচ্ছে যে সে ওদেরই ঠকাচ্ছে—কিন্তু আমি জানি তা নয়। এখনও দেখছে ও, বুঝছে।'

'কিন্তু সিপাইরা?'

'সেই ত হয়েছে আরও বিপদ। নানা এখানকার বড় মুরুব্বি, এর ভাবটা না বুঝতে পেরে তারা এখনও ইতস্তত করছে। লক্ষ্ণৌ, মীরাট, দিল্লীর খবর আমরা যতটা পারছি কলাও ক'রে প্রচার করছি। কিন্তু তবু যেন গা তাতছেনা। আজিমুল্লা, টোপী, টীপা সিং—এরা ত প্রাণপণে চেষ্টা করছে নানাকে টেনে নামাবার, কিন্তু নানাকে আমি চিনি আজিজন। সিপাইরা না এগোলে ওকে নামানো যাবে না। ইংরেজদের ও ভয় করে এখনও, আর খুব নির্বোধও নয়।...আবার ওর ভাব না বুঝলে সিপাইরাও এগোবে না।'

তারপর একটু থামিয়া আমিনা কহিল, 'তুই ত সিপাইদের ভার নিয়েছিলি আজিজন!'

'হ্যাঁ—তা নিয়েছিলুম। সে ভার এখনও বইছি বই কি! প্রাণপণেই বইছি। কত নেমেছি তা তুমি জানোনা বহন্—কত পাঁকে নেমেছি! এ দেহ হুতাশনে না পুড়লে আমি বোধ হয় খোদার দরবারে গিয়ে কোনদিন দাঁড়াতে পারব না!'

'জানি না। কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝি এ স্ত্রীলোকের কাজ নয়!...হয়ত আমাদের উচিত হয়নি এ কাজে আসা।'

একটু হতাশার সুরেই বলে আমিনা।

'না না। তুমি ভেবোনা—এ আমরা সফল করবই। নরকে না নামলে নরকের আগুন জ্বাঁকানো যায় না।... আচ্ছা আমি দেখছি।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর আমিনা উঠিয়া পড়িল।

'কী বলতে এসেছিলে তা ত বললে না?'

'না। বিশেষ কিছুই না। শুধু একা একা আর পারছি না। ওরা সর্দারকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে। ...কার সঙ্গে দুটো কথা কই বলত!...আর যারা আছে তারা সবাই নিজের নিজের স্বার্থের চক্রে ঘুরছে? আর যেন পারছি না—আজিজন। এক একসময় মনে হয়—দিল্লী চলে যাই। সেখানে নিজের হাতে কটাকে সাবাড় ক'রে রক্ত মেখে হিন্দুদের কল্পনায় যোগিনী সাজি!...রক্তের তৃষ্ণায় পাগল হয়ে উঠেছি আজিজন।'

'জানি বহন্। কিন্তু ধৈর্য ধরো। আগুন যে এখনও ভাল ক'রে জ্বলেনি। ফুঁ দিয়ে জ্বাঁকিয়ে তুলি এসো। তারপর সেই আগুনে না হয় নিজেরাও পুড়ব।'

আমিনা নিঃশব্দে সিঁড়ির মুখের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কতটা যেন চুপিচুপি কহিল, 'কালও তাকে দেখেছি। এমনি সন্ধ্যায়। বাড়ীর ছাদ থেকে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পেলাম—জাহাজে পাল তুলে সে আসছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকেই। তার হাতে একটা বন্দুক। আর তার পাশে—সে-ও। সেই পাপিষ্ঠটাও!'

আজিজন কথা কহিল না। দূর পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের রক্তাভা তখনও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই, তাহারই উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে 'হিমকুন্দ মুণালাভং' শুকতারা। সেইদিকে সে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমিনা আবার বুরখায় মুখ ঢাকিয়া নিচে নামিয়া গেল।

২৫

আজিজন সন্ধ্যার অনেকপরে ছাদ হইতে নামিল। অলস ক্লান্ত পদে আবার আসিয়া দাঁড়াইল বারান্দায়। পাড়ার বাকী বাড়ীগুলিতে দেহবিলাসিনীর দল অনেকেই সাজিয়া গুজিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখের কাছে একটা করিয়া চেরাগ জ্বলিতেছে প্রায় প্রত্যেকেরই। পথিকের দলও তাই ঊর্ধ্বমুখ। দেশের আব্হাওয়াতে যতই আসন্ন বিপর্যয়ের আভাস থাকুক, চারিদিকের আকাশে যতই মেঘ ঘনাইয়া

আসুক—এ পথের পথিকদের চোখে লোভাতুর কামনার দৃষ্টি দেখিয়া তাহা অনুমান পর্যন্ত করিবার উপায় নাই। এখানে বোধকরি ঘৃণায় কালও প্রবেশ করেন না, তাই এখানকার জীবন সেই আদিমকালেই থম্‌কিয়া থামিয়া আছে।

আজিজনের বারান্দায় আজ ঝাড় জ্বলে নাই। ঘরেও একটি মাত্র সেজ্‌-এর আলো। তাহাতে আজিজনকে দেখা যায় না। সে পর্দার আড়ালে নিশ্চিন্ত হইয়াই দাঁড়াইল।

মোটা মোটা বানিয়ার দল আসিল—চলিয়া গেল। একটি ফৌজী দল বল্লা করিতে করিতে আসিয়া কয়েকটি মেয়ের সহিত দরদস্তুর রসিকতা জুড়িয়া দিল—তাহার পর একে একে ঐ প্রায়ান্ধকার বাড়ীগুলার রহস্যময় কোন কোণে মিলাইয়া গেল।···কুলুকীওয়ালা ফুলওয়ালার দল হাঁকিয়া যাইতেছে।···ওপাশের দুই তিনটা বাড়ী হইতে মদমত্ত কোলাহল উঠিয়াছে। চিরপরিচিত আব্‌হাওয়া—প্রত্যহের নরক!

কিন্তু আজিজনের কোনদিকে খেয়াল ছিল না। পথের দিকে তাকাইয়া ছিল সে, কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। শ্রান্ত চোখ দুটি পথের দিকে মেলা ছিল হয়ত—দৃষ্টি ছিল বহুদূরে, হয়ত বা বহুদূর অতীতে।

অকস্মাৎ নিচের পাথর বাঁধানো পথে এক সিপাহীর নাগরা বাজিয়া উঠিতেই যেন আজিজনের চমক ভাঙ্গিল। লোকটির দিকে তাকাইতেই চোখে পড়িল সে-ও সতৃষ্ণ উৎসুকনেত্রে উপরের দিকে তাকাইতেছে। পাশের বড় পানওয়ালার দোকানের 'ডিবিয়া' হইতে তাহার মুখে আলো আসিয়া পড়াতে চিনিবারও কোন অসুবিধা হইল না। পর্দা সরাইয়া ঈষৎ কোমল কণ্ঠেই আজিজন ডাকিল, 'খাঁ মহম্মদ!'

'আপ্‌কা বান্দা বিবিসা'ব।' আভূমি-নত সেলাম করিল খাঁ মহম্মদ।

'এসো, এসো,। ওপরে এসো। একটু গল্প করি। অনেকদিন দেখিনি।'

খাঁ মহম্মদের চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু একবার নিচের দরজার দিকে তাকাইয়া করুণ কণ্ঠে কহিল, 'দারোয়ান ঢুকতে দেবে কি?'

'দেবে, দেবে। দিলওয়ার খাঁ—ছেড়ে দাও ত সিপাইকে!'

মুখটা বাড়াইয়া আজিজন নির্দেশ দিল দারোয়ানকে।

খাঁ মহাম্মদ জুতা বাহিরে রাখিয়া পাপোষে পা মুছিয়া সসঙ্কোচে ফরাসের বিছানা দেখাইয়া দিয়া নিজেও একটি তাকিয়া টানিয়া লইয়া হেলান দিয়া বসিল।

'তারপর খাঁ সাহেব, খবর কি? পান খাও একটা।··· খবর সব ভালো? জরু ছাওয়াল সবাই ভাল ত? কটা নিকেয় বসলে আর?'

'আর কেন তানাদা করেন বিবি, পেটে খেতে পাই না,—তার নিকে! দুটো ছিল একটা মরেছে—আপদ গেছে! আর পেরে উঠছিনা বিবি। কীই বা মাইনে—দেনায় দেনায় মারা গেলাম!'···

পানের ডিবা হইতে পান ও খানিকটা কিমাম লইয়া সে মুখের ভিতর ফেলিয়া দিল।

'দুঃখ করোনা খাঁ মহম্মদ। এবার আর কোন ভাবনা থাকবে না।···বরং এক কাজ করো, এই সামনের হপ্তার মধ্যেই যে ক-টা পারো নিকা করে নাও। দুটিটা ত লোটো—হায় খাজা আর বেশী দিন সামলাতে হবে না!'

'কেন, কেন?' রূপসী ও সর্বজনবিদিতা বারনারীর সামনে বসিতে পাইয়া খাঁ মহম্মদের মাথা খুলিয়া গিয়াছে। তামাসার সুরে বলিল, 'আসমান থেকে মোহর পড়বে?'

'আসমান থেকেই পড়বে বটে, তবে মোহর নয়—গুলি!'

'সে কি?'

'আর কি! যা বলছি তাই শোন। জানো ত আমার কাছে হরেক খবর আসে। আমি ফুটাবাতে বলছিনা। তোমাদের জান নিয়ে আর বেশী দিন এখানে থাকতে হবে না।'

'সে কি? কেন কেন—কী ব্যাপার?' মুখ শুকাইয়া উঠিল খাঁ মহম্মদের। সে পিকদানীতে পানটা নামাইয়া মুখ হাল্‌কা করিয়া লইল তাড়াতাড়ি।

'আর কি ব্যাপার! তোমরা আরও ঘুমোও না! মীরাটের সিপাইরা অমন একটা কাণ্ড করলে, তা তোমরা ত একটা সাড়াও দিলে না। একসঙ্গে সবাই জাগলে

হাওয়ায় উড়ে যেত।...তোমরা তামাসা দেখছ—ওধারে ইংরেজ তৈরী হয়ে গিয়েছে। তেলেঙ্গী মুলুক থেকে গোরা ফৌজ আসছে তারা দিল্লী যাবে। আর তোমাদের কি করা হবে জানো? এই সামনের মাসের কোন এক তারিখে তোমাদের কুচকাওয়াজে ডাকা হবে। তারপর হাতিয়ার পরখ করার নাম করে বন্দুকগুলো হাতিয়ে নিয়ে—তোমাদের সকলকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেবে। আর যাতে তোমরা না ওদের পেছনে লাগাতে পারো।...বুঝেছ ইারামজাদা?'

'সাচ্!'

'সাচ। তুম্হারা কসম!'

খাঁ মহম্মদের মুখে কিছুক্ষণ কথা সরিল না। তারপর শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, 'কিন্তু মীরাটের তারাই ত সব গড়বড় করে দিল। কথা ছিল সামনের একত্রিশ তারিখে সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়াবে। ওরা হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার করলে।...কে কি করবে—করছে, পুরো খবর ত আমরা পাচ্ছি না, নানাসাহেবের মতলবও যেন কেমন কেমন—আমরা হুট ক'রে কী করব বলুন ত! একটু সোচে সমঝে না দেখলে—'

'বেশ ভালো ক'রে সোচে সমঝে ছাখো। তাড়া কি? তবে মাথাটা কাঁধের ওপর থাকতে থাকতে যত পারো ভেবে নাও। বেশী দিন আর ভাবতে হবে না।

খাঁ মহম্মদ বোকার মত খানিকটা আজিজনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বার দুই জিভ্ বুলাইয়া শুষ্ক ওষ্ঠদুটিকে সরস করিবার চেষ্টা করিল। তারপর অকস্মাৎ একসময় উঠিয়া বিনাসম্ভাষণেই একরকম ছুটিয়া নিচে নামিয়া গেল। বাহিরের পাথরবাঁধানো পথে নাল-বাঁধা নাগরার দ্রুত শব্দ আবর্তনে বোঝা গেল সে দৌড়িবার মত করিয়াই হাঁটিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে হয়ত বা অনেকদিন পরেই আজিজনের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আজিজনের অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। খাঁ মহম্মদ তাহার কথা পুরাপুরি বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং অপরকেও বিশ্বাস করাইতে চেষ্টার ত্রুটি রাখে নাই। সে সারারাত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যারাকের সিপাহীমহলে, এমন কি ক্যাভ্যালরি লাইনেও আব্হাওয়া বেশ উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। খাঁ মহম্মদ কসম খাইয়া বলিয়াছে—কথাটা একেবারে ঝুট হইতে পারে না, সকলেরই এই কথা। ক্রমশঃ ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিল।

এতই ঘোরালো হইল যে কথাটা কানপুর হইতে একসময় লক্ষ্ণৌ পৌঁছিল। স্যার হেন্‌রী বেশ একটু চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অবস্থাও খুব ভালো নয়, তবু তিনি অনেক ভাবিয়া শ'দুয়েক গোরা সিপাহী তখনই পাঠাইলেন কানপুরে—ওখনকার প্যারিসনকে সাহায্য করিবার জন্য।

তাহারা আসিয়া পৌঁছিতে সার হিউ হুইলার হাসিয়া খুন হইলেন। তিনি তখনই এক খৎ লিখিয়া তাহাদের লক্ষ্ণৌতে ফেরৎ পাঠাইলেন। লিখিলেন, 'এখানে এমন কোন গোলমালের ভয় নেই। তাছাড়া নানাসাহেব আছেন—অনেকটা ভরসা। আপনাদেরই প্রয়োজন বেশী—সুতরাং এদের ফেরৎ পাঠালুম। আশা করি মনে কিছু করবেন না। ধন্যবাদ।'

খবরটা যথাসময়ে আমিনার কাছে পৌঁছিল বৈকি। সে বহুদিন পরে নবাবগঞ্জের বড় পীরের আস্তানায় সিন্নি পাঠাইল।

ক্রমশঃ

ঋণশোধ

[গল্প]

প্রশান্তকুমার সিংহ

মোড়ের পানদোকানটা ফেলে একটু এগিয়ে গেলেই কালীঘাট পার্ক। এর দক্ষিণ দিক থেকে পূর্ব দিকে মুখ করে হাঁটলে চোখে পড়ে সামনের সরু রাস্তাটা। পার্কের পূর্ব দিকে একটা রাস্তা, উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে। ডান দিকে পড়ে একটা অপরিষ্কার জায়গা। রাতের বেলা কয়েকটা বাস এখানে তাদের রাজত্ব বিস্তার করে। উত্তর দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে মহীশূর বংশের গোরস্থান। সামনেই চোখে পড়বে প্রণবদের বাড়ী। এই ত, মাত্র কয়েক বছর আগে এখানে এসে দুতলা বাড়ীর উপরের তিনটে কামরা নিয়ে বসবাস করছে। সঙ্গে মা, বাবা ও ভাইবোনেরা।

সেদিনটা ছিল বোধহয় মঙ্গলবার। এইবার প্রণব কলেজে চলে যাবে পড়াতে। গত তিন বছর ধরে এই কাজ সে করে আসছে; কি বৃষ্টি, কি রোদ। ভাইবোনেরা স্কুল কলেজে পড়ে, তাদের জন্যও খরচ জোগাতে হয়। বাবা আপিসে কাজ করেন কিন্তু তিনিও ত সাধারণ কলমপেষা কেরাণী। কতই বা আর সেখানে পান। তবু স্বচ্ছন্দে না হলেও সংসার চলে যাচ্ছে কোনরকমে।

কলেজে পড়াতে যাবার আগে প্রণব এল বাবার ঘরে। অরবিন্দবাবু বসে আছেন একটা আরাম কেদারায়। পার্কের ঠিক ওপারের যে ট্রামের আনাগোনা ও লোকের ব্যস্ততা তা এখান থেকে বেশ ভালভাবেই দেখা যায়। তিনি এদিকে এক দৃষ্টিতে উদাসনয়নে চেয়ে আছেন।

জুতোর শব্দে তাঁর চমক ভাঙল। মাথা ঘুরিয়ে প্রণবকে দেখতে পেলেন। বাবার দিকে চেয়ে সে বলল, আমার আজ ফিরতে একটু দেরী হতে পারে। প্রত্যুত্তরে কিছু আসার আগেই সে পা বাড়িয়ে দিল চৌকাঠের বাইরে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামবার শব্দ ভেসে এল অরবিন্দবাবুর কানে। সে শব্দও কিছুক্ষণ পরে মিলিয়ে গেল অসীমের অন্তরীক্ষে।

আপিসে যাবার এখনও দেরী আছে অন্ততঃ বেলা এগারটা বাজবার আগে নয়। এখন ত সবে মাত্র নটা। সময় কাটাবার জন্য সেদিনের কাগজটার দিকে হাত বাড়ালেন। একটা পৃষ্ঠার উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, বোধহয় মিনিট পাঁচেক—তাঁর চোখ পড়ল অদূরের কৃষ্ণচূড়ার গাছটার উপর। চৈত্রের শেষে একে একে ফুটে উঠেছে প্রায় সব ক'টি কুঁড়ি। যেন সাদা কাপড়ের উপর খানিকটা রক্তের ছোপ। একগোছা লালফুল নিয়ে কে যেন সন্তর্পণে এক তরুণীর কবরীতে যত্ন করে গুঁজে দিয়েছে। সূর্যের আলো পড়েছে গাছটার, তাই আজ আরও ঝলমল্ করছে। আকাশে আজ মেঘ নেই। গোরস্থানের ভাঙা গেটের পাশেই আরও একটা গাছ। একমাথা এলোমেলো চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন একটি দুষ্টু ছেলে। মারুতের হিল্লোলে গাছটা দুলে দুলে উঠছে; কয়েকটা পাখী এসে বসেছে। যেন দোলনায় বসে তারা দোল খাচ্ছে। আজ চারিদিকেই সমস্ত জায়গা জুড়েই একটা আনন্দের সাড়া, জীবনের প্রকাশ।

কিন্তু ঠিক পাশে; জরাজীর্ণ প্রাচীরের ভিতরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে মহীশূর বংশের স্মৃতি। তাও আজ বিলুপ্তপ্রায়। লোকের মন থেকে এটা হয়ত এতদিনে লোপ পেত। মুসলমান স্থাপত্যশিল্পের যে ভিত্তি কারিগরেরা এককালে অতি যত্নের সঙ্গে প্রতিটি কবরের উপর গেঁথে তুলেছিল আজ তার বেশীর ভাগই ভেঙেচুরে গেছে। আজ কোথায় তাদের সেই শিল্পনৈপুণ্য? দেওয়ালের মধ্যের ফাঁকগুলি এই সুযোগ নিয়ে যেন পরিধি বাড়িয়ে নিজের মনমত গৃহ তৈরবার চেষ্টায় আছে। কালের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা, বাধা দেবার ক্ষমতা জনবিস্মৃত কালেখাঁ, জনমেজয় কামানেরও নেই। এই সর্বনাশের হাত থেকে এই স্মৃতি কে বাঁচিয়ে রাখবে? কাল সত্যিই সর্বগ্রাসী।

পাশা পাশি চলেছে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম। কালের

গতির পাশে যতদিন না পূর্ণচ্ছেদ পড়ছে ততদিন এ খেলা চলবে। অরবিন্দবাবু এইভাবে কালের সাগরে ডুব দিয়ে অতীত স্মৃতিকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিলেন। মনে হয়ত একটু সহানুভূতিরও উদ্রেক হচ্ছিল।

মেয়ের ডাকে তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ল। বাবার হাতে একটা গোলাপী রঙের খাম তুলে দিয়ে মাধবী বলল, দাদার নামে চিঠিটা এসেছে, রেজেষ্ট্রী চিঠি। দাদার বদলে তুমি সই করে দাও।

খামটা একবার উল্টেপাল্টে দেখলেন। পরীক্ষা করলেন গভীর মনোনিবেশসহকারে। ঠিক এই ধরণের খাম কোথায় যেন দেখেছেন আর একবার। মিলিয়ে দেখলেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। ঠিক মনে পড়ছেনা এইটেই আরও আশ্চর্য। ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন তিনি। না, কিছুতেই তিনি মনে করতে পারছেন না।

মাধবী এইমাত্র কলেজ থেকে ফিরেছে। হাতের কলমটা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, বাবা, তাড়াতাড়ি সই করে দাও, পিওন দাঁড়িয়ে আছে নীচে। বন্যির বাঁধের মত চিন্তাধারা ভেসে গেল। তিনি মেয়ের হাত থেকে কলমটা নিয়ে খস্‌খস্ করে নিজের নামটা লিখে দিলেন। বাবার অবস্থা দেখে মাধবী নিজেই বাবার হাত থেকে চিঠিটা টেনে নিয়ে চলে গেল।

অরবিন্দবাবু গুছিয়ে বসলেন আরাম কেদারায়। হাত দুটি চোখের পাতার উপর চেপে ভাবতে বসলেন। খামটার বৈশিষ্ট্য একটু লক্ষ্যণীয়। খামের ডানদিকে ঠিক উপরে দেখা যাচ্ছে যেন একজন সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে—অপরদিকে আছে একটা জাহাজের ছবি। এটা এগিয়ে আসছে লোকটাকে উদ্ধার করতে।

চিঠিটা অন্যমনস্কভাবে আবার তুলে নিলেন হাতে। কোন কারাক ত নেই! আগের সেই খামটার সঙ্গে হুবহু মিল। খামের ঠিক মাঝখানে যত্নের সঙ্গে প্রণবের নাম লেখা। কোন নৌখিন লোকের কাছ থেকে নিশ্চয়ই এটা এসেছে। সচরাচর এমন খাম চোখে পড়েনা। আগের চিঠিটায় তাঁর নাম লেখা ছিল, আর আজ এই চিঠিটা লেখা আছে তাঁর ছেলের নামে। তফাৎ শুধু [illegible]

তিনি হঠাৎ চিন্তামগ্ন হলেন। মনে হল কিনারায় যেন পৌঁছেছেন। চিন্তার স্রোতে ক্রমেই ভাটা পড়তে লাগল। একটু একটু করে তিনিও ভেসে চলেছেন উল্টোদিকে। মানসপটে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য। তরঙ্গায়িত লহরী মালার ঘাত প্রতিঘাতে দেখতে দেখতে জীবনটা পেছিয়ে গেল সাত বৎসর আগে। এতদিন পরে ব্যাপারটি আজ অনেক অস্পষ্ট, তবুও কুহেলিকা ভেদ করে চোখে পড়ল তার রূপ।

তিনি থাকতেন নগরাহাটে। ষ্টেশনে নেমে খালের পাশ দিয়ে একটু এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়ে তবে তাঁর বাড়ী। এখানকার স্কুলে প্রণব বেশ ভালভাবে পড়াশুনা করছিল। তার বাবা প্রতিদিন 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারী' করেন এখান থেকে। কিছু জমিজমা ও একটা পুকুর আছে। অন্য সব ভাইবোনেরা তখন ছোট। পড়াশুনায় তার বেশ টান, মাথাও ভাল। প্রধান শিক্ষক তাকে যথেষ্ট ভালবাসেন।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে মাকে বলল, মা আমার শরীর ভাল নয়, বোধ হয় জ্বর হয়েছে। মা তার কপাল স্পর্শ করলেন, হ্যাঁ একটু গরম। ভাবলেন এমনি জ্বর, দুএকদিনেই সেরে যাবে। সামনে আবার পরীক্ষা আসছে। তিনদিন পরেও যখন জ্বর ছাড়লনা তখন মা আরও শঙ্কিত হলেন, বাবাও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জ্বর উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বাধ্য হয়ে ডাকতে হল নির্মল ডাক্তারকে।

বয়সে তিনি নবীন। প্র্যাকটিস তিনি করছেন গত তিন চার বছর কিন্তু এরই মধ্যে বেশ যাতায়াত ছড়িয়ে পড়েছে। তিন টাকা 'ভিজিট' দিতে হলেও লোকে তাঁকেই ডাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হলনা; ডাক পড়ল নির্মল ডাক্তারের। অনেক প্রশ্নই তিনি সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন রোগীর বিষয়। কবে থেকে জ্বর হয়েছে, রোগী এ কদিন কি খেয়েছে। সব শুনে একটু ভেবে বলেছিলেন, কম্বল চাপা দিয়ে রাখবেন। যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন দিনে তিন চার বার জ্বর দেখবার কথা। জ্বরের ওঠানামা দেখে সকলের ভয় হল, বাড়ীতে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিল।

পরের দিন তিনি আবার এলেন। জিভ দেখে পেট

টিপে ভাল করে দেখলেন। জ্বরের ওঠানামা পরীক্ষা করলেন মনযোগ সহকারে। চিন্তিত হয়ে পড়লেন বেশ কিছুক্ষণের জন্য। অরবিন্দবাবুকে একদিকে আলাদাভাবে ডেকে বললেন, দেখুন আমার সন্দেহ হচ্ছে রোগটা টাইফয়েড। তবে আমি জোর গলায় বলতে পারি না কারণ রক্ত পরীক্ষা করা এখানে সম্ভব নয়। আমি সন্ধ্যার সময় আর একবার আসব, তখনই আরও বেশী নিশ্চয়তা দিতে পারব। আমি এখনও জানিনা রোগটা কি!

রাত্রে আবার জ্বরের ওঠানামা দেখে বলেছিলেন, আপনি ওকে কলকাতায় নিয়ে যান; সেখানে ওরা রক্ত পরীক্ষা করে ঠিক বলতে পারবে। তাছাড়া হাসপাতালে থাকলে সেবা যত্নের ত্রুটি হবেনা।

পরদিন সকালের ট্রেনে কলকাতায় নিয়ে আসা ঠিক হল। নির্মল ডাক্তার বলেছিলেন, লেক হাসপাতালে নিয়ে যাবেন; ওটা বেশ কাছেই। তাছাড়া ওখানে চিকিৎসাও ভাল হয়। ছেলেকে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। আগে করলেন তার শোবার ব্যবস্থা। ছেলের মাথা রাখলেন নিজের কোলে। অরবিন্দবাবুর সঙ্গে রয়েছে তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভাই।

ইঞ্জিনের বাঁশি বেজে উঠল, ট্রেনটাও যেন হাই ভেঙ্গে নড়েচড়ে বসল তারপর চলতে সুরু করলো। গাড়ী ছুটে চলেছে এক একটা ষ্টেশন পেছনে ফেলে। বাকুইপুরে গাড়ী বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। দরকার হলে ইঞ্জিন জল নেয়। আশ্চর্য, দশ মিনিট হয়ে গেল, গাড়ী এখনও ছাড়ছেনা। লোকেরা কামরা থেকে মুখ বের করে দেখতে লাগল। অনেকে নীচে নেমে দাঁড়াল। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

এদিকে কমল যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ট্রেনটা অন্যদিন দেরী করে না, আজই যত গণ্ডগোল? অনেকক্ষণ পরে ট্রেন আবার যেতে লাগল। এবার ট্রেন ছুটতে লাগল বেশ বেগে, যে দেরীটা হয়েছে তা যোগাযোগ কম করবার জন্য। তালগাছগুলি দুরত্ব বজায় রেখে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে।

ছেলের গায়ে হাত দিয়ে বাবা দেখেন সে বেশ কাঁপছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে রে? কোন উত্তর না দিয়ে প্রণব বাবার মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে রইল কেবল। অরবিন্দবাবুর বেশ ভয় করতে লাগল।

হাসপাতালের ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করে বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই, মাসখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। ওকে আমরা ভর্তি করে নিচ্ছি এই হাসপাতালে। এরপর এল ছোট চাকা লাগান চেয়ার। ঠেলতে ঠেলতে তাকে নিয়ে এল সাত নম্বর ওয়ার্ডে। ডানদিকের সারির যে বিছানা খালি ছিল তাকে সেখানে শুইয়ে দেওয়া হল। বেড্ নম্বরটা অরবিন্দবাবু মনে মনে দুতিনবার আওড়ে নিলেন—সাতাশ।

ছেলের গায়ে মোটারকমের সুঁই ফুঁড়তে দেখে শিউরে উঠলেন অরবিন্দবাবু অথচ ছেলেটা নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। বিকেলেই এল রিপোর্ট। ওরা ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে—রোগ টাইফয়েড্।

ডাক্তার সান্যাল খবরটা নিয়ে এলেন। ইনি হলেন সাত নম্বর ওয়ার্ডের ডাক্তার। বিকেলে ফিরে খবরটা শুনে অরবিন্দবাবুর মাথায় যেন বাজ পড়ল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, কি, ওষুধ কিনে দেবেন ত? 'ক্লোরোমাইসেটিন' ত আমরা পাইনা। মানে ওয়ার্ডে এর সাপ্লাই বন্ধ। ছেলেকে যদি বাঁচাতে চান তবে অন্য উপায় ত আর দেখিনা।

নিজের পকেটে একবার হাত ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কত খরচ লাগবে? জিজ্ঞাসা না করেই বা করেন কি! আয়-ব্যয়ের খাতা তুলনা করে দেখলে যা উদ্বৃত্ত থাকা সে আর কতটুকু! ডাক্তারবাবু অবস্থাটা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলেন। আশ্বাসের সুরে বললেন, কত আর হবে! মনে করুন শ'খানেক। তিনটে 'কাইল' ওষুধ লাগবে।

অরবিন্দবাবু মনে মনে বেশ কয়েকবার সংখ্যাটা আবৃত্তি করলেন। সম্প্রতি ওষুধের একটা 'কাইলের' দাম তাঁর কাছে আছে। তারপর? যদি দরকার হয় ধার করবেন, নতুবা জমি বিক্রি করে দিবেন।

ওষুধ কিনে দিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে খবরটা দিলেন। স্ত্রী শুনে হাউমাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছেলেমেয়েরাও কান্না আরম্ভ করে দিল।

এখন টাকার দরকার। তিনি ধার করলেন এক

স্বর্ণকারের কাছ থেকে। লেখাপড়া করে দিলেন জমির কিছুটা অংশ। পরদিন আরও দুটো ফাইল কিনে নিয়ে ডাক্তার সান্যালের হাতে তুলে দিলেন।

'চার্ট' তুলে দিয়ে ডাক্তার রীতিমত ঘাবড়ে যান। জ্বরের ওঠানামার এ কিরকম ভাব? এটা লক্ষ্য করলেন ক্রমাগত তিনদিন ধরে। জ্বর কমে যাবার কথা কিন্তু একি? রক্তপরীক্ষা ভুল হয়নি ত? মনে তাঁর আশঙ্কা জাগে। আবার রক্ত পরীক্ষা করালেন তিনি. এবারেও ঠিক আগের মত রিপোর্ট। এখন উপায় আছে একটা। কয়েকটা ফাইল ওষুধ আরও খাওয়াতে হবে। সেইদিনটি ডাক্তার একটা পোষ্টকার্ড বাড়ীতে লিখে দিলেন। চিঠি পেয়ে অরবিন্দবাবু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। এবারে আর ওষুধ বের করতে পারলেন না। পকেট থেকে বের হল ডাক্তার সান্যালের লেখা চিঠিটা। ডাক্তার বললেন, চিঠিটা পেয়েছেন দেখছি। ওষুধ এনেছেন ত?

কি উত্তর দিবেন অরবিন্দবাবু? চেয়ে রইলেন ডাক্তারের মুখের দিকে। ডাক্তারের চোখ দেখে মনে হল যেন তাঁকে চোখদুটি প্রশ্ন করছে, আমার দিকে অমন করে দেখলে কি ছেলে সেরে উঠবে? এখন আরও ওষুধ চাই।

ছেলের কাছে গেলেন এবার, সঙ্গে রয়েছেন ডাক্তারবাবু ও নার্স। প্রণব যন্ত্রণায় ছটফট করছে না বটে কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সে যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। চোখ বন্ধ করে সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিদ্রা উপভোগ করছে। কি জানি, হয়ত ডাক্তারবাবু নিজেই ওকে এভাবে রেখেছেন যেন যন্ত্রণার উপশম হয়।

নালিশের সুরে তিনি ডাক্তার সান্যালকে বললেন, কিন্তু সেদিন ত আপনি কেবল তিনটে ফাইলের কথাই বলেছিলেন? আমি ধার করে টাকা ক'টা জোগাড় করেছিলুন। এখন আবার কার কাছে গিয়ে হাত পাতব বলুন। বাড়ীর অবস্থাও সেইরূপ। ডাক্তার আশ্বাসের সুরে বলেছিলেন, তিনটে যখন পেরেছেন তখন বাকিগুলিও চেষ্টা করলে জোগাড় করতে পারবেন। যাবার আগে তিনি বলে গেলেন, মাঝখানে ওষুধ দেওয়া বন্ধ করলে রোগীকে বাঁচান অসম্ভব।

ডাক্তার সান্যালের শেষ কথাগুলি অরবিন্দবাবুকে তীরের মত বেঁধে। কি করবেন তিনি? সংসারে একা খেটে কেমন করে বজায় রাখবেন এই দোটানার সামঞ্জস্য?

সেদিন বিকেলে হাসপাতালে হৈ চৈ পড়ে গেল। জমাদারদের মধ্যেই চাঞ্চল্যটা বেশী। ওয়ার্ড ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে, চারিদিকেই ছুটাছুটি। বিলেত থেকে এক সাহেব তার স্ত্রীর সঙ্গে আসছেন এই হাসপাতাল দেখতে। দেখতে দেখতে ওয়ার্ডগুলি ঝকঝকে তকতকে হয়ে উঠল। রোগীরাও যে যেভাবে পারছে পরিষ্কার হয়ে নিচ্ছে।

দুটো কমলালেবু হাতে নিয়ে অরবিন্দবাবু ছেলের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ছোট টুলটা টেনে নিয়ে ঝপ্ করে একসময় বসেও পড়লেন। কোনদিকে তাঁর খেয়াল নেই। যারা রোগীদের বিকেলে দেখতে এসেছিল তারা প্রায় সকলেই চলে গেছে; কয়েকজন আত্মীয় এখনও রয়ে গেছে। কেউ কেউ তখনও রোগীর পাশে বসে সেবা করছে।

ডাক্তার সান্যালের সঙ্গে সাতনম্বর ওয়ার্ডে ঢুকলেন একজন মেম সাহেব ও তাঁর স্বামী। দেখলেই অনুমান করা যায় বয়স বেশী নয়। তাঁরা ভারতে এসেছেন বিশেষ করে হাসপাতালগুলি দেখতে। ডাক্তারের সঙ্গে আজ নার্সও আছেন। মেমসাহেবের প্রশ্নের উত্তর মাঝে মাঝে তিনিই দিচ্ছেন। উল্টে আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করছেন। সাহেব প্রত্যেক রোগীর বিছানার কাছে গিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করছেন, এ রোগীর কি অসুখ? ডাক্তার সান্যাল রোগীর 'চার্ট' তুলে নিয়ে তাঁকে দেখাচ্ছেন ও উত্তর দিচ্ছেন।

তাঁরা চারজনে একসময় এসে উপস্থিত হলেন প্রণবের বিছানার পাশে। তখনও লেবু দুটো অরবিন্দবাবুর হাতে রয়ে গেছে। অনেকগুলি জুতোর শব্দ পেয়ে মুখ তুললেন ও এদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রোগীর 'চার্ট' খুলে সাহেব দেখতে লাগলেন। হঠাৎ সাহেব থমকে গিয়ে মেমসাহেবকে কাছে ডকেলেন। জ্বরের এ কিরকমের অস্বাভাবিক ওঠানামা! তাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে রইল 'চার্টের' উপরে।

ডাক্তার সান্যাল ইংরেজীতে বললেন, এর টাইফয়েড

হয়েছে ; একে আমরা ক্লোরোমাইসিটিন দিচ্ছি ; ওষুধটা খুব ভাল। আর ইনি হচ্ছেন ছেলেটির বাবা—অরবিন্দবাবু।

সাহেব ও তাঁর স্ত্রী সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন যেন একটা মড়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মেমটি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি খুব ভয় পেয়েছে নিশ্চয়। মুখের চেহারা দেখে ত তাই মনে হচ্ছে। ডাক্তারবাবু মুখটা একটু গম্ভীর করে বললেন, লোকটা গরীব। ছেলের জন্ত যে ওষুধ লাগবে তা যোগাড় করতে অক্ষম। ওষুধটা বেশ দামী কিনা।

প্রণবের চোখদুটো এদিক ওদিক ঘুরছিল। সমস্ত শরীরটাই ছিল স্থির। মেম সাহেবের চোখাচোখি হতে ইংরেজীতে বললেন, ভাল হয়ে যাবে, ভয় পেওনা।

এরা চলে গেলেন। অরবিন্দবাবু আবার বসলেন টুলটার উপর। ভাবনা তাঁর সমস্ত মনটা কুয়াশার মত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। লেবু দুটো নিঙড়ে কেবল রসটুকু ছেলেকে খাওয়ালেন। ছেলেটার অবস্থাও আজ যেন তেমন ভাল নয়। আজ আর তিনি ফিরবেন না। রাত্রের মত আজ ছেলের পাশেই থাকবেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে নার্স আবার ওয়ার্ডে এলেন রোগীদের ওষুধ খাওয়াতে। সব রোগীদের ওষুধ একরকম খাওয়ান হয়ে গেছে। প্রণবের ওষুধ খাবার সময় আরও একঘণ্টা পরে। যাবার সময় নার্স এসে অরবিন্দবাবুকে বলে গেলেন, ডাক্তারবাবু আপনাকে একবার ডাকছেন অফিসের মধ্যে। ডাক্তারের কথা শুনে বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ল ওষুধের কথা। মনের মধ্যে ভেসে উঠল বেদনাক্লিষ্ট ছেলের মুখ। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলেই ত বলবেন ওষুধের কথা। কি বলবেন এবার ডাক্তার সান্যালকে ? একেবারে ছুটে পালাতে ইচ্ছা হল।

নার্সের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে এসে হাজির হলেন। ডাক্তার তাঁকে দেখে বললেন, এই যে, আপনি এসেছেন। বসুন ওই চেয়ারটায়। নিজের একরকম অজ্ঞাতসারেই বসে পড়লেন।

ড্রয়ার খুলে ডাক্তার তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন একটা গোলাপী রঙের খাম। অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি। এ আবার কোন ছল ? খামটা খুলে ফেলুন, ডাক্তার জোর গলায় বলেন। অরবিন্দবাবুর দৃষ্টি খামটার উপর নিবদ্ধ। বামদিকে একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে আর ডানদিকে রয়েছে একটা মানুষ। এ আবার কি রকম খাম। ওজনও আছে বেশ।

কম্পিত হস্তে খুলে ফেলেন খামটা। কিন্তু একি ? তিনি স্বপ্ন দেখছেন না ত ? তাঁকে কেউ প্রতারণা করছে না ত ? নার্স এবার বললেন, গুনে দেখুন দু'শো টাকা আছে কি না। একবার ভাবেন সংখ্যাটা। হ্যাঁ, গুনেই নেবেন তিনি। দশটাকার কুড়িটা নোট রয়েছে তার মধ্যে। আর এর সঙ্গে আছে একটা কার্ড—সাহেবের দেশের ঠিকানা।

ডাক্তারের কথায় তিনি যেন আবার এ জগতে ফিরে এলেন। তিনি বললেন, যান এখন গিয়ে আরও তিনটে 'ফাইল' কিনে আনুন। বাক্য ব্যয় না করে যন্ত্রচালিতের মত সেদিন দোকানের দিকে তিনি পা চালিয়েছিলেন। একটু পরে হাতে করে এনেছিলেন 'ক্লোরোমাইসেটিনের' আরও তিনটে 'ফাইল'।

এর প্রায় ছমাস পরে প্রণব ভালভাবে সেরে উঠেছে। এ যেন সে বিশ্বাসই করতে পারেনা। সে জানত টাইফয়েড্ হলে শরীরের কোন না কোন অংশে ক্ষতির চিহ্ন থেকে যায়। কিন্তু সে যে একেবারে সুস্থ।

'হাসতে হাসতে ডাক্তার সান্যাল সেদিন প্রণবকে বলেছিলেন, কি যন্ত্রণাটাই না তুমি আমাকে দিয়েছ বাপু। আমাকে ত ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে। আমার এত বছরের অভিজ্ঞতা সত্বেও তোমার মত কঠিন রোগী পেয়ে আমি ভয় পেয়েছিলুম। একটু উপদেশ দিয়ে প্রণবকে 'ডিসচার্জ' করেছিলেন।

অনেক দিন কেটে গেছে তার পরে। স্কুল থেকে সে কলেজে এসেছে। কলেজ করবার সময় প্রত্যেকদিন 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারী' করেছে। কষ্টের উপযুক্ত ফলও একদিন সে পেয়েছে। এক সুযোগে সে এম, এ, পর্যন্ত পড়ে ফেলল। বাবার ও বিশেষ করে মায়ের ত আনন্দের সীমা নেই। ভাইবোনদেরও মুখ উজ্জ্বল করবে একথাও সে মাঝে মাঝে ভাবে। শেষ পর্যন্ত কলেজে পড়াবার সুযোগটা সে পেয়ে গেল। ভাইবোনদেরও পড়াবার ব্যবস্থা মোটামুটি করেছে।

কালীঘাট পার্কের কাছে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আসে। নিজের ও বাবার আয়ে বেশ চলে যাচ্ছে। এক একবার মা তাকে বলেন, প্রণব এবার বাবা তুই একটা বৌনা ঘরে আন, আমরা আর কদিন? প্রণব সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বলে ওঠে, তুমি চুপ কর দেখি। আমার ওসব করবার সময় নেই। মা বলেন, সে কিরে? সময় নেই মানে? বিয়ে করবি আবার সময় নেই? তখন সে রেগে যায়। বলে, তুমি ওসব বাজে কথা বন্ধ কর দেখি। মাকে বাধ্য হয়ে এখানেই থামতে হয়।

এদিকে দরজায় কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। স্ত্রী এসে অরবিন্দবাবুকে ডাক দিয়ে বললেন, আজ এখনও আপিসে যাবার সময় হয়নি বুঝি?

কোথায় চলে গেল গোলাপী রঙের খাম আর কুড়িটা দশটাকার নোট। বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, আমি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে তোমরা শান্তি পাও বোধহয়? এই বলে দুমদাম করে পা ফেলে স্নান ঘরের দিকে গেলেন। তাঁর স্ত্রীও সুর সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, কি জানি বাপু, পুরুষমানুষের মেজাজটাই আলাদা। কখনও গরম কখনও আবার নরম।

যাঁকে উদ্দেশ করে বলা তাঁর কানে কথাটা গেল কিনা তার সন্ধান না নিয়ে তিনিও গজ্‌গজ্‌ করতে করতে রান্নাঘরে গেলেন।

রাতে ফিরে প্রণব দেখল বাবা গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। সব যেন থমথম করছে। তার ছোট বোন মাধবী রেজেষ্ট্রী করা খামটা এনে দাদার হাতে তুলে দিল। নিজের ঘরে প্রণব চলে গেল। মাধবীও দাদার সঙ্গে চলে গেল। সে জানে দাদা তাদেরই জন্য কত পরিশ্রম করে সারাদিন। তাই সে ফিরে এলে দাদার হাত থেকে ঘামে ভেজা জামাটা ধরে নেয়, টেবিল গুছিয়ে রাখে—আরও কত টুকাটুকি কাজ করে।

চিঠিটা পড়তে এক মিনিটও লাগল না। যত্নের সঙ্গে লেখা—তোমার টাকা পেয়েছি, ধন্যবাদ। তোমার মহৎ মনটাকে আজ চিনলাম। টাকাটা মহৎ কাজেই লাগাব। শেষে সেই সাহেব ও মেম সহি করেছেন।

অনেক কষ্ট করে সে দু'শ টাকা জোগাড় করেছিল। কষ্ট স্বীকার করতে হলেও উপকারীর উপকার সে ভুলেনি। এত বছর পরে সেই টাকা সাহেবকে সে পাঠিয়েছিল। চা খাবার সময় অরবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, যে সাহেব তোমার অসুখের সময় সাহায্য করেছিলেন তিনি আবার কিছু পাঠিয়েছেন বুঝি? তাঁর মেমসাহেব কেমন আছেন? প্রত্যুত্তরে কি বলবে প্রণব? চোক গিলে বলল, হ্যাঁ ভাল আছেন। তবে টাকা পাঠাননি, এবার পাঠিয়েছেন দুলাইনের একটা চিঠি।

শেষ কোথায়

শ্রীসৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৩

Work is delight here, not a drudgery, কাজ, কাজ, শুধু কাজ। অবিশ্রান্ত কর্মের প্রবাহ, বিরামহীন। ভোর চারটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত। তারপরও দুই এক ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে হয় ডায়েরী লিখিতে অথবা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের জবাব দিতে। প্রথমে মনে হইত অরুণের, ক্লান্তিতে বুঝি সমস্ত শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। But work is delight. প্রতি প্রভাতেই নতুন অনুপ্রেরণা লইয়া জাগিয়া উঠিত অরুণ। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ প্রশান্তদা দুইদিন বৈকালে অরুণকে লইয়া বেড়াইয়া আসিয়াছেন। অরুণের সঙ্গে পরিচয়ও হইয়াছে সকলের। আন্তরিকতার স্পর্শে অনেকের সঙ্গেই 'আপনি' সম্বোধন 'তুমি'এর পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেদিন প্রথম গানের ক্লাসে গেল সে। শিক্ষয়িত্রীর গলার স্বর শুনিয়া মুগ্ধ হইল। প্রথম গানটি শেষ হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন :

'আপনি বুঝি নতুন এসেছেন ?'

'এঁদের মধ্যে নতুন বটে। তবে আমার আসাও আজ ক'দিন হয়ে গেল।'

'আমি ক'দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলাম। ছিলাম না এখানে'।

হঠাৎ অরুণ বলিয়া বসিল :

'আপনার গলাটিতো খুব মিষ্টি। খুব ভাল গলা'।

শিক্ষয়িত্রী একটু হাসিলেন। ডাগর দুই চোখ যেন স্বপ্ন মাখান, আবেশময়।

'আপনি দেখছি গানের খুব ভাল সমঝদার !' কথাটা যেন একটু উপহাসচ্ছলেই বলিলেন। অরুণ উত্তর করিল : 'গান শুনতে আমার বেশ ভাল লাগে, যদিও গাইতে জানি না নিজে। 'তা কি বলে আপনাকে ডাকব ?'

'শোভাদি, শোভা রায় আমার নাম।'

দুপুরের খাবার ঘণ্টা পড়িতেই গানের ক্লাস ভাঙ্গিয়া গেল। সময়ানুবর্তিতা এখানে খুব বড় জিনিস। সমস্ত দিনের রুটীনটা ছকে বাঁধা। একমিনিট দেরী হইলেই সমস্ত কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। খাওয়া দাওয়ার পরে আজ আর বিশ্রাম নাই। মন্ত্রীসভার নির্বাচন। সমস্ত কাজ এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই করে। প্রতি বিভাগেই আছে পৃথক পৃথক মন্ত্রী। এক কথায় যাহাকে বলে self-administration.

কোথা হইতে কি হইল, অরুণ নিজেও কিছু বুঝিতে পারিল না। নির্বাচনে প্রধান মন্ত্রীত্বের জন্য তিনজনের নাম প্রস্তাব হইল। অরুণের নাম প্রস্তাব করিলেন শোভাদি নিজে। এক সঙ্গে মেয়েদের উনিশটা হাত উঠিল অরুণের পক্ষে। অরুণ আপত্তি করিল। নূতন আসিয়াছে সে, এখনও ভাল করিয়া সকলের সহিত পরিচিতই হইতে পারে নাই। কিন্তু সেবার আদর্শ লইয়া এই মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন। ইহা গ্রহণ না করিবার অর্থ নইত্যালিসের মূল আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা। সেবা করিতে কি সে ভয় পায় ? কিন্তু—। করুণ চোখে সে একবার শোভাদির দিকে তাকাইল। শোভাদি তখন পাশের মেয়েটীর সহিত কি কথা বলিতেছেন।

বৈকালে টিফিনের সময় বারান্দার এককোণে বসিয়া অরুণ চিনাবাদাম চিবাইতেছিল। 'ঠাকুর আসিয়া পাশে বসিলেন। নেপালের ঠাকুর। লোকটির আসল নাম হরমোহন। রামকৃষ্ণ ভক্ত। পূর্ববঙ্গে কোনও একটা

'হোম'এ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। খালি গা, কোঁচাটী উল্টাইয়া পড়া। সারা দেহে একটা সহজ, সরল গ্রাম্য-ভাব। আজ নির্বাচনীতে খাদ্যমন্ত্রী হইয়াছেন। আলাপের কোনও ভূমিকা না করিয়াই হাসিয়া বলিলেন :

'কি ভাই, প্রধানমন্ত্রী হইয়া খুব ভাবনায় পড়ছ দেখছি। আরে, অত ভাবনার কি আছে! ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিক চইল্যা যাইব, কি বল ?'

অরুণ হাসিল।

'বসুন হারুদা, আর দুটো বাদাম নিন।'

অত বড় হরমোহন নাম সংক্ষেপ করিয়া সকলে হারুদা বানাইয়া লইয়াছে। হারুদা বাদাম খাইতে খাইতে বলিলেন :

'এই দেখ, আমারে যে খাদ্যমন্ত্রী করল, আমি কি ভয় পাই ? হোম-এ থাকতে এইসব ঢের করছি। কিছু ভাইব না ভাই। আপনা থাইক্যাই সব চইল্যা যাইব।'

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত অরুণ ঘুমাইতে পারিল না। কিসের এক অজানা অনুভূতির উন্মাদনায় জাগিয়া রহিল। বৈকালেই মন্ত্রীগণ নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্ব বুঝিয়া লইয়াছে। সকালের প্রার্থনা শেষ হইতেই শিক্ষকদের মধ্য হইতে একজন অরুণকে বলিলেন যে ছায়া বোনের একটী দুল হারাইয়া গিয়াছে।

'ছায়া কে ?'

'শিক্ষার্থীদেরই একজন। না, না, চুরি হবে না কখনও এখান থেকে কোন দিনিদ, এ নিশ্চিত। পেলে কেউ দিয়ে যাবে, এও ঠিক। তবে, কাল বিকেলে প্রার্থনার সময় যদি দুল ঘরে পড়ে গিয়ে থাকে। আপনি প্রধান মন্ত্রী, একটু খোঁজ করে দেখবেন ভাল করে।'

সকালে জলযোগের আগে ঘরটী অরুণ তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল আরও দুইজন সহপাঠি লইয়া। এই একটী মাত্র ঘরে ক্লাস, প্রার্থনা শোয়া বসা সবই তাহাদের করিতে হয়। মেয়েদের জন্য এই রকমই দুইটী ঘর আছে, কিছু দূরে, আশ্রমের পূর্বদিকে। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজিতেও দুল কোথাও মিলিল না।

স্নানের ঘণ্টার সময় অরুণ রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, হঠাৎ কানে গেল, ঠিক পিছনেই কে ডাকিতেছে।

'অরুণদা, শুনুন !'

অরুণ পিছন ফিরিয়া তাকাইল। ছায়া।

'কি ব্যাপার !'

'আমার দুলটা পাওয়া গিয়েছে।'

'দুল। কিসের দুল ?'

'বাঃ! কিরিটিদা কিছু বলেন নি আপনাকে ?'

'ওঃ!' একটু অপ্রস্তুত হইল অরুণ।

'একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তা', পেয়েছেন তো দুলটা ?'

অরুণের অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়া ছায়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঝরণার মত স্বচ্ছল, স্নিগ্ধ হাসি।

'প্রধান মন্ত্রীর তো স্মৃতিশক্তি বেশ প্রবল দেখতে পাচ্ছি।'

অরুণের ভ্রু একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মেয়েটিতো বড় হালকা! কোনও জবাব না দিয়া অরুণ রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

'শুনুন অরুণদা, আপনি অসন্তুষ্ট হলেন ? আমি কিন্তু কিছু ভেবে ও কথা বলিনি।

ছায়ার চোখে মুখে মিনতির ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিল। অরুণের শিক্ষিত মন মুহূর্তে নিজেকে সংযত করিয়া লইল।

'আমি কিছু ভাবিনি। আপনার দুল পেয়েছেন শুনে খুসীই হয়েছি।'

জোর করিয়া অরুণ হাসিয়া তাহার দিকে তাকাইল। কিন্তু ছায়া মনে মনে বুঝিল যে অরুণ শুধু তাহাকে খুসী করিবার জন্যই এ'কথা বলিয়াছে। ধীরে ধীরে চোখ নামাইয়া বলিল :

'দুলটা আমার নয়, দীপ্তির। তাই অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওটা পেয়ে খুবই আনন্দ হয়েছিল মনে। আমায় বিশ্বাস করুন অরুণদা, আমি সত্যি কিছু ভেবে ওকথা বলিনি।'

ছায়ার এই সরলতায় অরুণ মুগ্ধ হইল। তাহার নিজের মনকেই সে ধিক্কার দিয়া উঠিল। ছিঃ ছিঃ এত সহজেই সে উহার সম্বন্ধে একটা হাল্কা ধারণা করিয়া লইয়াছে! প্রত্যুত্তরে কিছু বলিতে যাইবে, হঠাৎ দেখে, কখন নিঃশব্দে দীপ্তি আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে। সেই পাঞ্জাবী বয়সের

মেয়েটি। অরুণ একটু চুপ করিয়া রহিল। সমস্ত ব্যাপারটাই যে এরূপ বিশদরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। কথা আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। সমস্ত ব্যাপারটার উপর একটা যবনিকা টানিয়া দিবার উদ্দেশ্যে সে বলিল :

'আমার কোনও আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলে আমি ক্ষমা চাইছি, ছায়া দেবী! আপনাকে ব্যথা দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না।'

অরুণ চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ দীপ্তির কথায় থমকিয়া দাঁড়াইল।

'দাঁড়ান, কি হয়েছে?'

'সেটা ওঁর কাছেই শুনবেন।'

'যদি আপনাকেই অনুরোধ করি বলতে?'

'আমি বলতে চাইনা, বিশেষ করে এই মুহূর্তে।'

'ওঃ, বেশ। চল ছায়া, আগে আমি শুনি ব্যাপারটা।

একটু পরিহাসের লোভ অরুণ সামলাইতে পারিল না। হাসিয়া বলিল—'সব শুনে কি বন্ধুর হয়ে কৈফিয়ৎ চাইতে আসবেন না কি আবার?'

'প্রয়োজন হয় তো আসব।'

'তার প্রয়োজন হবে না। কৈফিয়ৎ আমার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আপনার বন্ধুর কাছ থেকে দয়া করে সেটুকুও শুনে নেবেন।

এই ব্যাপারটা প্রায় এইখানেই মিটিয়া গেল। বৈকালে অরুণ প্রশান্তদার সহিত বেড়াইতে যাইবে বলিয়া তাঁহার খোঁজ করিতে আসিয়া দেখিল, তিনি তাঁহার ঘরের সামনের উঠানে পায়চারী করিতে করিতে ছায়ার সহিত কি গল্প করিতেছেন। পরণে খদ্দরের ধুতি, গায়ে একটী কম্ফুয়া ও তাহার উপর জড়ানো গেরুয়া রংয়ের একটী চাদর। মাথায় সামান্য টাকের আভাষ। বোঝা যাইতেছিল, তিনি ইতিমধ্যেই ছায়ার মনের সমস্ত গ্লানি দূর করিয়া দিয়াছেন। ছায়াকে অরুণ দুপুরের ক্লাসেও দেখিয়াছে অত্যন্ত ম্লান। এই মেয়েটির স্পর্শকাতর মনের পরিচয় পাইয়া অরুণ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। পরিহাসচ্ছলেই লওয়া উচিত ছিল তাহার। সারাদিন সকালের ঘটনাটা তাহার মনে মাঝে মাঝে খোঁচা দিতেছিল। এখন ছায়ার মুখে সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। নীরব হাসিতে তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া প্রশান্তদাকে অরুণ বলিল :

'দাদা, চলুন আমরা বেড়িয়ে আসি।'

তাহার এই আহ্বান স্মিতমুখে গ্রহণ করিয়া প্রশান্তদা বলিলেন :

'আজ সকালে তোমাদের কি হয়েছিল অরুণ?'

অরুণ প্রত্যুত্তরে শুধু ছায়ার মুখের দিকে আর একবার তাকাইল। বৈকালের রৌদ্রের স্বর্ণাভা ছায়ার মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে অপূর্ব লাবণ্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে। চিরদিনের সৌন্দর্য উপাসক মন অরুণের। সেদিকে তাকাইয়া তাহার কেমন ভাল লাগিল।

প্রসঙ্গ বদলাইয়া প্রশান্তদা বলিলেন : 'তোমার তো এখনও সহকারী মন্ত্রী নেওয়া হয় নি। এক কাজ কর, তুমি ওকে কিংবা দীপ্তিকে সহকারী করে নাও। জানতো, এখানে নিয়ম হচ্ছে ভাইদের ভেতর মন্ত্রী হলে বোনদের ভেতর থেকে সহকারী বেছে নিতে হয়! বোনদের বেলাও তাই। এতে কাজের সুবিধা হয়।'

'বেশ, বোনদের ভেতর কাউকেই তো আমি তেমন জানি না। একটু ভাবনায় পড়েছিলাম। আপনি বলে দিলেন, ভালই হ'ল। দু'জনার কাকে নেব, বলুন।'

'দীপ্তিকে নিতে পার তুমি।'

ছায়ার দিকে তাকাইয়া অরুণ বলিল :

'দীপ্তিকে তা' হ'লে সন্ধ্যার প্রার্থনার পর আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে বলবেন।'

বেড়াইতে বেড়াইতে প্রশান্তদা অরুণকে বলিলেন :

'তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি অরুণ। তুমি এ'মাসের জন্যে প্রধানমন্ত্রী হয়েছ। আশ্রম সুপরিচালনার দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণভাবে তোমার ওপর। আশ্রম পরিচালনার ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তোমার কোনও কথায় বা কাজে নইতালিমের মূল আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা না থাকলে তোমার কোন কাজেই আমরা বাধা দোব না। কোন নির্দেশও শুধু চাইলেই পাবে, অযাচিত নয়। Learning by doing, এ'বিষয়ে এই আমাদের মূল নীতি। তোমার কাজের অভিজ্ঞতাই তোমাকে সুষ্ঠু পথ দেখিয়ে দেবে।'

অরুণ নীরবে শুনিয়া যাইতেছিল। এই স্বল্প বাক্, সংযত চরিত্রের মানুষটীর উপর দিন দিনই তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া উঠিতেছিল। নীরবেই কিছুক্ষণ পথ চলিবার পর হঠাৎ থামিয়া প্রশান্তদা বলিলেন :

'আজ সকালে ছায়ার পরিহাস তুমি উপেক্ষা করলেই পারতে।'

প্রশান্তদার কণ্ঠে স্নেহের সুর লক্ষ্য করিয়া অরুণ বলিল :

'সকালের আচরণের জন্য সত্যই আমি অনুতপ্ত, দাদা। নব পরিচয়ের আবরণে হঠাৎ এই ঠাট্টাটা আমার মন মেনে নিতে পারেনি। আর কিছুদিন পরে হলে এটা হয়তো আমার মনেই আসতো না।'

প্রশান্তদা বলিলেন—'তুমি আসবার আগে এই আশ্রমে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে ভাই। কথাটা সেই জন্যেই তোমাকে বিশেষ করে বলা। বিশিরকে তুমি জান। সেদিন কি কাজে বিশির বোনদের হোষ্টেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কয়েকজন পুকুর ঘাটে কাপড় কাচছিলো তখন বিশির তাদের লক্ষ্যও করেনি হয়তো। কিন্তু বোনেরা এসে অভিযোগ জানায় আমার কাছে। সেই থেকে দু'দলে যেন একটা দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। বাইরে তার আর প্রকাশ না ঘটলেও, মন তাদের এখনো শান্ত হয় নি। না, না, দোষ কার সে নিয়ে তর্ক নিরর্থক। আমি শুধু আশা করি, তুমি এই ব্যাপারে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য করে আনতে পারবে। নইলে আশ্রমের কাজে অনেক বাধা পড়বে।'

সমস্যার জটিলতায় অরুণ চিন্তিত হইয়া পড়িল। ইহার পূর্বে এমন ধরণের সমস্যা তাহার জীবনে কখনও আসে নাই। চিন্তাকুল মুখে সে শুধু বলিল :

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব দাদা।'

সমস্ত পথ আর কোনও কথা হইল না। সন্ধ্যার প্রার্থনার পর দীপ্তি আসিয়া দেখা করিল।

'হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করেছেন যে বড়?'

'বসুন, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

দুজনে বারান্দায় একপাশে মাদুর পাতিয়া বসিল। ভূমিকা করিয়া অরুণ বলিল :

'আপনি এখন Deputy Premier। প্রতি কাজেই আপনার পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে বোনদের দিকটা আমি তো ঠিক জানি না।'

'বোনদের দিকটা জানবার আগ্রহ আছে না কি?

অরুণের দৃষ্টি মুহূর্তে কঠিন হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে হাসিয়া ফেলিল এই ভাবিয়া যে এই মেয়েটীর খাম-খেয়ালী মেজাজটীকে সে চিনিয়া ফেলিয়াছে। কণ্ঠস্বরে কিছুটা জড়তা মিশাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল :

'কি শুভক্ষণে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, জানি না। আচ্ছা, আমার ওপর আপনার এত রাগ কেন?'

'রাগ কোথায় দেখলেন?'

'সব কিছুই কি চোখ দিয়ে দেখবার দরকার হয়? থাক্, এখন তো আমাদের মিলে মিশে কাজ করতে হবে। Let us be friends'.

পরের সপ্তাহের কর্মতালিকা স্থির করা দরকার। দুইজনে গভীরভাবে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। মৃদু লণ্ঠনের আলোর সম্মুখে দুইজনেই গভীর কর্ম ব্যস্ত। ছায়া আর ছবি আসিয়া পাশে বসিতেই অরুণ অন্যমনস্ক ভাবে একবার তাকাইল। হঠাৎ ছবির দিকে চোখ পড়িতেই চমকিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য! এতবড় জিনিষটা সে এতদিন লক্ষ্য করে নাই! মেয়েটীকে সে বহুবার দেখিয়াছে, কিন্তু এমন কথা তো তাহার একবারও মনে হয় নাই। ফুটফুটে ছোট মেয়েটী। বয়সে বোধহয় তাহাদের সকলেরই ছোট হইবে। অরুণ বার বার তাহার দিকে তাকাইতে লাগিল। তারপর এক সময় বলিয়া উঠিল :

'এখন থাক দীপ্তি দেবী। খাবার ঘণ্টাও এখুনি পড়বে। খাবার পরে না হয় আর একবার বসা যাবে।'

অরুণের এই আকস্মিক ভাবান্তর কাহারও নজর এড়াইল না। সকলে উঠিয়া পড়িলে অরুণ দীপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল :

'আপনি একটু দাঁড়ান। সেকেণ্ড ব্যাচে যাবেন।'

দুইজনে উঠানে নামিয়া পায়চারী আরম্ভ করিল। ততক্ষণে বারান্দায় দুইটী কর্মব্যস্ততার মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ জায়গায় যাইয়া বসিতে দুইদল ছেলেমেয়ে বারান্দায় পরিবেশন করিতে লাগিল।

একটা মৃদুগুঞ্জন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে সকলেই একবার তাকাইল এই দুইটী ছেলেমেয়ের দিকে। কি সুন্দর মানাইয়াছে উহাদের! অরুণের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গৌরবর্ণ লম্বা দোহারা চেহারা। বারান্দা হইতে পেট্রোমাক্সের আলো পড়ায় তাহার গেরুয়া রংয়ের জামাটী যেন গায়ের রংয়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাহার পাশে পাশেই দীপ্তি সাধারণ একখানা আটপৌড়ে সাড়ী পড়িয়া ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছে। কথাবার্তা তাহাদের বারান্দা হইতে কিছু শোনা যায় না, কিন্তু যাহারাই একবার তাহাদের দিকে তাকাইল, তাহারাই মনে মনে প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

দীপ্তি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একবার অরুণের দিকে তাকাইল। যেন স্মৃতির গহনে কিছু খুঁজিবার চেষ্টা করিয়া অরুণ বলিল :

'আমার একটী বোন আছে দীপ্তি দেবী। আমার একমাত্র বোন। পাঁচবছর বয়সে মা মারা গিয়েছেন। ওর বয়স তখন ছ'বছর। একসঙ্গেই মানুষ হয়েছি আমরা। But she was my sister, my mother, my friend, my all was she. পৃথিবীতে আমার একমাত্র আকর্ষণ ওই। দশবছর বয়স থেকেই ও আমার সব ভার নেয়। যতদিন একসঙ্গে ছিলাম, মায়ের অভাব ও আমাকে বুঝতে দেয় নি।'

'এখন তিনি কোথায়?'

'ষোলবছর বয়সে বিয়ে হবার পর থেকেই স্বামীর সঙ্গে আগ্রায় আছে। আজ পাঁচবছর তাকে দেখিনি। অথচ এক মুহূর্তও তাকে না দেখে থাকতে পারতাম না। কলকাতায় পড়বার সময়ও ওকে কাছে এনে রেখেছিলাম।'

অরুণের প্রতি মমতায় দীপ্তির মন আর্দ্র হইয়া উঠিল। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল : 'হঠাৎ তাঁর কথা মনে পড়ল যে?'

'ছবিকে দেখে। আশ্চর্য, মানুষের চেহারায় এত সাদৃশ্য থাকতে পারে!'

প্রসঙ্গ ঘুরাইবার জন্য দীপ্তি বলিল,

'কি কথা আমাকে বলবার জন্যে থাকতে বলেছিলেন।'

যেন অতীতের একটা স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল অরুণ। কি আশ্চর্য! কত কাজ তাহার সামনে! এখন কি আর ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ লইয়া ভাববিলাসের সময় আছে। মনকে একটা ঝাড়া দিয়া উঠিল, চোখ হইতে কাটিয়া গেল স্বপ্নের মোহ। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল তাহার স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে তাকাইয়া বলিল : 'হ্যাঁ, বলছি।'

অত্যন্ত সোজা এবং সহজ ভাবেই বলিল অরুণ :

'আমি শুনতে পেলাম, আমি আসবার আগে এখানে ভাইবোনদের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে। দোষগুণের বিচারটাই এখানে বড় নয়। বড় হচ্ছে, এই দ্বন্দ্বের শেষ করে উভয়পক্ষেরই মনে সুস্থ, সহজভাব ফিরিয়ে আনা। ভাইদের দিকটা আমি দেখব, কিন্তু আপনাদের দিকটা তো আপনাকেই দেখতে হবে।'

'আমাকে কি করতে হবে, বলুন।'

'কোনও নির্দেশ দেওয়া আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না, কারণ আপনাদের আমি ভাল করে জানি না। পথ আপনি নিজেই খুঁজে পাবেন। প্রয়োজন হলে বলবেন, চেষ্টা করব পরামর্শ দিতে।'

সেদিন রাত্রিতে কাজ কর্ম সারিয়া ঘরে আসিতেই প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। অনেকেই শুইয়া পড়িয়াছে, অরুণ নিজের বিছানাটী লইয়া বিছাইতে যাইবে হঠাৎ কোণের দিকের অন্ধকারের মধ্য হইতে চাপা খিলখিল শব্দ শুনিয়া পিছন ফিরিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিল। অন্ধকার কোণ হইতে একটা চাপা আওয়াজ কানে আসিল,

'নেপাল!'

'অতুল!'

'প্রধান মন্ত্রী না হতে পেলে আর জীবনে সুখ নেই রে ভাই!

'কেন রে অতুল?'

'এত চেষ্টা করছি, কিন্তু এমনি কপাল, আজ দু'মাসের চেষ্টায় একটার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারলাম না।'

'ওঃ, এই! তা', তোমার কিছু ভাবনা নেই অতুল। আমি নেপাল, এই জাতগয়লার ছেলে নেপাল, আজ এইখানে, এই ঘরের মধ্যে বসে দিব্যি করছি—।'

হঠাৎ মাঝখানের একটী মশারীর ভিতর হইতে শুনা গেল—'ঠাকুর, ঠাকুর। নেপাল, এ'সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলেছেন জান,—স্ত্রীলোকের কাছ ঘেঁষিকা সব সময় একশ হাত দূরে থাকবা।'

নেপাল ছুটিয়া আসিল। 'ঠাকুর' বলিয়া অদ্ভুত এক শব্দ করিয়া মশারীর উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। হাড়দা হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন। আশেপাশের কয়েকটী ছেলে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল। অতুল মুচকী হাসিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল।

অরুণ অর্ধেক বিছান বিছানাটা ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরের জ্যোৎস্নায় পা বাড়াইল।

ক্রমশঃ

ভারতের শিক্ষা সমস্যা

ডাঃ কে. এল. শ্রীমালি
[ভারত সরকারের শিক্ষা উপমন্ত্রী]

স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন দিকে আমরা কতদূর কি উন্নতি করিয়াছি এবং কোন্ কোন্ সমস্যার সমাধান এখনও সম্ভব হয় নাই আজ তাহা খতিয়া দেখা দরকার। যে সকল কাজ এখনও অসম্পূর্ণ আছে সেইগুলিরমধ্যে শিক্ষা অন্যতম। ভারতের শিক্ষা সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিলও বটে।

চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকাদের বিনা বেতনে ও বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদান—আমাদের সংবিধানের অন্যতম নির্দেশ। সংবিধানের নির্দেশ না থাকিলেও এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইত। কারণ প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সমাজই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে স্বাভাবতঃ বাধ্য।

প্রতিটি লোকের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশই গণতন্ত্রের লক্ষ্য। লক্ষ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার কোনও সুযোগ না দিলে এবং দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর থাকিলে গণতান্ত্রিক সমাজ কার্যকরীভাবে চালান যায় না। বাক্য, সম্মেলন, ও ধর্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা এবং ভোট দিবার ও দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা গণতান্ত্রিক সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু যদি দেশের অধিকাংশ লোকই তাহাদের পরিবেশের অবস্থা বুঝিতেই না পারে এবং তাহাদের সমস্যাগুলির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারে তবে এই সকল অধিকার অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

গণতান্ত্রিক সমাজের লোকেরা যাহাতে মৌলিক অধিকারগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করা, চিন্তা করা এবং একত্রিত হইয়া কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। কাজেই গণতান্ত্রিক সমাজ পরিচালনার পক্ষে স্বাক্ষরতা একটী প্রাথমিক ও অপরিহার্য উপকরণ। কাজেই পাশ্চাত্য দেশগুলির মত ভারতেও বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া শিক্ষা বিপ্লবের প্রথম পর্যায় অতিক্রম করিতে হইবে।

শিক্ষার ব্যাপারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খুব আশাব্যঞ্জক নহে। সংবিধানে নির্দিষ্ট লক্ষ্য যেন ক্রমেই পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। যেভাবে আমরা অগ্রসর হইতেছি তাহাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকাল শেষেও সংবিধানের নির্দেশনামা সম্পূর্ণরূপে পালিত হইবে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালশেষে আমরা ৬-১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদের মাত্র ৬২·৭ শতাংশের এবং ১১-১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের মাত্র ২২·৫ শতাংশের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিব।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের। তাঁহাদিগকে যুক্তভাবে সংবিধানের নির্দেশ কার্যকরী করিবার জন্য অধিক সম্পদ প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ অথবা রাজ্য সরকারের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। কোন কোনও রাজ্য ইতিমধ্যেই বাজেটের মোট বরাদ্দের ২০ শতাংশ শিক্ষা বাবদ ব্যয় করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে আর অধিক অর্থব্যয় সম্ভবপর নহে। আবার কোন কোনও রাজ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়া অনগ্রসর। তথাপি সংগতির অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের প্রভেদ হইতে পারে না। কাজেই সমগ্র দেশে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের নির্দেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে যথাযোগ্য দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

ভাষা শিক্ষা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষার সংস্থান লইয়াও এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান করিতে হইবে। মাতৃ-ভাষা অথবা একটি আঞ্চলিক ভাষাই যে শিক্ষার মাধ্যম হইবে এই বিষয়ে এখন বোধ হয় আর দ্বিমত নাই। অধিকাংশ রাজ্যেই এই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য কোনও কোনও রাজ্যে দুই একটি স্কুলে এখনও প্রাথমিক স্তরেও ইংরেজীর মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

হিন্দী ও ইংরেজীর স্থান লইয়াও মতদ্বৈধ আছে। হিন্দী ভারতের সরকারী ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে—ভারতের অধিকাংশ লোকে ইহা বুঝিতে পারে বলিয়া; অন্যান্য ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নহে। কিন্তু কেবল সরকারী ভাষা হইলেই চলিবে না—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের নিমিত্ত আমাদিগকে একটি ভাষা ঠিক করিতে হইবে।

এতদিন কেবল উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। জনশিক্ষা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়িবে। ইংরাজী ভাষার দ্বারা আর এ কাজ চালান ঠিক হইবে না। অল্প কয়েকজন কর্মচারী দ্বারাই যখন সরকার চালান যাইত, আর সংস্কৃতি যখন কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তখন ইংরাজী দিয়াই কাজ চলিত। গণতান্ত্রিক সমাজে ক্রমেই অধিক সংখ্যক লোকের সরকারের কাজে সহযোগিতা করিতে হয়—সাংস্কৃতিক প্রসারেও সকল শ্রেণীর লোকের অংশ গ্রহণ প্রয়োজন হয়। কাজেই ভারতের সর্বত্র শিশুদিগকে হিন্দী শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। ইহাতে জাতীয় ঐক্য ও সাংস্কৃতিক সংহতি বৃদ্ধির সাহায্য হইবে।

ইংরাজীর স্থান

আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার দুইটি কারণ আছে। (১) ইংরাজী একটি মাত্র দেশের ভাষা নহে; ইহা ক্রমে আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত হইতেছে। ভারত ক্রমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে যাইতেছে। কাজেই বিশ্বসমাজ গঠন এবং মানব সভ্যতা সম্প্রসারণে আমাদের যে অবদান ইংরাজীর মাধ্যমেই তাহা দিতে হইবে। (২) বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার ভাষাও ইংরাজী। জাতীয় উন্নতিসাধন এবং জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ অপরিহার্য। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার মূল গ্রন্থাদি হিন্দী ভাষায় অথবা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় নাই বলিলেই চলে। কাজেই কারিগরি বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা ভাল করিয়া জানিতে হইবে।

অতএব স্কুল ছাড়িবার আগে প্রত্যেক ছাত্রকে তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে; আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী এবং ইংরাজী। যে সকল ছাত্রের মাতৃভাষা হিন্দী তাহাদিগকে আর একটি ভারতীয় ভাষা শিখিতে হইবে। এইভাবে হিন্দীভাষী ও অহিন্দীভাষীদের মধ্যে সমতা সাধন করা যাইবে। তিনটি ভাষা শিক্ষা করা ছাত্রদের পক্ষে ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়া থাকে তাহা অমূলক। আজকাল অনেক দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ছাত্রেরা তিনটি ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। যেখানে সংস্কৃতির স্বাধীনতা, জাতীয় সংহতি এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রী ভারতীয় সমাজের আদর্শ সেখানে তিনটি ভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য প্রয়োজন।

কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন

সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্য সমূহের আত্মকর্তৃত্ব অবশ্যই থাকিবে; কিন্তু সাধারণ জাতীয় শিক্ষানীতি ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ অবশ্যই চেষ্টা করিবেন।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। যথা—কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ, বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ সাহায্য কমিশন, অখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ, অখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার পর্ষদ প্রভৃতি। একটি অখিল ভারতীয় বুনিয়াদি শিক্ষা পরিষদ গঠনের কথা ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন।

এই পর্ষদ ও পরিষদগুলি যাহাতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ঈপ্সিত সংস্কার সাধন করিতে পারে তজ্জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচী রূপায়ণে এই সহযোগিতা না থাকিলে জাতীয় একতা দুর্বল হইয়া পড়িবে।

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং জাতীয় একতা গড়িয়া তুলিবার অন্যতম শক্তিশালী বাহন হইল শিক্ষা। কেন্দ্রীয় সরকার যদি শিক্ষাপরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করেন ইহার অর্থ এই নহে যে, ইহাতে রাজ্যসমূহের কর্তৃত্বে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ করা হইতেছে—বরং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। গ্রামীণ ও নগরের শিক্ষার মানের তারতম্য, শিল্পোন্নত ও অনগ্রসর রাজ্যগুলির মধ্যে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার মানের বিসদৃশ পার্থক্য আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান গলদ। এই গলদ দূর করিতে যদি কেন্দ্রের সাহায্য পাওয়া যায় তবে রাজ্যগুলির তাহাতে খুসীই হওয়া উচিত।

কেন্দ্রের হাতে এই ক্ষমতা সংহতকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলা যায়। সহিষ্ণুতা, উভয় পক্ষের অভিমতে গুরুত্ব উপলব্ধি এবং বিজ্ঞজনোচিত রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানের সাহায্যে আমরা এই বিষয়টি সমস্যার সমাধান করিতে পারিব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নারীর ভূমিকা

শ্রীসুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[লণ্ডনে ফ্রাউহম রিবেট্রপের দুভিয়াশী]

লণ্ডনে জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রদূতের পত্নী ফ্রাউ ভন রিবেট্রপ হিটলারের বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত একজন বিশেষ স্ত্রীলোক ছিল। এই সুবেশী, সুন্দরী, মস্ত ব্যবসায়ীর কন্যার ন্যায় নাজীভক্ত দুর্লভ ছিল।

আমা এলিজাবেথ হেন্কি বালিকা বয়সেই রাজনীতিতে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। সামরিক এবং নৌবিভাগের পদস্থ ব্যক্তিরা উইল হেল্‌মের দরবারের পুরাতন জাঁকজমক এবং রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিত এবং ঐ বালিকা তাহাদেরই প্রথম প্রথম পছন্দ করিত। অন্যান্য যুবক যুবতীর ন্যায় সেও জার্ম্মাণীর হৃতগৌরব শাসকপক্ষকে সমর্থন করিত।

কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল এবং যতই জার্ম্মাণী মরিয়া হইয়া উঠিতে লাগিল, রাজবংশের কাহাকেও রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে সক্রিয় না দেখিয়া আমা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্ষমতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার লোভ তাহার অত্যন্ত প্রবল ছিল।

হিটলার যখন তাহার অকাল অভ্যুত্থানের ফলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল তখন আমা বলিল "শেষ পর্য্যন্ত যদি সে লুডেনডর্ফের মত নেতা ও বিখ্যাত যোদ্ধার সাহায্য পায় তবে তাহার উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হইতে পারে।"

অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মত নাজীবাদকেও তখন জার্ম্মাণীতে খরচের খাতাতেই ধরা হইয়াছিল। অসংগঠিত একটি বিপ্লবের পরিচালক, ভূতপূর্ব্ব বন্দী হিসাবে ছাড়া সেই হিটলারের নাম আবার জার্ম্মাণীতে শোনা যাইবে একথা কেহ তখন ভাবিতেও পারে নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে মদের রাজার ধনীকন্যা আমা তার পিতার শ্যাম্পেন বিক্রয়ের ভ্রমণকারী এজেন্ট ভন রিবেট্রপকে বিবাহ করে। রিবেন্ট্রপ ধনী ছিল একথা বলা চলেনা, তবে অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধানী না হইলেও সে অত্যন্ত প্রখর ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন চতুর প্রভাবশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল।

তাহারও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। আমা এবং যাহাকে সে স্বামী হিসাবে বরণ করিল তাহার মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল ছিল। উভয়েই রাজতান্ত্রিক দল হইতে আসিয়া এমন একটি জায়গায় পৌঁছিয়াছে যে হয় তাহাদের উদারনৈতিক দলে ভিড়িতে হয় নয়ত হিটলার চালিত ব্রাউনসার্ট দলের নূতন আদর্শ সমর্থন করিতে হয়।

ভ্রমণের মধ্যে সে কয়েকবার নাজীদের দ্বারা সংগঠিত সভায় যোগদান করিয়াছিল। সভাগুলি বাহ্যতঃ গুপ্ত হইলেও কর্তৃপক্ষের অজানিত ছিল না।

সে হিটলার ও অন্যান্য নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। হিটলারের মধ্যে সে প্রাচীন কালের গভীর রাজনৈতিক চাতুর্য্য দেখিতে না পাইলেও তাহার মধ্যে সে অসাধারণ কৃতিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইল।

রিবেন্ট্রপ এবং তার স্ত্রী হিটলারের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিল যে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ দেশকে অনেক কিছু দিতে পারে। দেশের ধ্বংসোন্মুখ শিল্প বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া অন্ততঃ জার্ম্মাণীর বেকার সমস্যার সমাধান কিছুটা করিতে পারে। জার্ম্মাণী যে প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে এবিষয়ে তাহাদের সহিত আরও অনেকে একমত ছিল। সেরূপ অবস্থায় হেন্কি পরিবারের ঐশ্বর্য্যও ডাঙায় মিলাইয়া যাইবে।

হিটলার ও তাহার সমর্থকরা যে বিশ্ব-বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেছে একথা তখন কোথাও প্রকাশ পায় নাই। হতাশায় ভাঙিয়া পড়া জার্ম্মাণ জাতিকে তাহারা পুনর্গঠন করিতে চাহিতেছে ইহাই লোকে বুঝিয়াছিল।

জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ অনেক কিছুই দিতে পারে। ইহা

সাম্যবাদীদের সমাজতন্ত্রবাদ নহে কারণ, হিটলার অনেকবার সাম্যবাদের কঠোর নিন্দা করিয়াছে-এবং জুদের অপেক্ষা তাহাকে বেশী বিপজ্জনক বলিয়াছে।

রাশিয়ার সাম্যবাদের প্রচার জার্ম্মাণীকে ভরিয়া ফেলিয়াছে। সারা দেশ লাল হইয়া যাওয়ার একটা প্রকৃত বিপদ দেখা দিয়াছে। শত শত ধনী ব্যবসায়ীর সহিত রিবেট্রপরাও লাল বিপ্লবের সম্ভাবনাকে আতঙ্কের সহিত লক্ষ্য করিতেছিল। রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের কোন আশা ছিল না, জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদকে হটাইয়া দিবার মত অন্য কোন আদর্শও দেশের মধ্যে ছিল না। সাম্যবাদের সহিত এই আন্দোলনও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সাম্যবাদ এবং জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ এই দুইটির মধ্যে একটিকে তাহাদের বাছিয়া লইতে হইবে।

সাম্যবাদ ফ্রাউ ডন রিবেট্রপকে কিছুই দিতে পারেনা। জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ হয়ত তাহাকে কিছু দিতে পারে। হয়ত ঐ পথে তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাও পরিতৃপ্ত হইতে পারে। ইহা একটি নূতন নীতি, নূতন আদর্শ, সবে মাত্র নিজেকে প্রকাশ করিতেছে।

স্ত্রী পুরুষ সকলেই সর্ব্বত্র ইহার মতামত বিচার করিতেছে এবং বলিতেছে "অবস্থা আরও খারাপ হইতে পারে না" যদি জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ আমাদের কাজ ও নিয়মিত সাপ্তাহিক বেতন দিতে পারে তবে তাহা সর্বদা উপবাস ও দুর্দ্দশার চেয়ে ভাল।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের নিকট হইতে ধনীদের কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

আমা এলিজাবেথ রিবেট্রপ মন স্থির করিয়া ফেলিল। জার্ম্মাণীর পুনরুদ্ধারের জন্য আভ্যন্তরীন ব্যাপারে কিছুটা করা তাহার মত স্ত্রীলোকের পক্ষে বেশ সম্ভব ছিল। তাহার স্বামীও কিছু মূর্খ ছিলনা, সেও এই ব্যাপারে তার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে এবং এমনকি দলের একজন নেতাও হইয়া যাইতে পারে।

আমা স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, সে নিজেকে একজন রাজনৈতিক সেবিকারূপে কল্পনা করিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল যে সে দেশের একজন প্রধান স্ত্রীলোক, সকলে তাহাকে তোয়াজ করিতেছে এবং প্রশংসা করিতেছে।

তাহার অর্থ তাহাকে হিটলারের দলের নিকট কৃতকার্য্য হওয়ার রাস্তা খুলিয়া দিল। দলের নিকট অর্থের প্রয়োজন ছিল; ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য আমা এবং তার স্বামী প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাইতে প্রস্তুত ছিল।

অন্য রাজনৈতিক দলগুলি বোধ হয় কিছুটা সম্মান বোধ থাকার জন্য একজন ব্যবসায়ীর কন্যাকে দলের উচ্চশ্রেণীতে গ্রহণ করিতে বিশেষ উৎসুক ছিলনা। জার্ম্মাণীতে তখন শ্রেণীপার্থক্য অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমা এবং তাহার ক্যানডাসার স্বামী সাবেক সামরিক গোষ্ঠীর সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। বার্লিনের সমাজের বনিয়াদি পর্য্যায়ে কোন উৎসবাদিতে নিমন্ত্রিত হইলে তাহারা যে সামাজিক হিসাবে নিম্নস্তরের একথা অনুভব করিতে হইত।

একটি উৎসবে সর্ব্বাপেক্ষা সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইয়াও তাহাকে শুনিতে হইয়াছিল "ঐ সুন্দরী স্ত্রীলোকটি কে?" সেভেল এবং নানারূপ সামরিক চিহ্নদ্বারা সুসজ্জিত একটি পদাতিক বাহিনীর কর্ণেল উত্তর দিয়াছিল "ঐ লাল চুলওয়ালা জীবটি মদ্য ব্যবসায়ী বুড়ো হেন্ত্রির কন্যা আমা রিবেট্রপ। সে তার বাপের ভ্রমণকারী দালাল ঐ লোকটাকে বিয়ে করেছে।" রিবেট্রপ এক গ্লাস শ্যাম্পেন হাতে নিয়া দাঁড়াইয়া গ্লাসের বস্তুটির প্রশংসা করিতেছিল, তাহাকেই সে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

স্ত্রীলোকটি হাসিয়া উত্তর দিল, "শ্বশুরের প্রস্তুত হলাবলের কত গুণ তারই ব্যাখ্যা করছে।"

কর্ণেল বলিল "নিশ্চয়ই সেই সঙ্গে কমিশন পাওয়ার আশায় কিছু অর্ডারও নেওয়ার চেষ্টায় আছে"।

স্ত্রীলোকটি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল "হামা কেন যে এই সব মেয়েদের তার উৎসবে নিমন্ত্রণ করে আমি ভেবে পাইনা। এ সম্বন্ধে তাকে আমি বলব। ও জীবটি আমাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত নয়"।

কর্ণেল গম্ভীর ভাবে বলিল "হামা বোধ হয় বাধ্য হয়েই ওকে নিমন্ত্রণ করেছে"।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল "কেন? সে কি সব জায়গাতেই যায়?"

কর্ণেল উত্তর দিল "ও ত প্রায়ই ঘুর ঘুর করে বেড়ায়,

বোধ হয় আমাকে সাদা নিমন্ত্রণ করে ওর বাবা তাদের কেনা মদের উপর বিশেষ একটা কমিশন দেয়।

ফ্রাউ ভন রিবেন্ট্রপ ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেও কাহাকেও তাহা বুঝিতে দিলনা, উপরন্তু সে পুনরায় তাহার সহিত আর একটি ভোজ সভায় মিলিত হইল এবং কয়েকদিন পরে এক ভোজ সভায় তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিল।

কর্ণেল হাসিয়া বলিল "মেয়েটার ব্যবসাবুদ্ধি আছে, বুঝতে পেরেছে যে গতবার ভোজের পর আবার তোমার কিছু মদ কেনার দরকার হবে।"

ঘটনাটি ফ্রাউ ভন রিবেন্ট্রপের মনে বসিয়া গেল এবং সে চিরকালের জন্য সামরিক ব্যক্তিদের ভোজসভা বর্জন করার সিদ্ধান্ত করিল। অতঃপর ভবিষ্যতে সেই হইবে নিমন্ত্রণকারী এবং আজ যাহারা তাহাকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিতেছে শীঘ্রই তাহারা তাহার ভোজ সভায় নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

চতুর চক্রান্তকারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী শীঘ্রই তাহার উদ্দেশ্যসাধন করিল। সে এবং তার স্বামী খোলাখুলি নূতন দলভুক্ত হইল এবং সেই উপলক্ষে একটি সম্বর্ধনা সভায় ভূতপূর্ব্ব বন্দী হিটলারকে প্রধান অতিথিরূপে নিমন্ত্রণ করিল।

আমার চেষ্টায় সম্বর্ধনা সভাটি চমৎকার সাফল্যলাভ করিল। ভোজ সভায় প্রায় চারিশত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। যাহারা মদের রাজার কন্যাকে বনিয়াদি সমাজে প্রবেশ করার চেষ্টায় আক্ষেপ করিয়াছিল সেই সমস্ত নেতৃস্থানীয় এবং বর্ত্তমানে অবহেলিত অনেক ব্যক্তিও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

হিটলার তখন রাজনৈতিক উন্মাদনার স্বপ্ন দেখিতেছিল। আমার ভোজ সভায় সে তাহার আদর্শ ও নীতি ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাইয়া অনেক অনুগত ভক্ত সংগ্রহ করিয়া ফেলিল। নিমন্ত্রণকারিণীর অনুরোধে বার্লিনের কর্ম্মহীন ব্যক্তিদের জন্য একটি সাহায্য তহবিল খোলা হইল। কয়েক সহস্র মার্ক ঐ রাত্রেই চাঁদা সংগ্রহ হইল। ঐ চাঁদার তহবিলের দ্বারাই বর্ত্তমান জার্ম্মাণ জীবনের বৈশিষ্ট্য হিটলারের প্রতিষ্ঠিত উইন্টার রিলিফ ক্যাম্পেনের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা হইল। উইন্টার রিলিফ ক্যাম্পেনের প্রথম পরিকল্পনার কৃতিত্ব ফ্রাউ ভন রিবেন্ট্রপেরই প্রাপ্য। হাজার হাজার মার্ক ঐ তহবিলে সে দান করিয়াছে।

হিটলার এবং রিবেন্ট্রপের মধ্যে শীঘ্রই গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। তার এবং তার স্ত্রীর কথার উপর হিটলারের খুব আস্থা ছিল। আনার সহিত সে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তত্ত্ব ব্যবহার করিতে এবং তার প্রতিষ্ঠিত ব্রত উদ্‌যাপনের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব থাকিলে তাহা শোনার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত।

নিজের এবং তার স্ত্রীর ভবিষ্যৎ যে সুনিশ্চিত একথা রিবেন্ট্রপ অনতিবিলম্বেই বুঝিতে পারিল এবং জার্ম্মাণীকে পুনরায় একটি বিরাট শক্তিরূপে গড়িয়া তোলার নেতৃত্ব যে গ্রহণ করিয়াছে তাহার বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে পরিলক্ষিত হইল। সময় আসিলেই বিশেষ অনুগ্রহ পাওয়ার দাবী তাহাদের সুনিশ্চিত রহিল।

রিবেন্ট্রপ এবং তাহার স্ত্রী ধরিয়া লইল যে তাহারা অসাধারণ প্রতিভাশালী রাজনীতিক। ভাগ্যমান মদের দালালটি সরকারের একজন সদস্য হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত হিটলারের অনুগ্রহে প্রধান মন্ত্রীরও লাভ করিল। আনা অবশেষে অহিংসবাদী রাজীরূপে আসন লাভ করিল এবং যাহারা কয়েক বৎসর আগে সম্মুখে ভদ্রতা দেখাইয়া পশ্চাতে তীব্র শত্রুতা করিত, তাহারাই তাহার সভায় আসিয়া ভীড় জমাইতে লাগিল। মদব্যবসায়ীর কন্যা আনা এলিজাবেথ রিবেন্ট্রপের বন্ধুত্ব সকলের নিকট কাম্য বস্তু হইয়া উঠিল, কারণ তাহার নিকট কোন কথা বলা আর হিটলারের নিকট কোন কথা বলা একই ছিল। সে যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া কিছু দিবে হিটলার তাহাই অনুমোদন করিবে।

আনা তথাপি সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে তাহার প্রভাব আরও বাড়াইতে চাহিল। যে অল্প কয়েকটি লোক হিটলারের মনের কথা জানিত রিবেন্ট্রপ তাহাদের মধ্যে একজন। জার্ম্মাণী গোপনে তাহার অস্ত্রশস্ত্রের বাড়াইয়া চলিতেছিল এবং একটার পর একটা ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিতেছিল। জার্ম্মাণীর শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। বেকারত্বের অবসান ঘটিয়া সমৃদ্ধি

আসিতেছিল। হিটলার দৈবপুরুষ বলিয়া দেশে খ্যাতি রটিল এবং জু বিতাড়নই খ্যাতির একটি প্রধান উপকরণ বলিয়া গণ্য হইল। জুরাই সব নষ্টের মূল এ সম্বন্ধে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল।

ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং ইটালীতে অনুপ্রবেশ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অষ্ট্রীয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

প্রায় সর্ব্বত্রই নাৎসীসমাজ হিটলারের ইচ্ছাকেই কাজে পরিণত করিতেছিল, সর্ব্বত্রই রাজনীতিকদের মনে বিষ সঞ্চার করিয়া চলিতেছিল, হিটলারের প্রয়োজনমত ঐ বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। বহু বৎসর পূর্ব্বে হিটলারের ঘোষিত অনুশাসন এত চমৎকার কাজ করিতেছিল যে হিটলার নিজেও তাহা ভাবিতে পারে নাই।

রিবেট্রপ এবং তার স্ত্রীর নিকট হিটলার গর্ব্ব করিয়াছিল। "আমি ঠিকই বলিয়াছিলাম। বহুদিন আগে আমি বলিয়াছিলাম যে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিলে বেশীর ভাগ পুরুষই বোকা বনিয়া যায়। আমরা স্ত্রীলোকদের কাজে লাগাইয়াছি। ফ্রান্সের দিকে তাকাও। তাহাদের সরকার অস্থির, সর্ব্বত্রই ঈর্ষা, কোথাও কোন উন্নতি নাই। রাজনীতিকেরা পরস্পর বিবাদ করিতেছে এবং নিজেদের ক্ষুদ্র দ্বেষ ও ঈর্ষা প্রকাশ করিতেছে। চিন্তা করিলে ইহা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় যে নারীই এই সমস্ত গণ্ডগোলের মূল। এই অবস্থা চালু রাখাই আমাদের স্বার্থ।"

"আমা যখন জিজ্ঞাসা করিল ইংল্যাণ্ডের খবর কি?" হিটলারের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে বলিল "ফ্রান্সের মত ইংল্যাণ্ডে মেয়েরা সকল হইতে পারে নাই। তা ছাড়া জার্ম্মাণীর অগ্রগতিতে ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে বিপদ আসার সম্ভাবনা কম। ইংরেজরা ঠাণ্ডা এবং অমিশুক। তাহাদের নৌবল আছে বটে কিন্তু সৈন্যবল অকিঞ্চিৎকর। তাহারা জয় নিশ্চয়ে চুক্তি মাফিক করিয়া চলে বলিয়াই মনে হয় এবং বোকার মত বাজে কাজে পয়সা নষ্ট করে। যত সব ভদ্র জোচ্চরের দল।"

গৃহকর্ত্রী বলিল "কিন্তু তথাপি ইংল্যাণ্ড যে একটি প্রবল শত্রু হইতে পারে ইতিহাসই তাহা প্রমাণ করে।"

রিবেট্রপ বলিল "ইংল্যাণ্ড এখন নিষ্ক্রিয়। নিজেকে সে এরূপ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে যে নূতন জার্ম্মাণীকে প্রতিরোধ করার সামর্থ্য তাহার নাই। সেখানেও কাটল ধরিয়াছে।"

হিটলার ঐরূপ ভাসা ভাসা বিবরণের উপর আস্থা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলনা।

ফ্রাউ আনা সুযোগ ছাড়িল না। সে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে যদি মেয়েরা এত করিয়া থাকিতে পারে তবে ইংল্যাণ্ডেই বা পারিবে না কেন?"

হিটলার বলিয়াছিল "না পারার কোন কারণ নাই।"

আনা রিবেট্রপ কয়েকদিন পরে অতি গোপনে তাহার এক বান্ধবীর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করে এবং বলে যে সেণ্ট জেম্‌সের দরবারে রাজদূত হিসাবে শীঘ্রই রিবেট্রপ ইংল্যাণ্ডে যাইতেছে এবং সে নিজে জুয়ারের নিকট হইতে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিক ও নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার ও জার্ম্মাণীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করার ভার পাইয়াছে।

ফ্রাউ ভন রিবেট্রপের ঐ বান্ধবীই এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডে সমাজের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বিভীষণ বাহিনীর ভিত্তি স্থাপন করাই ফ্রাউ ভন রিবেট্রপের কাজ হইল।

এই নূতন কাজটি তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতির উপযোগী হইল। তাহার বাসনা হইল যে লণ্ডনে সে অদ্বিতীয়া সমাজ-নেত্রী হইতে পারিবে এবং জার্ম্মাণ রাজদূতের স্ত্রী হিসাবে সে রাণীর সম্মান পাইয়া সাধারণের অনধিগত অভিজাত শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পাইবে। ভাবিয়াছিল লণ্ডনের সকল দরজাই তাহার নিকট খোলা থাকিবে এবং সে তাহার পছন্দ মত বন্ধু-বান্ধব সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নাজীবাদে দীক্ষিত করিয়া তুলিবে যাহাতে প্রয়োজনের সময় তাহারা জার্ম্মাণীর কাজে লাগিতে পারে। তাহার স্বামীকে ইংল্যাণ্ডে রাজদূত হিসাবে নিযুক্ত করার প্রকৃত তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারিল না। ইংল্যাণ্ডে কেহই তাহাকে মদের রাজার দুহিতা বলিয়া জানিবেনা। সেণ্ট জেম্‌স দরবারে সে সকল হইবে। সকলেই তাহাকে

শুভেচ্ছা জানাইবে এবং বিপন্ন আপদের কথা বলিতে আসিবে এবং দুর্বল মুহূর্তে জার্মাণীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অনেক কথা তাহাদের নিকট হইতে সে জানিতে পারিবে।

অতএব আমা প্যারিসে প্রস্তুত মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদে বাক্স বোঝাই করিয়া লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু আমা তার কাজে সাফল্যলাভ করিতে পারিলনা। অন্যান্য জার্মাণদের মত আমাও ইংরাজদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। লণ্ডনের সমাজ আমার পদমর্যাদা অনুযায়ী তাহাকে ভদ্র ভাবে গ্রহণ করিল কিন্তু অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না। সোজা কথা এই যে ধূর্ত ও চতুর হইলেও আমা প্রথম হইতেই সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিল।

প্রথম হইতেই সে রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং নাজীবর্ম্মী জার্মাণীর অতাধিক সুখ্যাতি করিয়া ভুল করিয়া বসিল। কথাবার্ত্তাতেও সে অত্যন্ত সতর্ক ছিল।

প্রায়ই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবের সহিত ইংল্যাণ্ডের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে রাজপুরুষদের বিরুদ্ধসমালোচনার সময় বলিত "এখন জার্মাণীতে আমরা এরকম হতে দেই না। আপনারা আমাদের পদ্ধতিতে এই সব লোকের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না কেন?" হয়ত বলিত "আসল সমস্যা হইল এই যে ইংরাজরা অত্যন্ত ভালমানুষ এবং ভাবপ্রবণ। এদেশে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রয়োজন।"

আমার নিকট নাজীবাদের ব্যাখ্যা শুনিলে লোকের মনে হইত যে জার্মাণী লোকের পক্ষে স্বর্গ। প্রগতি বিরোধীরা বন্দীশালা, পাশবিকতা ও গেষ্টাপো নামক গোয়েন্দা বিভাগ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করিয়া থাকে। আমা তাহার নিকট রক্ষিত হিসাব পত্র হইতে বলিয়া যাইত হিটলার ক্ষমতায় আসীন হইবার আগে এত লক্ষ বেকার ছিল, এত লক্ষ না খাইয়া মারা গিয়াছে—এখন অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লোক এখন সুখী এবং সন্তুষ্ট। যে নেতা তাহাদের জন্য এত করিয়াছে তাহারা তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে। জার্মাণীর উন্নতিতে কেহ বাধা দিতে পারিবেনা।

বাজারে যুদ্ধের গুজব শোনা যাইতেছিল। আমা তাহা তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিল। "বলিল জার্মাণী যুদ্ধ চাহে না। জার্মাণী পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় কথা এই যে ইংল্যাণ্ডের বহুলোক জার্মাণীর বিরুদ্ধে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ পোষণ করিতেছে।"

"জার্মাণদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করায় ইংরাজদেরই লাভ। দুইটি জাতি পরস্পরের উপর বিশ্বাস রাখিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে এবং পৃথিবীতে নবজীবনের সূচনা করিতে পারে।"

আমাকে তার অংশ অভিনয় করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইল। ইংরাজের মনোভাব, রাজা এবং রাজ্যের প্রতি ইংরাজের বিশ্বস্ততা আমা বুঝিতে পারে নাই। সরকারের সমালোচনাকে সে সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া ভুল করিল। সরকার এবং সরকারের সমালোচনাকে সে দুর্বলতা মনে করিয়া ভাবিল যে এই দুর্বলতাকে সে জার্মাণীর পক্ষে কাজে লাগাইতে পারিবে। একথা সে বুঝিল না যে সরকারের যত তীব্র সমালোচনাই করুক না কেন, খাঁটি ইংরাজের একটি বিশেষ গুণ আছে। এই গুণেই রাজ্য এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা সমস্ত দলাদলি ভুলিয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইতে পারে।

অতএব ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই যে ব্রিটেনে থাকার সময়, ব্রিটেনের বা ব্রিটিশ সরকারের বা তাহার দেশের মধ্যে ভাল কিছুই নাই এরূপ ধারণাসম্পন্ন কতকগুলি বিকৃতমন রাজদ্রোহীকেই আমা বন্ধুরূপে পাইয়াছিল। "যে কোন মূল্যে শান্তি" এই দল বিপদ ও অসুবিধার সম্মুখীন হইতে ভয় পাইয়া শান্তি খুঁজিতেছে এইরূপ কতকগুলি তথাকথিত আদর্শবাদী লোক ইহার মধ্যে ছিল।

এই জাতীয় লোকের নিকট হইতেই আমা ব্রিটিশজাতি এবং ব্রিটেনের লোক সম্বন্ধে নিজের ধারণা গঠন করিল। ইহাদের সমালোচনা হইতেই সে ধারণা করিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গন ধরিয়াছে, এবং সেখানকার লোকেরা একতাবদ্ধ হইতে অসমর্থ এবং জার্মাণীর ভয়ে ভীত।

সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার এই যে আমা কখনও

খাঁটি ইংরাজ নাগরিকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায় নাই, কতকগুলি বিকৃত মস্তিষ্ক দেশদ্রোহীদের সহিত মিশিয়া তাহাদেরই সে সমগ্র বৃটিশ জাতির প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিল।

আমা মনে মনে গর্ব্ব করিতে লাগিল যে সে বুদ্ধির অতি বিশ্বাসভাজন এবং ইংরাজ জাতির সঠিক পরিমাপ এবং ধারণা সে করিতে পারিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের আসন্ন ধ্বংস এবং পতনের কতকগুলি গল্প শুনিয়া তাহাই সে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল এবং তদনুযায়ী রিপোর্ট পাঠাইল।

হিটলারের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইলেই যুদ্ধ হইবে এবং ইংরাজরা তখন যুদ্ধ করিবেনা। মিউনিকের সেই কলঙ্কজনক ঘটনা অপেক্ষা আমার বিবরণের সত্যতার আর কি বেশী প্রমাণ প্রয়োজন? অষ্ট্রিয়ার একজন ইহুদির নিকট ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী টুপি খুলিয়া শান্তির প্রস্তাব দিয়া ছুটিয়াছেন। কুর্জন্টন হাউস টেরেসের দূতাবাসে জার্ম্মাণ দূতাবাসের বন্ধ ঘরের ভিতর তথাকথিত সংগঠনকারীদের হাসিতে হাসিতে গলা ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রধানতঃ স্ত্রীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া জার্ম্মাণ দূত রিবেন্ট্রপ হিটলারকে আশ্বাস দিল যে ব্রিটেন যুদ্ধ করিবে না এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন।

হিটলারের অনুশাসন আমা সাফল্যের সহিত অনুসরণ করিতে পারিয়াছিল একথা মোটেই বলা চলেনা। নগণ্য কয়েকজন রাজপুরুষ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া যাহারা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাহারা কেহই আমার দ্বারা প্রভাবিত হইল না। লণ্ডনের সমাজ ও রাজনীতিকদের সে যথাসাধ্য প্রভাবিত করার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সকলেই তাহার প্রতি রাজদূতের স্ত্রী হিসাবে প্রাপ্য নীরস ভদ্রতা দেখাইয়াছিল, তার বেশী কিছু নয়। কূটনৈতিক খেলার গভীরতা মদের রাজার কন্যার পক্ষে আয়ত্তের বাহিরে ছিল।

আজ ইংল্যাণ্ডে তাহার বন্ধুদের অবস্থা কি? বেশীর ভাগই ডিফেন্স রেগুলেশনের ১৮/ বি ধারার কবলে পড়িয়া কারাগারের অন্তরালে আছে।

প্রকৃত পক্ষে আমা একজন পণ্ডিত উৎকট কল্পনাপ্রবণ জড়বুদ্ধি স্ত্রীলোক ছিল। পোষাকের উপর তাহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। একটি পোষাক দুইবার পরিয়া সে কখনও জনসাধারণের সম্মুখে বাহির হয় নাই। বেশীর ভাগ পোষাকই সে মোটা টাকা ব্যয় করিয়া সরাসরি প্যারিস হইতে আমদানী করিত।

জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া আসিয়া সে হিটলারকে রাজী করাইতে চেষ্টা করিল যে মেয়েদের পোষাকপরিচ্ছদ নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে তাহার একটি সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদ পাওয়া উচিৎ।

একটি জার্ম্মাণ পরিবার যে অর্থে ছয় মাস জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে ঐ পরিমাণ অর্থ একটি মাত্র পোষকের জন্য যে ব্যয় করিবে সে হইবে যুদ্ধকালীন জার্ম্মাণ মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের প্রধান উপদেষ্টা।

তাহার এই অভিযানের সুরুতেই সে বার্লিনে মেয়েদের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সকলে মঞ্চের দিকে তাকাইয়া রহিল। যুদ্ধের সময় কিরকম পোষাকপরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিৎ তাহা বুঝাইবার জন্য এখনই একজনের আবির্ভাব হইবে।

বৃহদ্বরে অর্কেষ্ট্রা বাজিতেছিল। মৃদু আলোকের মধ্যে আমা যখন মঞ্চে প্রবেশ করিল তখন তীব্র কেন্দ্রীভূত আলোর ছটা আসিয়া তাহার উপর পড়িল।

প্যারিসে প্রস্তুত অত্যন্ত চটকদার পোষাক তাহার অঙ্গে শোভা পাইতেছিল, তাহার উপর মূল্যবান পশু লোমের কাজ করা ছিল। তার হাতে একটি ফুলের তোড়া ছিল। হাতে, আঙ্গুলে, গলায় মূল্যবান অলঙ্কার তার অগাধ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছিল।

নাজী জার্ম্মাণীর কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে থাকিয়াও মেয়েদের পক্ষে ইহা সহ্য করা সম্ভব হইল না। একযোগে সকলে চিটকারী দিয়া তাহাকে মঞ্চ হইতে তাড়াইয়া দিল।

কূটনীতিকের স্ত্রী হিসাবে আমা যতটা বিফল হইয়াছিল এ ক্ষেত্রেও সে ততটা বিফল হইল। চীৎকার করিয়া মারমুখী জনতা ভাঙ্গিয়া পড়িল। পুলিশ কিছু ধরপাকড় করিল।

তখন হইতে জাতির জীবনে আমার কর্ম্মক্ষেত্র সাধারণ

স্তরে নামিয়া আসিল। বার্লিনের আমেরিকান বন্ধুদের নিকট জানা যায় যে তখন হইতে আমা গৃহকর্ত্রীর জীবন যাপন আরম্ভ করিল। সাধারণ দান ধ্যান উপলক্ষ্য ছাড়া বিশেষ বাহিরে আসিতনা। অবশ্য হিটলারের নিকট তাহাদের বিশ্বস্ততা কিছুমাত্র কমে নাই।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

[খাঁটি জার্মাণ মহিলার সহরে আগমন]

যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জার্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান মহিলারা আসিয়া ইংল্যাণ্ড-ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের বেশীর ভাগই হয় ছাত্রী না হয় চাকরাণীর বেশে আসিয়াছিল।

নূতন জার্মাণীর এই দৌত্য, হিটলারের নারী বাহিনী দ্বারা নাজীদের প্রয়োজনীয় সংবাদ যোগাইবার সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার একটি অংশ।

জার্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান মেয়েদের মধ্যে প্রায় কেহই জানিত না যে তাহারা জার্মাণ দৌত্যের একটি অংশ। এই গোয়েন্দাগিরির জন্য তাহারা বেতন পাইত না। বরং নিজেদের দেশে খবর চালান দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য তাহাদের কিছু দিতে হইত।

দলের তহবিলে বা উইন্টার রিলিফ তহবিলে প্রত্যেকেই যাহা রোজগার করিত তাহা হইতে কিছু-না কিছু চাঁদা দিতে হইত। না দিলে জার্মাণীতে তাহাদের আত্মীয়স্বজনকে ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইত।

জার্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার সর্ব্বত্র চাকুরীসন্ধানী অফিস স্থাপিত হইল। ইহাদের মারফৎ মেয়েরা ইংল্যাণ্ডে চাকুরী পাইত। তাদের সমস্ত ব্যবস্থা সেখান হইতেই করা হইত। মেয়েদের জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করিয়া রওনা হওয়া ছাড়া আর কিছু করিবার ছিল না। যেসব মেয়েরা সেখানে কাজ করিবে তাহারা কিরূপ লোক, কি করে, এবং ঐ কাজে নিযুক্ত হইলে কিরূপ লোকের সংস্পর্শে তাহাদের আসিবার সম্ভাবনা আছে ইত্যাদি সমস্ত বিবরণই মেয়েরা বিদেশে যাওয়ার আগে নাজীরা সংগ্রহ করিয়া রাখিত।

ঐ সমস্ত খবরাখবর বার্লিনে রক্ষিত নামানুযায়ী সূচী-পত্রে লিপিবদ্ধ থাকিত।

জার্মাণদের কার্যপদ্ধতি ছিল নিখুঁত।

ইংল্যাণ্ডে একবার উপস্থিত হইলে মেয়েরা নাজীদলের সভ্য হইয়া থাকিতে বাধ্য হইত। একবার বিদেশে উপস্থিত হইলে ঐ জাল কাটিয়া বাহির হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল: তাদের যাত্রার পূর্ব্বে মাতৃভূমির প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিয়া দেওয়া হইত। ইংল্যাণ্ডে থাকিবার সময় যে নাজী দলপতির অধীনে তাহারা থাকিবে তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হইত।

যতদূর সম্ভব মেয়েদের সামরিক নৌ বিভাগ এবং বিমান বিভাগের কর্মচারীদের গৃহেই থাকিবার ব্যবস্থা হইত। কর্মচারীদের গৃহে কথাবার্ত্তার টুকরা খবর বা তাহাদের কানে আসিয়া আসিত ঐ সমস্ত খবর জার্মাণীর পক্ষে প্রয়োজন ছিল।

মেয়েদের থাকার দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় স্থান ছিল বড় বড় ব্যবসাদার ও শিল্পপতিদের গৃহ। যে সমস্ত খবর তাহারা চালান দিত সেগুলি নিতান্তই টুকরা খবর হয়ত খুব নির্ভর-যোগ্যও নহে। কিন্তু চক্রান্তকারী নাজীদের পক্ষে কোনটাই অকিঞ্চিতকর ছিলনা। ব্রিটিশদের গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করা তাহাদের একান্তই প্রয়োজন ছিল।

মেয়েদের "সুবিধার" জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সেখানে তাহাদের মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইত।

প্রতি সপ্তাহে মেয়েদের সমিতিতে যাইতে হইত এবং দলপতির নিকট কাজের অগ্রগতির সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করিতে হইত।

সমস্ত কাজ খুব চতুরতার সহিত সম্পাদন করা হইলেও ভিতরে অনেক ফাঁক থাকিয়া যাইত।

লণ্ডনে রাজদূতের পত্নী আমা ভন রিবেন্ট্রপ নাঝে মাঝে ঐ সমস্ত সমিতিতে গিয়া মেয়েদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিত, কিন্তু যে কারণেই হউক মেয়েদের মধ্যে প্রয়োজনীয় উৎসাহ সে জাগাইয়া তুলিতে পারিতনা। তার একজন বান্ধবীর নিকট সে বলিয়াছিল যে "ঐ সমস্ত চাকরাণীর দলের জন্য সময় নষ্ট করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিলনা, অন্যান্য অনেক গুরুতর কাজে তাহার মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ছিল।"

এই কারণে ক্রাউ শোলুক ক্লিফ নামে একজন মহিলাকে লণ্ডনে পাঠান হইল। হিটলার তাহাকে খাঁটি আর্য্যাণ মহিলা আখ্যা দিয়াছিল। ৩০,০০০,০০০ আর্য্যাণ মহিলা ও বালিকার দেখা-শুনা করার জন্য এই মহিলাটি সবে মাত্র হিটলার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। স্ত্রী হিসাবে এবং মা হিসাবে আর্য্যাণ মহিলাদের উপযুক্ত করিয়া তোলা, বালক বালিকাদের প্রতিপালন করার পরিকল্পনা তদারক করাই তাহার কাজ ছিল। অন্ততঃ তাহার নিয়োগের এই ব্যাখ্যা জনসাধারণের নিকট করা হইয়াছিল।

ক্রাউ শোলুক ক্লিফ মনে প্রাণে নাজী ছিল। উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা সম্বন্ধে সে ছিল সন্দেহের অতীত। হিটলারকে সে দেবতার ন্যায় পূজা করিত। কিন্তু খাঁটি আর্য্যাণ মহিলা হইলেও ইংরাজদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাহার যোগ্যতা বিশেষ কিছু ছিলনা।

সে ছিল চারিটি সন্তানের জননী; মোটা, গোলগাল বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।

ক্রয়ডনে বিমান হইতে সে অবতরণ করিল। ইংল্যাণ্ডে তাহার সেই প্রথম এবং বোধ হয় শেষ পদার্পণ।

আমি তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খাঁটি আর্য্যাণ মহিলার কথা শুনিয়া আমি আশা করিয়াছিলাম বিমান হইতে একজন চটকদার সুন্দরী বাহির হইবে।

কিন্তু আমি নিতান্তই নিরাশ হইলাম। সুন্দরী তরুণীর বদলে বিমান হইতে একজন বিরাট দেহ মহিলা বাহির হইয়া আসিল। বয়স অপেক্ষা তাহাকে যেন বৃদ্ধাই বোধ হইতেছিল অথবা তার গোল মুখ ঝুলিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখের দুইটি থুতনী দেখিতে পাইলাম এবং মনে হইল আরও একটি থুতনী বাহির হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ কাল পরিচ্ছদে ঢাকিয়া আস্তে আস্তে বিমান হইতে মহিলাটি বাহির হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলাম যখন সে তাহার বাসরা উঁচু করিয়া বিমানের সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতেছিল তখন। কোন স্ত্রীলোকের পায়ের পাতা যে অত বড় হইতে পারে তাহা জীবনে এই প্রথম দেখিলাম।

আমার সহকর্মীকে বলিলাম "এই তাহা হইলে খাঁটি নাজী?" সে শুনিয়া একটু হাসিল। তাহাকে দেখিয়া একটি ক্লক মেজাজের ছক বলিয়া মনে হইল। যে সব সাংবাদিকরা তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছিল তাহাদের সহিত ভদ্রতা রক্ষা ও দুএের কথা ক্রয়ডন কর্তৃপক্ষের সহিত ভদ্রতা রক্ষাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না।

"আমার কিছু বলিবার নাই, আপনারা চলিয়া যান" সে অনবরত চীৎকার করিয়া এই কথাই বলিতে লাগিল।

রিবেট্রপের দূতাবাসের একখানা গাড়ী আসিয়া তাহাকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কার্লটন টেরেসে চলিয়া গেল এবং যতদিন সে এদেশে ছিল ততদিন ঐখানেই সে ছিল।

এই পরিদর্শনের সময় ক্রাউ ক্লিফ আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগিদের সকলের সহিতই দেখা করিয়াছিল। আজ তাহারা সকলেই "বিপদজনক" বলিয়া চিহ্নিত। তারা সকলেই ছিল শান্তির দালাল এবং এ্যাংলো-আর্য্যাণ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতায় বিশ্বাসী আদর্শবাদী।

তাহার প্রেরিত বিবরণ যাহাতে আমা ও তার স্বামীর প্রেরিত বিবরণকে সমর্থন করে সে সম্বন্ধে আমা মনোযোগী ছিল।

যে সমস্ত দলপতি ইংল্যাণ্ডে সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিল তাহাদের উৎসাহ দেওয়াই তাহার প্রধান কাজ ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেককে দূতাবাসে ডাকিয়া পাঠান হইত। ডাক পড়িলে সকলেই একান্ত বশম্বদের ন্যায় আসিয়া হাজির হইত, এবং প্রয়োজনীয় উপদেশাদি লইয়া যাইত।

অনেক সময় ক্রাউ ক্লিফ মোটরে করিয়া গ্রামের ভিতরে গিয়া আর্য্যাণ বালিকাদের তত্ত্বাবধান করিয়া আসিত।

কার্লটন হাউস টেরেসে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠান যে একটা প্রধান কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে দলপতিদের তাল ভাবে অবহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যত ক্ষুদ্র সংবাদই হউক না কেন বিবরণ হইতে যেন কিছু বাদ না পড়ে। মানবদের এবং মনিবদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে মেয়েদের আলোচনা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইত। সৈন্য ও নৌবহরের চলাচল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার, কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম ও যে সব সৈন্যদল তাহারা পরিচালনা করে

তাহাও অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। ভোজ সভায় টেবিলে বসিয়া সে বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিত। যে সব স্থানীয় সৈন্যদলে, নৌবহরে এবং বিমানে কাজ করিত, নূতন অস্ত্র-শস্ত্র, বিমান এবং জাহাজ সম্বন্ধে গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। মেয়েদের উৎসাহ দিয়া ভাল ইংরাজী শিখান হইত। যাহাতে তাহারা ঐসব খবর শুনিয়া বুঝিতে পারে এবং জানাইতে পারে। এটা তাদের জন্মভূমির প্রতি একটা কর্ত্তব্য।

স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্ত্রীরাও এ সম্বন্ধে আরও খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিত। ইংরাজ স্ত্রীরা মোটেই সন্দেহপরায়ণ নহে। জার্ম্মাণ মেয়েরা চালাকী করিয়া কথা বলিতে উৎসাহ দিলে অনেক জরুরী বিষয় জানিতে পারিত।

ইহার পরই দেশের সর্ব্বত্র অবস্থিত দলপতিদের নিকট হইতে স্রোতের মত জার্ম্মাণ দূতাবাসে রিপোর্ট আসিতে লাগিল।

ফ্রাউ ক্লিষ্ট লণ্ডনে তাহার গুপ্ত উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্বন্ধে আনন্দিত হইয়া জার্ম্মাণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

বাঙলার লোকসঙ্গীত

শ্রীজয়দেব রায়

সাহিত্যরস সঞ্জাত সঙ্গীতের মধ্যে মার্জিত সুসংস্কৃত ভাবধারাটেই প্রাধান্য এগুলির অধিকাংশেই নগর ও উপনগরে প্রচলিত আছে।

আর একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর সঙ্গীতধারা চিরকাল ঐ ধারার সঙ্গে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। এই ধারার গানে এমন একটি অনন্য-সাধারণ ভাব সঙ্গতি রহিয়াছে যে, এই জাতীয় সকল শ্রেণীর গানকেই একটি বিশেষ নামে পরিচারিত করা যায়।

বৃহত্তর বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষায় রচিত বহু প্রকার লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাবগত ও রসগত সাম্য সামঞ্জস্য আছে।

পল্লী সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য মূলতঃ পাঁচটি—(১) পল্লীসঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ন্যায় সুরই মুখ্য। পল্লীসঙ্গীতে সাহিত্যরস গৌণ। সুরবিহীন ভাবে শুধু কথার আবৃত্তি নিরর্থক এবং রসবেদন অসম্পূর্ণ। পোটো গান, ভাটের গান প্রভৃতি তো কবিতার আকারে রচিতও নয়।

(২)। আদিবাসীদের ভাষার যেমন কোন বর্ণমালা নাই, পল্লীসঙ্গীতেরও সেইরূপ কোন স্বরলিপি নাই, কঠিন বৈয়াকরণ শাসন নাই। স্বরলিপি অবশ্য এদেশের প্রাচীন সঙ্গীতেরও ছিল না, কিন্তু সেখানে ছিল ঘরোয়ানা, সুরচ্যুতির শাসনের জন্য প্রহরী শ্রোতার সতর্ক কর্ণ, সর্বোপরি কঠিন নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসন।

স্বরলিপি রচনার প্রথা না থাকায় পল্লীসঙ্গীতের সুরের অক্ষুণ্ণতা নাই; বিভিন্ন গায়ক একই গানকে নানা সুরে নানাভাবে পরিবেশন করিতে পারে। তাহার ফলে গানের সুরের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির অবকাশ রহিয়াছে।

(৩)। পল্লীসঙ্গীতের গীতিরীতি গায়কের কণ্ঠের উপরই সর্বতোভাবে নির্ভর করে। লোকসঙ্গীতের গানের গীতিরীতি সম্পূর্ণ আঞ্চলিক; সারি, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, চটকা প্রভৃতি এক একটি শ্রেণীর লোকসঙ্গীত এক একটি অঞ্চলের বিশিষ্ট গান। সেই অঞ্চলের সকল গায়কের কণ্ঠে ঐসঙ্গীত সকল গানই কতকটা একই গীতিরীতির অনুগামী হইয়া পড়ে।

(৪)। লোকসঙ্গীতের সকল গানই মিশ্র রাগরাগিণী সঞ্জাত। আপাত দৃষ্টিতে পল্লীগানের কোন নির্দিষ্ট রাগিণী নির্দেশ সম্ভব না হইলেও, প্রতিটি গানই ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের কোন-না-কোন রাগিণীকে আশ্রয় করিয়া রচিত।

বাঙলা দেশের লোকসঙ্গীতে প্রধানত ঝিঁঝিট, খাম্বাজ ও ভৈরবী ভঙ্গিমার সুরই রূপলাভ করিয়াছে।

তালের দিক দিয়াও লোকসঙ্গীতে বৈচিত্র্যের অভাব আছে, জটিল তাল গায়করা সাধারণত এড়াইয়াই চলে। দাদরা, খেমটা, বড় জোর ঠুংরী ও খয়রা তাল ছাড়া লোক-সঙ্গীতে অন্য কোন তাল শোনা যায় না। এক একটি আঞ্চলিক বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতের দ্বারা লোকসঙ্গীতের ছন্দ বা তাল নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৫)। লোকসঙ্গীতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে গায়কের অবাধ স্বাধীনতা আছে। সঙ্গীত রচয়িতার কথা ও সুরকে বজায় রাখিবার দায়িত্ব গায়কের নাই। পরিবেষ অনুযায়ী গায়কের নিজের কিংবা তাহার শ্রোতাদের মনোভাব অনুসারে গাইবার সময়ে যে কোন গানের যেচ্ছামত রকমফের করিবার অধিকার তাহার আছে।

কাজকর্ম ও বৃত্তির (action and vocation) সঙ্গে লোক সঙ্গীত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এক এক শ্রেণীর গানকে এক এক শ্রেণীর অভিনয়প্রবণতা বৈশিষ্ট্যদান করে।

মার্জিত নাগরিক কণ্ঠে সুসংস্কৃত লোক সঙ্গীতগুলি কতকটা বেমানান বলিয়া মনে হয়। বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি সুরে রচিত সত্য শিক্ষিত কবিদের কাব্যরসাশ্রিত গানগুলি তাই কোনদিন পল্লীসমাজে সমাদর পায় নাই।

এগুলিতে অশুদ্ধ উচ্চারণ, অমার্জিত ভাষা, বিচিত্র বাচন-

ভঙ্গী সব মিলিয়া একটি বিশিষ্ট আবেষ্টনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই শহরের কৃত্রিমতাপূর্ণ পরিবেশে গানগুলি কেমন যেন স্ফূর্তি লাভ করে না।

বাঙলার পল্লীসমাজে অবসর বিনোদনের নিত্য সঙ্গী এই সঙ্গীত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। এখানে বৈজ্ঞানিক বা পণ্ডিতী নীতি অনেকটা শিথিল, সেজন্যই হয়ত জনগণের হৃৎস্পন্দন এই সকল গানে সহজেই শোনা যায়।

নগরসৃষ্টি তো অল্পদিনের, তাহার পূর্বে পল্লীর এই সঙ্গীতই ছিল সারা দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়। বাঙলার সেই গ্রামগুলি আজ মাপরিকভাবে আবিষ্ট। তবু তাহার সেই পুরাতন অন্তঃসলিলা সুরধারা আজও আমাদের মনে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। দেহে মনে দুর্বল, ধন জ্ঞানে দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছে এই লোকসঙ্গীতই একমাত্র আনন্দের আশ্রয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"গ্রামসাহিত্যের মধ্যে কল্পনার স্থান অধিক থাক বা না থাক, সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দ তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। পল্লীচারণের চক্রবাক সঙ্গীতের মতো তাহা নিখুঁত সুরতালের অপেক্ষা রাখে না...সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে কল্পনা প্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।"

তাই একদিন শোনা একটি গানের একটি কলিই পল্লীর মাঠে ঘাটে বহুদিন ধরিয়া ধ্বনিত হয়। সারাগ্রামের স্ত্রী পুরুষ সবারই কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকে সেই গান।

বাঙলার ধর্ম জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই এই সঙ্গীত সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মপিপাসু নরনারীগণ দেব মন্দিরের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া ভক্তিভাবে সঙ্গীতের সহায়তায় গূঢ়দর্শনতত্ত্বের আভাসও লাভ করিত। কথকতার মাধ্যমে সাহিত্যরসতৃষ্ণাও চরিতার্থ করিত। এই ভাবেই বহিয়া আসিতেছে এই দেশের লোক সংস্কৃতি, বাঙলা দেশের সাহিত্যে গণমানসের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে এই সঙ্গীতেরই সহায়তায়। বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বৌদ্ধ গান ও দোহা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ছিল বৌদ্ধ সহজযান পন্থাদায়ের সাধনভজনের গান। এইগুলির ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদির বিচার করিয়া পণ্ডিতরা এগুলিকেও লোকসঙ্গীত বলিয়া অনুমান করেন। এই শ্রেণীর ঢারেঢোরে আকারে ইঙ্গিতে তত্ত্বকথা প্রচারের ধারা পরবর্তী যুগের রামপ্রসাদী গানের ও বাউল গানের মধ্য দিয়া বহিয়া আসিয়াছে।

তাহার পরবর্তী সাহিত্যের নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—কৃষ্ণ যমালি নামে এক শ্রেণীর ঝুমুর গানের পদ্ধতিতে রচিত। বড়ু চণ্ডীদাসের এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই বাঙলার যাত্রাগান এবং পালাগানের সূত্রপাত করিয়াছে।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি একদিন পল্লীর আসরে পল্লীসঙ্গীতের সুরেই উদ্গীত বা আবৃত্ত হইত।

লৌকিক সঙ্গীত ও সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে আতঙ্কের ভাব ছিল অন্যতম অনুপ্রেরণা। মানুষ যেখানে অসহায়, প্রকৃতির প্রসাদন ছাড়া সেখানে কোন গত্যন্তর নাই। এই ভীতিপ্রসূত দেবস্তুতি দেবমহিমা প্রচারকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে মঙ্গলগান। ব্যাঘ্র ও সর্পের উপদ্রব, বিধর্মীর অত্যাচার, মহামারীর উপদ্রব প্রভৃতি এক একটি স্বতন্ত্র মঙ্গল গানের পালা রচিত হইয়াছিল। অমঙ্গলের আশঙ্কা নিমূলিত করিবার জন্যই মঙ্গল গানের রচনা।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী গীতিকা তাঁহাদের সাধনার উপজীব্য। এই কীর্তনই ক্রমে বাঙালীর একান্ত আপনার ধন হইয়া উঠিল, সুরের কৌলীন্য রাগ আর হয়ত সম্ভব হইল না, কিন্তু ভক্ত, রসিক সুরশিল্পী কবিদের হাতে পড়িয়া তাহার একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব ভঙ্গিমা গড়িয়া উঠিল, এই জন সমাদৃত কীর্তনের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে অধিকার করিলেন সেই মহা-প্রেমিক বাঙালীর হিয়া অমিয়া মথিয়া যিনি কান্না ধারণ করিয়াছিলেন।

কীর্তনের অনুকরণে সারা দেশে আরও নানা সুরে নানা ভঙ্গীতে রচিত হইল টহলগান, গৌরগীতি, হরিনাম গান। হেমন্তের শেষে গ্রাম পথে শেষ রাতে চাষী গৃহবাসীকে প্রভাতের কাজে আহ্বান জানায় এই টহলদার। ভোর-রাত্রে ছিন্ন কম্বায় শুইয়া পল্লীর চাষীরা শুনে—

জানো তারা নগরবাসী নিশি অবসান রে।
দৌড়গরিব বলে, উঠরে কুতুহলে শীতল হবে
মন প্রাণ রে।
কত নিম্নে রাওরে চাষী সারো রাতের কোলে
মন জানে কি ভাব ভাবে শুকসারী বলেরে।

পৃথিবীর সাথে সঙ্গীত হইল রামপ্রসাদী গান। এই শ্রেণীর গুরু সংসারের তুচ্ছতা হইতে মনকে সাময়িক মুক্তি আনিয়া দেয়, আর আনিয়া দেয় পার্থিব জীবনের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ইঙ্গিত।

সহজিয়া সাধনা অনেকের মতে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এই ধারায় রচিত দেহতত্ত্ব এবং বাউলের গান অলিখিত পল্লী কবিতাও অতি সহজের মধ্যে থাকিয়া যায়। বাউলদের চেয়ে এই দেহতত্ত্বের গানে ইঙ্গিত ব্যঞ্জনা আরও গূঢ় গহন, যেমন—

কেউ জানেন একই ঘরে তিন দেওয়া হ'ল তার।
কোন ঘরেতে কন্যা ঘরে অন্যায়ে।
কেন এলে আরে ভাই, এলে ব্যাপার করিতে
সেওনারে সেওনা ভাই ফলার ঘরে নরিতে।

বাউল কবি রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে আজ সভ্য গোষ্ঠীতে স্থান পাইয়াছে, অপূর্ব কাব্য লক্ষ্যও লাভ করিয়াছে। নাথপন্থী, অবধূত মার্গীয় সহজিয়া সাধকদের উত্তরাধিকারী এই বাউলরা। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন প্রাচীন চর্যাপদের যুগের সিদ্ধাচার্যদের সঙ্গে বাউলদের যোগ সাধনার সামঞ্জস্য আছে। বজ্রযানী, সহজযানীদের অনেক সাধনাঙ্গের উল্লেখ বাউলদের গানেও আছে।

মানুষ সাংসারিক ঐশ্বর্যে নিমগ্ন, আধ্যাত্মিক সম্পদে নিঃস্ব, মহাকাল অগোচরে তাহার পরম ধনকে হরণ করিতেছে নিম্নের গানটির প্রতিপাদ্য—

মন ঘুমাইছ কিরে বেহুঁসে যায় তোর দিন,
ও তোর রঙমহলে চৌচালা ঘরে চোর দিচ্ছে সিঁদ।
ও তোর ঘরেতে সিধাইয়া চোরায় চতুর্ দিকে চায়;
ধন কড়ি থুইয়া চোরায় মানিক লইয়া যায়।

পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী গান সম্পূর্ণ লৌকিক প্রেমের গান, তাহার মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনা কিছু নাই।

বাঙলা দেশ হইতে বৌদ্ধ সংস্কৃতি কালে বিদায় গ্রহণ করিলে ভগবান বুদ্ধদেব এই দেশে ধর্মরাজে পরিণত হন। এখন সেই ধর্মপূজা শিবের গাজনে পর্যবসিত হইয়াছে। গাজন উপলক্ষে গীত সন্ন্যাসী গান একদিন উত্তরবঙ্গে রাজনৈতিক নবচেতনা জাগাইয়াছিল। এই গানটি তাহারই নিদর্শন—

কোম্পানীর ইংরাজেরা বড়ই চতুরা।
নবাবের ফৌজ দিয়া কেল্লা দিয়া মারা॥
(ও ইংরাজ বলব কি?)
কোম্পানীর শাসন ভারি ছাড়ে না কড়ি কানা।
কোম্পানীর রাজ্য জুড়্যা হ'ল অনটন।
সগ্‌সগ মনিষ্যি মর্যা যমের বাড়ি যান।
(ও ইংরাজ বলব কি?)

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES:
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES : . . . .
MILLS : HOWRAH-13 . . .
OFFICE : 22-6853-58

সত্যি...

মোপোল

সব চেয়ে ভাল

১/০ আনায় ১০টি. ১৷/০ আনায় ৫০টি

ACI MJ/68

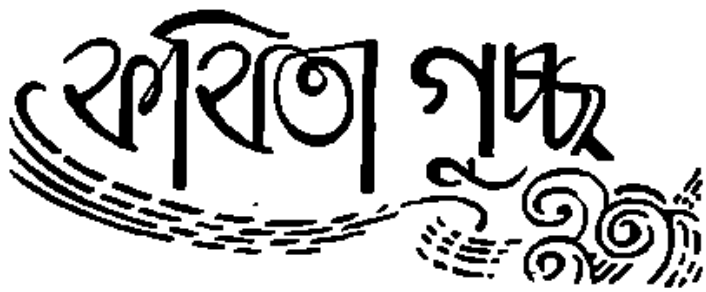

বেগবতী

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তে গেলে সেই নদী।
বেগবতী নাম, কিন্তু বর্ত্তমানে রিক্তবেগ ক্ষীণ ;
নির্জ্জন আলোয় নিরবধি
জংগলের বস্ত্র সেজে জপমালা গোনে নিশিদিন
নিশ্চিন্ত আলসে।

একদিন ওরই তীরে ব'সে
আগামী আলোর স্বপ্নে সিক্ত হ'ল দুটি ছেলেমেয়ে ;
একজন আলো আর অন্যজন আলোর বিভাস !
আজব পাখির ডাকে সন্ধ্যা এল মহাকাশ বেয়ে ;
পোড়ো মন্দিরের ইঁটে ক্লান্ত ইতিহাস
রহস্যের কথা ভুলে স্থির হ'ল।
ছেলেমেয়ে দুটি
কী দেখে কী জানি
নিশি-পাওয়া পথে পথে ছুটে গেল অমিয়-সন্ধানী !

সুপ্তিমগ্ন বসুমতী। আকাশেরও লেগেছে নিঝুটি।
অসহ্য মৌনের ভারে তারা
ছুটে গেল অন্ধকারে উন্মাদের মত দিশাহারা
এদিকে ওদিকে !
কখনও আশায় ক্ষুব্ধ হতাশায় কখনও উদ্দাম ;—
শেষরাতে অবসন্ন পেল বুঝি সেই আলোটিকে,
অভাবিত আনন্দের দাম
দিয়ে যেতে হ'ল শেষে ক্ষুদ্র দুটি দেহের ডালিতে,
ফুলের চেয়েও শুভ্র পূত উপহারে।

সেই থেকে বেগবতী প'ড়ে থাকে একা একধারে।
জলতী দেহের বার্ত্তা নিতে
ভ্রমবশে আসে শুধু মাঝে মাঝে বিদেশী পাখিরা,
ভ্রমশেষে তারা উড়ে যায়।
শুধু ওর নিত্যসঙ্গী পাগলটি আশায় আশায়
খুঁজে ফেরে নিশিদিন কোথায় হারালো সেই হীরা ?

নারী

শ্রীসিপ্রা ঘোষ

মনে পড়ে ম্লান-ছবি স্পর্শাতীত তবু কি সুন্দর—
এলায়িত কেশ-মাঝে স্নিগ্ধ-মুখ নয়নাভিরাম,
সুচারুলোচন অহি ! কম্পমান পুষ্পিত অধর ;
তোমার দেহের তটে সব প্রেম লভিছে বিরাম ॥

তোমার তনিমা ঘিরে ফাল্গুনের রঙিন আবেশ
তোমার ললাট পরে সবুজের শ্যাম-সমারোহ,
উতল-বিতল-মায়া ; কি অপূর্ব শুচি-শুভ্র-বেশ ;
পুষ্প বন্ধ্যা তৃণে শস্যে পরিপূর্ণ যৌবনের মোহ ॥

আষাঢ়ের স্নেহ নামে সে প্লাবনে জাগে কলধ্বনি কঠিন-ধরিত্রী-বক্ষে অয়ি নারী, জাগাও স্নিগ্ধতা
মর্মরিয়া বাঁশবন নেমে আসে শ্যামল-ছায়ায়, পুরুষের রুক্ষ-দেহে আনো তুমি পুষ্পোপম-প্রাণ,
সে অমৃত-বারি বুঝি ঢাল তুমি কল্যাণ-রূপিণী ; লীলাহীন-অঙ্গ' পরে নিয়ে এসো মধুর-দ্বিধতা ;
বহুদূরে প্রসারিত অন্তহীন জীবন-যাত্রায় ॥ জাগিয়া উঠুক তারা শুনি তব মিলন-আহ্বান ॥

জলধারে স্নিগ্ধ হয় ধরিত্রীর-মাটির-অঙ্গন তুমি কন্যা, তুমি প্রিয়া, তুমি বধূ—কল্যাণ-রূপিণী
স্পর্শে তব লুপ্ত হয় জীবলোকে তুচ্ছ মৃত্যু ভয়, হে আদি জননী নারী। তুমি অঙ্গ, তুমি সার্থকতা,
সঞ্জীবনী তনিমায় জেগে ওঠে প্রসুপ্ত জীবন; জীবনের সুখ-দুঃখে বীর-ভোগ্যা, তুমি-স্পর্শমণি ;
হে নারী নমতাময়ী। তুমি স্থির-নিস্তব্ধ-বিস্ময় ॥ —হে সুন্দরী—রাজকন্যা ; ধ্যানমগ্না তুমি মহাশ্বেতা ॥

প্রীতিভরা-হাসিমুখ : বিরুতা-সে কী অপরিমেয়
তোমার নয়নালোকে স্নেহাক্ত সে ঝরে অবিরাম,
তোমার যৌবন হতে পান্থ পায় চলার পাথেয় ;
পুরুষের প্রেম হয় তব পায়ে বিমুগ্ধ প্রণাম ॥

মানব-সাগর-তীরে নিয়ে মাথে শান্তি সুধা-ঘট
নাম তুমি : আনমনা—কি অপূর্ব কি প্রশান্ত-ছবি,
তোমার তরুণী-দেহ পুরুষের পুণ্য-তীর্থ তট ;
স্নেহময়ী-চিরন্তনী তুমি নারী—জননী পৃথিবী ॥

হে নিত্য-নবীনা-প্রিয়া ; তপস্বিনী অশ্রুমুখী সতী,
সীমন্তিনী বধূ তুমি : অয়ি দৃঢ়া, চির-আয়ুষ্মতী ॥

যুগল আঁখি

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

ঐ যে দুটি আঁখি
পরাণ-ভরা ঘুমের ঘোরে ভোর-পাখি যায় ডাকি।
সরম আমার সয়না সবুর, অবুঝ সবার মাঝে
বিস্ময়ে তাই অবাক হয়ে কেবল চেয়ে থাকি।

সারা আকাশ বুঝি
ঐ নিরালায় কুলায় পেল সকল খোঁজা খুঁজি।
হাতছানি দেয় নিরুদ্দেশে মায়াদীপের বাঁশী
মানে না মন কোনই মানা নেশায় সোজাসুজি।

শুনি কোথায় দূরে
ভৈরবীতে সানাই কাঁদে অন্তরের পুরে।
বাউল হাওয়া ফাগুন পাওয়া, ব্যথার বীথিছায়ে
গন্ধে উতল কস্তুরিকা, আগুন গোলাপ জুড়ে।

কে বুঝে তার ভাষা!
চিরকালের নীরবতায় মুখর ভালবাসা।
ঢেউয়ের ডাকে ডুব দিয়ে কেউ ফিরলো না তো আর
অথৈ কেনিল মধুর মরণ, এমনি সর্বনাশা।

ঐ যে দুটি চোখ
অকূলপানে আকুল টানের কি যে বিষম ঝোঁক।
চকিত এক চাউনিতে শোক অশোক হয়ে ফোটে
জ্বলিয়ে হৃদয় দেয় গলিয়ে···বাজে অশ্রুলোক।

জীবন-ছবি

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

হয়তো ভেবেছো তুমি—কেউ গেলে সেইটুকু ফাঁকা
কিছুতেই ভরবে না, মন, কাঁচা রঙ্ দিয়ে-আঁকা
জীবনের এ কাগজ বহুদামী, সাদা তার-ঢের!
কাঁচা রঙে আরো ছবি পাবে তুমি, ছবি পাবে ফের!

মানুষের হাতে আছে মোটমাট কতগুলি তুলি
তুমি তার কিবা জানো? সময়ের রুদ্র অংগুলি
বার বার মুছে দেবে সব ছবি, তবু তুলি তার
কাজটুকু করে যাবে আরো ছবি এঁকে বারবার।

আজ যাকে কাছে পেলে কাল তাকে লাগবে যে ভালো
তার কিছু মানে নেই। কত এলো আবার হারালো!
সময়ের ব্যবধানে দূরে দূরে আছে আরো ঘাঁটি:
আরো কেউ হেঁটে যাবে হাতে নিয়ে রঙ-তুলি-বাটি।

জীবনের এ কাগজ বহুদামী, সাদা তার ঢের!
কাঁচা রঙে আরো ছবি পাবে তুমি, পাবে ছবি ফের।

এক বিহংগ

হিমাংশু চৌধুরী

দেখলেম। যুগে যুগে তোমাকেই দেখলেম।
অলিন্দে, নির্জনে, দুরন্ত দুপুরে,
মৌসুমী, মরু-উট পেরিয়ে—
বর্তুল বৃত্তের একধারে আধুনিকা
একপাশে পুরাতনী চিনলেম।
দেখলেম।

দেখলেম-তোমাকেই দেখলেম।
দেহগত, দেহহীন—আরো দূর নির্জনে
দুরন্তা নীহারিকা,—আরো দূর অজনে—
হয়তো তারারো দূর,—কতদূ-র, কোনখানে
না চিনেও, তোমাকেই চিনলেম।
দেখলেম।

দূ-রে নয়। এত কাছে। কাছে নয়। মেশামেশি,
সত্তার কি গভীরে চিনলেম—নিজেকেই চিনলেম।
আমার দেহলী ঘিরে তোমার দেহের মায়া
কায়ায় ছড়িয়ে আছে জানলেম।
মনের নাগালে তুমি দেহের সীমায় আছো জানলেম।
মনের মায়ারীলোকে তুমি দূর, দেহাতীত চিনলেম।
দেখলেম।

তীর তরঙ্গ

পারুল ঘোষ

পাশাপাশি বসি এসো—সমুদ্র এখন শান্ত আছে,
অজস্র রূপালি ফুল ছড়িয়ে তরঙ্গ খেলা করে
অনেক অনেক দূরে—এইখানে তীর ভূমি পরে,
উজ্জ্বল বালির পরে ভিতির খঞ্জন যেথো নাচে।

বলো আজ সেই কথা, চিরদিন প্রকাশ যা যাচে,
নিভৃত বুকের সেই স্বপ্নকথা খুলে ধরো বারেকের তরে—
এই উন্মাদনা ভরা শরতের সুন্দর প্রহরে,
নীরব ছায়ার মতো সরে এসো, কাছে, আরো কাছে।

সমুদ্র উদ্দাম হবে—এ সৈকত হারাবে কোথায়,
লবণাক্ত মহাসিন্ধু পরিব্যাপ্ত হবে এইখানে,
এই ক্ষুদ্র কাঁটা শুদ্ধ, পাখীরা তলাবে একটানে—
তুমি-আমি তারো চিহ্ন ধুয়ে যাবে দিগন্ত সীমায়।
সময় বিহঙ্গ ওড়ে, বেলা আর বেশী বাকী নাই,
এখনো বলো সে-কথা, কখনো বুঝিনা যার মানে।

যাত্রা বা গীতাভিনয়

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

আজকাল যাত্রা বড় আর একটা চোখে পড়ে না। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো যাত্রার কিছু কিছু প্রচলন থাকলেও কলকাতা সহরে যাত্রা, পালা গান, ঝুমুর প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব সম্পদের আর দেখা মেলে না। আমাদের ছোটবেলায় কলকাতার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের আবাসে দোল-দুর্গোৎসব উপলক্ষে যাত্রা দেখবার সৌভাগ্য হ'য়েছে। পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে সুমধুর সংগীত, বলিষ্ঠ অভিনয়, ছুড়িদের উদাত্ত কণ্ঠে গান,—সত্যই সত্যই দর্শকদের মুগ্ধ করতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় ইংরেজদের অনুকরণে থিয়েটার আত্মপ্রকাশ করবার পর আমোদ-অনুষ্ঠানের গণ্ডীর বাইরে ধীরে ধীরে যাত্রাকে স'রে যেতে হ'ল। শুধু যাত্রা কেন, পাঁচালী, ঝুমুর, কবির লড়াই প্রভৃতিরও জনপ্রিয়তা ক'মে যেতে লাগলো। ক্রমে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাত্রাকে সহর থেকে একেবারেই বিদায় নিতে হ'ল। থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের যুগপৎ আক্রমণে স'রে যেতে হ'ল একেবারে গ্রামাঞ্চলে,—কিন্তু সেখানে গিয়েও নিস্তার নেই। সখের থিয়েটার ও সবাক চিত্রের উদ্যত বাহুর চাপে গ্রামাঞ্চলেও যাত্রার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে উঠলো।

[গীতিনাট্য]

যাত্রা ও অপেরা অর্থাৎ গীতিনাট্যের ভেতর মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। স্থূলভাবে যাত্রাকে আমরা যদি গীতিনাট্য বলি, তাহ'লে বোধ হয় ভুল হবেনা। দুইয়ের উপাদান প্রায় একই। গানের ও নৃত্যের প্রাচুর্য দুইয়েতেই বিদ্যমান। দুইয়েতেই সংলাপ কম। তবে কাহিনীর দিক দিয়ে দুইয়ের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ আছে বটে। যাত্রার কাহিনী পৌরাণিক, যদিও সে কাহিনীতে বীর রস, করুণ রস, সব রসই থাকতে পারে, কাহিনী হয় তো বিয়োগান্ত ঘটনার ভেতরও শেষ হ'তে পারে। কিন্তু গীতিনাট্যের কাহিনী অত্যন্ত লঘু, হাল্কা ধরণের। যবনিকা পতনও তার মিলনান্ত ঘটনার ভেতর দিয়ে। তাহলেও গান যেখানে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেখানে কাহিনীর চেয়ে গানের আসন শ্রেষ্ঠ এবং এইদিক দিয়েই যাত্রা ও গীতিনাট্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য নেই বললেই চলে।

যাত্রা বাংলার একান্ত নিজস্ব বস্তু। যাত্রায় দুই তিন বা তার চেয়ে বেশী পাত্র-পাত্রী গানের সাহায্যে নানা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা পৌরাণিক ঘটনাবিশেষ অভিনয় ক'রে থাকেন। সংলাপও থাকে তাতে কিছু কিছু। বীর রস ও করুণ রসের প্রাধান্যই যাত্রা-কাহিনীতে দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য মাঝে মাঝে যাত্রায় হাস্য-রসও যে না থাকে, এমন নয়। যাত্রাকে পালাগানও বললে বোধ হয় ভুল হবে না। পালাগানে মূল গায়ক ও তাঁর দোহারেরা নাটকীয় আলাপ-অংশ চালিয়ে যান। ঝুমুর ও পাঁচালীকে পালাগানের পর্যায়ে ফেলা যায়। ঝুমুর ও পাঁচালীর ভেতর তফাৎ এই, ঝুমুরে দুজন পাত্র-পাত্রীর দ্বৈত সংগীত ও নৃত্য থাকে। একজনের অধিক পাত্র-পাত্রী থাকলেও কোনো পদের বা গানের মধ্যে দুইজনের বেশী লোকের কথাবার্তা থাকেনা। পাঁচালীতে অভিনেতা একজন মাত্র। চামর দুলিয়ে সেই অভিনেতা বা গায়ক পাঁচালীতে গান গেয়ে থাকেন। কথকতাও এই শ্রেণীর। কথকতায়ও একজনই গায়ক, অভিনেতা—সব কিছুই।

[যাত্রার প্রকৃত অর্থ]

যাত্রার প্রকৃত অর্থ, দেবতার উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা। আবার দেবতার উৎসব উপলক্ষে নাট্যগীতিও বটে। প্রাচীনকালে বাংলাদেশে যাত্রার পালা-বাঁধার কোনো

বালাই ছিল না। অর্থাৎ কোনো বাঁধাপালা ছিল না। পাত্র-পাত্রীরা নিজে থেকেই, অর্থাৎ নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে গান ও সংলাপ চালাতেন। অনেক সময় হয়তো কয়েকটি শুধু গান বেঁধে দেওয়া হ'ত। পাত্র-পাত্রীরা নিজেরাই ঘটনাচ্ছলে সংলাপ মুখে মুখে তৈরি ক'রে নিতেন। বাঁধা পালার প্রচলন হয় পরে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত-চন্দ্রের 'চণ্ডী-নাটক' যাত্রাপালার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা চলে। ঐ সময়ে 'কৃষ্ণযাত্রা', 'চণ্ডীযাত্রা', 'চৈতন্যযাত্রা' প্রভৃতি নানা শ্রেণীর যাত্রাপালা আত্মপ্রকাশ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে কালীয়-দমন ও রাসযাত্রা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

তারপর বাংলা দেশে যে ধরনের যাত্রা প্রচলিত হয়, তাতে পাঁচালী, কীর্তন, ও থিয়েটার ধরনের সংলাপ, যুগোক্তি ইত্যাদি সব কিছুরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

যাত্রাকে গীতাভিনয় বলা হয়। যাত্রার পালা বাঁধা ও থিয়েটারের নাটক বাঁধার ভেতর প্রভেদ বহু ও ব্যাপক। থিয়েটারের প্রধান উপাদান,—দৃশ্যপট, সাজসজ্জার পরিবর্তন, আলোর বাহার ও ক্ষেত্র বিশেষে ঐক্যতান-বাদন। যাত্রায় এগুলির মূল্য বিশেষ কিছু নেই। যাত্রার মূল সম্পদ 'জুড়ি-দোহার'।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ মন্তব্য ক'রেছেন—"ধর কালিদাসের 'শকুন্তলা' আরম্ভ হ'ল—হরিণ শিকারে চলেছেন রাজা রথ চালিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভেতর দিয়ে। থিয়েটারওয়ালা এখানে ঠেকবে, এটা নিশ্চয়। গতিবেগ নেই রথের, হরিণের, কিছুরই; স্থির দৃশ্যপট, স্থির কাট-কাগজে-কাদায়-মাটিতে রথ ঘোড়া সবই—তার উপরে খাড়া সচলাচল রাজা ষ্টেজের উপরে, রাজার মৃগয়া-যাত্রার একটা বৈরূপ্য ঘটন ছাড়া কিছুই সম্ভব হয় না। কাজেই থিয়েটারের ষ্টেজে এ অংশ সুযোগ্য লোকে বাদ দিয়ে যান। যাত্রাওয়ালা এখানে নির্ভয়—সে গানের পর জুড়ির-গান বর্ণনা জুড়ে দর্শকের মনোরথ তেজে নিয়ে ফেলে আশ্রমের কাছে। গীতছন্দে স্পন্দন চল্লো, হরিণ দৌড়ালো নানা বর্ণের মধ্যে দিয়ে দৃশ্য-পরম্পরা ছাড়িয়ে, চ'লে গেল মন অতি সহজ উপায়ে যাত্রাতে,—বলে মনোরথ (স্বচ্ছন্দ গতি পেলে সুর, ছন্দের সাহায্যে)—এই ছিল যাত্রার বিশেষত্ব। থিয়েটারে যেটা ঘটানো অসম্ভব, সেটা সুসম্ভব হ'ল যাত্রার অধিকারীর কাছে। দিলে সে হাঁকিয়ে রথের জুড়ি ঘোড়া আসরের মধ্যে নির্ভয়ে—ধুলো লাগলো না দর্শকের গায়ে, বালি পড়লো না কারুর চোখে, ঘুমো দিলে না কেউ।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে একপ্রকার গীতিনাট্যে চলন হ'য়েছিল, যেটাকে নিছক্ যাত্রাও বলা চলে না, থিয়েটার বলাও চলে না। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে যে গীতাভিনয় হ'ত, তা সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-সম্বন্ধে ব'লেছেন—"উনবিংশ শতকের শেষের দিকে 'গীতাভিনয়' নামে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরনের এক প্রকার অভিনয় এদেশে দেখা দিয়াছিল। এই সকল অভিনয় পুরাদস্তর নাটকেরই মত; তফাতের মধ্যে অভিনয়ে দৃশ্যপটাদির বালাই ছিল না। নাটকাভিনয় এদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া সকলের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন সম্ভব ছিল না।"

পালাগান যাত্রাগানের পূর্বরূপ বলা যেতে পারে। এই পালাগানের সহিত পূর্বভারতে প্রচলিত এপ্রকার গীতিনাট্যের ধারার সংযোগে যাত্রার সৃষ্টি, অনেকে এ মতও প্রকাশ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর এইরূপ নাটক রচনার ধারা বঙ্গদেশ ও মিথিলা থেকে নেপালে প্রসারিত হয়।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রীজয়দেব কবি', প্রবন্ধে লিখেছেন—"এইসব নাটকে গদ্য অংশ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বা মৈথিলে এবং পদ্যশ্লোকের স্থানে মৈথিলী বা কোসলী (অথবা পুবী-হিন্দী)-তে পদ্য বা গান আছে। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কার্যকলাপ (প্রবেশ, নির্গমন, উপবেশন ইত্যাদি) পূর্ব-নেপালের প্রাচীন ভাষা, ভোট-ব্রহ্ম শাখার অনার্য মোঙ্গলীয় ভাষা নেওয়ারীতে লিপিবদ্ধ আছে।...রামানন্দ রায় কর্তৃক এই সংস্কৃতময় গীতগোবিন্দের অনুকরণে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে জগন্নাথ-বল্লভ নামে 'সংগীত-নাটক' রচিত হইয়াছিল। পদময় সংগীত-নাটক বা নাট্যকাব্যের ধারা বিচার করিলে গীতগোবিন্দকে ঐ পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।"

ষোড়শ-শতকেও যে বাংলাদেশে যাত্রার প্রচলন ছিল, তার প্রমাণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক গীতাভিনয়। শ্রীচৈতন্যদেব সপারিষদ ষোড়শ শতকের 'রুক্মিণীহরণ' নামে একখানি নাট্যগীতির অভিনয় করেন। তাতে শ্রীচৈতন্যদেব লক্ষ্মীর অংশ গ্রহণ করেছিলেন, রুক্মিণী সেজেছিলেন গদাধর, নিত্যানন্দ সেজেছিলেন বড়াইবুড়ি, শ্রীমান নারদের ও হরিদাস কোতোয়ালের অংশ গ্রহণ ক'রেছিলেন।

পূর্বেই বলেছি যাত্রাগানে হাস্য-রসের স্থান বিশেষ ছিল না। তবে একেবারে যে ছিল না, তাও বলা যায় না, কারণ প্রাচীন কালে কৃষ্ণযাত্রার হাস্য-রসের অবতারণার জন্য নারদমুনি ও তাঁর শিষ্য ব্যাসদেবের চরিত্র যাত্রা কাশীতে প্রবর্তন করা হয়। এবং পরে এরই অনুকরণে যাত্রাগানে নারদ চরিত্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ফলে উনবিংশ শতক থেকে যাত্রাগানে মাঝে মাঝে হাস্যরসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

[যাত্রার বৈশিষ্ট্য]

যাত্রার বিশেষত্ব এই, তার গতিবেগ অর্থাৎ ইংরাজিতে আমরা সকলে বলি 'টেম্পো'। যাত্রায় আছে প্রচণ্ড গতিবেগ। একটি পালা সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাত্রার অধিকারীর কোনো প্রকার শান্তি নেই। পূর্বে এক একখানি পালা চলতো তিন চার দিন ধ'রে। তবে প্রতিদিনে যে অংশটুকু অভিনীত হ'ত, সেটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ তিন চার দিনে এক একটি পালা শেষ ক'রলেও তার মধ্যে সংযোগ বা ইংরাজিতে আমরা যাকে বলি 'কন্টিনিউইটি', তা বিচ্ছিন্ন হ'ত না। এইখানেই পালাগান রচয়িতা ও যাত্রার অধিকারীর মুন্সিয়ানা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যাত্রা সম্পূর্ণ জনপ্রিয়তা হারায় নি। মুকুন্দ দাসের যাত্রার নাম শোনেন নি, এমন ব্যক্তি বিরল বললেও অত্যুক্তি হবে না।

[তবে এখনো বিভিন্ন অপেরা পার্টি আছেন যাঁরা প্রয়োজন হ'লে দৃশ্যপট সাজিয়ে একই পৌরাণিক কাহিনী —ষ্টেজে অভিনয় করতে পারেন, আবার প্রয়োজন ব'লে উন্মুক্ত জায়গায় বিনা দৃশ্যপটে পুরোপুরি সেই কাহিনী যাত্রার ঢং-এ অভিনয় করতে পারেন। এই সব দলই বর্তমানে যাত্রাগানের মুখ রক্ষা করছেন, কারণ এখনো গ্রামাঞ্চলে যখন যাত্রাগান হ'য়ে থাকে, তখন এই সব দলই সহর থেকে গিয়ে যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা এই সব দলই ক'রেছেন। 'ভদ্রার্জুন', 'দশভুজা', 'কংসবধ', 'সীতার বনবাস', 'অহল্যা', 'অভিমন্যু বধ', এই সব পৌরাণিক কাহিনীই যাত্রার বিষয়-বস্তু।

[যাত্রার নবরূপ]

ইংরেজি ধরনে অনুকরণ ক'রে আমাদের দেশে পরে যে থিয়েটার প্রচলন করা হয়, সেই থিয়েটারও যাত্রাকে একেবারে বাদ দিয়ে পারে নি। অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে একপ্রকার গীতিবহুল ছোট নাটক, অর্থাৎ গীতিনাট্যের যে ব্যবস্থা করা হয়, তা যাত্রারই সংশোধিত নূতন রূপ বলা যেতে পারে। এ-ধরণের নাটক প্রথম লেখেন বাংলার রঙ্গমঞ্চের জনক নটগুরু শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর রচিত, 'আলাদিন', 'স্বপ্নের ফুল', 'ম্যায়সা কা ত্যায়সা', 'মায়া তরু', গীতিনাট্য হিসেবে এককালে বিশেষ প্রশংসা অর্জন ক'রেছিল। তবে গিরিশচন্দ্রের 'আবুহোসেন' এই সব গীতিনাট্যের ভেতর সর্বোৎকৃষ্ট বলা যেতে পারে।

যদি রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা'-কে যাত্রাগানের বিশেষ পরিশোধিত নব উদ্ভাসিত রূপ বলি, তা হ'লেও বোধ হয় ভুল হবে না। গীতিনাট্যের বিশেষ রূপ প্রবর্তন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই বিশেষ রূপ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদের প্রখ্যাত গীতিনাট্য,—'আলিবাবা'-তে।

গীতিনাট্য যাত্রাগানের আর একটা রূপ ব'লে এ-সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করলাম,—আমার মনে হয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, যান্ত্রিক সভ্যতা ও আমাদের বৈদেশিক অনুকরণ প্রিয়তার প্রাবল্যে যাত্রা একদিন বিলুপ্ত হবেই,—আর সে-দিনেরও বেশী দেরী নেই। কিন্তু যাত্রার মৃত্যু নেই,—যাত্রাগান বেঁচে থাকবে গীতিনাট্যের ভেতর দিয়ে, কারণ গীতিনাট্য যাত্রাগানের সংশোধিত নূতন রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সোভিয়েট ও সোভিয়েট প্রভাব

(৩)

পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরী উভয়ই নূতন রাজনীতি সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। প্রথমে পোলাণ্ডের কথায় আসা যাউক। হিটলার একদিন পোলাণ্ডকে সায়েস্তা করিতে গিয়া গোটা বিশ্বের নজরে পড়িয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পোলাণ্ড হইতেই সুরু হইল। অর্থাৎ পোলাণ্ডকে আক্রমণ করিবার পর ব্রিটেন কাপড়-কাচিয়া যুদ্ধে লাগিয়া গেলেন। আজ কয়েকটি মাত্র বছর বাদেই আবার দেখা যাইতেছে যে, পোলাণ্ডের কারণে সোভিয়েট রাশিয়াকে নখদন্ত বিকাশ করিতে হইতেছে। ইহার কারণ যে রাজনৈতিক প্রভুত্ব হিটলারের কাম্য ছিল, সোভিয়েটেরও তাই ছিল। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কারণে কাল ও পাত্রের নির্বাচনের বিভিন্নতা লাভ করিয়াছে। সেই বিভিন্নতা কি, এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। হিটলার রাজনৈতিক স্বার্থ বৃদ্ধিতে আচ্ছন্ন ছিলেন, তাই পদানিত রাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্যস্ত ছিলেন। ষ্টালিন হিসাবে ভুল করেন নাই—ধীরে অতি ধীরে নিজ ও রুশজাতির প্রভাবের প্রাসাদ একটির পর একটি পাথর বসাইয়া গাঁথিয়াছেন। কিন্তু কিঞ্চিত মালমসলায় গোলমাল ছিল। গাঁথুনির প্রথম দিকে ঐ মসলাগুলিই বেশ জোরদার ছিল। কিন্তু ষ্টালিনের মৃত্যুর পর মসলা যেন শুকাইয়া গেল। আজ সবই তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ক্ষমতায় আসীন ষ্টালিন যাহা ছোট-ছোট জাতিগুলিকে শিখাইয়াছেন, তাহাই সেই জাতিগুলি ঘায় পড়িয়া বলিয়াছেন। যাহা একদিন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে স্বীকৃত হইয়াছিল তাহা আজ আত্মমর্যাদার প্রয়োজনে ভাঙ্গিতে হইয়াছে। সোভিয়েট যে প্রভাবের বীজ একটা জাতির বিপন্ন অবস্থায় বপন করিতে সাধসী হইয়াছিল সে জাতি বিপন্ন অবস্থা মুক্ত হইয়াই আত্মচিন্তা ও আত্ম-সমালোচনায় মগ্ন হইয়াছে। তাহারা সন্ধান হইয়া বুঝিতে পারিল রাজনৈতিক বন্ধুত্ব নির্মম শাসনের আকার ধারণ করিয়া জাতির আত্মমর্যাদা পিষিয়া মারিতেছে। গুণগত ভাবে ইহার সহিত হিটলারী প্রভুত্বের প্রভেদ নাই। বস্তুত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার যে কত মহৎ ও পবিত্র এই সব ঘটনাই তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। খৃষ্টধর্ম জগতে একদিন ধর্মের নামে এক বিপুল প্রভাবের রাজত্ব গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। জাতির আত্মমর্যাদাকে অবহেলা করিয়া পোপ একদিন সর্বাত্মক প্রভুর আসনে বসিতে চাহিয়া-ছিলেন। মানবের অন্তর্নিহিত মর্যাদাবোধ অস্ত্ররূপে সমাধান খুঁজিল। পোপকেও হার মানিতে হইল। আজ ষ্টালিনকেও হার মানিতে হইতেছে। ইতিহাসের এই গতি পরিবর্তন ষ্টালিন জীবীত অবস্থায় ঘটিলেই বিষয়টির যথাযথ বিচার সম্ভব হইত। আজ ষ্টালিন বাঁচিয়া থাকিলে কি নীতি গ্রহণ করিতেন সেইটাই ছিল লক্ষ্য করার বিষয়। কিন্তু এই জাতীয় আত্মমর্যাদার অধিকারের আন্দোলন ষ্টালিন স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহা হইলেও ইহা আজ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বহু পূর্বেই ষ্টালিন-প্রভাবে ঘুণ ধরিয়াছিল। মহাশয় ষ্টালিন তাহা আপন অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন, সম্ভবত শেষ জীবনে বুঝিয়াছিলেন রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রভাব কম্যুনিষ্ট বিশ্ব মানিয়া লইবে না। ইতিহাসের দ্বিচক্রযানে স্বাতন্ত্র্যের মেঘ বহু পূর্বেই দেখা দিয়াছিল। পশ্চিম দেশে ষ্টালিন টিটোকে দেখিয়াই সামলাইয়া লইতে পারিতেন। পূর্বদেশে মাও সে-তুং-এর নেতৃত্ব ষ্টালিনকে কি সান্ত্বনা দিয়াছিল তাহা বলা মুস্কিল। তবে হো-চি-মিন ও মাও-সে-তুং যে কম্যুনিজমের একটা নূতন গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা লইয়া আসিতেছেন তাহা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন।

এ কথাটা আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয়তাবোধ, সমাজ-ব্যবস্থা সবই একটা বিশেষ অবস্থায় প্রভাব হজম করিতে পারে। ইহার অধিক পরিমাণ কোন জাতিকে গলধঃকরণ করাইলে তাহা বদ-হজমে পরিণত হয়। এই কথাটা আমরা আমাদের ভারতীয় কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের যুক্তি তর্কদ্বারা বুঝাইতে সমর্থ হই নাই। তাহারা ভাবপ্রবণ যুবকদলকে অনভিজ্ঞ,

মার্কসের তর্কশাস্ত্রের ইন্‌জেকশন দিয়া এমন একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, তাহার ভয়াবহ ফল জাতিকে ভোগ করিতেই হইল। 'জনযুদ্ধ' গেল, আসিল 'তেলেঙ্গানা' বিভ্রাট। অশান্ত নেতৃত্বের ক্ষণস্থায়ী সিদ্ধান্ত বিদ্বেষ ও বিভেদের ধূম্রজাল সৃষ্টি করিল। ধনীগৃহের আদর্শবাদী যুবক, জাতীয় ঐতিহ্যের অবমাননাকারী নিঃস্ব মধ্যবিত্ত যুবক, আর অপমানিত, ক্ষুধার্ত শ্রমিক—সবাই মাতিয়া উঠিল। বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গৃহস্থের গৃহকোণ—কিছুই বাদ যায় নাই। সবই যেন 'তেলেঙ্গানা' আর 'জনযুদ্ধে' মাতিয়াছে। এই মত্ত অবস্থা ট্রাম-বাস পোড়াইয়া তবে শান্ত হইল। কেহ কেহ বুঝিলেন 'নানকিনের পথ' তাহাদের পথ নহে। সব রোগেরই এক দাওয়াই নহে! অবস্থা ভেদে, পরিবেশ ভেদে সমস্যার বিচার করিতে হয়। যে ধর্মকে, ধর্মপ্রভাবকে ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছিল—তাহাকে আজ পোলাণ্ডে আবার ডাকিয়া আনা হইতেছে। যে সব নেতৃত্ব বিদ্বেষ না ছড়াইতে অনুরোধ করিয়াছিল তাহাদের একদিন বিদ্রূপের বাণে জর্জরিত করা হইয়াছে। চিন্তাশীলেরা বার বার বলিয়াছেন, গ্রহের প্রভাব যদিবা সহ্য হয় উপগ্রহের প্রভাব অসহ্য। কিন্তু উপায় নাই। দেশের বেশির ভাগ যুবক মাতিয়াছে। যে রাজনীতিতে অন্যের বিরুদ্ধে বলিবার সুযোগ আছে—তাহাতে লোক পাওয়া যায় এত আমরা ঘরের রাজনীতিতে দেখিতেছি। বাহিরেও এইরূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে। আমরা ও আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা বাদে আর সব মন্দ। এইরূপ পাইকারী নিন্দা ও পাইকারী প্রশংসার বিপদ এই যে, ইহা সিন্ধাবাদ নাবিকের দৈত্যের মত সহসা বিকট আকার ধারণ করে। পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরীর ক্ষেত্রে দৈত্যটি বিকট আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাকে পুনরায় মার্কসীয়-বিদ্বেষ মতে কবলীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হইতেছে। ফলে প্রাণহানী, রক্তপাত, সম্পত্তি নষ্ট ইত্যাদি। যে ইউরোপ এই সেদিন একটা বিশ্বযুদ্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিল সে ট্যাঙ্কের দ্রুতগতি দেখিয়া ভয় পায় না বটে, কিন্তু আণবিক বোমার বিভিষীকা দেখিতেছে। মার্কিন এশিয়ার উপর আণবিক বোমার পরীক্ষা চালাইয়াছে তাহা এশিয়ার আকাশেই সীমাবদ্ধ থাকিবেনা, বিশ্বের বায়ুস্তরও সীমান্ত ঘাঁটি মানে না। মানবের রচিত শাসন প্রকৃতির পায় শিকল পরাইতে পারে না। অথচ ইউরোপীয় রাজনৈতিক নাটকের কুশীলবগণের দুর্দশা হইতেছে যে, তাহারা প্রেম, প্রীতি ও আত্মানুসন্ধানের পথে যাইতেছেন না। ফলে নিজের বিদ্বেষের আগুনে পুড়িতেছেন, অপরাপর ছোট জাতিগুলিকেও পুড়িয়া মারিতেছেন। ইহাই হইল পাশ্চাত্য জাতিবর্গের প্রভাব-যুদ্ধের মর্মান্তিক, ভয়াবহ ট্র্যাটেজি। এই ট্র্যাটেজি গঠিত হইতেছে জাতিবর্গের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিয়া, আবার ধ্বংস হইতেছে জাতিবর্গের স্বার্থ বলিয়া দিয়া। বস্তুত রক্তমোক্ষই ইহার অন্তিম পরিণতি—আজিকার প্রভাব-যুদ্ধে ইহাই পরিস্ফুট।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ভারতে বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প মিশন

কয়েকদিন পূর্বে নয়া দিল্লীতে বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প মিশন এসে পৌঁছেছেন। এগার জন বিশিষ্ট শিল্পপতি নিয়ে গঠিত এই মিশনের নেতৃত্ব করছেন স্যার এরিক কোট্‌স। ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে ইংলণ্ডের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ ও অভিজ্ঞতার সুযোগ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেইজন্যই এই মিশনের আগমন। বৃটিশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত এই মিশনে শিল্প সমূহের ফেডারেশন ও কলম্বো পরিকল্পনার সহযোগিতা গ্রহণ করা করা হয়েছে। এই মিশন প্রায় এক মাস ভারতে অবস্থান করে অনুসন্ধান কার্য সমাপ্ত করবার পর ভারত সরকারের নিকট তাদের রিপোর্ট পেশ করবেন। এ সম্পর্কে প্রাথমিক কাজগুলো হাতে নেবার জন্য গত মাসে একটি অগ্রিম দল ভারতে সফর করে গেছেন।

স্যার এরিক কোট্‌স ভারতে নতুন মানুষ ন'ন। পঁচিশ বছর তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকুরী করেছেন এবং পঞ্চদশ জেনারেলের কার্যকরী পরিষদের অর্থ-সচিবের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাছাড়া গত বছর যে বৃটিশ দল ভারতে এসে দুর্গাপুরে একটি নূতন ষ্টীলের কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দেন, স্যার এরিক কোট্‌স সেই দলের নেতৃত্ব করেন। সুতরাং ঐ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প দলের নেতৃত্ব করবার জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিই নির্বাচিত হয়েছেন এবং আশা করা যায় যে এই মিশনের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করবে। স্যার এরিকের নিজের কথায়, "অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু এমন পরিপ্রেক্ষিত ও ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব যা ভারতের অবশ্য প্রয়োজনীয় শুরু শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করতে পারে।"

এই মিশনকে সাহায্য করবার জন্য বৃটিশ শিল্পসমূহের ফেডারেশন একটি বিশেষ পুস্তিকা প্রকাশিত করেছেন। এই পুস্তকটির নাম "ভারত-বৃটিশ শিল্পীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুসন্ধান কার্য", এই পুস্তিকার লেখক ভারতের শিল্পীয় জাগরণে বৃটেনের স্বার্থের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতের শিল্পীয় জাগরণ হলে, দেশের লোকের আয় বেড়ে যাবে এবং তাতে বৃটিশ পণ্য দ্রব্যের রপ্তানী বেড়ে যাবে। অবশ্য ব্যবহারিক শিল্পের রপ্তানী খুব শীঘ্র বাড়বে বলে মনে করা যায় না। কারণ কতকগুলি ব্যবহারিক দ্রব্য এখনই ভারতবর্ষে উৎপন্ন হচ্ছে এবং বনিয়াদি শিল্প দ্রব্যের আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান রাখবার জন্য ভারত সরকার আমদানী নিয়ন্ত্রণের কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তা হলেও যতদিনে ভারতের জীবন যাত্রার সাধারণ মান আরও উন্নীত না হচ্ছে ততদিনে বৃটিশ ব্যবহারিক দ্রব্যসমূহের ভারতীয় বাজারে চাহিদা থাকবেই। বনিয়াদি পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে সম্ভাবনা বর্তমানে নিশ্চয়ই ভাল। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ভারত বিদেশ থেকে ১০০ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং মূল্যের বিভিন্ন কল-কব্জা আমদানী করবে। কাজেই বৃটিশ বনিয়াদি শিল্পের উৎসাহিত হবার কারণ আছে। ঐ পুস্তিকায় আরও বলা হয়েছে যে আজ বৃটেন যে সব জিনিষ উৎপন্ন করছে অতি

নিকট ভবিষ্যতে ভারতও সে সব উৎপন্ন করবে। তা ছাড়া ভারত-সে সকল জিনিষ পৃথিবীর বাজারে রপ্তানীও করবে। এসব বিষয় বৃটিশ শিল্পপতিদের লক্ষ্য করবার জিনিষ। কিছু কিছু বৃটিশ শিল্পপতিগণ ইতিমধ্যেই ভারতে তাঁদের পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। পাছে তাঁদের ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। সব দিক বিচার করে দেখা যায় যে এই ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পমিশনের অনুসন্ধান কার্য কেবলমাত্র ভারতই নয়, বৃটেনের পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব-ব্যাঙ্ক হইতে ভারতীয় রেলপথে মূলধন নিয়োগের প্রশ্ন

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নয়নের জন্য ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও ২২৫ কোটি টাকা ক্ষয়-ক্ষতি খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট ১১২৫ কোটি টাকার মধ্যে ৪২৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে ব্যয় করা প্রয়োজন হবে। রেলপথের উন্নয়নের জন্য কিছুদিন থেকে বিশ্ব-ব্যাংকের সভাপতি মিঃ ইউজেন ব্ল্যাকের সঙ্গে ভারতের বর্তমান অর্থমন্ত্রী শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারীর পত্রালাপ চলেছে। মিঃ ব্ল্যাক তাঁর এক চিঠিতে বলেছেন যে রেলপথে নূতন মূলধনের অভাব হেতু সর্বপ্রথমে রেলপথের কাজের মান উন্নয়ন এবং রাস্তার পরিবহন ও উপকূল ভাগের নৌ-বাণিজ্যের উন্নয়ন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেছেন যে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ সরবরাহ করতে প্রস্তুত যে-কোন ব্যাংকের পক্ষেই পরিবহনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ১৯৫০ সাল থেকেই উপকূল ভাগের নৌ-বাণিজ্য ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় জাহাজের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা যায় যে উপকূলীয় নৌ-বাণিজ্যে পরিবহন ক্ষমতার অত্যন্ত অভাব বিদ্যমান। আরও প্রায় ৩০ খানি জাহাজের প্রয়োজন রয়েছে এবং এই অভাব কয়লা ব্যবসায়ীরা বিশেষ ভাবে অনুভব করছেন। উপকূল ভাগের নৌ-বাণিজ্য অলাভজনক বলে নাকি এই অবস্থা। এ অবস্থার উন্নয়ন করতে হলে নৌ-বাণিজ্য ও রেলপথের ভাড়ার মধ্যে একটা সংযোগ রক্ষা করা দরকার, আরও লক্ষ্য করা হয়েছে যে বর্তমানে রেলের যে ভাড়া আছে তা বাস্তবতা-বর্জিত এবং অলাভজনক। সুতরাং এর ভাড়া বাড়ানো দরকার। সঙ্গে সঙ্গে এই ভাড়ার একটা অংশ উপকূলীয় নৌ-বাণিজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখবার জন্যও বলা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে উপকূলীয় নৌ-বাণিজ্যকে সংরক্ষণ করবার জন্য রেলপথের ভাড়া বাড়ানো যুক্তিসঙ্গত কিনা। রেলপথ যদি কম ভাড়া আদায় কোরেও নিজের বাজেট ঠিক রাখতে পারে, তা হলে ভাড়া বৃদ্ধি করা উচিত হবে কিনা এ প্রশ্ন জাগে। কারণ এর ফলে সামগ্রিক দিক থেকে অধিকাংশ লোকেরই সুবিধার থেকে অসুবিধা হবে বেশী।

আর রাস্তার পরিবহন সম্পর্কেও সম্ভাবনা আপাততঃ খুব বেশী নয়। কারণ সরকার দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কাল পর্যন্ত রাস্তার পরিবহন রাষ্ট্রায়ত্ত করবেন না বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ভারতের রাস্তাঘাট এখন পর্যন্ত বিশেষ উন্নত নয়। রাস্তা ও পুলের সংস্কার ও উন্নয়ন না হলে ভারী মালবাহী শকটের পক্ষে চলাচল সম্ভব নয়। সুতরাং রেলপথের উন্নয়ন ভিন্ন ভারতের মাল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের সম্ভাবনা নাই। এসব কথা চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাঁর প্রতিনিধি শ্রী বি, কে, নেহরুর সঙ্গে ভারতের রেলপথের উন্নয়নের পরিকল্পনায় অর্থ সাহায্য করবার জন্য মিঃ ব্ল্যাককে অনুরোধ জানিয়ে বিচক্ষণতার কাজই করেছেন।

কোম্পানী সেক্রেটারী ও একাউন্টান্ট বৃত্তি

কোম্পানী বিল নিয়ে আলোচনা কালে কেউ কেউ প্রত্যেক পাব্‌লিক ও প্রাইভেট কোম্পানীতে সেক্রেটারী নিয়োগ করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তখন মন্তব্য করা হয়েছিল যে কোম্পানী সেক্রেটারীদের একটি বৃত্তি গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এরকমের কোন বিধি যুক্তিসঙ্গত হবে না। বর্তমানে ভারতে সেক্রেটারীদের কাজ করবার জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এর মধ্যে দুটি বিলেতী প্রতিষ্ঠানের শাখা এবং অপরটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এগুলো দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলে

বিবেচিত হওয়ায় ভারত সরকার নীতিগতভাবে পার্লামেন্টের আইন বলে কোম্পানী সেক্রেটারীদের একটি বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছেন। আইন বিধিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কোম্পানী সেক্রেটারীদের জন্য নূতন ইন্ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবেন বলে ঠিক করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি কলকাতাতে স্থাপিত হবে। ভারতে কষ্ট এণ্ড ওয়ার্কস একাউন্টান্টদেরও একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এর বর্তমানে ৩০৩ জন সাধারণ সভ্য এবং ২৬৭ জন ছাত্র সভ্য আছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে দু'বার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির কার্যকরী পরিষৎ প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখবার প্রস্তাব দিয়েছেন এবং সরকার এ প্রস্তাব বিবেচনা করছেন। আশা করা যায় সরকার প্রতিষ্ঠানটির কার্যভার গ্রহণ করবেন এবং একে আইনগত স্বীকৃতি দেবেন।

উত্তর ভারতের চায়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতা চা নিয়ন্ত্রণ সমিতি উত্তর ভারতের চায়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা ঘোষণা করেছেন। কলকাতা এবং পৃথিবীর অন্যান্য বাজারে চায়ের সরবরাহ বর্তমানে খুব বেড়ে যাওয়ায় চলতি মরশুমের অধিকাংশ সময়ে অনেকগুলি চা বাগানকে উৎপাদন খরচেরও কম মূল্যে চা বিক্রী করতে হয়েছে। এজন্য উত্তর ভারতের চা উৎপাদনকারী সমিতিগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই সমিতি সভ্য-চা-বাগান গুলোর কাছে কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

(১) আসাম উপত্যকার ও দুয়ারের সমস্ত বাগানগুলো ২০শে নভেম্বর থেকে চা পাতা তোলা বন্ধ করে দেবে।

(২) কাছার, ত্রিপুরা, দার্জিলিং ও তেরাই অঞ্চলের যে-সব বাগান ১৯৩৩, ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালের গড় উৎপাদনের সমান চা উৎপন্ন করেছে সেগুলিও ২০শে নভেম্বর থেকে চা তোলা বন্ধ করে দেবে। আর যে সব বাগান এখনও ঐ পরিমাণ উৎপন্ন করতে পারেনি, সেগুলি ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে চা তোলা বন্ধ করে দেবে।

(৩) সমস্ত বাজে চা যা কলকাতা নিলামের বাজারে বিক্রী হবার অযোগ্য সেগুলো নষ্ট করে ফেলতে হবে।

আশা করা যায় যে এই সব ব্যবস্থার দ্বারা বর্তমানে বাজারে যে অতিরিক্ত সাধারণ চা আছে তা হ্রাস পাবে এবং উত্তম, মধ্যম ও সাধারণ চায়ের মধ্যে একটা স্থিতি অবস্থা ফিরে আসবে। মরশুম শীঘ্র শেষ হলে বাগানেরও কিছু উপকার হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ পুনরায় চাষের এবং কলকব্জা ও কারখানার বাড়ীঘর সংস্কারের জন্য বেশী সময় পাওয়া যাবে। শ্রমিকদের বসবাসের ঘরগুলিরও সংস্কার হওয়া সম্ভব। একটা আশঙ্কা আছে যে শ্রমিকদের আয় হয়ত কিছু কমে যাবে। তাদের মূল বেতন অবশ্য কাটা যাবে না, কিন্তু মোট আয় অনেক কমে যাবে।

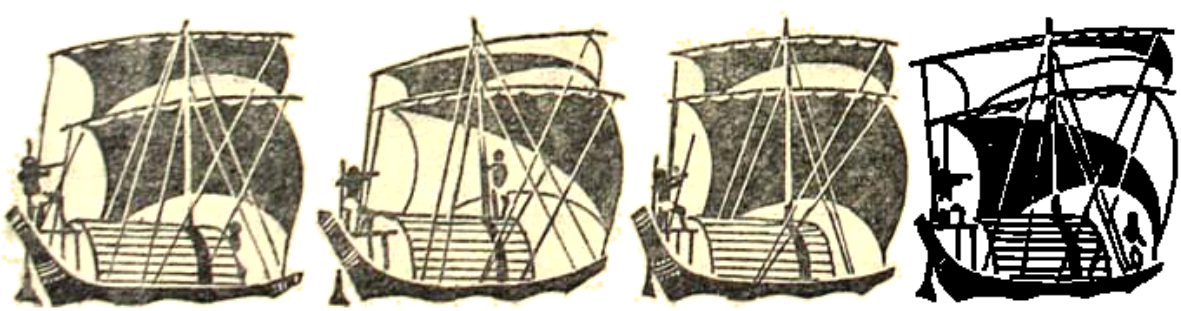

ভারতের নূতন মানচিত্র

ইংরেজ নিজের সুবিধা অনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সৃষ্টি করেছিল। যখন যে অঞ্চল ইংরেজগণ জয় করে তখন সেই অঞ্চল নিয়ে একটা প্রদেশ গঠন করা হত। এভাবে তারা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে একটা অসামঞ্জস্য এনে দেয়। সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বাইর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, ভারতের পূর্ব উপকূল থেকে শুরু করে দক্ষিণ উপকূল ঘুরিয়ে পশ্চিম উপকূলেরও কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে মাদ্রাজ প্রদেশের সৃষ্টি এবং হিন্দী ও মারাঠী ভাষাভাষী দুটী অঞ্চল নিয়ে মধ্যপ্রদেশ গঠন করার পেছনে ইংরেজের শাসন সুবিধা ও দেশ জয়ের কালানুগমন ছাড়া আর কোন যুক্তি ছিল না। এছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজদের করুণার্থী প্রায় ৬০০ দেশীয় রাজ্য ছিল—এদের অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে কোনও যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বলা যায় কিছুটা প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য হিসাবে এদের সীমানা নির্দেশ করা হ'য়েছিল।

দেশ বিভাগের সঙ্গে এদের-ও সীমানার সামঞ্জস্য লোপ পায়, ঐ দুটি প্রদেশই খণ্ডিত হল। এছাড়া দেশবিভাগের সময় ইংরেজ ৫০০ দেশীয় রাজ্যকে সার্বভৌম ক্ষমতা দিয়ে যায়—এতেও নূতন করে এক সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালে সারা ভারত বহু প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত অবস্থায় কংগ্রেস সরকারের হাতে আসে। সর্দার প্যাটেলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতায় দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অংশ বিশেষে পরিণত হয় এবং জাতীয় একতার (national solidarity) পথে একধাপ এগিয়ে আসে। কিন্তু তখন-ও 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিন শ্রেণীতে প্রদেশ-সমূহ বিভক্ত ছিল।

স্বাধীনতাসংগ্রামের সময় থেকেই কংগ্রেস ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সমর্থক ছিল এবং স্বাধীনতালাভের পর-রাষ্ট্র শাসনভার হাতে পেয়ে কংগ্রেস সে আদর্শ ভুলে যায়নি। ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করা কংগ্রেস সরকারের অভিপ্রায় ছিল। তবে একথা সব সময়ই মনে রাখা দরকার যে, ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনেরও অন্যান্য দিক আছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক দিক বাদ দিয়ে শুধু ভাষার প্রাধান্য মেনে রাজ্য-পুনর্বিন্যাস সুবিবেচনার কাজ নয়। সংবিধান রচনার সময় দু'টী কমিটী এই প্রশ্নের বিচার করে। 'গণপরিষদ' স্থাপন করে 'ধর'-কমিটি এবং নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করে আর একটি কমিটি—তার নাম হ'ল I. V. P. শ্রীজহরলাল নেহেরু, শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল ও শ্রীপট্টভি সীতারামিয়া এর সদস্য ছিলেন। এই দুই কমিটি অভিমত দেয় কেবল ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করায় বিপদ আছে অনেক—হয়ত মিলনের চেয়ে তাতে বিভেদই বাড়িয়ে তুলবে।

তাই রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন নিয়োগের সময় ভাষার ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে শাসনকার্য, অর্থনীতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যও কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কমিশনের কাজ চলার সময় এবং সুপারিশ বের হবার পর বিরোধী দলগুলি নানাভাবে জনগণকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেছে এবং একমাত্র ভাষার ভিত্তিতেই রাজ্যগঠনের জন্য আন্দোলন করেছে। নানাস্থানে গোলমাল দেখে কংগ্রেসেরও কিছু কিছু সমর্থক মনে করেছে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য পুনর্গঠন কাজে হাত না দিলেই ভাল হ'ত।

এরূপ বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও কংগ্রেস সরকার রাজ্য

পুনর্গঠন কাজ সম্পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর ছিল এবং তারা নভেম্বর থেকে ভারতের মানচিত্র নতরূপ ধারণ করেছে। এতে কংগ্রেস সরকারের দৃঢ় ও সংযত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সরকারের এ সৎসাহস ও কর্মদক্ষতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

রাজ্যপুনর্গঠনের কাজে সরকার জনগণের সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর মোটামোটি নির্ভর করেছে এবং কখনও সুস্থ জনমত উপেক্ষা করেনি। বোম্বাই সহর বোম্বাই রাজ্যে রেখে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মিলন প্রস্তাব বাতিল করে এবং পাঞ্জাবে দ্বিভাষী রাজ্য সৃষ্টি করে সরকার ও জনমতের সঙ্গে মিল রেখেছে। তাই আজ একমাত্র গুজরাট ছাড়া সমস্ত ভারতেই সন্তোষের আভাস পাওয়া যায় এবং আশা করা যায় গুজরাটও শীঘ্রই সরকারী ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হবে।

নতুন ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ তুলে দিয়ে সব একপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। সর্বমোট ১৪টী রাজ্য ও ৭টী কেন্দ্রশাসিত এলাকা এই ২১টী অংশে ভারতকে বিভক্ত করা হয়েছে এবং রাজপ্রমুখ পদ বিলোপ করা হয়েছে। এতে শাসনকার্যের সুবিধা হবে এবং অপচয় কমবে। সরকারের একাজ কতটা প্রশংসনীয় ও সুবিবেচনাপ্রসূত তা বলতে গিয়ে স্বভাবতই বিখ্যাত বৃটিশ পত্রিকা "দি ইকনমিষ্ট" The Economist এ প্রসঙ্গে যে সমালোচনা করেছে তা মনে হয়। পত্রিকাটির মতে রাজ্যপুনর্গঠন—

"...is a triumph both for the Indian love of compromise and for the government's responsiveness to the wishes of its people"

অর্থাৎ রাজ্যপুনর্গঠন ভারতের আপোষ-মনোভাব ও সরকারের জনমতের প্রতি শ্রদ্ধার জয় সূচনা করেছে। "ইকনমিষ্ট" মনে করে এরজন্য "Mr. Nehru and the Congress Party ought to reap a big political reward" অর্থাৎ শ্রীনেহেরু এবং কংগ্রেস এর জন্য পুরস্কৃত হওয়া উচিত।

আজকের জনসন্তোষ ভবিষ্যৎ উন্নত ভারতের প্রতি ইঙ্গিত করে। নানা বাধাবিপত্তির পর সরকার রাজ্য-পুনর্গঠন করে গণমনের একটি বহুবাঞ্ছিত ব্যাপারকে বাস্তবে পরিণত করেছে। "ইকনমিষ্টের" মতে "However bitterly people have felt, they have never forgotten that they are Indians first, and Gujratis, Sikhs and Bengalis only second." জনগণের এ একতাবোধও ধন্যবাদার্হ। বাসস্থানের প্রশ্ন না তুলে আমরা সকলেই ভারতীয় এই-ই আমাদের সত্যিকার পরিচয়।

ভারতের পুনর্গঠিত প্রদেশ সমূহের নাম, আয়তন ও লোক সংখ্যার তালিকা নীচে দেওয়া হল। পাঠকগণ দেখতে পাবেন পশ্চিম বাংলার আয়তন ৩০০০০ বর্গ মাইল হতে ৩০২৮০ বর্গমাইল হয়েছে।

রাজ্য	আয়তন (বর্গমাইল)	জন সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)
অন্ধ্র—	১১০,২৪০	৩২২
আসাম—	৮৪,৯২৪	৯০
বিহার—	৬৭,৮৩০	৩৮৯
বোম্বাই—	১৮৮,২৪০	৪৭৮
কেরল—	১৪,৯৮০	১৩৬
মধ্যপ্রদেশ—	১৭১,২০০	২৬১
মাদ্রাজ—	৫০,১৭০	৩০০
মহীশূর—	৭২,৭৩০	১৯০
উড়িষ্যা—	৬০,১৪০	১৪৬
পাঞ্জাব—	৪৬,৬১৬	১৬০
রাজস্থান—	১৩২,৩০০	১৬০
উত্তর প্রদেশ—	১১৩,৪১০	৬৩২
পশ্চিম বঙ্গ—	৩০,২৭৯	২৬২
জম্মু ও কাশ্মীর—	৯২,৭৮০	৪৪
কেন্দ্র শাসিত এলাকা—		
দিল্লী—	৫৭৮	১৭.৪
হিমাচল প্রদেশ—	১০,৪১১	৯.৮
মনিপুর—	৮,৬৪৮	৫.৮
ত্রিপুরা—	৪,০৩২	৬.৪
লাক্ষাদ্বীপ ও আমিন ডি ডি	১,৯০০	০.২
আন্দামান-নিকোবর—	৩,২১৫	০.৩

বাংলায় বন্যার ধ্বংসলীলা

আশ্বিনমাসের প্রথমদিকে এবার বাংলায় একটা অস্বাভাবিক রকমের বন্যা হয়। উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা বাদ দিয়ে আর প্রায় সব জেলাতেই এ বন্যায় অল্পবিস্তর কিছু ক্ষতি করেছে। তার মধ্যে হুগলী, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতি হয়েছে। মোটামুটি হিসাবে জানা গিয়াছে মোট ৩৮,০০০ গ্রামের মধ্যে ১০ হাজার গ্রাম বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রায় ২ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ ১০ লক্ষ লোক আশ্রয়হীন হয়েছে; বন্যায় তাদের ঘর-বাড়ি ভেসে গিয়েছে। কয়েকদিন পর্যন্ত কয়েকটা জেলার প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ড জলমগ্ন ছিল। কোথাও কোথাও রেলের উপরেও জল উঠেছিল। হয়তো ২৫।৩০ লক্ষেরও বেশী লোক আশ্রয়চ্যুত ও বৃত্তিচ্যুত হয়েছিল। ২।৩ সপ্তাহ পর্যন্ত তারা নিজ বাসস্থলে ফিরে যেতে পারেনি। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের লোক যারা ছোট-খাটো ইণ্ডাষ্ট্রী বা উদ্যোগ থেকে জীবিকা অর্জন করতো তাদের অনেকের যন্ত্রপাতিও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বহু তাঁত জলের নীচে অনেকদিন পড়েছিল। মাস দুয়েক পূর্বে আর একবার বর্ষা হয়ে তরীতরকারী ও অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। এ বন্যাতেও ফসল কিছুটা নষ্ট-হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয় ধানের খুব বেশী ক্ষতি হয়নি। কিন্তু অনেক কাটা পাটও বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে।

বাংলার আর্থিক অবস্থা এমনিতেই খারাপ। তারপর বন্যায় এতখানি ক্ষতিতে জনসাধারণের দুঃখকষ্ট অনেক বেড়েছে। সরকারের আর্থিক লোকসানও অনেক হয়েছে। এ বন্যার অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করে। এতবড় একটা ব্যাপক ধ্বংসের মুখে সরকারী বা বেসরকারী কোন সাহায্যদানই পর্যাপ্ত হতে পারে না; কিন্তু তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে এ বন্যার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে তৎপরতার সঙ্গে বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামে গ্রামে সাহায্য বিতরণ করেছে তার তুলনা বিরল। সরকারী কর্মচারীগণ দিনরাত পরিশ্রম করেছে, এমন কি পূজার ছুটিতে পর্যন্ত তারা রিলিফের কাজ করেছে। বন্যার্ত গ্রামবাসীদের আচরণও বেশ প্রশংসনীয় ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী ডোলের আশায় ক্যাম্পে পড়ে থাকার চেয়ে তারা তাড়াতাড়ি নিজ নিজ বাসস্থলে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজ নিজ কৃষি বা অন্য ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবে এবং বন্যাবিধ্বস্ত ঘরবাড়ী মেরামত করবে—এ আগ্রহ তাদের মধ্যে বেশ তীব্র ছিল।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দেশের ছিল পুলিশ সরকার;—অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোনমতে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এমনি কোন নৈসর্গিক দুর্বিপাকে কংগ্রেস, রামকৃষ্ণমিশন ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও সেবামূলক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সাহায্যে অগ্রসর হত, কিন্তু আজ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে এ কাজ মূলতঃ রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। পূর্বে বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে যে সাহায্য দেওয়া হ'ত তা অনেকটা প্রতীক স্বরূপ (symbolic); বিশেষ সাহায্য দেওয়া সম্ভব হত না। এবার কার বন্যায় ১২ কোটি টাকার মত বা হয়ত তার চেয়েও বেশী রিলিফের জন্য ব্যয় হবে—রাষ্ট্র ভিন্ন আর কারুরপক্ষে এত বড় দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়। কাজেই এবার রিলিফের কাজ প্রধানতঃ বাংলা সরকারই করেছে। কোন রাজনৈতিকদল বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নিজেদের অর্থ সামর্থ্যে সেবার কাজ করলে সরকার থেকে কোন বাধা দেওয়া হয়নি; বরং রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব সে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের ব্যাপক সংগঠন দেশের সর্বত্র আছে যা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নেই। অন্যান্য রাজনৈতিকদলের চেয়ে কংগ্রেসের অর্থবল ও জনবল বেশী; তাই কংগ্রেস কিছু সেবাকার্য অনেক স্থানেই করেছে এবং সরকারের রিলিফের কাজে যথাসম্ভব সহযোগিতা করেছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল সেবাকার্যে স্বভাবতঃই তৎপর হতে পারেনি। তাই তাদের মনে একটা আশংকা জাগাও স্বাভাবিক ছিল যে জনমন তাদের প্রতি অনেকটা বিমুখ হবে। এ মনোভাব থেকে অনেক জায়গায় তারা এমন সব কাজ করেছে যাকে বলা চলে রিলিফের কাজে বাধা দেওয়া। মানুষের দুঃখকে রাজনৈতিক রেষারেষিতে পরিণত করা বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষে খুব অস্বাভাবিক নয়—যদিও অবাঞ্ছনীয়। অনেক স্থলে তারা বন্যাপীড়িতদের মধ্যে গিয়ে সরকারী

বিলিফের অপব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষ জাগাবার চেষ্টা করেছে। ক্যাম্প থেকে যখন চলে যাবার সময় এসেছে বিরোধী রাজনৈতিকদলের কর্মীরা গিয়ে তখন উল্টো মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টাও করেছে।

দশলক্ষ আশ্রয়চ্যুত লোককে সাময়িকভাবে আশ্রয়দান করা খুবই কঠিন কাজ; আজকাল সরকারী গুদামে খাদ্যশস্য প্রচুর জমা থাকে, তা থেকে মণে মণে চাল নিয়ে গ্রামে গ্রামে বিতরণ করা তত কঠিন নয়। কিন্তু রাতারাতি দশলক্ষ লোকের জন্য ছাউনীযুক্ত কোন আশ্রয় সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। বন্যার পরেও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়েছে; উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে তাদের কষ্ট বর্ণনার অতীত। দশহাজার তাঁবু কিছুদিনের মধ্যে সংগ্রহ করে কতকলোকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। স্কুল কলেজ তখন বন্ধ ছিল; তাই সেখানেও বহু লোক আশ্রয় পেয়েছিল। কিছুদিন পরে আরও ৪ হাজার তাঁবু সংগ্রহ হয়েছিল। সাময়িক ব্যবস্থা তখন যা করা সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা করেছিল। সরকারী ব্যবস্থায় কোন দোষ ত্রুটী ছিল না এ দাবী আমরা করছিনা; একেবারে ত্রুটীহীন কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়। এই বিপদের সময় বহুদিন পরে দেখা গিয়েছে কংগ্রেস অনেকটা সক্রিয় হয়েছিল। কংগ্রেস যদি তার এই সেবা সংস্থা এর পরেও বজায় রাখতে পারে তাহলে এই নৈসর্গিক দুর্বিপাকে কংগ্রেসকে নূতন শক্তি দিয়ে যাবে।

এই যে দশ লক্ষ লোক বা ১০ হাজার গ্রাম বন্যায় পীড়িত হয়েছে এদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা কি করা যায় তাই এখন চিন্তা করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রস্তাব করেছে আদর্শ গ্রাম গঠন করবে। গ্রামের লোকেরা নিজেরা ইট কাটবে; সরকার করলা যোগান দেবে। তা দিয়ে যতটা সম্ভব পাকাবাড়ি করা হবে, ছাউনী থাকবে টিনের। রাস্তা, নালা, পঞ্চায়েতঘর, স্কুল, ঔষধালয়, বাজার, সমবায় দোকান, ছোটখাটো ইণ্ডাষ্ট্রী বা উৎপাদের কারখানা ঘর, যোগাযোগের জমি প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রত্যেক গ্রামে করা হবে। বাংলা অথবা সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাম নিয়েই বেঁচে আছে। বিদেশী শাসনে গ্রামগুলোও সর্বপ্রকারভাবে শোষিত হয়েছে—কেবল ধনসম্পদ নয় গ্রামের জনসম্পদও সহর শোষণ করে নিয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন (community development) ও জাতীয় প্রসার পরিকল্পনায় (National Extension Service) গ্রামগুলির উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে। বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামের লোকদের পুনর্বসতি করবার সময় যদি নূতন ছাঁচে গড়তে পারা যায় তাহলে উপরোক্ত দুই পরিকল্পনার যা উদ্দেশ্য তার অনেকটা সিদ্ধ হতে পারে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে যে ভারতের ৫½ লক্ষ গ্রামের সবগুলিকেই সমাজ উন্নয়ন বা জাতীয় প্রসার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যে ১০ হাজার গ্রাম বন্যায় এবার নষ্ট হয়েছে তাতে অবিলম্বেই ঐ উন্নয়ন কাজ শুরু হতে পারে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই এর ব্যবস্থা হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

নৈসর্গিক দুর্বিপাক অনেক দেশের উপরই এসেছে, বন্যার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিসাধন করে ভূমিকম্প। ভারতবর্ষে ও বিহারে এবং কোয়েটাতে ভূমিকম্পে গত বিশ বাইশ বছরের মধ্যে খুবই ক্ষতি করেছিল। এত বড় বন্যায় বাংলাদেশে প্রাণহানি খুবই কম হয়েছে। এমনি দৈববিপাকে মানুষ বা জাতি যদি ভেঙ্গে পড়ে তা হলেই সেই বিপাক সত্যিকার ক্ষতিসাধন করে। আর যদি মানুষ দুঃখকে জয় করে জীবনকে নূতন করে গড়ে তুলতে পারে তা হলে প্রকৃতির উপর মানুষের জয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আশাকরি বাংলা এই দুঃখের ভিতর দিয়ে মানুষের জয়কেই ঘোষণা করবে এবং স্বাধীন ভারতের উপযুক্ত গ্রাম গঠন করবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

হঠাৎ একই সময়ে আন্তর্জাতিক অবস্থা মধ্য ইউরোপে ও সুয়েজ অঞ্চলে খুব সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌ল। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ইডেন যেন কিছুতেই সুয়েজের শোক ভুলতে পারছিলেন না। ইস্রায়েলের সঙ্গে মিশর ও অন্যান্য আরবজাতিসমূহের ঝগড়া বহুদিন যাবত চলছে। সুয়েজ নিয়ে যখন গোলমাল অনেকদিন থেকে চলছিল তখন ইস্রায়েল হঠাৎ মিশর আক্রমণ করল। আরবজাতিসমূহ ইস্রায়েলের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করত এবং সুযোগ পেলে যেকোন সময় তারা ইস্রায়েলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে

ফেলবার চেষ্টা করবে—একথা তারা জোর গলায় বরাবর বলত। মিশরের সঙ্গে ইস্রায়েলের ঝগড়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল সিনাই উপত্যকার উত্তর দিয়ে গাজা (Gaza) অঞ্চল নিয়ে। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধবিরতি বা অবহার (Armistice) শর্ত অনুসারে গাজা মিশরের অধিকারে ছিল। কিন্তু গাজা সত্যিকারভাবে মিশরের অংশ নয়, বরং ইস্রায়েলেরই অংশ। ইস্রায়েলবাহিনী যে-কোন সুযোগে গাজা ও সিনাই উপত্যকার কতক অংশ দখলের চেষ্টা করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। সুয়েজ নিয়ে মিশর যখন বিব্রত তখন এই চেষ্টা করা ইস্রায়েলের পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

অপরদিকে একটা সন্দেহ লোকের মনে জাগতে পারে যে ইংরেজ ও ফরাসী ইস্রায়েলকে এই কাজে প্ররোচিত করেছে। এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় যখন আমরা দেখি যে মাত্র ১২ ঘণ্টার অন্তিম পত্র (Ultimatum) দিয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একযোগে মিশরকে আক্রমণ করল কিন্তু ইস্রায়েলের দিকে তারা দৃষ্টিও দিলনা। ফলে হ'ল একই সময়ে মিশরের উপর ইস্রায়েল, ফরাসী ও ইংরেজবাহিনীর আক্রমণ চলতে লাগল। একা ইস্রায়েলের সঙ্গেই সামরিক শক্তিতে মিশরের এঁটে উঠা কঠিন। ইস্রায়েল যদিও আকারে ও লোকসংখ্যায় অনেক ছোট তবুও সামরিক শক্তিতে সে যে কোনও আরব রাষ্ট্র চাইতে বেশী শক্তিশালী; হয়তো বা সমস্ত আরবরাষ্ট্রসমূহের সমবেতবাহিনীর সঙ্গেও ইস্রায়েল বোঝাপড়া করতে পারে। ইংরেজ ও ফরাসী চরমপত্র দিয়েছিল ইস্রায়েল ও মিশর দুই দেশের উপরই যদিও আক্রমণকারী (aggressor) ছিল ইস্রায়েল এবং মিশর কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল। চরমপত্রে নির্দিষ্ট বার ঘণ্টা উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথেই ইংরেজ ও ফরাসী-বাহিনী একযোগে মিশরকে আক্রমণ করল। এ থেকে ইংল্যাণ্ডকেও অনেকে সন্দেহ করে যে ইংরেজ ও ফরাসী ইস্রায়েলকে উস্কানী দিয়ে মিশর আক্রমণ করিয়েছিল।

ইতোমধ্যে সংযুক্ত জাতি সংস্থায় (U. N. O.) বৃটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সেখানে প্রস্তাব করা হ'ল অবিলম্বে মিশরে যুদ্ধের বিরতি ঘটাতে হবে; ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইস্রায়েলকে বলা হ'ল মিশর থেকে যার যার সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইস্রায়েল যখন এবিষয়ে ইতস্ততঃ করছিল তখন—রাশিয়া এই তিন জাতিকে হুমকী দিয়ে চিঠি দিল। রুশিয়ার চিঠির ভাষায় এ আভাস প্রায় স্পষ্টই ছিল যে অবিলম্বে ঐ তিন জাতি মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না থামালে রুশিয়াকেও হয়ত সৈন্য পাঠাতে হবে এবং তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের শুরুও ওখান থেকেই হবে। সংযুক্ত জাতি সংস্থার প্রস্তাবে যে ফল হয়নি রুশিয়ার এক ধমকে সে ফল হবেই বলে এখন সবাই আশা করছে। আশা করা যায় সুয়েজ ও মিশরের হাঙ্গামা এখন সহজেই মিটে যাবে। এই ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ইডেন সর্বত্রই নিন্দিত হয়েছেন। তাঁর মন্ত্রী-মণ্ডলীর দুজন মন্ত্রী এনিয়ে পদত্যাগও করেছেন। বিলেতের অনেক নাম করা কাগজ ইডেনের একাজের নিন্দা করেছে এবং কেউ কেউ তাঁর পদত্যাগও দাবী করেছে। মোটের উপর এই ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের ইজ্জত ও সম্মানের হানি অনেকটা হয়েছে।

অপরদিকে মধ্য ইউরোপেও অবস্থা বেশ সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। রাশিয়া ও রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহে কিছু-দিন যাবৎ একটা মানসিক বিপ্লব চলছিল। রাশিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশ অধিবেশনে ষ্ট্যালিনবাদের বিরুদ্ধে যে মত প্রচারিত হয় তার অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল ইউরোপীয় কমিউনিষ্ট দেশসমূহের নেতারা ও জনসাধারণ যেন নূতন করে ভাবতে শুরু করল। এতদিন সমস্ত কমিউনিষ্টদলের ভাবনা চিন্তা সবই ছিল ষ্ট্যালিনের হাতে ও সোভিয়েতের কমিউনিষ্টদলের হাতে। ক' বছর পূর্বে যুগোশ্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটো যখন ঐ মত অগ্রাহ্য করে স্বাধীনভাবে ভাববার ও চিন্তা করবার দাবী করলেন তখন সমগ্র রাশিয়ার ক্রোধ তাঁর উপর বর্ষিত হল। ষ্ট্যালিনবাদ বর্জনের পর গতবছর রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন ও রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধানসচিব ক্রুশ্চেভ যুগোশ্লাভিয়ায় গিয়ে টিটোর সঙ্গে ভাব জমিয়ে এসেন।

তারপর পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর জনসাধারণের মধ্যেও দাবী উঠল সোস্যালিজম্ বা সাম্যবাদের দেশভেদে রাস্তার পার্থক্য হতে পারে। স্বাধীনচিন্তার দাবী করার ফলে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে অনেক কমিউনিষ্ট নেতাকে জীবন

বা স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়েছে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার রক্তসম্পর্ক অনেকটা আছে। তা-ছাড়া পোল্যাণ্ড জার্মাণীর যে অংশ গত যুদ্ধের পর গ্রাস করেছে তা রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া বজায় রাখা কঠিন বা অসম্ভব তাও পোল্যাণ্ড জানে। এই দুই কারণে পোল্যাণ্ডের লোকগণ রাশিয়ার প্রতি কতটা অনুগত। তবুও যে কঠিন শাসন রাশিয়ার সৈন্যের জোরে ও ইঙ্গিতে সেখানে চলছিল তা তাদের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হাঙ্গেরীর পক্ষে রাশিয়ার প্রতি অনুগত থাকার কোনই কারণ নেই। হাঙ্গেরীর লোকদের বলা হয় Magyar বা ম্যাগার—এরা হ'ল তুর্কীজাতির অন্তর্গত। উভয়দেশেরই অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার রথের চাকার সঙ্গে জড়িত। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যায়—রাশিয়ান বাজার দরের চাইতে কম দরে পোল্যাণ্ড থেকে কয়লা নিয়ে এবং তা হাঙ্গেরীর কাছে বিক্রী করে বাজার দরের চাইতে বেশী দামে। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী পাশাপাশি দেশ; নিজেরা স্বাধীনভাবে এ লেনদেন করতে পারত কিন্তু তা তাদের করতে দেওয়া হয়না। ঠিক রুশিয়া মতই বা রুশিয়ার চাইতেও বেশী করে এই উভয় দেশে জোর দেওয়া হ'য়েছে ক্যাপিট্যাল গুড্‌স্ বা মৌলিক-যন্ত্রপাতি উৎপাদনের দিকে; ব্যবহার দ্রব্য (consumer's goods) সেখানে দুর্লভ ও দুর্মূল্য। কারখানার শ্রমিক বা ক্ষেতের কৃষক কাহারও না আছে ব্যক্তিস্বাধীনতা, না আছে শ্রমের স্বাধীনতা, না আছে সাধারণ জীবনযাত্রার উপায়।

পোল্যাণ্ডের একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ ল্যাঞ্জ (Dr. Lange) বছরখানেক পূর্বে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তিনি নিষ্ঠাবান কমিউনিষ্ট। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা গঠনের আলোচনার সময় তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে, শোনা যায় তিনি পোলিশ সরকারকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন যে রাশিয়ান পরিকল্পনার আদর্শ না নিয়ে ভারতীয় পরিকল্পনার আদর্শ গ্রহণ করতে। তিনি ব্যবহারদ্রব্য উৎপাদনের দিকে জোর দিতে বলেছিলেন, হাতের উৎপাদন ও কুটির-উৎপাদনের দিকেও তিনি জোর দিয়েছিলেন।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী এতদিন মনে মনে জ্বলছিল। রাশিয়ার নেতাগণ যখন বেলগ্রেড্ গিয়ে টিটোর সঙ্গে কোলাকুলি করে এলেন তখন এই দুই দেশের নেতাদের মনেও সাহস জাগল। পোল্যাণ্ডের অন্যতম কমিউনিষ্ট নেতা (Gomulka) গোমুল্‌কা প্রচলিতমতবিরোধী কথা বলার জন্য কিছুদিন পূর্বে জেলে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন। হাঙ্গেরীর তেমনি এক নেতা র‍্যাইক (Rajk) তাঁর দলবলসহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। র‍্যাইক ও তাঁর অনুচরদের দেহ কবর থেকে খুঁড়ে বের করে জাতীয় বীরের সম্মানে আবার সমাধিস্থ করা হ'ল। গোমুল্‌কা পোল্যাণ্ডের কর্তৃত্বের আসনে এসে বসলেন। হাঙ্গেরীতেও তেমন আরেক নেতা স্থায়ী কর্তৃত্ব পেলেন।

পোল্যাণ্ডের শাসনভার সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টির হাতেই রইল এবং তারা পুরাপুরি রুশিয়ার সঙ্গে কাটছাঁট করতে রাজী নয়। কিন্তু হাঙ্গেরীর শাসনকর্তৃত্ব পুরা কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে রইলনা; এক সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলী সেখানে গঠিত হল। পূর্বেই বলেছি রাশিয়ার প্রতি অনুগত থাকার যেটুকু কারণ পোল্যাণ্ডের আছে হাঙ্গেরীর তাও নেই; তাই একটু খোলা পেয়েই তারা আগপাছ বিচার না করে দ্রুত ছুটল। এইসব দেশের সঙ্গে রাশিয়ার এক সাময়িক সন্ধি হয়েছিল—তাকে বলা হ'ত ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact)। এই চুক্তির বলে রাশিয়া এইসব দেশে সৈন্য রাখতে পারত। স্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হ'য়ে জনসাধারণের চাপে সেই ওয়ারশ চুক্তি পর্যন্ত নাকচ করে দিলেন।

রাশিয়া হাঙ্গেরী থেকে সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছিল এবং দুই রাষ্ট্রেরই দুই নূতন মন্ত্রীমণ্ডলীকে মেনেও নিয়েছিল। ইতোমধ্যে একটি ঘটনা ঘটল:—সেটি হ'ল মিশরের উপর ইংরেজ ফরাসী ও ইস্রায়েল আক্রমণ। এইভাবে মিশরের ধ্বংসে রাশিয়া বরদাস্ত করতে পারবে না, ইংরেজ ও ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধ তাকে করতেই হবে। কিন্তু হাঙ্গেরীর দৃষ্টান্ত ক্রমে ক্রমে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নিয়ে তারপক্ষে ইংল্যাণ্ড ও ফরাসীর বিরোধীতা করা অসম্ভব। কাজেই যে কারণেই হউক আবার রুষবাহিনী হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করতে লাগল

এবং পুরাপুরি কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট সেখানে স্থাপন করা হ'ল। এই নূতন গভর্ণমেণ্টের নেতা হলেন কাদার (Kadar); তিনি কমিউনিষ্ট বাহিনীকে হাঙ্গেরীতে থাকবার আহ্বান জানালেন এবং ওয়ারস চুক্তি আবার স্বীকার করে নিলেন। রাশিয়া এখন বলতে পারে যে হাঙ্গেরীর গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে তারা ওখানে সৈন্য রাখছে; এটা নিতান্তই আভ্যন্তরীণ ব্যাপার—অন্যের হস্তক্ষেপ করার কিছু নেই।

যুক্তি যা-ই দেখানো হউক এবং যত যুক্তিই থাকনা কেন হাঙ্গেরীতে রুশিয়ার আচরণ সম্পূর্ণভাবে নিন্দার্হ। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স মিশরে অন্যায় করেছে বলে রুশিয়া হাঙ্গেরীতে অন্যায় করবে এ কোন যুক্তি নয়, কিন্তু প্রাকৃত রাজনীতিতে এমনি সব যুক্তি অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করলেও চলে না। আজ হাঙ্গেরীতে রুশিয়া যা-ই করুক একথা মনে করা যায় যে, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী যুগোশ্লোভিয়ার অনুকরণে রাশিয়ার নিগড় গণ্ডী থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে। এসব দৃষ্টান্ত দেখে ভারতীয় কমিউনিষ্টপার্টিও আজ তোতাপাখীর মত বলছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মেনে তারা স্বাধীনভাবে সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হবে। রুষবিপ্লবের অব্যবহিত পর একটা সময় এসেছিল অরাজতন্ত্রিক যে কোন দেশকেই রাজতন্ত্রিক দেশসমূহ শত্রু বলে মনে করত। ইংল্যাণ্ডের নেতৃত্বে ইউরোপের সমস্ত রাজতন্ত্র ফরাসীপ্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেই মনোভাব বদলে গেল—ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে আবার গলাগলি খাতির হ'ল। রুশ বিপ্লবের পরও ঠিক তেমনি সমস্ত অসাম্যবাদীদেশ (Non-Socialist) সাম্যবাদী রুশিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। শত বিশ্বযুদ্ধে আবার এরা রুশিয়ার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধও করল। তারপর আবার মতবাদমূলক (ideological) দলবন্ধী করতে যাওয়া অনেকটা অস্বাভাবিক। রাশিয়া যখন তার বিংশতি সোভিয়েত কংগ্রেসে তাদের মতবাদের কাঠিন্য অনেকটা শিথিল করল তখন মতবাদমূলক দলবন্ধী আরও অযৌক্তিক হ'য়ে পড়ল। যুগোশ্লোভিয়া রাশিয়ার চাইতে কম সাম্যবাদী নয়, তার সাথে ভাব করা চলে কারণ সে রাশিয়ার গণ্ডীবদ্ধ নয়। আজ পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী যদি এমনিভাবে রাশিয়ার গণ্ডীর বাইরে চলে যায় তবে তাদের সঙ্গেও ভাব করতে গণতন্ত্রীদেশসমূহের বাধবে না। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর এই বিবর্তন থেকে হয়ত ইতিহাসের আর এক নূতন অধ্যায় শুরু হবে।

THE
UNION BANK OF INDIA LIMITED
Estd : 1919
Head Office : Apollo St., Fort, Bombay. 1.
Capital Paid-up ... ... Rs. 40,00,000
Reserve and other Funds ... ... Rs. 35,00,000
Chairman : Mr. M. S. Captain
Banking business of every description transacted including Foreign Exchange.
General Manager, F. K. F. NARIMAN

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

কেয়ো-কার্পিন

অপূর্ব স্নেহজ কেশ তৈল

নৈজ গুণের এই কেশ তৈল
চুল পড়া বন্ধ করে, ঘন
সুন্দর চুল উৎপাদনে সাহায্য
করে আর মাথা ঠাণ্ডা রাখে

প্রস্তুত কারক :
দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১৩ • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ

যদিও কাশিতে ভুগছেন,
এ্যালেম্বিকের গ্লাইকোডিন
টার্প- বাসক সেবনে
অবিলম্বে নিরাময় হয়ে
এই নোটিশ অনায়াসেই
মান্‌তে পারেন॥

Alembic

গ্লাইকোডিন টার্প বাসক

এ্যালেম্বিক কেমিকাল ওয়ার্কস্ কোং লিঃ, বরোদা-৩

মন্দিরা

ঊনবিংশ বর্ষ — অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ — অষ্টম সংখ্যা

স্মৃতিকথা

শ্রীকালিদাস রায়

সুনীতি আমার কবিতার একজন বৈদেশিক শ্রোতা ছিল। সে আমার দুটি কবিতার ইংরাজি verse এ অনুবাদ করে শুনিয়েছিল। আমি সে দুটির কপি চেয়েছিলাম, সে দেয়নি। সে বলেছিল, "ওতে metrical defect আছে—ও আমার একটা experiment মাত্র, ও কিছু হয়নি।" সুনীতি গোপনে গোপনে তখনই প্রবন্ধ লিখত—প্রবন্ধ অনার্য ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে। সুনীতি আমাকে সে প্রবন্ধগুলো পড়তে দিয়েছিল, আমি ভাবতাম—"সুনীতি এ সব কেন লেখে? এ সব কে পড়বে?" তখন জানতাম না—ঐ বীজে একটা বিরাট বনস্পতির অঙ্কুর নিহিত রয়েছে। সে যে একদিন বিদ্যার একটা জাহাজ হয়ে উঠবে তাও কোনদিন ভাবিনি। কারণ, বন্ধুসংসদে সে কখনও বিদ্যা জাহির করত না—সরস করে সাধারণ বক্তব্য বলাই ছিল তার প্রকৃতিগত—সারস্বত সাধনা ছিল তার অত্যন্ত সংগোপনে। আমার সংসর্গে কাব্যের আঁচ যে তার গায়ে লাগেনি, তা নয়, তবে তাকে কবি বানাতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম যে মানুষ কবিতা এমন বোঝে এবং সংস্কৃত কবিতা এত সুন্দর আবৃত্তি করে, সে নানা ভাষায় সাহিত্যের এমন সমঝদার সে কবি একদিন হবেই। আঁচ যে একটু লেগেছিল তার একটা প্রমাণ দিই। সে তার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র রচনা করেছিল সংস্কৃতে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। পত্রখানি এই—

স্বস্তি স্থৈর্য্যে পরিণয়বিধাবুৎসবং সংবিধাতুং
সম্পূর্ণাঙ্গং সকলসুহৃদঃ স্বাগতৈঃ প্রেমধারান্।
প্রীতিস্নিগ্ধং প্রমুদিতমনা যাচতীমাং লিপিং তে
জায়াং নামাঙ্কুরতকমলাম্ আপ্তকামঃ সুনীতিঃ।

আমি তার সাহচর্য পেয়েছিলাম সব চেয়ে বেশি। তাকে কবি বানাতে পারিনি—কিন্তু সে আমার মনে ভাষাতত্ত্বের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত করেছিল। সেই অনুরাগের ফলে আমি বৈয়াকরণ বনে গিয়ে ধূলিমাখা দুটি চরণ দিয়ে শিক্ষাবিভাগের রাজাত্তরণ লাঞ্ছিত করছি। সুনীতির সঙ্গে বহরমপুর থেকে পত্র লেখালেখি চলত। তাতে অনেক মান-অভিমানের কথা চলত।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দিকে আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই তার আবৃত্তি ও অভিনয় বিদ্যার জন্য। অভিনয় বিদ্যার রাজ্যে যে সে একটা যুগান্তর আনবে তা আমাদের ইনস্টিটিউটের থিয়েটারেই বুঝতে পেরেছিলাম। শিশির আমার কবিতার একজন উপভোক্তা ছিল। সে আমার

'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতা কোন কোন সভায় আবৃত্তি ক'রে সেকালের শিক্ষিত পুরবাসীদের কাছে কবিতাটিকে পরিচারিত করেছিল। এখনো সে আমাকে 'ওগো বিংশ শতাব্দীর লঘু কালিদাস' ব'লে ডাকে। এই সম্বোধনের কারণ পরে বলব। অভিনয় বিদ্যায় তার অসামান্য মৌলিকতা ছিল। তাকে শেখাবার কিছু ছিল না। তবু সে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মত অধ্যাপক মন্মথ নাথ বসুর কাছে ভক্তাভরে এই বিদ্যার পাঠ গ্রহণ করত। নাট্যকারের ত্রুটি অভিনয়চাতুর্যের দ্বারা সংশোধন করে নিতে তার মত আর কাকেও দেখিনি। সুনীতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি অনুমান করতে পারিনি। কিন্তু শিশিরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না।

আমাদের ইন্‌সটিটিউটের Debating Sectionএ রমেশচন্দ্রের বিতর্ক করবার শক্তি দেখে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই। পরে এঁর সঙ্গে যে শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে সে শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতা আর কারো সঙ্গে ঘটেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে লেকচারার করে নিয়ে যাবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। পরে তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের আমি শিক্ষক হয়েছিলাম, এমনকি তাঁর পরিবারের একজন পরিজনতুল্য ব'লেই গণ্য হয়েছিলাম।

গিরিজাশঙ্করের প্রতি ঐ একই কারণে আকৃষ্ট হই। পরবর্তী জীবনে ইনি আমাকে প্রবন্ধরচনায় উৎসাহিত করেন। বঙ্গবাণীতে আমি যখন প্রবন্ধ লিখতাম—ইনি তখন সে সকল প্রবন্ধের এত বেশী সুখ্যাতি করেন যে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমার কাছে কবিতা না চেয়ে প্রবন্ধই চাইতেন। এবং সে প্রবন্ধ পত্রিকার প্রথমেও ছাপা হ'ত। যৌবনকালে রচিত আমার গদ্য প্রবন্ধকে গিরিজাবাবুর মত এত আদর কেউ করেনি। সে এখন হতে ত্রিশ বছর আগের কথা।

নরেশের (মিত্র) প্রতি আকৃষ্ট হই তার অসাধারণ অভিনয় শক্তির জন্য। নরেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বধর্মনিষ্ঠ অসাধারণ পণ্ডিত। এঁর সঙ্গে বহরমপুর হ'তেই পরিচয় ছিল। এঁর পুত্রদ্বয় দেবীপ্রসাদ ও কামাক্ষীপ্রসাদ আমার ছাত্র—আমি তাদের সাহিত্য রচনাতেও দীক্ষা দিয়েছিলাম।

অন্যান্য সুহৃদ্‌গণের মধ্যে ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (স্থাপত্যবিদ্যাবিশারদ), গিরীন্দ্র সেন (এটর্নী), রামাপদ বসু (ধৃকবিজ্ঞানে দক্ষ), প্রকাশ চন্দ্র মিত্র (স্বর্গত), প্রফুল্ল ঘটক (রঙ্গীপুরের উকিল), রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অবসর প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার), শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় (স্বর্গত), অম্বিকাচরণ মল্লিক (উকিল, বালুবাদ), সুরেশ দাশগুপ্ত (হাকিম), ডাঃ অমূল্য চক্রবর্তী ইত্যাদির নাম মনে আছে। এঁদের কারো কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। একজনের নাম বিশেষ ক'রে মনে আছে—তার নাম সুস্থির কুমার বসু (খিদিরপুরের সন্তোষবাবুর ভাই)। সদস্যদের মধ্যে এমন রূপবান্ কাউকে মনে হ'ত না। সুশ্রীককুমার বলে আমি ডাকতাম। সে হাসত, আর বলত 'ক'টা হ্রস্বার্থে ত? আমি বলতাম না ওটা সম্বোধনান্ত 'ক'। তার সঙ্গে শেষ দেখা জামসেদপুরে।

সুস্থিরের ভাইপোরা আমার ছাত্র, তাদের কাছে তাদের কাকার গল্প করতাম। শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্তের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল—হয়ত তিনি এখন তা ভুলে গেছেন।

সদস্যেরা চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় করল। আমার উপর আদেশ হ'ল দ্বিজেন্দ্রলালের 'যখন সঘন গগন গরজে বরিষে বরষা ধারা'—গানটির সুরে একখানা বঙ্গবাণীর মহিমাস্তব লিখে দিতে হবে। এই গান অভিনয়ের প্রারম্ভে কোরাসে গীত হবে। আমি লিখে দিলাম—

দ্যুলোক ভূলোক পুলকি, আলোকে
জননী আমার রাজে।

অমৃত শুভ্র কমলরক্ত মরমকমল মাঝে।
মুঞ্জরে ফুল চরণে, গুঞ্জ গুঞ্জরে মধুবাণী।
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

দ্বৈপায়নের ওঙ্কারজলে অভিষেক করে কাশী।
কবিরাজ আনে ভক্তহিয়ার পূত ধূপধূমরাশি।
কৃত্তি আলিল বর্তী তমসাতীর্থের রবি খানি'
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

কবিকঙ্কণ দিল কঙ্কণ, কণে চণ্ডীর পানে,
কবিরঞ্জন রঞ্জিল পদ, হৃদয়ালক্ত দানে
ভারতচন্দ্র আরতি আলোকে উজলে অঙ্গখানি
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী

প্রভাকর-প্রভাকরে দিল টীকা ললাট উজলি ভালে
রঙ্গ ভুষিল কত্রতেজের অরুণ অঙ্গরাগে।
দাশরথি দিল নথনী আনিয়া পল্লীপরান ছানি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

বিদ্যাসাগর বহিল ভক্ত নৈবেদ্যের থালা,
শ্রীদীনবন্ধু মঠ-প্রাঙ্গণে ধরিল বরণ ডালা,
যার পুরোহিত ভূদেবের নাই পূজায় অঙ্গহানি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।
বঙ্কিম যার অঙ্কিল চারু কাজল উজল আঁখে,
নবীন যোগিল অয়লাক্ত যার পাকজন্ত আঁখে।
হেমের হৈমী হৃদয়বীণাটি শোভিল শুভ্র পাণি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

মরালের মত 'মধু' গীতরত চরণ নেড়িয়া ভাসে,
গিরিশ হরিষে হরিচন্দন দরিষে চরণ পাশে।
নিখিলের শির রবি-কবি যার চরণে লুটায়ে আনি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

হাসিকান্নার হীরাপান্নার দুল দিল দ্বিজরাজ,
রজনী করেছে রজনীর সেবা, প্রভাতে প্রভাত আজ।
দেবনর ঋষি মিলিয়াছে আসি পুষ্পাঞ্জলি-পাণি,
আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল জ্ঞানের রাণী।

শরৎচন্দ্রের তখনও উদয় হয়নি, কাজেই তাঁর নাম নেই। এটা বরাতী লেখা, একটা তালিকামাত্র। পর্ণপুট ১ম সংস্করণে মঙ্গলাচরণ হিসাবে এই কবিতা দিয়ে গ্রন্থারম্ভ হয়েছিল। পরে এই গান গ্রন্থে স্থান পাবার অযোগ্য মনে করে বর্জন করেছি।

কেউ কেউ বলেন, "এ গানটাকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার সভা-সমিতিতে গাইবার জন্য। এ গান দিয়ে সাহিত্যসভার কাজ আরম্ভ হতে পারে। সুরটা বেশ সোজা, কোরাসে গাওয়া চলে।" নিজের শক্তিতে যা বাঁচে না, 'প্রয়োজন' তাকে বাঁচিয়ে রাখে। যদি দেশের লোকের প্রয়োজন থাকে তবে তা বাঁচাক, বাঁচাক। আমার মনে হয় দেশের লোকের কোন প্রয়োজন নেই তাই কোন বই-এ আর রাখিনি।

৺জ্ঞানপ্রিয় মিত্রের পরিচালনায় ইহা ইনস্টিটিউটের অভিনয়ারম্ভে কোরাসে গীত হত। আমিও ঐ দলে যোগ দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু সম্মত হইনি। পরে ইনস্টিটিউটের দল কলিকাতা টাউনহলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের প্রারম্ভে একে কোরাসে গান করে। ঐ সম্মেলনে ঐ একটা গানই হয়েছিল। একজন ছাত্রকবির পক্ষে এটা যথেষ্ট গৌরবেরই কথা এটা আনন্দ গর্বের সঙ্গে বন্ধু মহীতোষ রায় চৌধুরী আমাকে এক পত্রে জানায়। কারণ, তখন আমি বহরমপুরে ছিলাম। মহীতোষ লিখেছিল—ঐ গান যখন কোরাসে গাওয়া হচ্ছিল টাউন হল তখন হাজার হাজার লোকের সমাগমে গম গম করছে। ঐ গানে আমার বুক বন্ধুগর্বে ফুলে উঠেছিল। আমার তখন দুঃখ হচ্ছিল,—তুই তা শুনতে পেলি না।

ইনস্টিটিউটের আর দুজন সভ্যের সঙ্গে সামান্য আলাপ মাত্র হয়। ঘনিষ্ঠতা হয় নি। পরে এঁদের সঙ্গে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূত্রে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এঁরা ডাঃ সুশীলকুমার দে ও ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজনের নাম করতে হয়—তাঁর নাম কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন। ইনি বীরভূম পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—তাতে আমি লিখতাম।

কুলদাপ্রসাদের সরস বিশুদ্ধ ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করবার শক্তি ছিল। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও সাহিত্যে তার অনন্যসাধারণ দখল ছিল।

ইনস্টিটিউট হলের বাহিরে গাঁদাফুলের বন ছিল, সেই বনের ধারে বেঞ্চি পেতে সন্ধ্যাকালে আমরা কয়েকজন ব'সে গল্পগুজব করতাম। এর নাম হয়েছিল—Mangold Club; এই ক্লাবটির স্মরণার্থে আমি আমার বন্নরী' কবিতাগ্রন্থটিকে ঐ ক্লাবের সদস্যদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলাম। বইখানার প্রচার হয়নি—সদস্যেরা হয়ত এ বই-এর খবরই রাখেননি।

ইন্‌স্টিটিউটে দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেখবার—তাঁদের ভাষণ শুনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। এখানে বেড় বছর আমার স্বপ্নের মত কেটে গিয়েছে। সেকালের সেই একতালা ছোট বাড়ীটি আমার স্মৃতিলোকের অনেকটুকু জুড়ে আছে। এ পারে যেন আমার যৌবনের সেই সখ্যমধুর গোকুল আর ওপারে মথুরার রাজপুরী—মাঝখানের পথটি যেন যমুনা। মথুরার রাজপুরীতে আজ সেই ব্রজের রাখালটির প্রবেশাধিকার নেই। এখনকার ইন্‌স্টিটিউটে আবৃত্তি পরীক্ষার বিচারক হিসাবে আমন্ত্রিত হই—কিন্তু এ ভার আমি নিতে পারি না। বড়ই ক্লেশাবহ কাজ। বৃদ্ধ বয়সে আমি ধৈর্য রাখতে পারি না।

ইন্‌স্টিটিউটের বন্ধুগণকে লক্ষ্য ক'রে পরবর্তী জীবনে একটা কবিতা লিখেছিলাম—সেটা এই—

আজি বন্ধু হয়েছে কৃপণ,
সেদিনের ভালবাসা চির মিতালির আশা
কাঞ্চন-কৌলীন্য চাপে হয়েছে স্বপন।

আজি পরে দেখা হ'লে ছুটি মীর্ণ কথা ব'লে
দ্রুতগতি চলে যাও, পড়ু অছিলায়;
নিবেছে প্রেমের ধূপ, শুধু আজি রূপকূপ,
আজিকে স্মরে না উৎস হৃদয়নিলয়।

আজি হাত দিয়ে হাতে চলিতে পার না সাথে,
ভাব' বুঝি যাবে তাতে পদেরও গৌরব,
দেখা যদি বর্ষ পরে স্পর্শ করি হর্ষভরে
অপচয় কর না-ক সময় বৈভব।

দিনভোর অবিরল কত কথা অনর্গল,
সে প্রীতি ফুরাবে কভু হয়নিক মনে,
ছিঁড়িয়া অঙ্কের খাতা চিঠি লেখা সাত পাতা,
আজ সে দিনের কথা আসে কি স্মরণে?

পাঁচখানা পত্র দিলে জবাব আজ না মিলে,
এত পর হতে পারে যে ছিল আপন?
হৃদয়ের নতুনতা আজি দূর—দূরগতা
যেন অন্যান্তরকথা, হয়েছে স্বপন।

বৃন্দাবন আর মধুপুর—
কত আর দূর হায়, অই তাই দেখা যায়,
তবু যেন মনে তার লক্ষ ক্রোশ দূর!
দেশের হৃদয় মাঝে তব উচ্চাসন রাজে,
হইয়াছ মানুষের মতন মানুষ।
আমি ছন্দোজীবী হীন বৈভব-গৌরবহীন
আজো সেই উড়াতেছি রাখালী কানুয়া।
কেহ বা নবদেব, হাকিম খেতাবী কেহ,
বিলাতী বেলাত-পাওয়া কেতাবী ডাক্তার,
কেহ হাইকোর্ট-চারী উজ্জ্বল গাউন-ধারী,
কেহ গবেষণা সারি' পেলে পুরস্কার।
বিশ্ববিদ্যা-তরুশিরে কেহ বসি ডিগ্রী-নীড়ে
শত শত কোকিলের হয়েছ বাবুস,
দেখা হ'লে বার বার বলি আজ 'স্যার, স্যার',
নাম ধ'রে ডাকিবার হয় না সাহস।
শাঁসালো শ্বশুর কারো, কেহ করো কারবারও,
কেহ ধনযক্ষ রণলক্ষ্মী-প্রসাদাৎ,
গায়ে ছিটাইয়া কাদা দেখে দ্রুত যাও দাদা
মোটর ছুটায়ে, যেন শহরে ডাকাত।
আজি বন্ধু যাই হও চিরদিন তাই নয়,
কূজন করেছি মোরা একই তৃণনীড়ে,
লজ্জা পাও তায় ভাই, এড়াইয়া চল তাই
অস্বীকার সে জীবনের এই সাক্ষীটিরে।
কৈশোরের কুঞ্জে হায় ফল-ফুলকামনায়
যেই প্রীতি-বীজ মোরা করিনু বপন,
'শুকাল অঙ্কুর তায়, মুকুল পলাশ আর'
মেলিল না, সবি বন্ধু হয়েছে স্বপন।

'প্রবাসী' 'ভারতী' 'সোরভে' মিশবার সুযোগ হয়নি বটে কিন্তু ঐ সোরভের কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়। আজ তাঁর কথা দেশের লোক ভুলে গিয়েছে। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রশিষ্যদের সর্বজ্যেষ্ঠ ও নেতা। ইনি কতকগুলো চমৎকার প্রথম শ্রেণীর প্রেমকবিতা লিখেছিলেন। তখনও তাঁর কাব্যগ্রন্থ (একতারা) প্রকাশিত হয়নি। কবিতাগুলো সবই তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন। সে কবিতাগুলোর সন্ধান আজ আর কেউ রাখে না। কবিতাগুলো 'একতারা' নামে কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত

হয়েছিল। ৫০০ কপি বই ছাপিয়েছিলেন—দুই হাতে বিলি করে দিয়েছিলেন—দোকানে বিক্রয়ের জন্ম দেননি। সেকালে কোন কবিতার বই বিক্রয়ের জন্ম ছাপা হ'ত না—রসজ্ঞদের মধ্যে বিতরণের জন্মই কবি নিজের পয়সা খরচ ক'রে ছাপতেন। এইভাবে কত উৎকৃষ্ট রচনা যে বিস্মৃতির তলে চাপা পড়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। রচনা প্রথম শ্রেণীর হলেও এদেশে টেকে না—যথাযোগ্য প্রচার চাই। দ্বিজুদাদার কবিতাগুলো প্রেমকবিতা না হলে হয়ত তাদের ২।৩ টি পাঠ্য পুস্তকে থাকত। নরেন্দ্র দেবের কাব্য-দীপালীতে সে কবিতাগুলোর দু'একটা নিদর্শন মিলবে।

আমি দ্বিজদাকে বলেছিলাম—কবিতার বইখানার প্রচার হ'ল না। দ্বিজদা বলেছিলেন—দুখানা বই দুজনের কাছে থাকলেই চলবে। একখানা সত্যেনের কাছে আর একখানা তোমার কাছে। আমি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবিতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম—আমার বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়ের ৪র্থ খণ্ড যদি কোনদিন প্রকাশিত হয় তবে তাতে প্রবন্ধ থাকবে।

এঁর ভ্রাতা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী নরেন সেন স্কোয়ারে একটি মেসে বড় একখানা ঘর নিয়ে থাকতেন। সঙ্গে পরিবারের আরো ২।৩ জন যুবক থাকত। মাঝে মাঝে প্রাতঃকালে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। তিনি আমার সম্বন্ধে আশা পোষণ করতেন—কবিতা রচনা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিতেন। আমার কবিতার দু-একটা লাইন বদল ক'রে দিতেন। তাঁর কয়েকটি অসমাপ্ত কবিতা ছিল—আমাকে সেগুলি পূর্ণাঙ্গ করবার অধিকার দিয়েছিলেন।

আমি বুঝতে পারতাম না—জামসেরপুরের জমিদার এভাবে মেসে থাকেন কেন? একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাতে উত্তর দিয়েছিলেন—আমি সাহিত্য চর্চার জন্ম কলকাতায় থাকি—এই সখের জন্ম এষ্টেট হতে টাকা নেওয়া উচিত মনে করি না। এখানে আমি একটা চাকরী করি। তাতে যা পাই তাতেই কলকাতার খরচ চালাই।" কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে যাতায়াত করতেন, প্রত্যেকটি কবিতা কবিগুরুকে শুনিয়ে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ কবিকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর লেখা'র কবিতাগুলো কবিগুরু আগাগোড়া দেখে দিয়েছিলেন।

আমি যতীনদাকে বলতাম—আপনার সহস ত কম নয়। আপনি রবীন্দ্রনাথকে কবিতা শোনাবার আবার revise করে দেবার জন্ম অনুরোধ করেন? তিনি বলতেন, এতে দুঃসাহসের কি আছে? আমিই ত তাঁর প্রধান শিষ্য। আমার মনে হয় শিষ্যত্বের অধিকারের সঙ্গে জমিদারী সাহেবেরও যোগ ছিল।

আমার এক আত্মীয় কবিরাজের ঔষধালয় ছিল আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে। কবিরাজের নাম রাখালদাস সেনগুপ্ত। ইনি সুপণ্ডিত রসজ্ঞ ব্যক্তি। ইঁহার গৃহে প্রায়ই যেতাম। ৩০২ আপার সার্কুলার রোড থেকে স্কটিশচার্চ কলেজ যাতায়াতে রাখালদার বাসা পথেই পড়ত। এখানে আমার সঙ্গে অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের পরিচয় হয়।

মোহিতলাল যখন কবিরাজ জীবনকালী রায়ের ঔষধালয়ে আড্ডা জমাতেছিলেন, আমি তখন কবিরাজ রাখালদাস কাব্যতীর্থের ঔষধালয়ে ইষ্টগোষ্ঠী রচনা করছিলাম। দুই কবিরাজই আমার সম্বন্ধে দাদা।

কৃষ্ণবিহারী ছিল রাখালদাদার সম্বন্ধে সম্বন্ধী! কৃষ্ণ-বিহারীর পরিচয় এই (১৮৮৬—১৯৪৫)—এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সপ্তম স্থান এবং এফ-এ পরীক্ষায় ৯ম স্থান অধিকার করে। বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী অনার্সে উচ্চাঙ্গের আসন পায় এবং দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চতরে এম. এ পাশ করে। দিল্লী হিন্দু কলেজে কিছুদিন অধ্যাপকের কাজ ক'রে ভাগলপুর কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক হয়। বহুদিন এই কলেজে কাজ করার পর শেষ জীবনে আরা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে সন্ন্যাস রোগে দেহত্যাগ করে। কৃষ্ণবিহারী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ো বিভিন্ন ফ্যাকল্টি ও বোর্ড অব ষ্টাডিসের সদস্য ছিল।

কৃষ্ণবিহারীর সবচেয়ে বিখ্যাত বই গীতাঞ্জলির ভাব-ধারা আমাদের রসচক্র থেকে প্রকাশিত হয়।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক, আই-এ ও বি-এ পরীক্ষায় আমার বইগুলি কৃষ্ণবিহারীর চেষ্টায় পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। এই কৃষ্ণবিহারীর মত পরম বন্ধু আমার জীবনে আর পাইনি। তার বাড়ী ছিল

নিমতলা ঘাট লেনে। ক্রমে কৃষ্ণবিহারীর বাড়ীতে যাতায়াত বেড়ে গেল। সে সুলেখক ছিল। 'অর্ঘ্য' নামক একটি মাসিকপত্রের অন্যতর সম্পাদক ছিল। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণবিহারী আমার কবিতার অনুরক্ত ছিল। আমি একদিন বলেছিলাম—"তুমি ভালো বল্লেই ত ভালো হ'ল না। অনেকে আমার লেখা পছন্দ করে না।" কৃষ্ণবিহারী তাতে উত্তপ্ত হয়ে বলেছিল—"আমি ইংরাজী সাহিত্যে ভালো অনার্স পেয়েছি—ইংরাজির এম-এ তেও খুব ভালো ফল করেছি—অনেক ইংরাজি কবিতা পড়েছি, এখন বি-এ,র ছাত্রদের অনার্স পড়াচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা আমার নখদর্পণে। আমি বাংলা সাহিত্যের একজন লেখক, আমার মতামতের কোন মূল্য নেই, যত মূল্য আছে ঐ ঈর্ষাপরায়ণদের।" আমি বলেছিলাম—"ঈর্ষা-পরায়ণদের কথারও যেমন মূল্য নেই—পরম বন্ধুর কথারও তেমনি মূল্য নেই।" তাতে সে বলেছিল—"সে বন্ধু আমি নই—আমার চক্ষুলজ্জা বলে কিছু নেই।" যা হোক তার কাছে বহু রচনার বিরূপ সমালোচনাও পেয়েছিলাম; কৃষ্ণবিহারী কবিতা লিখত না, প্রবন্ধ লিখত। সে যখন যা কিছু লিখত, সেই লেখা নিয়ে কাগজে কাগজে খুব আলোচনা হ'ত। কৃষ্ণবিহারী আমাকে দেশবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সে ভাগলপুরে ইংরাজির অধ্যাপক হয়ে যাবার পর তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ খুব কম হত। শেষজীবনে কৃষ্ণবিহারী আরা কলেজে Principal ছিল। ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই সে মারা গেল। আমরণ আমার সঙ্গে সে নিয়মিত পত্র ব্যবহার করেছিল। আমার "লাজাঞ্জলি" তার নামে উৎসর্গ করা। কত ভাবেই যে সে আমার সাহিত্যসেবায় সাহায্য করেছে—সব কথা বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমার 'পর্ণপুটের' কোন কোন কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য লিখে মোহিতলাল একখানা ১৬ পাতার চিঠি লেখেন। সেই চিঠি আমি কৃষ্ণবিহারীর কাছে পাঠাই। কৃষ্ণবিহারী সেই চিঠির পাশে পাশে টীকা ও উত্তর লিখে চিঠিখানা আমাকে ফেরৎ দেয়। মোহিতলাল কিছুদিন পরে তার চিঠি ফেরৎ চেয়ে পাঠায় বোধহয় একটি প্রবন্ধের অঙ্গীভূত করার জন্য। আমি সেই সচীকপত্র মোহিতলালের কাছে পাঠিয়ে দিই। তারপর আমার দুই বন্ধুতে পত্রে পত্রে সংগ্রাম বেধে যায়। মোহিতলাল দুর্জয় প্রতিদ্বন্দ্বী। কৃষ্ণবিহারীও হটিবার পাত্র ছিল না। বিশেষতঃ তখন মোহিতলাল স্কুলমাষ্টার। আর কৃষ্ণবিহারী একটা প্রথম শ্রেণীর কলেজের সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। তার অধ্যাপকতার অভিমান ছিল খুবই। দুইজনে জীবনে দেখা যদিও এরা দুজনে পাশাপাশি গ্রামেরই লোক এবং দুজনের মধ্যে কুটুম্বিতাও ছিল। এঁদের দুইজনের লেখনীযুদ্ধ প্রকাশিত হলে লোকে আমোদ পেতে পারত। কৃষ্ণ-বিহারীর রসচক্র হতে প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলির ভাবধারা' একখানা উৎকৃষ্ট সমালোচনা পুস্তক হয়েছিল। এখন সে বই আর পাওয়া যায় না। এই একখানি অপূর্ব পুস্তক আজ বিস্মৃতি-সাগরে মজ্জমান। কৃষ্ণবিহারীর বড় ভাই ছিলেন অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত (গণিতের বিপিনবাবু ন'ন) ইনি রিপণ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। এঁকে বড়দাদা বলেই ডাকতাম। বিপিনবাবু অত্যন্ত রাশভারি লোক ছিলেন, খুব কম কথা বলতেন। তবে রিপণ কলেজের ছাত্রেরা থরথর করে কাঁপত। ইনি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ও 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামে দুইখানি পুস্তক লিখেছিলেন। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতি কথা। পরিপ্রশ্নের দ্বারা ঐ স্মৃতিকথা সংগ্রহ করেন। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' রামেন্দ্র সুন্দরের সঙ্গে বহু বিষয়ের আলো-চনার সংগ্রহ। এই চমৎকার পুস্তক দুখানা এখন আর পাওয়া যায় না। এই দুটি রত্ন বিস্মৃতির রত্নাকরের গর্ভে উদ্ধারের জন্য প্রতীক্ষা করছে। ইনি বলতেন—বড় বড় দিগ্‌গজ মনীষীদের বিদ্যার বৎসামান্য College Class এ বিতীর্ণ হয়—বাকি সবই দেহটাকে আশ্রয় করে অপচিত হয়। কেউ কেউ অবশ্য বই লেখেন—তাতে সবটা সঞ্চারিত হয় না। তবে এঁদের বইএর প্রকাশকও মেলে না। আমি ঠিক করেছি ঐ শ্রেণীর সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে পরিপ্রশ্নের দ্বারা অনেক কথা জেনে নিয়ে প্রচার করব। ব্রজেন্দ্র শীলকে ধরব, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে ধরব।"

ইনি অকালেই দেহত্যাগ করেন। এঁর দ্বারা কেউ বজায় রাখল না। এখন যারা পণ্ডিতদের কাছে যায়—তারা লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানে না কাজেই

তাদের সাহচর্যলাভের ফল তথাকথিত বন্য রচনায় পরিণত হয়।—জ্ঞানগর্ভ প্রণয় রচনার রূপ ধরে না।

শুনেছিলাম কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালকে বেষ্টন ক'রে একটি সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই গোষ্ঠী ছিল অভিজাত প্রবীণ সম্প্রদায়ের সাহিত্যসেবীদের। এজন্য এই গোষ্ঠীর দিকে কখনও আসিনি। কিন্তু ওই গোষ্ঠীর কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী আমার পরম বন্ধু হয়ে পড়লেন। দেবকুমারবাবু ছিলেন বরিশাল জেলার লাখুটিয়ার জমিদার।—অভিজাতসম্প্রদায়ের, শিরোমণি জমিদার ব'লে শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথের দুইজন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এঁর দুই ভগিনীপতি। দীনেন্দ্রঠাকুর ছিলেন এঁর ভায়ে। ইনি ছিলেন "প্রেমলতা"রচয়িত্রী কুসুমকুমারী দেবীর একমাত্র পুত্র—সেকালের একজন নাম-করা কবি। আমার সঙ্গে আলাপ হবার আগে ইনি 'বিজয়া' পত্রিকায় আমার উদ্দেশে একটি কবিতা প্রকাশ করেন। তার ফলে এঁর সঙ্গে বান্ধবতা। কবিতাটি মানসী পত্রিকার জন্য কবি যতীন্দ্রমোহনকে পাঠান। যতীনদা কবিতাটি ফেরৎ দেন। তাতে ইনি বড় দুঃখিত হন। আমার মতন একজন উদীয়মান কবির উপর লেখা কবিতা যে ছাপা চলে না—তা তিনি বুঝতেন না। পর্ণপুট'ই এঁর নামে উৎসৃষ্ট হয়েছিল—ইনি ঐ গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করেছিলেন। ইনি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি জীবন-চরিত রচনা করেন। ধারা, প্রভাতী ইত্যাদি নামে তাঁর কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থ ছিল। ইনি চল্লিশের কোঠাতেই দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে ইনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠের একজন ভক্ত সাধক হয়েছিলেন এবং সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী রচিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনচরিত রচনায় ইনি সহায়তা করতেন। এঁর সঙ্গে শেষ দেখা পুরীতে ঐ গোস্বামী প্রভুর মঠে।

পাঁচ ছয় বৎসর ধরে এঁর সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ ছিল। শেষ জীবনে ইনি রবীন্দ্র বিদ্বেষী হয়ে পড়েন। Gastric Ulcerationএ এঁর অকাল মৃত্যু হয়।

'সাহিত্য' পত্রিকাকে অবলম্বন করে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই গোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্র-নাথের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। সেজন্য এঁদের কাছাকাছি কখনও যাইনি। সেকালে 'সাহিত্য' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র শিষ্যদের রচনার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হত, যাকে আসল সমালোচনা বলে সম্পাদক তা কোনদিন করতেন না। তিনি মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচনাগুলোকে আশ্রয় করে এমন সব বাক্যশেল হানতেন যেগুলো লেখকদের মর্মভেদ করত। অনেকে পড়ে আনন্দ পেত এবং ভুল লেখা না পড়েই লেখার উপর ক্লিষ্ট প্রয়াসের ক্লিষ্ট টিপ্পনীগুলো সম্পাদককে একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক মনে করত। সম্পাদক ইংরাজী সাহিত্য পড়েননি, কিছু সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছিলেন, তার ফলে তাঁর মতামত যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হত। বহুদিন পর্যন্ত এরূপ টিপ্পনী কণ্টকিত মাসিক সাহিত্য সমালোচনার ধারা এদেশে চলেছিল। কিন্তু সমাজপতির মত গালি দেবার মুন্সিয়ানা কোন পত্রিকায় দেখা যায় না। 'শনিবারের চিঠি' অবশ্য পরে 'সাহিত্য' পত্রিকাকে মুন্সিয়ানায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, 'সাহিত্য' পত্রিকার গোষ্ঠীর কাছে কোন উৎসাহ লাভের আশা ছিল না। এই গোষ্ঠীর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের স্নেহ আমি লাভ করেছিলাম—তা আগেই বলেছি। একমাত্র এঁর গৃহেই আমার যাতায়াত ছিল। এঁর গৃহে একটি খুব বড় লাইব্রেরী ছিল। ইনি 'আর্যাবর্ত' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করতেন। আমি তার নিয়মিত লেখক ছিলাম। আর্যাবর্তে অনেক ভাল লেখা প্রকাশিত হ'ত।

বহরমপুরের কবি নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় থেকে বছর বছর এম. এ পরীক্ষা দিতেন। তিনি ক্রমে সাতটি এম-এ পাশ করেন। এঁর সঙ্গে বহরমপুরেই আলাপ ছিল। কিন্তু ইনি এত গম্ভীর ছিলেন যে এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সম্ভবপর হয়নি। সুধীনবাবু (সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেকালে একজন গণ্যমান্য সাহিত্যিক। ছোট গল্প ও সনেট লিখতেন। তাঁর ৩।৪ খানা বই ছিল। সে-সব বই এখন বিলুপ্ত। এখন তিনি সৌম্যেন ঠাকুরের পিতা বলেই পরিচিত। ইনি কবি করুণানিধানের কবিতার অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। একদিন নলিনীবাবুর সঙ্গে জোড়া-সাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে গেলাম।

এই আমার প্রথম জোড়াসাঁকোর তীর্থদর্শন। নলিনীবাবু যেতেন সুধীন্দ্রনাথের কাছে। নলিনীবাবুর কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সে সকল আজ বিলুপ্ত। তিনিও সাতটি এম-এ ডিগ্রীর মালা গলায় দিয়ে শেষ যৌবনেই চির বিদায় নিয়েছেন। তিনি দশবার (তিনবার ফেল হন) এম-এ পরীক্ষা দেবার জন্যই যেন জীবিত ছিলেন। নলিনীবাবুর সঙ্গে অনেকবার সুধীনবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। সুধীনবাবু ছিলেন অত্যন্ত শান্ত, ধীর মিতভাষী পুরুষ। কাজেই বেশি কথাবার্তা হতনা, কারণ নলিনীবাবুও ছিলেন অত্যন্ত মিতভাষী। আমি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে ঠাকুরবাড়ীর সর্বাঙ্গীণ পরিচয় বিশেষতঃ ঐ বাড়ীর সংস্কৃতিসাধনা সম্বন্ধে বহু তথ্য জেনে নিতাম। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুধীনবাবুকে অনেক কথাই বলতে হত। এঁর কাছে আমি রবীন্দ্রনাথের এক ভ্রাতা সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখি—তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। পরে অমলের সঙ্গে অনেকবার সে বাড়ীতে গিয়েছি—আদি ব্রহ্মসমাজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান, বৈঠক ও পারিবারিক নাট্যাভিনয় ইত্যাদি উপলক্ষে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে কোন কোন ভূমিকায় অভিনয়ে নামতে দেখেছিলাম।

৫নং বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় তিনখানা ইজীচেয়ারে অবনীবাবু, সমরবাবু ও গগনবাবু তিনভাই শুয়ে থাকতেন। সমরবাবু কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলতেন না। মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতাম। অবনীবাবু আর্ট সম্বন্ধে নিজের বিচিত্র উপলব্ধি সম্বন্ধে নানা কথা বলতেন। শুনে মনে হত সে সব বইপড়া কথা নয়; তাঁরই মৌলিক চিন্তার কথা। সে সব কথা পরে বাগীশ্বরী লেকচারের বইএ পড়েছি। তখন এঁদের গৃহে লক্ষ্মীশ্রীর অন্ত ছিল না, খুব ঘরদোর ঘরবরলা। পারিবারিক নাট্যাভিনয় এই বাড়ীতেই হ'ত। সেদিন দেখলাম সে বাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই—তা একটা উঠানে পরিণত হয়েছে। দেখে বড়ই ব্যথা পেলাম। সরস্বতীর সঙ্গে এক গৃহে বাস করতে না পেরে লক্ষ্মী পলায়ন করেছেন—ভবনটিকেও ধ্বংস করে গিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টিকে বুকে ধরে সরস্বতী নীলাকাশে হাসছেন।

একদিন জোড়াসাঁকোয় একটি সাহিত্যিক বৈঠক শেষ হলে আমার পিতা ডাঃ কালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। কবিগুরু বললেন—"ওঃ, তুমি ছাত্র কবি? তোমার লেখা 'ভারতী' 'প্রবাসী'তে দেখেছি। হাঁ, তোমার অন্তরের অনুরাগ আছে। লিখে যাও, লিখে যাও।" ভালোমন্দ কিছুই বললেন না।

কৃষ্ণ বিহারী আমাকে শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা ভবনে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আত্মভোলা সাধক কবি—একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তখন তিনি অন্ধ। 'কুন্দ' ও 'কিশলয়' আমার দুইখানা কবিতার ক্ষুদ্র পুস্তক উপহার দানের জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম। বই দু'খানি আমার নেহাৎ কাঁচা হাতের লেখা। ছাপা কাগজও অত্যন্ত অপকৃষ্ট। সে বই দু'খানা তিনি যে পড়বেন তা আমি প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কিছু দিন বাদে তাঁর 'অপূর্ব নৈবেদ্য' প্রকাশিত হল; তাতে দেখলাম—'কবি কালিদাস রায়ের প্রতি' (কুন্দ কিশলয় পাঠান্তে) শিরোনামায় একটা চমৎকার কবিতা। দেখে আমি অবাক হলাম। ভাবলাম—মানুষটা কত বড়। একজন উদীয়মান কবিকে উৎসাহ দেওয়ার কি অকপট গভীর আগ্রহ তাঁর। সে কবিতাটা ১৩৫৮ চৈত্র সংখ্যার 'কথা সাহিত্যের'র কালিদাস সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

খেয়ালী কবি দশদিনে দশখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে বইগুলো সাহিত্যরসিকদের হাতে হাতে বিলিয়ে দিয়ে এলাহাবাদে চ'লে গেলেন। বলা বাহুল্য, আমি একপ্রস্থ উপহার পেয়েছিলাম। সে বই আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। এর বাসাতেই আমার মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। মোহিতলাল দেবেন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ছিলেন। রবীন্দ্র শিষ্যের দল দেবেন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ছিলেন।

আজ দেবেন্দ্রনাথও বিস্মৃত প্রায়। মোহিতলাল ও কৃষ্ণ-বিহারী দুই প্রতিভারই তাঁর কবিতাবলীর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর রচনার একখানা চয়নিকা আজও প্রকাশিত হয়নি। আমি যখন ২৬ বৎসর আগে এলাহাবাদ গিয়েছিলাম, তখন তাঁর ভ্রাতা এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ সুরেন্দ্রনাথ সেন (তিনিও কবি) একখানা চয়নিকা সংকলন করতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি বলেছিলাম—এ যোগ্য ব্যক্তি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মোহিতলাল। তাতে

তিনি বলেন—কই মোহিত ত কোন সম্বন্ধ রাখে না, কোন আগ্রহও প্রকাশ করে না। শুনেছি মোহিতলাল একখানা চয়নিকা সংকলন করে গিয়েছেন—বোধ হয় বঙ্গ ভারতী প্রকাশ প্রতিষ্ঠান তা প্রকাশ করবে। ছাত্রদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় পাঠ্যপুস্তকে ২।১টি কবিতায়। ক্রমে পাঠ্যপুস্তক হ'তেও তাঁর রচনা বিলুপ্ত হ'তে চলল। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব মোহিত লালের কবিতায় নেই, কিন্তু করুণা নিধান ও কুমুদরঞ্জনের কবিতায় আছে। মোহিতলাল তাঁর বহু কবিতা মুখস্থ বলতে পারতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন কবিতার বহিরঙ্গীয় পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত অনুরাগী। তিনিও দেবেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের পরেই বাংলার শ্রেষ্ঠ জীবিত কবি ব'লে মনে করতেন। দেশবন্ধু তাঁর রচনার পরম ভক্ত ছিলেন। উভয়ের মধ্যে কবিতায় প্রীতিবিনিময় হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথকে বন্ধু বলে স্বীকার করে তাঁর নামে গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। 'সাহিত্য' পত্রিকার গোষ্ঠী, 'ভারতী' পত্রিকার গোষ্ঠী, 'মানসী' পত্রিকার গোষ্ঠী সকল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরাই দেবেন্দ্রনাথকে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি বলে ভক্তি করতেন। তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ ছিল না। এমন যে কবি তিনি কি করে আজ বিস্মৃত হ'তে চললেন ভেবে বিস্মিত হতে হয়। সেই সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে পড়তে হয়।

বাংলা দেশের এমন দুর্ভাগ্য যা স্থায়িত্বলাভের যোগ্য তাও স্থায়িত্ব লাভ করে না। পাষাণে বীজ বপন করলে কি তা অঙ্কুরিত হয়? বীজের দোষ কি?

এ দেশের পাঠকরা বর্তমান নিয়ে এত মত্ত যে অতীতের দিকে দৃক্‌পাত করবারও অবসর পায় না।

বহরমপুরের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় তখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ পেয়েছিলেন (কিংবা গবেষণা করছিলেন ঠিক মনে নাই।) কিন্তু তখনই তিনি গ্রন্থকার হয়েছেন। পরে তিনি ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় ও ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে যুগান্তর আনয়ন করেছিলেন, সে কথা কোন শিক্ষিত লোকের অবিদিত নয়। তাঁর স্নেহের আকর্ষণে তাঁর গৃহে যাতায়াত করতাম। তিনি বলতেন—আমি যে তথ্য সংগ্রহ করে যাব—তুমি তাকে কবিতায় রূপ দিও। সত্যেন দত্তকেও আমি এ কথা বলেছি। এঁর গৃহেই আমার মিতা ডাঃ কালিদাস নাগের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নারীর ভূমিকা

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[হিটলারের অভিনেত্রী বন্ধু]

অভিনেত্রীদের উপর এডল্‌ফ হিটলারের আশ্চর্য রকম ঝোঁক ছিল। অবশ্য সাদা রংয়ের অভিনেত্রীদেরই সে পছন্দ করিত, কারণ তার মতে তাহারাই খাঁটি আর্য-বংশসম্ভূতা। বাদামী রংএর আঁচ দেখলেই তাহার সন্দেহ হইত যে তাহার রক্তে দুয়ের রক্ত মিশ্রিত আছে। কাজেই জার্মানীতে এখন প্রত্যেক অভিনেত্রীর রং সাদা—হয় খাঁটি নয়ত কৃত্রিম।

সাদা রং ছাড়া অন্য কোন রংএর অভিনেত্রী হিটলারের নজরে পড়িবার আশা করিতে পারিত না। যাহার বর্ণ যত ছাই রং ঘেঁষা হইবে তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ততই উজ্জ্বল হইবে। অন্ততঃ পর্দার আড়ালে এই রকম ধারনাই চালু ছিল।

জার্মানীর জন্য চিরকাল অবিবাহিত থাকার প্রতিজ্ঞা না করিলে বোধ হয় সে তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি মার্শাল গোয়েরিং যে অভিনেত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল তাহাকেই বিবাহ করিত।

সে হিটলারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিল। তার ছেলে মেয়েদের সে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং সর্বদা মূল্যবান উপহার দিত।

এমি প্রকৃতই সুন্দরী অন্ততঃ যুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে যখন আমি তাহাকে দেখি তখন তাহাই বোধ হইয়াছিল। বোধ হয় বার্লিনে সে-ই সর্বাপেক্ষা প্রিয় অপেরা অভিনেত্রী। লম্বা নীল চোখ ভেলভেটের মত উজ্জ্বল রং ঠিক যেন একখানি ছবি। উজ্জ্বল সোনালী রং-এর চুল দিয়া সর্বদাই সে খোঁপা বাঁধিয়া রাখিত। সে চুলের উপর ব্যয়সাধ্য কৃত্রিম সাজসজ্জার প্রয়োজনই হইত না; দেখিলে একশুদ্ধ বেশন বলিয়াই বোধ হইত।

মঞ্চে ভিন্ন এমি কখনও কৃত্রিম অঙ্গসজ্জার আশ্রয় গ্রহণ করিত না। এমনকি সে পাউডারও ব্যবহার করিত না।

সে বলিত "আমি স্বাভাবিক ভাবেই থাকিতে চাই। রং এবং পাউডার মঞ্চেই ভাল, ঘরে তার স্থান নাই। ঐগুলি মেয়েদের কৃত্রিম করিয়া তোলে এবং মেয়েরা তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য মাতৃত্বের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। হিটলারের ঘোষিত বিশুদ্ধ নাজীবাদের কথাই সে বলিত।

লেখক বলিয়া সে যাহাকে জানে তাহার সামনে সে তাহার প্রভু এবং সে মালিকের মনের কথাই বলিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কোন নাজীই প্রচারের সুযোগ কখনও নষ্ট করে না।

এমি সোনেমান যখন কুমারী এমা সোনেমানের তখন হিটলারের ভোজ সভায় প্রায়ই যাওয়ার নিমন্ত্রণ হইত। ১৯৩৪ সাল হইতেই তাহাদের সম্বন্ধে গুজব ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। হুরার এবং এমি সম্বন্ধে আড়ালে অনেক কুৎসা প্রচারিত হইয়াছিল। আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে আমি বলিতে পারি যে ঐ সমস্ত কুৎসা একেবারেই ভিত্তি-হীন। তাহাদের মধ্যে কোন নিষিদ্ধ প্রণয় ছিল না। অভিনেত্রী এবং গায়িকা হিসাবে হিটলার এমির অত্যন্ত প্রশংসা করিত। সে তাহার বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষা করিত এবং সম্ভবতঃ তাহাকে দিয়া নাজীবাদের সাহায্য হইবে বলিয়াই মনে করিত, কারণ এমি তাহার এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিতে কখনও লজ্জিত হইত না।

কিন্তু হিটলার শীঘ্রই নিন্দুকদের মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিল।

একবার এক পার্টিতে হুরার তাহাকে বিপত্নীক গোয়েরিং-এর সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। কয়েক সপ্তাহ পরেই উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। সুন্দরী এমি বলিত

যে ইহা একটি প্রথম দর্শনেই ভালবাসার নিদর্শন। আমার নিজের ধারণা এই যে একজন পদস্থ সেনাপতি হিসাবে তার প্রতি এমির শ্রদ্ধা জন্মিলেও তার অর্থের প্রতিও এমির দৃষ্টি ছিল।

গোয়েরিং যে রকম ঐশ্বর্যের কুৎসিত আড়ম্বর ভালবাসিত সমস্ত জর্মানীতে আর কেহ সেইরূপ ছিল না। বিখ্যাত হওয়ার জন্য এবং নিজের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য সে রুচিবিগর্হিত যে কোন কাজ করিতে পারিত। বার্লিন হইতে কয়েক মাইল দূরে তাহারা যে বাসস্থান করিল সেই প্রাসাদ ঠিক তাহাদের রুচির উপযোগীই ছিল। তাহার ভোজন কক্ষে ১৩০ জন অতিথি বসিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কক্ষটি মার্বেল পাথরের মোড়া ছিল আর মেঝে অত্যন্ত মূল্যবান কার্পেটে মোড়া ছিল।

প্রাসাদের অজস্র কক্ষের প্রত্যেকটি বিভিন্ন ভাবে গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যের পরিচায়ক বহুপ্রকারের আসবাব পত্রের দ্বারা সজ্জিত ছিল। কারিন হলে তাহার একটি নিজস্ব পশুশালা ছিল। তার ভিতর এগারটি পোষা বাজ পাখী ছিল এবং বারটি বা তার কিছু বেশী সিংহের বাচ্চা ছিল এবং তার প্রত্যেকটির নাম ছিল কাইজার। বাচ্চাগুলি সম্পূর্ণ পোষ মানাইয়া ছিল এবং যুদ্ধের আগে এদিকে মোটরে করিয়া পোষা কুকুরের মত তাহাদের লইয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে। সাপ্তাহিক ভোজসভায় নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভীতি উৎপাদন করিয়া তাহারা প্রায়ই বাড়ীর মধ্যে বিচরণ করিত।

প্রকৃতপক্ষে তার বাড়ীটি একটি যাদুঘর ছিল, কারণ গোয়েরিং সব রকমের কারুশিল্পের অনুরক্ত ছিল। তার বিরাট সংগ্রহশালা ছিল। পরে যুদ্ধে পরাজিত দেশের লুঠের মালে আরও ভরিয়া উঠিয়াছিল।

গোয়েরিংএর সাজসজ্জা ও নানারকম পোষাক পরিচ্ছদও হয়ত অভিনেত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। কিন্তু মার্শালের জীবনস্রোত যদি অন্য খাতে প্রবাহিত হইত তাহা হইলে ভাঁড় হিসাবে সে অসামান্য সাফল্য লাভ করিতে পারিত। সে নানারকম নূতন ধরনের পোষাক আবিষ্কার করিতে ও পরিতে ভালবাসিত। এখন তার ৮৭ রকমের পোষাক আছে এবং দিনের মধ্যে তাহাকে পাঁচবারও পোষাক বদলাইতে দেখা গিয়াছে। তার ইউনিফর্মের অনেকগুলি তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত। সেগুলি অবশ্য প্রচলিত রীতিসম্মত ছিল না এবং জার্মান সামরিক বিভাগের সরকারী ইউনিফর্মের তালিকায় তাহার স্থান ছিল না।

এমি বলতো যে তার কোন রাজনৈতিক ধারণা নাই এবং তার স্থান রাজনীতির মধ্যে নহে গৃহের মধ্যে এবং স্ত্রী হিসাবেই সে তাহার অস্তিত্বের দাবী করে। কিন্তু রাজনৈতিক উৎসবাদিতে সুযোগ পাইলেই সে যোগদান করে এবং তার হীরা, জহরৎ, পোষাকপরিচ্ছদ ইত্যাদির জাহির করে।

হিটলারের উপর এমির অসাধারণ প্রভাব। সে তাহাকে প্রতিভাশালিনী দূরদৃষ্টিসম্পন্না নারী বলিয়া মনে করে এবং যখন কোন কারণে জনসাধারণের সমর্থনের প্রয়োজন হয় তখন হিটলার তাহার পরামর্শ গ্রহণ করে।

ইংরাজ এবং ইংরাজী সব কিছুর উপর একটা তীব্র বিদ্বেষ এমি সব সময়েই প্রকাশ করে। ইংরেজদের গোঁয়ার্তুমি ও প্রতারণাই যুদ্ধের মূল এই কারণে তাহাদের কঠিন ফলভোগ করা উচিৎ এই প্রচারই সে করিত।

ইচ্ছা করিলে আজ সে জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হইতে পারিত; কিন্তু চতুর অভিনেত্রীর অতখানি দুরাশা ছিল না। তার নিজের দুর্বলতা কোথায় তাহা সে জানিত। হীরা, জহরৎ, পোষাকপরিচ্ছদ, জাঁকজমক এসবের প্রতি তাহার দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল এবং ইহার সবই গোয়েরিং তাহাকে দিতে পারিত।

এমির শত্রুও আছে। তার মধ্যে প্রধান হইল মাগ্‌দা গোয়েবেল্‌স। ভূতপূর্ব অভিনেত্রীর উপর তাহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। কারণ হিটলারের প্রিয়পাত্রী হিসাবে প্রচার সচিবের স্ত্রীর উপর মুরুব্বিয়ানা ফলাইবার অনেক সুযোগ তাহার ছিল।

মাগ্‌দা তখন নূতন গঠিত সমাজনৈতিক বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিল। তার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে ইহার উদ্দেশ্য ছিল জার্মান মহিলাদের কৃত্রিমতার সাহায্য ব্যতীত সুশ্রী থাকার উপায় নির্দেশ করা।

এই বিভাগের পরিচালিকার সম্বন্ধে ও তাহার নিয়োগ সম্বন্ধে এমি খোলাখুলি ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত।

গোয়েবেল্‌সের অধীনে জার্মান প্রেস অভিযান চালাইতে ছিল যে, জার্মান মহিলাদের খাঁটি জার্মানীতে প্রস্তুত কাপড়-চোপড় ব্যবহার করা উচিত।

জনসাধারণের নিকট এমি পোষাকের জাঁকজমকের জন্য বিখ্যাত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময় সে ফ্রান্স হইতে মোটামুটি পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার কেনার সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল।

সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত জার্মান দূতবাসের মারফৎ জিনিসপত্রগুলি কেনার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তাদের উপর প্যারিসে গিয়া ঐগুলি কুমারী সোনামানের নামে পাঠাইয়া দিবার নির্দেশ ছিল।

ব্যাপারটি নিরাপদে মিটিয়া যাইত কিন্তু সীমান্তের শুল্কবিভাগ গোয়েরিংএর স্ত্রীর কুমারী নাম চিনিতে না পারিয়া জিনিসগুলি আমদানী শুল্কের জন্য আটক করিল।

বার্লিনের কয়েকজন সাংবাদিক খবরটা জানিয়া ফেলিল, কিন্তু মন্ত্রীসভার নির্দেশে সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতে পারিল না।

গোয়েবেল্‌সের নিকট মাগ্‌দা ঘটনাটা শুনিয়া একটা কেলেঙ্কারী ঘটাইবার সুযোগ পাইল।

ক্রুদ্ধ সমাজনৈতিক পরিচালিকা গোয়েরিংএর বাড়ী গিয়া এমির সহিত দেখা করিতে চাহিল।

গোয়েরিং পত্নী শান্ত ভাবে হাসিমুখেই তাহাকে স্বাগত জানাইল। সে ছিল পাকা অভিনেত্রী, অন্যের সম্মুখে মনের তিক্ততা গোপন রাখা তাহার পক্ষে খুব সহজ ছিল।

এমির দুর্ভাগ্যক্রমে মাগ্‌দা যখন উপস্থিত হইল, এমির বৈঠকখানায় তখন কয়েকজন অতিথি উপস্থিত ছিল।

মাগ্‌দা তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর মত অভিনেত্রী ছিল না। গোয়েরিংএর মত পদস্থ ব্যক্তির স্ত্রী হইয়া সে প্যারিস হইতে পোষাকপরিচ্ছদ কেনার সাহস করে এবং আরও অন্যায় কথা এই যে সে সরকারী শুল্ক পর্যন্ত ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে, এই জন্য বিষম উত্তেজিত অবস্থায় সে সেখানে উপস্থিত হইল এবং সোজা তার বক্তব্য বিষয় উপস্থিত করিয়া গোয়েরিং-পত্নীর আচরণ সম্পর্কে তাহার মত জানাইল। ক্রুদ্ধা স্ত্রীলোকটির জিহ্বা সংযত করা কিছুতেই সম্ভব হইল না। একটা তিক্ত অবস্থার সৃষ্টি হইল এবং শেষ পর্যন্ত মাগ্‌দা গোয়েরিং পত্নীকে "সস্তা বিলাসিনী অভিনেত্রী" বলিয়া গালি দিয়া চলিয়া গেল।

এই ঝগড়া কোন দিনই মেটে নাই। হিটলার সর্বদাই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিত যাহাতে একই উৎসব উপলক্ষে কখনও মাগ্‌দা ও এমিকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করা না হয়।

এমিও তাহার স্বামীর মত বিশ্বাস করিত যে বৃটিশ-বোমা বার্লিনের মাটিতে কখনও পড়িবে না। কিন্তু যখন ব্রিটিশ বোমা জার্মানীতে প্রথম পড়িল তখন এমিই প্রথম নিরাপদে পলায়ন করিল।

সে তাহার সন্তানাদি লইয়া অষ্ট্রিয়ায় চলিয়া গেল।

সেখানে সে মোটেই জনপ্রিয় হইতে পারিল না। নিজের দেশে তাহার মর্যাদা অনুযায়ী সে যে কোন উচ্চবংশের অষ্ট্রিয়ান অপেক্ষা নিজেকে বড় বলিয়া মনে করিত। অষ্ট্রিয়ানরা ভূতপূর্ব অভিনেত্রীর এই ব্যবহার ও আড়ম্বর পছন্দ করিল না।

হিয়েনাতেও এমির সহিত লুণ্ঠনকারী হিসাবে গোয়েরিং-এর খ্যাতি পৌঁছিয়াছিল। একদিন রাত্রে যখন সে নানারকম অলঙ্কার ও একটি হীরার টায়রা পরিয়া নাট্যমঞ্চে উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত দর্শক দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ঐ টায়রাটা কোথা হইতে চুরি করিয়াছ?" সকলের সমস্বর চীৎকারে এমিকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া পলায়ন করিতে হইল এবং পুলিশকে শান্তিরক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে হইল।

ঘটনার পর কুড়িজনকে গ্রেপ্তার করা হইল। ফলে শেষ পর্যন্ত অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল।

মাগ্‌দা গোয়েবেল্‌সের কানে শীঘ্রই ঘটনার বিবরণ পৌঁছিয়া গেল এবং সে মনের আনন্দে খবরটা বার্লিনে প্রচার করিয়া দিল।

একজন ইংরাজ বালিকা এমির অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিল। সে হিটলারের ভক্ত এবং নাজীবাদে দীক্ষিতা ছিল। এমি

এবং গোয়েরিংএর বিবাহবাসরে সে উপস্থিত ছিল। বিবাহের পর নিমন্ত্রণবাসরে গোয়েরিং ঘোষণা করিল যে এমি এবং তাহার ইংরাজ বান্ধবী আর্ধনারীর দুইটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

মাসের পর মাস এই ইংরাজ মহিলা হিটলারের সংস্পর্শে ছিল। তাহার আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ হিটলার তাহাকে একটি সোনার স্বস্তিক দিয়াছিল। তারপর বোধহয় কিছু একটা ঘটিয়াছিল কারণ বালিকাটি হিটলারের বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িল। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে কয়েক সপ্তাহ থাকার পর শেষ পর্যন্ত তাহাকে এই দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখন সে স্বাধীনভাবে বোধহয় প্রায় অকর্মণ্য অবস্থায় ব্রিটেনেই আছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সে কখনও নাজীবাদ পরিত্যাগ করে নাই।

এমি গোয়েরিংও তাহার স্বামীর ন্যায় তীব্র ইংরাজ-বিদ্বেষী ছিল। ব্রিটেনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার জন্য সব কিছুই সে করিতে পারিত। হিটলারকে সর্বদাই ইংরাজ বিদ্বেষী করিয়া রাখাই বর্তমানে তাহার কাজ। তাহার স্বামীর কথা এখন এডল্‌ফ হিটলার সর্বদাই শুনিবে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা ছিল না, তাই এই কাজে তাহার স্বামী তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। জার্মানবাহিনীকে জয়ের শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া দিতে অকৃতকার্য হওয়ার জন্য হিটলারের উপর তাহার প্রভাব কমিয়া গিয়াছিল। দাম্ভিক, উৎকট ভাব-প্রবণ, বাক্যবাগীশ গোয়েরিং গত শরৎকাল পর্যন্ত হিটলারের অনুগ্রহভাজন ছিল। এখন অবশ্য হিটলার তাহার সম্বন্ধে ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেছে। প্রায়ই তাহার কথার খেলাপ হইয়াছে। তবুও হিটলার গোয়েরিংএর বাড়ীতে যায় এবং এমির নিকট চলতি গুজব বা তাহার স্বামী ও পুত্র কন্যাদের কথা শোনে। কিন্তু মার্শাল যত ভুলই করুক না কেন হিটলারের উপর এমির যতদিন প্রভাব থাকিবে ততদিন তাহার স্বামীরও নিরাপদ থাকিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বিপদ্‌জনক নারী]

বেনিটো মুসোলিনীকে ইটালীর নিরঙ্কুশ নিয়ন্তা বলা যাইতে পারে, তাহার উপরেই জাতির ভাগ্য নির্ভর করে। কিন্তু বেনিটো মুসোলিনীও একটি নারীর দ্বারা প্রভাবিত। লাগামটি তাহার হাতেই আছে তাহার মস্তিষ্কই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

মুসোলিনী সর্বদাই একটি ভাব দেখায় যে সে একটি বিরাট শক্তিমান পুরুষ এবং তাহার ইচ্ছাই আইন। প্রকৃত-পক্ষে ,এই তর্জন গর্জনকারী লোকটি একটি নারীর মুখপাত্র। ঐ নারী এক সময় ইটালীর রাণী হওয়ার বাসনা করিয়াছিল।

কাউন্টেস এড্ডা সিয়ানোর এই উচ্চাশা সফল হয় নাই। কিন্তু এদিকে বিফল হইলেও তার দেশের শাসনকর্ত্রী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে কখনও বিসর্জন দেয় নাই।

আমাকে যদি কেহ ইয়োরোপের সর্বাপেক্ষা বিপদ্‌জনক নারীর নাম করিতে বলে তবে আমি নিঃসন্দেহে এড্ডা সিয়ানোর নাম করিব।

সরকারীভাবে ফ্যাসিষ্ট ইটালীতে জনসাধারণের কাজে নারীর কোন স্থান ছিল না। ফ্যাসিষ্ট নীতি অনুযায়ী তাহাদের গৃহে থাকিয়া জাতির জন্য সন্তান পালন করার কথা এবং পুরুষদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কথা।

এড্ডা সিয়ানো আবিষ্কার করিল যে সরকারী শাসন-যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া একাধিক ব্যক্তি যাহা করিতে পারে তাহা অপেক্ষা পর্দার আড়ালে থাকিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোক বাদ দিয়া একাই সে অনেক অধিক পরিমাণে নিজের দেশের শাসনব্যবস্থা ও ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

এড্ডা ইল ডিউসের প্রিয় কন্যা। সে কঠিন হস্তে তাহার পিতাকে শাসন করিত। সে ছিল কল্পনাপ্রবণ, দাম্ভিক ও অত্রভেদী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাহার কোন কাজে বাধা দিলেই বোঝা যায় যে সে ইটালীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ নারী।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সে দিন গুনিতে থাকে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে থাকে এবং প্রয়োজন হইলে বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিয়া সুযোগ পাইলে শত্রুর পশ্চাতে ছুরিকাঘাত করে। সে কখনও সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না। সে সুযোগের অপেক্ষা করে

এবং শিকার যখন আঘাত সম্বন্ধে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকে তখন মারাত্মক আঘাত করে। ভদ্র এবং অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সে প্রথমে মন হইতে সন্দেহ নিরসন করার চেষ্টা করে। তার অমায়িকতা যেখানে যত বেশী বিপদও সেখানে তত বেশী।

এড্ডার সহিত আমার অনেকবার দেখা হইয়াছে। ইটালীর রাজধানীতে মুসোলিনীর বিজয় অভিযানের কিছুদিন পরেই প্রথম তাহার সহিত আমার রোমে দেখা হয়। অবশ্য মুসোলিনীর সে অভিযান ছিল রেলের প্রথম শ্রেণীর সেলুনে আরাম এবং বিলাসিতার মধ্যে।

এড্ডা সুন্দরী ছিল না। সে বেঁটে, তার বুক সরু এবং ঠোঁটে কাঠিন্যের ছাপ। চোখের ভিতর তার চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। অদ্ভুত সবুজ আভাযুক্ত ধূসর বর্ণের চোখ। মেয়েদের মধ্যে এরকম নিষ্ঠুর চোখ আমি কাহারও দেখি নাই। মুখ দেখিলেই তাহাকে কুচক্রী ও কলহপ্রিয় বলিয়া মনে হয়। কথা বলার সময় মনে হয় যে আলোচ্য বিষয় হইতে অন্যত্র অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাহার মন নিয়োজিত আছে। তার হাত সর্বদাই চঞ্চল, মস্তিষ্ক কোন সময়েই বিশ্রাম পায়না। কথা বলার সময় সর্বদাই হাত নাড়ান এবং অঙ্গভঙ্গী করা অভ্যাস।

তার পিতার মত তার চালচলনও অনেকটা নাটকীয় ধরনের। সে সর্বদাই একটা বাহ্যিক ছদ্মাবরণ অবলম্বন করিয়া থাকিতে ভালবাসে। অদ্ভুত স্ত্রী এবং বাতার অভিনয়ই তাহার বিশেষ পছন্দ।

তার জন্ম সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে। শোনা যায় যে মুসোলিনী যখন ইটালী হইতে পলাতক হইয়া সুইজারল্যাণ্ডে ছিল সেই সময় একটি রাশিয়ান সোস্যালিষ্ট নারীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়।

মুসোলিনীর ন্যায় রাশিয়ান স্ত্রীলোকটিও নিজের দেশ হইতে পলাতক ছিল। সেখানে সমস্ত জাতির পলাতকদের একটি আড্ডায় উভয়ের দেখা হয় এবং উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মে।

এই গল্পের মূলে সত্য যাহাই থাকুক না কেন মুসোলিনীর স্ত্রীর সহিত বা এড্ডার ভাই বোনদের সহিত এড্ডার কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইল ডিউসের উপর আধিপত্য বিস্তার-কারিণী এই স্ত্রীলোকটি অপেক্ষা তাহারা অনেকেই বেশী স্বাস্থ্যবান।

এমনকি তাহার বয়সটাও রহস্যময়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কাউণ্ট সিয়ানোর সহিত বিবাহের সময় তার বয়স বলা হইয়াছিল ১৯; কিন্তু তাহাকে বয়সের তুলনায় অনেক বড় দেখাইত। আমি যখন তাহাকে ৬ বৎসর পূর্বে দেখি তখন তাহাকে ৪০ বৎসরের কাছাকাছি বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

ইংল্যাণ্ডের উপর এড্ডার তীব্র বিদ্বেষ ছিল। শিশুকাল হইতেই সে ইয়াঙ্কি বা ইংরাজদের কিছুই ভালবাসিত না। তদানীন্তন সমাজতন্ত্রবাদী স্নেহময় পিতা তাহার মনে শৈশব অবস্থাতেই এই বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই সে বলিত "ধনতন্ত্রের স্বর্গ, সেখানে দরিদ্ররা উপবাসী থাকে এবং তাহাদের পদদলিত করিয়া ধনীরা আরও ধনী হয়"।

ব্রিটিশ জাতি লোভী এবং অর্থগৃধ্নু, অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া রাজত্ব করিতে চায়। এই ধারণার মধ্যেই সে লালিতপালিত হইয়াছে।

প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে এড্ডা ইংলণ্ডে আসিয়াছিল। সে তখন ইটালীর ফ্যাসিষ্ট নেতার কন্যা। রাজা অপেক্ষা ফ্যাসিষ্ট নেতার ক্ষমতা তখন অধিক।

কল্পনাপ্রবণ এড্ডা তখন অতি সাধারণ নারী। সে অনুমান করিয়াছিল যে ব্রিটিশরা তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইবে। কিন্তু তেমন কিছুই হইল না।

এদেশে একজন ইটালিয়ান অভ্যাগত ছাড়া সে আর কিছুই নয়, কাজেই সাধারণ ভদ্রতা ছাড়া আর কিছুই সে পাইতে পারে না।

তার সম্মানের জন্য সরকারী অভ্যর্থনা ও ভোজসভার আয়োজন হইয়াছিল ইহা সত্য, কিন্তু ইহাতে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিটিল না। সে চাহিয়াছিল রাণীর মর্যাদা এবং সম্মান।

সমাজে সে সাধারণ ভদ্র ব্যবহারই পাইয়াছিল—কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। ইটালীর এই কুচক্রী স্ত্রীলোকটির সহিত লণ্ডনের ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হইল না। বিরক্ত হইয়া এড্ডা ইটালীতে ফিরিয়া গেল।

ইংল্যাণ্ডকে সে ঘৃণা করিত। এইবার সে তাহার প্রতিশোধ লইবার চক্রান্ত করিতে লাগিল।

তারপর আসিল আবিসিনিয়ার যুদ্ধ। ইংল্যাণ্ড ইটালীর বিরুদ্ধে নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ করিল।

এড্ডা বলিল, "ইটালীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের এইরূপ করিবার সাহস হইল কি করিয়া? আমাদের বন্ধু বলিয়া পরিচিত জাতি যদি এইরূপ আচরণ করে তবে ইটালী নিশ্চয়ই তাহার প্রতিশোধ তুলিবে। এমন দিন আসিবে যখন ইংল্যাণ্ড ইটালীর বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিবে, তখন ইটালী" তার দাবী জানাইবে কোন ধরা প্রদর্শন করিবে না।"

অনেকদিন হইতেই এড্ডা ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইতেছিল।

লণ্ডন হইতে ইটালীতে ফিরিবার পথে এড্ডা বার্লিনে একমাস ছিল। নাজী নেতাদের সহিত সাক্ষাতের সময় ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে তাহার মতামত মাত্রই গোপন করিল না। ইহার ফলে তাহারা দেখিল এড্ডা স্বেচ্ছায় তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে।

বার্লিনে রাতারাতি এড্ডাকে রাণীর মর্যাদায় সম্মানিত করা হইল। প্রতিহিংসার বীজ বপন হইয়া গেল।

জার্মানী এবং ইটালী একসঙ্গে কাজ করিবে—ইহাতে দুইটি জাতিরই উপকার হইবে। তাহারা একসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের শক্তি এবং প্রভাব খর্ব করিতে পারিবে; উত্তরে জার্মানী এবং দক্ষিণে ইটালী।

নূতন পরিকল্পনা লইয়া এড্ডা রোমে ফিরিয়া গেল। সে নিজেকে একজন কূটনিতিক বলিয়া মনে করিল। এখনও সে তাহাই মনে করে।

এক সময় সে গর্ব করিয়া বলিয়াছিল "পুরুষেরা অনেক দিন ধরিয়া কূটনৈতিক জগৎ অধিকার করিয়া আছে, এখন মেয়েদের আসিয়া পুরুষদের ভুলভ্রান্তিগুলি সংশোধন করার সময় আসিয়াছে। মেয়েদের মস্তিষ্কের সহিত পুরুষদের মস্তিষ্কের তুলনা হয় না"।

এক বৎসর পর পুনরায় সে বার্লিনে ফিরিয়া আসিল। এই এক বৎসর সে রোমে তাহার পিতার সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিয়া তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এই দুইবার সাক্ষাতের মধ্যে রোম এবং বার্লিনের মধ্যে অনেকবার গোপন বার্তাবিনিময় হইয়া গিয়াছে এবং একাধিক উচ্চপদস্থ জার্মান দূত নূতন কূটনিতিক এড্ডার সহিত আলোচনা করিয়া গিয়াছে।

বার্লিনের কূটনিতিকরা শীঘ্রই দেখিল যে বেনিটো মুসোলিনী সম্পূর্ণরূপে তার কন্যার প্রভাবে চলিত হইতেছে। কন্যা তাহাকে যেদিকে নিয়া যাইবে সেই দিকেই সে যাইবে। জার্মানী এবং ইটালীকে একসূত্রে বন্ধন করিতে হইলে এই আশ্চর্য নারীর দ্বারাই তাহা সম্ভব। ইংল্যাণ্ডের ধ্বংসের জন্য যে কোন চক্রান্তেই সে অংশ গ্রহণ করিবে।

মুসোলিনী যে ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সতর্ক ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া এড্ডার উপদেশেই চলিত একথাই লোকে বলিত।

ইটালী এবং জার্মানীর মধ্যে কোনদিনই প্রকৃত বন্ধুত্ব ছিল না—একজন আর একজনের উপর ঈর্ষা এবং সন্দেহ পোষণ করিত। জার্মানী ইটালীকে সর্বদাই দুর্বল এবং নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিত এবং নিজেদের দেশ রক্ষা করার মত ক্ষমতাও তাহাদের আছে বলিয়া মনে করিতনা।

কিন্তু ১৯৩৬ সালে ইটালীর ধাপ্পা এবং বাগাড়ম্বরে জার্মানীও প্রতারিত হইল। জার্মানীর অনেকে মনে করিল একনায়কত্বের অধীনে আসিয়া ইটালীর বোধ হয় অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, মুসোলিনী বোধহয় একটি নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়া ইংল্যাণ্ডের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

জার্মানী ইটালীর বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিল। পৃথিবী বিজয়ের পরিকল্পনায় সে ইটালীর সাহায্য চাহিল। অতএব এড্ডা আবার বার্লিনে নিমন্ত্রিত হইল।

প্রথম সাক্ষাতের সময় এড্ডা রাণীর মত অভ্যর্থনা পাইয়াছিল। ১৯৩৬ সালের আড়ম্বর তাহা ম্লান করিয়া দিল।

সর্বত্রই তাহাকে সম্মান দেখান হইল। বার্লিন টার্মিনাসে তাহাকে গার্ড অব অনার দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইল। সেখানে নাজী নেতারা তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল, পতাকা সজ্জিত রাস্তা দিয়া তাহাকে অশ্বারোহী সৈনবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

অভ্যর্থনার জাঁকজমক তার গর্বিত মনের নিকট অত্যন্ত অকেরণীয় হইল।

পরে আরও অনেক কিছু হইল। হিটলার তাহাকে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করিল এবং হিটলারের দক্ষিণ দিকে তাহার আসন নির্দিষ্ট হইল। হিটলার তাহার হস্ত চুম্বন করিয়া তাহার বুদ্ধি এবং দক্ষতার প্রশংসা করিল এবং তাহার বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ নিজের হাতের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি ফটোগ্রাফ তাহাকে উপহার দিল।

রিবেন্ট্রপ, গোয়েরিং, গোয়েবেলস এবং অন্যান্য সকলে তাহাকে ভোজসভায় আপ্যায়িত করিল এবং ভাঁড়ের ন্যায় তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। ইটালীই একমাত্র দেশ যার কৃষ্টি, শিল্প ও সঙ্গীত পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এড্ডা টোস্ট দিলেন।

গোয়েরিং তাহাকে তাহাদের প্রাসাদে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। তাহারা আজীবন বন্ধুত্বের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। এড্ডার নামে গোয়েরিং-এর একটি কন্যার নামকরণ হইল।

কুডলফ্ হেসের সহিত তাহার দীর্ঘ আলোচনা হইল। কুডলফ হেস্ মেডিটেরিনিয়ানের নাজী বিশেষজ্ঞ ছিল।

ঐ আলোচনাতেই বার্লিন-রোম-গ্রন্থির ভিত্তি স্থাপিত হইল।

নূতন পরিস্থিতি ঘোষণার আনন্দে উৎসাহিত হইয়া এড্ডা রোমে ফিরিয়া গেল।

শোনা যায় সিয়ানো বলিয়াছিল "জার্মানীর সহিত আমাদের বন্ধুত্ব সম্ভব নহে। জনসাধারণ এইরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাইবে। প্রস্তাবটি অবাস্তব।"

এড্ডা বলিল "জনসাধারণ বিরুদ্ধতা করিবে? কে এরকম বিরুদ্ধতা করিতে দিবে? জনসাধারণকে যেরূপ আদেশ করা হইবে তাহারা সেইরূপই করিবে।"

সিয়ানো দুর্বলভাবে বলিল "প্রস্তাবটি কিন্তু জনপ্রিয় হইবে না।"

তাঁর স্ত্রী বলিল "জনপ্রিয়তার অর্থ কি? জনসাধারণ তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক কি তাহা জানে না। আমাদেরই তাহা স্থির করিয়া দিতে হইবে। জার্মানীর সহায়তায় আমরা মেডিটেরিনিয়ান এবং অর্ধেক পৃথিবী আয়ত্বে আনিতে পারিব। সময় আসিলে ইটালীর লোক জার্মানদের অভ্যর্থনা করিবে।

সিয়ানো বৃদ্ধস্বরে বলিল "যা ভাল বোঝ কর"।

চার মাস পরে ইটালীর বৈদেশিক মন্ত্রী সিয়ানোকে প্রথম চুক্তি সম্পাদন করার জন্য বার্লিনে পাঠান হইল। চুক্তিগুলি সবই পূর্ব এড্ডা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল এবং এই চুক্তির জন্যই ইটালীকে যুদ্ধে নামিতে হইল।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এড্ডার বিদ্বেষ আজ পূর্বাপেক্ষা আরও গভীর হইয়াছে। রোমের লোকদের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে লণ্ডনে বোমা ফেলার জন্য এবং জার্মানীকে ইটালীয়ান বিমান দিয়া সাহায্য করার জন্য এড্ডাই দায়ী।

মুসোলিনী প্রথমতঃ প্রস্তাবের বিরোধী ছিল। কিন্তু তাহাকে শেষ পর্যন্ত কন্যার প্রস্তাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইল। তাহারই বিশেষ অনুরোধে ইটালিয়ান বিমান ইংল্যাণ্ডে বোমা ফেলিতে গিয়াছিল, ইহাতে তাহার দেশের সহিত জার্মানীর জোট পাকান প্রমাণ হইলে পরে ইটালীর উপর পাল্টা আঘাত আসিতে পারে ইহা ভাবিয়া ইল্ ডিউস শঙ্কিত হইয়াছিল।

শোনা যায় এড্ডাকে সে বলিয়াছিল "ব্রিটিশও কিন্তু রোমে বোমা ফেলিতে পারে।"

এড্ডা উত্তর দিয়াছিল "ব্রিটিশের সে সাহস নাই। আমাদের বিমান অবশ্যই ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করার জন্য যাইবে। জার্মানীর উপর আমাদের এটা একটা কর্তব্য।"

অতএব ইটালীর বিমান ইংল্যাণ্ডের উপর গেল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তাহাদের আবার ফিরিয়া আসিতে হইল। ঐ দিক দিয়া জার্মানীর কোন সাহায্যের প্রয়োজন ছিলনা। জার্মানীর অধিকৃত স্থানের উপর ইটালিয়ান বিমানের উপস্থিতিতে জার্মানীর ঝঞ্ঝাট আরও বাড়িল।

এড্ডা এখানে চালে ভুল করিল। ইটালিয়ান পাইলট দেখিয়া জার্মানী বুঝিয়া ফেলিল যে ইতালীর সামরিক দক্ষতার কোনই উন্নতি হয় নাই। মুসোলিনীর সামরিক প্রস্তুতি কেবল আড়ম্বর মাত্র এবং নাজীদেরই ইহার জের টানিতে হইবে।

পরে আলবানিয়াতে এবং উত্তর আফ্রিকায় ইতালির পরাজয়ে এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল।

অনেকটা এড্ডার চাপে পড়িয়াই মুসোলিনী নিরপেক্ষতার মুখোস খুলিয়া ফেলিয়াছিল। এড্ডার স্থির বিশ্বাস ছিল যে ব্রিটেন শেষ আঘাত পাইয়াছে এবং এবার জার্মানী ইটালীকে অতিক্রম করিয়া এড়াইয়া যাইবে। এই সুযোগে পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করাই প্রশস্ত। দুই চারি দিনের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটিবে একথা ভাবিয়া মুসোলিনী ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এই কুচক্রী স্ত্রীলোকটি ইটালীর অধিবাসীদের নিকট অনেক কিছুর জন্যই ধন্যবাদের পাত্রী হইয়া রহিল।

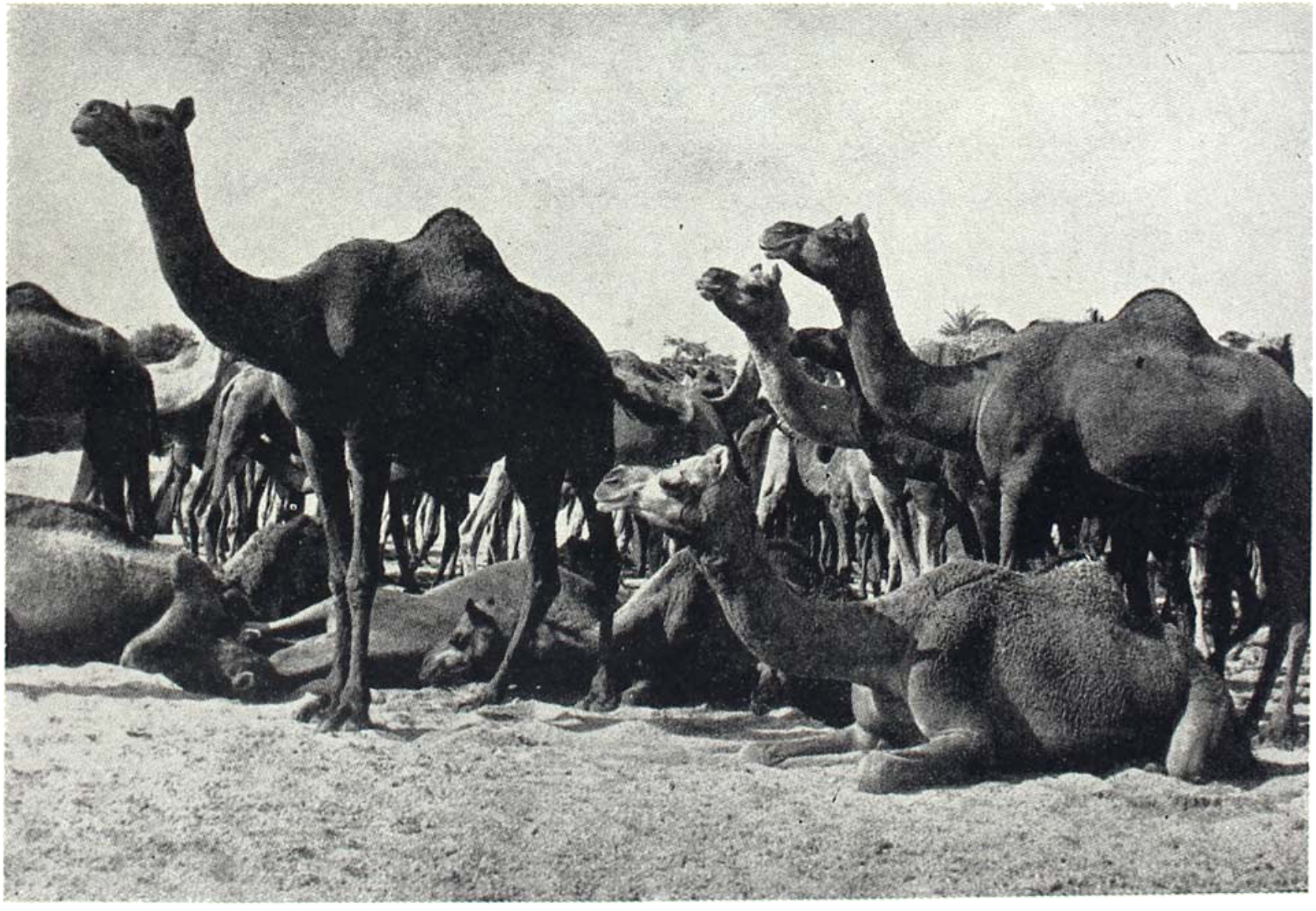

যৌথ পরিবার

॥ নোটিশ ॥

শারিপুত্ত মৌগল্যায়ন

মাথার সামনের জানালাটা খুলে দেয় মৃগাংক। একটা মিষ্টি বাতাস এসে আছড়ে পড়ে কপালে, মুখে। বেশ লাগে ভোরের এ সজীব স্পর্শ। এর একটা আলাদা অনুভূতি আছে।

সূর্য এখনো ওঠে নি। সবে পূব দিগন্তে একটু একটু আলো ফুটে উঠেছে। এত ভোরে কোনদিনই ওঠে না মৃগাংক। ওঠার বিশেষ প্রয়োজনও এতদিন হয়নি।

কিন্তু আজকের কথা আলাদা। আজকের দিনটি অনেক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এসেছে। মৃগাংকের মুখে একটা অস্পষ্ট আনন্দের রেখা উঁকি মারে।

মেঝের বিছানা ডিঙিয়ে বাইরের উঠোনে এসে বসে ও। রাস্তায় জল দেওয়ার আওয়াজ আসছে। কাগজওয়ালাদের সাইকেলের ঘন্টা বাজছে।

সত্যি আজকের দিনটা নতুন। অন্ততঃ মৃগাংকের কাছে ত বটেই। তার অনেক ব্যর্থতা, অনেক ক্লান্তির পর—আজকের দিনটি একটা নতুন পরিচয় নিয়ে আসছে। মৃগাংক ভাবনার চেয়ে-বেশী উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। সূর্য উঠছে।

মৃগাংকের আর যেন সবুর সইছে না। তাই উঠান ছেড়ে আবার ঘরে এসে মাকে জাগায়।

বলে "ওঠ ওঠ, সেযকালে রান্নাই শেষ করতে পারবে না তুমি। ওঠ, ওঠনা মা।" তারপর বোনের গাল টিপে জাগিয়ে তোলে ওকেও। অলস চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে কপোট রাগের ভান করে বলে "কিরে রাণু সূর্য যে মাথায় এল। সবাই উঠে পড়েছে, তোরই ওঠার নাম নেই। ওঠ এখারে। একটু চা টা কর।"

মা সস্নেহে মৃগাংকের দিকে তাকায়। ওর ছেলেমানুষী ভাবটা মায়ের হৃদয়ে একটা পরম তৃপ্তির পরশ আনে। মা হাসে। তারপর মুখ ফিরিয়ে দুহাত জোর করে দেবতার কাছে আজকের দিনটির সার্থকতা কামনা করে। বিছানার চাদরটা টানতে টানতে আবার কথা কয় মা "তোর যে আর সবুরই সইছে না। পারিস ত এখনি ছুটিস্ যেন।"

"তুমি জান না বলেই এসব বলছ মা। ভাবছি চাকরী পেলে আমায় অর্ধেক দিন না খেয়েই যেতে হবে কিনা!"

মৃগাংক আর দাঁড়ায় না। দ্রুত পদক্ষেপে উঠোন পেরিয়ে বাথরুমে এসে ঢোকে। ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় মনটা যেন আরো বেশী মুখর হ'য়ে ওঠে। উচ্ছ্বাসের উত্তেজনায় গুন্‌গুনিয়ে একটা সুর ভাজে ও। উনুনের নীলাভ ধোঁয়াটা সমস্ত বাথরুমটা ছেয়ে যাচ্ছে। আর দাঁড়ানো যায় না।

মৃগাংক বেড়িয়ে আসে বাথরুম থেকে। উঠোনে উঠতে গিয়েই আবার রাণুর সাথে মুখোমুখি।

চুলগুলো পেছনে সরাতে সরাতে হাসলো মৃগাংক। তারপর রাণুর চুলের গোছায় টান দিয়ে বলল "জলদি চা আন্ রাণু। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই তোর শাড়ী—প্রথম মাস কেন? আজই—হ্যাঁ, আজই তোকে শাড়ী দেব। অতএব একটু ঘুষটুস্ দে—"

দাদার উৎসাহের দি'কে চোখ মেলে রাণুও হাসলো। চুলগুলো ওর হাত থেকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—"আগে তোকেই না। সাতদিন ধরে যা দেবার লিষ্ট করছ তা সারা বছরের মাইনা দিয়েও হয় কিনা সন্দেহ।" মৃগাংক হাসে। এপাশের তার থেকে গামছাটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে "হবে। নিশ্চয়ই হবে। শৈলেনবাবুই ত বলেছেন এ ইন্টারভিউর বিষয় ভাবতেই হ'বে না। জানিস শৈলেনবাবু কে?"

শৈলেনবাবুর পরিচয় রাণু জানে। এ সাতদিন এ নামটাই এ বাড়ীতে সব চেয়ে বেশী আলোচিত হয়েছে। তাই দাদার ব্যক্তি পরিচয়ের জন্য সময় নষ্ট না ক'রে সরে যায় রাণু।

মৃগাংক কিছুক্ষণ চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ওর পতি-পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাণুর শাড়ীটা ছিঁড়ে গেছে। ঐ ত মাত্র একটা শাড়ী। দুঃখ-দৈন্যতা আর কষ্টে ওর কুমারী মনটাও বুঝি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ওর যন্ত্রণা আর সবাই তাড়ো শাড়ী পরে—বেণী দুলিয়ে আলতোভাবে পেন্সিলটা চিবুকে ঠুকতে ঠুকতে কলেজে যায়। হাজার আনন্দে তারা মুগ্ধ। আর রাণু—

একটা অস্পষ্ট ব্যথা এসে হঠাৎ মৃগাংকের সারা দেহ মনে জড়িয়ে ফেলে। না এবার জীবনের একটা অন্য রূপ দিতে হবে। রাণুকে সুখী করতে হবে। আসছে বছরই ওকে কলেজে ভর্তি করে দেবে সে।

মৃগাংক এই সাতদিনের মধ্যেই আগামী দিনগুলোর পরিষ্কার পরিকল্পনা করে রেখেছে। সুস্থ সবল জীবনের একটা স্বাভাবিক নক্সা এঁকেছে মনে মনে। দরজা ছেড়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় মৃগাংক। এখানে দাঁড়িয়ে খাল পাড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছটা চোখে পড়ে। মৃগাংক তাকায়। সূর্য উঠে গেছে। প্রথম মিষ্টি আলোটা কৃষ্ণচূড়ার বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওর মুখে এসে পড়ে।

মৃগাংক অবাক হয়ে দেখে।

এত সুন্দর হ'তে পারে কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম ফুলগুলো?

এত মাদকতা আছে সূর্যালোকের?

কই আগে ত এসব চোখে পড়েনি?

আর পড়বেই বা কি করে? মৃগাংক ভাবে।

কি অসহ্য গ্লানি—কি নিদারুন দৈন্যতার মধ্যেই না আড়াইটা বছর কেটে গেল। এই সাতটা দিন আগেও তার রেশ ছিল। সে সব কথা ভাবতে গেলেও শিউরে ওঠে মৃগাংক। আজকের উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্যে সেই প্রাক্তন পংকিল দিনগুলোর কথা না ভাবাই ভাল।

সন্তু আর শিবি এরি মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে বসেছে। বিষয়টা কি দেখতে যাওয়ার আগেই মায়ের হুঙ্কার কানে আসে। রাণু মাঝখেকে সন্তুকে বকতে বকতে শিবিকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। সন্তু ভাই দাদার কাছে এসে ছোট মাথাটুলিয়ে মালিশ জানায়। কেন জানি একটু বেশী মাত্রায় বাৎসল্য এসে পড়ে মৃগাংকের।

আজ যেন সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেছে। সন্তুকে কাছে এনে স্নেহের সুরে বলে "ও ত ছোট,—ওর সাথে কি ঝগড়া করতে আছে। তুমি ত দাদা। ঝগড়া কোর না। যাও ভাই মনিকে আদর ক'রে এসো—যাও।"

দাদার কথায় ধীরে ধীরে আদর করার অঙ্কই বুঝি বেড়িয়ে যায় সন্তু।

মৃগাংক আবার বাইরের উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকায়। চোখের সম্মুখে আকাশের রং ডিঙ্গিয়ে অনেক মুখ ভেসে ওঠে।

সব।—সব চেনা মুখ।

মা, রাণু, শিবি, সন্তু।

এদের প্রত্যেকের দায়িত্ব তার ওপরেই। অথচ কি পারলো মৃগাংক? একটু হাসিও ত আনতে পারলো না? বরক দারিদ্র্যতার নিষ্পেষণে জ্বলে পুড়ে ছাই ছাই হয়ে গেছে তারা সবাই। তার প্রতিদিনের ব্যর্থতা এ সংসারে দুঃখসহ আঘাত করেছে—তাদের শান্ত সংযতবদ্ধতা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

কিন্তু আজ—

বহু গ্লানি, বহু হতাশার পর আজ একটা বাঁচার দীপ্ত শিখা জ্বলে উঠেছে। মৃগাংক হাসে। নতুন করে সে বাঁচবে। নতুন পরিচয়ে তার পথ সৃষ্টি হবে। সংসারের নক্সা পাল্টন হ'বে।

কল্পনার রেশটা খান্ খান্ করে দিয়ে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢোকে রাণু। টেবিলটার উপর ছড়িয়ে রাখা সার্টিফিকেট-গুলো সরিয়ে চায়ের কাপটা রাখে। একটা বিশ্রী আওয়াজ তোলে টেবিলটা।

রাণু হাসে।

বলে "দাদা তোমার চা—"

সচকিতে জানালা থেকে সরে ওর সামনে এসে কাপটা তুলে জিজ্ঞাসা করে মৃগাংক, "ভাত চাপিয়েছিস ত?"

"এবার চাপাব। এত তাড়া কেন?"...

"তুই বুঝবি না রাণু—বুঝবি না। আজ দেখছি না খেয়েই ইনটারভিউ এ্যাটেণ্ড করতে হ'বে।"

রাণু চুপ। একবার শুধু ওর অস্থিরতার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর সোজা ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এলো।

মৃগাংক চেয়ারটার ওপর ভালো করে বসে নিয়ে আবার সার্টিফিকেটগুলো টেনে নেয়।

এপ্লিকেশনে যা-যা দিয়েছিল তা সবই ঠিক আছে। এগুলো সরিয়ে এবার ইনটারভিউ লেটারটা দেখে ও। দেখে আর উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। এই সাতদিনে বহু বার দেখেছে এটা। শুধু কি সে-ই! মা দেখেছে—রাণু দেখেছে—চেনা জানা অনেকেই দেখেছে। এর মধ্যেই যেন একটা সুন্দর সুখী জীবনের নক্সা রয়েছে।

মৃগাংক এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডুপ্লিকেট কাগজের পর টাইপকরা অক্ষরগুলোর দিকে।

ইংরেজী হরফগুলোকে কেন্দ্র করে মৃগাংকের মনের মণিকোঠায় অতীতের দিনগুলো হাহাকার করে ওঠে।

মৃগাংক ভাবে—

দীর্ঘ আড়াইটা বছর যুদ্ধ করেছে মৃগাংক। তিল তিল ক'রে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল তারা। বাপীর মৃত্যুটা —তাদের জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। কলেজ জীবনের সোপান থেকে হঠাৎ নেবে আসতে হয়েছিল বাস্তবের উগ্রতায়। সব আশা—সব ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি হয়ে গেল। বাঁচতে হবে—চাকরী চাই—অন্ন চাই—আশ্রয় চাই, কিন্তু—কে দেবে চাকরী? কে বাঁচার জন্য আশ্রয় দেবে? প্রতিদিন মৃগাংক মাথা খুঁড়েছে। ডালহাউসী থেকে বিড়িরপুরের ডক্ এরিয়া পর্যন্ত সব চষে ফেলেছে ও। কিন্তু কোথায় চাকরী? চাকরী শব্দটা যেন রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

প্রত্যহ বিরাট ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে এসেছে ও। উন্মুখ হয়ে রাণু, মা, শিবি, সন্তু পথ চেয়ে থাকত। নিজের কপালটা মুছতে মুছতে প্রত্যহই ব্যর্থতার বাঁধা কথাগুলো বলতে হত।

তবু চলত দিনগুলো। ধারকর্জ করে কোন রকমে জোড়া তালি দিয়ে দিয়ে তবু মাথা গুঁজে আছে ওরা। এর নাম কি বাঁচা? মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে মৃগাংক। তার তরুণ মন সব কিছু ভেঙ্গে খান্ খান্ করে দিতে চেয়েছে। আজকের মিথ্যে সভ্যতার মুখোস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ছাই ক'রে দিতে চেয়েছে।

কিন্তু পারে নি সে—পারে না সে।

এত সাধনা এত দৈন্যতার মধ্যেও তবু অপ্রত্যাশিত ভাবেই নতুন উদ্যম এলো—নতুন উৎসাহ এলো।

প্রত্যহর মত সেদিনও মৃগাংক ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে এসেছিল বাড়ীতে। আজও কিছু হোল না বলার আগেই মায়ের উৎকণ্ঠতায় চম্‌কে যায় মৃগাংক। শুধু মা-ই নয়।—রাণু শিবি এমন কি সন্তুও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ল। মৃগাংক চম্‌কেই উঠেছিল। তারপর বোকার মত সপ্রশ্নে মুখ তুলে তাকিয়েছিল ও'দের মুখর মুখগুলির দিকে। এক সঙ্গে সবার কথায় কিছু বুঝল—কিছু বুঝল না ও।

তারপর রাণুই এগিয়ে দিয়েছিল রেজিষ্ট্রি চিঠিখানা। ওদের মুখের উজ্জ্বলতাকে ছাপিয়ে ক্লান্ত মৃগাংকের মুখে উন্মাদের নতুন ব্যঞ্জনা উঠ্‌ল। ভেতরের চিঠিটা খুলে ফেল্‌ল সামনে।

এক একটা অক্ষর যেন জীবনের এক একটা জটিলতা খুলে দিচ্ছিল। আড়াই বছরের অনেক শত এপ্লিকেশনের একটা উত্তরই নয়—একেবারে ইনটারভিউ।

সব ভুলে সব ফেলে চিঠিটাকে শক্ত মুঠোয় জড়িয়ে ধরেছিল সেদিন। তারপর ছুটতে মাকে আর রাণুকে টেনে এনেছিল বুকের নিবিড়তায়।

বলেছিল "এবার আমরা সত্যি বাঁচবো মা!"

সেদিন জীবনের অন্যরূপ—অন্যমনে দেখেছিল মৃগাংক।

শৈলেনবাবুর উৎসাহেই এই দরখাস্তটা করেছিল। তারি এক বন্ধু নাকি রিক্রুটিং অফিসার! না কোন সন্দেহ-ই আর নেই! এ চাকরীটা হবেই!

মৃগাংক হাসে। দক্ষিণের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে।

চায়ের কাপটা সরিয়ে রাখে ও।

পাশের ফ্লাট থেকে বিশ্রী কান্নার আওয়াজ আসছে। রমাকান্ত বাবুর বাচ্চাটা বোধহয় মারা গ'য়েছে।

ইস্ বেলাও কম হয়নি!

মৃগাংক আপন মনেই বলে, মা যেন কি! একটুও হুস্ থাকলে হোত!

চেয়ার ছেড়ে দ্রুত পদক্ষেপে রান্নাঘরে এসে ঢোকে ও। মায়ের নিশ্চিন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে একটু

গম্ভীর স্বরেই বলে "কি মা ভাত হোল ?—কটা বাজলো খেয়াল আছে ?—"

মা নিরুত্তর। রাণু হাসে।

তারপর রান্নাঘরের জীর্ণ জানালাটার দিকে তাকিয়ে নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলে রাণু "এইবার চাল ছাড়ব দাদাভাই।"

রাণুর কৌতুকের রেশটা মৃগাংককে ধরে ফেলে। তবু কপোট রাগতঃ স্বরে মা'কে সামনে রেখে বলে "মা তুমি ওকে সাবধান করে দাও কিন্তু।"

ছেলের মুখের দিকে মুখ রেখে হাসে মা। "তুইও যা কেমন বলত! এই ত সবে দাতটা। এত অস্থিরতাই বা কেন ? যা, ধীরে সুস্থে সব হয়ে যাবে।"

বোনের কাছে পরাজয় মেনে নিয়েই বেরিয়ে আসে মৃগাংক। ওর সামনে রাগের ভাব প্রকাশ করলেও বাইরে এসে ওদের আড়ালে আনন্দে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে।

সত্যি কি অপূর্ব পরিবর্তন তাদের সংসারের। সবাই হাসছে—সবাই অভিমান করছে।

এই ত চেয়েছে সে—এই ত সুখী জীবনের নক্সা।

মৃগাংক পায়চারী করে।

এবার বাঁচবে সে—নিশ্চয়ই বাঁচবে। নতুন রূপ নিয়ে দাঁড়াবে সে।

তারপর—

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবেই স্তব্ধ হয়ে গেল মৃগাংক। অন্তরের কোথায় যেন একটা পরিচিত সুর রেণু রেণু হয়ে আছড়ে পড়ছে। বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে মৃগাংক।

না—আজো সব পরিষ্কার মনে আছে ওর। সব—সব কিছু মনে আছে।

আড়াই বছর আগেকার একটা রোমান্টিক স্বপ্ন। একটি তরুণ মনের উত্তাল জোয়ারের দিনের রং-মিছিল।

এত দারিদ্র্যতা, এত দৈন্যতা, এত ব্যর্থতাতেও সে দিনগুলির অনুভূতি যেন একটুও পাল্টায়নি।

এ পালটাতে পারে না—কখনই পারে না। মৃগাংক আনমনেই ব'লে ফেলে কথাগুলো।

আশ্চর্য লাগে ওর। সত্যি এতদিন কি ক'রে ভুলেছিল। আর সে ভুলবে না। এবার যাবেই—নিশ্চয়ই যাবে। আকুল বিহ্বলতা নিয়ে বলবে—

কিন্তু কি বলবে ? কি বলতে হয় ? মৃগাংক ভাবে। এই সুদীর্ঘ আড়াইটা বছরের ব্যবধানে হয়তো সুনীতি কত পালটেই না গেছে। তার পরিচয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ত ওর মন অনেক দূরে সরে গেছে।

না—না—এ হতে পারে না—এ কখনোই হতে দেবে না সে।

মৃগাংক মাথা নাড়ে। সে কিছুতেই এ স্বীকার করবে না—কিছুতেই না।

সুনীতি—সুনীতি—

আপন মনেই ও উচ্চারণ করে শব্দ কটি। তিনটে শব্দের সংমিশ্রণের মনের এ ভিন্ন আর্দ্রতা আগে কখনো টের পায়নি মৃগাংক।

শ্রাবণের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় সুনীতি মৃগাংকের চোখে নতুন রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল। সেখানে বন্ধুই শেষ নয়—সঙ্গিনীই সমাপ্তি নয়—

আরো আছে—আরো কিছু থাকবে।

সেদিন দুজনে ভিজেছিল। দুজনে তাকিয়েছিল দুজনার দি'কে। দুটি মুগ্ধ হৃদয় মিশে গিয়েছিল। অথচ মৃগাংক এই আড়াইটা বছর ভুলেই গিয়েছিল সে বর্ষার কথা—সে অঙ্গীকারের গুরুত্বতা।

মৃগাংক ওবাড়ীর নতুন চুণকাম করা শোবার ঘরটার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে।

রোদটা পায়ে এসে পড়েছে। দু'একটা চড়াই উড়ে এসে পাখার শব্দ তুলে আবার চলে যাচ্ছে।

মৃগাংক পায়চারী ক'রে।

আজ সে যাবেই সুনীতির কাছে।

আজকের সার্থকতার কথাটা তাকেই প্রথমে জানাবে সে। মৃগাংক যেন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না। ইচ্ছে হয় এখনই ছুটে যায় সুনীতির কাছে। তবু সব বাসনা ছেড়ে আপাততঃ নাইতে যেতে হয় মৃগাংকের। মনের আবেগে জলের পর জল ঢালে মাথায়।

বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে মা চিৎকার করে ওঠে, "ওরে অত জল ঢাললে আমরা নাইবো কি করে ? তুই কি আজ একেবারেই ছেলেমানুষ হয়ে গেলি নাকি ?"

কিন্তু কে শোনে কার কথা। উপরন্তু আনন্দের

কলরোলে দরজার একটা পাল্লা খুলে বালতি সুদ্ধ জল ঢেলে দেয় মাকে, রাণুকে, শিবিকে, সন্তকে।

একটা আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে এ বাড়ীর ছোট্ট পরিবারটিতে। জীবনের জোয়ার এসে গেছে এ বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। মা বোঝে, মৃগাংক বোঝে—রাণু বোঝে।

তাই আজ আর কেউ কাউকে বাধা দেয় না।

রোদটা বাড়ীর কার্নিসে এসে পড়েছে।

রান্নাঘর থেকে ডালের গন্ধ আসছে। সত্যি সত্যি এবার যাবার সময় হোল।

মৃগাংক সব গুছিয়ে নেয়। অস্থিরতাটা কেমন যেন চাপা উদ্বেগের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। কেমন একটা অসহায় ভাব এসে গেছে।

থালা শুদ্ধ ভাত ফেলে রেখেই মুখ ধুয়ে উঠে পড়ে মৃগাংক। মা লক্ষ্মীর ঘটের বেলপাতা মাথায় ছোঁয়ায়। অপরিসীম আশীর্বাদে মৃগাংককে ছেয়ে ফেলে মা।

শিবি সন্তকে আদর করতে করতে মৃগাংক বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার মোড় ফিরতে গিয়ে পেছন ফেরে ও।

মা দাঁড়িয়ে আছে দরজায় আর রাণু দাঁড়িয়ে তারই পাশে। জীবনের নতুন দিনটিতে তারা বুঝি উদারতা ঢেলে দিচ্ছে। মৃগাংক চোখ ফেরায়।

সামনের পানের দোকানটা থেকে আজকে একটা সিগারেটই কিনে ধরিয়ে নেয়। অন্য দিন হলে দুটো পয়সা এভাবে খরচা করতে হয়ত সাহস পেত না ও। কিন্তু আজকে দিনটি স্বতন্ত্র। আজকে এ তুচ্ছতার কোন কথাই উঠ্‌তে পারে না।

মৃগাংক জোরে জোরে হাঁটে। কর্মব্যস্ত মানুষের স্রোতের মধ্যে সেও একজন। ভাব্‌তে বেশ ভালো লাগে ওর।

আজ ফেরার পথে শিয়ালদার বাজারটা একটু ঘুরে আসতে হবে। শিবি সন্তর বড় ইলিশ মাছের সখ। শুধু ওদেরই? সেও বাদ যায় না—রাণুও না।

আর কিন্‌তে হবে একখানা শাড়ী—

সেই যে আকাশী রংয়ের শাড়ীটা। এই তো সেদিনও শো-কেসে দেখে এসেছে মৃগাংক। ওতে বেশ মানাবে রাণুকে—

দাম হয়ত একটু বেশীই পড়বে। তা হোক—নতুন চাকরী পেয়ে দাদা যদি একটু দামেই শাড়ী দেয় তাতে কি দোষ হয় নাকি?

আজ সত্যি অনেক কাজ—অনেক—অনেক।

সবার আগে যেতে হবে বিপিনদার অফিসে। কটা টাকা দেবে সে!

আজ সবাই ধার দেয়—দিতে চাইছে। মৃগাংক হাসে। অথচ এইত কিছুদিন আগেও সবাই হাত ঘুরিয়েছে। কেউবা এড়িয়ে গেছে—কেউবা মুখের সামনেই বলেছে তুমি শোধ করবে কি করে?—

মৃগাংক সিগারেটটায় জোরে জোরে টান দেয়। বিপিনদার কাছ থেকে শিয়ালদা। তারপর—

তারপর মীর্জাপুর—

সুনীতি—

হঠাৎ একটু দাঁড়িয়ে উত্তরের আকাশটার দিকে তাকায় ও। সুনীতি বাড়ী থাক্‌বে তো? চিনবে তো মৃগাংককে? হাঁ নিশ্চয়ই চিনবে। চিনবেই। নিজেই নিজের মনকে প্রবোধ দেয় মৃগাংক।

হয়ত রাগ করবে সুনীতি। হয়তো অভিমানে ফুলে উঠ্‌বে ওর উন্নত গ্রীবা।

বেশ হবে—রাগ্‌লে বড় সুন্দর দেখায় নারীকে। তারপর—উঃ, বাসটায় যা ভীড়। ডালহাউসীর বাসটা স্টপেজে এসে দাঁড়াতেই অফিসমুখো মানুষের ব্যস্ততায় মৃগাংকর কল্পনার খেই হারিয়ে যায়।

মৃগাংকও কোন রকমে ওঠে বাসটায়। বাস চলে।

মৃগাংকের মনে হয় বাসটা তাকে নতুন জীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ও হাসে। আকাশটা বড় নীল।

ঠিক সুনীতির চোখের মত। কতদিন সে-চোখ দেখে না ও। আড়াই বছরের ব্যগ্রতা আজ হঠাৎ সমস্ত আকাশটায় দেখতে পায় ও।

নীল বৈচিত্র্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে কখন যেন সময় কেটে গেল। কখন যেন ডালহাউসীর সীমানায় এসে গেল বাসটা।

মৃগাংক নাবে। পকেটের সার্টিফিকেটগুলো একবার

ভালো করে অনুভব ক'রে ত্রস্ত পদক্ষেপে ভীড় ঠেলে এগোয় ও।

সমস্ত চিন্তাধারাটা মুহূর্তেই পল্টে গেল! বাড়ীঘর, আকাশ, বাস, সুনীতি, চোখ সব—সেরে গিয়ে সেখানে রূপ নিল তুলট কাগজ, টাইপ করা হরফ, সার্টিফিকেটগুলো উত্তেজনায় ওর শরীরটা কাঁপে।

নির্দিষ্ট অফিসে এসে পেসে মৃগাংক। এ্যালুমিনিয়ামের প্লেটে সোনার জল দিয়ে লেখা সাইনবোর্ডটা। লাল কার্পেটটা সিঁড়ি থেকে নেমে উঠে গেছে ওপরে। সামনেই ভেতরে কাঁচের দরজা। সেটা এত পরিষ্কার যে ধরতে ভয় হয়—সংকোচ হয়।

মৃগাংকের বুকটা কেঁপে ওঠে।

ছোট্ট রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে এগোতে যায় ও।

হঠাৎ ওর চোখের দৃষ্টি আটকে যায় কাচের ওপর আঁটকানো একটা ছাপানো কাগজের দিকে। তেমনি তুলোট কাগজ—তেমনি টাইপ করা অক্ষর।

একটা নোটিশ!

কৌতূহল চাপতে না পেরে মৃগাংক পড়তে থাকে—"বিশেষ জরুরী বিবেচনায় এ বছর নতুন করিয়া লোক নিয়োগ করা আমাদের সম্ভব নহে। গত বছরের বিরাট ঘাটতি—"

আর পড়তে পারে না মৃগাংক। সমস্ত মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। কার্পেট, লেখা, নোটিশ সব একাকার হ'য়ে ওর মাথায় এক বিপুল আলোড়ন তুলছে। তবু আধ চেতনার মধ্যে মৃগাংক আবার চোখ নাবায় লেখাটার মর্মার্থের দিকে—

"গত শনিবার এমার্জেন্সী জেনারেল মিটিংএ ইহাই স্থির হইল। যাঁহারা আজ ইন্টারভিউ পত্র লইয়া আসিবেন তাঁহাদের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পরবর্তী কোন সময়ে প্রয়োজন হইলে তাহাদেরই প্রথম আহ্বান করা হইবে……।"

আর পড়া যায় না, চারিদিকে সব অন্ধকার—চারিপাশে হতাশার মিছিল। কোথায় যাবে—কি করবে সে?

রাস্তার ওপরেই বসে পড়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয় মৃগাংক। সত্যি আর ওর শক্তি নেই। কানের কাছে যেন লক্ষ হাতুড়ীর শব্দ।

সেই অস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যে একবার যেন মা ভেসে উঠলো—একবার বাপু—একবার শৈলেনবাবু আর—

আর একবার সুনীতি। মৃগাংক দু'হাতে চোখ ঢাকে। ইচ্ছে হয় প্রাণ খুলে কাঁদে।

মৃগাংক উঠে দাঁড়ালো। পা টলছে। চোখ কাঁপছে। কান্নাকে যেন আর কিছুতেই আটকাতে পারছে না ও। তবু চোখ দুটো জোর ক'রে সামনের আকাশের অতলান্তে মিশিয়ে দেয়।

না—সে নীল আর নেই। এখন কেমন যেন একটা ছাই ছাই রং।

আজ নতুন করে রিক্ত বোধ মৃগাংক। নতুন করে নিঃস্ব বোধ।

পারবে কি মৃগাংক আবার নতুন ক'রে সংগ্রামে নাবতে। পর্যুদস্ত মন কি আবার জাগতে পারবে?

মৃগাংক ভাবে।

মা হয়ত দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বাপু বুঝি আকাশী রংয়ের শাড়ীর আশায় সময় গুনছে।

শিবি-সন্তু চকোলেটের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

আর—আর সুনীতি—

সুনীতির কাছে কি আর কোনদিনই যাওয়া যাবে?

মৃগাংক চোখ মোছে।

তারপর হাজার ভীড়ের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে এগিয়ে চলে স্প্লানেডের দিকে।

মৃগাংক আজ মরল।

স্পন্দিত সত্যতার নিষ্পেষণায় একটি তরুণ মন পরাজিত হোল।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক প্রেমিকা

সুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

প্রেম ভগবানের আশীর্বাদে পূত জিনিস। পুরুষের প্রাণে এই প্রেম জাগ্রত করে নারী, সৌন্দর্য পূজার প্রথম হোমশিখা প্রদীপ্ত করে নারী, মুকুলিত কবিত্বকে ফুটাইয়া তোলে নারী। তাই কবি নারীকে অভিহিত করিয়াছেন "পবিত্র তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী, তুমি ভীষণ মধুর" বলিয়া। এই সৌন্দর্য রূপ নানাভাবে নানারসে প্রেমিকের চিত্তকে আবিষ্ট করে। তখন সে প্রিয়ার নয়ন পানে বিহ্বল নেত্রে তাকাইয়া থাকে। তাহাতে প্রিয়ার হৃদয়ে যে অনুরাগের সঞ্চার হয় কবি সেই চিত্রটি আঁকিলেন।

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ মাঝারে
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে,
মনের এ রুদ্ধ স্রোত দেহখানা করি বিদারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখি করিতে প্লাবিত।

যৌবনের সমস্ত কামনা বাসনা মথিত করিয়া যে কামনা উত্থিত হয় তাহা নারীর জন্য। জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে নারী পুরুষের চোখে প্রতিভাত হয় অপূর্ব সুন্দররূপে। চতুর্দিকের পরিবেশ তখন নারীময় হইয়া উঠে। ফুলের স্পর্শ মনে হয় যেন প্রিয়ার কোমল স্পর্শ, দক্ষিণ বাতাসে নিঃশ্বাস মনে হয় বিরহীনী প্রিয়ার দীর্ঘশ্বাস। বসন্তের গোলাপের দিকে চাহিলে মনে হয় রূপসী প্রিয়ার অনুরাগ রঞ্জিত লজ্জারক্ত রাঙ্গা কপোলখানি। উষার বাতাসে তিনি কাহার অঞ্চলের মৃদু স্পর্শ অনুভব করেন। "প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার।"

বসন্তের আকাশের মধ্যে প্রিয়ার মিলনচুম্বন দেখিলেন। মেঘের পাশে মেঘ দেখিয়া তাহাতে ক্ষণিকের চুম্বনের ছোঁয়াছোঁয়ি দেখিলেন।

"দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছোঁয়ি মাঝে যেন সরসের হাস,
দুখানি অলস আঁখি পাতা, মাঝে সুখ-স্বপন আভাস।

নারীর দেহ-সৌন্দর্য প্রেমিককে মুগ্ধ করে। তাহার দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যে সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য হইল, সুকোমল স্তন। কিন্তু কবি এই স্তনকে কামনার বস্তুরূপে দেখেন নাই। কবির নিকট ইহা "পবিত্র সুমেরু" "দেবতার বিহার ভূমি" "প্রেমের সঙ্গীত", বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে নারীর প্রাণে যে মধুর প্রেমের সঞ্চার হয়, বাহিরে তাহাই কুসুমিত হইয়া ফুটিয়া উঠে। যাহার সৌরভ সুধা প্রেমিকের পরাণ পাগল করিয়া তোলে তাহা কবির কাছে পবিত্র মন্দির স্বরূপ। তিনি বলিয়াছেন :—

হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর
হের নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

শুধু তাহাই নয়। ইহা যেন চিরস্নেহ উৎস ধারায় অমৃতরাশি নির্ঝরিত করিয়া বিশ্বের অধরকে সিক্ত করিয়া দিতেছে, দেখিতে পাইলেন।

প্রেমিক প্রেমিকার আরেকটি কামনার বস্তু হইল তাহাদের চুম্বন। এই চুম্বনকে কবি দেখিলেন যেন :—

গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থ যাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।

প্রিয়তম ও প্রিয়তমার প্রেমকে কবি কখনও খারাপ চোখে দেখেন নাই বরং তাহাদের প্রেমকে নানাভাবে পবিত্রতার রূপ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কবি মানস সুন্দরীকে বলিতেছেন "তোমার রিক্ত হস্ত আলিঙ্গনে ভরিয়া দিয়া আমার কণ্ঠ জড়াইয়া ধর, তোমার সুকোমল স্পর্শে আমার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠুক, অন্তর উদ্ভাসিত হউক, আমাকে প্রিয়তমা বলিয়া সম্বোধন কর, কুন্তল আকুল মুখ আমার বক্ষে রাখিয়া অর্থহারা ভাবে ভরা ভাষায় কথা বল। যখন তোমার কাছে চুম্বন মাগিব, তখন গ্রীবাখানি বাঁকাইয়ো না, উজ্জ্বল সুধাপূর্ণ মুখ ওষ্ঠাধারে রাখিয়ো। যদি চোখে জল আসে, দুজনেই মিলিয়া কাঁদিব, যদি হাসি আসে তবে অর্ধনিমীলিত চোখে দুজনেই হাসিব, যদি কোন কথা

মনে পড়ে, তবে আনন্দ নির্ঝরের মত বলিয়া যাইও। কেবলমাত্র থাকে যেন দুইটি প্রাণে জুটিয়া :—

শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালবাসা।

যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছলতায় অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের যে মায়া আসে, ললাটে অধরে উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায় বাহুযুগে সিক্তদেহের রেখায় রেখায় যে লাবণ্য বন্দী হইয়া আছে, তাহাতে কবির প্রাণে মাতোয়ারা হয় নাই, বরং বাহুর নিবিড় আকুলতা তাহার হৃদয়ে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। তাই কবি বলিলেন "ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি, এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী", প্রেমিক প্রেমিকার কাছে সমস্ত সংসার সব মিথ্যা হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের অনুভব থাকে। নারী হৃদয়ে যে কামনা বাসনা প্রেমের পিপাসা রহিয়াছে তাহার চিত্রটি কবি আঁকিলেন। দেবযানী বৃহস্পতি পুত্র কচকে বলিতেছেন :—

ভেবে দেখো একবার
কত উষা, কত জ্যোৎস্না কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধ ঘন অনানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে,—
তারি মাঝে হেন প্রাতে, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন সুরভিরাত্রি, হেন হৃদয়ের মেলা,
হেন সুখ, হেন সুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চিরচিত্ররেখা
চিররাত্রি চিরদিন। শুধু উপকার
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর ?

নারী শক্তি অপরিসীম। তাহার "মন সহস্রবর্ষে সাধনার ধন।" এবং তাহার "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।" দেহের মিলনে কাতর হইয়া প্রেমিক বলে—"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে। প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন", বিশ্বশোভা সমস্তই অবারিত ও অনাবৃত। নারী সৌন্দর্য বিশ্ব সৌন্দর্যের অংশ বিশেষ। কবি তাই নারীকে বসনভূষণের সমস্ত কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করিয়া সুর বালিকার বেশ ধারণ করিতে বলিতেছেন।

ফেল গো বসন ফেল, ঘুচাও অঞ্চল
পর শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ

সেই নির্মল পবিত্র সৌন্দর্যের সম্মুখে সমস্ত ভোগ বাসনা অবনত হইল।

অতনু চাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।

তথাপি তৃষ্ণার যেন পরিতৃপ্তি হয় না। তিনি প্রিয়াকে বলিতেছেন—তুমি আমার চোখের ঘুম ও ঘুমের স্বপ্ন হরণ কর। আমার লজ্জা ও আবরণ তুলিয়া লও। তুমি আমার জীবন মরণ পর্যন্ত অধিকার করিয়া লও। তোমার সহিত আমার পূর্ণ মিলন হোক, সেখানে আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত তোমার সত্তার সঙ্গে এক হইয়া যায়। তাহা হইলে আমাদের মিলন অসীম সুন্দর হইবে। যাহা অসীম ও সম্পূর্ণ তাহার নামই তো ঈশ্বর। এই পার্থিব দেহ-মিলন কি কখনও অসীম ও সম্পূর্ণ হয় ? তাই কবি বলিতেছেন :—

এ কি দুরাশার স্বপ্ন হয়ে গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন খানে ?

পূর্ণ মিলন তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। ইহা সংসারের কামনাময় দেহ মিলনের অনেক উর্দ্ধে। ইহা অপার্থিব। পার্থিব স্থূল সৌন্দর্যের ভোগে শীঘ্র দেহ মনে অবসাদ আসে। তাই কবি বলেন—

"কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাসরুদ্ধ হয়,
পরাণ কাঁদিতে থাকে, মৃত্তিকার তরে,
এ-যে সৌরভের বেড়া—পরাণের নয়,
কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই।

তিনি তাই এই মিলনের অবসান কামনা করেন।—

দাও খুলি দাও সখি এই বাহু পাশ
চুম্বন মদিরা আর করিয়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস
ছেড়ে দেও ছেড়ে দাও বক্ষ এ পরাণ।

দৈহিক ক্ষুধার মোহ ক্ষণস্থায়ী। সীমাবদ্ধ প্রেমে অতৃপ্ত বেদনা। তাই কবি বলিতেছেন :—

এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।

প্রেম স্বর্গের সৌন্দর্য নিয়া বিকশিত। তাহা কামনার পঙ্কে কি আবদ্ধ রাখা যায়? কবি উহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছেন :—

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে দাঁড়াও সরিয়া
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।"

প্রেমকে ভোগের বস্তু বলিয়া মনে না করিয়া ইহাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে যাচাই করিলে ইহার সার্থকতা বুঝা যায়। কেবল ভোগের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য মানবজীবনের সৃষ্টি হয় নাই। মানবহৃদয়ের প্রেম ক্ষণিকের মোহ নয়। তাই কবি বলিতেছেন :—

নহে নহে এ তোমার বাসনার দান,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি,
এ তোমার ঈশ্বরের মহান্ আশ্বাস,
স্বর্গের আলোকে তব এই সুখ মানি।

সৌন্দর্য ও প্রেম অসীম ও অখণ্ড। মানুষের দেহ ও মনে তাহাদের খণ্ড প্রকাশ। খণ্ড ভোগের অতৃপ্ত জ্বালা, প্রেমিক প্রেমিকা এই অনন্ত প্রেমের সাধনা করিবে। তাহারা খণ্ড ভোগের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবে না। কারণ সম্পূর্ণ পাওয়া গেলে তো তাতে মোহ থাকে না। অসম্পূর্ণ পাওয়াতেই আগ্রহের সজীবতা। প্রকৃত প্রণয়িনী প্রতিদান চায় প্রেমের। তাহার প্রেমাস্পদ তাহাকে ভালবাসে কি না জানিতে আগ্রহান্বিত। সংশয়ের মধ্যে থাকা বাস্তবিক অতিশয় ক্লেশকর। তাই প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রশ্ন করে, তুমি আমায় ভালবাস কি না সত্য করিয়া বল। মরীচিকার পিছনে ঘুরিয়া কি লাভ? কারণ

জীবনের কাজ আছে প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে ফাঁকি।

নির্মল প্রেমকে ভোগ লালসার মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না, নারী পরম সুন্দরের অংশ। দেহ ভোগের দ্বারা উহা লাভ করা যায় না। ইহা দেহাতীত সত্তা। প্রেম স্বর্গের জিনিষ, চিরসুন্দর—

হৃদয় মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

প্রেম কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে। সে সৌন্দর্য অনন্ত। লালসালুব্ধ দৃষ্টিতে পাইতে চাহিলে, দেখা গেল তাতে সে অত্যন্ত হীন, তাই সে বলিল—

"পবিত্র তুমি নির্মল তুমি
তুমি দেবী তুমি সতী
কুৎসিত হীন অধম পামর
পঙ্কিল আমি অতি।

তাঁহার প্রিয়া অনন্ত সৌন্দর্যে চিরসুন্দর। কবিও অনন্ত প্রেমময়।

কবি তাঁহার প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছেন—কোন অনাদি কাল হইতে, সৃষ্টির উষায়। তাই জন্মে জন্মে শতরূপে প্রিয়ার সঙ্গে চলিতেছে প্রেমলীলা :—

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার।
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চির কাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার।
কতরূপ ধরে পরেছ গলায়
নিয়েছো সে উপহার।
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

যুগে যুগে সকল প্রেমিক প্রেমিকারাই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এ জগতে কাব্য উপন্যাস ইতিহাস ও বাস্তব জগতে যত প্রণয় প্রণয়িনী আছেন তাহা কবি প্রিয়ার যেন প্রতিচ্ছবি। নিত্যকালে প্রেমের পুনরভিনয় তাঁহারা করিতেছেন :—

আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে,
বিরহ-বিধুর নয়ন সলিলে
মিলন মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে।

নূতন বনাম নবীন

শ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায়

নূতন বললেই মনে পড়ে পুরাতনকে আর নবীন বললে প্রাচীনকে। যেমন আঁধার বললে আসে আলোর কথা আর কালো বললে সাদা; মাথা টানলে কান আর কান টানলে মাথা। আবার পুত্র বিনা পিতৃর পরিচয় কোথায়; শিষ্য বিনা কেমন ক'রে সম্ভব গুরুর অস্তিত্ব? এঁদের একের পরিচয়েই অন্যের পরিচিতি। ইংরেজীতে এদেরেই বোধ হয় বলে Relative Terms. দার্শনিকেরা কি এদের Dialectic বলবেন?

পুরাতন আর প্রাচীনের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন তাই আগে দেখা যাক্। পুরাতন আর প্রাচীন তো সমার্থক? কিন্তু কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে যায়। পুরাতন আমরা বলি কাকে? যা' কিছু জীর্ণ, শীর্ণ, বিগতশ্রী তাইতো পুরাতন। অনেকটা ক্ষয়ে যায় পুরাতনের; সব থেকেও কিছুই থাকে না তার। পুরাতনের প্রতি একটা অবজ্ঞা আছে আমাদের। পুরোনো বস্তুর অপূর্ণতাটুকু পূরণ করার দিকে লক্ষ্য নেই; তাকে ফেলে দিয়ে বোঝা বওয়ার দায়মুক্ত হবার দিকেই বেশী ঝোঁক্। পুরাতন লঘু অথচ স্থির; কোথায় তার চপলতা?

পুরাতনের সগোত্র হইলেও সবর্ণ নয় প্রাচীন; একটা বিশিষ্ট মর্যাদা আছে তার। কিছু না থেকেও তার সবই আছে। প্রাচীনের গুরুত্ব সমধিক। বহুদিনের পুঞ্জীভূত বেদনার ইতিহাস বিধৃত থাকে প্রাচীনের মধ্যে; সঙ্গে সঙ্গে থাকে অতীতের আনন্দ-মুখর দিনের সুখস্মৃতিগুলি। প্রাচীনের ঐতিহ্য আছে; আছে তার নভঃস্পর্শী অভিজাত্য। তার প্রতি আমাদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সুগভীর। বোঝা ব'লে ফেলে দেওয়া তো দূরের কথা তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আমাদের প্রাণান্তকর প্রয়াস। প্রাচীনের ক্ষেত্রে লঘুতার কথাই ওঠে না। আপন মহিমায় ভাস্বর সে। প্রাচীন আর পুরাতনে এতই তফাৎ। সমার্থক শব্দ বলে প্রচলিত হইলেও দু'য়ের আবেদন দু'প্রকার। এর মূলে আছে এক সূক্ষ্ম শব্দগত অর্থপার্থক্য।

নূতন ও নবীনের মধ্যেও ওই একই শব্দগত অর্থপার্থক্য বিদ্যমান। আপাতদৃষ্টিতে দু'টি শব্দকে সমার্থক ব'লে মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে ঠিক তা' নয়। এমন কথায় অবশ্যই আপত্তি উঠতে পারে তবে তর্কের কথা বাদ দিয়ে এমনটা বলা চলে। কারণ বিতর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্ভবে না। তার শেষ কথাই হল one word more. বরং ওপরের কথাগুলো মেনে নিলে নূতন আর নবীনের সম্পর্ক নির্ণয়ে সুবিধে হবে অনেক।

নূতনের মধ্যে উত্তেজনার খোরাক আছে যথেষ্ট কিন্তু তার স্থায়িত্ব স্বল্পকাল। নূতন স্বল্পায়ু। সাময়িক প্রয়োজন মেটাতেই তার আগমন। মাদকতা আছে নূতনের; আছে উগ্রতা। নূতনকে ভাল লাগে। কিন্তু সত্যই কি ভালবাসা যায় তাকে? আমোদ আছে নূতনে; আনন্দ কই? নূতনের গতি লক্ষ্যহীন পথে। গতির আনন্দ থাকলেও গভীর আয়েস নেই নূতনে। ক্ষণিকের চমক লাগানই তার কাজ। যেমন চমক লাগায় বর্ষার মেঘ—যা' ক্ষণিকের। কোকিল ডাকা বসন্তের প্রাণ আকুল করা সুর কই নূতনে? অকারণ পুলকে নৃত্য করে নূতন। নাচ যখন ফুরোয় তখনি বিদায় গ্রহণ করে নূতন। লঘুতার ক্ষেত্রে পুরাতনের সঙ্গে তার একটা মিল আছে সত্য; মিল নেই চাপল্যের ক্ষেত্রে। পুরাতন স্তব্ধ; শান্ত সমাহিত। প্রতি অঙ্গে তার বেদনার ক্রন্দন। নূতন উল্লাসমুখর, সারা অঙ্গে তার স্ফূর্তির আমেজ; আবেগ-কম্পন। নূতনের সুরু হবার সাথে সাথেই পুরাতন শেষ হয়ে যায় না; নূতনের পাশে পাশে সেও চলতে থাকে যদিও গতি হয় স্তিমিত। এটা লক্ষ্যযোগ্য। তারপর কালক্রমে একদিন পুরাতনের আসনে এসে

আরোহণ করে নূতন। পুরাতন ঝরে পড়ে ধীরে ধীরে; নূতনের চলে যাবার দিন এগিয়ে আসে অতি সত্বর। যা' নূতন তাই পুরাতন। যা পুরাতন তাই কি নূতন? আজ যা' নূতন কাল আর তা নূতন নয় নিশ্চয়ই?

নূতনে নবীনে সম্বন্ধটা বড় কাছাকাছি; পার্থক্যটাও কিছু কম নয়। নূতন অপক্কা; নবীন অহাঙ্কা। পুরাতন যদ্যপি বিগতশ্রী, নবীন শ্রীমান। নবীন সবুজ, অবুঝ, কাঁচা ও তাজা। আত্মরক্ষার অর্থাৎ পুরাতনকে যা মেরে বাঁচাতে পারে সে; আর তাতেই তো তার বিকাশ। আপন ছন্দে বয়ে চলে সে; আসে সৃষ্টির তালে তালে। নবীনের আবির্ভাব স্বাভাবিক; নূতন আকস্মিক। নবীন অপরূপে স্নিগ্ধমধুর। অনাগতদ্রষ্টা সে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বীজ উপ্ত আছে তার অভ্যন্তরে। নবীনের মধ্যে পুলক আছে, যা' আমাদের মনে জাগায় শিহরণ; আর আছে তার গান। আলোর গান। ক্ষণিক দিনের আলোক নয় অনেক দিনের আশার কথা শোনায় নবীন। নূতন প্রথমে নূতন, পরে পুরাতন—যা' ক্ষীয়মান। কিন্তু নবীন বর্ধিষ্ণু। প্রাচীনের প্রতি যদি আমাদের অশেষ সম্ভ্রম থাকে তবে নবীনের প্রতি আছে অসীম স্নেহ, আকস্মিকতার প্রশ্ন ওঠে না নবীনের ক্ষেত্রে। বহুদিন ধ'রে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পরই ঘটে তার আগমন। নূতনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় কোথায়? ডিঙিয়ে চলাই তার অভ্যেস। নিজের পা রাখার স্থান এ পর্যন্ত নির্মীত না হওয়ায় সামান্য বিরামটুকুরও অবসর নেই তার। কিন্তু আপনি বিকশিত হয়ে ওঠার স্পর্শ রাখে নবীন।

নূতন সহজেই পুরাতন হ'য়ে যায়, কিন্তু নবীনের সে আশঙ্কা নেই। পূজার বস্ত্র নূতন। কিন্তু দু'দিন বাদেই তা' পুরাতন। অপরপক্ষে শিশু সে চির নবীন। সমস্ত 'জগৎ পারাবারের শিশু' এসে মিলেছে একই স্থানে—সে তার নবীনতায়। শিশু আমাদের নয়নানন্দবর্ধক। সে কি কখনো হ'তে পারে পুরাতন?

রাতের আকাশে শতকোটী তারকা বিরাজমান। পূর্ণিমার চন্দ্রিমার শোভা অনির্বচনীয়। সৃষ্টির আদিকাল হ'তেই তারা বিরাজিত তবু তো' তা'রা আজিও পুরাতন হ'য়ে যায়নি। কবিকে অসম্মান করতে চাই না কিন্তু 'চাঁদকে ঝলসানো রুটি' রূপে প্রত্যক্ষ করতেও তো পারি না। আমরা কি বলেছি পূর্ণিমার চাঁদ বড় বিশ্রী, বড় পুরাতন? না, তা' বলা তো আর হ'য়ে ওঠেনি। ওরা যে নবীন! তাই নূতনের মত কোনদিন পুরাতন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই ওদের।

নূতনের স্বভাব চোখ ধাঁধান; নবীনের প্রকৃতি মন মাতান। রক্তের মধ্যেও নেশা ধরায় নূতন; নবীন আনে অপার তৃপ্তি। তার দীপ্তি অবিনশ্বর। নূতন স্বল্পায়ু; নবীন চিরন্তন। যেমন মেঘ ক্ষণিকের; সূর্য চিরদিনের।

'নূতন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে; নবীন আসে চিরকালের আনন্দ দিতে।'

প্রচার ও পরিকল্পনা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থ সহজ কথায় জাতীয় সম্পদের সাহায্যে জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। প্রত্যেক দেশেরই প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনবল কিছু না কিছু পরিমাণে রয়েছে। অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে নিজ নিজ মুনাফার আশায় এ সম্পদ নিয়োজিত করে। এতে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রাধান্যই প্রকাশ পায়। পরিকল্পনার অধীনে জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে জাতীয়তারও মঙ্গলবিধানের চেষ্টা করা হয়। পরিকল্পনার আওতায় ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা সামগ্রিক স্বার্থই প্রাধান্যলাভ করে। অর্থাৎ, জাতীয় উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ ত্যাগের প্রয়োজন নাগরিকগণ সমগ্রভাবেই তা স্বীকার করে আবার লব্ধ দৌলতও তারাই ভোগ করে। রাষ্ট্রাধীন পরিকল্পনা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা এবং সরকার এ পরিকল্পনার সহায়ক। ব্যক্তিগত মুনাফা শিকারের বদলে জাতীয় উন্নয়ন ও জাতির অগ্রগমন পরিকল্পনা আধিক কাঠামোর অধীনে দ্রুত স্থান করে নেয়। 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সন্তোষই আধিক পরিকল্পনার মূল কথা। বর্তমান দুনিয়ার প্রায় সকল রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পর্যন্ত সকলেরই একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। আজ আর এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পথে আধিক উন্নয়ন যে কোন দেশের পক্ষেই অপরিহার্য। বিচ্ছিন্নভাবে আধিক উদ্যোগে জাতীয় কল্যাণ বা জাতীয় শক্তিবৃদ্ধি অসম্ভব একথা আজকের যে কোন দেশই সত্য বলে মেনে নিয়েছে। তাই পরিকল্পনার পথাবলম্বী আজকের রাষ্ট্রপুঞ্জ।

পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার পর আরেকটি বিষয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। সবদেশে একই রকমের পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও উন্নয়নের ক্রম (degree) অনুসারে পরিকল্পনার স্বভাব ও গতি নির্ধারিত হয়। ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে না; আবার উন্নত দেশের পরিকল্পনার লক্ষ্য যেমন সমতাজনিত বণ্টন, অনুন্নত দেশের পরিকল্পনার লক্ষ্য তা হতে পারে না। বণ্টনের প্রশ্নের আগে চাই উৎপাদন, উৎপাদন না থাকলে বণ্টনযোগ্য কিছু থাকে না ফলে বণ্টনের প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই অনুন্নত দেশের মূল পরিকল্পনা উৎপাদনধর্মী। দীর্ঘমেয়াদী আদর্শ সমবণ্টন হলেও এরূপ দেশের পরিকল্পনার প্রাথমিক ও প্রধান কাজ বহুল উৎপাদন। ভারতবর্ষ অনুন্নত দেশ, তাই উৎপাদনই আপাততঃ ভারতীয় পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে ভারতীয় পরিকল্পনা ভারতীয় জনগণের উন্নত জীবন মান এবং উন্নততর সামাজিক অবস্থার আদর্শ গ্রহণ করেছে।

পরিকল্পনা থেকে জনগণকে বাদ দিয়ে দেখা যায় না—দুটী অবিচ্ছেদ্যভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ভারতীয় পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক আদর্শে রচিত এবং জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও মতামতের উপর নির্ভরশীল। পরিকল্পনা সার্থক করতে হলে জনগণের ইচ্ছা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে এবং সর্বদা একে যথাযথ স্থান দিয়ে চলতে হবে। জনগণ পরিকল্পনার মত বিরাট ব্যাপারে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখে না; তাই তাদের এ ব্যাপারে জ্ঞানলাভের জন্য সহায়তা করা আবশ্যক। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে এ জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে যে রাষ্ট্র নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠান বটে; কিন্তু ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার উপরই এর ভিত্তি। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা জনসাধারণের উন্নতির জন্যেই রচিত এ দিকটাও তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। পরিকল্পনা সার্থক করে

উন্নততর জীবন যাপন করতে হলে তাদের দায়িত্বও ঠিকভাবে পালন করতে হবে একথা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমরা প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা শেষ করে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েছি—এ সময় বিগত পাঁচবছরের কাজের সাফল্য জনসাধারণকে জানাতে হবে। বর্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্যও তাদের কাছে সোজা ভাষায় বুঝিয়ে বলা দরকার। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় আমরা প্রথম পরিকল্পনাকালে সন্তোষজনক সাফল্য লাভ করেছি; এতে নতুন উদ্যমের সন্ধান পাওয়া যায় এ দিকটা তাদের কাছে বলা প্রয়োজন। দেশের অনেকেই জানে না যে গত পাঁচ বছরে জাতীয় আয় ১৮%; খাদ্যশস্যোৎপাদন ২৪%; তুলার উৎপাদন ৪৪%; শিল্পোৎপাদন ৩৩%; এবং মাথাপিছু আয় ১১% বেড়েছে। জনসাধারণের মধ্যে এ সব তথ্যপরিবেশন করা একান্ত দরকার; কারণ এতে তারা উৎসাহ পাবে এবং বর্তমান পরিকল্পনার সহায়তায় এগিয়ে আসবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে আমাদের সফলতায় আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকা এ খবর প্রচারের উদ্দেশ্য নয় বরং এ সার্থকতা থেকে উৎসাহ পেয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথে আরো এগিয়ে যাবার জন্যেই জনসাধারণকে ইহা জানানো দরকার। ভারতীয় পরিকল্পনার শুরু থেকেই ভারতীয় জনগণ জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি কাজে অদম্য উৎসাহেরও পরিচয় দিয়েছে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৯০০ আঞ্চলিক কর্মশালা (local works) স্থাপিত হয়েছে; বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে প্রায় ১৫ লক্ষ নরনারী যোগদান করে বিনা পারিশ্রমিকে জাতীয় উন্নয়ন কাজ করেছে। এতেও আমাদের সন্তুষ্ট থাকবার কথা নয়। কারণ ভারতের আয়তন জনসংখ্যা ও বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবার লোকের প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করে দেখলে এ সংখ্যা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলা চলে না। আরো বেশী সংখ্যক লোকের সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রয়োজন এবং এর জন্যে প্রয়োজন পরিকল্পনার প্রচার।

বিভিন্ন দেশে এ প্রচার কাজ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক এবং চীনে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীগণ পরিকল্পনার বার্তা সর্বসাধারণের কাছে ব'য়ে নিয়ে যায়। জাপান, স্কান্ডিনেভিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকান দেশসমূহে প্রচার কাজের জন্যে বিস্তৃত ব্যবস্থা রয়েছে এবং পরিকল্পনা ব্যয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রচারকাজে ব্যয়িত হয়।

ভারত গ্রামপ্রধান দেশ; এখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৯% গ্রামে বাস করে। এদের মধ্যে পরিকল্পনা প্রচার করার জন্য এক বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন। এদের সাহায্য ছাড়া শুধু সহরে জনগণের সাহায্যের উপর জাতীয় পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করতে পারে না। ভারতীয় অর্থনীতি গ্রামীন অর্থনীতি, তাই গ্রামের জনগণের মধ্যে প্রচার কাজ বিস্তার করা একান্ত প্রয়োজন। অর্থ ও জনবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপাদান জনসাধারণই এর যোগান দেয়। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্য ঘাটতি ব্যয় ও উন্নয়ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম জনসাধারণকেই বহন করতে হয়। স্বল্পসঞ্চয় পরিকল্পনা কার্যকরী করার ও সরকারী ঋণ আদায় করা ব্যাপারেও জনগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অপচয় বন্ধ করতে হলেও তাদের সহযোগিতা দরকার। প্রচারের মাধ্যমে তাদের বোঝাতে হবে যে পরিকল্পনা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি এবং এর উদ্দেশ্য তাদেরই মঙ্গলসাধন। জনগণের মতামতের উপরই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাও জনসাধারণের মতামতের প্রকাশ।

পরিকল্পনা কমিশন জনসাধারণের মতামত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কমিশনের মতে, 'a widespread understanding of the plan is an essential stage in its fulfilment.....the plan has therefore, to be carried into every home in the language and symbols of the people and expressed in terms of their common needs and problems" দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার সমস্ত প্রচারব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ কোটি টাকা—রাজ্যগুলি ব্যয় করবে ৬ কোটি টাকা আর কেন্দ্রীয় ব্যয় হবে ৭ কোটি টাকা। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হবে। পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য বিভিন্ন ভাষায় পুস্তিকাকারে

ছাপানো হবে। ফিল্ম, রেডিও, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমেও প্রচার কাজ চালানো হবে।

কমিশন প্রচার সম্পর্কে সচেতন সন্দেহ নেই, তবু একথা বলা দরকার যে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার কাজ চালানোর মত বিরাট স্কীম কমিশন গ্রহণ করতে পারেনি। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে সমস্ত প্রচারপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বেশীর ভাগই শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে চলতে পারে; অশিক্ষিত জনসাধারণ এর থেকে পরিকল্পনা সম্বন্ধে বেশী কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারে না। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—এর প্রতিটি ঘরে প্রচার কাজের মাধ্যমে পরিকল্পনা জনপ্রিয় করতে হলে ১৩ কোটি টাকায় তার সংকুলান হওয়া অসম্ভব। গত পাঁচ বছরেও প্রচার কাজ করা হয়েছে; কিন্তু দেখা গেছে সাধারণ লোক আশা-প্রদ ভাবে সহযোগিতা করেনি। স্বল্পসঞ্চয় পরিকল্পনায় নোট আদায় থেকে দেখা গেছে এর খুব সামান্য অংশই গ্রামীন জনগণের সঞ্চয়। স্বল্প আয়বিশিষ্টদের কাছ থেকেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে গ্রামের লোক ও শ্রমিকদের আয় বেড়েছে তবুও স্বল্প-সঞ্চয়ে আশানুরূপভাবে তারা অংশ গ্রহণ করেনি—এতে তাদের হাতে বাড়তি আয় রয়ে গেছে—এরূপ অনুমান ভ্রান্ত নয়। তারা পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেনি তাই নগদ টাকা দিয়ে সঞ্চয় সার্টিফিকেট কেনার দিকে ঝোঁক যায়নি। প্রচারের মধ্য দিয়ে তাদের এ সব দিক বুঝিয়ে না দিতে পারলে তারা শুধু ফলভোগীর পর্যায়েই থাকতে চাইবে, দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা তাদের কখনো হবে না।

ভারতে আয়ের তুলনায় সঞ্চয়ের হার অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক কম। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সে হার বাড়ানো একান্ত দরকার। গ্রাম্য জনসাধারণ ও স্বল্পআয় ভোগীদের এ কথা বুঝিয়ে বলা দরকার এবং তাদের হাতের সঞ্চয় উন্নয়নমূলক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আনা প্রয়োজন। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকায় এখনো নানা ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক লোক বাধার সৃষ্টি করছে—জলসেচের সম্পূর্ণ সুবিধা ভোগ করেও অনেকে জলকর দিতে নারাজ, প্রচার দ্বারা এদের জলকরের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক। অবশ্য সরকার বিরোধী দলগুলিও এর জন্য আংশিকভাবে কিছু দায়ী।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে জনসাধারণের এক বিরাট আর্থিক দায় বহন করতে হবে। মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, বাড়তি কর ৪৫০ কোটি টাকা এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ২৫০ কোটি টাকা তুলতে হবে, ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করতে হবে। এর সমস্ত দায়ই পড়বে জন-সাধারণের উপর। আপাতদৃষ্টিতে এ বোঝা তাদের কাছে অবাঞ্ছিত—কিন্তু পরিকল্পনা শেষে সুখ ও সমৃদ্ধির সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে তারা হাসি মুখে এর ভার বইবে। প্রচারের মাধ্যমে এ কথাও তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

সার্থকভাবে প্রচার কাজের জন্য প্রত্যেক গ্রামে স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী স্থাপন করে তাদের সাহায্যে সকলের কাছে সোজা ভাষায় ও অল্প কথায় পরিকল্পনা কি ও কেন বুঝিয়ে বলা দরকার। সরকারী প্রচারব্যবস্থা অপেক্ষা সরকার নির্দিষ্ট পথে বেসরকারী ও স্থানীয় প্রচারসংস্থার মাধ্যমে প্রচারের সার্থকতা বেশী, তাই স্থানীয় জনগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজনদের নিয়ে প্রচার সংস্থা গঠন করতে হবে। গ্রাম্যপ্রচার সংস্থার কাজ পরিদর্শন ও সহায়তার জন্যে আঞ্চলিক সংস্থা এবং প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্যসংস্থা থাকা দরকার। সমস্ত রাজ্য সংস্থার কাজ পর্যবেক্ষণ ও তাদের পরামর্শ দেবার জন্যে প্রত্যেক রাজ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় প্রচারসংস্থা স্থাপন করা দরকার। যে কোন আর্থিক সংস্থাই সব সময় ভালরূপে হিসাবপত্র রক্ষা করবে এরূপ ব্যবস্থা না থাকলে অর্থের অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে—তাই এ সব সংস্থার হিসাব পত্র পরীক্ষা করে জনসাধারণের নিকট সব সময় রিপোর্ট উপস্থিত করা প্রয়োজন। এতে জনগণের বিশ্বাস ও সহযোগিতা বাড়বে।

ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনা জনগণের পরিকল্পনা, তারাই এর সার্থকতার জন্যে সর্বপ্রকার দায় বহন করে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে এর উদ্দেশ্য তাদেরই মঙ্গল বিধান। জনগণই সমস্ত শক্তির উৎস এবং তাদের বাদ দিয়ে কোন কাজেই সাফল্যলাভ সম্ভব নয়—একথা ভুললে চলবে না। ছত্রিশ কোটি জনতার দেশ এই ভারতবর্ষ—জনবলের দিক থেকে সমৃদ্ধ ভারত জনগণের সহায়তায় অর্থবল সংগ্রহেও অসমর্থ হবে না।

সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য

নগেন দত্ত

যে মানুষ একদিন গান গাহিয়াছে, সে নিশ্চয়ই কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া গান গাহিয়াছে, এই গানের সুর আসিয়াছে অন্তরের অনুভূতি হইতে। অনুভূতির গভীরতা যত বৃদ্ধি পাইয়াছে ততই অন্তর হইতে কেমন যেন একটি লক্ষ্যস্থল নির্ধারিত হইয়াছে। এই নির্ধারিত লক্ষ্যস্থলই একদিন রূপ লইয়া জীবন-দেবতারূপে দেখা দিয়াছেন। আমাদের বর্তমান সাহিত্য সাধনার যুগে কাব্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'র কথাই বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের কাব্যসাধনার ধারার অনুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাইব যে, কাব্যের মহত্তর বিকাশ জীবনদেবতার বন্দনা গানে মধুর হইয়া উঠিয়াছে। গভীর রহস্যময় অনুভূতির মধ্যে জীবনদেবতার রূপ যেন স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। বস্তুত বাঙ্গালা কাব্যে রবীন্দ্রযুগ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগ যে লক্ষ্যের পথেই ধাবিত হউক না কেন, ইহার জীবনদেবতার সন্ধান কখনও নিঃশেষ হয় নাই। সাহিত্যের ভিত্তি মূলে এই আবেদন বরাবরই রহিয়াছে। মানুষ কাব্য রচনা করিয়াছে প্রেমানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইহা যেমন সত্য, তেমনই ইহাও সত্য যে প্রেম নিছক সামাজিক প্রেম না থাকিয়া, বরং মহৎ বিশ্ব প্রেমানুভূতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। এমন কি প্রেমের সন্ধান করিতে গিয়া এক পরমজনকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। যদিও বর্তমান বাঙ্গালা কাব্যে এই পরম সম্পদকে পাওয়ার প্রবৃত্তি বিরল হইয়া উঠিয়াছে, তবু আমাদের পূর্ববর্তী কবি সাধকেরা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা স্বল্প নহে। আমরা মাত্রাতিরিক্ত সামাজিক হইয়া জীবনকে বহুর হাটে বিকাইয়া দিয়াছি। কিন্তু ইহা ভাবি নাই একের সাধন পূর্ণ না হইলে বহুতে তাহা প্রতিফলিত হয় না। যেখানে ধ্যানের মাঝে বহুর প্রতিবিম্ব পড়িতেছে, অজস্র কণ্ঠে কোলাহল বাজিয়া উঠিতেছে সেখানে একের শান্তসমাহিত মূর্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠে না, ভাব বহু বিচিত্র হইতে পারে কিন্তু তাহা এক অখণ্ড সুরে বাজিয়া ওঠে না। এই অখণ্ড সুরের সাধনাই সাহিত্য সাধনার চরম বিকাশ।

'চরম বিকাশ' ভাবটি সম্যক্ উপলব্ধি করিবার পূর্বে কাব্য, শিল্প ও সাহিত্যের কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। শিল্প, সাহিত্যের বিচিত্র প্রকাশকে যদি আমরা সামাজিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখি তবে ইহাতে আমাদের নিছক সামাজিক মনই উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের সামাজিক মন যাদেও আর একটি মন আছে। সেই মন বহুর কোলাহল হইতে দূরে —বরং খানিকটা নির্জনপ্রয়াসী। খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এই মনটি অনেক সময় সামাজিক-মন-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। বাস্তব বিচারে ইহাই প্রতীয়মান হইবে। সামাজিক মন পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রথার বন্ধনে বন্দী। তাহাকে বিধি ও নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। মনের এই অবস্থাকে গৃহপালিত জন্তুর বাধ্যতা স্বরণ করাইয়া দেয়। বৃহত্তর সমাজ যেখানে অবস্থিত সেখানে সামাজিক মানুষের বহুবিচিত্র কোলাহল শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু এই অজস্র কোলাহলের মধ্য হইতে সাধক যেমন সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, ভাবগম্ভীর মূর্তি রচনা করিয়া তার অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করেন, তেমনই শিল্প-সাহিত্যের প্রাঙ্গণে অসংখ্য সামাজিক চরিত্রের কোলাহলের মধ্য হইতে শিল্প-সাহিত্যের সাধক এক পরিপূর্ণ ভাবের মূর্তি গড়িয়া থাকেন। কি শিল্পে, কি সাহিত্যে একটা পরিপূর্ণ ভাবমূর্তি প্রকাশ না পাইলে কোথায় যেন অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। শিল্প বা সাহিত্য সাধনাও জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির সাধনা। আমাদের পূর্ব কথিত 'চরম বিকাশ' ভাবটির সার্থকতা এখানে উপলব্ধ হইবে। এই উপলব্ধ সত্য সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে কে কিভাবে প্রকাশ করিতেছে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার। অঙ্কনশিল্প নিছক রঙের খেলা নহে, কবিতা নিছক বাক্য ছন্দের সমাবেশ নহে

গল্প উপন্যাস নিছক গল্প বা কাহিনী নহে। তবে ইহারা কি? কোন্ জাতীয় কলা-কৌশলের মাধ্যমে ইহা প্রকাশ করিলে বিশেষ রূপে ও ভাবে ব্যক্ত হইবে?

সাহিত্যে শিল্পকৌশল একটি বড় সমস্যার আমদানী করিয়াছে। এই 'শিল্প-কৌশলে'র উপর অযাচিত গুরুত্ব ন্যস্ত করিয়া আমরা সাহিত্যকে চরম উদ্দেশ্যের পথ হইতে বিতাড়িত করিয়াছি। সাহিত্য রচনায় 'শিল্প কৌশলে'র সবিশেষ মূল্য রহিয়াছে—কি বলে, যেমন মানুষ বুঝিতে চায় তেমনই কেমন করিয়া বলে, কি কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহা প্রকাশ করে, তাহা ও বুঝিতে চায়। শিল্পে, কাব্যে, সাহিত্যে এই উভয়ের মধ্যে অহি নকুল সম্বন্ধ না থাকিলেও কিছু মৌলিক বিরোধ রহিয়াছে। কোন-কোন ক্ষেত্রে সাহিত্য সেই চরম উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া নিছক উদ্দেশ্য প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—আবার কোথায়-বা উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া কলা কৌশলের খেলা চলিতেছে। ইহার দুই উগ্র দৃষ্টান্ত হইল উদ্দেশ্য-কণ্টকিত উপন্যাস আর নিছক বাচনভঙ্গীর রম্য-রচনা। পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যেই এমন আবোল-তাবোল বিরাট ঘটিয়া থাকে। প্রাক্-বিপ্লব যুগের রুশ সাহিত্য আর বিপ্লবোত্তর যুগের রুশ সাহিত্য—এ দুইয়ের মাঝে যেমন প্রভেদ ঘটিয়াছে তেমন আবার নূতনত্বের আমদানী হইয়াছে। সাহিত্যে বিশেষ উদ্দেশ্য মুখ্যরূপ ধারণ করিয়া আবার মানব মনে প্রচুর সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে মদ হইতেই তাদের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে! এদিকে ইংরেজি সাহিত্যে সাংবাদিকতার স্পর্শ লাগিয়া এক কৌশলপ্রধান অজস্র অসংযত বাক্যবিন্যাসের সাহিত্য রচিত হইতেছে। ফলে জীবনের সব কিছুই মূল্য পাইতেছে, এবং সব কিছুই বলা হইতেছে, এই অবস্থা সাহিত্যে সাংবাদিকতা আমদানী হইলেই সম্ভব। কেননা, সাংবাদিকের সবই ঘটনা এবং তাহাকে প্রকাশ করাতেই তাহার কৃতিত্ব এবং কৌশলে প্রকাশ করিতে পারিলেই আরও বিশেষ কৃতিত্ব। কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টিতে, সাহিত্য স্রষ্টার দৃষ্টিতে এই পার্থিব জগতের সব ঘটনাই 'ঘটনা' নহে। সে সমগ্র পার্থিব জগৎকে দুধ-জলে মেশানো বলিয়া মনে করে এবং গ্রহণ করিবার বেলা জল ফেলিয়া দুধটুকুই গ্রহণ করে। এই বস্তুবিচারের পূর্বে শিল্পীকে ও সাহিত্যিককে অধিকারী ভেদের সাধনায় নিরত থাকিতে হয়। আমার চেতনা অন্তর্বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যাহা দেখিলাম ও বুঝিলাম তাহাকে মানসগবেষণাগারে উপযুক্তরূপে পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে কিনা—এবং সত্য সত্যই পর্যবেক্ষণের ফল পাওয়া গিয়াছে, না অনন্তকালের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া দিয়া নবচেতনার একটি স্ফুলিঙ্গের জন্য প্রতীক্ষা করা হইতেছে,—এই সব প্রশ্ন, শিল্পচেতনা ও সাহিত্যিক মানস গঠনের পথে একান্তভাবে আসিয়া পড়ে। শিল্পসৃষ্টি, সাহিত্য সৃষ্টি যদি একমাত্র সাহিত্যিকের বা শিল্পীর ব্যক্তিগত বিষয় হইত তবে হয়ত মানব সমাজ—এত বাধা ধামাইত না। কিন্তু শিল্পী, সাহিত্যিক বা কবি তাঁহাদের ব্যক্তিগত সমাজ-জীবনের সীমানা ছাড়াইয়া বৃহত্তর কোন জগৎ সৃষ্টিতে সক্ষম বলিয়া উত্তমনাম অর্জন করিয়াছেন। এবং তাঁহারা পরমার্থের সাধকের মত জীবনের গূঢ় রহস্যের উদ্ধেশ্যের সন্ধানী। কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পীকে জীবনভর এই সন্ধান-কার্য চালাইয়া যাইতে হয়। কাজেই কোন সাহিত্যিক, কবি বা শিল্পীর সৃষ্টিকে দুই-একখানা উপন্যাস, গল্প, কবিতা বা চিত্রদ্বারা বিচার সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে দুই-একটি চটক রচনা বা চিত্রসৃষ্টির দ্বারা আপাতখ্যাতিকে শিল্প সৃষ্টির সার্থক নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যায় না। কেননা, সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিতে চিরন্তন কালপ্রবাহ বহিয়া চলিতেছে। শিল্পে, সাহিত্যে, কাব্যে অনন্তকালকে মুখ্য জানিয়া, এবং সমসাময়িক কালকে উত্তরকালে মিলিয়মান পদধ্বনি মনে করিয়া সাহিত্যিক বা শিল্প স্রষ্টাকে চলিতে হইবে। উত্তর-কালের যে ধ্বনি আজ শোনা যাইতেছে, তাহা আবার কাল প্রবাহের ঘূর্ণীতে মিশিয়া ডুবিয়া যাইতেছে—ধ্বনির মিলিয়মান অবস্থাই শিল্পী মনে রহস্যের আবেশ সৃষ্টি করিয়া থাকে। মনের এই রহস্যময় আবেশ অবস্থায় শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবির জীবনসন্ধানের স্পৃহা জন্ম লয়। এই জীবন-সন্ধানই বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্যমুখে ধাবিত হয়।

কাজেই সাহিত্য বা শিল্প এক অর্থে—উদ্দেশ্যমুখী হইতে বাধ্য। এবং সে উদ্দেশ্য তথাকথিত সমাজগত জীবন হইতে বহু উর্ধ্বে।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর দর্শনের একটুখানি

শ্রীহারাধন রক্ষিত

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসবের আনন্দে দেশ প্লাবিত। দিশি দিশি আনন্দের দুর্বার প্রবাহে আনন্দের আতিশয্যে আত্মভোলা। মুস্কিলে পড়িয়াছি আমি, আমাকে করিতে হইবে মায়ের দর্শনের আলোচনা। দর্শন লাভ যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে যাহা অসম্ভব অন্ধ আমার পক্ষে তাহা আকাশ কুসুম। ভরসা এই যে মায়ের অনুগ্রহে মূর্খ কালিদাস মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায়ই সম্বল করিয়া মায়ের দর্শনে অবতীর্ণ হইব। হয়ত আমার দৃষ্টিশক্তি পরিস্ফুট হইতেও পারে!

"সাধারণ দোকান ঘরে ঐতিহাসিক যোদ্ধাদের ছবি থাকে, রাজনৈতিক নেতাদের ছবি থাকে আর থাকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সাম্প্রদায়িকতা-বিক্ষুব্ধ দিনে তরুণ এক মুসলমানের দোকানে বৃহদাকৃতি মায়ের ছবি এবং সেও একটি মাত্র ছবি। সে যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।" এক অপূর্ব রহস্য। হিন্দু ভাবে মা হিন্দুর, মুসলমান ভাবে মুসলমানের, জগৎ ভাবে মা বিশ্ব-জগতের। তাই আজ দেশপাত্রের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবী মায়ের উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতা বলেন, "ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীসারদা দেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষকথা" এবং "শ্রীশ্রী মা ছিলেন পুরাতনের শেষ প্রতীক ও নূতনের সার্থক সূচনা।" কিন্তু তাঁহাকে সমগ্র নারী জাতীর আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভারতীয় কৃষ্টি, সাধনা ও ঐতিহ্যের তিনি জলন্ত প্রতিমূর্তি।

সারদা দেবীর দর্শন এক অপূর্ব বিরাট বস্তু। নিম্নের স্তবকটিকে আমরা তাহার সারাংশ বলিতে পারি:—

"গৃহী যেই জন চলে সংসারে
বন্ধন বোঝা লইয়া মাথে
সন্ন্যাসী যেবা উদাসী জীবন
ঢাকিয়াছে দেহ গেরুয়া সাজে।
জ্ঞানী হয়ে যেবা শ্রবণ মনন
করিয়াছে সার সাধনা পথে,
ভক্তকর্মী যোগী বা যাহারা
সিদ্ধি মাগিছে বিরোধী মতে,
সবাই তাহারা মায়ের চরণে
যুগপৎ চাহে কাম্য ফল
গৃহে সন্ন্যাসে মিলন সূত্র
ত্যাগের মন্ত্রে হয় উজ্জ্বল।"

সারদা দেবীর জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য যে তিনি ধ্যান-লোকের কল্পিত দেবীর জীবন যাপন করেন নাই—সাধারণ মহিলার মত সরল সহজ জীবন যাপন করিয়াছেন। প্রথম জীবনে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে অতি সাধারণ যুবতী বধূর মত; স্বামীর নিকট থাকিতে তিনি ব্যস্ত। এই জন্য নেহাৎ সাধারণ মানুষের মত অছিলায় স্নান করতেও দ্বিধা করেন নাই। সাধারণ মানুষের মতই তাঁহার ভয় সঙ্কোচ। কিন্তু এই সাধারণ মহিলার মধ্যেই বিরাজ করিতেছিলেন এক অসামান্যা মহিমা, জগজ্জননী।

তাঁহার মতে ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা। "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা", ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "জগৎ মিথ্যা, তিনিই সত্য।" সংসার অনিত্য, ইহা তিনি বহু স্থানে বিভিন্ন ভাষায় বলিয়াছেন। "তৎসৎ" ঈশ্বর ছাড়া জগতের সবই মায়া। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "ছেলেদের এখন জ্ঞান হচ্ছে—সংসার যে অনিত্য তা তারা বুঝতে পেরেছে। সংসারে যত লিপ্ত না হওয়া যায় ততই ভাল।" "স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল, সব মায়া।" "এক ভগবানই নিত্য, সত্য, তাকে ডাকতে পারলেই ভাল।" "সংসার মায়ার বন্ধন।" আবার এক জায়গায় শ্রীমা বলিয়াছেন, "সংসারে মাগ ছেলে নিয়ে কি আর সুখ আছে? কামিনী আর কাঞ্চন ওতেই ভুলে রয়েছে। সংসারে সবই ভোগের।" সংসারে যা কষ্ট

তা আর বলতে! কষ্টের পার নেই।" "দুঃখপূর্ণ ই জগৎ। সংসারে দুঃখের কি অন্ত আছে!" সংসারে সুখ দুঃখ কি পরিমাণ সেই সম্পর্কে মাকুর প্রতি তাঁহার যে কথা তাহা অপূর্ব চমৎকার। মাকুকে তিনি বলিতেছেন, "মাকু, সংসারে ফুলের মত পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের কি আছে বল দেখি? সংসারে যে কি সুখ তাত দেখছিস্। স্বামী সুখও দেখলি। এখন লজ্জা হয় না—আবার স্বামীর কাছে যাস্?.....পবিত্র ভাবটা কি স্বপ্নেও তোদের ধারণা হয় না? এখনও কি ভাই বোনের মত থাকতে পারিস নে? খালি শূয়োরের মত থাকতে চাস্? তোদের সংসারের জ্বালায় আমার হাড় জ্বলে গেল।"

অন্যত্র বলিয়াছেন, "সংসারে থাকলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে।" এমনি ভাবে তাঁহার—দর্শনের সমগ্র সুর—ঈশ্বরই সত্য আর সব মায়া। ঈশ্বর লাভের প্রচেষ্টাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। মায়ের দর্শন—স্মরণ করাইয়া দেয়—শঙ্কর দর্শনের মায়াবাদের কথা।

তাহা হইলে সংসারীদের উপায় কি? এই মিথ্যার জাল কেন? "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং" গীতা বলিতেছেন। উপনিষদে আছে "সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" "সর্বগতঃ শিবঃ।" আমরা অনুরূপ দেখি—মায়ের দর্শনেরও মূল কথা। তাঁহার বিভিন্ন কথা হইতে আমরা ভগবানের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "যে ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছেন, তুমি তাহাকেই ডাক।" জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—যে, 'ছায়াতেও ভগবান আছেন।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "বাবা, লোকে ভগবান্ ভগবান্ করে, এই যে খুঁটিটি দেখছ, এর ভিতর ভগবান আরোপ করতে পারলেও ভগবান লাভ হতে পারে।" সুতরাং "জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—ইহাও অবশ্যই তাঁহার দর্শন। তাহা হইলে সংসারও তো মিথ্যা নয়। ইহাও তিনি বলিয়াছেন যে "ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জান্তে না পেরে ঘুরে মরছে।" সুতরাং সংসারী লোকেরা যদি তাহাদের কর্ম ও আচরণের মধ্যে ঈশ্বর চিন্তাই প্রধান করিয়া লয়—দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। সংসারীদের প্রতি মায়ের যে নির্দেশ উপদেশ তাহা হইতে আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব।

সংসারীদের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। অথচ সংসারীদের জীবন যে কঠোরতর ইহা তিনি একাধিক স্থলে বলিয়াছেন, কিন্তু সংসার ও সংসারীকে তিনি হেলায় তুচ্ছ করেন নাই। একদিন জনৈক ভক্তকে তিনি বলেন, "তোমার এখন সন্ন্যাসী হওয়া চলবে না, বুড়ো বাপের সেবা করতে হবে।" সংসারীদের বলিয়াছেন, "দু'বেলা জপই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট।" সন্ন্যাসীদের লক্ষ লক্ষ বার জপ করিতে বলিয়াছেন। অথচ সংসারীদের বলিয়াছেন যে দ্বাদশ বার জপ করিলেই তাহাদের যথেষ্ট হইবে। সংসারীদের শুধু উপদেশ দিয়াছেন তাই নয়। তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে একদিন বলেন, "দেখেছো, কেমন সুন্দর চুপড়িটি ওরা তখন ফেলে দিতে বললে। ওদের কি? সাধু মানুষ। ওসবে আর কি আর মায়া আছে? আমাদের সামান্য জিনিষটিও অপচয় করা সয়না। ওটি থাকলে তরকারীর খোসাটাও রাখা চলত।" অন্যত্র তিনি বলেন, "গৃহীদের বহিঃসন্ন্যাসের দরকার নেই" এবং "সংসার করলেও ঈশ্বর কোটি হতে পারে।" এমনি ভাবে তিনি বহুবার বহু স্থলে উপদেশ করিয়াছেন যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—তিনি সংসারকে হেয় বাদ দিয়া ফেলেন নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের অক্ষর জ্ঞান নাই। অথচ কি আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার। তিনি—বহু স্থলে অধিক সন্তান জন্মানোর তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "একটা দেহ হতে পাঁচটা ছেলে বেরুচ্ছে, ওরা কি মানুষ? সংযম নেই, কিছু নেই—যেন পশু।" "সংসারী লোক খালি গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলের জন্ম দিতে থাকে, ঐ যেন কাজ।" তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। তাই তিনি, পাশ্চাত্যদের—Standard of living না হইলে—বিবাহ করা ঠিক নয়—, জোরের সহিত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিষয় সম্পত্তির আন্দাজ বুঝিয়া, ছেলেপুলেকে খাওয়াইয়া পড়াইয়া মানুষ করিবার সামর্থ্য বুঝিয়া ছেলের জন্ম দেওয়া উচিত। অন্যথায় মানুষের জীবন

বিড়ম্বনাবহুল হয়। তাঁহার এই মত Economist দের birth control এর কথা মনে করাইয়া দেয়। আজ আমরা বিজ্ঞানীদের মুখে যে birth control এর কথা শুনি, মা প্রায় একশত বৎসর পূর্বেই তাহা বলিয়াছেন।

ভগবানই—মায়ের মতে নিত্য বস্তু, এই কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলেন যে ভগবানকে ডাকাই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, তাকে ডাকিলেই সব মিলে। "কে বা বাপ? কে বা মা? ঈশ্বরই সব।" "ভগবান বালক স্বভাব। কেউ চায় না, তাকে দেবে, আবার কেউ চায়, তাকে দেবে না।" সকল ভালর মাঝে তিনিই নির্ভুল। সকল দুঃখের মধ্যে—তিনিই সুখ। ইহাই মায়ের সমদৃষ্টির মর্ম। সুতরাং মানুষের তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করাই শ্রেষ্ঠ কাজ। ভগবানকে লাভের পন্থাস্বরূপ—মা জপ-তপের উপরই খুব জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভগবানের জন্য তপস্যা করা প্রয়োজন।" "জপ তপের দ্বারাই পরম শান্তি লাভ হয়। জনৈক ভক্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ঐ দিকের বারান্দায় বসে জপ করুক না, দেখি কেমন মনে শান্তি না আসে।" "জপ ধ্যান না করলে কি হয়? সে সব যে করতে হয়।" "জপ অভ্যাস করতে করতে মানুষ সিদ্ধ হয়—জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি।" গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়" কিন্তু শ্রীমা আবার বলিয়াছেন যে "জপ তপের দ্বারাও ভগবান মিলে না যদি না প্রেম ভক্তি হয়। অবশ্য জপ তপের দ্বারাই প্রেম ভক্তি হয়।" তিনি বলেন, "জপ তপের দ্বারা কর্মপাপ কেটে যায়। কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না।" ধ্যান, জপ, ঈশ্বর চিন্তায় পাপ কাটে।"

আমরা ত ভাবলাম মায়ের মতে জপধ্যান করিয়া প্রেম ভক্তি হইলেই ভগবানকে মিলিবে। কিন্তু ভগবানকে পাওয়ার উপায় সম্পর্কে ইহাই তাঁহার শেষ কথা নয়। শত জপধ্যান, শত প্রেমভক্তিও ব্যর্থ। তিনি বলেন, "কৃপা বড় কথা। তাঁর কৃপাতে তাঁকে পাওয়া যায়।" কৃপাই যদি বড় কথা হয় তবে অন্য সবের প্রয়োজন? কিন্তু মানুষের কৃপা লাভ করিতে হইলেও ত যথেষ্ট কাকুতি মিনতি করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। সুতরাং ভগবানের কৃপা লাভের জন্যও জপ ধ্যান শ্রদ্ধাভক্তি ইত্যাদির দরকার। এই পুঁজি যাহার থাকিবে তাহাকে হয়ত ভগবান কৃপা করিতে পারেন। সংসারী লোকের পক্ষে ধর্ম লাভের জন্য মায়ের আর একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মা বলেন, "স্বামী-স্ত্রী একমত হলে তবে ধর্মলাভ হয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুব বেশী মতানৈক্য হয় কিনা—তাহা আমার পক্ষে বলা কঠিন। স্ত্রী স্বামীর ইষ্ট পথে সাহায্যকারিণী ইহা তাঁহার মত। তাই স্ত্রীকে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে সহধর্মিণী।"

সমধ্যানুবর্তিতার জন্য মা বার বার উপদেশ দিয়াছেন। জপ ধ্যানের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া লইতে তিনি বলিয়াছেন। তপস্যাদির কথা কাহাকেও জানিতে না দেওয়া ভাল—ইহা তাঁহার মত। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেই আমরা ইহা দেখিয়াছি। তিনি পারিতে কাহাকেও তাঁহার জপ তপের কথা বলিতেন না।

মায়ের কথার স্থানে স্থানে দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা আছে, এবং দীক্ষা না নিলে দেহ শুদ্ধ হয় না—ইহাও তাহার মত। দীক্ষা না নিয়া গেরুয়া পরাও সম্ভব নয়, মা বলেন। কিন্তু খুব কম বয়সে দীক্ষা নেওয়ারও তিনি পক্ষপাতী নহেন। একদিন ছোট একটি ছেলে দীক্ষা নিতে চাহিলে—মা বলেন, "এখন ছেলে মানুষ, বেগে ছোঁচাতে পার না—এখন কি দীক্ষা হয়?" "দীক্ষালব্ধ মন্ত্রের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়।" দীক্ষার মন্ত্র সম্বন্ধে মা বলেন, "মন্ত্র কাহারও নিকটে বলিতে নাই। তবে তোমার গুরুভায়ের নিকট বলিতে পার; তাহাতে দোষ নাই।" দীক্ষাদান সম্পর্কে মা বলিতেন, "মন্ত্রের ভিতর দিয়ে শক্তি যায়; গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়। শিষ্যের পাপ গুরুতে আসে।" দীক্ষা প্রসঙ্গে মা বলেন, "উপদেশ এমন আধার কই? আধার চাই মা, নইলে হয় না।" ইহা সহজে বোধগম্য। কাচের বৈয়ামে ঘি ভাল থাকে না নষ্ট হইয়া যায়। তাই বলিয়া ঘি ভাল জিনিষ নয়—ইহা বলা যায় না। সুতরাং চীনামাটির বৈয়াম দরকার। সেইরূপ দীক্ষাও যাকে তাকে দিলে ফল হয় না। সৎপাত্রে দিতে হয়।

গুরু সম্পর্কে তাঁহার মত খুবই প্রণিধানের বস্তু। তিনি বলেন, "গুরু ভক্তি থাকা চাই। ভক্তিতেই মুক্তি। গুরু সবই এক।" আবার বলিয়াছেন, "গুরু বাক্যে বিশ্বাস

রাখতে হয়। গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে নাই।" গুরু দ্বারা শিষ্যের ইষ্ট সিদ্ধি হয় ইহাই মায়ের দর্শনের কথা।

শ্রীমা সন্ন্যাস জীবনকে শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়াছেন। একদিন এক সন্ন্যাসী ভক্তকে বলেন, "বাছা, তোমরাই ভগবান, ভগবানের জন্য কে সব ত্যাগ করতে পেরেছে?" সন্ন্যাস জীবনে স্বাভাবিক জীবনের সাবলীলতা নাই। তাঁহাদের জীবন শত দিক হইতে নিয়ন্ত্রিত। অনিবার্য কারণেও তাঁহারা তাঁহাদের নিয়ম নিষ্ঠার ব্যতিক্রম করিতে পারে না। মা বলেন, 'অসুখ হয়েছে বলে গৃহস্থ বাড়ীতে সন্ন্যাসী কেন থাকবে? মঠ রয়েছে, আশ্রম রয়েছে। সন্ন্যাসী ত্যাগের আদর্শ। কাঠের শ্রীমূর্তি পুতুল যদি রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, সন্ন্যাসী কখনও উলটে দর্শন করবে না। আর সন্ন্যাসীর অর্থ থাকা একান্ত খারাপ। চাকি (টাকা) না করতে পারে এমন জিনিষ নেই।" আরও বলিয়াছেন, "সেরুয়া পরে কখনও মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ো না। মন যখন ঠিক থাকবে না, আমার অনুমতি হইল গেরুয়া ছেড়ে বিয়ে করবে। নেড়া নেড়ির দল করার চেয়ে —বিয়ে করা ভাল।" সাধু সন্ন্যাসীদের বিবাহ উৎসবে যাইতে তিনি সর্বদা বারণ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "সাধু সন্ন্যাসী মানুষ বিয়েতে যাবে কেমন করে? সাধুর মায়ায় জড়াতে নেই।" ভক্তদের বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসীদের তিনি সাবধান করিয়াছেন যেন শ্রাদ্ধের অন্ন ভক্তরা না খান। তিনি বলিয়াছেন, "আজ শ্রাদ্ধের অন্ন খেতে নেই, ভক্তির বড় হানি হয়।" "নেহাৎ না পারলে শ্রাদ্ধে বিষ্ণু বা দেবতাদিগকে যা নিবেদন হয় তাই গ্রহণ করবে। প্রসাদী হলে আদ্যশ্রাদ্ধের অন্নও ভক্তেরা খেতে পারে।" সাধুর বিশেষ প্রয়োজন না স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মানুষ ত কিছু করে না, এদের কথাতে কিছু কিছু ভগবানের নাম করে।"

গীতার কর্মযোগকে মা একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। নিষ্কাম হইয়া কর্ম করিতেই হইবে ইহা তিনি বলিয়াছেন। "নিত্যং কর্ম কুরুতং" ইহা তাঁহার মত। "কাজ করা চাই বই কি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।" "কর্ম করতে হয়।...বসে থাকতে নেই; বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা, কুচিন্তা সব আসে।" "কাজে মন ভাল থাকে।" কিন্তু সর্বপ্রকার কামনা বাসনা-লেশ-শূন্য হইয়া কাজ করিতে হইবে। তাহা না হইলে কাজ বন্ধনেরই কারণ হইবে।" কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ইহাই মায়ের কর্মদর্শন। মায়ের কাছে কোন কর্মই ছোট নয়। তাঁহার বাক্যে ও আচরণে ইহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

কামনা বাসনা মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধনের কারণ। ইহাই মানুষকে দুঃখ দেয়। শ্রীমা বলেন, "বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না, বাসনা হতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়।" "একটুও বাসনা না থাকলে দেহ থাকে না!" তাঁহার মতে "যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা ত থাকবেই!" শ্রীমা বলেন, "এক কথায় বলতে গেলে, নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেন না বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্ম মৃত্যুর কারণ, আর মুক্তি পথের অন্তরায়!" শ্রীমা নিজে প্রার্থনা করিয়াছেন, "ঠাকুর রাধু যেন কোন বাসনা না জাগে।"

সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের যে আদর্শ ঠাকুর আমাদের দিয়া গিয়াছেন, মা তাহারই প্রচার করিয়াছেন জীবনব্যাপী। ঠাকুরের "যত মত তত পথ" এরই প্রতিধ্বনি করিয়া মা বলিয়াছেন, "সাধু পুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক! সে জন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য! যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখী এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে! শুনতে ভিন্ন বলেও সকলগুলিকেই আমরা পাখীর বোল বলি—একটাই পাখীর বোল আর অন্যগুলো পাখীর বোল নয় এরূপ বলি না!" তাঁহার এই কথা মনে করাইয়া দেয় ঠাকুরের জলের বিভিন্ন নামের উপমার কথা—গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি! শৈব শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন মতে উপাসনা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে! ইহাতে মতবিরোধ কখনও কখনও দেখা যায়! মায়ের মতে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই! মা বলেন, "সব সত্যি কিছু মিথ্যে নয়—মা, উনিই সব!. উনিই প্রকৃতি, উনিই পুরুষ!" "রাম আর শক্তি ত ভিন্ন নন!" আরও বলিয়াছেন, "বাবা,

তিনিই মহেশ্বর, তিনিই মহেশ্বরী! তিনিই সর্ব দেবময়! তিনিই সর্ব বীজময়।" বিভিন্ন সাধু বিভিন্ন মত প্রচার করেন ইহার দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি যে মা ইস্‌লাম ক্রিশ্চিয়ানিটী ইত্যাদি সব ধর্মকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন! অনেক সময়ই দেখা গিয়াছে তিনি অভিরুচি অনুযায়ী মন্ত্র দিয়াছেন! কোন বিশেষ বিগ্রহের বা মন্ত্রের উপাসনায় তিনি বাধ্য করেন নাই! তাঁহার ঔদার্যই পারসী যুবককে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা নিতে!

নারীদের সম্পর্কে তাঁহার অভিমত যে তাঁহারা লজ্জা বর্জিত হইবেন না! তিনি বলিয়াছেন—"স্ত্রীলোকের লজ্জাই হল ভূষণ!" সহ্যগুণের কথা তিনি বার বার বলিয়াছেন! তাঁহার মতে "সহ্যের চেয়ে কিছুই নেই!" মা বলেন, "সংসারে কত রকম লোক থাকে! সব সহ্য করে থাকতে হয়!"

মায়ের মতে বিশ্বহিত প্রচেষ্টা মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। মায়ের দৈনন্দিন কর্মে ও আচরণে ইহা বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। মানুষ না, শুধু সমগ্র প্রাণীর জন্ম মায়ের স্নেহ সমভাবে লাভ করিয়াছে। চলার পথে মটরের নীচে পড়িয়া কুকুর মারা গিয়াছিল তাই মা মটরে চড়া বন্ধ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ধ্বংস লীলা দেখিয়া মা বলিয়াছেন, "কি পোড়া যুদ্ধই লেগেছে। কত দিনে যে থামবে, লোকে খেয়ে পরে বাঁচবে।" তাঁহার এই মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ বাঙ্গালী বা ভারতীয়দের জন্যে নহে—সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্যে। সার্থক তাঁহার মাতৃত্ব! জনৈক ভক্তকে বলিয়াছেন, "বাবা, তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার বুকে শেল বাজে।" বিশ্ববোধ ব্যতিরেকে ইহা সম্ভব নয়। তাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিশ্বের ধূলি কণার সহিতও তাঁহার হৃদয়ের যোগ রহিয়াছে। দেখিয়াছি আমরা তাঁহাকে জানা অজানা সকল মানুষ সকল জীবজন্তুর জন্ম ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে। তাই তিনি জগজ্জননী। না হয় কেন বলিবেন, "তোমরা ভাল থাক, আমিই ভুগি।"

মায়ের দর্শনে ইহাই চমৎকার যে, তিনি প্রচলিত নিয়মাদিতে খুব বিশ্বাসী। বারবেলা তিনি মানেন। মানতাদিতে তাঁহার খুবই বিশ্বাস আছে। বহুবার নানা কারণে দেবতার মন্দিরে—ছাগ্য দিয়া মানত করিতে আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। সাধারণ মানুষ যেরূপ গঙ্গাজলকে অতি পবিত্র মনে করি, তিনিও তেমনি করিয়া থাকেন। এক জায়গায় বলিয়াছেন, "গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে ফেল, ঠাকুরের ভোগ উঠবে। তিনি 'ভাল দিন' ইত্যাদি মানিয়া থাকেন। দীক্ষা দান প্রসঙ্গে জনৈক ভক্তকে একদিন বলেন, "কাল ভাল দিন—লক্ষ্মী পূর্ণিমা, কাল হবে। এই দিনে দীক্ষা হইলে শীঘ্রসিদ্ধি হয়।" যাত্রার দিন দেখা দরকার উহাও তাঁহার মত। জনৈক ভক্তকে তিনি বলেন, "আজ পয়লা অগস্ত্য যাত্রা, আজ বাড়ী হতে যাত্রা করে এসে কোথাও থাকতে নেই।" সাধারণতঃ নিয়ম আছে মানুষ-গুরুর পায় তুলসী দিতে নাই। তাই মা একদিন এক ভক্তকে বলেন, "তুলসী পাতা থাকে ত পায়ে দিও না।" প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে মাও বলেন, "কার্তিক মাসে শিউলি ফুল দিয়ে পূজো করতে হয়, এবং দেবীর পূজোতে সাদা ফুল লাগে না।" সাধারণে কেউ কোথাও যাওয়ার কালে যদি বলে 'যাই,' উত্তরে বলা হয় "এস"। মাও বলিতে নাই। মাও ইহা খুব মানেন। তিনি বলেন যে, বিদায় নেওয়ার সময় "যাই" বলিতে নাই, "আসি" বলিতে হইবে। মানুষের মৃত্যুর পর গয়াতে পিণ্ডদান সম্পর্কে তিনি বলেন, "উন্মত্ত পুরুষ ছাড়া আর সকলকে এক বছর প্রেত যোনিতে থাকতে হয়। তারপর গয়ায় পিণ্ডদান, মহোৎসব তাদের উদ্দেশ্যে, এসব করলে প্রেতযোনি মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে যায়।" "যতদিন না বংশে কোন ভাগ্যবান জন্মে গয়ায় পিণ্ড দেয়, কি ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়াদি করে, ততকাল প্রেত দেহে থাকতে হয়।" প্রচলিত প্রায়শ্চিত্ত প্রথাকেও মা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মানুষ যে রোগ নিয়ে মরে, যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে মরে, তবে পরজন্মেও সেই রোগ হয়।" এমনি ভাবে সাধারণ মানুষের যাহা ধারণা মা সেইগুলি সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্ঘজননী শ্রীমা জীবন তত্ত্ব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিয়া গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ নারী জীবনের খুঁটি নাটি তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। উপরে যে সব প্রচলিত বিশ্বাসের

কথা আলোচনা করিলাম তাহার অধিকাংশই নারীদের বিশ্বাস।

বাইবেলে আছে "Heaven is much more pleased to see a repentant sinner, than ninety nine percent of them who never go astray." মা এই সম্পর্কে একমত। একবার একটি যুবতী একটা গর্হিত কার্য করিয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হয়। মা তাহাকে কোলদিয়া বলেন, "আচ্ছা, যা করেছ, করেছ, আর করোনা।" তাঁহার মতে "দোষ ত মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে তা জানে কজনে?" "আমার ছেলে যদি ধূলো কাদা মাখে, আমাকেই-ত ধূলো কাদা ঝেড়ে কোল নিতে হবে! মায়ের মত যে, দুষ্টও সৎ হইতে পারে, চোরও সাধু হইতে পারে এবং প্রত্যেককেই সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে।

অন্যের দোষ বন্ধ দিয়া গুণটুকুই দেখিতে হইবে। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, "ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও। আমি যেন কখনও কারও দোষ না দেখি।" আবার বলিয়াছেন। "দোষত মানুষ করেই। ও দেখতে নাই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়।" তিনি অপরের দোষ আলোচনা না করা উচিত বলিয়াছেন। বলিয়াছেন তাহাতে দোষী ব্যক্তির দোষ বা অপরাধ কমিয়া যায়—এবং আলোচনাকারীদের অপরাধ ও দোষ বাড়ে। সুতরাং পরচর্চা মহাপাপ। মানুষকে নির্মল চরিত্র গঠন করিতে হইলে—পরচর্চা বাদ দিতে হইবে এবং সচ্চরিত্র হওয়া প্রত্যেকেরই উচিত—ইহা মায়ের স্পষ্ট অভিমত। তিনি নিজে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র গঠনের প্রার্থনা করিয়াছেন "তোমার ঐ জ্যোছনার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।"

জন্মান্তর বাদে মা বিশ্বাসী। তাঁহার মতে মানুষ মৃত্যুকালে যাহা ভাবে, পরজন্মে সেইরূপ জন্মগ্রহণ করে। মা বলেন "অজ্ঞান হবার পূর্বে যে চিন্তাটি ছিল, যে চিন্তাটি নিয়ে অজ্ঞান হয়েছে, সেই চিন্তাটি অনুযায়ে গতি হয়।" গীতাতে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

"যং যং বাপিস্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।"

"যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তকালে দেহত্যাগ করেন, হে কৌন্তেয়, তিনি সর্বদা সেই ভাবে তন্ময়চিত্ত থাকায় সেই ভাবেই ভাবিত হন।"

"মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এরই প্রতিধ্বনি করিয়া মা বলিয়াছেন, "মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? কথা সত্য হলেও অপ্রিয় করে বলতে নেই।" কিন্তু তিনি যে মিথ্যার বেসাতী করিতে বলিয়াছেন, তাহা নহে।" সত্যতা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা অতি উচ্চ। তিনি বলেন, "এ কলিতে শুধু সত্যের আঁট থাকলেই ভগবান লাভ হয়। "ঠাকুর বলতেন যে সত্য কথাটি ধরে আছে, সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।" "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

"ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি", ইহা মায়েরও মত। তিনি বলেন, "মনেতেই সব। মন শুদ্ধ না হলে কিছুই হয় না" "মন স্থির করে একবার তাকালে লক্ষ জপের কাজ হয়।··· মন চাই, তবে তাঁর কৃপা।" একটু লক্ষ্য করিলেই আমরাও বুঝিতে পারি যে মনের যোগ না থাকিলে আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি অকর্মণ্য হইয়া যায়। ছাত্রদের পক্ষে ইহা সহজ-উপলব্ধি গম্য। পরীক্ষার সময় যেখানে-ঘণ্টা বাজিতেছে তাহার কাছেও বসিয়া দেখিয়াছি কখন ঘণ্টা বাজিয়াছে—টের পাই নাই—কারণ মন সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট। তাই মনোযোগ না থাকিলে কোন কাজ হয় না।

বিবাহ জিনিষটাকে মা খুব ভাল চোখে দেখেন নাই। তিনি বলেন, "বিয়ে করা বড় জঞ্জাল। বিয়ে না করলে আর কি? যেখানে থাক সেখানেই স্বাধীন। বিয়ে করা হচ্ছে মহাপাপ।" "ভগবানকে ডাকুক আর না ডাকুক, যে বে' না করে সে ত অর্ধমুক্ত। যে সময়ে ভগবানে একটু মন হবে, সে সময়ে—হু-হু করে এগোতে থাকবে। আর যাদের মহাপাপ তারাই বিয়ে করে—সংসার করে। বিবাহ সম্বন্ধে মায়ের মত অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। বিবাহ না করে যদি নাই হয়—তবে বিবাহের মত তিনি দিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মত বাল্যবিবাহের তীব্র নিন্দা তিনি করিয়াছেন। তিনি বলেন, এখানে পোড়া দেশের লোকে—কি আট বছর হতে না হতেই বলে পরগোত্র করে

দাও, পরপোত্র করে দাও। বিবাহে দৈহিক সম্পর্কই প্রধান। "তাই মা বলেন, "ভালবাসাই দুঃখ।" "Love is heaven", আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু সেই ভালবাসাতে দৈহিক সম্পর্ক থাকে না। তাহা আত্মিক ভালবাসা। 'Divine Love'.

দুঃখ সম্বন্ধে মায়ের দর্শন বড়ই চমৎকার। "দুঃখই জীবনের স্পর্শমণি"। মা ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দুঃখই ত ভগবানের দরজার দান। তিনি যত দুঃখ কষ্ট দিচ্ছেন তাও বুক পেতে নিতে হবে।" "দুঃখ না থাকলে সুখ কি বুঝা যায়?" আরও বলিয়াছেন যে, দুঃখ—মানুষের কর্মফল। ইহা ভোগ করিতেই হয়। চিরদিন কারও দুঃখে যাবে না। যেমন কর্ম তেমন ফল। তেমন যোগাযোগ হয়।" রোগ ব্যাধিকে মানুষ দুঃখ বলিয়াই মনে করে। কিন্তু মায়ের মতে—"ব্যাধিহি পরমতপঃ"। সত্যই রোগ শোক না থাকিলে মানুষ ভগবানকে ভুলিয়া যাইত। অসুখের সময়ও অন্ততঃ মানুষ ভগবানকে স্মরণ করে। দারিদ্র্যকেও মানুষ দুঃখ বলিয়া ভাবে। কিন্তু মা যীশুর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, "দীনার্তরাই ধন্য।"

যে যুগে মানুষ পরের সর্বস্ব অপহরণ করিতে ব্যস্ত সেই যুগে আবির্ভূত হইয়াও মা সাম্যবাদের জলন্ত বিগ্রহ। প্রত্যেকে যাহাতে সমান সুখে বাস করিতে পারে—তাহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে—ইহা মায়ের মত। শুধু মানুষ নয় পশুপাখীর জন্যও তাঁহার সাম্যবাদী মন সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন, "যারে যা প্রাপ্য তা হতে তাকে বঞ্চিত করা কি উচিত? এই যে তরকারীর খোসাটা—এত গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়।"

জাতের বালাই মায়ের কাছে নাই। যে যতটুকু চরিত্র বলে বলীয়ান সে মায়ের কাছে ততবড়। পৈতা ইত্যাদি ব্রাহ্মণের পরিচয় নয়—ইহা মায়ের মত। বিশ্বজননী যিনি তাঁহার কাছে কোন ভেদ বুদ্ধি থাকিতে পারে না। আমজাদকে সস্নেহে পরিবেশন করার মধ্যেই তাহার প্রমাণ মিলে। সচ্চরিত্র বহু অব্রাহ্মণ ভক্তকে প্রণাম করিবার জন্য মা রাধুকে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ। মা সকলের পূজাধিকার স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই আশ্চর্য চরম গোঁড়ামির যুগেও মা কি সুন্দর প্রগতিশীল মন নিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,—"ভক্তের জাত নেই।"

খাদ্যাদি সম্পর্কে মা খুবই উদার। তিনি কোন বাঁধা ধরা নিয়ম সৃষ্টি করেন নাই। বলিয়াছেন, "খাবার ভিতর কি আছে?" বাঙ্গালীদের মাছ খাওয়ার জন্য তিনি উৎসাহ দিয়াছেন। বলিয়াছেন, "মাছ খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে।" তীর্থ দর্শনের দ্বারা পুণ্য হয় ইহাই মায়ের বিশ্বাস। তিনি নিজেও বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। কাশী সম্পর্কে তিনি বলেন, "কাশী চৈতন্যময় স্থান, এখানে সব জীব চৈতন্যময়"। আরও বলেন, "ঠাকুরের জন্মস্থান—পুণ্যস্থান মহাপীঠস্থান তীর্থভূমি।" মায়ের মতে অল্প বয়সেই তীর্থ ভ্রমণ করা উচিত। মা আবার-এও বলেন যে, ঘরে বসেও তীর্থ ভ্রমণের ফল হয়। "ভ্রমিয়ে যারো—ঘরে বসে তবে, যদি করতে পার।" ইহাই মায়ের মত।

প্রবাদ আছে—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।" মাও এই বিষয়ে এক মত। তিনি বলেন, "যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্ম শাপেও কিছু হয় না।" ঠাকুর স্বয়ং ভগবান—ইহা মায়ের বিশ্বাস।

নিবেদিতা বলিয়াছেন যে, মা পুরাতনের প্রতীক ও নূতনের সার্থক-সূচনা, তাঁহার সার্থকতা দেখিয়াছি আমরা মায়ের দর্শনে। প্রাচীন ও বর্তমানের মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করিয়াছেন তিনি। ব্যবসাদার পুরোহিতের গোঁড়ামিতে দেশ উৎসন্নে যাওয়ার যোগাড় হইয়াছিল। দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী, বিবেকানন্দ ও মহাত্মাজী। প্রগতি শীল মনের যে আদর্শ মা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি সমগ্র মানব সমাজ বিশেষতঃ নারী সমাজ গ্রহণ করেন তবে মহা-কল্যাণ সাধিত হইবে। চিন্তার কার্যে নারীরা সংকীর্ণ—এইরূপ অপবাদ আছে। ইহা অংশে সত্য না হইলেও নির্জলা মিথ্যা নয়। কিন্তু মা এই অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। সমাজের প্রতিটি মা যদি মায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় তবে সমাজ খুবই সুন্দর হইবে। তাহা হইলেই নেমী করিয়া সার্থক মায়ের আবির্ভাব।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় আমি মাকেও প্রণতি জানাইতেছি;—

"তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এজগতে;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।"

শরৎচন্দ্র

রণজিৎ কুমার সেন

একথা হয়তো সত্য যে, শরৎচন্দ্র মানব-চরিত্রের বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শাশ্বত কালের বড় কিছু দর্শন, বড় কিছু সারতত্ত্ব রেখে যেতে পারেননি, কিন্তু তিনি যে-কালের ও যে-সমাজের নর-নারীর মর্ম-বেদনাকে নানা কাহিনীর স্তরে স্তরে গেঁথে রেখে গেছেন, তত্ত্ব হিসেবে, দর্শন হিসেবে তার মূল্যই বা কম কি!

আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান যেখানে প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করে মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির উপর প্রভাব বিস্তার ক'রতে অগ্রসর হ'য়েছে, সমাজবিজ্ঞানের সেই অগ্রগামিতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র অনবহিত ছিলেন না। প্রচলিত নীতি যেখানে ঈশ্বরের নির্দেশরূপে ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগ ক'রেছে, আধুনিক সমাজবিজ্ঞান সেখানে অর্থনৈতিক বনিয়াদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে ব'লেছে—মানুষের জীবন-সংগ্রামের মধ্যেই তার নীতি স্ফুরিত হ'চ্ছে। এ ছাড়া মানুষের মননরাজ্যে বাইরে থেকে প্রবিষ্ট করাবার মতো কোনো বিষয় নয় নীতি। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান শুধু যে একটা কঠিন বিদ্রোহ নিয়েই এসেছে, তা নয়; সেই সঙ্গে কঠিন প্রশ্নও তার কণ্ঠে। পূর্বে সমাজ-জীবনে যে সমস্যাগুলি ছিল, এবং বহুলাংশে এখনও আছে, তার উপর পুরুষ-শাসিত সমাজের কর্তাদের প্রযোজিত ঈশ্বরানুগ ধর্মীয় গোঁড়ামী ও প্রবলের অনুশাসন একদিকে যেমন মুখ্য ছিল, অপরদিকে তেমনি মানুষের মনে সেই অনুশাসন সম্পর্কে ক্ষুব্ধ থাকলেও তার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। সামাজিক অধীনতা সেই প্রকাশক্ষমতাকে পঙ্গু ক'রে রেখেছিল। আধুনিক কালে সেই অধীনতা যে সর্বৈব ঘুচেছে, তা নয়, কিন্তু মানুষের দ্বিধাগ্রস্ত মন ইদানীন্তন কালে প্রবলের ধর্মের ভয়কে জয় ক'রে উঠতে পেরেছে। যেখানেই বাধা, সেখানেই সেই বাধা অপসরণের প্রচেষ্টা ও প্রশ্ন। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান সেই নির্ভীকতা ও প্রশ্ন নিয়েই এগিয়ে এসেছে। শরৎ-সাহিত্যে এই প্রশ্নেরই স্বাক্ষর। তাঁর 'শেষপ্রশ্ন' বাংলার চিরাচরিত সমাজ-নীতির বিরুদ্ধে একটি কঠিন জিজ্ঞাসায় উজ্জ্বল। অথচ তা ব'লে একথা ব'লবোনা যে, প্রচলিত নীতিকে আঘাত ক'রে তিনি জরাগ্রস্ত এই সমাজের পরিবর্তন সাধন ক'রতে পেরেছেন। সে কাজ হ'চ্ছে কর্মীর, সমাজ সংস্কারকের। জীবনশিল্পী সংস্কারের ইঙ্গিত বহন করেন বটে, কিন্তু শাসন-ক্ষমতা যাদের হাতে, প্রকৃতপক্ষে সে কাজ তাদেরই। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হ'চ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রচলিত নীতিকে সম্পূর্ণভাবে ভাঙাও সম্ভব নয়। কিন্তু সেই ভাঙবার গান সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রেই গ'ড়ে ওঠে। বিদেশে অনেক ক্ষেত্রে তা হয়েছে, এবং আমাদের দেশে তার কাজ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণের' কাল থেকে সুচাগ্র পরিমাণে দেখা দিয়েছে। নতুন ধাক্কা এসেছে শরৎচন্দ্র থেকে। তিনি গ্রামকে দেখেছেন, সর্ব-শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের দুঃখ জানতে চেষ্টা করেছেন, সামাজিক ধারাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নেবার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি বাঙালী চরিত্রকে, এবং যতদূর সম্ভব তার সার্থক রূপ দিয়েছেন তিনি। বাংলার প্রচলিত সাহিত্য-ধারায় তিনি বিদ্রোহের সুর যোজনা ক'রে দিলেন। বাংলার মাটিকে তিনি ললাটের তিলক ক'রে নিয়েছিলেন, মাটির মানুষ ছিলেন শরৎচন্দ্র। বাংলার মাটিকেই তাই ভালোবেসেছিলেন তিনি জীবন দিয়ে। সাহিত্যে এতকাল যে সব দেবদুর্লভ চরিত্র ছিল, তারা এসে এতদিনে তাঁর সাহিত্যে দেখা দিল সুখ-দুঃখ ও পাপ-পুণ্যে জড়িত খাঁটি মানুষ হ'য়ে। অবাস্তব বা ইউটোপিয়ান বিষয়বস্তু যতই রোমাঞ্চকর হোক না কেন, তার সঙ্গে যে ব্যবহারিক জীবনের কিছুমাত্র যোগ নেই, মানুষকে মানুষ

হিসেবে বাঁচতে হ'লে যে মাটিকেই প্রয়োজন তার একান্ত ক'রে, শরৎচন্দ্র তার প্রমাণ রেখে গেলেন। ধর্ম নিয়ে তাঁর গোড়ামী ছিলনা, শাস্ত্র নিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে তর্ক ক'রতে জানতেন না, সূক্ষ্মকে ছেড়ে তিনি গ্রহণ ক'রেছিলেন জীবনের অতিবড় সত্যকে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা না ক'রে মানুষের হৃদয়বাদী অস্তিত্বের মধ্যেই তিনি খুঁজেছিলেন পরমার্থলাভের পথ। তাঁর সাহিত্যে মানুষই প্রধান, মানুষই বড়। বাংলার নিগৃহীতা নারী জাতির উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল যেমন অপরিসীম, তেম্‌নি তাঁদের হ'য়ে সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রতেও তিনি কম করেননি। 'নারীর মূল্যে' স্ত্রীজাতির সমস্যাবলীকে শরৎচন্দ্র যেভাবে তুলে ধ'রেছেন, তা অপূর্ব এবং অভূতপূর্ব এবং সেই সঙ্গে সমাজের বিরুদ্ধে একটা বড় challange-ও বটে। বাংলার রক্ষণশীল সমাজ শরৎচন্দ্রকে গ্রহণ বা সহ্য ক'রতে পারেনি, কিন্তু বাংলার বিপ্লবী যৌবন তাঁকে জয়মাল্যে ভূষিত ক'রেছিল। রক্ষণশীল সমাজের আভিজাত্যের মূলে তিনি কুঠারাঘাত ক'রলেন। সমাজের মিথ্যে আভিজাত্যের অহং ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেল। যারা ছিল চির উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণ্য, পতিত ও অনাদৃত, সেই মাটির মানুষেরাই শরৎসাহিত্যের প্রধান নায়ক-নায়িকা হ'য়ে দাঁড়ালো। আনলেন তিনি ডিমোক্রেসির সুর; বাংলার ভাবী গণসাহিত্যের তিনি পথিকৃৎ।

নিজের রচনা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র ব'লেছেন: 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হ'য়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলেনা—সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নিবিচারের দুঃসহ সুবিচার, তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্যে সম্পদে ওরা বসন্ত আনে জানি; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতি-যূথী, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ ব'য়ে গেল, তার ভিতরে ওরা দেখা দিলেনা। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলোনা। সে দারিদ্র্য আর্যার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি, স্তুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ ক'রবার ধৃষ্টতাও আমি করিনি।'

বাংলার নারী-সমস্যা সম্পর্কে ব'লতে গিয়ে তিনি ব'লেছেন: 'মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে ক'রেই রেখেছি, মানুষ হ'তে দিইনি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাইই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় ক'রে দেখেছে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে।... আমার মনে হয়, মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব ক'রেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক—সকল দিক দিয়েই ছোট হ'য়ে গেছে।'

নিপীড়িত জনগণের প্রতিভূ হ'য়ে সংসারে তাদের দাবী প্রতিষ্ঠা ক'রে গেলেন শরৎচন্দ্র। এদিক থেকে তিনি ছিলেন গোর্কি ও ডস্টয়েভস্কির সমগোত্র। 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' গ্রন্থে লিখিত ভদ্র যুবক র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ গিয়ে প্রণাম ক'রলো পতিতা অনূঢ়া সোনিয়াকে। নিজের পরিচয় জানিয়ে বাধা দিতে গেল সোনিয়া, কিন্তু সে বাধা মানলো না; র‍্যাস্‌কল্‌নিকফ; বল্‌লো: 'I did not bow down to you personally, but to the suffering humanity in your person.' অর্থাৎ—'আমি তো তোমাকে প্রণাম করিনি, তোমার মধ্য দিয়ে নিপীড়িত জনগণকেই প্রণাম ক'রলাম।'—র‍্যাস্‌কল্‌নিকফের মুখ দিয়ে ডস্টয়েভস্কিই কথা ব'লেছেন—যেমন ব'লেছেন কমল, সাবিত্রী, কিরণময়ী, গফুর প্রভৃতির মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র। সমাজ সংস্কারের অদম্য শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে না এলেও সামাজিক বৈষম্য আর মানুষের নীচতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন শরৎচন্দ্র। শিল্পীর কাজ সমস্যাকে তুলে ধরা, কর্মীর কাজ সে-সমস্যা সমাধান করা।

স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি ছিলেন শরৎচন্দ্র। কথার পর কথা গেঁথে তিনি শুধু মায়াজালই রচনা করেননি, বাংলার মর্মের দিকটাকেও বিশেষভাবে উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন বাঙালী'র কাছে—যা বহু শতাব্দীব্যাপী অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো তার নিরুদ্ধ মনের মধ্যে গুম্‌রে গুম্‌রে মরছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙালী সমাজে যে ভাঙন ধ'রেছিল, তারই সার্থক রূপ ধরা দিল শরৎ-সাহিত্যে। তাই ব'লে সে রূপ যে অনন্তকালের হ'য়ে থাকবে—এ বিশ্বাস তিনি রাখেননি। একদিন আবার নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে, নতুন ভাবধারা নিয়ে নতুন মানুষ আসবে সংসারে, বড় ক'রে দেখা দেবে আবার সে দিনের সমস্যাগুলিই। অতীত ঢাকা প'ড়ে যাবে। তার জন্যে মনের প্রস্তুতি ছিল শরৎচন্দ্রের। কত বড় বলিষ্ঠ মন হ'লে সে-প্রস্তুতি থাকতে পারে? তিনি ব'লতেন: 'সংসারে অনেক কিছুর মতো মানব-মনেরও পরিবর্তন আছে; সুতরাং আজ যা বড়, আর একদিন তাই যদি তুচ্ছ হ'য়ে যায়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেদিন আমার সাহিত্য সাধনার বৃহত্তর অংশও যদি অনাগতের অবহেলায় ডুবে যায়, আমি ক্ষোভ ক'রবো না। শুধু মনে এই আশা রেখে যাবো, অনেক কিছু বাদ দিয়েও যদি-সত্য কোথাও থাকে, সেটুকু আমার থাকবে।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সে সত্য অমর এবং অবিনশ্বর। অর্থাৎ যে হৃদয় দিয়ে মানুষ ও সমাজকে তিনি উপলব্ধি ক'রেছেন, যে চোখ দিয়ে দেশ-কাল-পাত্রকে তিনি দেখেছেন, যে দরদ দিয়ে স্বদেশকে তিনি ভালবেসেছেন আর যে বুদ্ধি দিয়ে শুভাশুভ সমস্ত কিছুকে তিনি বিচার ক'রেছেন,—সে হৃদয়, সে চোখ, সে দরদ আর সেই বুদ্ধি একান্তই দুর্লভ। সে শুধু সত্য নয়, একান্ত সত্য হ'য়ে ভাবীকালকেও অনুপ্রাণিত ক'রবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বুদ্ধিবাদের একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে আমাদের সমাজ-মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছে। পদে পদে সংশয় ও সন্দেহের চোখ নিয়ে আমরা অগ্রসর হ'য়ে চ'লেছি। তাতে আজকের সাহিত্যিক সমাজের বহুপরিব্যাপ্ত সমস্যা ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধিত মানুষের আচার-পদ্ধতি ও জীবন-ধারাকে ভাষা-বলিষ্ঠ লেখনীতে ফুটিয়ে তুললেও হৃদয়ের উদার বৃত্তির অভাবে তা পরিপূর্ণ সার্থকতার পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। সে পথের সন্ধান র'য়েছে শরৎচন্দ্রের মধ্যে। তাই তিনি আজও অপরাজিত। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সার্থকতা এইখানেই। তিনি মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালী হ'য়েও বিশেষ একটা দেশ-কাল বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পীই তা থাকেন না। বিশেষ কোনো সমাজ বা দেশের তাঁরা চিত্র আঁকলেও তার মধ্যে রূপ নিয়ে দাঁড়ায় কালাতীত দেশোত্তীর্ণ মানুষেরা। তাই তাঁরা বিশেষ কোনো কালের হ'য়েও সর্বকালের এবং সর্ব মানুষের। সেক্সপীয়র সম্পর্কে একসময় লাণ্ডার ব'লেছিলেন: 'Shakespear is not our poet, but the world's, therefore on him no speech.' অর্থাৎ—সেক্সপীয়র শুধু আমাদেরই কবি নন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর, অতএব তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া বাহুল্য।' শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও এই কথাটি প্রযোজ্য। তাঁর মতো মানব-

প্রীতি ও সমবেদনবিধুরতা আজকের সমাজে একান্ত দুর্লভ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি আমাদের সমাজের কোনো কোনো মহল থেকে শরৎ-সাহিত্যকে এরই মধ্যে ছোট ক'রবার একটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রচেষ্টা চ'লেছে। তাঁরা হয়তো অসাধারণ শক্তিধর হ'য়ে থাকবেন, যদিও তেমন কোনো শক্তির অসাধারণত্ব অদ্যাবধি স্পষ্ট হয়ে সমাজের কাছে ধরা দেয়নি। তাঁদের পক্ষে শরৎচন্দ্রের উক্তিটিই বোধ করি যথেষ্ট হবে: 'হয়তো আপনাদের মনের কোণে এই কথাটা আছে—এর শক্তি কম, তা হোক্, কিন্তু এ কখনও অনেক জানার ভান ক'রে আমাদের অকারণ প্রতারণা করেনি।'

সাহিত্যের মুক্তি সম্পর্কে তিনি ভাবীকালের ইঙ্গিত দিয়ে স্পষ্টই ব'লেছেন: '...সমস্ত দেশের সাহিত্যে কত অসত্য, কত পঙ্গুতা এসে পড়েছে। সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হ'য়ে তার ভিতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই তো সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু, আমাদের সাহিত্যে নতুন জিনিষ দেবার যো নেই। ইউরোপের কথা ধরুন। ওদের Church আছে, Navy আছে, Army আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক যাবার যো নেই, কোন-একটু নড়চড় হ'য়েছে কি সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। তারই মধ্যে যে একটু আঘটু পারে, সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্র্যহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। সাহিত্যে—স্বাধীনতার মানে অরাজকতা, anarchy নয়। এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা ক'রে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাইনে, কিন্তু দেখি—কথা হয় যেন সব লুকিয়ে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। 'সিডিসন' (Sedition) বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। তাই আমার মনে হয়, বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না। রাজনীতিতে, ধর্মে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত বাঁধা, পা গুটানো আর থাকবেনা, যেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেইদিন আবার সাহিত্য সৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।'

আজ স্বাধীন-ভারতে তার আভাস ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌চে। বিশ্বের ছায়াপাত ঘটেছে আজ বাংলা সাহিত্যে। আজ কেবল বাঙালী জীবনের সমস্যাই বড় নয়, ভাগতিক সমস্যাবলীর তা একটা অংশমাত্র। এই ভাবে আজ বাংলা সাহিত্যের একটি ব্যাপ্তির যুগ সুরু হ'য়ে গেছে, এবং সেই যুগের অগ্রনায়ক ও প্রথম প্রবর্তক হ'চ্ছেন শরৎচন্দ্র। কোনো দলবিশেষের অনুদার চিত্তবৃত্তির মাপকাঠিতে শরৎচন্দ্রের বিচার করা চলে না। ম্যাথার যেমন সেক্সপীয়র সম্বন্ধে বলেছেন, শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও সেই কথাটিই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাঙালী সমাজ তার পরম লাঞ্ছনার দিনে পেয়েছিল দরদী শরৎচন্দ্রকে। বাংলা সাহিত্যের ক্রমঃপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী যদি কখনও অকৃতজ্ঞ চিত্তে তার সেই দরদী মানুষটিকে অকস্মাৎ ভুলে যায়, তবে তার মতো বড় পাপ বোধ করি বাঙালী জীবনে কোনোদিন ঘটবে না।

সাতাইশে নভেম্বর

শ্রীউৎপল রায়

সাতাইশে নভেম্বর—আমার জন্মদিন। বন্ধু অসীমের অনুরোধে দিনটি কোলকাতায় কাটানো ঠিক হলো।

আগের দিনে কোলকাতায় এসে হাজির হলাম। আমার উড়োজাহাজখানা যখন দমদম বিমানগৃহে পৌঁছাল তখন ভোরের পাখীর কাকলী সুরু হয়েছে। কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষ আর সিক্যুরিটি পুলিসের হাত থেকে সহজেই ছাড়া পেয়ে একটি ভাড়াটে ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হলাম বন্ধুর ঠিকানায়। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়ায় বাড়ী। দোতলায় পাশাপাশি খানকয়েক ফ্ল্যাট। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খৃষ্টান, মাদ্রাজী, বাঙ্গালী প্রতিবেশীতে মিলে একটি সেক্যুলর ষ্টেট।

ভোরের প্রথম সূর্য সামনের নিমগাছের আড়াল থেকে তখনও লুকোচুরি খেলছে। এক একটি রূপালী কিতার মতো এসে পড়ছে বারান্দায় রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উনিশ কুড়ি বছরের মেয়েটির গায়। আমি সিঁড়ির মুখে পা বাড়াতেই মেয়েটির চোখে চোখ পড়ল। একটা অপূর্ব সৌন্দর্যের ঝলকানি আমার চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। একটু জোর করেই আমার চোখ জোড়াকে টেনে এসে বন্ধুর ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে গেলাম। থমকে দাঁড়াতে হল। বন্ধুর ফ্ল্যাট তালা বন্ধ।

মেয়েটি এগিয়ে এসে বললো—আপনি কি অসীমবাবুকে চান? আপনিই কি মিঃ রায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি আমার আসবার কথা জানেন?

বললে—হ্যাঁ জানি। তারপর বললো অনিবার্য কারণে কালই বিকালে অসীমবাবুদের এবাড়ী ছেড়ে যেতে হয়েছে। তাঁরা দেশে চলে গেছেন। যাবার সময় আপনাকে এক-খানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

ঘরে ঢুকে খামে আঁটা একখানা চিঠি এনে আমার হাতে দিল। চিঠিখানা নিতে গিয়ে আবার তার চোখে চোখ পড়ল। আমি আমার অবাধ্য চোখ দু'টোকে টেনে আনতে পারছিলাম না। আমার মনে হলো—"ভারত-বর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র" সত্যই মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।"

অসীম লিখেছে—প্রায় দেড় বছরের বাড়ী ভাড়া ছিল বাকী। সবটা আমার নয়। বন্ধুর নে'য়া বাড়ী। বাকীর অঙ্কটা সবটা ছিল না আমার জানার মধ্যে—তবুও অনেকটাই ছিল। উপায় ছিল না কিছু। বন্ধুর নামে নোটিশ করে উঠিয়ে দেবার হুকুম কখন কোর্ট থেকে হয়েছে টেরও পাইনি। আদালতের হুকুম নিয়ে এসে হাজির। বাড়ী ছাড়তেই হবে। এত তাড়াতাড়ি উঠতে হবে ভাবতে পারিনি। কি আর করব? সবাইকে নিয়ে বাড়ীর দিকে দিকে ছুটতে হলো—সেও এক অনির্দেশ যাত্রা।

সেই সঙ্গে লিখেছে—

"তোমার জন্ম দিনে থাকতে পারলাম না, কিন্তু রইল আমার অফুরন্ত শুভ কামনা।

একই সঙ্গে নানা কথা এসে মনের দুয়ারে ভীড় করলো। একদিন এদেরও ঐশ্বর্য ছিল। দালান কোঠা বাড়ী ঘর সব কিছুই। কিন্তু জানি না কেন—লক্ষ্মী মুখ ফিরালেন। আজ কিনা এরা পথে এসে দাঁড়িয়েছে! কে জানে—হয়ত বা দেনার দায়ে খাজনার-দায়ে গ্রামের বাড়ীর ভাঙ্গা দালানের ইটগুলোও নিলাম করে নিয়েছে মহাজন; নয়ত জমিদার। অথবা দখল করে নিয়েছে রাজনৈতিক চক্রান্তকারীর দল। এমনি ধারা ভাবতে ভাবতে কয়েক মিনিট কেটে গেল। তারপর মনে মনে ঠিক করে ফেললাম একটা হোটেলে গিয়ে উঠব। এ্যাটাচিকেসটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই মেয়েটি বাধা দিয়ে বললো—কোথায় যাবেন? একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো—বসুন, চা আসবে।

চা এলো। আমার হাতে একটি পেয়ালা তুলে দিয়ে

আর একটি পেয়ালা হাতে করে সে রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। ডান পাটাকে একটু উঁচুতে তুলে বাঁ পায়ে ঠেকিয়ে বুড়ো আঙুলটাকে আনমনা ভাবে নাড়তে নাড়তে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অত্যন্ত পরিচিতের মত সপ্রতিভভাবে বললো—আপনি যে ক'দিন থাকবেন আমাদের অতিথি হয়েই থাকবেন—আপনাকে আর কোথাও যেতে দেওয়া হ'বে না।

সেই সঙ্গে বললো অসীমের পরিবারের সঙ্গে তাদের নিবিড় বন্ধুত্ব। আমাকে তারা কোথাও যেতে দিতে পারে না।

আমি একটু আপত্তি করতেই, হুকুমের ভঙ্গীতে জানিয়ে দিলো কোন আপত্তি চলবে না।

চা খাওয়া শেষ হ'তেই আমাকে নিয়ে গেল তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। তারপর পাশে একটি ছোট্ট কামরায় আমার জিনিষ ক'খানা গুছিয়ে দিয়ে বললো—এঘরটা আপনাকে দেওয়া হলো। কোন কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন,—কেমন?—হ্যাঁ, আমার নাম দময়ন্তী রিচার্ড। অতটা বলতে পারবেন না। তা—যেটুকু ভাল লাগে তাই বলে ডাকবেন।

মেয়েটি চলে গেল নিজের কাজে। আমি ভাবতে লাগলাম মেয়েটির অদ্ভুত আপন করে নেবার ক্ষমতার কথা। চমৎকার তার কথা বলবার ভঙ্গী। মনে হলো প্রাচ্যের সকরুণ মমতা আর পশ্চিমের সংস্কারমুক্ত মন দুই-ই মিলেছে ওর মধ্যে। আর তা ধরা পড়েছে তার নামে।

বাড়ীর কাজ সেরে দশটা বাজতেই বেরিয়ে পড়ল অফিসে। যাবার বেলায় বলে গেল—বাড়ীর অতিথি হয়ে বসে থাকবেন না যেন।

বিকালে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ী ফিরতে বেশ একটু রাত হলো। সবাই আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। খাবার টেবিল সাজানো। ঘরে ঢুকতেই একটু শাসনের ভঙ্গীতে দময়ন্তী বলে উঠলো এত রাতে কোথায় ছিলেন? একটু লজ্জিত হ'লাম। খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই নিজের ঘরে চলে গেল। বাতিটি নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বার হুকুম করে দময়ন্তী চলে গেল তার শোবার ঘরে। আমার কিন্তু ঘুম হ'লো না। মন নানা কথায় ভরে উঠতে লাগলো। নানা স্বপ্ন নানা রঙে রঙিন হয়ে নানা চেহারায় মনের দুয়ারে এসে হাজির হতে লাগলো।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারটা বাজলো। ছোট্ট নীল আলোটি জ্বালিয়ে ঘরটি আলো করে দরজা ঠেলে ঢুকলো শ্রীমতী দময়ন্তী। আমার হাতে একটা তাজা ফোটা গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে বললো—আপনার জীবন এই ফুলের মত সুন্দর হোক।

আমি সকৃতজ্ঞ নমস্কারে আমার জন্মদিনের প্রথম প্রহরে তার শুভ কামনা মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। সে তার ঘরে চলে গেল।

পরদিন রোববার। অসীম নেই, আমার সাথী হলো দময়ন্তী। সকাল থেকে আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যায় এসে গান্ধীঘাটে হাজির হ'লাম। শীতের সন্ধ্যা, দর্শকের তেমন ভীড় নেই। এক কোণে সিঁড়ির উপর আমরা দু'জন পাশাপাশি বসে আছি। চুপ চাপ। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম দময়ন্তীর দৃষ্টি নদীর স্রোত বেয়ে দূরে বহুদূরে চলে গেছে। আনমনা হয়ে কত কি ভাবছে।

জিজ্ঞেস করলাম কি ভাবছেন?

একদম হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলে বললো—কি ভাবছিলাম? বলব? তা আপনাকে বলতে আমার আপত্তি নেই।

বললাম—এত সহজে লোককে বিশ্বাস করতে নেই। ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে বললো—বিশ্বাস করে ঠকতে আমি রাজী—কিন্তু মানুষকে অবিশ্বাস করতে পারব না।

একটু হেসে বললাম—জীবনে দুঃখ আছে ঢের।

তা থাক্'। বাক্তিত্বে ভরা তার কণ্ঠ আমার কানে বেজে মনে এসে ধাক্কা দিল। আমি চুপ করে গেলাম।

দময়ন্তী বলে চললো—রাজনীতির জোয়ারের ঠেলায় অসীম বাবুর পরিবার এলো ভেসে। আমরা এসেছি অর্থের অন্বেষণে তারও কিছু আগে। আমাদের নৌকা যেখানে এসে ভিড়লো তাঁরাও এসে তারই পাশে ঠেকলেন। আমাকে অর্থের অন্বেষণে ঘুরতে হয় পাগলের মত। অসীম বাবুরও সেই দশা। ছাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর বাড়ী ফিরে

আমাদের দু'জনে মাঝে মাঝে আলাপ হয় একটু আধটু। টুকরো রাজনীতি, একটু সাহিত্য, সামাজিক সমস্যা এমনি আরও।

সেদিন ছিল শনিবার। অফিসের পর ট্রামের ভীড় এড়াতে গিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরছি। সঙ্গে সুনন্দা। সুনন্দা আমাদের অফিসেরই একটি মেয়ে। সুনন্দা হঠাৎ বললো—জানিস্, মিসেস্ সুর আজ বলছিলেন তুই নাকি···

চাকরীর সুরু থেকে এমনি ধরো টিপ্পনী শুনে শুনে প্রায় প্রুফ্ হয়ে এসেছি। একে বিলিফের চাকরী। তায় কর্তাব্যক্তিদের কীর্তির অভাব নেই। ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে এ্যাসেম্বিলী হাউস পর্যন্ত তাঁরা গরম করে রাখেন। অতএব এর উত্তাপ একটু আধটু লাগবে এত স্বাভাবিক। তবুও কথাটা বুকে এসে ধাক্কা দিল। আহত করল আমাকে।

বালবিধবা মিসেস্ সুর একাউন্টস-এ কাজ করেন। সুনন্দা একদিন তাকে বলেছিল—আপনার হিসাবের খাতায় জমার ঘরে দেখছি আছে শুধু আপনার ব্রহ্মচর্য আর সতীত্বের হিসাব—আর খরচের কোঠা ভরে রেখেছেন সার্বজনীন দুর্নীতির খতিয়ান দিয়ে। সুনন্দাই নয়, রুচিওয়ালা মাত্রেরই মিসেস্ সুরের রসালো দুর্নীতির ঘোষণা বেসুর ঠেকত—কিন্তু তাই বলে তার শ্রোতার অভাব ঘটেনি কোনদিন! হালে তিনি তাঁর সুর এত চড়িয়ে দিয়েছেন যে তা ব্যক্তিগত কুৎসায় এসে পৌঁছেছে। তাঁর রুচিজ্ঞানের নির্লজ্জ পরিণতি দেখে ক্রোধে ক্ষোভে আমার সারা দেহ কাঁপতে লাগলো। বাড়ী ঢুকে মেজেতে মাদুর পেতে আমি শুয়ে পড়লাম। আমার সারা দেহ অবশ হয়ে এলো।

সন্ধ্যার পর অসীমবাবু এলেন। দেহটাকে অতি কষ্টে টেনে তুলে কোন মনে বললাম। মুখে কোন কথা সরছিল না।

অসীমবাবু প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে আপনার?

একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। বললাম—কই,—না ত'!

—এত কি ভাবছেন?

—এত কি ভাবছি? একটু থেমে বললাম—ভাবছি একটি আংটি তৈরী করব। তাতে থাকবে জীবনের একটা ছবি। আংটিটাকে ঘিরে থাকবে একটা সাপ। চোখের কাছে থাকবে দু'টো পাথর—দু'টো ক্যাটস্ আই! রাতের অন্ধকারে ঝকঝক করে জলবে। তেমনি থাকবে মুখে খানিকটা পটাসিয়াম সাইনেড্—। আত্মহত্যার জন্য নয়—সাংঘাতিকতার প্রমাণ।

আমার অব্যক্ত বেদনার স্পর্শ তিনি অনুভব করলেন। সহানুভূতিতে তার বুক ভরে উঠলো। আমাকে অনুরোধ করলেন একটু ঘুরে আসবার জন্য। এক রকম টেনে হিঁচড়েই আমাকে বার করলেন। সেদিনও এই খানেই আমরা এসেছিলাম। বসেছিলামও এমনি পাশাপাশি। আমি আর কিছুতেই আমার দেহের ভার সামলাতে পারছিলাম না। আমার দেহ তাঁকে আশ্রয় করে এলিয়ে পড়লো। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্রোতে যেন আমার সকল গ্লানি ধুয়ে নিয়ে গেল। তাঁর সস্নেহ স্পর্শে আমি তৃপ্তি অনুভব করলাম। আমার দেহমন জুড়িয়ে এলো। আমি যেন একটা আশ্রয় খুঁজে পেলাম। মুহূর্তের জন্য নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললাম।

আকাশে শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ। আমার চোখে চোখ পড়তেই খিল খিল করে হেসে উঠল। সে হাসির অর্থ আমি বুঝলাম। লজ্জায় আমি একরকম মরে গেলাম। আস্তে করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বললাম অনেক রাত হয়েছে চলুন উঠি।

বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হলো। খাওয়া দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। সারারাত ঘুম হলো না। ক্ষণিকের দুর্বলতাকে আমি কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারলাম না। মুছে দিতে চাইলাম না সে স্মৃতিকে। আমার সেই দুর্বলতার সলজ্জ সাক্ষ্য আমার ডায়রীর খানকয়েক পাতায়। দেখবেন? বাড়ী ফিরে আপনাকে দেখাব।

হাওয়ায় উড়ে আসা দময়ন্তীর চুলগুলো আমার দেহে সস্নেহে স্পর্শ ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার সকরুণ মমতা। মনে দুলছিল অজানা স্পন্দন।

বলা তার শেষ হলো। আমরা উঠে পড়লাম। আমার মন তখনকণে উড়ে গিয়েছিল কোন কেতকীর বেড়া ডিঙিয়ে কোন এক অজানা সিপ্রা নদীতীরে।

সারা পথ চুপচাপ কেটে গেল। বাড়ী ফিরেই দময়ন্তী ডায়েরী হাতে আমার ঘরে এসে হাজির। সেই সঙ্গে দেখালো একটি শঙ্খ। পুরীর বেলাভূমি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া হবে। শঙ্খটি দেখিয়ে বললো—অসীমবাবুর টেবিল থেকে সেদিন এটিকে তুলে নিয়েছিলাম। না বলেই নিয়েছিলাম। ভাল লাগছিল না। মন কেবলই বলছিলো—না বলে নেওয়া? না, ওঁকে জানান চাই-ই। ঘুরে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার কি কিছু হারিয়েছে?

একটু হেসে একটু আনমনা হয়ে বললেন—না ত; কিছুই হারায় নি। সব ঠিক আছে।

তারপর আমার মুখের দিকে বেশ করে তাকিয়ে টেবিল থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে কি যেন লিখতে সুরু করলেন।

আমার সারা দেহে যেন একটা বিদ্যুতের চমকানী অনুভব করলাম। সেই সঙ্গে মন বলতে লাগলো—"সব ঠিক আছে"—বানিয়ে বললেন না ত?

দময়ন্তী আরও কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা তার ভিজে এলো। আবেগভরা কণ্ঠে তার সকল ভিতরের আন্দোলনকে অতিক্রম করে বেরিয়ে এল—আমার প্রতি তার প্রশ্ন—"আচ্ছা, আপনি জাত মানেন না?"

বললাম—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

বললো—আপনি আমাদের ছোঁয়া খান যে—আপনার জাত যাবে না? আমরা ত ছোট জাত।

একটু হাল্কা করবার জন্য বললাম—জাত যাবার ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাও নাকি?

কিন্তু দময়ন্তী নিজেকে আর চেপে রাখতে পারল না। একেবারে ফেটে পড়ল। বললো—না অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া আমাদের স্বভাব নয়। সে আপনারাই পারেন। আপনাদের প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা সবই আপনাদের জাত্যভিমানের হাতে পরাভূত। আপনারা ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করতে পারেন, মরবার পর তাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতে পারেন, মানুষকে নারায়ণ বলে প্রচার করতে পারেন, কিন্তু মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করেন না। তাদের আপনারা জানেন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বলে। তাদের আপনারা বিচার করেন সামাজিক আচারের মাপ কাঠি দিয়ে। আপনারা সভায় সমিতিতে বক্তৃতায় প্রচার করেন—"অজ, মূর্খ মুচি মেথর" আপনাদের ভাই, কিন্তু ও আপনাদের মনের কথা নয়, মুখের কথা।

বুঝলাম কোথায় তার বেজেছে। বললাম ত্রুটি আমাদের আছে জানি। কিন্তু আমরা জানি সমাজ বদলায়; তার অনুশাসন চিরদিন এক থাকে না। ইতিহাসের প্রয়োজনে আমাদের সমাজ কখনও পিছনে পড়ে থাকবে না।

—না, তা আপনাদের হয় না। যদি হ'তো তবে আমরা আজও নীচ জাত বলে উপেক্ষিত হ'তাম না। আমাদেরকে আপনাদের থেকে দূরে সরে আসতে হ'তো না।

বললাম—তা কেন হবে? ধর্মের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আসক্তি ত থাকবেই।

উপেক্ষার হাসি হেসে বললো—ধর্ম, ধর্ম ক'টা লোক মানে? আচ্ছা বলতে পারেন ধর্ম বলতে কি বোঝেন?

—বললাম—ধর্ম বলতে আমাদের শাস্ত্রকাররা বোঝেন সত্যকেই।

বললো—তা কি আপনারা মানেন? সত্যের খাতিরেও কি আপনারা মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করেন?

বললাম—আমাদের দুর্বলতার কথা আমি জানি আর সেই রন্ধ্রপথে পাপ ঢুকে সমাজ দেহে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তাও আমি মানি। এও মাঝে মাঝে মনে হয় স্বয়ং ভগবানও হয়ত এ ছিদ্র বন্ধ করতে পারবেন না। তাই বলে সমাজের একটা সংস্কারকে—একটা দুর্বলতাকে ধর্ম বলে মেনে নেওয়া উচিত হয় না। কেননা প্রতিদিন যা ঘটে তা সত্য নয়—ঘটনা মাত্র।

দু'জনেই চুপ করে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ এমনি কাটলো। তারপর বললাম—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? কিছু মনে করবে না ত?

—বলুন।

—অসীম কি জাত মানে?

—খুব সম্ভব না। তবে বাড়ীর লোকেরা ত মানেন।

আর একটা কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। বললো—থাক; এবার ঘুমান। রাত অনেক হয়েছে। শরীর খারাপ হবে।

আলো নিবিয়ে দিয়ে সে চলে গেলো।

দু'দিনের পরিচয়ের স্মৃতি নিয়ে আমাকে ফিরতে হলো। আসবার সময় বার বার বলে এলাম চিঠি লিখবার জন্য, জবাব এড়িয়ে অনুরোধ করলো কোলকাতায় এলে তাদের অতিথি হ'তে। ঢাকায় এসে চিঠি লিখেছিলাম। জবাব পাই নি! তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আমার দু'দিনের মেষ্ট দময়ন্তী—ভারতের সর্বকালের সকল নর-নারীর শ্রদ্ধার আসন দখল করে রইল।

হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি এলো। অচেনা মেয়েলী হাতের লেখা। দময়ন্তীর চিঠি। পিতার মৃত্যু শয্যার পাশে বসে লিখেছে—

"আসন্ন বিপদের প্রতীক্ষায় বসে আছি। কেবলই আপনাকে মনে হচ্ছে।"

আর কিছু নাই।

চিঠি পড়ে নিজেকে সামলাতে পারি নি। অনেক ভেবে সন্ধ্যার ফ্লাইটে কোলকাতা পৌঁছলাম। আমাকে দেখে কত খুসী! বললো জানতামই আপনি না এসে থাকতে পারবেন না।

সন্ধ্যার পরের দিকে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে গেল। ডাক্তার এলেন। বলে গেলেন রাতটা একটু সাবধানে কাটাতে।

রাত আর কাটলো না। রাত দু'টোর বৃদ্ধ চলে গেলেন।

সেবাব্রতী দময়ন্তী! একদিনে কী অদ্ভুত বদলে গেল। সারাদিন বেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটুগেড়ে পাথরের মূর্তির মত বসে রইল। সন্ধ্যা নেমে এলো। পাশে বসে ভাবছিলাম কি বলে সান্ত্বনা দেব। ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তবুও চেষ্টা করলাম। পিঠে সস্নেহে হাত দিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম —"ভাই, চোখের জলে তাঁর যাত্রা পথকে ভিজিয়ে পিচ্ছিল করে কি লাভ? কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। আমার স্পর্শে সে ভেঙ্গে পড়লো। আমার কোলের উপর মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো—ভীষণ কান্না! সে কান্নার ভাষা নেই।

আমাকে ফিরতে হলো ঢাকায়! ফিরে অনেক চিঠি লিখেছি। যদি একটু খবর পাই। কেমন আছে? কি করে চলছে? কোন আপদ ঘটে নি ত?

কোন জবাব পাই নি। ক্ষোভে দুঃখে এক একবার মন বিদ্রোহী হয়েছে। আবার তার সেই হাসিমাখা মুখ-খানি চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সব অভিমান মুহূর্তে মিলিয়ে গেছে।

একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সাতাইশে নভেম্বর তার চিঠি এলো আমার জন্মদিনে তার শুভেচ্ছা বহন করে। তারপর থেকে প্রতি বছর সাতাইশে নভেম্বরে তার চিঠি পাই। নিজের কোন কথাই কোনদিন জানতে দেয় নি। মাঝে মাঝে জানতে চেয়েছে আমার খবর। অনেক উপদেশও দিয়েছে।

তার সম্বন্ধে কৌতূহল হয়েছে—জানতে চেয়েছি অনেক কথাই। জবাব দেয় নি।

এবারেও আমার জন্মদিনে পাঠিয়েছে তার অনুরন্ত শুভেচ্ছা। সেই সঙ্গে পাঠিয়েছে অসীমের কাব্যসংগ্রহ।

দময়ন্তী তাতে স্থান পেয়েছে। নীল শাড়ীর অব-গুণ্ঠন ভেদ করে তার ছবি ফুটেছে। কিন্তু শ্রদ্ধায় নয়, অনুরাগে নয়—অনুকম্পায়।

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : 22-6853-58

নূতন দশমিক মুদ্রার বিনিময় হার

নূতন দশমিক মুদ্রাগুলি আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৫৭) হইতে বাজারে ছাড়া হইলে প্রচলিত মুদ্রার কত আনা কত পাই দিয়া কতটি নয়া পয়সা পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে প্রধান চিন্তার বিষয়। অবশ্য এ বিষয়ে দুশ্চিন্তার কিছুই নাই। কারণ নূতন মুদ্রাগুলি প্রচলিত হইবার পরও কয়েক বৎসর পুরাতন ও নূতন উভয় শ্রেণীর মুদ্রাই আইনানুগ মুদ্রা বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

আজকাল এক টাকায় ৬৪টি পয়সা বা ১৯২ পাই হয়। নূতন ব্যবস্থায় ১০০ নয়া পয়সায় এক টাকা হইবে। নিম্নের তালিকায় নূতন মুদ্রা ও পুরাতন মুদ্রার বিভিন্ন অংশগুলি পাশাপাশি দেখান হইল (এইগুলি অবশ্য সর্বক্ষেত্রে সমমূল্যের নহে) :—

নয়া পয়সা	প্রচলিত মুদ্রা
১ নয়া পয়সা	১ পয়সা
২ নয়া পয়সা	২ পয়সা
৫ নয়া পয়সা	১ আনা
১০ নয়া পয়সা	২ আনা
২৫ নয়া পয়সা	৪ আনা
৫০ নয়া পয়সা	৮ আনা
১০০ নয়া পয়সা	১৬ আনা
(১ টাকা)	(১ টাকা)

উপরের তালিকায় নূতন মুদ্রার ২৫, ৫০ এবং ১০০ নয়া পয়সার সমমূল্যের মুদ্রা প্রচলিত মুদ্রায় আছে। সেইগুলি হইল যথাক্রমে প্রচলিত মুদ্রার ৪ আনা, ৮ আনা এবং এক টাকা। কিন্তু ১ নয়া পয়সা, ২ নয়া পয়সা, ৫ নয়া পয়সা এবং ১০ নয়া পয়সার সমমূল্যের কোনও মুদ্রা বর্তমানে চালু নাই। এইগুলি প্রচলিত ১ পয়সা, ২ পয়সা, এক আনা এবং ২ আনার স্থান গ্রহণ করিবে।

আগামী ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল সবগুলি নূতন মুদ্রা বাজারে ছাড়া হইবে না। কেবলমাত্র ১ নয়া পয়সা, ২ নয়া পয়সা, ৫ নয়া পয়সা এবং ১০ নয়া পয়সা বাজারে ছাড়া হইবে। অন্য মুদ্রাগুলি অর্থাৎ ২৫ নয়া পয়সা, ৫০ নয়া পয়সা এবং নূতন টাকা (১০০ নয়া পয়সা) পরে ছাড়া হইবে।

ক্রমে ক্রমে যতই নূতন মুদ্রা বাজারে চালু করা হইবে, প্রচলিত মুদ্রাগুলিও ক্রমে ক্রমে বাজার হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে। তিন বৎসর কালের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই মধ্যবর্তী সময়ে নূতন ও পুরাতন মুদ্রার বিনিময় হার সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

রেডি রেকনার

লোকে যাহাতে সহজে এই বিনিময় হার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারে সেইজন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুইটি রেডি রেকনার (পূর্ব নির্ধারিত বিনিময় তালিকা) প্রস্তুত করা হইয়াছে। টাকার লেনদেনের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে এইগুলি পাওয়া যাইবে। এই রেকনারগুলিতে ১ টাকা পর্যন্ত বিনিময় হার দেওয়া আছে। এক টাকা ও তাহার বেশী টাকার বিনিময় হার নূতন করিয়া শিখিবার কোনও প্রয়োজন নাই; কারণ প্রচলিত এবং নূতন উভয় প্রকার মুদ্রা ব্যবস্থায়ই টাকার মূল্য অপরিবর্তিত আছে।

১নং রেডি রেকনারে ১ পাই হইতে ১ টাকা পর্যন্ত সকল মুদ্রার বিনিময় হার দেওয়া আছে। ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে খাতাপত্রে হিসাব ঠিক করিবার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ ইহা তৈয়ার করা হইয়াছে। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে যেটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেইটি হইল ২নং রেডি রেকনার। ইহাকে সরল রেডি রেকনারও বলা হইয়া থাকে। ইহাতে আনায় ও পয়সায় বিনিময় হার নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৩ পাই, ৬ পাই এবং ৯ পাই—এই ভাবে পয়সার হিসাব দেওয়া আছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য সংখ্যার পাই এই হিসাবে ধরা হয় নাই। কারণ লেনদেনের ব্যাপারে পাই মুদ্রার বড় বেশী চলন নাই।

এই সরল রেকনার (২নং) ব্যবহার করার সময় জনসাধারণ দেখিবেন, আনার কলমটি উপর হইতে নীচে ১ হইতে ১৬ এর কোঠা পর্যন্ত আছে। তীর আঁকিয়া ইহার গতি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাম হইতে ডান দিকে গিয়াছে পাইয়ের কলম। এখানেও তীর আঁকিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক আনা ও পাইয়ের সমমূল্যের নয়া পয়সা কত হইবে তাহা বাহির করিতে হইলে উপরের দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া চলিতে হইবে।

লেনদেনের ব্যাপারে যখন প্রকৃত পক্ষে মুদ্রা দেওয়া হয় তখনই মাত্র এই তালিকা ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে পুরাতন মুদ্রা নূতন মুদ্রায় রূপান্তরের প্রয়োজন হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে সঠিক হার বাহির করিতে হইবে—ইহাতে টাকার ভগ্নাংশও বাদ দেওয়া চলিবে না। তারপর ঐ ভগ্নাংশগুলি উপরের বিনিময় তালিকা অনুযায়ী নয়া পয়সায় পরিবর্তিত করিতে হইবে। যেমন, যদি একটি পেন্সিলের দাম হয় দেড় আনা (ছয় পয়সা) আর কেহ এক ডজন পেন্সিল কিনিতে চান তবে কেবল নয়া পয়সায় দাম দিতে হইলে নিম্ন লিখিতভাবে হিসাব করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ মূল্য বাহির করিতে হইবে :—

প্রচলিত মুদ্রায় ১২টি পেন্সিলের দাম= ১২ × ১½ = ১৮ আনা অথবা ১ টাকা ২ আনা

এই টাকার মূল্য নূতন মুদ্রা ব্যবস্থায়ও অপরিবর্তিত আছে। সরল রেকনার (২নং) অনুসারে ২ আনার সমান হইল ১২ নয়া পয়সা। কাজেই নূতন মুদ্রায় ১২টি পেন্সিলের দাম হইবে ১ টাকা ১২ নয়া পয়সা।

১নং রেডি রেকনার

খাতাপত্রে হিসাব মিলাইবার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ ১নং রেডি রেকনার তৈয়ার করা হইয়াছে। ইহার ব্যবহারে একটু অসুবিধা হইতে পারে। কারণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে প্রচলিত মুদ্রার বিভিন্ন পরিমাণ একই সংখ্যক নয়া পয়সার সমান। যেমন, ৩ পাইও ২ নয়া পয়সার সমান এবং ৪ পাইও ২ নয়া পয়সার সমান ধরিয়া ধরা হইয়াছে। ১০০ নয়া পয়সার সমান ১৯২ পাই ধরিয়া ৪ পাই দুই পয়সার কাছাকাছি হয়; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ৩ পাই লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কারণ ১৯৫৫ সালের ভারতীয় মুদ্রা (সংশোধন) আইনের ১৪ (২) ধারা অনুযায়ী মোটামুটি হিসাবে উহা ২ নয়া পয়সার সামিল।

কাজেই এই হিসাবে কিছু ক্ষতি হইবে—বিশেষতঃ প্রথম দিকে। কিন্তু যখন অধিক সংখ্যায় নূতন মুদ্রা চালু হইবে তখন এই ক্ষতি অনেক কমিয়া যাইবে। মাত্র নয়া পয়সা দেওয়ার সময় এই মোটামুটি হিসাব প্রযোজ্য। কাজেই এই হিসাবের সুবিধা লাভের আশায় কেহ কেহ কেবল পয়সার পর পয়সা বা আরও ছোট মুদ্রা দিয়া যাইবে —ইহার সম্ভাবনা কম। বেশী পরিমাণে পয়সা দিলে লোকসানের ভাগ আরও কমিবে। সে যাহাই হউক, যতটুকু ক্ষতিই হউক না কেন, মাত্র একজন ব্যক্তির সামান্য ক্ষতি হইবে আর একজন ব্যক্তির ততটুকু লাভ হইবে। আর, মধ্যবর্তীকালীন কয়টা বৎসর পার হইয়া গেলে আর কোনও সমস্যাই থাকিবে না।

চলতি মুদ্রা ও দশমিক মুদ্রার পারস্পরিক মূল্য হ্রাস

আগামী ১৯৬৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতে দশমিক মুদ্রা চালু হইবে। তখন হইতে তিন বৎসর কাল বর্তমানের চলতি মুদ্রার প্রচলনও অব্যাহত থাকিবে। উক্ত অন্তর্বর্তীকালে উভয় শ্রেণীর মুদ্রার পারস্পরিক মূল্যহার নিম্নরূপ হইবে :—

চলতি মুদ্রার মান	দশমিক মুদ্রার মান
১ পাই	১ নয়া পয়সা
২ পাই	১ নয়া পয়সা
৩ পাই বা ১ পয়সা	২ নয়া পয়সা
৪ পাই	২ নয়া পয়সা
৫ পাই	৩ নয়া পয়সা
৬ পাই বা ২ পয়সা	৩ নয়া পয়সা
৭ পাই	৪ নয়া পয়সা
৮ পাই	৪ নয়া পয়সা
৯ পাই বা ৩ পয়সা	৫ নয়া পয়সা

চলতি মুদ্রার নাম	দশমিক মুদ্রার নাম	চলতি মুদ্রার নাম	দশমিক মুদ্রার নাম
১০ পাই	৫ নয়া পয়সা	৩ আনা ৮ পাই	২৩ নয়া পয়সা
১১ পাই	৬ নয়া পয়সা	৩ আনা ৯ পাই	২৩ নয়া পয়সা
১২ পাই বা ১ আনা	৬ নয়া পয়সা	৩ আনা ১০ পাই	২৪ নয়া পয়সা
১ আনা ১ পাই	৭ নয়া পয়সা	৩ আনা ১১ পাই	২৪ নয়া পয়সা
১ আনা ২ পাই	৭ নয়া পয়সা	৪ আনা	২৫ নয়া পয়সা
১ আনা ৩ পাই	৮ নয়া পয়সা	৪ আনা ১ পাই	২৫ নয়া পয়সা
১ আনা ৪ পাই	৮ নয়া পয়সা	৪ আনা ২ পাই	২৬ নয়া পয়সা
১ আনা ৫ পাই	৯ নয়া পয়সা	৪ আনা ৩ পাই	২৭ নয়া পয়সা
১ আনা ৬ পাই	৯ নয়া পয়সা	৪ আনা ৪ পাই	২৭ নয়া পয়সা
১ আনা ৭ পাই	১০ নয়া পয়সা	৪ আনা ৫ পাই	২৮ নয়া পয়সা
১ আনা ৮ পাই	১০ নয়া পয়সা	৪ আনা ৬ পাই	২৮ নয়া পয়সা
১ আনা ৯ পাই	১১ নয়া পয়সা	৪ আনা ৭ পাই	২৯ নয়া পয়সা
১ আনা ১০ পাই	১১ নয়া পয়সা	৪ আনা ৮ পাই	২৯ নয়া পয়সা
১ আনা ১১ পাই	১২ নয়া পয়সা	৪ আনা ৯ পাই	৩০ নয়া পয়সা
২ আনা	১২ নয়া পয়সা	৪ আনা ১০ পাই	৩০ নয়া পয়সা
২ আনা ১ পাই	১৩ নয়া পয়সা	৪ আনা ১১ পাই	৩১ নয়া পয়সা
২ আনা ২ পাই	১৪ নয়া পয়সা	৫ আনা	৩১ নয়া পয়সা
২ আনা ৩ পাই	১৪ নয়া পয়সা	৫ আনা ১ পাই	৩২ নয়া পয়সা
২ আনা ৪ পাই	১৫ নয়া পয়সা	৫ আনা ২ পাই	৩২ নয়া পয়সা
২ আনা ৫ পাই	১৫ নয়া পয়সা	৫ আনা ৩ পাই	৩৩ নয়া পয়সা
২ আনা ৬ পাই	১৬ নয়া পয়সা	৫ আনা ৪ পাই	৩৩ নয়া পয়সা
২ আনা ৭ পাই	১৬ নয়া পয়সা	৫ আনা ৫ পাই	৩৪ নয়া পয়সা
২ আনা ৮ পাই	১৭ নয়া পয়সা	৫ আনা ৬ পাই	৩৪ নয়া পয়সা
২ আনা ৯ পাই	১৭ নয়া পয়সা	৫ আনা ৭ পাই	৩৫ নয়া পয়সা
২ আনা ১০ পাই	১৮ নয়া পয়সা	৫ আনা ৮ পাই	৩৫ নয়া পয়সা
২ আনা ১১ পাই	১৮ নয়া পয়সা	৫ আনা ৯ পাই	৩৬ নয়া পয়সা
৩ আনা	১৯ নয়া পয়সা	৫ আনা ১০ পাই	৩৬ নয়া পয়সা
৩ আনা ১ পাই	১৯ নয়া পয়সা	৫ আনা ১১ পাই	৩৭ নয়া পয়সা
৩ আনা ২ পাই	২০ নয়া পয়সা	৬ আনা	৩৭ নয়া পয়সা
৩ আনা ৩ পাই	২০ নয়া পয়সা	৬ আনা ১ পাই	৩৮ নয়া পয়সা
৩ আনা ৪ পাই	২১ নয়া পয়সা	৬ আনা ২ পাই	৩৯ নয়া পয়সা
৩ আনা ৫ পাই	২১ নয়া পয়সা	৬ আনা ৩ পাই	৩৯ নয়া পয়সা
৩ আনা ৬ পাই	২২ নয়া পয়সা	৬ আনা ৪ পাই	৪০ নয়া পয়সা
৩ আনা ৭ পাই	২২ নয়া পয়সা	৬ আনা ৫ পাই	৪০ নয়া পয়সা

চলতি মুদ্রার নাম	দশমিক মুদ্রার নাম	চলতি মুদ্রার নাম	দশমিক মুদ্রার নাম
৬ আনা ৬ পাই	৪১ নয়া পয়সা	৯ আনা ৬ পাই	৫৯ নয়া পয়সা
৬ আনা ৭ পাই	৪১ নয়া পয়সা	৯ আনা ৭ পাই	৬০ নয়া পয়সা
৬ আনা ৮ পাই	৪২ নয়া পয়সা	৯ আনা ৮ পাই	৬০ নয়া পয়সা
৬ আনা ৯ পাই	৪২ নয়া পয়সা	৯ আনা ৯ পাই	৬১ নয়া পয়সা
৭ আনা	৪৩ নয়া পয়সা	৯ আনা ১০ পাই	৬১ নয়া পয়সা
৭ আনা ১ পাই	৪৩ নয়া পয়সা	৯ আনা ১১ পাই	৬২ নয়া পয়সা
৭ আনা ২ পাই	৪৪ নয়া পয়সা	১০ আনা	৬২ নয়া পয়সা
৭ আনা ৩ পাই	৪৪ নয়া পয়সা	১০ আনা ১ পাই	৬৩ নয়া পয়সা
৭ আনা ৪ পাই	৪৬ নয়া পয়সা	১০ আনা ২ পাই	৬৪ নয়া পয়সা
৭ আনা ৫ পাই	৪৬ নয়া পয়সা	১০ আনা ৩ পাই	৬৪ নয়া পয়সা
৭ আনা ৬ পাই	৪৭ নয়া পয়সা	১০ আনা ৪ পাই	৬৫ নয়া পয়সা
৭ আনা ৭ পাই	৪৭ নয়া পয়সা	১০ আনা ৫ পাই	৬৫ নয়া পয়সা
৭ আনা ৮ পাই	৪৮ নয়া পয়সা	১০ আনা ৬ পাই	৬৬ নয়া পয়সা
৭ আনা ৯ পাই	৪৮ নয়া পয়সা	১০ আনা ৭ পাই	৬৬ নয়া পয়সা
৭ আনা ১০ পাই	৪৯ নয়া পয়সা	১০ আনা ৮ পাই	৬৭ নয়া পয়সা
৭ আনা ১১ পাই	৪৯ নয়া পয়সা	১০ আনা ৯ পাই	৬৭ নয়া পয়সা
৮ আনা	৫০ নয়া পয়সা	১০ আনা ১০ পাই	৬৮ নয়া পয়সা
৮ আনা ১ পাই	৫১ নয়া পয়সা	১০ আনা ১১ পাই	৬৮ নয়া পয়সা
৮ আনা ২ পাই	৫১ নয়া পয়সা	১১ আনা	৬৯ নয়া পয়সা
৮ আনা ৩ পাই	৫২ নয়া পয়সা	১১ আনা ১ পাই	৬৯ নয়া পয়সা
৮ আনা ৪ পাই	৫২ নয়া পয়সা	১১ আনা ২ পাই	৭০ নয়া পয়সা
৮ আনা ৫ পাই	৫৩ নয়া পয়সা	১১ আনা ৩ পাই	৭০ নয়া পয়সা
৮ আনা ৬ পাই	৫৩ নয়া পয়সা	১১ আনা ৪ পাই	৭১ নয়া পয়সা
৮ আনা ৭ পাই	৫৪ নয়া পয়সা	১১ আনা ৫ পাই	৭১ নয়া পয়সা
৮ আনা ৮ পাই	৫৪ নয়া পয়সা	১১ আনা ৬ পাই	৭২ নয়া পয়সা
৮ আনা ৯ পাই	৫৫ নয়া পয়সা	১১ আনা ৭ পাই	৭২ নয়া পয়সা
৮ আনা ১০ পাই	৫৫ নয়া পয়সা	১১ আনা ৮ পাই	৭৩ নয়া পয়সা
৮ আনা ১১ পাই	৫৬ নয়া পয়সা	১১ আনা ৯ পাই	৭৩ নয়া পয়সা
৯ আনা	৫৬ নয়া পয়সা	১১ আনা ১০ পাই	৭৪ নয়া পয়সা
৯ আনা ১ পাই	৫৭ নয়া পয়সা	১১ আনা ১১ পাই	৭৪ নয়া পয়সা
৯ আনা ২ পাই	৫৭ নয়া পয়সা	১২ আনা	৭৫ নয়া পয়সা
৯ আনা ৩ পাই	৫৮ নয়া পয়সা	১২ আনা ১ পাই	৭৬ নয়া পয়সা
৯ আনা ৪ পাই	৫৮ নয়া পয়সা	১২ আনা ২ পাই	৭৬ নয়া পয়সা
৯ আনা ৫ পাই	৫৯ নয়া পয়সা	১২ আনা ৩ পাই	৭৭ নয়া পয়সা

চলতি মুদ্রার নাম	দশমিক মুদ্রার নাম	চলতি মুদ্রার নাম	দশমিক মুদ্রার নাম
১২ আনা ৪ পাই	৭৭ নয়া পয়সা	১৪ আনা ১১ পাই	৯৩ নয়া পয়সা
১২ আনা ৫ পাই	৭৮ নয়া পয়সা	১৫ আনা	৯৪ নয়া পয়সা
১২ আনা ৬ পাই	৭৮ নয়া পয়সা	১৫ আনা ১ পাই	৯৪ নয়া পয়সা
১২ আনা ৭ পাই	৭৯ নয়া পয়সা	১৫ আনা ২ পাই	৯৫ নয়া পয়সা
১২ আনা ৮ পাই	৭৯ নয়া পয়সা	১৫ আনা ৩ পাই	৯৫ নয়া পয়সা
১২ আনা ৯ পাই	৮০ নয়া পয়সা	১৫ আনা ৪ পাই	৯৬ নয়া পয়সা
১২ আনা ১০ পাই	৮০ নয়া পয়সা	১৫ আনা ৫ পাই	৯৬ নয়া পয়সা
১২ আনা ১১ পাই	৮১ নয়া পয়সা	১৫ আনা ৬ পাই	৯৭ নয়া পয়সা
১৩ আনা	৮১ নয়া পয়সা	১৫ আনা ৭ পাই	৯৭ নয়া পয়সা
১৩ আনা ১ পাই	৮২ নয়া পয়সা	১৫ আনা ৮ পাই	৯৮ নয়া পয়সা
১৩ আনা ২ পাই	৮২ নয়া পয়সা	১৫ আনা ৯ পাই	৯৮ নয়া পয়সা
১৩ আনা ৩ পাই	৮৩ নয়া পয়সা	১৫ আনা ১০ পাই	৯৯ নয়া পয়সা
১৩ আনা ৪ পাই	৮৩ নয়া পয়সা	১৫ আনা ১১ পাই	৯৯ নয়া পয়সা
১৩ আনা ৫ পাই	৮৪ নয়া পয়সা	১৲ টাকা	১০০ নয়া পয়সা
১৩ আনা ৬ পাই	৮৪ নয়া পয়সা		
১৩ আনা ৭ পাই	৮৫ নয়া পয়সা		
১৩ আনা ৮ পাই	৮৫ নয়া পয়সা		
১৩ আনা ৯ পাই	৮৬ নয়া পয়সা		
১৩ আনা ১০ পাই	৮৬ নয়া পয়সা		
১৩ আনা ১১ পাই	৮৭ নয়া পয়সা		
১৪ আনা	৮৭ নয়া পয়সা		
১৪ আনা ১ পাই	৮৮ নয়া পয়সা		
১৪ আনা ২ পাই	৮৯ নয়া পয়সা		
১৪ আনা ৩ পাই	৮৯ নয়া পয়সা		
১৪ আনা ৪ পাই	৯০ নয়া পয়সা		
১৪ আনা ৫ পাই	৯০ নয়া পয়সা		
১৪ আনা ৬ পাই	৯১ নয়া পয়সা		
১৪ আনা ৭ পাই	৯১ নয়া পয়সা		
১৪ আনা ৮ পাই	৯২ নয়া পয়সা		
১৪ আনা ৯ পাই	৯২ নয়া পয়সা		
১৪ আনা ১০ পাই	৯৩ নয়া পয়সা		

আনা পাই নয়া পয়সার পরিবর্তনের সরল রেডি রেকনার ; কোনও একবার লেনদেন কালে নির্দিষ্ট মূল্যের প্রচলিত মুদ্রা হস্তান্তরের সময় ব্যবহার্য।

প্রচলিত মুদ্রা বা নূতন মুদ্রার পরিবর্তনের সময় প্রকৃত প্রস্তাবে নগদ পয়সা হস্তান্তরিত না করিলে ১০০ নয়া পয়সায় ১ টাকা অথবা ১৬ আনা বা ১৯২ পাই ধরিতে হইবে।

কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ আনা পাইয়ের সম মূল্যের নয়া পয়সা কত হইবে তাহা বাহির করিবার নিয়ম :

উপর হইতে নীচের কলমে যেখানে প্রদত্ত সংখ্যক আনার কোঠা আছে তাহা বাহির করুন। তারপর বাম দিক হইতে ডান দিকে প্রদত্ত সংখ্যক পাই যে কলমে আছে তাহা বাহির করুন। এই দুই কলম গিয়া যেখানে মিশিয়াছে সেই কোঠায় যে সংখ্যাটি আছে প্রদত্ত সংখ্যক আনা ও পাইয়ের পরিবর্তে তত নয়া পয়সা পাওয়া যাইবে।

আনা	পাই ০	৩	৬	৯
০	...	২	৩	৫
১	৬	৮	৯	১১
২	১২	১৪	১৬	১৭
৩	১৯	২০	২২	২৩
৪	২৫	২৭	২৮	৩০
৫	৩১	৩৩	৩৪	৩৬
৬	৩৭	৩৯	৪১	৪২
৭	৪৪	৪৫	৪৭	৪৮
৮	৫০	৫২	৫৩	৫৫
৯	৫৬	৫৮	৫৯	৬১
১০	৬২	৬৪	৬৬	৬৭
১১	৬৯	৭০	৭২	৭৩
১২	৭৫	৭৭	৭৮	৮০
১৩	৮১	৮৩	৮৪	৮৬
১৪	৮৭	৮৯	৯১	৯২
১৫	৯৪	৯৫	৯৭	৯৮
১৬	১০০	০	০০	০০

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই রেডি রেকনার (২নং) ব্যবহারের প্রণালী বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে :—

ধরুন ৫ আনা ৬ পাইয়ের পরিবর্তে কত নয়া পয়সা পাওয়া যাইবে তাহা আপনি বাহির করিতে চান। উপর হইতে নীচের দিকের সারিতে "আনার" কলমে যেখানে ৫ আছে তাহা বাহির করুন। তারপর বাম দিক হইতে ডান দিকে "পাইয়ের" সারিতে যে কলমটি ৬ দিয়া সুরু হইয়াছে তাহা বাহির করুন। এই দুইটি কলম দিয়া যেখানে মিলিত হইয়াছে সেই সংখ্যাটি হইল ৩৪। কাজেই বুঝিতে হইবে ৫ আনা ৬ পাইয়ের সমমূল্যের মুদ্রা হইল ৩৪ নয়া পয়সা।

জীবনানন্দ ও তাঁর কবিতা

শ্রীমতী শিপ্রা ঘোষ

"নিসর্গ ও ইতিহাসের কবি জীবনানন্দ দাশ—জ্যোৎস্না-স্নাত আকাশের নীচে কিংবা অন্ধকার বনে আনন্দ মত্ত ইঁদুর, বেড়াল, প্যাঁচা, হরিণছানা, গাঙচিল ও শকুনই তাঁর কবিতার প্রাণ, সার বস্তু। আর জীবনের স্বাদ, ব্যর্থতা ও ভাবালুতা নিয়ে রচিত হয়েছে তাঁর কবিতা—যা বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত, যা আধুনিক।"

আধুনিক কবিতা কী বা কাকে বলে তা' এক কথায় বলে বোঝানো যায় না। তবে এটুকু বলতে পারি যে আধুনিক বলতে সময়ের কোন চিহ্ন নেই, তাই এক যুগে যা' আধুনিক পর যুগে তা' প্রাচীন, আবার এক যুগে যা' প্রাচীন পর যুগে তাই আবার আধুনিক! রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও আমরা এ কথা বলতে পারি, শুধুমাত্র ইদানীন্তনই কবিতার প্রাণ নয়, চিরন্তনও কিছু আছে বৈকি। আজকের পাঠক সমাজ যাঁরা ইদানীন্তনকেই সার বস্তু বলে মনে করেছেন তাঁরাই হয়তো একদিন চিরন্তনের প্রত্যাশা করবেন, তখন রীতির সঙ্গে নীতিটাকেও মেনে নিতে হবে সমান ভাবে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের কবিতার বক্তব্য কী, তাঁদের কাব্যে কী ধরনের স্বকীয়তা আছে—এই সব প্রশ্নে বিব্রত হয়েছেন কবিরা। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র হয়ত ঠিকই—চিন্তা, ভাষা ও ভাব-ধারা হয়ত পৃথক। কিন্তু তবুও রবীন্দ্র-যুগে রোমান্টিসিজমকে সংযত রেখে যে সকল কবি কবিতা রচনা করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সার্থক কবি—'আপন স্বরূপে আপনি ধন্য।" অনেকের ধারণা আধুনিক কবিতা রচিত হয় গদ্যছন্দে এবং দুর্বোধ্যতাই এর রসগ্রহণের একমাত্র কণ্টক! কিন্তু তা' নয়, আমি বলি যে আধুনিক কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্তমান যুগের সমাজব্যবস্থার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং শ্লেষাত্মক রচনার মাধ্যমে এর প্রবঞ্চনার মুখোস উন্মোচন করা! এবং আধুনিক-মনন-জীবী কবিদের কবিতার স্বাতন্ত্র্য এইখানেই। আধুনিক বাংলা কবিতায় নবতম ভাবধারার প্রবর্তন করলেন জীবনানন্দ দাশ,—ইনি ছিলেন প্রকৃতির কবি! সংশয়, সন্দেহ, বেদনা ও তিক্ততায় ভরা তাঁর কবিতাবলী! নিসর্গের মাঝেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর কবিতার উপাদান, হেমন্তের ধান খেত, বনের ক্যাম্পে যাই হরিণীর ডাক, ধূ ধূ মাঠ, কাশফুল, বুনোহাঁস, বার বার উদ্বেলিত করে তুলেছে তাঁর কবি-কল্পনাকে! 'বনলতা সেন'-এ কবি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর জীবনের আদিম বিশ্বাসকে, ক্লেদাক্ত পৃথিবীর বুকে খুঁজেছেন তিনি জীবনের মানে! তাই নারীর পাখীর নীড়ের মত বিশ্বাসযোগ্য চোখে তিনি দেখতে পেয়েছেন শান্তির আভাস। আজ যেদিকে তাকাই অন্নবস্ত্রের হাহাকার আর জিঘাংসাত্মক সমাজনীতি! কোথাও "ধাইত্রাস্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল" কোথাও বা দেখি দুর্বল-অসহ জীবন-যাত্রা!" চারিদিকে পানগাছ, ঘোলাজল, বেজালয়, সেঁকো কেরোসিন!' শূন্য চাতুরীর মূঢ় হাসি নিয়ে যেন জেগে আছে বাংলা দেশের ভাঙনধরা-সমাজ আর দুর্বল-রাজনীতি। আর তারই বুকে গড়ে উঠেছে আজ মানব জীবনের স্বপ্ন; রচিত হয়েছে কবিতা, উন্মোচিত হয়েছে সাহিত্যের অগ্রগতির সিংহ দ্বার। আধুনিক কবিতা পাঠক সমাজকে দিতে চেয়েছে আনন্দ, আশা ও উদ্দীপনা, কিন্তু সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়াঙ্কিত ডিগ্রী নিয়ে আজকের পাঠক পাঠিকারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না কবিতাকে! তাই জীবনানন্দের ইতিহাস ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে গভীর উপমা তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। আর সেই কারণেই বোধহয় আধুনিক কবিতাকে সযত্নে পরিহার করে চলেন তাঁরা। কিন্তু সব দুর্বোধ্যতা ও ভাবালুতা নিয়ে জীবনানন্দ রূপদক্ষ-কবি। বোধের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছেন তিনি।

"পথ চিনে এ ধুলোয় নিজের জন্মের চিহ্ন" যিনি চেনাতে এসেছেন তাঁকে যেন উপেক্ষা না করি। যদিও আজ 'জীবনানন্দ দাশ' চলে গেছেন এ পৃথিবী থেকে, যদিও জানি নাটির বুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তাঁর পথ চলার একটি স্বাক্ষর, তবুও মনে হয় পরবর্তী আধুনিক কবিদের কবিতায় বজায় থাকবে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য আর তারই বুকে বেঁচে থাকবে তাঁর স্বপ্ন, জ্ঞান ও সাধনা। "চোখ রেখে নীলাকাশে" তাঁকেও হয়ত খুঁজে পাব আমরা "পৃথিবীর মাধুরীর অন্ধকার ঘাসে।"

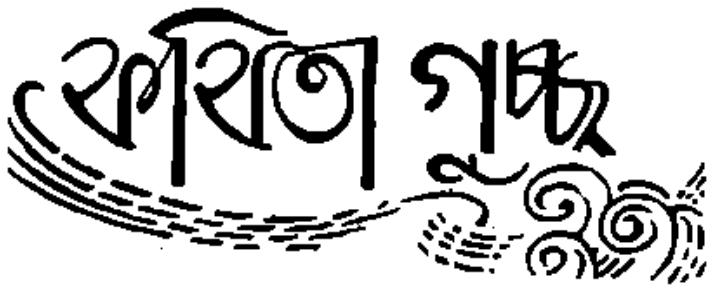

হয়তো

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

হয়তো সে আজও শুয়ে আছে
আকাশের জগতে কোথাও,
চিকা-চোখের নীল তার সেই গাঢ় নীল রং-এ
নিবিড় আতত কোরে।
তার সে নীরব ছায়া
ফেলে রেখে বাসনার জলে
শুয়েছে সে তীরে।
হয়তো হঠাৎ লিখে ধু-ধু জলে অভিমানী নাম।

মনে হয় হারায়নি হারিয়ে
ছিঁড়ে খুঁড়ে মনের বুনন
প্রাণের সবুজে এঁকে মনে হয়,
আসবুজ কোরেছে পৃথিবী
আবার নতুন রঙে রঙে
হৃদয়ের সব নীল ঢেউ
নদী আজ নিয়েছে ফিরিয়ে ;
ভুলিয়ে দিয়েছে তার প্রতীতির ব্যথা।

হয়তো আকাশে আছে,
হয়তো লুকোনো-মুখ ছায়া-ছায়া আশার মিছিলে
তার সে প্রেমের দেনা শোধ কোরে চলে যেতে
না পারার অভিমান
দুরুদুরু ভীরু বুকে নিয়ে
হয়তো লুকিয়ে আছে পলাশের রঙে।

হে আমার দেশবাসী

খলিল জিব্রান্
অনুবাদ : বিভূরঞ্জন গুহ

হে আমার দেশবাসী ! কি চাও তোমরা ?
তোমরা কি ইচ্ছা কর, তোমাদের জন্যে
গড়ে দেব সুরম্য প্রাসাদ শূন্যগর্ভ কথার বাঁধুনীতে ?
অথবা, গড়বো বিশাল মন্দির, যা শুধু স্বপ্ন দিয়ে ছাওয়া ?
অথবা, এই কি তোমাদের দাবী যে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব
মিথ্যাবাদী আর উৎপীড়কেরা গড়েছে যে মিথ্যার পাহাড় ?
আমার এই আঙুল দিয়ে সবলে উপড়ে ফেলব
সে বিশাল বিষবৃক্ষ মইকুহ, যা রোপণ করেছে সযত্নে
ভণ্ড আর দুষ্কৃতিকারীর দল ? বলো বলো
কি তোমাদের অন্তর দাবী ?

কি চাও, কি চাও, আমার কাছে, হে আমার দেশবাসী ?
তোমাদের খুশী করবার জন্যে কি মিহিসুরে মিঠা মেয়েলী
গান রচব ?
না কি আপন খুশীতে গর্জন করে উঠব বলবান্ সিংহের মত ?
গান তো গেয়েছি তোমাদের জন্যে, কিন্তু পা তোমাদের
নৃত্যচঞ্চল
হোল কৈ ? তোমাদের জন্যে ফেলেছি অশ্রুজল
কিন্তু তোমাদের চোখ সিক্ত হোল কৈ ?
তবে কি এক চোখে হাসি আর এক চোখে কান্নার
অভিনয় করব ?

তোমাদের আত্মা ক্ষুধার জ্বালায় বিদীর্ণ,
কিন্তু তোমাদেরি সামনে আকীর্ণ হয়ে আছে
জ্ঞান বিজ্ঞানের রসাল ফল, উপত্যকায় ছড়ানো
অসংখ্য উপল খণ্ডের মত।

তৃষ্ণায় হৃদয় তোমাদের বিস্তৃত,
কিন্তু জীবনের প্রস্রবণ হতে সরসধারা তো বয়ে চলেছে
তোমার গৃহের দ্বারদেশেই তবু তা
পান করে সঞ্জীব হও কই ?

সমুদ্রে আছে জোয়ার, ভাঁটা,
চন্দ্রের আছে কলায় কলায় হ্রাস ও বৃদ্ধি,
কালের আছে শীত, গ্রীষ্ম ঋতুর পরিবর্তন
পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্য, ভাঙে গড়ে বদলায়
কিন্তু সত্য থাকে স্থির তার নেই কোন লয় ক্ষয়
নাই তার বিনাশ। তবে কেন তোমাদের
এ মিথ্যা প্রয়াস সত্যের সুন্দর রূপকে বিকৃত করবার ?

নিস্তব্ধ নিশীথে তোমাদের আমি ডেকেছি
আকাশে চাঁদের শোভা, তারার নিষ্কলঙ্ক মাধুর্য
চোখ মেলে দেখতে। ঘুম ভেঙে তোমরা চমকে উঠেছ
ভীত হয়ে আঁকড়ে ধরছ' তরবারি, আর্ত চীৎকারে বলেছ,
"কোথায়, কোথায় শত্রু ? তাকে প্রথম হনন করতে হবে।"
প্রত্যূষে যখন শত্রু দ্বারে দিলো হানা, তখন তোমাদের
চীৎকার করে ডেকেছি, কিন্তু তবুতন্দ্রা তো তোমাদের
ভাঙলো না – তোমরা যে তখন ভয়ের ঘোরে আছন্ন,
আর যুদ্ধ করছো তোমাদের দুঃস্বপ্নের অলীক ছায়ার সাথে।

আমি তোমাদের আহ্বান করে বলেছিলাম,—
"চলো চলো অন্ধকূপ ত্যাগ করে পর্বতের শীর্ষদেশে
সেখান থেকে দেখবে সমগ্র বিশ্বের বিপুল সৌন্দর্য"
তোমরা বললে "না, এই অন্ধকার গহ্বরেই
বাস করে গেছেন আমাদের পিতা, পিতামহ,
এ অন্ধকার ছায়াতেই রয়েছে তাঁদের কবর।
এ দেশ ছেড়ে কোথায় যাবো কোন অজানা দেশে,
যা হয়নি পবিত্র তাঁদের পাদস্পর্শে ?

আবার তোমাদের ডেকে বলেছিলাম—"চলো ওই
সমতল ভূমিতে, যার বুকে বয়ে চলেছে বেগবতী স্রোতস্বতী
তার দাক্ষিণ্য উজাড় করে দিয়েছে অতল সমুদ্রে।"

তোমরা ভয় পেলে, বললে, "নদীর কলগর্জনে
আমাদের অন্তর কম্পিত, ঐ সিন্ধুর অতল
ভয়াল গহ্বর যে আমাদের দেহকে গ্রাস করবে।"

হে আমার স্বদেশবাসী, তোমাদের আমি ভালবেসেছিলুম,
কিন্তু সে ভালবাসা যে আমার বুকে বেদনার মত বাজে।
আর তোমাদের কাছে সে ভালবাসা তো মূল্যহীন
আজ তাই তোমাদের ঘৃণা করি, সে ঘৃণা বন্যার মত
দুর্বার বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যত শুষ্ক বৃক্ষশাখা,
জীর্ণ ভিত্তি কত লোকালয়।

হে আমার দেশবাসী দুঃখ পাই তোমাদের ক্লীবত্বে,
কিন্তু সে দুঃখ তো তোমাদের দৌর্বল্যকে বাড়িয়েছে মাত্র
আর শুষ্ক ঝুরিয়েছে জীবন ক্ষয়কারী তোমাদের শিথিল
আলস্যের।
আজ চোখ মেলে দেখছি তোমাদের ভীরুতা, মূঢ়তা
আর আমার আত্মা ঘৃণায় শিউরে উঠছে।

অশ্রুবিসর্জন করেছি তোমাদের অপমানে পরাজয়ে।
কিন্তু আমার তপ্ত অশ্রুর লাভাপ্রবাহ তো রুদ্ধ করে দিতে
পারলো না
তোমাদের দৌর্বল্য ; কিন্তু সে অশ্রু উন্মোচন করে
দিয়েছে আমার মুগ্ধ দৃষ্টির আবরণ।
আমার এ গলিত অশ্রু তো পৌঁছল না তোমাদের
অচেতন পাষাণ হৃদয়ে কিন্তু সে অশ্রু আমার
অন্তরাত্মার কালিমা মার্জনা করে দিয়েছে।
আজ তোমাদের দুঃখকে আমি উপহাস করি
এ নিষ্ঠুর হাস্য হচ্ছে ঝড়ের পূর্বের আতংক জাগানো
বজ্রগর্জন।

হে আমার দেশবাসী, কি চাও তোমরা ?
এই কি চাও যে
তোমাদের যে ভূতে-পাওয়া চেহারা তার
প্রতিবিম্ব দেখবো স্থির জলের বুকে ?
এসো তবে, এসে দেখ কী কদর্য বীভৎস তোমাদের মূর্তি।
দেখ আর চিন্তা করো। ভয়ে তোমাদের চুল
ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে, লজ্জাহীন অসংযম
তোমাদের কোটরগত নিষ্প্রভ চোখে এঁকে দিয়ে গেছে
কালো স্বাক্ষর
ভীরুতার ঘৃণ্য দাগ লেগেছে তোমাদের কপোলে,
বিবাক্ত চুম্বনে তোমাদের ঠোঁট যে শীতের ঝরা-পাতার
মতো পীতবিবর্ণ।

হে আমার দেশবাসী—কিসের অনুসন্ধান করো তোমরা ?
বৃহৎ জীবনের কাছে কি তোমাদের দাবীর অধিকার ?
তোমরা যে তার ত্যাজ্যপুত্র।

তোমাদের আত্মাকে বন্ধক দিয়েছ
পুরুত-মোল্লার পঙ্কিল হাতে, ভেল্‌কী দেখানো ফকীর
দরবেশের হাতে।
তোমাদের দেহ কম্পিত হচ্ছে অত্যাচারী ও শোণিত-
পাতকারীর
নখরঘাতে, দেশের পবিত্র মৃত্তিকা কম্পিত হচ্ছে
বিজয়ী শত্রুসেনার দর্পিত পদভরে।
কি আশা করতে পার, তোমরা মেরুদণ্ডহীন অমানুষের দল,
যারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারো না মানুষের মত
মাথা উঁচু করে সূর্যের পানে মুখ করে ?
তোমাদের কোষবদ্ধ তরবার কলঙ্ক-মলিন, তোমাদের
বর্শাফলক ভগ্ন।
তোমাদের বর্ম হয়েছে ছিন্নভিন্ন।—যুদ্ধক্ষেত্রে কি নিয়ে
তোমরা দাঁড়াবে ?

তোমাদের ধর্ম হচ্ছে ভণ্ডামী, তোমাদের জীবন হচ্ছে
মিথ্যাচার,
তোমাদের পরিণতি হচ্ছে শূন্য ব্যর্থতা।
তবে বেঁচে থেকে তোমাদের কি লাভ ?
চিত্ত-দৈন্য যাদের বেসাতী মৃত্যুই কি তাদের
একমাত্র সান্ত্বনা নয় ?

জীবন তো হচ্ছে, বীর্যবানের সংকল্পে
যৌবনের উদ্দামতায়, পরিণত জীবনের উদ্দেশ্যমুখী শ্রমে,
বৃদ্ধের প্রজ্ঞায় যা দেহের জরাকেও করে উপেক্ষা।

কিন্তু হে আমার দেশবাসী, তোমরা তো মৃত—
জন্মেছ তোমরা বার্ধক্য ও দুর্বলতার পাপ নিয়ে,—
চর্ম-তোমাদের লোল, মস্তিষ্ক তোমাদের বিশুষ্ক
তোমরা তাই অবোধ শিশুর মত ডুবতে ভাল বাস
কর্দমকুণ্ডে,
তাই তোমাদের প্রিয় ব্যসন পরস্পরকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ।

জ্ঞান হচ্ছে উজ্জ্বল আলো যা দ্যুতিময় করে তোলে
জীবনের উত্তপ্ত স্পন্দনকে ;—এতে আছে সকলের অধিকার
যার আছে অনুসন্ধানের অদম্য স্পৃহা ; কিন্তু
হে আমার দেশবাসী, তোমরা তো খোঁজ অন্ধকারকে।
তোমরা তো দূরে পালিয়ে যাও আলোকের কেন্দ্র হতে।
নিরুদ্যম তোরা চেয়ে থাক, কবে দৈবকৃপায় সরস জলধারা
আসবে পাষাণ পাহাড়ের বুক থেকে।
তোমাদের দেশের দৈন্য দুর্দশা, সে তো
তোমাদেরি পাপের শাস্তি···তোমাদের এ পাপের
ক্ষমা নেই, কারণ তোমরা যে জ্ঞানপাপী!

মানবতার অগ্রগমন চলেছে আলোকদীপ্ত নদীর মত,
গান গেয়ে চলেছে নদী, দুর্গম পর্বতের গোপন কথা
বহন করে কূলহীন সাগরের বুকে ; কিন্তু
হে আমার দেশবাসী, তোমরা স্রোতহীন বদ্ধ
পঙ্কিল জলাভূমি—সেখানে কিল্‌বিল্ করছে যত ক্রিমিকীট
আর সরীসৃপ।

মানবাত্মার প্রকাশ পবিত্র উজ্জ্বল মশালের নীল রবি-
শিখার মত,
সে বহ্নি পাবন করে দাহন করে,যত শুকনো পাতা,
যত জীর্ণতা—
সে বহ্নিশিখা ঝড়ের রাতে উদ্দীপ্ত-হয়ে দেবতার মুখকে
আলোকিত করে।
কিন্তু হে আমার দেশবাসী···তোমাদের আত্মা
তো ছাইয়ের মত মূল্যহীন, দীপ্তিহীন,—বাতাস তাকে
ঘুরে ফেলে
আবর্জনার মত মৃত বরফ ঢাকা প্রান্তরে—ঝড় তাকে উড়িয়ে
নিয়ে ছড়িয়ে দেয় উষর প্রান্তরে।

হে আমার দেশবাসী, মৃত্যুর ছায়াকে তোমরা ভয়
কর কেন ?
মৃত্যুর মহৎ করুণা, তোমাদের ক্ষুদ্রতাকে স্পর্শ করতেও
ঘৃণা করে,
বীরের কৃপাণকে বৃথাই তোমরা ভয় কর, কারণ
তোমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় বিদ্ধ করতে তা লজ্জাবোধ করে।

তোমাদের ঘৃণা করি, হে আমার দেশবাসী,
কারণ শৌর্য ও মহত্ত্বকে তোমরা ঘৃণা কর।
তোমাদের আমি অশ্রদ্ধা করি, কারণ তোমরা নিজেরাই
নিজেদের অশ্রদ্ধা কর। আমি তোমাদের শত্রু,
কারণ তোমরা জানো না তোমরা শত্রু
সমস্ত দেবত্বের, সমস্ত মহত্ত্বের, সমস্ত ঐশ্বর্যের।

সুবর্ণ রেখা

বিভূতি ভট্টাচার্য

দুধ-সাদা রাতে তুমি কি সেজেছ এলিয়ে চুল,
ফাঁকে ফাঁকে তার সোনালী তারার অগাধ ধূল,
ধূপছায়া সাড়ী, সাঁচ্চা জরীর সোনালী পাড়,
মিনে করা নদি। দুলছে তোমার সোনালী হার।

ময়ূর-পঙ্খী মেলেছে ওখানে পাখ্না তার,
ঢেউ তুলে চলে ক্রৌঞ্চ মিথুন বুকে তোমার,
পাতা-অরণ্যে উঁকি মারে ওরা সারাটিক্ষণ,
মাটির দেশেতে অমরাবতীর শ্বেত-তোরণ।

গোধূলি সূর্য মাখায় তোমাকে রঙ সোনার,
পাহাড়ী যুঁইএর গন্ধে ভরানো মুখ তোমার,
তোমাকে দেখেই ঝিঁঝির সেতারে কত না সুর,
একটানা বাজে ঝরানো পাতার কত নূপুর।

তাইতো আমার যাযাবর মন এখানে এই,
দাঁড়িয়ে অবাক, তোমার পথের কিনারাতেই,
ভুলে যায় সব, কলকারখানা মানুষ ভিড়,
এখানেই খোঁজে তোমায় গানের সুরেলা নীড়।

॥ দুই ॥

পুষ্প পাঠক

এখানে অনেক সুখ শান্ত-হিম এ মনের ঘরে
নিবিড় ছুয়াসা নেই। আলো আছে—চাঁদের খবর
তাই অনেক নিকটে : অনেক বনের পাখী ঘরে
আসে। গান গায় আর আকাশের এই নীল চরে।

পৃথিবীর পিপাসা অনেক। একটিও কথা নেই
তাই ; গভীর ঘুমের ঘোরে শুনে যাই একটানা
মনের নূপুর ধ্বনি : স্বপ্ন যেন কথা কয় :
প্রাণ পায় : শিল্পীরও আয়ু শেষ : অবশেষ এই।

এখানে কোথায় সুখ ! চড়া পড়ে নদীও হারায়
একটি ভোরের রঙ, অন্য এক ভোরে ধুয়ে যায়।

পথ-তরঙ্গ

অমলকান্তি ঘোষ

সেদিন আমরা তিন বন্ধুতে সাইকেল চেপে
বেড়াতে গিয়েছি। সহর-প্রান্ত তখন নরম আলোর প্রলেপে
মৃদু উজ্জ্বল। ছোট ঘর বাড়ী আর তারপরে নিঃসীম মাঠ
চুলের মতন এই কালো পথ ছুঁয়ে চলে গেছে মাটির ললাট।

পাক দিয়ে ঘুরে চিম্‌নীর ধোঁয়া উঠছে আকাশে।
যেন নিঃশ্বাসে
কোন কুমারী গরল ছড়ালো।
ভয় নেই, ভাই, উদার আকাশ কখনো নেবে না কারো কিছু
কালো।

গম-জোয়ারের শীষে আর তাজা ঘাসের ডগায়
হৃদয়ের চির-সংশয় দোলে। এত কী লজ্জা রোদের আভায়।
কৌতুক শুধু কৌতুক ভাসে সমীর হাস্তে?
চপল বাতাস নূতন মতন গোপন আলাপ আনে প্রকাশ্তে!

ছোটাতী রমণী দল বেঁধে চলে সহরের দিকে।
চোখের তারায় আবছায়া কোন সন্দেহ লিখে
এদিকে তাকায়।
পার হয়ে গেলে অতি অকারণেউজ্জ্বল হয় হাসির ছটায়।

কয়লাগুঁড়োর পথ চলে গেছে দক্ষিণে বামে।
এখন বিকেল; একটু বাদেই এক হ'য়ে যাবে গভীর
আরামে
অন্ধকারের মসৃণ স্নেহে। এ পথগুলির
যাত্রার সীমা কারখানা আর খনিতেই স্থির।

এবার আবাস খনিমজুরের; ঢেউ ঢেউ ছাদ
দীর্ঘ গৃহের প্রতি ঢেউ-তলে এক পরিবার পৃথিবীর স্বাদ
ঘুমে-ঘুমে আর দ্বন্দ্বে-কলহে প্রতিদিন পায়।
এই বিকেলের সবটুকু রূপ ওখানে ব্যর্থ সকরুণতায়।

সামনেই কল টিপ্‌টিপ্‌ জল সারাদিনে শুধু বিকেলে-সকালে।
বালতির ঠোকা ঠন্‌ ঠন্‌। আর মন্‌ মন্‌ গলা কলহের তালে।
দু'টি উলঙ্গ
শিশুর সঙ্গী কুকুর শাবক, মেলায় মত্ত, কী মহারঙ্গ।

…কোলাহল ক্রমে বাড়ছেই শুধু, আজ শনিবার।
পথ থেকে দূরে মাটির দেয়াল, আটচালা ঘর; দোকানী সে
তার
পণ্য বিকোয়।…কারণ ত নয় মুক্তির লোভ। ব্যথা-
নিরসন;
শুধু আনন্দ সপ্তাহ শেষে, কয়লা-মজুর বিমুক্ত-মন।
শুধু আনন্দ বড়ো আনন্দ আরো আনন্দ এর সীমা নেই
সারা সপ্তাহ শেষ হয়ে যায় একটি দিনেই।

ঘন জঙ্গল। রাস্তার বাঁকে
ক্ষুদ্র দোকান, মৃত্তিকাময়। ছোট এক শিশু দেখছে
আমাকে…
দ্রুত সাইকেল অবাক অবাক।
তার দুই চোখে সুরগুঞ্জন বিস্ময় রাগ।……
ক্ষুদ্র দোকান।
এখানে মিলবে, জলযোগ-বিড়ি-সিগারেট-পান।
দূর যাত্রীরা 'বাস' থেকে নেমে দু'এক মিনিটে
রাখবে শীতল বিশ্রাম পথ-শ্রান্তির পিঠে।

অবাক অবাক দ্রুত সাইকেল।……
উঁচু নীচু পথ, যেন এর ঢেউ হ'ল উধেল।
এ প্রান্তরের বেলাভূমিটুকু পার হয়ে গিয়ে,
কয়লা খনির বহু জনপদ নগর ভিঙিয়ে,
বাংলাদেশের পায়ের তলায়
এর তরঙ্গ মৃত্যু নিয়েছে সমতলতায়।

শেষ কোথায়

শ্রীসৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪

দিনের পর দিন কাটে। প্রতিটি দিনই মনের কোণে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়া তোলে। কত হাসি, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা। জীবনটাকে যে এত বিভিন্ন দিক হইতে দেখা যায় এই অভিজ্ঞতা অরুণের প্রথম। মাঝে মাঝে অরুণ খুব গম্ভীর হইয়া যায়। অলকাদি আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হয়েছে অরুণ ?'

অলকাদি কান্তাইয়ের শিক্ষয়িত্রী। মধ্যবয়সী এই মহিলাটী অরুণকে বড় স্নেহ করেন।

'দিদি, মনের ভেতর মাঝে মাঝে একটা অস্থিরতা অনুভব করি। কি জন্যে, কিসের জন্যে, তা খুঁজিয়া পাই না।'

প্রশান্তদা প্রায়ই ডাকিয়া নানা বিষয় আলোচনা করেন। অরুণ হুঁ হাঁ করিয়া সায় দেয়, অন্যমনস্কভাবে। প্রশান্তদা অরুণের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইয়া ওঠেন। একদিন অরুণ আসিয়া বলিল : 'কাজের একঘেয়েমী অসহ্য লাগছে দাদা। রোজই একই রুটীনের পুনরাবৃত্তি। হাঁপিয়ে উঠেছি। বই দিন, পড়ব।'

মাসের শেষে অরুণের মন্ত্রীত্ব শেষ হইয়াছে। সারা দেহ ও মনে আসিয়াছে অবসাদ। অরুণ ভাবে, এত শীঘ্র তাহার মনের ভাণ্ডার ফুরাইয়া গেল কি করিয়া। হায়রে কর্মের ঘাতপ্রতিঘাতে মনের সহস্র পাঁপড়ি যখন দিকে দিকে খুলিয়া গেল, তখনই সে কর্মহীন হইয়া পড়িল। বাহিরের আলো বাতাসের স্পর্শে তাহারা মাতিয়া উঠিয়াই ঝরিয়া পড়িল। দৈনন্দিন ছক বাঁধা কাজে আর তাহার মন ওঠে না। মনে হয়, অনেক কিছু করিবার আছে। সামনের গুপ্ত ভাণ্ডারের দ্বার কোন প্রকারে খুলিতে পারিলেই অনন্ত ঐশ্বর্যে মন পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কোথায় সেই চাবি!

বইয়ের ভিতর ডুব দিল অরুণ। প্রশান্তদা বাছিয়া বাছিয়া তাহাকে বই দিতে লাগিলেন। দেশের ভাগ্যই গান্ধীবাদ ও তাহার আদর্শ সম্পর্কীয়। তাহা ছাড়া অরুণ পড়িল বিশ্বের ইতিহাস, বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লেখা। বিজ্ঞানের ছাত্র সে, এই সব বিষয় লইয়া ইহার পূর্বে কখনও গভীরভাবে চিন্তা করে নাই। দৈনন্দিন রুটীন বাঁধা কাজের সময়টুকু ছাড়া সব সময়ই সে বই পড়িয়া কাটাইতে লাগিল। পড়িবার এক উদগ্র নেশা তাহাকে যেন ভূতের মত পাইয়া বসিল। কতদিন এইভাবে চলিত, বলা যায় না—হঠাৎ একটী ঘটনায় তাহার মন অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হইল।

রান্নার পালা পড়িয়াছিল অরুণের। সকালে বারান্দার এক কোণে বসিয়া চা খাইল। মনটা তাহার সকাল হইতেই ভারী। কিসের যেন এক অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। ছেলেমেয়েরা সকলেই নিজ নিজ কাজ ও ক্লাস লইয়া ব্যস্ত। বেলা আসিয়া ডাকিল : 'অরুণদা, একবার এদিকে আসুন। ভাতের হাঁড়িটা নামাতে হবে।'

হঠাৎ তাতিয়া উঠিল অরুণের মন। স্ত্রী পুরুষে সমান অধিকারই যদি দাবী করিবে, তবে ভাতের হাঁড়িটাও নামাইতে পারিবে না উহারা ? ভুলিয়া গেল যে হাঁড়ি নামান উহাদেরই একচেটিয়া।

দুইহাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া হাঁড়িটা নামাইতে গেল অরুণ। আগেও কয়েকবার নামাইয়াছে। হঠাৎ হাত ফস্‌কাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল হাঁড়িটা। একটা সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কায় শোভাদি চীৎকার করিয়া উঠিয়া সজোরে অরুণের হাত ধরিয়া টান দিলেন। আশে পাশের অনেক ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিল। চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া ক্লাস ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন প্রশান্তদা।

সকলে আসিয়া ভীড় করিয়া অরুণকে ঘিরিয়া ধরিল আর শুদ্ধ নিষ্পলক চোখে ছড়ান কেন ও ভাতের দিকে একবার চাহিয়া অরুণ দাঁড়াইয়া রহিল।

খুব রক্ষা পাইয়াছে এ' যাত্রা। পায়ে মাত্র কয়েক কোঁটা কেন পড়িয়া ফোস্কা উঠিয়াছে। আশ্রমের ডাক্তার আসিয়া ঔষধ লাগাইয়া দিলেন। চারিদিকে চাহিয়া একটু অপ্রস্তুতের মত হাসিল অরুণ।

ঘটনাটা স্বাভাবিক। দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে লইয়া রান্নার ব্যাচ তৈরী হয়। প্রতি সপ্তাহে এ'রকম দুইটি দল রান্নার কাজ করে। অত বড় হাঁড়ি বলিয়া ছেলেরাই নামায়, মেয়েরা সাহস করে না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। দীপ্তি কিন্তু এই ঘটনায় বেলাকে ক্ষমা করিল না। দুপুরে মেয়েদের হোষ্টেলে এই লইয়া আলোচনা হইতেছিল। দীপ্তি নিজের জামা কাপড়গুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল: 'কিন্তু ওঁকে হাঁড়ি নামাতে বলাটাই অন্যায় হয়েছে। এ'সব কি ওঁদের কাজ? এখন ভালয় ভালয় সেরে উঠলে হয়!'

বেলা ঘটনায় খুবই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, 'সবাই তো নামায়। কি করে বুঝব যে হঠাৎ হাত কস্কে যাবে? আর পড়লো তো লাফিয়ে সরে আসবে তা' নয়, কেমন যেন হয়ে গেল। ওদিকে তাকিয়ে ওখানটায়ই দাঁড়িয়ে রইল।'

'তোর ঐ অবস্থা হলে তুইও তাই করতিস্। হাঁড়ির টানে মুখ থুবড়ে যে পড়ে যায় নি, সোজা হয়ে যে দাঁড়িয়েছিল, এই ঢের। অতবড় একটা শরীর, কেন, তুইও তো পারতিস্ হাঁড়িটা নামাতে। এ কি একটা নিয়ম না কি যে ওঁদেরই নামাতে হবে?'

বেলা চুপ করিয়া রহিল। দীপ্তি গজ গজ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

পিছন হইতে ছবি ডাকিল, 'কোথায় যাচ্ছ দীপুদি, এই রুদ্দুরে?'

'আয় আমার সঙ্গে,' বলিয়া দীপ্তি আগাইয়া চলিল।

দুপুরে পায়ের যন্ত্রণাটা একটু বাড়িয়াছে। একটু তন্দ্রা মত আসিয়াছিল অরুণের। পায়ের শব্দে চোখ খুলিয়া ছবিকে দেখিয়া একটু হাসিল।

'কি রে, দিদিমণি! এই রুদ্দুরেই ছুটে চলে এলি। আয়, বোস্ বিছানার এ'পাশটায়।'

'দীপুদিও এসেছে।'

অরুণ উঠিয়া বসিল বিছানায়। দরজার দিকে তাকাইয়া দেখিল, দীপ্তি ঘরে ঢুকিতেছে। পরিহাস করিয়া বলিল: 'ছবির আসাটা না হয় বুঝতে পারি। ওর ধারণা, দাদামণি খুব সাংঘাতিক রকম জখম হয়েছে। কিন্তু আপনি এই অসময়ে।'

তাহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া দীপ্তি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল: 'পা কেমন আছে?'

'যন্ত্রণাটা একটু বেড়েছে। মনে হয় দু'চারদিন ভোগাবে। ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ডটাই যে হয়ে গেল!'

'দেখি পা।'

ঝুঁকিয়া পড়িয়া দীপ্তি তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। অরুণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পা টানিয়া লইল।

'ছিঃ ছিঃ, এ কি করলেন আপনি! পায়ে হাত দিতে গেলেন কেন?'

দীপ্তি কোনও উত্তর দিল না। আরও খানিকক্ষণ পায়ের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। অরুণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। কি যে হইল, এতে তা'র অপরাধটা যে কোথায়, কিছুই বুঝিতে পারিল না। ছবির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইতে ছবি ধীরে ধীরে বলিল, 'দীপ্তিদি খুব রেগে গিয়েছে।'

'কেন রে?'

'তোমার পা পুড়ে যাওয়ায়। এইমাত্র বেলাদিকে খুব বকে এল।'

অরুণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

'না না, এতে বেলার দোষটা কি? তুই একবার পাঠিয়ে দিবি তো দীপ্তিকে আমার কাছে। আমি বুঝিয়ে বলব ওকে।'

'বলব। কিন্তু বা খামখেয়ালী মেয়ে! বোঝাতে পারবে বলে মনে হয় না। এমনিতে খুব ভাল। কিন্তু একবার রাগলেই বিপদ।'

অরুণ হাসিল। দীপ্তির মেজাজের বহু পরিচয় সে পাইয়াছে। মেয়েটিকে আজও সে বুঝিতে পারে না।

বৈকালের দিকে হারুদা আসিলেন। প্রায় মধ্যবয়সী এই লোকটিকে অরুণের মোটামুটি ভালই লাগে। বিছানার একপাশের চাদরটা একটু টান করিয়া অরুণ হারুদাকে বলিল, 'আসুন হারুদা, বসুন।'

হারুদা বসিলেন।

'কেমন আছে ভাই, পা'টা ?'

'যন্ত্রণা একটু বেড়েছে। ফোস্কাগুলোও যেন একটু বড় হয়েছে মনে হয়।'

হারুদা পা'টা দেখিতে লাগিলেন। এই দেখার মধ্যে কেমন একটু আন্তরিকতার ছোঁয়াচ পাইয়া অরুণের বড় ভাল লাগিল। কয়দিন হইতেই হারুদা'র একটু অন্যমনস্ক ভাব অরুণ লক্ষ্য করিতেছিল। আজ একটু নিভৃতে হারুদাকে পাইয়া দুই এক কথার পরই অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, হারুদা ?'

হারুদা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অরুণের দিকে তাকাইলেন।

'আজ ক'দিন থেকেই আপনাকে একটু আনমনা দেখছি। ব্যাপার কি বলুন তো ? এখানকার কাজ কর্ম কি আপনার ভাল লাগছে না ?'

হারুদা কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন :

'কাজ কর্মের জন্য নয় ভাই। হোম্ এ সুপারিন্টেন্ট আছিলাম, এই রকম কাজে অভ্যস্ত আছি আমি। তার জন্য না। তা'ছাড়া ছোট কাল থাইক্যাই ঘর সংসারের কাজ দেখতে হয় আমার।'

'তবে ?'

'কি জানি ভাই, সংসার লইয়া বড় মুস্কিলে পইড়্যা গেছি। এক বছর তো সংসারে এক পয়সাও দিতে পারলুন না। তিনটি ছেলেপেলে দিয়া তোমার বৌদিরে ভাইয়ের বাসায় রাইখ্যা আইছি। ভাইয়েরও আয় কম। নানাদিক দিয়াই কষ্ট হইতে আছে। তাই তোমার বৌদির চিঠিটা পাইয়া মনটা একটু খারাপ আছে আর কি !'

আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর তিনি বলিলেন,

'পাকিস্তান হইয়াই এই অসুবিধায় পইড়্যা গেছি। বাড়ী ঘর, জায়গা জমি কোন উন্নতির চেষ্টা করুন, তারও সময় নাই। অবস্থা অবশ্য কোনদিনই ভাল আছিল না, তবে চইল্যা যাইতে আছিল এক রকম। এখন বড় ঠৈইক্যা পড়ছি।'

অরুণ নীরবেই তাহার কথা শুনিতেছিল। হারুদার প্রতি সমবেদনায় তাহার মন দোলা দিতে লাগিল। হারুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

'ঠাকুর ! ঠাকুর ! যাউক, আমি বেশী এ' লইয়া ভাবিনা ভাই। ঠাকুরের যেমন ইচ্ছা তেমনই হইব। এখন এই ট্রেনিংটা লইয়া যদি কাজের কোন সুবিধা করতে পারি।'

একটু ব্যথিত ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন : 'কি জান ভাই, সবই বুঝি। নতুন আদর্শ, নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি, শোষণহীন শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক সমাজ, এ'তো আমার নতুন শোনা না। স্বামীজি এই সব কথা অনেক আগেই বইল্যা গেছেন। তবে দুঃখু এই যে সব বুইঝাও শুধু চাকরীর খাতিরেই সারাজীবন কাজ করতে হইল। কাজের জন্য কাজ করতে পারলাম না।'

হারুদার কথায় যেন বাঙালী সমাজের সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের কথারই প্রতিধ্বনি।

অরুণের পা কয়েকদিন বাদেই ভাল হইয়া গেল। আপাততঃ রান্নার কাজ হইতে সে অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু দীপ্তির সে'দিনের ব্যবহার তাহার মনের মধ্যে বার-বারই ঘুরিয়া ফিরিয়া উঁকি দিতে লাগিল।

রাত্রিতে খাইবার পরে অরুণ ডায়েরী লিখিতেছিল। প্রশান্তদার ঘরে ডাক পড়িল। একপাশে দক্ষিণমুখী ছোট ঘরটা। সামনেই দুইটী মাঝারি আকারের আমগাছ। ঘরের ভিতর এক পাশে একটি বইয়ের আলমারী। সমস্ত মেঝে জুড়িয়া মাদুর পাতা। একটী ছোট ডেস্কের উপর কয়েকটী লিখিবার সরঞ্জাম। কোণের দিকে একটী ছোট জলচৌকীর উপর চরকা। দক্ষিণদিকে জানালার পাশেই একটি ছোট তক্তপোষ ও তাহার নীচে মাঝারী আকারের একটী ট্রাঙ্ক। একপাশের দেয়ালে একটী ব্রাকেটে কাপড় জামা ঝুলিতেছে। প্রশান্তদা তক্তপোষে বসিয়া অরুণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অরুণ ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বিজ্ঞানের ছাত্রকে একটা কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে অরুণ, তুমি তৈরী ?'

অরুণ স্মিত মুখে চাহিয়া রহিল।

'আশা করি মন তোমার বেশ সুস্থ আছে এখন ?'

কয়েকদিন পূর্বের মনের অস্থিরতার জন্য অরুণ লজ্জা পাইল। প্রশান্তদা বুঝিলেন।

'এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই অরুণ। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে এবং বিচার করতে গেলে এটা সুলক্ষণ। মন তোমার উন্মুখ হয়ে আছে নতুন কিছু গ্রহণ করবার জন্যে। যেদিকে যা পাও টেনে নাও মনের ভেতর। যাক্, যে জন্যে ডেকেছি শোন, All India Basic Education Conference হচ্ছে একটা। আর সাত দিন বাদেই অলকা আর নিবারণদা তা'তে যাচ্ছেন বাংলা দেশের প্রতিনিধি হয়ে যোগ দিতে। এই সীতারামপুর আশ্রমকেই আমরা মডেল হিসাবে নিয়েছি। আর সব রিপোর্টও প্রায় তৈরী হয়ে গিয়েছে। এখন balanced dietএর ভিত্তিতে balanced cultivationএ আমরা কতদূর এগুতে পেরেছি, তার একটা রিপোর্ট তোমাকে তৈরী করে দিতে হবে। কালকের দিন তুমি ভেবে কাজের একটা কাঠামো দাঁড় করাবে। কাল রাত্রিতে আমরা আবার এই নিয়ে আলোচনা করব।'

বলিতে বলিতে প্রশান্তদা উঠিয়া পড়িলেন। অরুণও তাঁহার সহিত বাহিরে নামিয়া আসিল। দুইজনে উঠানের উপর ধীরে ধীরে বেড়াইতে লাগিলেন।

এই নূতন কাজের ভার পাইয়া অরুণ যেন বর্তাইয়া গেল। কাজের গুরুত্ব সে উপলব্ধি করিয়াছিল। সমস্ত মন তাহার আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তাহারই তৈরী রিপোর্ট পাঠ হইবে সর্বভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে। এ যে কত বড় সম্মান, কতবড় আনন্দ! অরুণ কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

পূর্ববর্তী কয়েকমাসের কৃষি মন্ত্রীদের নিকট হইতে অরুণ সব বুঝিয়া লইল। কতটুকু জমি চাষ হইয়াছে, কতটুকু জমি পতিত আছে, কি করিলে তাহা কর্ষণযোগ্য করা যায়, কোন শস্য কতটুকু লাগাইলে সর্বাপেক্ষা অল্প জমিতে আশ্রমের এতগুলি লোকের প্রত্যহ সুসমঞ্জস খাদ্যের যোগাড় হইতে পারে, এই সকলের গভীর গবেষণায় সে মত্ত হইয়া গেল। প্রশান্তদা মাঝে-মাঝে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অরুণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয়। অরুণ যেন বিশ্বসংসার ভুলিয়া গেল।

Final report লিখিয়া যাত্রার আগের দিন অরুণ অলকাদি ও নিবারণদাকে প্রশান্তদার ঘরে বসিয়া সব বুঝাইয়া দিল। রিপোর্ট দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। কৃষির অধ্যাপক নিবারণ ঘোষ। কৃষিই তাঁহার প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনিও তো এত যত্ন ভাবে ভাবিতে পারেন নাই। প্রশান্তদা অরুণের কাঁধে হাত রাখিলেন। তাঁহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। সামনের দিকে তাকাইয়া আছেন তিনি। এক অপূর্ব অনুভূতিতে অরুণ হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ে হাত ঠেকাইল। প্রত্যুত্তরে তিনি অরুণের মাথায় হাত রাখিলেন।

দুপুরে খাইবার সময় পরিবেশন করিতে করিতে পাতের কাছে যাইতেই ছায়া বলিয়া উঠিল, 'বৈজ্ঞানিকের ধ্যান ভাঙলো ? বাবাঃ, এ যে দেখছি শিবের ধ্যান!'

অরুণ হাসিয়া বলিল :

'তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে সাধনার প্রয়োজন আছে বৈ কি।'

'তাই বলে এই পৃথিবীসুদ্ধ সবাইকে ভুলে যাওয়া ?'

'পৃথিবীতে লোক অনেক। তা'দের ক'জনের সঙ্গেই বা দেখা হয় আর ক'জনকেই বা মনে রাখতে পারি বল ?'

'তবু দু'একজনকে তো রাখা যায়।'

'যথা ?'

'এই আমরা সব।'

অরুণ সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

'তোমাদের কথা তো সব সময়েই মনে হয়। সারাক্ষণই তো চোখের ওপর দেখছি। মনে না রেখে উপায় কী ?'

অরুণ অন্যদিকে চলিয়া গেল। অতুলের কাছে আসিতেই অতুল বলিল, 'কি হে ভায়া, বালতি সুদ্ধ কি সবই ওদিকে উপুড় করে দিয়ে এলে না কি ? আমরাও যে রয়েছি।'

'খাওনা কতটা খাবে।'

'আর খাওয়া! খাওয়া কি আর আছে ভায়া! হাসি ঠাট্টায়ই পেট ভরে গ্যাছে।'

এ'পাশ হইতে নেপাল এক চোঁক জল গিলিয়া ঘটিটা নামাইয়া বাঁ হাতে ভুড়ি দিয়া উঠিল, 'তারা ভায়া, মালো, আর কত দেখাবি মা !'

ইহাদের এইসব আলোচনা অরুণ আর গায়ে মাখে না। প্রথমে প্রথমে খুব রাগ হইত। ক্রমে সে বুঝিয়াছে শিক্ষিত হইলেও ইহাদের রুচি বিশেষ মার্জিত নয়।

বৈকালে একঘণ্টা কৃষির কাজ করিতে হয়। আশ্রমের সমস্ত কাজের মধ্যে এই একটী মাত্র কাজ, কেন যেন অরুণের পছন্দ হয় না। কৃষির অধ্যাপক নিবারণদাও এইজন্য অরুণের উপর একটু বিরক্ত। কিন্তু নইতালিমের মূল বৃত্তিগুলির মধ্যে কৃষি একটী। পরিকল্পিত উপায়ে চাষ করিয়া সর্বাপেক্ষা কম জমিতে সুসমঞ্জস খাদ্যের ব্যবস্থা তো আছেই, শিশুদের শিক্ষা ব্যাপারে সম্বন্ধযুক্ত পাঠ দিতে গেলেও ইহার প্রয়োজন অসীম। তাই পছন্দ না হইলেও অরুণ কৃষির কাজে নিয়মিত ভাবেই যায়। নিবারণদা বলেন, 'গাছকে ভালবাসতে হবে। গাছের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হবে।' গাছের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলিতেও অরুণ দেখিয়াছে তাঁহাকে। এত গাছপালা, তরিতরকারী হয়, কিন্তু নিজ হাতে কিছু ছিঁড়িয়া আনিতে পারেন না নিবারণদা। নিজের চেষ্টায় উৎপাদন করিয়া তাহা খাইতেও যেন কষ্ট হয় তাহার। মুক্ত প্রকৃতিকে অরুণ চিরদিনই ভালবাসে। কিন্তু তৈরী করা কৃত্রিম বাগানের উপর এই মমতার আতিশয্য, এতো প্রকৃতিকে ভালবাসা নয়। একটু যেন বাড়াবাড়িই মনে হয় অরুণের।

বৈকালে অরুণ পশুপতির সঙ্গে গাছের গোড়ায় জল দিতেছিল। গোড়াগুলি অনেকদিন খোঁড়া হয় নাই। অরুণ প্রস্তাব করল, গোড়াগুলি প্রথমে খুঁড়িয়া পরে জল দিতে। পশুপতি উত্তর করিল :

'কি হে, balanced diet আর balanced cultivationএর স্কীম করে হঠাৎ যে কৃষির ওপর খুব মনোযোগ বেড়ে উঠেছে দেখছি। 'তা'—এখন তোমার ক'দিন কাজ না দেখালেও চলবে ভাই। কর্তৃপক্ষের মনে impression যা হবার, তা' তোমার স্কীম তৈরীতেই হয়ে গিয়েছে। বাজী ভাই তুমিই মারলে।'

অরুণ একটু অবাক হইল। হঠাৎ তাহার উপর পশুপতির এই ঈর্ষার কারণ কি?

পশুপতি একটু বেঁটে, গোলাকার চেহারা, একটী ভুঁড়িও আছে ছোটরকমের। বাড়ী মেদনীপুর জেলার এক গ্রামে। সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে, চাষ বাস, জমি জিরাত আছে। বি, এ পাশ করিয়া গ্রামের হাইস্কুলে মাষ্টারী করিত আর ঘরসংসার দেখাশুনা করিত। কন্ট্রোলের সময় মুড কমিটির সেক্রেটারী হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, এইবার পাপক্ষালন করিতে আসিয়াছে। কথার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রু ও ভুঁড়ি এক সঙ্গেই নাচিয়া উঠে।

পশুপতির কথায় অরুণ উত্তর করিল,

'হঠাৎ এ' ভাবে কথা বলছ যে পশুপতি? ব্যাপার কি বলতো?'

পশুপতি কোনও জবাব দিল না। অরুণও আর কোন কথা না বাড়াইয়া নিজের মনেই কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

আগের দিন বৈকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজিকার প্রভাতটী বড় শান্ত স্নিগ্ধ রূপে ধরা দিল। রবিবার, আশ্রমের দৈনন্দিন সাধারণ কাজ ছাড়া আজ ক্লাস সবই বন্ধ। প্রায় তিনমাইল দূরবর্তী এক গ্রাম হইতে আহ্বান আসিয়াছে, আশ্রমের কর্মীদের একটী রাস্তায় উদ্বোধন করিতে হইবে। গ্রামবাসী নিজেরাই পাকারাস্তায় সহিত সংযোগ করিয়া একটী নূতন সড়ক নির্মাণ করিবে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্যই শুধু আশ্রমের কর্মীদের এই আমন্ত্রণ।

সকালে দল বাঁধিয়া মেয়েদের হোষ্টেলের পাশ দিয়া যাইবার সময় মেয়েরাও আসিয়া যোগ দিল। অরুণ দেখিল, রুক্ষ এলো চুলে দীপ্তি আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছে। অরুণ আহ্বান জানাইল,

'আসুন, আপনি যাবেন না?'

উত্তরে দীপ্তি একটু ম্লান হাসিল। ছায়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'ফুল কিন্তু নিয়ে আসবি ছায়া। ও দিকটায় অনেক ফুল পাওয়া যায় শুনেছি।'

'সে কি আপনি যাবেন না?

অরুণ দাঁড়াইয়া পড়িল। ছেলেমেয়ের দল বক্সা করিতে করিতে খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। উত্তরের প্রতীক্ষায় অরুণ দীপ্তির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। দীপ্তি উত্তর করিল :

'না, আমি কদিন থেকে জ্বরে ভুগছি।'

'জ্বর! সে কি? কৈ, কেউ তো বলেনি আমায়?'

'ভুল জানতে যেন ভুল হয় না ছায়া।' বলিয়া দীপ্তি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

ছায়া পাশেই দাঁড়াইয়াছিল অরুণের অপেক্ষায়। অরুণ তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল,

'কৈ, তুমিও তো বলনি আমায়?'

'বলব কি, ও মহাদেবের ধ্যান ভাঙানো কি আমার কর্ম?'

'কি বিপদ!' অরুণ অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। 'এ কদিন না হয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। কালও তো বলতে পারতে!'

'বলেছিলাম। তবে বোঝবার মত মনের অবস্থা আপনার এখনো আসে নি।'

'তার মানে?'

'কিছু নয়, চলুন। ওরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।'

'আমি একবার দীপ্তির সঙ্গে দেখা করব। তুমি গিয়ে বল।'

'তা হয় না অরুণদা। আমাদের হোষ্টেলে ঢুকতে হলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়।'

'কিন্তু দীপ্তিকে দেখে যাওয়াও আমার উচিত। তা'ছাড়া, হোষ্টেলে এখন আর কেউ নেই। তুমি যাও, গিয়ে বল।'

ছায়া একটু ভাবিল। কাজটা সঙ্গত হইবে কিনা ঠিক বুঝিতেছিলনা। কিন্তু অরুণের মনের আগ্রহাতিশয্যে বলিল: 'আসুন আমার সঙ্গে। খবর দিয়ে দেখা করবার দরকার হবে না।'

ছায়ার পিছনে ঘরে ঢুকিয়া অরুণ দেখিল, একখানা তক্তপোষের উপর দীপ্তি শুইয়া আছে। কাছে যাইয়া বলিল: 'ক'দিন থেকে জ্বর? আমায় একটু বলেও নি এরা সব। দেখি, জ্বর আছে না কি এখন?'

দীপ্তির কপালে অরুণ হাত রাখিল। অরুণ লক্ষ্য করিল না, কিন্তু ছায়া দেখিল, অরুণের সেই স্পর্শে দীপ্তি যেন একটু শিহরিয়া উঠিল। বোধ হয় এই প্রথম স্পর্শ বলিয়া। দুই চোখে অসীম মমতা লইয়া চাহিয়া আছে অরুণ। সে দৃষ্টিতে কি ছিল, দীপ্তি যেন চমকিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কপালের উপর হইতে অরুণের হাত নামাইয়া দিয়া বলিল: 'আপনাকে খবর দিয়ে কি হবে? আপনি কি ডাক্তার যে দু'বেলা এসে দেখবেন?'

তাইতো, দীপ্তির অসুখ করিয়াছে কিনা তাহা অরুণের জানিবার প্রয়োজন কি? আগে জানিলেই বা সে কি করিতে পারিত? অসুখ করিয়াছে, ডাক্তার দুইবেলা আসিয়া দেখিয়া ঔষধ দিতেছে। মেয়েরা আছে, সেবা শুশ্রূষার অসুবিধা নাই। তা'ছাড়া অসুখ এমন গুরুতর কিছু নয়। অসুস্থতার সংবাদে এতটা ব্যস্ত হওয়া তাহার উচিত হয় নাই। একটু যেন অশোভন হইয়া গিয়াছে। এই অশোভনতাকে ঢাকিবার জন্যই যেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল: 'যাক্, আজ তো আর জ্বর নেই। ভাল হয়ে যাবেন এবারে।'

হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া ছায়াকে বলিল: 'এঃ, আমরা বড় পিছিয়ে পড়লাম ছায়া। চল, চল, জোরে পা চালিয়ে ওদের ধরতে হবে।'

অরুণের এই অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়া দীপ্তির মুখ সকৌতুক স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিল, 'ছায়া, কুল।'

ঘর হইতে বাহির হইতেই অরুণ দেখিল, রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আছে অতুল। মিটিমিটি হাসিয়া অতুল বলিল, 'বেরুতে একটু দেরী হয়ে গেল ভায়া। যেতে যেতে হঠাৎ তোমার গলা শুনতে পেয়ে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, একসঙ্গেই যাই। তা', 'কেমন আছেন দীপ্তিবোন?'

'ভাল।'

সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়া অরুণ আগাইয়া চলিল। সারাপথ ধরিয়া শুধু একটা প্রশ্নই তাহার মনে জাগিতে লাগিল যে তাহার এই আকস্মিক ব্যস্ততা প্রকাশের কারণ কি? একি শুধুই কৃতজ্ঞতা?

আনুষ্ঠানিক ভাবে রাস্তার উদ্বোধনের কাজ শেষ হইয়া গেল। প্রায় দুইহাজার লোকের এক জনতা। স্থানীয় অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই একটি করিয়া ঝুড়ি ও কোদাল লইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের অসীম আগ্রহে একঘণ্টায়ই রাস্তার কাজ আশাতীতভাবে অগ্রসর হইল।

অনুষ্ঠানান্তে জলযোগ। গ্রামের এক সম্পন্ন গৃহস্থের

বৈঠকখানায় আসিয়া সকলে বসিলেন। গৃহস্বামী সাধারণ দেশী প্রথায় জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মুড়ি, শশা ও আদার কুঁচি। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে অরুণ সাধারণতঃ তথাকথিত ভদ্রতার ধার ধারে না। তাহার স্বাস্থ্যও যেমন ভাল, খাইতেও পারে প্রচুর এবং সেজন্য লজ্জাবোধও করে না বিশেষ। এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া ও একঘণ্টা কোদাল চালাইয়া তাহার ক্ষুধাও পাইয়াছিল বেশ। একটা ছোট কলাই করা গামলা ভর্তি-মুড়ি লইয়া উঠানের এক-পাশে বড় গাছটার শিকড়ের উপর বসিয়া সে নিঃশব্দে মুড়ি চিবাইতে লাগিল।

ছায়া আসিয়া ডাকিল, 'অরুণদা!'

'উ!'

'ফুল নিয়ে যাবে না?'

চর্বিত গ্রাসটা গলাধঃকরণ করিয়া অরুণ বলিল, 'কার জন্যে?'

'দীপ্তি যে বলে দিল।'

'সে তো তোমাকে বলেছে।'

'না, আপনাকেই।'

'কি করে?'

'বড় বড় উঁচু গাছ। আমি কি করে পাড়ব?'

অরুণের খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এক গ্লাস জল খাইয়া বলিল:

'চল, দেখি কোথায় তোমার ফুল। বাবাঃ, যা খিদে পেয়েছিল!'

ছায়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই ঝরণার মত স্বচ্ছ মিষ্টি হাসি। মন জুড়াইয়া দেয়। এই হাসিটি অরুণের বড় ভাল লাগে। বড় মিষ্টি মেয়েটা। দীপ্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু। দীপ্তির প্রখরতার কাছে এ যেন সুশীতল ছায়া। আকৃতি ও প্রকৃতিতে এত অসমঞ্জস থাকা সত্ত্বেও দুইজনে এত মিল হয় কি করিয়া! অরুণ মাঝে মাঝে ভাবে।

বেলা প্রায় এগারটায় তাহারা ফিরিয়া আসিল। ছায়ার হাতে একগুচ্ছ সাদা ফুল। দীপ্তি আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছে। ফুল দেখিয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। দীপ্তির হাতে ফুল দিয়া তাহার কানে কানে কি বলিল। দীপ্তির সুগৌর মুখ ইষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে দৃষ্টি তুলিয়া দেখিতে পাইল, অরুণ তখন আপন মনে হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। ফুলগুলি দীপ্তির হাত হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

অর্চনা আসিয়া দীপ্তির কাঁধে হাত রাখিল। একটু হাসিয়া বলিল: 'অরুণ চলে গেলো বুঝি?'

দীপ্তি হাত ছাড়াইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

[ক্রমশঃ]

হাঙ্গারীর হার-জিৎ

[শ্রীবন্ত]

সোভিয়েট সীমান্তের ছোট দেশ হাঙ্গারী, ইহার নিরাপত্তা সোভিয়েট নিরাপত্তার অস্থিমজ্জার সঙ্গে জড়িত—ইহা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন। রাজনীতির অভিধানে সীমান্তের ছোটখাট দেশগুলির ভাগ্য এই ভাবেই রচিত হইয়া থাকে। মার্কিন নিরাপত্তার প্রয়োজনে দক্ষিণ আমেরিকার অনেক ছোট দেশ ঐরূপ বিব্রাট ভোগ করিয়া থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব রবার্ট ল্যানসিং দক্ষিণ আমেরিকার উপর চাপ দিয়া অনেক জার্মানকে তাড়াইয়াছিলেন। এবং মার্কিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা (অবশ্য রাজনীতির প্রয়োজনে) এমন করিয়াছিলেন যে, ছোটখাট অনেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সার্বভৌম ক্ষমতার স্বাদ ভুলিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইহার পর আবার প্যান আমেরিকার প্রচার রহিয়াছে, আমিকার পূর্ব-ইয়োরোপীয় সমস্যাকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে হইবে। এবং হাঙ্গারী দেশ ছোট বলিয়াই প্রধান প্রতিবেশীর নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য—তবে সেটা স্বেচ্ছায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সোভিয়েট সমগ্র অঙ্কটি সঠিক ভাবে কষিয়া ঠিকে ভুল করিয়াছেন। অর্থাৎ বিশ্বের দরবারে ছোট জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সবরে চীৎকার করিয়া জানাইয়া দিয়া তবে নিজের কার্য সমাধা করিতেন। তাহা হয় নাই বলিয়া বিব্রাট বাঁধিয়াছে। আরও একটা ঠিকে ভুল হইয়াছে—জেম্‌স্ কাদারকে এখনই ঝুলি হইতে বাহির করিয়া প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানো উচিত হয় নাই। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার লৌহবলয়টি হাঙ্গারীর চতুর্দিকে ঘিরিয়া রাখিয়া ইম্‌রী নেগিকে নিয়া আর কিছুকাল সাপের খেলা খেলিলে ভালই হইত। ততক্ষণে সুয়েজের সমস্যায় ইংরেজকে কোণঠাসা করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাব পাকা পোক্ত করা সম্ভব হইত। সোভিয়েট কূটনীতি হঠাৎ নখদন্ত বাহির করিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে সজাগ করিয়া দিয়াছে। হাঙ্গারীতে বিদেশী পশ্চিম রাষ্ট্রের উস্কানী আছে বলিয়া সোভিয়েট যাহা প্রচার করিয়াছে—তাহা সত্য স্বীকার করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, সোভিয়েট ভুল করিয়াছে। প্রথম ভুল অতিমাত্রায় শঙ্কিত হইয়া সে 'ভদ্রলোকের কিলচুরি' নীতি ভুলিয়া গিয়াছিল। প্রথম আঘাতটা সহ্য করিয়া পরে যদি সুদে আসলে আদায় করিত তবে বিশ্বের কেহই বড় একটা মাথা ঘামাইত না। কেননা, হাঙ্গারীকে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সোভিয়েটের বন্ধুত্বের জন্য হাত বাড়াইতে হইত। কাজেই বুদ্ধিমানের মত তথাকথিত স্বাধীন নির্বাচনের সুব্যবস্থা করিয়া পরে তাতে মারিবার ভয় দেখাইলেই পাকা জুয়াড়ীর মত কাজ হইত। দ্বিতীয় ভুল, যুগোস্লাভিয়াকে খোঁচাইয়া তোলা। যুগোস্লাভিয়া তাহার রাষ্ট্রদূত ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছে—তাহার অর্থ বিশ্বের জনমত প্রভাবিত করিতেছে। এই প্রভাবটা সোভিয়েটের অনুকূলে না গিয়া বরং প্রতিকূলেই যাইবে। ফলে ভিতরকার কথা অনেক বেশী বাহির হইয়া পড়িবে। প্রাক্তন ক্রুদ্ধ হইয়া যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিয়াছে। ইহাতে সোভিয়েটের নৈতিক পরাজয় সূচিত হইয়াছে। সোভিয়েট যখন ব্যবসাদারী মন লইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে তখন অদ্বৈতবাদটা কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিলেই ভাল হইত। সোভিয়েট কূটনীতি সময়-জ্ঞান হারাইয়াছে। অন্তত হাঙ্গারীর ক্ষেত্রে ত বটেই।

এই অবস্থার সম্মুখীন হওয়াই হাঙ্গারীর আসল হার। হাঙ্গারীর রাজনৈতিক জীবনে হার-জিতের প্রশ্ন সবসময়ই জড়িত রহিয়াছে। কাজেই হাঙ্গারীর পক্ষে প্রতিবেশী চটাইয়া নিশ্চিন্তে বাস করা মুস্কিল। জেম্‌স কাদারই হোক আর ইম্‌রী নেগীই হোক এই অতি অস্বস্তিকর রাজনৈতিক সত্য কেহই এড়াইতে পারিবেন না। কিন্তু সোভিয়েট যে হাঙ্গারীকে এতদিন ধরিয়া শিখাইয়া-পরাইয়া মানুষ

করিল সে হাঙ্গারী কেন বিদ্রোহ করিল এ প্রশ্নের জবাব নাই। সোভিয়েটের ভুল নীতি হইতে একটি সত্য আবিষ্কার হইল যে, আদর্শপ্রীতি হইতে জাতীয়তার প্রীতি ন্যূন নহে। হাঙ্গারীকে কম্যুনিষ্ট হইবার পূর্বে হাঙ্গারী জাতি বলিয়া প্রথম মর্যাদা লাভ করিতে হইবে। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট করিতে ব্যস্ত ছিল, একটা জাতিকে জাতি হিসাবে সম্মান বা মর্যাদা দিতে শিখে নাই। তাই সোভিয়েট শক্তির মহড়া দেখিয়াই হাঙ্গারী জাতি ভীত হয় নাই, সেখানে এখনও ধর্মঘট চলিতেছে। জাতীয় শ্রমিক সংস্থা তাহাদের নেতৃত্ব বিকাশ করিয়াছে—সেই নেতৃত্বকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হইয়াছে। শ্রমিকসংস্থাকে বেআইনি ঘোষণা করিয়া—জাতির যৌথ নেতৃত্ব ধ্বংস করা হইতেছে।

কিন্তু হাঙ্গারী সমস্যা খুব গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, হাঙ্গারী জিতিয়াছে। বিশ্বজনমতকে হাঙ্গারী তাহার স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইয়াছে। কেননা এই হাঙ্গারী আজ বিশ্বজনমতের দরবারে তাহার দাবী পেশ করিয়াছে। এই দাবীকে একেবারে উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য সোভিয়েটের নাই। সোভিয়েটকে আরও এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, কেননা পূর্ব ইয়োরোপে ষ্টালিন যে প্রভাবের রাজত্ব গড়িয়াছিলেন তাহা প্রভুত্বের শক্তিতেই সত্য ছিল। তাহার মধ্যে সহঅবস্থান বা সহযোগিতার প্রশ্ন তেমন একটা ছিলনা। এতদিন পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের ছোট ছোট জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী নূতন করিয়া মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ এই দাবীর আন্দোলনকে বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। এবং ইহা আজ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে হাঙ্গারী নৈতিক শক্তিতে অনেক বলীয়ান।

বুদাপেস্তের চিঠি

[শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের জনৈক বন্ধু হাঙ্গারীর বর্তমান পরিস্থিতির কিছুকাল পূর্বে বুদাপেস্ত ভ্রমণে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসের পর হাঙ্গারীবাসীদের দেশের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবার দৃঢ়সংকল্প চিঠিখানিতে ফুটে উঠেছে।]

ভূপেন দা,

.....কয়েকদিন আগে Milan হতে একখানা চিঠি redirected হয়ে এসেছে আপনার। দেখা যাচ্ছে আপনি আমার চিঠি অনেক কাল পান নাই। আমি Milan হতে Office shift করেছি Genoaতে March মাসে; আপনাকে তার পরেও কয়খানি চিঠি দিয়েছি। জানিনা সে চিঠিগুলি পৌঁচেছে কিনা।

আমি মাঝে দুই বার Budapestএ গিয়েছিলাম। সেখান হতে ফিরেও চিঠি দিয়েছিলাম। Budapest বেশ সুন্দর জায়গা। লোকে এত Iron Countryর কথা বলে—একবার দেখে নেওয়া গেল। কি ভাবে যুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়েছে—এত গরীব দেশ, এখনও পরিষ্কার করে re-build করতে পারে নাই। লোকেরা কি পরিশ্রম করছে—ছেলেমেয়েরা এত খাটছে দেখার জিনিষ। আমাদের পক্ষে Budapest ভয়ানক Expensive জায়গা। কেননা Artificial Exchange rate। বাইরের এবং ভেতরের rate 3 : 1। এতে করে জিনিষপত্রের দাম ভয়ানক বেশী এবং Consumer Goods বিশেষ করে। খাবার জিনিষ বেশ পাওয়া যায় এবং Hungarian-দের জন্য কোন অসুবিধা নাই।

Danubeএর পারে Budapest. Danubeএর এক ধারে Buda অপর পারে Pest কি সুন্দর Parkগুলি এবং সহর। কি রকম স্বাস্থ্য চর্চা ওদের। Sports in any form খুব popular. কারখানার লোকদের শিক্ষা দেওয়ার সুন্দর বন্দোবস্ত। Workshopএর সময়ের ভেতরেই Class হয় এবং যাতে সকলে Knowledge inprove করতে পারে তার জন্য নানারকম চেষ্টা। এসব দেখে শুনে আমার মনে হয় আমরা কত পেছনে। এদের চেষ্টা হচ্ছে শিখবার এবং উন্নতি করবার। এর জন্য এদের Special Administration এর দরকার করে না। Existing Machineryর ভেতর দিয়েই সব কাজ চালিয়ে নেয়। এরা সব সময়ই বলে এবং কাজেও দেখায়—এক সময় আমরা খুব আনন্দে ও সমৃদ্ধিশালী ছিলাম, গত যুদ্ধে আমাদের যা লোকশান হয়েছে—কিন্তু আমরা আবার উঠব—অনেক বৎসর লাগবে না। তবে Russian Controlএ সুখী নয়।

আমার মনে হচ্ছে আর কয়েক মাসের মধ্যেই দেশে ফিরতে পারব। দেশে ফিরে অনেক পরিবর্তন দেখব নিশ্চয়।.....

ইতি—
প্রফুল্ল

সত্যি...

মেপোলে

সব চেয়ে ভাল

1/০ আনায় ১০টি, ১।/০ আনায় ৫০টি

[AC] MJ/168

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ভারতে খনিজ তৈলের অনুসন্ধান কার্য ঃ—

কোন দেশের শিল্পায়নের পক্ষে খনিজ তৈল একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ভারতে বর্তমানে ৪৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টন খনিজ তৈলের চাহিদা আছে। কিন্তু দেশে শিল্পায়নের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে খনিজ তৈলের চাহিদা বেড়ে ১ কোটি টন হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এই চাহিদা দেশের খনিজ তৈলের উৎপাদন বাড়িয়ে মেটাবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক মাস থেকে সরকার খনিজ তৈলের অনুসন্ধান কার্যে খুব তৎপর হয়েছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালেই রাজস্থানের জয়সালমার অঞ্চলে খনিজ তৈলের অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ হয়, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালেও এই অনুসন্ধান কার্য এগিয়ে চলেছে। এ ছাড়া কাম্বে ও জওয়ালামুখীতেও অনুসন্ধান কার্য সরকার হাতে নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে খনিজ তৈলের অনুসন্ধানের জন্য সরকার স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম তৈল কোম্পানীর সঙ্গে একযোগে কাজ করবার জন্য একটি চুক্তি করেছেন। এছাড়া আসামে তৈল খনির অনুসন্ধানের জন্য সরকার আসাম তৈল কোম্পানীর সঙ্গে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করবার জন্য আর একটি চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

খনিজ তৈলের অনুসন্ধান ও তার উৎপাদন একটি দুরূহ কাজ। দেশে উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব থাকায় কলম্বো পরিকল্পনা ও কানাডা থেকে কারিগরী সাহায্য নিয়ে সরকার কাজে অগ্রসর হন। এই প্রসঙ্গে গত ২৬শে নভেম্বর ভারত সরকার ও সোভিয়েৎ সরকারের মধ্যে এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে আগামী ডিসেম্বর মাসের মাঝা মাঝি ২৬ জনের একটি রুশ তৈল বিশেষজ্ঞদল ভারতের তৈল অনুসন্ধান কার্যে সহায়তা করবার জন্য এদেশে এসে পৌঁছোবেন।

ভারতসরকারের ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখের শিল্পনীতি অনুসারে খনিজ তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে সরকারের দায়িত্বে রাখা হয়েছে। সরকার এই দায়িত্ব পালনের জন্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারেন। আমাদের দেশে যে সকল বৈদেশিক কোম্পানীগুলো খনিজ তৈলের উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট আছে তারা সরকারের নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করে অভিযোগ করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কে, ডি, মালব্য তাঁর সাম্প্রতিক আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপ ভ্রমণকালে অন্যান্য দেশের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তা লক্ষ্য করবার বিষয়। তাঁর মতে ঐ সকল দেশ থেকে আমাদের দেশের বিধি-নিষেধ অনেক উদার। সেখানে কোন কোন দেশে বিশেষতঃ কানাডাতে কেবলমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য খনিজ তৈল উত্তোলন করতে দেওয়া হয়। আর ৮৫ ভাগ তৈল যা পাওয়া যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের তৈল থেকে তা উত্তোলন করবার জন্য সরকারের টেণ্ডার-আহ্বান করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় ভারত সরকার প্রথম পর্যায়ের তৈল উত্তোলনের জন্য ২০ বৎসর মেয়াদের চুক্তি করেছেন এবং ২০ বৎসর পরে এই

চুক্তি আপনা থেকেই আরও ২০ বৎসর কাল স্থায়ী হবে। কাজেই ভারতের নিয়ন্ত্রণ পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলি থেকে বেশী বলে অভিযোগ করা চলে না।

ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা :—

১৯৪৩ সালের ২০শে জুলাই ভারতসরকার ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে ষ্টার্লিং পাওনা ক্রমান্বয়ে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এক চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তি ১৯৫১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ আছে। সম্প্রতি এই সরকারদ্বয় পারস্পরিক আলোচনায় স্থির করেছেন যে এই চুক্তির মেয়াদ আর বাড়াবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ বর্তমানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই, চুক্তির আসল উদ্দেশ্য মোটামুটি পূর্ণ হয়ে যাবে। এই সিদ্ধান্তের দরুন ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা আদায় করবার অধিকারের কোন ক্ষতি হবে না। ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখের ভারত সরকারের ঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৯৪৩ সালের ২০শে জুলাই তারিখের বৃটিশ সরকারের সঙ্গে অর্থ সংক্রান্ত চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা ক্রমশঃ মিটিয়ে দেওয়া। এই চুক্তি অবশ্য সম্পূর্ণরূপে নূতন চুক্তি নয়। ভারতসরকারের, তদানীন্তন অর্থ-মন্ত্রী শ্রী সি, ডি, দেশমুখ ও বৃটিশ সরকারের চ্যান্সেলর অব্ এক্সচেকার মিঃ আর, এ, বাটলারের সঙ্গে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে যে আপোষ হয় তাহাই ১৯৪৩ সালের ২০শে জুলাই নিয়ম-মাফিক ভাবে চুক্তি পত্রে আবদ্ধ হয়।

বৃটিশ সরকারের কাছে ভারত সরকারের ষ্টার্লিং পাওনা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারত সরকার ছিল বৃটিশ সরকারের কাছে দেনাদার, কিন্তু যুদ্ধের পরে দেখা গেল যে ভারত কেবলমাত্র তার দেনা পরিশোধ করে নাই, সে এক মস্তবড় পাওনাদার হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লণ্ডনে তার ভাণ্ডারের অংশ হিসাবে কিছু ষ্টার্লিং সিকিউরিটি রাখত। কিন্তু তার পরিমাণ ছিল খুব সামান্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পূর্বে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৪ কোটি টাকা। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ১৯৪৫-৪৬ সালে এর পরিমাণ অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ১১৬ কোটি ষ্টার্লিং পাউণ্ড। যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার ভারতে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বহু অর্থব্যয় করতে বাধ্য হন; তা ছাড়া এদেশ থেকে বহু দ্রব্য সামগ্রীও বৃটেন ও অন্যান্য দেশে আমদানী করেন। এর জন্য বৃটীশ সরকার দিলেন ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। কিন্তু ভারতকে দাম মিটাতে হয়েছিল টাকায়। তাই ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটিগুলো হস্তান্তরিত করে দিলেন এবং রিজার্ভ ব্যাংক তার আইন অনুসারে এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটিগুলির বিরুদ্ধে কাগজী নোট বাজারে ছাড়তে সুরু করল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরে ভারত সরকার তার এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটিসমূহের বিরুদ্ধে তার পাওনা আদায়ের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের প্রথম চুক্তি হয়। এই চুক্তির মেয়াদ ছিল মাত্র ৬ মাস। পরে ঐ চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে আর একটি চুক্তি ৩ বৎসরের মেয়াদে করা হয় এবং এই চুক্তির মেয়াদ ১৯৫১ সালের ৩০শে জুন উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের চুক্তির ফলে মোট ষ্টার্লিং পাওনা থেকে পাকিস্তানের অংশ চলে যাওয়ায় ভারতের নীট পাওনা দাঁড়ায় ৮০ কোটি ষ্টার্লিং পাউণ্ডে। ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই এর পরিমাণ ছিল ৬৪·৩ কোটি ষ্টার্লিং পাউণ্ড। ১৯৫০ সালের চুক্তি ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই থেকে ৬ বৎসর কাল স্থায়ী এবং আগামী ১৯৫৭ সালের ৩০শে জুন এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। এই চুক্তি অনুসারে ভারত এই ছয় বৎসর কাল প্রতি বছরে ৩·৫ কোটি ষ্টার্লিং পাউণ্ড করে ষ্টার্লিং-পাওনা প্রয়োজনানুসারে তুলতে পারবে। অর্থাৎ এই ৬ বৎসরে ভারত মোট ২১ কোটি ষ্টার্লিং পাউণ্ড তুলতে পারবে এবং মেয়াদ শেষে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা থাকবে ৪৩·৩ কোটি ষ্টার্লিং পাউণ্ড। এই চুক্তির প্রথম পাঁচ বছরে মাত্র ১৩·১৯ কোটি ষ্টার্লিং আদায় করা হয়েছে অথচ চুক্তি অনুসারে ভারত ১৭·৫ কোটি ষ্টার্লিং পাউণ্ড আদায় করতে পারত। এত কম বৈদেশিক মুদ্রা আদায়ের কারণ ভারতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিদেশ থেকে খাদ্য সামগ্রীর আম-

দানী হ্রাস। কিন্তু সম্প্রতি স্টার্লিং পাওনা হঠাৎ কমতে সুরু করেছে। গত ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি স্টার্লিং কিন্তু এই কয়েক মাসে তা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ৪৪·৩৩ কোটি স্টার্লিংএ এসে দাঁড়িয়েছে। এত হ্রাসের কারণ ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস ও আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি।

অম্বর চরখা :—

অম্বর চরখা নিয়ে পার্লামেণ্ট থেকে সুরু করে দেশের বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক মহলে বহু তর্ক বিতর্ক হয়ে যাবার পর শেষ পর্যন্ত সরকার অম্বর-চরখার ব্যবহার প্রবর্তনের নীতি পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করেছেন। পরিকল্পনা কমিশনও এ সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য ও সুপারিশ করে গিয়েছেন। হস্ত চালিত তাঁতশিল্পের জন্য যে সুতোর প্রয়োজন হয়, তা যদি যথেষ্ট পরিমাণে গ্রাম্য শিল্পের মাধ্যমে উৎপন্ন করা যায় তা হলে পল্লীর কর্ম-সংস্থানের অবস্থার নিশ্চিত উন্নতি হবে। সুতো কাটার এই বিকেন্দ্রীকরণের অপর একটি উদ্দেশ্য হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে মিলের মুখাপেক্ষী না রেখে পল্লীর শিল্প থেকেই প্রয়োজনীয় সুতো সরবরাহ দিয়ে সাহায্য করা। অম্বর চরখার উৎপাদন পদ্ধতি ও কারিগরী জ্ঞান প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা কিছুদিন আগেই আরম্ভ হয়েছিল। উৎপাদন কেন্দ্র শিক্ষাকেন্দ্র ও অম্বর চরখার উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি নিয়ে একটি পাইলট স্কীম খাদি ও পল্লী শিল্পবোর্ডের হাতে দেয়া হয়েছে। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় উৎপাদন মন্ত্রণালয় খাদি ও পল্লী শিল্পবোর্ডকে অম্বর চরখার পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়েছেন। বোর্ড এ পর্যন্ত মাত্র ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। আশা করা যায়—আগামী মাসের শেষ পর্যন্ত অম্বর চরখার উৎপাদন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আরম্ভ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে কেবলমাত্র শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতেই সুতো ও কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে।

সম্প্রতি ভারতসরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ করা হয়েছে যে আগামী ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ৭৫,০০০টি অম্বর চরখা উৎপাদন ও বিতরণের বন্দোবস্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালের আর্থিক বৎসরে ৩০০ 'পরিশ্রমালয়' (শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র) স্থাপন করবার পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে ৩১৭টি ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ২৮টি বিদ্যালয় (শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান) ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে। ১০,২০০জন অম্বর চরখার সুতো কাটবার কর্মী ও প্রায় ১০৬০ জন নির্দেশক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষালাভ করছেন। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৪,২০০ চরখা উৎপন্ন হয়েছে এবং তারমধ্যে ৭,৮০০টি বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে বিতরণ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমেদাবাদ তাঁতশিল্পের গবেষণা সংস্থা অম্বর চরখার উৎপাদন ক্ষমতার উন্নতি সাধন করার জন্য পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। বোম্বাইর কটন টেক্‌নলজিক্যাল লেবরেটরীও চরখার কিছু উন্নতি সাধন করেছেন।

অম্বর চরখার উৎপাদন যদি সন্তোষজনক হয় তা হলে সরকার এর সম্প্রসারণ করবেন। খাদি ও পল্লী শিল্প বোর্ড পাঁচ বৎসরের জন্যে যে পরীক্ষা মূলক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তাতে এই পরিকল্পনার কালে ২৫ লক্ষ অম্বর চরখা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর ফলে একদিকে যেমন দেশের কাপড় উৎপাদন বেড়ে পল্লী অঞ্চলে বস্ত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের পূর্ণ-কিংবা আংশিক কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

পুস্তক-পরিচয়

আকাশের প্রার্থনা—শ্রীমতী শিপ্রা ঘোষ। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ, কলিকাতা। দাম ।৷০।

লেখিকা ছাত্রী, সবে কৈশোর-উত্তীর্ণা। কিন্তু তাঁর কবিতাগুলি দুর্বল বা আড়ষ্ট নয়। সুন্দর স্বপ্নময় স্বতঃস্ফূর্ত রচনা, প্রকাশ ভঙ্গীও পরিণত। এঁর কয়েকটি কবিতা 'মন্দিরা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। বিকাশোন্মুখ হৃদয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা বেদনা কল্পনা সহজ মাধুর্য নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে।

"তোমার দু'চোখে খেলা করে প্রেম,
আমার হৃদয়ে জ্বালে আলো"

অথবা

"তবু যেন মনে হয় সব স্বপ্ন, সব মিথ্যে ফাঁকি ;
ভালোবাসা মহাপাপ : তবু কেন আলো জ্বেলে রাখি ?"

পড়লে বোঝা যায় এ পরের কথার প্রতিধ্বনি নয়, আপন মর্মের সুর। দৃশ্য বর্ণনাতেও নূতন দৃষ্টির পরিচয় মেলে :

"ভুলেও কি কাঁদে মন
ব্যথার চাতালে ;
একটানা সুর তানে
পাড় দেয় ধান ভানে গ্রামবধূ শুদ্ধ চেঁকিশালে।',

নতুন কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ হ'লেও 'আকাশের প্রার্থনা' প্রতিভার অভ্রান্ত পরিচয় বহন ক'রে এনেছে।

আকাশ-মাটির গান : সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৫/১ তারাপদ চাটুজ্যে লেন। পোঃ বোটানিক্যাল গার্ডন্' শিবপুর, হাওড়া। ২৲।

"রোগজীর্ণ বন্দীজীবনের একাকিত্বের ফাঁকে ফাঁকে" লেখক কাব্যচর্চা করেছেন। এ তাঁর মানসিক তৃপ্তিলাভের পথ। কবিতাগুলিতে সবত্ন অনুশীলনের, নিষ্ঠার এবং আন্তরিকতার চিহ্ন পরিস্ফুট। ভাষায় এবং ছন্দে মার্জিত শ্রী দেখে ভালো লাগলো। কোথাও অস্বাভাবিক ভঙ্গিমা নেই।

"কার কথা বারবার বলে ওই ছায়াচ্ছন্ন মেঘলা আকাশ—
কে আসে আমার কাছে চুপি চুপি বাদল রাতের
অভিসারে।"

চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন সেই মানসীর স্বপ্ন কবিমন আচ্ছন্ন করেছে। বিদেশী কবিতার অনুবাদগুলিও সরস এবং সাবলীল। হেরিক, ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থ, কীট্‌স্, সুইনবার্ণ, ডে-লা-মেয়র, টেনিসন, স্টিভেন্‌সন্ এবং মেস্‌ফিল্ড—সেখানে সসম্মান স্থান লাভ করেছেন।

চার্বাকের উক্তি—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : শ্রী বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ সি, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলিকাতা ২০। মূল্য ১৷৷০।

একসময়ে অরীন্দ্র বাবুর কবিতা বহু মাসিক পত্রের শোভাবর্ধন করত ; পত্রিকা-পাঠকদের কাছে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তারপর দীর্ঘকাল তিনি সাহিত্য-সংসার থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর দু'খানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক-বর্গ আবার সেই বিস্মৃতপ্রায় কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। কবি জগতের রূপ-রসের অনুরাগী, তাই ইহ-বিমুখ মনোভাবের বিরোধী। এই কারণেই তিনি ইহবাদী চার্বাকের বাণীর মধ্যে নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনেছেন। তবে চার্বাক সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা যে সত্য নয়, তিনি যে শুধু ইন্দ্রিয়সুখের পোষকতা করেন নি,—তিনি ছিলেন 'বহুজনহিতবাদী' সে কথা 'চার্বাকের উক্তি' কবিতার আরম্ভে লেখক উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতি প্রেমিক জীবন-অনুরাগী এই কবির রচনায় প্রকৃত কবি-মনের সন্ধান মেলে।

—বী।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ইংরাজী জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আমরা মন্দিরার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন করিতেছি। আগামী পৌষ-সংখ্যা মন্দিরা এই বিশেষ সংখ্যারূপে বাহির হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষব্যাপী বিচিত্র কর্মধারার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের সুচিন্তিত আলোচনা এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই উপলক্ষে 'মন্দিরা'র জন্য স্বয়ং বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রী সি, ডি, দেশমুখ, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জী, অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জী, ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী, ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, ডাঃ জে, সি, বর্ধন, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, অধ্যাপক নিহাররঞ্জন রায়, শ্রীজ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা, শ্রীমীরা দত্তগুপ্তা, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীদেবী মুখার্জী, শ্রীআশুতোষ বাগচী, শ্রীত্রিপুরারী চক্রবর্তী, শ্রী ডি, কে, সান্যাল, শ্রী এস, এস, কাঞ্জিলাল, ডাঃ এ, সি, উকিল এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট লেখকগণও এই সংখ্যার জন্য লিখিবেন। প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রত্যেক গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ হইবে।

বহু জ্ঞাতব্য তথ্যসম্বলিত ও সারগর্ভরচনাসমৃদ্ধ এই বিশেষ সংখ্যাটির মূল্য মাত্র ২৲ টাকা ধার্য করা হইয়াছে, ভি, পি, খরচ স্বতন্ত্র। নির্দিষ্ট সংখ্যক কপি ছাপা হইবে বলিয়া যাহাতে আপনি আপনার কপিটি নিশ্চিতরূপে পাইতে পারেন তজ্জন্য আমাদিগকে পূর্বাহ্নে জানাইয়া দিলে আনন্দিত হইব।

কর্মসচিব
মন্দিরা

সুয়েজ ও হাঙ্গেরি

ভারতবর্ষ একান্তভাবে শান্তিপ্রয়াসী। যুক্তজাতি সংস্থায় তার প্রচেষ্টা পৃথিবীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। কোরিয়া ও ইন্দোচীনে তার উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং সে আশা করেছিল, অদূর ভবিষ্যতে আর কোথাও অশান্তি দেখা দেবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইস্রায়েল, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিনা আক্রমণে তার সে আশা বিফল হয়েছে। অবশ্য, যুদ্ধ যাতে অবিলম্বে বন্ধ হয়, সেজন্য সে বিশেষরূপে চেষ্টা করেছে এবং অন্যান্য জাতির সহযোগে যুক্তজাতিসংস্থার মারফত সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য আক্রমণকারীদের উপর চাপ দিয়েছে। আক্রমণকারীরাও সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। সুয়েজ এলাকা তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছে যুক্ত জাতি সেনাবাহিনী। তাতেও ভারত বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে। মনে হচ্ছে, মিশরের হাঙ্গামা অচিরে মিটে যাবে।

হাঙ্গেরির আভ্যন্তরীণ অবস্থা উদ্বেগজনক। রাজনৈতিক দলাদলির ফলে ওখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিচুক্তি অনুসারে হাঙ্গেরি সোভিয়েটপ্রভাবাধীন স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে থাকবে, ঠিক হয়েছিল। ভিতরের গোলযোগে শঙ্কিত হয়ে বর্তমান হাঙ্গেরির রাষ্ট্রশক্তি সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বিশৃঙ্খলা দমনের অভিপ্রায়ে বা অজুহাতে সোভিয়েট সরকার সেখানে সেনাদল পাঠায়। এই সেনাদলের মূলুম হাঙ্গেরির জনসাধারণ মানতে রাজি নয়, তার নানা নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। মিল-ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট, শ্রমিক বিক্ষোভ, প্রতিবাদ-জ্ঞাপক শোভাযাত্রা ইত্যাদির খবর কড়াকড়ি ভেদ করেও বাইরে আসছে। যুক্তজাতিসংস্থা ওখান থেকে সোভিয়েট সৈন্য সরিয়ে নেবার প্রস্তাব করেছে, কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্র সে প্রস্তাব মেনে নেয়নি। জাতি সংস্থার কোনও পরিদর্শককেও তদন্তের জন্য সেখানে যেতে দিতে হাঙ্গেরি রাজি হয়নি। ভারত এক্ষেত্রেও বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের পক্ষপাতী। প্রত্যেক জাতি নিজের ব্যবস্থা নিজে করবে, এই তার আদর্শ। সে আদর্শ রক্ষিত না হলে স্বাধীনতার অর্থ থাকেনা। নূতন সোভিয়েট সরকারের পূর্বঘোষিত নীতির সঙ্গে হাঙ্গেরিতে এই কার্যকলাপের সামঞ্জস্য নেই। জনগণের প্রাণ নিয়ে খেলা পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে যেমন অপরাধ, সাম্যবাদীর পক্ষেও তেমনি।

পাকিস্তানের কথা

পাকিস্তানে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার রদবদল এবং এক দলের উপর অপর দলের দোষারোপ—এ ছাড়া প্রকৃত রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। যিনিই শাসন-ভার হাতে নিচ্ছেন তিনিই প্রথমে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা এবং জন-সাধারণের উন্নতি সাধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তারপর দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে বা দেশকে মুক্ত করতে তিনি অক্ষম, ভারতের নিন্দায় এবং কাশ্মীর ছাড়তে পাকিস্তানের একথা ঘোষণায় তিনি পঞ্চমুখ; জনগণের মঙ্গলসাধনে তিনি উদাসীন অথবা অপারগ।

সম্প্রতি সুরাবর্দি সাহেব ভারতের, তথা ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর প্রতি অবিরাম বাক্যবাণ বর্ষণ করছেন। ভারতের কাছ থেকে শত্রুতার আশঙ্কায় আরব-লীগে থাকা পাকিস্তানের পক্ষে অপরিহার্য, একথা তিনি ঘোষণা করেছেন; পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি নেহরুজী পছন্দ

করেননি—সেইটেই তার সার্থকতার চরম প্রমাণ বলে আত্ম প্রসাদ লাভ করেছেন। তা করুন, কিন্তু পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য জনগণ কেউ হল বিতাড়িত আর কেউ রইলো অজ্ঞতার অন্ধকারে ও দারিদ্র্যের পঙ্কে। এ অবস্থার অবসান কবে হবে, কে জানে?

চৌ-এন্-লাই

চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই ভারত রাষ্ট্রের সম্মানিত অতিথিরূপে এখানে এসেছেন। কলকাতায়ও এসেছিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে অভ্যর্থনা করেছে। এ অভ্যর্থনা কেবল ব্যক্তি বিশেষকে নয়, সমগ্র চীনকে। প্রতিবেশী এই বিরাট দেশ দীর্ঘকাল ভারতের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ এবং অনেকটা একই সংস্কৃতির সাধক। উভয় দেশের আধুনিক কালের আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থায়ও মিল আছে। তাই স্বভাবতঃ পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির যোগ দৃঢ় হয়েছে। এই যোগ উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হউক, এবং বিশ্বে মহান্ আদর্শ স্থাপন করুক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী

আগামী জানুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হয়েছে। এই ইতিহাস কৌতূহলজনক ও গৌরবময়। সরকারী দৃষ্টিতে যে শিক্ষা কেবল শাসন চালাবার উপায়মাত্র ছিল, তা কি ক'রে জাতি-গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হ'লো এবং দেশে নূতন চিন্তার বিকাশ সাধন করলো, সেকথা জানা আমাদের কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয় এই শতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাস প্রণয়ন করছেন। আমাদের পত্রিকাতেও এই উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। খ্যাতনামা মনীষিবৃন্দ এই সংখ্যায় লিখতে সম্মত হয়েছেন, সেজন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে
বিজয়-বৈজয়ন্তীবাহী

মোহিনী মিল্‌স্ লিমিটেড

(স্থাপিত ১৯০৮)

১ নং মিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)

২নং মিল

বেলঘড়িয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেন্টস

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

DENA BANK

The Saving Services offered by the Dena Bank will help you to save for the future.

General Banking Business Transacted.

A STRONG BOFFICE

DEVKARAN NANJEE BANKING CO., LTD.

HEAD OFFICE:

DEVKARAN NANJEE BLOCK, HORNIMAN CIRCLE, BOMBAY 1.

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১। মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হ'তে আরম্ভ।

২। প্রত্যেক সংখ্যার দাম আট আনা। বার্ষিক সভাক দাম ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক তিন টাকা চার আনা। বৎসরে দুইবার গ্রাহক হওয়া যায়, বৈশাখে বা কার্ত্তিকে। অন্য কোন সময়ে গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কার্ত্তিক থেকে বৎসর সুরু হবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নম্বর দেবেন। 'মন্দিরা' প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সময় মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের রিপোর্ট সহ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে আমাদের জানাবেন।

লেখকদের প্রতি

যথাসম্ভব নতুন বানান ব্যবহার করবেন। নকল রেখে রচনা পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা নষ্ট করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৫০৲

" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—২৮৲

" সিকি পৃষ্ঠা—১৮৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা তজ্জন্য দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

ম্যানেজার—**মন্দিরা**

৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

ফোন :—বি, বি, ২৬৬০

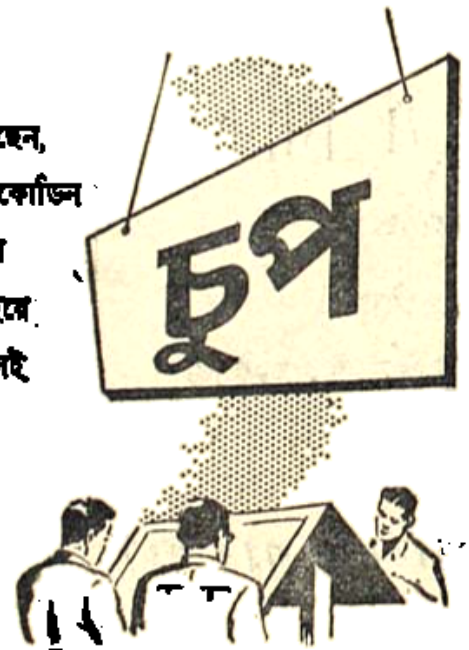

যদিও কাশিতে ভুগছেন, এ্যালেম্বিকের গ্লাইকোডিন টার্প- বাসক সেবনে অবিলম্বে নিরাময় হয়ে এই নোটিশ অনায়াসেই মানতে পারেন।

Alembic

গ্লাইকোডিন টার্প বাসক

এ্যালেম্বিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ কোং লিঃ, ভরোদা-৩

সিনেট ভবন

এই বিশেষ সংখ্যার চিত্রগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য—আর্ল অফ্ ক্যানিং চার্লস জন (১৮৫৭)

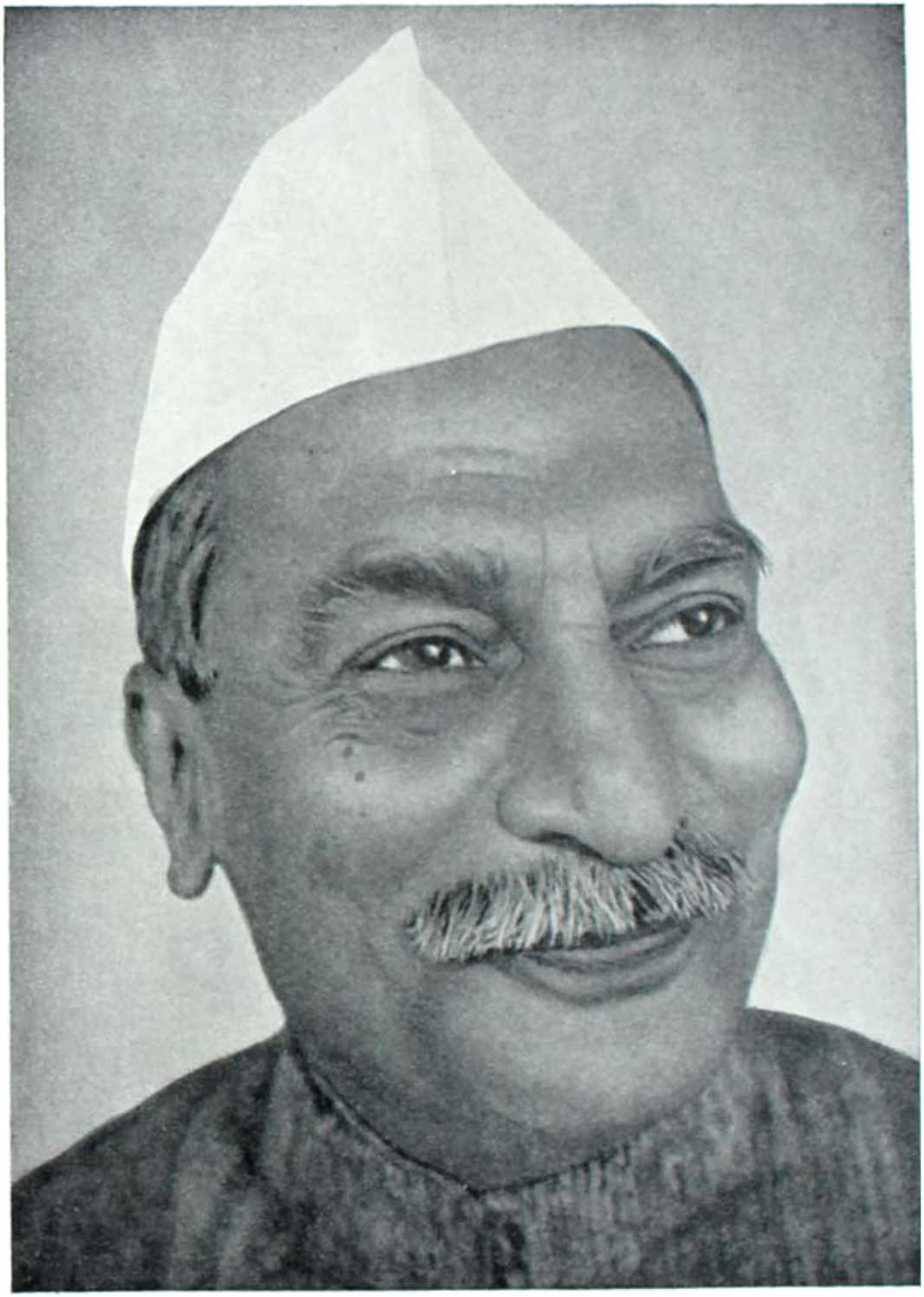

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

মন্দিরা

উনবিংশ বর্ষ | পৌষ, ১৩৬৩ | নবম সংখ্যা

আমার পরীক্ষা

(বাংলায় লিখিত)

[রাষ্ট্রপতি ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। এন্ট্রান্স হতে শুরু করে সব পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইনি প্রথম হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার—তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল, ব্রহ্মদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং সমগ্র বাংলা। এই যুগে সব পরীক্ষায় প্রথম হওয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

রাজেনবাবু নামেই তিনি ভারতের জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন; আজও সেই নামেই তাঁকে অভিহিত করলে আমাদের ভাল লাগে। নিজের পরীক্ষার অভিজ্ঞতা তিনি এই প্রবন্ধে লিখেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর মমত্ব-বোধ ও গৌরববোধের সুস্পষ্ট পরিচয় এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়। রাজেনবাবু কেবল রাষ্ট্রনৈতিক নেতা নয়, তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি।

তাঁর এই লেখাটি বাংলাতেই তিনি রচনা করেছেন। তাঁর লেখা পেয়ে 'মন্দিরা' গৌরব বোধ করছে।] মঃ সঃ

ভগবান জীবনে পরীক্ষা এনে দেন নানাভাবে, বিচিত্র ঘটনায় ও পরিবেশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি প্রত্যেক ছাত্রের মতই আমার জীবনেও এক সময়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হত। কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের পরীক্ষার চেয়ে বড় পরীক্ষা যে তার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতে পারে, সে কথা আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে। সেই দুঃখের শিক্ষা চরিত্র গঠনের বহু ইঙ্গিত দিয়ে গেছে।

বাণীর প্রসাদ এ জীবনে বার বার পাবার সৌভাগ্যলাভ হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের প্রথম দ্বার ছিল প্রবেশিকা অর্থাৎ সেকালের এন্ট্রান্স। সে পরীক্ষা বর্তমানের তুলনায় বেশ শক্ত ছিল। সে কথা এখনো বহু প্রাচীন এনট্রান্স পাশকে সগর্বভরে বলতে শুনি। তখন এত পাশের রেওয়াজ ছিল না, ছিল না এত ভাল বিশ্ব-বিদ্যালয়। কিন্তু বর্মা থেকে বিহার, উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত ভারতের বিরাট অংশ জুড়ে ছিল আদি ও অনন্য বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের গৌরব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তখনকার সমসাময়িক প্রধান বিদ্বান সুধীরা বলেন যে সে সময়কার প্রবেশিকা ছিল বিদ্যার শুধু প্রথম দ্বার নয়, সিংহদ্বার।

সেই সিংহদ্বারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছি স্কুলের শেষ পরীক্ষাটি দিয়ে। ভরসা আছে যে বেশ ভালই করব। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি। এমন সময় এল বিনামেঘে বজ্রাঘাত। স্কুলের হেডপণ্ডিত পাশ হতে পারিনি। এনট্রান্সে ডুবিং বিষয়ে আমি পরীক্ষা দিতে পারব

না। এই বিষয়ে স্কুলের টেষ্ট পরীক্ষায় আমি ফেল হয়েছি।

তখনকার দিনে অন্যান্য বিষয়ের মত ড্রয়িংও একটি বিষয় ছিল। কিন্তু ঐচ্ছিক বিষয়। তাতে কেউ পাশ না করলে সে বিষয়ে শূন্য পেত, আর পাশ করলে হয় বিশ না হয় পঁচিশ নম্বর পাওয়া যেত। সেই নম্বর বৃত্তি পাওয়ার জন্য হিসাবে যোগ করা হত।

চিরকালের ছাত্রসমাজের মতই আমারো মনোযোগ কেবল ড্রয়িং ঐচ্ছিক বিষয়ের দিকে একটু কম ছিল। এতে পাশ করতে পারিনি। অতএব পণ্ডিতমহাশয় আমায় আটকিয়ে দিলেন। হেডমাষ্টার মহাশয় আমাকে পরীক্ষা দিতে দেবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। বৃত্তির জন্য স্কুলের কৃতিত্ব তাতে প্রমাণিত হবে, এমন আশা তিনি পোষণ করতেন। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় প্রাচীন গুরুগৃহের মর্যাদায় আত্ম-প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে ইংলণ্ডের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যেক বিষয়ের অধ্যাপকের মতামতের উপর ছাত্রদের ভাগ্য যে রকমভাবে নির্ভর করে ঠিক তেমন ভাবেই ড্রয়িংবিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়ের মতামতের উপর আমার ভাগ্য নির্ভর করছিল। হেডমাষ্টার মহাশয়ের ইচ্ছা বা স্কুলের ভবিষ্যৎ কৃতিত্ব তার আদর্শ মানদণ্ডকে টলাতে পারবে না। অবশেষে তিনি আমার নাম পাঠাতে রাজী হলেন এই সর্তে যে আমি পরীক্ষা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন দিনে এক ঘণ্টা ধরে ড্রয়িং অভ্যাস করব। এনট্রান্স পরীক্ষায় আমার প্রথম হবার সৌভাগ্য হল। পণ্ডিত মহাশয়ের মান ও আমার স্কুলের সম্মান দুই-ই রাখবার আনন্দ সেই কিশোর জীবনের মানসিক পরীক্ষাকে সার্থক করে দিল।

ইণ্টারমিডিয়েট অর্থাৎ ফার্ষ্ট আর্টসের পরীক্ষাতেও অনুরূপ সৌভাগ্য এবং তার পূর্বাহ্নে ভাগ্য পরীক্ষা হয়েছিল। তখনকারদিনে আর্টস্ ও সায়েন্স—কলা ও বিজ্ঞানের—পুরোপুরি ভাগ ছিল না।

ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়ার মধ্যে যে রস পেয়েছিলাম সে রস টেষ্ট পরীক্ষার ফল ঘোষণার সময়ে বিস্বাদ হয়ে উঠলো। কলেজের শেষ পরীক্ষার ফল ঘোষণার সময় প্রিন্সিপ্যাল আমার নাম পড়লেন না। আমি অবাক হয়ে গিয়ে সবিনয়ে প্রতিবাদ করলাম। তার ফলে তিনি রাগ করে আমায় পাঁচ টাকা জরিমানা করলেন। আবার প্রতিবাদ করার ফলে তিনি জরিমানা দশ টাকা করে দিলেন। এই রকম করে বাড়তে বাড়তে জরিমানা বিশ টাকা হয়ে গেল। আমার উপর যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়তে লাগল। তার পরের দিনই ছিল ইউনিভার্সিটিতে নাম পাঠানোর দিন। হায়, আমার নাম পরীক্ষার জন্য পাঠান হবে না!

কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে! পরের দিন টাকা জমা দেবার সময় দেখা গেল যে আমার নামও সকল ছাত্রদের তালিকায় রয়েছে। ভুল, শুধু একটি ভুল বশতঃ আমার নামে অন্য একটি ছাত্রের ফলাফল বসান হয়ে গিয়েছিল। এবারকার মানসিক পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে কেটে গেল। আবার প্রথম হওয়ার গৌরব এই ভাগ্যের পরিহাসকে মন থেকে মুছে দিল, সঙ্গে সঙ্গে দিল নূতন একটি শিক্ষা। মনে মনে প্রার্থনা করলাম যে ভগবান যদি দুঃখ দেন, তাহলে সে দুঃখ সইবার ক্ষমতাও যেন দেন। তাহলে দুঃখের দিন পার হয়ে আসতে পারব নিশ্চয়ই।

বি, এ, পরীক্ষার সময় জীবন পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সে সময় শুধু একটি নয়, তিনটি বিষয়ে অনার্স নেওয়া চলত। এবং সব বিষয়ের অনার্স পরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর যিনি পেতেন, তিনি পেতেন বি, এ, পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রার্থিত সম্মান ঈশান স্কলারশিপ। বছরের পর বছর এবং এখন পর্যন্ত এই চূড়ান্ত সম্মানটি সকল বি, এ, পরীক্ষার্থীর স্বপ্ন হিসাবে বিরাজমান থাকে। আমি ইংরাজী ও ইতিহাসে অনার্স নিয়েছিলাম এবং শ্রদ্ধেয় এইচ, এম, পাসিভাল মহোদয়ের ছাত্র ছিলাম। এই জ্ঞান-তপস্বী কথা বলতেন কম, কিন্তু বিদ্যাদান করতেন প্রচুর। নিজের সংসারে নিঃসঙ্গ, কিন্তু মনোজগতে অপ্যায়ন তাঁর নিত্য সঙ্গী। বাইরের ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে যত দূরে থাকতে চাইত, মনে মনে তাঁর তত কাছে আমরা ছিলাম। এই বিশ্বাস, এই সচেতনতা তাঁর বাহিরের নিরাসক্ততার আবরণ ভেদ করে আমাদিগকে তাঁর নিকটে আসতে সহায়তা করত। প্রেসিডেন্সী কলেজের শেষ পরীক্ষার পরে তিনি আমাদের নম্বর জানিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। আমিও নিশ্চিন্ত মনে

নিভৃতে অধ্যয়নের জন্য জামতাড়ায় চলে এলাম। কিন্তু এবারো আমার শান্ত নিস্তরঙ্গ মনের সরোবরে দুঃসংবাদ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলো। আমি ইতিহাস অনার্সে ফেল করেছি। অতএব ইতিহাসে অনার্স পরীক্ষার দেওয়ার জন্য আমার নাম পাঠান হবে না।

তখনি চলে এলাম কলকাতায়। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস হয় না। কুণ্ঠিত মনে চিন্তিত মুখে হাজির হলাম পার্সিভ্যাল সাহেবের বাড়ীতে। তিনিই যে খুব বেশী নম্বর পেয়ে প্রথম হবার খবর আমায় দিয়ে ছিলেন! এদিকে মাত্র কদিন আগে কলেজে নতুন নিয়ম হয়ে গেছে যে এর পর থেকে আর টেষ্ট পরীক্ষার নম্বর অধ্যাপকরা ছাত্রদের জানাতে পারবেন না। কাজেই তার আগে পার্সিভ্যাল সাহেব আমায় যে নম্বর জানিয়ে ছিলেন, তা এখন প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করলে নিয়মে বাধবে।

স্বল্পভাষী অধ্যাপক কিন্তু অভয় দিলেন যে আমি নিশ্চয়ই সর্ব্বোচ্চ স্থান পেয়েছি। এদিকে অধ্যক্ষ ঘোষণা করেছেন যে আমি ইতিহাসে ফেল করেছি। পার্সিভ্যাল সাহেব শুধু সংক্ষেপে জানালেন যে আমি যেন সময়মত কলেজে আসি। নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে এবং সে ভুল সংশোধন হয়ে যাবে।

সত্যিই ভুল হয়েছিল। এবং শুধু সে ভুলেরই সংশোধন হল না; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান ও ঈশান স্কলারশিপ আমার এই বিপদেও মানসিক পরীক্ষার পুরস্কার হিসাবে এসে সকল দুঃখকে ঘুচিয়ে দিলে।

সেদিন অপরিণত বয়সে অপেক্ষাকৃত অসহায় এই তরুণের কাছে এই বিপর্যয়গুলি বিরাট বলে মনে হয়েছিল। তিন তিন বারই ইউনিভার্সিটিতে প্রথম হবার পরিবর্তে এসে উপস্থিত হয়ে ছিল শুধু ফেল হওয়া নয়, তার চেয়েও বড় অসম্মানের সম্ভাবনা, পরীক্ষা দিতে না পারার মত অসম্মান। কিন্তু "বিপদি ধৈর্যম্" হচ্ছে শাস্ত্রের বচন। দুঃখের শিক্ষা, সহিষ্ণুতার সাধনা হচ্ছে পরম সম্পদ। সেই সম্পদ যেন আমাদের সকল শিক্ষাকে মহান করে তোলে।

আজ পঞ্চাশ বছর পরে সে সব কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সেই আশা দিয়ে ভরা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলি। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শত-বার্ষিকী উৎসব হচ্ছে এখনো আমার বহু স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের লীলাভূমি এই মন্দির। সে ত শুধু একটি বিদ্যামন্দির নয়, শুধু ভারতের বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী একটি প্রতিষ্ঠান নয়;—এ হচ্ছে জীবনসংগ্রামের পরম সাধনার ক্ষেত্র, প্রস্তুতির প্রথম প্রাঙ্গণ। এই রণক্ষেত্রে প্রতি সার্থকতার উপক্রমণিকা হয়েছে সংগ্রামের মধ্যে; প্রতি বিজয়ের পুরোভাগে পড়েছে পরাজয়ের অন্ধকার ছায়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের জীবনেও এমনি কত সংগ্রাম ও নিরাশার অবস্থা এসেছে। মাতৃভাষায় বিদ্যাশিক্ষার প্রথম পরিকল্পনায়, বিদেশী শাসনতন্ত্রের প্রভাবের অধীন না থেকে স্বতন্ত্র মানসিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে শিক্ষা প্রণালী গঠনের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমগ্রদেশের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে শিক্ষার আদর্শের প্রতীক হিসাবে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের সহায়তায়, বহু শিক্ষাবিদের ত্যাগে ও সাধনায় পরিপুষ্ট এই বিশ্ববিদ্যালয় সকল সংগ্রামে জয়ী হয়েছে। ভাবতেও আজ আনন্দ হয় যে এখানে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যে শিক্ষালাভ করেছি এই পরীক্ষা গুলির মধ্যে দিয়ে, যে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে এই চিন্তাভাবনার মুহূর্তগুলিতে, তারই প্রতিবিম্ব খুঁজে পেয়েছি সেই সময়ের রচিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রের অমর রচনায়:—

"বিপদে মোরে রক্ষা করো　　এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে　　নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।"

রাজেন্দ্র প্রসাদ

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের বাণী

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 'শিখা'র এই বিশেষ সংখ্যার জন্য একটি প্রবন্ধ দিতে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর ২।৩ দিনের মধ্যেই তাঁর পত্নীবিয়োগ হল। এরপর যে তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু লেখা পাব—সে আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। তবু-ও তিনি একটি বাণী পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি 'শিখা' এর জন্য অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের বাণী ছোট হলেও এতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর মমত্ব ও মমর যোগের পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গুণীর আদর করে নিজের গৌরব বৃদ্ধিই করেছিল। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন ২০ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন; বাংলার বাহিরের এমনি আরো বহু গুণী-ব্যক্তিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আদর করে নিয়েছিল। ভারতে আজ পর্যন্ত ৯ জন F. R. S. হয়েছেন; তার মধ্যে ৪ জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁদের নাম হল—জগদীশচন্দ্র বসু, সি-ভি রমন, মেঘনাদ সাহা ও প্রশান্ত মহলানবিশ। তা ছাড়া—কৃষ্ণন-ও কলিকাতাতে বসেই তাঁর গবেষণা করেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত হন নি। Indian Science Association-এ তিনি গবেষণা চালান এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গৌরবের কথা ডাঃ রাধাকৃষ্ণন উল্লেখ করেছেন এবং আশা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ঐ গৌরবময় ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারবে।

ঃ সঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার কার্যগতিক যোগ ও সম্পর্ক ছিল প্রায় ২০ বছর ধরে—১৯২১ হ'তে ১৯৪১ পর্যন্ত এর মধ্যে আমি অন্যত্র-ও কিছু কিছু কাজ কখন ও গ্রহণ করেছি। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর প্রেরণামূলক নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম কলা (arts) ও বিজ্ঞান (Science) স্নাতক-উত্তর বিভাগ গড়ে তোলেন। তিনি এটা বলেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কেবল শিক্ষার প্রসার নয়—শিক্ষার প্রকৃত বিকাশ সাধন-ও তার উদ্দেশ্য। পণ্ডিত তরুণদের তিনি যে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন, তা সর্ব্বজনবিদিত। যখন আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসিক ও নৈতিক শাস্ত্রের (অর্থাৎ দর্শনের) শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাজা পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক নিযুক্ত করা হল, তখন আমার বয়স মাত্র ৩২ বছর। আমারই মতো বয়সের আরো অনেককে এমনি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিলাতের বিখ্যাত বিদ্বৎসংঘ রয়েল সোসাইটি (Royl Society) যে ক'জন ভারতীয়কে এর সভ্য করেছিল—(F. R. S.), তার মধ্যে অন্তত অর্ধেক ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে।

আমার একান্ত আশা ও কামনা যে-পন্থা অনুসরণ ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক সময় বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অর্জন করেছিল—ভবিষ্যতেও যেন সে পন্থাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুসরণ করে। সেই প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের দিনে আমি-ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইংল্যাণ্ডের হাউস্ অব্ কমন্সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্মঞ্জুরের বিষয় আলোচনা করা হয়, তখন সেখানে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ হয় যে, ভারতে আধুনিক জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজন আছে। আলোচনাকালে কোম্পানির জনৈক ডিরেক্টর নাকি বলেন যে, তাঁহারা আমেরিকায় স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়া যে বোকামি করিয়াছেন তাহার ফলে তাঁহারা আমেরিকা হারাইয়াছেন, ভারতের ক্ষেত্রে তাঁহারা তদনুরূপ বোকামি করিলে ফল ভাল হইবে না।

উহার বিশ বৎসর পরে কোম্পানির সনদ পুনর্মঞ্জুরের সময় একটি সর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় যে, প্রতি বৎসর অন্যূন এক লক্ষ টাকা সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের জন্য এবং বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। ইহার অল্পদিন পরে ১৮১৭ সালে ইউরোপীয় ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। পরবর্তী বৎসর কলিকাতার বিশপ তরুণ মিশনারিদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং ইংরেজী ভাষার জ্ঞান বিস্তারের জন্য শিবপুরে একটি কলেজ স্থাপন করেন।

সে-সময় আধুনিক শিক্ষার উন্নয়ন সহজ ছিল না। ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণের সমর্থক এবং আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার সমর্থকগণ জয়লাভ করেন। কিন্তু ১৮৪৫ সালে বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদ কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টার কোর্ট তাহা সমর্থন করেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা

১৮৪৪ সালে ভারতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের একটি পরিকল্পনা ডিরেক্টার কোর্টের নিকট একটি সরকারী ডেসপ্যাচে বিবৃত করা হয়। স্থির করা হয় যে, কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে এবং সেগুলির কাজ হইবে—অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোর্স শেষ করিয়া যে সব ছাত্র প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগকে ডিগ্রী দেওয়া। দুই বৎসর পরে ভারত সরকার পরিকল্পনাটি সমর্থন করেন এবং তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের খসড়া বিল রচনা করেন। ১৮৪৭ সালে প্রথম বিলটি পাশ হয়। ঐ বৎসর ২৪শে জানুয়ারি গভর্ণর জেনারেল বিল অনুমোদন করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়।

ইহার পূর্বে বাংলা ও উত্তর ভারতে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল সেগুলি, এমন কি, বাহিরের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসে। ১৮১৮ সালে স্থাপিত আগ্রা কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিনেট সভার ৩৮ জন সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের ছয়জন ছিলেন ভারতীয়। গভর্ণর জেনারেল ছিলেন চ্যান্সেলার। ১৮৫৭ সালে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা গৃহীত হয়। ২৪৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৬২ জন উত্তীর্ণ হয়। প্রথম ডিগ্রি পরীক্ষার ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দুইজন সাফল্য লাভ করেন। ইঁহারাও আবার গ্রেস মার্ক পাইয়া

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইঁহাদের অন্যতম হইতেছেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রথমাবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন প্রসার হয় নাই। প্রধানতঃ সরকারী ও খৃষ্টান মিশনারিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার যোগাযোগ ছিল। বে-সরকারী ভারতীয় চেষ্টায় প্রথম মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশান স্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৯ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে সিটি কলেজ, আলবার্ট কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় ১৮৮২ সালে ২,৮২৭ জন পরীক্ষার্থী, ১৯০২ সালে ৮,১৫০ জন, ১৯১৭ সালে ২৮১১৮ জন, ১৯২৭ সালে ৩০,২০২ জন, ১৯৩৭ সালে ৩৪,৩৪৭ জন ও ১৯৪৭ সালে ৪৫০০৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে কতক-গুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে চলিয়া গেলেও তাহার ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পায় নাই।

পূর্ব পাকিস্থান হইতে দলে দলে উদ্বাস্তু ছাত্র চলিয়া আসায় গত নয় বৎসরে ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট ৯৮টি কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য শিক্ষার কলেজ আছে। সেগুলির ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৭৮ হাজার এবং শিক্ষক সংখ্যা ২২৫০। এই হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ক্লাশের ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে ধরা হয় নাই এবং ১৬টি বৃত্তিশিক্ষা কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের হিসাব ধরা হয় নাই।

অর্থাভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্য ব্যাহত হইতেছে। এক্ষণে ভারত সরকার বিশ্ব-বিদ্যালয় সাহায্য কমিশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কাজকর্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং নূতন নূতন উন্নয়নের কার্যে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের—সম্ভবতঃ বিশ্বের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। কাজেই ইহার সমস্যাও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বৃহত্তর।

আগামী জানুয়ারি মাসে (১৯৫১) কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শতবার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হইবে। এই উপলক্ষে শুধু যে সভা সমিতির অনুষ্ঠান হইবে তাহা নহে, এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানেরও সুযোগ পাওয়া যাইবে।*

* প্রেস্ ইন্‌ফরমেশন্ ব্যুরো'র সৌজন্যে।

ভারতে উচ্চশিক্ষার সমস্যা

শ্রীচিন্তামন দ্বারকানাথ দেশমুখ

শিক্ষা যেখানে নাই স্বাধীনতাও সেখানে থাকে না। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে মন্তব্য করেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার জন্য অধিকতর হারে ব্যয় কোন স্বাধীন জাতির গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার কারবারে মূলধনের সামিল। এ যুক্তি অকাট্য।

কিন্তু অনুন্নত দেশ পড়ে এক দুষ্টচক্রের ফেরে—স্বল্প আয়, সুতরাং মূলধন খাটানো সম্ভব হয় না; আবার মূলধন খাটাতে না পারলে কম আয়ই অব্যাহত থাকে। এক্ষেত্রে সামান্য যা কিছু পাওয়া যায় তাকেই এমনভাবে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে সর্বাপেক্ষা বেশী উপার্জন সম্ভব হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত যে সব দেশের সম্পদ প্রচুর, যারা নিজেদের আয় ছড়িয়ে বিলিয়ে খেতে পারে, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তারা অগাধ টাকা ঢালতে পারে। আর একটু এগিয়ে একথা বরং জোর দিয়ে বলা যায় যে মানুষের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির খাতিরে এসব দেশের কর্তব্য এদিকে মূলধন খাটানো। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে মানুষ আদর্শবাদকে টেনে খাটো করে রাখতে বাধ্য হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তব ফল কতটা পাওয়া যাবে তাকে সে হিসাব করে চলতে হয়, আশুকার্যকারিতা বুঝে অর্থ ব্যয় করতে হয়।

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার সমস্যা যদি এভাবে বাস্তব মাপকাঠিতে মেপে বিচার করা যায়, তাহলে দেখতে পাব আমাদের চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী, তৈরিব্যয় অতিরিক্ত, তৈরি মালেরও রকম যেমনটি হওয়া উচিত তার চেয়ে নীরস। শিক্ষিতের বেকার সমস্যা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য পরিকল্পনা সমিতি (Planning Commission) একটি বিশেষ পরীক্ষক দল নিয়োগ করেছিল। তাদের হিসাবে বেকারের সংখ্যা পাঁচলক্ষ পঞ্চাশ হাজার। তাছাড়া তাদের মতে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার অর্থ, উদ্দেশ্য ও সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও এই সমস্যার বিরাটত্ব প্রায় একই আকারের থেকে যাবে। এর থেকে কি বোঝা যায়?—যোগানের আতিশয্য। শতকরা পঞ্চাশটি ছাত্র ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার বেলায় বাদ পড়ে যায়; বাকী পঞ্চাশটি গ্র্যাজুয়েট হবার বেলায়। এতে বোঝা যায় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় কি বিপুল অপচয় ঘটছে। আর শিক্ষা সত্ত্বের তৈরি মালের উৎকর্ষের দিকে যদি তাকাই তাহ'লে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বলব চিলেচালাভাবে না দেখে বরং জিনিষটাকে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই দেখা উচিত। ছাত্রের সংখ্যা বাড়ছে; সঙ্গে সঙ্গে না বাড়ছে লাইব্রেরী না ল্যাবরেটরী, না শিক্ষক, না পড়াশুনার স্থান। শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত তা নিয়ে চলছে কতগুলো ঘোলাটে চিন্তার ধারা। ছাত্রদের পরীক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি তাদের পক্ষে অনিষ্টকর। তরুণ ছাত্রদের চোখের সামনে বিভীষিকার মত বিরাজ করছে সুযোগের অভাব—এ সমস্তের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি যা বের হচ্ছে গুণের দিক দিয়ে তা দিনের দিন অপকৃষ্ট না হয়েই পারে না।

এ অবস্থার ভিতরে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবেই—তা অযৌক্তিক মনে হতে পারে; সংবিধানের মৌলিক অধিকার বিরোধী বলে সে সিদ্ধান্তের সমালোচনা হতে পারে। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে কোন একটা বিশেষ ঘরে জন্ম একটা আকস্মিকতার বেশী কিছু নয়; কিন্তু সেই আকস্মিকতার ফলে ভাগ্যে যে ধনসম্পদ জুটেছে শুধু তারই বলে যে কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় অবাধে প্রবেশ করতে পারবে কি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে একটা বিশেষ সুযোগ হিসাবে গণ্য করতে হবে; শুধুমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেই সে সুযোগ কেউ পাবে না, পাবে যোগ্যতা থাকলে। দরিদ্র ঘরের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যদি উচ্চশিক্ষার ঝোঁক ও যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহ'লে স্কলার-

শিপ দিয়ে হোক্, ফেলোশিপ দিয়ে হোক্ উচ্চশিক্ষা পেতে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। সতর্কভাবে বাছাই করা ছাত্রদেরই যদি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পরীক্ষায় ফেল্ করার ফলে যে বিপুল অপচয় ঘটে তার পরিমাণ যথাসম্ভব কমানো যায়। এর ফলে নানাধরণের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পাবে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে তাদের শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। এর জন্যে প্রয়োজন, যে সব ছাত্র মধ্যশিক্ষা শেষ করেছে তাদের প্রত্যেকের ছাত্রজীবনে যে যে বৃত্তি শিক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখিয়েছে সে সব দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সেই অনুযায়ী তাদের ভবিষ্যতে কর্মজীবন নির্দিষ্ট করা। এর অর্থ দাঁড়াবে, মধ্যশিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে এখনকার মত ধরাবাঁধা রাখলে চলবে না; আরও বহুমুখী করে তুলতে হবে।

এর আরেকটা দিক আছে—এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এখনকার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি যেন সরকারী চাকুরীর যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে না থাকে। পরীক্ষা পাশ যে মতলব নিয়ে, তার কুফল এতে অনেকটা কমে। কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এ নিয়ে অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মাথা ঘামাচ্ছেন। তাঁদেরও ত্বরায় কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, কিন্তু ত্বরান্বিত করতে গিয়ে অপসিদ্ধান্তে যেন না পৌঁছান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তার আবাস ও গ্রন্থাগার—এসবের উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে, তেম্‌নি চেষ্টা হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যানুপাতের উন্নতি বিধানের। তবে অর্থাভাবে এ সব চেষ্টাই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য।

কিন্তু একটি জিনিষ আছে যা শিক্ষাক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্র—সবাই করতে পারেন অর্থাভাব সত্ত্বেও। শুধু ব্যর্থতার অনুভূতি নিয়ে চলে লাভ নেই, নালিশ পুষে রেখে বা দুর্দশার জন্যে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েও ফল নেই। তার চেয়ে বরং নৈতিকক্ষেত্রে আমাদের যে নেতৃত্বের সংকট দেখা দিয়েছে তাকে যদি জয় করতে পারি, শুধু অর্থকারী মনোভাব নিয়ে না চলে আমরা যদি ধর্মপ্রচারকের উদ্দীপনা নিয়ে চলি, যে যে ক্ষেত্রে কাজ করি সেখানে যদি কঠোরতর পরিশ্রম করতে পারি, তাহলেই ভারতবর্ষ আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। ভারতে উচ্চশিক্ষার পরিণতির সমস্যা অতি জটিল। তার সামান্য কয়েকটি দিকেরই মাত্র উল্লেখ করেছি। এই সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে গভীর চিন্তার প্রয়োজন; যেহেতু জাতির রাজনীতি, অর্থনীতি ও কৃষ্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আমাদের তরুণ ছাত্রদের গভীর মননশক্তি, কর্মপ্রয়াসে অধ্যবসায় এবং সুমহান্ নৈতিক-বলের উপর। ভারতের অগ্রগতির পথে তাদেরই ত এক একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

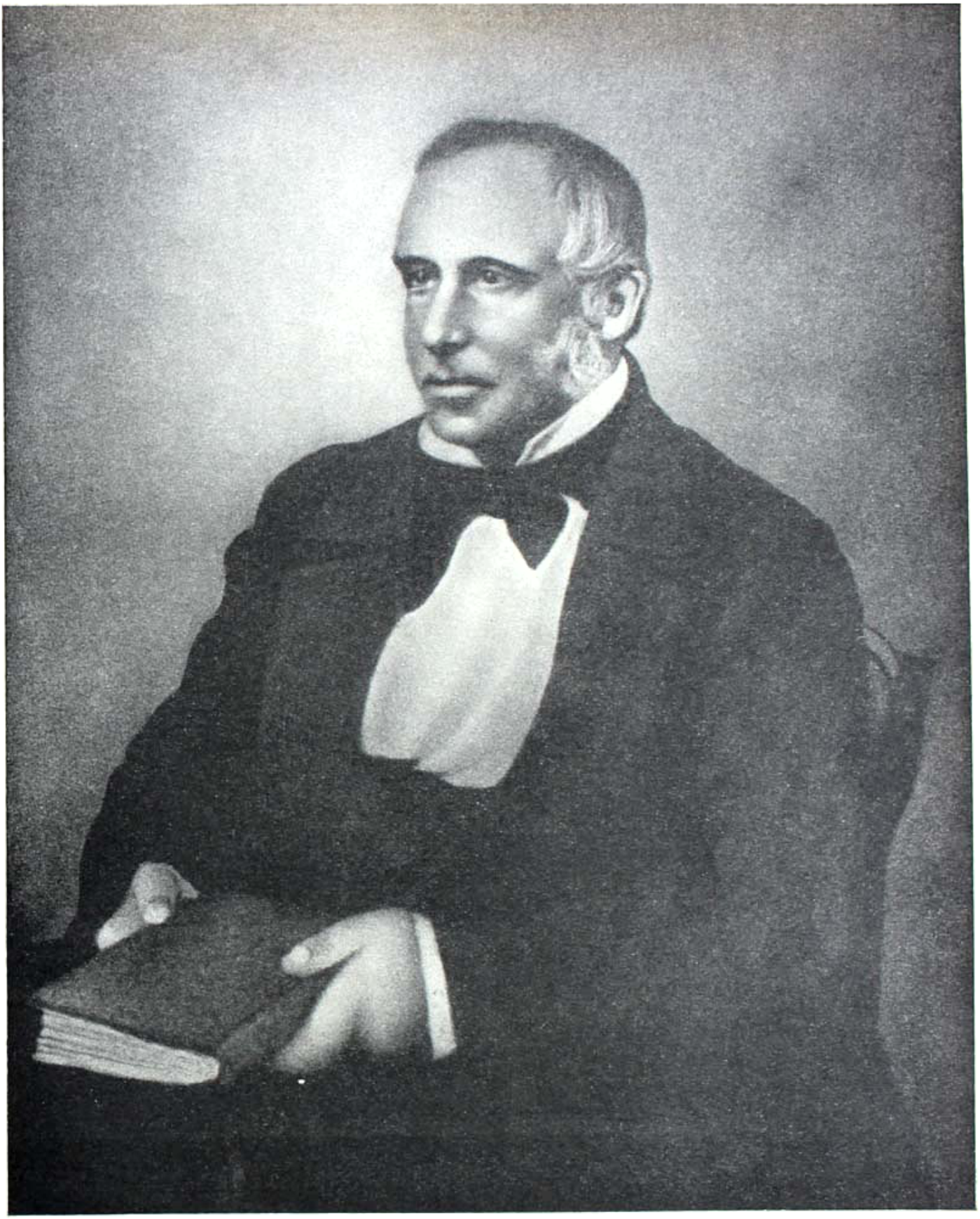

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য—স্যার জেম্‌স উইলিয়াম কোল্‌ভিল
(২৪শে জানুয়ারী, ১৮৫৭—২৪শে জানুয়ারী, ১৮৫৯)

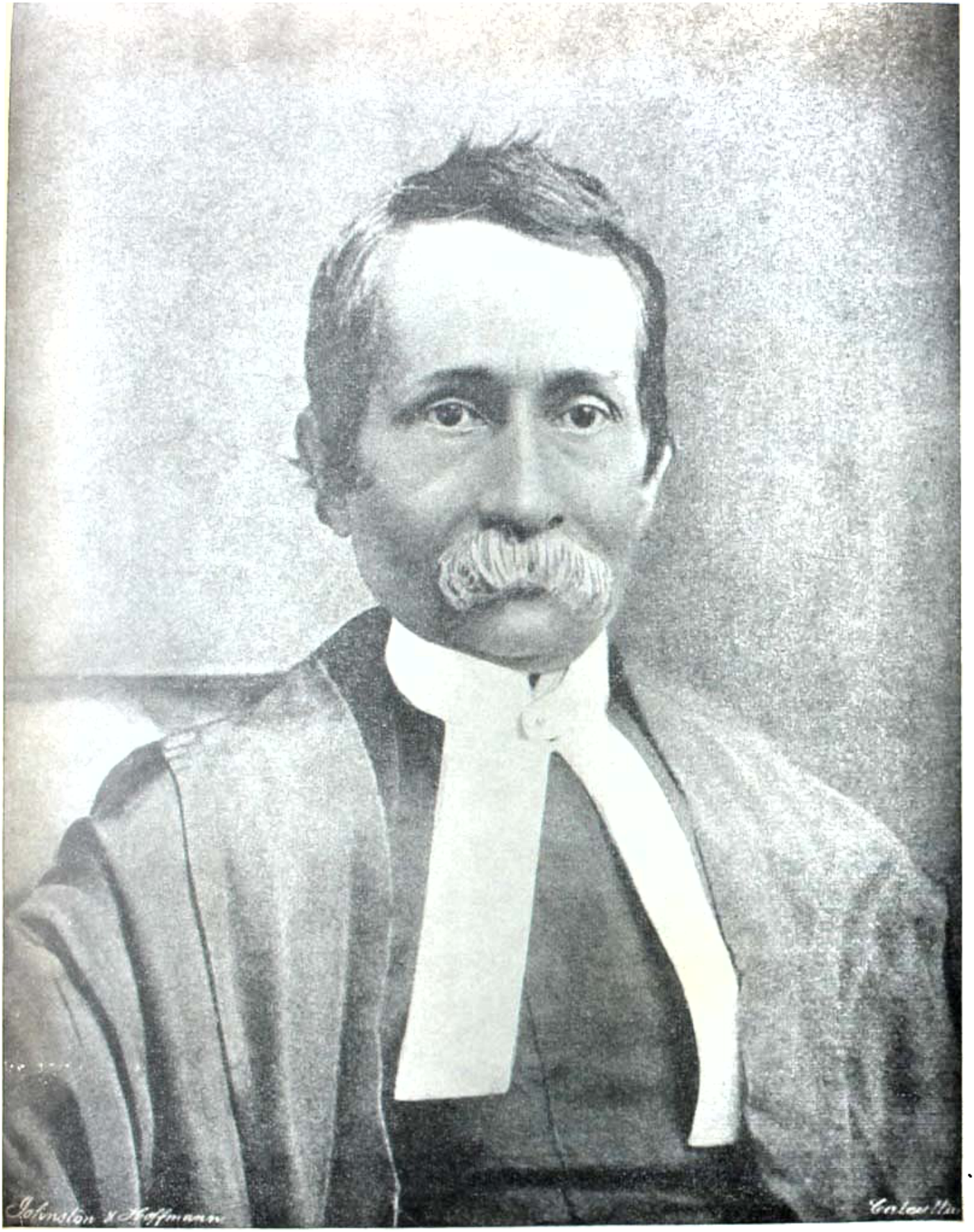

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(১লা জানুয়ারী, ১৮৪৪—৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১২)

ভারতের শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের [illegible]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'মক্ষিরা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুশী হ'লাম। ভারতে উচ্চশিক্ষার প্রথম বেদী রচিত হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নব ভারতের অগ্রগতিতে এর দান অসামান্য।

S. C. Bard

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স শতবর্ষ পূর্ণ হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী এই শিক্ষাকেন্দ্র—"বিদ্যার প্রসারবৃদ্ধি"—উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়—ইংরেজী "ইউনিভার্সিটী" শব্দের প্রতিশব্দ :—এ দেশে ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের অভাবহেতু উহার বৈশিষ্ট্যদ্যোতক কোন শব্দ ছিল না—তাহা গঠিত করিতে হইয়াছিল। ভারতে কোন দিন বিদ্যার অনাদর ছিল না; পরন্তু বিদ্যার গৌরব এতই অধিক বিবেচিত হইত যে, চাণক্য বলিয়াছেন—নৃপতি কখন বিদ্বানের তুল্য হইতে পারে, না; কারণ, রাজা কেবল স্বদেশেই পূজিত, বিদ্বানের পূজা সর্ব্বত্র। ভারতের নানা স্থানে বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। নালন্দা হইতে নবদ্বীপ নানা স্থান—"ভারতীর রাজধানী—ক্ষিতির প্রদীপ" ছিল। কিন্তু সে সকল শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাব্রতীরা রাজশক্তির ও সমাজের সাহায্যে যে পদ্ধতিকে শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহার সহিত য়ুরোপে প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির প্রভেদ সুস্পষ্ট। ভারতের এই পদ্ধতি ভারতের বাহিরেও প্রাচী'র নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এখনও মিশরে "আল আজহার" প্রতিষ্ঠানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

জ্ঞানের আদর ছিল বলিয়াই হিন্দুর কীর্ত্তি আজ সমগ্র সভ্যজগৎকে চমকিত করিয়াছে। সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যখন স্মরণ করিয়াছিলেন—"উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি"—তখন তিনি সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

হিন্দুর স্বাধীনতাহানির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিদ্যানুরাগের আগ্রহ নষ্ট না হইলেও বিদ্যানুশীলনের সুবিধা সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। বিজেতা মুসলমানরা তাঁহাদিগের মাতৃভাষার অধিক সমাদর করিতেন।

তাহার পরে মুসলমান শাসনের পতনদশা—দেশে শান্তির অভাব, ধন ও প্রাণ আর নিরাপদ নহে। বাঙ্গালার অবস্থা—বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায়—দেশে তখন "মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই।" তখনও বাঙ্গালায় পাঠশালা ও টোল ছিল, কিন্তু দেশের সেই অবস্থা বিদ্যাচর্চ্চার বা বিদ্যাবিস্তারের পক্ষে অনুকূল নহে।

তাহার পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনের, প্রকৃত পক্ষে, অবসান ঘটিল—ইংরেজের প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, দেশে অশান্তির স্থানে শান্তি এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর বিদ্যানুশীলনের আগ্রহ বাধামুক্ত হইয়া শক্তিশালী হইতে লাগিল।

বাঙ্গালী ইংরেজীও শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সে বিষয়ে সরকারের সাহায্য পাইল না। তখনও ভারতবর্ষে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসক—কোম্পানীকে ইংলণ্ডের সরকারের ছাড় লইতে হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন ছাড় নূতন করিয়া লইতে হয়, তখন এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারতে আধুনিক জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজন আছে। সেই প্রস্তাবের আলোচনা-প্রসঙ্গে কোম্পানীর এক জন ডিরেক্টার বলেন—ইংরেজ আমেরিকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্থাৎ সে দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া যে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহারা আমেরিকা হারাইয়াছেন—ভারতে যেন সেইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করা না হয়।

এই মনোভাব অনেক ইংরেজ অনেক দিন পোষণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা জেমস্ অধীন আমেরিকার প্রাদেশিক কোন শাসককে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তিনি যেন

সেই প্রদেশে মুদ্রা-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে না দেন। তাহাতে হায়দ্রাবাদ সামন্ত রাজ্যের নৃপতি নিজাম য়ুরোপের বিজ্ঞানের সৃষ্ট তিনটি দ্রব্য দেখিতে চাহিলে তাঁহার দরবারে ইংরেজের প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন সিডেনহাম—একটি এয়ার পাম্প, যুদ্ধজাহাজের ক্ষুদ্র নমুনা ও মুদ্রাযন্ত্র তাঁহাকে দিলে—মুদ্রাযন্ত্রের মত "ভয়াবহ যন্ত্র" প্রদান করায় ইংরেজ শাসকদিগের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০ বৎসর পরে ছাড় যখন আবার মঞ্জুর করা হয়, তখন একটি সর্ত্ত করা হয় যে, ভারতীয়দিগের সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন জন্য এবং ভারতীয়দিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারকল্পে কোম্পানীকে বৎসরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

এদিকে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্থানে স্থানে খ্রিস্টীয়রা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালী বালকদিগকে ইংরেজীতে শিক্ষা দিতেন। অনেকেই কোনরূপে ভাঙ্গা ইংরেজীতে ইংরেজদিগের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিবার সামর্থ্য লাভই যথেষ্ট করিয়া বিবেচনা করিতেন। রথযাত্রার রথ বুঝাইবার জন্য "Church Church—wooden church, three-stories high"—ইত্যাদি তখন বলা হইত। এই সময় ঘড়ী ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার একটি স্কুল স্থাপিত করেন। কোম্পানী যে টাকা ব্যয় করিবার সর্ত্তে ছাড় মঞ্জুর করাইয়াছিলেন, তাহাতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা ও পরে হিন্দুদিগের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ডেভিড হেয়ার যখন একটি বড় ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিতেছিলেন, তখন সুপ্রিম কোর্টের জজ সার হাইড ইষ্ট বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় এই বিষয়ে অবহিত হ'ন। ইষ্ট ও হেয়ার ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে এই প্রস্তাবের আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেন। এ বিষয়ে আন্দোলন ও আলোচনা চলিতে থাকে এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে (বর্ত্তমানে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ঐ স্থানে অবস্থিত) বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই বিদ্যালয়ই হিন্দু কলেজে পরিণত হয় এবং পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী নূতন বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি—"amidst the acclamations of all ranks of the native population of the city" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অট্টালিকার মধ্যস্থলে সংস্কৃত কলেজ ও দুই বাহুতে হিন্দু স্কুল স্থান পায়।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রথম দুইটি শ্রেণী লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজদিগের মধ্যে দুইটি দল হয়—এক দল এ দেশে আধুনিক প্রথায় ও ইংরেজীতে শিক্ষাদানের সামর্থক, অপর দল প্রাচ্যবিষয়ে শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক দল ইংরেজ স্বার্থহানির ভয়ে এ দেশে আধুনিক শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদিগের বিরোধীদলের লর্ড মেকলে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই পার্লামেণ্টে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "ভারত সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। ইহার ইতিহাসের সহিত অন্য কোন রাজ্যের ইতিহাসের ঐক্য নাই—ইহার রাজনীতিক অবস্থাও স্বতন্ত্ররূপ—ইহার উন্নতি বা অবনতি কি নিয়মে হইতে পারে, তাহাও আমরা জানি না। "It may be that the public mind of India may expand under our system till it has outgrown the system; that by good government we may educate our subjects into a capacity for better government; that having become instructed in European knowledge, they may in some future age demand European institutions. Whether such a day will ever come I know not. But never will I attempt to avert or to retard it. Whenever it comes, it will be the proudest day in English history".

কিন্তু আমরা পরে দেখিয়াছি, যখন ইংরেজী শিক্ষার

ফলে ভারতীয়গণ তাঁহাদিগের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা লাভের দাবী করেন, তখন ইংরেজরা—আরণ্য উপন্যাসের বীরত্ব কলসমুক্ত দৈত্যকে দেখিয়া যেরূপ ভীতিবিহ্বল হইয়াছিল সেইরূপ, শঙ্কিত হইয়াছিলেন এবং ভারতীয়-দিগকে বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইয়াছিল।

যখন ইংরেজী শিক্ষার পক্ষীয় ও বিরোধী দুই দলে তর্ক চলিতেছিল, তখন—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে এক পত্র লিখিয়া এ দেশে য়ুরোপীয় শিক্ষক-দিগের দ্বারা ভারতীয়দিগকে অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, অস্থিবিদ্যা প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে য়ুরোপীয়রা উন্নত সেই সকল বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে বলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে স্থির হয়, এ দেশে সরকার ইংরেজী শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন। তখন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতের বড়লাট।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরবৎসর ধর্মপ্রচারকরা প্রচারকদিগকে শিক্ষাদান ও ইংরেজী ভাষায় জ্ঞানবিস্তার জন্য গঙ্গার পরপারে শিবপুরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই বিদ্যালয় গৃহেই এখন এন্‌জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত।

খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ কলিকাতায় কয়টি বেসরকারী কলেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল এসেম্‌ব্লীজ ইনষ্টিটিউশন ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত করেন। সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ—ইহাদিগের পরবর্ত্তী।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদ কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তারা তখন তাহাতে সম্মতি দেন নাই। পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন এক সরকারী ডেস্‌প্যাচে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়, তখন কোম্পানী আর আপত্তি করিতে পারেন নাই। তখন স্থির হয়, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি স্থানে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেগুলি শিক্ষা দিবে না—কেবল পরীক্ষা করিবে অর্থাৎ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত কলেজগুলিতে পাঠ শেষ করিয়া যে সকল ছাত্র বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহারা উপাধি পাইবে। দুই বৎসর পরে ভারত সরকার প্রস্তাবটির সমর্থন করিলে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। ঐ বৎসর ২৪শে জানুয়ারী বড়লাট ঐ আইন অনুমোদিত করিলে সর্ব্বাগ্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ও উত্তর ভারতে যে সকল উল্লেখযোগ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেগুলি—এমন কি আরও কয়টি কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হয়। সে সকলের মধ্যে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত আগ্রা কলেজ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্যপরিচালক সমিতি (সিনেট) প্রথমে মাত্র ৩৮ জন লোক লইয়া গঠিত হয়। এই ৩৮ জনের মধ্যে মাত্র ৬ জন ভারতীয়। বড়লাটই বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার ছিলেন। ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত বড়লাটই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার থাকিতেন। তাহার পরে প্রদেশের গভর্ণর সে পদ লাভ করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশিকা (এণ্ট্রান্স) পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথম উপাধি পরীক্ষায় ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ২ জন সাফল্য লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাদিগের অন্যতম। এই ২ জনকেও কিছু "গ্রেস মার্ক" দিতে হইয়াছিল।

পরীক্ষার কঠোরতা সম্বন্ধে তখন যে কিছু আলোচনা হইয়াছিল, তাহা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে (৮ই মার্চ্চে) ভাইস-চান্সেলার উইলিয়াম মিউর বক্তৃতায় বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলেন, পরীক্ষার ফলে, বোধ হয়, পরীক্ষার্থী ও অধ্যাপক উভয় সম্প্রদায়ে কিছু হতাশার উদ্ভব হইয়াছে। পরীক্ষামাত্রেই তাহা হয়। কিন্তু সে হতাশা হইতে যদি অব্যাহতি লাভ করিতে হয়, তবে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মান খর্ব্ব করিতে হয়, নহেত পরীক্ষার যে আদর্শ গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতে সে পরীক্ষায় সাফল্যের কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মান গ্রহণ করিয়া পরীক্ষার্থীরা পরিশ্রম করিয়া সাফল্য লাভ করেন, ইহাই অভিপ্রেত।

সুতরাং বুঝায় "That if our Degrees are difficult to obtain they are of value when obtained ; that they indicate a high degree of education in the best and truest sense of the word, and laudabale perseverance to overcome difficulties in the candidates, who have obtained them ; and that they secure to the posessor, a position which ought to be, and I trust will be, one of honour and respect not only in this country, but in any country, in the civilized world, where academical distinctions are valued, which he may choose to visit."

তখনও বিজ্ঞান অপেক্ষা সাহিত্যে অধিক মনোযোগ প্রদান করা হইত। এমন কি কিছুদিন পরে যখন ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতীয় বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ব্যতীত অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা তথায় অতিরিক্ত ছাত্ররূপে পাঠ্য বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিত।

তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায়—ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যতীত অঙ্কশাস্ত্র (পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি), ভূগোল ভারতের ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা পাঠ্য ছিল। প্রবেশিকা (এণ্ট্রান্স) পরীক্ষার পরে ২ বৎসরে পরবর্ত্তী পরীক্ষা—এফ, এ অর্থাৎ ফার্ষ্ট একজামিনেশন ইন আর্টস্। তাহাতে ইংরেজী, সংস্কৃত (বা অন্য কোন ভাষা), অঙ্ক (পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি ও কণিকসেকশন), পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, রোমের ও গ্রীসের ইতিহাস পাঠ্য ছিল। ধরিয়া লওয়া হইত, ঐ মধ্যবর্ত্তী পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইত, তাহারাই পরে কোন্ দিকে অধ্যয়ন করিবে তাহা স্থির করিয়া লইবার যোগ্যতা অর্জন করিবে। বিজ্ঞান তখন সাহিত্যের মত গুরুত্ব লাভ করে নাই। মধ্যবর্ত্তী পরীক্ষার পরে "বি, এ"—বা ব্যাচিলার ইন আর্টস্ উপাধি পরীক্ষা। তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—"এ" অর্থাৎ আর্টস্ ও "বি"—বিজ্ঞান। "এ" বিভাগে ইংরেজী ও দর্শন অবশ্যপাঠ্য ও "বি" বিভাগে অঙ্ক ও ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য ছিল। "এ" বিভাগে সংস্কৃতাদি কোন ভাষা বা ইতিহাস, অথবা অর্থনীতি এবং "বি" বিভাগে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় ইচ্ছামত অধ্যয়ন করা চলিত। তাহার পরে—এম, এ পরীক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে। পরে প্রাথমিক পরীক্ষা যেমন ম্যাট্রিকুলেশন হয়—তেমনই মধ্যবর্ত্তী পরীক্ষা "আই, এ" ও "আই, এস সি এবং প্রথম উপাধি পরীক্ষা "বি, এ" ও "বি, এস্ সি" হয়।

প্রথম যুগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ অধিক প্রসার লাভ করে নাই। প্রধানতঃ সরকারী ও খৃষ্টানদিগের কলেজগুলি লইয়াই বিশ্ববিদ্যালয় চলিত। ক্রমে বেসরকারী কলেজের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। সে বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউশন (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) অগ্রণী। কেশবচন্দ্র সেনের অ্যালবার্ট কলেজ, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিটী কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রিপণ কলেজ (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), গিরিশচন্দ্র বসুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবাসী কলেজ প্রভৃতি পরবর্ত্তী।

স্ত্রীশিক্ষার জন্য বেথুনের চেষ্টায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই পরে বেথুন কলেজে পরিণতি লাভ করে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আর অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যাই অধিক থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিরূপ বর্দ্ধিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

বৎসর (খৃষ্টাব্দ)	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
১৮৮২	৩,৮২৭
১৯০২	৮,১৫০
১৯১৭	২৮,৬১৮
১৯২৭	৩০,২০২
১৯৩৭	৩৫,৩৪৭
১৯৪৭	৪৪,০০৮

প্রথমে যেমন বড়লাট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার থাকিতেন, তেমনই সরকার কোন য়ুরোপীয় রাজকর্মচারীকে ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত করিতেন। ক্রমে যখন বেসরকারী ও ভারতীয় ভাইস-চান্সেলার নিয়োগের বিষয় আলোচিত হইতে থাকে, তখন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের জজ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম ভারতীয় ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত করা হয়। তখন ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারকে বা ফাদার লাফোঁকে নিয়োগের বিষয় আলোচিত হইতেছিল।

গুরুদাসবাবুর পরে আবার কয়জন ইংরেজ ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত হইবার পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন।

এই সময়ে বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশে নূতন অবস্থার উদ্ভব হয়। সেই আন্দোলনের একাংশে সরকারী বা সরকারের সাহায্যে পরিচালিত শিক্ষায়তন বর্জ্জন। এ বিষয় অরবিন্দের যুক্তি ও উক্তি এইরূপ :—

"We are dissatisfied with the conditions under which education is imparted in this country, its calculated poverty and insufficiency, its anti-national character, its subordination to the Government and the use made of that subordination for the discouragement of patriotism and the inculation of loyalty. Accordingly we refuse to send our boys to Government Schools or to schools aided and controlled by the Government.

এই বর্জ্জন যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে সরকার কর্তৃক দেশের শিক্ষানিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হইবে এবং তরুণমন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিদেশীর হস্তচ্যুত হইবে।

ইংরেজ এ দেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল তাহাতে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অনেক ত্রুটি ছিল। ইচ্ছাকৃত ত্রুটি সম্বন্ধে উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার বলিয়াছিলেন—ইংরেজ কিসে স্বল্পব্যয়ে শাসন ও শোষণ করিতে পারিবে সেই উদ্দেশ্যে ঐ শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়া বিরাট কেরাণী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে এবং শিক্ষা হইতে মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক তিনটি বিষয় সযত্নে বর্জ্জন করিয়াছিলেন—শৃঙ্খলা, সন্তোষ ও গর্ব্ব।

সেই পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইয়াও যে ভারতীয়দিগের মনে জাতীয়তাবের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভারত মানসের শক্তির ও বৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক।

ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাভাব ও তাহার দাবী স্বাধীনতালাভ-প্রয়াস যত বর্দ্ধিত হইতেছিল, ইংরেজ শাসকরা ততই শিক্ষাকে সরকারের অধীন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ডিসরেলী এইরূপ চেষ্টা বর্ব্বরযুগের উপযোগী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন—

"Wherever was found what was called a paternal government was found a State Education. It has been discovered that the best way to secure implicit obedience was to commence tyranny in the nursery."

যে বিক্ষোভ স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত, তাহার জন্য অ্যালেনটাইন চিরল অনায়াসে ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে বিশেষভাবে দায়ী করিয়াছিলেন। শিক্ষকরা অল্প বেতনে কাজ করেন—সুতরাং অসন্তুষ্ট। ছাত্ররা প্রায়ই অবাঞ্ছিত স্থানে বাস করে—

"live in promiscuos messes, or, as is too often the case, in lodgings of a very undesirable character, sometime even in brothels, and almost always under conditions intellectually, morally and physically deleterious."

বড়লাট কার্জ্জন এই নির্দ্দেশেই নির্ভর করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির সমর্থন করেন। তাঁহার দ্বারা গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সিদ্ধান্ত তাঁহার মতের অনুকূল হয়। প্রথমে কমিশনে কোন হিন্দু সদস্য মনোনয়ন করা হয় নাই। তাহাতে আপত্তি ধ্বনিত হইলে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সদস্য করা হয়। তিনি অধিকাংশের সহিত একমত হইতে

পারেন নাই। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২১ মার্চ সরকারের ভোটের আধিক্যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। দেশে তাহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয়।

বঙ্গবিভাগের বিক্ষোভ সেই আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত হয়। বিভক্ত বঙ্গে সরকার যে ভাবে শিক্ষা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে জনমন তিক্ত হইয়া উঠে। পশ্চিমবঙ্গে কার্লাইল সার্কুলার ও পূর্ব্ববঙ্গে লায়ন সার্কুলার ছাত্রদিগকে সরকারের আজ্ঞাবহ করিবার চেষ্টা করে। সিরাজগঞ্জ স্কুলের ছাত্রদিগের রাজনীতিক কার্য্যে রুষ্ট হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যামফাইল্ড ফুলার সেই স্কুলের অনুমোদন বাতিল করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটকে পত্র লিখিলে—বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ভারত সরকারকে জানান, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত না হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। বড়লাট তাঁহাকে সমর্থন করিতে অক্ষম হয়েন এবং তিনি পদত্যাগ করেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এই সকল ঘটনার ফলে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্জ্জনের আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে, তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস-চান্সেলর নিযুক্ত হয়েন। তখন জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্জ্জনের বিরোধী হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয়।

ক্ষমতা পাইয়া আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন।

কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার জন্য তাঁহাকে পরে সরকারের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। সেই বিরাগ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে চান্সেলার লর্ড লিটনের সহিত তাঁহার সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাবিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইনের খসড়া পড়িয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। তাহাতে বিরোধের সূত্রপাত হয়। পরবৎসর চান্সেলার লর্ড লিটন তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানান, তিনি সরকারের কতকগুলি সর্ত্তে সম্মত হইলে তাঁহাকে ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত করা হইবে। কোনরূপ সর্ত্তে সম্মত হইয়া ঐ পদ গ্রহণ আশুতোষ অপমানজনক বিবেচনা করিয়া চান্সেলারকে যে পত্র লিখেন, তাহা স্মরণীয়। তাহার উপসংহার এইরূপ :—

"You have one before you who can speak and act fearlessly according to his convictions, and you are not able to stand the sight of him. It may not be impossible for you to secure the service of a subservient Vice-Chancellor, prepared always to carry out the mandates of your Government and to act as a spy on the Senate. He may enjoy the confidence of your Government, but he will certainly not enjoy the confidence of the Senate and the public of Bengal. We shall watch with interest the performance of a Vice-Chancellor of this type, creating a new tradition for the office.

"I send you without hesitation the only answer which an honourable man can send—an answer which you and your advisers expect and desire, I decline the insulting offer you have made to me.

ইহার পূর্ব্বেও একবার—আবুল রসুল, আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী লোককে অধ্যাপক নিযুক্ত করায় সরকারের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষ হইয়াছিল।

যখন আশুতোষ প্রথম ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৯০৬ খৃষ্টাব্দ) তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ হইয়াছে। তাহা অনিবার্য্য ছিল।

তখন সরকার একটি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ছোটলাট গঙ্গার পরপারে বিশপস কলেজের বাড়ী কিনিয়া তথায় একটি কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। সেই সংবাদে তৎকালে 'ষ্টেটসম্যান' মন্তব্য করেন—

"The people show great mechanical skill, and delicate and skilful manipulation; and thirty years hence those of us who may be alive then will probably see Calcutta the mother of many of the manufactures for which we now depend on Europe."

ঐ বৎসর ২৯শে অক্টোবর 'কলিকাতা গেজেটে' প্রচারিত হয়—ঐ প্রস্তাবানুসারে কাজ হইতেছে।

এই প্রতিষ্ঠান ক্রমে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত হয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে (১৮৮০ খৃষ্টাব্দ)।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ভারতে (হয়ত সমগ্র এশিয়ায়) সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ববৃহৎ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-শিক্ষাকেন্দ্র। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রথমে নারীদিগের উপাধি লাভের অধিকার ছিল না। সেইজন্য প্রথম নারী ডক্টর কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও "জি, এম, সি" (গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল কলেজ) বিবেচিতা হইয়াছিলেন। ইহাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারী কলেজ।

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার প্রসঙ্গে বলা যায়,—১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৪জন ছাত্রী এনট্রান্স পরীক্ষা ও ২জন ফার্ষ্ট একজামিনেশন ইন আর্টস পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে একজন ব্যতীত অপর সকলেই বেথুন কলেজের ছাত্রী।

এইস্থানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যা অল্প না হইলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানের আগ্রহ ও কার্য্য যৎসামান্য। ইহার কারণ সন্ধান করিলে দেখা যায়—জন ষ্ট্রাচী তাঁহার ভারত শাসন সম্বন্ধীয় পুস্তকে বলিয়াছেন—পরধর্ম্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা মুসলমানদিগের প্রতীচ্য শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছার অন্যতম কারণ—"Feelings of religious intolerance sometimes tend to make the Muhamadans refuse to admit the necessity of Western knowledge" আর শিক্ষা কমিশন বলিয়াছেন—ধর্ম্ম শিক্ষা এবং আরবী ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ মুসলমানের প্রধান অভিপ্রেত। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক জন মুসলমান সদস্য অভিযোগ করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিতে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীদিগের সংখ্যানুপাতে অল্প, তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুল ও কলেজসমূহের ছাত্রদিগের শতকরা ৮০ জন হিন্দু, ১২ জন মুসলমান, অবশিষ্ট অন্যান্যধর্ম্মাবলম্বী।

(২) পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয় মোট ২৬ লক্ষ টাকা দান পাইয়াছেন। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু প্রভৃতির আন্তরিক পরিচয় পাওয়া যায়। এই টাকার মধ্যে ২৫ হাজার টাকা এক জন ভারতীয় খৃষ্টানের দান। (ইনি ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়) পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানের দান মাত্র ৬ শত টাকা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ক্ষমতা লাভ করিয়া আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাহার উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত হয়েন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল পরীক্ষক প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষা দানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার আগ্রহ দেশের শিক্ষিত সমাজে লক্ষিত হইতেছিল। লোকের মনোযোগ আর একটি বিষয়ে নিবদ্ধ হইতেছিল—প্রাথমিক শিক্ষা। এ দেশে পূর্ব্বে প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ছিল না, কিন্তু যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহাকে জাতীয় শিক্ষা বলিলে অসঙ্গত হয় না। কারণ, জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য—প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাহার কাজের উপযুক্ত করা। সে শিক্ষায় তাহাই হইত। তদ্ভিন্ন শিক্ষা ব্যয়বহুল ছিল না। ইংরেজের শাসনে পুরাতন পদ্ধতির বিনাশ হয় বটে, কিন্তু ইংরেজ এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের দেশে অবলম্বিত নীতি গ্রহণ করেন নাই। কাজেই অজ্ঞতার অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছিল—সঙ্গে সঙ্গে দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের সহিত বিরাট

অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগ লুপ্ত হইতেছিল। সমাজ যখন এইরূপ পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহানুভূতি হারায় তখন তাহা দুর্বল হয় এবং রাজনীতিক হিসাবে তাহার পরাধীনতা স্থায়ী হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জাপান রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং অপ্রত্যাশিত জয় লাভ করে। আলফ্রেড লায়াল বলিয়াছেন, প্রাচী'র জাপানের এই জয় (জলে ও স্থলে) ভারতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধভাব প্রবল হইবার অন্যতম কারণ। তখন যে সমগ্র প্রাচীতে নূতন ভাবের প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল, তাহা ইংরেজ রাজনীতিকরাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভারতের গবর্ণর-জেনারল মিণ্টো সে সম্বন্ধে বলেন—

"The Government of India would be blind indeed to shut its eyes to the awakening wave which is sweeping over the Eastern world, overwhelming old traditions and bearing on its crest a flood of new ideas."

জাপানের অপ্রত্যাশিত জয়ের কারণ সন্ধান করিতে যাইয়া অনেকেরই দৃষ্টি জাপানে শিক্ষাবিস্তারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জাপানের জননায়কগণ দেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন—ফলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মিকাডোর নির্দ্দেশ প্রচারিত হয়—জাপান হইতে অশিক্ষা দূর করিতে হইবে—কারণ, জ্ঞানের বিস্তার ব্যতীত দেশের লোকের উন্নতিবিধান কখন হইতে পারে না। সুতরাং স্থির হইল—

"It is intended that henceforth education shall be so diffused that there may not be a village with an ignorant family, nor a family with an ignorant member."

কোন গ্রামে একটি শিক্ষিত পরিবার ও কোন পরিবারে একটিও অশিক্ষিত লোক থাকিবে না।

বাঙ্গালায় স্বামী বিবেকানন্দ কণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"যতদিন দেশে জনগণ অশিক্ষিত বা অভুক্ত থাকিবে, ততদিন যাহারা তাহাদের অর্থে শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদিগের বিষয় বিবেচনাও করে না তাহাদিগকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করিব।" এই সন্ন্যাসী দেশবাসীকে পুরাতনের জন্য গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া নূতন শিক্ষা লাভ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারের উপেক্ষা আন্দোলনের বিষয় হইয়াছিল। শেষে বহু বিবেচনার পরে বোম্বাই প্রদেশের গোপালকৃষ্ণ গোখলে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন (১৮ই মার্চ্চ, ১৯১০ খৃষ্টাব্দ)—

"That this Council recommends that a beginning should be made is the direction of making elementary education free and compulsory throughout the country, and that a mixed Commission of officials and non-officials be appointed at an early date to frame definite proposals."

গোখলে মহাশয় রাজনীতিক মৃদু দলের ছিলেন এবং তাঁহার প্রস্তাবটি অনাবশ্যক মৃদুতারই পরিচালক। সুদীর্ঘ ও বহুতথ্যপূর্ণ বক্তৃতায় তিনি তাঁহার প্রস্তাবের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করেন এবং দেখাইয়া দেন, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টারস যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা কমিশন মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—সরকার ভারতের অধিবাসীদিগকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে স্বীকার করিয়াছিলেন।

গোখলে মহাশয়ের প্রস্তাব ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি ভারতীয় সদস্যদিগের দ্বারা সমর্থিত হয়। দেখান হয়, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপান ছাত্রদিগের বিদ্যালয় গমন বাধ্যতামূলক করিবার প্রয়াস হয় এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা যথাসম্ভব অবৈতনিক করা হয়।

কিন্তু সরকার পক্ষে হার্ভি এডামসন ঐ মৃদু প্রস্তাবও গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন—কেবল প্রতিশ্রুতি দেন—ভারত সরকার গোখলে মহাশয়ের প্রস্তাব "যত্ন-সহকারে" বিবেচনা করিবেন।

গোখলে মহাশয় বিরোধীদিগের যুক্তি খণ্ডন করিয়া

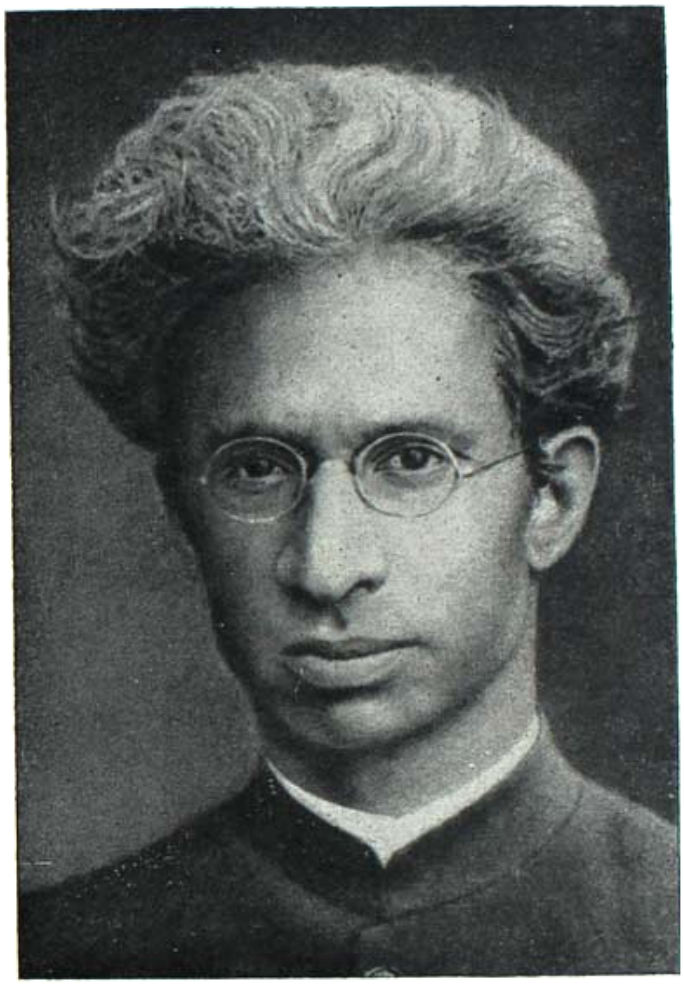

ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

বক্তৃতা করিলেও—অবস্থা বুঝিয়া—প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়েন।

ভারত সরকারের মনোভাবের পরিচায়ক এই কার্য অনেককেই ব্যথিত করিয়াছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম। তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সঙ্ঘে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তিনি সরকারের কার্যের বিরোধিতা—প্রকারান্তরে—করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি "যেন তেন প্রকারেন" কার্যসিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে স্থির করিলেন—প্রয়োজন হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মান খর্ব করিয়াও দেশের বালকবালিকাদিগকে শিক্ষালাভে আকৃষ্ট করিবেন—এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবেন যে, দস্তরীর মত পদের জন্যও প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী পাওয়া যাইবে। যাঁহারা মান খর্ব করার বিরোধী, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—শিক্ষা সমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক; উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করা ত পরের কথা, তিনি সে জন্য অভূতপূর্ব সুব্যবস্থা করিবেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ("পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট") সব ব্যবস্থা থাকিবে। তিনি গবেষণাকার্যে সাহায্য করিবার জন্য তিব্বত হইতেও অধ্যাপক আনিয়াছিলেন—তিব্বতী অধ্যাপকের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য বিভাষী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার দৈহিক প্রয়োজনের জন্য দার্জিলিংএ তাঁহার ও ছাত্রদিগের বাসের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় কখন শিক্ষা বিস্তারের জন্য এমন আয়াস স্বীকার করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের মনোভাব কিরূপ বিরূপ হইয়াছিল, তাহা তাইস-চান্সেলার আশুতোষকে লিখিত চান্সেলার লর্ড লিটনের পত্রেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু আশুতোষের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ বিস্তার সাধিত হয়। বালিগঞ্জে তারকনাথ পালিতের প্রদত্ত গৃহে এবং আপার সার্কুলার রোডের নূতন নির্মিত গৃহে বিজ্ঞান কলেজের দুইটি অংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেনেট হাউসের পার্শ্বে মাধববাবুর বাজার ও পশ্চাতে অপ্রীতিকর বসতী ছিল। সে সকলের স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহ নির্মিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিপুল সংগ্রহে সমৃদ্ধ হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি পুরাবস্তুশালা প্রতিষ্ঠিত করেন।

সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় কলেজের সংখ্যা বর্ধিত হয় এবং সে সকলের মধ্যে কয়েকটি নারীদিগের জন্য।

সরকার আবার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করিলে সেই কমিশন যে সকল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে বলেন, সে সকল ব্যয়সাধ্য। কিন্তু সরকার সে সকলের জন্য আবশ্যক অর্থ না দিয়া ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার জন্য বহু অর্থ প্রদান করেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মুসলমানদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা সরকারের অভিপ্রেত ছিল।

আশুতোষ লর্ড লিটনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার পরে—লর্ড লিটন ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত করেন। ভূপেন্দ্রনাথ তখন ভগ্নস্বাস্থ্য—ভারত সচিবের পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে আসিয়াছেন এবং তদুপরি পুত্রশোকে কাতর। তিনি এই পদ লইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু লর্ড লিটনের অশ্রুপাত ও সনির্বন্ধ অনুরোধে তাহা গ্রহণ করিয়া বিরোধের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার লোকান্তর ঘটে।

তাঁহার পরে সরকার এক জন ইংরেজকে ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরে যদুনাথ সরকারকে সেই পদ প্রদান করেন।

দেশ বিভাগের ফলে (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ) পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়—তাহার পূর্বে সরকার পাটনায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্ষেত্র আরও সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন।

প্রাথমিক পরীক্ষাকে—স্কুল ফাইন্যাল নাম দিয়া—তাহার কর্তৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্ত হইতে লইয়া একটি বোর্ডে স্থাপিত হইয়াছে। সে বোর্ড সর্বতোভাবে সরকারের

অধীন। স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতে খণ্ডিত বাঙ্গালায় নানারূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার ও ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা স্বদেশী সরকারও যে করেন নাই, এমন নহে। ইতোমধ্যে আবার—

(১) রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং

(২) স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের যে বিজ্ঞান বিভাগ যাদবপুরে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছিল, তাহাও স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে।

কিন্তু পাকিস্তান হইতে দলে দলে হিন্দু ধন প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য পশ্চিম বঙ্গে আসিয়াছেন। সে সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর উক্তি (৩রা এপ্রিল ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) :—

পাকিস্তানীরা "have followed a persistent policy of squeezing the minorities from Pakistan, and in carrying out that policy all kinds of means have been adopted : ejecting Hindus from their homes by requisitioning their houses, ill-treatment, application of Islamic concepts of life to non-believers in Islam, murders and arson, looting and destruction of properties, forcible conversions and abduction of women".

হিন্দুদিগের পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া আসার ফলে গত ৯ বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে বহু কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিতে বা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতে হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট ৯৪টি কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য শিক্ষার কলেজ রহিয়াছে। সে সকলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৭৮ হাজার—শিক্ষকসংখ্যা প্রায় ২ হাজার ৫০। এই হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকদিগকে যেমন গণনা করা হয় নাই—১৬টি বৃত্তি-শিক্ষা কলেজের ছাত্রদিগকেও শিক্ষাদিগকে ও তেমনই গণনা করা হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বিরোধিতা করিতেছেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে যেমন, সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীকে চান্সেলার গভর্ণরের শিক্ষা সেক্রেটারী নিয়োগেও তেমনই তাহার প্রমাণ।

নূতন আইনের অধিকারে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভাইস-চান্সেলার বেতনভুক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে ইহার বর্তমান ভাইস-চান্সেলার বলিয়াছেন :—

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশের—সম্ভবতঃ বিশ্বের—বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। কাজেই ইহার সমস্যাও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(২) অর্থাভাবে বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্য ব্যাহত হইতেছে।

শতবৎসরে বিশ্বের এই বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় বহুবিঘ্ন-কঙ্কর-কণ্টকিত পথ অদম্য উৎসাহে অতিক্রম করিয়া বিদ্যার বিস্তার সাধনের কর্তব্য পালন করিয়াছে—গন্তব্য স্থানাভিমুখগামী হইয়াছে। সরকারের বিরোধিতার বাত্যা, প্রতিকূল আন্দোলনের বন্যা এ সকলে ইহার গতি সময় সময় মন্থর হইলেও গতি কখন স্তম্ভিত হয় নাই। দেশের লোকের ত্যাগে ও সাহায্যে ইহা উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট ও সবল হইয়া নূতন নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহার অতীত গৌরবময়—ভবিষ্যৎ আরও গৌরবোজ্জ্বল হউক।

হিত-মিত-গ্রহণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে কিছু লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যদিও আমার স্বাস্থ্য অনুকূল নহে তথাপি এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর হইল না। আজিকার এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে একটি মাত্র কথাই আমার মনে হইতেছে। সেই কথাটি হইতেছে **হিত-মিত-গ্রহণ**। ইহা সমগ্র বিশ্বের দেশ কাল পাত্র নির্বিশেষে হিতকর তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি মনে করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবে ইহার অপেক্ষা আর কোন কথাই উৎকৃষ্ট নাই। যে কোন ব্যক্তি একটু অনুধাবন করিলেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শিশু জন্মগ্রহণ করিলেই আমরা তাহাকে কী দান করিতে পারি? যাহা তাহার হিতকর ও পরিমিত। তাহাকে আমরা দুধ দিয়া থাকি এইজন্য যে তাহা তাহার হিতকর এবং সেই দুধ পরিমিত হওয়া আবশ্যক। অন্যথা তাহা তাহার অহিতের জন্য হয়। চোখ দিয়া আমরা রূপ অর্থাৎ সাদা-কালো প্রভৃতি বর্ণ বা ছোট বড় ইত্যাদি আকার দেখিয়া থাকি। তজ্জন্য আলোর সাহায্য লইতে হয়; কিন্তু সেই আলো যদি হাজার বাতির হয় তবে আমাদিগকে চোখ বন্ধ করিতে হয়। রূপ দেখা হয় না। তেমনই বীণার শব্দে আমাদের আনন্দ হয়। কিন্তু যদি বজ্রধ্বনি হয় আমরা কান বন্ধ করি। আমাদের শরীরে তাপ যদি পরিমিত থাকে আমরা সুস্থ থাকি; কিন্তু তাহা যদি অত্যধিক হয় আমরা অসুস্থ হইয়া পড়ি। এইভাবেই যদি আমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখি তাহা হইলে ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে হিত-মিতকে-গ্রহণ করাই বিশ্বের একমাত্র কল্যাণ। এই কথাকেই নানাদেশে নানারূপে বলা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন ইহাকে 'কামবিজয়', কেহ বলিয়াছেন 'মারবিজয়'। উপনিষদের একটা কথা বলি:

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতা।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

মানুষ যখন হৃদয়ের কামনাকে ত্যাগ করে তখন সে অমৃতকে লাভ করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

অধ্যাপক কে, কে মুখার্জি
শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিভাগের প্রধান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

টিচার্স ট্রেনিং সার্টিফিকেট কোর্স

মাত্র কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্বেও বাংলা দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণকে শিক্ষণ-শিক্ষা দান করার বন্দোবস্ত নিতান্ত অপ্রচুর ছিল। তখন সারা বাংলাদেশে সরকারী পরিচালনাধীনে মাত্র দুইটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ছিল—একটি কলিকাতায় (ডেভিড্ হেয়ার্ ট্রেনিং কলেজ), এবং অপরটি ঢাকায় (ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ)। কাজেই বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ট্রেনিং লইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেন। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে, ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি আবশ্যকীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিচার বিবেচনা করিয়া ১৯৩৫ সালের মে মাসে সিণ্ডিকেটের নিকট তাঁহাদের বিবরণ পেশ করেন। কমিটি প্রস্তাব সমূহের মধ্যে এক বৎসরব্যাপী বি-টি কোর্স খোলার পরিবর্তে কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং কোর্স এবং অবকাশকালীন শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থারই সুপারিশ করা হইয়াছিল। সিণ্ডিকেট সভা এই কমিটির প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে প্রথম দফায় পাঁচ বৎসরের জন্য অনুমোদন করিবার জন্য সেনেটের নিকট সুপারিশ করেন, এবং যাহাতে ইহাকে অচিরে কার্যে পরিণত করা যায়, সেজন্য সিণ্ডিকেটকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দিবার জন্য সেনেটের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। ১৯৩৫ সালের ১লা জুন তারিখের সভায় সেনেট উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া সিণ্ডিকেটের সুপারিশ গ্রহণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ই প্রকৃতপক্ষে এই বিভাগের সৃষ্টিকর্তা। বঙ্গ জননীর এই সুসন্তানের অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশের তথা সমগ্র ভারতের শিক্ষাজগতে যে কি অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির নিকট সুপরিজ্ঞাত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এক সংকটজনক মুহূর্তে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই একধাপ অগ্রপদক্ষেপ শ্যামাপ্রসাদের পিতা স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের সহিতই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছিল। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের যাবতীয় প্রয়োজন সম্বন্ধে এই বরেণ্য শিক্ষাব্রতী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সদাজাগ্রত ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল, এবং প্রয়োজন হইলে এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য দুঃসাহসিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ঝুঁকি লইতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ স্থাপনের ফলে দীর্ঘদিনের অনুভূত দুইটি অভাব পূরণ হইল। প্রথমত, এই প্রদেশে শিক্ষণ-শিক্ষা ব্যবস্থার যে অপ্রতুলতা ছিল তাহা কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইল। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও একটি নিজস্ব শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ সংযুক্ত হইল।

এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিভাগটির পরিচালনার ভার অর্পিত হইল সুযোগ্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয়ের উপর। বর্তমানে ইনি দিল্লির কেন্দ্রীয় শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় নিয়োজিত মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সম্পাদক রূপে কিছুদিন পূর্বে তিনি এক মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। প্রথম অবস্থায় শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় এবং বর্তমান লেখক, এই দুইজন মাত্র এই বিভাগের সকল সময়ীয় (whole-time) শিক্ষক ছিলেন। অবশ্য, তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষকও আংশিক সময়ের জন্য (part-time) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে—ডাঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বর্তমান প্রধান), ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী (পরবর্তী কালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, ডা, সুরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের তদানীন্তন অধ্যাপক), ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সেন (বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের বর্তমান প্রধান), অধ্যাপক এইচ্, জেড্, এ কবীর (পরবর্তী কালে ভারতসরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সহিত সংযুক্ত শিক্ষাবিভাগীয় সম্পাদক এবং পরামর্শদাতা) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ও বাংলা বিভাগের তদানীন্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রেভারেণ্ড সি, এস্, মিল্‌ফোর্ড, অধ্যক্ষ জে, এম্, সেন (পরবর্তী কালে এই বিভাগ ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান), অধ্যাপক পি, এন্, ঘোষ, অধ্যাপক হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর অবৈতনিক সাহায্যলাভেও এই বিভাগটি উপকৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগের পরিচালনায় মাঝে মাঝে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ দ্বারা পাঠ্য বিষয়াতিরিক্ত বক্তৃতা (extension lecture) দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইত। যাঁহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই সকল বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করিয়া বিভাগকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার প্রাক্তন ডিরেক্টর্ অফ্ পাবলিক্ ইনস্ট্রাকশন মিঃ ডব্লিউ, সি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ডাঃ ডব্লিউ, এ, জেন্কিন্স, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু, এবং আরও কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতীর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথম অবস্থায় মাত্র তিনমাস ব্যাপী সংক্ষিপ্ত শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স (Short Course of Teachers' Training)-এর উদ্বোধন করিয়া এই নূতন বিভাগের কাজ আরম্ভ হয়। সংক্ষিপ্ত হইলেও এই কোর্সে ভর্তি হইবার জন্য প্রথমবারেই যথেষ্ট সংখ্যক আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছিল। ট্রেনিংপ্রাপ্ত হইবার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে যে সত্যিকারের আগ্রহ বা ইচ্ছা আছে তাহা এই চাহিদা হইতেই বোঝা যায়। কিন্তু, স্থানাভাবের জন্য প্রথমবারে ৭০ জনের অধিক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এই শিক্ষার্থীবৃন্দের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাত্ত্বিক (theoretical) এবং ব্যবহারিক (practical)—উভয় প্রকারের শিক্ষাই এই বিভাগে দেওয়া হইত। হাতে-কলমে শিক্ষকদিগকে পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতার ১০টি বিদ্যালয় এই বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিত।

গ্রীষ্মের ছুটিতে অবকাশকালীন কোর্স এবং বিশেষ ইংরাজী শিক্ষকতা কোর্সের ব্যবস্থাও এই বিভাগ হইতে করা হয়; এবং এই সময় হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। কোর্সগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার নিদর্শন স্বরূপ বলা চলে যে বহু সংখ্যক শিক্ষক এইগুলিতে যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চবিদ্যালয়ের অনেক প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাও ছিলেন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় আসন্ন নব-বিধান (New Regulations) প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ভূগোল বিষয়ে এবং বিজ্ঞানেও একটি করিয়া স্বল্পকালীন শিক্ষণ শিক্ষা কোর্স প্রবর্তনের দায়িত্ব এই বিভাগকে লইতে হয়। এই নূতন কোর্স দুইটিরও প্রত্যেকটি তিনমাস স্থায়ী ছিল।

লণ্ডন এবং প্যারিস্ বিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট ডিগ্রী

লাভ করিয়া ডাঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, এবং ভূগোল বিষয়ে শিক্ষণ-শিক্ষা সংক্রান্ত শাখা বিভাগটি পরিচালনার ভার তাঁহার উপরই অর্পিত হয়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সযত্ন এবং সমর্থ পরিচালনা দক্ষতায় ক্রমে ক্রমে এই শাখা বিভাগটি বিকাশ লাভ করিয়া বর্তমানের পূর্ণাঙ্গ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ভূগোল বিভাগের রূপ পাইয়াছে।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষণ শিক্ষা লাভেচ্ছু শিক্ষক-দিগকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ একটি স্বল্পকালীন কোর্সেরও প্রবর্তন করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপর এই কোর্স পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং আশুতোষ কলেজ এই বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের সহিত সক্রিয় সহ-যোগিতা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শিক্ষার্থী-গণকে ব্যবহারিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের ল্যাবরেটরীগুলিকে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নানাভাবে এই বিভাগকে পর্যাপ্ত সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

প্রথম অবস্থায় মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য এই বিভাগ পরিচালনার অনুমোদন লাভ করা গিয়াছিল বলিয়া প্রথম পাঁচ বৎসর শুধু মাত্র 'স্বল্প মেয়াদী' শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা লইয়াই এই বিভাগটিকে মূলতঃ ব্যাপৃত থাকিতে হইয়া-ছিল। বর্তমানে এই স্বল্পকালীন শিক্ষণ-শিক্ষা ব্যবস্থা আর চালু নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-টি ক্লাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের ইতিহাসে পরবর্তী স্মরণীয় ঘটনা হইল—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পূর্ণাঙ্গ বি-টি ক্লাসের প্রবর্তন। ১৯৪০ সালের ২৪শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত সেনেট সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এই বিভাগের অধীনে ঐ বৎসরের জুলাই মাস হইতে পূর্ণাঙ্গ বি-টি ক্লাস খোলার ব্যবস্থা করা হইবে। এই মর্মে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ায় প্রথম বৎসরেই এই ক্লাসে ভর্তি হইবার জন্য প্রায় ৭০০ দরখাস্ত পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, স্থানাভাবের জন্য ১০০ জনের বেশী শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট আর্টস্ কাউন্সিলের তদানীন্তন সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্বোধনী বক্তৃতা দ্বারাই বি-টি ক্লাসের প্রবর্তনের ফলে বিভাগীয় অধ্যাপক মণ্ডলীর সংখ্যাও বাড়াইতে হইল। কয়েকজন অতিরিক্ত অধ্যাপক নিয়োগের সাথে সাথে একজন রিসার্চ ফেলো এবং কারু শিল্প, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন ইনস্ট্রাকটরও নিযুক্ত হইলেন। সাধারণ বিষয় সমূহের জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা ছাড়াও চিত্রাঙ্কন এবং হাতের কাযের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হয়। ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার ধ্বনিতত্ত্ব এবং কথ্য ইংরাজী শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা এবং পাঠ্যানুগ বিভিন্ন বিষয়ে (Co-curricular activities) শিক্ষাদানেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ের ক্লাসে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। এত-দ্ব্যতীত আরও ছয়টি ঐচ্ছিক (optional) বিষয়েও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এইগুলি যথাক্রমে—(১) তুলনা-মূলক শিক্ষা (Comparative Education), (২) সামাজিক এবং অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব (Social & Ab-normal Psychology), (৩) মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শিশু পরিচালনা (Mental Hygiene & Child Guidance), (৪) নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী বিদ্যালয় পরিচালনাপদ্ধতি এবং উহাদের সংগঠন (Methods and Organization in Nursery, Kindergarten & Montessori Schools), (৫) মানসিক পরীক্ষা ও শিক্ষাগত পরিমাপ (Mental Tests & Educational Measurements), এবং (৬) অন্ধদের শিক্ষাব্যবস্থা (Education of the Visually Handi-capped)। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রমোহন সেন ও অধ্যাপক মোহিনী-মোহন ভট্টাচার্য, ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রভৃতি জনকয়েক প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতীর extension lecture-এর বন্দোবস্তও করা হইয়াছিল। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে বেহালায় অন্ধ বিদ্যালয়, কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়, সরিষা

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম শিক্ষালয়, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন প্রমুখ স্থানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে প্রথম বৎসরের বি-টি ক্লাসের শিক্ষার্থীবৃন্দকে মহাসৌভাগ্যবান্ বলা চলে; কেননা, ইঁহারা ঐ বৎসর শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসার সুযোগলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। বার্ধক্যজনিত এবং তৎকালীন দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকমণ্ডলীর কাছে প্রায় চল্লিশ মিনিট ব্যাপী এক সারগর্ভ শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। গভীর শোকের বিষয়—পরবর্তী বৎসরেই কবি পরলোক প্রয়াণ করেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপকগণ যাহাতে সুপরিকল্পিতভাবে গবেষণা কার্য চালাইয়া যাইতে পারেন তাহার জন্যও এখানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে গবেষণামূলক কার্যে অগ্রণী ছিলেন শ্রীঅনাথ নাথ বসু, বর্তমান লেখক, শ্রীহরিপদ মাইতি, শ্রীমুনীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ ডি, সি, দাশগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাস অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং-এই বি-টি ক্লাস সমূহের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু, ইতিমধ্যে নানাদিকে এই বিভাগের কর্মধারা সম্প্রসারণের ফলে এবং বিশেষ করিয়া ট্রেনিং লাভেচ্ছু শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাধিক্যের ফলে এই বিভাগের জন্য আরও অধিকতর স্থানের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছিল। এই কারণে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগটিকে ৯৫নং রসা রোডে (বর্তমানে ১৬১ নং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে) এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই গৃহটি বসবাসের উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ঠিক উপযোগী নয়। তবুও এই গৃহসংলগ্ন কিয়ৎপরিমাণ উন্মুক্ত স্থান থাকায় এবং গৃহে কয়েকটি বৃহৎ গাড়ীবারান্দা সংযুক্ত থাকায় নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান এবং পাঠ্যবিষয়াতিরিক্ত অত্যাবশ্যক ক্রীড়াকৌতুক, বিচিত্রানুষ্ঠান, নাটক প্রভৃতির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে। কলেজ ভবনের সংলগ্ন দুইটি ছোট বহির্গৃহ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পুরুষ ছাত্রদের জন্য একটি ছোট আকারের ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করাও সম্ভব পর হইয়াছে। পরবর্তীকালে কলেজের প্রধান ভবন এবং হোস্টেল গৃহটির সংস্কার সাধিত হওয়ায় আরও খানিকটা সমস্যার সমাধান হইয়াছে। প্রধান কলেজ ভবনটি দুইতলা হইতে তিনতলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। হোস্টেল গৃহটিও একতলা হইতে দুইতলা হইয়াছে। ফলে, শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে এম্-এ, এম্-এস্-সি ছাত্রদের জন্যও কিছু অতিরিক্ত স্থানের বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হইয়াছে।

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের এম্-এ/ এম্-এস্-সি ক্লাস

M. A. (Education)/M. Sc. (Education) Class.

শিক্ষাবিজ্ঞানসংক্রান্ত স্নাতকোত্তর বিভাগটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। প্রতিষ্ঠা দিবসে পৌরোহিত্য করেন তদানীন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এই সংযুক্ত বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ হইলেন পরলোকগত বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী জিতেন্দ্র মোহন সেন মহোদয়।

শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের ভবনটিতেই স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিভাগেরও ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বি-টি ডিগ্রী-প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা যাঁহারা 'শিক্ষা' বিষয় লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছেন—মাত্র তাঁহারাই এম্-এ, এম্-এস্-সি (এডুকেশন্) ক্লাসে ভর্তি হইতে পারেন।

পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও ল্যাবরেটরীতে হাতেকলমে কাজ করিতে হয় বলিয়া এই বিভাগের ক্লাসসমূহে স্থান সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইয়াছে। স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগে প্রথমদল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১২ জন পুরুষ এবং ১২ জন মহিলা শিক্ষার্থী ছিলেন। ১৯৫০-৫১ সালের সেসনে অধ্যয়নরত এই প্রথম দলের মধ্যে ২০ জন ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত হন। ফলে পঞ্চবার্ষিক শ্রেণীতে আরও নূতন ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

প্রথমদলের ২ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা শিক্ষার্থী মাসিক ৭৫৲ টাকা হারে যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন এবং

সরলা সেন গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তিগুলি পরলোকগত জিতেন্দ্রমোহন সেন মহাশয় কর্তৃক তাঁহার মাতাপিতার স্মরণার্থে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদ্ধেয় সেন মহাশয় এই উদ্দেশ্যে একটী স্থায়ী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠাকল্পে—বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁহার ১ নং সিরিশ বিশ্বাস লেন স্থিত পৈতৃক বাসগৃহটি সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই সম্পত্তির মূল্য ৮০ হাজার টাকার উর্দ্ধে, এবং ইহার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ৩৩০০৲ টাকা। বি-টি কোর্স সমাপ্তির পর পরবর্তী পর্যায়ে যাঁহারা শিক্ষা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা-লাভ গ্রহণ করিতেছেন অথবা মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানে বা অনুরূপ কোন বিষয়ে ডক্টরেটের জন্য গবেষণা কার্যে লিপ্ত হইতে চাহেন—তাঁহারাই এই বৃত্তিলাভের অধিকারী।

১৯৩১ সালে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম এম্-এ, এম্-এস্-সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষায় ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য হন। ইঁহাদের মধ্যে চারিজন প্রথম শ্রেণীতে ১০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং দুইজন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বৎসর এই বিভাগ হইতে সাড়ম্বরে একটি 'শিক্ষাসপ্তাহ' কর্মসূচী প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাতে বক্তৃতা, বিতর্কসভা, আলোচনাচক্র (Symposia) প্রদর্শনী প্রভৃতির বিরাট ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষে যে সকল শিক্ষাসম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ ডি-এম্-সেন, ডাঃ পরিমল রায়, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট অতিথিবর্গের যোগদানে অনুষ্ঠানগুলি সর্বাঙ্গীন সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়া ছিল।

বর্তমানে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সংখ্যা সর্বাধিক ৩২ বত্রিশ। বিশ্ববিদ্যালয় এম্-এ, এম্-এস্-সি বিভাগের কয়েক-জন ছাত্র ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের সহিত যুক্ত এই বিভাগের কতকগুলি ক্লাস ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে গ্রহণ করা হয়। উক্ত কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগেও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

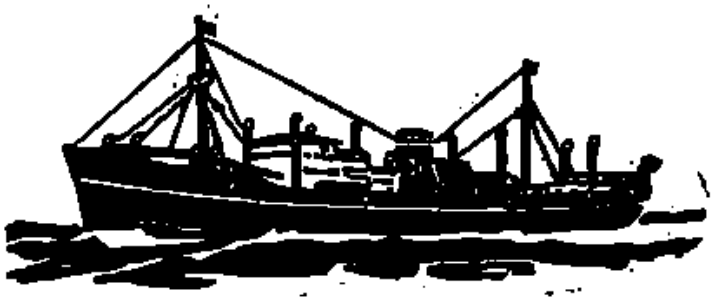

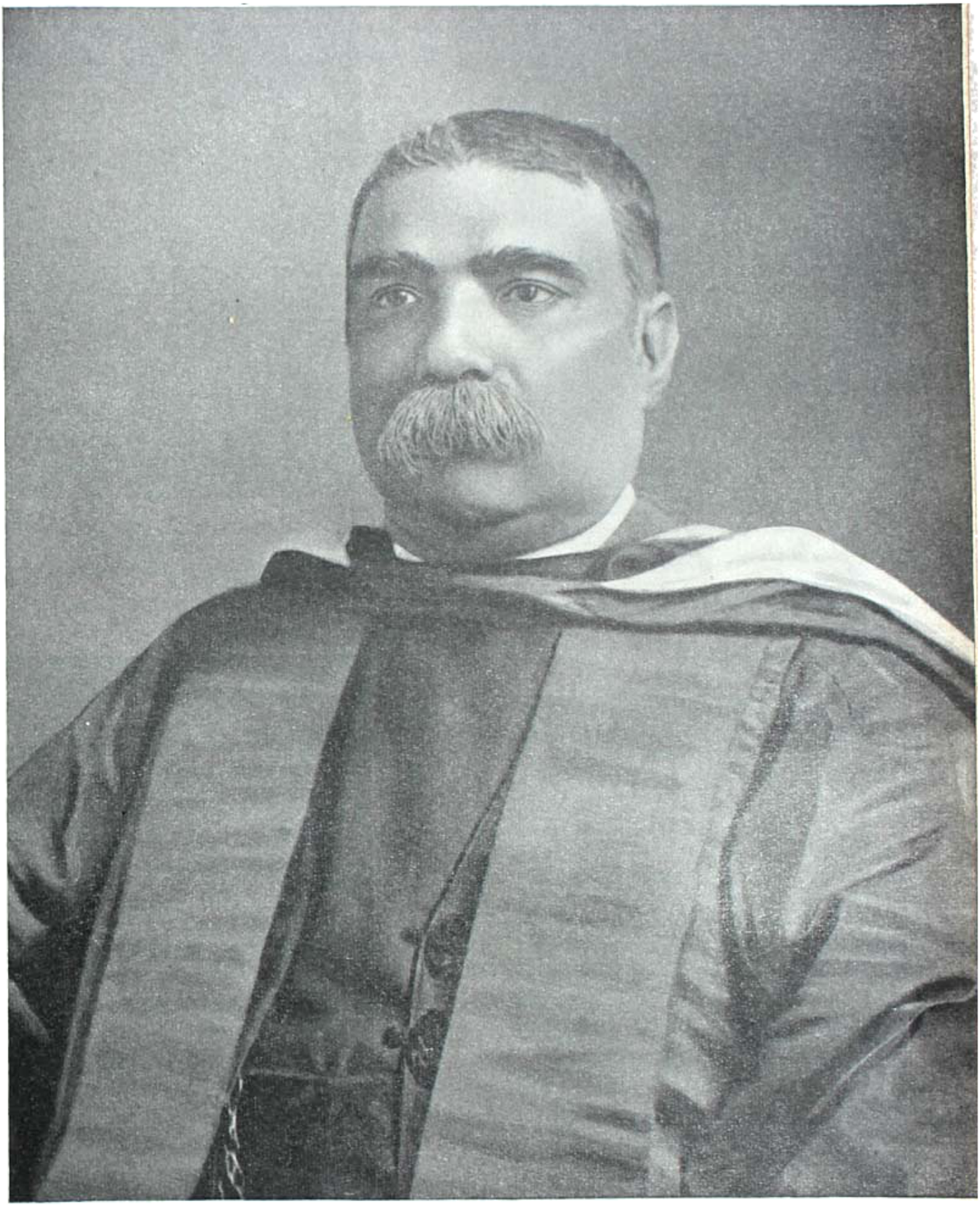

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
(৩ঠা এপ্রিল, ১৯২১—৩রা এপ্রিল, ১৯২৩)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী
৩১শে মার্চ, ১৯১৬—৩০শে মার্চ, ১৯১৮

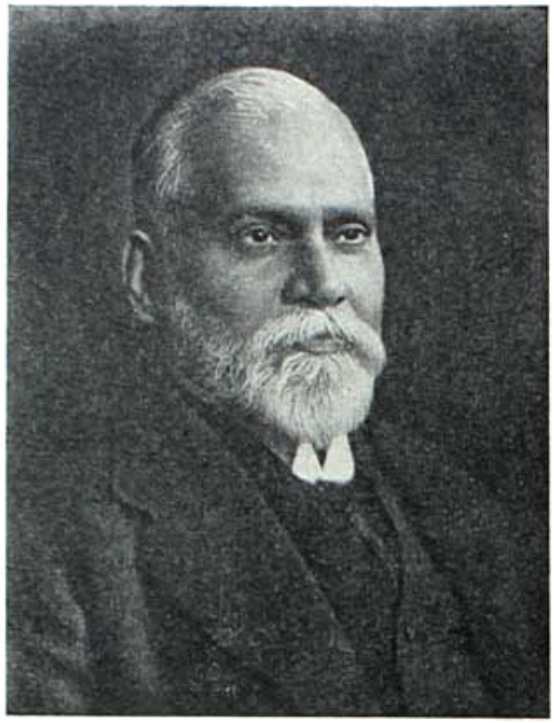

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
ভূপেন্দ্রনাথ বসু
৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৩—৭ই আগষ্ট, ১৯২৪।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
স্যার নীলরতন সরকার
(৩১শে মার্চ, ১৯১৯—৩রা এপ্রিল, ১৯২১)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
স্যার যদুনাথ সরকার
(৮ই আগষ্ট, ১৯২৬—৭ই আগষ্ট ১৯২৮)

পশ্চিম বঙ্গের উচ্চশিক্ষা

ডাঃ জে. সি. ঘোষ

দেশের গঠনভার দেশবাসীর হাতে। দেশবাসীর যোগ্যতা যতখানি দেশের উন্নতিও ততখানি সম্ভব। বাঙালীর যোগ্যতা ও বাংলার উন্নতি এই জন্যই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সংখ্যাধিক্য দিয়া এই যোগ্যতার বিচার হয় না। যে রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থা যত উন্নত, অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় সেই রাষ্ট্রের জয় ততই সুনিশ্চিত। কর্মক্ষেত্র বহু বিচিত্র—প্রতিক্ষেত্রেই যোগ্যতম কর্মী যত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ততই দেশের কল্যাণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ও এই সত্য মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় যোগ্যতম কর্মীর সমাবেশ করিবার জন্য যে সর্বাত্মক চেষ্টার প্রয়োজন সে বিষয়ে বাংলাদেশ কতখানি সচেতন হইয়াছে?

উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাঙালী যথেষ্ট আস্থাবান। যাহাতে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় তজ্জন্য যত্ন লওয়া গণতন্ত্রী-রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। সহজ ভাবপ্রবণ যৌবনের প্রারম্ভকাল যাঁহাদের কলেজে অধ্যয়নের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে তাঁহারাই উত্তরকালে রচনা করিয়াছেন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাণকেন্দ্র। কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক এক কথায় সকল প্রগতিবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে এই শিক্ষিত সমাজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, দাঁড়াইতেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত, দুইটি অতন্দ্র চক্ষুর সদা সাবধানী সতর্ক দৃষ্টি দিয়া এই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হয়—ইহাই ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য। আর শিক্ষিত নরনারী হইলেন ব্যক্তি স্বাধীনতার সদা জাগ্রত প্রহরী। কেবল ভারতেই নহে, সমগ্র বিশ্বেও ইঁহারাই হইলেন গণ-তান্ত্রিকতার সংরক্ষক। সকল গণতন্ত্র আর অযোধ গণদেবতা একে অপরের পরিপন্থী।

দুইমাস পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রে সফরকালে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতেই আমার এই ধারণা দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সফরকালে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, ডীন ও অধ্যাপকবৃন্দের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। উচ্চশিক্ষালাভে আগ্রহী ছাত্রের সংখ্যাধিক্য বশতঃ আমা-দিগকে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় আমি তৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়াছি। সর্বত্রই আমি শুনিয়াছি যে আমাদের দেশে ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের এই সুগভীর আগ্রহ আমাদের উন্নততর জীবনে পৌঁছিবার পক্ষে মূল্যবান পাথেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ১৮ হইতে ২৩ বছরের ছেলে মেয়েদের প্রতি ৩ জনের ১ জন হয় কলেজে পড়িতেছে অথবা কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। স্থানীয় কলেজগুলিতে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং ছাত্রছাত্রীগণ কলেজ গুলিতে যে সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন তাহার অকুণ্ঠ প্রশংসাই করিতে হয়। বিরাট কর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহ যাঁহাদের প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে—যাঁহাদের আবিষ্ক্রীয়া ও উদ্ভাবনী শক্তির ফলে দেশের পরিবহন, শিল্প, যোগাযোগ, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে সেই সব স্ব-প্রতিষ্ঠিত পরিকৃতের কর্মপ্রয়াসই রচনা করিয়াছে আমেরিকার অর্থনীতির বনিয়াদ। এই সত্য স্বীকার করিয়াও বলিতে হয়, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়নিষ্ক্রান্ত যুবশক্তিই এই উৎপাদনমুখী কর্মপ্রবাহকে পরিস্ফীত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে—সৃষ্টি করিয়াছে আমেরিকার আধুনিক অর্থনীতি। সৃজনধর্মী কর্মেই তাহাদের গৌরব, তাহারা পরশ্রমজীবী হইতে ঘৃণা বোধ করে, উৎপাদিকাশক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত করে এমন সব যন্ত্র তাহাদের মনকে আকৃষ্ট করে। নিশ্চিত নিরাপত্তা অপেক্ষা নব নব কর্মপ্রয়াসের মূল্য তাহাদের নিকট অধিক বলিয়া মনে হয়। অনিশ্চিত

ভবিষ্যতের ঝুঁকি লওয়ার মধ্যে তাহারা পায় ঐতিহ্যের আস্বাদ, জগতের বা সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা সর্বদাই প্রস্তুত। পূর্ণতর সমৃদ্ধতর জীবন লাভের উপযোগী পরিপার্শ্বিকতা তাহারা নিজেরাই সৃষ্টি করিয়া লয়। উচ্চতর শিক্ষালাভ যাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই, এইসব শিক্ষিত যুবকদের কর্মপ্রয়াসের ফলে তাহাদের জন্য নূতন নূতন কর্মের সংস্থান সম্ভব হয়।

একটি বিষয়ে আমি আশ্বস্ত হইয়াছি—আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজগুলিও যদি ছাত্র ছাত্রীদিগকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করে যাহাতে তাহারাও উচ্চতর কর্মপ্রয়াসে অনুরূপ আহ্বান হয়, নিপুণ শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং সৃজনকর্মে গৌরব অনুভব করে তবে আজ যে ভয়াবহ দারিদ্র্য আমাদের নিত্য দহচর, অনতিবিলম্বে তাহার হাত হইতে মুক্ত হইয়া আমরা পরমসমৃদ্ধিলাভ করিতে পারিব।

কিরকম ধরণের কলেজে এই প্রকার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইতে পারে? স্বল্প ব্যয়ে এ রকম শিক্ষায়তন পরি-চালনা করা সম্ভব এরকম একটা ভ্রান্ত-ধারণা আমাদের দেশে আছে। এই ভ্রান্তি যত শীঘ্র দূর হয় ততই মঙ্গল। শিক্ষাব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এর ন্যায় মনীষীর—আবির্ভাব জীবনে একবারই সম্ভব। সম্প্রতি লোকান্তরিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব রসায়নাচার্য রায়ের স্থান নেই, অথবা অনাড়ম্বর-জীবন উচ্চচিন্তা পরায়ণ বেলুড় কলেজের সন্ন্যাসী আচার্যগণ—এরকম দৃষ্টান্তাদি একান্ত দুর্লভ। এই দুর্লভ দৃষ্টান্তাদি দিয়া আমাদের বহু ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থার বুনিয়াদ রচনা করার কল্পনা কখনই ফলপ্রসূ হইবে না।

যন্ত্রবিদ্যা ও কারিগরী শিক্ষা প্রদান কার্যে শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেরই একমাত্র অধিকার রাশিয়ায় স্বীকৃত হইয়াছে। "দীপসে দীপ জলে", দীপশিখা উজ্জ্বল হইলেই তাহার দ্বারা অপর দীপটির শিখাটিকে প্রজ্বলিত করা যায়। এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণের এক পঞ্চমাংশ যাহাতে শিক্ষণ অথবা গবেষণা কার্য গ্রহণ করেন সে জন্য তাহাদিকে দেওয়া হয় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। ঐ দেশে ইহারা উচ্চতম বেতন পাইয়া থাকেন। তাই সমযুগে অধ্যাপনা ও গবেষণারত বিজ্ঞানী এবং কারিগরীবিদ্যাবিশারদগণের পক্ষে লোভনীয় পারি-শ্রমিক ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা যে দেশ না করিতে পারিবে তাহাকে প্রতিবেশী দেশের সহিত অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতেই হইবে। উচ্চতম মনন-শীলতার অধিকারী এই মানুষেরাই প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণ করিবে—তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষায়তনগুলি সাধারণতঃ বিশেষত্ববর্জিত উপাদানেই গঠিত হয়। যে বেতন অধ্যাপকগণ পাইয়া থাকেন তাহা যোগ্যব্যক্তিগণকে শিক্ষাদান কার্যে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যোগ্য অধ্যাপকের সংখ্যা নিতান্ত কম, কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। লেবরেটারী, লাইব্রেরী ও কমনরুমে স্থানাভাব, উপকরণাদিও খুবই অপ্রচুর, কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। এই কলেজগুলির মোট আয়ের শতকরা ৯৫ ভাগই আসে ছাত্রবেতন হইতে। আর ছাত্রগণের অধিকাংশই নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। ছাত্র-প্রতি গড়ে বার্ষিক ১৫০৲ টাকা পাইবার কথা। কিন্তু তাহারও অনেকখানি কন্-সেশন ও নানাবিধ কারণে মকুব করিতে হয়। ফলে অর্থকৃচ্ছ্রতাহেতু শিক্ষায়তনগুলি স্বভাবতই ক্ষীণজীবী ও পঙ্গু হইয়া পড়ে। যেখানে শিক্ষাব্যবস্থা পঙ্গু, সেখানে ইণ্টারমিডিয়েট বা উচ্চতর পরীক্ষায় শতকরা ৫০ জনের অধিক ছাত্র যদি অকৃতকার্য হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে? এই অপচয়ের জন্য ছাত্রগণের মানসিক অনগ্রসরতা যতখানি দায়ী, তাহা অপেক্ষা অধিকতর দায়ী শিক্ষাবিকারিগণের অবহেলা ও ঔদাসীন্য। রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের ছাত্রগণের কৃতকার্যতার হার শতকরা প্রায় এক শতেরই কাছাকাছি। যাহারা আমাদের ছাত্র-দিগকে তাহাদের অসাফল্যের জন্য ধিকৃত করেন, বেলুড় রামকৃষ্ণ কলেজের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে কি? আমাদের যুবশক্তির শ্রম ও সময়ের এই বিরাট অপচয়; অসাফল্যজনিত নিদারুণ উদ্বেগ ও মনস্তাপ এবং অভিভাবকগণের অপূরণীয় অর্থক্ষয় সবকিছু সম্বন্ধে কালক্ষেপ না করিয়া আমাদের জননায়কগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা

একান্ত প্রয়োজন। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণের জন্য নির্ভীক ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার আজ বড়ই প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপনের দিনে এই প্রয়োজনের প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ না করিলে শতবার্ষিক উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যই বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে করি।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির উন্নতির জন্য রাশিয়ানগণ যাহা করিতেছে, আমেরিকানগণ যাহা করিয়াছে, আমরা বাঙালীরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির জন্য কি তাহা করিতে পারি না? ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়। একটি সুনির্দিষ্ট সর্বসম্মত শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করিয়া তাহার রূপায়নে দেশের জনসাধারণ, সরকার ও শিক্ষাবিদ্‌গণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আজ প্রয়োজন। অনৈক্যে কার্যসিদ্ধি হইবে না। এই ত্রিবিধ স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অথচ ক্ষুদ্র একটি রাজ্য-সংস্থা গঠন করিয়া শিক্ষা পরিকল্পনার ভার ইহার উপর অর্পণ করিলে রাজ্যের উচ্চশিক্ষার উন্নতি বিধান করা সম্ভব হইতে পারে।

বলা বাহুল্য কার্যপরিকল্পনা-ব্যয়-নির্বাহের উপযোগী অর্থসংগতিও এই উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট সংস্থাটির থাকা চাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থাগমের পন্থার কোন অভাব নাই। এই বিষয়ে তিনি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এমন একদিন ছিল যখন শিক্ষাদান মহত্তম দান বলিয়া ভারতে পরিগণিত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এইরূপ পরহিতৈষণা আজ প্রায় দুর্লভ। যাহাও আছে তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। যাহারা দিতে পারেন তাঁহাদের উপর কর ধার্য করিয়া অর্থ সংস্থান করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যাঁহারা ব্যক্তিগত আয়কর দিয়া থাকেন এবং কলিকাতার করদাতাগণ— এই পর্যায়ে পড়েন। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে বিভিন্নরাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকাগণের প্রাথমিক শিক্ষাদানের যাবতীয় দায়িত্ব ক্রমশঃ গ্রহণ করিতেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্যসরকারের হাতে ছাড়িয়া দিলে কলিকাতা কর্পোরেশন এই বাবদ যে ব্যয় করেন তাহা উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতে পারিবে। বর্তমান করের উপর ১০ পার্সেন্ট হারে সারচার্জ ধার্য করিলে রাজস্বখাতে এই বাবদ অতিরিক্ত প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে দেয় ব্যক্তিগত আয়করের উপর দশ শতাংশ শিক্ষাকর ধার্য করিলে গড়ে বার্ষিক দেড় কোটি টাকার ব্যবস্থা হয়। যত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন হউক না কেন কোন সংস্থাই প্রয়োজনীয় অর্থ না পাইলে কোন কাজ করিতে পারে না। এই সত্য সার্বজনীন স্বীকৃতিলাভ করিলে উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য উপরোক্ত শিক্ষাকরাদি ধার্য করার পথে কোন অন্তরায় থাকিবেনা।

১৯৫৪ খৃঃ ছাত্রজীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে একটি চাঞ্চল্যকর অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার কলেজ ছাত্রগণের অর্ধেকের বেশির ভাগই দরিদ্র পরিবার ভুক্ত। এই সব পরিবারের ব্যক্তিপ্রতি আয় মাসিক ৫০৲ টাকারও কম। অনেকেই জীবনযাত্রার নিম্নতম মানেও পৌঁছিতে পারে না। অনেকেরই বাসস্থান অতিশয় অপ্রশস্ত। ঠাসাঠাসি করিয়া অনেকগুলি লোককে বড়জোর ২৪ বঃ ফুট পরিমিত কুঠুরীতে বাস করিতে হয়। দিবাভাগে যেখানে তাহারা অধ্যয়ন করে সেই কলেজগুলিতেও তাহাদের ভাগ্য সমান অপ্রসন্ন। ক্লাসে বেঞ্চিতে বসিতে পারিলে নিজেদিগকে সৌভাগ্যবান বলিয়া তাহাদের মনে করিতে হয়। লেবরেটারীতে মাত্র কোনরকমে দাঁড়াইবার জায়গা পাওয়া যায়, অগত্যা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানই ছাত্রদিগের দৈনন্দিন জীবনের একটি প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়ায়। যত্নের অভাবে, সহানুভূতির অভাবে, পরিচালনার অভাবে আমাদের ছাত্রগণের জীবনে যদি বিষাদ, সংশয় ব্যর্থতা আর হতাশা নামিয়া আসে, তবে বুঝিতে হইবে দেশের চরম দুর্দিন সমাসন্ন। দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট বুভুক্ষাকাতর ক্ষীণ মানুষটি সম্বন্ধে মহাকবি যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। দ্রুত ও সুশৃঙ্খল অগ্রগতির পুরোভাগে আমরা আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়কে দেখিতে চাই ধরায় স্বর্গ আনিবার পটভূমি রচনার উন্মাদ আগ্রহে উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলনের স্বেচ্ছাবাহীরূপে তাহাদের দেখিতে চাহিনা।

অগ্রগতিকে দ্রুততর করিবার জন্য চাই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, সহযোগিতাভিত্তি-গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানুষের মনে

জাগাইতে হইবে নূতন আশা, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র দেশবাসীর জীবনযাত্রাকে সচ্ছন্দতরূপে উন্নীত করিবার যোগ্যতা বিষয়ে সকল সংশয় দূর করিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। আমাদের কলেজগুলি হইবে এই সব নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর, নূতন জাগরণের উৎসস্থল। ইউরোপ ও আমেরিকায় এরকম কলেজ অনেক আছে। সেখানে ছাত্রগণ সকাল ৭টা হইতে রাত ৯টা পর্যন্ত কলেজেই কাটায়। স্নান ও দুপুরের আহার তাহারা কলেজেই সারিয়া লয়। অধ্যয়নের জন্য তাহাদের নির্দিষ্ট স্থান আছে, আর আছে অবসর-বিনোদনের প্রচুর উপকরণ। ছাত্রবন্ধুগণ এবং অধ্যাপকগণের সহিত নানাপ্রকার আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া তাহাদের মন বিকশিত হয়, মনে এমন একটা শক্তি সঞ্চারিত হয়, যার ফলে মননশীলতার ধারা ক্রমবিকাশের পথে নিত্য পরিচালিত হয়। আমাদের দেশে মানসিকতার একটি বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মননশীলতা বিকশিত হইতে হইতে এমন একটা স্থানে আসিয়া থমকাইয়া যায় যেখান হইতে তাহার এক পদও নড়িবার সামর্থ্য থাকে না। এই মননশীলতা অব্যাহত থাকিলে হয়ত জগৎকে অনেক কিছুই দিতে পারিত—কিন্তু সহসা অর্থপথে স্তব্ধ হওয়ায় সেই সম্ভাবনা সম্ভাবনারূপেই থাকিয়া গেল। মানসিক উন্মুখতা, আত্মশিক্ষার প্রবল প্রেরণা এ পথের খুবই অভাব। সকল মন যখন গ্রহণবিমুখ হয়, যখন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন বুঝিতে হইবে শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্যই বিফল হইল, বহু শতাব্দীর জনগ্রসরতা ঠেলিয়া ফেলিয়া আজ নবজাগ্রত ভারত অন্যান্য জাতির সহিত অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবার জন্য যে সাধনা করিতেছে তাহাও শিক্ষার এই ব্যর্থতার ফলে ব্যাহত হইতে বাধ্য।

জনসাধারণ যতদিন না কলেজগুলির মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হন, পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলি যে পদ্ধতিতে মানসিক উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করেন—যতদিন না আমাদের কলেজগুলি সেই সব পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছেন ততদিন আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আকাশ কুসুম রচনার ন্যায়ই নিরর্থক রহিবে, যাঁহারা অর্থাভাবের দোহাই দেন তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত বক্তব্য—বাঁধ নির্মাণ, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের খাল খনন কিম্বা বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন, এসকল অপেক্ষাও চরিত্র গঠন, মানসিকতার সম্যক অনুশীলন ও ধীশক্তির বিকাশই আমাদের অধিকতর প্রয়োজন। বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির জন্য অর্থের সংস্থান করা যদি সম্ভব হইয়া থাকে, তবে জাতির চরিত্র গঠন ইত্যাদির জন্যই বা অর্থাগম সম্ভব হইবে না কেন?

ছাত্রজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন :—

যুবা স্যাৎ সাধু, যুবা অধ্যায়ক :—
আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ

প্রার্থনা করি, আমাদের কলেজগুলিতে যে সব ছাত্র শিক্ষিত হইবে তাহারা যেন ভাল হয়; মহান আদর্শ সিদ্ধির জন্যও তাহারা যেন অকল্যাণের পথ গ্রহণ না করে; তাহারা যেন পরিশ্রমী ও অধ্যয়নপরায়ণ হয়; জ্ঞানপিপাসা যেন তাহাদের স্বভাবে পরিণত হয় তাহাদের জীবন সুশৃঙ্খল হউক; স্বসমাজের কল্যাণে নিয়মশৃঙ্খলার গুরুত্ববোধ তাহাদের মধ্যে জাগরিত হউক; তাহারা যেন দৃঢ়মনা ও দৃঢ়সঙ্কল্প হয়; কোন প্রলোভন, কোন উৎপীড়নেই তারা পথ হইতে তাহারা যেন বিচ্যুত না হয়; তাহারা সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী হউক। এইরূপ যুবকের সংখ্যা যে দেশে সর্বাধিক, অগ্রগতির পথে সে দেশের স্থান সর্বাগ্রে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ

প্রিয়রঞ্জন সেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাব্দীর উৎসবে আজ মনে পড়িতেছে নিজেদের কথা। এ উৎসব তো বাহিরের শুধু নয়। ইহা যে আমাদের অন্তরেরও উৎসব। এ উৎসবে আমাদের নিজের কথা পরিবর্তনের কথা, সুতরাং এ উপলক্ষে নিজের চশমার রং ইতিকথার মধ্যে আনিবেই।

স্নাতকোত্তর বিভাগ অর্থাৎ বি. এ বা বি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করিবার পর এম্. এ. পড়িবার ব্যবস্থা স্যার আশুতোষ নূতনভাবে করিয়া শিক্ষা জগতে যুগান্তর আনিয়াছিলেন। বিভিন্ন কলেজে গুণী জ্ঞানী অধ্যাপকদের একত্র করিয়া উচ্চতর শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা এবং বিদ্যাধিমণ্ডল—সকলেরই হিতসাধন করিয়াছিলেন। তখনকার কালে তাঁহাকে যে সব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহার কথা আজ বলিয়া কাজ নাই। আমরা কি পাইয়াছিলাম, সে কথাই বলি।

১৯১৭ সালে কলিকাতায় এম্-এ পড়িতে আসি। স্নাতকোত্তর বিভাগ তখন খোলা হইয়াছে, তবু প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইয়া স্নাতকোত্তর বিভাগে স্থান পাইলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাদের tutorial ক্লাস হইত। অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ স্বয়ং আমাদের ভার লইয়াছিলেন—আমরা তাঁহার নিকট ইংরেজী সাহিত্যের সম্বন্ধে রচনা দেখাইয়া লইতাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের পুস্তকাগারে পাঠ করিবার সুযোগ ও সুবিধাও পাইতাম। এইটুকু সম্বন্ধ তখন ছিল। ক্লাস সমস্তই হইত বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজী বিভাগে এত ছাত্র হইত যে তিনটি 'সেকশন' খোলা হইয়াছিল, আমরা প্রায় তিন শত ছাত্র ইংরেজী পড়িতাম। এখনকার দৃষ্টি ও তখনকার দৃষ্টি এক ছিল না—তখন ছিল ভূরিভোজনের ব্যবস্থা, এখন আহার সংযম, dieting—যাহাতে খাদ্যবস্তু জীর্ণ হয়, অনধিকারী (?) না প্রবেশ করিতে পারে বিদ্যালয় মন্দিরে। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে পদপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহাদের অর্জিত বিদ্যা ব্যর্থ হয় নাই।

নূতন বিভাগ খোলার পর বিভিন্ন নূতন নূতন বিদ্যা শিখাইবার যখন ব্যবস্থা হইল তখন আমাদের মধ্যে উৎসাহ সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, ভারতীয় ভাষা বিভাগ, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব—সবগুলিই একে একে পড়িব, পড়িয়া পরীক্ষা দিব, আমরা বিশেষজ্ঞের বিশেষ বিদ্যা অপেক্ষা পল্লবগ্রাহিতার অভিযোগ সত্ত্বেও প্রশস্ত ভিত্তিকেই সেদিন কাম্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, হয়তো নূতনত্বের মোহেই, কে জানে! এসব বিষয়ে অবশ্য আমাদের স্বপ্ন সফল হয় নাই। কিন্তু মন চাহিয়াছিল স্যার আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট কল্পনায় গা ভাসাইয়া দিতে। এই উৎসাহেই ইংরেজীর ছাত্র হইয়াও Sten Konowর বক্তৃতা শুনিতে শান্তিনিকেতন গিয়াছি, জগওয়ালের ও জ্ঞানশাস্ত্রীর বক্তৃতা শুনিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করিয়াছি। এম্ এ বলিতে তখন আমরা বিশেষজ্ঞতা অর্জন মনে করিয়া একটি বিষয় লইয়া থাকি নাই। ভুল করিয়াছি বলিয়া এখনও মনে হয় না।

আমাদের যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে মনে পড়ে অধ্যাপক ষ্টীফেন, জগদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডনষ্টন, নিখিল মৈত্র, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, রজনীকান্ত গুহ, শৈলেশ্বর সেন, বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, হোমস ও ষ্টার্লিং—ইঁহাদের কথা। আজকার ছাত্রসমাজ ইঁহাদের অনেকের কথাই শুনিয়াছেন। বিদ্যার জন্য ইঁহাদের সকলেরই খ্যাতি ছিল। ইঁহাদের সকলের উদ্দেশে প্রণামাঞ্জলি অর্পন করি।

১৯২৩ সালে স্যার আশুতোষের সাদর আহ্বানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই। তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনায় সেদিন যে উদারতার পরিচয় পাইয়াছিলাম

তাহা বলিবার নহে। আমার মত সামান্য লোকের সঙ্গে তিনি সহজ অথচ অন্তরঙ্গভাবে কথা বলিয়াছিলেন, পরামর্শ দিয়াছিলেন, বেঙ্গলুর কলেজের পাকা চাকুরি ছাড়িয়াও কলিকাতায় আসিবার জন্য বলিয়াছিলেন। আমার ভাগ্য যে স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতা সত্ত্বেও সেদিন তাঁহার কথা শুনিয়াছিলাম।

১৯২৩ সালে পুনরায় স্নাতকোত্তর বিভাগে আসি, পড়াইবার জন্য। তখন হইতে ১৯৫৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে শিক্ষকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে নানারূপ আশঙ্কা ছিল—কিন্তু আমরা অকুণ্ঠ স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলাম। মনে পড়ে অধ্যাপক ব্রজগোপালবাবুর কথা—তাঁহাকে মনের সন্দেহের কথা জানাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যদি নিজের কাজ করে যাও nobody will interfere with you, আর যদি special privileges চাও তবে তার দাম অবশ্য দিতে হইবে। খুবই খাঁটি কথা, পরবর্তী জীবনে বহুবার ইহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছি—অবশ্য non-interference এর কথাটাই আমাদের কাছে তখনকার যুগে আসল ছিল।

দীর্ঘকাল স্নাতকোত্তর বিভাগে কর্ম করিয়াছি। বহু মধুময় স্মৃতি মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে। এখনও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের সঙ্গে একটা মমত্ববোধ অনুভব করি, তবে এখন তো পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ নাই, বিভিন্ন কলেজে তাহার রূপান্তর হইয়াছে শাসনকার্যের সৌকর্যের জন্য তাহার রং বদলাইয়াছে। এখন যাঁহারা অধ্যাপক তাঁহারাই লাভ-ক্ষতির কথা বলিতে পারিবেন। আমরা যে অধিকার পাইয়াছিলাম তাহাতে সকলেই অধ্যাপকদের কাছে সমান সমাদর পাইয়াছিলাম, আমাদের বয়সের, জ্ঞানের, অধিকারের প্রশ্ন তাঁহারা কখনও ওঠান নাই—বহুদিনের পরিচয়ে তাঁহাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর, আরও দৃঢ় হইয়াছিল। শতাব্দীর মধ্যে আমাদের এই প্রায় ত্রিশ বৎসরের সক্রিয় যোগ যতদিন বাঁচিব ততদিন সযত্নে স্মরণ করিব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ নাই কি? ব্যক্তিগত অভিযোগ তো যথেষ্ট আছে, প্রতিষ্ঠানগত অভিযোগও আছে। স্যার আশুতোষের ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে স্বপ্ন সফল করিতে পারি নাই, সে ক্ষোভও রহিয়া গিয়াছে। সেদিন সুযোগ পাইলে ব্যবস্থা করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থার মূল্য ভারতে সর্বত্র স্বীকৃত হইত, এই একটি বিভাগের দ্বারাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা সিদ্ধ হইত। কিন্তু স্যার আশুতোষের বিয়োগের পর, ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে যে ভিত্তি তিনি রচনা করিলেন, তাহা একেবারেই নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। সে সুযোগ আর আসিবে না। তাহা সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতি গঠনের জন্য যে বিরাট আয়োজন করিয়াছিল, তাহার সামান্য অংশীদার হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের অংশটুকু সার্থক বলিয়াই মনে করি।

বাই লেনের কথা

অধ্যাপিকা ডক্টর উমা রায়, এম-এ ট্রিপল ডিফিস

১৯৫৭ সালের জানুয়ারীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করছে। ভারতের তথা এশিয়ার সর্ব্বৃহৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবান্বিত ইতিহাস আজ বিশ্বের সম্মুখে সুপ্রকাশিত।

মনে পড়ছে ১৯৩৮ সালের কথা। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মিত্র তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারি। একখানা ক্যাজুয়াল স্টুডেন্টশিপের দরখাস্ত নিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সম্মুখে—বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের কর্মচারী প্রভাসবাবুর সঙ্গে। দরখাস্ত পড়ে সেক্রেটারি চাইলেন আমার দিকে। বললেন—ডিস্‌টিঙ্কসন্ নিয়ে পাস করেছেন—ক্যাজুয়াল স্টুডেন্ট হ'য়ে পড়তে চান কেন? এতে তো পরীক্ষা দিতে তিন বছর লাগবে।

প্রভাসবাবু বললেন—রেগুলার স্টুডেন্ট হ'তে চাইছেন না টাকার জন্য। এঁর বাবা ভাগলপুর বারের একজন লীডিং এ্যাডভোকেট এবং গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন—এখন তিনি নেই—খরচ দেবে কে?

মুহূর্তে মনের চাকা ঘুরতে সুরু করল। মনে পড়ল স্কুল জীবনের কথা—মাত্র দু বছরের মরশুম। বাবা বললেন—বাড়ীতেই মাষ্টার রেখে পড়াবো—আর স্কুলে নয়। শুধু মাত্র পড়াবার জন্যই চারজন নিযুক্ত হলেন। স্কুলে পড়লে এর চার ভাগের এক ভাগও বোধ হয় খরচ হত না। তারপর এল কলেজ—সেও বাবা কলকাতায় পাঠাতে রাজি হলেন না। প্রোফেসর রেখে ও স্বয়ং নিজে পড়াতে লাগলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্সের কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি। অপরিসীম যত্নে ও অজস্র খরচে তিনি আমার শিক্ষাজীবনকে অগ্রসর ক'রে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু আজ চমক ভাঙল—সেক্রেটারীর কথায়। তিনি বললেন—শুনুন, আপনাকে আমি ফ্রি স্টুডেন্টশিপ দিচ্ছি—আপনি শুধু এ্যাডমিশন ফি জমা দিয়ে দিন—

আমার স্পষ্ট মনে আছে শ্রীযুক্ত মিত্রের সম্মুখে আমি কোনো কথাই বলিনি—কোনো অনুরোধই করিনি সেদিন। প্রভাসবাবুর সামান্য কথায় আমার দিকে মুহূর্ত মাত্র দৃষ্টিপাত করে তিনি দরখাস্তের উপরে ফুল ফ্রী স্টুডেন্টরূপে ভর্তি হবার অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি যদি এই সহানুভূতি না দেখাতেন তাহলে আজও হয়তো—কে জানে—বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ অনুত্তীর্ণ থাকত কি না।

সময়ের অবিরল তরঙ্গাঘাতে বেলাবালুর উপরে অঙ্কিত সমস্ত চিহ্ন বারে বারে মুছে যায়—কে মনে রাখে ঘটনার কথা—কে মনে রাখে মানুষের কথা! অনেক সময় উপকারের স্মৃতি আত্মসাহনার অপ-স্মৃতি রূপেও অভিমানকে নিপীড়িত ক'রে চিত্তকে বিমুখ ক'রে তোলে! কিন্তু বিদ্যার যে আলোক জীবনকে মুক্তি দিয়েছে অন্ধকার থেকে, আজ এই শত বার্ষিকীর দিনে তার সূচককে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

মনে আছে ভর্তি হবার পরে দেখা করেছিলাম ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সংস্কৃতের ঘরগুলি দোতলার একটি সরু করিডোরের দু-দিক দিয়ে পর পর চলে গেছে। পরবর্তী কালে আমরা ছাত্র ছাত্রীরা ঐ গলিটিকে বাই-লেন ব'লে কৌতুকে উল্লেখ করতাম। তিনি তারই একটি ঘরে বসে একটি মোটা সংস্কৃত বইএর পাতায় দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। আমি গিয়ে স-সংকোচে দাঁড়ালাম। সঙ্গে ক'রে যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন—তিনি আমার সমস্ত পরিচয় দিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁর শান্ত মুখে বিদ্যার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে এক অপার্থিব চেতনার আলোকও উদ্ভাসিত হ'য়ে ছিল। যে গভীর স্নেহের সঙ্গে আমাকে তিনি আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়েছিলেন তার কথা কোনো দিন বিস্মৃত হ'তে পারব না। বস্তুত সেই আর্থিক সংকটের দিনে তিনি

যদি তাঁর নিজ গৃহের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের যে কোন গ্রন্থ নেবার, কাছে রাখবার এবং পড়িয়ে দেবার সুযোগ না দিতেন তাহ'লে সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারের ধূলিকণা টুকুও আজ ললাটে স্পর্শ করবার যোগ্যতা লাভ করতে পারতাম না!

আমার মনে আছে এম্ এ-তে সংস্কৃতকে পাঠ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করায় আত্মীয় মহলে অনেক সকৌতুক উপহাস সহ্য করতে হয়েছিল। আমাদের পরিবারে সংস্কৃত পঠন পাঠনে কারও রুচি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ সকলেই নিয়েছিলেন হয় ইংরিজিতে না হয় ইতিহাসে। কিন্তু আমার স্বর্গত পিতার ইচ্ছাকে স্মরণ ক'রে সংস্কৃতকেই আমি বেছে নিয়েছিলাম এবং এই বেছে নেবার মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের যে পাথেয়কে আমি পেলাম—তা অমৃত স্বরূপ।

বাস্তবিকই আমাদের এই দেশে যে বিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত আছে তার মধ্যে ইংরেজিয়ানার অংশই সর্বাধিক। যে প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃত ভাষার স্বর্ণ-কৌটায় রত্ন-মণির মতন সঞ্চিত আছে তার উত্তরাধিকারিত্ব আমরা প্রত্যেকেই যদি অর্জন না করতে পারি তাহ'লে জাতীয় চেতনার একটি অংশ যে অনাড় হ'য়ে থাকবে—তাতে কোনো সংশয় নেই।

অথচ ছাত্রীজীবনেই কতবার শুনলাম—বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র সংখ্যা যে অনুপাতে কম তাতে একটা বিভাগ স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা করা যায় না। এও শুনে ছিলাম যে শীগগিরই সংস্কৃত বিভাগ উঠিয়ে দেওয়া হবে। কারণ এ বিভাগের বহু গ্রুপের জন্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত রাখা হ'লে যে অজস্র টাকা খরচ করতে হয় তার দশ ভাগের একভাগ টাকাও ছাত্র'দের কাছ থেকে উঠে না। তবু শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত বিভাগ রয়েই গেছে। রয়েই গেছে বটে —কিন্তু ধীরে ধীরে যেখানকার সেই বাই লেনে পরিণত করছে ইতিহাস, আরবী ফার্সী ও স্ট্যাটিস্টিক্স্। সংস্কৃতের স্থান ঐটুকুও ছেড়ে থাকতে পারবে না!

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীর কথা মনে হ'লে মনে পড়ছে এরপর সংস্কৃত শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় কোন স্থান দেবেন? এই অবহেলিত এক কোণে সরে থাকা বাইলেনের স্বরূপবিস্তরের মধ্যেও ক্রমশই কি সে তার স্থান ছেড়ে দিতে থাকবে অন্য বিভাগকে? বিশ্ববিদ্যালয় যাঁদের সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ক'জন! বর্তমানের সমস্ত বহির্মুখিতা ও চটুল জীবনযাত্রা কিংবা আদর্শহীন ভাবে ভেসে বেড়াবার স্বাভাবিক প্রবণতাকে পরিত্যাগ ক'রে সাধনার দ্বারা যাঁরা প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাকে এ পর্যন্তও বহন ক'রে এনেছেন—ভারতকে যাঁরা ভারত বলে আজও জগতের সামনে চিনিয়ে দিচ্ছেন বা চিনিয়ে দেবার উপকরণ নিরভিমানে সঞ্চয় ক'রে রেখে যাচ্ছেন—তাঁদের জন্য শতবার্ষিকী কোন্ বরণ প্রদীপ জালিয়ে রেখেছে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
ডাঃ হাসান সুহ্রাবর্দী
(৮ই আগস্ট, ১৯৩০—৭ই আগস্ট, ১৯৩৪)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
মহম্মদ আজিজুল হক্
(৮ই আগস্ট, ১৯৩৮—১২ই মার্চ, ১৯৪২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
ডাঃ রাধাবিনোদ পাল
(১৩ই মার্চ, ১৯৪৪—১২ই মার্চ, ১৯৪৬)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১২ই মার্চ, ১৯৪৬—২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
(৮ই আগষ্ট, ১৯৩৪—৭ই আগষ্ট, ১৯৩৮)

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ

শ্রীমতী দেবী চক্রবর্তী, এম. এস-সি., পি. আর. এস. (কলিকাতা) ডি. ফিল. (অক্সফোর্ড)
প্রধানা অধ্যাপিকা, রসায়ন, বেথুন কলেজ, কলিকাতা।

আমার জীবনে পাঁচবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের যে সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের দিনে কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই সকল দিনের কথা স্মরণ করিয়া মনে যথেষ্ট আনন্দ পাই এবং শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া যায়। বিজ্ঞান কলেজ হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা যে কি ভাবে পরবর্তী জীবনে আমার সহায়তা করিয়াছে তাহারই দুটি কথা বলিতে চাহিতেছি।

আমার বাবা বিদেশে থাকিতেন। বাল্যকালের সুদীর্ঘ সাতবৎসর আমার কাটিয়াছে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীনিবাসে। সেই সাত বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি আমাদের স্কুলের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গম্ভীর বিজ্ঞান কলেজ। শিশুকাল হইতেই সেই কলেজের প্রতি ছিল আমার একটা গভীর বিস্ময় এবং অদ্ভুত আকর্ষণ। যখনই সুবিধা পাইতাম সেই কলেজের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া ভাবিতাম যদি জীবনে কোনদিন ঐ কলেজে পড়িতে পারি তবেই আমার জীবন সার্থক। কে জানিত আমার শৈশব-কৈশোরের সেই স্বপ্ন একদিন বাস্তবে পরিণত হইবে?

আমাদের স্কুলের ছাত্রীনিবাসে লেডি অবলা বসু প্রায়ই আসিতেন এবং আমাদের কত স্নেহ-যত্ন সহকারে দেখাশুনা করিতেন। তিনি আমাকে প্রথম হইতেই অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কতদিন এমনও হইয়াছে যে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাড়ী লইয়া গিয়াছেন। সেই সময় বসুবিজ্ঞানমন্দিরের চারিধারে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া দেখিয়াছি আর মনে মনে অবাক হইয়া গিয়াছি বিজ্ঞানের রহস্যের কথা ভাবিয়া। শিশুকাল হইতেই বিজ্ঞানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছি।

তাহার পর আমার জীবনের সেই অবিস্মরণীয় দিনটি উপস্থিত হইল যেদিন আমি বহু আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিজ্ঞান কলেজের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গে আর একটি মেয়ে ভর্তি হইল তাহার নাম শোভনা সেন। দুইজনে উৎসাহের সঙ্গে কলেজ করিতেছি। একদিন প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাসে কাজ করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ অনুভব করিলাম পিছনে কে বিনুনি ধরিয়া টানিতেছে। খুবই ভয় পাইয়া গেলাম—কেন না শোভনা তো পাশেই দাঁড়াইয়া আছে, সে নিশ্চয়ই একাজ করে নাই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবিলাম 'কলকাতার ছেলেরা কি ক্লাসে মেয়েদের চুল ধরে টানাটানি করে!' এখানে 'কলিকাতার ছেলেদের বলিবার একটু কারণ ছিল—আমি ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আসামে চলিয়া যাই এবং সেখান হইতেই বি. এসসি. পাশ করি। তৎক্ষণাৎ পিছনে তাকাইয়া দেখি একজন পাতলা ছিপছিপে বৃদ্ধ মুন্সিপরা ভদ্রলোক! তাঁহাকে পূর্বে কখনও দেখি নাই। নিমিষেই চিনিলাম ইনিই হইতেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আমরা দুইজনেই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি এক ঘুষি মারিয়া বলিলেন, "এই দেখ তোকে আমার বড় ভাল লেগেছে—আমি চাই যে সব মেয়ে এখানে পড়তে আসবে তাদের যেন তোর মত স্বাস্থ্য হয়।" প্রায়ই আমার কণ্ঠায় হাত দিয়া দেখিতেন যে রোগা হইয়া যাইতেছি কি না! তাঁহার নিকট যে স্নেহ পাইয়াছি তাহা আমার জীবনের পরম সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। একদিন তিনি আমাদের বলিলেন, "কাল তোদের নেমন্তন্ন"। আচার্যদেব কলেজেই থাকিতেন। একখানি ছোট ঘর—সেখানেই ছিল তাঁহার ঘর সংসার। নিমন্ত্রণ খাইতে খাইতে অনেক দেরী হইল। একটু একটু করিয়া কত কি খাওয়াইলেন। আবার প্রতিটি জিনিস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কে কবে কোথা হইতে এই সকল

তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাহাও বলিতে লাগিলেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুড়ি রাখিলে মুড়ি কত টাট্‌কা থাকে তাহাও শিখাইলেন। কত সব গল্প করিতে করিতে আমাদের খাওয়াইতেছেন তার আমরাও গল্পে তন্ময় হইয়া খাইয়া যাইতেছি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখি প্রায় আধঘণ্টা হইল ক্লাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমরা তখন বলিলাম যে এখন যদি ক্লাসে যাই তাহা হইলে তো বকুনি খাইতে হইবে। তিনি আমাদের তখন বলিলেন "আজ আমার সঙ্গে"। আমরা তাঁহার সঙ্গে গেলাম। আমাদের তখন ডাঃ পি. কে বোস মহাশয়ের সঙ্গে ক্লাস। আচার্যদেব বলিলেন, "দেখ প্রফুল্ল ওদের বকিস না—আমি ওদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

এক বছর পরে সিকস্‌থ্ ইয়ারে উঠিয়া থিসিস নিবার পালা পড়িয়া গেল। কলেজে ভর্তি হইবার বহুপূর্বে লোকমুখে ডাঃ যোগেন্দ্র চন্দ্র বর্ধন মহাশয়ের যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়াছিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম তাঁহারই নিকট কাজ করিব; কিন্তু ছাত্রদের নিকট শুনিলাম যে তিনি অত্যন্ত কড়া লোক। তাঁহার নিকট থিসিস লইলে সারাদিন খাটিতে হইবে। সারা ফিফ্‌থ্ ইয়ার বেশ আরামে কাটাইয়াছি তাই ভাবিলাম তাহাতে আর কি, না হয় পরিশ্রম করিব। অতবড় পণ্ডিত লোকের কাছে কাজ শিখিব সে কি কম সৌভাগ্যের কথা! একদিন সাহস করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং আমার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। প্রথমে তিনি যথেষ্টই আপত্তি করিলেন, কিন্তু পরে আমার আগ্রহ দেখিয়া রাজি হইলেন। আমরা পাঁচজন তাঁহার নিকট থিসিসের কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার নিকট নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছিলাম তাহার তুলনা হয় না। তিনি আমাদের প্রত্যেককে হাতে ধরিয়া কাজ শিখাইয়াছেন। যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম ততই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। আর সর্বাপেক্ষা বেশী অবাক হইলাম তাঁহার সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার প্রণালীতে। তিনি ব্যবহার করিতেন মোটা কনট্রোলের ধুতি, গায়ে একটি পাঞ্জাবী, আর পায়ে সামান্য চটি। বেশভূষার দিকে কোনই লক্ষ্য ছিল না। গবেষণাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। দিনের পর দিন এক নিয়মে এক তালে ল্যাবরেটারীতে কাজ করাতেই তাঁহার একমাত্র আনন্দ। গল্প করিয়া বা দলাদলি করিয়া এক মুহূর্ত সময়ও তাঁহাকে নষ্ট করিতে দেখিনাই। তিনি মিশুক প্রকৃতির মানুষ নহেন—কলেজের অনেকেই তাঁহাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তিনি আদর্শস্থানীয়। পরে যখন অল্পফোর্ডে প্রফেসার হিন্‌সেল উডকে জানিবার সৌভাগ্য হইল তখন তাঁহার সহজ সরল জীবনযাত্রার সহিত আমার মাষ্টার মহাশয়ের জীবনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

এমন গুরুর নিকট কাজ করিলে শিষ্যের জীবনও ধন্য হইয়া যায়। আমি গবেষণার কাজে এক বিমল আনন্দ পাইতে লাগিলাম। নিবিষ্ট চিত্তে সমস্ত দিন কাজ নিয়াই ব্যস্ত থাকিতাম। তাহার পর এম. এসসি পরীক্ষা ভালো ভাবেই পাশ করিলাম।

পরীক্ষা পাশের পর আবার আমার মাষ্টার মহাশয়ের নিকট গেলাম। বলিলাম রিসার্চ করিতে চাই। তিনি তাহাতে বলিলেন, 'বড় শক্ত কাজ, ধৈর্য ধরে এতদিন টিকে থাকতে পারবে?' আমি বলিলাম, পারিব। এখানে আরও একটি কথা না বলিয়া পারিতেছিনা—আমার মার একান্ত ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণা আমাকে এই কাজে অদম্য উৎসাহ দিয়াছে। আমার মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের পিপাসা ছিল অসাধারণ। তাঁহার বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার ছেলেমেয়েরা যেন আজীবন জ্ঞানলাভের সাধনা করিয়া যায়। তাঁহারই আগ্রহে, তাঁহার আশীর্বাদ মাথায় লইয়া আমি শেষ পর্যন্ত ডাঃ বর্ধনের নিকট গবেষণার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। সেই সময় তাঁহার বিশেষ কৃতীছাত্র ডাঃ রামনারায়ণ চক্রবর্তীও ডি. এস-সির জন্য রিসার্চ করিতেছিলেন। যেমন গুরু, তেমনই শিষ্য। দুইজনেই নীরব কর্মী। আমরা সকলেই ডাঃ চক্রবর্তীকে তাঁহার কর্মদক্ষতার জন্য যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতাম। আমাদের সময় বিজ্ঞান কলেজে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কমীন্দ্র চন্দ্র দত্ত, ডাঃ বিদ্যুৎ কুমার ভট্টাচার্য ও ডাক্তার প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মেধাবী ছাত্র গবেষণারত

ছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ কর্মদক্ষতা, জ্ঞানের পিপাসা, গবেষণার প্রতি গভীর অনুরাগ আমাদের সকলের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

আমি যখন ডাঃ বর্ণনের নিকট কাজ আরম্ভ করি তখন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বহু ব্যক্তি বহুবার বলিতে লাগিলেন, "কেন তুমি ওখানে গেলে, তোমার কিছুই হইবে না।" কথাটা আমার কেমন যেন ভাল লাগিত না—আমি অবশ্য উত্তরে কখনও কাহাকেও কিছু বলি নাই। তখন এই কথার তাৎপর্য ঠিকমত বুঝিতে পারিতাম না—এখন মনে হয়, তাঁহারা ইহাই বলিতেন যে 'তোমার ডিগ্রী পাওয়া অত সহজ হইবে না।' আমি কোনও দিকে কোনও কথা না শুনিয়া নিবিষ্ট মনে রিসার্চের কাজ করিয়া যাইতাম। ভাবিতাম কাজ শিখিতে আসিয়াছি আগে তো কাজ শিখি, পরে ডিগ্রীর চিন্তা। কাজের আনন্দেই কাজ, জ্ঞানের আনন্দেই গবেষণা।

১৯৪৭ সালে যখন স্টেট স্কলারশিপ পাইলাম তখন মাস্টার মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'আর কটা মাস থাকলেই তোমার ডি. এসসি. টা হয়ে যেত'। কিন্তু আর যদি অক্সফোর্ড যাইবার সুযোগ না পাই—তাই বাধ্য হইয়াই যাত্রা করিতে হইল।

অক্সফোর্ডের প্রফেসার Sir Robert Robinson, O. M. F. R. S. নোবেল লরিয়েটএর নিকট কাজ করিতে রওনা হইলাম—তিনি তখন রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহার সেক্রেটারী Mrs. Gellhardএর সহিত দেখা করিলাম। খবর পাইলাম দুইদিন পর প্রফেসার তাঁহার ঘরে আমার সহিত দেখা করিবেন। সকাল হইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছি—কত আশা কত আনন্দ—দেখা হইবে বিশ্ব-বিখ্যাত প্রফেসার স্যার রবার্ট রবিনসনের সহিত। অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার অমায়িক সুন্দর ব্যবহারে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। প্রথমে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কাজের বিষয় আলোচনা করিলেন। তাহার পর সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ল্যাবরেটারীতে। ল্যাবরেটারীতে যাইতে যাইতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ছেলেদের সহিত একসঙ্গে কাজ করিতে আমার আপত্তি আছে কি না। আমার ইহাতে কোনই আপত্তি নাই তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। তাহার পর একটি ছোট ঘরে আমাকে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলাম একজন বৃদ্ধ—বয়স তাঁহার প্রায় সত্তরের কাছে—আর একজন আমাদের বয়সী ছেলে কাজ করিতেছেন। ঘরে যাইয়াই প্রফেসার সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার পাশের ঘরে গিয়া কাজ করিতে আপত্তি আছে কি না। আমি এই ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম ভদ্রলোক হয়ত ভাবিতেছেন আমি তাঁহার সহিত কাজ করিতে রাজি হই নাই।

দেখিলাম ঘরখানি খুবই সুন্দর। ঐ ছোট ঘরখানিতে কাজ আরম্ভ করিলাম। আমার সেই ঘরের সঙ্গী হইলেন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ অধ্যাপক গোলডস্‌ওয়ার্দি। আমার নূতন জায়গায় নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে এতটুকুও কষ্ট হয় নাই; কারণ, বৃদ্ধ অধ্যাপক গোল্ড্‌স্‌ওয়ার্দি আমাকে নিজের মেয়ের মত করিয়া সকল সময় সস্নেহে আমায় সব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই বৃদ্ধ ভদ্র লোক পটাশিয়ম লইয়া কাজ করিতেছিলেন। ভদ্রলোককে যথার্থই বিজ্ঞানতপস্বী বলা যাইতে পারে। এই সত্তর বৎসর বয়সেও তাঁহার জ্ঞান লাভের অদম্য উৎসাহ দেখিলে সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়।

ওখানে আমার প্রথম কাজ ঠিক হইল হাইড্রোজেনেশান (hydrogenation) করা। এই কাজে যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন তাহা সকলের ঘরে থাকে না। আমি একটি ইংরেজ ছাত্র ডাঃ বেইলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় ঐ যন্ত্র আছে। তিনি বলিলেন যে নীচে মিঃ কেম্পের ঘরে বেশ ভাল একটা যন্ত্র আছে, তুমি তাঁহার কাছে যাও। মিঃ কেম্পকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তিনি খুব লম্বা এবং মাথায় বিরাট টাক, বয়স চল্লিশের কাছে হইবে। আমার বক্তব্য তাঁহাকে জানাইলাম; কিন্তু মিঃ কেম্প তৎক্ষণাৎ মুখের উপর বলিয়া দিলেন যে, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত—আমি তোমাকে এ যন্ত্র ব্যবহার করিতে দিতে পারি না, কারণ যন্ত্রটি নষ্ট হইয়া যাইবে। কথাটি শুনিয়াই অত্যন্ত লজ্জিত এবং ব্যথিত হইলাম। তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া চলিয়া আসিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, কেন

অকারণে অপমানিত হইতে মিঃ কেম্পের কাছে গেলাম। তাহার পর যে হাইড্রোজেনেটারটা সকলের ব্যবহারের জন্য সেটা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। দেখিলাম দীর্ঘকাল সেটা কেহই ব্যবহার করে নাই। অনেক পরিশ্রম করিয়া নিজের হাতের চুড়িতে পারা ঢেলিয়া সম্পূর্ণ একাই সেটাকে কাজের উপযোগী করিয়া লইলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখনও কাহারও নিকট কোন সাহায্য চাহিব না। সৌভাগ্যক্রমে এই সকল কাজের সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাহা না হইলে সুদূর বিদেশে আমার অবস্থা কি হইত, ভাবিতেই ভয় হয়। মিঃ কেম্পের বিশেষ দোষ ছিল না, কারণ প্রথমে অনেকেই ভাবিয়া ছিলেন যে ভারতবর্ষের ছাত্রী, সে আর কতটুকু জানে? দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম এই ভুল ভাঙ্গিতেই হইবে। যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছি—সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং যিনি আমার হাতে ধরিয়া কাজ শিখাইয়াছেন তাঁহার যেন সম্মান রাখিতে পারি। যে শিক্ষা আমি কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে পাইয়াছিলাম সে শিক্ষা আমাকে যে কি ভাবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিয়াছিল আজিও তাহারা ভুলিতে পারি না। যাহা হউক যে কাজ করিতেছিলাম সে কাজ আমার আশাতীতরূপে সফল হইল। প্রফেসর খুব খুসি হইলেন। তাঁহার ধারণা খুব ভাল হইল। মিঃ কেম্পের নিকটও আমার কাজের সংবাদ পৌঁছাইল। তিনিও বহুদিন হইতে ঐ ধরণের কাজেরই চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি সন্ধ্যার পর রোজই ল্যাবরেটারীতে থাকিতাম। কতদিন বহু রাত পর্যন্ত কাজ করিয়াছি। মেডি রবিনসনএর মুখের কথাই ছিল, মিস মুখার্জি অত পরিশ্রম করিয়ো না। তাঁহার নিকট কত স্নেহ যত্ন লাভ করিয়াছি তাহা বলা যায় না। দিন দশ পরে একদিন সন্ধ্যার পর শুনি কে আমার দরজায় ঠক ঠক করিতেছে। বলিলাম, ভিতরে আসুন। সাধারণতঃ ঐ সময় বড় একটা কেহই ল্যাবরেটারীতে থাকিত না। দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, দেখিলাম মিঃ কেম্প। কে বলিবে সেই মিঃ কেম্প। তিনি অত্যন্ত নম্রভাবে বলিলেন —'আমি অত্যন্ত দুঃখিত।' আমি তখন বলিলাম—আপনার দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই। আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছি—আমার প্রতি আপনার ধারণা যে খুব একটা ভাল হইবে তাহা নহে। এখন ও সকল কথা থাক। তখন মিঃ কেম্প আস্তে আস্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিস মুখার্জী আমি আপনার হাইড্রোজেনেটার ব্যবহার করিতে পারি? আমি তখন সানন্দে রাজি হইলাম। তাহার পর ব্যাপার হইল যে তিনি সব জিনিষপত্র লইয়া আমার ঘরে হাজির হইলেন। আমাকেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার সব কাজটা করিতে হইল। ইহার পর হইতে কেম্পএর সহিত আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতেই আমার সকলেই বেশ ভাল চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, 'ভারতবর্ষে তুমি কোন আচার্যের নিকট কাজ শিখিয়াছ?'

নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই আমার থিসিস শেষ হইল। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ল্যাবরেটারীতে যেখানে ডাই-সন পেরিনস প্রমুখ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করিয়াছেন এবং যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেরা ছাত্রের সমাবেশ হয় সেখানে যে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া কাজ করিয়া আসিতে পারিয়াছি, তাহার জন্য আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এখন দেশে বিজ্ঞান গবেষণার চর্চা অনেক বাড়িয়াছে। এখন যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারা যেন তাঁহাদের উদ্দীপ্ত গবেষণার ফলদ্বারা জগতের নিকট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব আরও বাড়াইয়া তুলিতে পারেন—আজ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের শতবার্ষিকীর দিনে সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

বৌদ্ধ মূলশাস্ত্র গ্রন্থ ত্রিপিটক প্রচারের ইতিহাস

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে ধীরে ধীরে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী সংগৃহীত হয়। এই বাণীসম্ভার বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম—এই তিন ভাগে বিভক্ত বলে বৌদ্ধ মূল ধর্মশাস্ত্রের নাম ত্রিপিটক। এই ত্রিপিটকের কিছু অংশ শ্রাবকভাষিত, কিছু ঋষি এবং দেবভাষিত। কথিত আছে যে ত্রিপিটকে সন্নিবদ্ধ ৮৪,০০০ হাজার সূত্রের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ ৮২,০০০ বিরাশী হাজার সূত্র নিজেই বিবৃত করেছিলেন। অবশিষ্ট দুই হাজার অঙ্গাঙ্গদের।

এই সূত্রগুলি কিন্তু পাণিনির ধরণের সূত্র নয়। এখানে সূত্র অর্থে বোঝায় এক একটা কাহিনী, সমগ্র উপদেশ, Discourse Lesson. ভগবান বুদ্ধ তাঁর ৩৫ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বোধি-প্রাপ্তির সময় থেকে ৮০ বৎসর বয়সে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত নিরন্তর যে উপদেশ, ভাষণ প্রভৃতি প্রদান করেছিলেন, তার সমুচ্চয় এই—ত্রিপিটক—এই কর্ম ও ধর্মবীরের বলিষ্ঠ ও ধর্মিষ্ঠ জীবনে আহার-নিদ্রা করার সময় ছিল কিনা, অথবা কোন অপৌরুষেয় শক্তির বলে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়—তাই কেবল অবাক হয়ে ভাবতে হয়। এই গ্রন্থের মাধুর্য, সৌন্দর্য, জ্ঞানগরিমা, মার্গদেশনা প্রভৃতি আজকের এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। আজ আমরা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শততম প্রতিষ্ঠাবৎসরে "বন্দিরা"র বিশিষ্ট সংখ্যায় এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করবো, যা' ইতঃপূর্বে পর্যালোচিত হয়নি বললেই অত্যুক্তি হয় না। সেটি হচ্ছে ভারতবর্ষের বাইরে যুগে যুগে ত্রিপিটক-প্রচারের ইতিহাস এবং চীন-কোরিয়া-জাপান, অন্যদিকে তিব্বত এবং ব্রহ্ম-শ্যাম-কম্বোজ-সিংহলে প্রচারিত ত্রিপিটকের তুলনামূলক সমালোচনা, অর্থাৎ একই মূলাধার থেকে উদ্ভূত হয়েও এই ত্রিপিটক-ত্রয় পুনরায় কি করে ভিন্ন রূপায়ণ পরিগ্রহ করেছে, তার একটি স্বল্পায়তন বিবৃতি। স্থানাভাবহেতু এখানে তিব্বতীয় ত্রিপিটকের উপরেই আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে।

শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও ত্রিপিটকের এত প্রচারের মুখ্য কারণ—মহামতি রাজচক্রবর্তীকুলধুরন্ধর সম্রাট অশোক (রাজত্ব সময় খৃঃ পূঃ ২৭৪—২৩২)। বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহণের পরে তিনি স্বকীয় জীবনে যে পরমাশান্তি লাভ করেছিলেন, তার বিশ্বব্যাপিনী ব্যাপ্তি তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন—তজ্জন্য ভারতের নিকটবর্তী দেশসমূহেও তিনি তিনি ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন। ত্রিপিটক-রূপে সংগৃহীত ভগবান বুদ্ধের বাণী ভারতের পরিব্রাজক বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশবিদেশে প্রচার করতে লাগলেন। "কালস্য কুটিলা গতিঃ"। যদিও ত্রিপিটকের উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ, তা হলেও ত্রিপিটক ভারতের বাইরে সমধিকভাবে স্বীয় গৌরব ও সুষমা বিস্তার করতে লাগলো। যুগে যুগে কত শত শত, সহস্র সহস্র ধর্মপ্রাণ মহামনীষীরা চীন, কোরিয়া, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্ম, সিংহল, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি অঞ্চলে এই মহামহিমময় গ্রন্থের বাণীপ্রচারের জন্য দেহমনঃপ্রাণ সমর্পণ করে ভারতের সারস্বত ধর্মজিজ্ঞাসার আলো চিরপ্রোজ্জ্বল রেখে গেছেন, কে জানে?

দেশে দেশে প্রচারিত ত্রিপিটকসমূহের মধ্যে তিনটি ত্রিপিটক সমধিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। প্রথমতঃ, থেরবাদীদের পালি ত্রিপিটক—শ্যাম, কম্বোজ, ব্রহ্ম ও সিংহলে এর প্রচলন। দ্বিতীয়তঃ—চীন ভাষায় লিখিত চীন, কোরিয়া ও জাপানে প্রচলিত ত্রিপিটক। তৃতীয়তঃ—তিব্বতীয় ত্রিপিটক।

পাশ্চাত্য মনীষীদের অত্যধিক আগ্রহের ফলে থের-পালি ত্রিপিটকই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে রিস ডেভিডস্ দম্পতীর নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নিখিল বিশ্বে পালি ও বৌদ্ধসাহিত্যের বহুল প্রচারেই তাঁদের

সংস্থাপিত পালি টেক্সট সোসাইটির দ্বারা অনুরুদ্ধ। ১৯৩১-৩১ সালে টাকাকুসু জুনজিরো (Takakusu Junjiro) সম্পাদনায় পালি ত্রিপিটকের অনুবাদ জাপানী ভাষায় প্রকাশিত হয় ৬০ খণ্ডে।

চীনদেশীয় ত্রিপিটকের বিভিন্ন অংশ চীন, কোরিয়া ও জাপানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল; এবং ত্রিপিটকান্তর্গত গ্রন্থসমূহের পাঠেও অনেক পার্থক্য ছিল। আকৃতিতেও ছিল এ ত্রিপিটক অতি পুরাণ ধরণের। কিছুকাল পূর্বে ডাঃ টাকাকুসু এবং ওয়াটানাবে কৈক্যোকু ঐ সকল উপাদান সংগ্রহপূর্বক তার এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেছেন।

তিব্বতীয় ত্রিপিটক

বৌদ্ধধর্ম তিব্বত দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। তখনকার রাজা Srontsestan Sgam-po স্বদেশে লেখ্যভাষার প্রবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনবোধে Thon-mi-san-bho-taকে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গত করবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের উচ্চ আদর্শে তিনি তিব্বতীয় ভাষার ব্যাকরণ এবং লিখিত ভাষার প্রবর্তন করেন। এই লিখিত ভাষার প্রবর্তনের ফলেই তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রসার এবং ভারতীয় ভাবধারার পূর্ণ প্রবর্তন সংঘটিত হয়।

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজা Kuri-srou Ide-bstan সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বসময়ে তিব্বত সমধিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় ঐ সময়ে অনূদিত হয়। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা Ral-pa-can-র সময়েই বৌদ্ধধর্মের আরো প্রসার ঘটে; পূর্বের অনুবাদসমূহের পুনরালোচনা এবং স্থলবিশেষে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নূতন বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ তখন করা হয়। বর্তমান সময়ে তিব্বতীয় ত্রিপিটকে যে সকল গ্রন্থ আছে সেগুলির অর্ধেকের থেকে বেশী পুস্তক ঐ সময়েই অনূদিত হয়। এই অনুবাদ অতি উচ্চাঙ্গের। কিন্তু এই রাজার কতিপয় সমৃদ্ধিশালী প্রজা তাঁর বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যাসক্তির জন্য তাঁর প্রতি বিরূপ হন এবং ফলে, তিনি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন।

তৎপরবর্তী রাজা Glan-dar-ma বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং ঐ সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের কোনও প্রকার উন্নতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে Rin-chen-bzan-po এবং খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পরম সুপণ্ডিত অতীশের প্রাদুর্ভাবের ফলে তিব্বতে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম প্রগতি লাভ করতে থাকে। পুনরায় অনুবাদ-কার্য চলতে থাকে। চীনদেশে এ সময়ে সুঙ রাজত্ব সময়; তখন বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে অবসাদগ্রস্ত। কিন্তু তিব্বতে তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভূত প্রভাব। ঐ সময় থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতে নিরন্তর সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। Sde-dge সংস্করণের পরিশিষ্ট পাঠে জানা যায় যে এই অনুবাদকার্যে ১০৭ জন ভারতীয় ও ২২২ জন তিব্বতী মনীষী আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন।

তিব্বতীয় ত্রিপিটক কঞ্জুর (Kanjur) ও তঞ্জুর (Tanjur) এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সূত্র ও বিনয় এবং দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মন্ত্র-তন্ত্র এবং ভূগোল, ইতিহাস, তর্কবিদ্যা, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থ। যদিও খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই ত্রিপিটক, তাহলেও পিকিং ছি-সি (Sde-dge) এবং নর্থ (Snar-than) সংস্করণ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জাপানের ওটানি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পিকিং সংস্করণটি সংরক্ষিত আছে, তার কঞ্জুর ভাগে তন্ত্রের ৭২৯, প্রজ্ঞাপারমিতার ৩০, রত্নকূটের এক, অবতংসকের এক, সূত্রান্ত ২১৮ এবং বিনয়ের ২৬টী, মোট ১০৫৫টি গ্রন্থ আছে। তঞ্জুরের ভাগে স্তোত্রসমূহের ৬৪, তন্ত্রবৃত্তির ২৬৯০, প্রজ্ঞাপারমিতার ৪২, মধ্যমকের ১৫৮, অতীশের মধ্যমক টীকা দীপঙ্কর-জ্ঞানের ১০৩, সূত্রান্ত-বৃত্তির ৩৯, চিত্তমাত্রের ৭৭, অভিধর্ম শাস্ত্রের ২০, বিনয় টীকা ৪৫, জাতক ৬, পরিকথা ও লেখা ৪৫, হেতুবিদ্যা ৬৭, শব্দবিদ্যা ২৮, চিকিৎসা বিদ্যা ৭, শিল্পবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও আশ্চর্যশাস্ত্র ৪৪, পুনর্বার আশ্চর্যশাস্ত্র ১৪৭ এবং সূচীলিপি ১—মোটের উপর ৩৫২২টী গ্রন্থ। তাহলে মোটের উপর কঞ্জুর ও তঞ্জুরে মিলে ১০৫৫+৩৫২২=৪৫৭৭ গ্রন্থ তিব্বতী ত্রিপিটকে আছে। এবং কঞ্জুর গ্রন্থে রাখবার জন্য

১০৭ তন্ত্রের জন্য ২২৫—৩৩২টি বক্তব্যস্থান বিনির্মিত হয়েছে।

উপরিলিখিত বর্ণনা থেকে এটী সুস্পষ্ট যে ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সর্ববিধ ইতিহাসের দিক থেকে এই গ্রন্থ এক অনন্য, অমূল্য সম্পদ।

চীন-কোরিয়া-জাপানে প্রচারিত ও প্রচলিত ত্রিপিটকে গ্রন্থের সংখ্যা তিব্বতীয় ত্রিপিটকের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়। কারণ শেষোক্ত গ্রন্থের কন্জুরের মাত্র ৪৪৬টি গ্রন্থ চীন-কোরিয়া-জাপানী ত্রিপিটকে দৃষ্ট হয়। সমভাবে, তন্জুরের ১০৭টী গ্রন্থ মাত্র চীন-কোরিয়া-জাপানী ত্রিপিটকে অনূদিত হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের সঙ্গে তুলনায় তিব্বতীয় ত্রিপিটকের অবস্থা একই।

এখানে দুটী বিষয়ের মাত্র উল্লেখ করে আমি এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি। প্রথমতঃ তিব্বতীয় লেখ্য ভাষা সংস্কৃত-আদর্শে অনুপ্রাণিত শুধু নয়, বিনির্মিত বলে তিব্বতীয় ত্রিপিটক থেকে সংস্কৃত ত্রিপিটকের মূল সমুদ্ধার সম্ভবপর! সুদূর মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি ও নেপাল অঞ্চল থেকে যে সকল ত্রিপিটক-গ্রন্থের অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সংখ্যা তুলনায় অতি মুষ্টিমেয়। এটী বলাবাহুল্য, বৌদ্ধ ত্রিপিটক শাস্ত্রের সংস্কৃত মূলটীর আবিষ্কার-প্রচেষ্টা যেমন একান্ত দরকার, তদ্রূপভাবে তিব্বতীয় ত্রিপিটক থেকে যথাসম্ভব মৌলিক সংস্কৃত ত্রিপিটক সমুদ্ধার করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অতীশ-দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, পদ্মসম্ভব, জননী লক্ষ্মীংকরা, জননী চিন্তা প্রভৃতি—যাঁদের অনেকেই বাঙ্গালী—মহামনীষীরা এই সংস্কৃত জ্ঞানগরিমা ত্রিপিটকের সাহায্যে সুপ্রকট করে গেছেন। অন্যদিকে পালি ত্রিপিটকই যে ভগবান বুদ্ধের সত্যধর্মের একমাত্র প্রতীক, তা' ভাববার কারণ নেই। সংস্কৃত ত্রিপিটক, সংস্কৃতে লিখিত বহু বৌদ্ধগ্রন্থ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হলে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ আরো সুপ্রকট হবে। বৌদ্ধ দার্শনিক সকলেই তো সংস্কৃতের মহাধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—সংস্কৃত সাহিত্যরসপিপাসু মাত্রেরই আজ ভাববার ও দেখবার দিন এসেছে—যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য কেবল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, দর্শন, ক্রিয়াকলাপ, কাব্যালঙ্কারেই সীমাবদ্ধ নয়। পালি সাহিত্যে যা' কিছু ছিল বা আছে, তা' সংস্কৃতেও সুলিখিত ছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের হ্রাসপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এ সাহিত্যও সংস্কৃতবাহ্য হলেও—ভারতের বাইরে গিয়ে, বিশেষতঃ তিব্বত, জাপান, কোরিয়া, চীন প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করছে। মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ বেশীর ভাগই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত যাঁরা সত্যই ভালবাসেন, সংস্কৃতির যাঁরা ধারক-বাহক তাঁদের অবশ্য কর্তব্য—এই সমস্ত লুপ্ত রত্ন সমুদ্ধার করা। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন ভারতবর্ষেরই অক্ষয় প্রাণশক্তির এক অপূর্ব প্রকাশ—যা' বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জনসমাজকে এখনও বিমুগ্ধ করে রেখেছে, এবং যাঁরা সেজন্য ভারতবর্ষকে তাঁদের আধ্যাত্মিক মাতৃভূমি বা Spiritual Motherland মনে করেন। এই বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুদ্ধার হলে সংস্কৃত সাহিত্যের পরিধি ও গভীরতা দ্বিগুণ বর্ধিত হবে, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে ভারতবাসী মাত্রেরই অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরাজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ইহাই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ব-ভারতে নালন্দা, নবদ্বীপ প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচলন ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান যুগে বহুলাংশে সেই পুরাতন ঐতিহ্য সগৌরবে বহন করিয়াছে এবং আধুনিক কালের উপযোগী নব নব শিক্ষা পদ্ধতি ও গবেষণার পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

নব বঙ্গের তথা আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এই বিদ্যায়তনের সঙ্গে ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক-রূপে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং পক্ষান্তরে তাঁহাদের নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের অনুপ্রেরণায় স্থাপিত হিন্দু কলেজ বাঙ্গলাদেশে ও ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করে। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তি এবং দল নির্বিশেষে স্বীকৃত হয়। সর্ব প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার ফলে আধুনিক উচ্চ শিক্ষাপদ্ধতি বিজয় গৌরবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে।

ভারতের ইংরাজ প্রভুরা সহজে এই শিক্ষার প্রবর্তন করেন নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পরে বাঙ্গলাদেশে ইংরাজ আধিপত্যের সূচনা হয়। কিন্তু পরবর্তী এক শত বৎসরের মধ্যে ইংরাজ শাসকগণ উচ্চশিক্ষা বিস্তারকল্পে বিশেষ কোনই প্রয়াস করেন নাই। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির সময় ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাত্র এক লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারিত হয়। এই অর্থের মূল্য তখনকার দিনে বর্তমান কালের তুলনায় অনেক অধিক হইলেও সমগ্র বৃটিশ ভারতের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহা নিতান্তই নগণ্য বলিতে হইবে।

হিন্দু কলেজের (১৮১৭) প্রতিষ্ঠা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর ভারতের শিক্ষার ধারা ও সংস্কার সম্বন্ধে নানা প্রকার জটিল সমস্যা ও বাদানুবাদে এই সময়ের অনেক মনীষীই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ও তাহার ফলাফল এই আলোচনাকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন সদস্য লর্ড মেকলের নেতৃত্বে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের নীতি গৃহীত হয় এবং উহা প্রবর্তনের জন্য অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতির সূচনাকালে মেকলে এবং অন্যান্য রাজপুরুষগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ এবং আশঙ্কার কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মেকলে এক ঔদ্ধত্যজনক উক্তি করিয়াছিলেন যে সাধারণ যে কোনও ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের এক শেলফ্ পুস্তক সংস্কৃত এবং আরবি ভাষায় লিখিত সমগ্র পুস্তকাবলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারে। এই মেকলেই আবার ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতীয়গণের ইংরাজের আইন ও শাসননীতি লাভের আকাঙ্ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক বৃটিশ পার্লামেণ্টের এই আশঙ্কার উত্তরে বলিয়াছেন, এমন একদিন আসিবে কিনা জানিনা যেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য শাসননীতি ও শাসন ব্যবস্থার দাবি করিবেন কিন্তু এমন দিন যদি সত্যই আসে তবে উহাই হইবে ইংলণ্ডের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গৌরবের দিন। মেকলের এই উক্তির তারিখ হইতে কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখটি

বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি শ্রীচিন্তামন দেশমুখ

গ্রেট-বৃটেন ও ভারতের ইতিহাসে চিরকাল এই সম্মানের দাবি করিবে।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে মেকলের নেতৃত্বে যে নীতির প্রবর্তন হয় তাহারই পূর্ণ বিকাশ হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে মহামতি স্যার চার্লস উডের ডেসপ্যাচে। এই ডেসপ্যাচের নীতি অনুযায়ী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সী সহরে বর্তমান যুগের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের ফলে একশত বৎসরে ভারতবর্ষের অনেক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় জীবনে ইহার সার্থকতা কতটুকু? পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ইংরাজগণ যতই মহত্ত্ব দাবি করুন না কেন ইহা সত্য যে তাঁহাদের সমগ্র চেষ্টা এবং অপচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের জনগণের শতকরা ৮৮ জন ছিল নিরক্ষর। বর্তমান যুগের যে কোনও সভ্য শাসক বর্গের ইহাতে গৌরবান্বিত বোধ না করিয়া লজ্জিত বোধ করা উচিত নয় কি?

উচ্চশিক্ষার খাতে ব্যয় করিতে ভারতের বৃটিশ শাসকবর্গ যে একেবারেই মুক্তহস্ত ছিলেন না তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিম্নলিখিত তালিকা হইতে সহজেই পাওয়া যায়:—

	বৃটিশ আমলের শেষ বৎসর ১৯৪৭-৪৮ টাকা	ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৯৫৩-৫৪ টাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মোট ব্যয়	৪,৬১,৮২,৮০০	২৮,৬৫,৯১,৫০০
কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে দেওয়া	৬৬,৮৫,৪৩৬	২,৬৭,৮৮,০০০
প্রাদেশিক সরকার সমূহের তহবিল হইতে দেওয়া	৫৮,১৯,৭০৬	১১,১১,৪১,০০০
করদ ও মিত্র রাজ্য সমূহের তহবিল হইতে দেওয়া	১,২৬,২৪,১৩৫	.....

১৯৫৪-৫৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যয়ের মোট পরিমাণ ৩২,৫০,০০,০০০ টাকা। ইহার মধ্যে বর্তমান ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে দেওয়া হয় ২,৮০,০০,০০০ টাকা।

শাসকবর্গের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও বাঙ্গলাদেশে উচ্চশিক্ষা যে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার প্রধানতম কারণ এই যে বাঙ্গলার চিন্তাশীল মনীষী এবং নেতাগণ বুঝিয়াছিলেন যে শিক্ষা ব্যতীত দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথম উচ্চশিক্ষা প্রচলনের জন্য বে-সরকারী কলেজ স্থাপন করিয়া এই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। যুবকগণ যাহাতে স্বল্প ব্যয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই বৎসর পরে তিনি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন নামক কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। উহাই বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলার অন্যান্য কয়েকজন মনীষী ও শিক্ষাবিদ্ বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রেরিত হইয়া উচ্চ শিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ৺আনন্দ মোহন বসু ও ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে সিটি কলেজ, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রিপন কলেজ, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আচার্য ৺গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বারা বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠা কলিকাতায়, বাঙ্গলাদেশে ও সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা প্রসারের পথ প্রশস্ত করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা তখন কেবল মাত্র বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমে পেশোয়ার হইতে পূর্বে রেঙ্গুন পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের উচ্চশিক্ষা তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঙ্গলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঙ্গলার বাহিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণ নিজ নিজ প্রদেশে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। এই সম্পর্কে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ৺মদনমোহন মালব্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার উচ্চ শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টার অনুকরণে বাঙ্গলাদেশের প্রধান প্রধান স্থানগুলিতেও কলেজ স্থাপন চলিতে থাকে। বৃটিশ সরকার মাত্র বিভাগীয় শাসন কেন্দ্রে একটি করিয়া কলেজ পরিচালনা করেন। কিন্তু ইহা দেশের উচ্চ শিক্ষার চাহিদার পক্ষে মরুভূমিতে বিন্দুমাত্র

বারি সিঞ্চনের ন্যায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ছিল। কাজেই বেসরকারী প্রেরণায় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ, রহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, খুলনা দৌলতপুর কলেজ প্রভৃতি মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এই বেসরকারী কলেজগুলিকে অনেকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এখানে সাধারণতঃ অল্পব্যয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকগণ শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষকগণের বেতনও সরকারী কলেজের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা প্রসারে এই সব কলেজের দান অতুলনীয়। বর্তমান খণ্ডিত বঙ্গেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজের সংখ্যা ১২৩। ইহাদের মধ্যে শতাধিক কলেজ প্রধানতঃ ছাত্র বেতনে ও বেসরকারী সাহায্যে চালিত হয়। ইহা স্বীকার্য যে উচ্চ শিক্ষা প্রচারে খৃষ্টীয় মিশনারীগণ কোন কোন স্থানে অগ্রণী হইয়া কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যাও নগণ্য। বাস্তবিক এক শত বৎসরের মধ্যে দেশে যে সামান্য পরিমাণ উচ্চ শিক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহার গৌরব প্রধানতঃ বেসরকারী শিক্ষাবিদ্ ও পৃষ্ঠপোষক ও অধ্যাপকগণের প্রাপ্য। শত বৎসরের হিসাব নিকাশের সময় বাঙ্গালী এই সব শিক্ষাব্রতীগণকে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে স্মরণ করিবে।

শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে দেশবাসী যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ঋণী ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু যাহা পাইয়াছি তাহার পরিবর্তে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য ও উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত? সত্য বটে মাতৃঋণ অপরিশোধনীয়। কিন্তু আমরা কি এই বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি? শুনিয়াছি ভারত-সরকার-গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়-ভাতা-মজুরী-কমিশন শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে এক কোটি টাকা দান করিবেন। কিন্তু বর্তমান যুগে দ্রব্য মূল্যের হিসাব করিলে এই এক কোটি টাকা ৺রাসবিহারী ঘোষ ও ৺তারকনাথ পালিতের দানের পরিমাণের অপেক্ষা কম।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজি মহম্মদ মহসীন, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিতের ন্যায় হৃদয়ের প্রসার অবশ্য সাধারণের নিকট আশা করা যায় না। তবুও এ কথা বলিতে বাধ্য হইব যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত অগণিত ছাত্র ইচ্ছা করিলে আর এক কোটি টাকা এই উপলক্ষ্যে অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া মাতৃসমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিতে পারিতেন। "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"—এই পুরাতন বাক্যের সফলতা প্রমাণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মান প্রদর্শন করিতে ও অপেক্ষাকৃত স্বাবলম্বী করিতে আমরা কি কোনরূপ সম্মিলিত চেষ্টা করিয়াছি? বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাগণ প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহারাই কি শিক্ষিত জনমতকে এ বিষয়ে কোনরূপ সংহত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? ইহার কোন পরিচয় বাঙ্গলার বাহিরে আমার ন্যায় রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট শ্রেণীভুক্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রের নিকট আজিও পৌঁছায় নাই।

মনে পড়ে ১৯২১-২২ সালের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তখন দলে দলে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলি হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। হুঙ্কার ছাড়িলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, "সাত কোটি বাঙ্গালী, মাথা পিছু একটা করিয়া টাকা দাও, আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনতার গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিব।" সেদিনের পরাধীন জনগণ এই ডাকে সাড়া দিতে পারেন নাই। আজ স্বাধীন দেশের অধিবাসীগণের পক্ষে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সমবেত ভাবে চেষ্টা না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার উন্নতির জন্য শুধুই সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত কি না ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধী প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রগণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিলে হয়তো এ বিষয়ে সফলতা লাভ করিতেন।

গ্রন্থজগতের দুই একটি কথা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বই সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত সত্য হইল এই, বইএর বাজারের একদল বড় গাহেক হইলেন তাঁহারা যাঁহারা কস্মিন্ কালেও বই পড়েন না। যাঁহারা বই সত্য সত্যই পড়েন অনেক, তাঁহারা বই কেনেন খুব কম। আমি একজন জমিদারের কথা জানি, বই কেনা তাঁহার একটা বাই ছিল। তখনকার দিনে পয়সার তাঁহার কিছু অভাব ছিল না, তাই যেখানে যে ভাষায় যে ভাল বই পাইতেন কিনিয়া আনিতেন। ভাল বই কথাটার লক্ষ্য ভাল বিষয়ও নয়—ভাল প্রকাশ-ভঙ্গিও নয়; ভাল বই শব্দের মুখ্য অর্থ ভাল কাগজে ভালভাবে ছাপা, ভাল আকার, এবং ঝকঝকে তকতকে বাঁধাই। বই কিনিয়া তিনি একটি সুন্দর ঘরে আলমারীর তাকে তাকে সাজাইয়া রাখিতেন,—নিজেও আর ছুঁইতেন না, অপর কাহাকেও কোনও দিন ছুঁইতে দিতেন না। কিন্তু যত্নের কোনও অভাব ছিল না; পোকা-নিবারক বহুমূল্যের বার্ণিশ দিয়া নিত্য ঝাড়িয়া পুঁছিয়া তাহাদের উজ্জ্বল্য এবং মর্যাদা নিরন্তরই বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইত। গ্রন্থগুলি ব্যবহার হইত শুধু দূরদৃষ্টির দ্বারা—অভিজাত কোন অতিথি আসিলে জমিদার মহাউৎসাহ সহকারে তাঁহাকে তাঁহার গ্রন্থাগারে লইয়া গিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বইগুলি দেখাইতেন—বাঙলা-ইংরাজী, আরবী-ফার্সী, সংস্কৃত—ইউরোপের অন্যান্য ভাষারও কিছু কিছু। দেখিয়া সকল অতিথিই তাজ্জব বনিয়া যাইতেন, আর তাহাতেই ছিল এই জমিদারের গর্বজনিত অসীম আত্ম-প্রসাদ; লোকে দূর হইতে দেখিয়া তাজ্জব বনিয়া গেলেই তিনি বহু মূল্য দিয়া দেশ দেশান্তর হইতে অনেক কষ্টে এই সব ভাল ভাল বই যোগাড় করিবার একটা পরম সার্থকতা মনে মনে অনুভব করিতেন।

জমিদারী প্রথা লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের গ্রাহকের এই বিশেষ শ্রেণীটিও যে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এমন কথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। আধুনিক নাগরিক অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এই শ্রেণীটির একটি রূপান্তরিত মূর্তি দেখা যায়। ড্রইং রুমে অন্য কিছু আসবাব; কিন্তু যেটুকু তাহা পরিচ্ছন্ন এবং রুচি-সঙ্গত। তাহার ভিতরে একটি বিশেষাকৃতির বইয়ের তাক, তাহার ভিতরে কয়েকখানি বাজারের সেরা বই—সব জিনিসটিই অনুগ্রহভাবে নয়নরোচন—এবং গৃহশোভন। আপনি যদি কৌতূহলবশতঃ একখানি গ্রন্থ টানিয়া স্থানভ্রষ্ট করেন তবে গ্রন্থের মালিক ভদ্রতার খাতিরে মুখে কিছু বলিবেন না, কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইবেন। বইগুলির আশে পাশে হয়ত আলগা ফ্রেমে বাঁধান দুই একখানি চিত্র বা আলোকচিত্র আছে,—দুই একটি ফুলদানি আছে—দুই একটি বিশেষ ধরণের পুতুল বা খেলনা আছে, ইহার কোনওটাই ধরিবার নয়, পড়িবারও নয়—সবটাই সৌখিন আসবাব।

আজকাল শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মতটিকেই প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায় যে, শিশুদের কাছে বইকে ঠিক আকর্ষণীয় খেলনার সামগ্রীর মতন করিয়াই দিতে হইবে; খেলায় মত্ত শিশু আর পাঁচটা খেলনাকে নিজের আগ্রহেই যেমন খুঁজিয়া টানিয়া লয়—বই সম্বন্ধেও যেন তাহাই করে। কিন্তু বই সম্বন্ধে এই নীতিটি মানুষের শৈশব এবং কৈশোর পর্যন্তই আমার কার্যকরী বলিয়া মনে হইয়াছে। যৌবন হইতেই আর একটা সত্য আবার আমাদের প্রণিধানের বিষয় হইয়া ওঠে। কলেজের যে সব ছেলেরা নূতন নূতন ঝকঝকে তকতকে বই আনিয়া টেবল সাজাইয়া রাখে তাহাদের পড়িবার আগ্রহটা ছেঁড়া-পুঁথিওয়ালা বা অল্প পুঁথিওয়ালা বা অ-পুঁথিওয়ালাদের আগ্রহ অপেক্ষা বেশি দেখা যায় তাহা নয়; অত সহজে সব সময় ভাল ভাল বই হাতের কাছে পাওয়াটা তাহাদের যথেষ্ট আগ্রহ-উদ্রেকের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায় না-ত? অন্ততপক্ষে আমার বিশ্বাস পুরণো ছেঁড়াপুঁথি সংগ্রহ করিয়া বা পরের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া—

অথবা গ্রন্থাগার হইতে বই সংগ্রহ করিয়া যাহাদের পড়াশুনা করিতে হয় তাহাদের ঘর, আগ্রহ ও নিষ্ঠা এই সংগ্রহ চেষ্টাতেই বাড়িয়া যায়; অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাদের পড়া মোটের মাথায় ভাল হয়।

আমরা যখন দেশ-গাঁয়ে পড়িতাম তখন দেশ-গাঁয়ে বইয়ের আমদানী খুব কম ছিল। অল্প বই ত দূরের কথা বৎসরান্তে পাঠ্য বই কেনাও মহা হাঙ্গামার বিষয় ছিল, কারণ শহর ব্যতীত সেগুলি সংগ্রহ করিবার অন্য উপায় ছিল না। ইহার ফলে আমাদের ভিতরে একটা প্রথা তখন পর্যন্ত বেশ চালু ছিল; তাহা হইল বই হাতে লিখিয়া লওয়া। গোটা বই-ই আমরা হাতে লিখিয়া লইতে দেখিয়াছি। আর পুরনো বই যোগাড় করিয়া তাহাতে দুই একটা নূতন বিষয় হাতে লিখিয়া যোগ করিয়া লওয়া—ইহা ত আমরা প্রায় সকলেই করিতাম। ইহাতে অসুবিধা অনেক হইত বটে, কিন্তু উপকারও কিছু হইত। পড়াশুনার ব্যাপারে একটা গভীর নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় আসিত।

বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বেও কিন্তু বই বলিতে তালপাতার পুঁথি বা দেশী তুলট কাগজের উপরে লেখা পুঁথির প্রচলন বেশ ছিল। মুদ্রিত পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা বা দুর্মূল্যতাই যে ইহার মুখ্য কারণ ছিল ঠিক তাহা বলা যায় না;—অনেকখানি কারণ ছিল আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থবিমুখতা। আমাদের সাহিত্যও কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত দেশ গাঁয়ে শাস্ত্রের সহিত অভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত হইত। গীতাচণ্ডীই যে আমাদের শাস্ত্র ছিল তাহা নয়, রামায়ণ মহাভারত, শিবায়ন, মঙ্গল কাব্য, পদাবলী, চরিতগ্রন্থ, এমন কি বিবিধ পাঁচালীও এক সঙ্গেই আমাদের হরি-পিপাসা এবং মোক্ষ-পিপাসা মিটাইত। আর এই সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে আর একটা বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে মুদ্রণের দ্বারা গ্রন্থের অমর্যাদা হয়। বিভিন্নপ্রকারের যন্ত্রের চাপে পড়িয়া পড়িয়া গ্রন্থের অন্তর্নিহিত মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। এই জন্য অনেক সময় দেখিয়াছি, সভায় মুদ্রিত গ্রন্থ সুলভ হইলেও জনসাধারণের একটী অংশ তাহা কখনই ব্যবহার করিতেন না; তালপাতায় বা তুলটকাগজে গ্রন্থ লিখিয়া লইতেন। গ্রন্থলেখা এবং লেখানো উভয়ই সে সময়ে অতিশয় পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। ধনবান্ লোক পুঁথি লেখাইয়া পুণ্যার্জনের চেষ্টা করিতেন।

পুঁথি সম্বন্ধে এই মধ্যযুগীয় সংস্কার অবশ্য শ্রদ্ধেয় নহে। কিন্তু পুঁথিকে অবলম্বন করিয়া অনেক সময় যে যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখিয়াছি তাহা অবশ্যই শ্রদ্ধার্হ। ভারতবর্ষের জৈন সাধুগণের মধ্যে পুঁথিলিখনচর্চা এখনও সুপ্রচলিত। জৈন সাধুগণ সাধারণতঃ মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠ করেন না। ধর্ম-সংস্কার বাদ দিলেও তাঁহাদের মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিবার কতগুলি বাস্তব বাধা আছে। জৈন সাধুদের স্থায়িভাবে কোথাও বসবাস করিবার নিয়ম নয়, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ধর্মের আচরণ এবং ধর্মের প্রচারই তাঁহাদের কাজ। এই ভ্রমণ ব্যাপারেও তাঁহারা কখনও কোন যানবাহন ব্যবহার করেন না,—কারণ পথে যানবাহন ব্যবহার করা তাঁহাদের মূল অহিংসাবাদেরই বিরোধী। এখনও তাই বছরে পাঁচ-সাত শ' মাইল তাঁহারা হাঁটিয়া চলেন। এই হাঁটিয়া চলিবার সময় তাঁহাদের সামান্য বস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্র তাঁহাদের নিজেদের বহন করিতে হয়; আর বহন করিতে হয় পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহ। কিন্তু অত্যাবশ্যক জৈন শাস্ত্রও নেহাৎ কম নহে, খাস পঞ্চাশেক হইবে। এই পঞ্চাশখানি তালপাতার বা তুলট কাগজের পুঁথি বহন করিয়া বেড়ানও একজনের পক্ষে সম্ভব নহে তাই তাঁহাদিগকে গ্রন্থ-সংক্ষেপ করিতে হয়। গ্রন্থ-সংক্ষেপ তাঁহাদিগকে দুইভাবে করিতে দেখিয়াছি; প্রথমত তাঁহারা অল্পবয়স হইতে জৈনশাস্ত্র মুখস্থ করিতে থাকেন। বহু সাধু দেখিয়াছি যাঁহাদের অশিতিপর বয়স পর্যন্ত মুখস্থ। অতিশয় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া বাদবাকি গ্রন্থ তাঁহারা পুঁথিতে লিখিয়া লন। এই পুঁথিলেখা বিষয়ে স্বাভাবিকই তাঁহাদের একটি বিশেষ নিয়মের দিকে মন দিতে হয়, সে নিয়মটি হইল অতি ছোট অক্ষরে পুঁথি লিখিবার নিয়ম—যাহাতে গ্রন্থের কলেবর বহন করিবার পক্ষে অনুপযোগী না হয়। অল্পদিন এক্ষবার এই জাতীয় ক্ষুদ্রাকারে লিখিত গ্রন্থ দেখিয়াছি; তাহার মধ্যে একখানি গ্রন্থ দেখিয়াছি, পনর ইঞ্চি লম্বা এবং তিন ইঞ্চি পাশ—ইহার দুইপাশে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করিয়া দুই ইঞ্চি বাদ দিয়া এবং উপরে নীচে আধ ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করিয়া বাদ দিয়া শ্লোক লেখা

হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কিকিদধিক আড়াই শত করিয়া শ্লোক লেখা হইয়াছে। ফলে একখানি মাঝারি আকারের গ্রন্থের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় চল্লিশখানি গ্রন্থের নকল-করা হইয়াছে। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুই পড়িতে পারিলাম না, কোনও দাগকে কোনও অক্ষর বলিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। কিন্তু লেখক নিজে সত্র তত্র গড় গড় করিয়া পড়িয়া গেলেন। অন্যান্য সাধুদেরও পড়াইয়া দেখিলাম, দেখিলাম তাঁহাদেরও মোটামুটি পড়িয়া যাইতে কোনও অসুবিধা হয় না। এইভাবে এইসব সাধুদের মধ্যে পুঁথি-নকল করারই বিশেষ একটা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কত সংক্ষেপে অথচ কত সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, ইহার জন্য সাধনা ও অধ্যবসায় দেখিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়।

প্রারম্ভে একজাতীয় লোকের কথা উল্লেখ করিয়াছি যাঁহারা শুধু গ্রন্থ কিনিয়া ঘর সাজান কিন্তু গ্রন্থ পড়েন না। কিন্তু আর একদল লোক দেখিয়াছি যাঁহাদের সত্যকারের পরিচয় দিতে হইলে গ্রন্থ-পাগল ব্যতীত অন্য আখ্যা দেওয়া যায় না। আমরা একটা চলিত-কথা সবাই জানি, মাছের চুপড়ির গন্ধ না হইলে মেছোনীর রাত্রে ঘুম হয় না। ঠিক এমন ভাবেই দুই একজন লোক নিজের চক্ষে দেখিয়াছি; সারাদিনে নিজেদের চারিপাশে কিছু বই ছড়াইয়া না রাখিলে তাঁহাদের শুধু ঘুম নয়, আহার-বিহারও ঠিকভাবে হয় না। এই প্রসঙ্গে বহুশ্রুত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় কাশীধামের মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতে পারি। এক খানি ঘরের সর্বত্রই বই—আনাচে-কানাচে বই—মেঝেতে ভাগে ভাগে রক্ষিত বিবিধ বই ও কাগজপত্র—মাঝখানে ছোট একখানি বিছানার মত তাহাতে একটি তাকিয়া; দিবসে তাহা বসিবার আসনের কাজ করে—নিশীথে তাহাই শয্যারূপে ব্যবহৃত হয়। একটি ঘরে নিশিদিনে খালি বই—আর বই—আর শুইয়া বসিয়া একটি মানুষ।

কলিকাতায় দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে দেখিয়াছি। যে ঘরে প্রায় সদা সর্বদা থাকিতেন তাহা বইয়ে বইয়ে ঠাসা না থাকিলেই তাঁহাকে কেমন অস্বস্তি ভোগ করিতে দেখিতাম; ফাঁকা ঘরেই যেন তিনি হাঁপাইয়া উঠিতেন। চেয়ার টেবলে তিনি কাজ করিতে ভাল-বাসিতেন না, তাহার মুখ্য কারণ—তাহাতে হাতের কাছে এবং নিজের চারিদিকে ছড়াইয়া বই রাখা যাইত না; তাই একটি খাটে বসিয়া লইতেন—আর চারিদিকে বই ছড়াইয়া লইতেন। বাড়ি হইতে যখন বাহির হইতেন তখন কয়েকটি খামায় ভরিয়া বই লইতেন গাড়ীতে। পায়খানায় যাইবার সময় হাতে কিছু মাসিকপত্রিকা এবং এডগার ওয়ালেসের ডিটেকটিভ উপন্যাস লইয়া যাইতেন। একদিন দুপুরের পর গিয়া দেখি তিনি খানা ভরিয়া বই বাছাই করিতেছেন—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—সেদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে যাইবার কথা! এক-দিনের কথা বলিয়া শেষ করি। অতিরিক্ত রক্তের চাপে এবং বই পড়ার জন্য অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তাঁহার বাম চক্ষুটির রক্তবাহী শিরা ফাটিয়া গিয়া চক্ষুটি নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহাকে সেই অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজের একটি ক্যাবিনে রাখা হইল। সেই অবস্থায় সেই ক্যাবিনে বসিয়া তিনি একটি কলেজের লোককে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, রাত্রের জন্য তাঁহাকে দুই চারিখানি বই পৌঁছাইয়া দিতে পারে কি না। সে লোকটি বলিল,—'সর্বনাশ, এই অবস্থায় আপনি এইখানে আবার বই পড়বেন?—বলেন কি?' তিনি চুপি চুপি আবার উত্তর করিলেন,—'না রে না, পড়ব না,—এই একটু হাতে নাড়া-চাড়া করব!'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয় ★

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়

একশ বছর আগে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের হাতেই ছিল। এর চ্যান্সেলার ছিলেন রাজপ্রতিনিধি, রেকটার ছিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাষ্ট্রপাল আর ভাইসচ্যান্সেলারও ছিলেন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি পদে পদেই বিদেশীর শাসন ও চোখরাঙানী মেনে নিয়ে কাজ করতে হ'ত পরাধীন বাঙালীকে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইচ্যান্সেলার নিয়োগে প্রথম ব্যত্যয় ঘটল। বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বাঙালী এই পদ অলঙ্কৃত করলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ এলেন ভাইসচ্যান্সেলার হয়ে।

বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে বাংলাদেশ তখন স্বদেশী আন্দোলনে মেতে উঠেছে। বিদেশী পণ্যবর্জন নীতির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী-শাসিত, বিদেশী-পরিচালিত, বিদেশী শিক্ষার কেন্দ্ররূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্জন করবার ধুয়া তখন প্রবলভাবে চলছে। তখনকার সাময়িক পত্রিকাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলদীঘির সোলামখানা এবং তার ভাইসচ্যান্সেলার আশুতোষকে স্যারসরস্বতী বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট তারিখে বাংলা দেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হল। আর একদিকে স্যার আশুতোষ বিদেশীশাসকপরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগান্তকারী সংস্কার সাধন করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদিন কেবল পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষা পাশের ডিগ্রী ডিপ্লোমা দেওয়াই এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। এইবার তাকে বিদ্যার পীঠস্থান করে গড়ে তুলতে আশুতোষ নির্ভীক ভাবে এগিয়ে এলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যে-বিজ্ঞানে-গবেষণায় পৃথিবীর মধ্যে যাতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে তারই জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। অপরদিকে নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষাকে জনসাধারণের অধিগম্য করে তোলা তাঁর ব্রত স্বরূপ হয়।

১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং স্যার তারকনাথ পালিতের মুক্তহস্তে দান স্যার আশুতোষের কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করল—সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুব্যবস্থা হল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকেই স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি মুদ্রণালয়ের অভাব বোধ করছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ছাপার কাজকর্ম হেয়ার প্রেস, কটন প্রেস, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রভৃতি বাইরের কয়েকটি প্রেসে করা হত। তাতে একদিকে যেমন ব্যয়বাহুল্য হত অন্যদিকে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য সর্বদা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। নিজস্ব একটি মুদ্রণালয় থাকলে এই অসুবিধা দূর হয়। তাই আশুতোষ অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-মুদ্রণালয়ের মত কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করলেন—তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের কাজ হবে এবং তার অধ্যাপক ও কৃতীছাত্রের গবেষণার কাজও এই মুদ্রণালয়ে ছাপা হয়ে তা বিশ্বের দরবারে খ্যাতি অর্জন করবে।

আশুতোষ ছিলেন গুণগ্রাহী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। স্নাতকোত্তর বিভাগে রাধাকৃষ্ণন, রমন, মেঘনাদ সাহা,

---

★ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ের গোড়ার কথায় উপকরণ সংগ্রহে উহার প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র বাসুমহাশয়ের সাহায্য লেখক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন।

সত্যেন বোস, ভাণ্ডারকর, হেম রায় চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র, সুনীতিকুমার প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীকে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান করে আনলেন। তাঁদের পাণ্ডিত্য ক্লাসঘরেই শেষ হল না। তাঁদের নিজেদের নতুন নতুন গবেষণা এবং তাঁদের উৎসাহ ও পরিচালনায় তাঁদের কৃতী ছাত্রদের রচনা ও গবেষণার কাজও দ্রুত এগিয়ে চলল। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের খরচায় তাঁদের রচনা প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্য তিনি এই সকল গ্রন্থের লাভের সব টাকা লেখকদেরই দিয়ে দিতেন। অবশ্য তাঁর অভাবের পর এই নিয়ম আর রইল না। বই ছাপানোর সকল খরচ বাদে লাভের অর্ধাংশ লেখকদের দিতে আরম্ভ করা হল—এখনও সেই নিয়মই চলছে।

স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক এবং গবেষকদের রচনা প্রকাশের সুবিধার জন্য আশুতোষ আরও ব্যবস্থা করলেন। 'দি জার্ণাল অব দি ডিপার্টমেন্টস্ অব লেটার্স' এবং 'দি জার্ণাল অব দি ডিপার্টমেন্টস্ অব্ সায়েন্স' বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয় থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকল। এই পত্রিকা দুটি মূল্যবান রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে কাগজের অভাবের জন্য এই পত্রিকা দুটি বন্ধ হয়ে আছে। বর্তমানে আবার ঐ পত্রিকা দুখানি প্রকাশের ব্যবস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯২১ খৃস্টাব্দে আশুতোষ 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকাটি কিনে নিলেন এবং এখন পর্যন্ত এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া ও সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য আশুতোষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা বিনামূল্যে বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। আজও পর্যন্ত 'দি ম্যাথেমেটিক্যাল বুলেটিন' 'দি জার্ণাল অব্ দি ফিজিক্যাল সোসাইটি', 'দি জার্ণাল অব্ দি কেমিক্যাল সোসাইটি', 'দি জার্ণাল অব দি জিওলজিক্যাল অ্যাণ্ড মাইনিং সোসাইটি', 'দি জার্ণাল অব্ দি সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি', এবং বাংলার 'দর্শন' পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের খরচেই ছাপা হয়।

বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয় থেকে প্রায় হাজার খানেক মূল্যবান গ্রন্থ ছাপা হয়েছে। বাইরের কোন প্রকাশক এধরণের বই প্রকাশ করতে সাহস করেন না—কারণ এই সকল বইএর অধিকাংশই পণ্ডিতসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ের এটি একটি বিশেষ দান।

আজকের রোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বৃহৎ বাড়ীতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রায় দুশ কর্মী কাজ করছেন তার পিছনে যে ইতিহাস আছে সে সম্বন্ধে দুটি একটি কথা না বললে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

মুদ্রণালয় স্থাপনের জন্য আশুতোষ ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর সিণ্ডিকেটে একটি আর্থিক পরিকল্পনা পেশ করেন। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে একটি মেশিন প্রেস সমেত মুদ্রণালয়ের অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ১২ই জুন তারিখে সিণ্ডিকেটের সম্মতিক্রমে শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যথা ক্রমে প্রুফরীডার ও অ্যাসিসট্যাণ্ট পদে নিয়োগ করা হয়। সেই সঙ্গে চোদ্দজন কম্পোজিটার ও ডিষ্ট্রিবিউটার এবং একজন পিয়নকে নিযুক্ত করা হয়। হেয়ার প্রেসের প্রিণ্টার উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রতিদিন তাঁর সুবিধামত আসতেন এবং কম্পোজিটারদের কাজ কর্ম দেখে যেতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রিণ্টারের কাজ করতেন। মেশিন চালাবার জন্য পাঁচু নামে একজন দারোয়ান নিযুক্ত হল। সে ও তার সাহায্যকারীরা কাজের নির্দিষ্টহারে পারিশ্রমিক পেত।

বর্তমান 'ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন' এর বাড়ীর পশ্চিমদিকে একখানি একতলা বাড়ী ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়-মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বাড়ীতে দুখানি মাত্র ঘর ছিল। ছোট ঘরটিতে প্রুফরীডার ও অ্যাসিসট্যাণ্ট বসতেন এবং বড় ঘরটিতে মেশিন ও প্রেস প্যালারি ছিল। সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের পদ তখনও হয় নি। তিন মাস কাজ চালাবার পর একজন সুপারিনটেনডেণ্ট নিয়োগের দরকার হল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সুপারিশে শ্রীযুক্ত কার্তিক চন্দ্র ঘোষগুপ্ত মহাশয়কে আশুতোষ ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর প্রথম সুপারিনটেনডেণ্ট পদে নিয়োগ করলেন। তিনি কাজ করতে এসে দেখলেন 'মিনিট্‌স্', 'ক্যালেণ্ডার' ইত্যাদি অনেক বছর ছাপা না হয়ে পড়ে আছে।

মুদ্রণালয়ের প্রসার না করে সে কাজ তোলা সম্ভবপর নয়। কার্তিকবাবুর পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি ক্র্যাটবেড প্রিন্টিং মেশিন, একটি ট্রেডল্ মেশিন ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম কেনবার এবং অতিরিক্ত প্রুফরীডার কম্পোজিটার নিয়োগেরও অনুমতি সিণ্ডিকেট সভা থেকে মঞ্জুর হল। মুদ্রণালয়ের প্রসারের জন্য কলুটোলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ভবানী দত্ত লেনের একটি দোতালা বাড়ী ভাড়া করা হল। সেই বাড়ীটি অত্যন্ত জীর্ণ ছিল। কয়েকমাস পরে সেই বাড়ীর দোতালার এক অংশ হঠাৎ রাত্রে ভেঙ্গে পড়ে। তাড়াতাড়ি প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের একখানি তেতালা বাড়ী ভাড়া করে মুদ্রণালয়টিকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময় মেশিনের সংখ্যা বেড়ে পাঁচ এবং কম্পোজিটার প্রভৃতি প্রায় পঁয়ত্রিশ জন হয়।

প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে মুদ্রণালয় থাকার সময় ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর রাত্রে কি করে একতালায় আগুন ধরে যায় তাতে তার অনেক অংশ পুড়ে যায়। ইতিমধ্যে ল-কলেজের পশ্চিমদিকের বস্তিগুলো তুলে দিয়ে সেখানে বারভাঙ্গা বিল্ডিং তৈরী হয়ে গিয়েছিল এবং ল-কলেজ তার চারতালায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। ল-কলেজের আগের বাড়ীটি খালি হওয়ায় মুদ্রণালয় সংগঠনের কাজ প্রথমত সেখানেই করা হয়; কিন্তু বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর দক্ষিণদিকের একতালা ও দোতালাটি মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প থাকায় সেইখানেই নেওয়া হয়। কিন্তু রেজিষ্ট্রার আপিসের স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে মুদ্রণালয়টিকে ল-কলেজের পুরোনো টাইল শেড আনতে হল। এখানে মুদ্রণালয় আনবার পর আরও একটি বড় মেশিন কেনা হল এবং কর্মচারীর সংখ্যাও বাড়তে সুরু হল। এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ে সংস্কৃত বা বাংলা বই একটিও ছাপা হয়নি। এইবার ঐ দুই ভাষাতেও বই ছাপবার ব্যবস্থা হল। ষিবো সাহেব ও পণ্ডিত বহুবল্লভ শাস্ত্রীর ধাতুকোষ এবং রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' প্রকাশের ব্যবস্থা হল। ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস্ অব দি হিন্দুস্' গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থাও করা হল। ষিবো সাহেবেও ও শাস্ত্রীমহাশয়ের সংস্কৃত গ্রন্থ ষ্টিরিও টাইপ করে মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে কার্তিকবাবু রেজিষ্ট্রারের আপিসে বদলী হয়ে যান। তাঁর পরে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক মহাশয় সুপারিনটেনডেণ্ট হয়ে এলেন। তিনি আগে কটন প্রেসে, গোলাপসিংহের প্রেসে এবং এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে কাজ করে আসছেন। তাঁর সময়ে মুদ্রণালয়ের যথেষ্ট উন্নতি হয়। অতুলবাবু যেমন সঙ্গীতজ্ঞ তেমনই অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর রচিত 'আশুতোষের ছাত্রজীবনী' নামক বইখানি বহুবার ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় মেয়েদের পাঠ্য ছিল। অতুলবাবু ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পরে ১লা জুলাই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এক বছরের জন্য প্রধান প্রুফরীডার শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস সুপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গাঙ্গুলী মহাশয় সুপারিনটেনডেণ্ট হন। তিনি এখানে আসবার আগে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া প্রেসে কাজ করতেন। গাঙ্গুলী মহাশয়ের সময়ে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাসে মুদ্রণালয় তার নিজস্ব বাড়ী হাজরা রোডে স্থানান্তরিত হয়। দীনবন্ধুবাবু ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন দিল্লীতে কাজ নিয়ে চলে যান। তাঁর পরে অ্যাসিসটাণ্ট সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন মহাশয় ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন ঐ কাজ গ্রহণ করেন। তিনিও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুআরি দিল্লীতে কাজ নিয়ে চলে যান। ১২ই ফেব্রুআরি থেকে আমাকে ঐ কাজের ভার দেওয়া হয়।

পিতার সুযোগ্যপুত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তিনি যখন ভাইস্‌চ্যান্সেলার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের মত মুদ্রণালয়েরও প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। আগে এই মুদ্রণালয়ে মনোমেশিন ছিল না। তাঁর সময়েই একটি মনো-অপারেটিং মেশিন ও মনোকাষ্টিং মেশিন কেনা হয়। তাঁরও পিতার মতই সকল দিকে লক্ষ্য ছিল। তিনি বাংলা পরিভাষা বিভাগ করেন এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বানানের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম প্রকাশ করেন।

স্যার আশুতোষ যে আদর্শ নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন নানা দুর্গতি সুগতির মধ্যে সেই আদর্শ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়টি এখন ভারতের বিশিষ্ট মুদ্রণালয়ের মধ্যে অন্যতম। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শত বার্ষিকীর দিনে এই প্রতিষ্ঠানের সকলদিকে সকল প্রকারে যাতে উন্নতি হয় সেদিকে দেশবাসীর বিশেষ দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আচার্য শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত
(১৫ই মে, ১৯৫৪ হইতে)

পুরোনো স্মৃতি

আশুতোষ বাগচি

১৯১৫ সনের সেপ্‌টেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আপিসে আমি চাকরি পাই। আমার চাকরি পাওয়ার কাহিনী বিবৃত করলে চল্লিশ বৎসর পূর্বে কোন্ পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারীর নির্বাচন ও নিয়োগ হত তার একটা ধারণা হবে।

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের একটা মেসে থেকে আমি তখন চাকরির খোঁজে আছি; মুরুব্বি বলতে কেউ নাই। এক সময় স্কাশন্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেম, সে কথা বলতে ভয় পাই—তখন প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ চলছে। মেসে আমার এক বন্ধু খবর পান রেজিস্ট্রার আপিসে না-কি কাজ খালি আছে। কোন্ বিভাগে, কি কাজ, কি রকম যোগ্যতার লোক চাই—সে-সব কিছুই জানা নেই। আমার বন্ধু সেই কাজের সন্ধানে আমাকে ইউনিভার্সিটি আপিসে যেতে বললেন এবং আমাকে একরকম ঠেলেই পাঠিয়ে দিলেন। আমি কোনোদিন ইউনিভার্সিটির চৌকাঠ মাড়াই নি, আমার দুঃসাহসে আমি নিজেই মনে-মনে আশ্চর্য হচ্ছিলেম। হার্ডিং হস্টেলে আমার এক বাল্যবন্ধু থাকতেন, অগত্যা তাঁরি শরণ নিলেম। আপিসে তাঁরও কেউ চেনা লোক ছিলেন না। তখন তিনি আবার তাঁর এক হস্টেল-চাম্‌এর সঙ্গে আমাকে আপিসে পাঠিয়ে দিলেন। সে-ভদ্রলোক আমাকে ইউনিভার্সিটি প্রেস-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটকের (শুনলেম সম্প্রতি তিনি স্বর্গত হয়েছেন) আপিসে আমাকে পৌঁছে দিয়ে তাঁকে বললেন, "ইনি আমার বন্ধু, আপিসে না-কি কাজ খালি আছে, আপনি যদি এঁকে একটু সাহায্য করেন এ-বিষয়ে।" এই বলে তিনি চলে গেলেন। ঘটক সাহেব (ঐ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন) জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি প্রুফ পড়তে জানেন।" বললেম কিছুকিছু জানি। তাতে তিনি বললেন, "ভালো জানেন?" উত্তরে আমি বললেম টেস্ট্ করতে পারেন। তখন তাঁর আপিসের একজন প্রুফ-রীডারের সঙ্গে কয়েক গেলি প্রথম-রীডিঙের প্রুফ দেখতে দিলেন। দেখলুম আরো জনকয়েক ভদ্রলোক প্রুফরীডিঙের পরীক্ষা দিচ্ছেন আমারি মতো। ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট পরে প্রুফ দেখা হয়ে গেলে সুপারিনটেন-ডেন্ট আমাদের দেখা প্রুফগুলো নিয়ে তাঁর ঘর থেকে চলে গেলেন। আমরা চুপ করে বসেই আছি। খানিক বাদে ফিরে এসে তিনি এক পিওনের হাতে একটা স্লিপ দিয়ে তার সঙ্গে আমাকে দ্বারভাঙ্গা বিল্‌ডিঙে পাঠিয়ে দিলেন। দ্বারভাঙ্গা ভবনের দোতলায় পশ্চিমদিকের যে-ঘরটায় ইন-স্পেক্টার অব্ কলেজেস্ বসেন এখন সেটা ছিল তখন Asst-Registrar-এর ঘর। সেই ঘরে আর একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক বসতেন; পরে জানলেম তিনি আপিসের প্রবীণতম বিচক্ষণ কর্মচারী—নাম অমৃতলাল বসু। এক-হারা চেহারা, কপালটা চওড়া, অল্প চুল, মুখে বসন্তের দাগ, একগাল পান, গায়ের রং ময়লা। আপিসের কাজে তখনকার ভাইস-চ্যান্‌সেলারের ডান হাত ছিলেন তিনি। প্রেসের পিওন তাঁর কাছে আমাকে পৌঁছে দিয়ে সেই স্লিপটা তাঁর হাতে দিয়ে চলে গেল। অমৃত বাবু আমাকে বসতে বলে এক তাড়া প্রুফ সংশোধন করতে দিলেন। যিনি কপি ধরেছিলেন তাঁর নাম জয়ন্তী বাবু। সাতটা বেজে গেল—রীতিমত রাত। চাকরির সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই, অথচ প্রুফ পড়ছি তো পড়ছি-ই। মনে উত্তাপের সঞ্চার হচ্ছে, আবার এ-কথাও মনে পড়ছে 'বসে থাকার চেয়ে বেগার দেওয়া ভালো'। এমন সময় অমৃত বাবু আমাকে ডেকে বললেন, "আমার সঙ্গে আসুন ভাইস-চ্যান্‌সেলার ডাকছেন।' V.-C. ডক্টর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল, 'ভারত-বর্ষ' মাসিকে তাঁর 'ইওরোপে তিনমাস' পড়েছি, কিন্তু সেই প্রথম দেখলুম তাঁকে; সৌম্য দর্শন, গোঁফদাড়ি কামানো, স্নিগ্ধ চাহনি, মাথা ভরা দুধের মতো সাদা চুল, সাদা চোগা-চাপকান পরা, বাঁ-হাতে একখানা

ছোটো কাগজ। বহুকাল পরে তাঁর যে আবক্ষ মর্মর-মূর্তি স্থাপিত হয়েছে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের এক-তলার হলে ঢুকতেই বারান্দায় তার সঙ্গে মিল দেখতে পাই তাঁকে আমার প্রথম-দেখা তাঁর চেহারার। লক্ষ্য করে দেখলুম তাঁর হাতের সেই কাগজখানি আমারি চাকরির দরখাস্ত আর-তার সঙ্গে পিন্ দিয়ে আঁটা আমার কয়েকটি প্রশংসা-পত্রের ছাপানো কপি। তিনি কথা কইলেন ইংরেজিতে—তিন-চার মিনিটের বেশি না। মনে হল ইংরেজিতে কথা-বার্তা কইতে পারি কিনা যাচিয়ে নিতে চান। প্রশংসা-পত্রের মধ্যে একখানি ছিল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের, একখানি ৺অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের, একখানি অধ্যাপক ৺নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—অসহযোগ আন্দোলনে যিনি সব ছেড়ে এক রকম সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। মনে হল খুশি হলেন। বাস, হয়ে গেল ইউনিভার্সিটির সব-বড়ো কর্তার সঙ্গে ইন্‌টারভিউ! একটু পরে অমৃত বাবু আপিস-ঘরে এসে আমার সেই দরখাস্তটা দেখালেন আমাকে, V.-C.-র হাতে লেখা আছে তার এক কোণে "appointed for this month on Rs. 30/-. Put up his case before me after one month's work.'

রেজিস্ট্রার আপিসে দু'জন দক্ষ (efficient) ক্লর্ক রীডারের প্রয়োজন হয়েছিল সেই সময়। লোক বাছাইয়ের ভার পড়ে প্রেস-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের উপর। তিনি রেবতী বাবু (৺রেবতীমোহন রায়) নামে এক ভদ্রলোককে ও আমাকে মনোনীত করে পাঠিয়ে দেন আপিসে। আমরা দুজনেই কাজে নিযুক্ত হই। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ঐ কাজের জন্য কোনো 'কর্মখালি' বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। লোকের মুখে-মুখে খবর পেয়ে কর্মপ্রার্থীরা উপস্থিত হয়েছিলেন আমারি মতো। আমার বেলায় তো অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে যায়—ঘটক সাহেবের সঙ্গে দৈবক্রমে মুখ-চেনা ছিল হার্ডিং হস্টেলের সেই ছাত্রটির, আর তিনি কিছু না জেনেও সেই ঘটক সাহেবের কাছেই পৌঁছে দিলেন আমাকে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের ঘরেই আরো দু'তিন দিন জয়ন্তীবাবুর সঙ্গেই প্রুফ পড়া গেল। তার পর রেবতী বাবু যোগ দিলেন কাজে। রেবতীবাবু ও আমি একসঙ্গে আরো দু'তিন দিন কাজ করার পর অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার চন্দ্র বাবু (৺ চন্দ্রভূষণ মৈত্র) বললেন, 'রেজিস্ট্রার ডেকেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসুন'। ডক্টর পল যোহানেস্ ক্রল তখন রেজিস্ট্রার। তাঁর ঘরে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়াতেই সাহেব প্রশ্ন করলেন 'তুমি পূর্বে কোথায় কাজ করেছ।' কিছুকাল পূর্বে কাশীতে ডক্টর অ্যানি বেসান্ট-এর থিওসফিক্যাল সোসাইটির একটি প্রেসে কিছুদিন কাজ করি—সাহেবকে সে-কথা বললেম। প্রায় চার-পাঁচ মিনিট সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যেতে বললেন। সাহেব ছিলেন জার্মান—তাঁর কথা বুঝতে একটু অসুবিধে হলেও সকল প্রশ্নেরই ঠিক-ঠিক চটপট জবাব দিয়েছিলেম। তাঁর টেবিল থেকে অল্প দূরে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলি এবং বেরিয়ে আসবার সময়ও নড্ (নমস্কার) করে আসি। চন্দ্র বাবু কিছুক্ষণ পরে অমৃত বাবুর সামনে আমাকে বললেন আমার সম্বন্ধে সাহেবের খুব ভালো ইম্‌প্রেশান (impression) হয়েছে। কখনো আমাকে দরকার হলে সাহেব কৌতুক করে বলতেন "Send that theosophist from Banaras."

এমনি ভাবে ইউনিভার্সিটিতে কর্মচারী নিয়োগ হত সেকালে। ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নির্বাচন ও নিয়োগেও স্যর আশুতোষ অনেক সময় এই পদ্ধতিই অনুসরণ করতেন; সকলেই জানেন, তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এমন-সব লোককে বেছে বেছে অধ্যাপকের আসনে বসিয়েছিলেন যাঁরা শুধু ইউনিভার্সিটিরই নয় সমস্ত ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। রামণ রাধাকৃষ্ণণ ভাণ্ডারকার মেঘনাদ সত্যেন-বোস রায়চৌধুরী সুনীতিকুমার প্রমুখ মনীষীদের গৌরবে কোন্ ভারতীয় গর্ব বোধ না করেন। আজই তাঁরা বিশ্ববিশ্রুত, কিন্তু তরুণ যৌবনে যখন ছিল না তাঁদের খ্যাতি—কেউ জানত না চিনত না, আশুতোষ তখনই তাঁর অদ্ভুত সন্ধানী-আলো ফেলে তাঁদের আবিষ্কার করে সাবেকি নিয়মে ইউনিভার্সিটির বিদ্যাবিবর্ধনের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন তাঁদের মাথায়। ...তবে এই পদ্ধতির সব চেয়ে বড়ো বিপদ অনেক সময় এটা স্ব-জন-পোষণের অতি নিচুস্তরে নেমে যায়—বিশেষত নিয়োগকর্তা যদি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ চরিত্রের লোক না হন।

তখনকার দিনে ইউনিভার্সিটির বড়ো-বড়ো (ম্যাট্রিক্, ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এ.-বি. এস্‌সি) পরীক্ষার ফল তৈরি হয়ে গেলে সিণ্ডিকেট সভায় পাস হওয়ামাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণদের নাম ইণ্ডিয়া গেজেটে বের করবার জন্ম হুড়োহুড়ি বেধে যেত। আপিসের অধিকাংশ কর্মচারীকেই তখন সেই কাজে যোগ দিতে হত—তা যিনি যে-কাজেই থাকুন আর বেতনের মর্যাদা যেমনই হোক। সাধারণত গরমিকালেই পরীক্ষার ফল বের হয়ে থাকে। সমস্ত ম্যাট্রিকের, ইণ্টারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের এবং বি. এ.-বি. এস্‌সি-র ডিস্‌টিংশান ও পাসের তালিকার নাম বর্ণানুক্রমে, আর ইণ্টারের প্রথম বিভাগ ও বি. এ.-বি. এস্‌সি অনার্স্ তালিকার নাম গুণানুসারে বের করতে হত। যে-ঘরে এই কাজের প্রস্তুতি-পর্ব চলত তার সব জানালা-শার্সি ও পাখা বন্ধ করতে হত, নতুবা হাওয়া লাগলে একটি-একটি করে বহু যত্নে সাজানো নাম উড়ে গিয়ে সব পণ্ডশ্রম হয়। কর্মীরা ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের গুমট গরমে। তার পর আসল রোলের সঙ্গে সেই তালিকার হাজার-হাজার পরীক্ষোত্তীর্ণদের নাম একটি-একটি করে চেক দেওয়া হত। সমগ্র কাজটাকে বলা হয় 'গেজেট ওআর্ক'। চেকিঙের সময় একটানা কাজ চলত দিন-রাত। রাতের আহার যাহোক করে সেরে নেওয়া হত আপিসেই। তখনকার দিনে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল কম; কাজেই সাতটা-আটটা অবধি আমাদের কাজ করতে হত প্রায় বারোমাসই—কোনো 'ওভারটাইম' ছিল না সে জন্ম। কিন্তু 'গেজেট ওআর্কের' সময় টিফিনের জন্ম কর্তৃপক্ষ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ মঞ্জুর করতেন। কোনো-কোনো বছর নরেন বাবু (৺নরেন্দ্রনাথ সেন, রায় বাহাদুর) তাঁর বাড়ি থেকে আম সন্দেশ খাবার আনিয়ে দিতেন। বিশেষ কোনো কাজের দায়িত্ব তখন তাঁর উপর ছিল না, সাধারণভাবে রেজিস্ট্রারকে সাহায্য করতেন। সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করতেন; সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ...গেজেট ওআর্কের সময় পরের দিন সকালে আমরা বাড়ি ফিরেছি—এমন কতদিন হয়েচে।

যে-কাজের জন্ম আমার চাকরি হয় সেটা ছিল ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডারের প্রুফ দেখা। ক্যালেন্ডার (প্রথম খণ্ড) সংকলন করতেন অমৃত বাবু নিজে। ইউনিভার্সিটির যাবতীয় তথ্য থাকে এই খণ্ডে। বছর দুই পরে অমৃত বাবু ঐ-কাজের ভার যেন আমাকে। পূর্ব বৎসরের ক্যালেন্ডারের পুরোনো বিষয়ের সঙ্গে নতুন-নতুন তথ্য সংযুক্ত হত। সে জন্ম সতর্কভাবে সিণ্ডিকেট ও সেনেট সভার আদেশ-নির্দেশ সম্বন্ধে সাবধানে টুকে রাখতে হত—নজর এড়িয়ে গেলেই বিপদ। ছাপতে দেওয়ার পূর্বে অমৃত বাবু প্রেস-কপি একবার নিজে দেখে দিতেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার ১৯১৬ সনের জুন মাস থেকে আমাকে চাকরিতে স্থায়ী করা হয়, কিন্তু হুকুমটা বেরোয় 'সতর সনের জানুআরিতে। ঐ সময়ে আরো কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত হন আমার ঠিক পূর্বে ও পরে। আমাদের সকলের চাকরিতে স্থায়ী হবার আদেশ হয় এক সঙ্গে। তাঁদের তিন-চার জনের নাম বিশেষ করে মনে পড়ে। একজন ৺প্রবোধ ঘোষ; তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল বাংলা সাহিত্য চর্চায়। 'সবুজপত্রে' মাসিকে তাঁর লেখা বেরোত। সুন্দর-সুন্দর ছোটো গল্পের একখানি উপাদেয় বই আছে তাঁর—বইটির নাম আবৃত্তি। কিছুকাল চাকরি করে তিনি ওকালতি করতে যান। এখন তিনি পরলোকগত। এক জনের নাম শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি শেষের দিকে ক'বছর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার ছিলেন। গোড়া থেকেই আপিসের কাজে খুব খাটতেন, বাড়িতে ফাইল নিয়ে রাত্রেও আপিসের কাজ করেছেন জানি। প্রশংসনীয়রূপে মিতভাষী ছিলেন তিনি, আর ছিলেন কর্তৃপক্ষের ছন্দানুবর্তী। এক-জনের নাম শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার—উনিশ শতকের প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বড়ো ছেলে। বাংলা ভাষায় তাঁর বিলক্ষণ অধিকার ছিল আর পড়াশুনাও ছিল বিস্তর। তিনি প্রেসের কাজের খুঁটিনাটি অনেক বিষয় জানতেন; পরে ইউনিভার্সিটি প্রেসের হেড প্রুফরীডার হয়ে যান। আর একজন শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ইউনিভার্সিটি গ্রন্থ-প্রকাশন বিভাগের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে বহন করে যথাসময়ে অবসর নেন। চাকরিতে থাকতেই তিনি হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতেন, এখন বৌবাজার অঞ্চলে তিনি একজন নাম-করা হোমিওপ্যাথ্। আরো একজনের কথা মনে পড়ছে, তাঁর নাম মণীন্দ্র সিংহ, খুব রসিকতা করে মজাদার

গল্প করতে পারতেন। ঠিক মনে নেই কেন, বছর কয়েক পরেই তাঁর চাকরি যায়। পরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং বাঁকুড়া থেকে বাংলার বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেবার স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে সদলবলে কাউন্সিলে ঢোকেন। অবিনাশবাবু বেঁচে আছেন কিনা জানা নেই।

১৯১৭ সনে পরীক্ষার পূর্বে দু-দু'বার ম্যাট্রিকের প্রশ্ন-পত্র বেরিয়ে যায়। ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ বিস্ সাহেবের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় নতুন করে প্রশ্ন-পত্র ছাপিয়ে ২৩ জুলাই থেকে তৃতীয়বার ম্যাট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে নির্বিঘ্নে সমাধা হয়। সতর সনের মে মাসে স্যার আশুতোষের প্রস্তাবক্রমে সেনেট-সভা 'পরীক্ষা নিয়ামক'-এর (Controller of Examinations) পদ সৃষ্টি করেন। সে বছর পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট বি. এ.-বি. এস্‌সি., এম্. এ.-এম্-এস্‌সি. আইন—সব জড়িয়ে প্রায় ত্রিশ হাজার। তখনো পাটনা, ঢাকা, রেঙ্গুন, গৌহাটি ও উৎকল ইউনিভার্সিটির জন্ম হয় নি। সুতরাং সুদূর বর্মা আসাম ওড়িষ্যা ও বিহারের দুর্গম পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে কিছু সময় হাতে রেখেই প্রশ্ন-পত্র পাঠাতে হত। ক্রল সাহেব একজন মাত্র কর্মচারীর সাহায্যে বিপুল পরিশ্রমে এই কাজ সম্পন্ন করতেন। চন্দ্রবাবুও তাঁকে সাহায্য করতেন, কিন্তু কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও অভ্যাস ছিল না তাঁর। ক্রল সাহেবের কাজের ইয়ত্তা ছিল না। সপ্তাহে নিয়মিত একটা করে সিণ্ডিকেট মীটিং, প্রায় প্রতিমাসে একটা সেনেট মীটিং, অনিয়মিত ফ্যাকাল্টি মীটিং, বোর্ডের মীটিং, বার্ষিক কন্‌ভোকেশান ইত্যাদি তো ছিলই; তা ছাড়া ছিল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-আসাম-ব্রহ্ম দূর-দূরান্তরের এবং কলকাতার কলেজগুলোর অধ্যক্ষ আর ডাজন-খানেক ইস্কুলের হেড মাস্টারদের সঙ্গে শিক্ষা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ রকমের ঘরোয়া চিঠি-পত্রের বিনিময়। তখনো পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ যথাযথ সংগঠিত হয় নি, কিন্তু এম্. এ.-এম্-এস্‌সি শ্রেণীর সূত্রপাত করে দিয়েছেন স্যার আশুতোষ। সে-কাজেরও দায়িত্ব তখন রেজিস্ট্রারের। ক্রল সাহেব অসুরের মতো (যাকে বলে হারকিউলিয়ান) পরিশ্রম করতেন ঐ পরিণত বয়সে। সকলে যখন চলে গেছেন আপিস থেকে, দ্বারভাঙ্গা ভবন অন্ধকার তখনো আটটা-নটায় আলো জ্বলছে রেজিস্ট্রারের ঘরে। তার পরে তিনি বাসায় ফিরতেন বাইসিক্লে চেপে।

১৯১৭ সনের নবেম্বর মাসে পরীক্ষাসমূহের প্রথম কন্‌ট্রোলার নিযুক্ত হন রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু; ছিলেন তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এলেন ইউনিভার্সিটির কঠিন কর্মভার কাঁধে তুলে নিতে। তিনি গণিত-শাস্ত্রে পি. আর. এস্. ছিলেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে অবিনাশ বাবু ১৮৮৮ সনে একত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ডক্টরেট ডিগ্রী প্রবর্তনের পূর্বে ওটাই ছিল ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতীক। অবিনাশ বাবুর বক্তৃতা করবার অভ্যাস ছিল না কিন্তু তাঁর কলম চলত খুব দ্রুত। অতি অল্প সময়ে তিনি চোস্ত ইংরেজিতে বড়ো-বড়ো চমৎকার নোট, চিঠি-পত্র স্বচ্ছন্দে লিখে দিতেন চড়চড় করে। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কাউকে দেখি নি অফিসারদের মধ্যে। প্রফেসার শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল তাঁর—দুজনেই ছিলেন গণিত-শাস্ত্রী—তিনি প্রায়ই অবিনাশ বাবুর ঘরে এসে বসতেন, আর দুই বন্ধু চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে গল্প করতেন। কৌতুক-কর একটা ইডিওসিন্‌ক্রেসি (idiosyncrasy) ছিল তাঁর,—সেটা হচ্ছে ব্যাসিলাই-আতঙ্ক। নানা লোকের হাতে ঘোরে বলে টাকা-পয়সা স্পর্শ করতেন না। দুপুরে আপিসে একটু চা খেতেন, সে-চা তৈরি করে দিত তাঁর সঙ্গে-আনা এক পুরোনো পিওন। কিন্তু চা-পানের পূর্বে কদুই অবধি সাবান-গরম জল দিয়ে আচ্ছা-করে ঘুরে নিয়ে তবে তো চা খাওয়া যেতে পারে! চুরুট ধরিয়ে ছাইদানিতে রেখেছেন, আবার টানবেন, সহসা কারো আঙুলের ছোঁয়া লেগে গেল—সে-চুরুট বাতিল হল তক্ষুনি।

কন্‌ট্রোলারকে সাহায্য করবার জন্য দুজন পুরোনো আর একজন নতুন কর্মচারী দেওয়া হয়। তাঁদের একজন ছিলেন রমেশবাবু। রমেশবাবু পর-পর চারজন কন্‌ট্রোলারের কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল কন্‌ট্রোলারকে বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্রে প্রশ্ন-পত্র প্রেরণে সাহায্য করা। যথোচিত বিশ্বাস রক্ষা করে রমেশ বাবু তাঁর কর্তব্য পালন করে গেছেন। হাইকোর্টের যশস্বী

উকিল ৺বঙ্কিমচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর পিতা। সেই তিন জন কর্মচারীর সাহায্যে অবিনাশবাবু ১৯১৮ এবং ১৯ সনের সকল পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র সম্পর্কিত যা-কিছু সমস্ত ব্যবস্থা করেন।

১৯১৮ সনের এপ্রিল মাসে অবসর-প্রাপ্ত অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল বিখ্যাত কৃষ্ণলাল দত্ত রেজিস্ট্রার হয়ে আসেন এক বছরের জন্য। ডক্টর ক্রল ইউনিভার্সিটি প্রফেসার অব্ বটানি নিযুক্ত হন এবং ১৯২৮ পর্যন্ত ঐ আসনে ছিলেন। কে. এল্. দত্ত আসতেন শুনেই আপিসে একটা সাড়া পড়ে যায়। দত্ত সাহেবের রঙ্ কালো হলেও পুরো সাহেব ছিলেন পোষাক-পরিচ্ছদে—শুভ্র-শ্মশ্রু সুচারুরূপে কৌরিত, সিল্কের স্যুট, চিক্কণতা-সম্পন্ন মূল্যবান বিনামা, এক কথায় যাকে বলে খোস-পোষাকী ও ফিটফাট। রেজিস্ট্রারের চেম্বারে বসেই বললেন সিণ্ডিকেট সভা বসবে ভাইস-চ্যান্সেলারের ঘরে, রেজিস্ট্রারের ঘর কাজ-কর্মের জন্য, মেম্বারদের গল্প-গুজব ও আড্ডা দেবার জায়গা নয়। সুতরাং, সিণ্ডিকেট মীটিং ইত্যাদির জন্য যত চৌকি-টেবিল ছিল সে-ঘরে সব চালান হয়ে গেল ভি-সির ঘরে। অত বড়ো ঘর একেবারে খালি। একখানা টেবিল, খান চার-পাঁচ চৌকি, একখানা সেল্ফ, একটা লোহার সিন্দুক—এই মাত্র রইল ঘরের আসবাব। পুব দিকের জানালার কাছে হল তাঁর নিজের বসবার ব্যবস্থা। যথানির্দিষ্ট সময়ে আপিসে পৌঁছে যান; বিনা প্রয়োজনে তাঁর ঘরে ঢোকা বারণ। এক বছর ছিলেন তিনি, মনে পড়ে না কর্মচারীরা যেখানে বসে কাজ করতেন দোতলার সেই বড়ো ঘরটায় কোনোদিন ঢুকেছেন। সমস্ত আপিস কিন্তু সন্ত্রস্ত থাকত তাঁর প্রতাপে। দেখলুম শুধু বাইরে নয়—ভিতরেও তিনি সাহেব। বিহিতভাবে আপিসের বিভিন্ন কাজের শৃঙ্খলার জন্য কতকগুলি সেক্শান ভাগ করলেন—যেমন রিসীভিং, ডেস্প্যাচ, মীটিং, স্কুল, কলেজ, টাইপ-রাইটিং, বিবিধ, পরীক্ষা (Examinations)। বাছাই করে যোগ্যতম কর্মচারীদের উপর ভার দেওয়া হল প্রত্যেক সেক্শনের। যতদূর মনে পড়ে মীটিং সেক্শানের ভার ছিল অমৃত বাবুর উপর। ইউনিভার্সিটিতে মীটিং সেকশানের প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশি। সুতরাং রেজিস্ট্রারের ঘরের কাছেই একটা ঘরে মীটিং সেক্শানের বসবার ব্যবস্থা হল। গোড়ার দিকে কিছুদিন প্রত্যহের ডাক (mail) তাঁর ঘরে নিয়ে খুলতে হত। হুকুম হল সমস্ত চিঠির জবাব তিন দিনের মধ্যে দিতে হবে, না গেলে তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ। প্রত্যেক কর্মচারীকে সারাদিনের কাজের ডায়েরি রাখবার আদেশ হল। কিছুদিন রেজিস্ট্রার খুশিমতো নিজে সেই ডায়েরি দেখেছিলেন। কর্মচারীদের 'সার্ভিস বুক' খোলা হল; রেজিস্ট্রার নিজের হাতে সেই সার্ভিস বুকে মন্তব্য লিখে রাখতেন। পূর্বে এ-সবের কোনো বালাই ছিল না। ১৯১৮ সন ইন্ফ্লুএন্জা মহামারীর বছর (যাতে ষাট লক্ষ ভারতবাসী মৃত্যু কবলিত হয়)। অপ্রাসঙ্গিকে হলেও বলি, সেই ব্যাধিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যশস্বী সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের যে সমূহ ক্ষতি হয়েছে তাঁর অকাল-বিয়োগে তা সকলেই অনুভব করেন। যাক, আপিসের অনেককে আপিস কামাই হতে হয় এই-অসুখের জন্য। ফলে, আপিসে যাঁরা আসতেন তাঁদের উপর অসম্ভব কাজের চাপ পড়ে এবং আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত তাঁদের কাজ করতে হয়েছে শুয়ে শুয়ে—এই কড়া নিয়মের ঝাপটে।

আপিসের কাজে সুনিয়ম ও শৃঙ্খলা আনতে, অল্প সময়ে কম লোক দিয়ে বেশি কাজ তুলতে এবং ইউনিভার্সিটির ব্যয়-সংকোচ করতে তিনি এমন-সব উপায় উদ্ভাবন ও পদ্ধতি প্রবর্তন করেন যা পূর্বে কারো মাথায় আসেনি। তার কারণও ছিল সুস্পষ্ট। পূর্বতন রেজিস্ট্রারেরা সকলেই ছিলেন অধ্যাপক-মানুষ আর দত্ত সাহেব ছিলেন ষাট টাকা বেতনের কেরানিগিরি থেকে শুরু করে অবসর-প্রাপ্ত তিন-হাজারী Accountant-General. তাঁর ব্যবস্থার দুই-একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। সে বছরের (১৯১৮) পরীক্ষার্থীদের সেই সব-প্রথম উত্তরের খাতায় (answer-book) পাতার দুটি পৃষ্ঠাতেই উত্তর লিখতে হয়েছিল; তার পর থেকে সেই নিয়ম বরাবর চলে এসেছে। কলমের একটি আঁচড়ে কাগজের ও-বাবদ খরচ অনেক কমে গেল। সেই বছরই রোলের খাতায় প্রতি পৃষ্ঠায় পরীক্ষার্থীদের নাম পঁচিশটির স্থলে ত্রিশটি করে ছাপা হল। এতে করে, প্রথম-

বিশ্বযুদ্ধের সেই চড়া বাজারের কাগজের খাতে ইউনিভার্সিটির মোটা খরচ বেঁচে গেল। সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্রে কোন্-কোন্ বিষয়ের কতগুলো প্রশ্ন-পত্র পাঠাতে হবে পূর্বাহ্ণেই তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয়, রোল লেখা ও ছাপানো এবং সমস্ত কেন্দ্রে পাঠানো, পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ-পত্র লেখা ও সময় মতো ইস্কুল-কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া—এর প্রত্যেকটি কাজের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। সুতরাং এর কোনো-একটা অংশে কাজ আটকা পড়ে গেলে আর-আর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। দত্ত সাহেব এমন চমৎকার একটা পদ্ধতির নির্দেশ দিয়ে দিলেন যাতে গড়গড় করে চলল কাজের বিভিন্ন অংশ, কোথাও এতটুকু বাধা পড়ল না, অল্পক্ষণের জন্যও থেমে গেল না। এই অ-পূর্ব পদ্ধতি উনি চলে যেতেই পরিত্যক্ত হয়। তার কারণ উল্লেখ না করাই শিষ্ট-রীতি মনে করি। পূর্ব রীতি ছেড়ে দিয়ে বর্তমান রীতিতে ম্যাট্রিক (তথা স্কুল ফাইন্যাল) পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তন করেন দত্ত সাহেব। তিনি রেজিস্ট্রার ছিলেন মাত্র এক বছর। ঐ সময়টুকুর মধ্যেই আপিসের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রায় চল্লিশ বছর পরেও তাঁর সম্বন্ধে এই ছাপ হয়ে গেছে মনে যে তাঁর মতো দক্ষ প্রশাসক ইউনিভার্সিটিতে আমি দেখিনি। এই সময় ৺কুঞ্জবিহারী ঘোষ ছিলেন আপিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। পূর্বে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্ট-এর আপিসে চাকরি করতেন। সেখানে স্যর আশুতোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে স্যর আশুতোষই তাঁকে ইউনিভার্সিটি আপিসে নিয়ে আসেন। তাঁর কাজ-কর্ম ছিল বেশ পরিচ্ছন্ন। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর বড় ছেলে। বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পরলোকগত ডক্টর বিমলচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ফুল্লবাবুর ভাইপো। অবসর নেওয়ার সময় না হতেই কোন কারণে তাঁকে আপিস ছাড়তে হয়। তারপর আর খুব বেশি দিন বাঁচেননি তিনি।

১৯১৯ সনের জুলাই মাস থেকে কন্‌ট্রোলারের স্বতন্ত্র পৃথক আপিস হয়। কন্‌ট্রোলার আপিসের কর্মচারী সংখ্যা তখন হল সাতাশ জন। সেই সময় রেজিস্ট্রার আপিসের পুরোনো কর্মচারীদের ভিতর থেকে উনিশ জনকে কন্‌ট্রোলার আপিসে বদলি করা হয়। নরেনবাবু হলেন অ্যাসিস্‌ট্যান্ট কন্‌ট্রোলার। পুরোনোদের মধ্যে শ্রীযুত জয়ন্তীপদ চৌধুরি ছিলেন একজন। আমার চাকরির প্রথম দুতিন দিন এঁরি সঙ্গে কাজ করেছিলেম। জয়ন্তী বাবুকে সকাল বেলাটা বিচারপতি স্যর আশুতোষের স্টেনো-টাইপিস্টের কাজ করতে হত, তাই তিনি একটু বেলায় আপিসে আসতেন। অমায়িক স্বভাবের মানুষ বলে সকলেই ভালোবাসতেন তাঁকে। সুন্দর হাতের লেখা ছিল তাঁর; বেশির ভাগ সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা লিখে দিতেন তিনি—লিখতেনও খুব তাড়াতাড়ি। অবশ্য তিনি একা পেরে উঠতেন না, অন্যান্য কর্মচারীদেরও লিখতে হত কিছুকিছু। আইন ও মেডিক্যাল পরীক্ষাগুলোর পরীক্ষক-নিয়োগ থেকে পরীক্ষার ফল বের করা পর্যন্ত সমস্ত কাজের দায়িত্ব তিনি প্রায় একলাই বহন করতেন। পরে তিনি সে-ভার আমার কাঁধে চাপিয়ে দেন। জয়ন্তীবাবুর দুই জ্যেঠা—মহেশচন্দ্র চৌধুরি এবং শ্রীশচন্দ্র চৌধুরি ইউনিভার্সিটির ফেলো (সদস্য) ছিলেন। পুণ্যশ্লোক গুরুদাস যখন ভি-সি মহেশবাবু সেইসময় সিণ্ডিকেট সভার সদস্য ছিলেন। ঐ-উনিশ জনের মধ্যে আমিও ছিলেম একজন। সেই সময় বাইরে থেকে নতুন কর্মচারী যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁর কথা বেশি-বেশি মনে জাগে তাঁর নাম ছিল রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। পূর্বে তিনি সুবার্বন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আপিসে যে-কাজের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল সেটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর তিনি সে-কাজ নিখুঁত করে সম্পন্ন করতে দারুণ পরিশ্রম করতেন। তাঁর কাজের গতি ছিল মন্থর, তাই সময় লাগত বেশি—রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত কাজ করতেন আপিসে বসে। তাঁর স্বভাবে ছিল একটা উদার মাধুর্য, কোনো ক্ষুদ্রতা বা সংকীর্ণতা দেখি নি কখনো তাঁর কথায় ও আচরণে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার অল্পকাল পরে এই সদাশয় বন্ধুবৎসল সহকর্মী ইহলোক থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

১৯২৬ সনের নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি—মনে হয় সতর তারিখে—কন্‌ট্রোলার অবিনাশ বাবু পুজোর ছুটির পর মিহিজাম থেকে কলকাতায় এসেছেন সেনেট-সভার মীটিংএ উপস্থিত হবার জন্য। ছুটো-আড়াইটের সময়

আপিসে তাঁর ঘরে এসে বসলেন, গল্প-গুজব করলেন খানিকক্ষণ, তিনটেয় মিটিংএ যোগ দেবার জন্য পটপট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটু বাদেই শুনি অবিনাশ বাবু মারা গেছেন প্রেস-বাড়ির দু'দিকের ঘরের মধ্যেকার করিডরে। সেনেটের মীটিং তখন আরম্ভ হয়ে গেছে, শহরের সব সেরা ডাক্তার-বৈদ্যেরা সেখানে উপস্থিত, ছুটে এলেন সকলে, দেখলেন জীবন-দীপ নিবে গেছে। সভা বন্ধ হয়ে গেল তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে। যদিও ১৯১৯ সনের মাঝামাঝি থেকে '২৬ সন পর্যন্ত তাঁর অধীনে চাকরি করেছি, তবু প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর সংস্রবে যথেষ্ট পরিমাণে আসতে পারিনি; বলা চলে না এমন কোনো কারণে, আমার উপর তিনি প্রসন্ন ছিলেন বলে মনে হয় নি। কিন্তু এটা অনুভব করেছি তাঁর মনটি ছিল গঙ্গাজলে ধোওয়া বেলপাতার মতো নির্মল পবিত্র। ইউনিভার্সিটি পলিটিক্সের গন্ধও পৌঁছত না তাঁর কাছে। পরীক্ষকদের কাছ থেকে প্রশ্ন-পত্র সংগ্রহ, প্রশ্ন-পত্র মুদ্রণ, এবং যথাসময়ে পরীক্ষা-কেন্দ্রে প্রশ্ন-পত্র প্রেরণ—এই নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন আপিসে, তারও বেশি সময় বন্দী থাকতেন 'স্ট্রংরুম্'-এ। আপিস চালাতেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্‌ট্রোলার নরেন বাবু। অবিনাশ বাবুর মৃত্যুতে ইউনিভার্সিটির মুখপত্র Calcutta Review শোক প্রকাশক-যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন মনে পড়ে তাতে এই কথাটি ছিল: 'His magnanimity, we understand, has left his family utterly destitute and helpless'. তখনকার দিনে হাজার-টাকা বেতনের একজন বাঙালী ভদ্রলোক পরিবারের জন্য কোনো সংস্থান করে যান নি, এর থেকে তাঁর আপন-ভোলা চরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চুরট ছাড়া আর কোনো নেশা বা কোনো প্রকার ব্যসন তাঁর ছিল বলে কারো কাছে শুনি নি; গণিতশাস্ত্র-চর্চা ও লেখাপড়া করাই ছিল তাঁর একমাত্র ব্যসন, প্যাস্টাইম—যা বলতে চান।

অবিনাশ বাবুর শূন্য আসনে নরেনবাবু নিযুক্ত হলেন অচিরেই। অডিট্ অফিসার শৈলেনবাবু (৺শৈলেন্দ্রনাথ বসু) হলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্‌ট্রোলার। ছুটোই অস্থায়ী ব্যবস্থা। পর বৎসর ডক্টর শ্রীযুত বিনোদবিহারী দত্ত Assistant Controller নিযুক্ত হন। পূর্বে তিনি ছিলেন ফেনি কলেজে গণিতের অধ্যাপক। তারও পূর্বে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'Servant' কাগজের তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন কিছু দিন। বিনোদবাবুর মেজ-দাদা ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্ত বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ছিলেন সে সময়, পরে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন—স্বামী বিশ্বারণ্য নামে তাঁর বর্তমান পরিচয়। এঁরা সব ক'ভাই-ই সুবিদ্বান। নরেনবাবু যখন Asst. Controller ছিলেন তখন নিজে কাজ কমই করতেন, কিন্তু কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতেন বিলক্ষণ। অবিনাশ-বাবু আপিসের সমস্ত ভার কার্যত নরেন বাবুর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। নরেনবাবু ছিলেন প্রিয়ংবদ ও প্রিয়দর্শন, আর 'সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়'; তার উপর ছিলেন যাকে বলে খুব tactful. সুতরাং নরেনবাবু তাঁর আপিস-তরণীটিকে ভাটিতেই হোক আর উজানেই হোক কখনো অনুকূল স্রোতের কখনো অনুকূল হাওয়ার সাহায্যে পাকা মাঝির মতো চালিয়ে নিতেন। সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি সর্বদা নিপতিত ছিল তাঁর উপর।

বিনোদবাবু এলেন বাইরে থেকে, কাজেই সব জেনে-শুনে বুঝে নিতে তাঁর সময় লাগল কিছুদিন।

১৯১৯ সনে কে. এস্. দত্তর স্থানে স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক ৺রায় বাহাদুর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এপ্রিল মাসে রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। তখনও আমি রেজিস্ট্রার আপিসে কাজ করি, কিন্তু সেই বছরেই বদলি হই কন্‌ট্রোলার আপিসে। তখন থেকে রেজিস্ট্রারের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ-ভাবে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না, কারণ ১৯৩০ সনের পূর্ব পর্যন্ত কন্‌ট্রোলার ও তাঁর আপিস রেজিস্ট্রারের অধীন ছিল। পরে, ঠিক কোন্ সনে মনে নাই, কন্‌ট্রোলার রেজিস্ট্রারের অধস্তন এবং অধীনস্থ অফিসার গণ্য হবেন স্থির হয়। ১৯২১ সনে চন্দ্রবাবুর মৃত্যু হয় এবং তাঁর জায়গায় আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক ৺যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার নির্যুক্ত হন। ১৯৩১ সনে জ্ঞানবাবু অবসর নেন; তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় দু'বছরের জন্য রেজিস্ট্রার হন। যতদূর মনে পড়ে তখন থেকে আবার

আমাদের রেজিস্ট্রারের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসতে হয়। আদিত্য বাবুর সৌজন্য এবং ছোটো-বড়ো নবীন-প্রবীণ সকল কর্মচারীর সঙ্গে ভদ্র ও মিষ্ট ব্যবহার স্মরণীয় ও আদর্শস্থানীয় হয়ে আছে। দু'বছর পরে আদিত্য বাবু যখন ইউনিভার্সিটির দর্শন শাস্ত্রের প্রফেসর নিযুক্ত হন তখন যোগেশবাবু (১৯৩৩ সনে) রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। অনেকদিন এ. আর. ছিলেন তিনি, আপিসের কাজের খুঁটিনাটি এবং কর্মচারীদের নাড়ীনক্ষত্র জানা ছিল তাঁর। ইউনিভার্সিটি প্রেস আগে থেকেই সম্পূর্ণ তাঁর অধীনে ছিল, আর তখন থেকেই প্রেসের আয়তন দ্রুত বাড়তে থাকে। তিনি সকালবেলা আপিসে আসতেন আর বাড়ি ফিরতেন রাত্রে; আপিসেই স্নান-আহারের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। কোনো রকম ব্যায়াম কিংবা শারীরিক শ্রম-সাধ্য কাজের একান্ত অভাব, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে-বসে ডেস্ক-ওআর্ক করার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়। মাঝে-মাঝেই তাঁকে লম্বা ছুটি নিতে হয়েছে। তাঁর অনুপস্থিতিকালে কখনো নরেন-বাবু কখনো বিনোদবাবু রেজিস্ট্রারের আসনে বসেছেন অস্থায়িভাবে।

কনট্রোলার হওয়ার পর নরেনবাবু পূর্বে যেটুকু খেলা-ধুলো করতেন সেটাও ছেড়ে দিলেন, (আগে রোজ বিলিআর্ড খেলতেন) আরো আয়েসি হয়ে পড়লেন, তাঁরও স্বাস্থ্য ভেঙে গেল, অস্থি-চর্ম সার হল শরীর, লোকের সাহায্য নিয়ে গাড়িতে ওঠা-নামা করতে হত; শেষে ১৯৩৫ সনে অকাল-মৃত্যু বরণ করলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত গ্ল্যাড্‌স্টোন প্রতি বছর শীতকালে স্কটল্যাণ্ডের বনে-জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেতেন স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যে—তাঁর জীবনীতে পড়েছি। আমাদের দেশেও স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ বুড়ো বয়স পর্যন্ত নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা করতেন—তাঁর আত্ম-জীবনীতে নিজে লিখে গেছেন।

নরেনবাবুর মৃত্যুর পর বিনোদবাবু হলেন কনট্রোলার। অ্যাঃ কনট্রোলার হয়ে এলেন পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর অমরপ্রসাদ দাসগুপ্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এবং দীর্ঘকাল সিণ্ডিকেট সভার সদস্য পরলোকগত জে. এন. দাসগুপ্ত, ব্যারিস্টার, ছিলেন ডক্টর দাসগুপ্তের পিতা। ডক্টর দাসগুপ্তকে আমরা অনেক আগে থেকেই চিনতেম। পরে বিনোদবাবু ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্পেক্টার অব্‌ কলেজেস্‌ নিযুক্ত হলে অমরবাবু কনট্রোলার হন। ১৯৪৬ সনে যোগেশ বাবুর মৃত্যু হয়। তখন বিনোদবাবু অস্থায়ীভাবে রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সনে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ অস্থায়ী রেজিস্ট্রার হন; তার আগে তিনি ছিলেন ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্পেক্টার অব্‌ কলেজেস্‌। বিনোদবাবু সেই পদে নিযুক্ত হন। কনট্রোলার আপিসে বিনোদবাবুর অধীনে দীর্ঘকাল কাজ করেছি, তা ছাড়া তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানবার সুযোগ হয়েছিল। বিনোদ বাবুর একটা বড়ো দোষ বা গুণ ছিল এই যে কর্মচারীদের তিনি সহকর্মী বলে মনে করতেন, অধস্তন কেরানি-মাত্র মনে করতেন না। সব সময়ে তাঁদের সহযোগিতা পেতে চেয়েছেন, হুকুমে কাজ চালানো মোটেই পছন্দ করতেন না তিনি। এ জন্য অনেকে তাঁকে দুর্বল অফিসার বলে মনে করতেন। তাঁর স্বাভাবিক সহৃদয়তার অমর্যাদা করতে দেখেছি কোনো-কোনো সহকর্মীকে। জানি না এতে লাভবান হয়েছেন তাঁরা না বিনোদবাবু।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে যখন কনট্রোলার আপিসের বেশির ভাগ বহরমপুরে স্থানান্তরিত হয় তখন সতীশবাবু কলকাতার কেন্দ্রগুলোর পরীক্ষা পরিচালনার ভার স্বেচ্ছায় স্বীয় 'বৃষস্কন্ধে' গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তাঁর নিয়ন্ত্র (ইন্‌স্পেক্টারের) বোঝা তো ছিলই। সতীশবাবুও গণিতের ছাত্র, এম. এ. পরীক্ষায় সুবর্ণ-পদক পেয়েছিলেন। তিনিও ছিলেন অধ্যাপক—স্কটিশ চার্চ কলেজে। স্যর আশুতোষ ইউনিভার্সিটি কমিশনের সদস্যরূপে কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে যুবক সতীশচন্দ্রের অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হন এবং অল্প কাল পরেই তাঁকে ইউনিভার্সিটিতে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তখন থেকে ইউনিভার্সিটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অধ্যাপক, সেক্রিটারি, ইন্‌স্পেক্টার, রেজিস্ট্রার, ট্যাবুলেটার, সেনেট্‌-এর মেম্বার, সম্প্রতি ট্রেজারার—পদমর্যাদায় ইউনিভার্সিটিতে দ্বিতীয় আসন সতীশবাবুর। তাঁর দুর্বলতা তিনি হঠাৎ রেগে যান আর বাক্যের আগুনের মতো ধপ্‌ করে জ্বলে ওঠেন, আবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আগুন নিবে জল হয়ে যায়। তাঁর চরিত্রের মহৎ বৈশিষ্ট্য ঘেটা আমি নিজে বহুবার দেখেছি সে হচ্ছে তিনি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
(১৩ই মার্চ, ১৯৪২– ১২ই মার্চ, ১৯৪৪)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
চারুচন্দ্র বিশ্বাস
(২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯—১০ই মে, ১৯৫০)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১২ই মে, ১৯৫০—১১ই এপ্রিল, ১৯৫৪)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
(১২ই এপ্রিল, ১৯৫৪—১৪ই মে, ১৯৫৫)

রাগের মুখে যদি কাউকে অকারণ তিরস্কার করে থাকেন আর নিজের ভুল পরে বুঝতে পারেন তবে তার কাছে অকুণ্ঠ মার্জনা চাইতে একটুও ইতস্তত করেননি। সৌম্যতায় অভিজাততায় সহৃদয়তায় বাগ্মিতায় ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ আসনেই ছিল তাঁর যথার্থ স্থান। মানুষ সতীশবাবুকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা তাঁকে ভালো না বেসে পারেন নি।

কন্‌ট্রোলার আপিসের গোড়ার দিকে ১৯১৯ সনে বাইরে থেকে নতুন যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুত দেবী-প্রসাদ দত্ত ছিলেন এক জন। তিনিও গণিতের এম. এ. এবং স্কুল মাস্টার ছিলেন। দেবীবাবুর পিতা ৺নেত্রলাল দত্ত তখন ইউনিভার্সিটির ক্যাশ বিভাগে চাকরি করতেন। সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং আইন কলেজের ভাইস-প্রিন্‌সিপ্যাল ৺বিরাজমোহন মজুমদার ছিলেন দেবী বাবুর মামা। দেবী বাবুর মতো তন-মন-প্রাণ দিয়ে আপিসের কাজ করতে আর-একজনকে দেখেছি—তিনি প্রকাশবাবু, যাঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দু'জনেরই ছিল 'আপিস স্বর্গ আপিস ধর্ম আপিস হি পরমন্তপ'। দেবীবাবু পরে অ্যাডিশন্যাল কন্‌ট্রোলার হয়েছিলেন। ডক্টর এ. পি. দাসগুপ্ত যখন অ্যা-কন্‌ট্রোলার তখন ঐ পদের সৃষ্টি হয়।

আমার চাকরির শেষের দিকে কয়েকজন যুবক-কর্মচারী নিযুক্ত হন কন্‌ট্রোলার আপিসে। তাঁদের মধ্যে তিন জনের কথা বলবার লোভ সামলাতে পারছিনে। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীযুত পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত শচীনন্দন বসাক ও শ্রীযুত বারীন্দ্রকুমার রক্ষিত। এঁদের কর্তব্যনিষ্ঠা কর্মপটুতা নিরলসতা মার্জিত ভদ্র রুচি আর নির্ভীক তেজস্বিতা দেখে মনে-মনে তারিফ করেছি। শচীনন্দন বাবুর আর এক বিশেষ গুণ তিনি খুব কম কথা বলতেন। কাজে ফাঁকি দেওয়া এঁদের কোষ্ঠীতে লেখে না। পাঁচুবাবু পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে চাকরি নিয়ে গেছেন জানি।

স্বর্গত অমৃতবাবু আমাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছিলেন। ইউনিভার্সিটির আইন-কানুন, সেনেট-সিণ্ডিকেটের রুলিং তাঁর এক রকম কণ্ঠস্থ ছিল বলা যায়। বিয়াল্লিশ বছর চাকরির পর, যতদূর মনে পড়ে ১৯৩২ কি '৩৩ সনে, কর্ম হতে অবসর নেন অমৃতবাবু। গুণগ্রাহী শ্যামাপ্রসাদ স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় অমৃতবাবুর ছোটো একটি ছবি সমেত সংক্ষিপ্ত (প্রায় আধ কলম) প্রশস্তি প্রকাশ করেন। তাঁর পরেই শ্রীযুত কার্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত রেজিস্ট্রার আপিসে সুপরিন্‌টেন্‌ডেন্ট হন। ইউনিভার্সিটি প্রেস যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন কার্তিকবাবু ছিলেন তার প্রথম সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট, পরে তাঁকে আপিসে আনা হয়। শেষে তিনি অ্যাসিস্টাণ্ট রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন। ছোটোদের জন্য বই, যাকে শিশু-সাহিত্য বলা হয়, কার্তিকবাবুর কলম থেকে প্রচুর বেরিয়েছে, এবং সাহিত্যের এই বিভাগে একটি স্থায়ী আসন আছে তাঁর। আশীর কাছাকাছি তাঁর বয়স এখন, বেশি চলাফেরা করতে পারেন না। এই কার্তিকবাবু চিরদিন পরেশনাথ মন্দিরের পাড়ায় তাঁর বাড়ি থেকে দিনের-পর-দিন সারা বছর হেঁটে আপিস যাতায়াত করেছেন। দোষের মধ্যে তাঁর হাতের লেখা ছিল দুষ্পাঠ্য। আপিসে তিনি ছিলেন আমার একজন যথার্থ হিতৈষী।

আমার অবসর নেওয়ার আগের পনর-ষোল বছর আমার উপর এমন কতকগুলো বিশেষ কাজের ভার ছিল যার সম্পর্কে ইউনিভার্সিটির কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসার-লেকচারার, উকিল-ব্যারিস্টার-বিচারপতি, ডাক্তার এবং বিভিন্ন বিদ্যার গবেষণাকারী ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট-সংস্রবে আসতে হয়েছে আমাকে। সেই সুযোগে অনেক বরেণ্য মনীষি ও শিক্ষাব্রতীর সঙ্গে পরিচয়ের দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাঁদের ইউনিভার্সিটি-সংক্রান্ত কাজে আমার সামান্য শক্তিতে সাহায্য করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। সেই সব মনীষিদের কারো-কারো বিনম্র ও সশ্রদ্ধ ব্যবহারে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়েছি। আজ এই উপলক্ষে তাঁদেরও মধ্যে একজনের প্রতি আমার অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করি। নিজের বিশেষ বিদ্যায় যাঁর জগৎ-জোড়া খ্যাতি, পাণ্ডিত্য যাঁর সার্বভৌম, বৈদগ্ধ্যে ও চিত্তোৎকর্ষে যাঁর তুলনা দুর্লভ, দেশ-বিদেশের সুধী-সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্মানে যিনি সমৃদ্ধ, কিন্তু এই-সব সম্পদ যিনি তাঁর গাত্র-বল্কের মতো নিজের অজ্ঞাতসারে সব সময় সহজে বহন করছেন সেই স্বনামধন্য প্রফেসার শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যেমন যে-কোনো সাধারণ মানুষের মতো এই অকিঞ্চনজনের সঙ্গে আত্মীয়ের আচরণ করেছেন সেই মহৎ মধুর ও সুখ-স্মৃতি জীবনের শেষ দিন অবধি অন্তরে জেগে থাকবে।

অনেকেই শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে প্রথম পনের বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহের জন্য নিজস্ব কোনও পৃথক আবাস ছিল না। ইহার কারণ যে, যে-বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেই বৎসরই বৃটিশরাজ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে বিপন্ন হয় এবং তাহার পর কয়েকবৎসর গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা মন্দ থাকে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ১০ নং ক্যামাক্ ষ্ট্রীটের কয়েকখানি ঘর ভাড়া করিয়া তাঁহার দপ্তরের কাজ চালাইতেন। তখন আজকালকার মতন পরিবহন ব্যবস্থা ছিল না, অতএব জনসাধারণের পক্ষে সাহেবী পাড়ায় যাওয়া খুবই অসুবিধাজনক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে সিণ্ডিকেটের অধিবেশন হইত। সেনেটের সভা কোনও সময় ইঞ্জীনিয়ারিং কলেজে কোনও সময় টাউন হলে এবং কোন সময়ে উপাচার্যের বাড়ীতে হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি সাধারণতঃ টাউন্ হলেই বসিত। কোনও কোনও সময়ে সম্পূর্ণ টাউন্ হলটি পাওয়া যাইত না। একবার যখন বি. এ. পরীক্ষার্থীরা সেখানে পরীক্ষা দিতেছিল, তখন টাউনহলের দ্বিতলে একদল বাঙ্গদার মনের সুখে বাদ্যযন্ত্রের উপর হাত পাকাইতেছিল এবং পাশের ঘরেই ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারের নিষ্পত্তির জন্য আর একদল লোক চিৎকার করিতেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ১০৪৮। টাউনহলে স্থান না হওয়াতে বহু পরীক্ষার্থীদের জন্য ময়দানে তাঁবু খাটাইয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। তাঁবুর মধ্যে প্রত্যহ অপরাহ্নে যে অসহ্য গরমে পরীক্ষার্থীদের কষ্ট পাইতে হয় তাহার ফলে ঐ বৎসর পাশের সংখ্যা অনেক কম হয়। এই ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত গৃহনির্মাণের সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের নিকট একটি নিজস্ব বাসভবন নির্মাণের জন্য আবেদন করেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রেজিষ্ট্রার মহাশয় ১০নং ক্যামাক্ ষ্ট্রীটের ঘরগুলি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং ৩নং বাসেল ষ্ট্রীটে তাঁহার দপ্তর স্থানান্তরিত করেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ, ভারত গভর্ণমেণ্ট জানাইলেন যে কলেজ ষ্ট্রীটের পশ্চিমপারে, এবং হিন্দু-কলেজের সম্মুখে যে দীঘি আছে তাহার অপর দিকে সরকারের অধিকারে যে জমি আছে সেই স্থানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য গৃহনির্মাণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট আরও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, ইমারৎখানি এমন জায়গায় তৈরী করিতে হইবে যেন ভবিষ্যতে মাধব-বাবুর বাজারটি ক্রয় করিয়া উহা কলুটোলা ষ্ট্রীট পর্যন্ত বর্ধিত করা চলে।

বঙ্গীয় সরকারের স্থাপত্যশিল্পী মিঃ গ্রাণভিল্ ইমারতটির পরিকল্পনা তৈয়ারী করেন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-গৃহ নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম নিজস্ব গৃহে বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসব পালন করে। সেনেট-গৃহ নির্মাণ কার্যে সরকারের খরচ হয় মোট ৪,৩৪,৬৯৭৲ টাকা।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া এই সুন্দর ও বহু স্মৃতি-বিজড়িত সেনেট-গৃহখানি মাধববাবুর বাজারেরই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিমা প্রচার করিতে থাকে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সরকারের সাহায্যে মাধববাবুর বাজারটি ৮ লক্ষ ১৪ হাজার টাকায় ক্রয় করা হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থলে যে অট্টালিকাখানি আশুতোষ বিল্ডিং নামে পরিচিত তাহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৩টি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল—যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা তখন সমগ্র উত্তরভারত ব্যাপী ছিল। এই কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যাও অতি অল্প ছিল। এই একশত বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইয়া এখন মাত্র পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। তথাপি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় বহু সহস্র ছাত্রছাত্রীকে সেবা করিতেছে। বর্তমানে ১২৪টি কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই কলেজগুলিতে প্রায় ৮৫০০০ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। কলিকাতা সহরে যে কলেজগুলি অবস্থিত তাহাদেরই ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫৩০০০। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রায় তিন

হাজার ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতেছে। অতএব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৎসরে ৮৮০০০ ছাত্র-ছাত্রীকে জ্ঞানবিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

যে প্রতিষ্ঠান আজ একশত বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীর জীবনের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, যে প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্ত্যজ্ঞানের আলোক বিতরণ করিয়া বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল ভারতীয়ের মধ্যে অগ্রণী করিয়াছে এবং বহু ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও নির্ভীকভাবে বাঙ্গালীর সেবা করিতেছে, সেই প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনা করা, তাহার দেশ সেবা ব্রতে সাহায্য করা, প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্তব্য। আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একশততম জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা এই জ্ঞানধাত্রী জননীর সহস্রায়ু কামনা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত অধিকতর গৌরবময় হউক। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানগণ ভারতবাসীকে বহু যুগের সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত করিয়াছে, ভারতকে স্বাধীন করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানরা স্বাধীন ভারতের একনিষ্ঠ সেবক হউক এবং তাঁহাদের সেবায় স্বাধীন ভারতের পতাকা চিরউড্ডীন থাকুক, এই প্রার্থনাই করি।

ভারতে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত

ইংরেজ নিজেদের প্রয়োজনে ভারতে একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক সৃষ্টির প্রয়াস পায়। বিরাট এই দেশ ভারতবর্ষ, ইংরেজ জাতির কয়েকজন দমস্ত লোক লাগিয়ে দিলেও ভারত শাসনের পক্ষে পর্যাপ্ত লোকবল পাওয়া যাবে না, এছাড়া দেশীয়দের সাহায্যে শাসনকার্যের কিছুটা এবং দৈনন্দিন মামুলি (routine) কাজের সবটা করাতে পারলে বহু সুবিধা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ইংরেজ-শাসক ভারতে ইংরেজী ও ইংরেজীর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেবার প্রতি আগ্রহ দেখায়। ফলে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজের প্রভাবের ছাপ পড়ে, আজও সে ছাপ মুছেমুছে ফেলা যায় নি, এখনো সেকালের পদ্ধতি নিয়েই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চলছে। ইংরেজ গিয়েছে, গিয়েছে ইংরেজের ভাগ্যের সাথে মিলিয়ে ভারতীয়ের ভাগ্য নির্ণয়ের পালা। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আজ শিক্ষাপদ্ধতির জাতীয়তা করণ—জাতীয় আদর্শ, জাতীয় বল, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গণতান্ত্রিক জনগণকে জ্ঞান সংগ্রহে সহায়তা করুক—এটাই আজ কাম্য। কামনার ও প্রয়োজনের মানদণ্ডে পরিপূর্তির যাচাই করে দেখা যায় আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি—আমাদের শিক্ষায় অপচয় আছে, তৃপ্তি নেই। তৃপ্তির নতুন পথে আমাদের চলার দিন এসেছে—সে পথ কি তা দেখিয়ে দিতে হবে, শুধু নতুন ব্যবস্থা চাই বললেই চলবে না। পথ নির্দেশ করা আমাদের নাগরিক কর্তব্য।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের থাকা উচিত, কারণ অক্ষরজ্ঞান যার নেই তাকে স্বাধীন রাষ্ট্রের যোগ্যতম নাগরিক করে গড়ে তোলা দুরূহ কাজ। তাই রাষ্ট্রের দায়িত্বে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা ছাড়া উচ্চশিক্ষার মান আকর্ষণীয় করা যাবে না। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ঝোঁক অনুযায়ী ছাত্রগণ বিষয় নির্বাচন করে ভবিষ্যতের পথ বেছে নিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করা দরকার। এর জন্যে প্রয়োজন এ শিক্ষার সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ (expansion and diversification)। উচ্চশিক্ষা বা কলেজীশিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন মহলে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে—এর সংস্কার করে মান উন্নত করতে হবে উন্নত মানের পাঠ্যবস্তু ছাত্রছাত্রীদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েই দায়িত্ব পালন করা চলে না, ছাত্রছাত্রীদের এরূপ মানের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষকগণের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও অবস্থার উন্নতি বিধান প্রয়োজন। গবেষণার সুযোগ দিয়ে বেশী সংখ্যক যুবকযুবতীদের দক্ষ পরিচালকের অধীনে গবেষণার কাজে লাগানো দরকার।

প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী পর্যন্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা বিচার করে বলা চলে এতে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে; এগুলো সংস্কার করা উচিত। চরিত্র গঠনের উপযোগী পাঠ্য বিষয়ের অভাব সর্বত্রই চোখে পড়ে। এ অভাব দূর করা ভিন্ন সুশিক্ষা দেবার আশা বৃথা।

আলোচ্য প্রবন্ধ উচ্চশিক্ষার আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ; তাই আলোচনার বিষয় হলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এর আওতায় পড়ে না—অবশ্য আনুষঙ্গিক হিসেবে এদের সম্বন্ধেও ইঙ্গিত না থেকে পারে না। উচ্চশিক্ষার ধাত্রী ও জননী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক'খানি ইট-পাথর কাঠের প্রাসাদপুরী নয়—এ প্রাণবান্, এর প্রাণ-শক্তি জাতির জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। জাতির জীবন প্রবাহের গতির নিয়ামক বিশ্ববিদ্যালয় তাই এর কাছে আমরা পাই চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান। এমন ক্ষমতা যার তাতে গলদ থাকলে জাতীয় চরিত্রে গলদ থেকে যায় তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় যে সব গলদ রয়েছে তা দূর করতে হবে। শিক্ষা বিষয়ে বিদ্যালয় হবে সার্বভৌম ক্ষমতাশালী (autonomous)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা, ব্যবস্থা ও উন্নতি নিয়ে বহু মনীষী আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত ধারণা থেকেই এ প্রবন্ধ রচিত। মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে বাস্তবতামূলক বা উপযোগিতামূলক ধারণা আজও আমাদের পরিষ্কার নেই। আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ কেউ কাউকে বাদ দিয়ে চলতে গেলে চলার পথে হোঁচট খেতে বাধ্য। শুধু ভাবের রসে জীবন সমৃদ্ধ করা চলে না; ভাবের সঙ্গে বাস্তবের রসায়নেই জীবনের কৃতিত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা আমরা পাচ্ছি তা আরো বাস্তববাদী হওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃতি ও ভাবের ধারক ও বাহক হ'য়ে বিশ্ববিদ্যালয় বেঁচে থাকে কালে জাতীয় জীবনে এগুলো অপরিচ্ছেদ্য; কিন্তু তার সঙ্গে জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কেই। জাতীয়জীবন আজ যেন দুদিকে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে; এদের দ্বিমুখী গতি ফিরিয়ে একমুখী করতে হবে; এদের মিলতে হবে একই মহাসঙ্গমে। তাহ'লেই শুধু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ফলপ্রসূতা আমরা বুঝতে পারবো।

আলোচনার এ অংশটা হয়তো একটু বিমূর্ত (abstract) ধরনের হ'য়ে পড়ছে—তাই সহজ কথায় বলা দরকার:—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যারা পাবে তারা শুধু ভাববাদী না হয়ে কর্মবাদীও হবে, দুচারটে ভাবধর্মী অবিদ্যা (academic) কথার দুলবুরি না ছড়িয়ে ভাব ও বাস্তবের সমাবেশে জাতীয়চরিত্র দৃঢ় করবে, জীবনসংগ্রামের একলা চলার মনোভাব ছেড়ে সমষ্টিগত অগ্রগমনের দিকে লক্ষ্য রাখবে, চরিত্রবল ও কর্মবল দিয়ে দশজনের অনুকরণীয় হবে, এমন শিক্ষার প্রসূতি হবে বিশ্ববিদ্যালয়। প্রত্যক্ষভাবে সমাজসেবায় অংশগ্রহণ করতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা বাড়াবার কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে।

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্র সংখ্যা বিচার করলে দেখা যায় সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাধারণশিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (professional) ও শিক্ষার্থীর চেয়ে বহুগুণ বেশী। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজ্ঞ, শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকদের সংখ্যা লজ্জাকরভাবে কম। সাধারণশিক্ষাক্ষেত্রেও মোট জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমীদেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম, তবু বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীর তুলনায় বহুগুণ বেশী। ফলে জাতির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞের সংখ্যা নগণ্য। গঠন, সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে লোকের অভাব। সাধারণ শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে—কারণ জীবনের প্রতিপদক্ষেপে তাদের সুযোগহীনতা ও অসহায়ত্ব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থার জন্যে শিক্ষার্থীরা কতটা দায়ী ভেবে দেখতে হবে। "সোবিদ্যায় নয়" মনোভাব নিয়ে ছাত্রদের এ নিয়ে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করলে চলবেনা। আঁধারে ঘেরা ভবিষ্যৎ, তবু সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রের ভীড়ের কারণ কি? একথা বলা ঠিক হবেনা যে অপরিণামদর্শিতার ফলে ছাত্রগণ বি. এ., বি. এস্‌সি পড়তে যায়। আই. এস্‌সি পাশ করে ডাক্তারী বা ইঞ্জিনীয়ারীং পড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করে বি. এস্‌সি পড়তে যাওয়া ছাত্রের সংখ্যা কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষে বসে ছাত্রদের বলতে শোনা যায়—"এম্. এ পড়তে এসেছি সাময়িকভাবে বেকারত্ব ঘোচাতে।" কলেজের ছাত্রদের অনেকের মুখেও এরূপ উক্তি শোনা যায়। অনন্যোপায় হ'য়ে পড়তে এসে এরা শিক্ষায় মন বসাতে পারেনা—রাজনীতি, দলীয় মনোভাব ইত্যাদি অবাঞ্ছিত পথে গা এলিয়ে দেয়; ছোট্ট অসন্তোষের বীজ থেকে পর্বতপ্রমাণ অবাধ্যতা ও অপরিণামদর্শিতার বিষবৃক্ষ গজিয়ে সমাজদেহ ক্ষতবিক্ষত করে। আলোর সন্ধান পেলেও এরা আঁধারের পথ বেছে নেবে এরূপ ধারণা করবার কোনও কারণ নেই। বিকল্প সুযোগের অভাবেই এদের জীবনে ছন্দপতন দেখা দেয়; বিকল্প (alternative) শিক্ষাসুযোগ পেলে তারা তা আগ্রহ নিয়েই গ্রহণ করবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বৃত্তিমূলক (professional) শিক্ষাব্যবস্থার প্রাচুর্য থাকলে সমাজজীবন বহুভাবে উপকৃত হয়। অনেকের মতে কলেজীশিক্ষায় ভর্তি করবার আগে শিক্ষার্থীদের একটা উচ্চমানের পরীক্ষা (test) পাশ করতে হবে—এভাবে শিক্ষার্থীর ভীড় কমানো যাবে। এ ধারণা কতটা যুক্তিসঙ্গত তা ভাববার বিষয়। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙবার উদ্যম খুব প্রশংসনীয় নয়। এতে পরের যাত্রা হয়তো ভাঙে কিন্তু নিজের কাটানাকের

ক্ষতিপূরণ মেলে না। রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব শিক্ষাথীদের শিক্ষার সুযোগ মেটানো। দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে আংশিকভাবে এদের কাছে শিক্ষার দরজা বন্ধ করে দেওয়া সমীচীন নয়—উচ্চশিক্ষার বেদীতে যারা স্থান পাবার যোগ্য নয়, তাদের বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা না করে কলেজী-শিক্ষার দরজা বন্ধ করা নীতিগত, সামাজিক ন্যায়গত ও বাস্তব বিবেচনার দিক থেকে অন্যায়ই শুধু নয়, অমার্জনীয় অপরাধও। এতে জীবন প্রাচুর্যের উৎস তরুণতরুণী-সমাজে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠতেও পারে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ পেলে অনেকেরা বা সাধারণশিক্ষার প্রতি ঝোঁকহীন ছাত্রগণ সেদিকেই ঝুঁকবে, সাধারণ শিক্ষাগারের দিকে ছাত্রদের মত চেয়ে থাকবার জন্যে দরজায় ধর্না দেবেনা। উচ্চদেশে মেধাপরিমাপক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়; এ পদ্ধতি ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যয়বহুল দরিদ্র ভারতের পক্ষে এরূপ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া দুর্বুদ্ধির পরিচায়ক। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়ে দিলেই দেখা যাবে একশ্রেণীর শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় এ সুযোগ নেবে—এদের অভিভাবকগণও এদিকে আগ্রহী হবেন। মেধা-পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধিত হবে। যে সকল বৃত্তিশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে তার দিকে লক্ষ্য করলেই এ-সত্য ধরা পড়ে। ক্ষিদে পেলে ক্ষুধিতকে তার ক্ষিদে পেয়েছে একথা বলে দিতে হয় না, দিতে হয় আহার্য—তা না পেলে সে অখাদ্য কুখাদ্য খেতেও বিরত হয় না। বৃত্তিশিক্ষার জন্যেও একশ্রেণীর ছাত্র ক্ষুধিত হয়ে বসে আছে, এরূপ শিক্ষার সুযোগ তাদের কাছে আহার্যের মত। এশিক্ষা পাবার সুযোগ না পেয়েই এরা সাধারণ শিক্ষা তাদের কাছে অখাদ্য কুখাদ্যের পর্যায়ের জেনেও এতেই ভীড় বাড়াচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে সার্ভে, ড্রাফ্‌টস্‌ম্যানশিপ্‌, ইঞ্জিনিয়ারিং, ওভারসীয়ারী, মেডিক্যাল, নার্সিং, শিক্ষক-শিক্ষণ, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় কোথাও শিক্ষার্থীর অভাব নেই, বরং ভর্তি হতে পারার সুযোগের অভাবে একটা বেদনা-বোধ নিয়ে হাজার হাজার ছাত্র সাধারণ শিক্ষার দিকে ঝোঁকে। এ অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের একার নয়, সমগ্র ভারতেই এক অবস্থা। ফলে একদিকে এসব বিষয়ে অভিজ্ঞদের অভাবে গঠন ও সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অপরদিকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অযোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রের ভিড় বাড়ছে—কাজেই সামাজিক অমঙ্গল ঘটছে। সাধারণ শিক্ষায় বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীরই অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ আর বৃত্তিশিক্ষার সুযোগের অভাব—এ দু'য়ের ঘূর্ণাপাকে শিক্ষার্থী সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর জননী ও সমাজে ধাত্রী এ সমস্যার সমাধানে এরই সর্বপ্রধান দায়িত্ব। এখানে প্রশ্ন ওঠে এর পক্ষে কতটা করা সম্ভব। সমাজকল্যাণী নাগরিকগঠনের দায় রাষ্ট্রের—বিশ্ববিদ্যালয় এ কাজে একমাত্র সহায়ক। শিক্ষাসংস্কারের জন্যে প্রয়োজনী অর্থ রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দেবে, এটা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য। একথা আবার বলে রাখা দরকার যে অর্থ ও পরামর্শ দেবার ক্ষমতার চেয়ে বেশী কিছু রাষ্ট্রের (সরকারের) হাতে থাকা অবাঞ্ছনীয়—শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বভৌম থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়। সরকার হবে উপদেষ্টা, সহায়ক; পরিচালক হবে বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্তন অতি আবশ্যক। কমার্স, আর্টস্‌, সায়েন্স, বৃত্তিমূলক পরীক্ষা ইত্যাদিতে পাশ করলেও ডিগ্রী দেবার আগে কিছুদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক করা দরকার—এরজন্যে বিরাট ব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না। সরকারী সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন হাসপাতাল, কৃষিক্ষেত্র (farm), স্কুল, গবেষণাগার, বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশ ছাত্র ভর্তি করবার ব্যবস্থা করতে পারে। একথা মনে রাখতে হবে যে বাস্তব অভিজ্ঞতালাভের ক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়কেই জোগাড় করে দিতে হবে; ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ ক্ষেত্র জোগাড় করা শক্ত। আর্টস্‌ বিষয় সম্বন্ধে বলা হয় বাস্তব অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ এতে থাকতে পারে না। এ ধারণার যুক্তি খুঁজে পাওয়া শক্ত। বিজ্ঞান বিষয়ের মত গবেষণাগারে বসে আর্টসের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয় না বটে, কিন্তু সমাজও কম বড় গবেষণাগার নয়। বিভিন্ন দলে আর্টস্‌ ছাত্রগণ সামাজিক অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থা, ঐতিহাসিক সত্য, সাহিত্যিক প্রগতি ইত্যাদি তাদের সমাজের প্রতিটি দিকের খুঁটিনাটি তথ্য আবিষ্কার করতে পারে। এ

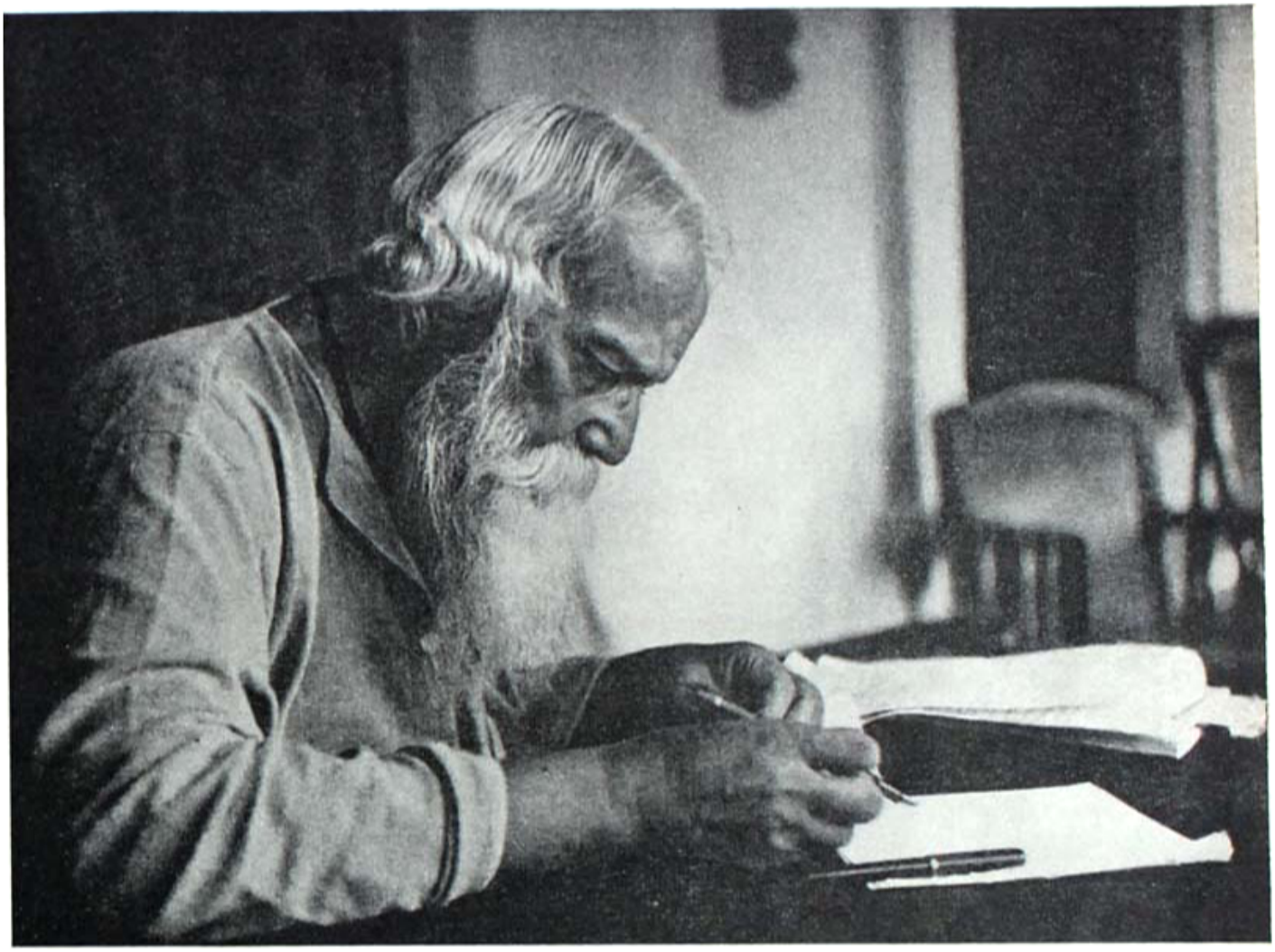

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রথম মহিলা স্নাতকদ্বয় (১৮৮৩)

চন্দ্রমুখী বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকবৃন্দ (১৮৫৮)
যদুনাথ বসু এবং
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

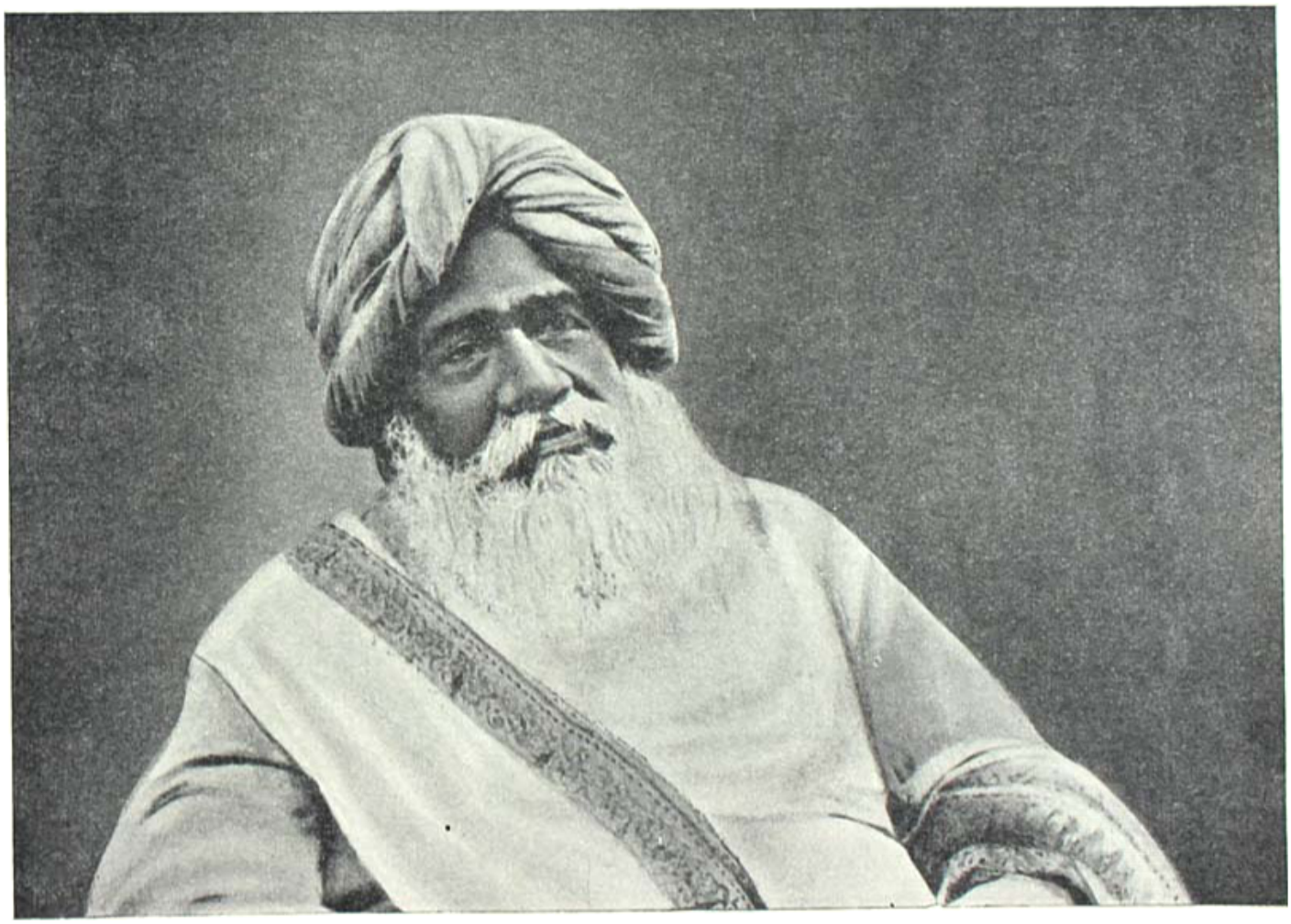

বাস্তবজ্ঞান তাদের পুথিগত জ্ঞানের পরিপূরক হবে। আমরা প্রতি বছর বহু অর্থনীতির ছাত্র পাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজের বাস্তব আর্থিকরূপ প্রকাশ করে সমস্যাসমূহের সমাধানের পথ দেখাতে পারে এরূপ বাস্তবধর্মী অর্থনীতিবিদ্ আজো আমাদের দেশে সৃষ্টিমেয়। পারিপার্শ্বিকের দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু পুঁথি ঘেঁটে বিদ্যালাভের এই-ই চরম পরিণতি। নিজের গ্রাম, সহর, প্রদেশ ও দেশকে তলিয়ে দেখবার মতো বাস্তব শিক্ষার সুযোগ পেলে ছাত্রগণ আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যাবে একথা জোর করে বলা চলে। কারণ এরূপ অভিজ্ঞতা থেকে এরা সৃষ্টিসন্ধানী মন ও ক্ষমতা লাভ করবে। সৃষ্টির আনন্দ মানুষের মনে সনাতন, তাকে জোর করে জাগিয়ে তুলতে হয় না। স্রষ্টা সৃষ্টির আনন্দ নিজেও ভোগ করে, অপরকেও বিলায়—শিক্ষার বস্তু বাস্তবে রূপ দেবার আনন্দ সীমাহীন। হাতে কলমে শেখবার সুবিধে পেলে ছাত্রদের কাছে 'এটা নীরস, ওটা সরস' এরূপ কোনো বিষয় থাকবে না। ছাত্রদের নিবিড় সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাঁরা জানেন কোন ছাত্রের কাছে কতকগুলো বিষয় নীরস—সৃষ্টিধর্মী শিক্ষা এ ধারণা দূর করবে। কিতাবে রস থাকে না, নিজের মনের রস দিয়ে তাকে রসিয়ে নিতে হয়, আর তারজন্যে প্রয়োজন মনকে সৃষ্টিক করে তোলবার উপাদান—সৃষ্টিধর্মী শিক্ষা। এরূপ ব্যবস্থায় সমাজ ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাবে ফলে সামাজিক কল্যাণের মূর্তি নিয়ে দেখা দেবে বিশ্ববিদ্যালয়।

ছাত্রদের মধ্যে আজ যে শৃংখলাবোধের অভাব দেখা দিয়েছে, নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে উন্নত করবার ক্ষমতার যে অভাব বেড়ে চলেছে, শিক্ষায় আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারলে শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করতে পারলে এ অভাব দূর হবে। 'মেনতেন প্রকারেণ' পরীক্ষা পাশের মনোভাব দূর করতে পারলে তবেই শিক্ষায় আগ্রহ দেখা দেবে। আগ্রহশীল, সৃষ্টিক্ষম নাগরিক—রাষ্ট্রের গৌরবের বস্তু। জ্ঞান, গরিমা ও শক্তির আসনে আগামী ভারতকে বসাতে হলে শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন অতি প্রয়োজনীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুবকল্যাণ কর্মধারা

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
ইংরাজী বিভাগ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক যে খুবই গভীর একথা আজ পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন্ (১৯১৭-১৯) এই দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রথমে আকর্ষণ করেন। তখন ছাত্রদের শরীরচর্চা, বাসাবস্থা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যত্ন নেবার জন্য একটি বিভাগ খোলার পরিকল্পনা হয়। ১৯২০ সালে তৎকালীন উপাচার্য নীলরতন সরকার ও বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানে এই বিভাগ বোর্ড অব্ হেল্‌থ নামে পরিচিত। এই বিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব-কল্যাণ কর্মধারার পরিচয় মেলে।

প্রথম থেকেই ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়াই ছিল এই বিভাগের মূল উদ্দেশ্য। খাদ্য তত্ত্ব সম্বন্ধেও গবেষণা ও পর্যালোচনা এখানে হয়েছে আজ পর্যন্ত প্রায় ৮০,০০০ ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন এই বিভাগের চিকিৎসকেরা। ৩০টি বিশেষ মূল্যবান বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে।

কলেজী ছাত্রদের খেলাধুলা ও শরীর চর্চার ভারও এই বিভাগের ওপর অনেকদিন ছিল। নৌকাচালনা, সন্তরণ, ব্যায়াম ও নানাবিধ ক্রীড়ার আয়োজনও ধীরে ধীরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠতে থাকে। বর্তমানে এ সব ব্যবস্থা স্পোর্টস্ বোর্ড করে থাকেন। ১৯৪৪ সাল থেকে বোর্ড অব্ হেল্‌থের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্দুকচালনা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯২৪ সাল থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমাজসেবার সুযোগ বিস্তার করবার ভার নেন বোর্ড অব্ হেল্‌থ্। এই বিষয়ে অনুরোধ ও অর্থ সাহায্য আসে ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে। ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে যুব-কল্যাণ কর্মধারার স্থান আছে। জাতীয় যুবশক্তিকে বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনা এবং বহুবিধ উপায়ে তাকে সতেজ সংঘত ও কৃষ্টি সম্পন্ন করে তোলাই এই কর্মধারার উদ্দেশ্য। কয়েকটি মূল উদাহরণ হচ্ছে সমাজসেবা শিবির, যুব-উৎসব, ভারতের বিভিন্ন স্থানে যুব-আবাসের ব্যবস্থা, শিক্ষা ও আনন্দের জন্য ভ্রমণের আয়োজন ইত্যাদি।

সমাজসেবা শিবিরগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সক্রিয় পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া। এতে দু পক্ষেরই যথেষ্ট লাভ। নিরক্ষরতা দূর করা, স্বাস্থ্য ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা, সামাজিক-অর্থ নৈতিক এবং লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা—সমাজসেবী ছাত্রছাত্রীরা গ্রামে গিয়ে এই সব কাজ করে থাকে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে তারা নানাপ্রকার নির্মাণ ও সংস্কারের দ্বারা গ্রামোন্নয়নে সহায়তা করে। গত দু' বছরে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় এইরকম প্রায় ২০টি শিবির হয়েছে। এই সব শিবির থেকে পাওয়া তথ্য সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরণের সমাজসেবা সরকারী তত্ত্বাবধানে এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেসনের অর্থসাহায্যে ছাত্রেরা গ্রামসেবকদের সঙ্গে মিলে করেছে অনেক জায়গায়। প্রায় ১৫০ ছাত্র অস্থাবধি সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে কাজ করে এইভাবে অ্যাপ্রেন্টিস্‌শিপ্ ট্রেনিং পেয়েছে।

আর একটি কাজ গত তিন বছর ধরে বোর্ড অব্ হেল্‌থ্ করছেন। সেটি হচ্ছে যুব-উৎসবের সংগঠন। ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের আয়োজনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই যুব-উৎসবে যোগদান করে। নয়া দিল্লীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় টাল্‌কোট্‌রা উদ্যানে। সেখানে শিবিরে বাস করে ছাত্রছাত্রীরা। কলাশিল্প, নৃত্য সংগীত ও অভিনয়ের প্রতিযোগিতা চলে এক সপ্তাহ ধরে। গত তিন বৎসরের উৎসবেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে অংশ গ্রহণ করেছে।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে বোর্ড অব্ হেল্‌থ্ নিজস্ব গণ্ডীর বাইরে বহু কাজ করেছে। সে কাজ প্রশংসনীয় হলেও সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। সেই জন্যই খেলাধুলার জন্য যেমন আলাদা স্পোর্টস্ বোর্ডের সৃষ্টি হয়েছে যুব-কল্যাণ কার্যের জন্যও তেমন একটি আলাদা বোর্ড অব্ স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ারের প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝতে পারছি। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব শেষ হলে কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে দৃষ্টিক্ষেপ করবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গভাষা সাহিত্য

শ্রীকালিদাস রায়

আমরা যখন লেখাপড়া করেছি—তখন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পরীক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠান। এখনকার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। বাংলা সাহিত্য ব'লে একটা বিষয়ও পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলনা। বাংলা ভাষাতেও তখন পঠন পাঠন ছিলনা। সেকালে যে সকল কৃতবিদ্য মনীষী বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঋণী না হলেও পরোক্ষভাবে ঋণী ছিলেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কলেজে ইংরাজি সাহিত্য দর্শন ও ইতিহাস এবং সংস্কৃত সাহিত্য অত্যন্ত যত্নের সহিত অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ঐ সকল বিষয় থেকে বাংলা সাহিত্যরচনায় ভাব, অনুভাব, মতবাদ, তত্ত্ব-তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছিলেন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছিলেন।

তারপর ১৯০৯ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদীক্ষার রূপান্তর ও যুগান্তর ভার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত সাধনায় ও উদ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নব কলেবর লাভ হ'ল। ক্রমে বাংলা সাহিত্য পরীক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয় ব'লে গণ্য হ'ল, বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষার প্রবর্তন হ'ল এবং বাংলাভাষার পঠন পাঠন চলতে থাকল।

এই রূপান্তরিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে কতটা পুষ্টিদান করেছে—বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কতটা ঋণী—তাই এখানে আলোচ্য। সেকালে বাংলা একটা বিষয় রূপে গণ্য হ'ত না ব'লে যে শিক্ষার্থীরা বাংলা-ভাষায় ভাল করে অনেকে লিখতে পারত না তা নয়। যারা মাইনার স্কুলে পড়ে আসত—তারা বাংলা-ভাষা সুষ্ঠুরূপেই অধিগত ক'রে আসত। কারণ, মাইনারে বাংলা ভাষার মান উচ্চ ছিল—এখনকার, মাট্রিক বা স্কুল ফাইন্যালের মানের চেয়ে তা নিম্নতর ছিলনা। তাছাড়া তারা ইতিহাস ভূগোল পদার্থ বিদ্যা, গণিত ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বাংলাভাষাতেই অধ্যয়ন করত। কিন্তু সকলে ত মাইনার স্কুলে পড়ত না—অনেকেই গোড়া থেকেই হাইস্কুলে পড়ত। তারা বাংলাভাষা ভালো ক'রে শিখত। বোধহয় সেজন্য সেকালে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পিতাকেও ইংরাজিতে চিঠি লিখত। অবিমিশ্র বাঙালীদের সভাতেও বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইংরাজিতেই বক্তৃতা করত।

বাংলা অবশ্যপাঠ্য হওয়ার পর প্রত্যেক ছাত্রকেই এখন বাংলা ভাষা শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে অধিগত করতে হয়। এখন আর—বাংলা লিখতে পারি না একথা বলবার উপায় নেই, বাংলা ভালো জানিনা বলে গৌরব করবারও সুবিধা নেই। এখন সকলেই বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লিখতে পারেন। বাংলাভাষায় বক্তৃতা করতে পারেন, বাংলাগ্রন্থপাঠে সকলেরই অনুরাগ বেড়েছে। বাংলাভাষায় লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্য রচয়িতার সংখ্যাও ঢের বেড়েছে—বাংলাভাষায় অজস্র পুস্তকও রচিত হচ্ছে—বাংলা সংবাদপত্র এখন ঘরে ঘরে পঠিত হয়,—বাংলাসংবাদ-পত্র সাপ্তাহিকের স্তর পার হয়ে দৈনিক স্তরে আরোহণ করেছে। এ সমস্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েরই অবদান।

বাংলাভাষার পঠন পাঠনের প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় বাংলা ভাষার অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। পরীক্ষাদের পাঠ্য বিষয়গুলির গ্রন্থাবলী বাংলা ভাষায় রচিত ও অনুদিত হচ্ছে। তার ফলে বাংলা ভাষায় এখন সর্বশাস্ত্রেরই বিচার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্ভব হচ্ছে। এখনও অবশ্য এ কাজ প্রাথমিক স্তরেই আছে—কিন্তু অনতিবিলম্বে সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবেই নিষ্পাদিত হবে।

ছাত্রগণকে সর্বশাস্ত্রই বাংলা ভাষার মাধ্যমিকতায় পঠন পাঠনের সুযোগ দেওয়ায় এবং পরীক্ষায় প্রশ্নাবলীর বাংলায় উত্তর দেওয়ার অধিকার দেওয়ায় ছাত্রগণ সকল বিষয়ের

তত্ত্বতথ্যাদি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করবার দক্ষতা লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সকল বিষয়ের পারিভাষিক শব্দও রচনা করিয়া দিয়াছে। এই যে বাংলায় সকল বিষয়ের ভাবপ্রকাশের দক্ষতা ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিকতায় লাভ করেছেন এবং করছেন—তা বর্তমান স্বাধীন বাংলার বিবিধ প্রতিষ্ঠানে তা কাজে লাগছে এবং লাগবে।

বাংলায় অনার্স ও এম-এ পরীক্ষার প্রবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভাষার যোগাযোগ ঘটেছে, প্রাচীন সাহিত্যের সমাদর বেড়েছে। প্রাচীন লুপ্ত প্রায় সাহিত্যের পুনরুদ্ধার, পুনর্মুদ্রণ, সটীক সংস্করণ ও ঐ সাহিত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়েছে। ফলে প্রাচীন সাহিত্য শুধু আলোকে আসে নাই তা নবকলেবর লাভ করে সমাদৃত হচ্ছে। প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বহু পুস্তকই রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে—যে সকল গ্রন্থ অন্য প্রকাশকরা প্রকাশ করতে চান না যথেষ্ট লাভের প্রত্যাশা নেই ব'লে—বিশ্ববিদ্যালয় তা প্রকাশ করেছে এবং করছে। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে বর্তমান সাহিত্যের যোগধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল—স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের গবেষণার ফলে তাহা পুনরায় গ্রন্থিত হয়েছে। এম-এ শ্রেণীর ছাত্রদের প্রয়োজনেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিরচিত হয়েছে এবং ইতিহাসের অধিকতর উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছে। কেবল ইতিহাস বাংলা ভাষা তত্ত্বের গ্রন্থাদি এম-এ ছাত্রদের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকতায় রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমান সাহিত্যেরও বহুগ্রন্থ বহুদিন পুনর্মুদ্রিত হয়নি—সেগুলি লুপ্ত হইতে চলেছিল। এম-এ ও বি-এ অনার্সে পাঠ্য হওয়ায় সেগুলির পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হচ্ছে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কৃতী ছাত্রদের বৃত্তি দিচ্ছে। বাংলার লোক সাহিত্যের উদ্ধারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বহু অর্থব্যয় করেছে এবং করছে। রবীন্দ্র সাহিত্য নিজেই একটা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গভীর সংযোগ রক্ষা করেছে—ফলে রবীন্দ্র সাহিত্যের রসপ্রদাতা ও রসবেত্তার সংখ্যা ঢের বেড়েছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশ থেকেও বাংলা বিভাগে ছাত্র ও শিক্ষার্থী আকর্ষণ করতে পারছে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পুষ্ট করছেনা—তার গৌরব ঢের বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে থিসিস্ পেশ করার অধিকার ও ডক্টরেট দেওয়ার প্রবর্তন করার ফলে বৎসর বৎসর বহু গবেষণামূলক ও সমালোচনামূলক গ্রন্থাদি রচিত হচ্ছে।

সকল গ্রন্থ ডক্টরেট অর্জন করতে পারে না বটে, কিন্তু গ্রন্থরচনা ব্যর্থ হয় না। গ্রন্থগুলির সামান্য সামান্য ত্রুটি থাকলেও বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করছে। বাংলা সাহিত্যের বিবিধ শাখার মধ্যে সমালোচনা সাহিত্য সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দান। সমালোচনা সাহিত্যের সাধারণ পাঠকের বড়ই অভাব—অনার্স ও এম-এ ছাত্রদের জন্যই সমালোচনা সাহিত্য এদেশে রচিত হচ্ছে—বাইরের পাঠকের ভাবনায় নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি লেকচারারশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তন্মধ্যে শরৎচন্দ্র লেকচারারশিপ, লীলা লেকচারার শিপ, গিরিশ লেকচারার শিপ উল্লেখযোগ্য। এক একটি লেকচার এক একখানি গ্রন্থের রূপ ধরে এবং এই গ্রন্থগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রকাশ করে। এই সকল লেকচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণতঃ সাহিত্যিকদেরই আহ্বান করে। এতে সাহিত্যিকদের সম্মানিত করা হয়, বৃত্তি দানে উৎসাহিত করা হয় এবং চিন্তাগর্ভ গ্রন্থরচনায় উদ্দীপিত করা হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-ও একটি প্রকরণ।

এখন কথা হতে পারে—আসল সাহিত্য দেশের কাব্য, নাট্য, কথাসাহিত্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কি? রবীন্দ্রনাথ থেকে আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যা রচিত হয়েছে—তার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় পরিবর্ধিত লেখকদের রচনা নয়। দুই দশ জন গ্রাজুয়েট সাহিত্যিকও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কি ঋণী? বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের কোন-না-কোন ভাবে সম্মানিত করছেন। যেমন—লেক্‌চারার শিপ দিয়ে, মেডাল দিয়ে, প্রাইজ দিয়ে, অনার্স ও এম-এ পরীক্ষায় গ্রন্থ পাঠ্য ক'রে। আমি সে ঋণের কথা বলছিনা। এসব মর্যাদা অকিঞ্চিৎকর—

অনারারি ডিগ্রিটি না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত মর্যাদা দান হয় না।

রিপণ কলেজ থেকে একবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পথের পাঁচালী রচনার জন্য অভিনন্দন দেওয়া হয়। বিভূতি তদুত্তরে বলেছিলেন তিনি কলেজের কাছে পথের পাঁচালীর জন্য ঋণী ন'ন। তিনি ঋণী তাঁর জন্মগ্রাম বারাকপুরের (বন গাঁ) কাছে। তাতে অধ্যাপক বটুক নাথ ভট্টাচার্য বলেছিলেন—গ্রন্থের উপাদানের জন্য তিনি কলেজের কাছে ঋণী ন'ন সত্য। কিন্তু রসসৃষ্টির উপকরণের জন্য তিনি কি তাঁর কলেজের কাছে ঋণী ন'ন? তাছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের মত মহামনীষীর প্রভাব কি কিছুই ছাত্রদের উপর সঞ্চারিত হয় নি? আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম।

মূল কথা হচ্ছে—এ যুগের কোন বাংলা গ্রন্থের সৃষ্টির মূলে যদি ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব বর্তমান থাকে—তবে তা বিশ্ববিদ্যালয়েরই পরোক্ষ দান। আমি জানি বিভূতিভূষণ বহু ইংরাজি গ্রন্থ পড়তেন—সেই সব গ্রন্থ পাঠের ফল উপাদানে না হোক উপকরণে কি রূপ লাভ করে নি?

যাই হোক, যে সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে কখনো ছিলেন না—তাঁরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ একেবারে অস্বীকার করতে পারেন না। তাঁরা কলেজে বেশিদিন হয়ত পড়েন নি—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসঙ্গে পরিবেষ্টিত পূর্বসূরিগণ সহযোগিগণ ও সুহৃদ্‌গণের মধ্য দিয়ে ভাব ভাষা ভাবী তথ্য ইত্যাদি পরিশ্রুত হয়ে তাঁদের লেখনীতে কি সঞ্চারিত হয় নি? অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যায় না বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূল শিক্ষাক্ষেত্রও কারো কারো প্রতিভাকে বল ও পুষ্টিদান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ই ত একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র নয়।

বিজ্ঞান সাধনা ও বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের দুইটি অঙ্গ—আর্টস ও সায়ান্স। সায়ান্স বা বিজ্ঞান বিভাগের কথা আমরা কম বেশী অবগত আছি। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং স্যর্ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমনের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স কলেজের অধ্যয়ন-অধ্যাপন উহার প্রতিষ্ঠাবধি পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্দ্ধশতাব্দীকাল এই বিভাগ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে কিরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহা স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়; এখানে সে চেষ্টা করিবও না। বিজ্ঞান সাধনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম যুগে আদৌ প্রগতিশীল হয় নাই; ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে কিছু করাইবার জন্য বিস্তর আন্দোলন ও আলোচনা পরিচালিত করিতে হয় দেশহিতৈষী মনীষী-বৃন্দকে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবং একাধিক বিজ্ঞান-সাধক বিজ্ঞানের গবেষণায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উৎসবের সুযোগে আমরা সংক্ষেপে আজ এ কথা স্মরণ করিব।

বিজ্ঞানবিষয়ক পত্র-পত্রিকা ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত হইতে থাকে গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক হইতে। শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যাপক জন ম্যাক কিমিয়া বিদ্যার গবেষণা ও অধ্যাপনা আরম্ভ করেন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে। এই সনেই এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে এক প্রস্থ বক্তৃতাও তিনি করিয়াছিলেন। কেমিষ্ট্রি বা রসায়ন শাস্ত্রের তখন বাংলা করা হইত কিমিয়া বিদ্যা। অধ্যাপক ম্যাক ১৮৩৪ সনে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'কিমিয়া বিদ্যার সার' প্রণয়ন করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়ম ক্রুক ওসগনেসি কর্তৃক পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত বিদ্যুতের গবেষণা খুবই অগ্রসর হয়। বড়লাট অকল্যাণ্ড ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীবর্গ এবং বেসরকারী মান্যগণ্য দেশী-বিদেশী ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে ডাঃ ওসগনেসি বিদ্যুতের এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা দেখান। বিলাতে এই সময় মহামতি ফ্যারাডে বৈদ্যুতিক গবেষণা পরিচালনা করিতেছিলেন। ওসগনেসি বিদ্যুৎ-বিষয়ক গবেষণায় এতটা পারঙ্গম হন যে, ভারত-সরকার পঞ্চম দশকের প্রারম্ভে এদেশে 'টেলিগ্রাফ' প্রবর্তনে তাঁহাকে বিনা দ্বিধায় নিযুক্ত করিলেন। তিনি এই বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল বা অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। সেযুগে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ বিজ্ঞানের আলোচনা-গবেষণার কেন্দ্র হইয়া উঠে। এসিয়াটিক সোসাইটির তো একটি উদ্দেশ্যই ছিল—বিজ্ঞান চর্চা। এখানেও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা চলিতেছিল বহু পূর্ব হইতেই।

অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও বিজ্ঞানের আলোচনায় অগ্রসর হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা যে সমুদয় বিভাগ পরিচালনা করিতেন তাহাতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান আলোচনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় বিজ্ঞান-শিক্ষার আয়োজন হয়। পাঠশালায় প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান-পুস্তক রচনা করেন। পরে তাঁহারই সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ইহার পৃষ্ঠায় সচিত্র ও অ-চিত্র বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও এই পত্রে স্থির করিয়া দেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে যখন বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহার অন্যতর মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ণীত হয় বিজ্ঞানের আলোচনা। মেডিক্যাল কলেজ বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মধুসূদন গুপ্ত, অধ্যাপক শিবচন্দ্র কর্মকার, এবং বাহির হইতে অনেকে উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। অবশ্য পূর্বে কোন কোন লেখক সাধারণ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন, তবে ঐ সময় হইতেই এ বিষয়ক পুস্তক রচনার ধুম পড়িয়া যায়।

১৮৫৭ সনের ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় লণ্ডন ইউনিভার্সিটির আদর্শে। পাঠ্য বিষয় নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ, উপাধি ও সার্টিফিকেট প্রদান—এই সমস্ত কার্য্যের ভার লইলেন বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দায়িত্ব যথারীতি সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহের উপরই ন্যস্ত রহিল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কার্য বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার আদর্শ রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ বিজ্ঞান তথা রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষার ব্যাপারে ইহার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। শ্রীরামপুর কলেজ প্রথম হইতেই এই বিষয়ের একটি বেসরকারী কেন্দ্র হয়; কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৮৫৬ সন হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা হইল। কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ পুনর্গঠিত হইল ষষ্ঠ দশকে। এই দশকের মধ্যভাগে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফাদার ইউজিনি লাফোঁ এখানে বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণা সুরু করেন। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে জন ম্যাকের মত ফাদার লাফোঁর নামও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার গবেষণাগার একে একে এই কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সপ্তদশ দশকের প্রথমে আলেকজাণ্ডার পেডলার প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়া আসেন। তিনি এখানে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া গবেষণা কার্য সুরু করিয়া দেন। একদিকে ফাদার লাফোঁ ও অন্যদিকে আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার কর্তৃক যুব-ছাত্রগণ বিজ্ঞান-চর্চায় প্রেরণা জোগাইতে লাগিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্য্যগণ কৈশোরে ও যৌবনে ইঁহার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সপ্তম দশকে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসারে এবং গবেষণায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতবর্ষ বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়-নিরপেক্ষ ভাবে এদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা ও ও বিজ্ঞানের গবেষণার সূত্রপাত হইল। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে পাঠ্যবিষয় নিয়ন্ত্রণ করে বিজ্ঞান-শিক্ষার বিবিধ পাঠ্য পুস্তকাদি স্থির করিয়া দিতেন। ইহার বেশী কিছু করার আবশ্যকতা তখন তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই বলিলেও ভুল হইবে না।

কিন্তু বিজ্ঞান তখন অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। নব নব আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন দেশের শক্তিবৃদ্ধি হইতে থাকে অপ্রত্যাশিত রকমে। রাজা রামমোহন রায় গত শতাব্দীর প্রথম পাদেই বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সপ্তম দশকে বঙ্কিমচন্দ্র ডাঃ সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠার আয়োজনকে অভিনন্দন জানাইয়া স্বদেশবাসীর বিজ্ঞান চর্চার আবশ্যকতা অতিশয় জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক সর্ববিধ উন্নয়নের মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞান শিক্ষার বহুল প্রচলন। সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাঙালী-যুবকগণ কেহ কেহ বিলাত হইতে বিজ্ঞান-শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহারা একবাক্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু সরকারী কর্মে লিপ্ত থাকিয়া ১৮৮৬ সনে বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার অত্যাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া একখানি সুচিন্তিত পুস্তিকা প্রকাশিত করিলেন, এই পুস্তিকায় তিনি যে পরিকল্পনা বিবৃত করিয়াছিলেন তাহাই আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিলেন ১৮৮৮ সনের প্রথমে কলিকাতা রিভিয়ুতে। এই পুস্তিকা ও প্রবন্ধে বিজ্ঞান শিক্ষা গবেষণা এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার একটি সুন্দর প্রস্তাব করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অতি গৌণ ভাবে। এবং তাহাতেও ত্রুটি-বিচ্যুতি বিস্তর ছিল।

গত শতাব্দীর শেষ দশক এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক—এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে, প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে ভারতবাসীরা অনেকটা আত্ম-সচেতন হইয়া উঠে। শিক্ষার সংস্কার সাধন যে অত্যাবশ্যক—বারংবার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে মনীষিগণ এবং শিক্ষিত সাধারণ উভয়েই অনুভব করিতে থাকেন। রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি পরস্পর সাপেক্ষ, আবার অর্থ নৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞান-শিক্ষার অত্যাবশ্যকতা। 'ন্যাশনাল এডুকেশন' বা জাতীয় শিক্ষার কথা আমরা বহু পূর্ব হইতেই শুনিতে অভ্যস্ত ছিলাম। হিন্দু মেলার

প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা গান্ধি নিজ সপ্তম দশকের আরম্ভে 'ন্যাশনাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পাঠ্য বিষয়ের একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে মনীষিগণ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ পাদে বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিলেন ইহা তো পূর্বেই বলিয়াছি। তবে এ বিষয়ে সার্থক প্রয়াস সুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে। তখন লর্ড কার্জনের বঙ্গব্যবচ্ছেদ জাতির প্রাণে শেল হানে। মুমূর্ষু জাতিকে রক্ষা করিবার উপায় কি? শাসনে অধিকার স্থাপন এবং শোষণ নিরোধের উপায় কি? নিছক রাজনৈতিক প্রচেষ্টা দ্বারাই ইহা সম্ভব নয়, শিক্ষার সংস্কার আবশ্যক। আর বিজ্ঞান শিক্ষাকেই ইহার মূলে করিতে হইবে। সাধারণ বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান উভয়ই শিক্ষণীয়। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যারতন প্রতিষ্ঠিত হইল। একটি সভা বিশেষে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়া যুবকদের বিদেশে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ষ্টেট স্কলারশিপও দুই-একটা প্রদানের ব্যবস্থা হইল এই সময়ে ঐ একই উদ্দেশ্যে।

কিন্তু ব্যাপকভাবে শিক্ষার সংস্কার আবশ্যক। আর ইহা সম্ভব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান দ্বারা। বিশ্ববিদ্যালয় সরকার-পোষিত, ইহার অর্থের অভাব নাই, আবার বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম-ব্রহ্মদেশ—এই বিরাট ভূখণ্ডের উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় ইহা দ্বারা। বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৪ সনে "ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ এক্ট" দ্বারা বিশেষ করিয়া এতদঞ্চলে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কি শুভক্ষণে সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার বা উপাচার্য নিযুক্ত হইলেন! তিনি আইনটি এমনভাবে কার্যে রূপায়িত করিলেন যে, উচ্চশিক্ষা সংকোচন দূরে থাকুক ইহা ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভই করিতে লাগিল। তিনি একাদিক্রমে আট বৎসর উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; ইহাও আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। এখানে বিজ্ঞান-শিক্ষার কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। তাঁহার দ্বারা বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যাপ্তিলাভ সম্ভব হইল। এতদিন বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য যে আয়োজন চলিতেছিল, প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের গবেষণার যে পথ আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র দেখাইতেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের মরশুমে বিজ্ঞান-গবেষণা এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দিকে শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল—এই সকলের একটি স্পষ্ট রূপ দিতে প্রয়াসী হইলেন সার্ আশুতোষ।

সার্ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-রূপায়ণে বিজ্ঞানকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আই. এস্ সি ও বি-এস সি নামক স্বতন্ত্র শ্রেণী ও পরীক্ষা প্রবর্তিত হইল। আই-এসসি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যও পঠিতব্য বিষয়ের অঙ্গীভূত রহিল বটে, কিন্তু বি-এসসি পরীক্ষায় সাহিত্য ও অংকের কোন স্থান না রাখিয়া সম্পূর্ণ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা লইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহকে বিজ্ঞান-শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয় কতকগুলি সর্ত সাপেক্ষে। প্রথমতঃ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি কলেজকে স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানশিক্ষাদানকারী প্রত্যেক কলেজকেই লেবরেটরি বা বিজ্ঞান পরীক্ষণ ও গবেষণাগার স্থাপন করিতে হইল, তৃতীয়তঃ এই সকল পরীক্ষাগারে উপযুক্ত সহকারী অধ্যাপকের (demonstrator) সহায়তায় ছাত্রদের হাতেকলমে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ শিক্ষা দিতে হইবে। সরকারী ও বেসরকারী কোন কোন কলেজে—যেমন প্রেসিডেন্সীকলেজ বা সেণ্ট জেভিয়াস কলেজ—আগে হইতেই লেবরেটরির ব্যবস্থা ছিল। এই সময় হইতে ছাত্রদেরও গবেষণাকার্যের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল। লেবরেটরির কার্যেরও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইল আই-এস্সি এবং বি-এসসি পরীক্ষায়।

এত গেল সংশ্লিষ্ট কলেজ সমূহে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা। সার্ আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অতঃপর স্নাতকোত্তর শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিলেন। এই স্নাতকোত্তর শিক্ষার নাম দেওয়া হইয়াছে "পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিস্"। আর্টস্ এবং সায়ান্স বা বিজ্ঞান দুই-ই ইহার অঙ্গীভূত হইয়াছে। সায়ান্স কলেজের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ব্যাপারে আচার্য্য-প্রবর রচন্দ্র ও সার সি. ভি রমনের কথা গোড়াতেই বলিয়াছি। ইহার প্রতিষ্ঠায় সার্ আশুতোষের কৃতিত্ব অপরিসীম। দানবীর রাসবিহারী ঘোষ এবং তারকনাথ পালিতের বহু লক্ষ টাকা দানে তবে সায়ান্স কলেজ স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। অন্য দাতাদের নিকট হইতেও অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতাদৃশ কর্ম-প্রয়াসে সরকার তেমন সুপ্রসন্ন হইলেন না; আশুতোষের নির্বন্ধাতিশয্যে শুধু সরকারের নিকট হইতে শুধু অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপে শতাব্দীব্যাপী বিজ্ঞান-সাধনার ভার বিশ্ববিদ্যালয় নিজ হস্তে লইলেন।

১২নং আপার সার্কুলার রোডস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ

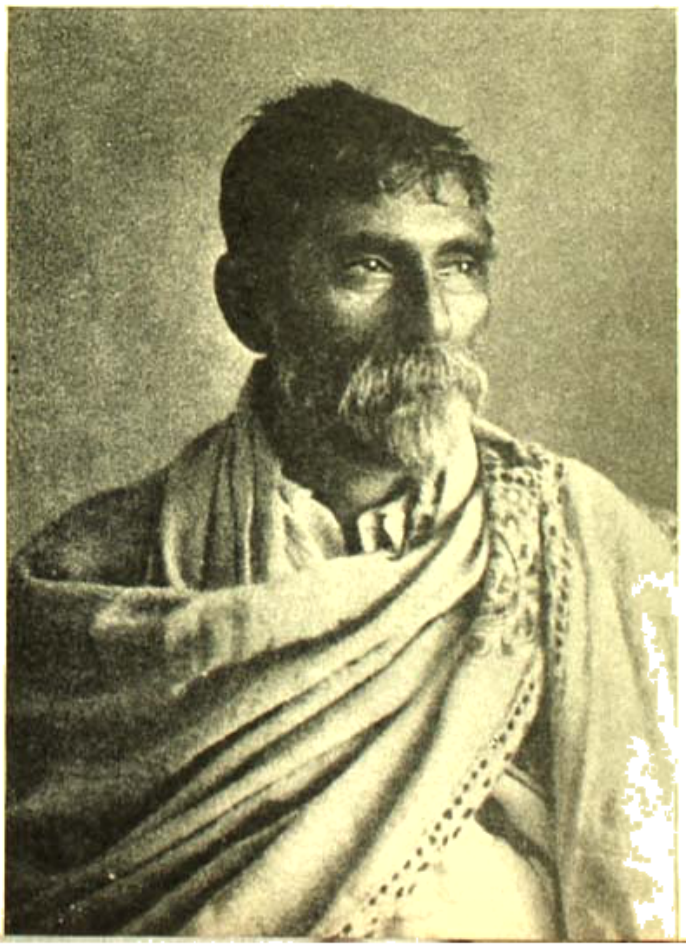

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

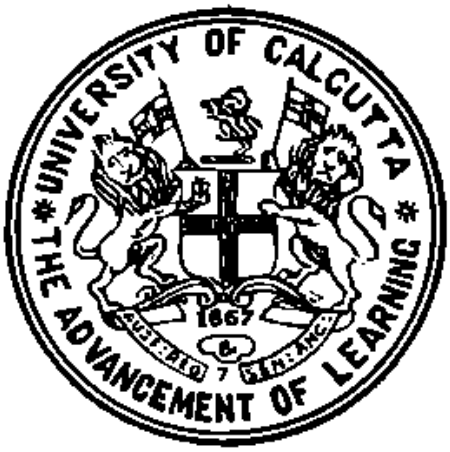

ONE

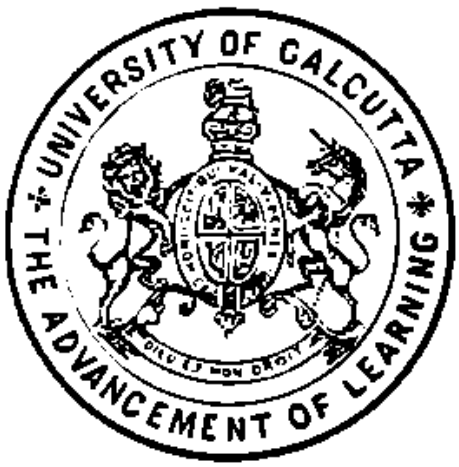

TWO

CHANGING SEALS

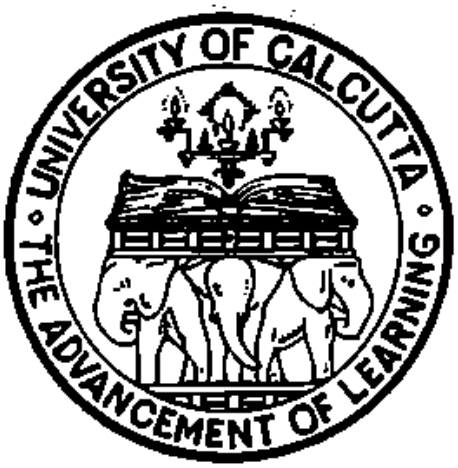

THREE

FOUR

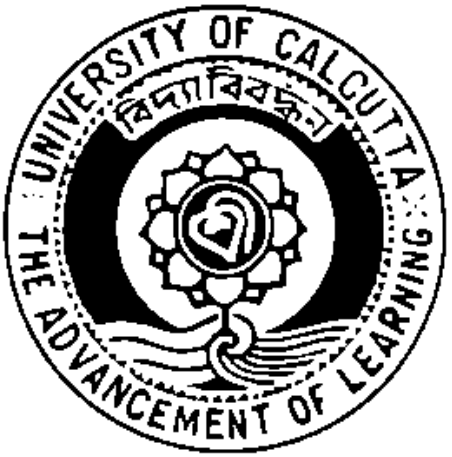

FIVE

SIX

Calcutta University.

ENTRANCE EXAMINATION 1857.

Sudeendra Nath Bose

who was a Candidate at the late Entrance Examination of the Calcutta University, and who then produced a Certificate that he had attained the age of 16 years and was of good moral character, has been declared by the Board of Examiners to have passed such Examination, and has been placed in the First Division.

CALCUTTA UNIVERSITY,
The 4th of May 1857.

W. Grapel Smith
Registrar.

শেষ কোথায়

শ্রীসৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বানুবৃত্তি

All India Exhibition চলিতেছে কলিকাতায়। প্রশান্তদা প্রস্তাব করিলেন, ছেলেমেয়েদের লইয়া সেখানে যাইবেন। জংশন ষ্টেশন এখান হইতে প্রায় তিন মাইল পথ। প্রথম লোকাল ট্রেন ছাড়ে ভোর পাঁচটায়। রাত্রি তিনটায় রওনা হইতে হইবে। আগের দিন সকলে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া রাখিল। আশ্রমের সম্মুখ দিয়াই চওড়া কাঁকর বাঁধান রাস্তাটি রেল-লাইন পার হইয়া, গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের মধ্য দিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। স্থির হইল, সকলেই দল বাঁধিয়া হাঁটিয়া যাইবে। রাত্রিশেষের অস্পষ্ট আলোতে এই অভিযানের একটা আকর্ষণ আছে; বোধ হয় নূতন উষার ডাক। আশ্রমজীবন আরম্ভ হইবার পর এই প্রথম বাহিরে যাওয়া। অরুণ ভাবে, ভালই হইল। আশ্রমের বাহির হইতে একবার এই জীবনটাকে ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাইবে। হয়তো নির্মোহ দৃষ্টিতে তুলনা করিলে সত্যটাই আরও বিকশিত হইয়া ধরা পড়িবে। কিছুদিন হইতেই তাহার মনে এই কথাটা জাগিতে ছিল। অরুণ প্রস্তুত হইতে লাগিল।

যাত্রার পূর্বদিন বৈকালে অরুণ বেড়াইতে বাহির হইল। প্রায় আট বৎসর একাদিক্রমে সে কলিকাতায় কাটাইয়াছে। কত বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজন। বিশেষভাবে রাণীর সহিত দেখা করা প্রয়োজন। তাহার এই নূতন জীবন সম্বন্ধে রাণী তাহার মুখে সব শুনিতে চায়। নানা কারণে সীতা-রামপুর আসা তাহার সম্ভব হয় নাই। অরুণ কলিকাতা যাইবার সংবাদ তাহাকে আগেই চিঠিতে জানাইয়া দিয়াছে।

ছোট ছোট শালগাছের ঝোপে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া একটা জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া লাল মাটীর সরু পায়ে চলার পথ। জঙ্গল শেষ হইলে খোয়াই। হাজার বৎসরের মাটী রৌদ্র ও বৃষ্টির আঘাতে ক্ষয় হইয়া ধুইয়া যাইতেছে। এখানে অরুণ বৈকালের দিকে আসিয়া প্রায়ই বসে। স্থানটীর নির্জনতা ও প্রকৃতির এই রিক্ত সৌন্দর্য তাহার বড় ভাল লাগে। আত্মস্থ করিয়া দেয় তাহাকে। এই শান্ত পরিবেশে নিজেকে যেন পরিপূর্ণভাবে খুঁজিয়া পায় অরুণ। আজও এখানে আসিয়া অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণাভার দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিল। পিছনে কথার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল, একদল মেয়ে কুচিকুল ছিঁড়িয়া মাথায় গুঁজিতেছে। অরুণ মুখ ফিরাইয়া লইল।

ছবি কিন্তু অরুণকে ঠিক দেখিয়া ফেলিয়াছিল।

'দীপুদি, দাদামণি।'

ছবি ছুটিয়া যাইয়া অরুণের পাশে বসিল।

'দাদামণি, কি সুন্দর ফুল, দেখ।'

আঁচল হইতে কতগুলি ফুল বাহির করিয়া ছবি অরুণের হাতে দিল।

'ফুল দিয়ে আমি কি করব রে?'

ফুলগুলি লইয়া অরুণ তোড়া বাঁধিতে লাগিল।

ততক্ষণে অন্য সকলেই কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের দিকে তাকাইয়া অরুণ বলিল,

'এমন রাজকন্যার মত বোনটী আমার, কার হাতে গিয়ে পড়বে তাই ভাবছি।'

অরুণের এই পরিহাসতরল কণ্ঠে সকলে হাসিয়া উঠিতেই ছবি রাগ করিয়া কোঁচড়ের ফুলগুলি মাটীতে ছড়াইয়া ফেলিল। তাহার ছেলেমানুষীতে সকলে দ্বিগুণ জোরে হাসিতে লাগিল।

'তারপর, দলবেঁধে সব ফুল তুলতে বেরিয়েছেন দেখছি। বাঃ, সকলেই যে একগোছা করে ফুল নিয়েছেন। তা, কলকাতায় যাচ্ছেন তো সব কাল? কে কোথায় থাকবেন?' সহজভাবেই অরুণ জিজ্ঞাসা করিল।

'কে কোথায় থাকবে, অত খবরে আপনার দরকার কি ?'

গলার শব্দ শুনিয়া অরুণ বুঝিল, দীপ্তি কথা বলিতেছে।

'আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।'

অরুণের মুখ দীপ্তির কথার ভঙ্গীতে কঠিন হইয়া উঠিল। তবুও সংযত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল,

'যথা ?'

'ছায়া থাকবে ইটালীতে, ওর মামার বাড়ীতে। ওকে ওখান থেকে আপনি এ' দু'দিন সময় মত exhibitionএ নিয়ে আসবেন।'

'হুকুম নাকি ?'

'হুকুম কিসের ! নিয়ে আসবেন, এইটাই বলা রইলো।'

'প্রয়োজন হলে ছায়াই সে কথা বলতে পারতো।'

এ'পাশ হইতে অর্চনা বলিয়া উঠিল,

'ছায়া বললে যদি আপনি না শোনেন ?'

'দীপ্তি বললেই শুনব, এ' ধারণাই বা আপনাদের কি করে হল ?'

'শোনাটাই সম্ভব।'

অরুণ বিরক্ত হইল। অর্চনার দিকে তাকাইয়া বলিল,

'আপনাদের ধারণাকে ধন্যবাদ। ছায়াকে নিয়ে আসা প্রয়োজন বোধ করলে, ছায়া বললেই হয়তো আনতাম। আর কেউ বললে নয়।'

অরুণ দীর্ঘপদক্ষেপে চলিয়া গেল। ছবি এতক্ষণ এক-পাশে বসিয়া শুনিতেছিল। এইবার আগাইয়া আসিয়া বলিল,

'আচ্ছা, যখনই তোমাদের দেখা হবে, তখনই যদি তোমরা ঝগড়া করবে বাপু, তো, দাদামণির সঙ্গে কথা না বললেই হয়।'

ছবির কথায় গুমোট কাটিয়া গেল। সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। দীপ্তি কিন্তু হাসিতে পারিল না। শুধু অরুণের যাইবার পথের দিকে একবার তাকাইল।

প্রশান্তদার পাশে পাশে অরুণ চলিয়াছে নীরবে। ছেলেমেয়েরা দল বাঁধিয়া আগাইয়া গিয়াছে। দূরে অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যায়। পল্লীর এই শান্ত স্তব্ধ জীবন যাত্রায় বাঁধভাঙার ঘোলাবের ঢেউ তুলিয়া, নিস্তব্ধ গ্রাম্যপথকে সচকিত করিয়া যেন নূতনের অভিযানে চলিয়াছে এই ছেলেমেয়ের দল। সদ্য ঘুমভাঙা চোখে দুই একজন আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছে। অরুণের কিন্তু এই কোলাহল ভাল লাগিল না। এমন সুযোগ জীবনে খুব কমই আসে। দুই চোখ ভরিয়া উন্মুখ চিত্তে সে রাত্রিশেষের এই মোহময় রূপ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। এই চিরন্তন শাশ্বত রূপটী জীবনের উচ্ছলতায় ভাঙিয়া দিতে তাহার প্রবৃত্তি নাই।

অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল। প্রথম প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ুতে অরুণের দেহ ও মন জুড়াইয়া গেল। ততক্ষণে তাহারা গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের ভিতর অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে। কিছুদূরে, মাঠের শেষে জংশন সহরের বৈদ্যুতিক আলোগুলি একে একে নিভিয়া গেল। একটা পথের বাঁক পার হইতেই দেখা গেল, কাঁধে একটা ব্যাগ লইয়া একটা ছোট কালভার্টের রেলিংয়ের উপর দীপ্তি বসিয়া আছে। প্রশান্তদা সস্নেহ মৃদুহাস্যে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

'এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছ ?'

'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম দাদা।'

দীপ্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। একপাশে অরুণ ও একপাশে দীপ্তিকে লইয়া তিনি নীরবেই অগ্রসর হইলেন।

চলিতে চলিতে হঠাৎ অরুণ প্রশ্ন করিল,

'আচ্ছা দাদা, বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের কতকগুলো ছকবাঁধা কাজ করে যাওয়াতেই কি জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় ?'

বড় কঠিন প্রশ্ন। প্রশান্তদা ঈষৎ আশ্চর্য হইয়া অরুণের মুখের দিকে তাকাইলেন।

'আর একটু খুলে বল অরুণ।'

'আমি বলছি, জীবনের প্রতি কাজেই যদি শৃঙ্খলার গণ্ডী টেনে দেওয়া যায়, তা' হ'লে কর্মের চেয়ে শৃঙ্খলাটাই বড় হয়ে ওঠে। কর্মের চারদিকে একটা গণ্ডী টেনে দেওয়া হলে কর্ম তার স্বাভাবিক গতি ও মাধুর্য হারিয়ে ফেলে। বিকশিত হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় না।'

'কি করে বুঝলে ?'

'একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিকেলে প্রায়ই আমি শাল-বন পেরিয়ে খোয়াইয়ের ধারে গিয়ে বসি। দিনের শেষের

ঐ প্রাকৃতিক মাধুর্য আমার বড় ভাল লাগে। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই আমার মনে হয়, কর্তব্য রয়েছে। প্রার্থনায় যোগ দিতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই নিবিড় যোগাযোগ মুহূর্তে ছিঁড়ে যায়। মনটা ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে।'

ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে প্রশান্তদা বলিলেন,

'এক্ষেত্রে, আমি বলব, তোমার প্রার্থনা সেখানেই হয়ে যায়। তুমি সেখানেই বসে থাকবে। নতুন করে তোমার প্রার্থনায় যোগ দিতে হবে না। তোমার এই উপলব্ধিই প্রার্থনা।'

আর কোনও কথা হইল না। ষ্টেশনে পৌঁছিলে ছেলেমেয়েরা তাহাদের কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। সকলের অলক্ষ্যে শুধু অরুণ ও দীপ্তিকে শুনাইয়া অতুল বলিল,

'নেপাল, যাত্রাও কি একই সঙ্গে সুরু হল নাকি?'

ট্রেনে উঠিয়া অরুণ ঘুমাইয়া পড়িল। মধ্যপথে জল লইবার জন্য একটা মাঝারি গোছের ষ্টেশনে ট্রেন কিছুক্ষণ থামে। সকলেই কিছু খাবার কিনিবার জন্য নামিয়া পড়িল। অরুণ জাগিল না। দুই একটি ছেলে অরুণকে জাগাইতে গেলে প্রশান্তদা বাধা দিলেন। পাশের গাড়ীতে মেয়েদের মধ্যে তখন খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে আর তাহারই মধ্যে একজন গাড়ীর জানালার পাশে বসিয়া দুই চোখ দিয়া যে সমস্ত প্ল্যাটফরমটা অরুণকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, একমাত্র অন্তর্যামী ব্যতীত কেহ তাহা টেরও পাইল না।

হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া নামিতেই দীপ্তি একান্তে অরুণকে বলিল,

'কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আমি সারা রাস্তা আপনাকে খুঁজেছি।'

'কারণ?'

'ভয় নেই, ছায়াকে নিয়ে আসবার হুকুম করব না।' দীপ্তি হাসিয়া বলিল।

'সকাল থেকে তো খান নি কিছু।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাঙ্কের ওপর।'

'চলুন আমার সঙ্গে, পৌঁছে দেবেন আমাকে।'

'আমার তো সময় হবে না। তা' ছাড়া আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে কেন? কলকাতার রাস্তাঘাট তো আপনি চেনেন'।

'কিন্তু আপনি যে খাননি কিছু এখনও।'

'আপনার বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাওয়াবেন?'

অরুণের দৃষ্টি ধীরে ধীরে কোমল হইয়া আসিল। একটি অনাত্মীয়া নারীর এই উদ্বেগ তাহার বড় ভাল লাগিল। চলিতে চলিতে বলিল,

'আমাকে আগে বাড়ী যেতে হবে দীপ্তি দেবী। আজ ক'দিন হয় দেশ থেকে বাবা এসে বসে আছেন আমার জন্যে। আমি কথা দিচ্ছি, আজ exhibition থেকে ফেরবার পথে আপনাদের বাড়ী যাব। আয়োজনের যেন ত্রুটী না হয়। জানেন তো, কি রকম পেটুক আমি।'

দীপ্তির মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পিছন হইতে ছায়া বলিয়া উঠিল,

'আমারও নেমন্তন্ন আছে তো? যে খাটুনীটা খেটেছি সোটা রাস্তা অরুণদাকে খুঁজতে। একটা পারিশ্রমিক তো আছে।'

মনের এই ব্যাকুলতা অরুণের নিকট প্রকাশ হইতেই দীপ্তির মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সলজ্জ হাসিয়া ছায়াকে বলিল,

'আমার নেমন্তন্নের অপেক্ষা রাখলি কোথায়, নিজেই তো খেচে নিয়ে নিলি।'

'কিন্তু আমি তো একা যেতে পারব না।' ছায়া অরুণের দিকে একবার চাহিল।

কথার মধ্যে এই ছলনাটুকু ধরিতে পারিয়া অরুণ হাসিয়া উঠিল।

'বেশ, আমিই তোমায় নিয়ে যাব। দাও তোমার ঠিকানা।'

গেটের বাহিরে ছায়ার লোক অপেক্ষা করিতেছিল। ছায়া তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল। যাইবার আগে আর একবার বলিয়া গেল, অরুণদা যেন অবশ্যই তাহাকে exhibitionএ লইয়া যায়।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর অরুণ তাহার বাবার ঘরে আসিয়া বসিল। রাশভারী লোক। অরুণের না মাকা

যাইবার পর আর বিবাহ করেন নাই। দেশেই থাকেন। ধীরে সুস্থে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'কেমন লাগছে ওখানে ?'

'ভাল, খুব ভাল।' এক কথায় জবাব দেয় অরুণ। জিজ্ঞাসা করে,

'ঠাকুরমাকে নিয়ে এলে না কেন বাবা ?'

'তোমার ওপর হুকুম হয়েছে এবার দেশে যাবার।'

অরুণের মুখে ব্যথার কালোছায়া ঘনাইয়া আসে, ম্লান হাসিয়া বলে,

'এখন কি করে যাব, training শেষ না হলে ? তা' ছাড়া, দেশ বিভাগের পর থেকে দেশকে তো আর দেশ বলে ভাবতে পারছি না। মনে সে জোরই পাই না।'

এইখানেই পিতা-পুত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। পিতা মনে করেন, মানুষের গড়া এই বিভাগ মানুষের মনে কোনও ফাটল ধরাইতে পারিবে না। আর পুত্র মনে করে, যেখানে তাহার কোনও অধিকারই রহিল না, তাহাকে সে আপন ভাবে কেমন করিয়া। অরুণের বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর অরুণ উঠিল। অনেক কাজ বাকী আছে। রাণীর সহিত দেখা করিতে হইবে, ছায়াকে লইয়া exhibitionএ যাইতে হইবে। আর দেরী করা চলে না।

রাণীর সহিত দেখা করিতে রাণীও exhibition দেখিতে বাহির হইল। কিন্তু ছায়ার ওখানে যাইয়া দেখা গেল সে আগেই এক আত্মীয়ের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে।

অরুণ একটু বিরক্ত হইল। মিছামিছি তাহার এই পরিশ্রম। রাণীর সহিত সে ট্রামে উঠিল।

গেটের কাছে সকলেই অরুণের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ রাণী বলিয়া উঠিল,

'দীপ্তি, তুই ?

দীপ্তি কলকণ্ঠে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল।

'জানাশোনা আছে নাকি তোমাদের ?'

'দীপ্তি আর আমি যে একই কলেজে পড়েছি।'

কিছুক্ষণ পরের কথা। অরুণ বিজ্ঞানের ছাত্র। সে Science galleryতে Theory of Evolution লইয়া ডুবিয়া গেল আর দীপ্তি ও রাণী একটা রেষ্টুরেন্টের কেবিনে মুখামুখী বসিয়া গল্প করিতে লাগিল।

দীপ্তি জিজ্ঞাসা করিল,

'ওঁর সঙ্গে তোর কতদিনের পরিচয় ?'

'কার কথা বলছিস্, বল তো ?

'যাঁর সঙ্গে exhibitionএ এলি।'

'বেশী দিন নয়। ঢাকায় থাকতে দু'একবার দেখা হয়েছে কয়েকটা functionএ। কলকাতায় আসবারও অনেক পরে বাবার সঙ্গে অরুণের পরিচয় হয়। অরুণের বাবা আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনিই চিঠি লিখেছিলেন ওকে আমাদের বাড়ী যেতে। তা', আরো তো ছেলে আছে তোদের কলেজে। সবাইকে বাদ দিয়ে অরুণের কথাই যে জিজ্ঞেস করছিস্ বড় ?'

দীপ্তি একটু কৌতুকের হাসি হাসিল। রাণীর কথার কোনও সোজা জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

'কেমন লাগে তোর ছেলেটীকে, বলতো ?

রাণী স্বচ্ছ হাসি হাসিয়া উঠিল।

'কেমন বল্ তো ? পরক্ষণেই যেন একটু আত্মস্থভাবে বলিতে লাগিল,

'এক কথায় ওঁর পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় রে।'

সুর বদলাইয়া বলিল,

'এতদিন তো একসঙ্গে আছিস। মনে হয় ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে একটু। তুই-ই বল না, ছেলেটী কেমন।'

দীপ্তি যেন একটু ঠাট্টার সুরেই বলিতে লাগিল,

'তবে শোন্। দেখতে শুনতে বেশ সুপুরুষ। লেখা-পড়া ও ভালই জানেন। বাড়ীর অবস্থাও বেশ ভাল বলেই শুনেছি। দেশে নাকি জমিদারীও আছে। বোধ হয় সেই জন্যেই সকলের ওপর বেশ হুকুম করতে পটু, আর সে হুকুম না মানলেই ভয়ানক রাগ। এদিকে কিন্তু অপরের হুকুম মানতে একেবারেই নারাজ।'

দীপ্তি হাসিয়া উঠিল। রাণী এতক্ষণ আগ্রহে দীপ্তির মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। কিসের এক সন্দেহের

অনুভূতি তাহার মনে দোলা দিতে লাগিল। হাসি মুখেই বলিল,

'লক্ষণ তো ভাল নয় ভাই। মাত্র তো ক'দিনের পরিচয়। এরই মধ্যে এতটা study করে ফেলেছিস্?'

এইবার দীপ্তির স্বরে পরিবর্তন দেখা গেল।

'স্বল্প পরিচয়ে মানুষকে কতটুকুই বা জানা যায়। কিন্তু এ যেন ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। আচ্ছা, বাস্তব সম্বন্ধে কি ও একেবারেই অচেতন? যেন সব সময়েই একটা কিছু নিয়ে ডুবে থাকতে চায়।' বলিতে বলিতে যেন কিসের এক আবেগে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

রাণীর চোখের সম্মুখ হইতে একটা পর্দা ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে দীপ্তির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ডাকিল,

'দীপু!'

দীপ্তি কোনও উত্তর দিলনা। আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাণী বলিল,

'অরুণকে আমি জানি। ধ্যান ওঁর ভাঙবে কিনা কোনদিন, জানিনা। কিন্তু তোর তপস্যায় যদি তা ভাঙে, সেদিন হয় তো মহাদেবের মতই ও পাগল হয়ে উঠবে। এই ওঁর স্বভাব। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি তোর কথা ভেবে। কি করে এমন হ'ল?

এ'কথারও দীপ্তি কোনও উত্তর দিল না। রাণী যেন নিজের মনেই কথাগুলি বলিয়া যাইতে লাগিল,

'চিরদিনের খামখেয়ালী মেয়ে তুই। দূর থেকেই সবাই তোকে দেখে এসেছে। কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস করেনি। আর আজ তুই কিনা যেচে একজনার ভালবাসার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছিস্?'

ম্লান হাসিয়া দীপ্তি বলিল,

"ভগবান মানুষের সব দর্প বুঝি এমন করেই ভেঙে দেন। তোদের ভাষায় এ আমার পতনও বলতে পারিস্।' বলিতে বলিতে দীপ্তির মুখ যেন আনন্দ ও গর্বে অপূর্ব লাবণ্যময় হইয়া উঠিল। রাণী অবাক হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

'কিন্তু একটা কথা ভাই। ওঁকে যেন তুই এসব কথা কিছু বলবি না। সে লজ্জা রাখবার যায়গা আমার থাকবে না। ধ্যান যদি ওঁর ভাঙে, সে আমার তপস্যায়ই ভাঙুক।'

সেদিন রাত্রিতে দীপ্তিদের বাড়ী হইতে পরিপূর্ণ আহারে ও দীপ্তির মায়ের ব্যবহারে তৃপ্ত হইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে রাণী বলিল,

'দীপু বড় ভাল মেয়ে অরুণ। তুমি ভাগ্যবান, ওর সঙ্গে পরিচিত হয়েছ।'

অরুণ উত্তর করিল,

'বড় খামখেয়ালী মেজাজ। কখন যে কি mood এ থাকবে, বোঝাই দায়। আমার সঙ্গে তো প্রায়ই ঝগড়া হয়। তবে আজ খাইয়েছে খুব যত্ন করে। আর মা-টীও চমৎকার।'

অরুণের এই সরলতায় রাণী রহস্যময় হাসি হাসিল।

॥ ৭ ॥

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিতে অরুণের চোখে আশ্রম জীবনের একটা বিশেষ দিক সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিল। এ যেন একটা আলাদা জগৎ। এই স্বল্প কয়েকদিনের জীবনে আশ্রমের একটা নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া তাহার মনে হইত, বাহিরের পৃথিবীর চেহারাও বুঝি বদলাইয়া যাইতেছে। এখানকার শুদ্ধ শান্ত পরিবেশ তাহার মনে এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তাহারই রঙীন আলোয় সে সব কিছু বিচার করিতে বসিত। বাহিরে যাইয়া দেখিল, এই পরিবর্তন শুধু তাহার অন্তরে। বাহিরের জগৎ ইহা লইয়া মাথা ঘামায় না। যাহারাও বা ইহা লইয়া চিন্তা করে, ব্যক্তিগত জীবনে ইহার রূপ দেয়না। সেই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে এই চিন্তাধারার রূপ দেওয়াও সুকঠিন। মাত্র কয়েকটী লোক, যেন দলভ্রষ্ট হইয়াই এই নূতন পরিবেশ সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে। সেদিন সকালে সাকাইয়ের কাজের ঘণ্টায় শিশিরের সঙ্গে ইহা লইয়াই কথা হইতেছিল। পরিচ্ছন্নতার দিক হইতে শিশির অতি পরিপাটি। কি ব্যক্তিগত, কি সামুদায়িক জীবনে কোনও প্রকারের অপরিচ্ছন্নতাকে সে সহ্য করিতে পারেনা। তাহার এই অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার জন্য সহপাঠিদের কাছ হইতে অনেক ঠাট্টা

নিশ্চয়ও সহ্য করিতে হয়। অনেকগুলি অগোছাল চরিত্রের মধ্যে ক্রমেই যেন সে একা, নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িতেছিল। অনেকটা নিজের মনেই কাজকর্ম করিয়া যায়, অবসরমত গানের চর্চা করে। সেদিন ঝাঁট দিতে দিতে অরুণের সহিত প্রদর্শনীর কথা লইয়াই আলোচনা হইতেছিল। অতুল ঠাট্টার সুরে বলিল,

'গোটা exhibitionটা খুঁজলাম ভাই, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার আভাস কোথাও খুঁজে পেলাম না। আমার মনে হয়, অতুলের ছেলেমেয়েরা মিলে ওখানে সাফাইয়ের একটা demonstration দিলে ভাল হত। শিশিরকেই না হয় সাময়িক ভাবে সাফাই মন্ত্রী করে নেওয়া যেত।'

নেপাল উত্তর করিল,

'তবে কি চালা হত রে ভাই, তবে কি চালা হত। সাফাই কি অত সোজা জিনিষ। যাকে বলে দেহ ও মনের আবর্জনা ঝেঁটিয়ে দূর করা। মনে নেই সেদিন কিরীটীদা সাফাই সম্বন্ধে কি বলেছিলেন?

নেপাল কোদাল লইয়া এক কোণের আবর্জনার স্তূপ খুঁড়িতে সুরু করিতেছিল। এইবার কোদাল হাতে লইয়াই বক্তৃতার ভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিরীটীদা'র সুর নকল করিয়া হাত পা নাড়িয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল,

'বন্ধুগণ, এই সাফাই হচ্ছে নইতালিমের মূল আদর্শ। সাফাই দু'রকমের—ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক। আপনারা শিশুদের গঠন করবার সময় তাদের মধ্যে যদি সাফাইয়ের এই সুঅভ্যাসটী গঠন করে দিতে পারেন, যদি যা কিছু অন্যায়, সমাজের যা কিছু গ্লানি, আবর্জনা শিশুরা ঘৃণা করতে শেখে তবেই নতুন সমাজ গঠন সহজ হয়ে উঠবে।'

শিশিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হঠাৎ সুর খাদে নামাইয়া বলিল,

'ল্যাও বাবা, এই বার ঠ্যালা সামলাও।'

তাহার বলিবার ভঙ্গীতে সকলে হাসিয়া উঠিতে শিশিরের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। অরুণ বলিল,

'কিন্তু একটা কথা ভাই। আশ্রমের সঙ্গে বাইরের পরিবেশের যে অসামঞ্জস্য, তা'তে দু'য়ের মধ্যে একটা সমতা আনা কোনদিনই সম্ভব হবে কিনা, আজ এই প্রশ্নই বারবার আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে।'

এতক্ষণে শিশিরের কথা বলিবার একটা সুযোগ মিলিল। নেপালের দলের সহিত ইহার যেমন কোন মিল নাই, অরুণের সহিত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করিয়াও সে তাহার নাগাল পায় নাই। অরুণের দিক হইতেও শিশিরের প্রতি যেন একটু অবিচারই করা হইয়াছে। যেন তাহার যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হয় নাই। মনের কোণে এই কারণে একটু অভিমানও সঞ্চিত ছিল শিশিরের। অরুণের প্রতি তাহার ভালবাসাও ছিল যতটা, তাহার ব্যক্তিত্বকে মনে মনে, বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারেই, সম্ভ্রমও করিত প্রায় ততটাই। কিন্তু নেপাল অথবা অতুলদের মত কোন কিছুরই বহিঃপ্রকাশ ছিল না। আজ এই মুহূর্তে অরুণের কথায় আলোচনার মোড় ঘুরিয়া যাইতে নেপালের ঠাট্টার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সে যেন বর্তাইয়া গেল। অরুণের কথার জবাবে বলিল,

'পরিবেশ পরিবর্তনই তো হবে আমাদের ভবিষ্যতের কাজ। এ'বিষয়ে চেষ্টা করে যেতে হবে। আমার মনে হয়, গ্রামের মধ্যে প্রয়োজন হবে সামুদায়িক সাফাই আর সহরে ব্যক্তিগত।'

'কথাটা ঠিক বুঝলাম না তো।'

'গ্রামের সাধারণ লোকের মন যেন পরিষ্কার। অন্ততঃ সহরের মত জটিলতা সেখানে কম। কারণ, গ্রামের লোকের জীবনযাত্রাই বড় সরল। তবে গ্রামের মধ্যে রাস্তা-ঘাট, পুকুর, গোয়াল এগুলো অপরিচ্ছন্ন হয়ে থেকে দেহের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। আর সহরের লোকের মন থেকে জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন করা প্রয়োজন। জটিলতা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন নয়, জটিলতার চেয়ে সরলতা অনেক ভাল বলে।'

একটু থামিয়া, নেপালের আগের দৃষ্টিটাই যেন ফিরাইয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল,

'অবিশ্যি, গ্রামের লোক হলেও নেপালের মত লোকের মনের গ্রন্থি মোচন করা নইতালিমের সাধ্য নয়।'

নেপাল বলিয়া উঠিল,

'আরে যাও, যাও।'

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল।

ইহার পরে একের পর এক কয়েকটি ঘটনা অরুণের মনে গভীর রেখাপাত করিল। ঘটনাগুলি এইরূপ—

সেই মাসের জন্য অরুণ খাদ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছিল। নির্বাচিত হইবার প্রধান কারণ তাহার আগের মাসের খাদ্য-মন্ত্রীদের কাজের সমালোচনা। অরুণের মত এই যে, খাদ্য-মন্ত্রীর শুধু খাদ্য জোগাইয়া চলিলেই হইবে না, পরন্তু কত কম খরচে আশ্রমের প্রতিটি লোককে সুসমঞ্জস খাদ্য দেওয়া যায় তাহাও দেখিতে হইবে। এইখানেই খাদ্য মন্ত্রিত্বের সাফল্য নির্ভর করিবে। প্রতি সপ্তাহে প্রতিটি লোকের ওজন লওয়া প্রয়োজন। আর খাদ্য কেবলমাত্র সুসমঞ্জস হইলেই চলিবে না, উহা সুস্বাদুও হওয়া চাই। অরুণের মতে খাদ্যমন্ত্রিত্বে শিক্ষণীয় বিষয় ইহাই। নেপালের দল অতশত বোঝে না। খাওয়াটা ভাল হইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ইহা লইয়া যখন ক্লাসে প্রায়ই অরুণ সমালোচনা করিতে লাগিল তখন অরুণের এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই যেন নেপাল প্রভৃতি তাহাকে খাদ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করিল।

খাদ্যবিষয়ে অরুণ খাতাপত্রে যতই বৈজ্ঞানিক গবেষণা করুক, প্রকৃত কাজে সে একেবারেই অনভিজ্ঞ। অরুণ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। দায়িত্ব হাতে লইবার আগেই এক সপ্তাহের একটি পরিকল্পনা মোটামুটি স্থির করিয়া ফেলিল। আশ্রমের বাগান হইতে আগামী সপ্তাহে কি কি তরকারী পাওয়া যাইতে পারে, তাহার খাদ্যমূল্য কি, সুসমঞ্জস খাদ্য পূরণ করিতে হইলে বাকী কোন্ কোন্ জিনিষ কতটা পরিমাণে বাজার হইতে কিনিতে হইবে, তাহার দামই বা কত হইতে পারে, তাহার হিসাব ঠিক করিয়া লইয়া সে নিজেই হাটে যাইবে ঠিক করিল। পরিকল্পনাটি সে প্রশান্তদাকে একবার দেখাইল। আশ্রমের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কিছু পরিবর্তনও করিল। সমস্ত জিনিষটির একটি বৈজ্ঞানিকরূপ দিতে যাইয়া অরুণ যেন আবার মাতিয়া উঠিল।

জংশন ষ্টেশনের কাছেই বড়বাজারে সপ্তাহে একদিন, রবিবার, হাট বসে। সঙ্গে আর একটি ছেলে ও গরুর গাড়ী লইয়া সে হাটে রওনা হইয়া গেল। যাইবার পূর্বেই অর্চনা আসিয়া বলিল,

'হাটে যাবেন শুনছি ?'

'হ্যাঁ। যে বিপদে আপনারা ফেলেছেন, না গিয়ে আর উপায় কি ?'

'পারবেন ঠিকমত সব জিনিষ কিনে আনতে ?

'আগে কখনও কিনি নি। তবে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারব।'

অর্চনা একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল,

'কিন্তু এর আগে কোন খাদ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে বাজার করে আনে নি। তা' ছাড়া যে রোদ, খুব কষ্ট হবে আপনার।'

এ'কথার জবাবে অরুণ বলিল,

'আগের মন্ত্রীরা হয়তো এদিকের কাজ সেরে সময় করে উঠতে পারেনি। আমিও হয়তো কাজের ভার হাতে নিলে পরের সপ্তাহে আর সময় করে উঠতে পারব না।'

'কিন্তু ফিরতে বেলা প্রায় তিনটা বেজে যাবে। একে এই রোদ, তায় আবার সারাদিন না খেয়ে থাকবেন।'

অর্চনার মুখ হইতে কথাটা বাহির হইলেও কথাটা যেন ঠিক অর্চনার নয়। কথার সুরটি ও যেন তাহার পরিচিত। ইহার পূর্বে এই ধরণের কথা কোথায় যেন সে শুনিয়াছে। অরুণ একটু অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতেই একটা সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগিল। অর্চনাকে বলিল,

'হাটে যে যায়, এই রদ্দুরে তারই কষ্ট হয়। কষ্ট হয়তো কিছুটা হবে, তবে ননীর পুতুল তো নই, গলে নিশ্চয়ই যাব না।'

ফিরিবার পথে অরুণ টের পাইল যে ইহা সাইকেল চালিয়া জংশন ষ্টেশন হইতে খবরের কাগজ লইয়া যাওয়া নয়। প্রখর রৌদ্রে তাহার সমস্ত মুখ লাল হইয়া গিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি মাথায় উঠিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া অরুণ বারান্দায় এলাইয়া পড়িল। সারা দেহ হইতে ঘামের স্রোত নামিয়া আসিতেছে। একটি ছেলেকে ডাকিয়া জিনিষপত্রগুলি গাড়ী হইতে নামাইতে বলিয়া অরুণ বিশ্রাম করিতে লাগিল। বারান্দার এই দিকটা হইতে মেয়েদের হোষ্টেলের বারান্দার খানিকটা

অংশ দেখা যায়। হঠাৎ সেইদিকে তাকাইতে অরুণ দেখিল, দীপ্তি বাহির হইয়া আসিয়া তাহার দিকে একবার তাকাইয়াই ব্যস্তসমস্তভাবে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই অর্চনা দুইমাস সরবৎ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নিমেষ মধ্যে হাটে যাইবার আগের কথাগুলি অরুণের কাছে পরিষ্কার হইয়া ধরা দিল। সকৌতুকে অর্চনাকে জিজ্ঞাসা করিল,

'সরবৎ কে পাঠাল ?'

অর্চনা হাসিল।

'কেন আমিই তো নিয়ে আসছি।'

'তা' তো দেখছি। কিন্তু পাঠাল কে ? আপনি তো বাহক মাত্র।'

তাহার প্রশ্নের কোনও সোজাসুজি জবাব না দিয়া অর্চনা বলিল,

'কেমন, বলেছিলাম না খুব কষ্ট হবে! এবারে বুঝলেন তো ? নিন্, ভিরিয়ে উঠে চান সেরে নিন্। আমি অপেক্ষা করছি।'

অর্চনা কাছে বসিয়া পরিপাটি করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল। হঠাৎ অরুণের ছোটবেলাকার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার বোন সুধাও ঠিক এইভাবে বসিয়া না খাওয়াইলে ভাল করিয়া অরুণের পেটই ভরিত না। অরুণ ছবিকে ডাকাইয়া আনিয়া গল্প করিতে করিতে খাইতে লাগিল।

সন্ধ্যায়, প্রার্থনার আগে অরুণ দীপ্তিকে একান্তে পাইয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল,

'আমার স্বাস্থ্য নিয়ে, খাওয়া নিয়ে যদি আপনার এত ভাবনা, তবে নিজে এসে বললেই তো পারেন। অর্চনাকে পাঠান কেন ?'

'তার মানে ?'

'আর খুলে বলবার কোনও প্রয়োজন দেখছি না তো।

দীপ্তি কোনও উত্তর না দিয়া প্রার্থনা সভায় মেয়েদের যায়গায় যাইয়া বসিল। সেই প্রায়ান্ধকার আলোতে লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইত যে ধরা পড়িয়া যাইয়া কিসের এক উত্তেজনায় দীপ্তি যেন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। চোখে মুখে তাহারই সুস্পষ্ট ছাপ।

কয়েকদিন পরের কথা। অরুণ বসিয়া আগামী নববর্ষের বিশেষ ভোজের খাদ্য তালিকা সম্বন্ধে শোভাদির সহিত পরামর্শ করিতেছিল। খাদ্যমন্ত্রী হইবার পর এই মহিলাটির উপর অরুণ বিশেষভাবে নির্ভর করে। মাথা পিছু পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়া, কোন্‌টার সঙ্গে কি রান্না হইবে এইসব সমস্ত ব্যাপারেই অরুণ শোভাদিকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করে না। দীপ্তি আসিয়া দাঁড়াইল।

'আপনার সঙ্গে কথা ছিল। খুব ব্যস্ত কি ?

'বসুন একটু। এটা শেষ ক'রে নি শোভাদির সঙ্গে।'

প্রায় আধঘণ্টা আলোচনার পর অরুণ মুখ তুলিয়া দীপ্তির দিকে চাহিল।

'কি খবর কৃষ্টিমন্ত্রী ? খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোনও fine arts ঢোকাবার মতলব আছে নাকি ?

'আপনার খাবার রকম দেখে, নিরর্থক জেনেই ও চেষ্টা আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

অরুণ সজোরে হাসিয়া উঠিল। দীপ্তি বলিল,

'তা' নয়, শুনুন। নববর্ষ উৎসবে সন্ধ্যার পর আমরা মেয়েরা একটি নৃত্যনাট্যের আয়োজন করব ঠিক করেছি।'

'ছেলেদের প্রবেশ নিষেধ না কি ?'

'দর্শক হতে পারবে, কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারবেনা'

'বেশ।'

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। দীপ্তি এইবার কথাটা পাড়িল।

'আমি নৃত্যনাট্যের একটা বিষয়বস্তু ঠিক করেছি। আপনাকে একবার ভাল করে দেখে দিতে হবে।'

'খাদ্যমন্ত্রী আমি। স্থূল বস্তুটার সঙ্গেই সম্পর্ক, বুঝিও সেটা ভাল। কিন্তু fine arts সম্বন্ধে কিছু বুঝি বলে তো মনে হয় না।'

'সেদিনের সেই আবৃত্তিটা শুনে কিন্তু তা মনে হয় নি।'

'ওটা একটা নিছক লোক পাওয়া গেল না বলেই করতে হ'ল। আপনি বরং শিশিরের কাছে যান। ভাল গায়ক, এদব দিকে চেষ্টাও আছে ভাল।'

'কার কি ভাল, সেই বিচারের জন্যে আপনার কাছে আসা হয় নি। আপনি যা জানেন, তাতেই চলবে।'

'দেখুন দীপ্তি দেবী' আমি এ'বিষয়ে কিছু জানিনা বললেই হয়।'

অরুণ যেন দীপ্তিকে একটু রাগাইবার জন্যই বলিল। দীপ্তির এই খানখেয়ালী মেজাজটীকে একটু প্রশ্রয় দিতেই যেন তাহার ভাল লাগে। সে নিজেও একজন দক্ষ শিল্পী। আবৃত্তি ও অভিনয়ে তাহার যথেষ্ট যশ আছে এবং ইহা লইয়া সে চিন্তাও করে বেশ।

'তবে আমারই ভুল হয়েছে আপনার কাছে আসা।'

দীপ্তি উঠিয়া পড়িতেই অরুণ হাসিয়া ফেলিল।

'দেখি-আপনার লেখা।'

'কিন্তু যখন জানেনই না এসব, তখন আর দেখে লাভ কি?'

'পরামর্শ না দিতে পারলেও কিরকম লাগছে সেটা তো বলতে পারব।'

'সেটা উৎসবের পরে বললেও চলবে।'

একপ্রকার রাগ ও অভিমান লইয়াই দীপ্তি চলিয়া গেল এবং পরবর্তী কয়দিন চেষ্টা করিয়াও অরুণ তাহার এই অভিমান ভাঙাইতে পারিল না।

নববর্ষের প্রথম উষার আলো এখনও ধরণীর বুকে ফুটিয়া ওঠে নাই। প্রভাতের অস্পষ্ট আলোকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলে মেয়েরা প্রভাতফেরী গাহিতেছিল। হে নূতন দিনের নূতন মানুষ, আজ এই নববর্ষের প্রথম প্রভাতে সমস্ত সঙ্কোচ ও জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তোমরা নূতন উদ্বোধনায় জাগিয়া ওঠ। রবীন্দ্রসঙ্গীত। গানের বিষয়বস্তুটী অরুণের বড় ভাল লাগিল। সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই দীপ্তি স্নিগ্ধ নির্মল হাসিতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

বাহিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রার্থনার আয়োজন হইয়াছিল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলে স্নান সারিয়া আসিয়া সেখানে বসিতে ছোট ছুইটি মেয়ে সকলের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া দিল। প্রশান্তদার উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল নববর্ষের প্রথম প্রভাতের প্রার্থনা,

'অসতো মা সদ্ গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।'

হে প্রভু, অসত্য হইতে আমাকে সত্যপথে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও। মিথ্যার আবরণ উন্মোচন করিয়া সর্বদা শুধু সত্যই যেন আমাদের চোখে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। যাহা কিছু অজ্ঞানতা তাহাই অন্ধকার। আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানের আলোকে যেন আমাদের আত্মা নির্মল হয়।

'তমসাবৃত অন্তর মম আলোকে ভরিয়া যাও।
মৃত্যু হইতে অমৃতের কোলে তুলে নাও, তুলে নাও।'

আজিকার নূতন দিনের নূতন প্রভাতে এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

প্রার্থনার শেষে ছবি ও ছায়া আসিয়া প্রশান্তদা ও অরুণকে প্রণাম করিল। অরুণ ছবির কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। প্রশান্তদা তাহাদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন,

'ছবিকে কি দিলে অরুণ?'

'ওর দাদার আশীর্বাদ।'

প্রশান্তদার মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন,

'সেটা তো পাবিই। জাগতিক কিছু দাও যেন ওর দাদামণির কথা চিরদিন ওর মনে থাকে। স্নেহের বাহ্যিক প্রকাশেরও মাঝে মাঝে প্রয়োজন আছে।'

এই ছুইটী প্রাণের নির্মল বন্ধনকে প্রশান্তদা যেন চিরস্থায়ী করিতে ব্যাকুল। পরমস্নেহে ছবির দিকে তাকাইয়া অরুণ বলিল,

'সুধীকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি সে চায়। তখন সুধার বয়স তেরো বছর। বিজের মত উত্তর করেছিল সুধা,—তোমার পেট ভরে খাওয়া। ওর ধারণা ছিল, আমি পেট ভরে খাই না। জানেন দাদা, আজ আমার বেশী খাওয়ার মূলে সুধার সেই চাওয়া।' অরুণের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

ছবি বলিয়া উঠিল,

'দাদামণি, আজ বিকেলে আমি ও তোমাকে আমার খুসীমত খাওয়াব। সব খেতে হবে কিন্তু। না বলতে পারবে না।'

ছায়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল। এইবার বলিল,

'শুধু ছবি কেন, আমিও খাওয়াব।'

অরুণ অভিনয়ের ভঙ্গীতে করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,

'দু'জন ? পেরে উঠব তো !'

সকলে প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উঠিল।

রাত্রিতে খাবার আয়োজন বৈকালেই সমাপ্ত হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরেই মেয়েদের উৎসব আরম্ভ হইবে। দীপ্তি আসিয়া অরুণকে বলিল,

'স্টেজ কেমন সাজান হয়েছে দেখবেন চলুন।'

'কিন্তু ভাল লাগলো কি মন্দ লাগলো, এর বেশী তো কিছুই বলতে পারব না।'

'দেখুন, বছরের প্রথম দিন আজ। ঝগড়াটা না হয় মুলতুবীই রইল।'

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল অরুণ। দীপ্তির অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করিয়া একটু রাগাইবার জন্যই যেন বলিল,

'তা' হলে কাল থেকেই আবার সুরু করতে চান না কি ?'

'আমি না, চলুন', বলিয়া হঠাৎ দীপ্তি অরুণের হাত ধরিয়া টানিল। অরুণ হাত ছাড়াইয়া একবার দীপ্তির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,

'চলুন।'

প্রথম দৃশ্যে পর্দা উঠিবার পর দেখা গেল, দুইদল মেয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। একদল অপরূপ বেশবাসে সজ্জিত, অপর দলটির বেশভূষা জীর্ণ, মলিন। নূতন আসিয়াছে পুরাতনের স্থান অধিকার করতে। যাহা কিছু মলিন, যাহা কিছু জীর্ণ, সব দূর করিয়া দিবে। পুরাতন কিন্তু তাহার স্থান ছাড়িতে চায় না। নিজের স্থান আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে চায়। নূতনের সৌন্দর্যের কাছে সে পরাভূত হইয়াও এক কোণে পড়িয়া থাকিবে। নৃত্যের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। নূতনও যেন আর পুরাতনকে দূরে সরাইতে পারে না। ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এমন সময় আবির্ভাব হয় নূতনের রাণীর। দিগন্ত তাহার রূপের ছটায় সমুজ্জ্বল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তিনি পুরাতনের দিকে চাহিতেই একে একে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইবার দেবী প্রসন্ন দৃষ্টিতে নূতনের দিকে চাহিলেন। নূতন আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল।

ইহার পর কয়েকটী দৃশ্যে নৃত্যের মাধ্যমেই দেখান হইয়াছে নূতনের সৃষ্টি, এতদিনের আবর্জনা ও গ্লানি দেশকে শ্মশান করিয়া ফেলিয়াছে। সেই শ্মশানে নূতন প্রাণের সৃষ্টি হইল, আর সেই প্রাণ দিন দিন বাড়িয়া উঠিয়া নূতন জগতের সৃষ্টি করিল। যে জগতে দুঃখ নাই, দ্বেষ নাই, আছে শুধু আনন্দ, শুধু প্রেম। সমাপ্তি দৃশ্যে সকলে দেবীকে পূজা করিল। দেবী বরাভয় মূর্ত্তিতে, প্রশান্ত হাস্যে তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন।

অভিনয় শেষ হইলেও অরুণ অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিল। সমস্ত পরিকল্পনাটী দীপ্তির। নৃত্যশিক্ষাও তাহার। নিজে সে দেবীর অভিনয় করিয়াছে। অরুণ নিজে একজন কৃতী শিল্পী। সে বুঝিতে পারিল, কতখানি উচ্চাঙ্গের জ্ঞান থাকিলে এই নৃত্যনাট্য পরিচালনা সম্ভব। শ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, দীপ্তিকে একবার প্রাণ খুলিয়া অভিনন্দন জানাইতে হইবে। উঠিতে যাইতেছিল, দেখিল, দীপ্তি আসিয়া কখন পাশে দাঁড়াইয়াছে। মুগ্ধকণ্ঠে অরুণ বলিয়া উঠিল,

'অপূর্ব !'

'কি অপূর্ব ? নাটক, দৃশ্যপট না পরিকল্পনা ?'

'সব। আর সবচেয়ে অপূর্ব আপনি।' অরুণ যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল।

'এই প্রথম প্রশংসা পেলাম আপনার কাছে। আজকের দিনটী আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

দীপ্তি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ফিরিয়া তাকাইলে দেখিতে পাইত, একজোড়া মুগ্ধ চোখ আবিষ্ট ভাবে তাহার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ছায়া কোথা হইতে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বোধ হয় এই দৃশ্যের নীরব সাক্ষী সেই।

'অরুণদা।'

অরুণ স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহার দিকে চাহিল। নাটকের দৃশ্যের ঘোর তখনও কাটে নাই।

'একটা কথা বলবার ছিল।'

'বল।'

'দীপ্তি জিজ্ঞেস করছিল, আজকের দিনে তোর দাদা আমাকে কি দিলেন ?'

অরুণ সচকিত হইয়া উঠিল।

'দীপুকে কি বলল দাদা ?'

'সে তো নিজে আমার কাছে কিছু চায়নি বোন। তবু ও না চাইতেই তাকে যা দিয়েছি, তাতে যদি সে তৃপ্ত না হয়ে থাকে তো যা তার কাম্য, তাকে চেয়ে নিতে ব'লো। সম্ভব হলে আমি তা নিশ্চয়ই দোব।'

সেই রাত্রিতে অরুণ ভাঁড়ারে বসিয়া প্রতিরাত্রির মতই পরদিনের রান্নার আয়োজন আলাদা করিয়া রাখিতেছিল। সারাদিনের উৎসবক্লান্ত আশ্রম যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। শুধু মাঝে মাঝে মৃদু চাঁদের আলোকে হালকা হাওয়া কোন্ এক নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ বহিয়া আনিয়া ঘরের ভিতর লণ্ঠনের শিখাটীকে কাঁপাইয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। অরুণের চোখে ও শ্রান্তির ঘোর। হঠাৎ চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখে, দুই হাতে কপাট ধরিয়া এক নারীমূর্তি। বাতাসে তাহার খোলা চুলগুলি অল্প অল্প কাঁপিতেছে। নিঃশব্দে অরুণ আসিয়া তাহার মুখামুখী দাঁড়াইল।

'আপনি ?'

দীপ্তি কোনও কথা বলিল না। শুধু নীরবে নত হইয়া তাহার পায়ে মাথা ঠেকাইল। অরুণ দুইবাহু দিয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিল। মুখামুখী দাঁড় করাইয়া অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করিল,

'কি চাও আমার কাছে ?'

'আশীর্বাদ।'

অরুণ নীরবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

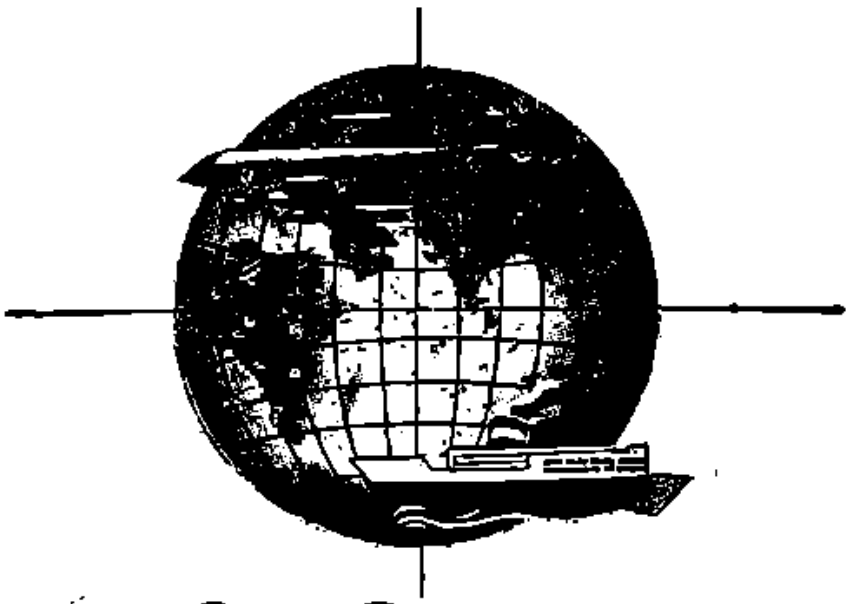

বৈদেশিক বাণিজ্য ...

সকল যুগেই দেশের ধনসমৃদ্ধির অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায় বৈদেশিক বাণিজ্য। কিন্তু বর্তমানকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার একান্ত ভাবে নির্ভর করে দেশের উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর।

বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অভিজ্ঞ কর্মচারী মারফৎ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্ববিধ সাহায্যদানে পারদর্শী।

পৃথিবীর যাবতীয় উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নিজস্ব এজেন্ট ও করেসপনডেন্ট আছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

অজ্ঞাত বাস

প্রভাত দেবসরকার

দুপুর বেলার দিকে মজলিশটা বসে। মেয়েদের।

পাশাপাশি তিনচারটি পরিবার। বাঙালী। কর্মসূত্রে একজায়গায় জড় হ'য়েছে। একই পালক। ছা' পোষা কেরাণী।

বয়েসের দিক দিয়ে যত না, এ শহরে অনেক আগে থেকে আছেন বলে' বোস মশায়ের স্ত্রীই এ মজলিসের মধ্যমণি, ডাক নামে সবার দিদি। আড্ডা বসে তাঁর বাসায়। শীতকালে উঠানে খাটিয়া টেনে রোদ্দুরে, গরমে দরজা-জানালা বন্ধ করে' ঘরের মধ্যে অন্ধকারে।

সেদিন দিদি বলেন, তোমরা তো কাল এসেচো, আমি আজ দশ বছর দেখছি ওঁদের—যেমনি কথাবার্ত্তা, তেমনি আচার ব্যবহার! কাপড়টা পর্য্যন্ত ভাল করে' পরতে জানেন না। বাঙালী হ'লে—

মাঝখান থেকে দাস মশায়ের স্ত্রী বললেন, আমাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক বেরিয়েছে—বঁড়শে-বেয়লার ঘোষ-ওঁরা!

পান মুখে দিয়ে দিদি বললেন, অমন বলতে হয়, না হলে মিশবে কি করে?

তবু দাস মশায়ের স্ত্রী বললেন, আমার মামাশ্বশুরের বড় ভাজের পিস্‌তুতো বোনের—

দিদি হেসে বললেন, সই-এর বোনের বকুলফুলের সম্পর্ক!

কথাটা উঠেছিল এখানকার সবচেয়ে পুরোণ বাসিন্দা ঘোষ বাড়ির ছোট বউ-এর সাধ-ভক্ষণ নিয়ে। খাওয়া-দাওয়া বাঙালীসুলভ হয়নি, নেমন্তন্নও ঠিক মত নাকি করেনি, আদর-আপ্যায়ন মেড়ো-খোট্টার মত! মজলিশে সেই আলোচনা চলছে কদিন ধরে ক্রমাগত। একা দিদির কথা নয়, সব বাঙালী পরিবারের। একা দাস মশায়ের স্ত্রী আর কত মুখে হাত চাপা দেবেন! পড়ে-পাওয়া সম্বন্ধে কত ঢাকবেন!

এক সময় রেগে দাস মশায়ের স্ত্রী বললেন, নেমন্তন্নে না গেলেই পারতেন সব! মেড়ো-খোট্টার সঙ্গে না মিশলেই হয়!

দিদির পার্শ্ববর্তিনী মুখুজ্জে মশায়ের স্ত্রী বললেন, আপনার গায়ে লাগার কোন মানে হয় না!···দিদি ঠিকই বলছেন। মেড়ো-খোট্টা না তো কি? আজ না হয় আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ বেরিয়েচে—

চোখ-মুখ রাঙা করে' দাস মশায়ের স্ত্রী বললেন, আজ বলে নয়, লোকের ভাত তোলা ভাল নয়! আমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে' বলচি না!

মুখুজ্জের স্ত্রী উত্তর দিতে মুখিয়ে উঠতে দিদি থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি ভাই রাগ করো না মণিকা, বউগুলো যেন এক বয়স! আমাদের সঙ্গে খাপ খায় না।

তেমনি মুখ গম্ভীর করে' মণিকা বললে, খাপ না খাওয়ালেই হয়, কে মাথার দিব্যি দিচ্ছে?

দিদি বললেন, তুমি শুধু-শুধু রাগ করচো মণিকা, বিদেশে পড়ে আছি বলে মাথার দিব্যির কথা আসচে, না হ'লে আর কে কার খোঁজ রাখতো বল!

সেই জন্যে বুঝি আড়ালে সমালোচনা করতে হ'বে! রেগে মণিকা উঠে পড়ল, মানুষকে যা তা বলতে হ'বে?

অবাঞ্ছিত ভাবে আলোচনার সূত্রটা যেন ঘুলিয়ে গেছে। জট পড়েছে।

মুখুজ্জের স্ত্রী ঠোক্কর দিলেন, ভাগ্যে এখানে এসেছিল তাই একটা কুটুম বেরুল! বলে কি না—

দিদি বাধা দিলেন, ছি, নিজেদের মধ্যে অমন করতে নেই শোভা! মণিকা যখন রাগ ক'রচে তখন আমাদের কিছু না বলাই উচিত!

একান্ত বাধ্য ছোট বোনের মত শোভা দিদির গায়ে চলে পড়ল, অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে' হাসলে। মণিকা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কেবল আজ নয়, দু'জনের কেউ কাউকে সহ্য ক'রতে পারে না। দিদি বুঝলেও মুখে কিছু বলেন না। হয়তো তাঁরও পক্ষপাতিত্ব আছে এ ব্যাপারে।

দিদির মুখে পান গুঁজিয়ে শোভা বললে, শুনলেন তো কথা, আপনাকে শুদ্ধ গ্রাহ্য নেই—খালি হাম্ বড়ামী !

দিদি হাসলেন। অমন অনেক তিনি দেখেছেন, আরো কত দেখবেন—প্রথম-প্রথম অমন হয় ! কত আত্মীয় বেরোয় কত মাখামাখি ! তারপর—

এই দিদি-ই থাকেন শেষ পর্যন্ত। দিদি না হ'লে চলে না।

এদিক-ওদিক চেয়ে চোখ টিপে শোভা বললে, হিংসে ! নতুন কুটুমের জন্যে তো ভারি বয়ে গেচে ওর ! তারা ভারি খোঁজ করে ! আমি কথা বলেচি, সহ্য হচ্চে না—

দিদি চোখ বুজিয়ে বললেন, হিংসের কি আছে ?

শোভা দিদির গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে, আপনি যেন জানেন না !

দিদি হয়তো জানেন, হয়তো জানেন না।

শোভা বললে, আপনি আমাকে একটু বেশী ভালবাসেন, ওর সহ্য হয় না !

দিদি হেসে বললেন, বাসি নাকি ?

সলজ্জ কণ্ঠে শোভা বললে, জানি না !

শোভার আরক্তিম মুখের দিকে চেয়ে দিদি যেন পরিতৃপ্তির আনন্দে হাসতে লাগলেন। লুকোচুরিটা উভয়ে বোঝেন।

নজ্‌লিশ ছাড়াও দিদির সঙ্গে শোভাকে প্রায়ই দেখা যায়। সময়ে অসময়ে। এক বাড়ির ভাড়াটে না হ'লেও স্বামীকে অফিস রওনা করিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে শিকল তুলে পাঁচিল টপকানোর মত কুয়োতলাটা পেরিয়ে শোভা দিদির বাসায় এসে উঁকি দেয় : কি করচেন দিদি ?

তখনো দিদির অর্ধেক রান্না বাকি, চোখে উনুনের ধোঁয়া, মুখে পান। কথা কইতে পারেন না।

উঁকিটা স্পষ্ট করে' শোভা বলে, এলাম দিদি !

দিদি ঘটির জল গামলায় ঢেলে বলেন, এস ! মুখুজ্জে মশায় অফিস গেছেন ?

হ্যাঁ ! যেন একটা কঠিন পরীক্ষা দিয়ে এল শোভা !

তারপর কতক্ষণ ধরে' কত গল্প হয়। শোভার বাসা থেকে ছেলেমেয়ে এসে এসে কেঁদে কেঁদে বার বার তাগাদা দিয়ে যায়—কুয়োতলার ভিজে-মাটি রোদে শুকিয়ে ওঠে। গল্প আর ফুরোয় না।

শেষে একই বাড়ির ভাড়াটে মণিকা এসে দোর গোড়ায় দাঁড়ায়। মুখ বাড়িয়ে বলে, দিদি, ওঁকে পাঠিয়ে দিন—ওঁর ছেলেমেয়ে ওদিকে কেঁদে সারা !

দিদির সঙ্গে গল্প ক'রতে ক'রতে শোভা বুঝি ঘর-সংসারের কথা ভুলে যায়।

তারপর দুপুরেও বিরাম নেই। সবার আগে শোভাই আসে ! দিদির কাছে-কাছে থাকতে কত যেন তৃপ্তি তার, কত যেন সুখ, আনন্দ।

মণিকা আড়ালে বলে, আদিখ্যেতা ! কি আর করবেন, পরচর্চা !

ঠিক পরচর্চা বুঝি নয়। আরো কিছু, যা আর সবার জানবার কথা নয়। অসম বয়েসের এ হেন মেয়ে বন্ধুত্ব বড় একটা দেখা যায় না।

স্বামী জিজ্ঞেস ক'রলে শোভা হেসে বলে, দিদি খুব ভাল —অমন মানুষ দেখা যায় না ! কি ভাল মানুষ !

মুখুজ্জে মশাই কৌতুক করেন, তাই নাকি। খুব ভাল মানুষ ?

চোখ পাকিয়ে শোভা বলে, নিজে যেন জানেন না। এই জন্যে লোকে বলে—

কি বলে ? মুখুজ্জে মশাই চেয়ে দেখেন সত্যি রেগে গেছে শোভা। এখন গলা দিয়ে জল নেবে গেছে, বলবেই তো ! শোভা রেগে বলে।

মুখুজ্জে মশাই চুপ করে' যান। বাড়াবাড়ি হ'লেও তাঁর বলবার কিছু নেই, বিদেশে নানাভাবে উপকৃত তিনি বোস মশায়ের স্ত্রীর কাছে, দিদি অনেক করেছেন, করেনও।

বদলী হয়ে প্রথম যখন এ শহরে পা দিলেন, মনে হ'য়েছিল অকূল পাথার ! ফেরৎ গাড়িতেই ফিরে যাবেন, কাজ নেই চাকরি করে ! রাস্তায় বোস মশায়ের সঙ্গে দেখা। বাঙালী দেখে ঠিক চিনেছিলেন। রাত সারাতে বন্ধুদের পরামর্শে বহু পূর্বে তিনি এখানে এসেছেন। চেহারায় বাঙালীত্ব ঘুচে গেছে।

আগ বাড়িয়ে বোস মশাই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো

বাঙালী ? ডুবন্ত ব্যক্তির কুটি আঁকড়ানর মত মুখুজ্জে মশাই বললেন, আজ্ঞে হাঁ !

বোস মশাই বললেন, বেশ. আপনাকে দেখে খুব খুশী হলুম !

মুখুজ্জে মশাইও খুশী হ'য়ে বললেন, তবু একজন বাঙালী দেখা গেল !

বোস মশাই বললেন, কেন বাঙালী দেখেন নি ? বিস্তর বাঙালী আছেন এখানে !

সংবাদটা হাঁ করে' গিলে মুখুজ্জে মশাই বললেন, তাই নাকি ? দেখিনি তো !

বোস মশাই হেসে বললেন, দেখবেন, এসেছেন যখন।

খানিক উভয়ে উভয়কে দেখে। বোস মশাই জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কি উদ্দেশ্যে ? মানে—

মুখুজ্জে মশাই বললেন, চাকরি, মিলিটারী এ্যাকাউন্টস্ !

বোস মশাই বললেন, ও।

মুখুজ্জে মশাই বললেন, আপনি ?

হাতের লাঠিটা হস্তান্তরিত করে' বোস মশাই বললেন, আমারও চাকরি !

চাকরি, বিদেশ, বাঙালী—অন্তরঙ্গতা হবার আর কি বাকি ! সঙ্গটা যতক্ষণ থাকে।

এগিয়ে বোস মশাই বললেন, ফ্যামিলী এনেছেন ?

অসহায়ভাবে মুখুজ্জে মশাই বললেন, না ! বাড়িঘর না পেলে—

বোস মশাই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় উঠেছেন ?

হোটেলে। নাক-মুখ কুঁচকে মুখুজ্জে মশাই বললেন !

বোস মশাই বললেন, অনেক খরচ !

মুখুজ্জে মশাই চুপ করে' মুখ কাঁচু-মাচু করে' রইলেন অর্থাৎ সে কথা আর বলতে। সমব্যথী না হ'লে কে বুঝবে !

বোস মশাই বললেন, ফ্যামিলী নিয়ে আসুন এবার !

কিন্তু—মুখুজ্জে মশাই ইতস্ততঃ করলেন।

বাসা আমি ঠিক করে' দেব। আমাদের মহল্লায় বাড়ী আছে !

আছে ? বেশ জোরে নিঃশ্বাস পড়ল মুখুজ্জে মশাইএর।

লক্ষ্য করে' বোস মশাই বললেন, তবে আপনার পছন্দ হ'লে হয়।

বুঝি বিনয় প্রকাশ করেছিলেন বোস মশাই এই সদ্য আগত বাঙালী চাকুরেটির কাছে।

পাশাপাশি বাড়ি। পাশাপাশি বলি কেন একই বাড়ির দেড়খানি ঘর। বাকি দেড়টা বোস মশাইএর। কল পায়-খানা কমন, গলা খাঁকরি দিয়ে জানাতে হয় প্রয়োজনটা, পিঠ চুলকোলে শোনা যায়।

আনবো আনবো করে' অনেকদিন ফ্যামিলী আনেননি মুখুজ্জে মশাই। থাকতে থাকতে কেমন যেন আপন জন হ'য়ে গেলেন মুখুজ্জে মশাই এঁদের। বোস মশায়ের স্ত্রী ওরফে দিদি, প্রায়ই এটা-সেটা পাঠিয়ে মুখুজ্জের তত্ত্ব-তল্লাস করতেন। ঘরে ঘোরে ঝাঁট-পাট সাজানো-গোছান করে দিতেন সঙ্গোপনে। কতদিন মুখুজ্জে মশাই অবাক হ'য়ে ভেবেছেন, এ কি করে' সম্ভব হয়; যেন মনে পড়ছে তাঁর অফিস যাবার সময় সব ওলোট-পালট ছিল। তোলা-ঝি-এর বড় দায় পড়েছে।

অফিস বেরবার সময় ঘরের চাবিটা মুখুজ্জে মশাই দিদির কাছে রেখে যেতেন। দুপুরে ঝি এসে যেন এঁটো বাসন বার ক'রতে অসুবিধা না হয়।

হঠাৎ একদিন অসময়ে অফিস থেকে ফিরে মুখুজ্জে অবাক হ'য়ে গেলেন। দিদি তাঁর ঘর পরিষ্কার করছেন, বিছানা-মাদুর ঠিক করছেন।

এ কিন্তু ভারি অন্যায় দিদি ! আপনি কেন ? মুখুজ্জে ঘরে ঢুকে বললেন।

দিদি সপ্রতিভ : অন্যায় আবার কিসের ? ভাই-এর না হয় একটু করলুম ! কি মূর্তি হ'য়েছিল, নিজেরই খারাপ লাগছিল !

মুখুজ্জে অপ্রস্তুত ! প্রতিবাদ করলেন, না না, আপনি করতে যাবেন কেন ?

দিদি ঘর গুছিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন বৌ আসুক, তখন করবো না। অথচ সেই বৌ কেন যে আনছেন না, মুখুজ্জে মশাই জানেন ; এই ভাবে এক বছর কেটে গেল।

তারপর অধিক পরিচয়ে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হ'লে বোস

মশাই জিজ্ঞেস করতেন, কি হে ভায়া, ফ্যামিলী-ট্যামিলী আনবেনা, ঠিক করেচ নাকি ?

মুখুজ্জে বলতো, ফ্যামিলীই আসতে চায় না যে !

বল কি ? কোমরেই বুঝি কিক্ বেদনা লেগে যায় বোস মশায়ের, আমায় উনি কিন্তু এক মিনিটও থাকতে পারতেন না কাছ ছেড়ে ! মা লক্ষ্মীর সাহস আছে বলতে হ'বে।

তারপর হে-হে করে' হেসে বোস মশাই বলতেন, জায়গাটারও নাম ডাক তেমন ইয়ে নয়। কথায় বলে মথুরা-বৃন্দাবন।

মুখুজ্জেও হাসতো। তারপর হঠাৎ রঙ্গ-ভঙ্গ করে বোস মশাই জিজ্ঞেস করতেন, তুমিই বা থাক কি করে ফ্যামিলী ছেড়ে ? পারও ?

মাথা চুলকে মুখুজ্জে বলতো, বদলীর চেষ্টায় আছি দাদা। যদি হয়, কেন মিথ্যে কতকগুলো খরচ করি আবার।

বোস মশাই আর কিছু বলতেন না। যুক্তিটা বোধ হয় গ্রহণ-যোগ্য। তাঁর মত তো সবাই বাতের ভয়ে দেশ ছাড়েনি। ফেরবার আশা রাখে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোভাই থাকতে দিলে না। একটা ছুটিতে গিয়ে সপরিবারে আনতে হ'লো মুখুজ্জেকে। বদলী হওয়ার অছুহাত টিঁকলো না।

শোভা যা ভেবেছিল তা নয়। দিদি দিদির মতই। যেন ছোট বোন কাছে এসেছে, সব দেখিয়ে শুনিয়ে গুছিয়ে দিলেন। এতটুকু আঁচ লাগল না শোভার সংসার পাততে। যেটার অভাব দিদিই পুরিয়ে দিলেন মুখের কথা বলতে না বলতেই।

একদিন শোভা কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললে, দিদি আপনি কত ভাল !

দিদি স্মিত হাসলেন। আঁচলের আড়াল থেকে ব্যঞ্জনের বাটিটা বার করে বললেন, খেও !

শোভা স্নেহধন্য, বিগলিত হ'য়ে বললে, ওমা এযে এঁচোড় ! কোথায় পেলেন দিদি ? ও খুব ভালবাসে কিন্তু !

দিদি কিছু বললেন না। তিনি জানেন সে-কথা।

কিন্তু শোভার উচ্ছ্বাসের শেষ হ'লো না। পাড়ার আর পাঁচটা পরিবার তখুনি জানলো, দিদি ভাল জিনিষের ভাগ এদের দিয়ে থান। দিদি বড় এক চোখো !

শুধু মণিকার নয়, দৃশ্যটি আরো পাঁচটি প্রবাসিনীর দৃষ্টি-কটু লাগে। তাঁরা আরো একটা মজলিসে জড় হ'য়ে নানা বিরূপ মন্তব্য করেন।

ধূনোর গন্ধ দিয়ে মিত্তির মশায়ের স্ত্রী রেণুকণা বলে, আজ কি, কবে থেকে দেখচি—তখন মুখুজ্জে মশাই দিদির পাশের ঘরে বাস করতেন ! শোভার তখন জন্মই হয়নি।

পাড়ায় একেবারে একটেরে থাকে বলে সব সময় খবর কানে পৌঁছায় না, তবু সব কথাতেই আছে। ইন্দু বললে, অত ভাব কিন্তু ভাল নয়, বোস মশায়ের যেমন—

মণিকা ঠোকর দিয়ে বললে, ভাবের আর তোমরা দেখলে কি, যখনি দেখ মুখোমুখি !

ইন্দু চোখ বড় বড় করে' বললে, বল কি ! এতই ভাব।

মণিকা এদিক-ওদিক চেয়ে বললে, একা নাকি, কর্তা-গিন্নী দু'পাশে। এই পান খাওয়া হ'চ্ছে এই গল্প হচ্ছে।

ইন্দু বললে, তোমার রান্না ঘর থেকে তো সব শোনা যায়, শোননি, কি গল্প করে ?

মণিকা বললে, কি আর, পরচর্চা। সবাই খারাপ, কেবল ওঁরা দুটি ভাল।

ইন্দু কৃত্রিম লজ্জার ভান করে' বললেন, মুখুজ্জে মশাই সামনে বসে থাকেন ?

সবাই বুঝি চোখ টিপ্‌লো। মিত্তির মশায়ের স্ত্রী হেসে বললেন, তোর যেমন কথা। দিদির সামনে আবার লজ্জা কিরে ?

ইন্দু অবাক হ'য়ে বললে, কি জানি, আমার উনি মেয়ে-মানুষের ছায়া দেখলে সেদিকে আর মাড়ান না।

দুঃখে হেসে মণিকা বললে, তোর ছায়াকে কি করে জড়িয়ে ধরে ?

কপট ক্রোধে ইন্দু প্রতিবাদ ক'রলে, বড় মুখ আলগা তোমার ভাই, ছেলে-পুলের সামনে।

কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছু হয় না। এত মাখামাখির প্রকৃত কারণ কি ? দিদির অনেক গুণ, এর বেলায় তিনি ভারি

একচোখো। দরকার ছাড়া তিনি কারো বাড়ি আসেন না, কিন্তু শোভার ঘরে ওঁর আনাগোনার হিসেব নেই—কে জানে সকাল, কে মানে সন্ধে, কে মানে দুপুর! রাত দুপুরও হয় কতদিন, বোস মশাই খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডাকতে আসেন। মণিকা কতদিন স্বামীকে বলেছে, কি দরকার, দাও না বাপু আমাদের ঘরগুলো ছেড়ে—দিদি বোন পাশাপাশি থাকুক। আমরা না হয় বোস মশায়ের বাড়িটা নিই।

খাটিয়ার ওপর কাৎ হ'য়ে কড়িকাঠ গুনতে গুনতে দাস মশাই বলেন, দিলেই হয়! উনিই তো ছেড়ে দিলেন তাই আমি এলুম!

এর আগে দাস মশাইরা ছিলেন ঐ কুয়ো তলার এঁদো-পড়া একটা বাড়িতে, একটু আড়ালে। মুখুজ্জের ফ্যামিলী আসবার পর বোস মশাই বাড়িটা ছেড়ে দিলেন—সামনে একটা তিন ঘুপরী পাকা বাড়িতে ওঠে গেলেন, মণিকারা সেই দিনই উঠে এল শোভাদের পাশের ঘরে। এখন ভাবতে অবাক লাগে বোনকে ছেড়ে দিদি সরে গেলেন কেন? না হোক সাত পা তো!

কিন্তু প্রথম থেকেই সন্দেহ। কল-জল নিয়ে মন কষাকষি তো আছেই, তার ওপর ঐ দিদির আসা-যাওয়া।

ঘোর দোড়ায় মণিকা যদি দেখে কোনদিন, সাদর অভ্যর্থনা করে, দিদি গ্রহণ করেন, কিন্তু তার ঘরে এসে বসেন না—কি বললেও ঠিক বসতে চান না! ঐ শোভা অন্ত প্রাণ! কেন?

দাস মশাই শোনেন স্ত্রীর মুখে। বিরক্ত হয়ে কোনদিন হয়তো মন্তব্য করেন, তুমি ডাক কেন? যাক দিদি তার দিদি, আমাদের কি!

কিন্তু মণিকার মনঃপূত নয়। অথচ এমনিতে কি ভাল মানুষ, একটু কারো বিপদ-আপদ হোক, প্রাণ দিয়ে উনি করবেন। পাড়া মাথায় করে' রাখেন অসুখ বিসুখে! কেবল সুখ-সামাদা মুখুজ্জে মশায়ের বাড়ি! ঐ তারি ঘোষ দিদির, আর কি ছোট বোন নেই সারা মনুষ্যে! সুতরাং মেয়েমহল থেকে পুরুষ মহলেও কথাটা আলোচনা হয়। দাস-সরকার-মিত্তির কারো না কারো সঙ্গে দেখা হ'লে বলেন, আর শুনছেন, মুখুজ্জে কাল অফিস কামাই করেছে!

দাস মশায়ের খেয়াল হয়, কাল মুখুজ্জে অফিস যাননি। ওঁর হাত দিয়ে 'সিক-নোট' পাঠিয়েছেন। ওতো হাতের পাঁচ, সোনাগুনির কি আছে!

সরকার বললেন, কাল বোস মশায়ের বাত বেড়েছিল যে।

দাস মশাই হাসলেন, ও!

সরকার মশাই বললেন, যাই বলুন মশাই, বিদেশে এমন আত্মীয় পাওয়া ভাগ্যের কথা!

দাস মশাই বললেন, ভাগ্য বলে ভাগ্য, মায়ের পেটের বোনও অমন করেনা!

যেন হঠাৎ মনে পড়ল। সরকার মশাই বললেন, আর শোনেননি এবারে ভাই ফোঁটায় দিদি মুখুজ্জেকে কাপড় দিয়েছেন!

এক চালে মাথা কিনে আছেন, সুতরাং তিনি জানেন না এমন কখনো হতে পারে না, দাস মশাই বললেন, উনি আমার দাদাকে দিয়েছেন যে!

দাদাকে মানে? বোস মশাইকে! আক্ষেপ করে সরকার মশাই বললেন, আহা দিক দিক, আমরা দেখে সুখী হই।

পারত পক্ষে মুখুজ্জে সহকর্মীদের এড়িয়ে চলে। উঁচু-নীচু কথা যদি হয় কি দরকার! তাছাড়া তার অপরাধ কি, কেউ যদি তাদের ভালবাসে? তারা তো আর মানা করেনি! দিদি দিবার।

মেলামেশায় প্রায় এক ঘরে হ'য়ে আছে মুখুজ্জে, অফিস থেকে এসে সেই যে ঘরে ঢোকে, বেরুর আবার সেই অফিস যাবার সময়! গুটি গুটি ছাতার আড়ালে।

লোকটা কি? ঘর থেকে একদম বেরোয় না! ভালও লাগে?

দাস মশাই টিপে বলেন, মধু আছে মশাই, মধু!

মধু? দুটো খাটিয়া আর ন্যাড়খানা ঘর, ওর আবার মধু কোথা? কি যে বলেন!

দাস মশাই হাসেন। অফিস অনেকটা পথ, চলতে চলতে গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে বলেন, রসিক ব্যক্তি ওরই

মধ্যে যে সংগ্রহ করতে পারেন—সেই কোথায় যেন পড়েছিলুম—

সহযাত্রী সরকার মশাই বলেন, ও এক একজনের স্বভাব, কুনো!

আবার বুঝি হাস মশাই হাসেন। যা তিনি বোঝেন এঁদের বোঝাবেন কি করে! রাতদিন দেখছেন তিনি, শুনছেনও।

হঠাৎ সরকার বললেন, ঐ যে!

একা একা মুখুজ্জে চলেছে সামনে। মহা নিমের ছায়ায় ফিস্‌ফিসানি। একটু থেমে ঘাড়-গলা মুছে হাস বললেন, লোকটার ভাগ্য ভাল মশাই! আপনার আমার মত নয়—

সরকারও থেমেছেন—কিসে?

কিসে নয়, মধুরায় এসে একদিনও ভুগতে হ'লো না! দিদির শ্বাশুড়ের তলায় বিদেশে পা দিয়েই। নিজেদের কথা ভাবুন একবার—কত ধরনশালা, হোটেল মেরে না তবে বাসা-বাড়ি! কি ভোগান্তি বলুন দেখি শালার চাকরিতে! দেশ-ভাগে এত কষ্ট হয়নি।

সরকার মশাই সায় দিলেন, তা যা বলেচেন, দেশ গিয়ে যে দুঃখু এখন চাকরি থেকেও সেই দুঃখু!

হাস মশাই বললেন, সবার ভাগ্যে দিদি জোটে না!

সরকার মশাই বললেন, লোকটা বড় মেয়ে-সেন্‌কা বাই বলুন—

হেসে হাস মশাই বললেন, বলুন মেয়েমুখো, মেয়ে কপালে!

একটু পা চালিয়ে এসে সবাই প্রায় কাঁধাকাঁধি হ'য়ে পড়ল। পিছন থেকে হাস মশাই ডাকলেন, মুখুজ্জে মশাই, কি ব্যাপার?

থেমে মুখুজ্জে মুখ ফেরালেন। মনে হ'লো মুখটা যেন তাঁর কেমন হ'য়ে উঠেছে। রক্তহীন।

সরকার বললেন, কাল কি হ'য়েছিল অফিস আসেননি?

অস্ফুটে মুখুজ্জে বললেন, শরীরটা ভাল ছিল না।

সরকার বললেন, খুব সাবধান মশাই, আজকাল সময় বড় খারাপ! তেমন কিছু নয় তো? না হ'লেই ভাল। বিদেশ-বিভুঁই!

মুখুজ্জে সাড়া করলেন না। সহকর্মী আত্মীয়ের সামিল!

সরকার বললেন, আপনার সাহস আছে, তবু তো দেড় বছর দুবছর সিঙ্গল্ কাটিয়ে দিলেন, ভাগ্যিস কিছু হয়নি। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। হাস বললেন, সবার শরীর তো আপনার মত নয়—ভাতে-বাতে তরিবতে রাখতে হ'বে! শরীরের নাম মহাশয়—

সরকার সম্পূর্ণ করলেন, যা সওয়ায়ে তাই সয়!

সে কথা বুঝি মুখুজ্জের সম্বন্ধে বলা চলে না। সাধারণ বাঙালীর মত চেহারা, বয়সের আন্দাজ বড় একটা চলে না। ছয় তিরিশ নয় চল্লিশ গোছ! তুলনায় একটু লম্বা। মাথার চুল যেমন কাল, গায়ের রঙ তেমনি গৌর! গৌর-ই বুঝি ডাক নাম মুখুজ্জের।

মিলিটারী রেকর্ড অফিসের পেটা ঘড়িতে শাস্ত্রী ঘণ্টা বাজালে, দশটা। বেমুরা। এক ঝলক ধুলো উড়ল।

অফিস গেটের মধ্যে পা দিয়ে হাস বললেন, ইঃ, এরি মধ্যে কিরকম বোদ্দুর দেখুন! এবার ভোগাবে!

সরকার বললেন, শালা, আর জায়গা পেলে না—কোথায় পাঠালে দেখনা! শীত গেল তো গরম! দুঃখের ভাত আর সুখ করে খেতে দেবে না!

সায় দিয়ে হাস মশাই বললেন, যা বলেচেন! শালার চাকরিতে ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। এই কি একটা জায়গা, মানুষে থাকে?

সরকার চোখ টিপলেন, হাস বললেন, ওঁর কথা অবশ্য আলাদা!

যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, মুখুজ্জেকে সরকারকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাল কথা, আপনার বদলীর দরখাস্তর কি জবাব পেলেন?

হাস মশাই হেসে বললেন, বাঁধা গৎ, জানেন না? কেয়ারফুলি কন্‌সিডার্ড বাট্ রিগ্রেটেড্। ছাপন কর্ম আছে! একবার যখন এনে ফেলেছে, তখন দশটি বছর চোখ-কান বুজে থাকুন! আমি তো ভাবচি, এখান থেকেই রিটায়ার করবো? সরকার বললেন, তা মন্দ হয় না। শেষ বয়েসে "ধামে" বাস করতে পারবেন। সংসার তো পাতাই রয়েচে!

দাস মশাই বললেন, হুঁ, খুব সুবিধে—এ জন্মে বাপের নাম ভুলে পরজন্মে কেষ্টের নাম করবো!

মুখুজ্জে চুপ করে ছিল। সরকার আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি দাদা 'সি-সি-আর নাকি'?

ধীরে মুখুজ্জে বললেন, এখনো কোন জবাব আসেনি।

সহকর্মী দু'জনেই চমকে উঠলো। এখনো জবাব আসেনি! অর্থাৎ—

সরকার ঢোক গিলে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কমাস হ'লো?

মুখুজ্জে বললেন, তা অনেকদিন···হিসেব করিনি।

মনকে প্রবোধ দিয়ে দাস মশাই বললেন, দরখাস্ত ফাইল হ'য়ে গেছে। "ফর্ম" বোধ হয় আর ছিল না!

সন্দিগ্ধ ভাবে সরকার বললেন, তা কখনো হয়? হাঁ-না একটা কিছু জবাব নিশ্চয়ই দেবে! দেরী হলো যখন—

আর কোন কথা হ'লো না। বদলীর দরখাস্ত, তার আবার গবেষণা! ওর চেয়ে আকাশের চাঁদের কল্পনা ঢের বেশী বাস্তব!···

কিন্তু তা বুঝি নয়। মাঝে মাঝে বহু জলেও ঢেউ ওঠে। কোথা দিয়ে কি হয়, কে বলতে পারে! কার ভাগ্যে কি আছে কে জানে। যাকে বলে উইশুফল। মুখুজ্জের কলকাতা বদলীর অর্ডার আজই প্রথম ডাকে এসেছে। দাস সরকার মিত্তির সুর চন্দ আনন্দে দুঃখে বেদনায় পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। মুখুজ্জেকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল: ভাগ্যবান মশাই আপনি, ফাঁড়া কেটে গেল! যাক বাঁচলেন!

মুখুজ্জে ঠিক যেন অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না। মনে হ'চ্ছে, সবাই যেন তার সঙ্গে কৌতুক করছে। খুব আনন্দ একটা হ'চ্ছে না। সবার মুখের দিকে ক্যাল্-ক্যাল্ করে চেয়ে দেখছেন, সত্যি না, ঠাট্টা!

দাস বললেন, আমি বলেছিলুম আপনার ঠিক লেগে যাবে! কেমন লাগল কিনা?

সরকারও সেই কথা বললেন, কেমন আজ বলিনি? জবাব একটা পাবেন, দরখাস্ত কখনো নাপে করতে পারে।

ওরি মধ্যে মিত্তির একটু ঠোকর দিলেন, লোকজন থাকলে সব হয়, আমার দেখা আছে। মুখুজ্জে যে-সে নয়।

সুর মশাই বেসুরা গাইলেন, শালা আমাদের কপাল পাথর চাপা—পাঁচ বছর হয়ে গেল এক ষ্টেশনে! শোনেই না!

সরকার আশ্বাস দিয়ে বললেন, শুনবে শুনবে! হাত খুলেচে!

সুর মশাই বললেন, মন্ত্রদের রাজত্বে আর নয়। বাঙালীর ছেদ্দ করে ছাড়বে!

মুখুজ্জে নীরব। আনন্দসংবাদে কেমন যেন গভীর বেদনা অনুভব করে। তারপর অনেক আলোচনা হ'লো নিজেদের মধ্যে, অর্থহীন। কে কার কথা শুনছে, জেল-খানার কয়েদীদের আবার সুখ-দুঃখ, তার আবার বোঝা পড়া! দাবী-দাওয়া! যে ছাড়া পেল, সে পেল!

তবু আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় সংবর্ধনার একটা আয়োজন ক'রতে হয় নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে। যার যেমন ক্ষমতা। সরকারই উৎসাহী হ'লেন, সবাই চাঁদা দিলে। দু'তিন দিন উত্তেজনায় কেটে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখুজ্জেই সব ভেস্তে দিলে। বদলী বাতিলের দরখাস্ত করে বসল। এখানে বেশ আছে, আর নাড়ানাড়ি তার পছন্দ নয়। কলকাতায় গেলে এমন কিছু তার হাত-পা গজাবে না, চতুর্বর্গ লাভ হ'বে না! জায়গাটা খারাপ কিসে? সব দিক বিবেচনা করে—

আপত্তিটা ঠিক মুখুজ্জের নয়, শোভাই স্বামীকে রাজী করিয়েছে, বাদ দাও দেশ-ঘর, আত্মীয়-স্বজন! এখানে বাপু বেশ আছি! কলকাতায় নানান জ্বালা! অনেক কথা, অনেক মন জুগিয়ে চলতে হয়। তারপর খরচ! এই তাই চলে না এখানে, সেখানে তো শুনচি কথাই নেই! কি করে চালাবে এই মাইনেয়? ভেবে দেখেচ!

সহকর্মী বন্ধুরা অবাক হ'লেন। লোকটার মতলব কি কে জানে। পায়েধরে যা পাওয়া যায় না, পা দিয়ে তাই ঠেলছে হাতে পেয়ে! বলে কিনা কলকাতায় যাব-না! স্ত্রী বুঝিয়েছেন আর উনি বুঝে বসে আছেন! আর কখনো দেশের মুখ দেখতে পাবি ভেবেছিস!

দাস মশাই বললেন, আঃ, আপনারা অত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন। ভদ্রলোক ঠিক করেছেন, দিদিকে ফেলে যায় কি করে? তা হ'লে দিদিকে যে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

আড়ালে সবাই হাসাহাসি করলে রসালাপে। আহা দিদি!

সরকার মশাই বললেন, আমাকে যদি কেউ বলে আজকে রাজত্ব আর আস্ত রাজকন্যে দিচ্ছি এখানে থাক, আমি মশাই এক তিলও থাকবো না! নিকুচি করেচে—

সুর মশাই বললেন, না থেকে যাবেন কোথায়! আপনার ইচ্ছেয়?

দাস মশাই হেসে বললেন, গিন্নীর ইচ্ছেয়!

সত্যিকারের দিদি কি বলেছিলেন আমাদের জানা নেই। মুখুজ্জে বদলী হ'লেন না। শোভা খুশী হ'য়ে দিদিকে সংবাদটা দিলে: কি দিদি, ভাল করিনি?

কেমন যেন মিইয়ে দিদি বললেন, সে তোমরা বোঝ আমি আর কি বলবো। মুখুজ্জে মশাই কি বলেন?

উড়িয়ে দিয়ে গর্বে দুলে শোভা বললে, ও আবার কি বলবে?

শুনে আড়ালে মণিকা বললে, আদিখ্যেতা! বাড়-বাড়ি—ছাতা দিয়ে দিদি এবার মাথা রাখবেন।

মাসখানেক পরে। কার মনে কি আছে কে জানে। হঠাৎ একদিন দাস মশায়ের বদলীর অর্ডার এলো। কলকাতা!

হৈ হৈ আর তেমন হ'লো না সহকর্মীদের মধ্যে। মুখুজ্জেই মাটি করে দিয়েছে, যেন ওটা একটা সংবাদই নয় আর। মুখের ওপর না করে দিয়েছে। বাঙালী অতো ঘরকুনো নয়!

তবু সরকার মশাই উৎসাহ দেখালেন। কেরৎ চাঁদা আবার তুলে যথোচিত বিদায় সম্ভাষণ জানান হ'লো দাসকে। বিদায়ভাষণে দাস মশাই কেঁদে ফেললেন। বদলীর চাকরির নানা দুঃখের বর্ণনা করলেন। আর বললেন, কত দুঃখ হচ্ছে তাঁর সবাইকে ফেলে যেতে। আত্মীয় বিয়োগ ব্যথার চেয়ে বেশী!—

তারপর নিজের বাড়িতে ছোটখাটো একটা ভোজেরও আয়োজন করলেন দাস মশাই। মুখুজ্জে, মুখুজ্জের স্ত্রী দাঁড়িয়ে থেকে দেখাশোনা করলে সকলকে আদর-অভ্যর্থনা করলে। এমন-মেলামেশা বুঝি তাঁরা এতদিন পাশাপাশি বাস করে' কখনো করেননি। শোভাকে খুব বেশী উৎসাহী দেখালো। মণিকাও সারাদিন 'শোভাদি শোভাদি' করে অস্থির ছোট বোনটির মত। দিদির তেমন খোঁজ হ'লো না আজ।

ক'দিন ধরে ক্রমাগত বাঁধা-ছাদা হ'য়েছে, হাতে ব্যথা, মন ভারি হ'য়ে উঠেছে। রাত দুপুর পর্যন্ত এটা তুলে ওটা রেখে আর স্বস্তি নেই। কদিনে ক' হাঁড়িকেন তেলই পুড়ে গেল। রান্নাঘরের উনুন ভেঙে ফেলা হয়েছে, শোভাই নেমন্তন্ন করেছে একটা দিন আর নাই রান্নাবাড়া করলে আমার ঘরেই সব খেও!

মণিকা রাজী হ'য়েছে। যেন যাবার মুহূর্তে মানুষটাকে চিনতে পারল, এতদিন ভুল চিনে এসেছে। কি লজ্জা! সত্যি বুঝি দুঃখু হয় এদের ফেলে যেতে।

দাস মশাই বললেন, থাক, আর যা বাকি আছে, কাল করো। ছেড়ে দাও—

বাঁধা বেডিং আবার খুলে মণিকা বললে, তা হ'লেই হয়েছে, কাল সময় পাব কখন? বেশ যা হোক তুমি।

বিরক্ত হয়ে দাস মশাই বললেন, বেলা একটার মধ্যে হ'বে না?

মণিকা উত্তর দিলে না, এটা-ওটা নেড়ে শব্দ করতে লাগল সমানে। গুছনোর কি শেষ আছে। পাঁচ বছরে কি কম জিনিষ-পত্তর হয়েছে। ওঁর কি, সব ফেলে দিয়ে যাও। দেশে ফিরছ যখন, অভাব হ'বে না কিছুর।

মণিকা শোনে না। কত মায়া! সামান্য মাটির হাঁড়িটার জন্যেও! সব যদি নিয়ে যেতে পারতো সঙ্গে করে। তা কি হ'বে, ওঁর জন্যে?—তাড়া দিচ্ছেন।.....

হঠাৎ যেন কোথা থেকে হাসির শব্দ শোনা গেল। মণিকা পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে, স্বামীর হাসির দমকে দাড়ির চারপাশটা দুলছে।

কি ব্যাপার! হঠাৎ হাসচো কেন? মণিকা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

দাস মশাই উত্তর না দিয়ে সশব্দে হাসতে লাগলেন।

আঃ, শুধু শুধু হাসচো কেন? পাগল হ'লে নাকি? মণিকা উঠে এল।

হাসমশাই বললেন, একটা কথা মনে পড়ে গেল!

কি কথা, যার জন্যে রাত দুপুরে হাসতে হবে অমন করে? স্বামীকে মণিকা ধমকে ওঠে।

হেসে হাসমশাই বললেন, তোমার শোভাদিটা ভারি বোকা কিন্তু।

মণিকা বললে, বোকা কিসে?

হাসমশাই বললেন, উনি মনে করেন দিদি ওঁকে খুব ভালবাসেন।

ক্রুদ্ধশ্বাসে মনিকা বললে, বাসেনই তো, না হ'লে কেউ মেশে বদলী হ'তে চায় না, ঐ দিদির জন্যে—

হাসমশাই বললেন, সেই জন্যেই তো হাসচি!

সব সময় হেঁয়ালী মণিকার ভাল লাগে না, রেগে বললে হাসো যে তুমি অদভার মত। বুড়ো বয়েসে ভাঁড় পাচ্ছেন! ভালবাসার মর্ম তোমরা কি বুঝবে? ছি—

হাসমশাই গম্ভীর হ'য়ে বললেন, তোমরা বোঝ তো? কিন্তু যাই বল, দিদি আসলে ওঁকে ভালবাসেন না, তিনি ভালবাসেন আর একজনকে—

বিস্ময়ের ধমকে বুঝি মণিকা চীৎকার করে ওঠে, কাকে?

মুখুজ্জেকে!

মণিকা হতভম্বের মত স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল, ব্যাপারটা যেন সে বুঝতে পারছে না।

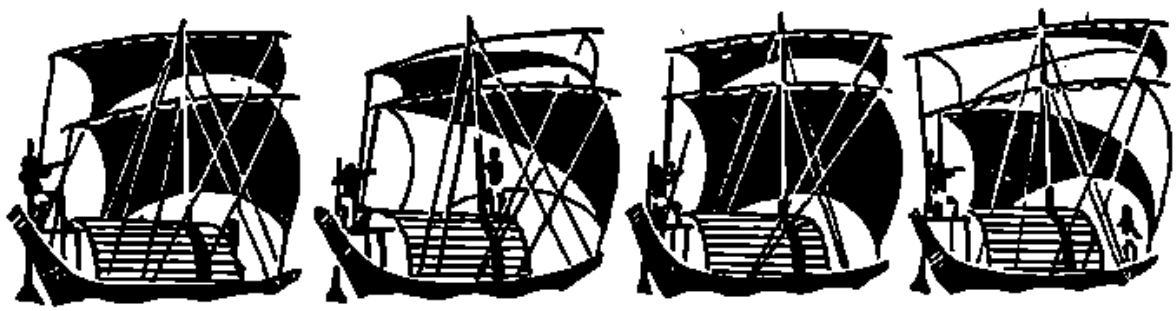

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : 22-6853-58

সত্যি...
মেপোল্
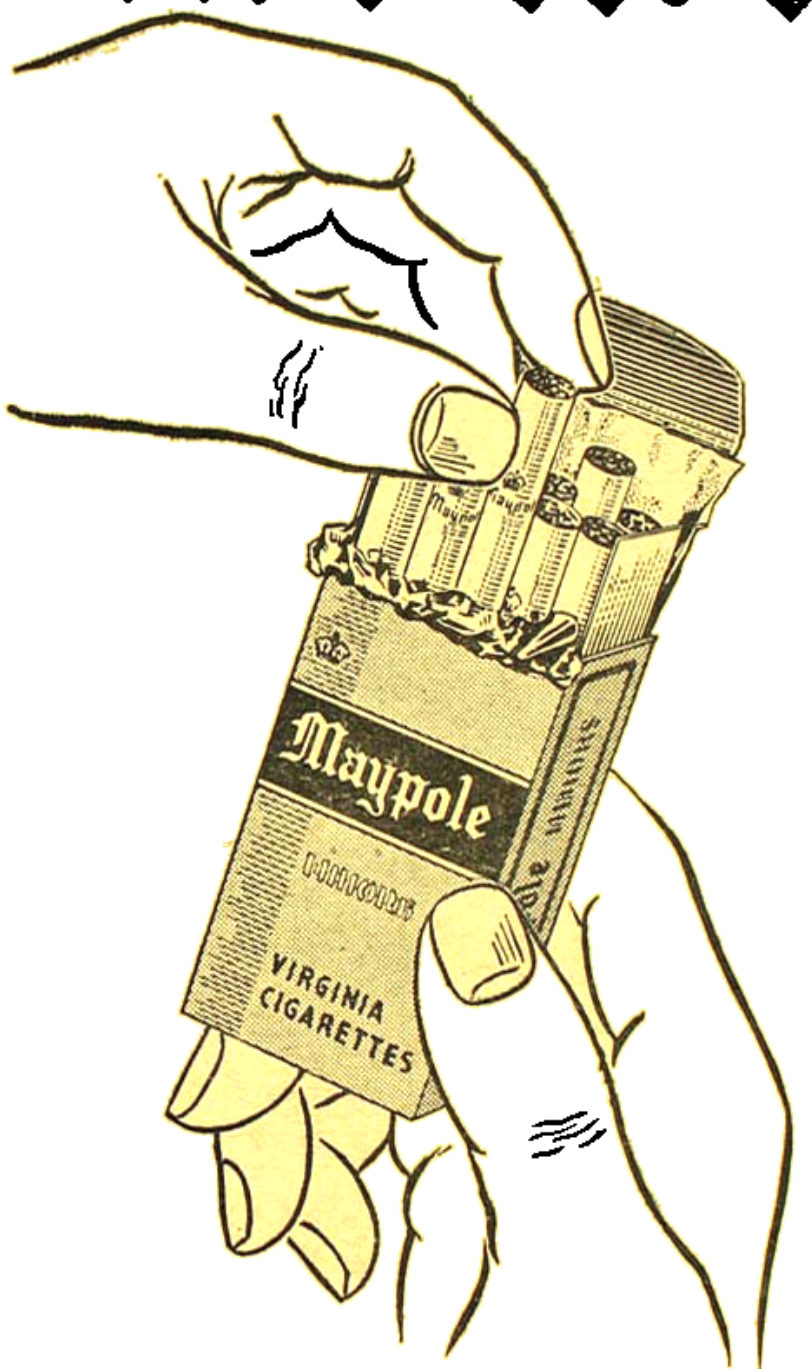

সব চেয়ে ভাল
ACI
।/০ আনায় ১০টি, ১।/০ আনায় ৫০টি
MJ/168

"বৈজ্ঞানিক কবি রবীন্দ্রনাথ"

শ্রীশ্রুতি দেবী

আমার এক জ্যাঠামশাই আছেন, তিনি পণ্ডিত মানুষ বিশেষ পাঠশেষী এবং কলাসাহিত্যাদি মোটেই পছন্দ করতেন না। ভাল ছেলে হিসাবে খ্যাতি ছিল, তাই সব বিষয়েই ভাল ছেলে ছিলেন ঠিকই, তবে সাহিত্যে তাঁর তেমন রুচি ছিল না। আমি তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী তখন হঠাৎ একদিন তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করি। দেখি যে তিনি আমার বাংলা বইয়ের কবিতা পড়ছেন—সেদিন আর কিছু বলিনি। তারপর প্রায়ই যখন তাঁর এই ব্যাপার দেখতে লাগলাম তখন আমার স্বভাবচপল মন আর স্থির থাকতে পারল না। হঠাৎ একদিন বলে ফেললাম—"ও জেঠু আপনার কি মাথা খারাপ হল?" উনি কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিলেন "কেন বলত?" আমি বললাম "অঙ্ক গিয়ে এখন কাব্যে রুচি হ'ল কেন আপনার?" তখন জেঠু বললেন "ওরে পাগলি, কাব্যইত সব, তা জানিস না বুঝি?" তখন আমি কৌতুক করে বললাম—"এ কি ভূতের মুখে যে রাম নাম শুনি—কাব্যে আবার কি আছে "বিশ্বে যা কিছু নহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার আনিল গণিত আর বাকি বিজ্ঞান" তখন জেঠু অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবে বললেন—"ওরে তোরা কিছুই জানিস না। বৈজ্ঞানিকদের কিছুই বুদ্ধি নেই। ওদের একমাত্র ক্ষমতা চর্বিত চর্বণ করা—বুদ্ধি যা কিছু সব কবির"। আমিও তখন স্থির হ'লাম—বললাম "তার মানে?" তখন জেঠু যা বললেন তা সংক্ষেপে এই যে—

বৈজ্ঞানিকরা যা কিছু আবিষ্কার করে, সবই ত এই পৃথিবীতে আছে, তবে তারা নতুন আর কি দিল বিশ্বকে? যা কেউ জানত না তা বরং সবাইকে জানিয়ে দিলে—তাতে সূক্ষ্মবিচারে তাদের আমরা আবিষ্কারক কিছুতেই বলতে পারব না। আবিষ্কারক ত' স্বয়ং ভগবান, তার চেয়ে বৈজ্ঞানিকদের আমরা বলতে পারি বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত। মানুষের মধ্যে আবিষ্কারক যদি কেউ থাকে ত' সে কবি! কবিই করেছে নিত্য নতুন নতুন সৃষ্টি—একমাত্র কবির পক্ষেই আকাশে ফুল ফোটান সম্ভব। অতএব সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে আবিষ্কারক যদি কাউকে বলতে হয় ত' আমরা বলব কবিকেই, বৈজ্ঞানিককে নয়।

কথাগুলো সেই সময় তত সুবিধার মনে হয়নি, কারণ আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী, তার উপর সবে পড়ছি—ফলে "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী" দোষটা আমার মধ্যে তখন জাজ্বল্যমান; তাই কথাগুলো শুনতে ঠিক ইচ্ছাও করছিল না। কিন্তু এটা দেখেও খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যে কথাগুলো অদ্ভুত ভাবে আমার মনে দাগ কেটে গেল -যার জন্যে আজ এত দিন পরে সেই কথাগুলোরই আবার পুনরালোচনা করছি। কথাগুলো প্রায়ই ভাবতাম। আমার একটা রোগ আছে সব কথা বাবাকে বলা, কিন্তু কেন যেন এ কথাগুলো তাঁকে বলতে ভাল লাগল না। এগুলো যেন ভাবতেই ভাল লাগে বেশী।

তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানা ভাল বাংলা বই পেয়েছিলাম। পড়ে, পড়ে সেটা আমার খুব ভাল লাগল—আর ততই জেঠুর কথাগুলোর অসারতার কথা ভাবতে লাগলাম।

বইটিতে পড়লাম যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুঞ্জ পুঞ্জ পদার্থ রাশিকে ঘেরা আলো, উত্তাপ সবই বিদ্যুৎময়—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যুতের লীলাখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা জানি যে বিশ্ব-পদার্থের শেষ অবস্থা অর্থাৎ যেখানে পদার্থ তার নিজের স্বাতন্ত্র্য হারায় না; অথচ সবচেয়ে ছোট, সেই অবস্থা হচ্ছে পদার্থের অণু (Molecule) অবস্থা, কিন্তু তারও পরের অবস্থা অর্থাৎ চরম অবস্থা হচ্ছে পরমাণু (Atom) অবস্থা; যেটা বাস্তবিক পক্ষে একেবারেই অবিভাজ্য। কিন্তু এতেও নিস্তার নেই—বৈজ্ঞানিকদের মনে প্রশ্ন জাগল এই পরমাণুরই বা উপাদান কি? প্রশ্ন থাকলেই বুঝতে হবে যে তার উত্তরও আছে। এবং অবশেষে মিললোও উত্তর—

বিশেষ পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেল যে পরমাণুর উপাদান—'বিদ্যুৎ'।

হ্যাঁ ধর্মী (+ve) এবং না ধর্মী (−ve) বৈদ্যুতিক শক্তিই সকল পদার্থের মূল উপাদান—বিজ্ঞানের ভাষায় তাদের বলে যথাক্রমে Electron ও Proton. এদের বিভিন্ন অনুপাতের ওপরই নির্ভর করে পদার্থের বিভিন্নতা আর এই হ্যাঁ ও না ধর্মী বিদ্যুৎ প্রত্যেক পদার্থে থাকে সমান ভাবে যাতে করে পদার্থগুলি হতে পারে "বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ" (Electrically neutral)। শুধু তাই হলেও না হয় বাঁচতুম। আবার দেখলুম যে এই Electron আর Protonরা স্থির থাকে না, এরা সদা ঘূর্ণায়মান। Electron Protonকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আবার অপর পক্ষে Proton ও ঘুরছে একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে। এই Electron ও Protonরা এক একটি কণার মত। এতেই বিস্ময়ের শেষ নয়—অসীম বিস্ময় আবার উঁকি মারল—এই কণার আবার তরঙ্গ। কিন্তু মানুষের সীমাহীন কৌতূহল যখন Electron ও Protonএর কণা এবং তরঙ্গ উভয় রূপই এক সঙ্গে দেখতে চাইল—তখন "অনিশ্চয়তা বাদ" মাথা উঁচিয়ে গর্জন করে উঠল—"অসম্ভব! মানুষের পক্ষে এদের কণা ও তরঙ্গরূপ এক সঙ্গে দেখা অসম্ভব। খবরদার, আর এগিও না।" সেই বইটা থেকে আমি এইটুকুই সংগ্রহ করলাম আমার নব্য বিদ্যার ঝোঁড়ে। মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠল। বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল—এও কি সম্ভব? সমস্ত বিশ্ব পদার্থ-ই কি তাহলে নাচছে? অগণিত কণা সমূহ রূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাহলে অহর্নিশ তরঙ্গায়িত হচ্ছে—এইটাই হচ্ছে তবে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার? একটা নির্দিষ্ট নিয়মের শৃঙ্খল পায়ে পরে বিশ্বরূপ মহাকাল নটরাজ বেশে তবে কি সমস্ত দেশকাল ব্যেপে শুধু নৃত্যই করছেন? ভাবতেও সমস্ত মন ভরে ওঠে।

এখনও জেটুর কথাগুলোর অর্থশূন্যতার কথা মনে হতে থাকে। সমস্ত মন যখন একটা নৃত্যের ছন্দে ভরপুর তখন হঠাৎ একদিন রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান খুললাম। এটা আমার স্বভাসিদ্ধ কাজ—মন উন্মত্ত হলেই আমি রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করি। তাই গীতবিতানটাতে হাত দিলাম মনের একটা স্বচ্ছন্দ গতি ফিরিয়ে আনবার জন্যে। কিন্তু তখন কে জানত যে এই গীতবিতানের পাতায় অপেক্ষা করে রয়েছে আমার জন্যে—অনাবিষ্কৃত একটা মস্ত জিনিষ আমারই আবিষ্কারের আশায়?

প্রথম যে লাইনটা চোখে পড়ল সেটা হচ্ছে—

নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।

মন চমকে উঠল, সেই নাচ। চিত্ত দুর্বার হয়ে উঠল, সম্পূর্ণ কবিতাটা না পড়ে আর স্থির থাকতে পারলাম না। পড়ে চললাম.....

সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।
তোমার চরণ পাবন পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে।
নমো নমো নমো
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।

দেখলাম প্রথম স্তবক হ'ল কবির প্রার্থনা—মহাকালের কাছ থেকে কবি ভিক্ষা করে নিচ্ছেন চৈতন্য। "তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ কেঁদে কেঁদে উঠছে শুধু একটু মুক্তির জন্য। মুক্তি মানেই হচ্ছে নিজের সত্তাকে বিলিয়ে দিয়ে বিশ্বসত্তার মধ্যে লীন করে দেওয়া—আর এই মুক্তিতেই নিহিত আছে চৈতন্যের বীজ। কবি তাই মহাকালের কাছে মিনতি করছেন যে তিনি যেন দেশকাল জুড়ে গভীর সুর ও তালের মূর্ছনায় এমন নৃত্য সুরু করেন যাতে সেই নৃত্যের সুরে ও তালে কবির মন ভরে ওঠে। কারণ এই নৃত্যেই রয়েছে মুক্তির ইঙ্গিত, তারপর কবি সেই নৃত্যের রূপ বর্ণনা করলেন।

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ—
নৃত্যে তোমার মায়া
বিশ্ব তনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।

তোমার বিশ্ব নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।
নমো নমো নমো
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।

কবি বলছেন যে মহাকালের নৃত্যে রয়েছে মুক্তি ও মায়ার উভয় রূপ—আলো ছায়ার মত তারা এমন ভাবে পরস্পর মিশে আছে যে আমাদের স্থূল দৃষ্টি পৃথকরূপে দুটোকে দেখতে পায় না। সেই নৃত্যই রূপ পরিগ্রহ করেছে সমগ্র বিশ্বের অণুপুঞ্জে; আর সেই নৃত্যের তরঙ্গই কোথাও করছে সৃষ্টি কোথাও স্থিতি বা প্রলয় সমস্ত দেশকাল পরিব্যাপ্ত করে। কবির বিস্মিত মনে জাগে ধাঁধা—কূল কিনারা খুঁজে পায় না চিন্তারে। কি করেই বা পাবে? বৈজ্ঞানিক ত' আমাদের শিখিয়েছেন—পদার্থের একাধারে তরঙ্গ ও কণারূপ দেখা অসম্ভব। কবির লেখনী এখানে তাঁর সেই বিস্ময়ের অনুভূতিতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। আর আমাদের মনে পড়ছে সেই "তরঙ্গ তত্ত্বের" কথা "অনিশ্চয়তা বাদের" কথা।

এবার কবির বিজ্ঞানী সত্তা এই নৃত্যের সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলেন।

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু।
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র ভানু
তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।
নমো নমো নমো
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।

আর তার পিছনে রইল কবির ভাবময় অকাট্য যুক্তি। তিনি দেখলেন যে অনড় পরমাণু কণাগুলি প্রাণহীন জড়-পিণ্ড—এরা এক একজন প্রাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, কিন্তু এই বিবশ বিশ্বই চৈতন্যময় হয়ে উঠল সুন্দরের নাচন তালে —রূপময়ের স্পর্শে তারাও পেয়ে গেল এক একটি বিশিষ্ট রূপ। আর সেই রূপই হ'ল আলো—আলোকের উৎসই'ত সূর্য্যদেব। আর এই রূপের পরপারে যে অরূপ আছেন তিনিই হলেন কবির সন্ন্যাসী, সুন্দর, ভয়ঙ্কর—তিনিই আমাদের মহাকাল—সত্য, শিব, সুন্দর—যাঁর "পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু"।

উপসংহারে কবি উপলব্ধি করলেন এই সুখ দুঃখের ক্ষুদ্র সংসার সেই তাণ্ডব নৃত্যের প্রভাবে কেমন করে প্রভাবিত হয়—

মোর সংসারে তাণ্ডব তব
কম্পিত জটাজালে
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর
ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
জীবন মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদ মন্দ্র হে।
নমো নমো নমো
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।

তিনি বললেন যে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি এত প্রবল যে সে তার ক্ষুদ্র চাওয়া পাওয়ার সফলতা ও বিফলতার মধ্যে এমনভাবে বন্দী হয়ে থাকে যে এই প্রলয় নৃত্যও সেখানে অনুভূত হয় না, এমন সনতার সৃষ্টি হয়। অথচ কেউ যদি একবার এর

মধ্যেও তার, সূক্ষ্ম অনুভূতিকে চালনা করতে পারে তবে সে পাগল হয়ে যাবে। 'নাচের ঘূর্ণিতালে' সে সমগ্র বিশ্বলোকের দর্শন পাবে। জীবন মরণ সবই তখন তার নৃত্যময় হয়ে উঠবে। এই চাঞ্চল্য আমাদের কবি উপলব্ধি করেছিলেন।

উঃ আশ্চর্য! বিশ্বের বিস্ময় আজ আমাকে আশ্রয় করল—যা কিছু সেই বিজ্ঞান বইটাতে পড়েছিলাম তার প্রতিটি শব্দই যেন মনে হচ্ছে রবীন্দ্র গীতিকাব্যের ছন্দধারায় আটকে পড়েছে। বৈজ্ঞানিকদের কোন তথ্যই তাহলে কবির তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির বাইরে যেতে পারে না। কবিই তবে আদি সৃষ্টিকর্তা, আবিষ্কারক, সর্বাপেক্ষা প্রখর ধীসম্পন্ন।

তাই দেখি যে যেখানে বিজ্ঞান হার মেনেছে সেখানে কাব্যের জয়যাত্রা—আর যেখানে বৈজ্ঞানিকের বিতর্কণ-মন করেছে নতি স্বীকার সেখানে কবির নির্মল চিত্তই উপলব্ধি করেছে আনন্দময়কে।

আজ এতদিন পরে জেঠুর কথাক'টির মর্মোপলব্ধি করলাম। আমার মনের দুরন্ত বিক্ষোভ গেল থেমে। আবিষ্কার (স্থূল অর্থে) করলাম বৈজ্ঞানিক কবি রবীন্দ্রনাথকে"।

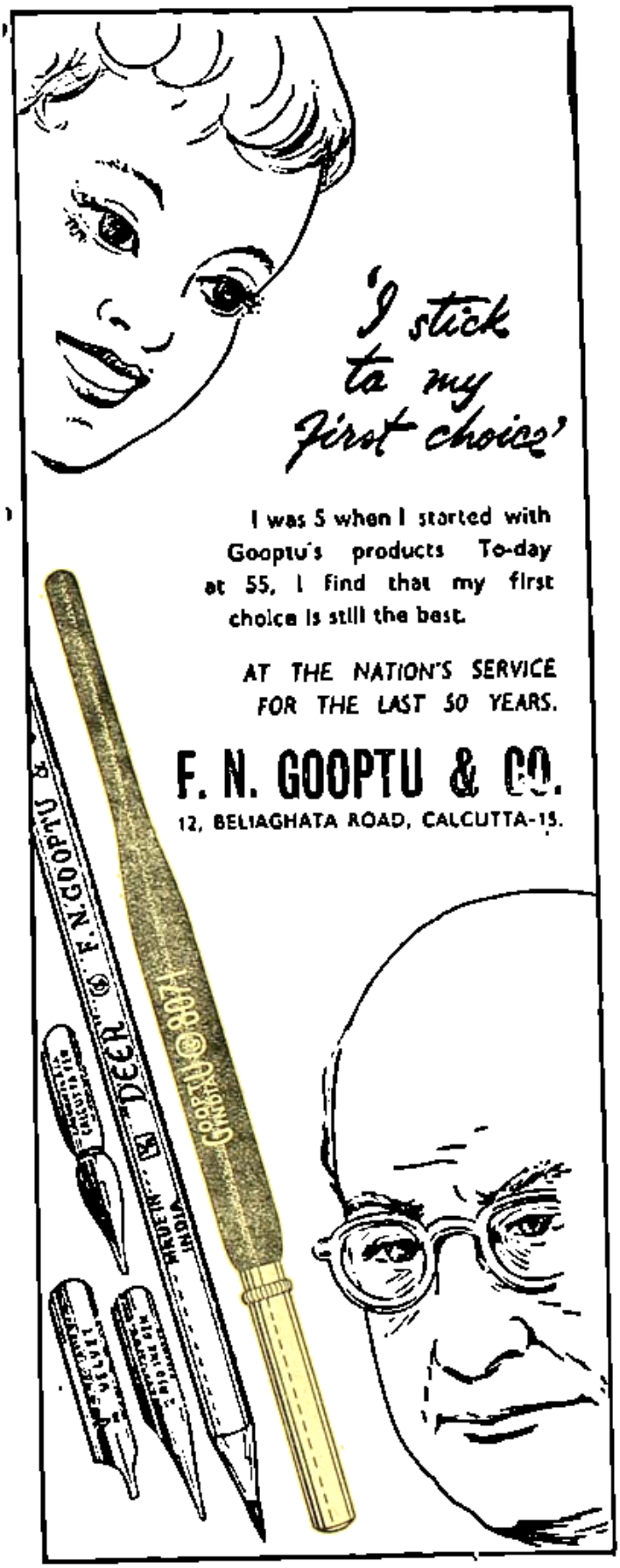

THE BHARAT LINE LIMITED

The Liability of the members is Limited.)

NATIONAL SHIPPING COMPANY

SERVICES OPERATED

THE INDIAN COASTAL TRADE
PAKISTAN/INDIA-BURMA-CEYLON TRADE
CEYLON/INDIA TRADE
BURMA/INDIA TRADE
BURMA/CEYLON TRADE
INDIA-PAKISTAN-BURMA CEYLON/PERSIAN GULF TRADE

OTHER FIXTURES FOR OTHER PORTS ACCORDING TO DEMAND

For Rates of Freights, Sailings, etc., apply to the Company's Bombay Office at :

BHARAT HOUSE, 104, APOLLO STREET, FORT, BOMBAY 1

Telephone Nos. 30891, 30892 & 30595

FREIGHT BROKERS

PITAMBER LALJEE & SONS

BHARAT HOUSE, 104, APOLLO STREET, FORT, BOMBAY 1

Telephone Nos. 38946, 38030

মন্দিরা

উনবিংশ বর্ষ | মাঘ, ১৩৬৩ | দশম সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দু'একটি কথা

ডক্টর শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসব গত জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলক্ষে শতবৎসর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় কি ভাবে জাতির মননশক্তি বিকাশের সহায়তা করেছে, জাতির মনীষার উৎস কতটা খুলে দিয়েছে, নূতন জাতি গঠনের কতটা ভিত্তি রচনা করেছে, দেশের সমাজ-জীবন ও রুচি-নিরূপণের উপর কিরূপ প্রভাবশীল হয়েছে এই সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এর বাইরের কার্যকলাপ, নূতন নূতন পরীক্ষা প্রবর্তন ও বিধি-প্রণয়নের তথ্য সঙ্কলন প্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এর অন্তর্নিহিত প্রভাবের মাত্রা নির্ণয়। বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে একটা বিশেষ প্রণালীতে পরিচালিত করে। মেধাবী ছাত্রবৃন্দকে এই প্রতিষ্ঠানে সমবেত করে' দিগ্‌বিদিকে জ্ঞানের আলো বিকীরণ করে, বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষানুরাগের একটা আদর্শ উপস্থাপিত করে সমস্ত দেশের মানস আব-হাওয়ার একটা নিগূঢ় পরিবর্তন সাধন করেছে। এই পরিবর্তনের স্বরূপটি ঠিক কি এবং এটা দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ হিতকর হয়েছে কি না এই প্রশ্ন একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার্য।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইংরেজ আমলের প্রথম দিকেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এ দেশে আরম্ভ হয়েছিল এবং এর জন্য ব্যক্তি বিশেষের পরিচালনায় ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশ কোন একটা সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে চলত কি না বলা দুষ্কর। শিক্ষার বিষয় তালিকা সম্ভবত পরিচালকের ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী সংকলিত হত, শিক্ষার মান হয়ত প্রাথমিক স্তরকে অতিক্রম করে যায় নি। ১৮১৭ খৃঃ অঃ হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সমগ্র ও ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করবার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচিত হল। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম দেখলে প্রথম যুগের বাঙ্গালী ছাত্র সম্প্রদায়ের যে কি রকম জ্ঞান পিপাসা ছিল, তারা যে অগস্ত্য মুনির মত এক নিঃশ্বাসে সপ্তসিন্ধু শোষণের দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেছিল, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আমার মনে হয় ইংরেজী শিক্ষা প্রথম যুগই ছিল তার

স্বর্ণ যুগ। এত প্রতিভা ও মনীষার সমাবেশ এক বিদ্যালয়ের ছায়াতলে এর পরে কখন ঘটেছে কি না সন্দেহ। মধুসূদন, ভূদেব, রাজনারায়ণ এঁরা তিনজনই অফুরন্ত প্রাণশক্তির বলে সমাজ ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে নিজেদের স্থায়ী প্রভাব অঙ্কিত করে গেছেন। কবিপ্রতিভা যে বিদ্যালয়ের জ্ঞানানুশীলনে স্নেহরসপুষ্ট প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে পারে মধুসূদন বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে তার এক মাত্র নিদর্শন। তাঁর বহু ভাষাবিৎ পাণ্ডিত্য, তাঁর অনলস নিয়ম-শৃঙ্খলবদ্ধ জ্ঞান সাধনা, তাঁর তত্ত্বানুসরণতৎপর মানস কৌতূহল সবই এক বিচিত্র একমুখীনতায় তাঁর কাব্যের মূলে রসসিঞ্চন করেছে। ভূদেব তাঁর সুদৃঢ় চরিত্রসংযম ও আচারনিষ্ঠতায় ও সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তাশীল আলোচনায় ও রাজনারায়ণ তাঁর প্রদীপ্ত ধর্মবোধ ও জনহিতৈষণা প্রণোদিত কর্মোদ্যমে এই নবীন শিক্ষা ধারার প্রাণোজ্জ্বল রসধারা আকণ্ঠ পান করেছিলেন—তাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁদের জীবন চেতনা ও কর্মশক্তিকে পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

২

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে মননশীলতা ও জ্ঞানস্পৃহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও চিরন্তন; প্রতিভার সঙ্গে এর যোগাযোগ আকস্মিক ও বিরল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উহার পরীক্ষা প্রবর্তনের প্রথম বৎসরেই (১৮৫৭), কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় উচ্চ মনীষা ও সৃষ্টি প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রকে পরীক্ষার্থীরূপে লাভ করার অসাধারণ সৌভাগ্য এর ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বতোমুখী, ও বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আগ্রহশীল মানসিকতার গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাবের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া দুরূহ—বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা শিক্ষণীয় বিষয়-তালিকার মধ্যে বঙ্কিমের সর্বগ্রাসী মানস বুভুক্ষার তৃপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। ইংরেজী লিখবার অমন অদ্ভুত ক্ষমতা, যুক্তিশৃঙ্খলার এরূপ নিখুঁত পরিপাট্য, শ্লেষ প্রয়োগে এত মর্মভেদী নিপুণতা বঙ্কিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কিরূপ পাঠক্রম থেকে আহরণ করেছিলেন, কোন্ শ্রোণগুরু তাঁকে এরূপ অসাধারণ অস্ত্রক্ষেপকৌশল শিখিয়েছিল জানতে বিশেষ কৌতূহল হয়। কিন্তু এ কৌতূহল কোনও দিন মিটবে বলে আশা করা যায় না। বঙ্কিমকে সামনে রেখে এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা সুরু হ'ল, এর শতাব্দী-ব্যাপী অগ্রগতির মধ্যে অনেক কৃতী ও মেধাবী ছাত্র এর আশীর্বাদকে পাথেয় রূপে গ্রহণ করে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নূতন বাঙলাকে যারা গড়ে তুলেছিল, বাঙলার শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-উন্নয়ন, রুচি গঠন ও শাসন-ব্যবস্থার যারা ভার নিয়েছিল তারা সবাই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সম্প্রদায়। পরাধীন বাঙলার রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতাস্পৃহা প্রধানত এদের প্রভাবেই স্ফুরিত হয়। যে নেতৃত্বশক্তি আজ শত বৎসর ধরে দেশের অগ্রগতিকে পরিচালিত করেছে, তার অর্ধস্ফুট আদর্শ স্বপ্নকে রূপ দিয়েছে, তার অস্পষ্ট আবেগ ও আকাংক্ষাকে একটা আত্ম-সচেতনতার সুস্পষ্টতায় ফুটিয়ে তুলেছে তার মূল উৎস ছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থা। বাঙলার যে মনীষা এতদিন সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনের সঙ্কীর্ণ কক্ষ-পরিক্রমায় নিঃশেষিত হয়েছিল ন্যায়শাস্ত্রের বস্তু-স্পর্শহীন বুদ্ধি প্রাখর্যের খেলায় মেতেছিল। পুরাতনের গণ্ডীর মধ্যে নিষ্ফল গতানুগতিকতায় আবর্তিত হচ্ছিল, তা এই নূতন শিক্ষার প্রেরণা পেয়ে, নিজ বিকাশ ও পরিণতির নূতন নূতন উপাদান ও উপলক্ষ্য পেয়ে, জ্ঞান-রাজ্যের নূতন দেশ আবিষ্কার ও অধিকার করে আবার অনুকূল-ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায় দীপ্ত হয়ে উঠল। যে জ্ঞানার্জনস্পৃহা বাঙলার মানস সংস্কারে বহুযুগ ছিল, তা এতদিন অনুকূল সুযোগের অভাবে, উপযুক্ত শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের বিরলতায়, নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অনিয়মিত ছন্দে কুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ করছিল তা হঠাৎ অপর্যাপ্ত আয়োজনের প্রাচুর্যে ও নিয়মিত অনুশীলনের আশ্রয়ে বেগবান অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে পরিণত হল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শত শত স্কুল ও কিছু সংখ্যক কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়মাধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জনসাধারণের সাধারণ বুদ্ধির মানকে উন্নততর স্তরে নিয়ে গেল ও দেশের মনো-রাজ্যে একটা ছোট-খাট বিপ্লবই ঘটিয়ে দিল। বাঙালীর মনে জগৎ সম্বন্ধে ধারণা ও জীবনকে আস্বাদন করার প্রণালী ধীরে ধীরে কিন্তু অভাবনীয় রূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

৩

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর প্রথম ৫০।৬০ বৎসর মৌলিক গবেষণা অপেক্ষা জ্ঞান আহরণের দিকেই ছাত্রদের বেশী লক্ষ্য ছিল। বিশেষত ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে নূতন আবিষ্কার বা সৃষ্টির দিকে বাঙ্গালী ছাত্রসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় নাই। নূতন শিক্ষার বিস্ময় ও আনন্দ তাদের এত আবিষ্ট করে রাখত যে একে অবলম্বন করে নিজ স্বাধীন মননশক্তি বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা ততটা সচেতন ছিল না। বরং প্রথম যুগের ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী অনুবাদ ও গ্রন্থপ্রণয়নের দ্বারা ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি মাতৃভাষায় প্রকাশের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে তাঁদের সম্মুখে প্রসারিত জ্ঞান সমুদ্রের সীমাহীন বিস্তৃতি তাঁদের মাতৃভাষার চর্চায় ও উহার সমৃদ্ধি সাধনে অনেকটা উদাসীন করে তুলল। পূর্ব যুগে পাশ্চাত্ত্যজ্ঞানের সহিত প্রথম পরিচয়ের ফলে যা সম্ভব ব'লে বিবেচিত হয়েছিল, জ্ঞানের ব্যাপকতর প্রসারের সঙ্গে তা অসম্ভব বলেই পরিত্যক্ত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্রে উজ্জীবিত ও মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞাশীল বাঙ্গালী বাবুর বিরুদ্ধে বর্ষিত হয়েছে। দীনবন্ধুর নিমে দত্ত জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার নেশায় নিজ ঐতিহ্যবিস্মৃত বাঙ্গালী যুবকের প্রতিনিধি। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রথম ফলস্বরূপ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রা ও মাতৃভাষার প্রতি বিরাগের এক সত্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দেশব্যাপী প্রসারের সঙ্গে এর উগ্রতা ও উন্মাদনা অনেকটা শান্ত হয়ে দেশের সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে এর সহজ মেশামেশি ঘটল। প্রথম যুগের আভিজাত্য গৌরববোধ ধীরে ধীরে কমে এসে উহা মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানের ন্যূনতম জীবন যোগ্যতার নিদর্শনরূপে গৃহীত হল। এর মর্যাদা অবনমিত হয়ে ইহা অন্তরের রসপ্রেরণার উৎস থেকে জীবিকার্জনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপায়ে পর্যবসিত হল। একে ঘিরে যে কল্পনাবিলাস, স্বপ্নলোকবিহার ও আদর্শ-প্রয়াণ মনুরের বিচিত্রবর্ণ কলাপের ন্যায় আমাদের জীবনে রঙীন হয়ে উঠেছিল জীবন সংগ্রামের কঠোরতায় তার অবসান ঘটল। বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত যারা প্রকৃত জ্ঞানানুরাগী ও মেধাবী-ছাত্র ছিল তারাই এই উচ্চশিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হত। ফলে এরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করে সহজেই দেশের নেতৃত্বপদ অধিকার করতে পারত। কিন্তু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় সাধারণ-বুদ্ধির ছেলেরাও ভিড় করে দাঁড়াল ও চাকরী পাবার আশাই যখন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠল, তখন শুধু যে এর মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হ'লো তা নয়। শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রত্যয় ও জীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার শক্তিও সেই অনুপাতে কমে গেল। এই বস্তুবোধের সঙ্গে অসম্পৃক্ত, অকেজো তত্ত্বের বাষ্পে আপ্লুত শিক্ষার বাস্তব অনুপযোগিতা শোচনীয়ভাবে প্রকট হয়ে পড়ল। যে শিক্ষা মনুষ্যত্বগৌরবের পরিপূর্ণ বিকাশ ও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সুসামঞ্জস্য পরিণতি ঘটায় তা তার জৈব অভাবপূরণের একটা অপটু যন্ত্রের পর্যায়ে নেমে এল। কিছুদিনের মধ্যেই জীবিকার্জনের চেষ্টায় বিব্রত, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন দেহে ও মনে অবসন্ন শিক্ষিত যুবক শুধু যে সমাজ-নেতৃত্ব থেকে খারিজ হ'লো তা নয়, সকলের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠলো। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়। কিন্তু এই ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তির সংখ্যা মুষ্টিমেয়। যাদের উন্নতির মূলে শিক্ষার প্রত্যক্ষ-প্রভাব নাই, সেই জাতীয় লোক—ধনী-ব্যবসায়ী ও শ্রমার্জিত সম্পদের অধিকারী কৃষিজীবী—সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন হতে লাগল। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এইটিই সব চেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়িয়েছে। বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সমতা রেখে, মানস শক্তিকে বর্ধিত করে ও দেহের পটুতা কোন মতে ক্ষুণ্ণ না করে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পরিণত বিচারবুদ্ধি ও দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা সমস্ত বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হবার প্রেরণা যুগিয়ে, সে কেমন করে তার সন্তানদের জীবনযুদ্ধে জয়ী করতে পারে তাই আজ তার পক্ষে গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের বিষয়।

৪

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নও অনিবার্যভাবে উদিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত কাজ হ'ল উচ্চস্তরের মানসশক্তিসম্পন্ন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন নূতন আবিষ্কারে উন্মুখ, সত্য ও সুন্দরের উপাসক

এক শ্রেণীর শিক্ষাব্রতী তৈরী করা ও সমাজে যাতে তারা জ্ঞানোপযোগী প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার জন্য রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করা। জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচার, উন্নত-স্তরের অর্থশিক্ষিত শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা পাশের ছাপ মেরে তাদের জ্ঞানপরিধিবৃদ্ধির খানিকটা বিজ্ঞাপন, প্রভৃতি কাজ হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরোক্ষ ফল হতে পারে। কিন্তু এরা তার প্রত্যক্ষ কর্তব্যের অঙ্গীভূত নয়। তার প্রধান কৃতিত্ব গুণের উৎকর্ষ-বিধানে, সংখ্যাবাহুল্যে নয়। দুধে জলে মিশিয়ে দুগ্ধের পরিমাণবৃদ্ধি ও ঐ জলো দুধের দ্বারা জাতির শৈশবকে চিরস্থায়ী করা জনহিতৈষণার একটা পূর্যায়ের কাজ হতে পারে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল কাজ হল দুধকে খাঁটি রেখে ঐ দুধ হজম করে যারা পরিপুষ্ট জীবনীশক্তির অধিকারী হতে পারে তাদের প্রতিই মনো-নিবেশ করা।

আজ সমস্ত বিশ্বের সমস্যা এত জটিল হয়েছে যে এই সমস্ত-পাশ ছেদনের জন্য তীক্ষ্ণতম মনীষার ও উচ্চতম নীতিবোধের প্রয়োজন। দেশে অর্ধশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়লেই এ সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা এরা কেউই গ্রন্থির মর্মভেদ করতে পারবে না। সমস্ত বিশ্বের কথা ছেড়ে দিয়েও ভারতবর্ষেই এত সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে যে সেগুলির চাপ কমাবার জন্যও আমাদের মনীষার পূর্ণ পরিণতির একান্ত প্রয়োজন। আজ আমাদের অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, শোষণহীন সমাজগঠন, গ্রাম্যসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রসার, বেকারসমস্যার সমাধান নূতন সংস্কৃতি ও জীবন ছন্দের প্রতিষ্ঠা—এ সমস্তই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার দাবী করেন। তাছাড়া শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনেই প্রত্যাশিত ফল লাভ করা যাবে না। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে প্রভাবশীল নেতৃত্ব ও উন্নত নৈতিক আদর্শ। আজ সমস্ত জগতে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, যে সঙ্কট বিশ্বের উপর বিভীষিকার ছায়া বিস্তার করেছে তার মূল কারণ হচ্ছে যে বৃহৎ সমস্যা সমাধানের ভার পড়েছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের উপর। মিশর হাঙ্গেরিতে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এই উদার ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের অভাবই সূচিত করে। বামনকে অতিকায়ের বোঝা তুলতে দিলে যুগপৎ যে করুণ ও হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় বর্তমান বিশ্বসমস্যা নিয়ন্ত্রণে অনেকটা সেই ব্যাপারই প্রকটিত হচ্ছে। সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর জাতীয়তাবাদ যেমন একদিকে আমাদের স্বচ্ছ, তারনিষ্ঠ দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিচ্ছে, তেমনি নিদারুণ অর্থ সঙ্কট প্রচলিত অর্থনীতির বাহ্যিক প্রয়োগে মোটেই সমাধানের পথে অগ্রসর হচ্ছে না। ভবিষ্যতের বিশ্ববিদ্যালয়কে একদিকে বিশ্বপ্রসারী দৃষ্টিকে উন্মীলিত করতে হবে, আর একদিকে মানবিক সুখশান্তি ও মর্যাদার স্বীকৃতির ভিত্তিতে শ্রেণীসংঘর্ষ নিবারণ করে ধনবণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

৫

তাছাড়া দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত দেশের সাহিত্য সৃষ্টি ও শিল্পকলার অনুশীলন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক না রেখে নিজ অন্তর্নিহিত প্রেরণা শক্তিরই অনুসরণ করেছে। উনবিংশ শতকের শেষপাদে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের সৃষ্টিকার্য ওর প্রভাব নিরপেক্ষ হয়েই অগ্রসর হয়েছে। প্রাক্-আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিনিষেধ কণ্টকিত আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হন নাই ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় পরিণত প্রজ্ঞা ও বিচার বুদ্ধির যথেষ্ট নিদর্শন থাকলেও কোন সংস্থা-নির্দিষ্ট পাঠক্রম হতে তা আহরিত হয় নি; বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ প্রতিভার বিকাশে কোন প্রত্যক্ষ সহায়তা করে নি, তেমনি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট-শ্রেণীর সাহিত্যে অসংযত উল্লাস নিয়ন্ত্রণ ও রুচি বিশুদ্ধিসংরক্ষণের দিকেও বিশেষ কোন প্রভাবের পরিচয় দেয়নি। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ স্থাপন ও সুধীজনোচিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধরচনায় অবশ্য এর হিতকর প্রভাব কিছুটা দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর আমাদের সাহিত্যে যে সৃষ্টির ধারা চলেছে ও ললিতকলার মাধ্যমে যে সৌন্দর্য ও রুচিবোধের উন্মেষ ঘটছে তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ এখনও অত্যন্ত ক্ষীণই মনে হয়। সঞ্জীবনী ভাগীরথীর ধারা হিমালয়শৃঙ্গ হতে নিঃসৃত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তুঙ্গ হিমাচল-গৌরব ও প্রস্তর-কঠিন পাঠক্রম জাতির মর্মনিঃসৃত কোন

প্রাণধারাপ্রবাহে স্নিগ্ধ ও সরস হয়নি। সাধারণ শিক্ষার্থীকে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া দেশের ঐতিহ্য গৌরব ও প্রাণশক্তির উৎসের সহিত পরিচিত করার কোন ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত প্রয়াস করা হয় নি। সমাজ-জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রয়োজনমূলক। দেশের রক্তধারা ও নাড়ী-স্পন্দনের সঙ্গে এর যোগ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নারী শিক্ষা বিষয়েও নারীর অন্তর-মাধুর্য ও নিসর্গজাত গুণসমূহ বিকশিত করার কোন উল্লেখযোগ্য আয়োজন দেখা যাচ্ছে না। নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে দেখা হচ্ছে, পরি-পূরকরূপে নয়। জাতির মানস-কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়ে এর সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার যে মূল প্রেরণা যোগানর, জাতির জীবনকে এক সুনির্দিষ্ট, সুবলয়িত আদর্শে সুবদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত করে তোলার যে দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় অভিধান থেকে অনুদিত হয় সে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি এখনও আসে নি। আশা করা যায়, আগামী শতবর্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই নূতনরূপ বিবর্তন সম্পূর্ণ হবে। বর্তমান মানুষের যে উদ্‌ভ্রান্তি, উৎকেন্দ্রিকতা, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অসামাঞ্জস্য ও অনির্দিষ্ট বেদনাবোধ তার চিত্তকে ভারা-ক্রান্ত করে তুলেছে, সমাজের যে শান্তি ও ভারসাম্য আজ প্রবলভাবে বিচলিত হয়েছে, ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয় সেই মানসব্যাধি-উপশমের ও বিধ্বস্ত ভারসাম্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। চিকিৎসকের নিকট ম্যাক-বেথের সেই ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন—"Canst thou minister to a mind diseased ?'—জ্ঞানের তপোবন থেকেই তার শেষ উত্তর পাবে এরূপ আশা না থাকলে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই নিরাশ হতে হয়।

স্মৃতিকথা

শ্রীকালিদাস রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

এইভাবে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার মরীচিকার পিছে পিছে ঘুরে বেড়াই আর রাত্রি ন'টা পর্যন্ত-ইনস্টিটিউটে আড্ডা দিই। ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারী ছিলেন বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেক্রেটারী হয়েছিলেন আমার পরমহিতৈষী রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি আমার আড্ডা দেওয়া নেশার কথা জানতে পেরে একদিন ডেকে আমায় মৃদু তিরস্কার করলেন। অনেক কথাই ভুলে গিয়েছি—তাঁর সেই স্নেহের তিরস্কার ভুলিনি। সংস্কৃতির নানা শাখায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যিনি জীবনে কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি—সেই ব্যক্তির এরূপ তিরস্কার করবার অধিকার যে ছিল ষোল আনা, তাও বুঝতাম।

এখন হতে পড়াশুনায় মন দিলাম। কিন্তু অদৃষ্টে আমার দুর্ভোগ আছে—তা কে খণ্ডাবে? নতুন উপসর্গ জুটলো। প্রত্যহ বিকালে চোখ জ্বালা করে জ্বর হতে লাগল। ভোর বেলায় ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত। জ্বর উঠত কম। বুকে পিঠে বেদনাও অনুভব করতাম। খুক খুক করে কাশতাম। প্রথম প্রথম গ্রাহ্য করিনি। ক্রমে দেখলাম দুর্বল হয়ে পড়ছি। তখন মনে হল আমার বোধহয় পাকাপাকি টিবি হল। চরক সংহিতার রাজযক্ষ্মার লক্ষণের কথা মনে পড়ল—অংস ও পার্শ্বদেশে বেদনা, করচরণে সন্তাপ, সর্বাঙ্গীণ জ্বর—আর চাই কি? আমাদের গাঁয়ের ৫।৭ জন যুবক কলকাতা হতে টিবি নিয়ে গ্রামে ফিরে মারা গিয়েছিল। চরণ দাদাও কলকাতা হতে টিবি ধরিয়ে বাড়ী যান। কিন্তু তাঁরা সকলেই থাকতেন কলুটোলার একটা অন্ধকার বাড়ীর মধ্যে।

আমি তো থাকতাম চারদিকে খোলা কাশিমবাজার রাজার বাগান-বাড়িতে। যদিও এবাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেশনের গায়ে, প্রাতঃকালে শীতকালে নাক ঝাড়লে কালি বেরুত। আমার প্রাক্তন শঙ্কা আমাকে কাতর করে তুলল। কোন ডাক্তারের কাছে হয়ে গেলাম না—স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেবে—"টি-বি হয়েছে"। পশুপতি দাদার কাছে গেলাম না—তিনি ডাক্তার কবিরাজ দুই-ই। রাখাল দাদার (কবিরাজ) ঔষধ খেতে লাগলাম। —ফল হল না। মাতৃসম্পর্কে দূর আত্মীয় রাজেন্দ্র কবিরাজের কাছে গেলাম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—"সাংঘাতিক কিছু নয়, কলকাতার জলবায়ু তোমার সহ্য হচ্ছে না—তুমি অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যাও। আর কিছু করতে হবে না।"

আমি—ঔষধ কিছু—? পথ্য?

কবিরাজ—ঔষধ কিছু না, যা খুশি খাদ্য খেতে পার।

আমি—বাহিরে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে যেতে পারি? খারাপ কিছু নয় নয়ত?

কবিরাজ—খুব খেতে পার। খারাপ কিছু নয়।

ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিকের বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম। তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা ছিল আমার সেকালের বন্ধু। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শরৎ মল্লিকের সঙ্গে মধুপুর চলে গেলাম। মধুপুরে তাঁর শ্বশুর সপরিবারে ছিলেন। তাঁর শ্বশুর ছিলেন (আমার আত্মীয়; বিবাহের সূত্রে পরে নিকট আত্মীয় হ'ন)। সেই আত্মীয়তার ক্ষীণ সূত্রের উপরই নির্ভর করিনি। তাঁর পুত্র দ্বারকানাথ ছিল আমার পরম বন্ধু এবং সমস্ত পরিবারের কাছে আমি ছিলাম ঘনিষ্ঠ।

মধুপুরে সন্ধ্যার সময় পৌঁছলাম,—আশ্চর্য, সেইদিন হতে আমার আর জ্বর হল না। এই আত্মীয়ের নাম রায়বাহাদুর বিনোদ বিহারী মজুমদার। ইনি পাটনায় Public Prosecutor ছিলেন। তখন ইনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। ইনি বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ও দেশ নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেনের জ্যেষ্ঠ জামাতা। ইনি পরে

আমার ঐ কবিরাজ মহাশয়ের স্নেহাই হ'ন। কিছু দিন আগে কলিকাতার গুপ্ত লেনে ইনি এঁর এক আত্মীয়ের বাসায় অনেকদিন ছিলেন—তখন প্রায়ই এঁর কাছে যাতায়াত করতাম। ইনি আমাকে পুত্রের মতন স্নেহ করতেন। এমন হৃদয়বান আত্মীয়বৎসল আদর্শ গৃহস্থ এযুগে দুর্লভ। গিয়ে দেখলাম বন্ধু দ্বারকানাথ সেখানে নেই—তার ভ্রাতারাও (পরেশনাথ, বৈদ্যনাথ) নেই। আছে ছোট ছোট মেয়েরা। ৪১ বৎসর পরে তাদেরই একজনের কন্যার সঙ্গে আমার মধ্যম পুত্রের বিবাহ হয়েছে। আর একজনের সঙ্গে আমার এক শ্যালকের বিবাহ হল। এখানে কিছুদিন থাকার ফলে শরীর আমার নীরোগ হল, ওজনে বাড়লাম। অকালমৃত্যুভয় আর থাকল না। মধুপুর হতে বহরমপুরে ফিরে গেলাম—এখন যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হ'ল। পীড়িতা জননীর পীড়াপীড়ি শুরু হ'ল—বিবাহ করতে হবে। সেকালের হিসাবে আমার বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হ'তে চলেছে। এখন এ বয়সে মেয়েদেরও বিবাহকাল অতিক্রম করে না। মা'র শরীর খুব খারাপ—বেশীদিন যে বাঁচবেন না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। মায়ের আকিঞ্চনে, বাবার আদেশে আর ঐ বিনোদবাবুরও অনুরোধে বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়ে কলকাতায় ফিরলাম। বলা বাহুল্য পাত্রী বিনোদ বাবুরই আত্মীয় কন্যা। মধুপুরে ছিলাম পৌষ মাসে, বিবাহ হল ফাল্গুনের শেষে।

সেকালের যুবকেরা উপার্জনক্ষম না হয়েই বিবাহ করত। লোকের বিশ্বাস ছিল পুরুষ মানুষ হলে নিশ্চয়ই থাকবে না। যে ভাবেই হোক উপার্জন করবে। কন্যার পিতারা কন্যার বয়স ১২।১৩ বছর হলেই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তাঁরা উপার্জনক্ষম সুপাত্রের ভরসায় কন্যাকে বেশীদিন অবিবাহিত রাখতে চাইতেন না। কন্যাদের শিক্ষাদানের বালাই ছিলনা। তাঁরা ভাবতেন—মাথা গুঁজবার ও দুবেলা খাওয়ার সংস্থান থাকলেই যথেষ্ট। তারপর যে ছেলের লেখাপড়া শিখছে সে নিশ্চয়ই যে ভাবেই হোক উপার্জনও করবে। এখনকার লোকের তুলনায় তখনকার লোক একটু বেশী দৈবনির্ভর ছিল।

আমি যখন স্কুলে পড়তাম—তখনই দেখেছি আমাদের কোন কোন সতীর্থ বিবাহিত। কলেজে পড়বার সময় সন্তানদের পিতাদের সঙ্গেও পড়েছি। সতীর্থদের মধ্যে ব্রহ্মদেশে জামাইবাবুর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। বি, এ পাশ করার পর ত কথাই নাই। তখন সকল যুবকই বিবাহযোগ্য বলে গণ্য হ'ত।

বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়ে দেশে গেলাম। বাড়ীর লোক কেউ কন্যা দেখেনি। কন্যা ছিল বহুদূরে পালামৌ ডালটনগঞ্জে। কে আর দেখতে যায়? সঞ্জীবচন্দ্রের লেখায় পালামৌএর খবর জানতাম। একালে যেমন পাত্রপক্ষ হুকুম করেন—"কন্যা কলকাতায় নিয়ে এস দেখাবার জন্য"—সেকালে এইরূপ অসঙ্গত আদেশ শিষ্টাচার-সম্মত ছিল না। আগে হতেই পালামৌ আমার কাছে রোমান্টিক হয়ে ছিল।

আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু আমার বিবাহে কোন পণের দাবী করেন নি, এটা দিতে হবে, ওটা দিতে হবে বলেও দাবি করেন নি। তিনি বলতেন যারা ছেলের বিয়ের খরচ কন্যার পিতার কাছে দাবি করে, তারা সাংসারিক ও মানসিক দারিদ্র্যের কথাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করে—তাদের ঘরে কন্যাদান না করাই উচিত। পরের দেওয়া টাকায় বিবাহে সমারোহ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। আমার শ্বশুর কৃতবিদ্য পাঁচ ছেলের বিবাহে পণ নেন নি—কোন মেয়ের বিয়েতেও পণ দেন নি। আর আজ আমাদের এবং আমার শ্যালকদের প্রত্যেক মেয়ের বিয়েতে নগদ টাকা পণ দিতে হচ্ছে। তাই মনে হয় এযুগে পণের কুপ্রথা দিন দিন প্রবলই হচ্ছে। অথচ আজকাল উপার্জনক্ষম না হলে কোন পাত্রের বিয়ে হয় না। যুবকরা ত আজকাল খুব প্রগতিশীল অথচ এ বিষয়ে মাথা নত করে এই অনাচার সহ্য করে। অবশ্য কেউ কেউ শ্বশুরবাড়ীর পরম ভক্ত হয়ে নানা অছিলায় সুদশুদ্ধ এই টাকা ফেরৎ দেয়। তাতে কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন শ্বশুরের প্রতি অবিচারের পরিশোধ হয় কি?

এযুগে শুধু পণ নয়—এযুগে বহুমূল্য পাত্রাভরণ, বিবিধ বিলাস দ্রব্য, ফার্ণিচার, রেডিও, রূপার বাসন, দামী চায়ের সেট ইত্যাদি নানা দ্রব্যের দাবি থাকে। যাক—যা বলছিলাম তাই বলি—

বাবা পণ না চাওয়ায় এবং সকল বিষয়ে উদারতা

[illegible]খানায় আমার শ্বশুর পরিবারের ধারণা হয়েছিল—বাবার প্রচুর টাকা আছে এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে আমাকে বেশ ভুগতে হয়েছিল।

সেকালে কোন পাত্র তার বধূকে শুভদৃষ্টির আগে দেখত না। আমার বিবাহ হয়েছিল পাত্রীপক্ষের বশে থেকে। আর পাত্রীপক্ষ কী দেখেছিলেন, তাঁরাই জানেন। পরবর্তী জীবনে আমার অনেক বন্ধুর (যেমন—কুমুদ রায় চৌধুরী, প্রফুল্ল বক্সী, গজেন মিত্র ইত্যাদির) কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল—তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমাকে—"কি দেখে এমন সম্ভ্রান্ত ঘর তোমার মত দরিদ্র ছাত্রীকে কন্যাদান করেছেন? বিশেষতঃ আমার বড় শ্যালিকার কিছুকাল আগে বিবাহ হয়েছিল—এক ধনিপুত্র (এখন স্বর্গত) অক্সফোর্ডের এম. এ, বিলাতী ডক্টর ও ব্যারিষ্টারের সঙ্গে। আমার স্ত্রীর পিতৃব্য আই. সি. এস. (এখনো জীবিত)। স্ত্রীর শ্বশুরকুল আত্মীয়েরাও পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত।

এইরূপ গণ্যমান্য আত্মীয় থাকার কোন লাভ না হোক, ক্ষতিও কম হয়নি। সেকালে বিলাত ফেরতদের নিয়ে সমাজে খুব হলাহলি হত। বড়লোকদের নিয়ে বিশেষ গোল হতনা—কিন্তু বিলাত ফেরতার সংসর্গ নিয়ে গরীব লোকেরাই ছিল বিপদে। আত্মীয়গণ এরূপ বিয়েতে সম্মতি দিলেন না।

কিন্তু বরলেন "এখানেই বিয়ে দেব।" বিবাহ-যাত্রার সময়ে গোঁড়া সমাজ যে কত প্রবল শক্তি ধরে তা বুঝতে পারলেন। বহরমপুরের যে পরিবারের ৭।৮ জন পরে বিলাত গিয়েছিল সে পরিবারও বিবাহে যোগ দিল না। কলিকাতার অনগ্রসর সমাজে ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের বিলাত থেকে ফেরার পর প্রায়শ্চিত্ত না করার জন্য একটা ঘোঁট চলছিল। পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যসমাজে নৈষ্কাটি অঞ্চল থেকে যাঁরা আগে বিলাত গিয়েছিলেন তাঁরা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক বা আমার পত্নীর পিতৃব্য যাবা ও জননী প্রায়শ্চিত্তও করেন নি। আমার শাশুড়ীর মাতুল বিলাত থেকে এসে খৃষ্টান হয়েছিলেন। কলিকাতার আত্মীয়েরাও বিবাহ বয়কট করলেন। বহরমপুরের বন্ধু (প্রসিদ্ধ কবিরাজের পুত্র) ডাঃ বৈদ্যনাথচরণ রায় (তখনও ডাক্তারি পাশ করে নি) আত্মীয়দের নিষেধ না শুনে আমার পাশে বসে বিবাহ বাড়ীতে এসে ছিল। তার সেই উদারতার ও নৈতিক সাহসের কথা ভুলব না। বৈদ্যনাথ বাবাকে বলেছিল—"আমি নিজেই দুদিন পরে বিলাত যাব। কোন লজ্জায় গোঁড়া আত্মীয়দের কথা শুনব? দেখবেন, যারা এ বিবাহ বয়কট করল—তাদের প্রত্যেক বাড়ী থেকে কৃতী ছেলেরা বিলাত যাবে।" যে সব আত্মীয় আমাকে ভালবাসত—বাবাকে ভক্তি করত, তারা ভাবল আমার বিবাহে যোগ দিলে তাদের মেয়ের বিয়ে হবে না। এসব হ'লো বর্তমান যুগের পক্ষে বড়ই কৌতুকজনক ব্যাপার—সেজন্য এসব লিখছি। যেযুগে বিলাত না গেলে কেউ কুলীন হয় না—সে যুগের লোকের এতে বিস্ময় জন্মাবে। বাঁকিপুর থেকে আমার বন্ধু (পরে আত্মীয়) দ্বারকানাথ মজুমদার, রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের দৌহিত্র, যারা নিষেধ না মেনে বিবাহে যোগ দিতে এসেছিল। আর আশ্চর্যের বিষয়, গ্রামের স্বজাতিগণ বিবাহ দিতে এসেছিলেন। এটা ছিল আমার নিকট সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বহরমপুর ও কলকাতার নিকটআত্মীয়রাও যখন এলেন না—তখন আমার বৃদ্ধ পিতা কেঁদে ফেললেন। বৈদ্যনাথ তাতে বলেছিল—"রায় মশায়, চঞ্চল হবেন না। আমি আছি কালিদাদার সঙ্গে। আমি থাকলেই বুঝবেন, সকলেই ত আমার আত্মীয়। অনেকে আছেন। আমাকে কে ত্যাগ করবে? আমি একাই সকলের প্রতিনিধি।"

দুরারোগ্য রোগে শয্যাগত মাকে গৃহে রেখে এসেছি; বাবার চোখে জল, আত্মীয়গণ বর্জন করলেন। মনের কি অবস্থা নিয়ে যে বিবাহ করেছিলাম তা অনুমেয়। যা হোক, বন্ধুরা ত্যাগ করেনি। কেনই বা করবে? সাহিত্যিক বন্ধুরা, ইন্‌স্টিটিউটের বন্ধুরা, কলেজের বন্ধুরা সকলেই সঙ্গে ছিল।

পূর্বেই বলেছি তখন কলকাতা সমাজে ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের বিলাত যাওয়া নিয়ে ঘোঁট চলছিল—তারই ফলভোগ করলাম আমি। দশাননো দশেৎ সীতাং বন্ধনং সাগৎ মহোদধেঃ।

দরিদ্রের দুঃসাহসের ফল আমরা ভোগ করলাম। দরিদ্রের দুঃসাহস কমনীয় নয়। এখন তখনকার দুর্ভোগের কথা স্মরণ করে হাসি পায়, এখন ত বিলাত ফেরতারাই

সমাজের শিরোমণি। আর বছ ঘরেই মেয়ে বৌ আসছে। এই কয় বছরে কি বিপর্যয়ই না হয়েছে!

দুর্ভোগ বিবাহরাত্রেই সমাপ্ত হয়নি। সবাহাস্তে বাড়ী ফিরে গেলে গ্রামের সম্ভ্রান্ত কুটুম্বেরা বৌভাত বয়কট করলেন। তাঁরা সরল বিশ্বাসে বিয়ে দিতে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন কলকাতার সভ্যলোকেরাও এ বিয়ে বয়কট করল, তখন বুঝলেন বিয়েতে যোগ দেওয়া ভাল হয়নি। সেকালের সমাজের একটা চিত্র বলে আত্মকথায় এই কথা বিবৃত করলাম।

বন্ধুদের জন্ত একটা চিঠি ছেপেছিলাম। এখন তা পড়ে আমার হাসি পায়। এই হাসির ভাগও আমার পাঠকদের দেওয়ার জন্ত এখানে চিঠিটা তুলে দিলাম। তখন সংস্কৃত সাহিত্য খুব মন দিয়ে পড়তাম, তার সাক্ষ্য এতে মিলবে।

জীবন নাট্যের প্রস্তাবনা

"ওগো বিংশ শতাব্দীর লঘু কালিদাস,
মৃগয়ায়, বাহুবলে　　স্বয়ংবর সভাতলে
কোথায় জিনিতে জায়া তব অভিলাষ?
অবন্তীর অন্তঃপুরে　　সিপ্রাতীরে কত দূরে?
কিংবা অলকায় ফিরে শাপান্ত মিলনে?
হেমকূট সৌধশিরে?　　অচ্ছোদ সরসীতীরে?
সুরপুরে উর্বশীর বচনঝঙ্কনে?
চৌরপঞ্চাশিকা গেয়ে　　কাশ্মীরের রাজ গেহে?
কিংবা পলাশবনে যথা মালতী মাধবে?
বিদিশার চিত্রাগারে　　সহসা মিলিবে তারে
লভিবে কি সাগরিকা বসন্ত উৎসবে?"
"ক্ষম বন্ধু ক্ষম ভাই　　নাটকত্ব জুটে নাই,
মরাল মেঘের দৌত্য টিকিলনা ধোপে।
দুকূল বাধারে ছলে　　চাহিল না কেহ ভুলে,
ছিঁড়িল ভূষণ অঙ্গ মালিনীর ঝোপে।
সৌরাষ্ট্রের রাজ দ্বারে　　লগুড় লইয়া তাড়ে।
ভাবী রাজ জামাতারে নারিল চিনিতে।
কিন্নর মিথুন-পিছে　　ছুটিয়া মরিনু মিছে,
কেশী হস্তে কেশ যায় অপ্সরী জিনিতে।
মার্কণ্ড অনেক জোটে　　কামদগ্ধ নেই মোটে!
শত স্বয়ংবর গেল হতাশ স্বপনে।
যমুনার জলে গিয়ে　　বাঁশি টেনে ফেলে দিয়ে
তপে বসিলাম শেষে 'নন্দীর' শাসনে।"
"তবে এ ছদ্মের মত　　তিনি বুঝি মনমত
অভিসারে মনোমত চলিয়াছে আজ।
সে বুঝি তপের শেষে　　নববধূটির বেশে
হৃদয় জপিছে তার রাজ-অধিরাজ?"
"হাঁ সখে, হয়েছি ঠক　　ভিখারী বাতুলোপম
বিবাহে চলিল করি উমরুবিনায়
কপালে হানিয়া কর　　শ্বশ্রূ কহে: একি বর!
শ্বশুর সভায় বসি গণিছে প্রমাদ।
একটু প্রভেদ আছে　　ভুল বুঝে থাক পা।
ভাঙিয়া আমার তপ, নিজ তপে মগ্ন,
নব বসন্তের বলে　　উমা যে জিনিল ছলে
তপস্যা করিলে কভু এ হেন পতি লভ্য?
অর্দ্ধদগ্ধ করি হরে　　অনঙ্গ জিনিল শরে
রাজাল বিজয় ডঙ্কা বসন্ত সকালে।
ভণ্ড এ শিবের ধ্যান　　খণ্ড ভলো, সতি জ্ঞান
রতির হাস্যের রোল পড়িল নাকালে
চড়ি তবে খড়বর　　চলিল এ ভণ্ড হর
কৃষ্ণ অঙ্গ ছাড়া দিয়া ভস্মের ভূষণে
যারা ভাই সহচর　　আছে তারা বরাবর
অবশ্য যাইবে মর্ত্য ভূঙ্গীর শাসনে।"

বিবাহের বর যাত্রায় লোকের অভাব হয়নি। ইনস্টিউটের বন্ধুগণ ছিল, সাহিত্যিক বন্ধুগণ ছিলেন, (কে কে ছিলেন মনে নেই)। কাশিমবাজারের মহারাজের বাগান বাড়ীতে আমি থাকতাম, সেখান থেকেই আমার বিবাহ হয়েছিল—মহারাজই বরযাত্রীদের আপ্যায়নের ও গ্রাম থেকে আগত আত্মীয়গণের আহারাদির এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে সহায়তা করেছিলেন। শিল্পী চারু রায় আমাকে বরবেশে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। আমার কলেজের যে সব বন্ধু হোষ্টেলে থাকতেন তাঁরা সবাই সঙ্গে গিয়েছিলেন। বরযাত্রীর সংখ্যা খুব বেশিই হয়েছিল। বিবাহ বাড়ী ছিল……একটি বাড়ীতে।

বিবাহের পর গ্রামের বাড়ীতে ফিরে গেলাম। তখন আমার গ্রাম থেকে কলকাতায় আসতে হলে গ্রাম থেকে

বারো ক্রোশ দূরবর্তী বর্ধমান ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধরতে হ'ত। তখনো বারহারোয়া লাইন তখন খোলেনি বর্ধমান কাটোয়া লাইনের ত কথাই নেই। এই বারো ক্রোশ গোরুর গাড়ীতে আসতে হ'ত। বাবা বরকন্যার জন্য দুখানা পাল্কীর ব্যবস্থা করেছিলেন। দুখানা পাল্কী ষ্টেশনে তিন দিন প্রতীক্ষা করেছিল—কারণ আসবার সময় একাই পাল্কীতেই এসেছিলাম—আর একখানায় পুরোহিত এসেছিলেন। আজকে সেকথা স্মরণ করে হাসি পায়। এই অযথা ব্যয় বাবা কেন করেছিলেন—জানিনা। আমিই বা কেন আপত্তি করিনি—মনে করলে লজ্জা পাই।

আমি বিবাহ করতে গিয়েছিলাম—কাঁদতে কাঁদতে। কারণ মার শরীরের অবস্থা শোচনীয়—এমনকি মৃত্যু আসন্ন বলেই মনে হচ্ছিল। গ্রামে ভালো চিকিৎসক ছিলনা—বলেছিল—ভয় নেই। দশজ পথই বিষণ্ণ হয়ে ছিলাম—বিবাহে কে যোগ দিল—না দিল সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না—বিবাহের দিন আমি কিছুতেই প্রফুল্লতার সঞ্চার করতে পারিনি। এমন বিষণ্ণ এবং বিরক্ত মুখে বোধ হয় কেউ বিবাহ করেননি। ফিরবার পথে এই বিষাদ আরও ঘনীভূত হ'ল। বর্ধমান ষ্টেশনে গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল—সে বললে রায়গিন্নী ভাল আছেন। সংবাদটা মিথ্যা বলে হ'ল তবু একটু আশ্বস্ত হ'লাম। বর্ধমান ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমে স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম কথা হ'লো। এই প্রথম বাক্যালাপের শুভক্ষণটিকে ছন্দে বন্দী করে রেখেছি

হাঁ ও না

বর্দ্ধমান স্টেশনের ওয়েটিংরুমে।
তোমার নয়ন দুটি ঢুলুঢুলু ঘুমে
চল্লিশ বৎসর আগে মধুময় ফাল্গুন প্রভাত,
ফিরিতেছি বিবাহান্তে কাটাইয়া ট্রেনে সারা রাত
সঙ্গে বরযাত্রীদল। তুমি ছিলে একা।
এক ঠাঁকে করিলাম দেখা।
প্রথম তোমার সাথে বাক্যালাপ সেই অবসরে
মুহূর্তের তরে।
সে মুহূর্ত কালের গগনে
সন্ধ্যাতারা হয়ে জ্বলে আজো মোর প্রেমের স্বপনে।
দুটি প্রশ্ন করেছিনু, একটিতে বলেছিলে 'হাঁ',
অন্যটিতে 'না'।
এর বেশি কোন কথা বলো নাই, পথের সম্বল
হইল তা, যেন তারা দুই কানে দুইটি কুণ্ডল।
দুটি একাক্ষরী শব্দ মন্ত্রারম্ভে ওঁ হ্রীং সম
সঞ্চারিল শক্তি গূঢ়তম।
বিনা অগ্নিশিখা
তাহাতেই হয়ে গেল আমাদের সত্য কুশণ্ডিকা।
তারপরে বহু কথা হয়েছে জীবনে,
কথার প্লাবনে
হাঁ-না এই শব্দ দুটি আজো যেন শীর্ষ তুলি আছে
আমাদের কাছে।
চিরদিন আমি ত মুখর
আমার অজস্র প্রশ্নে আজো তব ও দুটি উত্তর।
বহুবার ও স্টেশন জীবনে করেছি অতিক্রম
কখনো হয়নি মোর ভ্রম
সে বিশ্রাম গৃহটির মৃদু প্রেম স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়া
ভেটিতে বন্দিতে তারে নিঃশব্দে নমিয়া।
দূরদূরান্তের ক্লান্ত যাত্রীদের কোলাহল নামে
ও-ঘর আমার কাছে তীর্থ হয়ে রাজে।
পুরা কবিতাটা আমার পর্ণপুট ও আহরণে আছে।

বিবাহ করে বাড়ী ফিরলাম—দেখলাম মার অবস্থা মন্দ হতে মন্দতর। কুশণ্ডিকা হ'লো। কাকা বৌভাতেরও আয়োজন করেছেন ঘটা করে। কিন্তু ঘটার পরিণতি হ'ল শোচনীয়। বৌভাতে আত্মীয়েরা এমনকি যাঁরা বিয়ে দিতে গিয়েছিলেন তাঁরাও এলেন না। বিলাত ফেরতার বাটীর মেয়ের পরিবেশন করা অন্ন খেলে জাত যাবে। নিম্নজাতির লোকদের খাইয়ে দেওয়া হল। রাত্রে মার অসুখ খুব বেড়ে গেল। পরদিন মা বিদায় নিলেন।

বৌভাতে যাঁরা আসেন নি—তাঁরা মার মৃতদেহ কাঁধে করে নয় মাইল দূরে কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন। আমাদের গ্রামে প্রথা ছিল মৃতদেহে মুখাগ্নি করে ছেড়ে দেওয়া হত—নব শায়কজাতির লোকেরা গঙ্গার ঘাটে নিয়ে

যেত। প্রথম স্বজাতির লোকেরা অতদূর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে গেল।

তারপর মার শ্রাদ্ধে সকলেই যোগ দিলেন। শ্রাদ্ধে বহু ব্যয় হ'ল। বিবাহ ও শ্রাদ্ধ দুই কাজে বাবা সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। মা নিজে চিরবিদায় নিয়ে সামাজিক গোলমাল মিটিয়ে গেলেন। তাঁর বড় সাধ ছিল বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘর সংসার ক'রেন, তা তাঁর সে সাধ মিটলনা। আমার পত্নীর হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে তিনি বলে গেলেন শুধু এইজন্যই যেন তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় আমার বধূকে কেউ অপয়া বলেনি।

বারো বছরের বালিকা আমার জন্য হবিষ্যান্ন রান্না করল। বিবাহের তিন দিন পরে থেকে আমার সুখের অন্ন রন্ধন করে পাতে নিয়েছিল—৪৪ বৎসর দুইবেলা তাই করছে। শ্রাদ্ধের পর আমাদের একত্র বাস সুরু হ'ল আমি তাই লিখেছিলাম—

দুর্দিনের বরণ

হলো তোমার বরণ প্রিয়ে অশ্রুমতীর ধারে,
যৌবন হলো রোদন ভরা বেদনাঝঙ্কারে।
কোথায় প্রমোদ কোথায় হাসি ?
বাজ্‌লনাক সানাই বাঁশী,
হাহাধ্বনি উঠলো শুধু শোকের পারাবারে॥

আসেনিক পূর্ণিমাতে পুষ্পশোভন রথে,
তোমার সাথে প্রথম দেখা অশ্রুপিছল পথে।
শ্মশাননাঝে, জীবনসাথী,
জ্বল্‌ল চিতায় বাসরবাতি,
বাসর-বাতি ভর্‌ল আকাশ অমার আঁধিয়ারে॥

আস'নি সই হ'তে আমার সুখের সহচরী ;
শোকের দিনেই দিলদরদী আমূলে কৃপা করি।
সেই হ'তে ঐ আঁচলটি যে
অশ্রুতে মোর গেল ভিজে,
সেই হ'তে সই বর্‌ষে আমার সকল বেদনারে॥

দশটী বছর ঘনীভূত দুইটি দিনের পুটে,
দুইদিনে প্রেম দশটী বছর আগিয়ে গেল ছুটে।
সুখের দিনের প্রথম মিলন
দুখের রাতে শিথিলবাঁধন,
অশ্রুজলের মিলন অটুট এ-পারে ও-পারে

ভাটের গান

শ্রীজয়দেব রায়

ঐতিহাসিক ছড়াগান বা ভাটগীতি এককালে বাঙলাদেশেও প্রচলিত ছিল। কোন বরেণ্য ব্যক্তির মহিমা গান করিয়া কিংবা কোন সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাকে স্থায়িত্ব দানের উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ এসকল ছড়াগান রচিত হইত।

কবি রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর ভাটের ছড়ার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগানগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে……।"

প্রকৃতই এই সকল ছড়ার মধ্যে সমসাময়িক ইতিহাসের গভীর ছায়াপাত হইয়াছে। পল্লীবঙ্গের ইতিহাসে এ পর্যন্ত যতগুলি ঘটনা সম্পাত ঘটিয়াছে পল্লীর চারণকবিরা প্রায় সবগুলিকেই ছড়ার আকারে গ্রন্থন করিয়া রাখিয়াছেন।

বঙ্গদেশের উপর দিয়া গত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে কত দুর্যোগ, কত বিপ্লবই না বহিয়া গিয়াছে! সেগুলির ছাপ আজ হয়ত মুছিয়া গিয়াছে, সমাজ-সংসারে তাহার প্রভাব আজ আর নেই, কিন্তু এই ছড়াগুলি আজও সেগুলির স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

ভাটের ছড়ার মধ্যে বিষয়বস্তুর বেশ বৈচিত্র্য আছে। এগুলির মধ্যে বর্গীর হাঙ্গামা, জলদস্যুদের অত্যাচার, পলাশীর যুদ্ধ, বন্যা-দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিষয়ই প্রধান। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার বন্দনা, বিষ্ণুপুরের দলমাদলের গান, মুর্শিদাবাদের কিরীটকোণা কাহিনী প্রভৃতি শ্রেণীর ছড়াগুলির সঙ্গে দেবদেবীর মহিমাও জড়িত আছে।

দামোদরের বন্যায় উপদ্রুত মুসলমান ভাট কবিরা রচনা করিলেন—

ভাসল ছাগল গোরু, কার-বা জরু, কার-ও গুড়ের হাঁড়া।
কেউ বলে ভাই ভেসে গেল, আমার গো একপাল ভেড়া॥
ভাসল রাজপুত প্রায় ঘনের ঘুত, লোটা হাতে ক'রে,
আর ভাই মিঞাসাহেবেরা ভেসে যায় মুরগী ঘাড়ে ক'রে॥

আল্লা রাখ জান মেহেরবান সিন্নি দেবার কথা;
মধ্যখানে ভেসে যায় সব, দুষ্ট হয় ভাই মাথা॥

মুসলমান রাজপুরুষরা হিন্দু প্রজাদের বহু ভাবেই পীড়ন করিয়াছে, তাহাদের অত্যাচারে সে সময় হিন্দু সম্ভ্রান্ত অভিজাতদের ধনমান সবই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ইতিহাস অক্ষয় হইয়া আছে নিম্নের ছড়াটিতে—

নবাব শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় আইল।
বারো ভূমে জমিদার সব মাড়াইল॥
জমিদার মাড়াএ নবাব আনে সেই ঘড়ি।
তজবিজ টঙ্কাখাই, নাই তার, পায়ে লাগায় বেড়ি॥
কারে কারে ইটের উপরে ক'রে রেখেছে খাড়া।
চাবুকের চোটে কার পোস্ত দিচ্ছে নাড়াচাড়া॥
কারু কারু ফেলে রেখেছে শিঙি মাছের গাড়ে।
জোড়া বেতের বাড়ি তাদের পৃষ্ঠে তুলে মারে॥

পল্লীগৃহস্থদের উপর অত্যাচার কেবল মুসলমান তিহিদার, থানাদার, ফৌজদাররাই করে নাই, মগ, ফিরিঙ্গি, মারাঠীবর্গী, সিপাই, সান্ত্রী অনেকেই বারবার পল্লীর শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। বাঙালী সেদিন তাহাদের বাধা দিতে পারে নাই, কিন্তু সেই সকল অত্যাচারের ইতিবৃত্ত যুগযুগ স্মরণ করিয়া আসিতেছে।

ভাট কবিরা গাহিতেছে—

বীরভূম থাক্যা আইল বরগী বর্ধমানে খানা
বর্ধমান ছাড়িয়া হুগলী আইল কতজনা॥
কালানৈ দিয়া হুগলীর ফৌজে আসে বর্গীর পাল
বর্গী দেখিয়া লোকে যত কাঁপে হালে হাল॥
বর্গী সকল যখন এসে হবে একত্তর
কাঙাল গরীব মেরে ঘুচাবে, লুটিবে শহর॥

নবাব আলিবর্দি খাঁ বাঙলা দেশকে এই বর্গীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আলিবর্দি খাঁ-কে তাই দেশের লোক আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। নবাব

সরফরাজ খাঁ-র হাত হইতে আলিবর্দি কি ভাবে এদেশের সিংহাসন অধিকার করেন, সে প্রসঙ্গ লইয়া একটি ছড়া—

নবাবের তাম্বু আইল খামরা সড়াইতে
আলিবর্দির তাম্বু তখন শুতীর দরগাতে॥
নবাবের তাম্বু পড়িল গিরিয়ার মাঠেতে।
আলিবর্দির তাম্বু তখন পড়িল পিপিলাতে।

তারপর—

হাজার হাজার পণ্টন কেটে ময়দান ভরিল,
সরফরাজ খাঁ নবাবকে মেরে যুদ্ধে হারাইল।
হাতী পড়িল ঢুলঢুলিতে, ঘোড়া পড়িল রণে,
পান্ধাদার ডুবাইল সাহস বিলের কোণে॥

বাঙ্গালার পিতৃভক্ত বীর বালক আলিম সিংহ এই যুদ্ধেই অক্ষয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

সরফরাজ খাঁ-র সেনাপতি ছিলেন গিয়াস খাঁ। আলিবর্দির সঙ্গে গিরিয়ার ময়দানে তাঁহার প্রচণ্ড লড়াই হয়। ছড়ায় আছে—

গিয়াস খাঁ বলিল তখন, শুন নবাবজী।
আলিবর্দির শির কেটে এনে দিব আজি॥

তারপর—

পড়িল নবাবের তাম্বু ব্রাহ্মণের স্থানে।
আলিবর্দির তাম্বু পড়ে গিরিয়া ময়দানে॥

আলিবর্দি আত্তপ্রিয় ছিলেন, তিনি রণোৎসাহী গিয়াস খাঁর সঙ্গে প্রথমটায় আপোষ করিতে চেষ্টা করেন—

শুন তুমি ওরে গিয়াস বলি যে তোমাকে।
ভাইজান মিশিতে এসো, লড়াই করছ কাকে?

কিন্তু— হায় গো আল্লা বারিতাল্লা খোয়াব দিন রেতে।
গিয়াস খাঁর হবে লড়াই আলিবর্দির সাথে॥

পশ্চিমবঙ্গে যেমন বর্গীর অত্যাচার, পূর্ববঙ্গে তাহার অপেক্ষা ভয়াবহ অত্যাচার করিয়া গিয়াছে মগ ও পোর্তুগীজ হার্মাদরা।

দূরে থাকি ডাকুর দল দুরমি ধরি চায়।
দেখিয়া বাঙ্গালী পণ্টন ক'রে হায়রে হায়॥
দশবারোজন আইল তারা কালো অঙ্গি পরি।
কারো গায়ে লাল কোর্তা মাথাতে পাগড়ি।
কোমরেতে তলোয়ার হাতেতে বন্দুক॥

বাঙ্গলার বীরদের সঙ্গেই এই সকল জলদস্যুদের অবিরত যুদ্ধবিগ্রহ হইত—

কয়েকজন আইল আইল্যা তথায় সাগরে মাছ ধরে।
ডাঙ্গার শুক্ত হৈলরে সেই ধু ধু বালুর চরে॥
কারো মাথা কাড়ি গেলরে, কেহ গেল মরে॥
হাইল্যার মধ্যে একজন রয় সে সেই বুড়া।
তাড়াতাড়ি আইল পশুই নরীচের গুঁড়া॥
নরীচের গুড়া আনি কি কাম করিল।
মুটকরি ডাকাইতের চোখে দেলা দিল।
ভোম খাইয়া পড়ে ডাকাত বালুর উপরে॥

এ সকল ছড়া কেবল রূপকথা নয়, সত্য সত্য বাস্তব ঐতিহাসিক কাহিনী।

মুসলমান আমলের পরে ইংরেজ আমলে আসিয়াও এই শ্রেণীর ভাটের গান রচনা বন্ধ হয় নাই। তবে একালের ইতিহাস বহু সূত্র হইতে সংগৃহীত হয়, তাই ছড়াগানের ঐতিহাসিকতা লইয়া আর কেহ বিশেষ চিন্তা করে না।

বাঙলার পল্লী অঞ্চলে গোরা ফৌজের পদার্পণ কালে-ভদ্রেই ঘটিত। তাহার উপর বিরাট সুসজ্জিত বাহিনী লইয়া রণমার্গী গোরাসৈনিকদের আবির্ভাব নবদ্বীপে গৌরাঙ্গদেবের অভ্যুদয়ের ন্যায়ই পল্লীগৃহস্থের স্বাভাবিক জীবনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। বীরভূমের পল্লীকবি গোরাসৈন্য দর্শনে রচনা করিলেন—

এমনি অবিরত,
এমনি অবিরত, আসছে কত তুরুখ্ সওয়ার।
কামান গেঠান কত হাজারে হাজার॥
কিবা তারা আসছে গাড়ি,
তার উপরি দেখতে যেন ঠাট।
তাহার উপরে আছে ইংরাজ সরাপ॥
কিবা তার রূপের ছটা, বরণকটা দেখতে মাধুরী।
কিবা সাহেব কিবা গোরা চিনতে না পারি॥
বন্দুকে সাঙ্গীন চড়া,
বন্দুকে সাঙ্গীন চড়া, আসছে গোরা, বিপক্ষ বিনাশে॥
কটকের পদধূলি উড়িছে আকাশে।
দিয়ে হরিনাম, কৈল ত্রাণ গৌরচন্দ্র রায়।
এবে বিলাতী গোরার হাতে পাছে প্রাণ যায়॥

"রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদন"

শ্রীমতী সন্ধ্যা দত্ত

মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন দ্বিধান্বিত পদক্ষেপে অগ্রসর হয় পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া। প্রত্যেক মানুষেরই একটা পরিচিত ও পরিচিত পরিবেশ আছে। ঐ মনের উপর পরিবেশের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নহে। এ সত্য সাধারণ মানুষের উপর যেরূপ প্রয়োগ করা চলে, কবির জীবনেও ইহা কিছু কম প্রযোজ্য নহে। কবি ব্যক্তির অনুভূতিটি এক বিশেষ ভাবের সামাজিক চিত্ত। জগৎ ও জীবনলীলা কবি চিত্তে যে ভাবের স্পন্দন সৃষ্টি করে—কাব্য তাহারই বাঙ্ময় রূপায়ণ। কাব্যসৃষ্টির মূলে একদিকে থাকে একটি চিত্ত; অপরদিকে ঐ চিত্তেরই একটা পরিবেশ—আঘাত সংঘাতময় ঘটনার জগৎ। কাব্য, কবিচিত্ত এবং পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার এক বিশেষ অভিব্যক্তি। এই দিক হইতে বিচার করিলে কবির স্থান, কাল ও জীবন যাপনের পরিচয় শুধু প্রয়োজনীয়ই নহে, অত্যাবশ্যকীয়ও বটে। এই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কবির জীবনদর্শন বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় কাব্যে ও সাহিত্যে। পৃথিবীর প্রায় সকল কবি ও সাহিত্যিকগণেরই জীবন ও কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের সৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছে তাঁহাদের জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ। কবি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই উভয়-কবির জীবনদর্শনের ভিত্তি যে পরিবেশের দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহাকে বিচার করা প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্য রবি-প্রতিভার অজস্র দাক্ষিণ্যের ভারে অনত। একা রবীন্দ্রনাথই পৃথিবীর মধ্যে সার্বভৌম কবি—একাধারে কবি, সমালোচক, প্রবন্ধকার ঔপন্যাসিক, এক কথায় মহাকাব্যকার ছাড়া সব কিছু। সেক্সপীয়র ও গ্যেটে ছাড়া ইউরোপীয় সাহিত্যেও এমন কোন কবির নাম করা দুষ্কর, যিনি তাঁহার দেশ কালের গণ্ডী এমন করিয়া অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রপ্রতিভা আলোচনা করিলে এ সকলই স্বীকার্য্য। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে এমনভাবে স্থান দিতে আর কেহ পারেন নাই। বহির্মুখী বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতির বীজ রবীন্দ্রনাথই রোপণ করিয়া গিয়াছেন—এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অবদান সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে বাঙ্গালীমাত্রেই এত আত্মহারা হইয়া যান যে এতবড় প্রতিভা বিকাশের পরিপূরক হিসাবে আর কোন বস্তু কার্যকর ছিল কিনা তাহা কেহ একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না। সমালোচকগণ কেবল বিশেষণ দ্বারা প্রশস্তি করিয়া করিগুরুর বন্দনায় ব্যাকুল, আর পাঠকগণের সীমাবদ্ধ পাঠ্যবস্তুর মধ্যে তো অন্যান্য কাব্যের সহিত রবীন্দ্রকাব্যের তুলনামূলক সমালোচনার অবসরই স্বল্প। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই বটে—কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে বস্তুর প্রভাব সর্বাধিক তাহা বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতিভার অস্বাভাবিকত্ব এমন কিছুই চোখে পড়ে না—ঠিক যেমনটি পড়ে মধু কবির ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে দেখা যাইবে তাঁহার অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ—যাহা পরবর্তী জীবনে তাঁহার প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। আর মধুসূদনের কাব্যে দেখা যাইবে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার ছাপ।

রবীন্দ্র-যুগের প্রায় ৩৬।৩৭ বৎসর পূর্বে মধু কবির প্রতিভা বাংলা সাহিত্যে নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছিল। তৎকালীন বঙ্গসমাজ ও সাহিত্য বিচার করিলে দেখা যায়, সেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সাহিত্যিক দৈন্যের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ অভিনব দৃষ্টি লইয়া মধুসূদন বাংলার কাব্যসৃষ্টি শুরু করেন। পরাজয় ও পরাধীনতার বেদনাবোধে জাতীয় চিত্ত তখন সমাচ্ছন্ন। অপ্রত্যয় ও আত্মদৈন্যে জাতির কবি-স্বভাব উপহত, সুর ছন্দ ও রুচি বিকৃত। পশ্চিমের জীবন

এবং সাহিত্য সংস্কৃতির নব পরিচয়ে বাঙ্গালীর দৃষ্টিবিভ্রম ও চিত্তবৈক্লব্যের সৃষ্টি করিয়াছে। গঙ্গরীতির তখনও শৈশব। প্রাকৃত অবনমিতকণ্ঠ কবিওয়ালার নাগর প্রতিবেশীগণ আসরে তাল রক্ষা করিয়া চলিয়াছে—এমন সময়ে "গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী" ঠিক সেইভাবে যেমনটি প্রয়োজন তেমন সুর, ছন্দ শব্দসঙ্গীত কল্পনা যেন অতর্কিতে জাগিয়া উঠিল মধু কবির কণ্ঠে। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের পূর্বেই বাংলাসাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল বিদ্যাসাগরের গদ্যে, রঙ্গলালের কাব্যে ও প্যারীচাঁদের গল্পে। কিন্তু এ সকল প্রয়াসের মধ্যে একটি ত্রুটির জন্য পাশ্চাত্য প্রভাব এদেশে আসিয়াও আমাদের চিত্তকে সম্পূর্ণ নাড়া দিতে পারে নাই—কারণ এতদিন সে তাহার যথার্থ মাধ্যমটি লাভ করিতে পারে নাই। মধু-কবির অমিত্রাক্ষর ছন্দে সেই মাধ্যমটি সে লাভ করিল। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান যে লক্ষণ গতি বা চলতা, অমিত্রাক্ষরের যতি-পাতের অব্যাহত স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতায় তাহার প্রকাশ। অমিত্রাক্ষরের অভাবে এতদিন ইউরোপীয় সভ্যতার বহিরঙ্গ মাত্র বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এক্ষণে অমিত্রাক্ষরের মাধ্যমে ইহার অন্তরতম গুণ সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিল। শুধুমাত্র নূতন ছন্দ আমদানীর ক্ষেত্রেই নহে—শেষ বয়সে 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনার দ্বারা মধুসূদন কাব্যজগতে যে 'dramatic' বা নাটকীয় বিষয়বস্তুর আমদানী করিলেন, তাহা সত্যই অভিনব। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের জন্মই কবি মধুসূদনের সম্ভোগাগরিত সমাজচেতনায় এবং নরনারী-নির্বিশেষ মনুষ্যত্ব ধারণায়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নারীর অবৈধ প্রেমকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হইত না। মধুসূদনের কাব্যেই প্রথম দেখা যায় নারী চরিত্রগুলি ধর্ম ও সমাজসংস্কার বিসর্জন দিয়া যেন দুর্জয়তর অভিমানে সজ্জিতা। মেঘনাদবধের প্রমীলা সমাজের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যে দুর্জয় অভিমানে বাহির হইয়াছে—বীরাঙ্গনায় তাহা আরও বেশী দুর্জয়তর। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন যে পাশ্চাত্য আদর্শের মূল—তাহা বঙ্কিম উপন্যাসেও দৃষ্ট হয়। তাঁহার মত নীতিবাগীশও বিধবার প্রেমকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমাজচেতনায় যে ব্যষ্টিগত রূপ দেখা যায়—তাহা মধুসূদনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। মধুসূদন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের নারীচরিত্রগুলিতে সেই ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের সমাজসংস্কারে বন্দিনী জীবনের বন্ধন মোচনের প্রয়াস দেখা যায়।

কাব্যে মধুসূদনের অন্যতম অবদান পত্রকাব্য রচনা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পত্রকাব্য ছিল না। হংসদূত, মেঘদূত ও পদাঙ্কদূত প্রভৃতিতে পত্র প্রেরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও দূতের মাধ্যমে—বীরাঙ্গনার নায়িকাগণের ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে নায়কগণের নিকট নহে। মধুসূদন বাংলার বিদ্রোহী সন্তান। তিনি প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শে কেবল দেবত্বের আদর্শ লইয়া চরিত্রসৃষ্টি করেন নাই। তিনি পূর্ণ মনুষ্যত্বের ideal দ্বারা চালিত। মনুষ্যত্ব বলিতে তিনি কেবল মানুষের সদ্‌গুণসমূহকে বুঝান নাই—মানুষ যে, সে দোষে গুণে সম্পূর্ণ হইবে, একদিকে থাকিবে দেবত্ব ও অপরদিকে পশুত্ব। তাই দেবোপম রামচরিত্রকে তিনি সম্মান করেন নাই, খতখানি করিয়াছেন মহাপাপী রাবণকে। সে যাহাই হউক—মধুসূদনের প্রতিভার বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নাই। কেবল বাংলাসাহিত্যের সেই দৈন্যের যুগে কত অসাধারণ ঋণ স্বীকার করিয়া মধু-কবি কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন তাহার স্বল্প পরিচয় দেওয়া গেল।

অপরপক্ষে রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলাসাহিত্যে সাহিত্যিক দৈন্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার কিছুই কবি অনুভব করেন নাই। তাঁহার পূর্বেই সাহিত্যক্ষেত্র অনেক সমৃদ্ধ ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের রচনার দ্বারা। মধুসূদনের ন্যায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত ভাষা গড়িয়া লইতে হয় নাই; তাহা পূর্ব হইতেই যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। আর মধুসূদনের ভাবকল্পনা তখনকার পক্ষে এতই নূতন এবং ইহার আধার অমিত্রাক্ষর ছন্দ এতই অভিনব যে ইহা চালাইবার জন্য প্রচলিত তদ্ভব শব্দ তুলিয়া প্রচুর আভিধানিক শব্দ ও নামধাতুর প্রচলন করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রযুগে তাঁহার রচনার ব্যাপকত্ব ও বিস্তৃতি ধারণ করিবার জন্য বাংলাসাহিত্যের ভূমি যেন পূর্ব হইতেই কর্ষণ করা

ছিল। তাহার উপর উপযুক্ত বীজ পতিত হইয়া বাংলা সাহিত্য ফুলে ফলে সজীব হইয়া উঠিল, তাহার অজস্র দানে বিশ্বের সাহিত্যভাণ্ডার তাই আজ সমৃদ্ধ।

কবি মোহিতলাল মধুসূদনের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'মধুসূদন আধুনিক সাহিত্যের পত্তনকারীদের অন্যতম এবং কেবলমাত্র প্রতিভার শক্তিতে তিনি বোধ হয় অদ্বিতীয়...'। কিন্তু এত বড় প্রতিভার অধিকারী হইয়াও মধুসূদনের পরিণতির অপূর্ণতা বাস্তবিকই মর্মান্তিক ও দুঃখদায়ক এবং প্রকৃতপক্ষে ইহার জন্য দায়ী তাঁহার পারিবারিক ও তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাবধারার বন্যায় যখন বঙ্গসমাজ ও সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হইতে বসিয়াছিল, সেই সময়ে যুবক মধুসূদন ইংরাজী সাহিত্যের রসে মাতাল হইয়া পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিলাতের যে রোমান্টিক ছবি বিদেশী ছাত্রের কল্পনাকে অপূর্ব স্বপ্ন-সুষমায় ভরিয়া তোলে, তাহা কিশোর মধুসূদনের চিত্তকে রঙীন নায়কতায় উত্তেজিত করিয়াছিল—যাহা তাঁহাকে ঘর ভুলাইল, স্বদেশ, স্ব-সমাজ, পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব সব ভুলাইয়া আহ্বান করিল আপন বক্ষে। সে ডাক মধুসূদন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি ধর্মত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইলেন এবং বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করিতে শুরু করিলেন কিন্তু ইহা ক্ষণপ্রভার প্রভার মতোই ক্ষণস্থায়ী হইল। তাঁহার কবিপ্রতিভাকে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবে বুঝিতে পারিয়াই, অবশেষে তিনি বাংলা ভাষাতেই কাব্যরচনা শুরু করেন। খৃষ্টান হইয়া বিশপস্ কলেজে অধ্যয়নকালে এবং মাদ্রাজে স্কুলে শিক্ষকরূপে থাকা কালে গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল সাহিত্য ভাল করিয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট কাব্য ও নাটকগুলির জন্ম হয়। মধুসূদনের শেষজীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের ইতিহাস বাল্যকাল হইতেই মহাকবি হইবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। তিনি ছিলেন দুরন্ত আশাবাদী ও আত্মসচেতন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাই যে তাঁহাকে জীবনে অটল মহিমায় অধিষ্ঠিত রাখিবে, এ ধারণা তাঁহার মনে ছিল সুদৃঢ়, কিন্তু পরিণামে সকলই ব্যর্থ হইল। প্রেম, যশ এবং অর্থ—এই তিনের কাঙাল মধুসূদন জীবনভোর কেবল অভাবের জ্বালাই ভোগ করিলেন। পূর্বজীবনের ব্যর্থতা অপেক্ষা শেষ জীবনের দুর্দশাই তাঁহার অধিকতর মর্মন্তুদ। এত বড় কবি হইয়াও জীবিতকালে তিনি খ্যাতি অপেক্ষা গঞ্জনাই লাভ করিয়াছেন অধিক। তাই তাঁহার আপন স্মারক লিপির এক জায়গায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—

"Born an age too soon"—a time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, book sellers, painters—et hoc genus Omne and now I am obliged to shell out.

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কাব্যসৃষ্টি করিয়া জীবিতাবস্থায়ই যে সম্মান ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বাংলাদেশের খুব কম কবি ও সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। ইহা তাঁহার নিজের উক্তিতেই স্পষ্ট। তাঁহার পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে "দেশের প্রতিভূস্বরূপ" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩১৮ সালে যে কবি-সম্বর্ধনার আয়োজন করেন তথায় অভিভাষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সম্মান যেখানে মহৎ, যেখানে সত্য, সেখানে নম্রতায় মন আপনি নত হয়। অতএব আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্বে এ-কথা অন্তরের সহিত জানাইয়া যাইতে পারিব যে, আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্বাদের মত মাথায় করিয়া লইলাম।"

রবীন্দ্রনাথ ও মাইকেলের কবিজীবন সম্পূর্ণ বিপরীত দুই পরিবেশের প্রান্তে গঠিত বলিয়া, এই দুই কবির জীবনদর্শনও বিভিন্নরূপ। আশাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট জীবন পরিপূর্ণ অক্ষয় সৌন্দর্য লইয়া বিরাজমান। তাই তিনি মরিতে চাহেন না এই 'সুন্দর ভুবনে'—রিক্ততার মধ্যেও তাই তিনি অনুভব করেন নবজীবনের ইঙ্গিত। তাঁহার মতে মৃত্যু জীবনের চরম পরিণতি নহে, মানুষ মরে না—সে অনন্ত জীবন পথের যাত্রী—মৃত্যু অনন্ত জীবন নাট্যের মধ্যবর্তী দৃশ্যান্তর মাত্র। তাই তিনি মৃত্যুতে বিচলিত নহেন, দুঃখে কাতর নহেন। যে মৃত্যুর মাঝে অন্তহীন প্রাণ ঢাকা আছে, তার বেদনার উন্মত্ততাই তিনি আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিতে ব্যাকুল।

কিন্তু মাইকেল জীবনের ব্যর্থতার বেদনায় জীবনকে অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথের মত জীবনাতীতকে দর্শন করিতে পারেন নাই। জীবনে দুঃখ, দারিদ্র্য ও অশান্তির অভিশাপে জর্জরিত হইয়া বড় দুঃখে তাঁহাকে বলিতে শুনি—

"নারিলি হরিতে মণি, রহিল কেবল ফণী
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন কেমনে ?"

সত্যই তাঁহার জীবনের ব্যর্থতার বেদনা ভোলা সম্ভব নয়। ইহলোকসর্বস্ব কবি মধুসূদনের নিকট জীবনের সব কিছুই চরম সত্যের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে হইত। তাই দুঃখ তাঁর কাছে দুঃখই ; মৃত্যু—মৃত্যুই ; সে স্নান সমান নহে। মৃত্যু তাঁহার নিকট আনিয়া দেয় সমাপ্তির সংবাদ, রবীন্দ্রনাথের মত নব জীবনের সম্ভাবনা নয়। একটি ফুল দেখিলে যেমন প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দর্যই আমাদের নিকট বনলক্ষ্মীর চরম আদর্শ বলিয়া মনে হয়—ফুলের পরবর্তী রূপের কথা যেমন আমরা আপাত দৃষ্টিতে দেখিনা, মধুসূদন তেমন করিয়া ইহজীবনের সবকিছুই চরম আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। জীবনকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত জীবনের রূপ তাঁর অজ্ঞাত ছিল। তাই নববর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া গত জীবনের অপূর্ণ বাসনার স্মৃতি আর মৃত্যুর অনিশ্চয়তা তাঁহার মনকে অমানিশার অন্ধকারে ঢাকিয়া দেয়। তিনি জানেন যে তাঁর জীবনবেলা অবসিত প্রায়। অচিরেই আসিবে মৃত্যুরূপী অন্ধতমসাচ্ছন্ন রজনী যাহা আর কখনই প্রভাতের কলকাকলীতে মুখর হইয়া উঠিবেনা। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় ঘনতমসা তাঁহার কাছে ভয়াবহ। তাই তিনি নববর্ষকে পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া আহ্বান করিতে পারেন নাই। আশাহীন জীবনে সায়াহ্নে গত ও অনাগতের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কবিগুরুর মত নববর্ষকে সাদরে আহ্বান জানাইয়া বলিতে পারেন নাই—

'হে নূতন এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে'

কবি মধুসূদনের কবিতায় আলোকদীপ্ত ভবিষ্যতের কোন চিত্র নাই। অতৃপ্ত কামনার ভগ্নস্তূপেই হইয়াছে তাহার নৈরাশ্যের বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের সহিত মধু কবির জীবনের অনুভূতির বিরাট পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ আজীবন যে পরিবেশে মানুষ হইয়াছিলেন তাহাতে দুঃখের রক্তলিখা নাই। দারিদ্র্যের স্পর্শ তাঁহার গায়ে লাগে নাই বলিয়া জীবনে দুঃখের অনুভূতি তাঁহার কম। সেজন্য আশাবাদী কবি হওয়াটা তাঁর পক্ষে খুব বড় কথা নহে। কবিগুরুকে আমরা এভাবেই আখ্যা করিতে পারি। তিনি যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহা রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট কবি-চিত্তের প্রস্তুতি ক্ষেত্রহিসাবে যথেষ্টই সমৃদ্ধ ছিল। এই পরিবেশ হইতেই তাঁহার প্রকাশশক্তির বৈশিষ্ট্য জন্মিয়াছে! তাঁর জীবন দর্শনের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। প্রেম, সুখ, দুঃখ, জন্ম মৃত্যু এ সব কিছুর ধারণায় রবীন্দ্র-কাব্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহা উপনিষদ পরিবেশের দান। অপরপক্ষে মধুসূদনের জীবনের অভিজ্ঞতা তিক্ত ও বিষাদময়—জীবনের সর্বদিক দিয়া তিনি হইয়াছেন বঞ্চিত। তাই বিভীষিকাময় রিক্ততায় জীবন তাঁর ভয়াবহ। কোন বিশ্বভার মধুসূদনের ছিল না, যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের। মধু কবির কল্পিত মৃত্যু সীমাহীন, নিরা-লোক, নিঃশব্দ, তিমির রাত্রি। নিরাশার অতলান্ত অন্ধ-কারে আশার সূর্য যাঁর নিমজ্জিত, মৃত্যুকে তো তিনি আনন্দময়রূপে দেখিতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন বহুভারতীর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। সেজন্য বাংলাসাহিত্যের যে কোন বিভাগে তাঁহার সৃষ্টির বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। কিন্তু মধুসূদন মাত্র ৪।৫ বৎসরের চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যকে যেন চারিশত বৎসরের অগ্রগামী করিয়া দিলেন। কত বড় প্রতিভার অধিকারী হইলে এই অল্প সময়ের মধ্যে গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি নানা বিদেশী ভাষার অন্তর্নিহিত গূঢ় সৌন্দর্য অন্তরে নিজস্বভাবে উপলব্ধি করিয়া বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা সম্ভব হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অনন্য সাধারণ প্রতিভা ছিল বলিয়াই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর কাব্য রাজ্যে আজও একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রভাব প্রত্যক্ষত সাহিত্যিক হইলেও পরোক্ষত তাহা সমগ্র নব্য ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে। তিনি ইউরোপীয় প্রবাহের মহত্তর ভগীরথ। রবীন্দ্রনাথের মত উচ্চাদর্শ ও মহত্তর কল্পনা, উপমার সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য

এবং কোন বিষয়ে হয় তো মধু কবির ছিল না—রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য না থাকিতে পারে মধুসূদনের রচিত সাহিত্যে—কিন্তু তাঁহার সাহিত্যের এক নব পর্যায়ে যিনি কাব্যসংসারে এক নূতন পথ দেখাইলেন তাঁহার প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য ও সাহিত্যিক দায়িত্ব যে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধুসূদনের মত পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন নিশ্চয়ই বিভিন্ন হইত, যার ফলে হয়তো রবীন্দ্রসাহিত্যের এ রূপ আজ দেখা যাইত না। রবীন্দ্রনাথের মত এত সুদীর্ঘকাল বঙ্গভারতীর সাধনা করিলে ও জীবনের পরিবেশ এত প্রতিকূল না হইলে মধুসূদনই বাংলাসাহিত্যকে ভাবে, ভাষায় ও নতুনত্বের দিক দিয়া আরও সমৃদ্ধিশালী করিয়া যাইতেন —তাঁহার প্রতিভা বিচারে একথা মনে হওয়া মোটেই অসঙ্গত নহে।

হেগেল দর্শনে বাস্তবতা

অমলেন্দু চৌধুরী

১৮১৫ সাল থেকে জার্মাণীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে জার্মাণী একরকম অষ্ট্রিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে ছিল। ফেডারেল রাইট নিয়ন্ত্রিত হোত অষ্ট্রিয়ার দ্বারা। কিন্তু ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লব সমস্ত ইউরোপের বুকে নতুন জোয়ার এনে দিল। প্রতিক্রিয়াশীল মেটারনিকের ক্ষমতার বিরুদ্ধে পর্তুগাল, ইটালী, অষ্ট্রিয়া ও জার্মাণী বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। যদিও এই নতুন প্রাণচেতনা জার্মাণীতে বার বার প্রতিহত হয়েছিল এই কয়েকটি কারণে (১) ভিয়েনা চুক্তির নিষ্ক্রিয়তা (২) জার্মাণ রাজপুরুষদের স্বার্থপরতা (৩) ফ্রান্সিয়ার নিলিপ্ততা। কুখ্যাত কার্লবাদ ডিক্রীই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু জার্মাণীর এই আন্দোলন বাইরের দিক থেকে প্রতিহত হয়েছিল। যদিও ভিতরে ভিতরে তা দুই দিক দিয়ে সার্থকতার দিকে চলেছিল (১) বাস্তব জগতে (২) ভাবের বা চিন্তার জগতে। বাস্তব জগতের উদাহরণ জলভরিন আর ভাবের জগতে নতুন কবি ও দার্শনিকদের চিন্তাধারা। এই চিন্তা জগতের দুই প্রতিভূ ছিলেন ফিক্‌টে (Fichte) ও হেগেল। চিন্তার জগতে এই আলোড়ন জাতীয়তার রূপ পায়। সুতরাং হেগেল দর্শনের বাস্তবতা বিচার করতে গেলে প্রথমেই ইতিহাসের পটভূমিকায় তার আলোচনা দরকার। কারণ অবস্থা ও সময় চিন্তা জগতের বাস্তব মাপকাঠি। হেগেল দর্শনের ভিতর জাতীয়তার ধ্বনিটি পাই; তখনকার সময়ে তার বড় অর্থ ছিল। তার মূল আদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র (Nationalist State)। কারণ তাঁর রাজনীতি বিষয়ক লেখাগুলো ছিল সেই জাতীয়তারই বাস্তব নমুনা। ফরাসী বিপ্লব তাঁর মনে আশার সঞ্চার করেছিল। তার স্বরূপ তাঁর নিজের লেখার ভিতর থেকেই পাই, যেমন, "The vision of a better and juster time has entered alive into the souls of men, and a desire, a longing, for a purer, freer condition has moved every heart and has alienated it from the existing state of affairs.....call this, if you like, a fever paroxysm, but it will end either in death or in eliminating the cause of the disease."

এই যে আশা এর প্রধান সার্থকতা হচ্ছে, এ মৃত্যু কিংবা রোগের আসল কারণকে দূর করে দেবে; সময়ের ইতিহাসে তার বড় অর্থ ছিল। তিনি আশা করতেন, যে-আলোড়ন মানবাত্মার ভিতর জাগরণের সৃষ্টি করেছে তা একদিন সার্থক হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তিনি বিপ্লবী ছিলেন না, তবুও ধর্ম থেকে আরম্ভ করে সামাজিক বৃষ্টিভঙ্গির বড় রূপান্তরকে স্বীকার করতেন। তিনি সর্বদাই গোষ্ঠিবদ্ধ ইচ্ছাশক্তিকে বেশী মর্যাদা দিয়েছেন। "জার্মাণীর রাষ্ট্রতন্ত্র" নামক প্রবন্ধগুলির ভিতর রাষ্ট্র হিসাবে জার্মাণীর দুর্বলতার কথাই বলেছেন। কারণ তখন রাষ্ট্র হিসাবে জার্মাণী ছিল কতকগুলি ছোট ছোট পরগণার মত। তাদের ভিতর ঐক্য বলে কিছুই ছিল না। সমাধান হিসাবে তিনি কতকগুলো কারণের উপর জোর দিয়েছিলেন (১) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ (২) ব্যক্তি স্বাধীনতা। এদুটো দেশের শক্তি হানি করেছে। কারণ ছোট ছোট পরগণায় বিভক্ত রাষ্ট্রগুলির ভিতর স্বার্থপরতা ছিল মূল উপাদান। হেগেলের চিন্তাধারা সর্বপ্রথম দেশের এই দুর্বলতাকে আবিষ্কার করলো। তিনি সমস্ত জাতির সামনে ঐক্যের পথ দেখিয়েছিলেন।

হেগেলের কাছে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কিছুটা নতুন রূপ নিয়েছিল। রাষ্ট্র সবচেয়ে বড় সঙ্ঘবদ্ধশক্তি যার দ্বারা সম্পত্তিকে রক্ষা করা যায়। এই সঙ্ঘবদ্ধশক্তির ক্ষমতা রূপায়িত হয়

সামরিক শক্তির ভিতর দিয়ে। জাতীয়তাই রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতি হিসাবে আর্য্যদের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, তাকে একই রাষ্ট্রে রূপায়িত করা যায়। তিনি কেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। একটি শক্তিশালী সামরিক নেতৃত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সে পথে জাতীয় চেতনার ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়েই যেতে পারা যায়। এখানে তাঁর ভিতর রিচ্যু ও ম্যাকিয়াভেলির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তবে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী ইটালী ও জার্মাণীর ইতিহাসে সফল হতে দেখা যায়। পরবর্তী যুগে বিসমার্ক তাঁর সে আশা বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। সেদিক থেকে তাঁর জাতীয়তা-বিশ্বাস (১) ডায়লেকটিক (হেতুশাস্ত্র) (২) ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার ভিতর দিয়ে দর্শনের রূপ পেয়েছিল। কারণ তিনি ইতিহাসের ঘটনার ভিতর একটা প্রয়োজন-বাদ আবিষ্কার করেছিলেন। ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা শুধু ঘটতে পারে বা ঘটবার উপযোগী বলেই যে ঘটছে তা নয়, বর্তমান সভ্যতার পরিণতির ভিতর তার কায়া লুকিয়ে আছে। নীতিশাস্ত্রগত প্রয়োজনীয়তাই হেতু শাস্ত্রের প্রাণ।

বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে হেগেল দর্শনের বিচার করতে গেলে বলা যায় যে তাঁর দর্শন সুশৃঙ্খলভাবে বর্তমান চিন্তাধারাকে গঠন করেছে। তাঁর দর্শনের প্রধান তাৎপর্য ধর্ম ও মেটাফিজিক্স, যদিও রাজনীতি অপ্রধান অংশ। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসের ভিতর যে রূপান্তর দেখা গেল, তা সবদিকেই সমস্যার সৃষ্টি করলো। বিশেষতঃ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ রুশোর মতবাদে দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবের সন্ত্রাসবাদ ও রুশোর দৃষ্টিভঙ্গী এক ধরণের চিন্তাধারা পুষ্ট করেছিল, তাদের ভিতর বার্কের চিন্তা অন্যতম। কিন্তু হেগেল সমস্ত বিপরীত ধর্মীয় চিন্তাধারার ভিতর সমন্বয় সাধন করে-ছিলেন। বিশেষতঃ হিউমের যুক্তিবাদ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি তাঁর দর্শনকে প্রভাবান্বিত করেছিল। সুতরাং তাঁর দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটা নতুন ধরণের তর্কশাস্ত্র (লজিক) ও বুদ্ধিবাদ। এক কথায় হেতুশাস্ত্র যুক্তি, বিষয় ও মূল্যের ভিতর একটা যোগাযোগের সৃষ্টি করেছে। হেগেলের হেতুশাস্ত্র পরবর্তী যুগে মার্কস্‌দর্শনের কাঠামো সৃষ্টি করেছে। তাঁর জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক রূপ নিয়েছিল ফ্যাসিজম্ রূপে।

হেগেল দর্শনের বাস্তবতার দিকটি বিচার করলে এই দুই ধারায় আলোচনা করা দরকার (১) হেতু শাস্ত্র (২) ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। যদিও এই দুই দিককে ভাগ করা যায় এই ভাবে (১) বাস্তবতার দিক (২) আদর্শ-বাদের দিক। ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা (Historical necessity) একধরণের বুদ্ধিবাদ এবং মেটাফিজিক্সের দিক থেকে বিচার করলে কার্যকারণবাদের মতই মনে হয়ে থাকে। ঘটনার ধারা বা ইতিহাসের ধারাকে একটা বিশিষ্ট যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বিচার করাকেই হেতুশাস্ত্র বলে থাকে। সেদিক থেকে হেগেল বিশ্বের দর্শনের পটভূমিকায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। কারণ আধুনিক যুগের বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদ গড়ে ওঠে হেগেলের ভিতর দিয়েই। যদিও এই বস্তুবাদ-চিন্তাধারা একরকম সার্থক রূপ নেয় রাসেলের Neo-realism এর ভিতর দিয়ে। সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি—শাশ্বত ইচ্ছা ও ব্যক্তি ইচ্ছার সংঘর্ষের চরম রূপ প্রকাশ পেয়েছে রাষ্ট্রে। ইতিহাসের ঘটনার ভিতর লুকানো একটা শাশ্বত প্রয়োজনীয়তা। এই প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটে যাচ্ছে। ইতিহাসের কাঠামোও তৈরারী হয় এই প্রয়োজনকে স্বীকার করে। এই প্রয়োজনবাদ অনেকটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মত। অর্থনীতি, ধর্মনীতি ও দর্শন তিন বিষয় বিবেচনা করবার পথে তার একটা অবদান আছে। কারণ এর ভিতর দিয়েই আসলকে বিচার করা যায়। এই ঐতিহাসিক পদ্ধতি যা হেগেল ব্যবহার করেছেন তা সাধারণতঃ বিশ্লেষণও সর্বসাধারণভাবে ব্যবহার (Generalisation) করাও বুঝায়। প্রকৃতির ভিতর একটা নিয়মের অস্তিত্ব আছে, এই অস্তিত্বকে কেন্দ্র করেই ঘটনা। এই পদ্ধতিকে প্রগতির সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে একে বায়োলজিক্যাল বিবর্তনের মত বোঝা যায়, কিন্তু হেগেল বায়োলজি সম্বন্ধে কোন কিছু ধারণা করেন নাই।

তাঁর এই পদ্ধতি শুধু ইতিহাসের ঘটনাকে অনুসরণ

করে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস মাত্র নয়। বিশেষতঃ এর ভিতর মানসিক ও বস্তুবাচক প্রকৃতির একটা সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। এই দিক থেকে তিনি আদর্শবাদী। চিন্তার নিয়ম ও ঘটনার নিয়ম একভাবেই চলে। ইতিহাস আমাদের সামনে বিচার শক্তির এমন একটি নীতি দেয় যা দিয়ে আমরা সত্যকে মিথ্যার আড়াল থেকে এবং আসলকে নকলের ভিতর থেকে পৃথক করতে পারি। ইতিহাসের এই গবেষণা একটি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়। হেতুশাস্ত্রের ভিতর দিয়েই হেগেল তা বাস্তবে রূপায়িত করেন। এই চলার ধারা সাধারণতঃ সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে চলেছে (Synthesis)। কারণ নিবন্ধ ও প্রতি নিবন্ধের (Thesis and Antithesis) সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে একটি নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়। একে সংশ্লেষক পদার্থ বলে (Synthesis)। আরও সহজ করে বললে +ক এবং—ক পরস্পরগত সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে 'খ'কে সৃষ্টি করেছে। 'খ' সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ। এই পদ্ধতিকে হেতুশাস্ত্র (Dialectic) বলে। হেগেলের দর্শনে হেতুশাস্ত্র বিশেষ তত্ত্বরূপে ধরা হয়। হেগেল সমস্ত বস্তু ও ঘটনার বাইরের প্রকৃতিতে তত্ত্বগত নিয়মের বেড়াজালকে দেখিয়েছেন। তিনি নিজে একে যুক্তবাদী তর্কশাস্ত্র রূপে বিচার করেছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল ধারার দুই দিক হোল (১) গ্রীক দর্শন (২) খৃষ্টধর্মের নীতিজ্ঞান। সাধারণতঃ নগর সভ্যতায় এথেন্সের মূল দর্শন অপরিহার্য। সভ্যতাকে বিচার করতে যেয়ে হেগেল তার দুটি অবস্থার কথা বলেছেন (১) সৃজনশীলতা (২) অবক্ষয়গ্রস্ত রূপ। হেগেলের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলা।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার ভিতর তাঁর ধারণা কখনও সীমাবদ্ধ ছিল না। কারণ এই প্রয়োজনবাদ গভীর সত্য থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। ইতিহাসের ভিতরেই তার সমস্যার সমাধান আছে। অতিরিক্ত জ্ঞানী লোকেরাও এই গতির উদ্দেশ্যকে পর্যন্ত বুঝতে পারেন না। যদিও মহামানবেরা এই গতির গৌণ উপাদান এবং তাঁরাই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাসের অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁদের ভিতর দিয়ে একটা সুনিয়ন্ত্রিত রূপ নিয়ে থাকে। মানুষের ধ্যান ধারণা তার আভাস মাত্র বুঝতে পারে। সুতরাং ইতিহাস অনন্ত রূপে জ্ঞানী এবং গভীর সত্যের উপরেই তার ভিত্তি স্থল। এই সত্যের ভিতর একটা গভীর যুক্তি আছে যা সাধারণতঃ ব্যক্তি মানুষের যুক্তির থেকে অনেক উপরে। হেগেলের একমাত্র ধারণা যে "The real is the rational and the rational is the real. এই সত্য অনেক প্রশ্ন সৃষ্টি করে। এর কতটা যুক্তি আছে সে কথাও বিচার সাপেক্ষ। তবে সত্য ও যুক্তি একটা গভীর তত্ত্ব শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। হেতু শাস্ত্রের পতি দুই বিপরীত উদ্দেশ্যের ভিতর দিয়ে সংশ্লেষণ করে চলেছে। এই সংঘর্ষ সভ্যতার অন্তর্নিহিত প্রতিবাদের কথাই প্রমাণ করে। হেগেলের দর্শনে বিবর্তনের ধারণা সবচেয়ে প্রথমে দেখা যায়। সামাজিক বিবর্তন কথাটি এর পরের থেকেই আসে। তার সার্থক রূপ পাই মার্কসে। টয়নবির (Toynbee) ইতিহাসের ধ্যানধারণাও অনেকটা এই রকম। তার "Rout-Rally, Rout-Rally, Rout-Rally-Rout" এই পদ্ধতি হেতুশাস্ত্রের "Thesis, anti thesis—Synthesis' এর মত। হেগেল দর্শনে বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবতা বেশ ছিল। কিন্তু টয়নবির দর্শন রহস্যবাদের দিকে ঝুঁকেছে। কারণ সভ্যতার সৃজনশীলতা ও অবক্ষয়ের রূপটি যেমন হেগেলে তেমনি টয়নবির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

হেগেল দর্শনে যে সংঘর্ষের অস্তিত্ব দেখা যায় তা একধরণের গতিবাদ। ইতিহাসের ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পরস্পর বিরোধের ভিতর দিয়েই যে নতুনের সৃষ্টি হয় তাই ক্রমশঃ অস্তিত্বের দিকে যায়। এই গতির ভিতর একটা সমতাল আছে। এই সমতাল আবার কখনও স্থায়ী নয়। স্থায়ীত্ব কথাটা সময় ও অবস্থার সঙ্গে সমান পরিবর্তনশীল। এই সংঘর্ষের পথও কখনও সম্পূর্ণ নয়। কারণ প্রত্যেক চলার ভিতর সত্যের ও মিথ্যার মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায় এবং তাদের বিচারও চলে না। মানব সভ্যতার অভিযান কখনও পরিপূর্ণতা পায় না। তার অভিযান প্রতিনিয়ত একটা সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই চলেছে। এই গতি সম্বন্ধে ধারণা নতুন নয় কিন্তু এর প্রকাশ ভঙ্গিমা একেবারেই নতুন। হেগেল তাঁর চিন্তাধারা

প্লেটোর ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন। মাঝে মাঝে তার ভিতর সক্রেটিস সুলভ স্নেহও দেখতে পাওয়া যায়।

হেগেল দর্শনের বাস্তবতা বিচার করতে গেলে তার পরবর্তী দার্শনিকদের বিচার করা দরকার। চিন্তা জগতে হেগেল একেবারে বিপ্লব এনে দিয়েছেন। তাই পরের যুগে তাঁর চিন্তা দুই ধারায় রাজনৈতিক রূপ পেয়েছে। কারণ বায়োলজির দিক দিয়ে যেমন ডারউইনের বিবর্তনবাদ সমস্ত প্রাণিজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা করেছে, তেমনি হেগেলের হেতুশাস্ত্র বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলেছে। হেতুশাস্ত্রীয় বাস্তবতা (Diaclectical materialism)-র সুর হেগেলের ভিতরেই ছিল। হেগেল থেকে কার্ল-মার্কস পর্যন্ত সমস্ত যুগকে একটি ধারায় ভাগ করা যায়, যেমন হেতুশাস্ত্রীয় আদর্শবাদ থেকে হেতুশাস্ত্রীয় বাস্তববাদের যুগ (The age from Dialectical Idealism to Dialectical Materialism)। কার্ল-মার্কস ও হেগেলের মধ্যে ততটুকু পার্থক্য; উৎপত্তি ও পরিণতির ভিতর যতটুকু প্রভেদ আছে। হেগেলের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা গভীর তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কার্ল-মার্কসের ইতিহাস অর্থ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কস ইতিহাসের গতি পরীক্ষা করবার সময় দুইটি দিকে বেশী জোর দিয়েছেন (১) শ্রেণী সংঘর্ষ (২) অর্থ নৈতিক পটভূমিকা (class struggle), (economic interpretation of history)। তবে শ্রেণীসংঘর্ষের মূল প্রকৃতি ডারউইনের বায়োলজির অনেক তফাতে। কারণ মার্কস দেখাতে চেয়েছেন প্রতিটি যুগ বিচার করলে দেখা যায় যে, শাসকশ্রেণী আর শাসিতশ্রেণীর ভিতর এক ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে আসছে। অর্থ নৈতিক পটভূমিকা বললে জীবিকা জগতের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের ইতিহাসের রূপান্তর বোঝা যায়। এই অর্থ নৈতিক সৃজনশীলতার রূপান্তরই ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে মার্কসের জীবিকা জগৎ (Means of Production) সাধারণতঃ শুধু অর্থনীতির কথাই প্রমাণ করে না। "জীবিকা" কথাটি একটা জটিলতারই সৃষ্টি করে। কারণ জীবিকা বলতে অর্থ নৈতিক, এবং ধারাবাহিক সামাজিক দিকটির কথাও প্রমাণ করে। এর ভিতর নীতিশাস্ত্রেরও আভাস থাকতে পারে। কারণ পরবর্তী যুগে মার্কস পন্থী চিন্তাবীরেরা মার্কসের ধারণাকে যতটা রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিকের উপর ফেলেছেন তাতে মূল ধারণার অনেক অপভ্রংশ হয়। যদিও অর্থ নৈতিক দিকটাই প্রধান বস্তু। মার্কসের ইতিহাস বর্তমান যুগকে প্রত্যক্ষভাবে রচনা করেছে। হেগেলের হেতুশাস্ত্রের বাস্তব রূপ মার্কসের ভিতর পাওয়া যায়। হেগেল দর্শনের আদর্শবাদকে মার্কস ত্যাগ করেছেন। তবে হেতুশাস্ত্রের মূল কাঠামো যেমন নিবন্ধ ও প্রতিনিবন্ধ ও সংশ্লেষণ অথবা থিসিস, এনটিথিসিস্ ও সিনথেসিস-এর মূল রূপটি একই রেখেছেন। বর্তমান যুগকে রূপায়িত করতে যেয়ে মার্কস বলেছেন যে নিবন্ধ হ'ল বুর্জোয়া শ্রেণী এবং প্রতিনিবন্ধ হ'ল প্রোলেটেরিয়েট বা সর্বহারা শ্রেণী এবং উভয়ের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে সংশ্লেষণ অবস্থা হোল শ্রেণীহীন সমাজ। এই পথ বিপ্লবের। কারণ বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী বলতে এখানে ভূমি সভ্যতার থেকে যন্ত্র সভ্যতার ক্রমবিকাশের যুগটিও নির্দেশ করে। কার্ল-মার্কসের এই মতবাদ কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে বাস্তব রূপায়ণের পথে। সমাজ বিবর্তনের রূপটি মার্কস দেখিয়েছেন। সাধারণতঃ বিপ্লব বলতে অবস্থার প্রতিপক্ষতাই বোঝায়। সামাজিক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে যে দুটি প্রধান শ্রেণী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেমন ধনী ও সর্বহারাশ্রেণী, এই ভাববারা চিন্তা জগতে তত্ত্বগত সংমিশ্রণ প্রবলতাও বোঝায় (speculative meta-osmosis)। সহজ করে বললে মার্কস হেগেলের পথই অনুসরণ করেছেন। তবে যুগের সমস্তাকে দেখবার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হেগেলের ছিল না, যেমন তিনি ভেবেছেন যে জনবৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট হয়েছে কলোনিবাদ। কিন্তু মার্কসের যুগকে দেখবার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট ছিল, তাই তিনি সত্যকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

হেগেল দর্শনের আর এক দিক উগ্র জাতীয়তাবাদে রূপ পেয়েছে। জাতীয়তার উগ্র রূপ বর্তমানে ফ্যাসিষ্ট দর্শনে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। হেগেল জাতিগত সার্বভৌম নেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বের ইতিহাসে এক জাতি অন্য জাতির উপর অধিকার বিস্তার করবে। জার্মাণ

জাতির সেই ভবিষ্যৎই তিনি কল্পনা করতেন। বিসমার্কের জার্মানী একীকরণের পর থেকে জাতীয়তা বোধ একটা প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনে রূপায়িত হয়েছিল। ফ্যাসিষ্ট চিন্তা-বীরদের লেখার ভিতর তার যথেষ্ট পরিচয় মেলে যেমন—

"If the German in its historical development had gained that herd like unity as other people have, the German Reich should to day be mistress of the globe."

হেগেলের বিশ্বাস এখানে ধর্মে পরিণত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত জার্মাণ হয়েছে এই প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রাণকেন্দ্র। এর ঐতিহাসিক কারণ বিবেচনা করলে বলা যাবে জাতিগত দুর্বলতা তাকে উগ্র জাতীয়তার পথে এগিয়ে দিয়েছে। ইটালী ও জার্মাণীর ইতিহাসেই তার পরিচয় ইতিহাসের পটভূমিকায় হেগেল দর্শনের বস্তুনিষ্ঠা বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে অন্য কোন দর্শন এভাবে যুগকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। কারণ হেগেল বর্তমান চিন্তাধারার ভিত্তি সৃষ্টি করেছিলেন। ইতিহাসকে দর্শনের ভূমিকায় পর্যালোচনা করতে যেয়ে তিনি একটি নতুন নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক যুক্তিবাদ গভীর তত্ত্বজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের ধারাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ অস্তিত্বের সার্বভৌম করে তুলতে যেয়ে তার দর্শন রহস্যবাদের দিকে ঝুঁকেছে। ইতিহাসের যুক্তিকে সাধারণ মানুষের যুক্তি ও ধারণার বাইরে স্বীকার করে তিনি এক ধরণের জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। তবে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে তার হয়ত একটা কারণ ছিল।

(পূর্বানুবৃত্তি)

(২৮)

মুন্সী কালকাপ্রসাদের মত বিপদে বোধ হয় আর কেহই পড়েন নাই।

গোলমালের খবরটা শহরেও বেশ ফলাও ভাবে ছড়াইয়া ছিল। যদিচ মুন্সীজি জরু-গরু সবই প্রায় দেহাতে পাঠাইয়াছেন তবু নিজের প্রাণটাও ত আছে। আর নিজের প্রাণ কিছু কেলনা নয়। ভাবিয়া দেখিতে গেলে সর্বাগ্রে তাঁহার এই দুগ্ধ-ঘৃত-পুষ্ট দেহটাকেই সুদূর দেহাতে কোথাও পাঠানো উচিত ছিল—যেখানে না আছে বেইমান সিপাহীরা—কেহ কোন কালে পদার্পণ করিবে না; শহরের খবর যেখানে পৌঁছিতে একমাস সময় লাগে। কারণ, কালকাপ্রসাদ যথেষ্ট ভাবিয়া দেখিয়াছেন, কিছুদিন যাবৎ দিনরাতই ভাবিতেছেন বলিতে গেলে—জানটা বাঁচিলে জরু গরু দুই-ই হইবে। তিনি ত মাত্র চারটি বিবাহ করিয়াছেন,—তাহার ভিতর রামসঙ্করের মেয়েটা এখনও ঘর করিতেই আসে নাই—সুতরাং তিনটি হওয়াই উচিত—তাঁহার অবস্থার লোকে আটটা বিবাহ করিতে চাহিলেও কখনও পাত্রীর অভাব ঘটিবে না।

কিন্তু মুস্কিল হইতেছে এই যে এই দেহটাকেই আপাতত কোনক্রমে কানপুর হইতে সরানো যাইতেছে না। তাঁহার মনিব গ্রীনওয়ে সাহেব কাহারও কোন কথাতে কর্ণপাত করিবার লোক নন। দু-একবার যে সে চেষ্টা কালকাপ্রসাদ করেন নাই তাহা নয়, তবে সে নিতান্তই অরণ্যে রোদন। লোকটার বৈষয়িক বুদ্ধি খুব—তাহা কালকাপ্রসাদও স্বীকার করিতে বাধ্য। ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকবার দেখা গিয়াছে সাহেব 'এক বগ্‌গা-ঘোড়া'র মত কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজের দূর-দৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন। যাহাকে কুটা জাহাজ বলিয়া ভাবা গিয়াছে তাহাই কূলে পৌঁছাইয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন—সাত ডিঙা মধুকর। তবে সাংসারিক ব্যাপারে সাহেব যে শিশুর মতই অজ্ঞ, তাহাতে কালকাপ্রসাদের সন্দেহমাত্র নাই। আসন্ন ঝড়ের সংকেত সবাই পাইয়াছে, কেবল সেটা সাহেবেরই চোখে পড়িতেছে না? মেমসাহেবদেরও রীতিমত মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে, তাহা কালকাপ্রসাদ ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছেন—কিন্তু সাহেব স্ত্রীলোকের কথায় কর্ণপাত করিয়া সতর্ক হইবেন, তেমন ভরসা নাই।

অথচ সাহেব না ছাড়িলে তিনি যাইতে পারেন না। বিষম রগচটা মানুষ। দেহটা থাকিলে গরু-জরু সব হইবে, এটাও যেমন সত্য কথা—দেহটা রাখিতে তেমনি কিঞ্চিৎ রজতরসেরও দরকার। লোকে যতই বা ভাবুক (মন্দ লোকে মনে করে কালকাপ্রসাদ বেশ দুপয়সা জমাইয়াছেন!)—চারিটি স্ত্রী বহন করিয়া লোকলৌকিকতা বজায় রাখিতে এই বাজারে কত পড়ে তা যে ভুক্তভোগী সে-ই জানে। 'তনখা' ত মাত্র নাসিক ত্রিশটি টাকা, উপরি আছে তাই বড়মানুষী দেখাইয়াও কোনমতে চলিয়া যায়। জমিবে কোথা হইতে?

'ঐটি বলতে পারবনা বাপু, মাফ করো।

'মালেকান আন্দাজ ক'রেছেন যে আপনি এবার ভয় পাবেন। সেই জন্যেই তিনি আসছিলেন।...আপনার কোন ভয় নেই, আপনার ওপর তাঁর নজর থাকবে।'

'ওরে বাবা, তাঁর নিজের ওপর নজর রাখতে ব'লো। ঝড় উঠলে তিনিই বা কোথায় থাকবেন আর তুমিই বা কোথায় থাকবে—কেউ কি বলতে পারে?...না সে ভরসা আমার নেই।'

'আপনি নানা সাহেবের মুন্সীর কাজ করবেন, তাহ'লে সকল দিক রক্ষা হয়।'

'না। আমি শুধু ক'টা মাস চুপ ক'রে বসে আরাম করব আর তামাক খাবো।...বুঝেছ?...বেগমসাহেবাকে ব'লো তাঁর যখন দরকার পড়বে তখন আমি নিজেই গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াবো, কোন ভয় নেই।'

'মালেকান বলে দিয়েছেন যে যদি কোনমতেই আপনি এখানে থাকতে রাজী না হন্ ত আপনার কোন একটা ঠিকানা দিয়ে রাখতে, যেখানে অন্তত খৎ পাঠালে আপনি পাবেন।...সে ঠিকানা আমি আর তিনি ছাড়া কেউ কোন দিন জানবে না—খোদা কসম!'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

গলাটা অকারণে নামাইয়া নানকচাঁদ বলিলেন, 'গঙ্গার ওপারে বদরুকা বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানে কায়েৎ ধর্মদাসের বাড়ীতে খৎ পাঠালেও আমাকে সেই দিনই পাঠাতে পারবে। বুঝেছ?'

'জী। আদাব।'

সর্দার খাঁ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। অতবড় দেহ—কিন্তু লোকটা চলে যেন নিঃশব্দে—কতকটা বিড়ালের মত।...

নানকচাঁদ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার অপস্রিয়মান মূর্তিটার দিকে চাহিয়া থাকিলেন। একটু পরে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই ডাকিলেন, 'রাম লখিয়া।'

বুড়া নিচের দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

'আমরা আজই এখান থেকে চলে যাবো। তোমার যা দামী জিনিস গুছিয়ে নাও। মাল বেশী নেওয়া চলবে না।'

'কোথায় যাবে বাবুজী?'

'আপাতত বদরুকা। তেমন বুঝলে আরও দূর দেহাতে কোথাও।'

'বদরুকা? সেখানে কে আছে?'

'কায়েৎ ধর্মদাসকে মনে আছে? তোমার নানীর কে হয়?'

'ও, হ্যাঁ। এই গত মাসেও ত টাকা ধার করতে এসেছিল!'

'হ্যাঁ—এখন দরকার ধরে বুঝেই তাকে টাকা ধার দিয়েছিলুম। নইলে তার কী আছে—কী দেখে অতগুলো টাকা ধার দেব?...ওর বাড়ীতে থাকাই সুবিধে। দেহাত-কে দেহাত—অথচ মনে করলেই এখানে আসা যাবে।...ওর যথাসর্বস্ব তমসুক করা, তা নাহ'লে আমাকে রাখতে রাজী হ'তনা।'...

'কিন্তু লোকটা বিপদে পড়বে না ত?'

'বোধ হয় না। সে রকম বুঝলে সরে পড়ব।'

রামলখিয়ার স্তিমিত দৃষ্টিতে প্রশংসার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে যেদিন প্রথম এবাড়ী আসিয়াছে তখন এই বর্তমান মনিবের বয়স মাত্র আট। সেইদিন হইতে আজও সে উহার বুদ্ধির তল পায় না। কত আগে হইতে ভাবিয়া কাজ করে—আশ্চর্য!...

নানকচাঁদ নিজের ঘরে গিয়া লিখিবার বাক্স হইতে মোটা-দুই খেরো-বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া সযত্নে একটি কাপড়ে মুড়িয়া লইলেন। লেখাপড়া করিয়াই খাইতে হইবে যখন, তখন এগুলি ফেলিয়া গেলে চলিবেনা।

আরও কিছু কাগজ-পত্র গোছগাছ করিয়া একটি ভারী পুঁটুলি বাঁধা হইল। তাহার পর কাজ শেষ করিয়া নানকচাঁদ একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বাহিরে তখন বাতাসে অগ্নিকাণ্ড শুরু হইয়া গিয়াছে। ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহর। তাহারই মধ্যে যেন দূরে কোথায় একটা হল্লা চলিতেছে। সেদিকে কান পাতিয়া থাকিতে থাকিতে নানকচাঁদ অস্ফুট কণ্ঠে নিজেকে প্রশ্ন করিলেন, 'সত্যিই কি আংরেজশাহী যাবে? নানাই মালিক হবে? হিন্দু না মুসলমান? বাহাদুর শা? আবার সেই ঝগড়া?...কে জানে!'

(২৭)

সেদিন যে সন্ধ্যার পর হইতে শ্মশানঘাটের অদূরে একটি একটি করিয়া তিনচারটি বজরা নৌকা আসিয়া পরস্পরের সহিত ভিড়িয়াছিল, তাহাতে বিশেষ কোন অর্থ কেহ আরোপ করে নাই। কারণ গরমের সময় অনেকেই সন্ধ্যার দিকে নৌকা করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হয়। বন্ধুবান্ধবদের নৌকা এক করিয়া গান বাজনা ত বটেই, এমন কি এই ভাবে একত্র হইয়া খোশ-গল্প করাও নূতন নয়। সুতরাং বিস্মিত হইবার কোন কারণ ছিল না—অনুসন্ধিৎসু হওয়ারও না।

এই নৌকাগুলির মাঝের বড় বজরাটিতে একটা বড় ফরাশ পড়িয়াছে, সরবৎ এবং পান-তামাকেরও আয়োজন প্রভূত। তবে নাচ গানের কোন আয়োজন ছিল না। সেটা পাশের একটা মাঝারি বজরার ছাদে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একটা বেসুরো সারেঙ্গ—তাহার সহিত চপ্‌চপে তবলা—গাইয়েও জরাজীর্ণ একটি বৃদ্ধ, সম্ভবত এই তিন জন ছাড়া ইহাদের শ্রোতাও কেহ নাই।...বস্তুত আয়োজনটা গান বাজনা শুনিবার বা শুনাইবার জন্যও নয়। ইহা নিতান্তই আসল উদ্দেশ্যটাকে চাপা দেওয়ার একটা বহিরাবরণ মাত্র।

মাঝের নৌকাটিতে যাঁহারা জড়ো হইয়াছিলেন তাঁহাদের বৈঠক তখনও শুরু হয় নাই, তাঁহারা নিঃসন্দেহে অপর কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরস্পরের সহিত কথা কহিবারও প্রবৃত্তি ছিলনা তাঁহাদের—আগেভাগে আলোচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন অপর পক্ষের সহিত বোঝাপড়া করার প্রয়োজন।

ইহারা সকলে সমবেত হইবার বেশ কয়েকক্ষণ পরে প্রায় নিঃশব্দে ঘাটের ধারে তিনটি ডুলি আসিয়া নামিল। নিঃশব্দে হইলেও, বজরার ছাদে যে মাঝিটি বসিয়া ঘাটের দিকে চাহিয়া ছিল, তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। সে ঘরের ভিতর মুখবাড়াইয়া অনুচ্চকণ্ঠে শুধু বলিল, 'এসে গিয়েছেন ওঁরা।' তাহার পর একটা ডিঙ্গি খুলিয়া শুধু মাত্র 'লগি'র সাহায্যে পারে আসিয়া পৌঁছিল।

পার হইতে নৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, 'কে?

'বাবা বিশ্বনাথের সেবক।'

নিশ্চিন্ত হইয়া তিনজনেই ডিঙ্গিতে উঠিলেন। ডিঙ্গি আবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাঁধা বজরাগুলির সহিত আসিয়া লাগিল। আগন্তুকরা নামিলেন, সেই ডিঙ্গিতেই মাঝিমাল্লারা পারে চলিয়া গেল। সম্ভবত সেইরূপই হুকুম ছিল, আলোচনার সময় অপর কাহারও থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কেবল সেই মাঝারি বজরাটার ছাদে বসিয়া মেয়েরা গলায় বৃদ্ধ গায়কটি প্রাণপণে গাহিয়াই যাইতে লাগিল। তাহাদের কানে কোন কথা পৌঁছানো সম্ভব নয়, তাহারা নিজেদের মধ্যেই নিজেরা পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করিয়াই ইহাদের সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই গরমের দিনে রাত্রিবেলা ভাল গানবাজনার আভাস পাইলে অবাঞ্ছিত অপর নৌকার আসিয়া ভিড়াও আশ্চর্য নয় যে!

নৌকা হইতে বজরায় আসিয়া নামিলেন তিনজন,—নানাসাহেব, নানার ভাই বালা সাহেব এবং আজিমুল্লা। নানার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় তিনি খুব স্বেচ্ছাসুখে আসেন নাই, কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছেন। তিনি ভিতরে আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন। সবই পরিচিত মুখ—বিশেষ পরিচিত—সুবাদার টীকা সিং, নানার নিজস্ব মোসাহেব জোয়ালা প্রসাদ, ঘোড়া-ওয়ালা মদদ আলি—এককালে নানারই কর্মচারী ছিল, এখন স্বাধীন ব্যবসায় করে, কি জমাদার শামসুদ্দীন খাঁ—ইহারা প্রায় সকলেই অন্তরঙ্গ শ্রেণীতে পড়ে, তবু অস্বস্তি ঘোচে কৈ?

নানা ভিতরে ঢুকিতেই সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। নানা সাহেব নিজে বসিয়া ইঙ্গিতে সকলকে বসিতে বলিলেন। তারপর মুখে একটা কৃত্রিম প্রসন্নতা টানিয়া আনিয়া বলিলেন, 'তারপর, টীকা সিং কী খবর বলো। আজকের এ জরুরী তলব কেন?'

টীকা সিং জিভ কাটিয়া বলিল, 'ছি পেশোয়া জী! আপনাকে আমরা তলব করতে পারি! আমরা হলুম বান্দার বান্দা!...বিশেষ প্রয়োজনেই—'

'সেই প্রয়োজনটাই ত শুনতে চাইছি।'

'পেশোয়াজী, ভারতের সিংহাসন আপনার দোরে এসে ফিরে যাচ্ছে। সৌভাগ্য বার বার আসেনা মানুষের কাছে—মনে রাখবেন।'

নানা সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, 'কেন কেন ? আমি কি করলাম। তোমাদের সময় হ'লেই—'

'আপনি আংরেজদের অভয় দিয়েছেন, আপনার সিপাহীরা তোশাখানা পাহারা দিচ্ছে—এর দ্বারা কী বোঝায় বলুন !—সিপাহীরা আপনার মনের ভাব বুঝতে পারছেনা ঠিক !

নানা আরও ব্যস্ত হইলেন। কহিলেন, 'কিন্তু সে কি তোমাদেরই কাজ এগিয়ে রাখছি না ?'

'কেমন করে বুঝব বলুন। আপনি তাদের কাছে তাদের মত বলছেন, আমাদের কাছে আমাদের মত বলছেন। কোনটা আপনার মনের কথা আমরা কেউই বুঝছিনা। মাফ্ করবেন পেশোয়াজী—আমরা জংলী লোক, রেখে ঢেকে মিষ্টি ক'রে কথা বলতে পারিনা। সিপাহীরা আপনার সম্বন্ধে রীতিমত সন্দিহান। তারা বলছে আমরা এগিয়ে যাবো—পেশোয়াজী যদি ভরা-তরী ডোবান !'

'তারা কি প্রমাণ চায় ?'

'আপনি একটা খৎ লিখে সই করে দিন যে আপনি সিপাহীদের নেতা হয়ে আংরেজদের সঙ্গে লড়াই করবেন।'

'নেতা ত বাদশা। বাহাদুর শাহ আজও জীবিত।

'তাহলে আমরা তাঁর কাছেই যাবো কি পেশোয়া ? এই আপনার শেষ জবাব ? আপনার পূর্ব পুরুষের তখ্ত্ আপনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন ?'

'কেন, কেন—তাতে কি এই বোঝায় ?'

'হ্যাঁ, তা বোঝায় বৈকি পেশোয়া। বিনাশ্রমে আপনি পুরো সুবিধাটা ভোগ করবেন—তা হবে না।'

ধুন্ধুপন্থ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। খানিক পরে কহিলেন, 'বিহার এখনও চুপচাপ। কুঁয়ার সিং তাঁর মকদ্দমার ফলাফল জানবার জন্য অপেক্ষা করছেন, এখনও তাঁর টেলার সাহেবের ওপর ভরসা। এ অবস্থায় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়া কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে ?'

'বিহারও তাই বলছে। আমরাও যদি ঐ কথা বলি তাহ'লে কোনদিনই কোন কাজ হবেনা। মীরাটে দিল্লীতে শুরু হয়ে গেছে—এখন আর বসে থাকবার উপায় নেই পেশোয়া ধুন্ধুপন্থ। সিংহকে খোঁচা দিয়ে তার সামনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায়না। তাকে না মারলে সে-ই আপনাকে মারবে।···না, সময় আর নেই। চারদিকে গোলমাল দেখেছে—খবর সব পাচ্ছে ওরা। সতর্ক হ'তে শুরু করেছে। ওদের সময় দেবার আগেই শেষ করতে হবে। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকতে থাকতেই বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে, জড়ো হতে দিলে চলবেনা। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করতে পারবনা !'

আবারও একটা স্তব্ধতা নামিয়া আসিল। নানা সাহেব হাতের মুক্তার আংটিটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছিলেন। পেশোয়ার সিংহাসন—দেশ বিদেশ হইতে দূত আসিত সে সভায়, পেশোয়াদের ভ্রূকুটিতে সারা ভারত, এমন কি ইরাক ইরাণ তুর্কিস্তান অবধি কাঁপিত একদা। খুব বেশী দিনের কথা নয়, পৌরাণিক যুগের কথা ত নয়ই। হয়ত আজও সেদিন ফিরাইয়া আনা যায়—

এতক্ষণ টীকা সিং এবং নানা সাহেবই কথা কহিতেছিলেন ! এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন স্বয়ং আজিমুল্লা। কহিলেন, 'অপেক্ষা করতে পারবেন না ত কি করবেন ?'

কণ্ঠে যেন একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গেরই সুর।

নানা সাহেবের দিবাস্বপ্ন ছুটিয়া গেল। তিনিও উৎসুক ভাবে তাকাইলেন টীকা সিংয়ের দিকে।

টীকা সিং প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'তাহলে আমাদের শত্রু বলেই গণ্য হবেন নানা সাহেব ! কারণ উনি আমাদের আনুকূল্য যখন করলেন না—তখন ওঁর পক্ষে একটি দিকই খোলা রইল—আংরেজের সহায়তা করা। সে দিকটা অন্তত আমাদের বন্ধ করতে হবে বৈ কি !'

উৎকণ্ঠিত ভাবে নানা সাহেব কহিলেন ; 'কী মুস্কিল, এসব কথা উঠছে কেন ! সিপাহীদের আমি জবান দিয়েছি, আমি তাদের সর্বোতোভাবে সাহায্য করব। সে জবানের দাম নেই ? এইমাত্র টীকা সিং আমাকে পেশোয়া বলেই সম্বোধন করেছিলে না ? তা'হলে আর অবিশ্বাস করছ কেন ? আমি রাজা, তায় ব্রাহ্মণ !'

টীকা সিং নত হইয়া নমস্কার জানাইয়া কহিল, 'আমার বিশ্বাসের কোন প্রশ্নই উঠছেনা—কিন্তু সিপাহীরা আপনার দস্তখত ছাড়া মানতে চাইছেনা।'

'বেশ দাও—কোথায় কী সই করতে হবে—করে দিচ্ছি।'

টীকাসিং ইঙ্গিত করিতেই শামসুদ্দীন খাঁ ভেস্ট্-এর ভিতর হইতে একটি ইস্তাহারের কাগজ বাহির করিয়া দিল। নানাসাহেব কাগজখানি হাতে লইয়া লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতেই হেঁট হইয়া পড়িলেন। উর্দুতে লেখা একটা ইস্তাহারের মত। তাহাতে পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থ বেইমান ইংরেজদের তাড়াইয়া দেশকে আবার স্বাধীন করিবার জন্য সিপাহীদের আহ্বান জানাইতেছেন। সহজ ও সরল, অনাড়ম্বর ভাষা—কিন্তু নানাকে চিরকালের মত জড়াইয়া ফেলিবার পক্ষে যথেষ্ট!

নানা পড়া শেষ হইয়া গেলেও বহুক্ষণ সেই দিকে চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অত্যন্ত দ্রুত ভাবিতেছেন তিনি—সময় নাই। হাঁ কি না—এক মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করিতে হইবে।...আংরেজদের তিনি এই গত কয়েক বৎসরে ভাল করিয়াই চিনিয়াছেন। শত্রু হিসাবে উহারা উপেক্ষণীয় নয় আদৌ।...শেষে কি সব যাইবে? উহাদের প্রতিহিংসাও সাংঘাতিক!

অথচ—স্বর্ণ-নির্মিত মণি-মাণিক্যখচিত পিতৃপিতামহের সিংহাসন!...

আজিমুল্লা একটি দস্তাবেজ এবং কলমদান আগাইয়া দিলেন হাতের কাছে—যেন নানাসাহেবেরই ইঙ্গিতে।

নানা ধুন্ধুপন্থ একবার অসহায়ভাবে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। স্থির পাষাণের মতই অবিচল সে মুখ, নির্মম! কাহারও নিকট হইতে এতটুকু ভরসা পাইবার সম্ভাবনা নাই। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধুন্ধুপন্থ কলম টানিয়া দোয়াতে ডুবাইলেন এবং দস্তখত করিয়া দিলেন। দস্তখত করিতে করিতে তাঁহার হাত যে একবার শিহরিয়া উঠিল তাহা আর কেহ না দেখুক আজিমুল্লার দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি টীকা সিংহের মুখের দিকে তাকাইলেন। টীকা সিংহের অধরোষ্ঠে অতি ক্ষীণ একটা হাসি ফুটিয়াই মিলাইয়া গেল!

নানাসাহেব-করা কাগজখানা টীকা সিংয়ের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া কতকটা বাহাদুরীর সুরেই বলেন, 'নাও এবার হ'লত?...আর অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই আশা করি?'

টীকা সিং কাগজখানা দুই হাতে গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইল। কহিল, 'বান্দার অপরাধ নেবেন না। আমি নিরুপায়।'

নানা সাহেব একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তাহলে আমার ছুটি? চলো আজিমুল্লা!'

একসঙ্গে ডুলিতে উঠিলেও তিন জনে একসঙ্গে ফিরিলেন না। আজিমুল্লার ডুলি অন্যপথে ঘুরিয়া এক-সময় বড় পীরের দরগায় আসিয়া থামিল। ডুলিগুলির বিভিন্ন পথেই আসিবার কথা—কারণ একত্রে গেলে লোক সন্দেহ করিবে। সতর্কতার কারণেই ডুলির ব্যবস্থা, নহিলে গাড়ী ঘোড়া ত ছিলই।

দরগা তখন একেবারেই জনশূন্য। পরবের দিন নয়, ঈদের পরব বহুকাল মিটিয়া গিয়াছে—এসময় কেহ থাকিবার কথাও নয়। তবু, হয়ত অন্য কোন ইঙ্গিতেই, এমন কি ভৃত্যদেরও সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বাতিগুলিরও অধিকাংশই নিভানো।

আজিমুল্লা দরগার প্রাঙ্গণে উঠিয়া কিন্তু সেদিকে গেলেন না—একবার মাত্র হাতটা টুপীতে ঠেকাইয়া পীর সাহেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লইয়াই সেই আবছায়া আলোতে পথ দেখিয়া দেখিয়া চলিলেন উঠানের ওদিকে, পরবের দিনে যাত্রীদের থাকিবার যেসব ঘর আছে—সেই দিকে।

একটি ঘরের বাহিরে অন্ধকারে ঘনীভূত আঁধারের মত দাঁড়াইয়া ছিল সর্দার খাঁ। আজও, এতদিন ধরিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও, আজিমুল্লা একটু চমকিয়া উঠিলেন। সর্দার খাঁ অন্ধকারে সে চমক লক্ষ্য করিল না; করিলেও বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ হইত কিনা সন্দেহ, সে যেমন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে ঘরের ভিতর দিকটা দেখাইয়া দিল।

আজিমুল্লা ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন আমিনা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহীর ন্যায় অস্থিরভাবে সেই ছোট্ট ঘরটির মধ্যে পায়চারী করিতেছে। সামান্য চেরাগের আলো, কিন্তু তাহাতেই তাহার মুখের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ধরা পড়ে।

আর তেমনি হইয়াছে তাঁহার 'কুন্‌কে-শক্ত' যুগল-কিশোরটা। আজ যদি গ্রীনওয়ে সাহেবের অনুমতি না লইয়া তিনি গা-ঢাকা দেন ত অমনি সে গিয়া নানাভাবে পল্লবিত করিয়া কথাটা লাগাইবে এবং তাঁহার চাকরীটা খাইয়া নিজে গিয়া সে আসনে বসিবে তাহার পর—তাহার পরের অবস্থাটা মুন্সীজি ভাবিতেও পারেন না!...

অথচ এধারে হাওয়া ক্রমশই গরম হইয়া উঠিতেছে।

খানিকটা ভরসা ছিল যতদিন বন্ধু কানহাইয়ালাল এখানে ছিলেন। রোজ প্রত্যূষে গিয়া দুটা সুখ-দুঃখের গল্প করিয়া খানিকটা ভরসা পাওয়া যাইত। গত তিন দিন হইল—তিনিও নি-পাত্তা হইয়াছেন। লোকটা কী অদ্ভুত—একবার বলিয়া গেল না পর্যন্ত। আগের দিনও কত 'সাহুকারী' করিয়াছে, কত ভরসার কথা শোনাইয়াছে। অথচ সেদিন ভোরে গিয়া দেখেন—একেবারে ভোঁ-ভাঁ—দুয়ারে একটি ভারী পোছের দেশী তালা ঝুলিতেছে।... এদিক ওদিক কোথাও পলাইয়াছে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই—কারণ তাহা হইলে পায়াভাঙ্গা চার-পাইটা অন্তত পড়িয়া থাকিত ঁ সেটাও যখন নাই—

কালকাপ্রসাদ সেইদিন হইতে আরও অসহায় অনুভব করিতেছেন নিজেকে। যতই হউক, একের বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়। কী যে করিবেন—। গত দুই দিন ত একদম ঘুমাইতে পারেন নাই। সামনেই বকর-ঈদ পরব—বাজারে গুজব, বকরার বদলে সেদিন সাহেবদেরই কোরবানী করা হইবে। আর সেই সঙ্গে দানের সহিত দক্ষিণার মত, ওজনের সহিত কাউয়ের মত তাহাদেরও—। না, আর ভাবিতেও পারেন না। ভাবিতে গেলে মাথা ঝিম ঝিম করে—

এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ বোধ করি ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

ঈদের ঠিক আগের দিন সাহেব ডাকিয়া বলিলেন, 'সরকারের কাছে অনেকগুলো টাকা পাওনা। কালেক্টার বিল পাশ করেও দিয়েছেন, আজই গিয়ে টাকাটা নিয়ে এসো। দু দিন আবার পরবের ছুটি পড়ে যাবে নইলে।'

জয় মহাবীরজী, জয় বাবা বজরঙ্গজী।

এক আধ পয়সা নয়—পাঁচ পাঁচটি হাজার টাকা।

টাকা আদায় হইলে দুই পাঁচদিন মুন্সীর হেফাজতেই থাকে। এই টাকাটা যদি কালকাপ্রসাদ বাড়ীতেই রাখেন ত কেহ টের পাইবে না। বকর-ঈদের ঝঞ্ঝাটা কাটিয়া গেলে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। তেমন হয় ত ঐ টাকাটা লইয়াই তিনি গা-ঢাকা দিবেন। নদীর ওপারে এগারো ক্রোশ দূরে তাঁহার মাসীর বাড়ী। সে কথাটা বিশেষ কেহ জানেও না।.....সেখানেই গিয়া উঠিবেন। তাহার পর, জান বাঁচিলে ঐ টাকাটা মুলধন করিয়াই কোন কারবার শুরু করা যাইবে। এছাড়া জমি-জমা ত রহিলই। বিবিরের মধ্যেও কিছু কিছু আছে। মায়ের কাছেও কিছু পাঠাইয়াছেন। সব একত্র করিলে একরকম চলিয়াই যাইবে।

অনেক দিন পরে কালকাপ্রসাদের মুখে হাসি ফুটিল। স্নান শেষ করিয়া একটু দুগ্ধ পান করিয়া তিনি পুনশ্চ বজরঙ্গজীকে স্মরণ করিয়া ট্রেজারির দিকে রওনা হইলেন। বুড়া চাকর রামদাস এখনও কোথাও যায় নাই, তাঁহাকে ফেলিয়া সে যাইবেও না। তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন—আজ তাঁহার ফিরিতে দেরী হইবে, ফিরিয়া আর তিনি নিজে রুটি পাকাইতে বসিতে পারিবেন না। রামদাসই যেন খান-কয়েক পুরী ও ভাজি বানাইয়া রাখে। 'পাকী' খাবারে দোষ নাই, সকলের হাতেই খাওয়া যায়।

ট্রেজারীতে পৌঁছিয়া কিন্তু আবার বেশ খানিকটা ঘাবড়াইয়া গেলেন। যে সব পাহারাদারেরা ওখানে থাকে, যাহাদের সহিত যৎকিঞ্চিৎ 'জান-পছানা' আছে, তাহাদের কাহারও টিকি নাই। এ যে সিপাহীর মেলা। চারিদিকেই বন্দুক-ধারী ফৌজী সিপাহী। ইহার ভিতর নানা-সাহেবের লোকও কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাহাদের হাতেও আর আদাশোটা নাই, সব বন্দুক। মেজাজটাও—অভিজ্ঞ লোক দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিলেন, একেবারে 'মিলিটারী' কী করিবেন, ঢুকিবেন না ফিরিয়া যাইবেন—ফিরিয়া গিয়াই বা সাহেবকে কী কৈফিয়ৎ দিবেন—পাংশু বিবর্ণ মুখে যখন ইহাই চিন্তা করিতেছেন, পিছন হইতে কাহার একটা ভারী হাত কাঁধে পড়িল।

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলেন—এমন কেহ নয় বাবু নানকচাঁদ! তবু ভাল! আবার ধড়ে প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

'কী দেখছ কালকাপ্রসাদ? চুকবে, না ফিরে যাবে?'

'কিছুইত ভেবে পাচ্ছিনা উকীলসাহেব। ব্যাপারটা কি? "রাজ" পালটে গেল, না কি?'

নানকচাঁদ মুচকী হাসিয়া বলিলেন, 'কতকটা তাই বটে। তারপর? এখনও আছ তাহ'লে, আমি বলি দেহাতে পালিয়েছ কোথাও।'

'কোথায় আর পালাব বলো। কাজ কারবার ফেলে—'

'কাজ-কারবার আর কতকাল তোমারা সাহেব চালাতে পারবে মনে করো?'

'কেন বলো ত নানকচাঁদ ভাই—কী শুনছ?'

'শোনবার দরকার কি, চোখ মেলে ত্যাখোই না। সামনেই ত তিরজুটী। কালকটার সাহেবের পরোয়ানাতে আর কাজ হচ্ছে না। সুবাদার টীকা সিং হয়েছে মালিক। তাঁর হুকুম হ'লে টাকা মিলছে, নইলে মিলছে না। সিপাহীদের দয়া না হ'লে ত কেউ ভেতরে ঢুকতেই পারছে না।'

'তুমি গিয়েছিলে?'

'না। এখনও যাইনি। লালা ভগবৎরাম এসেছিলেন একটু আগে। তা তাঁরই যা দুর্দশা দেখলুম চোখের সামনে—। মোটে যাবো কিনা তাই ভাবছি।'

'তোমার পাওনা আছে কিছু?'

'সে সামান্যই। আসলে আমি হালচাল দেখতেই এসেছিলুম। ··তুমি যাবে না?'

'যাবো?'

'যাও না। ক্ষতি কি? জানে মারবে না—ভয় নেই। হয়ত একটু সন্দেহ অবশ্য দিতে পারে। আবার টাকা পেয়েও যেতে পারো। মিলিটারী মেজাজ—কখন কি ভাবে থাকে বলা যায় না ত!'

'সেই ত ভাবছি।···আচ্ছা, নানাসাহেবের সিপাহীও ত দেখছি এখানে।···তা এরা এরকম করছে মানে কি? নানাসাহেবও কি তাহলে সোজাসুজি আংরেজের দুষমনী করছে?'

'না। নানাসাহেবই ত এখন রক্ষক। এরা ত পাহারাদার, আংরেজদের হয়েই পাহারা দিচ্ছে।' সামান্য একটু ব্যঙ্গের সুর নানকচাঁদের কণ্ঠে থাকিলেও গম্ভীর ভাবেই বলেন কথাগুলা।

কালকাপ্রসাদ শুষ্কওষ্ঠে একবার জিভ্‌টা বুলাইয়া লইয়া বলেন, 'তা চলো না ভাই তুমিও একটু?'

'না ভাই। আমি বোধ হয় এখান থেকেই ফিরব। আমাকে অনেকেই চেনে।···সেদিন লালারাম মুৎসুদ্দির কী হয়েছিল জানো?'

'না ত। কী হয়েছিল?···

'ও আর ওর লোকজন কিছু টাকা নিয়ে যাচ্ছিল। নানার অনেকদিনের রাখ চিন্‌না আপ্পার ওপর—ওর ভায়েকে মকদ্দমার খরচা জোগাচ্ছিল ত আপ্পাসাহেবই—তা মনিবকে ধরতে না পেরে চাকরকেই ধর্। ব্যাস—হঠাৎ পথের মাঝে গাড়ী ঘেরাও। লালা-রাম বুদ্ধিমান লোক। সে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থেকে পড়েই পাশের ঝোপে গা-ঢাকা, লোকজনও যারা ছুটে পালাতে পারলে পালাল—যারা পারলে না, মার খেলে।···টাকা কড়ি সব লুঠ করে নিলে নানার সিপাহীরা।'

'তাই নাকি? তাহ'লে আমি ফিরি।'

'আর না না। তোমার সাহেব কি তুমি ত আর নানার সঙ্গে কোন দুষমনী কি বেইমানী করোনি। তোমার অত ভয় কি?···কত টাকার হুণ্ডী তোমার?'

'পাঁচ হাজার।'

'অতগুলো টাকা ছেড়ে চলে যাবে? দিনকাল ভাল নয় হে।···ঐ টাকাটা হাতে থাকলে—বুঝলে না, জান-বাঁচানোরও সুবিধা হবে। ওটা ত আর কিছু আদায় করেই সাহেবের দফ্‌তরে জমা দিচ্ছ না।' উচ্চাঙ্গের হাসি হাসেন নানকচাঁদজী।

'না—মানে ঠিক তা নয়—সাহেবের টাকা যখন—। তবে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ তবের কথাই বলছি।'

নানকচাঁদ একরকম তাঁহাকে ঠেলিয়াই দেন সামনের দিকে।

টাকাও অনেকগুলা, বিশেষত এই আসন্ন দুর্যোগ—আসন্নই বা কেন' সমাগতও বলা চলে।

গঙ্গামায়ী এবং সংকট-মোচনকে স্মরণ করিয়া শুষ্ক-তালু কালকাপ্রসাদ আগাইয়া যান পায়ে পায়ে।

চুকিবার মুখেই এক সিপাহী মারমুখো হইয়া তাড়া দিল, 'কেয়া মাংতা ? কাঁহা যাতে হো ?'

'এই একটা—একটা হুণ্ডী ছিল।'

'ব্যস। ঐখানে দাঁড়াও। হুণ্ডী দাও এখানে। সুবাদার সাহেব দেখবেন। যদি তিনি হুকুম দেন ত রুপেয়া মিলবে, নইলে নয়, সাফ কথা।'

'কেন—কালেক্টার সাহেব পাস ক'রে দিয়েছেন। সই-সাবুদ সব আছে।'

'কে কালেক্টার সাহেব ? ওসব আমরা বুঝিনা। ওসব জমানা চলে গেছে। টাকা চাও ত এই কানুন। নাইলে ভাগো।'

ওদিক হইতে একটি সিপাহী সামনে আসিয়া সোজা সঙ্গীনটা কালকাপ্রসাদের বুকের সামনে খাড়া করিয়া ধরিল।

'ব্যস—আর একটা কথা নয়।···দিতে হয় দাও, তার পর ঐ পাশে দাঁড়িয়ে থাকো। ডাক পড়ে ভেতরে যাবে। নইলে সোজা বাড়ীর পথে ধরো।'

হাত পা হিম হইয়া আসিতেছিল কালকাপ্রসাদের, সঙ্গীনের চেহারাটা দেখিয়াই। নিতান্ত চুপ করিয়া থাকিলে সঙ্গীন আর খাড়া থাকিবে না, বুকে আসিয়া বিঁধিবে, এই ভয়েই কাঁপিতে কাঁপিতে বিলখানা বাহির করিয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল···

প্রায় দুইদণ্ড কাল সেইভাবে বলির পাঁঠার মত দাঁড়াইয়া কাঁপিলেন কালকাপ্রসাদ—গ্রীনওয়ে সাহেবের দোর্দণ্ড-প্রতাপ মুন্সী।

তাহার পর ভিতর হইতে সুবাদার সাহেবের হুকুম আসিল, 'মঞ্জুর'।

সঙ্গীন দিয়াই ভিতরটা দেখাইয়া সিপাহী কহিল, 'যাও, সোজা খাজাঞ্চীখানায়।'

কালকাপ্রসাদ এইবার ঢোক গিলিলেন। ভিতরে গেলেই কোপ বসাইবেনা ত ? মৎলব কি ?

নেহাৎ এখন ছুটিয়া পলাইতে গেলেও বোধ হয় গুলি ছুঁড়িবে, নচেৎ তিনি পাঁচ হাজার টাকার মায়া করিতেন না। জানটাই যদি না রহিল—পাঁচ হাজার কেন, পাঁচ লাখ হইলেই বা লাভ কি ?

ভিতরে গাইতে যথারীতি টাকা গণিয়া দেওয়া হইল। পাঁচ হাজার টাকা বড় কম নহে—গিনিতে টাকাতে মিলাইয়াও অনেক। অন্য সময় হইলে এখানকার বক্সীরাই গিন্না গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসে, সেলাম করিয়া দুই আনা পয়সা বখশীষ লয়। এখন সিপাহীদের কিছু বলিতে সাহস হইল না। টাকার থলির ভারে প্রায় বাঁকিয়া কালকাপ্রসাদ কাঁপিতে কাঁপিতে ফটক পর্যন্ত আগাইয়া আসিলেন।

কিন্তু দেউড়ীতে পড়িতেই পিছন হইতে হুকুম হইল, 'রোকো।'

আবার কী রে বাবা ! কালকাপ্রসাদের কপাল হইতে ঘাম পড়িয়া চোখ লবণাক্ত ও ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে, জৈষ্ঠের খর-রৌদ্র আকাশে বেশ চড়িয়াছে, একটু পরেই হয়ত 'লু' চলিবে। কোনমতে গাড়ীটা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলে যে হয়। যদিচ সাহেবের গাড়ী, তবু সোজা নিজের বাড়ীতেই গিন্না ওঠা যাইবে, এমন হামেসাই হয়—গাড়োয়ান সন্দেহ মাত্র করিবেনা। তাহার পর···রাত্রের আঁধারে রামদাসকে লইয়া নৌকায় চড়িতে কতক্ষণ ?

এতক্ষণ কোন আশাই ছিলনা, সে এক রকম। কিন্তু টাকাটা গণিয়া দিতে দেখিয়া কথঞ্চিৎ যেন ভরসা পাইয়াছিলেন, চিন্তাগুলিও তাহাদের স্বাভাবিক গতিপথ ধরিয়া চলিয়াছিল। তাই, কিছু কিছু আশা ভরসার কথাই ভাবিতে শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু এ আবার কী হইল ?

এক জমাদার সাহেব আগাইয়া আসিলেন, 'আমাদের পাওনাটা জমা ক'রে দিয়ে যাও—'

'কিসের পাওনা ?·· বখশীষ ?' হঠাৎ কথাটা কালকা-প্রসাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই নিজের আহাম্মকি বুঝিলেন কিন্তু তখন আর উপায় কি ? হাতের পাশা ও মুখের কথা বাহির হইয়া গেলে আর ফিরে না।

'বখশীষ !' জমাদার সাহেবের মুখ কালবৈশাখীর আকাশের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, 'বখশীষকে চায় তোমার মত সাহেবের পা-চাটা কুকুরের কাছ থেকে ? আমরা কি ভিখ্-মাঙ্গা ? আমরা চাইছি আমাদের পাওনা। আমাদের তহবীলের টাকাটা দিয়ে যাও।'

'তহবীল ?'

'ইয়া-ইয়া—তহবীল। আমাদের এখন ঢের টাকার দরকার। এখানে কানুন করা হয়েছে যা টাকা লোকে আদায় করে নিয়ে যাবে, তার সিকি এখানে জমা দিতে হবে। ঐ আমাদের খাজাঞ্চী বসে আছে, ঐখানে জমা ক'রে দাও !'

পাশেই আর একজন সিপাহী দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, 'ছেড়ে দাও না জমাদার সাহেব, সাহেবের গদীতেই জমা হ'তে দাও, সবই ত আমরা পাবো।'

'সে তখনকার কথা তখন হবে। এখন যা কিছু আইন-মোতাবেক হওয়া চাই !'

এই বলিয়া জমাদার সাহেব কালকাপ্রসাদকে একটা ঠেলা মারিলেন, 'যাও, ওখানে টাকাটা বুঝিয়ে দিয়ে এসো। রসিদ চাও, রসিদও মিলবে। চোরা কারবার নেই আমাদের এখানে।'

জমাদার সাহেব নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া উঠিলেন।

শেষের ঘটনাটা একেবারে ফটকের কাছেই ঘটিল বলিয়া কয়েকপদ দূরে শিরীষ গাছের তলায় দাঁড়াইয়া থাকিলেও নানকচাঁদের কানে সবই গিয়াছিল। তিনি যেন এইটুকুর জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আর দাঁড়াইলেন না। দ্রুত সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া একেবারে সরকারী সড়কে পড়িলেন। তাঁহার নিজস্ব এক্কা সেখানেই অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি ইঙ্গিতে চালককে পিছনে সরাইয়া দিয়া নিজেই লাগাম হাতে লইলেন এবং যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে উকীলপাড়ার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ী ফাঁকা। সেই পূর্ব-বর্ণিত অর্ধবধির বৃদ্ধা দাসী ভিন্ন কেহই ছিল না। স্ত্রী পুত্রকন্যাকে বহুপূর্বেই সরাইয়া দিয়াছেন। দফ্‌তরের কাগজপত্র বাক্সে বন্ধ করিয়া দেরাতে চালান করিয়াছেন, কেরাণীদেরও দুই মাসের ছুটি দিয়া দিয়াছেন, কেবল নিজেই এখনও মায়া কাটাইতে পারেন নাই। কিন্তু এবার আর দেরী করা সম্ভব নয়।

গাড়ী হইতে নামিয়া নানকচাঁদ বলিলেন, 'ইয়ার আলি, তুমি এখন ঘোড়া খুলে দাও। তুমিও খানা পিনা করেগে। একেবারে সন্ধ্যার সময় আসবে, আমাদের ফেরীঘাটে পৌঁছে দেবে। তারপর তোমারও ছুটি। ঘোড়া নিয়ে তুমি তোমার বাড়ী চলে যেও, খবর পাঠালে আবার আসবে !'

নানকচাঁদ দরজায় আঘাত করিতেই বুড়ি রামলখিয়া দরজা খুলিয়া দিল। নানকচাঁদ ভিতরে প্রবেশ করিতে সংক্ষেপে শুধু বলিল, 'লোক আছে ওপরে !'

'লোক ! এ সময়ে আবার কে লোক ?'

বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল নানকচাঁদের। একপা পিছাইয়াও গেলেন বোধ হয়।

'সর্দার খাঁ।'

তবু ভাল। আশ্বস্ত হইলেন কিন্তু ভ্রুকুঞ্চিত হইয়া উঠিল তাঁহার। আর নয়, উহাদের জন্য ঢের করিয়াছেন তিনি।

উপরে উঠিতে দেখা গেল সর্দার খাঁ অসহিষ্ণুভাবে তাঁহার দপ্তর-খানার শূন্য ঘরে পায়চারী করিতেছে। এই লোকটিকে দেখিলে নানক চাঁদের শরীরের মধ্যে কেমন করে। এই দৈত্যের মত ভয়ঙ্কর লোকটা ভিন্ন কি আর আমিনা বেগম লোক খুঁজিয়া পায় না।

'কী খবর সর্দার খাঁ ?' কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়াই প্রশ্ন করেন নানকচাঁদ।

ভূমিকা করা সর্দার খাঁর অভ্যাস নয়। সে সোজাসুজি উত্তর দিল, 'মালেকান আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, সন্ধ্যার সময় ঐ দরজায় বুড়িকে রাখবেন।'

'তাঁকে কষ্ট করতে বারণ ক'রো, আর আমার দেখা পাবেন না।'

'জরুরী দরকার তাঁর।'

'তা হোক, আমার দরকার আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী।'

'তাহ'লে কাল ?'

'আর কোনদিনই নয়। তুমি মহাভারত পড়োনি নইলে বলতুম, আজ থেকে আমার অজ্ঞাত-পর্ব শুরু।'

'মানে—?'

'মানে আমি আজই এখান থেকে পালাচ্ছি। হ্যাংগাম না মিটলে আর ফিরব না।'

'কোথায় ?'

আজিমুল্লার পায়ের শব্দে থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, 'খবর ?'

'ভাল। সই করেছে।'

'সে কাগজ কোথা ?'

'টীকা সিংয়ের কাছে।···

'নানা বোকেনি কিছু ?'

'কিচ্ছুনা। অভিনয় নিখুঁত। আমি টুঁ শব্দটি করিনি। যা বলেছে, টীকা সিং-ই বলেছে। অবশ্য সে আপনারই শেখানো কথা। মোদ্দা বলেছে ভাল!'

আমিনার মুখের ভ্রূকুটি অনেকটা সরল হইল। সে একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস—বোধ করি স্বস্তিরই—ফেলিয়া কহিল, 'কবে নাগাদ শুরু করতে পারবেন আপনারা ?

'ঠিক বলা যাচ্ছে না। সিপাহীদের মনোভাব বোঝা কঠিন। ক্ষেপে উঠল ত ক্ষেপেই উঠল—নইলে নয়। তবে তিনচার দিনের মধ্যে আরম্ভ না করলে মুস্কিল হবে। এখন যারা ভেতেছে তারা হয়ত আবার জুড়িয়ে যাবে।'

'তিন চার দিন!' কতকটা উদ্বিগ্নভাবেই বলে আমিনা, 'সে যে বহুত দেরী। এখনও নানার ওপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই···ওকে চিনি ত, আবার সে কী করবে—

'একটু নজর রাখুন, উপায় কি ?'

'মুস্কিল হয়েছে যে ঐখানেই। নানা সাহেবও আমার ওপর নজর রাখতে শুরু করেছেন।···আচ্ছা দেখি। যাই এখন।'

আমিনা দুয়ারের দিকে দুই-পা অগ্রসর হইল।

মনে হইল আজিমুল্লা আরও কিছু বলিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলিলেন না—একটা অভিবাদনের ভঙ্গি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। আমিনা বাহিরের অন্ধকারে মিলাইয়া যাইবার পর নিজেও গিয়া ডুলিতে উঠিলেন।

তাড়া তাঁহার নিজেরও বড় কম নাই—এ কথাটা হুশেনী বেগম কবে বুঝিবে ?

(ক্রমশঃ)

ক্ষয় রোগীর আশেপাশে

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

ইতিহাস ? না, এ ইতিহাস নয়। দিগ্‌ভ্রান্ত মৃত্যু মিছিলের ছন্নছাড়া কয়েকটি মানুষের কথা। এরা হাসতে ভুলে গেছে। ভাবতে পারে না এরা এখনও মরেনি, বেঁচে আছে। মৃত্যু-পীড়িত এক একটি মানুষ। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত এদের মনোভাবও উপলব্ধি করা যায়। এরা আমাদের মত খায় পরে, কেউ কেউ চলে ফিরেও বেড়ায়, তবু আমাদের থেকে এরা কত ভিন্ন—যেন বিদেশী। এরা ভিন্ন পরিমণ্ডলের মানুষ—মৃত্যু এদের কাছে স্বতঃসিদ্ধের মত সত্য।

এক বছর পূর্বের কথা, তবু সে গতকালের ঘটনার মত আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে আছে। মার্চ মাসের শেষ গরম পড়েছে খুব, বেলা বোধ করি তখন সাড়ে বারটা-একটা হবে, দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়েছি, ঘুমও এসেছিল—এমন সময় একটানা কড়া-নাড়ার শব্দে করতে নিতান্ত বিরক্ত হয়ে বাতাসের মত টলমল করতে করতে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম দরজার বাইরে বন্ধুবর বিনয় দাঁড়িয়ে। বলতে যাচ্ছিলাম ভেতরে এসে শুয়ে পড়, কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুঝতে বিলম্ব হলো না, গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। বিনয়ের মুখখানা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে, ছলছল করছে ওর চোখ দুটো। বললাম কি হয়েছে বিনয় ?

বিনয় ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। বিনয়ের কান্না এক নিমেষে আমাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সচেতন করে দিল। বিনয়ের হাত ধরে খাটের উপর এনে বসালাম।

বিনয় নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো, টাইফয়েড থেকে উঠার পর রাণীর শরীরটা কিছুতেই ভাল হচ্ছিল না, ডাক্তারবাবু এটা সেটা করে শেষটা বললেন : একটা একসরে প্লেট নিন না। আজ প্লেট তুলে জানা গেল ওর টি, বি, হয়েছে। শুধু হয়েছে তাই নয়, ডান লাংসে তিনটে ক্যাভিটি ফর্ম করেছে এবং বামদিকে অ্যারুরো মার্ক এগিয়ে চলেছে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। ঐটুকু বাচ্চা মেয়ের হলো টি, বি ? কই পূর্বে তো শুনে এসেছি বয়স্কদেরই টি, বি, হয়, অত ছোটদেরও যে হয় এমন তো জানতাম না। কিন্তু কতটুকুই বা আমরা জানি ? এই তো সেদিন দেখলাম বছর খানেক বয়সের একটি শিশু হাঁপানির টানে টানে চোখ মুখ লাল করে শক্ত হয়ে উঠেছে। কই সেও তো পূর্বে জানতাম না—জানতাম বুড়োরাই বুকের পাঁজর দুলিয়ে দুলিয়ে বসে হাঁপায়। আসল কথা জরা-মরণের কাছে শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধের একঘর।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম : বিনয়, শান্ত হও, বিপদের মুখে বিচলিত হলে তো চলবে না। রাণী তোমার যেমন ছোট বোন তেমনি আমারও—আমাদের তার চিকিৎসার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেইটাই হবে আমাদের প্রথম কাজ।

জানি বাঁচবে না, তবু সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

ও কথা আমি মানিনে। যাক, এ নিয়ে তোমার সংগে তর্ক করতেও চাই নে—তুমি একটু বসো আমি মুখ হাতটায় একটু জল দিয়ে আসি, তারপর চল খোঁজ নিয়ে দেখি রোগের ট্রিটমেন্ট কি হতে পারে।

পথে বেরিয়ে বললাম : কাকাবাবুকে অফিসে সংবাদ পাঠিয়েছ কি ?

: না। বাসাতেও কিছু বলা হয়নি।

: খুব ভাল করেছ। সংবাদটা যতদিন সম্ভব কাকাবাবু, কাকীমা এবং রাণীর কাছে চেপে গিয়ে হালকা করে দিতে হবে। কাকাবাবুর দিকটা বিশেষ করে ভাবতে হবে, অমন হাই ব্লাড প্রেসারের রোগী, ওঁকে জানানটা এখন

ঠিক হবে না, আর জানিয়ে কাজ নেই কাকীমা এবং রাণীকে, রাণী ছেলেমানুষ, শুনলে ঘাবড়ে যাবার সম্ভাবনা ওর খুব বেশি। শুধু মাত্র সতীকে জানিয়ে নার্সিং-এ লাগাতে হবে—যাতে করে এঁটো-কাটা থেকে রোগটা আর না ছড়াতে পারে।

: দাদাও চেপে রাখতে চাচ্ছেন, কিন্তু ক'দিন চেপে রাখা সম্ভব হবে?

: একদিন সম্ভব হলেও সে মঙ্গলের হবে—প্রথম আঘাতের গুরুত্ব বড় বেশি।

খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল রিপোর্টে অসুখ যত বেশি লিখেছে, আসলে অসুখ ততো বেশি নয়। এক গ্রাম ষ্ট্রেপটোমাইসিন দু'বেলা ভাগ করে ইন্‌জেকশন নেওয়া আর দিনে ছ'টা করে পি, এ, এস টেবলেট খাওয়া, রোগীর বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা। বাড়ি রেখে ট্রিটমেন্টে কোন বাঁধা নেই, তবে বেটার ট্রিটমেন্ট যাদবপুর হসপিট্যাল বা মাদ্রাজ স্যানাটেরিয়ামে বিমুক্ত করা।

মাদ্রাজের প্রশ্ন আমরা ছেড়ে দিলাম, কেননা ছেলে মানুষ আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে দূর বিদেশে একলা গিয়ে থাকতে পারে না, প্রয়োজনের সময় আমরাও পারবো না দেখাশুনা করতে। তাই সবদিক থেকে যাদবপুরই আমাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আর্থিক দিকের। টি, বি রাজকীয় ব্যাধি, খরচও তার রাজকীয়। হসপিট্যালের পেয়িংবেডের লম্বা টাকা খরচ বাদেও বাকি থাকে ওষুধ, প্লেট তোলার খরচ এবং অপারেশনের প্রয়োজন হলে লম্বা আর এক গাদি টাকার—এক কথায় এ রোগে শুধু টাকার খেলা। বাংলা দেশে ক'জন পারে এই হাজার হাজার টাকা জোগাতে? বোধ হয় হাজারে একজনও নয়, কাজেই ফ্রি বেড চাই। দুজনে এমনই সব আলোচনা করতে করতে যখন বিনয়ের বাসায় এসে পৌঁছালাম তখন প্রায় পাঁচটা বাজে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম—সেই এক মূকরাজ্য, অতি বড় মুখর মানুষও সেখানে মুহূর্তে মূক হয়ে যায়। ঘরখানা থমথম করছে। কাকাবাবু তখনও অফিস থেকে ফেরেননি। দাদা ঘরের কোণায় বিছানার গাদার উপর ম্লানমুখে বসে আছেন আর দেওয়াল ঠেস দিয়ে নতমুখে বসে আছে সতী। কাকীমা মেঝেতে আঁচল পেতে শুয়ে চোখের পাতা দুটো তাঁর ভিজে-কোলের মধ্যে গুঁজে আছে রাণী নিজে। ইতিপূর্বে সে যে অনেক কেঁদেছে সে তার মুখে শুষ্ক জলের দাগ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল। আমার বুঝতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হলো না যে সংবাদটা আমি অন্তত কয়েকদিনের জন্যেও চেপে রাখতে চেয়েছিলাম, সে সংবাদ কয়েকটা ঘণ্টা চাপা না থেকে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। রাণীকে কাছে ডেকে বললাম: এই সন্ধ্যেবেলায় অমন মুখ ভার করে শুয়ে কেন?

রাণী অপরাধীর মত মুখ নীচু করে বসে রইলো, আমার কথার কোন জবাব দিল না। ওকে আরো কাছে টেনে নিয়ে মাথার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম: অসুখ করেছে ডাক্তারবাবুর কাছে গিছলাম ওষুধপত্রের ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি, ওষুধ খেলে ভাল হয়ে যাবে এতে আবার মন খারাপের কি আছে?

রাণী ভ্যাঁক করে কেঁদে আমার কোলে মুখ লুকাল। কাঁদতে কাঁদতে বললো: এ অসুখ কখনও ভাল হয় না, তাহলে আপনারা তো এখন থেকে আমাকে ছোঁবেন না, আমার সঙ্গে কথা কইবেন না—আমাকে পাঠিয়ে দেবেন হসপিট্যালে।

রাণীর দৃঢ় প্রত্যয়ের স্পষ্ট কথাগুলো আমাকে অতি মাত্রায় বিমূঢ় করে দিল। ও দেখেছে অন্ত একজন টি, বি, রোগীকে, যে নিঃস্ব ভিখারীর মত হসপিট্যালে মরেছে। হসপিট্যালে তাকে কেউ দেখতে যেত না। মৃত্যুর সময় যে পাশে দুটি জলভরা কাতর চোখ বা একখানা স্নেহমাখা কোমল করস্পর্শও পায়নি। এমন কী মৃত্যুর পর মৃতদেহ সৎকারেরও কোন ব্যবস্থা আত্মীয়-স্বজনদের তরফ থেকে করা হয় নি। কি সান্ত্বনা দেব রাণীকে? হয়ত আজ যে কথা জাঁকজমক করে বলবো কাল তার কোন বাস্তব মূল্য থাকবে না—সবৈব মিথ্যে হয়ে যাবে। সত্যি হলেও রাণী আজ তা কোনক্রমেই বিশ্বাস করতে পারবে না। তবু হেসে বললাম পাগলী, এ অসুখ যদি না সারে তবে এত ওষুধ-পত্র হয়েছে কি জন্যে? ডাক্তারবাবুরাই বা আছেন কি করতে? আর ঐ কথা তুই ভাবতে পারিস আদপে

তোকে দেখবো না, তোকে ছোঁবো না, তোর সংগে কথা কইবো না—তোকে হসপিট্যালে পাঠিয়ে দিয়ে দায় হাস্কিত শেষ করবো—যতসব পাগলামি চিন্তা। তবে কথা হচ্ছে প্রত্যেক অসুখের ক্ষেত্রেই সাবধান হতে হয়, যাতে করে অসুখটা আর একজনের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়তে পারে। কাকীমার কলেরার সময় ওঁর পাশ থেকে উঠে তুই-ও তো সাবান গরম জলে হাত পরিষ্কার করেছিলি। অসুখের কষ্টের কথা ভেবে সব অসুখের জন্যেই আমাদের সাবধান থাকতে হয়। আর হসপিট্যালের কথা হচ্ছে সেখানে সর্বদা সমস্ত রকম আধুনিক চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত থাকে—তবে তুই হসপিট্যালে না যেতে চাস যাবি না, এতে আর কি আছে।

এক মাস কেটে গেল। রাণী বেশ খানিকটা প্রকৃতস্থতা ফিরে পেয়েছে। আস্থা স্থাপন করতে এবং ধারণা বদলাতে পেরেছে আমাদের সম্পর্কে। হসপিট্যালে যেতেও ওর আর তেমন আপত্তি নেই। হসপিট্যালে যেতে যে ওর আপত্তি ছিল না সেটা মৌখিক। হসপিট্যাল ঠিক হতেই সে কথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমাদের মাঝখানে রাণীকে বসিয়ে নিয়ে ট্যাক্সি যখন যাদবপুরের দিকে ছুটলো, রাণীকে তখন বিদ্যুতের মত চঞ্চল, হাসি-খুশীতে ভরপুর বলে মনে হতে লাগল। কিছু পরে ওর জীবনে যে, বিরাট এক বিচ্ছেদের রাত আসছে—আমরা যে, ওকে রেখে চলে আসবো, ওযে, ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ নিয়ে একলা পড়ে থাকবে—এর কোন কথাই ওর মনে নেই। ওর চোখে মুখে রয়েছে একটা স্ফুটতর আনন্দ জ্যোতি। পথপাশের কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুলগুলোর মত, ও এই মুহূর্তে দুঃখ-বেদনা এবং পৃথিবীর সমস্ত মালিন্যের অতীতে এক আনন্দ-লোকের কিশোরী। কোথাও নেই এক তিল মনোবিকার। কিন্তু হসপিট্যালে পৌঁছাতে ষ্ট্রেচার এসে যখন ওকে আমাদের মধ্য থেকে ছিন্ন করে ওর জন্যে সংরক্ষিত বেডে নিয়ে ওকে বসিয়ে দিল, তখন ওর মধ্যে পনর মিনিট পূর্বের সে স্ফূর্তির ব্যঞ্জনা, আনন্দজ্যোতি, বিদ্যুতের চঞ্চলতা কোন কিছুই আর অবশিষ্ট রইলো না। ওকে দপ করে জ্বলে উঠে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া উল্কার মত মনে হতে লাগল।

এই মুহূর্তে ও আমাদের জগৎ থেকে ছিন্ন উৎপাটিত—ও আর আমাদের কেউ নয়। আশেপাশে আরো কয়েকখানা মুখ দেখলাম, তারাও রাণীর ক্ষুদ্র বৃহৎ সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এরা জীবন-মৃত্যুর সন্ধির স্থল থেকে পা তুলে মৃত্যুর মুখে পা ফেলতে চলেছে—এরা সব এক গোত্রের।

মৃত্যুর পংক্তি ভোজে যে, হাসি বা বৈচিত্র্য একেবারেই নেই তা ঠিক নয়। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে বৈচিত্র্য কিঞ্চিৎ থাকবেই। মৃত্যুর কালিপড়া ছায়ামলিন মুখেও হাসি না দেখেছি তা নয়। তবে সে হাসিতে অন্তরের যোগ প্রাণের স্পর্শ পাইনি। যে হাসি মানুষের জীবনের বড় সম্পদ সে হাসি এখানে পদে পদে খণ্ডিত। মৃত্যু তো চিরন্তন সত্য, তা বলে কি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম ত্যাগ করে, আনন্দ সুখ বিসর্জন দিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছি? তা হলে তো জগৎ-সংসার বহুদিন পূর্বেই অচল হয়ে যেত, সৃষ্টি যেত থেমে। কেন তা হয় না—মৃত্যুর পদধ্বনি ওখানে দূরাগত, সে কানে তেমন করে পৌঁছে না—অন্তর স্পর্শ করে না, কিন্তু ক্ষয়রোগীদের কানে মৃত্যুর নূপুর-নিক্কণ প্রতি মুহূর্তে ধ্বনিত হচ্ছে, বুকের মধ্যে যন্ত্রণার বিরাট আলোড়ন আর প্রতিপদে ডাক্তারবাবুদের এটা নয় ওটা নয়—হসপিট্যাল পত্রিকা 'নবজীবন' এর যে কোন এক সংখ্যা খুললে দেখা যায় রোগীদের নানারূপ প্রশ্নের উত্তরে শুধু না আর না। এই একটানা না, নার মধ্যে পড়ে রোগীদের জীবনগুলোই না-ময় হয়ে পড়েছে।

হসপিট্যাল জীবনের প্রথম দিকে রোগী তার চারপাশে শয়নে-স্বপনে শুধুই মৃত্যুর কালো ছায়া দেখে। আশে পাশের রোগীদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে সে বুঝতে চেষ্টা করে সত্যি তার বাঁচবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি না? আদৌ কেউ ভাল হয় কিনা? যদি হয় তবে কত দিনে এক এক জন ভাল হয়? সবার অপারেশন্ হয় কিনা? আমার এই বেড থেকে পূর্বে কতজন মরেছে? কত জিজ্ঞাসা—তা সব লেখা-জোখা চলে না।

আর যাঁরা পুরানো রোগী তাঁরা আসেন—নবাগত অতিথির কাছ থেকে বাইরের দুনিয়ার খবরাখবর হাল-চাল বুঝে নিতে। ঐ সঙ্গে হসপিট্যাল সম্পর্কে নবাগতকে অবহিত করে দিতে। তাঁরা অভিভাবক সেজে নবাগতকে

এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে অনেক অযাচিত উপদেশ দিয়ে যান।

এত কথা বলতে পূর্বে আমি কখনও মেয়েদের দেখিনি। মেয়েরা যে এত প্রগল্‌ভ হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কথা বলার জন্ত এদের এ ব্যাকুলতা কেন? তাঁদের আশেপাশে কত রোগী, তাঁদের কথা বলার লোকের অভাব হওয়ার তো কথা নয়। বছরের পর বছর ভিন্ন জাতের ভিন্ন ধর্মের এমন কি ভিন্ন জগতের লোকও যদি এক সংগে পাশাপাশি বাস করে, তা হলেও স্বাভাবিক কারণে তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবেই। আর এঁরা তো প্রায় সবাই বাঙালীর ঘরের মেয়ে-বৌ। আসল কথা, কথা বলার লোকের অভাবের জন্ত এরা প্রগলভ, তা ঠিক নয়, আসলে এঁরা বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলে ক্ষণিকের জন্ত উপলব্ধি করে নিতে চান যে, তাঁরা এখনও বেঁচে আছেন মরেন নি কিন্তু নিজেদের পরিমণ্ডলের বাইরের লোকের সংগে কথা বলবার সুযোগ ওরা খুবই কম পান, এমন কি অনেকে আদৌ পান না। তাই মরিয়া হয়ে আসেন গায়ে পড়ে কথা বলতে চান জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ হতে।

রোগীদের কারো বাড়ি থেকে সপ্তাহে একদিন, কারো বা মাসে একদিন দেখতে আসেন; আবার এমন রোগীও বিরল নন, কস্মিনকালে যাঁদের বাড়ি থেকে কেউ তাঁদের দেখতে আসেন না। কাজেই এঁরা যদি কথা বলার জন্তে ব্যাকুল হন, তাহলে তো এঁদের দোষ দেওয়া চলে না।

ঐ প্রগলভতার মূলে আর একটা কারণ আছে বলে মনে হয়—সুস্থ হয়ে তাঁরা তাঁদের পূর্বের সামাজিক জীবন ফিরে পাবেন কিনা এই জিজ্ঞাসা। তাঁরা চান একটা আঁচ নিতে পরবর্তী জীবনটা তাঁদের কেমন হবে, কোথায় হবে সংসারে তাঁদের স্থান। এ জিজ্ঞাসা মনে জেগেছে তাঁদের রোগের প্রথম অবস্থার স্মৃতি থেকে। রোগা দেহে বাড়িতে এবং হসপিটালে আত্মীয়-স্বজনের রূঢ় অবহেলা পুনর্জন্ম লাভের আনন্দ থেকে এঁদের অধিকাংশকে অতি নির্মমভাবে বঞ্চিত করেছে। বেঁচে উঠলেও এঁরা বিন্দুমাত্র সুখী নন। এদের সমস্ত ভবিষ্যৎটা ঘৎপরোনাস্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে সবাইকে যে, ঐ একই ক্যাটেগরিতে ফেলা যায় তা বলছি না। তবে উপেক্ষাটা কমবেশি হলেও প্রায় মিথ্যে নয়। আর বিশেষ করে বিবাহিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে ঐ উপেক্ষাটা বহুলাংশে সত্য। তাই এঁদের বাঁচার আনন্দ নেই, সুখ নেই—শুধু বেঁচে যে আছেন এই একান্ত সত্যটাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করবার জন্তে একটা কিছু চাই—সেইটাই বোধ হয় প্রগল্‌ভতা।

সাড়ে ছ'টার ঘণ্টা বেজে গেল। আমরা উঠে পড়লাম, কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরুতে পারলাম না। আসন্ন সন্ধ্যার ধূমল রেখা তখন ঘন হয়ে এসেছে—এমনি সময় বাঈর পাশের ঘর থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। বয়স বোধ করি তাঁর বছর কুড়িক হবে। তিনি বিবাহিতা। বারান্দার আলোটা জেলে, ঘরের দরজায় অঞ্জলি করে জল ছিটিয়ে দিলেন। ঘর থেকে একটা প্রদীপ এবং ধূপ আনিয়ে এনে, বারান্দার রেলিং এর পাশে রাখা টবের তুলসী গাছটার তলে প্রদীপটা রেখে, ধূপটা ক'বার ঘুরিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করলেন। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সব কাণ্ডটা দেখছিলাম; কাকাবাবুও। ভদ্রমহিলা চলে যেতে কাকাবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন বাঙালীর মেয়ে।

বারান্দা পার হয়ে আমরা মৌন হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। 'বাঙালীর মেয়ে' শব্দ দু'টি যে, আমার মনে বিন্দুমাত্র অনুরণন তোলেনি তা নয়, কিন্তু তবু আমার চিন্তায় তখন ঐ কথার প্রাধান্ত ছিল না। আমার তখন খুঁটিনাটি করে মনে আসছিল অল্প কয়েক দিন দেখা তাঁর রূপটা। ভদ্রমহিলাকে ক'দিন থেকেই আমার ভিন্ন জগতের বলে মনে হচ্ছিল। তিনি যেন ঠিক এখানকার রোগীদের জগতের নন। এবং তাঁর আজকের এই আচরণটা আমার ধারণাকে আরো দৃঢ়—সুসংবদ্ধ করে দিল।

হস্পিট্যালে দু-জাতের রোগী আছেন। এঁদের নাম দেওয়া যায় বেড পেশেণ্ট আর হাঁটা-চলা রোগী; অর্থাৎ কিনা একদল বিছানার থেকে নামার অনুমতি পান নি, আর অন্তদল ওয়ার্কিং—গণ্ডিবদ্ধ এলাকার মধ্যে হাঁটা-চলার অনুমতি পেয়েছেন। নবাগত আর অসুখ যাঁদের বেশি তাঁরাই বেড পেশেণ্ট।

ওয়ার্কিং যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা এখন ওখন করেন, রেডিও চালান, বারান্দায় বসে বেঁধে বসে গল্প করেন, তাস খেলেন, লাইব্রেরির বই এনেও পড়েন। এঁদের মধ্যে জীবনের কানোলিনী কুলপ্লাবিনী জোয়ারের অভিব্যক্তি নেই ঠিক, তবু জোয়ারের একটা পূর্বাভাস মেলে। পূর্বোক্ত ভদ্রমহিলা জাত বিচারে দ্বিতীয় জাতের অর্থাৎ ওয়ার্কিং পাওয়া পেশেন্ট, তবু তাঁর মধ্যে জীবন-জোয়ারের সামান্যতম পূর্বাভাসও নেই। ইনি সামনে গুনটেনে চলেছেন।

ওঁকে আমি হাসতে, কারো সংগে অধিক কথা কইতে, বারান্দায় অন্তত ভ্রমণে কস্মিন কালে দেখিনি। দেখেছি মাত্র কালে ভদ্রে এঁর, ওঁর ঘরে গিয়ে একেবারে অনাহূতের মত বসে থাকতে—তাও ক্ষণেকের জন্যে। পূর্বে যে প্রগল্‌ভ মেয়েদের কথা বলেছি ইনি সে দলেরও নন। ওঁর জগৎটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বছর মধ্যেও ওঁকে খুঁজে নিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। সংসার মাকে থেকেও নেই, কিন্তু কেন?

গাড়িতে বসে আমি বহুভাবে বিশ্লেষণ করেও ঐ কেনর কোন জবাব খুঁজে পাইনি। জবাব পেয়েছিলাম পরদিন হস্পিট্যালে গিয়ে রাণীর কাছে সব কথা শুনে।

রাণী বল্‌লো: কাল যাঁকে তুলসী তলায় প্রদীপ জেলে, ধূপ ধরিয়ে দিতে দেখেছিলেন, ওঁকে দেখলে সত্যি বড় কষ্ট হয়। ওঁর অসুখ হওয়ার পর থেকে ওঁর শ্বশুর বাড়ির কেউ, এমনকি ওঁর স্বামী পর্যন্ত ওঁর সংগে কথা কইতেন না, ওঁর ঘরে যেতেন না—এমনি করে ছ-সাত মাস বাড়িতে কাটার পর ওঁকে হস্পিট্যালে দেয়। প্রথম প্রথম দু-একদিন স্বামী আর শাশুড়ী এসেছিলেন, এখন আর তাও আসেন না। আসে মাঝে মাঝে ওর ছেলে মানুষ রোগা একটা ভাই।

শেষ ওর শাশুড়ী এসেছিলেন তিন-চার মাস পূর্বে। এসে বল্‌লেন: বৌমা কেমন আছ।

: ভাল।

: জ্বর কাশি তো একই রকম আছে?

: জ্বর কমেছে আর কাশি মোটেই নেই। ডাক্তারবাবু বলেছেন, আপনি খুব শীঘ্র ভাল হয়ে যাবেন।

শাশুড়ী অত্যন্ত জ্বলে উঠলেন। বললেন: ওসব তোমার বানান মিথ্যে কথা, আমাদের সব মারবার ফন্দি। অসুখের গোড়াতে থেকেই দেখে আসছি, জানি তো সব। ব্যস্, ঐ শেষ। এখন একখানা চিঠি পর্যন্ত দেন না। গতকাল যে কেনর উত্তর মেলেনি আজ এই মুহূর্তে সেই কেনোর উত্তর আমার কাছে অতিমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভদ্রমহিলার সমস্ত আচরণের একটা ব্যাখ্যা পেলাম।

ভদ্রমহিলার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল, তাঁর এ অসুখ মস্ত বড় একটা সামাজিক পাপ—কলঙ্ক বিশেষ এবং এর জন্যে মুখ্যতঃ তিনি নিজেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। ঐ চিন্তা থেকে তাঁর মনে আরো একটা সংক্ষয় উপস্থিত হয়েছে, তাঁর অসুখের জন্যে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকদের মত অন্য সবাই বুঝি তাঁকে বিকট ঘৃণা করে, তাই তিনি সদাসর্বদা এড়িয়ে চলেন মানুষের ছোঁয়াচ। আজ এই মুহূর্তে ডাক্তারবাবুর আশ্বাসে তাঁর মনে যে, ক্ষীণ নবজন্ম লাভের আশা জেগেছে, সেখানে যদি উপেক্ষার আঘাত লাগে, তবে আর সান্ত্বনার তিলমাত্র আশ্রয় থাকে না। তাই মন তাঁর সর্বদা শংকিত আড়ষ্ট। ব্যাকুল হয়ে আশ্রয় খুঁজছে, কিন্তু কোথায় আশ্রয়। কি জানি তুলসী গাছের মধ্যে কোন আশ্বাস মিলেছে কিনা?

রাণীর পাশের বেডে একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি অতিমাত্রায় প্রগল্‌ভ না হলেও, নেহাত কমও ছিলেন না। গায় পড়ে উনি অনেক সময় কথা কইতেন। প্রথম দিন আমরা রাণীকে নিয়ে যাওয়ার কিছু পরে উনি অনেকটা স্বগত ভাবেই বল্‌লেন: সিটটা খালি ছিল, ক'দিন একলা আছি, মনটা কেমন খাঁ-খাঁ করছিল, ভাবছিলাম একটা পেশেন্ট এলে মন্দ হয় না—ভগবান ঠিক মিলিয়ে দিয়েছেন। আমি বেশ ভাল করেই জানি কথাগুলোয় কাকীমা, সতী, দাদাবাবু সবাই বেশ একটু বিরক্ত এবং ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। দাদাবাবুর বিরূপতাটা অবশ্য অল্প দিন পরে কেটে গিছল, কিন্তু অন্যদের কোনদিন কাটেনি। প্রথম প্রথম কেউতো ওঁর সংগে কথাই কইতেন না, কিন্তু উনি ঠিক বলে যেতেন। কথা বলার সে কী ব্যাকুলতা। এর মূলেও ছিল ওঁর আত্মীয় স্বজনের সচেতন পরিহার। মা-ভাই-স্বামী মিলিয়ে সপ্তাহে একদিনের বেশী কেউ আসতেন না।

সেদিন সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় এলেন ওর এক ভাই। বেশ লম্বা-চওড়া দুলবাবু গোছের লোক। দু-একটা অতি সাধারণ কথার পর ভদ্রমহিলা বললেন : মাঝে মাঝে এলে তো পারিস্—এই কত দিন পরে এলি বলতো।

: এখানে আসবো কি বুক ভরে মরণ নিয়ে যাওয়ার জন্যে? এটা কি প্রমোদ-উদ্যান যে, সকাল-বিকেল এসে একটু হাওয়া খেয়ে যাবো? কে রোজ রোজ এই মৃত্যু পুরীতে আসতে চায় শুনি। আমি আসি, আমার কিনা প্রাণের মায়া নেই তাই। আর হ্যাঁ, আমরা এলে কি তোমার বুকখানা জুড়িয়ে যায়, রোগের উপশম হয়, আর না এলেই বুঝি বুকখানা জলে পুড়ে খাক হয়ে যায়—তা তো আর নয়। বেশ তো বাপু দিব্য আরামে খাচ্ছ-দাচ্ছ, শুয়ে আছ।

ঘরের মুক্ত বাতাসটা এক নিমেষে কেমন ঘোলাটে মত হয়ে এলো। ভারি হয়ে উঠলো রাণীর মুখখানা। কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছলেন ভদ্রমহিলা। আমার মধ্যে কেমন যেন একটা শিভ্যালরীপনা জেগে উঠলো, ইচ্ছে হলো এক চড় মেরে ভদ্রলোকের কণ্ঠটা রুদ্ধ করে দিই।

পরদিন হস্পিট্যালে গিয়ে রাণীর কাছ থেকে দরকারি কথা জেনে নিয়ে সোজা ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করলাম : কেমন আছেন?

: ভালই।

: আচ্ছা আপনার অসুখটা কি খুব বেশি! প্রায় দু'মাস আছেন অথচ আপনাকে খাটের উপরেও উঠে বসতে দেয় না, আর রাণী আমার এক সপ্তাহ পেরোবার পূর্বেই ওয়াকিং পেয়ে গেছে।

: অসুখ আমার রাণীর মতই কম ছিল। জ্বর, কাশি ছিল না—ছিল এক বুকে অল্প একটু অসুখ এই মাত্র। কিন্তু এখানে এসে কাশি খুব বেড়ে গেছল, অবশ্য এখন আর তেমন বেশি নেই। রক্তও মাঝে একদিন উঠেছিল, তাই বোধ হয় আমাকে উঠতে দেয় না আর বয়সটাও তো আমার ওর থেকে ঢের বেশি।

সবই যুক্তি সংগত কথা। বললাম : এখন আর রক্ত ওঠে না?

: মাত্র একদিন উঠেছিল।

: জ্বর হয় না?

: না।

কয়েক দিন পরের কথা, নার্স এসে জ্বর দেখে থার্মোমিটার ঝেড়ে দিতে গেলে, ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন : কত দেখলেন?

: সাড়ে নিরানব্বই।

: তবে তো এক রকমই আছে।

: হুঁ।

আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগল। সেদিন ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন : ওঁর জ্বর হয় না, অথচ আজ সাড়ে নিরানব্বই শুনে বললেন : তবে তো একই রকম আছে—আশ্চর্য বটে।

একজন নার্সের সংগে কয়েকদিন যাতায়াতে একটু পরিচয় হয়েছিল, তাঁকে কাঁকা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ ভদ্রমহিলার অসুখ তেমন বেশি নয় তবু আপনারা ওঁকে ওয়াকিং দেন না কেন?

নার্স ভদ্রমহিলা একটু হেসে বললেন : কে বললে আপনাকে ওঁর অসুখ কম? ওঁর কাশির ঠেলায় আপনাদের পেশেন্ট দিনে-রাতে ঘুমাতে পারে না। এক বুকে তো ওঁর কিছু নেই—শেষ হয়ে গেছে—অন্য বুকের অবস্থাও ভাল নয়। তা বাদে ঘোলা ঘোলা রক্ত তো রোজই উঠছে, জ্বর খুব বেশি কমলে সাড়ে নিরানব্বই পর্যন্ত নামে—এমন পেশেন্টকে কি উঠতে দেওয়া চলে?

বটে! তবে উনি সেদিন আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলেন? কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল ঐ মিথ্যে ছলনা টুকুর? হ্যাঁ প্রয়োজন ছিল বই কি। ঐ ছলনা টুকুর প্রয়োজন ছিল। একে ওঁর খারাপ অসুখ তাতে আবার খুব বেশি শুনলে যদি সবাই ওকে খুব ঘৃণা করে, কথা না বলে। একথা ভাবাও ওদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর। তাই একান্ত ভাবেই লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন ত সমান বিশিষ্ট অসুখটার কথা।

বয়স পঞ্চাশ পার করে দেহ-মনে একটু ঠাকুরদা ভাব না এলে গল্পের শ্রোতা মেলে না—গল্পও জমে না। তাই আমাদের গল্প জমে না, মেলে না একাগ্র শ্রোতা—দাদাবাবুর জমে, সৃষ্টি করে এক উন্মুখ আগ্রহ।

সেদিন দাদাবাবুর গল্প এক রোমাঞ্চকর মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা সবাই তন্ময় হয়ে শুনছি। ঠিক এই সময় এক ভদ্রমহিলা এসে দরজার বাইরে দাঁড়ালেন। পূর্বে তাঁকে কোনদিন দেখিনি। বয়স তাঁর ত্রিশের কাছা-কাছি হবে। ছন্দসৌষ্ঠবহীন দেহটা তাঁর ছিল বেশ মেদ বহুল। নামটা তাঁর যেন শোভনা শুনেছিলাম বলেই মনে পড়ছে। তবে তিনি শোভনাই বটে।

ভদ্রমহিলা রাণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি নূতন এসেছ? তোমার অসুখ তো শুনেছি খুব কম, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে। এই দেখ আমি ভাল হয়ে আজ চলে যাচ্ছি। হয়তো শুনে থাকবে আমি সাড়ে চার বছর ছিলাম তা বলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমার অসুখ ছিল খুব বাড়াবাড়ি, তাও দেখ ভাল হয়ে গেলাম। আচ্ছা চলি। গাড়ির সময় হয়ে গেল অথচ এখনও আমার কিছুই গোছ-গাছ করা হয়নি। যদি কোলকাতার বাড়ি যেতাম কোন ভাবনাই থাকতো না— যাচ্ছি সেই হাজারিবাগ। বাবা ওখানে বাসা নিয়েছেন, এখন ওখানেই কিছুদিন থাকবো, তারপর যাব পুরী, সেখান থেকে কোলকাতায় ফিরে একদিন বেড়িয়ে যাব কেমন।

ভদ্রমহিলা এসে ভূমিকাবিহীন বেশ কিছু ভাল কথা শুনিয়ে গেলেন, কিন্তু এদিকে আমাদের গল্পের তাল কেটে একেবারে বেতাল হয়ে গেল। গল্প সেদিন আর জমলো না।

অল্প পরে রাণীর ধাই এসে বললো: শোভাদি চলে যাবে, ঐ দেখ ওরা সব কাঁদতে যাচ্ছে।

কথাটা আমার কাছে কেমন যেন কৌতুকপূর্ণ বলে মনে হলো। বারান্দায় চেয়ে দেখি সত্যি একদল রোগী চলেছে। আমি বৃদ্ধা ধাইকে প্রশ্ন করলাম: কাঁদতে যাচ্ছে মানে?

: উনি হস্পিটালে আছেন মোট সাড়ে চার বছর। প্রথম দেড় বছর ছিলেন কাঁচরাপাড়ায় এবং শেষের তিন বছর এখানে। সবার সংগেই ওঁর জানা শোনা। চলে যাবেন বলে ক'দিন থেকে নার্স, ধাই এবং পেশেন্টদের খুব খাইয়েছেন। আর বলেছেন: 'আমি যে তোমাদের এত ভালবাসি, তোমরা আমাকে কেমন ভালবাস সেটা বুঝবো যাওয়ার দিন, আমার জন্যে তোমাদের মন খারাপ করে কিনা, চোখে জল আসে কিনা দেখে।' তাই সব দল বেঁধে গেল চালাই কাঁদতে। কিন্তু যারা কাঁদতে গেল তারা উনি গেলেই বাঁচে। কি জ্বালাতনই না এই তিন বছর ধরে করেছেন।

সব শুনে আমি বেশ একটু অবাক হোলাম। ভাবতে লাগলাম ভদ্রমহিলার হঠাৎ এখানে আগমন এবং বাক-চাতুর্যের কথা।

যাঁরা কাঁদতে গিছলেন, তাঁরা অল্প পরে খুব হাসাহাসি করতে করতে ফিরে এলেন, ওঁদের কথা-বার্তা থেকে আমি ভদ্রমহিলাকে বেশ নিখুঁৎ ভাবে চিনে ফেললাম।

একজন বললেন: আজ হস্পিটাল জুড়োলো। এই ক' বছর ধরে ডাক্তার, নার্স, ধাই থেকে আরম্ভ করে পেশেন্টদের পর্যন্ত অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

আর একজন বললেন আলাবার জন্যেই তো এক বছর পূর্বে ছুটি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাড়ি যায় নি। কত ছলনা করেই না এই একটা বছর কাটিয়েছে। ছুটি হওয়ার পর প্রথম বলল: ডাক্তারবাবু, না আমার অসুখ এখনও সারে নি, শরীর দেখুন কত খারাপ, বুকটাও ব্যথা ব্যথা করে।

ওর বুক ব্যথা, শরীর খারাপ এ আর কিছুতেই সারে না। ডাক্তারবাবু দু-তিন মাস ধরে ও কিছু না, কিছু না বলে শেষটা বিরক্ত হয়ে বললেন: 'এখন আপনার যা অসুখ ও বাড়ি গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কিছুদিন থাকলেই ভাল হয়ে যাবেন।'

ও কিছুতেই বাড়ি যাবে না। ডাক্তারবাবুর অত চাপাচাপির ফলে, ও একদিন দাঁতের গোড়া থেকে চুষে চুষে রক্ত এনে থুথুর সংগে ফেলে রেখে, ডাক্তারবাবু এলে দেখাল। ডাক্তারবাবু অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। বাড়ির থেকেও কেউ আসেন না যে, তাঁকে বলবেন। কি আর করেন, শেষটা ওর শ্বশুরবাড়ি এবং বাবাকে চিঠি লিখলেন, 'শোভনার আর কোন অসুখ নেই, কিন্তু মন থেকে অসুখের ভাবটা এখনও যায়নি, এ অবস্থায় আর অধিক দিন এখানে থাকলে রোগাতংকেই ওর মৃত্যু হবে। তা যদি আমরা এখানে আর রাখতেও পারি নে, আপনারা না নিয়ে

গেলে আমাদেরই পাঠিয়ে দিতে হয়।' তাই এবার ও আর না দিয়ে পারলো না।

আর একজন বললেন : ও এখানে অমন করে পড়ে থাকবো কেন, আমার তো এক মুহূর্তের জন্যেও এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না।

: কি জানি। বোধ হয় স্বামীর সংগে তেমন বনিবনাও হয় না। স্বামীকে তো এখানে কখনও আসতে দেখিনি।

: কিন্তু চিঠি তো দিতো।

বাড়ি না যেতে চাওয়া, সবার উপর আধিপত্য বিস্তার করার প্রয়াস এবং যাওয়ার দিন কাঁদতে ডাকার অর্থ আমি বুঝি।

এ সবের মূলে ছিল বাড়ির লোকের উপেক্ষা এবং ঘৃণা। বাড়ি গেলেই হয় তো একটা উপেক্ষা আর অবহেলা তাঁর চারি পাশে পাঁচিল তুলে ঘিরে রেখে। শোভনা তার কাল-রোগ সেরে বাড়ি এসেছে, এ কথা তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। হয়ত শ্বশুর বাড়ি থেকে এখনি ওঁকে বাড়ি ঠাঁই দিতেও রাজি নয়। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করে উনি নিজেকে এখানে ছোট করতে পারেননি, পারেননি আঁকড়ে ধরা আশ্রয় ছেড়ে শুন্যে লাফ দিতে।

স্বামীর সংসারে প্রভাব প্রতিপত্তি হারানোর কল্পনা উনি করতে পারেন না। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি যে, কণামাত্র হারায়নি তাই প্রমাণ করবার জন্যে তিনি এখানে একটানা প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইতেন, এবং তাঁকে যে সবাই এড়িয়ে চলতে চায়, এই আশংকা থেকেই তিনি তাঁর চারপাশের সকলের কাছে তাঁদের নির্ভেজাল ভালবাসা দেখবার দাবি করতেন। এই ভালবাসার নিদর্শন থেকে তিনি বুঝে নেন, অন্যের মত নিশ্চয় তাঁর আত্মীয়-পরিজন তাঁকে ভালবাসবে ; এমন কি এখনও বাসে।

আমার এই সিদ্ধান্ত যে সত্য, সে আর একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বেশ স্পষ্ট হয়ে যাবে। ভদ্রমহিলার বাবার এবং শ্বশুর বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল, শরীরও তাঁর বিন্দু-মাত্র খারাপ নয়, অথচ বাপের বা শ্বশুর বাড়ির কোথাও না গিয়ে বাবার সংগে একলা যাচ্ছেন হাজারিবাগ, এর থেকে কি একথা যথেষ্ট পরিষ্কার হয় না যে, ওঁর জন্যে বাড়ি এখনি স্থান ছেড়ে দিতে নারাজ ? এখনও বেশ কিছুদিন ধরে ওঁকে নীরোগ দেহের পরীক্ষা দিতে হবে। তবেই হয়ত বা কোথাও একটা আশ্রয় মিললেও মিলতে পারবে। কিন্তু যে যায় সে আর ফিরে না, সে চিরদিনের জন্যেই যায়।

মিটিং বসেছে। একেবারে রাণীর দরজার পাশে। কিন্তু যে মিটিং-এর সংগে আমরা অতিমাত্রায় পরিচিত, এ তেমন মিটিং নয়। তিনখানা চেয়ার, বক্তা তার একখানায় একলা উপবিষ্ট। বাকি দু-খানা দু-জন করে চারজন দখল করেছেন ; আর জন আষ্টেক চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে। আলোচ্য বিষয়টি অতি আধুনিক এবং মুখরোচক। বক্তার চোখে মুখে একটা পরিষ্কার উজ্জ্বল দীপ্তি, বচনভঙ্গিও বেশ চাতুর্য পূর্ণ, বয়সেও তিনি নবীনা। বক্তার নামটা যদিও আমি জানি না, তবে আমি তাঁর নাম দিয়েছি অন্তরা। মোট কথা আসরটা যে বেশ ভাল জমবে সে বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নেই। আর হলোও তাই।

বক্তা বলছেন : ম্যাট্রিক, আই, এ, কিংবা বি, এ, পাশ করে ৭৫৲ টাকা থেকে ১৫০৲ টাকা অংকের যে কোন একটা কাজ পেলে আজকালকের যুবকগুলোর বিয়ে করা চাই। কেন ? বিয়েটা কি না করলেই নয় ? বিয়ে না করতে পারলে কি এদের জীবনটা ঊষর মরুময় হয়ে যায়, আর বিয়ে করলেই রাজপদ প্রাপ্তি ? বিয়ে করবার আগ্রহ আছে কিন্তু জীবন সুন্দর, সার্থক করবার চেষ্টা নেই। চাকরি পেলেই এরা বিয়ে করবার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। অথচ এরা চাকরি পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কত বড় বড় আদর্শের কথাই না শুনিয়ে এসেছে। 'বিয়ে! কমপক্ষে মাসিক পাঁচশ' টাকা আয়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে, কোন দিন বিয়ের কথা ভাববোও না। বিয়ে করলেই তো হলো না। পরের মেয়েকে ঘরে এনে তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারবো না, ছেলে-মেয়েদের মুখে একটু দুধ দিতে পারবো না, লজ্জা নিবারণের কটি-বস্ত্র মাত্র সংগ্রহ করতে পারবো না, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্যে কানাকড়ি পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবো না—তবু বিয়ে করতে হবে।' কিন্তু এসব বড় বড় কথার ধার কেটে যায়, একশ' টাকা মাইনের একটা চাকরি পেলে। সেই চাকরি জোটা ব্যস্ অমনি বিয়ে করা। তখন পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে কেউ কিছু বললে জবাব আসে কি করবো মায়ের মুখ চেয়ে শেষটা

বিয়ে করতে হলো। মিথ্যে কথা, না এখানে শিখণ্ডী মাত্র। প্রেরণাটা থাকে অন্যত্র।

ধরে নিলাম দেড়শ' টাকা মাইনের চাকরি। বুড়ো মা-বাবা, ছোট ভাই-বোন, নিজে আর স্ত্রী, খাবে কি শুনি? তবু বিয়ে করা চাই? ফল হয় কি? সবক'টা তিলতিল করে মরণের পথে এগিয়ে যায়। সাবসটেনসিয়াল ফুড তো দূরের কথা, একেবারে জোলোডাল, ভাজাও তার কোনদিন জোটে না। অবশ্য যাদের এখানে বাড়ি-ঘর আছে তারা তবু একটু পরে আছে আর ও বালাইটুকুও যাদের নেই, জলেডোবা, কাদা-বজবজে বস্তি বাড়িতে এগার টাকা করে বাইশ টাকার দু'খানা ঘর, তার মধ্যে শুয়োর গাদাগাদি করে পড়ে থাকা; সেখানে না ঢোকে একফালি আলো, না ঢোকে একতিল হাওয়া, এর ভেতর থেকে সংগ্রাম করে মানুষ আর ক'দিন বাঁচতে পারে শুনি। এরই জন্যে তো আমাদের দেশে ক্ষয়রোগ এমন পাইকারি হারে বেড়ে চলেছে।

ঐ বস্তি বাড়িতে টি, বি হলো; দেখতে নরক গুলজার হয়ে ওঠে। কে কি করে ইনকেকশান ঠেকাবে বলো। তবু বিয়ে করতে হবে, নষ্ট করতে হবে কতকগুলো মেয়ের জীবন। এই যে, আবার টি, বি হয়েছে এর মূলে কি ঐ অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে বস্তি, পেটভরে দু'টো অন্নের অভাব নয়? আর একবার টি, বি হলে, বিশেষ করে পরের মেয়ের, সেকি তীব্র নির্যাতন, অবহেলা! মানুষ হয়ে এসব সহ্য করার থেকে মরাও ভাল। এই যে, আমি হস্পিট্যালে আছি, ভয়ে কালেভদ্রে ছাড়া কেউ দেখতে পর্যন্ত আসে না। ভাবে, পাপ বিদেয় করেছি, নিশ্চিন্ত। মেয়ে আসে ভাল, না এলেও ক্ষতি নেই। বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব? একটু চেষ্টা করলেই একটা বৌ জুটে যাবে।

তোমরা বলবে ওরা বিয়ে না করলে আমাদের বেড়ে যাবে দুর্দিন। যে ক'দিন মা বাবা থাকবেন সে ক'দিন এক রকম চলবে, তারপর দাদা-বৌদির পাল্লায় পড়ে যে, গঞ্জনা ময় জীবন সুরু হবে সে হবে আরো সহস্রগুণে মর্মান্তিক। কিন্তু আমি ঐ সব সাবেকি যুক্তি আদৌ মানি না। আমি বলি আমরা আমাদের হেয় করে না রেখে নিজেদের মূল্য বাড়িয়ে তুলবো। মূল্যহীন বিয়ে করে মৃত্যুর রজ্জু গলায় পরার পরিবর্তে আমরা আমাদের মর্যাদার পথ খুঁজে নেব। আমাদের ধারণা হয়ে গেছে বিয়ে না করলে মেয়েদের একদিনের জন্যেও চলে না—ও কথাও মিথ্যে। পূর্বে হয় তো বিয়ে না করলে চলতো না, কিন্তু এখন বেশ চলে। আমরা চলে না ভেবেই অযৌক্তিক প্রতি পদে নিজেদের ছোট করি, হীন হয়ে পড়ি—তাই ছেলের দল ভাববার অবকাশ পায় তারা মেয়েদের ত্রাণকর্তা। মেয়েরা কত অসহায়, তারা করুণা করে বিয়ে করে তাদের উদ্ধার করে। ঐ উদ্ধত চিন্তার বশবর্তী হয়েই ওরা একটা মেয়ের জীবন অতি সহজে নষ্ট করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। ঐ ধারণা আমাদের ভেঙ্গে দিতে হবে। বলিষ্ঠ করতে হবে মনকে—প্রস্তুত হতে হবে সংগ্রামের জন্যে।

বক্তৃতাটা কেমন যেন হঠাৎ শেষ হলো। বাধ-প্রতিবাদ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কোথাও কিছু নেই—বক্তৃতার বাক্যছটায় সবার মনেই একটা অনাগত নৃত্যের সুর তোলার প্রচেষ্টা। গান শেষ হয়েছে, কিন্তু ঝংকারের রেশ তখনও মিলায়নি। মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠছে চিত্ত গগনে।

ডাক্তারবাবু একখানা চলন্ত ট্রাম। ছুটে এসে স্টপেজে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে, চলে যান গন্তব্য পথে। সেই স্বাভাবিক দ্রুত গতিতে এসে দাঁড়ালেন রাণীর ঘরে। বললেন: কি খবর রাণী দেবী? জ্বর কত বিকেলে?

: নাইনটি এইট পয়েন্ট সিক্স্।

: সকালে কন্‌ফারেন্সে (নির্দিষ্ট সময় অন্তর হস্পিট্যালের ডাক্তারবাবুরা মিলে একজন রোগীকে পরীক্ষা করেন, তাকেই বলে কন্‌ফারেন্স) যেতে না যেতে বিকেলেই জ্বর কমে গেল। আর তোমার বাবা কিনা বলেন এ, পি না করলে হবে না। দেখি কেমন এ, পি করতে হয়। দু-মাস হলো তো—আর মাস চারেক, তারপর তুমি ফুলে যাবে, ছুটাছুটি করবে, যা মনে চায় তাই করবে।

একটু খানি চুপ করে থেকে ডাক্তারবাবু পুনরায় বললেন: মন খারাপ লাগছে, দল জোটেনি বুঝি? দাঁড়াও আলো-কুকার পাশে সিট খালি হলেই ওদিকে দেব। আলো-কুকার সঙ্গে এতদিনে ভাব হয় নি? ওরা আসেনা এখানে?

: হুঁ—আসে।

: তবে? ওরা আসে, আসেন মা-বাবা, দাদারা, দিদি দাদাবাবু, দাদাদের বন্ধুরা, তবু মন খারাপ? দাঁড়াও ছেলে মেয়ের বিয়ের জোগাড় করে দিচ্ছি, আলো-কৃষ্ণার পাশে একটা সিট খালি হোক।

ডাক্তারবাবু যখন রাণীর সংগে কথা বলছিলেন—ঠিক সেই সময় দরজার পাশে ক্ষণকালের জন্যে দু'টো বাচ্চা মেয়েকে দেখলাম। দু'টোই প্রায় সমান লম্বা-চওড়া হবে। একটার পরনে ফ্রক, অন্যটার শাড়ী। আমার প্রথমটা মনে হয়েছিল, এরা হয়তো, মা-মাসি, দিদি বা বৌদি এমনই কাউকে দেখতে এসেছে। কিন্তু পরে জানলাম ওই ডাক্তারবাবুর আলো-কৃষ্ণা।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে, ওদের দেখে বললেন: এত বড় বিয়েটা তোমরা দিলে, কিন্তু আমাকে একটি বারের জন্যেও বললে না। হ্যাঁ, তা বিয়েটা কি রকম হলো কৃষ্ণা, তোমার ছেলে আর আলোর মেয়ে; তা দেখো বৌ-ভাতে যেন বাদ না পড়ি।

বুঝলাম ওরাই ডাক্তারবাবুর আলো-কৃষ্ণা। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, সেদিন আর ওদের সংগে ভাব করবার সময় পেলাম না। আর ওরাও ডাক্তারবাবুর কথা শুনে তাড়াতাড়ি পালিয়েছিল। তার উপর ওদের সম্পর্কে যে, আমার বিশেষ একটা আগ্রহ ছিল তাও নয়। রাণীর মত ছোট দু'টো বাচ্চার অসুখ হয়েছে, হস্পিট্যালে এসেছে তার বেশি তো কিছু নয়। আর বিশেষত্ব বলতে ওরা পুতুল বিয়ে দেয় এই মাত্র। ওরা নিতান্ত ছেলেমানুষ, কাজেই ওটাও আমার কাছে বিশেষ কোন আকর্ষণীয় ঘটনা বলেও মনে হয় নি। ছোট বাচ্চা হাঁটা চলার অনুমতি পেয়েছে, ঘুরে ফিরে পুতুলের বিয়ে দেবে এতে বিস্ময় প্রকাশের আছেই বা কি?

বিশেষ কোন ঘটনা বা কথা সম্পর্কে মনের মধ্যে ঔৎসুক্য বোধ না জাগলে স্মৃতিতে তার রঙ পাকা হয় না। আসন্ন সন্ধ্যার রক্তরাগরঞ্জিত পশ্চিম আকাশ যেমন এক খণ্ড কালিঢালা ফলকের নীচে ক্ষণেকের মধ্যে হারিয়ে যায়, ঔৎসুক্য বিহীন আঁচড়ও তেমনি স্মৃতির পাতায় পরক্ষণেই যায় মুছে। আলো-কৃষ্ণাকেও তাই পরদিন গিছলাম ভুলে। কিন্তু যদি কোন কারণে সেই তুচ্ছ কালি ঢাকা ঘটনা জিজ্ঞাসায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন আবার প্রয়োজন হয়, স্মৃতির রোমন্থনের মধ্য দিয়ে তাকে ফিরিয়ে পাওয়ার প্রয়াস পায়, তুচ্ছ হয়ে ওঠে উচ্চ। আলো-কৃষ্ণার আসনও হয় সুদৃঢ়।

হঠাৎ গল্পের স্রোতে বাধা পড়ল। রাণী কাকে হাত ইসারা করে ডাকল। বাইরে চেয়ে দেখি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আলো-কৃষ্ণা। আমরা চাইতেই ওরা দেওয়ালের আড়ালে সরে গেল।

রাণী বললো: আপনারা আছেন তাই ওরা এলো না। আপনারা চলে গেলে ওরা রোজ আসে এবং যতক্ষণ না ভাত আসে ততক্ষণ বসে গল্প করে।

রাণীর কাছে আরো শুনলাম আলো-কৃষ্ণার মধ্যে আলো ছোট। আলোর বয়স নয়-দশ বছর, আর আছেও কৃষ্ণার চাইতে ঢের বেশি দিন, প্রায় সাড়ে তিন বছর, এখনও থাকতে হবে আরো বহুদিন। ওর অপারেশন হবে, কিন্তু শরীর খারাপ—বয়স কম বলে হচ্ছে না। আর কৃষ্ণার বয়স বার-তের। এসেছে বছর খানেক, ভাল হয়ে উঠেছে চলে যাবে শীঘ্র।

আলো কৃষ্ণার বাড়ী থেকে প্রতি রবিবারে কেউ না কেউ আসে। এতে কিন্তু ওদের যে বিশেষ কোন অভিযোগ আছে তা নয়। ওরা ওদের জগৎ নিয়েই খুসী। প্রথম প্রথম ওদের হয়তো হস্পিট্যালে এসে মা-বাবা, দাদা-দিদি এবং কচি ভাইটার জন্যে মন কেমন করতো, এখন আর তেমন করে না। ঐ স্নেহের সম্পর্কটা এখন ওদের জীবনে দীর্ঘ দিনে অনেকটা থিতিয়ে ফিকে হয়ে গেছে। ওরা তাই ধানের চারার মত তুলে এনে রোপণ করার ক্ষেতকেই স্ব-ভূমি বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই বাড়ির আত্মীয় স্বজনের চাইতে ওদের কাছে হস্পিট্যাল অনেক বেশি সত্য—অনেকটা নিজস্ব।

আলোর কাছে কৃষ্ণা তাই দিন-রাত্রের মত পরিপূর্ণ।

ডাক্তারবাবুদের আইন-শৃঙ্খলা মানতে গিয়ে যে-আলোকে কুঁজী হতে হয়েছে অর্থাৎ কিনা বিছানায় এক-ভাবে শুয়ে থাকতে গিয়ে তার শিরদাঁড়া বেঁকে পিঠে কুঁজ গজিয়ে গিয়েছে, সেই আলো যে দিন দোতলার ঘরে কৃষ্ণার আগমন বার্তা পেল, সেদিন কোন শাসন, কোন তটভূমি

তাকে প্রতিহত করতে পারে নি—সে এসে মিলেছে কৃষ্ণার সংগে। আর আজ সেই আলো-কৃষ্ণার মিলিত স্রোত দোতলা এবং ওয়ার্ডের বাঁধন ভেঙে তেতালার রাণীর ঘরে এসে ত্রিস্রোতা হয়েছে!

ওদের কাছে হস্পিট্যালে একজন নবাগতা বান্ধবী পাওয়া, সাতদিন প্রতীক্ষার পর প্রিয়জনদের পাওয়ার অপেক্ষা অনেক বেশি প্রীতীপ্রদ।

এখানে ওরা যেন স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত—হস্পিট্যাল ওদের একিয়ারে এসে গেছে। এখানে বসে পুতুলের বিয়ে দিতে ওদের সংকোচ আসে না, শাসন রজ্জুর কোন ভয় থাকে না।

ভাবা কঠিন। সে একটা দিনের মত দিন বটে; যে দিন ওরা ওদের আপন করে নেওয়া প্রিয় স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে, সেই শৈশবের অতি নিবিড় করে পাওয়া মা-বাবা, দাদা-দিদির স্নেহনীড়ে ফিরে যাবে। সেদিন কি ওরা আত্মীয়বিয়োগব্যথায় আকুল হয়ে কাঁদবে না? আজকের হস্পিট্যাল কি সেদিন দু-বাহু প্রসারিত করে ওদের বুকে জড়িয়ে ধরবে না? জানি বিসমার্কের পদত্যাগের মত সেই অনাগত দিনটা বিশ্ব-খাতায় আঁচড় টানতে পারবে না। হয় তো অনাদরে কপালকুণ্ডলার মত একটা ট্রাজিক কাব্যে সব কিছুর পরিসমাপ্তি হবে।

গাড়ির হর্ণ শুনে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। আবার একটা নতুন রোগী এলো? বারান্দায় উঠে গিয়ে সামনের নেল ওয়ার্ডের দিকে চাইতেই দেখলাম, একখানা বেবি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, আর নিচের তলার বারান্দায় কিসের একটু অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে। মনে করলাম কয়েকদিন থেকে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর মহড়া চলছে, এও তারই একটা সংযোগ মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা ছিল না। একজন রোগীর ছুটি হয়ে গেছে, তাঁকেই বিদায় সম্বর্ধনা জানান হচ্ছিল।

বারান্দায় খান আটদশ চেয়ার এবং একখানা টেবিল ফেলা। টেবিলের উপর কয়েকটা রজনীগন্ধার গুচ্ছ এবং সোডাপের তোড়া রাখা রয়েছে। ছুটি হওয়া রোগীটি প্রচুর ফুলের মালা পরে একখানা চেয়ারে বসে; একজন বক্তা কি যেন সব বলে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য আমি তেমন খেয়াল করে শুনিনি। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তার কথা ক'টি বেশ মন দিয়ে শুনেছিলাম। তিনি বললেন: আজ আমরা আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করছি। তবু একথাও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, রজনীবাবু যেমন শক্তিশালী মন নিয়ে মৃত্যুকে জয় করে আজ ফিরে যাচ্ছেন ওঁর সেই আদর্শ যেন আমাদের মৃতকল্প শক্তিকে জাগিয়ে তুলে, রোগ জয় করতে সাহায্য এবং অনুপ্রেরিত করে। ভগবান ওঁর কুশল করুন।

তৃতীয়: আপনার ভবিষ্যৎ জীবন সার্থক-সুন্দর হোক। সত্যসুন্দর শিব আপনার সহায় হোন।

চতুর্থ: বহু সৈনিক টি, বি-এর অজেয় গর্বকে খর্ব করে জয়ী হয়েছেন। আপনিও তাঁদের একজন। গীতার কথায় বলি, আপনি জয়ী—আপনি পৃথিবী ভোগ করুন।

পঞ্চম: ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনার ছুটিতে আজ আমরাও নূতন করে বাঁচবার আনন্দ অনুভব করছি।

সম্বর্ধনার উত্তরে রজনীবাবু বললেন: আমার শক্তি-সাহসের মূলে ছিল আপনাদের অকৃপণ দাক্ষিণ্য। আশাহত মৃত্যুর ভয়াবহতা এবং যে নিঃসংগতা নিয়ে এখানে এসেছিলাম আপনাদের পাশে না পেলে তার থেকে আমার মুক্তি হতো না। আপনারা আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণ করেছেন আপনাদের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে, বাঁচবার শক্তি-সাহস যুগিয়েছেন। আজ আসন্ন বিচ্ছেদের মুহূর্তে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আমি যারপর নাই মনঃকষ্ট অনুভব করছি। আজ গণ্ডিবদ্ধ জীবনে আপনাদের ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু বৃহত্তর জীবনে আবার সকলের সংগে মিলিত হওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাও এই মুহূর্তে হৃদয়ের মধ্যে পুরে নিয়ে যাচ্ছি। ভগবান আপনাদেরও রোগমুক্ত করুন।

সম্বর্ধনা সভা শেষ হলো। এক একবার সবাইকে শেষ বারের মত আলিংগন করে রজনীবাবু গাড়িতে গিয়ে উঠলেন হাত উঁচু করে, মুখ বাড়িয়ে বললেন: আজ যদি আপনাদের সবার সংগে এক সংগে বাড়ি যেতে পারতাম তাহলে কি ভালই না লাগত।

মৃত্যু সাগরে বান ডাকলো। যাঁরা বাঁচবার কথা চিরতরে ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁরাও রজনীবাবুকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, তবে তো তাঁরাও বাঁচতে পারেন। রূপ-রস-গন্ধভরা পৃথিবীতে তাঁদেরও নবজন্ম হতে পারে।

গাড়ি ছাড়ল। দেখলাম একপাশা সজীব মানুষ দাঁড়িয়ে, চোখগুলো তাদের সব নবীন আশার আনন্দে জল জল করছে। মুখে এক অপূর্ব জ্যোতি।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

এরা দুরন্ত

লেখক : এ্যালেক্সি টলষ্টয়

অনুবাদ : বিমলকুমার ঘোষ

রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশের কোনও যায়গা:.....

হেজেল গাছের ঘন এক ঝোপের মাঝে সুগন্ধ ঘাসের উপর আমরা শুয়ে। সংকেত ঘাটিটা ভালভাবে লুকানো; যুক্ত আকাশ ঈষৎ নীল; চারিদিকে গুমোট গরম। প্রচণ্ড গরমে গাছের পাতায় পাতায় একটা চড়্ চড়্ শব্দ উঠছে। কাছাকাছি আছে একটা পিঁপড়ের ঢিবি। লেফটেন্যান্ট ঝ্যাবিন মাঝে মাঝে তা'র গালের ওপর থেকে পিঁপড়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘাসের একটা ঝোঁটা চিবোতে চিবোতে ধীরে ধীরে এক কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন.....

"মস্তিষ্ক চালনা জার্মান সৈন্যের কাছে নিষিদ্ধ; কারণ, এটা ক্যাপিষ্টদের মধ্যে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। একবারে কোনও জিনিষ বুঝে নেবার ক্ষমতা জার্মান মস্তিকে নেই। এ রকম কয়েকটি মুহূর্তেই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সুবিধা হল। আমরা যে তখন বিশেষ বিপদে পড়েছি তাতে কোনও সন্দেহই ছিল না। অতীতের দিকে তাকিয়ে একবার সেই কথা মনে হলেই যে কোন লোকের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাবে। অবিশ্যি, আমাদের ছেলেরা খুবই সাহসী। সংকেতদাতা পেট্রভের কথাই ধরা যাক। তার মুখ দেখে কেউ বলতে পারবেনা যে, সে এরকম সাহসী। তাকে দেখলে অত্যন্ত ভাল মানুষ বলে মনে হয়। তার ভাবালু চোখ দুটিতে কুয়াশা ভেসে বেড়ায়—প্রত্যেক দিনই সে তার প্রেমিকাকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখত। ছেলেরা তাকে নিয়ে সব সময়ই ঠাট্টা করত; পেট্রভ, তুমি কে হে? রক্ত মাংসের মানুষ না চলমান একটি পুতুল? তুমি এখন ফ্রন্টে আছ সেটা ভুলে যেওনা—উঠে দাঁড়াও.....' সে তখন জবাব দিত, 'বক্‌বক্ কোরোনা। কাজের সময় কেউ আমাকে পেছনে পড়ে থাকতে দেখবে না'....."

হাঁটুর ওপরে যে লোকটি নোটবই নিয়ে বসেছিল সে জিজ্ঞাসা করল, "কমরেড ঝ্যাবিন, কি করে আপনি পঁচিশ জন লালসেনা নিয়ে অতদিন ক্যাপিষ্ট সীমান্তের পেছনে রইলেন আর কি করেই বা একেবারে অক্ষত দেহে ফিরে এলেন?"

ঝ্যাবিন তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "আমার একজন শোফার আছে। লোকটা বেশ চটপটে। আমি তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম: 'মেলকভ, এই গাড়ী নিয়ে ঘোরাঘুরির মধ্যে তুমি এসে পড়লে কি করে? তোমার ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বা অংকের ছাত্র হবার কথা.....' সে তখন বলেছিল, 'এটা হঠাৎ হয়ে গেল। আমি যখন একেবারে শিশু তখনই আমি এই চাকুরীতে এসে পড়ি.....' আপনি জানতে চান, কি করে আমরা জার্মান সীমান্তের পেছনে আটক হইলাম? বলছি। আমার ওপর এক আদেশ এল যে 'পি' নামে এক গ্রামে আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জমা করতে হবে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ষ্টাফ হেড কোয়ার্টারের সংগে যোগাযোগ রাখতে হবে।

"ফল হল এই যে আমরা চারিদিক থেকেই বেষ্টিত হয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার দিকে ক্যাপিষ্ট সৈন্যে ভর্তি দুটো ট্রাক 'দুবকি' নামে এক গ্রামে এল। তারা অবিশ্যি অন্য কিছু সন্দেহ করেনি। প্রথমে তাদের নীরবে যেতে দিয়ে পরে আমরা পাশ থেকে বৃষ্টির মত মেশিনগানের গুলি চালাতে থাকলে তারা যখন হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ীর বাইরে আসতে লাগল, তখন তাদের আমাদের বেয়নেটের স্বাদটা বুঝিয়ে দিলাম। অবিশ্যি, জার্মানরা এই স্বাদ পছন্দ করে না। কেউ কেউ পালিয়ে গেল। তাদের অফিসার এক পুকুরের ভেতর গিয়ে ডুব দিয়ে শুধু তার নাকটা জলের ওপর উঁচু করে রেখে বসে রইল। আমরা তার ব্যাগে অত্যন্ত মূল্যবান কতকগুলি দলিল পেলাম।

"তারপর আমরা পঁচিশ জনই জার্মানদের গাড়ীতে উঠে গাড়ী চালিয়ে দিলাম। সামনের গাড়ীতে আমি ও পেট্রভ, শেলকভ পেছনে। আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন, একটি তারা বা চাঁদ দেখা যায় না। জার্মান এলাকার ভেতর দিয়ে সীমান্তের পাশাপাশি আমরা চলতে লাগলাম। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা চলে গেল—একটি লোককেও দেখা গেল না। আমাদের পশ্চিম দিকে আগুনের আভা, পুব দিকে গুলি চালনা এবং বড় বড় বোমা ফাটার শব্দ। আগুন এবং বন্দুকের আওয়াজে আমাদের দিক নির্ণয়ের সুবিধা হল।

"সামনের গ্রামটাকে আমাদের পরিচিত বলে মনে হ'লে; আমার গাড়ী থামালাম, পেট্রভ গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়ে বললে: 'আমাকে একবার যায়গাটা দেখে আসতে দিন।'

"দেখলাম—ওর ভেতরে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে এবং ওর প্রেমিকাকে একেবারেই ভুলে গেছে। ওকে বললাম, 'এগিয়ে যাও।' হাত বোমার পকেট হতে করে সে বেরিয়ে গেল। আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে কি রকম তাড়াতাড়ি, নিঃশব্দে, আদতো পায়ে পায়ে সে বেরিয়ে গেল। চল্লিশ মিনিট পরে ঝোপের মধ্যে পাতা নড়াচড়ার একটা শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি সে সোবারের কেবিনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বলল সে, 'গ্রামে একদল ক্যাসিষ্ট গাড়ী দেখে এলাম।'

"বলা বাহুল্য, এরকম খবরে আমাদের মোটেই খুসী হবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের ওটাই একমাত্র যাবার রাস্তা—আমাদের বাঁদিকে ও ডানদিকে খানা পুকুরের সারি আর আমাদের ফিরে যাওয়াও নিরর্থক। শেলকভ আশ্বাস দিয়ে বললে: 'তোমরা সব গাড়ীতে উঠে পড়, আমরা ওদের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

"ভাবলাম, রাত্রির অন্ধকারে আমাদের লোহার টুপি-গুলো জার্মান টুপি বলেই চলে যাবে, আমাদের প্রতীক-চিহ্ন লক্ষ্য করাও অসম্ভব—শুধু আমাদের রুশ বেয়োনেটের বৈশিষ্ট্যেই আমাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা। আমি ছেলেদের হাঁটুর ওপর রাইফেল রাখতে বললাম।

"কিছুক্ষণ পর আমরা একদল মালবাহী মোটরের সুমুখে জার্মানদের থামবার সংকেত স্বরূপ তিনটি নীল আলো দেখলাম। শেলকভ হেড লাইটের আলো কমিয়ে দিলে; বাক্সভর্তি কতকগুলো ৭ টন লরী ও রেডিয়েটরের ওপর আঁকা সাদা থালার ওপরে কালো স্বস্তিকা পতাকা দেখা গেল। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে তিনজন অফিসার পকেট বিজলী বাতি জ্বালিয়ে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগল। শেলকভ হেডলাইটগুলো জ্বালিয়ে দিলে তারা হাত দিয়ে চোখ ঢেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। আমাদের নিম্নাঙ্গের ওপর আঁকা লাল তারকাচিহ্ন লুকিয়ে রাখবার জন্য মুখ ঘুরিয়ে আমরা নীরবে তাদের সেই লরীর সারি পেরিয়ে গেলাম। তারপর আমরা বিচ্ছিন্ন আপেল ও চেরি গাছের মাঝে হারিয়ে যাওয়া ঘুমন্ত একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে গেলাম। ঐ সুন্দর গ্রামে বাস করা ভাগ্যের কথা নিশ্চয়ই। গ্রামটি তখন জনমানবশূন্য, লোকজন সব পালিয়ে গেছে।

"একটা ছোট্ট কাঠের গির্জার কাছে একটা খোলা গাড়ীতে বসে আদমের আপেলের মত গোলাকার ও কঠোর মুখ একজন জার্মান অফিসার পকেট বাতির সাহায্যে খুব মনোযোগের সঙ্গে একটা ম্যাপ দেখছিল। পেট্রভ গাড়ীর বাইরে ঝুঁকে হাতবোমা ছুঁড়ে মারবে ঠিক তখন আমি খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেললাম।

"ঐ অফিসারের নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ হল। আমরা যখন গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে এসেছি তখন বিশ অশ্বশক্তি একটা মোটর সাইকেলে একজন সৈন্য সাইডকারে একজন মেসিনগানচালক নিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। এবার পেট্রভ তার হাতবোমা এমন সুন্দরভাবে ছুঁড়ে মারল যে সাইডকার থেকে ছিটকে আমাদের দিকে প্রায় ছ' ফুট এগিয়ে এল সেই মেসিনগানচালক যেন সে আমাদের তাড়াতাড়ি কিছু বলতে চায়; মোটরসাইকেল চালকও তার মোটরসাইকেল নিয়ে একেবারে হুড়মুড় করে পাশের খাদে গিয়ে পড়ল।

"আমরা আলো নিভিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটলাম। আমাদের সুমুখের ঝোপটার ওপর তখন দিগন্তের আগুন একটা রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। ঝোপটার কাছে এসে ছোট একটা নদীর ওপর একটা কাঠের পুল দেখে আমরা গাড়ীর গতি কমিয়ে দিয়েছি

এমন সময় কর্কশ গলায় এক জার্মান গর্জে উঠল। রাইফেল ও হাতবোমা নিয়ে তৈরী থেকে আমরা নীরবে বসে রইলাম। দেখি দুজন শান্ত্রীর অস্পষ্ট মূর্তি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একজন দূরে দাঁড়িয়ে রইল, আর একজন শোফারের কেবিনের কাছে এসে জানালার ওপর নাক চেপে ভেতরে তাকাতে লাগল। আমরা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছি। হঠাৎ সে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় চুপি চুপি বলল : 'বাশ, পুল, আপনারা যাবেন না। ফ্যাসিষ্টরা গুলি করবে…

"তারপর নদীর ধারে ধারে মাঠের উপর দিয়ে ব্যাঙের ডাক শুনতে শুনতে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে আর একটা রাস্তার ওপর এলে আবার নীল আলো দেখা গেল। দেখলাম ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ করে এক সারি ট্যাঙ্ক এগিয়ে চলেছে। নেতা ট্যাঙ্কটি আমাদের থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে। এই দেখেই তাড়াতাড়ি আমি ছেলেদের বললাম : 'শুয়ে পড় এবং দয়া করে তোমাদের পেছন দিক লুকিয়ে ফেল'।

"রাস্তার এক পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের গাড়ী চালিয়ে সম্মানের সংগে কালো কালো ভারী ভারী ট্যাঙ্ক-গুলোকে যেতে দেওয়া হল। সাদা থালার ওপর আঁকা স্বস্তিকা পতাকাগুলো যেন চোখ মেলে সারা পৃথিবীটাই লক্ষ্য করছিল। ফ্যাসিষ্টরা মনে করে যে মাথার খুলি ও আড়াআড়িভাবে আঁকা হাড়ের ছবি,—যেমন তাদের কোটের ওপর, কালো ট্যাঙ্কের ওপর এবং বোমার ওপর থাকে,—শত্রুপক্ষের ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। অনেক বর্বরজাতি যুদ্ধ করতে যাবার সময় যে মুখোস পরে যায় তাতে দাঁত ও শিঙের ছবি থাকে। এগুলোও ভয় দেখাবার জন্যই করা হয়।

"সেই ট্যাঙ্কগুলোর পর এল বিমান-ধ্বংসী কামান, তেলভর্তি ট্যাঙ্কগাড়ী ও লরীর দল। জলের মতই একথা সহজ হয়ে দাঁড়াল যে আমরা যদি এখনই সরে পড়তে না পারি তবে বড়ই বিপদ। আমাদের অন্য রাস্তায় যেতেই হবে। কিন্তু কি ক'রে যে যাব সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যাক্—আমাদের চেষ্টা করতেই হবে—নইলে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্দেহের উদ্রেক করব।

"দেখা গেল আমাদের ডানদিকে বার্চ গাছের মধ্য দিয়ে একটা গলি চলে গেছে। স্বেলকভ এক নজরে এটা দেখে নিয়েই গাড়ীর মুখ ওদিকে ঘুরিয়ে দিলে। গাড়ীর উজ্জ্বল আলোয় গাছের গুঁড়িগুলোর রঙ সাদা হয়ে গেল এবং আমরা একটা গ্যারেজের একেবারে উঠানে এসে পড়লাম।

"স্বেলকভ গাড়ী ঘুরিয়ে আবার পেছনে আনতে লাগল। যেন সে গাড়ীতে তেল নিতে চায়। কয়েকজন জার্মান সৈন্য দৌড়ে এসে গ্যারেজের দরজা খুলে দিল। হিটলার যে তাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে শিক্ষা দেয়নি তাতে মঙ্গলই হয়েছে। স্বেলকভের গাড়ী অর্থাৎ আমাদের ঠিক পেছনকার গাড়ীটা ঘুরল, তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে ঐ পার্কের গলি দিয়ে ছুটতে লাগল। আমাদের পেছনে আমরা একটা চীৎকার ও কয়েকবার গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম কিন্তু তখন আমরা যে রাস্তায় আগেকার গাড়ীগুলো চলছিল সেই রাস্তায় এসে গেছি। তারপর আমরা এমন একটা ভঙ্গীতে চলতে লাগলাম যেন আমাদের ওরকমভাবে চলবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আমরা যেন এইমাত্র তেলভর্তি করে এলাম। এই ভঙ্গীতে ট্যাঙ্কের সারি ছাড়িয়ে রাস্তা ছাড়িয়ে উঁচু উঁচু শস্যের এক ক্ষেতে প্রবেশ করা হল।

"ভোরবেলা ছোট্ট একটা বনের কাছে পৌঁছে দেখলাম তেল ফুরিয়ে গেছে। গাড়ীগুলো বনের ভেতর লুকিয়ে রেখে আমরা প্রাতরাশ খেতে বসলাম। হঠাৎ পেট্রল একটা বিস্কুট মুখে নিয়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বনের ভেতর চলে গেল। বনের ভেতর থেকে কিছু একটা শব্দ হয়েছিল—আনুমানিক নয় বৎসরের একটি ছেলেকে হাত ধরে সে টেনে আনলে। ছেলেটির চুল ছোট করে ছাঁটা, নাকটি মোটা, চোখদুটি থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে।

"ছেলেটি চিৎকার করে বললে, 'কি করছেন আপনারা? আপনারা কি দেখতে পাননা যে আমি আপনাদেরই একজন? আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাদের ক্যাপিষ্ট ভেবেছিলাম।' 'তুমি এখানে কি করছ, হে?' আমি শুধোলাম। ছেলেটি বললে, 'আমি একজন স্কাউট। আমি ওকসেন দাদুর সংগে কাজ করছি।

"ছেলেটির বিবরণ থেকে বুঝতে পারলাম যে এই

ছেলেটি ও তার মত আরও পাঁচটি ছেলে আশী বছরের বুড়ো ওকসেন হাদুর সংগে তার বাড়ীতেই হয়ে গেছে। গ্রামের পুরুষ ও মেয়েরা তাদের ছেলেমেয়ে, পালিত পশু-পাখী নিয়ে জলা-জঙ্গলে গিয়ে সেখান থেকে গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছে। ওকসেন হাদুর বাড়ী হয়েছে তাদের ঘাঁটি। এই ছয়টি ছেলে সারাদিন এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। রুটির জন্ত ভিক্ষার ভান নিয়ে তারা এমনকি জার্মানদের কাছে পর্যন্ত যায়, চারিদিকে নাক চুকিয়ে জার্মানদের সাজ সজ্জা দেখে নিয়ে বৈকালে তারা ঘাঁটিতে হাদুর কাছে গিয়ে সারা দিনের খোঁজখবর বলে দেয়। গেরিলা যোদ্ধারা রাত্রিতে ঘাঁটিতে এলে বুড়ো প্রত্যেকের কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন ঃ যেমন—অমুক অমুক যায়গায় জার্মান বাহিনীর কয়েকজন সৈন্ত-সামন্ত যে ঘাঁটি করেছে তাকে উড়িয়ে দিতে হবে, অন্ত এক যায়গায় কিছু পরিমাণ পেট্রল এসেছে, ট্যাঙ্কের একটা ইউনিট মাত্র এসে পৌঁছেছে যেগুলোকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে।

"কী চমৎকার এই ছেলেটি! সূর্য ওঠার আগেই সে আমাদের বনের আর এক প্রান্তে নিয়ে এল। মনে হল সাপ যেমন বুকের ওপর ভর দিয়ে ঘাসের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে দ্রুতবেগে এগিয়ে যায় তেমনি গতিতে সে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা তার সংগে পাল্লা দিয়ে হেঁটে পারলাম না। বনের প্রান্তে এসে দেখলাম কতকগুলো তেল দেবার ট্যাঙ্ক আর পাঁচটা ফাইটার প্লেন দাঁড়িয়ে আছে।

"এই দেখেই ওগুলোকে উড়িয়ে দেবার কাজ তাড়াতাড়ি স্থির করে ফেলা হল। জার্মান পাহারাদাররা সারারাত্রি জাগরণের পর না ঘুমিয়ে পড়বার জন্ত ট্রেকের পাশ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিল। আমার চোরাগুলিচালকরা গুলি চালালে পর তারা তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে পড়ল। তড়িঘেসে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম। জার্মান বোমা ফাটার শব্দ আমাদের যতখানি না ভীত করে তোলে আমাদের এই আনন্দধ্বনি জার্মানদের অবস্থা আরও বেশী কাহিল করে ফেলে। মাটির নীচ থেকে ফ্যাসিষ্টরা বেরিয়ে এল—কেউ হাত তুলল, কেউ কেউ দৌড়ে গিয়ে অটোমেটিক রাইফেল থেকে গুলি চালাতে আরম্ভ করল। একটা ফাইটার প্লেন থেকে প্যারাসুটের বেল্ট ধরে একজন প্যারাসুট সৈন্তকে টেনে এনে ট্যাঙ্ক ও প্লেনগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আবার আমরা বনের ভেতর চলে এলাম। ছেলেটি বললে: 'আমাকে এখন দৌড়ে হাদুর কাছে গিয়ে সব বলতে হবে। তিনি এই বিমান ঘাঁটিতে এক বড় গেরিলাদল পাঠাবেন ভাবছিলেন.....'

"তারপর আমরা সারাদিন সেখানেই রইলাম। চলন্ত ট্যাঙ্কের শব্দ শোনা গেল। জার্মানরা বনটাকে মেসিনগানের গুলিতে এফোড়-ওফোড় করে ফেললে। আমরা অবিশ্যি খুব নিরাপদ যায়গায়ই লুকিয়ে ছিলাম। আমরা স্থির করলাম রাত্রিতে ভিনা নদীর ধার দিয়ে গিয়ে জার্মান ব্যূহের কোন দুর্বল যায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ফ্যাসিষ্টরা ঘন ব্যূহ রাখে না—তারা সরু সরু ব্যূহে দ্রুত গতিতে চালিয়ে যায়। মস্তিষ্কে বিন্দুমাত্র পদার্থ আছে এমন যে কোন লোক তাদের ব্যূহ ভেদ করে চলে যেতে পারে।

"পাশে মেসিনগান নিয়ে দলে দলে ভাগ হয়ে আমরা রাস্তিরে রওনা হলাম। দূরে জলন্ত 'ডি' শহরটা দেখা যাচ্ছিল। দেখি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে জলন্ত আগুনের গোলা প্রায় মেঘ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে। ফ্যাসিষ্টরা আলোর এই রোশনাই সিনেমা থেকেও বেশী পছন্দ করে। দেখা গেল জলন্ত শহরের ওপর বিমান ঘুরে ঘুরে যারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সেইসব অসহায় আবাল-বৃদ্ধ বনিতার ওপর গুলি চালিয়ে তাদের জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

"আমরা কিন্তু এই দৃশ্য সহ্য করতে আর প্রস্তুত ছিলাম না···রাগে টগবগ করে উঠল আমাদের রক্ত। কতক্ষণে আমরা ফ্যাসিষ্টদের মুণ্ডপাত করব সেটাই আমাদের একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠল। একটা যাত্রীবাহী গাড়ী থামালাম আমরা। গাড়ীর মধ্যে তিনজন অফিসারও বসে ছিল। তাদের সবাইকে খতম করে ফেলবার আগে আমরা 'ডি' শহরের দিকে তাদের গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দিলাম যাতে জলন্ত 'ডি' শহরের ছবি তাদের কাছে সিনেমা দেখার চাইতে বেশী প্রীতিকর না হয়ে ওঠে। তারপর অনেকখানি টেলি-ফোনের তার কেটে মালবাহী মোটর বাহিনীর যাবতা ট্যাংকে গাড়ী আক্রমণ করে প্রহরীদের সবাইকে খুন করে প্রহরী-

দের সবাইকে খুন করে ট্যাংক থেকে তেল বের করে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলাম। এ সমস্ত করেও আমরা সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। কারণ, দিগন্তে রোশনাইটা তখন খুবই উজ্জ্বল, খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তারপর কিছু দূর এসে দেখি তিনটি ট্যাংক অলসগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। শত্রুকে কাছে পেয়েও হতাশ হতে হল। কারণ তরল আগুন-ভর্তি কোন বোতল আমাদের কাছে ছিল না। তবু কুছ পরোয়া নেই! পেট্রভ এবং আরও দুজন আমাদের অন্যান্য ছেলে-দের কাছ থেকে কতকগুলো হাতবোমা সংগ্রহ করে রাস্তার পাশে গিয়ে লুকিয়ে রইল এবং পরে প্রত্যেকে প্রত্যেকের লক্ষ্যস্থল স্থির করে অব্যর্থ লক্ষ্যে হাতবোমা ছুঁড়ে মারল। সুমুখের ট্যাংকটা পিছিয়ে এল, অন্য দুটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ফ্যাসিষ্টদের অন্ধকারে লক্ষ্যহীনভাবে গুলি চালান ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

"এর পর আমরা সারা রাত্রি গাড়ী চালিয়ে মাঠের পর মাঠ, বন-জঙ্গল পেরিয়ে একটা ছোট্ট বাড়ীতে এলাম। সেই বাড়ীতে তখন কোন আর্মাণ ছিলনা। কয়েকটা বাড়ীর ভেতর নাক চুকিয়ে আমরা অবস্থাটা দেখে নিলাম। জানালাগুলো খোলা—জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন নেই। হঠাৎ এক কুটিরের খড়ের চালে একটা মোরগ ডেকে উঠল। মোরগটা তখন প্রভাতের পৌঁছ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে। চারিদিকে তাকিয়ে আমাদের নজর এক বাড়ীর ওপর গিয়ে পড়লে দেখা গেল বারান্দায় এক বুড়ো ও এক বুড়ি দাঁড়িয়ে আছেন। বুড়োর মাথায় এক টাক, বুড়ীর গায়ের চামড়া ঝুলে গেছে, তার মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই।

"বুড়ী চীৎকার করে উঠলেন, 'ওমো ছেলের বাবা, এদের যেন আমাদের লোকের মত মনে হচ্ছে।' বুড়ী আমাদের প্রত্যেককে চুমা খেয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। কিন্তু আমাদের তখন ঐ বুড়ীকে চুমা-টুমা দেয়ার মত অবস্থা নয়—শিকার দেখলে শিকারীর যেমন এক বিজাতীয় ক্ষুধা পায় আমাদেরও তখন তেমনি ক্ষুধা পেয়েছে। বুড়ো একটা রুটি এনে পুরু পুরু ভাগে কেটে দিলে বুড়ী তাতে মধু মাখিয়ে দিলেন আর উথলিত হয়ে বার বার বলতে লাগ-লেন, 'খাও, খাও, সোনামনিরা, খাও, খাও।'

"ঐখানে সেদিনটা কাটাবার অসুবিধা ছিল আমাদের। বুড়ো পোষাক পরে ভেড়ার চামড়ার টুপি মাথায় দিয়ে আমাদের জলা-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এক গ্রামে আনলেন। এখানে ছিল পেরিলা বাহিনীর হাসপাতাল। সারা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটে এল আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য, মেয়েরা তাদের বাড়ী যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করল। সকল গ্রামবাসীদের অনুরোধ ত এড়ান যায় না; প্রাচীন প্রথানুযায়ী পরিশ্রান্ত পথিককে যথাসম্ভব যত্ন করতে হবে। মেয়েরা আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করতে সাহায্য করে আমাদের গায়ে যে সব ফোস্কা উঠেছিল সেগুলো বেশ যত্ন করে জল দিয়ে ধুয়ে দিলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যোজা দিলে, তারপর তাদের উনুনের ওপর যা কিছু খাবার ছিল তাই আমাদের পরিবেশন করলে।

"আমি পেট্রভের দিকে তাকিয়ে দেখি সে আবার আগেকার মত আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে। চোখে তার সেই পুরোণো করুণ দৃষ্টি···কৃষকরা ত আমাদের কিছুতেই ছাড়বেনা! ঐখানে থেকে আমরা তাদের গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেব এমন প্রতিজ্ঞতি তারা আমাদের কাছ থেকে আদায় করবেই···আমাদেরই কি তা করতে ইচ্ছা ছিল না? কিন্তু কর্তব্য কর্তব্যই···

সহসা লেফটেন্যান্ট ঝ্যাবিন উঠে দাঁড়িয়ে "শত্রু বিমান" বলে চীৎকার করে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এক আদেশ দিলেন। হেজেল ঝুপের দীর্ঘ ঘাস প্রাণের আবেগে দুলে দুলে উঠল। দেখলাম বেশ উঁচু আকাশে পাঁচটা ফ্যাসিষ্ট বোমারু উড়ে আসছে। সংকেত ঘাঁটি থেকে বিমানঘাঁটিতে সংবাদ যাবার পর তিন মিনিটও হয়নি এমন সময় দেখা গেল আমাদের যোদ্ধা বিমানের একটা ইউনিট আকাশে দেখা দিয়েছে। তারা সোজা আকাশে ঐ বোমারুগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে আমাদের মনে হল যেন তারা তারযন্ত্রের মত গান গাইছে। তেহারা তখন তাদের ভীতি-প্রদ, মহাগর্বী ভারী ভারী ফ্যাসিষ্ট বিমানগুলোকে পাখা গুটিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করা হল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে···ঝিকে-নীল আকাশ থেকে মেসিন গানের ব্যাট-ট্যাট-ট্যাটের অস্পষ্ট আওয়াজ তখন শোনা যায়। আমাদের যোদ্ধারা তখন ভীষণ বেগে ওদের পিছু নিয়েছে। একটা বোমারু কাৎ হয়ে পড়ল এবং তারপর পেছনে ধোঁয়ার এক লম্বা লেজ সৃষ্টিকরে তীব্রবেগে একে-বারে সোজা মাটির দিকে নেমে এল।

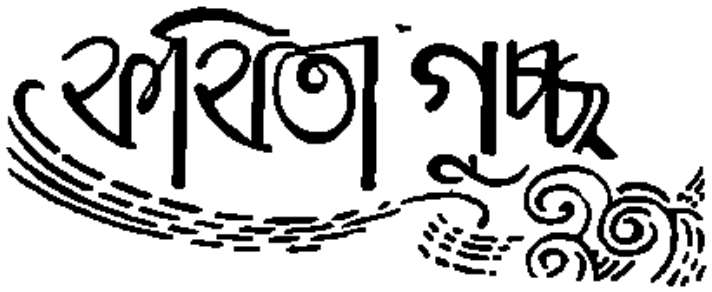

সুভাষচন্দ্র

সন্তোষকুমার অধিকারী

পৃথিবীর বুকে দুর্যোগ নিশা, মৃত্যুর যাতনাকে
অনেক রক্তে হৃদয়ের ছেঁড়া রক্তের বেদনায়
ঘুচালো যাহারা দধীচির মত কঠিন তপস্যায়
অস্থি-র দানে, রাত্রি শেষের দীপ্তপ্রভাত হায়
রক্তের ঋণে মহাজীবনের সে ব্যথা কি মনে রাখে ?
সে ক্ষোভ নীরব মর্মে যে আজও বেদনায় সীমাহীন ;
দুঃস্বপ্নজ্বালা সয়েছি তবুও শেষ হয় নাক' ঋণ ;
এত গ্লানি কোথা রাখি ?
তাঁর বেঁধা বুকে যে পাখী গেয়েছে মুক্তির মহাগান
আঁধার জ্বালানো বহ্নিতে সে যে জীবন করেছে দান,
স্মৃতির শিশিরে ছবি তার আজও আঁকি ;
স্বর্গ বিজয়ে দধীচির ঋণকে কবে রেখেছে মনে ?
ভোরের তারাকে দিনের আলোয়
ধূলিতে দিয়াছি ঢাকি !!

বৃন্দাবন

শ্রীসুধীর গুপ্ত

ভূগোলের জড়-পিণ্ড ভূমি-খণ্ড নহে
ভাগবতী বৃন্দাবন লীলা-রসোজ্জ্বল ;
দয়িতের দয়িতার মুগ্ধ হিয়াতল
গড়িতেছে এ ভুবন মিলনে—বিরহে
প্রেমাবেশে অপ্রাকৃত এই কালিন্দীহে
উচ্ছল আনন্দ-সুধা করে টলমল্ ;
দিব্য-স্বপ্ন মূর্তি মাগে হেথায় কেবল ;—
শ্রীচৈতন্য-রাধা-ভাব বৃন্দাবনে বহে।
ভাগবতী বৃন্দাবন ভাব-দ্যুতি ময় ;—
ঊর্ধ্বগ আত্মার চির শান্তি-নিকেতন ;
ভূগোলের জড়-পিণ্ড ভূমি সে তো নয়।
মহাভাব-রস-ঘন প্রীতি-প্রস্রবণ
সেথায় ঝরিছে নিত্য ; উদয়—বিলয়
তা'রে ঘিরে চলিয়াছে লীলা চিরন্তন।

তোমার রাত্রিকে

রথীন্দ্র নাথ সেন

মেঘে মেঘে তুমি যে কথা লিখেছ কাল,
যে ছবি এঁকেছ শিশিরের প্রতিভাসে—
আকাশে ছড়িয়ে ঊর্মিল মায়াজাল,
আমাকে করেছ প্রবুদ্ধ আশ্বাসে ;

সে কথা এখানে এ মাটির সংরাগে
শোনালে নিবিড় বেদনার অনুনয়,
জোনাকির চোখে সন্ধ্যার অনুরাগে,
তোমার রাত্রি বড় দূর মনে হয়!

হৃদয়ের নীড়ে যে সুর বাজালে কাল—
ঢেউ তুলে নীল স্বপ্নের কুয়াসায়,
উষাও আজকে সে সুরের হরিয়াল,
তোমার রাত্রি বড় দূর মনে হয়।

গুল্ম

বুদ্ধদেব ঘটক

কতো যে অস্থির দিনের তট রেখা
আমি কী সুস্থির দাঁড়াতে পারি।
জানি না ভুলেছি কী অন্তমনে দেখা
পদ্মকলি দিন, বন্ধ নারী।
হৃদয়ে তন্ময় গহন কান্নার
আজকে কালো দিন, তন্দ্রা, ছায়া;
বইতে পারি না যে কামনা গুরুভার
অন্ধ জীবনের নিগূঢ় মায়া,
বেদনা জমে শুধু অশ্রু ধারাপাত
আজকে তাই দিয়ে বন্ধ কালোরাত

আমার কামনার তীক্ষ্ণ শায়কেরা
আকাশে সূত্রেই লক্ষ্যশেষ;
পারিনি জ্বালাতে যে বন্ধদেহ ঘের
একটি রাত্রির বন্ধ দেশ!
ভেবেছি সূচীমুখ শিরার কোলাহলে
রক্তে দোলা দেবে কলোচ্ছ্বাস,
বাসনা নিঃসীম ডুবের মতো জলে
আজকে ঝিকি ঝিকি—আর্ত শ্বাস।

ভরাবো এই দিন কিসের মায়াবলে
ভাটার টানে নদী হৃস্ব ক্ষীণ
ছড়ায় ঝরাপাতা দিনের ছায়াতলে
বাড়ায় জীবনের অশেষ ঋণ।
তাইতো মনে ভাবি আজকে ভেবে ভেবে
যতোই বলি কেন প্রেমের কথা—
ক্লান্ত দিনরাত মৃত্যু এঁকে দেবে
ঢাকতে পারবো কী এ শিথিলতা!

আমার দিনমান নেশায় যেন টলে
দুঃখ সীমাহীন, আশার ঘোর—
সকল ভাবনার আবর্তি কোলাহলে
হৃদয় অসহায়, রাত কঠোর!
শঙ্খচিল দিন যন্ত্রণায় কাঁদে
প্রহরময় জাগে চাতকী রাত;
ক্ষয়িত হওয়া মন দুরাশা নিয়ে বাঁধে
হৃদয়ে বাতাসের নরম হাত।

কোথায় ডাকে কেউ, মৃদুল ফিসফাস
প্রার্থনার মতো সুর গহন—
স্নিগ্ধ দুচোখের ছায়ায় বিশ্বাস,
ফোটে কী কখনও অন্তমনঃ
এই যে দিন আর ঝড়ের এই রাতে
তুমি ও আমি বলো শুদ্ধ ছবো,
পুথুল মাটিময় দুটোলে রাঙাপ্রাতে
ছড়াবে ফুল বুনো সৌরভও।

নির্ব্বাচন

শ্রীমুসাফির

"ভোট দেবেন কাকে ?"
"জোড়-বলদের থাকসে !"
"ভোট দেবেন কিসে ?"
"কাস্তে ধানের শীষে !"

শীতের আমেজ মাখা এমনিতে শান্ত
ক্ষেপে যাবে এমনি যে তা কি কেউ জানত ?
চুপচাপ শুয়ে ব'সে ছিল সব ঠাণ্ডা,
হঠাৎ পাখার মোড়ে উঠে গেল ঝাণ্ডা,—
তিনরঙা, এক-রঙা, হাতুড়ি ও কাস্তে
কেউ ওঠে তড়িঘড়ি, কেউ ওঠে আস্তে।
কংগ্রেস, কমুনিস্ট, আরো যত ছিল সব,
ধেয়ে এসে চিল্লায় বাধে মহা কলরব
কানুয়ান কাহেলী সে পড়াছেড়ে সদ্য
দিনরাত ঘরে ব'সে লিখছিল পদ্য,
গুপীনাথ গুঁই তার সখ শুধু যাত্রায়,
তারিণী তবলা সাধে তেতালার মাত্রায়,
তিনকড়ি হাজরার বাজখাঁই মানারে
হারাতে পারেনি কেউ এপথে বা ধামারে,
মুখে পুরে পান আর দিলীপের জর্দা,
কেবল ব'য়েছে বুড়া ভৈরোর পর্দা,—
—বেধে গেল ডামাডোল এমনি ছুরন্ত,—
একে একে ছোটে সব বাইরে তুরন্ত।
নেপো নস্করার সেই জিলিপির দোকানে
সিনেমার গান বাজে, টানে টানে লোক আনে,
সেইখানে পাওারা ব'সে করে সল্লা,
চা ও জিলিপি চলে, আর চলে বল্লা।
কানু, হাবু, কেলারাম, মোবেদের পটলা,
লালনের বেকিতে ব'সে করে জটলা,
কেউ বা ভিতরে আসে, কেউ যায় বাইরে,
তাড়াতাড়ি চলে সব,—সময় যে নাইরে।

একই অবস্থাখানা ওপাড়ার বাজারে,
নর আসে, নারী আসে শতকে বা হাজারে।
খেলাধূলা গেল আজ, কর্মের বড় ধুম,
চীনা বাদামের হাটে লেগে গেল মরশুম।
ধন্দিণা মিস্তির বলে নিঃশ্বাস ছাড়ি,
'ইমেকশানের বাটে লাগাতে হইবে পাড়ি।'
বালক, যুবক, বুড়া, জেনানা সমস্ত
এদিকে ওদিকে ধায় ভয়ানক ব্যস্ত,
চোখে নেই ঘুম, গেল নাওয়া আর খাওয়া যে,
দুই কানে তালা ধরে মোগানের আওয়াজে।
ঘন-ঘন চোঙা ফোকে হেঁকে যায় মাইকে,
জিপে, অটোরিকশায়, কেউ যায় বাইকে,
চারিদিকে ওঠে রব, 'ভোট দিন, ভোট দিন!
দু-মাসেরও কম জেনো আছে আর মোট দিন।'
সভা ও সমিতি ঘরে, গাল দেয় মিছিলে,—
'চিনিনে তোদের বুঝি, সেদিনও যে কী ছিলে ?
যত ধান খেলে ঘুঘু বিয়ালিশ সালেতে,
এবারে হিসাব হবে কত ছিল চাল এতে।'
ঘুঘু বলে, 'ভাই সব, ভারি লোক হাসালে।
ভাবো কি ভুলবে ভবি এই ভাবে শাসালে ?
ঘাবড়িয়ে যাব মোরা নই ত সে পাত্র,
যা-কিছু বলার সবে শুরু হোলো মাত্র।
ন-বছর ব'সে আছ উজিরির তক্তে,
চারিদিক ঘিরে আছে শাদা-টুপি ভক্তে,
গ্রাহ্য না-করো কারে, করো সবে তুচ্ছ।
দাঁড়কাক প'রে আছে ময়ূরের পুচ্ছ।

পাঁচশালা প্লান ক'রে কত পান খেলে গো,
কাগজে-কলমে তার হিসাব কি মেলে গো ?
বিয়াল্লিশের কথা আজো দেখি তুলছ,—
দুনিয়া এগিয়ে চলে, একথাটা ভুলছ।
কুইট-ইণ্ডিয়া মোরা যদিও বা বলিনি,
গাঁধীর দোহাই দিয়ে জনতারে ছলি'নি।—
এটা কেন পাবলিকে বিলকুল চেপে যাও ?
হাটে হাঁড়ি ভাঙলেই যেমালুম ক্ষেপে যাও ?
বিগত পনেরো সালে আর কিছু ঘটে নি ?
খদ্দর-পরাদের নামে কিছু রটে নি ?
স্বরাজ পেয়েছো পারমিটে লাইসেন্সে
ভুখারা আজাদী পেলো বলে কোন sense—এ ?
ভারত স্বাধীন হোলো. শহীদেরা ধন্য !
অনাহারে শিশু মরে—সে কাহার জন্য ?
হিসাব করিয়া দেখ গত নয়-সালেতে
খেটে-খাওয়া মানুষেরে রেখেছো কী হালেতে।
দিয়েছো বাড়াতে আজ একটি কদম তার
মাটি না-ভিজায়ে খুনে ভুখা—নাঙ্গা জনতার ?
রিফিউজিদের কথা না-তোলাই ভাল যে,
কতমত আশ্বাস দিয়েছিলে কালও সে।
আজকার কি হালৎ দেখেছো কি আঁখিতে ?
চাল নাই, চুলা নাই, খাবি খায় কাঁকিতে ?
টুটা-কানি ভীখ মাঙে পরণেতে পিন্ধবে—
চেয়ে না-দেখাই ভাল, নয়নে যে বিন্ধবে !
লাখে লাখে মানুষেরা এই দশা পেলো গো,
আজাদীর পাকা পাকা ফল বুঝি খেলো গো।
তাইত আওয়াজ তুলি, প্রতিকার ক'রবো।
মেহনতি জনতা, এক হো। এক হো।
জানি মনে এ আওয়াজে নেই কোন সততা,—
যে পথ নিয়েছি, দাদা, তোমাদেরই মত তা।'
কথা শুনে জ্ব'লে যায় কংগ্রেসী চিত্ত,—
'কঠিন জবাব এর দেওয়াই উচিত ত'।
এ আজাদী ঝুটা হায়,—বলেছিল যাহারা
তারা আজ জনতার স্বার্থের পাহারা !
চূড়ান্ত বেয়াদবী, দারুণ অসভ্য !
তবু দেখো আক্ষেপ ক'রে নেই লভ্য।
উত্তর দিতে হবে বেশ ক'রে শুছায়ে,
যে কালিমা ছড়ালো তা দিতে হবে মুছায়ে।
তবে শোনো, বাজে কথা ব'লে নেই ফায়দা,
Tactics হয় politics এর কায়দা।
কাগজ-কলম নাও, লিখে ফেলো poster,
চোখা leaflet ছাপ',—দেখ, কত cost তার।
রুষ আর ভারতের মাঝে দিয়ে তসবি (১)
ভাল ভাল বক্তৃতা লেখো দিল্ চস্পি (২)
হাঙ্গারি reference দিলে কোন দোষ নাই,
Kadar-এ মাখালে কাদা কোন অফশোষ নাই।
ভুলো না ক' কোন কথা শাসনের গলদের
ঘাস ও বিচালি দাও মুখে জোড়া-বলদের'।
নিবারণ হালদার বলে, 'বেশ, আচ্ছা,
যুক্তিটা খাসা বটে, যুক্তিটা সাচ্চা।
তবু এক কথা আছে শোন বলি, দোস্ত,
তকরির ক'রে যাবে বুকনিতে হোস্ত
এমন দেখিনে কেউ কংগ্রেস ক্যাম্পে,—
লিখে দিতে পারি এটা revenue stamp-এ'।
চৈৎরাম চৌবে সে চোখা চোখা কথা কয়,
মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিক, ভাবিতে উচিত হয়।
বহু তকলিফ স'য়ে আজাদীর লড়ায়ে
কাবিয়ার হোলো যারা,—কোথা সেল ছড়ায়ে !
স্বরাজের পরদিন যে নেতারা গজালো,
কংগ্রেস দলটারে রাতারাতি মজালো।
সেদিন ভাবেনি' কেউ আখেরের ভাবনা,
আজ ব'সে মাথ' জোড়া-বলদের জাবনা।
সওয়াল পুছিলে বটে জবাবটা দিতে হয়,
তাতে লাগে ইলেমের দরকার অতিশয়।
দিল্ ও দেমাগ্ দুই অনটন যবে যে,—
এ খবর হালফিল ওয়াকিব সবে যে।
ভাবো ব'সে এখন সে remedy ইহার কি,
জনতারে আপনানো নয়ত' ইয়ারকি !'...

(১) তুলনা (২) মনোরঞ্জন

প্রার্থীরা চ'টে বলে, 'নেই কুছ পরোয়া !
শোনো বলি কানে কানে কথা কিছু ঘরোয়া।
না-চিহ্ন যদিও নিজে হয় উদ্বেদবার (৩)
Bank account এই বোম্বাবে credit তার।
রাজনীতি বাদ দাও, শোনো কথা serious,
টাকার ওজনে লোক হয় meritorious।
টাকা আনে জিত,—যদি না থাকে ললাটে,—
এ কথাটা লেখা আছে শাস্ত্রের মলাটে।
তাই লড়ি এই আনেবালা (৪) চুনাবট (৫) যে,
আমাদের পথে কেবা ভালে রুকাবট (৬) যে ?
জনতারে হাত করা—কোন্ ভারি কবা সে ?
গালে হাত দিয়ে ভাবো, মন-ভারি ঘতাশে ?
পাউডার দুধ দাও, ধুতী, শাড়ী, সুড দাও,
বাছা বাছা খেলোয়াড়ে ভাল ভাল বুট দাও,
থিয়েটার করে যদি, দাও তুলে stage-টা,
আলগোছে অনমিতে নিয়ে নিয়ো pledge-টা।
বুঝে যদি ঠিক-ঠাক সাবধানে চালো হাত,
কোন সন্দেহ নেই, হ'য়ে যাবে বাজী মাৎ।
কায়দাটা তাড়াতাড়ি ক'রে নাও রপ্ত,
Leftist জমানৎ হয় যেন জপ্ত।

হুঁশিয়ার ! slogan-টা লও থোড়া পালটি,—
বুঝিতে না-হয় যেন কোন difficulty।
বলো, 'প্রার্থীরা মোটে দুইজন, চিনে নিন।
এই জোড়া-বলদের ভোট দিন। ভোট দিন।'
খেঁদির পিসীর ছিল এ পাড়ায় কার্ধ,
নিবারণ হালদারে পথে করে ধার্ধ।
বলে, 'এক কথা কই, হালদার মশা' গো,
ঘর বাড়ী হারাদেরও কী মজার দশা গো।
পেত্নীর মত মেয়ে মোটা হোলো নিক্ষে
মিটিতে গেল খেঁদি হাতা-ওলা সিক্ষে।
'এপিট ওপিট' (৭) ক'রে ঘ'সে আছি কতদিন,
পোলোট (৮) দিল না, বলে—ভোট দিন, ভোট দিন।
ভোটটা যে এত দামী আগে ত' তা' বুঝিনি,
পোলোট কি ভাবে মেলে তার পথও খুঁজিনি।
এখন যাইয়া যদি এডমিস্টারে কই,
ভোটটা তোমারে দিনু, পোলোটটা দাও ঐ,—
তা হলে কি বাড়িখানা তাড়াতাড়ি ওঠে না ?
ঘরের বাবদ লোন্ সাথে সাথে জোটে না ?'
'বুড়ি মাগো,' হেসে বলে নিবারণ হালদার,
কলিকালে বলদেরা সব চেয়ে মালদার।

এড্‌মিস্টারে (৯) হোক্, হোক্ যা সে পেয়ারা,
জোড়া-বলদের জোর তারো চেয়ে জেয়াদা।
প্লট পেতে হ'লে জোড়া-বলদের কাছে যাও,
সবারে শুনায়ে হাঁকো—ভোট দাও। ভোট দাও।'…
শুনে বুড়ি বলে, 'কথা নয় বটে মন্দ,
—এ বলদে দুধ দেয়, তাই মনে সন্দ'।

---

(৩) প্রার্থী (৪) আগামী (৫) ইলেকশান (৬) বাধা (৭) affidavit—উদ্বাস্তুদের বাড়ীর জন্য জমী দেওয়ার আগে এফিডেভিট করানো হয়। (৮) প্লট—জমী (৯) এডমিনিস্ট্রেটর—উদ্বাস্তু শিবিরের পরিচালক।

শুধু বাঁচার জন্য

সুভাস সমাজদার

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে আস্তেই নদীর পাড়ে কংগ্রেস ঘাটের বুড়ো ঝাপড়া বটগাছটার মাথায়। দূরে ওপারে অজস্র গাছপালায় ছেয়ে থাকা চকরাম আর চক-ভৃগু গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে জ্বলে উঠল সন্ধ্যা প্রদীপের আলো। শঙ্খের ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠল কংগ্রেস পাড়ার প্রত্যেকটি বাড়ী। মধুর প্রশান্তিভরা সেই সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে হঠাৎ কোথা থেকে একটা কুকুর আর্তগলায় কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে উঠল। ঠিক এমনি তিক্ত কক্ষন গলায় চিঁ চিঁ করে নিশিবালা বলল—ওগো চুপচাপ বসে কি ভাবছো? সারাটা জীবন তো জ্বালিয়েই খেলে, শেষ সময় মুখে একটু ওষুধ পথ্যিও দেবে না?—শ্বাসরোধী অন্ধকার ভরা ঘরের বাতাসে তার গলার স্বরটা মাথা কুটে মরতে লাগল। কিন্তু বারান্দার এককোণে দুই হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে বসে থাকা মানুষটার নিশ্চল পাথরের মত মূর্তিটায় এতটুকু শিহরণ জাগল না। চুপ করে বসে রইল কালীনাথ। নিদারুণ একটা জ্বালা হিংস্র সাপের মত পাক দিয়ে উঠল তার বুকের ভেতরে। কি করতে পারে সে? কতটুকু ক্ষমতা আছে তার? দারিদ্র্যের কথা বললে মানুষের আর সহানুভূতি জাগে না। নিজে একদিন সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে পরাধীন দেশের মুক্তির জন্য কারাবরণ করেছিল। সহ্য করেছিল অমানুষিক দুঃখ কষ্ট, অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখিও দাঁড়িয়েছিল—এসব কথা বললে আশ-পাশের লোকের ঠোঁটের কোনায় কোনায় চাপা হাসি উঁকি দেয়। কে জানে, হয়তো ওরা মনে মনে ব্যঙ্গ করে, বিদ্রূপ করে। মোক্তারীতে তার আয় নেই ঐক পয়সা। সাত আটটা কাচ্চাবাচ্চা আর রোগা বৌ নিয়ে তার এই বিশাল সংসারটা যেন একটা ক্ষিপ্ত জন্তুর হিংস্র থাবার মত চারিদিক থেকে তাকে আঁকড়ে ধরছে। নাঃ একটা কিছু করতে হবে। হঠাৎ গা ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়াল কালীনাথ। তার নজরে পড়ল, উঠোনের পাতলা অন্ধকারের ভেতরে ঘন-কালো থকথকে একদল অন্ধকারই যেন কিলবিল করে নড়ছে।

—এই কে রে ওখানে? চীৎকার করে উঠল কালীনাথ।

—বাবা, আমরা পিন্টু, পুটি, বুড়ী···কালীনাথের কালো কালো রোগা প্যাকাটির মত আটটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বিচিত্র গলায় কলরব করে উঠল।

—কি করছিস তোরা ওখানে?

—দু'পয়সার মুড়ি কিনে এনে খাচ্ছি বাবা। তুমি তো আজ আর ভাত চড়ালে না।

দুপয়সা! বিস্মিত উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল কালীনাথ—পয়সা কোথায় পেলি তোরা।

—ও বাড়ীর বোলোকাকার কাছে নিয়েছি।

—এ্যাঁ! শেষ পর্যন্ত তোরা ভিক্ষে করতে সুরু করলি! তোরা—নিদারুণ ক্রোধে বাদবাকী বক্তব্যটা তার গলার ভেতরে আটকে গেল। একটা প্রেতের মত সেই উঠোনে পথচারী করতে করতে সে বিড় বিড় করে বলল

—তোরা ভিক্ষে করতে সুরু করলি!

তোদের আর কি দোষ? আমি তোদের বাপ, তোদের সব দায়িত্ব—

—ওগো শুনছো, মুখে একটু জলও দেবে না? বাইশ বছর তোমার ঘর করলাম। স্বামীর সব কর্তব্যই তো—

—মরো, মরো, তুমি মরো—ডান হাতটা অস্বাভাবিক জোরে মুঠো করে ঘরে ক্রুদ্ধ আক্রোশে চীৎকার করে উঠল কালীনাথ

—তুমি মরলে আমার হাড় ক'খানা জুড়ায়—বলেই আগুনের একটা হল্কার মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

সাহেব কাছারীর ঘন শালবনের ভেতর দিয়ে জমাট অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া পথ ধরে হন হন করে চলেছে

কালীনাথ। তার মনের আলোড়ন চিন্তাস্রোতের ভেতরে গরম জলের মত টগবগ করে ফুটে উঠল. সেই স্বদেশীযুগে তার অসংখ্য বক্তৃতার কথাগুলো···সূর্যমুখী ফুল যেমন সূর্যের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে আবর্তিত হয় তেমনি স্বাধীন দেশের প্রত্যেকটি মানুষ শুধু রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাবে। তার বদলে সমান না হোক ভালভাবে বেঁচে থাকবার মত সঙ্গত পরিমান অর্থ তাকে দেবে রাষ্ট্র···বলেছিল গান্ধীর আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কথা···মানুষকে হতে হবে সৎ, ছোট ছোট স্বার্থের বাসনা কামনা থেকে হতে হবে মুক্ত, জীবনের প্রতি প্রেমে, জীবের প্রতি ভালবাসায় সে হবে আদর্শ মানুষ···তবেই সার্থক হবে ডেমোক্র্যাসি···কত গাঁয়ে কত শহরের হাজার হাজার জনতার বিস্ময় মুগ্ধ তন্ময় চোখের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল এসব কথা কিন্তু—

কিন্তু সেই স্বপ্ন আজও কি সুদূর নীল দিগন্ত পারের কোন স্বপ্নই হয়ে নেই? তার ছোট ছোট সন্তানগুলোর সব দায়িত্ব তাকেই কি বহন করতে হবে? যে দেশের জন্য সে আজ পথের ভিখারী হয়ে গিয়েছে, সেই দেশের রাষ্ট্রের, সমাজের কি কোন কর্তব্যই নেই? দেশের কাজে জেল খেটেছে, আত্মমান গিয়েছে বলে সে লোকের কাছে কোন শ্রদ্ধা চায় না, সম্মান চায় না। ফুলের মালা, হাজার হাজার মানুষের উচ্ছ্বসিত হাততালি সে অনেক পেয়েছে। আজ সে শুধু বাঁচতে চায়, দু'বেলা দুমুঠো ভাত পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তার কানের পাশের দুটো রগ দপ্ দপ্ করতে লাগল।. অসহ্য যন্ত্রনায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। হঠাৎ খিদিরপুরের শ্মশানের দিকে কালীনাথের চোখদুটো যেন আটকে গেল। ঘুরে-তরল অন্ধকারে কে যেন এক ঝলক রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছে। কার যেন একটা চিতা জ্বলছে দাউ দাউ করে। সাঁ সাঁ করা জলো হাওয়ায় আত্রোইয়ের জলে কল্লোল উঠেছে। মোক্তার পাড়ার হাড়কিপটে ঐ শুয়োর চট্টোরাজটা বুঝি ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। না খোঁড়া জমেতা কামিনী বিশ্বাসটা গেছে? যাক যাক বড়লোক-গুলো মরে হেজে পৃথিবীর ভারটা হাল্কা হয়ে যায় না কেন? দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা এত জোরে চেপে ধরেছে কালীনাথ, যে চিন চিন করে জ্বলে যেতে লাগল ঠোঁটটা। রক্ত পড়ছে বোধ হয়। কিন্তু এ কী? চিতার আলো তো নয়। এ যে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বলে পরিচিত ঘুলো নিত্য পাগলা! ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে আর চোকে চোকে নারকেলের মালাইতে করে তাড়ি খাচ্ছে। কালীনাথের পায়ের শব্দে হঠাৎ যেন চমকে উঠল নিত্য-পাগলা। কর্কশ গলায় বলল—কে?

—আমি কালীনাথ।

এত রাত্রে শ্মশানে কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে? অবশিষ্ট কারণটুকু খেয়ে মিটি মিটি হেসে আবার বলল—কি পরীক্ষা করে দেখতে এসেছো সত্যিই আমি কোন মৃতদেহের ওপরে বসে বামাচারী সাধনা করি কি না?

—জানি ওসব কিছুই তুমি কর না—বলল কালীনাথ—আমি শুধু জানতে এসেছি, কোন কিছু কাজ কম্ম না করেও কেমন করে তুমি দুধ ঘি খেয়ে মনের সুখে বাস করছো—দূরে শালবনের জমাট অন্ধকারের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে চাপা উত্তেজিত গলায় সে আবার বলল—আমি দেশের কাজে কত পরিশ্রম করেছি, লেখাপড়া শিখেছি তবু দুবেলা পেট পুরে খেতে পাই না। বাচ্চাগুলো ককিয়ে কাঁদে, ওষুধের অভাবে বৌ মরো, মরো—ধুনির আলোর ছায়া কাঁপছে নিত্যপাগলার চোখেমুখে। কালীনাথের কথাটা যেন সে শুনতেই পেল না। সে চোখদুটো আধ বোজা করে কি বিড় বিড় করে বকছে। আর বাঁক খাওয়া নদীটার মতই তার দোমড়ানো মুখখানা কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধ স্তব্ধতায় ঘেরা খিদিরপুরের শ্মশানে শোঁ শোঁ করা বাতাসে কান্নার মত আওয়াজ জেগে চলেছে একটানা। আচমকা বলে উঠল নিত্যপাগলা—দেখ কালীনাথ, যদি খেয়ে পরে বাঁচতে চাও, তবে স্ত্রীসুদ্ধ মন্ত্র নাও, দীক্ষা নাও—

—বলো কী? বিস্মিত হয়ে কালীনাথ বলল, দীক্ষা নিয়ে, মন্ত্র নিয়ে নাক টেপাটিপি করে ঘরে অন্ন আসবে? ওসব তো জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা—

শোন—গম্ভীর ভরাট গলায় বলল নিত্যপাগলা—সব সময় জানবে কালীনাথ, যারা জীবন থেকে পালাতে চায়, তারা জীবনকে ভোগ করারই বিপুল দুরাশায় মাথা খোঁড়ে—দূরে হাকিমপুরের মাঠে তরল অন্ধকারে চাকা, পাবনা, বরিশাল কলোনীর আলোগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল

নিত্য পাগলা। সারা মুখে বেদনার একটা কালো ছায়া নেমে এল। ঘোলাটে দুটো চোখের অপলক দৃষ্টিতে যেন কোন বিভীষিকা দেখছে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল নিত্য-পাগলা আমার বাঁ হাতটা অবশ কেন জানো ?

—না।

—তোমরা তো আবার দেশ সেবা লাইনের লোক। তন্ত্রসাধনার কথা বিশ্বাস করো কি না, জানি না—

—তুমি বলো না ?

বীরভূমের তারাপীঠ শ্মশানে আমি বীরাচার মতে নয় বছর তপস্যা করেছিলাম। হয়তো তুমি জানো, বীরাচার মতে তন্ত্রসাধনায় মদ্য, মাংস, মৈথুন, মৎস্য আর মুদ্রা—এই বাহ্য পঞ্চমকার করাটি প্রয়োজন। কিন্তু—

—তুমি হঠাৎ তান্ত্রিক হতে গেলে কেন ? বিয়ে থা করে সংসারী হলেই তো পারতে—

—সংসারী। আকস্মিক একটা রূঢ় আঘাতে সে যেন আঁতকে উঠল। বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল নিত্যপাগলা কয়েক মুহূর্ত। শান্ত মৃদু গলায় ধীরে ধীরে সে বলল—পর নারীর সহজ ভালবাসার ভেতরে আমার জন্ম হয় নি ভাই। অনেক পরে, বড় হয়ে জানতে পেরেছিলাম, এক কুলটা বৈষ্ণবীর গর্ভে একাধিক পুরুষের লালসায় আমার জন্ম—

এ্যাঁ বলো কি ? চীৎকার করে উঠল কালীনাথ।

—চুপ, শোন, যেদিন প্রথম জানলাম আমার জন্ম-বৃত্তান্ত, সেদিনই আমার চোখের সম্মুখ থেকে ঝপ্ করে নিভে গেল সূর্যের আলো। বন্ধুবান্ধব, আশপাশের লোক সবাই আমাকে পরিত্যাগ করল। সংসার হয়ে গেল আমার কাছে ধু ধু মরুভূমি। তখন ভাবলাম, যা পেলে ইহ জীবনে মানুষের আর কিছু দরকার হয় না, সেই তন্ত্রসাধনার সিদ্ধিলাভের আশায় নিজের দেহকে নানাভাবে পীড়ন করে, কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা করতে সুরু করলাম। ঐ পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু—

—কিন্তু কী ? রুদ্ধ উত্তেজিত গলায় বলল কালীনাথ।

উঃ কী অসহ্য জ্বালাধরা সেই স্মৃতি কালীনাথ! নিত্যপাগলার চোখে যন্ত্রনার চিহ্ন ফুটে উঠল।

সেদিন ছিল অমাবস্যা। রাত্রির মধ্যযামে তারাপীঠের ধু ধু শ্মশান প্রান্তরে এখানে ওখানে দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছিল। ধোঁয়া, ছাই আর আগুনের ঝাঁজে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। সেই সময় আমি আমস্তাওড়া গাছের নীচে বসে চণ্ডালের একটা ডাগর বয়সের কুমারী মেয়েকে মহামায়ারূপে পুজো করছিলাম। কিন্তু অদ্ভুত বিচিত্র একটা ভয় অকারণে আমার বুকের হাড়ে হাড়ে জমাট বেঁধে উঠছিল। অবশ হয়ে আসছিল হাত পা। কেবলই আমার মনে হচ্ছিল, চোখ খুললেই দেখতে পাবো শ্মশানের বিশাল মাঠ ঘুড়ে হাজার হাজার প্রেতাত্মা নেচে বেড়াচ্ছে। তাদের জবা ফুলের মত রাঙা চোখ দিয়ে গল গল করে রক্ত ঝরছে। হু হু করা বাতাসে তাদের অট্টহাসি শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, এই তারাপীঠেরই কোন প্রেতাত্মা হয়তো হিমশীতল কঙ্কাল বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। চোখ খুলতেই আমি চমকে উঠলাম। চণ্ডালের সেই কুমারী মেয়েটা সুডৌল নরম হাত দুটো দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার চোখের কোণায় কোণায় আমন্ত্রণের দৃষ্টি। ঠোঁটে ঝিলি-মিলি হাসি। নারীদেহ উপভোগের বিচিত্র স্বাদ তো দূরের কথা, কোন যুবতী মেয়ের আঙুল ছোঁয়ার পর্যন্ত সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি। সব সময় আমার রক্তের প্রতিটি অণু পরমাণুতে দুঃসহ একটা কামনা কেঁদে কেঁদে ওঠে। আমার মাথার ভেতরে আগুনের ঝড় বয়ে চলেছে। আমার দেহ বেয়ে মাকড়সার মত ঝুলছে মেয়েটি। সেই মুহূর্তে আমার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। কিছুক্ষণ পরই যখন আমার সেই উন্মাদ উত্তেজনাটা মিটিয়ে এল তখুনি নিজের শোচনীয় ব্যর্থতার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে শ্মশান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল,—বোধ হয় তুমি জান, মৈথুন সাধনায় সাধক ব্যর্থ হলে, তার অঙ্গ বৈকল্য হয়ে থাকে। এই ঘটনার ছয় মাস পরে আমার বাঁ হাতে অসাড়তার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল—মধ্যে ভরা ডুঙ্গীটা ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিল নিত্যপাগলা। ক্লান্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল—সেই থেকে জপতপ ছাড়লাম, তারা মা-র নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করি নি আর কোনদিন। সবই ছাড়লাম

কিন্তু গেরুয়া এই জামা কাপড়টা আর চুল দাড়ি এ সব রাখলাম।

মানে? ওগুলো তাহলে তোমার মেক আপ? তপস্যাধনার কিছু জানো না?

—কিছু না। এক বিন্দুও নয় ভাই। সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হলে ঐ পথে কেউ সফল হয় না—

—তাহলে এত লোক কিসের আশায় তোমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে? কোন স্বার্থে তারা টাকাপয়সা দেয়?

—এখুনি সব দেখবে—বলেই হঠাৎ নিত্যাপাগলা কানটা খাড়া করল। চাপা গলায় বলল, কালীনাথ তুমি ঐ শ্মশানের চণ্ডীঘরটায় যাও তো। আমার ভক্তরা আসছে—বটগাছের নীচে চালাঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে গেল কালীনাথ।

ঘাড় হেঁসে ছোট ছোট করে কুষ্ঠিগীরদের কায়দায় চুলছাটা পানের দোকানদার নরেন এসেই বলল—কারণ টারণ কৈ বাবা? এই নাও তোমার জন্য আমার বাড়ীর গোটা কয়েক ডিম নিয়ে এসেছি।

—এই দেড় সের খাঁটি দুধ নাও বাবা—বুলডগের মত মুখখানা কুঞ্চিত করে হেসে বলল—পাঠশালার মাস্টার হেমবাবু—আমার মেয়ের বিয়ে কি এবছর হবে না বাবা?

—হাঁ। হবে-চোখদুটো আধবোজা করে চুপ গলায় বলল নিত্যাপাগলা—পনের বছর পর্যন্ত ওর কালির যোগ আছে। যোলতে পা দিলেই হবে—

—পরপর তিনটে ছেলে হয়েই মরে গেছে বাবা—গোপালবাবু কন্ট্রাক্টার তার কপাল থেকে সোজা ঝুলেপড়া শকুনীর ঠোঁটের মত বাঁকা নাকটা চুলকে নিয়ে বলল—কি করি বলো তো বাবা?

—পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কর। আবার সন্তান সম্ভবা হলেই, আঁতুড় ঘরের সামনে এমন একজন ব্রাহ্মণ বসিয়ে রাখবে যার একটি সন্তানও মরে নি—

—নিশ্চয়ই বাঁচবে তো বাবা—বলল গোপাল কন্ট্রাক্টার এই নাও তোমার প্রাপ্যটা কুড়ি টাকা—ঘুরে শ্মশান যাত্রী-দের বিশ্রামের চালাঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে কালীনাথের চোখ দুটোয় লোভের আভা জেগে উঠল। একে একে ভক্তরা সবাই চলে গেল। দুধ ঘি ডিম প্রচুর সামগ্রীর স্তূপের দিকে তাকিয়ে নিত্যাপাগলার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। কালীনাথ এগিয়ে এসে বলল—তুমি যে সব ভবিষ্যতবাণী করলে, সেগুলো যদি না ফলে?

—না ফলে এরা আসবে না। কিন্তু নতুন আর একদল আসবে—গলার স্বরটা একটু নামিয়ে বলল নিত্যাপাগলা—দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দেশে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের ওপরে বিশ্বাসটা সহজে নষ্ট হবে না কালীনাথ। আর এই বিশ্বাস-টুকুই আমার মূলধন—

—তুমি তাহলে ভেক ধাপ্পাবাজী আর ভণ্ডামী করে পেট চালাচ্ছো এবং শশ্মানে দিন কাটাচ্ছো? আদর্শবাদী দেশসেবীর চোখে অবজ্ঞা ফুটে উঠল।

—দেখ কালীনাথ—ধক্ করে জ্বলে উঠল নিত্যাপাগলার চোখদুটো—যে যুগের যে নীতি। আজকের দিনে যারা অর্থ, মান প্রতিপত্তি ও সম্মান নিয়ে সমাজে বাস করছে তাদের সকলের চকচকে ঝকঝকে জীবনের আড়ালে প্রচণ্ড ভণ্ডামী আর দুর্নীতিই লুকিয়ে আছে। মনে রেখ। আজকাল অর্থ দিয়েই মানুষের মূল্য যাচাই হয়—

তাই ব'লে বাঁচার জন্য দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে হবে?

—মানুষের দুশ্চরিত্রতার ওপরে পতিতার অন্ন নির্ভর করে। তার কাছে দুশ্চরিত্রতা কেমন মূল্যবান হয়ে ওঠে, তেমনি এযুগের মানুষের কাছে সমস্ত ঘৃণ্য অসৎ নীচ প্রবৃত্তিগুলো মূল্যবান হয়ে উঠেছে। কেননা তারা দেখেছে, এ পথেই তাদের অন্ন আসছে—কালীনাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে যড়যন্ত্রচাপা ফিস ফিসানির সুরে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন বলল নিত্যাপাগলা।

—সত্যি বলছো? তুমি বলো কি যে? বিস্ময়ে আনন্দে কালীনাথের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বিষণ্ণ গলায় বলল—আমার স্ত্রী কি মদ খেতে রাজী হবে?

হবে কালীনাথ হবে শুধু বাঁচার জন্য মানুষ সব পারে। আচ্ছা আমি এখন চলি কেমন? বেলতলা কলোনীতে যেতে হবে—

দুপুরের রোদ বাঁকা হয়ে পড়েছে আত্রাইয়ের জলে। নিত্যাপাগলার পরামর্শের কথাটা কালীনাথ তার স্ত্রীকে

বলল। সব শুনে রুদ্ধ গলায় নিশিবালা বলল—ওগো বলছো কি ? মদ খেতে হবে ?

—গেরুয়া, রুদ্রাক্ষের মালা না পরলে ভৈরবী হবে কি করে ? আর মদ না খেলে তোমার চোখে মুখে আত্মস্থ-ভাবই ফুটবে না—চারিদিকে তাকিয়ে নীচুগলায় আবার বলল কালীনাথ—বেশী কি আর খাবে ? মাত্র কয়েক ঢোক খাবে—

—তারপর ?

—তারপর আমি তোমাকে সব বলে দেব। তুমি জানো না নিশি, ঘরিন্দের গাঁয়ের বাঁহে হাবা গোবা মানুষ দলে দলে ভেঙ্গে পড়বে আমাদের কাছে। কেউ চাইবে মাদুলী, কেউ চাইবে দুরারোগ্য রোগের বিধান—

তার বদলে নিশ্চয়ই টাকা পয়সা পাওয়া যাবে ? চারদিনের উপোসী নিশির চোখদুটো চক চক করে উঠল।

—নিশ্চয়ই দেবে নিশি—বলল কালীনাথ এই ভাবেই তো নিত্যপাগলা আরামে আছে। স্বচ্ছল অবস্থা ওর। দূর সম্পর্কের এক বিধবা পিসীমাকে বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধানের জন্য রেখে স্ত্রীর হাত ধরে একদিন মধ্য-রাত্রে গেরুয়া গাড়ীতে চেপে কালীনাথ চলে গেল সহর থেকে ষোল মাইল দূরে কুমারগঞ্জে। পাড়ার লোক আর ছেলেমেয়েদেরকে পিসিমা বললেন—কালীনাথ তার বৌকে নিয়ে গাঁয়ের দিকে হাওয়া বদলাতে গেছে—

ছয়মাস পর। কেল্লা গ্রামের বুড়াকালীর মন্দিরের সম্মুখে ধানকাটা ফাঁকা মাঠে রাত্রির অন্ধকার তরঙ্গিত হয়ে বয়ে চলেছে। গাঢ় অন্ধকারের বুকে রক্তের রঙ ধরেছে। এলমেলো হাওয়ায় কাঁপছে অসংখ্য মশালের শিখা। মণ্ডপের চারিদিকে শত শত মেয়ে পুরুষ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। বুড়াকালীর থানের পাশে চুল ছেড়ে দিয়ে গেরুয়া শাড়ী পরে ধূম্রভঙ্গীতে ভৈরবী বেশে দাঁড়িয়ে আছে নিশিবালা। কালীনাথের পরণেও তান্ত্রিকের মত পোষাক। সে গম্ভীর ভরাট গলায় কালীপূজোর সংস্কৃত মোত্র আওড়াচ্ছে আর ফুল বেলপাতা দিয়ে ভৈরবীকে পূজো করছে। মৃদু একটা গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে চলেছে জনতার ভেতরে এইবার মা ভৈরবীর ভর হবে রে—পূজো শেষ করে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করল কালীনাথ ভৈরবীকে। চোখদুটো জবাফুলের মত লাল। কারণের নেশায় তার রক্তের ভেতরে বয়ে চলেছে উত্তেজনার উত্তপ্ত জোয়ার। হঠাৎ রাত্রির আড়ষ্ট নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল কালীনাথ—জয় মা ভৈরবীর জয়। জয় বুড়াকালীর জয়—বলেই পাখীর পালকের মত নিশির-হাল্কা দেহটা ধাঁ করে কাঁধের ওপরে তুলে নিয়ে থানের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল কালীনাথ।

—জয় মহাদেবের জয়! আকাশ কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। কালীনাথের ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে গাঁজলা গড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ তীরবিদ্ধ একটা জন্তুর মত আঁ আঁ করে নিদারুণ একটা শব্দ করে ভৈরবীকে আছড়ে নামিয়ে দিল বুড়াকালীর থানের পাশে। জলে পচা নরম মরাডালের মত নড়বড়ে দেহটা দিয়ে নিশিবালা ধুঁকে ধুঁকে বিড় বিড় করে মন্ত্র বলতে লাগল। গোল্লার রাজবংশীপাড়া মাতব্বর ক্যাকারা এগিয়ে এসে চীৎকার করে বলল জনতা এই বাঁহে তোমাদের যার যা বাঞ্ছনা আছে মা ভৈরবীকে কও—ভৈরবীর ভর হইছে রে—

—মা মোর উত্তর পাকোরের জমিটা জোর দখল করেছে খরাইলের জোব্বাররা—বলল ছাদোনের বুড়ীমা।

—এই নে, লাল সালুর টুকরোটা কাছে রাখ—চুলু চুলু চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে ভৈরবী বলল—এই শালুটা মন্ত্র পড়ে দিয়েছি। ওটা কাছে রাখলে বাবুদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা যাবে—

প্রণামী ? বাঁজখাই গলায় বলল কালীনাথ।

—দশ টাকায় হবি না বাবা ?

—না।

—এক কুড়িই তা হলে থাকলো—দুটো পিঁচুটি পড়া চোখে কাতর দৃষ্টি বুটিয়ে আঁচলের খুঁট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে কালীনাথের হাতে দিল ছাদোনের মা।

—মোর ব্যাটার বৌয়ের ক্ষণে ক্ষণে দাঁত কপাটি লাগে—বলল পূর্ণ মোড়ল।

—কোন দুষ্টু আত্মার ভর হয়েছে তোমার ব্যাটার বৌয়ের ওপরে—বলল ভৈরবী শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে হবে—

—দশ পনেরো টাকা খরচ হবে—বলল কালীনাথ।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। তখনো শত শত লোক প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চীৎকার করছে ভৈরবীর কাছে আমাকে আগে যাবা দাও—জনতার ভেতরে ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গেছে। কালীনাথ দেখল, অসংখ্য শীর্ণ হাত করুণ প্রার্থনার ভঙ্গীতে আকাশের দিকে মাথা তুলেছে। ঠেলাঠেলি করে যে পারছে, ভৈরবীর কাছে আসছে। নিশিবালার সামনে একটা চাটাইয়ের ওপরে বৃষ্টির মত পড়ছে টাকা পয়সা। ধুতি শাড়ী, চাল ডাল, আলু কুমড়া —যার যা সামর্থ্য আছে সে তাই দিচ্ছে। কালীনাথের মুখখানা হাসিতে ঝলমল করে উঠল।

বরিন্দের শান্ত, নিরিরোধ দারিদ্র্য-জীর্ণ দেহাতী মানুষের মুখে মুখে বাতাসের বেগে খবর রটে গেল—সাক্ষাত মহাদেব আর পার্বতীই যেন আবির্ভূত হয়েছেন তাদের কল্যাণের জন্ত। সমাজের সবচাইতে নীচুতলায় পড়ে থাকে বলেই দূর পল্লী অঞ্চলের এই নমশূদ্র উঁরাও—

রাজবংশী আর সাঁওতালদের ধর্মের ওপরে আস্থাটা খুব বেশী। তাদের যুগ প্রবাহিত রক্তধারায় যে সরল ধর্ম বিশ্বাসের প্রেরণা রয়েছে কালীনাথ আর নিশিবালা তারই সুযোগ নিয়ে কৃষ কঙ্কন অস্থিসার দুস্থ মানুষগুলোর টাকা-পয়সা, চালডাল এমন কি লক্ষ্মীর ঝাঁপির টাকা পর্যন্ত লুটে নিয়ে কেরা ছেড়ে বাঁহিচা, বাউল, বড়মল্লিকপুর, কলহার, পতিরাম, মোহানা ইত্যাদি গ্রামের পর গ্রাম এগিয়ে চলল। দিনের পর দিন ফুলে উঠল, ফেঁপে উঠল কালীনাথের টাকার অঙ্ক। কিন্তু এক একটা শান্ত সন্ধ্যার অবসর সময়ে তান্ত্রিকের ছদ্মবেশ পরা দেশপ্রেমিক কালীনাথের মনে হয়, দেশের এই মূর্খ সরল মানুষগুলোকে ঠকিয়ে উপার্জন করছি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষিদের যন্ত্রনায় কুঞ্চিত, জীর্ণ মুখগুলো। সেই মুহূর্তে তার বিবেক বুদ্ধি সাপের মত ফনা তুলে ফুঁসে ওঠে, যেভাবেই হোক বাঁচতে হবে। যে দেশের জন্ত সে এত করেছে, সেই দেশই তাকে দুমুঠো খেতে দেয় নি!

কয়েক মাস পরই শহরে তার বাঁশ চেকা দেওয়া জীর্ণ বাড়ীটার চালে টিন উঠল। ছেলেমেয়েদের পরনে নতুন জামাও দেখা গেল। পাড়া প্রতিবেশীদের মনে সন্দেহের ছায়া পড়ল। পিসীমা সবাইকে বললেন—কালীনাথ কাটা কাপড়ের ব্যবসা করছে গাঁয়ের হাটে হাটে—

বছর ঘুরে এল। টাকার লোভে মত্ত হয়ে কালীনাথ সস্ত্রীক গ্রামের পর গ্রাম ঘুরতে স্মরণ গ্রামে এল। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেছে নিশি আজকাল। তার সমস্ত চেহারাটার ওপরে কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। তীব্র তীক্ষ্ণ একটা দুশ্চিন্তায় তার হৃদপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ভাল করে খায় না। ঘুমায় না। কথা বলে না কালীনাথের সঙ্গে। যে হাজার হাজার দুস্থ, নিরন্ন মানুষকে বঞ্চিত করে তারা অর্থ রোজগার করছে, তাদেরই বুককাটা হাহাকার যেন তার কানে বাজতে থাকে। মনে হয়, সেদিন আর দূরে নয়। যেদিন এই পাপের জন্ত মর্মান্তিক নিষ্ঠুর কোন প্রতিফল পেতে হবে।

ওগো ত্রিকুলের কালীপূজোর মেলায় আমাদের ডাকছে —বলল কালীনাথ—যাবে? পাওনাগণ্ডা ভাল—

কোন কথা বলল না নিশিবালা। বিষন্ন চোখদুটো ছড়িয়ে দিল দূরে যেখানে চৈত্রের আগুনঝরা রোদে জ্বলছে স্মরণগাঁয়ের সোনাডাঙ্গার মাঠ। দূরে দূরে খেজুর গাছগুলো বাতাসে ডাইনীর মত মাথা নাড়ছে। শকুনেরা একটা মরাকুকুরের চারিদিকে গোল হয়ে বসে সাঁড়াশীর মত লম্বা গলা বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ি খাচ্ছে। সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলল—না, আমি যাবো না—এই ঠকের ব্যবসা আমার আর ভাল লাগছে না—

—চল না লক্ষ্মীটি। ত্রিকুলে বেশ মোটা রোজগার হবে—

—না, না কোথাও আমি যাবো না—তীক্ষ্ণগলায় চেঁচিয়ে উঠল নিশি—আমি কালই সহরে ফিরে যেতে চাই—

—সেখানে তো শুটকিমুড়ো না খেয়ে মরছিলে। শুধু দুমুঠো খাইয়ে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্তই তো এ পথ ধরেছি—

পশুও তো বাঁচে। শুধু বাঁচাই কি সব? ওগো, তুমি কি বুঝতে পারছো না, বাঁচতে গিয়ে তুমি নিজেকে কত হীন করে ফেলেছো!

—রাখো, রাখো—দাঁত খিঁচিয়ে বিষাক্ত কটুগলায়

বলল কালীনাথ—এখন পেটে দুটো দানা পড়েছে কি না, অমনি বড় বড় কথা বেরুচ্ছে—

স্বরগগাঁয়ের ভাঙা নড়বড়ে পাঠশালা বাড়ীটার চারিদিকে রাত্রি নেমেছে গভীর হয়ে। নিস্তব্ধ গ্রামটা নিজের শুদ্ধতায় তলিয়ে গেছে। ঘুম নেই শুধু পাঠশালা ঘরের ভেতরে দুটো প্রাণীর চোখে। কালীনাথ আর নিশিবালা দুজনে দুটো মূর্তির মত একটা জীর্ণ বাঁশের মাচার ওপরে বসে আছে।

—সত্যিই সহরে ফিরে যাবে? ত্রিকুলে যাবে না নিশি? ব্যাকুলগলায় বলল কালীনাথ। নিশিবালার মুখের দিকে নজর পড়তেই তার বুকের ভেতরটা টলমল করে উঠল। মেটে প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় নিশির জলভরা চোখদুটো চিক চিক করছে।

—এ কী নিশি তুমি কাঁদছো? তোমার মুখের একটু হাসির জন্যই তো ছন্নছাড়ার মত গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে দুপয়সা উপার্জন করছি—কোন কথা বলল না নিশি। নিশব্দে তাদের তোরঙ্গটা খুলে খদ্দরের পুরানো একটা শাড়ী আর ধুতি বের করল। মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, ওগো তোমার কি মনে নেই, আজ ষোলই বৈশাখ—

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে নিশি। আজকের তারিখেই তো ঐ খদ্দরের কাপড় পরে তোমার আমার বিয়ে হয়েছিল। তোমার বাবাও ছিলেন আদর্শবাদী নেতা—

—সেদিন তোমার কোন সম্বলই ছিল না। মাথা গুঁজবার একটা চালাও ছিল না, উপার্জন ছিল না। শুধু ছিল তোমার অসাধারণ চরিত্রবল—নিশির চোখের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। আশ্চর্য একটা শুচিতার বিভায় সে যেন প্রদীপের মত জ্বলছে। নিশির কথাগুলো তার বুকে তীরের মত বিঁধে গেল। কালীনাথের চোখ বেয়ে নামল অশ্রুর দুটো শীর্ণ ধারা। ব্যাকুল অথচ চাপা ব্যাথায় ভরে উঠল তার মুখখানা। বহুকাল পর সে নিশিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল,—আর আমরা এ ব্যবসা করবো না নিশি। তুমি ঠিক বলেছো। এ পথ ছেড়ে দেব। সহরে গিয়ে একটা পানের দোকান টোকান দেব। ছেলেরাই দোকান চালাবে। আমি আবার বারে প্র্যাকটিশ করবো —নিশির মনে হল, সে যেন গান শুনছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে কালীনাথের মাথার ভেতরটা। ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, কানাইলাল, সত্যেন ইত্যাদি দেশ প্রেমিকেরা সবাই যেন তার বুকের ভেতরে দাঁড়িয়ে মাথা কুটে বলছে—এ তুমি কি করছো কালীনাথ? টলতে টলতে ভাঙা জানালাটার কাছে এগিয়ে এল। সে যেন স্পষ্ট শুনতে পেল, স্তব্ধ করা রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে শিবপুকুরের জলে কলরোল উঠছে, যেন একটা মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, বাঁচতে হলে, সত্যিকারের মানুষের মত আদর্শ নিয়ে বাঁচো।

রাতের আকাশে মেঘ জমেছে। থেকে থেকে কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুতের রক্তদীপ্তি। নিশিবালা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, পুরানো দিনের মতই কালীনাথ সভায় বক্তৃতা করেছে। অগণিত মানুষের উচ্ছ্বসিত করতালির শব্দে তার কণ্ঠস্বর ডুবে যাচ্ছে। তার গলায় দুলছে রাশি রাশি ফুলের মালা। খবরের কাগজের পাতায় তার নাম ছাপা হচ্ছে, দেশময় মানুষের মুখে মুখে তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে—সুখস্বপ্নের আবেগে তার ঠোঁটদুটো থর থর করে কাঁপছে। বোজা চোখদুটো দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু—

কিন্তু নিদারুণ অস্বস্তিতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে কালীনাথের বুকের ভেতরটা। সহরে গিয়ে দিন রাতে আবার সেই হিংস্র দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, অনিশ্চিত উপার্জনের আশঙ্কাটা তার মনে পাথরের মত চেপে বসল। লণ্ঠনের শিখাটা বাড়িয়ে দিল কালীনাথ। উত্তেজিত কাঁপা হাতে টিনের সুটকেশটা খুলতেই হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় ঝলসে উঠল, বহু কাঁচা টাকা, নতুন ধুতি শাড়ি আর পুরানো আমলের ভারী ভারী গয়না—তাদের মাত্র দেড় বছরের উপার্জন। না, না, এই বাঁধা আয়ের পথ সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। অতীতদিনের সেই অর্দ্ধাহার অনাহারের মর্মান্তিক যন্ত্রণাক্লিষ্ট দিনগুলো সব যেন কলরব করে উঠল তার বুকের ভেতরে। ত্রিকুলের কালীপুজোর মেলায় হাজার হাজার দুস্থ মানুষ টাকাপয়সা, চালডাল আরও নানা জিনিষ নিয়ে অধীর আগ্রহে তারই জন্য অপেক্ষা করছে, ভাবতেই উগ্র লোভের বিষ জ্বালা ধরিয়ে দিল তার রক্তে।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ঘন অন্ধকারে মগ্ন গ্রাম থেকে মোক্ষানগরের রাস্তাটা বিশাল একটা মোটা সাপের মত নিথর হয়ে পড়ে আছে। বৃষ্টির বড় বড় ফোটাগুলোকে মুহূর্তে শুষে নিচ্ছে রাস্তার লাল ধুলো। নামাবলী গায়ে জড়ানো, রুদ্রাক্ষের মালাপরা কালীনাথ লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছে মোক্ষানগর, তপন ছাড়িয়ে ত্রিকুলের কালীর মেলার দিকে। স্বাতীনক্ষত্র যখন চন্দ্রে গমন করবে, যখন মহা অমাবস্যার অন্ধ রাত্রি নেমে আসবে ত্রিকুলের বুড়ো বটগাছের মাথায়, তখন হাজার হাজার আর্ত মানুষ তাদের সর্বস্ব দিয়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই তান্ত্রিকের কাছে এসে নিজের দুঃখকষ্ট যন্ত্রনার বিষান চেয়ে নেবে। হায় রে অবোধ মানুষ! কালীনাথের কানের কাছে বাজতে লাগল ভণ্ড তান্ত্রিক, ধুলো নিত্যপাগলার কথা—মানুষের দুশ্চরিত্রতার ওপরে পতিতার অন্ন নির্ভর করে, এযুগের মানুষের কাছে সমস্ত অন্যায়, অসৎ, নীচ প্রবৃত্তি-গুলো মূল্যবান হয়ে উঠেছে, কেননা সে দেখছে যে এই পথেই তার অন্ন আসছে। জোর পায়ে হাঁটতে সুরু করল কালীনাথ।

সত্যি...

মেপোল

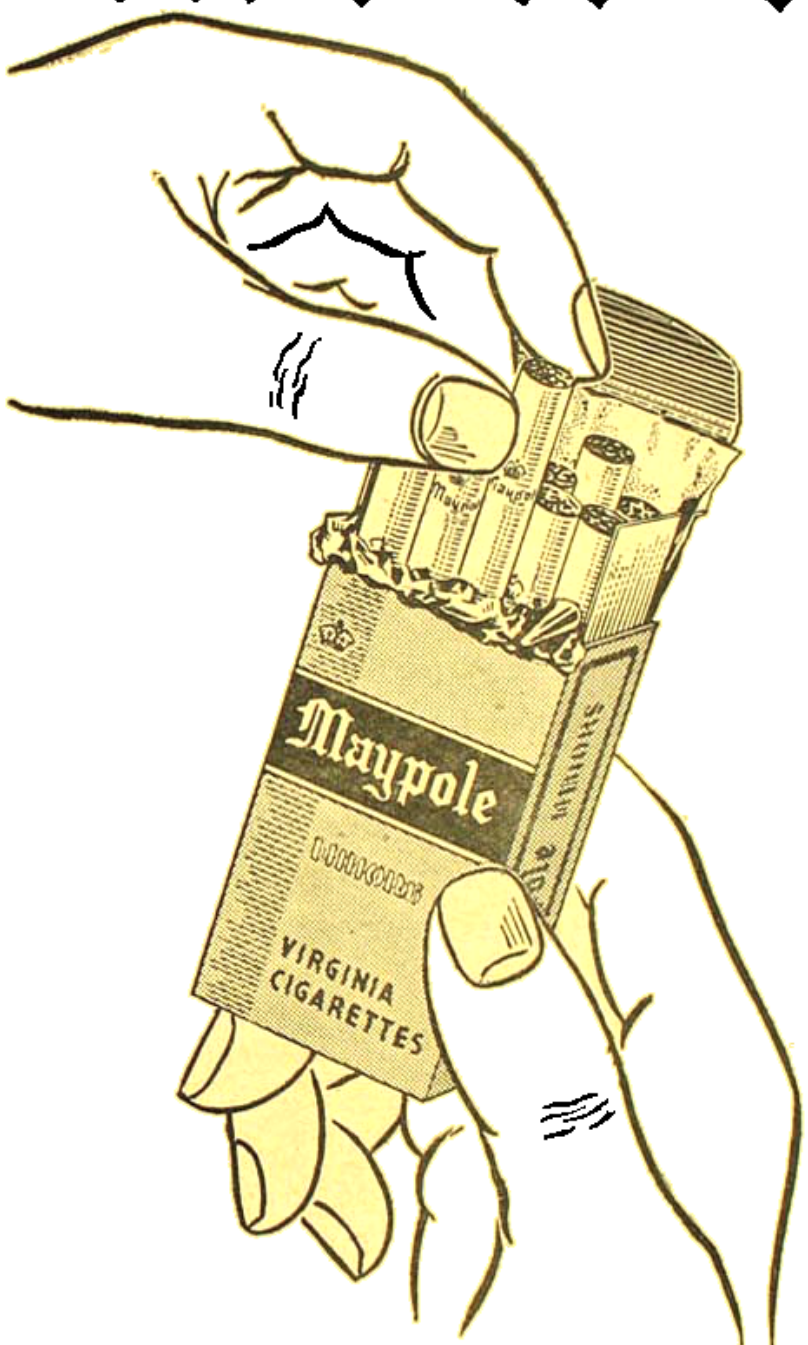

সব চেয়ে ভাল

AC1 ।/০ আনায় ১০টি, ১৷/০ আনায় ৫০টি MJ/168

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নারীর ভূমিকা

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৭ম পরিচ্ছেদ

মনে ছিল কত সাধ
বিবাহে সাধিল বাদ

এড্ডা মুসোলিনী ভাবিয়াছিল সে ইটালীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র উম্বার্টোকে বিবাহ করিবে। মুসোলিনীর নিকট প্রস্তাবটি অত্যন্ত সুখরোচক ছিল।

ইশ ডিউস জানিত তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজপুত্রকে বিবাহ করিয়া ইটালীর রাণী হইবে ইহা অত্যন্ত সুখের কথা।

এড্ডা তাহার অমার্জিত চাল চলনের দ্বারা ব্যাপারটি ঘোলাটে করিয়া না তুলিলে কোন অসুবিধা হইতনা। বালিকা বয়স হইতেই সে অত্যন্ত অসংযত ছিল এবং সাধারণ সংযত চাল চলন সে পছন্দ করিত না।

এক সময় তার মনে হইল "আমি কেন ইটালীর রাণী হইনা? আগে আগে যাহারা রাণী হইয়াছে তাহাদের অপেক্ষা রাণী হিসাবে আমি কিছু খারাপ হইব না। আমি যদি রাণী হই তবে আমি শাসনকর্ত্রীই হইব, কেবলমাত্র সিংহাসনে ঝোলান পুতুল হইয়া থাকিব না।"

ব্যাপারটিকে সমস্ত দিক দিয়া গুরুত্ব দিয়া চিন্তা করিয়া এড্ডাকে উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করার চেষ্টা চলিল।

ইটালিয়ান সমাজের একজন প্রথম শ্রেণীর মহিলা হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্য এড্ডাকে একটি আদর্শ আদব কায়দাবিশিষ্ট বিদ্যালয়ে পাঠান হইল। সেখানে নিয়মানুবর্তিতা এবং চাল চলন অত্যন্ত কঠোর। অতএব এড্ডা তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবদের পর্য্যন্ত না জানাইয়া একদিন বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইল এবং সোজা বাড়ী গিয়া বলিল "বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে।"

মুসোলিনী খুব কড়া অভিভাবকের ন্যায় তাহাকে পুনরায় স্কুলে ফেরৎ পাঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে তাহাকে ভাল কথায় বুঝাইবার চেষ্টা হইল যে তাহার নিজের ভালর জন্যই পুনরায় স্কুলে যাওয়া দরকার। তাহাতেও ফল হইল না। মুসোলিনী পুনরায় শক্ত হইয়া তাঁহাকে স্কুলে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিল। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে লিখিয়া জানাইল যে এড্ডা ফিরিয়া যাইতেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এড্ডা বাঁকিয়া বসিল।

শিক্ষয়িত্রী এড্ডাকে পুনরায় ভর্তি করিতে প্রায় অসম্মতি প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিয়া দেওয়ায় ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। চিঠিখানি অবশ্য অত্যন্ত কূটনৈতিক ভাষায় এমন ভাবে লেখা হইয়াছিল যাহাতে ইশ ডিউস অসন্তুষ্ট না হইতে পারে। চিঠিতে বলা হইয়াছিল যে এড্ডা পিতা মাতাকে অত্যন্ত ভালবাসে এজন্য তাহাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, অতএব তাহার জন্য একজন গভর্ণেস রাখিয়া দিলেই ভাল হয়।

মুসোলিনীকে হাল ছাড়িয়া দিতে হইল এবং এড্ডা একজন গভর্ণেসের তত্ত্বাবধানে বাড়ীতেই থাকিয়া গেল।

গভর্ণেস ছিল একজন ইংরাজ মহিলা। তখন পর্য্যন্ত ইংরাজদের বিরুদ্ধে মুসোলিনীর কোন বিরক্তি ছিল না। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং ইটালীর তার অংশ হিসাবে লুটের মাল যথেষ্টই পাইয়াছিল। মুসোলিনীও সবেমাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তখনও নিজের পদে সুদৃঢ়ভাবে স্থিতি লাভ করিতে পারে নাই। ইংরাজরা ইটালীতে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল এবং মুসোলিনীও দেশের হাওয়া বুঝিয়া চলিতেছিল।

অবশেষে দিন আসিল, ইটালীর ভবিষ্যৎ রাণীকে

যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। দেখা করার সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক ছিল। এড্ডাকে যতদূর সম্ভব বনিয়াদি কায়দায় উপস্থিত করা হইল।

কিন্তু যে ব্যক্তি রাজাকে অন্তরালে ঘাবাইয়া রাখিয়াছে তাহার কন্যার প্রতি যুবরাজ উদ্বাটো আকৃষ্ট হইল না। স্যাভয়ের রাজ পরিবারের যুবরাজ একজন অতি সাধারণ লোকের কন্যাকে বিবাহ করার মত হীনতা স্বীকার করিতে পারে না, বিশেষতঃ যে কন্যার জন্ম সম্বন্ধে নানারূপ গুজব প্রচলিত আছে।

শোনা যায় যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে প্রিন্স উদ্বাটো সোজা "না" বলিয়া দিয়াছিল এবং এসম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিল।

অতএব এড্ডার আশা চূর্ণ হইল এবং স্যাভয় রাজ-পরিবারের উপর সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। তার পর হইতেই রাজার সহিত তাহার পিতার বিভেদে সে ইন্ধন যোগাইয়া চলিয়াছিল। এড্ডা ইহাকে তাহার প্রতি চরম অপমান বলিয়া মনে করিল এবং আজও সে প্রতিশোধ গ্রহণের রাস্তা খুঁজিতেছে। সে যুবরাজকে খুব সহজ শিকার বলিয়া মনে করিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল যে ইটালীর একনায়কের কন্যাকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

এবিষয়ে এড্ডা নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়াছিল এবং তার পিতার শক্তি সম্বন্ধেও সে অতিরিক্ত ধারণা করিয়াছিল। মুসোলিনী একনায়ক হইতে পারে কিন্তু ইটালীতে স্যাভয় রাজ পরিবার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আজ উহা আরও দৃঢ় হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

ইহার কিছুদিন পরেই এড্ডা সিয়ানোর সংস্পর্শে আসে। এড্ডার উপর তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না। এড্ডা ছিল তাহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন ফ্যাসিজমের উৎসাহে উদ্বিগ্ন কূটনৈতিক খেলার এমেচার।

এড্ডার ভিতর সে নিজের উচ্চাশা পূরণের পথ দেখিতে পাইল। ইশ ডিউসের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিলে সে দেশের মধ্যে নিজের ইচ্ছামত উচ্চপদ লাভ করিতে পারিবে এবং একজন শক্তিমান বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে। জীবনসঙ্গিনী হিসাবে সে কাম্য না হইলেও কূটনীতির পথ সে সরল করিয়া দিতে পারিবে। এক নায়কের জামাতা হইতে পারিলে মুসোলিনী তাহাকে অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

তখন পর্যন্ত দিয়ানো জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে যুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন উৎসাহ পাইল না। তার পর সাংবাদিক হওয়ার চেষ্টা করিয়া অজ্ঞাত অখ্যাত কাগজে-সংবাদের গুজব পরিবেশন করিতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত ইহাতেও ক্লান্ত হইয়া সহরে বাবু হইয়া আলস্যে দিন কাটাইতে লাগিল।

রোমের গ্র্যাণ্ড এবং এক্সেলসিওর এই দুইটি হোটেলেই আমেরিকান মহিলাদের বেশী যাতায়াত ছিল। সেও এই দুইটি যায়গায় যাতায়াত সুরু করিল।

শোনা যায় গালিয়াজ্জো সিয়ানোর বেশীর ভাগ সময়ই ধনী আমেরিকান মহিলাদের সহিত আলাপ পরিচয়েই কাটিয়া যাইত, আশা ছিল তাহাদের সাহায্যে নিজের ভবিষ্যৎ গুছাইয়া লইবে।

তাহার পিতা এডমিরাল সিয়ানোর উপর হাত খরচের জন্য তাহার নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু বৃদ্ধ এডমিরাল এ বিষয়ে খুব উদার ছিল না। প্রকৃত পক্ষে নিজের পদ-মর্য্যাদা অনুযায়ী চাল চলন রক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধের আর্থিক টানাটানি চলিতেছিল।

গল্প শোনা যায় যে গালিয়াজ্জো তার পিতাকে এড্ডার সহিত তার পরিচয়ের কথা বলিয়াছিল এবং একটা বিবাহ ঘটাইতে পারিলে মন্দ হয় না এইরূপ আশ্বাসও দিয়াছিল।

এডমিরাল সিয়ানো একজন খাঁটি ফ্যাসিষ্ট ও মুসোলিনীর দক্ষিণ হস্ত বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে যদি মুসোলিনীর অবাঞ্ছিত কিছু ঘটে তবে সেই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে ফ্যাসিষ্ট সুপ্রীম কাউন্সিলে এইরূপই ঠিক ছিল।

যুবক সিয়ানো এইরূপ পদস্থ ব্যক্তির পুত্র-হিসাবে আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে পারে

নাই। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ যুবক ছাড়া তাহার আর কোন পরিচয় ছিল না।

পুত্র এড্ডার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ইহাতে এডমিরাল সিয়ানো আনন্দিতই হইয়াছিল এবং আশা করিয়াছিল যে আকর্ষণটি উভয়তঃই হইবে। এরকম বিবাহে পুত্রের ভবিষ্যতও নিশ্চিত হইবে ইহাই সে মনে করিয়াছিল।

অতএব বিবাহ ঘটাইবার জন্য সেও চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই পরিকল্পনা চমৎকার সাফল্য লাভ করিল। কয়েক-মাস পরেই এড্ডা এবং সিয়ানোর বিবাহ হইয়া গেল এবং সিয়ানো প্রচার মন্ত্রীর পদ লাভ করিল।

পদমর্য্যাদা অনুযায়ী তাহার স্বামী যাহাতে খ্যাতিলাভ করিতে পারে সেদিকে এড্ডা দৃষ্টি দিল এবং দৃঢ় সংকল্প করিল যে দেশের মধ্যে তাহার স্বামীকে ক্ষমতার অধিকারী করিয়া তুলিবে। কারণ তাহার পক্ষে একজন সাধারণ লোকের স্ত্রী হইয়া থাকা সম্ভব ছিল না।

শীঘ্রই সিয়ানোকে পূর্বাঞ্চলে পাঠান হইল। এড্ডার সহিত সাংহাই গিয়া এড্ডার চতুর প্রচার-কার্য্যের সহায়তায় তাহার সুনাম বৃদ্ধি পাইল।

রোমে মুসোলিনী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বৈদেশিক মন্ত্রী করিয়া দিল।

এড্ডার সহিত পুত্রের বিবাহ হওয়ার ফলে বৃদ্ধ এড-মিরাল কোন অজ্ঞাত উপায়ে নিজের অবস্থার প্রচুর উন্নতি করিয়া ফেলিল এবং মৃত্যুকালে বিরাট ধন-সম্পত্তি রাখিয়া গেল। ১৯৩০ সালে তাহার পুত্রের বিবাহ হয় এবং তাহার আট বৎসর পর তাহার মৃত্যু হয়। এই কয় বৎসরের ব্যবধানে "বিচক্ষণ লক্ষ্মীর কারবারে" সে এই অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। এড্ডা এবং কাউন্ট সিয়ানো বর্তমানে ঐ সম্পত্তির মালিক।

এড্ডার জীবনে একটি অন্ধকারময় অধ্যায় আছে। নাজী ফ্যাসিষ্ট মিলনচক্রের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মহলের দু'এক জন ছাড়া তাহা আর কেহ জানে না।

অষ্ট্রিয়ার ক্ষুদ্রে চ্যান্সেলার ডলফাসের হত্যাকাণ্ডের সহিত এড্ডার জীবনের ঐ অংশ জড়িত।

অষ্ট্রিয়ার কোন কোন অংশের প্রতি মুসোলিনীর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। অক্ষশক্তির ধনিষ্ঠাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বে এড্ডা বার্লিন হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে নাজীবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই এবং এটাও বুঝিল যে হিটলার অষ্ট্রিয়ার মাথায় এবং সম্ভবতঃ ইটালির মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিজের জন্য কিছু গুছাইয়া লইতে চায়।

এড্ডা ঠিক করিল যে ইটালী নাজী কূটনীতিকদের হাতের মোয়া কাড়িয়া লইবে। সে দেখাইয়া দিবে যে বুদ্ধির খেলায় সে তাহাদের অপেক্ষা অনেক চতুর।

সে ঠিক করিল যে অষ্ট্রিয়ায় সেই ফ্যাসিবাদের অগ্রদূত হইবে। সীমান্তের ইটালিয়ানরা চ্যান্সেলারের নিকট কিরূপ ব্যবহার পাইতেছে সে সম্বন্ধে নানারূপ গল্প বলিয়া মুসো-লিনীকে সে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ইটালিয়ানরা সেখানে অপাংক্তেয় হইয়া আছে, তাহাদের অতিরিক্ত করভার বহন করিতে হয় অথচ সরকারী শাসনযন্ত্রের উপর তাহাদের কোন হাত নাই। ফ্যাসিষ্ট ইটালীর অনভি-বিলম্বে এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান ঘটান উচিৎ। দূরবর্তী নির্বাসিতরা মুসোলিনীর দিকে মুক্তির জন্য তাকাইয়া আছে। গত যুদ্ধে ইটালী কি অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে নাই? সঙ্ঘবদ্ধ ফ্যাসিষ্ট ইটালীকে বাধা দিবার ক্ষমতা অষ্ট্রিয়ার পতনশীল সরকারের নাই।

মুসোলিনী কন্যার অনুরোধে তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিয়া ফেলার অপেক্ষা একরাপ আগাইয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি গুলনিগকে রোমে ডাকিয়া পাঠাইল এবং এড্ডার ইচ্ছা অনুযায়ী তাহাকে বলিল যে ইটালিয়ানদের অষ্ট্রিয়ার শাসন ব্যবস্থায় উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হইবে।

গুলনিগ দাবী সোজা-সুজি অস্বীকার করিয়া বসিল এবং এই ঘটনার কথা শুনিয়া হিটলার মনে করিল মুসো-লিনী তাহার নিজের ব্যাপারে অনধিকার হস্তক্ষেপ করিতেছে। ইহাতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে বুঝিল ইহার ভিতর এড্ডার হাত আছে। এই এড্ডা সম্বন্ধে সে বলিয়াছিল "অত্যন্ত বিপজ্জনক স্ত্রীলোক", কিন্তু ঠিক-ভাবে চালাইতে পারিলে জার্মানীর কাজে লাগিতে পারে।

এই ঘটনার পর হিটলার ভাবিল যে এখন তাড়াতাড়ি

যাহা হউক একটা কিছু না করিলে মুসোলিনী তাহার কন্যার সাহায্যে অনেকটা আগাইয়া যাইবে।

অষ্ট্রিয়াতে তাহার লোকজন তখন ভালভাবে আস্তানা গাড়িয়াছে। তাহাদের কাজ ছিল সৈন্যদলকে উত্তেজিত করা এবং একটা ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করা। ইহুদের নির্দয় ভাবে নির্য্যাতন করা হইতেছিল এবং নাজী বিরোধীদের নিকাশ করা হইতেছিল।

অষ্ট্রিয়ার নাজী সন্ত্রাসবাদীদের নেতা গ্লোবকনিক। তার কাজ ছিল বিরুদ্ধবাদীদের সরকারীভাবে হত্যা করা।

তাহার সহিত ছিল আর্থার সিসইঙ্কোয়ার্ট নামে ভিয়েনার একজন উকিল। নাজী মক্কেলদের নিয়াই তার কারবার ছিল। এই জার্মাণ ঘেঁষা উকিলটি অত সামান্য পসারের উপর নির্ভর করিয়া কিভাবে ব্যয়বহুল চাল চলন রক্ষা করিয়া চলিতেছে ইহা ভাবিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। চ্যান্সেলারের হত্যার পূর্বে ভিয়েনাতে সে একজন মান্যগণ্য লোক ছিল।

গ্লোবকনিক যখন ভীতির অভিযান চালাইতেছিল সে তখন ডলফাসের সহিত উপরে বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া ভিতরে ভিতরে তার বিরুদ্ধে একটার পর একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া চলিতেছিল।

ডলফাস মুসোলিনীর দাবীকে ধৃষ্টতা মনে করিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিল এবং দৃঢ়ভাবে শুশনিগকে সমর্থন করিল।

তারপর আসিল হিটলারের দাবী—নাজীদের সহিত অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার করিতে হইবে এবং আভ্যন্তরিণ ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে।

এড্ডার নিকট ইহা অসহ্য হইল; সে মনে করিল হিটলার তাহাকে টপকাইয়া আগাইয়া গেল। অতএব সে এবং সিয়ানো তাড়াহুড়া করিয়া ভিয়েনায় আসিয়া গ্লোবকনিক ও সেস ইঙ্কোয়ার্টের সহিত দেখা করিল।

নাজীনেতারা বার্লিনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতেছিল। এড্ডার সহিত খোলাখুলি ঝগড়া করায় হিটলারের তখন লাভ ছিলনা। এড্ডাকে পরে কাজে লাগাইবার প্রয়োজন ছিল কাজেই নাজীরা তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতে লাগিল যেন এড্ডার সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এড্ডার পরামর্শ অনুযায়ী সিয়ানো মুসোলিনীর দাবী উত্থাপন করিতে লাগিল এবং অষ্ট্রিয়ান চ্যান্সেলারকে দাবী মানিবার জন্য ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু কোন ফল হইলনা।

ডলফাসের সংকল্প ছিল ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ় সে ইটালীয় এই নূতন কাউন্টকে তাহার উপর সর্দারি করিতে দিতে রাজী হইল না।

সিয়ানো যখন তাহার কাজ করিতেছিল এড্ডা তখন নাজী-নেতাদের সহিত আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। নাজীরা তাহাকে বুঝাইল যে ইটালী এবং জার্মানী একসঙ্গে তাহাদের দাবী পেশ করিলে ভাল হয়। সে অবস্থায় ডলফাস কিছুতেই তাহা অস্বীকার করিতে সাহস করিবে না। কিন্তু যদি করে? যদি করে তাহা হইলে ক্ষুব্ধ নাজীদল অষ্ট্রিয়াতে কি কাণ্ড ঘটাইবে তাহার সীমা নাই। হয়ত ডলফাসকে তাহারা শেষ করিয়াও ফেলিতে পারে।

এড্ডা এবং চক্রান্তকারীদের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়া গেল। পৃথক পৃথক দাবী জানান একটা অবাস্তব প্রস্তাব। সে যুক্তভাবে কাজ করাই স্থির করিল। এড্ডা তার গুপ্ত অভিসন্ধি মনের মধ্যে গুপ্ত রাখিয়া স্বামীর সহিত রোমে ফিরিয়া আসিল। সে অবশ্য নিজে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ডলফাসকে তাহার অকৃতকার্য্যতার মূল্য দিতে হইবে এবং নাজীরাই মূল্য আদায় করিয়া দিবে, এড্ডার কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাইতে হইবে না ইহাই সর্ত স্থির হইল।

ইহার অল্পদিন পরেই ডলফাসকে হত্যা করা হইল। এড্ডা সন্তুষ্ট হইল। অষ্ট্রিয়ান চ্যান্সেলারকে ইটালীর দাবী প্রত্যাখ্যানের মূল্য দিতে হইল এবং নাজীরাই মূল্য আদায় করিয়া দিল।

কিন্তু এই কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রে ইটালীর কি লাভ হইল? কিছুই না। হিটলার অষ্ট্রিয়ায় অভিযান করিয়া সমস্ত দেশ দখল করিয়া লইল। ইটালী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

ওডিলো গ্লোবকনিক তাহার উকিল সহযোগীকে প্রধান সহকারী হিসাবে রাখিয়া নিজেই অষ্ট্রিয়ার ক্ষুদে হিটলার হইয়া বসিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু তার বদলে সে হিটলারের দেহরক্ষী নিযুক্ত হইল। একটি অটোমেটিক

পিস্তল হাতে তাহাকে ফুরারের সহিত সর্বত্র যাইতে হয়। উকিল বাবুটিকে এখন চীফ কমিসনার হিসাবে হল্যাণ্ডে নিযুক্ত দেখা যাইবে।

এড্ডা সিয়ানো এজন্ত হিটলারকে কখনও ক্ষমা করিতে পারে নাই। কিন্তু হিটলারের প্রতি সে অসীম শ্রদ্ধা দেখাইত। কিন্তু তাহা একান্তই বাহ্যিক টান। প্রকৃত-পক্ষে এড্ডা নাজী-নেতাকে তাহার ক্ষমতা ও প্রত্যেককে তাহার কাজে লাগাইবার দক্ষতাকে অত্যন্ত ঈর্ষা করিত।

অষ্ট্রিয়ার খেলায় হারিয়া গিয়া সে প্রতিশোধ গ্রহণ করার সংকল্প করিল।

ধূর্ত কূটবুদ্ধি এড্ডা ভাবিল মুখে হিটলারের সহিত বন্ধুত্ব রাখিয়া তাহার পিতাকে দিয়া সে হিটলারকে কূট-নৈতিক খেলায় হারাইবে। কেবলমাত্র সীমান্তে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিয়া ইংল্যাণ্ডকে তাড়াইয়া তুলিবে সেই সময় সে তাহার পিতাকে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে বাধ্য করিল।

এড্ডার যুক্তি ছিল ইংল্যাণ্ডের কিছুতেই জয় হইতে পারে না। জার্মানী অত্যন্ত শক্তিশালী। ইটালী এতদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যে আর তাহার ফিরিবার পথ নাই। কিন্তু জার্মানী জিতিলে ইটালীর অনেক লাভ। ইটালীর সাম্রাজ্যের প্রয়োজন, তাহার বিস্তারের জন্ত স্থান প্রয়োজন। জয় লাভ করিতে পারিলে ব্রিটিশ উপনিবেশের কিছুটা অংশ অবশ্যই ইটালীর অধীনে আসিবে। আমরা দূরে সরিয়া থাকিলে জার্মানীর নিকট হইতে সামান্ত কিছু লুটের ভাগ ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না। ইটালী যুদ্ধে প্রবেশ করিলে যুদ্ধের স্থায়িত্ব কমিয়া আসিবে। সুয়েজ ক্যানেল বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার আফ্রিকার উপনিবেশ দখল করিয়া লইলে ইংল্যাণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে।"

মুসোলিনী ইংল্যাণ্ডের পতন সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিত ধারণা লইয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু হিটলার ইহাতে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। নাজীরা তাহাদের পূর্ব পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুর্বল মিত্রশক্তিকে সমর্থন করিতে লাগিল।

এদিকে রোমে বসিয়া এড্ডা ক্রমাগত ইটালীর পরাজয়ের সংবাদ পাইয়াও ক্রূর হাসিতে লাগিল। হিটলারের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ সফল হইল কিন্তু নিজের দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া তাহার মূল্য দিতে হইল।

রাজনৈতিক খেলা কেমন লাগিতেছে একথা একবার আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে রহস্যময় হাসির সহিত আমাকে বলিল "রাজনীতিতে আমার কোন উৎসাহ নাই। রাজনীতি পুরুষদের জন্ত, নারীর পক্ষে উহা হইতে দূরে থাকাই উচিত। ঘর-সংসার স্বামী ও শিশু সন্তান লইয়াই তাহাদের কাজ। নারীর স্থান ঘরে, রাষ্ট্রের প্রতি সেখানেই তাহাদের কর্তব্য আছে। ঘরে আমার সন্তানদের মধ্যেই আমার কাজ কেন্দ্রীভূত, তাহার বাহিরে সঙ্গীত ও শিল্প সম্বন্ধেই আমার উৎসাহ।"

তাহার বালিন ভ্রমণ, সাংহাই অভিযানে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাহার পরিকল্পনা, ভিয়েনায় তাহার ষড়যন্ত্র এবং সর্বোপরি ডলফাসের হত্যাকাণ্ডের কথা আমার মনে হইল।

এড্ডা সিয়ানো একজন ভাল অভিনেত্রী হইতে পারিত।

৮ম পরিচ্ছেদ

বুলগেরিয়ার রাজকন্যা

রাজা বোরিসের ভগ্নী রাজকন্যা ইউডক্সিয়া হস্তক্ষেপ না করিলে বুলগেরিয়া এখনও যুদ্ধের বাহিরে থাকিতে পারিত।

সরকারীভাবে রাজপুত্রী অবসর জীবন যাপন করিতে ছিল কিন্তু আসলে সে মোটেই অবসর গ্রহণকারী অন্তরাল-বর্তিনী নারী ছিল না। তার শক্তির উপরেই রাজসিংহাসন স্থাপিত ছিল। রাজা বোরিসকে সেই দূরদর্শিতা পরিচালনা করিতেছিল। লোকে তাহাকে বুলগেরিয়ার মুকুটহীন রাণী বলিত, এবং যে কোন রাজমন্ত্রীর উত্থান বা পতন তাহার উপর নির্ভর করিত।

ইউডক্সিয়ার রাজনীতির দিকে বরাবরই ঝোঁক ছিল। ষড়যন্ত্র পাকান তাঁর অভ্যাস। ষড়যন্ত্র পাকাবার সুযোগ পাইলে সে অত্যন্ত খুসী হইত।

তাহার বাৎসরিক আয় মাত্র প্রায় ২০০ পাউণ্ড হইলেও বর্তমান ষ্টেটগুলির মধ্যে সে অত্যন্ত ধনী এবং

প্রভাবশালী বলিয়া পরিচিত ছিল। দেশের বেশীর ভাগ লোক কৃষিজীবী হইলেও কৃষকদের উপর তাহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল।

রাজার অনুগত ভগ্নীরূপে থাকার এবং তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর দৃষ্টি রাখার একটা বাহ্যিক ভাণ তাহার সর্বদাই ছিল এইজন্য নিজেকে সে সর্বদাই রাঁধুনী ও পরিচারিকা বলিত। প্রকৃতপক্ষে ইউডক্সিয়া নিজে খুব ভাল রান্না করিতে পারিত এবং প্রায়ই রাজার জন্য বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য রান্নাঘরে গিয়া তদারক করিত।

তাহাকে নিঃসন্দেহে একজন বুদ্ধিমতী ও দক্ষতাসম্পন্না নারী বলা যাইতে পারে। ছয়টি ভাষায় সে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে পারে। শিল্পী হিসাবেও সে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত। চিত্রবিদ্যার উপর তাহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তার অঙ্কিত স্বাভাবিক দৃশ্যের চিত্র দেখিয়া বিশেষজ্ঞরা উচ্চ প্রশংসা করিয়াছে।

সোফিয়াতে কয়েকবার তাহার চিত্রের প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত বল্কান ষ্টেটের উপর কর্তৃত্ব করার দুরাশাই তাহার বিশেষত্ব ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক আলোড়ন ও ঘূর্ণীবাত্যা হইতে সে কিছুতেই দূরে থাকিতে পারিত না।

রাজনৈতিক চক্রান্তকারীরা তাহার নিকট আসিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করিত। ইউডক্সিয়াকে কোনমতে দলে টানিতে পারিলেই কার্যসিদ্ধি হইবে এই বিশ্বাস বুলগেরিয়ার চক্রান্তকারীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল।

বুলগেরিয়ার অদ্ভুত পরিস্থিতি ও ইউরোপের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র রাজপুত্রীর জীবন কিরূপ প্রভাবের মধ্যে গঠিত হইয়াছিল ইহা জানিতে হইলে বুলগেরিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা দরকার।

সেখানকার রাজনীতিকরা অসাধু এবং দুর্নীতিপরায়ণ ছিল একথা বলিলে অবস্থাটা অনেক হাল্কা করিয়া বলা হয়।

সেখানকার সমস্ত জাতিটাই দুর্নীতিপরায়ণ।

রাজনীতিকরা নিজেদের জীবন ও স্বাধীনতার ঝুঁকি দিয়াও কেবলমাত্র অর্থ ও ক্ষমতার লোভে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আসে। সরকারী কর্মচারীরাও কেবলমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই চাকরীতে আসে।

বুলগেরিয়ার একজন মন্ত্রী অপেক্ষা ইংলণ্ডের অনেক ব্যাঙ্কের কেরাণীরা বেশী বেতন পায়। বেতনের উপর সেখানে কেহ নির্ভর করে না, উহা ত উপরি পাওনা। পদমর্যাদা এবং উহার সহিত কি পরিমাণ ঘুষ পাওয়া যাইতে পারে উহাই আসল কথা।

বুলগেরিয়ার জনসাধারণের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীরা নিজেদের পক্ষকে যে কোন ভাবে ঘুষ পাওয়ার একটি উপায় বলিয়া মনে করে। যে সমস্ত কর্মচারীরা পাসপোর্টে সিল মারে তাহারাও তাহাদের কাজের জন্য কিছু আশা করে। জনসাধারণের উপকারের জন্য কোন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করাইতে হইলে সহরের মেয়রকে অথবা কোন মান্য গণ্য ব্যক্তিকে অথবা, কাউন্সিলের কোন সভ্যকে ঘুষ দিতে হয়। মন্ত্রী হইতে রেলের কুলি পর্যন্ত দেশের সর্বত্রই ঘুষের রাজত্ব।

সৈন্যবাহিনীর সোলাবারুদ প্রয়োজন। সেখানে ঘুষের নদী। অস্ত্রশস্ত্রের কারখানওয়ালারা সেখানে সেখানে ঘুষ ছড়ায়। দেশে কেহ ব্যবসা করিতে চাহিলে সেখানেও ঘুষ। হিংসা, দ্বেষ, মারামারি দৈনন্দিন ঘটনা।

পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ঘুষের ব্যবস্থা সমস্ত দেশ এবং তার রাজনৈতিক ও বৈষয়িক আবহাওয়াকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বালিকা বয়সেই ইউডক্সিয়া রাজনৈতিক মতলববাজদের খপ্পরে পড়িয়াছিল। বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী জার্মাণ ঘেঁষা কুব স্বভাব ঝাঁকফ ক্ষমতা আয়ত্তে আনার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। তার টাকা ছিল কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা ছিলনা।

তার ধারণা ছিল রাজা তার মতলবের বিরুদ্ধতা করিবে। কাজেই সে অগ্রসর হইয়া ইউডক্সিয়াকে দলে টানিয়া লইল। ছোট খাট বিলাসিতার জন্য ইউডক্সিয়ার অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং ঝাকফেরও অর্থ যোগাইবার সামর্থ্য ছিল। ইউডক্সিয়া তার প্রস্তাব মানিয়া লইয়া ঐ সময় তার সামর্থ্য অনুযায়ী যতটা সম্ভব প্রভাব বিস্তার

করার জন্য ঘুষ গ্রহণ করিল। ঝাঁকফ মন্ত্রী সভায় প্রবেশ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিল।

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ইউডক্সিয়া বুলগেরিয়ার চক্রান্তকারীদের হাতের পুতুল হইয়া রহিল। সর্বদাই রাজাকে হাত করিবার জন্য তাহার নিকট ঘুষের প্রস্তাব আসিত এবং যতদিন সে মূল্য পাইত ততদিন তাহার নিকট হইতে কাজ পাইতে অসুবিধা হইতনা।

গত যুদ্ধে বুলগেরিয়ার পরাজয়ের পরে ঝাঁকফের পতন হইল। বুলগেরিয়ার জনসাধারণ জারের অত্যাচারে অসহ্য হইয়া বিদ্রোহ করিল। কৃষকদের নেতা আদর্শবাদী ষ্টাম্বলিনস্কি দেশের মধ্যে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কিন্তু তার বুদ্ধি এবং সাধুতা থাকিলেও টাকা ছিলনা। ঝাঁকফ এবং তার সমর্থকদের অর্থ বৃষ্টির মুখে কৃষকদলের মন্ত্রী সভা টিকিতে পারিলনা।

ইউডক্সিয়ার মত কৃষক প্রধান মন্ত্রীর শত্রু আর কেহ ছিলনা। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়া শীঘ্রই দেশে রাজার স্থলে সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে এই ভয়ে সে তাহাকে একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিল।

রাজপুত্রীর হৃদয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার মাধ্যমে ঐ কয়েক বৎসর ঝাঁকফ রাজার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দেশে বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। সর্বত্রই ঝাঁকফের গোয়েন্দা ছিল। কৃষক প্রধান মন্ত্রীর সমর্থকরা সর্বত্র প্রহৃত হইতে লাগিল। কেহ কেহ খুন হইয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত একটা বিদ্রোহ দেখা দিল এবং ঝাঁকফ পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিল।

তাহার প্রথম কাজ হিসাবে সে ভূতপূর্ব সরকারের ১২০০০ সমর্থককে গ্রেপ্তার করিয়া কঠিন শাস্তি দিল। প্রহসন করিয়া হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হইল। দেশের সাম্যবাদী বিদ্রোহীদের শাস্তির আদর্শ হিসাবে ষ্টাম্বলিনস্কিকে ঝাঁকফের আদেশে গুলি করিয়া মারা হইল।

ইহার পরেই ঝাঁকফ রাজকন্যা এবং তাহার ভ্রাতার জীবন নিরাপদ বলিয়া ঘোষণা করিল।

বৎসরের পর বৎসর প্রধান মন্ত্রী নাজীবাদের প্রচার করিয়া চলিল। তার অর্থশালী বন্ধু এবং সমর্থকদের জার্মাণীতে পাওয়া যাইবে। এই বিশ্বাসঘাতকটি গত কয়েক বৎসর নাজীদের নিকট হইতে কত লক্ষ পাউণ্ড যে ঘুষ পাইয়াছে তাহার আন্দাজ করাও কঠিন।

যুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে বুলগেরিয়ার রাজনীতিকরা যত অর্থ উপার্জন করিয়াছে তত আর কখনও করিতে পারে নাই।

১৯৩২ সালে জার্মাণী একবার বুলগেরিয়ার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা বিস্তার করার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু জার্মাণীর হাত একান্ত ভাবে গোপন রাখার প্রয়োজন ছিল। ইটালী তাহার জার্মাণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি রাখিতেছিল। ইটালীর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। দেশে স্রোতের মত টাকা আসিতে লাগিল। ঝাঁকফ মনের আনন্দে ঘুষ গ্রহণ করিতে লাগিল।

এই রাজনৈতিক দ্বারা খেলায় ইউডক্সিয়া তার নিজের অংশ ভালভাবেই অভিনয় করিল। ঝাঁকফ ইটালী ও জার্মাণী উভয় পক্ষের নিকট হইতে ঘুষ গ্রহণ করিয়া অমিত ক্ষমতাশালী রাজকন্যাকে অবহেলা করিতে সাহস করিলনা।

নাজী এবং ফ্যাসিষ্ট ইহাদের মধ্যে যে বেশী টাকা দিবে ঝাঁকফ তাহাকেই সমর্থন করিতে মনস্থ করিল। এক সময় মনে হইয়াছিল বুলগেরিয়ায় ফ্যাসিবাদেরই জয় হইবে এবং ঝাঁকফ একনায়ক হিসাবে ক্ষমতায় আসীন হইবে।

ইউডক্সিয়া মনে করিল সে এইরূপ লোকের হাতে ক্ষমতা থাকিলে অন্ততঃ সিংহাসন নিরাপদ থাকিবে। অতএব সে ইটালিয়ান ফ্যাসিষ্ট দলের সভ্যা হইয়া মুসোলিনীর গুণ গান করিতে আরম্ভ করিল এবং ফ্যাসিষ্ট দলের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল।

ফ্যাসিষ্ট দলের জয় যখন সুনিশ্চিত বলিয়া দেখা গেল তখন বার্লিন ভীত হইয়া যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত করিল।

সোফিয়ার কূটনৈতিক দূত প্রেরিত হইল, তাহারা ঝাঁকফ এবং ইউডক্সিয়ার সহিত মন্ত্রণা আরম্ভ করিল। গভীর রাত্রে মন্ত্রণা সভা বসিতে লাগিল।

ঐ সব গুপ্ত মন্ত্রণা সভার ফল কি হইল? রাজা

যোগিন ক্রমে জার্মাণীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। দুর্বল চিত্ত রাজার প্রতি তার ভগ্নী ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

রিবেন্ট্রপ শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে নাজীরা রাজকন্যার নিকট হইতে মূল্যবান সাহায্য পাইতে পারে। এই স্ত্রীলোকটিকে কি ভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে ঝাঁকফ পূর্বেই তাহা বলিয়া দিয়াছিল। বুলগেরিয়ায় অবস্থিত জার্মাণ কূটনৈতিক দূতরাও তাহা সমর্থন করিল।

কিন্তু এই চতুর স্ত্রীলোকটিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করার সুযোগ তখনও আসে নাই। জার্মাণী সাবধানে অগ্রসর হইতেছিল। শুধু বুলগেরিয়া নহে সমস্ত বলকান ষ্টেটগুলিকেই মুঠার মধ্যে আনিতে হইবে। প্রথমেই রুমানিয়াকে দখলে আনিতে হইবে। তারপর তাহার নিকট প্রতিবেশীকে নূতন শাসন ব্যবস্থার জালে ফেলিতে হইবে।

প্রয়োজনের সময় রাজকন্যাকে দিয়া একটা বড় অংশ অভিনয় করানই স্থির হইল।

সে পর্য্যন্ত ঝাঁকফকে ঘুষ দিয়া খুশী রাখিতে হইবে। বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে সাফল্যের সহিত অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা বজায় রাখিতে হইলে অন্যান্য সহযোগীদেরও কিছু কিছু দিয়া হাতে রাখা দরকার।

জার্মাণীর চরেরা দলে দলে ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিয়া জার্মাণীর পক্ষে প্রচার সুরু করিল। বার্লিনের নাজীরা ইউডক্সিয়ার নাম তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিল, প্রয়োজনের সময়ে বাহির করিয়া কাজে লাগাইতে পারিবে, উপস্থিত কোন তাড়াতাড়ি নাই।

তুরস্কে ভন প্যাপেন এবং সোফিয়ায় নিযুক্ত জার্মাণ মন্ত্রী উভয়ের উপরেই এই নারীর দুরাকাঙ্খায় ইন্ধন যোগাইবার ভার ছিল। বার্লিন হইতে আদেশ করা হইল যে বুলগেরিয়ায় সাম্যবাদের ভীতি জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যে লাল জুজুর সহিত হিটলার শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল, রাজা এবং রাজভগ্নীর মধ্যে সেই লাল জুজুর ভয় ঢুকাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল।

রাজকন্যা শীঘ্রই গুজবের অভিযানে কাবু হইয়া পড়িল। তার নিজের দেশেও লাল জুজুর অভ্যুত্থান হইবে ইহা ভাবিয়া সে ভীত হইয়া পড়িল। সে অবশ্যম্ভাবী দেশের মধ্যে, তাহার ক্ষমতা ও তাহার ভ্রাতার সিংহাসন সবই ভাসিয়া যাইবে।

নাজীদলের লোকেরা রাশিয়ার চরের ছদ্মবেশে নিজেদের প্রতাপ দেখাইতে লাগিল এবং ইউডক্সিয়ার চক্রান্তকারীরা প্রাণপণে তাহাদের বাধা দিতে লাগিল।

এই সমস্ত চক্রান্ত এবং প্রতিচক্রান্তের মধ্যে ইটালিকে টানিয়া আনা হইল। ইউডক্সিয়া তাহার এই বিপদের সময় তাহার ফ্যাসিষ্ট বন্ধুদের সাহায্য চাহিল, এদিকে ঝাঁকফ গোপনে বার্লিনে খবর পাঠাইল যে কার্যক্ষেত্রে ইটালীর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং জার্মাণীর উদ্দেশ্যের পক্ষে তাহা মারাত্মক আশঙ্কার কারণ হইবে।

নাজীরা এইবার তাহাদের তালিকা হইতে ইউডক্সিয়ার নাম বাহির করিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে এমন ভাবে কাজে লাগাইল যে বুলগেরিয়াকে একান্তভাবে নাজীদের জালে জড়াইয়া পড়িতে হইল।

যুদ্ধের চৌদ্দমাস তখন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং নাজীদের পক্ষে অবস্থা ভালই চলিতেছে।

বাহিরের লোকেরা মনে করিল কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রেট ব্রিটেন ঘাবড়াইয়া যাইবে।

মুসোলিনীর লোভ বেশী এবং সে তখন ঝাঁপাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে। উহাতেই তাহার ভাগ্য চিরকালের জন্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া গেল।

মানচিত্রের মধ্যে তখন বুলগেরিয়ার স্থান একটি বিন্দুর মত। ইংল্যাণ্ডের পতন হইলে যে কোন সময়ে তাহার দিকে হাত বাড়াইলেও চলিতে পারে।

ইংল্যাণ্ডের উদ্ধার পাওয়ার আশা যখন সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হইল সেই সময় মুসোলিনী জয়লাভ ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া বসিল।

সে বুলগেরিয়ার বিশ্বাসঘাতকদের ঘুষ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া উপস্থিত কার্য্যে সাফল্য লাভ করার জন্য সমস্ত চেষ্টা ও মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিল।

ইউডক্সিয়া এই ব্যবহারে মর্মাহত হইল। এইভাবে অবহেলা সহ্য করিতে সে অভ্যস্ত ছিল না। ফ্যাসিষ্টদের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া সে বার্লিনের দিকে তাকাইল।

নাজীদের নিজেদের অধিকার কায়েম করিবার ইহাই ছিল প্রথম ধাপ। জার্মানীর ছোট তরফের অংশীদার মুসোলিনীর কাজের ফলেই ঐ প্রথম ধাপে উঠা সম্ভব হইল।

বুলগেরিয়ার তখন আর সাম্যবাদের ভয় ছিল না। সে অবস্থা চলিয়া গিয়াছে। এবং তুরস্ক অত্যন্ত বিপদের কারণ হইয়া উঠিল। কারণ সে যে কোন সময়ে ব্রিটিশের পক্ষে যাইতে পারে এবং ব্রিটিশ নৌবহরের জন্য দার্দানেলিস খুলিয়া দিয়া কৃষ্ণসাগরে বুলগেরিয়ার বাণিজ্যের আদানের কারণ ঘটাইতে পারে। তুরস্ক ও নাজীদের বিরুদ্ধে বল্কান জোটের চেষ্টা করিতেছিল। এই জোট সাফল্য লাভ করিলে জার্মানীর উদ্দেশ্যের পরিপন্থি হইয়া বুলগেরিয়ার পক্ষে ক্ষতিকারক হইবে। জার্মানী জয়লাভ করিলে জোটের অংশীদারেরা অবশ্যই কৃতকর্মের ফল ভোগ করিবে। জয়লাভ সুনিশ্চিত। কেবল সময়ের প্রশ্ন।

রাজা বোরিস নাজী চক্রান্তকারী ও ঝাকফের মত আশাবাদী ছিল না। সে ইটালীকে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিয়াও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল।

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছিল। উত্তর আফ্রিকা হইতে ব্রিটিশ বাহিনী সরিয়া আসার সঙ্গে ইটালীয়ানরা সর্বত্র তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

মুসোলিনী উল্লসিত হইয়া উঠিল। নাজীরা তাহার সাফল্যকে অভিনন্দন জানাইল এবং বুলগেরিয়ার স্রোতের মত টাকা ঢালিতে লাগিল।

রুমানিয়া হাতে আসিয়া গিয়াছে, তেল পাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার। কিন্তু রুমানিয়ার তেল নাজীদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কৃষ্ণসাগরের অপরদিকে আরও মূল্যবান তেলের খনি ইংরাজদের দখলে আছে।

গ্রীস একটি লোভনীয় স্থান। আলবানিয়াতে গ্রীসের জয়লাভে ইংরাজরা আনন্দিত হইল। কিন্তু ইটালী এবং জার্মানী বুঝিল যে শীঘ্রই পট পরিবর্তন হইবে।

রুমানিয়ায় অবস্থিত জার্মান বাহিনীকে বুলগেরিয়ার ভিতর দিয়া সালোনিকা পর্যন্ত যাইতে দিলে তাহারা গ্রীক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া দিতে পারিবে।

কিন্তু রাজা বোরিস এই পরিকল্পনায় বাধা দিল।

বার্লিন হইতে নির্দেশ আসিল। রাজার উপর ইউডক্সিয়ারই প্রকৃত প্রভাব ছিল। তাহাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগান হইল।

রাজকন্যার কুটিরে ঝাকফের সহিত রাজকন্যার গোপনে দেখা হইল। সেখানে কি ঘটিয়াছিল তাহা হয়ত কোন দিনই জানা যাইবে না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে অবিলম্বে রাজার আচরণে দুর্বলতার অভ্রান্ত লক্ষণ দেখা গেল।

ইউডক্সিয়া তাহার নাজী প্রভুদের আদেশ পালন করিতে। জার্মানীর ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত জাতির বিরোধিতা করা বৃথা একথা সে রাজাকে দিনের পর দিন বুঝাইতে লাগিল। বুলগেরিয়া আশা করিল যে গত মহাযুদ্ধে তাহার যে সমস্ত অংশ পরহস্তগত হইয়াছে এবারে জার্মানী সেগুলি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করিবে।

শোনা যায় দুর্বল চিত্ত রাজা বলিয়াছিল "গতবার আমরা ভুল করিয়াছিলাম। এবারও আবার একই ভুল করা উচিত হইবেনা।"

ইউডক্সিয়া উত্তর দিয়াছিল "আমাদের বন্ধু ও সহযোগীদের পরিত্যাগ করাই এবার আমাদের ভুল হইবে। গ্রীকদের আলবানিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। আফ্রিকা হইতে ইংরাজরা সৈন্য পাঠাইবার পূর্বেই আমরা স্যালোনিকা দখল করিয়া লইব, তুরস্ক বাধা দিতে সাহস করিবেনা। এই ভাবে বুলগেরিয়া বল্কানের মধ্যে একটি শক্তিশালী রাজ্য হইয়া উঠিবে। হিটলার এবং মুসোলিনী এজন্য আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে। আমাদের দেশকে তাহারা পুনর্গঠিত করিয়া দিবে এবং পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়া আসিলে আমরা তাহার ফল পাইব।"

"আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন এবং উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে বাধা জন্মাইতে পারেন কিন্তু মনে রাখিবেন আপনার আচরণের উপর এই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।"

ধীরে ধীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল, ইউডক্সিয়া জার্মানীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিল। বোরিস নরম হইল এবং বুলগেরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।

বার্লিনে প্রস্তুত পরিকল্পনা অনুযায়ী সে এবং ঝাকফ অক্ষশক্তির তরফেই খেলিতে লাগিল।

এই ৪৩ বৎসরের অবিবাহিতা রাজকন্যার এদেশে অনেক বন্ধু ছিল। প্রতি বৎসর সে তাহাদের সহিত দেখা করিত। একটি পদস্থা মহিলার সহিত প্রায়ই সে দেখা করিত। সে মহিলাটি বিবাহের পূর্বে সপ্তমে বুলগেরিয়ান মন্ত্রীর কন্যা কুমারী ষ্টানসিয়ফ ছিল।

সারা জীবন ষড়যন্ত্র করিয়া কাটাইবার পর শটকরা তাহার জন্য একটি বর যোগাড় করার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এক সময় রুমানিয়ার ভূতপূর্ব রাজা ফ্যারল বর নির্বাচিত হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। তারপর আসিল হেহেনজলারের এক রাজপুত্র। কথাবার্তা অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার পর সে সোফিয়ায় দেখা করিতে আসিল। একজন মোটা বিসদৃশ দান্তিক ভার্যার বরের উপর সে মোটেই আকর্ষণ অনুভব করিলনা। বাজারে তার খুব সুনামও ছিলনা।

ইহার পর আসিল একজন ইটালীয়ান রাজপুত্র সেও সোফিয়াতে তার আচরণের ফলে অমনোনীত হইল এবং অন্যত্র পাত্রী খুঁজিবার জন্য চলিয়া গেল। তারপর আসিল উর্টেম্বারের ডিউক। কিন্তু সেও মনোনীত হইলনা।

বিবাহ করা অপেক্ষা একা থাকাই রাজপুত্রীর পছন্দ। সাধারণ একজন জমীদারের স্ত্রী হইলে তাহার কূটনৈতিক কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে; ইহা অপেক্ষা বুলগেরিয়ার মুকুটহীন রাণী হইয়া রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা তাহার পক্ষে অনেক বাঞ্ছনীয়। [ক্রমশঃ

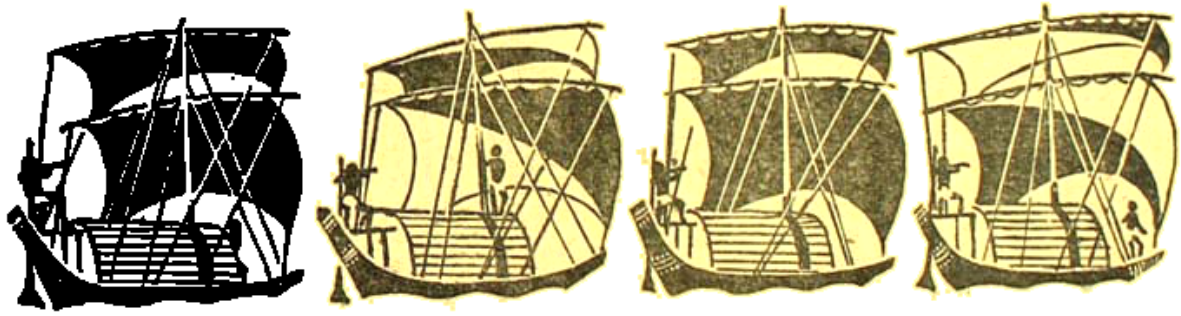

THE BHARAT LINE LIMITED

(Incorporated in Bhavnagar State. The Liability of the members is Limited.)

NATIONAL SHIPPING COMPANY

SERVICES OPERATED

THE INDIAN COASTAL TRADE
PAKISTAN/INDIA-BURMA-CEYLON TRADE
CEYLON/INDIA TRADE
BURMA/INDIA TRADE
BURMA/CEYLON TRADE
INDIA-PAKISTAN-BURMA CEYLON/PERSIAN GULF TRADE

OTHER FIXTURES FOR OTHER PORTS ACCORDING TO DEMAND

For Rates of Freights, Sailings, etc., apply to the Company's Bombay Office at :

BHARAT HOUSE, 104, APOLLO STREET, FORT, BOMBAY 1

Telephone Nos. 30891. 30892 & 30893

FREIGHT BROKERS

PITAMBER LALJEE & SONS

BHARAT HOUSE, 104, APOLLO STREET, FORT, BOMBAY 1

Telephone Nos. 38946, 38030

পশ্চিম এশিয়ার শক্তি কেন্দ্রে ঘাটতি

মিশর হইতে ইংরেজ-ফরাসী সরিয়া আসিয়া অঙ্গকে পথ বাৎলাইয়া দিয়াছে। যাহা একদিন ইংরেজের ঘাঁটি ছিল তাহা শূন্য থাকিবে—একথা ইংরেজ রাজনীতিকরা ভাবিতে রাজী নহেন। এ-ইচ্ছা মার্কিন রাজনীতিকরা যথাযথ অনুভব করিয়াছেন। বিদেশে সাম্রাজ্যবাদীর সৈন্য মোটামুটি রাজার হালেই থাকে ইহাদের শাসন ও শোষণ দুই-ই চলে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের নামে খাদ ইংলণ্ডেও যখন এত কুৎসা রটিয়াছে তখন ইহার কৌশলের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই প্রয়োজনে মার্কিন রাজনীতিকেরা সাড়া দিয়াছেন। স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি যে পরিকল্পনা লইয়া আগুয়ান হইয়াছেন তাহাতে গণতন্ত্রপন্থী মার্কিনেরা ভাবিত হইয়াছেন। যদি এই ভাবে বিদেশে সৈন্য পাঠাইতে হয় তবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন তাহার পুরোনো ব্যাধির বিষটা মার্কিনদের দেহেও ছড়াইতে পারিবে। অতএব রাজনৈতিক দর্শনের জগতে মার্কিন-ব্রিটেন একই বন্ধনীর মাঝে আটকা পড়িবে। তাই মার্কিন দেশের গণতন্ত্রীরা ইহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু মার্কিন রাজনীতি দর্শনের যে গুণগত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করে নাই। সবারই অলক্ষ্যে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই মার্কিনরা ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করিতে চাহিতেছে অথবা অধিকারে মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ের মাঝে এই মত্ততা জন্ম লইয়াছে। মার্কিনরা নিজেদের শক্তির এই বিপুল পরিচয় পাইয়া বিভিন্নদিকে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছে। বহুদিন হইতেই মার্কিন জাতির অন্তরে শক্তির মত্ততা আশ্রয় লইয়াছিল যুদ্ধ ও যুদ্ধ জয় ইহাতে ইন্ধন জোগাইয়াছে। মার্কিন অর্থনীতি বিশ্ব-বাণিজ্যের তরী ভাসাইয়া যে সম্পদ ঘরে তুলিয়াছে তাহাতে তাহার (মার্কিনদের) পক্ষে যুদ্ধ ঘাঁটি ও অস্ত্র নির্মাণ অতি সহজ হইয়াছে। ইহার পর আণবিক বোমার আবিষ্কার ও ব্যবহার জাতির মধ্যে আরো গর্ব সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপে মার্কিনদের যে সৈন্য-সামন্ত রহিয়াছে তাহা সোভিয়েটের প্রতি নজর রাখিতে ব্যস্ত। কাজেই শক্তির আস্তানা সৃষ্টিতে নূতন উদ্যম চাই এবং নূতন ভৌগোলিক সীমানা—। প্রাচ্য দেশে জাপান ত হাতের পাঁচ রহিল। কিন্তু এই শক্তি আস্তানার ব্যাপক পরিধি গঠনে পশ্চিম এশিয়ার অঞ্চল যথাযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

স্নায়ু যুদ্ধে সোভিয়েটের পক্ষে সমান-সমান টক্কর দিবার পর মার্কিন কূটনীতিবিদ্‌রা এইরূপ একটি সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। মিশর সোভিয়েট অস্ত্র পাইতেছিল, কিন্তু ইহার সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের কৌশলও আয়ত্ত করিতেছিল, ইহা মার্কিনের মনঃপীড়া দিতেছিল। মার্কিনরা ইঙ্গ-ফরাসীকে মিশর আক্রমণে সাহায্য করে নাই,—বরং রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে ইঙ্গ-ফরাসীর বিরোধিতা করিয়াছে। এই বিরোধিতা যে নিছক কূটনৈতিক কৌশলমাত্র একথা কাহারো বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ সোভিয়েট প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করিতে হইলে অন্তত বাহ্যত একটা বিরোধের বর্ম গায় আঁটিয়া রাখা ভাল। ইহাতে ইঙ্গ-ফরাসী বাদে অন্য রাজনৈতিক জগত যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিবে কিন্তু মার্কিনদের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। মার্কিন ও ব্রিটেন উভয়ই জানে কেহ কাহাকেও ছাড়াইতে পারিবেনা। ছাড়িবার যদি মার্কিনদের মন থাকিত তবে তাহারা ইংল্যাণ্ড হইতে সামরিক ঘাঁটি তুলিয়া লইত, এবং ইংল্যাণ্ডকে একবারে রুশীয় ভল্লুকের মুখের কাছে ছাড়িয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইত। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী বুলগানিন্ ইঙ্গ-ফরাসীর মিশর আক্রমণ কালে বলিয়াছিলেন যে, উড়ন্ত অস্ত্রদ্বারা ইংল্যাণ্ডকেও আক্রমণ করা চলে। ইহাতেই আসল অবস্থার স্বরূপ বোঝা যাইবে। মার্কিন সহায়তা না থাকিলে ইংল্যাণ্ডের দ্বীপকে আণবিক অস্ত্র দ্বারা বিধ্বস্ত

করা তেমন অসম্ভব কাজ নহে। অন্তত সোভিয়েট রুশকুশলীরা সেভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। ইহা আর যাহাই হোক, ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে ভরা। যুদ্ধ বাধিবে কি বাধিবে না—তাহা পরে ভাবা যাইবে। কিন্তু বাধিলে উড়ন্ত অস্ত্রই আকাশে উড়িবে এই বিষয় সন্দেহ নাই।

ব্রিটিশ কূটনীতিবিদেরা এই রণ বিভ্রাটের সম্ভাবনা বুঝিয়াই মার্কিনদের পশ্চিম এশিয়ায় প্রবেশে তেমন কিছু বাধা দেয় নাই। আর বাধা দিলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি মানিতেন কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার। পশ্চিম এশিয়ায় আজ সোভিয়েট প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতেছে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু সোভিয়েট সুকৌশলে রণ-সম্ভার দিয়া ও নীতির মহিমা প্রচার করিয়া পশ্চিম এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে এক নয়া আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। এই আলোড়নের মাঝে বাগদাদ চুক্তি ডুবিয়া যাইবার উপক্রম। ইহা দেখিয়া পাকিস্তান ও ইরাণ মার্কিনদের পশ্চিম এশিয়ায় প্রবেশ অতি আদরে সমর্থন করিতেছে। এই সমর্থন লাভের আশায় পাকিস্তান প্রধান মন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করিতেছেন। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট এই বাগদাদ চুক্তি সমর্থন স্রোতে পা ভাসাইতে রাজী হয়েন নাই। কাজেই খাস ইসলামের জগতে মার্কিন প্রভাব একটু কোঁড় খাইল।

কিন্তু সিরিয়ার নিকট হইতে পরোক্ষভাবে কোঁড় খাইলে হইবে কি ইতিপূর্বে সৌদী আরব মার্কিন অর্থ পাইয়া তাহার সমগ্র তৈল সম্পদ বিক্রি করিয়া দিয়াছে। অতএব প্যামেল আবদল নাসেরের আরব রাষ্ট্র সংহতির স্বপ্ন সমুজ্জ্বল না হইয়া একটু ধোঁয়াটে রঙের হইয়াছে। এবং আঘাতটা মনে হইতেছে আরব রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর মধ্য হইতেই আসিবে। মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের এই আঘাত কতটা সহ্য করিতে পারিবে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার। আরব রাষ্ট্রের রাজনীতিতে যে ফাটল ধরার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহা রাজা সৌদী আরবকে লইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে নাকি। রাজা মার্কিন দেশে ভ্রমণ-কালে যে-সব বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে সুর এলোমেলো বোধ হইতেছে। মিশরের নেতৃত্বের যে সম্ভাবনা আরব জগতে দেখা দিয়াছিল তাহা যেন একটু ম্লান হইতে শুরু করিয়াছে। মিশর যদি এখনও ঠিক সতর্ক না হয় তবে সে আরব রাজ্যেই হয়ত সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে। সেই সম্ভাবিত পারিপার্শ্বিক-এ মিশর নিজ অস্তিত্ব কি পরিমাণ জোরের সহিত রক্ষা করিবে তাহা ভাবিবার কথা বটে। কেননা, রাজা সৌদী আবার নিজ নেতৃত্ব আরব দেশে একেবারে নাসেরের হাতে ছাড়িতে রাজী হইবেনা ইহা সুস্পষ্ট। তাছাড়া তাঁর আশা যে মার্কিন অর্থে সৌদী আরব রাষ্ট্র আধুনিক হইয়া গড়িয়া উঠুক। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় মার্কিন রাষ্ট্রপতি এইরূপ আশ্বাসই তাহাকেই দিয়াছেন। মার্কিনরা সৌদী আরবকে ঋণ দিবে স্থির করিয়াছে। কাজেই মার্কিনরা বোধ হয় মধ্য প্রাচ্যে আসিয়া পড়িল।

ন. ব.

শৈব মতবাদ ও শৈব সাহিত্য

রণজিৎ কুমার সেন

শৈব মতবাদের মূল কথা 'শিবোহং', অর্থাৎ—'আমিই শিব'; জীবনান্তেই পাশমুক্তাবস্থায় 'শিব' অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে, এবং শিব নির্গুন, আনন্দস্বরূপ। সকল কামনার ঊর্দ্ধে আসন তাঁর। এ হ'লো উন্নত শৈববাদীদের মতে শৈব মতবাদের মূল কথা। অবশ্য এটাই লৌকিক আচার ও লৌকিক পূজার্চ্চনার বিধির মধ্য দিয়ে কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। উন্নত ধরনের শৈববাদীরা দ্বৈতবাদীদের ন্যায় শিবের 'সগুণ' ভাব স্বীকার করেন না। তাঁদের বিবেচনায় শিব 'নির্গুন', গুণাতীত, এবং এ ধরনের শিবোপাসকেরা শিবের পাশাপাশি আর কোনো দেবের অস্তিত্ব মেনে নিতে রাজি নন্। এক শিবই তাঁদের উপাস্য।

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরই প্রাধান্য ছিল, এখানে 'হিন্দুধর্ম' তথা 'আর্য্যসংস্কৃতি' বহুদিনই অজ্ঞাত এবং দূরে সরানো ছিল। সাম্যপন্থী বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় ক'রে বাঙালী যে সেদিন পশ্চিমাগত হিন্দুধর্মী রাজা-রাজড়াদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছে, এর নজীর বংলার ইতিহাসে অনেক মিলবে। শশাঙ্কের পূর্বে উল্লেখযোগ্য কোনো হিন্দুধর্মী বড় রাজার দৃষ্টান্ত আমাদের ইতিহাসে বিরল। তখনও পূর্ববঙ্গ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। শুধু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নয়, পূর্ববঙ্গ বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ বিবেচিত হতো। 'বিক্রমশিলা' তখন বৌদ্ধ-মতাবলম্বীদের একটি প্রধান তীর্থ-ক্ষেত্র। শশাঙ্কের পরেও পালরাজাদের সময়ে 'রাঢ় বঙ্গে'ও বৌদ্ধধর্মের পুনরায় জোয়ার আসে। তাই প্রথম যেদিন 'হিন্দুধর্ম' তথা 'আর্য্য সংস্কৃতি' বাংলার মাটিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রতে অগ্রসর হয়, সেদিন তাকে অনেক মেহনত ক'রতে হয়েছিল, আশ্রয় ক'রতে হয়েছিল অনেক কূট-কৌশল; বৌদ্ধমতবাদী বাঙালীর কাছ থেকে তাঁরা নিদারুণ প্রত্যাঘাতও পান। সে সময়ে এখানে প্রথম পত্তন হয় শৈব মতবাদের। শৈব মতাবলম্বীরাই প্রথম হিন্দু সংস্কৃতির ধ্বজা উড়ান বাংলার মাটিতে।

স্পষ্টতঃ বলতে গেলে শৈব মতবাদ কতকাংশে আর্য্যেতর সম্প্রদায় ঘেষা। শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের ব্যাধের কাহিনী তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এসব কাহিনীর মূল বক্তব্য—শিব জনগণের দেবতা। জনগণের সঙ্গেই তিনি চলেন ফেরেন। পতিতোদ্ধারই তাঁর প্রধান কাজ। সাম্যধর্মী বৌদ্ধ বাংলার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হিন্দু আর্য্যরা সেদিন দাঁড় করালেন শিবকে। শিবকে সামনে রেখেই সেদিন তাঁদের জয়যাত্রার সূত্রপাত। তাই প্রথম এখানে প্রতিষ্ঠা পান শৈবমত-বাদীরা। শিবের এই প্রাচীনত্বের নিদর্শন বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ পুরাণ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। প্রায় গ্রন্থের মুখ-বন্ধেই শিব প্রসঙ্গ, শিবের প্রশস্তি। এর কারণ হিসেবে অবশ্য একথাও অনুমান করা যায় যে, শিব হিন্দুদের মতে দেবাদিদেব, সকল দেবতার ঊর্দ্ধে তিনি। তাই প্রথমেই তাঁর স্থান বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু শিবস্তুতি অধিকাংশে ধর্মকাব্যগুলির মুখবন্ধ হিসেবে স্থান পেলেও শৈব-মতবাদীরা কিন্তু অধিককাল প্রতিষ্ঠা পেলেন না। এই না পাবার একটা বড় কারণ তাঁদের ধর্মের কাঠিন্য। বাঙালী ভাবপ্রবণ, সারা ভারতের মধ্যে বাঙালীই প্রথম ভাব-বিপ্লবকে গ্রহণ করে। বাংলার আর্দ্র জলবায়ু ও সরস মাটিই তাকে ভাবপ্রবণ ক'রে তুলেছে; তার মনে কাঠিন্য কম, নীরস কাঠিন্যকে বাঙালী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে উঠতে পারে না। বোধ করি প্রধানতঃ এই কারণেই বাঙালী দীর্ঘকাল নিজের ক'রে গ্রহণ ক'রতে পারেনি শৈবমতবাদকে। বাঙালী চায় তার দেবদেবীকে নিজের আত্মীয় হিসেবে গ'ড়ে তুলতে, চায় তাঁকে মানুষ রূপেই বাংলার কুটীরে দেখতে; তাঁর সগুণ রূপই বাঙালীর কাছে অধিক পূজনীয়, নির্গুণ রূপ নয়। ফলে কিছু কাল শিব নানারূপে বাঙালীর নিত্য সঙ্গী থেকে বাংলার তন্ত্র সাধনার মধ্যে দিয়ে মাতৃভাবে শক্তিরূপে পরিণতি পেলেন।

কিন্তু শৈবমতবাদ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও শৈব সাহিত্য

আকার ও ব্যক্তিত্ব কম নয়। তন্মধ্যে রতিদেব ও রঘুরাম রায় কৃত 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যখানি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। এ কাব্যখানি রচিত হয় আনুমানিক ১৭৪ খৃষ্টাব্দে। প্রায় দু'শো বছর পূর্বেকার হস্তলিখিত পুঁথিতে রতিদেব সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা মোটামুটি এইরূপ—

'পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী।
জন্মস্থান হুন্দদন্তী চক্রশালা খ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বন্দম রাম নারায়ণ।
হরণী লোটায়ে বন্দম যত গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ি যে শঙ্কর শংকর।
মন্ত্রদাতা দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥
গোপীনাথ দেব সুত রতিদেব গায়।
দুর্গামঙ্গল পুঁথি এহি হরগৌরীর পায়॥'

এই গ্রন্থ থেকে আমরা শিব চতুর্দশীব্রতের শিবমাহাত্ম্য উপলক্ষ্যে রচিত ব্যাধের কাহিনী পাই। এ ছাড়া আর যে ক'খানি কাব্য শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে লিখিত হয়েছে, তন্মধ্যে শিব হরিহরের পুত্র শঙ্কর নামীয় কবিকৃত 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল', ভবীরবের 'শিবগুণ মাহাত্ম্য' এবং রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ণ' এবং তৎপরবর্তিকালে লিখিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'শিবায়ণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে রামেশ্বরের 'শিবায়ণ' সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এই গ্রন্থে আমরা কবির যে কেবলমাত্র কবি দৃষ্টির পরিচয় পাই তা-ই নয়, এই গ্রন্থে রামেশ্বর তাঁর হাস্যরসবোধেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। নারদের চরিত্রটি এই গ্রন্থে এমনভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে যে, তা যথার্থই উপভোগ্য। নারদ কর্তৃক নিরূপিত জামাতাকে দর্শন ক'রে মা মেনকা গিরে করাঘাত ক'রে ব'লছেন—

'নারদ করেছে বটে ভালো বটকালি
আসেতে জানিলে মত দিত কোন শালী!'

ঢেঁকি-বাহন নারদ মাকীকে গিয়ে জানালেন—শঙ্কর বাঘিনীর প্রেমে ম'জেছেন, ক্ষেতে চাষ ক'রতে গিয়ে বাঘিনীর সঙ্গে প্রেমরঙ্গে আমোদে প্রমোদে কাল যাপন ক'রছেন শঙ্কর। পার্বতীকে তিনি বলছেন—

'না গো, মামী ভালো ক'রে দেখিয়াছি সুনজরে
প্রেমজ্বরে জরেছে মহেশ
এ প্রেম সে প্রেম নয় আদিরস মিশ্র হয়
তাই ভয় করি বড় মনে।

নারদের কথায় পার্বতীর দাসীরা তাঁকে যেভাবে ভর্ৎসনা করে, তার ভিতর দিয়েই রামেশ্বর নারদের খাঁটি রূপটি পাঠকের সামনে তুলে ধ'রেছেন।—

'নারদের এ কথায় দাসীরা কহিল তায়
দূর বুড়ো মিনসে হতচ্ছাড়া।
বকিস না মাথামুণ্ড ওরে কুষ্মাণ্ডের কুণ্ড
চলে যা ঢেকিটে করে ঘাড়া।'...

শিবায়ণে যে দেব-চরিত্রগুলি অঙ্কিত হ'য়েছে, তাতে দেবত্ব তো দূরের কথা' অনেকস্থলে মানবত্বও আরোপিত হয়নি। ভীম এসে নবাগত বাঘিনীর যে বর্ণনা মহেশের কাছে দিচ্ছেন, তা কি ভাষায়, কি ভাবে—সব দিক দিয়েই অতি সাধারণ স্তরে নেমে এসেছে।—

'এত কহি ঋষিবর গমন করিলে পর
ভীম আসি কহিল মহেশে,
এ যে বড় কর্মভোগ বাধাইল গোলযোগ
এক মাগী বাঘিনী এসে॥
ভাঙ্গিয়া শস্যের গাছ জল ছেঁচে ধরে মাছ
শস্যক্ষেত্রে বারণ না শুনে,
আমি যদি বলি কিছু মাগীটা আমার পিছু
শুনাইয়া দেয় চতুর্গুণে॥
ধরিতে যাইলে ছুটে আমায় মারিতে উঠে
মাগী যেন জলন্ত আগুন।
কি কব নারীর গায় হাড় ভোলা হলো দায়
তা না হলে করিতাম খুন॥'...

নারীর প্রতি যে সম্মানের ভাষা ভীম প্রয়োগ করেছেন, তার চাইতে নারীকে খুন করলেও বোধ হয় নারীর প্রতি যথেষ্ট সম্মানই প্রদর্শন করা হ'তো।

অপরদিকে গৌরী শিবের নিকট যেভাবে তাঁর অনাহার ক্লিষ্ট দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের অভাব জ্ঞাপন ক'রছেন, তা আমাদের বিংশশতাব্দীর অন্নক্লিষ্ট বস্ত্রহীন মরণোন্মুখ বাঙালীর মৈত্রকেও ছাড়িয়ে গেছে। শিব ভিক্ষা থেকে ফিরেছেন;

তাঁর ঝুলি ঝেড়ে যা কিছু খাদ্য সামগ্রী বেরিয়েছে, তা নিয়ে দুই ভাইয়ে কাড়াকড়ি সুরু হ'য়েছে।—

'লাড়ুগুলি সব খেয়ে ফেলে ষড়ানন।
তাহা দেখি শুণ্ডে চাপি রাখে গজানন॥
ছয় মুখে ছ'টা লাড়ু দিয়াছে পুরিয়া।
গণেশ ধরিল তার গলাটি টিপিয়া॥'

পার্বতী কোনোমতে পুত্র দুটিকে শান্ত ক'রলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আবার স্বামী-পরিচর্যায় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়তে হ'লো।—

'মরিলে গায়ের ঘাম কহিলেন হর
সিদ্ধি কিছু খুদ্ধি (পার্বতী) তুমি বাটহ সত্বর॥
নন্দী বেটা খোটনাটা ফেলেছে ভাঙ্গিয়া।
কন্দী খাটায়ে ঘাও সিদ্ধিটা বাটিয়া॥'

এরপর শিবের মুখ দিয়ে কবি তাঁর সংসারের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা তৎকালীন দরিদ্র চাষি-সমাজের একটি মর্মন্তুদ চিত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য। যেমন—

"গৌরীকে কহেন হর, 'শুন প্রাণাধিকে,
ক্ষুধায় উদর জ্বলে; নাহি থাকে টিকে।
ঘরায় যা পারো কিছু করহ রন্ধন।
ভিক্ষায় তণ্ডুলে অন্ন ফলেতে ব্যাঞ্জন॥
ছেলে দুটি ছটোপুটি করিছে ক্ষুধায়।
বিলম্ব করোনা যাহ রন্ধন শালায়॥

স্বামী পুত্র সকলের আহারান্তে সাধারণ গৃহস্থ বধূর মতো গৌরী আপন আহার সমাপ্ত ক'রলেন—

'এইরূপে সকলেরে অন্নদান করি
আপনি আহার তরে বসিলেন গৌরী।
পদ্মা আদি তিন সখী বসে তিন ধারে।
গল্প শুনিবেতে সবে প্রবৃত্ত আহারে॥'

উমার তপস্যা অধ্যায়ে কবি শিবের প্রতি উমার অগাধ প্রেম ও আত্মনির্ভরতার যে চিত্রটি এঁকেছেন, তা আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ছদ্মবেশী শিবকে উমা ব'লছেন—

'নাহি বুঝি হিত কি করি বিহিত
আমি যে অবলা বালা।
নিরখিয়া হরে সেই মনোহরে
ঘটিয়াছে এই জ্বালা॥

তাঁহারই যে রূপ নেহারি স্বরূপ
সঁপিনু জীবন মন।'···

শিবায়ণ মূলতঃ ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ হ'লেও সর্বক্ষেত্রে যে একটি সুউচ্চ ধারা বজায় রেখে চলেছে, এমন নয়। অবশ্য ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আমরা বারবনিতাদের যুবকদেরকে প্রলোভিত ক'রবার যে চিত্রগুলি দেখতে পাই, তাও উচ্চাঙ্গের নয়। নৃত্যক্ষেত্রে হর-গৌরী বাদ্দী ও বাদ্দিনীর বেশে যে রসলীলা ক'রেছেন, তা সাধারণ বাদ্দীদের রুচিকেও হার মানায়। যেমন—

'বলি ধান পঞ্চানন বাহু কবি প্রসারণ
গৌরীকে করিতে আলিঙ্গন।'···

এর পরও পার্বতীর মুখ দিয়ে কবি হরের প্রতি যে ভাষার প্রয়োগ ক'রেছেন, তা শ্লীলতার গণ্ডিকেও অতিক্রম ক'রেছে বলা যায়। যেমন—

'ছি ছি ছি ছি ছুঁওনাকো সরে যাও দূরে থাক
পর নারী হরিতে মনন
হ'তে যদি রূপবান পীড়িতে পণ্ডিত টান
মদনের জ্বলিত অনল।
বয়েস না দেখিতাম আয়েস না ভাবিতাম
মজিতাম হইয়া চঞ্চল।'—ইত্যাদি—

এখানে কবি কেবল দেবতাকে মর্ত্যের ধূলোকাদায় নামিয়েই ক্ষান্ত ন'ন, তাঁকে সাধারণের স্তর থেকে নিচে নামিয়ে আনতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। অনেকে একে দেবলীলা ব'লে আধ্যাত্মিকতা আরোপ ক'রে থাকেন, তা নিয়ে এখানে তর্কের প্রয়োজন নেই।

এই গ্রন্থে কবি বহু ছোটোখাটো উপাখ্যানেরও অবতারণা ক'রেছেন। বাণরাজার উপাখ্যানে কবি শিবকীর্তন করতে গিয়ে অধিক পরিমাণে কৃষ্ণমাহাত্ম্যই বর্ণনা ক'রেছেন। শিব স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে বিপদগ্রস্ত ভক্তের উদ্ধার সাধনে কৃষ্ণকে স্তুতি ক'রতে গিয়ে ব'লছেন—

'তুমি ওহে যদুপতি সকল জীবের গতি
দেহ মুক্তি পাপী বুঢ় জনে।
তুমি ব্রহ্ম সনাতন তুমি কমলা নারায়ণ
সবে যত তোমার অর্চ্চনে।'...

জয়ন্তী উপাখ্যানে রাম নাম মহিমা কীর্তিত হ'য়েছে। জয়ন্তী বারাঙ্গনা হ'য়েও রাম নামের প্রভাবে বিষ্ণু দূতগণ কর্তৃক বৈকুণ্ঠে গমন করে, আর পরাজিত যমদূতগণ উত্তম মধ্যম প্রহার খেয়েও নিষ্কৃতি পায়না, প্রভুর নিকটে গিয়ে তিরস্কৃত হয়; স্বয়ং যমরাজ উপদেশ দিলেন—

'জান না যে জন করে শ্রীরামের নাম।
সে সাধু—পরশে মম নাহিক বিধান॥'

বিশ্বহর উপাখ্যানেও হরিভক্তির গুণগান করা হ'য়েছে—

'স্বর্গবাসে অধিকারী হইল চণ্ডাল।
হরিভক্তি যেই সেই পূজ্য সর্বকাল॥'

এতদ্ব্যতীত দিলীপ রাজার উপাখ্যানে 'কপিলী হরণ' পালায়ও কৃষ্ণ মহিমাই ঘোষিত হ'য়েছে; তবে বৃকাসুরোপাখ্যানে, বৃষপর্বাসুরোপাখ্যানে ও অন্ধকোপাখ্যানে শিব-বন্দনাই গীত হ'য়েছে। একাদশী ব্রত উপাখ্যানের শেষে কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত—সকলকেই ভক্তিযুক্ত হ'য়ে এই ব্রত আচরণ ক'রবার উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে।—

'বৈষ্ণব অথবা শৈব শাক্ত কিবা আর।
একাদশী ব্রতকথা কর্তব্য সবার॥
হরিচরণের ভক্তি মুক্তি যদি চাও।
একাদশী ব্রত করি বাসনা পুরাও॥'

এ ছাড়া শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন পাওয়া যায় বাংলার মঙ্গলকাব্য গুলিতে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, এমন কি বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মমঙ্গলেও শিব-মাহাত্ম্য বর্ণিত হ'য়েছে। গোরক্ষ বিজয়ের যে পুরণো পালাকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তার প্রথমেও এ জাতীয় শিব-মাহাত্ম্য-কীর্তিত মুখবন্ধ র'য়েছে। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণেও শিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শিবকে নিয়ে আরও বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হ'য়েছে; তবে সেগুলিতে শিবকে আমরা যতটা দেবাদিদেব রূপে না পাই, তার চাইতে অধিক পাই মনুষ্যসমাজে হাস্যাস্পদরূপে। সেগুলিতে খোলাখুলি বুড়ো শিবকে নিয়ে পরিহাস করা হ'য়েছে। শিব ভাঙ্গখোর, শিব মাতাল, তাই যুবতী গৌরীর কাছে শিব ঘৃণিত। গরুপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যগুলিতে 'শিবের বিয়ে,' 'হর-গৌরী কোন্দল' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি এর নিদর্শন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে যুবতী অন্নপূর্ণার স্বামীরূপী ভাঙ্গখোর বৃদ্ধ মাতাল শিবকে চূড়ান্তভাবে ঠাট্টা করা হ'য়েছে। এগুলি আমাদের মনে ভক্তির খোরাক জোগায় না, জোগায় হাসির খোরাক।

অপরাপর কতকগুলিতে সোজাসুজি শিবকে অগ্রাহ্যই করা হ'য়েছে। দেখানো হ'য়েছে শৈব মতবাদের হীনতা ও নীচতা; আর তারই পাশাপাশি উক্ত গ্রন্থগুলির লেখকেরা বড় ক'রে তুলেছেন তাঁদের উপাস্য 'শক্তি'কে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল—প্রায় সর্বত্রই এই সুর। তাঁদের এসব কাব্যগুলির মধ্যে শিবের সঙ্গে প্রায়শঃই শক্তির কলহ লক্ষ্য করা যায়। লেখকের নায়ক-নায়িকা এখানে পূজো ক'রছেন লেখকের উপাস্যদেবী মনসা, চণ্ডী ও শীতলাকে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কন চণ্ডী'তে 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' অধ্যায়েও শক্তির সঙ্গে শিবের লড়াই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। খুল্লনা শক্তির উপাসনা করে, ধনপতির কাছে তা অসহ্য। সে পদাঘাতে চণ্ডীর পূজার ঘটসরা ভেঙে ফেলে। তার মতে চণ্ডী ডাকিনী দেবতা। উক্ত কাব্যগ্রন্থে শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে চণ্ডীর জয় দেখানো হ'য়েছে। খুল্লনার উপাস্য দেবীরই হ'য়েছে জয়। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-ও তাই; চাঁদবেনে শিবভক্ত, আর মনসার সঙ্গে তার লড়াই। শেষ পর্যন্ত তাকে বিষহরির তেজের কাছে হার মানতে হ'লো। চাঁদবেনের সপ্তডিঙ্গা যখন ভেঙে খান খান হ'য়ে সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে, তখন চাঁদসদাগর 'শিব' 'শিব' বলে চিৎকার করছে, কিন্তু তেজশালিনী শক্তিস্বরূপা বিষহরির তরে শিব তটস্থ। শক্তি তাঁর মত প্রচার ক'রবার জন্য, আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, শিব-ভক্তদের জব্দ ক'রছেন, কিন্তু শিব তথাপি নির্বিকার। রচয়িতা তাঁকে একেবারে পরাজিত ও পলায়নপর একটি চরিত্র হিসেবে এঁকে তবে আরাম হ'য়েছেন। শিব এসব স্থানে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট। আর এই

নিশ্চলতা ও নিশ্চেষ্টতাই শৈবমতবাদীদের পরাজয়ের প্রধান কারণ।

বাঙালীর মন সহ্য ক'রতে পারে না নির্গুণ শিবকে। তাই বাংলার লৌকিক কাব্যে, বাংলার লোকসঙ্গীতে, কাহিনী ও উপকথায় শিব উপেক্ষিত, উপহসিত। কবির লেখনীতে শক্তি প্রাধান্য পেয়েছে, নানা কাহিনী ও নানা উপকথায় কবিরা শ্রেষ্ঠ ক'রে তুলেছেন শক্তিকে। সে বোধ করি বাংলার মহিমময়ী নারী-শক্তিকে প্রাধান্য দেবার জন্য। বাঙালী নারীকেই চিরকাল বড় ক'রে দেখেছে। এরকম নানা প্রতিকূলতার জন্য বাংলাদেশে একদা 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবাদের সৃষ্টি হ'লেও আসলে শৈব মতবাদ প্রায় উপেক্ষিত। যে শিব বাঙালীর প্রাণকোষে জাগ্রত, তিনি মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের শিব নন্, তিনি পুরাকালের বৈদিক বা ঔপনিষদিক শিব। তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের অধিশ্বর, শাশ্বত, সুন্দরম, অদ্বৈতম; তিনি সর্বযুগের সকল মতের উর্দ্ধে, তিনি নিরাকার হ'য়েও সগুণাধার। শক্তির প্রভাবে যাঁরা শৈবমতবিরোধি, তাঁদের কাছেও তিনি পূজ্য।

শ্রীশঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্য

সমবায় পণ্যাগার ও চিনির কারখানা

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কৃষি এবং শিল্প এই উভয় ক্ষেত্রেই বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠনের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র কল্যাণমূলক কার্যকলাপের বিকেন্দ্রণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই আসে সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন। এবং তার জন্য সমবায়ের বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে কৃষি সংক্রান্ত ক্রয়-বিক্রয় এবং নানাবিধ প্রক্রিয়া, পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন উৎপাদন ক্রেতাদের সমবায় ভাণ্ডার, শিল্পী ও শ্রমিকদের সমবায় এবং নির্মাণ সমবায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। পরিকল্পনা কমিশনও এইসব ক্ষেত্রে সমবায়ের সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করেছেন।

গত বছর পার্লামেন্ট থেকে কৃষি উৎপাদন (উন্নয়ন ও ও পণ্যাগার) নিগম আইন পাশ হবার পর, সম্প্রতি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্যাগার বোর্ড গঠিত হয়েছে। এই বোর্ডের কাজ হবে সমবায় সমিতির অথবা পণ্যাগার কোম্পানীর মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন, প্রক্রিয়া, ক্রয় বিক্রয়, সংরক্ষণ, পণ্যাদি গুদাম-জাত রাখা এবং আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ের পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণ সাধন করা।

এই বোর্ড স্থাপিত হয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ঋণ ও প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন রাজ্যে সমবায় সম্প্রসারণের জন্য সাহায্য দিয়েছে। এ ছাড়া পাঞ্জাবের তিনটি সমবায় চিনির কারখানাকে ৩৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ৩৪টি চিনির উৎপাদক সমবায় কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২২টি কারখানা লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছে। তারমধ্যে পাঞ্জাবের যে তিনটি কারখানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে শীঘ্রই উৎপাদন হবে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশন সমবায় চিনির কারখানার জন্য ৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে।

প্রতিষ্ঠানমূলক ঋণের অধিকাংশে ভাগই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যোগান দিয়ে থাকে। এ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্যস্থিত সমবায় ব্যাঙ্কগুলোকে ৯ কোটি ৩১ লক্ষ স্বল্প-কালীন ও ১১২ কোটি টাকা মাঝারি দীর্ঘকালীন মেয়াদে ঋণ দিয়েছে। ভারতসরকারও রাজ্যসরকারসমূহকে বিশেষ মাঝারি দীর্ঘ ও দীর্ঘকালীন ঋণ হিসাবে ১৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। প্রথম ঋণটি মঞ্জুর করেছেন একটি সমবায় চিনির কারখানা স্থাপনের জন্য, দ্বিতীয়টি কৃষির উন্নয়নের জন্য এবং তৃতীয়টি বীবরদের একটি সমবায় স্থাপনের জন্য। স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়াও সমবায় ব্যাঙ্ক গুলোর টাকা পয়সা আদান-প্রদানে অধিকতর সুযোগ সুবিধা দেবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে সমবায়ের উন্নয়নের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আশা করা হয়েছে আর দশ বছর পরে দেশের মোট ব্যবসায়াদি, ঋণ, ক্রয়-বিক্রয়, ইত্যাদির শতকরা ৫০ ভাগ সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। সমবায় সমগ্র সমাজের ও ব্যক্তি-বিশেষের কর্মশক্তিকে বন্ধন মুক্ত করে দেয় এবং যেখানে সমবায় সাফল্যলাভ করে সেখানে সারা সমাজের হয় প্রভূত উপকার। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল রয়েছে গ্রামে, তাই এদেশে সমবায়ের গুরুত্ব অত্যধিক।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৫০ সালে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪,৬৫০ লক্ষ গজ এবং সুতোর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১,৬৬০ লক্ষ গজ। তারপর থেকে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের উৎপাদন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে এবং প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বস্ত্রোৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল তা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ভারতীয় কল-সমূহ সরবরাহ করে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। গত ১৯৫৬ সালে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প ৫২,৮৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপাদন করে এক রেকর্ড স্থাপন করেছে। ১৯৫৫ সালে বস্ত্রোৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫০,৯৪০ লক্ষ গজ। তেমনি ১৯৫৬ সালে সুতোর উৎপাদনও ১৯৫৫ সাল থেকে বেশী ছিল। ১৯৫৫ সালে সুতো উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬,৩০০ লক্ষ গজ, আর ১৯৫৬ সালে ছিল ১৬,৫২০ লক্ষ গজ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কাপড় ও সুতোর উৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ১৯৬০-৬১ সালে কাপড় ও সুতোর উৎপাদন বাড়িয়ে যথাক্রমে ৮৫,০০০ লক্ষ গজ ও ১৯,৫০০ লক্ষ গজ তোলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে হস্ত-চালিত তাঁত শিল্প, খাদি প্রভৃতি গ্রামা কুটীর শিল্পেরও উৎপাদন থাকবে।

বিদেশে এদেশ থেকে যে সব দ্রব্য রপ্তানী হয় বস্ত্রশিল্প-জাত দ্রব্য তারমধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বস্ত্রের রপ্তানীর পরিমাণ ১০,৩০০ লক্ষ থেকে ১১,০০০ লক্ষ গজ পর্যন্ত তোলবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ১৯৫৬ সালে বিদেশে কাপড়ের রপ্তানী মোটামুটী হিসাবমত ৭,৩৪৪ লক্ষ গজ হয়েছে। সুতরাং নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। কাপড়ের রপ্তানী বৃদ্ধি করবার জন্য কয়েকটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথমত প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর কাপড়ের দামের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক দামে কাপড় সরবরাহ করতে হবে। দ্বিতীয়ত কাপড়ের রকম ও মান বজায় রাখতে হবে এবং সরবরাহ যা'তে নির্ধারিত সময়ে দেওয়া হয় সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে হবে।

শকট শিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতি

কিছুদিন পূর্বে শকট শিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই নীতিতে বাণিজ্যিক যানের উপরে গুরুত্ব অধিক আরোপ করা হয়েছে। শুল্ক-কমিশন যে সুপারিশগুলো করেছেন তার মধ্যে প্রধান ক'টি নীচে দেওয়া হল ঃ

১। যাত্রীবাহী অপেক্ষা বাণিজ্যিক শকটের নির্মাণের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২। বাণিজ্যিক শকটের ক্ষেত্রে ডিজেল শকটের চাহিদা হবে সর্বাধিক এবং এই চাহিদা মেটাবার জন্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা করতে হবে।

৩। দেশে আরও যাত্রীবাহী শকটের নির্মাণ বাঞ্ছনীয় হবে না।

৪। নূতন কেন্দ্র অপেক্ষা বর্তমান কেন্দ্রগুলোতে বাণিজ্যিক শকট উৎপাদনের অতিরিক্ত ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে।

শুল্ক কমিশনের এই সুপারিশসমূহ সরকার নীতিগত ভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন এবং প্রত্যেক কারখানার উৎপাদন পরিকল্পনা শুল্ক-কমিশনের এই সুপারিশ অনুযায়ী স্থির করে নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে সরকারী স্টাডিগ্রুপের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে শুল্ক-কমিশন যদিও বছরে ১২০০০ যাত্রীবাহী ও ১২০০০ বাণিজ্যিক শকটের চাহিদা হবে বলে ধরে নিয়েছেন, আসলে বিক্রীর হিসাব থেকে অন্যরকম ভাব দেখা যায়। ১৯৫৩ সালে যাত্রীবাহী গাড়ী ও বাণিজ্যিক গাড়ীর কাটতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০০০ ও ৮০০০। স্টাডি গ্রুপ আরও বলেছেন যে তাঁরা বছরে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ বাণিজ্যিক গাড়ী কাটতির সুপারিশ করেছিলেন এই মনে করে যে বেশী পুরাতন বাণিজ্যিক গাড়ী ও যাত্রীবাহী বাসের সংস্কার বা নির্মাণ কার্য যথানিয়মে চলবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহের একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের মধ্যে এমন একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুলতে হবে যাতে এই সংখ্যক শকটের কাটতি সম্ভব হয়ে ওঠে।

বিশিষ্ট নির্মাতাদের মতে এই অল্প চাহিদার কারণ, অত্যধিক করভার, রাজ্য সরকারসমূহের লাইসেন্স দিবার পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রিয়করণের ভীতি। স্টাডি গ্রুপ মনে করেন যে শকট শিল্প চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সরকারের উপর নির্ভর করেছে। সরকার আমদানী শুল্ক সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কিছু পরিবর্তন করেছেন এবং তার ফলে কোন কোন শকটের মূল্য কিছু হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, শকটের বাজার সরকারী মহল থেকে বে-সরকারী মহলেই বেশী। সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে ভারতীয় শকট শিল্পও শকটের দাম কমাতে এবং চাহিদা বাড়াতে পারে বলে স্টাডি গ্রুপ মনে করেন।

অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের সম্প্রসারণ

আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে অ্যালুমিনিয়ামের স্থান লোহারই পরে। বক্সাইট খনি, যা' থেকে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়, ভারতে ২৫০০ লক্ষ টন আছে বলে অনুমান। এর মধ্যে ২৭০ লক্ষ টন খুব উঁচু শ্রেণীর খনি। বক্সাইট খনি কেবলমাত্র বৃহৎ আকারের এবং উঁচু শ্রেণীরই নয় সারা দেশময় এই খনি ছড়িয়ে আছে, এবং দেশে অনুসন্ধান করলে আরও বক্সাইট খনি পাওয়া যেতে পারে বলে অনুমান হয়। মোটের উপর ভারতের অ্যালুমিনিয়াম খনির অবস্থা সন্তোষজনক।

ভারতে এখন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনকারী দুইটি কারবার আছে এবং এদের যৌথ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫০০০ টন, কিন্তু এই কারবার দুটির সম্প্রসারণ সাধন করে উৎপাদন ক্ষমতা ৭৫০০ টনে তোলা হয়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা দেশে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে দেশের উৎপন্ন ৭৩৩৩ টন ছাড়া আরও ১৫,৮০৫ টন বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়েছিল। বর্তমানে আমাদের অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা প্রায় ২৫০০০ টন এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা কাল শেষ হওয়ার মধ্যে এই চাহিদা বেড়ে ৩৫,০০০ থেকে ৪৫,০০০ টন দাঁড়াবে বলে অনুমান। এ থেকে বোঝা যায় যে উৎপাদন ক্ষমতা ও চাহিদার মধ্যে কত তফাৎ রয়েছে। এ জন্য দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ৩০,০০০ টন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই হীরাকুদে ১০,০০০ টন উৎপাদনক্ষম একটি কারখানা স্থাপনের জন্য এবং বর্তমান কেন্দ্রগুলির একটি কেন্দ্রের উৎপাদন বাড়িয়ে ৫০০০ টন করবার জন্য দুটি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার ফলে অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন ক্ষমতা ২০,০০০ টনে উঠবে।

পুস্তক পরিচয়

Women's Education in Eastern India :— The First Phase : by Jogesh Chandra Bagal : The World Press Private Ltd., 37, College Street, Calcutta-12. Price Rs. 7.8 as.

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল দীর্ঘকাল ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার, তথা ভারতের নবজাগরণের ইতিহাস সংকলন করছেন। তাঁর আলোচনা সপ্রদ্ধ, কিন্তু ভাব-বিহ্বল নয়। তথ্য প্রমাণের দৃঢ় ভিত্তির উপরে তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। নেতৃস্থানীয় পূর্বগামীদের দান সম্বন্ধে তাঁর ভাষা উচ্ছ্বসিত নয়—বস্তুতঃ কোথাও তাঁর ভাষা উচ্ছ্বাস-প্রবণ নয়—তিনি শুধু তাঁদের সাধনা ও প্রয়াসের বিবরণ দিয়ে গেছেন ; সে বিবরণ স্বতঃই ঐ নেতৃবর্গের মহত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠকের মনকে সচেতন করে তুলবে।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ভূমিকায় বলেছেন : ভারতের নবজাগরণের ইতিহাস রচনায় ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের দান অবিস্মরণীয় ; সুলভ জনপ্রিয়তার পথ পরিহার করে তাঁরা বৈজ্ঞানিক পন্থায় সত্য সন্ধান ক'রেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক পূর্বভারতে—বিশেষ ক'রে বাংলায়—আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা পূর্বে এদেশে ছিলনা, এমন নয়। বেদের যুগ থেকে বহু ভারতীয় বিদুষী জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ও বিবিধ লোক-কলা ও লোক-সাহিত্যেও তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার নিদর্শন মেলে। কিন্তু অতীতের নারীদের বিদ্যাচর্চা প্রধানতঃ গৃহ বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাপক ভাবে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী হয়েছিলেন উনিশ শতকের কতিপয় দূরদর্শী বাঙালী মনীষী এবং কয়েকজন বিদেশী ভারত-হিতৈষী। এই বিদেশীদের অধিকাংশ ছিলেন ধর্ম-প্রচারক।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' এদেশের প্রথম স্ত্রীশিক্ষা প্রচারক প্রতিষ্ঠান। তারপর মহিলা-সমাজ, মহিলা-সমিতি, শ্রীরামপুর মিশন, জন্ ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্ (বেথুন), রাজা রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করে। এঁদের চেষ্টার ও কার্যকলাপের সম্যক্ পরিচয় এ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থখানি উপাদান সমৃদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য।

ওরা কাজ করে—প্রশান্তকুমার রায়। পরিবেশক : বিবুলিওথেক্, ১১।এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৷৷০।

"...'ওরা কাজ করে' লেখা হয়েছিল ইংরেজী উনিশশো সাতচল্লিশের জুন থেকে জুলাইয়ের মধ্যে—ভারতবর্ষ সাংস্কৃতানিক স্বাধীনতা লাভ করবার কিছুদিন আগে। ...এখানে যে কথাটা বিশেষ ক'রে বলবার, তা হ'লো এই উপন্যাসের সময় নিয়ে। তখন ক্ষমতার দম্ভে এক শ্রেণীর মানুষ যেন ন্যায়-নীতির মুখোসটাও খুলে ফেলেছে।...ক্রমে তেরোশো পঞ্চাশের অনাহার দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে মানবতাবোধ স্তিমিত হয়ে আসছে। নিদারুণ হতাশায় মানুষের প্রতি মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। উপন্যাসের আরম্ভটা এইখানেই।" (ভূমিকা) ঐ সময়ের শ্রমিক বিক্ষোভ, ছাত্র আন্দোলন, জনসংগ্রাম—বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের চিত্র—কাহিনী আকারে উপস্থিত করা হয়েছে এ গ্রন্থে। গল্পের সূত্র ক্ষীণ ; কিন্তু রচনায় লেখকের আন্তরিকতার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় মেলে।

শাশ্বতিক—বসুধারা। প্রাপ্তিস্থান : বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৪।০।

"মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তার অতীতের বনেদের উপর। নতুন পথ তৈরী করে সামনে এগিয়ে চলতে হলে তাকে পেছন ফিরে দেখতেই হবে—পেছনের পথের সঙ্গে সামনের পথে সামঞ্জস্য রইলো কিনা।" প্রগতি কাম্য, কিন্তু সাময়িক মোহবশে শাশ্বত বলতে বা চিরন্তনকে ভুলে গেলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো এই কথাই লেখক বোঝাতে চেয়েছেন। উপন্যাসখানি আদর্শমূলক। ইতিহাস এবং সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ মধ্যে মধ্যে এসে পড়েছে, কিন্তু তাতে গল্পের গতি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়নি। রচনা কবিত্বপূর্ণ এবং সাবলীল।

মামার দেশ—শ্রীঅমরকুমার দত্ত। প্রাপ্তিস্থান : বরেন্দ্র লাইব্রেরি। ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৸০।

বাংলার নির্দোষ সম্পূর্ণ সুরুচিসঙ্গত কৌতুক-নাটকের বড়ই অভাব। এই ক্ষুদ্র নাটকখানি সে অভাব অংশত পূরণ করলো। ব্রাহ্মমিশন প্রেসের কর্মচারীদের তাগিদে এখানি লেখা হয়েছিল। কিন্তু সাময়িকতাকে অতিক্রম করে এখানি সকলের উপভোগের সামগ্রী হয়েছে। 'ছাপার ভূল' যে কত বিচিত্র রূপ ধারণ ক'রে এককালে হাস্যকরুণ রৌদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন রসের উদ্বোধন করতে পারে তার উপভোগ্য দৃষ্টান্ত এতে মিলবে। এমন সংযত মনোজ্ঞ কৌতুক নাটিকা সচরাচর চোখে পড়েনা। কলেজে বা ক্লাবে অভিনয়ের একান্ত উপযুক্ত।

নূতন দিনের আশায় : ডাঃ সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরিবেশক ; শৈলশ্রী, ১।১।১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মূল্য ৩৲।

আদর্শমূলক উপন্যাস। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের গণ্ডী ভেঙ্গে যাঁরা 'এক জাতি' গড়তে চান, তাঁদের চরিত্র কল্পনা করে লেখক কাহিনী রচনা করেছেন। ভাষা ও সাহিত্যের দিক্ থেকে বিচার করলে হয়তো কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়বে, তবু পাঠক এতে অনেক সময়োপযোগী ভাববার কথা পাবেন।

মালা : শ্রীলতা চট্টরাজ। প্রকাশক : বি. কে. চট্টরাজ। ৩, সাবার্বান মুল রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৲। লেখিকা নতুন, কিন্তু কৌতুকে-বিদ্রূপে সরস এই নয়টি গল্পে তাঁর পরিণত রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের ছোটখাটো ঘটনাকেও নিপুণভাবে তিনি পরিবেশন করেছেন। নানা লোকের স্বভাবগত দুর্বলতা এক নিমিষে তাঁর চোখে পড়ে গিয়েছে এবং সংযত মৃদু হাস্যের সঙ্গে তিনি সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্রতিদিনের সামান্য ব্যাপার নিয়েই তাঁর গল্প, কিন্তু গল্পের বুনন নিখুঁত। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় বলেছেন : "বিষয় বস্তুর সঙ্গে পরিচয় গভীর বলেই রচনার ভঙ্গীটি সহজ ও স্বচ্ছ।" এই সাবলীলতা তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতার নিশ্চিত প্রমাণ। —বী।

নির্বাচন—আগামী মার্চ মাসে স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। এর গুরুত্ব সমধিক। প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস দেশের সমর্থন লাভ করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিল। আশা করি এবারেও সমর্থন লাভ করবে। প্রথম বারের চেয়ে এবারে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে। দেশবাসীর অভিজ্ঞতা ও বিচারশক্তিও বোধ হয় কিছুটা বেড়েছে। প্রথমবারে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতি দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কা'র হাতে রাষ্ট্রচালনার ভার দেওয়া যায়, তার কি ফল হবে, তার জানা ছিলনা। আপন হাতে কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করার সুযোগ পূর্বে সে কখনও পায়নি, সুতরাং ঐ বিষয়ে সে ছিল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

কংগ্রেসের হাতে দায়িত্ব সমর্পণ করে সম্ভবতঃ সে ভুল করেনি। গঠনের কাজে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। তার বৈদেশিক নীতি দেশের সকল দলের এবং বিদেশের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। দেশের বহুবিধ আভ্যন্তরিক সমস্যা সমাধানের পক্ষেও ভারত এগিয়ে চলেছে, সন্দেহ নেই। অবশ্য সেক্ষেত্রে—অনেকে হয়তো বলবেন— অগ্রগতি আরও দ্রুত হওয়া উচিত; কিন্তু, নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তাকে যে ভাবে চলতে হচ্ছে, তাতে দেশ যতটা এগিয়েছে, তা উপেক্ষনীয় নয়। দোষ ত্রুটি ভুল ভ্রান্তি—কাজ করতে গেলে ঘটে থাকেই, তাকে বড় করে দেখা সঙ্গত নয়; যত্ন নিষ্ঠা এবং সাফল্যের পরিমাণই প্রধানতঃ গণ্য।

অপরাপর দলে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি অনেকে আছেন; তাঁদের পরামর্শ ও সহযোগিতা আমরা মূল্যবান্ বিবেচনা করি। বিরোধিতার উগ্র মনোভাব দেশ-গঠনের অনুকূল নয়। দেশ-সেবাকে ধর্ম বলে মনে করলে ভিন্ন দলের লোকও কর্মক্ষেত্রে অনেক সময়ে একত্র হ'তে পারেন। আমরা বীর বিচক্ষণ দেশানুরাগীদের সহযোগিতা আশা করবো। কাউকেই আদর্শ ত্যাগ করতে বলবোনা; ভিন্ন দলের যোগ্যলোকও নির্বাচিত হয়ে এলে তাঁকে আমরা অভ্যর্থনা করে নেবো; এবং আশা করবো, তিনি দেশের কল্যাণকে সকলের উপরে স্থান দেবেন।

তবে, কংগ্রেস শাসনভার নিয়ে বিবিধ পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং আমরা মনে করি, তাকে পরিকল্পনার কাজে অগ্রসর হবার এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির ব্যাপারে একই নীতি অনুসরণ করবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই কারণে তার উপর এবারেও দায়িত্ব ন্যস্ত করার আমরা পক্ষপাতী। অপর দলের হাতে শাসনভার গেলে আমাদের নব রাষ্ট্রের এই অপরিণত অবস্থায় কিছুটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে। ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গেলে সে-টা অবশ্যম্ভাবী। কাজেই সকলের আনুকূল্য প্রার্থনা করি। দেশসেবী পদাধিকারকে সেবার একমাত্র উপায় বলে মনে করেননা; সেবার পথ নানাভাবে নানা দিকে উন্মুক্ত; তা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা অসঙ্গত।

কাশ্মীর-সমস্যা—কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে জন-সাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা পাকিস্তানের বর্তমান শাসক-বর্গের এক মজার খেলা। খাদ্য, বস্ত্র ভাষা ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি উপলক্ষ্য করে' জনসাধারণের অসন্তোষ পাছে মারাত্মক ভাবে জ্বলে ওঠে, তাই তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টায় তাঁরা কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। হয়তো সাময়িক উত্তেজনায় পাকিস্তানের এক সম্প্রদায় অন্য কথা ভুলে যায়। কিন্তু

এ খেলা কত দিন চলবে? আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক অধিবেশনে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক নীতির সমর্থন মেলেনি বলেই শোনা যায়। অবশ্য মৌলানা ভাসানির প্রতিবাদ করেছেন সুরাবর্দি সাহেব। তবে সুরাবর্দি সাহেবকে নানারূপে দেখে দেখে জনসাধারণ আজ হতবুদ্ধি। কোন্ কথা বিশ্বাস করবে, তাবতে হয়।

যুক্ত জাতি সংস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন লীলাও বিস্ময়কর। পাকিস্তানের দাবি অনুসারে জাতি সংস্থার পক্ষ থেকে সেনাদল পাঠানো, ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্য অপসারণ এবং সংস্থার প্রতিনিধির পরিচালনায় গণভোট গ্রহণের আবেদন—এবং এ সব প্রস্তাব যে ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ থেকে উত্থাপিত হতে পারে, এ কথা পূর্বে অনুমান করা যায়নি। ভারত প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননের বক্তৃতা সমাপ্ত হবার পূর্বেই পাকিস্তানের আবদার অনুযায়ী প্রস্তাব উত্থাপন ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিনিধিদের মর্যাদার অনুকূল হয়নি।

পূর্বের আইন অনুসারে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং কাশ্মীর সংবিধান সভাও অন্তর্ভুক্তি প্রস্তাব সমর্থন করেছে; আজ তাকে বাতিল করে দেবার অধিকার কারও নেই। সেকথা শ্রীযুক্ত মেনন, আমাদের প্রধান মন্ত্রী এবং কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন।

ইঙ্গ আমেরিকার প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়নি, রাশিয়ার অস্বীকৃতির ফলে সে প্রস্তাবে বান্‌চাল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে জাতি-সংস্থার সভাপতি সুইডেনের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জারিংকে ভারত ও পাকিস্তানে গিয়ে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রস্তাব রাশিয়া আপত্তি করেনি ভোটও দেয়নি। শ্রীযুক্ত মেনন বলেছেন, ভারত আতিথ্য-প্রদর্শনে ত্রুটি করবেনা, তবে কাশ্মীরের জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী ভারত অন্তর্ভুক্তির কোনও পরিবর্তন সে হ'তে দেবে না। আর সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে কোনও সুচিন্তিত মত প্রকাশ তার পক্ষে সম্ভব নয়।

পাকিস্তান কাশ্মীরে হানা দিয়েছে জাতি-সংস্থার নির্দেশ অমান্য করে,' এখনও তার বিস্তৃত এক অংশ অধিকার করে আছে, সৈন্য অপসারণ করা দূরে থাকুক যুদ্ধের প্রস্তুতি বাড়িয়ে চলেছে, ইঙ্গ-আমেরিকা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়ে তার সাহায্য করছে, উপরন্তু পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে ভারতকে নিন্দা করছে—এ দৃশ্য ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতির অদূর-দর্শিতার ও নিঃস্বতার পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। ভারত কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কোন মতেই বৈধ নয়।

গোড়ার কথাটাই বা কি? কাশ্মীর নিজের ভাগ্য নিজে গড়বে—এই তো দাবি। সে তো ভারতের সঙ্গে নিজেকে সর্বপ্রকারের বৈধ উপায়ে যুক্ত করেছে। তবে অন্য কার কি বলবার আছে? কাশ্মীরবাসী তার ভালো-মন্দ নিজে বুঝুক। ভালো করুক, মন্দ করুক,—তারই চিন্তার বিষয়? পাকিস্তানের তা নিয়ে মাথা-ব্যথা কেন? কোনক্রমেই একথা বলা চলেনা যে কাশ্মীর কোনদিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বা হতে চেয়েছিল।

মুসলমান-পরিষ্ঠ দেশ বলেই পাকিস্তান যদি তার উপর দাবি ঘোষণা করতে চায় তা হলে তো ধর্মের ভিত্তিতে দুনিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থাই নতুন করে গড়তে হয়। কাশ্মীরের জনসাধারণের সুস্পষ্ট অভিমত এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির সকল বিধি অগ্রাহ্য করেও সে যদি কুটচক্রীদের সঙ্গে মিলে জাতি সংস্থায় বিভ্রাট সৃষ্টি করতে সাহসী হয়, তবে সংস্থা শান্তি প্রতিষ্ঠাকামী বলে জগতের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেনা। দক্ষিণ আফ্রিকা, গোয়া পাকিস্তান প্রভৃতি নানা ব্যাপারেই সংস্থা, বিশেষতঃ তার অন্তর্গত নিরাপত্তাপরিষৎ দুর্বলতার পরিচয় দিচ্ছে, এটা দুঃখের বিষয়।

মন্দিরা

উনবিংশ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৬৩ | একাদশ সংখ্যা

স্মৃতি কথা

শ্রীকালিদাস রায়

পূর্বানুবৃত্তি

আমার বিবাহ হয় ১৯১২ সালের ফাল্গুন পূর্ণিমায়। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তির পর চৈত্র মাসটা দেশের বাড়ীতেই থাকলাম। কলিকাতায় ফিরবার আর প্রয়োজন ছিল না। তারপর সস্ত্রীক ডালটানগঞ্জে গেলাম। সেখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ এত বেশী যে নববধূর আকর্ষণেও পাহাড়িয়া উত্তাপ আমার সহনীয় হ'ল না। সেখানে অল্প দিনই ছিলাম। পালামৌএর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পালামৌ নামে একটা কবিতা লিখেছিলাম। এ কবিতা আমার পর্ণপুট ও আহরণে আছে। সেটার আরম্ভ এইরূপ—

ঐ যে গিরির পরে শোভিছে গিরি
তমাল পিয়াল ছায় রয়েছে ঘিরি
নীলাকাশে দিক শেষে ধূমাইয়া-ঠিক মেশে
দ্যুলোক দেশের পথে সাজানো সিঁড়ি॥

পালামৌ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবার আর একটা কারণ কাশী চুনার ইত্যাদি স্থলে কয়েকদিন বাস। সেখান থেকে কাশী গেলাম। এই প্রথম আমার কাশী দর্শন। এখানে উত্তাপ আরো বেশি—সকালে এক ঘণ্টার বেশি ঘুরতে পারতাম সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে বিশেষ কিছু দেখা হ'ত না। সেখান থেকে মোগল সরাইএ আমার শ্বশুরের বাসায় ২।১ দিন থেকে চুনার গেলাম। সেখানকার কেল্লাটা দেখে—বাঁকিপুরে চলে এলাম। সেখানে বিনোদবাবুকে প্রণাম দিয়ে শান্তিনিকেতনে একদিন থেকে কলকাতা চ'লে এলাম। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের দর্শন পেলাম না। তিনি গ্রীষ্মকালে শান্তিনিকেতনে থাকতেন না। গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য সে যাত্রায় রাজগৃহ, নালন্দা, মুঙ্গের, ভাগলপুর ইত্যাদি স্থলে যাওয়া হ'ল না।

আষাঢ় মাসে বহরমপুর থেকে কলিকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু আবার সেই জ্বর হ'তে লাগল। যখনই জ্বর আরম্ভ হ'ত, বহরমপুর যেতাম। জ্বর বন্ধ হলেই কলিকাতায় আসতাম। ৭।৮ দিন ভালো থাকার পর আবার জ্বর হ'ত একটু একটু, আবার বাড়ী চলে যেতাম। এই অবস্থায় পড়াশুনায় মন দেওয়া শক্ত হয়ে উঠ্‌ল। তবে টি-বির ভয় অন্তত ছিল না। এই সময়টায়

অজস্র প্রেমের কবিতা লিখতাম এবং সেগুলি মাসিক পত্রে ছাপাতাম। সে সব কবিতা পর্ণপুটে স্থান পেয়েছিল।

আশ্বিনমাসে আবার পালামৌ গেলাম। এবার কিছুদিন সেখানে ছিলাম। এই সময়ে আনন্দবাজারের ভূতপূর্ব সম্পাদক প্রফুল্ল সরকারের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি তখন সেখানে, যতদূর মনে পড়ে, ওকালতি করতেন। প্রফুল্লবাবু আমার গাইড ছিলেন। টম টম চড়ে পালামৌএর নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতাম। সস্ত্রীক লাতেহার পাহাড়েও গিয়েছিলাম। কয়দিন পরে সস্ত্রীক চলে এলাম—সে উপলক্ষে রচিত একটা কবিতা বৈকালীতে আছে—

কবিতাটা এই—

গিরিমল্লিকার মত ফুটেছিল তব অন্তটিতে
বধূটি আমার,
আজি লয়ে যাই তারে, হে বৎসলা উৎসময়ী ভূমি
গৃহে আপনার।
দিগন্তে কজ্জলকান্তি বনশ্রী সহসা
নবধারাপাতে
চিরপটভূমি হ'য়ে তার চারু প্রতিমারে ঘেরি
র'য়ে যাবে সাথে।
তাহার কৈশোরখানি দিয়া তব পুষ্পময় পাণি
করেছ রচনা
তোমার মহুয়াবন সাক্ষী তার বয়ঃসন্ধিক্ষণে,
কভু ভুলিব না।
তোমার মলয় বায়ু অঙ্গে তার রস শিহরণ
তুলিল সঞ্চারি'
তোমার কীচকবন করে তারে প্রথম উন্মনা,
ভুলিতে কি পারি?
লাবণ্যের তটে তটে, বেণীধামে তার রক্তাগরে
হেরিব কেবলি
তব তরঙ্গিত ছবি, বনলতা-কুসুমসুষমা
রয়ে কুতূহলী।
বনকুরঙ্গীর মত তার চল তরল নয়ন,
কলচপলতা,
অঙ্গের বন্ধুর কান্তি, নিশিদিন স্মরাইবে মোরে
তোমারি ত কথা।
তুমি যারে গড়িয়াছ আকৃতি কঠোর-কোমলা
লালিতো গৌরবে,
কিছু যদি পেয়ে থাকে সে তোমার জীবনের ধন,
ধন্য আমি তবে।
আরণ্য মাধুরী তব প্রফুল্লতা সৈরিক গরিমা
তব তেজোবল
জীবনযাত্রার পথে পায়নি কি কিছু কিছু তার
পাথেয় সম্বল?
কর আশীর্বাদ আজি গিরিভূমি সুরভি শিরীষ-
কেশর বর্ষণে,
মঙ্গল মণ্ডিত হোক্ তার নব সংসারজীবন
বন্ধুর অঙ্গনে।

(পালামৌএর উদ্দেশে)

পালামৌএর পরিবেষকে আমার Romantic মনে হয়েছিল, ঐ পরিবেষ আমার নববধূর চারপাশে একটা Romantic পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিল। প্রেমকবিতা-গুলিকে ঐ পরিমণ্ডলটি রসাবিষ্ট করেছিল। সেইরূপ দুইটি কবিতা এখানে উৎকলন করছি—

(১)

ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় তুলসী-কুঞ্জে কি দিয়ে তুষিব তোমার হিয়া?
কোথা বীর-ভক্ত তমাল নমেরু দেবদারু চারু নীপ?
পলাশ-শ্রীর ললাটের 'পরে কোথা সে চাঁদের টিপ?
শিরীষ-বালার অলক দুলায়ে পবন হেথা না ঘুরে,
মহুয়ার বনে মাতিয়া হেথায় মৌমাছি নাহি ঘুরে।
বনদেবী হেথা শৈলসোপানে এলায় না তার বেণী
কোথা দিগন্তে তরঙ্গায়িত তুঙ্গ গিরির শ্রেণী?
হেথা শিলাজতু গলায়ে ঝরে না গেরুয়া উৎসবারি।
সিকতাহৃদয় বিদারি এখানে ওরেনাক কেহ ঝারি।

কোথায় উদার অবাধ জীবন ভূধরের পাদমূলে।
চপল চরণে কোথা ছুটাছুটি গিরিনদী-কূলে-কূলে ?
ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া
হেথায় বক্ষ-অঞ্চলে তব কি দিয়ে ভুলিব হিয়া ?

ওগো পাহাড়িয়া বালা,
বল্লীবলয় ভুজে তব, গলে কুটমল্লিকা-মালা।
প্রকৃতি হেথায় সুকৃতির রূপে বেঁধেছে কুটীরখানি,
আলিপনা আঁকা ছায়ামণ্ডপে এস গিরিবনরাণী।
পূর্ণ কুম্ভ তব মেখলায় পাণি-বন্ধন যাচে,
কম্বু হেথায় তব চুম্বন আশায় আশায় আছে।
ফুল পল্লব ভূষণ তোমারি ভবনভূষণ পর'
টানো শির'পরে লাজগুণ্ঠন শঙ্খবলয় ধর।
আঁক' সীমন্তে সিন্দুর রেখা, বাঁধ কুন্তলরাশি,
হোক অচপল চরণযুগল, সংযত হোক হাসি।
পিঞ্জরে হেথা পড়িয়াছ বাঁধা গিরিকুঞ্জের পাখী
হরিণ নয়নে ঘেরিয়া বেড়িল শত তরুণীর আঁখি,
ওগো পাহাড়িয়া বধূ,
হরিত পর্ণপুটে আনো গিরিপ্রকৃতি হৃদয়মধু। (পর্ণপুট)

(২)

ওগো, মহুয়াবনের সাকী,
এস—মুখমদিরায় মুকুলে মধুপে মাতায়ে বকুলশাখী।
কপোল-পিয়ালা চলচল তায়
গোলাপী সরাব টলটল তায়,
তব তুল্-তুলে আঙুর-আঙুলে মুছাও আমার আঁখি।
ওগো, বারুণীপুরীর সাকী
তব রূপসীধু পিয়ে পিয়ে প্রিয়া,
বিভসে অবশ হোক মম হিয়া,
তব প্রেমরস-দ্রাক্ষাকুঞ্জে ঢুলে পড়ে' যেন থাকি।
এস দ্রাক্ষাবনের সাকী।

ওগো, শৈলসাহুর রাণী,
আনো ও-বাহুর অটল অটুট শিলার নিগড়খানি।
পাষাণি, উৎস পাষাণকারায়
চন্দনশীত উৎস ধারায়
বন্দী যেন গো আপন হারায়, না শুনে মুক্তি-বাণী।
ওগো, পাষাণদেশের রাণী।
বীরবালা, আজি রণ অবসান,
চরণে সঁপিয়া কবচ কৃপাণ,
বিদ্রোহী পারে পড়িছে লুটায়ে চির পরাজয় মানি,
ওগো শৈলপুরীর রাণী।

ওগো, অসিতদেশের প্রিয়া,
এসো খঞ্জন-আঁখির ভুরুর অঞ্জনলতা নিয়া।
দূর দিগন্ত, ঘনবন গিরি
উজলি ক্লান্ত কুহেলিকা চিরি,
মসীসিন্ধুর শশী তুমি উদি' আলোকিলে মম হিয়া।
ওগো, কজ্জলকেশা প্রিয়া।
আঁক'লো ইন্দ্রনীল-শলাকায়
রস-অঞ্জন আঁখির পাথায়,
স্বপনে বুলাও যাদুকরি, মায়া-অনুরঞ্জন দিয়া!
ওগো নিকষদেশের প্রিয়া।

ওগো, স্বপনপুরীর পরী,
এস লম্বিত ইন্দ্রধনুর মালিকা হস্তে ধরি'।
তারার কুসুম ছড়াতে ছড়াতে,
ছায়াপথ বেয়ে নাম' এ ধরাতে,
কনকের দীপে জোনাকি-ফিন্‌কি প'ড়ে যাক্ ঝরি ঝরি!
ওগো, স্বপনলোকের পরী।
লুতাজালে রচা লঘুলঘুকায়
প্রজাপতিখচা দুটী পাখনার
ছায়ায় হাওয়ায় মোহন মায়ায় চেতনা লহ গো হরি'।
ওগো, কল্পবনের পরী। (পর্ণপুট)

আর একটি কবিতার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটি বালিকা বধূ। এই কবিতাটিরই ইংরাজি অনুবাদ করেছিল বন্ধুবর সুনীতিকুমার।

আমার বালিকা-বধূ,
অঞ্চলভরা সৌরভ তার অন্তরভরা মধু।
ফুটেছে শুভ্র যুথীর মতন,
মৌনমধুর সৌম্য শোভন,
আলোক-নীহারে নোলক-মুকুতা টুল-টুল করে বায়।

দীপের মতন নাহি শিহরণ,
নাহেক উগ্র চর্চ্চা যেমন,
বকুলের মত ব্যাকুল অধীর করেনাক মদিরায়।
অধরে নবীনা বধূ,
অকলঙ্কভরা পরিমল তার,—অন্তরভরা মধু।

জীবন-সখীটি মম
সঙ্কোচমুঠি তার কর দুটি পঙ্কজ-কলিসম।
ললিত লতিকা লজ্জারোচনা
ঢলঢল নীল কুসুমলোচনা,
পেলব তরল তনিমা ভরিয়া সরল গরিমা তায়।
সে যে চির-অবলম্বনশীলা
জানেনাক ছল কৌশললীলা;
তরুর শাখাটি জড়ায়ে লতায়ে ঘুমায়ে পড়িতে চায়।
আমার বালিকাজায়া,
কম্বলপরা করদুটি—তার পঙ্কজময়ী কায়া।

বালিকা-কান্তা মোর,
শুভ্ররুচির অন্তর-বেলা,—শুচি তার আঁখিলোর।
নব নিদাঘের ভাগীরথীসমা
বহিয়া নিভৃতে মায়াদয়া ক্ষমা,
শুভ্র সংসার-সৈকতে শোভে পুণ্যের মহিমায়।
নাহি উদ্বেল আবিল প্লাবন,
শীতল শান্ত স্বচ্ছ জীবন
ধীরি ধীরি যেন কুলু-কুলু বয় ঝিরি-ঝিরি মলয়ায়।
হরষী হরিতা মোর,
ললিতরুচির হসিত তাহার, শুচি তার আঁখিলোর।

আমার আদুরী প্রিয়া,
কণ্ঠ তাহার ভুবে জনে জনে বচন-মাধুরী দিয়া।
শারিকার মত নহে সে মুখরা,
কোকিলার মত সে নহে প্রখরা,
মধুরীর মত রূপগৌরবে টলে' টলে' নাহি যায়।
সে-যে মোর শ্যামা বনের পাখীটি,
শিসে হরে মন—সচকিতদিঠি,
চায় এ হৃদয়-কুলায়-নিলয়ে লুকাইতে আপনায়।

আমার সোহাগী প্রিয়া—
কণ্ঠ তাহার বটে অমিয়া, পোষ মানে তার হিয়া।

(পর্ণপুট)

প্রেমের কবিতা কেউ পড়ে না। স্বয়ং কবিগুরুর প্রেমের কবিতাগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। আমার প্রেম কবিতাগুলির একেবারেই প্রচার হয়নি। পর্ণপুটের পরবর্ত্তী সংস্করণে অধিকাংশ বাদ দিয়েছি। পর্ণপুট এযুগের পাঠকদের অপরিচিত। আমি যে চিরকালই বুড়ো ছিলাম এককালে প্রেমের কবিতা লিখ্‌তাম, আজকালকার পাঠকরা তাও জানে না। অনেকে জানে আমি ব্রজ কবিতাই লিখেছি। সেগুলোও যে প্রেমেরই কবিতা, পারমার্থিক কবিতা নয়, তা লোকে ভাবেও না।

একজন সাহিত্যরথীর কবিতাপুস্তকে বালিকাবধূ নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হ'ল। যে সব কবি বালাবধূ নিয়ে কবিতা লিখেছেন তাতে তাদের ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। না, এই কবিতাটা পড়ে আমাকে আর একটা কবিতা লিখতে হয়েছিল। ঐ কবিতায় আমাকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছিল বলে আমার ধারণা জন্মেছিল। আমি লিখেছিলাম—

ছিল একদিন বাল্য-বিবাহ প্রথা,
লিখেছিনু তাই বালিকা-বধূর প্রণয়-সূচনা কথা।
পীড়ন করিল যে কবি বিদ্বুষী যুবতী নারীর পাণি
সে কবি কবিতা লিখিল আমারে শাণিত ব্যঙ্গ হানি।
তখন জীবনে চলিছে প্রেমের নিত্য নূতন খেলা,
উত্তর দিতে করেছিনু অবহেলা।
প্রণয়ের বীজ লইয়া জনমে নারী
যেমন তার সে-বীজেরই সহকারী,
সে-বীজ হইতে জনমে যে-লতা ক্রমে তা লতায় চলে
লভি স্নেহরসে উপচয় পলে পলে।
তারপর ক্রমে পল্লবঘন হয়
ফুলফল লাভ করার আগেই চাহে সে যে আশ্রয়।
বয়ঃসন্ধিকাল
সূচনা যে করে তাহার তারিখ সাল।

বলিলাম আমি সেই বীজটির কথা,
জনমে যাহাতে বালার প্রণয়লতা,
এলো কি তা নেমে বংশধারার স্রোতে,
অথবা আসিল জন্মান্তর হতে,
সে সব বিচার নয় মোর করিবার
পণ্ডিতগণ করুন বিচার তার।
দশের প্রণয় দেখিয়া কেহ কি প্রণয় শিক্ষা পায়।
অথবা গ্রন্থ পড়িয়া কেহ কি প্রণয়ে দীক্ষা পায়?
প্রণয় শেখে কি পরীক্ষা পাশ করে কেউ একে একে,
প্রণয় শেখে কি রঙ্গমঞ্চে সিনেমার ছবি দেখে?
মূক-প্রণয়েরে প্রণয় বলে না যারা
মুখর-প্রণয়ে তাহারা আত্মহারা।
নিভৃতে নীরবে প্রণয় হৃদয়ে জাগে—
শিখিতে তাহার ভাষা বহুদিন লাগে।
আরেক প্রশ্ন আসে
শিক্ষিত যুবা বালিকা-বধূরে কি করিয়া ভালবাসে?
বৃথা এই জল্পনা।
ভালবাসে কারে? অর্ধেক নারী অর্ধেক কল্পনা
সেইত তাহার প্রণয়পাত্রী, সেইত প্রাণেশ্বরী।
আপন মনের মাধুরী মিশায়ে যাহারে তুলে সে গড়ি।
হৃদয়ের সুধা বধূর হৃদয়ে ঢালি পান অবিরাম,
প্রণয় তাহারি নাম।
বহুদিন থেকে এই অমৃতের হয় প্রাণে উপচয়,
বালা বা যুবতী ভাবিবার আর অবসর কোথা রয়?
আপন কল্পরমা
আশ্রয় পায় যে নারীর দেহে সেই তার প্রিয়তমা।

আমার এক আত্মীয় বিলাত থেকে অনেক গুলি ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁহার বধূ তখন ষোড়শী, তিনি একটি বালিকাকে বিবাহ করে বিলাত গিয়েছিলেন —সেখানে ৩।৪ বছর ছিলেন। বহুদিন পরে ফিরে এলেন। চমৎকার প্রেমের কবিতার বিষয়বস্তু পেলাম। একটা খুব বড় আবাহনী কবিতা লিখে ফেললাম ঐ ষোড়শীর পক্ষে ওকালতি ক'রে। অশিক্ষিতা বাঙালী-বধূর পক্ষে একটু ব্যারিষ্টারি করবার প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ, স্বামীটি পাশ্চাত্য শিক্ষার উচ্চতম সোপান থেকে নেমে আসছেন। কবিতাটা আমার পর্ণপুট ১ম সংস্করণে স্থান পেয়েছিল —পরের সংস্করণে তা বাদ দিয়ে লিখেছি। কবিতার কিয়দংশ এই—

শুরু শুরু সুখে তার বেপথুতে দুরু দুরু বুক,
স্বেদে অভিষিক্ত তনু, রোমাঞ্চন অঙ্গে জাগরূক,
সে আজিকে প্রাবৃটের কম্পমানা কদম্বের শাখা,
ধীরে দিও পদভার ওগো শিখী ধীরে মেলো পাখা।
দক্ষারিণী পল্লবিনী লতা যদি তরু বক্ষ পেয়ে
লুটায়ে ঘুমায়ে পড়ে ক্ষমো তারে কৃপানেত্রে চেয়ে।
মুরছিয়া পড়ে যদি তব জ্ঞানপারাবার তীরে,
জোয়ারে উছলি প্রেমে বক্ষে নিও তন্বী তটিনীরে।
প্রেমাবেশে আত্মহারা যদি নারে কহিবারে কথা,
নীরব বাগ্মিতা তারে ক্ষমা কোরো শুদ্ধ কান্তরতা।
আনন্দে নিরুদ্ধকণ্ঠ হৃদয়ছন্দে বুদ্‌বুদের সম
প্রাসঙ্গিক অর্থহীন অর্ধস্ফুট বাণী তার ক্ষম।
ক্ষমিও দুলিত দুটি মৃণালের ক্লান্তি অবসাদ
তরঙ্গ প্রহত আঁখি উৎপলের শতেক প্রমাদ,
প্রেমের নীহারে স্নিগ্ধ হয়ে এস উষার অরুণ,
কমলের মর্মকোষ টুটাইতে প্রেমিক তরুণ।
(১৩২০—ফাল্গুন, মানসী)

যার উদ্দেশে লিখলাম তিনি কবিতাটার রস গ্রহণ করেছিলেন ব'লে মনে হয় না। আর এক যুবজানি কৃতী যুবক সেই সময়ে বিলাত থেকে ফিরে এসেছিল আই-সি-এস হয়ে। আমার একবন্ধু তাকে আমার লেখার একটা কপি দিয়েছিল। শুনেছি তিনি বিশেষতঃ তাঁর দাদারা কবিতাটা খুব appreciate করেছিলেন। আত্মীয় বন্ধুরা যে কবিতা একেবারে বোঝে না—তখনও আমি তা জানতাম না। সেজন্য আমার কবিশক্তির অপচয় কম হয়নি। সেই আই-সি-এসটিও আমার সঙ্গে পরিচয় করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। কবিতাটা কৃষ্ণবিহারী পর্ণপুটে ছেপেছিল— আমি পরের সংস্করণে বাদ দিয়ে দিয়েছি।

কবিবর যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি যতীন্দ্রমোহনের গৃহে পরিচয় হয়। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ও আমাকে লক্ষ্য ক'রে দুইটি ব্যঙ্গ কৌতুক রসের কবিতা লেখেন। তখনও তাঁর

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কবিতা দুটি ছাপাবার ইচ্ছা তাঁর ছিলনা। কবি যতীন্দ্রমোহন কবিতা দুটি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মর্মবাণীতে প্রকাশ করেন। আমার উপর রচিত কবিতাটির ভাবার্থ—'অনেক মালমসলা যোগাড় ক'রে বহুবিধ ব্যঞ্জন রাঁধলাম কিন্তু সব তাতেই একটু লবণ কম পড়ে গেল।' আমি এতে একটুও রাগ করিনি, কারণ, ব্যঞ্জনে লবণ কম পড়ল কিনা রাঁধুনী নিজেই চেখে চেখে বুঝতে পারে—আমি নিজেই তা অনুভব করতাম। মোহিত-লাল আমাকে সে কবিতা পড়ে বলেছিল—"যতীনবাবুকে বলো,—লবণ কম পড়েনি, লঙ্কাবাঁটা কম পড়েছে। আরো লঙ্কা বাঁটা দিতে পারলে মুখরোচক হ'তে পারত।" আমার অভিমান হয়েছিল যতীনদাদার (কবি যতীন্দ্র-মোহনের) উপর। ছাপাবার জন্য নয়, যেরূপ বিজয়োল্লাসের সঙ্গে কবিতা দুটা বার বার তিনি পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন—তাতে তাঁর মনোভাবটা খুব ভাল লাগেনি।

কিন্তু এহো বাহ্য। সম্ভ্রান্ত আত্মীয়দের সঙ্গে আমার এক তথাকথিত বন্ধুর ডাক্তার ভ্রাতাকে প্রাক্ বৈবাহিক আশীর্বাদ করতে গেলাম—তার বাড়ীতে। ঐ বন্ধুটি ছিল যতীনের আত্মীয়। সে কবিতাটি মুখস্থ করে রেখেছিল। যতক্ষণ তার বাড়ীতে ছিলাম—ততক্ষণ সে আমার সঙ্গে অন্যকথা বলেনি—শুধু ঐ কবিতা বার বার আবৃত্তি ক'রে আমাকে তাতাতে চেষ্টা করেছিল। সঙ্গে সম্ভ্রান্ত আত্মীয়গণ, আমি বড়ই অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। একজন এম-এ-পাশ-করা যুবকের ঐরূপ প্রগল্‌ভতায় আত্মীয়েরা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা যদি রসিকতা বুঝতেন, তা হলে আমাকে অতটা লজ্জিত হতে হ'ত না। পথে এসে তাঁরা বললেন—'ভাইটিও কি এমনি ছ্যাবলা নাকি।' আমি বললাম, "না—ঠিক বিপরীত।" আমি আজও সেই আচরণ ভুলতে পারিনি। আমার প্রবীণ আত্মীয়টি বলেছিলেন—'এমন অদ্ভুত অতিথিসৎকার কখনো দেখিনি।" আমি যতীনকে সব কথা লিখে জানালাম। সে লজ্জিত হয়ে লিখল, আর কখনো কবিতায় কাকেও ব্যঙ্গ করব না।

সন্দেশ নামে একখানি শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র ছিল তাতে আমি মাঝে মাঝে লিখতাম। সন্দেশে একটি ছবি বেরোয়—তাতে একটি শিশু চশমা চোখে ঠাকুরদাদা সেজে মাসিক কাগজ খুলে গড়গড়া হাতে চেয়ারে বসে আছে। আমি সেই ছবি দেখে একটা কবিতা লিখে শিশুনামক শিশুপাঠ্য পত্রিকায় ছেপেছিলাম তার প্রথম চার লাইন—

আজকে বসি ঠাকুরদাদার কেদারায়
খোকা আমি গিয়াছি তা ভুলিয়া।
ছোঁয় না মাটি দুলাচ্ছি তাই দুটি পায়
হস্তে মাসিক কাগজখানি খুলিয়া।

এই কবিতা পর্ণপুটের প্রথম সংস্করণে ছিল! এখন শিশুপাঠ্যে পুস্তকে আছে। আজকালকার তরুণ সম্পাদকরা যেন মনে করেন না তাদের ব্যঙ্গ করেছি।

এই সময় রবীন্দ্রনাথকে পঞ্চাশত্তম জন্মতিথিতে দেশবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। সত্যেন্দ্র, চারুচন্দ্র, মণিলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন ইত্যাদি রবীন্দ্রশিষ্যগণ ছিলেন উদ্যোক্তা। আমি যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে চাঁদা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম বহরমপুরে। টাউন হলে কবির অভিনন্দন হ'ল। উত্তর কলিকাতা হ'তে এ বিষয়ে একটু বিরোধিতা হয়েছিল। পরিষদের ছাত্র সভ্য গণের পক্ষ থেকে আমি কবিতায় অভিনন্দন রচনা ক'রে পড়েছিলাম,—রবীন্দ্রনাথের চরণ স্পর্শ সেই আমার প্রথম। সে অভিনন্দন কবিতাটি পর্ণপুটে ছিল। পরে উহা শব্দাড়ম্বর মাত্র মনে ক'রে বাদ দিয়েছি। পরিষদ্ থেকে অভিনন্দন পত্র ছেপে দিয়েছিল।

রজনীকান্ত সেনের কবিতাবলীর উপর একটা বড় নিবন্ধ এই সময় লিখি। পরিষদ্ এজন্য একটা মেডাল ঘোষণা করেছিল। মেডালটা আমি পেয়েছিলাম। নিবন্ধটা গৃহস্থ পত্রিকায় বেরিয়েছিল—কিন্তু দুঃখের বিষয় তার কপি আমার কাছে নেই। এখন সেটার অভাব খুবই অনুভব করি। রজনীকান্তের মৃত্যুতে লিখিত শোক গাথাটা পর্ণপুট ১ম সংস্করণে ছিল।

আমি অত্যন্ত বেশি বন্ধুবৎসল ছিলাম। বন্ধুত্বটা আমার কাছে একটা Passionএ পরিণত হয়েছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিবাহের পর থেকে এই সখ্যবন্ধন ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ল—ক্রমে বন্ধুদের ভুলতে লাগলাম।

এটা খুবই স্বাভাবিক। একটা কবিতায় এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলাম—

কি দাম দিয়ে কিনেছি প্রেম জানো তা কি সতি ?
হৃদয় বেসাতিতে হ'ল কী নিদারুণ ক্ষতি ?
যাদের মাঝার থেকে আমায় আনলে প্রিয়ে টানি,
তারা আমার কী যে ছিল জানো কি কল্যাণি ?
খোঁজ নিয়েছ একটি দিনও কোথায় গেল তারা ?
তোমার প্রেমের পাথার তলে হায়রে সবি হারা।
নদীর বুকে চড়া জাগে বন্যা স'রে গেলে
তেমনি তাদের স্মৃতি আজি উঠছে মনে ঠেলে।
কে তাহারা ? যাদের সাথে এক বোঁটাতে, প্রিয়ে
কিশোর জীবন উঠল ফুটে কেশর বিথারিয়ে।
একই তৃষা ভয় ভাবনা একই আশার টান।
এক বাঁধনে তাদের প্রাণে বাঁধল আমার প্রাণ।
কোথায় ক্ষুধা, কোথায় বাধা, গৃহের আকর্ষণ
তাদের সাথে রাত্রি জেগে তর্ক আলাপন।
গঙ্গাতীরে একসাথে সেই সান্ধ্য ভ্রমণ করা,
মাধুর্য্য নেই কণ্ঠে তবু এক সাথে গান ধরা।
একই মন্ত্র উচ্চারিয়ে একই শ্রীমন্দিরে
পাশাপাশি অঞ্জলি দান জ্ঞানের জননীরে।
দুদিন অদর্শনে সে কি বিরহ দুঃসহ
তাদের নামই জপমালা হইত অহরহ,
রাত্রি জেগে পত্র লেখা ছিঁড়ে খাতার পাতা,
রসায়নের খাতা হ'তো রসলিপির খাতা,
তারাই আমায় করল কবি পত্ররচনায়,
কাব্য লেখা সুরু হ'ল প্রেমের প্রেরণায়।
চলতে গেলে তাদের গায়ে পড়তে হ'ত চ'লে,
ব্যথার দিনে তপ্তললাট থাকত তাদের কোলে।
তাদের কাঁধেই হাত দিয়ে মোর দীপ্ত মনোরথে
আগিয়ে আসা বেত্রবনের ছাত্রজীবন পথে।
অট্টহাসির হট্টরোলে এক সাথে দোল খাওয়া
পড়ছে মনে, তা.দর ফিরে আর কি যাবে পাওয়া ?
স্বার্থহারা আত্মহারা অহৈতুকী প্রীতি
কোথায় গেল আজকে শুধু জাগছে তাহার স্মৃতি।
সেই প্রীতিরই তুলনাতে—যাকগে সে সব কথা,
তোমার প্রণয় ভুলিয়ে দিল সকল ক্ষতির ব্যথা।
কে শুনালো এহো বাহ্য আগে কহ আর।
মনে হলো দয়িতাপ্রেম সকল প্রেমের সার।
মনে হ'লো সখ্য বুঝি স্বপ্ন মায়াময়,
মিশলে পারাবারে নদের তটের স্মৃতি রয় ?
তীর্থপথে সাথী তারা সতীর্থ সহায়
আধেক পথে আগিয়ে দিয়ে কোথায় গেল হায়।
তাই ভাবি গুপ্তব্যথার কথাটি আজ কই
ভেবে দেখ কিনেছি প্রেম কি দাম দিয়ে সই। (ক্রমশঃ)

॥ আশ্চর্য যৌবন ॥

শ্রীমতী শিপ্রা ঘোষ

"Yet all experience is on arch where through
Gleams that untravelled world
Whose margin Fades

—Tennyson'.—

কতদিন খুঁজেছি তোমাকে
বন হ'তে বনান্তরে দেওদার শিরীষের ফাঁকে।
পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে অমর্ত্যের তীরে ;
পুঞ্জিত-তিমিরে।
খুঁজেছি তোমাকে আমি উজ্জ্বল আকাশে
নীলাভ মেঘের বুকে, দক্ষিণ-বাতাসে
বর্ণালী-ছন্দস্ব ;
খুঁজে খুঁজে শুধু ক্লান্ত হয়।
তবুও তো প্রান্তরের ঘাসে
খুঁজে ফিরি দিনে-রাত্রে অকূল আকাশে,
পড়ন্ত রোদের আলো স্বপ্ন আনে চোখে ;
খুঁজে ফিরি তবুও তোমাকে।
তারপর একদিন—
প্রসন্ন-উদাস-মন প্রত্যাশা-নবীন
শাশ্বত-শতাব্দী পারে প্রথম যেদিন পেলাম তোমার দেখা ;
তুমি ছিলে একা !
অতীতের-অস্পষ্ট জগতে
ধূ-ধূ এক প্রান্তরের পরে।
তোমার দু'চোখে ছিল বিষুব্ধ-স্বপন
মনে ছিল অগাধ কল্পনা
তীব্র স্বাদ তুমি কী জাননা,
তোমার দেহের তীরে কেঁপেছিল আশ্চর্য-যৌবন ?
বুকে কাঁদে বসন্তবাহার—
অভিমান অনুরাগ এ প্রেম আমার।
কিন্তু এযে তুমি নও
তোমার আভাস,
ধূসর-গোধূলি-বেলা উজ্জ্বল-প্রকাশ।
তোমার জড়িত-নেত্রে জীবনের হেঁয়ালি-ইশারা
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে সন্ধ্যাতারা ;
কাঁপে মন, কাঁপে নদী, কাঁপে এক আশ্চর্য-যৌবন
বিস্মৃতির ব্যাপ্তিমাখা প্রণয়-ভীষণ।
তাই, খুঁজে ফিরি আজো তোমাকে
লোক হ'তে লোকান্তরে পিয়ালের শাখে।
স্মৃতির আগুন-জ্বলে, কেঁপে ওঠে পলে পলে
ছুঁয়ে আসে নীলশিখা তোমার দু'চোখ ;
দূর-স্বর্গলোক।
খুঁজে ফিরি রূঢ়-রৌদ্রে অন্ধকার মাটির তলায়,
পাখীদের বহুল পাখায়।
খুঁজে ফিরি মাঠে, ক্ষেতে, সমুদ্রের পারে
ধূসর-দ্বীপের-প্রান্তে কূলহারা নদীর দু'ধারে।
খুঁজে ফিরি আজো তোমাকে
যুগ হ'তে যুগান্তরে হিজলের কাঁকে।
তোমাকে খুঁজব আমি প্রতিদিন
উজ্জ্বল-আকাশে
নিখিলের নীরব আভাসে।
খুঁজব তোমাকে আমি হলুদ-ফুলের বুকে—
প্রজাপতি যেখানে ঘুমায় ;
অনুরাগ প্রেমের সীমায়,
সেইখানে যবে যবে দেখা
শুধু তুমি, আমি একা ;
...কেউ নেই—
নেই পাখী, নেই নদী, নেই কোনো অলীক স্বপন ;
দুজনার চোখে কাঁপে
শুধু সেই আশ্চর্য যৌবন ॥

শেষ কোথায়

শ্রীসৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৮)

অরুণের দিনগুলি মধুময় হইয়া উঠিয়াছে। সে'দিনের সেই ঘটনার পর হইতে দীপ্তির সহিত তাহার দেখা হয় প্রত্যহ বহুবার, কিন্তু কথা হয় না কোনও। শুধু চকিতে দীপ্তি একবার অরুণের দিকে চাহিয়া সলজ্জ চোখ নামাইয়া নেয়। অরুণও মুগ্ধচোখে তাহার দিকে তাকায়। ভাষা তাহাদের মূক হইলেও দীপ্তির প্রতি কাজের প্রতিটি অর্থ এখন অরুণের চোখে সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দেয়। মাঝে মাঝে কাজের খাতিরে দুই একটা নির্দেশ দিতে হয়। দীপ্তি তাহার চোখে তাকাইয়া শোনে, নীরবে নির্দেশ পালন করে। যেন আপনাতে আপনি তৃপ্ত। তাহার এতদিনের সাধনা বুঝি সিদ্ধ হইল। তাহার ডাকে অরুণ সাড়া দিয়াছে।

দুপুরের পরিবেশনকারীদের খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছিল অরুণ। পরিবেশন দলের লীডার দীপ্তি। রান্নাঘরের দরজার কাছে একটা টুলে বসিয়াছিল অরুণ। দীপ্তি রান্না করা জিনিষগুলি একে একে থালতিতে তুলিয়া পরিবেশনকারীদের হাতে দিয়া অরুণের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সদ্য স্নান সারিয়া আসিয়াছে, মুখে বুলাইয়াছে সামান্য প্রসাধন। চোখের কোণে সূক্ষ্ম কাজলরেখা। রোজই স্নানের পরে দীপ্তি এই সামান্য প্রসাধনটুকু করে। এতদিন অরুণ লক্ষ্য করে নাই। আজ জিজ্ঞাসা করিল—

'মুখে কি মেখেছ ? চোখে কাজল দিয়েছ কেন ?'

দীপ্তি অরুণের মুখের দিকে তাকাইয়া সলজ্জ হাসি হাসিল।

'এতদিন তো নজরে পড়েনি। আজকাল আবার মেয়েদের মুখ খুঁটিয়ে দেখবার অভ্যাস হয়েছে দেখছি।'

'মেয়েদের নয়, তোমার। কেন মেখেছ ওগুলো ?'

'স্নানের পর ওগুলো আমি একটু মাখি। ছোটবেলাকার অভ্যাস।'

'কিন্তু স্বাস্থ্য তোমার এমনিতেই যথেষ্ট ভাল। রং যথেষ্ট করসা, আর দেখতেও সুন্দর তুমি। ওগুলো মাখবার তো কোনও প্রয়োজন দেখি না। আরও সুন্দর হবার সখ নাকি ?'

'সব মেয়েরাই মাখে।'

'তুমি তো সব মেয়ে নও। শোন, স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের অভাব যাদের, তারাই নিজেদের সুন্দর করবার জন্যে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়। তোমার তো তার কোনটারই অভাব নেই। কেন মাখ ওসব ?'

'বেশ, তুমি যখন বলছ, মাখব না।'

মুখে সে মাত্র এই কয়টি কথা বলিতে পারিল, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বলিল,—আমার সৌন্দর্য, আমার রূপসজ্জা এ তো তোমারই জন্য। তুমি যাহা ভালবাস না, সে প্রসাধনে আমার প্রয়োজন কি ?

অরুণ কিন্তু ইহাতে খুশী হইল না। বলিল, 'আমার কথায় নয় দীপু, নিজে বুঝতে চেষ্টা কর। শুধু সুরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে বেশভূষা করলেই তো যথেষ্ট।'

দীপ্তি হাসিয়া ফেলিল। একটু কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'বুঝেছি বাপু। আর মাখব না। হল তো ?'

দীপ্তি একবার খাবার জায়গা ঘুরিয়া আসিতে গেল। অরুণ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। দীপ্তির এই নির্ভরতাটুকু তাহার ভাল লাগিয়াও লাগিতেছিল না। সে বুঝুক তাহার কথার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। যাহা কিছু কৃত্রিম, অসত্য, তাহার উপর তাহার মন চিরদিনই বিরূপ। মেকীর আচ্ছাদন হইতে খাঁটি জিনিষটিকেই সে খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়। কৃত্রিমতার আবরণে সত্যকে শুধু অপমান করিবার চেষ্টাই হয়, সত্যের প্রকাশ হয় না।

ফিরিয়া আসিয়া দীপ্তি বলিল, 'আজ মায়ের চিঠি পেয়েছি। তোমার কথা লিখেছেন।'

'মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিও।'

দীপ্তি একটু ইতঃস্তত করিতে লাগিল। একবার অকারণেই একটু আরক্ত হইল। অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু বলবে?'

'হাঁ, আমার কোন কথাই তো বলা হয়নি তোমায়।'

'আর কিছু বলবার কি প্রয়োজন আছে?'

অরুণ স্নিগ্ধ হাসি হাসিল। দীপ্তির মুখেও সলজ্জ হাসি।

'অপ্রয়োজনেও এ'সময় তোমার সঙ্গে কথা বলতে মন চায়। শুধু কথার জন্যেই কথা বলা।'

'কিন্তু মনকে সংযত করতে হয় দীপু। কথা বলবার সময় আমরা অনেক পাব। এটা আশ্রম। আমরা একটা ব্রত নিয়ে এসেছি এখানে। সে ব্রত আমাদের উদ্‌যাপন করতে হবে কঠোরতার মধ্য দিয়ে। স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধা হয়তো আসবে। মনের কোণে তাকে লালন করব, কিন্তু বাইরে তাকে প্রকাশ হতে দোব না।'

'দরকারী কথাই অনেক আছে বলবার।'

'আমি শুনব। কখন বলতে চাও?'

'যখন তোমার সময় হবে।'

'আমি ডাকব তোমাকে সময় করে। কিন্তু একটু দেরী হবে। আর ক'দিন বা! খাদ্যমন্ত্রীত্বের এই ঝামেলাটা যাক।'

'বেশ, তোমার ডাকের জন্যে আমি অপেক্ষা করব।'

ইহার পর আর কোনও কথা হইল না বটে, কিন্তু অরুণের দিক থেকে ডাক আর আসিল না।

সেদিন দুপুরে অরুণ ক্লাসে বলিয়াছিল। বিষয়বস্তু ছিল, 'বিশ্বের ইতিহাসে মানব সভ্যতার বিকাশ।' প্রশান্তদা বলিতেছিলেন, 'বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, আজ থেকে মাত্র ত্রিশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়। প্রথমে মানুষ ছিল যাযাবর। ধীরে ধীরে যখন তার জীবনে কৃষি স্থান পেল, মানুষ পেল স্থিতি। এক জায়গায় সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে শিখেই সে সভ্যতার গোড়াপত্তন করল। তখনও যাযাবর মানুষের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হ'ত, ধ্বংসে হয়ে যেত তাদের গড়া এই শিল্প-সভ্যতা। তবুও এই ধ্বংসের মধ্য দিয়েই তিলে তিলে সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছে। রাজায় রাজায় হয়েছে যুদ্ধ আর সেই ধ্বংসের অন্তরালে বসে সাধারণ মানুষ গড়ে তুলেছে এই সভ্যতা। ধ্বংসের পেছনে এই নীরব সৃষ্টির আয়োজন। আজ আমরা সাধারণ মানুষের সেই সৃষ্টির ইতিহাসই শিখব, যুদ্ধের বা ধ্বংসের ইতিহাস নয়। আলেকজাণ্ডার বড় বীর কি পুরু বড় যোদ্ধা, সেটা বিচার করবার আগে আমরা বরং বিচার করব, কেন, কি কারণে আলেকজাণ্ডারের গড়ে তোলা এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাসের ঘরের মত হাওয়ায় উড়ে গেল। সেইখানেই আসবে আমাদের ইতিহাস পাঠের প্রকৃত সার্থকতা।'

প্রশান্তদা থামিলেন। অরুণ উঠিয়া প্রশ্ন করিল,—

'কিন্তু ধ্বংসের ইতিহাসেরও তো প্রয়োজন আছে। যুগে যুগে সমাজ ও সভ্যতার ভেতর গ্লানি জমেছে। সে গ্লানি যখন উঠেছে, তখনই তাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হয়েছে। শুধু সংস্কার করলেই চলেনি।'

'ওটা ঠিক তা' নয় অরুণ। ধ্বংসের ভেতর সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে থাকে এ'কথাটা মেনে নিলেও, তা' সামগ্রিক ধ্বংস নয়। সামগ্রিক ধ্বংস কখনই প্রকৃত কল্যাণ আনতে পারে না—চাই পরিবর্তন। গ্লানিটাকে সরিয়ে দিতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বিকাশ করতে হবে সত্যের। সত্য স্বয়ং প্রকাশ হলেও মাঝে মাঝে তাকে প্রকাশও করাতে হয়। এই সত্যকে জানার মধ্য দিয়েই সভ্যতার বিচার হবে।'

প্রশান্তদা বলিয়া চলিলেন, 'আজ মানব সভ্যতা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে হয় তাকে ভিন্নপথে চলতে হবে, নতুবা তার ধ্বংস অনিবার্য। এখানে এসে সে থমকে দাঁড়িয়েছে। মানবাত্মার কাতর ক্রন্দন শুনতে পেয়েছে সে। আর এগুতে পারছে না। কিন্তু পথ কোথায়? সামনে বিরাট গহ্বর। সেখানে পেছন থেকে কে তাকে ঠেলে দিচ্ছে। আর বুঝি পতন ছাড়া উপায় নেই। পথের সন্ধানে আকুলচিত্তে সে যখন চারদিকে তাকাচ্ছে, তখন দেখতে পেল, কে তাকে অভয় দিচ্ছে, 'Here I stand. সে পথ প্রেমের পথ, অহিংসার পথ, শান্তির পথ। সে পথে নিজের আত্মিক শক্তিতে এগিয়ে চল, কেউ তোমাকে বাধা দিতে

পারবে না। সর্বকালের সকল অকল্যাণকে জয় করে এই পথেই চির শান্তি আসবে।'

ক্লাস শেষ হইয়া গেলেও প্রশান্তদার কথাগুলি যেন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অরুণ গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল। প্রশান্তদার এই যুক্তি তাহার মন ঠিক মানিয়া লইতে পারিতেছিল না। পরিবর্তনে অরুণ বিশ্বাসী হইলেও ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তাকে ও যেন অস্বীকার করিতে পারে না। হিন্দি শিক্ষক লছমনদা ঢুকিলেন।

হঠাৎ অরুণ সচকিত হইয়া উঠিল। তাইতো! ভুলিয়াই গিয়াছিল সে একেবারে। আর মাত্র এক ঘণ্টা পরেই তাহাকে প্রায় আশীটি লোকের বৈকালের জল-খাবার জোগাইতে হইবে। যে লোকটি আশ্রমে প্রতি তিনদিন অন্তর মুড়ি অথবা চিঁড়া দিয়া যায়, সে আজ কয়দিন আসে নাই। অরুণ তাহার খোঁজে সকালে তাহার বাড়ী যাইতে লোকটি বলিয়াছিল, দুপুরে সে মুড়ি লইয়া অবশ্যই আসিবে। কিন্তু বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেলেও তাহার দেখা নাই। লোকটির বাড়ী কিছুদূরে। আর সময়ও নাই যে তাহার বাড়ী যাইয়া খোঁজ করিয়া আসিবে।

এই অজপাড়াগাঁয়ে হঠাৎ কাজ চালাইবার মতও কিছু মিলিবে না। অরুণ অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার এতদিনের প্রাণপাত পরিশ্রমের সাফল্য বুঝি আজ নিমেষে নষ্ট হইয়া যায়, এই চিন্তা অপেক্ষাও এতগুলি ক্ষুধিত ছেলেমেয়েকে সে কি বলিবে, এই ভাবনাই তাহাকে অধিক পীড়া দিতে লাগিল। লছমনদার কাছ হইতে ছুটি লইয়া বাহির হইয়া সে একবার গেট পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল। অকারণে একবার ভাঁড়ার ঘরের তালা খুলিল। কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা দেখিয়া সে যখন বাহির হইয়া আসিতেছিল, তখন দেখিতে পাইল, বেলা মেয়েদের হোষ্টেল হইতে সেই দিকেই আসিতেছে। কাছে আসিয়া বেলা জিজ্ঞাসা করিল, —'আজ বিকেলে কি খাওয়াবেন অরুণদা?'

অরুণ চিন্তাকুল মুখে তাহার দিকে চাহিল।

'তুমি ক্লাসে যাও নি?'

'একটু হোষ্টেলে গিয়েছিলাম। দীপু কতগুলি বেল এনেছে, সরবৎ খাওয়াবে আমাদের। তা'ই তৈরী করবার ভার পড়েছে আমার ওপর।'

'তৈরী হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, একবার ক্লাসে যাচ্ছি।'

'তা', সরবৎ শুধু তোমরাই খাবে, আমরা কি দোষ করেছি?'

'সেটা দীপুকেই জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি করে বলব?'

বেলা সকৌতুকে হাসিয়া আগাইয়া গেল। হঠাৎ অরুণের মনে একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিল। বেলাকে ডাকিল, 'শোন বেলা, শুনে যাও।'

বেলা আসিয়া কাছে দাঁড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'সরবৎ তোমাদের কতটা হয়েছে?'

'ভয় নেই। পরিমাণ যতটাই হোক্, দীপ্তিকে বললে আপনি অন্ততঃ ভাগ পাবেন নিশ্চয়ই।' তরলকণ্ঠে বেলা উত্তর করিল।

অরুণ বলিল, 'চল, আমি দেখব।'

বেলা একটু অবাক হইল।

'কি ব্যাপার বলুন তো অরুণ দা?'

অরুণ উদ্বেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বেলার কাছে প্রকাশ করিয়া বলিল। বেলা একটু চিন্তিত হইল।

'কিন্তু এ' সরবতে কি হবে?'

'তাই তো বলছি, চল একবার দেখে আসি। যদি না ফুলোয়, ছোট ছেলেমেয়েদের শুধু দোব। বড়দের দোব না।'

'দীপুকে একবার জিজ্ঞেস করবেন না?'

'জিজ্ঞেস করা উচিৎ। কিন্তু প্রয়োজনের কথা বললে সে নিশ্চয়ই কিছু বলবে না। তাকে বরং পরে আমিই বুঝিয়ে বলব।'

বেলা একটু দ্বিধা করিল। দীপ্তির সহিত অরুণের ঘনিষ্ঠতা টের পাইলেও সে এ'বিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় ছিলনা। তাই আবার বলিল, 'আচ্ছা, আমিই বরং একবার বলে আসি।'

অরুণের পৌরুষে আঘাত লাগিল। একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, 'যেতে চাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসতে পার। কিন্তু আমি বলছি, তার প্রয়োজন হবে না।'

'বেশ, চলুন।'

প্রায় এক বালতি সরবৎ বেশ ঘন করিয়া দই মিশাইয়া তৈরী হইয়াছিল। অরুণ বেলাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'জল মিশিয়ে খাবার উপযুক্ত রেখে এটাকে কতটা বাড়ান যেতে পারে বেলা ?'

'তা প্রায় তিন বালতি করা যেতে পারে। সঙ্গে কিন্তু গুড় চাই।'

'তাতে সবাইকে একবার দেওয়া যাবে ?'

'বোধ হয় পারা যাবে।'

'বেশ, চল আমার সঙ্গে।'

তখন আর কোনও চিন্তার অবসর ছিল না। টিফিনের ঘণ্টার আর মাত্র মিনিট পনেরো আছে। অরুণ সরবতের বালতি হাতে তুলিয়া লইল।

সরবৎ দেওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অরুণ মহিলাদের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া চা খাইতেছিল। দীপ্তি আসিয়া অরুণের সামনে দাঁড়াইল। গম্ভীরভাবে বলিল,

'কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

সম্বোধনের পরিবর্তনে অরুণ অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল।

'শুনলাম, আমাদের হোস্টেল থেকে আপনি বেলের সরবৎ নিয়ে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার কি ব্যাপার বলতো ?'

'সরবৎটা আমি তৈরী করিয়েছিলাম, আমরা মেয়েরা খাব বলে।'

'বেশ তো', অরুণ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'আমরাও না হয় ভাগ নিয়েছি।'

'কিন্তু সরবৎটা যখন আমার, তখন আমাকে না জিজ্ঞেস করে আপনার নেওয়া উচিৎ হয় নি।'

অরুণ আরও আকর্ষ হইয়া দীপ্তির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি এত কথা বলছ কেন ? এতে ঔচিত্য বোধের প্রশ্নটাই বা এত বড় হয়ে দাঁড়াল কেন দীপ্তি ?'

'সে আমার আপনার কোনও দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আমি শুধু বলতে চাই, অন্ততঃ সাধারণ ভদ্রতার খাতিরেও আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা আপনার উচিৎ ছিল।'

অরুণের মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ভদ্রতাজ্ঞান সম্বন্ধে এই ধরনের ইঙ্গিত জীবনে এই প্রথম। শুধু প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া বলিতে পারিল,—

'প্রয়োজনের খাতিরেই আমাকে এ'কাজ করতে হয়েছে দীপ্তি।'

'কি প্রয়োজন আপনার হয়েছিল, যা'তে শিষ্টতার সাধারণ গণ্ডীও আপনাকে লঙ্ঘন করতে হয়েছে ?'

'বার বার শিষ্টতার প্রশ্ন তুলো না। কিন্তু সত্যই কি তুমি আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাও ?'

'যদি তা'ই চাই ?'

'বেশ, বেলাকে জিজ্ঞেস করো, সে বলবে।'

'বেলাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এর জন্যে দায়ী সেও। কিন্তু আপনার কাজের কৈফিয়ৎ আপনাকেই দিতে হবে।'

'দীপ্তি, মানুষের ধৈর্যের সীমা আছে—তা' লঙ্ঘন করলে মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। এ নিয়ে আমি আর তোমার সঙ্গে কোন কথাই বলতে চাই না।'

অরুণ যেন সহ্যের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দীপ্তি কি পাগল হইয়া গেল নাকি ? কিন্তু আরও আঘাত যে অরুণের জন্য তখনও অপেক্ষা করিতেছিল তাহা সে বোঝে নাই। অরুণের শেষ কথা কয়টি দীপ্তির নারীত্বে আঘাত করিল। ততক্ষণে তাহাদের এই বাদানুবাদ শুনিয়া দুই চারিটি করিয়া ছেলে মেয়ে আসিয়া চারিপাশে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দীপ্তি ও অরুণ যেন এই লজ্জাকর পরিস্থিতি সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন। কিছুক্ষণ কঠোর দৃষ্টিতে অরুণের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া দীপ্তি বলিল,—

'বেশ, এখানে আমার কাছে কৈফিয়ৎ না দিলেও আইনসঙ্গত কৈফিয়ৎ আমি আদায় করে নোব।'

অরুণ নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিল না। তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি উপায়ে ?'

দীপ্তি একবার প্রশান্তদার ঘরের দিকে চাহিতেই অরুণ বুঝিল। এতদূর! এই ব্যাপার লইয়া দীপ্তি যাইবে প্রশান্তদা'র কাছে নালিশ জানাইতে! অরুণ স্তব্ধ হইয়া গেল। অপমানের চূড়ান্ত সে নিজেই তাহাকে করিয়াছে

তাহাতে ও তাহার মন তৃপ্ত হয় নাই! এখন কিনা আবার প্রশান্তদা'র দরবারে দাঁড়াইয়া দীপ্তির কাছে তাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে? এই ঘটনার তুচ্ছতা সে প্রশান্তদাকেও তুচ্ছ করিয়া দিবে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা হীনতার গ্লানি উপলব্ধি করিয়া বিচলিত স্বরে অরুণ বলিল, 'আমার অনুরোধ, তুমি এখন ঘরে যাও দীপু। সে কারণেই হোক, তুমি উত্তেজিত হয়েছ। পরে আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলব।'

'থাকুন আপনি। আমি কি করব না করব, সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসিনি। আপনার যা জবাব, আপনি প্রশান্তদার কাছেই দেবেন।'

অসহ্য অপমানে, ক্ষোভে ও ব্যথায় অরুণ যেন অসাড় হইয়া পড়িল। কোন কিছু স্থির ভাবে ভাবিবার শক্তি পর্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। পিছন হইতে অর্চনা ডাকিল, 'দীপু, শোন্ এদিকে। যাস্ না।'

দীপ্তি কোনও কথা শুনিল না। প্রশান্তদার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে দীপ্তির যাইবার পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বেলা ভীড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

'আপনি যাবেন না অরুণদা। কৈফিয়ৎ যদি দিতে হয়, আমিই দোব।'

অরুণ কোনও কথা বলিল না। প্রশান্তদার ঘরের দিকে শুধু পলকহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। অর্চনা ডাকিল—'অরুণ!'

অরুণ একবার তাহার দিকে তাকাইতেই অর্চনা ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'কেন এমন হল অরুণ?'

অরুণ এ'কথারও কোন উত্তর দিল না। প্রশান্তদার ঘরের দিকে তাকাইয়া শুধু তাঁহার আহ্বানেরই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আহ্বান আসিল। বেলা আবার বাধা দিতে অরুণ শুধু বলিল, 'অবুঝ হ'য়োনা বেলা। প্রশান্তদার ডাক আমি উপেক্ষা করতে পারি না।'

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এইরূপ। ক্লাস হইতে ফিরিয়াই দীপ্তি তাহার বেলের সরবতের খোঁজ লইল। বেলাকে না পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। বেলা আসিয়া বলিল, 'অরুণদা নিয়ে গিয়েছেন।'

'কেন রে?'

'বিকেলে টিফিন দিতে। ভাঁড়ারে কিছু ছিল না।'

ওপাশ হইতে রমা বলিয়া উঠিল, 'ভালই হল। সৎকাজে লাগল।'

কথার ভঙ্গীতে একটু বিদ্রূপ মিশান ছিল। দীপ্তির কেমন ভাল লাগল না। বেলাকে বলিল, 'তা, আমাকে একটু জিজ্ঞেসই না হয় করতিস্!'

'আমি বলেছিলাম। অরুণদা বললেন, এখন আর সময় নেই। পরে বুঝিয়ে বলবেন।'

রমা ফোঁড়ন কাটিল, 'তা, বোঝাবুঝি তো হয়েই আছে। দীপুর জিনিস নিয়েছে অরুণ। এর আর পরে বোঝাবুঝি কি? কথা হচ্ছে মেয়েদের হোষ্টেলে ঢোকাটা। অরুণের যেন অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে ক'বার হল রে দীপু?'

দীপ্তির রাগ হইল। কেন অরুণ এ'ভাবে তাহাকে প্রকাশ করিয়া ছোট করিতে চায়! রমার দিকে তাকাইয়া বলিল, 'যার দরকার, সে হিসাব রাখলেই পারে ক'বার হল।'

রমা যেন অবাক হইয়া গেল।

'বলিস্ কি রে, আমার কাছে এলে তবে তো হিসাব রাখব!'

দীপ্তির চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এ কি কুৎসিৎ ইঙ্গিত! কোন দিনই কঠোর সংযমে সে বিশেষ অভ্যস্ত নয়। রমার দিকে জ্বলন্ত চোখে চাহিয়া বলিল, 'তোর কথার কোনও জবাব দিলে নিজেকেই ছোট করা হয়। তাই জবাব আমি দোব না।'

বলিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই বেলা তাহার অনুসরণ করিল।

'কোথা যাস্ দীপু?'

দীপ্তির সমস্ত রাগ যাইয়া অরুণের উপর পড়িয়াছে। বেলার কথার জবাব না দিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল।

'কৈফিয়ৎ আমাকে নিতেই হবে। এত বড় সাহস ওর কি করে হয় যে আমার অনুমতি না নিয়েই আমার জিনিস ও নিয়ে যায়?'

বেলা কিছু বলিতে যাইতেছিল। দীপ্তি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'তুই থাম বেলা। ওর হয়ে আর তোকে সাফাই গাইতে হবে না।'

প্রশান্তদার ঘরে ঢুকতেই অরুণের দৃষ্টি দেখিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। উঠিয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে অরুণ?'

অরুণ তাঁহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া শুধু দীপ্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। দীপ্তি অরুণের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ কেহ কোনও কথা বলিল না।

প্রশান্তদা দীপ্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি অভিযোগ দীপ্তি?'

দীপ্তি বলিতে লাগিল, 'প্রথম অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে উনি আমাদের হোষ্টেলে যান।'

এই নূতন অভিযোগের আঘাতে অরুণের মুখ ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া গেল। প্রশান্তদা তাহা বুঝিয়া বলিলেন, 'বোস অরুণ।'

অরুণ দাঁড়াইয়াই রহিল।

'তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ?' প্রশান্তদা পুনঃরায় দীপ্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

'আমার বিনানুমতিতে আমার জিনিষ উনি হোষ্টেল থেকে নিয়ে এসেছেন।'

প্রশান্তদা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে তাকাইলেন। ততক্ষণে অনেক চেষ্টায় অরুণ কিছুটা আত্মস্থ হইয়াছে, ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—

'দু'য়েরই প্রয়োজন হয়েছিল।'

'হোষ্টেলে তখন কে কে ছিল?'

'কেউ ছিল না। আমি বেলাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

আরও দু'একটা প্রশ্নের পর প্রশান্তদা ব্যাপারটা বুঝিয়া বেলাকে ডাকিলেন। বেলা আসিয়া অরুণেরই কথার সমর্থন করিল। প্রশান্তদা দীপ্তিকে বলিলেন, 'কি কারণে জানি না, তুমি তোমার মানসিক ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছ। তুমি পরে আমার সঙ্গে দেখা করো।'

হঠাৎ দীপ্তি বলিয়া ফেলিল, 'কিন্তু এর জন্যে ওকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

বলিয়া ফেলিয়াই অরুণের দিকে চাহিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

ঘরের ভিতর সেই মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটিয়া গেলেও বোধহয় সকলে এতটা চমকিয়া উঠিত না। প্রশান্তদা কঠোর দৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে চাহিলেন। অরুণের দৃষ্টিও একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই পরমুহূর্তেই যেন নিভিয়া গেল। স্থির দৃষ্টিতে প্রশান্তদার মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়ভাবে সে বলিল,—'জীবনে এমন কোনও কাজ আমাকে করতে হয়নি যার জন্যে আমার ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন হতে পারে। দীপ্তি ওর কথা তুলে না নিলে আমি ওকে কোনদিনই ক্ষমা করিতে পারব না।'

একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভিতর একটা নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল। তারপর প্রশান্তদার কণ্ঠ শোনা গেল,—'তুমি এখন যেতে পার দীপ্তি।'

বেলা ও দীপ্তি বাহির হইয়া যাইতেই তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

প্রশান্তদার ঘর হইতে বাহির হইয়া অরুণ গেটের দিকে চলিল। কোথায় যাইবে, ঠিক ছিল না। শুধু ইহাই তাহার মনে হইতেছিল যে আশ্রম হইতে কিছুক্ষণ দূরে সরিয়া থাকা প্রয়োজন। এখানকার বাতাসে যেন তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে এক সময় সে দেখিল যে খোয়াইয়ের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্লান্ত অরুণ বসিয়া পড়িল। সমস্ত মন অবসাদগ্রস্ত ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। এই মাত্র যাহা ঘটিয়া গেল তাহা ভাবিবার ক্ষমতা পর্যন্ত যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কতক্ষণ এইভাবে বসিয়াছিল, অরুণ টের পায় নাই। রাত্রি গভীর হইতে সে আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। ঘরে ঢুকিতে যাইয়া দেখে, অন্ধকারে বারান্দার কোণে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে।

'কে?'

অর্চনা এক গ্লাস দুধ হাতে লইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। এতক্ষণে যেন অরুণের ক্ষুধাতৃষ্ণার অনুভূতি ফিরিয়া আসিল। অর্চনার হাত হইতে গ্লাসটি লইয়া এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে নিজের মাদুরটি পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

নারীর উক্তি

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার রায়

আমাদের আর বলতে দিলে কই? নিজেদের যা বলার তাতো বলই আর আমাদের যা বলার (তোমরা মনে কর) তাও তোমরাই বল। অথচ তোমরাই বল যে যেমন পৃথিবীর তিন ভাগ জল তেমনি পৃথিবীর ধ্বনিপুঞ্জের তিন ভাগই নারী। হতে পারে হিসেব তোমরা বোঝ এবং কথাও আমরা একটু বেশীই বলি। কিন্তু যে কথা শোন না সে কথা কিসের? সে তো শব্দমাত্র। নিজের কথার দাম তোমরা নিজেরাই দিয়ে এসেছ এবং তাই আমরা বলি পৃথিবীর কথার বাজারের পুরো চার ভাগই পুরুষ। সেখানে আমাদের কথার স্থান বা দাম নাই। অবশ্য 'আমাদের কথা' মানে 'আমাদের বলা' কথা, 'আমাদের নিয়ে' কথা নয়। সেদিকে বরং বেশীর ভাগ কথাই আমাদের নিয়ে, কারণ তোমাদের ছন্নছাড়া জীবনে আমরা ছাড়া আর কি আছে বল? আর যা ছিল সব তো ধোঁয়ায় ধুলোয় একাকার ক'রে হারিয়ে ব'সে আছ। নিজেকে হারিয়ে ফেলতেও হয়তো আর বেশী দেরি নাই। অবশ্য তোমাদের মতে নিজেকে এইরকম একেবারে হারিয়ে ফেলতে পারাটা নাকি একটি চরম সার্থকতা। মরণ আর কি!

তোমরা বল নাকি শুনি যে নারী না জাগলে দেশ জাগে না। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ তোমাদের নিছক স্বার্থপরতার কথা কারণ তার মানে হয়তো পুরুষ ঘুমিয়ে থাকলেও চলবে, যেমন বাড়িটি চালানোর জন্য নারীরই জাগার প্রয়োজন। পুরুষটি ততক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলেও ক্ষতি নেই। আর তোমরা যে ঘুমিয়ে আছ তার প্রমাণ তোমরাই যত অবাস্তব স্বপ্নজাল তৈরি কর; এবং আমরা যে জেগে আছি তার প্রমাণ হোল প্রতি পদে পদে খোঁচা দিয়ে তোমাদের আশেপাশের সহজ সত্যগুলিকে চিনিয়ে দিই। আমরা না থাকলে ঘুমের ঘোরে তোমরা আরও কত কি যে করতে তা ভেবেও পাই না। তবু তোমরা অকৃতজ্ঞ তাই আমাদের এই খোঁচা চিনতে পারলে না, বল খোঁটা। যাই হোক ইতিমধ্যে তোমাদের অনেক কিছু চিনিয়ে দিয়েছি কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজটি এখনো বাকী; সেটি হল তোমাদের নিজেদের কাছে নিজেকে চেনানো। এবং তোমাদের শাস্ত্রে বলে নাকি যে সেইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ জানা, অর্থাৎ, Know Thyself, নিজেকে জানো।

আমরা অহঙ্কার করব না কিন্তু নারীর নিজেকে জানা অনেকদিনই শেষ হয়েছে। তোমরাই বরং আমাদেরও চিনলেনা, নিজেদেরও চিনলেনা। আমাদের নিয়ে কবিত্ব কর তোমরাই, কারণ সত্য কি জান না। তোমরা বল মেয়েরাই মেয়েদের দেখতে পারে না কিন্তু 'দেখতে পায় না' বলতে পার কি? আমরা মনে করি তোমাদের এই নিন্দা মেয়েদের পক্ষে প্রশংসারই কথা কারণ তাদের সৃষ্টি অন্তর্ভেদী, সত্যরূপ তারা সহজেই ধ'রে ফেলে, নিজেদেরও এবং তোমাদেরও। আর তোমরা? তোমাদের সৃষ্টি কুয়াশা। যেখানেই দৃষ্টি দাও সেখানেই কুয়াশা রচনা কর, কখনো ভাবের, কখনো বা নিছক কথার। আর তোমরা এমনই অন্ধ যে এই কুয়াশাকেই বল দিব্যজ্যোতি, আরো কত কি!

তাই তোমরা চিরকালের পথভ্রষ্ট। উত্তরে হয়তো বলবে, পথে যার চলেই পথ হারায়, নারী কোনদিন পথ দেখলেই না তার, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আরো বলবে তার সংসার হল রান্নাঘরের ছোট্ট কোণটি, সে বিরাট বিশ্বসংসারের কি বুঝবে? বেশ ছোট্ট কোণই সই. কিন্তু তবু ওটি তো ঠিক রেখেছি। আর তোমরা? বিরাট বিশ্বসংসারের একটা ছোট্ট কোণও ঠিক রাখতে পারলে না, চারিদিকটা শুধু ঘুলিয়েই তুললে। পথ হারানোটা বড় কথা নয়, সে হয়তো আমরাও হারাতাম কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে বিপথটিই পথ ব'লে ঠিক করা হচ্ছে এবং এর চেয়ে বড়

দর্শনে পথিকের আর কি হতে পারে? একদিন আমাদের ডাক পড়েছিল তোমাদের দৃষ্টিশক্তি সাহিত্যে ঠিক ক'রে দিতে। এবার হয়তো ডাক পড়বে তোমাদের এই বাইরের কুপথ ও কুপথ্যগুলোকেও ঠিক পথে আনতে, তোমরা যে শুধু কথার আবর্জনা বাড়িয়ে তুলছ, সেগুলো কাজের খোঁচায় দূর করতে।

এই সম্পর্কে মনে পড়ে তোমাদের ছেলেমানুষির কথা। যারা কোনদিন নিজেদের দৈনন্দিন জীবন পথের খাদ্য কোন্‌টা, অখাদ্য কোন্‌টা চিনল না তারাই আবার বড়াই করে অমৃত খুঁজে বার করবার। আগে সাবালক হও, আগে বোঝ জীবনটা কি (লম্ফঝম্প, মারামারিই নয়) তার পরে, তার অনেক পরে, বুঝবে অমৃত কি। আমরা বুঝেছি জীবনের সঠিক রং ও রূপটি, তাই আমরা অমৃতের কথা বলি না, বুঝেছি মৃত্যুই এর একমাত্র মুক্তি!

এমন যে ছেলেমানুষ নাবালক, তবু তোমাদের পণ্ডিতেরা বলেন আমরাই নাকি তোমাদের পেছনে ধাওয়া ক'রে বেড়াই। কবি, এছাড়া তোমাদের উপায় কি বল? পথ-হারানো ছেলেমানুষগুলোকে ঘরে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব যে আমাদেরই। আবার তোমরাই বল যে তোমরা আমাদের ঘর দাও। কি হাস্যকর কথা! তোমাদের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হলে আমাদের পদমাত্র সম্বল হত কারণ তোমরা হলে সন্ন্যাসীর জাত, যার কাজই হল অন্যের ঘেড়ে ঘনের মোষ তাড়ানো।

বুদ্ধি তোমাদের বেশী নাকি কই, কাজের বুদ্ধিতো দেখিনা এবং যে বুদ্ধিতে কোন কাজই এগোয় না সে বুদ্ধিই বা কেমন? তোমরা যে সংসারে অতিবুদ্ধির তালগোল পাকিয়ে ফেলেছ তার একমাত্র উপায় হল এখন গলায় দড়ি দেওয়া কিম্বা আমাদের কাছে কিছুটা বোকামির পাঠ নেওয়া। তোমরা ভাবছ একি! বোকামির জন্য আবার পাঠের কি দরকার? কিন্তু দেখছ না এই অতিবুদ্ধিমান সংসারে ওইটিই একমাত্র কঠিন পাঠ। বুদ্ধির পাঠতো জলের মত সোজা, মনেই হল—আমি বুদ্ধিমান। এখন তোমাদের প্রয়োজন হয়েছে একবার বলতে পারার যে আমি বোকা!

আমরা তোমাদের মতে চিরকালের বোকার জাত। আর এখুনি দেখালাম যে কাজ তোমাদেরই পড়ে আছে, আমাদের নেই। তাই যদি হয় তবে একবার বোকার পথ অনুসরণ ক'রে দেখনা কেন। তবু সে তো একটা চলার পথ। আর তোমাদেরটা? শুধুই ধোঁয়া আর ধুলো। ধোঁয়া কথার সৃষ্টি কর আর ধুলো পরের চোখে দাও। অবশ্য মুখে বড়াই কর ও রাজনীতি। কিন্তু ও ক'রে আর কতদিন চলবে? ওই ধোঁয়া শীঘ্রই নিজের মস্তকে ঢুকবে আর ধুলো নিজের চোখে পড়বে। সংসারের অচল অবস্থা দেখে মনে হয়, হয়তো ইতিমধ্যেই পড়েছে।

শেষ কথা বলি, আমাদের নারী ব'লে কৃপাই কর আর গালই দাও কিন্তু তোমরা যেন সত্যিকার পুরুষ হয়ে উঠতে পার। আর মনে রেখ পুরুষ হয়ে জন্মালেই পুরুষ হওয়া যায় না। আরও মনে রেখ সংসারে আজ নারীর অভাব ঘটেনি, ঘটেছে পুরুষের; পুরুষসিংহের নয়, পুরুষবাঘের নয়, অভাব ঘটেছে যথার্থ পুরুষমানুষের!

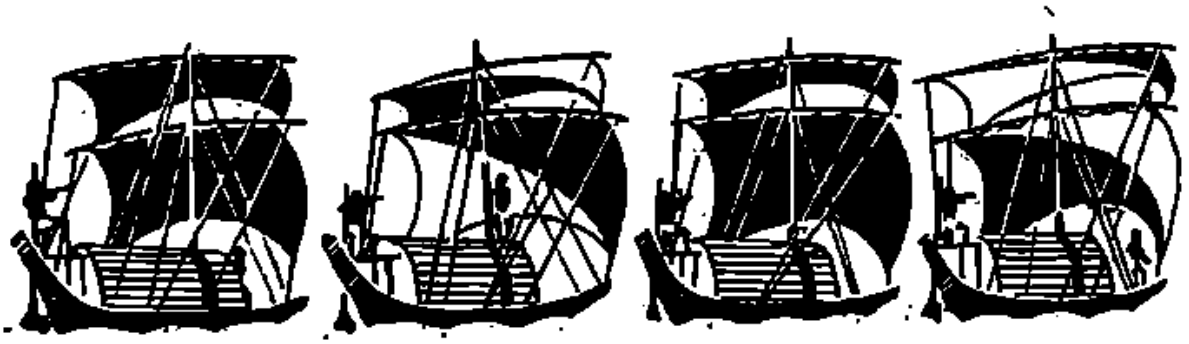

ভারতীয় শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত

ভারতবর্ষ শিল্পোন্নয়নের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। আধুনিক যুগে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় করতে হলে শিল্পের উন্নয়ন একান্তভাবে প্রয়োজন। ভারত এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছে। শিল্প উন্নয়নের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুঁজি বা অর্থ বিনিয়োগের প্রশ্ন, কারণ শিল্পের জন্য প্রয়োজন দুই প্রকার পুঁজি—চলতি পুঁজি এবং স্থির পুঁজি। এ পুঁজি ছাড়া শিল্পের কথা ভাবা যায় না।

ভারতে এরূপ পুঁজি পাওয়ার জন্যে শিল্পপতিগণ সাধারণতঃ শেয়ার বিক্রী করে থাকেন। জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করেও পুঁজি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাদের অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ যোগান দেয়। এ ছাড়া ব্যাংক এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানও শিল্পে অর্থবিনিয়োগ করে থাকে। এসমস্ত উপায়ে শিল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাই আমাদের দেশে প্রথান। দেখা যাচ্ছে শিল্পে পুঁজি জোগান দেবার জন্যে বহু উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হয়, এতেও কিন্তু আমাদের পুঁজির সমস্যা সমাধান হয় না।

ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান এতই নীচু যে এদের হাতে উদ্বৃত্ত বেশী কিছু থাকে না। তাই এরা শেয়ার কিনতে খুব বেশী সমর্থ হয় না; এছাড়া এদের মধ্যে যারা একটু সমর্থ তাদের মধ্যেও বিনিয়োগস্পৃহা খুব আশাপ্রদ নয়। অন্যান্য দেশে নতুন শিল্পসংস্থা স্থাপন করবার পক্ষে একটা বিশেষ সুবিধা এই যে ব্যাংকগুলি মোট পুঁজির একটা অংশ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি (guarantee) দেয় আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা এখনো উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের ব্যাংকগুলি একমাত্র চলতি পুঁজি সরবরাহ করতে পারে কারণ এরাও জনসাধারণের জমার উপর নির্ভর করে এবং একারণে জনসাধারণের চাহিদামত টাকা ফিরিয়ে দেবার দায়ে আবদ্ধ। ব্যাংকের কাছ থেকে যে পরিমাণ চলতি পুঁজি পাওয়া যায় তার পরিমাণও খুব কম আর এরজন্য দেয় সুদের অংকও বেশ বেশী কারণ সুদের হার খুব বেশী।

এসব আলোচনার পর দেখা যায় দেশে এখনো আশানুরূপ পুঁজি জোগানদারের অভাবে শিল্পসংস্থাগুলি অসুবিধার মুখে পড়েছে এবং নতুন শিল্পসংস্থা বাড়বার সুযোগ পাচ্ছে না। অবশ্য এদিকে সরকারী উদ্যোগ গত কয়েক বছরে যা হয়েছে তা প্রশংসনীয় এবং আমরা পরে তা আলোচনা করে দেখব। আশানুরূপভাবে পুঁজি জোগানের জন্যে বেসরকারী দিকটাই প্রধান এবং একে এভাবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের জনসাধারণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহী হয় তাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে। আমানত খাতে প্রাপ্ত পুঁজির উপর ঝোঁক না দিয়ে শেয়ার খাতে পুঁজি প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত। আমাদের ব্যাংকিং ব্যবসায় সুসংহত করতে পারলে অল্প সুদে ব্যাংকগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জোগান দিতে পারবে। অন্যান্য উন্নত দেশে স্থাপিত শিল্প ব্যাংকের অনুকরণে আমাদের দেশেও শিল্প ব্যাংক স্থাপন করে শিল্পে পুঁজিজোগানের পথ সহজ করা যেতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা রচয়িতাগণ ভারতের শিল্পবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করছেন এবং একথা বলা যেতে পারে যে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদির কথা মনে রেখে প্রতি বছর ভারতে প্রায় দুই লক্ষ লোকের কাজের সংস্থান করা যেতে পারে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রয়োজনের তুলনায় এখন পর্যন্ত আমাদের শিল্প খুবই অকিঞ্চিৎকর আর এর বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজির জোগানও খুবই কম।

শিল্প অর্থ জোগানের উদ্দেশ্যে Industrial Finance Corporation, State Financial Corporations, International Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation

প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দেশের শিল্পোন্নয়ন কাজ দ্রুত হবে এরূপ আশা করা যাচ্ছে। এদের প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়, মোটামুটিভাবে এদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। Industrial Finance Corporation শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণ ঋণের জন্য গ্যারান্টি দিতে পারে, underwritingএর কাজ করতে পারে, সরাসরি অর্থ সাহায্যও করতে পারে। এছাড়া সরকারী অনুমোদন নিয়ে বিশ্বব্যাংকের নিকট থেকে ধার নিয়ে বৈদেশিকমুদ্রাও ধার দিতে পারে। ১৯৪৬ সালের এক সংশোধনী আইনের বলে সরকার কর্পোরেশনের বিদেশী ঋণের জন্যে গ্যারান্টি দিতে পারে। এভাবে কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। চিনি, সিমেন্ট, কাঁচ প্রভৃতি বহু শিল্পে কর্পোরেশন এপর্যন্ত দুইভাবে অর্থ নিয়োগ করেছে—প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সম্প্রসারণ এবং নতুন শিল্পের স্থাপন। কর্পোরেশন গত আট বছরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে এবং তার মধ্যে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে। Industrial Finance Corporation বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করে; ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহায়তার জন্যে ১৯৫২ সালে State Financial Corporation Act পাশ করে বিভিন্ন রাজ্যে আর্থিকসংস্থা গঠনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এসব প্রতিষ্ঠান মেয়াদী জমা (fixed deposits) গ্রহণ করতে পারে। এ কর্পোরেশন যে ঋণ দেয় তা ২০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্য কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে কর্পোরেশন গ্যারান্টি দেয় এবং শিল্পসংস্থার শেয়ার ও বণ্ডে অগ্রিম প্রতিশ্রুতি (underwrit) দেয়। এর সহায়তায় ছোট ছোট শিল্প সংস্থাগুলি কাজ চালানোর জন্যে এবং নতুন সংস্থা গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজি পেতে পারে এবং বিপদের দিনে নিজেদের আর্থিক অবস্থা ভাল রাখতে পারে। ১৯৫৬ সালে একটি সংশোধনী আইন বলে এসব কর্পোরেশনের কাজের পক্ষে আরও সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সদস্যদের অর্থে অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পসম্প্রসারণের জন্যে Industrial Finance Corporation গঠিত হয়েছে—ভারত এর সদস্য এবং এতে ভারতের পুঁজি প্রায় ৪১,০০ ডলার। অনুন্নত দেশসমূহে বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যদি আর্থিক সহায়তা কোথাও না পাওয়া যায় তাহলে কর্পোরেশন এদের ঋণ দিতে পারে, এর জন্যে সরকারী গ্যারান্টির দরকার হয় না। এই কর্পোরেশন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি কিনতে পারে না। তবে সরাসরিভাবে পরিচালনার অংশ গ্রহণ করতে পারে বিদেশী সহায়তায় Industrial Credit and Investment Corporation এর সৃষ্টি হয়েছে। এর সহায়তা করেছে ভারত, বিশ্বব্যাংক, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা। নতুন শিল্পসংস্থা স্থাপন ও পুরাতন সংস্থার সম্প্রসারণ কাজের জন্যে এ কর্পোরেশন ঋণ দিতে পারে। কর্পোরেশন এরূপ শিল্প সংস্থার শেয়ারও কিনতে পারে। বিদেশী পুঁজিপতিগণ নিজেদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভারতে এরূপ কোন আর্থিক সংস্থা স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে তারা সুবিধাজনক শর্তে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে। এরই মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বেসরকারী পুঁজি এই কর্পোরেশন পেয়েছে এবং তার পরিমাণও প্রায় ২½ কোটি টাকা—আশা করা যায় আরো পুঁজি পাওয়া যাবে। বিদেশে বেসরকারী পুঁজি যে অনিশ্চয়তার স্তরে ছিল, এ কর্পোরেশন তা দূর করেছে।

ম্যানেজিং এজেন্টগণ ভারতীয় শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং অতীতে এরা বহু শিল্পের প্রসার ও স্থাপন কাজে প্রচুর পরিমাণে পুঁজি সরবরাহ করেছে। এদের আর্থিক সহায়তায় বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু এদের কাছ থেকে শিল্পে পুঁজি নেবার অপকারও এত বেশী যে বর্তমান অবস্থায় আর ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা সমর্থন করা যায় না। তাই ১৯৫৬ সালে কোম্পানী আইন পাশ করে এদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে ম্যানেজিং এজেন্টদের শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের ঝোঁক কমে গেছে কারণ আগে তারা যে পরিমাণ মুনাফা শিকারের সুযোগ পেত নতুন আইন বলে তার সুবিধা নাই।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বিদেশী পুঁজিপতিগণ বিশেষ করে ইংরেজ পুঁজিপতিগণ এদেশে শিল্পে অর্থযোগান দিত।

পাট, রবার, চা, কয়লা, স্বর্ণ, কাগজ এবং কাপড়ের কলের কিছু অংশে বিদেশী মূলধনের উপর ভিত্তি স্থাপন করেই গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পরে বিদেশী পুঁজিপতিদের মনে নানারকম সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং এই জন্যে বিদেশী পুঁজির পরিমাণও কমে যায়। এমনকি বহু বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ভারতীয়দের হাতে তাদের মালিকানা বিক্রী করে দিয়ে চলে গেছে। ভারতসরকার এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী বহুবার বিদেশী পুঁজিপতিদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তাদের স্বার্থবিরোধী কোন কাজই করা হবে না, তবে অপরপক্ষে তাদেরও ভারতীয় স্বার্থের দিকে অধিকতর নজর দিতে হবে। ভারতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশনও (১৯৪৯-৫০) বিদেশী পুঁজির অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। ১৯৪৮ সালে ভারতে নিয়োজিত মোট বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল ৪৯৬ কোটি টাকা আর এরপর প্রতিবছর গড়ে মাত্র ৪।৫ কোটি টাকা বিদেশ থেকে মূলধন হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা কমিশন ভারতে শিল্পের উন্নতির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় তাঁরা কৃষির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিলেও শিল্পের দিকও উপেক্ষা করেননি এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতে মোট শিল্পবিনিয়োগের হিসাব ধরেছিলেন ৩২৭ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা মূলতঃ শিল্পোন্নয়নের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং মোট ব্যয়ের অধিকাংশই শিল্পে ব্যয় করার সুপারিশ করেছে। সরকারী ও বেসরকারী এ উভয়প্রকার ক্ষেত্রেই শিল্পোন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে। সরকার শিল্পে বিনিয়োগের জন্য পুঁজি পাবে কর, ঋণসঞ্চয়, ঘাটতিব্যয়, বিদেশী সাহায্য ইত্যাদি উপায়ে। শিল্পবিকাশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবার জন্যে National Industrial Development Corporation স্থাপন করা হ'য়েছে। কোন কোম্পানী পুঁজি ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন বোধ করলে এ কর্পোরেশন তার জোগান দিতে পারবে এবং কোম্পানীর শেয়ার কেনা ও অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দেওয়াব্যাপারে এর ক্ষমতা থাকবে।

বর্তমান জগতে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্যে শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে বেশীলোকের কর্মসংস্থান সম্ভব এবং কমদামে ভোগ্য বস্তুর সরবরাহও সম্ভব। এছাড়া জাতীয় সংরক্ষণের জন্যেও শিল্প অপরিহার্য্য। শিল্পের উন্নয়নের জন্যে চাই পুঁজি। পুঁজি সরবরাহের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে তার মাধ্যমে দেশের শিল্পের প্রয়োজনীয় পুঁজি এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না, জনসাধারণ শিল্পমনা হলে তাদের স্বল্প আয় থেকেও শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারে এবং এরূপ বিনিয়োগদ্বারা তারা নিজেদেরই ভবিষ্যৎ সুখের ও সুন্দর করে তুলতে পারে।

দ্বিধা

সমীর সেনগুপ্ত

শিয়ালদা নর্থ ষ্টেশন থেকে সকাল ৮-২০ মিনিটের লোকাল ট্রেণটা অতঃপর ছাড়ল—মন্থর গতিতে, ঝন্-ঝন্ ঘটাশ ক'রে। বিচিত্র আওয়াজ তুলে যন্ত্রদানবের চলার পথ মুখর হ'য়ে উঠল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম—হেমন্তের সকাল—সূর্যের সোনালি আভা ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত রেল ইয়ার্ডে—একে একে সরে যাচ্ছে সব ঘুম ভাঙা রেল কোয়ার্টারগুলো। কোথাও সবে আগুন উনোনের মুখ দিয়ে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে হাল্কা কুয়াশা ভেদ করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কোথাও বা ঘরের গৃহিণী রোদে শুকোতে দিচ্ছে ধোয়া বাসী কাপড় চোপড়—

ছবি সরে গেল—মানিকতলা খালের ব্রীজ পেরিয়ে এলাম—গাড়ীর গতি বেড়ে গেছে। কামরার ভেতরে ফিরে তাকাতে হ'ল—সামনের সীটে বসা এক উড়িষ্যাবাসী গাল ভর্তি পান নিয়ে বলছে—"বাবু এ গাড়ী ব্যারাকপুর যাবি তো"। বলছে বাংলা, কিন্তু ওড়িয়া টান সুস্পষ্ট। বল্লাম 'যাবে'। আবার বাইরে চোখ ফেরাচ্ছিলাম কিন্তু হ'ল না 'উড়িষ্যাবাসী' তখন তার কাজকর্মের কথা তুলে বসেছে; —চলেছে ব্যারাকপুর কোন এক স্কুলের এন, সি, সি, ক্যাম্পে; সেখানে তাকে রাঁধতে হবে। কিছুক্ষণ পরে কি ভেবে যেন হঠাৎ সে চুপ করল। আমিও হাঁপ ছেড়ে জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকালাম।

দূরপট সবুজ শোভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সোনার ফসল ধানের চারায় সোনার বরণ রোদের ঝিলিক দেখে মনটা আমার খুশীর আমেজে ভরে উঠল। গুণ গুণ করে উঠলো আমার সকল সত্তা। আকাশের দিকে তাকালাম নির্মেঘ আকাশটা যেন বড় বেশী নীল দেখাচ্ছে বুঝলাম ও আমার চোখের দেখা রং নয়—মনের কোঠায় রং ধরেছে—

..."এই যে তানসেন গুলি"—হ'লো না—কবিত্ব আর চল্লনা। তানসেন গুলির প্রকোপে নেমে আসতে হ'ল কঠোর বাস্তবের মাঝে, ততোধিক কঠোর ওই রেল কোম্পানির দারু নির্মিত তৃতীয় শ্রেণীর আসনে বসে শুনতে হ'ল তানসেন গুলির বুলি। কি জানি মনটা আমার সেদিন বড় প্রসন্ন ছিল তাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম "তানসেনগুলির" ক্যানভাসারের ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরের বক্তৃতা —অপূর্ব ভাব, বলবার ভঙ্গিমা—অদ্ভুত তার ধৈর্য, সকল কামরার মধ্যে তার শ্রোতা দেখলাম আমরা গুটি তিনেক লোক, তবু সে বলছে "রাখতে চান, দেখতে চান, বলবেন —পাঞ্জাবের আসল গুলি—তানসেনগুলি মাত্র দু' আনা—দু' আনা···পরিবর্তে ছ' পয়সা" লোকটির বোধ হয় বলা শেষ হয়েছে, তাই সে থামল। কিন্তু থামার সঙ্গে সঙ্গে আবারযেন কে তার জিনিষের মাহাত্ম্য গাইতে শুরু করলো—আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবার—বাইরের দিকে মুখ ফেরালাম। গাড়ী তখন উল্টাডাঙ্গা রোড ষ্টেশনে ইন্ করছে!

বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—হঠাৎ কেন জানিনা ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই ঘুম ভাঙ্গার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য এদিক ওদিক তাকালাম। একটি ৮।৯ বছরের ছেলে হাত পেতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে—ভাল ভাবে চেয়ে দেখলাম চোখে তার ভিক্ষের আকুলতা নেই, কেমন যেন একটা যান্ত্রিক ভাব—"একটা পয়সা দিন বাবু—" হাতটা একটু নাড়াল। পয়সা দেওয়ার প্রবৃত্তি হ'ল না—দুবার বৃথাই ছেলেটা তার খিদের কথা জানিয়ে সরে গেল পাশের এক ভদ্রলোকের কাছে। চেয়ে দেখলাম ঠিক যন্ত্রের মত আবার ও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে "পয়সা দিন", মনটা কেন জানি বিদ্রোহী হয়ে উঠল আজকার সমাজের বিরুদ্ধে। কেন? কেন এত দৈন্য ওই শিশু মনের?—কেন ওকে ভিক্ষে করতে হয়? কেন ওকে ভিক্ষে করান হয়? দারিদ্র্যই যদি মূল কারণ হয় তবে কেন ভগবানের দেওয়া কচি দুটি হাতকে দিয়ে ভিক্ষে করান হয়—আর আমরা ওই হাতে পয়সা দিয়ে নিজেকে দয়াবান ভেবে পরিতৃপ্ত হই?

চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। ওপাশ থেকে আর একটা কচি মুখের আওয়াজ ভেসে এল। তাকিয়ে দেখলাম ৯।১০ বছরের একটি ছেলে বলছে "এই যে বাবুরা মামি ব্যাগে পয়সা রাখুন"—সবার চোখের সামনে সে তুলে ধরেছে একটা প্ল্যাসটিকের সস্তা ধরের ব্যাগ। আরও কি যেন সে বলল। ভাল ভাবে শোনা হয়নি। মন তখন প্রশ্ন হয়েছে একটু আগের সমস্যার আশু সমাধানের একটা পথ দেখে। সত্যি তো এরা ভিক্ষে না করেও বাঁচতে পারে। "বাবু, লাগবে একটা ব্যাগ? মাত্র তিন আনা"—হাসি মুখে বল্লাম "না দরকার নেই। আমার আছে। তবু সে বল্লে "নিন না বাবু একটা"—চোখে মুখে তার এক আকুল কাতরতা আমাকে ব্যাকুল করলো। সে যেন ছোট্ট একটি কথার মধ্যে দিয়ে বলছে "ওগো নাও আমার এই ছোট্ট জিনিষটুকু—আমায় বাঁচতে দাও—আমি বাঁচতে চাই—ভিক্ষে করে নয়—কাজ করে—ভগবানের দেওয়া হাত যতই ছোট হোক না এখন—ছোট ছোট কাজ করেই আমি বাঁচতে চাই। মাথা নাড়লাম, না ভাই আমার দরকার নেই। ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ছেলেটি সরে গেল। আমার ষ্টেশন এসে গেছে, নেমে পড়লাম। কিন্তু কি যেন একটা মনের ভেতরে খোঁচা দিতে থাকে।···নিলেই হ'তো একটা ব্যাগ, কতই বা দাম ছিল, ফিরে দাঁড়ালাম। কিন্তু ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। আমি নীরবে দাঁড়িয়ে দেখলাম ট্রেনটা প্ল্যাটফরম্ ছেড়ে চলে গেল। কানে আমার বাজতে থাকে "নিন না বাবু একটা।".....

সহরের বুকে কোলাহলে হারিয়ে গেল সেই ছোট্ট ছেলের করুণ মিনতি "নিন না বাবু একটা", রোজকার এই যাওয়া আমার পথের মাঝে কত কিই তো ঘটে কেই বা তা মনে রাখে—আমারও রইল না কোন খেদ, মিলিয়ে গেল সেদিন কাঁকিনাড়া ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে মনে যে হাহাকার উঠেছিল ছোট্ট ছেলেটির বাঁচবার প্রয়াসে সাহায্য করতে না পারার জন্য।

ষ্টেট্ বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হয়রান হয়ে গিয়ে শতবার দেখা ম্যাগাজিনটার পাতাগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওলটাচ্ছিলাম, হঠাৎ পাশের পকেটে টান পড়ল। যন্ত্রচালিতের মত খপ করে চেপে ধরলাম বামাল শুদ্ধ হাতটা। চেয়ে দেখি আমার মুঠিতে ধরা হাতের মালিক দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। চোখে মুখে কি এক অসহায় করুণ ভাব—"আমায় ছেড়ে দিন।" গলার স্বরটা বড় চেনা ঠেকল। ভালভাবে চেয়ে দেখি, সেই ছেলেটা—যাকে সেদিন হাসি মুখে ফিরিয়েছিলাম—সে ছোট্ট একটা ব্যাগ চোখের সামনে তুলে ধরে বলেছিল "নিন না বাবু একটা।" আমার বদ্ধ মুষ্টি হাতটা একবার কেঁপে উঠল। সেই সুযোগে হাত ছাড়িয়ে ভয়ার্ত হরিণের মত ছুটে পালিয়ে গেল ছেলেটা। পাশের থেকে দু' একজন চীৎকার করে উঠল ধর-ধর চোর-চোর। ছেড়ে দিলেন কেন মশায়—আচ্ছা করে দু' এক ঘা দিয়ে দিলেন না কেন?"—আমি পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। সহরের সব কোলাহল আমার কাছে স্তিমিত হয়ে এল। কানে তখন বাজছে সেই করুণ মিনতি "নিন না বাবু একটা—" আমার মত সবাই হয়ত ওকে হাসি মুখে ফিরিয়ে দিয়েছে—দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তবু হাতে আসেনি একটা পয়সা, কিছে তার মেটেনি—ক'দিন তা কে জানে? তারপর হয়ত বিদ্রোহী শিশু মন নেমে এসেছে পথে অনেক আশা নিয়ে। ট্রাম বাসের আওয়াজ আমার কাছে অসহ্য বোধ হল। সবাই যেন বিদ্রূপ করে আমায় বলছে এর জন্য দায়ী তুমি—দায়ী তোমার সমাজ—দায়ী তোমার দেশ। বাসে চড়া আর হ'ল না মনের ভেতর আবার সেই পুরান ঘা'টা দগ্ দগ্ করে উঠল "নিন না বাবু একটা" ছেলেটার সেই আকুল মিনতি।

ভারতের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

পঞ্চম পর্ব

—প্রথম অভিনয়

ভরত বললেন—রঙ্গমঞ্চের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের পূজা সম্পন্ন করবার পর আমি পিতামহ ব্রহ্মাকে বললাম—এইবার আমায় আদেশ দিন—কোন্ নাটক মঞ্চস্থের ব্যবস্থা করবো।

উত্তরে পিতামহ বললেন—'অমৃত মন্থন' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা কর। আমি এই নাটক রচনা করেছি। মঞ্চোপরি এই নাটক অভিনীত হ'তে দেখলে দেবতারা নিশ্চিত আনন্দলাভ করবেন। ধর্ম, কাম ও অর্থ প্রতিপালন ও অর্জনে এই নাটকীয় উপাদান বিশেষ শিক্ষামূলক, সন্দেহ নেই।

'অমৃত-মন্থন' নাটক মঞ্চস্থ করা হ'ল। দেবতা ও দানব,—সকলেই প্রীত হ'লেন।

ভরত ব'লে চ'ললেন—কিছুদিন পরে পিতামহ এই নাটক মহাদেবের সম্মুখে অভিনয়ার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

একদিন অন্যান্য দেবতাদের সংগে নিয়ে পিতামহ কৈলাসে উপস্থিত হ'য়ে যথারীতি মহাদেবকে অভিবাদন ক'রে বললেন—আমি নাটক রচনা করেছি। মঞ্চের ওপর এই নাটক দেখে আপনি প্রীতিলাভ করুন।

দেবাদিদেব উত্তরে বললেন—উত্তম! অভিনয়ের ব্যবস্থা করুন। এ অভিনয় আমার ভালো লাগবে নিশ্চয়।

[ত্রিপুরদাহ]

ভরত একটু হেসে বললেন—ত্রিপুরদাহের প্রতিপাদ্য বিষয় কি জানো? একদা মহাদেব তাঁর অগ্নিবাণ নিক্ষেপ ক'রে ত্রিপুর নামে এক দুর্দান্ত অসুরকে বধ করেছিলেন। সেই কাহিনীই ত্রিপুরদাহ নাটকের উপাদান।

যাইহোক্, মহাদেব অভিনয় দেখে অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে পিতামহকে বললেন—আপনি যে নাটক রচনা করেছেন, তা মঞ্চের উপর দেখলে দর্শকদের যশ, মেধা ও বুদ্ধির উৎকর্ষ হবে। এই নাটকের অভিনয়ে নৃত্য-পরিকল্পনা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। মূল নৃত্য-পরিকল্পনা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে মঞ্চের ওপর দেখানো হয়েছে। প্রতি নাটক মঞ্চস্থ করবার পূর্বে এই প্রকার নৃত্য-পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হোত। এই বিশেষ নৃত্যকে মূল নাটকের পূর্বরঙ্গ বলা যেতে পারে।

একথা শুনে পিতামহ ব্রহ্মা বললেন—দেবাদিদেব, নৃত্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।

মহাদেব ভরতকে আহ্বান ক'রে বললেন—ভরতকে নৃত্য সম্বন্ধে কিছু বল।

ভরত বললেন—তিনি আমায় নৃত্য-সম্বন্ধে যে জ্ঞানদান করলেন, আমি এখন সেই সম্বন্ধে তোমাদের সামান্য কিছু বলবো।

[নৃত্যের সৌন্দর্য]

নৃত্যের সৌন্দর্য নির্ভর করে অঙ্গহারের ওপর—অঙ্গহার মানে প্রধান নর্তক বা নর্তকীদের নৃত্য,—কিন্তু এই নৃত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ আবার নির্ভর করে অন্যান্য প্রধান নর্তক বা নর্তকীদের নৃত্যের ওপর।

আত্রেয় বললেন—ভালো বুঝতে পারলাম না।

ভরত বললেন—মনে কর তোমার সামনে রঙ্গমঞ্চে এক নৃত্য চ'লছে—সামনে প্রধান নর্তকী। কিন্তু তার আশে-পাশে বা তাকে ঘিরে আছে এক নর্তকীর দল। নৃত্য চলছে—কিন্তু প্রধান নর্তকীর নৃত্য মূল নৃত্য হ'লেও অন্যান্য নর্তকীর নৃত্য মূল নৃত্যকে অধিকতর সাবলীল ও বলিষ্ঠ করছে—দুইটিই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে মূল নৃত্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে অন্য নৃত্যের ওপর—সেই নৃত্যকে বলে অঙ্গহার, বুঝলে?

বললেন আত্রেয়—এইবার পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

ভরত বললেন—এই অঙ্গহার আবার কয়েকটি বিশেষ করণ নিয়ে সাধিত—করণ মানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন। অঙ্গহার মোট বত্রিশ প্রকার। করণ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিকভাবে সঞ্চালনের ওপর অঙ্গহারের উৎকর্ষ নির্ভর করে। প্রতি অঙ্গহার ছয়টি, সাতটি, আটটি বা নয়টি করণ নিয়ে সাধিত। করণের মোট সংখ্যা হ'ল একশো আট।

[রঙ্গমঞ্চের নির্দিষ্ট বিভাগ]

ভরত বললেন—আমি এর আগে তিনপ্রকার রঙ্গালয়ের কথা বলেছি এই রঙ্গালয়ে অভিনয়ের পূর্বে রঙ্গালয়ের শ্রেণী-বিশেষে-রঙ্গমঞ্চ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে।

এই ভাগ এমন ভাবে করতে হবে যাতে দর্শক বুঝতে পারেন স্থানটি কোথায়—অর্থাৎ যে-স্থানে অভিনয় চলছে, সে স্থানটি কোথায়? সে বৃক্ষটি কি। সহর, উদ্যান, নদী, আশ্রম, বন, সমুদ্র, স্বর্গ, মর্ত্য বা পাতাল বা কোনো গৃহ, কোথায় অভিনয় হ'চ্ছে, তা বুঝতে পারেন।

আত্রেয় বললেন—কিন্তু বুঝবে কি ক'রে? কোনো দৃশ্য যদি না থাকে, তাহ'লে বোঝা কঠিন নয় কি?

ভরত উত্তর দিলেন—না। এই ভাগের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলেও, অভিনয়ের সংলাপ, কাহিনী, ঘটনা ও রঙ্গমঞ্চ বিভাগের প্রচলিত প্রথা ও রীতি থেকেই দর্শক ঘটনার স্থান বুঝতে পারবেন।

এই রীতি ও প্রথা অনুসারে যে-সব অভিনেতা প্রথমে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবেন, তাঁদের মনে করতে হবে তাঁরা কোনো গৃহের অভ্যন্তরে আছেন। যাঁরা তার পরে প্রবেশ করবেন, ধ'রে নিতে হবে তাঁরা গৃহের বাইরে আছেন। প্রথম ব্যক্তিকে দেখবার জন্য বা তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করবার জন্য যিনি পরে প্রবেশ করবেন, তিনি ডানদিকে ঘুরে দাঁড়াবেন।

যে অভিনেতা গৃহ থেকে বেরিয়ে বাইরে আসতে চাইবেন, তাঁকে আসতে হবে যে দরজা দিয়ে তিনি প্রবেশ করেছেন সেই দরজা দিয়েই। অর্থাৎ প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ একই। তবে আবার যদি তাঁকে রঙ্গমঞ্চে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়, তাহ'লে তিনি তাঁর পরের অভিনেতা যে দরজা দিয়ে এসেছিলেন, সেই দরজা দিয়েই আসবেন।

সমমর্যাদার ব্যক্তিরা পাশাপাশি রঙ্গমঞ্চে চলবেন। নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা অভিজাত বা উচ্চবংশীয়দের আশে-পাশে চলবেন। দাসীরা প্রভুর পুরোভাগে চলবে।

যদি রঙ্গমঞ্চের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অভিনেতারা বারবার পরিভ্রমণ করেন, তখন বুঝতে হবে অভিনেতারা কোনো দূর দেশে এসেছেন এবং এই পরিভ্রমণের কম-বেশী মাত্রায় স্থানটির দূরত্ব নির্দ্ধারিত হবে।

[দেবচরিত্র]

নাটকের কাহিনীর ভিতরে দেবতা বা অর্দ্ধদেবতাদের চরিত্র যদি থাকে, তাহ'লে অভিনয় কালে দেবতাদের সহর বন, সমুদ্র বা পর্বত যাবার সময় আকাশ পথ দিয়ে পুষ্পক-রথের সাহায্যে বা তাঁদের দেবশক্তির সাহায্যে পরিভ্রমণ করতে হবে। কিন্তু যদি তাঁরা নাটকীয় চরিত্র অনুযায়ী ছদ্মবেশে থাকেন, তাহ'লে মর্ত্যের মানবদের মতোই ভূমির ওপর দিয়ে তাঁদের চলা-ফেরা করতে হবে।

দেবতা বা অর্দ্ধদেবতারা তাঁদের ইচ্ছানুসারে সমগ্র মর্ত্য পরিভ্রমণ করতে সক্ষম হ'লেও নাটকে দেবচরিত্রদের শুধু ভারতবর্ষেই চলা-ফেরা করতে হবে।

নাটকের কাহিনী অনুযায়ী যদি কোনো নাটকীয় চরিত্রকে দূরে যেতে হয় তাহ'লে ঐ অঙ্কের যবনিকা তাঁর প্রস্থানের সংগে সঙ্গে ফেলে দিয়ে ইঙ্গিতে দর্শকদের ঐ কথা জানিয়ে দিতে হবে। এবং পুনরায় এই কথা পূর্বাবস্থের দৃশ্যে ঘোষণা ক'রে দর্শকদের জানিয়ে দিতে হবে।

[সাফল্য ইঙ্গিত]

নাটকীয় কাহিনীতে নায়ক নায়িকা বা যে-কোন চরিত্র যদি তাঁর প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ করেন, তাহ'লে এই সাফল্য তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে রঙ্গমঞ্চে নির্দিষ্ট একটা জায়গা পরিভ্রমণ ক'রে—যদি প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়, তাহ'লে সেই অঙ্কের যবনিকা পাত ক'রে তা ইঙ্গিতে দর্শকদের জানিয়ে দিতে হবে।

ভরত বললেন—নাটকীয় ঘটনাবলী যদি একমাস থেকে এক বছর সময়ের ভেতর নিহিত থাকে, তাহ'লে তা একটা অঙ্কের ভেতর সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। একটা অঙ্ক

শেষ হ'লে মনে করতে হবে ঘটনাবলীর সময়—একমাস থেকে এক বছর পর্য্যন্ত শেষ হ'য়েছে।

ভরত ব'ললেন—ভারতবর্ষে নাটক মঞ্চস্থের ব্যাপারে রঙ্গমঞ্চ বিভাগ ও অভিনেতাদের রঙ্গমঞ্চে চলাচলের নিয়ম বললাম। এখন দেবতা ও অর্দ্ধদেবতাদের সম্বন্ধে কিছু শোনো।

যক্ষ, কুবের, গুহক, রাক্ষস, ভূত ও পিশাচ হিমালয় পর্বতে বাস করে। ঐ হিমালয়েই কৈলাস শিখর। গন্ধর্ব ও সম্বরাজ বাস করে হেমকূটে। শেষ, বাসুকী, তক্ষক ও অন্যান্য নাগরা নিষাদের ওপর বাস করে। তেত্রিশ দল দেবতা বাস করে মেরুদেশে। সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিরা নীল পর্বতে বাস করে। শ্বেত পর্বতে বাস করে দৈত্য ও দানবগণ।

দেবতা ও অর্দ্ধদেবতাদের কার্য্যাবলী তাদের অভ্যাস ও শক্তি অনুযায়ী রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু তাঁদের কার্য্যাবলী দৈব শক্তির প্রভাবান্বিত হ'লেও তাঁদের সাজ-পোষাক মানুষের মতোই হওয়া কর্ত্তব্য। দেবতা-চরিত্র নাটকে চিত্রিত করতে গেলে তাদের মানব-চরিত্রের যত কাছে আনা যায়, ততই নাটকীয় উপাদান ও চরিত্র যে বলিষ্ঠ হবে তার কোনো সন্দেহ নাই।

[পঞ্চম পর্ব সমাপ্ত]

ক্ষয় রোগীর আশেপাশে

শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

পূর্বানুবৃত্তি

পরিভাষা বা আভিধানিক অর্থে যাকে দুষ্টুমি বলে, আমি তাকে বলি সজীবতার ধর্ম। গোর্কী একবার একঘেয়ে জীবন যাপন করতে করতে ভেবেছিলেন সত্যি তিনি বেঁচে আছেন তো? আর ঐ বেঁচে আছেন কিনা প্রমাণ করবার জন্যে একটা চলন্ত দেওয়াল ঘড়ির মধ্যে খানিকটা ধুলো ঢুকিয়ে দেবেন মনস্থ করেছিলেন। তাই বলছিলাম আপাত দৃষ্টিতে আমরা যাকে দুরন্তপনা বা দুষ্টুমি বলি, সে কিন্তু আদলে গতিশীল প্রাণ-প্রবাহের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। হস্‌পিট্যালের হাঁটা চলা রোগীদের মধ্যে তাই দুষ্টুমিটা কখনো কখনো একটু অধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যেত।

পাশের ওয়ার্ডের মিনতি প্রায় বিকালে এসে রানীর ঘরে বসতেন। নানা রকম গল্পও শুনতেন। সেদিন গল্প তেমন জমছিলনা। বললাম: সারাদিন কি করে কাটান সেই গল্পই শুনান আজ।

: বেশ সেই গল্পই শুনুন। কিন্তু বলার মত কথা খুব কম, শুয়ে বসেই প্রায় দিন কাটে। একজন লাক্ষ্ণৌয়ের মুসলমান আর একজন ফিরিংগি মেয়ে ছিল আমাদের ওয়ার্ডে। তাদের নিয়েই খানিকটা সময় মজায় কাটতো। ঐ ফিরিংগি মেয়েটাকে দেখলেই রেবা বলে একটা মেয়ে গাধা গাধা করতো। ফিরিংগি মেয়েটা কিন্তু বেশ বাংলা বুঝতো। বলত: আমি উনিশ বছর বাংলা দেশে আছি, বাংলাও কিছু কিছু না বুঝি তা নয়, বলতো কেন আমায় অমন গাধা গাধা করো।

আমরা খুব হাসাহাসি করতাম। রেবা বলত: তুমি গাধাই তো, তা না হলে ঠাট্টা বোঝো না।

ফিরিংগি মেয়েটা রাগ করে চলে যেত তার ঘরে।

লক্ষ্ণৌয়ের মেয়েটি ছিল ভারি সুন্দরী। ইংরেজী এবং হিন্দি সে বেশ ভাল জানত। বাংলা আদৌ বুঝতো না। ডাক্তারবাবু তাকে এসে প্রায় বলতেন, হাতে লাখা সময়, একটু বাংলাটা শিখে নাও না—পড়ে নাও খানিকটা রবীন্দ্রনাথ।

একদিন ও এসে আমাকে ধরলো, তুমি হামারে বাংলা ছিখায়ে দেও।

: শিখিয়ে তো দেব, বর্ণপরিচয়ের বই কই? বই আনাও, শিখিয়ে দেব। আর মুখে মুখে যদি কিছু ভাঙ্গা কথা শিখে যেতে চাও তো এসো শিখিয়ে দি।

: টাই দাও।

: কাল যখন ডাক্তারবাবু তোমাকে দেখতে আসবেন তখন তাঁকে বলবে: ডাক্তারবাবু তুমি আস্ত একটা গাধা। তবে হ্যাঁ এ কথা যে, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিলাম সে কথা কিন্তু কাউকে বলবে না, কেমন।

ও রাজি হয়ে চলে গেল। আমি লক্ষ্য করলাম, ও সারা দুপোর বসে তালিম দিচ্ছে ডাগ্‌দারবাবু তুমি আছ তো একটো গাধা। ওর ছেলেমানুষী দেখে আমি পুলকিত হোলাম। ভাবলাম কাল বলুক না একবার ডাক্তার বাবুকে।

হঠাৎ সন্ধ্যে বেলায় ও খুব মুখ ভার করে আমার ঘরে এসে ঢুকল। বললো: তুমি বহুত দুষ্টু। টুমি হামারে বাঙাল দেশের বহুত খারাপ বাত ছিখিয়ে দিচ্ছ।

আমি তো মুখে আঁচল চেপে খুব হাসতে আরম্ভ করলাম। ও বলল: টুমার কাছে আমুর কুছ ছিখ্‌বোনা। টুমি বহুত কাজিল আদমি হায়।

অল্প কদিন পরে ও একদিন এক বর্ণপরিচয় হাতে করে এসে হাজির হলো। দেখলাম ইতিমধ্যে ও বর্ণপরিচয়ের পাঠ শেষ করেছে। এখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে চায়। পড়তে অবশ্য সে নিজেই একটু আধটু পারে, মানে বোঝেনা, বুঝিয়ে দিতে হবে।

মনে মনে খুব খুশী হোলাম। কতটুকুই বা বিদ্যে আমার আছে যে, আমি ওকে রবীন্দ্রনাথ পড়াব, কিন্তু সে-

কথা ও বুঝবে না, বিশ্বাসও করবে না। আমি রবীন্দ্রনাথের বাংলার মেয়ে এই কথাই ওর কাছে চরম সত্য। আমি বেশ একটু গর্ববোধ করলাম।

না পারলেও ওকে আমার ক্লাস এইট-এর বিদ্যে নিয়ে কিছু পড়িয়ে দিতে হবে। সঞ্চয়িতা ছিল কাছে, খুলে 'অভিসার' কবিতাটা বের করলাম। ওকে পড়ালাম—মানেও যেমন আমি বুঝেছিলাম তেমনি তাকে বুঝালাম চার পাঁচ-বার সমস্ত কবিতাটা পড়িয়ে দিয়ে বললাম: এবার তুমি পড়।

ও সুরু করলো:

সাধু উপগুপ্ত

মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একলা ছিলে সুপ্ত।

ওর পাঠ শুনে আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না। বললাম: দেখে পড়ো, সাধু নয়—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত।

সন্ধ্যাবধানেকের মধ্যে ও রবীন্দ্রনাথের কতকগুলো কবিতা মুখস্থ করে ফেলল। আর কথায় কথায় প্রায়ই তার মুখস্ত দু'চার লাইন, ছোট শিশুর মত আধো আধো কণ্ঠে বলতো।

ক'দিন পরে ওর অপারেশনের কথা ছিল। বললাম: অপারেশন করে, এবার তো তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।

ও খুব নিষ্টি করে বললো: ওরে, আছা নাই, আছা ছুঁচ দিছে ছলনা।

মেয়েটাকে আমার বেশ লাগতো। অপারেশনের পর বেশ তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে গেল। যেদিন চলে যাবে, আমরা বললাম: আমাদের তো আমাদের সঙ্গে কথাই বলতে পারছনা। বাড়ি গিয়ে হয়ত একেবারে ভুলে যাবে আমাদের। হয়ত সেরে কেউ কেউ বাড়ি ফিরবো তোমার মত পুলক নিয়ে, কেউ কেউ চিরদিনের মত পৃথিবীর থেকে বিদায় নেবো। যখন শুনবে অমুক নেই—মরে গেছে, তখন হয়ত ক্ষণেকের জন্যে মনটা বিষণ্ণ হবে, বড় জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলবে হতভাগিনী। অতলান্তে তলিয়ে যাবে সে দীর্ঘশ্বাস—হতভাগিনীর কথা আর মনে ঠাঁই পাবে না।

ব্যাস, কি যে, সব বাজে আবল তাবল বকো সবাই আমার মত ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। আর তোমার কথা বলছ, জীবনে তোমাদের কথা কোনদিন ভুলতে পারবো না। তোমাদের স্মৃতি আমার বুকে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ছোট ছেলে মেয়েদের মত লাইনটানা কাগজে বাংলা হরফে বড় বড় করে লিখে ও এখনও আমাদের চিঠি দেয়।

সারাদিন হৈ-চৈ করতো, ও চলে যাওয়ায় মনটা বেশ খারাপ হয়েছিল। প্রথম প্রথম ক'দিন আর ঘর থেকে বেরুইনি। সেদিন বিকালে রোগীর ঘরে গিয়ে বসলাম। বেশ জাকিয়ে বসে গল্প করছি এমন সময় ডাক্তার দাশগুপ্ত এসে হাজির হলেন। আমাকে তো খুব তেড়েমেড়ে বললেন। এখানে কি তোমার শুনি?

কি আর বলি মিথ্যে করে বললাম: একখানা বই নিতে এসেছিলাম।

: তোমাকে এত ঘুরাঘুরি করতে মানা করেছি। তবু মানা শুনবে না, বুঝবে ঠেলা, দেখ ভুগতে হবে কতদিন, বলে চলে গেলেন।

: এদের জ্বালায় আর শান্তি নেই।

রোগী বললো: ও আবার এমন অসময় এসেছিল কেন?

: কে জানে? হয়ত কারো অসুখ বেড়েছে, নার্স কল দিয়েছে।

: দেখে তো ওর মাথা, বোঝে কোন ছাই। ফটো দেখে কনফারেন্স করে তো ট্রিটমেন্ট করে।

: তবু দাশগুপ্ত লোকটা ভাল। ঘোষের ভাব দেখেছিস্ তো, কেমন ছোঁয়া বাঁচিয়ে বুকেপিঠে টেথিসকোপ ছোঁয়ায়। ভয়ে তো কথাই বলে না। যদি যক্ষ্মার বীজাণু ওর মুখে ঢুকে যায়।

: ওর গালে একদিন থুথু দিয়ে দেব।

রোগী তা পারতো, ও ছিল খুব দুষ্টু। আমি ওকে নিষেধ করলাম। বললাম: ছি! ওতে তোর উপর ওদের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে। কাজ কি লোকের সংগে চটা-চটি করে। হয়ত বাঁচব না, সেখানে শুধু অভিশাপ কুড়াতে যাই কেন?

পরদিন বিকালে ঘর থেকে আর বেরোলাম না।

রেবা এসে বল্‌লো : কই চা দে। আমার ঘরে থাকত চা, আর রেবার ঘরে ষ্টোভ। চুরি করে তো সব করতে হতো ডাক্তারবাবুরা বা নার্সরা জানতে পারলেই গাল দেবে, তাই অমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বল্‌লাম : চা তো ফুরিয়ে গেছে আনা হয়নি। তুই বরং এক কাজ কর ঐ ফিরিংগি মেয়েটার ঘর থেকে একটু চা নিয়ে আয়।

: আমার সংগে ওর যে পরিমাণ ভাব! আর আমাকেই যেতে বলছিস্ চা আনতে?

: না দেবে, ও লোক মোটেই খারাপ না, আর বলিস্ তোমার চা'ও আমরা করবো, সব এক সংগে বসে খাওয়া যাবে। দেখিস্ ও তাতে খুব খুশী হবে।

ফিরিংগি মেয়েটার ঘরে চা-স্টোভ দুই-ই থাকতো। ডাক্তারবাবুরা ওকে চা খেতে বলেছিলেন। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি ও আমাদের মত দুর্দান্ত ছিলনা। ও স্টোভে শুধু চা আর ওভালটিনের জন্যে জলগরম ছাড়া আর কিছুই করতো না। কিন্তু আমরা ফাঁক পেলেই, দুধ জ্বালিয়ে ক্ষীর, ধাফবয়েল ডিমটা ঝাল-মশলা দিয়ে ডালনা আর আটা-ময়দা-আলু দিয়ে চপ, সিঙ্গাড়া করে চব্য-চোষ্য করে মারতাম। কত চপ, সিঙ্গাড়া যে খেয়েছি তার কি হিসাব-নিকাশ আছে। মনে করছেন এখন খুব শুদ্ধ হয়ে গিয়েছি মোটেই তা নয়, সুযোগ পেলে এখনও ঐ কু-পথ্য গুলো দিব্য চলে।

যা হোক সেদিন বিকালের চা খাওয়ার মজার কথাই বলি। রেবা চা করছে মাসি ঘর থেকে ডেকে বল্‌লেন : কি করছিস্‌রে মিনতি?

আমাদের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে এক বিধবা ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি আমাদের সরকারী মাসিমা। মাসির প্রশ্ন শুনে খুব বেকায়দায় পড়ে গেলাম। চা-এর জল তখন হয়ে গেছে, রেবা চা দিতে যাচ্ছে, এমন সময় লাগল মাসির চা পিপাসা। মাসির এ চা পিপাসার কথা আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। কি উত্তর দেব ভাববার পূর্বেই রেবা ফস করে বল্‌লো : মাসি চিরতার জল দেব একটু?

রেবার উপস্থিত বুদ্ধিটা ছিল খুব প্রখর।

আমি ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌লাম : আরে একেবারে তাহা মিথ্যে কথাটা বল্‌লি? মাসি জানবেন কি করে। অপারেশন হয়েছে শুয়ে আছেন, উঠে এসে সত্যি-মিথ্যে তো আর যাচাই করতে পারবেন না।

মাসি কিন্তু ওদিক থেকে বল্‌লেন : তারি দুষ্টু হয়েছিস্ সব, আমাকে দিস্ এক পেয়ালা।

সবই পণ্ড, মাসির কাছে কোন জারিজুরি খাটলো না। রেবা তবু মরিয়া হয়ে বলে ফেল্‌লো : মাসি তোমার না, এই এক সপ্তাহ পূর্বে অপারেশন হলো আর আজ তুমি খাবে চা!

: ওরে খাব খাব, তোর আর অত মাসির উপর খবরদারি করতে হবে না। ধন্বীচির নাম শুনেছিস্ তো, তিনি তাঁর অস্থি ত্যাগ করেছিলেন দৈত্য-দানবদের সংহারের জন্য আর আমি আমার বুকের অস্থি ত্যাগ করেছি টি, বি-র জার্ম ধ্বংস করবার জন্যে, আবার কি চাই? এখন আর না খেয়ে আমাকে টি, বি-র মূল্য পরিশোধ করতে হবেনা।

মাসি রেবার চাইতে আমাকেই একটু অধিক নেক নজরে দেখতেন। আমাকে ডেকে দু'টাকার একখানা নোট আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন : মুড়ি আর সিঙ্গাড়া আনা। হ্যাঁ তোরা ক'জন?

: তিনজন।

: তবে দু'আনার মুড়ি আর চারখানা সিঙ্গাড়া আনিস্ কেমন?

আমার হাতে টাকা দেখে রেবা প্রথমটা বেশ খুশীই হলো। কিন্তু মাত্র চারখানা সিঙ্গাড়া আনা হবে শুনে নূতন করে চা তৈরি করবার শ্রম স্বীকার ওর কাছে খুবই বিরক্তিকর মনে হলো। বল্‌লো : না চারখানা নয়— একেবারে চারগণ্ডা আনতে দে।

: কিন্তু মাসি যে, আমাকে তেড়ে আসবে।

: রেখে দে তোর মাসির তেড়ে আসা। বলবি আমি যেন শুনলাম চারগণ্ডার কথা, তাহলে মাসি আর কিছু বলবে না। আর মাসির সাকসেসফুল অপারেশন হয়েছে, মন এখন মাসির দিল-দরিয়া, দেখিস ভাগের ভাগ চারখানা পেলে মনে মনে মাসি খুশীই হবে।

মনে মনে স্বীকার করলাম রেবার যুক্তিই সার যুক্তি।

চা পেয়ে, চারগণ্ডা সিঙ্গাড়া আনার জন্যে মাসি আর চটে গেলেন না।

শুধু, যে আমাদের ওয়ার্ডেই আমরা এমন ছিলাম এবং অন্য ওয়ার্ডের সব দাদু সহ-ভদ্র প্রকৃতির ছিল তা মনে করবেন না। আমার বেবার থেকে আরো এক কাঠি বেশি ছিলেন কমলা নেহেরু ব্লকের দিদিভাই। যাকে সবাই দিদিভাই বলতো, অবশ্য পেছনে। তাঁর দাপটে রোগী-ডাক্তার, নার্স সবাই ছিলেন সন্ত্রস্ত। তবে এ কথাও ঠিক যে, সবাই তাঁকে যেমন ভয় করতো, তেমনি ভালও বাসতো। ভালবাসা আকর্ষণ করবার মত যথেষ্ট গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি যখন তখন যার তার ঘরে ঢুকে তাদের কাছে যা কিছু পেতেন বিনা দ্বিধায় খেয়ে নিতেন আবার প্রয়োজন হলে নিজের খাবার-দাবার এমন কি জামা-কাপড় পর্যন্ত হাসি মুখে খুলে অন্যকে বিলিয়ে দিতেন।

দিদিভাই ছিলেন রাজপরিবারের মেয়ে—ধনী ঘরের বৌ। আধিপত্য বিস্তার এবং বজায় রাখার প্রচেষ্টা ছিল তাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট। যদি কস্মিন কালে কেউ তাঁর মতে মত না মিলিয়েছে অমনি তিনি রেগে-আগুন, তেলে-বেগুন হয়ে তাঁর ছেলেবেলার শিকারে যাওয়ার গল্প শুনাবার ছলে ভূত-প্রেতের গল্প বলে মস্তপুত এমন একটা ভয়ের সৃষ্টি করে দিতেন, তাঁকে উপেক্ষা করে কার সাধ্য। এবং শাসাতেন আজ রাত্রে শ্মশানের সেই মড়ার মাথা তোর বেডে নাচিয়ে তবে ছাড়বো, বুঝলি তখন ঠেলা। ব্যস্ আর যায় কোথায়।

ঐটুকুই কিন্তু দিদি ভাই-এর সব পরিচয় নয়। নূতন নূতন বহু মজার মজার প্লান বেরুত প্রতিনিয়ত ওঁর মাথা দিয়ে এবং নানা ব্যাপারে তাঁর অদ্ভুত সাফল্য দেখে আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে যেতাম। নতুনদি বলে এক ক্যাটি বয়স্ক ভদ্র মহিলা ছিলেন—দিদিভাই খুঁজে পেতে তাঁর সংগে কি এক সম্পর্ক আবিষ্কার করে বসলেন, আর সেই হলো তাঁর কাল। সম্পর্ক আবিষ্কারের পর থেকে দিদিভাই সারাদিন তাঁকে ভাজুক নাচ-নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। একদিন দেখলাম উঁচু করে কাপড় চোপড় পরিয়ে, সিগারেটের কৌটোর রাংতার দাঁত মুড়ে এবং কানে গয়না করে পরিয়ে মাথায় একখানা ছোট ভাঙা চুপড়ি দিয়ে নতুনদি সাজিয়ে ওয়ার্ডময় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোন দিন দুধওয়ালা সাজিয়ে দুধ বিক্রি করলেন, দিনের বেলায় এমনই বহুরূপী করে তাঁকে নাচাতেন আর রাত্রে খেয়ে দেয়ে গায়ুকোমর বেঁধে একখানা লাঠি হাতে করে খানিকটা ছুটিয়ে নিয়ে আসতেন। বলতেন: দেখি কেমন না আপনার ক্যাট কমে। এক একদিন ঐ ছুটোছুটির বেলায় নার্সরা এসে দিদিভাইকে বকাবকি সুরু করতেন। দিদিভাই বলতেন: আমরা তো নড়া না, বহুদিনের পুরানা, অসুখ বাড়ার তো ভয় নেই তা বাদে দু'দিন পরেই যখন চলে যাচ্ছি তখন আবার অত কি।

আমরা তো হেসে কুটি কুটি। কিন্তু বহুরূপী সাজা নূতনদির কাঁচুমাচু মুখ দেখলে আর হাসি আসতো না, দুঃখ বোধ হতো বেশি।

মেন বিল্ডিং-এ রেবা আর কে, এন, বি-র দিদিভাইকে হস্পিট্যাল কর্তৃপক্ষ হয়ত কোন দিন ভুলবেন না।

মিনতির গল্পের সংগে এবার নিজের দেখা একটা গল্প জুড়ে দি। যাঁদের কথা বলতে যাচ্ছি এঁরা সবাই বয়স্ক মেয়ে-বৌ, তবু এঁদের আচার-ব্যবহার আমার কাছে নিছক বালিকা সুলভ বলে মনে হতো। সংসার জীবনে এমনটা বোধ হয় আদৌ দেখা যায়না।

বারান্দায় একখানা খাট কিছুদিন রাখা ছিল। বিকেলে দিন বেঁধে সব সেই খাটে গিয়ে বসতেন। তখনকার ওঁদের সে ছেলেমির কথা আমি কোনদিন ভুলবোনা।

একদিন বিকেলে খুব হাসাহাসি শুনে, চোখ কান দুটোই ওদিকে ফেরালাম। একজন বললেন: দেখবো কে বেশি তড়াতড়ি, কাঁচা গাব, পাকা গাব বলতে পারে।

একজন খুব তাড়াতাড়ি কয়েকবার বলে শেষটা একবার বলে ফেললেন: কাঁচা গাব, পাকা বাপ। আর সংগে সংগে ছুটলো হাসির ফোয়ারা।

এমনি একদিন নয় চলতো প্রত্যহ।

আট নম্বর ওয়ার্ডে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্র মহিলা ছিলেন। আকারে-প্রকারে তাঁকে নিতান্ত বালিকা দেখালেও, বয়স তাঁর কুড়ির কম ছিল না। হস্পিটালে এসেছিলেন তিনি একটা মাত্র রোগ টি, বি নিয়ে, কিন্তু অল্প ক'দিনের মধ্যে আর একটা বাড়িয়ে নিলেন মূর্ছা।

ডাক্তারবাবুরা ওঁর আত্মীয় স্বজনদের বল্‌লেন ; মাস-খানেক বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাখুন মূর্ছাটা সেরে যাবে। এ মূর্ছা মেন্টাল ডিজিজ ভিন্ন আর কিছুই নয়। মাসখানেক পরে আবার হস্‌পিট্যালে দিয়ে যাবেন, এ মাসখানেক বাড়িতে চিকিৎসা চলুক তাতে কিছু মাত্র ক্ষতি হবে না। তবে আপনারা একটু সাবধান থাকবেন এই পর্যন্ত।' কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা তাঁদের রোগিণীকে এক মাসের জন্যে বাড়ি নিতে রাজি হননি।

চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁরা সহযোগিতা তো করলেনই না, বরং অসহযোগিতা করলেন বড় করে, এসে ভদ্র মহিলাকে বল্‌তেন : অসুখ করেছে ওষুধ খাবে, কিন্তু মাছ-মাংস-ডিম জ্বান থাকতে খাবে না।

ভদ্র মহিলা মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া বন্ধ করলেন। কিন্তু অধিক দিন বন্ধ রাখা সম্ভব হলো না। ডাক্তার বাবুদের চাপে পড়ে আবার তাঁকে মাছ-মাংস-ডিম ধরতে হলো, কিন্তু প্রথম প্রথম যে মূর্ছাটা দু-পাঁচ দিন পরে পরে হোত সেটা প্রতিদিন এক-দুবার করে হতে লাগল। ক্রমে সুরু হলো মুহুর্মুহুঃ।

এমন রোগীর প্রতি নার্স-ধাইদের যে, স্পেশাল কেয়ারটুকু নেওয়া উচিত তা তাঁরা নিলেন না। অমন জ্বর রোগী মূর্ছার মধ্যে যদি একবারের জন্যে খাটের উপর থেকে সিমেন্টের মেঝের উপর পড়ে যেত, তবে যে, কি ঘটতো তা ভাবতেও পা শিউরে ওঠে। কিন্তু তেমনটা হতে পারেনি। নার্স-ধাইরা তাঁদের কর্তব্য না করলেও, পাশের ঘরের অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগিণীরা পালা করে রাত জেগে তাঁর খবরদারি করেছেন। এখানে রোগীদের সমবেদনা একটা মস্ত বড় সম্বল।

ডাক্তারবাবু মুহুর্মুহুঃ মূর্ছার কথা শুনে খাট বের করে মেঝেতে বিছানা করে দিতে বল্‌লেন।

মূর্ছার কথা ডাক্তারবাবুর কানে গেল, কিন্তু নার্স-ধাইদের দায়িত্বহীনতার কথা তাঁর কানে গেল না। মনে সবাই বিরক্ত, আমি নিজেই অনেকের মুখে বিরক্তির কথা শুনেছি। কিন্তু আশ্চর্য ওঁরা আমাদের কাছে অভিযোগ করেন, ডাক্তারবাবু বা কর্তৃপক্ষের কাছে করেন না। বোধ হয় প্রকাশ্যে অভিযোগ জানিয়ে কেউ অপ্রিয় হতে চান না। আর অভিযোগ জানিয়েই বা হবে কি ? প্রিয় জনরাই যখন উপেক্ষার পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন, তখন টাকার নার্স-ধাইদের কাছে ওর বেশি আর কি আশা করা যাবে।

খাটখানা বের করে ঘরের সামনে বারান্দায় রাখা হলো। খাট বের হতেই ভদ্র মহিলা কান্না-কাটি আরম্ভ করলেন। 'আমি কি মরে গেছি যে, আমাকে খাট থেকে সব নামাল। মরে গেলে তবেই তো খাট থেকে নামায়—আমি কিছুতেই মেঝেতে শোব না।

পাশের রোগীরা অনেক করে বুঝিয়ে সুজিয়ে ওঁকে মেঝেতে শোয়ালেন। এক পাগলামি গেল বটে, কিন্তু মাথায় আর এক পাগলামি এসে চাপলো। যতক্ষণ ওঁর ঘরে কেউ থাকতো ততক্ষণ উনি বেশ ভাল থাকতেন, ঘর থেকে লোক চলে গেলেই অমনি নার্স-ধাই-ডাকা ঘণ্টা নিয়ে বাজাতে সুরু করতেন। অন্য রোগীরা অতি মাত্রায় বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা কাহাতোক চব্বিশ ঘণ্টা ওঁর ঘরে বসে থেকে পারেন ? তাঁদের নিজেদের তো স্নানাহার-বিশ্রাম আছে, সব সময় তো আর ওঁর ঘরে বসে থাকলে তাঁদের চলে না। তাই প্রথম প্রথম ওঁর ঘণ্টা শোনা মাত্র ওঁর ঘরে গেলেও শেষদিকে তাঁদের কোন উপায় থাকতো না। যতক্ষণ কেউ না কেউ যেত, সে পর্যন্ত ঘণ্টা নাড়া থাকতো না। ঘণ্টা শুনে অনেক সময় আসতো নার্সরা। তারা এলেও ঐ একই কথা বস—গল্প বলো। নার্সরা যেত খুব চটে। বল্‌তো : আহ্লাদী আমার ! তোমার এখানে বসে থাকি আর আমার কাজটা কে করবে শুনি ?

কিন্তু সে কথা কে শোনে। ঘণ্টা বিরামহীন বেজে চলে। বিরক্ত হয়ে একজন নার্স এসে ঘণ্টাটা নিয়ে গেল।

অন্য রোগীরা ওঁর উপর বিরক্ত হলেও, সংগে সংগে পাগলা মেয়েটার জন্যে একটা বেদনাও তাঁদের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে কেঁদে উঠতো। কিন্তু কত পারেন, তাঁরাও তো সব রোগী ? আর ওঁর বায়নাই বা কত ? শুধু কি পাশে বসে গল্প বলা ? তাঁকে বুঝিয়ে, সাধ্য-সাধন করে পথ্য ওষুধ খাওয়াতে হবে—না হলে সব থাকবে পড়ে, উনি খাবেন না। ঠোঁট ফুলিয়ে ছোট মেয়েটির মত অভিমান তাঁর লেগেই ছিল।

সাধারণ চোখে সব দেখে তাকে মনে হতে পারে, অত বোঝাবার কি এমন দায় পড়েছিল যে, ওঁর জন্যে অত করতে যেত। দায় ছিল বই কি। সমবয়সীরা অন্যদের ওঁর ঘরে আকর্ষণ করতো। আর একটা কথা আমার বিশেষ করে মনে হয়েছে। একঘেয়ে জীবন যাপন করার মানির মধ্যে নূতন কিছু একটা এলে ওঁদের সেদিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করতো। ওঁকে নিয়ে তাঁদের দিন কাটাতো বেশ কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে। আর মনে থাকতো নিজেদের এমন দুদিনের কান্না।

কিন্তু ভদ্র মহিলার এই স্নেহ প্রেমের কাঙালপনা কেন? বোধ হয় সংসার থেকে ওঁর মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছে প্রিয়-জনদের প্রেমের সিংহ দুয়ার ওঁর জন্যে চির রুদ্ধ হয়ে গেছে করে পড়া স্নেহের অমৃত ধারা।

সেদিন এক ভদ্র মহিলার মৃত্যুর সংবাদ পেলাম। সে মৃত্যু যেমন মর্মান্তিক তেমনি করুণ। যাঁর সব থেকে বেশি বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁরই হয়েছে মৃত্যু। মৃত্যু মমতাহীন।

ভদ্র মহিলার নাম আমি জানিনে, যা হোক মিষ্টি দেখে কিছু একটা ভেবে নিন। ওঁর স্বামী ছিলেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর তিনি নিজে ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষার্থিনী। পরীক্ষার শেষ দিন হঠাৎ হলের মধ্যে তাঁর ব্লিডিং হয়।

বাড়ি ফেরার সংগে সংগে ওঁর স্বামী এক বড় ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তারবাবু ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন: নিশ্চিত করে বলা না গেলেও টি, বি হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। অল্প অল্প কাশি ছিল, শরীর ভাল যাচ্ছিল না, আজকের ব্লিডিং সবই টি, বি-র লক্ষণ।

ব্যস্। ভদ্র মহিলা মূর্ছা গেলেন, জ্ঞান হলো পুরো তিন দিন পরে।

অধ্যাপক প্রথমটা কি করবেন ভেবে পেলেন না। তবে এটা বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝলেন, এক বছরের শিশু পুত্রকে স্ত্রীর কাছে রাখা কোন মতেই আর যুক্তি সংগত হবে না। আবার এই মুহূর্তে নির্মম হয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়েই বা নেবেন কি করে, মহা সমস্যা—একমাত্র পথ হচ্ছে হস্পিটালে রিমুভ করা। কৌশলে তিনি হস্পিটাল সম্পর্কে স্ত্রীর মতটাকে জেনে নিলেন।

হস্পিটালে যেতে ওঁর এতটুকু আপত্তি ছিল না। যে শিশু পুত্রকে তিনি মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করতে পারতেন না, তাকে ছেড়ে তিনি হস্পিটালে যাওয়ার জন্যে বুক বাঁধলেন। স্বামীর মত তিনিও হয়তো পুত্রের ভবিষ্যতের কথা ভেবে হস্পিটালকে মেনে নিয়েছিলেন।

স্ত্রীকে যাদবপুরে ভর্তি করলেন, কিন্তু অধ্যাপক নিজে স্থায়িভাবে কোলকাতায় থাকতে পারলেন না, চাকরির খাতিরে গৌহাটি ফিরে যেতে হলো। অবশ্য তাঁর জন্যে ভদ্র মহিলার বিশেষ কিছু অসুবিধা ছিল না, ওঁর দিদি ছিলেন কোলকাতায়, তিনি সদাসর্বদাই ওঁর দেখাশুনা করতেন। অধ্যাপক এক সংগে কোলকাতায় আসা যাওয়ার মত ছুটি পেলে স্ত্রীকে এসে দেখে যেতেন, তাকেও রাখতেন নিয়মিত যোগাযোগ।

ভোগের সামগ্রি যখন অফুরন্ত ভাবে আমাদের চারদিকে ছড়ান থাকে, ইচ্ছা মাত্রই পাওয়া যায়, তখন তার মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। জীবনের সব ক্ষেত্রেই ঐ এক কথা। তাই দুঃখের ভেতর দিয়ে আসে সুখের উপলব্ধি—মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে চেনা যায় জীবন আর পৃথিবীকে। অবশ্য উপলব্ধি আরো গভীর হলে জীবন-মৃত্যু একাকার হয়ে যায়, কিন্তু যখন তা না হয় তখন বিষাদের তলে ঢাকা পড়ে প্রতি মুহূর্তের চেতনা। বেড পেশেন্ট হয়ে ভদ্র মহিলার মন তাই হাহাকার করে উঠলো। শুয়ে শুয়ে দিনে বহুবার করে উনি রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করে যেতেন:

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।
ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া।

নিম্নে গভীর অতীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধে অঞ্জলি—
'এসো এসো' সুরে করুণ মিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥
ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ মোহ বন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা রসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ভুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

বাংলাদেশের বসন্তের একটা আশ্চর্য রূপ আছে—আছে একটা চমৎকারিত্ব। প্রতিদিন সকালে চোখ মেলতেই মনটা নূতন আগ্রহে ভরে যায়। ভদ্রমহিলা বেডে শুয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতেন পূর্বাশার দুয়ারে নবদিনের সূর্যোদয়—শিশিরসিক্ত বৃক্ষ-লতা-পাতা-দূর্বাদলে, প্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়া আলো। সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটার উপর বসে কিচির-মিচির করে একদল শালিক বা চড়ুই বা এমনি কোন পাখী। নিদ্রাজড়িত চোখে সোনা হয়ে ওঠে ভোরের দিনটি। এমন বসন্ত তো আরো কত গেছে, কিন্তু এমন করে তো সেরূপ চোখে ধরা পড়েনি—সূর্য তো প্রতিদিনই ওঠে, কিন্তু নবোদিত সূর্যকে এমন ভাল তো পূর্বে কখনও লাগেনি। মনটা যেন কেমন করে—কিসের একটা বেদনা মনের মধ্যে খচখচ করে।

নূতন উপলব্ধি নিয়ে, নববর্ষের দিন উনি শুয়ে শুয়ে একটা প্রবন্ধ লেখেন। শুনেছি প্রবন্ধটি ওঁর মৃত্যুর অল্প ক'দিন পরে হস্‌পিট্যাল পত্রিকা 'নবজীবনে' বেরিয়েছিল। প্রবন্ধটা আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়নি ঠিক—তবে ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমি এত বেশি কথা শুনেছি তার থেকে আমার যে, ধারণা হয়েছে তাই এখানে উপস্থিত করছি।

বিপুলা এ ধরণীর কতটুকু জানি! পৃথিবীটা যে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, এত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে ভরা তা আজকের মত পূর্বে কোনদিন উপলব্ধি করিনি। আজ আমি পৃথিবীর ধূলো-বালি-তৃণের স্পর্শ হারিয়ে চিনেছি ধরণীর ভিন্ন আর একটা রূপ। সে অতি সজীব সবুজ।

যখন আমি আমার স্বামী আর শিশুপুত্রের সংগে একত্র বাস করছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র সংসার ভিন্ন জগতের কোন বৈচিত্র্যই আমার কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল না। আজকের পূর্বে আমি পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের কোন খোঁজই কোনদিন রাখিনি। শরৎ-বসন্তে পৃথিবীর এই স্বপ্নময় সবুজ রূপলীলা আমি কোনদিন দেখিনি, দেখিনি ফুলোৎসব—শুনিনি দোয়েল-কোয়েলের প্রভাতী।

হঠাৎ এই বিপুলা পৃথিবীর আমি একটা নূতন রূপ আবিষ্কার করে ফেলেছি। আজ এই খাটের উপর শুয়ে আমি দেখি এক ফালি আকাশ আর পৃথিবী। আহাঃ! মরিমরি! কি তার রূপ! কখনও শান্ত-শ্যামল-উদার, কখনও রুক্ষ-ধূসর—পাশাপাশি যেন শিব আর রুদ্র, আকাশ কখনও নিমুক্ত-নীল, কখনও কালো মেঘভারে আনত। ওরই মধ্যে আমি যুগ-যুগান্তরের অনেক কথাই পড়তে পাই। পৃথিবীর ধূলোমাটির সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে যে মুহূর্তে শূন্য, রিক্ত হয়ে পড়েছি—ঠিক সেই ক্ষণটিতে দিগ্‌বলয় আমাকে দু'হাতে দিয়ে আকর্ষণ করতে লাগল। যাদের কোনদিন চিনিনি জানিনি তারাই আজ আমাকে প্রিয়জন করে নিয়েছে—আকুল করে টানছে বুকের মধ্যে। ওরা আমাকে মাধুরী-মদিরা পান করিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চায় সুদূর বহুদূরে অপার শান্তি, অনন্ত প্রেম-সৌন্দর্যের মধ্যে।

আজ এই মুহূর্তে মৃত্যু মিছিলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবী! তোমার বৈচিত্র্যপূর্ণ দিন-রাত্রি, আলো-আঁধার, গাছ-পালা নিয়ে তোমাকে আমার কি ভালই না লাগছে। আজ তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, পেছন থেকে কে যেন কানে কানে বলছে এ জগৎ রূপের প্রস্রবণে ভরা। এ জগৎ অপূর্ব।

এসো বৈশাখ! আজ তোমাকে শেষবারের মত অভিনন্দিত করি। তুমি জীবনের প্রতীক, তুমি সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। জরা-জীর্ণ, মালিন্যের সংগে তোমার আপোষ রফা নেই। তুমি আমাকে তোমার অভয়মন্ত্র দাও।

হে শুচি বৈশাখ! তোমার এই আকাশ-আলো আমার তৃষ্ণা বাড়িয়ে তুলেছে। আমাকে মহত্তর, বৃহত্তরের মধ্যে টেনে পরিপূর্ণ করেছে। হে রুদ্রকান্ত শিব! তোমাকে নমস্কার।

এই প্রবন্ধ লেখার পর উনি আর অধিকদিন বাঁচেননি। পৃথিবীর আকাশ-আলো স্তব্ধ করে চলে গেছেন অবশ্য সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে।

মৃত্যুর পূর্বে উনি হঠাৎ অধিকার করেছিলেন মৃন্ময় পৃথিবীকে। জেগেছিল ওঁর মনে বাঁচবার এক আকুল আগ্রহ। ডাক্তারবাবু এলেই উনি কি ব্যাকুলতা নিয়েই না ওঁকে প্রশ্ন করতেন: ডাক্তারবাবু আমি ভাল হবো তো? আবার আমি এই পৃথিবীতে আমার স্বামী আর খোকনকে ফিরে পাবো তো?

ডাক্তারবাবু তাঁর সেই চিরন্তন আশ্বাস দিয়েছিলেন: আমি বলছি নিশ্চয় আপনি ভাল হয়ে যাবেন। স্বামী-পুত্র নিয়ে আবার ঘর সংসার করতে পারবেন।

কিন্তু ডাক্তারবাবু তাঁর সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি—ওঁকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি তাঁর স্বামী-পুত্রের কাছে।

একটা বেপরোয়া রোগিণী এলেন হস্‌পিট্যালে। অসুখ হয়েছে জানবার পর থেকে তিনি অতিমাত্রায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। কোন নিষেধ তিনি মানতেন না। মৃত্যু যখন ধ্রুব নিশ্চিত তখন কিসের শাসন, কিসের বাঁধন। বরং যে ক'দিন সময় পাওয়া যায়, জীবনকে নিবিড় করে ভোগ করে নেওয়াই শ্রেয়।

ডাক্তারবাবু তাঁকে বন্ধুভাবে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বললেন: অসুখ আপনার এমন বেশি নয়, আমি বলছি আপনি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবেন। শুধু অত্যাচার করবেন না।

ক্ষয় রোগ তাঁর বুকে গুরুভার পাষাণের মত চেপে বসেছিল। ক্ষয় রোগ সারে না এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হয়েছিল, কারো কোন আশ্বাসেই তিনি আস্থা স্থাপন করে সুস্থির হতে পারেননি।

নবাগতা হিসাবে ডাক্তারবাবু ওঁকে বেড পেশেন্ট হয়ে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা সে কথা একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন। খাটের উপর তিনি অনেকক্ষণ বসে থাকতেন বটে, কিন্তু রাত বারটার পূর্বে তাতে পিঠ দিতেন না। এদিকে উঠতেন অন্য রোগীদের সংগে ঠিক সাড়ে চারটায়।

সেদিন ডাক্তারবাবু ওঁকে দেখতে গেলে, উনি বললেন: ডাক্তারবাবু আমি ওয়াকিং পাব করে?

: ওয়াকিং তো আপনি ইতিমধ্যে নিজেই নিয়ে নিয়েছেন, আমার দেওয়ার অপেক্ষা তো রাখেননি। নূতন করে এখন আর আপনাকে ওয়াকিং কি দেব। থাক ওয়াকিং নিয়েছেন নিন, কিন্তু খাওয়া-দাওয়াটা একটু ভদ্র-মহিলা মাফিক করুন। অন্তত তেল-লংকাটা একটু কম করে খান। যা খেলেন সে যদি শরীরের কাজে না লাগল তবে ক্ষয়পূরণ হয়ে রোগ মারবে কেমন করে? অসুখের কষ্ট আছে, সেখানে অত্যাচার করে আরো কষ্ট বাড়িয়ে নেওয়ার অর্থ হবে কি?

: আপনাদের হস্‌পিট্যালের যারা কোন ভদ্রমহিলা খেতে পারেন নাকি?

: যাঁরা পারেন তাঁরা ভাল হন।

: কিন্তু আমি যে খেতে পারিনে।

: ওষুধ খেতেও তো ভাল লাগে না, তবু অসুখের জন্যে ওষুধ খেতে হয়—ভেবে দেখুন মুখে ভাল না লাগা আর অসুখ সারা এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা আপনার কাছে অধিক প্রিয় বলে মনে হয়।

: নিঃসন্দেহে অসুখ সারাটা ভাল, কিন্তু অসুখ যে সারবে না সে তো আমি ভাল করেই জানি।

ডাক্তারবাবু অতি মাত্রায় চটে যান। ভাবেন ক্ষমতা হাতে থাকলে এসব রোগীকে তিনি এখুনি বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। এঁদের দিয়ে একটা বেড জুড়ে রেখে অন্যের ক্ষতি করা কোন মতেই উচিত নয়।

ভদ্রমহিলা নিয়মের বিরাট ব্যতিক্রম। নিষেধ মানতে তিনি বদ্ধপরিকর। বাদ যেত না তাঁর চলাফেরা, উপর নীচে করা, দুবেলা খাওয়ার পূর্বে স্টোভে করে পোস্ত চচ্চড়ি ধোকার ডালনা এমন কিছু দুই-এক ভাগে করে নেওয়া।

প্রথম বর্ষা। সমস্ত আকাশ কালো করে ভীষণ ঝড়-জল এলো। ঝড়-জল সুরু হয়েছিল বিকেল চারটায়, আর শেষ হলো সন্ধ্যে সাতটার পর।

নার্স ভিজিটিং আওয়ার্স শেষে ওঁর ঘরে গিয়ে দেখে, ঘরখানা জলে ভেসে যাচ্ছে। সমস্ত বিছানাটা ভিজে টুপটুপে হয়ে গেছে। জানালাটা তখনও খোলা তা দিয়ে হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে ঢুকছে। নার্স তো সব দেখে আগুন। রেগে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো।

ডাক্তার বাবু এসে বললেন : এসব আপনি কি সুরু করেছেন।

ভদ্রমহিলা অত্যন্ত শান্ত কোমল কণ্ঠে বললেন : জীবনে আর তো কখনও এমন নূতন বর্ষায় ভেজার দিন পাব না ডাক্তারবাবু।

অসুখ দেখতে দেখতে ওঁর খুব বেড়ে গেল। বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারেন না। ডাক্তারবাবু এসে প্রশ্ন করলেন : কেমন আছেন ?

: তা আমি কি করে বলবো, সে তো আপনারা বলতে পারেন।

: আমরা যা জানি তা আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি না, আপনার নূতন কোন কষ্ট আছে কিনা তাই বলুন।

: ডান পাশের মাড়ির দাঁতগুলো খুব ব্যথা হয়েছে, বোধ হয় আক্কল দাঁত উঠছে।

: আপনার একটু আক্কেল হলে আমি বাঁচি।

আক্কেল ওঁর হয়েছিল কিনা সে কথা জানিনে, তবে তিনি যে ভাল হয়ে ওঠেনি সে কথা জানি।

ক্ষয় রোগ সম্পর্কে সাধারণের দু'রকমের ধারণা আছে। অদ্ভুত আতঙ্ক আর স্থিতিস্থাপক সতর্ক মনোভাব। অর্থাৎ একদল টি, বি শুনলে তার ত্রিসীমানা তো দূরের কথা চতুঃসীমানা পর্যন্ত ভয়ে ভাবনায় মাড়ান না। শেষটা টি, বি যদি এসে ঘরে বসে তো আর রক্ষে থাকবে না। আর অপর দলের ধারণা হ্যাঁ টি, বি একটা মারাত্মক রোগ বটে, কিন্তু তাই বলে তার জন্যে পকেট্রিয়ে তালা-চাবি এঁটে ঘরে খিল দিয়ে পড়ে থাকবার কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন না। শুধু রোগটা সম্পর্কে যথোচিত সচেতন এবং সতর্ক থাকলেই হলো। আর টি, বি যে একটা দুরারোগ্য ব্যাধি তাও তাঁরা মনে করেন না। বরং অন্যান্য রোগের মত টি, বিও উপযুক্ত চিকিৎসায় ভাল হয় এই কথাই সুস্পষ্টভাবে বিশ্বাস করেন। কিন্তু যুগনীতি বদলে গেল। সেদিন আবিষ্কার করে ফেললাম তৃতীয় রকম ধারণা পোষণ করা ব্যক্তিও আছেন। টি, বি সম্পর্কে এই নবাবিষ্কৃত তৃতীয় শ্রেণীর ধারণা টি, বি একটা রোগই নয়, যেমন চিংড়ি মাছ নয়—পোকা, আরশুলা পাখী নয় পতঙ্গ, ঠিক তেমনি।

কথা কইতে কইতে রাণী একসময় বারান্দার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বললো ; দেখুন কাণ্ড ! ঐ নূতন রোগিণীর বাড়ি থেকে বাচ্চাদের এনে ওঁর কোলে দিচ্ছে আর উনিও কেমন অবলীলাক্রমে বাচ্চাদের কোলে করে আদর করছেন চুমা খাচ্ছেন।

দেখলাম তাই বটে। ভদ্রমহিলার কোলে মাস দশেক বয়সের একটা ছেলে, তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে পরিতৃপ্তির সঙ্গে চুম্বনে তাকে অস্থির করে তুলছেন। অপর বছর দুই বয়সের ছেলেটা বারান্দায় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। রেওয়ালে হাত ঘষছে, কখনও মনের আনন্দে ছোট হাতের মুঠি মুখের মধ্যে পুরিয়ে দিচ্ছে। মাতাপিতার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। চোখ দুটো জ্বালা করে জলে ভরে এলো, কিন্তু তবু মনের তপ্ত জ্বালা মনের মধ্যে গোপন করলাম—ওঁরা যদি আমার কথাটা ভাল করে ভাল ভাবে না নেন।

তৃতীয়দিনে আর চিত্তবেগ সংযত করতে পারলাম না। উঠে গিয়ে ভদ্রমহিলার স্বামীকে বললাম : দেখুন কিছু যদি মনে না করেন,ঐ কচি বাচ্চাদের হস্‌পিট্যালে আনা মোটেই সংগত নয়। ঐ দেখুন বাচ্চাটা সারা বারান্দায় ছোটাছুটি করছে, যেখানে সেখানে হাত দিয়ে সেই নোংরা হাত মুখে দিচ্ছে, উনি ছোট বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে চুমা খাচ্ছেন, এর কোনটাই ওদের পক্ষে আদৌ মঙ্গলের নয়। মানুষ আমাদের আপনার প্রিয়, কিন্তু রোগটা তা নয়, কাজেই যতটা সম্ভব সতর্ক করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য।

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে বিজ্ঞের মত একটু মুচকি হেসে বললেন : ওদের বিধিলিপি খণ্ডে দেওয়ার ক্ষমতা তো আমাদের নেই।

: আমি হাতে করে বিষ খেলাম এবং অবধারিত ফল লাভ করলাম ; একে কি আপনি বিধিলিপি বলবেন না কর্মফল বলবেন।

: আমি ঐ কথাই বলবো, বিধিপুরুষ ছয় রাতের দিন চার আঙুল কপালে যা লিখে গেছেন, সে কোন পুরুষ সিংহের খণ্ডাবার ক্ষমতা নেই। এই ওরা ছোঁয়াছুঁয়ি করছে বলেই ওদের টি বি হবে আর ছোঁয়াছুঁয়ি না করলে কিছুই হবে না একথা আর যেই স্বীকার করুক, আমি করিনে। ওঁর টি বি হয়েছে, ও তো কখনো কোন টি, বি রোগীর সংস্পর্শে হয়নি, তবু ওঁর টি, বি হলো কেন?

: আপনার স্ত্রী হয় না জেনে কোন টি, বি রোগীর সংগে মেলামেশা করেছেন, না হয় ওঁর ভেতরে রোগ প্রতিরোধের উপযুক্ত ক্ষমতা ছিল না তাই রোগ প্রকাশ পেয়েছে।

: ঐ হলো, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আমার ছিল, ওঁর ছিল না কেন? ওটা আসলে আর কিছুই নয়, বিধাতার অযোধ বিধান।

: সবই যদি আপনার মতে বিধির বিধান হয়, তবে অহেতুক ওঁকে এখানেই বা এনেছেন কেন? কপালে যা আছে তাই যখন হবে, তখন আবার এত কষ্ট স্বীকার করা কেন?

একটু কথা আছে, ভাল হওয়ার হলে ওষুধ ভোগের কাজটা কমিয়ে দিতে পারে।

: কেন ওটাই বা বিধাতার হাতের বাইরে কেন? যিনি স্থূল থেকে সূক্ষ্ম পর্যন্ত সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করছেন সেখানে তাই বা সম্ভব কি করে।

: বিধাতা বিধান দিয়েছেন তোমার পতনে মৃত্যু—সে মৃত্যু গাছ থেকে পতনে হতে পারে, ছাদ থেকে পতনে হতে পারে, আবার কলার বা আমের খোসার উপর পা পড়ে পতনেও যে, সে মৃত্যু না হতে পারে তা নয়। আসল কথা পতনে মৃত্যু। গাছে, ছাদে বা গাড়িতে আপনি না চড়তে পারেন, তবু আপনার পতনে মৃত্যু হবেই অর্থাৎ মৃত্যু যেখানে ধ্রুব সেখানে সুবেন তো পড়ে মরুক স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এসেও কিছু করতে পারবেন না। আমরা যদি বিধির বিধান না বুঝি তো সে দোষ বিধাতাপুরুষের নয় আমাদের।

বুঝলাম এমন দার্শনিকের সংগে অহেতুক তর্ক করা বৃথা। একবার একজন তাঁর প্রতিপক্ষকে বলেছিলেন, কংগ্রেসের নীতি ভাল যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার আমার ছেলে গরুটা তোমাকে দিয়ে দেব। কিন্তু এই শ্রেণীর মনুষ্য সম্পর্কে যাঁদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সবিনয়ে নমস্কার করে বলবেন, তা ছেলে গরুটা তোমারই থাক, ওতে আমার প্রয়োজন নেই। আমিও ভদ্রলোককে মনে মনে নমস্কার জানিয়ে সোজা ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে কথাটা খুলে বললাম।

পরদিন ভদ্রলোকের সাথে মুখোমুখি দেখা হতেই ভদ্র লোক চোখ নামিয়ে নিলেন। নতমুখখানা ক্ষোভে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। ভদ্রলোক আর মুখ তুললেন না। বাচ্চা দু'টিকে কাছে কোথাও দেখলাম না।

সে যেন এক প্রাণোৎসব। চারিদিকে ছুটাছুটি হুড়ো হুড়ি পড়ে গেছে। লক্ষ্য বস্তুটা অতি তুচ্ছ। অথচ বর্তমানে সেটা অসামান্যই হয়ে উঠেছে—একদল হস্‌পিটালে অপারে-শনের ফিলম তুলতে এসেছেন। সব থেকে বড় আকর্ষণ বোধ হয় প্রখ্যাত অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল আর অভিনেত্রী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। অনেকে এঁদের পর্দায় অভিনয় দেখেছেন, দেখেছেন তাঁদের ছবি, কিন্তু রক্ত মাংসের প্রিয় শিল্পী দু'জনকে কখনও দেখার সুযোগ পান নি; আজ যখন সেই অভাবিত সুযোগ নিতান্ত অযাচিত ভাবে হাতে এসে পড়েছে, তখন কোন ক্রমেই এই সৌভাগ্যের সুযোগটা হারালে চলে না। আর হারান চলে না বলেই সকলে ঝড়ো হাওয়ার মত সেই সকাল থেকে দাপাদাপি করে ফিরছেন। একদল মরা মানুষ কোন অজ্ঞাত কাপালিকের মন্ত্রগুণে জেগে উঠে হয়ে পড়েছে ভীষণ চঞ্চল।

অপারেশনের ছবি তোলা হচ্ছে। হস্পিটালের কয়েক-জন ডাক্তারবাবুও আছেন। অপারেশন থিয়েটারের দরজা ভেতর থেকে অর্গল বন্ধ নয়—শুধু মাত্র ভেজান ছিল। রোগীরা কয়েকজন কয়েকবার দরজা খুলে ধমক খেয়ে ফিরে এলেন। শেষে অপারেশন থিয়েটারের পাশের ঘরের খোলা জানালায় সবাই গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। যেখানে তিন-চার জন ভাল করে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না, সেখানে ঠেলাঠেলি করে প্রায় শতখানেক রোগী জড়ো হয়েছেন।

দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম করা তো পড়ে মরুক সকলের বোধ হয় ভাল করে খাওয়াই হয় নি। বাজে একটা

মুহূর্ত নষ্ট করবার কি সেদিন তাঁদের অবস্থা ছিল—একে বারেই না।

বিকেলে দু'একজনের ভিজিটার আসবেন সেদিকেও তাঁদের খেয়াল নেই। এক জনের ভিজিটার এসে ঘরের মধ্যে বহুক্ষণ বসে থেকেও যখন রোগিণীর সন্ধান পেলেন না, তখন বাইরে এসে পাশের ঘরের একজন রোগিণীকে ডেকে বললেন : আচ্ছা শান্তি কোথায় বলতে পারেন ?

: আপনি বসুন আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি, সে স্যুটিং দেখতে গেছে।

একটু পরে ভদ্রমহিলা শান্তির কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে তার স্বামীর কাছে নিয়ে এলেন। বললেন : ও আমার কথা বিশ্বাসই করছিল না।

ছ'টার পর স্যুটিং শেষ হলে, আট ন'বছরের জন সাতেক রোগিণী বারান্দায় এসে একটা সতরঞ্চি পেতে বসলেন। চোখে মুখে তাঁদের একটা ক্লান্তির ছাপ। যেন কয়েক রাত জেগে সব মেয়ের বিয়ে দিয়ে অতিমাত্রায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তবু কি এতটুকু ছেলেমানুষি কমেছে ? এতটুকু না একজন বললেন : বইটা রিলিজ হলে ডাক্তার বাবুকে বলে আমরা একদিন দল বেঁধে সব দেখতে যাবো। এখন তো আমাদের দিয়ে আর রোগ ছড়াবার ভয় নেই। তারপর বসে দেখতে দেখতে আমাদের এখান থেকে তোলা সীনটা এলে বলবো ঐ দেখ আমাদের হস্‌পিটাল থেকে তোলা সীন। আর পাশে যারা থাকবে তাদের সিনেমা দেখা সংগে সংগে মাথায় উঠবে। টি, বি রোগীর পাশে বসেছে শুনে ছুটে পালাবে।

হঠাৎ খুব একটা মজার জিনিষ নেহাত অবহেলার মধ্যে হাতে পেয়ে সকলেই মহা খুশী। একটা জীবন্ত খেলা হাত থেকে যেতে না যেতে আর একটা হাতে পাওয়া সত্যিই দুর্লভ।

রাত তখন সাতটা। ভিজিটার তাড়ান এবং রোগীদের রেষ্টের ঘণ্টা বাজলো। এ সংগে বাজলো আকাশে ঝড়-বৃষ্টির ঘণ্টা। হুহু করে ছুটলো ঝড়, নামলো মুষল ধারে বৃষ্টি। কিন্তু তবু উঠতে হবে, রোগীদের পাশে আর বসে থাকা চলবে না, তারা এবার রেষ্ট নেবে। কি আর করি, নেমে এলাম একতলার বারান্দায়। বৃষ্টি আর থামে না এদিকে ঘড়িতে বেজে গেল সাড়ে সাতটা।

হাফপ্যান্ট পরা, গেঞ্জী গায়ে একটা ষোল-সতের বছরের ছেলে বিড়ি টানতে টানতে বারান্দার শেষের একধারে এসে জড়সড় হয়ে বসল। বললো : বাবু বুঝি বাড়ী যেতে পারেন নি ?

: কই আর পারলাম।

ব্যাস, আমার সব চুপচাপ। চারিদিক থেকে নেমে আসছে বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন। টি, বি হস্‌পিট্যালের সে ভয়াবহ আলো ছায়া, নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতা কল্পনা করা যায় না। প্রতি ঘরে আলো জ্বলছে, কত রোগী আছে হস্‌পিটাল ঘরে, কিন্তু কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। তাতে বর্ষণ মুখর ঘন দুর্যোগের রাত—গা কেমন যেন ছোপ ছোপ করে।

চুপচাপ দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ছেলেটিকে বললাম : তুমিও যেতে পারনি ?

: আমি আর যাব কোথায় ? এখানে মেল ওয়ার্ডে কাজ করি—বাসা থেকে এই সবে খেয়ে দেয়ে এলাম।

: তা হলে তুমি এখানকার বাসিন্দা। তা তোমার এখন কাজ কর্ম কিছু নেই।

: রোগীরা ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলেই কাজ, না ডাকলে আর কাজ কি।

: কাজ-কর্ম যখন নেই, তখন তোমাদের হস্‌পিট্যালের গল্প বল শুনি।

: এখানকার আর গল্প কি।

গল্প না হোক, যা দেখে তোমার এখানে সব চাইতে আশ্চর্য বলে মনে হয়েছে সেই কথাই বলো।

ছেলেটি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে বললো : আমার এখানে সব চাইতে আশ্চর্য লেগেছে সবের অধিক সকলের মরণের উৎকট ভয় আর সম্প্রতি কালের একজন নবাগত রোগীকে। মরার ভয় ডাক্তার-নার্স-ঝাই-ঠাকুর চাকর রোগী সবারই একরূপ। সবাই যেন মরার ভয়ে মরে ভূত হয়ে আছে। আমার ছাওয়াল বেলায় আমাদের চট্টগ্রামে একবার দেখলাম বাজার সৈন্যে ভরে গেছে—হঠাৎ একদিন সকালবেলা উঠে দেখি রাতারাতি তারা সব কোথায় চলে গেছে। শুনলাম সব লড়াইতে গেছে এবং সেখানেই প্রায় সব মরেছে। ওরা কি মরার ভয় করতো—এতটুকু না। আর তাদের চেহারা ছিল কি, যেন সব এক একটা দৈত্য।

মরতে তারা জানতো—যারা মরতে জানে না তারা আবার বাঁচবে কেমন করে, এমনিতেই তো তারা মরার ভয়ে সব মরে আছে।

মনে মনে প্রমাদ গুনলাম, এ যে আবার দার্শনিক কথা বলে। বললাম: তাই বটে কিন্তু ওকথা থাক, তুমি বরং তোমার সেই আশ্চর্য রোগীটার কথাই বলো। সে বাবু অল্প কদিন হলো এখানে এসেছেন, কিন্তু তাঁর যে, এই খারাপ অসুখ হয়েছে তা তিনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না। বলেন: বাড়ির লোকই তাঁর মহাশত্রু। তাঁরাই চালাকি করে, ডাক্তারকে টাকা খাইয়ে একখানা মিথ্যে ফটো তুলিয়ে তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন। উনি যদি কখনও ছাড়া পেয়ে বাড়ি যেতে পারেন তবে সেই দিন এই জালিয়াতির জবাব দেবেন। কিন্তু সে শুভ লগ্ন হয়তো তাঁর জীবনে কোন দিনও আসবে না; চারিদিকের টি, বি রোগীর বেড়া জাল-ছিঁড়ে কি করে তিনি নিজেকে অধিক দিন সুস্থ রাখতে সক্ষম হবেন। ডাক্তার বাবুরা পর্যন্ত তাঁর বাড়ির লোকের সংগে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে,তাঁর কথা না শুনে তাঁকে জোর-জবরদস্তি করে টি, বি-র ওষুধ গেলাচ্ছেন। এই কুটিল চক্রান্ত থেকে তাঁর মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

এক একদিন আমাকে ডেকে বলতেন: দেখ্ বাড়ির লোকগুলো কি কাল্‌প্রিট (কালপ্রিট) আমাকে এসে বলে কিনা: অসুখ তো কত লোকেরই হচ্ছে, ওষুধ খাচ্ছে ভাল হয়ে উঠছে, এর জন্যে আবার মন খারাপের কি আছে? তুইও দেখিস্ দু'দিনে ভাল হয়ে যাবি। বোঝ একবার সয়তানির বহরটা।

উনি তো প্রায় রোজ ঐ রকম বলেন আর এদিকে করতেন কি জানেন, থার্মোমিটারে জ্বর তুলে ঝেড়ে কমিয়ে রাখতেন, নার্সরা এসে দেখতেন জ্বর নেই। আর মাঝে মাঝে যখন রক্ত উঠতো তখন থুথু প্রায় গিলে ফেলতেন। হঠাৎ যদি কখনও ভুল করে রক্ত মাখা থুথু ফেলে ফেলতেন, অমনি লুকিয়ে নিজে গিয়ে সেটা ধুয়ে নিয়ে আসতেন। ডাক্তার বাবুরা এর কিছুই জানতেন না।

আবার এক একদিন আমাকে ডেকে বলতেন: আচ্ছা তুইকি বিশ্বাস করিস্ যে, আমার টি, বি হয়েছে? দেখ্‌তো আমার হেলথটা।

: ভেতরে ঘুণধরা উপরে নাদুসনুদুস শরীরকে কি স্বাস্থ্য বলা যায়?

: অর্থাৎ তুইও বলতে চাস্ আমার ভেতরটা ফাঁপা—ফুটবলের মত বাতাস দিয়ে ওরা? তোর বুদ্ধির নামটা যেই রেখে থাকনা কেন, তার বুদ্ধির তারিফ না করে পারি নে।

: ঘুণ ধরা বাঁশের লাঠি প্রথমটা দেখে, ঘুণ ধরেছে কিনা অনেক সময় ধরা যায় না—কারো উপর সেটার প্রয়োগ হলেই ধরা পড়ে তার অন্তঃসার শূন্যতা। দেখা যায় প্যাকাটির মত খুট করে ভেঙে যায়।

বাবু ভীষণ জ্বলে উঠতেন। বলতেন: খুব বড় বড় বাত শিখেছিস্ দেখছি। ব্যস্ দু-তিন দিন আর আমার সংগে কথাটি কইতেন না। বলুন এ রোগী আশ্চর্য রোগী নয়।

আমার কাছে এ রোগী আশ্চর্য নয়। ওঁর ঐ রোগকে অস্বীকার করার মূলে ছিল ওর বাঁচবার ঐকান্তিক কামনা। পাছে মারাত্মক টি, বি রোগ হলে যদি তিনি আর না বাঁচেন, সেই ভয়ে নিজের কাছেই রোগের কথা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইতেন না। তাই অন্যে ওর খারাপ অসুখ হয়েছে বললে উনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন এবং তাঁকে তাঁর ঘোর শত্রু বলেই মনে করতেন।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই মর্ত্যপ্রীতি কম-বেশি হলেও প্রতিটি মানুষের মধ্যে সমভাবে বর্তমান। কারো চেতন কারো বা অবচেতন মনের মধ্যে ঐ মর্ত্যপ্রীতি ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হচ্ছে। এই মর্ত্যপ্রীতি টি, বি হস্পিট্যালে গেলে সর্বব্যাপী, বহু বিস্তৃত ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। ওখানে যেন কোরাস চলছে; মরিতে চাহিনা মোরা সুন্দর ভুবনে। প্রকাশ্যে কোরাস চললেও, অন্তরের অন্তস্থলে মৃত্যু ভয় গুরুভার পাষাণের মত চেপে ছিল। কেউ যদি এসে তাঁদের সামান্য একটু আশা, আশ্বাসের কথা শুনায় অমনি তাঁদের মুখের উপর যে, অপূর্ব প্রফুল্লতার প্লাবন খেলে যায়, সে কোন শব্দ-চাতুর্য দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব

নয়! জানি না শিল্পী তাঁর তুলির টানে কিংবা হাতের চাপে সে সুখ প্রত্যক্ষ গোচর করতে পারেন কিনা; তবে এ কথা জানি সে মুখ দেখবার এবং সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করবার—দেখাবার নয়।

এমনি একখানা মুখের কথা এক্ষণে বলবো। সেদিন আমরা বসে গল্প করছি এমন সময় পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের গীতা দেবী এলেন। ভদ্রমহিলার বয়স বেশি নয়—বোধ করি আঠার-উনিশ হবে। প্রথম বাচ্চা হওয়ার পরই তাঁর অসুখ প্রকাশ পায়, তখন থেকে নবাগতা শিশু কন্যাকে ছেড়ে হস্পিটালে আছেন। আছেনও বছর খানেক। ভদ্রমহিলা এসে বেশ নিঃসংকোচে আমাদের সংগে গল্প জমিয়ে নিলেন।

গল্পের মাঝখানে দাদাবাবু এক সময় রাণীর হাতখানা টেনে নিয়ে দেখে বললেন: ছোড়দি তুমি খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।

ভদ্রমহিলার চেহারায় ছিল একটা ম্লানিমা এবং মুখে ছিল একটা আছুরে ভাব। উনি খুব ব্যগ্র হয়ে দাদাবাবুকে বললেন: আপনি হাত দেখ্‌তে পারেন, আমার হাতখানা একবার দেখে দেবেন।

: কেন দেখব না, তবে আমি তো আর তেমন হাত দেখতে জানি নে।

ভদ্রমহিলা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: তা যেমন যা পারেন তাই দেখে দিন।

দাদাবাবু হাত দেখে বললেন: তোমার হাত তো বেশ ভাল হাত। আয়ুও বেশ দীর্ঘ। তবে তোমাকে একটা প্রবাল ধারণ করতে হবে।

: আমাকে আরো একজন জ্যোতিষীও প্রবাল ধারণ করতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছিলেন, আমার আয়ু খুব কম—মাত্র চল্লিশ বছর।

: তিনি যখন বলেছিলেন তখন হয়ত তোমার আয়ু রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তাই তিনি ও কথা বলেছিলেন। এখন তোমার আয়ুরেখা বেশ স্পষ্ট, আমি বলছি তুমি দীর্ঘায়ু এবং সুখী হবে।

: তা হলে আমি সেরে উঠবো?

যাঁরা ঐ কথাকটি বলবার সময় ভদ্রমহিলার মুখখানি দেখবার অবকাশ পাননি, তাঁরা কিছুতেই শুধু ঐ কথা কটি দিয়ে তাঁর সেই মুহূর্তের সেই ব্যাকুলতা কোন ক্রমে অনুমান করতে পারবেন না। ঠিক তেমনি উপলব্ধি করতে পারবেন না, দাদাবাবু যখন বললেন: নিশ্চয়; তখনকার সেই খুশী ভরা মুখখানি। অত খুশী যে, কাউকে কিছু দিয়ে করা যায় সে আমার পূর্বে জানা ছিল না। তাই বলছিলাম এ মুখের সংগে কোন কিছুর তুলনা বা বিনিময় করা চলে না।

দাদাবাবুর কথা সত্য হোক, মিথ্যে হোক কিছু মাত্র এসে যায় না, শুধু যিনি মৃত্যু-যাত্রী টি, বি রোগীদের মুখে দক্ষিণা হাওয়ার ঐ আনন্দ-জোয়ার বহিয়ে দিতে পারেন, তিনি নিশ্চয় বিশ্ববাসীর শুভেচ্ছা লাভ করেন।

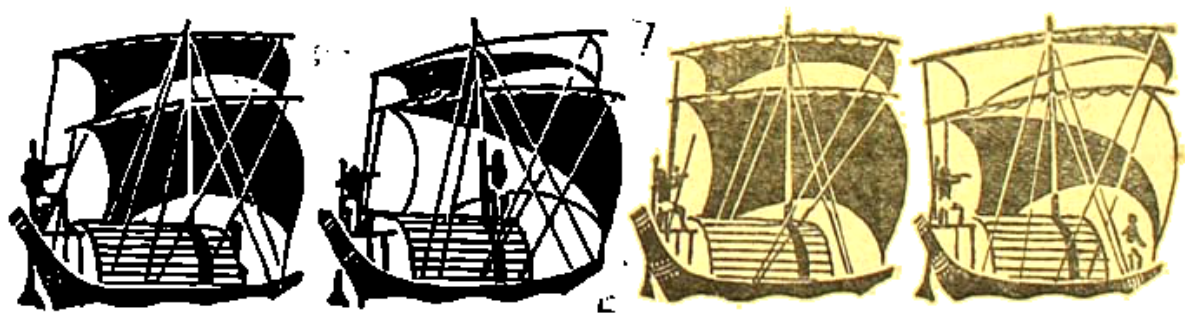

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ ২৮ ॥

নানাসাহেব প্রাসাদে ফিরিয়া সোজা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। এই মুহূর্তে তাঁহার একটু নির্জনে থাকা দরকার। কাহারও সঙ্গ আজ তাঁহার ভাল লাগিতেছেনা।

'হাতের পাশা আর মুখের কথা' একবার বাহির হইয়া গেলে আর ফেরেনা, এ সত্য তিনি ভাল রকমই জানেন। তাই পাশাটা অত তাড়াতাড়ি ফেলিবার ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু—। না, সব গোলমাল হইয়া গেল।

নানাসাহেব স্থির হইয়া বসিতেও পারিলেন না।

তিনি নির্বোধ নন। সারা ভারতের খবর সংগ্রহের জন্য তিনি মুঠামুঠা টাকা খরচ করিতেছেন। আজিমুল্লা ও তাত্যা ভাবে যে কেবল মাত্র তাহাদের বুদ্ধির উপর ভর দিয়াই নানা চলেন। কিন্তু তাহা আদৌ সত্য নহে। এমন কি, তাহাদের উপর খুব বেশী নির্ভর করিবার কারণ আছে বলিয়াও তিনি মনে করেন না। তবে সে সব পরের কথা—এখন তাহাদেরও খানিকটা দরকার বৈকি!

দিল্লী, মীরাট, আম্বালা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ফতেপুর। হয়ত বা কাশী এলাহাবাদও। কিন্তু এইটুকু জায়গাই তামাম হিন্দুস্তান নয়। বাঙলা দেশ একেবারে ঠাণ্ডা। বিহার এখনও অনিশ্চিত। শিখ বা রাজপুতদের উপর কোন ভরসাই নাই। এক তাঁহার নামে মারাঠীরা ছুটিয়া আসিবে। তাও কি সকলে আসিবে? হোলকার, গয়েকোয়াড়, সিন্ধিয়া? তাঁহার বংশের পুরাতন শত্রুরা?

কে জানে। কেমন যেন মাথার মধ্যে সব গুলাইয়া যাইতেছে।...

বড় সাংঘাতিক শত্রু ইংরেজরা। বড় সর্বনাশা শত্রু।

দীর্ঘদিন ইংরেজদের সংস্পর্শে থাকিয়া উহাদের উনি ভাল করিয়াই চিনিয়াছেন। উহারা একটু ভুল করিয়াছে, ভারতীয়দের মানুষ বলিয়াই গণ্য করে নাই। সেই ভুলের মূল্য স্বরূপ প্রথমটায় হয়ত একটু অসুবিধায় পড়িবে। ...কিন্তু শেষ পর্যন্ত?

শেষের কথাটাই ভাবিতেছেন নানাসাহেব।...শেষ রক্ষা হইবে কি?

বহুক্ষণ ধরিয়া নানা অস্থির ভাবে পায়চারী করিলেন। তাঁহাকে এই দুঃসময়ে ঠিক সৎ-পরামর্শ দিতে পারে, এমন একজনও নাই। তাঁহার যাহারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাহারা শুধু উত্তেজিতই করিতেছে।... নানার নিজেরও উত্তেজনার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। হৃদয় ত অহোরাত্রই বলিতেছে ঝাঁপাইয়া পড়ো।...কিন্তু বুদ্ধি বলিতেছে—আর একটু ভাবিয়া দেখ, এখনও সময় আছে।...

অবশেষে একসময় নানা মন স্থির করিলেন।

কার্পেট-মোড়া ঘরের মেঝে—তবু সাবধানে, পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে গেলেন। কপাটটা নিজের হাতে বন্ধ করিয়া দিলেন, ভিতর হইতে। তাহার পর তাঁহার জন্যই-বিলাত-হইতে-লইয়া-আসা সিক্রেটেয়ার টেবিলটার সামনে আসিয়া বসিলেন। কাগজ ও কলম উপরেই

ছিল, টানিয়া লইয়া খস খস করিয়া এক দীর্ঘ চিঠি লিখিলেন।

চিঠি লিখিলেন তিনি হুইলার সাহেবকে।

চিঠি লিখিলেন তাহার মর্মার্থ এই :—

জেনারেল হুইলার অবশ্যই অবগত আছেন—এতদিন এ বিষয়ে তাঁহার অবহিত হওয়াও উচিত—যে দেশের চতুর্দিকেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এদেশী সিপাহীরা বহুদিন যাবতই কোম্পানীর ব্যবহারে তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। এই সিপাহীদের সংখ্যা নগণ্য নহে—তাহাও জেনারেল সাহেবের জানা উচিত। সিপাহীদের পিছনে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন রাজশক্তিও আছেন—কারণ এদেশী রাজন্যবর্গেরও কোম্পানীর উপর প্রসন্ন থাকিবার কোন কারণ নাই। এক্ষণে সে বিদ্রোহের ঢেউ কানপুরে পৌঁছিয়াছে। সিপাহীরা সকলেই তাহাদের নেতৃত্ব করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই মহামান্য পেশোয়ার শরণাপন্ন হইয়াছে। নানাসাহেবের সে নেতৃত্ব করার অর্থ সমগ্র মারাঠা জাতির এই বিদ্রোহে যোগ দেওয়া। এক কথায় হিমাচল হইতে মহারাষ্ট্র, এমন কি সুদূর মহীশূর পর্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে এক যোগে মাথা তুলিবে। সে শক্তির সামনে হুইলার সাহেবের মুষ্টিমেয় স্বদেশবাসী কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবেন তাহা তাঁহার ন্যায় প্রবীণ ও বিচক্ষণ সেনাপতির অনুমান করা কঠিন নয়। নানা ধুন্ধুপন্থের প্রতি কোম্পানী চরম অবিচার করিয়াছেন—ধর্মত এবং ন্যায়ত যেটা তাঁহার প্রাপ্য—সেটা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে নানাসাহেবের অনেক আগেই এই যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়া উচিত ছিল। নানাসাহেব ইহাকে বিদ্রোহ বলিয়া স্বীকার করিতেও রাজী নহেন, হিন্দুস্তানের মুঘলবাদশাহ এবং পেশোয়াদের বিরুদ্ধেই কোম্পানী বরং বারবার বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, এই সাম্রাজ্য গ্রহণ ও পরিচালনায় তাঁহাদের কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী নাই। যাহা হউক জেনারেল সাহেব ও কমিশনার সাহেবের ব্যক্তিগত সখ্য এবং শুভ ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়াই এখনও তিনি ইতস্তত করিতেছেন। এবং সেই পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরেই তিনি সাহেবদের তথা কোম্পানীকে একটি শেষ সুযোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। নানাসাহেব স্বীয় সিংহাসনও চাহেন না, পৈত্রিক সামান্য পেন্সনের উপর তাঁহার ন্যায্য দাবী যদি কোম্পানী মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে নানাসাহেব যে কেবল এই যুদ্ধে সিপাহীদের দিকে যোগ দিবেন না তাহাই নহে—সর্বপ্রযত্নে তিনি কোম্পানীর সহায়তা করিবেন এবং সমগ্র মারাঠাশক্তি সংহত করিয়া ইংরেজদের এই ঘোর বিপদে রক্ষা করিবারও দায়িত্ব লইবেন।...এই পত্র হুইলার সাহেবের হস্তগত হইবার পর চার প্রহর কাল তিনি উত্তরের অপেক্ষা করিয়া নিজের কর্তব্য স্থির করিবেন এবং কোন উত্তর না পাইলে বা তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিকূল উত্তর পাইলে তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্যও দায়ী থাকিবেন না।...

দীর্ঘ পত্র কিন্তু লিখিতে বেশীক্ষণ সময় লাগিল না। লেখা শেষ করিয়া একবার আদ্যোপান্ত চিঠিখানি পড়িয়া লইলেন তাহার পর সযত্নে তাহা ভাঁজ করিয়া সাবধানে শীলমোহর লাগাইলেন।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। প্রাসাদের ভিতর কোন শব্দ নাই। দূরে আস্তাবল হইতে মধ্যে মধ্যে শুধু ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এবং হ্রেষা শোনা যাইতেছে—এমন কি সে শব্দ চারিদিকের শান্ত নিস্তব্ধতায় প্রতিধ্বনিত হইয়া ভয়াবহই শোনাইতেছে।

তবু নানাসাহেব সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া ঘরের বাহিরে দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গরমের দিন, সকলেই সম্ভবত ছাদে বা খোলা জায়গায় খাটিয়া বিছাইয়াছে কিন্তু শুইয়া পড়িলেও এতগরমে সহজে ঘুম আসে না। অনেক সময় লোকে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে মাত্র।

নানাসাহেব জুতা খুলিয়া ফেলিলেন। নগ্নপদেই দালান অতিক্রম করিয়া একেবারে একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষের কাছে আসিয়া চাপা গলায় ডাকিলেন, 'মজরকর!'

তেমনি চাপা গলায় জবাব আসিল, 'জী'।

মাংগরকরও একেবারে নিঃশব্দে—এক অপূর্ব কৌশলে সেই গবাক্ষপথেই ভিতরে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

নানাসাহেব আঙ্গরাখার মধ্য হইতে লেফাফাখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, 'এখনই এটা হুইলার সাহেবের বাংলোতে গিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে

এসো। যদি ঘুমিয়ে থাকেন, তাঁর আর্দালীকে ব'লো যে খুব জরুরী চিঠি—এখনই এটা তাঁর পাওয়া দরকার। যাই হোক্ সাহেবের নিজের হাতে ছাড়া কাউকে দিওনা। দরকার হয়ত ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রো। কিন্তু খুব সাবধান, এ চিঠি আর কারুর হাতে না পড়ে বা কেউ না জানতে পারে। যদি তা হয় তাহ'লে তোমার গর্দান যাবে—আর যদি চুপি চুপি কাজ হাসিল ক'রে আসতে পারো মোটা বখশীষ পাবে—যাও। তোমাকে কানপুর শহরে খানিকটা জমি দিয়ে দেব, বুঝলে ?'

মঙ্গরকর নিঃশব্দে শুধু মাথা হেলাইয়া জানাইয়া দিল যে কথাটা তাহার বুঝিতে কোন অসুবিধাই হয় নাই। তাহার পর আবারও যুক্ত করে প্রণাম করিয়া তেমনিই আশ্চর্য কৌশলে সেই গবাক্ষপথে বাহিরের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল।

এবার নানাসাহেব কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। পকেট হইতে উপহার-প্রাপ্ত একখানা বিলাতী রুমাল বাহির করিয়া ললাট ও কণ্ঠের ঘাম মুছিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

নানা ধুন্ধুপন্থ সাধারণত বাহিরে শয়ন করেন না। ঠিক সাহস করেন না হয়ত। তাছাড়া অধিকাংশ দিনই কাটে তাঁহার কোন না কোন উপপত্নীর ঘরে। সেখানে টানাপাখার আয়োজন আছে, বিশেষ অসুবিধা হয় না।

কিন্তু আজ এতরাত্রে আজিমা বা হুসেনী বা আর কাহারও ঘরে যাইতে ইচ্ছা হইল না। সকলেই রাজনীতি আলোচনা করিতে বসিবে। এখন তাঁহার মনের ভাবটা ঠিক আলোচনা করিবার মত নয়।

নানা নিজেই ঘরের কপাটে অর্গল লাগাইলেন, তাহার পর নদীর দিকের শিক লাগানো জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া 'শিবশংকর' ও 'গনপতি মহারাজ'কে স্মরণ করিতে করিতে এ-ঘরেই বহুদিনের অব্যবহৃত বিছানাটাতে শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে সহজে তাঁহার চোখে ঘুম আসিল না। দূরে কম্পমান দীপশিখাটার দিকে অতন্দ্রনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া প্রায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

॥ ২৯ ॥

মংগরকর দারুণ চমকাইয়া উঠিল। সে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে আসিয়াছে—বিড়ালের মতই শব্দহীন পদে কিন্তু তাহার চেয়েও নিঃশব্দে এবং মার্জার গতিতে আর একজন কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই এতক্ষণ, এখনও হয়ত পারিত না, যদি না এই-মাত্র যে সঙ্কীর্ণতম বাঁকটা পার হইয়া আসিল সেটা পার হইবার সময় অনুসরণকারীর গায়ের জামাটা দেওয়ালে ঘসিয়া যাইত। সম্ভবত সে লোকটা বেশী বলিষ্ঠ, তাই অত সুঁড়ি পথে দুদিকের দেওয়ালে বাঁচাইয়া আসিতে পারে নাই। নামান্যই একটু খস্‌খস্ শব্দ হইয়াছে কিন্তু ছুঁচিয়ার মারাঠীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

সে কিছুক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

লোকটা একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—নিঃশ্বাসের শব্দ, যত মৃদুই হউক, শোনা যাইতেছে বৈকি! তবে সেও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

ভয়ে মঙ্গরকরের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল।

সে পিছনে—সে দিব্য মঙ্গরকরকে লক্ষ্য করিতেছে, মঙ্গরকরের সে উপায় নাই। হয়ত কোন হাতিয়ার আছে উহার কাছে, হয়ত কেন—নিশ্চয়ই আছে।.....মতলব কি উহার ?...

অতি ধীরে ধীরে মঙ্গরকর পিছনের দিকে ঘাড়টা ঘুরাইল। নীরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই ঠাওর হয় না। দুদিকে নিরেট দেওয়াল, পিছন দিক হইতে কোন আলো আসিবারও সম্ভাবনা নাই—কারণ এইমাত্র একটা বাঁকের মুখ ঘুরিয়াছে, সামনে আর একটা বাঁক।

মরীয়া হইয়া পড়িলে অনেকসময় মানুষের বুদ্ধিও খোলে। মঙ্গরকরের মনে পড়িল সামনের বাঁকটা ঘুরিতে পারিলেই সামনে খোলা জায়গা পড়িবে। আর কোন আলো না থাক—নক্ষত্রের আলো ত আছেই। এত অন্ধকারের পর সেটুকু পাইলেও অনেকখানি দেখা যাইবে—

যেমন ভাবা প্রায় তেমনিই কাজ। এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-গতিতে অগ্রসর

হইল মজরকর। কিন্তু যে লোকটা পিছনে আসিতেছিল বোধ করি তাহার গতিই মার্জারের মত নয় শুধু—দৃষ্টিও, সে এতক্ষণ ধরিয়া স্পষ্টই দেখিয়াছে অগ্রবর্তীকে—কারণ বাঁকের মোড়টা ঘুরিয়া সঙ্গে সঙ্গেই পিছন হইতে লোহার মত কঠিন ও হাতীর থাবার মত ভারী একখানা হাত কাঁধের উপর আসিয়া পড়িল এবং আর একটা হাত বজ্র-মুষ্টিতে তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিল। না রহিল মজরকরের শব্দ করিবার কোন উপায় আর না রহিল তাহার পলাইবার বা এমন কি নড়িবারও কোন সুযোগ। শুধু ভয়েই নয়, অবশ্যগতিকেও কাঠ হইয়া রহিল।

তবে সুখের বিষয় মজরকরকে সে অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে হইল না। যে লোকটা বাঘে ছাগল ধরার মত তাহাকে ধরিয়াছিল—সে অনায়াসে সেই ভাবেই, যেন শূন্যে উঠাইয়া, তাহাকে লইয়া পাশের একটা কামরাতে ঢুকিয়া পড়িল এবং দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরটা অন্ধকার নয়, ভিতরে কুলুঙ্গিতে একটা চেরাগ জ্বলিতেছিল। অল্প কয়েক মুহূর্ত পরে—আলোটা চোখে সহিয়া যাইতে মজরকর লক্ষ্য করিল, যে লোকটি তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে—সে স্বয়ং সর্দার খাঁ। যখন তাহাকে অবলীলাক্রমে শূন্যে ঝুলাইয়া লইয়া আসা হইতেছিল—তখন এই লোকটির কথাই তাহার মনে পড়িয়াছিল—আর সেই কারণেই—এখন চিনিতে পারিয়াও ভয় কিছু মাত্র কমিল না। এ লোকটার দানবসুলভ দৈহিক শক্তির কথা তাহার জানা আছে—হাতিয়ারের প্রয়োজন নাই, এমনিই তাহার ধড় হইতে মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া লইতে পারে সে অনায়াসে।

সর্দার খাঁ অবশ্য তাহাকে বেশীক্ষণ এসব কথা চিন্তা করিবার অবকাশও দিল না। বিনা ভূমিকায় একেবারেই কাজের কথা পাড়িল, 'কৈ চিঠিটা দেখি।'

মজরকর চুপ করিয়া রহিল, কাঠের মত।

'কৈ দাও, চিঠিখানা।'

'না।'

'দেরী ক'রে লাভ নেই। চিঠি আমার চাই-ই।'

'জীবন থাকতে দেবো না।'

'তাহ'লে জীবনটাই যাবে।'

'তা যাক। মনিবের কাজ করতে গিয়ে মরতে হয় মরব। বিশ্বাসঘাতক—এ অপবাদ ত কেউ দেবে না।'

ভয় মজরকরের কাহারও অপেক্ষা কম নহে কিন্তু এখন যেন কেমন একরকমের অদ্ভুত সাহসে তাহাকে পাইয়া বসিল। জিদ্ চাপিয়া গেল বলা যাইতে পারে।

সর্দার খাঁ আবারও তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল। কহিল, 'তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে বেশী সময় লাগবে না আমার—কিন্তু জোর ক'রে নিতে হ'লে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবেনা। সেটা ত বুঝতেই পারছ—'

মজরকর চুপ করিয়া রহিল।

মুখে আস্ফালন করা করা এক জিনিস, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো আর এক।

যে লোহার মত মুষ্টিটা তাহার গলায় চাপিয়া বসিয়াছে সেটি একটু হেলিলেই ফরসা—মট্ করিয়া ঘাড়টি ভাঙিবে। মজরকর শুষ্ক জিহ্বাটা একবার শুষ্কতর ওষ্ঠে বুলাইয়া ঘেটাকে সরস করিবার বৃথা চেষ্টা করিল—মুখে তাহার কোন উত্তর জোগাইল না।

কুলুঙ্গির মধ্যে চেরাগ জ্বলিতেছিল বলিয়া ঘরের একটা দিকে আদৌ আলো যায় নাই। সুতরাং সেখানে যে তৃতীয় ব্যক্তি একজন ছিল তাহা মজরকরের লক্ষ্য করিবার কথা নহে। এখন সেই দিক হইতেই অত্যন্ত পরিচিত এবং মিষ্ট একটি কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল, 'ওকে ছেড়ে দাও সর্দার খাঁ। আমি দেখছি—'

হুসেনী বেগম!

ঠিকই ত। ধোঁয়া দেখিলেই আগুন বুঝিতে হইবে। সর্দার খাঁ যখন ধরিয়াছে তখন আর কাহার প্রয়োজন!

স্ত্রীলোক জাতটাই এমনি—পুরুষের প্রতিপদে প্রোয়েশা-গিরি করাই স্বভাব। মজরকরের নিজের জীবনের বহু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা মনে পড়িয়া এই মুহূর্তে নানা সাহেবের প্রতি কেমন এক প্রকার অনুকম্পাই বোধ করিতে লাগিল।

সর্দার খাঁ মজরকরকে ছাড়িয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আমিনা অন্ধকার কোণ হইতে খানিকটা সামনের দিকে আসিয়াছে ততক্ষণে।

সর্দার খাঁর কাছে একটা হত্যা ছেলেখেলা মাত্র—কিন্তু মঙ্গরকরকে বাঁচাইয়া রাখা চাই—তাহা আমিনা ভাল করিয়াই জানে। তাই সে কাগজটা নিজের হাতেই তুলিয়া লইল।

"মঙ্গরকর—মানুষ ভয় পেয়ে অনেক বোকামী ক'রে বসে। তার যারা হিতাকাঙ্ক্ষী তাদের কাজ সেটা শোধরানো। ও চিঠি নানাসাহেব হুইলারকে লিখেছেন—একথা জানাজানি হ'লে তাঁর রক্ষা থাকবে না। সেই জন্যই ও চিঠিটা আটকাতে চাই। ওটা তুমি আমাকে দাও, একথা—আমি তোমাকে শপথ ক'রে বলছি আর কেউ জানতে পারবে না—এই আমরা দুজন ছাড়া। তুমি কাল ভোরে পেশোয়াজীকে বলো যে তুমি সাহেবকে চিঠি দিয়ে এসেছ, তাহ'লেই হবে। নইলে পেশোয়ার বিপদের শেষ থাকবে না। আর পেশোয়া বিপদে পড়লে আমরাই বা কোথায় থাকব?'

মঙ্গরকর আড়ে একবার সর্দার খাঁর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'কিন্তু—'

'কিন্তু কি? বখশীষ ত? পাবে বৈকি। নানাসাহেব যা বলেছেন তাত পাবেই, তাছাড়া সহরে খানিকটা জমি আমিও দেব তোমাকে।'

'মাফ্ করবেন বেগমসাহেবা। ওটা ত কাজ করবার বখশীষ। বিশ্বাসঘাতকতার বখশীষ আলাদা।'

'বেশ। কী চাও বলো। যা চাইবে—পাদ্যে কুলোলে নিশ্চয় দেব।'

মঙ্গরকর এবার চোখ তুলিয়া আমিনার চোখের দিকে তাকাইল। কেমন একপ্রকার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, 'যা চাইব দেবেন ত—পাদ্যে কুলোলে?'

আমিনার দৃষ্টিও মঙ্গরকরের দৃষ্টিতে স্থির রহিল, একটি চোখের পাতাও বোধ করি কাঁপিল না। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করিল, 'দেব।'

'যখন চাইব?'

'কথা দিয়েছি যখন—দেবই।'

মঙ্গরকর জামার ভিতর হইতে মোহর করা চিঠিখানা বাহির করিয়া দিল।

চেরাগের ক্ষীণ আলোতেও ঠিকানাটা পড়িতে বা বুঝিতে কোন অসুবিধা হইল না। আমিনা লেফাফাটা সযত্নে নিজের কামিজের জেবে রাখিয়া দিল। মঙ্গরকর নিঃশব্দে কপাট খুলিয়া পূর্বের মতই মার্জারগতিতে বাহিরের সূচীভেদ্য অন্ধকারে মিলিয়া গেল।...

সর্দার খাঁ কপাটটা আবার বন্ধ করিয়া দিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের মতই হিস্ হিস্ করিয়া উঠিল, 'ওর মুণ্ডুটা কিন্তু আমি সত্যিই নিজে হাতে ছিঁড়ে ফেলব মালেকান—এ আমাকে একদিন করতেই হবে।'

আমিনা হাসিল। মধুর কৌতুকের হাসি। কহিল, 'তোরও তাহ'লে মনের ভাব মুখে বেরিয়ে আসে সর্দার?'

তাহার পর কাছে আসিয়া একটা হাত সর্দারের কাঁধে রাখিয়া কেমন একপ্রকার এলাইয়া পড়িবার ভঙ্গীতে তাহার বিশাল বুকে ঠেস দিয়া কহিল, 'এখনই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, আগে বখশীষটা দাবী করুক!

আজও আমিনার এই গামাস্তম প্রশ্নে সর্দার খাঁর উগ্র পৈশাচিক মুখখানা নিমেষে কেমন একরকম মাধুর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সেও হাসিল। অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া কহিল, 'না, লোকটার বড় স্পর্ধা!'

আমিনা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জেব-এর চিঠিখানা দেখাইয়া কহিল, 'ওরে এটা যে আমার কত বড় ব্রহ্মাস্ত্র হইল তা জানিস না। এর জন্যে সত্যিই—আমি না করতে পারি এমন কাজ নেই, না দিতে পারি এমন কোন মূল্য নেই! যেদিন এ অস্ত্র ছাড়ব সেদিন বুঝবি!'

সে ফুঁ দিয়া আলোটা নিভাইয়া সর্দার খাঁর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিল এবং সেই গাঢ় অন্ধকারেই কয়েকটা গলি পথ ও কয়েকটি সিঁড়ি পার হইয়া অনায়াসেই নিজের মহলে গিয়া পৌঁছিল।

সর্দার খাঁও পিছনে পিছনে ছিল বৈকি।

কখনও কোন কারণে সে মালেকানকে চোখছাড়া করে না। মালেকান নিরাপদে মহলে পৌঁছানো পর্যন্ত আজও সে নিঃশব্দে খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখিয়া অনুসরণ করিয়াছিল। আজও যথানিয়মে মহলের দ্বার তাহার মুখের সামনে বন্ধ হইয়া গেল। প্রয়োজন ছাড়া সর্দার খাঁর কথা ভাবিবার অবসর মালেকানের নাই—সে কথা সেও জানে। তাই প্রতিদিনের অভ্যাসমত, আর কোন

প্রয়োজন মালকানের স্মরণ হয় কিনা সেই অবসরটুকু দিয়া, আজও সে খানিকটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার অন্ধকারেই যখন সে নিজের বাসার দিকে রওনা হইল—তখন তাহার একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়িল না। হয়ত ঐ পাথরের মত বুকখানায় তাহার নিঃশ্বাসও পড়ে না।

॥ ৩০ ॥

নানা পরের দিন সকালে প্রায় দুই প্রহর বেলা অবধি হুইলারের কাছ হইতে উত্তরের অপেক্ষা করিলেন। মঙ্গরককে তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—সে হুইলার সাহেবের হাতেই চিঠি দিয়া আসিয়াছে। সুতরাং উত্তর একটা এতক্ষণে আসা উচিত। 'হাঁ' কিংবা 'না'—সোজাসুজি একটা উত্তর। সাহেব জাতের ভদ্রতায় এতটুকু বিশ্বাস তাঁহার এখনও আছে—চিঠির উত্তর একটা দিবেই।

কিন্তু একের পর এক প্রহর বৃথাই কাটিয়া গেল তাঁহার উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায়, কোন উত্তরই আসিল না।

একবার মনে হইল আর কাহাকেও পাঠাইয়া খোঁজ করেন কিন্তু পরক্ষণেই আত্মধিক্কার জাগিল—ছি! সাহেব মনে করিবে গরজটা তাঁরই বেশী।

এধারে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে নানান খবর আসিতেছে।

সাহেব পাড়ায় ঘরবাড়ী জ্বলিতেছে। চোরা-গোপ্তা খুনজখম ত চলিতেছেই।

উহারা যে বিষম ভয় পাইয়াছে, তাহা মুখচোখের চেহারাতেই টের পাওয়া যাইতেছে। স্ত্রীলোক কিছু ও ও অসুস্থ লোক ইতিমধ্যেই সেই মাটির কেল্লায় শুইতে শুরু করিয়াছে। আজিমুল্লা উহার নাম দিয়াছে "নাচারগড়"। বাকী যাহারা অস্ত্র ধরিতে পারে তাহারা সারারাত সশস্ত্র বসিয়া পাহারা দিতেছে। দিনে-রাতে ঘুম নাই কাহারও।

তবু তাঁহার চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিলনা উহারা।

আশ্চর্য স্পর্ধা ত!

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত ক্রুদ্ধ আক্রোশে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন নানা ধুন্ধুপন্থ। ইচ্ছা হয় প্রত্যেক ইংরেজটাকে তিনি ধরিয়া নিজ হাতে একটু একটু করিয়া গলা টিপিয়া মারেন। শুধু কেবল—। বড় ভয়ঙ্কর উহারা, বড় ভয়ঙ্কর!

খবর এদিকে সবই শুভ—গত দু'তিনদিনের মধ্যে বেরিলি, বদাউন, মোরাদাবাদ সর্বত্র বিদ্রোহীদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোথাও ইংরেজরা বাধা দিতে পারে নাই। বন্যার জলের মত এই প্রচণ্ড শক্তি একে একে সারা হিন্দুস্তান ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তারপর? বন্যার জলের মতই যদি ক্ষণস্থায়ী হয় সে শক্তি?

চারিদিক হইতে 'টেলিগিরাপে' সংবাদ আসিতেছে গতকালকার দুটি সংবাদই—পুব এবং পশ্চিমের—পৌঁছিয়াছে আজ সকালে।

মোরাদাবাদে জজ উইলসন বহুদিন অবধি বন্যাকে নিজের ব্যক্তিত্বের বাঁধ দিয়া ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন—কিন্তু গত কাল তিনিও হার মানিয়াছেন। সরকারী খাজাঞ্চীখানা সিপাহীদের হাতে পড়িয়াছে, সাহেবদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও কেহ কিছু লইতে পারে নাই। কোনমতে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছে মাত্র।

তবে কি ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য—তাঁহার কল্যাণের জন্যই হুইলার উত্তর দেয় নাই? সৌভাগ্যসূর্য কি সত্যই অস্ত গিয়াছে। এখন তাহাদের—ইংরেজের—সহিত সন্ধি করিলে তাঁহাকেও তাহাদের সহিত চরম দুর্ভাগ্য—অপমান ও মৃত্যুবরণ করিতে হইত?

যদি সেই কথাটাই বিশ্বাস করিতে পারিতেন।

আজ আবার একটি সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। পুবে জেনারেল নীল মার্চ করিয়া আসিতেছেন। কাশীর কাছাকাছিই আসিয়া পড়িয়াছেন।

প্রথম আঘাতের প্রচণ্ডতা ও আকস্মিকতায় ইংরেজ জাতির রণদুর্দমতা হয়ত খানিকটা স্তম্ভিত হইয়াছে মাত্র—সময় পাইলেই প্রচণ্ডতর বেগে সে আবার প্রত্যাঘাত করিবে।

এক ভরসা, যদি বিহার ওদিকটা সামলাইয়া লয়। কিন্তু পারিবে কি?

সংশয়, আশঙ্কা ও দ্বিধায় নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত হইতে হইতে নানাসাহেব অসহায়ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গণিতে লাগিলেন। কিছুই করা হইল না।

সেদিন নানা ধুন্ধুপন্থ নিজেকে লইয়া এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে হুসেনী বেগমের খবর লওয়ার তাঁহার অবসর মিলে নাই। লইলে জানিতেন সে বেগমসাহেবা তাহার মহলে নাই—প্রাসাদ হইতে বহুদূরে আজিজনের বাড়ী সিধা সকাল হইতে বসিয়া আছে।

নীলের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ আমিনাও পাইয়াছে। বিহার এখনও চুপচাপ। কুঁয়ারসিং এখনও টেলার সাহেবের ভরসা ছাড়িতে পারেন নাই। অপর সকলেও দোলাচল-চিত্ত।

যদি বিহার না ইংরেজদের ওদিকে ব্যস্ত রাখিতে পারে তাহা হইলে—

তাহা হইলে এখানে কিছুই হইবে না। নানাসাহেব যে এখনও ইতস্তত করিতেছেন তাহা আর কেহ না জানুক আমিনা জানে।

ইংরেজের কোথাও কোন পাল্টা জয়লাভ হইয়াছে—এই ধরণের একটি সংবাদও আসিবার আগে এখানে আগুন জ্বালিতে হইবে। দাবানল জ্বলিলেই ঝড় ওঠে, সেই ঝড়ের ঝাপ্টায় নানাসাহেবকেও উড়াইয়া আনিয়া ফেলিবে। আগুনের আবর্তে আসিয়া পড়িবেন।

নানাসাহেবের জন্য এতটুকু চিন্তিত নয় আমিনা, তাহার নিজের জন্যই সে ব্যস্ত।

তাহার নারীযজ্ঞে যে এখনও পূর্ণাহুতি পড়ে নাই—তাহার প্রতিহিংসা যে এখনও চরিতার্থ হয় নাই।

শামসুদ্দীন খাঁ যাতায়াত করিতেছে টীকাসিংহের কাছে। তাহারই আগমন-প্রতীক্ষায় দুই বোন উৎকণ্ঠিত বসিয়া আছে।

বেচারী শামসুদ্দীন।

কাল কী কুক্ষণেই যে আজিজনের ঘরে মাথা-গলাইয়াছিল।

আজিমুল্লার কাছ হইতে পূর্বাহ্ণেই একটি মোহর বখশীষ পাইয়াছিল সে—নৌকার নাটকটা অভিনয় করার বায়না হিসাবে। তখন হইতেই তাহার সঙ্কল্প স্থির ছিল। নৌকার ফেরৎ সোজা আসিয়া মোহরটি আজিজনের হাতে দিয়া বলিয়াছিল, 'নাও বিবি, এবার খুশী ত?'

আজিজন সুর্মা-টানা চোখে বিদ্যুৎ হানিয়া বলিয়াছিল, 'তোমাকে দেখেই খুশী খাঁ সাহেব। মোহর কি আমি চেয়েছি?'

'না তা চাওনি, সত্যি কথা। তোমার বহুত মেহেরবানী আমার ওপর—পেয়ার বলতে সাহস হয় না—কিন্তু কী জানো বিবি সাহেব, তোমার ও সোনার হাতে সোনার মোহর ছাড়া মানায় না যে।'

তাহার পর আরও দুইটা টাকা জেব্ হইতে বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া বলিয়াছিল, 'তোমার নোকররা সব গেল কোথায়, কিছু মালটাল আনাও!'

'ব্যাপার কি খাঁ সাহেব, টাকায় ভাস্‌ছ যে আজ। কোথা থেকে এল এত?'

'আসবার এখনই কি হয়েছে। বলো, আর দুটো-পাঁচটা দিন সবুর করো। শাহী ত আমাদের হাতেই আসছে। আংরেজ আর কদিন? যত টাকা জমিয়েছে ঐ হারামখোরগুলো, সব আগে হাতে পাই—তোমার এই খড়ের কড়িকাঠ অবধি মোহরে ঠেসে দেব। ওর কি?... নাও, চালাও ফুর্তি।'

তা ফুর্তিটা কাল খুব জমিয়াছিল ঠিকই।...

কিন্তু ভোর না হইতেই তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া এই যে বিবি সাহেব সুতার টানার মত একবার ব্যারাক আর একবার বিবির বাড়ী—নাকে দড়ি দিয়া ছুটাইতেছে এইটেই যেন কেমন কেমন। অথচ ঐ খুব-সুরৎ বিবি যদি গলা জড়াইয়া গালে গাল রাখিয়া অনুরোধ করে ত সে অনুরোধ ঠেলাই বা যায় কেমন করিয়া?

তার উপর আজিজন তাহার কথা দিয়াই তাহাকে জব্দ করিয়াছে।

বলে, 'আখো আর কতদূর। শুনছিই ত আজ সেই ছমাস আগে থেকে যে শাহীটা তোমরা নিয়ে নেবে।... কৈ? হালচাল ত সে রকম দেখছিনা। ভাল মানুষের মত রোজই ত তোমরা আংরেজ গুলোর হুকুম মাফিক কুচকাওয়াজ করছ—নড়ছ ফিরছ ঘুরছ।...তোমাদের যা মর্দানী আমার জানা আছে, মুখেই যা কিছু লম্ফ ঝম্প, তাও আমার মত মেয়েমানুষের কাছে!'

শামসুদ্দীনের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া ওঠে। বলে, 'আজই, আজই শুরু হয়ে যাচ্ছে [redacted], তাও জানো না।'

'তুমি ছাউনী থেকে ঘুরে আমাকে পাকা খবরটা দিয়ে যাও খাঁ সাহেব।'

'তোমার এত তাড়া কেন বলো ত ?'

'বাঃ—আংরেজের খাজাঞ্চীখানা তোমাদের হাতে পড়লে মোহর দিয়ে আমার ঘর ভরিয়ে দেবে—সে কথা কি ভুলে গেলে ?·· এরই মধ্যে যদি ভুলে যাও ত টাকা হাতে পেলে কী করবে ?'

কাল প্রথম রাত্রির প্রতিজ্ঞা ও আজ প্রভাতের মধ্যে বহু বোতল মদ বহিয়া গিয়াছে—তবু ক্ষীণ ভাবে কথাটা মনে পড়ে বৈ কি।

'খামখাঙ্কা কেন বিবি—ঠিক পাবে তোমার মোহর।'

'মোদ্দা খবরটা দিয়ে যেও।'

'দেব। এখন প্যারেড্ আছে—দেরেই দিয়ে যাবো।'

'ঠিক ত ?'

'ঠিক।'···

শামসুদ্দীন অবশ্যই কথা রাখিয়াছিল।

সে আসিয়া খবর দিয়াছিল যে, সে কিছুমাত্র বাজে কথা বলে নাই, আজই বাঘের খেলা সুরু হইবে। স্বয়ং টীকা সিংহের মুখ হইতে সে খবর লইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু তবু অব্যাহতি পায় নাই।

আজিজন অনুরোধ করিয়াছে—সুমধুর অনুরোধ আদেশেরও বাড়া—ঠিক কখন হইতে শুরু হইবে, সব কয়টি রেজিমেণ্ট যোগ দিবে কিনা, অথবা—কোনটির সম্বন্ধে এখনও কিছু সংশয় আছে—সবটার পাকা খবর দিয়া যাইতে।

সে খবরও শামসুদ্দীন দিয়া গিয়াছে। বৃহস্পতিবারের বিকালের দিকটায় বুঝি দিন ভাল থাকেনা—টীকা সিংয়ের মত কুসংস্কার—তাছাড়া চন্দ্রলজ্জার ব্যাপারও একটা আছে—সুতরাং রাত্রেই সুবিধা। কোনমতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবিজান যেন ধৈর্য ধরে, আর কিছু ভাবিতে হইবেনা।

তাহাতেও রেহাই মিলিলনা।

আজিজন তাহার জন্য সরবৎ ফরমাশ করিবার নাম করিয়া ভিতর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, 'খাঁ সাহেব, তুমি আমার জন্যে অনেক মেহনৎ করলে, একথা আমি কখনও ভুলবনা—কিন্তু আরও একটা কথা বলব—সেটাও রাখতে হবে—আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি।'

'আবার কী ? আমাদের এখন কত কাজ সেটা বুঝছ না বিবি সাহেব।'

'ও, কাজটাই বুঝি বড় হ'ল—আমার চেয়ে ? বেশ যাও—কিছু করতে হবেনা।'

'বলো, বলো, বলে ফ্যালো—কী ফরমাশ !'

'ঠিক কখন থেকে তোমরা কাজ শুরু করবে—আমি জানতে চাই। কিছু একটা নিশানী ঠিক করে জানিয়ে দিয়ে যেও। ব্যস—আর কিছু নয়, এই-ই আখেরী।'

'অনেক ফরমাশ খাটলুম বিবি, বখশীষ কি মিলবে তা এখনও কিছু শুনিনি !' শামসুদ্দীন দাঁত বাহির করিয়া বলে।

'মিলবে কি—মিলে যাচ্ছে ত হাতে হাতে !'

'কী রকম—কী রকম ?'

'এই যে যতবার আসছ আমাকে দেখতে পাচ্ছ, আমার কথা শুনছ—সেটা লাভ নয় ?'

'হাঁ।—তা ঠিক, তবু বান্দা কিছু উপরি বখশীষও আশা করে।

'এইটুকু ক'রে যাও—আজিজন বিবি বান্দার বাঁদী হয়ে থাকবে চিরকালের মত !'

'ঠিক ?'

'ঠিক।'

শামসুদ্দীন খুশী হইয়া প্রায় নাচিতে নাচিতে চলিয়া গিয়াছে—এবং খানিক পরে টীকা সিংহের অনেক তোষামোদ করিয়া খবরটি জানিয়া লইয়া পৌঁছাইয়াও দিয়াছে।

'তিনটি পিস্তলের আওয়াজ হবে পর পর ! তাহলেই জানতে পারবে আমরা আমাদের কাজ শুরু করলুম। হ'ল এবার ? খুশী ?'

'খুশী।'

'তাহ'লে আমার বখশীষটা ?' নাটকীয় ভঙ্গীতে সেলাম করিয়া দাঁড়ায় শামসুদ্দীন।

আজিজন জবাবটা মুখে দেয়না—কৃতজ্ঞতা কাজেই জানায়।

এক হাতে শামসুদ্দীনের গলা জড়াইয়া আর এক হাতে নিজের খোঁপার মধ্য হইতে আতরের তুলিটা বাহির করিয়া তাহার দাড়ীতে ও গালে আতর লাগাইয়া আদর করিয়া গাল টিপিয়া বলে, 'অত ঘন ঘন বখশীষের লোভ ভাল নয়—বুঝলে খাঁ সাহেব।'

(ক্রমশঃ)

কাশ্মীর প্রসঙ্গ ও ব্রিটেন

শংকর

কাশ্মীর ভারতের ইতিহাসে নূতন ভূমিকা গ্রহণ করিতে যাইতেছে। পাকিস্তান তাহার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে। অর্থাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে নিজ দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য যত প্রকার কলা-কৌশল প্রয়োগ করিবার মত আছে তাহা সবই উজাড় করিয়াছে। পাকিস্তানের এইসব কৌশল ও যুক্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রিটেনের মনোভাব আমাদের বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করিয়াছে। ব্রিটেন কী চায়? পাকিস্তানের মত ভারতও ব্রিটেনের বন্ধু। কিন্তু ব্রিটেন ভারতের বন্ধুত্বের প্রতি যেন আড় চোখে চাহিতেছে। মনে হইতেছে ব্রিটেন কাশ্মীরকে একটা দাবা খেলার ঘোড়ের মত ব্যবহার করিতেছে। নচেৎ চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া ব্রিটেন কিছুতেই ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে বিদেশী সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব সমর্থন করিত না। কাশ্মীরের ঘটনা সবই ব্রিটেন জানে, তাহার তহবিলে সব ঘটনাই জমা আছে, তবু কেন যে ব্রিটেন এমনটা করিল, এই প্রশ্ন প্রত্যেকটি ভারতবাসীর মনে জাগিবে। ব্রিটেন মিশর হইতে যে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা তাহার কাজে লাগে নাই।

মিশর আক্রমণে ব্যর্থ হইয়া ব্রিটেন আত্মচিন্তাও করে নাই। তার সমস্ত পররাষ্ট্র নীতিই ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতেছে। সে ভাবিতেছে: যদি ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও শান্তি ঠিক থাকে তবে তাহার সব কূলই রক্ষা হইবে। আসলে ইহা অবাস্তব চিন্তা। কেননা, ব্রিটেনের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা কিছু সবই প্রাচ্য দেশে—ইহার মধ্যে ভারত একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, আফ্রিকার অংশও যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু ব্রিটেন তাহার অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব খুঁজিতে গিয়া এশিয়া বা আফ্রিকাবাসী কাহারো নিকট বন্ধুত্ব প্রদর্শন করে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাকা পররাষ্ট্রবিদ্‌দের মত ফরাসীর কাঁধে কাঁধে মিলাইয়াছে মাত্র। ফলে সে মিশরের সুয়েজ সমস্যাকে খানিকটা ফরাসীর চোখ দিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু ফরাসীর চেয়ে প্রাচ্যখণ্ডে ব্রিটেনের আজও অধিকতর হিত-স্বার্থ রহিয়াছে। এই হিত-স্বার্থ রক্ষায় সেকেলে অস্ত্র-কৌশল অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। একথা ব্রিটেন কেন ভাবিতেছে না—তাহা ভাবিয়া আমরা আশ্চর্যবোধ করিতেছি। বস্তুত এই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা হইতেই ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের পররাষ্ট্রনীতি জন্ম লইয়াছে।

ভারত মিশরের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের বিরোধিতা করিয়া হইয়াই প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছে যে নিছক জঙ্গীবাদ আজিকার দিনে অচল। ক্রুদ্ধ রক্ষণশীল দল সুয়েজ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিত হারাইয়া ভারতের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছে এবং কাশ্মীরকে বিরোধের বাহ্য খণ্ড হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্রিটেনের শিল্পপতিরা সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক। এখানে ভারতে ব্রিটেনের বিপুল মূলধন খাটিতেছে। সুতরাং বৈষয়িক ব্যাপারে ব্রিটেনের স্বার্থ পাকিস্তানের চাইতে ভারতেই বেশী রহিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের ইঙ্গ-মার্কিন ভারত বিরোধী প্রস্তাব দেখিয়া মনে হয় এই অকাট্য বাস্তব স্বার্থটা ব্রিটেন ভুলিয়া গিয়াছে। এই ভুল কি ইচ্ছাকৃত, না সত্য-সত্যই বেহিসাবী কারবার তাহা বুঝা মুস্কিল। যদি বেহিসাবী কারবার হয় তবে ব্রিটেনকে—রক্ষণশীল ব্রিটেনকে—এই জন্য অনুতাপ করিতে হইবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত নীতি হয় তবে ব্রিটেনকে অচিরেই দূর প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যে আপনার ক্ষমতার দুঃখ-জনকে সীমা অনুভব করিতে হইবে। কেননা, মধ্য প্রাচ্য রক্ষার ইতিমধ্যেই মার্কিন আগাইয়া আসিয়াছে। এবং আজ অব্যবস্থার চাপে ব্রিটেন খণ্ড শক্তির অধিকারী হইয়াছে, এবং মধ্য প্রাচ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা দেখা দিয়াছে তাহা কেবলমাত্র শক্তির মহড়া দেখাইয়া প্রশমিত করা সম্ভব হইবেনা। কাজেই মিশর ও মধ্য প্রাচ্যে

পররাষ্ট্রনীতি নূতন করিয়া চালিয়া সাজিতে হইবে। ভারত মিশরে ব্রিটিশ নীতির নিন্দা করিয়া শুধু এই সত্য প্রকাশ করিয়াছে, এবং মধ্য প্রাচ্যব্যাপী নব জাগ্রত চেতনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছে।

ব্রিটেন—বিশেষ করিয়া রক্ষণশীল ব্রিটেন—ভারতকে বিব্রত করিবার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রস্তাব আনিয়াছে। এই প্রস্তাবের কার্যকারিতা কি, ইহার ফল কতটা ব্যাপক হইতে পারে ব্রিটেন তাহা খতাইয়া দেখে নাই। শুধু কূটনৈতিক হিসাবে দেখিয়াছে, যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের বাহিনীর নামে একবার ভারতে বিদেশী সৈন্য প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলেই হয়। তাহা হইলে ভারতের নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় একটা কীলক প্রবেশ করানো যাইবে, এবং পরবর্তীকালে সবই সম্ভব হইবে, বহিঃশত্রু আক্রমণ, চাই কি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্রিটেন ও তাহার সমগ্র অধিবাসী এইরূপ চিন্তা করে না। কয়েকজন রাজনীতিক বাদে গড়পড়তা ব্রিটেনের অধিবাসী অন্তরূপ চিন্তা করিয়া থাকে। আমাদের এই বিশ্বাস যে বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রমাণ পাওয়া যাইবে মিঃ বিভানের উক্তি হইতে। তাঁর বিবৃতিতে প্রকাশ যে তিনি ও তাঁর দল (শ্রমিক দল) মধ্য প্রাচ্য ব্যাপারে এইরূপভাবে জড়িত হইতে চাহেন না। ইহা হইতেই ব্রিটেনের রাজনৈতিক চেতনার আর একটি প্রবাহ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি মিঃ গানার জেরিং ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন—এবং ইতিমধ্যেই প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে ভারতের নীতি মিঃ গানার জেরিংকে সবিনয়ে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, মিঃ গানার জেরিং ভারতে আসিবার পূর্বে ইঙ্গ-মার্কিন নীতির অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে। কেননা, ভারতের ব্রিটিশ হাই কমিশনার মিঃ ম্যালকম্ ম্যাগ্‌ডোনাল্ড ভারতের বিষয় আলোচনার জন্যই ব্রিটেনে গিয়াছিলেন। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের মতামত মার্কিন প্রতিনিধিও জানিতে পারিয়াছেন। তাই মনে হইতেছে ইঙ্গ-মার্কিন নীতি রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে যে ভুল করিয়াছে তাহার হয়ত পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দিবেনা। তাঁহারা চাহেন যে, পরস্পর রাষ্ট্রের মধ্যে (ভারত ও পাকিস্তান) আলাপ-আলোচনার দ্বারা সমস্যার সমাধান হোক। যে কোন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এমন প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, যদি এই নীতির সার্থকতা ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতিকেরা খুঁজিয়া পাইয়া থাকেন তবে নিরাপত্তা পরিষদের ঐরূপ প্রস্তাবের কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু ভারত কাশ্মীর সম্পর্কে তার নীতি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিয়াছে। কেন যে, আজ কাশ্মীর গণভোটের প্রশ্ন অবান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা পূর্বাপর ঘটনাদ্বারা নিরাপত্তা পরিষদে বিবৃত হইয়াছে। এই নীতির ভিত্তিতে মিঃ কৃষ্ণমেনন কাশ্মীরের আইন সম্মত কি ঘটিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। গণভোটের যে পরিপ্রেক্ষিত তখন ছিল আজ তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তন পাকিস্তান স্বীকার না করিলেও, বিশ্ববাসী স্বীকার করিবেন।

কাশ্মীরের সাংবিধানিক পরিবর্তন বিশেষ লক্ষ্য করিবার। কাশ্মীরবাসীরা নিজস্ব গঠনতন্ত্র রচনা করিয়া তাহার নির্বাচন সর্বত্র শেষ করিতে চলিয়াছে— জননতের এই যে পরিবর্তন তাহা পাকিস্তান স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। বস্তুত কাশ্মীরবাসীর এই মানসিক পরিবর্তন পাকিস্তানীদের বেসামাল করিয়াছে। নিজ গৃহে যাহারা গণতন্ত্রসম্মত কার্য করিতে সমর্থ হয় নাই—তাহারাই অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই অপকর্মের ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে তাহা পাকিস্তান ভাবিতেও পারেনা। আমরা আশা করি ইতিহাসের সিদ্ধান্ত পাকিস্তান মানিয়া চলিবেন।

সত্যি... মেপোল

সব চেয়ে ভাল

১/০ আনায় ১০টি, ১৸০ আনায় ৫০টি

ACI

MJ/168

সঞ্চয়ই শ্রেষ্ঠ সেবা

আমাদের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় নতুন ভারত গড়ার মহান কাজে আগামী পাঁচবছরে ব্যয়ের জন্যে ৪,৮০০ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। এই বিপুল অর্থের ৫০০ কোটি টাকা পেতে হবে জাতীয় সঞ্চয় হতে। আপনার দান যতই সামান্য হোক, দেশোন্নয়নের কাজে লাগবে

ভারতের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করুন

জাতীয় সঞ্চয়

জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য

এইভাবে টাকা খাটানোর সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য কিতাবাদি জানতে হলে
ন্যাশন্যাল সেভিংস কমিশনার, সিমলা, অথবা আপনার রাজ্যের
রিজিওন্যাল সেভিংস অফিসারকে লিখুন।

DA 56/212

নিঃসন্দেহে—তারও অধিকার আছে ...

"মন্দির-প্রবেশ হলো একটি পবিত্র কাজ, যা' 'অস্পৃশ্য'দের কাছে হবে স্বাধীনতার মর্মবাণী, যা' তাদের আশ্বাস দেবে, ভগবানের কাছে তারা পদানতচ্যুত নয়।"

—মহাত্মা গান্ধী

অস্পৃশ্যতা বিলোপ করে ভারতীয় সংবিধান সকলকে সমান সামাজিক ও নাগরিক অধিকার দান করেছে। কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে একই ধর্মমতাবলম্বী লোকের জন্যে উন্মুক্ত সর্বসাধারণের কোনো পূজার স্থানে প্রবেশ করায় বাধা দিতে পারে না, অথবা একই ধর্মমতাবলম্বী অন্য লোকের জন্যে অনুমোদিত বিধি-নিয়ম মেনে সর্বসাধারণের কোনো পূজার স্থানে পূজা, প্রার্থনা বা কোনো ধর্মানুষ্ঠান পালন করায় আপত্তি করতে পারে না।

অস্পৃশ্যতা নির্মূল করুন—সমতার আদর্শ তুলে ধরুন

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ভারতীয় কাগজ শিল্প

কাগজ শিল্প প্রত্যেক সভ্যদেশেই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বলে গণ্য হয়ে থাকে। বস্তুতঃ কোন দেশের কাগজের কাটতির পরিমাণ থেকে সেখানকার সভ্যতার মান সম্পর্কে ধারণা করা চলে। ভারতে কাগজের কাটতির পরিমাণ অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় অতি নগণ্য। যেখানে জাপানে মাথাপিছু কাগজের কাটতির পরিমাণ ৫০ পাউণ্ড, ইউরোপীয় দেশসমূহে ১০০ থেকে ২০৪ পাউণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৪০০ পাউণ্ড, সেখানে ভারতে মাথা পিছু কাগজের কাটতির পরিমাণ মাত্র দু'পাউণ্ডের মত। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে কাগজের কাটতির পরিমাণ ছিল ৩,১৭,০০০টন। এর আগে ১৯৫০-৫১ সালে এর পরিমাণ ছিল ২,০৯,০০০ টন। অথচ এই সময়ে দেশে কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ ১,১৪,০০০ টন থেকে বেড়ে ২,২৭,০০০ টন হয়। কাটতির পরিমাণ থেকে দেশের উৎপাদন কম হওয়ায় বিদেশ থেকে প্রায় ১,৩০,০০০ টন কাগজ প্রতি বৎসর আমদানী করতে হয় এবং এজন্যে প্রতি বৎসর ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশে শিক্ষা আরও বিস্তার লাভ করলে কাগজের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলবে। বর্তমানের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬০-৬১ সালে, দেশের বিভিন্ন প্রকারের কাগজের চাহিদা ৫২০,০০০ টনে দাঁড়াবে বলে অনুমান। মূল্যের দিক থেকে বর্তমানের ২৯ কোটি টাকার জায়গায় তখন কাগজের মূল্য হবে ৬৯ কোটি টাকা। সুতরাং ১৯৬০-৬১ সালে দেশের কাগজের উৎপাদন আরও ৪০ কোটি টাকা মূল্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

ভারতের কাগজ শিল্পের একটি সুবিধা এই যে এই শিল্পের কাঁচা মালগুলির অধিকাংশই এই দেশেই পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে এই শিল্প পিছিয়ে পড়ে আছে, তার কারণ কাঁচা মালের প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব, পরিবহন-ব্যবস্থার অনুপযুক্ত বন্দোবস্ত এবং দেশের অভ্যন্তরে কল-কব্জা প্রাপ্তির অভাব। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা কালে দেশে কাগজের উৎপাদন কিছু বাড়লেও, চাহিদার পরিমাণ আরও বেশী বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং কাগজ শিল্পের সমস্যাগুলির সমাধান করে কাগজের স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভের জন্য খুব সুপরিকল্পিত কার্য-সূচী গ্রহণ করবার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শিল্পের প্রতিবন্ধকের মধ্যে, বাঁশ প্রভৃতি কাঁচামালের সরবরাহ অন্যতম। এদের প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণার অভাব, পরিবহনের সুবন্দোবস্তের অভাব এবং বনীকরণের দ্বারা এই কাঁচামালের সরবরাহ ঠিক রাখার বে-বন্দোবস্ত এই অসুবিধার প্রধান কারণ। সম্প্রতি সরকার এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্য একটি তদ্বির্ধক (অ্যাড্ হক) কমিটি স্থাপন করেছেন, বন-বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল এই কমিটির সভাপতি। এই কমিটিকে বাঁশ, ব্যাগাসি, ছবাই প্রভৃতির প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে বলা হয়েছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবে।

রবার শিল্পের উন্নয়ন

১৯৫৫ সালের হিসাবে ভারতে মাথা পিছু রবারের কাটতি ০·২ পাউণ্ড এবং সেখানে চীনদেশে ০·৩ পাউণ্ড

জাপানে ১·৩ পাউণ্ড, রাশিয়ায় ৩ পাউণ্ড পশ্চিম জার্মাণীতে ৭·৪ পাউণ্ড, বৃটেনে ১১·৭ পাউণ্ড এবং আমেরিকায় ২০·৭ পাউণ্ড। এ থেকে বোঝা যায় যে এদেশে রবার শিল্পের উন্নয়নের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা রয়েছে। বিগত কয়েক বছরের রবারের কাটতির হিসাব নিলে দেখা যাবে যে আগামী বছরগুলিতে রবারের কাটতি অনেক বেড়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৪৯ সালে ভারতে রবারের কাটতি ছিল ১৯,১৯২ টন, আর ১৯৫৬ সালে এই কাটতির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৩১,৪০৫ টন। কাটতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে গিয়েছে। ১৯৪৯ সালে ভারতে রবারের উৎপাদন ছিল ১৫,৫৮৭ টন আর সেখানে ১৯৫৬ সালে এর পরিমাণ হয়েছে ২৩,৪৪৪ টন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রবার উৎপাদনের যে পরিমাণ স্থির করা হয়েছে তাতে পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেছেন যে ১৯৬১ সালে উৎপাদকদের কাঁচা রবার ৪০,০০০ টন প্রয়োজন হবে। বর্তমানে রবার উৎপাদক সমিতির মতে ১৯৬১ সালে উৎপাদকদের ৬০,০০০ টন কাঁচা রবার প্রয়োজন হবে এবং দেশীয় উৎপাদন বর্তমানের ২৪০০০ টন। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারতকে আরও অনেক বছর পর্যন্ত আমদানী কৃত রবারের উপর নির্ভর করতে হবে। ১৯৫৬ সালে রবারের আমদানী হয়েছে ৯,২১০ টন, অর্থাৎ দেশীয় উৎপাদন ও মোট কাটতির ব্যবধান থেকে ১,২৫২ টন বেশী, ১৯৫৫ সালে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩,৪৯১ টন। ১৯৫৬ সালে ভারতে রবার উৎপাদকেরা ২৪০৯ টন কৃত্রিম রবার ব্যবহার করেন এবং ১৯৫৫ সালে এর পরিমাণ ছিল ১০৫ টন। এই সময়ে কৃত্রিম রবারের আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭১০ টন ও ৫৬২ টন।

আখের উৎপাদন বৃদ্ধি

চলতি মরশুমে অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে আখের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়ে যাবে বলে আশা করা যায়। সমগ্র ভারতের হিসাবে এই মরশুমে আখের উৎপাদন ৫ কোটি ৪৮৯ লক্ষ টন হবে বলে অনুমান। এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ আখের চাষে অধিকতর জমির নিয়োগ। এই বছর আখের চাষে ৪৫ লক্ষ একর জমি ছিল কিন্তু পূর্ববর্তী বছরে ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ একর। একর পিছু উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়ে সমগ্র ভারতে একর পিছু উৎপাদন ১৯৫২-৫৩ সালে ছিল ১২·৮ টন কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালে তা হয়েছে ১৩·২ টন। আখ-চাষে অধিকতর জমির নিয়োগ ছাড়া আরও তিনটি কারণ আখের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। প্রথমতঃ বৃষ্টি যথাসময়ে এবং প্রচুর পরিমাণে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ বোনার সময় থেকেই আবহাওয়া ভাল পাওয়া গিয়েছিল এবং তৃতীয়তঃ কৃষকেরা ভাল সেচ ব্যবস্থার সুযোগ পেয়েছিল। উত্তর প্রদেশ, বিহার, মহীশূর, মধ্য প্রদেশ এবং বোম্বাই প্রদেশে আখের চাষে অধিকতর জমির নিয়োগ হয়েছে। এর মধ্যে-উত্তর প্রদেশের বৃদ্ধিই হয়েছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এখানে জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছে যথাক্রমে ৩,৯৬,০০০ একর ও ৪৪ লক্ষ টন। বন্যা প্রভৃতি নানান বিপর্যয় সত্ত্বেও এই বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একর পিছু আখের উৎপাদন বৃদ্ধি মহীশূরেই হয়েছে অধিক। এই প্রদেশে উৎপাদন বৃদ্ধির হার গড়ে ১৯৫২-৫৬ সালের ১৪·৬ টন থেকে বেড়ে ১৯৫৬-৫৭ সালে ২৪·৪ টন হয়েছে। এ ছাড়া বিহার, রাজস্থান, পেপসু ও হায়দরাবাদেও উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার কয়েকটি রাজ্যে, যেমন অন্ধ্র, আসাম, বোম্বাই ও মাদ্রাজে উৎপাদনের হার হ্রাস পেয়েছে। বিহার এবং উত্তর প্রদেশে আখের উৎপাদন সর্বাধিক কিন্তু এই দুটি রাজ্যে এবং উত্তর ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে একর পিছু আখের উৎপাদনের হার খুব কম। অথচ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে এই হার বেশ ভাল। এ থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে উত্তর ভারতের গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় আবহাওয়া থেকে দক্ষিণ ভারতের সমোষ্ণ মণ্ডলীয় আবহাওয়া আখ চাষের পক্ষে অধিক উপযোগী। তবে অনুপযোগী আবহাওয়া আবহাওয়া সত্ত্বেও উত্তর ভারতের আখের একর পিছু উৎপাদন বাড়ানো যে সম্ভব নয় তা ঠিক নয়। সার প্রয়োগ এবং অন্যান্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক সম্মত উপায়ে চাষ করলে উত্তর ভারতের আখের একর পিছু উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

পাট শিল্পের গতি

ভারতীয় অর্থনীতিতে পাট শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দেশ বিভাগের পর কাঁচা মালের সমস্যা ভারতীয় পাটকল গুলিতে গুরুতররূপে দেখা দিয়েছিল। কারণ তখন দেশের প্রয়োজনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এই দেশে উৎপন্ন হ'ত এবং অধিকাংশ পাট উৎপাদনকারী এলাকা পাকিস্তানের অংশে চলে যায়। কিন্তু সুখের বিষয় কাঁচা পাটের উৎপাদন বিগত কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারতে পাটের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ গাঁট এবং সেখানে ১৯৪১-৫২ সালে তার পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ গাঁট হয়। অবশ্য তারপর থেকে নানান কারণে উৎপাদন কিছু হ্রাস পেয়েছে।

বর্তমানে ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ গাঁটে পাট পাটকলগুলির প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রায় ২০ লক্ষ গাঁট পাট পাকিস্তান থেকে প্রতি বছর আমদানী করতে হয়। পাকিস্তানের পাট রকমের দিক থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হলেও, তার দাম এত বেশী পড়ে যে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারতীয় পাট শিল্পের পক্ষে তা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের পাটশিল্প খুব উন্নত হয়নি, কিন্তু যে হারে পাকিস্তানের পাটকলগুলি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতকে যে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে এমন আশঙ্কা করা অসঙ্গত নয়। পাকিস্তানে পাটশিল্প গড়ে উঠবার স্বপক্ষে কয়েকটি সুবিধা আছে। তার মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা মাল ও সস্তা মজুর উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আর একটি অতিরিক্ত সুবিধা এই যে পাকিস্তানের পাটগুলি আধুনিক কল-কব্জায় সজ্জিত হবার সুযোগ পাবে। পাকিস্তান দেশের অভ্যন্তরে পাট দ্রব্যের মূল্য বেশ চড়া আছে এবং ঐ দেশীয় পাটশিল্প আভ্যন্তরীণ বিক্রয় দ্বারা বেশ কিছু লাভ করে থাকে। কাজেই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার পক্ষে পাকিস্তানের কিছু অতিরিক্ত সুবিধা আছে। এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থেকে যথাসময়ে সমস্যার সম্মুখীন হবার মত শক্তি সঞ্চয় করাই এখন ভারতীয় পাটকলগুলির প্রধান কর্তব্য।

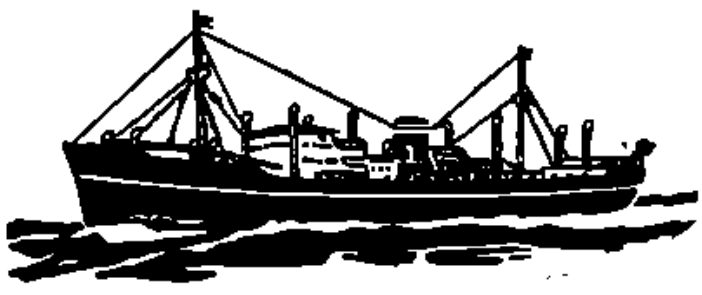

নির্বাচন :

ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন শেষ হ'লো। এ নিয়ে জনসাধারণের উত্তেজনা, জল্পনা-কল্পনারও আজ অবসান। দেখা গেল, লোকসভায় কংগ্রেস বহুল পরিমাণে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে ; রাজ্য বিধান সভাগুলিতেও কেরল বাদে অপরাপর স্থলে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভিন্ন দলের লোকদের নানাবিধ দাবি ও আশা পোষণ সত্ত্বেও বোঝা গেল, কংগ্রেস এখনও দেশবাসীর আস্থাভাজন।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিরোধিতা কোথাও কোথাও উগ্র এবং সক্রিয়। তবু বিধান সভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা অপর সকল দলের মোট সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। সাধারণ দেশবাসী শুধু কথার উপর নির্ভর করেনি, কাজের উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন।

অবশ্য অন্য দলে যোগ্য লোক নেই, এ কথা আমাদের বক্তব্য নয়। আছেন এবং তাঁদেরও অনেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এটা সুখের বিষয়। তাঁদের সহযোগিতায় ও পরামর্শে দেশ লাভবান্ হবে, আমরা এই আশা করবো।

এই নির্বাচন-উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার ঘটেছে, এটা দুঃখের বিষয়। বিশেষ ক'রে বিধান রায় বনাম ইস্‌মাইল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। জনাব ইস্‌মাইল কম্যুনিস্ট দলের প্রার্থী ছিলেন। ভোটে হারা সত্ত্বেও ফল ঘোষণার পূর্বেই তাঁর সমর্থকেরা তাঁর জয়লাভের মিথ্যা খবর প্রচার করেছিলেন এবং শোভাযাত্রাও করেছিলেন ; সে শোভাযাত্রায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি মুহুর্মুহুঃ শোনা গিয়েছিল।

দলাদলির মোহে কংগ্রেসকে জব্দ করবার জন্যে যদি কেউ এরকম সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উত্তেজিত করে থাকেন তবে তিনি দেশদ্রোহিতা করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় সেকথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু অবশ্য তাঁর দলের দিক্ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ; বলেছেন, তাঁদের দলের কেউ সাম্প্রদায়িক জিগির তোলেননি ; ভোটারদের কাছে সাম্প্রদায়িক ভাবের আবেদনও তাঁরা করেননি ; বিধান চন্দ্র রায় মহাশয় ইস্‌মাইল সাহেবের চেয়ে মাত্র ৫৪০ ভোট বেশি পেয়েছেন, তার কারণ, মেহনতী মানুষেরা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতে পারছেনা, তাঁরা বিধানচন্দ্রকে ভোট দেয়নি। অথচ, এ-কথা অনেকের মুখেই শোনা যাচ্ছে, বৌবাজার-এর ভোট সাম্প্রদায়িক প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ইস্‌মাইল্ সাহেবের জয় হ'লে তিনি মুখ্য মন্ত্রী হবেন, মুসলমান সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করবেন, কলকাতা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে, এ আশ্বাসও নাকি দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি বিধান বাবু স্বকর্ণে শুনেছেন বলেছেন ; আমাদের পরিচিত বহু ব্যক্তির কাছে শুনেছি, তাঁরাও শুনেছেন। বিডিবপুর অঞ্চলে ঐ ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা হয়েছে, খবর পেয়েছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু প্রশ্ন করেছেন, মুখ্য মন্ত্রী যদি নিজে শুনে থাকেন তবে অবিলম্বে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করালেন না কেন ? সাধারণ মানুষ হিসাবে আমাদের মনে হয়, প্রকাণ্ড ভিড়ের মধ্যে কেউ এরকম ধ্বনি করলে তৎক্ষণাৎ তাকে ধরা বা তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজ, সম্ভবপর নয়।

সমগ্র জনতাকে এ জন্য দায়ী করতে গেলে সংঘর্ষের এবং অপ্রীতিকর পরিণামের সম্ভাবনা। দলের মধ্য থেকে উত্থিত কোন ধ্বনি নিজের কানে শুনলেও তা প্রমাণ করা কঠিন। কাজেই ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে নজর রেখেই চলতে হয়।

কম্যুনিস্ট দলের প্রচারিত পুস্তিকার প্রতিলিপি আনন্দবাজারে প্রকাশিত হচ্ছে। তাতে স্পষ্টতঃ কংগ্রেসী শাসনে মুসলমানদের প্রতি অবিচার অত্যাচারের অভিযোগ করা হয়েছে; সুকৌশলে তাদের সাম্প্রদায়িক ভাবকে উস্কিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধান সভার বিতর্কে শ্রীযুত জ্যোতি বসু স্বয়ং বলেছেন, এদেশে মুসলমান সম্প্রদায় তো ভয়ে মৃতপ্রায়; তারা সরকারের সন্দেহভাজন হয়ে সদা শঙ্কিত। এসব কি সাম্প্রদায়িক ভাবকে উত্তেজিত করার দৃষ্টান্ত নয়? আমরা কি দলীয় স্বার্থের খাতিরে এমন ক'রে দেশের ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করবো? বিশেষতঃ আজকের দিনে যখন ভারতে পাকিস্তানে মনোমালিন্য এবং পাকিস্তানের তরফ থেকে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের ছমকি চলছে,তখন এ দেশেও পাকিস্তানী জিগির তোলা কি সর্বনাশের পন্থা নয়?

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES FLOOR RUNNERS
CHAIR CLOTH & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : 22-6853-58

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

ঊনবিংশ বর্ষ | চৈত্র—১৩৬৩ | দ্বাদশ সংখ্যা

স্মৃতিকথা

শ্রীকালিদাস রায়

কোনদিন চেষ্টা ক'রে জীবনের গতি ফেরাবার প্রবৃত্তি আমার হয়নি। যখন যে স্রোত এসেছে তাতেই ভেসে পড়েছি—কোথায় গিয়ে যে পৌঁছাব তা ভাবিনি। এইরূপ স্রোতে-ভাসা এই জীবন একেবারে দৈবাধীন। পুরুষকারের প্রয়োগ একেবারে নেই বললেই হয়। বরাবর ঘটনাস্রোতে ভাসতে ভাসতে এতদূর এসে পড়েছি।

জীবনে কোন লক্ষ্যই ছিল না, কি ভাবে কি বৃত্তিতে কোথায় যে জীবন কাটবে কিছুই ভাবিনি, জীবনে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিলনা। এরূপ দৈবনির্ভর জীবনে যতটুকু হবার তা হয়েছে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বাহারবন্দরের ম্যানেজার হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বললেন—"যাবি আমার কাছে?" আমি বললাম—"হ্যাঁ, যাব।"—বাস, আমার দ্বিতীয় কথা নেই। ভবিষ্যৎ যে কি, এই 'যাব' উক্তিতে তা ভেবেও দেখিনি। জীবনের প্রত্যেক পরিবর্তনটা এইভাবেই হয়েছে, এক কথায়।

অল্পদিন আগে বিবাহ করেছি, বয়স বড় জোর ১৮।১৯ সাহিত্যসমাজ হ'তে বিদায় নিয়ে, আত্মীয়বান্ধবদের কাছ হতে বহু দূরে। যে সাহিত্য সাহিত্য করে অপ্রকৃতিস্থ হয়েছিলাম, তার সেবার কি হবে? পরীক্ষা দেওয়ারই বা কি হবে? সেখানে যাব সেখানকার স্বাস্থ্য কেমন? সেখানকার সামাজিক পরিবেশ কিরূপ? গন্তব্য-স্থান হলো—রংপুর জেলার মধ্যে উলিপুর, কুড়িগ্রাম থেকে বারো মাইল, তিস্তারীর ব্রহ্মপুত্রতীর থেকে বারো মাইল দূরবর্তী। পথ রীতিমত দুর্গম। এ সব কথা কিছু না ভেবে যাত্রা করলাম বিছানাপত্র ও একটা বাক্স নিয়ে।

তখন উলীপুর যেতে হলে তীমারে পদ্মা পার হতে হোত। পদ্মার ওপারে ছিল মিটার গেজ লাইন। সেই লাইনের গাড়ীতে চ'ড়ে গেলাম তিস্তা সংগমে। তিস্তা হতে আবার আরো গেজ লাইন। গাড়ীগুলো কদর্য। সেই লাইনের ট্রেনে চেপে গেলাম কুড়িগ্রাম।

কুড়িগ্রাম একটি মহকুমা শহর, অথচ ইহা এক খানা বড় গ্রাম ছাড়া কিছুই নয়। মিউনিসিপ্যালিটি নেই

কাঁচা রাস্তা, পথে অনেক দূরে দূরে ল্যাম্পপোষ্ট. বাড়ীগুলো অধিকাংশ টিনের। শহরের মেরুদণ্ডীয় পথ দিয়েই সরু রেল লাইন গিয়েছে। শহরের মধ্যে গাড়ী দ্রুত যায় না। চলন্ত গাড়ীতেই উঠানামা চলে। শহরের শেষ প্রান্তে ষ্টেশন, অনেকে পথেই নেমে পড়ে ট্রাম হ'তে নামার মত।

কুড়িগ্রামের হেডমাষ্টার ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। ইনি আমাদের আত্মীয় ছিলেন, এঁর নাম ইন্দুভূষণ রায়, হরেনদাদার ভায়রাভাই। এঁকে আগেই চিঠি লেখা ছিল। ইনি একটি টিনের বাড়ীতে থাকতেন। ঘরের দেওয়াল ছিল না, খড়া বেড়ার বেষ্টনী দেওয়ালের কাজ করত। এ অঞ্চলে অধিকাংশ ভদ্রলোকের বাড়ী এইরূপ।

তিস্তা হ'তে কুড়িগ্রামে ট্রেনে আসবার সময় দেখলাম, দুধারে পাটের বন। এত উঁচু পাটগাছ আমি আগে দেখিনি। এই পাটের বন দিয়ে যাবার সময়ে আমার কেবল মনে হচ্ছিল, "এ কি রাজ্য রে বাবা, এদেশে কি করে থাকব?" যাই হোক সন্ধ্যার সময় ইন্দুদাদার বাসা বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

ইন্দুদাদার বাসায় পাঁচখানা হতে ফিরে ইন্দুদাদাকে বললাম, "আমি বাড়ী ফিরে যাব ভাবছি।" তিনি বললেন—"পাগল নাকি? উলিপুর হতে তোমার জন্য হাতী এসেছে। খেয়ে দেয়ে যেতে হবে। কেন বল ত তোমার নস্তি বলছে?"

আমি বললাম—"এই দেখুন, পাঁচখানা।"—ইন্দুদাদা হেসে উঠে বললেন—"এটা হলো গরীব মাষ্টারের বাসা। আর তুমি যাচ্ছ রাজবাড়ীতে। সে বাড়ীতে মহারাজ এসে থাকেন। ম্যানেজার সারা বছর সপরিবারে বাস করেন। সেখানকার ব্যবস্থা অনুমান-করে নাও।"

আমি বললাম—"আর এই হাতী? হাতীতে কি ক'রে চড়ব—হাতীর পিঠ হ'তে যে পড়ে যাব।"

ইন্দুদাদা—"আরে হাতীই এ দেশের যান, সবাই হাতী চড়ে যাতায়াত করছে। আর তুমি পড়ে যাবে? তবু ত তোমার জন্য ঘোড়া পাঠায়নি।"

তখন আমার মনে পড়ল—বাবা কাসিমবাজার হতে ৫০ মাইল পথ হাতী চড়েই যেতেন। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব শক্ত নয়।

যাহোক, হাতী চ'ড়ে কর্মস্থলে যাত্রা করলাম। যাত্রাটা রাজকীয়ই হলো। শেষ পর্যন্ত এই যাত্রাপর্বতের মূষিক প্রসব যে হবে তা—তখনই অনুমান করেছিলাম। পথ ১২ মাইল। পথের দুই ধারে পাটবন। পাটের ক্ষেতের পাশে মাঝে মাঝে আমকাঁঠালের গাছ। রাস্তার হাতী পথের দুধার হতে কাঁঠাল ছিঁড়ে খেতে খেতে চলল।

উলিপুরে পৌঁছলাম। যে ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হল, দেখলাম সে ঘরের মেঝে ম্যাটিং করা, শোওয়ার জন্য স্প্রিঙের খাট, টেবিলে শেজ, ঘরের পাশে কলকাতার মত বাথরুম পায়খানা (সেফটি), বারেন্দায় চাপরাশী, দারোয়ান। আমার রুমমেট আমার কাসিমবাজারের বাল্যবন্ধু গোবিন্দ। মনটা প্রফুল্ল হ'ল।

• • •

উলিপুর গ্রামখানা আধাপল্লী আধা শহর। এখানে থানা আছে, রেজিষ্টারী আফিস আছে, সাবপোষ্ট-আফিস আছে, বড় একটা বাজার আছে। Charitable Dispensary আছে। ব্রহ্মপুত্রতীরের চিলমারি বন্দরের Hinterland এই অঞ্চল। এই বাজারে বহু মাড়োয়ারী পাটের কারবার করে। তাদের কাপড়ের বড় বড় দোকান আছে। ডাক বাংলো আছে। এখানে একটা হাইস্কুল ত বহুকাল আগে হ'তে আছেই। সরকারী কর্মচারীরা প্রায়ই এখানে আসেন এবং মহাসমাদরে রাজকীয় আতিথ্য লাভ করেন।

কাসিমবাজারের মহারাজের বিরাট কাছারির জন্য উলিপুর ছোট শহরে পরিণত হয়েছিল। উলিপুরের দুটি প্রধান অংশ। একটি অংশে মহারাজের বিরাট

কাছারিবাড়ী ও কর্মচারী, দারোগান, প্রহরী ইত্যাদির বাসভবন। আর এক অংশে স্থানীয় লোকদের, বিশেষ ক'রে জোতদারদের বাসভবন, বাজার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। কাছারি বাড়ী ও গ্রামের প্রধান রাস্তার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা খোলা মাঠ। এই মাঠে সুবৃহৎ পুষ্করিণী, তার চার-দিকে চারটে ঘাট বাঁধানো। আর মাঠটা বড় বড় বকুল গাছের অবস্থিতিতে ছায়াশীতল। কাছারিবাড়ীর সম্মুখের পরিবেশটি সুন্দর। এই পরিবেশটি আমার খুব ভাল লাগল। বুঝলাম এই পরিবেশের মালিক মহারাজ, কিন্তু এর শ্রীমাধুর্য আমারই উপভোগ্য—অন্য কারও নয়।

এ অঞ্চলে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় ব'লে ধনী জোতদাররাও পাকা বাড়ী গড়ে না, টিনের বাড়ীতেই থাকে।

উলিপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশটি আমাদের ভাগীরথী তীরের পরিবেশের মতই। প্রচুর গাছপালা, কেবল নারিকেল গাছ এখানে নেই। ফল ও ফুলের গাছ অজস্র। ভাগীরথীতীরের শ্যামলশ্রী এখানে আছে—অথচ তার ম্যালেরিয়া নেই, স্বাস্থ্য বেশ ভালই। স্থানটি আমার খুব ভাল লাগল! খাদ্যদ্রব্য এখানে সুলভ, অবশ্য সুলভতার সঙ্গে আপাততঃ আমার সম্বন্ধ নেই। কারণ আমি ত হরেনদাদার পরিবারভুক্ত। বহরমপুরে যাঁর বাড়ীতেই দিনের অধিকাংশ কাল কাটাতাম, এখানে তাঁর বাড়ীতেই থাকব। বহুদূর-বর্তী হলেও উলিপুর আমার পক্ষে পুরা প্রবাস হয়ে ওঠেনি।

উত্তরবঙ্গে এসে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল পূর্ববঙ্গের সঙ্গেই। কাছারির কর্মচারীদের শতকরা ৯৫ জন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোক। আমি তাঁদের মধ্যেই সাত বছর আনন্দে কাটালাম। এঁদের মাইনে ৫০।৬০ টাকার বেশি কারো ছিল না। কিন্তু এঁরা বেশ সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। অনেকের বাড়ীতেই ঠাকুর চাকর ছিল। এঁদের আহারাদির মানও অনুচ্চ ছিল না।

আশ্চর্যের বিষয়, উলিপুরে স্থানীয় ভদ্রপরিবার বা নিম্ন শ্রেণীর কোন পরিবারের কোন স্ত্রীলোককে বাড়ীর বা'র হতে দেখিনি। পূর্ববঙ্গের পরিবারগুলিরও কোন স্ত্রীলোক কখনও বাড়ীর বার হত না। আমার স্ত্রী খোলা গাড়িতে মিসেস কে. এন. গুপ্ত ও মিসেস মল্লিকের (স্ত্রীর খুড়িমার) সঙ্গে ডাকবাংলোয় গিয়েছিল ব'লে পূর্ববঙ্গের লোকে নিন্দা করেছিল। আর আজ কলকাতায় দেখছি সেই পূর্ববঙ্গের স্ত্রীলোকদের সর্বত্র অবাধ গতিবিধি, তারা দশটা পাঁচটা অফিস করছে। ৩০ বছরে কি অদ্ভুত পরিবর্তনই না হয়েছে!

স্কুলে গিয়ে যোগ দিলাম। নতুন হেডমাষ্টারও আসলেন ঐ দিনই। নতুন হেডমাষ্টার সেকালের ইংরেজির এম-এ। বয়স ৬০এর কম নয়, ৭০এর কাছাকাছি হবে। তিনি তাঁর ঠিক বয়স কিছুতেই বলতেন না। যোগ্য পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর মাথা একটু অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে ছিল।

স্কুলঘরটি একটা মাঠের মধ্যে। পুরাতন গৃহ। একটি হলঘর, বাকি ঘরগুলো ছোট ছোট। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বেশি নয়, ঐ গৃহেই ধ'রে যেত। পরে যখন ছাত্রসংখ্যা বাড়ল—তখন টিনের ছোট বড় শেড তোলা হল। স্কুলে সরকারী সাহায্য ছিল না। স্কুলের নাম মহারাণী স্বর্ণময়ী হাইস্কুল। ইহা বাংলাদেশের একটা প্রাচীনতম স্কুল। মহারাজ মাসে ৩৩০৲ টাকা সাহায্য করতেন। অবৈতনিক ছাত্রের সংখ্যা ছিল খুবই বেশি। শিক্ষাবিভাগের কর্তারা মাসিক সাহায্য দিতে চাইতেন, মহারাজ তা নিতেন না।

School Inspector P. Chatterjee আমাকে বলেছিলেন—'স্কুলটার যে উন্নতি হচ্ছেনা এর প্রধান কারণ স্কুলটি প্রায়ই ফ্রী। বিনা পয়সায় বা অল্প পয়সায় যে শিক্ষা পাওয়া যায় সে শিক্ষার প্রতি কারো দরদ থাকেনা। আপনারা ৫৲ টাকা ক'রে

মাইনে করুন, দেখবেন, স্কুলে ছেলে ধরবে না এবং ছেলেরা লেখাপড়ায় খুব উন্নতি করবে। সত্যর ভিন অবস্থা। শিক্ষা যে দামী জিনিস এটা না দেখাতে পারলে লোকে শিক্ষা নেবে কেন ?"

স্কুলে কাজ করে বিকেলে ছেলেদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন কি টেনিস খেলে এবং সন্ধ্যাবেলা কবিতা লিখে বা বই পড়ে আমার দিনগুলো বেশ কাটতে লাগল।

আমিও টেনিস খেলতাম, একথা মনে করে আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে। সঙ্গ ও পরিবেশ এজন্য দায়ী।

কিন্তু সাহিত্যপ্রচারের সুবিধা ছিল না, এখান হতে এক মাসিক পত্রে লেখা পাঠানো ছাড়া। তা অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলছিল।

পুজোর সময় গ্রামের বাড়ীতে গেলাম। ফিরবার পথে কলকাতা হয়ে আসলাম। ইদানীং একজন নতুন বন্ধু জুটেছিল কৃষ্ণবিহারীর মারফতে। তাঁর নাম শরচ্চন্দ্র ঘোষাল। তিনি খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন, যেমন সংস্কৃত ও পালীভাষায়, তেমনি ইংরাজিতে। তখন তিনি অধ্যাপক। ইনি পরে কুচবিহারের জজ হ'ন। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বললেন, "আপনার একখানা কবিতার বই ছাপবার উদ্যোগ করছি।"

আমি বললাম—"টাকা কোথা? রসুন, আগে টাকার যোগাড় করি।" তিনি বললেন—"সেজন্য ভাবতে হবেনা, সে হ'য়ে যাবে।"

ব্যাপারটা বুঝলাম না, বললাম—"মাসিকপত্র থেকে কবিতাগুলো সংগ্রহ করতে হয়। আমার কাছে কিন্তু কপি নেই।"

শরৎবাবু বললেন—"তার চেষ্টা হচ্ছে।"

এই সব সংক্ষিপ্ত উক্তি হ'তে বিশেষ কোন আশার আলোক পেলাম না। এত অল্প কথার মধ্যে যে গভীর অর্থ নিহিত থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

উলিপুরে ফিরে গেলাম। একদিন সহসা দুশো টাকার টেলিগ্র্যাফিক মানি-অর্ডার। অবাক হয়ে গেলাম। কে টাকা পাঠায়? তা ছাড়া টেলিগ্র্যাফিক কেন?

টাকা পাঠিয়েছেন বরিশাল—লাখুটিয়ার জমিদার কবি দেবকুমার রায়চৌধুরী। চিঠিতে লিখেছেন—কবিতার বই ছাপাবার জন্য, আপাততঃ এই টাকা পাঠালাম; বাকি পরে পাঠানো হবে। শরৎ ঘোষালের সংক্ষিপ্ত উক্তিগুলির সার্থকতা বুঝতে পারলাম। কৃষ্ণবিহারী ও শরৎ দেবকুমারের বাড়ীতে মিলিত হ'য়ে কবিতার বই ছাপাবার পরামর্শ ঠিক করেছিল।

কৃষ্ণবিহারী চৈতন্য লাইব্রেরী হতে কাপি তৈরী করেছিল এবং শরৎ কবিতাগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিন্যাস করে ভূমিকা লিখে' 'পর্ণপুট' নাম দিয়ে বই ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিল।

কলকাতায় বই ছাপা হচ্ছে। আমি কৃষ্ণবিহারীকে লিখেছিলাম আমার ইনস্টিটিউটের বন্ধুদের কাছে সাহায্য পাবে। সম্পাদক দুজন আমাকে কিছুই জানায় নি! এ-বিষয়ে ইনস্টিটিউটের শ্রীশকে (শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থাপত্যশিল্পে বিশেষজ্ঞ) একখানা পত্রে, বন্ধুরা আমার বই এর সম্বন্ধে কোন Interest নিচ্ছে না ব'লে কি সব অনুযোগ করেছিলাম। বন্ধুবর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বন্ধুদের পক্ষ হ'তে উত্তর দিয়েছিল।

"শ্রীশকে যে চিঠি লিখেছ, তা পড়ে মনে বেশ একটা আঘাত পেয়ে না লিখে থাকতে পারলুম না। আমাদের উপর তোমার চিঠিতে যে সকল অভিযোগ আছে, তার সমস্তর কৈফিয়ৎ দিতে পারা যায় কি না তা নিয়ে discuss করতে চাই না। কিন্তু তোমার ঐ চিঠি, আর কোলকাতায় এসে তিনচার দিন কাটিয়ে গিয়ে আমাদের সঙ্গে একবার দেখা না করা, অন্ততঃ তোমার আসার বিষয়ে খবরও না দেওয়াটা, এসব have given me a painful shock. তোমার বইএর সম্বন্ধে কিছু তদারক করতে পারিনি; তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে তুমি যে রকম সম্পাদকের

উপর তোমার বই ছাপাবার ভার দিয়েছ, তাতে আমাদের মত নগণ্য লোকের meddle করার কোনও আবশ্যক করে না। শরৎবাবুর editing এর উপর আমাদের কি বলবার থাকতে পারে? তোমার বইএর প্রকাশ ও সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের কোন উৎসাহ নেই একথাটা বলা সঙ্গত কিনা ভেবে দেখো। বই প্রকাশ করবার প্রস্তাবটা বোধহয় আমাদের কাছ থেকে with some enthusiasm উঠেছিল। এ বিষয়ে ঘটক প্রফুল্ল; এড্‌ভোকেট তোমার উপর পুরাতন বন্ধুদের neglect করার counter charge দিচ্ছে। আমার অনেক দিনের আন্তরিক ইচ্ছে ছিল, তোমার লেখা আমার favourite ক'টা poem যে বইয়ে বেরুবে তার ভালো edition de luxe করে ছাপিয়ে নেব! রাধাবাজার ঘোরাঘুরি ক'রেও তা হ'লো না।

তোমার 'ধর্মক্ষেত্র' কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা না বলে থাকতে পারলুম না। শ্রীশ ঐ কবিতাটি সংগ্রহ ক'রে নকল করার ভার নিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' ইনস্টিটিউটে পাওয়া গেল না। অন্যত্রও খোঁজবার ত্রুটি করেনি। তোমার চিঠিতে মাঝে মাঝে তাগাদা আসত বটে, কিন্তু 'ধর্মক্ষেত্র' 'পর্ণপুটে' বেরুবে এধারণা আমার ছিল না। তোমার শেষ চিঠি পেয়ে আমি শ্রীশকে দিয়ে নকল করিয়ে দিয়েছি। এ কাজে আমার বোধহয় গাফিলি হয়ে গেছে, কিন্তু circumstancesএর দিকে নজর দিও।

• • শিশির (শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী) তোমাকে যথা সময়ে পত্র দেয় না। কিন্তু নানা কারণে শিশিরের মাথা তোলবার অবসর নেই। সাক্ষাৎ না হ'লে সব কথা বলা যায় না। Institute politics এর জালে পড়ে ওর নিজের কাজেরও যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু তা বলে আমি তাকে বন্ধু হিসাবে aristocratic বলতে পারি না। That was the unkindest remark made by you.

তোমার চিঠি সবটা পড়েছি। শেষে তুমি অভিমানের কথা লিখেছ। তুমি দু-দুবার কলকাতায় এলে, একবারও আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না। কতদিন আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মনে করে দেখি। পুরাতন দিনের স্মৃতির খাতিরে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হলো না? এতে কি আমাদের রাগ বা দুঃখ করার কিছু নেই?

তোমার বন্ধু বলে আমরা যথেষ্ট গৌরব অনুভব করি। কিন্তু তোমায় নিয়ে আমাদের বাইরে খাতির বৃদ্ধি করবার জন্য parade করি না। সাহিত্যিক হবার ইচ্ছেও নেই, হ'তেও পারব না। তোমার কবিতা সাধারণতঃ পড়তে ভালো লাগে, critically তার দোষগুণ ধরতে পারি না; সেজন্য আমরা indifferent?

• • সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে বোধ হয় কলকাতায় আসছ। ইনস্টিটিউটে চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় করবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। আজ ইংরিজির ১লা এপ্রিল। ১০ই অভিনয় হবে। বই স্থির করা হ'লো পরশু। রিহার্সেল আরম্ভ হয়নি। নূরা ও হেলেন ভূমিকার জন্য লোক এখনো জোটেনি। তুমি শুনে থাকবে আমাদের সকলের প্রিয় প্রিয়দর্শন বিজনবিহারী বসু (যে চন্দ্রগুপ্তে মুরা, জনায় গলা সেজেছিল) আর নেই।

গত ১০ই তারিখে তার কলেরায় মৃত্যু হয়েছে। এর উপর আমাদের অভিনয় করাটা কি রকম বিসদৃশ ও disheartening আন্দাজ করতে পার।• Opening Song হিসাবে তোমার 'দ্যুলোক ভূলোক পুলকি আলোকে' (পর্ণপুটের ১ম সংস্করণের প্রথম রচনা) গানটা গাইবার কথা হয়। কিন্তু গুরু (জ্ঞানপ্রিয়) বলেন, তা হ'লে "যখন সঘন গগন গরজে" গানটা জমবে না।

"দ্যুলোক ভূলোক' গানটা 'যখন সঘন গগন'—গানটার সুরেই লেখা। আমি তোমার দ্বারা সময়োপযোগী আর একখানা গান রচনা করিয়ে নেবার কথা বলায় গুরু বলেন—যেসব আনাড়ী গায়ক নিয়ে কাজ, ২।৪ দিনে নতুন গান শিখে নিতে পারবে না। জানা পুরাতন একটা গান Instituteএ গাওয়া হবে। আর Townhall-এ সাহিত্যসম্মিলনীর প্রারম্ভ সঙ্গীতটা তোমার 'দ্যুলোক ভূলোক পুলকি আলোকে' (বঙ্গবাণী) গানটাই হবে। তিনি এই রকমই ঠিক করেছেন। আমার বোধ হয় সে বেশ হবে, কিন্তু Instituteএ তোমার গানই হয় এটাও আমার বিশেষ ইচ্ছা। তোমার যে গান কয়টি আমাদের কাছে আছে, সেগুলো শারদীয় গানটা। বোধহয় সময়োপযোগী হবে না।

• •

চিঠির উত্তরটা একটু শীঘ্র যেন পাই। —ইতি

তোমার—সুনীতি

১লা এপ্রিল, ১৯১৪

শান্তি এবং মুক্তির প্রতীক
জওহরলাল
ভারতের পররাষ্ট্র নীতির এক অধ্যায়

শ্রীসচ্চিদানন্দ হোড়, এম, এ ; এল, এল, বি.

"বিচলিত হো'ল হৃদয় তাঁহার
বিগলিত হো'ল আঁখি,
বিজয়ী অশোক ভবনে ফিরিল
লজ্জায় মুখ ঢাকি।"...

কালিঙ্গী যুদ্ধবিজয়ী অশোক রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে সম্পূর্ণ ভিন্ন মন এবং অনুভূতি লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। যুদ্ধের বীভৎস হত্যাকাণ্ড এবং যুদ্ধের নারকীয় দৃশ্য দর্শনে মর্মাহত হইয়া 'চণ্ডাশোকে' 'ধর্মাশোকে' রূপান্তরিত হইলেন এবং বৌদ্ধধর্মের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধবর্জন ও শান্তি এবং মৈত্রীর প্রচারে আত্মনিবেদন করিলেন। ভারত আত্মার শাশ্বত বাণী আবার দিকে দিকে প্রচারিত হইল, ভারত ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। ঐতিহাসিকের ভাষায় "The Kalinga war might be regarded as the turning point in the history of India and the world."

ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্র নীতির পর্যালোচনা করিতে হইলে তাহার মূল সূত্র খুঁজিতে মহানুভব সম্রাট অশোকের মহান নীতির দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মহাত্মাজীর উদ্ভাবিত 'সত্য এবং অহিংসার' নূতন অস্ত্রে যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হইতেছিল তখন এই নূতন অস্ত্রের প্রয়োগ কৌশল এবং শক্তি বিশ্বজনের বিস্ময় উৎপাদন করিত। ভারতের এই অভিনব অস্ত্রের দিকে পরাধীনতা এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলি সাগ্রহে চাহিয়া থাকিত এবং তাহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেও ভারতের সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করিত। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মাদ্রাজ অধিবেশন হইতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আন্তর্জাতিক ঘটনাপঞ্জীর উপর অধিকতর ভাবে মনোনিবেশ করে। পণ্ডিত জওহরলাল দীর্ঘদিন যাবৎ কংগ্রেসের বৈদেশিক দপ্তরের সচিব ছিলেন এবং কংগ্রেসের বহু প্রচেষ্টা এবং প্রস্তাবের মূলে তাঁহার সুনিপুণ হস্তের কর্মকুশলতার পরিচয় মেলে। ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রান্ত হইলে কংগ্রেস ইটালীর এই হীন কার্যের তীব্র নিন্দা করে। ১৯৩৬ সালের ফ্যাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোর হাত হইতে স্পেনের সাধারণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থাকে রক্ষা করিতে যে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দল প্রেরিত হয় তাহার পিছনেও পণ্ডিত নেহেরুর প্রেরণা ছিল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে রণবিধ্বস্ত চীনের সাহায্যার্থে 'কংগ্রেস মেডিকেল মিশন' প্রেরণও তাঁহার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্বের উপর তাঁহার তীব্র ঘৃণা এবং বিরাগ প্রকাশ পায় রোম বিমান বন্দরে ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুসোলিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারে অনিচ্ছা প্রকাশে। বর্তমান দিনের ভারতের পররাষ্ট্রনীতির পর্যালোচনা করিতে হইলে সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে যে প্রাক্-স্বাধীনতা দিনের কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা। ১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে পণ্ডিত নেহেরু

জাতির উদ্দেশ্যে যে বেতারভাষণ দেন তাহার ভিতরই তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির মূল সুরটি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। তিনি বলেন যে ভারত বিশ্বশান্তি এবং পরপদানত দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইবে; আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোন 'গোষ্ঠীভুক্ত' না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে উভয়দলের সঙ্গেই সম্প্রীতির সহিত ভারত কাজ করিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হয় যে যখন স্বাধীনতা বিপন্ন এবং ন্যায়বিচার পদদলিত তখন ভারতবর্ষ নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না। পণ্ডিত নেহেরুর মতে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা, বর্তমান যুগে অচল এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতমহাসাগরীয় দেশগুলির কার্যক্রমই পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের মাপকাঠি হইবে এবং আটলান্টিক-মহাসাগরীয় দেশগুলি তাহাদের বর্তমানের সুউচ্চ স্থান হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইবে। এই ভাবধারার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখা যায় ১৯৪৮ সালে দিল্লীতে এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির সম্মেলনের ভিতর দিয়া। দীর্ঘদিন সুপ্তির কোলে শায়িত এশিয়ার দেশগুলি সর্বপ্রথম এই সম্মেলনের মাধ্যমে একত্রিত হইয়া প্রতিবেশীর দিকে বিশ্বাস এবং সহানুভূতির চক্ষে তাকাইল। অতীতের ছিন্ন-সূত্র সংযোজিত হইল। সম্রাট অশোকের 'ধর্মবিজয়' প্রচেষ্টার মুকুটে আর একটি পালক সংযোজিত হইল। আর ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে গত এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ে এশিয়া-আফ্রিকা মহাসম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। সেখানে এই দুই মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া নিজেদের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি খোলামনে আলোচনা করেন। এই আলোচনা পৃথিবীর শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সহায়তা, পারস্পরিক নিরাপত্তা বোধ, এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব দৃঢ়তর করিয়াছে। নেহেরু-চৌ বিঘোষিত পঞ্চশীলের নীতি আন্তর্জাতিক শান্তি এবং সৌহার্দ্য স্থাপনের এক মূল্যবান ঘোষণাপত্র। বান্দুং সম্মেলনে এই 'পঞ্চশীলের' নির্দিষ্ট ধারাগুলিই আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য স্থাপনের মাপকাঠি হিসাবে গৃহীত হওয়ার প্রকৃতপক্ষে এই মহাসম্মেলন ভারতের পররাষ্ট্রনীতিরই জয় এবং সাফল্য সূচনা করে।

পরপদানত দেশগুলির স্বাধীনতার সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস চিরদিনই সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছে এবং ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিতেও সেই সুর অব্যাহত রহিয়াছে। তাই কেনিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া, বৃটিশ গিয়ানা প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারত পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এক নির্দিষ্ট খাতে বহিয়া চলিয়াছে তাই যে কোন আন্তর্জাতিক সংঘাতে এবং মতবিরোধে ভারতের মতামত সমগ্র জগৎ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে।

এই ভাবেরই প্রকাশ কোরিয়ার সংঘাত নিবারণে এবং ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতিতে ভারতের নেতৃত্বের সুপ্রতিষ্ঠায়। বিশ্বের দরবারে নয়াচীনের আসন সুপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, খণ্ডিত জার্মানীর একীকরণ, অস্ত্র-শস্ত্র সংবরণ এবং আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্বন্ধেও ভারতের মত অত্যন্ত স্পষ্ট। এই বিষয়গুলির আলোচনার জন্য বৃহৎ চতুঃশক্তির প্রধানদের ভিতর মতৈক্যের জন্য জেনেভায় যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সাফল্যপূর্ণ সমাপ্তি প্রচেষ্টায় ভারতের অবদান উল্লেখযোগ্য। ভারত বিশ্বাস করে যে যুদ্ধ দ্বারা কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। পরন্তু শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া আলাপ আলোচনাই ইহার প্রকৃত মাধ্যম। ভারতের ফরাসী অধিকারগুলির অবলুপ্তি ইহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং বিলম্বে হইলেও ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী পর্তুগালও যে এই পন্থা অনুসরণ করিবে ইহা সুনিশ্চিত।

এই সম্পর্কে ভারতের নীতি স্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন আমাদের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন। তিনি বলিয়াছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যার জটিল গ্রন্থি তরবারীর সাহায্যে দ্বিখণ্ডিত না করিয়া ধৈর্য এবং সহানুভূতির সহিত ধীরে ধীরে উন্মোচন করাই ভারতের লক্ষ্য। তাই কোনরূপ সামরিক আঁতাতই ভারতের নীতিবিরোধী। এইজন্যই উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (NATO) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (SEATO) সম্বন্ধে ভারত কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং এইরূপ চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত স্থায়ী সৌহার্দ্যপূর্ণ 'সহ-অবস্থানের' নীতিই ভারত গ্রহণ করিয়াছে। এই সম্পর্কে নেহেরু-চৌ এন লাই বিঘোষিত 'পঞ্চশীল' নির্ভুল পথের দিক নির্দেশক। পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ামক হিসাবে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা অত্যন্ত মূল্যবান দলিল. ভারত এবং চীন ছাড়াও বর্তমান সময় পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, ত্রিবেতনাম, যুগোস্লাভিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি এই পঞ্চশীলের নির্ভুল নির্দেশ মানিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

রাষ্ট্র সংঘের আদর্শে বিশ্বাসী ভারত কাশ্মীর সমস্যা লইয়া রাষ্ট্রসংঘের দরবারে হাজির হয়, যদিও তার বিচার এখনও হয় নাই তবুও ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসংঘের সততায় বিশ্বাসী। পাকিস্তানের পশ্চিমা সামরিক জোটে যোগদান এবং আমেরিকার কাছ হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করায় ভারসাম্যের পরিবর্তনের জন্য কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত গণভোটের দাবীতে এখন আর বিশ্বাসী নহে।

উপরিলিখিত ঘটনাপঞ্জীর বিচারে আমরা দেখিতে পাই যে ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি সম্রাট অশোকের প্রবর্তিত নীতি এবং প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেস-বিঘোষিত নীতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া একই খাতে বহিয়া চলিয়াছে। অস্ত্রবলে হীনবল ভারত স্বীয় উচ্চ আদর্শ এবং আত্মিক শক্তির প্রভাবে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভিতর নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক শান্তির এবং স্বাধীনতার অগ্রদূত পণ্ডিত জওহরলাল অনির্বাণ দীপ হস্তে স্বীয় লক্ষ্যে অবিচল ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার এই যাত্রাপথ সুগম হইয়া উঠুক, লক্ষ লক্ষ রণক্লান্ত বিধ্বস্ত নরনারীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠুক, বাঁচিবার আনন্দে নূতন করিয়া ঘর বাঁধুক আবার তাহারা। কবির ভাষায়—

"হে মহৎ তব বাণী নিখিল 'ভুবন' ভরি আজি
জাগুক আবার
উঠুক মিলনমন্ত্র সাম্যবাদে কম্বুকণ্ঠে বাজি
টুটিয়া আঁধার;
হিংসা, দ্বেষ মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত শঙ্কাতুরে
হো'ক শান্ত হো'ক
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক।'

আমিনা আর অপেক্ষা করে নাই। সে এতক্ষণ আজিজনের বাড়ী ছিল—কতকটা একা একা এই অনিশ্চয়তা সহিতে পারিতেছিল না বলিয়াই। নানা নিজের চিন্তার মধ্য, আজিমুল্লা ছাউনির দিকেই কোথাও আছে—এবং সে যে আজ বিশেষ ব্যস্ত, তাহা কেহ বলিয়া না দিলেও অনুমান করিতে পারে। আর তা না থাকিলেও সব সময় তাঁহার সহিত দেখা করা সম্ভব নয়।...নানা যতক্ষণ নিজের খাস কামরায় থাকেন ততক্ষণ তাঁহার কাছে কোন স্ত্রীলোকের যাওয়া নিষেধ, এমন কি স্বয়ং মহিষীদেরও। আমিনার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া এখন আর তাহার নানার কাছে যাইতে ইচ্ছাও করিতেছে না। যাওয়া মানেই তো অভিনয় করা।

সুতরাং আমিনা সম্পূর্ণই একা আজ। আর এই একাকীত্ব সে আর সহিতে পারিতেছে না। সম্ভব হইলে সে পুরুষ বেশে নিজেই ছাউনীতে যাইত, ঐক্লীব সিপাহীগুলিকে দেখিয়া লইত সে। কিন্তু তা সম্ভব নয়—তাহার এই অসামান্য রূপ পুরুষের ছদ্মবেশে ঢাকা পড়িবে না তাহা সে জানে।

নানা কয়দিন হইতে নবাবগঞ্জের প্রাসাদও ছাড়িয়া দিয়াছেন। হুইলারকে আত্মসমর্পণ করিতে তাঁহার কাছে একেবারে ছাউনীর ধারে একটা প্রাসাদে আসিয়া উঠিয়াছেন। এটা আজিজনের বাড়ী হইতে খুব দূর নয়, আমিনা ঘুরপথে গলাইয়া পরপরই কতকগুলি গলিপথ ঘুরিয়া সে প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিল।

গরমের দিন, সন্ধ্যা হইয়াও হইতে চায় না।

আমিনা নিজের মহলে পৌঁছিয়া স্নান সারিল। একমাথা রুক্ষকেশের যত্নসহকারে সযত্নে পান করিল, এক টিন তামাকু পোড়াইল, তবুও অন্ধকার হয় না। অবশেষে একটু আব্ছা হইতেই সে উঠিয়া গিয়া ছাদে দাঁড়াইল। ভাগ্যে নানাসাহেবের সহিত তাঁহার জেনো মহল উঠিয়া আসে নাই বিঠুর হইতে। তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া ছাদেও ওঠা যাইত না। এমন কি আজ আপালাও নাই, প্রাসাদে ফিরিয়াই মুসম্মতের মুখে খবর পাইয়াছে—নানাসাহেব আপালাকে বিঠুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। নানাসাহেব বাজীরাওর মহিষীদের সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই—অবশ্য এটাও ঠিক যে তাঁহারাও করেন নাই। স্বামীর পোষ্যপুত্রের হাত হইতে যতটা ব্যক্তিগত টাকাকড়ি ভরসা বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা করিয়াছেন, তদুপরি বিনয়-আশ্বাস লইয়াও নিরন্তর বিব্রত ও বিপন্ন করিয়াছেন। তাই শেষ পর্যন্ত নানা একরকম তাঁহার জননীদের নজরবন্দী করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি ভগ্নীদের বিবাহের ব্যাপারেও তাঁহাদের কথা শোনেন নাই। পৈত্রিক পেন্সনে বঞ্চিত নানাসাহেবের এই সব সম্পত্তি এবং টাকাকড়িই ভরসা—নিজের হাতের বাহিরে যাইতে দিবার ইচ্ছা ছিল না শুধু নয়, উপায়ও ছিল না।

কিন্তু মহিষীরা সে কথা তোলেন নাই। চারিদিকে গোলমালের আভাস, নানাসাহেবও এই গোলমালে জড়াইয়া পড়িতেছেন—এ কথা তাঁহাদের কানেও পৌঁছিয়াছিল বৈকি! কাজেই তাঁহারা যে অন্তিম সময়ে যতটা সম্ভব নিজেদের 'ভবিষ্যৎ' ভাবিবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নয়। নানার অনুপস্থিতিতে প্রাসাদে বহুষড়যন্ত্র পাকিয়া উঠিতেছে—এই সংবাদ ক'দিন ধরিয়াই নানা পাইতেছেন। কথাটা আমিনার সামনেই আলোচিত হইয়াছে। নানা তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছেন কিন্তু শুধু বাহির হইতে ব্যবস্থা করিয়াও সবটা সামলানো যায় না বলিয়া ভিতর হইতে নজর রাখিতে আদালা বেগমকে আজই সকালে বিঠুরে চালান করিয়াছেন। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীদেরও নানা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন না। বাজীরাওর মহিষীদের পক্ষে বন্ধুদের 'হাত করা' খুব কঠিন কাজ হইবে না।

সে যাক—আদালাও এখানে নাই বলিয়া আমিনা বাঁচিয়া গেল। অসময়ে পুরুষরা ছাদে ওঠে না—উঠিলেও হুসেনী বেগম আছেন শুনিলে কেহ উঠিবে না।...আমিনা চোখে দূরবীণ লাগাইয়া একদৃষ্টে ছাউনীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল আমিনাকে।

দীর্ঘ, মন্থর কয়েকটি ঘণ্টা, কালের দীর্ঘতম অনুচ্ছেদ কয়েকটি!

ক্রমশ চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। প্রাসাদের পেটা ঘড়িতে আটটা বাজিল, ন-টা, তারপর এক সময়ে দশটাও বাজিয়া গেল।

বুলবুল আসিয়া কহিল, 'সারাদিনই ত কিছু খেলে না। খানা নিয়ে আসব এখানে?'

'না—এখন ভাল লাগছে না কিছু।'

'কিন্তু কিছু না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বে যে! হয়ত আজও সারারাত জাগতে হবে, শরীরে তাকৎ না থাকলে যুঝবে কী ক'রে?'

'আজ শরীর ঠিক থাকবে। তুই বকিস নি। বরং আর এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে আয়। আর শোন—সর্দার এলে তাকে নিচে অপেক্ষা করতে বলিস।'

কথা বলিলেও আমিনা এক লহমার জন্যও দূরবীণ হইতে চোখ সরায় নাই। তাহার একটা কানও পড়িয়াছিল ঐ দিকে।

অন্ধকারের ভিতরও ছাউনির দিকে একটা কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য হইতেছিল। বহুলোক উত্তেজিত হইয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। স্থানে স্থানে জটলা।...

শহরের দিকেও উত্তেজনা কম নাই। এতদূর হইতে মনে হইতেছে যেন সেখানে একটা হাট বসিয়াছে।... অনেকেই কয়দিন ধরিয়া কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছে, অধিকাংশ লোকই . উত্তেজিত, গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীরা শঙ্কিত। গোলমাল হাঙ্গামার অর্থ তাহারা জানে। কিন্তু মনোভাব যাহাই হউক—ঘুম নাই কাহারও চোখেই। চারিদিকেই জটলা, চারিদিকেই একটা কঠকর প্রতীক্ষা। যে আগুন চারিদিকে জ্বলিয়াছে সে আগুন এখানেও জ্বলিবে। যে ঝড় সমস্ত উত্তরপশ্চিম ভারতের উপর দিয়া বহিতেছে তাহা এখানে পৌঁছিল বলিয়া।

আজ অথবা কাল—কয়দিন ধরিয়াই এমনি আসন্ন হইয়া আছে ব্যাপারটা।

সকলেই জানে, সকলেই অপেক্ষা করিতেছে, কেবল ঐ ইংরেজগুলা অমন বাহ্যনিরুদ্বেগ বজায় রাখে কেমন করিয়া? সত্য বটে স্ত্রীলোকদের উহারা ঐ গড়খাইটার মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছে, নিজেরাও সারারাত সশস্ত্র বসিয়া থাকে—তবু বাহিরের প্রশান্তি কাহারও এতটুকু নষ্ট হয় নাই। নিত্যকার কাজ নিয়মিত ভাবেই করিয়া যাইতেছে; যেন ভয় পাইবার, সতর্ক হইবার মত কোন কারণই কোথাও ঘটে নাই।

এত নির্বোধ উহারা?

পরিষ্কার অদৃষ্টলিপিও পড়িতে পারে না?

অথবা নিয়তি যখন ঘনাইয়া আসে তখন এমনিই হয়।

ভগবান বহুদিন হইতেই উহাদের হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছেন। সাহেব পাড়ায় আগুন লাগা ত প্রায় রোজকার ঘটনা হইয়া উঠিল। সেদিনও একজোড়া সাহেবমেমকে কে বা কাহারা খুন করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল, সকলে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। তবে এত কিসের সাহস উহাদের, অথবা নির্বুদ্ধিতাই ?

এতদিন পলাইবার উপায় ছিল। সে চেষ্টা ঘুরে থাক্—টাকা এবং হাতিয়ার আগলাইবারও চেষ্টা না করিয়া—যুদ্ধের সময় সবচেয়ে প্রয়োজন যে দুটি জিনিস, সেই দুটিই শত্রুর হাতে তুলিয়া দিয়া—সবচেয়ে প্রকাশ্য স্থানে আসিয়া আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিল। এ নিতান্তই ভগবানের মার।

যেটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ এখনও হয়ত ছিল আমিনার—সেটুকুও চলিয়া গেল।

ঈশ্বরই তাহাকে দিয়া মারণযজ্ঞের আয়োজন করাইতেছেন, সে নিমিত্ত মাত্র।

ফট্—ফট্—ফট্!

তিনটি পিস্তলের শব্দ না?

আসিল কোথা হইতে? ছাউনির দিক হইতেই ত। আমিনার বুকের রক্ত যেন সেই তিনটি শব্দে তিনবার চমকাইয়া উঠিল।

কিন্তু ওদিকে আবার কি? উত্তর দিকের আকাশে অত আলো কিসের?

আমিনা ছুটিয়া এদিকে আসিল।

আলো নয়—আগুন। সাহেব পাড়ার কোন বাংলোতে আগুন লাগানো হইয়াছে। তাহারই রক্তিম আভা। দেখিতে দেখিতে বহুস্থান জুড়িয়া অন্ধকার আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। একটা নয়—বহু বাংলোয় আগুন লাগিয়াছে। ওদিকে বোধ হয় একদল লোক এই সঙ্কেতটারই অপেক্ষা করিতেছিল।

অকারণ অগ্নিকাণ্ডে আমিনার রুচি নাই। সে আবার দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ছাউনির দিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটু আগে ওদিক হইতে চাপা আলোচনার গুঞ্জন শোনা যাইতেছিল তাহা এতক্ষণে কোলাহলে পরিণত হইয়াছে। জনরোল দূরশ্রুত সমুদ্রকল্লোলের মতই শোনাইতেছে।

কাজ আরম্ভ হইয়া গেছে।

আমিনার এতদিনের সাধনা ও স্বপ্ন তাহা হইলে সফল হইতে চলিয়াছে!

এসময়ে এ ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা যায় না।

কানে গেল নিচের দিক হইতে অনেকগুলি লোকের কথা বলার আওয়াজ। হেঁট হইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল—স্বয়ং নানাসাহেবও ছাদে আসিতেছেন। তিনিও বোধ করি স্বচক্ষে দেখিতে চান ব্যাপারটা।

আমিনা আর দাঁড়াইল না।

নানাসাহেবের সহিত দেখা হওয়া এখন আদৌ অভিপ্রেত নয়। এখন কিছুটা তাহার স্বাধীনতা প্রয়োজন—

বড় সিঁড়ি দিয়া নানাসাহেব উঠিতেছেন, সেও পাশের আর একটা সিঁড়ি দিয়া দ্রুত নিচে নামিয়া আসিল।

কিন্তু ঘরে আসিয়াও স্থির থাকিতে পারিল না।

মুসম্মৎকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, 'সর্দার এসেছে?'

'অনেকক্ষণ—ওদিকের দরজার বাইরে বসে আছে সে।'

আমিনা কাশ্মীরী কাঠের দেরাজটা খুলিয়া তাহার সেই ছোট্ট পিস্তলটা বাহির করিয়া অভ্যাসমত কোমরের কাছে গুঁজিল, তাহার পর ঠিক বুরখা নয়—একটা গাঢ় খয়েরী রঙের রেশমী চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকিতে ঢাকিতে বলিল, 'কেউ যদি খোঁজ করে ত বলিস তার ভীষণ মাথা ধরেছে, নয়ত বলিস নবাবগঞ্জের বড় দরগায় সিন্নি দিতে গেছে—কি যা হয় বলিস। আমি চল্লুম।'

মুসম্মৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, 'কোথায় যাবেন এমন সময়ে মালেকান? ওদিকে বিষম গোলমাল হচ্ছে—শুনতে পাচ্ছেন না?'

'সেই জন্যেই ত যাচ্ছি। ছাউনির দিকেই যাচ্ছি।

এতদিন ধরে এত আয়োজন করলুম,—এত ঘুরলুম, আর আজই ঘরে বসে থাকব? কাঠ কুড়িয়ে মলুম—এখন আগুন-জ্বালাটা নিজের চোখে দেখব না?'

তবে উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ হইয়া মুলমুৎ আরও কি একটা বলিতে গেল কিন্তু সে অবসর মিলিল না, কারণ আমিনা ততক্ষণে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

ঘর হইতে দালান, সেখান হইতে সেকালের অন্দর মহলের অসংখ্য সরু সরু সুঁড়ি পথ—সেগুলি পার হইয়া সিঁড়ি ও উঠান—কোথাও আমিনা তাহার গতি বিন্দুমাত্র মন্থর করিল না। একরকম সে ছুটিয়াই চলিয়াছে। এমন কি সর্দার খাঁ সঙ্গে আসিতেছে কিনা সে খোঁজটাও করিল না; সর্দারের সামনে দিয়া আসিয়াছে—তাই যথেষ্ট। সে ঠিক পিছু লইয়াছে। কাহাকেও গোপন করিয়া আসিবারও প্রয়োজন নাই—নানাসাহেব ছাড়ে. তাছাড়া আজ সকলেই উত্তেজিত, উদ্‌ভ্রান্ত। কে কোথায় যাইতেছে সে খবর লইবার কাহারও অবসর নাই।

কোঁকের মাথায় প্রাসাদ হইতে বহুদূর চলিয়া আসিবার পর আমিনা নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিল। 'তার ঘর' বা টেলিগ্রাফ অফিসের কাছ হইতেই ভীড় দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। দর্শকরা ত আছেই—মজা দেখিবার জন্য বহু লোক আসিয়া খালের এপারে জড়ো হইয়াছে। কাজে অকাজে বহু লোকই ছাউনিতে আসে, তাহার উপর আজ আর কড়াকড়ি করিবার লোক নাই—যাহারা কোন কালে ছাউনির দ্বারে কাছে ঘেঁষিতে সাহস করে না। তাহারাও আজ বুক ঠুকিয়া সামনে আসিয়া ভীড় জমাইয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া সিপাহীরাও ব্যস্ত হইয়া ঘোরাফেরা করিতেছে—এবং তাহাদের অধিকাংশই ঘোড়সওয়ার। এক একবার তাহারা যেমন বেপরোয়া ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে অমনি প্রাণের দায়ে ভীড়টা ছত্রভঙ্গ হইয়া আকস্মিক ভাবে পিছনের লোকদের উপর আসিয়া পড়িতেছে—সে আরও বিপদ।

আমিনা কহিল, 'বড্ড ভুল হয়ে গেল রে সর্দার, ঘোড়া নিয়ে বেরোন উচিত ছিল!'

সর্দার কহিল, 'নিয়ে আসব?'

'যাবি?...আমি একলা থাকব একেবারে? কোথায় ছিটকে পড়ব হয়ত—এসে যদি দেখা না পাস?'

একটা আমগাছের নিচে দাঁড়াইয়া উহারা কথা বলিতেছিল। সেইখানেই হঠাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল সর্দার খাঁ, কহিল, 'আমার কাঁধে পা দিয়ে গাছের ওপর উঠে যান মালেকান, ওখানে নিরাপদে থাকবেন। আমি ঘোড়া আর খবর দুই-ই নিয়ে আসছি।'

তাহার বিপুল দেহ সত্ত্বেও সে আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।...

একটু পরেই সর্দার ফিরিল। কোথা হইতে দুটা ঘোড়াও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, আর আনিয়াছে স্বয়ং আজিমুল্লাখাঁকে।

আজিমুল্লাও একটা ঘোড়ায় সওয়ার হইয়াছেন। তিনি কাছে আসিয়া সযত্নে আমিনাকে নামাইলেন গাছের ডাল হইতে। তাঁহার কয়েকটি আঙুলে মাত্র ভর দিয়া আমিনা আশ্চর্য লঘুগতিতে একেবারে ঘোড়ার পিঠে আসিয়া বসিল।

'আপনার এই ভীড়ের মধ্যে এভাবে আসা ঠিক হয়নি বেগমসাহেবা, সর্দারকে পাঠালেই পারাতেন। না হয় আমি গিয়ে খবর দিয়ে আসতুম।... আজ বহু বদলোক এখানে জড়ো হয়েছে।' মৃদু অনুযোগ করেন আজিমুল্লা।

কোমর হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া আমিনা আজিমুল্লার সামনে মেলিয়া ধরিল। অসহিষ্ণুভাবে বলিল, 'হাতিয়ার ছাড়া আমি বেরুই না। আমি ঠিক আছি। এখন খবর বলুন।'

'খবর খুব ভাল। টীকা সিং অসাধ্যসাধন করেছে। কাল সারারাত ধরে সিপাহী লাইনের মেয়েছেলে আর টাকা কড়ি দেহাতে সরিয়ে দিয়েছে—সাহেবরা সন্দেহও করেনি। আজ ওরই পিকেট ডিউটি ছিল—সুবিধেই হয়ে গেছে। সময় বুঝে ওরই সওয়াররা আগে বেরিয়ে এসেছে। ঐ দেখুন ঘোড় সাহেবের * বাংলো জ্বলছে। খুব নির্বিবাদে কাজ মিটে গেছে। ওরা মালখানা থেকে টাকা আর নিশান দখল করবার সময় এক সুবেদার মেজর বাধা দিতে গিয়েছিল—বেচারী প্রাণ দিয়ে নিজের স্পর্ধার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। টীকা সিংহের ঘোড়-সওয়াররা বেরিয়ে এসে এক নম্বর ইন্‌ফ্র্যান্ট্রিকে ডাক দিতেই তারাও বেরিয়ে এসেছে। ওরা সোজা চলে গেছে নবাবগঞ্জের দিকে, জেলখানা, ট্রেজারী আর ম্যাগাজিন এগুলো দখল করতে।'

'এ ত দুটি মাত্র রেজিমেন্টের কথা বললেন। বাকী? ছাপ্পান্ন আর তিপ্পান্ন?'

'একটু মুস্কিল বেধে গিয়েছে। ওরা এখনও ইতস্তত করছে—ওদের মনের ভাবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বেগম সাহেবা।'

'সে কি। এখনও বোঝা যাচ্ছে না? এতকাল কী করলেন তবে?'

আমিনার কণ্ঠে হতাশা ও বিরক্তির সুর।

সে ঘোড়ার মুখ ফিরাইল।

'কোথা যাচ্ছেন?' আজিমুল্লা বিব্রত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি আবার ওর মধ্যে অনর্থক,—?'

'চলে আর সর্দার খাঁ।' আমিনা যেন আজিমুল্লার উপস্থিতি ও আশঙ্কা একই সঙ্গে উড়াইয়া দিতে চায়।

ভীড় ঠেলিয়া আরও খানিকটা যাইতেই খোদ টীকা সিংহের দেখা পাওয়া গেল।

'কী খবর টীকা সিং?' আমিনা স্থান কাল পাত্র সব ভুলিয়া নিজেই সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে প্রথমটা ঘাবড়াইয়া গেলেও সঙ্গে আজিমুল্লাকে দেখিয়া টীকা সিং আশ্বস্ত হইল। তখন পরিচয় জানিবার সময় নাই। সে উত্তরটা আজিমুল্লাকেই দিল, 'কাম ফতে খাঁ সাহেব! ট্রেজারী আর ম্যাগাজিন দুই-ই আমাদের হাতে এখন। সবাই চলে এসেছে, কেবল এই দুটো দলই বড় বেগ দিচ্ছে। তিপ্পান্ন আর ছাপ্পান্ন।

আমিনা ঘোড়া চালাইয়া সোজা টীকা সিংহের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'শুনুন, টাকার লোভ দেখান। বলুন এখন যদি না আসে ত ওদের বাদ দিয়েই লুঠের টাকা ভাগ করা হবে, এর পর আর ওদের কোন দাবী থাকবে না!'

'লুঠের টাকা?' টীকা সিং খানিকটা হতভম্ব ভাবেই প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ হ্যাঁ—ট্রেজারীর টাকা। বলুন যে ট্রেজারীর টাকা ভাগ করা হচ্ছে, না এলে ভাগ পাবে না। যা খুশী বলুন গিয়ে, মোদ্দা—তাড়াতাড়ি করুন। লোহা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর পিটোনো যায় না—ইংরেজীতে একটা কথা আছে। এখন যদি বেরিয়ে না আসে ত সকাল বেলা ঐ ইংরেজগুলোই যা তা লোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেবে। যান—দেরি করবেন না।'

নেতৃত্ব করিবার জন্মগত অধিকার লইয়া কোন কোন মানুষ জন্মায়। আমিনাও সেই শ্রেণীর মানুষ। তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীর মধ্যেই এমন এক অলঙ্ঘ্য নির্দেশ ছিল যে টীকা সিং—সে নির্দেশ কোথা হইতে, কাহার কাছ হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্যও থামিল না। সোজা ঘোড়া ছুটাইয়া ভীড়ের মধ্যে চলিয়া গেল তখনই।

অধৈর্য আমিনাও আর পিছনে অপেক্ষা করিতে পারিল না—যতটা সম্ভব ভীড় সরাইয়া একেবারে সামনের দিকে আগাইয়া গেল। যাহারা ঘোড়ার চাপে সরিতে বাধ্য হইল, তাহারা দুই একজন যে রোষ-কষায়িত নেত্রে না তাকাইল তাহা নয়—কিন্তু সশস্ত্র সর্দার খাঁ ও আজিমুল্লা খাঁকে দেখিয়া

* Riding master

আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না—মহিলার অগ্রাধিকার অগত্যা মানিয়া লইল।

যখন আর যাওয়া গেল না—তখন আমিনা এক অসমসাহসিক কাণ্ড করিল। নিজের ঘোড়া সর্দার খাঁর ঘোড়ার পাশে লইয়া গিয়া তাহার কাঁধে ভর দিয়া সোজা ঘোড়ার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

॥ ৩২ ॥

টীকা সিং আমিনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। গলার আওয়াজ চড়া—এমন দেখিয়া দুইজন সওয়ারকে সে পাঠাইল ছাপ্পান্ন নম্বর ও তিপ্পান্ন নম্বরের লাইনে। তাহারা চারিদিকের সব কোলাহল ডুবাইয়া নিজেদের বক্তব্য অধিকাংশের কানে পৌঁছাইয়া দিল—আমিনারই শিখানো কথা—"ভাইসব, মন দিয়ে শোন। ট্রেজারীর টাকা আমরা হাতে পেয়েছি, এখানকার সিপাইদের মধ্যেই তা ভাগ হবে, কিন্তু যারা এর মধ্যে আমাদের দলে আসবেনা, বা আজ রাতে ট্রেজারীতে উপস্থিত হবেনা তারা সে টাকার কোন ভাগ পাবে না। সূর্যোদয়ের পর আর কারুর কোন দাবী গ্রাহ্য করা হবে না।"

ছাপ্পান্ন নম্বরের মধ্যে অনেকেই উসখুস করিয়া উঠিল; শুরু হইল শলাপরামর্শ; একটু পরে গুঞ্জন—তাহার পর একে একে ঘুরে ঘুরে বন্দুক কাঁধে করিয়া আসিয়া উঠিল এধারের সড়কে, যেখানে টীকা সিংহের অনুগামীরা দাঁড়াইয়া অধীর আগ্রহে তাহাদের 'বোন্ত' আর 'ভাইয়া'দের প্রতীক্ষা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে ছাপ্পান্ন নম্বরের ব্যারাক প্রায় খালি হইয়া গেল।

বিদ্রোহীদের কোলাহল ও জয়ধ্বনি বহুদূরে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল।

আমিনা আরও খানিকটা অপেক্ষা করিয়া আজিমুল্লাকে পাঠাইল তিপ্পান্ন নম্বরের খবর সংগ্রহ করিতে। সে নিজে সেখান হইতে নড়িল না—ফিরিতে ত রাজী হইলই না। আজিমুল্লা অনেক অনুরোধ করিল—প্রতিশ্রুতি দিল যে সে নিজে প্রাসাদে গিয়া খবর পৌঁছাইয়া দিবে কিন্তু আমিনা কোন কথাই কানে তুলিল না, বলিল, 'এর শেষ না দেখে আমি নড়বনা খাঁ সাহেব—আপনি মিছেই সময় নষ্ট করছেন।'

অগত্যা আজিমুল্লাকেই হার মানিতে হইল।

অনেকক্ষণ পরে শেষ রাত্রের দিকে তিনি ফিরিয়া দুঃসংবাদ দিলেন, 'তিপ্পান্ন নম্বরের হাওয়া ভাল নয় বেগম সাহেব—ওরা বোধ হয় ইংরেজদের ছাড়বে না। ওদের মধ্যে সাত আট জন চলে গিয়েছে কিন্তু বাকী কারুর ইচ্ছে নেই!'

অসহিষ্ণু বিরক্তিতে আমিনা নিজেরই ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া রক্তাক্ত করিয়া ফেলিল।

এদিকে আজিমুল্লার কথা শেষ হইবার আগেই প্যারেডের বিউগল বাজিয়া উঠিল। শেষ রাত্রেই প্যারেড্ ডাকা হইয়াছে—কতকটা অবশিষ্ট সৈন্যদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করার জন্যই। আমিনা উদ্‌গ্রীব হইয়া ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিল। তিপ্পান্ন নম্বর, এবং ছাপ্পান্ন নম্বরেরও কয়েকজন যথারীতি আসিয়া মাঠে সারি দিতেছে।

আমিনার চোখ-দুটা সেই আবছা অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলিতে লাগিল। অকস্মাৎ সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া আজিমুল্লাকে কহিল, 'আর একঘণ্টার মধ্যেই তিপ্পান্ন নম্বরও আপনাদের সঙ্গে মিলবে খাঁ সাহেব, আমি ব্যবস্থা করছি!'

সে আর দাঁড়াইল না, কিছু খুলিয়া বলিলও না। প্রাণপণে—বলিতে গেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে, ঘোড়া ছুটাইয়া প্রাসাদের দিকে রওনা হইল। এমন কি যাওয়ার আগে একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত জানাইয়া গেল না আজিমুল্লা খাঁকে।

* * * *

আরও আধঘণ্টাখানেক পরে উদ্বিগ্ন, বিংকর্তব্য-

বিমূঢ় হইলার সাহেবের চাপরাশী আসিয়া হাতে লেফাফায় আঁটা একটি চিঠি দিল—চিঠির উপর পরিচ্ছন্ন ইংরেজীতে হইলার সাহেবের নাম লেখা। আর্দালী জানাইল—কে এক বুরখাপরিহিত স্ত্রীলোক আসিয়া তাহার হাতে এই চিঠিখানি দিয়াই চলিয়া গেছে।

হইলার সাহেব তখন একা তাঁহার টেবিলে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা কফি সামনে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। সংবাদটা তাঁহার মাথায় ঢুকিতেই কিছু বিলম্ব হইল। তিনি বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে আর্দালীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'আমার নামে চিঠি এনেছে? মেয়েছেলে? বুরখা পরা স্ত্রীলোক? কী লিখেছে সে চিঠিতে?'

আর্দালী অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া কহিল, 'আজ্ঞে তা বলতে পারব না। খামে আঁটা চিঠি। এই যে—'

সে চিঠিখানা বাড়াইয়া ধরিল।

হইলার সাহেব চিঠিটা হাতে করিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। পরিচ্ছন্ন ইংরেজীতে খামের উপর নাম লেখা। মুক্তার মত হরফ, তবু বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে কোন স্ত্রীলোকেরই লেখা।

ইংরেজী-জানা আর কে এমন স্ত্রীলোক এখনও শহরে আছে? আর কীই বা সে চায় তাঁহার কাছে?

খামখানা খুলিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হয়—তবু হইলার সাহেব কয়েক মুহূর্ত সেটা হাতে করিয়াই বসিয়া লেখিকার নাম অনুমান করিবার চেষ্টা করিলেন। মিসেস গ্রীনওয়ে? মিসেস টেলর? আর কে হইতে পারে?

অবশেষে খামখানা ছিঁড়িতেই হইল।

তেমনি মুক্তার মত হস্তাক্ষরে পরিচ্ছন্ন চিঠি। কয়েক-ছত্র মাত্র—নির্ভুল ইংরেজীতে লেখা।

"প্রিয় জেনারেল হইলার, বিদ্রোহীদের মধ্যে বন্দোবস্ত হইয়াছে—একদল সৈন্য বিশ্বস্ত থাকিবার ভান করিয়া আপনাদের গড়খাইয়ের মধ্যে থাকিবে। তাহার পর কোন-এক অসতর্ক মুহূর্তে ভিতর হইতে আপনাদের আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত করিবে। সতর্ক থাকিবেন। জনৈক বন্ধু!"

চিঠিখানা পড়িয়া হইলার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর আর্দালীকে পাঠাইয়া লেফটেনান্ট য়্যাশেকে ডাকিয়া আনাইলেন।

য়্যাশে আসিতে নিরবে চিঠিখানা তাঁহার হাতে দিলেন হইলার। য়্যাশের পড়া শেষ হইলে প্রশ্ন করিলেন, 'কী বুঝলে?'

'কে লিখল চিঠিখানা আর কী মতলব—তাইত ভাবছি।'

'আমার মনে হয়, নানাসাহেবের যে কে-এক আংরেজী জানা বেগম আছে শুনেছি—এ চিঠি তারই লেখা।'

'হ'তে পারে। কিন্তু তাহ'লে এ চিঠি কি খুব নির্ভরযোগ্য মনে হয় আপনার?'

'কেন নয়? শুনেছি কনভেন্টে পড়েছে, ইংরেজদের সে ভালবাসে—তার পক্ষে আমাদের একটু সময় থাকতে হুঁশিয়ার ক'রে দেওয়াটাই ত স্বাভাবিক।

য়্যাশে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তাহ'লে কী করবেন ভাবছেন?

'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। বেশীর ভাগই ত গেছে—ও ক'টাকেও তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাক।...এমনিই হয় ত যাবে—আজ না হয় কাল। মিছি-মিছি এ অনিশ্চয়তা আর সহ্য হচ্ছে না। সব যাক্—'

'তা ব'লে আমরা স্বেচ্ছায় ওদের ঠেলে দেব ঐ বিশ্বাসঘাতকগুলোর মধ্যে? যদি সত্যিই ওরা বিশ্বস্ত হয়?'

'যদি না হয়? যদি এই চিঠিই সত্যি হয়? ঘরের মধ্যে শত্রু পুষে রাখা কি ভাল?'...বরং যে কজন আছি নিজেরা নিজেদের জোর বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে আত্মরক্ষা করাই ভাল!'

য়্যাশে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'তা এখন আমাকে কী করতে বলেন!'

হইলার হঠাৎ যেন বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, 'আমাকেই সব বলতে হবে! কেন, তোমরা কি কেউ কোন ঝঁ সি

নিতে পারো না। বেশ, আমি বলছি যাও, ওদের ওপর গোলা চালাও। সোজা।'

র‍্যাশে নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

'ওদের ওপর গোলা চালাব? কামান থেকে?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। কানে কম শুনছ নাকি?'

নিজের ঠোঁট দুটায় একবার জিভ বুলাইয়া লইয়া র‍্যাশে ঢোঁক গিলিয়া তবু বলিলেন, 'বেচারীরা হয়ত এখন নিশ্চিন্ত মনে রসুই পাকাতে বসেছে—এ সময় —সেটা কি ভাল হবে?'

'ওঃ, বড় যে দয়া দেখছি! আমরা যখন নিশ্চিন্ত মনে খেতে বসব, ওরা যদি সে সময় আমাদের ওপর গুলি চালায় সেইটেই বড় ভাল হবে, না? শয়তান বেই-মানের জাত ওরা—সব সমান! যাও, যা বলছি তা করো গে!'

র‍্যাশে নিরবে অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তিপ্পান্ন নম্বর রেজিমেণ্টের তখন সত্যই রসুই চড়িয়াছিল। কেহ বা উর্দি খুলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছে, কেহ বা উর্দি পরিয়াই বসিয়া তামাক টানিতেছে।

এমন সময় কে একজন খবর দিল ছাপ্পান্ন নম্বরের যাহারা কাল চলিয়া গিয়াছিল তাহাদেরই কয়েকজন আসিয়া তোষাখানা হইতে সিন্দুক বাহির করিয়া ভাঙিতেছে এবং নিশানগুলি আলাইয়া দিতেছে। একজন সার্জেণ্ট বাধা দিতে গিয়াছিল তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে।

একজন হাবিলদার সবে গুড়গুড়ি মুখে তুলিয়াছিল, সে সেটা নামাইয়া রাখিয়া কোমরে বেল্ট আঁটিতে আঁটিতে ছুটিল—'আডজুটাণ্ট' সাহেবকে খবর দিতে।

এমন সময় অকস্মাৎ একসঙ্গে তিনটি কামান তাহাদের দিকে মুখ করিয়াই অগ্ন্যুদ্গার করিয়া উঠিল

গুম্-গুম্-গুম্!

সকলে স্তম্ভিত, হতচকিত।

তাহাদেরই কামানে তাহাদেরই উপর ছোঁড়া হইতেছে?

তাহারা ভুল দেখিতেছে না তো?

তাহাদের এই সংশয়ের জবাব দিতেই বোধ হয় কামানগুলি আবারও গর্জন করিয়া উঠিল—

গুম্-গুম্-গুম্—

তারপর আরও একবার। আর সংশয়ের অবকাশ রহিল না।

যে যে দিকে পারিল ছুটিল। যেমন অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই—যাহারা শুধু ল্যাঙট পরিয়া তেল মাখিতেছিল, তাহারা জামা উর্দী পরিবারও অবসর পাইল না। কোন-মতে একহাতে সেগুলা আর এক হাতে বন্দুকটা, আঁকড়াইয়া ধরিয়া সেই হাস্যকর অবস্থাতেই ছুট দিল।

দেখিতে দেখিতে ব্যারাক খালি হইয়া গেল। তবে একেবারে নয়। তবু রহিয়া গেল কয়েকজন। যাহাদের কাছে জানের চেয়ে নিমকের মূল্য বেশী তাহারা কিছুতেই ব্যারাক ছাড়িয়া নড়িল না। র‍্যাশে ইঙ্গিতে গোল-আজদের নিরস্ত করিলেন। আর নয়।

সেদিক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জামার হাতায় ললাটের ঘাম মুছিতে মুছিতে বন্ধু ও সহকর্মী টমসনকে বলিলেন, 'অনেক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলাম আমরা এই কদিনে,—একের পর এক। কিন্তু আজকের এইটেই বোধ হয় চরম। ইতিহাসে এর দ্বারাই আমরা সব-চেয়ে বড় বেকুবদের মধ্যে স্থান ক'রে নিতে পারব!'

[ক্রমশঃ]

শেষ কোথায়

শ্রীসৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বানুবৃত্তি

(৯)

যথাসময়ে অরুণের ঘুম ভাঙিলে মনে হইল তাহার সমস্ত অন্তর বুঝি শূন্য হইয়া গিয়াছে। দুঃখ বেদনার কোন অনুভূতিই সেখানে নাই। সবই যেন কেমন ফাঁকা। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ধীরে ধীরে একটা অপরিসীম অস্বস্তি আসিয়া অধিকার করিতে লাগিল। একটা কিছু না করিতে পারিলে অরুণ যেন আর কিছুতেই নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করিতে পারিতেছে না। অর্চনাকে ডাকিয়া বলিল: 'আজকের মত আমার হয়ে তোমার যন্ত্রপাতির কাজটা চালিয়ে দিতে হবে। শোভাদি রয়েছেন, তিনি সব জানেন। দরকার হলে তাঁকে সব জিজ্ঞেস ক'রো।'

ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া অর্চনা জিজ্ঞাসা করিল।

'কিন্তু কেন এমন হ'ল অরুণ? দীপুকে আমি জানি। বোধ হয় কোথাও কোন ভুল হয়েছে। আমার অনুরোধ হঠাৎ কিছু করতে গিয়ে ওর উপর তুমি যেন অবিচার ক'রে বসোনা।'

অরুণের সহিত অর্চনার অন্তরঙ্গতা বন্ধুত্বের পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অরুণ ম্লান হাসিয়া বলিল, 'ভয় নেই। আঘাত যখন পেয়েছি তখনই যদি নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছি, তখন নতুন কিছু করে বসব না। কিন্তু ওসব কথা আর তুমি তুলো না অর্চনা। আমি যা বললাম, সেটুকু শুধু কর।'

অরুণ বাহির হইয়া পড়িল। বেলা যখন প্রায় নয়টা তখন নিজের ঘরে ঢুকিতে যাইবে, শুনিতে পাইল, ঘরের ভিতর তাহাদের গতকালের ঘটনা লইয়াই তুমুল তর্ক চলিতেছে। অরুণ থমকিয়া দাঁড়াইল।

নেপাল তাহার নিজস্ব ধরণে বলিতেছিল, 'কিন্তু দীদির এটা অন্যায়। কি ওঁদেরও মেয়েমানুষ গো! অরুণের মত ছেলেকে একেবারে হটিয়ে দিলেন!'

অতুল তাহার স্বভাবসিদ্ধ মুচকী হাসিয়া বলিল, 'দুর্বলতা, বুঝলে হে নেপাল, এটা স্ত্রী জাতির প্রতি স্বভাবসুলভ দুর্বলতা। বল দেখি গিয়ে তুমি ওরকম একটা কথা অরুণকে, ভদ্রতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে। ঘুসিতে মুখ কাটিয়ে দেবে না অরুণ! আমি তো বাবা ভয়ে ভয়েই থাকি। যে চেহারা আর মাথা তো নোয়ায়ই না। সব সময় যেন আকাশের দিকে চেয়ে আছে।'

হারুদা বলিয়া উঠিল, এ সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলেছেন জান?'

নেপাল রুখিয়া উঠিল,

'আরে রেখে দাও তোমার ঠাকুর। তরকারী কুটবার সময় তো দিব্বি মেয়েদের গা ঘেঁসে বোস। তখন বুঝি ঠাকুরের কথা মনে থাকে না?

শিশির একটু স্বল্পভাষী। ইহাদের আলোচনা সে শুনিতেছিল। এইবার বলিল, 'অরুণ যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছে। অন্য কেউ হলে হয়তো একটা কি করে বসতো।'

'Weakness বুঝলে শিশির, ওটা weakness। ওটাকে ঠিক ভদ্র ব্যবহার বলা চলে না।' অতুল উত্তর করিল।

'বেশ, তোমার কথাই যদি ধরে নেওয়া যায়, তা'হলে weaknessটা উভয়তঃ। আর তাই যদি হবে, তবে এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি কেন? তা'নয়। এটা মেয়েদের একটা দম্ভ। সে দিন আমার সঙ্গে কি করলো, মনে নেই! ওদের ধারনা, আমাদের ওরা যেমন খুসী অপমান করতে পারে। বাধা দেবার কেউ নেই।'

অরুণ সচকিত হইল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আশ্রমের সেই পুরাতন দম্ভ ঘুমায়িত হইয়া উঠিবার

উপক্রম করিতেছে। ইহাকে আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, 'দিদির, একজন বা দুজনকে নিয়ে ওদের সকলকে বিচার করলে অন্যায় হবে ভাই। আর তা' ছাড়া, এ নিয়ে তোমাদের মধ্যে আলোচনা করেই বা কি হবে?'

'না, এর একটা প্রতিকার দরকার। মেয়েগুলো সব ভেবেছে কি? ধাড়ী ধাড়ী সব মেয়ে, এখনও বিয়ে পর্যন্ত হয়নি, এত তং কেন তাদের?'

'নেপাল!'

অরুণের কণ্ঠস্বরে নেপাল আহত হইল। বলিল, 'তোমার ভালোর জন্যেই আমরা বলছিলাম ভাই। এ যে আমাদের সকলেরই অপমান।'

'না। এ অপমান শুধু আমারই। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা। আমি চাই না, এ নিয়ে তোমরা কোন আলোচনা কর। যদি কিছু করতে হয় তো সে আমিই করব।'

সেই দিনই সারা দুপুর গ্রামে ঘুরিয়া অরুণ কতগুলি বেল কিনিয়া আনিল। গয়লাবাড়ী হইতে কিছু দই ও দোকান হইতে কিছু গুড় কিনিয়া টিফিনের ঠিক আগে একটী ছোট ছেলের হাত দিয়া দীপ্তির কাছে পাঠাইয়া দিল।

প্রশান্তদার সামনে অতবড় কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই দীপ্তি নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়াছিল। ছিঃ ছিঃ, অরুণের অধিকারবোধকে সে এইভাবে অপমানিত ও অস্বীকার করিল। অরুণ তো নিজে যাচিয়া তাহার উপর এই অধিকারবোধকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যায় নাই; বরং সেই উপযাচিকা হইয়া, তাহার সমস্ত সত্তাকে বিকশিত করিয়া উৎসুকচিত্তে অরুণের আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যেটুকুর নিমিত্ত তাহার সমস্ত অন্তর আকুলি বিকুলি করিতেছিল, সময় আসিলে তাহাকে বরণ করিয়া লইবার পরিবর্তে অপমান করিল কেমন করিয়া! আজ অরুণের সামনে সে দাঁড়াইবে কোন্ লজ্জায়! নিজ হাতেই তো সে অরুণের নিতান্ত স্বাভাবিক দাবীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহার সমস্ত কথার উত্তরে অরুণ একমাত্র তাহার অধিকার-বোধকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। অরুণের এই সংযত আচরণের কাছে দীপ্তি নিজেকে নিতান্তই ছোট মনে করিতে লাগিল।

পরমুহূর্তেই তাহার মনে আশঙ্কা জাগিল অরুণ এইবার কি করিবে। এতদিনের সাধনায় অরুণের মনের কোণে যে সামান্য স্থান করিতে পারিতেছিল, তাহা বুঝি অরুণ সমূলেই উৎপাটিত করিয়া ফেলিবে। স্নেহ ও প্রীতির পরিবর্তে অরুণের চোখ দুইটি শুধু তাহাকে নীরব ধিক্কার দিয়াই ফিরিবে। সে দুঃখ দীপ্তি কেমন করিয়া সহ্য করিবে? দীপ্তি কোন পথই খুঁজিয়া পাইল না। শঙ্কিতচিত্তে সে অরুণের আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার দুঃখ আরও বড় হইতেছিল এই ভাবিয়া যে এই বেদনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার মুখও তাহার নাই। কেহ তাহার জন্য সমবেদনা জানাইবে না। অন্তরের দুঃখভার যতই অধিক হউক না কেন, উহা তাহার অন্তরেই বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে।

আর অরুণ! তাহার দুঃখের বোঝাইয়া কাহার নিকট মুক্ত করিবে! দীপ্তি জানে, নিতান্ত অন্তরঙ্গ কেহ এ' কথার উল্লেখ করিলেও অরুণ তাহার হৃদয় মুক্ত করিয়া ভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিবে না। সে প্রকৃতিরই নয় সে। অরুণের প্রতি সমবেদনায় দীপ্তির মন অস্থির হইয়া উঠিল। সে যে কি করিতেছে, কোথায় আছে, কিছুই জানিবার উপায় নাই। সকালের ক্লাসে অরুণকে দেখিতে পাইল না, দুপুরেও নয়। দীপ্তি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সবাই যেন তাহার সহিত অসহ-যোগ করিয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই সকলে তাহার সহিত অরুণের প্রসঙ্গ এড়াইয়া চলিতেছে। দুপুরের ক্লাস হইতে বাহির হইয়াই সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া দীপ্তি অরুণের খোঁজ লইবার জন্য ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

'ছায়া!'

ছায়ার তরকারী কুটিবার পালা ছিল। বটির উপর বসিয়াই একবার দীপ্তির দিকে তাকাইল। দীপ্তি কোনও কথা বলিতে পারিল না, শুধু নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

হোটেলের বারান্দায় উঠিতেই দেখিল, বেল ও দই লইয়া একটি ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ছেলেটি হাসিমুখে তাহার কাছে আসিয়া বলিল, 'অরুণদা পাঠিয়ে দিলেন, আপনাকে দেবার জন্তে।'

দীপ্তির ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া তাহাকে এইগুলি ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলে। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনও শব্দই বাহির হইল না। শুধু অপলক দৃষ্টিতে সে ছেলেটার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ছেলেটি জিনিষগুলি নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর দীপ্তি আর পারিল না। অপরাধের ভার ক্রমেই যেন বোঝার মত চাপিয়া বসিতেছে। তাহা ছাড়া অরুণের কোনও সংবাদই না পাইয়া সে যেন আর কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিল না। আজ সমস্ত দিন, কোন ক্রমেই, একবারও সে অরুণকে দেখিতে পায় নাই। প্রার্থনা সভায় পর্যন্ত অরুণ অনুপস্থিত। দীপ্তি আসিয়া ভাঁড়ার ঘরের সামনে দাঁড়াইল। অর্চনা ভাঁড়ার গুছাইতেছিল। একবার দীপ্তির দিকে চাহিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া দীপ্তি ডাকিল, 'অর্চনাদি!'

অর্চনা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল, কোনও উত্তর করিল না।

হঠাৎ অর্চনা দেখিল, দীপ্তির চোখের কোণ চিক চিক্ করিতেছে। হাতের কাজ ফেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তি আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না, অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'অর্চনাদি, আজ সারাটা দিন কোথায় থাকলো কি করলো, খেল কি না খেল, কিছুই জানতে পারলাম না। সারাদিনে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না।'

অর্চনা তাহার দুঃখ বুঝিল। এই গ্রামবেয়ালী মেজাজের মেয়েটাকে সে ভালবাসিয়াই তাহার অন্তর চিনিয়া লইয়াছে। সস্নেহে বলিল, 'দুপুরে সে ওধারের বারান্দার এক কোণে বসে খেয়েছে বোন্। কিন্তু তারপর আর ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আচ্ছা, আমি একবার খোঁজ করে দেখছি।
তুই এইখানেই দাঁড়া।'

অর্চনা খোঁজ লইয়া আসিয়া বলিল যে অরুণ প্রশান্তদার ঘরে বসিয়া চরকা কাটিতেছে ও প্রশান্তদার সঙ্গে কি কথা বলিতেছে। দীপ্তি তবুও দাঁড়াইয়া রহিল।

'কিরে, কিছু বলবি?' অর্চনা জিজ্ঞাসা করিল। দীপ্তি কোনও উত্তর না দিয়া আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। দিন কাটিতে লাগিল।

কয়েকদিন পরের কথা। মাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অরুণের খাদ্যমন্ত্রিত্বও শেষ হইয়াছে। অরুণ যেন মুক্তি পাইয়াছে। মনের এই অস্থিরতা লইয়া খাদ্য-মন্ত্রিত্বের এই গুরুদায়িত্ব বহন করা তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল: অর্চনার সাহায্য না পাইলে সে বোধ হয় পারিয়াই উঠিত না। এইবার মাসের প্রথম দিনেই আসিল হিসাব নিকাশের পালা। 'প্রতি-মাসেরই প্রথম দিনে আশ্রম কর্মীদের এক সাধারণ সভা বসে। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী নির্বাচিত হয়, ভোট লইয়া। গতমাসের মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রত্যেক মন্ত্রী নিজ নিজ কার্য বিবরণী পাঠ করে। তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি মন্ত্রীর কার্যের সমালোচনা হয়। এই সমালোচনার উদ্দেশ্য পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী যাহাতে আরও উন্নত ধরণের কাজ করিতে পারে। সেদিনও সাফাই মন্ত্রী অতুল তাহার কার্য-বিবরণী পাঠ করিতে উঠিল। সমস্ত কাজের মোটামুটি একমাসের একটা হিসাব দাখিল করিল। গতমাসের বিশেষ সাফাই হিসাবে উল্লেখ করিল কয়েকজন সর্ব

ভারতীয় নেতার সীতারামপুর আশ্রম আগমন উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী সামগ্রিক সাফাই। উপসংহারে বলিল,

'প্রায় সকলের কাছ থেকেই সকল প্রকার সহযোগিতা পেয়েছি সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে। তবুও দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, দু'একজনের সহযোগিতা আরও আশানুরূপ হলে কাজ হয়তো আরও অনেক ভাল হত। আমি অনুরোধ করি এবং আশাও করি যে ভবিষ্যতে সকলেই সর্বতোভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে সাফাইয়ের কাজটি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন।'

অতুলের বক্তৃতা শেষ হইলে সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। এই অপ্রত্যক্ষ সুস্থ অভিযোগ কাহার বিরুদ্ধে? সকলেই স্পীকারের আহ্বানের অপেক্ষা করিতে লাগিল। অরুণ কিন্তু মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। সে জানে, এই অভিযোগ কাহার বিরুদ্ধে। আগে হতেই সে অনুমান করিয়াছিল যে ঠিক এই ধরণের অভিযোগ একটা আসিবে এবং তাহার জন্য প্রস্তুতও হইতেছিল নিজের মনে। এইবার জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া, স্পীকারের আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

'মাননীয় স্পীকারের অনুমতি নিয়ে আমি সাফাই মন্ত্রী অতুলভাইকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। বিবরণীর শেষ দিকে তিনি যে সামান্য একটু অসহযোগিতার আভাষ দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তিনি আরও স্পষ্ট এবং নির্দিষ্টভাবে বলবেন কি?

অতুল দাঁড়াইয়াই ছিল। সে যেন ঠিক এই প্রশ্নেরই প্রত্যাশা করিতেছিল। অরুণের প্রশ্নের জবাবে বলিল, 'আপনারা, আশ্রমের ভাইবোন সকলেই জানেন, গতমাসে কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতাকে আমাদের এই আশ্রমে অভ্যর্থনা করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তিনদিন আগে থেকেই আশ্রমটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবার দরকার হয়ে পড়ায় সামগ্রিক সাফাইয়ের একটা বিশেষ রুটিন প্রবর্তন করা হয়। সাফাইয়ের সময়ও পঁয়তাল্লিশ মিনিটের যায়গায় বাড়িয়ে দু'ঘণ্টা করা হয়েছিল।'

অতুল একটু থামিয়া সকলের উপর দৃষ্টি বুলাইতে গেল। অরুণের অসহিষ্ণুতা ক্রমেই বাড়িতেছিল। সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'কেন?'

সকলের সপ্রশ্ন দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া অরুণ আবার প্রশ্ন করিল,

'সাফাই মন্ত্রী অতুলভাইকে আমি জিজ্ঞেস করছি, প্রতিদিন পঁয়তাল্লিশ মিনিট আর প্রতি রবিবার দু'ঘণ্টা যে সাফাইয়ের রুটিন আছে, তা'কি তাঁর পক্ষে যথেষ্ট মনে হয়না? যদি না হয়, তবে এই সময় বাড়াবার কি ব্যবস্থা তিনি করেছেন? আর যদি এই সময়ই পর্যাপ্ত বলে মনে হয় তবে আশ্রমে এত জঞ্জাল জমল কি করে, যে তিনদিন ধরে সামগ্রিক সাফাইয়ের প্রয়োজন হতে পারে? আশ্রমের সকল কর্মীই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন বলেই আমার বিশ্বাস। তবে কি অতুল ভাই বলতে চান, সাফাইয়ের ঘণ্টায় কর্মীরা তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেন না?'

এইবার অতুল একটু বিব্রত বোধ করিলেও তাহার মুখে একটু ক্রূর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল! অরুণের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আমি সকলের সম্বন্ধে বলিনি দু'একজনের কথাই বলেছিলাম।'

সভার মধ্য হইতে কেহ কেহ মন্তব্য করিয়া উঠিল, 'তাঁদের নাম করে খুলে বলুন। এমনভাবে হেঁয়ালী রেখে সবাইকে জড়াবেন না।'

অতুল সমস্ত সভার দিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল। তাহার মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি। অরুণের দিকে পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, 'আমি অরুণ ভাইয়ের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ আনছি। সে দিন আশ্রমের গেটের পাশের ডোবাটা ভর্তি করবার ভার অরুণ ভাই আর হারুদার ওপর পড়েছিল। অরুণ ভাই তা' করেন নি এবং পারবেন না বলে আমাকে জানানওনি। আমি সবিনয়ে অরুণ

তাইকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কেন তাঁর এ' রকম করবার দরকার হয়েছিল ?'

এই প্রত্যক্ষ আক্রমণের সামনে অরুণ যেন দৃঢ় হইয়া উঠিল। অতুলের দিকে না তাকাইয়া স্থির, শান্ত স্বরে উত্তর করিল,

'সভার সকলের অবগতির জন্যে আমি প্রকৃত ঘটনাটা বলছি। যদিও ভোরাটা এত বড়ছিল যে দু'জন লোকের পক্ষে তা' দু'ঘণ্টায় ভরাট করা প্রায় অসম্ভব, তবুও এ' কাজ যথাসাধ্য শেষ করবার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। আপনারা জানেন, গত মাসে আমি খাদ্যমন্ত্রী ছিলাম। কাজ কিছুদূর এগিয়ে যেতে হঠাৎ রান্নাঘরে বিশেষ প্রয়োজনে আমার ডাক পড়ে। অতুলভাইকে খুঁজে না পেয়ে আমি হারুদাকেই সব বলে আসি। পরে অতুলভাইয়ের সঙ্গে দেখা হতেই আমি সব বলেছিলাম। কাজটা শেষ করতে পারি নি বলে আমি লজ্জিত। কিন্তু এতে সহযোগিতার অভাব কোথায় ঘটেছে, তার বিচারের ভার আমি সভ্যগণের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।' অরুণ একটু থামিয়া সমস্ত সভার উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া আনিতেই তাহার চোখে মুখে এক দুষ্টু হাসি খেলিয়া গেল। অতুল ততক্ষণে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতেই অরুণ বলিল,

'ছোট বেলায় দেখতাম, বছরে একদিন সবাই মিলে উঠে পড়ে লেগে যেত স্কুল পরিষ্কার করতে,—কি ? না ইন্সপেক্টর সাহেব আসবেন স্কুল পরিদর্শন করতে। আমাদের এই আশ্রমেও সেই গতানুগতিকতার অনুসরণ করলে আমরা নতুন কি শিখলাম ?'

অতুলের মাথাটা যেন আরও একটু ঝুঁকিয়া পড়িল। অরুণ চারিদিকে চাহিয়া একটু স্নেহের সঙ্গে বলিল, 'আজকের এই সমালোচনা থেকে আমি ভবিষ্যৎ সাফাই মন্ত্রীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বুদ্ধ-পূর্ণিমার কয়েকদিন আগে প্রশান্তদা একদিন ক্লাসে বলিলেন,

'ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের দিন আগত প্রায়। আমাদের এই আশ্রমের আদর্শ ভগবান বুদ্ধের বাণী। তাই আমার ইচ্ছা, তোমরা ঐ দিনটীকে বিশেষভাবে পালন কর। অরুণ, তুমি এ'বিষয়ে ভেবে দেখে, এ'মাসের ফাইনমন্ত্রী শিশিরের সঙ্গে পরামর্শ করো। উৎসব পালনের ভার আমি তোমার ওপরই দিলাম !'

এই কয়দিন অরুণ সাধারণ কাজ কর্ম ছাড়া আশ্রমের প্রায় সব কাজই এড়াইয়া চলিয়াছে। এমন কি, তাহার সহপাঠীদেরও। একমাত্র ক্লাস ও কাজের সময় ছাড়া সে আশ্রমেই থাকিতনা। লক্ষ্যহীনভাবে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত। মাঝে মাঝে প্রশান্তদার ঘরে চরকা কাটিয়া অথবা বই পড়িয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাইয়া দিত। প্রশান্তদার সঙ্গেও বিশেষ কোনও কথা হইত না। সে যেন চেষ্টা করিয়াই দীপ্তির কথা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। জীবনে ঘাত প্রতিঘাত আছে, কিন্তু তাহা লইয়া বিলাসিতা করা চলবে না। নারীকে সে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা দূরে থাক, নারী সম্বন্ধে সে সচেতনই কোনদিন ছিল না। দীপ্তির প্রতি আকর্ষণ তাহার মনে যে রঙীন জাল বুনিতে উদ্যত হইয়াছিল, এই এক আঘাতেই তাহা ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। শুধু আঘাতটাই তাহার মনের ভিতর মাঝে মাঝে খোঁচা দিতে লাগিল। ধীরে ধীরে অরুণের মন দীপ্তি সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল আর তাহার এই নীরব ঔদাসীন্য টের পাইয়া আর একজন অন্তরের অন্তঃস্থলে শঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

শিশিরের সঙ্গে অরুণ আসন্ন উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিল। এইমাসের ফাইনমন্ত্রী শিশির। বুদ্ধ-পূর্ণিমা উপলক্ষে অরুণ বুদ্ধদেবের জীবনীকে ভিত্তি করিয়া একটী মূক অভিনয় করিবে স্থির করিয়াছিল। স্ত্রী ভূমিকা নির্বাচনের জন্য মেয়েদের কাছেও ডাকা দরকার। অরুণ দীপ্তির নাম প্রস্তাব করিতে শিশির অবাক হইয়া বলিয়াই ফেলিল, 'সে কি, এত কাণ্ডের পর আবার সেই দীপ্তিকেই ডাকছ ?'

অরুণ উত্তর করিল, 'ভুল করছ শিশির। ঘটনা যা ঘটেছে, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এ'সব বিষয়ে দীপ্তির প্রতিভাকে অস্বীকার করি কি করে?'

অরুণ তাহাকে ডাকিয়াছে, দীপ্তি যেন বিশ্বাসই করিতে পারে না। এই কয়দিন যে তাহার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ করিয়া সে অরুণের ডাকের জন্যই অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল! বাহির হইবার সময় অর্চনা হাসিমুখে বলিল, 'আবার যেন ঝগড়া টগড়া কিছু করে বসিস্ না। কি বলে অরুণ, এসে আমাকে বলবি।'

আশায় ও নিরাশায় দীপ্তির মন উদ্বেল হইয়া উঠে। উৎকণ্ঠিত অথচ সলজ্জ হাসি হাসিয়া উত্তর করে, 'আচ্ছা, সব বলব।'

দীপ্তি আসিয়া দাঁড়াইতেই অরুণ বলিল, 'বোস দীপ্তি। বুদ্ধ-পূর্ণিমার উৎসব নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তোমাকে একটু ডেকেছি।'

অরুণের কণ্ঠের নির্লিপ্ততা মুহূর্তে লক্ষ্য করিয়া দীপ্তি স্তব্ধ মত দাঁড়াইয়া রহিল। কই, অরুণকে অপমান করিবার সময়ও তো অরুণের এই নির্লিপ্তভাব ছিল না। বরং তাহার আচরণে ব্যথিত হইয়া নিজের অধিকার বোধকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিল। নির্নিমেষ চোখে সে অরুণের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অরুণ সে দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া শিশিরকে বলিল, 'শিশির, সমস্ত জিনিষটা ওঁকে একবার ভাল করে বুঝিয়ে বল।'

অনেক কষ্টে মনকে সংযত করিয়া দীপ্তি শিশিরের কথা শুনিল।

'আমাকে কি করতে হবে?'

'ছুটো কাজ। প্রথমতঃ এটার কোনও রদ বদলের পরিকল্পনা যদি তোমার থাকে, তা বলবে। দ্বিতীয়তঃ, কে কোন ভূমিকায় কাকে কি পার্ট দেওয়া যেতে পারে, তা' ঠিক করা। মেয়েদের পার্টের direction ও তোমাকে দিতে হবে। আমি সাধ্যমত তোমাকে সাহায্য করব।'

'কে লিখেছেন এটা?'

'অরুণ।' শিশির উত্তর করিল।

'লেখা সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই, কারণ, এর চেয়ে ভাল লেখা আমার কল্পনায় আসে না। পার্ট আমি বলে দিচ্ছি।'

দীপ্তি নিজে সুজাতার পার্ট লইল। কাজ শেষ হইবার পর শিশির উঠিয়া গেল। দীপ্তি অরুণকে বলিল, 'একটু দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

অরুণ দাঁড়াইল। সহজভাবেই বলিল, 'বল।'

'তোমার ডাকতো এখনো এল না!

অরুণ হাসিল। ব্যথিত ম্লান হাসি। বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'তার কি আর কোনও প্রয়োজন আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।' দীপ্তি দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, মুহূর্তের ভুলের অপরাধে প্রয়োজন এত সহজে শেষ তো হয়ইনি, বরং বেড়ে গিয়েছে।'

'ওসব কথা থাক দীপ্তি। তোমার সেদিনের কথা আমি মন থেকে মুছে ফেলেছি।'

'কিন্তু আমি যে পারছি না।'

দীপ্তির স্বরে চরম অনুতাপ ফুটিয়া উঠিল। অরুণ চুপ করিয়া রহিল। দীপ্তি বলিতে লাগিল, 'আজ আমি বুঝতে পেরেছি, কতবড় আঘাত আমি সেদিন তোমায় দিয়েছি আর কতকষ্টে তুমি তা' সহ্য করেছ।'

দীপ্তি যেন ভাঙিয়া পড়িল। অরুণের মুখে তীক্ষ্ণ হাসি একবার চকিতে ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। বলিল,

'তা' নিয়ে তো আমি কোন অভিযোগ জানাই নি। শোন দীপ্তি, হৃদয় নিয়ে বিলাসিতা কোন দিনই আমার আসেনা যদি বা তোমার সংস্পর্শে এসে হৃদয় বস্তুটাকে বোঝবার চেষ্টা একদিন করেছিলাম, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, তুমি আমাকে আবার আমার সাধারণ পথে প্রতিষ্ঠিত করেছ। আর আমি এ নিয়ে নিজেকে জড়াতে চাই না।'

দীপ্তি শিহরিয়া উঠিল। এ যে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান।

উপযাচিকা হইয়া, সমস্ত লজ্জা, সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া নারীত্বের ডালি সে অরুণের সামনে তুলিয়া ধরিল আর অরুণ তাহা নির্বিকার চিত্তে ফিরাইয়া দিল! অরুণের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, অত্যন্ত সহজ। সে মুখে দীপ্তির প্রতি অভিমানের একটী রেখাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শেষ যুক্তি হিসাবেই দীপ্তি বলিল, 'তোমার কথাটাই শুধু তুমি ভেবে দেখছ। বেশ আমাকে বলে দাও আমি কি করব।'

'এর উত্তর আমি দিতে পারব না, দীপ্তি।'

একটু আঘাত করিবার লোভ অরুণ আর সংবরণ করিতে পারিল না। গলার স্বরে সামান্য শ্লেষ মিশাইয়া বলিল, 'তোমার আঘাত করবার প্রবৃত্তিও যত দীর্ঘস্থায়ী জেগে ওঠে, অনুতাপও তাই। বিচার করে দেখতে গেলে ওটাও এক ধরণের বিলাসিতা। কি করবে, তা তুমিই খুঁজে নিতে পারবে। তোমাকে উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই।'

ব্যথায় দীপ্তির মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ঠিকই হইয়াছে। অরুণের নিকট হইতে ইহাই তাহার প্রাপ্য ছিল। ইহার বহুগুণ আঘাত সকলের সামনেই সে তাহাকে দিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল অরুণই। মুখ তুলিয়া সেই কথাই বলিতে যাইতেছিল, অরুণ তাহাকে থামাইয়া দিল।

'কথায় কথা বাড়বে দীপ্তি। ও'সব অপ্রিয় আলোচনা থাক। আমি চাইনা, মাত্র এক বছরের জীবনে আমাদের কারুর ভেতর কোনও অপ্রীতিকর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিদায় নেবার সময় আমরা যেন হাসিমুখেই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি!'

এমন করিয়া কোনও নারীকে কোনও পুরুষ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, বিশেষ করিয়া দীপ্তির মত নারীকে! অরুণের কথায় তো বিদ্বেষের লেশও নাই! অসহ্য দুঃখের মধ্যেও অরুণের এই বিকারবিহীন চিত্তের পরিচয় পাইয়া দীপ্তির মন গভীর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। এমন পুরুষকে জয় করিতে পারাই নারীত্বের চরম গৌরব। দীপ্তি নূতন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। অতি অল্প দিনই সে অরুণের সংস্পর্শে আসিয়াছে। তথাপি অরুণের সমস্ত ইচ্ছাকে সে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিবে, তদনুযায়ী নিজেকে সাজাইবে। অরুণ দেখুক, বুঝুক সে যে তাহারই আদর্শ সম্ভূত এই নারী।

কিন্তু মনে মনে এই সংকল্প করিলেও দীপ্তি দিন দিনই বিমর্ষ হইয়া পড়িতে লাগিল। অরুণের দিক হইতে কোন সাড়া তো পাওয়া যায়ই না, বরং অরুণ যেন নিতান্ত সহজ ভাবেই তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। সে সরিয়া যাওয়ায় কোনও কাঠিন্যের আবরণ নাই, প্রত্যাখ্যানও নাই। দীপ্তির সঙ্গে দেখা হইলে এখন আর তাহার চোখের কোণ সিলিক দিয়া ওঠে না, বিরক্তি বা অবজ্ঞার প্রকাশও সেইখানে নাই। প্রয়োজনে আর দশটী মেয়ের মতই সহজ, সাধারণ ব্যবহার করে। দীপ্তির মন শুমরিয়া কাঁদিয়া ওঠে। এ কি হইল?

অর্চনা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কথা হল রে সেদিন তোদের?'

দীপ্তি উত্তর করিল, অর্চনাদি, পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় বলে শুনেছি। কিন্তু যার প্রাণের নির্ঝর শুকিয়ে গিয়েছে, তাকে বাঁচাই কি করে?'

আর অরুণ! নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া আজ সে জয়ী হইয়াছে। দীপ্তিকে না দেখিলে আজ বোধ হয় দীপ্তির কথা তাহার দিনান্তেও একবার মনে পড়ে না।

রিহার্সেলে প্রত্যেকের পার্ট নিজে অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দেয় অরুণ। মূক অভিনয়। অন্তরাল হইতে বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর ঘোষণা হইবে, আর মঞ্চে অভিনেতা-গণ তাহাই অঙ্গভঙ্গী সহকারে ফুটাইয়া তুলিবে। ভাষার অভাব শুধু মূক অভিনয়ে পূরণ করিতে হইবে। এই মূক প্রকাশটাই এখানে প্রধান। অরুণ বিশেষ যত্ন লইয়া যথোপযুক্ত নির্দেশ দিতে লাগিল। নিজে সে

সিদ্ধার্থের পার্ট লইয়াছে। নেপালকে দিয়াছে বসন্তের পার্ট।

কিন্তু সুজাতার অভিনয়ে প্রাণের স্পর্শ কোথায়? অরুণ সব দেখাইয়া দিতে পারে, কিন্তু অপরের অভিনয়ে রস আনিয়া দিবে কি ভাবে? দীপ্তিকে একদিন মুখ ফুটিয়া বলিয়াই ফেলিল, 'দেখ, তোমার সব কিছুই নিখুঁত হচ্ছে। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বড় জিনিষ, সেটাই আসছে না। অভিনয়কে প্রাণবন্ত করে তোলবার চেষ্টা কর।'

'আমার অভিনয় পছন্দ না হলে পার্ট বদলে দাওনা! এর চেয়ে ভাল আমার হয় না।'

অরুণ চিন্তিত হইল। কোথায় যেন একটু গলদ রহিয়াছে, যেন একটু অভাববোধ। অথচ সুজাতার পার্টের উপর তাহার নিজের সাফল্যও অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

অরুণ উত্তর করিল, 'কিন্তু এ পার্ট তোমার চেয়ে আর ভাল করবে কে? আর একটু চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই দরদ আসবে। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব মুহূর্তে তোমার এই পরমার নিয়ে প্রবেশ। কত বড় গুরুত্ব তোমার এই পার্টের।

'না পারলে কি করবো, বল?'

কথাটা অরুণ অর্চনাকে কথার ছলেই সেদিন বলিল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অর্চনা, এত বড় দক্ষ শিল্পী সে, তার অভিনয় কি করে প্রাণহীন হয়।'

অর্চনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমি জানি কি করে প্রাণহীন হয়। কিন্তু কারণ বললে কি তুমি বিশ্বাস করবে?'

'নিশ্চয়ই করব। আমি একটা পথ খুঁজে পাব। তুমি বল।' অরুণ আগ্রহে বলিল।

অর্চনা হাসিল। এই আত্মভোলা ছেলেটিকে সে বড় স্নেহ করে, ভালবাসে। দু'জনেই প্রায় সমবয়সী। পরস্পরের এই প্রীতির সম্পর্ক বড় সহজ, বড় সরল। কোনও সঙ্কোচ বা জড়তা সেখানে নাই।

'দীপুর দিকে আর একটু নজর দাও অরুণ, পার্ট ওর নিশ্চয়ই খুলবে।'

'কিন্তু আমি তো যতটা সাধ্য ওকে দেখিয়ে দিয়েছি।'

অর্চনা আবার হাসিল।

'কিন্তু তা'তে প্রেরণা কোথায়?'

অরুণ চমকিয়া উঠিল। অর্চনার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, 'এ তোমার ভুল অর্চনা। আমার কাছ থেকে প্রেরণা লাভের কোন প্রয়োজনই নেই।'

অর্চনার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বলিল, 'অরুণ, মেয়েদের তুমি কতটুকু চেন?'

পরিহাস তরলকণ্ঠে অরুণ বলিয়া উঠিল, 'রক্ষা কর। একবার একটু চিনতে গিয়েই যে ধাক্কা খেয়েছি।'

'কিন্তু সেটাই ওর আসল রূপ নয়।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'তর্ক করোনা অরুণ। শুধু এইটুকু মনে রেখ, তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আমার যতই নিবিড় হোক, দীপ্তিকে আমি তোমার চেয়ে ভাল করে জানি। এখানে আমার ভুল হতে পারে না। ওর বাইরের ব্যবহার দিয়ে ওকে বিচার করলে শুধু ভুল নয়, ওর ওপর অবিচারও তুমি করবে।'

চিন্তাকুল মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অরুণ উত্তর করিল, 'তোমার সব কথা মেনে নিতে না পারলেও তোমার কথামতই আমি কাজ করব। এ'ছাড়া ওর পার্ট ভাল হবার আর কোন পথই দেখছি না।'

অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য অরুণ তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। অর্চনার কথায় সে ভাবিল, তাহার আচরণে একটু মনোযোগ দেখাইলেই যদি দীপ্তির অভিনয় সুন্দর হয়, তবে তাহাই সে করিবে। দীপ্তির উপর তো তাহার কোনও বিদ্বেষ নাই। দীপ্তিকে অরুণ ডাকিয়া পাঠাইল। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিল।

'অর্চনা বলল, তোমার দিকে ঠিকমত নজর দিইনি বলেই তোমার পার্ট খুলছে না। তোমার কি মনে হয়?

অরুণের এই সরলতায় দীপ্তি হাসিয়া বলিল,

'বেশ তো, নজর দিয়েই দেখ না, খোলে কি না।'

'But you are a problem দীপু।'

বহুদিন পরে অরুণের মুখে এই সম্ভাষণ। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অরুণের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল 'পার্ট আমার নিশ্চয়ই ভাল হবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।' তাহার চোখে মুখে নিশ্চিত আশ্বাসের আভা দেখিয়া অরুণ আশ্বস্ত হইল।

উৎসবের দিন দুপুরে অতুল টিপ্পনি কাটিয়া বলিল, 'It is a challenge, বুঝলে তারা! দেখব, দীপ্তির চেয়ে অভিনয় ভাল হয় কি না।'

নেপাল লাফাইয়া উঠিল, 'ভাল মানে? অদ্ভুত; অপূর্ব! দীপ্তি তো ওর কাছে নস্যি! কি বল অরুণ, পারবেনা মেয়েটাকে হারিয়ে দিতে!'

নাট্যশিক্ষা সম্বন্ধে ইহাদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অরুণ হাসিল। প্রকৃত শিল্পী সে। সে জানে, এই ক্ষেত্রে অন্ততঃ প্রতিযোগিতা চলেনা। প্রতিটি অংশের অভিনয় নিখুঁত হইলেই সামগ্রিকভাবে অভিনয় সার্থক হইয়া উঠে।

প্রথম দৃশ্যে সিদ্ধার্থ নগর পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। জীবনে এই প্রথম তাহার পরিচয় জরা ও মৃত্যুর সঙ্গে। অব্যক্ত যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিয়াছে সিদ্ধার্থের মুখে এই প্রথম পরিচয়ে। মৌন ভাষায় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একি? কি করিয়া ইহা হয়। ইহার সঙ্গে তো আমার পরিচয় নাই কোনদিন। মন্ত্রী সিদ্ধার্থকে ঘুরে সরাইয়া লইয়া যায়। প্রশ্ন প্রশ্নই থাকে, কোন উত্তর মেলে না। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় হইয়া চলে। অবশেষে আসে সেই চরম দৃশ্য।

অত্যন্ত জিজ্ঞাসা মনে লইয়া রাজপুত্র গৃহত্যাগ করিয়াছেন। পিতা, মাতা, সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, এমনকি সদ্যোজাত পুত্রও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। অশান্ত, উদ্বেল মন। কে তাঁহার এই জিজ্ঞাসার জবাব দিবে? কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন সিদ্ধার্থ অনুক্তাবস্থায়। কিন্তু সিদ্ধি কোথায়? কোথায় সেই সমাধান? কাছে আসিয়া ও তো পথ খুঁজিয়া পান না। কোথায় যেন অসঙ্গতি। শাস্ত্রোক্ত মতে তপস্যা। নিয়ম পালনে কোনও ত্রুটী নাই। তবুও সিদ্ধিলাভ হয় না কেন? সমাধানের পথ চকিতে একবার দেখা দিয়াই মিলাইয়া যায়। এমন সময় সুজাতা প্রবেশ করিবে পরমান্ন লইয়া।

দৃশ্য আরম্ভ হইবার আগে দীপ্তি অরুণকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া প্রণাম করিল। অরুণের মুখে প্রশ্নের আভাষ পাইয়া বলিল,

'আজকের দিনে তুমি আমার গুরু। আশীর্বাদ করো, যে কথা আমি তোমাকে দিয়েছি, তা' যেন সফল করতে পারি। তোমার মুখ যেন উজ্জ্বল হয়।'

চকিতে অরুণের মনে অর্চনার কথাগুলি খেলিয়া গেল। দীপ্তির কাঁধে হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল, 'আমার শিষ্যত্বে অনেক বিপদ আছে জান। যাক্ আমার আশীর্বাদে যদি কোন কাজ হয়, তবে অভিনয়ে আজ তুমি আমাকেও পরাজিত করবে। আর সে পরাজয়েই আমার গৌরব।'

দীপ্তি নত হইয়া আবার অরুণের পায়ের ধুলা লইল।

সিদ্ধার্থ ধ্যানে বসিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ নিজ শরীরের উপর সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া কঠোর তপস্যায় মগ্ন তিনি। কিন্তু সিদ্ধিলাভ তো হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল। অবতাররূপে নরদেহ ধারণ করিয়া ভগবান আজ প্রকৃতির বশীভূত। আসন ছাড়িয়া বুঝি তাহাকে উঠিয়া পড়িতে হয়। দেহ কৃশ, দৃষ্টি নিমীলিত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত। ঠিক এমনি সময় সুজাতা প্রবেশ করিল, ধীরে, অতি ধীরে। পাছে ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের ধ্যান ভাঙিয়া যায়। দীর্ঘ এলোচুলের রাশি পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পরণে শুচিবাস, ললাটে চন্দনরেখা। আকুল নেত্রে সিদ্ধার্থের দিকে চাহিয়া পরমান্নের থালা সম্মুখে নামাইয়া দিল। জোড় হস্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ধ্যান কি সিদ্ধার্থের ভাঙিবেনা! ধীরে, অতিধীরে, সিদ্ধার্থ যেন একটু নড়িয়া উঠিলেন। পদ্মপলাশ লোচন যেন

ঈষৎ উন্মিলীত হইল। সে দৃষ্টিতে অপার করুণা, অনন্ত প্রেম ঝরিয়া পড়িতেছে। ঈষৎ হাস্যে অধর স্ফুরিত। এত রূপ, এত শান্তি, এত করুণা! সিদ্ধার্থের দৃষ্টি পরমাণুর উপর পড়িল। মুখে আনন্দের ছায়া। এই রূপকেই কি বৈষ্ণব কবিগণ গোপীমনোহারী আখ্যা দিয়াছেন! এরই মধ্যে কি লুক্কায়িত আছে অনন্ত আশ্বাস, নিঃশেষে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত! সুজাতা আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল। আর এদিকে হঠাৎ দীপ্তির চোখে চোখ পড়িতেই অরুণ শিহরিয়া উঠিল। এই কি সেই দৃষ্টি যুগে যুগে যাহা মুনিগণের ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে, যোগীশ্বরকে করিয়াছে উন্মাদ, সর্বকালের পুরুষ কি ইহারই নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে? মাত্র কয়েকটী মুহূর্ত। মঞ্চের অন্তরালে সূত্রধর তখন ঘোষণা করিতেছে, সুজাতার সেই পরমান্ন ভোজন করে, দেহে ও মনে বলীয়ান হয়ে, সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী।

'সুজাতা মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল;

ও বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ও ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

ও সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

আর প্রশান্তদা মঞ্চের ভিতরে পর্দার পাশে দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতেছিলেন। দীপ্তি ও অরুণের এই মৌন মিলনের সাক্ষী রহিলেন মাত্র তিনি।

সমবেত কণ্ঠে গীত হইতে লাগিল:

'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি—।'

(১০)

পর্দা পড়িতেই প্রশান্তদা দীপ্তিকে লইয়া মঞ্চে প্রবেশ করিলেন। অরুণকে আবেগে জড়াইয়া ধরিলেন। দীপ্তির হাত ধরিয়া অরুণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আজকের আনন্দের তুলনা নেই অরুণ। তোমার ওপর উৎসবের ভার দেওয়া আমার সার্থক হয়েছে।

অরুণ দীপ্তির দিকে চাহিয়া সলজ্জ হাসি হাসিল। প্রশান্তদা এই হাসিটুকুও লক্ষ্য করিলেন।

মঞ্চ হইতে বাহির হইয়া আসিতেই অর্চনা হাসিমুখে বলিল, 'সিদ্ধার্থের জ্ঞানলাভ হ'ল?'

অরুণ সচকিত হইল। তবে কি অর্চনাও লক্ষ্য করিয়াছে তাহার সম্মোহিত দৃষ্টি! বলিল, 'অভিনয় শুধুই অভিনয়। এর সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক কোথায়?'

'তাই কি? কিন্তু বাস্তব সম্পর্ক বর্জিত হলে যে অভিনয় প্রাণহীন হয়ে পড়ে।'

'তুমি বড় দুষ্ট হয়েছে অর্চনা।' অরুণ হাসিমুখে বলিল, 'কিন্তু ভুল তো আমার হয়নি অরুণ।'

অরুণ তাহার দিকে একবার চাহিতেই অর্চনা বলিয়া উঠিল, 'কি জানি বাপু, তোমার চোখের চাউনিতে কি আছে। ও রং টংগুলো ধুয়ে ফেল।'

অরুণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অর্চনা কিন্তু কেন যেন অরুণের সঙ্গে গলা মিলাইয়া হাসিতে পারিল না।

পরদিন সকালে ক্লাসে প্রশান্তদা অরুণ ও দীপ্তির অভিনয়ের অজস্র প্রশংসা করিলেন। ক্লাসের শেষে অরুণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দীপ্তির সঙ্গে ঝগড়া তোমার মিটেছে আশা করি।'

'ওর ব্যবহারের জন্যে ও অনুতপ্ত হয়েছে' অরুণ উত্তর করিল।

প্রশান্তদা মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি জানি, ও হবে। ওটা ওর সাময়িক একটা ভুল। ও নিয়ে ওকে বিচার করা চলে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'একটা জিনিষ আমি এতদিন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না অরুণ। প্রয়োজন যতই হোক, বিনানুমতিতে ওর জিনিষ কি করে তুমি নিলে।'

তাঁহার কথার গতি কোন দিকে যাইতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অরুণ সাবধান হইল। কোনও উত্তর না দিয়া প্রশান্তদার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রশান্তদা বলিলেন,

'দীপ্তিকে একবার পাঠিয়ে দিও।'

অরুণের মন আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া গেল। জীবনের শ্রেষ্ঠক্ষণে সে প্রশান্তদার আশীর্বাদ পাইয়াছে। দীপ্তিকে ডাকিয়া বলিল,

'কাল তোমার চোখে কি ছিল?'

'সুন্দরের প্রশংসা। সৌন্দর্যের নীরব সমর্থন!'

'কিন্তু এত সহজে ধরা পড়ে গেলে?'

'ধরা তো আগেই দিয়েছি। মাঝখানে একটা আবরণ পড়েছিল, সেটাও কাল ছিঁড়ে ফেলেছি।'

'সেটা না হয় আমার কাছে। কিন্তু ও চোখের দৃষ্টিতে যে সকলেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।'

'কে হয়েছে না হয়েছে, তা জানবার তো আমার দরকার নেই।' যাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম, কই তাঁর কি অবস্থা তা তো জানতে পারলাম না।'

'তার আগে আমার কথা এই যে, অভিনয় তো শুধু অভিনয়ই।'

'কেন, তুমিই তো বলেছ যে প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকলে অভিনয় ফুটে ওঠে না।'

অরুণ দুষ্টু হাসি হাসিয়া বলিল, 'বলেছিলাম নাকি?'

আবার সেই দৃষ্টি। দীপ্তির সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। চোখ নামাইয়া বলিল, 'অমন করে আমার দিকে চেওনা বাপু। লোকে দেখলে কি বলবে?'

দীপ্তির মুখ ততক্ষণে লাল হইয়া উঠিয়াছে। অরুণ পরিহাস করিয়া বলিল,

'লোকের দেখতে বা বুঝতে কি আর বাকী রেখেছ? যাও, প্রশান্তদা ডাকছেন।'

'দোষটা বুঝি শুধু আমারই?'

'না, না, সে কি?' অরুণ ব্যস্ত ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, 'এসব হৃদয় দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে তো পুরুষই চিরকাল অপরাধী হয় বলে জানি।'

তাহার বলিবার ভঙ্গীতে দীপ্তি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এত মিষ্টি হাসি সে হাসিতে পারে, তাহা সে নিজেই জানিত না। হাসির রেশ মিলাইয়া গেলে অরুণ বলিল, 'যাও, প্রশান্তদা ডাকছেন।'

'কেন?'

'বোধ হয় তোমার চেয়েও আমার অভিনয় ভাল হয়েছে, সেটা গোপনে জানাবেন বলে।' অরুণ উদাস-ভাবে উত্তর করিল।

'গোপনে কেন?

'পাছে এই নিয়ে আবার ঝগড়া কর আমার সঙ্গে।'

দীপ্তি আবার হাসিয়া উঠিল।

প্রশান্তদার ঘর হইতে কিন্তু দীপ্তি চিন্তিতমুখে বাহির হইয়া আসিল। প্রশান্তদা তাহাদের এই নীতির বন্ধনকে অপ্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ'কথাও ঐ একই ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে অরুণকে তিনি ভালভাবেই জানেন। ওর স্বভাবই হইল কোন কিছুতে ডুবিয়া থাকা। দীপ্তির উপর তাঁহার এই বিশ্বাস অবশ্যই আছে যে কোনও ক্রমেই সে আশ্রমের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। কিন্তু দীপ্তিকে ইহাও লক্ষ রাখিতে হইবে যে এই ব্যাপারে মত্ত হইয়া অরুণ যেন তাহার আসল কাজ না ভুলিয়া যায়। তারপর সুস্পষ্টভাবেই তিনি দীপ্তিকে বলিয়াছেন, 'অরুণের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু আশা করি বোন। তুমি দেখবে, তার প্রতি কাজে তুমি যেন শুধু প্রেরণাই যোগাতে পার, বাধার সৃষ্টি যেন না কর।'

বড় শক্ত কাজ। সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন সে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তাহার উপর এই বিরাট কর্তব্যের ভার অর্পিত হইল! দীপ্তি নিজেকে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, আর বহুদিন পরে অরুণ ডায়েরী খুলিয়া লিখিল, 'জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করেছি। যুগে যুগে নারী পুরুষকে শক্তি জুগিয়েছে। নারীর সন্নিধ্য পুরুষকে প্রেরণা দেয়, কর্মশক্তির বিকাশ করে, এ' সত্য আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি।'

ইহার পর হইতে দীপ্তির সঙ্গ যেন অরুণের অপরিহার্য

হইয়া দাঁড়াইল। মন তাহার সর্বদাই দীপ্তিকে খুঁজিয়া বেড়ায়। দেখা হইলে কথা বিশেষ কিছু হয় না। শুধুই চোখের একটু দেখা। অথবা কি যে চায় অরুণ দীপ্তির কাছ হইতে, নিজেই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মাঝে মাঝে দীপ্তিকে আরও নিবিড়-ভাবে পাইবার ইচ্ছা হয়, আরও বেশীক্ষণ পাইতে চায়। কারণ অকারণে প্রায়ই তাহাকে ডাকিয়া পাঠায়। দীপ্তি আসে, দাঁড়ায়, অরুণের কথা শোনে, দুই একটা উত্তর দিয়া চলিয়া যায়। অরুণ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে।

একদিন দীপ্তিকে ডাকিতেই ছায়া বলিয়া উঠিল, 'কি এত আপনাদের কথা অরুণদা যে শেষই হতে চায় না?

হঠাৎ এই প্রশ্নে অরুণ একটু থতমত খাইল। ছায়া গম্ভীর মুখে চলিয়া গেল, কিন্তু দীপ্তি আর অরুণের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল না। অরুণ ভাবিল, ছায়া হয়তো দীপ্তিকে কিছু বলেই নাই। কিন্তু বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া যখন দীপ্তির সহিত পথে দেখা হইতেও সে কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, অরুণ থমকিয়া দাঁড়াইল।

'দীপু, শোন।'

দীপ্তি সেইখানেই দাঁড়াইয়া বলিল, 'কি বলবে, বল।'

অরুণ হাসিল।

'এত তাড়াতাড়ি কিসের? দাঁড়াও।'

ছায়া সঙ্গে ছিল। গম্ভীর মুখে বলিয়া উঠিল, 'তোরা তা' হলে কথা বল্ দীপু, আমি চলি।'

অরুণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

'সে কি, তুমিও দাঁড়াও। একসঙ্গেই গল্প করতে করতে এগুই। কথা আমার বিশেষ কিছু নেই।'

'আমার সময় নেই। অরুণদা।' ছায়া চলিয়া গেল।

অরুণ একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল, 'ছায়া হঠাৎ ওভাবে চলে গেল যে?'

'কাজ আছে তো বলেই গেল। নাও, কি বলবে, বল আমারও সময় নেই।'

'ওঃ, আচ্ছা বেশ, তুমিও যেতে পার।'

'অমনি অভিমান! আচ্ছা, এত বারবার ডেকে পাঠাও কেন বলতো? ছিঃ, ওরা সব কি ভাবে, বলতো? অবিশ্যি মুখে ওরা কিছু বলে না, কিন্তু তুমি ডেকে পাঠালেই ওরা মুখ টেপাটেপি করে হাসে।'

'কেন, হাসে কেন? এতে হাসবার কি আছে?'

পিছন হইতে কাশির শব্দ শোনা গেল। গলা খাঁকারি দিয়া শালবনের আড়াল হইতে অতুল ও পশুপতি বাহির হইয়া আসিল। অতুল মুচকী হাসিয়া বলিল, 'ভায়া বুঝি এদিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলে? আজ কাল যে দেখিই না। সেই সেদিন সিদ্ধার্থের জ্ঞান-লাভের পর থেকে আর পাত্তাই নেই। এক যায়গায়, একঘরে থাকি, রাত পোহালেই মুখ দেখা দেখি হবে। কিন্তু ক্লাস ছাড়া আর দর্শনই মেলে না। তা', তুমি না হয় নতুন জ্ঞানই লাভ করলে, কিন্তু আমাদের তো তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতেও ইচ্ছা হয়।'

অতুলের কথা শেষ হইতেই দীপ্তি চলিয়া যাইতে-ছিল, হঠাৎ যেন অতুল তাহাকে দেখিতে পাইল।

'আরে, দীপ্তি বোনও যে রয়েছেন এখানে। আপনিও বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছেন? বেশ, বেশ, তা', অরুণের সঙ্গে বুঝি হঠাৎ দেখা হয়ে গেল?'

অতুলের মুখে মুচকী হাসিটি লাগিয়াই আছে। অতুলের কথায় এক কদর্য ইঙ্গিতের আভাষ পাইয়া অরুণের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কঠোর দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, 'কি বলতে চাও তুমি?

অতুল যেন সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি জিভ কাটিয়া, মাথা নাড়িয়া, বিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, 'না, না, বলব আর কি! তবে,—কথাটা মনে হল আর কি, যে এই যোগাযোগটা কিন্তু অদ্ভুত।'

অরুণের সমস্ত শরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। অসহ্য ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল,

'Brute'

এইবার অতুলের ইঙ্গিতে পশুপতি আগাইয়া আসিল।

অরুণের মুখামুখী দাঁড়াইয়া, প্রথমত ভ্রু ও ভুরু নাচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'Brute মানে ?

'Brute মানে তোমরা যা।'

'একটু ভেবে চিন্তে কথা বলবে অরুণ।'

যথেষ্ট ভেবেছি। তোমাদের মত ইনিয়ে বিনিয়ে অতত্র ইঙ্গিতে আমার যায় আসে না।

'তবে কি শক্তি পরীক্ষা ?'

ইহাদের অজ্ঞতামূলক স্পর্ধায় অরুণের হাসি পাইল। পল্লীর চরে বাড়ী তাহার। বাবা তাহার জমিদার ও বিখ্যাত লাঠিয়াল। নিজে সে ছোট বেলা হইতে শুধু যে শরীর চর্চাই করিয়াছে, তাহা নয়। লাঠি, ছোরা, সড়কি ইত্যাদির ব্যবহার খুব ভাল ভাবেই তাহার আয়ত্তে আছে। তাহাদের বহু সর্দার প্রজা আজও তাহার খেলা দেখিয়া প্রশংসা করে। অনেকে তাহার কাছে হারিয়াও গিয়াছে। পশুপতির কথার উত্তরে অরুণ বলিল, 'শক্তির দম্ভ আমার না থাকলেও তোমাদের কাছে শক্তির অপব্যয় মাত্র। তবুও, একটী মেয়ের সম্মান রাখবার প্রয়োজন হলে, আমি তা'ও দিতে প্রস্তুত।'

অরুণের মূর্তি দেখিয়া পশুপতি ভয় পাইয়া গেল। অতুল আগে হইতেই একটু ঘুরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া পশুপতি বলিল, 'আরে, তোমার সঙ্গে যে আজকাল কথা বলবারই জো নেই। ঠাট্টাও বোঝনা ?'

'খুব ভালই বুঝি। কিন্তু ঠাট্টার ভেতর অতত্র ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝি না।'

ঘটনার আকস্মিকতায় দীপ্তি এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চমক ভাঙিতেই অরুণের হাত ধরিয়া টানিল।

'ছিঃ, এ কি করছ তুমি ? চলে এস, এস বলছি।'

অতুল ও পশুপতির মধ্যে একবার চোখাচোখি হইয়া গেল। কিন্তু নির্বিকারভাবে আসিয়া অরুণ দীপ্তিকে বলিল, 'ঘটনাটার জন্যে আমিই দায়ী দীপ্তি। কিন্তু এরপর আমার মনে হয়, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আমাদের দেখা সাক্ষাৎ করাই উচিৎ হবে না।'

দীপ্তি কোনও কথা কহিল না। আশ্রমে ঢুকিতে অর্চনা পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল, অরুণ তাহাকে ডাকিল।

'কি ব্যাপার, তোমরা সবাই আমাকে বয়কট করলে না কি ? না ডাকলে যে কেউ কথা বল না ?

অর্চনা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ একটু উদ্বিগ্ন হইল।

'ব্যাপার কি অর্চনা, আমাকে খুলে বল।'

'দীপ্তিকেই জিজ্ঞেস ক'রো।'

ততক্ষণে দীপ্তি অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে।

'তুমিই বলনা, কি হয়েছে।'

আশ্রমের গেটের পাশেই একটী বাঁধান বেদী ছিল। সেইদিকে দেখাইয়া অর্চনা বলিল, 'চল, বসি গিয়ে ওখানটায়।

একটু ইতঃস্তত করিয়া অর্চনা বলিল, 'অরুণ, তুমি আমার বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের দাবী নিয়েই তোমাকে কয়েকটা কথা বলব।'

'তোমার দাবী আমি মেনে নিচ্ছি অর্চনা,—তুমি অসঙ্কোচে বল।'

'দীপ্তির সঙ্গে তুমি মেলামেশা বন্ধ করে দাও।'

'হঠাৎ এ' কথা কেন, বলতো ?'

'এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অরুণ। কারণ অকারণে তুমি দীপ্তিকে ডেকে পাঠাও, এ'টা সকলেরই চোখে পড়েছে। মেয়েদের দিক থেকে কেউ কিছু বলবেনা এতে, কিন্তু ছেলেদের দিক থেকে এ নিয়ে কথা উঠেছে। হতে পারে, এটা তাদের ঈর্ষা। কিন্তু কথা যখন উঠেছে, তখন মেলামেশা বন্ধ করাই ভাল। তা'ছাড়া তোমার পড়াশুনা, কাজ কর্মেরও ক্ষতি হচ্ছে এতে।'

অর্চনা অরুণের মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, তুমি যে অনেক উঁচুতে অরুণ। কেন এদের সুযোগ দেবে কথা বলতে ? যেখানে দু'জনেই দু'জনার মনের পরিচয় পেয়েছে, সেখানে দেখাশুনা বেশী না হলে ক্ষতি কি ?'

অনেকক্ষণ পরে অরুণ বলিল, 'তুমি আমার সত্যি-কারের বন্ধু অর্চনা। তোমার কথা আমি ভেবে দেখব।'

সন্ধ্যার প্রার্থনার পর অরুণ বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াতেই ছায়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। অন্ধকারে ঠাহর করিতে না পারিয়া অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

'আমি ছায়া, অরুণদা!'

'কিছু বলবে?'

'হাঁা, কিন্তু এখানে নয়। এদিকে সরে আসুন।' বারান্দার এক কোণে যাইয়া ছায়া বলিল, 'আমার আজকের বিকেলের ব্যবহারে আপনি আশ্চর্য হয়েছেন?'

'ওভাবে চলে না এসে আমাকে সব কথা তোমার খুলে বলা উচিৎ ছিল। যাক্, তুমি যা বলবে, আমি জানি। তুমি এখন যেতে পার।'

অরুণ ঘরে ঢুকতেই একটা চাপা আলোচনা যেন তাহাকে দেখিয়া বন্ধ হইয়া গেল। সমস্ত ঘরে একটা থমথমে ভাব। অরুণ কিসের একটা অস্বস্তি অনুভব করিল। কিন্তু ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার সময় অথবা প্রবৃত্তি কোনটাই তাহার ছিলনা। নিঃশব্দে চিঠির মালাটী লইয়া সে বাহিরে আসিল।

খাওয়াদাওয়ার পর মুখ ধুইয়া ফিরিবার পথে মৃদু কণ্ঠে শিশির তাহাকে ডাকিল। পুকুরের একপাশে একটা ছোট ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে আসিয়া দুইজনে বসিলে শিশির জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ বিকেলে অতুল আর পশুপতির সঙ্গে তোমার কি হয়েছে?

অরুণ উত্তর করিল, 'অভদ্র ইঙ্গিত করছিল, তাই একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।'

'দীপ্তি ছিল তোমার সঙ্গে?'

'সে সময়টায় ছিল।'

'সমস্ত ব্যাপারটার একটা কদর্য রূপ দিয়ে ওরা প্রশান্তদার কাছে নালিশ জানিয়েছে।'

অরুণ চমকিয়া উঠিতেই শিশির আবার বলিল,

'আমি আর নেপাল অনেক বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা শোনেনি।'

অনেকক্ষণ নীরবতার পর অরুণ বলিল,

'সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গেই একটী মেয়ের মান সম্ভ্রম জড়িত রয়েছে। তা' নয়তো এমন শিক্ষা আমি ওদের দিয়ে দিতাম যে জীবনেও তা ভোলবার নয়। আমাকে একা আক্রমণ করবার সাহস ওদের কোনদিনই হবে না, সে আমি জানি। যাক্, যা হবার হবে। চল, এবার উঠি।'

ফিরিবার পথেই প্রশান্তদার ঘরে অরুণের ডাক পড়িল। মৃদু হাসিয়া, থালাটী শিশিরের হাতে দিয়া বলিল, 'চলি শিশির। আজ বোধ হয় আমার বিশেষ পরীক্ষা।'

অরুণ প্রশান্তদার ঘরের দিকে চলিয়া গেল আর শিশির শঙ্কিত হৃদয়ে তাহার যাইবার পথের দিকে তাকাইয়া অন্ধকারেই দাঁড়াইয়া রহিল। যাইতে যাইতে অরুণের মনে যেন একটা দৃঢ় সংকল্প জাগিয়া উঠিল; কোনও অন্যায় তো সে করে নাই। প্রশান্তদার মুখামুখী দাঁড়াইয়া মাথা উঁচু করিয়া সেই কথাটাই সে বলিয়া আসিবে।

'কে?'

'আমি।' দীপ্তি আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল।

'শোন, প্রশান্তদার কোন কথায় যেন উত্তেজিত হয়ো না। যা বলেন, শুনে যেও।'

দীপ্তির বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া অরুণ বলিল, 'সেটা প্রশান্তদার বলার ওপর নির্ভর করছে। অন্যায় আমি কিছুতেই সহ্য করব না। প্রশান্তদার ওপর এ' বিশ্বাস আমার আছে যে অন্যায় তিনি করবেন না।'

'তা হোক্, তুমি আমায় কথা দিয়ে যাও। বল, কোনও কথার জবাব তুমি দেবে না।'

ব্যাকুলভাবে দীপ্তি অরুণের একটা হাত চাপিয়া ধরিল। অরুণ দুই হাতের মুঠোয় দীপ্তির হাত দুইটী লইয়া তুলিয়া ধরিল।

ক্ষণকাল দীপ্তির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়া দিল। তারপর সোজা প্রশান্তদার ঘরে যাইয়া প্রবেশ করিল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তদা বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে অরুণ, একটা বিশেষ জরুরী কাজের জন্যে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। বেশ মন দিয়ে শোন।'

অরুণ বসিলে বলিলেন,

'তোমার মন বেশ ভাল আছে?'

অরুণ জোর করিয়া একটু হাসিল, কোন কথা বলিল না।

প্রশান্তদা বলিয়া চলিলেন, 'কাজটা খুব শক্ত। সময়ও লাগবে বেশ। কোন, ভূমিকা ছাড়িয়া প্রশান্তদা কাজের কথায় আসিলেন।

'তোমাকে এক সেট model lesson plan তৈরী করতে হবে, বিভিন্ন বিষয়ের। Technique of Education and preaching সম্বন্ধে প্রায় সব কিছুই তোমাদের পড়ান হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় এ রকম কোনও lesson plan নেই। তাই আমার ইচ্ছা, তুমিই সেটা তৈরী কর।'

অরুণ অবাক হইয়া প্রশান্তদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ এই সময়ে এই রকম একটা গুরুতর কাজের ভার প্রশান্তদা তাহাকে কেন দিলেন! কই, আজকের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলা দূরে থাকুক, কোন আভাষও তো দিলেন না! কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর দিল, 'বেশ, আমি করব।'

প্রশান্তদার বললেন, 'যে সব বইয়ের দরকার হবে তোমার, আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবে।'

চিন্তাকুল মুখে অরুণ বলিল, 'বইয়ের চেয়ে ও বেশী দরকার হবে orphanageএর ছেলেদের। স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করতে হবে অনেকটা। craft work তো আছেই। কিন্তু একটা অসুবিধা হবে।

'কি, বলো।'

'Orphanageএর ছেলেরা আমাদের প্রচলিত সামাজিক পরিবেশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। এ দিক থেকে ওরা অনেকটা abnormal, কাজেই ওদের ওপর ভিত্তি করে lesson plan তৈরী করতে গেলে একটা বিশেষ দিকই বাদ পড়ে যাবে।'

প্রশান্তদা সাগ্রহে উত্তর করিলেন, 'এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে, জগন্নাথপুরে আমাদের একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে। গ্রামের ছেলে মেয়েরা সেখানে পড়ে। সেখানে তুমি তোমার এই সামাজিক পরিবেশ পেতে পার।'

এতক্ষণে অরুণের কাছে সব পরিষ্কার হইয়া গেল। প্রশান্তদা কোনও ছলে কিছুদিনের জন্য তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চান। একবার বিচার করিয়াও দেখিলেন না তিনি, অরুণের অপরাধটা কোথায়। মুহূর্তে অরুণ মন স্থির করিয়া ফেলিল। দূরেই থাকিবে-সে কিছুদিন। আশ্রমের এই গ্লানিকর আবহাওয়া হইতে কিছুদিন দূরে সরিয়া থাকিলে তাহার মন আবার সুস্থ সতেজ হইয়া উঠিবে। এখানকার সঙ্গ তাহার সহ্য হত না। ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া অরুণ বলিল, 'বেশ, সেখানেই আমি যাব। প্রায় একমাস সময় লাগবে মনে হয়। সেখানেই থাকব। কাল সকালেই আমি বেরুতে চাই। বইগুলো, আমি এখনই নিয়ে যাব। আর একটা কথা, এই একমাসের ভেতর আমি সীতারামপুর আসব না। কোনও নির্দেশের প্রয়োজন হলে খবর পাঠাব, আপনাকে যেতে হবে সেখানে। কিন্তু, অরুণ ম্লান হাসিয়া বলিল, 'এ কি আমার নির্বাসন দাদা?'

প্রশান্তদা অরুণের কাঁধে হাত রাখিলেন।

'ভুল বুঝোনা অরুণ। তোমাকে দিয়ে আমার অনেক আশা।

'কিন্তু আমি তো অন্যায় কিছু করি নি। নীতি ও আদর্শের দিক থেকে আশ্রমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এমন কোন কাজইতো আমি করি নি। তবুও কেন এই শাস্তি আমায় দিলেন?'

রুদ্ধ অভিমানে অরুণের গলা কাঁপিয়া উঠিল।

প্রশান্তদা বলিলেন,

'এর ও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অরুণ। বেশ, তোমার কথার জবাবই আমি দিচ্ছি। দীপ্তির আকর্ষণে তুমি তোমার বর্তব্য ভুলে যেতে বসেছিলে। নির্মোহ মন নিয়ে বিচার করলে সেদিক দিয়ে তুমি অপরাধী। কিন্তু সে কথা থাক। তার চেয়েও বড় জিনিষ, তোমার প্রতিভা বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল দীপ্তির ওপর আকর্ষণ। কিন্তু আশ্রমের অধ্যক্ষ হিসাবে আমি তোমার এই প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটতে দিতে পারি না। প্রত্যেকের ভেতর থেকে গুণটুকু বেছে নিয়ে তার বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়াই আমার কাজ। দোষের আপেক্ষিক বিচার করে তার সংশোধন, অন্ততঃ তোমাদের বয়সী ছেলে মেয়েদের পক্ষে, সময় সাপেক্ষ। এত বছরের স্বল্প সময়ে সেটা হয় না। তাই এই পথই আমি বেছে নিয়েছি।'

প্রশান্তদা একটু থামিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে আবার বলিলেন, 'বেশ, তুমি ঐ সম্বন্ধে ভাব। দু'দিন পরে আমায় বলবে।'

'না, ঐ সম্বন্ধে ভাবা আমার হয়ে গিয়েছে দাদা। কাল ভোরেই আমি বেরিয়ে পড়তে চাই।'

অরুণের স্বর দৃঢ়।

পরদিন অতি প্রত্যূষে, প্রার্থনার ঠিক পরেই একটী ছায়ামূর্তি প্রশান্তদার ঘর হইতে দৃঢ় পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিল; সঙ্গে প্রশান্তদা। গেটএর সামনে আসিয়া সেই মূর্তি প্রশান্তদাকে প্রণাম করিল। প্রশান্তদা তাহার মাথায় হাত দিয়া অস্ফুটে কি বলিলেন। বোধ হয়, সমস্ত অন্তর দিয়া তাহার একান্ত প্রিয় এই ছেলেটীর মঙ্গল কামনা করিলেন। মূর্তি মাথা তুলিয়া একবার সমস্ত আশ্রমের উপর নিজ দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল। তারপর অকস্মাৎ যেন সচেতন হইয়াই মুহূর্তের দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পুনরায় দৃঢ় পদক্ষেপে গেটএর বাহিরে পা বাড়াইল। তখনও ভোরের আলো সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। ছোট পুকুরের ধার দিয়া, বাঁশঝাড়ের মধ্যদিয়া, বড় অশ্বত্থগাছটীর নীচ দিয়া অরুণের দীর্ঘ দেহটী পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রশান্তদা নীরবে, পলকহীন দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

[ক্রমশঃ]

ক্ষয়রোগীর আশেপাশে

শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

কোলকাতায় একটু কাজ থাকায় রাণীর ওখান থেকে একটু সকাল সকাল উঠে পড়লাম। ট্রেণের সময় হয়ে গিছলো, একটু জোর জোর হেঁটে আসছিলাম, হঠাৎ সামনে কে একজন পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল। মুখ তুলে চাইবার পূর্বেই বন্ধুবর অরুণ হাতখানা ধরে ফেল্‌লো। এবং আমি মুখ তুলতেই বেশ একটু বিস্ময়ের সুরে বল্‌লো আপনি এখানে?

একটা বাচ্চাকে দেখতে এসেছিলাম।

অরুণ বিষণ্ণ হয়ে বল্‌লো: টি,বি দেখছি আজকাল ঘরে ঘরে হতে সুরু করেছে। খাবার দাবার নেই, তার উপর স্থানাভাব এইটুকু পশ্চিম বঙ্গের উপর এত লোকের চাপ, টি. বি না হয়ে যাবে কোথায় বলুন? এই আমার বোনটাকে গত বছর অত করে বিয়ে দিলাম, আর একটা বছর না যেতে তার হলো টি, বি। শ্বশুরবাড়ির ওরা করছেন সবই, কিন্তু বেশ একটু বিরক্তির সংগে।

অরুণ ক্ষণকাল চুপ করে থেকে পুনরায় বল্‌লো: শান্তার সংগে আপনার পরিচয় নেই চলুন, পরিচয় করিয়ে দেব।

পরিচয় আপনার করিয়ে দিতে হবে না, ওয়ার্ড নম্বর আর বেড নম্বরটা দিন কাল আমি নিজে গিয়ে পরিচয় করে নেব। আজ আর হাতে সময় নেই এই ট্রেণেই কোলকাতায় ফেরার বড় প্রয়োজন—ট্রেণের মাত্র দু'মিনিট বাকি আছে।

এ ট্রেণে আর নয়, পরের ট্রেণে দুজন এক সংগে গল্প করতে করতে যাব।

আমার কাজের খুবই ক্ষতি হবে জেনেও আর কোন আপত্তি করতে কেমন যেন সংকোচ হলো। বল্‌লাম চলুন এখানে দাঁড়িয়ে আর সময় নষ্ট নয়, পরের ট্রেণ আধঘণ্টা পরে, চটপট শান্তার সংগে পরিচয়টা সেরে আসি।

শান্তার ঘরে গিয়ে বসলাম। পরিচয়ের পর্বটা শেষ করে অরুণ বললে: নৃপেন বাবু এখানে যদি একটা সিট পেতাম, তবে দু'দিন একটু আরাম করে রেষ্ট নিয়ে নিতাম. টুমওয়ে আন্দোলনের সময় ক'দিন জেল খেটে এসেছি. সেখানে রেষ্ট হয় ঠিক, কিন্তু কোন রকম কম্‌ফর্ট থাকে না।

অরুণ রংগ করে হেসে যে কথা বলতে চেয়েছিল, সে কথা যে, কোথায় কি ভাবে আঘাত করে কতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা সে ভাবতেও পারে নি। শান্তা ধীরে কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বল্‌লো: দাদা অতি বড় শত্রুর জন্যেও টি, বি হসপিটালে বেডের কামনা করো না, এখানকার রোগীরা সুখে থাকে বা কম্‌ফর্ট কতখানি পায় সে কথা সঠিক জানিনে, কিন্তু তাদের ক্লান্তিকর মানসিক দ্বন্দ্বের কথা জানি, সে যে কত দুর্বিষহ তা তোমরা কস্মিনকালেও কল্পনা করতে পারবে না।

"এখানে এসে ছ'মাস এক বছরের পূর্বে তো কেউ বাড়ি যেতে পারেই না, বরং অধিকাংশকেই দীর্ঘকাল এখানে থাকতে হয়। তার ওপর অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাড়ির লোক মাসে চার-পাঁচ দিনের বেশি দেখতে আসে না; ভাবতে পার রোগীদের দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টা সময় কি করে কাটে? তোমরা বাইরের থেকে দেখে ভাবতে পার দুগ্ধফেননিভ শয্যা, প্রচুর রসনা পরিতৃপ্তিকর খাদ্য, অবসর বিনোদনের জন্যে প্রতি ওয়ার্ডে রেডিও, তাস, ক্যারাম এবং পাঠাগারের গ্রাহক হলে প্রত্যেক রোগীর জন্যে সপ্তাহে দুখানা করে বই—আবার কি চাই? এর সব কথাটি সত্য, তবু তার পাশে আর একটা মর্মান্তিক সত্য আছে—ক্ষয়রোগে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর সম্ভাবনা এবং চার পাশের নির্মম অবহেলা। ক্ষয়রোগ ক্ষয় করছে রক্ত-মাংসের দেহ এবং মৃত্যু আর অন্য বহুতর চিন্তা অহরহ শোষণ করছে মানসিক শান্তি।

প্রতিদিন রোগীরা একটু একটু করে মৃত্যুর মধ্যে নিজেদের বিলুপ্ত করে দিচ্ছে, এর মত মর্মান্তিক আর কোন শাস্তি কি স্রষ্টার সৃষ্টিতে আছে? তুমি জেলের কথা বলছ—জেলের মধ্যে গৌরব আছে, আছে সহস্র রকমের সান্ত্বনা।

"তুমি দেশের কাজে জেলে গেছ, তুমি মনে মনে গৌরব বোধ করতে পার, শত সহস্র মানুষের দুঃখকে তুমি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছ বলে। তোমার জন্যে সহস্র সহস্র নর-নারী পূজার ডালি সাজিয়ে রেখেছে, মনে মনে রেখেছে তোমার জন্যে আন্তরিক শুভ কামনা আর কি চাই? সেখানে জেলে থাকার বেদনা অকিঞ্চিৎকর আর চোর ডাকাত, গুণ্ডা এবং বদমাইসের কথা বলবে, তাদেরও একটা সান্ত্বনা আছে তারা কৃত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা কোথায়? আমরা কি হেলায় ছলে হাতে করে টি. বির জার্ম গিলে এসেছি অথবা টি. বি রোগীর সংগে অহেতুক মাখামাখি করে টি. বি বাধিয়েছি? আমাদের এ রোগের জন্যে কি বলে নিজেদের দোষী করে সান্ত্বনা লাভ করবো? যদি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, আলো হাওয়া না পাওয়ার জন্যে অধিকাংশের ক্ষয়রোগ হয়ে থাকে অথবা যদি প্রাণের দায়ে ট্রামে-বাসে ক্ষয় রোগীর পাশে বসে যেতে গিয়ে না জেনে বুকের মধ্যে বাসাকীট ভরে নিয়ে এসে থাকি তার জন্যে কি প্রকৃত পক্ষে আমরা দায়ী?

"সান্ত্বনা নেই বরং আশে পাশে থেকে মরণ অহরহ আমাদের দিকে তাকাচ্ছে এবং অবহেলার নির্মম প্রহার আমাদের জর্জরিত করছে। তোমরা যত বড় অনুভূতিপরায়ণই হওনা কেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবন কিছুতেই তোমরা কল্পনায় আনতে পারবে না। এক হঠাৎ দৈব যদি তোমাদের বুঝিয়ে দেয় সে স্বতন্ত্র কথা।"

পুষ্টিকর খাদ্য, রেষ্ট এবং ওষুধ সব কটিই ক্ষয় রোগ চিকিৎসার বিজ্ঞান সম্মত পন্থা তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবু ক্ষয় রোগীদের মানসিক স্ফূর্তি না থাকলে ওষুধ, পুষ্টিকর খাদ্য আলো-হাওয়া এবং রেষ্ট রোগ নিরাময়ের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। রোগ এবং মৃত্যু চিন্তা থেকে রোগীদের মনকে ঘুরে সরিয়ে না রাখতে পারলে, আরো অধিক সংখ্যায় রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

মেল ওয়ার্ডের সতীশ বাবু একটু ভিন্ন মেজাজের লোক। ভদ্রলোকের অসুখ খুব কম ছিল আর সেই ছিল তাঁর কাল। অল্প অসুখের গর্বে ভদ্রলোক তার ঘর থেকে বেরুতেন না, কথা কইতেন না অন্য রোগীদের সংগে। ভয় ছিল তাদের ছোঁয়াচে যদি তার অসুখ বেড়ে যায়। আর ঐ আশংকার জন্যে ধাই-ভৃত্য সবার সংগেই তাঁর মনকষাকষির অন্ত ছিল না।

অন্যদিনের মত ভৃত্য সেদিন বিকেলে ওঁর কাপড় তুলে বল্‌লো: বাবু আপনার কাপড় কোন খানা দেখে নিন।

আর যায় কোথায়, ভদ্রলোক একেবারে ক্ষেপে গেলেন। বল্‌লেন: তোকে আমি কতবার না বলেছি আমার কাপড় কেচে আলাদা করে লুকিয়ে নিয়ে আসবে, তবু তুমি সেই এক সংগে করে নিয়ে এসেছ?

অন্যের যে অসুখ আপনারও সেই অসুখ তার আবার অত আলাদা করতে হবে কি? আর জনে-জনের কাপড় আলাদা করে কেচে শুকিয়ে আনার মত সময় ত আমাদের থাকে না। আপনার যদি অতই আলাদা করে ছোঁয়া বাঁচাবার প্রয়োজন হয় তবে টাকা দিয়ে আলাদা লোক রাখুন, এখানে তো আর লোকের অভাব নেই।

যতীনবাবু তেরিয়া হয়ে উঠেন। বল্‌লেন: তাই রাখবো, যত সব পাজি জোচ্চোর।

টিফিন, লানস্ বা ডিনার যাই হোক না কেন খেয়ে সতীশবাবু থালা, বাটি গেলাশ আগলে বসে থাকতেন, ধাই থালা, বাটি, গেলাশ ধুতে এলে, সতীশবাবু বল্‌তেন: সবার তো ধোয়া হয়ে গেছে, না হয়ে

থাকে তো আগে ঘুরে এস। সব শেষে আমার কটা ঘুরে দিয়ে যেও। যার তার এটোর সংগে মিশিয়ে যে সৃষ্টি খোয়াবে সেটি চলবে না।

যত সব—টি. বি পেসেন্টের আবার টি, বি-র ভয়। তা হলে আমরা আপনাদের এটো ছুই কেন? আমাদের কি জ্ঞানের ভয় নেই? থাক পড়ে আপনার থালা, বাটি, গেলাশ অত পেয়ে উঠিনে, বলে ধাই চলে যায়।

সতীশবাবু গজগজ করেন: নবাব সব।

বিজ্ঞান সম্মত পন্থা অবশ্য যাদের ঘুধু পজিটিভ তাদের পজেটিভ-ওয়ার্ডে এবং যাদের নেগেটিভ তাদের নেগিটিভ ওয়ার্ডে রাখা. কিন্তু এখানে তা সব সময় সম্ভব হয় না. না হলেও ক্ষয় রোগের সংগে সংগ্রাম করে যাদের রেজিষ্টান্স পাওয়ার বেড়ে গেছে এবং নিয়মিত ট্রিটমেন্টের অধীনে যারা আছে তাদের বুকে নতুন করে দুই-এক লক্ষ টি, বি জার্ম প্রবেশ করে অবস্থার বড় রকমের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। আসলে এমন খিট্‌খিটে শুচিবাই আসে রোগীর মৃত্যু ভয় থেকে—এতে কোন সংশয় নেই। তবে এ কথাও ঠিক ঐ ধরণের ছুচিবাই গ্রস্ত লোক সারা জীবন ধরে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে যাবে। কেন না প্রতি মুহূর্তেই অপূর্ণতার বেদনা এঁদের ক্ষতবিক্ষত করে।

সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে রাণীর ওখান থেকে উঠে নিচে নেমে কয়েক পা এগুতেই কানে এলো কে যেন আমার অতি ঘনিষ্ঠ নাম ধরে ডাকছে। অতি মাত্রায় বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যে নাম ধরে মা-বাবা, খুব নিকট আত্মীয়-স্বজন এবং মুষ্টিমেয় দুই-এক জন বন্ধু ডাকে, এই ভর সন্ধ্যে বেলায় টি-বি-হাসপাতালে কে আমার সেই নাম ধরে ডাকতে পারে ভেবে পেলাম না। আশে. পাশে, সামনে এবং পেছনে চেয়ে কাউকে কোথাও দেখতে পেলাম না। পরে ডান পাশের [illegible]ডিটার দিকে মুখ তুলে চাইতেই দেখি, তেতলার বারের জানালায় দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রমহিলা। দূর থেকে আবছা অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে মুখখানা চেনা কি অচেনা ভালিস দেওয়ার পূর্বেই ভদ্রমহিলা হাত তুলে ডাকলেন: এই যে, শুনুন শুনুন।

এক মিনিট ইতস্তত করে ফিরতে হলো। তাঁকে চিনতে না পারলেও মনে মনে একটা সান্ত্বনা ছিল এই, যিনি আমার নেহাৎ ঘরোয়া নামটা জানেন, তিনি একদিন নিশ্চয় আমার বিশেষ পরিচিতা ছিলেন।

উপরে গিয়ে যাঁর সামনে মুখোমুখি দাঁড়ালাম তাঁর সঙ্গে যে. কস্মিন কালে আমার কোন পরিচয় ছিল এমনটা কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না।

পরে ভদ্র মহিলার আত্ম পরিচয় থেকে তাঁকে চিনলাম, তখন পূর্বের না চেনার জন্যে কিছুতেই নিজের উপর দোষারোপ করতে পারলাম না।

ভদ্রমহিলার নাম রুবলা। এক যুগে বাড়ি ছিল প্রায় আমাদের বাড়ির কাছাকাছি অর্থাৎ দু-বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি হলে চার ফারলঙ-এর বেশি ছিল না। তবু ওর সংগে আমার কোনই আলাপ পরিচয় ছিল না। বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো এবং অন্যান্য কাজকর্ম উপলক্ষে তাঁকে বোনদের মধ্যে দেখেছি, আর দেখেছি কখনও কখনও বিকেলের দিকে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতে, এই তো মুখদেখা পরিচয়। আর সে পরিচয়ও ছিল বাল্যের। -তারপর প্রায় বছর দশেক হলো বাড়ি ছেড়েছি, পাকিস্তান হয়েছে আর বাড়ি যাওয়া হয়নি, ওকেও আর দেখিনি। এবং ইতিমধ্যে ওর টি. বি হয়ে দেহেরও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে, বদলে গেছে মুখের চেহারা। আর পরিবর্তন মানে কি, দেখলে মনে হয় একখানা কংকালকে কে যেন অসীম করুণা করে একখণ্ড চামড়ার চাদর দিয়ে মুড়ে রেখেছে। চামড়ার নীচের নীল বড়, বড় শিরাগুলো পর্যন্ত কেমন যেন বিশ্রী হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে! মাংস বলে বস্তুটা দেহের কোথাও একতিল আছে বলে মনে হয় না। হাতের কবজি এবং আঙুলগুলো যেন কাঠি-কুঠির মত। মুখের দু'পাশের হাড় দু'খানা

অসম্ভব রকম উঁচু হয়ে উঠেছে। চোখ দুটোকে কে যেন এক হাতুড়ির ঘা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। সেই বসা চোখ দুটোর উপর কপালের হাড়খানা ঝুঁকে পড়ে, চোখ দুটোর অনেক খানি আবৃত করে ফেলেছে কাজেই আমার পক্ষে ওঁকে না চেনাটাই ছিল স্বাভাবিক।

বেশ মনে পড়ে বাড়ি থাকতে পঞ্চাশ সালে দুর্ভিক্ষ পীড়িত এমন বহু নর-নারী দেখেছিলাম। মাঝে মাঝে তাদের চোখেমুখে এক হিংস্রতার ঝিলিক লক্ষ্য করেছি, এর চোখেমুখে সে রকম তার লক্ষ করিনি ঠিক, তার কণ্ঠে এক অদ্ভুত জোর লক্ষ্য করেছি: অত জোর যে, ঐ অস্থি-চর্মসার দেহটার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

রমলাদেবী বললেন: আপনি এখানে কাকে দেখতে এসেছিলেন?

: ছোট একটা বাচ্চাকে দেখতে আসি, আপনি চিনবেন না।

: বাচ্চাদেরও আজকাল টি. বি হচ্ছে—মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজন ছেড়ে থাকা যে, কি কষ্ট সে আমরা বুঝি। যদিও আমি বেড পেশেন্ট তবু পরিচয় করিয়ে দেবেন মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবো।

: হ্যাঁ পরিচয় করিয়ে দেব।

: কতদিন হলো এখানে এসেছে?

: কত দিন আর মাস দুই এখনও হয়নি।

: ইস্ অসুখ যত কমই হোক না কেন, ছ'মাস-এক বছরের পূর্বে বাড়ি ফিরতে পারবে না! আমার বছর কয়েক পূর্বে একবার প্রথম অসুখ হয়। তিন বছর কাঁচড়াপাড়ায় থেকে ভাল হয়ে বাড়ি ফিরি। শরীর কি ভালই না হয়ে ছিল, তেমন মোটাসোটা আমি কোন কালেই ছিলাম না। বছর খানেক পরে একটা বাচ্চা হতেই আবার বুকে পিঠে বেশ একটা ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। গামছা নিংড়াতে গেলে বা কলস তুলতে গেলেও বুকের মাঝখানে লাগতে লাগল। কাশিও ছিল সংগে একটু। প্লেট তুলে দেখা গেল ফের টি. বি হয়েছে। প্রথম বার হয়েছিল ডান-দিকে এবার বাঁ-দিকে। হলো সারলো, হোল। ও তো সকাল-সন্ধ্যে-দুপোর খানাহার ত্যাগ করে ঘুরতে লাগল, কিন্তু হসপিট্যাল আর হয় না। এদিকে অল্পদিন না যেতেই রক্ত উঠতে লাগল। প্রথমবার কিন্তু রক্ত ওঠেনি একদিনও। আরো কিছু দিন বাড়ি থাকার পর হসপিট্যাল ঠিক হলো। হসপিট্যালে এলাম, দেখতে দেখতে একটা বছর চলে গেল সারা তো দূরের কথা, শরীরের হাল হয়েছে দেখুন। যদি এবার আদৌ সেরে উঠি, তবে সে তিন-চার বছরের পূর্বে নয়।

রমলা দেবী একটু চুপ করে থেকে পুনরায় বললেন: মরবার আমার অবশ্য বিন্দুমাত্র ভয় নেই, কেবল তাজা রক্ত দেখলে সহ্য করতে পারি নে। তাই খুব পান খাচ্ছি আজকাল। পানের লাল দিয়ে রক্ত ঢাকা পড়ে।

রমলাদেবী মিথ্যে বলেন নি। মৃত্যু ভয় সত্যি তাঁর ছিল না। তবে রক্ত দেখলে ভয় পেতেন, তার ভিন্ন কারন থাকতে পারে। হয়ত কোন দিন কোন বিশেষ মুহূর্তে রক্ত সম্পর্কে একটা ভয় ওর বুকে বাসা বেঁধে থাকবে। আজও তা ঠিক পূর্বের মত অনড় হয়ে আছে। সে যা হোক মৃত্যু ভয় যে, রমলা দেবীর ছিল না সে কথা আমি জোর করে বলতে পারি। উনি যেমন জোরের সংগে বলতেন মরণকে আমি ভয় করিনে, তেমন জোরের সংগে টি. বি হসপিট্যালের রোগী তো দূরের কথা কোন সুস্থ লোককেও আমি পূর্বে কখনও বলতে শুনিনি।

রমলা দেবীর ধাতু-প্রকৃতিতে আর যাই থাক, মৃত্যু ভয় ছিল না তা আমি বহু বার বহু ভাবে প্রত্যক্ষ করেছি।

মরণরে,
তুঁহু মম শ্যাম-সমান।

এবং

অর্ত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরই ধরণ।
কহো, মিলনের একি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

এ গান রমলা দেবীর কণ্ঠে বেশ মানাতো। তিনি যদি গান গাইতে জানতেন তবে তিনিই হতেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ঐ গান দু'টি গাইবার যোগ্যতম অধিকারিণী।

ঘন্টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে আর দেরী করা নয়, শেষটা নার্সরা এসে যা তা বলবে, আর রোজই যখন এখানে আসছি তখন কাল পর্ত না হয় একবার আসবো, বলে উঠতেই রমলা দেবী বললেন: চলে যাবেন কিন্তু কোন কথাই তো শুনে নেওয়া হ'লো না। বাড়ি কত দিন যাননি বলুন তো?

: ছ'চল্লিশ সালে বাড়ি ছাড়ার পর আর বাড়ি যাইনি।

: অর্থাৎ আমার বিয়ের পূর্বে।

: হবে হয়ত বা।

: কাকিমা ওরাও আর যাননি।

: মা-বাবা একবার মাত্র ক'দিনের জন্যে গিছলেন; সেও চার পাঁচ বছর হয়ে গেছে।

: কাকিমাকে একদিন নিয়ে আসবেন বুঝলেন।

: হুঁ, কিন্তু আজ আর নয়, বলে আর অপেক্ষা মাত্র না করে বেরিয়ে পড়লাম।

পাঁচ সাতদিন পরে রাণীর ওখান থেকে উঠে দেখলাম, তখনও একটু সময় আছে, মনে করলাম, একবার রমলা দেবীর ওখান থেকে ঘুরে আসি। দূর থেকে অনেকগুলো কণ্ঠ ছাপিয়ে রমলা দেবীর কণ্ঠ কানে এলো। কিন্তু ঘরের ভেতর অতগুলো কণ্ঠ কাদের —ওর শ্বশুর বাড়ির লোক নয় তো? শ্বশুর বাড়ির লোক হলে তাঁরা আমাকে চিনবেন না—দেখে কি ভাববেন কে জানে?

আশংকা অমূলক ওর শ্বশুর বাড়ির কেউ নন। আশে পাশের রোগীর দল। আমি দরজার সামনে যেতেই সব ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রমলা দেবী আমাকে দেখে মনে মনে খুশী হলেও, মুখ গম্ভীর করে বললেন: এই বুঝি আপনার কাল, পর্ত?

: কাল পর্ত মোটেই সময় করতে পারিনি?

: কাকিমাকে আনেন নি?

: বোম্বেন তো মার আসা মানে এক দুর্গোৎসবের ব্যাপার, দেখি সুবিধামত একদিন নিয়ে আসার চেষ্টা করবো।

রমলা দেবীর মুখখানা একটু ম্লান হয়ে গেল। আমাকে দেখে হয়ত আশা করেছিলেন মা পেছনে আছেন এবং বহুদিন পরে দেশের পরিচিত একটা মানুষকে কাছে পেয়ে একটু তৃপ্তি অনুভব করবেন, কিন্তু তা না হওয়ায় উনি বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

সে মুখখানা আমার বুকে বিঁধলো। সহজ হওয়ার জন্যে বললাম: সময় আছে আপনাদের হস্পিট্যালের কিছু কিছু গল্প শুনান।

: কতকগুলো মরা মানুষের আবার গল্প কি?

: ভূত-প্রেতেরও গল্প হয়। সে যা হোক খুব চটে গেছেন বুঝতে পারছি, কাজেই আজকের মত উঠি।

: রাগ আবার করলাম কখন, আর আমরা রাগ করলেই বা আপনাদের কি এসে যায়?

: এটাও অরাগের কথা হলো না।

: আপনি কি আজ শুধু ঝগড়া করবেন বলে এসেছেন নাকি?

: তা অভিযোগটা মন্দ হলো না।

কথাটা বলে ফেলেই উনি বেশ লজ্জিত হয়েছেন বুঝলাম। এবং আবহাওয়াটা একটু হাল্কা করবার জন্যে বললেন: বাচ্চাটা কেমন আছে?

: একটু ভালোর দিকে বলেই তো মনে হচ্ছে, তবে নতুন প্লেট না তোলা পর্যন্ত সঠিক তো কিছু বুঝা যাচ্ছে না।

: সে কথা ঠিক, তা করে নাগাদ প্লেট তুলবে বলছে।

: তিন কুড়ির ভিতর।

: দেখুন ভালই হবে মনে হয়।

: উচিত তো তাই।

: কাকিনাকে একদিন নিয়ে আসবেন বুঝলেন।

: কথা দিতে পারছি নে, তবে ইচ্ছে রইলো।

: কতদিন দেখিনি, নিজেদের লোকজন দেখলেও একটু ভাল লাগে।

মনে পড়ল ঈশ্বর গুপ্তের সেই অপূর্ব ছত্রটি : 'দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া,' কথা কটি প্রবাসী মনের যেন মর্ম কথা। বললাম : রাগটা যখন কমেছে, এবার বলুন কেমন আছেন।

রমলা দেবী হেসে ফেললেন। বললেন : খুব ভালই, খুব শীঘ্র ছেড়ে দেবে, তবে এবার আপনাদের অ্যাম্বুলেন্স বা ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতে হবে না, হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি ডাকলেই চলবে।

রমলাদেবী যে ঐ কথাগুলো রাগ বা রংগ করে বলেছিলেন তা নয়, ঐ ছিল তার কথার ধরণ। উনি নিশ্চিত জানতেন এবার আর কিছুতেই বাঁচবেন না। শুধু উনি কেন অতিবড় আশাবাদীর পক্ষেও উনি বেঁচে উঠবেন, এ কথা আশা করা ছিল খুবই শক্ত। তবু বললাম বলে বলে ঐ সব বাজে কথাগুলো কি না চিন্তা করলেই নয়।

পূর্বের মত অল্প একটু হেসে বললেন : আপনি কি বিশ্বাস করেন আমি এবার ভাল হয়ে উঠবো।

না করার তো কোন কারণ দেখিনা। আজকের যুগে মরা মানুষকেও বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে, আর আপনি তো একটা জীবন্ত মানুষ।

আমি মরি এটা অবশ্য আমি চাইনা, কিন্তু এবার আমার মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত তবে তার জন্যে আমার কোন দুঃখ, ভয় বা ক্ষোভ নেই।

হ্যাঁ একথা উনি বলতে পারেন, ওঁকে আমি একটী দিনের জন্যেও মৃত্যু ভয়ে বিচলিত হতে দেখিনি। উনি বেশ সহজ ভাবেই সবার সঙ্গে আলাপ করতেন। বললাম : 'বাঁচবেন না এমন কথা ভাববার প্রয়োজনই বা কি।'

আবার সেই মিষ্টি হাসি দেখা দিল ওর মুখে, বললেন : কিছু না, কিন্তু তাতে সত্য মিথ্যে হয়ে যাবে না।

তেতলার সিড়ি বেয়ে যখন নিচে নেমে এসেছি—ঠিক সেই সময় হাত তুলে নমস্কার করে এক ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন : দেখুন কিছু মনে করবেন না আপনাকে যেন কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে — মুখখানা আপনার খুবই চেনা চেনা লাগছে, তবে ঠিক যে কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছিনে।

: ভবঘুরে মানুষ আজ এখানে কাল সেখানে এই করেই বেড়াই, কাজেই কোথাও হয়ত দেখে থাকবেন।

ভদ্রলোক বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। বললেন : আচ্ছা আপনি কি নৈহাটি, কাঁচরাপাড়ার ওদিকে থাকেন।

: না কোলকাতাতেই থাকি।

ভদ্রলোক একেবারে চুপসে গেলেন। অনেকটা সংকোচের সংগে বললেন : ঐ দিকের ট্রেণে কি আপনি কখনও যাতায়াত করেন নি।

: এক সময় দু-তিন দিন ও লাইনে গিছলাম বটে।

: একদিন দুপোর দুটো পনরোর ট্রেণে একজন যুবক দুজন বৃদ্ধাকে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন, তার ভেতর একজন বিধবা ছিলেন, তিনি ভিড়ের চাপে অজ্ঞান হয়ে গেছলেন—ছিলেন না আপনি সেই গাড়িতে।

: হ্যাঁ ঐ লাইনের গাড়িতে অনুরূপ এক ঘটনার সময় আমি গাড়িতে ছিলাম বটে।

ভদ্রলোকের মুখখানা বেশ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন : তাই বলুন। সেদিন ঐ কম্পার্টমেন্টে যারা ছিল তারা কি কোন দিন আপনার কথা ভুলতে পারবে?

আমি বেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

ভদ্রলোক তখন সুউচ্চ ভিতের উপর উঠে দাঁড়িয়ে-

ছিলেন। বললেন: তা আপনি এখানে কতদিন আছেন?

: আপনাদের হসপিট্যাল কর্তৃপক্ষ বড় নির্দয়, তাই আর এখানে বাস করাটা হয়ে উঠছে না, শুধু আসি আর যাই।

: কি ভুলটাই না করেছিলাম, ক্ষমা করবেন। রোজ বিকেলে আপনাকে উপর থেকে নামতে দেখে মনে করেছিলাম আপনি বুঝি উপরে থাকেন ওয়ার্কিং পেয়েছেন তাই বিকেলে মাঠে বেড়াতে বেরোন। তা আপনি এখানে কাকে দেখতে আসেন?

: ছোট একটা বাচ্চা আছে, তাকে।

: তা আপনি রোজ রোজ এখানে আসেন এটা তো ঠিক নয়। আমি মরবার ভয়ে এ কথা বলছি তা মনে করবেন না। এ রোগ হওয়া মানে সেরে উঠলেও চির-দিনের মত ইন্‌ভ্যালিড হয়ে যাওয়া। আমাদের যাদের প্রতিদিন খেটে খেতে হবে, তাদের এ রোগ হওয়ার পরে ভাল না হয়ে মরাই শ্রেয়। সাবধানের মার নেই, তাই বলছিলাম রোজ এখানে আসার দরকার কি।

: দরকার হচ্ছে বাচ্চাটার মনে স্ফূর্তি জাগিয়ে রাখা। তা বাদে টি. বি. হসপিট্যালে এলেই টি. বি. হবে একথা ঠিক নয়। আমি এখানে যাতায়াতে যথেষ্ট সচেতন এবং সতর্ক হয়ে, শুধু যে, ইন্‌ফেকশান না হতে পারে তা নয়। আর যে, পাইকারি হারে আজকাল টি. বি. হচ্ছে, তাতে যে কোন মুহূর্তে যে কোন স্থান থেকেই তা ইন্‌ফেকশান হতে পারে। এখন কথা হচ্ছে হসপিট্যালে আসা বা বাইরে ঘোরাঘুরিতে ইন্‌ফেকশান হতে পারে বলে ঘর থেকে বেরুব না সে তো আর চলেনা। আসল কথা আমাদের সব কিছুই করতে হবে, তবে আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না। যথোচিত সতর্ক থেকেও যদি টি. বি. হয়, তখন চিকিৎসা করান ছাড়া তো আর কোন উপায় থাকবে না।

: চিকিৎসা আপনি করলেন, সেরেও উঠলেন, কিন্তু ঐ অকর্মণ্য পঙ্গু দেহটা নিয়ে কি হবে!

: টি. বি. হলেই দেহটা অকেজো হয়ে যাবে এটা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন? তবে অকেজো যে কেউ কেউ না হন এমন আমি বলছিনা, কিন্তু সে হয় তারা, যাদের অসুখ খুব বেশি হয়েছিল, বড় রকমের অপারেশন করে হাড় কেটে বা লাংস বন্ধ করে দিয়ে ডাক্তার বাবুরা জোড়া তালি দিয়ে যাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন তারা। এ ছাড়া অধিকাংশই সেরে উঠে আবার পূর্বের মত কোন কর্ম করার শক্তি ফিরে পেয়ে থাকে।

আচ্ছা আমি যদি সত্যই সেরে উঠি, তবে এখান থেকে ফিরে গিয়ে কি অফিসের কাজে যোগ দিতে পারবো?

: না তা পারবেন না।

: তাহলে।

: উত্তরটা অতি সোজা, আপনি নিজেই একটু ভাবলে বুঝতে পারবেন। টি. বি. কে আপনি মারাত্মক অসুখ বলে জানেন এবং বিশ্বাস করেন টি. বি. হয়ে ভাল হলেও সে লোক আর কোন কাজে আসেনা, কিন্তু টাইফয়েডকে কি আপনি মারাত্মক রোগ বলে মনে করেন? করেন না তো বেশ, এখন বলুন তো আপনার টাইফয়েড হয়েছে, আপনি ভাল হয়ে ভাত খাওয়ার পরদিন কি অফিস করতে পারবেন?

: তা কি করে পারবো, টাইফয়েডে যে শরীর ভীষণ খারাপ করে ফেলে, দীর্ঘ দিন বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে পায়ের জোর চলে যায়, হাঁটতে গেলে পা কাঁপে, তবে সেরে ওঠার পর কিছুদিন খেয়ে দেয়ে শরীরটা ঠিক করে নিতে পারলে, ঠিক অফিস করতে পারবো।

: টি. বি. সম্পর্কেও ঐ একই কথা অর্থাৎ অসুখ সারলেও শরীর সারতে কিছু সময় লাগে এবং শরীর ঠিক হলে আপনি অকর্মণ্য হয়ে থাকবেন কেন? তবে টাইফয়েড থেকে উঠে শরীর ঠিক করতে যদি ছ'মাস লাগে, টি. বি. থেকে উঠে শরীর ঠিক করতে ছ'বছর লাগবে।

ভদ্রলোক ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। বললাম: আমি নিজে বারজন টি, বি, রোগীর কথা বিশেষ ভাবে জানি, তাঁদের দুজন মারা গেছেন আর বাকি দশজন ভাল হয়ে উঠেছেন। সেই দশজনের আটজন রেওয়ার ছুটাছুটি, কাজ-কর্ম এবং ঘর-সংসার করছেন! অন্য দু'জন এখনও কর্মঠ হয়ে উঠতে পারেন নি বটে, তবে আমার বিশ্বাস তাঁরাও একদিন পূর্ণ জীবনী শক্তি নিয়ে, জীবন যুদ্ধে যোগ দিতে পারবেন।

: তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি সেরে উঠলে পূর্বের মত কর্মদক্ষতা ফিরে পাব?

: আমি তো তাই বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাসটা অবৈজ্ঞানিক নয়।

: আপনার কথাগুলো মেনে নিয়ে সুখানুভব করছি বটে, তবু কথাটা সত্য হলেও সম্পূর্ণরূপে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করার মত জোর পাচ্ছিনে।

: সে আমিও বুঝি, তার কারণ হচ্ছে টি, বি, সম্পর্কে আমাদের অমূলক আতংক। টি, বি, কে আমরা সাক্ষাৎ যমদূত বলে জেনে এসেছি, এই জানারও যে একটা যুক্তি যুক্ত কারণ ছিল তাও আমি। কিছুকাল পূর্বেও টি, বি, হলে অনেকে আর সেরে উঠতেন না। তখন টি, বি-র প্রায় কোন ওষুধও ছিল না, কিন্তু আজ বহুলাংশে সে যুগ কেটে গেছে, আমাদের হাতে এখন বেশ কিছু ওষুধ-পত্র এসেছে এবং নিকট ভবিষ্যতে এমন দিন আসছে, যেদিন টি, বি, টাইফয়েডের মত আমাদের কাছে সহজ হয়ে আসবে, থাকবেনা আমাদের ক্ষয়রোগতংক, রোগা-রণ্যে টি, বি, ও অন্য পাঁচটা সহজ রোগের মত ম্লান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নারীর ভূমিকা

নাজী নারীর হাতে বন্দী-রাজা

শ্রীসুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(৯ম পরিচ্ছেদ)

"একটি নাজী বালিকার পরিকল্পনা যদি সফল হইত তাহা হইলে বেলজিয়াম যে ভাবে স্বাধীনতা ও শাসন-তন্ত্রের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহা করিত না।"

বেলজিয়ামে তাহাকে লোকে ব্যারনেস 'বি' বলিয়া কানাঘুষা করিত। সে রাজা লিওপোল্ড ও তাহার মা রাণী এলিজাবেথএর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। নাজীরা তাহাকে এই কাজের জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়াছিল।

সে জার্মানীর এক বিশেষ অভিজাত পরিবারের কন্যা এবং প্রধান সেনাপতির আত্মীয়া ছিল। সে নিজেকে জার্মানীর লৌহ মানব বিসমার্কের বংশোদ্ভবা বলিয়া দাবী করিত।

তাহার দুই ভাই জার্মানীর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল এবং আর এক ভাই যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে অত্যন্ত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল।

বর্ত্তমান অংশে অভিনয় করার জন্য রিবেণ্ট্রপ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল।

তখন সে সবেমাত্র একটি কিশোরী। কিন্তু তখন হইতেই নাজীবাদের প্রতি তাহার অকৃত্রিম নিষ্ঠা ছিল।

রিবেণ্ট্রপ তাহাকে বার্লিনের এক নিমন্ত্রণ সভায় দেখিতে পায়। জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ জার্মানীকে কি দিতে পারে তাহাই সে একজন বর্ষীয়সী মহিলাকে বুঝাইতেছিল।

বালিকার কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রথমে সে বেশ মজা পাইতেছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে তাহার যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া চমৎকৃত হইল এবং লক্ষ্য করিল যে শ্রোতার উপর সে যেন এক মোহিনী মায়া বিস্তার করিতেছে।

তার ধারণা হইল ব্যারনেস 'বি' প্রাণ-শক্তিতে পরিপূর্ণ এবং ঠিক ভাবে চালাইতে পারিলে তাহাকে দিয়া নাজীদের অনেক কাজ হইতে পারে।

বার্লিনের এই অভিজাত পরিবারের কন্যা ভবিষ্যতে কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনয় করিবে এবং ইতিহাসে তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, রিবেণ্ট্রপ তাহার সুদূর প্রসারী কল্পনা দ্বারা তখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

ব্যারনেস 'বি'কে দলে টানিয়া নিয়া ডাঃ গোয়েবেল্‌সের নিকট উপস্থিত করা হইল। সে তাহাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়া দলের জন্য কিছু কাজ করিয়া দিতে বলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই গোয়েবেল্‌স বুঝিতে পারিল যে ব্যারনেস একজন সাধারণ আত্মকেন্দ্রিক উচ্চাভিলাষিণী বালিকা নহে বা তাহার মধ্যে কোন কপটতাও নাই। সে হিটলার ও নাজীবাদের আন্তরিক সমর্থক।

শীঘ্রই বিরাট উইন্টার রিলিফ ফাণ্ডের এবং অন্যান্য নাজী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সে বার্লিনের অভিজাত মহিলাদের সভায় বক্তৃতা করিতে লাগিল। এই ভাবেই তাহার কাজ শুরু হইল।

গোয়েবেল্‌স এবং অন্যান্য বাছা বাছা শিক্ষকের নিপুণ শিক্ষার ফলে ক্রমেই সে প্রস্তুত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং রাজনৈতিক নেতাদের কিভাবে বশমতে আনিতে হয় তাহা শিখিতে লাগিল।

ইহাও নাজীদের একটি শয়তানীপূর্ণ পরিকল্পনা। যুদ্ধক্ষেত্রেই সব সময় যুদ্ধে জয়লাভ হয়না। দেশের বিশ্বাস-ঘাতকতা অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিদের দক্ষতা অপেক্ষা অনেক বেশী জয়লাভের সুযোগ আনিয়া দেয়।

ব্যারনেস 'বি' তাজিলা করিয়া উড়াইয়া দিবার মত তরুণী নহে। অদ্ভুত সৌন্দর্য, দীর্ঘ দেহ, রাণীর মত সংযম দেখিয়া তাহার আভিজাত্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মিতে লোকের দেরী লাগিত না। মাঝে মাঝে সে লজ্জানম্র সঙ্কোচ দেখাইলেও প্রায়ই তাহাকে তেজস্বী ও প্রভুত্ব পরায়ণ বলিয়া মনে হইত। কথা বলার সময় তাহার গভীর নীল চোখ কখনও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত কখনও বা রহস্যময় কৌতুক-চঞ্চল দেখাইত। তাহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ দেখিয়া মনে হইত যে কেহই তাহার প্রভাব এড়াইয়া যাইতে পারিবেনা।

মোটের উপর বিপজ্জনক খেলার অংশ গ্রহণ করার মত উপযুক্ত তরুণীই সে ছিল।

হিটলারের সহিত অনেকবার তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। এক সময় হিটলার তাহার রূপের ফাঁদে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের প্রায়ই এক সঙ্গে দেখা যাইত।

কিন্তু ব্যারনেস জানিত না যে তাহাকে কি কাজের ভার দেওয়া হইবে।

সেলজিয়ামে অন্য তরুণীরাও কাজ করিত কিন্তু ব্যারনেসের তুলনায় তাহারা ছিল অকিঞ্চিৎকর। হিটলারের পঞ্চম বাহিনীর কাজ তখন দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। রাজনৈতিক আবহাওয়ার উপর জার্মান সৈন্য নীতি কতকটা প্রভাব বিস্তার করিতেছিল কিন্তু তাহা দর্শকের মধ্যে ছিল না।

রাজা দলীয় চক্রান্ত হইতে দূরে ছিল। ইউরোপে শান্তিরক্ষা এবং নিজের দেশের উন্নতিই তাহার একমাত্র কাম্য ছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া রাজা লিওপোল্ড চুপ করিয়া বসিয়া ছিলনা। মূল্য যাহাই দিতে হউক না কেন, দেশ রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে সে জার্মানীর বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিতে প্রস্তুত ছিল। রাজা এবং রাজ-উপদেষ্টারা যুদ্ধের ঘনঘটা দেখিয়া জার্মান সীমান্ত রক্ষার আয়োজন করিতেছিল। ফ্রান্সের মত তাহারাও জার্মানীকে বাধা দিবার জন্য স্থায়ী দুর্গের উপর নির্ভর করিয়াছিল।

রাজা লিওপোল্ড বিশ্বাস করিল যে দেশ আক্রান্ত হইলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স সাহায্য করিবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাহার পিতাও এইরূপ করিয়াছিল।

রাজা লিওপোল্ড ব্রিটেনে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল এবং ব্রিটেনের সব কিছুর উপর তাহার একটা শ্রদ্ধা ছিল। সে জার্মানীদের বিশ্বাস করিত না এবং নাজী দর্শনের বিরোধী ছিল।

এই সময়ে তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। মোটর দুর্ঘটনায় তাহার রাণীর মৃত্যু হইল। রাজার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। উজ্জ্বল আনন্দময় জীবন বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হতাশ এবং বিষাদময় জীবন হইতে তাহাকে টানিয়া তোলা দুরূহ বলিয়া মনে হইল। তাহার নিকট জীবনের কোন মূল্যই রহিল না। সুইডেনের অষ্টিডের সহিত তাহার বিবাহ বাহিরের যোগাযোগের দ্বারায় স্থির হয় নাই ইহার মূলে গভীর স্থায়ী ভালবাসা ছিল। লিওপোল্ড তাহার রাণীর প্রতি একান্ত অনুগত ছিল এবং তাহার মৃত্যুতে রাজার মন একেবারে ভাঙিয়া গেল।

রাজমাতা এলিজাবেথ ছাড়া তাহাকে দেশের প্রতি কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা যাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রাজমাতার উপদেশে রাজা সুইজারল্যাণ্ড বেড়াইতে যাইতে রাজী হইল। তখন শীতের মরসুমী খেলা পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। বরফাবৃত পাহাড়ের উপর স্কী খেলিয়া রাজা নিজের দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল।

রাজা লিওপোল্ড যে হোটেলে উঠিল সেই দিনই ব্যারনেস 'বি' ও ঐ হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহা কি আকস্মিক ঘটনা? ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই দেখা গেল রাজা এই সুন্দরী তরুণীর সহিত আলাপ করিতেছে। সন্ধ্যায় তাহাদের একসঙ্গে নাচিতেও দেখা গেল। এ সবই কি আকস্মিক?

একই ফি পার্টির সভ্য হিসাবে পরদিন সকালে তাহাদের আবার সাক্ষাৎ হইল এবং বিকালে তাহারা আবার একত্রে নাচে যোগ দিল।

তাহার সান্নিধ্যে রাজাকে প্রফুল্ল এবং সুখী মনে হইল; মনে হইল সে নিজের দুঃখ ভুলিয়া আবার পূর্বেকার স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়া পাইয়াছে। তাহার সঙ্গীরা বহুদিন পরে আবার তাহাকে প্রথম হাসিতে দেখিল। ব্যারনেস 'বি' ধীরে ধীরে তাহার মোহ বিস্তার করিতেছিল।

জার্মান তরুণীর সহিত তাহার বন্ধুত্বের কথা জানাইয়া সে তার মাকে চিঠি লিখিল। এলিজাবেথ কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া তাহাকে দেখা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। রাজার পুনরুদ্ধারের যে কোন সুযোগই তাহার নিকট গ্রহণীয় ছিল। তাহার আশঙ্কা ছিল রাজা ক্রমে ক্রমে বিষাদে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সর্বদাই সেই মারাত্মক মোটর চালনার কথা রাজার মনে হইত এবং নিজেকেই সে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী মনে করিত।

শীতের মরসুমী খেলাগুলি শেষ হইয়া গিয়াছে। ব্যারনেস ব্রুসেল্‌সে গিয়া কয়েকদিন থাকার জন্য রাণীর নিমন্ত্রণ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল।

এদিকে বার্লিনে রিবেন্ট্‌প, গোয়েবেল্‌স ও হিটলার তাহাদের পরিকল্পনার সাফল্য দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ব্রাণ্ডার্সে রাণীর অতিথি হইয়া থাকিয়া সে কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া দিল এবং রাজার সহিত তাহার বন্ধুত্ব বাড়িয়া চলিল। নাজীদের গুপ্তচক্রে তাহার সহিত রাজা লিওপোল্ডের বিবাহের সম্ভাবনাও আলোচিত হইল। জার্মান তরুণীর এই পুরস্কার লাভ নাজীদের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও, তাহাদের আশা অনুযায়ী রাজা লিওপোল্ডকে এত সহজেই জালে জড়ান গেল না। বিবাহের কথা ঐ সময়ে অচিন্তনীয় ছিল।

ব্রাজীলুতের সহিত তাহার পুত্রের বন্ধুত্বে রাণী এলিজাবেথ তাহার সাধ্যমত উৎসাহ দিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে কোন কথাই সে শুনিতে চাহিতনা এবং বন্ধুত্ব ভিন্ন তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে ইহা বলিলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। সে যে নাজীদের একজন চর সে কথা রাণী এলিজাবেথ একেবারেই বিশ্বাস করিত না।

সে বলিত "তার নিকট আমাদের দেশ অনেক ভাবে ঋণী। রাজার জীবনে সে নূতন উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে এবং তাহাকে তাহার দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছে।"

লিওপোল্ড এবং ব্যারনেস কখনও খোলাখুলি একত্রে জনসাধারণের মধ্যে বাহির হইত না। বেশী কথা বলার জন্য সে ব্যস্ত ছিল না। যুদ্ধের কিছু পূর্বে ব্যারনেস তাহাকে একবার জার্মানীতে বেড়াইতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিল এবং তাহার মত হইলে রাজমাতাকেও সঙ্গে নিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু এরকম ভাবে ভ্রমণে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে ইহা মনে করিয়া লিওপোল্ড পরিষ্কার ভাবে ফাঁদে এড়াইয়া গেল। তার বদলে সে গোপনে ট্রিসবার্গে বেড়াইতে গেল। সেখানে ব্যারনেসের কিছু জমিদারী ছিল।

এই ভ্রমণের কথা বেলজিয়ামে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হইল। ট্রাসবার্গের স্থানীয় কাগজেও এ সম্বন্ধে কোন ঘোষণা বাহির হইল না। বেলজিয়ামের রাজা সেখানে সাধারণ লোকের মত ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হইয়া কয়েকদিন অবস্থান করিল।

রাণী এলিজাবেথ চাহিয়াছিল সে ব্যারনেস তাহার কাছে অনির্দিষ্টকাল থাকুক কিন্তু চতুর তরুণী এরকম প্রস্তাব আমল দিলনা। সে বুঝিতে পারিল রাজার উপর তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে তাহাকে আড়ালে থাকিতে হইবে এবং রাজাকেই তাহার দিকে আগাইয়া আসিতে হইবে।

কিন্তু কোন বিচ্ছেদ না আসিতে পারে সেজন্য সে যেন তাহাদেরই অনুরোধে রাজপ্রাসাদের নিকটে একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিতে রাজী হইল এবং রাজা ও রাজ-

মাতাকে তাহার বাড়ী ঘর সাজাইতে সাহায্য করিবার অনুমতি দিল।

এই সব বিলাসিতার সাজসরঞ্জামের খরচ প্রয়োজনীয় ব্যয় হিসাবে বার্লিন হইতে বহন করা হইল।

ব্যারনেস 'বি' অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে নাজীবাদের বিজ্ঞাপন ছড়াইত না। নিজেকে আড়ালে রাখিয়া কি ভাবে কাজ করিতে হয় সে বিষয়ে সে নিপুণ ভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিল।

যে হত্যাকারী মৃদু বিষক্রিয়া দ্বারা শিকারকে কাবু করে তাহারই মত সে ধীরে ধীরে জার্মানীর স্বার্থ সিদ্ধি করিতে লাগিল।

জার্মান সীমান্তে বিরাট দুর্গশ্রেণী নির্মান করিবার জন্য লিওপোল্ড বিশেষ জোর দিতেছিল। সে ব্যারনেসের নিকট দুর্গশ্রেণীর বিবরণ জানাইল। ধীর ভাবে সব শুনিয়া সে বলিল "এত অর্থ বৃথা ব্যয় করিয়া লাভ কি? জার্মানীর বেলজিয়াম আক্রমণ করিবার কোন ইচ্ছাই নাই।

রাজা তিক্তভাবে বলিয়াছিল "১৯১৪ সালেও সে কথা আমরা শুনিয়াছিলাম।"

ব্যারনেস উত্তর দিল "এখন অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তা ছাড়া এসব আলোচনায় আমাদের লাভ কি? বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন প্রশ্নই বর্তমানে উঠিতেছেনা। আমিও ত একজন জার্মান।"

মৃদু বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল।

তার পর আসিল যুদ্ধ। রাজার সহিত জার্মান তরুণীর বন্ধুত্ব ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইল না। লিওপোল্ড ক্রমেই তাহার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল এবং প্রায় প্রতিদিনই গোপনে তাহার সহিত দেখা করিতে লাগিল।

কখন কখন রাজমাতার প্রাসাদে দেখা হইত কখনও বা তরুণীর নিজের বাড়ীতে দেখা হইত।

সর্বদাই রাজাকে আশ্বাস দেওয়া হইত যে বেলজিয়ামকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য রাজা যখন এত চেষ্টা করিতেছে, তখন জার্মানী অবশ্যই তাহার নিরপেক্ষতা মান্য করিয়া চলিবে। রাজাও এই আশ্বাসবাণী সত্য বলিয়া মনে করিত।

সে ছোট ছোট জাতিগুলি লইয়া আত্মরক্ষার জন্য জোট বাঁধিতে চেষ্টা করিল। যুদ্ধ তাহার সীমান্তের নিকটবর্তী হইয়া আসিলে তাহার দুর্গশ্রেণী সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইল।

ব্যারনেসের কাজ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। রাজার মাধ্যমে বেলজিয়ামকে মিথ্যা আশ্বাসে ভুলাইয়া রাখিতে হইবে, উদ্যত আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিরোধ না হয়।

দেশের ভিতরে পঞ্চম বাহিনী হার্লিসের নির্দেশে কাজ করিতেছে কিন্তু ব্যারনেসের কাজ ছিল সাধারণ পঞ্চম বাহিনী বা নাজী প্রচারকদের অনেক উর্ধ্বে। সে তার নিজের পদ্ধতিতে নিজের কাজ করিয়া যাইত এবং সে কাজের সাফল্য সম্বন্ধে তাহার ধারণা খুব উচ্চ ছিল।

বেলজিয়ামের আত্মরক্ষার সমস্ত গোপন তথ্যই জার্মান সমর-নায়কদের জানা ছিল। তাহাদের দুর্বলতাগুলি লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইল।

শেষ আঘাত আসিয়া পড়িল; রাতারাতি জার্মান বাহিনী অভিযান আরম্ভ করিয়া দিল এবং পুনরায় আর একবার বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হইল।

রাজা লিওপোল্ড নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সাহসের সহিত নিজের সৈন্য বাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়াইয়া নিষ্ফল যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সৈন্যদেরও বেলজিয়ামের সাহায্যে আসিতে দেরী হইল। ফ্রান্স ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। এসবই ইতিহাসের কথা।

নেপথ্যে কি হইতেছিল?

সমগ্র ব্রিটিশ বাহিনীকে বন্দীত্বের মুখে সমর্পণ করিয়া রাজা লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণের কারণ কি?

মাসের পর মাস সেই মোহিনী যাদুকরী ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে বিষ সঞ্চার করিতেছিল। দুর্ধর্ষ জার্মান-

বাহিনীর প্রতিরোধ করার চেষ্টা আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। জার্মানীর অগ্রগতি রোধ করিতে গেলে যে কোন জাতিরই ধ্বংস অনিবার্য, বরং জার্মানীর সহযোগিতা করিলে জার্মানী তাহাদের ভাল সর্তে সুখ ও স্বাধীনতা দিতে পারে। ইউরোপে শান্তিভঙ্গ করার জন্য ইংরাজরাই দায়ী। ধনতা ও রাজ্যের লোভে, পৃথিবীর উপর আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য এবং জার্মানীর ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা দমন করিবার জন্য ইংরাজরাই অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে।

ইংরাজরা তখন কোথায় ছিল? তাহাদের সৈন্য-বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইল। ফ্রান্সকে দিয়া যুদ্ধ করাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া তাহারা দেখিল যে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া একলা যুদ্ধ করা ছাড়া তাহাদের আর কোন গতি নাই। মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাইতেছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ধ্বংস অনিবার্য। ইংল্যাণ্ড ধূলায় মিশিয়া যাইবে।

অনভিজ্ঞ যুবক লিওপোল্ড দিশাহারা হইয়া দেখিল পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইতেছে!

নরওয়ে আক্রান্ত হইয়াছে, ডেনমার্ক বিনা বাধায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, হল্যাণ্ড ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ফ্রান্স ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সাহসী ব্রিটিশ বাহিনী ডানকার্কের দিকে সরিয়া যাইতেছে।

ব্যারনেস যে সমস্ত পূর্বাভাস দিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল সবই সেইরকম ঘটিল।

এবারে বিয়ের পূর্ব ক্রিয়া দেখা দিল! লিওপোল্ড হতাশায় ভাঙিয়া পড়িয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল। দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার কোন আশাই রহিল না।

বেলজিয়ামের রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়া সন্ধির সর্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কার্যতঃ আজ সে নিজের প্রাসাদে বন্দী। জার্মানরা দেশে লুণ্ঠনরাজ করিতেছে, দেশের লোকের সহিত ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে।

এই হীন চক্রান্ত সম্পূর্ণ সফল না হইলেও তাহাদের সাফল্য লাভ করিবার পথ এইরূপ সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার জন্য হিটলার, রিবেন্ট্রপ এবং গোয়েবেলস্ তাহাদের ছাত্রীর জন্য গর্ব অনুভব করিতে পারে।

ভারত ও কমনওয়েলথ

শঙ্কর

মিঃ বিভান শ্রমিক দলের নেতা। বিশেষ ভাবে প্রগতিপন্থী নেতা বলিয়াই খ্যাত। বর্তমানে তিনি ভারত ভ্রমণে-রত আছেন। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভারত যদি কমনওয়েলথ পরিত্যাগ করে তবে তাহা রাজনৈতিক দিক হইতে ভুল হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও সাম্রাজ্যবাদী-রাজনীতিকদের এই কমনওয়েলথ একটি অদ্ভুত সংস্থা। এই সংস্থাটি প্রথমে বিশেষ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতির ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক চেতনার অভিব্যক্তিতে ব্যর্থ হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির সমাবেশে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা জাতীয় চেতনা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রূপ লইল। দক্ষিণ আফ্রিকার এই জাতীয় চেতনা হয় বর্ণবিদ্বেষে পরিণত হইল, অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেত জাতির বিশেষ আবাসভূমির দাবীতে পরিণত হইল। অথচ সাম্রাজ্যের সামরিক প্রতিরক্ষাকে কেন্দ্র করিয়াই এই কমনওয়েলথ মূলত গঠিত হইয়াছিল, ইহার সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত রহিয়াছে সাম্রাজ্যের অর্থনীতি।

বস্তুত এই সাম্রাজ্যিক অর্থনীতি কমনওয়েলথের জাতিগুলিকে কোথায়-ও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করিতেছে। এই অর্থনীতির প্রভাব যাহাতে খোলা স্রোতে প্রভাবিত না হয় তাহার জন্য নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে ভারত ও পাকীস্তান দুইটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইবার পর সাম্রাজ্যিক অর্থনীতি বহুল পরিমাণে তাহার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই পরিবর্তিত অর্থনীতিই কমনওয়েলথের সদস্যগণকে এক নয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে।

কমনওয়েলথের রাষ্ট্রগোষ্ঠীর যাহা সংগঠন রহিয়াছে তাহাতে কেহ কাহারো রাষ্ট্রগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। একই রাজনৈতিক সাহচর্যের মধ্যে থাকিয়া রাষ্ট্রগত বিরোধ না হইলেও বহুক্ষেত্রে স্বার্থের বিরোধ অনেকটা নূতন ধরণের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। কমনওয়েলথ রাষ্ট্র সমষ্টির সভ্য হিসাবে ব্রিটেন ও দক্ষিণ আফ্রিকা পাশাপাশি কাজ করিতেছে। অথচ ব্রিটেনের দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ নীতির বিরোধিতা করিবার মন নাই। ভারত ও পাকিস্তানকে যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতি করিতেছে তাহা ব্রিটেনকে পরোক্ষভাবে স্পর্শ করিতেছে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটেন কিছু করিতে চাহেনা বা চাহিলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিবাদ করিবে। অষ্ট্রেলিয়া 'আনজাসে'র সদস্য। ইহার একটি সামরিক ও কূটনৈতিক দিক রহিয়াছে; এবং ইহার কেন্দ্রে মার্কিন প্রভাব পরিপূর্ণ বেগে কাজ করিতেছে। ইহা কমনওয়েলথের বাহিরের প্রভাব বলিয়া সবাই স্বীকার করিবেন। পাকিস্তান কমনওয়েলথ রাষ্ট্র সমষ্টির আর একটি সদস্য। সে বোগদাদ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে, এই বোগদাদ চুক্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনে কোন অস্পষ্ট ধারণা নাই। কি উদ্দেশ্যে এই চুক্তি রচিত—তাহা ভারতীয় রাজনীতিকেরা জানেন। ব্রিটেন নিজের স্বার্থে এই সামরিক চুক্তি জিয়াইয়া রাখিতেছে। অথচ কমনওয়েলথের আর একটি রাষ্ট্রকে যে এই চুক্তি ও মার্কিন সামরিক সাহায্য কি পরিমাণে আঘাত করিতেছে তাহা সে বিচার করিতে চাহেনা।

তাহা হইলে উপরিউক্ত বিশ্লেষণ হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কমনওয়েলথ রাষ্ট্র সমষ্টি মূলত সর্বব্যাপারেই স্বাধীন। শুধুমাত্র ব্রিটেনের রাজকীয়

প্রতীক বা রাজকীয় প্রতিভূর প্রতি সম্ভাষাপন্ন। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিবার রহিয়াছে, তাহা মূলত ব্রিটেনের বিষয়। ব্রিটেন এই রাষ্ট্র সমষ্টির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। ব্রিটেন তাহার শক্তি ও সামর্থ লইয়া যেদিকে ঝুঁকিবে সেদিকেই পাল্লা ভারি হইবে। বস্তুত ইহাই ভয়ের কারণ। কাশ্মীর ব্যাপারে ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল যেভাবে পাকিস্তানকে প্রশ্রয় দিয়াছে তাহাতে প্রতিটি ভারতবাসীর মনে এই কথাই উদয় হইয়াছে যে, কমনওয়েলথে থাকায় কেবলমাত্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিঃ বিভানের বক্তৃতায় এ জাতীয় দ্বন্দ্ব বা ঘোর কাটিবার কোন ইঙ্গিত নাই। এই সব পরস্পর রাজনৈতিক বিরোধ নিরসন করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই তবে কমনওয়েলথ টিকিয়া থাকিবে। অর্থাৎ কমনওয়েলথের রাষ্ট্রীক সম্বন্ধ অটুট থাকিবে। পরস্পরের স্বার্থের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করিলে আহত রাষ্ট্র কমনওয়েলথ ছাড়িবার সঙ্কল্প অবশ্যই করিবে। কমনওয়েলথ বাঁচাইতে হইলে ব্রিটেনকে নূতন করিয়া রাজনৈতিক চিন্তার সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

নয়া নিগ্রো রাষ্ট্র ঘানা

শত এবং সহস্র কণ্ঠের ধ্বনির মধ্যে ডাঃ অক্রুমা নূতন পশ্চিম আফ্রিকা রাষ্ট্র ঘানার জন্ম ঘোষণা করেন। এই রাষ্ট্রের পূর্বে নাম ছিল গোল্ডকোষ্ট। সম্ভবত ইহাই পশ্চিম আফ্রিকার দ্বিতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র। এত দিনে একটি নিগ্রো দেশের দুশ বছরের পরাধীনতার অবসান হইল। নেহেরুজী বলিয়াছেন আফ্রিকা মহাদেশে বহু গাঢ় ছায়ার ছাপ রহিয়াছে, এই গাঢ় ছায়ার আস্তরণ ভেদ করিয়া আলোর বিকাশকে নেহেরুজী সানন্দে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। এবং নেহেরুজী এই আশা পোষণ করেন যেন এইরূপ আলোর বিকাশ আরো ব্যাপক হয়। আমরা এশিয়াবাসীরা নিগ্রো দেশটির মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

ডাঃ অক্রুমা ঘোষণা করেন যে, তার সরকারের পররাষ্ট্র নীতি হইবে—শান্তি, মর্য্যাদা ও সৌহার্দ্য। বস্তুত এই তিনটি স্তম্ভের উপরই সব দেশের পররাষ্ট্রনীতি গঠিত হওয়া উচিত। আফ্রিকার এই স্বাধীন রাষ্ট্রটি আপনার মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ইহা আমরা আশা করি।

আমাদের মনে হয় ডাঃ অক্রুমা তাঁর ঘোষণায় মর্য্যাদা কথাটির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কেননা, ইহা বহুবার ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, নবগঠিত রাষ্ট্র নবলব্ধ নিজস্ব মর্য্যাদা অনেক সময় বৃহৎ ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। ফলে স্বাধীনতা পাইয়াও নবরাষ্ট্রগুলি মর্য্যাদার সহিত তাহা ভোগ করিবার অবকাশ পায় না। পরন্তু আভ্যন্তরীণ গোলযোগ অকাল মেঘের মত আসিয়া জোটে। তাহাতে মর্য্যাদা কথাটি এখানে বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব পাইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের পররাষ্ট্র নীতিতে 'শান্তি' ও 'সৌহার্দ্যের' স্থান অনেকখানি। ইহা সমানভাবে পররাষ্ট্র নীতিতে প্রতিফলিত না হইলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সকল উগ্রপন্থী রাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে। ইহার সমস্ত রাজনৈতিক কার্য্যাবলী দুরভিসন্ধি আত্মপ্রকাশ বলিয়া মনে হয়। সেদিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ডাঃ অক্রুমা পৃথিবীর সব বৃহৎ রাষ্ট্রের শুভেচ্ছা লইয়া কাজে হাত দিলেন। ইহা রাজনৈতিক পরিণত বুদ্ধির পরিচয় বলিতে হইবে, কেন-না, ডাঃ অক্রুমা বলিতেছেন যে, ঘানা কাহারো নিকট হইতে অর্থনৈতিক সাহায্য উপহার হিসাবে গ্রহণ করিবে না এবং ব্রিটেনের যখন একটি উপনিবেশ উন্নয়ন সংস্থা রহিয়াছে—ঠিক সেই প্রকৃতির আর একটি সংস্থা গঠন করিবে। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই উন্নয়ন সংস্থা গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ঘানার অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ। ঘানার কোকোসম্পদ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনে সক্ষম। ইহার সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য ডাঃ অক্রুমা ষ্টার্লিং এলাকার সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন, তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বিদেশী মূলধন পাওয়া যাইবে, এবং সম্ভবত তাহাদের তিনি কোনরূপ বিব্রত করিবেন না।

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ঘানা রাষ্ট্রকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘানার স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁর বাণী পাঠাইয়াছেন।

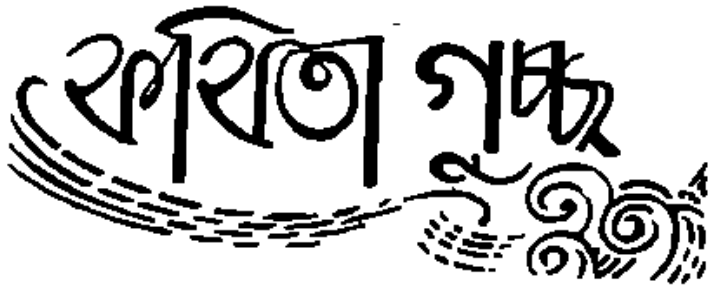

রাতের ক'লকাতা

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

এসপ্ল্যানেডের বুক জুড়ে
চোখে জ্বালে হাজারো বাতির
শিকার সন্ধানরতা চটুল চোখের তারা.
মানুষের ভীড়,
ধাবমান চল,
এই ট্রাম চলে গেল—
এই বাসে সেও নিখোঁজ
শহরে ঘুমন্ত চোখে ঘুম ঘুম রাতের তন্দ্রাঘোর।

দূরের গীর্জ্জা থেকে ভেসে আসে ঢং ঢং প্রহর ঘোষণা
কোনদিন থামবো না
বলেছিল এ সহর—ট্রাম বাস-কোলাহল
কল কারখানা
রাতের গর্ভ ছিঁড়ে
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে
আগুন নিশানা।

ধাতুচক্র ঘোরে ফেরে কত কড় ঝঞ্ঝার আলোকে
হৈ চৈ চীৎকার ধুলোট ধোঁয়ায় বোবা সাইরেনের স্বর
রাতের প্রশান্তি নামে দুরন্ত প্রাণ-বুকে'
বিকট দৈত্যের মত ঘুমায় সহর।

জীবন

অধ্যাপক—বাসুদেব দত্তরায়

ছলছল কলতান
শুধু সুর শুধু নৃত্য,
রঞ্জিত ব্যাকুল কল কোলাহল
অলক্ষ্য বাণের সন্ধান,
ব্যাকুল সুরের মূর্চ্ছনা
দুর্গম দুঃসহ পথে
নিত্য আনাগোনা।

কামনার সুপ্ত কোরক
গোপন রাত্রির অভিসার
অকম্পিত দীপ শিখা
লক্ষ কোটী প্রাণ তারকার।
গতিচুম্বিত পথে
লীলায়িত তাপরাশি
নব জনমের নূতন প্রকাশ
হাসি অশ্রু রাশি।

নব-পরিচ্ছেদ

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

এইখানে টানো পূর্ণচ্ছেদ,
আজিকার দ্বন্দ্ব ও বিভেদ
লুপ্ত হয়ে যাক চিরতরে।
মর্মের মর্মরে আর স্নায়ুর শিহরে
সুতীব্র পিপাসা—
জাগায়ে তুলুক বিশ্ব ভরি নূতন জিজ্ঞাসা।

আঁধার রাত্রির নভ ভরিয়াছে মেঘে,
অশনির ধ্বনি আর বিদ্যুতের সুতীক্ষ্ণ আবেগে—
সৃষ্টির শিয়রে আসে ঘনায়ে প্রলয়।
নিষ্ঠুর নির্মম মৃত্যু করাল কুটিল আর কৃষ্ণছায়াময়।

সৃষ্টির সুন্দর সুর বিপর্যস্ত হত্যার তাণ্ডবে,
ধ্বংসের উৎসবে।
মুমূর্ষুর নয়নের কোণে—
তবু আশা স্বপ্নজাল বোনে।
অনেক না দেখা স্বপ্ন, অস্ফুট কল্পনা,
ভয়াল তমিস্র রাতে বহি আনে উষার ঘোষণা।

দীর্ঘপথ—রুক্ষ রূঢ় বন্ধুর দুর্গম,
করি অতিক্রম
যেতে হবে দুর্দিনের দুরন্ত যাত্রীরে—
কামনার কনক মন্দিরে।
শীর্ণা নদীস্রোতোজলে আসিবে জোয়ার
দুর্দম দুর্বার।
জলোচ্ছ্বাস বিপুল বিশাল—
নিঃশেষে ভাসায়ে লবে অতীতের অস্থি ও কঙ্কাল।
নাহি দ্বিধা, নাহিক সংশয়,
মহান গৌরবে হবে আমাদের জয়

আবার উঠিবে জাগি নবীন উৎসাহ,
মৃত্তিকার মন্ত্রস্পর্শে মুছে যাবে অসুন্দর রুক্ষতার দাহ।
সতেজ শ্যামল—
ফলিবে মাটির বুকে নূতন ফসল।

আজ নহে দুঃখ সৈন্য, নহে আর ক্লেদ,
এইবার লেখা হবে নব পরিচ্ছেদ।

সত্যি...

মেপোল

সব চেয়ে ভাল

ACI ।/০ আনায় ১০টি, ১।/০ আনায় ৫০টি

কবি বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ধর্মতত্ত্ব

শ্রীসন্ধ্যা দত্ত

আজ বিংশ শতাব্দীর একপ্রান্তে বসিয়া সমগ্র বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য করিলে প্রথমেই যে প্রতিভাবান ও শক্তিধর পুরুষকে আমাদের মনে পড়ে, তিনি হইলেন উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের উজ্জ্বল প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ও সাধারণ পরিচয় ঔপন্যাসিকরূপে কিন্তু তাঁহার সমগ্র কার্য পর্যালোচনা করিলে যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে কেবলমাত্র ঔপন্যাসিক বলিয়া তাঁহার পরিচয় শেষ করা যায় না—তিনি একাধারে সাহিত্যিক, সমালোচক, ঋষি, কবি, দার্শনিক ও জাতীয়তার উদ্বোধক। 'কমলাকান্তে' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে' নানা তথ্য পরিবেশন করিয়া তিনি নিজের হৃদয় পাঠকের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা একরূপ ছিলনা বলিলেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সমালোচনা পদ্ধতি সাহিত্যে প্রবর্তন করেন—যাহার পূর্ণতা আমরা দেখি—রবীন্দ্রনাথে. 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টারূপে। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি-কবি। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতার উজ্জ্বল প্রাণবন্যায় ভারতীয় সভ্যতা যখন বিপন্ন—দেশের যুবকসমাজ উচ্ছৃঙ্খলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত—জাতীয় জীবনের এইরূপ এক সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র দ্বারা সমগ্র বাঙ্গালীর প্রাণচেতনায় যেন নতুন করিয়া অমৃতরস জোগাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন জাতীয়তার উদ্গাতা, হইলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। কত বড় অঙ্কের শক্তির অধিকারী হইলে শুধুমাত্র সাহিত্যের জগতেই নয়, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনেও নবসৃষ্টির বীজ বাঙ্গালীকে নতুন করিয়া জাগাইয়া তোলা সেই দুর্দিনেও সম্ভব হইয়াছিল—তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ঔপন্যাসিকরূপে হইলেও তাঁহার সমস্ত উপন্যাস রচনার অন্তরালে তাঁহার আর একটি পরিচয় গোপন রহিয়াছে—যে তিনি কবি। পুস্তক হিসাবে পৃথকভাবে তিনি কাব্য রচনা হয়ত করেন নাই; তাঁহার সমস্ত রচনাবলী পাঠান্তে আপাতদৃষ্টিতে কবি হয়ত তাঁহাকে বলা যায়না—কিন্তু তাঁহার রচনা যে বহুলাংশে কাব্যগুণসম্পন্ন একথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। 'কবি' শব্দের মূলগত অর্থ দ্রষ্টা। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টারূপে বঙ্কিমচন্দ্র কবি। কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' 'কে গায় ঐ' প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্কিমের প্রচুর কবিত্বের নিদর্শন বিদ্যমান। কমলাকান্তের দপ্তরে 'বসন্তের কোকিল' নামক প্রবন্ধটি ইংরাজী সাহিত্যে যাহাকে Fantasy বা কল্পলোক কাহিনী বলা হয়—তাহাই। এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু নির্বাচনেই বঙ্কিমের কবিকল্পনার একটা দিক প্রকাশিত হইয়াছে এবং কাব্যধর্মিতার গুণে শুষ্ক তথ্য অপূর্ব রসমণ্ডিত হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধুমাত্র কাব্যগুণের দিক দিয়া বিচার করিলেও কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমের অপরূপ সৃষ্টি।

প্রবন্ধ বাদ দিয়া উপন্যাসগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের কবিত্বের চূড়ান্তরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পর 'কপালকুণ্ডলা' 'মৃণালিনী' 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর' 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'রাজসিংহ' প্রভৃতি একে একে প্রকাশিত হয়। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে গিরিজায়ার গান-বঙ্কিমের স্বরচিত। এই কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে যেন আমরা বৈষ্ণবযুগে ফিরিয়া যাই—সেই যুগে, যেখানে :—

'দুহু কোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া'—

বঙ্কিমের এই রচনাগুলির মধ্য দিয়া যেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের ভাবগাম্ভীর্য ও পদলালিত্যের ইসারা পাওয়া যায়। তাঁহার 'মথুরাবাসিনী শ্যামবিলাসিনী রে' এই গানটির নিম্নলিখিত পংক্তি দুইটি—

"বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে
বহত নিশাস রে
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী
না মিটিল আশা রে"—

ব্যর্থ আশার এই অতৃপ্ত কামনা যেন কোন্ অনাদি যুগ হইতে প্রেমের অতৃপ্তি ঘোষণা করিয়া হৃদয়কে বিচ্ছেদের হাহাকারে পূর্ণ করিয়া তোলে। রাধিকার অন্তরের বিকৃতা শেষ লাইনটির মধ্যদিয়া অপূর্ব কাব্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে—যেন কথা কয়টিই একটি সম্পূর্ণ কাব্য।

শুধুমাত্র কপালিনীই নহে, এ যুগের অন্যান্য উপন্যাসগুলিও বঙ্কিমের কবিত্বশক্তির অভাব কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের পটভূমিকাই লেখকের ভাব ও কল্পনার চূড়ান্ত নিদর্শন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জনমানবহীন অরণ্যভূমি, দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রের জলরাশি আর পুণ্যসঙ্গমের মানসে প্রাচীন বঙ্গনরনারীর গঙ্গাসাগর যাত্রার জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া লেখক এমন এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন যে পাঠকের নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই তাহার মন কোন এক কল্পলোকের দিকে ছুটিয়া চলে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের conception প্রায় এক—রূপমোহের দ্বন্দ্ব, মানুষের জীবনে প্রেমই একমাত্র সত্য—যার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া ঘটে প্রকৃতির কাছে পুরুষকারের পরাভব—সেই Greek tragedy'র নিষ্ঠুর Fatalism বা নিয়তিবাদ। যত বড় দুর্ঘটনীয় পুরুষকারই হউক না কেন নিয়তিই ঘটায় তার পরাজয়। মানবজীবনের আদর্শ, ধর্ম, নৈতিক জ্ঞান সব কিছুর সমাপ্তি ঘটে পুরুষের জীবনে নিয়তির অমোঘ নিষ্ঠুর বিধানে। পাশ্চাত্যের এই ভাবধারা বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাস রচনায় অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্কিমসৃষ্ট ভবানন্দ, জীবানন্দ, চন্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, প্রতাপ প্রত্যেকেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মহিমাময়। কিন্তু এত বড় মহান্ সৃষ্টি, এত মহৎ চরিত্র যাঁহাদের তাঁহারা কেহই কি এড়াইতে পারিয়াছে জীবনের চিরন্তন সমস্যা প্রেম ও তাহার দ্বন্দ্বকে? কেহই পারে নাই। বঙ্কিম-উপন্যাসের এই জীবনজিজ্ঞাসা প্রত্যেক পুরুষ চরিত্রেই দেখা দিয়াছে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এই চরিত্রগুলি যেমন মহিমাময়—তাঁহাদের মৃত্যুর tragedyও ঠিক ততখানি মহনীয়। রূপমোহের এই ট্রাজেডি সাহিত্য জগতে বঙ্কিমের অমর সৃষ্টি। উপন্যাসগুলির কাহিনী ও ঘটনাসংস্থাপন এবং ইহাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে বঙ্কিম চূড়ান্ত ভাবে কাব্যিক মনের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন "—রূপে মুগ্ধ কে কার নয়?" অন্যত্র তাঁহাকে বলিতে শুনি—"রূপ রূপবানে নাই, রূপে স্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র"। প্রতাপের মৃত্যুর পর উপন্যাসের শেষাংশের—('যাও প্রতাপ' অনন্তস্বর্গ-ধামে যাও·····সহস্র শৈবালিনী পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও ভালবাসিতে চাহিবে না) বিচার করিলে বোঝা যায়, কথাগুলির মধ্যে কি দুর্বার আবেগ—অথচ শান্ত ও স্তিমিত ভাব—এক কথায় বলা যায়—কাব্যধর্মিতার চরম উৎকর্ষ। ইহা ছাড়াও বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাসেও কোথায় যে কাব্যরস ফুটিয়া ওঠে নাই—বাহির করা শক্ত।

আনন্দমঠ, 'সীতারাম' ও 'দেবী চৌধুরাণী' বঙ্কিমের এই ত্রয়ী শেষ বয়সের রচনা—যখন তিনি গীতার ব্যাখ্যা ও ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই উপন্যাস তিনখানি প্রধানতঃ গঠনমূলক ও ইহাদের মাধ্যমে আদর্শ প্রচারই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য। কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের উদ্দেশ্যমূলক রচনা হইলেও ভাবাবেগ ছাপাইয়া তত্ত্ব কোথাও বড় হইয়া উঠে নাই, বিশ্লচেতনাকে বাদ দিয়া নীতিজ্ঞান পায় নাই আধান্য, কারণ সহজাত কাব্যধর্ম সত্যানুসন্ধানের পথেও তার স্বাভাবিক বৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে না কখনই। তাই বঙ্কিমের ত্রয়ীতেও কাব্যগুণের অভাব দৃষ্ট হয়না। আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র কাব্যের চূড়ান্ত নিদর্শন। ইহাতে বঙ্গমাতার যে তেজস্বিনী সর্বঐশ্বর্যশালিনী একাধারে অন্ন ও অভয়দাত্রী মূর্তি আঁকিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ইতিপূর্বে আর কোন কবি এরূপ আঁকিতে সমর্থ হন নাই। ইহার পর বিচার করা যায়—শান্তি-জীবানন্দ, কল্যাণী-ভবানন্দের ট্রাজেডিকে। বঙ্কিমের কাব্যধর্মিতার মানদণ্ডরূপে, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিম নারীর প্রেমকে যাচাই করিয়াছেন দেশপ্রেমের কষ্টিপাথরে। সন্তানধর্ম কঠোর—নিয়তির মত নিষ্ঠুর, সাধারণ মানুষের ভাবাবেগের স্থান সেখানে নাই। কিন্তু মানুষের হৃদয়াবেগ কোন স্থির নির্দিষ্ট পথ মানিয়া চলে না। তাই ভবানন্দ জীবানন্দের মত মহাপুরুষ সন্তানধর্মে দীক্ষিত হইয়াও কঠোর কর্তব্যের গুরুভার মাথায় লইয়াও জীবনের সত্যকে রুধিতে পারে নাই অস্বীকার—একদিকে দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব, অপরদিকে নারীর প্রেম আদর্শের দ্বন্দ্বে, এই দুমুখী ভাবধারার সঙ্গমস্থলে তাঁহাদের চিত্ত দোলায়মান। তাই প্রচণ্ড অন্তর্দাহে তিল তিল করিয়া নিজেকে দগ্ধ করিয়া অবশেষে ভবানন্দকে দেখি কল্যাণীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে, হৃদয় মন অশান্ত, বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে সন্তানধর্মের বিরুদ্ধে, হৃদয়াবেগের নিকট আদর্শের ঘটিয়াছে পরাজয়। তাই কল্যাণীর প্রশ্নের উত্তরে ভবানন্দকে বলিতে শুনি—'সন্তানধর্ম অতলতলে ডুবিয়া যাক্, বল কল্যাণী তুমি আমার হইবে?' সমস্ত উপন্যাসখানির মধ্যে এত তীব্রভাবে প্রকাশিত হৃদয়াবেগ আর কোথাও নাই। এর সহিত সমান কাব্যগুণধর্মী

শান্তি-জীবনের ট্রাজেডি। সমস্ত সমস্যার সমাধান না হউক একটা সুসমঞ্জস আত্মসমীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন এই বলিয়া—"হায় রমণীরূপলাবণ্য, ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক্।"

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের উদ্দেশ্য স্বীকার করিতেন তাই তাঁর রচনা আগাগোড়াই কাব্য। তিনি জাতসারে ছন্দকাব্য রচনায় অকৃতকার্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সকল স্থানেই গদ্যে কাব্য রচনা করিয়াছেন। কবি মোহিতলাল তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সাহিত্যকে খাঁটি শিল্পকলার আদর্শে কল্পনা না করিয়াও তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কাব্যাংশেও কি মহৎ, কি সুন্দর ও মহিমময়"।

কিন্তু কেবলমাত্র কবিজনোচিত কল্পনা ও ভাব-সাম্রাজ্যেই বঙ্কিম অমর নহেন। তাঁহার ধর্মতত্ত্বে ধর্মের যে নূতন ব্যাখ্যা দেখা যায় তাহাও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের অমর প্রতিভার অবিস্মরণীয় অবদানের একদিক। ধর্মতত্ত্ব, অনুশীলন তত্ত্ব, 'বিবিধ প্রবন্ধ' 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি বঙ্কিমের পরিণত বয়সের রচনা—তাই অপেক্ষাকৃত ভাবগভীর ও তত্ত্বহুল বিবিধ প্রবন্ধের কতগুলি প্রবন্ধে তাঁহার দার্শনিকতার পরিচয় মেলে।

আনন্দমঠের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্যই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। সত্যানন্দের মত মহাপুরুষও এই ধর্মপথে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কারণ সত্যানন্দ শুধু জ্ঞান আহরণ করিয়াই নিবৃত্তি হইয়াছিলেন। তাঁহাতে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনের সামঞ্জস্য হয় নাই। গীতার এই আদর্শকে অবলম্বনপূর্বক বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের বৃত্তিগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন —শারীরিক ও মানসিক। মানসিক বৃত্তিগুলিকে তিনি আবার তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন—জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জনী। সংসারে যে কোন কর্ম করতে গেলেই প্রথমে প্রয়োজন সে বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান—যাহা কর্ম সম্পাদনের প্রেরণা বা উৎস। মানুষ জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করে, পরে কার্য-কারণ বৃত্তির সাহায্যে কর্ম সম্পাদনে উদ্যত হয় আর চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি মানুষের চিত্তকে নির্মল আনন্দে পূর্ণ করে। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তির ফল জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দ—যাহার সহিত জড়িত আছে ভক্তি-রসের নির্মলতা। সকল বৃত্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপন—ইহাই ধর্মতত্ত্বে দার্শনিক বঙ্কিমের মূল কথা। এই তত্ত্বই তিনি পরিণত বয়সের বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

বাঙালীর জাতীয় জীবনের এই দুর্দিনে বঙ্কিমের নব-প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন তত্ত্বের সত্যই প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। জাতি হিসাবে বাঙালী বড় ভাবপ্রবণ। ইহার অবশ্য ভাল ও মন্দ দুই দিকই আছে। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত ঘটায়। যে আদর্শে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের সন্তানগণকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন—সেই আদর্শ অনুসরণপূর্বক মানুষ ও জাতি হিসাবে সকলেরই জীবন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার ব্যাপকতা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোনরূপ বিশেষণে বিশ্লেষিত করিলেও এ প্রতিভার পরিমাপ হয় না। নবযুগের পথিকৃৎ, আধুনিক ঔপন্যাসিক-গণের পূর্বসূরী, বাঙালীর জাতীয়তার উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অমরত্ব স্মরণ করিয়া প্রত্যেকেরই নিজেকে কৃতার্থ মনে করা উচিত।

পুস্তক পরিচয়

হাসির তুবড়ি—শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার। আশুতোষ লাইব্রেরি; ৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ১৷৷০

উনিশটি মজাদার কবিতা। সঙ্গে মজাদার ছবি। ছোট ছেলেমেয়েদের ভাল লাগবে, সন্দেহ নেই। তাদের খুশী করবার জন্যে সাহিত্যিক ও প্রকাশকেরা যে আজকাল প্রচুর যত্ন নিচ্ছেন এবং নানাবিধ আয়োজন করছেন, তা দেখে আনন্দ হয়।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র—শ্রীমন্মথমোহন গোস্বামী, বসুমতী প্রেস—পাব্লিকেশন বিভাগ। ১৫৯।১৬০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ১২৲।

রুচি-ভেদে বস্তুতঃ ভারতচন্দ্রের প্রশংসায় এ যুগের শিক্ষিত বাঙালী কতকটা কুণ্ঠিত। শুধু প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। বস্তুতঃ সৌন্দর্য সৃষ্টিতে যে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জীবনের দুঃখের দিকটাই বেশীর ভাগ বড় কবি সযত্নে দেখিয়েছেন; সুখের দিকটাই বা কবি দেখবেন না কেন? ভারতচন্দ্র সুখের সুনিপুণ চিত্রকর। প্রণয়লীলার বিচিত্র রসমাধুর কত মনোজ্ঞ নাগরিক ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তার দৃষ্টান্ত পাই তাঁর রচনায়। শুধু তাই নয়, জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুকাবহ দৃশ্য হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর দৃষ্টিপাতে। বাংলা ভাষার তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, ভাবেও তাঁর স্বকীয়তা এবং বলিষ্ঠতা তর্কাতীত। তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অনন্যসাধারণ। শ্রীযুক্ত গোস্বামী আলোচ্য গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ কবির জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বহু তথ্য সযত্নে সংগ্রহ ও পরিবেশন করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে বইখানি মূল্যবান্।

চেঙা বেঙা (২): নাকাল নেংটি

(৩): চালাক বোকা।

লেখক: শ্রীবিনয় ঘোষ (মৌমাছি)। শিশুসাহিত্য সংসদ্; ২২এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲।

এত কম দামে পাতায় পাতায় রঙিন ছবিওয়ালা এমন মজাদার গল্পের বই দেওয়া যেতে পারে, তার দৃষ্টান্ত দেখালেন শিশু সাহিত্য-সংসদ্। নববর্ষে, পূজায়, জন্মদিনে বা পরীক্ষার পর শিশুদের উপহার দেবার চমৎকার জিনিস। মৌমাছি জুগিয়েছেন গল্পের মধু। নেংটি নাকাল হয়েও কি ক'রে ভাগ্যগুণে কেলেঙ্কারির হাত থেকে বেঁচে গেল, ছিজদবনে নাদাহুঁড়ি হাতীর ফটো তুলতে গিয়ে চেঙাবেঙার কি দুর্গতি ঘটলো, তেলা মনে করে কুমীরে চড়ে কি ক'রে তারা রক্ষা পেলো—সে সব কৌতুক খবর বেফাঁস করা হয়েছে এই দু'খানি বইয়ে। এ পর্যায়ে আরও অনেকগুলি বই বেরুবে। একখানা পড়লেই ছেলেমেয়েরা পরের খানার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবে, এমনি চিত্তাকর্ষক ক'রে লেখা হ'য়েছে গল্পগুলি।

শিক্ষায় পথিকৃৎ: শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৪৲।

শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে লেখক বাঙালীদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ গ্রন্থ শুধু তাঁর অধ্যয়নের নয়, অভিজ্ঞতারও ফল বহন করছে। মনোজ্ঞ, জ্ঞানগর্ভ তাঁর রচনা। কয়েকটি প্রবন্ধ 'মন্দিরা'য়, অপরগুলি অন্যান্য মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তখনই এগুলি চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রুসো, পেস্তালৎসী, হার্বার্ট, ফ্রোএবেল, মন্তেসরী, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—প্রধানতঃ এঁদের আদর্শ ও কর্মপন্থা এতে আলোচিত হয়েছে। আজ শিক্ষাসংস্কারের কথা উঠেছে। এ-বই থেকে আমরা অনেক ভাববার খোরাক পেতে পারি।

ধী—

বর্ষশেষ—

'মন্দিরা'র উনিশ বছর শেষ হ'লো ; বৈশাখে সে কুড়ি বছরে পড়বে। এই দীর্ঘ দিন নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে অতিবাহিত করতে হয়েছে। যখন সে প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তখন দেশের আকাশে রাজনৈতিক দুর্যোগের ঘনঘটা, ভারতবাসীর স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দমন করবার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের ধনুর্ভঙ্গ পণ। সেদিন সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবার সঙ্গে সঙ্গে সে মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছে নির্ভয়ে, শাসকদের কঠিন ভ্রূকুটিকে ভয় করে চলেনি। তার পর বহু বিপর্যয় উত্তীর্ণ হয়ে সে স্বাধীন ভারতের মন্দিরে প্রবেশ করেছে নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। বিদেশীর সঙ্গে সংগ্রাম শেষ হয়েছে, ঘরের কাজ সবই পড়ে আছে। মন দিতে হবে সেদিকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-উন্নয়ন—নানা দিকে কর্মী চাই, জাতি-গড়ার হাতিয়ার চাই। আজ বাইরের কোনও শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, দুঃখ-দৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অসাড়তা নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে অভিযান! শত শত গ্রামে আনতে হবে নবজীবনের স্বপ্ন, নগরে নগরে জাগাতে হবে নূতন কর্মপ্রেরণা। আত্মবিরোধে নয়, আত্মসংহতিতে জ্বালাতে হবে মঙ্গল প্রদীপ। আজকের মন্দিরার এই বাণী।

দক্ষিণারঞ্জন ও সুনির্মল—

শিশু-সাহিত্যের দুই অক্লান্ত সেবককে সম্প্রতি আমরা হারিয়েছি—'ঠাকুরমার ঝুলি'র অমর লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে এবং শিশুমনোহারী অসংখ্য মজাদার কবিতার লেখক সুনির্মল বসুকে। দক্ষিণারঞ্জনের বয়স হয়েছিল প্রায় আশী। আজ যাঁরা প্রৌঢ়, তাঁরা অনেকেই বাল্যে তাঁর বই হাতে নিয়ে রূপকথার স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করেছেন। লালকমল, নীলকমল, রাক্ষসীরাণী, ঝুমুরপক্ষী নাও, মন-পবনের দাঁড় আজও হয়ত তাঁদের মনের এক আশ্চর্য স্থল করে আছে। এমন ঠাকুর মায়ের মুখের ভাষাকে ছাপার অক্ষরে তুলে ধরতে আজ পর্যন্ত আর কেউ পারেননি। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বিশেষ ক'রে উল্লেখ করেছিলেন। তার পর 'ঠাকুরদাদার ঝুলি,' 'দাদামশায়ের থলে,' 'ঠান্‌দিদির থলে,' 'চারু ও হারু,' প্রভৃতি অনেক বই তিনি শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বাংলার রূপকথা, ব্রতকথা, রঙ্গকথা, গীতিকথা তাঁর চেষ্টায় বিস্মৃতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। সুনির্মল বসু পঞ্চাশের কোঠা ছাড়াবার আগেই বিদায় নিলেন। তাঁর মত ক'রে ছড়া বাঁধতে, ছোটদের মনের মত ক'রে গল্প-কবিতা রচনা করতে বেশী লেখক পারেননি। ও-গুলি যেন তাঁর মনোয়াসে আসত। তাঁর বইয়ের সংখ্যা বোধ হয় চল্লিশের কম নয়। ছোটদের প্রায় সব পত্রিকাতেই মাসে মাসে তাঁর লেখা বেরুত। সুরে, ছন্দে, ভাষার সরল কারুকাজে তাঁর রচনা পরম উপভোগ্য। কখনও পূর্ব-বাংলার, কখনও পশ্চিম-বাংলার, কখনও সাঁওতাল পরগণার দৃশ্য বর্ণনা করে, গান শুনিয়ে তিনি ছেলে-মেয়েদের মন চঞ্চল ক'রে তুলেছেন, কখনও বা আসর জমিয়ে পেটুক গদাইচরণের গল্প শুনিয়েছেন, আবার কখনও ঝিপটে 'ঠাকুর-ঝি'কে এনে দিয়ে তাদের অভিনয়ের শখও মিটিয়েছেন। ছোটদের মনে ছন্দ সম্বন্ধে কৌতূহল সঞ্চারের জন্যে 'ছন্দের টুংটাং' বলেও তিনি একখানি

সরস ছোট্ট বই লিখেছিলেন। বড় হয়েও যাঁরা শিশু-মনের কোমলতা ও সরসতা বজায় রাখতে পারেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।

নির্বাচনের পর—

নির্বাচনের পর ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদে এবং বিভিন্ন রাজ্যসভায় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের আয়োজন চলছে। কেরল ব্যতীত অন্য সব রাজ্যে কংগ্রেসী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে' তাঁরাই মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। উড়িষ্যাতে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ দলদল-নিরপেক্ষ গরিষ্ঠতা না থাকলেও দলনেতা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

কেরলে দু'জন স্বতন্ত্র সদস্যকে নিয়ে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত নাম্বুদ্রিপাদ উদ্বোধন-বক্তৃতায় বলেছেন, সকলের সহযোগিতা নিয়ে তিনি কর্মে অগ্রসর হতে চান; চাষীর উন্নতি এবং বেকার সমস্যার যথাসাধ্য সমাধান তাঁর কার্যসূচীতে প্রথম স্থান পাবে। সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, সম্ভবতঃ কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলীর কাজে তাঁরা কিছুটা নূতনত্ব দেখতে পাবেন; তবে তাঁর মনে হয়, ঐ কর্মচারীদের কাছ থেকে মন্ত্রিদের অনেক জিনিষ শেখবার থাকবে, আবার মন্ত্রিদের কাছ থেকেও কর্মচারীরা নিজেদের বিষয় পাবেন।

এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে আমরা আনন্দিত হয়েছি। শুধু নূতনত্বের জন্যই নয়। একদিকে জনমত যথাযোগ্য সম্মান পেয়েছে, অন্যদিকে কম্যুনিষ্ট কর্মীরা শুধু বিরুদ্ধ সমালোচনায় প্রবৃত্ত না থেকে জাতিগঠনের কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন। দায়িত্বভার গ্রহণ করে' তাঁরা অন্যদলীয় কর্মীদের সঙ্গে জাতিগঠনের কাজে অংশীদার হন, দলাদলি বা বিরোধে শক্তিক্ষয় না করে সমাজ-দেহে শক্তিসঞ্চার করুন, এই আমরা চাই।

নয়া পয়সা—

নয়া পয়সার বিভ্রাট ও বিভ্রান্তির অন্ত নেই। সরকার দশমিক মুদ্রা প্রচলনে উদ্‌যোগী হয়েছেন, তাতে কেউ বেশি আপত্তি করেন নি। কিন্তু নূতন পুরাতন মুদ্রা বিনিময়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় নানা অভিযোগ উঠছে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে হিসাব যেমন চলতে হয়। বিনিময়-হার নানাস্থানে নানারকম হলে লোকের অসুবিধা হয়। পূর্ব থেকে সরকারী অভিপ্রায় প্রচার না করায় জনসাধারণ বিনিময় সম্পর্কে সচেতন বা সতর্কও হতে পারে নি। আজ যখন তারা দেখছে, সরকার বলছেন, এক-আনার সমতুল্য ছয় নয়া পয়সা, অথচ সরকারী বাসে ও ট্রামে দাবি করা হচ্ছে এক আনার টিকিটে সাত নয়া পয়সা, সরকারী তালিকায় আছে দু'আনার মূল্য বারো নয়া পয়সা, কিন্তু দু'আনার এনভেলপ তাকে কিনতে হচ্ছে তেরো নয়া পয়সায়, তখন সে আপত্তি করবে বই কি! আরও অদ্ভুত, চিঠির খামে দু'আনার একখানা ডাক টিকিট সাপেক্ষে চলবে, কারণ তার তুলামূল্য তেরো নয়া পয়সা, কিন্তু এক আনার দু'খানা ডাক টিকিট চলবে না, কেন না ডাক বিভাগের নির্দেশ অনুসারে তাতে হবে ছয়-ছয় বারো নয়া পয়সা। একটি টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে কুড়ি খানা তিন পয়সার পোষ্টকার্ড (৩ পয়সা = ৪ নয়া পয়সা), কিন্তু ১৬টি আনির বদলে মিলবে উনিশখানা (৴৯ = ৬ নয়া পয়সা) আর ফেরত এক নয়া পয়সা। এ হিসাবে শিক্ষিতদেরই মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের তো যাবেই। আর সরকারী কর্মচারীরাও হিসেব করতে হিম্‌সিম্ খাচ্ছেন; ফলে ডাকঘরে ভিড় জমছে, কাজ এগোচ্ছে না, কখনও মারামারিও ঘটে যাচ্ছে। সহজবুদ্ধিসম্মত একটা বন্দোবস্ত করে তবে নতুন মুদ্রা বাজারে ছাড়া উচিত ছিল, আমাদের এই মনে হয়।

বঙ্গ সংস্কৃতি—

কয়েক বছর ধরে বঙ্গসংস্কৃতিসম্মেলন নামে একটি পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠান কলকাতা শহরে চলছে। বাউলি, বাউল, তর্জা, কবিগান, রামায়ণগান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি লোকসমক্ষে উপস্থিত করা অনুষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য। উদ্যোগ মহৎ এবং জনসমাগম দেখে বোঝা যায়, দেশবাসী এতে উৎসাহী। এ বৎসর অনুষ্ঠানের কাজ তেমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়নি। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে মনোযোগী হবেন আশা করি।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।